সুন্দর শ্রীমণ্ডিত
কেশের জন্য
সর্বদাই একটি ভাল কেশতৈল ব্যবহার করা উচিত। তেলের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে 'কোকোলা'র নাম। আদর্শ কেশতৈল হিসাবে কোকোলার খ্যাতি অর্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত।
কোকোলা
সর্বাধিক জনপ্রিয় কেশতৈল
জুয়েল অফ্ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৩৪

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

কথা ও কাহিনী

কথা ও কাহিনী

সূচীপত্র

শেফালীর মিতালী
হিমানী মানেই স্নো। হাঁ, ঠাকুমা তো তাই বলেন।
আর আজও নাকি "হিমানী" বল্লেই মুখে মাথায় স্নো-ই বোঝায়।
যদিও বাজারে এখন অনেক স্নো বেরিয়েছে, তবুও কমনীয়
ত্বকের বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হিমানী স্নোর প্রলেপের কাছে
আর কিছু নয়। খর শীত, প্রখর গ্রীষ্ম, আর্দ্র বর্ষা, বিধুর বসন্ত
- হিমানী সব ঋতুতেই সমান ভালো, কারণ এতে
নেই জান্তব স্নেহ, আছে শুধু ভেষজ উপাদান।
হিমানী স্নো
হিমানী প্রাইভেট লিঃ • কলিকাতা-২

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

প্রবন্ধ

কবিতা

সূচীপত্র

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা

কবিতা

কবিতা

সূচীপত্র

পথ চলতে মনে রাখবেন—১

অল্প কম, নিতান্ত প্রয়োজনীয় মালপত্র সঙ্গে করে আপনি রেলের কামরায় ঢোকামাত্রই দেখবেন সহযাত্রীরা যেন হাসিমুখে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে। কারণ আপনার মালপত্র যত্রতত্র না ছড়িয়ে, অন্য যাত্রীর বসার অসুবিধা না ঘটিয়ে সহজেই বেঞ্চের তলায় বা সুবিধামত জায়গায় রাখা যায়।

যাত্রাপথে অপ্রয়োজনীয় বাড়তি মালপত্র অনায়াসে লাগেজ ভ্যানে রেখে দিতে পারেন।

অল্প মাল নিয়ে চলুন, এতে আপনারও আরাম, অন্য যাত্রীদেরও স্বস্তি। সবাই আপনাকে সহযাত্রী হিসেবে পেতে চাইবে

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

"আমি গাইতে ভালবাসি—আর ভালবাসি গান শুনতে। সঙ্গীত আমার অন্তরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে আছে যে, গান বা বাজনা শুনলেই আমার মন ভরে ওঠে—তা সে গান বা সুর যত আলাদাই হোক। সেই কারণেই ফিলিপ্‌স-র রেডিওর আশ্চর্য আওয়াজ আমাকে এত মুগ্ধ করে।"

ফিলিপ্‌স-এর ওপর আস্থা রাখুন। আর ভারতবর্ষে একমাত্র ফিলিপ্‌সই আপনাকে দিতে পারে: ■ অতুলনীয় 'মনোসোনিক' বৈশিষ্ট্য ■ আধুনিক 'লো-লাইন' ডিজাইন ■ দেশের সর্বত্র নিজস্ব ডীলার—ফিলিপ্‌স কারখানায় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় যাঁদের কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য কাজ পাওয়া যায়।

গীতা দত্ত
প্রসিদ্ধ প্লেব্যাক গায়িকা,
এক অপূর্ব মরমী ভাব এঁর
সব গানই সুললিত আর
সুমধুর করে তোলে।

ফিলিপ্‌স মনোসোনিক রেডিও

সেরা জিনিস • অনন্য রকমের

বাংলার
লক্ষ্মীশ্রী
ফিরে আসুক

শারদীয় যুগান্তর
১৩৭১

মহিষমর্দিনী

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

ত্রেতাযুগে রাক্ষসরাজ রাবণের নিধন প্রয়োজনে শ্রীরামচন্দ্র দেবীর অকাল-বোধনে পূজা করিয়াছিলেন এবং দেবীর প্রসাদে দুরন্ত বৈরিবিনাশে সমর্থ হইয়াছিলেন, এ আখ্যায়িকার সহিত আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে; কিন্তু একথা হয়ত' আমাদের অনেকেরই জানা নাই যে, আদি কবি রচিত মূল সংস্কৃত রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রকৃত দুর্গাপূজার কোনও উল্লেখই পাওয়া যায় না। কীর্তিবাসের বাংলা রামায়ণে এ উপাখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে আর তাহাও কেবল বাঙ্গালীকবির নিরঙ্কুশ কল্পনাপ্রসূত নহে। কালিকা, বৃহন্নন্দিকেশ্বর প্রভৃতি পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজার কিছু কিছু প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায়।

রামের প্রতি অনুগ্রহ ও রাবণের নিগ্রহ সাধনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা রাত্রি-কালে বৈষ্ণবী মহাদেবীর বোধন করিয়াছিলেন। আশ্বিনের শুক্লপক্ষে নিদ্রাভঙ্গে দেবী লঙ্কায় আসিয়া সপ্তাহকালব্যাপী রাম-রাবণের যুদ্ধ পরম প্রীতিভরে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ঐ সময় দেবতাগণ প্রতিদিন রামের বিজয়োদ্দেশ্যে তাঁহার পূজা করিতেন; আর প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে রাক্ষস-বানরাদির মাংস-শোণিত ভক্ষণে দেবীরও সবিশেষ তৃপ্তিলাভ হইত। সপ্তাহা-বসানে দেবী রামের হস্তে রাবণের বিনাশসাধন করান। রাবণ নিহত হইলে নবমীর দিন ব্রহ্মা সকল দেববৃন্দের সহিত জগন্মাতার বিশেষ পূজা করিয়াছিলেন। তাহার পর দশমীতে শবরোৎসব সহকারে দেবীর বিসর্জন দেওয়া হয়। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্রও সুরসৈন্যগণের শান্তির নিমিত্ত এবং দেবরাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য দেব-সেনারও নীরাজন করিয়াছিলেন।

স্বাতীনক্ষত্রযুক্ত তৃতীয়াদিবসে রাম-রাবণের যুদ্ধ অতি ভীষণ হইয়া উঠিলে অনিশ্চিতের আশঙ্কায় বিষণ্ণ ইন্দ্রকে দেবী অভয় দিয়াছিলেন। আর শ্রবণাযুক্ত দশমীতে দেবীর বিসর্জন, শান্তি ও নীরাজনাপূর্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত সাদর সম্ভাষণ করিয়া দেবরাজ স্বধামে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের উদ্দেশ্যে মহাদেবীর যে মূর্তির আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মহিষমর্দিনী রূপ। এই মহিষমর্দিনীর ত্রিবিধ রূপ পুরাণে কথিত হইয়াছে। কি কারণে ত্রিবিধ রূপ হইল, সে সম্বন্ধে এক বিচিত্র উপাখ্যান আছে।—

পুরাকালে রম্ভ নামে এক অসুর মহাদেবকে কঠোর তপস্যায় বশীভূত করিয়া বর প্রার্থনা করে, যেন দেবাদিদেব তিন জন্ম অসুরের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। দেবাদিদেব স্বীকৃত হইলে কামার্ত রম্ভাসুর একটি মহিষীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে। মহিষের আকৃতিবিশিষ্ট এই অসুর-নন্দন [illegible] শিবের অংশসম্ভূত ছিল, কিন্তু আসুরিক প্রকৃতিবশে ত্রিভুবন পীড়ন করিত। কোন সময় কাত্যঋষির পুত্র কাত্যায়নের জনৈক শিষ্য রৌদ্রাশ্ব হিমাচলে সুদুষ্কর তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। দুর্বৃত্ত মহিষাসুর মায়াবলে দিব্য-স্ত্রীমূর্তি ধারণপূর্বক তাঁহাকে মোহিত করায় ঋষির তপোভঙ্গ হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ গুরুদেব কাত্যায়ন মহিষকে অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, নারীহস্তে তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তদনু-সারে মহাদেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইয়া অসুরের বধসাধন করেন। কিন্তু শিবের বরে ঐ অসুর একই মূর্তিতে উপর্যুপরি তিন কল্পে তিনবার জন্মগ্রহণ করে; আর তাহার নিধনের জন্য চণ্ডিকাকেও তিন কল্পে তিনটি ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। তৃতীয়বার বিনাশের পর দেবী অসুরকে বর-প্রদান করেন যে, অনন্তর আর ত্রিশহাজার একশত আট কোটি কল্প তাহার জন্ম হইবে না—সে সর্বদা দেবীর পাদলগ্ন থাকিয়া দেবীর পূজাকালে আনুষঙ্গিক পূজাভাগের অধিকারী হইবে।

যে তিন বিভিন্ন মূর্তিতে তিন কল্পে পর পর আবির্ভূতা হইয়া দেবী তিনবার মহিষমর্দন করেন, সে তিন রূপের নাম উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গা। শ্রীরামচন্দ্র যে মূর্তিতে দেবীর পূজা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীসপ্তশতী চণ্ডীর মধ্যম-চরিত মাহাত্ম্যে সর্বদেবতার তেজোহংশসম্ভূতা যে দেবীর চরিত-গাথা উপলব্ধ হইয়াছে এবং, বর্তমানে আমরা যে মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তির পূজা করিয়া থাকি, সে তিন দেবীই এক— ভগবতী মহিষাসুরমর্দিনীর তৃতীয় মূর্তি দুর্গা। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর আখ্যান সকলেরই জানা আছে। মহিষাসুর ত্রৈলোক্য বিজয় করিয়া দেবগণকে অধিকারচ্যুত করিলে তাঁহারা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শরণাপন্ন হন। অনন্তর সকল দেবতার শরীরজাত তেজোমণ্ডল হইতে চণ্ডিকা দেবীর অভিনব রূপের অভিব্যক্তি হয়; আর এই নবাভিব্যক্তা দেবীমূর্তিই মহিষ বিনাশ করিয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাণান্তরে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ত্রেতাযুগে দেবতাগণ কর্তৃক সংস্তুতা মহামায়া ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তর তীরে ষোড়শভুজা বিপুল মূর্তিপরিগ্রহে ভদ্রকালী রূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ভদ্রকালী দেবগণের প্রার্থনায় মহিষ বধ করিয়া দেবগণের

প্রতি আদেশ করেন, জম্বুদ্বীপে হিমাচল-পর্বতের নিকট কাত্যায়ন মুনির আশ্রমে গিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে। তাঁহার আদেশে ত্রিমূর্তি, দশদিক্‌পাল ও অন্যান্য দেববৃন্দ যথা-স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিতে থাকিলে রুদ্রগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া মহিষাসুরের অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করেন। ইহা শুনিয়া দেবগণ বিস্মিত হইলেন, তাঁহারা ভাবিলেন যে, দেবী ত তাঁহাদের সম্মুখেই মহিষাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন; আবার মহিষাসুর কোথা হইতে আসিল?

যাহা হউক, অসুরের অত্যাচার ও কুকীর্তির কাহিনী শুনিয়া কুপিত দেববৃন্দের শরীর হইতে তেজোরাশি নির্গত হইতে থাকে। সেই মিলিত তেজঃপুঞ্জই দেবীর রূপ ধারণ করে। জগন্মাতার প্রাদুর্ভাব হয় আশ্বিনী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। শুক্লা সপ্তমীতে তাঁহার মূর্তি পূর্ণমূর্তি ধারণ করে। অষ্টমীতে দেবী অলঙ্কার ও বেশভূষায় সুসজ্জিত হন। নবমীতে নানা উপচারে পূজিতা দেবী তৃপ্তি-লাভ করিয়া মহিষাসুর বধ করেন। অনন্তর দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিসর্জিতা হইয়া স্বধামে গমন করেন।

রাবণ ও মহিষাসুর—উভয়েই নবমী-তিথিতে নিহত হইয়াছিল। এজন্য মহা-নবমীতেই পূজার সমধিক আড়ম্বর। বলিদানেরও বিশেষ ব্যবস্থা এই নবমী পূজার দিনে। এই দিনই নানা উপচারে দেবী পূজিতা হইলে তিনি প্রীতিভরে পূজকের শত্রুনাশ ও অভীষ্টসিদ্ধি করিয়া থাকেন। মহিষাসুর শিব-বরে শিবাংশসম্ভূত ছিল বলিয়া সে হরগৌরীর পরম ভক্ত ছিল।

এ সম্বন্ধে আরেকটি পৌরাণিক উপাখ্যান আছে। তৃতীয় জন্মে মহিষাসুর যখন তাহার পর্বতপুরীতে বাস করিতেছিল, তখন সে রাত্রিতে এক দুঃস্বপ্ন দেখে যে মহাদেবী অতি বিকটভাবে মুখব্যাদান করিয়া খড়্গের দ্বারা তাহার শিরশ্ছেদ করিয়াছেন এবং তাহার শরীর হইতে নির্গত রক্তস্রোত পান করিতেছেন। নিদ্রাভঙ্গে অসুররাজ অত্যন্ত ভীত হইয়া ভক্তি-ভরে দেবীর পূজা করে এবং দেবীও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হন। অনন্তর তিনি মহিষাসুরকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে সে তাঁহার নানারূপ স্তুতিবাদ করিয়া বলিতে থাকে—দেবী, আমি যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা ত মিথ্যা হইবার নহে। আমি বেশ বুঝিতেছি যে আপনিই আমার বিনাশ-সাধন করিবেন। আমি জানি যে, মহর্ষি কাত্যায়ন আমাকে ব্রহ্মশাপ দিয়াছিলেন যে স্ত্রীজাতির হস্তে আমার নিধন হইবে।

ঋষির সে শাপ অমোঘ, কখনও ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু আপনি যে আমাকে বধ করিবেন, ইহাতে আমি কিছুমাত্র বিচলিত নহি, পরন্তু ইহা আমার ভাগ্যের কথা। আমি বহুদিন নিষ্কণ্টকে অসুররাজ্য ভোগ করিয়াছি, ইহলোকে এমন কোন বিষয় নাই, যাহা আমার ভোগে আসে নাই। এখন আমার প্রার্থনা আমাকে একটি যজ্ঞভাগ প্রদান করুন। তখন দেবী বলিলেন, "দেখ মহিষ, আমি পূর্বের দুইটি কল্পে মহিষাসুররূপী তোমাকে নিহত করিয়াছি; প্রথম সৃষ্টিতে অষ্টাদশভুজা উগ্র-চণ্ডারূপে এবং দ্বিতীয়সৃষ্টিতে ষোড়শভুজা ভদ্রকালীরূপে। আর এখন এই তৃতীয়সৃষ্টিতে দশভুজা দুর্গারূপে তোমাকে মর্দিত করিব। কিন্তু এখন তুমি যে প্রার্থনা করিতেছ, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। অবশিষ্ট যজ্ঞভাগ এমন একটিও নাই, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। তথাপি তোমার প্রীতির নিমিত্ত বলিতেছি যে, এখন দুর্গামূর্তিতে তোমাকে বধ করিবার পর তুমি চিরকাল আমার পাদলগ্ন হইয়া থাকিবে, আর যে স্থলে আমার পূজা হইবে, সেইস্থলে আমার সহিত তুমি পূজিত হইবে। পূর্বের দুই জন্মে উগ্রচণ্ডা ও ভদ্র-কালীরূপে আমি তোমাকে নিজ চরণতলে গ্রহণ করি নাই, কিন্তু আমি এই নিয়ম করিয়া যাইতেছি যে, কেবল দুর্গামূর্তি নহে, উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালী মূর্তিতেও তুমি আমার সহিত পূজিত হইবে। আরও বলিতেছি যে, আমি পূর্ব দুই মূর্তিতেও তোমাকে আমার পাদ-লগ্নরূপে গ্রহণ করিলাম।" এই বলিয়া দেবী মহিষাসুরকে তাঁহার পূর্ব দুই জন্মের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাইলেন। উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালী মূর্তি-দর্শনে মহিষাসুর অভিভূত হইয়া পড়িলে দেবী অন্তর্হিতা হইলেন এবং মহিষাসুরও স্বস্থানে গমন করিল। মহামায়ার দ্বারা মোহিত হওয়ায় মহিষাসুরের ধর্মভাব অধিক দিন স্থায়ী হইল না, তখন সর্বদেবশরীরজ তেজঃসম্ভূতা দেবী মহিষমর্দিনী দুর্গারূপে মহিষাসুরের নিধন করিলেন।

সিংহারূঢ়া বাগীশ্বরী
(কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তি)

'ভবভাবনার বার্তা'

বিশ্বপালনের জন্য কৃষি-বাণিজ্য-পশু-পালনবৃত্তিস্বরূপা আপনি!

মহিষাসুর বধের পর দেবতাগণ পুলকিত-চিত্তে দেবীর স্তব করলেন। স্তবের এই কথাকটির মধ্যেই দেবীর আদি পরিচয়-রহস্য নিহিত।—

সুদূর প্রাচীন যুগে দেবীর মহিষমর্দিনী মূর্তি ছিল না এখনকার মতো। তবে বর্তমান রূপের উৎস-প্রেরণা ছিল কৃষিসম্পদের ভেতর। এই উৎস-প্রেরণার পরিব্যাপ্তি ছিল দেশবিদেশের মাটিতে। ভারত—ভারতের বাইরে—দূরদূরান্তে।

পৃথিবী দেবী

পৃথিবীর প্রচ্ছন্ন জননশক্তির সংগে পরিচয় ঘটল, আদিম মানুষের পৃথিবী জননী আখ্যা পেল।—কৃষিসম্পদই মানুষের ধনপ্রাণ—সব কিছু। পৃথিবীদেবীর আরাধনার প্রতীক হ'ল দেশের শস্য, বৃক্ষ, নদী, পর্বত, গুহা, বন্যপশু ও অস্ত্রশস্ত্র। এই সব পূজার মাধ্যমেই জননী পূজা পেতেন। যে-সব দেশ কৃষিসম্পদ পৃথিবীকে মাতৃদেবীরূপে ধারণা করে নিয়েছিল, সেই সব দেশের নৈসর্গিক রূপে রূপায়িত করা হ'য়েছিল দেবীকে।

নব্য প্রস্তর যুগে ভারত তথা ব্যাবিলন, অ্যাসেরিয়া, পারস্য, আফ্রিকা, মিশর এবং ইয়োরোপের প্রায় সমগ্র দেশই পৃথিবীকে বিশ্ব-জননীর স্বীকৃতি দিয়েছিল। জননীর উৎসব-কালকেও সাদরে স্বাগত জানিয়েছিল। বসন্ত থেকে শরৎ অবধি জননী আরাধনার ঋতু নির্ধারিত হয়েছিল।—পৃথিবীর নতুন যৌবন আগমনের সূচনা থেকে ফলে-ফুলে-শস্যে ভরপুর পূর্ণযৌবনের সময় অবধি।

ধরিত্রীমাতারূপে প্রকাশ হলেন দেবী দুর্গা বিশ্ববাসীর কাছে এই ভাবে।

দেশবিদেশের ধর্মগ্রন্থ-পুঁথি-পুরাণ বেদ-তন্ত্র প্রভৃতি আলোচনা করলে এই সত্যই প্রতীয়মান হয়। চণ্ডীতেও দেখতে পাওয়া যায়, দেবীকে বলা হয়েছে—মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।—পৃথিবীরূপে বিরাজিতা আপনি! বেদব্যাখ্যাগ্রন্থ বৃহদ্দেবতায়ও পৃথিবী অদিতি, দুর্গা, সরস্বতী ইত্যাদি—একই দেবীর বিভিন্ন নাম দেখানো হয়েছে।

দেবীপ্রতীক

আদর্শ দেবীমূর্তি গড়ে ওঠবার আগে—নব্যপ্রস্তর ও ব্রোঞ্জযুগে ধরিত্রীমাতাকে ভারত, ক্রীট, প্রাগ্‌হেলেনীয় যুগের গ্রীস, আনাতোলিয়া এবং প্রায় সমগ্র ইয়োরোপেই দেবীশিলা, দেবী-বৃক্ষ, দেবীস্তম্ভ, দেবীপর্বতরূপে পূজা করা হ'ত।

ভূমধ্যসাগরের উপকূলবাসী সেমিটিকরা আবার পবিত্র পাহাড়-গাছ পূজার সংগে দেবী-শিলা-স্তম্ভকে 'মাস্সেবা, নম্ব' বলে শ্রদ্ধা জানাত।

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়দেবী

শিকারীরা শিকারের জন্য, কৃষিজীবীরা শস্য উৎপাদনের জন্য এবং পশুপালকেরা পশুর জীবন রক্ষার্থে—উদ্ভিদ-গুল্মের প্রয়োজনে সমৃদ্ধি উর্বরতার দেবী ধরিত্রীমাতাকে পূজা করত। দেবীর প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিধ্বংসী রূপকে আবার শত্রু দমনের জন্য আগমন প্রার্থনা জানাত কেউ কেউ।

এই চার শ্রেণীর উপাসকদের প্রার্থনার ধারা অনুসারে দেবীও চারটি চরিত্রে প্রকাশ হ'লেন। শিকারীদের কাছে যুদ্ধদেবী। কৃষিজীবীদের কাছে সৃষ্টিকর্ত্রী। পশুপালকদের কাছে পালনী-শক্তি। শত্রু ভয়ে ভীতদের কাছে সংহাররূপিণী-শত্রুনাশিনী।—'প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ......রৌদ্রায়ৈ।' সৃষ্টি-স্থিতি-লয়দেবী। বিভিন্ন জাতির মনো-ভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী দেবীর ধ্যান-স্তব নানা ভাবে-ভাষায় প্রচার হ'তে লাগল।

অগ্নি ও পৃথিবী দেবী

সৃষ্টি-স্থিতি-লয়দেবীর ভাব প্রকাশের পর। দেবীপ্রতীক বৃক্ষ-শিলায় রূপান্তর ঘটল প্রাচীনদের অনেকের কাছে। বৃক্ষের শাখায় শাখায়, প্রস্তরের খণ্ডে খণ্ডে সংঘর্ষণের অগ্নি-

সিংহবাহিনী দেবীস্তম্ভ (মাইসিনি)

স্ফুলিংগকে দেবীরই নতুন রূপে প্রকাশ ধরে নিলে তারা। অগ্নি হ'ল পৃথিবীদেবী।—'আগ্নেয়ী পৃথিবী'। পৃথিবীদেবীর পূর্ব গুণও অগ্নিতে আত্মস্থ হ'ল। অগ্নিদেবীকে আহ্বান করা হ'তে লাগল—অন্নদাত্রী, অসুর-দলনী, রক্ষাকর্ত্রী নামে।—'বিপাজসা পৃথুনা শোশুচানো বাধস্ব দ্বিষো রক্ষসো অমী বাঃ।'

ভারত-ক্রীট-কালডিয়া ও ইয়োরোপবাসীরা এবং পার্সী-মিশরী-ইহুদী-গ্রীক-রোমক-চীন জাতিরাও অগ্নির আরাধনা সুরু করলে।

প্রাচীনতম যুগের দেবীমূর্তি

বৃক্ষ-শিলা-অগ্নি ইত্যাদি উপাসনার কালেই ধরিত্রীমাতা দুর্গাদেবীর মূর্তি গড়ে উঠেছিল। এ প্রমাণ ভারতের সিন্ধুসভ্যতার কেন্দ্রস্থল মাহেঞ্জদড়ো ও হারাপ্পায় পাওয়া যায়। ইয়োরোপের ক্রীট দ্বীপেও। পোড়ামাটি ও পাথরের দেবী প্রতিমা তৈরী হ'ত। বৃক্ষ-মূর্তি অংকিত সিল এবং দেবীবাহন সিংহের প্রতিকৃতিই সেই অতীতের সাক্ষী। ক্রীট-দ্বীপের কোথাও কোথাও আবার দেবী প্রতিমার বদলে স্তম্ভ-বৃক্ষের দু'পাশে দেবীবাহন সিংহের পাথর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকত। মাইসিনিতে এ নিদর্শন পাওয়া গেছে।

দেবীবাহন সিংহ বন্যপশু পূজার সময়ই পশুশ্রেষ্ঠ ও অমিতশক্তির অধিকারী রূপে প্রাচীনদের চিন্তাধারায় প্রতিভাত হ'য়েছিল। সকল শক্তির নিয়ন্ত্রী মাতৃদেবীর বাহন প্রতিনিধি করা হ'য়েছিল তাই সিংহকে।—'...বক্ষঃস্থলে শারদা। '...হুংকৃতিরিয়ং শ্রীচর্চিকা চণ্ডিকা'। সিংহের হৃদয়ে দুর্গা। হুংকারে দুর্গা-চণ্ডিকা।

পরবর্তী যুগে দেশবিদেশের দেবী মূর্তির সমন্বয়

মানুষের সভ্যতার ক্রমবিকাশের সংগে সংগে এই মহামাতা পৃথিবীদেবী বিভিন্ন দেশের-জাতির-সংস্কৃতির ধারা অনুযায়ী বহু নাম-রূপ-কর্মে প্রকাশ হয়েছেন। '...ব্যধদুঃ পুরুত্রা

ভূরিস্থাতাং...।' বহুভাবে অবস্থিতা দেবীকে সর্বদেশের যজমানগণ বিবিধ রূপে আরাধনা করেন।

ভারতের মাতৃদেবী দুর্গার সংগে ক্রীট, ভূমধ্যসাগরের উপকূল, মিশর, দক্ষিণপারস্য এবং সুমেরীয় ও ইয়োরোপবাসীদের মাতৃদেবীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

সিংহবাহিনী দুর্গার সংগেই অন্যান্য দেশের ভিন্ননাম্নী মাতৃদেবীর রূপ-গুণ-প্রকৃতির অনেকটা সাদৃশ্যসেতু বর্তমান। ক্রীটের মহামাতা কখনো সিংহ-সিংহীর মাঝখানে পর্বতচূড়ায় দণ্ডায়মানা, কখনো উপবিষ্টা। তিনি বর্শা-ধারিণী। বৃষ, সর্প, দণ্ড, দুমুখো কুঠার, চন্দ্রকলা ইত্যাদি পরিবেষ্টিতা। তিনি বৃক্ষনিম্নে, উদ্ভিদ-গুল্ম পাশেও সমাসীনা। সর্পদেবী নামেও পরিচিতা তিনি—সর্পধারিণী। —'ত্রিশূলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনী।' —ত্রিশূল - চন্দ্র - সর্পধারিণী - বৃষবাহিনী দুর্গারমতো ক্রীটের মাতৃদেবীও প্রাচুর্য-সমৃদ্ধি, উর্বরতাশক্তি ও যুদ্ধের দেবী। ব্যাবিলনের ইশতারদেবী সিংহবাহিনী অসুরনাশিনী ঃ ক্রীটের মহামাতার মতো মিশরের আইসিস-হ্যাথরও। নবদুর্গার নারসিংহী মূর্তির সংগে আকৃতির অনেকটা মিল মিশরের সিংহমুখী সেখেত-হ্যাথরের।

চণ্ডীস্তোত্র আর ইশতার স্তোত্রের অনেক পদ একার্থবোধক

'ইশতার হু শেপস দি লাইভস অফ অল ম্যানকাইণ্ড,' '...এক্সলটেড ওভার অল দি গডস', '...ক্রম দি ইভিল স্পেলস', 'দি গিফট অফ স্ট্রেংথ ইজ দাইন...'। —সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে। ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবী

'প্রম্বনাম' শিবমন্দিরের ভাস্কর্যে মহিষমর্দিনী অষ্টভুজা

দশভুজা শ্রীদুর্গা (পাল-স্থাপত্যশিল্প)
(বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত)

দুর্গে...॥' সর্বকার্যকারণরূপিণী-সৃষ্টিকর্ত্রী, সর্বেশ্বরী, সর্বশক্তিময়ী, ভয়-বিপদত্রাত্রী।

ইশতারের সমশ্রেণীর দেবী ব্যাবিলোনীয়ার 'নীথ'ও'। ইনি তীর-ধনুক-বজ্র-ধারিণী। এঁর বাণীতে—'আই অ্যাম হোয়াট হ্যাজ বীন, হোয়াট ইজ, অ্যাণ্ড হোয়াট শ্যাল বী'—দুর্গাদেবীর সনাতনী রূপটিই ফুটে উঠেছে।—'যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্কচিদবস্তু সদসদ বাখিলাত্মিকে। তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং...' ॥ —যে কোনো চেতন বা জড়বস্তু অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতে হবে—সে সবের শক্তি দেবী।

ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় এক দেশের প্রবল প্রতাপ অন্য দেশের আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতি-নীতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। ধর্মেও। প্রভাবান্বিত দেশের ধর্ম-দেবীর ভাব-গুণ আরোপিত হ'য়েছে প্রভাবিত দেশের ধর্ম-দেবীর ওপর। এক দেশের দেবীকে অপর দেশে নিয়ে আসাও হ'য়েছে। এই সব কারণে কখনো দুই নামের একদেবী, কখনো এক নামেই দুই দেশের দেবীকে দেখা গেছে। আনীত দেবীও আবার সময় সময় নতুন দেশের দেবীর নামও গ্রহণ ক'রেছেন।

ক্রীটের মাতৃদেবী রীয়া গ্রীসে প্রসন্নময়ী-স্নেহ-গাম্ভীর্যে-সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি, ইনি দুর্গারই মতো একাই শস্য-ঐশ্বর্য-জ্ঞান ও সংহারের দেবী। দুর্গার লক্ষ্মী-সরস্বতী ও যুদ্ধদেবীর রূপের প্রতিচ্ছায়া যেন রীয়া। ইশতারও তাই। ভাগ্য-জীবন নিয়ন্ত্রী বরদাত্রী রীয়ার বাহন সিংহ।

আনাতোলীয়ার দেবী কেডেশ আসেন মিশরে রাজাদের যুগে। ইনি অনাবৃত দেহে সিংহপৃষ্ঠে দণ্ডায়মানা। খৃঃ পূঃ ৫৩৮ অব্দে পারস্যের রাজা সাইরাসের সময়ে ব্যাবিলো-নীয়ার মাতৃদেবী 'নিনা, ইশতার', পারস্যদেবী 'অনাহিতায়' রূপান্তরিত হয়।

ভারতেও এক এক ধর্মবাদের প্রবল প্রভাবে দেবী দুর্গার নাম পরিবর্তন হ'য়েছে অনেক ক্ষেত্রে। রূপও অল্পবিস্তর। চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশ-দ্বাদশভুজা ইত্যাদি তন্ত্রে দেবী হ'য়েছেন মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। বেদে অদিতি, রাত্রি, বাক্। বৌদ্ধশাস্ত্রে মারীচী, জৈন ধর্মগ্রন্থে শারদাবাগীশ্বরী।

দুর্গা ও কালী

দুর্গার একটি বিশেষ রূপান্তর ও রূপ অপূর্ব সংযোগ সাধন করেছে বিশ্বের মাতৃ-দেবীদের রূপান্তররূপে। দুর্গার এ রূপান্তর কালী মূর্তিতে—সংহারিণীরূপে। এখনো দুর্গা উপাসনায় অষ্টমী-নবমী সন্ধিক্ষণে—কালী-চামুণ্ডার পূজা বিধেয়। এই কালীই ঋগ্বেদের রাত্রি। মুণ্ডকোপনিষদের অগ্নিজিহ্বা। অগ্নিশিখা।—'কালী করালী চ মনোজবা...।' বেদের অগ্নিদুর্গাই অগ্নিকালী। দুর্গা-কালী পরস্পরে অভিন্ন। তন্ত্র-পুরাণের সার চণ্ডীতে দেবী গৌরবর্ণা। গৌরবর্ণা অম্বিকার ললাট থেকে কৃষ্ণবর্ণা কালী-চামুণ্ডার প্রকাশ। চণ্ড-মুণ্ড দৈত্য বিনাশের জন্য।—ভ্রূকুটীকুটিলাৎ তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্। কালী করাল বদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।'

এই ভয়ংকরী কালীকেও দেখতে পাওয়া যায় প্রাচীন বৃটিশ-আইল্যাণ্ডের মাতৃদেবী দনুর (দুর্গার স্বরূপ) ভেতর। দনু পর্বতবাসিনী পার্বতী-দুর্গার মতোই। পর্বত নাম্নীও। দনুর ভেতর থেকে অনুর (কালী) আবির্ভাব। দনু বিশ্বজননী, উর্বরাশক্তি, পৃথিবী-লক্ষ্মী ও যুদ্ধদেবী গ্রীকমাতা দিমিতারের সমতুল্যা।

দনুর অনুমূর্তি ভীষণা—দৈত্যদানবহন্ত্রী। এই অনুই আবার আইরিশ 'মরিগু', 'ফ্যাইলালিক' দেবী—কালী। দেবীর রণহুংকারে দশ সহস্র বজ্র-কণ্ঠধ্বনি, কালীর চণ্ড-মুণ্ড

দেবী পার্বতী
(খুলনা জেলার সেনহাটিতে প্রাপ্ত)

বধের সময়কার রণক্ষেত্রের দৃশ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। '...নাদাপূরিতদিঙমুখা'। বিকট শব্দে দিঙমণ্ডলপূর্ণকারিণী কালী।

স্কটল্যাণ্ডের প্রাচীন আদিবাসীদের ফ্যাইললিক দেবীর মুখ কৃষ্ণবর্ণ। কালীরই মতো ইনি যুদ্ধ-উর্বরতার দেবী।

প্রাচীন ইংল্যাণ্ডের লিসটারশায়ারের 'ব্ল্যাক-অ্যানিজ' ইশতারের সময় মহামাতা ছিলেন। ইনি সে সময় সেলটিকদের পূজ্যা। দেবীর মুখ নীলাভ-কালো। চোখ ভীষণ। ত্রিনয়ন—দুটি চোখ ছাড়াও মাথাতে একটি গভীর তীব্রচঞ্চল চোখ। ফ্রিগালিয়ার দিমিতারও কালীর মতো কৃষ্ণবর্ণা। মিশরের আইসিস-হ্যাথর এবং সেখেথ-হ্যাথর দুর্গা-কালীরই প্রতিরূপ।

ব্যাবিলনের নিনসাল দেবীই সুমেরিয়ার 'নানা'। ইশরাত-আইসিস-হ্যাথরের সমপর্যায়ভুক্ত দেবী ইনি। এই দেবী আবার সেখেথ-হ্যাথররূপে শত্রু বধ করেন।

জাপানের চনণ্ডী ও অষ্টভুজা হপ্পিবেনতেন এবং তিব্বতের 'লাল্মো' দেবী দুর্গা-কালীর অনুরূপ।

দেবী পূজায় প্রাচীন নিদর্শন

এক দুর্গাই শরৎকাল থেকে বসন্তকাল পর্যন্ত পূজিতা হন বিভিন্ন নামে—দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা।

শস্যাধিষ্ঠাত্রী অন্নপূর্ণা উপাসনায় মূর্তির সংগে প্রাচীন যুগের প্রতীক পূজাও করা হয় এখনো। —কৃত্রিম উপায়ে, নতুন ফসল ফলিয়ে। এ পূজা রাজস্থানে গংগোর নামে খ্যাত। মহারাষ্ট্রে-নাগপুরের অনেক জায়গায় দেবী পূজা পাল উৎসব অনুষ্ঠানে—দুর্গাপূজার দশমীতে—দশরায় গোধূমবীজ বপন পর্বে।

গংগোর অনুষ্ঠান পুরুষবর্জিত পূজা। পাশ্চাত্যের বন-দিয়া দেবীর পূজাও পুরুষবর্জিত। অন্নপূর্ণার মতো বন-দিয়া, বনদুর্গা ও ক্রীটের ওয়াইল্ড গডেস একই প্রকৃতি-গুণের দেবী। শাকম্ভরী দুর্গাও তাই। প্রাচীন রোমকদের অন্নপরেন্না নামেও এক অন্নাধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। তিনিও অন্নপূর্ণার মতো বসন্তকালেই উপাসিতা হ'তেন। গ্রীকদেবী ডিমিতারও অন্নদেবী। ফ্রিগালিয়ায় তিনি দুটি রঙে প্রকাশ—হলুদে ও সবুজে দিমিতার। তাজা-পাকা ফসলের রঙে ফসল হয়ে মিশে আছেন তিনি। রোমকদের শস্যদেবী সিরিসের মতো দিমিতারের নামও ফসলের সংগে যুক্ত হ'য়ে রয়েছে।

দুর্গাপূজায়ও নবপত্রিকার আরাধনা অতীতস্মৃতি। নবপত্রিকাই (ধান-হলুদ ইত্যাদি ন'টি গাছ) প্রকৃতিদেবী দুর্গা। চলতি কথায় কলাবৌ নামে অভিহিতা নবপত্রিকা।

ক্রীটদ্বীপের মাতৃদেবী এবং ইংল্যাণ্ডের ব্ল্যাক-অ্যানিজের পুরনোকালের প্রতীক ছিল ওক গাছ। পরবর্তী যুগে ইংল্যাণ্ডের মে-ডে, মে-পোল ও স্কটল্যাণ্ডের ওক গাছের তলায় 'মোট' উৎসবই বৃক্ষপূজার অবশেষ রেখেছিল শুধু।

দুর্গাপূজার অপরিহার্য অংগ হোমাগ্নিই পূর্বের অগ্নিপূজা ও বৈদিক যজ্ঞের সাক্ষী। ক্রীটের 'পেতসোফা-ফায়ার' ও রোমের অগ্নিদেবী ভেস্টার অনুষ্ঠানই স্কটল্যাণ্ডের 'বেলটেন' (মে-ডে) এবং ইংল্যাণ্ডের মিডসামার-ফায়ারের (আশীর্বাদী অগ্নির) উৎসবের মধ্যে দিয়েও প্রকাশ হ'য়েছিল অনেকদিন ধরে।

দেবীর অভিন্নত্ব

'পৃথিবী যা দুর্গা কালী-সরস্বতী-লক্ষ্মী তথা।'

পৃথিবী, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী —একই দেবী। দেবীর পৃথক পৃথক মহিমা প্রকাশই এক একটি নামের কারণ। —এতাসামেব মাহাত্ম্যান্ নামান্যত্বং বিধীয়তে।

সমৃদ্ধি জ্ঞানের সমন্বয়—এই দুটি ভাব যখন ফুটে ওঠে একা দুর্গায়, তখন তিনি লক্ষ্মী-সরস্বতী বিদ্যা। শান্ত প্রকৃতি তাঁর। আর যখন সংহারের ভাব জেগে ওঠে, তখন তিনি অবিদ্যা-ভয়ংকরী কালী। অশান্ত প্রকৃতি তাঁর।—'অতি সৌম্যাতি রৌদ্রায়ৈ......।' দেবী দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতীর সমষ্টিভুক্তা শক্তি। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মাতৃদেবীরা বেশীর ভাগ এই একই রূপ-গুণের অধিকারিণী।

মহামাতা দুর্গার অভিন্নতা ভারতের দেবীদের পূজা-অনুষ্ঠানেও পরিলক্ষিত হয়। একনামের দেবীর উপাসনায় অন্য নামের দেবীর অথবা দুটি নামের দেবীর একই সঙ্গে পূজা-অনুষ্ঠান।

বাঙলার দুর্গোৎসবে পাঞ্জাব-তামিল মহারাষ্ট্রের কতক স্থানে সরস্বতী পূজা বিধেয়। কার্তিকী অমাবস্যায় কালীপূজার সময়—দীপালী উৎসবে—উত্তরপ্রদেশে, রাজস্থান এবং পাঞ্জাবে শস্যদেবী লক্ষ্মীর, কিন্তু ঐ সময়েই বোম্বাইয়ের কোনো কোনো জায়গায় একসংগে লক্ষ্মী-সরস্বতীর উপাসনা চলে। নেপালের 'পঞ্চক' ব্রতের পাঁচদিনের মধ্যে লক্ষ্মীপূজার একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট থাকে। বাঙলায় আবার কালীপূজার পরেই লক্ষ্মী-উপাসনা রীতি। শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গাপূজায় অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে—সন্ধিপূজায় কালী-চামুণ্ডার আরাধনা অপরিহার্য তান্ত্রিক দেবী-পূজকদের কাছে।

'সৃষ্টি স্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনী'

সৃষ্টি-স্থিতি বিনাশের শক্তিরূপিণী দুর্গা মাতৃদেবীকে বাঙলা-ভারত-মিশরে 'মা' নামে অভিহিত করেছে। ব্যাবিলোনীয়রা আমা-মামা-মামি নামে। অনেক দেশের মাতৃদেবীর নামেও দুর্গাদেবীর উমা নামের প্রতিশব্দ শোনা যায়।—অ্যাসেরীয়দের উম্মও ব্যাবিলোনীয়দের উম্মু, উম্ম। একাডীয়-দ্রাবিড়ীয় ও কুষাণদের উম্ম-উম্মু-ওম্ম।

দেশ-বিদেশের দেবীদের মূর্তি-নাম-গুণে প্রায় একাত্মতা দেখে মনে হয়, একই সামাজিক পরিবেশে পৃথিবীব্যাপী মাতৃদেবীর আরাধনার উদ্ভব হয়েছিল। 'জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্। তথাপি তৎসমুৎপত্তির্বহুধা।' জগৎই দেবীর বিরাট মূর্তি। তিনি সর্বব্যাপিনী হয়েও বহুরূপে আবির্ভূতা এক এক জায়গায়।

যেসব দেশে মাতৃপূজার প্রচলন হয়েছিল অত্যধিক, সে সব দেশ মাতৃতান্ত্রিক হয়ে উঠেছিল। ক্রীট জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলত। ভারত বলে এখনো। মিশরের রাজপরিবারও মাতৃতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এক সময়। দক্ষিণ ইয়োরোপবাসী ও স্কটল্যাণ্ডের পিক্‌টজাতিরা মাতৃতান্ত্রিক ছিল। বৃটেনের কতক অংশের লোকেরাও। মাতৃতান্ত্রিক দেশগুলিতে অতীতে মায়ের দিক দিয়েই বংশগণনার বিধি নির্দিষ্ট ছিল।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেরই মাতৃদেবী আজ স্মৃতির অতল গহ্বরে। কিন্তু ভারতে এখনো সেই আদিমাতা—আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গা নানা রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ধর্মবিপ্লবের ভেতর দিয়েও দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রগামিনী হ'য়ে চলেছেন।

ধরিত্রীমাতা দুর্গাকে প্রণাম!

ধরিত্রৈ মাতৃকায়ৈ দুর্গায়ৈ নমো-নমঃ।

জাপানে দুই

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বছর দুই আগে অপ্রত্যাশিতভাবে জাপান যাবার নিমন্ত্রণ জুটে গেল। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ অধ্যাপক ইয়ামানুচি (Yamanuchi) লিখলেন বর্তমান যুগে "বিজ্ঞানী মানুষের কর্তব্য কি" সে বিষয়ে আলোচনার জন্য একটা ছোট বৈঠকের আয়োজন করেছেন—সেখানে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মুখপাত্র স্বরূপ আমি যদি সেই সভায় যোগদান করি—তা হলে জাপানী বিজ্ঞানীরা সকলে সুখী হবেন। খরচের সব ভার তাঁরাই নেবেন। কাজেই প্রতিবন্ধক কিছুই রইল না।

ছাড়পত্র পেতেও বিশেষ বিলম্ব হল না, তাই বর্ষার শেষে একদিন বের হলাম—জাপানের পথে। আজকাল উড়োজাহাজের কল্যাণে জাপানের মত দূরদেশও একদিনের মধ্যে পেঁৗছান যায়। উড়োজাহাজে এক ভারতীয়ের সংগে আলাপ হয়ে গেল। দাক্ষিণ ভারতীয় ইনি—সর্বজাতি-সমন্বয়-সংস্থার দপ্তরের কর্মচারী। মধ্যে মধ্যে তাঁকে নানা দেশ ঘুরে বেড়াতে হয়—ও সেই সময় তিনি কোরিয়ার পথে।

জাপান আমাদের দেশের অনেক উত্তরে, কাজেই শীতের ভয়ে মাত্র গরম পোষাক সংগে নিয়েছিলাম—তাঁর কাছে শুনলাম অসুবিধা হবে প্রচুর—। ভাদ্র মাসে জাপানেও বেশ গরম ঠেকবে। তিনি জাপানে অনেকবার গিয়েছেন—এবারও কোরিয়ার পথে টোকিওতে একরাত্রি কাটিয়ে যাবেন বললেন। নানা গল্প শুনলাম তাঁর কাছে—পথে হংকং-এ কিছুক্ষণ নেমে থাকতে হয়েছিল। বন্ধু বললেন, আজব শহর এই হংকং—এখানে সব জিনিষই খুব সস্তা ও অল্প আয়াসেই মেলে! তিনি নাকি সব সময় এইখান থেকেই তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ তৈরী করান—ও একদিনের মধ্যেই দর্জি মাপ নিয়ে পছন্দসই ইংরাজী পোষাক করে দিতে পারে এই তাঁর কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা।

নানা অলোচনায় সময় তাড়াতাড়ি কেটে গেল। টোকিও'র বন্দরে যখন পেঁৗছালাম—তখন গভীর রাত্রি। নিজের বাক্স-প্যাটরা সামলে নিয়ে বন্দরের বাহিরে আসতেই, বৈঠকের পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন তিনজন। অল্প বয়সী দুইজন পুরুষ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞান পড়ান। কুমারী "মাৎসুয়ো ইয়ামোতো"ও (Matsuyo Yamamoto) এসেছিলেন "Tokyo'র Asia foundation"-এর প্রতিনিধি হিসাবে। ইনি নাকি কিছুদিন আগে ভারতে বেড়িয়ে গিয়েছেন ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছ থেকে আমার সন্ধান পান। Tokyo বিশ্ববিদ্যালয় ও Asia foundation যুক্তভাবে এই বৈঠকের আয়োজন করেছে—কাজেই বিশেষ করে ইনি আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। Tokyo Airport-এ মোটরগাড়ী অপেক্ষা করছিল—গন্তব্যস্থল—বন্দর থেকে অনেক দূরে—তাছাড়া পথে অন্য দুজন বন্ধুদের বাড়ী পেঁৗছে দিয়ে গেলাম। International House-এ যখন পেঁৗছালাম, তখন রাত বারটা অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে। পথে বৈঠকের পরিচয় দিলেন কুমারী ইয়ামাতো, সেখানে যাঁরা উপস্থিত থাকবেন, তাঁরা প্রায় সকলেই জাপানী, ২।৩ জন মাত্র বিদেশী অভ্যাগত থাকবেন। তাঁর মধ্যে আমি একজন।

জাপানী বিজ্ঞানীরা সকলে জাপানী ভাষায় বক্তৃতা দেবেন শুনলাম—এবং আমার মত বিদেশীদের জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা থাকবে। এর আগে কয়েকবার আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে উপস্থিত হ'তে হয়েছে কোন কোন জায়গায়—বক্তৃতাও করতে হয়েছিল—কাজেই এই ধরণের বন্দোবস্তে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ইয়ামোতো বিশেষ করে বললেন—জাপানে শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা। বিজ্ঞানীরা অনেকে হয়ত নানা ভাষায় বিজ্ঞানের বই পড়তে পারেন, —ইংরাজী, ফরাসী, জার্মাণ তো বটেই—তবুও অন্য ভাষায় নিজেদের বক্তব্য বুঝাতে তাঁদের ভরসা হয় না। তাই আগেই তিনি আমাকে সতর্ক করে গেলেন।

International House-এ থাকার বন্দোবস্ত ছিল—কাজেই রাতের শেষটুকু বিছানাতেই গড়িয়ে পথের ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করা গেল। সকালে উঠে দেখি, ত্রিতলের একটা ছোট ঘরে আশ্রয় মিলেছে। খাট, টেবিল, দুটি চেয়ার ও একটি ছোট দেয়াল-আলমারীকে স্থান দিয়ে ঘরে খালি জায়গা বেশী বাকী নেই। তবে খাটের মাথার দিকে কাঠের দেয়ালের অর্ধেকই সরে যায়—বের হয়, সামনে একটু ছোট বারান্দা। ঝুঁকে নিচে বাগানে নানা রকমের অচেনা গাছপালা চোখে পড়লো! প্রকাণ্ড শহরের মাঝে এই পান্থশালা, তবু পরিবেশ এমনভাবে সাজান যে, হঠাৎ মনে হবে বোধ হয় যেন কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে পড়েছি! শহরের কোলাহল এসে পেঁৗছয় না।

সন্ধ্যাবেলায় দেখা যায়, শহরের নানা রংগের আলোর আভায় আকাশ রঙ্গীন করে রেখেছে, তার তীব্রতা চোখকে কষ্ট দেয় না। নীচের তলায় প্রশস্ত বৈঠকখানা, আরও একতলা নীচে খাবার ঘরের সারি। ওদের মধ্যে একটিতে বৈঠকের বন্দোবস্ত হয়েছিল। মধ্যাহ্নভোজনের পরে নীচের তলায় একটি ঘরে আমরা সকলে জমা হ'তাম। এক দিকের সারা দেয়াল জুড়ে বড় এয়ারকণ্ডিশনার-এর যন্ত্রপাতি—বাতাসকে বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ করে রাখছে। Black Board, Recording Tapes, বসবার চেয়ার টেবিল ইত্যাদি সবই রয়েছে এই ঘরে। যিনি যা বলছেন সবই চৌম্বক-ফিতাতে ধরা পড়ে যাচ্ছে। পরে অবসর মত আবার পাঠোদ্ধার হবে। তাছাড়া বক্তা কেউ কেউ আবার তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম টাইপ করে এনেছিলেন—বলার পূর্বে বললেন জানিয়ে দিতে তিনি কি বলতে চান। পরে তাঁর কথাগুলি বিশদভাবে শুনে তাঁর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রকাশ করার সুযোগ মিলবে সকলেরই।

আমি বাঙ্গালী পদার্থবিজ্ঞানী। যুগোশ্লাভিয়া থেকে একজন গণিতজ্ঞ, ইনি জাপানে কিছুদিনের জন্য এসেছেন উচ্চাঙ্গের গবেষণা করতে। আর একটি আমেরিকান দার্শনিক। ইনি কয়েক বৎসর টোকিওতেই অধ্যাপনা করেছিলেন —আবার এই বৈঠকে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। আমাদের তিনজনকে ইংরাজীতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন প্রোফেসার তাকেদা। পরে যখন আমাদের বলার সময় এলো তখন তিনি তাড়াতাড়ি Short-hand-এ লিখে নিয়ে জাপানীতে তর্জমা করে অন্য বিজ্ঞানীদের জানালেন—যদিও মনে হয় তাঁরা মোটামুটি আগেই বুঝেছিলেন আমরা কি বলতে চাইছি।

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইয়ামানুচি (Yamanuchi) প্রথমে উদ্বোধন করলেন। প্রায় এক সপ্তাহ এই আলোচনা চলেছিল, তার মধ্যে আমাকেও একদিন বলতে হয়েছিল। সেই সময়ে যা মনে এলো তাই বলতে হলো, পূর্বে থেকে কোন লেখা প্রবন্ধের উপর নির্ভর করা যায়নি। বহুদিন বাদে দেখছি জাপানী বন্ধুরা পাঠোদ্ধার করে নিজের দেশে ছাপিয়েছেন ও তার কয়েকটি কপি আমাকে পাঠিয়েও দিয়েছেন।

বৈঠকে যোগদান করেও প্রচুর অবসর থাকতো, প্রতিদিন তাই টোকিও শহর দেখবার কৌতূহল অনেকাংশে মিটাতে পেরেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শহর বিমানের আক্রমণে

টোকিও শহরের অধিকাংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল শুনেছি। এখন আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে নতুন টোকিও, পুরানোকালের কাঠের বাড়ী দেখতে পাওয়া যায় না। লোহা, সিমেণ্ট, কংক্রীট দিয়ে গড়ে উঠেছে নানা সৌধ—অট্টালিকা—লোকসংখ্যায় নাকি আজ টোকিও নিউইয়র্ককেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান সে অধিকার করে বসেছে। বিপুল জনস্রোতের ভার নিতে শহরের মধ্য দিয়েই গিয়েছে ২টি রেলপথ—তা ছাড়া অগণিত ট্রাম বাস চলেছে নানা পথে। এশিয়া ফাউণ্ডেশন-এর সৌজন্যে নানা স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। বিপুল পণ্যসম্ভার বেচাকেনা চলেছে নানা জায়গায়—দেশ-বিদেশের ব্যবসায়ী পর্যটক ঘুরে বেড়াচ্ছেন সর্বত্র। আত্মীয়-স্বজনকে উপহার দিতে হবে এই অছিলায় ২।৩টি বড় বড় Departmental Stores দেখার সুযোগ হয়েছিল। সুউচ্চ বিরাট অট্টালিকা, প্রত্যেক তলাটি নানাবিধ পণ্যে সুসজ্জিত। আবার ক্রেতার পরিশ্রম লাঘব করতে একাধিক ইলেকট্রিক লিফ্‌ট ওঠানামা করছে। অন্যদিকে ভেতরে সুসজ্জিত কক্ষে জলযোগ, পানভোজনের ব্যবস্থাও রয়েছে দেখা গেল।—এ সবই অবশ্য বর্তমানে সকল উন্নত দেশেই D-Store এ দেখতে পাওয়া যাবে। একবার নিজের ব্যবহারের জন্য একটি হাতঘড়ি কিনতে ওইখানের বিখ্যাত Seiko র দোকানে গেলাম। ঢুকেই সর্বত্র দেয়ালে Show case -এ কাচের Shelf -এ নানা রকমের ঘড়ি চোখে পড়ল। সবই জাপানে তৈরী, এ'দেরই কারখানায়। ঘড়ি পাওয়া গেল, পাঁচ হাজার ইয়েন,

সপ্তাহ

অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ টাকায়। ঠিক ওই রকমের ঘড়ি আজকাল এদেশে তৈরী হচ্ছে দেখছি—জাপানী কারিগরেরা এসে আমাদের এই বিদ্যায় পারদর্শী করেছে। H.M.T. র ঘড়ির জন্য আমাদের দেশে সকলে ঝুঁকেছে—তবে আমরা এখনো জাপানের মত সস্তায় এটিকে বাজারে দিতে পারিনি—আমাদের দেশে সেই একই ধরণের ঘড়ি কিনতে প্রায় ১০০্ টাকা পড়বে।

সেই দিনদুপুরে উত্তাপ প্রচণ্ড ঠেকলো—বোধ হয় পরনে গরম পোষাক বলে অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছিল। মধ্যাহ্নভোজন সারতে কাছেই এক মার্কেটে ঢুকলাম—দেখি রাস্তা ঘাট সমেত সারা মার্কেটটি বিরাট যন্ত্রের কল্যাণে বাহিরের উত্তপ্ত জনপথ থেকে অনেক বেশী ঠাণ্ডা হয়ে রয়েছে। শ্রান্তি ঘুচে গেল। তবে উপরের ঘরে ভোজনাগারে সর্বত্রই লোকের ভিড়। জায়গা পেতে রাস্তার থেকে সিঁড়ি দিয়ে মাটির নীচে নামতে হলো।

জাপানীরা মৎস্যাহারী ও আমাদের দেশের মত মাছ ভাত সর্বত্রই পাওয়া যায়। তাতেই সেই দিনের ক্ষুধা মিটলো।

পরাজিত জাপানের উপর বিজয়ী আমেরিকান বীর ম্যাক আর্থার কয়েক বৎসর একনায়কত্ব করেছিলেন। সেই সময় তিনি চেয়েছিলেন এই সমরপ্রিয় জাতির ভাবনাধারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে। তাঁর শাসনে অস্ত্রধারী সৈনিক একটিও রইল না জাপানে। যুদ্ধপ্রিয় নেতৃস্থানীয়দের জমিদারী কেড়ে নিয়ে ম্যাক আর্থার সাধারণ লোকদের মধ্যে ভাগবাঁটরা করে দিলেন। যুদ্ধের রসদ ও গোলাবারুদের কারখানা সব বন্ধ হলো। বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল জাপানে প্রায় একশ' বছর আগে। তবে মেয়েরা বেশীর ভাগ ঘরকন্নার কাজ নিয়েই থাকতেন। এখন বিজয়ী আমেরিকানদের আনুকূল্যে সমাজে বিপুল পরিবর্তন এসে পড়লো। এর সঙ্গে হয়ত অর্থনৈতিক নিয়মগুলিও কাজ করছিল। মেয়েদের অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বের হ'তে হলো। সংসার প্রায় তা না হলে অচল হ'য়ে দাঁড়ায়। উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রে, শিল্পোৎপাদনের কারখানায়, স্কুল, কলেজে সর্বত্রই মেয়েরা পুরুষের কাজ করতে সুরু করলে। ফলে এলো বেশভূষা, ভাবনাচিন্তার মধ্যেও গভীর পরিবর্তন। জাপানী মেয়েরা পূর্বেকার দেশীয় বেশভূষা ছেড়ে দিয়েছে। এখন ছেলেমেয়েরা জাপানে সর্বত্রই আমেরিকান কেতায় সাজসজ্জা করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের মনোভাব কতদূর পরিবর্তিত হয়েছে অল্পদিনের মধ্যে তার নির্ণয় করা বিদেশীর পক্ষে অসাধ্য। তবে পথেঘাটে স্কুল কলেজে অফিস কারখানায় সর্বত্র এখন আমেরিকান বেশভূষার প্রচলন দেখা যাবে ছেলে ও মেয়ে এই দুই মহলেই।

* * *

সামরিক বিপুল ব্যয়ভার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে জাপান তার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি অর্থসামর্থ্য ব্যবসায় বাণিজ্যে উৎপাদন ও অনুসন্ধানের কাজে লাগিয়েছে। বিজ্ঞানে ও শিল্পের ক্ষেত্রে তার বিজয় অভিযান পৃথিবীর সকলকে চমৎকৃত করেছে। আমরা যখন কলেজের ছাত্র, তখন ইংরাজের তৈরী মাল বয়কটের যুগ। জাপানী মাল, এদেশে তখন আসতে সুরু হয়েছে। হারিকেনের চিমনী, কাচের গেলাস, জাপানী মিলের ছিট সবই এদেশে আসছিল। তবে সে সব বস্তু লোকের মনোরঞ্জন করতে পারতো না। কাচের গেলাসে গরম জল ঢাললে হয়তো তার তলা খুলে পড়ে যেত। বা হারিকেন লন্ঠনের কাচ সামান্য উত্তাপের অনেকে্য ফেটে চৌচির হতো। জাপানী সিল্ক অল্প দিনের ব্যবহারেই জীর্ণ হয়ে পড়তো। সকলেই বলতো জাপানীরা অনুকরণ করতে পারে, তবে উচ্চাঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে সরবরাহ তাদের পক্ষে অসম্ভব—মৌলিক গবেষণা থেকে তারা অনুকরণেই বেশী পটু—। তাই প্রথম প্রথম বহু দেশপ্রেমিক শিক্ষার্থী ছেলে জাপানের দিকে ঝুঁকলেও—পরে তারা জার্মাণী, আমেরিকা, ইংলণ্ড যেতে সুরু করলে। ম্যাঞ্চেষ্টারের পুরানো কল-কারখানা কিনে আমরা কাপড়ের মিল সুরু করেছিলাম—সেই প্রতীচ্যের প্রতি মোহ আমাদের আজও কাটেনি—স্বাধীনতার যুগেও ভারতের নানা বিষয়ে প্রগতির চেষ্টা থেকে এই কথা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হবে। ইতিমধ্যে জাপান [illegible] তার শিক্ষানবিশী শেষ করে বিজ্ঞানে, শিল্পে

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর ঈশানচন্দ্র বসু পরিবারের শত বৎসরের অধিক পুরাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গা প্রতিমা

কালার ট্রান্সপেরেন্সি : প্রফুল্ল মিত্র

শীর্ষদেশে সর্বস্বীকৃত নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। কাচ উৎপাদনের হয়েছে অদ্ভুত পরিণতি, আজ জাপানের তৈরী ক্যামেরা লেন্স পৃথিবীর সেরা জার্মাণ-তৈরী লেন্স থেকে সকল রকমে ভাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। গুণপনার প্রতিযোগিতায় সফল হয়েছে সে নানা ক্ষেত্রে, তার তৈরী ক্যামেরা ইংলণ্ডের বাজারে আদৃত হচ্ছে। তার Transistor Set পৃথিবীর সর্বত্র সেরা বলে গ্রাহ্য হয়েছে। সেদিন এদেশের এক রাসায়নিক বললেন Nylon-এর প্রস্তুতির ব্যাপারেও জাপান এমন সব যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে—তার ফলে জাপানী পেটেণ্টের সমাদর আজ করছেন, আমেরিকানরা, কেন না, তাঁরা মনে করেন এই প্রক্রিয়ায় অনেক অল্প খরচায় কৃত্রিম রেশম ইত্যাদি প্রস্তুত সম্ভব হবে। শান্তিকামী জাপান তাই সব বিষয়ে নিজের গুণপনা দেখিয়ে নিজের দেশের শ্রীবৃদ্ধি করছে।

* * * *

বৈঠকের শেষে প্রোফেসার ইয়াসুচি টোকিওর পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে একদিন যেতে অনুরোধ করলেন। তাঁর বিভাগের শিক্ষক, ছাত্র, ছাত্রী সকলের কাছে—নিজের বিষয়ে কতকগুলো কথা বলতে হ'লো—বিশেষ করে পরিসংখ্যান রীতির কথা ও কোয়ান্‌টাম-বিজ্ঞানে ১৯২৫ সালের নতুন নতুন উদ্ভাবনীর ইতিহাস। সে সময় আমি শিক্ষার্থী হিসাবে বার্লিনে উপস্থিত ছিলাম—ও সেই সময় হাইসেনবার্গ (Heisenberg), ডিরাক (Dirac) ও শ্রোডিংগর (Schrodinger) নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে বিপুল উত্তেজনা স্বচক্ষে দেখেছিলাম তারই গল্পকথা বলা হ'লো। ইংরেজীতে বললেও সকলে কথাগুলি বুঝলেন পরের প্রশ্নাবলী থেকেই তা বোঝা গেল। তারপরে পদার্থ-বিজ্ঞানে সেই সময় যেসব কাজ হচ্ছিল এই বিভাগে তা দেখতে নিয়ে চললেন প্রোফেসার ইয়ামানুচী। পরাজয়ের পর থেকে সুদীর্ঘ এত বৎসর ইমারতের রং ফেরান, বালির কাজ ও অন্যান্য জীর্ণতা সংস্কার করা সম্ভব হয়নি—তাই এই দৈন্য অবস্থা বিদেশীকে দেখাতে প্রোফেসর একটু লজ্জিত বোধ করছিলেন। ঘরের ভিতরে কিন্তু সর্বত্রই নতুন ধরণের অনুসন্ধানী কাজ চোখে পড়লো। যন্ত্রপাতিতে বোঝাই রয়েছে ঘরগুলি—হঠাৎ দেখলে একটু অগোছাল ভাব বলে মনে হ'বে—যাহা জাপানী চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। তবে যে জিনিষ বেশী করে মনে গেঁথে গেল তা বিজ্ঞানের শিক্ষার ব্যাপারে মামুলী পন্থা ও সনাতনী পরীক্ষা ছেড়ে জাপানী শিক্ষকেরা বর্তমান যুগের সাম্প্রতিক ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিতে বিশেষ ব্যগ্র। পরে একটি ঘরে আমাকে নিয়ে হাজির করলেন, প্রোফেসর ইয়ামানুচি। যেখানে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক স্বয়ংক্রিয় গণনা-যন্ত্র এক জাপানী অধ্যাপক আবিষ্কার করেছেন। কলেজের কারুশালায় তার পরিকল্পনা রূপ পেয়েছে ও সাময়িক ভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এখন শিল্পপতিরা এগিয়ে এসে গড়ে তুলেছেন কয়েক লক্ষ টাকা দামের একটি নতুন যন্ত্র। যা বাহিরের কারখানা থেকে তৈরী হয়ে সবে ঘরে বসেছে, ও তার বিষয়ে চলছে খুঁটিনাটি পরীক্ষা নিরীক্ষা। পাশে দাঁড়িয়ে যন্ত্রের উদ্ভাবক মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ বোধ করছিলেন—এতদিনের স্বপ্ন বুঝি বা সফল হ'তে চললো।

ইতিমধ্যে কয়েকটি বাঙ্গালী ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। এঁরা তিনজনই এসেছেন কৃষি-বিভাগে গবেষণা করতে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পবিত্র সেনের ছাত্র।

আগষ্ট মাসের পচা গরমে কষ্ট পাচ্ছি। International House-এর ঘরে দরজা জানেলা রাজারুজি থাকলেও খুলে রাখা চলে না—কাজেই একটা Table fan সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম—একজন ছাত্র সহানুভূতি জানিয়ে নিজের ব্যবহারের জন্য যে একটি পাখা জোগাড় করেছিল তাই কয়েকদিনের জন্য ধার দিয়ে গেল। এদের একজন তখন তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণে বীজের মধ্যে যে পরিবর্তন আনা সম্ভব তার ফলে স্থায়ীভাবের কোন উন্নতি চাষের ফসলে আশা করা যায় কিনা—তাই নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞাসা করে বসলাম, তেজস্ক্রিয় বস্তুর ব্যবহার কোথা থেকে শিখলে? উত্তরে জানলাম—ছাত্রাবাসের কাছেই সরকারী তেজস্ক্রিয়-পদার্থ নিয়ে গবেষণার কেন্দ্র রয়েছে—সেখানে আবার অব্যবসায়ীকে ব্যবহার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে অল্প কয়েক মাসের জন্য কারুশালায় কাজ করতে নেওয়া হয়—এবং অল্প কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান ছেলেরা দলে দলে শিখে নিচ্ছে, যাতে তারা অন্যক্ষেত্রে তার ব্যবহার নির্বিঘ্নেই করতে পারে। গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যাপকের নাম জেনে নিলাম। প্রোফেসার কিমুরা। বহুদিন আগে স্বর্গত বন্ধুবর বিধুভূষণ রায় যখন কোপেনহাগেনে প্রোফেসার বোরের কাছে নতুন কোয়ান্টাম বিজ্ঞান শিখতে যান—তখন সেখানে নানা দেশ থেকে গবেষক ছাত্রেরা জড় হয়েছিল। প্রোফেসার বোরের ভাবনা নতুন বিজ্ঞানের প্রসার কতভাবে হ'তে পারে। ছাত্ররা সকলেই পরস্পরের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করতো, প্রোফেসর বোরও মধ্যে মধ্যে তাতে অংশ গ্রহণ করতেন। বিধুভূষণ ফিরে এসে নানা গল্প করতেন সেই যুগের—তাঁরই কাছে জাপানী কিমুরা, নিশিনার নাম অনেকবার শুনেছিলাম। জাপানে ফিরে গিয়ে আণবিক ক্ষেত্রে গবেষণা চালাবার জন্য Tokyo শহরে Nishina একটা Cyclotrone বসিয়েছিলেন। আমাদের দেশেও প্রায় একই সময়ে বন্ধুবর ডাঃ মেঘনাদ সাহা সায়েন্স কলেজে চেষ্টা করছিলেন একই ধরণের যন্ত্র বসাতে। নানাভাবে অবস্থা হেরফেরের মধ্য দিয়ে আজ সেই Cyclotrone চালু হয়েছে। ডাঃ সাহার স্বপ্ন সফল হয়েছে—সুযোগ্য কর্মী ডাঃ বসুর হাতে সেটি অনেক নতুন তথ্যের খবর দিতে পেরেছে। যুদ্ধের মধ্যে প্রোফেসার নিশিনাও একটা চালু যন্ত্র গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরে যুদ্ধে জাপানের হার হলো। হিরোশিমা শহর আণবিক বোমার আঘাতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। নাগাসাকিতেই লক্ষাধিক নিরীহ লোকের মৃত্যু ঘটলো। তারপর আমেরিকানরা জাপান দখল করে বসলে—আমেরিকান সেনানী নিশিনার Cyclotrone খুঁজে বের করল। নিশিনা অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে এই ধরণের পরীক্ষা চালিয়ে তিনি শুধু শুদ্ধ-বিজ্ঞানের সেবা করছেন—ভবিষ্যতে তাঁর উদ্ঘাটিত তথ্যের সমরের ক্ষেত্রে ব্যবহারের কোন সম্ভাবনাই নাই। তবু সেনার দল নির্মমভাবে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে নিশিনার বহুদিনের সাধনার ধন টোকিও উপসাগরে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলে। এসব কথা খবরের কাগজে পড়া। কিমুরার নামে কৌতূহল সজাগ হয়ে উঠলো। স্বদেশী ছাত্রটিকে বললাম—আমার নাম করে প্রোফেসার কিমুরাকে জিজ্ঞাসা করো আমি একদিন তাঁর গবেষণা কেন্দ্র বেড়িয়ে আসতে পারি কি-না।

* * * *

সম্মতি পেয়ে একদিন কিমুরার রেডিও-আইসোটোপ স্কুলে হাজির হলাম। দরজার কাছে অভ্যর্থনা করার জন্য কিমুরা নিজে উপস্থিত। জাপানী প্রথায় নিজের জুতা-জোড়াটি খুলে একপাশে রেখে জাপানী চটি একজোড়া পরা হল, পরে বিধিমত অভিবাদন, সম্ভাষণ জানিয়ে প্রোফেসারের বসবার ঘরে হাজির হলাম। পুরানো দিনের অনেক কথার আলোচনা হ'লো। শুনলাম নিশিনার যন্ত্রটি নাকি কাছেই কোন এক জায়গায় বসান ছিল। কিমুরার সহকর্মী ডাঃ মুরাকামিও (Murkami) সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। পাশের আলমারী থেকে একখানি জাপানী বই আমার হাতে দিয়ে তিনি বললেন—ভারতীয় বিজ্ঞানীদের লেখা বই, আমরা তর্জমা করেছি ডাঃ কোটারী ও ডাঃ ভবের লেখা বইখানি আণবিক বিস্ফোরণের কথা নিয়ে আলোচনা এবং পৃথিবীর নানাস্থানে পরীক্ষামূলক যেসব বিস্ফোরণ ঘটেছে তার ফলে কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় ভস্ম বাতাসে ভেসে বহু দূর দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ছে তারই নির্ধারণ ও সেই বিষয়ের নানা পরিসংখ্যানিক তথ্য ও ভবিষ্যতে অদূর ভবিষ্যতে এরই ফলে মানব সমাজের কতদূর ক্ষতি হ'তে পারে তা নিয়ে নানা কথা। বইখানি ইংরাজীতে লেখা, এবং ভারতে বিজ্ঞানী মহলেও এর বেশী প্রচার নেই বলে আমার ধারণা। জাপানে কিন্তু বইখানি সমাদর পেয়েছে। ডাঃ মুরাকামি নিজে তেজস্ক্রিয় ভস্ম নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন—বললেন হিরোসিমায় বোমা ফাটার পরেই সেখান থেকে ভস্ম সংগ্রহ করেছিলেন তিনি ও তার উপর গবেষণা করেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি অর্জন করেছেন। ডাঃ মুরাকামিকে সঙ্গে নিয়ে গবেষণা কেন্দ্রের নানা ঘরে ঘুরে বেড়ালাম। সর্বত্রই কাজ চলেছে। বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি প্রতি ঘরেই সঞ্চিত রয়েছে। লেবরেটরীর বাড়ী নাকি মাত্র ৭।৮ বৎসর আগে তৈরী হয়েছে—যন্ত্রাদির বেশীর ভাগ জাপানেরই কারখানায় তৈরী—হয়ত প্রথমে বিদেশ থেকে কিছু আমদানী হ'তো, পরে সে দেশেই সব রকম কাজের উপযোগী হাতিয়ার তৈরী হচ্ছে।

* * * *

কিয়াটো ও নারা সহরে ৫।৬ দিন ঘুরে বেড়িয়ে রাজধানী টোকিওতে ফিরে এলাম প্রায় রাত দশটা। হোটেলের পরিচালক আমাকে ঘরে

পৌঁছে দিতে এল। পুরানো ঘরখানাই পাওয়া গেল। জিনিষপত্র যথাস্থানেই রয়েছে। বিদায় নেবার সময় পরিচালক বললে অনুগ্রহ করে আজ রাতে যেন জানলা বন্ধ করেই ঘুমোই। অসম্ভব গরম ও বাতাসে অস্বাভাবিক থমথমে ভাব—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কেন একথা বলছো। ম্লানমুখে উত্তর করলে রাতেই হয়ত তাইফুন এসে পড়তে পারে। ক'দিন সহরের বাইরে কাটিয়েছি—এই বিপৎপাতের সম্ভাবনায় কিছুই জানি না। অবশ্য তাকে আশ্বাস দিলাম— তুফান আরম্ভ হ'লেই উঠে সব বন্ধ করে দেব।

ভোর থেকেই জোর হাওয়া ও বৃষ্টি হয়েছে। নীচের বারান্দায় পরিচারকরা সন্ত্রস্তভাবে বৃষ্টির জল বুরুশ দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। একখানা ইংরেজী দৈনিক কিনে পড়ে দেখি—আসন্ন ঝড়ের খবর কয়দিন আগে টোকিও সহরে প্রচার হয়েছে। কামাকুরার সমুদ্রতটে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ আছড়ে পড়ছে—কয়দিন আগে থেকেই। বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার স্রোতে দেশের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা—স্বেচ্ছাসেবক হাজারে হাজারে পাহারা দিচ্ছে, কোথাও ধস্ নামলে যেন তখুনি মেরামত করে ফেলতে পারে। সহরের মধ্যে নতুন বহু সহস্র প্রহরীর আমদানী হয়েছে, ঝড়ের প্রকোপে বৈদ্যুতিক সরবরাহের তার ছিঁড়ে কিংবা গ্যাসের পাইপ ভেঙ্গে সহরে অগ্নিকাণ্ড সুরু হ'তে পারে, তারই প্রতিষেধের জন্য এই সতর্ক ব্যবস্থা। জাপানীরা জানে বিপুল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাণ্ডবকে প্রতিরোধ করতে শেষ অবধি মানুষের শক্তি হয়ত নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর দাঁড়াবে, তবু তারা বিনা চেষ্টায় পরাজয় স্বীকার করবে না। সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজেকে বাঁচাবার জন্য শেষ অবধি চেষ্টা করে দেখবে। সুখের বিষয় সেবার ব্যাপার বেশী দূর গড়াল না। বিকালের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এলো। খবর এলো শেষ অবধি ঝড়ার কেন্দ্র দিক পরিবর্তন করে জাপানের পশ্চিম উপকূলের দিকে বেঁকে গিয়েছে। শহরের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

* * * *

দু' হাজার বৎসরের ইতিহাসে পড়া যায় জাপানকে কয়েকবার বিশ্ববিধ্বংসী শক্তির প্রতিস্পর্দ্ধিতা করতে হয়েছে, ও প্রত্যেক বারেই সে নিজেকে শেষ অবধি বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। মঙ্গলদের অভিযান প্রতিরোধের রোমাঞ্চকর গল্প জাপান যাবার আগেই সত্যসুন্দর দেব মশায়ের মুখে শুনে গিয়েছিলাম। ১২৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই মঙ্গলবাহিনী পশ্চিমে, দক্ষিণ রাশিয়া ও হাঙ্গারী থেকে পূর্বে কোরিয়া সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিপুল ভূখণ্ড অধিকার করে বসেছিল। চীনদেশের শেষ ক্ষীণ প্রতিরোধও চূর্ণ হয়ে গেল ১২৭৬ সালে। মঙ্গল সাম্রাজ্য আড্রিয়াটিক থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত—সম্রাট কুবলৈখানের অধীনতা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে। ক্ষুদ্র দ্বীপরাজ্য জাপান তখনও স্বাধীন। সম্রাট দূতমুখে বশ্যতা মানতে জাপানরাজকে আহ্বান করলেন—কিয়োটো তখন জাপানের রাজধানী। রাজা পার্ষদরা ভয়ে মুহ্যমান হয়ে অধীনতা স্বীকারের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো। তবে কামাকুরার বীর সামন্তেরা কিছুতেই রাজী হলো না—বরঞ্চ কয়েকজন দূতের শিরশ্ছেদ করে তারা জানিয়ে দিল তারা কিছুতেই মাথা নোয়াবে না। সম্রাট ক্রোধে জ্বলে উঠলেন—১২৭৪ সালে কোরিয়া থেকে জাহাজে করে পাঠালেন প্রভূত এক সৈন্যবাহিনী—তারা কিয়সুর উত্তর উপকূলে নেমে পড়লো! রণডঙ্কা বেজে উঠলো—তবে সেবার মঙ্গল সৈন্য বেশীদূর অগ্রসর হলো না—কিছু দিন বাদে দেশে ফিরে গেল। বোধ হয় তাদের রণতরীর ব্যূহ ঝড়ঝাপটার মধ্যে নিজেদের নিরাপদ মনে করলে না। আবার যে মঙ্গলেরা ফিরে আসবে—তা জাপানীরা বুঝেছিল—কয়েক বৎসর ধরে কামাকুরার ক্ষাত্রকুল উত্তর কিয়সুতে পাহারা দিতে লাগলো হাকাটা (Hakata) উপসাগরের মধ্যে প্রকাণ্ড এক উঁচু বাঁধ গড়ে তুললে যাতে মঙ্গলদের অসম-সাহসিক অশ্বারোহী সৈনিকদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হ'তে পারে। বিপুল রণতরী ব্যূহ রচনা করে কোরিয়া এবং চীনের সংযুক্ত চমূ এগিয়ে আসতে লাগলো ১২৮১ সালে—খবর রটে গেল দেড় লক্ষ অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য নিয়ে মঙ্গলরা ফিরে আসছে। এই বিপুল সৈন্যবাহিনীকে কিভাবে মুষ্টিমেয় কামাকুরার সামন্ত ঠেকিয়ে রাখবে? তবু তারা প্রাণপণ করে বাঁধে দাঁড়িয়ে রইল। শেষ অবধি দেখবে কি হয়, ও জাপানের কপালে ভাগ্যবিধাতা কি লিখে রেখেছেন। এ দিকে ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে অহোরাত্র প্রার্থনা জানাচ্ছেন এক বৌদ্ধ-ভিক্ষু (উপকথায় তাঁকে ভারতীয় বলে বর্ণনা আছে)—দেশের পরিত্রাণের জন্য আকুল প্রার্থনা আকাশ পূর্ণ করেছে ও মন্দিরের প্রাঙ্গণে ঘণ্টা বেজেই চলেছে মহাভিক্ষুর হাতে। অবশেষে শেষ অবধি দেবতা বুঝি মুখ তুলে চাইলেন। অসময়ে দূরে দক্ষিণ দিকে এক টুকরো মেঘ দেখা গেল। অল্পক্ষণবাদেই সারা আকাশ অন্ধকার করে উঠলো প্রচণ্ড ঝড়ো কাল-মেঘ ভগবানের প্রেরিত তাইফুং (কামিকাজে)। এর তাণ্ডব মঙ্গলদের অভিযাত্রী তরীসমূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে ডুবে গেল,—যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, ক্ষুদ্র জাপানী নৌবাহিনী তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিলে। মঙ্গলদের বিরাট অভিযান প্রতিহত হলো। প্রত্যেক জাপানীর মনে এই উপকথা গাঁথা আছে—প্রসিদ্ধ ঘণ্টাটি নাকি সযত্নে এখনো সেই মন্দিরে রক্ষিত আছে। জাপানের পুণ্যভূমি চিরকাল দেবতার কল্যাণে নিরাপদে থাকবে—শত্রু তাকে কখনো ধর্ষণ করতে পারবে না জাপানের এই স্থির বিশ্বাস কিন্তু মহাযুদ্ধে অযৌক্তিক বলে প্রমাণ হয়ে গেল। আধুনিক বিপ্লবের মুখে হাজার বৎসরের ধর্মধ্যান-ধারণায় নোঙ্গর ছিন্ন হয়ে জাপানীর মন কোন্ দিকে ভেসে চলেছে কে বলবে!

* * * *

জাপানে আমার মেয়াদ প্রায় শেষ হ'তে চললো। দেশে ফিরে আসব—সব ঠিক করেছি এমন সময় সুযোগ জুটলো জাপানে আণবিক চুল্লীর যোজনা স্বচক্ষে দেখার। অধ্যাপক কিমুরা সঙ্গে নিয়ে চললেন। আমরা সকাল ৭টায় মোটরে বেরিয়ে পড়লাম। বেশী দেরী হ'লে টোকিও সহরের ভিড়ের মধ্যে নাকাল হতে হবে এই ভয়ে। প্রায় ১ শত কিলোমিটার দূরে এই প্রতিষ্ঠান, সেখানকার অধিকর্তা কিকুচির নাম অনেকদিন থেকে জানি। পথে হিতাচির বিরাট কারখানা পাশে রেখে মিতোয় পৌঁছালাম—প্রায় সাড়ে ন'টায়। ডাঃ কিকুচী সাদর অভ্যর্থনা জানালেন—ঘুরে দেখবার অনুমতি পেলাম। ছোট একটা আণবিক চুল্লী কাজ করছে—আর একটি বড় চুল্লীকে গড়ে তোলার কাজ করছে ওই দেশের ছেলেরা। গড়ে তোলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমার নামে যুবকর্মীরা সকলে উৎসাহ করে বেরিয়ে এলো। নিজের চোখে সব দেখার সুযোগ মিললো। ধাতু ও কেলাসিত বস্তুর ধর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা চলেছে। সমুদ্রতীর থেকে বেশীদূর নয় মিতো—প্রায় হাজার কর্মী এইখানে বসতি করেছে—কাজ চলেছে। ছোট একটি খালের ওপারে শিল্পপতিরা গড়ে তুলছে এক কারখানা। আণবিক চুল্লী বিরাটভাবে সফল হ'লে—তার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কাজে লাগাবে আণবিক শক্তি!

খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—জাপানে তো ইউরেনিয়ম নেই—তোমরা কাঁচা রসদ কোথা থেকে পাবে? শুনলাম আমেরিকা থেকে আসবে। হেসে বললাম—এরাই না বোমার আঘাতে হিরোসিমা ধ্বংস করেছিল—আর নিশিনার Cyclotrone ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। আবার ভাবি আমরাও তো দেশে কানাডার সহযোগিতার মুখ চেয়ে আছে। সেদিন সন্ধ্যায় টোকিও সহরে ফিরে এলাম—পরের দিন দুপুরের প্লেনে দেশে চলে এলাম।
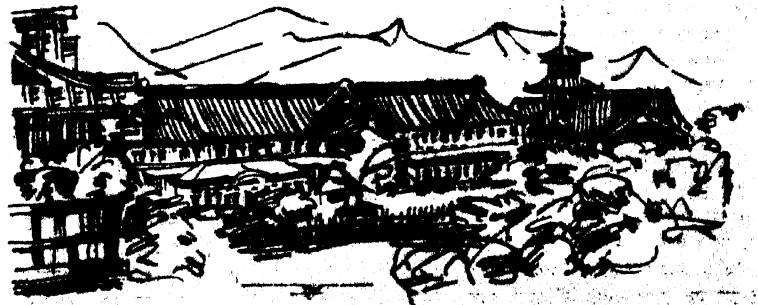
সাঁওতাল পরগণার একটি ছোট সহর, আমি গেছি স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য। কিছু কিছু হচ্ছিলও মন্দ নয়, এমন সময় একটা অসুবিধায় পড়ে যেতে হোল। যে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম—রান্নাবান্না করবে, অন্যভাবেও দেখবে-শুনবে, সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না তার ওপর উল্টে ওকেও দেখা-শোনা করা, দেহ-মনের ওপর বেশ চাপ পড়তে লাগল। একটা ছোট ওজনের কল সঙ্গে এনেছি, একদিন পরীক্ষা করে দেখি, যা এসেছিলাম তার চেয়েও পাউন্ড দুয়েক কমে গেছি। মনটা খুব দমে গেল। বাঙ্গালীদের ছোটখাট একটা ক্লাব আছে, বিকালে সেখানেই যাই। আজ কেমন ভালো লাগল না। যেখানে থাকি তার মাইল দুয়েক উত্তর দিয়ে অজয় নদী বয়ে গেছে। একটা বেশ নিরিবিলি জায়গা আছে। কিছুটা দূরে খান-পাঁচ-ছয় ঘর নিয়ে একটা সাঁওতাল পল্লী, মাঝে মাঝে যাই, সেইখানেই গিয়ে বসলাম। পাহাড়ী নদী, এমনি প্রায় শুকনো মাঠ, কিন্তু হঠাৎ যদি ওপরের দিক থেকে পাহাড়ের জল নামল তো বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ধাক্কা খেয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সেদিন ওপরে বৃষ্টিটাও নিশ্চয় বেশি হয়ে থাকবে, গিয়ে দেখি নদীর প্রলয়ঙ্করী মূর্তি।

বেশ ভাল লাগছিল। মুক্ত আকাশ, দূর চক্রবালে পাহাড়ের নীল রেখা, এই দুর্মদ নদী—প্রকৃতি যেন দিনের শেষে তার দুরন্ত মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বসেছে, কোনমতেই সামলাতে পারছে না। চেয়ে থেকে থেকে একটু অনামনস্ক হয়ে গেছি, এমন সময় নজরটা হঠাৎ ছেলেটির ওপর গিয়ে পড়ল। আমি তীরের ওপরে বসে আছি, ও-আছে নীচে আমার থেকে প্রায় শ'খানেক হাত দূরে, জলের কাছাকাছি একটা পাথরের চাঁইয়ের পাশে। একটু আড়ালে বলেই এতক্ষণ পড়েনি চোখে। প্রথমটা মনে হোল সাঁওতাল পল্লীর ছেলে। তারপর মুখটা একবার এদিকে ঘুরে যেতে বুঝলাম তা নয়, এমনকি বাঙ্গালীও হতে পারে। একটু কেমন কেমন ঠেকল যেন; বাঙ্গালী বেহারী সাঁওতাল—যাই হোক, এসময় ওখানে ওভাবে বসে থাকবে কেন? বয়সটাও মনে হোল উনিশ-কুড়ির মধ্যে অর্থাৎ অল্প, মান-অভিমানে আত্ম-হত্যা করতে যাওয়ার মতো; যেমন নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি।

ডাক দিলাম, হিন্দিতেই—"এই, শুনোতো।"

তীররেখার একটু আড়ালেই আছি, নিশ্চয় লক্ষ্য করেনি আমায়, একটু চকিত হয়েই ঘুরে চাইল। দ্বিতীয় বার ডাকতে উঠেও এলো ধীরে ধীরে। ঐ রকমই বয়স। কালো হলেও রংটা একটু মাজা। একটু বেশি রোগা যেন। বাংলাতেই প্রশ্ন করল—"আমায় ডাকছেন?"

বললাম—"বাঙগালীই? তা ওখানে অমন-ভাবে বসে কেন এসময়? জল বাড়ছে।"

একটু থতমত খেয়ে গেল যেন একটা খারাপ অভিসন্ধিই ধরা পড়ে গেছে এবং হয়তো তাইতেই ভাষাটাও বেশ জুগিয়ে উঠল না। একটা ঢোঁক গিলে বলল- "কেন, জিজ্ঞেস করছেন? এই...চাকরি খুঁজছি।"

তা ওখানে চাকরি আছে কে বলে দিয়েছে তোমায়?"

"না, সহরেই খুঁজছি।" —একটু লজ্জিত-ভাবে উত্তর করল। কিছু যে একটা ছিলই দুরভিসন্ধি তাতে আর সন্দেহ নেই। আর ওদিকে কথা না বাড়িয়ে প্রশ্ন করলাম—"কি কাজ করতে পার?"

সঙ্গে সঙ্গে নিজের গৃহস্থালির অবস্থা মনে পড়ে যেতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলাম—"রান্না করতে জান?"

উত্তর করল—"জানি!" —তারপর বেশ উৎসাহের সঙ্গেই বলল—"সেই চাকরিই খুঁজছি।"

বললাম—"তাহলে চলো, আছে চাকরি। বাসন মাজা, ধোওয়া-মোছা এসবও করতে হবে কিন্তু।"

"ওগুলো তো জানিই!" —এমন আত্ম-প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল যে, রন্ধনজ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহই হয়। তবু নিলাম সঙ্গে। পথে আসতে আসতে প্রশ্ন করে জানলাম নাম রতন, বর্ধমানের এক গ্রামে বাড়ি, জাতিতে কায়স্থ।

বেশ চৌকশ ছোকরা। বয়সের জন্য একটু বোধ হয় মন্থর, মাঝে মাঝে এলিয়েও পড়ে তবে জানে সব কাজ, ফাঁকিবাজও নয়। বিশেষ করে রান্নার হাতটা তো বেশ ভালোই, যেন রীতিমতো শিক্ষা আছে, এবং অভ্যস্তও।

দু'একদিনের মধ্যে গৃহস্থালির পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে নিল রতন; এমন কি বুড়ো চাকরটার পরিচর্যা পর্যন্ত। তাকে কি করে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে, এখানে সহজে সারবার নয়, রতনের পরিচর্যায় খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠলে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

ছেলেটার সবই ভালো, কিন্তু লক্ষ্য করলাম একটু যেন বোকা গোছের। সবই জানে, সবই করে, কিন্তু যেন একটা বাঁধা ছক ধরে যান্ত্রিক-ভাবে। একটা নূতন কিছুর সামনে এসে পড়লে দিশায় পড়ে গিয়ে হঠাৎ থেই হারিয়ে ফেলে। যতে করে মনে হয়, কার পরিচালনায় যেন অভ্যস্ত, নিত্য না হোক, মাঝে মাঝে রাস্তা ধরিয়ে না দিলে একটু দিশেহারা হয়ে পড়ে। অবশ্য কাজ আর মনিবের সাথে পরিচয় বাড়ার সঙ্গে এভাবটা কমে আসতে লাগল, তবু কিন্তু মজ্জার মধ্যে কোথায় আটকে রইলই একটু। মনের গঠনটা মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে—খানিকটা 'এব্‌ন্যর্মাল' অর্থাৎ সাধারণ থেকে আলাদা। ছোটখাট অসুবিধা হয় মাঝে মাঝে, তারপর একদিন একেবারে চরমে দাঁড়াল অবস্থাটা।

একা থাকি, কিভাবে কেমন চলে—বন্ধুদের সবাই একটু কুতূহলী থাকে, সেই প্রসঙ্গে দু'চারবার প্রশংসা করেছি রতনের, বিশেষ করে ওর রান্নার। একদিন রাত্রে নিমন্ত্রণও করলাম; সব মিলিয়ে জন সাত। সেদিন টেবিল টেনিসটা বেশ জমেছে, বার দুই ভাবলাম দেখে যাই, ছাড়া পেলাম না। নিজেরও ততটা তাগিদ হোল না, রতন তো রয়েছে। বাসাটা খানিক দূরেও। খেলা একেবারে শেষ করেই উঠলাম আমরা। পাড়িজন সোজাই চলে এলাম বাকি তিনজন বাসা হয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। রাত হয়েছে।

এসেই চোখ কপালে উঠল। দোরে শেকল দেওয়া, কোন সাড়াশব্দ নেই রতনের।

জানি কোথাও এসে থেই হারিয়ে ফেলেছে। ওদের ঘরে বসিয়ে বাইরের ওর ঘরটায় গিয়ে দেখি হাত দুটোকে বালিশ করে চিৎ হয়ে মেঝেয় শুয়ে আছে। আমি যেতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"কী ব্যাপার রে?"—একটু চাপা গলাতেই প্রশ্ন করলাম। প্রশংসা করি তাই আমারই যেন দায়।

এমন কিছুই ব্যাপার নয়। লুচি পোলাও দুই-ই করতে বলে গিয়েছিলাম। মাংস পর্যন্ত নামিয়ে ভাঁড়ার থেকে ঘি আনতে গিয়ে দ্যাখে যা ঘি আছে তাতে দু'রকমই হবে না। তখন দোকানও বন্ধ হয়ে গেছে, ও হাত পা এলিয়ে পড়ে ছিল।

বললাম—"ক্লাবে গিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে বললেই পারতিস। কিম্বা একটাই করতিস, আমায় বলে দিতিস। কত রকম তো উপায় ছিল।"

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, বলল—"তাই ভাবছিলাম। ও ঠিক হ'য়ে যেত। তাহলে...

বললাম—"হয়েছে। তোমায় আর উঠতে হবে না। যেমন শুয়েছিলি শুয়ে পড়, আর একটু করে গোঙাতে থাক মাঝে মাঝে।

—শুধু ওর যশ অটুট রাখা নয়, নিমন্ত্রণ করে ভাঁড়ারের খবর রাখি না, আমারও লজ্জা, গিয়ে বলতে হোল—"হঠাৎ পেটে একটা ব্যথা উঠে পড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। তেমন কিছু নয়, ওঠে মাঝে মাঝে।"

দলের মধ্যে এখানকার ডাক্তারবাবুও আছেন, বললেন—"ডিস্টার্ব করে কাজ নেই।"

এদিকে মাছ আর চাটনি বাকি আছে। ময়দা মেখে হাতে-নাতে সবাইকে সেরে নিতে হোল।

পিকনিকের মতো তখন একরকম করে হুজুগের মধ্যেই কেটে গেল, কিন্তু রতনকে রাখা একটা সমস্যা হয়ে পড়ল। আর কিছু নয় তো ওর যশটা বজায় রাখতেই যে কসরৎ সেটাই তো একটা দুশ্চিন্তার বিষয়। সবাইকে বলে রাখলাম এবং পাওয়াও গেল দুটো লোকের সন্ধান।

বেশ দ্বিধায় পড়ে গিয়ে মনটা একটু খারাপই যাচ্ছে। এমনি যে এ্যাবনর্মাল তার সম্বন্ধে একটা মায়া এসেই যায়, বেশ কিছু দিন কাটলও সঙ্গে, তার ওপর ছেলেটার অন্য কোন দোষ নেই; চুরি, কি নেশা ভাং কি ঐ ধরনের আর কিছু।

কি করব ভাবছি এমন সময় একদিন একটা খেয়াল মাথায় উদয় হ'তে, ছাড়ানো তো দূরের কথা, রতন আমার কাছে হঠাৎ অপরিহার্য হয়ে উঠল, দুর্লভ এক আবিষ্কার।

আমি তখন থিয়োজফি নিয়ে নাড়াচাড়া করছি; পরলোকের নানাস্তরের অধিবাসীবৃন্দ, মানুষের মনের ওপর তাঁদের প্রভাব, এই সব। রতনের পরিচালনা যদি সেখানকার কোন স্তর থেকে আসে তো সে এক আশ্চর্য ব্যাপার বৈকি। পূর্বপুরুষ বা কোন মহাপুরুষের সংযোগশালী আত্মা। কোন পরী, দেবী, দেবতা অদৃশ্য অভিভাবক বা গার্জেন এমনকি হয়ে থাকা এই রকম ক্ষমতাবান অপরিণত-মস্তিষ্কের মানুষকে চালিয়ে নিয়ে যান।

একদিন ওকে ডেকে প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁরে, তুই যে সেদিন চিৎ হয়ে শুয়ে ওরকম কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে ভাবছিলি, বললি ঠিক হয়ে যেত, তা কেন বললি ও-কথা?"

হাবার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বললাম—"আচ্ছা, এবার বল দিকিন—তোকে কি কখনও ভূতে পেয়েছিল?"

এবার মাথা দোলাল, বলল—"অনেক আগে ছেলেবেলায় একবার ভর হয়েছিল, ডাক্তার বললে হিস্টিরিয়া। ওষুধ দিয়েছিল।"

"ডাক্তারের মুণ্ডু!" উৎসাহিত হয়েই বললাম। প্রশ্ন করলাম—"সেরেছিল ওষুধে?"

"না, মাদুলিতে গেল। এই যে!"—দেখাল ডান বাহুতে একটা বেশ বড় মাদুলি।

পেয়েছি যা খুঁজছিলাম। সেদিন আর এ-কথাটা বাড়ালাম না। ভূত হোক, হিস্টিরিয়া হোক, আবার সেই সব কথা মনে করতে গেলে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে মনটা। একটু বরং সাহস দিয়েই বললাম—"ঠিক আছে, মাদুলি ধুয়ে জল খাস তো নিয়ম করে? খেয়ে যাবি। ওসব কিছু নয়, আর হবে না।"

ভুলে যেতে দিলাম ওকে প্রসঙ্গটা। আমি কিন্তু বসে নেই একটা খাতা করেছি এবং একটু কোথাও এ্যাবনর্মাল কিছু নজরে পড়লেই তখনই নোট করে যাচ্ছি: কি করে তোল, কি করে গেল। প্রচুর অবসর তার মনটা সর্বক্ষণ এদিকে, যেগুলো আগে ধর্তব্যের মধ্যে আনতাম না সেগুলোও অর্থবান হয়ে উঠছে। খাতা ভরে আসছে। খান দুয়েক নামকরা থিওজফির বইও আনতে দিয়েছি মাদ্রাজের আড্যায়ার থেকে। তারপর একদিন নিজের সামলো একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। একেবারে অপ্রত্যাশিত!

মাঝখানে রতন দিনকতক একটু দমে গিয়ে-ছিল। সেই ব্যাপারটার পর বোধ হয় একটা বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করে থাকবে। তা তিনি কোনরকমে কানেও গিয়ে থাকবে। অন্যলোক দেখছি। এদিকে আমার ভাবান্তরে ওর সহজ ভাবটাও ফিরে এসেছে। বরং বিপদের ছায়াটা কেটে গিয়ে আরও ফূর্তিতেই আছে।

ভূত-হিস্টিরিয়ার প্রসঙ্গটাও একেবারে মন থেকে সরে যাওয়ার সময় দিলাম যাতে সন্দেহ না হয় কিছু। তারপর, দিন দশেক পরে একদিন নিতান্তই গল্প করার ছলে প্রশ্ন করলাম—"হ্যাঁরে রতন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, ঠিক ঠিক বলবি কিন্তু।"

একটু লজ্জিতভাবেই বলল, "লুকুতে কেন যাব বলুন।"

বললাম, "হ্যাঁ, তাই। হঠাৎ কেমন মনে পড়ল তাই জিজ্ঞেস করছি তোকে; আর কিছু নয়। আচ্ছা বল দিকিন—এমন কি কিছু জানতে পেরেছিস, বা মনেই হয়েছে তোর যে, কি করতে হবে তোকে, বা কিভাবে চললে তোর ভালো হবে সেকথা তোকে কেউ বলে গেছে—স্বপ্নেই হোক বা যেভাবেই হোক?"

একটু বেশি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাবল রতন। উত্তরটা দিতে একটু সময়ও নিল, যেন একটা বড় রকম গোপন রহস্য প্রকাশ করে ফেলবার সংকোচেই, তারপর ঠোঁটে একটু সঙ্কোচের হাসি নিয়েই বলল—"হ্যাঁ, লোকে বলে বাবু।"

হিমবাহ — বিশ্বদেব বিশ্বাস

"গেছে বলে! কি রকম? একটু খুলে বলতে কোনও বাধা আছে?"—খুব আগ্রহের সঙ্গে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

"না, আপনাকে বলব তাতে বাধা কি আর?"

"তা হলে...তুই নিশ্চিন্দি থাক, আমি কাউকে বলতে যাচ্ছি না।"

আর একবার একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল রতন, তারপর বলল—"সেই বলে বলে তো আমায় পাস করালে।"

"পাস করালে মানে!!"—বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। রতন সঙ্কোচে মাথাটা একটু নীচু করে নিয়ে বলল—"আমি ম্যাট্রিক পাস। এই সনেই করলাম।"

"তা কই বলিসনি তো আমায়?"

"সেই মানা করে রেখেছিল। ছোট কাজ তো, পাস করা জানলে দিতে চাইতেন না।"

"আগে থাকতে সেই মানা করে রেখেছিল?"

মাথা দোলাল রতন। টিউশন পেলে বলব, এরকম কাজ পেলে নয়।"

"মনে হয় যেন কি হবে না-হবে সব জানে, নয়?"

মাথা দোলাল।

"বলে কি করে? সামনে এসে?"

মাথা দোলাল। প্রশ্ন করলাম—"স্বপ্নে দেখতে পাস?"

"তাও আসে।"—একটু বেশী সঙ্কুচিত হয়ে উত্তর করল।

দুর্লভ মিডিয়াম একজন পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করবার। একেবারে এতখানি হজম করা সম্ভব নয়, আমি চুপ করে কথাগুলো বেশ করে গুছিয়ে নিলাম মনের মধ্যে নোট বইয়ের জন্য। বললাম,—"হ্যাঁ, এইবার বল।...আচ্ছা তার আগে আর একটা কথা। টিউশন খুঁজেছিলি?"

ভাবলাম তাই না হয় জোগাড় করে দেওয়া যাবে একটা, শিক্ষিত ছেলে, পেটের দায়ে ছোট কাজ করতে হচ্ছে।

মনের গ্রন্থি খুলে আসছে। আগে একটু মাথা হেঁট করেই রইল রতন, তারপর লজ্জিত-ভাবে একটু হেসেই বলল—"পারতুম না বাবু, পড়ে পাস করা নয় তো।"

একটা রীতিমতো বিস্ময়কর কাহিনীর অবতারণা করল রতন। সে শুধু যে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে পাস করিয়েছে তাই নয়, গরীবের ছেলে, দারিদ্র্য এবং সব রকম প্রতি-কূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে তার উপায়ও বাৎলে গেছে। বললাম—"বেশ, শুনিই সবটা আগে। বল।"

—গাঁয়ের স্কুল থেকে মিডিল পাশ করে রতন বর্ধমানে এসে একটা হোটেলে কাজ নিল। পড়াশোনা করে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। মাইনে থেকে বই খাতা কেনা এক রকম করে চলল, কিন্তু হোটেলের অত খাটুনি, তার পর পড়াশোনা করা এক রকম অসম্ভবই। শেষে তারই বুদ্ধি এবং নির্দেশেই একটা ব্যবস্থা হোল। স্কুলের একজন মাস্টার হোটেলে থাকতেন, রতন তাঁকে খুব তোয়াজ করতে আরম্ভ করল। বেশি করে মাছ, মাংস, ভাতে, ডালে ঘি। জলখাবারের সময় দুখানা বেশি লুচি, কি টোস্ট, চায়ে বেশি করে দুধ। হাত করে ফেলল তাঁকে। তিনি পড়িয়েও দিতেন কিছু কিছু গরীবের ছেলের আগ্রহ দেখে; একটু এগুলো রতন। কিন্তু সে খুব অল্পই। বুঝিয়েই দিতেন, কিন্তু সেগুলো খেটেখুটে মাথায় জমা করে রাখতে হবে তো তাকেই। এদিকে বছর তিনেক পরে প্রাইভেটে দেওয়ার সময় হয়ে এল। মনটা খুব খারাপ, বৃথাই গেল সব। তখন সেই আবার বুদ্ধি জোগাল

—নকল করা বলে একটা ব্যবস্থা আছে এবং মাষ্টারের দয়া হলে কিছু শক্তও নয়। কত রকম উপায় আছে।

—মাষ্টারের তেমন দয়া হলে একেবারে বই খুলে উত্তর দেওয়া পর্যন্ত—সেই অনেক কিছু বাৎলে দিল—এই বাড়তি অনুকম্পার জন্য তোয়াজ করার নূতন উপায় পর্যন্ত। মস্ত বড় একটা নূতন ঝুঁকিও নিতে হোল তাঁকে।

এত সংক্ষেপে নয়, তবু খানিকটা রেখে ঢেকেই বিবরণটা দিয়ে কতকটা সঙ্কোচে কতক আবার গর্বেও মুখের দিকে চেয়ে রতন বলল—"পাস করে গেলাম!"

একটু যে আঘাত না পেলাম এমন নয়। পরলোকের তাঁরা উচ্চস্তরের আত্মা, এত খোসামোদিতে নামতে গেলেন শেষ পর্যন্ত।

ঠিক সোজাসুজি ওভাবে কথাটা না তুলে

প্রশ্ন করলাম—'কিন্তু এত করতে গেলেন কেন তোর জন্যে?'

সে রহস্যটাও বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল রতনের উত্তরে। এবার আরও সংকুচিতভাবে মাথাটা একটু নীচু করে থাকার পর বলল—"ভালো...ইয়ে...মানে—লভ রয়েছে যে।"

"ও! তাহলে ঠিক আছে।" —আমি আর বাড়ালাম না লজ্জাটা। বইয়েও বারণ, এসব রহস্যের মধ্যে বেশি প্রবেশ করতে নেই। তাঁরা বিচলিত হয়ে পড়েন। সব নষ্ট হ'য়ে যায়।

তা ভিন্ন আরও একটা কথা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মনে হল রতনের চোখ দুটি একটু সজল হয়ে উঠেছে হঠাৎ। আর এগুলো চলে না। জীবনের সবচেয়ে মর্মন্তুদ স্মৃতি উদ্বেল করে তোলা তো।

নকলের জোরে পাস করা, তবুও উৎকট মেহনৎ গেছে; স্বাস্থ্যটা একেবারে ভেঙে পড়ল রতনের। হোটেলের উদয়াস্ত কাজ, আর সামাল দিতে পারে না। পাস করার পর থেকে হোটেলে কাজ করতে কেমন একটু লজ্জালজ্জাও করতে লাগল। এদিকে হোটেল-ওলা ম্যাট্রিক-পাস চাকর রেখেছে বলে খদ্দেরের কাছে বড়াই করে, কিন্তু এক কপর্দকও মাইনে বাড়াবার বেলা নয়। অবস্থাটা যখন এইরকম যাচ্ছে, আবার তার নির্দেশ পাওয়া গেল—এই দিকে চলে এসে স্বাস্থ্যটা আগে ঠিক করে নিক। একটা টিউশন পায় ভালোই, না হয় পাস করার কথা লুকিয়ে কারুর রাঁধুনিগিরি করেই। হোটেলে ও-বিদ্যাটা ভালোরকমই আয়ত্ত করা ছিল।

আশ্চর্য হয়ে শুনে যাচ্ছি; আমাদের ঋষিরা যা বলে গেছেন—প্রেতলোক, পিতৃলোক, দেবযান, ওরাও যে বলে গার্জেন এন্‌জেল—সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য!—কী নাস্তিক হ'য়ে পড়েছি আমরা!

বললাম—"আচ্ছা, আর একটা কথা, তারপর আর তোকে বিরক্ত করব না। ঠিক করে বলতো —সেদিন তুই নদীতে আত্মহত্যাই করতে গিয়েছিলি; নয়কি?"

মাথাটা নীচু করে রইল। বললাম—"বল, আমি তো কাউকে বলতে যাচ্ছি না।"

"কিন্তু পাচ্ছিলাম না বাবু।"

"তারপর? নামলি না যে?...আবার সেই...?"

"হ্যাঁ বাবু, তার কথা...তারপর আপনিও..." হঠাৎ গলাটা বেধে গেল; চোখে কোঁচার খুঁট তুলল রতন। পিঠে হাত দিয়ে বললাম—"থাম। চুপ কর। অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাবি কিন্তু তার কথা; ভালোই হবে তোর।"

ওকে ছেড়ে দিয়ে আবার একটা হঠাৎ কৌতূহলে ডেকে নিয়ে বললাম—"হ্যাঁরে রতন, আমার সম্বন্ধে কিছু বলে?—এতদিন রয়েছিস সঙ্গে।"

"বলে বাবু। বলে দেবতার মতন সেবা করবে—অত ভালো মনিব—নেহাৎ......"

লজ্জিত হয়ে প'ড়ে তাড়াতাড়ি বললাম—"থাক, থাক হয়েছে। যা তুই।"

তা করে রতন। পান থেকে চুণ খসতে দেয় না। যতরকমভাবে করা চলে আমার সেবা। জানেও তো নানারকম হুনর-তরিবত। একদিন নজরে পড়ে গেল এক বাটি কয়েক দিনের জমানো সর থেকে ঘি তোয়ের করছে। আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—"তুই এও জানিস নাকি?"

একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। বলল—"হোটেল-ওলার জন্যে করতে হোত।"

নিজের দিকেও নজর আছে। মাঝে মাঝে আমার কলটার ওপর দাঁড়িয়ে ওজন নিতে দেখেছি। তবে, নিজের তদ্বির—সে যেন খানিকটা অবহেলার সঙ্গেই, নেহাৎ কার যেন নির্দেশ পালন করা। আমাকেই খ্যাঁচাতে হয় মাঝে মাঝে শরীরের দিকে নজর দেওয়ার জন্য।

বেশ চলছে। নোটে নোটে আমার খাতা ভরে উঠেছে। ক্লাবের সবাইকে উৎসাহিত ক'রে একটা প্ল্যানচেট আনাবার ব্যবস্থা করেছি। অবশ্য এসব এখন কিছু না বলে। এমন একটা তোয়ের মিডিয়াম হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া চরম মূর্খতা। আবিষ্কার করতেই হবে কোথায় কোন্ স্তর থেকে তিনি জাগতিক ভালোবাসাকে অম্লান ক'রে রেখেছেন ভালো-মন্দর মধ্যে দিয়ে। সত্যিই তো, ভালোবাসার সামনে আবার ভালোমন্দ বিচার কি?

মনে যখন এইরকম সংকল্প, হঠাৎ রতন অদৃশ্য হয়ে গেল। তবে আমার সংকল্প কার্যে পরিণত করতে না পারলেও, রহস্যটা আর রহস্য রইল না।

বলে রাখাই ছিল, রতন চলে যাওয়ার দুদিন পরেই একটা নূতন চাকর পাওয়া গেল। তাকে দিয়ে ঘর-দোর ঝাড়িয়ে নূতন করে গোছ-গাছ করছিলাম, একটা ভাঁজকরা কাগজ নিয়ে এসে প্রশ্ন করল—"দেখুন তো, আপনার চিঠি কি? আমাদের ঘরে তাকের উপর ছিল।"

রতন হয়তো কিছু লিখে রেখে গেছে আমার জন্য। তাড়াতাড়ি ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু ক'রেই বুঝলাম তা নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পড়ে ছাড়াও গেল না। লেখা আছে।

প্রাণাধিক, তোমার ওজন সাত স্টোন থেকে সাড়ে আট স্টোনে উঠেছে জেনে যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি। ঘি তৈয়ারির উপায় তোমায় বলিয়া দিয়াছি। রোজ-কার সর জমা করিয়া সেইভাবে করিয়া যাইবে এবং নিত্য সেবন করিবে। এতে কোন পাপ হয় না। মনিব বড় লোক। পাঁচরকম ভালোমন্দ খান, তাঁর শরীর ঠিক থাকিবেই। তাঁহাকে দেবতার মতন সেবা করিতে ভুলিও না। এবার কিন্তু যত শীঘ্র পার চলিয়া আইস। গ্রীষ্মের ছুটির পরই স্কুলে একজন ম্যাট্রিক শিক্ষকের পদ খালি হবে। গ্রামের ছেলে তুমি পাইবেই। তারপর আমাদের যা আশা আছে সফল করি-বেনই ভগবান। তারপর তুমি এই স্কুল থেকেই প্রাইভেটে আই-এ, বি-এ পাস করিতে পারবে। এবার ভালোভাবেই।"

উৎসাহিত করবার পর আরও কিছু কিছু আছে চিঠিতে, তবে তারিখ, ঠিকানা নেই; লেখিকার নামও নয়।

অনেক দিন নিজের ওজন নিইনি, ওকে নিয়েই মেতে ছিলাম। কেমন একটু খট্‌কা লাগতে তৌল হয়ে দেখি, ওদিকে যেমন হু হু করে বাড়ছিল, এদিকে এসে বরং একটু কমেই গেছে।

নকল বিদ্যা শিখিয়ে পাস করিয়ে নিয়েছে। আমায় বঞ্চিত ক'রে ওজন বাড়িয়ে নিয়েছে নিজের, তবু কিন্তু ভালো লাগল; একটা প্রথম শ্রেণীর রোম্যান্সই তো। চিঠির ভাষা থেকে মনে হয় খানিকটা শিক্ষিতাও, পরিণীতা, কি এখনও অপরিণীতাই—আগে নিজের মতোটি ক'রে তোয়ের ক'রে নিচ্ছে ওকে, চিঠির শেষ দিকে সেটা অস্পষ্ট করে তোলায় রোম্যান্সটা আরও গভীরই। ভালো লাগল, মনে দিব্যি একটি সুর রুণ রুণ করছে।

বেসুরো রইল শুধু নোটের খাতাটা। একদিন বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে সেটাকে অজয়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম।

চলার পথে — অমিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র সংলাপ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শেক্সপীয়র ॥ বার্নার্ড শ

শেক্সপীয়র ॥ ও কে, চেনা-চেনা যেন মনে হ।

বার্নার্ড শ ॥ ধরে ফেলেছ দেখছি, হাঁ আমি বার্নার্ড শ।

পীয়র ॥ এ যে অভাবিত বিনয়, শুধু নামটি বললে, বললে না সুপারম্যান।
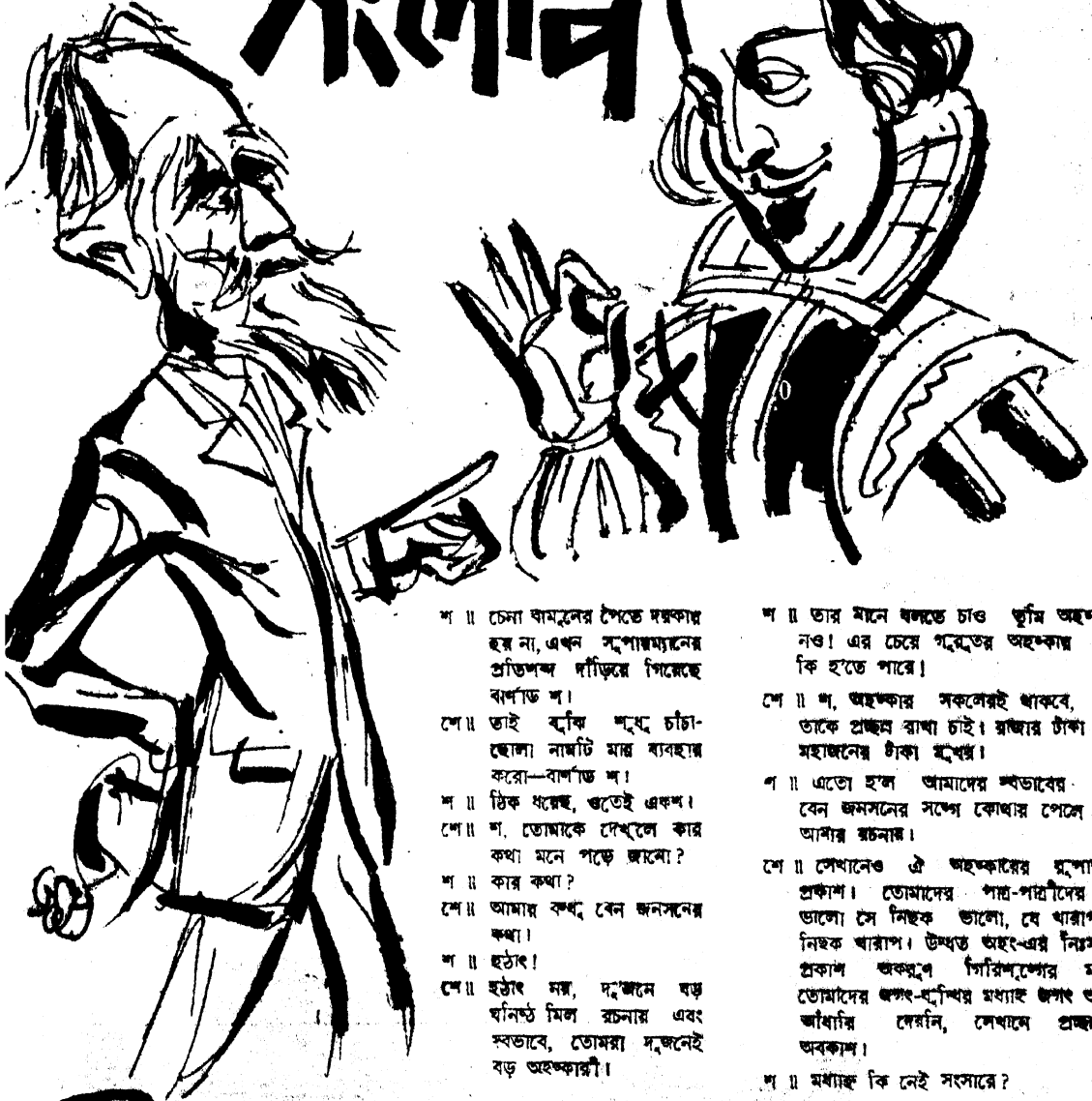
শ ॥ চেনা বামুনের পৈতে দরকার হয় না, এখন সুপারম্যানের প্রতিশব্দ দাঁড়িয়ে গিয়েছে বার্নার্ড শ।

শে ॥ তাই বুঝি শুধু চাঁচা-ছোলা নামটি মাত্র ব্যবহার করো—বার্নার্ড শ।

শ ॥ ঠিক ধরেছ, ওতেই একশ।

শে ॥ শ, তোমাকে দেখ্‌লে কার কথা মনে পড়ে জানো?

শ ॥ কার কথা?

শে ॥ আমার কথা, বেন জনসনের কথা।

শ ॥ হঠাৎ!

শে ॥ হঠাৎ নয়, দুজনে বড় ঘনিষ্ঠ মিল রচনায় এবং স্বভাবে, তোমরা দুজনেই বড় অহঙ্কারী।

শ ॥ তার মানে বলতে চাও তুমি অহঙ্কারী নও! এর চেয়ে গুরুতর অহঙ্কার আর কি হ'তে পারে।

শে ॥ শ, অহঙ্কার সকলেরই থাকবে, তবে তাকে প্রচ্ছন্ন রাখা চাই। রাজার টাকা মুক, মহাজনের টাকা মুখর।

শ ॥ এতো হ'ল আমাদের স্বভাবের ঐক্য, বেন জনসনের সঙ্গে কোথায় পেলে ঐক্য আমার রচনার।

শে ॥ সেখানেও ঐ অহঙ্কারের রূপান্তরে প্রকাশ। তোমাদের পাত্র-পাত্রীদের যে ভালো সে নিছক ভালো, যে খারাপ সে নিছক খারাপ। উদ্ধত অহং-এর নিঃসংশয় প্রকাশ অকরুণ গিরিশৃঙ্গের মতো। তোমাদের জগৎ-দৃষ্টির মধ্যাহ্ন জগৎ আলো আঁধারি নেয়নি, সেখানে প্রচ্ছন্নতার অবকাশ।

শ ॥ মধ্যাহ্ন কি নেই সংসারে?

শে ॥ অবশ্যই আছে; তবে তোমাদের জগতে কেবলই মধ্যাহ্ন। এমন কেন হ'য়েছে জানো? নিজেদের ব্যক্তিত্বের অংশ দিয়ে গড়েছ পাত্র-পাত্রীদের, আলো-আঁধারি তাদের অসহ্য, তাতে যে ঢাকা পড়ে যায় অহংটা। শ, নিজেকে ঢাকতে না পারলে জগৎকে দেখতে পাওয়া যায় না। দিবামান নিজেকে প্রচ্ছন্ন ক'রে তবেই অবারিত করে রাত্রির অন্তরালের রহস্যকে।

শ ॥ তুমি কি বলতে চাও, সে গুণ আছে তোমার রচনায়।

শে ॥ আমি নাই বললাম, লোকে বলে।

শ ॥ অহঙ্কারের বিষয় আছে তাতে বলতে পারা যায়।

শে ॥ অহঙ্কারের বিষয়কে অতিক্রম না করতে পেলে যে কবি হওয়া যায় না।

শ ॥ আমি তো কবি নই, নাট্যকার।

শে ॥ নাটক তো আমিও লিখেছি—

আট-দশ দিন কোথায় ছিলাম স্পষ্ট মনে নেই। সেটাকে হিমালয়ে বাস বলা চলে, কিন্তু দার্জিলিঙে বাস বললে ভুল হবে, যদিও ঘটনা এই দার্জিলিঙেই ঘটেছে।

অসীম দার্জিলিঙের কুয়াসাচ্ছন্ন দৃশ্যের মতোই এই অস্পষ্ট জবাবটি দিল খগেশের প্রশ্নের।

কলকাতার গ্রীষ্মের দাপটে অসীম দার্জিলিঙে এসেছে দিন পনেরো হ'ল। এর সঙ্গে অবশ্য একটা গোপন দাপটও ছিল, কিন্তু তা আপাতত প্রকাশযোগ্য নয়।

খগেশ বলল, ও সব হেঁয়ালি রাখ, সব খুলে বল। তিব্বতে যেতে চেষ্টা করেছিলি? না নেপালে? না কোনো আশ্রমে? না থিওসফির ব্যাপার?

ওর কোনটাই নয়, তবে শেষেরটায় সামান্য একটুখানি হয় তো মিলবে। তোর আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া একেবারে বৃথা হল না দেখছি।

বলিস কি? তবে তো সব শুনতে হয়।

তবে চল আগে কোনো নির্জন জায়গায় গিয়ে বসা যাক। সে অনেক কথা।—ব'লে অসীম খগেশকে প্রায় আধ মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে হাজির করল জলাপাহাড় রোডের থেকে একটা নিচু জায়গায়।

কেন যে নির্জন জায়গাটা ঠিক এইখানেই পাওয়া গেল তা খগেশ ঠিক বুঝতে পারল না। মাঝপথে আরও অনেক নির্জন জায়গা ছিল।

এইখানে বসে একটুখানি বিশ্রাম করেই সহসা অসীম বলল, ভাই, তোকে আমার জীবনের একটা অধ্যায় এতদিন গোপন রেখেছি। আমি পালিকে ভালবাসি।

পালি?—চমকে উঠল খগেশ।—কিন্তু তোর তো সংস্কৃতে অনুরাগ।

ভাষা নয়। সে আমার সব। পালি চক্রবর্তী। নামে কিছু এসে যায় না। ওদের পরিবারের সবারই ঐ রকম নাম। পালির এক বোনের নাম মৈথিলী। এক ভাইয়ের নাম প্রাকৃত। একটা বিলেতি কুকুর আছে, তার নাম তেলুগু। —কিন্তু এসব আর শুনে লাভ কি? তারা সব এখানেই এসেছে মাসখানেক হ'ল। এখন বুঝতে পারছিস, আমার কলকাতার গরম এবারে এত অসহ্য হয়েছিল কেন।

বুঝতে পারছি। কিন্তু তুই পালিয়েছিলি কার সঙ্গে? তেলুগু কুকুরের সঙ্গে নয় নিশ্চয়ই?

পালাব কেন? সে এক অ্যাডভেঞ্চার। একটা মোলাকাতের ব্যাপার।

কার সঙ্গে।

ভূতের সঙ্গে। কিন্তু তুই তো ভূত বিশ্বাস করিস না, তোকে সব বলে লাভ হবে কি কিছু? বিশ্বাস করবি?

বলে যা না। যুক্তিতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু যুক্তির বাইরেও তো কিছু থাকতে পারে?

অসীম চটে গেল এ কথা শুনে। বলল, যা বলবি, জোরের সঙ্গে বলবি, মিনমিন ক'রে বলবি না। বলবি বিশ্বাস করি, আর না হয় বলবি বিশ্বাস করি না। এ দুয়ের মাঝখানে রফা হয় কি ক'রে?

খগেশ বলল, তুই যা-তা বলছিস। কোথায় তোর শ্রীমতী পালি, আর কোথায় ভূত!—এ দুইয়ের সঙ্গে রফা হয় কি ক'রে?

রফা করব না। দুটিকে মেলাব।—ব'লে অসীম একটু ক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

ইতিমধ্যে এক গভীর কুয়াসার প্রবাহ ছুটে এলো ওদের পিছন থেকে, এসে ওদের গ্রাস ক'রে ফেলল। দেখবার কিছু আর রইল না ওদের চারটি চোখে।

অসীম বলল, এ খুব ভালই হ'ল। এখ
জমবে ভাল। সে দিনও এমনি কুয়াসা—কি
থাক সে কথা। গোড়া থেকে বলি। শোন, অ
ভূত দেখেছি।

বলিস কি? ভূত, না অদৃষ্ট পরি
আত্মা—

চুপ। যা বলি শোন। ভূত আমার সর্বনাশ ছিল প্রায়, কিন্তু পারে নি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে।

গেশ বলল, যাক, বাঁচা গেল। এইবারে তা নিশ্চিন্ত মনে সব শোনা যাক।

অসীম কিছুকাল ধ'রে ভূত চর্চা করছিল। কি থিওসফিক্যাল সোসাইটির বইটই নয়েও পড়াশোনা করছিল। সে এক কাহিনী। ঘরে অ্যানি বেসান্টের মূর্তি ও তাঁর শিষ্য মূর্তির ছবি টাঙানো ছিল খগেশ দেখেছে। ভিন্ন চোদ্দখানা অঙ্গুষ্ঠে পরিমাণ অস্পষ্ট সা কোনো কিছুর ছবিও টাঙানো ছিল এক দিকে। অসীম বলেছিল, ওগুলো তার তিন চতুর্দশ পুরুষের আত্মার ছবি। খগেশের সব কথা মনে আসছিল অসীমের ভূত দেখার শুনে।

অসীম হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল ডমরু চরিত ড়েছিস?

না তো। কার লেখা?

তুই একটি মূর্খ। শোন, ডমরু চরিতের ধের অঙ্গুষ্ঠে পরিমাণ আত্মার পাল্লায় পড়ে-।

কেমন করে?

ক অন্ধ সাধুর প্রভাবে। ডমরুধরের আত্মা তার দেহে অন্ধ সাধুর আত্মা ঢুকে ডমরু সেজে সে বিয়ে করতে রওনা হয়েছিল দলবল নিয়ে, এমন সময় আসল ডমরু আসল বাঘ বেশে গিয়ে হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বরযাত্রী দলের মধ্যে। প্রাণ যায়, এমন অবস্থায় ডমরুর দেহ থেকে সাধুর আত্মা বেরিয়ে গেল, আর বাঘের ভিতর থেকে ডমরুর আত্মা গিয়ে সেই সুযোগে নিজের দেহে প্রবেশ ক'র বিয়ে ক'রে চলে এলো।

গ্রান্ড! কিন্তু ছালটার কি হল?

তোর কাছে ছালটাই বড় হ'ল, এত বড় কান্ডটা কিছু না? চামড়াটা ডমরু রেখে দিয়েছিল, আসনের মতো ব্যবহার করত। এখন বুঝলি তো?—মানে প্রেতাত্মা যে আছে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি চাস?

তুই যা বললি, সে তো প্রেতাত্মা নয়, শুধু আত্মা। অঙ্গুষ্ঠে পরিমাণ। ভূত কোথায়? ভূতের সাইজ অনেক বড়।

ওরে বোকা, এই আত্মাই ইনফ্লেট করলে ভূত হয়। ভিতরে বাতাস ঢোকাতে হয়। সে আর কে করছে সব সময়?

কিন্তু তোর নিজের কথার সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়?

এই সব কথায় ভরা। একটি হৃদয় আমার কল্যাণের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল এ আমার জীবনে মস্ত বড় ঘটনা বলে মনে করতাম। তার চেহারার মধ্যে এমন একটা অপরূপ মাধুর্য—কিন্তু থাক সে কথা। সকল প্রেমিকই তার নায়িকার মধ্যে হঠাৎ একদিন ঐটি আবিষ্কার করে। এর নতুন কোনো বর্ণনা হয় না। তখন তার যা কিছু সব সুন্দর হয়ে দেখা দেয়। এর উপর যদি সে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ক্রমাগত চিন্তিত হতে থাকে, কি কি খেতে হবে, কি কি খেতে হবে না, এ সবও লিখতে থাকে, তা হলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়?

প্রেম ও সরষের তেল

পরিমল গোস্বামী

র একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় বেরিয়ে গিয়ে-, সেই সুযোগে সাধুর আত্মা ডমরুধরের ত্যক্ত দেহে প্রবেশ ক'রে তার বাগদত্তা কনেকে করতে যাচ্ছিল, এমন সময় সব ভেস্তে।

কি ক'রে?

এদিকে অনেক কান্ডের পর ডমরুর অঙ্গুষ্ঠ া সুন্দরবনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেখানে কটা কাঠুরে এক প্রকান্ড বাঘের ল্যাজ া সরু গাছে জড়িয়ে বাঘটাকে বেঁধে খছিল। বাঘ টানাটানি করতে গেলে ল্যাজ ড় যাবার উপক্রম, অথচ না পালাতে পারলে থাকে না। তখন সে মরীয়া হয়ে 'যা হয় ভেবে এমন এক হ্যাঁচকা টান মারল যে, চামড়া থেকে ভিতরের আসল বাঘটা বেরিয়ে গেল, চামড়াটা পড়ে রইল। ডমরু এই াগটা গ্রহণ করল।

কি ভাবে?

সে তখন ঐ বাঘের ছালের ভিতর ঢোকামাত্র টা পুরো বাঘ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

তারপর?

ডমরুর বিয়ের তারিখ ছিল সেই দিনই।

সম্পর্ক আছে বলেই তো বলছি। সে এক কাহিনী। আর তোকে যে এত জায়গা থাকতে এইখানে ডেকে আনলাম, এরও অর্থ আছে। এই খানেই সেই ঘটনা ঘটেছিল। ঠিক আমার এই পায়ের নিচে। এখানে একখানা পাথর ঢিলে অবস্থায় আছে, সেইটি সরালেই—কিন্তু শোন, গোড়া থেকে বলি। পালি আর আমি রোজ বিকেলে নতুন নতুন পথে বেড়াতাম। সন্ধ্যার আগে ও ফিরে যেত হোটেলে, আর আমি তখন এসে বসতাম চৌরাস্তায়। সেইখানে তোর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত। সন্ধ্যার আগে পড়ন্ত রোদে হঠাৎ শীত করত বড্ড বেশি। তাই অনেক আগেই তাকে বিদায় দিতে হত। ও কষ্ট পাচ্ছে, এতে আমার অস্বস্তি হ'ত।

একটা কথা। পালি যে তোর সঙ্গে বেড়াত, এইটেই কি সে তোকে ভালবাসে তার প্রমাণ? না স্পষ্ট ক'রে বলেছিল কিছু?

কিছু বলেনি। সব প্রমাণ ইনডাইরেক্ট। কলকাতায় থাকতে আমাদের চিঠি লেখা চলত নিয়মিত। চিঠিতে আর কোনো কথাই সে লিখত না, শুধু আমাকে কতক্ষণ বেড়াতে হবে, কতক্ষণ পড়াশোনা করতে হবে, কতক্ষণ ঘুমোতে হবে

কোন্ খাদ্যের উপর সবচেয়ে নজর ছিল?

সে শুনে হয় তো হাসবি। সবচেয়ে নজর ছিল সরষের তেলের উপর। চার পৃষ্ঠার কয়েকখানা চিঠিতে শুধু ঐ ভেজাল সরষের তেল খাওয়া বারণ করেছে। মানে ঐ তেল খেতে হলে তার সঙ্গে তার মাথা খাওয়ারও অনুরোধ ছিল। এতে কি বোঝা যায়? এ কি প্রেম?

প্রেম কি না জানি না, তবে তোর মাথাটা সে এই করেই খেয়েছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তোর গল্প এগোচ্ছে না। ভূত এখনো এলো না।

সে শুনলে ভয় পেয়ে যাবি। এইখানেই বেলা তিনটের সময় আমরা সেদিন বসে ছিলাম আর ঠিক আজকের মতোই ঘন কুয়াসায় সব ঢেকে গিয়েছিল।

ডাকলাম, পালি!

কোনো সাড়া নেই।

পালি! পালি!—আমার কণ্ঠ কুয়াসার ঘনান্ধকারে জড়িয়ে গেল, হারিয়ে গেল, কিন্তু তার সাড়া পেলাম না। কুয়াসা কেটে গেল, পালি নেই। রোজই প্রায় তেনজুংকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াত, আজ সেও নেই। সে একলে সন্ধানের

কাজ চালাতে পারত। তবে কি পালি বাড়ি পালিয়ে গেল গোপনে, আমাকে অহেতুক উন্মাদ করার জন্য?

ছুটলাম তাদের হোটেলের দিকে। মৈথিলী আর প্রাকৃতের সঙ্গে দেখা। তারা বলল এ বিষয়ে তারা কিছুই জানে না, পালি হোটেলে ফেরেনি। তেলুগু দুঃখে ল্যাজ নাড়তে লাগল। বলল, ভৌ।

তারপর?

মেয়েটার জন্য ভীষণ ভয় ধ'রে গেল। আমরা এক সঙ্গে পড়তাম, গতবারে আমরা এক সঙ্গে বি-এ পাস করেছি। আমি প্রায় পাগলের মতো পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু বেলা তিনটে হ'লে সমস্ত মন এই দিকে এই জবলা পাহাড়ের নিচের এই জায়গাটিতে ছুটে আসত, আমিও ঠিক এইখানে এসে পড়তাম। কেন আসছি, তার কোনো কারণ ছিল না, শুধু এইটুকু জানি যে, না এসে পারতাম না।

সেদিনও এমনি কুয়াসায় সব ঢেকে ফেলল। এখন তো সব সময়েই এমনি হচ্ছে। সে এমন অন্ধকার যে তা যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ এখান থেকে উঠে যাওয়া সম্ভব ছিল না। নিজের হাত দেখা যায় না এমন। আমি হয় তো হতাশভাবে নিশ্বাস ফেলেছিলাম।

হঠাৎ পাশ থেকে কে ব'লে উঠল, নিশ্বাস পাচ্ছি কার? কে তুমি? তুমি কি কাউকে হারিয়েছ? কিংবা পথ?

কণ্ঠটি ঠিক কপালকুণ্ডলার নয়, পরিষ্কার বাংলায় বয়স্ক পুরুষের কণ্ঠ। তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস শব্দ শুনলাম। গভীর এবং ভয়ংকর। সমস্ত গা শিউরে উঠল। তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু কন্ঠস্বর, রূঢ় এবং গম্ভীর।

আমি ভয়ে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ। কিছুক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না।—সেই কণ্ঠ পুনরায় উচ্চারণ করল, তুমি পালিকে হারিয়েছ? খুঁজে পাচ্ছ না?

আমি সর্বদেহে ভীষণ চমকে উঠলাম। আমার মনের কথা জানে, এ কে?

আবার শুনলাম, তুমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস কর? আমি যদি তার ঠিকানা বলি, বিশ্বাস করবে?

কেন করব না?—বললাম আমি। আনন্দে বিস্ময়ে বললাম, কেন করব না? নিশ্চয় করব।

সেই অদৃশ্য গম্ভীর কণ্ঠ আমাকে বলল, সে ভূতদের দেশে আছে এখন।

অ্যাঁ! মানে জীবিত নেই?

জীবিত আছে।

আপনি কে, দয়া ক'রে বলবেন?

আমি ডমরুর দেহ থেকে বাঘের ভয়ে পালানো অন্ধ সাধুর আত্মা। আমি আমার অন্ধ দেহে একবার ঢুকে বেরিয়ে এসেছি, আর ঢুকিনি। কিন্তু সে কথা যাক। তুমি যদি পালির কাছে যেতে চাও, তা হ'লে আমার কথা শুনতে হবে।

সত্যিই যদি তার কাছে নিয়ে যান, তবে শুনব।

তার জন্য মরতে প্রস্তুত আছ?

সেটা এতই সোজা যে জিজ্ঞাসার দরকার করে না। পালির জন্য আমি তার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ করতে পারি।

শুনে খুশি হলাম। তা হ'লে এই বড়িটি খাও। চিবিয়ে গিলে ফেল। খেতে খারাপ নয়।

বড়ি খাব কেন?

অদৃশ্য কণ্ঠটি এবারে একটু উত্তেজিত। এখুনি বললে, তার জন্য সব করতে পার। তবে আবার জিজ্ঞাসা কেন? খেলে তার কাছে যেতে পারবে।

তবে খাব।

সেই ঘন কুয়াসার অন্ধকার থেকে একটি হাত আমার হাত স্পর্শ করল। বলল, এই নাও বড়ি। এখুনি খেয়ে ফেল।

বড়ি মুখে পুরলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মাথা ঝিমঝিম ক'রে উঠল। কি যে হ'ল হঠাৎ বুঝতে পারিনি। কত দিন কেটে গেল তাও জানি না। তারপর জেগে উঠে দেখি এক অপরিচিত স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি। সেখানে অনেক লোক, কিন্তু দেখি প্রত্যেকের দেহ স্বচ্ছ। তখন মনে পড়ল, আমি ভূতের দেশে এসে পড়েছি। সাধুর আত্মা বলেছিল, এইখানে পালিকে পাব।

একজন ভূত এগিয়ে এলো আমার দিকে। এসে বলল, তুমি তো দেখছি মানুষ। ও! ঠিক তো, এবারে বুঝতে পেরেছি, তুমি একটি মানবীকে খুঁজতে এসেছ এখানে।

চমক লাগল না কথায়। ভয়ও পেলাম না। জীবন আর মৃত্যুর সঙ্গে রফা করতে হল শুধু পালির জন্য। প্রেতাত্মার দেশে দুই জীবন্ত নরনারী। দুই চরমের মিল। অথচ অদ্ভুত লাগল না।

ভূত বলল, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। এটা আমার নিজেরও দরকার ছিল। অদৃষ্ট মান তো?

আমি বললাম, যা দৃষ্টির বাইরে, তাকে অদৃষ্ট ব'লে মানি, এ তো বৈজ্ঞানিক সত্য।

ও সব তত্ত্বকথা ছাড়। আমারই সঙ্গে কেন তোমার দেখা হ'ল, ভাবলে তোমার অবাক লাগবে। এটা দৈব যোগাযোগ, লাখে এক হয় কিনা সন্দেহ।

আমি বিনীতভাবে বললাম, আমাকে সন্দেহমুক্ত করুন। সব খুলে বলুন।

ভূত বলল, আমারই পুত্র পালিকে নিয়ে এসেছে ভূতের রাজ্যে। দার্জিলিঙের ঘন কুয়াসায় তোমরা পাশাপাশি ব'সে ছিলে, সেই সময়ে সে তাকে নিয়ে এসেছে। তারা দুজনে একটা পৃথক বাড়িতে আছে। তুমি যদি পার, পালিকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাও। নইলে ছেলেটি আরও উচ্ছন্নে যাবে।

এও কি সম্ভব? মানুষের সঙ্গে ভূতের সহ-অবস্থান, এ তো আমি ভাবতেই পারছি না। পালিই বা এখানে থাকবে কেন?

এটি সম্পূর্ণ সম্ভব এবং একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। তোমরা পৃথিবীর উপরতলায় প্রতি মুহূর্তে এ কাজ করছ। ভূতের সঙ্গে মানুষের সহ-অবস্থান তোমাদের সমাজে সমর্থিত। চোরের সঙ্গে সাধুর, নরঘাতকের সঙ্গে নিরীহ মানুষের, সহ-অবস্থান তো তোমরা মেনে নিয়েছ। তাই না?

তা নিয়েছি বটে।—একটু ভেবে বললাম।

সেই একই ভাবে ভূতের সঙ্গে মানুষের একত্র বাস এ শহরে অস্বাভাবিক কিছু নয়। অবশ্য আমাদের ভয়ের কথা সেটা। আমরা এটা চাই না। দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপার্টহেড নীতিতে আমরা বিশ্বাসী। অথচ ছেলে মানবী প্রতিষ্ঠা করতে চায় এখানে।

তাহলে আমার উপায় কি? আপনি তো আপনার পুত্রের কাজ সমর্থন করেন না, মনে হচ্ছে।

সমর্থনের কথাই ওঠে না। ও কুলাঙ্গার, দুরাচার, পাষণ্ড। ও ভূতাধম। ও সমাজবিদ্রোহী। ওকে ত্যাজ্যপুত্র করব। আধুনিক কয়েকজন ছোকরা মিলে একটা দল গড়েছে। তারা বলছে, আমরা ভূত মানি না! শুয়োর কি বাচ্চা, ভূত-বংশের ছেলে হয়ে এমন কথা মুখে আনে। ভূত হয়ে ভূত মানে না মশায়, এ এক অসম্ভব কাণ্ড। ভূতসমাজের মূলে কুঠারাঘাত করতে চায় ওরা।

আমি বললাম, এ বিষয়ে আমার কোনো মত প্রকাশ করা শোভা পায় না। আমি শুধু পালিকে নিতে এসেছি।

তা হলে যাও ঐ বাড়িটাতে। কিন্তু তাকে উদ্ধার করতে পারবে কি না, বলতে পারি না। ছেলের পরিচয় তো দিলাম, ও একটি আধুনিক গুণ্ডা।

আমি কল্পনায় সেই গুণ্ডা ভূতকে দেখতে চেষ্টা করলাম। মনটা বড় দমে গেল। কিন্তু দৈহিক বলে তার সঙ্গে না পারলেও, আমার মনের বল তখন এত বেড়ে গিয়েছে যে, আমি একটা ছোটখাটো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়েই এগিয়ে গেলাম সেই বাড়িটার দিকে। ভাবলাম পালি ও আমার মিলিত শক্তিতে একটি তরুণ গুণ্ডাকে অবশ্যই কাবু করতে পারব।

কিন্তু ভাই খগেশ, সেখানে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে হৃৎপিণ্ডটা নেহাৎ শক্ত না হলে ফেটে যেত।

কি দেখলে?

দেখলাম, পালি সেই তরুণ ভূতের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসে একেবারে মশগুল। হেসে গড়িয়ে পড়ছে! ক্রমাগত হাসছে।

হাসছে? কি অদ্ভুত মেয়েরে বাবা। তা হলে তো তোর ভাগ্য নিতান্তই খারাপ বলতে হবে।

আর বলিস না, রে। সে কথা মনে হলে এখনও বুকে আগুন জ্বলে। আমিও তাকে অনেক হাসিয়েছি এককালে কিন্তু এমন সর্বস্ব বিলিয়ে হাসা দেখলাম এই প্রথম। ফিরে যাব কি না ভাবছি, এমন সময় পালি আমাকে দেখে হাসি থামাল, এবং গম্ভীর সুরে বলল, এখানে এসেছ কেন?

তোমারই জন্য।

আমার জন্য কেন?

কারণ আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে চাই।

কিন্তু আমি তো যাব না।

আমি প্রায় বসে পড়লাম এ কথায়। কেন যাবে না?

কারন আমি যার সঙ্গে এসেছি তার সুন্দর দাড়ি আছে, এবং সে ড্রেনপাইপ প্যাণ্ট পরে। উপরন্তু কবিতা লেখে। সে ভূত সমাজে থেকে ভূত মানে না, এই রকম পুরুষই আমি এতদিন কামনা করে এসেছিলাম। তোমার জন্য আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তুমি তো বলেছ, আমার জন্য তুমি সব রকম কষ্ট সহ্য করতে পার।

বল কি পালি?

ঠিকই বলছি। আমাকে যে এখানে নিয়ে সছে, তার নাম উপকীচক। পৌরাণিক যুগ কে সে ভূত হয়ে আছে, অথচ তার আচার বহার সব তোমাদের চেয়ে আধুনিক। ভীম দের ভাইদের সঙ্গে একে হত্যা করেছিল, ই থেকে উপকীচক ভীমের ভূত খুঁজে ড়াচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এর প্রতি তোমার াকর্ষণের আর কি কি কারণ আছে, বল।

পালি বলল, এ দুঃসাহসী, সমাজদ্রোহী। র বয়স বাড়েনি সেই থেকে। এ চিরযুবক।

আর তুমি পালি? তোমার যৌবন তো ায়ী হবে না। তখন কি করবে?—বুঝলি গশ, ওর সঙ্গে যেমন যেমন কথা হয়েছিল াই ঠিক সেই রকম বলছি তোকে। আমার শ্নের উত্তরে পালি বলল, যখন বুঝব বয়সে কে ছাড়িয়ে যাচ্ছি, তখন আমি ওকে ছেড়ে ব।

তুমি ছেড়ে যাবে, না ও তখন তোমাকে াড়িয়ে দেবে?

তাড়িয়ে দেবে কেন? ওর কোনো বিষয়ে ানো স্থায়ী আকর্ষণ নেই, আর সেই জন্যই র প্রতি আমার এত মায়া। আমাদের কখনও া ভাঙার যন্ত্রণা পেতে হবে না, কারণ ভুল ঝার অবকাশ নেই।

তা হলে এখন আমার কি হবে?

তুমি যে-কোনো অন্য একটি মেয়েকে বিয়ে র সংসারী হও, সব ঠিক হয়ে যাবে। বিয়েটা নুষের দরকার। এখানেও বিয়ে আছে, কিন্তু র স্থায়ী দাম কিছু নেই।

কিন্তু পালি, তোমার মতো একজন াজুয়েট মেয়ে এখানে শুধু একজনের ন্ডামি নিয়ে ভুলে থাকবে কি করে? সময় টবে কি ক'রে?

কেন, অন্যান্য আকর্ষণের কথা তো ামাকে বলেছি। এখানের টেলিফোন অফিসে পকীচক আমাকে একটা চাকরি করে দেবে লছে। তাতে সময় কেটে যাবে। ভূতরাজ্যে রাট এক টেলিফোন ভবন আছে।

বলিস কি অসীম? ওখানেও টেলিফোন বন?—বল, বল, তারপর?

তারপর রেগে বিষম উত্তেজিত হয়ে ফিরে লাম সেই জংলা পাহাড়ের গহ্বরের পথে। ঠিক খান দিয়ে—এই যেখানে আমরা এখন পা খেছি। উত্তেজিত না হ'লে আসা সম্ভব হ'ত । হয় তো ব'সে ব'সে বৃথা অনুনয় বিনয় তাম। পায়ের জোর উত্তেজনায় ভীষণ বেড়ে য়েছিল। কিন্তু উপরে উঠে আর সে জোর ল না, উঠেই অবশ অচেতন হয়ে পড়লাম। গে উঠে দেখি তেমনি ঘন কুয়াসা। আপনা কেই বলে উঠলাম, আমি কোথায়?

সেই সাধুর আত্মা বলে উঠল, ভয় নেই, ম আমার আশ্রয়ে আছ। সাত দিন অচেতন লে, আজ প্রথম কথা বলেছ।

আমার কি হবে সাধু?—জিজ্ঞাসা লাম?

তুমি এখনও পেতে চাও পালিকে?

বুঝতে পারছি না ঠিক। তবে বোধ হয় পেলে তাকে ক্ষমা করতে রাজি আছি। কিন্তু সাধু, আমি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছি, আমার মনে হচ্ছে আমি অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যাব। আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করেছেন, তাই আমার মৃত্যু হলে আপনি আমার দেহটিতে প্রবেশ করবেন। আমার বয়স বাইশ বছর। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। অনেকে মৃত্যুর পর দেহকে মেডিক্যাল কলেজে দান করে। আমি আপনাকে দান করলাম।

সাধু বললেন, কিন্তু কি করব তোমার দেহ নিয়ে? আমার জীবনে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। আমি এখন মুক্ত।

তাহলে আমার দেহ কারো কাজেই লাগবে না?

না। কারণ এখন তোমার মৃত্যু ঘটবে না।

আপনি কি ভবিষ্যৎ দেখতে পান?

পাই।

তাহলে দোহাই আপনার—

পালির খবর চাও তো? তাহলে কয়েক মিনিট সময় দাও, আমি উপকীচকদের দেশ থেকে চট করে ঘুরে আসি। মানে, মনে মনে ঘুরে আসব, ভয় নেই।

সাধুর আত্মা চুপ। আমি চুপ। দুর্ভেদ্য কুয়াসা নিস্তব্ধ। সে এক অপূর্ব হৃদহর্ষক অবস্থা।

একে একে পুরো দশ মিনিট কেটে গেল। দূরে জীবনের কোলাহল কুয়াসার ছাকনীতে ছাকা হয়ে কানে আসতে লাগল। যেন সব অবাস্তব, সব ছলনা। আমি দম বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছি। এমন সময় সাধু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, ওহে তোমার ভাগ্য বোধহয় ভাল, পালি ভূতের রাজ্য থেকে সোজা উপরে উঠে আসছে। দেখো, এইখানেই এসে উঠবে। আমরা কাছাকাছিই আছি।
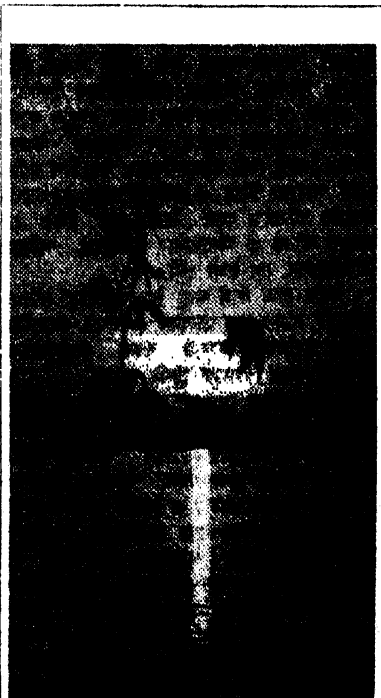
আমি একথা শুনে তড়াক করে উঠে বসলাম। বললাম, দেখুন ঠিক ঠিক বলবেন, ঠিক না হ'লে তার ভীষণ প্রতিক্রিয়া হবে আমার উপরে। কিন্তু একথা বলতে না বলতে পালির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, আপন মনেই বলছে, যাক বাঁচা গেল, বোধহয় ঠিক উঠে এসেছি।

স্বর অত্যন্ত ক্লান্ত।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি রামের বেশে লব-কুশের কন্ঠ শুনে যেমন "কার কণ্ঠস্বর" ব'লে উল্লাসভরে চিৎকার ক'রে উঠতেন, আমিও ঠিক তেমনি করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু সামলে নিলাম। সামান্য অভিমান তখনও ছিল। তাই শুধু তার আবির্ভাব সম্পূর্ণ অভিনন্দন পেল না আমার কাছে। আমি গম্ভীর কন্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, এসেছ পালি?

খুব ক্লান্ত কন্ঠে বলল, এখন কিছু বলবার সামর্থ্য নেই আমার। শুধু তোমার পাশে আমাকে একটু বসতে দাও।

এক মিনিট, দু-মিনিট, তিন মিনিট—ক্রমে বহু মিনিট কেটে গেল। কুয়াসাও কাটতে আরম্ভ করল ধীরে ধীরে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ সূর্যের আলোয় পাহাড়গুলো যেন স্নান করে উঠল, কাঞ্চনজঙ্ঘা হেসে উঠল।

এবারে চেয়ে দেখলাম, পালি হেলান দিয়ে বসে আছে বটে, কিন্তু জেগে নেই। সম্ভবত অতি ক্লান্তিতে তার চোখ দুটো বুজে এসেছে।

কিন্তু ওর পাশে একটা প্যাকেটের মতো কি পড়ে? কাগজে জড়ানো ওটা কি?

আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলাম। আধ ঘণ্টা পরে পালি চোখ মেলল।

ওঠ পালি, আমি বললাম। তোমাকে তোমাদের হোটেলে রেখে আসি। কিন্তু অত বড় একটা প্যাকেট কিসের?

পালির তখনও প্রত্যাবর্তনের বিস্ময় ঘোচেনি। ক্লান্তিও না। টেনে টেনে বলল, ওতে পাঁচ সের সরষের তেল আছে। ভেজাল তেলে তোমার স্বাস্থ্য যে রকম খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ে এলাম।

খগেশ বিস্মিত হয়ে বলল, পাঁচ সের তেল? তোর জন্য? এখন তা হলে বুঝতে পারছিস সব?

হাঁ, ভূতের দেশে ছিল ওর একটা দুঃস্বপ্নের কাল। সেটা কেটে গেছে।

তা হলে বুঝতে পারছিস তার সমস্ত সত্তা, তার মন, তার প্রবৃত্তি, সব পৃথিবীতে ফিরে এসেছে? আর তোকে সে ভোলে নি?—সব তোর দিকে অভিসার করেছে?

হাঁ রে, আমাদের বিয়ে আগামী ১৫ই অগ্রহায়ণ।

শেষ রশ্মি — শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাস

ওরা দু'পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের পর-অধীনতাপাশ মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের যে আয়োজন মহারাষ্ট্রে ফাড়কে বিদ্রোহ ও তাহার অনতিকাল পরে বোম্বাই শহরের প্লেগ হাঙ্গামার সময়ে র‍্যান্ড ও আয়হার্স্ট হত্যাপরাধে দামোদর হরি চাপেকরের ফাঁসীমঞ্চে আত্মাহুতি দান ঘটনায় শুরু হয়ে, বিগত বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নেতাজী সুভাষের আজাদ-হিন্দ আন্দোলন ও তৎপরে নৌ-বিদ্রোহে সমাপ্ত হল, তার অনেক ঘটনা ও ইতিবৃত্ত এখনও আমাদের অজানা থেকে গেছে। ঊনবিংশ শতকের এই পথের আন্দোলনের যে ইতিহাস চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেছে, তাকে আর উদ্ধার করবার কোনও পথ নেই। কিন্তু বিংশ শতকে যখন এই পন্থায় আন্দোলন তীব্রতম হয়ে ওঠে এবং তখনকার সময় থেকেই যাঁরা এই পথের পথিক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেও এখনও যে সামান্য কয়েকজন আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের কাছ থেকে এখনও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের মাল মশলা সংগ্রহ করা সম্ভবপর। এখনও এই কাজ শুরু না করলে অনেক মহামূল্যবান তথ্য আবার আমাদের হারাতে হবে।

সুখের বিষয় এই যে, সরকারী প্রচেষ্টায় একটি কমিটি গঠিত হয়ে এই ইতিহাসকে যতটা সম্ভব পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার কাজে ব্রতী হয়েছেন এবং বে-সরকারী পথে সতীন্দ্রনাথ সেন স্মৃতিরক্ষা সমিতি ও কর্মী সমাজ (হুজুরীমল লেন) নামে দুটি সংস্থা মহাজাতি সদনে এঁদের তৈলচিত্র সংরক্ষণের চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে এঁদের জীবনী ও কর্মধারার পরিচয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজও চলছে।

কিছুদিন আগে কর্মী সমাজ থেকে প্রকাশিত "নবাগত হে পথিক, বিগত পথিকদলে কর নমস্কার" শীর্ষক একখানা ছোট্ট পুস্তিকা আমার হাতে এসেছে। এতে মৈমনসিংহ জেলার বিপ্লবীদের ছবি ও জীবনী সংকলিত হয়েছে এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (ছোট ভূপেন), শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মালমশলা দিয়ে এঁদের ইতিহাসকে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ করতে সহায়তা করেছেন। কিন্তু অনবধানতাবশতঃ একটি ত্রুটি এঁদের এই সং ও অভিবাদনযোগ্য প্রচেষ্টাতেও ঘটে গেছে। ঐ মৈমনসিংহ জেলারই প্রিয়শঙ্কর সেনগুপ্তের কাহিনী ও প্রতিকৃতি ঐ সংকলনে বাদ পড়ে গেছে। অবশ্য এই পুস্তিকার সংকলয়িতাগণ যে প্রিয়শঙ্করের কীর্তিকলাপের কোনই খোঁজ রাখেন না, এমন নয়। কারণ পুস্তিকাটিতে এক জায়গায় লেখা আছে :

> "নাটোরের ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন বিপ্লবী কর্মী শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার (নির্বাণ স্বামী) বলেন যে, নরেন গোঁসাইকে হত্যার উদ্দেশ্যে জেল অভ্যন্তরে প্রেরণের জন্য একটি রিভলবার আসিয়াছিল মৈমনসিং টাঙ্গাইলের প্রিয়শঙ্কর সেনের এবং অপরটি আসে হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যের কাছ হইতে।"

আজও শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার নির্বাণ স্বামী রূপে জীবিত আছেন। এখনও চেষ্টা করলে তাঁর কাছ থেকে এই রিভলবার সংগ্রহের পূর্ণাঙ্গ কাহিনী জানা যাবে।

মাণিকতলার বোমা আবিষ্কারের পর ধর পাকড়ের ফলে ছন্নছাড়া বিপ্লবী দলকে সংযুক্ত করবার প্রচেষ্টা ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবের আগুনকে অনির্বাণ রাখবার জন্য কঠিন পরিশ্রমের অনেক কথাই অজানা আছে, কিন্তু এই সমস্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ও নেতৃত্ব দানকারী শ্রীসতীশ সরকার এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারেন।

স্বদেশী আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে ইংরেজ সরকার তলে তলে মুশ্লিম জনতাকে ক্ষেপিয়ে মৈমনসিংহ জামালপুর অঞ্চলে যে বিভীষিকার তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়েছিলেন আলোচ্য পুস্তিকাটিতে সে বিষয়ে উল্লেখ আছে। ধর্মোন্মাদ গুন্ডাদের অত্যাচার থেকে বিপন্ন হিন্দু অধিবাসীদের রক্ষা করবার জন্যে কলকাতার বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্র নন্দী, নরেন বসু, সুধীর সরকার, শিশির ঘোষ, হরিশ শিকদার ও প্রভাস দে যে মৈমনসিংহ গিয়ে বন্দুক ছুড়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন, সে ঘটনারও উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই সময়ে দিনের পর দিন রাত্রিবেলা পাহারা দিয়ে ও অমিতবিক্রমে গুন্ডাদের আক্রমণ প্রতিহত করে প্রিয়শঙ্কর সেন যে অদ্ভুত বীরত্ব ও অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে তথ্য নেই।

আজ ক্রমে ক্রমে বহু বিশ্রুতকীর্তি বীরের কাহিনী নানাজনের চেষ্টায় এইভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে; আমিও আমার জানা কয়েকজনের কাহিনী আজ বলবার চেষ্টা করব।

মাণিকতলার বোমার কারখানা আবিষ্কার হওয়ার পরে নেতৃত্বহীন বাংলার বিপ্লবীরা যখন পরস্পর সংযোগ হারিয়ে উদ্যমহীন হয়ে পড়বার উপক্রম দেখা দিল, তখন যুগান্তর পত্রিকার অন্যতম কর্মী ও সাধনা প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের অনুরোধে কলিকাতার মেছুয়া বাজারের প্রভাসচন্দ্র দে, টাঙ্গাইলের প্রিয়শঙ্কর সেনগুপ্ত, নাটোর নিছাবাজারের সতীশচন্দ্র সরকার গোপনে নিষিদ্ধ পত্রিকা যুগান্তর মুদ্রিত করে প্রকাশ করবার ভার নেন। বিপ্লবী দল যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি—জনসাধারণকে একথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে এঁরা বোমা তৈরী করে চলন্ত ট্রেণে ও শহরতলীর পুলিশ ফাঁড়ী আর থান[...] বোমা নিক্ষেপ করতেন। কি ভাবে সেই বো[...] তৈরী করা হ'ত তার একটি বিস্তৃত বিব[...] সম্প্রতি যুগান্তর সাময়িকীতে আলিপ[...] বোমার মামলায় কিছুদিন পরে ধৃত ও দণ্ডাজ্ঞ[...] প্রাপ্ত বিপ্লবী শ্রীনীরন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত "কা[...] মায়িকী বোমা" নামে প্রবন্ধে লিখেছেন। [...] প্রচেষ্টা ব্যতীত প্রভাসচন্দ্র, প্রিয়শঙ্করের [...] [illegible] থেকে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখে অ[...] চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে কলকাতার অনাথ [...] লেনে মৈমনসিংহবাসী বিপ্লবীদের আস্তান[...] টাঙ্গাইলের যোগেশ চৌধুরীর তত্ত্বাবধ[...] [illegible] তাঁর কাছ থেকে বোমা তৈর[...] [illegible] পরে চন্দ্রকান্ত গোপনে [illegible] বাব[...] করে দিয়ে তাঁরা [illegible] রাজ পরিবা[...] নারিকেলডাঙ্গা অঞ্চলে যে একটি বাগান [...] ছিল, সেখানে রাণীমার প্রত্যক্ষ সহায়তায় [...] তৈরীর কারখানা বানালেন। এই গো[...] বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সঙ্গে আমারও কিছু [...] ছিল। আমি ছাড়া এই প্রচেষ্টার শরিক শ্রীসত[...] চন্দ্র সরকার (বর্তমানে নির্বাণ স্বামী [...] শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আজও জীবি[...] নির্বাণ স্বামী ও বীরেন্দ্রনাথ আজও [...] অনুদ্ঘাটিত তথ্য উদ্ঘাটন করতে পা[...] উৎসাহী কর্মীদের উচিত এঁদের কাছ [...] সে সব তথ্য জেনে নেয়া এবং ভবিষ্যৎ ই[...]হাসের অঙ্গীভূত করা।

গোপনে নিষিদ্ধ পত্রিকা যুগান্ত[...] প্রকাশ ও বোমা প্রস্তুত এবং থানা আ[...] ইত্যাদি ছাড়াও এই দলের আরও বহু কর্ম[...] আছে; যেমন—আলিপুর বোমার মামলার [...] সাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যার জন্য জে[...] অভ্যন্তরে রিভলবার ও গুলী পাঠানো, অ[...] পুর বোমার মামলার প্রধান পরিচালক উ[...] আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র [...] যশোহরের তরুণ যুবক চারুচন্দ্রকে এই [...] নিয়োগ ইত্যাদি। চারুচন্দ্র বিকলাঙ্গ ছি[...] সেজন্য তাঁর কব্জীতে রিভলবারটি শক্ত [...] বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিকলাঙ্গ [...] তাঁর অসাধারণ মনোবলের সাহায্যেই কাজ [...] সমাধা করেছিলেন। এই কাজের প্রধান উ[...] ছিলেন সতীশচন্দ্র। পরবর্তীকালে যখন য[...] নাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) বিপ্লব অ[...]লনের নায়কত্ব গ্রহণ করেন তখনও সতী[...] তাঁর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। যতীন্দ্র[...] নির্দেশে যখন শামসুল হককে [...] করা স্থির হয়, তখন শামসুলকে হত্যা

জন্য ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত-কে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে [illegible]কে চিনিয়ে দেবার জন্যেও সতীশচন্দ্র তার সঙ্গে গিয়েছিলেন। হত্যার পর পালাতে অক্ষম হয়ে ধরা পড়ে সে যে স্বীকারোক্তি করে, তার ফলে যতীন্দ্রনাথের নির্দেশে সতীশচন্দ্র যে এই কাজে তাকে নিযুক্ত করেছিলেন, সরকার পক্ষ সে কথা জানতে পারেন। তার ফলে যতীন্দ্রনাথ ও সতীশচন্দ্রকে আত্মগোপন করতে হয়। এই ঘটনার পরে যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের কাপ্তিপোতায় নীরেন, মনোরঞ্জন, চিত্তপ্রিয় ও জ্যোতিষের সঙ্গে এক যোগে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে বীরের মৃত্যু বরণ করেন। সতীশচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে আত্মগোপন করে বহুদিন লুকিয়ে থাকার পর অবশেষে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)-এর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে নির্বাণস্বামী নাম ধারণ করে প্রকৃত সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে থাকেন। বর্তমানে বয়োভারে জীর্ণদেহ ও অন্ধ এই মহাবিপ্লবী হাওড়া মালটিকারী আশ্রমে অতি দুর্দশার মধ্যে কোনোক্রমে জীবন ধারণ করছেন। চক্ষু হীনতার জন্যে তাঁকে সর্বদা একজন অনুচরের উপর নির্ভর করতে হয়। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত মাসিক মাত্র পঞ্চাশটি মুদ্রা সাহায্যই তাঁর সম্বল। পঞ্চাশটি টাকায় দুইজন লোকের দুইবেলা আহার যে কী করে সম্ভবপর হয় তা বুঝতে পারি না। অবশ্য এঁরা ভবিষ্যতে দেশবাসীর কাছ থেকে রাজভোগের আশায় এই কণ্টসঙ্কুল জীবন বরণ করেন নি—করেছিলেন দেশপ্রেমের তাগিদেই। তবুও দেশবাসীর কর্তব্যহানি জনিত অপরাধ তো তাতে ক্ষালন হয় না। আজও যদিও নির্বাণ স্বামী প্রশান্তচিত্তেই দেশবাসীর এই অবহেলা ক্ষমা করে এই বার্ধক্যেও জীবন ধারণের ক্লেশ স্বীকার করছেন, তবুও বড় অনুতাপ হয় মনে—যখন এঁদের কষ্টের লাঘব করবার জন্যে কোন রকম পথের নিশানা চোখের সামনে দেখতে পাই না, তখন। কারণ আমি বহু বিপ্লবী গুরুস্থানীয় ও সহকর্মীকেই অত্যন্ত দারিদ্র্য ও ক্লেশ সহ্য করে মরণে শান্তিলাভ করতে দেখেছি। ইংরেজ শাসনকালীনই শেষ জীবনে প্রভাসচন্দ্র দে'কে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন ধারণ করে মৃত্যু ঘটতে আমি দেখেছি। তারানাথ রায়, কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থের চেষ্টায় তাঁর পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্বেদ শিক্ষালয়ে সামান্য বেতনের চাকরী করে অতি দারিদ্র্যের মধ্যেই পরলোকগমন করেছেন। নিখিলেশ্বর রায়মৌলিকের বৈপ্লবিক জীবনের সহকর্মী পরেশচন্দ্র লাহিড়ী পরবর্তী জীবনে ভোলানন্দ গিরি মহারাজের আশ্রমাধীন হয়ে অবধূত মণ্ডলেশ্বর মহাদেবানন্দ গিরি রূপে পরিচিত হন। নিখিলেশ্বর তাঁরই চেষ্টায় ঐ আশ্রমের সন্ন্যাসীরূপে যুক্ত হয়ে স্বামী ভবানন্দ নাম নিয়ে শেষ জীবনে [illegible] ভোলানন্দ আশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ও যে বিশেষ [illegible] কথা বলছি সেই সময়ের অন্যতম প্রধান অভিযান- [illegible] বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে [illegible] হন এবং ১৯২১ সালে মেদিনীপুর জেলে রাজবন্দীরূপে থাকতে হয়। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করার পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় কলিকাতা কর্পোরেশনের তরফে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের অ্যাসেসর নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য তিনি যে অর্থ আয় করতেন তার সবটাই অকাতরে দেশের কাজে ব্যয় করে দিতেন এবং তার ফলে শেষ জীবনে দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর দিন কেটেছে।

এই বিশেষ কালটির আরও দুইজন কর্মীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসছে, তাঁরা হলেন পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ও কৃষ্ণনগরের কার্তিকচন্দ্র দত্ত। এঁরা অর্ধোদয় যোগের সময়ে যে সব স্বেচ্ছাসেবক সেবাব্রতী যুবক অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তাঁদের ভিতর থেকে তরুণ কর্মী বেছে নিয়ে বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। কর্মী সংগ্রহে মোক্ষদাচরণ ও কার্তিকচন্দ্র এত বেশি মনোযোগ দিয়েছিলেন যে, তাদের মধ্যে বাছবিচার করে নেবার সময় পর্যন্ত তাঁরা পান নি; সেইজন্য ঐ দলের মধ্যে কয়েকজন এমন যুবকও ঢুকে পড়েছিল যাদের মানসিক গঠন খুব দৃঢ় ছিল না। এর ফলে তাঁদের প্রচুর দুর্ভোগও ভুগতে হয়েছিল। ঐ যুবকদের মধ্যে দুজন ধরা পড়বার পর স্বীকারোক্তি করে ফেলে এবং তারা রাজসাক্ষী হয়। এরাই বাংলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজসাক্ষী। তাদের একজন হল বিঘাটি ডাকাতি মামলায় ধৃত পান্নালাল চক্রবর্তী ও অপর জন নেতড়া ডাকাতির সংস্রবে ধৃত হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ললিতচন্দ্র চক্রবর্তী। এই দুই জনই তাদের স্বীকারোক্তিতে আমার নামও উল্লেখ করে দেয়, তবে পুলিশের নির্দেশে এমন কতকগুলো অলীক কাহিনীও আমার সম্বন্ধে জুড়ে দিয়েছিল যে, জেরায় সেগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং তাদের সাক্ষ্য আদালতের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় নি। এর ফলে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা ফেঁসে যায় এবং বিঘাটি ডাকাতির মামলায় মোক্ষদাচরণ, কার্তিকচন্দ্র, ধীরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির কারাবাসের আদেশ হলেও আমি খালাস পাই। আজ এই সুযোগে এই সমস্ত বিস্মৃত বীরদের স্মরণ করে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে পেরে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছি।

পরিশেষে শহীদ বালকবীর সুশীলচন্দ্র সেনের প্রতি আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে আমার আজকের প্রবন্ধ শেষ করব। মাত্র ষোল বছর বয়সে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উচ্চারণ করার অপরাধে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব সুশীলচন্দ্রের প্রতি বেত্রদণ্ডের আদেশ দেন। বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়েও সুশীলচন্দ্র মাতৃমন্ত্র পরিত্যাগ করেন নি। সেই কঠোর লাঞ্ছনাধন্য বীর সুশীলচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করেই কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাঁর গান লিখেছিলেন:

"মাগো যায় যেন জীবন চলে,
শুধু জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
"বন্দেমাতরম্" বলে ॥

* * *

আমার বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমি কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?
আমার যায় যাবে জীবন চলে॥

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসিকাঠে ঝুলিলে।
আমার যায় যাবে জীবন চলে ॥

কাব্যবিশারদের আশা সুশীলচন্দ্র পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর দুই অগ্রজ হেমচন্দ্র ও বীরেন্দ্রচন্দ্র সহ সুশীলচন্দ্র বিপ্লবের দীক্ষা নিয়েছিলেন। আলিপুর বোমার মামলা চলার সময়ে শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ থেকে তিন ভাইকেই বন্দীরূপে এনে সেই মামলায় আসামী শ্রেণীভুক্ত করা হয়। বিচারে হেমচন্দ্র ও বীরেন্দ্রচন্দ্রের প্রতি দীর্ঘদিনের দ্বীপান্তর দণ্ডাজ্ঞা হয় কিন্তু প্রমাণাভাবে সুশীলচন্দ্র মুক্তিলাভ করেন। নিজের দুই অগ্রজের এই কঠোর দণ্ড হতে দেখেও সুশীলচন্দ্র ভীত হয়ে এই বিপ্লবের কঠিন ব্রত ত্যাগ করেন নি, উপরন্তু আরও বেশি করে এই ব্রতে নিজেকে জড়িয়েছিলেন। নানা অসমসাহসিক কাজে সাফল্যলাভ করার পর ভ্রাতাদের দ্বীপান্তরবাসকালীনই তিনি প্রাগপুরে ডাকাতি করার পর পুলিশ কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হবার সময়ে গুলীতে আহত হন। নিজের মৃত্যু নিশ্চিত জেনে বন্ধুদের তিনি অনুরোধ করেন যে, তাঁরা যেন তাঁর মস্তকটি দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যান, যাতে তাঁকে সনাক্ত করে পুলিশ কর্তৃপক্ষ অন্যদের ধরতে না পারে। অনর্থক তাঁর আহত দেহকে বহনের দায় থেকে সহকর্মীদের অব্যাহতি দেবার মানসে তিনি যে অদ্ভুত আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন—ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়? পরবর্তীকালে সুশীলের অমর আত্মা বাঙলার অপর বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের অভীমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে—এ বিশ্বাস আমি করি। তাই দেশবাসীকে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যে, এঁদের কীর্তিকথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই, তাই সময় থাকতে সরকার পক্ষ থেকে যে ইতিহাস সংকলনের ভারপ্রাপ্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তাঁরা যেন তাঁদের অবহিত করেন।
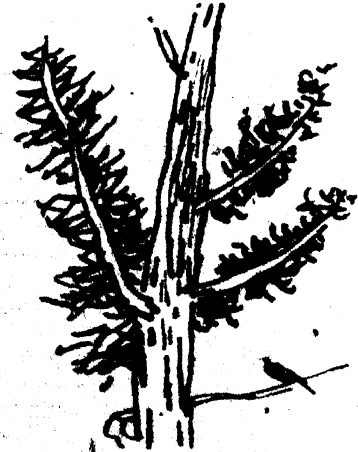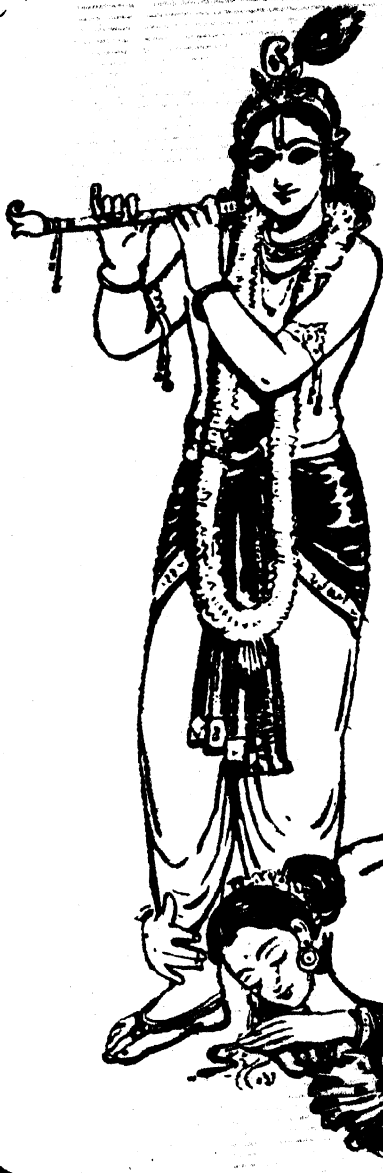
স্কেচ [illegible]গোপাল ঘোষ

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থিত
শ্রীশ্রী অমিয় নিমাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

একটি প্রেমের গল্প

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেম—ফুলমণির প্রেম। সাঁওতাল মেয়ে ফুলমণি। মজুরিণী খেটে বেড়াত। সুন্দরী কালো মেয়ে। মাথায় মেয়েরা একটু দীর্ঘাঙ্গী যারা হয় তাদের দেহে একটি ছন্দ থাকে। দীর্ঘাঙ্গী সাঁওতাল মেয়েদের এই ছন্দ—পরিশ্রমের ফলে মনোহর থেকে সুমনোহর হয়ে ওঠে। ফুলমণি দীর্ঘাঙ্গী তো বটেই—এবং তার দেহ-ছন্দ সুমনোহারিণী তো বটেই, তার উপর কিছু আছে যার জন্য বলছি সে সুন্দরী। সুন্দর তার দুটি চোখ। চোখে সৌন্দর্য তার বোবা সৌন্দর্য নয়, সে সৌন্দর্য কথা কয়। মুখখানি তার এমন মনোহারিণী ছন্দময়ী—দেহের থেকেও সুন্দর। তার উপর চুল আছে একরাশ। সকাল বেলায় টামনা কাঁধে ফেলে, ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে সঙ্গিনীর হাত ধরে গাঁয়ে ঢুকে—আমার বাগানের ফটকের সামনে দাঁড়াত, ফুল ভেঙে খোঁপায় পরবে। ফটকের দুদিকে দুটো বোগেন ভেলিয়ার গাছ। একটাতে সাদা এবং গোলাপী দু রঙের ফুল ফোটে, ওই ফুলের ওপর তাদের খুব ঝোঁক।

আমার দেশের বাড়ীতে একটি বাগান আছে। লোকে খুব তারিফ করে। বাগানটি সুন্দরই বটে।

আমার নিজের ঝোঁক আছে—আমার চেয়েও ঝোঁক বেশী আমার ছোট ভাইয়ের। আমি কলকতা থেকে গাছ নিয়ে যাই—সে লাগায়, জল দেয় এবং আরও গাছ এনে লাগায় নানান জায়গা থেকে। প্রচুর সার দেয়—গাছগুলি বন্য হয়ে বড় হয়ে ওঠে—নিচে ঘাস জন্মায় একটা আরণ্য-শ্রী—যা মানুষের কাছে—অন্তত শহরবাসীর পক্ষে পীড়াদায়ক তাই হয়ে ওঠে। আমি যখন যাই তখন এই সব গাছ ছাঁটাই করি, বাঁধাই করি—কিছু কিছু গাছ তুলেও দিতে দি এবং নিচের ঘাস-আগাছা তুলে পরিষ্কার করাই। আমি দেশে গেলেই মজুরের দরকার হয়। খবর পাঠিয়ে দি—মাঝি-মেঝেনরা আসে—খাটে। মেঝেনরা ফুল পরতে ভালবাসে—তারা খাটুক বা না-খাটুক—এসে দাঁড়ালেই তাদের বলি—কি চাই?

তারা বাংলাই বলে—একটি বিচিত্র টানের সঙ্গে বলে—কেনে—? ফুল!

বলি—কোন্ ফুল?

—ওই টো!

—নে!

ছোটোবাবু বকবে না?

—না—আমি বলব।

তারা খুসী হয়ে ফুল নিয়ে যায়। সে গোলাপ থেকে বোগেন ভেলিয়া পর্যন্ত। ছোট ভাই গন্-গন্ করলে—বলি, দেখ্—কমলাকান্তের দপ্তরে আছে—গরু কার? না—যে দুধ খায় তার। সে প্রসন্ন গোয়ালিনী দাম দিয়ে কিনে থাক—আর রোজ তাকে পেট পুরে খাওয়াক তা সত্ত্বেও। সুতরাং ফুল তার যে পরে। যে গাছ লাগায় তার নয়। মেঝেনগুলো দাঁড়িয়ে শুনে হাসে। মানে বুঝিয়ে দিলে সে হাসিতে জল-

তরঙ্গের সুর বেজে ওঠে। এ সব কথা ফুলমণির কথা একার নয় সুতরাং থাক।

সে দিন ফুলমণি বোগেন ভেলিয়া ভেঙে খোঁপায় প'রে এসে দাঁড়াল—বাবু—বাগানে খাটব লিবি না?

বুঝলাম খাটনি মেলে নি।

বললাম—ক'জন আছিস?

বললে—ক'জনা আবার? আমরা দু জনা! সে আর তার সঙ্গিনী। আমি মেয়েটির মুখের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই কথা বলছিলাম। মন বলছিল—বাঃ এ তো দেখি অপরূপা মেয়ে! ভাবলাম—ফটো তুলে নেব। আগে ওকে দেখেছি কিন্তু এত সুন্দর ছিল না। মেয়েটি যৌবনে যেন পোঁচেছে। ফুল ফুটছে বলে মনে হল।

সে আবার বললে—কি-ই বুলছিস্ বল্ কেনে? আমাকে এমন ক'রে দেখছিস কেনে? হ্যাঁ—। গ্রীবাটি একটু বেঁকে গেল আপনা আপনি।

বললাম—দেখছি—তুই খুব সুন্দর রে দেখতে!

অপর মেয়েটি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। এ মেয়েটি রাগ করে বললে—সি সবাই জানে। তা তু বুলবি কেনে?

—সুন্দর যে, তাকে সুন্দর বলব না, দেখবে না?

—না বুলবি না। দেখবি না! এখন বুল খাটনি লিবি?

—নেব। খাট। কিন্তু তোকে তো এর আগে দেখি নি রে? তুই এখানকার?

ঠিক এই সময় এল আমার নাতনী খুকু! খুকু এখন খুকু বললে রাগ করে—তাকে বলতে হয় শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী। না—মুখার্জী। কলেজের ছাত্রী। কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে এসেছে। এই গ্রামেই তারও পিত্রালয়। কলকাতায় পড়ে—আমার কাছেই থাকে। আমারও দুর্ভাগ্য—তারও দুর্ভাগ্য—। থাক সে কথা। তার বাপ শান্তিশঙ্কর—তার কথা মনে পড়লেই পৃথিবী কালো হয়ে যায় আমার কাছে!

এক মুহূর্ত অবসর দিন পাঠক! আমি আত্মসম্বরণ করে নি।

শকুন্তলা উৎসাহভরে 'দাদু' বলে ডেকে ফটকে এসে ঢুকল—কোন একটা উৎসাহজনক সংবাদ সে আনছিল কিন্তু সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল—বললে——বাঃ!

মেয়ে দুটি কাজে লাগবার জন্যে যে-মুখে ফিরেছিল—ঠিক তার উল্টো মুখ থেকে শকুন্তলা এসে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এবং মুগ্ধ হয়ে বললে—বাঃ!

মেয়ে দুটিও শকুন্তলাকে দেখে অধিকতর বিস্মিত হয়ে—দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

আমি বুঝেছিলাম—বললাম—কি?

শকুন্তলা বললে—ভারী সুন্দর তো!

বললাম—কে?

—এই মেয়েটি!

এবার মেয়েটি বললে—তু ভারি ভাল—খুব সোন্দর! এবার কেউ খিল-খিল করে হাসলে না ওরা। আমি বললাম—কে বেশী সুন্দর—মেঝেন না বাবুদের মেয়ে?

খুকু বললে—মেঝেন।

মেঝেন ঘাড় নেড়ে বললে—উঁ-হুঁ। তু। বাবুদের বিটি!

খুকু বললে—উঁহু—তুই।

—উঁহু তু।

খুকু বললে—দাদু তুমি সত্যি বল তো?

—বলব? মাঝিন রাগ করবি না?

—না। সত্যি বুলবি।

—দুজনেই সুন্দর।

এবার খিল-খিল ক'রে হেসে উঠল দুটি মেয়েতেই। তারপর মেঝেন বললে—তু খুব ভাল বাবু—তু খুব ভাল!

আর একটি মেয়ে সে এতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাক ছিল। শুধু যোগ দিয়েছে খিল-খিল হাসিতে আর অন্য সময়ে সঙ্গিনীর গলা ধরে কাঁধের উপর থুতনি রেখে মুচকি মুচকি হেসেছে! এবার সে বললে—খুব চালাক বেটিস তু বাবু।

এরপর ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ কানে এল গানের সুর। রবীন্দ্র-সঙ্গীত। গাইছে শকুন্তলা। সে গাইছে—কালো? সে তো যতই কালো হোক। আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ! গানের সুর আসছে বাইরে থেকে। অর্থাৎ বাগানের ভিতর থেকে। রোদ্দুরে কোথায় গান গাইছে—মনে কাব্য জেগেছে বলে বিরক্ত হলাম আমি। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম—ফটকের এপাশে অর্থাৎ ভিতরে বাগানের মধ্যে বোগেন ভেলিয়া আর একটা আউচ গাছের পরস্পরের মিলনে যে একটি ছায়াঘন কুঞ্জবনের সৃষ্টি হয়েছে—সেখানে খুকু এবং আমার ভাইঝি কুমু (খুকুরই বয়সী) সাঁওতাল মেয়ে দুটিকে নিয়ে আসর পেতেছে। খুব নিবিড় আসর। খুকু গান শোনাচ্ছে।

ভারী ভাল লাগল আমার। সরে এলাম জানালা থেকে। খুকুর গান শেষ হল। এর পরই সাঁওতালি সুর এল কানে! দেখলাম হ্যাঁ—ওই মেয়েটাই গাইছে। ধরতে চেষ্টা করে কান পাতলাম সজাগ করে—।

উপর কুলি—নামো কুলি মিলিন গা—
সিথানে সি জোড়া কদমগাছ।
কদমতলা যেয়োনারে যেয়ো না—
তুমারো বিয়া হবে না!
তুমারো বিয়া চুড়া হবে না রে হবে না—
কদম্ব গাছে ফুল ফুটিছে!
কদম ফুলে হলুদ রঙে সাদা দাগ—
গায়ে লেগে বিয়া হবে না!

হঠাৎ কোথা থেকে উচ্চকণ্ঠে কে বলে উঠল—ওয়াণ্ডারফুল। সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল। খুব জমিয়েছিস তো দুপুর বেলা!

কে বললে—আমি জানতাম। গলার আওয়াজেই বুঝেছিলাম। শকুন্তলার দাদা। মেডিকেল কলেজের ছাত্র আমারই নাতি শ্রীমান প্রশান্তশঙ্কর, কিন্তু আমরা বলি এ-এস—অর্থাৎ অশান্ত শঙ্কর। শকুন্তলা বলে—না দাদু এ-এস-এস। গলার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো।

পি-এস বাগানের ওপারের আলসের মত পাঁচিলটায় হাত দিয়ে প্রায় ডাকাতের মত লাফ দিয়ে পড়ল ভিতরে। চমকে উঠল তরুণীর দলটি। সাঁওতাল মেয়ে দুটি চমকে উঠে কয়েক হাত সরে গিয়ে দাঁড়াল।

শকুন্তলা বললে—তুই তো আচ্ছা অভদ্র দাদা—

পি-এস বললে—মানিলাম—মানিলাম সব কথা— —

শকুন্তলে নহ তুমি—তুমি সে মন্থরা
বাঁধিয়া মন্থরা ঝুটি—হে কলহপরায়ণা—
মানিলাম সব। কিন্তু এই দ্বিপ্রহরে
ছায়াঘন কুঞ্জবনে—এমন সুন্দর গান
মন্থরার দাদাটিরে করিল পাগল।

—তাই হনুমানের মত লাফ দিয়ে পড়লে উপ করে?

—তাই। হনুমানই হলাম কিন্তু গান বন্ধ হল কেন?

কে গাইছিল? এবার সে দূরে দাঁড়ানো সাঁওতাল মেয়ে দুটির মুখপানে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে—শি ইজ ভেরি বিউটিফুল মন্থরা!

—ও আমার মিতিন।

—তোর মিতিন? Wonderful—তা হলে তো আমি মিতিনের দাদা—মিতে হতেই বা দোষ কি? এই মাঝিন—এ তোর মিতিন?

—হ্যাঁ। আমরা মিতিন হলাম।

—তবে আমি তোর মিতে ওর দাদা! কি বল?

—না।

—না কেন?

এবার সঙ্গিনী মেয়েটি বলে উঠল—তা হলে উয়ার বিয়া হবে না বাবু। বলে সে হেসে উঠল

—কেন?

—মাঝি ছেলেগুলো রাগ করবে। হ্যাঁ!

এবার শকুন্তলা পরিহাস করলে—তা লে তো—ওর সঙ্গেই তোর বিয়ে দিয়ে দোব।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল এবার সঙ্গিনীটি। মেয়েটি বললে—যা তা বুলিস না মিতিন।

শকুন্তলা বললে—তা না হয় মিতিন হবি না। আমাদের বউ হবি!

—কেনে—তা হব কেনে?

—হবি না কেন?

নাতি—A. S. বা A. S. S. দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মত হাসছিল।

মেয়েটি বললে—তুদের বাড়ীর বউ হলে মাথাতে 'সান' (ঘোমটা) দিতে হবে। পাখী খেতে পাব না। খরগোস খেতে পাব না—

নাতি বললে—হাঁড়িয়া খেতে পাব না। বল বল—

—হেঁ। সিটোও বটে—

শকুন্তলা বললে—সব পাবি। আমার দাদা বন্দুকে পাখী মারে—মারবে, খরগোস মারবে—

সঙ্গিনীটি এতক্ষণ ধরে হেসে উঠে পড়ছিল। সে বললে—তুর দাদা বাঘ মারতে পারে, বুনো শুয়োর মারতে পারে? উ যাকে ধরেছে সে বাঘ মেরেছে—

নাতি বললে—আমিও বাঘ না হয় মারব!

—লারবি। সে তু লারবি।

নাতি বললে—সাক্ষী থাক চন্দ্র-সূর্য, সাক্ষী থাক দেবগণ—

নাতিটি আমার মেডিকেল কলেজে পড়ে, থিয়েটারপ্রিয়। সুদর্শন চেহারা লম্বা-চওড়া। কলেজের থিয়েটারে এর মধ্যেই আধা হিরো থেকে বারো আনা হিরোর পার্টে উঠেছে।

শকুন্তলা এবার দাদাকে বললে—হ'ল এবার হ'ল তো!

—কি হ'ল?

—ড্যাবা ড্যাবা চোখে লেন্সের চশমা, ব্যাঙের মত গাঙোর গ্যাং করে বক্তৃতা ...

ভাবতিস ভারী বীর। এবার হ'ল তো, ফুলমণির কাছে হেরে গেলি। দূর-দূর।

ব্যাপারটা কত দূর এগুতো জানি নে কিন্তু মনে হ'ল এই কাণ্ডজ্ঞানহীন আধুনিক ও আধুনিকাটি রহস্যচ্ছলে মাত্রা ছাড়িয়ে হয়তো বা একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে। যেটা অন্তত ওই সরল সহজ অর্ধবন্য আদিম নারীটির পক্ষে অসহনীয় অপমানকর হয়ে উঠবে। সুতরাং এ সময় পিতামহের আবির্ভাব না হ'লে নাটক বিয়োগান্ত হয়ে উঠবে। আমি গলা ঝেড়ে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। বললাম—ওহে ছোকরা এবং ওগো সাঁওতালনীর সখি শোন তো! বলি ব্যাপারটা কি?

—কেন দাদু?

—কেন? আমি ওদের লাগিয়েছি কাজ করতে আর তোমরা ভাই-বোন ওদের কাজ বন্ধ করে ইয়ার্কি সুরু করেছ। আর মেঝেন—তোরাও কাজ বন্ধ করে ওদের সঙ্গে জুটেছিস।

সঙ্গিনীটি বললে—কি করব বাবু? উরা কাজ করতে দিছে না কি!

এ মেয়েটি বললে—দেখ কেনে। এই বাবুটো তামসা করছে। তারপর সঙ্গিনীকে বললে—দেলা! অর্থাৎ চল।

ওরা কাজ করতে লাগল। আমি নাতি-নাতনীকে বললাম—ওদের নিয়ে পরিহাস করতে নেই ভাই। ওসব করো না। কোথায় কোন্ দোষ ধরবে ওরা কিম্বা মনে আঘাত পাবে!

—তুমি সব শুনেছ বুঝি।

—শুনেছি বই কি। বুড়ো হলেও মানুষ তো। বুড়ো বয়সে বাসরে মালা নিয়ে বিছানায় বসতে নিষেধ। কিন্তু তোমাদের বাসরে আড়ি পাতার অধিকার তো যায়নি! শ্রীমতী শকুন্তলে যখন কালো হরিণ চোখ গান শোনাচ্ছিল তখন থেকে কৌতুক সরস চিত্তে সবই শুনেছি!

—ওয়াণ্ডারফুল মেয়ে দাদু।

—কি রকম?

—ওর সব কথা শুনলাম তো! ওয়াণ্ডারফুল!

—সেই তো জিজ্ঞেস করছি গো!

* * * *

শকুন্তলার মেয়েটির সঙ্গে ভাব করতে ইচ্ছে হয়েছিল। সেটা ওর সৌন্দর্য মাধুর্যের জন্য। কখন গিয়ে ওরা যেখানে কাজ করছিল—সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে ঠিক ওর খেয়াল ছিল না। সেখানে দাঁড়িয়ে আপন মনে ওই গানটা গাইছিল।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করেছিল হঠাৎ—উ কি বুলছিস ঠাকরেন?

—গান বলছি রে!

—হুঁ তা গানে কি বুলছিস—আমি কালো তু সোন্দর?

—উঁহু। বলছি তুই কালো হলে কি হবে তোর চোখ খুব সুন্দর, তুই খুব সুন্দর!

—ভালো গান। বল্ গান টো আবার বল।

—তা হলে তোকে একটি গান বলতে হবে। বলিস তো গাইব।

—তা বুলব।

—তবে চল—ওই ছায়াতে চল!

—কাজ কি হবে? বাবু বকবে যি!

—না-না, দাদু কিছু বলবে না। আমি আছি দেখলে কিছু বলবে না!

—বুড়া বাবুর লাতিন তু। খুব ভালবাসে, লয়!

খুব ভালবাসে।

হুঁ। তবে চল। হাঁ ঠাকরেন তুকে কি বুলে ডাকছিল? নাম টো? ভারী মিঠা বটে।

—শকুন্তলা!

শকুন্তলা ঠিক উচ্চারণ করতে পারেনি। না পেরে নিজেরাই হেসেছিল খুব, বলেছিল—উ আমরা লারব ঠাকরেন!

—তবে আমার নাম খুকু।

—খুকু। ধেৎ সি তো গিধড়া বিটিকে বলে। এই টুকুন বিটি ছেলেকে বলে।

—তবে আমাকে মিতিন বলবি। আমি তোর সঙ্গে মিতিন পাতালাম।

—সি খুব ভাল হবে।

—তোর নাম বল এবার।

—আমার নাম ফুলমণি।

—খুব ভাল নাম রে!

—তুর নামটো কি বুলিলি—সিটা খুব ভাল!

—ওর নাম কি?

—উর নাম ঝুমরী মেঝেন! তুর বিয়া হয় নাই ঠাকরেন।

—ঠাকরেন কেন বলছিস? মিতিন বল! লাজ লাগছে গো! তু বাবু ঘরের মেয়ে!

—তাতে কি হল?

—বুলব। বুলব! তুর বিয়াতে এসে তুকে মিতিন বুলব, বরকে মিতে বুলব।

—দূর বিয়ে বুঝি এখন হচ্ছে আমার? বিয়ে আমি করব না এখন। সে লেখাপড়া শিখব পাশ করব তারপর—

—বাবা গো! কত পড়বি?

—অনেক। পাঁচ বছর ছ' বছর—তারপর চাকরী করব—

—চাকরী করবি? বাবা রে!

—কেন? দেখিস নি এখানে ইস্কুলে দিদিমণিরা চাকরী করে—

—হেঁ তা দেখলাম। তা উয়ারা বিয়া করে নাই?

—সিঁথিতে সিঁদুর দেখেছিস?

—হুঁ। দেখেছি, নাই। ভেবেছিলাম কিরিশ্চান সিঁদুর পরে না!

—তোর বিয়ে হয়েছে?

—না!

—তুই কখন বিয়ে করবি?

—বিয়া! হেঁ করতে হবে। তা একটোকে ধরতে হবে তো! একটোকে ধরলাম—তা ভাল লাগল না। মনামুনি হ'ল না!

—সেটা আবার কি?

—সিটো? কেনে এই দ্যাখ—ছোঁড়া গুলান ছুঁক-ছুঁক্ করে আমি সোন্দর কিনা—খুব ছুঁক-ছুঁক করে ভাব করতে চায়। কেউ ট্যাং-টেঙে লম্বা, কেউ এই খাটো, কেউ কুচ্ছিৎ, কেউ সোন্দর! সোন্দর ছোঁড়ার সঙ্গে ভাব করলাম। তারপরে দেখলাম উ বজ্জাত বটে। লয় তো কুঁড়ে বটে। লয়তো চোর বটে ছ্যাঁচড় বটে। মাতাল বটে। কেউ ভাল বটে—তা আমার ভাল লাগল না। তখন তাকে ছেড়ে দিলম। ভাগিয়ে দিলম যাঃ। পালা। আবার একটো দেখতে লাগলাম! মনের সঙ্গে মিল চাই তো!

—তোর বাবা-মা তারা পছন্দ করবে না!

—করে। বাবা পছন্দ করে। বিয়ে দেয়। তারপরেতে ছাড়বিড় হয়ে যায়। ফুলমণির সাঙ্গনী বলেছিল—উর বাবা মরে গেছে ঠাকরেন।

ফুলমণি করুণ স্বরে বলেছিল—তুর মতন মিতিন। তুর বাবা মরে গিয়েছে আমি জানি!

এরপর কয়েকটি নিস্তব্ধ করুণাঘন দুর্লভ মুহূর্ত!

হঠাৎ ফুলমণি বলেছিল—আমি যাই। মিতিন কাজে লাগি গা!

—না ব'স। তুই বড় ভাল রে।

—তু খু-ব ভাল মিতিন।

—তুকে ভাল লাগল যি! তাথেই! তাথেই আমাকে তুর ভাল লাগছে!

সঙ্গিনী ঝুমরী হেসে বলেছিল—ছোঁড়ারা বলে—ফুলমণি ভারী দুষ্টু।......

—কেন? তা ব'লে কেন?

—উ খুব গরব করে যি। ছোঁড়া দিকে পছন্দ করে না!

—তা তো করবেই না। ও যে খুব সুন্দর!

হেঁ। তু বুল তো ঠাকরেন! হেঁ। যাকে তাকে আমার মন লিবে কেনে?

করুণ মুহূর্তটি এরই মধ্যে আনন্দালাপের সরসতার মধ্যে কখন হারিয়ে গিয়েছিল। তারপর এসেছিল কুমু। খুকুর সমবয়সী মাসী। সে এসে জমিয়ে তুলেছিল আরও। সে গ্রামে থাকে—ফুলমণিকে চেনে। সে বলেছিল কেন সেই যে চিতে বাঘের লেজ ধ'রে ঘুরিয়েছিল—সে? তার সঙ্গে তো তোর ভাব হয়েছে। আমি জানি-না বুঝি!

ঝুমরী খুব হেসে উঠেছিল।

ফুলমণি বলেছিল—তু গানটি বল মিতিন। উ সব শুনিস না!

শকুন্তলা গান গেয়েছিল। এবং তার দাবীতে তার মিতিনও গান গাইতে সুরু করেছিল। অতঃপর এই কাণ্ড। রাসভ স্বরে চীৎকার করে বাহবা দিল A, S, S, লাফ দিয়ে পড়েছে—হনুমানের মত!

* * * *

এখানকার সাঁওতাল পাড়াটি খুব বড়। একশো সওয়াশো ঘর সাঁওতালের বাস। এবং অনেককাল অন্তত ষাট বছর ধরে এখানে তারা বাস করছে। আগে একজন সর্দারের অধীনে তারা বাস করত। বুড়ো মেঘলাল সর্দার ছিল প্রায় সাড়ে ছ ফিট লম্বা হিলহিলে রোগা। কিন্তু দুর্ধর্ষ সর্দার। এখন একশো সওয়াশো ঘরে—তিন-চারটে পাড়ায় তিন চারজন সর্দার। এখানে এখন চারটে রাইস মিল, তা ছাড়া দেশের স্বাধীনতার পর অনেক কাজ হচ্ছে। রাস্তা-ঘাট, ঘর-বাড়ী, ক্যানেল—তার জন্যে সাঁওতাল পাড়াটা জমে উঠেছে। এটা ছাড়াও আধ মাইল তফাতে একটা ছোট পাড়া বসেছে—মাইলখানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটা পুরনো পাড়া আছে। তা ছাড়াও তিন-চার মাইলের মধ্যে আরও আট-দশটা।

এই বড় সাঁওতাল পল্লীতেই পশ্চিম পাড়ায় ফুলমণি[illegible]ণির বাবা ছিল চাষী সাঁওতাল। বাড়ীতে দুটো বলদ ছিল—গৃহস্থের

কাছে জমি ভাগে নিয়ে চাষ করত। ফুলমণির মা চাষে খাটত স্বামীর সঙ্গে। দুই ছেলে এক মেয়ে। এক সময় ফুলমণির বাপ চাষ করে বেশ ধান-পান সঞ্চয় করেছিল। দুই ছেলে বড়। তারা চাষেও খাটত এবং চাষের সময় না হলে মজুর খেটে বেড়াত। মাটি কাটার কাজ করত। বাপ-মা দুই ছেলে খাটতে যেত, সঙ্গে যেত ফুলমণি, তখন সে দশ-এগার বছরের মেয়ে। খাটো কাপড় পরে সেও মধ্যে মধ্যে মাটি বোঝাই ঝুড়ি বয়ে বোঝাড়ের কাজ করত।

বড় দুই ভাই বিয়ে করে শুধু পৃথকই নয়, তারা স্থানান্তরে চলে গেল। একজন চলে গেল এপাড়া ছেড়ে ওদেরই দক্ষিণ পাড়ায়। বে পাড়ার সর্দারের সঙ্গে এপাড়ার খুব ঝগড়া। ফুলমণির বাপই ছিল এ পাড়ার সর্দার, ছেলে বিয়ে করলে ওপাড়ার সর্দারের নাতনীকে। বাপ-মায়ের সঙ্গে বেটার ঝগড়াই হয়ে গেছে এক-রকম। আর ছোট ছেলে বিয়ে করে চলে গেছে আমদপুরে—সে এক কলেখাটা মাঝির—কলে-খাটা মেয়েকে বিয়ে করে কলে খাটে।

বাপ-মা আর ফুলমণি বেশ ভালই ছিল। হঠাৎ বাপ মারা গেল। ফুলমণির বয়স তখন চৌদ্দ-পনের। সে তখন পুরোদস্তুর বোঝাড়ে এবং টামনা ধরতেও শিখেছে। তারই সমবয়সী এই ঝুমরীর সঙ্গে মিলে খাটে—একজন মাটি কাটে একজন মাথায় ঝুড়িতে বোঝাই করে ফেলে আসে।

কখনও মায়ের সঙ্গেও খাটে। বিয়ে না হলে পুরুষের সঙ্গে খাটলে না। বিয়ে হলে তবে স্বামীর বোঝাড়ে হয়ে কাজ করবে। ফুল-মণির মায়ের হাতে কিছু টাকা-কড়ি আছে এ সবাই বলে। বাপের মৃত্যুর পর দুই ভাই এসে দুটো বলদের একটা একটা করে নিয়ে গেছে। ধান তিন ভাগ করে দুই ভাই দু-ভাগ নিয়েছে—একভাগ মা আর ফুলমণি নিয়েছে। এখন খাটনি খেটে জীবিকা উপার্জন। কিছুদিন কলে খাটতে গিয়েছিল কিন্তু ফুলমণি পালিয়ে এসেছে। কলের মানুষগুলো মিস্ত্রী, ফিটার থেকে খাজাঞ্চী সব উত্যক্ত করেছিল তাকে। বেশী উত্যক্ত করেছিল যে সব গরুগাড়ীওয়ালারা ধান-চাল বয়ে আনে নিয়ে যায় ইষ্টিশানে তারা। সে মাকে বলেছিল তু কলে খাট। আমি দুটো খেটে খাব। ঝুমরীকে নিয়ে খাটব।

ফুলমণি মাটি কাটে মাটি বয়, চাষের সময় ধান পোঁতে, পৌষ মাসে ধান কাটে। দেখতে দেখতে কখন যে ফুলমণি যুবতী এবং সুন্দরী হয়ে উঠেছিল তা সে নিজেও জানতে পারেনি। জানতে পারলে—পাড়ার সাঁওতাল জোয়ানদের দৃষ্টি দেখে এবং বাড়ীতে তাদের ছোটখাটো ছুতো নিয়ে যাওয়া-আসা দেখে।

এবার আয়নায় মুখ দেখে সে নিজেকে সুন্দরী দুর্লভা বলে চিনতে পারলে, বুঝতে পারলে। এবং সাঁওতাল জোয়ানদের ভিড় দেখে বেশ একটু কৌতুকময়ী হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গরবিনীও বটে। সে রূপসী এ গরব তার হবার কথাই তো।

মায়ের কাছে টাকা নিয়ে সে দোকানে গিয়ে একখানা ভাল শাড়ীও কিনলে।

দোকানে গিয়ে বললে—আমাকে একটো ভাল কাপড় দে গো।

—ভাল কাপড়? কি রকম ভাল কাপড়!

—কেনে? ওই যে সব বাবুদের বিটীরা পরে। লাল পারা!

—দাও হে মেঝেনকে একখানা ভাল কাপড় দাও!

দোকানদারও গাম্ভীর্য বজায় রেখে রসিকতা যতটুকু পারা যায় করবার লোভ সামলাতে পারে না। দোকানের লোকও কাপড় ফেলে দিয়ে রসিকতা করে—দেখ। খুব ভাল লাগবে তোকে। খু-ব ভাল! মাঝি ছোকরারা দেখে ক্ষেপে যাবে!

ফুলমণি গরবে কৌতুকে মুখরা হয়েছে—সে বলে—তু ক্ষেপবি না?

দোকান শুদ্ধ লোক হো-হো করে হেসে ওঠে। ফুলমণি বলে—দেখ কেনে!

উর কথা শুনে কেনে! মাঝিরা ক্ষেপবে! ক্ষেপবে তো তুর কি?

একখানা গাঢ় নীল রঙের শাড়ীতে জরদা চেক দেওয়া শাড়ী সে পছন্দ করে নিয়ে আসে। কদিন আগে ইস্কুলের এক গোরী দিদিমণিকে ওই রকম সিল্কের শাড়ী পরতে দেখেছিল। সে ভাবেনি কালো রঙে এই নীল শাড়ী তাকে মানাবে না। ভাবেও নি এবং শাড়ীখানা পরেও সে ধরতে পারে নি যে তাকে মানাচ্ছে না। নিজেকে তার ভালই মনে হয়েছিল।

শাড়ী পরে সে ঝর্ণায় জল আনতে যাচ্ছিল—একলাই যাচ্ছিল। এবং ইচ্ছে করেই যাচ্ছিল। পিছনে তার আসছিল পূবপাড়ার সর্দারের ছেলে। খুব সেজেগুজে আসছে, হাতের বাঁশীটাতে মধ্যে মধ্যে ফুঁ দিচ্ছে। বুঝতে বাকী রইল না ফুলমণির যে সে তাকে বাঁশীর ইসারায় থামতে বলছে, ডাকছে।

থমকে সে দাঁড়াল। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—কি হে কি বটে হে? আমার পিছা কেনে আসছ? লম্বা গিরগিটি কুঁপো!

ছোকরা এমনটা প্রত্যাশা করেনি। তার বাপের অনেক ধান। চারটে বলদ। পাঁচ বিঘা নিজের ক্ষেত আছে। তাকে বিয়ে করবার জন্যে তাদের অনেক মেয়ের সাধ রয়েছে। সে বহু কিনতে পারে। তাকে এমন করে লম্বা গিরগিটি কুঁপো বলে—সম্বোধন করবে তা সে ধারণাই করতে পারেনি কানাই মাঝি।

সে থমকে গিয়ে বললে—আমি ঝর্ণাতে যাব। তুর পিছু কেনে যাব?

—যা তবে তু ঝর্ণাকে যা। আমি এইখানে বসব।

বসে পড়ল সে। তারপর হঠাৎ থুথু ফেলে বললে—হ্যাক্ থু! কানাই এতটুকু হয়ে গেল। সে বললে—আমাকে দেখে থুথু ফেললি তু?

—তুকে দেখে কেনে হবে! থুথু এলো তো কি করব!

কথা সে এমনভাবে বললে যে প্রতিবাদ বা ঝগড়া করবার মতও জোর কানাইয়ের রইল না। সে বাঁ-দিকে ভেঙে চলে গেল দূরবর্তী একটা ঝরণার দিকে।

খিল খিল করে হেসে উঠল ফুলমণি। তারপর উল্টো দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব জোরে ডাকতে লাগল—আঃ আঃ তু-তু মুংরা মুংরা! আঃ! লে-লে-লে-ইঃ! মুংরা তাদের বাড়ীর কুকুরটা।

পরের দিন খাটনি খেটে ফিরে এলে তার মা বললে—কানাইয়ের বাবা এসেছিল। টাকা দিবে! দশ টাকা দামের দুখানা কাপড় দিবে আরও সব দিবে!

খাটনী খেটে এসে মেজাজ তখন ভাল থাকে না। সে বললে—কি বললি?

—কি বলব? বললাম ইতো ভাল কথা—

—ভাল কথা? ছাই কথা।

—ছাই কথা? অবাক হয়ে গেল তার মা। উয়াদের জমি আছে—দুটো হাল আছে। ক ধান—

—তু যা খাগা যা! আমি উ বিয়া করব না

—করবি না?

—না। ওই লম্বা গিরগিটি কুঁপো। জো করবি তো চলে যাব আমি।

মরবি তু মরবি। বেশী জোর করলে থানাকে যাব। হুঁ।

কিছুদিন আগে বাবুদের এক মেয়ের বা বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল এক খারাপ পাত্রে সঙ্গে। মেয়ের অমত মানে নি। মেয়েটা চ গিয়েছিল থানায়। সে নিয়ে গাঁয়ে হুলুস্থু কান্ড হয়েছে। বিয়ে হয় নি। এ সব একাে ফুলমণিরা শিখেছে। ফুলমণির সাহস আছে সে কথা মা জানে। পিছিয়ে এসেছিল সে।

এরপর ফুলমণি এমন ধরণের কথ অনেককে বলেছে। হঠাৎ মোড় বদলাল।

মাস কয়েক আগে এখানে এল এ সাঁওতাল ছেলে। বুধন মুর্মু। সে নিজে বুধন মাঝি বলে না—বলে বুধন মুর্ম এসেছে মামুদ বাজারের ধার থেকে। সেখা সর্দারের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল। সেই জ পালিয়ে এসেছে এখানে—সে হল এখানক পুরনো সর্দার মেঘলাল মাঝির বেটীর বেট বেটা। সেই সম্পর্ক ধরে মেঘলালের বেট বেটার কাছে এসে বলেছে—ইখানে আমি থাক

মেঘলালের বেটার বেটার আজকা সর্দারিও নাই আর সে পুরনো অবস্থাও নাই তবু সে বলেছিল—এসেছিস তা থাক। তবে চ সর্দারের কাছে। তাকে বলতে হবে তো।

সর্দার ডগরু মাঝি মস্ত মাঝি। অবস্থা ভাল। ঘরে হাল আছে দুখানা। ধান বে রাখে। চড়া দরে বিক্রী করে। রবার টায়ার ক স্যাণ্ডেল পরে গেরামে যায়। বাজারে তার খাতি আছে। একটা বেটী আছে ছেলে চারটে। তা আলাদা। বেটীটার বিয়ে হয়েছে, জামাই এ ঘরে রয়েছে, শ্বশুরের ঘরে খাটছে। পাঁচ ব খাটবে। তারপর একজোড়া বলদ পাবে, বা পাবে, কিছু ধান পাবে। তখন আলাদা ঘর হ তাদের।

বুধনকে দেখে ডগরুর ভাল লাগল। ে একটা জোয়ান ছেলে। জবরদস্ত মাঝি হবে। এ তো মোটে উনিশ-কুড়ি বয়স—এখনই ছোঁড় এই ছাতি। এই লম্বা!

বুধনকে দেখে প্রথম দিন ফুলমণি ব ছিল—ই বাবা ই কুথা থেকে এল রে!

বুধন ফুলমণিকে বলেছিল—সি অ দূর বটে হে। মামুদ বাজার। সেই মোরক্ষী বাঁধলে যিখানে সিখান থেকে বটেক। তা তু কে বট গা? নামটি কি হে?

—নামটি নিয়ে কামটি কি হে? তু কুথাকার কে বট—তুমাকে বলব কেনে!

—আমি ইখানকারই হলাম। ইখানেই থাকব। মেঘু সর্দারের বিটীর বেটার বেটা আমি।

ইখানে থাকব। ডগরু সর্দার বলেছে! আমার নাম বুধন মুর্মু।

—হু। তা থাক। আমি ফুলমণি বটি।

—তোমার নামটি ভাল বটে।

—সত্যি না কি?

—হঁ। ফুলের মতুন বট হে তুমি।

—অঃ। মাথার চুলে পরবি নাকি?

—হ। মনটি তাই বটে।

—হঁ। তু খুব লাগর বটিস। ফুল পরবি চুলে! যাঃ পালা! ফুল পরা এত সোজা লয়! যা। যা। লইলে লোক ডাকব আমি। যা!

বুধনের বেলা থুথু ফেলতে পারেনি ফুল. শুধু তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেটা সন্ধ্যে-বেলা ফুলমণি গিয়েছিল গ্রামখানার ধারে দোকানে কেরাসিন তেল, সরষের তেল কিনতে। ফিরে আসবার পথে দেখা হয়েছিল বুধনের সঙ্গে। বুধন বসেছিল একটা টিলার উপর। সামনে বিস্তৃত প্রান্তর। ও মাথার পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছে গ্রামের বড় বাবুদের বাগান এবং বাগানের মধ্যে সাদা বাড়ীর মাথা। তার পাশে খানিকটা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় আরও অনেক দূরে দিগন্ত পর্যন্ত। সূর্য ডুবে গেছে। সেখানে আকাশের লাল রঙ ফুটেছে, সে রঙের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বুধন নতুন মানুষ। মাঝিরা সকলে মদ খেতে গেছে। সে যায়নি। এসেছে পরের ঘরে। তারা ভাত দিচ্ছে—হাঁড়িয়ার পয়সা কোথায় পাবে।

ফুল চলে আসতে আসতে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলেছিল—কি দেখছ হে বসে বসে?

—হুই লাল রঙ দেখছি।

খিল-খিল করে হেসে উঠেছিল ফুল। আকাশে তারা খোঁজ হে। লাল রঙ গিধড়াতে দেখ!

পরের দিন গ্রামে খাটতে এসে কিন্তু এক জায়গায় খাটুনী মিলেছিল। বাবুদের পুকুরের পাঁক তোলা হয়েছে—সেই পুকুরের পাড় কেটে সমান করাচ্ছে—বাগান হবে। মধ্যে মধ্যে কাটা তাল গাছের গোড়াগুলো উঠে রয়েছে সেগুলো তুলতে হবে। প্রায় তিরিশ জন মাঝি মেঝেন লেগেছে।

ঝুমরী আর ফুল, একজন কাটছে—একজন বইছে। কজন মাঝি কুড়ুল টামনা নিয়ে ওই গাছের গোড়া ওপড়াচ্ছে। বুধন তার মধ্যে একজন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সকলের চোখ পড়ল বুধনের দিকে। কুড়ুল চালাচ্ছে আর—হুঃ—হুঃ করে একটা শব্দ তার গলা থেকে আপনি বেরিয়ে আসছে। সে যেন একটা দৈত্যের মত। গোড়াগুলো তুলে সাবল লাগিয়ে পাড় দিয়ে ঠেলে ফেলে গড়িয়ে দিচ্ছে পুকুরের মধ্যে।

ঝুমরী বললে—দেখ—দেখ। গতরটো কি নিয়ে উঠছে দেখ।

ফুল বললে—তু দেখ!

—এই ছাতি ফুলেছে। বাবারে!

—তু মরগা—ওই ছাতিতে মাথা ঠুকে। পাজী—!—!

সে আপন মনে কাটতে লাগল মাটি।

হঠাৎ ভয়ার্ত এবং বিব্রত হয়ে চীৎকার ক'রে বুধন প্রায় তিড়িং বিড়িং করে লাফ দিতে লাগল। —এই। এই! এই!—

সে এক হাস্যকর দৃশ্য। —একটা এত বড় মরদ যে দৈত্যের মত মাটি কোপাচ্ছিল এক্ষুণি—সে লাফাচ্ছে দেখ—আর ভয়ে চেঁচাচ্ছে দেখ!

মেয়েরা সব হেসে গড়িয়ে পড়ল! পুরুষেরা জিজ্ঞাসা করল— কি? কি? দু এক জন ছুটে এল।

বুধন তখন দাঁড়িয়েছে স্থির হয়ে। বললে—হুঁ —হুঁ। দেখলাম। কাঁকড়া বিছে।

কাঁকড়া বিছে একটা নয় দশ বারোটা—। একটা তাল গাছের তলাটা চাড় দিয়ে তুলতেই তাদের গর্তটা বেরিয়ে পড়েছে—আলো পড়েছে দিনের—আর সেগুলো কিলবিল ক'রে বেরিয়ে পড়েছে। ছুটছে। —এদিক ওদিক।—

এবার মেঝেনগুলোর পালা—তারা ই—ই করে ছুটে পালাচ্ছে। একজনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আর একজন পড়ছে। ততক্ষণে মাঝিরা টামনা দিয়ে পিটতে মারতে সুরু করেছে। বুধন মারলে বেশী।

একটা ফুল মারলে। সে ভয়ে ছুটোছুটি করে পালায় নি। সে দাঁড়িয়েছিল সতর্ক দৃষ্টি রেখে—একটা তার দিকেই গিয়েছিল—সে সেটাকে বেশ ধীরতার সঙ্গেই টামনার ঘায়ে মেরে ফেললে।

সেই দিনই মাঝিদের মধ্যে বুধনের একটা নাম হয়ে গেল। লোকটা মরদ বটে! খাটবার ক্ষমতা আছে। "ই একটো ভালো মুনিষ হবে।" কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যায় তার বদনামও রটে গেল—ছোঁড়া দুর্দান্ত মাতাল।

খাটনির পয়সার অর্ধেক তার কাকা অর্থাৎ মেঘলালের নাতিকে দিয়ে যা অর্ধেক ছিল—দশ আনা পয়সা—তার সবটারই সে হাঁড়িয়া খেয়ে টলতে টলতে ফিরল এবং সন্ধ্যে বেলা থেকেই বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল ধুলোতে।

ঝুমরীকে ফুল বললে—যা ইবার যা—বুকে মাথা ঠুকগা! উ বজ্জাত বটে! মাতাল।

মাতালও বটে মরদও বটে। দুই সত্যি। খাটনী বুধনের বাঁধা হয়ে গেল। অন্যে খাটনী পাক বা না পাক ও পাবেই। কিন্তু মুস্কিল ওর বোঝাড়ে নাই।

ডগরু সর্দার ডেকে বললে—এক কাজ কর। 'গরদি জাওয়ে' কর। শ্বশুর ঘরে পাঁচ বছর থাকবি, খাটবি—ক্ষেতি কি আছে? —বোঝাড়ে পাবি। একলা কি খেটে মজা হয়?

বুধন বললে—সি হবেক। দেখি।

—তুকে তো সব বিটীর মা বাপ লিবেরে। মদটো কম খাবি!

—ওইটো তো হয় না গ! উথেই তো ঝগড়া লাগে! তা বর্ষাটো যাক। এখন তো বর্ষা নামছে—ধান পোতার সময়— এখন একা কাজ তো মিলবে গো। তা ছাড়া ডাল কাটা—কাঠ চেলা করা আছে, তাই করব!

আসলে সাঁওতাল কুমারীদের মধ্যে ওকে নিয়ে এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে গেছে। বুধনের সেটি ভাল লাগছে। মেয়েগুলো তার গা ঘেঁষে আসতে চায়,—কথা বলতে চায়; ওকে দেখে হেসে নিজেরা ঢলাঢলি করে, বুধন উপভোগ করে। আসে না শুধু ফুলমণি।

অনেক কসরত করে বুধন। নাচের সময় ওদের পাড়ায় ও যখন মাদল বাজায় তখন অন্য পাড়ার লোক বুঝতে পারে যে, বুধন মাদল নিয়েছে। বুধনের মাদল বাজানো এবং নাচ দেখতে যায় সকলে। বুধনের হাতে মাদলে আওয়াজ যেমন বের হয় তেমনি তার বুকের পেশী, হাতের পেশী নাচে—তেমনি সে লাফ দিয়ে পাক ফেরে। সে আর এখানে কেউ পারে না। কিন্তু ফুলমণি একদিন দেখে এসে আর যায় নি। বলে—ধুরে উ কি দেখব! উকে ডাক আমার নাচ দেখুক!

তা দেখে গেছে বুধন। বুধন একদিন মাদল বাজাতে চেয়েছিল ওদের পাড়ায়—কিন্তু ফুল বলেছিল—তা হলে সে নাচবে না!

বুধন হনুমান বাঁদর তাড়াতে সে একেবারে হৈ হৈ শব্দ তোলে—খুব লাফালাফি করে—গাছে ওঠে তেড়ে, সাঁওতালেরাও খুব উপভোগ করে—মেয়েরা তো দল বেঁধে দাঁড়িয়ে হাস্য কলরব করে, ফুল তাদের মধ্যে থাকে না। ওই শব্দ শুনলে একবার বেরিয়ে এসে দেখে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে—উকে—ওই মুখপোড়াদের সঙ্গে গাছে বাসা বাঁধতে বল!

এই ফুলমণিও কিন্তু কাছে এল।

সেবার ১৯৫৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে হল প্রলয়ংকর বৃষ্টি। নাগাড় ছত্রিশ ঘন্টা ধরে বর্ষণ—, ছত্রিশ ঘন্টায় বৃষ্টি হল বাইশ ইঞ্চি।

ময়ূরাক্ষী, কোপাই, বক্রেশ্বর ধুয়ে ভেসে একাকার হয়ে গেল। কোপাই এবং বক্রেশ্বরের মিলিত ধারা কুয়ে নদীর কূলেই সাঁওতালদের পল্লী—কিন্তু ওদের পল্লীটা একটা মোরামের টিলার উপর—যে টিলাটা নদীগর্ভ থেকে প্রায় ষাট ফুট উঁচু। জল নদীগর্ভ থেকে চল্লিশ ফুটেরও উপর উঠে-ছিল। ওরা টিলার উপরে থেকে শঙ্কিত হয়ে-ছিল—হয়তো বা এ বিশ ফুটও ডুববে। কিন্তু তা ডোবেনি। সারা দেশটাকে একেবারে জল-প্লাবিত ক'রে বাড়ীঘর ভেঙে খেতে-খামারে বালি চাপিয়ে এক ধ্বংস তাণ্ডব করে বান চলে গেল। দেশে হাহাকার উঠেছিল। কিন্তু সাঁওতালেরা বেরিয়েছিল শিকারে। বড় বন্যার পর ওরা শিকারে বেরিয়ে থাকে। কারণ মাঠে ডাঙায় জল উঠে—গর্তে থাকা জন্তুগুলিকে ঘর ছাড়া করে। তারা কিছু মরে, কিছু ভেসে গিয়ে ডাঙায় ওঠে, কিছু গর্ত ছেড়ে সময়ে বেরিয়ে পড়ে এখানে ওখানে আশ্রয় নেয়। সাঁওতালেরা সেই সময় হানা দিয়ে তাদের শিকার করে।

এই শিকারে বেরিয়ে সাঁওতালের দল সে দিন ফিরল হৈ হৈ করতে করতে। দুজনে একটা বাঁশের দুইদিক ঘাড়ে চাপিয়ে আনছে—তাতে একটা ছোট চিতে বাঘ। লেজ শুদ্ধ তিন হাত সাড়ে তিন হাত হবে। উঁচুতে হাত দুয়েক।

এটা মেরেছে বুধন। বুধন? হ্যাঁ বুধনা মারলেক। লড়াই করেছে হে! হাঁ লেজ ধরে হেঁই বোঁ বোঁ করে ঘুরায় বাঘটাকে—

আর বলতেও ওরা পারে না। [illegible] মনে ক'রে হি-হি-করে [illegible]

—তার পরেতে! বাবারে! [illegible] করে পড়ে, সি দাঁত বার করে হাঁকড়েছে-বাবারে—!

—তা বুধন ধরলেক বেটার ছামুকার পা দুটোকে, দু হাত দিয়ে লড়ুয়ে মরদের মত ধরলেক—।

বুধনের কাঁধটা রক্তাক্ত। বেটা বাঘ কামড় দিয়ে ধরেছিল। মাংস খানিকটা ছেড়ে গেছে। বাপ্‌রে। বুধন টলতে টলতে আসছে। হাঁড়িয়া খেয়েছে—প্রচুর খেয়েছে। বাঘের কামড়ে কাঁধটা জখম করেছে তা গ্রাহ্যই নেই। এ পাড়ার সর্দার ওপাড়ার সর্দার নাম পাড়ার সর্দার বলছে—হাঁ একটো মরদ বটেহে। বীর বটে!

ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত। অদ্ভুত বৈ কি! কোপাইয়ের ধারে—দুবেসোর একটা জঙ্গল আছে, সেখানে নদী একটা বাঁক ফিরেছে। কতকগুলো বড় বড় অর্জুন গাছ আছে আর নিচে ছোট অর্জুন গাছের জঙ্গল। লোকে ওখানকার গাছপালা কাটে না। ওখানে এদেশের লোকের দেবতা আছে। বাঘ এ অঞ্চলে নেই; আছে কোপাইয়ের উপরদিকে—সাঁওতাল পরগণার দিকে; সেখানে কোপাইয়ের দুপাশে বড় বড় পাথরের চাঁই আর শাল বনের জঙ্গল। বন্যাতে বোধ হয় বাঘটা ভেসে এসে ওই বাঁকে ঠেকে খেয়ে উঠে ওই জঙ্গলে বাসা নিয়েছিল।

মাঝিরা শিকার করতে করতে চলে গিয়েছিল উপরের দিকে। পেয়েছিল অনেক শিকার। খরগোস গোটাকতক, আর বনবিড়াল অনেকগুলো। এ বেটারা গাছে উঠে বাসা নিয়েছিল বানের সময়। জঙ্গলেই বাসা, জল ঢুকতেই গাছে চড়ে বসেছিল। বনবিড়ালগুলো ঘরের বিড়ালের চেয়ে বড়—আকারে ডবল। আর রং লালচে—তার মধ্যে গায় লাল ডোরা দাগ। নিচেটা এখনও কাদা ভিজে সপ্‌সপে, বেটারা এখনও ভালেই আছে। পাখী ধরে খেয়ে বলতে গেলে বেশ আছে। সাঁওতালেরা কাঁড় দিয়ে বিঁধে মেরেছে। আর মেরেছে কয়েকটা গোসাপ। দুবেসোর জঙ্গলে ঢুকে ওরা গাছের দিকে লক্ষ্য রেখে চলছিল। হঠাৎ বুধনের চোখে পড়েছিল—একটা ঝোপ—তার বাইরে একটা লেজ। কাদা মাখা হলেও বুধন লেজের রংটা বুঝতে পেরেছিল—ওই জবদা রকমই বটে। লেজটা বেশ একটু মোটা। মাথায় বাসা গেড়েছিল বনবিড়াল। একটা বড় বনবিড়াল বটে। গাছের ডালের উপর বনবিড়াল মারা সোজা। কিন্তু মাটিতে বেটারা সাংঘাতিক। সে ঠিক বাঘের মত ফোঁসায়—কার উপরে লাফ দেয় ঠিক নাই। লাফ দিলে নখে চিরে ফালি করে দেয় মানুষের দেহ। বুধন ফিসফিস করে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল—শুনেহে আমি গিয়া বেটার লেজটো ধরে টানব, আর বেটা ছামুতে যা পাবে—সামনের পায়ে নখে আঁকড়ে ধরবে। শালা খোঁটাতে পাঁঠার মতুন টান হয়ে যাবে—তুমরা ডাণ্ডা দিয়ে দিবে পিটে।

তারপর নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়ে কাদা মাখা লেজটা খপ করে চেপে ধরে মেরেছিল টান। বুধনের পরিকল্পনায় ভুল ছিল না। বাঘটা বানের জল খেয়ে কিছু কাতর ছিল—তবু তো সে বাঘ—সে ঝোপটার গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে গর্জন করে উঠেছিল। সে গর্জনে সকলে চমকে উঠেছিল। —ইরে বাবা! ই কি বনবিড়াল হে!

বুধন সাঁওতাল পরগণায় [illegible]। এদের থেকে তার বাঘের সঙ্গে পরিচয় আছে বেশী। সে চিতা বাঘ দেখেছে। সে বুঝেছিল—এটা বাঘ। সে বলে উঠেছিল—বাঘ বটে হে! বাঘ! শালা—! কাঁড় মার হে। এবং প্রাণপণে টেনেছিল পিছন দিকে। অন্য মাঝিরা কটা কাঁড় মেরেছিল—কিন্তু ঝোপের ভিতর ঢুকে বাঘটাকে ঠিক বেঁধা যায়নি। ওদিকে বুধনের টানে বাঘটার নখে ধরা ঝোপের ডাল ভেঙে বাঘটা বেরিয়ে এসেছিল। সাঁওতালরা অনেকে ছুটে সরে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বুধন উপায়ান্তর দেখেনি। বাঘটা আবার মাটিতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। ছোট বাঘ। তা হলেও বিক্রম ভীষণ। সে মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বাঘটার লেজ দু হাতে ধ'রে তাকে পাক দেবার মতলব ক'রে—হ্যাঁচকা টানে শূন্যে তুলে পাক কতক ঘুরিয়ে আর রাখতে পারেনি—ছেড়ে দিয়েছিল। বাঘটা খেই ক' হাত দূরে ধপ ক'রে আছড়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্ত।

সাঁওতালেরা এবার দু চারটে কাঁড় মেরেছিল—দুটো কাঁড় বিঁধেওছিল। বুধন যা করেছিল—তা কেউ ভাবতেই পারেনি। সে ছুটে এসে ওই মুহ্যমান বাঘটার পিঠের উপর লাফ দিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। ঠিক সামনে এসেছে—তখন বাঘটা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে তাকে থাবা মারতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বুধন দুই হাতে বেটার দুই পা ধরে পালোয়ানের মতই তার সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে পায়ে ঘুট দিয়ে। বাঘটা হাঁ ক'রে কাঁধে বসিয়েছিল কামড়। এবার বুধন হেঁকে বলেছিল—দা দিয়ে কোপা বেটাকে। মাথাতে হে—মাথাতে। মাথায় মারা সোজা ছিল না। কারণ বাঘটা কামড়ে ছিল বুধনের কাঁধ। দায়ের আঘাত বুধনের মাথায় পড়তে পারে। তারা মেরেছিল গর্দানে-পিঠে। বাঘটা যন্ত্রণায় বুধনের কাঁধ ছেড়ে পিছনের দিকে ফিরতে চেয়েছিল। সুযোগ পেয়ে বুধন তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল—বেটা পড়েছিল—চিৎ হয়ে। মুহূর্তে বুধন একজনের হাত থেকে দা কেড়ে নিয়ে সজোরে কোপ মেরেছিল নাক এবং উপরের মাড়িতে। কোপের উপর কোপ। বৃত্তান্ত এই।

তারপর বুধন বসে পড়ে বলেছিল—বাবারে। পরমুহূর্তে শুয়ে পড়েছিল। ডগুরু এসে কাছে বসে বলেছিল—হাঁড়িয়া খা।

—দে।

সেব খানেক হাঁড়িয়া খেয়ে খানিকটা পর সে উঠে দাঁড়িয়ে বাঘটাকে দেখে বলেছিল—শালা! তারপরে বলেছিল—দে আর খানিক হাঁড়িয়া দে।

হাঁড়িয়া খেয়ে বলেছিল—চল ইবার।

সেই ওরা হৈ হৈ করে আসছে। গাঁয়ের কাছে এসে হৈ-হৈ বেড়ে গেছে। বেশী হৈ হৈ করছে—বুধন নিজে। চারিদিকে সাঁওতালপাড়ার কুমারীরা তাকে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছে—সে হা-হা করে হাসছে! এখনও সে বিক্রম প্রকাশ করে বলছে—শালাকে ধরলম দুই থাবাতে চেপে। শালা কাঁধে কামড়ালে। লে শালা কামড়া। আমি বুধন বটি। হুঁ। দিতম শালার ছামুকার পা দুখানা মুচুড়ে ভেঙে। আমার সঙ্গে পারবে—শালা! —অঃ!

হঠাৎ তার চোখ পড়ল ফুলমণির দিকে। সে দলের সামনেই ছিল। আজ সে না এসে পারেনি। বলেছিল—কি হে ফুলমণি লাগছে! কেমন দেখছ হে বাঘটো? কি দেখছ হে? বাঘের নখ? হুঁ—উ আমি দিব না হে দিব না। আমার বউকে দিব!

ফুলমণি বলেছিল—সি তু দিস হে! আমি গিধড়া লই। গলাতে তক্তি পরি না! তা তুর কাঁধে রক্ত পড়ছে। ওষুদ লে। লইলে পাকবেক। বুঝবি ঠেলা! জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা!

—তু ধুয়ে দিবি?

দিব। তা দিব। বাঘ মেরেছিস আজ। তু দিব না কেনে?

এই সূত্রপাত। তখন থেকে জিত পাগ্লা বুধনের। হার ফুলমণির। হার ঠিক নয়—বুধন তাকে ভালবেসেছে—পাড়ার সকলে বুঝেছে বুধন ফুলমণিকেই বিয়ে করবে, কিন্তু বুধনের মদ খাওয়া নিয়ে ফুলমণির ঝগড়া চলছে। আর ঝগড়া পাড়ার সব মেয়ের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করা নিয়ে।

* * *

প্রথমে যে ঘটনাটি বলেছি, সেটি উনিশ শো ছাপ্পান্ন সালের নভেম্বরের প্রথম। এই বাঘ মারার মাস দেড়েক পরের। ঘটনাটার বিস্তৃত বিবরণ পেলাম আমার ছোট ভাইয়ের কাছে। তিনি কংগ্রেসী লীডার। এ ছাড়াও কিছু বেশী। এ অঞ্চলে এই ছোট ভাইটির আমার সেবাকর্ম অতি আন্তরিক এবং সর্বজনস্বীকৃত। আরও একটি গুণ আছে—সেটি এই যে—ইউনিয়ন বোর্ড থেকে শুরু করে এম-এল-এ এম-এল-সি বা অসংখ্য কমিটির কোনটার সভ্য পদপ্রার্থী কোন দিন হননি বা দিলেও গ্রহণ করেননি। গৃহ আছে, গৃহকর্ম তিনি করেন না। কিন্তু আদায় আছে—সে আদায় তাগাদা অভাবে আদায় হয় না। দিবা নাই রাত্রি নাই কোথাও কিছু হলেই তিনি ছুটেছেন। সে বন্যা, ঝড়, অগ্নিদাহ, দাঙ্গা, এমন কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উপক্রম পর্যন্ত। ছেলেরা চাকরী করে—সামান্য চাকরী তা থেকেই চলে যায়—চালান ছেলেদের মা। সাঁওতালেরা অত্যন্ত অনুগত। বাঘের খবর পেয়েই তিনি পরদিনই চলে গিয়েছিলেন সাঁওতালপাড়া। বাঘটা দেখে—বুধনকে দেখে—বাঘটাকে থানায় জমা দিয়ে—সদরে পাঠাতে বলেছিলেন—বুধন পুরস্কার পাবে এবং বুধনকে এনেছিলেন হেলথ সেণ্টারে—চিকিৎসার জন্য। সঙ্গে যারা এসেছিল—তাদের মধ্যে ফুলমণি ছিল। হাসপাতালে বুধনকে ইনজেকশন দিয়েছিল—ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়ে ভর্তি করে নিয়েছিল। কিন্তু বুধন চীৎকার করতে সুরু করেছিল—না—না—সে এখানে থাকবে না। তা হ'লে সে মরে যাবে!

ফুলমণি বলেছিল—বাবু উকে ছেড়েদে—গাঁয়ে নিয়ে যাই। কি ওষুদ দিবি দে। কি করতে হবে বল। আমি করব সব।

তাই করেছে ফুলমণি। ওকে রোজ সকালে হাসপাতালে এনেছে। দরকার মত ব্যাণ্ডেজ পাল্টাবার সময় তাকে ধ'রে বসে থেকেছে। বাড়ীতে খাবার অর্থাৎ প্রথম দু দিন সাগু তৈরী করে খাইয়েছে।

কথাটা সর্বজনবিদিত। কুমু তাই বলেছিল—বাঘ মারা মাঝিকে নিয়ে তোর কথা আমি জানি না বুঝি?

ফুলমণি বলেছিল—জানিস তো কি হল? হুঁ।

স্নানের আগেই শুনেছিলাম গল্প। সবাই শুনেছিলাম। আমি শকুন্তলা এ-এস-এস-সবাই। শুনে হেসে বলেছিলাম—দাদার বীর্যশুল্কা এই কন্যা, থিয়েটারি বীরে কভু করে না বরণ। তোমার হার!

শকুন্তলা বলেছিল—থিয়েটারি গোঁপ গাল-পাট্টায় হবে না দাদা। তুই গোঁপ রাখ। নইলে না হোপ!

এ-এস-এস বলেছিল—ছোটদাদু তোমার বন্দুকটা দাও। মহুরে তুই খানিকটা চা আর এক টিফিন-কেরিয়ার সন্দেশ খাবার করে দে। আমি এখুনি রওনা হব।

—কোথায়?

—সুন্দরবন—হাজারিবাগ—শুনেছি সাইরিয়াতেও ডোরা বাঘ আছে—যেখান থেকে হোক বাঘ মেরে এনে তবে জল গ্রহণ করব।

—তবে যে বলছিস খাবার করে দিতে।

ইয়েস। খাবার জল নয়। চাও জল নয়—চা। এইগুলো খাব এসে জল খাব।

—তার চেয়ে কলকাতা থেকে—একটা মরা বাঘের চামড়া—সেই মুণ্ড তৈরী করে দিয়ে বিক্রী করে—তাই একটা কিনে আন—এনে বল তুই মেরেছিস।

—প্রবঞ্চনা? না।—সে কভু হবে না আমা হতে!

বাড়ী থেকে তাগাদা এল স্নান করবার। আসর ভাঙ্গল।

খেয়ে ঘুমিয়েছিলাম—উঠে দেখলাম—মেঝেনদের কাজ শেষ হয়েছে—তারা নিবিড় হয়ে বসেছে শকুন্তলা এবং এ-এস-এসের সঙ্গে। গান হচ্ছে। গান হচ্ছে 'টেপরেকর্ডারে'; সাঁওতালী গান। মেয়ে দুটি সবিস্ময়ে শুনছে। আর বলছে—এই বাবা! এই বাবা! আর মধ্যে মধ্যে খিল খিল ক'রে হাসছে। শকুন্তলা বললে—এ-এস-এস হ্যাজ ওয়ান দাদু। টেপরেকর্ডার দেখিয়ে ওদের গান রেকর্ড করে—টাইগার কিলারের চেয়েও বিস্ময়ের পাত্র হয়ে উঠেছে।

পরের দিনও ওরা খাটতে এসেছিল। খাটনী না-মাথা। সারাটা দিন ওই তিনটি তরুণী এবং দুটি তরুণ মাতামাতি করেছিল।

দুটি তরুণের একটি এ-এস-এস—একটি বুধন। বুধনকে ওরা গিয়ে এই বাবুদের ছোকরাটির কথা বলেছিল—শুনে বুধনও এসেছিল সেদিন। খাটতে নয়, এমনি।

এ-এস-এস তার সঙ্গে মিতে পাতিয়ে খুব ভাব করলে। তার তীর ধনুক নিয়ে অনেক ব্যর্থ লক্ষ্যভেদ করলে। পাঞ্জা লড়ে হারলে। টেপ-রেকর্ডার দেখালে। ছোটদাদুর বন্দুক নিয়ে উড়ন্ত পাখী মারলে। খুব কলরব করলে। তাকে তার গগলসটা দিলে। এবং তার কাছ থেকে বাঘের নখ একটা নিলে।

চলে এলাম তারপর।

* * * *

পরের মাসে গেলাম—সেবার একলাই গিয়েছিলাম, সেবার কিন্তু ফুলমণির দেখা পেলাম না। ঝুমরী এসেছিল—সে হেসে বললে—স এখন—

হাসতে লাগল।

—কি? সে এখন কি?

—সেই বুধনকে নিয়ে মেতেছে!

বুঝলাম। বললাম—বিয়ে হবে কখন?

—এই ত্রোক্ত যোগেশে হবে।

পরের মাসে গেলাম—সেবার ফুলমণি এল। একা ফুলমণি, ঝুমরী ছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম—বিয়া কখন?

সে বললে—জানি না! তারপর বললে—সি তারা কই?

—কারা?

—সেই মিতে বাবুটো আর মিতিন টো? তোর নাতি আর নাতিন?

—তারা পড়ছে। কি করে আসবে?

চুপ ক'রে থাকল ফুলমণি। তারপর বললে—খাটি!

—খাট।

খাটতে লাগল সে। কিন্তু বারবার কাছে এসে দাঁড়াল। বললাম—কি?

বললে—কিছু নয়। শরীরটো ভাল লাগছে না। তাই দাঁড়ালাম।

—তবে খাটতে লাগলি কেন?

—খাব কি বাবু?

—তুই টাকা নিয়ে বাড়ী যা। আজ আর খাটতে হবে না।

—না। তা কেনে লিব? খাটি। খানিক কম খাটব। একদিন বেশী খেটে দিব।

—বেশ!

একটু পরে বললে—হা বাবু। তু তো মিতিনের মিতের মায়ের বাবা।

—হ্যাঁ দাদু!

—আমার লোম?

—তোরও বটি!

—তবে তু আমাকে একখানা না—দুখানা খুব ভাল কাপড় কিনে দিবি? আর জামা? দে কেনে।

বুঝলাম জীবনে যৌবন স্বপ্ন জেগেছে। বললাম—দেব। নিশ্চয় দেব। এবং গ্রামের দোকানে নিজে গিয়ে পছন্দ করে কিনে এনে দিলাম। বললাম—কলকাতা থেকে আরও ভাল এনে দেব এবার।

—দিস। যেন খুব সোন্দর লাগে আমাকে।

পরের মাসে যাওয়া হয়নি—আরও এক মাস পরে গেলাম। খুব ভাল কাপড় ব্লাউস এবং আরও কিছু সামগ্রী সৌখিন কাচের চুড়ি স্নো—এগুলো নিয়ে গেলাম। ডালাটা সাজিয়ে দিলে নাতি আর নাতনী। সন্ধ্যায় গিয়ে পেঁচৌছিলাম। পৌঁছেই ভাইকে বললাম—ফুলমণিকে একটা খবর দিয়ো তো?

——ফুলমণি? সে তো জেলে।

—মানে?

—ও সে অনেক কাণ্ড!

ফুলমণি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল—নিজে গলার একটা নলী কেটেও ফেলেছিল। তারজন্য পুলিশ গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য পাঠিয়েছিল।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম—কেন? আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল কেন? বুকটা ধড়াস ক'রে উঠল আমার, মনে পড়ল শিক্ষিত কৌতুকপরায়ণ দুটি অর্বাচীন তরুণ-তরুণীর কথা।
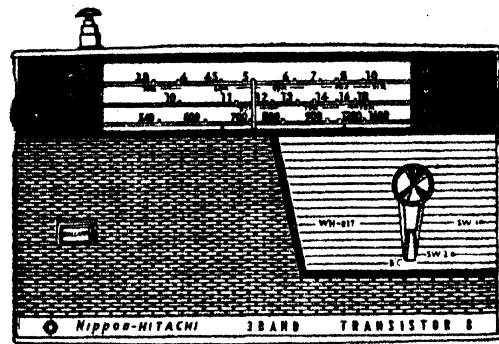
ছোট ভাই বললে—ওই বুধনের জন্যে। ওটা একটা শয়তান, মহা বদমাস—মাতাল আর—।

মাতাল বুধন—বহু কুমারীর সপ্রশংস সতৃষ্ণ দৃষ্টি-বিলাসী বুধন। কয়েক দিন যেন আত্ম-সমর্পণ করেছিল ফুলের কাছে। তাকে জয় ক'রে ফুলের আর গরবের সীমা ছিল না। ঠিকও হয়েছিল চৈত্র-বৈশাখে ওদের বিয়ে হবে। ফুলেদের বাড়ীতেই থাকবে বুধন। বুধন আর ফুল এ নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনত। ফুল বলত—চাষ করতে হবে। গরু কিনে ভাল ক'রে চাষ। জমি লোকে গরজ করে দিবে। বুধন মাঝির মত মুনিষ মিলবে কোথা? আর ফুলকে গাঁয়ের সবাই ভালবাসে—সে গিয়ে ভাল ভাল জমি ভগে নিয়ে আসবে।

খাটতে যেত একসঙ্গে। বিয়ে না-হলে বোঝাড়ে হতে নাই—তাই কুমরীর সঙ্গে ফুল খাটলেও কাছেই একলা খাটত বুধন।

বুধন কোথাও কাঠ কাটার কাজে একলা খাটতে গেলে—জলখাবার সময় ফুল ঠিক গিয়ে হাজির হত সেখানে।

চাঁদনী রাতে দুজনে মাঠে বসে থাকত। বুধনও মদ কমিয়ে এনেছিল। হঠাৎ দুমাস আগে তাদের বাড়ীতে এল ফুলের যে দাদা আমদপুরে কলে খাটে—সে তার বউ আর তার বোন। সে এক মেয়ে। ফুলের মত সুন্দরী সে নয় কিন্তু রঙ্গিনী। কলে খাটে, রঙীন শাড়ী পরে, ব্লাউস পরে—সিঁথি কেটে চুল বাঁধে—হাতে রঙীন চুড়ি, সে এক বিলাসিনী! ওরা এসেছিল ফুলের ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে। ফুলের ভাইয়ের এখন অনেক টাকা—সে ধুম করে অন্নপ্রাশন করবে বাবুদের মত—যা সাঁওতালেরা করে না। দু'দিন তারা ছিল—বুধন তখন খুব হৈ হৈ করেছে। খুব মদ খেয়েছে। মেয়েটার সঙ্গে খুব হেসেছে। ভাল লাগেনি ফুলের। ওরা চলে যাওয়ার পর সে বকেছিল বুধনকে। বুধন নির্লজ্জের মত দাঁত মেলে হেসেছিল। তারপর ফুল, ফুলের মা গিয়েছিল আমদপুরে। বুধন সঙ্গে যায় নি, যেতে দেয়নি ফুল। বলেছিল—তু কেনে যাবি—উ তুর কে বেটে? আগে বিয়া হোক আমাদের তখুন যাবি! আর যাবি কেনে? মদ খেতে? আর উই মেয়েটাকে দেখতে?—তা হলে তুকে মেরে ফেলাব আমি! মদ খেয়ে যখন পড়ে থাকবি—তখুন—হ্যাঁ।

বুধন কিন্তু শোনে নি। সঙ্গে যায়নি বটে—তবে ঠিক একদিন পরেই গিয়ে হাজির হয়েছিল। ফুল রাগ করেছিল—বুধন হেসেছিল সেই নির্লজ্জের হাসি। ঠিক সেই সময়েই সেই মেয়েটা তার নাম হাসি মেঝেন—নামটা দিয়েছে কলের বাবুরা। সেই হাসি মেঝেন এসে বলেছিল—হেই—গো—কুটুম জন গো। এস-গো বস গো।

বুধন বলেছিল—কুথা বসব বল্‌?

হাসি মেঝেন বলেছিল—আমার আঁচল পেতে দিব নাকি?—তারপরই বলেছিল—উঁহু—সি টো ফুল দিবে।

ফুল বলেছিল—না—আমি দিব না।

সে বলেছিল—তবে আমার গামছাখানা পেতে দি। বলে সত্যই গামছা পেতে দিয়েছিল।

তারপর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বুধন এমন ঢলাঢলি করেছিল যে, তা তার এবং তার মায়ের কারুর ভাল লাগে নি। ফুল পরের দিনই রাগ ক'রে চলে এসেছিল। মাকে থাকতে হয়েছিল। বুধন মদ খেয়ে পড়েই ছিল। তার মা চলে আসবার আরও দু'দিন পর সে এসেছিল ফিরে। এই সুরু।

ছোট ভাই বললে—তোমার কাছে ফুল কাপড় চেয়েছিল। কাপড় জামা। মনে আছে?

—আছে। এবারও তার জন্যে দামী কাপড় কিনে এনেছি। নিজে শকুন্তলা পছন্দ করে কিনেছে।

হাসলে ছোট ভাই। বললে—চেয়েছিল—ওই মেয়েটার মতন খুব সাজগোজ করবে ব'লে। বুধন ওর বাহারে ভুলেছে—ও-ও বাহার করবে ঠিক করলে। তখন বুধন সাপের মত খোলস ছাড়ছে। সে পালাতে সুরু করেছে আমদপুরে। আজ পালায়। দু'দিন পাত্তা থাকে না। পরে ফেরে। দিন কয়েক থাকে—আবার পালায়। এমনি। ফুল বাহার করেও ওর মন ফেরাতে পারলে না। তারপর সে ওই মেয়েটার মত মদ খেতে ধরলে। কিন্তু তাতে হবে কি? বুধন তখন ওই মেয়েটাকে নিয়ে কেলেঙ্কারীর একশেষ ক'রে ফেলেছে—

ফুল কাঁদিলে। ওকে অনেক সাধলে। পঞ্চায়েত ডাকলে। কিন্তু বুধন শুনলে তো! সে এখান থেকে পালাল। দু দিন গেল—চার দিন গেল—সাত দিন গেল—একদিন খবর এল—বুধন বিয়ে করেছে ওই মেয়েটাকে। বিয়ে নয় সাঙা। মেয়েটার বিয়ে হয়েছিল, সে ছাড়ান হয়েছে। কলের মিস্ত্রীদের সঙ্গে কলঙ্ক রটেছে। তার অনেক কাণ্ড। তাকেই বুধন সাঙা করেছে কাল!

ফুল কেমন হয়ে গেল। পাড়ার মেয়েরা হাসতে লাগল। বুধনকে নিয়ে তার প্রতি তাদের ঈর্ষার তো শেষ ছিল না। সে ছেলেদেরও। তারাও হাসতে লাগল। তখন ফুল একদিন একখানা খুব ধারালো কাটারী গামছায় বেঁধে নিয়ে রওনা হল আমদপুরে। ভাইয়ের বাড়ীতে উঠল। ভাইয়ের পাশেই থাকে বুধন। সেটা কলেরই কোয়ার্টার। সেটা ওই হাসি মেঝেনের। পাশাপাশি বাড়ী—মাঝখানে উঠোনে পাঁচিল। ফুল এসেছে জানতে পেরে বুধন-হাসি দরজায় খিল দিলে। ফুল কিন্তু দরজাতে ধাক্কাও দিলে না। সন্ধ্যেবেলা হাড়িয়া খেয়ে এল। সে প্রায় টং অবস্থা। পা টলছে। ফিরে এসে দাদার সঙ্গে বউয়ের সঙ্গে খুব খিল-খিল করে হাসলে। গরমের সময় বাইরেই সকলে শোয়। তারাও সকলে শুয়েছিল। রাত্রে ফুল উঠে কোমরে কাপড় কষে কাটারীটা গুঁজে নিয়ে খাটিয়া টেনে এনে তার উপর উঠে দেওয়াল টপকাল। ওদিকে হাসি আর বুধন জড়াজড়ি করে শুয়েছিল—ঘুমুচ্ছিল অগাধ ঘুমে। মদ তারাও খেয়েছিল প্রচুর। ফুলের লাফিয়ে পড়ার শব্দেও ঘুম ভাঙে নি। ফুল কাটারীটা নিয়ে দাঁড়াল—তাদের খাটিয়ার ধারে। এক কোপে দুজনকে নেবে!

ছোট ভাই থামল। তারপর বললে—তারপর কি হল তা একটা হেঁয়ালি। মানে ফুলের কি হল—কে জানে? ফুল বলে সি আমি জানি না। উদিগে মারতে ইচ্ছে হল না। কাটারীটা নিয়ে মুখটো উপর পানে ক'রে নিজের গলাতে মেরে দিল। খুব ধার করেছিলম কাটারীটোতে। বসে গেল!

মোট কথা—গলায় কাটারী বসানো ফুল যখন পড়ে গেল—আর তার রক্তের ফিনকি গিয়ে লাগল ওদের গায়ে, তখন ওদের চেতন হল। এই ওরা বলে।

লোকে, মানে পাশের কোয়ার্টারের লোক দেখতে পায়—বুধন আর হাসি লাসটা নিয়ে বাইরে ফেলে দিতে যাচ্ছে। গোলমাল করে তারা।
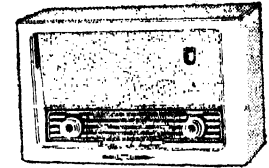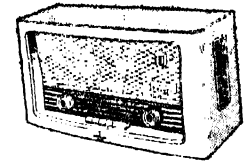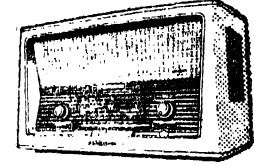
লোক জানাজানি হতেই—পুলিশ। তখম বুধন আর হাসি দুজনে ফুলকে খুন করেছে সাব্যস্ত করে চালান দেয়। ফুলকে পাঠায় হাসপাতালে। জখম বেশীই হয়েছিল, সামনে যে নলীটা, সেটা আধখানা কেটে গিয়েছিল। সেটাকে সেলাই-টেলাই করে—রক্ত দিয়ে কোনরকমে বাঁচালে। ঐ দিকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে প্রথম বিচার আরম্ভ হল। ফুল মরে নি। খুন করবার চেষ্টা করেছে—বুধন আর হাসি। প্রমাণ মেলা। এই সময় ফুল সুস্থ হল। সে বললে—না—। আমি উদিগে কাটব বলে এসেছিলম। ই কাটারীটো আমার। উদিগে কাটতে গেলম, উরা জড়াজড়ি ক'রে ঘুমুইছিল। খুব মদ খেয়েছিলম আমি। কাটতে গিয়ে কে'দে ফেলালম। কাঁদতে কাঁদতে মনে হল—লে—লে—তুর সুখ হোক। তু সুখ কর—খুব সুখ কর। আমি মরব। আমি মরব। বলে মুখটো উপর দিকে তুলে মারলম এক কোপ!

সরকারী উকীল জেরা করে বলেছিলেন—তুই বুধনকে বাঁচাবার জন্যে বলছিস।

—না। বুধনকে তো আমি মারতে পারতম। আমি মারলম না। মরং রোঙা সাক্ষী আছে। তাকে শুধাও গা!

* * *

এর পর বিচার ফুলমণির। আত্মহত্যার চেষ্টা। ছ বছর থেকে যাবজ্জীবন কারাবাস নাকি শাস্তি! কিন্তু বয়স ফুলমণিকে রক্ষা করেছে। ডক্তার বলেছেন—ওর বয়স আঠারো এখনও ঠিক হয়নি।

জজ সমস্ত কথা শুনে রায়ে লিখেছেন—"এই বিচার বিচারকের কাছে এক কঠিন সমস্যা। হিংসায় নরহত্যা নিষ্ঠুরতম অপরাধ। সেই অপরাধ করতে এসে সমস্ত সুযোগ পেয়ে এই শিক্ষাদীক্ষাহীন আদিম সমাজের একটি মেয়ে আত্মসম্বরণ করে করেছে নিজেকে হত্যার চেষ্টা! সজ্ঞানে সে করেনি। অজ্ঞান এবং প্রমত্ত অবস্থায় করেছে। এ বিস্ময়কর ঘটনা! হত্যা না করার জন্য সে মহনীয়া। আত্মহত্যার চেষ্টা অতি সকরুণ। তার উপর এর বয়স আঠারো পূর্ণ হয়নি। আমি সেই হিসাবে একে দু বছরের জন্য সংশোধনাগারে পাঠাচ্ছি। এবং এই আশ্চর্য সুন্দর একটি হৃদয়সম্পন্ন বালিকা যাতে দু বৎসরে কোন উৎকৃষ্ট সম্মানজনক শিক্ষা পায় তারজন্য বিশেষ সুপারিশ করছি।"

এখন সে সংশোধনাগারে। কি বোরস্টাল জেল আছে—সেখানে। আমার আর বিস্ময়ের অবধি রইল না।

* * *

বিস্ময়ের শেষ ওখানে হলে এ গল্প আমি লিখতাম না। আরও বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল আমার জন্যে।

এই সেদিন ১৯৬৪ সালের প্রথমে। আট বছর পর। দেওঘর গিয়েছিলাম। সেখানে একজন মহিলা ডাক্তার আছেন আমার আত্মীয়া। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে তাঁর কোয়ার্টারে। কথাবার্তা বলছি এমন সময় চাকর এসে ডাকলে তাঁকে। কিছুক্ষণ পরই তিনি একটি নার্সকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন দেখেই বুঝলাম আদিবাসিনী। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে। মুহূর্তে আমি তাকে চিনলাম—চিনলাম তার চোখ দেখে।—ফুল? অবাক হলাম। ফুল হলেও এ সে ফুল নয়। জ্ঞানবৃক্ষের ফলের পুষ্টি এবং লাবণ্য তার সর্বাঙ্গে। সে আরণ্য স্বাস্থ্যটি তার আর নেই। একটি প্রদীপে যেন কাচের ফানুষ পরানো হয়েছে। না। এ আমার পুরানো দৃষ্টির—ভুল দৃষ্টি। বয়স হলে চালসে ধ'রে ঝাপসা দেখে মানুষ। এও তাই। চশমার কাচ ঘষে মুছে ভাল ক'রে দেখলাম। এই তো ভাল। ফুল আরও অপরূপা হয়েছে।

সে প্রণাম করলে আমাকে—আর তো সে মজুর খাটা সাঁওতাল মেয়ে নয়। সে লেখাপড়া শেখা নার্সিং শেখা নার্স!

ফুলের বাংলা কথায় আর সে টান নেই। পরিষ্কার বাংলায় বললে—ঠিক চিনেছেন। ভাল আছেন?

—আছি! তুমি?

—ভালই আছি। হাসলে—সে বড় করুণ হাসি।

—রিফরমেটারিতে নার্সিং শিখেছ?

—ওখানে হাসপাতালে কাজ শিখেছিলাম। বেরিয়ে এসে পড়ে পাশ করেছি। এই তো এক বছর।

—বিয়ে করেছ?

নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালো—না।

আমি আত্মীয়াকে একটু যেতে বললাম। তিনি চলে গেলেন। বললাম—আমি সব জানি ফুল। তুমি যা করেছ—তা খুব কম লোকে পারে। কিন্তু এবার তুমি বিয়ে কর।

চুপ করে রইল।

—করবে না?

—না।

আর প্রশ্ন করলাম না ও-নিয়ে। কথাটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলাম।

—দেশে গিয়েছিলে?

—না। খবর নিয়েছি। মা ম'রে গিয়েছে। হাসি মরে গিয়েছে। বুধনের এক পাল ছেলে। পাঁচটা। মদ খেয়ে খেয়ে বুধনের হাঁপানি হয়েছে। হাসলে। ভেবেছিলাম নিয়ে আসব এখানে—চিকিৎসা করাব। কিন্তু না—সে লোকের সংশোধন হয় না। আমিও সইতে পারব না এখন। ওকে কিছু করে টাকা পাঠাই।

—টাকা পাঠাও?

—হ্যাঁ।

আমি ভাবছিলাম। সে বললে—মিতিন কেমন আছে?

—ভাল আছে। প্রফেসারি করছে।

—বিয়ে?

—হয়নি, বর পছন্দ হচ্ছে না।

খিল খিল ক'রে হেসে উঠল ফুল। এ ফুল—সেই ফুল।

মুখ নামিয়ে বললে—মিতে?

—তাকেও মনে আছে তোমার? ফুল শুধু হাসলে একটু।

ওঃ সে তো খুব বড় ডাক্তার হয়েছে। বিলেত ঘুরে এসে নার্সিং হোম করেছে।

মুখ নামিয়ে বললে—বিয়ে?

—হ্যাঁ বিয়ে তার হয়েছে।

—আমার মত কালো না সুন্দর?

বুকটা ধক্ করে উঠল আমার। বললাম—মাঝামাঝি!

হেসে উঠল ফুল। বললে—মিছে কথা বলছেন। আমি জানি খুব সুন্দর। ফরসা রং।

সত্যিই তাই। তারপর দুজনেই চুপ করে রইলাম। কি মনে হল—আমি প্রশ্ন করে বললাম—তুমি তার নার্সিং হোমে কাজ করবে? বলব তাকে?

ঘাড় নাড়তে লাগল সে—না। না-না-না।

(শেষ)

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

আগা হিস্‌সর কাশ্মীরীকে বোধহয় বাঙ্গালীরা এতদিনে ভুলেই গিয়েছে। অবশ্য কোনোদিনই তিনি বাঙ্গালীর সাহিত্যিক সমাজে জনপ্রিয় ছিলেন না: আর আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে বাঙ্গালীরা কোনো অবাঙ্গালী সাহিত্যিককে আমলই দিত না। এখন অবশ্য দিন পাল্টেছে।

আগাসাহেব ছিলেন একজন উর্দু ও হিন্দী নাট্যকার। কিন্তু যারা তাঁকে ঘনিষ্ঠ ভাবে জানত তারা জানে যে, তিনি একজন কবিও ছিলেন। শুধু কবি বললে চলবে না—ভালো কবি ছিলেন। গত প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন মহম্মদ ইকবাল একটা বড় কবিতা লিখেছিলেন যার নাম "শিকোয়া"। এই 'শিকোয়া' কবিতা উর্দু ভাষাভাষী মহলে খুব তরঙ্গ তুলেছিল। ভারতবর্ষে আরো অনেক উর্দু কবি নানা জায়গা থেকে এই "শিকোয়ার" জবাবে কাব্য রচনা করেছিলেন—"জবাব-এ-শিকোয়া"। আগা সাহেবও "জবাব-এ-শিকোয়া" লিখেছিলেন। আমি নিজে উর্দু জানি না, তবে লাহোরে অনেক শিক্ষিত উর্দুভাষীর মুখে শুনেছি যে, 'শিকোয়া'র জবাব যাঁরা দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখা হয়েছিল আগা সাহেবের। অনেকের মুখে এমন কথা অবধি শুনেছি যে, আগা সাহেবের এই "জবাব-এ-শিকোয়া" মহম্মদ ইকবালের মূল "শিকোয়া"র চেয়েও অনেক ভালো হয়েছিল।

আগাসাহেবের দেশ ছিল বারাণসীতে। কাশ্মীরের সঙ্গে তাঁদের কি সম্পর্ক তা জিজ্ঞাসা করেছিলুম—কিন্তু কি তিনি বলে-ছিলেন মনে নেই।

তিনি দেখতে ছিলেন লম্বা-চওড়া; পেশী বহুল শরীর—দাঁড়ি-গোঁফ চাঁছতেন—মাথায় কোনো টুপি কিংবা পাগড়ি ব্যবহার করতেন না। গেঞ্জির ওপরে শাদা পাঞ্জাবি আর একরঙা সিল্কের লুঙ্গি পরতেন। পায়ে ঠনঠনের মোটা চটি—বোধহয় সে চটি অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হতো। পথ চলতেন বীরদর্পে লম্বা লম্বা পা ফেলে। তাঁর চোখ-দুটি ছিল অসম্ভব রকমের টেরা—কোন দিকে কিংবা কার দিকে চেয়ে কথা বলছেন তা বোঝা মুশকিল হতো।'

তিনি ছিলেন চরমপন্থী দলের লোক। প্রভূত মদ্যপান করতেন এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিও সমানভাবে পালন করতেন। প্রতি কথায়—তা সে ভালো কথাই হোক আর মন্দ কথাই হোক—কিছু বলবার আগেই মুখ দিয়ে কতকগুলি অশ্লীল গালাগাল বেরুতো। গালাগাল বেরিয়ে যাবার পর আসল বক্তব্য বলতেন। কথা তিনি এমন জোরে হাত-পা নেড়ে ঘুষো মেরে বলতেন যে মনে হতো ঝগড়া করছেন; কিন্তু নাটক লিখতেন—যার এক-মাত্র বিশেষণ হ'তে পারে তুলনাবিহীন। ম্যাডান কোম্পানি তাকে টাকা দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। প্রধানতঃ ম্যাডান কোম্পানির জন্যই তিনি নাটক রচনা করতেন। তাঁর নাটক সে সময় অসম্ভব রকমের জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর ভাষা ছিল অনবদ্য এবং নিপুণ বাক্য রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর নাটকের অনেক কথা সে সময় প্রবাদে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—লোকের কথায় বার্তায় সেগুলি মুখে মুখে ফিরত।

শুধু তাই নয়—দীর্ঘদিন ধরে তাঁর এক একটা নাটক অভিনীত হতো এবং দর্শক সাধারণের মধ্যে তাঁর অনেক কথা এমনভাবে চলে গিয়েছিল যে অভিনেতার মুখে আর্ধেক কথা উচ্চারিত হ'তে না হ'তে বাকিটুকু শ্রোতৃবৃন্দ বলে উঠতো। তাঁর অনেক গান সম্ভ্রান্ত ঘরের লোক থেকে আরম্ভ করে গাড়োয়ানদের মুখে মুখে ফিরতো। এইরকম জনপ্রিয় লেখকের সমস্ত অবদান কি ক'রে আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল—তা ভাববার বিষয়।

আগা সাহেবের প্রায় সমস্ত নাটকই ছিলো মেলোড্রামা। শুধু নাটক কেন—তাঁর জীবনটাই ছিল একরকম মেলোড্রামা। প্রত্যেক নাটক তিনি নিজে রিহ্যার্সাল দিতেন। তাঁর অভিনয়-শিক্ষা দেবার পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। রিহ্যা-র্শ্যালের সময় অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে সিন-শিফটার পর্যন্ত সকলেই তটস্থ হয়ে থাকতো। আগাসাহেব শিখাচ্ছেন আর সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল খিস্তির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। কোন অভিনেতা কত পা অগ্রসর হ'য়ে ডান দিকে ফিরবে—একেবারে ফিরে দাঁড়াবে—না একটু একটু ক'রে ফিরে দাঁড়াবে—এইসব শেখানো চলতো। ম্যাডান কোম্পানি যখন বাংলা থিয়েটার আরম্ভ করবেন ব'লে স্থির করলেন—তখন আগাসাহেবের ওপরেই তার ভার পড়েছিল। তাঁর রচিত "অপরাধী কে?" নামক নাটকটিও দিনকয়েক অভিনীত হয়ে-ছিল। কিন্তু দর্শকের অভাবে তা বন্ধ করে দিতে হলো।

কিন্তু তখনও তাঁকে অধিনায়ক রূপে রাখা হয়েছিল—তবে শিশিরকুমার আসার পরে তাঁকে সরে আসতে হয়।

"ইহুদি-কি-লড়কি" নামে আগাসাহেবের সুন্দর একখানি নাটক ছিল। এই নাটকটি "খাটাও" থিয়েটারে বহুদিন ধ'রে অভিনীত হয়। ইতালীয় ভাষায় The Jewess নামে একখানি অপেরা আছে। এই অপেরাখানির ইংরেজি তর্জমা আমি পড়েছি। খুব সম্ভব আগাসাহেব এই অপেরাখানি থেকে "ইহুদি-কি-লড়কি" লেখবার প্রেরণা পেয়েছিলেন। নাটকের কাঠামো ছিল এই The Jewess অপেরাখানি, কিন্তু তিনি তার ওপর প্রকাণ্ড ইমারত তৈরি ক'রেছিলেন। "ইহুদি-কি-লড়কি অবলম্বন করেই বাংলা ভাষায় মিশর-কুমারী নাটক রচিত হয়েছিল এবং এক সময়ে এই মিশরকুমারী বাঙ্গালী দর্শক সমাজে খুবই জনপ্রিয় ছিল।

"ইহুদি-কি-লড়কি'র বিষয়বস্তু হচ্ছে—এক সময় রোম সাম্রাজ্যে ইহুদিদের ওপর রোম্যানরা খুবই উৎপীড়ন করতো। এই সময়ে রোমে "আজ্‌রা" নামে এক ধনী ইহুদি রত্ন-ব্যবসায়ী বাস করতেন। সাধু চরিত্রের লোক বলে তিনি বিদিত ছিলেন। একদিন সকালে "আজ্‌রা" বাড়ীতে নেই, তাঁর মাতৃহীন শিশু পুত্র এক চাকরকে নিয়ে ঘরের মধ্যে গুল্‌তি ছুঁড়ছিল। ঠিক সেই সময় পথ দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে রোমের প্রধান ধর্মযাজক এবং প্রধান বিচারক ব্রুটাস তাঞ্জামে চড়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি গুলতি জানলা দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে ব্রুটাসের গায়ে লাগে। তখুনি ব্রুটাসের সৈন্যরা আজ্‌রার বাড়ীর মধ্যে ঢুকে ছেলেটিকে গুলতি হাতে দেখতে পায়। আর দ্বিরুক্তি না ক'রে তারা ছেলেটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে ব্রুটাসের সামনে ফেলে দেয়। তার হাতে তখনও গুলতি রয়েছে। ব্রুটাস হুকুম দিলেন—একে নিয়ে গিয়ে ক্ষুধিত সিংহদের মুখে ফেলে দাও। সৈন্যরা ছেলেটিকে নিয়ে চললো—পেছন পেছন আজ্‌রার চাকর ইলিয়াসও তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলো। চার-দিক থেকে তার ওপরে চাবুক পড়তে

লাগলো। কিন্তু তবুও সে বাধা দিতে ক্ষান্ত হলো না। ততক্ষণে সৈন্যরা ছেলেটিকে টেনে নিয়ে গিয়ে সিংহদের সামনে ফেলে দিলে। ইলিয়াস শপথ করলে এর প্রতিশোধ সে নেবেই।

ইলিয়াস সারাদিন পাগলের মতো এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ালো। তারপর রাত্রির অন্ধকার একটু গাঢ় হ'তেই সে ব্রুটাসের বাড়ীতে ঢুকে তার একমাত্র মাতৃহীন শিশু কন্যাকে চুরি করে নিয়ে পালালো। ইলিয়াস ছুটতে ছুটতে মেয়েটিকে নিয়ে এসে তার মনিবের পায়ের কাছে ফেলে দিলে এবং দেয়াল থেকে একটা কাটারি খুলে নিয়ে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। কিন্তু সাধু আজ্‌রা তাকে বাধা দিয়ে বললে—না, হজরৎ মুসার আদেশ—তোমরা হত্যা করিবে না।

ব্রুটাসের কন্যাকে আজ্‌রা বুকে তুলে নিয়ে নিজের সন্তান নির্বিশেষে পালন করতে লাগলেন। ইহুদি কন্যার মতো তার নাম রাখা হলো "হান্না"। হান্নাও জানলে—সে আজ্‌রারই কন্যা।

হান্না বড় হ'তে লাগলো। রূপে গুণে অনুপমা ও নানা কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হান্নার নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সম্রাটপুত্র মার্কাস নিজেকে ইহুদিরূপে পরিচয় দিয়ে আজ্‌রার সঙ্গে পরিচয় করলে। আজ্‌রা পরে হান্নার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলে। মার্কাস রোজই আজ্‌রার বাড়ীতে যায়। হান্নার সঙ্গে কথা বলে—গল্প করে। পরিশেষে একদিন সে হান্নার কাছে প্রেম নিবেদন করলে। হান্নাও জানালে যে সেও তাকে ভালবাসে। খবরটা শুনে আজ্‌রা খুশিই হলো এবং ভবিষ্যতে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে হান্নার বিয়ে দেবে। ভেবে নিশ্চিন্ত হলো। কিন্তু একদিন অত্যন্ত অভাবিতভাবে হান্নার কাছে মার্কাসের স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়লো। মার্কাস স্বীকার করলে যে, সে ইহুদি নয়—সে রোম্যান। মার্কাস গুটি গুটি পালিয়ে যাচ্ছিলো—কিন্তু আজ্‌রা এতক্ষণ আড়ালে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনেছিলো। সে তাকে অভিসম্পাত দিয়ে মারতে উদ্যত হলে হান্না তাকে রক্ষা করলো।

কিছুদিন পরে সম্রাট পুত্রের বিবাহে দেশের সমস্ত বড়লোক নিমন্ত্রিত হওয়ায় আজ্‌রাও হান্নাকে নিয়ে বিবাহ-উৎসবে যোগ দিতে গেলো। সম্রাট-পুত্র বিবাহ সভায় উপস্থিত হওয়া মাত্র আজ্‌রা ও হান্না উভয়েই তাকে মার্কাস বলে চিনতে পারলো এবং আজ্‌রা চীৎকার ক'রে সম্রাটকে জানালে যে এই ব্যক্তি ইহুদি সেজে তার পরিবারে প্রবেশ করে তার মেয়ের সঙ্গে প্রেম ক'রে পালিয়ে এসেছে। সম্রাট হান্নার মুখে সমস্ত কথা শুনে বিবাহ বন্ধ ক'রে রাজপুত্রকে হাজতে পাঠিয়ে দিলে। দেশময় হৈ-হৈ পড়ে গেল। প্রধান বিচারপতি ব্রুটাসের আদালতে মার্কাসের বিচার আরম্ভ হলো। কিন্তু ইতিমধ্যে মার্কাসের ভাবী পত্নী সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রী হান্নার কাছে উপস্থিত হয়ে বললে সে যদি মার্কাসের বিরুদ্ধে মামলা তুলে না নেয় তাহলে মার্কাসের প্রাণদণ্ড হবে। হান্না কথা দিলে যে সে নিজে দণ্ডভোগ করবে এবং মার্কাসকে বাঁচাবে। কথামত হান্না বিচারালয়ে গিয়ে বললে যে সে কোনো কথাই বলবে না। ব্রুটাস মার্কাসকে সসম্মানে মুক্তি দিলেন এবং ইহুদি হয়ে রোম্যানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার জন্য হান্নাকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন—ফুটন্ত তেলের কড়ায় তাকে নিক্ষেপ করা হোক।

তারপর শেষ দৃশ্য। একদিকে প্রকাণ্ড কড়ায় তেল ফুটছে টগবগ করে। হান্নাকে সেখানে আনা হয়েছে—আজ্‌রা এসেছে, ব্রুটাস এসেছেন, কারণ তিনি হুকুম দিলেই হান্নাকে কড়ায় ফেলে দেওয়া হবে। ব্রুটাস বললে—কেমন আজ্‌রা! মেয়েকে তপ্ত তেলের কড়ায় ফেলে দিলে সাধু ইহুদির মুখখানা কেমন হয় তাই দেখতে এসেছি।

আজ্‌রা বললে—বেশ করেছ। তাই দেখো। কিন্তু জানো কি—ও মেয়ে কে?

বহুদিন বিস্মৃত দুঃস্বপ্নের মতো ব্রুটাসের মনশ্চক্ষে ভেসে উঠলো সেই ভীষণ রাত্রির কথা—যে রাত্রে তার একমাত্র শিশু কন্যা চুরি যায়। আজ্‌রার কথা শুনেই তার গলার স্বর নেমে এলো। সে জিজ্ঞাসা করলে—কে? কে ঐ মেয়ে আজ্‌রা?

আজ্‌রা বললে—বলছি, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কিন্তু তার আগে তোমায় প্রতিজ্ঞা করতে হবে—যে মুহূর্তে আমার মুখ দিয়ে ঐ মেয়েটির পরিচয় প্রকাশ হবে সেই মুহূর্তেই তুমি ওকে তপ্ত তেলের কড়ায় ফেলে দেবে।

ব্রুটাস মিনতি করতে লাগলো—বলো—বলো আজ্‌রা—বলো। তুমি যা চাইবে তাই দেবো।

আজ্‌রা সমস্ত ইতিহাস খুলে বললে। তারপরে সান্ত্রীদের বললে—এবার ফেলে দাও মেয়েকে।

ব্রুটাস তখন নতজানু হয়ে আজ্‌রার কাছে মেয়ের প্রাণভিক্ষা করলে। ব্রুটাস হান্নাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলো কিন্তু হান্না কোথাও গেলো না। সে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন করলে। হান্নার মুখে, হান্নার কণ্ঠে শেষ গান—"আপনে মৌলাকো ম্যয় শেগন্ বন্দু"—ইত্যাদি।

এই গান একদিন আপামর সাধারণ লোকের কণ্ঠে ধ্বনিত হতো। কিন্তু যাগ্‌গে সেদিনের কথা। "ইহুদি-কি-লড়কি"-র চিত্ররূপ দেওয়া ঠিক করে আমি আর নিউ থিয়েটার্সের অন্যতম কর্মচারী হাফিজ্-জি গেলুম আগাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তখন ক্রীক রো-র একটা বাড়ীতে থাকতেন। একতলার একটা ঘরে তিনি শুয়ে আছেন শুনে আমরা দুজনে সেই ঘরে ঢুকলুম।

আগাসাহেব শুয়েছিলেন—আমাদের দেখে পরম উৎসাহভরে উঠে বসলেন; দেখলুম—তিনি একটু রোগা হয়ে গেছেন। বললেন—তিনি অত্যন্ত অসুস্থ—বিধান রায়ের চিকিৎসাধীনে আছেন—হার্টের অসুখ। মদ্যপান বন্ধ, মাংসাহার বন্ধ—রুটি আর নিরামিষ তরকারীর ওপর আছেন। বললুম—যাগ্‌গে আগাসাহেব এ ভালোই হয়েছে। যৌবনে তো খুবই খেয়ে নিয়েছেন—এখন বুড়ো বয়সে নাই বা খেলেন।

আগাসাহেব বললেন—দাদা, জওয়ানি তো খুদ্ হি শরাব হ্যায়—

—অর্থাৎ যৌবনকাল উপস্থিত হ'লে আপনিই মত্ততা আসে। সে সময় অত মদ্যপান করা উচিত হয়নি।

দেখলুম আগাসাহেব একটু রোগা হয়ে গিয়েছেন বটে কিন্তু যে রকম চীৎকার করে হাত-পা নেড়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বললেন তাতে বোঝা গেল যে তাঁর মানসিক উৎসাহের কিছুই কমতি হয়নি। "ইহুদি-কি লড়কি"-র চিত্ররূপ দেওয়ার সংকল্প করেছি শুনে তিনি খুবই উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন—টাকাকড়ির কথা তুলতেই দিলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—আজ্‌রার ভূমিকায় কে অভিনয় করবে?

বললুম—আজ্‌রার ভূমিকায় অভিনয় করবার লোক আমাদের নেই—খোঁজ করতে হবে।

আগাসাহেবের ছোটো ভাই আগা মামুদ ছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা এবং রঙ্গমঞ্চে আজ্‌রার ভূমিকা অভিনয় ক'রে এক সময় খুব নাম করেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—আপনার ভাইকে পাওয়া যায় না?

খাটের ওপর বিরাট এক ঘুষো মেরে আগাসাহেব বললেন—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

দেখলুম কথা বলতে বলতে তিনি মাঝে মাঝে বুকের বাঁ-দিকটা চেপে ধরছেন। আর বেশি উত্তেজিত না ক'রে বললুম—তা হ'লে আপনার ভাইকে খবর দিন।

কিছুক্ষণ পর আমরা সেদিনকার মত বিদায় নিলুম।

দিন দুয়েক বাদে গিয়ে জানলুম—আগা মামুদ এখন রেঙ্গুণে সফররত—এক কোম্পানির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে এখন আসতে পারবেন না। আগাসাহেব আমাদের বললেন—কিছু ভয় নেই—আজরার ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য আমি আপনাদের ভালো লোক দেব।

দিন দুয়েক বাদে তিনি নবাবকে নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন—একে আজরার পার্ট দিন।

নবাব ইতিপূর্বে চিত্রে কখনও অভিনয় করেননি। কিন্তু প্রথম দিনের রিহার্শ্যালেই বুঝতে পারলুম সে পাকা অভিনেতা। আমরা বিনা দ্বিধায় তাকে আজরার ভূমিকা অভিনয় করতে দিলুম। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলি—এই নবাবের প্রথম চিত্রাভিনয়। সে আজরার পার্টে খুবই ভালো অভিনয় তো করেছিলই এবং ভবিষ্যতে একজন ভালো অভিনেতা বলেও চিত্রজগতে নাম কিনেছিল।

নবাব শুধু দেখতেই সুপুরুষ ছিল না—সে ছিল অতি ভদ্র এবং ভবিষ্যতে আমাদের পরম বন্ধুরূপে পরিগণিত হয়েছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে বোম্বাই শহরে দারুণ ক্যানসার রোগে এক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

যাই হোক, ইহুদি-কি-লড়কি শেষ হ'য়ে গেল। ছবি দেখে আগাসাহেবের উৎসাহ গেল বেড়ে। তাঁকে বললুম—নতুন গল্প দিন।

—"কুছ পরোয়া নেই"—বলে পরের দিন এক নতুন গল্প লিখে দিলেন। চমৎকার গল্প। তবে এখানে সেখানে একটু মেরামত করতে হবে ব'লে তিনি গল্পটা নিয়ে গেলেন; কিন্তু পরের দিনই তিনি আর একটা গল্প এনে হাজির। বললেন—ও গল্পটা তেমন সুবিধের নয়। নতুন গল্পটিও ভালো গল্প কিন্তু ঐ মেরামত করতে নিয়ে গিয়ে আবার নতুন গল্প

এলো। এই রকম কিছুকাল চলতে চলতে আগাসাহেব প্রকাশ করলেন—গল্প লেখা এখন থাক—তিনি একটি ছবি পরিচালনা করবেন—তোমরা সরকার সাহেবকে বলে ঠিক করে দাও।

ঠিক হলো আগাসাহেব তাঁর সোরাব-রুস্তম নাটকটির চিত্ররূপ দান করবেন। অভিনেতা-অভিনেত্রী পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। আর বাকি যা থাকে সব আমাদের স্টুডিও থেকে হবে। নির্দিষ্ট দিনে আগাসাহেবের পরিচালনা দেখবার জন্য স্টুডিওর সবাই উপস্থিত। ক্যামেরাম্যান—সাউণ্ডম্যান তৈরী। আগাসাহেব পারিষদবর্গ-সমেত এসে হাজির হলেন।

কথা ছিল সোরাব আরবী ঘোড়ায় চড়ে রুস্তমের সঙ্গে নদীর ওপারে লড়তে যাবে—এই দৃশ্যটি নেওয়া হবে। সোরাব এসে উপস্থিত হলেন। ইয়া লম্বা-চওড়া—প্রায় সাত ফিট উঁচু—তেমনি ঘাড়ে-গর্দানে। পোষাক-টোষাক পরে তিনি সেজে-গুজে তৈরী হলেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আরবী ঘোড়া দেখবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

স্টুডিও-সংলগ্ন যে বাগান ছিলো—সেই বাগানে হবে স্যুটিং। সেখানে একটা পাথরের বেদীও করা হয়েছে অর্থাৎ সোরাব ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে ছুটতে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘোড়া থেকে নেমে, ঘোড়া একটা গাছে বেঁধে, নদীর ধারে সেই পাথরটিতে একটু গা গড়িয়ে নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়বে আর ঘুম থেকে উঠে দেখবে যে ঘোড়া নেই। তারপর ঘোড়ার নাম ধরে খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করবে। ঠিক ছিলো—এই দৃশ্যটির ছবি তোলা হবে।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর আরবী ঘোড়া এসে উপস্থিত হলো সেটি একটি বড় আকৃতির ছাগল বললেই হয়। পেটটা জালার মতো—পেছনকার পা-দুটো গাধার মতো ঠাসা-ঠাসি করা। ঘোড়া নিয়ে যে সহিস এলো সেটি একেবারে সেই ঘোড়ারই মেকদার। ঘোড়া আর সহিস দেখে আগাসাহেব তো একেবারে খেপ-চুরিয়াস্‌ মুখ দিয়ে তুবড়ির মতো খিস্তি বেরুতে লাগলো ঘোড়া আর ঘোড়ার সহিসের উদ্দেশে। অশ্বিনীতনয় বেচারি উর্দু ভ যা জানতো না কাজেই নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু তার রক্ষক ফিরে তাকাতেই বোঝা গেল লোকটা আগাসাহেবের চেয়েও বেশি ট্যারা। দর্শকদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় ব'য়ে গেলো। আগাসাহেব তাকে একরকম প্রহার দিয়ে ঘোড়াকে মারলেন এক লাথি। তারপর হুকুম হলো—ফিরিয়ে নিয়ে যা।

সহিস তখন ঘোড়া ও নিজের প্রাণ নিয়ে পলায়ন করলে।

ঘোড়া চ'লে গেলো। ঠিক হলো—আরবী ঘোড়া এলে পরে ঘোড়ার দৃশ্য নেওয়া হবে। এখন নেওয়া হবে—সোরাব ঘুম থেকে উঠে চারিদিকে ঘোড়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। লোকটা রিহার্শ্যাল দিতে আরম্ভ করলে।

ঘুম থেকে উঠে সে দেখলো ঘোড়া নেই। তখন বিস্মিত হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে চীৎকার করতে লাগল—রকস্‌

বার দুয়েক চীৎকার করতেই আগাসাহেব উঠলেন ক্ষেপে। বেশ ক'রে লোকটাকে খিস্তি-টিস্তি ক'রে নিজেই দেখাতে আরম্ভ করলেন। আগাসাহেব ঘুম থেকে উঠেই চারিদিকে তাকিয়েই জলদগম্ভীর স্বরে চীৎকার করলেন—অর্‌ র্‌র্‌র্‌র্‌রে রক্‌স্‌! হাড়্‌ড়্‌ড়্‌ড়্‌রে রকস্‌—

তারপর ঐরকম ক'রে চেঁচাতে চেঁচাতে প্রায় কাঠা দুয়েক জায়গা লাফাতে লাফাতে দৌড়লেন। সেখান থেকে—হে-রে-রে-রে—র্‌র্‌র্‌ররকস—করতে করতে সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে চীৎকার করতে লাগলেন—হাবাকা ঝোকে সে পুছা—পানিকা লহরোঁ সে পুছা, লেকিন কোই নেহি জবাব দিয়া। হা-রে-রে-রে র্‌র্‌র্‌রে কস—

দেখিয়ে দিয়ে ফিরে এসে চেয়ারে ব'সে আগাসাহেব হাঁপাতে লাগলেন। কিন্তু নকল সোরাব যে—সে ও-রকম দৌড়তেও পারে না—লাফাতেও পারে না। সে একবার দু'বার চেঁচাতেই আগা সাহেবের মুখ দিয়ে খিস্তির তুবড়ি বেরুতে লাগলো—আরের্‌-রেই সোরাবকে বাচ্চে—ইধর্‌ দেখ্‌!

লোকটা মুখ ফেরালো। কিন্তু আগেই বলেছি—উত্তেজিত হ'লে আগাসাহেবের দুই চোখের মণি ভেতরে ঢুকে যেতো—খালি দেখা যেতো চোখের শাদা অংশ। তাকালে; কিন্তু কোনদিকে তাকালে ঠিক আগাসাহেবের দিকে তাকানো হবে বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে গেল।

এদিকে আগাসাহেব চেঁচাতে লাগলেন—ইধর্‌ দেখ্‌ আগা হিস্‌সর কাশ্মীরীকি তরফ দেখ্‌—তেরে বাপ্‌কা তরফ দেখ্‌

তবু সে কিছু বুঝতে না পারায় আগাসাহেব আবার দৌড়ঝাঁপ করে তাকে এবার পরিষ্কাররূপে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর ঘুরতে ঘুরতে এসে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন।

কয়েক মুহূর্ত পরে বললেন—এক গেলাশ জল দাওতো খাই—

স্টুডিওতে লিমনেড-বরফ ছিলো। তখুনি এসে পড়লো। আগাসাহেব তার অর্ধেকটা দিয়ে চোখ-মুখ-কানে লাগালেন আর বাকিটুকু মাথায় ঢাললেন। গেলাশটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—আর এক গেলাশ—

সেই গেলাশেরও ঐরকম সৎকার হওয়ায় এক বালতি জল নিয়ে এসে একটু একটু ক'রে তাঁর মাথা ও মুখ ধুইয়ে দেওয়া হলো এবং তখুনিই স্টুডিওর গাড়ীতে তাঁকে সপার্ষদ বাড়ীতে চালান করা হলো। সোরাব বেচারি পোষাক-পরিচ্ছদ পরেই আরবী ঘোড়ার পদাংক অনুসরণ করলে।

দিন পাঁচ-ছয় পরে আগাসাহেবকে দেখতে গেলুম। দেখলুম তিনি সামলে উঠেছেন—বিছানায় বসে অতি বিষন্ন দৃষ্টিতে টেলিফোনের দিকে চেয়ে আছেন।

জিজ্ঞাসা করলুম—কি হোলো!

তিনি অতি দুঃখিতকণ্ঠে প্রকাশ করলেন—দাদা, একটা মেয়েমানুষের প্রেমে পড়েছি—এইমাত্র টেলিফোনে খবর পেলুম—কাল রাত্তিরে সে আমাকে না জানিয়েই লাহোরে চলে গিয়েছে।

বললুম—আর এ-বয়সে কেন আগাসাহেব? ও কাব্যের ঐ ধর্ম।

আগাসাহেব বললেন—যা বলেছেন দাদা।

কথাটা বলে আগাসাহেব নিজেরই কবিতার দুটি চরণ উদ্ধৃত করলেন—

কোই লজ্জত্‌ নেহি ফির্‌ভি দুনিয়া জান দেতি হ্যায়।

খোদাবান্দা মোহাব্বত্‌মে মজা হোতা তো ক্যা হোতা? অর্থাৎ এই প্রেমঘটিত ব্যাপারে কোনো আনন্দই নেই। হায় ভগবান—প্রেমে যদি আনন্দ থাকতো, তাহ'লে না জানি কি হতো!

যাহোক্‌, সেদিনে কথাবার্তা বলে চলে এলুম। দিন দুয়েক বাদে একদিন সকালবেলা আপিসে বসে কাজ করছি কোথা থেকে আগাসাহেব এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—দাদা, আজ রাত্রেই আমি লাহোর যাচ্ছি। সেখান থেকে বোধহয় আর ফেরা হবে না। আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

আগাসাহেব চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে শুনলুম, তিনি একটি ছবি পরিচালনা করছেন। তার কয়েকদিন পরে শুনলুম—তিনি সেখানে দেহরক্ষা করেছেন।

আর একটি প্রতিভা অপব্যয়ের অন্ধকারে তলিয়ে গেল। কিন্তু কেন?

ট্যাক্সি

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দুজনকে এক খাঁচায় পোরেনি। আলাদা খাঁচায় রেখেছে। বিজলী আর সন্তোষ।

দারুন ভিড়, কিন্তু গম্ভীর ও সংযত।

আকর্ষণ শুধু বিজলী নয়, আকর্ষণ সন্তোষও। যে একবার আসছে ফিরে যেতে চাইছে না, জমে যাচ্ছে। পাপের কাহিনীটা কি, একটু শুনে যাই না।

বিরাট ঘর গমগম করছে। একটা ছুঁচ পড়লে শোনা যায়।

বিজলীকে একটা টুল দিয়েছে বসতে। দিব্যি মাথা তুলেই বসে আছে। মুখে তার যে বিমর্ষতা সে শোকের, অনুতাপের নয়। অনুতাপের হলে মাথা হেঁট করে বসত, অমন তরল চোখে তাকাত না চারদিকে।

মেয়েটা সুশ্রী, দেখলেই প্রথমে কেমন সহানুভূতি হয়। কিন্তু দাঁড়াও, কেসটা কী আগে শুনি। শুধু ভঙ্গি দেখেই বিচার হবে না। কিন্তু সঙ্গে ঐ পুরুষটা কে?

তার আলাদা খাঁচায় দাঁড়িয়ে আছে সন্তোষ। তাকে বসতে কোনো জায়গা দেওয়া হয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দাড়ি খুঁটছে।

সেসন জজ জুরি লিস্টীকৃত করেছেন। ফোরম্যান ঠিক হয়েছে। শপথমন্ত্র পাঠ করিয়েছে পেস্কার।

এবার সরকারী ফৌজদারী উকিল উঠলেন। মনে হল বিশাল ঘরের প্রত্যেকটা ইঁট, পুঁথি-পত্র, আসবাব সহসা সজাগ হয়ে কান খাড়া করে রইল।

'মৃতের নাম নরেশনাথ দাস, পলসন-গ্রিয়ার-সন কোম্পানির উপরতলার কেরানি।

প্রথম আসামী বিজলীবালা নরেশের স্ত্রী আর দ্বিতীয় আসামী সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় নরেশের বন্ধু। ট্যাক্সির মালিক।'

সকলে দম ছাড়ল। এক পলকে বুঝে নিল ব্যাপারটা কী এবং কেন?

'প্রসিকিউশানের কেস হচ্ছে সন্তোষ আর বিজলী ষড়যন্ত্র করে নরেশকে খুন করেছে। ভাতের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খুন করেছে। বিষ কিনে এনেছে সন্তোষ আর মিশিয়েছে বিজলী। উদ্দেশ্য, তাদের মিলনের অন্তরায় যে স্বামী তাকে সরিয়ে দেওয়া।'

সেই মান্ধাতার আমলের বস্তাপচা পুরোনো কাহিনী। এমন কিছু শোনবার মত নয়।

কিন্তু বিষটা কী?

'বিষটা মোক্ষম? পোটাশিয়াম সায়ানাইড।

পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখুন।'

'কিন্তু বিষটা ওরা পেল কী করে?'

'দুজনে ট্যাক্সি করে গিয়ে বিশেষ একটা দোকান থেকে কিনে এনেছে।'

ট্যাক্সি করে! হ্যাঁ, এই মামলায় ট্যাক্সিটাই প্রধান আসামী। কিন্তু তাকে তো আর ফাঁসি দেওয়া যাবে না।

একটু যেন নতুন রকম শোনাচ্ছে। অন্যত্র আর কাজ কী, খানিকক্ষণ দেখে যাই না নাটকটা। দেখি না দু-এক দৃশ্যেই জমে ওঠে কিনা, না কি শেষ পর্যন্ত ঝুলে পড়ে!

'শহরের প্রান্তে রেললাইন পেরিয়ে ছোট্ট একখানা একতলা বাড়ি করেছে নরেশ, পাশে ফালি এক টুকরো জমি তাতে ফুলের বাগান করেছে বিজলী। শুধু বাড়ি নয়, ফুলের বাগান, তার আনন্দ দেখে কে!

আগে শহরের ঘিঞ্জির মধ্যে ছিল, ছিল ঢুকড়ে-সুঁকড়ে। এখানে এসে বিজলীর আরেক মূর্তি। খাঁচার পাখি যেন ছাড়া পেয়ে আকাশে উড়ছে, আর বসলেও গাছে বসছে, আবার উড়ছে। ওর মধ্যে যে এত হাসি ছিল তা কে জানত। আর পিঠে যে ওর এত চুল এও যেন নরেশের নতুন আবিষ্কার।

আগে শুধু বই পড়বার উপন্যাস পড়বার নেশা ছিল। এটা কী ছাই বই এনেছ—পাতলা, একটুখানি—সুরু করতে না করতেই শেষ হয়ে যায়। বেশ একটা মোটাসোটা দেখে আনতে পারো না, বেশ দু রাত্তির কাটে! এটা আবার কী আনলে! এটা কেমন শক্ত, খুলে মেলে সব বলে না। ভাবখানা—তুমি বুঝে নাও! অত ভাববার বাববার আমার সময় কই? শিক্ষা কই? বেশ হৈহল করে সব বলবে, আগাগোড়া বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত হতে পারি, তেমন বই নিয়ে আসবে।

নতুন বাড়িতে, নিজের বাড়িতে এসে, বই মুখে নিয়ে বন্ধঘরে পড়ে থাকতে সে রাজী নয়। এখন নিজেই সে খুলতে-মেলতে চায়। রেডিয়ো শোনে, সিনেমায় যায়, বাগান করে। এমন কি এও বলে, চলো রেললাইন ধরে বেড়াই দুজনে। আরো কোথাও বাইরে যাই।

ছেলেপিলে যখন হল না তখন তার ফাঁক ভরে তোলবার জন্যে জিনিষ দিতে হবে না কি। শুধু অসুখে ভোরে উঠতে পারব না। আরো অনেক রকম সুখ আছে, সে সবে ভরে তোলো। মাত্র সন্তান না হলেই কোনো মেয়ে নিঃসত্ত্ব হয় না। তার মনুষ্যত্ব তো আছে!

বিয়ের পর এতগুলো বছর গেল, লেখাপড়া শেখবার ব্যবস্থা করে দিলে না। নইলে দেখতে বি-এ, এম-এ পাশ করে কেমন ঝিলিক দিতাম। তোমারই কেমন নতুন-নতুন লাগত।

'এখন এমনিতেই খুব নতুন লাগছে।' নরেশ হাসিভরা মুখে বলল।

সত্যি আগে যেন ঘরের বাসন-কোসনের মতই কিছু একটা ছিল, বড়জোর তোশক বালিশের মত, কিন্তু এখন একটা জীবন্ত বাজনার মত বেজে উঠেছে টুং টাং।

শুধু ছোট একটা বাড়ি দিয়েছে, ফালি একটা বাগান দিয়েছে, দিয়েছে কিছু এটা ওটা, তাইতেই এত! আরো কত না-জানি সম্ভাবনা ছিল লুকিয়ে! কত না-জানি প্রতিশ্রুতি!

একদিন এসে নরেশ বললে, 'তোমার ঐ বাগানের জমিটাকে কাজে লাগাই।'

'কেন কী করবে?'

'ওখানে একটা গ্যারাজ তুলি।'

'বলো কী গো', বিজলী উথলে উঠল: 'তুমি গাড়ি কিনবে?'

'গাড়ি কিনব, তবে এখুনি নয়। একটা টিনের বা টালির শেড তুলতে বেশি খরচ হবে না, কিন্তু ওটাকে গ্যারাজ বলে ভাড়া দিতে পারলে বেশ মোটা আয় হবে, আর তা থেকেই ভবিষ্যতে একদিন একটা গাড়ি—'

গাড়ি না হোক, গ্যারাজটা তবু মন্দ কী। গ্যারাজ শুনলেই কেমন গাড়ি গাড়ি লাগে। একদিন হবে-হবে মনে হয়।

'অনেকে জানো বাড়ি না করে গ্যারাজ করে। তাতে ব্যয় কম, আয় ভালো—' বাগানটা ছাড়তে হবে বলে সান্ত্বনার মতন করে বললে আবার নরেশ: 'এক মুঠ জমিও ফেলে রাখবার মত নয়।'

'কিন্তু তোমার গ্যারাজের ভাড়াটে পাবে?'

'ভাড়াটে তৈরি।'

'কে?'

'আমার বন্ধু সন্তোষ।' এই অঞ্চলেই থাকে।

'তার কী গাড়ি?'

'গাড়ি নয়, ট্যাক্সি।'

'ট্যাক্সি?' আহ্লাদে ফেটে পড়ল বিজলী: 'তাহলে মাঝেমাঝে আমরাও চড়তে পাব!'

'তা কেন্ না আমাদের একটু অবলাইজ করবে।'

'বাড়ির গাড়ি হলে আশা ছিল না, ট্যাক্সি যখন, তখন সুবিধেমত ফাঁকা করে নেওয়া যাবে। কী বল? না হয় পেট্রোলের দাম দেব। লম্বা বেরিয়ে পড়ব একদিন।'

এ আবার আরেক মূর্তি বিজলীর। নরেশ ভাবতেও পারত না বিজলী ঘরের কোণ ছেড়ে দূরের রাস্তায় পাড়ি দিতে পারে।

'এই খাল কেটে কুমির ডেকে আনল নরেশ।' পাবলিক প্রসিকিউটার বলতে লাগলেন: 'তুলসী কেটে বেগুন লাগাল।'

'মানে বাগানের জমিতে গ্যারাজ তুলল?' জজ জিজ্ঞেস করলেন।

হ্যাঁ, তাই। আসামী সন্তোষকে ভাড়া দিলে।'

'মাস-মাস ভাড়া দিয়েছে?'

'তাতে কোনো ত্রুটি করেনি।' প্রসিকিউটার মুখ-চোখ কুটিল করে তুললেন: 'সন্তোষের তখন গ্যারাজ দরকার গাড়ির জন্যে তত নয় যত ঐ পরস্ত্রীর জন্যে। আমরা সাক্ষী দেব কত-কত সে প্রথম আসামীকে ট্যাক্সিতে চড়িয়েছে, নিয়ে গিয়েছে এখানে-ওখানে—'

'কেন প্রথম আসামীর স্বামী সঙ্গে থাকেনি?'

'প্রথম-প্রথম থেকেছে, শেষে এমন সব টাইম বেছে নিয়েছে যখন নরেশ অফিসে, মানে, দুপুরবেলা। দুপুরে গাড়ি গ্যারাজে রেখে খেতে যাবার আগে বোঁ করে একটু ঘুরিয়ে আনা। আমাদের সব সাক্ষী আছে। কোনো কোনো দিন বা এখানেই মানে প্রথম আসামীর হাতেই খেয়ে যাওয়া। পাড়াপড়শী সব সাক্ষ্য দেবে। সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস। কী পাপ! কী নৃশংসতা!'

'এই, একটু যাবে নাকি বেড়াতে?' সন্তোষ তাকাল বটে নরেশের দিকে কিন্তু লক্ষ্য করল বিজলীকে।

'নিয়ে যাবেন?' আনন্দে আগুন হয়ে উঠল বিজলী।

'চলুন না, ঘণ্টাখানেক ছুটিই নিলাম না হয়!'

'ছুটি! ঘণ্টাখানেক।' বিজলী খুশিতে ঠিকরে পড়ল: 'গাড়ি চালাবেন তবু আপনার ছুটি। কী মজা!'

নরেশ একেবারেই কিছু বোঝে না এমন তো নয়, তাই উপর-উপর সে হাসল। সন্তোষ নিজেই সাফাই দিল। বললে, 'রোজ আজেবাজে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ঘুরি, আজ একেবারে অন্য-রকম হলে ছুটি-ছুটি মনে হবে বৈকি।'

'বিশেষ যখন এক পয়সাও পাবেন না।' হাসির লহর তুলে ভিতরে চলে গেল বিজলী।

তারপর এক গা সেজে বেরিয়ে এল। যেন কোন বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে এমনি সাজ।

আরো অন্য রকম, নতুন রকম দেখল নরেশ। দেখল বিজলী কেমন পরিহাস করতে পারে, কথার পিঠে ছুঁড়তে পারে কথা। কেমন শুধু একজনকে দেখাবার জন্যে বহুজনকে দেখাবার মত সাজতে পারে।

পিছনের সিটে স্বামী-স্ত্রীতে বসল নিশ্চিন্ত হয়ে।

ছেলেমানুষের মত আব্দার করে বিজলী বললে, 'খুব স্পিড দিন।'

বাইরে একটু ফাঁকায় এসে চল্লিশ ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে, দু কলি গান গেয়ে উঠল বিজলী।

বিজলীর মধ্যে এত চাপল্য ছিল, গতি আর স্ফূর্তির মধ্যে ফেললে সেও গান হয়ে যেতে পারে এ নরেশ ঘুণাক্ষরেও জানত না। মৃদুস্বরে বিজলীকে বললে, 'পিছন থেকে গান গেয়ে উঠলে ড্রাইভার হকচকিয়ে উঠে য়্যাক্সিডেন্ট করে ফেলতে পারে!'

'ওরে বাবা, দরকার নেই।' হাসতে লাগল বিজলী: 'শেষকালে খবরের কাগজে বেরোক, গানের গুঁতোয় য়্যাক্সিডেন্ট!'

নরেশ গম্ভীর হয়ে বললে, 'এবার ফেরা যাক।'

বিজলী বলল, 'যে চালাচ্ছে সে বুঝবে। এখানে যে ড্রাইভার সে মালিক, তা নিয়ে তোমার ভাবনা কেন?'

'তাই বলে তো যমের দক্ষিণ দুয়ার পর্যন্ত যেতে পারি না।'

'কী সব ছাইপাঁশ কথা!'

সচকিত হয়ে সন্তোষ বললে, 'না, না, এইবার ফিরব।' বলে হাসল: 'যমের দক্ষিণ দুয়ার সব সময়ে রাস্তায় নয় বাড়িতেও খোলে যায়।'

ফেরবার পথে বিজলী একেবারে চুপ করে গেল। উষ্ণ জলের ফোয়ারা হঠাৎ এ রকম ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে তাও বা কে দেখেছে!

বাড়ি ফিরে এলে নরেশ ক'টা টাকা সন্তোষের দিকে এগিয়ে ধরল।

'তার মানে?' নরেশের হাতটা সন্তোষ ঠেলে দিল।

'তোমার তেল তো খরচ হয়েছে।'

'হলে হয়েছে। আমি আমার আপনার লোকদের নিয়ে এমনি রাস্তায় বেড়াতে পারি

না?' বলে বিজলীর হাসিমুখটা দেখে আবার ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতিরিক্ত দুচার আনার রোজগারের জন্যে কত শর্টকার্ট ছেড়ে ঘুরপথে অতর্কিত গাড়ি চালিয়ে নিয়েছে, তাই বলে একদিন সন্তোষ বেহিসেবী হতে পারবে না, অপচয়কে ভাবতে পারবে না পরম প্রয়োজন, তার কী মানে আছে?

'তোমার কী রকম ছোট মন!' বিজলী বিরক্ত-মনে বললে, 'টাকা দিতে গেলে?'

'আমি তো অন্যায় কিছু করিনি। ট্যাক্সি চালিয়ে ওর রোজগার, ওকে শুধু শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করি কেন?'

'ক্ষতিগ্রস্ত করবে না তো পুরো দিলেই পারতে।'

'পুরো দেব কেন? আমি কি ট্যাক্সিটাকে এনগেজ করেছি? যদি দরকারই পড়ত ঐ লজঝরটাকে কে ডাকত? শহরে আর ট্যাক্সি নেই? ওই তো মন করে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাইল! বললে ওর ছুটি। সে-ই ড্রাইভার সে-ই গাড়িই চালাচ্ছে, অথচ তার গাড়ি-চালানোটা ছুটি, এ কী রকম যুক্তি বুঝতে পারি না।'

'যার যেমন মন সে তেমনি বুঝবে। কিন্তু আমি বলছি আপনা-আপনার ক্ষেত্রে টাকা আনতে গেলে কেন?'

'আহা কী আপনা-আপনি! শেষে একদিন গ্যারাজের ভাড়াটা মাপ চাক। বলুক, বড্ড টানাটানি এমাসটায়, পারি তো পরের মাসে দেব। আর তুমি বলবে, আহা, আপনা-আপনির ক্ষেত্র।'

কী সাংঘাতিক! কী কথা থেকে কী!

তার মানেই, দুয়ারে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকলেও বিজলী তাতে চড়তে পাবে না। যার ট্যাক্সি সে বিনি পয়সায় ঘুরিয়ে আনতে চাইলেও।

কিন্তু খুচরো-খুচরা অনেক সময় ট্যাক্সি গ্যারেজে চলে আসে যখন নরেশ বাড়ি নেই, অফিসে। তখন বিজলীকে ঠেকাবে কী করে? ও তো আর কোনো টানা লম্বা বেড়ানো নয়, এখানে-ওখানে ঠোকর মেরে আসা।

সামান্য দুটো মনিহারী জিনিষ কিনতেও যদি মাগনা ট্যাক্সি পাওয়া যায় তো ছাড়ে কে!

'কী, যাবেন নাকি দোকানে?'

'কী কেনা যায় ভেবে পাচ্ছি না।'

'অন্তত দুখানা কাপড় কাচা সাবান?'

'সে তো কালই কিনলাম।'

'তবে এক কাজ করুন। অমনি চলুন।'

'তাই ভালো। অমনিই ভালো। কিন্তু ধরা পড়লে কী বলব?'

'সে আর আমাকে শেখাতে হবে না। সে আপনি ঠিক চটপট বার করে নিতে পারবেন।'

'তা পারব। শেষরক্ষা করতে কালীঘাট তো আছেই।'

আজকাল আর রেখামাত্রও সাজে না বিজলী। যেমন থাকে তেমনি বেরিয়ে পড়ে, শুধু স্যান্ডেলটা পায়ে টেনে নেয়।

এ আরেক নতুন রূপ দেখে সন্তোষ। এ নরেশের জন্যে নয়। বেশ কেমন একটা উদ্ধত, উত্তেজিত রূপ। শাসন-না-মানা অবাধ্য ভঙ্গি। কখনো-কখনো এলো আঁচল আর খোলা চুলে সেই ভঙ্গিরই ইশারা ফোটে।

কিন্তু বসে তো দূরে, পিছনের সিটে। তাই তো বসবে। ফ্ল্যাগ ডাউন থাকে, লোকে ভাবে ভাড়া করে যাচ্ছে বুঝি। একা-একা ড্রাইভারের পাশে কে বসে?

এক-আধবার বসলে ক্ষতি কী! পাশে বসলেই তো তার এই বন্ধুতার মর্যাদা দেওয়া হয়। পেছনে গিয়ে বসলেই মনে হয় আমার করুণায় ও আছে, ওর করুণায় আমি নেই। আর ও অপাংক্তেয় বলেই ওকে পরিহার করেছি। আপনা-আপনি ক্ষেত্রে এ ভালো দেখায় না।

সেদিন ফেরবার সময় বিজলী ট্যাক্সিতে সন্তোষের পাশে বসল।

আর সেদিনই নরেশ প্রথম দেখল।

পাশে বসলেই বেশ গল্প করা যায়। বিজলী বললে, ট্যাক্সি ড্রাইভারের জীবন আমার খুব ভালো লাগে।'

'ভালো?'

'হ্যাঁ, রাস্তা পাও তো চলো, কেবল চলো। চলতে ছুটতে এগিয়ে যেতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। কত লোককে কত জায়গায় পোঁছে দিচ্ছেন, কত কাহিনী কত ঘটনার নীরব সাক্ষী হচ্ছেন, কে না উঠছে আপনার ট্যাক্সিতে, যে মেরেছে সে উঠে পালাচ্ছে, আবার যাকে মেরেছে তাকে তুলে হাসপাতালে পোঁছে দিচ্ছেন—কী, তাই নয়?'

'কিন্তু খাওয়া নেই ঘুম নেই বিশ্রাম নেই—'

'আছে, সবই আছে, তবে সময়মত নেই। এই যে একটা অসময়ের জীবন কিছু ধরা-বাঁধা নেই, লাইনটানা নেই, সেইটেই ভারি সুন্দর। আমারও ভারি ইচ্ছে করে এমনি ড্রাইভ করি।'

'আপনি ড্রাইভিং শিখবেন?'

'আপনি শেখাবেন?'

'কেন শেখাব না? কত মেয়েই তো আজকাল গাড়ি চালাচ্ছে। মাসখানেকও লাগবে না, আপনি শিখে ফেলবেন।'

'এই একটু একটু করে দুপুরের দিকে হলে হবে?'

'তাইতেই হবে।'

'আপনার গাড়ির যদি কোনো ক্ষতি হয়!'

'ক্ষতি হবে কেন? আমি তো আপনার পাশেই থাকব।'

তারপরে আরো কিছু কথা হল।

বিজলী গাঢ় স্বরে বললে, 'আপনার বন্ধু তো আপনার তুমি, সেই সূত্রে আমি আপনি থাকি কী করে?'

'আমার বন্ধু তো তোমারও তুমি, সেইসূত্রে আমিও বা বাদ পড়ি কেন?'

বিজলীর এই লজ্জামাখানো নতুন মুখটা সন্তোষ ছাড়া আর কে দেখেছে!

পাড়ার কানাঘুষোটাই বাতাসে ভাসতে-ভাসতে নরেশের কানে এসে লেগেছিল। নরেশ যখন অফিসে তখন গ্যারাজের নাম করে সন্তোষ ট্যাক্সি নিয়ে আসে আর বিজলীকে নিয়ে ঘুরতে বেরোয়। কোথায় যায় কে জানে। আধ ঘণ্টাটাক পরে ফেরে। কখনো তার বেশিও হয়। পরের মুখের কথা শুনে লাভ কী, নিজে একদিন এসে স্বচক্ষে দেখে যাও না!

তাই সময় বুঝে নরেশ চলে এল বাড়ি।

সেদিন বুঝি ফিরতে দেরি হল কিংবা কে জানে নরেশ অপেক্ষা করে আছে বলেই দেরিটা বেশি লাগছে। দেখল বিজলী ট্যাক্সি থেকেই শুধু নামল না, ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নামল।

'কোথায় গেছলে?'

'এই একটু ঘুরে এলাম।'

'জিজ্ঞেস করি কোথায়?'

'বললাম তো রাস্তায়।'

দরজায় দাঁড়িয়ে পথ আটকালো নরেশ বিষ ঢেলে জিজ্ঞেস করলে, 'ড্রাইভারের পাশ থেকে নামলে যে?'

'বা, ড্রাইভারের পাশে বসেছিলাম বলে।'

'ন্যাকামো কোরো না।'

'ড্রাইভারের পাশে বসতে গিয়েছিলে কেন?'

'কেন, বসলে কী দোষ হয়? তোমার বন্ধু ভদ্রলোক, তুমিই বলেছ ভালো চাকরি করা আগে, উপরওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ট্যাক্সি নিয়েছে। তার পাশে বসা যায় না?' ট্যাক্সি চালায় বলে সে এত ঘৃণ্য?'

'তাই বলে অমন গা ঘেঁষে বসবে, তার হাতের উপর হাত রেখে?' নরেশ আগুন হয়ে উঠল।

'তোমার কী পাপচোখ! আমি যে ওর কাছে ড্রাইভিং শিখছি। ড্রাইভিং শিখতে হলে প্রথমটা ড্রাইভারের পাশ ঘেঁষেই তো বসতে হয়।'

'কী শিখছ? ট্যাক্সি ড্রাইভিং।' আরো গলা চড়ল নরেশ: 'কেন তুমি ট্যাক্সি চালিয়ে খাবে?'

'কী বুদ্ধি!' এখানেও লঘু থাকতে চাইল বিজলী: 'ড্রাইভিং শিখছি। ট্যাক্সিতে চড়ে শিখলেও ড্রাইভিংই শেখা হয়, ট্যাক্সি-ড্রাইভিং শেখা হয় না। একটা কারিগরী বিদ্যা আয়ত্তে থাকে তো মন্দ কী! কখন কার কী দিন পড়ে কেউ বলতে পারে না।'

'না। যেখানে গাড়ি নেই সেখানে ড্রাইভিং শেখার মানে হয় না।'

'বা, গাড়ি তো হবে।'

'না, হবে না।'

'না হলেও আমি শিখব। যখন চান্স পেয়েছি তখন ছাড়ব না।'

'না, শিখবে না।'

বলে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে এই ভঙ্গিতে সামান্য এগুতেই বিজলীর পায়ে নরেশ লাথি মারল। ভাবখানা, এমনি দেখাল যেন অত কাছে সরে এসেছিল বলেই তাড়াতাড়িতে ধাক্কা লেগে গিয়েছে।

হাত দিয়ে পা চেপে ধরে বিজলী বসে পড়ল মাটিতে।

সন্তোষের মুখোমুখি হয়ে নরেশ জিজ্ঞেস করল: 'মিটারে কত উঠেছে?'

'তুমিই দেখ না কত।'

'যা উঠেছে দিচ্ছি। কিন্তু তোমাকে বলে রাখি তুমি দুপুরে বিজলীকে নিয়ে বেরুতে পারবে না।'

'ট্যাক্সি ডেকে কেউ উঠে পড়লে আমার ক্ষমতা নেই তাকে নিয়ে না বেরুই। প্যাসেঞ্জার যা নির্দেশ দেবে তাই মানতে আমি বাধ্য।'

'না, বাধ্য নও।'

'আইন দেখ।'

'আইন তুমি দেখ। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার স্ত্রীকে নিতে পারবে না ট্যাক্সিতে।' বলে ভাড়াবাবদ দুটো টাকা ড্রাইভারের সিটের উপর ছুঁড়ে মারল।

নোট দুটো কুড়িয়ে নিয়ে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল সন্তোষ।

'সেই থেকে বিজলীর উপর মার সুরু হল।' বললে আসামীদের উকিল, 'অমানুষিক নির্যাতন। আমরা দেব সে সব এভিডেন্স।'

'তাতে কী?' পাবলিক প্রসিকিউটার বললে, 'এখানে রাইট অফ প্রাইভেট ডিফেন্সের তো কোনো প্রশ্ন নেই।'

'কী আছে না আছে পরে দেখা যাবে।'

জজ প্রশ্ন করলেন : 'আপনাদের ডিফেন্স কী?'

'আমরা তো নট-গিল্টিই প্লিড করেছি। তাছাড়া আমরা সাজেস্ট করব, খাবারে বিষ ছিল না, ও বিষ জোগাড় করা আসামীদের পক্ষে অসাধ্য, আর যদি থেকেও থাকে, তাহলে সেটা সেলফ-য়্যাডমিনিস্টার্ড। মানে, নরেশ আত্মহত্যা করেছে।'

প্রসিকিউটর হাসল।

জজ প্রশ্ন করলেন : 'আত্মহত্যার কারণ?'

'তা জুরি মহোদয়রা বুঝে নেবেন।'

প্রসিকিউটর বললে, 'যে অবাধ্য স্ত্রীকে প্রহার করে শাসন করছে তার পক্ষে আত্মহত্যার মনোবৃত্তি অসম্ভব। সে তো স্ত্রীকে বাড়ি থেকেই বার করে দিতে পারে কিংবা মেরে ফেলতে পারে। শুধু বিজলীকে নয় সন্তোষকেও। উল্টে নিজে মরতে যাবে কেন?'

'সবই মুহূর্তের আয়োজন।' ডিফেন্স দর্শন আওড়াল।

'আপনারা নোট করুন।' ফোরম্যানের দিকে তাকাল প্রসিকিউটর : 'আত্মহত্যা। আর আত্ম-হত্যার সম্ভাব্য কারণ স্ত্রীর ব্যাভিচার। আমাদের ঐ ব্যাভিচারটা পেলেই হল। আমরা দেখাব ব্যাভিচারটাই স্বামী-হত্যার সাফিসিয়েন্ট মোটিভ।'

এবার ডিফেন্স হাসল। ভাব দেখাল যে শেষ হাসি হাসে সেই বুদ্ধিমান।

ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াতেই বিজলী ছুটে এসে উঠে পড়ল।

'এ কী, এ তোমার কী চেহারা!'

'এত দিন হাতে-পায়ে মারছিল কাল একটা লাঠি দিয়ে মেরেছে।'

'তুমি কী করলে?'

'আমি শুধু বাধা দেবার চেষ্টা করলাম, পালালাম, চেঁচালাম।'

'কেন, উলটে তুমি মারতে পারলে না।'

'আমি মারব?'

'নিশ্চয়ই মারবে। আইনে তোমার সে অধিকার আছে। আত্মরক্ষার জন্যে আততায়ীকে তুমি খুন পর্যন্ত করতে পারো। সে স্বামী হলেও পারো।'

'খুন?'

'হ্যাঁ, যদি মনে করো তার উদাত্ত আঘাত তোমার মৃত্যু ঘটাতে পারে। উত্তেজনার মুহূর্তে নিখুঁত নিক্তিতে অত সূক্ষ্ম বিচার করার সুযোগ নেই, তাই ও লাঠি নিয়ে মারতে উঠলে তুমি অনায়াসে দা-এর কোপ মারতে পারো। হ্যাঁ, অনায়াসে। এবার থেকে হাতের কাছে একটা ধারালো দা রাখবে।'

'দা রাখব! কোপ মারতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে। এই যে আজও আবার ট্যাক্সিতে এসে উঠলে, এ কত বড় একটা বিদ্রোহী মূর্তি। তার মানেই তো আজও আবার মার খাবে এবং সেটা কালকের চেয়েও বীভৎস হবে। মার খাবে জেনেও যদি এত বড় একটা বিদ্রোহ করতে পারো, তবে চিরকালের জন্যে মার যাতে বন্ধ হয়ে যায় তার জন্যে বিদ্রোহ করতে পারো না? আইনে তোমার এ বিদ্রোহের সমর্থন আছে। আত্মরক্ষা করবার জন্যে শত্রুকে নিপাত করলে আইনে কোনো দোষ হয় না। পালাবে আর মার খাবে, মার খাবে আর পালাবে—তোমার এ মূর্তির চেয়ে রক্তমাখা দা হাতে প্রচণ্ড মূর্তিটা অনেক বেশি সুন্দর!'

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল বিজলী। পরে নির্জীব কণ্ঠে বললে, 'আমাকে বিষ এনে দিতে পারো?'

'কেন, বিষ দিয়ে কী হবে?'

'আত্মহত্যা করব।'

'কেন, তুমি কী করেছ যে আত্মহত্যা করবে? সত্যি কী সে করেছে? শুধু স্বামীর অবাধ্যতা করেছে। সেও বাধাটা শুধু অযৌক্তিক বলে। তার দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদেই এ অবাধ্যতা।

'ও আমার ফুলের বাগানের উপর গ্যারাজ করেছে। আমার সামান্য এই সুখ, এই শুধু একটু বেড়াবার সুখ—তার উপর একটা পাপের ইমারত গড়ে তুলেছে। আকুল চোখে বিজলী কেঁদে উঠল।

পাপ! সন্তোষ চমকে উঠল।

কে জানে হয়তো একেই পাপ বলে। এই চলে আসা, এই বেড়াতে বেরুনো। আবার ফিরে গিয়ে মার খাওয়া। পাপ বলেই তো সমস্ত আকর্ষণীয়। ঐ কাটা ছেঁড়া ফোলা মুখটা তো পাপের জন্যই নরেশের কাছে কদর্য, আবার সেই পাপের জন্যেই সন্তোষের কাছে মধুর। স্বকীয়ে সুখ থাকলেও চমৎকারিতা নেই আর পরকীয়ে প্রতি মুহূর্তেই চমৎকার। পাপ অন্যায় হোক দন্ডার্হ হোক কিন্তু কে না বলবে, পাপ সুন্দর!

গাড়িতে স্পিড দিল সন্তোষ। বললে, 'ইমারত যদি সত্যি হয় তবে তা আর পাপ হবে কেন? তা প্রেম হবে।'

রাস্তাটা চেনা-চেনা লাগছিল, গাড়িটা থামতেই বিজলী বলে উঠল : 'আবার সেই স্টুডিয়ো? কত আর ছবি তুলবে?'

'সে তো তোমার ভালো মুখের ছবি তুলেছি, এ পাপ-মুখটারও ছবি তুলে রাখা দরকার। পরে হয়তো কাজ দেবে।'

এক-এক ধাপ করে ইমারত উঠছে। বিজলী বাধা দিল না। স্টুডিওতে ঢুকল। বেরিয়ে আসবার সময় বললে, 'আমাকে একটা ক্যামেরা কিনে দিও। কত দেখো তোমাকে ছবি তুলে দেব।'

'হ্যাঁ, তোমাকে মারতে ও লাঠি তুলেছে তেমনি ছবি।' এত বিপদেও লঘু হতে পারছে সন্তোষ।

কতক্ষণ পরে বিজলী জিজ্ঞেস করল : 'আচ্ছা তুমি কাউকে কোনোদিন চাপা দিয়েছ?'

দুহাত তুলে কোন অদৃশ্য দেবতাকে নমস্কার করল সন্তোষ। বললে, 'রক্ষে করো।'

'তুমি ঠাকুরদেবতা মানো?'

'না।'

'তবে ঐ কাকে নমস্কার করলে?'

'শুধু ঐ একটা ঠাকুর মানি। র‍্যাকসি-ডেন্টের ঠাকুর। ওর একটা মন্দির আছে, তার পাশ দিয়ে যাবার সময় ওকে ভারী হাতে পয়সা দিই। ও খুশি থাকলেই আর কোনো ভয় নেই।'

'তবে এক কাজ করো। আমি নেমে যাই। তারপর রাস্তার একটা গোলমেলে জায়গায় গিয়ে আমি দাঁড়াই, তারপর তুমি আমাকে চাপা দিয়ে চলে যাও।'

'তাতে আমার লাভ কী। তাতে আমার একূলও যাবে ওকুলও যাবে। পাপও যাবে প্রেমও যাবে। তাছাড়া যত গোলমেলে জায়গায়ই দাঁড়াও না কেন, গাড়ির সামনে ঠিক লাফ দিয়েও পড় না কেন, শেষমুহূর্তে নির্ঘাৎ তোমাকে বাঁচিয়ে দেব। নইলে এতদিন কী ড্রাইভারী করলাম! তবে তোমার সেই লোকটাকে যদি পাই তবে বোধ হয় বাঁচাই না।' একটা গরম নিশ্বাস ছাড়ল সন্তোষ : 'রাস্তায় তার সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দাও না।'

'সে তুমি একা-একা খুঁজে নিও। আমি যখন তোমার পাশে আছি তখন নয়।'

'তখন নয় কেন?'

'তখন হলে পুলিশে বলবে দুজনে ষড়যন্ত্র করে মেরেছে।'

'হ্যাঁ, ষড়যন্ত্রই তো ঠিক, দুজনের ষড়যন্ত্র। পাপের সঙ্গে প্রেমের। সেই ষড়যন্ত্র পাকা হলে কোনো সমাজের, কোনো আইনের সাধ্য নেই কিছু করতে পারে। কই তুমি তোমার শত্রুকে মারবে, তা নয় তুমি নিজেই মরতে চাইছ।

চাইছি কিন্তু পারছি কই? আত্মহত্যা করাও তো সেই নিজেকেই মারা।'

ট্যাক্সিতে শেষ বাঁক নিয়ে বললে, 'নিজের চেয়েও হীনতর যেখানে আছে সেখানে হীন-তরটাকে আগে না মেরে নিজে মরি কেন?'

'সেটাকে মারতে পারলে কে আর নিজে মরে! যাই হোক, পারি আর না পারি তুমি আমার পাশে থেকো।'

'আমি আছি আর আমার ট্যাক্সি আছে।'

পরদিন দুপুরে যথারীতি ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়ালেও বিজলী এল না। সন্তোষ হর্ণ দিল, তবুও না।

হয়তো কালকের মারপিটটা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিজলীকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে কিনা ঠিক কী। দরকার নেই গায়ে-পড়া কৌতূহলে। যখন প্যাসেঞ্জার নেই তখন ট্যাক্সি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই সমীচীন।

বাড়িতে ডাকে চিঠি পেল সন্তোষ।

'তুমি আর এখন এস না। কদিন ট্যাক্সি চড়া বন্ধ থাক। গ্যারাজ থেকে তোমাকে তুলে দেবার জন্যে যে মামলা করা হয়েছে তা তুমি লড়তে চাও তো লড়ো কিন্তু কিছুকাল তোমার ট্যাক্সি এ গ্যারাজে এনে রেখো না। অন্যত্র বন্দোবস্ত কোরো। আমি চাই না, তুমি ধারে-কাছে কোথাও আছ, এটা স্পষ্ট হয়। আমি আবার লিখব সময়মত। ধৈর্য ধরো। ইতি বিজলী।

এ আবার কোন্ মূর্তি! যেন কী রকম ঠান্ডা, হিসেবী, ঘোমটাঢাকা। যেন সন্তোষকে দূরে রাখা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা। এভাবে ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে কে বাঁচতে চায়! সামনাসামনি যুদ্ধ করে মারা ও মরা অনেক ভালো। অনেক উজ্জ্বল।

তারপরে কিছুদিন পরেই হত্যাকান্ড।

কদিন আগে নতুন বামুন রেখেছে, সেই রেঁধেছে ও ভাত-ডাল পরিবেশন করেছে, তবু তাকে সন্দেহ না করে পুলিশ বিজলীকে ধরল আর যখন বেরুল বিজলী সন্তোষের ট্যাক্সির সহযাত্রী ও ফটোগ্রাফির বিস্তীর্ণ বিবর তখন

সন্তোষকে ছাড়ে কে! মামলায় মধ্যে একটু রং-চং আনতে না পারলে কৃতিত্ব কই?

বিষ এত তীব্র যে খেতে-খেতে খাবার টেবিলেই ঢলে পড়েছে নরেশ। হাসপাতালেরও সাহায্য নিতে দেয়নি। আর ময়নাতদন্তে যখন বেরুল বিষটা সায়ানাইড তখন সন্তোষের হাত তো আরো প্রকট। পুলিশের সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজে পেতে দেরি হল না। সেই ফটোগ্রাফ স্টুডিয়োর লোক সাক্ষ্য দিল সন্তোষের অনুরোধে ও প্রয়োজনে সে প্রসিদ্ধ কেমিস্টের দোকান থেকে ঐ বিষ কিনেছে—এই দেখ তার ক্যাশমেমো।

সন্তোষের হেপাজতে বিজলীর ফটোগ্রাফ—লিপ্ততার প্রমাণ আর কী চাই? তা ছাড়া দিনের পর দিন ট্যাক্সি চড়া, প্রতিবেশীদের ঈর্ষাদগ্ধ চক্ষুই তার সাক্ষী। দুই আসামীরই এক উদ্দেশ্য, পথের কণ্টককে উৎখাত করা। খুনের প্রত্যক্ষদর্শী আর কজন থাকে? এ ক্ষেত্রে অবস্থাঘটিত প্রমাণ একই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হচ্ছে। সন্তোষই ফটোগ্রাফারের মারফৎ বিষ কিনেছে, চালান করে দিয়েছে বিজলীকে আর বিজলী তাই স্বামীর রাতের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

একেবারে রোদখটখটে শুকনো প্রমাণ। পর্যাপ্ত, পরিচ্ছন্ন।

ডিফেন্স তবু বললে, 'আমরা এখনো বলব আত্মহত্যা। নইলে ভাবতে পারেন, নরেশ, একজন যুবক, এরই মধ্যে উইল করেছে। দেখুন সেই উইল, মৃত্যুর সাতদিন মাত্র আগে করা। তাতে তার এই বাড়ি আর গ্যারাজ সে স্ত্রীকে দেয়নি, দিয়েছে তার ভাইপোকে। তার মানে কী? তার মানেই সে আত্মহত্যার কথা ভাবছিল, জীবনে ও সংসারে বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল তার। নইলে ঐ বয়সে কেউ অমনি বিনা উইল করে?'

'হ্যাঁ, দেখুন উইল।' প্রসিকিউসন পাল্টা বললে, 'স্ত্রী ব্যভিচারিণী বলেই ঐ উইল। গৃহিণীই যখন ঐ, তখন আর গৃহ কোথায়? বিতৃষ্ণা হওয়াই স্বাভাবিক। শুধু বিতৃষ্ণা? মৃত্যুভয়। দুষ্টা স্ত্রী নিয়ে বাস করা তো সাপ নিয়ে বাস করার সামিল।'

ব্যভিচার? কিন্তু কোথায় সেই আনন্দের আলো? কোথায় সেই মহাতরঙ্গ? এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায় মাঝে মাঝে তাকিয়েছে সন্তোষ। কই চোখের উপর চোখ ফেলে না কেন বিজলী? এ তার কী বিশীর্ণতা! ব্যভিচার তো সেই উত্তাল সাহস কই, কই সেই উদ্দীপন? এমন জানলে সন্তোষ তাকে রিভলভার জোগাড় করে দিত, শিখিয়ে দিত কেমন করে গুলী ছোঁড়ে? মরতে চলেছে, তবু জ্যোতিষ্মতী তেজস্বিনীর মত ভঙ্গি করে দাঁড়াতে পারছে না কেন?

যা সবাই আশা করেছিল, জুরি সর্বসম্মতিক্রমে দোষী ঘোষণা করল।

সবচেয়ে উল্লাস উৎসাহী পুলিশের। কত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাল ফেলে এ বিশাল মৎস্যকে ধরা হয়েছে, জুরির এ ভার্ডিক্ট কত বড় কৃতিত্বের পুরস্কার। স্বখাতসলিলে মানুষকে ডুবতে দেখার বোধহয় এক দার্শনিক তৃপ্তি আছে—তেমনি ট্যাক্সিওয়ালাকে নিজের ট্যাক্সির তলায় চাপা পড়তে দেখা।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই হল। আসামীদের একজন স্ত্রীলোক, ফাঁসি হয় কী করে? দুজনেরই যাবজ্জীবন কারাবাস।

কোর্ট ভাঙা ভিড়ের থেকে কেউ কেউ বললে, 'জেলে এদেরকে একসঙ্গে থাকতে দেবে তো?'

কেউ-কেউ আবার দুঃখ করে বললে, 'আহা, ট্যাক্সিখানার কী হবে?'

আপিল হল উঁচুতে। হ্যাঁ, সংযুক্ত আপিল।

আপিলে শুধু একটামাত্র পয়েন্ট। বিষ কেনার ক্যাশমেমোটা শুধু দেখুন। ক্যাশমেমোটা জাল।

জাল?

হ্যাঁ, স্পষ্ট জাল। দোকানের আগে-পরে অন্য সব ক্যাশমেমোর সঙ্গে মেলান, আর সকলের মধ্যে নির্দিষ্ট জায়গায় একটা ওয়াটার-মার্ক আছে, মামলার ক্যাশমেমোটাতে ওয়াটার-মার্ক নেই। এটা পুলিশ জাল করেছে। এটা না হলে যে সন্তোষকে টানা যায় না। সন্তোষকে টানা না গেলে নাটক কোথায়?

তারপর পোস্টমর্টেম রিপোর্টটাতে কি একটু চোখ বুলোবেন? বিষটা কি সত্যি সায়ানাইড, না, অন্য কিছু?

অতদূর পর্যন্ত, ডাক্তার পর্যন্ত যাবার দরকার নেই। ওটা থাক না। ক্যাশমেমোটা যদি চলে যায় তা হলেই তো হয়ে গেল।

ভিত্তিপ্রস্তরটাই যদি চলে যায় ইমারত কার উপর দাঁড়ায়?

আপিলে খালাস হয়ে গেল দুজনে।

ট্যাক্সিটা ধরে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ, ফিরিয়ে দিয়ে গেল। সন্তোষের বাসার সামনে রাস্তায়ই দাঁড়িয়ে আছে।

বাসা চিনে হেঁটে-হেঁটেই চলে এসেছে বিজলী।

'ও মা, ট্যাক্সিটা পেয়ে গেছ?' একটু বুঝি উচ্ছ্বসিত হতে চাইল।

কিন্তু সন্তোষের কোনো উত্তাপ নেই। সে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন বিজলীকে চেনে না, কোনোদিন দেখেনি।

সত্যিই বুঝি দেখেনি। ব্যভিচারের চরিত্র থেকেও বুঝি সে ভ্রষ্ট হয়েছে।

ম্লান মুখে বিজলী বললে, 'এখন তুমি যদি না আশ্রয় দাও আমার যাবার জায়গা নেই।'

'বাড়িতে একটাও গ্যারেজ নেই যে তোমাকে আশ্রয় দিই।' সন্তোষ উদাসীনের মত বললে।

কতক্ষণ নিঃস্বের মত একাকী দাঁড়িয়ে রইল বিজলী। পরে ক্লিষ্ট মুখে বললে, 'ট্যাক্সিটা করে একটু এগিয়ে দেবে?'

'দেখ না ট্যাক্সিটার কোনো চরিত্র নেই। চলার ধর্মটাই হারিয়েছে।' বিজলী আর কিছু বলল না। হেঁটে-হেঁটেই ফিরে চলল।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

কবির কাব্যরচনা নানা বিষয়বস্তু অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে দেবতার আরাধনা, প্রেম ও স্বভাবের শোভা অবলম্বন করে।

প্রত্যেক ঋতুতে স্বাভাবিক দৃশ্যাবলী, পরিবেশ ও নানা বিশিষ্ট বস্তু মানুষের মনকে নাড়া দেয়। প্রত্যেক ঋতুর স্পর্শে ও আন্দোলনে মানুষের মন বিচিত্র রসে ও ভাবে ভরপুর হয়ে ওঠে। এই আন্দোলন ও প্রতিক্রিয়ার ফলে কবি মানুষ কাব্য রচনা করে গেছেন, যুগে যুগে, দেশে দেশে ঋতু বর্ণনা করে।

মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত "ঋতু সংহার" কাব্য যাতে ছয় ঋতুর ছয়টি রসপূর্ণ বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর অলংকৃত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কালিদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ভারতের নানা দেশে প্রদেশে নানা ভাষায় ঋতু বর্ণনা করে নানা সরস কবিতা রচনা করে গেছেন কবিরা যা পাঠ করে আজও রসিকের চিত্ত আন্দোলিত হয়ে উঠে। বাংলা ভাষায় মধ্য যুগের কোন কোন কবি ঋতু বর্ণনা করেছেন, সকলেই যে কালিদাসের আদর্শ ও ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন, এমন কথা বলা যায় না।

কবিশেখর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের রচনায় ঋতু বর্ণনা অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু এ বর্ণনা ছয় ঋতুর বর্ণনা নয় 'বারমাসের' বৈশিষ্ট্য বর্ণনাঃ—

"কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে, প্রাণনাথ।
এইখানে বারমাস রহ হে ।।
বারমাসে ঋতু ছয়, লোকে তিন কাল কয়
কাল হয় একালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি ভ্রমরের গনগনি
প্রলয় মলয় গন্ধ বহ হে ।।
বিজুলি জলের ছাট্ মত্ত ময়ূরের নাট্
মণ্ডুকের কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমলকুল সাজাবে মল্লার ফুল
ভারতের এ বড় নিগ্রহে ।।

* * *

"অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ।।
নূতন সরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড় ।।
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এদেশে ।। ৯ ।।

উত্তর ভারতে ও রাজস্থানে ঋতু বর্ণনার কবিতার রীতি ও আস্বাদন একটু স্বতন্ত্র। হিন্দী কবিরা প্রায় ছয় ঋতু বর্ণনা করেন না, তাঁরা প্রত্যেক মাসের উপর স্বতন্ত্র কবিতা রচনার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সুতরাং তাঁদের কবিতায় ছয় ঋতুর বর্ণনা নাই— তাঁদের কবিতা "বারমাসিয়া" অর্থাৎ বার মাসের এক একটি মাস বর্ণনা করে বারটি কবিতা রচনা করেছেন।

হিন্দী কবিদের প্রভাবে, রাজস্থানের এক শ্রেণীর চিত্রকর এইসব "বারমাসিয়া" কবিতা অবলম্বন করে চিত্র রচনা করেছেন। এই শ্রেণীর চিত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল পৌষ মাসে "শীত-বিহার"—মৎ প্রণীত "মাষ্টার পিস্ অফ্ রাজপুৎ পেণ্টিং" গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই চিত্রখানির উপর একটি চমৎকার সরস

রাধা-কৃষ্ণের শীত-বিহার

হিন্দী কবিতা আছে তা উদ্ধৃতির যোগ্য :-

"পূষ নিশামে সুরারুণী লৈ বনি
বৈঠে দুহূ মদকে মাতবালে।
তেঁয়ো পদ্মাকর ঝুমে ঝুকে ঘন
ঘূমিরচৈ রস রংগ রসালে।।
শীতকো জীতি অভীত ভৈ
সুগনৈন সখি কণ্ঠ শাল দুশালে।
ছাক ছকা ছবিহীকো পিয়ে
সদ্ নয়নন্ কে কিয়ে প্রেমকে পিয়ালে।।"

(পদ্মাকর, "জগদ—বিনোদ।")

অবশ্য এই শ্রেণীর রচনায় পৌষনিশায় সাধারণ নরনারীর উপভোগের আনন্দ বর্ণিত হয়েছে। এতে বিশেষ কোনও উচ্চ চিন্তা নেই। বাংলা দেশেও পৌষ মাসের উপভোগ্য বস্তুর নির্দেশ আছে এক প্রাচীন লৌকিক প্রবচনে :—

"পাপোষ পিজড়ী আর শাশুড়ীর ঝি।
কম্বল, বালাপোষ, আর তপ্ত ভাতে ঘী।।"

কিন্তু ঋতু বর্ণনায়, কোন কোন হিন্দী কবি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন করে যথেষ্ট ভক্তিরসের পরিচয় দিয়েছেন, "বারমাসিয়ার" রসাল চিত্রমালায়। বিখ্যাত কবি কেশব দাস তাঁর "কবি-প্রিয়া" গ্রন্থে 'মার্গশীর্ষ' বা অগ্রহায়ণের সরস বর্ণনা দিয়েছেন, তাঁর মতে অগ্রহায়ণ মাস ('মার-সির') শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় :—

"মাসন মেঁ হরি অংস কহত যাসোঁ সব কোউ।
স্বারথ পরমারথ হু দোত ভীরথ মহু দোউ।।
কেসব সরিতা সরনি ফুল ফুল সুগন্ধ গুরে।
কুজত কল কলহংস, কলিত

কল-হংসনি কোসুরে

দিন পরম মরম সীত

ন গরম করম রহ পায় রিতু

কারি প্রাণনাথ পরদেস কঁহ মারসির

মারগ ন চিতু।।

অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ কবি লাল বলবীর তাঁর "শিশির বিলাস" কবিতায় নন্দলালা শ্রীকৃষ্ণের শীত বিলাসের বর্ণনা দিয়েছেন :—

শিশির-বিলাস

"বৈঠে চিত্র সালামে রূপ-লালা লালা
এক বয়িস্ বালা হূ মে

অংগ উজিয়ালা হৈ।

দীনহে গল্ বাহী তন-মন সোঁ লগাই মানো
সুন্দর অমোল কণ্ঠ মেলী বন মালা হৈ।।
লাল্ বলবীর ব্যাপৈ হিমাকি নানা পীর্ বীর্
প্রেম-রণ বীর পিয়ে রূপরস পিয়ালা হৈ।
দেখি ছবি আলা হোতা হৈ নিহালা, অংগ—
রাজৈ প্রতি পালা রাখে ছৈল্ নন্দলালা হৈ।।

ঋতু-সৌন্দর্য।।

উপরে বর্ণিত শিশির বিলাস কবিতা অবলম্বন করে একজন পাহাড়ী চিত্রশিল্পী 'মার্গশীর্ষ' মাসের চিত্র রচনা করেছেন, ঐ চিত্রটি বোম্বাই সরকারী চিত্রশালা থেকে এখানে প্রকাশিত হল।

কিন্তু পৌষ মাসের বর্ণনায় সাধক কবি তুলসীদাস বৈরাগ্যে চিত্র রচনা করেছেন—তা 'বারমাসিয়া' কবিতায় অপূর্ব ও অনন্য। তিনি তাঁর এই কবিতাগুচ্ছকে নাম দিয়েছেন "জ্ঞান-বৈরাগ্য ঔর্ প্রেমকা দর্পণ"।

পূষ

"পূষ কীট পতংগ হোতে,

কিংধো তরবার্ পাচ্ছরে

কিংধো জলকে জীব হোতে,

কিংধো সাগর মাচ্ছরে।

ভ্রমত ছট রিতু দিবস নিসিতন

সহত হৈ বহু দুঃখ রে

হরি বিমুখ সঠ জীব কতহু,

নাহি পাবত সুখ রে।

জগত সোভত ফিরত ইত উত,

অবধি ছিন ছিন ঘটতু রে

সুবস রসনা পাই কে

হরিনাম কাহে নানা রটত রে

ফিরত ভটাকত জ্ঞাত মৈঁ,

হরি হৃদয় জীবন মূরি রে

নাম কো জানেও নহী,

সব জানিবে মেঁ ধূরি রে।।

তুলসীদাস।

ভারতের কবিদের ঋতু বর্ণনা কেবলমাত্র উপভোগের চিত্র নহে, পরন্তু "জ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রেম দর্পণ"।

দুর্নীতির দর্পণে

অমিতাভ চৌধুরী
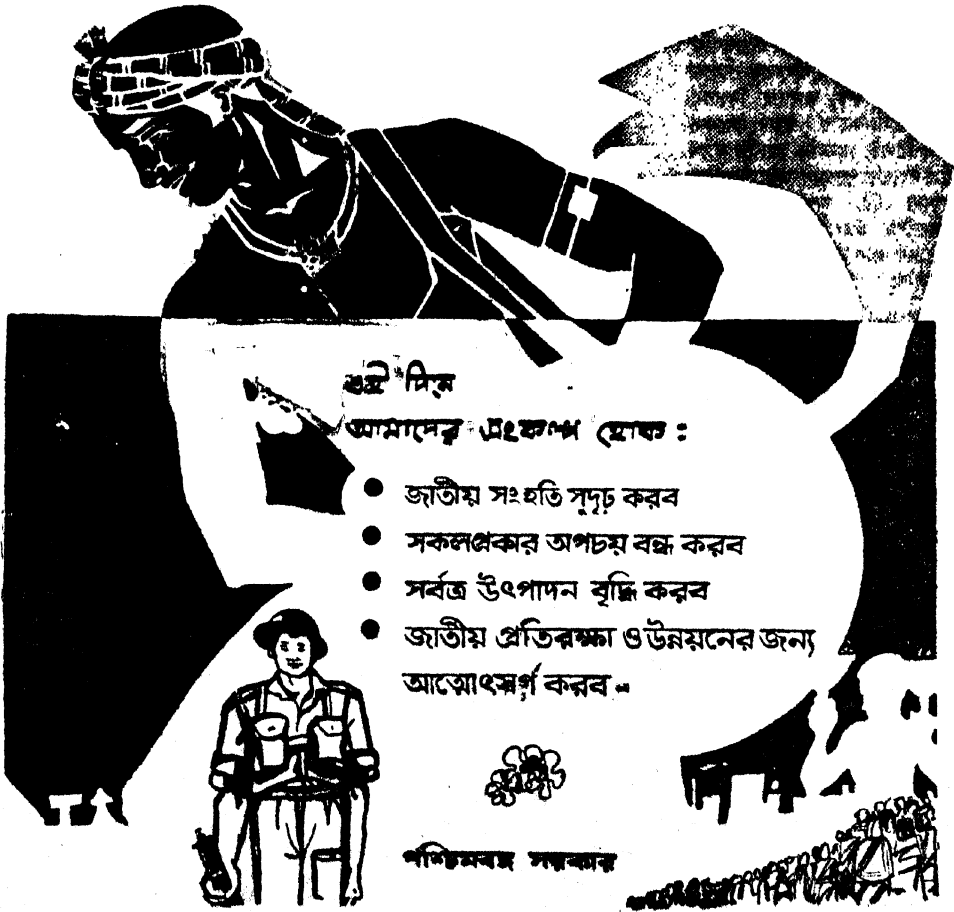
ভারতবর্ষে সমাজ এবং রাজশক্তি কি কখনো দুর্নীতিমুক্ত ছিল? পাঠকেরা পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধে তিনজন স্বনামখ্যাত ইতিহাসবিদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন যুগে, কিংবা মুসলমান যুগে, অথবা বৃটিশ যুগের আরম্ভে ভারতবর্ষে উৎকোচগ্রহণের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের কোনো অভাব নেই। প্রভাব বিস্তার, অনুগ্রহ বিতরণ, বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যস্বরূপ বৃহৎ উৎকোচ নেওয়া—এসব তো ছিলই, এমনকি প্রাচীন যুগে যে সময় শস্যের ও স্বর্ণের ভাণ্ডার অফুরন্ত ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, তখনও এই দেশে কোনো কোনো সম্রাটকে মূল্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, অতি মুনাফা শাসনের জন্য কঠোর শাস্তির এবং রেশনিং পর্যন্ত বলবৎ করতে হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণীদের অল্প বেতনেও বাদশাহী চাল বজায় রেখে চলা, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সঞ্চয়, লুণ্ঠন ও অপব্যয়ের ইতিহাস তত বেশী পুরানো নয়। পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরবর্তী প্রমোদ উদ্যানগুলিতে, কলকাতার উত্তরে ও দক্ষিণে অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে নৈশ-বিলাসের জন্য যে অর্থ অপচয় হত, সে অর্থ কালো কি সাদা তা নিয়ে এতদিন কেউ মাথা ঘামায়নি। কেননা টাকার বর্ণভেদ তখনও হয়নি। কিন্তু এ টাকা যে সরল উপার্জনের পথ দিয়ে আসেনি, সে কথা বুঝবার জন্য ইতিহাস গবেষণারও প্রয়োজন পড়ে না।

তাহলে কি এই বুঝতে হবে যে, দুর্নীতি অতীতেও যে-পরিমাণে ও যে-প্রকৃতিতে চলত, আজও প্রায় সেই পরিমাণে এবং সেই প্রকৃতিতেই চলছে? এবং অদ্যকার দিনের দুর্নীতির বিস্তার দেখে আমাদের আত্মগ্লানি কিংবা শঙ্কার কোনো কারণ নেই? অথবা আমরা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে, গ্লানিবোধের যদি কোনো কারণ থাকে, তা শুধু এ যুগের জন্য নয়, জাতির সমগ্র ইতিহাসের মধ্যেই এই গ্লানির কারণ রয়েছে?

আমি এই সিদ্ধান্তগুলি অস্বীকার করি। কেননা, প্রাচীন, মধ্য বা প্রথম বৃটিশ শাসন-পর্বের সঙ্গে ১৯৫১ সালের পরবর্তী প্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের পুরোপুরি তুলনা অযৌক্তিক। প্রজাতন্ত্রী শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আইনের সংজ্ঞা, কিংবা চেহারায় আমূল পরিবর্তন হয়েছে, একথা কেউ বলবে না। কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি নূতন মূল্যবোধ তৈরী হয়েছে; রাষ্ট্রীয় আচারে এবং রাষ্ট্র-

কর্মচারীদের আচরণে ন্যায়নীতির সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে; এমনকি শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসায় সংস্থার আচরণ সম্বন্ধেও এই মূল্যবোধের, বা ন্যায়বিচারের মাপকাঠি পাল্টে গেছে।

উৎকোচ গ্রহণ বৃটিশ আমলেও আইনবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু অনুগ্রহবিতরণ, আত্মীয় বাৎসল্য, স্থিত স্বার্থের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত হওয়া, কাউকে "ধরে" চাকরী পাওয়া এবং সাহেবকে খুশী রেখে ঠিকাদারী আদায় করা ইত্যাদি দুর্নীতির বহুবিধ প্রকরণ ও কৌশল সম্বন্ধে বৃটিশ যুগে খুব কম লোকই অশ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমন নীতিনিষ্ঠ বাঙ্গালী কর্মচারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যাঁরা আদালতে বা এজলাসে দুই প্রস্থ দোয়াতদান ও কলম রাখতেন, এই উদ্দেশ্যে যে, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখায় তাঁরা সরকারী কালির অপচয় করবেন না। কিন্তু এই নীতিনিষ্ঠা ব্যক্তিগত ধর্ম-বিশ্বাস থেকে আসত। এর ভিত্তি কোনো রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের উপর স্থাপিত ছিল না। "উপরী" আয় এবং কাউকে "ধরে" উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা তৎকালের কর্মচারীদের পক্ষে যেমন স্বাভাবিক ছিল, তেমনি সমাজও উক্ত কর্মচারীদের আচরণকে অস্বাভাবিক জ্ঞান করতো না।

অর্থাৎ দুর্নীতির সংজ্ঞা তখন কেবলমাত্র ফৌজদারী দণ্ডবিধির আওতায় সংকীর্ণভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই আওতার মধ্যে যারা দণ্ডনীয় অপরাধের আসামী হত, লোকে তাদের "ঘুষ খোর" বলত। এই ঘুষ-খুরী ছাড়া, অন্যান্য যেসব আচরণকে আজকের দিনে আমরা অন্যায়, সামাজিক অপরাধ, এমনকি রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক কার্য বলে জ্ঞান করি, পরাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র কিংবা সমাজ কেউই সেগুলিকে নির্দিষ্টভাবে দুর্নীতির সংজ্ঞার মধ্যে ফেলেনি। সুতরাং তৎকালে যারা এইসব আচরণ করেছে, তারা জ্ঞানত সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো আচরণবিধি লঙ্ঘন করেনি। তারা ব্যক্তিগত জীবনে অমার্জিত, কুৎসিৎ কিংবা লোভী হতে পারে, হয়ত তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রবল ছিল না একথাও সত্য। কিন্তু বাপের কিংবা মামার অফিসে পুত্রের বা ভাগ্নের চাকরী, কিংবা ঠিকাদারী লাভ করাটাকে কেউ আপত্তিকর মনে করত না, এবং বড় সাহেবের অনুমত্যনুসারেই এই আত্মীয়পোষণ চলতে পারত।

মাত্র ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে আমাদের চিন্তাধারায় যে একটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ ঘটে গেছে, অনেক সময় তা আমরা ভুলে যাই। সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রের কাছে ন্যায়নিষ্ঠার প্রত্যাশা গত ১৫।২০ বৎসরের মধ্যে বৃহৎ এবং ক্ষুরধার হয়েছে। এই ক্ষুরধার নীতিবোধের জন্ম—বলাবাহুল্য—আমাদের সংবিধান থেকে।

প্রকৃতপক্ষে, দুর্নীতির একটি সম্পূর্ণ নূতন সংজ্ঞা আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই সংজ্ঞাটি ব্যাপক। শুধু ব্যাপক নয়, সংজ্ঞাটি পজিটিভ বিশ্বাস থেকে জন্মলাভ করেছে। কী সেই বিশ্বাস যা অতীতে ছিল না এবং বর্তমানে রাষ্ট্রচিন্তার ভিত্তি তৈরী করছে? আমাদের সংবিধানের মূল এবং অন্তর্নিহিত বক্তব্য এই যে প্রত্যেক মানুষ এই রাষ্ট্রে সমানাধিকারের সুযোগ পাবে।

এই সমানাধিকার যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কারো দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেখানেই আমরা বলছি যে, দুর্নীতি আশ্রয় করেছে। অর্থাৎ সমানাধিকারের বঞ্চনাকে আধুনিক চিন্তায় দুর্নীতি বলে জ্ঞান করা হচ্ছে। রেশনের কার্ডের জন্য আমাকে লাইন দিতে হয়, যদি পুলিশ কমিশনারকে না দিতে হয়, তাহলে আমি বলব যে রেশনিং অফিসার দুর্নীতিগ্রস্ত। হাসপাতালে শয্যা, সরকারী চাকুরী, সরকারী ঠিকাদারী, স্কুলে ছাত্রভর্তি—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সমানাধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রতিযোগিতা তৈরী হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতায় যেখানেই অধিকার সাম্য লঙ্ঘিত হয়, সেখানেই আমরা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করি। এবং ন্যায্যত এ অভিযোগ উত্থাপনের অধিকার আমাদের হাতে এসেছে মাত্র সেদিন।

অতীতে যে-"অথরিটির" কল্পনা সমাজে উপাস্য ছিল, সে কল্পনা আজ ছিন্নভিন্ন। অতীতে সমস্তই দেবভোগ্য ও অথরিটিভোগ্য ছিল; এবং আমরা সেই ভোগের প্রসাদ পেতাম মাত্র। আজ আমরা সমাজের আহৃত ধন, উপার্জিত সম্পদ, কিংবা নবোন্মোচিত চাকরীক্ষেত্র কোনো কিছুতেই অথরিটির ভোগপ্রাধান্য এবং তৎপরে ইতরের প্রসাদলাভের নীতি স্বীকার করি না।

এই অস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন অভ্যাস বা সংস্কার চলে যায়, তা নয়। সুতরাং নূতন মাপকাঠির বিচারে অকস্মাৎ মনে হয় যে, দুর্নীতির বিপুল বিস্তার হয়েছে। আসলে দুর্নীতির সংজ্ঞার বিস্তার যে ব্যাপক হয়েছে, সেকথা আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই (যদিও এই বিস্মরণ একদিক থেকে নূতন নীতিবোধ সম্বন্ধে আমাদের আস্থাই প্রমাণ করে)।

আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য দুর্নীতির বিস্তার যেমন ব্যাপক মনে হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে বাস্তবেও দুর্নীতি বিস্তার লাভ করেছে বহুবিধ শাখা-প্রশাখায় সমাজের ও রাষ্ট্রের গভীর অন্তঃস্থল পর্যন্ত।

১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬২ সালের প্রথমাবধি যুগান্তর পত্রিকায় নেপথ্যদর্শন নামক কলামে আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল সরকারী উচ্চ মহলে দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ উদ্ঘাটন করা এবং দুর্নীতিকারীদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উভয়বিধ শাস্তির সম্মুখীন করা। আমি ৭ বৎসরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যত দুর্নীতির ঘটনা লক্ষ্য করেছি, যত অদ্ভুত, আশ্চর্য, বুদ্ধিবৃত্তি ও কৌশলের প্রয়োগে সস্তা পয়সা কামানো এবং সমাজকে বঞ্চনার চেষ্টা দেখেছি, যত দেখেছি নিরপরাধ শিক্ষিত চাকরীজীবীদের হতাশা ও ঘৃণা, এমনকি হিংসা—সংবাদপত্রে খুব কম লোকের তত দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে। আমি ৮০ কোটি টাকার বাজেট পরিচালনার সর্বোচ্চ এবং অবিসংবাদী কর্তাকেও দেখেছি প্রবীণ সিভিলিয়ানের জীবন-সায়াহ্নে এসে সরকারী পয়সায় প্রমোদ ও বিলাসে লোভ সম্বরণ করতে পারেননি। এবং ফলত অনিবার্যভাবেই দুর্নীতির সাক্ষ্য ও প্রমাণ এখানে ওখানে তিনি অসতর্কভাবে ছড়িয়ে গেছেন। অনিবার্যভাবেই তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের অশ্রদ্ধা, বিতৃষ্ণা ও হিংসা তিনি আকর্ষণ করেছেন।

অধঃপতনের এটা একদিক। অন্যদিকে দেখেছি, এ যুগের তরুণ ইঞ্জিনিয়ারকে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার বাসনা ও সেই সঙ্গে ক্ষমতাপ্রমত্ততায় পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত নেপথ্যদর্শনের আলো তাঁর উপরে পড়েছে এবং সরকারী যন্ত্র তাঁর বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে।

অভিজ্ঞ কর্মচারী, বহু দীর্ঘপথ হেঁটে অবশেষে সম্মান ও ক্ষমতার উচ্চতম আসনে পৌঁছেছেন, যৌবনে তিনি ছিলেন আশ্চর্য মেধাশক্তির জন্য প্রখ্যাত এবং মধ্যবয়সে অধ্যবসায়ের জন্য বহু পুরস্কৃত। তথাপি অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে লোভ, বাৎসল্য, আত্মীয়-মমতা তাঁর স্নায়ু বোধহয় দুর্বল করে দিয়েছিল। তাঁর পতন আমার হাত দিয়ে ঘটেছে।

এসব দৃষ্টান্ত অন্তত ২ শত ঘটনায় পরীক্ষিত সত্য হিসাবে দেখেছি এবং অপরীক্ষিত অভিযোগ হিসাবে পেয়েছি হাজারে হাজারে। এর থেকে আধুনিক দুর্নীতি সম্বন্ধে আমার মনে কয়েকটি বিশ্বাস জন্মেছে : এই দুর্নীতি সম্বন্ধে এ-জেনারেশন বা ও-জেনারেশনকে দোষ দিয়ে লাভ নেই; শুধু রাষ্ট্রকে দোষ দিয়েও লাভ নেই।

গোড়ার আমাদের তিনটি জিনিষ মনে রাখতে হবে। বিগত ১৪ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে সরকারী অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ ৫ শত কোটি টাকা থেকে ১৪৫২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, অর্থাৎ বৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে তিনগুণেরও বেশী। এই সঙ্গে সহজেই অনুমেয় যে, প্রশাসনিক শাখাগুলির কী প্রকান্ড বিস্তার এর মধ্যে ঘটেছে। এই দ্রুত অতিবিস্তারের ফলে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা দুর্বল হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়ত মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষের ৪০ কোটি নরনারীর মধ্যে প্রতিদিন সংখ্যাবৃদ্ধিজনিত চাহিদাবৃদ্ধি ঘটছে বিপুল আকারে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, এতদিন এই কোটি কোটি মানুষের অধিকাংশের কোনো চাহিদা ছিল না একমাত্র দুটো মোটা ভাত ছাড়া। তারা সমাজের কাছে চাকরী তো চায়ইনি, হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ সামান্যই চেয়েছে, স্কুলে ছেলে ভর্তি করতে চায়নি, সিমেন্টের জন্য লাইন লাগায়নি; টিন ইস্পাত কয়লা কেরোসিন এসব কোনো জিনিষে তাদের চাহিদার টান ছিল নামমাত্র। অর্থাৎ একটা ঘুমন্ত জনপুঞ্জ ছিল, যা বিগত ১৫।২০ বৎসরে অকস্মাৎ চাহিদার জগতে এসে দাঁড়িয়েছে বা দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং উৎপন্ন ও সরবরাহের তুলনায়—স্কুল, হাসপাতাল, সিমেন্ট, লোহা সমস্ত ব্যাপারেই—চাহিদা গেছে বহুগুণ বেড়ে। এর একটি অবশ্যম্ভাবী ফল দুর্নীতি। কারণ, হাসপাতালের শয্যাই হোক, অথবা বিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যাপারই হোক, বা খাদ্যের চাহিদাই হোক, মানুষকে দীর্ঘ প্রতীক্ষার লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে; এবং লাইন ডিঙ্গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে তাড়াতাড়ি প্রাপ্তিযোগ ঘটাবার জন্য যেমন মানুষ উৎসুক, তেমনি একদল দালাল বা প্রতিপত্তিশালী লোকের উদ্ভব হচ্ছে, যারা এই লাইন ভেঙ্গে "আগে-পাইয়ে-দেওয়ার" ব্যবস্থাপক। অতি নিকৃষ্ট ঘুষ দানের পদ্ধতি থেকে সুরু করে অতি উৎকৃষ্ট সিলেকশান কমিটি, এম-এল-এ'র প্রভাব, রাইটার্স বিল্ডিংসে দরবার করা ইত্যাদি বহুবিধ পদ্ধতির মারফৎ এই লাইন ডিঙ্গোনোর প্রথা বা দুর্নীতি প্রচলিত হচ্ছে।

তৃতীয়ত, মনে রাখতে হবে যে, "প্ল্যানড ইকনমি" বা পরিকল্পিত অর্থনীতি এদেশে প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুইটি দুর্নীতির রাস্তা তৈরী হয়েছে। পরিকল্পিত অর্থনীতির আগে অর্থনীতি ক্ষেত্রে কোনো শাসন শৃঙ্খলার ধারণা বা Conceptই আমাদের ছিল না। এখন শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে অনেক ঘটনাকে আমরা অর্থনৈতিক শৃঙ্খলাভঙ্গ বা দুর্নীতি বলে স্বীকার করছি (যেমন মূল্যবৃদ্ধির পদ্ধতি, ফাটকাবাজী এবং অতিমুনাফার চেষ্টা ইত্যাদি)। এই নূতন Concept জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্পক্ষেত্রে বহু আচরণ দুর্নীতির সংজ্ঞার মধ্যে এসে পড়েছে। অন্যদিকে এই অর্থনৈতিক শৃঙ্খলারক্ষার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছেন এবং সরকারী বিভাগ সৃষ্টি বা পুরাতন বিভাগের নূতন প্রসার হয়েছে। এই নূতন ক্ষমতাবানেরা শাসনের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহ বিতরণের অধিকারও লাভ করেছেন। সুতরাং অনিবার্যভাবে তাঁদের করধৃত দুর্নীতি দেখা দিচ্ছে আয়কর, শুল্ক, ট্রেড লাইসেন্স ও আমদানী-রপ্তানী দপ্তরে। লাইসেন্স বিতরণকারীরা এই বিষাক্ত আবহাওয়ার রচনাকারী এবং এই আবহাওয়ার শিকারে পরিণত হচ্ছেন।

বর্তমান দুর্নীতির বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রকে আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি উপরোক্ত মানচিত্রে তিনটি প্রধান এলাকায় ভাগ করে দেখতে শিখেছি। বলা বাহুল্য, এর থেকে দুইটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—প্রথমত, এই দুর্নীতির কতকটা অনিবার্য। দ্বিতীয়ত, এই দুর্নীতি দূর করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা—দ্রুত অনুসন্ধান ও তদন্ত, ক্ষিপ্রবিচার ও শাস্তি, মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন—এগুলি যেমন প্রয়োজন, এগুলি যেমন ফলপ্রদ, তেমনি একথা মনে রাখতে হবে যে, দুর্নীতি পুরোপুরি যাবে না যতদিন না অভাবের তীব্র তাড়না সমাজ থেকে অপসারিত হচ্ছে। শুধু পয়সার অভাব নয়, পয়সার অভাবে লোক চুরি করে বা ঘুষ খায়। কিন্তু ন্যায্য প্রাপ্যের অভাবে লোক ঘুষ দিতে বা খুঁটি "ধরতে" বাধ্য হয়। এই দ্বিতীয় প্রকারের অভাবটি আগে দূর করতে হবে। এককথায়, দারিদ্র্যমুক্তি এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে দুর্নীতিমোচনের সঙ্কল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গণতন্ত্রের আশীর্বাদে অতিসাধারণ মানুষের মনেও চাহিদা, মনুষ্যত্ববোধ এবং অভিযোগপ্রবণতা (যার অন্য নাম ন্যায়বিচার লাভের প্রত্যাশা) জাগছে। এবং এই গণতন্ত্রেরই কৃপায়, অন্যদিকে দুর্নীতির প্রসার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নিবার্য হয়েছে।

কিন্তু তার মানে কি এই যে, দুর্নীতির বর্তমান স্রোতের মধ্যে ভারতবর্ষের বর্তমান প্রজন্মকে ডুবিয়ে মারতে হবে? যদি এই স্রোতের মুখে বাঁধ তোলার চেষ্টা প্রত্যক্ষ ও বাস্তবরূপ নিয়ে দেখা দেয়, যদি গভর্ণমেন্ট, রাষ্ট্রনেতা এবং সমাজনেতারা (এবং বলাই বাহুল্য সংবাদপত্রও) একথা স্বীকার করেন যে, হতাশাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে কোনো দেশ প্রগতির দিকে পদক্ষেপ করতে পারে না; এবং সেইজন্য যদি তাঁরা সঙ্কল্পবদ্ধ হন যে, প্রতীকীভাবে হলেও এই দুর্নীতিকে হত্যা করতে হবে; নূতন, উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত জনতার সামনে তুলে ধরতে হবে এবং ক্ষমাহীন শাসনের ও শাস্তির ভয় প্রবলভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রে উপস্থিত করতে হবে তাহলে সমস্ত দুর্নীতি না যাক, দুর্নীতির আবহাওয়া দূর হবে। দুর্নীতির স্পর্ধিত অহংকার ভাঙতে হবে—এই প্রতিজ্ঞা যদি নেওয়া হয় এবং মহামারীর বিরুদ্ধে যে-কোন সভ্যসমাজ যেমন সতর্ক বেড়াজাল তৈরী করে, তেমনি এই মহামারীর বিরুদ্ধেও যদি প্রহরা উদ্যত হয় গৃহে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে সর্বত্র যুগপৎভাবে তাহলে এই আত্মগ্লানির যুগ কাটতে সময় লাগবে না। আশা এবং বিশ্বাস তখন দেখা দেবে। এখন সবচেয়ে মারাত্মক এই যে, দুর্নীতি এড়াতে চাইলেও এড়ানো যায় না, আমরা প্রত্যেকে এর অনিচ্ছুক শিকার এবং প্রত্যেকেই আত্মধিক্কারগ্রস্ত, ভগ্নোদ্যম অপরাধী।

—

দুর্নীতির দর্পণে প্রাচীন যুগ

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে 'রামরাজ্য' কথাটা বেশ চালু হয়েছে। নেতারা বলছেন রামরাজ্যের কথা—আশ্বাস দিচ্ছেন রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার সংগে স্থাপিত হবে এমন এক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা যে ব্যবস্থা হবে ন্যায় ও নীতিনির্ভর। সে ব্যবস্থায় কোন কলুষ, কোন দুর্নীতি থাকবে না। লোভ, দ্বেষ, শোষণ, উৎপীড়ন দূর হয়ে আসবে এক অভিনব সমৃদ্ধির আর স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার যুগ। জনসাধারণ আশায় আছে কবে আসবে সে সুদিন।

বস্তুতঃ রামরাজ্য সম্পর্কে এই উচ্চাদর্শের ধারণা নিছক কল্পনাবিলাস। রামরাজ্যের এই উচ্চাদর্শ পোষণ করে বাল্মীকির রামায়ণে এমন কোন তথ্য নাই। অনেকের বিশ্বাস রামরাজ্যের আদর্শে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বাস্তবপক্ষে এই ধরণের মত বা বিশ্বাসেরও কোন সমর্থন নাই। কি পৌরাণিক যুগে, কি ইতিহাসের প্রাচীন যুগে।

সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ার সংগে সংগে জীবনযাত্রার জটিলতা বাড়ে। বৃদ্ধি পায় অভাব বোধ, শুরু হয় ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা সব সময়েই নীতি বা ন্যায়মাফিক চলে না। আপন আপন সুযোগ ও সুবিধা প্রতিষ্ঠাই যখন লক্ষ্য, তখন ক্ষেত্রবিশেষে ন্যায় ও নীতির লঙ্ঘন, বা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ সব দেশে, সব কালে চলে আসছে। পৌরাণিক বা প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষে তার ব্যতিক্রম হয়েছে এ ধারণা নিশ্চয়ই সমীচীন নয়। কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে বিজয়ী পাণ্ডব পক্ষ কতবার অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন মহাভারতে তার বর্ণনা আছে। এই অন্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ' এই বাক্য বাণী মাত্র, বাস্তবে তার বিশেষ প্রয়োগ নাই।

রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের কাহিনী ছেড়ে ইতিহাস যুগের আলোচনায় আসা যাক্। প্রাচীন অথবা মুসলমান-পূর্ব যুগের ভারতের ইতিহাস সব ক্ষেত্রে এখনও স্পষ্ট নয়। তথ্য-প্রমাণাদির খণ্ডতা আর অপ্রতুলতার দরুণ প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা এখনও সম্ভব হয়নি। অনুরূপ কারণেই প্রাচীন ভারতের দুর্নীতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। খণ্ড খণ্ড প্রমাণের সাহায্যে তৎকালে প্রচলিত দুর্নীতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা পরিচয় অবশ্য দেওয়া চলে।

ধর্মশাস্ত্র আর কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বিভিন্ন অপরাধের, বিশেষতঃ সামাজিক অপরাধের, দণ্ড ও প্রতিকারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শাস্ত্রবর্ণিত বিভিন্ন পর্যায়ের অপরাধের প্রকৃতি ও ধরণ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তখনকার কালেও দুর্নীতি কম ব্যাপক ছিল না। রাজনীতিবেত্তা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এ সম্পর্কে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ মনে করা যেতে পারে। অর্থশাস্ত্র পাঠে জানা যায় রাজপুরুষ পর্যায়ে বিবিধ প্রকারের দুর্নীতি বিদ্যমান ছিল। আর সেই দুর্নীতি নিরাকরণের নিমিত্ত কৌটিল্যকে নানাবিধ নিয়ম নির্দেশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। একটি অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, রাজপুরুষ, বিশেষতঃ অর্থ বিষয়ে ব্যাপৃত কর্মচারী, কোন না কোন উপায়ে রাজার ধন ভোগ করবেই। এই তাদের প্রকৃতি। তাদের কার্যকলাপ রাজার পক্ষে জানা দুরূহ। এ কারণে রাজপুরুষদের উপর সব সময়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখা রাজার প্রধান কর্তব্য; তাদের কার্যরীতি সর্বস্তরে পরীক্ষণীয়। রাজপুরুষেরা কত প্রকারের দুর্নীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন তারও মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রে। রাজধনের অপহরণ ও অবচ্ছেদ বা ঘাটতিকরণ, গণনার ছলনা (হিসাবের কারচুপি), প্রজাদের ধনাপহরণ ও প্রজা পীড়ন, আপন স্বার্থে রাজকোষের নৈমিত্তিক ব্যবহার বা প্রয়োগ, নিবন্ধ পুস্তকে (হিসাবের খাতায়) প্রাপ্ত আয়ের অনুল্লেখ ও যথার্থাতিরিক্ত ব্যয়ের উল্লেখ, কর্মকরদের হিসাবে বৈষম্য বা কারচুপি, দ্রব্যমূল্যের বৈষম্য ঘটাইয়া লাভের অংশ গ্রহণ, আত্মস্বার্থে তুলাদণ্ডাদির বৈষম্য সম্পাদন ইত্যাদি বহুবিধ দুর্নীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল রাজপুরুষ শ্রেণীর মধ্যে। সে কারণে কৌটিল্য নিয়োগের পূর্বে সকল কর্মচারীর উপযুক্ত পরীক্ষা ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়েছেন। নিয়োগের পর গূঢ় পুরুষ ইত্যাদির সহায়তায় সকল পর্যায়ের রাজপুরুষের কার্যকলাপের উপর সন্ধানী দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজনীয়তা বার বার লিপিবদ্ধ করে গেছেন। নিয়মিতকাল অন্তর হিসাব পরীক্ষার নির্দেশও দিয়েছেন। তদুপরি রাজকর্মচারীদের উৎকোচপ্রবণতার বিষয়ও কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন। উৎকোচের প্রলোভনে কর্মচারীরা রাজ-স্বার্থের হানি করতেন নানা উপায়ে—উৎকৃষ্ট পণ্যের মূলে নিকৃষ্ট পণ্য রাজভাণ্ডারে গ্রহণ, উৎকৃষ্ট দ্রব্যকে নিকৃষ্ট গণ্য করে শুল্কমানের হ্রাস, কূট বা জাল মুদ্রা প্রচলনে সহায়তা, ইত্যাদি বহুবি[ধ] বিপত্তির বিষয় কৌটিল্য উল্লেখ করেছেন, তা[র] প্রতিকার এবং উপযুক্ত দণ্ডেরও ব্যবস্থা করে[ছে]ছেন, কেবল রাজস্বার্থই নয়, প্রজাদের স্বার্থ[ও] ব্যাহত হত রাজপুরুষদের অসাধু আচরণে[।] তার মধ্যে কূট শাসন বা মিথ্যা দলিল রচনা [ও] তার নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রীকরণ অন্যতম[।] কৌটিল্যের গ্রন্থ পাঠে জানা যায় উৎকোচে[র] আতিশয্যে সরকারী দলিল লেখক আ[র] নিবন্ধকরা হামেশাই এ কার্য করতেন।

অর্থশাস্ত্রের 'অধ্যক্ষ প্রচার' এই অধিকরণ বিশেষভাবে আলোচনা করলে জানা য[ায়] রাজ্যের সর্বোচ্চ পদাধিকারী থেকে নিম্নত[ম] কর্মচারীর মধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা বিশেষভা[বে] বিদ্যমান ছিল। এই প্রকার অপরাধপ্রবণ[তা] কেবল রাজস্বার্থ বা প্রজাস্বার্থের বিপত্তি ঘট[ায়] না, রাজ্যের নিরাপত্তারও ব্যাঘাত ঘটায়, [এ] দৃষ্টান্তও কৌটিল্য দিয়েছেন। রাজপুরুষ[দের] দুর্নীতিপ্রসূত কত বিভিন্ন ধরণের অপরা[ধের] সম্ভাব্যতা তিনি আলোচনা করেছেন তার ই[য়ত্তা] নেই। উপরে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র উ[ল্লেখ] করা হল। প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরাধ দূরীক[রণের] যথাযথ ব্যবস্থার নির্দেশও তাঁর গ্রন্থে পা[ওয়া] যায়। কোন কর্মচারী একটি বা বিভিন্ন অপ[রাধ] সম্পর্কে সন্দেহভাজন হলে একটি সংস্থা ক[র্তৃক] বিস্তারিত অনুসন্ধানের ব্যবস্থা ছিল। অনুসন্ধান কার্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্ম[পক্ষ] সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হত। উপযুক্ত স

প্রমাণের মাধ্যমে সংস্থা অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করতেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যথাভাগ দণ্ড নিতে বাধ্য হতেন। অপরাধের গুরুত্ব বিশেষে এই দণ্ড নির্ণীত হত। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাসন ও বধদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা আর মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক দুর্নীতিপরায়ণতা সম্পর্কে কৌটিল্য বিশেষ অবহিত ছিলেন। তাই তিনি প্রবর্তন করেছিলেন এক কঠোর শাসন ব্যবস্থা, আর সে ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনের জন্যে যথাবিহিত নিয়মাবলী ও নির্দেশ।

'কণ্টক-শোধণ' নামক এক পরবর্তী অধিকরণে কৌটিল্য কারুকৃৎ, বণিক ও জনসাধারণের দুর্নীতিপরায়ণতার দরুণ সমাজ-বিরোধী দুষ্ক্রিয়া প্রভৃতি রোধের ও প্রতিকারের ব্যবস্থাদির নির্দেশ দিয়েছেন। কারুকৃৎ ও বণিকগোষ্ঠীকে যথাবিহিত নিয়মাবলী মেনে চলতে হত। তন্তুবায়, রজক, রঞ্জক, তুন্নবায় (সূচীশিল্পী), সুবর্ণকার প্রভৃতি কারুকৃৎ বা জনসাধারণকে কি প্রকারে প্রতারণা করত তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় একটি অধ্যায়ে। সাধারণতঃ কারুকৃৎরা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট বস্তুর মিশ্রণে উৎকৃষ্ট বস্তুর মূল্য আদায় করে অতিরিক্ত মুনাফা লাভে সচেষ্ট থাকত। বৈদেহক বা বণিকরাও বিশেষভাবে এই দোষে দোষী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁরা 'পৌতব দোষ' বা ওজনে ফাঁকি দিতে বিশেষ অভ্যস্ত ছিলেন। বৈদেহক বা ব্যাপারীদের আর এক কারসাজি ছিল সকলে একজোট হয়ে পণ্য অবরুদ্ধ রেখে অযুক্ত বা অনুচিত মূল্য দাবী করা। এই অপরাধে কৌটিল্য সর্বোচ্চ দণ্ডের বিধান দিয়েছেন। পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে যথাযোগ্য নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। অসাধু ব্যবসায়ী আর দুর্নীতিগ্রস্ত রাজপুরুষদের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগ সম্পর্কেও কৌটিল্য বিশেষ অবহিত ছিলেন।

কৌটিল্যের সর্বপ্রসারী শাসনব্যবস্থায় চিকিৎসা বৈগুণ্যে রোগী মারা গেলে ভিষককে দণ্ড পেতে হত; নট, কুশীলব, কুহক বা ঐন্দ্রজালিক, চারণ শিল্পী প্রভৃতির বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা হত যাতে তাদের আচরণে লোকের পীড়া না ঘটে; গ্রাম ও জনপদবাসীদের শুচিতা বা অশুচিতা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা ছিল; দৈবী বিপদ অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ক্লেশ ও নাশকতা প্রতিরোধের ব্যবস্থা ছিল। এমনকি বিভিন্ন বিপণীতে মাপ পরীক্ষা, পানাগারে পানীয়ের উৎকর্ষ আর পানকারীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ, গণিকালয়ে গণিকাদের ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রভৃতি ছোট বড় অনেক কার্যই তাঁর শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থ রচনা করে গেছেন প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে। শাসনযন্ত্রে কারুক আর বৈদেহকশ্রেণী আর জনসাধারণের মধ্যে যে ব্যাপক দুর্নীতির ইঙ্গিত তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়, তা অনেকাংশে বর্তমানকালের অবস্থার অনুরূপ বলে মনে করলে হয়তো ভুল করা হবে না। প্রাচীনকালের দুর্নীতি আর সাম্প্রতিক দুর্নীতির প্রকৃতিতে বিশেষ প্রভেদ আছে বলে মনে হয় না। তবে বর্তমানের এই ব্যাপক দুর্নীতি আরও দৃঢ়বদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। কৌটিল্য দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রবর্তন করেছিলেন। অনেকের মতে কৌটিল্যের গ্রন্থ রচিত হয়েছিল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমলে। এই মতে বিশ্বাস করলে স্বীকার করতে হয় এই শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল। তার সমর্থন মেলে সমসাময়িক কালের গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের ভারত বর্ণনায়। কৌটিল্য পরবর্তী যুগে শাসনযন্ত্রের শিথিলতার দরুণ উপর্যুক্ত দুর্নীতি ও অপরাধের বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই লক্ষিত হয়। এই অবস্থাই হয়তো বিদেশী প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে থাকবে।

কৌটিল্য নানা প্রকারের দুর্নীতি আর তার প্রতিরোধ ও দমন ব্যবস্থারই আলোচনা করেছেন। নানা পর্যায়ের দুর্নীতি সম্পর্কিত বিশেষ কোন ঘটনার উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায় না। প্রাচীন ইতিহাসের অন্যান্য প্রমাণপঞ্জীতেও এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং জাল দলিল সম্পর্কীয় দুটি ঘটনার বিবরণ এ প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না। জাল দলিল সম্পাদনে অসাধু রাজপুরুষদের সহায়তার বিষয় কৌটিল্য বলে গেছেন। এ দুটি ঘটনা ঘটেছিল কৌটিল্যের বহু পরবর্তীকালে। দুটিতেই সংশ্লিষ্ট রাজপুরুষেরা বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন বলে জানা যায়। বিহারের সাসারামের নিকটবর্তী তারাচণ্ডী পর্বতলিপি থেকে জানা যায় সুবর্ণ হল নামক গ্রামের ব্রাহ্মণেরা গাহড়বালরাজ বিজয়চন্দ্রের (আনুমানিক ১১৫৫-৭০ খৃষ্টাব্দ) কোন কর্মচারীকে উৎকোচদানে প্রলোভিত করে এক কূট শাসনের বলে এমন দুটি গ্রাম ভোগদখলের অধিকারী হয়েছে যাতে তাদের কোন ন্যায্য স্বত্ব নাই। এই অঞ্চলের সামন্ত রাজা প্রতাপ ধবল এই পর্বতলিপিতে তাঁর বংশাধিকারীদের নির্দেশ দিচ্ছেন এই জাল শাসন অস্বীকার করবার জন্য। সম্প্রতি এই কূট শাসনটি আবিষ্কৃত হয়েছে সাসারামের অদূরস্থ সুনহার গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। সন্দেহ নাই, এই ব্রাহ্মণ বংশ শত শত বৎসর ধরে গ্রাম দুটি ভোগদখল করেছে এই কূট শাসনের বলে।

প্রায় অনুরূপ আর একটি ঘটনা ঘটেছিল কাশ্মীরে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে। কাশ্মীরের রাজা তখন যশস্কর। কহ্লণ তাঁর ন্যায়ানুবর্তিতার বিশেষ প্রশংসা করেছেন। রাজসভায় একদিন এক ব্রাহ্মণ অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলেন। অভিযোগের মর্ম এইরূপ— বিদেশ যাত্রার পূর্বে ব্রাহ্মণ তাঁর বসতবাটী এক বণিককে বিক্রয় করেন। বসতবাটী সংলগ্ন সোপানযুক্ত একটি কূপ ছিল। সেই কূপ পুষ্প ব্যবসায়ীরা কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করত। সেই অর্থে তাঁর স্ত্রীর ভরণপোষণ চলবে এই উদ্দেশ্যে কূপটি তিনি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। দেশে ফিরে তিনি দেখলেন তাঁর স্ত্রী কূপের দখল থেকে বণিক কর্তৃক তাড়িত হয়ে এক গৃহস্থের বাটীতে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ তিনি বিচারকদের নিকট উপস্থিত করে সুবিচার না পাওয়ায় তিনি রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হয়েছেন। এ দরবারে অভিযোগের যথার্থ সুরাহা না হলে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। অভিযোগ শ্রবণে রাজা বিচারসভা আহ্বান করলেন। বিচারকেরা বললেন যে, তাঁরা লিখিত বিক্রয়পত্রের চুক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণের অভিযোগ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন। রাজা বিক্রয়পত্র আনিয়ে 'সোপান কূপসহিত এই গৃহটি বিক্রীত হইল' এই বাক্যটি নিজে পড়লেন। তৎসত্ত্বেও ব্রাহ্মণের অভিযোগ সত্য বলে তাঁর মনে হল। তখন প্রত্যর্থী (প্রতিবাদী) বণিকের হাত থেকে তাঁর অঙ্গুরীয়টি কৌতুকছলে গ্রহণ করে এক ভৃত্যকে বণিকের গৃহ থেকে যে বৎসর বিক্রয়পত্র সম্পাদিত হয়েছিল সে বৎসরের গণনা পত্রিকা (হিসাবের খাতা) দরবারে আনবার আদেশ দিলেন। হিসাবের খাতায় তিনি দেখলেন বিক্রয়পত্রের লেখক রাজকর্মচারীকে (অধিকরণ লেখক) এক সহস্র দীনার পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। সামান্য কর্মের জন্য অত্যধিক পারিশ্রমিক প্রদানে রাজার সন্দেহ হল, বণিক লেখকের সহায়তায় বিক্রয়পত্রে 'র' স্থানে 'স' (অর্থাৎ 'সোপান কূপ রহিত' স্থলে 'সোপান কূপ সহিত') লিখিয়ে অন্যায়ভাবে কূপটি বিক্রয় চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করিয়েছে। জিজ্ঞাসিত হয়ে লেখক আপন দোষ স্বীকার করলেন। রাজা বণিকের সমস্ত সম্পত্তিসহ বাটী ব্রাহ্মণকে দিয়ে অসাধু বণিককে দেশ হতে নির্বাসিত করলেন। সভ্যেরা রাজার সুবিচারের অনুমোদন করলেন। এ দলিলটি ঠিক জাল দলিলের পর্যায়ভুক্ত না হলেও অসাধু ও অন্যায়ভাবে দলিলের পরিবর্তনে দুর্নীতির প্রকারভেদ মাত্র।

মুসলমান যুগে

ড: জগদীশনারায়ন সরকার

আধুনিক কালে দুর্নীতি নামক যে দানবটি তাহার ভয়াবহ হস্ত চতুর্দিকে প্রসারিত করিয়াছে, অনেকের ধারণা উহা শুধুমাত্র বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা-প্রসূত। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ইহার অনুপ্রবেশ কাল-পরিক্রমায় নিজস্ব স্থান দখল করিয়া নিয়াছে এবং ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের সহিত অংগাঙ্গিভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে পুরাতন কাল হইতেই।

পারসিক ভাষায় লিখিত বিবরণী, পত্রাবলী এবং বিদেশী পর্যটকবৃন্দের বিবরণ ও তৎকালীন সাহিত্য প্রভৃতি সমসাময়িক উপাদানগুলি মধ্যকালীন ভারতে (১০০০—১৭৫৭) দুর্নীতির বিভিন্ন রূপের উপর আলোকপাত করে।

(১) রাজনৈতিক জীবন

(ক) জালিয়াতী এবং প্রতারণা সামাজিক দৃষ্টিতে একটি ঘৃণ্য অপরাধ। দুর্ধর্ষ শেরশাহ এবং অতিনৈষ্ঠিক আওরঙ্গজেব এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। রাঠোর মালদেবের হস্তে যখন বিপন্ন শেরশাহ 'একমুষ্টি বাজরার জন্য হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য হারাইতে বসিয়াছিলেন' (১৫৪৪), তখন আত্মরক্ষার জন্য এবং মালদেবের মনে ভীতি উৎপন্ন করিতে শেরশাহ তাঁহার (মালদেবের) সেনাধ্যক্ষের পক্ষ হইতে জাল পত্র লেখা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা খুঁজিয়া পান নাই। শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন-বিবাদে, আওরঙ্গজেবের পরামর্শে সুজা ও মহম্মদ সুলতানের মধ্যে বিরোধ ঘটাইবার জন্য মীরজুমলা মিথ্যা পত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার মাড়বার যুদ্ধে আওরঙ্গজেব স্বীয় পুত্র বিদ্রোহী আকবরকে লিখিত জাল-পত্র দ্বারা রাঠোর-নেতা দুর্গাদাসকে প্রতারণা করিয়া উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন।

(খ) উৎকোচ এবং বিশ্বাসঘাতকতাও দেশ-জয়ের উপযোগী ব্যবস্থারূপে গণ্য হইয়াছিল। শেরশাহ রায়সিনের পুরণমলের সহিত কৃত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন (১৫৪৩)। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নরপতি মহান আকবর তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ দুর্গ আসীরগড় জয় করিবার জন্য (১৬০১) উৎকোচের আশ্রয় লইয়াছিলেন। বিজাপুর অভিযানে (১৬৬৫—৬৬) প্রবীণ রাজপুত সেনাধ্যক্ষ মীর্জা রাজা জয়সিংহ উৎকোচ, পুরস্কার, পদ ও জায়গীর প্রদানের দ্বারা তখনকার আমীর ও জমিদার-দিগকে সুলতান আদিলশাহের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মুঘল দলে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ করেন।

(২) সৈন্য গঠনপ্রণালী

সামরিক সুরক্ষার ন্যায় অত্যাবশ্যক বিষয়েও দুর্নীতির প্রকোপ প্রবল ছিল। অসৎ ব্যক্তিগত স্বার্থের সম্মুখে রাষ্ট্রগত মঙ্গল উপেক্ষিত হইত। তুর্কী সৈন্য মূলতঃ অশ্বারোহী বাহিনী ছিল। প্রতি রাজ-কর্মচারীকে আপনার অধীনে স্বীয় পদমর্যাদা এবং বেতনানুসারে নির্দিষ্ট সংখ্যক সিপাহী ও অশ্ব রাখিতে হইত। কিন্তু আমীর মনসবদার-গণ ইহার কম রাখিয়া বেতনের উদ্বৃত্ত অংশটুকু আত্মসাৎ করিতেন। সুতরাং সংখ্যাবলে এবং নৈপুণ্যে সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি সাধন হইত।

মাঝে মাঝে কতিপয় দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নরপতি এই অসাধুতা প্রতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সংস্কারের ফল কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মুসলমান যুগে ভারতবর্ষে প্রথম আলাউদ্দীন খলজী 'ঘোড়ার-দাগ' প্রথার প্রবর্তন করেন (১৩৬২-৬৩) শেরশাহ (১৫৪১—৪২) ও আকবর (১৫৭৩—৭৪) ইহার পুনরুদ্দীপন করেন। সরকারী সেবায় ব্যবহৃত হইবার পূর্বে ঘোড়ার জঙ্ঘায় তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়া দাগিয়া দেওয়া হইত। সিপাহী ও ঘোড়ার বর্ণনাত্মক তালিকা (চেহারা) প্রস্তুত করা হইত। সিপাহীদের বংশগত ও জাতিগত আনুপূর্বিক বিবরণ ব্যতীতও ব্যক্তি-গত আকার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা হইত (যেমন, গাত্রবর্ণ, চুল, কপাল, ভ্রু, চক্ষুতারকা, নাসিকা, শ্মশ্রু, কর্ণ, দন্ত, উচ্চতা ইত্যাদি), ঘোড়ারও বংশকৌলীন্য হিসাবে শ্রেণী বিভাগ হইত ও ৫২ দফায় বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল। কিন্তু ইহা কখনই লোকপ্রি[য়] হইতে পারে নাই। ইহার কার্যকারিতা দুই দিক দিয়া ব্যাহত হইত। প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার বিরোধিতা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ সৈন[্য] পরিদর্শন (Musters) নিয়মিতভাবে পালি[ত] হইত না। তথাপি সকলেই নিজ নিজ বেত[ন] নিয়মিতরূপেই গ্রহণ করিতেন। আরভি[ন] সাহেব বলেন, কাল্পনিক সৈন্য সমাবেশ এম[ন] এক পাপাচার যাহার জন্য বিশেষ উন্নতি কালেও মুঘল সৈন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ওমরাহগণ পরস্পরকে নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর[ণ] করিবার জন্য স্বীয় সিপাহীবৃন্দ ধার দিতে[ন] অথবা বাজার হইতে আনীত অভাবগ্রস্ত এ[বং] নিষ্কর্মা ব্যক্তিকে সহজলব্ধ প্রথম ভারবা[হী] টাট্টুঘোড়ার উপর চড়াইয়া কার্যক্ষম সৈন্যদে[র] সামিল গণ্য করিতেন।

এই ভ্রষ্টাচার দমন করিবার প্রচেষ্টা প্র[থম] প্রথম অপেক্ষাকৃত সফল হইয়াছিল। কি[ন্তু] আওরঙ্গজেবের পরবর্তী যুগে বিশেষ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে সাধারণ গোলযো[গ] এবং ক্রমবর্ধমান অসাধুতার মধ্যে সম[স্ত] সতর্কতাই অর্থহীন হইয়া পড়ে। আলিবর্দ[ী] আমলে বাংলায় (১৭৫০) ১৭০০ সিপাহ[ী] অধিকর্তাও ৭০ বা ৮০'র অধিক সৈন্য একত্রি[ত] করিতে পারিতেন না।

ভেনেসীয় পর্যটক মানুচী মুঘল বে[তন] বিভাগীয় কেরাণীর অত্যাচার সম্বন্ধে এ[কটি] চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। এক সৈনিক বেতন আনিতে যাওয়ায় কেরাণ[ী] তাহাকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করাইয়া রা[খে]। অধীর সৈনিকটি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দু[ইটি] দাঁত ভাঙ্গিয়া দিবে বলিয়া হুমকি [দেয়]। কিছুক্ষণ পরে কেরাণীটি বেতন দিয়া [দেয়]। কিন্তু মনে মনে প্রতিশোধ লইবার প্র[তিজ্ঞা] করেন এবং সৈনিকটির দৈহিক বিবরণীন[তে] তাহার দুইটি দাঁত কম বলিয়া লিখিয়া [দেন]। ভবিষ্যতে বেতন পাইবার জন্য তা[হার] বিবরণীর সহিত সামঞ্জস্য রা[খিতে] সৈনিকটিকেই নিজের দুইটি দাঁত তু[লিয়া] ফেলিতে হয়।

(৩) কর্মচারী কর্তৃক উৎকোচ গ্রহণ

নজর (উপহার, উপঢৌকন), উপরিলাভ, দস্তুরি, উৎকোচ ও পৈরবী (প্রভাব, চাপ) মধ্যকালীন ভারতে দুর্নীতির প্রধান রূপ ছিল। দুর্নীতির বীজ উপর হইতে নীচ পর্যন্ত, সম্রাট হইতে নিম্নতম কর্মচারী পর্যন্ত সমাজে উপ্ত হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ সাধারণ কৃষক এবং ব্যবসায়িবৃন্দই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইত।

(ক) নজর বা উপঢৌকন। পদস্থ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপহার দাবি করিবেন বা গ্রহণ করিবেন ইহা প্রকাশ্যভাবে স্বীকৃত হইত। মীর্জা গিয়াস, ইতিমাদ উদ্দৌলা, নূরজাহানের পিতা এবং জাহাংগীরের প্রধানমন্ত্রী নির্লজ্জভাবে উপহার দাবি করিতেন। শাহজাহানের সময় অবস্থার আরও অবনতি হয় : উপহার স্বেচ্ছাপ্রসূত না হইয়া অপরিহার্য এবং বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হয়। পেলসার্ট, পিটার মুণ্ডী, মানরিক, ম্যানডেলসলো, বার্ণিয়ে, মানুচী এবং আরও বহু ইউরোপীয় পর্যটক দৃঢ়তার সহিত এই ঘৃণ্য উৎকোচ প্রথার তীব্র নিন্দা করেন। আওরঙ্গজেবের উজীর জাফর খাঁও উপহার চাহিতেন। অসফল বীজাপুর অভিযানের পরও দাক্ষিণাত্যে সম্রাট মীর্জা রাজা জয়সিংহকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার পদে বহাল রাখার জন্য তিনি উজীরকে ত্রিশ হাজার টাকা ঘুষ দিয়াছিলেন। কোন সাধারণ বেসামরিক পদ পাইবার জন্য বা পদে বহাল থাকিবার জন্য মুঘল দরবারের অসংখ্য সভাসদকে উপহার দিতে দিতে ভীমসেন বুরহানপুরী অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্রাট নিজেও এই অনুচিত অর্থলোভ হইতে মুক্ত ছিলেন না। মীর খাঁকে আমীর খাঁ করিয়া, অর্থাৎ শুধু 'আ' (আলিফ) বিক্রয় করিয়া শাহজাহান এক লক্ষ টাকা লইয়াছিলেন। তাঁহার উপাধি-প্রত্যাশী পুত্রকেও আওরংগজেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একটি উপাধির জন্য তিনি কত মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছেন। শোলাপুরের দুর্গরক্ষক মনোহরদাসকেও 'রাজা' উপাধি দিয়া আওরংগজেব ৫০,০০০ টাকা লইয়াছিলেন।

এই নজরের বোঝা নিম্নাভিমুখে সামান্য কৃষককে পর্যন্ত বহন করিতে হইত। এক সামাজিক স্তর উচ্চতর স্তরকে উপহার দিবার জন্য নিম্নস্থ স্তরকে নিষ্পেষিত করিত : সম্রাট সুবাদারকে, সুবাদার জমিদারকে এবং জমিদার কৃষককে পীড়ন করিতেন। আবার প্রাদেশিক দেওয়ান কেন্দ্রীয় দেওয়ান দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া নিম্নস্থ রাজস্ব আদায়-কারীকে পেষণ করিতেন। এক্ষেত্রেও বোঝা সামলাইতে হইত কৃষককেই।

(খ) উপরিলাভ। মুঘল সাম্রাজ্যে বহু সংখ্যক নিম্নপদস্থ কর্মচারীদিগের (যথা কেরাণী ও মুহুরী) বেতন অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়া তাহারা অসৎ উপায়ে অভাব পূরণ করিবার এবং কার্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অননুমোদিত পারিশ্রমিক বা উপরি আদায় করিবার চেষ্টা করিত। সামরিক ও বেসামরিক শাসনকার্য বস্তুত ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইত বলিয়া এই বিষ প্রতিটি বিভাগে, কার-খানায়, রাজকীয় গুদামে, প্রাদেশিক কার্যালয়ে, ফৌজদারীতে ও সৈন্য ব্যবস্থায় সুদূর প্রসারিত ছিল।

(গ) উৎকোচ। ইহা ব্যতীত আরও এক প্রকারের 'উপরি' লাভের প্রচলন ছিল। বড় হইতে ছোট পর্যন্ত বহু কর্মচারীই অসংগত সুবিধা দিবার জন্য, সুবিচারের গতি বিচলিত করিবার জন্য অথবা রাজ্য বিরোধী ক্ষতিসাধক কাজ করিবার জন্য গোপনে অর্থ গ্রহণ করিতেন।

(ঘ) পৈরবী (প্রভাব)। মধ্যকালীন ভারতে দুর্নীতির আরও একটি গভীর উৎস ছিল পৈরবী (প্রভাব)। টিউডর ও স্টুয়ার্ট যুগের ইংল্যাণ্ডের ন্যায় তদানীন্তন ভারতে প্রভাব-শালী ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহাদের প্রতিপত্তি বিক্রয় করা এক সর্বব্যাপী এবং স্বীকৃত রীতি ছিল। সরকারী প্রণালীর মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত কর্মসাধনের জন্য অনেকেই তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিত। কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহারা উপরি আদায় বা এককালীন দান গ্রহণ করিতেন। মন্ত্রী এবং সভাসদগণের পক্ষে সম্রাটের সান্নিধ্য সহজলভ্য ছিল। সুতরাং এই সুযোগে তাঁহারা মকদ্দমা লইয়া যাইতেন এবং মক্কেলদিগের নিকট অনুগ্রহ বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন

করিতেন। ইহা ব্যতীত কর্মচারিবৃন্দ তাহাদের আত্মরক্ষা, ত্রুটি সম্বরণ এবং সম্রাটের নিকট উপরোধের জন্য এই সমস্ত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদিগকে অবাধে নগদ বা উপঢৌকন উৎকোচ হিসাবে প্রদান করিতেন।

(৪) বিচারে, পুলিশ ব্যবস্থায় ও গুপ্তচর বিভাগে

মুঘলকালীন ভারতে বিচার বিভাগে তিনটি পৃথক শ্রেণীর অধিকরণের ব্যবস্থা ছিল (ক) ধর্মবিষয়ক মকদ্দমাদির জন্য কাজী, (খ) প্রথাসংগত আদালতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা, দেওয়ান এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ। যথা ফৌজদার, কোতোয়াল অথবা হিন্দুদিগের জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পঞ্চায়েৎ এবং (গ) রাজনৈতিক মকদ্দমার জন্য, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ ও শাস্তি-ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য স্বয়ং সম্রাট বা তাঁহার প্রতিনিধি (কাজী নহে)।

কাজীরা বহুলাংশে পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ ছিলেন কিন্তু কার্যতঃ কাজীরা কদাচিৎ এই উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতেন। পক্ষান্তরে, অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইয়া ও দায়িত্বহীনভাবে তাহা ব্যবহার করিয়া তাঁহারা এই বিভাগকে দুর্নীতির এক বিশাল ক্ষেত্রে পরিণত করেন। কতিপয় স্মরণীয় ব্যক্তিবিশেষ ব্যতিরেকে মুঘল যুগে অধিকাংশ কাজীই উৎকোচ গ্রহণের জন্য কুখ্যাত এবং এই বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় কাজীদিগের পদও প্রায়ই উৎকোচ প্রদানে বিক্রীত হইত। কাজীর বিচার নিন্দা ও পরিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়। ইউরোপীয় পর্যটকগণ দৃঢ়স্বরে কাজীর দুর্নীতির নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি আবুল ফজলও কাজীদিগের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে, 'ইঁহারা মান্যতার নিদর্শনস্বরূপ পাগড়ি পরিতেন কিন্তু অন্তরে দুর্নীতি-পরায়ণ ছিলেন; অধিক ঝুলের আস্তিন পরিতেন কিন্তু অল্পবুদ্ধি ছিলেন।' আকবর এই দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে দৃঢ় উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

প্রবাদ আছে যে, কাজীর কুক্কুরীর সৎকারে যোগদান করিত সমস্ত নগর কিন্তু কাজীর মৃত্যুতে একজন নাগরিকও শবাধার অনুগমন করিত না।

(খ) পুলিস

মুঘল যুগে গ্রামের পুলিসী ব্যবস্থা পঞ্চায়েত বা মুকদ্দম (গ্রামের প্রধান ব্যক্তি) অর্থাৎ মোড়লের, নাগরিক পুলিস কোতোয়ালের ও জেলা পুলিস ফৌজদারের অধীন ছিল। গ্রামাঞ্চলে সাক্ষাৎভাবে পুলিসী ব্যবস্থা মুঘলরা বা মারাঠারা কেহই করেন নাই। শেরশাহ-এর জীবনীকার আব্বাস সরওয়ানী লিখিয়াছেন, "চুরি ও প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি কেবলমাত্র মুকদ্দমের মৌন সম্মতিক্রমেই সম্ভবপর হয়। মুকদ্দম ও কৃষক সমভাবেই চোর, তাহারা উভয়েই পরমাত্মীয়।"

(গ) গুপ্তচর বিভাগ

দুর্নীতির গতি গুপ্তচর বিভাগেও অব্যাহত ছিল। মুঘলগণ প্রকাশ্য এবং গুপ্ত দুই প্রকার চরের ব্যবস্থা রাখিতেন। প্রকাশ্যে থাকিতেন ওকিয়ানবীস বা ওকিয়া নিগার (ঘটনা লেখক বা তদন্তকারী): গুপ্তভাবে সোয়ানী নিগার বা সুফিয়া নবীস, ইঁহারা কেবল প্রয়োজনীয় ঘটনার বিবরণী লিখিতেন, প্রদেশে গুপ্তভাবে বাস করিতেন এবং প্রথমোক্ত শ্রেণীর চরদিগের উপর নজর রাখিতেন। কারণ তাহারা স্থানীয় কর্মচারীদিগের সহিত যোগসাজস করিতেন। সর্বাপেক্ষা গোপন চর ছিল হরকরা (বার্তাবাহক, বস্তুত গুপ্তচর); ইহারা মৌখিক সমাচার আনিত এবং সময়ে সময়ে লিখিত সমাচারও পাঠাইত। ইহা ব্যতীত নানা ডিটেকটিভ্ গুপ্তচর ও গোয়েন্দা থাকিত। মহল্লায় আবর্জনা পরিষ্কার করিবার জন্য যে সমস্ত ঝাড়ুদার থাকিত তাহারাও গুপ্তচর পর্যায়ে গণ্য হইত।

শঠ ও গোপন ষড়যন্ত্রকারী গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইহারা সর্বদা বিশ্বস্ত ছিল না। ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়ে প্রকাশ্য লেখকদের সহিত প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদিগের যোগসাজসের সম্বন্ধে অনুযোগ করিয়া বলেন যে এই জনাই "গুপ্তচর মৌজুদ থাকা সত্ত্বেও হতভাগ্য জনসাধারণের উপর অত্যাচার দৈবাৎ সংযত হইতে পারিত।" ভেনেসীয় পর্যটক মানুচীও তুল্য মন্তব্য করিয়া-ছেন—"কর্মচারিগণ লাভবান হইবার আশায় লুণ্ঠন ও নানা অন্যায় আচরণ করিত। তাহারা ওকিয়া নবীস (প্রকাশ্য লেখক) ও সুফিয়া নবীস (গুপ্ত সংবাদহারক)কে উৎকোচ দিত যাহাতে সম্রাট (তাহাদের দুষ্কৃতির বিষয়) জানিতে না পারেন।" ইংরাজ লেখক ডঃ ফ্রাইয়ারও সংবাদ লেখকদের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন। তাহার মধ্যে দাক্ষিণাত্য অভিযানে আওরঙ্গজেবের অসাফল্যের প্রধান কারণ ছিল গুপ্তচরদিগের নষ্টামি, কারণ ইহারা প্রায়ই সম্রাটকে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিত।

(৫) আর্থিক জীবনে দুর্নীতি

(ক) রাজস্ব সম্বন্ধীয় পীড়ন

মধ্যকালীন ভারতে জনসাধারণের আর্থিক জীবনের উপরও দুর্নীতি তাহার কৃষ্ণছায়া বিস্তার করিয়াছিল। জাতীয় করপ্রথা ছিল স্থূল ও অস্পষ্ট। ইহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানও জন-সাধারণের ছিল না। বিভিন্ন রাজত্ব কালে অল্প-বিস্তর পরিবর্তনও ইহাতে হইত। তাহার উপর ছিল কম বেতনভোগী কর্মচারিবৃন্দের দুস্তোষণীয় লালসা। দুই মিলিয়া প্রশাসনিক অত্যাচারের গতি অপ্রতিহত করিয়া দিয়াছিল। জনসাধারণের জীবনের গতি ধূর্ত, কুটিল এবং সদা উপস্থিত অব্যবহিত কর্মচারী ও রাজস্ব বিভাগীয় তাবেদারগণের রুক্ষতা ও ধনলোভ দ্বারা প্রভাবিত হইত।

অবশ্য রাজস্ব সংক্রান্ত পীড়ন যে কেবল ঐ বিভাগের নিম্নস্তরের কর্মচারিবৃন্দের দ্বারাই হইত তাহা নহে। কখনও কখনও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণও এই পীড়নে অংশ গ্রহণ করিতেন। লোভী দেওয়ান সরকারের প্রাপ্য রাজস্বের পরি-মাণ কাগজে বাড়াইয়া লিখিয়া দিত এবং রাজস্ব আদায়ের ইজারা, নিলামে সর্বোচ্চ ডাক যে ডাকিত তাহাকেই দেওয়া হইত। নমুনাস্বরূপ বলা যাইতে পারে, উড়িষ্যার দেওয়ান মহম্মদ হাশিম (১৬৬২) বিভিন্ন স্থানের রাজস্ব কাগজে দুই বা তিন গুণ বাড়াইয়া লিখিয়াছেন এবং ক্রোরী (আদায়কারী) পদের উমেদারগণকে পরগণার এই বর্ধিত কাগজী রাজস্ব (যাহা আসল উৎপত্তি হইতেও অধিক) উসুল করিতে [illegible] পরিবর্তনে করিতেন এবং পরিবর্তনকালে অর্থ গ্রহণ করিতেন। জমি সংক্রান্ত এই অনিশ্চয়তায় গ্রাম-গুলি জনশূন্য হইয়া পড়িত, কারণ বলপূর্বক রাজস্ব আদায়ের পেষণে কৃষকগণের জীবন দুর্বিষহ হইয়া পড়িত এবং ইহা দিতে অক্ষম হওয়ায় তাহারা পলাইয়া যাইত।

(খ) আবওয়াব (অবৈধ কর)

বৈধ ভূমিকর ও শুল্ক ব্যতীত বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পীড়াত্মক কর আদায় করা হইত। বিক্রয়কারী, ক্রেতা, ব্যবসায়ী ও পেশাদার-দিগের উপর এই সমস্ত অবৈধ সাক্ষাৎ কর (Direct Tax) মুসলমান নৃপতিগণ (যথা : সিরাজ তুঘলক : ১৩৭৫; আকবর : ১৫৯০; আওরঙ্গজেব : ১৬৭৩) বারম্বার নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কর্মচারি-বৃন্দের ধূর্ততার জন্য ইহারা শীঘ্রই অন্যরূপে পুনর্বার উপস্থিত হইত। বাদশাহী নিষেধ সত্ত্বেও একই জিনিসের উপর দুই বা তিনবার কর ধার্য করা হইত।

(গ) স্থানীয় কর্মচারীদিগের ব্যক্তিগত ব্যবসায়

স্থানীয় কর্মচারিগণ পীড়নের অন্য একটি উৎস। সওদা-ই-খাস (ব্যক্তিগত ব্যবসায়) সম্বন্ধেও সম্রাটের পুনঃকৃত প্রতিষেধ অগ্রাহ্য করিত। উৎপাদক ও খাদক উভয়কেই সমভাবে এই পরোক্ষ কর স্থাপনের বোঝা বহন করিতে হয়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে এই বিশেষ লক্ষণটি বর্তমান যুগের কালোবাজারের সহিত সহজেই তুলনা করা যাইতে পারে।

বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই ব্যক্তিগত ব্যবসায় করিতেন। যেমন বাংলার সুবাদার সুজা, মীরজুমলা, শায়েস্তা খান, আজিমু-উশ শান বাংলায় আসিবার পূর্বেই কর্ণাটক প্রদেশে নবাব মীরজুমলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল একচেটিয়া ব্যবসায় (Monopoly)। বিজিত দেশে কোরা বা অধৌত বস্ত্রে তিনি নিজের একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপিত করেন এবং শতকরা বিশ ভাগ মুনাফায় তাহা বিক্রয় করিতেন। খাদ্যশস্যেও তাঁহার একচেটিয়া অধিকার দৃঢ় ছিল। তাঁহার এলাকার মধ্য দিয়া যে ধান্য ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য মাদ্রাজে চালান যাইত তাহার উপর শুল্ক ধার্য করা হইত ও বাজার দর অপেক্ষা শতকরা পঁচিশ ভাগ অধিক মূল্যে ধান্য নাগরিকদিগের নিকট বিক্রয় করা হইত। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে তিনি বাংলায় এক অসামান্য কর আদায় করেন। তিনি ঢাকায় শস্য ব্যবসায়ীদের নিকট ৫০,০০০ টাকা দাবী করেন এবং অবশেষে বলপূর্বক তাহাদিগকে ২৫,০০০ টাকা দিতে বাধ্য করেন। এই কঠোরতায় পূর্ব হইতে সতর্ক হইয়া নগরশ্রেষ্ঠীরা তাঁহাকে তিন লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

বাংলার গভর্ণর (১৬৬৪-৮৮) হিসাবে নবাব শায়েস্তা খান প্রথমে ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকার ও নিষিদ্ধ আবওয়াবগুলি রদ করিয়া দেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে অধীনস্থ তাবেদারগণ তাঁহার অনবহিত প্রশাসনের সুযোগ লইয়া স্বচ্ছন্দে জনসাধারণকে নিষ্পেষণ করিত এবং পুরাতন পদ্ধতি পুনরায় চালু করিয়া তাঁহার অমিতব্যয়ী ভোগবিলাসের ইন্ধন জোগাইত।

স্থানীয় শাসক ও ফৌজদারগণ পা[illegible] [illegible] গাঠরী খুলিয়া নিজেদের [illegible]

দ্রব্যগুলি খামখেয়ালী মূল্যে বলপূর্বক আত্মসাৎ করিতেন। জাহাঙ্গীরের নিষেধ সত্ত্বেও এই অনিষ্টকর প্রথা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ (যথা আজিম উশ-শান) কর্তৃক প্রচলিত ছিল।

(ঘ) মুনাফাবাজী, কালোবাজার ইত্যাদি

মুনাফাবাজী, কালোবাজার, মালবাঁধাই প্রভৃতি দুর্নীতিগুলি মধ্যকালীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। আলাউদ্দীন খিলজীর সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী মন্তব্য করিয়াছেন, 'অতি অবাধ্য ব্যবসায়ীদের দমন করা অপেক্ষা অরণ্য পরিষ্কার করা অথবা দূরদেশ জয় করা সহজ।' সেই সময়ে ব্যবসায়ীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল! দিল্লীতে অবস্থিত খুচরা বিতরণকারী এবং স্বার্থবাহ অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ বণিক যাহারা বাহির হইতে দিল্লীতে শস্য আনিত। উভয় শ্রেণীর বণিকগণই বিপুল লাভ করিত। বাজারে দালালগণ দর নির্দিষ্ট করিয়া দিত এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই প্রবঞ্চিত করিত। ব্যবসায়ীরাও অধিক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিত এবং ওজন কম দিত। দিল্লীতে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করিতে দৃঢ় সংকল্প লইয়া আলাউদ্দীন খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণ করেন। তিনি শস্যবাজারও স্থাপিত করেন যাহাতে সেখানে জনসাধারণ এবং ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারে। ব্যবসায়ীদের মুনাফা বন্ধ হইয়া গেল, দিল্লীর দোকানীগণ বিরক্ত ও হতাশায় মুহ্যমান হইল এবং ভ্রাম্যমাণ বণিকগণ শস্য আনয়ন করা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুলতান ভ্রাম্যমাণ বণিকদিগকে তালিকাভুক্ত হইতে বাধ্য করেন। বাজারের সাহানা বা তত্ত্বাবধায়ক তাহাদের নজরবন্দী করিয়া রাখেন এবং সমবেত ও স্বতন্ত্র একরারনামা না লিখিয়া দেওয়া পর্যন্ত এবং বাজারে নিয়মিত শস্য সরবরাহ দিতে ও নির্ধারিত দরে বিক্রয় করিতে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে মুক্ত করেন নাই। সুলতান গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলের শাহানাগণ ও মুৎসরুরিফান (ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরগণ)-কে কৃষকদিগের নিকট হইতে যে কোন প্রকারে শস্য সংগ্রহ করিবার আদেশ দেন। কালোবাজারী ও মুনাফাবাজী বিলুপ্ত হইল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যাহাতে শস্য সংগ্রহ করিতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য তিনি প্রতি মহল্লায় দুটি বা তিনটি শস্যপূর্ণ সরকারী আড়ৎ বা শস্যগোলা স্থাপিত করেন। প্রয়োজন হইলে সেই গোলা হইতে ভ্রাম্যমাণ বণিকদিগকে নির্ধারিত দরে বাজারে বিক্রয়ের জন্য শস্য বিতরণ করা হইত। অবশ্য শস্য এত অধিক সংগ্রহ হইয়াছিল যে, ত্রিশ বৎসর পরেও গোলার মৌজুদ চাল আফ্রিকার পর্যটক ইবন বতুতা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খাদ্য নিয়ন্ত্রণ (Rationing) প্রথাও চালু করেন এবং ইহাতে কোন ত্রুটি হইলে কর্মচারী এবং পরিদর্শকগণ তিরস্কৃত হইতেন। খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যেরও মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল,—যথা বস্ত্র, অশ্ব, গবাদি পশু, ক্রীতদাস, মিছরি, শাকসব্জী, রুটি, চিরুণী, চটি, জুতা, কুঁজা, সূচ, সুপারি, পান ইত্যাদি। আলাউদ্দীন অসম্পূর্ণ মূল্য নির্ধারণে বিশ্বাস করিতেন না।

দুর্নীতি দমনের জন্য তিনি কর্মচারিগণকে ব্যাপক ক্ষমতা ও সুবিধা দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা বলপ্রয়োগ, বাধ্যকরণ ও ভয় প্রদর্শন এই তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন। ক্রেতারা যথার্থ মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারিয়াছেন কিনা, সে বিষয়ে বাজার-পরিদর্শকগণ তাঁহাদের নিকট অনুসন্ধান করিতেন ও যে সমস্ত ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মূল্য লইতেন তাঁহাদিগকে সুলতানের আদেশ লংঘন করার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। যথা বলপ্রয়োগ, পীড়ন, অসদ্ব্যবহার ও প্রকাশ্যে কশাঘাত। ওজন কম হইয়াছে কিনা এই সম্বন্ধে সুলতান নিজে অনুসন্ধান করিতেন ও ইহা প্রমাণিত হইলে দেওয়ান, ই-রিয়াসৎ দোষী দোকানীর নিতম্বদেশ হইতে সম পরিমাণ অংশ কাটিয়া লইতেন। শঠ দালাল ও কুটিল দোকানদারগণ বাজার হইতে বিতাড়িত হইত।

মুঘল আমলেও বাজারে দুর্নীতির প্রকোপ ছিল। এবং ইহা দমন করিবার জন্য দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের। বস্তুতঃ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বর্তমান যুগের কালোবাজারী প্রথা ব্যাপকভাবে চালু ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। গুজরাটে ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য কর্মচারিগণ বলপূর্বক বিক্রেতাগণের নিকট হইতে বাজারদর অপেক্ষা কম দরে জিনিস ক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীদিগের নিকট উহা বলপূর্বক অধিক দরে বিক্রয় করিতেন। আওরঙ্গজেবের ২০ নভেম্বর, ১৬৬৫-এর ফরমান (আদেশ) হইতে জানা যায় যে, "অনেক পরগণায় মুৎসদ্দীরা (আদায়কারী) শেঠীরা (গণ্যমান্য বণিক) ও দেশাইরা (গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি) নূতন ফসলের শস্য বাজারে বিক্রীত হইবার সময় জনসাধারণকে সুযোগ না দিয়া সমস্তটাই নিজেরা ক্রয় করিয়া লইত এবং ইহার জন্য ইহার মধ্যে যাহা গলিত বা নষ্ট হইয়া যাইত তাহাই ব্যবসায়ীদিগের নিকট বলপূর্বক উত্তম শস্যের দরে চাপাইয়া দিত। গভর্ণর ও ধনী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উদ্যানে অথবা সরকারী উদ্যানে প্রত্যেক প্রকারের শাকসব্জী ও ফলের চাষ করিতেন এবং ন্যায্য মূল্যের দ্বিগুণ দরে সব্জি বিক্রেতাদিগের নিকট ছাড়িতেন। আহমদাবাদ ও সেই প্রদেশের পরগণায় কেহ কেহ চাল ক্রয় ও বিক্রয়ের একচেটিয়া ব্যবসায়ের ইজারা লইয়াছিল এবং তাহাদের বিনা অনুমতিতে কেহই চালের কারবার করিতে পারিত না সেইজন্য গুজরাটে চাল অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়া পড়ে।"

(ঙ) বিদেশীয়দিগের মধ্যে দুর্নীতি

দুর্নীতির বিষ যে শুধু ভারতীয়দিগের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে। বিদেশী বণিকগণও অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ ছিল। এখানে শুধুমাত্র তাহার দুইটি বিশেষ প্রকাশ সম্বন্ধে উল্লেখ করিব। (১) সোরার কারবার— সোরা (Salt Petre) হইতে বারুদ তৈয়ারী হইত বলিয়া ইহা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে রপ্তানি করা হইত। বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি ইহা সংগ্রহ করিবার জন্য লালায়িত থাকিত। কিন্তু ইহার কারবার মধ্যযুগে মুঘল সম্রাটের একচেটিয়া ছিল। তাঁহার অনুমতি ব্যতীত অন্য কেহ ইহার ব্যবসায় করিতে পারিত না। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অজ্ঞাতসারেই স্থানীয় কুঠিয়ালগণ ছলনাত্মক উপায়ে এই অবৈধ ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিত। পরিষ্কৃত সোরা দেখিতে অবিকল চিনির দানার

পাচার করিত। কিন্তু ১৬৩০—৩২ খৃঃ অব্দে বিখ্যাত গুজরাট দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্যদ্রব্য যাহাতে গোপনে পাচার না হয় সেজন্য মুঘল প্রশাসনিক আদেশ জারী হইয়াছিল। সুতরাং কোম্পানীকেও স্বীয় সুনাম রক্ষার্থে কুঠিয়ালগণকে এই পন্থা হইতে নিরস্ত হইবার জন্য আদেশ দিতে হয়।

(২) ইউরোপীয়গণের ব্যক্তিগত ব্যবসায়। ইংরাজ ওলন্দাজ ও অন্যান্য কোম্পানীর স্থায়ী সেবক ব্যতীতও বহু স্বতন্ত্র ব্যক্তি (Free Men) ভাগ্যান্বেষী আসিয়া ও ব্যক্তিগত ব্যবসায় করিয়া প্রচুর অর্থলাভ করিত। ইহারা কোম্পানীর আমদানী ও রপ্তানি সংক্রান্ত সুবিধাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করিত। কুঠিয়াল ও সেবকগণের বেতন অত্যন্ত কম ছিল এবং এই অসদুপায়ে তাঁহারা অর্থাগমের সুবিধা উঠাইতেন। এই গোপনে অনুসৃত অনুচিত ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পিছনে ছিল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ, মুঘল প্রশাসনের কর্মচারিগণ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী, দালাল ও বেনেগণ। এই প্রথার প্রচলন এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ইহা আর গোপন রাখিতে পারা যায় নাই—প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। জাহাজের খোলে যাহাতে গোপনভাবে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের দ্রব্য পাচার না হইতে পারে সেজন্য ইংরাজ ও ভারতীয় রক্ষী নিযুক্ত হইত কিন্তু ইহারাও এত দুর্নীতিপরায়ণ ছিল যে, ইহা প্রতিরোধ করা অসম্ভব বলিয়া সুরাটের প্রেসিডেণ্ট ও কৌন্সিল কোম্পানীকে অবহিত করেন (৬ই জানুয়ারী, ১৬৪৮)।

দুর্নীতির দর্পণে

ইংরেজ যুগ

প্রতুল গুপ্ত

জব চার্ণক সূতানুটির ঘাটে নোঙর ফেললেন। ২৪শে জুলাই ১৬৯০ সাল। তখন শেষ বর্ষা। বৃষ্টিতে সূতানুটি গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। আগের বছর গঙ্গার ধারে কোম্পানীর লোকেরা কয়েকটি চালা তুলেছিল। বৃষ্টিতে ও গ্রামের লোকেদের উৎপাতে তার চিহ্ন নেই। ফৌজদারের সঙ্গে কোম্পানীর তখন বিবাদ চলছিল। খেসারত দিয়ে জব চার্ণক ঝগড়া মিটিয়ে নিতে চাইলেন। আর চাইলেন সূতানুটিতে বাস করবার অনুমতি। আওরঙ্গজেব, কিম্বা তাঁর পিতা পিতামহ কেউ বাংলাদেশে আসেননি। সূতানুটি কোথায় সে সম্বন্ধে তাঁর খুব অস্পষ্ট ধারণা ছিল। জব চার্ণকের দরখাস্ত পেয়ে তিনি সাম্রাজ্যের মানচিত্র চেয়ে পাঠালেন। দক্ষিণ বাংলায় নদীর ধারে ছোট গ্রাম, ইংরাজদের বসতি করবার অনুমতি দিতে তাঁর আপত্তি হল না। বাংলায় ইংরেজী আমলের সূত্রপাত হল।

আওরঙ্গজেব দানপত্র করে গিয়েছিলেন মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ছেলেদের মধ্যে ভাগ হবে। আশা ছিল, তাঁর যৌবনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই জানেন তাঁর এ আশা পূর্ণ হয়নি। তাঁর মৃত্যুর দশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের সঙ্গে দিল্লীর যোগ ক্ষীণ হয়ে এল। এবং পঞ্চাশ বৎসর পরে বাংলার নবাব ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করলেন। আরও কয়েক বৎসর পরে ইংরেজ নামেও বাংলাদেশের রাজা হলেন। পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে তখনও বাদশাহী জৌলুসের কিছু অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু সে কেবল সূর্যাস্তের সোনা। পুরনো আমল শেষ হয়ে এসেছে।

পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের ফল কি দাঁড়াবে এ কথা ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে লাগল। যে শাসন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল তাকে কিঞ্চিৎ মেরামত করে ইংরেজরা কাজে লাগাবার চেষ্টা করলেন। নতুন শাসনে কি পরিবর্তন হয়েছে লোকের চোখে পড়তে দেরী হয়নি। দুই আমলের কি প্রভেদ, উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হবে।

"...একদিন রাত্রিশেষে ভূষণা নগরের একটি সরু গলির ভিতর, পথের উপর একজন মুসলমান ফকির শুইয়াছিল। ফকির আড় হইয়া একেবারে পথ বন্ধ করিয়া শুইয়া আছে। এমন সময়ে সেখানে একজন পথিক আসিয়া উপস্থিত হইল। ...পথিক হিন্দু...তাহার নাম গঙ্গারাম দাস।... বাড়ীতে মাতা মরে, অন্তিমকাল উপস্থিত। তাই তাড়াতাড়ি কবিরাজ ডাকিতে যাইতেছিল।... গঙ্গারাম সহসা ফকিরকে লঙ্ঘন করিয়া [illegible]ন না।...গঙ্গারাম যোড়হাত [illegible] অনেক অনুনয় বিনয় এবং কাতরোক্তি করিল, ফকির কিছুতেই নড়িল না, কথাও কহিল না। অগত্যা গঙ্গারাম তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল। লঙ্ঘন করিবার সময় গঙ্গারামের পা ফকিরের পায়ে ঠেকিয়াছিল; বোধ হয়, সেটুকু ফকিরের নষ্টামি।...পাইকেরা গঙ্গারামকে বাঁধিয়া মারিতে মারিতে কাজির কাছে লইয়া গেল।...গঙ্গারাম কাজি সাহেবের কাছে আনীত হইলে, তাহার বিচার আরম্ভ হইল। ফরিয়াদি শাহ সাহেব—সাক্ষীও শাহ সাহেব এবং বিচারকর্তাও শাহ সাহেব। কাজি মহাশয় তাঁহাকে আসন ছাড়িয়া দিয়া দাঁড়াইলেন এবং ফকিরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে, কোরাণ ও নিজের চশমা এবং শাহ সাহেবের দীর্ঘবিলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রুর সম্যক সমালোচনা করিয়া, পরিশেষে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইহাকে জীয়ন্ত পুঁতিয়া ফেল।"

এই উদ্ধৃতির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় আছে। সীতারাম ঐতিহাসিক গ্রন্থ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের পূর্বাহ্নেই সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। উপরে লিখিত কাহিনী কাল্পনিক; কিন্তু এ জাতীয় ঘটনা অসম্ভব ছিল না। অন্যদিকে ভারতবর্ষের যে অংশ তখনও হিন্দু অধিকারে ছিল সেখানেও মুসলমান প্রজার নিগ্রহ একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কর্ণওয়ালিসের সময় থেকে যে শাসনযন্ত্র চালু হয়েছিল সে পূর্বেকার চেয়ে অনেক সুদৃঢ়। যেখানে কেবল হিন্দু মুসলমানের বিবাদ, সেখানে বিচারের ফল নিরপেক্ষ হবে এই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস। অবশ্য বাদী কিম্বা প্রতিবাদী ইংরেজ হলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এ[...] জন ইংরেজ জজ বলেছিলেন এক[...] **"Intelligent native"**. কে বিচারের [...] দিলে তারা ইংরেজের চেয়ে ভাল বিচার কর[...] সে যাই হোক ভারতীয়দের মধ্যে ঝগড়া বি[...] ইংরেজ বিচারকের নিরপেক্ষতার উপর লো[...] মোটামুটি আস্থা ছিল। কাজীর বিচারের [...] ইংরেজ হাকিমের বিচার যে অনেক ভাল [...] বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। এক সময় দিল্লী[...] ও জগদীশ্বরের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হ[...] কালক্রমে দিল্লীশ্বরের নাম লুপ্ত হয়ে[...] কিন্তু পরবর্তী যুগে দিল্লীশ্বরী মহার[...] ভিক্টোরিয়া প্রায় জগদীশ্বরীতে পরি[...] হয়েছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্রামা[...] লোকেদের সঙ্গে ইংরেজদের সংস্পর্শ [...] সামান্য ছিল। সীতারাম নামে ইস্ট ইণ্ডি[...] কোম্পানীর একজন সিপাহী ১৮৬১ [...] আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তিনি অযো[...] তিলোয়ী গ্রামের লোক। ছেলেবেলায় [...] শুনেছিলেন যে সাহেবরা ঠিক মানুষ [...] কোন কোন প্রাণীর মত তাদের জন্ম [...] থেকে। সীতারাম অবশ্য পরবর্তীকালে অ[...] ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে কাজ করেছেন [...] ইংরেজদের অনেক দোষ তাঁর চোখে পড়ে[...] কিন্তু তা হলেও কাজীর বিচারের [...] কোম্পানীর বিচার যে ভাল ছিল এ [...] তাঁর বুঝতে দেরী হয়নি। কেন কোন দুর্নী[...] উৎপত্তি এত প্রাচীন যে সে নিয়ে কোন উ[...] বাচ্য হত না। চাকুরি পেতে হলে উপরওয়াল[...] কাঞ্চনমূল্যে খুসী করতে হত। সেটা ধর্ত[...] মধ্যেই ছিল না। সীতারাম ড্রিল হাবিলদা[...] তার 'প্রাপ্য' ষোল টাকা না দেবার ফলে মুস্কি[...] পড়েছিলেন। অবশ্য সব টাকাই যে হাবিলদা[...] পকেটে আসত তা নয়, এর এক অংশ উপ[...] য়ালা ফিরিঙ্গী কিম্বা ইংরেজ সার্জেণ্টকে [...] হত। সমস্ত জীবন কোম্পানীর নিমক [...] বৃদ্ধ বয়সে সীতারামের ধারণা হয়েছিল ইংরেজ সরকারের সব কর্মচারী দুর্নীতিপর[...] —হিন্দু মুসলমানে কোন তফাৎ নেই। সা[...] লোকের বিশ্বাস ছিল চাপরাশীদের যে সেল[...] দিতে হয় তার এক অংশ কালেকটর সাহে[...] হাতে গিয়ে পৌঁছয়। সীতারামকে এ[...] ডেপুটি কমিশনারের দপ্তরে যেতে হয়ে[...] সেখানকার আমলা পেয়াদাদের পাঁচ টাকা দিতে রাজী না হওয়ায় মিথ্যা মামলায় জ[...] পড়ে তাঁকে দশ টাকা জরিমানা দিতে হয়ে[...] এ রকম উদাহরণ অনেক আছে। যখন ন[...] করদের সঙ্গে নীলচাষীদের বিবাদ চল[...] তখন বিচার বিভ্রাটের সীমা ছিল না। এ

গ্রামে যেমন অনেক জমিদার দারোগার সঙ্গে ভাব রেখে চলতেন, নীলকররাও তেমনি স্থানীয় জজ ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্তরঙ্গ ছিলেন; খানা, শিকার এবং পার্টিতে এই অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পেত। দেশী লোকের সুবিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। 'নীল দর্পণে' 'রোগ' সাহেব কিম্বা বিচার দৃশ্য একেবারে নাট্যকারের কল্পনা নয়। ইংরেজদের অনেক দুষ্কর্মের সহায় ছিল দেশী কর্মচারীরা। গোপীনাথ নায়েব কি পদী ময়রাণীর মত চরিত্র দুর্লভ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখরে'র যখন নাট্যরূপ দেওয়া হয় তখন "বিশ্বাস" নামে ধূর্ত, লোভী কোম্পানীর এক গোমস্তার চরিত্র নাটকে যোগ করা হয়েছিল। বিশ্বাসের মত কর্মচারীর অভাব ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন পাঠকের দীনেন্দ্রকুমার রায়ের উপন্যাস "নায়েব মহাশয়" মনে পড়তে পারে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প "নীলগঞ্জের ফালামন সাহেব" অবশ্য অন্য রংএ আঁকা। ফালামন সাহেবের সময় নীলের প্রতাপ অনেক কমে এসেছে।

চাকুরী পেতে হলে কিম্বা সরকারী দপ্তরে কোন কাজে গেলে সেখানে দুএক পয়সা দিতে হত এ তো জানা কথা। জুলুম বেশী না হলে তাতে মনে করার কিছু ছিল না। কিন্তু বাড়ীতে সুন্দরী মেয়ে বউ থাকলে কখনও বিপদ হত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় মহিলার সংখ্যা এদেশে খুব কম ছিল। একটি বিবরণে পাওয়া যায় ১৭৬৩ সালে অর্থাৎ মীরকাশেমের রাজত্বের সময় কলকাতায় অবিবাহিত ইউরোপীয় মহিলার সংখ্যা ছিল মোটে তিন। ইংরেজরা চৌদ্দ পনের বছর বয়সে কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে এদেশে আসতেন। যাঁরা জলহাওয়া মিতাচারের হাত এড়িয়ে রক্ষা পেতেন তাঁরা পরিণত বয়সে দেশে ফিরতেন, কেউ কেউ ফিরতেনই না। এর ফল যা হবার তাই হয়েছিল। রাণী এলিজাবেথের সময় একটি জনপ্রিয় কবিতার এক পংক্তি এই রকম :

My Daphne's hair is twisted gold.

কিন্তু কিছুদিন এদেশে থাকবার পর সুবর্ণকুন্তলা ড্যাফনির ছবি মনের মধ্যে ম্লান হয়ে আসত এবং সে জায়গা দীর্ঘকুন্তলা, আয়তলোচনা, শ্যামাঙ্গিনীরা অধিকার করত। শৈবলিনীর প্রতি লরেন্স ফষ্টরের মনোভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বঙ্কিম বলেছেন : "বঙ্গীয় ইংরাজদিগের মধ্যে তখন ধর্ম শব্দ লুপ্ত হইয়াছিল।" বঙ্কিমচন্দ্রের ভর্ৎসনা সত্ত্বেও বলব লরেন্স ফষ্টরের সৌন্দর্যবোধ ও কবিত্বশক্তি লুপ্ত হয়নি। ভীমা পুষ্করিণীর ধারে শৈবলিনীকে দেখে তার মনে হয়েছিল তুষারময়ী মেরী কি শিখারূপিণী উষ্ণ দেশের সুন্দরীর তুলনীয়া?" বাস্তব জীবনের এ রকম উদাহরণ ছাড়া অন্য রকম দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। জব চার্ণক জোর করে এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে সতী হতে দেননি, তাঁকে বিবাহ করেছিলেন এবং স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কানপুরের ইংরেজ সেনাপতি সার হিউ হুইলার যিনি সতীচৌড়া ঘাটে নানা সাহেবের সৈনাদের হাতে মারা গিয়েছিলেন, তাঁর স্ত্রী ভারতীয় ছিলেন। পাছে ইংরেজ ক্লাবে মহিলাটির অসম্মান হয় এই আশঙ্কায় তিনি নিজেও ক্লাবে যেতেন না।

'অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির' কথা আলাদা। অ্যান্টনি খাঁটি ইউরোপীয় ছিলেন না।

এত সব দুষ্কর্মের বিবরণে যদি মন না ভরে তাহলে অষ্টাদশ শতাব্দীর কলকাতায় আসতে হয়। কলকাতার সাহেবরা অবিশ্বাস্য অল্প সময়ে অগাধ টাকার মালিক হতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দপ্তরে কনিষ্ঠতম পদ ছিল রাইটার বা কেরাণীর। মাইনে বছরে দশ পাউণ্ড। তখন সস্তার দিন। তাহলেও এই টাকায় জীবনধারণ চলত না। বাবুগিরি তো দূরের কথা। স্বাস্থ্য ভাল, অদৃষ্ট প্রসন্ন এবং মুরুব্বীর জোর থাকলে তাঁরা শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের মেম্বার হতে পারতেন। কোম্পানীর দেওয়ানী পাবার পর কাউন্সিলের মেম্বারদের বছরে মাইনে ছিল আন্দাজ ৩০০ পাউণ্ড। ক্লাইভ বলেছিলেন, তিন হাজার পাউণ্ডের কমে তাঁদের খরচ চলা অসম্ভব। কিন্তু এহ বাহ্য। মাইনে থেকে কোনও খরচই চলত না। 'রাইটাররাও কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতায় একাধিক বাড়ী, গাড়ী, অসংখ্য দাসদাসী (তাদের সংখ্যা কখনও কখনও একশ পর্যন্ত হত) সহরের উপকণ্ঠে বাগানবাড়ী ইত্যাদির মালিক হতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় কাউন্সিলের মেম্বারদের এক রাত্রির তাসের জুয়াতে ৪০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত হারজিত হয়েছে। তাতে তাঁরা সর্বস্বান্ত হননি। মাইনের টাকা থেকে এত খরচ করা সম্ভব নয়। এ টাকা কোথা থেকে আসত? উত্তর খুব স্পষ্ট। কোম্পানীর কর্মচারীরা যেসব কাজ করতেন তাতে সুড়ঙ্গ পথে অনেক টাকা আসবার উপায় ছিল যে উপায় তাঁরা অবহেলা করেননি। দেশী বড়লোকদের কাছ থেকে সুবিধা বুঝে ঘুষ কিম্বা জুলুম করে টাকা বের করে নেওয়ার কৌশল সবারই জানা ছিল। সুড়ঙ্গ পথে নিয়মিত আয় ছিল ব্যবসা থেকে। ইংরেজরা বলতেন সম্রাট ফারুকশিয়রের ফারমানে তাঁদের বাংলা বিহার উড়িষ্যায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া আছে। এই 'অধিকারের' ফলে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসাতেও শুল্ক দিতেন না। মুর্শিদকুলি খাঁ কিংবা মীর কাশিম ফারমানের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নি। এই নিয়ে ঝগড়ার ফলে মীর কাশিমের সর্বনাশ হয়েছিল।

এই বিনা শুল্কে ব্যবসার মালিক ইংরাজরা ছিলেন। তাহলেও মূলধন আসত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। তাঁরা টাকা যোগাতেন এবং ব্যবসা দেখতেন। শুল্ক ফাঁকির ফলে অনেক লাভ হত, তার বেশীর ভাগই যেত নামেমালিক ইংরাজদের পকেটে। কোম্পানী যখন নিজে রাজস্ব আদায়ের ভার নিতে আরম্ভ করলেন, তখন এমন লাভের কারবার তুলে দেওয়া হল।

পলাশীর সময় থেকে রাতারাতি নবাব বদলে যাবার ফলে টাকা হাতে আনবার আর একটি উপায় আবিষ্কৃত হয়েছিল। নতুন নবাবকে কলকাতার কাউন্সিলের প্রীত্যর্থে সদস্যদের অনেক টাকা 'উপহার' দিতে হত। কখনও কখনও সামান্য অংশ কাউন্সিলের বাইরে গিয়েও পৌঁছত। সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ক্ষতিপূরণের জন্য মীর্জাফর পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এক কোটি টাকা ও কলকাতার সাহেবদের পঞ্চাশ লাখ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেছিলেন। পলাশীর পরে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় টাকা নিয়ে আসতে ২০০ নৌকার দরকার হয়েছিল। মীর্জাফর খুশী হয়ে কলকাতার বিশিষ্ট সাহেবদের যে টাকা উপহার দিয়েছিলেন তার পরিমাণ ৫২ লাখের বেশী। এর মধ্যে ক্লাইভ নিজে পেয়েছিলেন চার লাখ আশী হাজার। তিন বৎসর পরে মীরজাফরকে সরিয়ে দিয়ে মীর কাশিম যখন নবাব হলেন তখনও তাঁকে মুক্তহস্তে অর্থবৃষ্টি করতে হয়েছিল। অবশ্য কোষাগারের টাকা তখন অনেক ফুরিয়ে এসেছে। মীরজাফরের মৃত্যুর পর যখন তাঁর ছেলে নাজিমউদ্দৌলা মসনদে বসলেন তখনও তিনি কাউন্সিলের সদস্যদের বারো লাখ টাকা না দিয়ে নিষ্কৃতি পান নি।

পলাশীর কয়েক বৎসর পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা অনেকটা সতর্ক হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বার গভর্ণর হয়ে এসে ক্লাইভ দুর্নীতি দমনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর পূর্ববর্তী জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কোনও কোন সহকর্মী তাঁকে পরিহাস করেছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসকে একবার রাজা চৈৎ সিং কয়েক লাখ টাকা ঘুষ দিয়েছিলেন। হেস্টিংস অবশ্য সে টাকা নিজে ভোগ করেন নি। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে খরচ করা হয়েছিল। অযোধ্যার বেগমদের বিপদের কথা এবং নন্দকুমারের বিচার-বিভ্রাট সর্বজনবিদিত। মুন্নি বেগমকে বালক নবাবের অভিভাবিকা করা নিয়ে কানাকানির অন্ত ছিল না এবং তার ফল অনেকদূর গড়িয়েছিল। টাকা পয়সার ব্যাপারে কোম্পানীর উচ্চকর্মচারীরা সবসময় শুকদেব ছিলেন না। ময়দানে নতুন কেল্লা ফোর্ট উইলিয়মের কাজ যখন আরম্ভ হল তখন প্রধান ইঞ্জিনীয়র ক্যাপ্টেন ব্রোহিয়া অনেক টাকা তছরুপ করে ভারতবর্ষ ছেড়ে পালিয়ে যান। তাঁকে ধরা সম্ভব হয় নি। এই কারণে কেল্লার কাজ শেষ হতে অনেক দেরী হয়েছিল।

এই জাতীয় দুর্নীতি অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে অন্য দেশেও প্রচলিত ছিল। উপরতলার লোকদের দুর্নীতির ফল হয় সাংঘাতিক কিন্তু টের পেতে কখনও কখনও দেরী হয়। ছোট ও মাঝারি সরকারী কর্মচারী যাঁরা সব সময় সাধারণের সংস্পর্শে আসেন শাসনের সুনাম-দুর্নাম তাঁদের উপরে অনেকটা নির্ভর করে। ইংরেজের শাসনকে যে দেশের সাধারণ লোক এত ঘৃণা করতে শিখেছিল তার একটি প্রধান কারণ দেশী পুলিশ ও অ্যাঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টের ঔদ্ধত্য। শাসনযন্ত্রের দুর্নীতি প্রায় স্বাভাবিক উপায়ে সর্বকালে সব দেশেই দেখা দেয়, সেজন্য নানা উপায়ে শোধনের ব্যবস্থা রাখতে হয়। কালিদাস সাধারণ লোকের সঙ্গে নগরপালের ব্যবহারের যে চিত্র দিয়েছেন, তাতে তখনকার আরক্ষ বিভাগের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ পায় নি। মৃচ্ছকটিকের লেখক রাজশ্যালককে অনেক দুষ্কর্মের জন্য দায়ী করেছেন। এখন রাজাদের বড় দুঃসময়। তাঁরা নেই বললেই চলে। কিন্তু রাজশ্যালকেরা অন্য নামে মর্তলোকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন।
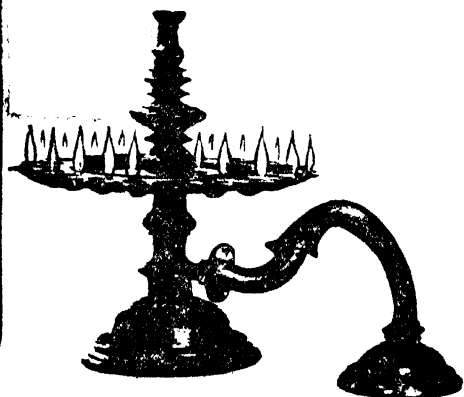
পরলোকগত নায়ক

ফোটো : তারক দাস

পৃথিবী থেকে চাঁদের এক পিঠ মাত্র দেখি। উল্টো পিঠ সম্পর্কে আমাদের চিরকালের কৌতূহল। সেই কৌতূহল এত দিনে মিটল। মহাকাশযান ওপিঠের ফোটোগ্রাফ তুলে আমাদের হাতে এনে দিয়েছে। এপিঠের মতোই অবিকল। কিছুমাত্র তফাৎ নেই। সেখানেও মরুভূমি, সমুদ্র ও পর্বতমালা। তাদের নামকরণও হয়েছে। যথা : সোভিয়েত পর্বতমালা, এডিসন ক্রেটার, জোলিও কুরী ক্রেটার, পাস্তুর ক্রেটার, মস্কো সমুদ্র ইত্যাদি।

| এক |

ফিরছে আজ ভাস্কর। দমদম এরোড্রোমে নীরদবরণ প্রতীক্ষা করছেন। সঙ্গে আছে ললিতা—সিতাংশুর স্ত্রী। সিতাংশুও ভাস্করের সঙ্গে এক প্লেনে আসছে।

শম্পাকেও বলেছিলেন নীরদ : ননদ-ভাজ দুজনেই চলো তোমরা। শম্পা আর ললিতা কাল কেক নিয়ে নীরদের বাড়ি গিয়েছিল। শম্পার নিজ হাতে বানানো কেক, নতুন শিখেছে। বলে, একলা করেছি কাকাবাবু। হাতেও দেয়নি কেউ, বউদিকে জিজ্ঞাসা করুন। এক্ষুণি খেতে হবে, খেয়ে বলুন কেমন হয়েছে।

শম্পাকে তখন যাবার কথা বললেন। শম্পা ঘাড় নাড়ে। রাজি নয়, এটা-ওটা অজুহাত দেখিয়ে কাটিয়ে দিল। অভিমান? কিম্বা তার চেয়েও বেশি বোধহয়। সন্দেহ, অপমানের শংকা।

লাউডস্পীকারে খবর হল : এসে পড়েছে প্লেন। দিগন্তে ছোট্ট এক পাখির মতো। গর্জন প্রচণ্ডতর হল। রানওয়ের উপর দিয়ে ধেয়ে আসে প্লেন এদিকে।

এক ছেলে নীরদবরণের, তাকে বিলাতে পাঠালেন। পড়াশুনো নয়, স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডি অঞ্চলটা দেখে আসবে ভাল করে। চটশিল্পের পুরানো ঘাঁটি—জুটমিলের কাজকর্ম দেখবে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাজের ব্যবস্থা ভাল করে জেনে বুঝে আসবে। হাতে-কলমে ট্রেণিং নেবার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন কয়েকটা জায়গায়। যাচ্ছে যখন, দেশটাও মোটামুটি দেখে আসুক। ফিরতে হবে কিন্তু এক বছরে—কম হলে ভাল, বেশি কোনক্রমেই নয়।

সেই এক বছরের জায়গায় তিন তিনটে বছর কেটে যায়, ফিরে আসার নাম নেই। চিঠির পর চিঠি যায়, জবাবও নিয়মিত আসে। ঘুরছে ভাস্কর চরকির মতো—আজ এখানে, কাল সেখানে। বাইরে এসে বুঝতে পারছে, দেখবার ও জানবার কত কি রয়েছে। ইউরোপ-জোড়া ভারতীয় চটের খদ্দের। কোথায় বা নয়—অস্ট্রেলিয়ায়, আমেরিকায়। দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও ছিল এই কিছুকাল আগে পর্যন্ত। এসেছে যখন খদ্দেরের সঙ্গে খানিকটা মোলাকাত করে যাওয়া উচিত। তাদের পছন্দ-অপছন্দ ও প্রয়োজন জেনে বুঝে যাওয়া, নতুন নতুন খদ্দের পাকড়াও করা। এই সমস্ত করে বেড়াচ্ছে ভাস্কর এবং টাকাও জলের মতন খরচ হচ্ছে। সেটা হবেই—ভাস্কর হাল-দারের খরচা একহাতে নয়, দু-হাতে। ফরেন-এক্সচেঞ্জ নিয়ে কড়াকড়ি—কিন্তু ব্যবসাসূত্রে বাইরের সঙ্গেও কোম্পানির লেনদেন রয়েছে,

চাঁদের ওপীঠ

উপন্যাস

মনোজ বসু

লন্ডন থেকেই স্টার্লিং-পাউন্ড সরবরাহের ব্যবস্থা। অসুবিধা কিছু নেই।

হেনকালে এক সাংঘাতিক খবর। স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার। মোটর ছুটিয়ে ভাস্কর কন্টি-নেন্টে বেড়াচ্ছিল। তার মধ্যে এক রাজধানী-শহরে (জায়গার নাম বলা ঠিক হবে না) সাংঘাতিকভাবে একটা মেয়ে জখম হয়েছে। হাসপাতালে আছে। মামলায় ভাস্কর আসামী। প্রাণে বেঁচে গেছে মেয়েটা—সেজন্য আশা করা যায় ক্ষতিপূরণ পেলে টানাহেঁচড়া বেশি হবে না। কিন্তু পরিমাণটা নিশ্চয় অত্যধিক হবে।

নীরদ ব্যাকুল হলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধুরা—শম্পার বাপ হিমাদ্রিও তার মধ্যে,—নীরদকেই দোষ দেনঃ যেমন প্রশ্রয় দিয়ে আসছেন। আরও কি হয়েছে, দেখুন গে। হাটে-মাঠে-ঘাটে বুহকিনীর দল—শ্বেতাঙ্গিনী একটা বউমা-ই হয়তো জুটিয়েছে আপনার জন্যে। চক্ষুলজ্জায় লিখতে পারে না। গিয়ে পড়ে লজ্জা ভাঙিয়ে বউ-ছেলে ঘরে নিয়ে আসুন।

লন্ডনের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ইন্ডিয়া হাউসের কেষ্টবিষ্টুদের একজন—নীরদ তাঁকে লিখলেন হালচালের খোঁজ নেবার জন্য। ঘটনাস্থলে ভারতীয় এমব্যাসি আছে—তাদের সঙ্গে যোগা-যোগ করে বন্ধু খবর জোগাড় করলেন: পেটি-চাপা দেয়নি মেয়েটাকে, ধাক্কা মেরে ভাস্কর গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থা নয় তখন, কিছু বেএক্তিয়ার ছিল।

নীরদ বাড়ি থেকে বেরুচ্ছেন না। লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা। সিতাংশু এসে বলল, অসম্ভব!

তিনটে কারখানা চালান নীরদ। তার একটা সোনার বাংলা কেমিক্যাল ওয়ার্কস। সিতাংশু ম্যানেজার। সে পরিচয় কিছুই নয়—ভাস্করের বাল্যসখা, সহপাঠী। নীরদের পৈতৃক বাড়ি হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীট, সিতাংশু সেই পাড়ারই ছেলে। তার উপরেও আছে—মিলের কাজকর্মে নীরদবরণের ডানহাত বলা হয় তাকে। ডানহাত সিতাংশু এবং বামহাত বলা হত—সে মানুষ পয়লা নম্বরের শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে—গোরদাস। দুয়ের মধ্যে কে ডানহাত, কে বামহাত তাই নিয়ে এমন কি তর্ক উঠতে পারত আগেকার দিন।

সিতাংশু বলে, আমি বিশ্বাস করিনে জ্যেঠাবাবু।

নীরদ আশ্বাস পেলেন তার কথায়। মুখ তুলে বললেন, আমিও না। কিন্তু ভাল করে খবর নিয়েই তো লিখেছে।

সিতাংশু জোর দিয়ে বলে, ভাস্কর এমন হতে পারে না। আপনি নিজে গিয়ে দেখে আসুন।

সে কি আর ওঠেনি নীরদের মনে? কতবার ভেবেছেন, গিয়ে পড়ে হিড়হিড় করে টেনে আনবেন: ভেবেছিস কি রে বজ্জাত ছেলে? আমি যেমন চিরজীবন সংসারে শিকড় বসাতে পারলাম না, তোর জীবনও তেমনি ভাবে যাবে নাকি? সেটি হচ্ছে না। তোর স্থিতি চোখে না দেখে দুনিয়া থেকে নড়ব না।

ইচ্ছে হয়েছে এমনি অনেকবার, কিন্তু উপায় নেই। ছেলে দূরে গিয়েছে, ছেলের মতন আর একটি আছেন। দেববিগ্রহ—শ্রীগোপাল। নিত্যপূজা নীরদবরণ নিজের হাতে করেন। ঠাকুরকে সামনে বসিয়ে ধ্যানধারণায় সকাল-সন্ধ্যার অবসরটুকু কী আনন্দে কাটে, সে জিনিস প্রকাশ করে বলার নয়। শ্রীগোপালের সঙ্গ ছেড়ে স্বর্গধামেও যেতে চান না তিনি।

আর এখন এই নোংরা ব্যাপারের মধ্যে যাওয়ার তো কথাই ওঠে না। সিতাংশুর প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে নীরদ বললেন, আমি নয়, তুমি চলে যাও সিতাংশু। তুমি গেলে বেশি কাজ হবে। তন্নতন্ন করে দেখে বুঝে আসবে। যত টাকা লাগে, উদ্ধার করে আনো আমার ছেলে। ছেড়ে এসো না।

আজকে তারা ফিরে এলো। কেবল করে সিতাংশু সংক্ষেপে জানিয়েছিল, সন্দেহ ও রটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। নীরদবরণের অবস্থা দেখে গিয়েছে, সেজন্য মিথ্যা প্রবোধও হতে পারে। সত্যমিথ্যা যাচাই হবে এখনই। সিঁড়ির মুখে সিতাংশু বেরুল, পিছনে ভাস্কর। হে ঠাকুর, হে শ্রীগোপাল, তৃতীয় ব্যক্তি মেমসাহেব-টাহেব প্লেনের খোপ থেকে না বেরিয়ে পড়ে যেন ওদের পিছনে। নীরদ অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন, অন্তরাত্মা কাঁপছে।

না, তৃতীয় কেউ নেই সঙ্গে মোটমাট দুজনই। ঝকঝকে বিশাল গাড়িতে উঠতে গিয়ে ভাস্কর হেসে ওঠে, উঃ বাবা, দুহাতে খরচা করেও তোমায় হারাতে পারলাম না। একলা সাধ্য নয় আমার। ভাই কি বোন থাকত দু-চারটে—একসঙ্গে সকলে চেষ্টা করে দেখতাম।

সেই ভাস্করই বটে! প্রসন্ন হাসিতে নীরদবরণের মুখ ভরে গেল। ভাস্করের বদল হয়নি—মুখে সেই পুরোনো রসিকতা। বাপ ছেলের নিরন্তর পাল্লা চলেছে। বাপ রোজগারের দিকে, ছেলে খরচের দিকে—কে কাকে হারাতে পারে সেই চেষ্টা।

গাড়িতে ভাল হয়ে বসে নীরদ ছেলের কথার জবাব দিলেন: খুব তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে। মানুষ পাঠিয়ে ধরে আনতে হল। এবারে উল্টো—তোমার কাঁধে বোঝা চাপিয়ে আমি পালাব। দেশদেশান্তর যাচ্ছিনে, হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটে পুরানো বাড়িতে আমার শ্রীগোপালের সঙ্গে গঙ্গাবাস করব। তোমার মতন ছটফটে নন গোপাল—বড় শান্ত।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ভাস্কর বলে, বেশ তো, বেশ তো।

তিন বছরের বিস্তর জমানো কথা মুখে এসে ভিড় করছে। সিতাংশু গিয়ে বলেছে নিশ্চয়, তবু নীরদ ধৈর্য ধরতে পারেন না। বললেন, মিল নিয়ে নানান ঝামেলা। তুমি দেখে গিয়েছিলে, দিনকে দিন অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠছে।

হোক না—! অবহেলার ভঙ্গিতে ভাস্কর বলে, এইবারে সব ঠিক হবে, আমি তৈরি।

আবার বলে, দেখে এলাম বাবা, চারটে মুল্লুক এক একজনের হাতে। এখানে তো দুটো লোকেই কান্নাকাটি পড়ে যায়। পুরোনো নিয়মে চলবে না, ভাঙাগড়া হবে। নতুন সব আইডিয়া নিয়ে এসেছি। বিদেশে টাকা তোমার অপচয় করে আসিনি।

নীরদবরণ তৃপ্তি পেলেন। এই তো চাই। প্রথম নীরদবরণ কাজে নামলেন, সব চেয়ে বড় সম্বল তখন আত্মপ্রত্যয়। তারই জোরে শিল্পপতি হিসাবে আজ প্রতিষ্ঠা। পড়তে পড়তে কতবার টাল সামলেছেন প্রত্যয় শক্ত আঁকড়ে ধরে। ছেলের কণ্ঠেও সেই প্রত্যয়ের ধ্বনি।

ললিতা নীরদের পাশটিতে চুপচাপ ছিল। টাকা অপচয়ের কথায় সে বলে ওঠে, মামলা মেটাতেও তো অনেক লেগে গেল—আঁ?

ঘাড় নেড়ে ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়: অনেক, অনেক। বিদেশী মুদ্রার ব্যাপারে এত ঝঞ্ঝাট, বাবার ব্যবস্থার গুণে টাকা যেন জলের ধারে এসেছে। বাবা তুমি জাদু জানো।

নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে নিজেই সেই গল্প শুরু করে দেয়: গাড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিলাম একটা মেয়েকে। সারা মুখ বিশ্রী রকম কেটে-কুটে গেল। হাসপাতালে চিকিৎসার পরেও গর্ত-গর্ত হয়ে আছে এখানে-ওখানে। সে গর্ত জীবনে ভরাট হবে না। মুখের চেহারা সব চেয়ে বড় সম্পদ ওদের—

মৃদু হেসে ললিতার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে টিপ্পনী কাটে: এদেশেও কি নয়? মোটা দাম নিয়ে তবে রেহাই দিয়েছে।

নীরদ লজ্জা পেয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করছেন: থাক না, ধীরেসুস্থে শোনা যাবে। তাড়াতাড়ি কিসের?

সামনের দিকে ড্রাইভারের সিটের পাশে সিতাংশু। সে বলে, দোষী এমব্যাসির লোকেরা। খবর আবার তাদেরই মারফতে এলো। সাজাবার কায়দায় কথার মানে একেবারে উল্টো হয়ে দাঁড়াল।

বলবার জন্য সিতাংশু আকুলিবিকুলি করছে। কতো কি ভেবে রেখেছেন এঁরা। গাড়ির মধ্যেই শুরু করে দিল। বলছে সিতাংশু, ভাস্কর মাঝে মাঝে কথা জুড়ে দেয়—

সত্যি সত্যি এক মেয়ে আছে কাহিনীর মধ্যে। যুবতী মেয়ে, সুদর্শনাও বটে। মেয়েটি সেক্রেটারিয়েটে ছিল, তা-ও মিথ্যা নয়। আর ভাস্কর যেমন ছিল—ঘটনাটা শুনে নিন, তারপরে বলবেন।

নিজ হাতে মোটর ছুটিয়ে ভাস্কর কন্টিনেন্ট বেড়াচ্ছে। মোটর জোটানোরই রাস্তা ইয়োরোপে, তেমন মজা কিছুতে নেই—দেদার ছোট, তারপর গাড়ি ফেলে কোন এক হোটেলে হাত-পা এলিয়ে দাও। এক রাজধানী-শহরে পৌঁচেছে, সেখানে এমব্যাসি আছে ভারতের। জায়গার নাম ছাপার অক্ষরে না-ই বা রইল—কারো কারো চাকরি নিয়ে টান পড়তে পারে। কী জানি, প্রোমোশনও হতে পারে—সেটা বেশি মারাত্মক। সন্ধ্যার পর গিয়ে পৌঁচেছে—নিয়ম আছে এমব্যাসিতে জানান দিতে হয়, সেই কাজ সেরে তারপর কোনখানে গিয়ে উঠবে।

ককটেল-পার্টি তখন এমব্যাসিতে। এসব জিনিস লেগেই আছে। জানেন না আপনারা—ঘরের মধ্যে যাই হোক, বাইরের দেশে কেউকেটার পত্তন দেখে মালুম হবে, কতবড় খাঞ্জে খাঁ আমরা! মদ বিনে নাকি বিদেশি বাগানো যায় না, অতএব ঢালাও ব্যবস্থা ওটার। সেই হুল্লোড়ের মধ্যে ভাস্কর গিয়ে পড়েছে।

গান্ধীভক্ত কি না সব—হাতে লাঠি গান্ধীজীর বিরাট ছবি একদিককার দেয়ালে। ছবির নিচেই দেয়াল জুড়ে টানা সেলফ—সেলফের উপর নানা বিচিত্র লেবেলের বোতল সাজানো। ঢালাঢালি হচ্ছে ঐ জায়গায় দাঁড়িয়ে এবং পান অন্তে খালি গেলাস সেলফেরই একপাশে এনে রাখছে। গান্ধীজী ছবি থেকে দেখছেন।

ঢুকে পড়ে ভাস্কর চমকে যায়। হাতের ঐ লাঠি তুলে গান্ধীজী নেমে পড়েন না কেন? অহিংসনীতি এখানে নয়, মূর্খের জন্য শাস্ত্রে ভিন্নপ্রকার ওষুধের ব্যবস্থা। গান্ধীজীর পক্ষে উপায় নেই যেহেতু ছবির ফ্রেমে আবদ্ধ এবং ভাস্করও পারে না যেহেতু হাতে ঐ লাঠিগাছিও নেই—গলায় ঝোলানো একটি ক্যামেরা শুধু। ক্লিক ক্লিক করে অতএব ক্যামেরায় কয়েকটি ছবি তুলে নিল গান্ধীজী ও তাঁর সম্মুখবর্তী ভক্তবৃন্দের। কন্টিনেন্টে ঘুরে ঘুরে কত ছবি তুলেছে, কিন্তু স্বদেশের মানুষকে দেখাবার এমন মজাদার ছবি একটাও নয়। কাগজে ছেপে দেবে: তোমাদের ট্যাক্সের টাকার সদ্ব্যয়টা দেখ বিদেশে। তা আবার গান্ধীজীর ছবির সামনে—তাঁকে যেন দেখিয়ে দেখিয়ে।

ছবি তুলে ভাস্কর দ্রুত পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। দেখেছে পার্টির অনেকেই, কিন্তু রসভঙ্গে বোধকরি নারাজ। এতজনের মধ্যে মেয়েটাই কেবল তাড়া করে এলো। পরে জানা গেছে, এমব্যাসিতে চাকরি করে। রিসেপসনিস্ট।

শুনুন, কে আপনি?

বিরক্ত কণ্ঠে ভাস্কর বলে, ইন্ডিয়ান। আমারই জায়গা এটা।

ডাকছেন এঁরা, ফিরে আসুন। হুকুম না নিয়ে ছবি তোলা বেআইনি।

ততক্ষণে ভাস্কর গাড়িতে উঠে পড়ে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিয়েছে। মেয়েটা বলছে, ছবি তুললেন কেন?

মুখ বাড়িয়ে ভাস্কর তীব্র কণ্ঠে বলে, হাতে যে পিস্তল ছিল না। থাকলে গুলীই করতাম।

ছবি নিয়ে যাওয়া চলবে না। আপনি স্পাই হতে পারেন। খুব সম্ভব তাই—

আরও গুটিকয়েক ইতিমধ্যে হল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মেয়েটা আচমকা দোর খুলে চলতি গাড়ির ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মরিয়া মুখে। ভাস্করের ঘাড়ের উপর পড়ে ক্যামেরা ছিনিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে দিল। লহমার মধ্যে এত সমস্ত। ধাক্কা দিয়ে ভাস্করও তাকে বাইরে ফেলেছে। রক্তে ভাসছে মেয়েটা। হৈ-হৈ কাণ্ড। পুলিশ, ফৌজদারি কোর্ট—

নিঃশব্দে নীরদবরণ শুনছিলেন, শিউরে উঠলেন, ইস! কত ক্ষতি হয়ে গেল—

ললিতাও জুড়ে দেয়: কত টাকা উড়ে গেল লোকের মাথায় এক কাণ্ড করে বসে—

বাধা দিয়ে নীরদ বললেন, না গো, টাকার ক্ষতি কে বলছে! ক্যামেরাটা গেল, ছবিগুলো পাওয়ার উপায় রইল না। দেশের ভিতর যা ঘটছে, সে সব দেখিয়ে দিতে হয় না, হাড়ে হাড়ে লোকে মালুম পাচ্ছে। বাইরের কাজ-কর্মের কিছু নমুনা দেখানো যেত ছবিগুলো হাতে থাকলে।

এই বাপ, এই ছেলে!

| দুই |

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে নীরদবরণ বললেন, ক্লান্ত আছ সিতাংশু, তোমরা আর পার্ক স্ট্রীট অবধি যেতে যাবে কেন? এখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে কোয়ার্টারে চলে যাও। গিয়ে বিশ্রাম করোগে।

ললিতা ও সিতাংশু নেমে পড়ল। পিতাপুত্র কেবল গাড়িতে।

ভাস্কর বলে, সরকারের উপর বড্ড রেগে আছ বাবা। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া আর ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে যাওয়া এক ব্যাপার। তোমাদের গিলে খেয়ে ফেলবে।

জানি রে জানি। সরকারকে তাই আগেভাগে গিলে রেখেছি। দেশের যত উৎপাত, তার পনেরো আনার মূলে আমরা। সরকারের নামে যত গালি, তার পনেরো আনাই নিজেদের ঘাড়ে পড়ে। অথচ দেশের কাজ বলেই একদিন শিল্প গড়তে নেমেছিলাম—

শুনে নিন সে ইতিহাস। ভাস্কর অনেকবার শুনেছে। নীরদবরণের সঙ্গে থাকতে গেলে না শুনে অব্যাহতি নেই।

নীরদ প্রথম বয়সে রাধারমণ রায় নামে একজনের পাল্লায় পড়েছিলেন। শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে, গুরুর মতো মানতেন। চাকরির উপর রাধারমণের বড় ঘৃণা: চাকরি তো চাকরগিরি। চাকরি ছাড়া ভিন্নতর পথ আছে—নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের রোজগার তো বটেই, দেশের মানুষেরও রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

ফ্যাক্টরি হবে, ঠিক হল। ইস্পাত-লোহা-লক্কড়ের কারখানা। নীরদের মূলধন, এবং টাকা বাদে অন্য সমস্ত দায়ঝক্কি রাধারমণের। হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটে নীরদের পৈতৃক পুরানো বাড়ি।

বাড়ি বন্ধক দাও—ব্যবসা এমনি জিনিষ, ও বাড়ি তোমার দু'টো বছরের মধ্যেই খালাস হয়ে আসবে।

নীরদের স্ত্রী চিরপঙ্গু। ভাস্করের জন্ম থেকে শাশুড়ী তারামণি সংসারে এসে আছেন। তিনিই গার্জেন, জবরদস্ত স্ত্রীলোক। কেমন করে কথাটা তাঁর কানে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ...চ : কখনো নয়। বাড়িটা যাবে তো হলো। আমার একফোঁটা নাতি আর হাড়মাসের পুঁটলি মেয়েটা ঘাড়ে করে কোথায় যাবো আমি? যা করতে চাও করো গিয়ে, কিন্তু বাড়ির দিকে নজর দেবে না, খবরদার!

মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন নীরদ : উপায়? এক উপায় তো পড়শীর টাকাপয়সা ঘটিবাটি কেড়েকুড়ে নেওয়া। নামটা সম্ভ্রান্ত—স্বদেশী ডাকাতি। ধরা পড়লে নিন্দে নেই।

শেষ পর্যন্ত তারামণিই উপায় করলেন। কিছু কোম্পানির কাগজ ছিল, জামাইকে দিয়ে দিলেন। হাজার দশেকের মতো হল। প্রথম ফ্যাক্টরি—শাশুড়ীর ঐ মূলধনে। পুরোনো এক রোলিং-মিল কেনা হল শহরতলিতে। মালিক চালাতে পারছিল না। ছোটখাট ব্যাপার, কিন্তু নাম হল জবর: বৃহৎ নামে যখন অতিরিক্ত ট্যাক্স নেই, সেদিক দিয়ে খাটো হওয়া কেন? গোটা বাংলাদেশ ধরে টান—সোনার বাংলা স্টীল কোম্পানি।

কাজকর্ম সেই আগেকার—বাতিল লোহা-লক্কড় সংগ্রহ করে তাই থেকে রড ইত্যাদি বানানো। পুরোনো যন্ত্রপাতি। তবে এদিকে যাই হোক, কারখানার জায়গাটা অতি প্রশস্ত। বিঘে দুয়েক জমি টিন দিয়ে ঘিরে রেখেছে ভবিষ্যতের ...। দুই মালিকের মনের আশারই মতো। উঠে পড়ে লাগলেন তাঁরা—এই ধ্যান এই জ্ঞান, আহারনিদ্রাই বন্ধ হবার জোগাড়। সেই প্রথম ... বলে না, আজও নীরদের সেই স্বভাব বুড়ো হয়েও বদলায় নি।

তবে বলি। বাইরে বটে ঘরবাড়ভারি রড বানানো, গূঢ় উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে। গোপন কাজকর্ম। বোমা-রিভলভারের যুগ সেটা। একটা রিভলভার সংগ্রহে কতজনের প্রাণ যাচ্ছে, সারা জীবন জেলবাস, হাজার হাজার টাকা খরচ—লাঞ্ছনার অন্ত নেই। রোলিং মিলের সঙ্গে সঙ্গে আর এক গুপ্ত কারখানা চলে অস্ত্র তৈরির জন্য। পিস্তল রিভলভার বন্দুক—দরকার মতো ছোরা-ছুরিও। ওরা সব জীবনদানে তৈরি—দুশমন দুটো চারটে নিপাত করে যেতে পারে, সেই জিনিষ হাতে তুলে দিই ওদের। আসল কাজ এইটে—স্বদেশী অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি। রড বানিয়ে যা মুনাফা হয়, বেশির ভাগ যায় এই কাজে। মাথা বটে রাধারমণের! বিশেষ কোনখানে যে শিক্ষানবীশী করেছেন, তা নয়। কিন্তু যাবতীয় অস্ত্রের নক্সা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিশ্বাসী কয়েকজন কারিগর দিয়ে গড়াচ্ছেন। ছেলেদের কাছে চালান হয়ে যাচ্ছে। বাইরের কেউ ঘুণাক্ষরে জানতেন না। এখন হাঁকডাক করে নীরদবরণ স্বদেশী অস্ত্রশালার কথা বলেন। যশ নেন।

কাজটা অনেকদিন ধরে চলছিল। ক্রমশ পটপরিবর্তন। বোমা-রিভলভার গিয়ে সংগ্রাম অহিংস পথে ঝুঁকল। শুধুই রোলিং মিল এখন, পুরোপুরি ব্যবসা। রাধারমণের কারখানায় আর মন নেই। সঙ্গে আছেন, এই পর্যন্ত। চিরকেলে ছন্নছাড়া মানুষ, আপন বলতে বাল-বিধবা মেয়েটা আর ছোট ছেলে—ঐ যে গৌরদাস। সে দুটিকে নীরদের হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের সংসারে গছিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন।

নীরদকে কিন্তু কাজ-কারবারে পেয়ে বসেছে। যেটা ছিল গৌণ, এখন তাই প্রধান। ব্যবসা ও অর্থার্জন। স্টীল কোম্পানি আছেই, তা ছাড়া আলাদা এক ফ্যাক্টরি হল সম্পূর্ণ নিজের। সোনার বাংলা কেমিক্যাল ওয়ার্কস। নানা রকম প্রসাধন-দ্রব্য বেরুল সেখান থেকে। আর কিছু অষুধ ও অ্যান্টিসেপটিক আরক। এই নিয়েও দেমাক নীরদবরণের : স্বাধীনতা-যুদ্ধের আর এক ধাপ—পুরোপুরি অহিংস পথে। রাজ্য-পাটের চেয়ে ব্যাপার-বাণিজ্যে ইংরেজের গরজ বেশি। বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে গলাধাক্কা দিয়ে দিচ্ছি আমরা। ক'বছর আগে এ সবের একটা জিনিষও এ দেশে হত না, জাহাজ বোঝাই হয়ে আসত। আরও ক'টা বছর দেরি করো, আমরাই জাহাজ বোঝাই করে ওদের পাঠাব।

দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ চলেছে। বাইরের আমদানি বন্ধ, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জিনিষ পড়তে পায় না। আহা, চলুক লড়াই—জোর চলুক, থেমে না যায় যেন হঠাৎ। লড়াইয়ে ইস্পাতের টানও বিষম—দরের দিক দিয়ে হীরা-মুক্তা ছাড়িয়ে যাওয়ার গতিক। এমন মওকার মুখে স্টীল কোম্পানি কিন্তু বিগড়ে বসল। সেকেলে লক্কড় যন্ত্রপাতি এলিয়ে পড়ল একেবারে। লোভে পড়ে দিবারাত্রি অবিশ্রাম খাটাতে গিয়েছিলেন, তারই প্রতিক্রিয়ায় হয়তো। বিদেশ থেকে নতুন যন্ত্রপাতি আনা সম্ভব নয় যুদ্ধকালের মধ্যে। এক্সপার্টরা দেখেশুনে রায় দিলেন, যন্ত্রপাতি অন্য কোন রোলিং মিলকে বেচে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ভেঙেচুরে মেশিনে ফেলে তারা রড বানাবে। সেই অবস্থা ... দিতে কিছুতে মন সরে না। তালাবন্ধ হয়ে রইল বহু দিন। আরম্ভ তারামণির টাকায়, শেষটা তিনিই নিয়ে নিলেন ঋণের বাবদে। তালিতুলি দিয়ে কাজও মোটামুটি চালু হল। তবে গোলমাল লেগেই আছে। একমাস দু-মাস বেশ চলল, হঠাৎ মেশিন বিগড়ে বসে।

রাধারমণ এই সময়টা একেবারে কলকাতা ছাড়লেন। দূরে মফস্বলে কোন্ এক সিদ্ধিহাট গাঁয়ে গুটি কতক ছেলে নিয়ে আশ্রম গড়েছেন, শুনতে পাওয়া যায়। আবার একদিন শোনা গেল, মারা গেছেন তিনি সেখানে। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে নীরদ চলে গেলেন রাধারমণের ছেলে গৌরদাসকে সঙ্গে নিয়ে। শ্রাদ্ধশান্তি সেখানেই হল।

এটম-বোমার প্রসাদে তাড়াতাড়ি লড়াইয়ের শেষ। স্টীল কোম্পানি জোর চলল আবার। দেশেরও ভোল পাল্টাল। স্বাধীনতা লাভ। নানান দিকে হরেক নেতার উদয়। কি পরিচয়? হপ্তা তিনেক জেলে ছিলেন—সন্দেহ হলে কাগজপত্র খুঁজে গবেষণা করতে পারো। অতীতের দুরাচার মস্তকের গান্ধীটুপিতে চাপা দেওয়া—অমোঘ শক্তি ধরে ঐ টুপি।

নীরদবরণ ইতিমধ্যে এক চটকলের কর্তা হয়েছেন। সোনার বাংলা জুটমিলের ম্যানেজিং এজেন্ট। ধাপে ধাপে কোন উঁচুতে এখন—দিক্পাল শিল্পপতিদের মধ্যে একজন।

তবু কখনো-সখনো নীরদ নিশ্বাস ফেলেন পূর্বস্মৃতির তাড়নায়। সে আমলের নভেলে যেমন সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব থাকত। চোখা বুলি বেরোয় এমনি মানসিক অবস্থায়। রাধারমণের মৃত্যু নিয়ে কথা উঠেছিল—নীরদ বললেন, ভাগ্যিস মরেছিলেন নয়তো আজকের দিনে তাঁকেই আত্মহত্যা করতে হত। তেজস্বী পুরুষ ভণ্ডদের মাঝে টিকতে পারতেন না। অন্যের কথা কি, আমিই তো পয়লা নম্বরের একটি।

তিন বছর পরে ছেলেকে পেয়ে আজ আবার সেই পুরোনো প্রসঙ্গ। নীরদ বলছেন, দেশের কাজ নিয়ে কত জনে কত দিকে নেমে পড়েছিল। দরিদ্র জীবন বরণ করে জনসেবার সংকল্প। আজকে ব্রতচ্যুত। এয়ারকন্ডিশন্ড বাড়ি, অগুন্তি আরদালি-বেয়ারা, খানসামা-বাবুর্চি, হাজার হাজার টাকার ইলেকট্রিক টেলিফোন আর জলের বিল—তা সত্ত্বেও মিনিস্টারের বাসঘর নাকি ঘোড়ার আস্তাবল। ক্ষমতা আছে বলে মেম্বাররা টপাটপ মাইনে বাড়িয়ে নিচ্ছে, অথচ সাধারণ মানুষে হাহাকার করে মরে—

হাসছিল ভাস্কর বরাবর, এবারে খিলখিল করে হেসে ওঠে। থতমত খেয়ে নীরদ থেমে যান। ভাস্কর এই বটে! দারিদ্র্য বস্তুটা কেমন সে যেন বুঝতে পারে না, অভাবের কথা মনে তার দাগ কাটে না। বলছে, শখের হাহাকার বাবা। অন্য দেশের তুলনায় আমরা তো স্বর্গধামে থাকি। তুমি বলে দিয়েছিলে—... নেমে তোমাদের চেয়ারম্যান তেজ্‌ মল্লিকের বাড়ি গেলাম। সেই সময় দোকানেও ঢুকেছিলাম কয়েকটা। এত সস্তা যে ম... হল দোকান সুদ্ধ কিনে ফেলি।

নীরদ হেসে বললেন, তুমিই পারো সেটা। পুরো দোকান না হোক সিকি আন্দাজ পারো হয় তো কিনতে। জন্ম হওয়া ইস্তক বড়লোক, টাকাকড়ি ঢিল-পাটকেলের মতন তোমার কাছে, যত্রতত্র ছুঁড়ে দিয়ে আনন্দ পাও। কিন্তু আর একটা জগৎ আছে, আমাদের জগতের ঠিক উল্টো। ইয়োরোপ ঘুরে এলে—আছে সেখানেও। সে জগতের আমরা খবর রাখিনে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা নেই। তোমার কাছে এত সস্তা, তারা কিন্তু হাতে ছুঁতেও ভরসা পায় না ঐ সব জিনিষ। বিপদ হল আমাদের অনেকগুণ বড় সেই জগৎটা। বিশেষ করে আমাদের দেশে।

বলেন, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, হেসে ওঠে কিনা ভাস্কর। বলছে, আমিও কি জানি তাদের? একেবারেই না—বড্ড বেশি ফারাক আমাদের ভিতর। তবে জন্ম থেকেই আমি বড়-লোক ছিলাম না—যত কিছু বলি পূর্বস্মৃতি থেকে। যেন আমার গত জন্মের কথা।

ইতিমধ্যে ফটকের সামনে গাড়ি এসে পড়েছে। পার্ক স্ট্রীটের অট্টালিকা। উর্দিপরা দারোয়ান সেলাম ঠুকে ফটক খুলে দিল। নুড়ি বিছানো ড্রাইভে খড় খড় আওয়াজ তুলে মোটর গাড়ি করিডরের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। খানিকটা আগে মিনিস্টারের বাড়ি নিয়ে ব... হচ্ছিল, সোনার বাংলা জুট মিলের ম্যানেজিং এজেন্টের বাড়িতেও তাই। এয়ারকন্ডিশন্ড ঘর, বেয়ারা চাপরাশি, বাবুর্চি-খানসামা ইত্যাদি। দূরে রাস্তা থেকে নজরে আসে এ বাড়ি। কত পথিক জনের নিশ্বাস পড়ে—... কত আরাম ক... ভোগসুখ বাড়ির ... !

সিঁড়ি ... পিছু পিছু, ভাস্কর উপরে উঠল। ... পরে। ...

দিয়েছে, হঠাৎ নীরদ ঘরে দাঁড়িয়ে বললেন, এখনই তোমায় বলা ঠিক হবে কি না, কুণ্ঠা হচ্ছিল। এতদিন একলা নিজের মধ্যে রেখেছি, বলার মানুষ পেয়ে ধৈর্য থাকছে না।

ভূমিকা শুনে চমক লাগে। সিতাংশু অল্পই জানে, যেটুকু জানে বলেছে। কাজ আর কৌতুক ছাড়া বাপকে ভাস্কর ভাবতে পারে না। বয়স হয়েছে, কিন্তু বার্ধক্য ছুঁতে আসেনি সাহস করে। বাপ-ছেলের সম্পর্ক তাদের মধ্যে খানিকটা বান্ধবের মতো। বিদেশ থেকে ফিরে সেই বাপকে দেখছে যেন আলাদা এক মানুষ। কণ্ঠস্বর ভিন্ন।

ভাস্কর বলে, হাসি ছাড়া তোমায় বিশ্রী দেখায় বাবা। যা বলবার হেসে হেসে বলো, নইলে আমি শুনব না।

হাসতে হয় অতএব নীরদের। বলেন, দুজনে আমাদের সেই পাল্লাপাল্লি—আমি কত রোজগার করতে পারি, তুমি কত খরচ করতে পার। হারাতে হন্দমুদ্দ চেষ্টা করে এসেছ। কিন্তু এবারে সত্যিই বুঝি হারলাম। দুটো হাতের একটা হাত আমার একেবারে খসে গেছে।

অর্থাৎ বিগড়েছে গৌরদাস। কথা বাড়াতে না দিয়ে ভাস্কর তাড়াতাড়ি বলে, তবে পাল্টাপাল্টি এবারে বাবা। আমি কত রোজগার করতে পারি, তুমি কত খরচ করতে পার। হুঁ, তুমি করবে খরচ! তোমার নিজের মুঠোখানেক আতপচাল আর তোমার শ্রীগোপালের দুখানা বাতাসা। পঞ্চাশটি টাকা রোজগার হলেও তো আমি জিতে থাকব।

হালকা সুর ছাড়া কথা চলে না এ ছেলের সঙ্গে। কোনদিন চলে নি, আজকেও চলল না। অতএব সহাস্যে নীরদ জবাব দেন : তা ভেবো না। আমার ঠাকুরের জন্য মন্দির গড়ব, দান-ধ্যান সদাব্রত কত কি হবে! শুধু শ্রীগোপাল দিয়েই ফতুর করে দেবো তোমায়।

ভাস্কর সগর্বে বলে, কোরো তাই, দেখা যাবে।

জোর দিয়ে আবার বলে, কথা রইল তবে বাবা। কাজকারবার তুমি তাকিয়ে দেখবে না, এক লহমাও ভাববে না এসব নিয়ে। টাকা নিয়ে শুধু খরচ করে যাবে, যেমন আমি এতকাল করে এসেছি। এবার থেকে আমি বাবা, তুমি ছেলে—আমারই মতন অবাধ্য অভব্য উড়নচণ্ডী ছেলে একটা। কেমন?

বাপকে জড়িয়ে ধরল আদর করে। সেই ভাস্করই আছে অবিকল, একটু বদলায় নি। তেমনি পাগল-পাগল ভাব।

[তিন]

পাগল কেমন শুনুন তবে। সুখময় চাটুজ্জেকে নিয়ে যা করেছিল। ভাস্কর সেই সময়টা মেটালার্জিতে ইস্তফা দিয়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং ধরেছে। শাশুড়ী তারামণিকে নিয়ে নীরদ প্রয়াগে কুম্ভমেলায় চলে গেলেন, ... জন্য কিছু আচার-অনুষ্ঠান ছিল। সেই ফাঁকে বাড়ি এসেছে ভাস্কর। কলেজের ছুটিও ছিল।

হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের পুরানো বাড়িতে। ভাস্করের খামখেয়ালি মেজাজ চাউর হয়ে গেছে ... টাকার মুঠো ছোকরার কাছে ধুলিমুঠোর মতন। তাক বুঝে ধরতে পারলে হয়। সাহেব গিন্নিঠাকরুন বাইরে চলে গেছেন, সুখময় খোঁজখবর নিয়েই এসেছে। এসে বৈঠকখানায় বসল।

ভৃত্য মাধব উপরে খবর দিতে এলো। গল্প-উপন্যাসে হামেশাই একরকম বিশেষ ধরনের পুরাতন ভৃত্য পাই, অতি-বিশ্বাসী এবং মনিবের অভিভাবক স্বরূপ। পড়ে পড়ে সেই-বস্তুর কথাবার্তা চালচলন কণ্ঠস্থ হয়ে আছে—মাধব কিন্তু সত্যি সত্যি তাই।

খবর দিতে এসে মাধব পরিচয় দেয় : ভারি ঘড়েল দাদাভাই। এ পাড়ার সবাই চাটুজ্জেকে জানে। আলিপুর কোর্টে মিথ্যে-সাক্ষী দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। সাহেবের কাছে কতবার এসে সাহায্য নিয়ে গেছে। তোমারও কিছু খসাবে—

সিতাংশুর সঙ্গে গুলতানি হচ্ছিল তখন। উৎসাহভরে ভাস্কর উঠে দাঁড়াল : এসো সিতাংশু, দান করে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করে আসি।

বৈঠকখানায় ঢুকেই প্রথম কথা : কত চাই, বলুন ঠাকুরমশায়।

এমন সরাসরি প্রশ্নে সুখময় হকচকিয়ে যায়। ভূমিকা ছাড়ে না তবু : সাহেব জানেন আমায়। আপনার সম্বন্ধে বিস্তর শুনে আসছি, সোনার টুকরো ছেলে! শুনতে পেলাম বাড়ি এসেছেন আপনি—

আরও শুনলেন, সাহেব নেই বাড়িতে—

সুখময় বলে, থাকলে তো ভালই হত। বড় মহাশয়-মানুষ। আপনি জানেন না, মাঝে মাঝে ওঁর কাছে এসে থাকি আমি।

ভাস্কর বলে, তা-ও জানি। কিন্তু সংক্ষেপে সারুন। তাস খেলতে খেলতে উঠে এসেছি।

সুখময় বলে, মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করে একটা পাত্তোরও ঠিক করেছি—

বাধা দিয়ে সিতাংশু বিরক্ত স্বরে বলে ভাস্কর কি রোজগেরে এখন? সাহেব আপনার বাঁধা মক্কেল, তিনি ফিরে এলে বলবেন।

ভাস্কর বলে, ব্রাহ্মণ-মানুষ আশা করে এসেছেন, বলেই ফেলুন। সংক্ষেপে সারতে বলছি—কত চাই, টাকার অঙ্ক বলে দিন।

একেবারে ন্যাড়া কথায় কাজকর্ম হয় না, একটু তবু ধানাই-পানাই : হাত ঝাড়লে পর্বত আপনাদের হুজুরে। টাকা পনেরো যদি দেন, কন্যাদায়ের খানিকটা সুরাহা হবে।

দিচ্ছি। পনেরো নয়, তিরিশ।

কী বলবে, ভাষা হাতড়ে পায় না সুখময়। মনে মনে দেমাক : বলবার বাঁধুনি কী আমার! মানুষ জলে ভেজে, এ আমার কথায় ভেজানো!

ভাস্কর তার কথা শেষ করল : তিরিশ টাকা দিচ্ছি, কিন্তু দাড়ি কাটতে হবে চাটুজ্জে মশায়?

মুখ-ভরা দাড়ির জঙ্গল। ত্রস্তভাবে বাঁ-হাতে দাড়ি ঢেকে সুখময় চাটুজ্জে বলে, কেন, দাড়ির কি হল?

ভাস্কর বলে, দাড়ি গালে রাখবেন তো মেয়েও ঘরে রাখুন গে। আমার দ্বারা কিছু হবে না। বাবাকেও মানা করব।

অবাক হয়ে চেয়ে পড়ে সুখময়। আবোল-তাবোল বলছে—মাথার গোলমাল নাকি ছোঁড়াটার?

তৎক্ষণে ভাস্কর পকেট থেকে তিনটে দশ টাকার নোট বের করে মেলে ধরেছে। পকেটের ভিতরটা খসখস করে উঠল—উঃ, কত নোট থাকে ওদের পকেটে!

সুখময় সকাতরে বলে, কন্যাদায় নিয়ে উপস্থিত, তার মধ্যে দাড়ির কথা ওঠে কিসে? এই দাড়ি, জানেন, আজকের নয়। তিরিশ বছর পালন করে আসছি। পিতাঠাকুর বরাবর বকাবকি করেছেন : ব্রাহ্মণের মুখে গজের দাড়ি কেন? তাঁর অবর্তমানে ব্রাহ্মণীও বকে থাকে। কারো কথা কানে নিইনে।

ফস করে হাত পকেটে ঢুকিয়ে ভাস্কর আরও একটা নোট বের করল : বুঝুন। এর উপরেও 'না' বলেছেন তো উপরে গিয়ে তাসে বসে যাবো।

ইতস্ততঃ ভাব দেখে ভাস্কর সত্যি সত্যি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ায়। সুখময় রোখ করে বলে, যাবেন না। ডাকুন পরামাণিক—

তারপর নিজেকেই বুঝি সান্ত্বনা দিচ্ছে: দাড়ি আবার উঠে যাবে। ভগবান আছেন। দুটো মাসেই যেমন-কে-তেমন।

ভাস্কর বলে, পরামাণিক কোথা এখন। আমরাই সেরে দিচ্ছি।

সিতাংশুকে বলে, শেভিং-সেটটা নিয়ে এসো দিকি। উঁহু, তিরিশ বছর ধরে শাল-সেগুনের জঙ্গল জমানো—পাতলা ব্লেডে কাজ হবে না। একটা কাঁচি জোগাড় করে আনো মাধব-দার কাছ থেকে। কাঁচি না পেলে সুপারি-কাটা জাঁতি আছে, তাতেও চলবে পরে।

মাধবের মুখে সুখময়ের বর্ণনা পেয়ে মানুষটাকে জব্দ করার লোভ দুর্বার। সিতাংশু বুঝেছে সেটা, তারও উৎসাহ। ছুটল মাধবের কাছে। কাঁচিই পাওয়া গেল, জাঁতি অবধি নামতে হল না।

কাঁচ-কাঁচ করে একটা কাগজের উপর ধার পরীক্ষা করে ভাস্কর প্রসন্ন মুখে বলে, ব্রহ্ম অঙ্গে হাত লাগিয়ে পাপের ভাগী হব না। নিজ হাতেই ছেদন করুন আয়নার সামনে গিয়ে।

কাঁচি চালিয়ে সুখময় মুঠোখানেক দাড়ি কেটে ফেলেছে, আরও কাটছে। ভাস্কর হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আপনার কন্যাদায়ের সাহায্য এক পয়সাও দেবো না কিন্তু।

কাঁচি বন্ধ করে সুখময় আর্তনাদ করে ওঠে : আমার এমনি হাল করে দিয়ে এটা কি বলছেন হুজুর?

কন্যাই তো নেই, কন্যাদায় কিসের? দাড়ির দাম ধরে দিচ্ছি, এই চল্লিশ। দু-মাসেই আবার তো উঠে যাচ্ছে। ফাঁকতালে ভাল লাভ হয়ে গেল, কি বলেন?

নোট চারটে হাতে এসেছে, কিন্তু কলঙ্কটাও মোচন করে যাবে সুখময়। বলে, কন্যা নেই, শত্তুরে লাগিয়ে গেছে। কানে নেবেন না। বলেন তো কন্যা সশরীরে হুজুরে এনে হাজির করি।

সে কন্যা চোখে দেখেই ছাড়ব না, জেরা করে পরিচয় বের করব। দাড়ি গেছে, ঝুটো কন্যা হলে মাথাও ন্যাড়া হবে কিন্তু।

বলতে বলতে ভাস্করের লঘু কণ্ঠ কিছু গম্ভীর হল : টাকা ছড়াই আমি, কথাটা কানে শুনেছেন। ছড়াই সত্যিই, জেনে শুনে ইচ্ছে করে দিই—বোকা বুঝিয়ে কেউ নিতে পারে না। আপনার কন্যাদায় নয়, অন্নদায়। অভাবের কথা বলতে মানুষের লজ্জা, কিন্তু শঠতায় বাহাদুরি। আমায় নির্বোধ বলে লোকের কাছে দেমাক করতে না পারেন, দাড়ি সেইজন্যে কাটা পড়ল। আপনার দাড়ি আপনিই নিয়ে

.....আমি কত রোজগার করতে পারি, তুমি কত খরচ করতে পারো।

যান, টাকার সংগে ওটাও পকেটে পুরে ফেলুন।

সুখময় চলে গেলে ভাস্কর গর্বদৃষ্টিতে একবার সিতাংশুর দিকে তাকায়। ভাবখানা : যা খুশি করা যায় টাকা দিয়ে। দেখলে?

হিমাদ্রিশেখর সিতাংশুর মামা। নীরদের বাল্যবন্ধুও বটে। শম্পা তাঁর মেয়ে। অনেক দিন ধরে ভাস্করের সঙ্গে শম্পার বিয়ের সম্বন্ধ চলছে। শম্পার তখন বিয়ের বয়স হয় নি, ভাস্করেরও নয়। শুধুমাত্র কথা—তা-ও এক-বার ওঠে, একবার ভেঙে যায়। নদীর জোয়ার-ভাটা যেমন—জল কখনো এদিকে, কখনো উল্টোদিকে। এখন হিমাদ্রি অবসর নিয়ে লক্ষ্ণৌ থাকেন দুই ছেলের কাছে। অবরে-সবরে কলকাতা আসেন, সিতাংশুর কোয়ার্টারে এসে ওঠেন। সে সময়টা কর্মস্থল কলকাতা ছিল। একটা বাড়িও ছিল, সে বাড়ি এখন ভাড়ায়।

সুখময়ের নিগ্রহ বেশ চাউর হয়ে গিয়েছিল। হিমাদ্রিও শুনেছিলেন। নীরদকে তিনি বললেন, অত টাকা কেন দিতে যান ছেলের হাতে?

সংক্ষিপ্ত সরল জবাব নীরদবরণের : খরচ করবে বলে।

হিমাদ্রি বলেন, বয়স যে নিতান্ত কাঁচা। বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নি—

খরচ করে তাই আনন্দ পায়। পরিপক্ব হলে জমিয়ে জমিয়ে ব্যাঙ্ক ভরাবে। যার কোন মূল্য নেই। বোকারাই টাকা জমায়।

আত্মসমর্থনে কিঞ্চিৎ অর্থনীতির ব্যাপারও এসে পড়ে : দিনকে-দিন টাকা সস্তা হয়ে যাচ্ছে, হতে বাধ্য। শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় আট মণ চাল—পুরো একটি টাকা প্রায় স্বর্গ-লোকের জিনিষ তখন, দেবতাদের ট্যাঁকে ঘোরে। আপনার আমার কড়ি-কড়ার বিকিকিনি। প্রথম লড়াইয়ের আগে এক-শ টাকা যার মাইনে, সে মানুষ ছোটখাটো লাটসাহেব। এক-শ টাকায় এখন রান্নার ঠাকুর পাবেন না। চীনের কি গতিক দাঁড়িয়েছিল—একটি হিসাবি মানুষ ব্যয়-সংক্ষেপ করে সারা জীবন জমিয়ে গেলেন বুড়োবয়সের সম্বল হিসাবে। ব্যাঙ্কের খাতায় বড় অঙ্কের টাকা (টাকা নয়, ইউআন)। টাকার দাম তখন এত পড়ে গেছে, আধ ডজন মুরগির ডিম কিনতেই সমস্ত সঞ্চয় কাবার।

মা-হারানো ছেলে, আদর দিয়ে মাথায় তুলেছেন—ভাস্করের সম্বন্ধে কোন কথা গায়ে পড়তে দেবেন না। নাছোড়বান্দা হিমাদ্রি তবু শেষ একবার বললেন, ছেলেমানুষের হাতে এত টাকা পড়া ঠিক নয়—সে আপনি যতই বলুন।

হেসে উঠে নীরদ নিরুপায় ভঙ্গিতে বললেন, টাকার কপাল করে এসেছে, আমি কী করব? আমার বাবা ছা-পোষা মধ্যবিত্ত ছিলেন, বড্ড টাকার কষ্ট পেয়েছি। ভাস্কর যে বড়লোকের বেটা।

গলা নামিয়ে আবার বলেন, আরও আছে। জানেন না আপনি, বাজি রয়েছে আমাদের মধ্যে। টাকা বন্ধ করলেই হার হয়ে যাবে আমার। বুড়ো বয়সে ছেলের হাতে হেরে মরতে বলেন?

নাও, হয়ে গেল! আজব বাপ, আজব ছেলে! আজ দাড়ি কাটছে, কাল এই ছেলে দেখতে পাবেন মানুষের মুণ্ড কেটে বেড়াবে।

সুখময়ের ব্যাপারটা ঐখানে শেষ নয়। বেশ খানিকটা ঘোঁট চলেছিল। পাড়ার অনেকেই তাকে জানে, ঘুষুলোক বলেই জানে। এতকাল বাদে দাড়িবিহীন হয়ে বেড়াচ্ছে—এই নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হতে হতে বৃত্তান্ত ছড়িয়ে পড়ল।

সিতাংশুই একদিন কথাটা পাড়ল : তোমার বদনাম রটেছে দাড়ি কাটার ব্যাপার নিয়ে।

কারা রটাচ্ছে, নাম বলে দাও—

মাধব সেখানে। উৎকণ্ঠিত হয়ে সে 'না' 'না' করে উঠল : বোলো না, কক্ষনো না। মিথ্যে তো বলে না কেউ। সুখময় মানুষটা খারাপ হতে পারে, তবু জাতে বামুন, বয়সও বিস্তর। নাম বলে দিক, আর তুমি কাঁচি নিয়ে তার দাড়ি কাটতে তেড়ে যাও।

মুখ টিপে হেসে সিতাংশু বলে, একটা নাম বলে দিতে পারি। শম্পা। ছি-ছি করছিল তোমার কাজে।

মাধব হেসে উঠে বলে, বেশ হয়েছে। যাও তেড়ে এবারে কাঁচি নিয়ে।

ভাস্কর বলে, সব লড়াইয়ে এক অস্তোর খাটে না। যে কজন বেশি চেঁচামেচি করছে, নাম বলে দাও সিতাংশু। সত্যি বলছি, কাঁচি নিয়ে পড়ব না।

মাধব বলে, তাহলে বন্দুক নিয়ে পড়বে। তা-ও পারো তুমি। কী যে পারো না, সেটা জানি নে বাপু।

ভাস্কর বলে, বন্দুক নয়, কিছুই নয়— একটা আলপিন অবধি হাতে নিচ্ছি নে। কারো গায়ে আঁচড়টি পড়বে না। অহিংস আসল ... এটা—আমায় যার জন্য মেটালার্জি ছেড়ে কেমিক্যাল-ইঞ্জিনীয়ারিং ধরতে হল।

চাপাচাপিতে বলতে হল পাঁচ-সাতটা নাম ... বেশির ভাগই ভাস্কর চেনে। কথা রাখল ... সত্যি। কয়েকটা দিন কাটল, গণ্ডগোল কিছু নেই।

সিতাংশুকে ভাস্কর জিজ্ঞাসা করে, কি বলছে এখন সেই মানুষগুলো?

চুপচাপ। তাই তো অবাক লাগে—

নিয়ম এই, অবাক হবার কিছু নেই। রহস্যময় হাসি হাসে ভাস্কর। বলে, খা... দিয়ে দেখো তো তাদের—কি বলে আমা... সম্বন্ধে।

সিতাংশু বলে, তা-ও হয়েছে। একেবারে চুপচাপ দেখে আমিই তখন দাড়ি-কাটার গল্প জুড়ে দিলাম। দেখি, কানেই নেয় না কেউ। তখন স্পষ্টাস্পষ্টি জিজ্ঞাসা করি, কাজটা কি হল কি? হুঁ-হাঁ করে সরে পড়ে। উত্তর মেলে না।

ভাস্কর হেসে বলে, কিন্তু উত্তরটা চাই আমার। যাক কিছু দিন—জিজ্ঞাসা কোরো ভাস্কর হালদার লোকটা কেমন?

ক'দিন পরে সিতাংশু নিজেই এ... উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে : কী মন্তোর জানো তু... বলো।

সহাস্যে ভাস্কর বলে, কি হয়েছে?

তোমার নিন্দে না করে জলগ্রহণ ক... না, তারা এখন শতমুখে তোমার প্রশংসায়।

মন্তোর কিছু নয়, মাংসখণ্ড। কুকু... মুখে মাংসখণ্ড ফেলে ঘেউ ঘেউ বন্ধ ক... সেই জিনিষ। মাংসখণ্ড নয় রে, টাকা। ... যে বলে, দুনিয়াদারির ফাঁকা সারবস্তু টাকা তাই। আগে যাচ্ছেতাই করে বলেছে, সরা... উল্টো রকম বলতে লজ্জা-লজ্জা করত। সে... এদিকে নয় ওদিকেও নয় এমনিভাবে ... কয়েকটা দিন। অতএব কিঞ্চিৎ ছুঁড়ে দিত... লজ্জাটজ্জা গিয়ে পুরোপুরি এখন আমার।

এমনি গল্প অনেক আছে। মিথ্যেও বিস্তর। তবে সুখময়েরটা সত্যি যেহেতু সিতাংশু নিজে দেখেছে। বাপ নীরদবরণ মানা করবেন কি—হাসেন মৃদু মৃদু, উপভোগ করেন। টাকা চাইলে কোন দিন 'না' বলেন না, না চাইলেও দেন। নীরদের মামার বাড়ি পাড়াগাঁয়ে—তাঁর বড়মামি এক ভাঁড় তেঁতুল-বীচি দিয়েছিলেন, শিশু নীরদ তাই দিয়ে টাকা-টাকা খেলাতেন। নীরদ তেঁতুলবীচি কোথা পাবেন, আসল টাকাই দিয়ে আসছেন ছেলের খেলার জন্য।

ভাস্কর একদিন প্রশ্ন করেছিল ঃ এত টাকা পাও কোথায় বাবা?

রোজগার করি।

বিশ্বাস হয় না। রোজগারের গোণাগুণতি থাকে, সীমা থাকে একটা। তোমার তা নয়, পকেটে হাত ঢুকিয়েই তো মুঠো করে বের করো। এক মুঠোয় হল না তো দুমুঠো। তাতেও হল না তো আবার—

প্রচুর টাকা আছে, সম্পদের মধ্যে ডুবে রয়েছেন, এমনি কথা শুনতে নীরদের ভালো লাগে। এই বড় দুর্বলতা—এরই জন্যে জীবন-পাত করে এসেছেন। সকৌতুকে তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন। উৎসাহ পেয়ে ভাস্কর বলে, বাক্স খুললে দেখতে পাই গোছা-গোছা পাঁচটাকা দশটাকার নোট, সিন্দুক খুললে দেখি একশটাকার নোটের তাড়া। এত টাকা রোজগারে হয় না, টাকা বানাও তুমি।

যেন বিষম ভয় পেয়েছেন এমনিভাবে নীরদ বলেন, সর্বনাশ, টাকা জাল করি তাই বুঝি বলতে চাও? তোমার বাবা জালিয়াত? শুনলে য পুলিশে ধরবে।

জালিয়াত কেন হবে? ভাস্করের কণ্ঠ গভীর য়ে ওঠে ঃ আমার বাবা ঋষিতপস্বী, আমার বা দেবতা। মন্তোরে তিনি টাকা করেন, যত চ্ছে করতে পারেন। দেবতার সঙ্গে লড়ে পারব কন? এত খরচা করেও শেষ হয় না। হেরে য়ে ভূত হই।

তিনটে বছর অদর্শনের পর সেই বাপ আজ আলাদা এক মানুষ। মুখের উপর বিষাদের ছায়া—কত হাসছেন, হাসাচ্ছে ভাস্কর অহরহ, তবু মুখের ছায়া নড়ে না।

বিদেশ থেকে ফিরে ঘরে পা দিয়েই বাপের খবর কথা শুনল ঃ বুঝি হেরে গেলাম। এবার কথা নীরদবরণ প্রথম বললেন—যৌবনে প্রৌঢ়কালে নয়, এই শেষ বয়সে এসে। ওপরে সবিস্তারে কথাবার্তা হয়েছে। নীরদ বলেন, সরকারী নিয়মে পঞ্চান্ন বছরে অবসর আমার ষাট হয়ে এলো। আমার জায়গায় র ম্যানেজিং এজেন্ট তুমি। আমার ছুটি—কর্ম যা কিছু, শুধু শ্রীগোপালকে নিয়ে।

ভাস্কর বলে, ছুটি মঞ্জুর। কাল থেকেই। লোকের ছেলে হয়ে আছি—নিজে এবারে লোক হই। সবুর সইছে না আমার।

বলল ঠাট্টার ঢঙে, চিরকাল যেমন বলে ছে। নীরদবরণের বড় ভাল লাগে। দ্বিধা এক বিন্দু, দায়িত্বের জন্য তৈরি। বুদ্ধি শিক্ষা আছে। আর আছে বিদেশের জ্ঞতা—নীরদের যেটা ছিল না। স্নেহকণ্ঠে বলেন, বাস্‌রে, এতবড় দায়িত্বের কাজ—জিনিষটা জেনেবুঝে [illegible]।

ভাস্কর ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় ঃ কাজ তো ভারি! কী কাজ করো তুমি, জানতে বাকি নেই। ডজন দুই-তিন সই করা দিনের মধ্যে—তার আবার জানবার বোঝবার কি আছে? কাল নয় তো কবে থেকে হবে, আমায় পাকা কথা বলে দাও।

এগ্রিমেন্টে অবশ্য আছে, আমার জায়গায় আমারই মনোনীত লোক বসাব, ডিরেক্টর বোর্ড আপত্তি করতে পারবে না। তা হলেও মীটিং চাই—মীটিংএ রেজল্যুশান পাশ করিয়ে নিতে হবে।

ভাস্কর বলে, করে ফেল মীটিং।

তুমি তো চেয়ারম্যানের বাড়ি উঠেছিলে। ডিসেম্বরের আগে আসা ঘটবে না, তুমিই বললে। এ মীটিং মল্লিক সাহেবকে বাদ দিয়ে হতে পারে না।

অধীর কণ্ঠে ভাস্কর বলে, সে আমি জানিনে বাবা। মীটিং যবে হয় হবে, আমি কাল থেকেই বসব। একবার গিয়ে তুমি কেবল সইগুলো সেরে আসবে।

করতে হল তাই। বাবার চোখেমুখে ক্লান্তি ফুটেছে, বিশ্রাম তাঁকে নেওয়াবেই। পরের হপ্তা থেকে ভাস্কর ম্যানেজিং এজেন্টের চেয়ারে বসছে। আর একটা চেয়ার পাশে—নীরদবরণের। কোন একসময় তিনি গিয়ে একটু বসেন, পরামর্শ দেন দরকার মতো। কাগজপত্রে সই তাঁকেই করতে হয়, এজেন্সি যখন তাঁর নামে রয়েছে।

[চার]

হিমাদ্রি এই সময়টা কলকাতায় প্রভিডেণ্ট ফান্ড নিয়ে কী সব গোলমাল, তার ফয়সালা করে যাবেন। এসেছেন তা মাসখানেক হয়ে গেল, ভাগনে সিতাংশুর কোয়া-র্টারে আছেন। শম্পাও ওখানে থাকে—এম-এ আর আইন পড়ছে। ঐ দুটো শেষ করে তারপর লক্ষ্ণৌয়ে বাবা-দাদাদের কাছে যাবে, কিম্বা প্রজাপতি মুখ তুলে চান তো শ্বশুরবাড়ি।

ভাস্কর ফিরে আসার পর নীরদের কাছে হিমাদ্রি জোর তাগিদ লাগিয়েছেন ঃ হয়ে যাক এইবার। আর দেরি কেন?

নীরদও বলেন, হোক না—

ঠিক এমনি উত্তর-প্রত্যুত্তর বছর দশেকের মধ্যে অনেকবার হয়ে গেছে। শম্পা মেয়েটিকে নীরদ এতটুকু বয়স থেকে দেখছেন। বড় ভাল লাগে। কোনদিনই ইতস্ততঃ নেই তাঁর। প্রস্তাব তবু ঝুলছে। তা-ই বা কেন—কখনো কখনো কানে এসেছে, শম্পার বিয়ে অন্যত্র পাকাপাকি হয়ে গেছে, দু-এক মাসের মধ্যে হয়ে যাবে। শেষ অবধি ভেস্তে যায়। মেয়ের সম্পর্কে হিমাদ্রি অতিরিক্ত হিসাবী বলেই। হিন্দুঘরের মেয়ে বিয়ের সাত-পাক একবার ঘুরে ফেললে উল্টো দিকে চোদ্দ-পাক দিয়েও বাঁধন খসানো যায় না। মনের নিক্তিতে পাত্রকে তৌল করে তিনি একবার এগোন, একবার পিছিয়ে পড়েন।

হয়ে যেত সেবারেই—ভাস্কর শিবপুরে কলেজে মেটালার্জিতে ঢুকেছে তখন। হলে মজা হত বেশ—কাঁচা বর-কনে নিয়ে সেকালের মতন বিয়ে-বিয়ে খেলা। উৎকৃষ্ট চাকরির ব্যবস্থা করেছিলেন হিমাদ্রি—চাকরির প্রস্তাব নিয়ে নীরদের কাছে এলেন—

নাম-করা এক বিলাতি কোম্পানির মস্তবড় অফিসার হিমাদ্রি, কলকাতা শাখার সর্বময় কর্তা। কোম্পানির ইংরেজ ডিরেক্টর পৃথিবী পরিক্রমণে বেরিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। সেইসময় বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো হিমাদ্রির মনে কথাটা উঠল—সুযোগ এসেছে তো গুছিয়ে নিতে হবে।

সাহেবের কাছে গিয়ে বললেন, বিশ বছর বয়সে তোমাদের কাজে ঢুকেছি, কোম্পানির কাজে জীবনপাত করলাম। সম্পর্কটা যেন চিরকাল বজায় থাকে, এই দরকার।

অন্তরঙ্গভাবে পারিবারিক পরিচয় দিলেন ঃ দুই ছেলে আর এক মেয়ে আমার। ছেলে দুজনেরই ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেছে, বড় ছেলের শ্বশুর লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে নিয়েছেন। দিব্যি উন্নতি করেছে তারা, তাদের জন্য উদ্বেগ নেই। আমি রিটায়ার করলে জামাই আমার চেয়ারে বসবে, এই হুকুম চেয়ে রাখছি।

সাহেব রাজি। বললেন, রিটায়ারের পরে কেন গাঙ্গুলি, তুমি থাকতে থাকতে জামাই এখনই তো ঢুকে পড়তে পারে। লিখিয়েপড়িয়ে তাকে তৈরি করো। তারপর লন্ডনের হেড-অফিসে কিছুদিন কাজ করে পাকা হয়ে আসবে, কোম্পানির খরচা দিয়ে নিয়ে যাবে। কলকাতায় হপ্তাখানেক আছি, তার ভিতরে জামাইকে নিয়ে এসো। চোখে দেখি, আলাপপরিচয় করি।

হাতে স্বর্গ পেলেন হিমাদ্রি, সাহেবকে শত-কণ্ঠে ধন্যবাদ দিলেন। বলেন, জামাই পুরোপুরি হয়নি এখনো—হবু-জামাই। কথাবার্তা পাকা অকাল চলেছে এখন—সামনের অঘ্রাণে অর্থাৎ নভেম্বরে বিয়ে হয়ে যাবে। অত্যন্ত সংস্বভাব বুদ্ধিমান কর্মঠ ছেলে, দেখে তুমি খুশী হবে সাহেব।

গুণাবলীর ফিরিস্তি দিয়ে এলেন, কিন্তু জামাইয়ের সাব্যস্ত নেই তখন অবধি। তিনটে ছেলে মনে মনে আঁচ করেছেন, তার ভিতর থেকে দেখেশুনে একটি বাছাই করবেন।

কিন্তু সময় এখন তো মাত্র একটি হপ্তায় দাঁড়িয়ে গেল। কাছাকাছি নীরদবরণ আছেন—পুরনো জানাশোনা, ভাগনে সিতাংশু পাত্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু—হিমাদ্রি তাঁর বাড়িতেই সর্বাগ্রে ছুটলেন।

কৃতিত্ব গৌরবে ফেটে পড়ছেন হিমাদ্রি। গোড়ায় একটু ভূমিকা করেন ঃ সাদা চামড়ার অধীনে কাজ করা কত সুখ বুঝে দেখুন। গুণের কদর বোঝে ওরা, কাজের মানুষের খাতির করে। নিজেদের শালার ছেলে পিসির বেটা নেই তো, সেজন্য উচিত বিচার পাওয়া যায়। নইলে ধরুন, একফোঁটা ছেলে ভাস্কর, অভিজ্ঞতা কিছুই নেই—অতবড় চাকরিতে এক কথায় তাকে বসিয়ে দিচ্ছি।

নীরদবরণ কোনরকম মন্তব্য করেন না, নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছেন।

আদ্যোপান্ত শেষ করে হিমাদ্রি বলেন, সাহেব নিয়ে যেতে বলেছে। একটুকু চোখে দেখবে, আলাপসালাপ করবে। পাঁজিতে ভাল যোগ-টোগ দেখে পরশু-তরশুর মধ্যে যেদিন হোক সঙ্গে করে নিয়ে যাই। ওর কলেজে একটা খবর পাঠিয়ে দিন, বাড়ি চলে আসুক।

নীরদ বললেন, ভাস্কর যাবে না।

অবাক হয়ে হিমাদ্রি তাকিয়ে রইলেন। পরক্ষণে মুখে হাসি ফুটল।

ঘাবড়াবার কিছু নেই। যা ছেলে আপনার এক দেখাতেই মাত করে আসবে। তাছাড়া আমি তো থাকব। কথা সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে আনব। অতবড় কোম্পানির ডিরেক্টর হয়েও যে কী খাতির করছেন, চোখে না দেখলে বুঝবেন না।

নীরদ হেসে বলেন, চাকরি করবে না আমার ছেলে।

বলেন কি! জগৎজোড়া এদের কাজকারবার—অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসবে খাস লণ্ডন থেকে। আই-সি-এস-এর মতন এ চাকরিও স্বর্গে ফলে, বলতে পারা যায়।

তবু নীরদ হাসিমুখে মৃদুমৃদু ঘাড় নাড়ছেন। হিমাদ্রি বিরক্ত হয়ে বলেন, চাকরি করবে না, মানেটা কি? ধরুন ডিভিসন্যাল কমিশনার করে দিল। কি হাইকোর্টের চিফ-জাস্টিস। সে-ও তো চাকরি।

নীরদবরণ বলেন, তবু করবে না। চাকরি মানেই চাকরগিরি। আমি নিজে যা কখনো করতে যাইনি, ছেলেকে তার মধ্যে দিতে যাব কেন?

উৎসাহ চুপসে গেল হিমাদ্রির। মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে তিক্ত কণ্ঠে বলেন, ছেলেও ব্যবসা-বাণিজ্যে যাবে বুঝি? পারবে মাসে মাসে হাজার টাকা রোজগার করতে!

সেই সময়টা সোনার বাংলা স্টীল কোম্পানিতে তালা পড়েছে। হিমাদ্রি সকল খবর রাখেন। সেই জিনিষটা ঠেস দিয়ে বলা আর কি!

নীরদের তবু কুণ্ঠাহীন জবাব: হাজার কি বলেন, হয়তো বা দশ টাকাও নয়। ছেলে আমার শুধুমাত্র রোজগার করবে, আর পরিবার পালন করবে, এমন জিনিষ চাইনে আমি। ইণ্ডাস্ট্রি গড়ে তুলবে সে—হয়তো সফল হবে, হয়তো হবে না। তবে এটা ঠিক, চাকরি সে কোনদিন করবে না। পারে তো অন্যদের চাকরি দেবে।

হিমাদ্রির দিকে চেয়ে আবার বলেন, আপনি বিরক্ত হয়েছেন। কিন্তু মেয়ের বিয়ে এখনো তো হয়ে যায়নি। শম্পা-মাকে ভাল লাগে, সেজন্য কোনদিন কিছু বলে থাকতে পারি। সেই কথা ধরে থাকবার কি আছে? এত বড় চাকরির লোভ অনেক বাপই ছাড়তে পারবে না—তাদেরই কারো একটা সৎ ছেলে দেখে নিন। ঝুঁকির মধ্যে কি জন্য যাবেন? আপনার সঙ্গে আমিও গিয়ে সেই পাত্র আশীর্বাদ করে আসব।

এর পর আর একটু বসে একথা-সেকথা বলে হিমাদ্রি উঠে পড়লেন। আর যে দুটি পাত্র ভেবে রেখেছেন, তাদের খোঁজ নিয়ে দেখলেন একটি টাইফয়েডে শয্যাশায়ী, অন্যটি বাপের সঙ্গে কলহ করে বাক্স ভেঙে টাকা নিয়ে পিটটান দিয়েছে। সপ্তাহ অন্তে ডিরেক্টর সাহেব কলকাতা ছাড়লেন, এতবড় সুযোগ মুঠোর মধ্যে এসে ফসকে গেল।

নীরদের সঙ্গে হিমাদ্রির দেখাসাক্ষাৎ পরেও অনেক বার হয়েছে। কথাবার্তাও না হয়েছে এমন নয়, কিন্তু ভাসা-ভাসা রকমের। শম্পার বিয়ের প্রসঙ্গ আর তুলতেন না। ভাস্করের সম্বন্ধে আগ্রহ একেবারে ঠান্ডা। চিরজীবন চাকরি করে আসছেন—ঐ জিনিষটাই বোঝেন ভাল। মাসান্তে নির্ঝঞ্ঝাট বাঁধা মাইনের মোটা টাকা—এ জিনিষ অবহেলা করে যারা অনিশ্চিত পথে হাতড়ায়, তাদের বুদ্ধির তিনি তারিফ করেন না। নতুন পাত্রের খবরাখবর নিচ্ছেন। সাহেব বলে গিয়েছেন, সামনের শীতকালে আবার আসবেন ইন্ডিয়ায়। যদি কিছু হবার হয়, সেই সময়। অতএব তাড়াতাড়ি নেই, ধীরে-সুস্থে পাত্র খোঁজা চলছে।

শেষ পর্যন্ত কোন কিছুই হল না। সাহেব আর ইন্ডিয়ায় এলেন না, শীতকালের আগেই মারা গেলেন। সেই শোকে কলকাতার অফিস একদিন বন্ধ রইল। আরও কিছুদিন পরে হিমাদ্রি রিটায়ার করলেন—নতুন ডিরেক্টর নিয়মের উপর একটা মাসও এক্সটেনসন মঞ্জুর করল না। রিটায়ার করে কলকাতা ছাড়লেন। তারপর থেকে মন খানিকটা ঘুরেছে—চাকরি ছাড়া অন্য বৃত্তিতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে, সেটা এইবার বুঝতে শিখেছেন।

স্টীল কোম্পানি তালাবন্ধ, কেমিক্যাল ওয়ার্কস চলছে ভাল—সেই অবস্থায় ভাস্কর বলেছিল, মেটালার্জি ছেড়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ঢুকে পড়ি তবে?

কিছু অপ্রতিভ হয়ে নীরদ বলেন, আমি তাই বলছি নাকি?

তোমার মন বলছে বাবা।

নীরদ হেসে ফেললেন: বিদ্যে তোমার অনেক হয়েছে—বইয়ের কথা শুধু নয়, মনের কথাও টপাটপ করে পড়ে ফেল।

ভাস্কর বলেছিল, সকলের কেন হবে, আমার বাবার মন। তুমি যে ছেলেমানুষ বাবা, মন গঙ্গা-জল। বলছিলে না, ডিগ্রি-ডিপ্লোমা চাকরির জন্য লাগে। যারা চাকরি করবে না, কাজ করবে, তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ হলেই হল, ডিগ্রির জৌলুষের দরকার নেই। হুকুমটা তবে কি এই দাঁড়াল না—স্টীল কোম্পানির দায়ে মেটালার্জি পড়লে, কেমিক্যাল ওয়ার্কসের জন্যে কি করবে করো? হুকুমটা বুঝে নিয়ে নতুন সেসনের অ্যাডমিশন-ফরম আমি এনে রেখেছি।

এম, এ আর আইন পড়ছে

হত তাই সত্যি সত্যি, বাপের ইচ্ছায় মেটালার্জি ছেড়ে কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভাস্কর ঢুকে পড়ত। কিন্তু লড়াই থেমে গেল আচম্বিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াময় নানা আজব ব্যাপার ঘটতে লাগল। বিজ্ঞানের দাক্ষিণ্যে সংকীর্ণ ব্যবধান ঘুচে গিয়ে মানুষ এবারে বিশ্ব-নাগরিক—এমনি সমস্ত গাল-ভরা বুলি। ওদিকে আস্ত এক একটা দেশ ভেঙে দু-টুকরো করছে—কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, জর্মনি এবং আমাদের ভারতেও সেই ব্যাপার—এক বাংলা কেটে দুই বাংলা।

কেমিক্যাল ওয়ার্কস এবং স্টীল কোম্পানি দুটোই মোটামুটি ভাল চলছে, তার উপর নীরদবরণ আর এক কারখানার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়লেন। ভারত স্বাধীন হবার পর অনেক সাহেব দেশি মানুষের কাছে কাজ-কারবার বেচে দিয়ে সরে পড়ছে। তেমনি একটা জুট-মিলের ম্যানেজিং এজেন্সী জুটিয়ে নিলেন তিনি।

চটের বাজারে ভারত প্রায় একেশ্বর। জগৎ-জোড়া খদ্দের, কোটি কোটি বিদেশি মুদ্রা আসে। এ হেন ইণ্ডাস্ট্রির উপর কতবড় কঠিন আঘাত এসেছে, কারবারের ভিতরে ঢুকে পড়ার আগে নীরদরা পুরোপুরি বোঝেন নি। জলের দরে সাহেবরা ছেড়ে যাচ্ছে অকারণে নয়। হুগলী নদীর কিনারা ধরে যাবতীয় জুটমিল, আর উৎকৃষ্ট কাঁচামাল ঢাকা-ময়মনসিং অঞ্চলে। দুটো আলাদা দেশ হয়ে গেল—গতিক হয়তো এমনি দাঁড়াবে, পাট অভাবে মিল বন্ধ এখানে, আর খদ্দের অভাবে পাট গাদা হয়ে জমবে পূর্ব-বাংলায়। মাঝখান থেকে মজা লুটবে ডান্ডি, সস্তা দরে কাঁচা মাল কিনে বাজার দখল করে ফেলবে। হতে পারে এমনি অনেক কিছু যদি না অব্যবসায়ী মানুষরা এর মধ্যে এসে পড়ে।

নীরদবরণ তা বলে একবিন্দু অনুতপ্ত নন। বিপদ দেখে রোখ আরও চড়ে উঠল। বিলাতি নাম ফেলে দিয়ে নতুন নামকরণ হল সোনার বাংলা জুটমিল। হোক না খণ্ডিত বাংলা, সোনা ফলাবেন এখানেই।

হুকুমটা এবারে আর মনে মনে নয়। সোজা-সুজি ভাস্করকে বললেন, জুট টেকনোলজি নিয়ে লেগে পড়ো। এমন শিল্প জখম হতে দেবো না। কাঁচা মাল এখানকার মাটিতেই ফলবে। ভাল পাট হবে না জানি, কিন্তু খারাপ পাট ভাল হয়ে যাবে মিলের ল্যাবরেটরিতে এসে। সোনার রং ধরবে। আঁশ ছিঁড়বে না। পাটের বিকল্প যেসব তন্তু, তার উপরেও গবেষণা হবে আমাদের ল্যাবরেটরিতে।

বলেন, পাটের জিনিষ নিয়ে ডান্ডির আজ এত দেমাক, কিন্তু ইতিহাস জানো না। ভারতীয় পাটে বুনন হবে, সেই জিনিষ খদ্দেরে নেবে, একসময় ভাবতেই পারত না ওরা। ডান্ডি গ্যারান্টি দিত: ভারতীয় পাটের একটি আঁশ পাবেন না আমাদের জিনিষে। পাশা উল্টে গেল আবার একদিন। ডান্ডি জাঁক

করে বিজ্ঞাপন ছাড়ে : পুরোপুরি ভারতীয় পাটে তৈরি জিনিষ, ভেজাল নেই। পশ্চিমবঙ্গের পাট দিয়েও ঠিক তাই হবে, বাণিজ্যের মোড় ঘুরিয়ে দেবো আমরা।

অতএব ভাস্কর পাটের নাড়ীনক্ষত্র নিয়ে পড়ল। বিলাত গেল। বেলফাস্ট থেকে একেবারে হালের যন্ত্রপাতি আনার ব্যবস্থা করল। খদ্দেরের রুচি ও চাহিদা বুঝে এলো দেশে দেশে টহল দিয়ে।

শম্পা এই নিয়ে খোঁটা দিতে ছাড়ে না। যেমন গিয়েছিল ভাস্কর তার সঙ্গে লাগতে। দেশে ফেরার পরেই ভাস্কর একদিন সিতাংশুর কোয়ার্টারে হাজির। নাকি, বড় দরকার সিতাংশুর কাছে। হতে পারে, কিন্তু দরকারের মানুষ শুধুই যে সিতাংশু কে বিশ্বাস করবে? সিতাংশুরেই বরঞ্চ এ সময়টা থাকার কথা নয়—ক্লাবে যায় এই সন্ধ্যাবেলা। আর শম্পা সুনিশ্চিত পড়াশুনো নিয়ে থাকে। শম্পা এরোড্রোমে পর্যন্ত গেল না তার সম্বন্ধে বিশ্রী জিনিষ ভেবে নিয়ে। শম্পাকে আজ শুনিয়ে যাবে।

ললিতা মামুলি দু-চার কথা বলে কাজের দোহাই পেড়ে উপরে উঠে গেল। ড্রইংরুমে ভাস্কর আর শম্পা। ভাস্করের সর্বপ্রথম কথা: শম্পা—তারপরে কী এখন তুমি? শম্পা দাশগুপ্ত? কী আশ্চর্য, শুনে গেলাম মজুমদার হয়ে যাচ্ছ। সেই তিন বছর আগে।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কৃত্রিম হতাশার ভঙ্গিতে শম্পা বলল, পাকা-কথা হয়েও ফেঁসে গেল। ছেলেটা ভাল, দেখতে রাজপুত্তুর। বাপ-ছেলে দুজনাই এডভোকেট। বাপের খুব ভাল প্র্যাকটিশ। ছেলে নিজে এলো একদিন—দেখে শুনে আলাপ করে গেল। আমায় নাকি ভারি পছন্দ তার। শুনে তো লাফাচ্ছি আমি—

ভাস্কর বলে, হল না কেন?

আমার অদৃষ্ট। বাবার দোষ ঠিক নয়, দোষ কারো দিতে হয় তো বাবার কোম্পানির ঐ বুড়ো ডিরেক্টরের। কোনও শীতকালে আর ... ইণ্ডিয়ায় আসবে না বাবার জামাইকে চাকরি দিতে। বাবা হিসাব করতে লাগলেন, বাপের প্র্যাকটিশ ভাল বলে ছেলেরও যে তাই হবে, কী মানে আছে? আর একটা নতুন সম্বন্ধও এসে পড়েছে এর ভিতর—

সকৌতুকে ভাস্কর বলে, সে পাত্রটি কেমন?

ভাল। এডভোকেট তো পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যায়, এ হল এটর্নি। বাবা বললেন, যখন এটর্নি হয়ে বসেছে, রোজগারের মার নেই। সম্পত্তি-শালী বেওয়া-বিধবা মক্কেল মেরে এটর্নির পয়সা। বেওয়া-বিধবার কোনদিন আকাল হবে না। এইখানে তুই মন ঠিক করে ফেল শম্পা। কি করব—পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ, এডভোকেট ছেড়ে নিজেকে তখন এটর্নির পাশে মনে মনে দাঁড় করাই। এটর্নিও নিজে দেখতে আসছে—আলাপটা কি ভাবে করব, সর্বক্ষন তাই মক্স করছি—

হাসিমুখে ভাস্কর শুনে যাচ্ছে।

শম্পা বলে, কিন্তু ভালর উপরেও ভাল আছে। বাবার মত ঘুরে যায় আবার। বললেন, খুঁত খুঁত করছিল আমার। বেওয়া মেরে পয়সা করবে কিন্তু নিজেও তো মরে যেতে পারে। তা হলে তোর তো পথে বসবার গতিক। ... নয় পাঁচ নয়, একটি মেয়ে তুই আমার—দেখে শুনে এমন ঘরে কী করে দিই? এবারে যা পেয়েছি—দশ দশখানা বাড়ি শহরের উপর। মাস অন্তে বাড়িভাড়ার মোটা টাকা আপনাআপনি এসে যায়। নড়ে বসবার গরজ হয় না। নড়েও না সে বাড়ির কেউ। বাড়ি সুদ্ধ মরে উজাড় হয়ে গেলেও ভাড়ার টাকার মার নেই। কী করি ভাস্কর-দা, বাবার ইচ্ছা বুঝে মনে মনে নিজেকে বাড়িওয়ালার পাশে দাঁড় করাই।

কথার ধরনে ভাস্কর খিল খিল করে হেসে ওঠে।

এইবারে শম্পার জবাব : অন্যে হাসুক, আপনি কি জন্যে হাসবেন শুনি? আপনারই মতন তো। হতে চাইলেন সাহিত্যিক। কোমর বেঁধে কলম নিয়ে বসলেন, লিখলেনও কতক-গুলো। পিতার ইচ্ছায় কলম ছেড়ে একেবারে লোহালক্কড়ের লাইনে। লোহা ছেড়ে তারপর—

কথা শেষ করতে না দিয়ে ভাস্কর বলে, তাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নেই। সাহিত্যের সরল সড়ক পেয়ে গেছি। বোকারাই কলম নিয়ে খাটতে যায়। বেশির ভাগ তো এই—কিছু না লিখেও সাহিত্যস্রষ্টা। কিছু না পড়েই সাহিত্যদ্রষ্টা—সব সাহিত্যিকের মাথার উপর চূড়ামণি হয়ে যাঁদের অধিষ্ঠান। কিন্তু আমার কথা থাক শম্পা। আজকাল কার পাশে তুমি মনে মনে দাঁড়াচ্ছ, জ্যেঠাবাবুর শেষ হুকুমটা কি তাই বলো।

শম্পা হেসে বলে, হায় অদৃষ্ট! বেহায়া হয়ে তা-ও আমায় নিজের মুখে বলতে হবে।

চা ঢালছিল ভাস্করের পাশে দাঁড়িয়ে। বলে, হুকুম এইখানে দাঁড়ানোর। ঘুরে ফিরে পুনর্মূষিক—আরম্ভে ঠিক যে জায়গায় ছিলাম।

কলকণ্ঠে শম্পা বলতে লাগল, সে-ও ভারি মজা কিন্তু। আপনার ফেরার কয়েকটা দিন আগে কাকাবাবুর সঙ্গে গিয়ে বাবা মিলের ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। অত বড় ব্যাপার, ধারণা ছিল না। বাসায় এসে আমার উপর ধমকানি। মাঝের যত সম্বন্ধ বাতিল। সকলের গোড়ায় যে কথাবার্তা, সেইখানে হবে। পুরানো বন্ধুর কাছে খেলো হতে পারিনে তোর জন্যে। মন ঠিক করে ফেল, ফিরে এলে আর দেরি করব না।

চায়ের বাটি হাতে তুলে দিয়ে শম্পা বলে, তা-ও শেষ নাকি? কোথায় কোন্ গণ্ডগোল পাকিয়েছেন, খবর চলে এলো। বাবার মুখ গম্ভীর—নতুন হুকুম বেরিয়ে পড়ে আর কি! সিতাংশু-দাদা উড়ে গিয়ে আপনাকে টেনে আনল, সাক্ষী দিয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে দিল।

ভাস্কর বলে, আবার নতুন বিপদ হতে কতক্ষণ! ধরো, মিলে আমাদের লালবাতি জ্বলল। জ্যেঠাবাবু হুঙ্কার ছাড়বেন, মন সরিয়ে নে শম্পা—

শম্পা বলে, ভয় দেখাবেন না বলছি। খাতির করে চা-টা দিচ্ছি, শোধ বুঝি তার।

এমনি সময় হিমাদ্রি ফিরলেন। বেড়াতে বেরিয়েছিলেন সেই বিকালবেলা। নিজেই বলছেন, বেড়াতে বেড়াতে হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটে তোমাদের পুরানো বাড়ি গিয়েছিলাম।

ভাস্করে শম্পায় চোখোচোখি, মুখ টিপে হাসে দুজনেই। এত বড় শহরে হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের চেয়ে বেড়ানোর ভাল জায়গা মিলল না। অর্থাৎ জোরদার পয় চলেছে এখন ভাস্করের।

বলছেন, পরশুদিন চলে যাচ্ছি, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করে এলাম। তুমি জানো না বাবাজি, কতদূর আমরা ঘনিষ্ঠ। এক ইস্কুলে পড়েছি। সেই সব পুরানো গল্প হল। হাঁটিতে বেরুলেন আমায় সঙ্গে নিয়ে। সেই লেক অবধি। লেকে গিয়েও চক্কোর দিচ্ছেন। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, কিন্তু হাঁটেন ছেলেছোকরার মতো। আমি পিছনে পড়ে যাই। দেহটি খাসা রয়েছে। ধার্মিক মানুষ, নিয়মের মধ্যে থাকেন, কেন থাকবেন না?

জুতো খুলে স্লিপার পায়ে ঢুকিয়ে সামনাসামনি বসে পড়লেন। বললেন, ছাতের উপরের ঠাকুরঘরও দেখালেন আমায়। পাশা-পাশি দুটো—জামাইয়ের আর শাশুড়ীর। পুণ্যের আবহাওয়া, মন ভরে যায়। কাজকর্মের দায়িত্ব তোমার উপরে দিয়ে পুরোপুরি আবার ভগবানে মতি দিয়েছেন। উচিত তো তাই। আমাদের লক্ষ্মৌর বাসায় জায়গার টানাটানি, তার উপর বাচ্চাগুলো কুরুক্ষেত্তোর করে বেড়ায়। নিরিবিলি একটু স্থির মনে বসব, সে উপায় নেই। দেখি, যাবার সময় কালীঘাট থেকে মা-কালীর পট একটা নিয়ে যাব।

শম্পাকে বলেন, তোর বউদি কোথায় রে? দেখা হয়েছে ভাস্করের সঙ্গে? খানসামাকে বল এইখানে আমায় চা দিয়ে যেতে। শুধু এক কাপ চা, অন্য কিছু নয়।

শম্পাই রান্নাঘর থেকে চায়ের পট এনে বিনা চিনির চা বানিয়ে দিচ্ছে। হিমাদ্রি বলেন, তোমার কথাও হল বাবাজি। মিলের সর্বেসর্বা তুমিই তো এখন। শুনে বড় আনন্দ হল।

ভাস্কর হেসে বলে, বাবা বলেছেন তো! বাবা তুলে ধরেন অমনি আমায়। আমার কী ক্ষমতা! পরখ করে দেখছেন আমায় দিয়ে কতদূর কি হতে পারে। পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটে এসেছেন, তা বলে কাজ ওঁকে ছাড়েনি।

তৃপ্ত হলেন হিমাদ্রি। ছেলে বাপকে এত দূর মান্য করে, বাপের উপর এমন নির্ভরশীল, বয়সে বুড়িয়ে এসে এসব শুনতে বেশ ভাল লাগে। বললেন, তা বললে কি শুনি! কাজের ছেলে তুমি বাবা, মিলের খোল-নলচে বদলে ফেলছ, বাজে লোকজন কমিয়ে দেবে। শুনলাম হৈ-চৈ লেগেছে তাই নিয়ে—

ভাস্করের অবাক লাগে। অতিশয় গুহ্য খবর। গৌরদাস গোল পাকাচ্ছে, কিন্তু বাইরের কেউ কিছু জানে না। সে জিনিষও হিমাদ্রি কেমন করে বের করে ফেলেছেন।

কৈফিয়তের ভাবে ভাস্কর বলে, নতুন নতুন হাই-স্পীড মেশিন এসে পড়েছে, চালু হয়ে গেল চার-পাঁচটা লুম স্বচ্ছন্দে এক হাতে চলবে। লোক ফালতু বয়ে যাবে, সেই ওদের ভয়। রাখা যেত তাদের না হয় কিছু দিন। কিন্তু ব্যাচিং ডিপার্টমেন্টের খরচা ওদিকে তিন-চার গুণ বেড়ে যাচ্ছে—রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিরেশ মাল মজবুত হবে, সোনালি রং ধরবে। না করে উপায় নেই—প্রতিযোগিতা সাংঘাতিক, পূর্ব-বাংলায় বড় বড় মিল বসে যাচ্ছে। কিন্তু একদল উঠে পড়ে লেগেছে—নতুন মেশিন চালু

হতে না পারে। তার মানে ইণ্ডাস্ট্রি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক, সেই ওঁদের মতলব।

হিমাদ্রি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। আগ্রহ দেখে ভাস্করের হাসি পাচ্ছে। কন্যাদায় নির্ঘাৎ এবার মোচন করবেন। ভাস্করকে একদা বাতিল করেছিলেন, বড্ড রোখ পড়েছে এবার। বিলেত থেকে নতুন চাকচিক্য নিয়ে ফিরল, অতবড় মিলের কর্তা হয়ে বসেছে। প্রশ্নের শেষ নেই, সীমা নেই। ভাস্কর এখন যা মুখে আসে এলোমেলোভাবে বলে যায়। রেহাই পেলে বাঁচে। শম্পা উপরে উঠে গেছে, বাণিজ্যের কচকচি কতক্ষণ ভাল লাগে মানুষের!

এরই হপ্তাখানেক পরে রবিবার সকালবেলা শম্পা পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি এলো। যুক্তকরে নিবেদন করে : ভয়ে বলি, না নির্ভয়ে বলি?

আসবে শম্পা, ভাস্কর জানে। সিতাংশুর কাছে শুনেছে। সহাস্যে বলে, গো-ব্রাহ্মণ দূত আর স্ত্রীলোক অবধ্য। স্বচ্ছন্দে বলে যাও।

জন্মদিন আজ আমার। সামান্য স্ত্রীলোক, অতিক্ষুদ্র আয়োজন। বৃহৎ বনস্পতির কাছে এসে পড়েছি। পায়ের ধুলো—উঁহু, জুতোর ধুলো—তা-ও তো হয় না, বাড়ির ভিতরে আবার ধুলো কোথায়?

বনস্পতির পা থাকে বুঝি? সে পায়ে আবার জুতো? হল না শম্পা, তোমার উপমার গোড়া থেকেই গোলমাল।

খিল খিল করে শম্পা হেসে ওঠে : বলতে দিন না আপনি। এমনি ক্ষেত্রে বিনয় করে যা সমস্ত বলতে হয়।

ভাস্কর বলে, মানুষটা পাকড়েছ ভাল শম্পা। বিনয়ের অবতার যেন আমি। মুখে সর্বক্ষণ বিনয়ের তুবড়ি ফুটছে। বলাবলির দরকার নেই, ভাবে বুঝে নিয়েছি। বাবার ঐ যে আছেন ভাবগ্রাহী শ্রীগোপাল, আমিও তেমনি।

যাবেন কিন্তু। জরুরি কাজকর্ম নেই তো বিকেলবেলা? দেখে নিন, আপনি আবার ব্যস্ত মানুষ—

না গো, কাজ আবার কি!

সকাল সকাল চলে আসুন তবে। ধরুন ছ'টা—কি, সাড়ে-ছ'টা। ছোট্ট ব্যাপার—জন কয়েক আত্মীয়-আত্মীয়া আর কলেজের বান্ধবী কজন। জমিয়ে গল্প করা যাবে। কেমন?

ভাস্করের ঘোর আপত্তি : ছ'টা যে বড্ড দেরি। পাঁচটায় গিয়ে আমি হাজির হব।

পরমোৎসাহে আরও জোর দিয়ে বলে, খাসা হবে শম্পা। ভিড় জমেনি তখন—একলা তুমি। তুমি আর আমি দু-জনে একা-একা থাকা যাবে বেশ অনেকক্ষণ।

আনন্দে বুঝি বাতাসের উপরেই ভাসতে ভাসতে শম্পা বাসায় ফিরে গেল। বিকালে পাঁচটার আগে থেকেই তৈরি। তৈরি যার জন্যে, সে মানুষটির দেখা নেই।

ছয় সাত সাড়ে-সাত বেজে গেল। যারা সব এসেছিল একে একে চলে গিয়ে ড্রইংরুম খালি। শম্পার কান্না পাচ্ছে—মানুষটির মুখেই মিষ্টি কথা শুধু। লজ্জা-অপমান গায়ে না মেখে শম্পা টেলিফোন ধরবার চেষ্টা করে। বেজেই চলে ফোন। তিন-চারবার ফোন করেছে, এক অবস্থা।

টং টং করে আটটা বাজে, সেই সময়টা ভাস্কর নয়—এলো মাধব। উৎসব শেষ হয়ে গেছে, বাড়ির লোক সব উপরে।

খবর পেয়ে শম্পা নেমে এসে বলে, খবর কি মাধব-দা?

ওবাড়ি যাতায়াতে মাধবও শম্পার মাধব-দা হয়েছে। মাধবের হাতে পরিপাটি প্যাকেট একটা। বলে, নাও গো দিদি, তোমার জন্যে।

শম্পা ছুঁয়েও দেখে না। জিজ্ঞাসা করে, ছোট সাহেবের খবর কি—তোমার দাদাভাইয়ের?

পাঁচটায় কাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আমি মনে করিয়ে দিলাম, শম্পা-দিদি এত করে বলে গেছে। তো বলল, আমায় কি হবে? জিনিষ পৌঁছে দিস, তাতেই হয়ে যাবে।

অনেক দামের জিনিষ বোধহয়, সেইজন্যে বলেছেন—

বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে সহজ হাসি হেসে শম্পা বলে, বোসো মাধব-দা। আসছি আমি এক্ষুনি—

পাশের ঘরে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে মাধব বলে ওঠে, আরও আছে দিদি। সত্যি একটা ভাল জিনিষ—

ফতুয়ার পকেট থেকে সুদৃশ্য কৌটো বের করল। হাসিতে দু-পাটি দাঁত মেলে কৌটো খুলে এগিয়ে ধরে : চেয়ে দেখ—

কানের গয়না, মুক্তা বসানো। যেতে যেতে শম্পা একবার আড়চোখে তাকিয়ে যায়। দামি জিনিষ, সন্দেহ কি!

প্লেট ভরতি খাবার এনে নিচু-টেবিলে পরম যত্নে সে সাজিয়ে দেয় : খাও মাধব-দা।

পরিতুষ্ট মাধব একটু না-না করে : বুড়ো মানুষের জন্যে এত কেন আনলে?

একটা জিনিষও পড়ে থাকবে না, শেষ করে তবে ছুটি।

খেতে খেতে একবার মাধব মনে করিয়ে দেয় : জিনিষ পড়ে রইল দিদি, সামাল করে রাখো।

হাসিমুখে শম্পা তাড়া দিয়ে ওঠে : চুপ! খাওয়ার মধ্যে বক বক করলে হজম হয় না।

হাত-মুখ ধুয়ে মুখে একটা পান ফেলে জুতো পরতে পরতে মাধব বলে, কিছু বলতে হবে দাদাভাইকে?

ফেরত নিয়ে যাও তোমার দাদাভাইয়ের জিনিষ। বোলো, দোকানের শো-কেসে আরও বেশি দামের জিনিষ থাকে, কেউ ছুঁতে যায় না। না নিয়ে গেলে আমি কিন্তু রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেবো মাধব-দা।

বলে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে শম্পা ফর ফর করে উপরে উঠে গেল।

রাতটুকু কোনক্রমে কাটিয়ে সকালবেলা ভাস্কর চলে এসেছে। এসে প্রশ্ন : রাস্তায় ছুঁড়তে যাচ্ছিলে, গয়নাটা পছন্দ নয় বুঝি?

শম্পা প্রথমটা হকচকিয়ে গেছে। বলে, অমন জিনিষ অপছন্দ কেন হতে যাবে?

কথাটা লুফে নিয়ে ভাস্কর বলে, ঠিক তাই। কোন গয়নাই কোন মেয়ে অপছন্দ করে না। ব্যাপারটা তাই ধরতে পারছিনে।

আমার জন্মদিনে চেয়েছিলাম আপনাকেই। নিজের বদলে জিনিষ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কী জানি, জিনিষই তো চায় মানুষে। সকৌতুকে শম্পার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভাস্কর বলতে লাগল, বিয়ের নেমন্তন্নে ছেপে দেয় : লৌকিকতা গ্রহণে অক্ষম। তার মানে, লৌকিকতা বলে একটি প্রথা আছে, ভুলবেন না সেটা ভদ্রজনেরা। চাকরির দরখাস্তের ফরমে দেখাদেখি আমরাও ছেপে দিই : ক্যানভাসিং নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ঐ জিনিষটা বিস্মরণ হলে তোমার অদৃষ্টে নির্ঘাৎ অশ্বডিম্ব।

দৃষ্টান্ত আরও দিচ্ছিল, অধীর হয়ে শম্পা ফুঁসে উঠল : যা চিরকেলে নিয়ম আপনার—কুকুরের মুখে মাংসখণ্ড। মাধব-দাকে দিয়ে মাংসখণ্ড পাঠিয়েছিলেন কাল।

ভাস্কর বলে, দুনিয়ার আধাআধি তো ঘুরলাম। মাংসখণ্ডই ছুঁড়ে এসেছি। ফল অব্যর্থ—সকল ক্ষেত্রে। এদেশে-বিদেশে আমার বিস্তর পরখ করা আছে।

অদৃষ্ট আপনার, মাংসলোভী কুকুর ছাড়া কিছুই দেখলেন না দুনিয়া ঘুরে! উত্তেজনায় কাঁপছে শম্পার কণ্ঠ। সকালবেলার খবরের কাগজটা সামনে। এইমাত্র পড়ছিল, চাঁদের উল্টোপিঠে রাশিয়া রকেট পাঠাচ্ছে। সেই উপমা মুখে এসে পড়ে : চাঁদের উল্টোপিঠ আছে, মানুষেরও আছে। টাকার বাইরেও আর এক দুনিয়া, সেদিকে নজর যায় না আপনাদের।

গালি ভাস্কর একেবারে গায়ে মাখে না। হাসিমুখ। বলে, টাকাই শুধু আছে কিনা আমাদের। অন্য কিছু নেই।

শম্পা বলে, কেন থাকবে না? আছে টাকার অহঙ্কার।

ভাস্কর সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় : ঐ দুটো জিনিষ। কাল রাত্রে মাধব-দা'র মুখে তাজ্জব এক তৃতীয় জিনিষ শুনলাম। টাকার চেয়ে বড় নাকি একটি মানুষ—মানুষটির বিহনে টাকার জিনিষ রাস্তায় ছুঁড়ে দেওয়া যায়।

কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে এলো। বলছে, এ জিনিষ আমার কাছে নতুন। সত্যিই জানা ছিল না। পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না বলে যাচাই করতে বেরিয়েছি।

মনমেজাজ শম্পার আগুন হয়ে ছিল, সে আগুন মুহূর্তে নিভে যায়। এখন লজ্জা। কথা ফিরিয়ে নেবে কেমন করে? তাড়াতাড়ি বলে, তাই বুঝি! এই কাগজেই খবর রয়েছে, এখানে না এসে সাহিত্য-পুরস্কারে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতার মধ্যে সেখানে শতমুখে টাকার নিন্দে—

ভাস্কর আশ্চর্য হয়ে বলে, বটে বটে!

ভাব দেখাচ্ছেন কিছুই যেন জানেন না। অথচ আপনারই মুখের কথা।

কাগজটা তুলে নিয়ে শম্পা দু-তিনটে লাইন গড় গড় করে পড়ে যায় : অর্থ প্রতিপত্তি রাষ্ট্রনেতৃত্ব সমস্ত ক্ষণজীবী—নিতান্তই তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোন একটি সার্থক শিল্পসৃষ্টির তুলনায়।

অধিক পড়তে দেয় না ভাস্কর। হো হো করে হেসে ওঠে : রোসো রোসো। বক্তৃতায় আমি এই সব বলেছি—কী সর্বনাশ! এত সব শক্ত শক্ত কথা উচ্চারণ করে দাঁত দু-পাটি অটুট নিয়ে আসতে পেরেছি!

শম্পা বলে, ছাপার অক্ষরে রয়েছে—

সেই তো মজা। ঘটা করে সভার মধ্যে অর্থ জিনিষটাকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে এলাম, মূলে কিন্তু অর্থেরই খেলা। দেশে কি জ্ঞানী-গুণীর

আকাল হয়েছে যে আমায় ডেকে সাহিত্য-সভার সভাপতি হতে? পুরস্কারের টাকাটা আমি দিয়েছিলাম—সেই মাংস ছোড়ারই ব্যাপার। অলিখিত বোঝাপড়া থাকে—সভাপতি আমি, সভাপতি-বরণ উপলক্ষে নানা বিচিত্র বিশেষণে ভূষিত করবে আমায়, এবং বক্তৃতা লিখে টাইপ করে রাখবে আমার জন্য। তা দেখ, বক্তৃতায় অত সব শক্ত কথা ঢুকিয়ে রেখেছে—খারাপ মতলব নিশ্চয়। পড়তে গিয়ে অপদস্থ হবো, সবাই হাসবে। আমিও ঘড়েল তেমনি। এখান থেকে দু-লাইন ওখান থেকে চার লাইন পড়ে কপি প্রেসকে দিয়ে দিলাম। কাগজে বেরুবেই আসল।

কথার ভঙ্গিতে শম্পা হেসে হেসে খুন। ভাস্কর বলে, বিশ্বাস করো অনেক ইতস্তত করেছিলাম কাল। তোমার নেমন্তন্নে আসি, না সভায় যাই? সভার দিকেই শেষটা পাল্লা ঝুঁকল। সাঁতারের ক্লাবে সভাপতি হয়ে ওস্তাদ সাঁতারু খ্যাতি পেয়েছিলাম। হরিসভায় গিয়ে ভক্তিবারিধি খেতাব। আর্ট-এক্‌জিবিসনে গিয়ে চিত্ররসিক। তা ভাবলাম, সবগুলো গুণই প্রায় গেঁথে ফেলেছি—লিখে লিখে একদিন সাহিত্যিক হবার বড় বাসনা হয়েছিল। বিনা খাটুনির সাহিত্যিক নামটা সভায় বসে স্বকর্ণে শুনে আসি। বলেওছে ঠিক তাই সভাপতি-বরণে। হায় রে হায়, আমি হলাম সাহিত্যিক!

টাকায় কী না হয়, দেখ শম্পা। টাকা ছুঁড়ব না তো কী!

শম্পার রাগ-অভিমান আর নেই। ঝিল-মিল করছে মুখ আনন্দে। চা নিয়ে বসেছে দু-জনে, শুনেছে ভাস্করের খাপছাড়া কথাবার্তা। ক্ষণে ক্ষণে খিল খিল করে হেসে ওঠে।

উঠবার মুখে ভাস্কর বলে, কাল আমার জিনিষ ফিরিয়ে দিয়েছ, আমি আজ নিজে নিয়ে এলাম। দোকানের জিনিষ নয়। তার বদলে—।

পকেট থেকে বের করল আংটি একটা। শৌখিন কেসে নয়, কাগজে জড়ানো। বলে, হীরে নয়, মুক্তো নয়, সামান্য একটু সোনা। মীনা করে আমার নাম-লেখা—বাবা দিয়েছিলেন এক জন্মদিনে। পুরানো ক্ষয়া জিনিষ—দামের দিক দিয়ে তুচ্ছ। সে কিন্তু তোমারই দোষ শম্পা। মাধব-দার কাছে বলেছ, টাকাকড়ির চেয়ে মানুষটা আমি বড়। এমন কথা প্রথম এই কানে গেল।

আংটি শম্পার মুঠোয় গুঁজে দিয়ে ভাস্কর গাড়িতে উঠে বসল।

[পাঁচ]

হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের পুরানো বাড়িতে নীরদ আবার গিয়ে উঠেছেন। আদিগঙ্গার একেবারে উপরে, অদূরে কালীঘাট। ছাতের উপর পাশাপাশি দুই ঠাকুরঘর—একটি তাঁর, একটি শাশুড়ী তারামণির। কাজের দায়ে পার্ক স্ট্রীটে মিলের বাড়িতে চলে যেতে হ… শ্রীগোপাল… গেলেন সঙ্গে। নীরদের ঠাকুর… তালাবন্ধ ছিল সেই থেকে। সে বাড়ি… শৌখিন—কেতাদুরস্ত চালচলনের মধ্যে… হয়ে ঠাকুরের নাম করা অসাধ্য। সে জায়গা… নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হলেন, আবার যেন নু… ফিরে পেলেন। তাহলেও পুরোপুরি নয়, না… এজেন্ট এখনও, মিলের অফিসে মাঝে মা… যেতে হয়।

মিলের গোলমাল দিনকে-দিন জমে আসছ… ভাস্কর উচ্চহাস্যে উড়িয়ে দেয়: ক… ঝাঁপিয়ে পড়লে হবেই তো গোলমাল। … দোর দিয়ে বসে থাকো—অখণ্ড পরিপূ… শান্তি।

নীরদকে বলে, বাবা তোমার মায়ার শরী… কড়া হাতে রাশ ধরা তোমায় দিয়ে হত … কাজকর্ম ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলত। কোম্পানি… অনেক সর্বনাশ হয়েছে। বিস্তর লোকস… খেয়েছে, নতুন বন্দোবস্ত যদ্দিন না হ… লোকসান ঠেকানোর কোন উপায় নেই।

গোলমালের প্রধান পাণ্ডা গৌরদাস… নীরদবরণ এক সময়ে দুটো হাতের একখা… বলতেন গৌরকে—শৈশব থেকে বাড়িতে আ… দিয়ে রেখেছিলেন। পুরোপুরি বাড়ির ছে… হয়েই ছিল সে। প্ল্যান বানচাল করতে … গৌরদাস উঠে পড়ে লেগেছে।

হীরে নয়, মুক্তো নয়, সামান্য একটু সোনা

প্রথমটা ভাস্কর ভাল কথায় বোঝাবার চেষ্টা করেছে। গৌর-কাকা বলে ডাকে ছেলেবয়স থেকে। বলে, অবুঝ হোয়ো না গৌর-কাকা। কাজ কলে করবে—মানুষ তাহলে কম তো লাগবেই। কলের কাজ মানুষের হাতের চেয়ে অনেক নিখুঁত আর পরিপাটি। দেশ ভাগ হয়ে উৎকৃষ্ট কাঁচা-মাল এখন ভিন্ন দেশের সম্পত্তি। পুরানো পথ ধরে থাকলে ধ্বংস অনিবার্য।

গৌরদাস তবু বলে, রাধারমণ রায়ের ছেলে বলো আমি—আমার ভাবনাটা ভিন্ন পথে। যে দেশে জনসংখ্যা এত বেশি, সেখানে কলকব্জা বাড়িয়ে মানুষ বেকার করবার মানে হয় না। ওটা নৃশংসতা। ছাঁটাই মানুষগুলোর অবস্থায় নিজেকে ফেলে বিচার করো।

রাগ করে ভাস্কর তর্ক বন্ধ করে দেয় : কল হবার আগে সেকালে পাটের সুতো আর পাটের চট ঘরে ঘরে কুটিরশিল্প হিসাবে চলত। তোমরা মাতব্বর হয়ে চালাও তাই আবার, পিছন দিকে মুখ ফেরাও। আমার পথ আমি ছাড়ব না।

ইউনিয়নে দলাদলি ছিল আগে, এ-দলে ও-দলে মারামারি পর্যন্ত হয়ে গেছে। ইদানীং এক-মন এক-প্রাণ। চেয়ারম্যান-সেক্রেটারি ওরা ভিতরের মানুষ রাখে না—বাইরের তা-বড় তা-বড় মহাশয়েরা। কিন্তু আসল মানুষ একজনই—গৌরদাস। বড় বড় আদর্শ এক ধরণের মানসিক ব্যাধি ছাড়া কিছু নয়—গৌরদাস হল দু-পুরুষে ব্যাধিগ্রস্ত।

বিলাত-ফেরত ভাস্কর বুড়োমানুষ ধার্মিক নীরদবরণের মতো নয়, পুরানো সম্পর্ক সে মনে রাখবে না। তোমারও চাকরি যেতে পারে গৌরদাস। হিতার্থীরা এমনি অনেক রকমে বুঝিয়েছে। গৌরদাস গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। লাটসাহেবের মতো চলাফেরা তার, বেপরোয়া কথাবার্তা।

নীরদবরণও ছেলেকে বারম্বার সতর্ক করেন : গৌরদাসটা সাংঘাতিক হয়েছে, ঘাঁটাতে যেও না। আট-ঘাট সমস্ত জানে। ঘরের ছেলে হয়ে ছিল, আদরযত্ন বিস্তর হয়েছে—কিন্তু ও-মানুষ বশ হবার নয়। উল্টো ফল বরঞ্চ, কোন-কিছুই গৌরের চোখের আড়ালে থাকত না। গতিক বুঝে শেষটা বলি, এত বড় দায়িত্বের পদ তোমার, কারখানার উপর না থাকলে কাজের অসুবিধা হচ্ছে। কায়দা করে বাড়ি থেকে সরিয়ে দিলাম।

নিশ্বাস ফেলে বলেন, তবে কাজের মানুষ বটে। ওরা ছিল আমার ডানহাত-বাঁহাত—সে আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনে। বয়স হয়ে নিজে তো ক্ষমতা হারিয়েছি—তার উপরে একটা হাত পঙ্গু। পঙ্গু কেন, বিষাক্ত হয়েছে সে হাত। কেটে ফেলবে তো বটেই, কিন্তু সইয়ে সইয়ে। বেশি তাড়াহুড়ো কোরো না, গোলমাল খানিকটা থিতিয়ে যাক।

ভ্রূভঙ্গি করে ভাস্করের সেই উড়িয়ে দেবার ভাব : গোলমালটা তুমি কোন্‌খানে দেখলে বাবা? ঘেউ ঘেউ করে, নেড়িকুত্তা ওগুলো; ডাকেই ওরা, কামড়ায় না।

নীরদবরণ বলে যাচ্ছেন—ভাস্কর অবাক হয়ে যায়। বাপের উদ্বেগ বাড়বে বলে সে গোপন করে আসছে—তিনি দেখি সমস্ত জেনে বসে আছেন। নীরদ বলছেন, টাকার অসুবিধায় প্ল্যান বানচাল হতে বসেছে, সে আমি জানি। গৌরদাসেরা বাগড়া দিচ্ছে তার উপরে। একদিন ছিল ম্যাজিকের মতন আমি খালি মুঠো থেকে ভরা মুঠো ঢেলে দিয়েছি। এখন ঠুঁটো-জগন্নাথ। মল্লিক সাহেবকে জানালে টাকার ব্যবস্থা হয়তো হয়ে যায়। কিন্তু ভরসা পাচ্ছিনে। কোম্পানির অনটনের অবস্থা জানাতে চাইনে এ সময়টা। আমার উপর সমস্ত ফেলে নির্ভাবনায় বসে পড়ে থাকেন—কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বেরিয়ে পড়ে!

কণ্ঠ বড় মিইয়ে এসেছিল, কি ভেবে হঠাৎ নীরদ চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। উৎসাহ দিয়ে বললেন, ভেবো না। আমি চুপ করে নেই। ডাকছি রাত-দিন ঠাকুরকে, তিনি সুরাহা করে দেবেন। কাগজ দেখে থাক? সুয়েজখাল নিয়ে লাগবে-লাগবে ঠেকাছে। তোমার কি মনে হয়?

হাসিমুখে ভাস্কর বাপকে ধমক দিয়ে উঠল : অন্যায় হচ্ছে বাবা, আমার এলাকার মধ্যে তুমি ঢুকছ। বকে দেবো কিন্তু। বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে—টাকার দায় আমার, তুমি খরচা করে যাবে। টাকা কত দরকার, তাই শুধু তুমি বলবে। তার বেশি একটি কথাও নয়।

একদিন চরমে উঠল। মুখোমুখি কলহ। গৌরদাস বলে, সাহেবরা বিদেশি হয়েও প্রতি-পালন করে গেছে। দেশি মানুষ এসে অবস্থা ভাল হবে—তা নয়, এত লোকের অন্ন মারতে লেগেছ তুমি।

ভাস্কর বলে, পুরো ছ-মাসের মাইনে দিতে রাজি যদি ওরা আপোষে চলে যায়। কম নয় সেটা।

তার পরে?

ছ-মাস যথেষ্ট সময়। কাজের মানুষ হলে এর মধ্যে কাজকর্ম জুটিয়ে নেবে।

সেটা বিদেশ দেখে এসে বলছ। কাজের মানুষ শুনেছি পড়তে পায় না। উল্টো রীতি এখানে। তদ্বিরের জোরে আনাড়ি উতরে যায়, গুণী গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

ভাস্কর খোঁটা দিয়ে বলে, জুটমিল তোমাদের সিদ্ধিহাট আশ্রম নয়। অন্নদান আর চরিত্রগঠনের জন্য নেই আমরা। সে আশ্রমও রাখতে পারলে কই? আমি সকলের আগে মিলের স্বার্থ দেখব। তার চেয়েও বড় কথা, স্বদেশি ইন্ডাস্ট্রির স্বার্থ।

গৌরদাস ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, লম্বাচওড়া বুলি বাইরে শুনিও। ঘরের মানুষ আমি, কোন্‌ খবরটা না জানি? ধাপ্পায় ভুলব না।

ঘরের মানুষ বুঝি তুমি?

খেলার সাথী ছিল এক বয়সে এরা দুজন। রাধারমণের ছেলে-মেয়েকে নীরদবরণ নিজের বাড়ি ডেকে এনে ঠাঁই দিয়েছিলেন। গৌরদাস আর তার দিদি অনুপমা। ভাস্করের চেয়ে বছর আষ্টেকের বড় গৌরদাস। তবু এক বাড়িতে নিত্যসঙ্গী—কতবার ঝগড়া হত, কতবার ভাব হত! এজেন্টের অফিস-কামরায় গৌরদাসের কণ্ঠে সেই ছেলেবয়সের ঝগড়ার সুর। ভাস্করের মুখে আরক্তিম, তবু সে সংযম না হারিয়ে বলে, তোমার বাংলো জুটমিলের ব্যাপারে তুমি ঘরের মানুষ নও গৌর-কাকা। পার্ক স্ট্রীটে যেও, তোমার ঘরোয়া কথাবার্তা তখন মজা করে শুনব। আমার সামনে এই অফিসঘরে তুমি কর্মচারী মাত্র।

গৌরদাস উচ্চহাসি হেসে উঠল।

ভাস্কর বলে, উপরওয়ালার মুখের উপর এমনভাবে হেসে ওঠা বেআদবি।

হাসি বেড়ে যায় গৌরদাসের। টেনে টেনে খানিকক্ষণ ধরে হাসে। বলে, হায় আমার উপরওয়ালা! পদ্মপত্রের উপর বারিবৎ। আছ উপরে, নাড়া দিলে পলকে গড়িয়ে পড়বে। রসাতলে তলিয়ে যাবে।

বাঁকা-হাসি, রহস্যময় কথার ধরণ। রাগ হয়েছিল ভাস্করের, এবারে ভয়ও হচ্ছে। বাবা সতর্ক করে দিয়েছেন—বড় সাংঘাতিক ওই গৌরদাসটা।

ভাস্কর বলে, হেঁয়ালি রাখো। কী চাও তুমি, স্পষ্ট করে বলো।

নতুন মেশিন বসবে না আমাদের মিলে। ভেবো না—খদ্দের আছে, লুফে নিয়ে নেবে। খরচা যা পড়েছে তার উপরেও ধরে দিতে রাজি।

ভাস্কর বলে, টাকার খরচাই সব নয়। কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে জানো। নিজে চলে গেলাম বেলফাস্টের ওয়ার্কসপে—

বটেই তো। এ বাজারে ভাল যন্ত্রপাতি আমদানি করা সোজা নয়। কিন্তু ও-জিনিস দুশমন আমাদের কাছে। যতক্ষণ আছে কেউ সোয়াস্তি

আমার সামনে এই অফিস ঘরে তুমি কর্মচারী মাত্র।

পাবে না। বিদায় করে দাও। গড়িমসি কোরো না, চালাকি খেলতে যেও না। আমার বাবা তোমার বাবা শিল্পপ্রতিষ্ঠায় নেমেছিলেন সেবার আদর্শ নিয়ে। টাকার গাদার উপর বসে টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন, সেজন্য নয়। সেই আদর্শ বজায় রাখতে হবে। একটি লোকও যাবে না। শেয়ার হোল্ডাররা ডিভিডেণ্ড না-ই পাক, অনেক মানুষ মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ে প্রতিপালিত হবে আমাদের মিলে। বড় বড় প্ল্যান ছেড়ে দাও—

একটানা বলে যাচ্ছে। অসহিষ্ণু ভাস্কর বাধা দিয়ে উঠল : তোমার কথায় ছাড়ব নাকি?

কথা একলা আমার হলে কি শুনতে? তোমার সলিসিটারও নিশ্চয় এই কথা বলবেন। জিজ্ঞাসা করে দেখ দিকি—

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হচ্ছিল এতক্ষণ। একটা গদি-আঁটা চেয়ার পেয়ে গৌরদাস ধপ করে বসে পড়ল। বসে আরামে হাঁটু দোলাচ্ছে। বলে, তোমাদের নিজস্ব সলিসিটার বিপিন দত্ত। সলিসিটার মক্কেলকে ফাঁস করে না, উচিত উপদেশ দেয়। তাঁর কাছেই সেজন্য সকলের আগে কাগজ পাঠিয়েছি। পয়লা কিস্তির সামান্য দু-চারখানা—আসল জিনিষ নয়, কাপি। পাকা লোক তিনি—দুটো-চারটে ভাত টিপেই গোটা হাঁড়ির খবর বুঝবেন। অন্ন খেয়েছি তোমাদের, হুট করে সাংঘাতিক কিছু করতে চাইনে। প্রস্তাবে যদি রাজি হও, ছিটেফোঁটাও বাইরে চাউর হবে না। কিন্তু মতলব খেলাতে গিয়েছ কি, আমরাও দেরি করব না। ধনুকে বাণ তো জোড়াই আছে, শুধু ছেড়ে দেবার অপেক্ষা।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে ভাস্কর বাইরে বেপরোয়া ভাব দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরের উদ্বেগ কিছুতে চেপে রাখতে পারে না আর যেন। তাকিয়ে দেখে গৌরদাস পরমানন্দে বলে, ভয়-দেখানোর কথা ভাবছ। পাশেই তো ফোন, সলিসিটার দত্তকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। ততক্ষণ বরঞ্চ আমি উঠে দাঁড়িয়ে মুখ গোমড়া করে করজোড়ে থাকি, উপরওয়ালার সামনে আদর্শ ভৃত্যের যেমন থাকা উচিত। ছবিতে যেমন গরুড়পক্ষীকে দেখা যায় প্রভু নারায়ণের সামনে:

একদা বড় ঘনিষ্ঠ ছিল, আলাপে আচরণে সেই সুযোগ গৌরদাস কিছু কিছু নেয় না যে এমন নয়। কিন্তু আজকে বড় বাড়াবাড়ি। কামরার মধ্যে ভাগ্যিস দুজন মাত্র, তৃতীয় মানুষ কেউ নেই। নিশ্চয় কোন মোক্ষম অস্ত্র তার হাতে, খরধার ব্যঙ্গের ভাষায় সেই অস্ত্রের আস্ফালন করছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গৌরদাসই আবার বলে, উপরওয়ালা ফোন করছেন, কর্মচারীর সেখানে থাকা উচিত হবে না। বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। হয়ে গেলে বেল টিপে ডাকবেন।

বশম্বদ ভৃত্যের যেমনটা হওয়া উচিত, জোড়হাত করে গৌরদাস বাইরে চলে গেল। 'আপনি' 'আপনি' বলে মজা করল খুব। চরম অপমান। তোয়াজ করে দুধ-কলা খাইয়ে কালসাপের বিষই বেড়েছে শুধু। সকলকে বিঁধিয়ে দিচ্ছে। সবাতেই হবে ছলে বলে যেমন করে হোক।

দরজার বাইরে অফিস-আরদালির টুল—তারই একটা টেনে নিয়ে গৌরদাস বসে পড়ল। কে না জানে গৌরদাসকে—হালের কাজকর্মে আরও তার পরিচয় খুলেছে। এ হেন ব্যক্তি এজেণ্টের দরজার সামনে টুলের উপর বসে—এদিক-সেদিক থেকে কৌতূহলীরা এসে জমছে। দরজার অন্তরালে কামরার ভিতর না-জানি কি বিচিত্র ব্যাপার ঘটে চলেছে এখন!

গৌরদাস হাসিমুখে বলে, কি গো মশায়রা, রাগ হল নাকি তোমাদের জায়গা দখল করেছি বলে? টুলটা খালি ছিল, তাই বসে পড়লাম।

একজনে বলে, হবেই তো রাগ। টুলে বসবার মানুষ কি আপনি?

তবে দাঁড়িয়ে পড়ি। সত্যিই তো—সবাই দাঁড়িয়ে, আমি একা কেন বসে থাকব?

এইসব চলছে। বেশ খানিকক্ষণ কেটেছে। ভিতর থেকে বেল বাজল না, দরজা ঠেলে এক সময়ে ভাস্কর নিজেই এসে হাজির। লোকজন কারো দিকে না তাকিয়ে হাত ধরে গৌরদাসকে নিয়ে গেল।

ভিতরে নিয়ে প্রশ্ন করে : সুপারভাইজার মানুষ বেয়ারার টুলে কেন? আমাদের ঐখানে নিয়ে বসাবে, তার বুঝি ইঙ্গিত দিয়ে রাখছ?

মিনিট কয়েক আগে যাকে দেখে গেছে, এ ভাস্কর যেন একেবারে আলাদা সেই মানুষ থেকে। মুখ মড়ার মতো ফ্যাকাশে। হবেই, সমবেদনা হয় না গৌরদাসের। আনন্দ হচ্ছে—প্রতিক্রিয়া যেমনটি আশা করেছিল ঠিক ঠিক তাই। বেশি বরঞ্চ।

হঠাৎ ভাস্কর পুরানো ডাক ডেকে বলে ওঠে : একটা জিনিষ চাইছি গৌর-কাকা। সলিসিটারকে বলেছ তুমি, এর পরে বাবাকে যেন না বলে বোসো। তাঁকে জড়িয়ে এত কাণ্ড, ঘুণাক্ষরে তিনি জানতে না পারেন!

গৌরদাস নিষ্ঠুর কণ্ঠে বলে, সে কি কথা! কীর্তি তাঁরই—তাঁর অজান্তে একটা কাজও হয়নি। অনেককাল ধরে বিস্তর কৌশলে জাল ছড়িয়েছেন। তাঁর বুদ্ধির উপরেও বুদ্ধি খেলে, সে খবর সকলের আগে তাঁরই তো জানা উচিত।

ভাস্কর বলে, এর মধ্যে কতখানি সত্যি কতটা মিথ্যে এখনো জানিনে। জানতে হবেই—এত কাণ্ড করে বসে আছ, না জানিয়ে তুমি রেহাই দেবে না—

কাতর হয়ে বলতে লাগল, সবখানি দায় আমিই কাঁধ পেতে নিচ্ছি, যা করবার আমি করব। কিন্তু বুড়োমানুষটির শান্তি ভেঙো না। হাতে ধরে বলছি তোমায়!

হাঁ-না কোন জবাব পাওয়া যায় না। পাষাণমূর্তি গৌরদাস—ভাবলেশহীন।

ভাস্কর বলে, ভিক্ষা বললে খুশি হও তো তাই। তোমার অজানা কিছু নয়—বিশ্বসংসারে কে আমার আছে বাবা ছাড়া? একা বাবাই মা-বাবা ভাই-বোন আমার। তোমার বাপকে চিরকাল তিনি গুরুর মতো মান্য করে এসেছেন। অতি দুঃসময়ে ভাই-বোন তোমাদের দুজনকে বাড়িতে আহ্বান করে এনেছিলেন। অনু-মাকে চলে যেতে হল—কিন্তু তোমায় বাবা ছাড়লেন না। নয় তো ভেবে দেখ গৌর-কাকা, তুমি যা হয়েছ হতে পারতে এমনি?

কখনো না, কখনো না—। অকুণ্ঠে গৌরদাস স্বীকার করে নেয় : বাবা কোনদিন তো পাই-পয়সার সঞ্চয় করেননি ছেলেমেয়ের কথা ভেবে। বড়দা দয়া করে বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে পড়াশুনোর বন্দোবস্ত করেছিলেন, নইলে আজ নিশ্চয় পথে পথে না খেয়ে ঘুরতাম। অথবা সোনার বাংলা মিলের নগণ্য এক মজুর হয়ে নতুন-কর্তার প্ল্যানিং-এর গুঁতোয় সর্ষেফুল দেখতাম চোখে।

ভাস্কর সদুঃখে বলে, নতুন-কর্তার যত খুশি দোষ দাও আপত্তি করিনে। কিন্তু বাবার দয়ার আশ্রয় নিয়ে তোমরা ছিলে, এর চেয়ে মিথ্যা আর হয় না। সংসারের সর্বময়ী ছিলেন তোমার দিদি। আমার অনু-মা। বাড়ীর মধ্যে তাঁর পুরো নাম নয়, আদর করে সবাই ছোট নামে ডাকত। অনু কিম্বা অনু-মা।

ঘাড় নেড়ে গৌরদাস সায় দিল।

ভাস্কর বলে যাচ্ছে, বাবাকে তুমি বড়দা বলতে। আপন ভাইয়েরই খাতির খেয়েছ কিনা দেখ মনে করে। প্রাণ ঢেলে ভালবাসতেন বিশ্বাস করতেন।

গৌরদাস হি-হি করে হাসে : তার ফলেও তো অভূতপূর্ব আবিষ্কার। নীরদবরণ ধর্মকর্ম করেন, আবার ঘড়েলও অমন দুটো হয় না—এ হেন মহাসত্য ভুবনে চিরদিন অবিদিত থেকে যেত। বাড়িতে আপন হয়ে থাকতে দিয়েছিলেন বলেই তো চোর-ডাকাতের জেল ধনে হতে যাচ্ছে পুণ্যবান মানুষটাকে পেয়ে।

ঠাণ্ডা মাথা এর পরে রাখা চলে না। ভাস্কর গালি দিয়ে উঠল : এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই? পশুর অধম হয়ে গেছ গৌর-কাকা।

গৌরদাস অবিচল কণ্ঠে বলে যাচ্ছে, না, কৃতজ্ঞতা নয়। মন জুড়ে যদি কিছু থাকে তো প্রতিহিংসা। বাবার জীবনপাত করে-গড়া স্টীল-কোম্পানি গেল, আমার দিদিকে রাত্তিরবেলা দূর-দূর করে পথের কুকুরের মতো তাড়াল—

বাক্য নয়, বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে অগ্নিধারা। বলতে বলতে যেমন হোঁচট খেয়ে গৌরদাস থামল : দূর, নিজের কথাই একশ গণ্ডা করে বলছি! আমার নিজের কিছু নয়, এত মানুষের অন্নে টান পড়েছে। বেশ, চুক্তিপত্র হোক—অন্ততঃ তিনটে বছরের মধ্যে নতুন মেশিন চালু হবে না, একটি মানুষ যাবে না। জোর করে নয়, লোভ দেখিয়ে কায়দাকৌশল করেও নয়—

ভাস্কর বলে, তারপরে আর দরকার হবে না। মিলে তালা পড়বে এই তিনটে বছরে—সোনার বাংলা স্টীল কোম্পানির মতো?

হি-হি করে গৌরদাস পাগলের মতো হাসতে লাগল।

রাধারমণের মেয়ে অনুপমা, বালবিধবা। ছোটভাই গৌরদাসকে নিয়ে নীরদবরণের বাড়ি থাকত। ছন্নছাড়া রাধারমণের অবস্থা বুঝে নীরদই সমাদরে নিয়ে এসেছিলেন। নীরদের নিজের সংসারও বিশৃঙ্খল। স্ত্রী পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী—বেঁচে থেকেও যেন মরে রয়েছে বারো মাস। সংসারের হাল ধরে আছেন শাশুড়ী ঠাকরুন তারামণি। আঁটোসাটো উজ্জ্বল চেহারা, প্রাচীন রাজবংশের মেয়ে। পিতৃবংশের রাজত্ব বহুদিন গেছে, কিন্তু সোনা, নগদ টাকা ও কোম্পানির কাগজ বিস্তর নাকি তারামণির হাতে। সেই জনশ্রুতির কারণে এবং রাশভারি স্বভাবের জন্যেও বটে, সকলে তটস্থ। জামাই নীরদবরণ অবধি। মা-মা-করে জল ঝরে যেন মুখে, সর্বব্যাপারে শাশুড়ীর উপদেশ নিতে

়সেন। তারামণিও তেমনি, ছেলেদের চেয়ে শি টান জামাইয়ের সংসারে। বছরের মধ্যে ধ হয় এগারো মাস এইখানে থাকেন। শান্তা কমাত্র মেয়ে—সেই মেয়ের পঙ্গু অবস্থার জন্য মাই-এর তিলেক বিরক্তি দেখেন নি, ঐ বস্থায় যতটুকু আরাম-আনন্দ দেওয়া যায় রদবরণের সেদিকে সজাগ দৃষ্টি। এই সব ণেই তারামণির এত ভাল লাগে। শান্ত হিষ্ণুতা ও কর্তব্যবুদ্ধির সঙ্গে পঙ্গু স্ত্রী য়ে বছরের পর বছর ঘর করে যাচ্ছে—তার রের শূন্যতা পূরণের জন্য বেশি বেশি যত্ন রেন শাশুড়ী তারামণি।

এই সংসার জুড়ে আছে অনুপমা। এমন য়ে হয় না। উপর-নিচে সর্বক্ষণ চরকির মতো রে। শান্তার অষুধপত্র সেবাযত্ন আর শিশু স্করের দেখাশুনার সকল ভার অনুপমা জের কাঁধে নিয়ে নিয়েছে। এর উপরে সংসারের টনিও আছে। যত খাটতে পারে, তত যেন র আনন্দ। দুটো চারটে হুকুম-হাকাম দিয়েই রামণি খালাস, তার বেশি করতে হয় না।

আদিগঙ্গার কিনারে হরিশ চাটুজ্জে ীটের বাড়িতে শাশুড়ী জামাই দু-জনেরই গবানে মতি। তেতলার ছাতের উপর সিঁড়ির রের দুপাশে দক্ষিণমুখী ঘর দুটো। ছাতের র্ণিশের উপর দিয়ে সারি সারি ফুলের টব— ধপুষ্প, যে সব ফুল পুজোয় চলে। এবং লসীগাছ। ছাতের নাম এজন্য দাঁড়িয়েছিল মিষারণ্য। নৈমিষারণ্যে মোটমাট দুই মুনি— ীরদবরণ ও শাশুড়ী তারামণি। সিঁড়ির পাশের ঘর দুটোয় দুই মুনির আসন। তারা- ণির এক গুরু ছিলেন—সিদ্ধপুরুষ, কুসুম- বা নামে প্রসিদ্ধ। এক টুকরো কাগজ থেকে ল করে দিতে পারেন—ফুল হাতে দেবেন না খে দেখিয়ে দেবেন এবং নাকের কাছে এনে ধ শোঁকাবেন। আর নীরদের গুরু বোধকরি শুড়ীঠাকরুনই।

অফিসে কাজের মধ্যে নীরদ ঘোরতর হেব। সকালবেলা কাজে বেরুনোর আগে এবং জকর্ম অন্তে বাড়ী ফিরে এসে ঘোরতর ক্ষণ। হ্যাটের নিচে টিকি, কোটের নিচে পবীত, টাইয়ের নিচে সোনার চেনে ঝোলান টকবচ। সকালে পুজো-আহ্নিক সেরে গবদ্গীতার একটি অধ্যায় সশব্দে পাঠ করে কশ-আটবার ইষ্টনাম লিখে সামান্য জলযোগের র কাজে বেরোন, তারপরে যত কিছু বলা ও খা ইংরেজিতে। দুপুরের লাঞ্চ ষোল- না বিদেশি। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে কাটপ্যান্টলুন ছেড়ে স্নানাদির পর টুবস্ত্র পরে ছাতের ঠাকুরঘরে ঢুকে ড়লেন। ভিন্ন মানুষ এখন একেবারে, ধক মানুষ। ও-ঘর থেকে ধূপের গন্ধ আসছে, তএব শাশুড়ীঠাকরুনও নিজ স্থানে জপতপ জো-অর্চনায় নিমগ্ন।

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে, ভাস্কর তখন ত বছরেরটি। তারামণি উত্তেজনায় কাঁপতে াঁপতে জামাইয়ের ঠাকুরঘরের দরজা ঠেলে তরে উঁকি দিলেন। নীরদবরণ ধ্যানে বসেছেন থারীতি। তারামণিরও বসবার কথা, কিন্তু নের এই রকম অবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। মগ্ন য়ে আছেন নীরদ। তারামণি একটু খুটখাট রলেন, সাড়া পাওয়া যায় না। ছোট ঘর ধূপের ধোঁয়ায় ভরে আছে, মিটমিটে প্রদীপ একটা— চেহারাটা তার মধ্যে আবছা দেখায়। নীরদই নয় যেন—পবিত্র ধোঁয়ার খানিকটা জমে গিয়ে নিষ্কম্প এক মূর্তি হয়ে বসেছে।

তাকিয়ে রইলেন মুহূর্তকাল ঐশীমূর্তির দিকে। আগেও দেখেছেন তারামণি। দেখে বড় তৃপ্তি হয়—তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার ভয়। ঈশ্বরে এতদূরে উৎসাহ দেওয়া হয়তো বা উচিত হয় নি। স্ত্রী ও শিশুপুত্র ছেড়ে ছাতের নৈমিষারণ্য থেকে পুরোপুরি অরণ্যবাসী হয়ে যাওয়া এ মানুষের পক্ষে বিচিত্র নয়। তারামণি কিছু চিরকাল বেঁচেবর্তে থাকবেন না। পঙ্গু মেয়ে ও অবোধ নাতির কী হবে তখন? অনুর উপর আশা করা গিয়েছিল— সংসার নিয়ে আছেও সে পড়ে। ভাস্করকে যা ভালবাসে, গর্ভের ছেলের জন্য কোন মা বোধকরি এতদূরে করে না। সমস্ত ভাল ছিল, কিন্তু সর্বনাশী কাণ্ড করে বসেছে—

বিষের জ্বলুনির মতো তারামণির সর্বদেহ জ্বলছে। তবু এই দেবস্থানে সংযত কণ্ঠে ডাকলেন: শোন বাবা—

নীরদবরণের নিষ্কম্প দেহ, ধ্যানভঙ্গের এতটুকু লক্ষণ নেই। কিছু জোর গলায় তখন ডাকতে হয়: উঠতে হবে যে বাবা, একটিবার নিচে যেতে হবে। নোংরা ব্যাপার এখানে বলব না।

নীরদ চোখ খুললেন। স্বর্গীয় রাজ্যে বিচরণ করছিলেন, মাটির জগতে অকস্মাৎ নেমে পড়ে যেন ধাঁধা লেগে গেছে। তারামণি কথার পুনরাবৃত্তি করলেন, কেলেঙ্কারি কাণ্ড। নামতে হবে একটিবার—পাঁক আমি পুণ্যের জায়গায় তুলতে পারব না। বিচলিত হয়ে পড়েছি, ডেকে তুলে তাই তোমার কাজ পণ্ড করলাম। অন্যায় হচ্ছে জেনেও।

খড়ম খটখট করে নীরদ শাশুড়ীর পিছু পিছু নেমে চললেন। দরদালানে এসে দাঁড়ালেন দুজনে। জামাইয়ের কাছে প্রকাশ করে বলতেও লজ্জা—একবার কেশে জোর করে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে তারামণি বললেন, অনুকে লক্ষ্য করেছ?

নীরদ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, কি হয়েছে অনুর?

কপাল পুড়েছে। কাউকে বলবার কথা নয়।

কথাটা বুঝি নীরদের উপলব্ধির মধ্যে আসে না। হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

তারামণি বলছেন, সন্দেহ হল আমার। মেয়েমানুষ হয়ে তুই মেয়েমানুষের কাছে লুকোবি! চেপে ধরলাম আজ সন্ধ্যার পর। দুয়োর এঁটে আচ্ছা করে গালমন্দ দিলাম। কাঁদতে কাঁদতে স্বীকার করল। চার মাস পোয়াতি।

নীরদবরণ স্তম্ভিত হয়ে থাকেন মুহূর্ত- কাল। বললেন, এমন কাণ্ড জেনে এখনো তাকে বাড়ি থাকতে দিয়েছেন? জানি দয়ার শরীর আপনার। এ বাড়ি কারো কিছু করবারও নেই আপনার উপর। তবে মা মিছামিছি কেন আমায় ডাকলেন?

তারামণি বলেন, দয়াটয়া নয়। অবস্থা- বিশেষে খানিকটা মানিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে থাকি বটে, এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। কিন্তু গোটা সংসার অনুর কাঁধে—তাকে সরাতে হলে তোমার পরামর্শ চাই বই কি বাবা!

কোন দরকার ছিল না। নীরদ তিক্তকণ্ঠে বলে, ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের করে সুবিধা মতন কোন এক সময়ে বললেই হত। হাতে ঘাড় ছুঁতে ঘেন্না করে তো ঝাঁটা মারতে পারতেন।

মনে মনে খুশি হয়েও বাইরে তারামণি রাগ দেখান। দেখাতে হয় এমনি। বললেন, কাজটা জঘন্য, তা হলেও বাড়াবাড়ি কিন্তু তোমার। এদ্দিন ধরে আছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই অনু অনু করে, ছেলেটা তো অনু-মা বলতে পাগল—

শাশুড়ীকে শেষই করতে দেন না নীরদ। কিছু রূঢ়ভাবে বলে উঠলেন, তা সে যা-ই হোক মা, এই কাণ্ডের পর সব সম্বন্ধ চুকে- বুকে গেছে। এক মিনিটও আর এ বাড়ি রাখা চলে না, গা ঘিন ঘিন করছে আমার।

রাত্রিটা কাটিয়ে ভোরবেলা অনুপমা চলে যাবে, এইরকমটা ভেবে রেখেছিলেন তারামণি। জামাইয়ের ভাবভঙ্গি দেখে সে প্রস্তাব মুখে আনতে ভরসা করলেন না। শুধুমাত্র বললেন, খানিকটা পরে। ভাস্কর ঘুমিয়ে যাক তার পরে চলে যাবে। নয়তো সে কান্নাকাটি করবে।

নীরদবরণ জবাবে বললেন, বলুন তো মা, ঘরে আগুন লাগলে তখন কি আর দেরি করা উচিত? সঙ্গে সঙ্গে নেভাতে হয়। তিল পরিমাণ দেরিতেও অনর্থ ঘটে যায়।

বড় হয়ে দিদিমার কাছে ভাস্কর কথাগুলো শুনেছিল। বাবার চোখে যেটা অপরাধ, নির্মম ক্ষমাহীন তিনি তার উপর। এমন যে অনু-মা, তাঁরও রেহাই হল না। যেখানে বাবার পা পড়ে, পুণ্য আর পবিত্রতার আলো। সেই মানুষটি, গৌরদাসের মতে, টাকা তছরুপের জন্য দায়ী। জেনে-শুনেই নাকি করেছেন। অনুপমার কথা এতকালের মধ্যে আজকে এই প্রথম শোনা গেল গৌরের মুখে। মনের তলে চেপে রেখেছিল, কোন একদিন প্রতিহিংসা নেবে বুঝি সেই অপেক্ষায়।

রাত্রিটা আজও ভাস্করের মনে পড়ে। ছবির বই দেখে একমনে পেন্সিল বুলিয়ে তেমনি এক দ্বিতীয় ছবি বানানোর চেষ্টায় ছিল—কী মনে হল, অসমাপ্ত ছবি হাতে ছুটতে ছুটতে চলে আসে অনুপমার ঘরে, অনু-মায়ের কাছে। শান্তভাবে অনুপমা বাক্স-পেঁটরা, কাপড়-চোপড় গোছাচ্ছেন। সে কিছু বড় ব্যাপার নয়, দশ- পনেরো মিনিটেই সারা হয়ে গেল। ছবি নিয়ে ভাস্কর হাঁ করে দাঁড়িয়ে। চোখ তুলে দেখছেন অনুপমা, তবু আদরের কথা বলেন নি। ভাল- মন্দ কিছুই না বলে নতমুখে নিজের কাজ করতে লাগলেন। ভাস্করও অন্য সময়ের মতন গায়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল না, বড় বড় চোখ দুটো মেলে অবাক হয়ে দেখে।

আর দেখছেন তারামণি। বেশ খানিকটা ব্যবধানে দাঁড়িয়ে। একের পর এক বিদায়ের পর্ব- গুলো চোখ মেলে দেখে নিলেন। জানলায় মুখ বাড়িয়ে দরোয়ানের উদ্দেশে হাঁক দেন: গাড়ি আসে না কেন এখনো? নিজে যাও তুমি, চাকর- বাকর দিয়ে হয় না।

থার্ডক্লাস ঘোড়ার-গাড়ি এসে গেল রাস্তার

খোয়ার উপর চাকা বাজিয়ে। অনুপমা এগিয়ে এসে তারামণিকে প্রণাম করে।

তারামণি বলেন, রাতটুকু কাটিয়ে গেলে পারতে। এদ্দিন রয়েছ, ঘণ্টা কয়েকে আর কী বেশি হত!

আঁচলটা মুখে চাপা দিল অনুপমা। ভাস্কর ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। আদর করতে গেছে কোন্ উৎপাত না-জানি ঘটে যায়, কাছে যেতে অনুপমার সাহসে কুলায় না। তাকায়ও না একবার ভাস্করের দিকে।

তারামণি বলেন, কোথায় যাচ্ছ ?

চোখ ঠারেন একবার। জানাই তো আছে, সত্যিকথা বলবে না, তবু জিজ্ঞাসা করলেন, এই রাত্রে উঠবে গিয়ে কোথা ?

সংক্ষেপে অনুপমা বলে, শিয়ালদা স্টেশন।

যা বলল, যথেষ্ট। জেরা করে লাভ নেই, ভারি শক্ত মেয়ে। কোন্ পুরুষ দায়ী তার এই বিপাকের জন্য—বিস্তর জেরা ক'রেও জবাব আদায় হয়নি। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে গুম হয়ে থাকে অনু।

বছর কুড়ি আগেকার সেই রাত্রিবেলা অনুপমা চিরদিনের মতো চলে গেলেন। সদর-দরজার সামনে ঘোড়ার-গাড়ি দাঁড়িয়েছে—দু-হাতে দুই বোঁচকা, বোঁচকার ভারে নুয়ে পড়ে অনু-মা বেরুচ্ছেন। শিশু ভাস্কর নিঃশব্দে দেখেছিল, ছুটে গিয়ে এবার পথ আটক করে।

কোথায় যাচ্ছ অনু-মা ?

কোথায় আবার! এই তো কালীঘাটে—মায়ের বাড়ি—

দু-হাতে অনুপমাকে জড়িয়ে ধরে শিশু একটা নাচন দিল : আমি যাবো, আমি যাবো—

না-রে মাণিক। রাত্রে বুঝি ছোটছেলে বেরোয়! গাছের উপর হনুমান থাকে, টুক করে ঝুঁটি ধরে তুলে নেবে।

অন্য সময়ে হনুমানের নাম শুনলে শিশু মুখে রা কাড়ে না। বিশেষ করে রাতের বেলা। সেই মন্ত্রেও আজ কাজ হল না, কানে নিল না ভাস্কর। রাস্তার গ্যাসের আলো বারান্ডায় এসে পড়েছে। অনুপমার চোখের দিকে চেয়ে—যা কারো নজরে আসেনি, অপোগণ্ড শিশু তাই ধরে ফেলল : তুমি কাঁদছ কেন অনু-মা ?

কই ? আরে পাগল, কোথায় আমার কান্না দেখলি তুই ? কত হাসছি—এই দেখ না।

সেই হাসতে গিয়ে বিপত্তি আরও। অশ্রু বাধা মানে না, দরদর ধারে গড়িয়ে পড়ল। অনুপমা কোলে তুলে নেয় ভাস্করকে। পাগলের মতন চেপে ধরেছে।

তারামণি অমনি হুঙ্কার দিয়ে পড়েন : নেমে আয় ভাস্কর, আয় বলছি। শুতে যাবি তুই এখন। শিগগির চলে আয়।

অপরাধী অনুপমা তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামান। নাতির হাত এঁটে ধরে তারামণি হিড়-হিড় করে টানছেন। হাত ছাড়াবার জন্য ভাস্কর আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। অনুপমা তাকিয়েও দেখে না, অন্য দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ঘোড়ার-গাড়িতে উঠে বসল। বিশ বছর আগেকার কথা। হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীট খোয়া-ওঠা অসমতল রাস্তা তখন। গাড়ির লোহা-বাঁধানো চাকা তার উপরে আর্তনাদ তুলে ছুটল।

আর ঠিক অমনি ধরনের আওয়াজ ভিতরের দিকে—পাশের ঘরে, পঙ্গু শান্তার বারো-মেসে শয্যা যেখানটা। কথাও বন্ধ কিছুকাল থেকে, তবে চোখ-কান আছে, চেতনা আছে। বোবা পশুর গোঙানির মতো একটা-কিছু বলতে চাইছেন শান্তা—অনুপমা চলে যায়, ঠেকাতে বলছেন বোধহয়। ছটফট করছেন প্রকাশ করে না বলতে পেরে। চাকার আওয়াজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে একেবারে মিলিয়ে গেল। দেখা গেল, আধেক-মরা রোগিণীর দুচোখ-ভরা জল।

গৌরদাস ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে সেই সময়টা সহপাঠীদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। দেশ দেখে বেড়াচ্ছে। মাস দেড়েক পরে ফিরল। দিদির ব্যাপার না শোনার কথা নয়, কিন্তু উচ্চবাচ্য করে না। যেন কিছুই হয় নি—অনুপমা বলে একটি নারী এ বাড়ির সর্বত্র জুড়ে থাকতেন, গৌরদাস একেবারে যেন বিস্মরণ হয়ে গেছে দেশভ্রমণে গিয়ে। রাধারমণের মতো মানুষের মেয়ে হয়ে এত বড় কেলেঙ্কারি—তাকে বোধকরি মরার সামিল ধরে নিয়েছে। হয়তো বা সত্যি-সত্যি মরে গেছে, অসম্ভব নয়। অনুপমা বড্ড ভাল, মোহের বশে ভুল করে বসেছিল—দুঃখ সেজন্য সকলেরই মনে মনে। গৌরদাসের কাছে কেউ কোনদিন তার কথা তোলে নি। আজকে কলহের মধ্যে গৌরদাসই প্রথম সেই কথা তুলল।

[ছয়]

আচমকা বজ্র নিক্ষেপ করে গেল গৌরদাস। নীরদবরণকে ঘুণাক্ষরে জানতে দেওয়া হবে না। ভাস্কর ছটফট করছে, সিতাংশুকে খবর দিয়ে পাঠাল। সলিসিটার তো আছেনই, সিতাংশুর পরামর্শ চাই আগে।

বলছে, হেন দোষ নেই যা নাকি বাবা করেন নি। হিসাবে নানান কারচুপি, ভুয়া কারবারের নামে পাওনা দেখানো, টাকা তছরূপ—ডজনখানেক চার্জ বাবার নামে। হিসাব একাউণ্ট্যাণ্টের হাতের বটে, কিন্তু বাবা যখন সই দিয়েছেন দায়িত্ব ও'রই। আমি বিশ্বাস করিনে। সাজানো জিনিষ নিশ্চয়ই, কিন্তু ভেবেচিন্তে বড় কায়দা করে সাজিয়েছে—

সিতাংশু সায় দিয়ে বলে, আমারও তাই মনে হয়, এত দূর হতে পারে না। ফাঁপানো আছে বিস্তর। তবে কিছু দিন থেকে বুঝতে পারছি, জেঠাবাবু খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন। পড়তা বড় খারাপ পড়েছে। এককালে ছাই-মুঠো ধরলে জেঠাবাবুর হাতে সোন-মুঠো হয়েছে, এখন উল্টো। দেখ, বড় কাজ-কারবারে এ সব হামেশাই করতে হয়। শিল্পপতিরা মতলব করেই একগাদা ব্যবসায়ে জড়িয়ে থাকে—যেমন আমাদের চেয়ারম্যান মল্লিক সাহেব। চেইন অব বিজনেস বলে—এতে বড় সুবিধা। এটার না হল তো ওটার—টাকা সব সময়ে হাতে মজুত থাকে, দরকার মতন চালাচালি করে নেয়। জেঠাবাবুর বিপদ হল—তুমি বিদেশে পড়ে রইলে, বয়স হয়ে গিয়ে নিজে আর দেখাশুনো খাটাখাটনি করতে পারেন না তেমন, তার উপর ইদানীং বড্ড বেশি ভগবানে পেয়েছে তাঁকে। সুযোগ বুঝে শত্রুর বুকের উপর বসে বসে নির্ভাবনায় দাড়ি উপড়োচ্ছে।

ভাস্কর গর্জন করে উঠল : জেলের ভয় দেখাল গৌর আজ মুখের উপর। বাবার সম্বন্ধে এত বড় কথা বলতে জিভ তার খসে পড়ল না।

ভ্রূ-ভঙ্গি করে সিতাংশু উড়িয়ে দেয় : ওঃ, জেলে দেবে! জেল কিনা ছেলের হাতের মোয়া! কাজ-কারবার করতে গেলে এদিক-সেদিক হয়েই থাকে—তুমিও যেমন! তা-বড় তা-বড় শিল্পপতি, বলতে গেলে সরকারকে যারা ট্যাঁকে করে বেড়াচ্ছে—কোন্ জন ষোলআনা সাচ্চা জিজ্ঞাসা করি।

ভাস্কর বলে, কথাগুলো বাইরে না যায়, আমার সেই ভয়। বাবার নামে কলঙ্ক পড়বে, বাবাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া হবে, তার আগে মরে যাই যেন আমি। করবার কিছু থাকলে আমিই তা করব। ঘুণাক্ষরে বাবার কানে না ওঠে, হাতে ধরে আমি গৌর-কাকাকে বলেছি।

একেবারে সর্বনাশটি ক'রছ, পাগলকে বলেছ সাঁকো নাড়াবি নে। তোমার সব চেয়ে দুর্বল জায়গাটা শত্রুকে দেখিয়ে দিয়েছ। কাগজ-পত্র এখনই হয়তো তাড়া বাঁধতে লেগেছে, সরাসরি জেঠাবাবুকে পাঠাবে।

দুই বন্ধু তারপর অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ করে। উপায় কি এই অবস্থায়? হাই-স্পীডের যন্ত্রপাতি যা আসছে, চালু হতে দেবে না। রেখে দিলেও শুনবে না—বেচতে হবে এখনই। আপদ বিদায় না হওয়া পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই ওদের। এত কষ্টের সংগ্রহ—হায়রে হায়, এই তার পরিণাম!

ভাস্কর বলে, বুকের উপর পিস্তল ধরে যেন সর্ত দিয়ে দিল। এক চুল এদিক-ওদিক হবে না।

সিতাংশু বলে, হুমকি মেনে নিলেও তো বিপদ। এত বড় বেইজ্জতির পর মিলের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক রাখা চলে না। মাথা হেঁট করে অপমান নিয়ে বেরুতে হবে।

জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে ভাস্কর স্বীকার করে নেয় : স্বেচ্ছায় না বেরুলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে একদিন। এর পরে তো হাতের পুতুল হয়ে গেলাম। ব্লাকমেল করে যেমন খুশি নাচাবে, যা ইচ্ছে করাবে আমাদের দিয়ে। প্রতিহিংসার কথা বলছিল গৌর—কায়দায় পেয়েছে তো কোন রকমে আর রেহাই দেবে না।

ভেবেচিন্তে সিতাংশু একটা উপায় বলল—সোজা বম্বে চলে যাওয়া মল্লিকসাহেবের কাছে। চেয়ারম্যানকে বাদ দিয়ে কিছু হবে না—আজ না হোক দুদিন বাদে খবর চলে যাবে। গৌরদাস পাঠাবে। সকলের আগে তুমি গিয়ে খোলাখুলি সব কথা বলোগে। আজব কিছু নয়—এ জিনিষ ডাল-ভাতের সামিল শিল্পপতিদের কাছে। জেঠাবাবুর উপর মল্লিকের বড় আস্থা। তোমার সুখ্যাতিও মুখে ধরে না। টাকাকড়ি দিতে হয় দেবেন। যা করতে হয় করে একাই সামলে দেবেন দেখো। চলে যাও।

বলে, এপ্রিলের জেনারেল মিটিংয়ে এসেছিলেন। তোমার নামে গদ্গদ। বললেন, অমন ছেলে হয় না। মিসেস দেখতে চান—দেশে ফেরার সময় বম্বে নেমে তাঁর বাড়ি একটিবার যাবে, বার বার করে নেমন্তন্ন করলেন—

একটু যেন হাসির রেশ ফুটল ভাস্করের মুখে। বলে, নেমন্তন্ন নিষ্কাম নয়। বড়মেয়েটা ঘাড়ে চাপাতে চান—একদিন থেকেই বুঝে এসেছি। কোটিপতির মেয়ে, খায়দায় ভাল, ওজনে পাহাড় বিশেষ। পাহাড় ঘাড়ে নিতে বলছ? ঘাড় ভেঙে যাবে যে আমার।

শম্পাকে হঠাৎ দেখা গেল। শম্পা এসে ছে। কথা ছিল বটে দুজনে ব্যালে দেখতে বে। ভারী শলাপরামর্শে ইস্তফা দিয়ে সিতাংশু তএব উঠল। বলে, টিকিট পেয়ে গেছিস? ামায় তো নিয়ে যাবি নে। কি করব, চলি তবে।

শম্পা কলকল করে বলে, সেকথা বলতে হবে না। তোমায় বলেছি, বউদি'কে বলেছি। ড়দি আরও মুখ বাঁকাল ঃ নাচ তো নয়, সার্কাস। একবার দেখেই শখ মিটেছে, আর য়।

একটা ব্যালে-পার্টি এসেছে শহরে। মস্কোর লসই থিয়েটার সেবারে এসে খেলা দেখিয়েছিল সোয়ানলেক ড্যান্স। সেই থেকে শম্পা ব্যালের নামে পাগল। এবারও ভেবেছে তেমনি কোন জিনিষ। টিকিট পাওয়া বিষম দুর্ঘট, অনেক কষ্টে শম্পা সেই অসাধ্যসাধন করেছে।

তৈরি হয়ে নিন, সময় বেশি নেই। একেবারে গোড়া থেকে দেখব। গোড়ার গোড়া থেকে।

শম্পার উল্লাসে মনের গুমট কাটল। তাড়াতাড়ি একটু চা খেয়ে নিচ্ছে। সেই সোয়ানলেক ঘুরছে শম্পার মাথায় ঃ কী করে হয় তাই ভাবি। এই দেখছি আলো-ঝলমল লেক, রাজহংসের সারি জলের উপর, ডাঙায় উঠে যত হাঁস পরী হয়ে গিয়ে নাচছে। আবার তক্ষুনি সব ঝাপসা হয়ে গিয়ে নীলপোশাকে নীল-চেহারার শয়তান। পলক ফেলতে না ফেলতে পালটে যায় কেমন করে?

ভাস্করকে দার্শনিকতায় পেয়ে বসে ঃ শুধু অপেরায় কেন শম্পা, জীবনেও ঠিক তাই। হাসি-হুল্লোড়-আনন্দ—পাতালের শয়তান তার মধ্যে এসে পড়ে লহমায় প্রলয় ঘটিয়ে যায়।

বেখাপ্পা ভাবে হঠাৎ বলে উঠল, ধোপে বুঝি এবারও টিকলাম না শম্পা। তোমার আসা-যাওয়া কমিয়ে দেওয়া ভাল।

বিমূঢ় দৃষ্টিতে শম্পা তাকিয়ে পড়ে। কথা সংঘাতিক, কিন্তু হাসিমাখানো কথার গায়ে। ভয় দেখাচ্ছে ঠিক ভাস্কর। সামলে নিয়ে দৃঢ় স্বরে শম্পা বলে, এখন হপ্তায় একবার হয়তো আসি। ভাবছি রোজ আসব। মাধবদা বুড়ো হয়ে পড়ছে, আপনার খাওয়ার তদারকি আমাকেই করতে হবে।

মিলের সঙ্গে বুঝি আর সম্পর্ক থাকে না। হেঁড়ছুড়ে বেরিয়ে পড়ব।

ভয়ের ভঙ্গি করে শম্পা বলে, খবরদার,—খবরদার! এমন কাজটি করবেন না। বাবা আবার পাত্র জোটাতে লেগে যাবেন। চিঠি আসবে, মন ঘুরিয়ে নে শম্পা।

সকাতরে মুখের দিকে চেয়ে বলে, দুটো মাস কোনরকমে চুপচাপ থেকে যান। অকাল চলছে যে এখন। অঘ্রাণ মাস এলে মন্তোর কটা পড়া হয়ে যাক। তারপরে যা ইচ্ছে করবেন, কেউ কিছু বলতে যাবে না।

কিন্তু তোমার বাবা যে জামাই করতে চান—ভাস্কর হালদারকে। লক্ষ্ণৌ চলে যাবার সময় অবধি এই মত ছিল, পরেও কোন উল্টো চিঠি আসে নি।

বাধা দিয়ে ভাস্কর বলে, জামাই করতে চান সোনার বাংলা জুটমিলের ম্যানেজিং এজেণ্ট যে ভাস্কর হালদার—

শম্পা বলে, সেই জন্য হালদারমশায়ের কাছে করজোড়ে নিবেদন, তেসরা অঘ্রাণ অবধি কায়ক্লেশে ম্যানেজিং এজেণ্ট পদটিতে থেকে যান। তারপর জুটমিল লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

শোনানই গেল না কথাটা কোনক্রমে, রসিকতা বলে শম্পা উড়িয়ে দেয়। হাল ছেড়ে দিয়ে ভাস্কর অন্য প্রসঙ্গে আসে। বলে, জুটমিল কেন, জগৎই আবার যে লণ্ডভণ্ড হবার লক্ষণ।

সকালের কাগজে মস্ত বড় হেড লাইনের খবর ঃ সুয়েজখাল নিয়ে লেগে গেল বুঝি ধুন্দুমার। আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমা পড়েছে। তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধ না বাধে।

ভাস্কর বলে, এবার যুদ্ধ বাধলে এটম-বোমা ধুলো-ধুলো করে দেবে জগৎ।

নির্ভীক শম্পা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয় ঃ আমাদের জগৎ আলাদা। বোমায় ভয় করি নে। তবে হ্যাঁ—বাবা। বাবার ভয় আমার। বাবা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ঃ মন তুলে নে শম্পা। সে জিনিষ বোমার চেয়ে ভয়ঙ্কর।

[সাত]

কিছুদিন থেকে ভাস্করের লক্ষ্য হচ্ছে, একটা স্কুটার ঘোরে তার সঙ্গে সঙ্গে। কখনো আগে আগে, কখনো দূরে পিছনে। সন্দেহটা মনে আসার পর নিরিখ করে দেখল, গাড়িটা একই বটে, নম্বর এক—তবে আরোহী বদলায়। অহঙ্কার আসা স্বাভাবিক—লাটবেলাট একলা ছাড়ার নিয়ম নেই, তার বেলাতেও তাই।

পরখ চলল। অসময়ে বেরিয়ে দেখা যাক। ভোরবেলা বেরুল, ঠিক দুপুরে বেরুল। কোথাও কিছু নেই—রাত দশটায় আচমকা বেরিয়ে পড়ল একদিন। অনেকটা পথ গিয়েছে—পিছনে, সামনে, ডাইনে বাঁয়ে কিছু দেখা যায় না। স্ফূর্তিতে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময়ে ঘুরে দেখে পরিচিত স্কুটার। স্কুটার যেন দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তৈরি হয়ে থাকে ফায়ার-ব্রিগেডের গাড়ির মতন, কোন দুজ্ঞেয় উপায়ে খবর পেয়ে দুড়দাড় বেরিয়ে পড়ে।

নিজের ড্রাইভারের দিকে ভ্রূকুটি করে। এরই যোগসাজস নাকি? হর্ন দেয় ঘন ঘন, কারণে অকারণে থেমে দাঁড়ায়, সঙ্কেতে জানান দিয়ে দেয় ঃ সাহেব বেরিয়ে পড়লেন। অন্তত ভাস্করের তাই সন্দেহ দাঁড়াচ্ছে। পুরানো ড্রাইভার, আছে বিস্তর কাল ধরে। কিন্তু আজকের দুনিয়ায় কারও উপর আস্থা নেই। গোরদাসও তো বিস্তর কাল ধরে এক বাড়িতে মানুষ, ভাস্করের ছেলেবেলার নিত্যসঙ্গী।

ড্রাইভারকে সরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে একদিন নিজে গাড়ি নিয়ে বেরুল। বড়রাস্তায় পড়ে হু হু করে ছুটিয়ে দিয়েছে, জর্মানির অটোবানে যেমন ছুটোত। হলে কি হবে—পিছনে তাকিয়ে দেখে সেই স্কুটার। আসছে বেশ খানিকটা দূরে বজায় রেখে। ভাস্কর জোর হঠাৎ কমিয়ে দিল। স্কুটারও গতিবেগ কমিয়েছে। মোটরগাড়িরই ছায়া যেন স্কুটার—ছায়া সঙ্গ ধরে চলেছে।

দিনে দিনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মনের উপর একটা অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া। গোপন বলে কিছু আর থাকতে দিল না জীবনে। রাস্তায় এই ব্যাপার—ঘরের মধ্যে যখন থাকে, কে জানে তখনো কেউ হয়তো দৃষ্টি মেলে আছে। কাছে আসে না, কথা বলে না, অমোঘ নিয়তির মতো সঙ্গে সঙ্গে আছে। অহোরাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইরের দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ নেই।

মিল থেকে একদিন ভাস্কর পায়ে হেঁটে বেরুল। স্কুটারের উপর কেমন এক বিষম আক্রোশ—স্কুটার অন্তত আজকে আর পাত্তা দেবে না। হাঁটতে হাঁটতে এলাকা পার হয়ে গিয়ে গাড়ি-টাড়ি নেবে একটা।

স্কুটার নয়, আজকে মানুষ। রাস্তায় একটা মানুষকে বড় সন্দেহ। বারবার তাকিয়ে দেখছে। ভাস্কর দ্রুত চলে তো সে মানুষও হাঁটার জোর বাড়িয়ে দেয়। ভাস্কর আস্তে যায় তো সে-ও যেন গণে গণে পা ফেলে। খুব খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ বাঁয়ের পথে নদীর দিকে ভাস্কর বাঁক নিল। ঘোর হয়ে গেছে। মানুষটা বোঝে নি, একেবারে গায়ের কাছে এসে পড়ল।

বেকুব হয়েই বুঝি কথা বলে ওঠে ঃ ফিরে গেলে হত না এইবারে? জায়গাটার বদনাম আছে সাহেব, রাহাজানি কত যে হয়েছে ঠিকঠিকানা নেই।

ভাস্কর মুখ তুলে কটমট চোখে তাকায়। মানুষটার বাঁ-হাতের কনুই অবধি কাটা। পানের ছোপ-ধরা দু-পাটি দাঁত মেলে নিঃশব্দে সে হাসছে।

ভাস্কর বলে, কে তুমি?

হুজুরের গোলাম।

চিনিনে তোমায়। কোন দিন দেখেছি বলেও মনে করতে পারিনে।

মানুষটা গদ্‌গদ হয়ে বলে, হুজুরের হাজার-লক্ষ গোলাম-নফর, তার মধ্যে ক'জনকে আর চিনে রাখা যায়। কিন্তু হুজুর তো একজনই। আমাদের চিনতে ভুল হয় না।

পিঁপড়ে-মাছি দেখে লোকে যেমন করে, ভাস্কর ঘাড় ফিরিয়ে হন হন করে নদীর একেবারে কিনারে এসে দাঁড়াল। জেলেডিঙি যাচ্ছিল একটা, হাত নেড়ে ডাকল। বলে, আরও কাছে—ঘাটে লাগাও মাঝি। ওপারে যাব।

হাত-কাটা মানুষটা পিছন থেকে বলে, পার হতে যাবেন না হুজুর—

ভাস্কর গর্জন করে উঠল ঃ নিজের কাজে যাও বলছি।

মানুষটি বিনয়ে কাচুমাচু হয়ে বলে, আমার কাজই তো এই হুজুর। হুজুরের খবরদারি করা। কোন রকম ঝঞ্ঝাটে হুজুর না পড়েন সেইটে দেখা। রাত্তিরবেলা ওপারে যাওয়া ঠিক হবে না। জোড়হাতে মানা করছি। কথাটা কানে নিন। পথঘাট মোটেই ভাল নয়।

বলতে বলতে—এমন বেশি কাতরতা কেঁদেই পড়ে বুঝি বা। রাগ হয়েছিল ভাস্করের—মানুষটার রকম দেখে হাসি পেয়ে যাচ্ছে। বলে, ওপার জানি আমি। পাহাড় না জঙ্গল নয়, পথঘাট এ পারের মতোই। জঙ্গল পাহাড় হলেই বা কী—দুনিয়া চষে বেড়িয়েছি পাহাড়-জঙ্গল বিস্তর ঘোরা আছে আমার।

হাত-কাটা তবু ঠান্ডা হবার নয়। বলে পথঘাট যেমনই হোক, মানুষজন ওপারের ব বেয়াড়া।

হঠাৎ দেখা গেল, ডিঙিটা ঘাট থেকে সরি

নিয়ে যাচ্ছে। সবিস্ময়ে ভাস্কর বলে, চললে যে মাঝি? আমি ঘাটে ডেকে নিয়ে এলাম।

মুখের কথা না হলেও ইশারায় হাত-কাটা নিশ্চয় কিছু বলেছে।

জলের উপর বোঠের এক প্রচন্ড টান দিয়ে মাঝি বলে, ভাড়া ধরা আছে আমার—

পার করে দিয়ে যাও। কতই বা সময় লাগবে! পারবে না তো ঘাটে কি জন্যে ভিড়লে?

মনে ছিল না হুজুর।

আগনৌকোয় আরও দুই মাল্লা বোঠে ধরেছে। তিন বোঠের টানে লহমার মধ্যে ডিঙি বিস্তর দূরে চলে গেল।

ক্ষেপে গিয়ে ভাস্কর চেঁচিয়ে বলে, দশ টাকা দিচ্ছি, পার করে দিয়ে যাও।

মাঝির বিনীত কণ্ঠ কানে আসে : পারাপারের রেট চার আনা। হবার হলে সিকি নিয়েই পার করে দিতাম। বেকায়দায় ফেলে বেশি আদায় করব, তেমন কাজ আমায় দিয়ে হবে না হুজুর।

বটেই তো! সাচ্চা মানুষ হয়ে হুজুরকে কেমন করে তোমরা বেকায়দায় ফেলবে?

রাগে গরগর করতে করতে ভাস্কর ঘাট থেকে উঠে এলো। ডিঙিনৌকো প্রায় অদৃশ্য। হাত-কাটা মানুষটা একটা গাছের তলায় ঠায় দাঁড়িয়ে।

ভাস্কর রুক্ষ কণ্ঠে বলে, কই হে, পিছন [illegible] না যে এখনো?

সপ্রতিভ কণ্ঠে হাত-কাটা বলে, আজ্ঞে, এই [illegible]চ্ছি—

এবং দূরে দূরে সেই আগেকার মতো [অ]নুসরণ করে চলল।

নিঃশব্দে কিছু পথ চলে সহসা ভাস্কর [illegible]ল উঠল, ওপারের মানুষ বেয়াড়া কি ভাল [illegible] নিনে। কিন্তু এ পারে তোমরা এক একটা [illegible]বজ্জাত।

লোকটা পরম আপ্যায়িত হয়ে হাসতে [হাস]তে বলে, হুজুরের পায়ের গোলাম।

পরের দিন ভাস্কর গৌরদাসকেই ধরেছে : [illegible]ায় নজরবন্দি করেছ?

জিভ কাটে গৌরদাস। কথার ঢং পূর্বদিনের পরম বিনয়ী হাত-কাটার মতোই : ছি-ছি। [illegible] গেলে তোমাদের খেয়েই সব বেঁচেবর্তে [illegible]। এমন সন্দেহ তোমার মনে আসা অন্যায়। [illegible]দেরও কানে শোনা পাপ।

ক্রুদ্ধ ভাস্কর বলে, ভন্ডামি রাখো। গাড়ি না [illegible] কাল হেঁটে বেরিয়েছিলাম। বলিহারি [illegible] তোমাদের—স্কুটারের বদলে মানুষ পিছু [illegible]। ধরেও ফেললাম। হাত-কাটা একজন, [illegible] হাতের কনুই অবধি নেই।

[illegible]বর মানুষ। মহাদেব তার নাম—নুলো-[illegible]। হাত-কাট দেখে হেলা কোরো না— [illegible] বিশ হাতের ক্ষমতা ধরে মহাদেবের ঐ [illegible]মা হাত। এক হাতে এমন ছোরা মারবে [illegible]অন্দ্র ছিটকে পড়লেও টের পাবে না গেছে [illegible] একটা জিনিষ। আবার শুনতে পাই ওর [illegible]তে বিনি-লাইসেন্সের বন্দুক-পিস্তলও [illegible]!

[illegible] উচ্ছ্বসিত হয়ে গৌরদাস বলে, [illegible]কেও লাগিয়েছে। আমি এতদূর [illegible]। মহাদেব মানুষটা বড় কাজের।

হুজুরের গোলাম

এমন স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকারে ভাস্কর স্তম্ভিত হয়ে যায়।

গৌরদাস বলে, চোরাগোপ্তা-মারধোর গুম-খুনে আমি বড় ঘেন্না করি। মরদ মানুষ হও, সামনাসামনি বুক ফুলিয়ে এসো। কিন্তু যত সব গোঁয়ারগোবিন্দ তাঁতি-মজুর—আমার কথা কে কানে নেবে!

ভাস্কর বলে, গুম-খুনের কথাও হচ্ছে নাকি?

হচ্ছে না। কত ধানে কত চাল, বোঝে কি ওরা? মজুরের লাস গাছতলায় পড়ে থাকে, ঝিলের জলে ভাসে, পুলিশে খুনের আস্কারা করতে পারে না। লাস মজুরের না হয়ে উপর-ওয়ালার হলে পুলিশ তখন কি করবে—এমন সব কথাও বলাবলি হয় শুনতে পাই। বলে খুব গোপনে, তবু আমার কানে গড়িয়ে আসে।

ভাস্কর উত্তেজিত হয়ে বলে, মগের মুলুক পেয়েছে! খবরটা বলে দিলে, ভাল হল। এবার থেকে পুলিশ নিয়ে চলাফেরা হবে।

গৌরদাস বলে, কী দরকার! বদনাম রটবে— নিজে অত্যাচারী বলেই অত সামাল সামাল। সত্যি সত্যি নও তা তুমি। হাসাহাসি করবে লোকে : দেখ, সাহেবেরা কত সুন্দর চালিয়ে গেছে, বাঙালি কর্তা হয়ে এসে যত গন্ডগোল। সুরাহাও কিছু হবে না, বেশি করে মানুষ ক্ষেপানো হবে।

জোর দিয়ে আবার বলে, কোন দরকার নেই। যারা ব্যবস্থা করছে, নিজেদের লোক বলেই ঘাঁত-ঘোঁত বেশি জানে তারা, পুলিশের চেয়ে বেশি দক্ষ এই ব্যাপারে। সর্বক্ষণ তোমায় নজরে নজরে রেখেছে, মন্দ লোকে হুট করে কিছু করতে না পারে। রাস্তায় বেরিয়ে ওদের দেখতে পাও, আবার রাত্তিরে যখন ঘুমিয়ে থাক, তখনও কয়েকটা ছোঁড়া পালা করে পার্ক স্ট্রীটে নজর রাখে। সবাই হুটকো নয়, বুদ্ধিবিচারও আছে অনেকের। কলসির দৈত্য তুমি বের করেছ, নির্গোলে ফের কলসিতে ঢোকানো তোমার পক্ষেই সহজ সকলের চেয়ে। হাইস্পীড মেশিনারি বাতিল করে দাও। করবেই যখন, বাপকে তুমি কী চোখে দেখ জানি—ন্যায় অন্যায় যা-ই হোক, শেষ পর্যন্ত করতেই হবে তোমায়। দেরি করে গোলমাল বাড়িও না। ঐ আপদ সরিয়ে দিয়ে তারপর ডঙ্কা মেরে যেখানে খুশি বেড়িও, কেউ আর তাকিয়েও দেখবে না।

মোটের উপর চক্রান্তটার আন্দাজ পাওয়া গেল। মরীয়া এরা। নতুন মেশিনারির হেস্ত-নেস্ত না হওয়া পর্যন্ত ভাস্করকে নড়ে বসতে দেবে না। খুনখারাবির জন্যেও তৈরি। পুলিশ নিয়ে কিছু করতে গেলে—গৌরদাস মোক্ষম অস্ত্র নিয়ে বসে আছে, তখন আর এক মুহূর্তের রেহাই করবে না। নীরদকে হাতকড়া পরিয়ে অন্ততপক্ষে একটা রাত হাজতবাস করিয়ে ছাড়বে। লাভ না-ও যদি হয়, প্রতিহিংসা নেবে।

বিজয়া দশমীর বিকালবেলা সিতাংশু বিচিত্র খবর দিল। জলধর নামে একজনের সে দেখা পেয়েছে।

বসিরহাটে গিয়েছিল সিতাংশু। ভূতপূর্ব এক জমিদার—সিতাংশুর পরম বন্ধু, ব্যবসায়ে তিনি কিছু টাকা লগ্নি করতে চান। কথাবার্তা সেরে এবারে সে কলকাতা ফিরছে। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভাল নয়। ড্রাইভারকে তাড়া দিচ্ছে : জোরে চালাও, আরও জোরে—

এক জায়গায় এসে আটকে গেল। বড্ড ভিড়। জোর কমিয়ে হর্ন দিতে দিতে ভিড়ের ভিতর পথ করে এগোতে হচ্ছে। বারোয়ারি দুর্গোৎসব, প্রতিমা দেখা যায় পথের উপর থেকেই। যাওয়ার সময়ও এই পথে গেছে, ভিড়-টিড় ছিল না, ওদিকে নজরই পড়েনি তখন।

জাঁকের পুজো বটে। বিশাল প্রতিমা, দুই মানুষের সমান। মস্তবড় প্যান্ডেলে সতরঞ্চির উপর চাদর পেতে আসর সাজানো। আসরের ঠিক মাঝখানে রকমারি বাদ্যযন্ত্র মানুষও কিছু কিছু বসে গেছে। যাকে বলা হয় সাংস্কৃতিক

অনুষ্ঠান, সেই জিনিষের আরম্ভ বুঝি এইবার। এত ভিড় সেইজন্য।

চমকিত হয়ে সিতাংশু বলে ওঠে, গাড়ি রোখো ড্রাইভার—এই জায়গায়। আমি নামব।

নেমে পড়ে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল ভিড় ছাড়িয়ে রাস্তার পাশে বটতলার দিকে গাড়ি রাখতে। দেরি হবে—কতক্ষণ হবে বলা যাচ্ছে না।

সাহেবি পোশাকের মানুষটা হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে পড়ল, চাওয়া-চায়ি করছে অনেকে। সিতাংশু ভিড়ের ভিতর ডুবে গেল। পান-বিড়ি-সিগারেটের অস্থায়ী দোকান সারি সারি—এক দোকানে জনা তিনেক বিড়ি কিনছে, বিড়ি ধরিয়ে প্যান্ডেলের পাশ দিয়ে তারা ভিতর দিকে চলল। নজর তাদেরই একটির উপর—যার নাম জলধর, পরিচয় হল পরে। প্যান্ডেল ছাড়িয়ে আরও খানিক পিছনে জীর্ণ প্রাচীন অট্টালিকা। বাইরের চাতালটা হোগলায় ঘিরে সাজঘর করেছে—বিড়ি টানতে টানতে জলধর সাজঘরে ঢুকে গেল।

আরতি শেষ। পুজোমণ্ডপের ভিড় সরে এবার যাত্রার আসরে জমছে। সিতাংশু জুতো খুলে পাণ্টলুন সুদ্ধ গড় হয়ে ঠাকুর-প্রণাম করে। পিতলের থালার উপর সিকি-আধুলি-পয়সার প্রণামী ছড়ানো—ব্যাগ খুলে সিতাংশু ধীরে-সুস্থে দুটো দশ টাকার নোট নিয়ে থালার উপর রাখল।

পুরুতঠাকুর চাঙারিতে নৈবেদ্য ঢালছিলেন, কাজ ভুলে অজ্ঞাতপরিচয় ভক্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে পড়লেন। পুজো কমিটির সেক্রেটারি হয়েছেন এবারে আশু পাঠক, হতে পারেন নি নবদ্বীপ ঘোষ। ইতস্তত ঘুরছিলেন তাঁরা, খবর শুনে পরিচয় করতে ছুটে এলেন।

নিবাস কোথা সাহেবের?

সিতাংশু বলে, কোথায় আবার, কলকাতা। কলকাতা ভবানীপুরে বাড়ি। কর্মসূত্রে অবশ্য কোয়ার্টারে থাকতে হয়। দেবীপুজোর দিনে ভাল একটা কাজের কথাবার্তা হল। তাই ভাবলাম, মাকে প্রণাম করে যাওয়া উচিত।

পুরুতঠাকুর অতএব সংক্ষেপে কিছু দেবী-মাহাত্ম্য শুনিয়ে দেন। একশ' বছরের পুজো—বেশি বই তো কম নয়। জায়গার নামও সেই জন্য দুর্গাতলা। জমিদার সিংহবাবুরা পুজো করতেন, তাঁদের অট্টালিকার সামান্য অবশেষ ঐ পিছন দিকে। সিংহবাবুরা উৎখাত হয়ে গেলেন, গাঁয়ে অনেকের উপর তখন স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হল : বছরে একবার এসে সকলকে দেখেশুনে যাই, তোরা সব বর্তমান থাকতে সেটা যেন বন্ধ না হয়। সর্বসাধারণে তখন থেকে ভার নিয়েছে, পুজো একটি বছরও বন্ধ থাকেনি। জাঁকজমক বরঞ্চ বেড়েছে।

পুরুত বললেন, প্রসাদ পেয়ে যেতে হবে।

সিতাংশু লুফে নেয় কথাটা : নিশ্চয়, নিশ্চয়। মায়ের প্রসাদে 'না' বলব, এত বড় বুকের পাটা নেই আমার। কোন্ দিকে যেতে হবে বলুন।

ভাঙা অট্টালিকার অন্দরের দিকে পুজোর ভাঁড়ার। সেখানে এক হাতল-ভাঙা চেয়ারে খাতির করে নিয়ে বসাল। রেকাবি-ভরা প্রসাদ—কয়েক রকমের মিণ্টি ও ফল।

সিতাংশু হেসে বলে, করেছেন কি! প্রসাদ কণিকামাত্র—ভক্তি করে মাথায় আর মুখে ঠেকাই। আচ্ছা, শুনবেন না যখন কমলালেবুর কোয়া কয়েকটা তুলে দিন। আর কিছু নয়।

কনসার্ট শুরু ওদিকে, পালার অতএব দেরি নেই। আশু পাঠক প্রস্তাব করেন : আসরে যাই চলুন। একটুখানি শুনে যাবেন। সকলে উৎসাহ পাবে।

যাবই তো—

তড়াক করে সিতাংশু উঠে দাঁড়ায়। যা বল্যা যায়, তাতেই উৎসাহ। মিশুক ও অমায়িক লোক। অথচ কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজারের অফিসে ঢুকে দেখ—সেখানে আলাদা একজন সিতাংশু।

সিতাংশু বলে, যাত্রাগান এক সময়ে কী ভালবাসতাম! কলেজে পড়ি তখন—পালিয়ে কতদিন যাত্রা শুনতে গেছি। মথুরসা'র দল, ভূষণ দাসের দল—সে কালের নাম-করা সব যাত্রাপার্টি। এখন আছে কিনা জানিনে।

নবদ্বীপ ঘোষ বলেন, খাঁটি জিনিষ কোথায় পাবেন এখন? এরা যাত্রার মধ্যে এখন দুনিয়া সুদ্ধ ঢুকিয়ে দিয়েছে—থিয়েটার সিনেমা সার্কাস যুযুৎসু মায় ম্যাজিক অবধি। যার যেটা পছন্দ বেছে নিয়ে দেখে।

আশু পাঠকের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলেন, এই জন্য মাথা-ভাঙাভাঙি করেছিলাম, দরকার নেই মশায় পোড়া যাত্রাগানের।

আশু পাঠক রাগ করে বলেন, বেশ তো, পরখ হয়ে যাচ্ছে এবার। আগে থেকে কান ভাঙানোর কী দরকার? গিয়ে বসুনগে—পায়ে পেরেক ঠুকে দেওয়া হচ্ছে না, যার ভাল না লাগবে উঠে চলে যাবেন।

সিতাংশু আগেই উঠে পড়েছে। হাতল-ভাঙা চেয়ারও চলল পিছু পিছু। কুড়ি টাকা দিয়ে ঠাকুর-প্রণাম করে, এহেন ভক্তজনকে সাধারণের সতরঞ্চিতে বসতে দেওয়া যায় না। পরনে ট্রাউসার, জাপটে বসার উপায়ও নেই তাঁর।

নবদ্বীপ ঘোষও একটা মোড়া সংগ্রহ করে সিতাংশুর পাশে বসে পড়লেন। ফিসির-ফিসির করেন কানের কাছে : পার্ট অবধি মুখস্থ করেনি, দেখুন। প্লেয়াররা বরঞ্চ চুপচাপ থাকুক, গলা চড়িয়ে প্রম্পটার একাই সকলের সব-কিছু বলে যাক। হচ্ছেও তো সেই ব্যাপার। ছ্যা-ছ্যা, এদেরই নামে সেক্রেটারি তো মূর্ছা যাবার দাখিল। ভিতরে কি আছে জানিনে বাবা। বায়না একদিন হয়েও শান্তি হল না, কাল আবার আছে এই ভূতের নৃত্য।

যার উদ্দেশ্যে বলা, তার কিছু কানে ঢোকে না। আসরের দিকে একনজরে তাকিয়ে সিতাংশু মগ্ন হয়ে পালা দেখছে। নবদ্বীপের এদিকে মারাত্মক অবস্থা। নিরপেক্ষ একজনকে দলে পাবেন, এই ভেবে জায়গা নিয়ে বসেছেন। মরি-মরি করে এখন শুনে যেতে হচ্ছে। নয় তো কথা উঠবে, থিয়েটার আনার প্রস্তাবে হেরে গেছেন বলে যাত্রার উপর খড়্গহস্ত। আশু পাঠক যত্রতত্র বলে বেড়াবেন।

দুটো অঙ্ক পুরো শেষ করে তবে বুঝি সিতাংশুর চৈতন্য হল। হাতঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় : আরে সর্বনাশ, একটা বাজল যে!

নবদ্বীপ আক্রোশভরে বলেন, তিনটে অঙ্ক বাকি এখনো সাহেব। শেষ হতে সকাল। শেষ করে তারপর একটু চা-টা মুখে দিয়ে চলে যাবেন।

কাজ আছে যে, নইলে তাই করতাম। বলতে হত না।

আশু পাঠক রাস্তা অবধি এগিয়ে দিচ্ছেন। সিতাংশু বলে, খাসা জমিয়েছে। ছেড়ে উঠতে মন চাইছিল না। কিন্তু দিনমানে বিশ্রাম পাইনে, একটুখানি না ঘুমলে বাঁচব না। কালকেও তো আছে শুনলাম। দেখা যাক, যদি আসতে পারি—

ঘুমিয়েছে সিতাংশু এগারোটা বেলা অবধি। বিকালবেলা ভাস্করের সঙ্গে দেখা করে সংবাদ বলল : জলধর সেই মানুষটার নাম। রাজা অম্বরীষ সেজেছিল।

[আট]

আহা-মরি যাত্রাগান—হিংসায় পড়ে নবদ্বীপ ঘোষ যা-ই বলুন। কেমিক্যাল ওয়ার্কসের ম্যানেজার হেন ব্যস্ত মানুষ পরের দিনও চলে এসেছে। রাস্তার ধারে বটতলার অন্ধকারে গাড়ি রেখে পায়ে পায়ে দুর্গা-মণ্ডপে হাজির হল।

মণ্ডপ খালি। প্রতিমা নেই, নিরঞ্জনে বেরিয়ে গেছে। আশু পাঠক দূর থেকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছেন : আসতে আজ্ঞা হয়। সেই চেয়ারটা গেল কোথা রে? দেখ্ দেখ্, শিগগির এনে পেতে দে।

সিতাংশু বলে, কাল ঐ যে শুনে গেলাম—অনেক দিন পরে শোনা তো, একটা দিনেই দিব্যি নেশা ধরে গেছে। যাত্রা শোনা নিয়ে কত যে বকুনি খেতাম বাবার কাছে!

যাত্রা নাকি জমেনি, কারা বলছিল? আশু পাঠক চারিদিকে গর্বভরে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন : বলি শুনতে পাচ্ছ সব? ডেকে আনো সেই ছোঁড়া-মানুষ ক'টাকে যারা নিন্দে রটিয়ে বেড়ায়। বুকের পাটা থাকে তো সমজদার মানুষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে যাক। কাল ঐ রাত অবধি শুনে গেছেন, কাজকর্ম ফেলে গাড়ির তেল পুড়িয়ে টানে টানে আজ আবার আসতে হল।

বলেন কি, এমন জিনিষেরও নিন্দে! সিতাংশু যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলে, দেশের বাইরেও অনেক জায়গায় গিয়েছি। এই সেদিনও কণ্টিনেণ্ট ঘুরে এলাম। নাটক দেখা আমার চিরকালের নেশা। বিদেশের বড় বড় থিয়েটার দেখেছি—কিন্তু যাত্রা হল আলাদা জিনিষ, ভিন্ন রস। কোন দেশের কোন অভিনয়ের সঙ্গে এর তুলনা চলে না।

গাওনা কাল যাচ্ছেতাই হয়েছে, আশু পাঠক নিজেও কি সেটা জানেন না? চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আসরের উপর দমাদম পুরানো বাড়ির ইটপাটকেল পড়তে লাগল, দূরদূরান্ত থেকে লোকে এসেছে, বিরক্তি ও রাগে তারাই ইট মারছে। এ নিয়ে রসিকতাও হল : ভাল গো[illegible] মেডেল পায়—পিতলের মেডেল কোন্ কা[illegible] লাগে শুনি। ইট বোধহয় তিন-চার গাড়ি জ[illegible] গেল। গাড়ি বোঝাই দিয়ে নিয়ে যাও গো যাত্রা মশাইরা, তোমাদের দালানকোঠা হতে পারবে।

এমনি অবস্থার পরেও সিতাংশু পা[illegible] শুনতে এসেছে। আশু পাঠক হাতে স্ব[illegible] পেলেন। সিতাংশুর এক একটা কথার প[illegible] সকলের উপর একবার করে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নে[illegible] সব চেয়ে বেশি শোনা উচিত নবদ্বীপ ঘোষে[illegible] সেই মানুষটাই অনুপস্থিত। প্রতিমার স[illegible] গিয়েছে, শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশে ঘা[illegible] ঘাটে হল্লা করে বেড়াচ্ছে। সেক্রেটারি বলে আ[illegible] পাঠক পুজোস্থান ছেড়ে নড়তে পারেননি।

ভাঙা চেয়ারটা এসে পড়লে কোঁচার কাপ[illegible] ঝেড়েপুছে স্বহস্তে আশু এগিয়ে দিলেন : ব[illegible] পড়ুন সার। আজকে কিন্তু বেশি রাত[illegible]

যাত্রা বসবে। আমি বলি, দরদালানে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর-ঠাকরুনদের দেখে আসুন। সময়টা কাটবে ভাল।

সিতাংশু আঁতকে ওঠে : রাত হবে কেন? দল বুঝি হাজির নেই?

হেসে আশু পাঠক নির্ভয় করেন : টাকা দিয়ে বায়না-করা দল—যাবে কোথায়? হুকুম দিলে দশ মিনিটে নেমে পড়বে। কিন্তু আসল যিনি পালা শুনবেন, তিনিই যে গরহাজির এখন।

ধাঁধার মতো কথাগুলো—আশুই আবার প্রাঞ্জল করে দেন : পুজোআচ্চা বলুন, গান-বাজনা বলুন সবই মা-দুর্গার নামে। আমরা বুঝতে পারিনে—কিন্তু এই দুর্গাতলায় জাগ্রত জগজ্জননী নিজে হাত পেতে পুজো নেন, চোখ মেলে পালা দেখেন। এখন মা জলে জলে ঘুরছেন, ফিরে না এলে যাত্রা বসে কি করে?

দুর্গাতলার পুজোর এক বিশেষ নিয়ম—প্রতিমা নৌকোয় তুলে নদীর উপর টহল দিয়ে বেড়াবে, কিন্তু বিসর্জন হবে না। ফিরিয়ে এনে রেখে দেবে সিংহবাবুদের প্রাচীন দরদালানের ভিতর। অতঃপর নড়াচড়া নেই আর, পাকা হয়ে রইলেন। আগের আগের মায়েরা সব আছেন, দেরই ভিতর ঠাঁই পাবেন একটা।

আশু পাঠক বলছেন, ফিরে এসে মা দর-লানে ঠান্ডা হয়ে বসুন, যাত্রা তারপরে। ন মা মন্ডপ থেকে শুনলেন, আজকে সব-লো মা দরদালানে একসঙ্গে গলাগলি হয়ে নবেন। তাই বলছিলাম, এই ফাঁকে পুরানো য়েদের ঘুরে ফিরে দেখে নিন। গায়ে কাগজ া আছে, কোন্ মা-জননী কোন্ বছরের, ন নিতে অসুবিধা হবে না।

জোড়াতালি চোরা দরদালানে আলোর ব্যবস্থা, হ্যারিকেন ধরে একজন আগে আগে চলল। সিংহবাবুদের আমলের প্রতিমা থেকে দ—প্রতিমা আর নয় এখন, রং চটে মাটি খসে য়ের তাবৎ খড়-দাঁড় হাঁ করে পড়েছে। র পর বছর হিসাবে আছেন সব লাইন-া—দিব্যি একটা প্রগতির ইতিহাস পাওয়া : মা যা ছিলেন, মা যা হয়েছেন।

এক পাক ঘুরে দেখে সিতাংশু বলে, টে আলোয় দেখে মন ভরে না, দিনমানে ভাল করে দেখব একদিন। চাতালের ঐ ই বুঝি যাত্রার মানুষ? বড্ড মাতিয়েছিলেন সমস্ত পার্ট ভাল। বিশেষ করে, ঐ যে বলে—রাজা অম্বরীষ যিনি সাজলেন।

খাতির করে জন কয়েক সঙ্গে সঙ্গে ছল, তারা এ ওর মুখে তাকায়। বলেন কী াক—অম্বরীষ সর্বশ্রেষ্ঠ! চতুর্থ অঙ্কে ঢিল পড়েছিল অম্বরীষের কারণেই। ার গুণের মধ্যে চেহারাখানা, আর আছে । সে গলার কাছে বজ্রগর্জন হার মানে। স এসে শুধু সেই গলারই প্রতাপ । শোকে হোক, উল্লাসে হোক, হোক, প্রেমালাপে হোক, হুঙ্কারের রশেষ নেই। তার জন্য ক্ষতি হয় াতাদের রাজরাজড়া দেখা নেই—কাবে, রাজকণ্ঠ সর্বক্ষণই বুঝি মারমুখি াকে। কিন্তু কাল বিপর্যয় কান্ড। নেশার ছল নিশ্চয় জলধর—কায়ক্লেশে কোন চতুর্থ অঙ্ক অবধি এসে অবস্থা এমন দাঁড়াল, প্রম্পটারের মুখে কথা বেরুতে দেয় না, একাই সব বলে দেবে। রাজা অম্বরীষ তো আছেই—তার উপরে মহারাণী নারদঋষি দূত একনাগাড়ে সব বলে যাচ্ছে। এতদূর আর সইল না লোকের—দুম করে একটা ঢিল। নানান দিক দিয়ে তখন বৃষ্টিধারার মতো ঢিল পড়তে লাগল।

এই মানুষের কথায় সিতাংশু পঞ্চমুখ। বলে, মানিয়েছিল কী চমৎকার! আসরে এলেন, তারপরে আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনি। সেকালের নেটিভ-স্টেটে ঘোরা আছে আমার, বিদেশে দেখে এসেছি। আসল রাজাও এমন সুন্দর হয় না।

যাত্রাদলেরই একটি এদের সঙ্গে আছে। নিন্দেমন্দ শুনে শুনে কান ঝালাপালা, তার মধ্যে এইসব প্রশংসার কথায় বুক ফুলে দশ-হাত হল। জলধরের সঙ্গে একটু বিশেষ খাতির তার, দুজনে একদিনে দলে ঢুকেছে। সগর্বে সেই কথা বলে, জলধর-দা হয় আমার। চেহারাই কেবল ভাল নয়, ঘরও ভাল। জলধর-দা ঘরের কথাসব আমায় বলে। ওর ঠাকুরদা ছিলেন বড় দরের পণ্ডিত। বাপও নাকি কলেজে পড়াতেন, লাখপতি হবার নেশায় পড়ে ব্যাপার-বাণিজ্য সর্বস্ব ফুঁকে দিলেন।

সিতাংশু অন্তরঙ্গ ভাবে মানুষটার কাঁধে হাত দিয়ে উৎসাহ দেখায় : বটে, বটে!

ব্যবসা ফেল হয়ে অকালে মারা গেলেন তিনি। তা লাখটাকা না-ই পান, ছেলে যা একখানা পেলেন লাখপতির ঘরেই মানায়। বলুন? দলের মধ্যে আলাদা ইজ্জত। আমি এই বদ্যিনাথ—তেমনি সব রয়েছে গোপীকিষ্টো, তিনকড়ি, নারাণ, পেল্লাদ। ও'র নামের সঙ্গে কিন্তু বাবু জুড়ে বলতে হবে—জলধর নয়, জলধরবাবু। খানিকটা লেখাপড়া নিজেও না শিখেছে এমন নয়, কিন্তু হলে হবে কি, খামখেয়ালি ক্ষ্যাপা মানুষ—

সিতাংশু ব্যস্ত হয়ে বলে, আছেন জলধর-বাবু? একটু আলাপ-পরিচয় করব।

বদ্যিনাথ বলে, না থেকে যাবে কোথা? এর নাম যাত্রাদল—আইন জেলখানার চেয়েও কড়া। ঘোরাঘুরি যত কিছু বেলাবেলি সেরে রাখুন—বেলা ডুবেছে কি, এক-পা আর নড়তে দেবে না। আসরের গাওনা থাকুক আর না থাকুক। গাওনা না থাকলে রিহার্শালে নিয়ে বসাবে।

গত রাত্রির মহারাজ অম্বরীষ ও আর কয়েকটি মিলে তাশ খেলছে। মহা উত্তেজিত।

বদ্যিনাথ ডাকল, ও-জলধরবাবু, তাস রেখে তাকাও একটিবার এদিকে।

কেবা শোনে কার কথা!

বদ্যিনাথ বলে, কানে যাচ্ছে না জলধরবাবু?

জলধর খিঁচিয়ে ওঠে : যা যা, গন্ডগোল করিস নে এখন। দেখছিস যে কাজে রয়েছি।

বদ্যিনাথ কিছু গরম হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! সার এসেছেন আলাপ-পরিচয় করতে—

নির্বিকার জলধর বলে, দেরি হবে।

সিতাংশু মোলায়েম হেসে বলে, তাড়া দিও না, ব্যস্ত কিসের? আমিই অপেক্ষা করব।

একজনে ইতিমধ্যে ছুটে গিয়ে হাতল-ভাঙা চেয়ার নিয়ে এল, সিতাংশুর পিছন পিছন কাল থেকে যার টানাটানি চলছে।

বদ্যিনাথ বলে, তোমার অ্যাকটিং সারের বড্ড ভাল লেগেছে। মেডেল দেবেন।

বেশ তো, দেবেন।

যেন অতিশয় স্বাভাবিক ব্যাপার, বিস্ময়ের কিছু নেই। বলে, রোজগারে বসেছি, কেবলই তুই বাগড়া দিচ্ছিস। এত কথা বলতে গেলে মাথার ঠিক থাকে!

চেয়ারে না বসে সিতাংশু খেলার পাশে দাঁড়িয়ে জলধরের রোজগারের বহর দেখছে। একটানা হেরে যাচ্ছে, তবু উৎসাহের অবধি নেই। ব্যাগ খুলে হারের পয়সা শোধ করে দিয়ে বলে, পুরো দশখানি টাকা মুনাফা করে পকেটে ফেলি, কথাবার্তা যত কিছু তার পরে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ। বদ্যিনাথ পুনরায় টোপ দিচ্ছে : মেডেল দেবেন বলে সার এসেছেন। পিতল নয় রুপো নয়, খাঁটি সোনার মেডেল।

রীতিমতো চটে গিয়ে জলধর বলে, বললাম তো সবুর করতে হবে। না পোষায় চলে যেতে পারেন।

অদৃষ্ট ভাল, সবুর বেশি করতে হল না। মনিব্যাগ ঝেড়েঝুড়ে উলটেপালটে দেখা গেল সাকুল্যে তিনআনা। নিশ্বাস ফেলে জলধর বলে, ভাত না-ই হোক, বিড়ি তো চাই। থাক তবে এই পর্যন্ত।

রণে ভঙ্গ দিয়ে লাট্টুর মতন পাক খেয়ে সিতাংশুর দিকে ঘুরল : কি আলাপ-পরিচয় করতে চান, বলুন।

জমাতে হবে মানুষটির সঙ্গে। একগাল হেসে ঘনিষ্ঠ সুরে সিতাংশু প্রশ্ন করে : নাম তো পেয়েছি, দেশ কোথা আপনার?

সে তো বদ্যিনাথই বলে দিতে পারত। এর জন্যে কাঠ হয়ে আপনি পাশে দাঁড়ালেন, বদ্যিনাথটা ভ্যানর-ভ্যানর করতে লাগল। দুয়ে মিলে দফাটি সারলেন, হেরে মরলাম।

প্রতিপক্ষ লোকটা এ-পকেট ও-পকেট থেকে বিজয়ের পয়সা নিয়ে একত্র করছে। সগর্বে বলে, হার তোমার আজ নতুন নাকি জলধর-বাবু?

সুযোগ পেয়ে সিতাংশু একটু খোসামুদি করে নেয় : হারুন আর যা-ই করুন, জলধর-বাবু খেলেন কিন্তু বড় ভাল।

জলধর তিক্তস্বরে বলে, চটাবেন না আমায়। ভাল তো খেলতে চাইনে, জিততে চাই। জিতে দশ-বিশ টাকা পকেটে ফেলব। তা মশায় খেলা কত রকমই তো খেললাম, আমার বাবাও সারা জন্ম খেলে গেছেন। জিত নেই আমাদের কপালে। হারের পর হার।

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হঠাৎ সিতাংশুর উপর : কী তাজ্জব চিজ আমি মশায়, অমন একনজরে তাকিয়ে রয়েছেন। চোখের টর্চ দুটো সরিয়ে ফেলুন, গা শিরশির করে। এত বড় জায়গাটার মধ্যে আর কিছু দেখবার নেই আমি মানুষটা ছাড়া? কাল আসরেও লক্ষ্য করেছিলাম।

বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ নয় সিতাংশু। বলে, যে সে মানুষ নন আপনি। ললাটে রাজটিকা—

বটে, বটে! রাগ গিয়ে জলধর হাসিতে ফেটে পড়ছে : পকেটে পুরো সিকিটাও নেই, ললাটে রাজটিকা নিয়ে ঘুরছি। শুনতে খাসা লাগে।

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে আরও একবার তাকিয়ে দেখে সিতাংশু জোর দিয়ে বলে, রাজা হবেন নির্ঘাত। কেউ রোধ করতে পারবে না।

জলধর বলে, হচ্ছিই তো রাত্রে রাত্রে। কোন আসরে বাদ যায় না।

বদ্যিনাথ জুড়ে দেয় : পাঁচখানা পালা আমাদের। জলধরবাবু সবগুলোতেই রাজা।

জলধর বলে, চুক্তি আমার সঙ্গে তাই। রাজার পার্ট ছাড়া করব না। স্বপ্নেই যদি খেতে হল, মুড়ি খেতে যাব কেন বলুন! খাব পোলাও। অভিনয়ই করব তো রাজা। কাল ছিলাম রাজা অম্বরীষ, আজকে মহারাজ যযাতি।

যাত্রাদলের আর একটি—গোপীকিষ্টো—এসে গেল এই সময়। বুড়োআঙুল আন্দোলিত করে হাসতে হাসতে সে বলে, লবডঙ্কা। কালকের অমন আসর মাটি করেছ, যযাতি আজকে আমি করব। মোশানমাস্টার তাই তো রপ্ত করাল এতক্ষণ ধরে। তুমি করবে জনৈক বনবাসী—আমার যেটা ছিল।

জলধর গর্জন করে ওঠে : ইয়ার্কি? রাজা ছাড়া অন্য কিছু হব না—কিছুতেই না। চুক্তি যা আছে।

সিতাংশুও লুফে নিয়ে বলে, নিশ্চয়। যাত্রার রাজা কেন, আসল রাজা। এত বড় রাজলক্ষণ বৃথা যাবে বুঝি? কায়দায় লাগছে না তাই।

তাই নাকি? এত রাগের মধ্যেও ফিক করে হেসে পড়ল জলধর। ক্ষণে শীত ক্ষণে গ্রীষ্ম—মানুষটার রকম বুঝি এই! বলে, এতখানি খবর রাখেন তো আপনিই দিন না কায়দা বাতলে। বড় কষ্টে আছি মাইরি। তিনটে অপোগণ্ড শিশু বাড়িতে, দুমাসের মধ্যে তাদের কিছু পাঠাতে পারিনি। রাজা হলে কোন হাঙ্গাম থাকে না। ভাণ্ডারিকে হুকুম করব, মাসে মাসে মোটা মাসোহারা চলে যাবে।

সত্যিই রাজা করব আমি—

চলে যাচ্ছিল জলধর, সিতাংশু হাত চেপে ধরল।

জলধর বলে, হাত ছাড়ুন দিকি, কী মুশকিল! অধিকারীকে দুটো শক্ত কথা শুনিয়ে আসি। দেরি হলে আমার আবার রাগ জুড়িয়ে যায়।

সিতাংশুর মুখের দিকে চেয়ে আবার বলে, ললাটে যাই থাক পকেটে মোটমাট তিনআনা। বিড়ির খরচা রেখে একটি আনা দিতে পারতাম ললাট-গণনার জন্যে। কিন্তু সাহেবমানুষের হাতে আনি দিতে লজ্জা করে।

আনি কি বলেন জলধরবাবু? টাকা নেবো—একটি হাজার অন্তত। লাখ লাখ টাকার মালিক হচ্ছেন, হাজার কি বেশি বলে ঠেকছে?

সে যেদিন হবো—

আমিও বলছি তাই। যেদিন হবেন তখন। আগাম একআনাও নয়।

হাত ধরে আকর্ষণ করে বলে, আসুন—

কোথায়?

লোকজনের মধ্যে কী আর বলি! কানের কাছে মুখ এনে সিতাংশু নিম্নস্বরে বলে, রাজাই হয়ে যাচ্ছেন, দেরি নেই তার। জনৈক বনবাসী সাজতে যাবেন কোন্ দুঃখে?

দুর্গাতলা ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়ল। জলধর বলে, নিয়ে চললেন কোথা বলুন দিকি?

হেসে সিতাংশু বলল, রাজা করতে।

কৌতুক লাগে জলধরের। বলে, রাজা করবার জন্য রাজহস্তী সেকালে পথের মানুষ শুঁড়ে জড়িয়ে পিঠে তুলে নিত। আপনার সে মশায় সেই গতিক।

সিতাংশু বলে, একালের রাজা হাতি চড়ে না, মোটরে চাপে—

ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার বটতলায় মোটরের পাশে এসে পড়েছে। সিতাংশু দরজা খুলে দিয়ে বলে, উঠুন।

সে কি মশায়, আসর যে একটু পরেই।

উঠে বসুন, নিরিবিলি ক'টা গোপন কথা বলি। একেবারে ফুঁ দিয়ে রাজা হওয়া যায় না, ক্রিয়াকর্ম আছে।

মতামতের খুব যে তোয়াক্কা রাখল সিতাংশু, তা নয়। ধাক্কা দিল আচমকা, হুমড়ি খেয়ে জলধর গাড়ির ভিতর পড়ে। সিতাংশু পাশে চেপে বসেছে। ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়ে দিল গাড়ি।

চেঁচায় না জলধর। কৌতূহল মনে মনে। গায়ে একটা শক্ত জিনিষ ফুটছে।

কোমরে কি আপনার মশায়?

সিতাংশু বলে, আপনার জন্যে নয়। দায়িত্বের কাজ করি, কত লোক চটে থাকে। কখন কোন্ বিপদ ঘটে, সেজন্য রাখতে হয়।

জলধরেরও দৃকপাত নেই। বলে, বুঝলাম। সশস্ত্র এসে রথে তুলে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছেন। কাপড়চোপড়ের এই তো বাহার, আর ব্যাগেও দেখলেন তিনআনার পয়সা। কোন্ লোভে করছেন বলুন তো, মতলবটা কি?

রাজা করব। এক জিনিষ কতবার বলাবেন আমায় দিয়ে?

গাড়ি তীরের বেগে ছুটেছে।

[নয়]

ম্যানেজারের কোয়ার্টার ফ্যাক্টরি কম্পাউন্ডের বাইরে। নিরিবিলি জায়গা। গাড়ি এসে দাঁড়াল, সিতাংশু নেমে পড়ে। জলধরকে ডাকে : নেমে পড়ুন জলধরবাবু—

থমকে দাঁড়িয়ে জলধর বলে, রাজবাড়ি নিয়ে এলেন?

রাজবাড়ি এত সামান্য? মহামাত্যের বাড়ি। যাত্রার মহামাত্যটি দেখলাম অবিরত দাড়ি পাকান, দাড়ি না পাকিয়ে বুদ্ধি খোলে না। একালের মহামাত্যেরা দাড়িগোঁফ-শূন্য।

মেঝেগুলো আয়নার মতন, আলো ঠিকরে পড়ছে। দিনমানে মুখ দেখাও চলে বোধহয়। এ হেন বস্তুর উপর পা ফেলে ফেলে চলা চাট্টিখানি কথা নয়। বিশেষ করে জুতো পায়ে রয়েছে—যে জুতোর তলার ফুটো দিয়ে মালসাখানেক ধুলো ঢুকে গেছে। পা ফেলতে কেয়াফুলের রেণুর মতন ফুরফুর করে ধুলো ছিটকে পড়ে।

তবু যেতে হয়। পাশে পাশে যাচ্ছিল সিতাংশু, সামনে ঘুরে দাঁড়িয়ে কোমর নিচু করে অভ্যর্থনা করে : ইতস্তত কিসের? ঘরে চলে আসুন।

ভক্তিমান শিষ্য গুরুঠাকুরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যেন। যেতে যেতে জলধর বলে, অমাত্য বাড়িতেই পা ওঠে না, রাজবাড়ি আমায় তো মশায় চ্যাংদোলা করে তুলতে হবে।

খানসামার কাছে জানা গেল মেমসাহেবরা সিনেমায় গেছেন। গাড়ি সেইখানে পাঠাতে বলেছেন, শো ভাঙলে নিয়ে আসবে।

এমনধারা মেঝে, তারও উপর চিত্র-বিচিত্র কার্পেট। কার্পেটের আহামরি ছবি নির্মমভাবে জুতোয় মাড়িয়ে যাচ্ছে।

সোফা দেখিয়ে সিতাংশু বলে, বসুন—

একজোড়া সানগ্লাস নিয়ে এলো কোথা থেকে। বলে, পরুন দিকি। বাইরে এলে পরে থাকবেন। রাস্তায় বেরুনোর সময় তো বটেই।

সানগ্লাস পরে বড়-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জলধর সকৌতুকে বলে, সিনেমা-আর্টিস্টরা পরে বেড়ায় দেখেছি।

মেক-আপ নিয়ে রূপের ফুলঝুরি ছোটায় তারা—হতচ্ছাড়া আসল চেহারা দেখে ফেললে কেউ আর রূপবান বলে মানবে না। সেই ভয়ে চোখ ঢেকে বেড়ায়। আপনারও ঠিক তাই রাজা হচ্ছেন, ঘর-ব্যাভারি চেহারা কেন মানুষকে দেখতে দেবেন?

সিনেমা থেকে গাড়ি ফিরে এলো অনতি পরে। তিন তরুণী প্রজাপতির মতো ফুরফু করে যেন উড়ে এসে ঘরে ঢুকল। নবেলে পড় যায় এমনি সব মেয়ের কথা। সিনেমা-ছবিতে—এবং ইদানীং পথেঘাটেও দেখা যাচ্ছে। অবো বস্তু—স্বপ্ন এবং রক্তমাংস চটকে বোধহ বানানো। অথচ কী আশ্চর্য—নিশাকালে এক ঘরের ভিতর মাত্র আট-দশ হাতের ব্যবধা দেখ দেখ, তিন কন্যা কলকণ্ঠে সদ্য-দেখা ছবি আলোচনা করতে করতে হঠাৎ চুপচাপ হ দাঁড়িয়ে পড়ল। জলধরকে দেখছে। আশ্বিনের রাত্রিবেলা রীতিমত শীত-শীত —কিন্তু জলধরের মনে হল, জামার নিচে ত সর্বদেহ ঘামছে তিনটে পরী মেয়ের আধ চক্ষু তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখছে। এবং সঙ্গে দেখছে গায়ের এই জামা, পায়ের জুতো জোড়াও।

সিতাংশু পরিচয় করিয়ে দেয় : আমার ললিতা। বোন শম্পা। আর ইনি ললিতার ম আমারও মা।

হরি, হরি! তিনের মধ্যে একটি হলেন অপর একটি তাঁরই সন্তান! জলধর যে নিয়েছিল—

ভাবনা চেপে রাখার বিদ্যা এ জা লোকের আয়ত্তে থাকে না। মনের কথাটা মুখে বলে ওঠে, আমি তো ভেবেছিলাম বয়সি তিনজন। একের গর্ভে আর এ হয়েছেন, কার বাপের সাধ্যি ধরবে?

শাশুড়ি ঝাঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নি শম্পার মুখে হাসির রেখা। তাড়াতাড়ি সে কথা আনে : চা হোক একটু?

সিতাংশু আপত্তি করে : এত রাতে আবার কেন? ডিনারে বসা যাক। ক্লান্ত আ জলধরবাবু, বিশ্রাম করবেন।

শম্পা মৃদুকণ্ঠে বলে, ইনি সেই অম্বর যা বলেছিলে দাদা, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

জলধরের কানে গেল না। সেই থেকে তাজ্জব হয়ে দেখছে তিন তরুণীকে। এ চোখ নামায়, আবার দেখে। মানুষের কী ক্ষমতা—খোদার উপর খোদকারি! সিতাংশু

দিদি শাশুড়িঠাকরুন—নইলে দলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে কচি, সকলের বড় রূপসী ও চঞ্চলা। বয়স নির্ঘাত দু-ভাগ কমিয়ে ফেলেছেন। ললিতা ও শম্পা বেশি কমায় নি বোধকরি নিতান্ত খুকি হয়ে যাবার আশঙ্কায়। সব মেয়ে একটা বয়সে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায়—তার কমে যাবে না, বেশিতেও নয়।

এমনি সব ভাবছে জলধর, ডিনারের বেল বাজল। সিতাংশু উঠে দাঁড়িয়ে বলে, আসুন—

টেবিলে চার প্রাণী—ললিতা শম্পা সিতাংশু আর জলধর। শাশুড়ি দিল্লি থাকেন—ক'দিন আগে এসে বড়মেয়ের কাছে ছিলেন,, আজকেই সেজ মেয়ে এই ললিতার কাছে এসেছেন। শরীরটা ভাল ঠেকছে না, ডিনারে বসবেন না তিনি, শুয়ে পড়েছেন। মিথ্যে অজুহাত—যে না সে ধরতে পারে। জলধরও। ভবঘুরে যাত্রা-ওয়ালার সঙ্গে এক টেবিলে বসবেন না, এই আর কি! কিম্বা তা-ও নয়। বেকুবের মতন ঐ যে বয়সের একটা কথা বলে ফেলল—শাশুড়ি-ঠাকরুনের বড্ড লেগেছে। সেই ক্রোধে শরীর খারাপ। স্ত্রীলোকদের সর্বব্যাপারে বড় বলো, বিষম খুশি—কিন্তু বয়সে বড় বলেছ তো রক্ষে নেই। সেটা বড়লোকের বাড়ি বলে নয়, পাড়াগাঁয়ের অতি-দরিদ্র ঘরেও পরখ করা আছে।

সে যাক গে—একটি কমেছে, খানিকটা তবু বাঁচোয়া। এ দুটোও গেল না কেন? কানে কানে ফিসফিস করে, আর চোখ দিয়ে চেখে চেখে খাচ্ছে যেন জলধরকে। নজর ফেরায় না। যেমন করে কাল যাত্রার আসরে সিতাংশু দেখছিল মহারাজ অম্বরীষকে। অত করে কী দেখ ঠাকরুনেরা বলো দিকি? তোমাদের মুখে আছে রূপ বাড়ানো ও বয়স কমানোর রকমারি চূর্ণ ও অবলেহ, আমার মুখে যদি কিছু লাগানো থাকে তো দারিদ্র্য। আর অতিরিক্ত বিড়ি খাওয়ার দরুণ ঠোঁটে কালো রং। সে জিনিষ এত কি দেখবার?

তা সে যাই হোক, জলধর পরোয়া করে না। নিজ কর্ম করে যাচ্ছে। ওঁচা ছেলে পরীক্ষায় সে পাশের ছেলের খাতা আড়চোখে দেখে আর টুকে যায়, জলধরের সেই অবস্থা। দেখছে ঠিক ঠিক ভাবে সিতাংশু ও মেয়েদের কায়দাকানুন, নিজে ঠিক তেমনি তেমনি করে যাচ্ছে। পারবে কেন, কতকাল ধরে শিক্ষা ওদের! হাত পিছলে চামচে ঠং করে মেঝেয় পড়ে যায়, বাঁ-হাতের কাঁটা বেখেয়ালে ক্রমে ডান হাতে চলে আসে। খানসামা প্লেট এগিয়ে ধরে, খাবার তুলে নিতে গিয়ে টেবিলের উপরে মাখামাখি হয়ে যায়। ওরা তিনটি প্রাণী হঠাৎ যেন কানা হয়ে গিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এবং কালা হয়ে গিয়ে চামচে পড়ার আওয়াজ শুনে পায় না। মৃদু কথাবার্তার তিলেক মাত্র ছেদ নেই—সময় কাটানোর আজেবাজে কথা। এরই মধ্যে খানসামার দিকে চোখ টিপে দিয়েছে বোধহয় ললিতো—দেখা গেল, সে-ই এবার প্লেটে ঢেলে দিচ্ছে, জলধর নিজে তুলে নেবে সে অপেক্ষা করে না।

আরও হল। ললিতা সহসা বলে ওঠে, হাতেই খান আপনি।

সিতাংশু জোর দিয়ে বলে, বাঙালী মানুষ আমরা—আলবৎ হাতে খাবো। হাতের পাঁচ আঙুলে মেখে মেখে খাবো।

শম্পাও যোগ দেয়: হাতে না খেলে খাওয়ার সুখ হয় নাকি? চচ্চড়ির ডাঁটা কি মাছের মুড়োর ঘিলু—এ সবের মজা কাঁটা-চামচে চালিয়ে মেলে না।

ললিতা বলে, সেই জন্যেই তো ভালবাসি হাতে খেতে।

হাতে খাওয়ার শতেক মহিমা মুখে, আর টুকটুক করে কেমন ছুরি-কাঁটা চালিয়ে যাচ্ছে। নিজে খাওয়ার চেয়ে খাওয়া দেখে বেশি সুখ। বিশেষ করে স্ত্রীলোক দুটির। যেন কল চালিয়ে যাওয়া—কলই খাদ্য এনে মুখের কাছে হাজির করে দিচ্ছে। এবং গালে ঠোঁটে এত রং মেখেছে, মুখ দুটোও ঘষামাজা সদ্য রং-করা কল ছাড়া কিছু নয়। স্ত্রীলোক হয়েও কী চমৎকার ছুরি চালায়—ছুরি হাতে পথে বেরিয়ে মানুষের পকেট-কাটাও অসাধ্য নয় এদের পক্ষে। অবাক হয়ে জলধর দেখে। রোসো না সোনামাণিক, কটা দিন সবুর করো, রপ্ত করে নিই, পাল্লা হবে তখন—ছুরি-কাঁটা নির্ভুলভাবে চালিয়ে কত দ্রুত কে খেতে পারে। জিনিষ দেখে ঠিক ঠিক যদি নকল করতে না পারব, অভিনেতার গরব নিয়ে কোন্ সাহসে তবে আসরে আসরে ঘুরি?

ডিনার শেষ করে বাটির জলে আঙুল ডুবিয়ে ললিতা ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল। সিতাংশুকে বলে, ড্রইংরুমে যাও তোমরা, কফি সেখানে যাবে। মা একলা আছেন উপরে, আমরা চললাম। চলো শম্পা—

বাবুর্চিকে যথোচিত উপদেশ দিয়ে শম্পার সঙ্গে তরতর করে সে উপরে উঠে গেল।

সিতাংশু বলে, কফি চলবে তো জলধর-বাবু?

ঘাড় নেড়ে দরাজ গলায় জলধর বলে, যা-কিছু আপনারা চালান আমারও চলবে। যা আপনাদের চলে না, সে জিনিষও চালাব। এ-রকম শততালি জুতো পায়ে পারেন চলতে কার্পেটের উপর? চলে বেড়িয়েছেন কখনো? মানুষ আমায় মোটেই কম ভাববেন না।

কথার ভঙ্গিতে সিতাংশু হেসে ফেলে: সে কী কথা! কমই যদি ভাবব, এত ছুটোছুটি কেন আপনার জন্যে?

জলধরকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে কৌটোসুদ্ধ তার দিকে এগিয়ে দিল: রেখে দিন, রাতের খরচা। আপনার ঘরেও নিশ্চয় দিয়েছে। চাকরবাকর বাইরে থাকবে, যখন যেটা দরকার পড়ে হুকুম করবেন। সঙ্কোচ করবেন না, নিজের বাড়ি ভাববেন এটা।

হেসে সঙ্গে সঙ্গে আবার সংশোধন করে নেয়: সেটা অবশ্য ঠিক নয়। একদিন দু-দিনের অতিথি এখানে। রাজামানুষ এমন সামান্য জায়গায় থাকবেন কি করে?

লুফে নিয়ে জলধর বলে, সত্যি কথা। মাঠ-ময়দানে দিন কাটে, উঁচু আকাশের নিচে। সন্ধ্যা-বেলা যাত্রার আসরে—সে জায়গাও ছোটখাট নয়। এমন দেয়ালের ঘেরের মধ্যে থাকা বড়-একটা ঘটে ওঠে না।

কৌতূকদৃষ্টিতে চেয়ে বলে, ভাঙুন দিকি এবার। কেন আমায় নিয়ে এলেন, এত খাতির কিসের? এখান থেকে কোথায় চালান করবেন?

সিতাংশু বলে, বলেছি তো রাজা করব। রাজবাড়ি চাই রাজার জন্য। সে বাড়ির মস্তবড় গেট। গেটে সর্বদা দরোয়ান হাজির—

রাজবাড়িটা সিতাংশু যেন চোখের উপর দেখছে—দেখে দেখে হুবহু বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছে: বন্দুকধারী দরোয়ান গেটে মোতায়েন, প্রকাণ্ড কম্পাউন্ড। লন সামনের দিকটায়—চতুর্দিকে ফুল ফুটে আছে, মাঝখানটা সবুজ নরম ঘাস। মুখে আর কত বলব—যাচ্ছেন সেখানে, গিয়ে সর্বময় হয়ে বসবেন।

একটু দম নিয়ে আবার বলে, রাজা হতে রয়ালড্রেস চাই। কাল গিয়ে দুজনে কেনাকাটা করব। রাজার আদব-কায়দা হাবভাব খানিকটা তালিম দিয়ে দেবো আমি। আপনাদের যাত্রা দলেও লাগে এসব। একটা-দুটো দিন এখানে রেখে তাই কষ্ট দেবো।

পাশের শোবার ঘরে পৌঁছে দিয়ে সিতাংশু উপরে উঠে গেল। পরিষ্কার হল না ব্যাপারটা। যাকগে, যা করতে চায় করুক। যাত্রাওয়ালার জীবনের দাম তো কানাকড়ি—এই জীবন নিয়ে বাজি ধরার বড় সুবিধা। যেটুকু জিতলাম পুরো-পুরি মুনাফা, হারলে কানাকড়ির লোকসান। খাতির করে আজ রিভলবার গায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে এসেছে—মতলব ঘুরে গিয়ে কাল সকালে যদি রিভলভার উঁচিয়ে তাড়া করে, এমন ঘরে আমার এই রাত্রিবাসের মুনাফাটুকু তবু থেকে গেল।

সে রাত্রে ঘুম নেই জলধরের চোখে, পাগল হবার জোগাড়। উঃ, এত সুখে থাকে মানুষ—এমন সব বস্তু মানুষের আরামের জন্য! মানুষে বানিয়েছে, মানুষে ভোগ করে। ঘরময় নানান ঢঙের আসবাব—দেয়ালে ছবি, জানলায় দরজায় বিচিত্র নক্সার পর্দা। মুখ দিয়ে কথাটি বের করতে হয় না, বোতাম টিপলে বেয়ারা খানসামা হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়ে। সাজসজ্জায় এরাই তো এক একটি রাজা। যে রয়ালড্রেস এঁটে আসরে নামি, এদের পোশাকের বাহার অনেক বেশি তার চেয়ে। অনেক দাম। আরও তো সিতাংশু বিনয় করে বলে গেল এই সামান্য জায়গায় দায়ে পড়ে রেখেছে কয়েকটা দিন। না জানি সেই আসল জায়গা কেমন যেখানটা আমার পাকাপাকি আস্তানা।

(তিনটে অপোগণ্ড শিশু ভগবান ভরসা করে ফেলে এসেছি, দু-মাসের মধ্যে এক আধলাও খরচ পাঠাতে পারিনি।)

সোফায় গিয়ে জলধর ধপ করে বসল। রাক্ষস, রাক্ষস! দেহের আধখানা গিলে ফেলল উদরে। বড়লোকে ঘরময় সারি সারি রাক্ষস বসিয়ে রাখে। আরাম কোথা—অস্বস্তি, আতঙ্ক। একবার জলধর খাটের উপর গিয়ে গড়িয়ে পড়ে। স্প্রিং-এর গদি—কিম্বা জলভরা পুকুর। এককালে জলধর খুব সাঁতার কাটত। আজকেও তাই—শয্যার উপর ইচ্ছাসুখে গড়িয়ে সাঁতারের সুখ করে নিচ্ছে। একেবারে সাড় লাগে না—জলে ভাসারই ব্যাপার।

তখন খেলায় পেয়ে যায়। দরজা ভেজানো আছে, জানলাগুলো একটি একটি করে এঁটে দিয়ে এলো। ভাবী রাজার ছেলেমানুষি খেলা চাকরবাকরে না দেখে ফেলে! (বউ বিনা-অষুধে বিনাপথ্যে মরে গেছে তিনটে ছেলেমেয়ে রেখে। চুলোয় যাকগে, দুনিয়ায় কেবা কার!) বিছানায় গড়ায় জলধর, সেখান থেকে সোফার উপর পড়ে, আবার বিছানায়। সব কটা আলো জেলে দিয়ে খুশি মতন এটাওটা নিভিয়ে দেখে। পাখা খুলে দেয় পুরো জোরে—শীত তো কি হয়েছে, চলুক। আয়নার কাছে গিয়ে ঘুরে ফিরে নানান ঢঙে দাঁড়ায়। দেয়ালের ছবি দেখে একবার দূরে দাঁড়িয়ে, একবার বা অতি-নিকটে

এসে—ঝানু ক্রিটিক যেমনটা করে। সুখ যখন হাতের কাছে পাওয়া গেছে, আষ্টেপিষ্টে উপভোগ করে নেওয়া যাক। বলা যায় না কাল দিনমানে কী গতিক দাঁড়াবে।

হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে কোন্ সব বস্তু রেখে গেছে শোবার ঘরে ও লাগোয়া বাথরুমের ভিতর। গুণছে এক দুই তিন চার—আস্ত একখানা রাত কাটানো বড়লোকের পক্ষে চাট্টিখানি কথা নয়—তার জন্যে কত সরঞ্জাম লাগে দেখ। বারোআনা জিনিষ তো চোখেই দেখেনি জলধর—ব্যবহার কেমন করে করবে সেই এক সমস্যা। এসে কেউ ব্যাখ্যা করে দিয়ে যেত!

বোতাম টিপে দিয়ে জলধর পা ছড়িয়ে সোফায় বসে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা। বড়লোকের চাকরবাকর কর্তব্যপরায়ণ বটে—নিশিরাত্রি অবধি ঘুমোয় নি, আড্ডা দিতে বেরোয় নি। টোকা পড়ল আবার।

ভিতরে এসো, জল দাও—

জল অদূরে কাঁচের সোরাইতে, পাশে গেলাস। উঠতে হবে না, হাত বাড়ালেই বোধহয় পাওয়া যায়। কিন্তু যে মানুষ রাজা হতে যাচ্ছে, হাত বাড়ানোর কষ্ট করা কি করে সম্ভব তার পক্ষে? সিতাংশুও বলে গেল, যা-কিছু দরকার হুকুম করে নিতে। বোতাম টিপে গম্ভীর গলায় তাই হুকুম করছে : জল—

পরক্ষণেই হি-হি করে হেসে ওঠে : কিছু মনে কোরো না ভাই। পরখ করে দেখলাম, কলকব্জা ঠিক ঠিক চলে কিনা। বসে পড়ো ওখানটা, কথাবার্তা বলি। যতক্ষণ না ঘুমোই, দলবল নিয়ে আড্ডা জমাই তাস-দাবা খেলি—আমার চিরকেলে নিয়ম। এই নির্জন কারাবাসে—বাপরে বাপ—মানুষ থাকে কি করে?

তবু বেয়ারাটা জল গড়িয়ে দেয়। দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

বসতে হুকুম করলাম, হুকুম মানলে যে না বড়। এ ঘরে বোসোনি কোনদিন? ধর্মকথা বলো। মানুষজনের সামনে অবশ্য বসা যায় না—কিন্তু আমি আবার মানুষ নাকি?

ছেঁড়া জুতো তুলে ধরে দেখায় জলধর, গায়ের জামা দেখায়। বলে, কত মানুষই তো এসে থাকে, এমন জিনিষ কাউকে পরতে দেখেছ? পরে এইখানে বসেছে? কুকুর-বিড়াল এনে পোষে, মনে করো তাই একটি আমি। আসনাই পেয়ে বিড়াল সোফার উপর বসেছে, তাকে কেন গ্রাহ্য করতে যাবে?

উঠে গিয়ে খপ করে তার হাত এঁটে ধরে : ঢং ছাড়ো দিকি। জমিয়ে না বসলে কথাবার্তায় জুত হয় না। সমীহ করতে হয়, দিনমানে সকলের সামনে কোরো। জামা-জুতোয় আমিও তখন খানিকটা ভব্য হয়ে যাব।

বসানো গেল না, কিন্তু পাথুরে মুখের উপর ক্ষীণ একটু হাসি দেখা দিয়েছে। বলে, বেড-টি চাই তো?

সেটা আবার কেমন বস্তু?

বুঝে নিয়ে জলধর বলে, না রে ভাই, মুখ না ধুয়ে ঘেন্না করে। অত ভোরবেলা কে দেখছে—ওটা ফাঁকি দেওয়া যাক। তারপর থেকে যতগুলো পর্ব, নিয়মমাফিক চালিয়ে যাবে। কেউ না বলতে পারে, বড়লোকি চালচলনে খুঁত আছে আমার।

আচমকা বলে উঠল, তোমার সাহেবের সঙ্গে আলাপ খুবই হয়েছে ভাই। কিন্তু পরিচয় একেবারে জানিনে। বলি মাথা-টাথা খারাপ নয়তো?

কী বলছেন হুজুর! অত বড় একটা মিল বলতে গেলে ইনিই চালিয়ে যাচ্ছেন।

কী জানি, আমার যেন কেমন-কেমন ঠেকছে। এক পাগলা জমিদারের গল্প আছে—পথের মানুষ তোয়াজ করে আনতেন, পর পর দাঁড় করিয়ে কতজনকে এক সঙ্গে বর্শায় গাঁথা যায় অতিথিদের উপর তার পরখ হত। তেমনি কোন মতলব নেই তো সাহেবের? দোহাই তোমার, চেপে যেও না।

বেয়ারা লোকটা এবারে শব্দ করে হেসে উঠল।

আরে আরে, কী সর্বনাশ করলে তুমি, কত বড় অন্যায় অরাজক কাণ্ড!

লোকটা হকচকিয়ে গেছে।

জলধর বলে, দেয়াল দেয়ালের-ছবি ছাত-মেঝে সব ভয় পেয়ে গেছে। আমাদের চাষাড়ে হাসি এ ঘরে আজ এই প্রথম হল।

বেয়ারা চুপ হয়ে গেছে ততক্ষণে। বলে, যাই হুজুর। গুড নাইট।

| দশ |

বড়লোকে সূর্যওঠা দেখেন কালেভদ্রে—ঘুম-পাহাড়ের চূড়োয় অথবা পুরীর সমুদ্রে। সে নাকি আজব দর্শনীয় বস্তু। ঘরব্যাভারি যে সূর্য প্রতিদিন ভোরে উঠে ডিউটি মাফিক রোদ ছড়াতে লেগে যায়, তাকে দেখবার জন্য চোখ মেলতে যাবে কে? যাত্রাদলের মধ্যেও বড়লোকের এই রেওয়াজটা চালু। ভোররাত্রি অবধি পালা গেয়ে বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমোয়।

কাল রাত্রে জলধরের পালা গাইতে হয়নি, কিন্তু ঘুমও হয়নি। ঘুমোয় কেমন করে, কে জানে, এত নরম বিছানায়! শুয়ে পড়ে আছে তবু—শব্দসাড়া নিচ্ছে বাড়ির মানুষদের কি গতিক। কান পেতে আছে। অনেকক্ষণ পরে বাইরে এক সময় মোটরের শব্দ পাওয়া গেল মোটর এসে দাঁড়িয়েছে। নিঃশব্দতার মধ্যে সিঁড়ি ধরে জুতোর আওয়াজ নেমে এলো। মোটর তার পরে বেরিয়ে চলে যায়।

অতএব এবারে উঠে পড়লে নিন্দে হবে না। ঘড়িতে আটটা। হাত-মুখ ধুয়ে জলধর ড্রইংরুমে বসে খবরের কাগজ ওলটাচ্ছে। কালকের সেই খাতিরের বেয়ারার কাছে জানা গেল, সিতাংশু বেরিয়ে গেছে। রোজই প্রায় যায়—জুটমিলের এজেন্ট হালদারসাহেবের বাড়ি। ব্রেকফাস্ট সেখানে। আর বড়-মেমসাহেব—মানে সাহেবের শাশুড়ির তবিয়ৎ ঠিক নেই, সেজন্য ও'রাও কেউ নামছেন না।

আহা রে, কী আনন্দের খবর! শাশুড়ি ঠাকরুনই নিশ্চয় ধমকধামকিয়ে ওঁদের আটকেছেন। ঈশ্বর, তুমি পরম দয়াময়!

বেয়ারা বলে, ও'দের ব্রেকফাস্ট উপরে চলে গেল। আপনাকেও ঘরে পাঠাতে বলি?

না, টেবিলে—

ঘরের মধ্যে সর্বচক্ষুর আড়ালে ইচ্ছাসুখে খাওয়া যেত—মুখে লেপটে, যথেচ্ছ ছড়িয়ে। টেবিলের খাওয়ার ভুলভ্রান্তিতে চাকরবাকরগুলো মুখ টিপে হয়তো হাসবে। হাসে তো বয়ে গেল। বাড়িতে নতুন পা দিয়ে রাত্রিবেলা কাল যা করবার করেছে— দিনমানে কাউকে এখন মানুষের মর্যাদা দেওয়া হবে না। বড়লোকে যেমন করে।

টেবিল লাগাও। একলাই খাবো আমি।

খাওয়া প্রায় শেষ—আচমকা শম্পা নেমে এলো। এসে কথাবার্তা কিছু নয়—কাপে চা ঢালছে। সহজভাবে প্রশ্ন করে : চিনি ক'টা দেবো?

দিন না যতগুলো দিয়ে পারেন।

চা দিল শম্পা, নিজেও এক কাপ নিয়ে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। চা খাওয়া ঠিক উদ্দেশ্য নয়, ছল করে এসেছে। এক চুমুক খায়, আর দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে।

জলধর বিব্রত হয়ে বলে, জামাটা বড্ড ছেঁড়া। সত্যি বলছি, নিখুঁত জামাও আমার আছে। কিন্তু আপনার দাদা একেবারে ফুরসত দিলেন না। গাড়ির কাছে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে ফেললেন।

হেসে শম্পা বলে, জামা দেখছি নে।

জলধর বলে, পান খেলে ঠোঁটের কালো দেখা যেত না। আপনাদের বাড়িতে সব আছে, কেবল খিলি-পান পাওয়া যায় না। একটা পান চিবোতে পারলে ঠোঁট আপনার মতোই হত।

ঠোঁট দেখছে কে?

এবারে রীতিমত চটে গিয়ে জলধর বলে, তবে কি দেখছেন? কাল দেখেছেন, আবার এখন এসে দেখতে বসলেন। আপনার দাদাও সেই দুর্গাতলার আসর থেকে তিন দিন একনাগাড়ে দেখে যাচ্ছেন। সত্যিকথা বলুন তো—ভূত দেখেন না কন্দর্প দেখেন?

কলহের সুরে শম্পা বলে, আমাদের দিকেও তো আপনি দেখছেন কাল থেকে। কী এত দেখেন, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি?

একটু চুপ থেকে জলধর বলে, বলব?

বলুন না। আপনি তো রেখে ঢেকে বলেন না। এসেই তো কাল বোমা ছুঁড়লেন বউদির মায়ের উপর।

কৌতূহলী শম্পা আবার বলে, বলে ফেলুন।

বড় সুন্দর দেখায় আপনাদের। আমি বলে কেন, যে না সে-ই চোখ ফেরাতে পারবে না।

ফেরাতে বলছে কে? ক্ষয়ে তো যাচ্ছি নে—আপনার মতন রাগারাগি করতেও যাবো না।

গা কুটকুট করে না?

শম্পা অবাক হয়ে বলে, দেখছেন চোখ দিয়ে তারজন্যে গা কেন কুটকুট করতে যাবে?

আমাদের করে কিন্তু। ছটফট করি কতক্ষণে সাজপত্তোর নামিয়ে বাঁচব। সাজঘরে ঢুকেই গোঁফ-চুল ফেলে নারকেলতেল-সাবান নিয়ে রং তুলতে বসে যাই। আপনাদের অভ্যেস হয়ে গেছে দিনরাত চৌপহর সাজ করে থাকা।

অভিমানভরে শম্পা বলে, কী এমন সাজ করেছি যে অত করে বলছেন!

জলধর এক সুরে বলে যাচ্ছে, গায়ের রংয়ে পদ্মফুলের আমেজ এনেছেন। আমরা এমনধারা পারিনে। এমনি রং কিসে ওঠায়, দিন না শিখিয়ে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

দেখুন না—। শম্পা একটা হাত বাড়িয়ে দিল : চোখে ধরে নিরিখ করে দেখুন।

জলধর প্রণিধান করে বলে, রং পাকাই বটে। কিন্তু হয় কেমন করে? বড়লোকের ঘরে ছাড়া এমন দেখিনে। ঘষতে ঘষতে হয় আর কি! পিতলের ঘটিও ঘষেমেজে সোনার মতন চকচক করে।

শম্পা উচ্ছ্বসিত হাস্যে বলে, চোখ আছে, ঠিক ধরেছেন। পিতলই আমি বটে। কিন্তু দাদা আপনাকে যার কাছে নিয়ে যাবেন, সেখানে খবরদার পিতল বলবেন না। আমার বিয়ে ভেঙে যাবে।

মজার কথাবার্তা—শম্পার বড় কৌতুক লাগে। এমন স্পষ্টবাদী অদ্ভুত মানুষের কাছাকাছি আসেনি জীবনে। ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে, কথা শুনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঘাঁটানোর প্রয়োজন হয় না—জলধর আপাতত মেজাজে আছে। নিজেই আবার বলে, দেখুন, বয়-বেয়ারা আয়া-আরদালি খানাসামা-বাবুর্চিতে কতজনা খাটছে, গণবার ইচ্ছে হল। কাল রাত্তির থেকে লেগেছি। পেরে উঠলাম না—এখন একে দেখছি, তখন তাকে দেখছি। এত চাকরবাকর কেন আছে, মানুষ তো এই ক'জন আপনারা।

কমিয়ে দেখা হয়েছে, চলে না। কষ্ট হয়।

ফিরতে দেরি হয়ে গেল, এখুনি বেরুব। ঘরে গিয়ে চট করে তৈরি হয়ে আসুন তো—

হাতে করে একটা প্যাকেট নিয়ে এসেছে। জলধর বলে, কি এটা?

রয়্যালড্রেস। যে ড্রেস পরে আপনি যাত্রার আসরে নামেন, সে হল পৌরাণিক আমলের। হাল-আমলের রাজরাজড়া যত, তারা পরে কোট-প্যান্ট। রাজমুকুটও অচল। বদলে টুপি চলছিল, তারও দিন শেষ হয়ে গেছে।

প্যাকেট হাতে দিয়ে সিতাংশু বলে, পরে আসুন।

জলধর একনজরে তাকিয়ে থাকে সিতাংশুর দিকে। সবিস্ময়ে সিতাংশু বলে, কি হল?

উঠতে হবে আপনাকে একটু। কোট-প্যান্টলুন কোন পুরুষে পরেছি নাকি? আপনারা পরে বেড়ান, কায়দা-কানুনগুলো মুখস্থ করে নিচ্ছি।

শম্পা একটা হাত বাড়িয়ে দিল

কিন্তু ঐ যারা চাকরবাকর, তাদের তো একটাও চাকর নেই। তবু দিব্যি চলে।

তারা নিজেরা খাটে। আমরা কেন খাটতে যাব টাকা আছে যখন? টাকা দিয়ে খাটনির লোক রেখেছি।

আচ্ছা, আরো যদি টাকা হয়?

সকৌতুকে শম্পা বলে, কি বলতে চাচ্ছেন আপনি?

আপনারা তবু এঘর-ওঘর করেন, নিজ হাতে তুলে তুলে খান, আমায় এই চা ঢেলে দিলেন। আপনাদের দশগুণ বিশগুণ যাদের টাকাকড়ি, তাদের বোধহয় চ্যাংদোলা করে তোলে, অন্য কেউ খাইয়ে দেয় বাচ্চা ছেলেপুলের মতো। কিম্বা একেবারেই হয়তো খায় না, চাকরবাকরে খেয়ে নেয় তাদের হয়ে—

এগারোটার কাছাকাছি সিতাংশু ফিরল। বলে, চান-টান হয়ে গেছে দেখছি। চমৎকার।

হাসতে হাসতে সিতাংশু উঠে দাঁড়াল। জলধর সামনে পিছনে ঘুরে ঘুরে দেখে। একটু আধটু টেনেটুনেও দেখল।

বলে, বসুন এবারে, হয়ে গেছে। মেক-আপটা মনে গেঁথে নিলাম। দলের মধ্যে আমার আলাদা নিয়ম—মেকআপ-ম্যানের হাতে সমস্ত ছেড়ে দিইনে। ওদের হল ছক-বাঁধা কাজ—যযাতি আর জাহাঙ্গীরে তফাৎ করে না। আমার অম্বরীষ দেখে এসেছেন, আরও সব দেখুন গিয়ে—ভূভারতের কোন অম্বরীষ আমার সঙ্গে মিলবে না। মহাভারতের ছবি কেটে নিজে টেরিটিবাজার গিয়ে ছবির সঙ্গে মিল করে কার্লিং-এর অর্ডার দিয়েছি। পোষাকেও সেই ব্যাপার—ভেলভেটের উপর শলমা-চুমকি কোন্ কায়দায় বসাবে, খড়ি এঁকে দরজিকে বোঝাই। তারপরেও যা বাকি থাকে, আয়নার সামনে নিজ হাতে ঠিক করে নিই।

সিতাংশু বলে, এখানেও ঠিক ঠিক সেই জিনিষ। সকলের আগে পোশাক-আশাক তার পরে অভিনয়।

সাজসজ্জা করে জলধর বেরিয়ে এলো। নিখুঁত, পরিপাটি। যেমন যেমন দেখে গেছে—অবিকল তাই।

শত কণ্ঠে সিতাংশু তারিফ করে: সুন্দর! বললেন যে এই পোশাক আপনি কখনো পরেননি?

সত্যিই তাই।

তাহলে যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও ঢের ঢের গুণী আপনি। ট্রেনিং-এ একদিন দুদিনের বেশি লাগবে না। চটপট ধরে নেবেন।

গাড়ি ছুটল সোজা চৌরঙ্গীপাড়ায়। সকলের আগে জুতো। নিউ মার্কেটের পাশে এক নাম-করা দোকানে একজোড়া কেনা হল, অর্ডার দিল আর এক জোড়ার। নতুন জুতো পায়ে পরে সেই বাক্সে জলধর ছেঁড়া জুতো ভরছে।

সিতাংশু বলে, কি হবে? ফেলে দিন।

জলধর বলে, রাজা করতে এনেছেন—বিশ্বাস নেই মশায়দের, খেয়াল মিটে গেলে হয়তো ফকির করে পথে ছেড়ে দেবেন। রাজার সাজ দোকানে মেলে, ফকিরের সাজ কোথায় পাব তখন? থাকুক যদি আবার দরকারে পড়ে।

জুতো হল তো সার্ট। সব চেয়ে বনেদি পোশাকের দোকানে গিয়ে উঠল।

অর্ডার নিন—জরুরী অর্ডার, কাল ট্রায়াল দিয়ে যাবেন, পরশু ডেলিভারী। যা ইনি পরে আছেন—এই কাপড়, এই কাটছাঁট, অবিকল এই জিনিষ। এমন ঢিলেঢালা নয় অবিশ্যি। অন্যের জিনিষ পরে এসেছেন, নমুনা দেখানোর জন্য।

ঠিক আছে, পরের দিন আটটার ভিতর জলধর তৈরি হয়ে থাকবে, তার নিজ স্থানটা সিতাংশু ঘুরিয়ে আনবে একবার। যেখানে যথাসময়ে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করবে। এর বেশি একটা কথাও পাওয়া গেল না সিতাংশুর মুখে। রহস্যময় হাসি হাসে। বলে, চোখেই তো দেখবেন। সেই জন্যে নিয়ে যাওয়া। ভয় করছে নাকি জলধরবাবু?

ভয় আমাদের মতন লোকের? এই সুখেই তো বেঁচে রয়েছি মশায়। রাজবেশ অঙ্গে নিয়েছি, ফকিরের আদি-বেশও ফেলিনি, ব্যাগে ভরে রেখে দিয়েছি। সিংহাসনে না পোষালে নেমে এসে ফকির। পকেটে তিন আনার উপর একটা পয়সাও যদি থাকে, বুঝব মুনাফা করে বেরুলাম। আর লোকসানে সর্বস্বান্ত হলাম তো সে-ও তিন-আনার বেশি নয়।

গেট খুলে মোটর প্রবেশের পথ করে দিয়ে দরোয়ান তটস্থ হয়ে পাশে দাঁড়াল। সিতাংশু বলে, আপনার রাজবাড়ি—

জলধর বলে, বলে দিতে হবে কেন? গেট দারোয়ান লন নুড়ি-ঢালা পথ—আপনার সেদিনের বর্ণনায় ছিল, বর্ণনা আমি মনে গেঁথে নিয়েছি।

গেটের উপরে উঁচু হরফে ভাস্করের নাম দেখিয়ে প্রশ্ন করে: উনি হলেন—

বর্তমান রাজা। আপনার অনুকূলে রাজতন্ত্র ছেড়ে বানপ্রস্থে যাবেন যদি অবশ্য মনে ধরে আপনাকে।

কম্পাউণ্ডের ভিতর গাড়ি ঢুকে গেছে। সবুজ ঘাসের লন, এক কণিকা ধুলো নেই একটি ঘাসের গায়ে। ঝলমল করছে। ফুল ফুটে আছে লনের চারি পাশে—গোলাপ আর ডালিয়া। চৌকো ত্রিকোণ ও গোলাকার ছোট ছোট বেডের উপর রংবেরংয়ের মৌসুমী ফুল। খড় খড় আওয়াজ তুলে রাস্তার নুড়ি ছিটকে মোটর ব্যালকনির নিচে দাঁড়াল।

সিঁড়ি বেয়ে দুজনে সোজা উপরে। কয়েকটা ঘর-বারান্ডা পার হয়ে এক দরজায় সিতাংশু মৃদু আঘাত করল। ততোধিক মৃদু স্বরে বলে, এসেছি আমরা।

জলধরকে বলে, সানগ্লাস খুলে ফেলুন এবারে। আর দরকার নেই।

কপাট খুলে গেল ভিতর থেকে। পর্দা সরিয়ে ঢুকে পড়ে—অবাক কান্ড! জলধরের চোখে পলক পড়ে না, ভিতরে আর এক জলধর। দুই জলধর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একই নাক-মুখ, গায়ের রং ও উচ্চতা প্রায় এক, অবিকল এক পোশাক। ভাস্কর ও জলধর নিঃশব্দে এ ওর আপাদমস্তক দেখছে।

অবশেষে সিতাংশু কথা বলে ওঠে, কি হল?

দেখে দেখে ভাস্করের মুখে হাসি ফুটেছে। বলে, বুদ্ধিটা মন্দ করোনি। লেগে যেতে পারে।

আরও বুঝি ভাল করে মেলাবে। ভাস্কর জলধরের কাঁধে হাত রাখল। কাঁধে হাত দিয়ে আয়নার কাছে এসে পাশাপাশি দাঁড়ায়। সিতাংশুও দেখে পিছন থেকে। পুলকিত কণ্ঠে বলে, মিথ্যে বলিনি, দেখতে পাচ্ছ। বিধাতার খেয়াল—এক ছাঁচে দু-বার ছাপ তুলেছেন।

ভাস্কর ঘাড় নেড়ে বলে, আলগা চেহারা এক বটে, কিন্তু তফাতও আছে। আমার ভ্রূ আর ওঁর ভ্রূ লক্ষ্য করে দেখ। আমার ঠোঁট সোজা, ওঁর ঠোঁটের শেষ দিকটা একটু বেঁকে রয়েছে যেন।

নিজের কপালের উপরে একটা কাটা দাগ দেখিয়ে ভাস্কর বলে, এ জিনিষও নেই ওই কপালে।

সিতাংশু বলে, নেই এখন—কিন্তু হতে কতক্ষণ! জলধরকে লক্ষ্য করে বলে, হবে জলধরবাবু?

স্ফূর্তি লেগে গেছে জলধরের। অবহেলার ভঙ্গিতে বলে, হয়না কোন্‌টা আমাদের? অষ্ট-বর্ষীয়া গৌরীদান, জরাগ্রস্ত যযাতি, চতুর্মুখ ব্রহ্মা অবধি হতে পারি, এতো ছিটেফোঁটা মেরামতি ব্যাপার। চিৎপুরের বৌবাজারে গণি মিঞার দোকান থেকে একটা জিনিষ কেবল আনিয়ে দেবেন, বাস!

সিতাংশু বলে, মেক-আপের ব্যাপারে ঐশী শক্তি ধরেন জলধরবাবু। তোমার এক পুরানো ফটো আছে আমার ওখানে। তাই দেখে দেখে দুরস্ত হয়েছে। এর পর আমার ওখানে যাবে না। ছবির মডেল সিটিং দেয়, তোমাকেও একটা সিটিং দিতে হবে। পোশাক পরটা সময় দেখে একবারে শিখে নিয়েছেন। সময় দেখে ক'টা দিনে পুরোপুরি তোমাকেই শিখে নেবেন। পরীক্ষায় খুঁত পাবে না তখন।

ভাস্কর হাসিমুখে বলে, পরীক্ষক আমি নই—তুমিও নও। এখনই তো ওঁর দিকে চলেছি। পরীক্ষক মাধব-দা। তাঁর সার্টিফিকেট পেলেই নির্ভয়ে তবে কাজে নামা যায়।

সিতাংশুর বাড়ি গেল কয়েকটা দিন ভাস্কর। ভাল লাগে জলধরকে। আলাদা ধরনের মানুষ—এরা এক অজানা জগতের বাসিন্দা। আলাপ-পরিচয়টা নিঃসন্দেহ কাজের দায়ে, তবু কিন্তু সে নতুন আবিষ্কারের আনন্দ পাচ্ছে। স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারত না, এই শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে গলাগলি হওয়া সম্ভব ভাস্কর হালদারের পক্ষে। সেই অঘটন ঘটেছে। এমন কি যেন ভালবেসে ফেলেছে জলধরকে।

ভাস্কর বলে, ক্ষমতা বটে তোমার জলধর-ভাই। ভাস্কর হালদারের বেশ নিয়ে দাঁড়ালে, আয়নায় পাশাপাশি আমার নিজেরই ধাঁধা লেগে যায়: খাঁটি ভাস্করটা কে—আমি না তুমি? মনে মনে জীবনবৃত্তান্ত আওড়াই, মা-বাবা-দিদিমার কথা মনে আনি। তুমি চলে আসার পরে ফোটোগ্রাফের এলবাম বের করলাম—পিক-নিকের ছবি, ইস্কুলে প্রাইজ-পাওয়ার ছবি, প্লেনের ভিতরের ছবি, ডান্ডির মিল-এরিয়ার ছবি। এমনি নানান পরীক্ষা করে তবে নিঃসন্দেহ হলাম: আমিই বটে ভাস্কর হালদার, তুমি নও।

বাঘ কুমীর আর বড়লোক সম্পর্কে জল-ধরের নিদারুণ অসোয়াস্তি—এখন দেখছে, তিনটে ঠিক এক রকমের জিনিষ নয়। খাসা লাগে ভাস্করের মুখে এইসব মজার মজার কথা শুনতে। হো-হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

চমকে উঠে ভাস্কর বলে, ভুল হয়ে গেল কিন্তু এবার—মারাত্মক ভুল। এই হাসি জলধরের। সাজে পুরোপুরি ভাস্কর, এই-খানটা কিন্তু জলধরকে ছাড়তে পারো নি। ভাস্কর হালদার বড়লোক, বিপুল শিক্ষাদীক্ষা, এমন শব্দ করে হাসা অসম্ভব তার মতো মানুষের পক্ষে। সূক্ষ্ম হাসি তার—মেয়েদের ঠোঁটে-মাখানো লিপস্টিকের মতো।

জলধর দেমাক করে বলে, পারিনে বুঝি? দেখুন।

মুখভাব মুহূর্তে বদলাল। ক্ষমতা রাখে বটে মানুষটা! সমস্ত নজর করে দেখে, হুবহু নকল করতে পারে। হাসছে রুচিবান সমাজে যে হাসিটা সচরাচর দেখা যায়।

জলধর বলে, হয়নি আপনাদের মতন? বিচার করে বলুন।

ভাস্কর সায় দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে জলধর অভিনয়ের সংযত হাসি মুখোসের মতন ছুঁড়ে ফেলে হুল্লোড় করে হেসে ওঠে।

আরে দূর, গোমড়া হাসিতে প্রাণ ভরে কখনো! কষ্ট করে না হয় দরবারে চালালাম, ঘরের মধ্যেও ঐ হাসি হাসব তো বেঁচে থেকে সুখ কি! আপনাদের বড়লোকের বাঁধাবাঁধিটাও বড় বেশি।

ভাস্কর গম্ভীর স্বরে বলে, বড়লোকের বড় কষ্ট জলধর-ভাই। তবু দেখ, লোকে দরদ করে না—উল্টে হিংসা করে।

সংগদোষে বড়লোক ভাস্করের মন ঘুরে গেল নাকি সত্যি সত্যি? বলে তোমার মোটা হাসিটা শিখিয়ে দাও তো আমায়। হেসে বাঁচি। আর সেই হাসির মাপসই কথাবার্তাগুলো। তুমি পুরোপুরি আমার মতন হলে, আমিই বা কেন তোমার রূপ ধরতে পারব না?

হে"-হে", শক্ত জিনিষ। সগর্বে জলধর ঘাড় নাড়ে: ইচ্ছারূপ ধারণ করতেন স্বর্গলোকের দেব-দেবীরা। আর একালে আমরা করে থাকি—যাত্রা-থিয়েটারের প্লেয়ার যারা আছি।

ভাস্কর বলে, প্লেয়ার আকাশ থেকে পড়ে না—শিক্ষায় তৈরি হয়। ছেলেবয়স থেকে কত কি শিখলাম, ওটাই বা পারব না কেন? তুমি পাঠ দাও জলধর-ভাই। পারি কিনা পরখ তো হওয়ার দরকার।

জলধর রাজি হয়ে বলে, আচ্ছা, ছোট্ট এই ব্যাপার—হাসিটা আগে চেষ্টা করুন। একবারেই যে হবে তার মানে নেই—

লেগে গেল ভাস্কর। মুক্তির বিশাল সাগর আমাদের একেবারে হাতের নাগালে রয়েছে, হঠাৎ যেন আশ্চর্য আবিষ্কার হয়ে গেল। ভাস্কর হাসে আর যাত্রাওয়ালা জলধর তার কায়দা বাতলে দেয়—এ হেন কান্ড চোখে দেখেও কেউ প্রত্যয় পাবে না।

আসে না ঠিক জিনিষটা—আনাড়ি ছাত্রকে উৎসাহ দেবার ভঙ্গিতে জলধর বলে, ঘাবড়াবার কি আছে! আবার হাসুন দিকি—এই তো, বেশ খানিকটা হয়েছে। আবার, আবার।

এর মাঝে দু-লাইন কবিতা আবৃত্তি করে উঠল: একবার না পারিলে দেখ শতবার, পারিব না ওকথাটি বলিও না আর—

হাসছে ভাস্কর—এমন উদ্দাম হাসি হাসেনি সে কোনদিন। যাদের সঙ্গে মেলামেশা এ হাসি শুনলে তারা কানে আঙুল দেবে। যে ঘরে হাসছে, সেখানে প্রাণহীন দেয়ালগুলোও বোধ-করি চকিত হয়ে উঠেছে। পাঠ বুঝি পুরোদস্তুর আরম্ভ হয়ে গেল—সামান্য সাধারণ হয়ে যাবার পাঠ খোলামেলা জীবনে প্রথম অভিযাত্রী ভাস্কর—প্রবেশলাভ ঘটেনি এখনো, যাত্রামুখে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। হাসতে কি পারছে ছাই ভাল করে? ভাবনাচিন্তার পাষাণভার বুকের উপর চেপে ছিল, তবু ঐ হাসির তোড়ে পাহাড় ধ্বসে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুরফুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

জলধর মন্তব্য করে—যেন কোন বহুদর্শী আচার্যের কণ্ঠ। বলছে, বাইরের সাজসজ্জা নিয়ে দেরি হয় না। আমাদের মেকআপম্যান আধঘণ্টার মধ্যে অমন এক ডজন মানুষ সাজিয়ে দিতে পারে। রাজা করছে দৌবারিক করছে রাজকন্যা করছে নফর করছে—টুক টুক করে সেরে দিচ্ছে এক-একজনকে ধরে। আর মোশানমাষ্টারের হল ভিতরের কাজ—চলনবলন হাবভাব তৈরি করে দেওয়া। সে কাজে একজনকে নিয়েই লেগে গেল হয়তো তিন-চার মাস। তা-ও সব ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে না। অ্যাক্টরের নিজের ভিতরের এলেম চাই। চেহারায় পুরোপুরি জলধর আপনাকে এক্ষুণি সাজিয়ে দিচ্ছি, সে কিছু কঠিন নয়। কিন্তু ভিতরের জলধর বানানো আমার হাতে নেই—ওটা আপনার নিজের।

আরও ক'দিন কেটেছে। এক সন্ধ্যায় পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির নুড়ি-ফেলা ড্রাইভে যথানিয়ম ভাস্করের অফিস-ফেরত গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। চেনা হর্ন পেয়ে মাধব রান্নাঘরে গিয়ে বাবুর্চিকে খুব তাড়া দিচ্ছে। এর পরেই চুপচাপ কিছুক্ষণ। ভাস্করের নিয়ম এই। নিচের ড্রইং-রুমে কেউ কেউ অপেক্ষা করে, দু-পাঁচটা কথা-বার্তা হয় তাদের সঙ্গে। অফিসের পোশাক ছাড়ে, পাজামা পরে, স্লিপার পায়ে ঢোকায়। স্নান করে উপরে [illegible]। বিছানায় গড়াল হয়তো একটুখানি, পিয়ানোয় টুংটাং করল।

কিম্বা হয়তো সাপ্তাহিক-মাসিকের পাতা উল্টায়। ইতিমধ্যে চায়ের টেবিল সাজিয়ে মাধব ডাকতে আসে। ঘণ্টাও বাজায় কোন কোন দিন।

ভাস্করের বদলে জলধর এসে আজ উপরের শয্যায় গড়িয়ে পড়ল। সেদিন দেখে গেছে সমস্ত, ভাস্কর দেখিয়ে শুনিয়ে তালিম দিয়ে দিয়েছে। উপুড় হয়ে আছে একটা বিলাতি ম্যাগাজিন মুখের সামনে ধরে।

মাধব এসে ডাকল, এসো দাদাভাই।

নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে টেবিলে বাইরের লোক থাকলে খানসামার ডাক পড়ে। নয়তো মাধব নিজের হাতে চা দেয়। দাদাভাইকে খাইয়ে তার আনন্দ—এতটুকু বয়স থেকে খাইয়ে আসছে।

দিয়েছে খাবার, জলধর পরমানন্দে খাচ্ছে। তা সত্ত্বেও মাধবের বকাবকি প্রতিদিনের মতো: যত বয়স বাড়ছে খাওয়া তত কমছে দাদাভাইয়ের। কোন্ হতচ্ছাড়া নিখাউন্তির দেশে গেলে—সেখান থেকে আরও উপোসের অভ্যাস নিয়ে ফিরেছ।

চলছে এমনি, হঠাৎ প্রচণ্ড হাসি। ভাস্করের আবির্ভাব—একা নয়, সিতাংশু আছে।

ভাস্কর বলে, কাকে বসালি মাধব-দা আমার জায়গায়? কার এমন খাতির?

মাধব অবাক হয়ে তাকায়। একবার ভাস্করের দিকে, একবার জলধরের দিকে।

সিতাংশু আরও হকচাকিয়ে দেয়: ঘাবড়ে যেও না মাধব-দা, ঠিক মানুষকে খাওয়াচ্ছ তুমি। উনি আসল, এটি জাল। পথে পেয়ে এই মানুষটাকে ধরে নিয়ে এলাম তোমাদের দেখাব বলে।

জলধরের দিকে চেয়ে বলে, মজাটা দেখ ভাস্কর। আয়নার ধারে গিয়ে বরঞ্চ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দেখ, অবিকল তুমি কিনা। দুজন মানুষে হুব এমনধারা—আশ্চর্য!

ভাস্কর বলে, ক্ষিধে পেয়েছে, খেতে দিবিনে মাধব-দা? আমার খাবার সমস্ত বুঝি জাল মানুষটাকে দিয়ে দিয়েছিস?

খাবার থাকবে না কেন, খাবারের অভাব কি। ইতস্তত করে মাধব দুজনের জন্য দুই প্লেট নিয়ে আসে।

ভাস্করকে দেখিয়ে সিতাংশু হা-হা করে ওঠে: একে টেবিলে কেন মাধবদা? রাস্তার মানুষ খাওয়াবে তো ওদিকে কোনখানে বসতে দাও।

হতভম্ব হয়ে মাধব দাঁড়িয়ে থাকে। ভাস্কর হেসে উঠল আবার—সেই হাসি যার খানিকটা রপ্ত করে নিয়েছে জলধরের কাছ থেকে। বলে, নঃ, একেবারে বুড়ো হয়েছিস মাধব-দা? চশমা ধর্। এইটুকু বয়স থেকে হাতে ধরে মানুষ করলি—আমায় চিনতে পারিসনে?

সিতাংশুর প্লেট মাধব আগেই টেবিলে দিয়েছে, অন্যটা হাতে ধরা ছিল। আরও একবার-দুবার মাধব জলধর ও ভাস্করের দিকে তাকিয়ে দেখে ঠকাস করে সেটি টেবিলে দিয়ে দেয়।

সিতাংশু বলে, একি মাধব-দা, আমার পাশে রাস্তার লোক?

মাধব বলে, বুড়োমানুষকে খেলাচ্ছ তোমরা। বসে পড় দাদাভাই। রাত্তিরে চোখে কম দেখি, তাই ধাঁধা লেগেছিল। দিনমানে এসো দিকি চালাকি করতে—তখন বোঝা যাবে।

জলধর সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে আত্মপ্রকাশ [illegible]

ওঁচড় ছিল, খসে গেল। নইলে আমি হেন লোকটা এমনি সব ঘরে এমনধারা। চেয়ার-টেবিলে খাচ্ছি,—ঘরময় আলো, ফুলদানিতে ফুল —ওরে বাবা, ওরে বাবা! এয়ারবন্ধুরা দেখতে পেলে চোখ কচলাবে—সত্যি, না স্বপ্ন?

লজ্জিত মাধব আর দাঁড়ায় না, সরে পড়ল। বাবুর্চি এসে চায়ের সরঞ্জাম রেখে গেল।

ভাস্কর বলে, সব চেয়ে কড়া যে পরীক্ষা, তাতে পাশ হলে জলধর-ভাই। মাধব-দাও ধরতে পারেনি। শুধু পাশ করা নয়, ফুল-নম্বর পেয়ে গেছ।

নিভৃতে গভীর পরামর্শ তিনজনে। বুদ্ধিটা সিতাংশুর—দৈবক্রমে জলধরকে পাওয়া গেল, তখন থেকে মাথায় এসেছে। পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে ভাস্কর হয়ে থাকুক জলধর। এই পাঁচটা সাতটা দিন। শরীর খারাপ বলে সেই কদিন ভাস্কর অফিসে যাচ্ছে না। দোতলার খোলা বারাণ্ডায় হামেশাই দেখা যায় তাকে, বই পড়ে সেখানে বেতের চেয়ারে বসে। লনেও আসে কখনো-সখনো। যারা চর হয়ে আছে, উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখুক চতুর্দিক থেকে। নুলো-মহাদেব ঘুরে বেড়াক আশেপাশে। গাড়ি নিয়ে বেড়াতে যায় তো স্কুটারও চলুক দেহরক্ষী হয়ে। গৌরদাস নিঃসংশয় হয়ে থাকুক বাড়িতে নজরবন্দি ভাস্কর হালদার। পাখি কিন্তু উড়ে গেছে ইতিমধ্যে আসল ভাস্কর উড়তে উড়তে বম্বে। তেজা মল্লিকের শরণ নিয়েছে: বাঁচান, এই তো অবস্থা। আমার বাবার গায়ে আঁচড়টি না লাগে। যেমন যেমন বলবেন তাতেই রাজি।

কথার মাঝে একটু থেমে ভাস্কর বলে, পাহাড়খানা ঘাড়ে চাপিয়ে হয়তো জামাই করতে চাইবেন। তাই সই। বিক্রি হয়ে যাবো ভালো দামে —বিরাট অঙ্কের বরপণ, আমাদের ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তি, বাবার চিরজীবন ধরে গড়ে-তোলা মান-ইজ্জত। শম্পা—

মাথায় প্রবল ঝাঁকি দিয়ে সব দ্বিধা ভাস্কর যেন ঝেড়ে ফেলে দেয়: শম্পা বড়লোকের মেয়ে, আমি বড়লোক। এমন খেলার চল তো আছেই আমাদের মধ্যে। কত নাচাই, কত কাঁদাই। সকলে ধরে নেবে তারই একটা। কিন্তু তুমি জানো সিতাংশু, খেলা করতে চাইনি আমি। বাবার চেয়ে বড় কেউ নয়। বাবার লাঞ্ছনা না হয়! বাবার ইজ্জতে ঘা না পড়ে। বাবাকে ছুঁয়ে একটি কথা কেউ না বলতে পারে। মেয়ে বিয়ে করা তো সামান্য কথা, তেজা মল্লিক যদি বলে, তার তেরোতলা বাড়ির ছাত থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে আমি এক মিনিটও দ্বিধা করব না।

[এগার]

কিন্তু ভাস্করকে কিছু করতে হল না। নীরদবরণ নিজে থেকেই ব্যবস্থা করে অপমান-লাঞ্ছনার বাইরে চলে গেলেন। ঘটনাটা সেই সময় আপনারা কাগজে পড়েছিলেন। বলে দিলে আবার মনে পড়বে।

কালীপুজোর কাছাকাছি সময়। সুয়েজ-খাল নিয়ে ধুন্দুমার বেধে গেল। বৃটিশ আর ফ্রান্স নেমে পড়েছে, ইসরায়েলও আছে।

হায় রে হায়, কী সর্বনাশ!

ব্যাপারটা নিয়ে নীরদবরণ রীতিমত বিচলিত। শুধু কাগজ পড়ে হয় না, খবরের কাগজের অফিস পর্যন্ত গিয়ে হানা দেন। পৃথিবীর নানা দেশের কাগজে কি লিখছে, খবরাখবর নেন সেখানে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিশ্বরাজনীতিতে যাঁরা খ্যাত, ব্যাকুল হয়ে ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসা তাঁদের কাছে। তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধ সত্যি বেধে যায় নাকি? এ্যাটম-অস্ত্রের যুগ— তো তামাম জগৎ গুঁড়িয়ে ধুলো- দেবে। যতক্ষণ ঠাকুরঘরে থাকেন শ্রীগোপালের সামনে, বিড় বিড় করে কামনা করেন। বিগ্রহ-সেবায় হেলা তারামণিকে বলেন, আপনি মা ভার নিন। মন বড্ড বিচলিত, ঠাকুরের অপরাধ ঘটছে।

না, সামলে গেল। মানুষের শুভবুদ্ধি কিম্বা আসল কারণ বোধহয় দ্বিতীয় মার খেয়ে উঠে এখন অবধি যথোচিত গড়ে তুলতে পারেনি মানুষে। সামান্য সুখ হয় না। আরও কিছুকালের তাই লড়াই মোটের উপর জমল না। আলেকজান্দ্রিয়া এবং এখানে ওখানে কয়েক পশলা করেই ক্ষান্তি দিল।

শুনে নীরদ বুক চাপড়ান: হায় কী সর্বনাশ!

সর্বনাশটা কতদূর, কালীপুজোর দিন প্রকাশ পেল। হরিশ চাটুজ্জে ফোন এলো। সকাল থেকে নীরদবরণের নেই। কোনদিন কখনো এমন হয় না। ভাস্কর। সিতাংশু এবং আরও অনেক পুলিশে খবর চলে গেল। শহরের হাসপাতাল এবং নীরদের পক্ষে যেখানে যাওয়া সম্ভব, সর্বত্র খোঁজাখুঁজি হচ্ছে।

সন্ধ্যাবেলা ডাকের চিঠি এলো নামে, তখন পরিষ্কার হল সমস্ত। এই নীরদবরণ নিজ হাতে লিখে ভোরবেলা ডাকবাক্সে ফেলেছেন: চলে গেলাম ইহলোক ছেড়ে। আত্মহত্যা মহাপাপ সেই পথ নিতে হল। নিরুপায়। হাবুডুবু খাচ্ছিলাম—হিসাবে কারচুপি এ-ব্যবসার টাকা ও-ব্যবসায়ে সরিয়েছি। খরচ করেছি। নতুন কিছু নয়, আগেও —সুদিনে সামলে নিয়েছি, টের পায়নি কেউ। এবারে গ্রহবৈগুণ্য—যত উঠতে গেছি, বালির মধ্যে আটকে পড়েছি ততই। দায়ে, আর ভাস্কর আমার টাকার অনটনে সেই আতঙ্কে। গৌরদাস সমস্ত ধরে ফেলেছে, দীর্ঘকাল ধরে প্রমাণপ্রয়োগ জোগাড় শাসাচ্ছে আমায়। মুখের শাসানি, আর চিঠিতে শাসিয়েছে। আর দেরি করবে না তারা প্ল্যান এক্ষুণি যদি বাতিল না করি। তাসের ঘর উড়িয়ে দেবে।

ঠাকুরের আশীর্বাদের মতন এমনি সুয়েজখালের হাঙ্গামা এসে পড়ল। চড়চড় করে শেয়ারের দর উঠছে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের মুখটায় যেমন হয়েছিল। ফাটকাবাজারে সেই মওকায় নীরদ বিস্তর পয়সা পিটেছিলেন—তখন থেকেই বড়লোক। পরে অবশ্য ওদিকে যাননি—ফাটকাবাজার লোকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে না। এতকাল তৃতীয়-বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনায় সর্বস্ব পণ আবার বিস্তর শেয়ার ধরলেন। কিন্তু লড়াই জমল না, সর্বনাশ হল। শেয়ারের দর গিয়ে এই দুরবস্থার উপর নতুন করে কয়েক টাকার দায়। সেটা দিতে হলে ভিখারি হলেও ভাস্করের অব্যাহতি হবে

...কুকুরের মতো পাওনাদার পিছনে লাগবে। ...টকাবাজারের লেনদেন লেখাজোখায় থাকে ..., শুধুমাত্র মুখের কথা। বেঁচে থাকলে ...তেই হবে টাকা, এক উপায় মরে যাওয়া। ...রে গিয়ে কলা দেখানো যায়! বড় লোভ ছিল, ...থেকে ভাস্করের বিয়ে থাওয়া দেবেন। ...মৃত্যুর পথ নিতে হল।

...নেই—দেহ তাঁর কোন্‌খানে? সারা-... সকলে উৎকর্ণ হয়ে আছে। শেষরাত্রে ...এলো লেকের জলে ভেসে উঠেছেন। ...নিয়ে আসা হল। ফুলে ঢোল—বীভৎস ...কৃত মূর্তি। ভেবেচিন্তে প্রস্তুত হয়েই ...লে পড়েছেন—মরণ কোনক্রমেই ফসকে না ...য়। পায়ে ডবল মোজা, গায়ে একগাদা জামা। ...তিনটে কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে পরা। মোটা ...রীর, তায় সাঁতার জানেন না মোটেই। প্রাণের ...য়ে আঁকুপাঁকু করে তবু যদি দৈবাৎ ডাঙা পেয়ে ... কাপড়-চোপড়ে দেহভার তাই সমুদ্রে ...রেন বাড়িয়ে রেখেছেন।

ঘটনা চাউর না হয়, সেই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ...সম্ভব। এমন এক শিল্পপতি আত্মঘাতী ...খবর বাতাসের আগে ছুটেছে। শোকে ...কারখানাই বন্ধ দিয়েছে, কারখানার লোক ...এসে পড়ল। বাইরেরও এসেছে। মানুষে ...গিস করছে। মৃত্যুর কারণ ফাটকাবাজার, ...জেনে ফেলেছে সকলে।

...লোকের মধ্যে গৌরদাসকে দেখা যাচ্ছে ...সেইটে বড় দৃষ্টিকটু। একদিন বাড়িতে ...পরিবারের মানুষ হয়ে ছিল। ...নিয়ে কানাঘুষো করছিল বুঝি কেউ ...কেউ—মুখে মধুর চাকাচাকি বেঁঝে না ...হয়ে বলে, সাক্ষাৎ কালিয়কুর। মুখের ...চি তুলে রাখবেন মশায়েরা। কত নিয়েছে কত ...আমার সাহেবের, শেষ-দেখাটা দেখে ...ও তার মন চাইল না।

...শোকস্তব্ধ ভাস্কর। কানে শুনে সে মাথাকে ...করে : ছুটি নিয়ে গৌরদাস গাঁয়ের ...ড়িতে আছে। থাকলে কি আসত না একবার? ... বস্তে জাল খাটিয়েছে, নিজের কীর্তি স্বচক্ষে ...খবার জন্য অন্তত আসত।

কয়েকটা দিন কেটেছে। আত্মঘাতী হলে ...উত্তরপুরুষের খুব সুবিধা। অশৌচ নেই, ...প্রায়শ্চিত্ত এক বছর পরে। শ্মশানবন্ধু হয়ে ...শ্মশানে যারা শব বয়ে নিয়েছে, তাদেরও। একটা ...ছর দিব্যি চুপচাপ থাকো ঘুমিয়ে। যদি কিছু ...রণীয় থাকে, বছর কাটিয়ে তার পরে।

ভাস্কর সজলচোখে সিতাংশুকে বলছে, ...বা ভালবাসতেন কিনা বড়—এই পথ নিয়ে ...নি আমায় সকল দায় থেকে বাঁচিয়ে গেলেন। ...ণের দায় থেকে মুক্ত, পিতৃদায় থেকেও। তাঁর ...মে অঞ্জলি ভরে অন্নপিন্ড দেবো, সে কষ্ট-...কুও হতে দিলেন না। কিন্তু আমি শুনব ... শ্রাদ্ধ আমি করবই তারিখ ধরে। আত্মঘাতী ...হলে কোন তারিখে আমায় পিন্ডদানে বসতে .... দেখ দিকি হিসাব করে? মঙ্গলবার—...সছে হপ্তায়? বেশ। পুরুতে মন্তর না-ই ...চালেন -বাবার আত্মার যাতে তৃপ্তি হয়, আমি ...ই করব ঐদিনে।

কী যেন ভাবছে বড় নিবিষ্ট হয়ে। তারই ...য় আচমকা প্রশ্ন : শম্পা তো এলো না ...বার। অসুখ-বিসুখ নাকি?

সিতাংশু বলে, শম্পা অজ্ঞানে। মামার নাকি অসুখ, এখন-তখন অবস্থা—মিথ্যে টেলিগ্রাম করে তাকে নিয়ে তুলেছেন। তারপর আজকেই চিঠি পেলাম, তেসরা অঘ্রান ঐখানে শম্পার বিয়ে দিয়ে দিচ্ছেন।

আবার বলে, কাগজে জেঠাবাবুর খবর পড়েছেন। এর পরে মামা আর দেরি করবেন! এ বাড়ির সঙ্গে শম্পার ঘনিষ্ঠতা, অনেকেই জানে। সেজন্য দূরে সরিয়ে নিয়ে বিয়ে দিচ্ছেন।

মুহূর্তকাল ভাস্কর স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর হেসে উঠল : এ দায়টাও কেটে গেল। তবে আর কি—নিশ্চিন্তে বেরিয়ে পড়ি এবার।

শাস্ত্রমতে অশৌচ না-ই হোক, এই ক'দিন ভাস্কর অফিসে যাবে না। জুটমিলের মাতব্বর গোছের কিছু লোক ডাকল—মঙ্গলবার ঐ শ্রাদ্ধের তারিখে পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি তাঁরা আসবেন। তাঁদের কথা যথেষ্ট শোনা আছে, ভাস্করের জবাব সেই দিন। নিজ মুখে সামনা-সামনি বলবে—মারফতি কথায় অনেক সময় মানে ঘুরে যায়।

আর সিতাংশুকে চুপি চুপি বলে, মোটা আমাদের ঠিকঠাক হয়ে আছে। আমি কিছু আগেই বেরিয়ে পড়ব। জলধর ভাস্কর হালদার হয়ে থাকবে। কোয়ার্টার ছেড়ে তুমিও পার্ক স্ট্রীটে থাকবে এই কয়েকটা দিন। জলধরকে সামলাবে। বক্তৃতার সময়টা পাশে থেকে ব্যবস্থা করবে।

পলানটা আদ্যোপান্ত আবার দুজনে আলোচনা করে। খুব উৎসাহ সিতাংশুর। বলে, তাই বাও তুমি। কাজ না হয়ে পারে না। তেজ্জা মল্লিক আগে হলে যদিই বা দ্বিধা করত, এ অবস্থায় গিয়ে পড়লে 'না' বলতে পারবে না। আরও সুবিধে, গৌরদাসটা নেই। এই গোলমালে পাহারাও নিশ্চয় কিছু ঢিলে হয়েছে।

ভাস্কর বলে, সকলের বড় সুবিধেটা বলছ না যে! শম্পার দায়ও নেমে গেছে। কোন রকম পরোয়া করিনে, একেবারে মুক্তপুরুষ আমি এখন। মন খুলে কাজ করতে পারব।

হাসছে ভাস্কর কেমন করে। সিতাংশু উঠে পড়ল। এ হাসি চোখ মেলে দেখা যায় না।

জলধরকে সিতাংশু বলে, মীটিং হচ্ছে মিলের লোক নিয়ে। আপনি বক্তৃতা করবেন।

আঁতকে ওঠে জলধর : কী সর্বনাশ! শিলুক-দিন কী আরম্ভ করলেন বলুন তো! পেটে কত বিদ্যে আছে যে বক্তৃতা করব? জানি তো শুধু অভিনয়—

সিতাংশু বলে, বক্তৃতা বুঝি অভিনয়ের বাইরে? যাত্রার আসরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন না আপনি?

সে তো মুখস্থ করা থাকে। হেসে কেঁদে মোশান দিয়ে বলে যাই।

সিতাংশু বলে, মিটিংয়ের বক্তৃতাও ঠিক তাই। অন্যে তৈরি করে দেবে, সেই জিনিষ আউড়ে যাবেন। একবর্ণ ভাবতে হবে না আপনাকে, একটি লাইন নিজে লিখতে হবে না।

জলধর কৌতুক পেয়ে যায় : বটে বটে! তবে তো যাত্রার পালারই মতো।

সিতাংশু বলে, মীটিং-এর আগে বক্তার বাড়ি গিয়ে দেখবেন, ঢক ঢক করে জল গিলছে আর বক্তৃতা মুখস্থ করছে। বড় হওয়ার অনেক জ্বালা। কিন্তু আমি বলি কি—মুখস্থর ঝামেলায় আপনার গিয়ে কাজ নেই। গড়বড় হয়ে যেতে পারে। দেখে দেখে পড়বেন। লিখিত বক্তৃতা যাত্রার আসরে চলে না, মীটিংয়ে চলে। তবে বাহাদুরিটা কম। গোড়ার দিকে ভূমিকা স্বরূপ পাঁচ-দশটা কথা—সেইটুকু মুখস্থ থাকলেই চলবে।

খুব রাজি এখন জলধর। শুধু সামাল করে দেয় : বক্তৃতার মধ্যে ইংরাজি কথাটথা থাকবে না মশায়। বুঝতেই পারেন, ওটা কিছু কম আসে আমার।

কিন্তু বলছে ভাস্কর হালদার যে! বিলেত-ঘোরা মানুষের মুখে দুটো-চারটে ইংরেজি থাকবেই। আহা, ঘাবড়ান কেন? রাজা অম্বরীষ হয়ে সেদিন তো পুরো এক সংস্কৃত শ্লোক কপচালেন—সংস্কৃতে বুঝি মহামহোপাধ্যায় আপনি! কিছু না—বলেন তো আপনি নন, মোশানমাস্টার বলিয়ে নেয়। বক্তৃতার মধ্যেও তেমনি ইংরেজি-ফ্রেঞ্চ-জার্মান-আরবি-ফারসি যাচ্ছেতাই থাকুক না—বলিয়ে নেবার দায় আমার। নাকে সর্ষের তেল দিয়ে আপনি ঘুমোনগে যান।

পার্ক স্ট্রীটের বাড়ির লনের উপর জমায়েত। বিষম বিপাক—ইতিমধ্যে পা হড়কে ভাস্কর জখম হয়েছে। বলাবলি হচ্ছে—মহাগুরু নিপাত, তার উপরে ঐ ভাবে গেলেন। বড্ড সামাল সামাল এই একটা বছর।

অতএব সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে আসা ভাস্করের পক্ষে সম্ভব নয়। যা বলবার দোতলায় বারান্ডা থেকে বলবে। লনে বসে দাঁড়িয়ে সকলে প্রতীক্ষা করছে। সিতাংশুর কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে রেলিং ঝুঁকে দাঁড়াল ভাস্কর—অর্থাৎ জলধর। ধরবার উপায় নেই যে নকল-ভাস্কর। পাশে দাঁড়িয়ে, এমন কি, সিতাংশুরও ধাঁধা লেগে যাচ্ছে।

কী বলছে ঈশ্বর জানেন—বক্তা জলধর কিছুই জানে না। তবে বলাটা হচ্ছে ভালই, ঘন ঘন হাততালি পড়ছে। বিকৃত মুখে মাঝে মাঝে বক্তৃতা বন্ধ করে—অভিনয়ের প্যাঁচ—যন্ত্রণা হচ্ছে যেন আহত পাখানায়। কথা বন্ধ করে বাঁ দিকে একটু কাত হয়ে পায়ের উপর এক একবার হাত বুলিয়ে নেয়।

নিচে থেকে বলছে, বসে বসে বলুন সার। দাঁড়ানোর কী দরকার?

বিনম্র হাসি হাসে ভাস্কর হালদার, অর্থাৎ জলধর : সে কী কথা। আপনাদের মধ্যে যেতে পারলাম না, আপনারাও কত জনে দাঁড়িয়ে রইলেন, বসি আমি কোন্ লজ্জায়!

অফিসের রুক্ষবচন সাহেব-মানুষটির মুখে এমন হাসি দেখে তাজ্জব লাগে। নানা টিপ্পনী শ্রোতাদের মাঝে। কেউ বলে, পাপের শেষ পরিণাম দেখে ঘাবড়ে গেছে। কেউ বলে, মানুষটা আসলে ভালই—নারকেলের মতন, উপরে শক্ত খোলা ভিতরে দুধাল শাঁস। কেউ বা বলে, গুঁতোর চোটে। আঙুল না বাঁকালে ঘি ওঠে কখনো? আমরা বেঁকে দাঁড়িয়েছি, উনি এবারে সোজা হয়েছেন।

কিন্তু ঘি সত্যি সত্যি উঠবে, বক্তৃতার মানে তাই কি দাঁড়ায়? ঘোরতর মতভেদ। কেউ বলে, হাঁ, সুনিশ্চিত। একউ বলে, না,

উল্টো। মনোযোগ দিয়ে শুনেছে সকলে, হাত-তালি দিয়ে সমর্থন জানিয়েছে। কিন্তু আসলেই গোলমাল—কী বলে গেল তার মানে সাব্যস্ত হচ্ছে না। অর্থাৎ বক্তৃতা রীতিমত ভাল হয়েছে। ভাল জিনিষের মজাই হল, মানে করতে গিয়ে দুজনে কখনো একমত হয় না।

মানে যা-ই হোক—মোটের উপর এটা দাঁড়াল, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা ভাস্কর পার্ক স্ট্রীটের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেছে। ঠিক এই সময়টা কলকাতা থেকে বহুদূরে সিঁধহাটা গ্রামে পিস্তলের গুলিতে গৌরদাস যদি খুন হয়ে থাকে, আততায়ী আর যে-ই হোক ভাস্কর হালদার কখনো নয়।

প্রহর খানেক রাত্রি। ঘন অন্ধকার, ঝিঁঝিঁ ডাকছে। জোনাকি উড়ছে এদিক সেদিক। পকেটে হাত ঢুকিয়ে ভাস্কর পিস্তল মুঠোয় চেপে নিল। টিপি টিপি এসে জানলার কাছে দাঁড়ায়।

লাইসেন্স-করা রিভলভার আছে, তাতে কাজ করা যাবে না। তদন্তে বের করে ফেলতে পারে পুলিশ। সামান্য চেষ্টাতেই পিস্তল জোগাড় হয়ে গেল। স্বদেশি আমলে একটি পিস্তল-রিভলভারের সংগ্রহে কত ছেলের মোটা মেয়াদে জেল হয়েছে, প্রাণও গেছে কত জনার। যার জন্যে রাধারমণ আর নীরদে মিলে স্টীল কোম্পানির পত্তন করে ফেললেন। এখন সে জিনিষ কত সহজে জোটানো যায়—সামান্য তিন-চার শ টাকার মধ্যে। গোপন কারখানা চলে—বেশি করে মুঙ্গের অঞ্চলে। পুরুষানুক্রমে বন্দুক-পিস্তল গড়ে ঐ অঞ্চলের কারিগরের সুদক্ষ হাত। ধুধুলোকেরা সুলুকসন্ধান রাখে, কারবার চালায়। গোড়ায় মুঙ্গেরি পিস্তল একটা জুটিয়েছিল, তারপর ভাস্কর খাঁটি বিলাতি জিনিষ পেয়ে গেল। বত্রিশ পয়েন্টের অটোমেটিক পিস্তল—আয়তনে ছোট্ট, ইঞ্চি ছয়েকের মতো। ধরাশায়ী হবার মুহূর্ত আগেও গৌরদাস বুঝবে না অব্যর্থ মারণাস্ত্র ভাস্করের মুঠোর ভিতরে।

বন্দে যাচ্ছি, সিতাংশুকে ভাঁওতা দিয়েছে। বাবা নেই, কার জন্যে আর তেজা মল্লিকের কাছে ধর্ণা দিতে যাওয়া, তাকে আমড়াগাছি করা? আত্মঘাতী মানুষটা কোন অলক্ষ্যে ছটফট করছেন, তাঁর আত্মার যদি কিছু শান্তি দেওয়া যায়। সেই কর্তব্যে ভাস্কর এসেছে। সন্ধ্যারাত্রেও একবার এসে গেছে এখানে এই জানলার ধারে। কেরোসিনকাঠের টেবিলের সামনের দেয়ালে দেয়ালগিরি। গৌরদাস ছিল তখন—ঘাড় নিচু করে কিছু লিখছিল এই দিকটা পিছন করে—কোন হিসাবপত্র মনে হয়। কোনখানে দাঁড়িয়ে তাক করবে, জায়গাও নিরিখ করে দেখল। চারিদিকে লোকজন দেখে ফিরে গেল। রাত করে এখন আবার এসেছে।

ভিতরে উঁকিঝুঁকি দেয়। গৌরদাস নেই। দেয়ালগিরি জ্বলছে—চিমনিতে কালি পড়ে আলো বড় বেরুচ্ছে না। আলো আছে, এবং ঘরের দরজা খোলা—কাছেপিঠে আছে সে কোথাও। এক্ষুণি এসে পড়বে।

হঠাৎ মানুষের গলা : কে ওখানে?

ভাস্কর হকচাকিয়ে গেছে। আচমকা টর্চের আলো মুখে পড়ল। ছুটে এসে ধরে ফেলল তাকে। জন চারেক তারা। ধরেছে অন্য কেউ নয়—গৌরদাস। চেপে ধরেছে ডান-হাতখানা—আর ডান পকেটে পিস্তল। হাতে হাত ধরে আলিঙ্গনে জড়িয়েছে, জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে চলল।

মেটেঘরের দাওয়ার কাছে গিয়ে ভিতরে তাকিয়ে নিচু গলায় বলে, ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এলাম মীরা। শব্দ-সাড়া পাচ্ছিনে, দিদি কি ঘুমিয়ে গেলেন? আর এই দেখ্, মস্ত মানুষ এসে পড়েছে। বড়ঘরে আলো জেলে তক্তাপোষে চাদর টাদর পেতে দে শিগগির।

গৌরদাসের দিদি—অর্থাৎ অনুপমা। ভাস্করের ছোট বয়সের অনু-মা। সেই এক রাত্রে কত বছর আগে অনু-মা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে এসেছিল, আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছিল শিশু ভাস্কর, হরিশ চাটুজ্জে স্ট্রীটের খোয়া-ওঠা রাস্তায় আর্তনাদ তুলে ঘোড়ার-গাড়ি অনু-মাকে নিয়ে চলে গেল।

ক্রমশ এখানকার অবস্থা সব শোনা গেল। অনুপমার বাড়াবাড়ি অসুখে গৌরদাস ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। অসুখটা সঠিক সাব্যস্ত হয়নি, নানারকম সন্দেহ। পেটের অসহ্য যন্ত্রণায় সময় সময় কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করে। আজকেই একটু আগে তেমনি হয়েছিল। অজাঙ্গা পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার সহজলভ্য নয়—ছুটোছুটি করে ক্রোশখানেক দূরের গঞ্জ থেকে ভূতপূর্ব-কম্পাউন্ডার ডাক্তারবাবুটিকে ধরে এনেছে। কষ্টে ও ক্লান্তিতেই বোধকরি অনুপমা ঝিমিয়ে পড়েছে এখন।

গৌর মীরাকে ডেকে বলে, ঘুমোচ্ছেন বুঝি দিদি? আচ্ছা, ঘুমান। ডেকে তুলে তবে কাজ নেই। তুই আগে এর হাত-পা ধোয়ার ব্যবস্থা কর্। সেই কলকাতা থেকে এসেছে, কষ্ট হয়েছে।

এমন চুপিচুপি বলল—কী আশ্চর্য, অনুপমার কানে গিয়েছে। সজাগ হয়ে বলে ওঠে, কে এলো রে গৌর? কলকাতা থেকে কে আমায় দেখতে এসেছে?

কত বছরের ব্যবধান—ভাস্কর তখন একফোঁটা শিশু। তবু কঠিন রোগশয্যার মধ্যে ক্ষীণ কেরোসিনের আলোয় জীর্ণশীর্ণ অনুপমার চিনে ফেলতে মুহূর্তমাত্র দেরি হল না। বলে, দোদো? দোদো তুই ভুলিসনি আমায়? সর্বনাশের খবর কাগজে বেরিয়েছে বাবা, ওরা সব পড়ছিল। আমার তো তক্ষুনি তোর কাছে ছুটে যাবার কথা। কারো কথা শুনতাম না, গিয়ে তোর এই অবস্থায় চোখের দেখাটা দেখে আসতাম। কিন্তু পোড়া রোগে শুইয়ে রেখেছে—শুয়ে শুয়ে ছটফট করি, আর ভাবি। দেখবার বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল, ভগবান তাই হাজির করে দিলেন। নইলে তুই এই ধাপধাড়া গাঁয়ে এসে আমার শিয়রে বসবি, এটা কেউ ভাবতে পারে?

প্রসন্ন মুখ—কথার মধ্যে এক একবার বিকৃতি আসছে মুখে, চুপ করে থেকে সামলে নেয়। পরক্ষণে আবার কথা বলে। ডাক্তারের চোখ এড়ায় না। বললেন, কি রকম হচ্ছে বলুন দিকি? যন্ত্রণা কোন্ খানটা?

অনুপমা হেসে উড়িয়ে দেয় : কতকাল পরে ছেলে পাশে বসেছে, এখন কি আর যন্ত্রণা থাকে ডাক্তারবাবু? রোগপীড়ে কিচ্ছু নেই—আমি সেরে গেছি, কাল-পরশুর মধ্যে উঠে বেড়াব, দেখতে পাবেন।

মরফিয়া ইনজেকসনের জন্য ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। অষুধও আছে। যন্ত্রণা বাড়লে অষুধ খাবার নির্দেশ দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

| বার |

কোথায় যন্ত্রণা? না, নেই।

অনুপমা হেসে হেসে গল্প করছে। রাত্রি অনেক—অনেক। রোগীর মলিন শয্যার উপর ভাস্কর সেই থেকে বসে। মীরা কতবার এসে এসে পড়ছে, নড়াতে পারল না। বাপের শোচনীয় মৃত্যু—হেন অবস্থায় মা থাকলে, সেই মা বোধকরি শৈশবের 'দোদো' নামে ডেকে গল্প-গাছায় এমনি করে ভোলান ছেলেকে।

অনুপমা বলে, মনে পড়ে দোদো, সেই যখন ছোট্টটি ছিলে সন্ধ্যার পরে আমার কিছু করবার জো ছিল না—ভ্যানর-ভ্যানর করতে হত তোমার সঙ্গে।

ভ্যানর-ভ্যানর কী বলো অনু-মা! সে যে রূপকথা—

পকেটের পিস্তলের উপর হাত চাপা দিয়ে ভাস্কর বলে যায়, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী পাতাল-বাসিনী রাজকন্যা রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্র কোটাল-পুত্র সদাগরপুত্রের গল্প—

সমস্ত মনে আছে দেখি তোমার—

ছিল না তো ভাস্করের—আশ্চর্য স্বপ্নের মতন এখনই সব ভেসে আসছে। জগতে কোন কিছুই বুঝি নিঃশেষ হয়ে যাবার নয়—লুকিয়ে থাকে কোনখানে, সুবিধা মতন বেরিয়ে পড়ে।

ভাস্কর বলে, অনু-মা, আমার মনে আছে, তুমিই কিন্তু সব ভুলে গিয়েছ।

আমি?

হ্যাঁ। বড় আমায় 'তুমি' বলতে বলো যে অনু-মা।

এখন যে বড় হয়ে গেছ বাবা। তার উপর বড়মানুষ—

ভাস্কর আর বলতে দেয় না। অভিমানের সুরে বলে, দেখছি তাই অনু-মা। বড়মানুষ হবার মতন অভিশাপ নেই, দুনিয়ায় কেউ দুচক্ষে দেখতে পারে না—বড়মানুষও যে মানুষ, সে কথা সকলের ভুল হয়ে যায়।

একটু থেমে মৃদু কণ্ঠে আবার বলে, বড়মানুষ আর নই অনু-মা। সত্যি সত্যি বলছি। কত দিন পরে তোমায় পেলাম—বড়মানুষ-বড়মানুষ করে গালমন্দ কোরো না।

আরও রাত হয়েছে। মীরা এবারে মারমুখী হয়ে পড়ে : রাত যে পুইয়ে গেল। আর নয়, খেতে আসুন এবারে। মামাকে বসিয়ে দিয়েছি, হাত গুটিয়ে বসে আছেন তিনি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় দুটো পিঁড়ি পাশা-পাশি। কী দুর্দৈব, গৌরদাসের পাশাপাশি খেতে বসতে হচ্ছে। পরনের স্যুট খুলে হোল্ড-অলে পুরে জংশন-স্টেশনে লেফ্ট-লাগেজে রেখে এসেছে। সাদামাঠা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে গাঁয়ে ঢুকেছে—লোকের বিশেষ নজর না পড়ে তার উপর। পাঞ্জাবির ডান পকেটে পিস্তল—সেদিকটা ঝুলে পড়ল নাকি? মুশকিল এখন জিনিষটা নিয়ে।

মীরা ভাত বেড়ে আনল। ভাস্করের পিঁড়ির সামনে একটা জলচৌকি—ভাতের থালা

...র উপর রাখে। গৌরদাসের থালা মাটিতে। ভাস্কর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তার জন্যে এই বিশেষ ব্যবস্থা। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলে, গৌর-কাকা যেন তো নিচু হয়ে খাবে, আমায় এই উট হয়ে খাওয়া কেন?

আপনার যে টেবিলে খাওয়ার অভ্যাস।

বিলেতের রেওয়াজ—আমি কি করব? সেখানে যদি মাটিতে খেতে যাই, সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকবে। খাওয়া যায় তার মধ্যে—বলুন। আমারও সাহস ছিল না সকলের মধ্যে একটা উল্টো কিছু করবার।

মুখ তুলে কৈফিয়তের ভাবে বলতে লাগল, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি—অকাজ যদি করেই থাকি, সেটা প্রবাসে গিয়ে। প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে বলুন—গোবর খেয়ে? নিয়ে আসুন একতাল।

গৌরদাস বলে উঠল, অকাজ কে বলছে। ওতে অসুবিধে হবে ভেবেছিল। জলচৌকি সরিয়ে নে মীরা, ভাস্কর রাগ করছে।

ইতিমধ্যে আরও কিছু নজরে পড়ল। পাশে আলাদা একটা রেকাবিতে ছুরি ও ছোট্ট হাতা। স্থান-কাল ভুলে ভাস্কর ক্ষেপে যায়ঃ বাঃ বাঃ. বিলাতি ব্যবস্থা আরও রয়েছে। কিন্তু ছুরি তো পেন্সিল কাটতে লাগে, হাতায় ডাল ঘোঁটে—খাবার তুলে কেউ খায় না।

সকৌতুকে মীরা বলে, পাড়াগাঁয়ে হুট করে এখন মেলে কোথায়? কন্টেসুন্টে চালিয়ে নিন, মিনমাসে কাল গঞ্জ থেকে আনবে। কাঁটা-ছুরি না হোক, চামচেটা মিলে যাবে।

মীরার কথার আগেই ভাস্কর হাতা-ছুরি দূর করে ছুঁড়ে দিয়েছে।

উঠান থেকে টুক করে বাঁশের চেলা কুড়িয়ে নিয়ে মীরা তলোয়ারের মতন ধরল:

ওকি, ওকি—

পিটুনি দেবো, বুঝতেই পারছেন।

ভয়ের ভঙ্গি করে ভাস্কর বলে, কী সর্বনাশ!

মীরা হেসে বলে, গেঁয়ো মেয়ে আমাদের মুখ-হাত দুই-ই চলে। মুখের ঝগড়া, হাতের পিটুনি।

মিথ্যা বলে নি। খেতে বসতে না বসতে দুজনের দুই থালা ঘিরে একপাল বিড়াল।

মারে মীরা চেলাকাঠের ঘা—ঘা খেয়ে বিড়াল পালিয়ে যায়। তবু সদাসতর্ক থাকতে হবে। দুধ গরম করে আনতে রান্নাঘরে গিয়েছে, সেই সময় বিড়ালের দল আবার এসে পড়ল। থাবা বাড়িয়ে থালা থেকে তুলে নিতে যায়—এতদূর সাহস। দূর থেকে দেখে মীরা তেড়ে আসে আবার চেলাকাঠ নিয়ে।

ভাস্কর বলে, লাঠি হাতে কি জন্যে এসে দাঁড়ালেন, ভেবে পাচ্ছিলাম না। উদ্দেশ্য এখন বুঝেছি।

হাসিমুখে মীরা বলে, কি বুঝেছেন বলুন। বিড়ালে খেতে এলে লাঠিপেটা করে তাড়াবেন।

উদ্দেশ্য আরও আছে। বলতে বলতে মীরা প্রকাণ্ড বাটি ভর্তি দুধ থালার পাশে রাখল।

ভাস্কর সকাতরে বলে, দুধ খাইনে আমি। বিশ্রী লাগে।

সামান্য একটু। আমসত্ত্ব দেওয়া আছে, নতুন-পাটালি এনে দিচ্ছি। এক চুমুকে শেষ হয়ে যাবে।

গৌরদাসের খাওয়া শেষ। ভাস্করও তার সাথে উঠে পড়তে যায়।

মীরা বলে, লাঠি হাতে কেন দাঁড়িয়েছি পুরোপুরি জানেন না। খেতে এলে বিড়াল মারি, আর না খেলে মারি—

বাক্যটা ভাস্কর পূর্ণ হতে দেয় না। পিঁড়িতে আবার বসে পড়ে চকচক করে বাটি শেষ করে ফেলল।

মীরা উল্লাসভরে বলে, এই তো দিব্যি খেয়ে ফেললেন।

ভাস্কর গোমড়া মুখে বলে, কি করি বলুন। দুধ বিশ্রী, পিটুনি যে আরও বিশ্রী।

কিন্তু এখনো শেষ নয়। চক্ষের পলকে মীরা রান্নাঘরে ঢুকে গাড়ুতে গরম জল পুরে আনল। বলে, আঁচাবেন আসুন।

ভাস্করের হাতে গরম জল ঢেলে দিচ্ছে গাড়ুর নলের মুখে। ভাস্কর বলে, আপনি সরে যান তো। আমি ঢেলে নেবো। খেতে বসুন গে আপনি।

আপনি পারবেন কেন?

ভাস্কর চটে গিয়ে বলে, না, আমি মানুষ নই। আপনারাই কেবল মানুষ। আপনারা সমস্ত পারেন—গাড়ুটা কাত করে জল ঢালবারও ক্ষমতা নেই আমার।

করালেন কবে যে শিখবেন। কল খুলে দেন, কলের মুখে জল পড়ে। এ-ও তাই। গাড়ুর নলের মুখে কলের মতন জল পড়ছে।

শুতে যাবার আগে ভাস্কর আবার একটু অনুপমার ঘরে গেছে।

অনুপমা বলে, খাওয়ার কষ্ট হল, বুঝতে পারছি। অভ্যেস নেই তো এমন।

ঠিক বলেছ, অনু-মা। ঝগড়া করে লাঠি ধরে সামনে বসে একজনে খাওয়াচ্ছে, এ অভ্যাস কোনদিন নেই আমার। এত সুখে কি খাওয়া যায়? না অনু-মা, ভুল বললাম। খেয়েছি একদিন তোমার কাছে—ছোটবেলায় তুমি এমনি করে খাওয়াতে, স্বপ্নের মতন মনে পড়ে। আজকে মীরা খাওয়াল।

কে জানত কলহ ও সংঘর্ষের পৃথিবীতে এমনি সব জায়গাও আছে যেখানে সামান্য কথা, ছোটখাটো খুনসুটি, আর নির্ভেজাল আনন্দ। শত্রুর বাড়ি আততায়ী হয়ে এসে একঘুমে রাত কাবার—কতকাল ভাস্কর এমন গভীর ঘুম ঘুমায় নি।

জলধরের বক্তৃতা দস্তুরমতো জমেছিল সেদিন। মীটিং শেষ, হাততালিতে কানে তালা ধরিয়ে দিয়ে মানুষজন বেরিয়ে যাচ্ছে। সিতাংশুর কাঁধে ভর দিয়ে জলধর উঠে পড়ল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভিতরে চলেছে। ব্যালকনিটা পার হয়ে দৃষ্টির আড়ালে গিয়েই চকিতে তাল-গাছের মতন খাড়া হয়ে দাঁড়াল। হলের ভিতর এদিক সেদিক বার কয়েক ছুটোছুটি করে নেয়।

সিতাংশু ধমক দিয়ে ওঠে: আঃ, পাগলামি রাখুন। দুমদুম আওয়াজ হচ্ছে—নিচে চাকর-বাকর, তারা সব কি ভাবছে বলুন দিকি?

সঙ্গে সঙ্গে জলধর নিশ্চল। বেকুব হয়ে বলে, বসে বসে পা লেগে গেছে। ছাড়িয়ে নিচ্ছিলাম। খঞ্জ কুব্জ অন্ধের অভিনয় আসরেও করি, কিন্তু এতক্ষণ ধরে নয়। উঃ মশায়, এত ভিরকুটিও জানে বড়লোকে! টাকা-কড়ি এলাক-পোশাক দেখে হিংসেয় জ্বলি, কিন্তু সব কষ্ট আপনাদের। জৌলুষ আছে, সুখ নেই।

অন্তরঙ্গ কণ্ঠে আবার বলে, মানে বুঝিনি, তা হলেও আন্দাজ হল বিস্তর ভাল ভাল কথা বলছিলাম। মানুষগুলো এবার থেকে সোনা-দানা পরবে, হীরেমাণিক কামড়ে কামড়ে খাবে। তাই না?

সিতাংশু বলে, শুনতে তাই বটে। কিন্তু সব কথার দুরকম মানে। ভিতরের মানেটা হল: ওরে হতভাগারা, পরবি গাছের বাকল, আর খাবি ঘোড়ার ডিম।

উঃ মশায়, এত মিথ্যেও বলিয়ে নিলেন! জলধর ফিক ফিক করে হাসে: আসরে পাঠ বলতে গিয়ে এই জিনিষ—ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা। স্বর্গধামে এসেও সেই ধান ভেনে যাচ্ছি। অভিনয়টা উতরেছে ভাল—কি বলেন? কী হাততালিটা দিল!

অভিনয় ভাল হয়েছে মানি, হাত-তালি তা বলে এমনি এমনি পড়ে নি। তদ্বির ছিল—ধরতা দেবার লোক ওদের ভিতর ঢোকানো ছিল, গোড়ার হাততালি তারাই দেয়। মানুষ একসঙ্গে বসলে তখন আর মানুষ থাকে না, মিলেমিশে জনতা। যেদিকে চালাবে, সেইদিকে চলবে। হাততালি না দিয়ে আমাদের লোক যদি 'শেম' 'শেম' করত, সবসুদ্ধ তখন সেই 'শেম' 'শেম' করে উঠত।

আছে জলধর দস্তুরমতো ভাল। ভাবনা-চিন্তা অভাব-অভিযোগ কিছু নেই। যা-কিছু প্রয়োজন, মুখে বলতেই এসে যাচ্ছে। বলার আগেও আসে। মন তবু ছটফট করে। ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়, জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়েছে যেন। মনের উপর জলধর চোখ রাঙায়: কুত্তার পেটে ঘি অসহ্য বুঝি? ঝেড়ে ফেলে দেয় মন থেকে বাইরের লোকজন জগৎসংসার।

সিতাংশু মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে: রাজা হয়ে লাগছে কেমন জলধরবাবু?

জীবনভোর এই তো চেয়েছি। খারাপ কেন লাগবে বলুন। ভাল—

জোর দিয়ে আবার বলে, খুব ভাল। দামি দামি জিনিষ খাচ্ছি পরছি (বিনা অষুধে বিনা পথ্যে স্ত্রী মারা গেল তিনটে অপোগণ্ড ছেলে-মেয়ে ফেলে), ছেলেমেয়ের কাছে রমারম টাকা যাচ্ছে। আর মানুষে কি চায়। তবে—

বলতে গিয়ে থেমে যায়। সিতাংশু উৎসাহ দিয়ে বলে, বলুন না—বলে ফেলুন। অসুবিধা হলে নিঃসঙ্কোচে বলবেন। সেই তো পয়লা দিনেই কথা হয়ে আছে।

একলা লাগে বড়। আসরে আসরে পালা-গাওয়া আড্ডাধারী মানুষ কিনা আমরা—

রাজাদের এই তো মুশকিল। সমান দরের মানুষ নইলে মেশা যায় না—বাছগোছ করে মিশতে হয়। কথাবার্তাও বলতে হয় হিসাব করে—নিখুঁত নিক্তির ওজনে।

প্রণিধান করে জলধর, মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়ে: তা বটে, রাজা কি না! বড্ড কষ্ট! দুনিয়ার সব সুদ্ধ রাজা হয়ে গেলে দিব্যি হত। অভাব-অনটন নেই, আর তখন বাছাবাছিও নেই। দল বেঁধে দেদার আড্ডা জমাও।

সিতাংশু বলে, রাজার খাতির-সম্মান টাকাকড়ি ভোগ করবেন, সেই সঙ্গে রাজার কল-

টুকুও নিতে হবে বইকি। নীর বাদ দিয়ে শুধুই ক্ষীর খাবেন, সে হয় না।

কী জানি, কোন্‌টা নীর আর কাকে বলছেন ক্ষীর!

একটুখানি চুপ করে থেকে জলধর অধীর কণ্ঠে বলে ওঠে, আসল রাজা হালদারসাহেব চার-পাঁচ দিনের কথা বলে বেরুলেন—তার দুনো হয়ে গেছে, আজও তাঁর পাত্তা নেই—

ভালই তো, চুটিয়ে আপনি রাজত্ব করে যান। ফিরে এলেই কি ছাড় পাচ্ছেন?

চমক খেয়ে জলধর বলে, সে কি মশায়, তখন আমায় কোন্‌ কাজে লাগবে?

ডুপ্লিকেট রাজা। আপনাদের যাত্রাদলে ডুপ্লিকেট থাকে—ধরুন আপনার অসুখ করল, ডুপ্লিকেট সেদিন অম্বরীষ সাজবে। এ-ও তাই, ভাস্কর হালদারের ডুপ্লিকেট হলেন আপনি।

উঃ মশায়, মতলব ভাল নয় আপনাদের। এই আঁটো-মাপের কুর্তা পরে আর হাসি বন্ধ করে আর মাপজোখের কথাবার্তা বলে গায়ের বাতাস মনের বাতাস কিছুই বেরুতে পারছে না। ফুলে গোল হয়ে যাবো যে ফুটবলের মতন, আপনারা বড়লোকেরা যেমন হয়ে যান। ফকিরের পোশাক বুক-বুক করে রেখে দিয়েছি—হালদারসাহেব ফেরা মাত্তোর গায়ে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ব। আপোষে না যেতে দেন তো প্যালাব।

সিতাংশু ভয় দেখিয়ে দেয়ঃ পালালেই হল! নুলো-মহাদেব পিছন ধরে আছে—ঘ্যাচ করে ছোরা বসিয়ে দেবে।

বলেন কি মশায়! অতি যাচ্ছেতাই ব্যাপার তো রাজা হওয়া।

সিদ্ধিহাট গাঁয়ে ভাস্করের দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আরও কত বারো দিন লাগে ঠিক কি! গ্রাম আটক করে ফেলেছে, সাধ্য কি চলে আসে। কলকাতায় নজরবন্দী ছিল—এখানে তার ঢের ঢের বেশি। রীতিমত অত্যাচার। মীরা জুতো-জামা সেরে ফেলেঃ যান না চলে খালি-পায়ে। বাসে ট্রেনে কিন্তু এই অবস্থায় যেতে হবে। মা একটু ভাল হয়ে উঠুন, তখন কেউ আর থাকার কথা বলতে যাবে না। সত্যিই তো কষ্ট হচ্ছে বড়মানুষের।

গৌরদাস বলে, আমরা কিছু জানিনে বাবা। যাবে তো তোমার অনু-মা'র কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে যাও। দিদির জন্যে আমিও তো সর্বকর্ম ফেলে আটক হয়ে পড়ে আছি।

অনু-মা'র সামনে গিয়ে রোগিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে যাওয়ার কথা বলা চলে না। অসহ্য যন্ত্রণা, কাটা-কবুতরের মতো ছটফট করছে, কোন অষুধে যন্ত্রণার উপশম হয় না। ভাস্কর হয়তো তখন বাড়ি নেই, ছোলা-মটরের ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরে কড়াইশুঁটি খাচ্ছে। খোঁজে খোঁজে মীরা গিয়ে পড়েঃ শিগগির আসুন, মা কেমন করছে। হন্তদন্ত হয়ে ছোটে ভাস্কর। বাইরে থেকেই কাতরানি শুনছে—আহত বোবা জন্তুর আওয়াজের মতন। ঘরে ঢুকে ডাক দেয়ঃ অনু-মা—! কোথায় যন্ত্রণা, কোথায় কি! চোখ তাকিয়ে অনুপমা হেসে পড়ে।

অষুধে [illegible] পারে না, ভাস্করের আসার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রবলে যেন যন্ত্রণা সেরে যায়।

দিনের পর দিন ভাস্কর কিন্তু বিষম বাড়িয়ে তুলছে। জুতো-জামা সেরে মীরা ভয় দেখিয়েছিল—একদিন লক্ষ্য হল, জুতো সত্যি-সত্যি পরিত্যক্ত—সর্বক্ষণের জন্য। খালি পায়ে এবং গেঞ্জি মাত্র গায়ে পথেঘাটে সর্বত্র ভাস্করের চলাচল।

মীরার চক্ষু কপালে উঠে যায়ঃ সর্বনাশ একটা না ঘটিয়ে ছাড়বেন না? সু পরতে ভাল না লাগে, মামার চটি পরে তো বেড়াতে পারেন।

গাঁয়ের মধ্যে কেউ চটি পরে না, খালি পায়ে বেড়াচ্ছে সব।

তাদের সঙ্গে আপনার তুলনা? কত বড়-মানুষ আপনি!

হঠাৎ ভাস্কর আগুন হয়ে ওঠেঃ দেখ, বড্ড লেগেছ তুমি আমার সঙ্গে। ('আপনি' গিয়ে 'তুমি' হয়ে গেছে কবে। যা গতিক 'তুই'তে না দাঁড়ায়।) যখন তখন যার তার কাছে বড়-মানুষ রটিয়ে বেড়াও। ভাবো, আমি টের পাইনে। মানা করে দিচ্ছি, কক্ষনো কোনদিন আর বলবে না।

মীরা সমান তেজে উত্তর দেয়ঃ এক-শ বার বলব। হাতিকে হাতি বলব না, ঘোড়াকে ঘোড়া বলব না, বড়মানুষকে বড়মানুষ বলব না—এত ভয় কিসের শুনি? বড়মানুষ খালি পায়ে হাঁটে না, আপনিও হাঁটবেন না—ব্যস, চুকেবুকে গেল।

রাগ দেখে ভাস্কর ঘাবড়ে গেছে। মিন মিন করে এবারে বলে, হুঁ, খালি পায়ে হাঁটবে কেন? আচ্ছা, মেনে নিলাম বড়মানুষ। বড়মানুষের পা বুঝি পা নয়?

সে পা হাঁটবার জন্য নয়।

কি করব তবে পা নিয়ে? রুপোয় মুড়ে রেখে দেবো?

রুপোয় না হোক, মোজায় জুতোয়। বলুন দিকি আপনি—সত্যি কথা বলবেন, গাড়ি ছাড়া গিয়েছেন কখনো কোথাও? কোন্‌ বড়মানুষটা পায়ে হেঁটে বেড়ায়?

ভাস্কর বিরক্ত কণ্ঠে বলে, অজ্‌ভঙ্গ পাড়া-গাঁয়ে আমার অনু-মা'র কাছে এসেছি—সেখানেও বড়মানুষ বড়মানুষ রব তুলে মাথা খারাপ করে দিল। বড়টুকু বাতিল করে শুধু মানুষ বলে কেউ মানবে না!

ভাস্করের মেজাজ হারানোর কারণ আছে। তাকে নিয়ে সত্যিই সাড়া পড়েছে। মীরা এর মূলে, কোন সন্দেহ নেই। আজকেই—এই খানিকক্ষণ আগে হাতে হাতে তার একটা প্রমাণ—

মাহিন্দার বলরাম কার কাছে যেন পরিচয় দিচ্ছেঃ রাজা-মানুষ খোড়োঘরের মধ্যে পড়ে আছেন। দ্বাপরে সেই যে পান্ডবের অজ্ঞাতবাস হয়েছিল—কলিতে আবার তাই।

নিচু গলায় বলছিল, তবু ভাস্করের কানে গেল। রাগে গরগর করতে করতে তখনকার মতো সরে গেল। মাহিন্দারটার অবধি কান ভাঙিয়েছে। কোন কাজে বলরামকে ডাকলে কাজটুকু করেই সুড়ুত করে সে সরে পড়ে। কথার মধ্যে 'আজ্ঞে' 'হুজুর' ঢোকায়, তা-ও লক্ষ্য হয়েছে। কারণটা প্রকট হল এবার।

নিরিবিলি পেয়ে এক সময় ভাস্কর বলরামের হাত চেপে ধরেছেঃ কার কাছে শুনেছ আমি রাজা-মানুষ? ছি- ছি!

বলরাম মুখ তুলে তাকায় ভাস্করের দি[illegible] জবাব দেয় না।

ভাস্কর বলে, না বললে কি হবে, আ[illegible] জানি। মীরা রটিয়ে বেড়াচ্ছে—পয়লা নম্ব[illegible] শত্রু সে আমার। তার কথা একবর্ণ বিশ্ব[illegible] কোরো না।

হাত চেপে ধরে ছিল বলরামের। হ[illegible] ছাড়িয়ে নিয়ে বলরাম ভাস্করের আঙ্গুলগু[illegible] টিপে টিপে দেখেঃ বড়মানুষ নইলে এ[illegible] নধর হাত হল কেমন করে? চামড়ার [illegible] একরত্তি হাড়-মাংস নেই—শুধুই তুলো।

একটা রোগ ভাই। রোগ নিয়ে ঠাট্টাতাম[illegible] করতে নেই। কানাকে কানা বলে না, খোঁড়া[illegible] খোঁড়া বলে না। কার কখন কি ঘটে, [illegible] জানে না। মাংস কিছু নরম বলে আমায় খুঁ[illegible] তোমারও এ জিনিষ হতে পারে।

বলরাম ঘাবড়ে যায়। তবু অবিশ্বা[illegible] সুরে বলে, শুধু খাওয়া ছাড়া ব[illegible] মানুষের হাতের কাজকর্ম নেই। হাত [illegible] জন্যে নরম—

তা সত্যি। আবার রোগের কারণেও [illegible] তেমনি হতে পারে। আমার যা হয়ে[illegible] সাহেবদের রং সাদা—ধবলরোগ যার হয়ে[illegible] সে-ও অমনি ধবধবে হয়ে যায়। রুগিকে [illegible] বলে কি সাহেব বলবে?

কতটা বিশ্বাস করল বলরাম কে জা[illegible] ভাস্কর তখনই ঠিক করে রেখেছে, ধমক দে[illegible] মীরাকে আজ আচ্ছারকম।

[তেরো]

হপ্তা তিনেক কাটল। কী আশ্চ[illegible] ভাস্করের চেহারাতেও যেন গেঁয়ো মানু[illegible] ছোপ ধরে যাচ্ছে। জলধর ভাস্কর হালদার হব[illegible] আগে যেমনটা ছিল, প্রায় তাই। একহাঁটু ধু[illegible] মেখে গাঁয়ের এখানে সেখানে সে চক্কোর দি[illegible] বেড়ায়। কতটুকু সাধ্য মীরার, কী ক[illegible] ঠেকাবে! বকাবকি করে, ভাস্কর কানেও [illegible] না। হাসে হি-হি করে—গাঁয়ের মানুষদের মত[illegible]

মীরা রাগ করে বলে, চলে যান আপ[illegible] গাঁ ছেড়ে। একদিনও আর থাকতে পাবেন ন[illegible]

ভাস্কর ভ্রূভঙ্গি করে বলে, যাব তোম[illegible] কথায়? আমার অনু-মার কাছে এসেছি, তু[illegible] তাড়াবার কে? বাড়ি গৌর-কাকার—তি[illegible] বলে দিন, তক্ষুনি চলে যাব।

গৌরদাস বলবে চলে যেতে! উল্টে [illegible] আরও তটস্থ হয়ে আছে। যখন তখন বলে[illegible] তোমার কষ্ট হচ্ছে জানি। দিদির কথা ভেবে[illegible] স্বার্থপর হয়ে আটকাচ্ছি। কনফারেন্স শে[illegible] করেই ডাক্তার পাল সিদ্ধিহাটে আসবেন, তার[illegible] পরে কি করতে হয় না হয়—সেই ক'টা দি[illegible] অন্তত থাকতেই হবে তোমায়।

ছন্নছাড়া মানুষ গৌরদাস বাপ রাখা[illegible] রমণেরই মতো। সংসারের বন্ধন শুধুমাত্র দিদি[illegible] আর দিদির মেয়ে মীরা। দিদি নয়, দেবী[illegible] দিদির অসুখের বাড়াবাড়ি শুনে ছুটে এসে[illegible] পড়েছে। ভাল রকম চিকিৎসার বন্দোবস্ত [illegible] করে নড়বে না। একটা বড় সুযোগ হয়েছে[illegible] জেলার সদরে মেডিক্যাল কনফারেন্স হচ্ছে[illegible] বৃহৎ আয়োজনে। ডাক্তার পাল সভাপতি হ[illegible] আসছেন। এইসব রোগের বিশেষজ্ঞ তিনি[illegible] দেশবিদেশের মেডিক্যাল জর্নালে তাঁর গবেষ[illegible] বেরোয়। সম্প্রতি একটা অষুধ বের করেছে[illegible]

নিয়ে খুব হৈ-হৈ চলছে। কিশোর বয়সে ডাক্তার পাল রাধারমণের সাগরেদি করতেন। রোগের লক্ষণ শুনে যথোচিত ব্যবস্থা দিয়ে গৌরদাসকে তিনি বলে দিয়েছেন, আপাতত নাহে'চড়া করতে যেও না এই অবস্থায়। চ্ছিই তো ওদিকে—তোমাদের বাড়ি যাব। যা রতে হয়. দেখেশুনে আমি বলে দেব।

ডাক্তার পাল না আসা অবধি এই কয়েকটা ন গৌরদাস ভাস্করকে আটকে রাখতে চায়। লে. কী ছটফট করতেন দিদি—অবস্থা দেখে যাণেরও চোখ ফেটে জল বেরুত। তুমি এসে আরোগ্য হয়ে গেল। যন্ত্রণা যে নেই, সেকথা নিনে। তোমার মুখ শুকোবে বলে দিদি শ হতে দেন না।

গৌরদাসের জোর পাচ্ছে, তবে আর ভাস্কর রকে গ্রাহ্য করতে যাবে কেন? আরও জোর নুপমার কাছে। গিয়ে ভাস্কর সোজাসুজি লিশ করে : দেখ অনু-মা, মীরা আমায় দূর করে তাড়াচ্ছে।

অনুপমার বিশীর্ণ মুখে হাসি ফুটে ওঠে। নহে মেয়ের দিকে চেয়ে বলে, আমি জানি ম হিংসুটে ওটা। এদ্দিন এক-সন্তান হয়ে —ভাগিদার এসেছে কিনা, হিংসায় জ্বলছে। মীরাকে বলে, তুই পেটের সন্তান, আর দো আমার বুকের সন্তান। তোর আগে ওকে রেছিলাম, দেদোর দাবি ঢের ঢের বেশি। কে রে ওকে চলে যাবার কথা বলার?

ভাস্কর বিজয়ীর আনন্দে মীরার দিকে টিপ্পনী কাটে : আস্পর্ধা বোঝ অনু-মা। তো ঐ যাক না চলে—

অনুপমার চোখে সহসা জল এসে যায়। যতই ওরা ভরসা দিক আমি নিজে টের । এত দুর্বল—হাতখানা উঁচু করতে কষ্ট পেট টিপলে বলের মতন কী একটা ঠেকে, -দিন পেট যেন ভরাট হয়ে আসছে। মন তোকে আমি বড্ড চেয়েছিলাম, দোদোকে একটিবার দেখে যাব। টানে তুই চলে এলি। এসেছিস যখন, থেকে যা পাঁচটা দিন। দেরি বেশি হবে না। সময়টা আমার মুখে একচোক জল তুই করে দিস।

ভাস্কর বলে, হুঁ, মরবেন—আবদার! আর কি মরতে! আমার মতন অনাথ য় দুনিয়ার উপর কে আছে, বল তো মা! কত কাল পরে মা পেয়েছি, তুমি ভয় দেখাতে লেগেছে। ডক্টর পাল দেখে তারপরে তোমায় কলকাতায় নিয়ে তুলব। পড়'ল লণ্ডনে কি ভিয়েনায় নিয়ে যাব। লায় আমার এক মা ভুগে ভুগে গেছেন, কে আমি কিছুতে যেতে দেবো না।

মীরা ইতিমধ্যে সরে গেছে সেখান থেকে। য়ে গেল সেই লজ্জায়? নাকি তারও জল এসে গিয়েছিল?

অবস্থা এর পরে ভাস্কর একেবারে অসহ্য তুলল। এক দঙ্গল জুটিয়ে নিয়েছে— উপর গামছা ফেলে তাদের সঙ্গে দীঘির স্নান করতে যায়। জল দাপাদাপি করে। যা স্নান করতে এসে ঘাটে নামতে না, ওরাই দলবলে পুরো ঘাট দখল ছে।

আর বাড়িতে মীরা ভাত বেড়ে হা-পিত্যেশ বসে। উদ্বেগ হচ্ছে, শহুরে মানুষ সাঁতার জানে না, অঘটন ঘটিয়ে না বসে। সে উদ্বেগ কারো কাছে খুলে বলা যায় না—নিজেই চলল অবশেষে ঘাটে।

এসে হাসবে কি কাঁদবে মীরা ভেবে পায় না। সাঁতার জানে না বলেই ভাস্করের যত বিক্রম ঘাটের উপরে। জল ঘোলা-ঘোলা হয়ে গেছে, স্নানার্থীরা রাগ করছে। মীরা ডাক দেয় : উঠে আসুন। ভাত ঠাণ্ডা-কড়কড়ে হয়ে গেল। বসেই আছি, বসেই আছি। আসুন শিগগির।

ভাস্কর চোখ তুলে দেখল একবার। কে যেন কাকে বলছে। ভুস করে দিল ডুব জলতলে। ডুব দিয়ে দম ধরে কে কতক্ষণ থাকতে পারে, সেই পাল্লা। আর সুবিধা, জলের নিচে মীরার তাড়না শুনতে হচ্ছে না।

যেই না আবার উঠেছে, মীরা গর্জন করে ওঠে : যাবেন না তো ভাতব্যঞ্জন আমি গরুর জাবনায় ঢেলে দিইগে।

বলেই ফরফর করে ফিরে চলল। ভয় পেয়ে ভাস্কর উঠে পড়েছে। চষা ক্ষেত, বড় বড় মাটির ঢেলা—তার মধ্য দিয়ে পথ সংক্ষেপ করে মীরা চলেছে। ভাস্কর ডাকছে পিছন থেকে : উঠে পড়েছি মীরা। দাঁড়াও একটু, চেয়ে দেখ—

বাইরে দেমাক করলে কি হবে, পায়ের তলায় ঢেলা পড়ে প্রাণ যাই-যাই করে ওঠে। আর মীরা ছুটে চলেছে কেমন দেখ। মাটিতে পা ছোঁয় না বুঝি তার, পরীর মতন আঁচল ভাসিয়ে যাচ্ছে। মাটি ছুঁলে এমন আলগোছে যেতে পারত না।

আলে ঠোক্কর খেয়ে ভাস্কর আচমকা তাছাড় খেল। মুখ ফিরিয়ে মীরা হায়-হায় করে ওঠে : এত করে বলি, জুতোটুতো পরে ভাল পথ নিয়ে চলাচল করুন। আমরা পারি বলে আপনি পারবেন? হল তো এবার?

ভাস্কর ততক্ষণে সামলে নিয়ে উঠে পড়েছে। সে-ও ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে : হবে আবার কি! পড়েছি নাকি? ঢেলা সরে গেল পায়ের নিচে থেকে—তোমাদের যায় না?

না, পড়বেন কেন! আমাদের ঘরে বিস্তর ভালমন্দ খেয়ে রক্ত বেশি হয়েছে কিনা, কব্জি ফেটে এমনি এমনি রক্ত বেরুচ্ছে। দেখতে পাবেন হাতের দশা কী হয়!

রক্ত বন্ধ করার অন্য কিছু না পেয়ে কব্জির উপর হাত চেপে ধরে মীরা তাকে একরকম টেনেই নিয়ে চলল। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলে, কী যে করি আপনাকে নিয়ে! গলবস্ত্র হয়ে বলছি, চলে যান আপনি। কোন্ দিন আরো কি সর্বনাশ ঘটাবেন—ভয়ে আমার বুক কাঁপে।

যাবো তাই মীরা, কিন্তু একা-একা নয়।

দুপুরের নির্জন মাঠ, হাতে হাত ধরা দুজনের, গাছপালায় ঢাকা ঘরবাড়ি দেখা যায় অদূরে। কী চোখে তাকায় ভাস্কর, মীরার সর্বদেহ থর থর করে কাঁপে।

বলে, একলাই চিরকাল থেকে এসেছি। কিন্তু যে লোভ ধরিয়ে দিলে, এখন আর সে সাধ্য নেই। একটি মানুষ চাই আমার, দুঃখকষ্টের দিনে হাতে হাত রেখে যে এগিয়ে নিয়ে চলবে। অনু-মা ভাল হয়ে গেলে তাঁর কাছে আমি ভিক্ষা চাইব।

মীরা হাত ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে, একটি কথাও না বলে দ্রুত পায়ে চলে গেল। হতভম্ব হয়ে ভাস্কর খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। কী পাগলামিতে যে পেয়ে বসল—মীরা বিষম রেগে গেছে। এর পরে মুখ দেখাব কেমন করে তার কাছে।

বাড়ি গিয়ে দেখে, না, রাগ করে বসে নেই— কাজেই ছিল মীরা। ইতিমধ্যে গাঁদাফুলের পাতা তুলে শিলে বেটে রেখেছে। খাওয়ার পিঁড়িতে বসতে না বসতে কব্জির ক্ষতের উপর খানিকটা প্রলেপ দিয়ে ন্যাকড়ায় কষে ব্যাণ্ডেজ করে দিল।

কোথায় রাগ! খিল খিল সে হেসে ওঠে : দুষ্টু মানুষটার হাত বেঁধে ফেললাম। কেমন জব্দ! হাত তুলে কেমন করে খান এবারে দেখি।

ভাস্করও সেই সুরে বলে, কুছ পরোয়া নেই। কারো গরজ থাকে তো ভাত মেখে মুখে তুলে দিক। নইলে আমার কি—রইলাম পড়ে উপোস করে।

পুরানো স্মৃতিতে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বলে, অনু-মাকে কম জ্বালিয়েছি! এটা দাও, ওটা দাও—নয় তো খাবো না, জেদ ধরে বসলাম। কোথা থেকে সেই সব আবদারের জিনিষ জুটিয়ে এনে কতরকম খোশামোদ করে কোলে বসিয়ে অনু-মা ভাত খাওয়াতেন। ছেলেবয়সে কত কি করা গেছে, ভাবলে এখন হাসি পায়।

মীরা বলে, বয়স হোক যা-ই হোক সেই ছেলেমানুষ আপনি এখনো।

সে যদি হয়ে থাকি, এই ক'দিনে এখানে এসে। অর্ধেক ইয়োরোপ চষে বেড়িয়েছি জানো— একলা, একটি প্রাণী। সে দেশের সেরা সেরা ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে ব্যাপারবাণিজ্যের কথাবার্তা চালিয়েছি।

একটি ভ্রুভঙ্গিতে মীরা ভাস্করের সকল কৃতিত্ব উড়িয়ে দেয়।

বিরক্ত হয়ে ভাস্কর বলে, মিথ্যে বলছি নাকি?

তা ছাড়া কি!

পাশপোর্টে অ্যারাইভ্যাল-ডিপারচারের নোট —তা-ও বুঝি ভুয়ো?

মীরা বলে, নিয়ে আসুন পাশপোর্ট। দেখব।

গাঁয়ের মধ্যে এখানে পাশপোর্ট কি জন্যে আনতে যাব? কলকাতায় চলো—

উঁচু দরের হাসি হেসে মীরা বলে, সে আমি জানতাম।

ভাস্কর ক্ষেপে যায়। বিদেশের যত বাহাদুরি এই দরিদ্র গ্রাম্যকন্যার কাছে প্রমাণ না করলে মানইজ্জত বুঝি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। বলে, খবরের কাগজ তো পড়ো—বিলেত থেকে ফিরলে ছবি বেরিয়েছিল আমার।

আকাশ থেকে পড়ে মীরা : তা হলে বুঝি আমার নজরে পড়ত না?

কী আশ্চর্য! তুমি যদি কানা হও, দুনিয়াটা মিথ্যে হয়ে যাবে? তোমার মামার কাছে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে নিও, সত্যি না মিথ্যে—

কী জানি, কোন্‌টা সত্যি আর কোন্‌টা মিথ্যে। তবে এটা মিথ্যে নয় যে—

কপট গাম্ভীর্য ছেড়ে মীরা অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে উঠল। মুখে আঁচল চেপেও হাসি রোধ করতে পারে না। বলে, এটা মিথ্যে নয় যে [illegible] ছেলে-মানুষ। কাগড়ায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে ভাতব্যঞ্জন

মেখেছি, হাঁ করেছেন—গালেও পড়েছে দু-এক বার। কিছুটি টের পাননি। কিন্তু আর নয়, লোকে দেখলে কি বলবে? চামচে এনে রেখেছি— মাথা ভাত চামচেয় তুলে তুলে খান। সন্ধ্যেবেলা কি কাল সকালে ব্যাণ্ডেজ খুলে দেবো।

এর পরে চরম হল সেই হাটবারের দিনটা। ডাক্তার পাল কনফারেন্স শেষ করে পরের দিন আসছেন। গৌরহরি সদরে চলে গেছে তাঁকে সঙ্গে করে আনবার জন্য। এদিককার সমস্ত দায় মীরার উপর। এত বড় মানুষটা আসছেন, খাবেন কাল দুপুরে। ভাল মাছ-তরকারির জন্য হাটে যাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু বিকালবেলা বলরামের জ্বর এসে গেল, কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাঁপছে।

বেলা ডুবু-ডুবু। লোকজন হাটে চলেছে বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে। উচ্চকণ্ঠে নিজেদের কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। কোনদিকে ছিল ভাস্কর, রান্নাঘরের দাওয়ার নিচে এসে দাঁড়ায়। চেঁচাচ্ছে ঃ কোথায় গেলে মীরা? হাটের সময় হয়ে গেল, হুঁশ নেই তোমার। ধামা-ঝুড়ি সব কোথা?

মীরা বেরিয়ে এসে বলে, ওবাড়ির গণেশকে বলে এসেছি, সে আমাদের হাট করে দেবে। ক্ষেতে নিড়ান দিচ্ছিল, এইবারে এসে পড়বে।

ভাস্কর বলে, বাড়ির মানুষ থাকতে পরের খোশামুদি করতে যাওয়া কেন? আমি পারিনে? নাকি আমায় সন্দেহ করো, পয়সা চুরি করব তোমার?

কারো পরোয়া করে নাকি ভাস্কর! ঝুড়ি-খালুই, কেরোসিনের-বোতল নিজেই খুঁজেপেতে নিয়ে এলো। গামছা পাট করে কাঁধে ফেলে তার উপর ঝুড়ি বসিয়েছে। ডান-হাতে মাছের খালুই ও হ্যারিকেন-লণ্ঠন, বাঁ-হাতে কেরোসিনের বোতল।

কি কি আনতে হবে বলে দাও—

বলবে কি মীরা, হেসেই খুন। একটানে কাঁধের ঝুড়ি কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঃ অবিকল বলরাম আমাদের। যে পাত্তরটা যেমনভাবে নিয়ে সে হাটে বেরোয়। একটা জিনিষ হয়নি কেবল, ঐখানে হেরে গিয়েছেন।

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ভাস্কর তাকাল।

কথার শেষে দিদিঠাকরুণ ডাকলেন কই? কি কি আনতে হবে দিদিঠাকরুণ—হুবহু এই বলবেন। হিসেব করে পয়সাকড়ি গুণে নিয়ে গাঁটে গুঁজবেন।

ভাস্কর বলে, মতলব বুঝেছি তোমার। আজেবাজে কথায় সময় কাটানো, এর মধ্যে গণেশটা এসে পড়লে তাকে সব বুঝিয়ে দেবে। লাজ নেই আমার শুনে নিয়ে। যেটা চোখে ধরবে, কিনে ফেলব।

ঝুড়ি কুড়িয়ে কাঁধের উপর নিয়ে দ্রুতপায়ে ভাস্কর বেরিয়ে পড়ল। একটু পরে গণেশ এলো, সে-ও পিঠ পিঠ ছুটেছে।

প্রহরখানেক রাত হয়েছে। আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না। কাঁধের ঝুড়িতে আনাজপত্র ডান-হাতের খালুইতে মাছ, বাঁ-হাতে ঝুলানো কেরোসিন ভরতি বোতল, গেঞ্জি গায়ে খালি পায়ে ভাস্কর হাট থেকে ফিরে ছাঁচতলায় এসে দাঁড়াল। পিছনে শূন্য হাতে গণেশ। তারস্বরে গণেশ নালিশ জানাচ্ছে ঃ একটি জিনিষ আমায় হাতে ধরতে দিলেন না। কী করব, হাটের মধ্যে তো লাঠালাঠি করতে পারিনে!

মীরা দাওয়ায় বেরিয়ে হ্যারিকেন তুলে ধরে দেখছে। অবাক হয়ে দেখে।

ভাস্কর বলে, এইখানে নামিয়ে রাখি? না, ঘরে?

মীরা বলে উঠল, ক্যামেরা আছে আপনার?

কেন থাকবে না? দেশ-বিদেশের কত ছবি তুলেছি। ছবি তুলতে গিয়েই সাংঘাতিক কেসে পড়েছিলাম। ক্যামেরা এখানে তো আনিনি।

মীরা বলে, আনলেও লাভ ছিল না। আমি ছবি তুলতে জানিনে। কিন্তু লোভ হচ্ছে এই ছবি একটা তুলে রাখতে। ছবি নিয়ে আপনাদের সোসাইটির সকলকে দেখাতাম। যাদের দিকে নিচুচোখে তাকান, বেমালুম তাঁদেরই একজন হয়ে গেছেন। জাত গেছে আপনার। জাত গেলে গাঁয়ের নিয়মে হুঁকো-নাপিত বন্ধ করে, আপনাদের চেয়ার বন্ধ। কাছেপিঠে আপনাকে তারা বসতে দেবে না।

তখন এই পর্যন্ত। ডাল সম্বরা দিতে হবে, ব্যস্ত হয়ে মীরা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। ইতিমধ্যে ভাস্কর হাত-পা ধুয়ে নিজের তক্তপোষে গড়িয়ে পড়েছে। মীরা কোমর বেঁধে এলো কলহের জন্য।

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিনা ভূমিকায় শুরু করে ঃ বোঝাপড়া করতে এলাম। গণেশ ছিল বলে তখন চুপ করে গিয়েছিলাম। এত বাড়াবাড়ি কেন, মতলবটা কী আপনার? এই মেজাজ এই চালচলন এই রকম চেহারায় গেঁয়ো মাহিন্দার হওয়া যায় না, ঝুড়ি কাঁধে হাট করে বেড়ালেও নয়। চোখ ঠারে মানুষে, কৌতুক দেখে। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস উপমাটা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না, আপনি বেরিয়ে পড়ে লোকের মুখ দিয়ে।

একটানা বলে যায়, জবাবের প্রত্যাশা করে না। কণ্ঠ উগ্র থেকে উগ্রতর হচ্ছে। বলে, প্রতিহিংসা নিচ্ছেন—আমি জানি। মামার সঙ্গে বিবাদবিসম্বাদ—সেই রাগে সবসুদ্ধ আমাদের জব্দ করছেন, বাড়ির উপর চড়াও হয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে মজুরবৃত্তি করছেন। আর জব্দ করছেন মাকে—কত ঐশ্বর্যের মধ্যে আপনাকে রেখে এসেছিলেন, তাঁর মুখে আজও সেই গল্প শুনি। অন্তত রোগা মায়ের কথাটা ভেবে এসবে ক্ষান্ত দিন। আর নয়তো আমি একমুখো বেরিয়ে পড়ি—চোখ মেলে এ জিনিষ দেখা যায় না।

শুনতে শুনতে ভাস্কর হেসে উঠল। লঘু কণ্ঠে বলে, কিছু না কিছু না মীরা, আমায় ভুল ভেবেছ। রাগের শোধ নয়—নতুন আনন্দের আমি চেখে চেখে স্বাদ নিই। অনেক দেশ ঘুরেছি, কিন্তু এই জগৎটা অদেখা ছিল আমার। অনাবিষ্কৃত মহাদেশ কিম্বা চাঁদের ওপিঠ দেখার আনন্দ। এই মানুষদের কেন্নো-কেঁচোর মতো অথবা বাঘ-কুমিরের মতো এড়িয়ে এসেছি। খাসা লাগে এদের, এক হয়ে মিলেমিশে থাকতে ইচ্ছে করে। ঝকমকে দালান-কোঠার বদলে থাকলামই বা খড়ের চালের নিচে। যে চালের নিচে অনু-মা'র মতো মা রয়েছেন আমার, বকাঝকার জন্যে তুমি রয়েছ। কলকাতার মিল-এলাকায় তোমার মামাকে মহাশত্রু ভাবতাম, সেই গৌর-কাকা এই সিন্দিহাটে কত দরদের মানুষ।

কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে আসে। একটু [illegible] আবার বলে, আমার বাড়ি-গাড়ি, প্র[illegible] প্রতিপত্তিতে সকলের হিংসা। কিন্তু ভাল[illegible] কত বড় কাঙাল হয়ে ছিলাম, এইখানে এসে [illegible] বুঝেছি। বাবা ছিলেন, তিনিও আজ [illegible] দুনিয়ায় কেউ নেই আমার। তুমি আর দূ[illegible] কোরো না মীরা—যে ক'টা দিন ভাগ্যে [illegible] তোমাদের কাছে থেকে যাই।

বুঝি হাতই বা ধরে ফেলত মীরার। [illegible] কান খাড়া করে। অনুপমার ঘরের দিক [illegible] কাতরানি আসছে। ছুটে যায় দু-জনে।

[চৌদ্দ]

ক্ষীণস্বর, কান পেতে শুনতে হয়। অনু[illegible] বলছে, বমি করে ফেললাম। আঙুলে তুলে [illegible] বলে ঠেকে। গলা খুসখুস করছে, এ[illegible] আবার—আবার—

ভাস্কর বলে, রক্ত না আরো-কিছু! আ[illegible] তো কিছু দেখিনে। ছটফট কোরো না অনু[illegible] ঠাণ্ডা হয়ে চোখ বুজে থাক। ঘুম এসে যা[illegible]

আলোর জোর কমিয়ে মিটমিটে করে [illegible] ভাস্কর। মীরা ওদিকে ভিজে গামছায় ম[illegible] মুখ মুছিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি রক্ত পরি[illegible] করছে। অনুপমা ঝিমিয়ে পড়েছে, রাতের [illegible] আর সাড়া দিল না।

পরের দিনও অবস্থার ইতরবিশেষ [illegible] ডাক্তার পাল এলেন। সেই আমলে অনু[illegible] তাঁকে দাদা বলত। শয্যার পাশটিতে [illegible] ডাক্তার ডাকলেন ঃ আমায় চিনতে [illegible] অনুপমা? তাকিয়ে দেখ একবার।

অনুপমা ফ্যালফ্যাল করে দেখে। একটু নাড়ল কেন। কথা বলে না।

পরম যত্নে দেখলেন ডাক্তার পাল। রা[illegible] রায়ের মেয়ে—সে তো দেখবেনই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষণ শুনেছেন। নিজে [illegible] জিজ্ঞাসা করছেন ঃ এই রকমটা হয় বাঁ[illegible] রকম? এই রকম? এরা ছাঁ দিয়ে যচ্ছে [illegible]

নিশ্বাস ফেলে বললেন ঃ একটা [illegible] আছে আমাদের—বেরিয়াম মিল এক্স-রে[illegible] কি হবে, সন্দেহ থাকলে তবে তো পরীক্ষ[illegible]

ভাস্কর ভেঙে পড়ল ঃ কোন যদি [illegible] থাকে—কলকাতায় নিয়ে কিম্বা যে-কোন[illegible] আমায় বলুন ডাক্তার। একটিবার চেষ্টা [illegible] দেখি।

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়[illegible] এ রোগের কাছে এখন অবধি পরাজিত [illegible] চিকিৎসা করি মনের তুষ্টির জন্য—তাতে [illegible] যন্ত্রণা কমে, জীবনের মেয়াদ হয়তো [illegible] বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু সেদিক দিয়ে [illegible] দেরি হয়ে গেছে। বিছানা থেকে [illegible] সরানোর অবস্থাই নেই। মাসও আর নয় [illegible] গুণতিতে এসে ঠেকেছে।

রান্নাবান্না হচ্ছে, দুপুরবেলাটা [illegible] খেয়ে যাবেন সেই আয়োজন। কিন্তু [illegible] দেরি না করে জীপে উঠে পড়লেন।

অনুপমা অর্ধ-অচেতন। ডাকাডাকি[illegible] মেলে, কথাবার্তা একেবারে মুখে কে[illegible] ক্রমশ নতুন এক উপসর্গ—বিড় বিড় ক[illegible] সব বলছে। অর্থহীন অসংলগ্ন বকুনি [illegible] করে কথা একসঙ্গে। যেমন ঃ দুই-[illegible] ক-খ-দ, কলা-আখ-গুড়, ছেলে-মেয়ে-বউ [illegible] ধরণের কথা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা[illegible]

আমাদের প্রধানমন্ত্রী

পাষাণ গৌরদাস। এমন করে বলছে—কণ্ঠস্বর একবিন্দু কাঁপে না। বলে, অসম্ভব—

ভাস্কর ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, কিছু যায় আসে না তোমার অমতে। মীরা সাবালিকা। স্বেচ্ছায় আমরা বিয়ে করব। কেউ রোধ করতে পারবে না।

গৌরদাস বলে, অসম্ভব। মীরা বোন হয় তোমার। একই পিতার রক্ত দুজনের দেহে।

বোমা পড়ল বুঝি ঘরের মধ্যে। তারপর স্তব্ধতা—জগৎসংসার পুড়ে জ্বলে ছাই হয়ে গেছে যেন।

ক্ষণপরে গৌরদাস কথা বলে, সেই রাত্রে একবাড়ি লোকের চোখের উপর দিদিকে স্বৈরিণী নাম নিয়ে চলে যেতে হল। আর পরম-ধার্মিক তোমার পিতৃদেব ছাতের উপরের ঠাকুর-ঘরে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন। ধ্যান তাঁর এতটুকু বিচলিত হল না।

মিথ্যে কথা—এটা তোমার নতুন বানানো। বাবা অনু-মা দুজনেই গেছেন, প্রতিবাদের কেউ নেই। গল্প ইচ্ছামতন বানিয়ে দিলেই হল।

প্রতিবাদ কানে না নিয়ে একই সুরে গৌরদাস বলে যাচ্ছে, সকল কলঙ্ক-লাঞ্ছনা একলা মাথায় নিয়ে নিঃশব্দে দিদি বেরিয়ে গেলেন, বিশ্বাস করে যাকে সর্বসমর্পণ করে-ছিলেন তার গায়ে আঁচড়টি পড়তে দিলেন না। কারো কোনদিন জানবার কথা নয়, কিন্তু আমার চোখ বড় ধারালো। মহাত্মা নীরদবরণের চিঠি আবিষ্কার করে দিদিকে একদিন চেপে ধরলাম, তখন 'না' বলতে পারেন না। কথা আদায় করে নিলেন, ব্যাপারটা প্রকাশ করব না। দেখতে পারো সে চিঠি, এখানেই আছে।

একটু থেমে তিক্তহাসি হেসে গৌরদাস আবার বলে, আমার বাবাও ছিলেন ঠিক এমনি—অভিমানের পাহাড়। মেশিন বিকল হয়ে সোনার বাংলা স্টীল কোম্পানির দরজায় তালা পড়ল, দেশশুদ্ধ সকলে জানে। তোমার ঐ পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের আর একটি কীর্তি। কেমন করে মেশিন ভাঙে, হাত বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেশিন আবার চালু হয়ে যায়, তাই নিয়েও গবেষণা আমার আছে। ঐশ্বর্য মানুষকে কত নিচুতে নামায়—যাঁকে গুরুর মতন মান্য করতেন তাঁকেও পথে বসাতে এতটুকু বাধল না। সমস্ত জেনেবুঝেও বাবা একটি কথা বললেন না, নিঃসম্বল পথে নেমে গেলেন—নিরিবিলি এই সিদ্ধিহাটে এসে উঠলেন। জানতেন, কিছুই হবে না, বয়স আর দারিদ্র্য বিপক্ষে—তবু কতকগুলো ছেলে জুটিয়ে আশ্রম বানিয়ে তাদের চরিত্র-গঠনে লেগে গেলেন। যেমন বাবা তেমনি আমার দিদি—একজোটি ও'রা দুজনে—নিজেরাই কেবল জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ হলেন। আর আমি কেমন করে উল্টো স্বভাব পেয়েছি। শুনেছি, মা এই রকম ছিলেন—অন্যায় সয়ে যেতে পারতেন না।

কিন্তু এত সমস্ত কথা শুনছে না বোধহয় ভাস্কর। আবিষ্ট হয়ে আছে। হাসছে ফিক ফিক করে, পাগলে যেমনধারা হাসে। বলে, পলকে কেমন ভোজবাজি হয়ে গেল গৌর-কাকা। ধন-ঐশ্বর্য নেই, কাজ কারবার নেই, বাবা নেই, অনু-মা নেই, মীরা নেই, শম্পা তো আগেই গেছে। মুক্তপুরুষ আমি। না, লেংটি পরে জঙ্গলে ঢুকছিনে আমি, আছে আমার একটা জিনিষ এখনো আমার শেষ বন্ধু—

মাথার উপরে তালকাঠের আড়া। তক্তপোষে উঠে হাত বাড়িয়ে ভাস্কর আড়ার উপর থেকে পিস্তল নামিয়ে আনল। বলে, একলা আসিনি গৌর-কাকা, বন্ধুকে সঙ্গে এনেছি। কেউ না থাক, পিস্তল আছে আমার।

পিস্তল তাক করল—গৌরদাসের দি... নয়, নিজের দিকে। আর কিছু জানে... ভাস্কর।

* * * *

সদরের হাসপাতালে বারো দিনের ... চেতনা ফিরল। অপারেশন হয়েছে, ... গুরুতর আঘাত। চেতনা কোনদিনই ফিরত ... —কিন্তু সেই মুহূর্তে ধাক্কা দিয়েছিল গৌ... দাস, পিস্তলের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

সিতাংশু এসে পড়েছে কলকাতা থেকে ... সঙ্গে শম্পা। ডাক্তারদের আশঙ্কা, দেখা গে... অমূলক। মস্তিষ্ক বেসামাল হয়নি, চি... পারছে ভাস্কর। এমন কি, পিছনের কথাও ... পড়েছে। বলে, তুমি যে লক্ষ্ণৌ চলে গি... ছিলে শম্পা, ফিরলে কবে?

শম্পা বলে, লক্ষ্ণৌ গিয়ে চক্রান্তটা বুঝল... বাবাকে স্পষ্ট বলে দিয়েছি, তাঁতের মাকু... যে একবার এদিক একবার ওদিক পরের ই... ছুটোছুটি করে বেড়াব। রাগ করে চলে এল... সে সব অনেক কথা। নিরুদ্দেশ হয়ে রই... গে, নইলে আপনিও শুনতে পেতেন।

নিঃশব্দ মীরা শম্পার পাশটিতে ... মীরার একখানা হাত ভাস্কর মুঠি করে ধ... বলে, শম্পা, আমার ছোটবোন। বড় দুঃখী...

এতগুলো কথার পর ক্লান্ত হয়ে ভা... আবার চোখ বুঁজল।

শেষ

প্রথম বই

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকাবার একটা ইতিহাস থাকে। কিন্তু সে ইতিহাস জানবার আগ্রহ কম আমাদের। লেখকদের আমরা বিচার করি তাঁদের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল দিয়ে। সবচেয়ে আমরা ভালো বইগুলির কথাই মনে রাখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম বই অথবা প্রথম পর্বের রচনা প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতি পায় না। অথচ এদের বাদ দিয়ে কোনো লেখক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিচার সম্ভব নয়। প্রথম বই সাহিত্য-প্রতিভার উৎস-স্বরূপ। উৎসের পরিচয় পেলে প্রতিভার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা সহজ হয়।

প্রথম বই থেকে লেখকের সহজাত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী রচনায় অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের ছাপ পড়ে। প্রথম বইয়ের পট-ভূমিকার সন্ধান করলে দেখা যায় কত বিচিত্র ঘটনার আবর্তে পড়ে অনেকে সাহিত্যের পথে এসেছেন। আবার দেখা যায় যাঁর হয়ত ছিল কবি হবার আকাঙ্ক্ষা, নানা কারণে তিনি হয়েছেন ঔপন্যাসিক; নাট্যকার হিসাবে খ্যাতি লাভের যাঁর বাসনা ছিল পরবর্তী জীবনে তিনিই হয়ত কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন দেখা যায়। এই শাখা পরিবর্তনের কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পাওয়া যায় সাহিত্যের ইতিহাসে।

প্রথম বই কেন্দ্র করে লেখকের মনে যত আনন্দ-বেদনার সৃষ্টি হয় পরবর্তী কোনো বইয়ের বেলাতেই তা হয় না। প্রশংসা পেলে আরো ভালো লেখার জন্য উদ্দীপনা পাওয়া যায়; বিরূপ সমালোচনা নবীন শিল্পীকে যেমন আঘাত দেয় তেমনি কখনো কখনো লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সংকল্পও

টমাস মান

টুর্গেনিভ
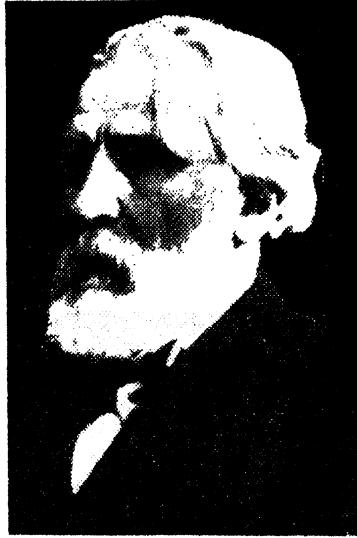
কঠোর করে। নতুন লেখক এঁদের দৃষ্টান্ত থেকে বাধা অতিক্রম করবার শক্তি পেতে পারেন।

লেখকের নিকট তাঁর প্রথম বই প্রথম প্রেমের মতোই অবিস্মরণীয়। পাঠকরা উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশের নিদর্শন হিসাবে প্রথম রচনাকে লেখক ভুলতে পারেন না। তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য এবং জীবন দর্শনের আভাস প্রথম বইতে পাওয়া যায়। প্রথম বই অনেক লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রথম প্রেম ও প্রথম বইয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগও বিরল নয়।

লেখকদের জীবনী থেকে এসবের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। যখন জীবনী লেখার প্রথা ছিল না সে যুগের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বাল্মীকি। ক্রৌঞ্চ-দম্পতির দুঃখে বেদনা-বিদ্ধ হয়ে এক সাধারণ মানুষ অকস্মাৎ মহাকবি হলেন। বেদনা এখনো সাহিত্য সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা। তবে নিছক বন্ধুর প্রতি সহানুভূতির জন্যই প্রথম বই ছাপতে দেবার দৃষ্টান্ত হয়ত বেশী পাওয়া যাবে না। ওয়াল্টার স্কটের জীবন থেকে এর উদাহরণ পাওয়া যায়।

স্কট কবিতা ভালোবাসতেন ছেলেবেলা থেকেই। মাঝে মাঝে দু'একটা কবিতা লিখতেনও। কিন্তু এটা ছিল তাঁর কাছে নিছক বাতিক। লেখক হিসাবে খ্যাতি লাভ করবেন এবং লিখে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন এটা ছিল কল্পনারও অতীত। তখন তিনি সেলকার্ক শহরের শেরিফ। সেখানে স্কুলের সহপাঠী জেমস্ ব্যালেণ্টাইন ছাপাখানা খুলেছেন। কিন্তু যথেষ্ট কাজ নেই। স্কট স্থির করলেন বন্ধুকে সাহায্য করতে হবে। তিনি সীমান্ত অঞ্চলের ব্যালাড সংগ্রহ করছিলেন অনেকদিন থেকে। সেগুলি সম্পাদনা করে এক প্রকাশককে দিলেন এই শর্তে যে বই ছাপাতে হবে ব্যালেণ্টাইনের প্রেসে। বন্ধুকে সহায়তা করবার তাগিদেই স্কটের সম্পাদনায় প্রথম বই 'মিনস্ট্রেলসি অব দি স্কটিশ বর্ডার (১৮০—০৩) প্রকাশিত হল। এই বই বিশেষ বিক্রী হয়নি।

চৌত্রিশ বছর বয়সে বের হল তাঁর প্রথম মৌলিক বই 'দি লে অব দি লাস্ট মিনস্ট্রেল (১৮০৫)'। এই গাথা-কাব্য থেকেও পয়সা পাবেন এমন আশা তাঁর ছিল না। জীবনে তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। কিন্তু এ বই থেকে খ্যাতি ও অর্থ দুই-ই তিনি পেলেন। তাতে তাঁর লেখার আগ্রহ বাড়ল।
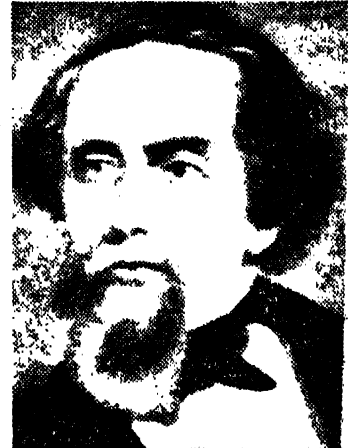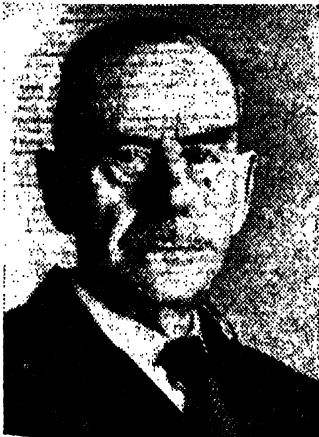
ডিকেন্স

কাব্যের সাধনা করলেন মধ্য বয়স পর্যন্ত। ১৮০৫ সালে 'ওয়েভার্লি' সাতটি পরিচ্ছেদ লিখে বন্ধুকে দেখতে দিলেন। উপন্যাস রচনায় এই তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা। নিজের উপরে আস্থা ছিল না। যদি কোনো সম্ভাবনাই না থাকে তাহলে এ পথে অগ্রসর হয়ে লাভ কি ? বন্ধু বললেন, কিছু হয়নি; লেখা পুড়িয়ে ফেল। উপন্যাস লেখা তোমার কোনো কালেই হবে না।

স্কট বন্ধুর উপদেশ মেনে নিলেন। তবে পাণ্ডুলিপি না পুড়িয়ে ফেলে রাখলেন এক কোণে। আট বছর পরে একদিন মাছ ধরবার সরঞ্জাম খুঁজতে গিয়ে হঠাৎ বাক্সে জিনিসপত্রের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলেন সেই অসমাপ্ত উপন্যাসের সাতটি পরিচ্ছেদ। এতদিন পরে নতুন করে পড়ে কিন্তু খারাপ লাগল না। শেরিফের চাকরিতে যথেষ্ট অবসর। অনেকটা যেন অবসর কাটাবার জন্যই তিনি কাহিনী শেষ করলেন এবং তা ছাপাও হল। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস এবং বিখ্যাত ওয়েভার্লি সিরিজের প্রথম বই। কিন্তু বেনামীতে বেরিয়েছিল। উপন্যাস তখনো আজকের মর্যাদা পায়নি। শেরিফের পক্ষে উপন্যাস লেখা সম্মানজনক মনে হয়নি।

ব্যালেণ্টাইনের প্রেস যাতে বড় হয় এবং নিজেও লাভবান হতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে স্কট প্রেসের অংশীদার হয়েছিলেন কিছু টাকা দিয়ে। কিন্তু ব্যালেণ্টাইনের অব্যবস্থায় ব্যবসা ফেল পড়ল; দেনা প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকা। ব্যালেণ্টাইন দেউলিয়া নাম লিখিয়ে দেনার দায় থেকে মুক্তি পেল। কিন্তু স্কট এই সহজ পথ গ্রহণ করলেন না। সংকল্প করলেন সকল দেনা তিনি মিটিয়ে দেবেন। কিন্তু টাকা কোথায় ? বই বিক্রির টাকা দিয়ে দেনা শোধ করাই একমাত্র উপায়। অবিশ্রান্ত লিখে চললেন তিনি। মৃত্যু শয্যায় শুয়েও মুখে মুখে বলে গেছেন, একান্ত সচিব লিখে নিয়েছে। দেনা শোধের ব্যবস্থা তিনি করে গিয়েছিলেন। সুতরাং স্কটের সাহিত্য-জীবনের উপর সহপাঠী ব্যালেণ্টাইনের প্রভাব গভীর।

টুর্গেনিভ গদ্য লিখতে আরম্ভ করেন আকস্মিকভাবে। পুশকিন 'সমকালীন' সাহিত্যপত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর টুর্গেনিভের সহায়তা লাভ করে কবি নেক্রাসভ কাগজের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কাগজের নবপর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় পাদপূরণ হিসাবে শেষের দিকে টুর্গেনিভের একটি ছোট্ট গদ্য রচনা ছাপা হয়। টুর্গেনিভ কবিতা লিখতেন, গদ্যের দিকে মোটেই ঝোঁক ছিল না। সম্পাদকের অনুরোধে রাশিয়ার অবহেলিত অত্যাচারিত ভূমিদাসদের সম্বন্ধে একটি রেখাচিত্র লিখে দেন। পাঠকেরা এই রচনাটিকে অভিনন্দিত করে। তারপর সম্পাদকের তাগিদে তাঁকে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি লেখা দিতে হয়। এগুলি সংকলন করে ১৮৫২ সালে প্রকাশিত হয় টুর্গেনিভের প্রথম বই; 'এ স্পোর্টসম্যান স্কেচেস্।' ভূমিদাসদের প্রতি লেখকের গভীর সহানুভূতি ফুটে উঠেছে এ বইয়ে।

উদারপন্থীরা বই পড়ে খুশি হল। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এর [illegible]

পূর্বাভাস। শিক্ষামন্ত্রী সম্রাটকে গোপন চিঠি পাঠিয়ে জানালেন, এ বই পড়ে ছোটরা আর বড়দের সম্মান করবে না। টুর্গেনিভ মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বলেছিলেন যে, 'এ স্পোর্টসম্যানস্ স্কেচেস্' রাশিয়ার ভূমিদাসদের মুক্তি দেবার জন্য যা করেছে সে কথা যেন তাঁর সমাধি ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়। সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁকে বলেছিলেন যে, এ বই পড়ে ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া সম্বন্ধে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন।

প্রথম বইয়ের এত বড় প্রভাব বড় দেখা যায় না।

এডগার অ্যালান পো এক অভিনেত্রীর পুত্র। দু'বছর পরে মা'র মৃত্যু হল। এক ধনী ব্যক্তি তাঁকে পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। যত্ন ও স্নেহের অভাব ছিল না। কিন্তু কল্পনাপ্রবণ কিশোরের কবি মন এই আশ্রয়ের মধ্যে সহানুভূতি খুঁজে পায়নি। শীঘ্রই বিরোধ দেখা দিল। পো বাড়ী ছেড়ে কিছুদিন আশ্রয়হীন হয়ে অনাহারে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর বোস্টন শহরে এসে নাম লেখালেন সেনাবাহিনীতে। এই সময়ে (১৮২৭) তাঁর প্রথম বই 'ট্যামারলেন অ্যাণ্ড আদার পোয়েমস' প্রকাশিত হয়। চল্লিশ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকার মধ্যে তৈমুরলঙ্গের কাহিনীটিই উল্লেখযোগ্য। তৈমুরলঙ্গ পৃথিবী জয় করে যখন বাড়ী ফিরল তখন বিরহযাতনা ভোগ করে প্রেয়সীর মৃত্যু হয়েছে। প্রেয়সীকে দেবার জন্যই পৃথিবীর সম্পদ আহরণ করতে সে বেরিয়েছিল। অকস্মাৎ তৈমুরের জীবন শূন্য হয়ে গেল।

এ বইয়ের এক কপিও বিক্রি হয়েছিল কি-না সন্দেহ। কোনো পত্রিকাই বইটিকে সমালোচনার যোগ্য মনে করেনি। শুধু দুটি কাগজে প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছিল। পো আধুনিক সাহিত্যে একটি মৌলিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন; বোদ্‌লেয়ার প্রমুখ অনেক লেখক তাঁর রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। প্রথম বইয়ের মধ্যেই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়।

পো পরিচিত ও প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে তাঁর বিষয়বস্তু গ্রহণ করেননি। টলস্টয়ের প্রথম এবং পরবর্তী রচনা বাস্তব জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। তাঁর সৃষ্ট অনেক চরিত্রের মধ্যেই লেখককে চেনা যায়। প্রথম উপন্যাস 'চাইল্ডহুড' আত্মজীবনীমূলক। এ বই ধারাবাহিক বেরিয়েছিল সাহিত্যপত্র 'সমকালীনে।' তাঁর নাম ছাপা হয়নি; লেখক হিসাবে ছাপা হয়েছিল দুটি অক্ষর—এল এন। পত্রিকা থেকে তিনি এক পয়সাও পারিশ্রমিক পাননি। রাশিয়ার এক সম্পন্ন পরিবারের কাহিনী শুরু হয়েছে এই কাহিনীতে এবং বয়হুড' ও 'ইয়ুথে' তা প্রসারিত ও সমাপ্ত হয়েছে। নিজের, বাবার এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কথা নিয়েই এই কাহিনী। কোনো কথাই গোপন করেননি। বাবা এক মহিলাকে ভালোবাসতেন। মহিলাও আকৃষ্ট ছিলেন তাঁর প্রতি, কিন্তু বিয়ে করতে রাজী হননি। কেননা, টলস্টয়ের বাবা তাহলে এক ধনবতী মহিলাকে বিয়ে করে সুখী হতে পারতেন না। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বাবা আবার তাঁকে বিয়ে [illegible] মহিলা সম্মত হলেন

না এই আশঙ্কায় যে তাহলে তাঁদের মধ্যে কাব্যময় মধুর সম্পর্ক আছে তা আর থাক না। অবশ্য তিনি মাতৃহারা সন্তানদের দা[illegible] নিয়েছিলেন এবং টলস্টয় তাঁর কাছেই মান[illegible] হয়েছেন। টলস্টয় তানিয়া চরিত্রের মধ্যে [illegible] মহিয়সী মহিলাকে অমর করে রেখেছেন।

চেকভের ছোট গল্প ও নাটক বি[illegible] সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রথম বই এক উপন্যাস। এই একটি উপন্যাসই তিনি লি[illegible] ছেন। এটি আবার গোয়েন্দা কাহিনী[illegible] পরবর্তী রচনার ধারার সঙ্গে এর কোনো যো[illegible] নেই। 'দি শুটিং পার্টি' হালকা গোয়ে[illegible] কাহিনী হিসাবে প্রশংসা পেতে পা[illegible] এ বইয়ের জন্য লেখক যত পরিশ্রম করে[illegible] এবং যত্ন নিয়েছেন পরবর্তী কোনো বই[illegible] জন্য তা করেননি।

'ডিকামেরনের' লেখক বোক্কাচ্চোর জ[illegible] হয় ১৩১৩ খৃীষ্টাব্দে। জন্মস্থান বোধ [illegible] প্যারিস। এক ইটালীয়ান বণিকের অবৈধ পু[illegible] কিছু লেখাপড়া শেখার পর নেপলসের রা[illegible] সভায় সভাসদ্ হয়ে এলেন। ভার্জিলে[illegible] কবরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একদিন এ[illegible] অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, কবর ছুঁয়ে শপ[illegible] করলেন আমৃত্যু সাহিত্যের সাধনা করবে[illegible] বিশেষ করে কাব্যের সাধনা। আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এক অভিজাত প[illegible] বারের তরুণী বধূ ফিয়েমেত্তার সঙ্গে পরিচ[illegible] প্রথম পরিচয়েই ফিয়েমেত্তার প্রেমে পড়লে[illegible] নেপলসে এসে তাঁর জীবনের গতি নতুন প[illegible] প্রবাহিত হল। ভার্জিলের কবর ছুঁয়ে [illegible] শপথ করলেন তা পূরণ করবার প্রেরণা পে[illegible] ফিয়েমেত্তার কাছ থেকে। ফিয়েমেত্তার স[illegible] গোপনে দেখা করবার ব্যবস্থা হল। প্র[illegible] দিনেই পরস্ত্রীর কাছে সরাসরি প্রেম নিবে[illegible] করতে বাধল। তাই নিজের মনোভাব [illegible] করবার জন্য কয়েকটি প্রেমের গল্প শোনা[illegible] বোক্কাচ্চো। ফিয়েমেত্তা বলল, গল্পগুলি [illegible] লিখে ফেল না !

বোক্কাচ্চো উৎসাহিত হয়ে লিখে ফেললে[illegible] এটি তাঁর প্রথম বই, 'লেবারস্ অব লাভ[illegible] ফিয়েমেত্তার মনের উপরে এ বইয়ের প্রভ[illegible] কতটা হয়েছিল তা জানা যায়নি, কা[illegible] ফিয়েমেত্তা এর পরে বেশী দিন জী[illegible] ছিলেন না।

আঁদ্রে জিদও তাঁর প্রথম বই দিয়ে ভাল[illegible] বাসার পাত্রীকে জয় করবেন ভেবেছিলেন। [illegible] তাঁর সহপাঠী ছিলেন পিয়ের লুই। তাঁর [illegible] থেকেই প্রথম লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। [illegible] সম্পর্কের বোন মাদলিনের প্রেমে পড়লেন। [illegible] নিজের মনের কথা লিখে বেনামে প্রকাশ করলে[illegible] ১৮৯১ সালে। বইটির নাম 'দি নোটবুকস [illegible] আঁদ্রে ওয়াল্টার'। মাদলিন ও তার অভিভাবক[illegible] এ বইয়ের দর্পণে তাঁর মনের পরিচয় পাবে, [illegible] ছিল তাঁর আশা। জিদের উদ্দেশ্য স[illegible] হয়েছিল। চার বছর পরে মাদলিনকে বিয়ে ক[illegible] ঘরে এনেছিলেন। তার পূর্বে অবশ্য অন্য এব[illegible] উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। এই বইয়ের [illegible] প্রশংসা পেয়েছিলেন মেতরলিঙ্ক এবং অন্য অনেক লেখকের কাছ থেকে। প্রথম বই তাঁ[illegible] সাহিত্য জগতে প্রবেশের অধিকার [illegible]

হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী রচনার বৈশিষ্ট্য এ বইয়ের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়।

ডি এইচ লরেন্স সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন কবি হিসাবে। এক মহিলার উদ্যোগে ১৯০৯ সালে তাঁর কয়েকটি কবিতা ছাপা হয় 'ইংলিশ রিভিয়্যু' কাগজে। এর দু'বছর পরে তাঁর প্রথম বইয়ের পাণ্ডুলিপি এক প্রকাশক গ্রহণ করে। লরেন্সের ভাগ্য ভালো: তাঁকে প্রথম উপন্যাস 'হোয়াইট পীককের' পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরতে হয়নি। ফ্রান্সিস বেট ইয়ং এই বই সম্বন্ধে বলেছেন যে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কোনো লেখকের প্রথম উপন্যাস 'হোয়াইট পীককের' মতো আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেনি।

বাইশ বছরের তরুণ সমারসেট মম্ উপন্যাস লেখার কথা কখনো কল্পনাও করেন নি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল নাট্যকার হবার। কিন্তু কোনো থিয়েটারেই তাঁর নাটকের পাণ্ডুলিপি গৃহীত হল না। বারবার ব্যর্থ হয়ে তাঁর মনে হল যে, কয়েকটি উপন্যাস লিখে জনপ্রিয়তা লাভ করলে তাঁর নাটক সমাদর লাভ করবে। প্রকাশক ফিশার আনউইন ছোট উপন্যাসের একটি সিরিজ প্রকাশ করছিল। এই সিরিজের লেখকদের আসল নাম ছাপা হত না, থাকত ছদ্মনাম। তাই সিরিজটির নাম ছিল 'ছদ্মনামা'। মম্ দুটি বড় গল্প লিখে এই সিরিজে ছাপাবার জন্য পাঠালেন। ফেরৎ এল। প্রকাশক জানাল, উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠালে বিচার করে দেখা হবে। চিঠি পাবার দশ মিনিটের মধ্যেই মম উপন্যাস লিখতে বসলেন। ডাক্তারী পড়বার সময় হাতে কলমে কাজ শেখবার জন্য তিনি ল্যাম্বেথ বস্তীতে ছিলেন তিন সপ্তাহ। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁকে তেষট্টিটি প্রসবের তত্ত্বাবধান করতে হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি লিখলেন প্রথম বই 'লিজা অফ ল্যাম্বেথ'। এই উপন্যাসে কল্পনার ভাগ কম; প্রায় সবটাই প্রকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। প্রকাশক পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করল। বই প্রথম ছাপিয়ে বের হল ১৮৯৭ সালে। লেখকের নাম বইয়ে ছাপা হয়নি।

প্রথম বই বের হবার পর পরিচিত মহলে মমের বেশ নাম হল। এর ফলে পরীক্ষার ফল না বেরুতেই তিনি চাকরি পেলেন। কিন্তু চাকরি নিলেন না। সংকল্প স্থির হয়ে গেছে। চাকরি করবেন না, লিখবেন। প্রথম টাকার অভাবে খুবে কষ্ট পেতে হয়েছে। 'লিজা অফ ল্যাম্বেথ' থেকে পেয়েছিলেন মাত্র পাঁচশ টাকা।

টমাস হার্ডির উপন্যাস লেখার কল্পনা কোনোদিনই ছিল না। ছেলেবেলায় মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন আর কবিতা লিখতেন। কাগজের অফিসে পাঠান, কিন্তু ছাপা হয় না, ফেরৎ আসে। পড়া শেষ করে লণ্ডনের এক স্থপতির দপ্তরে কাজে যোগ দিলেন। এখানে আলাপ হল এম্মা গিফোর্ডের সঙ্গে। কিছুদিন পরে হার্ডি তাঁকে বিয়ে করলেন। অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব-শালিনী মহিলা—হার্ডির বিপরীত। হার্ডি ছিলেন নিরীহ গোবেচারা প্রকৃতির। জন্মের পরে ডাক্তার তাঁকে মৃত মনে করেছিল। সত্যি বেঁচে আছেন কিনা দেখবার জন্য ধাই এক চড় মেরেছিল। চড় খেয়ে তাঁর জীবন ফিরে আসে। এবং সে জীবন টিকে ছিল নব্বই বছর। স্ত্রী এখন নির্দেশ দিলেন কবিতা ছেড়ে গদ্য লিখতে.

ফ্লোবেয়ার

তখন হার্ডি প্রতিবাদ করতে পারলেন না। একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন। প্রথম বই 'ডেসপারেট রেমিডিস' বের হল ১৮৭১ সালে। এই উপন্যাসটি অনেকটা আত্মজীবনীমূলক।

গলসওয়ার্দিও লিখতে আরম্ভ করেছিলেন প্রণয়িনীর উৎসাহে। তখনো তাঁদের বিয়ে হয়নি। অ্যাডা ও তার মাকে প্যারিস স্টেশনে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছেন। গাড়ী ছাড়তে কিছু দেরী আছে। দুজনে রেলওয়ে বুক স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। হঠাৎ সুসজ্জিত বইয়ের দিকে চোখ রেখে অ্যাডা বলল, তুমি লেখ না কেন? লেখক হবার মতো সব গুণই তো রয়েছে তোমার মধ্যে।

গলসওয়ার্দি উৎসাহিত হয়ে লন্ডনে ফিরে এসেই গল্প লিখতে শুরু করলেন। প্রথম গল্প 'ডিক ডেনভার্স আইডিয়া' শেষ করে অ্যাডাকে পড়ে শোনালেন। অ্যাডার খুব ভালো লাগল। কিছুদিন পরে দশটি গল্পের সংগ্রহ 'ফ্রম দি ফোর উইন্ডস' নামে প্রকাশিত হল (১৮৯৭)। প্রথম বইয়ে গলসওয়ার্দি জন সিনজন এই ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। বই ছাপার সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করতে হয়েছিল লেখককে। ভালো সমালোচনা হওয়া সত্ত্বেও পঁচিশ বছর পরেও এ বইয়ের কুড়ি কপি অবিক্রীত ছিল।

প্রথম বই দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করা এবং সেই বই বিশ্বসাহিত্যে স্থান লাভ করবার মতো দৃষ্টান্ত বিরল। 'মাদাম বোভারি' তার অন্যতম উদাহরণ। গুস্তাভ ফ্লোবেয়ারের এটি প্রথম রচনা না হলেও 'মাদাম বোভারি' তাঁর প্রথম মুদ্রিত বই। দীর্ঘ ছ'বছর ধরে একটু একটু করে লিখেছেন। মাসে গড়ে তেরো পাতার বেশী লেখা হত না। ১৮৫৭ সালে 'প্যারিস রিভিয়ুতে' ধারাবাহিকভাবে 'মাদাম বোভারি' প্রকাশিত হতে থাকে। সরকার এ বইয়ে অশ্লীলতার সন্ধান পেয়ে লেখকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুক্তি পেয়েছিলেন। 'মাদাম বোভারি' উপন্যাসের ইতিহাসে একটি নতুন বাঁক সৃষ্টি করেছে। এমন স্টাইল, জীবনঘনিষ্ঠ কাহিনী এবং নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পূর্বে দেখা যায় নি। এই উপন্যাস পরবর্তী বহু লেখকের রচনা-রীতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফ্লোবেয়ার নিজে মনে করতেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'টেম্পটেসান অব সেন্ট অ্যানথনি'। কিন্তু প্রথম বই মাদাম বোভারিই তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে।

প্রথম বই দিয়ে খ্যাতি লাভ করবার আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় থিওডোর ড্রেইজারের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস থেকে। ড্রেইজার সাংবাদিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন। একদিন অকস্মাৎ আর্থার হেনরি প্রস্তাব করল উপন্যাস লেখার। ড্রেইজার সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো কাগজের উপরে লিখলেন, 'সিস্টার কেরি'। তাঁর প্রথম বইয়ের নাম এমনি করে অকস্মাৎ স্থির হয়ে গেল। লেখা চলতে লাগল থেমে থেমে। আত্মবিশ্বাস নেই; নগদ পয়সার প্রয়োজনে প্রায়ই উপন্যাস বন্ধ রেখে কাগজের জন্য প্রবন্ধ লিখতে হয়। তবু কাহিনী একদিন শেষ হল। হার্পার কোম্পানী পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিল। ফ্রাঙ্ক নরিসের সুপারিশে ডাবল্‌ডে উপন্যাসটি ছাপতে সম্মত হল। প্রুফ দেখে প্রকাশকের স্ত্রী বলল, এ বই কিছুতেই প্রকাশ করা চলতে পারে না। কারণ বইটি অশ্লীল। প্রকাশকও তা স্বীকার করল। কিন্তু চুক্তিপত্র হয়ে গেছে। চুক্তিভঙ্গের দায়ে না পড়তে হয় এজন্য অল্প কিছু বই ছাপাল এবং তা বিক্রি করবার জন্য কোনো চেষ্টাই করল না। সুতরাং প্রথম সংস্করণের প্রচার হল না। সেন্সরের রোষদৃষ্টি পড়েছিল এ বইয়ের উপরে। তার ফলে পাঠক-মহলে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল।

'সিস্টার কেরি' এক গ্রাম্য তরুণীর অভিশপ্ত নাগরিক জীবনের কাহিনী। ড্রেইজারের বাল্যজীবন কেটেছে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে। রেললাইনের পাশে কয়লা কুড়িয়ে, বাড়ী বাড়ী ধোবার কাপড় বিলি করে কিছু উপার্জন করতে হত তাঁকে। খালি পায়ে ক্লাশে গিয়েছিলেন বলে স্কুল থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দুই বোন সমৃদ্ধ জীবনের প্রলোভনে বাড়ী ছেড়ে এসেছিল শহরে। নগর তাদের জীবনের সবটুকু রস নিংড়ে ছিবড়ের মতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। বোনদের জীবনের এই ট্র্যাজেডি সিস্টার কেরিতে রূপায়িত হয়েছে। অনেক সমালোচকের মতে এই প্রথম রচনা তাঁর শ্রেষ্ঠ বই।

ডিকেন্সও সাংবাদিক হিসাবে সাহিত্য-জীবন শুরু করেছিলেন। সমকালীন জীবন সম্পর্কিত কতকগুলি রেখাচিত্র বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর ডিকেন্স সাহিত্য জগতে পরিচিতি লাভ করেন। এই রেখাচিত্রগুলি সংকলন করে দুই খণ্ডে 'স্কেচেস অফ বজ' নাম দিয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৩৬-৩৭ সালে। ডিকেন্সের বয়স তখন চব্বিশ বছর। প্রথম বইয়ের এমন অভ্যর্থনা বড় কম হয়। যদিও রচনার মান খুব উন্নত ছিল না তথাপি সমালোচনা খুব ভালো হল। সাংবাদিক মহলে জনপ্রিয় ছিলেন বলেই হয় তো এটা সম্ভব হয়েছে। বই থেকে বেশ আয় হল। প্রথম বইয়ের এরূপ সমাদর না হলে হয়ত 'পিকউইক পেপার' লিখতে উৎসাহ পেতেন না। পারিবারিক জীবনেও শান্তি পেলেন। পাত্রী ঠিক ছিল। কিন্তু বিয়ে করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না আর্থিক অনিশ্চয়-তার জন্য। 'স্কেচেস অব বজ' থেকে নিশ্চয়তার আভাস পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই বিয়ে করলেন।

কবি শেলীর প্রথম বই 'দি নেসেসিটি অফ অ্যাথিজম' তাঁর সাহিত্য-জীবনকে না হোক, ব্যক্তিগত জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। গড়উইনের 'পলিটিক্যাল জাস্টিস' এবং ফরাসী সংশয়বাদীদের মতামত পাঠ করে নাস্তিক্যবাদের প্রতি তাঁর মন ঝুঁকেছিল। 'দি নেসেসিটি অফ অ্যাথিজম' নামক পুস্তিকায় নাস্তিক্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। খৃষ্টানদের নিকট নাস্তিক্যবাদ নিয়ে মাথা ঘামানো পাপ। তাই এ বই লেখার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁর কৈফিয়ং তলব করলেন এবং তাঁকে ও বন্ধু হগকে বিতাড়িত করা হল কলেজ থেকে। শেলীর পিতা ক্রুদ্ধ হলেন; তাঁর ধারণা হল হগই ছেলেকে বিপথে নিয়েছে। পুত্রকে আদেশ করলেন, হগের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করতে। শেলী সম্মত হলেন না বন্ধুকে ছাড়তে। সুতরাং পিতার আদেশে তাঁকে বাড়ী ত্যাগ করতে হল। নিঃস্ব অবস্থায় শেলীর নতুন জীবন শুরু হল। দারিদ্র্য এবং পিতার কঠোরতর অভিজ্ঞতাই তাঁর মনে স্বাধীনতার আদর্শ উদ্দীপ্ত করেছে। প্রথম বই প্রকাশ করে যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই তাঁর জীবনের পথ নির্ধারিত হয়েছে।

শার্লট, এমিলি এবং অ্যান ব্রন্টি ঔপন্যাসিক হিসাবে ইংরেজী সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রথম আকাঙ্ক্ষা ছিল কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করবার। তিন জনেই গোপনে গোপনে কবিতা লিখতেন। এমিলির গোপনতা ছিল সবচেয়ে বেশী। তাঁর লেখা বোনরাও কখনো দেখতে পায়নি। শার্লট হঠাৎ একদিন এমিলির কবিতার খাতা আবিষ্কার করে পড়ে ফেললেন। চমৎকার লেখা। তিন বোনের যে পৃথক পৃথক কবিতার বই শীগ্‌গীর বেরুবে এমন আশা নেই। সুতরাং স্থির হল তিনজনের লেখা থেকে নির্বাচন করে একটি কবিতার বই ছাপা হবে। অখ্যাত নতুন লেখকের বইয়ের প্রকাশক পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত নিজেদের খরচায় বই ছাপার ব্যবস্থা হল। বই বের হল ১৮৪৬ সালের মে মাসে। লেখিকাদের সম্বন্ধে পাঠক ও সমালোচকদের বিশেষ ভালো ধারণা থাকে না বলে তাঁরা পুরুষের ছদ্মনাম গ্রহণ করলেন। তিন বোনের নাম বইয়ে ছাপা হল যথাক্রমে কুরার, এলিস ও অ্যাকটন বেল। পুরুষের নাম নিয়েও 'পোয়েমস' বিক্রি হল না। একবছরে মাত্র দু কপি বই বিক্রি হয়েছিল। সমালোচনা ছাপা হয়েছিল তিনটি কাগজে। সমালোচকরা কবি হিসাবে এমিলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অবিক্রীত বইগুলি কিছু গেল পুরনো কাগজের দোকানে, আর কিছু বিতরণ করা হল লেখকদের মধ্যে।

কবিতার বই ব্যর্থ হওয়ায় তিন বোনই উপন্যাস লিখে ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত করলেন। এ পরীক্ষায় তাঁরা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রথম বই নোবেল পুরস্কার পেয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে; সুতরাং প্রথম রচনা যে কাঁচা হবে এমন কথা বলা যায় না। সেলমা লাগেরলফের প্রথম উপন্যাস 'গোস্তা বার্লিংস্ সাগা' বঙ্গসাহিত্যের একটি প্রথম শ্রেণীর বই। এ বইয়ের জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ১৯০৯ সালে। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

টমাস মান লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রথম উপন্যাস 'বুডেন ব্রুকস্' (১৯১১) লিখে। এক সম্পন্ন জর্মান বণিক পরিবারের ভাঙনের ইতিহাস কেন্দ্র করে কাহিনী রচিত। মান-পরিবারের ক্রমাবনতির ইতিহাসকে ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে। 'বুডেন ব্রুকস' অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল প্রকাশের পরেই। হিটলার মানের বই বাজেয়াপ্ত করবার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র জার্মানীতে 'বুডেন ব্রুকস্' বিক্রি হয়েছে পনেরো লক্ষ কপিরও বেশী।

এরিখ মারিয়া রেমার্কের প্রথম বই 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট' সাহিত্য জগতে আলোড়ন এনেছিল। এ বইয়ের রচনা কৌশলে মৌলিকত্ব ছিল না, কিন্তু লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে যুদ্ধের ভয়াবহতা এমন মর্মস্পর্শীরূপে তুলে ধরেছেন যে য়ুরোপের যুদ্ধপীড়িত জনসাধারণের চিত্তে তা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগাল। 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ণ ফ্রন্ট'-এর মতো বই সাফল্য লাভ করবার উপযুক্ত পরিবেশ তখন ছিল। সময়ের সহায়তা না পেলে এতটা খ্যাতি লাভ করা সম্ভব হত না। একমাত্র জার্মানীতেই এ বই বিক্রি হয়েছে দশ লক্ষ কপি।

মধুসূদনের প্রথম বাংলা বই লেখার কাহিনী বিচিত্র। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'রত্নাবলী নাটকের' অভিনয় হবে। ইংরেজ দর্শকরা যাতে অভিনয়ের মর্ম গ্রহণ করতে পারে সেজন্য নাটকটি অনুবাদের ভার দেওয়া হল মধুসূদনের উপর। মধুসূদনের অনুবাদ উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। 'রত্নাবলীর' রিহার্সালের সময় মধুসূদন মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতেন। একদিন তিনি মন্তব্য করলেন, নাটকটি খুব ভালো নয়। বন্ধুরা বললেন, বাংলায় এর চেয়ে ভালো নাটক কোথায়? থাকলে সেই নাটকেরই অভিনয় করতাম।

মধুসূদন তৎক্ষণাৎ বললেন, আমি ভালো নাটক লিখে দেব। বন্ধুরা তখন একথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি। মধুসূদন কিন্তু পরিহাস করেননি। তিনি সকল সংস্কৃত ও বাংলা নাটক পড়ে ফেললেন। অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হল তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। ১৮৫৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল। ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় মধুসূদনের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হলেন। 'শর্মিষ্ঠা' আধুনিক বাংলা নাটকের অগ্রদূত। কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা রায় দিলেন, এ নাটক কিছুই হয়নি। কারণ মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের রীতি অন্ধভাবে অনুসরণ করেননি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে যে নতুন ধারার তিনি সৃষ্টি করলেন প্রাচীনপন্থীরা তা প্রথমে মেনে নিতে পারেননি।

এমনি এক ঝোঁকের মাথায় মধুসূদন তাঁর প্রথম বই রচনা করেছিলেন।......

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর প্রথম বই 'নীলদর্পণের' জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। 'নীলদর্পণ' অপেক্ষা অধিকতর সাহিত্যগুণে সম্পন্ন গ্রন্থ দীনবন্ধু লিখেছেন। কিন্তু 'নীলদর্পণের' মতো নাটকের জন্য দেশ তখন অপেক্ষা করছিল। তাই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই এ-নাটক জনচিত্তে আসন লাভ করল। বইয়ে লেখকের নাম ছিল না। নামপত্রে ছিল—"নীলকর-বিষধর-দংশন কাতর-প্রজানিকর ক্ষেমঙ্করে কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং।" দীনবন্ধুই লেখক সে কথা প্রচার হতে অবশ্য দেরী হয়নি। 'নীলদর্পণ' দেশে এবং বিদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আর কোনো বাংলা বইয়ের বেলায় তা হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র এখন ঔপন্যাসিক হিসাবে পরিচিত। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয়েছিল কবি হিসেবে। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি রচনা করেন "ললিতা"। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস।' এ-বই ছাপা হয় ১৮৫৬ সালে। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেদিন দাবী করেছিলেন যে, তিনি নতুন কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছেন। ভূমিকায় তিনি বলেছেন : "সুকাব্যালোচক মাত্রেরই এ কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্য রচনা রীতি পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর উত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন।" "কতিপয় সুরসজ্ঞ বন্ধুর অনুরোধে এ বই তিনি প্রকাশ করেন।

এই শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন না। তিনি বঙ্কিমকে উপদেশ দিয়েছিলেন পদ্য ত্যাগ করে গদ্য লেখার। তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পাণ্ডুলিপি দুই দাদা শ্যামাচরণ ও সঞ্জীব পড়ে বাতিল করে দেন। তাঁদের মনে হয়েছিল এ-বই ছাপার অযোগ্য। বঙ্কিম লেখা প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে সঞ্জীবচন্দ্র কি মনে করে নিজের উদ্যোগে দুর্গেশনন্দিনী ছাপালেন। দুর্গেশনন্দিনী যে সমাদর লাভ করল তা ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্নের অতীত। এ থেকেই পেয়েছেন ভবিষ্যৎ রচনার প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বই 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ সালে। কবির বয়স তখন মাত্র সতেরো। এই গাথা-কাব্যটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে হঠাৎ ছাপা বই হাতে পেয়ে তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আগে বই ছাপানোর কথা তিনি কিছুই জানতেন না। বন্ধু প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বই ছাপিয়ে তাঁকে চমকিত করে দিয়েছিলেন। প্রবোধচন্দ্র 'কবি-কাহিনীর' প্রকাশকও। রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৮ সালে ২০শে সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করেন। 'কবি-কাহিনী' প্রকাশিত হয় ৫ নভেম্বর। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বই সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তখনকার দিনে বিখ্যাত সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'বান্ধব' পত্রিকায় এ বইয়ের লেখককে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রকাশককে অবশ্য ভুগতে হয়েছে। কারণ, কবিকাহিনী বিক্রি হয়নি এবং নতুন সংস্করণ ছাপবার কথাও কবির মনে হয়নি।

শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত রচিত 'মন্দির' নামে একটি গল্প। ব্রহ্মদেশে যাবার আগে এ গল্পটি তিনি দূর সম্পর্কীয় মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য পাঠান। প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে পঁচিশ টাকা পুরস্কার পান। এটি কুন্তলীন পুরস্কার গ্রন্থে প্রকাশিত হয় ১৩১০ সালে। এর পরে ১৩১৪ সালে ভারতীতে কয়েক কিস্তিতে তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়

সাহিত্য যাত্রা

কবিতা

কালিদাস রায়

পাঁচ বছর বয়স থেকে এগারো বছর বয়স পর্যন্ত একটানা গাঁয়ের বাড়ীতে ছিলাম। বাল্য জীবনে প্রতিফলিত গ্রাম্যজীবন ও পল্লী প্রকৃতির রূপকল্প আমার কবিতা রচনার প্রধান মূলধন। এই সময়ে যাত্রাভিনয় দেখেছি অনেকবার। বাউল গান, কবির গান, কীর্তন গান শুনেছি প্রচুর। শৈশবে যদুগোপালের পদ্যপাঠ ও বাংলা রামায়ণ-মহাভারত পড়েছিলাম। এই পর্যন্ত আমার কাব্য সাহিত্যের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়।

গোকুলানন্দ সেন নামে এক কবিরাজ আত্মীয় যাত্রার পালা লিখতেন, বসে বসে দেখতাম, আর অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম বড় হয়ে আমিও যাত্রার পালা লিখব।

গাঁয়ের স্কুলের পড়া শেষ করে এই সঙ্কল্প পোষণ করে এগারো বছর বয়সে ধান-দূর্বার অঞ্চল থেকে এলাম ফলফুলের অঞ্চলে, কূজন-গুঞ্জনের পরিবেশে অর্থাৎ রাঢ়ীগ্রাম থেকে এলাম কাসিমবাজারে, বহরমপুরের হাই ইস্কুলে পড়াশুনা করতে। বাবা চাকরি করতেন কাসিমবাজারের রাজবাটিতে। এখানে এসে প্রকৃতির শোভায় প্রথম মুগ্ধ হই। এখানকার বিহগকূজিত কুসুমসুবাসিত উদ্যান ও বনপথগুলিতে কৈশোরের অনেক বৈকাল বেলা কেটেছে।

এখানে পেলাম আমার পিসতুতো দাদা একাধারে কবি ও কবিরাজ রাধিকাচরণ বরাটের সাহচর্য। এই দাদাকে কবিতা লিখতে দেখে একদিন বললাম আমিও কবিতা লিখব দাদা, শিখিয়ে দাও কেমন করে লিখতে হয়। তিনি বললেন—সে কিরে? তোর বয়সই বা কি, বিদ্যেই বা কি! কবিতা কটাই বা পড়েছিস' লেখাপড়া শিখতে এসেছিস মন দিয়ে তাই শেখ, ওসব বাতিক ভাল নয় ছাত্রাবস্থায়। চুপ করে শুনলাম—কিন্তু মিল দিয়ে দিয়ে অক্ষর গুণে গুণে পয়ার লিখতে লাগলাম—লুকিয়ে লুকিয়ে। বাবার মুখে দাশু রায়ের পাঁচালির আবৃত্তি শুনেছি, সঙ্কল্প করলাম দাশুর মত পাঁচালি লিখব। এরপর পড়লাম মাইকেল, হেম, নবীনের কাব্যগ্রন্থ। হিতবাদী বসুমতীর উপহার গ্রন্থগুলি বাড়ীতেই পেলাম। পড়তে লাগলাম মন দিয়ে। একদিন দাদা ডেকে বললেন—'বড়মামা বলছিলেন তুই অঙ্কের খাতায় ছড়া পাঁচালি লিখিস—আমাকে বলেছেন ধমকে দিতে। তুই ও সব আর লিখিস না। এখন ইস্কুলের [illegible] ছাড়া কিছু লিখবার সময় নয়, লেখক হওয়ার জন্যে এখন তৈরী হওয়ার সময়। আমি বললাম কি করে তৈরী হতে হয়?

দাদা বললেন—সে অনেক কথা! অনেক কবিতার বই পড়তে হয়, ছন্দ শিখতে হয়, শব্দসম্পদ বাড়াতে হয়, বাংলা ভাষা ভাল করে আয়ত্ত করতে হয়, সংস্কৃত কাব্যনাট্য পড়তে হয়—ইংরাজি কবিতা অনেক পড়তে হয়, প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হতে হয়, আরও অনেক কিছু করতে হয়। সে সব শুনে কি হবে? আমি বললাম, আমাদের ইস্কুলে বাংলা পড়ানো হয় না, সংস্কৃত ব্যাকরণ কিছু কিছু পড়ানো হয়। ইংরাজি কবিতা দু-দশটা পড়ানো হয়েছে।

দাদা বললেন—তোকে কবি বানানোর জন্যে তো স্কুল লেখাপড়া শেখাচ্ছে না। তোর সহপাঠী ললিতের বাড়ীতে তিন আলমারী ভরা বাংলা বই আছে। স্কুলের পড়ার ক্ষতি না করে সেখানে গিয়ে বই পড়িস,—গ্রীষ্মাবকাশে গাঁয়ে যাস না। সংস্কৃত পড়ার জন্য পশুপতির টোলে ভর্তি করে দেব, আর ইংরাজি কবিতা অনেক পড়বি কলেজে গিয়ে। আমি ললিতের বাড়ীর [illegible] রক্ষিত আরশুলা ভরা আলমারীতে একদিন অভিযান করলাম, বহু গ্রন্থই সেখানে আবিষ্কার করলাম। প্রকৃতির শোভার সন্ধানে বনজঙ্গল, কুঠিয়ালদের কুঠির ধ্বংসাবশেষ, বিদেশী বণিকদের সযত্নে রক্ষিত গোরস্তান ও কাটি গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। প্রাইজ প[illegible] ইংরাজি কাব্যগ্রন্থগুলির ভিতরে প্রবেশ করতে বৃথাই শ্রম স্বীকার করে হতাশ হলাম। পদ্য লেখা আপাতত বন্ধ রাখলাম, কেবল নির্বিচারে বাংলা বই পড়তাম। এমন সময় পেলাম টালি এডিশনের রবীন্দ্র কবিতাবলী, পদ্মবনে মধুকরের মতো ঐ কবিতাবলীতে চিত্তনিমগ্ন হয়ে রইল। রবীন্দ্র-কবিতা পাঠে এবং পদ্য রচনায় আমার সহচর ও সহযোগী হলো—সৌরীন্দ্র ভট্টাচার্য। সৌরীন সুকবি বলে উত্তর কালে পরিচিত হয়েছিলেন।

এরপর কলমের মুখে পদ্য লেখার বন্য এল। যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হবে মুরারে! বাবার শাসন, দাদার উপদেশ, শিক্ষকদের বিরোধিতা, ম্যালেরিয়ার উৎপীড়ন— স[illegible] বালুর বাঁধের মতো ভেসে গেল। রবীন্দ্ররচনাবলী পড়ে আর কিছু না হোক প্রকৃতিকে নবরূপে আবিষ্কার করে সত্যই তাকে ভাল বাসতে শিখলাম। স্কুলে যাওয়ার বনপথটি পরম বান্ধব হয়ে উঠল। আর নানা নতুন নতুন ছন্দ শিখলাম। তখন আমার বয়স ১৫।১৬ বছর।

দাদা আমাকে টোলে ভর্তি করে দিলেন।—প্রধান প্রধান সংস্কৃত কাব্যনাট্যগুলি হ'ল আমা[illegible] দ্রুত পাঠ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও তাঁর প্রাচীন সাহিত্যগ্রন্থখানি পড়িয়ে অধ্যাপককেও মু[illegible] করে ফেললাম। তাঁর উপদেশে ভালো ভাবে সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ করতে লাগলাম।

এদিকে বাড়ীর ভাঙ্গা টিনের তোরংটি কাগজে রাবিশে ভরে উঠল। ওদিকে পরীক্ষা ক[illegible] নিকটবর্তী হ'ল। কবিতার তাগিদ ও ম্যালেরি[illegible] —এই দুই ব্যাধি দুদিক থেকে কাবু ক[illegible] তুলেছে তখন দুর্ভাবনার অন্ত নেই। কিছুক[illegible] পদ্য লেখা বন্ধ করলাম। কবিতার জোরে ন[illegible] গণিতের জোরে প্রথম বিভাগে সরকারী বৃ[illegible] সহ প্রবেশিকা পাস করে কলেজে গেলাম। ব[illegible]

শরৎচন্দ্র এর কিছুই জানতেন না। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 'বড়দিদির' পাণ্ডুলিপি এনে লেখকের অনুমতি না নিয়েই ছাপিয়ে দিলেন।

প্রথম দু' কিস্তিতে লেখকের নাম ছিল না। তার ফলে অনেকে মনে করেছিলেন এ লেখা রবীন্দ্রনাথের। তখন নব-পর্যায় বঙ্গদর্শনের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ। কর্মাধ্যক্ষ শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এসে রবীন্দ্রনাথকে অভিযোগ করলেন, আপনার নিজের কাগজ থাকতে ভারতীতে উপন্যাস দিয়েছেন,—এটা কি কথা। রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ শুনে তো অবাক্। [illegible]মহীন রচনাটি পড়ে তিনি বুঝিয়ে বললেন, লেখা তাঁর নয়; তবে অজ্ঞাতপরিচয় লেখক যে শক্তিশালী তাতে সন্দেহ নেই।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'বড়দিদি' প্রকাশ করেন যমুনা সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ পাল। এই উপন্যাস যে অভ্যর্থনা পেল তা থেকেই শরৎচন্দ্র নিয়মিত লেখার প্রেরণা লাভ করলেন।

কয়েকজন লেখকের প্রথম বই সম্বন্ধে বলা হল। প্রত্যেক লেখকের প্রথম বইয়ের একটি কৌতূহলোদ্দীপক ইতিহাস আছে। সকলের ইতিহাস হয়তো জানা যায় না। প্র[illegible] বই লেখকের মনের উপর যে প্রভাব বিস্[illegible] করে পরবর্তী বহুগুণে উন্নতমান বই [illegible] পারে না। সমারসেট মম পরিণত ব[illegible] বলেছেন, এখন একটা বই বের হলে [illegible] ভালো সমালোচনা, কত অর্থ, বন্ধুদের [illegible] অযাচিত প্রশংসা পাওয়া যায়। কিন্তু প্র[illegible] বই হাতে পাবার রোমাঞ্চ আর অনু[illegible] করি না।

—না।

ভাবতে ভাবতে একদিন বিকেলে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে হাঁটছি—দেখলাম পথের দু' পাশে নানা রকমের নানা বয়সী মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে।

মানুষের আদিরিপু চরিতার্থের এই এক বিচিত্র পণ্যশালা। এইখানে পরাজয় স্বীকার করেছে মানুষ তার যৌন ক্ষুধার কাছে। এইখানে জমা হয়ে আছে মানুষের কত প্রবঞ্চনার ইতিহাস। নারী প্রবঞ্চিত করেছে পুরুষকে, পুরুষ করেছে নারীকে। আবার এই পঙ্ককুণ্ডেই হয়ত-বা লোকচক্ষুর অন্তরালে একটি শতদল পদ্ম তার পাপড়ি মেলে আলোকের সন্ধানে হাত বাড়িয়েছে।

আমার শুধুই মনে হতে লাগলো—এখানেও গল্প আছে। জীবনের যেখানে এত অমর্যাদা, এত অপচয়, প্রকৃতি সেখানে তার প্রতিশোধ নেবেই।

এতগুলি নারী এখানে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করেনি নিশ্চয়ই। জন্মসূত্রে যারা এখানে রয়েছে তাদের একটা জীবন আছে। আর যারা এসেছে গৃহস্থের সংসার থেকে, কারও কন্যা, কারও ভগ্নী, কারও-বা পত্নী—জীবনের বহু বিচিত্র ধারা বয়ে তারা এসেছে এখানে। তারা দেখেছে জীবনের নগ্নরূপ। তারা জেনেছে—জীবনে আনন্দও যত, যন্ত্রণাও তত। তাদের সে জীবনের করুণ কাহিনী মনোরম না হতে পারে, লবণাক্ত অশ্রুধারায় যে অভিসিঞ্চিত—তাতে আর কোনও ভুল নেই।

লিখলাম একটি গল্প।

লিখলাম আমাদের গ্রামের সেই জয়াকে নিয়ে। অপরূপ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী জয়া। বিয়ের পরেই বিধবা হয়ে সে বাপের সংসারে ফিরে এসেছে।

জয়া উনোন ধরায়, বাটনা বাটে, রান্না করে, পুকুর থেকে কলসি-কলসি জল আনে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়, পান খায়, জরদা খায়, দিব্যি হেসে-খেলে ঘুরে বেড়ায়। বুঝতে পারা যায় না কোথায় তার দুঃখ।

জয়াদের বাড়ীর সামনে শিবের মন্দির। মন্দিরের সুমুখে টিনের নাটশালা, আর তার পাশেই একটা অনেক কালের পুরনো বটগাছ। প্রতিদিন সন্ধেবেলা আঁচল আড়াল করে প্রদীপ হাতে নিয়ে জয়া সেই ছায়া-ছায়া অন্ধকার বট-গাছের তলা দিয়ে নাটশালা পেরিয়ে মন্দিরের সিঁড়ি ভেঙ্গে দোর খুলে মন্দিরে ঢোকে। মন্দিরের বড় প্রদীপটি জেলে দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে। ভক্তি-ভরে প্রণাম করতে গিয়ে মাথা আর সহজে তুলতে চায় না। এতক্ষণ ধরে মন্দিরের দেবতাকে কী যে তার মনস্কামনা জানায় কে জানে। একাদশীর দিন উপবাস করে, মাছ মাংস খায় না, সাদা কাপড় পরে। পালা-পার্বণে সদ্যস্নাতা আলুলায়িত কুন্তলা ভক্তিমতী জয়া যখন নৈবেদ্য নিয়ে গিয়ে ঠাকুরের মন্দিরে গিয়ে দাঁড়ায়, গ্রামের মেয়েরা তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, 'কুল উজ্জ্বল-করা মেয়ে।'

গায় শিবের মন্দিরে প্রদীপ দিতে গিয়ে সেই জয়া চেনকদিন দেখলে প্রিয়দর্শন একজন তরুণ সন্ন্যাসী ংসসে আশ্রয় নিয়েছে নাটশালায়। অদ্ভুত এই তেজোদৃপ্ত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী মেয়েদের মুখের দিকে তাকায় না, কারও বাড়ীতে গিয়ে ভিক্ষা চায় না, ধুনির ওপর এক ঘটি জল বসিয়ে দিয়ে এক মুঠো চাল আর চারটি আলু সেদ্ধ করে নুন মাখিয়ে সারা দিনের খাওয়া খেয়ে নেয়। এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে জয়ার পরিচয় হলো। সন্ন্যাসীর শরীর ভাল ছিল না, রান্না করেনি, জয়া তাদের বাড়ী থেকে এক বাটি দুধ এনে দিলে। সন্ন্যাসী এই প্রথম তার নিয়ম ভঙ্গ করলে। তারপর দিনে দিনে তার নিয়ম ভঙ্গের মাত্রা বাড়তে লাগলো। শেষে এমন হলো—জয়া একদিন সন্ন্যাসীকে তার নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতের রান্না খাইয়ে দিলে। এক-দিনের বেশি সন্ন্যাসী কোথাও থাকে না। এক-দিনের জায়গায় তিন দিন রইলো মন্দিরের নাটশালায়।

তারপর চার দিনের দিন দেখা গেল গ্রাম ছেড়ে সন্ন্যাসী চলে গেছে।

সন্ন্যাসী চলে গেল সেটা এমন কিছু বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এই যে সেই দিন থেকে জয়াকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

গল্পাংশ হলো এই।

এইটিকেই ভাল করে লিখে ভাবলাম এক দিন কোনও পত্রিকার অপিসে গিয়ে দিয়ে আসবো। নজরুলের জন্য বসে থেকে লাভ নেই। তার চেয়ে সে যেমন আমাকে ছাপা গল্প দেখিয়েছে তাকেও তেমনি আমার ছাপা গল্প দেখিয়ে অবাক করে দেবো।

কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না।

কেমন করে হলো না সেই কথাই বলি।

চিৎপুরের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। বৈশাখের বৈকালে আকাশে কাল-বৈশাখীর কালো মেঘ দেখে তাড়া-তাড়ি ফিরে আসছিলাম। পথের মাঝখানে ঝড় উঠলো। ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। হাতে ছাতি নেই। আশ্রয়ের সন্ধানে পাশের বাড়ীগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে ছুটছি। হঠাৎ একটা আশ্রয় পেয়ে গেলাম।

রাস্তার ধারেই ছোট একখানি ঘর। দরজা খোলা পেয়ে ঢুকে পড়লাম। ঘরে আলো জ্বলছে। ইলেকট্রিকের আলো। একটি মাত্র দরজা ছাড়া কোন দিকে আলো-বাতাস প্রবেশ করবার পথ নেই। নড়বড়ে একটি তক্তাপোষের ওপর মাদুর বিছিয়ে এক মনে কাজ করে চলেছে একটি লোক। জিজ্ঞাসা করলে, 'কি চাই?'

বললাম, 'কিছুই চাই না। বৃষ্টির জন্যে ঢুকেছি।'

'বসুন।' বলেই সে তার কাজে মন দিলে।

কাজ এমন বিশেষ কিছুই নয়। হাতের কাছে এক গাদা ছাপা বই নামানো। পাশেই একটা মাটির মালসায় ময়দার খানিকটা আটা। তাই দিয়ে একটি একটি করে বই-এর ওপর সে 'বুক পোস্টের' লেবেল লাগাচ্ছে।

টিনের একটি চেয়ার ছিল। তারই ওপর বসে পড়লাম। ছাপা বইগুলো কি দেখবার ইচ্ছা হলো। বললাম, 'একখানা দেখবো?'

মুখ না তুলেই সে বললে, 'দেখুন।'

একখানি বই তুলে নিলাম। দেখলাম—পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকা। নানান রকমের প্রচুর বিজ্ঞাপন। মাঝখানে কয়েকটি গল্প। প্রথম গল্পটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যা[য়] লেখেন এই কাগজে?'

লোকটি বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। নিয়মি[ত] লেখেন। প্রতি সংখ্যাতেই তাঁর একটি করে গ[ল্প] থাকে।'

বললাম, 'আমি যদি গ্রাহক হতে চাই, ক[ত] লাগবে?'

এতক্ষণ পরে লোকটি আমার মুখের দিকে তাকালে। তারপর যেন গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেল—'প্রতি সংখ্যা দু' আনা। পনের দিন অন্তর একখানি করে কাগজ বেরোয়। মাসে দু'খানি। বছরে চব্বিশ খানি। বার্ষিক গ্রাহকের চাঁদা তিন টাকা। ডাকমাশুল আট আনা।'

বললাম, 'আমি গ্রাহক হতে চাই।'

বাঁ হাত দিয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগলো লোকটি।

বললাম, 'আজ আমার সঙ্গে টাকা নেই। আজ এই একখানি কাগজ নিয়ে গেলাম। এই নিন দু' আনা পয়সা।'

পকেট থেকে দু' আনা পয়সা বের করে দিলাম।

পয়সা দু' আনা রেখে দিয়ে বললেন, 'টাকা আনবেন। আমি গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করে নিয়ে আপনাকে রসিদ দিয়ে দেবো।'

আসল কথাটা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'নতুন লেখকের লেখা আপনারা ছাপেন?'

গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ছাপি। মনোনীত হলে।'

অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু যে রকম গম্ভীর হয়ে বসে আছেন, জিজ্ঞাসা করি কেমন করে? তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'শরৎবাবু আসেন এখানে? তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে?'

কাজ করতে করতেই সে বললে 'যেদিন আসবেন সেই দিন এলে দেখা হবে।'

'কখন আসেন?'

'ঠিক নেই।'

'সকালে না বিকেলে?'

'যেদিন আসেন, বিকেলেই আসেন।'

আর বেশি বকানো উচিত নয় লোকটিকে। বৃষ্টি বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। কাগজখানি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঘরের ভেতর মনে হচ্ছিল রাত্রি হয়ে গেছে। বেরিয়ে দেখি—তখনও সন্ধ্যা হয়নি।

পরের দিন চারটে বাজতে না বাজতেই পকেটে তিনটি টাকা আর আমার নতুন লেখা গল্পটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

গিয়ে দেখলাম লোকটি সেদিনও তেমনি কাজ করছে। পত্রিকার স্তূপ পাতলা হয়েছে বটে, কিন্তু তখনও শেষ হয়নি। দেয়ালের দিকে মুখ করে দেখলাম প্রিয়দর্শন এক ভদ্রলোক বসে আছেন একটি টিনের চেয়ারে। সুমুখে ছোট একটি টেবিল। মাথা নীচু করে কি যেন লিখছেন তিনি।

তিনটি টাকা দিয়ে গ্রাহক হলাম। ডাকমাশুল দিলাম না। কাছেই থাকি। নিজে এসে কাগজ নিয়ে যাব।

কিন্তু আমার আসল কথাটা তখনও বলা হয়নি। ভয়ে ভয়ে বললাম, 'দেখুন, একটি গল্প এনেছিলাম—'

লোকটি আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলে তুন লোকটিকে। বললে, 'ওইখানে। উনিই ম্পাদক।'

সম্পাদকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি লেন, 'রেখে যান।'

কোথায় রাখবো বুঝতে পারছিলাম না। খনও দাঁড়িয়ে আছি দেখে দয়া করে তিনি াত বাড়ালেন। বললেন, 'দিন। নাম-ঠিকানা লখা আছে তো? ফেরত পাঠাবার ডাকটিকিট দয়েছেন?'

'আজ্ঞে না। আমি নিজেই আসব। কাছেই থাকি।'

'দশ পনেরো দিন পরে একবার খবর নেবেন।'

দশ-পনেরোটা দিন আর কাটে না কিছুতেই। তার আগেই কিন্তু কাগজ বেরোবার দিন। গেলাম না কাগজ আনতে। ভাবলাম, আরও দিনকতক পরে যাব। আগে গেলে যদি বলে সেন, 'এখনও পড়তে পারিনি আপনার গল্প।' দি বলেন, 'তাড়া থাকে তো আপনার গল্প আপনি ফেরত নিয়ে যেতে পারেন।'

গেলাম আরও দিনকতক পরে।

গিয়ে দেখি, আপিস একেবারে সরগরম। আমার প্রথম দিনের পরিচিত লোকটি মেঝের ওপর নেমে বসেছে। একটি চটের ওপর সে বসে সে তার কাজ করে চলেছে। তক্তা-পোষের ওপর দু'জন নতুন লোক। একজনের হাতে একটি শালপাতার ঠোঙা। বাঁহাতে ঠোঙাটি রে তিনি কচুরি খাচ্ছেন। আর তাঁর পাশে যিনি সে আছেন তাঁর হাতে আমার সেই গল্পটি। ম্পাদকমশাই তাঁর নিজের জায়গায় বসে।

ঘরে ঢুকতেই মেঝেয় বসা লোকটি আমার দকে একখানি কাগজ বাড়িয়ে ধরে বললেন, নিন আপনার কাগজ। আমাদের কাগজ বেরুতে কদিন দেরি হয় না। ঘড়ির কাঁটার মত াংচুয়েল্।'

গল্পের কথাটা জিজ্ঞাসা করব কিনা ভাবছি, মন সময় সম্পাদকমশাই আমার দিকে তাকিয়েই লেন, 'এই তো এ'রই গল্প। আপনিই একটি ল্প দিয়ে গিয়েছিলেন না?'

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই দিয়ে গয়েছিলাম।'

ঠোঙা হাতে নিয়ে যিনি কচুরি খাচ্ছিলেন তিনি আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ রলেন। বললেন, 'নিজে লিখেছ?'

বুঝলাম, আমারই গল্প নিয়ে এ'দের াধহয় আলোচনা হচ্ছিল।

বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই লিখেছি।'

কচুরি ফুরিয়ে গিয়েছিল। ঠোঙাটির দিকে কবার করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ইনি ড়লেন তোমার লেখাটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। মরা শুনলুম। তোমার বয়েস দেখছি খুব । কি করা হয়?'

বললাম, 'একটু পড়াশোনা করি।'

'কিস্সু হবে না। কলেজে পড়ে বাপমায়ের সাগুলো কেন মিছেমিছি নষ্ট করছো। মার লেখাপড়া হবে না। আমি বুঝতে রেছি।'

এই বলে তিনি উঠলেন। ঠোঙাটি ফুট-তের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'মুরারি, এক গ্লাস জল। সারাদিন খাওয়া হয়নি। মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে ছিল। তোমাকে কড়া কথা শোনাচ্ছি। কিছু মনে কোরো না।'

নীচে বসে যে কাগজ আঁটছিল তার নাম বোধকরি মুরারি। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে কলাইকরা গ্লাসটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিতেই জল খেলেন তিনি।

এই সময় দ্বিতীয় ভদ্রলোকটি আমাকে বোধ করি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। জল খেতে খেতে বাঁহাতের ইসারায় তাঁকে থামিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'উঁহুঁ উঁহুঁ, আমার বলা শেষ হোক্।'

তিনি আবার আরম্ভ করলেন, 'তোমার লেখাপড়া হবে না। তবে এই গল্পটল্প লেখার চর্চা যদি রাখো—এইটে তোমার হবে বলে মনে হচ্ছে। আমি কে জানো?'

পাশের ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন তিনি। ভেবেছিলেন তিনি তাঁর পরিচয়টা দিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁকে গম্ভীর মুখে চুপ করে থাকতে দেখে তাঁর নিজের পরিচয় নিজেকেই দিতে হলো।

বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের আমি নিকট আত্মীয়। আমার বাবা লেখক, আমার মা লেখিকা। লেখা আমার রক্তের মধ্যে। আমি একটা নতুন স্টাইলের প্রবর্তন করেছি বাংলা-সাহিত্যে। উপন্যাসও নয়, নাটকও নয়, নাম দিয়েছি—নাট্যোপন্যাস। সব ঐতিহাসিক। পড়েছ বোধহয় আমার লেখা?

পড়িনি। পড়বার সৌভাগ্য হয়নি। কাজেই এমন ভাবে ঘাড় নাড়লাম যার মানে দু' রকমই হয়। পড়েছিও হয়, পড়িনিও হয়।

একটু গোলমালে পড়ে গেলাম। তাহ'লে ইনিই কি পত্রিকার সম্পাদক?

কিন্তু ভুলটা তিনি নিজেই ভেঙে দিলেন। বললেন, 'আমি সম্পাদক নই, কিন্তু আমার কথা সবাই মাথা পেতে স্বীকার করে নেয়। মুখের ওপর খাঁটি সত্যি কথা বলেছিলাম বলে বাবা আমাকে ত্যাজ্য পুত্র করেছেন। এখন বুঝেছো তো—তোমাকে তিরস্কার করবার অধিকার আমার আছে। এই যে গল্পটি তুমি লিখেছ এই যদি বঙ্কিমচন্দ্র শুনতেন, তাহলে তোমার কান-দুটি তিনি কস্ কস্ করে মলে দিতেন।'

চুপ করে যিনি তাঁর পাশেই বসেছিলেন এইবার তিনি কথা বললেন। বললেন, 'আপনার হয়েছে? এবার থামুন আপনি। আমি বলি।'

'বলুন। আমি থামলাম।'

বলেই তিনি তাঁর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে ধরাতে লাগলেন।

পাশের ভদ্রলোক বললেন, আপনার এই গল্পটি আমাদের খারাপ লাগেনি। তবে খুব রং-ছুট্ সাদা মাঠা গল্প। প্রকৃতির বর্ণনা-টর্ণনা একটু দেবেন। আপনার এখনও বয়েস আছে। ক্রমাগত লিখে যান। আপনার হবে। এই-বার আসল কথাটা বলি।'

'বলুন।'

'এই যে এক সন্ন্যেসীর সঙ্গে মেয়েটা পালিয়ে গেল—কেন গেল? তাই যায় কখনও? হিন্দুর ঘরের বিধবাকে দিয়ে এই গর্হিত কাজ করিয়ে খুব অন্যায় করেছেন আপনি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করলে ভাল হ'তো?'

'ওই সন্ন্যাসীর কাছে মন্ত্র নিতে পারতো মেয়েটা। সন্ন্যাসী হতো তার গুরু, মেয়েটা হতো তার শিষ্যা। এই নিন।'

বলেই গল্পটি তিনি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এরকম অশ্লীল গল্প কখনও লিখবেন না।'

সম্পাদকমশাই এতক্ষণ পরে কথা বললেন। 'আপনি অন্য গল্প দিয়ে যাবেন। আমি ছাপবো।'

নমস্কার করে বেরিয়ে আসছিলাম সেখান থেকে। সম্পাদকমশাই-এর ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াতে হলো।

'টাকা তিনটে ওঁকে ফেরত দাও মুরারি।'

বলেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার নাম-ঠিকানা রইলো। কমপ্লিমেণ্টরী কপি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই গল্পটিই আবার নতুন করে লিখে দিয়ে যেতে পারেন।'

কিন্তু সে গল্পটি তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী আমি আর নতুন করে লিখতে পারিনি। তার প্রায় চল্লিশ বছর পরে হুবহু সেই গল্পটিই ছাপা হয়েছিল খ্যাতনামা একটি মাসিক পত্রিকায়। তখন আর তাকে কেউ অশ্লীল বলেননি।

সেখান থেকে চলে আসবার সময় আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল সেদিন।

দোরের কাছে থমকে দাঁড়াতে হলো। দেখ-লাম এক ভদ্রলোক ঢুকছেন। মুখে চারটিখানি পাতলা দাড়ি, খালি গায়ের ওপর সিল্কের চাদর গলায় পৈতে, পায়ে খড়ম।

সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, 'এই যে শরৎদা, আসুন। আসুন।'

ইনিই তাহ'লে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়? আমার তখন আর কিছু ভাববার সময় ছিল না। একে-বারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

চট্ করে তাঁর পায়ের কাছে মাথাটা নুইয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বসলাম।

—'আরে আরে করছো কি? এসো ভাই এসো। দীর্ঘজীবী হও!'

মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, 'চিনতে পারলাম না তো!'

বললাম, 'আমাকে চেনবার দরকার নেই। আপনিই শরৎচন্দ্র?'

'হ্যাঁ ভাই, আমিই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

বললাম, 'আপনার 'বিন্দুর ছেলে' পড়ে চোখের জল রাখতে পারিনি।'

শরৎচন্দ্র ঘরের সবাইকে উদ্দেশ করে বললেন, 'দ্যাখো ভাই দ্যাখো তোমরা আমার লেখা ছেপে ছেপে কি হাল করলে দ্যাখো।'

এই বলে তিনি আমার গায়ে হাত রেখে বললেন, 'আমি সে শরৎচন্দ্র নই রে ভাই, আমার পিতৃদত্ত নাম শরৎচন্দ্র। এই আমার অপরাধ।'

বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় যিনি—তিনি চীৎকার করে উঠলেন, 'ইনি সাবিত্রী-কিরণময়ীর স্রষ্টা চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র নন, ইনিই আসল শরৎচন্দ্র।'

'ছি ছি ছি ছি, এ কী কথা বলছো তুমি? আমার অপরাধ হবে। আমিই নকল শরৎচন্দ্র।'

এই বলে তাঁর হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সাবিত্রী-কিরণময়ীর স্রষ্টা শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে তিনি বারম্বার প্রণাম করতে লাগলেন।

যে-সময়ের কথা বলছি, তখন আমার বয়স মাত্র একুশ কি বাইশ। আমাদের সাহিত্যিক

জীবন তখনও আরম্ভ হয়নি। সাহিত্যের নেশা ছিল মাত্র, কিন্তু সে নেশা তখনও ভাল জমেনি।

আমার জীবনের গতিপথ বড় আঁকা-বাঁকা। তখনই কলকাতায়, তখনই পল্লীগ্রামে। কখনও-বা কয়লাকুঠির দেশে, কখনও-বা সাঁওতাল-পরগণার জঙ্গলে।

আমি নিজেকেই নিজে পরীক্ষা করেছি চিরকাল। আমার জীবন নিয়েও যেমন খেলা করেছে আমার ভাগ্যবিধাতা, আমিও তেমনি খেলা করেছি নিজেকে নিয়ে। পরীক্ষা করে দেখেছি—লিখতে পারি কিনা, আর সে-সব লেখা ছাপা হয় কিনা। যেই ছাপা হয়েছে অমনি পালিয়ে গেছি সেখান থেকে। অজ্ঞাতবাস করেছি হয়ত কোনও লোহার কারখানায় নয়ত কোনও কয়লা-কুঠিতে। হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হলো, কয়লা-কুঠি থেকে একটি গল্প পাঠিয়ে দিলাম কলকাতার একটি বিখ্যাত পত্রিকায়। ছাপা হলো এবং আবার লেখা পাঠাবার জন্যে অনুরোধ এলো। আবার গল্প পাঠালাম। আবার ছাপা হলো। এবার শুধু ছাপাই হলো না, সম্পাদক-মশাই লেখার প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন। এই হলো সর্বনাশের সূত্রপাত। সর্বনাশ বলছি এই-জন্যে যে, তখন থেকেই লেখার ভূত চড়ে বসলো কাঁধে। লেখার নেশা ধরলো মনে।

আগেই বলেছি—আমার ভাগ্যদেবতা বড় মজার খেলা খেলেছে আমার জীবন নিয়ে। এবারেও সেই অদৃশ্য দেবতা তার হাতের ঘুঁটি চাললেন। একদিক থেকে প্রশংসার ঝড় উঠলো আর একদিক থেকে আমার ব্যক্তিগত জীবনে এলো এক হাস্যকর বিপর্যয়। জন্মগত সূত্রে যে ধনীর প্রাসাদে ছিল আমার একটি নিরাপদ আশ্রয় সে আশ্রয় আমাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করতে হলো। গৃহকর্ত্রীর ছিল একটি রহস্য-ময় কলঙ্কিত জীবন। তাঁর ভয় হলো—আমি বুঝি তাঁর সেই গোপন কলঙ্কের কথা একদিন দেবো ফাঁস করে। সুতরাং 'হয় তুমি লেখা ছাড়ো, আর নয়তো এখান থেকে দূর হও!'

সেখান থেকে দূর হয়েই গেলাম। লেখা ছাড়তে পারলাম না। দূর হয়ে গেলাম আবার এক অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু সে বাসস্থান আর অজ্ঞাত রইলো না কারও। লেখা আর লেখক ছিল চোখের সামনে, তারই সূত্র ধরে বন্ধু-বান্ধবেরা আবিষ্কার করে ফেললো আমার বস্তির আস্তানা। রাজার ঐশ্বর্য অবহেলায় পরিত্যাগ করে তখন আমি গিয়ে দাঁড়িয়েছি চরমতম দারিদ্র্যের মুখোমুখি।

লেখা দিয়ে জীবিকা অর্জন করা তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। পত্র-পত্রিকাও ছিল কম। প্রকাশক তো হাতে গোনা যেতো।

তখনকার দিনে একটি মাত্র মাসিক পত্রিকা (প্রবাসী) ছিল যেখানে নিয়মিত তাঁদের আইন-মাফিক টাকা পাওয়া যেতো। দেড় টাকা কলম। গল্পের আয়তন যতই বড় হোক, পনেরো টাকার বেশি নয়।

আমি তখন গল্প-লেখক, আর নজরুল ধরেছে কবিতা। কবিতা লিখে তখনকার দিনে নজরুল যা উপার্জন করেছে তা আর কেউ না জানুক আমি জানি। তাকেও কম ... ভোগ করতে হয়নি। আজ কেষ্টনগর ... হুগলী ... করে শেষে গ্রামোফোন রেক... রয়েলটি যতদিন না পেয়েছে ততদিন ... মুখ দেখতে পায়নি।

আমরা পয়সা পাইনি, কিন্তু পেয়... আনন্দ। যে আনন্দ পয়সা দিয়ে মেলে ... আমরা 'কল্লোল' করেছি, 'কালি-কলম' ... পত্রিকা দুটি যে খুব বেশি বিক্রি হয়েছে ... হয়নি। প্রতি সংখ্যায় যে উপাদেয় ... প্রকাশিত হয়েছে তাও হয়নি। কিন্তু ... যে ক-জন সাহিত্যসেবী এই দুটি পত্রি... কেন্দ্র করে একত্র মিলেছিলাম, তারা প্রত্যে... যে অসামান্য প্রতিভাধর তাও নয়, ... যে প্রেরণা যে আনন্দ আমরা সেখান ... পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। সেই প্রেরণা ... আমাদের আজও বাঁচিয়ে রেখেছে, সেদিনের ... সেই সঞ্চয় আমরা আজও খরচ করছি।

আমি আগে লিখেছি গল্প, তার পর ... লিখেছি উপন্যাস। উপন্যাস বলতে যদি ... বড় কিছু বুঝায় তাহলে সেরকম কিছু আমি ... লিখিনি বলতে হবে।

কাজেই আমার প্রথম উপন্যাসের ... করতে হলে নাম করতে হয়, '... ইতিহাস।' কিন্তু তাকেও ঠিক উপন্যাস ... যায় না। বড় গল্প বললেই যেন ভাল হয়।

সাহিত্য যাত্রা

প্রবন্ধ

বিনয় ঘোষ

নুষের জীবন যদি, সেক্সপীয়রের ভাষায়, কোন গবেট-কথিত কাহিনী হয়, যার বাগাড়ম্বরই সর্বস্ব, অন্তঃসার বলে কোন নেই, তাহলে কাণাগলির রাম থেকে ধ্যার দশরথ-নন্দন শ্রীরামচন্দ্র পর্যন্ত র জীবনের কাহিনীই তাই। বাল্মীকিরা য়ণ' রচনা করলে কোন রাম অমর হয়ে যান, তা না করলে 'রাম' উল্টে হয়ে যান 'মরা'। সেক্সপীয়র বাল্মীকি হোমার এ'রাও যদি য' হন, তাহলে এ'দের জীবনকেও ইডিয়ট- ত কাহিনী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ত্যিকের জীবন হলেই তা যে কেরল-এর লিস ইন্ ওআণ্ডারল্যাণ্ড'-এর মতো রোম- ক হবে, এরকম একটি ভ্রান্ত ধারণা কল্পনা- রী সাহিত্যিকরা সাধারণ মানুষের মনে বেশ লে রোপণ করে দিয়েছেন। সেই ধারণার এখন বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে, ক উৎপাটিত করা সহজ নয়। একালের হিত্যিক যাঁরা, তাঁদের জীবন ও সাহিত্য নটাই 'ওআণ্ডারল্যাণ্ড'-এর উপাদান নয়, স গদ্য অথবা সরস কাহিনী ও পদ্য, যাই া রচনা করুন না কেন।

প্রত্যেক সাহিত্যিকের ধারণা যে, তার জীবন হত্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান হবার যোগ্য। কিন্তু াতার কি যে যুক্তিসংগত কারণ তা বাস্ত- ই ভেবে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা জবা ভাবলেও দেখতে পাবেন যে, সমাজের ্য মানুষের জীবন নিয়েই তাঁরা সাহিত্য রচনা রছেন, কেবল নিজেদের জীবনের উপলব্ধি য় তাকে যাচাই করেছেন মাত্র। যদি রোমান্সের া ওঠে তাহলেও দেখা যায় যে, সমাজের বহু াত ও উপেক্ষিত মানুষের জীবন যে-কোন মধনা সাহিত্যিকের জীবনের চেয়ে অনেক ল রোমাণ্টিক হতে পারে। অন্তত হতে বাধা । সমাজে যারা কাজ করে তারা প্রথমে অতি- র একটি বৃত্তের ভিতরে থেকে কাজ শুরু । কাজ করা মানেই হল জীবনের পথে চলা, ড়িয়ে থাকা নয়। সমস্ত কাজেরই ধর্ম হল র ধর্ম। চলমান জীবের যেমন পা আছে, জরও তেমনি পা আছে। যত কাজ বাড়ে, জর প্রসার হয়, তত তার উদ্যোগপর্বের র বৃত্তটি প্রসারিত হতে থাকে, কখনও সঙ্কু- হয় না। ক্ষুদ্র বৃত্ত ধীরে ধীরে বৃহৎ হয়, বৃহৎ থেকে ক্রমে বৃহত্তর হতে থাকে। টি 'নিউক্লিয়াস' বা সেণ্টার থেকে, খানিকটা রেডিয়াসের দৈর্ঘ বাড়িয়ে, যদি একটির পর টি করে একাধিক বৃত্ত কম্পাস ঘুরিয়ে আঁকা তাহলে যে জ্যামিতিক চিত্রটি চোখের সামনে ন ওঠে, সেইটাই হল কর্মরত জীবনের চিত্র। পথে কোন বৃহত্তর বৃত্তের যে-কোন ণ্ট বিন্দু থেকে পিছনের নিউক্লিয়াসের দিকে তাকানো যায়, মধ্যে মধ্যে তাকিয়ে দেখতেও করে, কারণ হেঁটে আসা পথের কথা তে অনেকেরই রোমাঞ্চ হয়। কিন্তু সকলের না, যেমন আমার হয় না। হাটাপথের কথা ভাবতে তখনই রোমাঞ্চ হয় যখন কিছুটা পায়ে হেঁটে বেড়াতে বেড়াতে, কিছুটা পাল্কিতে চড়ে, কিছুটা ঘোড়ার পিঠে হাতির পিঠে চলতে চলতে মনোরম কোন উপবনে উপস্থিত হওয়া যায়, এবং সেখানে শকুন্তলাদের আশ্রম-মৃগের পরি- চর্যা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে-হাটাপথে খানাডোবা ভর্তি থাকে, সাপ-জোঁক কিলবিল করে, প্রত্যেক পদে পদে বিষাক্ত ফণার ছোবল খাবার সম্ভাবনা থাকে, সে পথের কথা ভাবতে একরকমের যে ভয়াবহ রোমাঞ্চ হয় তাকে 'শিহরণ' বলাই সঙ্গত। সে-পথের স্মৃতি- রোমন্থন অপ্রীতিকর এবং অপ্রীতিকর বলেই অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক অবাঞ্ছনীয় কাজ অনেক সময় বাঞ্ছিতদের তাগিদে করতেই হয়। এ লেখাও প্রায় সেই ধরনের একটি কাজ। অতএব আত্মকথন ক্ষমার্হ।

*

প্রদীপের আলো জ্বলছে, রেড়ির তেল তার ইন্ধন যোগাচ্ছে। আমি আর ছোট ভাই পাশাপাশি বসে পড়ছি। মা পাশে বসে মশারির ছিদ্রে তালি দিচ্ছেন, আর সত্তর বছরের বৃদ্ধা ঠাকুমা দূরে একটি কোণে বসে কাঁথা সেলাই করছেন। আবছা আবছা মনে পড়ছে। সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আফিসের কেরাণী বাবা তখনও আফিস থেকে ফেরেন নি। বর্ষাকাল, বাইরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আগের দুদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে ঘরের দাওয়ায় পর্যন্ত জল উঠেছে এবং তার সঙ্গে প্রচুর ঢোঁড়া ও হেলে সাপ কিলবিল করে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেছে। ছাতি আর লাঠি দিয়ে বাবা সাপ তাড়িয়েছেন ও মেরেছেন। দাওয়ার কোণে মা'র রান্নাঘর, সর্বদাই মা সাপের ভয়ে আতঙ্কিত। কালীঘাট অঞ্চলে একটি টিনের বস্তিতে দু'খানি ঘর। কলকাতা শহরে তখন অবশ্য পাল্কির যুগ শেষ হয়েছে, কিন্তু ছ্যাকরা গাড়ির যুগ শেষ হয়নি। দক্ষিণ কল- কাতা, বিশেষ করে কালীঘাট টালিগঞ্জ বালিগঞ্জ অঞ্চল তখনও শহর থেকে বেশ দূরে, কলকাতা যাচ্ছি বলে লোকে ধর্মতলা অভিমুখে যাত্রা করত। ট্রাম ছিল, বাস ছিল না। বাবা আফিস থেকে হেঁটে ময়দানের ওপর দিয়ে, হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে, কালীঘাটের বাড়িতে আসতেন। তাতে সারাদিন বসে কাজ করার পর হাঁটা হত এবং সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ভাড়া দু'টো পুরনো পয়সাও সাশ্রয় হত। অবশ্য অদ্যকার নয়া পয়সার যুগের দুটি কাগজের টাকার চেয়েও অনেক বেশি রওয়াব ও হাঁক-ডাক ছিল তখনকার দু'টি পুরনো পয়সার। একটি পুরনো পয়সা পেলে আমরা তখন হাত তুলে নৃত্য করতাম, ঈশ্বরকে বলতাম, হে ঈশ্বর! বাবাকে দীর্ঘজীবী করুন, যাতে মধ্যে মধ্যে পয়সাটি পাওয়া যায়!

কিন্তু ব্যক্তিগত স্মৃতির আমেজ লাগছে লেখাতে। জীবনস্মৃতি একেবারেই লিখতে চাই না, মনের কথাটা শুধু বলতে চাই। তবু এটুকু বলতেই হল, কারণ সেই শ্রাবণের থমথমে রাত্রিতে আফিস থেকে ফিরে বাবা আমাকে সাহিত্য-জীবনে দীক্ষা দিলেন, বললেন, 'বর্ষাকাল' সম্বন্ধে একটি রচনা লিখতে। রচনা যদি তাঁর মনঃপূত হয় তাহলে আমি পুরস্কার পাব দু'টি পুরনো পয়সা (একটি নয়) এবং দু'খণ্ড ভাজা মাছ (একখণ্ড নয়)। পুরনো একটি আনা দিয়ে সেদিন একটি ইলিশ মাছ কেনা হয়েছিল, তার সঙ্গে রাতে খিচুড়িও পাক করা হয়েছিল। অত্যুগ্র আকর্ষণে রচনা লিখতে বসেছিলাম। কিন্তু ঘুমের আকর্ষণে সব আকর্ষণ উবে গেল। তবু রচনা লেখা শেষ না করে উপায় নেই। তার আগে পয়সা তো দূরের কথা, রাতের খাবারও পাওয়া যাবে না। তাই হুকুম। বাবার মতো কড়া ডিক্টেটরের হুকুম অমান্য করে এমন দুঃসাহস মা-ঠাকুমা কারও ছিল না। চোখ দিয়ে তখন জল গড়িয়ে পড়ছে, তবু রচনা লিখতে হচ্ছে। ছত্রিশ বছর আগেকার কথা, তখন বয়স আমার এগারো। রচনা লিখে বাবার প্রতিশ্রুত পুরস্কার পেয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু রচনার একটি লাইনও মনে নেই। শুধু মর্মটুকু ভাসা-ভাসা মনে আছে। লিখে- ছিলাম, বর্ষাকালের সবই ভাল, কিন্তু আমাদের মতো গরীবের পক্ষে ভাল নয়। যত ঋতু আছে তার মধ্যে বর্ষাই হল গরীবের কাছে সবচেয়ে খারাপ ঋতু। কারণ বর্ষাতে তার ঘরে জল ঢোকে, সাপ পোকামাকড় ঢোকে এবং তার দৈনন্দিন জীবনধারণ অচল হয়ে যায়। রচনার ভালমন্দ জানি না, প্রত্যক্ষ বাস্তব জীবনের কথা লিখেছি। তার উপর সস্তা কল্পনার কোন প্রলেপ বা কোটিং দিইনি। কিন্তু সজীব কল্পনার রঙীন কাচ ছিল চোখে, তাই দিয়ে আমাদের মতো অগণিত অসহায় মানুষকে দেখেছিলাম সেদিন বর্ষাকালকে অভিশাপ দিতে। হাতেনাতে পেয়ে- ছিলাম ফলাফল। বাবা খুশি হয়েছিলেন। রচনা-

শক্তি এমন কিছু প্রকাশ পায়নি যা দেখে তিনি খুশি হতে পারেন। অনেকদিন পরে তাঁর একটি কথা থেকে মনে হয়েছিল যে, সেদিন তিনি আমার মধ্যে একটি পৃথক 'মন' আবিষ্কার করে খুশি হয়েছিলেন, যে মনটিকে জর্জ মুরের (George Moore) ভাষায় বলা যায় "by a mind I mean a new way of feeling and seeing". এই মনটিকে আজীবন আমি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। কতদূর তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছি তারই মাপকাঠিতে বিচার করেছি আমার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনের সংগ্রামের সার্থকতাকে। আগে মন, তারপর মনন। আগে হৃদয়, তারপর যুক্তি ও বুদ্ধি। এই আমার জীবনদর্শন এবং আমার সমস্ত সাহিত্যকর্মের উৎস এইখানে।

যাঁরা জ্ঞান-সাহিত্যের অনুশীলন করেন তাঁদের কাছে যুক্তি, বুদ্ধি ও মননের স্থান অনেক উঁচুতে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কিশোর বয়স থেকেই আমার মনে হয়েছে, যখন থেকে নাটক-নভেল লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তে শিখেছি, কেন ইতিহাসের মতন বিষয়, মহাপুরুষদের জীবনচরিতের মতো বিষয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব কাহিনী, মানুষের জীবনের কথা, সমাজের কথা, গল্প-উপন্যাসের চাইতে বেশি ছাড়া কম আকর্ষণীয় ও মনোরম হবে? অথচ তাই তো হত, আজও তো তাই হয়ে থাকে। তার কারণ ঐ রঙিন কাচটি বা মনটি নেই বলে। যাঁরা কথা-সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের প্রত্যেকের যা-হোক একটা মন আছে, যে শ্রেণীরই সাহিত্যিক তিনি হন না কেন। মনই মানুষকে টানে, তাই তাঁদের কাহিনী-সাহিত্য জনপ্রিয় হয়। কিন্তু জ্ঞান-সাহিত্যের সাধকরা বিশুদ্ধ মননপন্থী, মনহীন মনন তাঁদের সাধনার লক্ষ্য। তাঁরা নাকি তথ্যের উপাসনা করেন তান্ত্রিক সাধুর মতো, সাধারণ মানুষ সেই ভয়াবহ সাধনার উৎকট চেহারা দেখেই দূর থেকে প্রস্থান করে। তাঁদের রচনা যেমন অপাঠ্য, তেমনি বিকর্ষণীয়। কেবল জ্ঞান-বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের দম্ভটুকুই তাঁদের সম্বল, যদিও তারও অনেকটা ফাঁকা ও ফাঁপা। কোন বিখ্যাত সাহিত্যিক বলেছেন—"In order to give the glow of life to brute fact it must be transmuted by passion"—এই প্যাশানই হল মন, যে-মন সর্বদাই সজীব সচল সরস, যে-মন নতুন করে ভাবতে পারে, দেখতে পারে, অনুভব করতে পারে এবং তার জন্য নিয়ত উন্মুখ হয়ে থাকে। তথ্য তো প্রতিদিন পর্বতপ্রমাণ জমছে, সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে। সেই কবর-খুঁড়ে-তোলা তথ্যের কঙ্কাল দেখালে তো মানুষ আতঙ্কিত হবে। মন দিয়ে, প্যাশান দিয়ে সেই কঙ্কালে রক্তমাংস যোগ করে তার রূপলাবণ্য ফোটাতে হবে। তা না হলে কথাসাহিত্যই হোক আর জ্ঞান-সাহিত্যই হোক, সবই ব্যর্থ রচনা।

সেই বাল্যকালের "বর্ষাকাল" রচনার পর জীবনের উপর দিয়ে অনেক বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম কেটে গিয়েছে। পুরনো দুটো পয়সার বদলে অনেক বেশি টাকার দু-একটি পুরস্কারও পেয়েছি সাহিত্য রচনার জন্যে, যে-পুরস্কার সোমারসেট মোঅম-এর (Somerset Maugham) ভাষায় "not only set an honourable seal on a career but increase an author's market value" এবং "Not many people know how much bitterness, how much bargaining, how much intrigue goes to the awarding of a prize." কিন্তু কোন পুরস্কারের বাজারমূল্য বা সম্মান-মূল্যের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করার কারণ খুঁজে পাইনি, অবশ্যই অর্থের উপকারিতাটুকু ভোগ করা ছাড়া। যে পুরস্কার সবচেয়ে বেশি কাম্য ছিল, মনে হচ্ছে তার কিছু কিছু পাচ্ছি। দেশের সাধারণ, সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষের কাছে আমার সাহিত্য সাধনার বিষয়-বস্তু, গল্প-উপন্যাস-জাতীয় লালাস্রাবী ভোজ্য না হওয়া সত্ত্বেও এবং উত্তেজনাপ্রবণ কাহিনী-লোলুপ বাঙালীর লোভনীয় চিত্তের খোরাক না হয়েও যে উপাদেয় হৃদয়গ্রাহী ও সমাদরণীয় হয়েছে, সেইটাই আমার সাধনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সার্থকতা। পাওয়ার শেষ হয়নি, হয়ও না, কোন মানুষের জীবনেই হয় না। মনে হয় সবেমাত্র পেতে আরম্ভ করেছি, আরও পেতে হবে, আরও পাব। কিন্তু জীবনেরই যখন শেষ হবে একদিন, তখন পাওয়ারও শেষ হবে বৈকি! তবু মনে হয় যেন আজ পর্যন্ত সংঘাতমুখর প্রস্তুতি ও প্রস্তাবনার পর্ব কাটল শুধু। আসল সাহিত্যকর্ম শুরু হবে এখন থেকে। জ্ঞানসাধনায় শৈশব উত্তীর্ণ হওয়াই যে কত কঠিন তা পূর্বসূরীরা বলে গেছেন। কাজেই সাধনার শৈশবকালেই আমাদের মতন কর্মীদের মৃত্যু হবে জানি। তবু বাসনা-কামনার কথা বলতে বাধা নেই। শেষকালে বলব। মূল কথা হল, জ্ঞানসাহিত্য বা মনন-সাহিত্যকে যদি এযুগে উত্তম কথা-সাহিত্যের মতন চিত্তাকর্ষক, হৃদয়গ্রাহী ও বহুজনপ্রিয় না করা যায়, তাহলে মননশীল সাহিত্যকর্ম পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছু নয়।

কথাপ্রসঙ্গে মনে পড়ছে এবং প্রাসঙ্গিক বলে বলছি, কয়েক বছর আগে কোন একটি বিশিষ্ট বিদ্বৎসভায় ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে জ্ঞানীগুণী অনেক পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন বিদেশী ঐতিহাসিক এসেছিলেন, তাঁদের জন্যেই সভাটি ডাকা হয়েছিল। গবেষণার রীতি পদ্ধতি, নতুন নতুন ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা হল। একজন 'ডক্টর' ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—"সবই তো বুঝলাম। নতুন পদ্ধতিতে গবেষণাও না হয় করা হল, কিন্তু করেই বা কি হবে? কেউ তো এ সব পড়তে চায় না, বই ছাপলে তা গুদামজাত হয়ে থাকে, কোন পাঠাগার বা প্রতিষ্ঠান সরকারী গ্রাণ্টের টাকায় বাধ্য হয়ে কিনলেও সেখানে আলমারীতে পোকায় কাটে, কেউ পড়তে চায় না। তার কি হবে?" এই কথা শুনে বিদেশী ঐতিহাসিকরা বললেন, "খুব ভাল কথা তুলেছেন। তাহলে বোঝা দরক আমাদের ইতিহাস রচনায় ও গবেষণায় গ কোথায়? দেশের মানুষ ক্রমে সভ্য হ শিক্ষিত হচ্ছে, একথা যদি সত্যি হয় তাহ ইতিহাসের মতো বিষয়ই তাদের কাছে সবচে আকর্ষণীয় হতে বাধ্য। মানুষ সবার আ নিজেদের ইতিহাস জানতে ও পড়তে চায়। কি আমরা যে ইতিহাস লিখি সেটা কি মানু ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, না দেশের ইতিহা কোনটাই না। শুধু সন-তারিখ সাজিয়ে ক বস্তা তথ্য ও সংখ্যা কপি করে দিই, ত আবার একটা কোন অতিসংকী পিরিয়ড্ নিয়ে, ইতিহাসের ধা সঙ্গে তার যোগ নেই। একাজ যে-কোন সাধা কেরাণী করতে পারেন, অথচ তাই করে ঐতি হাসিকরা 'ডক্টর' উপাধিধারী হন। তাঁরা লেখেন তা অপাঠ্য। এ ইতিহা মানুষে পড়বে কেন? এ সমস্যা অন্যা দেশেও দেখা দিয়েছে। ইতিহাস রচনা ও গবে উভয়েরই পদ্ধতি আমূল বদলানো দরকা কথাগুলো আমার মনের কথা বলেই ভাল লেগে ছিল এবং মনেও আছে। আসল সমস্যা হ বর্তমান সমাজের শিক্ষাসংকট, সংস্কৃতিসংক বুদ্ধিসংকট। সংকটের কারণ হল, পৃথিবী চিন্তাশীল সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যান্ত্রিকতা। বর্তমান ধনতান্ত্রি সমাজের প্রৌঢ়ত্বে যন্ত্রবিজ্ঞান মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে, মানুষের সঙ্গে মানুষে সম্পর্ককে প্রতীকসম্পর্কে রূপায়িত করেছে বিবেক, বুদ্ধি, হৃদয় সবই মানুষ যন্ত্রের মতন অর্থ-উৎপাদনে নিয়োগ করেছে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষাও হয়েছে স্ট্যাটাস-প্রতীকসর্বস্ব। প্রকৃত বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানসাধনা নির্বাসিত হয়েছে সমাজ থেকে, কারণ তার প্রয়োজন নেই জ্ঞানবুদ্ধির বাণিজ্যের জন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় ট্রেড মার্কের ও স্ট্যাটাস-সিমবলের। এই সংকট, নিশ্চিত জানি, একদিন কেটে যাবে, যেদিন মানুষ বর্তমান ভেদবৈষম্য-বিষাক্ত সমাজবন্ধন থেকে মুক্ত হবে। সেদিন শিক্ষা সংস্কৃতির বন্ধনও মুক্ত হতে বাধ্য। সেদিন আমাদের আজকের অনেক শিক্ষা ভুলে যেতে হবে এবং নতুন করে আবার ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখতে হবে। সেই নতুন সমাজে আজকের অনেক গবেষণা ও ইতিহাস আবর্জনাস্তূপে নিক্ষিপ্ত হবে। সেই আস্থা না থাকলে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হত না। সেই মন না থাকলে সমস্ত মনন ব্যর্থ হত।

সাহিত্যকর্মের এই দুরূহ সাধনা কতটুকুই বা করতে পেরেছি এবং সামান্য যে শক্তি ও পুঁজি-টুকু নিয়ে জন্মেছি তাতে কতটুকুই বা করা সম্ভব। কিন্তু ব্যক্তিগত কথা এখানে বলিনি, বলেছি সামাজিক গতির কথা। সঙ্কট প্রতিরোধে আমি শুধু চড়ুই পাখির মতন এক টুকরো খড় সংগ্রহ করতে পারি। তবু মনটা যদি সমস্ত উৎপাতের মধ্যে বেঁচে থাকে, তাহলে আমার

হিত্যকর্মের পথ ও লক্ষ্য এবং মননের গন্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। এই বিশ্বাসই মার চলার পথের সম্বল।

সাহিত্যজীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা না াই বাঞ্ছনীয়, কারণ সে অভিজ্ঞতা কম-বেশি লাদেশের প্রত্যেক সাহিত্যকর্মীরই আছে। রতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কথা জানি না, বাংলাদেশের সাহিত্য-পরিবেশের কথা বলে ফরাসীদের কথা মনে হয়। সেখানকার াও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানা নয়, বই ড় জানা। ইংরেজ সাহিত্যিকরা নাকি বেশির গই আত্মকেন্দ্রিক এবং অনেকটা আত্মশান্তিতে স্থাবান। সমালোচকদের মতামতের পক্ষ-তিতা, গোষ্ঠীচক্রের বিশেষ অপপ্রচার নিন্দা-, এ সব তাঁরা সাধারণত উপেক্ষা করে চলতে রেন এবং বুদ্ধিমান পাঠকদের সুস্থ বিচার-িধর উপর তাঁদের শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু ফ্রান্সে নয়। ফ্রান্সের সাহিত্যজীবন অনেক বেশি রবমুখর, সাহিত্যিক গোষ্ঠীচক্র ক্লিক-টারী সেখানে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ঠ, যেমন ওঠেন সাহিত্যিকরা। সাহিত্যটা খানে একটা পেশার মতো, যে-পেশার মাজিক মর্যাদা আছে। কাজেই পেশাকে শেষ ন্ত পাশান করতে পারেন না, এ রকম বহু াকের ভিড় হয় সেখানকার সাহিত্যক্ষেত্রে। লেই গোষ্ঠীর জোরে, ক্লিকের চক্রান্তে প্রতিষ্ঠা র্জন করতে চান। তার জন্য শিল্পকলা হিত্যের ক্ষেত্রে ফ্রান্সে চেঁচামেচি বেশি, হিংসা-েষ অত্যন্ত প্রবল, কেউ কাউকে সহ্য করতে রেন না, বিশেষ করে কারও সাফল্য তো নয়ই। ন্সের এই সাহিত্যজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কজন বিখ্যাত সাহিত্যিক লিখেছেন :

"There the literary life is a merci-ess conflict in which one gives violent battle to another, in which one clique attacks another clique, in which you must be always on your guard against the gins and snares of your enemies, and in which, indeed, you can never be quite sure that a friend will not knife you in the back. It is all against all, and, as in some forms of wrestling, anything is allowed. It is a life of bitterness, envy and treachery, of malice and hatred."

বাংলাদেশের সাহিত্যজীবন সম্বন্ধেও এই ি বর্ণে বর্ণে সত্য। কতদূর সত্য তা কলেজ ীটের বই-পাড়াতে পা দিলেই মর্মে মর্মে াঝা যায়। যে-কোন পত্রিকার কার্যালয়েও তার ভাব পাওয়া যায়। তার পুনরুক্তি করে, অথবা া নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। এই পরিবেশ সাহিত্যকর্মীর ব্যক্তিগত জীবনকে নাড়া দেয় তা নয়। নিশ্চয় দেয়। অনেকের মতন আমা-ও দিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেশের াকিও মানুষের সদবুদ্ধি সদ্‌চিন্তা ও সুবিচার-িধর উপর ভরসা করে কাজে উৎসাহ য়েছি এবং দেখেছি ভরসা করে নিরাশ হইনি, াজে কর্মোৎসাহ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এ দেশে অন্তত অনেকটা ইংরেজপন্থী না হলে কোন সিরিয়াস সাহিত্যকর্ম করা এদেশে অন্তত সম্ভব নয়।

এই টুকরো কথার শেষ কথাটুকু বলি। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই এমন কথা বলব না, মানুষ যখন তখন নিশ্চয় আছে। কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষার উচ্চতা কতটা? খুব বেশি নয়। কারণ সময়ও তো অফুরন্ত নেই। চল্লিশের পরেই জীবন জীর্ণতার পথে পা বাড়ায়, দম দ্রুতগতিতে খরচ হয়ে যেতে থাকে। তাই আকাঙ্ক্ষাও সীমাবদ্ধ। আকাঙ্ক্ষা হল, আমার দেশের মানুষের কথা, সমাজের কথা, জীবনযাত্রা ও ধ্যানধারণার কথা, যা আমার কাছে সারা জীবন, উপন্যাস তো দূরের কথা, রূপকথার চেয়েও রোমান্টিক মনে হয়েছে, সেই কথা যেন আরও সত্য ও সুন্দর করে বলতে পারি। বাংলার সমাজ ও বাঙালীর সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করার পর যেন সমগ্রভাবে সুদূর-অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত, বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহাসিক প্রবাহ একটি গ্রন্থে বাঙালীর কাছে ধরে দিতে পারি, ফুটিয়ে তুলতে পারি। ট্রেভেলিয়ানের রচনা, ক্রম্পটনের রচনার কথা মনে পড়ে, 'মডেল' করতেও ইচ্ছা হয়। তবে আমার ধারণা হয়েছে যে, বাংলাদেশের ও বাঙালীর সমাজজীবন নিয়ে আরও অনেক বেশি আকর্ষণীয় ইতিবৃত্ত রচনা করা যেতে পারে, যদি অবশ্য মননের মুক্ত উন্মুক্ত ও উদার মনটি থাকে এবং যদি সেই জীবন প্রকৃত জনজীবনের ধারা হয়। এই কাজটি শেষ হলে মনে করব আমার কাজ শেষ হয়েছে। কাজ অসম্পূর্ণ হবে, অনেক কাজ বাকি থাকবে। কিন্তু তাতে কি? আমি থামলেও, আমার পরে জীবনের স্রোত থামবে না। আরও পূর্ণতর কাজ করার জন্য যোগ্যতর আরও অনেক সাহিত্য-কর্মী আসবেন, তাঁরা সেই কাজ করবেন। আমার এইটুকু কাজ নিজের মতন করে শেষ করতে পারলেই আমি বলতে পারব :

"I contend with none, not because none is worth my strife, but because I have said my say and I am well pleased to let others occupy my small place in the world of letters. I have done what I wanted to do and now silence becomes me. I am told that in these days you are quickly forgotten if you do not by some new work keep your name before the public, and I have little doubt that it is true. Well, I am prepared for that. When my obituary notice at last appears in......and they say : 'What, I thought he died years ago,' my ghost will gently chuckle" — (Somerset Maugham).

সাহিত্য যাত্রা নাটক

বিজন ভট্টাচার্য

নবনাট্য—কথাটা নিয়ে সাম্প্রতিককালে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেটা খানিকটা অনাসৃষ্টির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছেই বলা যায়। কেউ বলেন, নাট্য আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ইতিহাসে নবনাট্য বলে কোন কথা হতে পারে না। সংজ্ঞাটাই ভুল। কেউ বলেন, কথাটা আসলে হচ্ছে গণ-নাট্য; নবনাট্য বলে তার অপব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার কেউ বলেন, চল্লিশোত্তরকালে নাট্যের ক্ষেত্রে জীবনের যে নব-মূল্যায়ন হলো তাকেই বলবো নবনাট্য। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যুক্তি আছে এবং যেহেতু মনের অগোচরে কোন পাপ নেই, তর্ক থেকেই যায়। ইতিমধ্যে আমাদের যদি কোন চিৎপ্রকর্ষ না ঘটে তাহলে ভবিষ্যৎকালেও এই বিতর্ক চলতে থাকবে।

আমার মনে হয় এই বহুধা বিতর্কের সম্পর্কে নাট্যের ক্ষেত্রে আমাদের দায়-দায়িত্বের প্রশ্নটা যদি না গৌণ হতো তাহলে বিতর্কটা এতটা মজলিশী হতে পারতো না। এ শুধু নাট্যের ক্ষেত্রেই নয়। শিল্পাশ্রয়ী ভিন্ন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমাদের এই বিলাসিত মনের ইচ্ছা অনিচ্ছা দায়-নিরপেক্ষভাবেই প্রভূত বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।

আসলে যে কথা বলছিলাম, নাট্যধারার ইতিহাসে নবনাট্য কথাটার সংজ্ঞা কিভাবে নিরূপণ করা যায়। অখণ্ড নাট্য-আন্দোলনের ধারাবাহিকতার ইতিহাসে 'নবনাট্য' কথাটাকেই যাঁরা উড়িয়ে দিতে চান, আমি তাঁদের দলভুক্ত নই। নই এই কারণে যে নাট্যধারার ইতিহাসের অন্তর্বর্তী হয়েও চল্লিশোত্তর কালের নাটক ও নাট্য-প্রযোজনা একটি বিশিষ্ট যুগচেতনার সৃষ্টি করেছে। নিজস্ব দর্শনসঞ্জাত প্রাণধর্মে এই নাট্যচেতনা পূর্বাপূর্বের ধ্যান-ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে বলেই যাঁরা মনে করেন এই নবনাট্য গণ-নাট্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। তবে যেহেতু সেই নাট্যবস্তু বৃহত্তর জীবন-গোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং ধ্যান-ধারণার ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সৃষ্টিশীল নিষ্ঠা নিয়েই জীবনদর্শনের প্রতি বিশ্বাসের প্রতিশ্রুতি রেখেছে, সেইহেতু শিল্প-সাহিত্যের কারু-কারীগর হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিকের দানও অনস্বীকার্য।

চল্লিশোত্তর কালের শিল্প-সাহিত্য রচনায় সেই আংশিক দায় স্বীকার করা হয়েছে মাত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিকদের খাতে এ বাবদ যা পাওনাগণ্ডা সেটা এই কর্মকাণ্ডের হিসেব নিকেশের মধ্যেই সাব্যস্ত হতে পারে।

চল্লিশোত্তর কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গভীরাংক সমগ্র এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যে সামগ্রিক অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছিল তাতে নিঃসন্দেহে ভারতের মোহভঙ্গ হয়েছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন-ই তখন সমগ্র ভারতীয় মনের একমাত্র জবানবন্দী। যুদ্ধান্তে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান সম্পর্কে মিত্রশক্তির যৌথ ঘোষণাপত্রে যদিও ইংরেজের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ছিল, তবু যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভারতে জাতীয় আন্দোলনের এ হেন স্পর্ধিত অভিব্যক্তি ইংরেজ সুনজরে দেখলো না। অনিবার্য ফলস্বরূপ বাংলাদেশে নেমে এল মহামন্বন্তরের কালোছায়া। মুদ্রাস্ফীতির দরুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়ে বাংলা দেশের সমাজ-জীবন ভাঙনের মুখে। নবনাট্য আন্দোলনের কালাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই কাণ্ডের প্রারম্ভিক পর্বে।

সামন্ততান্ত্রিক লোকাচারী দর্শনের আওতায় লালিত হওয়া সত্ত্বেও দু'শ বছরের পরাধীনতার ইতিহাসে জাতিগতভাবে এবার যে শক্তির স্ফুরণ হলো তা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। পূর্বাপূর্বের জাতীয় আন্দোলন চূড়ান্ত মুহূর্তে অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাত্মবাদের আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু এবার জনসাধারণের জাগর প্রহরায় সেই আন্দোলন পরিসমাপ্তির পথে এগিয়ে চললো।

চল্লিশোত্তরকালের জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের তখন যে ভূমিকা ছিল তাতে করে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য কার্যকরী নয় বিবেচনায় উদ্দেশ্য প্রস্তাবেই পর্যবসিত হয়। কিন্তু অনতিকাল মধ্যেই স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এমনই এক বৈপ্লবিক রূপ পরিগ্রহ করে যে, এই সংঘের উদ্যোক্তাদের মধ্যে অনেকেই যুগোপযোগী একটি শিল্পী-সাহিত্যিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের জন্মক্ষণ ঐ সময়েই নিরূপিত হয়। বোধহয় সেটা উনিশ শ' একচল্লিশ কি বিয়াল্লিশ। বলা বাহুল্য বাংলা দেশের তদানীন্তন কালের প্রথিতযশা বহু শিল্পী-সাহিত্যিক এই সংঘের কাজে উৎসাহ দেন এবং প্রকাশ্যভাবে অংশ গ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্কন ক্ষেত্রেও শিল্পীরা জীবন ও রেখার সমন্বয় খুঁজে খুঁজে পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যস্ত।

শিল্প-সাহিত্যের এই বহুধা কর্মচাঞ্চল্যের মাঝখানে সঙ্গীত ও নাট্যের ক্ষেত্রেও এই সঙ্ঘের সভ্যগণ দেশাত্মবোধক প্রাচীন ও আধুনিক সঙ্গীত এবং ছোট ছোট নাটিকা পরিবেশন করে জনসাধারণের মনে বিপুল আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করেন। প্রকাশ্য জনসভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা নতুন এক ভাবদ্যোতনার সৃষ্টি করে। মধ্যবিত্ত জীবনমানসে স্বাধীনতা নান্দীপর্বে এমন প্রভাতী কর্মচাঞ্চল্য পূর্বে আর দেখা যায় নি।

কিন্তু একদিকে যেমন সঞ্চয় আবার তেমনি অপচয় চলেছে প্রাণের। সর্বনাশী আকাল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর উজাড় হয়ে চললো সৃষ্টি।

সেই কোটরাগত চোখের হাহাকার আমাকে সর্বপ্রথম নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে "আগুন" একটি ক্ষুদ্র নাটিকা মাত্র। ১৯৪২ সালে মঞ্চে ও বিভিন্ন জনসভায় এটি উদাত্তে পরিবেশিত হয়। ইতি মধ্যেই রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ এমনই এক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে যে, অক্ষম নিজেরই হাত নিজেরই গলা বেড়ে উদ্ধারের পথ খুঁজে ফেরে। ঠিক এমনই এক দুঃখের দিনে কলকাতার ফুটপাতের এক নিরন্ন পরিবারকে কেন্দ্র করে 'জবানবন্দী' নাটিকা রচনা করি। সঙ্ঘের উদ্যোগে প্রকাশিত নাটিকার মধ্যে এই নাটিকাটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক পত্রিকায় নাটিকাটি প্রকাশিত নাট্যামোদী মহলে কথঞ্চিৎ আমার উদ্দেশ্য করেছে। আমার সুস্পষ্ট মনে আছে প্রকাশ্য এক অধিবেশনে আমি যেদিন প্রথম এই নাটিকাটি পড়ি, সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন আমাকে 'চাষা' উপাধি দিয়েছিলেন। সত্যিকারের চাষা নই, তাই হয়তো মধ্যবিত্ত মানসে সেদিন সত্যিই শ্লাঘা অনুভব করে ছিলাম।

নাট্য রচনার অব্যবহিত পরেকার প্রশ্নই হলো প্রযোজনা। কেন না প্রযোজনা ভিন্ন নাট্য রচনার বিশেষ কোনই সার্থকতা নেই। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে উৎসাহিত করলেন। সঙ্ঘের অন্যান্য সভ্য ও সভ্যাগণের সক্রিয় সহযোগিতায় আমি 'জবানবন্দী' প্রযোজনার উদ্যোগী হলাম। গ্রামীণ জীবন, বিশেষ করে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের চাষাভূষো লোকের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই আমার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিল। সে কারণে তাদের অন্তরঙ্গ

বনের ঢং-রং ও বাচনভঙ্গীর সংগে আমার রিচয় ছিল। তবু বলবো "জবানবন্দী"-র ক প্রযোজনা অল্পকালের মধ্যেই সম্ভবপর য়েছিল উদ্যমী সভ্য-সভ্যাদের সচেতন কর্ম-তার সুনির্দিষ্ট নিয়োগেই। সত্যিকার বনে তাঁরা কেউ-ই নটনটী ছিলেন না। তু চরিত্র-রূপায়ণে তাঁরা যে কৃতিত্বের রিচয় দিয়েছেন, জীবনের প্রতি মমত্ববোধ ও দয়স্পর্শী দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে সেটা খনই সম্ভব হতো না।

'জবানবন্দী'-র সার্থক প্রযোজনা অপেশা-র নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসে সাধারণ ক মানসে এক বিপুল আশা আকাঙ্ক্ষার ার করে এবং নবনাট্যের ইতিহাসে এই তুন আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বর্ণসূত্র ধরেই 'জবান-ন্দী' প্রযোজনার অব্যবহিত পরেই 'নবান্ন' ক রচনা করি। সাড়ে তিন ঘণ্টার এই টকটি তদানীন্তন কালের শ্রীরঙ্গম মঞ্চে কাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনীত হয়। এখানেই ক অভিনয় রজনীতে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের ংগে আমার নাটকীয়ভাবে পরিচয় ঘটে। মঞ্চ েকে নিষ্ক্রমণের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখছিলেন শিশিরকুমার, ভ্রাতা বিশ্ব-নাথ ভাদুড়ীর কাঁধে হাত রেখে। আড়ে প্রস্থে দুজনেই সুবিশাল। বেরুবার পথে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। চোখ তুলে তাকাতেই দেখি শিশিরকুমার। চুরুটটি হাতে নিয়ে তার ণাই সরে দাঁড়িয়েছেন পথ ছেড়ে। অপ্রস্তুত হয়ে খানিকটা কৈফিয়ৎ দিয়েই বলে উঠলেন, কিছু মনে করবেন না। মানে—অভিনয় দেখ-ছিলাম। এই সেই আলমগীর, যে নাকি কাউকে কোন কৈফিয়ৎ দেয় না। আত্মশ্লাঘায় আপ্লুত হল মন। ভাবলাম, তুমিও আলমগীর আমিও মেদিনীপুরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক প্রধান সমাদ্দার। দু-দুটো ভাইপো কুঞ্জ আর নিরঞ্জনকে ইংরেজের গোলা-বারুদের মুখে ঠেলে দিয়ে আসছি। কিছু কম যাই!

ঠিক তারপরই শিশিরকুমারের প্রশ্ন হলো কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করি! আপনি কার কাছে অভিনয় শিক্ষা করেছেন?

আমি, কি উত্তর দেই ভাবছি, এমন সময় শিশিরকুমার বিশ্বনাথ ভাদুড়ীকে ডেকে আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, জানিস বিশে, আমাদের সেই হারান, আরে সেই যে ধোপাটা ......মনে পড়ছে না তোর?......সেই হারান ধোপা।

আলমগীর শিশিরকুমারের চোখে বিস্মৃত এক হারান ধোপা সেদিন যে সম্ভ্রম কুড়িয়েছিল তাতে আমার নিঃসন্দেহে মনে হয়েছিল যে 'নবান্ন' নাটক দেখে আলমগীর হয়তো এত-দিনে কোন এক রজকের ভূমিকায় পরিত্রাণ পেতে চাইছেন। আমার এ অনুমান মিথ্যে হতো যদি না শিশিরকুমার পরবর্তীকালে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' নাটকটি প্রযোজনা করতেন।

'নবান্ন' নাটকের সার্থক প্রযোজনা সেদিন জনচিত্তে যে বিপুল আশার সঞ্চার করে তাতে করে সামগ্রিকভাবে গোটা নাট্য আন্দোলন গুণগত বৈশিষ্ট্যে এক নতুন যুগের সূচনা করে। 'জবানবন্দী' নাটকে পরাণ মণ্ডলের চোখে সোনা-ধানের দুঃস্বপ্নই 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দারের সংগ্রামী চেতনায় কঠিন অংগীকারে প্রতিভাত হয়। ইতিহাসের যুগ-সন্ধিক্ষণে বৃহত্তর জনসাধারণের প্রতিভূস্থানীয় নাটকের বহু বিচিত্র চরিত্রগুলি রঙ্গমঞ্চে পাদ-প্রদীপের আলোয় সেদিন নাটকের মাধ্যমে যে ঘোষণাপত্র পাঠ করে পরবর্তীকালে বাংলা তথা সর্বভারতীয় অন্যান্য অপেশাদার সংস্থা-গুলিও সেই কার্যক্রম বিভিন্ন নাটকের মাধ্যমে পরিবেশন করে চলে।

এই নাট্য-প্রচেষ্টা বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে পরবর্তীকালে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের 'অভ্যুদয়' নাট্য প্রযোজনাও সেদিনের আর এক স্মরণীয় ঘটনা। মর্ম, যার যা-ই বক্তব্য থাক না কেন, জনসাধারণের দরবারে উপস্থিত না করে স্রেফ শীলমোহরের জোরে কোন ঘোষণাপত্রই আর চালিয়ে নেওয়া যাবে না। জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থন ভিন্ন কোন শিল্পকর্মই আপেক্ষিকভাবেও প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না।

ফলকথা নবনাট্যের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাণ-বস্তু অলৌকিক কোন ভাবভিত্তিক নয়। জনসাধারণের জাগর প্রহরায় এই নাট্য-বস্তু নবজীবনের কাছে দায়বদ্ধ। শিল্প-সংস্কৃতির দায়ভার আজ যাঁদের হাতে তাঁরাও যেন এ কথা স্মরণ রাখেন।

গোপাল ঘোষ

শারদোৎসবে অপরিহার্য্য
কেএমপি
বিশুদ্ধ তেল
নারিকেল তেল
KMP
COCOANUT OIL
সরষের তেল
পরিস্কার চীনাবাদাম তেল
তিল তেল
কে এম পি-র প্রত্যেকটি তেল গ্যারান্টি দেওয়া ১০০%. খাঁটি ও বাছাই করা কাঁচা মাল থেকে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তৈরী করা হয়। সম্পূর্ণ তৃপ্তির জন্য কে এম পি তেলই ব্যবহার করুন। ছোট, বড় শীল করা টিনে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।
পরিবেশক:
জি, এ্যাথারটন এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড
২১, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১
ব্রাঞ্চ—নিউ দিল্লী, বোম্বাই-১, মাদ্রাজ-১।

সেদিন

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তোমাতে আচ্ছন্ন ছিল সেদিন হৃদয়খানি মোর
তোমাময় সমস্ত ভুবন;
সমস্ত ইন্দ্রিয় মন অবিভূত; সে নেশার ঘোর
কাটেনি অনেক দিন। তখন যৌবন
সহস্র শিখায় জ্বলে, পুষ্পশরে জর্জরিত দেহ,
বেদনা অতলস্পর্শ দুরন্ত কামনা ধৈর্যহীন
কে দেবে অঞ্জলি ভরি' স্মিত হাস্যে প্রেম-অনুলেহ
তারই প্রতীক্ষায় ছিল উদ্‌ভ্রান্ত আমার রাত্রিদিন।

সেদিন কী বেশবাস, তনুদেহে কোন অলঙ্কার
ছিল না দেখার অবসর;
পরেছিলে নীলাম্বরী অথবা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী
ফুলকাটা শান্তিপুরী—দেখিনি তা; আমার অন্তর
তখন হারিয়ে গেল তরঙ্গিত রূপের জোয়ারে
ভেসে গেল দুই কূল: সেদিন গেলাম সব ভুলে,
সেদিন চেতনা মোর একমাত্র খুঁজিছে তোমারে,
সুখের বেদনা শুধু ক্ষণে ক্ষণে জাগে মর্মমূলে।

সেদিন শুধুই তুমি, তুমি ছাড়া কিছু নাই আর
স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নহেক আমার।

অনাবিষ্কৃত মন

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

অন্ধের পরে দয়া করে সব জন,—
কেননা, সে কভু দেখেনি দিনের আলো
বধিরেরো তরে গলে ব্যথিতের মন,
কেননা, শোনার অধিকার সে হারালো।

মূক যে মনের বেদনা বুঝাতে নারে—
আত্মা যাহার সমাধি মৌনে ঢাকা
ইঙ্গিত করি ভঙ্গীতে হাত নাড়ে
অস্ফুট স্বরে শুধু কাতরতা মাখা।

তবু হায় আরো রয়েছে কতই জনা
যাদের সকল অবিকল ইন্দ্রিয়—
তথাপি অন্ধ বধির বন্ধমনা
তাদের বেদনা কেন নহে দয়নীয়?
সুস্থ নয়ন, দেখেনাকো সত্যেরে
সুস্থ শ্রবণ, শোনে না বিবেক-বাণী
সুস্থ হৃদয়, শুধু তমসায় ঘেরে—
বিষায় বিশ্বে বিশ্বনাথে না মানি!

ইহাদের তাই সব থাকিতেও নাই
বেশী বুঝি তাই ইহাদেরি বেদনাই,—
আমিও যেহেতু ইহাদেরি একজন
তাই কৃপা চাই কৃপা কর সুধীজন।
আমরা অন্ধ
অনাবিষ্কৃত মন

ঝড়ের পাখী

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঝঞ্ঝা এলো দিগ্বলয়ে; ঊর্ধ্বে মেঘের ডাকাডাকি;
ক্ষিপ্ত সাগর ঐ মেতেছে; গান ধরেছে ঝড়ের পাখী!
পাহাড়-সমান তরঙ্গেরা বল্গা-ছেঁড়া অশ্ব বুনো
আসছে ধেয়ে লাখে লাখে; বজ্র হাঁকে পুনঃ পুনঃ।
সিন্ধুতীরের আর আর প্রাণী কাঁপছে সবাই আতঙ্কেতে;
প্রলয়-রাতের পাগলা মহেশ ধ্বংসলীলায় উঠলো মেতে?
ওরে আমার ঝড়ের পাখি, এবার তোমার লগ্ন এলো!
ঢেউ-তুফানের ঊর্ধ্বে তোমার জোরালো ঐ পাখনা মেলো!
নীড়ের তুমি নও বিহঙ্গ; তোমার খেলা চক্রবালে!
কলম্বাসের দোসর তুমি! দুঃসাহসী কালে কালে
যে-অজানার নিমন্ত্রণে অকূলে যায় নাও ভাসিয়ে—
তারই ডাকে ঝড়ের পাখি নীড়ের বাঁধন যাও কাটিয়ে!
আতপ্ত ঐ কোটরজীবন তোমার কাছে সুদুঃসহ;
বিঘ্ন-বিপদ রঙ্গে তোমার বংশী বাজায় অহরহ!
বিজ্ঞ যাঁরা ভুলের ভয়ে কূলে থাকুন নোঙর ফেলে!
সব-হারানোর পাগলামিতেই কলঙ্কিনীর কৃষ্ণ মেলে!
ঝড়ের পাখি, চিত্তে তোমার কোন অমরার বহ্নিশিখা?
জীবন-সাঁঝে দাও কবিরে সেই আগুনের এক কণিকা!

সমুদ্রের তীরে বসে বসে

জগদীশ ভট্টাচার্য

সমুদ্রের তীরে বসে বসে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়েছিল খুশি।
দেখেছিল
নীল জল সোনা হয় সকালে বিকেলে;
চাঁদের কিরণ ছুঁয়ে
ঢেউগুলি হাসে খিলখিল:
বাতাস মাতাল হলে
কি জানি কি যেন হয় তরলে অনিলে॥

সমুদ্রের তীরে বসে বসে
একটি অবুঝ মন
অকারণে হয়েছিল খুশি॥

তারপর একদিন
একটি পাগল এসে
ডুবে গেল সমুদ্রের বুকে।
ডুবে গেল সে-অতলে
যেখানে ঢেউয়ের খেলা নেই,
সূর্য নেই,
চন্দ্র নেই,
নেই কোনো মাতাল বাতাস।
ডুবে গেল
এক হয়ে গেল॥

সমুদ্রের তীরে বসে বসে
একটি অবাক মন
অকারণে হয়ে গেল কবি॥

ধৈর্য

বিষ্ণু দে

দেখি তার প্রতি অঙ্গে প্রতি অবয়বে
লোকোত্তর যে লাবণ্যে সৌন্দর্যলহরী,
অলৌকিক, তবু স্বৈত দেহময় স্তবে
কেন অষ্টপ্রহর যে উন্মুখর করি.

সে তত্ত্ব জানে না জানি স্বয়ং সুন্দরী!
আমি জানি কেন দিন অন্ধ সে সৌষ্ঠবে
জীবন-মৃত্যুতে কেন প্রদীপ্ত শর্বরী
নামেরূপে ক্রমান্বয়ে পালিত উৎসবে
বিনিদ্র চৈতন্যে জ্বালে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী।

জ্বালাবেও, যতদিন প্রাণ আছে শবে।
তারপরে, হয়তো বা নিস্পন্দ গৌরবে
অর্ঘ হবে পূর্ণ, দেবে চুম্বিত বৈভবে
আমাকে অশ্রুর স্নান। আমি ধৈর্য ধরি॥

আর এক রকম

অরুণ মিত্র

একটা কলির গুণগুণ শুনতাম
কুয়াশায়,
কে গাইছে ঠিক দেখা যেত না
মনে হত কাছে নৌকো ভিড়েছে
মাঝপথের ঘাটে,
হদিস বোঝা যেত না
কিন্তু সেই গুণগুণ বহতায়
আমার ভেসে পড়ার টান ছিল।

কুয়াশার ঋতু
দূরপাল্লার ভোরাই
আমার শিয়র থেকে স'রে গিয়েছে,
ভীষণ নীল আকাশ,
তবু আর এক রকম ভেলকি জমেছে।
আওয়াজ করবার জন্যে
অন্য কেউ সুস্পষ্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে;
জানলা খুললে দেখতে পাই
তার প্রশিক্ষিত শরীর
এবং তাতে তুফান জাগাবার কায়দা
এবং গলায় একমুঠো পয়সা ভ'রে
তার বাজানোর খেলা।

ধারা শ্রাবণ

অজিত দত্ত

অতিরিক্ত স্পর্শকাতরতা ভালো নয়। মনে করো
তুমি যেন বর্ম পরে আছ; যেন জীবনে কি প্রাণে
অথবা মনের কোনো দুর্বল কোমলতম স্থানে
খেলাচ্ছলে কেউ কোনো আঘাত করেনি। বৃহত্তর
জীবনের স্বপ্ন দ্যাখো। মন্ত্রী কিংবা নেতা হও। গড়ো
বড়ো বাড়ি; আরো বড়ো খ্যাতি-অখ্যাতির অভিমানে
ঢেকে রাখো ক্ষতগুলি। কেউ যেন কখনো না জানে
তুমি কত শূন্যগর্ভ, মুমূর্ষু, ব্যথায় জরো জরো।

অথবা—। বিকল্প জানো? অনন্ত শয্যায় ভাসমান
পরাজিত, মূর্ছাগত, ব্যর্থকাম রবে চিরকাল
অলীক প্রেমের স্বপ্নে—যে-স্বপ্নে সান্ত্বনা নেই কোনো।
যত জল ঝরে তত তৃষ্ণা বাড়ে; যে-গর্জন শোনো
সে শুধু বঞ্চনাময় অট্টহাস; মেঘে অন্তরাল
নীলের অন্তিম চিহ্ন; শুধু ঝরে কান্না অফুরান॥

দ্বিতীয় শৈশব

মণীন্দ্র রায়

কাগজের নৌকো দিয়ে অজানা বন্দর
ছোঁওয়া যেত বুঝি একদিন।
ঝাড়ের তেকোণা কাঁচে
দেখা যেত স্বপ্নের প্রাসাদ
সাতরঙা রহস্যের বিস্ময়ে রঙিন।

পৃথিবীর মানচিত্র আর ইতিহাস
তারপর দ্রাঘিমা ও শতাব্দীর মাপে
খুঁজে খুঁজে দেখেছি কতো-না!
কোথাও মেলেনি কোনো উত্তরণ আজো;
সব সিঁড়ি নামে বুঝি পাতালের দিকে,
সব স্মৃতি যেন অশ্রুলোনা।

কাগজের নৌকো তবু বুকের ভিতর
কেন আজো কাঁপায় গলুই?
কেন মনে হয় তবু অন্য কারো চোখের আলোয়
আরো একবার বেঁচে শিল্পের খেলায়
দ্বিতীয় শৈশব ফিরে ছুঁই!

স্কেচ — সুধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়

দুইবৃত্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সেই ব্যাণ্ডেল চার্চে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে যে পরিচয় হয়েছিল, সেই আলাপের জের টেনেই আমরা দুজনে ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম।

নিউ আলিপুরের নতুন রাস্তা। বড়ো বড়ো বাড়ী উঠছে বটে, কিন্তু এখনো ছাড়া-ছাড়া ভাব, এখনো বাতাসে জংলা মাটির নিঃশ্বাস, এখনো মাঠের গন্ধ। ঠিক সামনেই যেখানে মাটি খুঁড়ে একটা তিন-চারতলার ভিত-পত্তন শুরু হয়েছে, তার এক ধারে একরাশ বুনো কচুর গাছ আর দ্রোণ-ফুলের ঝোপ হাওয়ায় কাঁপছে এখনো। তবে আর বেশিদিন নয়—হয়তো ওইখানেই গ্যারেজ তৈরী হবে বাড়ীটার।

এইখানেই একটি ফ্ল্যাটে আর্টিস্টকে পাওয়া গেল। ভাড়া নিয়ে এসেছেন। কাছেই তাঁর জমি—সেখানে নিজের বাড়ী তৈরী করবেন ধীরে-সুস্থে।

বললেন, বাড়ীটা হোক, এসে দেখবেন তারপর। একতলার সিঁড়ি থেকে তেতলা পর্যন্ত ছবি দিয়ে সাজিয়ে দেব।

তাতে অবশ্য অসুবিধা হবে না। ঘর বোঝাই ছবি। দেওয়ালে, মেজেতে, খাটের তলায়—কোথায় নেই? বললেন, আরো পাঁচ-ছটা ট্রাঙ্ক ভর্তি হয়ে পড়ে আছে—একটু হাসলেন: পনেরো বছরে তুলি হাতে নিয়েছিলুম, আজ ত্রিশ বছর ধরে আঁকছি। আবর্জনা তো নেহাৎ আর কম জমল না।

আমি আর আমার স্ত্রী ওঁর মুখোমুখি ভারী একটা সোফায় বসেছিলুম। সামনে সার দেওয়া দক্ষিণের খোলা জানলা। তার ভেতর দিয়ে দূর-দিগন্ত—একটা হলদে বাড়ীর একটুখানি মাথা ছাড়া কোথাও আর চোখ আটকায় না। তবু হলদে বাড়ীর ওইটুকু আভাসও খারাপ লাগছে না, বর্ষার মেঘ ছিঁড়ে গিয়ে শরতের ঘন নীল আকাশ সোনালি রোদে মাখামাখি—হলদে বাড়ীটা যেন সেই রোদের একটা জমাট অংশ ছাড়া কিছু নয়। একটা বকের ঝাঁক উড়ে চলেছে, অনেক দূর পর্যন্ত তাদের চলে-যাওয়া দেখতে পাওয়া গেল।

আমার স্ত্রী বললেন, আপনার ছবির এক্জিবিশন দেন না?

——না। আমার ওতে বিশ্বাস নেই—আর্টিস্ট একটু হেসে সিগারেটের টিনটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে: ওভাবে নিজেকে পণ্যের মতো সাজিয়ে দিতে আমার বাধে।

আমি বললুম, পণ্য কেন বলছেন? নইলে লোকে আপনাকে চিনবেই বা কী করে?

—এটা ইয়োরোপ নয়।—আর্টিস্টের হাসিটা আর একটু প্রসারিত হল: এখানে আর্ট এক্জিবিশনে আসা একটা ফ্যাশান মাত্র—ছবি বোঝবার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। ছবি দেখতে দেখতে যে-সব কমেণ্ট অনেক সময় দর্শকদের কাছ থেকে আসে, সেগুলো শুনলে আর্টিস্টের আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়। তা চাইতেও আপত্তিকর হল রিভিয়ু।

কথাটা আমার গায়ে লাগল, আমার স্ত্রী একবার আড়চোখে চাইলেন। কখনো কখনো বিনাস্বাক্ষরে আমিও ছবির সমালোচনা কর
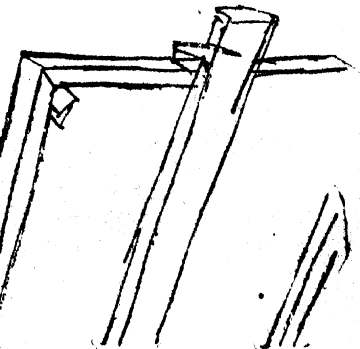
থাকি। বললুম, রিভিয়ুর ওপর এত রাগ কেন? আপনি কি বলতে চান, আর্ট-ক্রিটিকরাও ছবি বোঝে না?

—অনেকে বোঝেন; সবাই নয়। তার কারণ কী, জানেন? ছবি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে পারে, পড়াশুনোও থাকতে পারে হয়তো, কিন্তু ভালো ব্যাকরণ জানলেই যেমন সাহিত্য-বিচারের অধিকার জন্মায় না, ছবির ব্যাপারটাও তাই। ধরুন, লিখে বসল: 'নীলের ব্যবহার অকারণেই বেশি হইয়াছে।' কিন্তু ওই নীলটা যে ছবির মধ্যেই থেমে নেই, ওর সঙ্গে আর্টিস্টের মুডের একটা ব্যাপার আছে—ওর যে একটা আলাদা পার্সোনাল ইন্টারপ্রিটেশন আছে, এটা ক্রিটিকের কাছে সব সময় ধরা পড়ে না। অর্থাৎ ছবি বুঝতে আর্টিস্ট হতে হয়, যার ছবি তার মেজাজের দিকটা জানতে হয়, সহমর্মিতা দরকার হয়। নইলে রং-কম্পোজিশন-ফর্মের আলোচনা অনেকটা ভাষাতত্ত্ব দিয়ে কবিতা ব্যাখ্যা করবার মতো। শিল্পী এবং সমালোচকের কম্বিনেশন না হলে আর্ট-ক্রিটিক হওয়া যায় না আর তাদের সংখ্যা হচ্ছে কোটিকে গুটিক।

আমি বললুম, তার মানে কবিতার আলোচনা করবার আগে কবিতা লিখতে হবে?

—মনে মনে তো নিশ্চয়ই। কাগজে লিখলে আরো ভালো। ম্যাথু আর্নল্ডকেই দেখুন না। কবি ছিলেন বলেই অমন করে সমালোচনার দীপালী জেলে দিতে পেরেছেন।

আমার স্ত্রী বিরক্ত হয়ে হাই তুললেন। আমি বুঝতে পারলুম, এই কচকচি তাঁর ভালো লাগছে না। ভালো লাগবার কথাও নয়। আকাশের মেঘ ছিঁড়ে নীল আকাশ সোনায় মাখামাখি। জংলা মাটির নিঃশ্বাস জড়ানো হাওয়ায় ভাদ্রের শেষ ছোঁয়া; দেওয়ালের একটা ল্যান্ডস্কেপে কতগুলো উদ্ধত ফণীমনসা—কেয়া ফুলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই ছুটির সকালটা যেন জলভরা দীঘির মতো শান্ত-গভীর, আমরা অকারণে কথার পর কথা সাজিয়ে তাতে ঢেউ তুলছি।

ঠিক সেই সময় চায়ের ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন আর্টিস্টের স্ত্রী। প্রসন্ন একটুখানি হাসি ছড়ালেন আমাদের দিকে।

আমার স্ত্রী বললেন, ভারী অন্যায় মিসেস্ দাস। আপনি কি এতক্ষণ বসে খাবার করছিলেন আমাদের জন্যে?

মিসেস্ দাস বললেন, খাবার আমি কিছুই করিনি। কেকগুলো দোকানের, শুধু অমলেট দুটো ভেজে এনেছি।

—কেন এসব করতে গেলেন? কিছু দরকার ছিল না।

আর্টিস্ট বললেন, করেছে দায়ে পড়ে। আমার পুরোনো চাকরটা তিন মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, তার জায়গায় যে নতুন লোকটা এসেছে সে একেবারে হোপলেস। পরশু রসুন ছড়িয়ে সর্ষের তেলে এমন অমলেট ভেজেছিল যে, একেবারে টেনে রাস্তায় ফেলে দিতে হল। তা ছাড়া এমনিতেও ও খাবার-দাবার করতে ভালোবাসে। আপনারা হঠাৎ চলে এলেন, একটু আগে খবর পেলে অন্য ব্যবস্থা করা যেত। ও যা মোগলাই পরোটা আর চপ তৈরী করে—সত্যি বলতে কি—কলকাতার কোনো হোটেলেও সে জিনিষ আপনারা পাবেন না।

মিসেস্ দাস হাসলেন: ও'র সার্টিফিকেটে কান দেবেন না। উনি দারুণ ডিস্পেপটিক, শিং-মাগুরের ঝোল আর সেদ্ধ ছাড়া কিছুই খান না।

আমি বললুম, হাউ আনফর্চুনেট! ঘরে এমন রাঁধুনি, আর আপনি—

—আমার লোককে খাইয়েই সুখ। বন্ধুদের সার্টিফিকেটেই ও'র গুণপনার পরিচয় আমি পাই। তা ছাড়া বারো বছর আগে যখন ও'কে বিয়ে করি, তখন তো আর ডিস্পেপসিয়া ছিল না। সে রান্নার স্বাদ আমার মনে আছে।

সে রান্নার স্বাদ নিশ্চয় আলাদা, মনে মনে আমি বললুম। সেদিন আমারও ছিল। তখন স্ত্রীর হাতের নুনে-কাটা তরকারী আর বিশুদ্ধ গঙ্গা-বারির মতো মাছের ঝোলও অমৃতবৎ মনে হত। আর্ট-ক্রিটিক হওয়ার জন্যে মানুষকে কতদিন পরিশ্রম করতে হয়, ঠিক জানি না; কিন্তু স্ত্রীর ক্রিটিক হওয়ার জন্যে অন্তত বছর তিনেক অপেক্ষা করতে হয়—তার আগে পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন মুগ্ধতার পালা।

মিসেস্ দাস বললেন, নিন, চা খেয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে যাবে।

—আপনারা?

—আপনারা আসবার আগেই হয়ে গেছে। আপনাদের আর্টিস্ট তো সাড়ে সাতটায় বরাদ্দ দানা আর এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়েছেন, আর একবার কফি খাবেন ঘড়ি ধরে ঠিক দশটায়। এর ভেতরে আর কিছু ও'র চলবে না। আমি চা নিচ্ছি—আপনারা শুরু করুন।

খেতে খেতে ও'দের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কথাটাই মনে পড়ছিল। ঠিক তিন সপ্তাহ আগে। এমনি এক রবিবারে আমরা দুজনে ব্যান্ডেল চার্চে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বেড়াতে যাওয়ার দিন সেটা নয়, সকাল থেকে আকাশ মেঘলা ছিল, ইলশে-গুঁড়ি ঝরছিল থেকে থেকে। তবু ঘরে বসে বসে বিরক্তি ধরে গিয়েছিল—ভিজতে হয় ভিজব মনে করেই বেরিয়ে পড়েছিলুম আমরা।

সামনে ভরা গঙ্গার স্রোত, অজস্র মানুষের ভক্তি-বিশ্বাসে চর্চিত পুরোনো গীর্জাটি—ক্লান্তিহর পুবের বাতাস—মেঘলা ধোঁয়াটে আকাশ, সব মিলিয়ে বেশ লাগছিল। আমার স্ত্রী ভাদ্র মাসের কথাটা ভুলে গিয়ে গুন গুন করে শ্রাবণের গান গাইছিলেন: 'শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা'—এমন সময় দেখা হল ও'দের সঙ্গে।

বেশ রোমান্টিক।

ভদ্রলোক প্রৌঢ়ত্বে ঝুঁকেছেন, মাথার চুলে কাঁচা-পাকার ঝিকিমিকি। স্ত্রীর উজ্জ্বল দীর্ঘ দেহে সম্পূর্ণ যৌবন—অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর বয়েসের ভেতরে যে প্রচুর ব্যবধান আছে, দেখলেই সেটা বুঝতে পারা যায়। আমি তো প্রথম দৃষ্টিতে ও'দের স্বামী-স্ত্রী বলেই ভাবতে পারিনি—ভদ্রমহিলাকে মডেল বলেই ধারণা জন্মেছিল আমার।

পটভূমিটা ছিল অপূর্ব। স্ত্রী একটি গাছের পাশে আলগা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। পুবের হাওয়ায় তাঁর চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে। পেছনে বর্ষার গঙ্গা। স্বামী একটি ফ্রেমের ওপর ইজেল পেতে দ্রুত তুলিতে রঙের পর রঙ টেনে তাঁর ছবি আঁকছেন।

তাকিয়ে দেখলুম, হাতের টানগুলো পা[...]ক্কার। অনেক দিনের সাধনায় সিদ্ধ।

তারপরে আলাপ হল। আমরা আমা[...] পরিচয় দিলুম—ও'রা ও'দের। জানলুম, মিস্ট[...] দাস ইন্সিয়োরেন্সে ভালো চাকরী করেন[...] ছবি আঁকা ও'র নেশা। আর্ট স্কুলে পড়েন [...] স্বয়ংসিদ্ধ। কিন্তু ছবি সম্বন্ধে পড়াশুনো কর[...] ছেন—চিন্তাও করে থাকেন। আর এ ব্যাপা[...] তিনি রক্ষণশীল। নিখুঁত, বাস্তব ড্রয়িং[...] তিনি বিশ্বাসী, এ যুগের নানা আন্দোলন[...] অবক্ষয় বলে মনে করেন তিনি। তাঁর কাছে ছ[...] চেতন-অচেতন, স্বপ্ন-তন্দ্রা আর যুগের জটিল[...] তার গোলকধাঁধা নয়—চাক্ষুষ বস্তুর বাস্ত[...] প্রতিরূপ। গত একশো বছর ধরে ইয়োরোপে[...] শিল্প-ভাস্কর্য ক্রমশ ধ্বংসের দিকে চলে[...] বলেই তাঁর বিশ্বাস।

এ সব তো তর্কের কথা। কিন্তু মোটের ওপ[...] এই প্রিয়ভাষী ভদ্রলোককে আমাদের ভাল[...] লাগল। একটু বেশি বয়েসে বিয়ে করেছে[...] কিন্তু দেখলুম স্ত্রী-টি তাঁর ছায়া-সঙ্গিনী[...] স্বামী যখন কথা বলেন, তখন আশ্চর্য মু[...] দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন তাঁর দিকে, সম[...] মুখ তাঁর আলো হয়ে ওঠে। যেন স্বামীর কথা[...] গুলো তাঁর কাছে দৈববাণীর মতো মনে হ[...] মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে একটি শব্দকে[...] তিনি হারাতে চান না, যেন স্বামীর প্রতি[...] বাক্য তাঁর কাছে এক-একটি করে বিস্ময়ে[...] দ্বার খুলে দিতে থাকে। এমন অনুরাগিণী স্ত্[...] এর আগে কখনো আমি দেখিনি।

মিস্টার দাসও দেখলুম অকৃতজ্ঞ নন। স্ত্রী[...] সম্পর্কে তিনি উচ্ছ্বসিত।

দেখুন, ছবি আঁকছি আমি অনেক দি[...] থেকেই, কিন্তু সত্যিকারের প্রেরণা পেয়েছি গ[...] বারো বছর থেকে। আমার স্ত্রীই হচ্ছেন সে[...] কন্স্ট্যান্ট ইন্স্পিরেশন।

আমার স্ত্রীর দিকে একবার তাকিয়ে আ[...] একটু হাসলুম। বললুম, আপনি ভাগ্যবান।

—সেকথা বলতে পারেন, আমি নিশ্চ[...] ভাগ্যবান। অনেক সময় কোনো কোনো সমঝদা[...] বন্ধু এসে বলে বসেন, আমি নাকি নিতান্ত[...] মধ্য-যুগে বাস করছি, আমার ছবি নাকি ছেলে[...] ভোলানো রঙের খেলা, কালার্ড ফোটোগ্রাফ[...] অতিরিক্ত কিছু নয়। প্রায়ই হেসে উড়িয়ে দিই[...] কিন্তু মানুষের মন তো বুঝতে পারেন, মাঝে[...] মাঝে ডিপ্রেশন এক-আধটু আসেই। আমি যে[...] কিছুতেই আধুনিক ফর্ম-কনটেন্টকে নিতে পার[...] না, সে মেজাজই আমার নয়। তা হলে এতদিনে[...] সাধনা সব মিথ্যে? ভাবি, তুলি-টুলি স[...] জানলা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিই। কিন্[...] আমার সেই সব ন্যাস্টি মুডে কণিকাই আমাকে[...] বাঁচিয়ে রাখে। বলে, এ-সব মডার্ন আর্ট শুধ[...] ফ্যাশান ছাড়া কিছু নয়। ফ্যাশান দু-দিন পরে[...] ফুরিয়ে যায়, কিন্তু যা খাঁটি জিনিস তাই চির[...] কাল টিঁকে থাকে, তা-ই ইটার্নাল।

ভদ্রতা করে আমি বললুম, ঠিক কথা।

—ঠিক কথা কিনা জানি না। হয়তো আমি[...] ছবির ব্যাপারে মধ্যযুগেই বাস করছি, হয়তো[...] আমার এ-সব পোর্ট্রেটের দাম এ-কালে কানা[...] কড়ির বেশি নয়। তবু কণিকাই আমাকে শক্তি[...] দেয়, বলে—কোনোদিকে তুমি তাকিয়োনা, ছবি[...] এঁকে যাও। ওই জোরেই তো আছি মশাই—নইলে তো অফিসের পরে রোজ খেলে, আড্ডা দিয়ে কিংবা সিনেমা দেখেই দিন কেটে যেত।

কথায় গল্পে মেঘের ছায়া ঘন হল, বেলা ড় এল, বৃষ্টির ফোঁটা নামল দু-চারটে। রো বললুম, তাহলে চলি মিস্টার দাস—সাড়ে চটার ট্রেনটা আমাদের ধরতে হবে।

—কলকাতাতেই ফিরবেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা হলে ট্রেনের জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? মার গাড়ী রয়েছে—যাওয়া যাবে একসঙ্গে।

—আপনাদের অসুবিধে হবে—

—এত বড়ো গাড়ী মশাই, সাতজন বসতে রে, চারজনে কী অসুবিধে হবে? ভদ্রতার কার নেই—সবাই মিলে গল্প করতে করতে ল যাব।

সুতরাং আলাপ আরো ঘনীভূত হল। পথে রতে ফিরতে খরধারে বৃষ্টি নামল, জানলার চ তুলে দিয়ে মিস্টার দাস তাঁর শিল্পী-বিনের কথা আরো অনেক করে বলে যেতে গেলেন। অন্ধকার নামা পথ বৃষ্টিতে আরো পসা হয়ে গেল। হেড লাইটের আলো হাত য়েক দূরে এগিয়েই থমকে যেতে লাগল, পথ-ট-গাড়ী-গাছপালা সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন য়ে যেন একটি শিল্পী মানুষের একক মানসিক গতে আমরা সংহত হলুম। আর তারই চতরে মিস্টার দাসের পাশে বসে থাকা কণিকা বীর মুখ এক অপূর্ব তন্ময়তার তলিয়ে ইল, তাঁর চোখ দুটো প্রদীপের দুটি স্থির খার মতো চেয়ে রইল স্বামীর দিকে। লকাতায় এসে যখন পৌঁছলুম, তখন মাদের বাড়ীর সামনে এক হাঁটু জল। গাড়ী কে নামতে নামতে বললুম, অনেক উপকার রলেন মশাই—নইলে হাওড়া থেকে বাড়ী পৌঁছোনো আজ আমাদের দুর্ঘট হত।

—কিছু না—কিছু না—মিস্টার দাস সলেন: বেশ ভালো লাগল সন্ধ্যাটা। লাপও হয়ে গেল আপনাদের সঙ্গে। আরো শি হবো যদি একদিন আমাদের ওখানে য়ের ধুলো দেন।

সেই সূত্রেই এই রবিবারের সকালে আমি র আমার স্ত্রী মিস্টার দাসের এই ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছেছি। ভারী স্নিগ্ধ দিনটি। সারি সারি চের জানলার ভেতর দিয়ে শরতের ঘন নীল কাশ সোনালী রোদে মাখামাখি—হলুদে ড়ীর মাথাটা যেন সেই রোদের জমাট বাঁধা করো একটা। হাওয়ায় এখনো জংলা মাঠের ধ, বুনো গাছপালার নিঃশ্বাস, কাঁচা মাটির য়া। কণিকা দেবীর দুটো চোখের তন্ময় ষ্টি স্বামীর মুখের ওপর।

চা-খাওয়া শেষ হলে মিস্টার দাস বললেন, বার ছবি দেখুন।

ছবি দেখবার জন্যে দূরে যাওয়ার দরকার ই, এমন কি আসন ছেড়ে না উঠলেও চলে। রা ঘরটাই আর্ট গ্যালারী। দেওয়ালে ছবি, জের ছবি, নানা ধরনের স্ট্যান্ডে বসানো ছোট ড়ো ছবি। রং আর তুলির সমারোহ জ্বলছে রদিকে। টেবিলে রঙের টিউব, বাটি, অসংখ্য শ, স্তূপাকারে কাগজ আর ক্যানভাস।

মিস্টার দাস হাসলেন: 'আমি যত ভার মিয়ে তুলেছি, সকলই হয়েছে বোঝা।' কী রি এদের নিয়ে তাই ভাবি।

কণিকা বললেন, তোমায় কিছু ভাবতে হবে । যেমন আছে তেমনিই থাকবে।

—তা থাক। কিন্তু কিছুদিন পরে এই ছবি-গুলোই যে আমাদের উদ্বাস্তু করে দেবে। তখন আমরা আর থাকার জায়গা পাব না।

—সে আমি ভাবব।—কণিকা ভ্রূকুটি করলেন: তোমায় ভাবতে হবে না।

আমি বললুম, ছবির ভার যদি অসহ্য হয়ে থাকে, দয়া করে জানাবেন আমাদের। আমি লোক নিয়ে আসব। দেখবেন, এক ঘন্টার মধ্যেই ঘর সাফ হয়ে গেছে।

কণিকা শিউরে উঠলেন।

—না—না, ঘর সাফ করবার দরকার নেই। ওরা যেমন আছে, তেমনিই থাক।

—ওই দেখুন—মিস্টার দাস এবার শব্দ করে হেসে উঠলেন: এগুলো যেন ওর যখের ধন। প্রাণে ধরে একখানা ছবি বাইরে বেরুতে দেবে না। বন্ধু-বান্ধবকে পর্যন্ত একখানা প্রেজেন্ট করতে গেলে ও চটে যায়। বলে, মিথ্যে কেন দিচ্ছ? ওরা কদর বুঝবে না—ধুলোর মধ্যে ফেলে রাখবে কিংবা এমনভাবে দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবে যে কারুর নজরে পর্যন্ত আসবে না। তোমার এত কষ্টের জিনিস নিয়ে লোকে অপমান করবে, এ আমি সইতে পারব না।

আমি বললুম, উনি ঠিক কথাই তো বলেছেন।

—না মশাই, এ হল পিয়োর অ্যান্ড সিম্পল পজেসিভ ইনস্টিংক্ট। ইউ নো, উই আর চাইলডলেস। তাই সন্তানের জন্যে যত মমতা সব ও'র ছবির ওপর গিয়ে পড়েছে।

কণিকা রাঙা হয়ে বললেন, আঃ থামো।

—থামবার তো কিছু নেই—বেয়ার ফ্যাক্টস! কিন্তু একটি দুটি ছেলেপুলের বদলে তোমাকে হাজারখানেক সন্তানের পরিচর্যা করতে হয়—এইটেই যা তফাৎ।

—কী বকছ তুমি!

মিসেস দাসকে অস্বস্তি থেকে বাঁচাবার জন্যেই আমি আসন ছেড়ে উঠে পড়লুম। বললুম আপনাদের এসব দাম্পত্য আলাপে শ্রোতা হিসেবে আমাদের না থাকাই ভালো। তার চাইতে ছবিই দেখা যাক বরং।

আমার স্ত্রী কম কথা বলেন, চুপ করেই ছিলেন এতক্ষণ। তিনিই আগে এগিয়ে গেলেন সামনের দেওয়ালের দিকে। থামলেন প্রকাণ্ড একখানা তেল রঙ ছবির কাছে গিয়ে। মৃদু হেসে বললেন, পৌরাণিক সাবজেক্ট? ঠিক বুঝতে পারছি না তো?

শিল্পী এক মুহূর্তে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠলেন। বড়ো বড়ো পা ফেলে চলে এলেন ছবির কাছে।

—এটা? উর্বশী আর পুরূরবা। উর্বশী চলে যাচ্ছেন—পুরূরবার মিনতি শুনছেন না, তাঁর শাপমোচন হয়ে গেছে।

আমি বললুম, চমৎকার হয়েছে।

—হ্যাঁ, ছবিটা এঁকে আমারও ভালো লেগে-ছিল। কিন্তু আমার তৃপ্তি অন্য জায়গায়। উর্বশীর মুখের দিকে একবার ভালো করে চেয়ে দেখুন। কোনো সাদৃশ্য পাচ্ছেন কি কারুর সঙ্গে?

এমনভাবে ধরিয়ে না দিলে আমরা হয়তো খেয়ালই করতুম না। আমি আর আমার স্ত্রী একসঙ্গেই বললুম, মিসেস দাস!

—ঠিক ধরেছেন। আর এদিকে দেখুন। অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা।

ছবির পরিচয় দেবার দরকার ছিল না—একেবারে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার রূপমূর্তি। সোনার ত্রিশূলে দেওয়া শুভ্র শিবমন্দির আর পুষ্পিত বসন্ত অরণ্যের ওপর দিয়ে সূর্য উঠছে—আরক্তিম আলো আর রাত্রির ছায়া বিজড়িত সেই পটভূমিতে মুখ থেকে অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিচ্ছেন চিত্রাঙ্গদা—মুগ্ধ চকিত অর্জুনকে সম্ভাষণ করে যেন বলছেন, 'আমি চিত্রাঙ্গদা—রাজেন্দ্রনন্দিনী।' কিন্তু সেই অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখের যেটুকু দেখা যায়—তাও মিসেস দাস ছাড়া আর কারুর নয়!

আমি বললুম, ঠিকই বলেছেন, মিসেস দাস আপনার সাহিত্যকের ইনস্পিরেশনই বটেন।

—আজ, এই বারো বছর ধরে ওই আমার একমাত্র মডেল। এখানে দেখুন, একটা বিলিতী মাস্টারপিসের ইমিটেশন আঁকতে চেয়েছিলুম, আন্তনি আর ক্লিয়োপাত্রা। প্রাসাদের শিখরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুজন।—ক্লিয়োপাত্রা মাথা রেখেছেন আন্তনির বুকে—মিশরের রাণীর নীল চোখের তারায় ডুবে যাচ্ছেন রোমান সেনাপতি। দূরে নীল নদের মোহানায় অস্পষ্ট কয়েকটা যুদ্ধ জাহাজ—সেনাপতিকে বিজয়ের সিংহাসনে বসিয়ে তারা সমুদ্রে ফিরে যাচ্ছে—আর চারদিকে মরুভূমির ধু ধু বালুর উত্তাপ যেন কামনায় একটা অগ্নিবলয় রচনা করছে। ছবিটা আমাকে খুব মাতিয়ে দিয়েছিল।

বললুম, খুব স্বাভাবিক। সমস্ত কল্পনাটাই তো চমৎকার রোমান্টিক।

—একেবারে ইমিটেশন। মূলকে যতটা পারি ধরতে চেয়েছি। তবু লক্ষ্য করুন, সেই

রূপহীনা অথচ আগুনের মতো ভয়ঙ্কর ক্লিয়োপাত্রাকে আমি আনতেই পারিনি। তার বদলে ক্লিয়োপাত্রার মুখে বাঙালী মেয়ের কোমলতা পড়েছে—তার চোখের তারার নীল নদের ওপর আমি মরুভূমির রোদ ছড়াতে পারিনি, বাংলাদেশের দীঘির জলে নারকেল গাছের ছায়া কেঁপেছে।

বলবার প্রয়োজন ছিল না, সেই বাঙালী মেয়েটি কে। আমি আর আমার স্ত্রী একসঙ্গেই কণিকার দিকে চাইলুম। তেমনি তন্ময়, তেমনি মগ্ন; আন্তনির বুকে নয়—স্বামীর বুকে যেন মনে মনে মাথা রেখেছেন স্ত্রী: নীল নদে নয়, কোনো কালো দীঘির নিবিড় জলের ভেতরে তলিয়ে গেছেন!

মিস্টার দাস যেন তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন।

—কণি, আমার সিগারেটের টোব্যাকো ফুরিয়ে গেছে। একটা নতুন টিন নিয়ে এসো তো ড্রয়ার থেকে।

কণিকা নড়ে উঠলেন। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

মিস্টার দাস বললেন, জানেন, আমার চাইতেও বেশি নেশা ধরে গেছে আমার স্ত্রীর। একদিন ছবি না আঁকলে উনিই আমার চাইতে বেশি অধৈর্য হয়ে যান। বলেন, তুমি ছবি না আঁকলে আমি থাকতে পারি না—আমার রীতিমতো যেন শারীরিক কষ্ট হতে থাকে। তুমি যেভাবে চাও, আমি সিটিং দিচ্ছি—কিছু একটা আঁকো!

আমি বললুম, অভ্যাস হয়ে গেছে ও'র।

—অভ্যাস নয় মশাই, তার চাইতেও বেশি। আমার তো প্রায়ই মনে হয়, ছবিটা ফোটে ও'র চিন্তার ভেতরে, আমি শুধু তাকে তুলি ধরে রূপ দিই মাত্র। আর ও'র নিজের ভাবনায় যখন ছবি দেখা দেয়, তখন আর থাকতে পারে না, অদ্ভুতভাবে ছটফট করতে থাকেন—একটা আউটলেট না হওয়া পর্যন্ত যেন আর ও'র নিষ্কৃতি নেই!

আমরা চুপ করে শুনতে লাগলুম।

মিস্টার দাস হাসলেন ঃ একদিনের কথা বলি। অফিস থেকে ফিরেছি জ্বর নিয়ে—ইনফ্লুয়েঞ্জা। জ্বরের ঘোরে আধো ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, হঠাৎ চমকে জেগে উঠলুম। ঘরে বড়ো আলোটা জ্বলছে, কণিকা মাথায় হাত রেখেছে আমার, ওরও চোখ দুটো জ্বলন্ত। বললুম, 'কী হয়েছে কণি?' অদ্ভুত স্বরে বললে, 'তুমি কি আধ ঘণ্টার জন্যেও একটু উঠে বসতে পারো না?' 'কেন?' 'আমাকে মডেল করে যা হোক কিছু তুমি আঁকো—নইলে আমি স্থির থাকতে পারব না!' কী আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো। মনে হল, জ্বর আমার নয়, ও'রই শরীরে একশো পাঁচ ডিগ্রি টেম্পারেচার উঠেছে। আমার মাথা ঘুরছিল, চোখে ঝাপসা ঝাপসা দেখছিলুম, তবু উঠে বসতে হল। ও তক্ষুণি আমার জন্যে কফি তৈরী করে আনল—তাই গিলে আমি ছবি আঁকতে বসলুম। নেহাৎ মন্দ উৎরালো না। ওপাশে ওই যে সেমি-ন্যুড্‌টা দেখতে পাচ্ছেন, ও হল সেই রাত্রের ছবি।

আমার স্ত্রী হঠাৎ সরে গেলেন আমাদের কাছ থেকে। আমি দেখলুম ওর মুখের ওপর একটুকরো মেঘের মতো কী যেন ঘনিয়েছে। কিছু একটা বুঝেছেন এবং সেই বোঝাটা তাঁর ভালো লাগেনি।

ঘরের কোণে টেলিফোন বাজল। দাস এগিয়ে গিয়ে সেটা ধরলেন।

—হ্যালো—হ্যালো—কে, যতীন বোস? নমস্কার।

—.........

—কী বললেন, 'অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদা?' না—না—

—.........

—টাকার কোশ্চেনই নয় মশাই, অন্য ব্যাপার। আমি বেচতে পারব না।

—.........

—না, না, অসম্ভব। আচ্ছা, নমস্কার।

ফোন রেখে হাসলেন একটুখানি। হাসিটায় স্বাদ ছিল না।

বললেন, একজন বিজনেসম্যান অর্জুন আর চিত্রাঙ্গদা কিনতে চাইছেন। হাজার টাকা অফার করছিলেন।

—বেচবেন না বুঝি?

—নিজের কানেই তো শুনলেন!—আবার বিস্বাদ হাসিতে মিস্টার দাসের মুখ ভরে উঠল ঃ কণিকা কিছুতেই বেচতে দেবে না। অদ্ভুত ওর সাইকোলজী, মশাই। ছেলেপুলে তো নেই—সব অপত্যস্নেহ গিয়ে ছবিগুলোর ওপরেই

—বরপণ চাই না। এটা যৌতুকের ফর্দ।

পড়েছে যেন। আমি মধ্যে মধ্যে বলি, দু'চারখানা বেচলেই বা ক্ষতি কী, অন্তত রং-তুলি-ক্যানভাসের খরচ উঠে আসে, গাড়ীর তেলের দামটা উশুল হয়, কখনো কখনো শিলং-দার্জিলিং যাওয়ার খরচাটাও জোটে। তাছাড়া এত ছবি রাখবই বা কোথায়—শেষ পর্যন্ত পাঁচতলা বাড়ী তুললেও সে আমাদের জায়গা কুলোবে না। উত্তরে বলে, না—ছবি তুমি বেচতে পারবে না, ও আমাদের জিনিস, আমাদেরই থাকবে। স্ট্রেঞ্জ—না?

আমি কী জবাব দেব ভাবছিলুম ঠিক এই সময় কণিকা ফিরে এলেন।

—এনেছ টোব্যাকো?

—না, একটা কৌটোও নেই দেখছি। সব ফুরিয়ে গেছে। কালকেই আনতে হত, আমার খেয়াল ছিল না।

মুহূর্তে কী যে হয়ে গেল, আমি বুঝতেও পারলুম না। যেন একটা আবরণ সরে গেল মিস্টার দাসের মুখের ওপর থেকে, ফুটে বেরুল অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা—তীক্ষ্ণতায় চোখ দুটো ছুরির ফলার মতো ধারালো হয়ে উঠল।

—তার মানে, মার্কেটে না দৌড়ালে আর টোব্যাকো পাওয়া যাবে না?—কঠিন নির্মম স্বরে বললেন, কী করছিলে কাল সারাদিন—একটু নজর থাকে না কোনো দিকে? ইরেসপন্সিবল—ইডিয়ট কোথাকার!

ট্যাক্সি করে নিঃশব্দে আমরা ফিরে আসছিলুম। নিউ আলিপুর, আলিপুর পেরিয়ে গাড়ী যখন ময়দানের কাছে এল, তখন যেন এক যুগ পরে কথা কইলেন আমার স্ত্রী।

—একজন শুধুই মডেল, আর একজন শুধুই ছবি আঁকবার যন্ত্র। ওরা কী?

ওরা কী—তা কি আমিই জানি! শুধু স্বার্থপরতার দুটো বৃত্ত—প্রয়োজনের বাঁধনে একসঙ্গে বাঁধা। স্ত্রীর একখানা হাত মুঠোর ভেতরে টেনে নিয়ে বললুম, আর্ট-ক্রিটিক হয়েই আমি সুখে আছি, এর বেশি কিছুই আমি চাই না।

—

স্কেচ

গোপাল ঘোষ

মহাকাশ যাত্রায় শ্যাওলার ভূমিকা

শ্রীগোপাল ভট্টাচার্য

ইট, কাঠ বা অন্য যে কোন বস্তু দিন কয়েক পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখলে দেখা যাবে, তাদের গায়ে সবুজ রংয়ের এক রকম হড়হড়ে পদার্থ লেগে আছে। কাচের জারে জল রেখে দিলেও দিন কয়েক পরে তার গায়ে এই রকম সবুজ রংয়ের পদার্থ সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই জাতীয় পদার্থই যে একদিন মহাকাশযাত্রী মানুষকে তার দীর্ঘ যাত্রাপথে বাঁচিয়ে রাখতে সহায়তা করবে, সে কথা হয়তো কেউ কল্পনাও করেন নি। পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশযাত্রীরা যখন গ্রহান্তরে যাবার জন্যে দীর্ঘ পথে পাড়ি জমাবে, তখন তাদের শ্বাসক্রিয়ার অক্সিজেন যোগাবে এই সবুজ রংয়ের হড়হড়ে পদার্থ, যাকে আমরা শ্যাওলা বলে জানি। শ্যাওলা উদ্ভিদশ্রেণীভুক্ত অতি সরল গঠনের এককোষী জীবন্ত পদার্থ। সাধারণ উদ্ভিদের মত এদের শিকড়, কান্ড, পাতা বা ফুল বলে কিছু নেই। সরল গঠন আর ক্ষুদ্রকায় বলে মহাকাশযানে এগুলি ব্যবহার করবার পক্ষে খুবই উপযোগী। এগুলিকে জন্মাবার জন্যে প্রয়োজন কেবল জল আর আলোর—মহাকাশযাত্রীর প্রশ্বাস থেকে পাবে প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড আর তাদের পরিত্যক্ত পদার্থ থেকে পাবে নাইট্রোজেন এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ। শ্যাওলা অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। কাজেই গ্রহান্তরে গিয়ে আবার ফিরে আসতে যত সময়ই লাগুক, অল্প পরিমাণ শ্যাওলা নিলেই অক্সিজেন উৎপাদনের ব্যবস্থা হতে পারবে। তাছাড়া এই এককোষী উদ্ভিদগুলিকে খাদ্য হিসাবেও ব্যবহার করা চলবে। শ্যাওলার একপাত্র খাবার সাজিয়ে দিলে সেগুলি আর সবুজ শ্যাওলার মত দেখাবে না বা খেতেও শ্যাওলার মত মনে হবে না। মহাকাশযানের যাত্রীরা খাবার ঘরে গিয়ে দেখবে, সেই হড়হড়ে পদার্থটা যেন যাদুবলে সুখাদ্য পদার্থে পরিণত হয়েছে এবং খাবারটা পুষ্টিকরও বটে। পুরোপুরি ক্ষয়িবৃত্তির জন্যে যতটা মাংস এবং তার সংগে অন্যান্য উপকরণের দরকার, একমাত্র শ্যাওলা থেকে তৈরী খাবারেই তার মত পুষ্টিকর পদার্থ পাওয়া যাবে। তাছাড়া শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় সব রকমের ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, প্রোটিন এবং স্নেহজাতীয় পদার্থও পাওয়া যাবে। এই শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদগুলি এতই স্বাস্থ্যপ্রদ যে, এমন এক দিন হয়তো আসবে যখন দেখা যাবে—যাঁরা পৃথিবী ছেড়ে গ্রহান্তর যাত্রায় উৎসাহী নন, তাঁরাও এই শ্যাওলার তৈরী খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। শ্যাওলা থেকে তৈরী খাদ্যবস্তুকে একদিকে যেমন পৃথিবীর লোকের, অন্যদিকে তেমনই মহাকাশচারীদের পক্ষে অধিকতর মুখরোচক এবং লোভনীয় করে তোলবার ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

মহাকাশযানে অক্সিজেন ও খাদ্য সরবরাহের জন্যে শ্যাওলা ব্যবহারের পরিকল্পনা অবশ্য অভিনব, সন্দেহ নেই; কিন্তু শ্যাওলা মানুষের কাছে কোন অভিনব জিনিষ নয়। আমরা আদিজীবের যে সব অভিব্যক্তি দেখতে পাই, তার মধ্যে শ্যাওলাই হলো অতি প্রাচীন।

পৃথিবীর আদিযুগে—যখন মানুষের আবির্ভাব ঘটে নি—বানর জাতীয় প্রাণীদের পূর্বে—এমন কি, ডায়নোসোর, ব্রন্টোসোর, খড়্গদন্তী ব্যাঘ্র, লোমশ ম্যামথেরও পূর্বে—য গাছপালা, লতাগুল্মের চিহ্নমাত্রও ছিল না নীচে জল, মাটি আর উপরে আকাশ ছা কিছুই দেখা যেত না, সেই সুদূর অতীতে একমাত্র জীবন্ত পদার্থ ছিল, যারা সেই যু আজ পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিতভাবেই আ জীবনধারা অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। প্রাগৈতিহা যুগের প্রস্তরাদির মধ্যে সংরক্ষিত সেই আ যুগের শ্যাওলার জীবাশ্ম বা অস্পষ্ট ছ অনেকেই হয়তো দেখে থাকবেন।

কয়েক বছর পূর্বে দুইজন বৈজ্ঞা প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণীদের জীব সন্ধান করছিলেন। এক প্রাচীন ... আকরিকের মধ্যে ফ্লিন্টরকের সন্ধান পান। ... ছিল প্রায় দুই বিলিয়ন বছরের পুরাতন। ফ্লিন্টরকের অভ্যন্তরে শ্যাওলার জীব সন্ধান পেয়ে তাঁরা যে অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছিলেন, তা সহজেই বুঝা যায়। ... বুঝতে পারলেন—মানুষ এ পর্যন্ত যা দেখে এরূপ একটা প্রাচীনতম জীবন্ত বস্তু তাঁরা দেখতে পেয়েছেন। এটা যেন ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায় দেখবার আমরা আজকাল যে সব গাছপালা সেগুলি সবই এই আদিম শ্যাওলারই বংশধর মাত্র। ক্রম-বিবর্তন উদ্ভিদ-জগতে যেমন সত্য, প্রাণী-জগৎ, তথা মানুষের পক্ষে তেমনি সত্য। যুগের পর যুগ ধরে বিবর্তনের পথে উদ্ভিদের জটিলতা বৃ পেয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জন্তু কেউ দেখে নি, বানরাকৃতির নিয়েন্ডার গুহা-মানব বা তাদের আশ্রয় স্থলও কেউ প্র করে নি। হাজার হাজার বছর পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং উন্নত বুদ্ধি সম্পন্ন আধুনিক মানুষ তাদের স্থান অ করেছে। সেই যুগের যে সব গাছ প্রাগৈতিহাসিক মানুষকে খাদ্যাদি যোগা আশ্রয় প্রদান করতো, তারা এখন

বর্ধিতাকারে ক্লোরেলা ...
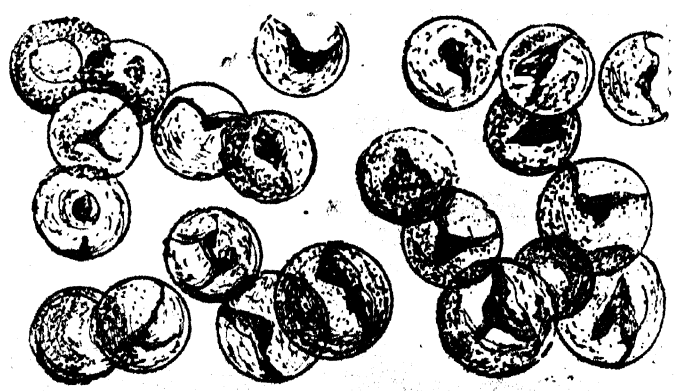
পরিবর্তিত হয়েছে যে, সেই প্রাচীন উদ্ভিদের বংশধর বলে তাদের চেনাই যায় না। কিন্তু মনে হয়, বিবর্তন যেন একটা জিনিষকে অতিক্রম করে গেছে—আজও এমন কতকগুলি উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়, যারা লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বেও ঠিক একইভাবে জন্মাতো। আজ কাচের ট্যাঙ্কের গায়ে বা আবদ্ধ জলাশয়ের উপরে যে পদার্থ জন্মায়, বহু লক্ষ বছর আগেকার শ্যাওলার জীবাশ্ম দেখে বুঝা যায়—উভয়ে একই রকমের পদার্থ।

পৃথিবীতে অনেক রকমের শ্যাওলা দেখা যায়; কিন্তু যেগুলি ভবিষ্যতে মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হবে, সেগুলি হচ্ছে আদিম যুগের অতি সরল গঠনের এক জাতের শ্যাওলা। এরা এত ক্ষুদ্র যে, সহজে নজরেই পড়ে না। কিন্তু ক্ষুদ্র হলে কি হয়—ট্যাঙ্কের কাচের গায়ে অসংখ্য শ্যাওলা জমে তাকে সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ করে তোলে। সংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যাপারটা তাদের পক্ষে গুরুতর বিষয় নয়। অতিদ্রুত তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। এদের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় অতি সহজ উপায়ে। একটি ভেঙ্গে দুটি হয়—দুটি ভেঙ্গে চারটি হয় এবং এভাবেই কয়েক ঘণ্টা পর পর তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাজেই ক্ষুদ্র বিন্দুর মত অল্প কয়েকটি শ্যাওলাই অতিদ্রুত বিস্তৃত স্থান দখল করতে পারে।

সব রকমের শ্যাওলার গঠন এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী এই রকম সরল নয়। বহু যুগ অতিক্রম করা সত্ত্বেও এদের সামান্যই উন্নতি ঘটেছে। সব শ্যাওলাও আবার ক্ষুদ্রাকৃতির নয়। কোন কোন শ্যাওলা লম্বা ফিতার মত, কোন কোনটা আবার পাতার মত চওড়া হয়ে থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলেই দেখা যায়—একই রকমের ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষ পরস্পর গাত্রসংলগ্ন হয়ে পাতা বা ফিতার আকারে দলবদ্ধভাবে রয়েছে মাত্র। শ্যাওলা যে কত রকমের আছে, তার সংখ্যা নির্ণয় করা দুষ্কর। কেউ কেউ বলেন—প্রায় ১০,০০০ বিভিন্ন প্রজাতির শ্যাওলা আছে, কেউ কেউ বলেন, এদের বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ১৭,০০০; আবার কারো কারোর মতে, এদের বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা ২০,০০০-এর কম নয়। সবুজ, নীলাভ সবুজ, লাল, বাদামী ইত্যাদি বিভিন্ন রংয়ের শ্যাওলারও অভাব নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অগভীর সমুদ্র-জলে, পুকুরের মিঠাজলে এবং গাছ, মাটি ও পাথরের গায়ে গরম ও ঠান্ডা আবহাওয়ায় বিভিন্ন জাতের শ্যাওলা জন্মাতে দেখা যায়।

ফটোসিন্থেটিক গ্যাস এক্সচেঞ্জার
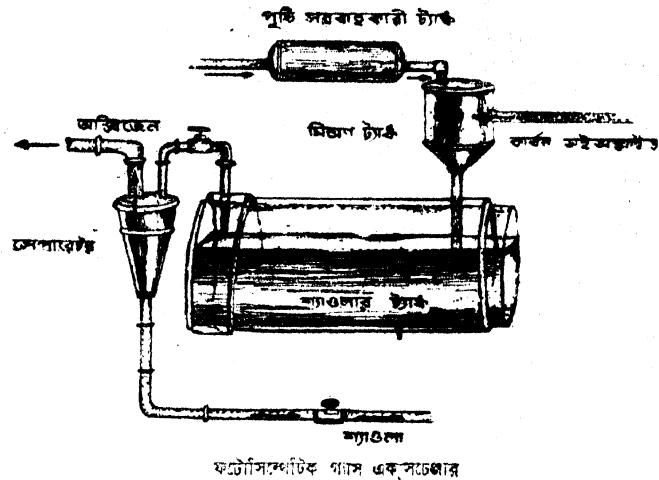
বহুকাল থেকেই মানুষ সামুদ্রিক শ্যাওলার সঙ্গে পরিচিত ছিল—তারা এগুলিকে সামুদ্রিক আগাছা হিসাবেই জানতো। কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতির শ্যাওলার বিষয় কিছুই জানতো না। সামুদ্রিক শ্যাওলা অনেক সভ্য দেশে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতো (এখনও হয়তো কোন কোন দেশে সামুদ্রিক শ্যাওলা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে)। ওষুধ হিসাবেও শ্যাওলার ব্যবহার ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল। তাছাড়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে স্মরণাতীত কাল থেকেই শ্যাওলা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্যাওলা ব্যবহারের নানা-রকম উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। আজকাল শ্যাওলা মিশিয়ে নানারকমের খাদ্যদ্রব্যও প্রস্তুত করা হয়ে থাকে; কিন্তু ইদানীং মহাকাশযান ও অ্যাটমিক সাবমেরিনের যাত্রীদের অক্সিজেন ও খাদ্য-সমস্যা সমাধানের জন্যে যে আণুবীক্ষণিক শ্যাওলার সাহায্য নেবার পরিকল্পনা হয়েছে, তার কাছে সে সব তুচ্ছ মনে হবে। যে রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে এই ক্ষুদ্রাকৃতির শ্যাওলা কেবল মহাকাশযানেই নয়, পৃথিবীর লোকেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে সক্ষম হবে।

মহাকাশ-যুগ সুরু হয়েছে। বিশ্বের অজ্ঞাত রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টায় মানুষ এখন পৃথিবীর বায়ুমন্ডল ছাড়িয়ে মহাশূন্য-যাত্রায় উদ্যোগী হয়েছে। অনেকেই হয়তো চাঁদে গিয়ে তার বড় বড় আগ্নেয়গিরির আবিষ্কার অথবা মঙ্গলগ্রহে গিয়ে সেখানে সত্য সত্যই কোন জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা, সেটা স্বচক্ষে দেখে আসবার কথা মনে মনে কল্পনা করছেন; কিন্তু মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে মানুষের পক্ষে গ্রহান্তরে যাত্রা কিভাবে সম্ভব হতে পারে, সে কথা কেউ ভেবে দেখেছেন কি? বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করে দেখেছেন—পৃথিবী থেকে মহাকাশযানের মঙ্গলে পৌঁছুতে লাগবে ১৩৮ দিন। মঙ্গলে পৌঁছে কিছুক্ষণ সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবে। কিন্তু যেতে যতটা সময় লেগেছিল, ফিরে আসতে তার চেয়ে বেশী সময় লাগবে—প্রায় ১৭৫ দিন। কিন্তু কেবল মঙ্গলে গিয়েই মানুষ থামবে না—হয়তো শুক্রও তাকে হাতছানি দেবে। সেখানে যেতে লাগবে ২৯৫ দিন। কিন্তু এখান থেকে ফিরে আসতে আরও কম সময় লাগবে—প্রায় ২২৩ দিন। মঙ্গল বা শুক্র যেখানেই যাক, মহাকাশ-যাত্রী এই দীর্ঘকাল শ্বাসক্রিয়ার জন্যে অক্সিজেন পাবে কোথায়? দীর্ঘকালের জন্যে অক্সিজেন-ট্যাঙ্ক নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কোন রকমে যদিও বা অক্সিজেনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, তবু মহাকাশ-যাত্রী যে কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করবে, তা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কেমন করে? কোন একটা জানালা খুলে গ্যাস বের করে দেবার উপায় নেই। অথচ যানের ভিতরকার আবদ্ধ বাতাসকে কার্বন ডাইঅক্সাইডমুক্ত করবার কোন ব্যবস্থা না করলে আরোহীরা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে। বিজ্ঞানীরা চিন্তা করে দেখলেন এই সমস্যা সমাধানের জন্যে এমন কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন যা জীবন্ত সবুজ উদ্ভিদের মত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে নেবে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করবে।

উদ্ভিদ যে ব্যবস্থায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ এবং অক্সিজেন মুক্ত করে, তাকে ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়া বলা হয়। ফটো-সিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ তৈরী করে। এই পরিবর্তনের সময় উদ্ভিদ অক্সিজেন মুক্ত করে দেয়। আলোর সংস্পর্শে এলেই এই প্রক্রিয়া সুরু হয়। কাজেই মহাকাশযাত্রীর অক্সিজেন সরবরাহের সমস্যা সমাধানের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, উদ্ভিদের অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড

শ্যাওলা থেকে তৈরী নানা প্রকার খাদ্যবস্তু

বিনিময়ের অনুরূপ কোন ব্যবস্থা মহাকাশযানে অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে। সবুজ উদ্ভিদের মত কোন বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকরী না হলে কোন সুবিধাজনক উদ্ভিদকেই এই কাজের জন্য বেছে নিতে হবে।

একথা সহজেই বুঝা যায়, টবে বসানো কোন উদ্ভিদ দিয়ে মহাকাশযান ভর্তি করা চলবে না। কাজেই যাদের জন্যে বেশী জায়গার দরকার হবে না, সামান্য যত্নেই যারা বেড়ে উঠে এবং দ্রুত-গতিতে বংশবৃদ্ধি করে, এমন উদ্ভিদেরই সন্ধান করতে হবে। এর ফলেই অতিক্ষুদ্র এককোষী শ্যাওলার কথাই উত্থাপিত হয়। এই এককোষী শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদগুলি জটিল গঠনের অন্যান্য উদ্ভিদের চেয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে খাদ্য উৎপাদন ও অক্সিজেন মুক্তকরণে যে উত্তমরূপে সক্রিয়—একথা বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন থেকেই জানতেন। ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ার বিষয় অনুসন্ধানের জন্যে এই এককোষী উদ্ভিদগুলি অনেকদিন থেকেই গবেষণাগারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু আকৃতির ক্ষুদ্রতা এবং কার্যকারিতাই বড় কথা নয়, শ্যাওলার একটা অতিরিক্ত সুবিধা এই যে, এরা মনুষ্য-পরিত্যক্ত পদার্থগুলিকেও শোষণ করে নিতে পারে। মহাকাশযানের যাত্রীদের পক্ষে এটা গুরুতর সমস্যা। শ্যাওলা জন্মাবার জন্যে কেবল কার্বন ডাইঅক্সাইডই নয়—নাইট্রোজেন, ম্যাগ্নেসিয়াম, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ সমন্বিত জলেরও প্রয়োজন। মনুষ্য-পরিত্যক্ত মল, মূত্রের মধ্যে এসব পদার্থের প্রায় সবকিছুই বর্তমান। শ্যাওলার খাদ্য হিসাবে যদি এসব পরিত্যক্ত-পদার্থ ব্যবহার করা যায়, তবে সেগুলি ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হবে। এই প্রক্রিয়ায় শ্যাওলা এসব পরিত্যক্ত পদার্থকে অক্সিজেন ও কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ শ্বেতসার ও শর্করায় পরিবর্তিত করবে এবং এ থেকে খাদ্য তৈরী হবে। মহাকাশে শ্যাওলা প্রেরণের এটাও একটা মস্ত সুবিধা। তাছাড়া শ্যাওলার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও রাসায়নিক পদার্থের মাত্রা আনুপাতিক হারে পরিবর্তন করে কোষের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বিজাতীয় পদার্থেরও পরিবর্তন করা যেতে পারে। যেমন—মাখন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনে চর্বি উৎপাদনকারী এবং মাংসের প্রয়োজনে উচ্চ প্রোটিন উৎপাদনকারী শ্যাওলা জন্মানো সম্ভব হবে। এসব কারণেই শ্যাওলার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা ভেবে বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, এই একটিমাত্র উদ্ভিদই মহাকাশযাত্রীর বেঁচে থাকবার পক্ষে যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সক্ষম হবে। বিভিন্ন প্রজাতির অনেক রকম আণুবীক্ষণিক শ্যাওলা আছে বটে, কিন্তু সবগুলিই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়। যাহোক, অনেকদিনের অনুসন্ধান ও বিচার-বিবেচনার পর ক্লোরেলা গোষ্ঠীভুক্ত একরকম আণুবীক্ষণিক শ্যাওলার সন্ধান পাওয়া গেল। এই এককোষী সবুজ শ্যাওলা অতি উচ্চ প্রোটিন সমন্বিত। ক্লোরেলা থেকে উৎকৃষ্ট এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করা যেতে পারে। এরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বংশ-বৃদ্ধি করে। কিন্তু ক্লোরেলারও রকমারি আছে। এক রকমের ক্লোরেলা নির্বাচন করা
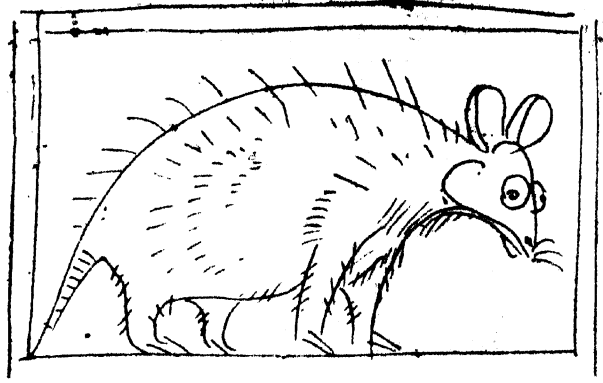
শিল্পীর খেয়াল

হলো, যারা সাধারণ তাপমাত্রায় ভাল রকম বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, মহাকাশে সেগুলি মোটেই কার্যকর হবে না। কারণ তাপমাত্রা ৮৫ ডিগ্রি ফারেন-হাইটের উপরে উঠলেই তাদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। সর্বদাই এগুলিকে তীব্র কৃত্রিম আলো অথবা সূর্যালোকের মধ্যে রাখতে গেলে শ্যাওলার ট্যাঙ্কের চতুর্দিকের তাপমাত্রা ৮৫ ডিগ্রির বেশীই থাকবে। সেগুলিকে ঠাণ্ডা রাখতে হলে যে সব অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন, সেগুলি যেমন ভারী তেমনই ব্যয়-সাপেক্ষ। মহাকাশযানের ওজন বৃদ্ধি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ক্লোরেলা ট্যাঙ্কে পরীক্ষা করে দেখা গেল, সেই ক্লোরেলাগুলি অনেকটা মন্থরগতিতে বংশবৃদ্ধি করে। কিন্তু বংশ-বৃদ্ধির হার দ্রুত না হলে মহাকাশযাত্রীদের অক্সিজেন সরবরাহ কম পড়বে। হিসাব করে দেখা গেল, প্রতিটি লোকের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের জন্যে ২০ ঘনফুট থেকে প্রায় ১০০ ঘনফুট জায়গার দরকার হবে। বিজ্ঞানীরা হাল ছেড়ে দিলেন—শ্যাওলা জন্মাবার ব্যবস্থার পর মহাকাশযানে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখবার জায়গায়ই থাকবে না।

তখন কার্যোপযোগী নতুন ক্লোরেলার সন্ধান চলতে লাগলো। অবশেষে টেক্‌সাসে এক রকম ক্লোরেলার সন্ধান পাওয়া গেল। এই ক্লোরেলার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। এরা ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রার মধ্যে সবচেয়ে ভালভাবে জন্মায়। তাছাড়া এই ক্লোরেলা অতি দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করে। প্রতিটি ক্লোরেলা ২৪ ঘণ্টায় প্রায় এক হাজার নতুন ক্লোরেলা উৎপাদন করতে পারে। এই বৃদ্ধির হার অনুযায়ী হিসাব করে দেখা গেল—মহাকাশে প্রতিটি যাত্রীর জন্যে প্রয়োজনীয় ক্লোরেলা উৎপাদন করতে জায়গা লাগবে মাত্র ৩ ঘনফুট থেকে ৫ ঘনফুটের মত। এই হিসাব অনুসারে ইতিপূর্বেই ৮ জন লোকের মত মহাকাশযান নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর পরে ক্লোরেলা সম্বন্ধে আর একটি নতুন তথ্যও জানা গেছে। সেটা হলো এই যে, একটি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্সিজেন সরবরাহের জন্যে যতটা শ্যাওলার দরকার, ঠিক ততটাই তার প্রয়োজনীয় খাদ্যেরও যোগান দিতে পারবে।

প্রয়োজনানুযায়ী শ্যাওলা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু মহাকাশযানে একে কাজে লাগা[নো] যাবে কেমন করে? বিজ্ঞানীরা সুবিধাজ[নক] ব্যবস্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে লাগলে[ন]। অনেক আলোচনা ও পরীক্ষার পর এক র[কম] যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হলে[া]। এই যন্ত্রের নাম দেওয়া হলো Photosynthetiic g a s exchange[r]। উদ্ভিদের ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়ার মতই এ[ই] যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডা[ই]অক্সাইডের স্থান পরিবর্তন ঘটবে। এই [গ্যাস] এক্সচেঞ্জারের বৃহত্তম অংশ হলো জল ও শ্যাওলা ভর্তি লম্বাটে ড্রামের মত একটা কাচ[ের] ট্যাঙ্ক। শ্যাওলা উৎপাদনের জন্যে জলে[র] মধ্যে দেওয়া হয় কার্বন ডাইঅক্সাইড ও উপযু[ক্ত] হারে মিশ্রিত রাসায়নিক উপাদানসমূহ। এক[টা] টেস্ট টিউবে যতটা ধরে, ততটা শ্যাওলা দিয়ে মহাকাশযানের শ্যাওলা উৎপাদনকারী যান্ত্রি[ক] ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। নিষ্কাশন য[ন্ত্রে] সংলগ্ন একটা নলের ভিতর দিয়ে কার্বন ডাই[-] অক্সাইড ট্যাঙ্কের মধ্যে আনা হয়। আরোহী[-] দের পরিত্যক্ত মল-মূত্র থেকে রাসায়নিক পদা[র্থ] পাওয়া যায়। কাঠ কয়লার ভিতর দিয়ে পরিস্রুত করে মূত্রের রং ও গন্ধ নিদূরিত করবার পর জলের সঙ্গে মেশানো হয়ে থাকে। মল পুড়িয়ে ছাই করে সেই ছাইও জলের মধ্যে দেওয়া হয়। পরিত্যক্ত পদার্থগুলিকে পোড়া[-] বার জন্যে যে অক্সিজেন দরকার তা শ্যাওলা থেকেই পাওয়া যায়। জল সমেত শ্যাওলা[-] গুলিকে পাম্পের সাহায্যে অনবরত নাড়াচাড়া করতে হবে, নচেৎ দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটবে না। আলোর সান্নিধ্যে ফটোসিন্থেসিস প্রক্রিয়া চলবা[র] সময় যে অক্সিজেন মুক্ত হবে, নলের সাহায্যে সেই গ্যাস যাত্রীদের কেবিনে সরবরাহ করা হবে। অতিরিক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হলে ক্লোরেলার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই যাতে অতিমাত্রায় সংখ্যা বৃদ্ধি না ঘটে, তার জন্যে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে। পুরাতন ক্লোরেলার চেয়ে নতুন ক্লোরেলা ভাল জন্মায় এবং তাদের বংশবৃদ্ধি দ্রুততর হয়। কাজেই পুরাতন কোষগুলিকে পৃথক করে দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে। এ[ই] পুরাতন কোষগুলিকে নলের সাহায্যে ড্রা[ম] থেকে বের করে এনে শুকিয়ে নেবার প[র] প্রোসেস করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।
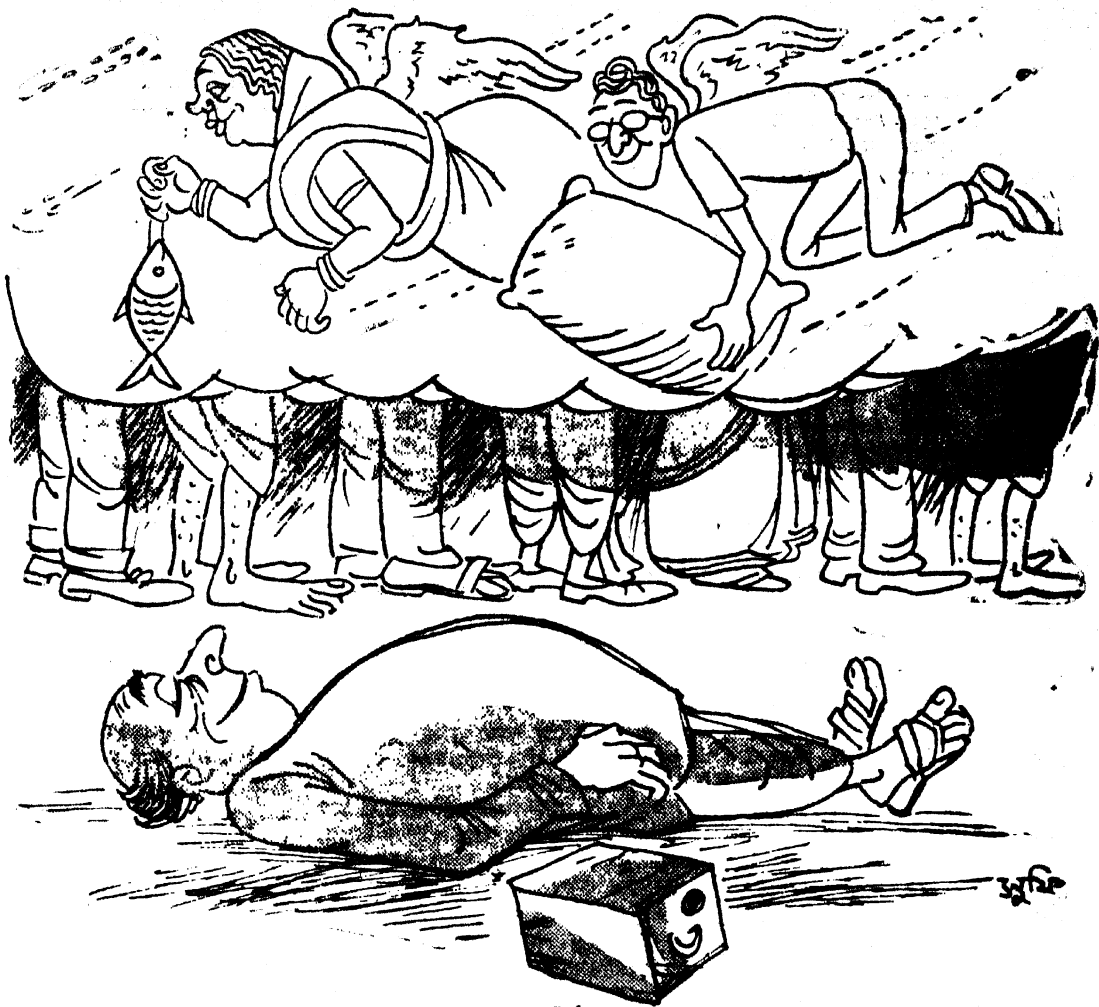
একটি তৈলাক্ত কাহিনী
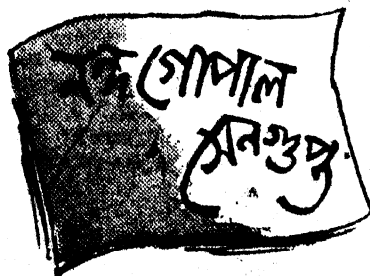
মেয়ের জরুরি চিঠিতে জানলাম শনিবার সকালে জামাই তাঁকে নিয়ে কলকাতায় আসছেন।

অনেক দিন তোমাকে আর মাকে দেখিনি, টা বড় ছটফট করছে, এই হল চিঠির বয়ান। ভারী ভালো লাগল কথাটা। বিয়ের পরও বাবার জন্যে তাহলে মন-কেমন করে মেয়ে-! আস্তে ব্যস্তে এসে ঢুকলাম রান্নাঘরে ীকে খবরটা দিতে।

কিন্তু এ কি কাণ্ড? এতটুকু উল্লাস শ পেল না তাঁর মুখের চোখের চেহারায়। র গলায় বললেন, সর্বনাশ!

ভাবলাম, তাহলে কি পরের হাতে তুলে য়ার পর মার কাছেও মেয়ে পর হয়ে যায়? ল এমনটা কেন?

একটু রাগত গলায় বললাম, তুমি যেন খুসী হলে না মনে হল!

গিন্নী বললেন, হবে কি করে? আজ বুধবার, মাঝে ত কালকের দিনটি। এক কি করে জোগাড়যন্তর করব সব বলো ত? কি জোগাড়ের কথা বলছ?

এবার বাবুদের অনুরোধে পড়ল জলকত লাই কাটি।

গৃহিণী বললেন, কেন জানো না? আজ দু-সপ্তা ধরে রেশনে ভাঙা ভাঙা আলো চাল দিচ্ছে। দু-টো থেকে মাছের লাইন দিয়ে রোজ খোকা ফিরে আসছে শুধু হাতে। একপলা তেলও পাওয়া যাচ্ছে না মুকুন্দর দোকানে যে দুটো আলু-বেগুন ভেজে দোব। জামাই এলে কি খেতে দোব তাকে......

আর বলতে হল না। জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল সব সমস্যা।

বললাম, তা ঠিক। তাহলে কি টেলিগ্রাম করে দোব যে আপাতত আসা বন্ধ রাখো?

তোমার কি ভীমরতি ধরেছে, গৃহিণী জিজ্ঞাসা করলেন জলদ-গম্ভীর কণ্ঠে।

ইতিমধ্যে পর পর দুটি সুসংবাদ নিয়ে এল যথাক্রমে রজক সোনালাল ও পরিচারিকা পাঁচুর মা। প্রথমটি হল যে তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সার মুকুন্দ এক কিলো করে তেল দিচ্ছে। দ্বিতীয়টি যে আজ র‍্যাশনে সিদ্ধ চাল দিচ্ছে এবং সে-চাল সরু এবং ফর্সা।

গিন্নী রান্নাঘর থেকে আমাকে জানান দেবার উদ্দেশ্যে ছেলেকে ডেকে বললেন, খোকা, যা ত বাবা একটু রেশন দোকানে। ওনার ত খালি মুখ সম্বসিয়া।

খোকা নামে খোকা হলেও আসলে কিন্তু এম-এ পাশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে। যোগ্য জননীর যোগ্য সিপাহী হবে সে কথা সত্যে থলি ও কার্ড নিয়ে [illegible] একটিও কথা না [illegible]

কোমরে কাপড় জড়িয়ে রান্নাঘর থেকে উঠানে বেরিয়ে এলেন গিন্নী।

বললেন, অনেক পুণ্যে এমন সোনার ছেলে পেটে ধরেছিলাম। নইলে কি যে হত আমার!

* * *

অগত্যা তেলের টিনটি হাতে ভালো মানুষের মতো মুখ করে বেরিয়ে পড়লাম আমিও। নইলে চার-আনা পয়সার বিনিময়ে পাশের বাড়ীর বিচ্চুকে লাইনে দাঁড় করাবেন গিন্নী। সেটা হবে বড়ই বে-ইজ্জতীর ব্যাপার।

মুকুন্দর দোকানে মস্ত লাইন। দার্জিলিং-হিমালয় রেলপথের মতো এঁকে বেঁকে তা প্রায় গোটা সদানন্দ রোডটা পাক দিয়ে এসে শেষ হয়েছে অনুকূল ডাক্তারের দরজার মুখে।

তারই শেষতম জন হিসাবে ঘাড় কাত করে দাঁড়ালাম। এক হাতে মুঠোর মধ্যে খুচরো পয়সা, অন্য হাতে তৈল-চর্চিত টিন। সুতরাং দাঁড়ানোটা কি রকম আরামপ্রদ হল, তা বুঝছেনই।

সেখান থেকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, মহিম হালদার স্ট্রীট থেকে আর একটা লাইন ঠিক একই রকম ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে এসে পড়েছে একেবারে রসা রোডের ওপর। এ হল সেই র‍্যাশন চালের লাইন। মাতৃভক্ত খোকা লাইন লাগিয়েছে এখানে।

একই পাড়ার দু-মুড়ো আগলে দাঁড়িয়েছি পিতা-পুত্রে অন্য কোন কারণে না, নিছক চাল ও তেলের জন্যে। আর তা পেতে চাইছি নগদ এবং ন্যায্য দাম দিয়ে।

ভেবে আপন মনেই হাসি পেল। ভাবলাম সত্যি কি অপদার্থ আমরা! এত করে প্রফুল্লদা উপদেশ দিচ্ছেন ভাতের বদলে রুটি অভ্যাস করতে। অত বড় ডাক্তার বিধান রায় এমন করে বুঝিয়ে গেলেন, কলা খাও, কলা খাও, ভাতে ডায়াবিটিস, আর তেল-মশলা দিয়ে রাঁধা তরকারিতে এমিবায়োসিস হয়... কিছুতেই তা বুঝলাম না আমরা! বুঝলে আজ কি এই হাল হত কারো?

ভাবতে ভাবতে দৃঢ়সংকল্প জাগল মনে, না, এই চাল-তেলের দাসত্ব মুক্ত হতেই হবে। এক বেলা ছাতু ও ভেলা গুড়, আর এক বেলা রুটি ও সব্জী সিদ্ধ খেয়ে জীবন ধারণ করতে হবে।

পারব না? খুব পারব। খোকাকে নিয়ে একটু ভাবনা। কিন্তু সে ত মাতৃভক্ত ছেলে, মা বললে টুঁ শব্দটি না করেই খেয়ে নেবে।

হ্যাঁ, এই পরিবর্তনে আর একটা সুবিধা হবে। মাছের প্রয়োজনটা আপনা থেকেই ভেগে যাবে। অবশ্য তাতে বাঙালীর সাংস্কৃতিক নিজস্বতাটুকু টিঁকে থাকবে ত? জানিনা!

ভাবছি হঠাৎ পিছন থেকে প্রচন্ড এক ধাক্কা। ভীত-চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখি প্রায় শো-দুই লোক কখন একে একে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন আমার পিছনে এবং তাঁদের সংহত চাপ এসে ঠেলা দিচ্ছে আমার পিঠে।

সামনে শো-দুই, পিছনে শো-দুই মাঝখানে ত্রিশঙ্কু রূপে দাঁড়িয়ে আমি। এক হাতে এক রাশ খুচরো পয়সা, অন্য হাতে তেলের টিন।

সহসা মনে হল পৃথিবীটা দুলছে। ছোট ছোট আলোর ফুলকি যেন নাচছে চোখের সামনে। তারপরই আস্তে আস্তে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল।

টাল সামলে ভালো করে চার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলাম। এ কি কান্ড? সামনে পিছনে কোথাও জন-প্রাণী নেই। সমস্ত লাইনটা এক মিনিটে যেন শূন্যে অদৃশ্য হয়েছে।

গন্ধেশ্বরীর টাটে বসে আছে মুকুন্দ নয়, তার জ্যাঠা বনমালী এবং দোকানের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছি একা আমি টিন হাতে।

বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল একবার। বনমালী বছর তিন আগে মারা গেছল না গাড়ী চাপা পড়ে? কিংবা যায় নি?

যাই হক, গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললাম, কি হে বনমালী, তেল পাওয়া যাবে নাকি?

যাবে বৈকি। কতটা চাই?

সলজ্জ কণ্ঠে বললাম, আমার ত মাসে লাগে সাত কে-জি। এটা সাত কে-জিরই টিন।

বনমালী দরাজ গলায় বলল, বেশ ত নিয়ে যান। দু-টাকা বারো নয়া পয়সা করে কে-জি।

চমকে উঠে বললাম, বলো কি হে?

বনমালী দু-হাত জোড় করে বলল, আপনি মানী লোক, বরাবরের খদ্দের। আপনার কাছে কি আর বেশী বলব? দামটা হঠাৎ বেড়ে গেছে তেলের।

এই পর্যন্ত বলেই হাত থেকে টিনটা নিয়ে বক বক করে ঠুঙি দিয়ে তেল ঢালতে লাগল সে বড় টিন থেকে। দেখলাম তেলটা খাসা সোনালি রঙের এবং একটা ঝাঁঝালো গন্ধও পেলাম তার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পয়সা গুণছি, দেখি পাশ দিয়েই মুটে সঙ্গে নিয়ে খোকা যাচ্ছে।

বললাম, পেলি চাল?

ওয়াটার্লু জয়ী ওয়েলিংটনের মতো মুখ করে সে বলল, পেলাম সাড়ে সাঁইত্রিশ কিলো, বাইশ টাকা বত্রিশ নয়া পয়সা দরে। বেশ ভালো চাল বাবা। আর কি মজা জানো? একটাও লোক ছিল না।

পিতা-পুত্রে বিজয় গর্বে রাস্তার মোড়ে এসে পৌঁছুলাম। আমরা চালও পেয়েছি, তেলও পেয়েছি। আর দুটোই পেয়েছি সেরা জিনিষ, দামেও আজকের দিনে ড্যাম চীপ!

কিন্তু এখানেই বিস্ময়ের শেষ নয়। দেখি কালী টেম্পল রোড থেকে হন হন করে স্যান্ডেল পায়ে এগিয়ে আসছেন স্বয়ং গৃহিণী। সঙ্গে পাঁচুর মা এবং তার হাতে ল্যাজে কানকোয় দড়ি দিয়ে ধনুকের ভঙ্গীতে বাঁকানো প্রকান্ড তাজা একটা গঙ্গার ইলিশ।

সবিস্ময়ে বললাম, বাজারে গিয়েছিলে বুঝি?

ঝাঁঝিয়ে উঠে গিন্নী বললেন, না গিয়ে করব কি? একজন গেলে চাউলের ধান্দায়, একজন তেলের। ইতিমধ্যে পবনা এসে বলল, বাজার ভরে গঙ্গার ইলিশ এসেছে, আর দু-টাকা কিলোয় বিক্রী হচ্ছে। পাঁচুর মাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নিজেই।

ছেলে সোল্লাসে বলল, চমৎকার! আজকের দিনটা দেখছি খুবই ভালো। চাল, তেল, মাছ, তিনটেই পাওয়া গেল!

* * *

তারপর আমরা তিনজন, মুটে আর পাঁচুর মা, এই পাঁচজন এক সঙ্গে পা চালিয়ে দিলাম বাড়ীর দিকে।

আমার মনে হল, এত আনন্দ জীবনে বুঝি আর কোনদিন পাইনি। পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েও না, রবীন্দ্রনাথের স্নেহচ্ছায়া পেয়েও না, বইয়ের বাবত হাজার টাকা দক্ষিণা পেয়েও না।

স্কেচ গোপাল

কিন্তু এ কি? হঠাৎ তাকিয়ে দেখি খোকা, পাঁচুর মা, মুটে, কেউ কোথাও নে... আমি একা পথে দাঁড়িয়ে রয়েছি তেলের ... হাতে এবং পথটা সদানন্দ রোড।

মনে হল চলছি ত চলছিই। পথ... অফুরন্ত। ক্রমে পথের চেহারা বদলাতে... করল। বাড়ী-ঘর, দোকান-পসার, গাড়ী... সব সরে যেতে লাগল চোখের সামনে ... রাস্তা হয়ে এল অন্ধকার, সংকীর্ণ, স্যাঁতস...

শুধু কেওড়াতলা দেশবন্ধু স্মৃতি... চূড়াটা মনে হল যেন তাকিয়ে আছে অনেক... থেকে!

ছায়ামূর্তির মতো একটি লোক চলে ... পাশ কাটিয়ে। গোটা শরীরটায় তার অ... জড়ানো। খালি চোখ দুটো খুব জ্বল... এবং তা একবার জ্বলছে, আবার নিভছে।

শুকনো গলায় বললাম, দেখুন, ... পাড়া রোডটা কোথায় বলতে পারেন?

ভাঙা কাঁসির মতো খ্যাঁতখেঁতে গলা... বলল, সেটা কোন শহরে?

বললাম, কেন, কলকাতায়!

খি-খি করে হেসে উঠল সে। আকাশ ফাটানো হাসি।

বলল, এ তোমার পৃথিবী নয় হে ... এ হল যমপুরী।

ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম, আঁ... কি? আমি যে তেল কিনতে বেরিয়ে... আমার ছেলে গিয়েছিল চালের লাইন ... আর গিন্নী বাজারে দৌড়েছিলেন মাছ ... করতে...

লোকটি আবার হেসে উঠল তেমনি ... তালা লাগানো উৎকট আওয়াজ করে।

বলল, আচ্ছা বেকুব ত তুমি। স্বাধীন... চাই, আবার চাল, তেল, মাছও চাই। জানো... ওগুলো স্বাধীনতার মাশুল?

বলেই দিল সজোরে এক ধাক্কা। ... খুবড়ে পড়ে গেলাম রাস্তার ওপর ... করে।

কিন্তু সেই ধাক্কাতেই চৈতন্য হল। ...

দেখি শিয়রে বসে আছেন গিন্নী ... হাত-পাখা হাতে। আমি বিছানায় শ...

বললেন, যখনই টিন নিয়ে বেরিয়েছ, ... জানি একটা কান্ড হবে। তোমার মুখে... জানা আছে আমার!

হর্ষমুখী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ভবের মানুষটার সঙ্গে বাইরের নামের সংগতি খুব কমই থাকে। হর্ষমুখীর বেলাতেও সেই কথা বলা যায়। নাম ল মনে হয়, মেয়েটি খুব খুশী। কিন্তু তা একেবারেই হর্ষমুখী একেবারেই হাসে না। ত জানে না, হাসতে পারেও না। তার শ বৎসরের জীবনে তাকে কোনদিন কেউ ত দেখেনি।

শৈশবকালে হেসেছিল। তখন তার বাপ-মা ছিলেন। কয়েকদিনের আগে-পিছু তারা ই যখন গত হলেন, তখন হর্ষমুখীর ন' বৎসর মাত্র। অনাথিনী পড়ল খুড়িমার । হাসির উৎস সেই দিন থেকেই পাথর-পড়ে গেল।

খুড়িমার অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা। স্কুল য় খুড়িমা সেইগুলিকে হর্ষমুখীর কোলে কাঁধে চাপিয়ে দিলে।

একটা দুরূহ ব্যাপার।

একটি ছেলে, দুটি মেয়ে। ছেলেটি ডান-তার খেলাও সাংঘাতিক। একদিন খেলা-হর্ষমুখীর কাঁধে ঘা বসিয়ে দিলে। রক্ত-

তারপরে খুড়িমার হাতে যা থাকে, হাতা-খুন্তি-বেড়ি দুম-দাম করে হর্ষমুখীর মাথায় পিঠে পড়তে থাকে।

হর্ষমুখী কাঁদে না। নিঃশব্দে মার খায় এবং ক্রন্দনরত মেয়েটিকে কোলে নিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করে।

দুপুর রাতে কোন মেয়ে যদি উঠে কাঁদতে লাগল, হর্ষমুখীকে ঘুম থেকে উঠে তাকে কোলে নিয়ে পায়চারী করতে হয়। তাদের কান্নাও সহজে থামে না, ঘুমও না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোলে নিয়ে পায়চারী করতে হয়।

পাড়ায় তার সমবয়েসী মেয়ে অনেক ছিল। তারা স্কুলে যেত, হাসত, খেলা করত। হর্ষমুখী চেয়ে চেয়ে দেখত। কিন্তু তাদের কাছে যাবার উপায় ছিল না। হর্ষমুখী একটুখানি মেয়ে দুটির চোখের আড়ালে গেলে, তারা কাঁদতে আরম্ভ করত। কাঁদলেই রসাতল কাণ্ড। তারপর খুড়িমার হাতের পুষ্পবৃষ্টি।

দেখতে দেখতে হর্ষমুখী হাসতে ভুলে গেল। কাঁদুনে মেয়েদুটি আর সে। মাঝে মাঝে ছেলেটা দৈত্যের মত এসে ঘাড়ের উপরে পড়ে। কিল-চড়-ঘুসিও মারে।

তিনচারটি ছেলেমেয়ে, বুড়ি-মা এবং কর্তা স্বয়ং। হর্ষমুখী তপ্ত খোলা থেকে উনানের মধ্যে পড়ল।

থনথনে বুড়ি-শাশুড়ী। মুখে বলতেন, চোখে ভাল দেখেন না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যেত হর্ষমুখীর তুচ্ছতম ত্রুটিও তাঁর চোখ এড়ায় না। ছেলেমেয়েগুলিও কাকার ছেলেমেয়েদের উপরে যায়।

কর্তা। তাঁর আদরও ছিল না, অনাদরও ছিল না। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে একটু চা খেতেই আটটা। তারপর মাথায় দু মগ জল ঢেলে নাকে-মুখে দুটো গুঁজে অফিস চলে যেতেন। ফিরতে সন্ধ্যা। তারপর পাড়ায় তাসের আড্ডা। সংসারের খুব বেশী খবর রাখতে চাইতেন না। মাইনের টাকা মায়ের হাতে ফেলে দিয়ে কর্তব্য শেষ করতেন।

কিন্তু সংসারের শান্তি এত সহজ নয়।

অফিস থেকে ফিরে চা খেতে যতটুকু সময়, তারই মধ্যে বহুবল্লভের কানে মা অনেক বিষ ঢালতেন। শুনে চুপ করে যাওয়ার উপায় ছিল না। মা ক্ষোভে, দুঃখে চিৎকারে পাড়া মাথায় তুলতেন। সেই কেলেঙ্কারীর ভয়েও বহুবল্লভকে

রক্ত কাণ্ড। খুড়িমা বললেন, ও কিছু নয়। ছেলেমানুষ মেরেছে; ন্যাকড়া পুড়িয়ে লাগিয়ে দিলেই হবে।

কিন্তু লাগিয়ে দেবে কে?

সুতরাং বিনা কিছুতেই কয়েকদিন ভুগে হর্ষমুখী সুস্থ হয়ে উঠল।

এই শ্রেণীর ঘটনা নিত্যই ঘটতে লাগল।

কিন্তু এর চেয়ে বেশী বিড়ম্বনা ভোগ করতে হত মেয়ে দুটিকে নিয়ে। দুটি মেয়েই সমান কাঁদুনে। একজন থামে তো আরেকজন কাঁদে। একটু অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই। ওঘর থেকে খুড়িমা তৎক্ষণাৎ ছুটে আসেন।

—ও কাঁদছে কেন? মারলি নাকি?

কাঁচু-মাচু ভাবে হর্ষমুখী বলে, মারিনি, খুড়িমা। ও এমনি কাঁদছে।

খুড়িমা ঝংকার দেন, এমনি কাঁদছে! ন্যাকা মেয়ে, এমনি কখনও ছোট ছেলে কাঁদে? তুই নিশ্চয় অন্তর-টিপুনি দিয়েছিস।

এই হর্ষমুখীর জীবন। সে হাসতে ভুলে গেল। খেলা করতে ভুলে গেল।

হর্ষমুখীর রূপ ছিল। এবং এই রূপের জোরে বিনা খরচায় তার একদিন বিয়েও হয়ে গেল।

পাত্রটি উপার্জনের দিক দিয়ে ভাল। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষের তিন-চারটি ছেলে-মেয়েও বর্তমান। হর্ষমুখীকে দেখতে এসে বহুবল্লভবাবু পরিষ্কার বললেন, বিয়ের ইচ্ছা তাঁর নেই। শুধু বুড়ি-মা ও ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনার জন্যে তাঁর বিয়ে করা। অবশ্য সেই-সঙ্গে সকাল ন'টার মধ্যে দুটি রাঁধা ভাতেরও দরকার আছে।

হর্ষমুখীর কাকা বললেন, এ দুটি বিষয়েই হর্ষমুখীর জুড়ি নেই। আপনি চোখ বুজে ওকে নিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু চোখ বোজবার দরকার ছিল না। হর্ষমুখীর রূপ ছিল।

হর্ষমুখীকে ডেকে তিরস্কার করতে হত। নরম তিরস্কারে মা শান্ত হতেন না, তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল হর্ষমুখীর উপর বহুবল্লভের হাত চলুক।

বহুবল্লভ অতটা পারতেন না। দু'চারটে কড়া কথা বলেই তাসের আড্ডায় বেড়িয়ে যেতেন।

রাত্রে বহুবল্লভ ফিরলে হর্ষমুখী কখনও এই সব মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করেনি। বলে না, তোমাকে মা যা বললেন, সেগুলি সত্যি নয়। কথাগুলো একটু বেঁকিয়ে বলা হয়েছে। ঘটনা ওইরকম করে ঘটেনি, এইরকম করে ঘটেছিল। বলে না, সে নিরপরাধ।

বহুবল্লভ লোক যে খুব খারাপ, তা নয়। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তিনি একটু শান্তি চান। পারিবারিক অশান্তিকে তিনি ভয় পান। সেই অশান্তি নিবারণের জন্যে তিনি স্ত্রীকে ধমক দেন। কারণ ওইটাই সোজা। মা জাহাবাজ মেয়ে। তাঁকে ধমক দেওয়ার সাহস বহুবল্লভের নেই। জানেন, তাতে অশান্তি একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। প্রকৃত ঘটনা জানবার তাঁর আগ্রহও নেই, সময়ও নেই। বৌকে তিরস্কার করে মাকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই তিনি সন্তুষ্ট।

বিশেষ হর্ষমুখীর মত বৌ। যে বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপরাধ এবং তার জন্যে প্রাপ্য তিরস্কার নিঃশব্দে মেনে নেয়। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ধারণা হয়েছিল, হর্ষমুখীর দোষ আছে।

কালক্রমে হর্ষমুখীর দুটি ছেলে হয়। হর্ষমুখী মনে মনে বলে, ঝাড়ের দোষ। হতে পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু শাশুড়ীর প্রশ্রয়ে এদের উৎপাত দাদাদের উৎপাতকেও ছাড়িয়ে গেল। দাদারা সৎমাকে গালি-মন্দ করত। হাত কখনও তোলে নি। এরা মায়ের উপর হাত তুলতেও দ্বিধা করে নি। বড়ছেলেটি একদিন একটা চায়ের কাপ এমন করে মায়ের দিকে ছুঁড়ে মারলে যে, হর্ষমুখীর কপাল কেটে দরদর ধারে রক্ত পড়তে লাগল।

হর্ষমুখী কাঁদলে না, ছেলেকে শাসনও করলে না, শাশুড়ী অথবা স্বামীর কাছে কোন অভিযোগও করলে না। রক্ত আপনা থেকেই যখন বন্ধ হল, তখন জল দিয়ে ধুয়ে দিলে।

সে জানে, অনুযোগ করা বৃথা। সংসারের কাছ থেকে এই তার প্রাপ্য। স্নেহ নয়, মমতা নয়, ভালবাসাও নয়। এই তার বিধিলিপি। শৈশবে বাপ-মা মারা যাওয়ার পর থেকে কারও কাছ থেকে কখনও লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও তিরস্কার ছাড়া অন্য কিছু সে পায় নি।

ক্ষতটা শাশুড়ীর চোখেই পড়ল না। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর ছোট-খাট ব্যাপার তাঁর চোখে পড়ে না। কিন্তু বহুবল্লভের চোখে পড়ল।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন : ওখানটা অমন করে কাটল কি করে?

—কেটে গেছে।

—ওষুধ-পত্র কিছু লাগিয়েছ?

—না।

হর্ষমুখী প্রসঙ্গটাকে আর অগ্রসর হতে দিলে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বহুবল্লভ প্রসঙ্গটা আবার তুললেন।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, দেখ, আমি কিছু বুঝি না, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে যে দোষ নেই, তা আমি বুঝতে পারি। কিন্তু চুপ করে থাক কেন? তাহলে তো অকারণ ব খেতে হয় না।

হর্ষমুখী সাড়া দিলে না। অবাক! বহুবল্লভের কণ্ঠস্বরের গাঢ়তা অনুভব কর কি আশ্চর্য কথা!

বহুবল্লভ বললে, ভাবছি, কাল দু সিনেমায় যাব। যাবে?

—না।

—'না' কেন? একটু বাইরে বেরুতে করে না?

হর্ষমুখী শুধু বললে, আমার স কোথায়?

—এত মেয়ে সময় করতে পারে, তুমি পা না?

—না।

সিনেমা-থিয়েটারের কথা হর্ষমুখী ভ পারে না। তার দিন-রাত্রি নীরেট শুধু কা ঠাসা। এত কাজ যে, দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য কয়েক ঘণ্টা বেশী হলেও শেষ করা যেত ন

তাছাড়া কাজই তাকে বাঁচিয়ে রে কাজ না থাকলে সে হয়ত মারা যেত, নয় হয়ে যেত। কাজ তাকে নেশার মত বেখেছে। তাকে দুঃখ সইবার শক্তি দেয়

সিনেমা থিয়েটার দূরের কথা দুটো কথা কইবারও তার সময় নেই।

মহাবল্লীপুরম

অমিয় তরফদার

হর-কি-প্যারী
শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
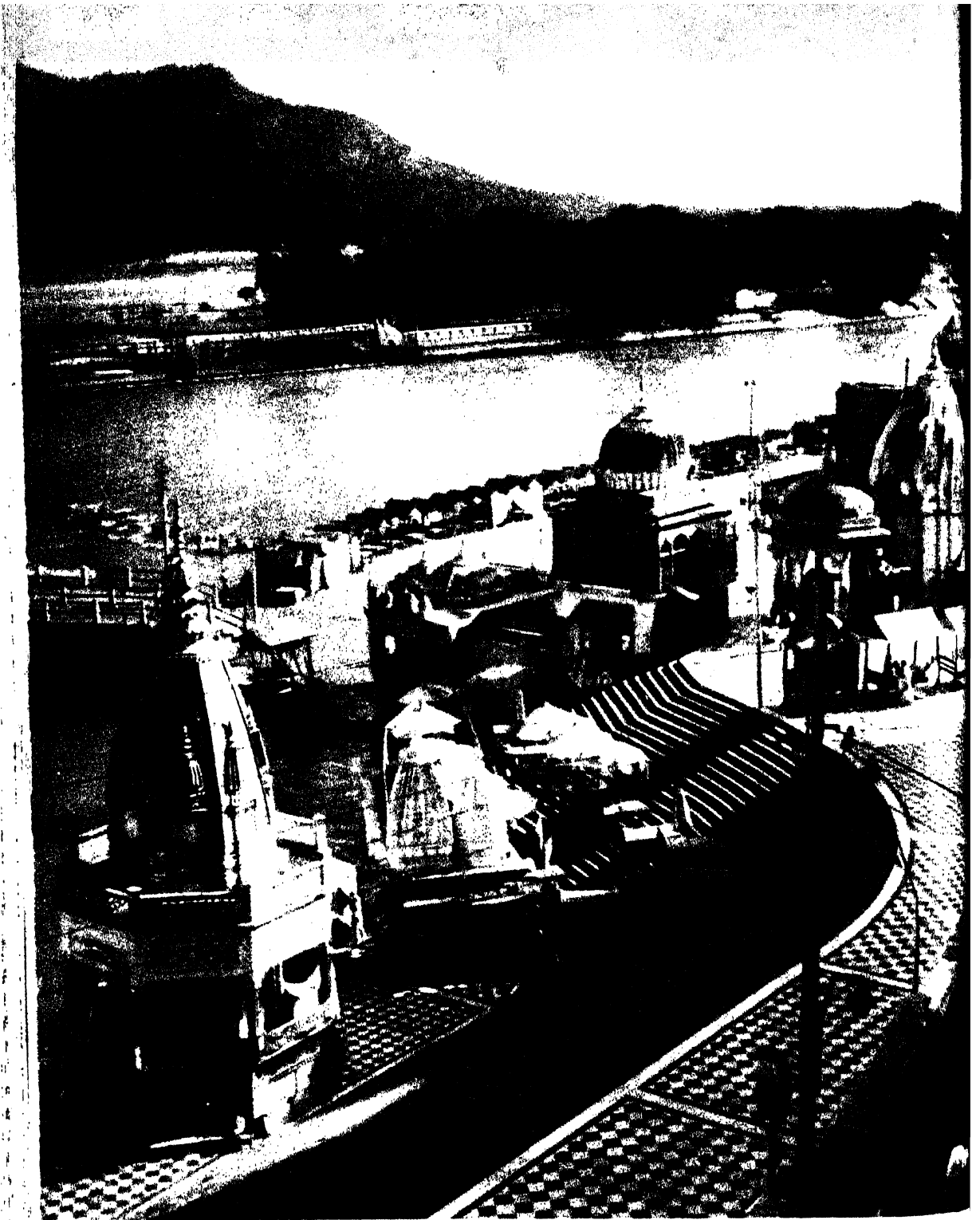
এ হেন হর্ষমুখী একদিন সকালে উঠতে পারেনি। ভোর পাঁচটায় সাধারণতঃ সে ওঠে।

বাড়ীতে একটা কোলাহল পড়ে গেল।

ছেলেরা চেঁচায়, চা কি হল?

ভোরে চাটুকু বিছানায় বসে না পেলে ওদের পড়ায় মন বসে না।

শাশুড়ী প্রথমে খেয়াল করেন নি। সকালে কাপড় কেচে এসে ঠাকুরঘরে পুজোয় বসেছিলেন। ছেলেদের চিৎকারে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কিছুটা উদ্বেগ, কিছু কৌতূহল। ছেলেমেয়েগুলো চেঁচাচ্ছে, হর্ষমুখীর হুঁশ নেই?

পুজোয় শাশুড়ীর মন বসল না। বেরিয়ে এসে ঝঙ্কার দিলেন: বিবির কি এখনও ঘুম ভাঙেনি? বহুর অফিসের ভাত দিতে হবে না? ছেলেমেয়েগুলো কি না খেয়ে ইস্কুল যাবে? ওরা চায়ের জন্যে চেঁচাচ্ছে, চা দিতে হবে না?

ভাঙা কাঁসরের মত গলার আওয়াজ।

হর্ষমুখীর ঘোর ফিকে হয়ে এল। মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সত্যিই তো, তার কত কাজ। চা তৈরি আছে, তারপর খাবার, তারপর অফিসের আর স্কুলের ভাত। সর্বশেষে শাশুড়ীর নিরামিষ রান্না।

হর্ষমুখী চোখ মেলে বাইরের দিকে চাইলে। এ বাড়ীর কোনখান থেকে রোদ দেখা যায় না। হর্ষমুখী রোদ দেখতে পেলে না। দেখলে বাইরে বেশ ফর্সা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠে বসবার চেষ্টা করলে। কিন্তু মাথা তুলতে পারলে না। মনে হল, কে যেন তার চুলের মুঠি ধরে তাকে খাটের সঙ্গে আটকে রাখলে।

কি হল?

বহু চেষ্টায় যদি সে উঠে বসল, মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হল, কপালের শিরাগুলি ছিঁড়ে যাবে বুঝি।

কিন্তু এত ভাববার তার সময় নেই। ছেলেরা চায়ের জন্যে চিলের মত চেঁচাচ্ছে। শাশুড়ী তাঁর গলার ভাঙা কাঁসরখানা বাজিয়েই চলেছেন।

হর্ষমুখী খাট থেকে নেমে টলতে টলতে নিচে এল।

তার কত কাজ। অন্যদিন এমন সময় চা তৈরী করে ভাত চড়িয়ে দেয়। আজ উনানটা পর্যন্ত ধরান হয়নি। কিন্তু উনান ধরিয়েই সেই উনানে চা তৈরী করতে হলে ছেলে-পুলে তাকে ছিঁড়ে খাবে। সে বুদ্ধি করে স্টোভটা জেলে চা চড়িয়ে দিলে। দিয়ে উনানে আগুন দিলে।

ছেলেরা ডাকাতের মত হুল্লোড় আরম্ভ করেছে।

তাদের সঙ্গে শাশুড়ীও যোগ দিয়েছেন।

নবাব-পুত্রেরা নেমে এসে চা খাবেন না। ওপরে তাদের ঘরে চা দিয়ে আসতে হবে। হর্ষমুখী চা তৈরী করে ওপরে এল চা দিতে।

ছেলেরা রাগে ফেটে পড়ল: এতক্ষণে চা এল? কি করছিলে এতক্ষণ? আমাদের পড়াশুনো নেই? চায়ের জন্যে কতক্ষণ বসে থাকব?

বাইরে থেকে শাশুড়ী ফোরণ দিলেন: বিবিসাহেবের ঘুম ভাঙেনি আজকে। ঘুম না ভাঙলেই তো পারত। একেবারে চিতেয় তুলে দিয়ে আসতাম।

সে সৌভাগ্য কি তার কোনদিন হবে?

কথাটি না বলে হর্ষমুখী নিচে নেমে এল। উনানটা ধরতে ধরতে কাপড় কেচে নিতে হবে।

কিন্তু মাথায় এত যন্ত্রণা কেন? চলতে পা টলছে। কলঘর থেকে কাপড় কেচে বেড়িয়ে আসতে হর্ষমুখী দেখে বহুবল্লভ বাজার নিয়ে এসেছেন।

ওর দিকে চেয়ে বহুবল্লভ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার চোখ অত লাল কেন?

চোখের কথা হর্ষমুখীর একবারও মনে হয়নি। প্রশ্ন শুনে মনে হল, চোখদুটো ভারি ভারি ঠেকছে বটে। একটু জ্বালাও করছে যেন।

কিন্তু তার দাঁড়াবার সময় নেই। সব কাজই বাকি। স্বামীর দিক থেকে তাড়াতাড়ি চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললে, ও কিছু নয়।

—না'কি? চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হয়েছে।

—না, হয়নি।

হর্ষমুখী তরতর করে ওপরে চলে গেল।

চা খেয়ে নিশ্চিন্ত মনে ছেলেরা পড়া আরম্ভ করে দিয়েছে। শাশুড়ী পুজার ঘরে।

আয়নায় মুখ দেখতে গিয়ে হর্ষমুখী লক্ষ্য করলে, চোখদুটো সত্যই লাল হয়েছে। জবা ফুলের মত।

কিন্তু ওটা তেমন কিছু নয়। মুস্কিল হয়েছে মাথাটাকে নিয়ে। অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে, মাথাটা বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

কিন্তু উনান কামাই যাচ্ছে। হর্ষমুখী তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল।

বহুবল্লভের ও তাঁর মায়ের খাবার দু'বেলাই উপরে দিয়ে আসতে হয়। রান্নাঘরটি ছোট এবং খুব পরিষ্কারও নয়। শাশুড়ী বলেন, ওই ঘরে বেটাছেলে খেতে পারে? সুতরাং অসুস্থ শরীরেও হর্ষমুখীকে এই দু'জনের ভাত উপরে নিয়ে যেতে হল। মেয়েদের শরীরটাকে (শাশুড়ী না হওয়া পর্যন্ত) শাশুড়ী শরীর বলেই মনে করেন না।

বহুবল্লভকে স্নান করে আসতে দেখে তিনি ওপর থেকে হাঁকলেন: বহুর চান হয়ে গেছে, বৌমা। তার ভাত নিয়ে এস।

বাজার করে ফিরে হর্ষমুখীর মুখ-চোখের অবস্থাটা বহুবল্লভের ভাল লাগেনি। চোখ লাল, মুখ ফোলা, ভাল লক্ষণ নয়।

বললেন, ওর শরীরটা বোধহয় ভাল নয় মা। আমি রান্নাঘরেই যাই।

মা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: রান্নাঘরে খাবি কি? কিছুই হয়নি বৌমার। তুই ব্যস্ত হোস না।

তিনি আবার হর্ষমুখীকে ভাতের জন্যে তাগাদা দিলেন।

কিন্তু হর্ষমুখীর দেখা নেই।

এবারে শাশুড়ী রেগে গেলেন। গলা সপ্তমে চড়িয়ে চিৎকার করলেন: বলি ও বড়লোকের বেটি! কথাগুলো কি কানে যাচ্ছে না? বহু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?

তথাপি হর্ষমুখীর সাড়া নেই। বহুবল্লভের মনের ভিতরটা অজানিত আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে অফিসের ভাতের কোনদিন বিলম্ব হয়নি। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না, এমনও হয়নি। জননীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল।

এসে দেখে, রান্নাঘরে সাজানো ভাতের থালার পাশে তার অচৈতন্য দেহটা পড়ে আছে।

বহুবল্লভ চিৎকার করে উঠল। ছেলে-মেয়েরা ছুটে এল। তাদের পিছু পিছু কোঁতাতে কোঁতাতে শাশুড়ীও নেমে এলেন।

হর্ষমুখীর অবস্থা দেখে তিনি আশঙ্কা-ব্যাকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, বিষ-টিষ খেল নাকি? কি সর্বনাশ হল গো!

ছেলে-মেয়েদের সাহায্যে বহুবল্লভ হর্ষমুখীর অচৈতন্য দেহটাকে উপরে নিয়ে গিয়ে খাটে শুইয়ে দিলেন। অফিস মাথায় উঠল। ছুটলেন ডাক্তার ডাকতে।

রোগিণীকে পরীক্ষা করে ডাক্তার মুখ বিকৃত করলেন। ইংজেকশান দিলেন, ওষুধ দিলেন, যাবার সময় বলে গেলেন, সন্ধ্যের মধ্যে জ্ঞান না হলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

সন্ধ্যার মধ্যেই জ্ঞান হল।

জবাফুলের মত লাল চোখ মেলে হর্ষমুখী কাকে যেন খুঁজতে লাগল।

বহুবল্লভ সমস্তক্ষণ খাটের পাশে বসে। তাঁর চিন্তা একটি বৌ গেছে, এটিও যদি যায়, তাহলে বুড়ি-মা এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাকী জীবনটায় তাঁর আর দুঃখের শেষ থাকবে না। এ বয়েসে আর বিবাহের সম্ভাবনাও নেই। ছেলের বৌ আসতে অনেক দেরী।

হর্ষমুখীকে চোখ মেলতে দেখে, তাঁর মনে আশার সঞ্চার হল। জ্ঞান হচ্ছে না দেখে তিনি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন।

হর্ষমুখীর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি খুঁজছ? কাকে খুঁজছ? ছেলে-মেয়েদের ডাকব?

হর্ষমুখী সাড়া না দিয়ে আবার চোখ বন্ধ করল।

আধঘন্টা পরে আবার সে চোখ মেলে চাইলে। কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে বহু-বল্লভের দিকে চেয়ে রইল।

বহুবল্লভ জিজ্ঞাসা করলেন, একটু ভাল বোধ হচ্ছে?

হর্ষমুখী সাড়া দিলে না। তেমনি অপলক চেয়ে রইল।

তারপরে ফিক করে একটু হাসলে।

হর্ষমুখীকে বহুবল্লভ কখনও হাসতে দেখেনি। পান্ডুর ঠোঁটে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত একফালি হাসি যে এত মিষ্টি হতে পারে, সে বিষয়ে তাঁর ধারণাই ছিল না। তাঁর বুকের ভিতরটা চঞ্চল হয়ে উঠল। হর্ষমুখীর একখানি হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, একটু ভাল বোধ হচ্ছে?

হর্ষমুখী আর একবার হাসলে। তার শেষ হাসি।

বললে, চললাম।

এবং চোখ বন্ধ করলে।

আরও ঘন্টাখানেক হর্ষমুখী বেঁচে ছিল। তার মুখের উপর ধীরে ধীরে মৃত্যুর ছায়া ঘনিয়ে এল। যন্ত্রণার এতটুকু চিহ্ন তার মুখে দেখা গেল না। সে যেন শিশুর মত তার মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঠোঁটের কোণ থেকে ভোরের চাঁদের মত হাসির রেশটুকু তখনও মিলিয়ে যায়নি।

ঝন ঝন ঝন ঝন ঝন, ঝন।
বাজিয়েই চলেছে ডাকের ঘণ্টা।

ধৈর্য ধরতে জানেনা, অপেক্ষা করতে শেখেনি। ছুটে এসো, তুলে ধরো নচেৎ নিস্তার নেই। কান ফুটো করবে। এক পায়ে চটি, এক পা খালি, কোঁচার আগাটা লুটিয়ে পড়েছে, ছুটে এসে রিসিভারটা তুলে নিলেন সরোজাক্ষ।

রসিক সাহিত্যিক সরোজাক্ষ ঘোষাল।

হ্যাঁ, সাহিত্য রসিক নয়, রসিক সাহিত্যিক। অবশ্য সাহিত্য রসিক নয়', বলাটা বোধহয় ভুল হল, তবে রসিক সাহিত্যিক হিসেবেই বিখ্যাত সরোজাক্ষ। হাসির গল্পের রাজা। পত্র-পত্রিকায় নামের তালিকায় সরোজাক্ষ ঘোষালের নাম দেখলেই বুঝতে হবে নিঃসন্দেহে হাসির গল্প। খুব মজার, খুব কৌতুকের।

ছেলে বুড়ো সবাই 'সরোজাক্ষ ঘোষাল' বলতে পাগল! সম্পাদকরাই বা কেন পাগল করবেন না, কেন তাঁকে? আর সরোজাক্ষর দুর্বলতা, অনুরোধ মোটেই এড়াতে পারেন বন্ধুরা অবশ্য বলে, 'ওসব এড়াতে যাও গল্পটা রাখো বাবা, ওটাও হাসির গল্প। দুঃখে চাইবে? লগন চাঁদা ছেলে 'হাসলে পরে, মাণিক ঝরে।' এক ফোঁটা-হ এক মুঠো টাকা! 'বাবাঃ!'

'বাবাঃ!'

অতএব সরোজাক্ষরও বলার উপায় 'বাবাঃ, আর হাসতে ইচ্ছে করে না। জী একটা সিরিয়াস লেখা লিখতে পেলাম না।'

একদা কোন একজন সম্পাদককে বলেছিলেন সরোজাক্ষ। প্রস্তাব করেছি 'একটা সিরিয়াস গল্প—' শুনে ভদ্রলোক হাঁ', করে উঠেছিলেন। 'চাইবে না, কেউ প চাইবে না, পাঠক আমায় মারবে—এরপর আ বলা যায়? 'আমার জন্যে আপনি মারই খ বলা যায় কি?

বলা যায় না।

তাই সরোজাক্ষর সেই মোটা খাতাটা, হাসিরও নয়, কান্নারও নয়, শুধু একটি বি বিধুর আনন্দে স্পন্দিত, সেটা আর লোক পড়ল না কোনোদিন।...অথচ সবিতা বলে 'কলম ধরে পর্যন্ত বিদূষকের পার্টই প্লে গেল, আমাদের গল্পটা লেখ না?'

সরোজাক্ষ বলেছিলেন, 'পাগল! আম সেকালের চেনা জানারা আছে, তোমার মেয়েরা আছে—'

থাক না! তাতে কি? ঠিক ঠিক নাম তো য় দিচ্ছ না? নাম ধাম বদলে তোমার নিজের ঙে লিখবে। অন্য আর কেউ বুঝতে পারবে শুধু তুমি, আর আমি।'

'তাতে লাভ?'

সবিতা একটু মিষ্টি হাসি হেসেছিল।

চল্লিশ পার হয়ে গেছে সবিতার, তবু হাসিটা বর্ণ হয়ে যায়নি। সেই তাজা আর মিষ্টি সিটা হেসে বলেছিল, 'বাঃ লাভ নেই বুঝি? মার মনে যে কী ভাবের তরঙ্গ খেলতো খন, সে কি তুমি কোনোদিন খুলে বলেছ মায়? তোমার গল্পের নায়কের মনস্তত্ত্ব শ্লেষণের মাধ্যমে টের পাবো সেটা! অবিশ্যি খনেরটাও যোগ কোরো!...আর—সবিতা পানে একটু চাপা আর দুষ্টু হাসি হেসেছিল, র নায়িকার মন নিয়ে কি তত্ত্বের ব্যাখ্যা রবে, তাও দেখবো!...দেখবো তুমি কত ওস্তাদ লিখিয়ে।'

বলে পর্যন্ত সবিতা হয়তো প্রতীক্ষা করছে। হয়তো যত পত্র-পত্রিকায় সরোজাক্ষ ঘোষালের লেখা বেরোয়, সব কিনছে। কিনছে, পড়ছে, আর হতাশ হচ্ছে। হয়তো বা এও ভাবছে, 'সরোজটা কী ছোটলোক! এত করে বললাম—'

কিন্তু উপায় নেই।

উপায় হচ্ছেনা।

সম্পাদক নেবে না। প্রকাশক নেবে না!

ওকথার আভাস দিতে গেলেই বলে ওঠে, 'উপন্যাস? সিরিয়াস? আপনিও আবার সিরিয়াস উপন্যাস লিখে জাত নষ্ট করতে চান মশাই? কেন? উপন্যাস লিখিয়ের তো অভাব নেই দেশে? সিরিয়াস ছাড়া তো তাঁরা কিছু ভাবতেই পারেন না। বাঙ্গালী হাসতে জানেনা—একথা আমাদের সাহিত্যিকরাই প্রমাণ করেছেন। বলতে গেলে আপনিই আমাদের সবেধন নীলমণি! আপনি আর আপনার রসের কলমটা বদলাবেন না!'

অতএব জাত নষ্ট করেন না সরোজাক্ষ। রসের কলম বদলান না!

'নিজেই পয়সা খরচ করে ছদ্মনামে ছাপিয়ে ফেলবো ওই মোটা খাতার লেখাটা—' এমন কথাও মনে হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু তেমন উৎসাহ আসে না। 'করলে হয়' গোছের একটা মনোভাব তলিয়ে আছে মনের একটা কোণায়।

হয়তো ওই উৎসাহের অভাবটা সবিতার সেই হুকুমের ফল।

হ্যাঁ হুকুমই বলেছিল সবিতা।

'কিন্তু একটি হুকুম, কিছুতেই তোমার ওই নায়িকাকে বিরহিণী, দুঃখিনী, প্রেমহীন বিবাহের যন্ত্রণায় চিরবিষাদিনী করতে পাবেনা।'

'করতে পাবেনা?'

'নিশ্চয় না! তোমার নায়িকা হবে বেশ সুখী সন্তুষ্ট হাসি খুসি আর—'

সরোজাক্ষ হেসে বলেছিলেন—'তবে আর লেখার উদ্দেশ্যটা কি? প্লটটা তাহলে কি হচ্ছে? একদা একটি মেয়ে আর একটি ছেলের মধ্যে ভালবাসা হল। প্রগাঢ় ভালবাসা, সাংঘাতিক ভালবাসা, দুর্দান্ত ভালবাসা। অতঃপর যথারীতি তাদের বিয়ে হলনা। মেয়ের বাবা ছেলের বাবাকে বললেন—'

'আঃ সে যাহোক একটা বানিয়ে লিখোনা বাবু। সেটা যে নিখুঁত সত্যি লিখতে হবে, তার কোনো মানে নেই। বাবা এখনো বেঁচে রয়েছেন।' সবিতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল।

'বেশ না হয় ওটা একটা কল্পিত কাহিনীই জোড়া হল—' সরোজাক্ষ বলেছিলেন, 'বিয়ে হল না সেটাই বক্তব্য, কেমন তো? বেশ দু'জনের বিয়ে হল না, তবে মেয়েটার চটপট অন্য একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হতভাগা ব্যর্থ প্রেমিক ছোকরা রাগ করে জন্মে আর বিয়েই করল না। 'পৃথিবীটাই হাস্যকর' এমনি একটা দার্শনিক মনোভাব নিয়ে হাসির গল্প লিখতে সুরু করল—'

'এই খবরদার!' সবিতা বলেছিল 'ওটা লিখোনা, হাতে হাতে ধরা পড়ে যাবে। গায়ক-টায়ক গোছের কিছু একটা কোরো বরং—'

সরোজাক্ষ হেসে ফেলে বলেছিলেন 'তা মন্দ বলনি। ওটা লিখলে ঘুণাক্ষরেও কেউ সন্দেহ করে বসবেনা। যাক নায়কটার তো তবু একটা ভদ্র মত ব্যবস্থা হল। কিন্তু নায়িকার?'

'নায়িকারও যা যা হল লিখবে', সবিতা বকে উঠেছিল, 'তাকে কি অব্যবস্থায় ফেলে রাখবে?'

'যা যা হল! ওঃ! তার তো সেই অন্য একটা ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল, কেমন? তারপর? হ্যাঁ তারপর বরের সঙ্গে খু—ব ভাব হল—'

'আহা ভাষার কী ছিরি! 'খুব' আবার একটা সাহিত্যের ভাষা না কি? লিখবে—লিখবে—বেশ ভাব হল।'

'অলরাইট! বেশ ভাব হল। মা লক্ষ্মীর কৃপায় বাড়বাড়ন্ত মন্দ হল না, মা ষষ্ঠীও কৃপা টুপা করলেন, তারপর?'

সবিতা ভুরু তুলে বলল, 'তারপর কি তার সবই আমি বলব? তাহলে আমার লিখতেই বা—বাধা কি ছিল?'

'বাঃ নায়িকার কথাটা তুমি না বুঝিয়ে দিলে? আমি তো তারপর আর কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনা।'

'রাগিও না ইচ্ছে করে। বানানো বানানো সব মানুষদের নিয়ে এত সব লিখতে পারো তোমরা, আর এখন কিছু খুঁজে পাচ্ছনা?'

'আমি তো হাসির গল্পের লেখক! বিদূষক। আমি তাহলে তোমার গল্পকে আমার এলাকাতেই টেনে আনবো। লিখবো—তারপর বিদেশে বেড়াতে এসে আবার দু'জনের দেখা হ'ল। নায়কটা উড়ে মালির হাতের কাঁচা ভাত আর পোড়া ডাল খাচ্ছে—দেখে নায়িকার পুরনো প্রেম উথলে উঠল, নায়কটাকে ডেকে ডেকে ধরে এনে ঠেসে চারবেলা খাইয়ে খাইয়ে মোটা করে তুললো—'

'দেখ, সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা করে করে তোমার পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। আমাদের গল্পটা ঠাট্টার জিনিস?'

সরোজাক্ষ হেসে বলেছিলেন, 'ঠাট্টার নয়, একথা জোর করে বলা শক্ত। তবে একেবারে সাধারণ তাতেও সন্দেহ নেই।

সবিতা চোখ তুলে বলে, 'কলমের তবে মহিমা কী, যদি সাধারণের ওপর অসাধারণত্ব আরোপ করতে না পারবে? লেখক কথাটারই বা অর্থ কি? ওটুকুতো কাগজের রিপোর্টাররাও লিখতে পারে। তিলটা তো কিছু না? অথচ তা দিয়েই তিলোত্তমা!'

হয়তো তারপর থেকেই ওই মোটা খাতাটায় হাত দিয়েছিলেন সরোজাক্ষ। কে জানে ওর মধ্যেই আছে কি না সাধারণকে অসাধারণ করে তোলার নজীর?

তিল তিল করে কি তিলোত্তমা গড়েছেন সরোজাক্ষ? সবিতার দেওয়া কাঠামোয়? হ্যাঁ কাঠামোটাও সবিতারই দেওয়া।

বলেছিল সে, 'তুমি যেন কিছুতেই বুঝতে রাজী নও, যেন কাঠামোটাই বাঁধতে পারবে না। এমনি আলগা ভাব। অথচ আমার এত ইচ্ছে করে আমাদের গল্পটা পাকা খাতায় উঠে থাক। নিজে যদি লিখতে পারতাম—'

সরোজাক্ষ বলেছিলেন বোধহয়, 'কি আর হবে ওসব, এই বুড়ো বয়সে?'

'শোনো কথা! তোমার আমারই না হয় এখন বুড়ো বয়েস হলো, ওরাও বুড়ো হয়ে গেছে তাই বলে? ওরা তো সেই যেখানে ছিল সেখানেই আছে। সেই তেরশো তেতাল্লিশ সালে।'

বেশতো উঁচু তাকে তোলা আছে, থাক না। পাড়লেই তো ভাবতে বসতে হবে, কি ছিল, কি ছিল না, কি ছিল, এখন আর নেই—'

'মোটেই না! লিখলে সব ছিল, সব আছে, সব থাকবে।...এই কাঠামোটা দিলাম বেঁধে—'

'সব ছিল, সব থাকবে সবিতা তুমি একটি পাগল? থাকা না থাকার হিসেবটা কি এমন ঢালা হিসেব?'

সবিতা বলে, 'কেন নয়? আমি বলছি—'সুখও থাকবে, ভালবাসাও থাকবে। প্রথম ভালবাসা, যাকে বলে তোমার গিয়ে প্রথম প্রেম, ওকি হারিয়ে যাবার?...না বাবু, ও একেবারে আত্মার মত। হারায় না ফুরোয় না, শুকোয় না মরে না!...কিন্তু ভালবাসা আছে—অতএব সুখ থাকবে না, অথবা সুখ রয়েছে তো ভালবাসা থাকা চলবে না, এই পচা পুরনো থিয়োরিট ছাড়ো তো তোমরা। নতুন কিছু তত্ত্ব শোনাতে পার না? নতুন কোনো সত্য!'

নতুন সত্য!

সরোজাক্ষ হেসে উঠেছিলেন।

'কতকগুলো চিরন্তন সত্য তো থাকবেই আমি যদি তালঠুকে নতুন কথা শোনাতে চেয়ে বলি, 'একই পাত্রে জলও রইল, আগুনও রইল আর সেটা রইলই! সেটা কি হাস্যকর হবে না জল আর আগুন কিছুতেই একই পাত্রে বসবাস করতে পারে না। হয় জলে আগুন নিভবে, ন আগুন জল শুষবে। এটাই হচ্ছে জীবনের অমো সত্য।'

'হাতী সত্য!'

সবিতা প্রায় 'ক্ষ্যান্ত পিসিদের' মত ঝঙ্কা দিয়ে উঠেছিল। 'জগতের সব কিছু একেবারে ছাঁচে ঢালা?...তোমরা লেখকরা বড় অহঙ্কার যেন যা কিছু জানবার সবই তোমাদের জানা হয়ে গেছে, যা কিছু বোঝবার সবই বোঝা হয়ে গেছে আর কিছু বাকী নেই। মনস্তত্ত্বের শেষকথা তোমরাই শেখাচ্ছ নিখুঁত নির্ভুল। ওই তত্ত্ব কী জটিল তত্ত্ব তা জানো? ঈশ্বর তত্ত্ব কোথা লাগে?......তোমরা ওকে অঙ্কশাস্ত্রের ছাঁচে ফেলে বলবে: 'এ হলে ও হয় না, ওটা আর হয় না—' সাধে বলছি অহংকারী।...... আমা থিয়োরিতেই আমাদের গল্পটা লিখবে, বুঝলে'

সরোজাক্ষ মৃদু হেসে ঘাড় কাৎ করেছিলেন 'বুঝলাম!'

'তবে বাবু এইবেলা যা করবার করে ফেলো, মরার আগে দেখে যাই।'

'মরার আগে দেখে যাই! চমৎকার!'

'আহা তা বলা কি যায়? সবিতা চোখে মুখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়েছিল, 'জীবন হচ্ছে পদ্মপাতায় জলবিন্দু। ......গল্পটা কিন্তু না পড়ে গেলে মরেও সুখ পাবো না।'

সরোজাক্ষ হেসে উঠে বলেছিলেন 'দিব্যি তো সুখে আহ্লাদে আছো, হঠাৎ মরণদশার চিন্তা কেন?'

'ওই তো বললাম জীবন ক্ষণভঙ্গুর।'

এতকথা বলবার অবকাশ পেয়েছিল সবিতা সেবার হাজারিবাগে বেড়াতে গিয়ে। সরোজাক্ষ গিয়েছিলেন পুজোর পর কিছুটা ক্লান্তি দূর করতে। হাসির গল্প লেখকেরও ক্লান্তি আসে বৈ কি। অন্তত সরোজাক্ষ ঘোষালের আসে।

হাজারিবাগে বন্ধুর একটা বাড়ী পড়ে আছে, মালিও আছে একটা, 'রান্না জানে' এ আশ্বাস দিয়েছিল বন্ধু!

গিয়ে দেখেন পাশের বাসায় সবিতারা।

ছেলে মেয়ে, বর দ্যাওর, ঠাকুর চাকর নিয়ে সে একেবারে এলাহী কান্ড! সরোজাক্ষকে দেখে হৈ চৈ করে বলেছিল, 'তুমি ওই মালিটার হাতে খাবে, আর আমি দুচোখ মেলে দেখব?........ তার থেকে সোজা কলকাতার টিকিট কাটো গিয়ে। ভাড়ার টাকা না থাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

সরোজাক্ষ হেসেছিলেন, 'মনে করোনা কেন, আমি একজন অপরিচিত ভদ্রব্যক্তি নিজমনে আছি, আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনো কারণ নেই তোমার—'

সবিতা তখন আর হৈ চৈ করেনি, শুধু চোখে মুখে লাবণ্য ঝরিয়ে বলেছিল, 'ওটা তোমার কিছু এমন মৌলিক উপদেশ হল না। ওসব সাধনা অনেক করেছি। কতদিন ভেবেছি যেন কোনোদিন ঘোষালদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি আমার, যেন ঘোষাল কথাটার বানানই জানিনা— সে সাধনা ধোপে টিকল না। তবে? কী দরকার বাবা ওই অবাস্তব কল্পনায়? তার থেকে অনেক বেশী সত্য আবার তুমি আমি পাশাপাশি বাড়ীতে আছি। তুমি যদি ওই মালিটার হাতে খাবেই প্রতিজ্ঞা করো, আর এইখানেই থাকবো প্রতিজ্ঞা করো, আমাকেই বিদেয় হতে হবে।'

অতএব কারুরেই বিদেয় হওয়া হয়নি।

সরোজাক্ষ হিসেব করে দেখেছিলেন সবিতার তখন চল্লিশ পার হয় হয় কি হয়েছে। ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে গেছে। সেই সময় এত কথা বলার সময় পেয়েছিল সবিতা।

সবিতার বর বলেছিলো, 'আপনারা মশাই গুণী লোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে পাওয়া ভাগ্যের কথা! আপনার বাল্যবান্ধবীর কাছ থেকে সাহস না পেলে এগোতেই পারতাম না।......'

সবিতার দ্যাওর বলেছিলো, 'বৌদির সঙ্গে আপনার এতদিনের পরিচয়? আশ্চর্য! আপনার লেখা নিয়ে তো ভীষণ ঠাট্টা-টাট্টা—'

আধাপথে থেমে গিয়েছিল বেচারা। বুঝেছিল বলাটা সমীচীন হয়নি।

সেদিন বিকেলে সেই পাথরের চাঁইটার ওপর বসে গল্প করতে করতে সবিতা বলেছিল, 'করিই তো ঠাট্টা! কেন করবো না? সারাজীবন শুধু তো বিদূষকের পার্টই প্লে করে গেলে!

উপায় কি? জীবনের প্রারম্ভে যে যা-ভূমিকা বেছে নেয়, তার থেকে তার উদ্ধার আছে না কি? বলেছিলেন সরোজাক্ষ তা সত্যিই নেই।

নইলে, এই যাকে বলে মেঘমেদুর আকাশ, পঞ্চাশ ঘেঁষা প্রৌঢ়ের মন উদাস করে দেবার মত উতলা বাতাস, এ হেন সময়ে টেলিফোন দূত বার্তা বয়ে বয়ে আনছে, ...'আমার গল্পটা হয়নি? বলেন কি? সর্বনাশ! লিখুন, লিখে ফেলুন সার! আপনার তো কলম ধরতে যা দেরী। সিদ্ধ কলম। খুব হাসির হওয়া চাই কিন্তু—মানে আপনি যেমন লেখেন—'

আফসোর সুখ ত্যাগ করতে হল।

সেই 'খুব হাসির গল্পটার জন্যে একটা প্লট হাতড়াতে থাকলেন কলম নিয়ে বসে। তা সম্পাদক মশাই খুব ভুল বলেননি, কলম নিয়ে বসাতেই হয়ে গেল খানিকটা। এবার সহজে এগিয়ে যাবে।...এক পেয়ালা চা কি চাইবেন এ সময়?

বলতে যাচ্ছিলেন, আবার টেলিফোন। ঝন ঝন ঝন ঝন।......বিরক্তিকর অস্বস্তিকর। কলমে ঢাকনি না পরিয়েই উঠে গেলেন সরোজাক্ষ, বললেন 'কে কথা বলছেন?'

তারপর আর কিছু বললেন না।

না, আর কিছু না।

ও পক্ষই বলছে।

কী বলছে?

মনে হচ্ছে সরোজাক্ষ যেন ধরতে পারছেন না কথাটা!

কিম্বা ধরতে পেরেছিলেন, শুধু বলবার কিছু নেই বলেই কিছু বলছেন না।

অনেকক্ষণ পরে বললেন, 'যাচ্ছি।'

রিসিভারটা আস্তে নামিয়ে রাখলেন।

তারপর আরো আস্তে বললেন, 'যাচ্ছি তাহলে?' কাকে বললেন?

না কাউকে বললেন না।

ঘরে তো কেউ ছিল না। এমনি উচ্চারণ করলেন।

কলমটা তেমনি মুখখোলাই পড়ে থাকলো, জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আরও আস্তে চুপিচুপি বললেন, গল্পটা তা হলে পড়লে না?

সবিতার ছেলেমেয়েরা হাউ হাউ করে কাঁদছিল, সবিতার বর পাথরের মত বসেছিল খাটের ধারে, সবিতার দ্যাওর বলল, 'হ্যাঁ আমিই ফোন করেছিলাম! বৌদি আপনাকে খুব ইয়ে করতেন—কিচ্ছু হয়নি! কিচ্ছুটি না। সকালে ও তো চা খেয়েছেন, কুটনো কুটে দিয়েছেন। তারপর এসে বললেন, "শরীরটা খারাপ লাগছে।' ব্যস! আপনার সঙ্গে সেই হাজারিবাগে শেষ দেখা, কী আনন্দ, কী ইয়ে—'

একটু সামলে নিয়ে বলল, 'দাদার দিকে তো তাকাতে সাহস পাচ্ছি না, আপনি যদি শেষ অবধি—'

সরোজাক্ষ থামিয়ে দিলেন।

শান্তভাবে বললেন 'আছি।'

[illegible]

জীবন ক্ষণভঙ্গুর,' এসব কথা তুমি বলেছিলে সবিতা? শুধু ঠাট্টা করে?

ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছিল, আগু... আসছিল, সরোজাক্ষ একটু সরে এলেন... লেন সবিতার বর আগুনের খুব কাছে... আছে, সবিতার দ্যাওর আস্তে বলল, ... একটু সরে এসো,' এল না। বলল 'থাক!'

অনেক পরে, যখন শ্মশান থেকে... আসছে সরোজাক্ষর খুব কাছে এসে... সবিতার বর। বলল, 'ওর কাছে দেও... রাখতে পারলাম না।......বলেছিল, ... থাকুক, আর যখনই হোক, ওর মরবার... যেন আপনাকে খবর দিই! হল না, সময়... না। শেষ কথায় সেই অভিযোগ জানিয়ে... সব শেষ উচ্চারণ করেছিল—

'কথা রাখলে না তো?'

সরোজাক্ষ চমকে তাকালেন।

একটা তীব্র প্রশ্নের ধাক্কা খেলেন...

কাকে?

কাকে?

সবিতার বর আর একবার বলল, ... যেখানে সত্যিই সময় পেলাম না।'

সময় পেলাম না। সময় পাওয়া ... এইটাই তো শেষ কথা। সময় যে পাও... না একথা কে মনে রাখে?

সরোজাক্ষ মনে মনে বললেন, আমি... রাখিনি, তোমার কথাও রাখিনি আমি। আমি তোমায় পড়াতে পারিনি, তোমার... আমার গল্প, আমাদের গল্প। আমি... ভেবেছিলাম, লিখলে আমাদের এই গল্পটা... সাধারণ ছাড়া আর কিছুই হবে না।..... আর হালকা।

অথচ তুমি তোমার মন দিয়ে ওজন ক... ওজন করে হতাশ হবে। তোমার সেই হ... ছবিটা ভেবেই আমি আমাদের গল্পটা... রেখেছিলাম, ফেলে রেখেছিলাম।

কিন্তু এখন কি মনে হচ্ছে জানো? হচ্ছে হয় তো নেহাৎ সাধারণ হতো না।... দেওয়া নতুন সত্যিই সে গল্প অসাধারণ... উঠতো।......

সবিতা, তোমার বর তোমার কাছে ... কথা রাখতে পারেনি বলে—আপশোস ... জায়গা পাচ্ছে না, তবু আমায় কেন মনে... কাকে? কাকে?

সবিতার দ্যাওর অস্ফুটে বলল, 'আ... সঙ্গেই ওখানে ফিরে একটু শরবৎ টরবৎ...

সরোজাক্ষ মাপ চাইলেন।

শ্মশান থেকেই বাড়ী ফিরবেন?'

সরোজাক্ষ একটু হাসলেন, 'তা তো ফির... শ্মশানেই থেকে যেতে পারা যায় কই?'

নাঃ থেকে যাবার ইচ্ছেও নেই।

বাড়ী ফিরে একটু টান্ টান্ করে... ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে একা চুপ... জিগ্যেস করতে, সবিতা, কাকে?

কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি ইচ্ছে মেটে? জীবন যন্ত্রণায় এক যন্ত্রণা সেই অস... [illegible] নেই? [illegible]
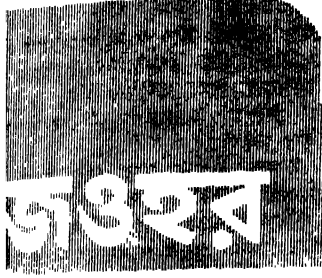
ওহরলাল বম্বেতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন ১৯৬১ সালের ১লা জানুয়ারী। বাঙালী ...রীর বিরাট জনতার মাঝে বসে শুনলুম ...ভাষণ। দেশীবিদেশী বিদগ্ধ গুণীজনে ভরা ...র ওপর সকলের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট ...ছিল তাদের অতিচেনা জওহরলালের প্রতি। ...সুসম্বন্ধ হল না ও'র বক্তৃতা। কবিগুরু ...কে বলতে গিয়েও একাধিকবার গান্ধীজীর ...এনে ফেললেন। যে মানুষটির সঙ্গে তাঁর জীবনের চালচলন, কিছু মূল্যবিচারের ...ভঙ্গী তফাৎ ছিল অনেক আবার যাঁর ...জাগরণের জীয়নকাঠির পরশ পেয়ে ঐশ্বর্য ...স, সম্ভ্রান্তঘরের আদব-কায়দা মর্যাদার ...ড়ুক মোড়া ভাবপ্রবণ যুবকের ঘুম ভেঙে- ...—তাঁর উল্লেখ প্রায়শ ঘটে যেত জওহরলালের ...য় ভাষণে। গান্ধীবাদের অনেকখানি বাদ ...রও উনি ছিলেন তার যোগ্য ধারক, বাহক, ...রক। তিলকছাপ, কন্ঠমালা, নামাবলি অঙ্গে ধারণ ক'রে বৈষ্ণব হওয়ার মতো ছিল তাঁর সাধন ভজন।

জওহরলালের এক ভক্ত বন্ধু আমারও ...। তাঁর কাছে থেকে "মহাত্মা"র দ্বিতীয়

...রিয়ে আসছে, হয়ে ওঠেনি? কিছু হয়ে ...ঠেনি? বলেন কি? সকালে যে বললেন—কথা ...তে পারলেন না? শরীর খারাপ? বেরিয়ে- ...লেন? তা' এই বৃষ্টি বাদলে বেরোতে গেলেন ...ন?......কিন্তু আমি যে মারা যাচ্ছি, প্রেস ...য়ে ফেলছে। একটু আদা চা খেয়ে বসে ...দন স্যার। নইলে রেলের নীচে গলা দিতে ...ব আমাকে। অবস্থা বুঝতে পারছেন না...... ...লা সেপ্টেম্বর কাগজ বার করতে না পারলে— ...খছেন?......বাঁচালেন! কাল সকালেই যাচ্ছি ...হলে? সত্যি বাঁচালেন!'

বাঁচালেন!

সরোজাক্ষ ঘোষালের তবে ক্ষমতা রয়েছে উঁকে বাঁচাবার!...সময় রয়েছে কথা রাখবার।

টেবিলের ধারে এসে বসলেন। দেখলেন ...মের মুখটা সকাল থেকে খোলা পড়েছিল, ...কিয়ে কাপে উঠেছে। নতুন করে কালিভরে ...সমাপ্ত গল্পটা টেনে নিয়ে বসলেন। সেই ধুবে ...সির গল্পটা। খানিকটা হয়ে আছে। সহজে ...গিয়ে যাবে। প্লটটা তো স্পষ্ট মনেও পড়ছে। ...ষণ মজার। নিশ্চিত জানেন পড়ে লোকে হেসে ...টি কুটি হবে।

গল্পটা এগোতে থাকল। লিখকলম!

মুদ্রণে সাহায্য ক'রছিলুম। জওহরলাল আবার পক্ষকাল পরে বম্বে আসছেন জেনে তাঁকে একবার বাড়ীতে আনার সখ জাগল মনে। এটা বেশ বেরাড়া সখ। বাড়ী মানে সমুদ্রতীরে একতলা ডেরায় স্বল্পপরিসর চারখানা ঘর। বাগানে ফুলফলের ক'টা গাছ আছে। চেয়ার টেবিল
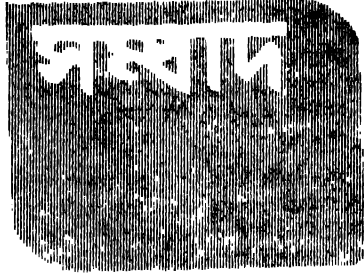
নেই জুৎমতো, মোড়া আর দড়ির খাটিয়া ব্যবহার হয় বসার আসনরূপে; তৈজসবাসনের উপযুক্ত সজ্জা নেই, দাসী বেয়ারা নেই।

সেদিন দুপুরে বন্ধুবরকে খোঁচা দিয়ে বললুম: "কেবল শুনি জওহরলাল পরম বন্ধু, অথচ তাঁকে একবার আনতে পারলেন না আপনার বাঙলোতে?" ঠিক নিশানায় গিয়ে লাগল এ ব্যঙ্গবাণ। ও'র "একান্ত" কুটিরের কাছেই রাজভবন; ভদ্রলোক দেহে মোটা খাদি সার্ট ঝুলিয়ে পাইপ টানতে টানতে চলে গেলেন রাজভবনে, তখনই জওহরলালের দিল্লী থেকে আসার কথা। ক'মিনিট পরে ফিরে উনি বললেন: "আজ সন্ধ্যায় ট্রম্বেতে অপ্সরার উদ্ঘাটন ক'রে জওহরলাল এখানে আসবেন। স্নানঘরে প্রায় ঢুকে প'ড়েছেন এমন সময় তোমার নালিশটা শোনাতে বললেন, 'ও আর ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রেখে লাভ নেই। প্রতিবারই নানা কাজ জুটে যায় এখানে এলে। আজই সন্ধ্যায় যাব তোমার বাড়ী।'

আমার মন তখন ভাবনায় কাতর। একদম একা কিভাবে আতিথ্য জানাব, একটু কিছু খেতে দেব। রামায়ণীসেনা থাকবে সঙ্গে, কোথায় তারা বসবে, কে আপ্যায়ন করবে তাঁদের। আমার মাথায় বাজপড়াভাব দেখে বন্ধু বললেন: "কি হ'ল? এত আস্ফালন করে অমন মিইয়ে গেলে কেন? ট্রম্বেতে চায়ের আসর সেরে ও'রা আসবেন।"

"ও'রা মানে? গভর্ণরও আসবেন না কি? একটা তো বসার যোগ্য চেয়ার আছে।"

"তা কি আর না আসবেন, তোমার পিতৃবন্ধু তিনি। অত ভাবনার কি আছে?"

"কী যন্ত্রণা, আমি তো আপনার মতো থান পঞ্চাশ বাছা বাছা বই দেখিয়ে চুরোট টেনে বসে থাকতে পারব না। একা ক' ঘন্টায় সব গোছগাছ ক'রব কি ক'রে? ঠিকে চাকরটিকে ডেকে পাঠান।"

"অতিথিদর্শক ডাকতে মানা ক'রেছে ওরা, তবে তোমার বান্ধবীকে ডাকতে পার চুপি চুপি।"

বান্ধবীকে ফোনে এত্তেলা পাঠাবার পরই ফটফট শব্দে মোটরবাইক এসে দাঁড়াল আমাদের ঘাসওলা মাঠের সীমানায়। সাদাপোষাকের কাঁধে বুকে তেরঙা কাপড়ের পট্টি ও সোনালী তারা-

আঁটা মানুষটি নেমে শুধোলেন: "এটা কি মিঃ—র বাড়ী?"

"হ্যাঁ"।

"পণ্ডিতজী এখানে আসবেন?" এ প্রশ্নের উত্তরটা তার বিশেষ পছন্দ হল না। পাশের বারো বাংলোয় জজ সেক্রেটারি প্রমুখ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরের বাস। আমরা পাশে হংসমধ্যে বকো যথা। চারপাশে চোখ বুলিয়ে মানুষটি বলল; "এ বাড়ীতে বেড়াফটক কিছু নেই, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য সতর্ক বন্দোবস্ত ক'রতে হবে। আপনারা যেন ভীড় ডাকবেন না ও'র আগমনবার্তা রটিয়ে।"

"ও কাজটা আপনারাই সুষ্ঠুভাবে সারবেন বুঝছি। উদ্দিতকমা এঁটে এখানে কচিৎ মানুষ আসে। এবার লোকেরা জেনে যাবে কি ব্যাপার, সাদা পোষাকে এলেন না কেন? আচ্ছা এত সাবধানতার দরকারই বা কি?

"তুমি এ বিষয়ে মাথা ঘামিও না, ওরা আপন কর্তব্য করুক।

মান্য অতিথি আসছেন, মিঠাই বানাবার দরকার জানিয়ে চেনা গয়লাকে চটপট সের তিনেক ভাল দুধ দিতে বলায় সে জিগ্যেস ক'রল: "কে রহিনজী? তাই কি ফটফটিয়ায় পুলিশের আদমী এসেছিল?"

যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা ভাষণের নকলে জানালুম: "হুঁ, লাটসাহেব আসবেন।"

ক্ষেপে ক্ষেপে পুলিশের গাড়ী আর মানুষরা এসে এমন তম্বাসী লাগাল যে পড়শীরা অনেকে ফাঁকটা ধরে ফেলল। লাট সাহেব ইতিপূর্বে এসেছিলেন, এমত কাণ্ড তখন ঘটে নি। অবাধ বিচরণে অভ্যস্ত দোআঁসলা কুকুরদ্বয়কে পড়শীদের চাকরদের এলাকায় বেঁধে রাখার ব্যবস্থা ক'রলুম নতুবা হয় ওরা চেঁচাবে নয় জওহরলাল ওদের প্রতি আমার চেয়ে বেশী নজর দেবেন। আমাদের এলাকার নিতান্ত শান্ত কর্মপটু বুড়ো জমাদারকে বললুম: "আপনমনে কাছাকাছি কাজ কর, সন্ধ্যায় জওহরলালজী আসবেন দেখো, কাউকে বলো না এ খবর।" সে শুকনো পাতা, কাগজকুটো ঝেঁটোতে থাকল কুঁজো হয়ে। যারা কাছাকাছি থাকে এমন অনুগত জনেদের ইশারায় জানিয়েছিলুম তারা ঐ সময় চুপচাপ এসে উপস্থিত হ'তে পারে—ধোবী, চৌকিদার, দুধওলা ভাইয়া, বাসনের কলাই করা লোক, মালী প্রত্যেকে নিজে এ খবর জেনে যেন না-জানিভাব বজায় রেখেছিল।

বান্ধবী টাক্সি থেকে নেমে বললো: "তুমি ও'র নাম কর নি ফোনে কিন্তু ও পথটা তো ইতিমধ্যে লোকেপুলিশে ভরে গেছে! তোমার রুকারী কম, পাশের জজ সাহেবদের কাছ থেকে আনালে না কেন?"

সর্বনাশ, ওদের ডাকতে পারি নি, এ নিয়ে মন কষাকষি ভুল বোঝাবুঝি হবেই। তুমি সেদিন জানালে যে ও'কে একেবারে দেখ নি তাই ডাকলুম, অবশ্য সাহায্যও চাই।"

"তুমি তো কেনা খাবার বা বোতলের সরবৎ ব্যবহার ক'রতে নারাজ, কি ব্যবস্থা রাখছ খাবারের?"

"গোলাপপাপড়ি পেস্তা এ'টে সন্দেশ করেছি, আলুভরিৎ করেছি, পান্তুয়া করা ছিল, ফল কাজু আছে, কমলার সরবৎ দেব, আর কি।"

বেতের ডালা থালায় টাটকা ফুলপাতার গুচ্ছ এ'টে তৈজসের দৈন্য ঢাকতে চেষ্টা করলুম। ওদের মালীর ছেলেটি নিজেই ফুল এনে এদিকে ওদিকে সাজিয়ে দিয়ে গেল। গয়লা একফাঁকে জানাল যে, ও দুধের দামও নেবে না, পণ্ডিতজীর সেবায় লাগবে ও দুধ। সন্ধ্যার অন্ধকার নামায় খেয়াল হল বাইরে জোর বাতি নেই, তখন আর কিছু করার সময় ছিল না।

শিঙা বাজিয়ে দ্বিচক্রযান আসার পর ক'খানা বড় গাড়ী এসে দাঁড়াল। দেহরক্ষী, পার্শ্বচর, চাপরাশি নামল, জওহরলাল নামলেন নাতিসহ, লাটসাহেব এক পা বাড়িয়েছেন এমত অবস্থায় শুনলেন : "আমার দেরী হয়ে গেছে. —র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সান্ধ্যভোজ আছে—আপনি রাজভবনে চলে যান ওদের আপ্যায়ন ক'রবেন দরকার হ'লে।" উদ্যত পদ অন্তর্হিত হল, গাড়ীটা নিঃশব্দে চলে গেল, আমি চাপা নিঃশ্বাস ছাড়লুম সরবতের গেলাস বা রেকাবের অকুলান ঘটবে না বুঝে। জওহরলাল চঞ্চল চরণে এগিয়ে এলেন। পা ছুঁয়ে প্রণাম করা পছন্দ করেন না তাই গান্ধীজীর মতো ও'কেও নত হয়ে নমস্কার করলুম। বান্ধবী বেকুব বাঙাল ঝপ করে প্রণাম করে। আমাকে অভব্য ভাবলেন না তো! পিঠে হাত রেখে বললেন : "কেমন আছ?"

বন্ধুর সাধনার ধন পুস্তক সংগ্রহ দেখতে ঘরে ঢুকলেন। বইয়ের ফাঁকে, আশেপাশে মাটির পুতুল পট বসান ছিল। বাঙলার পোটোকে ফরমাস দিয়ে পুরোনো ঢঙের যে দুর্গার মাথা করিয়ে নিয়ে গিছলুম সেটায় ও'র চোখ পড়ল। এটা ওঁর নানা বিশেষত্বের একটা। এত সজীব স্পর্শকাতর সন্ধানী মন চোখ, এত গ্রহণশক্তি ও অতি সহজভাবে সামান্য ভঙ্গী-ইশারা, কথার ফুলঝুরি দিয়ে মনোহরণ করার অনায়াস অভ্যাস। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট সবুজ মাঠটুকু, ঝাউয়ের চারাগুলো তারিফ ক'রলেন। দিগন্তপ্রসারী সমুদ্রে চোখ রেখে বললেন : "চমৎকার জায়গা, যেন ছোট একটা আশ্রম।"

বন্ধু বললেন : "এদিকটা বম্বের সবচেয়ে পুরোনো অংশ। প্রচীন বানগঙ্গা সরোবর, শিবমন্দির পাশেই। সামনে সাধুদের আখড়া, আশ্রম, শ্মশান।"

ঝট্ করে প্রতিবাদ হল' : "তা কেমন ক'র হবে? সাগর স'রে গিয়ে এ জায়গাটা জেগেছে না?'

ও'র এ অনুমান ভুল। আমার রাগ হ'ল।

ও'র এই রূপকে আমি ভয় করি। কিছু একটা বিপরীত মত উনি শুনিয়ে দেবেনই প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে। তাই প্রায়ই বলেছি : "গান্ধীজীর সান্নিধ্যে যেতুম নিশ্চিন্ত মনে, কোনও শঙ্কা জাগত না। জওহরলালের প্রতি আমার দুর্বলতা বেশী হলেও, ঐ নিশ্চিন্ত-বোধ নেই।"

ঘরে ঢুকে জওহরলাল সবেধন নীলমণি সোজা পিঠওলা চেয়ারটায় ব'সলেন, আরাম কেদারার ইশারা উপেক্ষা ক'রে। মরিয়া হয়ে বললুম : "একটু খেতে হবে।"

"না, না, এখুনি চা খেয়েছি, নৈশভোজ আছে পরে।"

সম্ভবত আমার চুপসে যাওয়া ভাব লক্ষ্য ক'রে বললেন : "আচ্ছা আন একটু খাব।"

"সরবৎ, চা, কফি, কি আনব?"

"সরবৎ।'

সাদা খাদি ঢাকা তক্তপোষে ভোজ্য পানীয় রেখে বললুম : "সব ঘরে করা, সহজপাচ্য।" তখনই জবাব হ'ল : "ঘরে ক'রলেই ভাল হবে আর দোকানের হ'লেই মন্দ তার কি মানে আছে?"

আমি শান্ত নম্রধাতের মানুষ নই, বেশ তেতে উঠেছি ততক্ষণে। বললুম : "নিশ্চয় কোনও মানে আছে ঘরের খাবারের স্বপক্ষের যুক্তির, শুধু শুধু ও কথা বলব কেন? হঠাৎ আপনি আসছেন, ফরমাসী খাবার নয়, যথারীতি তৈরী বাইরের খাবার খাওয়াব কি ভরসায়। অসুখ হোক্ আর কাগজে ঢিঢিক্কারে রটুক আমার। আমার করা খাবার সুস্বাদু না হোক, স্বাস্থ্যকর নিঃসন্দেহ।"

"ওগুলো মিষ্টি?"

'হ্যাঁ, আমি বাঙালী, মিষ্টি খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসি। বাংলা মিষ্টি ছানা থেকে তৈরী হয়, ক্ষীরে বানানো পেঁড়া গোলাপজামের মতো নয়, খুব হাল্কা।" বক্তৃতার সুফল ফলল। চামচ দিয়ে ভেঙে একটু খেলেন, আবার খেলেন। নাতিকে খেতে বললেন। দরবারী কেতায় অনভ্যস্ত আমি অধীনস্থ জনরা খাচ্ছে না কেন অনুযোগ করায় একটু উচ্চকণ্ঠে সহচরকে ডেকে বললেন : "তোমরা খাও, ও ঘরে করেছে খাবার।" আমি হাসলুম তখন।

সরবৎ পানান্তে বললেন : "কৈ সব দেখাও।"

"কি আর দেখাব। অন্ধকারে বাগান, পাক-শালা-বাগিচা দেখা যাবে না।"

"চল পাকঘর দেখাও।"

হায় রে কপাল। বারান্দায় বিরাজমান আমার শোবার খাটিয়ার পাশ দিয়ে যাবার মতো ইঞ্চি বিশেক জায়গা আছে। যদি ও'র পা ফসকায় কি মচকায় তো কেলেংকারি। রান্নাঘরে একভাগে কোদাল শাবলও থাকে। তবু ও'কে নিয়ে যেতে হ'ল। গ্যাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন : "তুমি এখানে রাঁধ?" মাথা নেড়ে সায় দিলুম। বান্ধবীর ছোট ছেলের আবদার ছিল ও'র স্বাক্ষর সংগ্রহের। ঠিক কেমন মেজাজে আছেন আঁচ করতে না পেরে দ্বিধা ক'রছিলুম। দুটি পড়শী কিশোরী রবাহূতে হয়ে এল খাতা হাতে। জওহরলাল মাথা নাড়-লেন, তারা ক্ষুণ্ণ হ'ল।

ভুবনমোহন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে খুব কাছ থেকে দেখবার জন্য বারো ঘরের চারগণ্ডা দাসদাসী, গাড়ীর চালক, জমাদার, চৌকিদার আবছা আলোয় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওদের কেউ আমন্ত্রণ জানায় না, অভিমান ক'রে দূরে স'রে থাকলে বঞ্চিত হবে সারাজীবন। মানের গোড়ায় ছাই দিয়ে ওরা মানী মানুষকে দেখতে এসেছে। মনে পড়ল স্বাধীনতা ল[াভের] বছর দুই আগে কংগ্রেস অধিবেশনের [...] ফটকে কত দেশের মানুষের ভীড়, মুখে কথা "দেশের বেতাজ সম্রাট জওহরল[াল] দেখতে চাই।"

ধন্যবাদ জানিয়ে, মৃদু হেসে বিদায় [...] জওহরলাল চললেন। গাড়ীর উদ্দেশ্যে। [...] না রাখার মূর্খতা আমাকে বিঁধছিল, আলো থাকলে ওরাও খুসী হ'ত ও'কে [...] ভাবে দেখতে পেয়ে। গাড়ীতে একপা [...] ফিরে চেয়ে বললেন : "ওরা কারা সব দাঁ[ড়িয়ে] ওধারে?"

"বারো বাঙলার মনিবদের নোকর-চাক[র] জমাদার, ধোপা, গয়লা।"

ফিরলেন জওহরলাল। তাদের সশ্রদ্ধ [...]নত নতির পরিবর্তে জোড়হাত ক'রে [...] সামনে দিয়ে "তোমরা এখানকার লোক, নম[স্কার]" বলতে বলতে হেঁটে গিয়ে গাড়ীতে উঠ[লেন] বহু বাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে পুরুষ[...] চলে গেলেন নিমেষে।

জমাদার, চৌকিদার, মালী—ওরা অ[...] আহ্লাদে বলল : বাইসাহেব, আপনার [...] আজ দেশের রাজাকে হাত দিয়ে ছুঁ[...] এমন কাছ থেকে দেখলুম। ভগবান আ[পনার] মঙ্গল করুন। "ভাবোদ্বেলচিত্তে বলল[ুম] "এতে আমার কি কৃতিত্ব আছে বল?" শুধু দেশের রাজা, তা' বসা মহামান্য [...] মশাই, এ যে বহুর হৃদয়রাজ।

ওদের খুসীর বার্তা জানিয়ে পরে [...]লাম : "এমন বড় ও জনবহুল আমাদের [...] যে কেবলমাত্র চোখের দেখা দেখে ধন্যবোধ [ক]রে তাদেরও দর্শন দেওয়া আপনার [...] সম্ভব নয়। গান্ধীজীরও এই সমস্যা ছি[ল] জাতীয় অন্ধ স্তুতি, বীর পূজোর সমর্থন উচিত কিনা বিচার্য হলেও আপনার প্রতি অকপট স্নেহ দেখে বড় ভাল লাগে। মানুষের অযাচিত ভালবাসাস্তুতি পেয়ে [...]নার কেমন লাগে আমি চেষ্টা করেও [...] পারি না। অত কাজের ফাঁকে আপনি [...] আমিও বড় খুসী হয়েছি। একটি ছোট [...] আপনার স্বাক্ষর চেয়েছিল, সেদিন সাহস [...] বলতে। ইচ্ছা হলে তা পাঠাবেন।" [...] ডাকে, ২৬শে জানুয়ারীর ছাপ নিয়ে ও'[র চিঠি] এল : "প্রিয় অনু, তোমার পত্র পেয়ে [ভাল] লাগল, ধন্যবাদ। সেই ছোট ছেলেটির [...] স্বাক্ষর পাঠাচ্ছি।"

হিন্দী ও ইংরেজীতে লেখা ও'র স[্বাক্ষর] বান্ধবীপুত্রকে দিয়ে বললুম : "সর[স্বতী] পূজোর দিনে যে স্মরণীয় বরদান পেলে মান রেখো।"

অপবাদ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ভীরু, সন্ত্রস্ত করাঘাত। প্রথমবার অপর্ণা শুনতেই পায়নি। একমনে মেয়েদের খাতা দেখছিল। নারীর আদর্শ, এ রচনাটা দশম শ্রেণীর মেয়েদের অপর্ণা নিজেই দিয়েছে, কিন্তু দেবার সময় কল্পনাও করেনি, এমন মারাত্মক সব মতবাদের সম্মুখীন হতে হবে। অনেকেরই আদর্শ চিত্রতারকা কিংবা পাদপ্রদীপের আলো-কোজ্জ্বলা নায়িকা। কেউ কেউ স্রেফ নম্বর পাবার জন্য সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের কথাও লিখেছে। কিন্তু এসব যে মনের কথা নয়, শিক্ষিকা ভোলানো আতসবাজী তা এতদিনের অভিজ্ঞ অপর্ণার কাছে দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হয়ে গেল। একটি মেয়ে নভশ্চারিণী তেরেসা হবার স্বপ্নও দেখেছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্রের রহস্যলোকে, সীমাহীন জগতে যাবার কল্পনা। তবু কিছুটা নতুনত্ব আছে কিন্তু পরের কয়েক লাইন পড়েই অপর্ণা রীতিমত চমকে উঠল। মেয়েটি লিখেছে, এই প্রাত্যহিক অভাব-[illegible] তন্ডুল-তৈল-মৎস্যের সমস্যা থেকে [illegible] অব্যাহতি, নীচে নামার ইচ্ছা তার [illegible]

আবার [illegible]

বিরক্ত হয়ে [illegible] সরিয়ে রাখল। ভিতর দিকে [illegible] মা দরজাটা খুলে দাও তো।

দরজা অপর্ণাও খুলে দিতে পারত কিন্তু দুটো কারণে দিল না। প্রথম, খাতা ফেলে উঠলেই দমকা হাওয়ায় খাতাগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ হয়তো অপর্ণার কাছেই কোন লোক এসেছে প্রার্থী হিসাবে, নিজে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলে আত্ম-সম্মানে সামান্য টোল খায়। তার চেয়ে চারদিকে খাতা ছড়িয়ে লোকটিকে সামনে ডেকে পাঠালে পরিবেশ যথোচিত হবে।

দরজা খুলে রাখালের মা বলল, বড়-দিদিমণি এক বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

এরকম একটা আন্দাজ অপর্ণা করেছিল সকালে একটি লোক এসেছিল, বিকেলে আর একটি আসতে পারে এমন সন্দেহ তার ছিল।

রামজয় শিক্ষাভবনে একজন ভূগোলের শিক্ষকের প্রয়োজন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন করা হয়েছিল। ফলে কিছু আবেদনপত্র এসেছে অবশ্য এই সুদূর গোবিন্দপুরে ভাল লোক কেউ আবেদন করে নি। স্ত্রীলোক একটি ছিল কিন্তু সে টিচারশিপ পাস না হওয়ায় তাকে নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

আবেদনপত্রগুলো স্কুলকমিটি দেখেছে তারাই ঝাড়াই বাছাই করে দুজনকে মনোনীত করেছে। দুজনেই যথারীতি পুরুষ।

এ পর্যন্ত ব্যবস্থা ঠিকই ছিল। কিন্তু স্কুলকমিটি আর এক উদ্ভট কান্ড করেছে প্রধান শিক্ষিকা অপর্ণাকে নির্দেশ দিয়েছে, দুই প্রার্থীকেই তাকে দেখতে হবে। দেখে আবেদ

পত্রের উপর মতামত দিয়ে পাঠাতে হবে স্কুল-কমিটির কাছে, তারা চূড়ান্ত বিচার করবে কাকে নেওয়া হবে।

অপর্ণা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, রাখালের মা ডাকল, বড়দিদিমণি, ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

অপর্ণা একবার উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল। এখান থেকে দেখার উপায় নেই। আলমারিটা আড়াল পড়েছে।

রাখালের মাকে বলল, এখানে পাঠিয়ে দাও।

কথার সঙ্গে অপর্ণা হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল। আঁচল দিয়ে মুছল মুখটা। উঠে গিয়ে হাল্কা প্রসাধন করার আর সময় নেই।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা নিজেকে শাসন করল। এতদিন পরেও তন্বী মনটা বয়সের স্তর ভেদ করে উঁকি দিতে চায়। চিরন্তন নারীসত্তা প্রধান শিক্ষিকার খোলসটাকে সরিয়ে আত্মপ্রকাশ করার জন্য উন্মুখ। দর্পণের সামনে দাঁড়ালে রূপোর রং মাখা কয়েকটা চুল কানের পাশে দেখা যায়। দুচোখের পাশে পাখীর পায়ের দাগ।

অবশ্য এ বৃত্তিতে যৌবন একটু আগেই বিদায় নেয়। নিরাসক্তি আর কাঠিন্য এ জীবিকার অঙ্গ।

হঠাৎ এত কথা কেন মনে হল অপর্ণার জানা নেই। লোকটি ধীরপায়ে চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিনীত, দাস্যভাব। ওকে চেয়ারে বসতে বলা উচিত।

খাতা থেকে মুখ না তুলেই অপর্ণা বলল কি প্রয়োজন বলুন?

আমি ওই বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে এসেছি। ভূগোলের মাস্টারি। এ উত্তর অপর্ণার জানা ছিল।

বসুন। আপনার নাম? প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাম্ভীর্য আনল কণ্ঠে। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা মুখ তুলল।

অপু! ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

অপর্ণা এমন একটা সম্বোধনে বেসামাল হয়ে গেল। খাতার ওপর থেকে হাতটা সরে যেতেই ফর ফর করে খাতার অনেকগুলো পাতা উল্টে গেল।

কিন্তু শুধু কি খাতারই পাতা ওল্টাল?

অপর্ণার ক্লান্ত, মাইওপিক দুটি চোখে লজ্জার ছায়া নামল। হাজার হিজিবিজি আঁকা দুটি গালে রক্তিম আভা। কথা বলতে গিয়ে প্রথম প্রণয়ভীতা তরুণীর মতন দুটি ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠল।

কি চিনতে পারছ না আমাকে? ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ল সামনের দিকে। ভাবটা যেন দুজনের মধ্যের ব্যবধানটা কমিয়ে আনলেই অপর্ণার চেনার সুবিধা হবে।

অনেক কষ্টে, অনেক জড়তা কাটিয়ে, অপর্ণা কথা বলল, তুমি এখনও বেঁচে আছ পার্থ?

পার্থ বিব্রত হল। বলল, এতদিন পরে এই যদি তোমার প্রথম প্রশ্ন হয়, তাহলে মনে হচ্ছে বেঁচে না থাকাটাই যেন উচিত ছিল।

কি উচিত ছিল জানি না। এতদিন পরে তা নিয়ে তর্ক করতেও মন চাইছে না, প্রবৃত্তিও নেই। কিন্তু কোথায় ছিলে এত বছর?

সবটা শোনার ধৈর্য কি তোমার হবে? তোমার বাবা তাড়িয়ে দেবার পর জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল।

এবার অপর্ণা সামলে নিয়েছে। আর কোন আড়ষ্টতা নেই। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, বাবার তাড়ানোটাই মনে আছে আর বাবার মেয়ের কাছে টানার কথাটা বেমালুম ভুলে গেছ বুঝি?

এতটা পার্থ আশা করে নি। ভেবেছিল আগুন নিভে গেছে। সামান্য স্ফুলিঙ্গও কোথাও নেই। সময়ের পলিমাটি পড়ে পুরোনো দিনের সব স্মৃতি নিশ্চিহ্ন।

তাই অন্যদিকে চেয়ে বলল, আগে কি বোকাই ছিলাম।

অপর্ণা হাসি চেপে বলল, এখন তো সেয়ানা হয়েছ, বিশেষ করে ইন্টারভ্যু যখন দিতে এসেছ তখন নিজেকে আর বোকা বলবে কি করে?

তুমি ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টা বোঝার শক্তি তোমার আছে তাহলে? আঘাত করার জন্য অপর্ণা যেন বদ্ধপরিকর। এতদিন ধরে মুখ বুজে যে বেদনা সহ্য করেছে, তার সবটুকু সে ফিরিয়ে দেবে। মানুষটাকে যখন মুখোমুখি পেয়েছে, তখন আর ক্ষমা নেই।

এর চেয়ে তুমি বরং আমার ইন্টারভ্যু নাও। কঠিন প্রশ্ন কর, আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

কি তোমার মতলব বল তো? এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এখানে দরখাস্ত দিলে যে?

তুমি চটে আছ, না হলে বলতাম, যেখানে আগুন, সেখানেই পতঙ্গ। দুর্নিবার অদৃশ্য টানে নিশ্চিহ্ন হবার আমন্ত্রণে এসে জুটেছি।

আশ্চর্য, চোখে এত ভাষা কোথায় জমা ছিল অপর্ণার? এ বয়সে এত বয়সে এমন অপাঙ্গদৃষ্টি দুর্লভ।

এখনও কবিতা লেখ নাকি?

উপস্থিত লিখছি না। জঠরানল এত লেলিহান, সেখানে কাব্যও ভস্মে পরিণত হচ্ছে। তোমার প্রসাদে চাকরিটা যদি হয়, তাহলে কোমর বেঁধে লাগব। প্রথম কবিতাই লিখব তোমাকে নিয়ে, লক্ষ্মীর সঙ্গে তুলনা করে।

পার্থর কথাবার্তার ধরনই এইরকম। জীবনে কোন সমস্যা আছে, প্রশ্ন আছে, পার্থকে দেখলে তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না।

পরিণত বয়সেই যখন এই, তখন প্রথম যৌবনে, যৌবনের খর মধ্যাহ্নে কি রকম ছিল তা খুব জানে অপর্ণা। হাড়ে হাড়ে জানে।

ওই ব্যাপারটার পরে কিছুদিন গাঁয়ে ফিরে গিয়ে ভাবলাম চাষবাস করি। ব্যাক টু ভিলেজ সম্বন্ধে লেকচার শুনেছি, বইও কিছু পড়েছি। তাই ঠিক করলাম জরু যখন মিলল না, তখন গরু নিয়েই মাতি। দেশে পূর্বপুরুষদের কিছু জমি ছিল, বোধহয় বল্লালসেনের আমল থেকে, কিন্তু ফিরে গিয়ে হতাশ হলাম। জমির চিহ্নও নেই, সেখানে সব কাঁচাপাকা দালান উঠেছে। জ্ঞাতিভাইদের। আমি অবাকই হলাম। কিন্তু তারা অবাক হল আমার চেয়েও অনেক বেশী। এতদিন পরে আমি যে আবার উড়ে এসে জুড়ে বসার চেষ্টা করব এটা তাদের কল্পনারও অতীত ছিল।

ছোট একটু বিয়োগান্ত দৃশ্য। আমার অসময়ে মৃত বাপকে স্মরণ করে সবাই কেঁদে আকুল হল। সেই নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুধারার ফাঁকে ফাঁকে এটাও বলল, অন্তিমকালে আমার বাপের মতিচ্ছন্নই হয়েছিল, নয়তো নিজের অংশের জমিজমা তিনি জ্ঞাতিভাইদের বিক্রি করে যাবেন কেন? বাবা যখন মারা যান, তখন আমি ছোট, শহরে মাসীর কাছে থেকে পড়াশোনা করছি। কাজেই দু বিঘার পরিবর্তে কিলনিখিলের মালিকানা নিয়ে আবার ফিরে এলাম।

এসে দেখলাম তুমিও নেই।

অপর্ণাকে তার বাপই সরিয়ে দিয়েছি[illegible] মেয়ের মতিগতি ভাল ঠেকেনি। চালচুলো[illegible] বাউন্ডুলে ডিগ্রী-সম্বল একটা ছেলের [illegible] নিজের আখের নষ্ট করবে এই ভেবে [illegible] কতকের জন্য তাকে কাশী পাঠিয়ে দিয়ে[illegible] নিজের বোনের কাছে। চোখের বাইরে [illegible] মনেরও বাইরে হয়ে যাবে বহু প্রচলিত ইংরে[illegible] প্রবাদ বাক্য স্মরণ করে।

কিন্তু অপর্ণা প্রবাদবাক্যের ধার ধি[illegible] হয় নি। দিন পাঁচেকের মধ্যে পিসি এক[illegible] বিশ্বনাথের মন্দিরে আরতি দেখতে ঢুকে[illegible] ভীড়ের ফাঁকে বেরিয়ে এসে একেবারে [illegible] স্টেশন। এক কাপড়ে।

কলকাতায় ফিরে বাপের কাছে ওঠে[illegible] নিজের টুকিটাকি যা ছিল তাই সম্বল [illegible] এক মেয়েদের বোর্ডিংয়ে আস্তানা গেড়েছি[illegible] সেখান থেকে সোজা হাজির হয়েছিল প[illegible] মেসে।

পার্থর খবর কেউ দিতে পারে নি।

দিতে পারবে কি? পা[illegible] হতাশ প্রেমিকের মতন এমন [illegible] পদার্থ তো আর নেই। আমি [illegible] দাউ দাউ করে জ্বলছি। তোমার ওপর, প[illegible] ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে, আমি মেদিনীপু[illegible] সেখানে একটা চাকরির আশা ছিল। প্রে[illegible] দাহ কমতেই পেটের দাহ সম্বন্ধে স[illegible] হলাম। কিন্তু বিধি বাম। বি-টি পাশ না [illegible] চাকরির আশা নেই। ফিরে এলাম, তবে ক[illegible] কাতায় নয়, বর্ধমান। বছর দুয়েক হবে [illegible] একটা স্কুলে মাস্টারি করলাম। ছেলে[illegible] আর অবসর সময়ে কবিতা লিখি। [illegible] নিয়ে। প্রেম সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে যখন [illegible] দার্শনিক হয়ে উঠেছি, তখন খেয়াল হল উ[illegible] চেষ্টা করা দরকার। বড় গাছে নৌকা না বাঁধ[illegible] অনটনের ঝোড়ো হাওয়ায় ভরাডুবি হতে [illegible] হবে না।

কলকাতায় এসে বি টি পড়তে [illegible] করলাম। সকাল, বিকাল টিউশনির প[illegible] ভর দিয়ে।

কোন সালে বল তো? অপর্ণার উদগ্র[illegible] প্রশ্ন।

পার্থ হিসাব করল, তারপর ব[illegible] উনিশশো পঞ্চাশ।

কি আশ্চর্য, সেই বছরই আমি [illegible] করেছি। তুমি ঢুকলে আর আমি বের হলাম[illegible]

পার্থ অমায়িক হাসি ফোটাল মুখে, অ[illegible] যাওয়া নিয়েই তো সংসার।

পার্থ একটু থামল। জরিপ করার ভঙ্গী[illegible] অপর্ণার আপাদ মস্তক দেখল, তারপর ব[illegible] পাশ করেও যে বিরাট কিছু একটা কর[illegible] পারলাম, এমন নয়। চারে মাছ ঠোকরা[illegible] মতন একবার এ স্কুলে একবার ও স্কুলে ঠু[illegible] বেড়াতে লাগলাম। দু-একটি বন্ধু-বা[illegible] পরামর্শ দিল, এম এ পড়ার জন্য, [illegible] ততদিনে দিব্য দর্শন হয়েছে। লেখাপ[illegible] অসারতা উপলব্ধি করেছি। ফলে, বিশ্ববি[illegible] দ্যালয়ের দেউড়ি আর মাড়ালাম না।

কেন একটা কাজ [illegible] করতে পার[illegible] এদেশের শতকরা [illegible] জন যুবক যা ক[illegible]

অপর্ণার কণ্ঠের পরিহাসের সুরটুকু পার্থ পেক্ষা করল। কৌতূহলীকণ্ঠে বলল, কি?

বিবাহ।

পার্থ হাই তুলল, তেমন শাঁসালো শ্বশুর টলে ব্যাপারটা হয়তো লোভনীয়, কিন্তু জন ভদ্রকন্যার জীবন আর বিষময় করে তে পারলাম না, বিশেষ করে হৃদয়ে যখন নাভাব'-এর বোর্ড ঝুলছে।

তার মানে? এবার অপর্ণার কণ্ঠে কোথাও রিহাসের সামান্য আভাসও নেই।

মানেটা নাই শুনলে। জীবনের সব তত্ত্ব না হয়ে গেলে জীবনে আর আকর্ষণ থাকে । তেমনই এটা তোমার নাগালের বাইরেই ক।

এ বয়সেও অপর্ণার মুখ সামান্য আরক্ত ল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সংকোচ জড়ানো লায় বলল, তোমার সব কিছুই বানানো।

পার্থ হাসল, জীবনটাই একটা মেক-বিলিভ। যাক্, হঠাৎ কাগজে দেখলাম, তোমাদের স্কুলের চাকরি খালির কথা। ভূগোলটা মার প্রিয় বিষয় ছিল, তাতো জানো। বি এ রীক্ষায় ভূগোলে নম্বরটাও মাঝামাঝি রকমের পেয়েছিলাম। বরাত ঠুকে দিলাম দরখাস্ত ছেড়ে।

তখন—

পার্থ বাধা দিয়ে বলল, ঠনঠনের কালীর দিব্যি, তুমি আছ বিন্দু বিসর্গ জানি না। আজ সকালে এখানে পৌঁছে সেক্রেটারির কাছে তোমার নাম শুনলাম। তুমি নাকি ইন্টারভ্যু নেবে। তখনও সন্দেহের সামান্য রেখা। এক নাম আর এক পদবী একাধিক মেয়ের হওয়া বিচিত্র নয়। এখানে এসে অবশ্য দেখলাম, আমার হারিয়ে যাওয়া মাণিকই বটে।

এ চাকরির ওপর তোমার লোভ কেন? মফঃস্বলে অন্য দিক দিয়ে হাজার অসুবিধা।

এই প্রথম অপর্ণা ইন্টারভ্যু নেবার মেজাজে প্রশ্ন করল।

পার্থর উত্তর যেন তৈরি ছিল।

আসল কথা তোমার সান্নিধ্য, অবশ্য অপর্ণা রায় যে তুমিই একথাটা জানবার পর। তা না হলে, মাইনেটা ভদ্র। আর মফঃস্বলে অসুবিধার যে কথাটা বললে, তার পাশাপাশি সুবিধাগুলোও কম নয়। শহরের আকর্ষণ নেই। সিনেমা, থিয়েটার, সামাজিকতা। সদা সর্বদা দাপে দুরন্ত হয়ে বেড়াবার অভিশাপ নেই। নিজে যা নও, অনবরত তাই প্রমাণ করার দুঃসাধ্য অপচেষ্টাও নয়। নিজেকে প্রসারিত করে বাঁচার অবকাশ আছে এখানে।

এবার অপর্ণা অনেকক্ষণ কথা বলল না। সকালে যে লোকটি এসেছিল, তাকে নির্বিবাদে নির্বিচারে প্রশ্ন করতে অপর্ণার কোন অসুবিধা হয় নি। মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ কি হওয়া উচিত থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা। কিন্তু সামনে বসা লোকটাকে এ ধরণের প্রশ্ন করা চলবে না। যার চোখে চোখ মিললেই এ বয়সেও রক্তের সমুদ্রে জোয়ার জাগছে, শিরায় শিরায় অদ্ভুতপূর্ব শিহরণ, তাকে শুষ্ক-শিক্ষানীতি নিয়ে প্রশ্ন করা যায় না। কিন্তু [illegible]নীতি নিয়েই কি যায়।

পার্থ, [illegible] করল। যথাসম্ভব আবেগহীন কণ্ঠ করার চেষ্টা করল অপর্ণা।

মন্ত্র একটা। শতেক বরষ পরে দেখা, আমি তো ভেবেছিলাম তোমার প্রশ্নের বাণে আমার শরশয্যাই রচিত হবে।

দোহাই তোমার, এক মিনিটের জন্য সিরিয়স হও।

অপর্ণা কাতর প্রার্থনা করল।

বল। পার্থ গম্ভীর হবার চেষ্টা করল।

এখানে চাকরি করতে হলে অনবরত আমার সঙ্গে দেখা হবে। কথা বলতে হবে। তোমার অসুবিধা হবে। নিজেকে লুকোতে হয়তো পারবে না। তুমি যা সেন্টিমেন্টাল। এই শিক্ষায়তনে এ ধরণের ব্যাপারের একটু আঁচ পেলেই মুস্কিল। স্কুল কমিটি ভারি কড়া। তোমার তো চাকরি থাকবেই না, আমার চাকরি নিয়েও টানাটানি হবে।

পার্থ পা দোলাল। হাসি-হাসি মুখে বলল, আর সে ভয় নেই। সিরিয়স হতে বলছ বলেই বলছি। এখন জীবিকাটাই প্রধান, জীবন নয়। আর তা ছাড়া, তুমি তো এখন পুরো মাত্রায় শিক্ষিকা। কাঠিন্যের আবরণে মোড়া। আগের সে দীপ্তি, সে কমনীয়তা কিছুই নেই। কাজেই আমার দিক থেকে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার।

মনে হ'ল অপর্ণার দেহের ভিত্তিমূলে ধরে কে যেন সবেগে নাড়া দিল। সারা মুখে পাংশু ছায়া। জ্যোতিহীন দুটি চোখ। নীরক্ত ওষ্ঠাধর।

কাবা করে পার্থ যে কথাগুলো বলল, তার সহজ অর্থ হ'ল, বয়স হয়েছে অপর্ণার। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের শেষ রক্তরাগও নিঃশেষে মুছে গেছে। অপর্ণাকে দেখে আকৃষ্ট হবার, পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাবার মতন কোন সম্পদ আর তার নেই। এই কথা শোনাবার জন্যই কি এতদিন পরে পার্থ এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে!

কি ব্যাপার জান, পার্থ তখনও নিজের কথা বলে চলেছে, দূর সম্পর্কের বোনের একটি মেয়ে ঘাড়ে চেপেছে। আমি ছাড়া তার তিনকুলে কেউ নেই। কাজেই তাকে মানুষ করে তোলার জন্য আমার ভদ্রগোছের একটা জীবিকা দরকার। এখন আর অন্য দিকে মনও নেই, অন্য কথা ভাববার বয়সও নেই।

এইবার, এতক্ষণ পরে পার্থ বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়েছে।

আঁচল দিয়ে কপালের জমে ওঠা ঘামের বিন্দু অপর্ণা মুছে নিল। শরীরটা ঝিম ঝিম করছে। ভেবেছিল পার্থকে বলবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আর কথাটা বলা চলে না। অপর্ণার ট্রাঙ্কের নীচে এত বছর ধরে পার্থের একটা ফটো লুকানো ছিল। অবসর পেলে, নিভৃত শয্যায় শুয়ে অপর্ণা অনেকক্ষণ ধরে ফটোটা দেখত। ওটা যেন শুধু ফটো নয়, নিজের ফেলে আসা জীবনের একটা অংশ।

বেশ, আমি যা বলবার স্কুল কমিটিকে বলে দেব।

খাতাগুলো সরিয়ে অপর্ণা উঠে দাঁড়াল।

পার্থ আশা করেছিল, এতদিন পরে দেখা, এক কাপ চা অন্তত অপর্ণা এগিয়ে দেবে, কিন্তু সে সব কিছুই নয়।

সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা পার্থর মনে পড়ে গেল। এখানে ইন্টারভ্যু দিতে সে এসেছে। কাজেই কোনরকম অন্তরঙ্গতা দেখানো অপর্ণার পক্ষেও সমীচীন হবে না। বাড়ীতে যদি অন্য বাসিন্দা থাকে, তারাই বা কি মনে করবে।

পার্থও উঠে দাঁড়াল। কোমল কণ্ঠে বলল, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি তো অপু?

অপর্ণা ঘাড় নাড়ল, নিশ্চয়। তুমি যখন একটা ব্যাপারে আমাকে নিশ্চিন্ত করেছ, তখন আমারও কর্তব্য তোমায় নিশ্চিন্ত করা।

কথাগুলোয় অপর্ণা একটু হাসিরও রং মাখাল।

তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পার্থ বলল।

অপর্ণা একটি পা এগোল না। ঠিক একভাবে, এক জায়গায় পাথরের মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তেমনই কঠিন, তেমনই অনভূতিহীন।

পরের দিন সকালেই অপর্ণা সেক্রেটারির বাড়ী গিয়ে হাজির।

আসুন মিস রয়, দুজন ক্যান্ডিডেটকেই তো দেখেছেন, কি মনে হ'ল? আমার তো মনে হয় পার্থ সেনই বেটার। অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারও ভাল, স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতাও আছে, তা ছাড়া বেশ সৌম্য দর্শন। কথাবার্তায় খুব স্মার্ট। মিনিট পাঁচেক ছিলেন আমার কাছে, তাতেই বেশ লাগল ভদ্রলোকটিকে।

অপর্ণা কোন উত্তর না দিয়ে ফাইলটা সেক্রেটারির সামনে মেলে ধরল। একটু কেশে গলাটা ঠিক করে নিয়ে বলল, আমার মনে হয় অনাদি মজুমদারই যোগ্য ব্যক্তি। একটু বয়স হয়েছে, তা হোক। নির্ভরযোগ্য লোক।

আবার অপর্ণা গলাটা পরিষ্কার করে নিল, পার্থ সেন অন্য বিষয়ে অবশ্য যোগ্যতর, কিন্তু একটা অসুবিধা আছে।

অসুবিধা? সেক্রেটারি বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

হাঁ, অপর্ণার কণ্ঠ অবিচল, আমি ভদ্রলোককে জানি। আমাদের সামান্য জুনিয়র ছিলেন। কলেজে একটা মেয়েকে নিয়ে বিশ্রী স্ক্যান্ডেল রটে। সেইজন্য একে বেশ কিছু দিন কলকাতা থেকে গা ঢাকা দিতে হয়েছিল। মেয়েটিও আত্মহত্যা করেছিল।

আত্মহত্যা? সেক্রেটারি চমকে উঠলেন।

আত্মহত্যা বলেই তো শুনেছি, কোমর থেকে ছোট চৌকো রুমাল বের করে অপর্ণা কপাল, গাল মুছে নিল, এমন লোককে মেয়েদের স্কুলে আনা কি ঠিক হবে।

না, না, নিশ্চয় না! সেক্রেটারির কণ্ঠে আর্তনাদের সুর, ওই অনাদি মজুমদারকেই রাখব। কমিটিতে আমি বলব সব কথা।

এতক্ষণে অপর্ণা মুচকি হাসল। বলল, এত সব কথা আমি আর দরখাস্তের ওপর লিখি নি। শতং বদ, মা লিখ। আপনাকে সব বললাম।

খুব ভাল করেছেন আপনি। কি দুনিয়া, বাইরে থেকে মানুষকে কিছু বোঝবার উপায় নেই। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার লোকটিকে জানা ছিল তাই!

অপর্ণা উঠে পড়ল। বাইরের দিকে যেতে যেতে বলল, এখন লোকটি হয়তো আমাকে চিনতেই পারবে না। আমায় চিনলে বিপদ

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

খাস তালুকে ভালুক রাজা

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

পুরনো দিনের কথায় অর্জুন সেন উদ্বেল হয়ে ওঠে। প্রথম যৌবনের উন্মাদনাভরা মুহূর্তগুলি যেন তার মধ্যে নেচে ওঠে। সে তার ঝুলির ভেতর থেকে এক একটা কাহিনী বের করে আমার সামনে তুলে ধরে।

—এবার শোনো আবু পাহাড়ে ভালুক শিকারের কথা।

রাজপুতানায় সেবার বেশ কয়েকদিন শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করেছিলাম। আমরা তিনজনই একই পথের পথিক। মোহন সিং আর শীতাংশু দুজনেই সমান উৎসাহী; তবে দেশ ভ্রমণটাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানাভাই আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। একদিন সেই প্রস্তাব করলে—

—চন্দ্রৌতিতে প্রচুর ভালুকের আনাগোনা, সেখানে গেলে দু-একটা পাওয়া যাবেই।

আবু পাহাড়ের তলদেশে চন্দ্রৌতি বা চন্দ্রাবতী একটি প্রাচীন স্থান। অতীতে ধন জন গৌরব যথেষ্টই ছিল, কিন্তু কালের কবলে এখন জঙ্গলে ঢাকা পড়েছে। সাদা মার্বেল পাথরে তৈরী ভাঙ্গা মন্দির বা প্রাসাদের জরাজীর্ণ রূপ মাঝে মাঝে সেই জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের কাছে প্রত্নতত্ত্বের চাইতে শিকারতত্ত্বের তাগিদটাই বড়—তাই, সে জঙ্গলে কত পুরাকীর্তি লুকিয়ে আছে, সেটা খুঁজে বের করার ধৈর্য বা সময় ছিল না।

মানাভাই প্রাচীন কাহিনী শুনিয়ে যায়।

—সুদূর অতীতে এই জায়গায় এক রাজার রাজধানী ছিল। তাঁর সঙ্গে আশ পাশের রাজপুত রাজাদের বড় একটা বনিবনা ছিল না। মুসলমানদের আমলে যখন সমস্ত রাজস্থানটাই মোগলদের এক্তিয়ারে চলে গিয়েছিল তখনও এই রাজ্যের রাজা তাঁর আরণ্য স্বাধীনতা অটুট রেখেছিলেন। কিন্তু এক রাজকুমারীর খামখেয়ালিতে একদিন এই রাজ্যেও বিপদ ঘনিয়ে আসে—আর মোগলদের উপর্যুপরি আক্রমণে এই রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এখন সেটা ভালুক রাজের খাস দখলে।

সেখানকার শিকারের কথাটা তোমাদের বলা হয়নি।—শোনো—

মানাভাই মাঝে মাঝেই খবর নেয়, ভালুক শিকারে যাওয়ার দেরী কত। আমরা তেমন গা করি না—

একদিন প্রত্যুষেই সে এসে হাজির—এবার আর একা নয়, সঙ্গে তার ছেলেকেও এনেছে। নাম মুন্নালাল—ছোট্ট মাথায় বিরাট এক পাগড়ী—হাতে প্রকাণ্ড লাঠি—গলায় কালো সুতোয় ঝোলানো চাঁদির চৌকো ধুকধুকি। বয়স ...এ কুড়ি—বাপের কাছে ব্যবসায়ে তালিম নিচ্ছে। লেখাপড়ায় অল্পবিদ্যাভয়ঙ্করী। গ্রামের পণ্ডিতের কাছে গালভরা শব্দ গুটিকয়েক কণ্ঠস্থ করে সুযোগ সুবিধা মত চালিয়ে দেয়।

মানাভাই তার পরিচয় দিয়েই আদেশ করে—

—এই মুন্না, সাহেবদের কাছে তোর হিম্মতের কথা শুনিয়ে দে।

সেও তৎক্ষণাৎ হাতের লাঠিটা বগলদাবা করেই সেলাম ঠোকে—তারপর সুর চড়িয়ে বলে—

সাহেব, আপনারা অনেক বাঘ মেরেছেন—কিন্তু ঋক্ষ মহারাজের কাছে যেতে হলে আমাদের সঙ্গে নেওয়া চাই।

শীতাংশু প্রশ্ন করে—

—ঋক্ষ মহারাজ? আরে বাপ্! এটা আবার কোথায় শুনলি?

—কেন আমাদের মাস্টার সাহেবের কাছে—হালে শিখেছি কিনা—ঋক্ষ মহারাজ বৃক্ষে উঠিতে পারে।

মানাভাই তাকে ধমক দেয়—

—এই মুন্না, চুপ কর দেখি—তোকে আর পণ্ডিতি ফলাতে হবে না।

তাড়া খেয়ে মুন্নালাল চুপ করে যায়—কিন্তু পরক্ষণেই তার হিম্মতের কথা শোনানো হয়নি বলে আবার সুরু করে—

—শুনুন, কী হয়েছিল। একবার এক ঋক্ষ—কী ভয়ঙ্কর দেখতে—যেন একটা ভীষণ রাক্ষস—এই এত মহুয়া ফল খেয়ে মাতাল হয়ে পড়ে আছে—আমি ছাড়া কেউ দেখেনি। পিতাজীকে কিচ্ছুটি বললাম না। চুপি চুপি কাকাজীর গাদা বন্দুকটা নিয়ে এসে ঋক্ষ মহারাজের মাথার ওপর নল বসিয়ে দড়াম্—ব্যস্ একাত—ওকাত—তারপরই কুপোকাৎ—

সাবাস দিয়ে বলি—

—কেয়াবাৎ—একটা ঘুমন্ত ভালুককে মাথায় নল ঠেকিয়ে মারা কী সোজা ব্যাপার! এমন হিম্মতের কথা ভুভারতে কেউ শোনেনি। তারপর তোমার ঋক্ষ মহারাজের কী হ'ল?

—হবে আর কী? ঋক্ষ মহারাজ জীবনে আর কখনো বৃক্ষে উঠিতে পারিবেন না—

পিতৃদেবের আদেশানুযায়ী তার হিম্মতের কথা শোনাতে গিয়ে মুন্নালাল সত্গুলি কথা বললে—মনে হ'ল তার নতুন-শেখা ঋক্ষ

[ঋক্ষ মহারাজ ! আরে বাপ !......

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

...াচ্ছে যে। এখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য তার ...মার সব চোখ বন্ধ।

অপর্ণা আর অপেক্ষা করল না। এখনও ...ত্রীদের অনেকগুলো খাতা দেখা বাকি আছে।

যেতে যেতেই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, সেক্রেটারি ...াল পেন্সিল দিয়ে পার্থর দরখাস্তের ওপর ...রে জোর ঢ্যাঁড়া দিচ্ছেন।

খাটি আট দশবার প্রয়োগ করতে পারায় তার মুখে মুখে আনন্দের ঢেউ।

মানাভাইকে জানিয়ে দিই—

—আজই শিকারে যেতে চাই।

সেও সর্বদাই প্রস্তুত।

আমরা প্রাতরাশ শেষ করে রওনা দিলাম।

সপুত্র মানাভাই পথ দেখিয়ে চলে।

প্রায় মাইলটাক এগিয়ে যাবার পর দারজী কিছুদূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ের দিকে জুলি নির্দেশ করে।

ওটাই ভালুকের আস্তানা।

আমরা সেই পাহাড়ে উঠতে থাকি। ওপরে ঠে দেখি, যেন কোনও আকস্মিক ভূমিকম্পে াহাড়ের চূড়াটা তচনচ্ হয়ে গিয়েছে। মস্ত ড় বড় ফাটল, এখানে সেখানে পাথরের চাঁই ূপীকৃত হয়ে আছে—বুঝি কোন দৈত্য এক- াদের তাণ্ডব চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে!

মানাভাইকে জিজ্ঞেস করি—

—এ জায়গায় কি জানোয়ার থাকতে রে? আমার ত' মনে হয়—তারা সব ভেগে ড়েছে!

সর্দারজী বলে ওঠে—

—সে কী সাহেব? আমি যে এক হপ্তা াগেও এ জায়গায় ভালুকের আনাগোনা দেখে য়েছি—আর সেই জন্যেই তো আগেই লোক- া পাঠিয়ে সব বন্দোবস্ত কায়েম। এই দেখুন খানে কতগুলো পাথর একসঙ্গে পাশাপাশি খে আড়াল দেওয়া হয়েছে।

শীতাংশু আমার কাঁধে একটা চিমটি কাটে. রপর দেখিয়ে দেয়—

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার থেকে টদশ হাত পেছনে ঠিক একটা নালার মত— হাড়ের বুক চিরে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে য়েছে। মনে হয় সমস্ত পাহাড়টা জুড়েই তার াকাবাঁকা গতি।

মানাভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই সে —

—হাঁ সাহেব, ওই নালাটাই ভালুকের স্তানায় যাবার পথ। ওর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার উপায় নেই—কারণ যদি আশপাশের কোনও গহ্বর থেকে ভল্লুকপ্রবর বেরিয়ে আসে, তবে আর আত্মরক্ষার কোনও উপায় থাকবে না। তারচাইতে চলুন, আমরা ওর ওপর দিয়ে নালা বরাবর এগিয়ে যাই।

ছোট খাটো গহ্বর অনেক পাওয়া গেল, কিন্তু সেগুলি এত ছোট যে তার মধ্যে ভল্লুকের প্রবেশ সম্ভব নয়। খানিকটা যাওয়ার পর একটা বেশ বড় গোছের গুহা দেখতে পেলাম।

মানাভাই পকেট থেকে একটা বাঁশী বের করে ফুঁ দিতেই সঙ্গে সঙ্গে ওপর-নিচে থেকে সাড়া পাওয়া যায়। বোঝা গেল, সর্দারজীর বন্দোবস্ত একেবারে পাকা। জানোয়ারের ওপর কড়া নজর রাখা হয়েছে। যদিই কোথাও তার সাড়া পাওয়া যায়, আমাদের কাছে খবর পৌঁছতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনেকগুলি বড় বড় পাথরের চাঁই সাজিয়ে পথ বন্ধ করা হয়েছে— গহ্বরটা পাহাড়ের ভেতরে বহুদূর চলে গিয়েছে মনে হয়। এরই মধ্যে ভল্লুকের আস্তানা—এ সম্বন্ধে আমাদের কারও কোন সন্দেহ রইল না। গুহার মুখে বাইরেও কিছুটা নিদর্শন পেলাম। টাট্‌কা পায়ের ছাপ দেখে মুন্নালাল লাফিয়ে ওঠে—

ঋক্ষ মহারাজ জরুর গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার বেরিয়ে আসার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সকাল থেকে যাদের পাহারায় রাখা হয়ে- ছিল, তারাও বললে যে, একটি প্রাণীকেও বাইরে আসতে বা ভেতরে ঢুকতে দেখেনি।

মানাভাইকে বলি—

—তাইতো, এখন কী করা যায়। এই গুহার মধ্যে তো আর ঢোকা যায় না— জানো- য়ারটাকে বের করে আনার কী ব্যবস্থা হবে?

সর্দার যেন তৈরী হয়েই ছিল—হাতের সুদীর্ঘ লাঠিটা শূন্যে ঘুরিয়ে বললে—

—এখুনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মুন্না, যাতো একটা লম্বা বাঁশ কেটে নিয়ে আয়।

ছেলেটিও যে কারিৎকর্মা তার পরিচয় দিতে কসুর করে না। বাঁশ আনতেই, তার মাথায় শুক্‌নো লতাপাতা বেঁধে মশাল তৈরী করা হ'ল, তারপর আগুন ধরিয়ে সেই গুহার মধ্যে অনেকটা ঢুকিয়ে দিলে—আর বাইরে থেকে তুমুল হৈ হৈ রব।

কা কস্য পরিবেদনা!

কোন সাড়া শব্দ নেই।

আমি প্রস্তাব করি—

—এতে হবে না। গুহার মুখে শুকনো পাতা জড়ো করে আগুন দেওয়া হোক—ধুঁয়োর চোটে বাছাধনকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

এত করেও কিছু ফল হ'ল না।

এবার মানাভাই তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে। কয়েকটা বড় পট্‌কা গুহার মুখে ছুঁড়ে মারতেই দুম্‌দাম্ আওয়াজ—কিন্তু গুহার ভেতর থেকে কোন প্রতিবাদ নেই।

হঠাৎ একটা চীৎকার শোনা যায়—

—ঐ-ঐ-ঐ-ঐ যে দেখা যায়।

মানাভাই গলা ফাটিয়ে জিজ্ঞেস করে—

—কোথায়? কোন্ দিকে?

আর কোনও সাড়া শব্দ নেই।

মানাভাইয়ের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত-মুখে বিরক্তির ছাপ!

—এরা কোনো কাজের নয়—যত সব আনাড়ী অপোগণ্ডের দল—

শীতাংশু একটা যুক্তি দেখায়।

—হয় তো জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কিছু নড়ে উঠেছিল—তাকেই গাইডরা ভালুক বলে ধরে নিয়েছে।

মোহন সিং প্রতিবাদ করে—

—ধরে নেবে কেন? ওরা যে দেখেছে বললে—

তাদের কথাকাটাকাটি এক কথায় থামিয়ে দিলাম—

—দেখাও বটে, খানিকটা ধরে নেওয়াও বটে!

মানাভাই তির্যক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়।

—তার মানে?

—মানে কিছুই নেই—। জঙ্গলের মধ্যে ভালুক হঠাৎ চোখে পড়লেও—তাদের গায়ের রং জঙ্গলের সঙ্গে এমন মিশে থাকে যে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ না দেখতে পেলে ঠিক ঠাওর করা যায় না—

মানাভাই সায় দেয়।

—সে কথা ঠিক, কিন্তু

আর কিন্তুর প্রয়োজন হ'ল না—হঠাৎ কী একটা চোখে পড়তেই সর্দারজী সচকিত হয়ে ওঠে—আমাদের তিনজনকে তিন জায়গায় প্রস্তুত হয়ে থাকার নির্দেশ দেয়—।

যেখানটায় জঙ্গল একটু পাতলা হয়ে এসেছে, পাশ দিয়ে সরু একটা পথের মত দেখা যায়, তারই এক প্রান্তে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। ঠিক তার বিপরীত দিকে—যেখানে পাহাড়টা একটু ফাঁপা দেখায়, তার নীচেই মোহন সিং; শীতাংশুর স্থান হ'ল একটা নালার ওপর ঝুঁকে পড়া ঝোপের আড়ালে। ⊥

মানাভাই তার ছেলেকেও একটা গাছের ওপর তুলে দেয়।

সে আপত্তি জানিয়েছিল।

—ঋক্ষ মহারাজ বৃক্ষে উঠিতে পারে।

মানাভাই তাকে আশ্বাস দিয়ে ঠাণ্ডা করে। তারপর অভিজ্ঞ সেনাপতির মত সেই হাল্কা জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়ে—আর সঙ্গে সঙ্গে তার বিটারের দল জঙ্গল বিট্ সুরু করে দেয়।

হঠাৎ আবার একটা চীৎকার শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ। আর কোনও সন্দেহ নেই যে ভালুক বেরিয়েছে।

শীতাংশু যেখানে ছিল, তার পাশ দিয়েই নালার দিকে কী যেন একটা চলে গেল না?

সে ছুটে এল আমার কাছে—খুব যে ভয় পেয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

মানাভাই হঠাৎ কয়েকটা হাউই জেলে নালার দিকে ছুঁড়ে মারে। শুকনো পাতায় আগুন লেগে ধোঁয়ার চোটে সব অস্থির, একটু বাতাস উঠতেই আগুন দাউ দাউ করে জলে ওঠে।

আর কতক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

মোহন সিং পাহাড় থেকে নেমে আসতেই সেই ভালুকটা তার চোখে পড়ে গেল। কিন্তু তখুনি তাকে গুলী করা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারে না! জানোয়ারটা আমাদের কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে গদাইলস্করী চালে এগিয়ে চলছিল, তার পাশেই একটা বাচ্চা—বারে বারেই মায়ের পিঠে উঠতে চায়—কিন্তু মাটিতে পড়ে আবার ধাড়ী ভালুকটার পিছনে ছোটে। আমরা কিন্তু আড়ালে থাকায় কিছুই বুঝতে পারিনি।

আমি আর শীতাংশু এটা ওটা আলাপ করি—এমন সময় হঠাৎ একটা মাঝারি গাছের ওপর থেকে মানাভাই চীৎকার করে বল্লে—

—হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার—

চমকে উঠেই দেখি আমরা দুজন যে পাতলা জঙ্গলের আড়ালে ছিলাম তার পাশের পথ দিয়ে আমাদের প্রায় কুড়ি গজ দূরে একটা ধাড়ী আর একটা বাচ্চা ভালুক ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে চলেছে—ভাগ্যে আমাদের দেখতে পায়নি—নইলে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

আর দেরী না করে ট্রিগার টিপলাম—বাচ্চাটা পেছনের পায়ে আঘাত খেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ধাড়ী ভালুকটাকে ইতিপূর্বে পরিষ্কার দেখা যায়নি। এবার দেখতে পেলাম। পাগলের মত ছুটে এসেই দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে বাচ্চাটাকে দুহাতে টেনে তুললো। তারপর সেটাকে তার পেটের সঙ্গে একহাতে জাপটে ধরে তিন পায়ে ভর করে চল্তে থাকে।

আমার দ্বিতীয় গুলীটি লাগলো ভালুকের কোমরে। সঙ্গে সঙ্গেই সেই জানোয়ার বিকট আওয়াজ করে ধেয়ে আসে—তার দাঁতগুলো হাঁ-করা মুখের ভেতর ঝিকমিক করে ওঠে—গায়ের লোমগুলি খাড়া হয়ে উঠেছে—একটা থাবা উঁচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সে যেভাবে আসতে থাকে, মনে হ'ল হাতের সামনে পেলে এক এক আঁচড়েই আমাদের এক এক জনের ভবলীলা সাঙ্গ।

শীতাংশুর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিতেই সে পাশেই একটা টিলার ওপর উঠে গেল। আমিও আর কিছুমাত্র দেরী না করে গুলী করি। সেটা লাগলো তার ঘাড়ে। বাচ্চাটাকে মাটিতে ফেলে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গী করে ভালুকটা এগিয়ে আসে।

প্রায় দশ গজ সামনে—এবার সেই উন্মত্ত ভালুক সোজাসুজি আমাকে দেখতে পায়। দু-দুটো গুলী খেয়েও ভালুকটা কাবু হয় না—বরং জবরদস্ত গুণ্ডার মত দুহাতের থাবা মেলে আমার ওপর হামলা চালায়।

আর মাত্র কয়েক হাত ব্যবধান। দেহের সমস্ত শক্তি ও গতি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে ভালুকটার মুখে বোধহয় একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠেছিল—কিন্তু আমার শেষ সম্বল সেই গুলী প্রচণ্ড বেগে আঘাত করল তার বুকে—সাদা লোমের ওপরে ফিনকী দিয়ে নেমে আসে কৃষ্ণকায়া ভল্লুকীর গাঢ় রক্তের ধারা। একটা মরণ-আর্তনাদ করে সেই জানোয়ারটা ছিটকে পড়ে গেল—পেছনের পা দুটো শুধু নিষ্ফল আক্রোশে মাটির ওপর ঘসতে থাকে—সামনের দুটো থাবায় উদ্যত হিংসা।

ভালুকটাকে খতম করার পর একটুখানি সময় পেয়ে, দুটো বন্দুকেই আবার গুলী ভরে নিয়েছি। শীতাংশুকে বলি—

—বাচ্চা ভালুকটা গেল কোথায়?

যেখানে বাচ্চাটা রেখে ধাড়ী ভালুকটা আমাদের দিকে ছুটে এসেছিল, সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই শীতাংশু যেন আঁৎকে ওঠে—তার কণ্ঠে একটা বিহ্বল আর্তনাদ। সামনে ঝোপের আড়াল থাকায় আমি কিছু দেখতে পাইনি। শীতাংশুর চীৎকার শুনে বন্দুক দুহাতে ধরে তার কাছে ছুটে যেতেই— উঁচু স্থান থেকে অতি ভয়ংকর একটি [illegible] চোখে পড়ল। আর একটি বিরাটকায় ভ[illegible] বাচ্চাটাকে দুহাতে শূন্যে তুলে ধরে, দুপা[illegible] ওপর ভর করে উন্মত্তের মত ছুটে আস[illegible] নিহত ভল্লুকীটির কাছে এসেই সে সা[illegible] থাবা দিয়ে সহধর্মিণীর মুখে একটা ঝাপটা [illegible] দেখলে—তারপর সেই ধরাশায়ী জানোয়ার[illegible] আপাদমস্তক শুঁকে যখন বুঝতে পারে যে [illegible] দেহে প্রাণ নেই—তখন সেই বিরাটকায় ভল্লু[illegible] চেহারাটাই যেন বদলে গেল। শোকে [illegible] ক্ষুব্ধ আক্রোশে জানোয়ারটা উন্মত্ত হয়ে ও[illegible]

আর সময় নষ্ট করা উচিত ন[illegible] শীতাংশুকে তার বন্দুকটা দিয়ে বলি—

—দুজনেই একসঙ্গে গুলী করব। [illegible] বিরাট জানোয়ার—আক্রমণটাও তেমনি [illegible] হওয়া চাই।

দুজনেই ট্রিগার টিপলাম—[illegible] ভালুকটা বুকে হাত চেপে ধপ্ করে [illegible] পড়ে। বাচ্চাটাও দু'তিন হাত দূরে ছিট[illegible] যায়। শীতাংশুর দ্বিতীয় গুলীতে [illegible] দু'একবার ছটফট করেই নেতিয়ে পড়ল।

এদিকে মানাভাই যে ছুটে আমার কাছাকা[illegible] এসে পড়েছে—সে দিকে খেয়াল নেই—[illegible] সেই দৈত্যের মত জানোয়ারটাকে শেষ [illegible] করার চিন্তায় ডুবে আছি। বুকের সাদা দাগ[illegible] দেখতে পাই না।

বাচ্চাটা নেতিয়ে পড়তেই ভল্লুকটা[illegible] দুপায়ে ভর করে আসতে থাকে। বাচ্চার কা[illegible] এসেই তাকে একবার পরখ করে নেয়, তারপ[illegible] সর্বহারার মত মরিয়া হয়ে ছুটে আসে।

মানাভাই আমাকে তাড়া দিয়ে বলে—[illegible] দেরী কেন? গুলী করুন—

ততক্ষণে আমিও মনঃস্থির করে নিয়ে[illegible] ভালুকের মাথা লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপলাম।

একটা বিকট বুকফাটা আর্তনাদ [illegible] জানোয়ারটা ডিগবাজী খেয়ে হুড়মুড় করে প[illegible] গেল। চারিদিকের পাহাড়ে পাহাড়ে সেই স[illegible] শঙ্খনাদের প্রতিধ্বনি।

ওদিকেও প্রচণ্ড সূর্যের দাহিকা[illegible] নিস্তেজ হয়ে পশ্চিমের কোলে ঢলে পড়েছে।

জলের স্রোত

ফোটো : কে চক্রবর্তী

তৈল তত্ত্ব
বিমলচন্দ্র ঘোষ

নেই সুতরাং তেল না পেলেও নেই ক্ষতি,
খেয়ে সিদ্ধিলাভ হোক বা না-হোক খেতে হবে
র খাতিরে। হায় তৈলহীনা রুক্ষ বসুমতী!
টগবগ ফোটে তৈলকুণ্ড অদৃশ্য রৌরবে।

কী নিঃশব্দ রান্নাঘর! খুন্তি আর নাড়েনাকো সতী
গৃহিণীরা। ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ নেই, কড়ায় নীরবে
ফুটন্ত জলের তলে শাকসব্জী অগতির গতি!
ব্যঞ্জনের ব্যঞ্জনায় রসোত্তীর্ণ খাদ্যের গৌরবে।

সংসার তৈলহীন। শ্রেণীশীর্ষ ক্রোধে কম্পমান
কর্মীবাঙ্গিদের নিস্তেল পায়ের চামড়া ফাটে।
নিত্য তেল দিতো তাদের আতঙ্কে মুখ ম্লান
পায় মাথা খোঁড়ে প্রভুদের কঠিন চৌকাঠে।

কৃপাপ্রার্থী উমেদার চাটুদার বেকারের দল,
'তেল, তেল, কোথা তেল!' চিৎকারে কাঁপায় ধরাতল।

পঞ্চশীল
রামেন্দ্র দেশমুখ্য

প্রহার, প্রহরীমুক্ত, মাঝরাতে যুগ্মচিন্তা হাসে,
শুধু রক্তজবা কেন, আমি কবি রজনীগন্ধার,
এই জনাকীর্ণ দেশে যন্ত্রণার মথিত সুবাসে
মমতায় বিজড়িত দুই হাত উষা ও সন্ধ্যার।

সব নদী পিতামহী, সব তারা প্রপিতার আলো,
ওরা হাসে মাঝরাতে করুণার হাসি দীর্ঘজীবী,
ফুৎকারে আকুল সূর্য যুগচিন্তা কত না ফুরালো,
অবলুপ্ত জনপদে ভস্মস্তরে শুয়ে কত ঢিবি।

ধ্বংসস্তূপে মিশে যাব কোন এক মৃন্ময় প্রমাণে,
প্রহার, প্রহরীমুক্ত, তাই চিন্তা এত হাসে আজ,
কঙ্কালের খোসাগুলি চূর্ণাকার কোন উপাদানে
হাজার বছর পরে স্তরে স্তরে খোলে তার সাজ।

অতএব ডাক দিই, বিপরীতে মিলাই হৃদয়,
শালবন, ভারীশিল্প, সন্নিহিত বাসনার জয়।

অবিকল
আনন্দ বাগচী

কিছুই ভাঙেনি এই বুকের ভিতর, সেই ঘর,
অবিকল সেই নারী, সেই জ্যোৎস্না জোয়ার ভাটায়,
আঁকাবাঁকা চেনা গলি, জন্মান্তর, মুখস্থ শহর
রঙ্গমঞ্চ জুড়ে সেই একই গল্প, কাঁটায় কাঁটায়
অদৃশ্য ঘড়িতে দিচ্ছে পুরনো সময়, ভালোবাসা
বর্ষা বসন্তের ফুলে এখনো নিমগ্ন, স্বপ্ন দেখা
মালা গাঁথা ছিঁড়ে ফেলা, কবিতায় জীবনপিপাসা
নিঃসঙ্গতা রাত্রিদিন, নিঃসঙ্গতা ফুরিয়ে আবার
দুঃখের সুখের সেই ভেলিপ্যাসেঞ্জারী চলছে; একা
আষাঢ়ে গল্পের মত দর্পণে দাঁড়াবে ক্লান্ত দিন।

হৃদয়ে নিকটবর্তী পৃথিবীর সব পথ এমনি সরল,
প্রদীপের নীচে ছায়া, চোখের একটু নীচে জল॥

যাত্রী
শ্রীকৃষ্ণধন দে

অনন্ত আকাশ সে কি রাত্রির মায়ায় বন্দী থাকে?
তারার সঙ্কেত নিয়ে ধরা দিতে চায় আপনাকে?
যেখানে কল্পনা ব্যর্থ, নিঃসীম দৃষ্টির শক্তি ম্লান
আলোক-উত্তরী দিয়ে সেথাও কি ছায়াপথ আঁকে?
সেই আকাশের বুকে কবে এল ক্ষুদ্র আলোকণা
অনন্ত যাত্রার পথে বুকে বহি মৌন-আরাধনা,
কাছে আসে কত সূর্য, ছায়াপথ, কত নীহারিকা—
তবুও চরম তীর্থ-পথ তার আজো মিলিল না।
ক্লান্তিহীন যাত্রা তার, শ্রান্তিহীন আগ্রহ দুর্বার,
অনন্তের পথে চলে, জানে না'ক কোথা শেষ তার,
একটি স্ফুলিঙ্গ শুধু—তার বিশ্ব-পরিক্রমা সাধ,—
কত জ্যোতিঃ সমারোহে, কত স্তরে গাঢ় তমিস্রার!
কোন্ নভঃসিন্ধুপারে—কোথা কোন্ মহাকেন্দ্র তলে
আজো সে ধরিতে ছোটে লক্ষ্য তার মহাকৌতূহলে।

অচেনা
উমা দেবী

অনেক চেনার পর মনে হলো অস্পষ্ট এখনো—
ছড়াও—ছড়াও মন্ত্রজাল—
স্থূল চর্ম ভেদ করে—পার হয়ে অস্থি-মজ্জা-রক্তের কঙ্কাল
তার সে দিগন্তরেখা।
সে রেখার অস্পষ্ট কুহেলি—
শত শত জন্ম আর মৃত্যুর স্মৃতিতে
সে কি আজো চিন্তাতীর্ণ?

মাদুময় দেহকোষ—
এক দেহ হতে অন্য দেহে
পার হয়ে—পার হয়ে—পার হয়ে—
এখন পারে না আর পার হয়ে যেতে।

মনে হয় এই শেষ।
—তারপর দেখি
নূতন দিগন্ত দেখা দেয়—
নূতন মুখের রেখা উল্লাসে উদ্দাম
মনে মনে জপ করি পুরাতন নাম।

অভিমন্যু
বটকৃষ্ণ দে

'যাস নে ওখানে,' বলেছিলো বহু হিতৈষী বন্ধুরা,
'সুদূর সেখানে পথ হারাবার সমূহ সম্ভাবনা।'
শুনিনি। দেখেছি দিগন্ত-জোড়া ঘন-পুষ্পিত চূড়া
জানিয়েছে দুর্নিবার নিবিড় স্বাগত সম্ভাষণ,
—আমিও মানিনি মানা।

অন্ধকারের বন্ধ-কারায় আলো নেই, দিন নেই
গোলকধাঁধার ঘূর্ণ্য চক্রে বেরুবার পথ নেই—
যতোই এগোই, দেখি পিছে হটি নিজের অজ্ঞাতেই,
নীল অরণ্য কাঁসের নেশায় মাতায় আমার মন
—নিশানা হারায় খেই।

আমরা সবাই সুখ-দুঃখের সংসার পাতি। খুঁজে
বেড়াই কোথায় মোল-মনের মিতা?
ভোরের আকাশে উজ্জ্বল আলো, সন্ধ্যায় আবৃতা
কালো কুহেলীতে। এই ব্যূহে নিষ্ক্রমণের পথ নেই,
—মন অভিমন্যু যে।।

সূর্যমুখীর প্রেম

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সূর্যমুখি!
স্বর্ণ-উজলা আলোর যাত্রী তুমি,
সূর্যের বধূ—মাটির স্বপ্নভরা।
গহন রাতের নিবিড় অন্ধকারে
সঞ্চিত মধু হৃদয়ে পীযূষধারা,
চেয়ে থাকো পথ
নতুন দিনের আশে।
আঁধার সাগর পার হয়ে চলে খেয়া,
আলোর দুয়ারে নামিবে স্বর্ণরথ;
উতরোল আশা, অসহ অন্ধকারে
পলে পলে চলো তুহিনসিক্ত পথ।

চোখের কাজল ধুয়ে যায় আঁখিজলে;
মুকুলিত মন মেলি কাঞ্চনদল,
মুখ তুলে চায় প্রভাত সূর্যপানে।
তপস্যাশেষে কিশোরী গৌরী যেন
ধবল গিরির অঙ্গে মিলায় আঁখি;
অশ্রুসিক্ত হিমগিরিচূড়া পলকে শিহরি ওঠে,
স্মরশরাসনে ওঠে টঙ্কার ধ্বনি।
তৃতীয় নয়নে ঝলকে বহ্নিশিখা!
মৃত্যুর মাঝে প্রেম হয় গরীয়ান।
আঁধার রাত্রি পারে,
বিরহ তিমির ঠেলিয়া দুহাতে
আসে যুগে যুগে মিলন পিয়াসী মন,
উদয় শিখরে অরুণোদয়ের স্নিগ্ধ পরশ লাগি,
তারা যে তোমার সহযাত্রিণী
অসহ অন্ধকারে।
প্রেম নয় শুধু, প্রণয় দীক্ষা
দিয়েছ তাদের তুমি।
অনিমিখ আঁখি, তপস্যারতা উমা,
সোনার পাপড়ি ভরিয়া লয়েছে প্রেমে,
অনল শিখায় বক্ষ দিয়াছ পাতি।
প্রেমের প্রতীক মূর্ত প্রতিমা তুমি,
ওগো চিরবধূ,
চিত্তের মধু বিকশিত শতদলে,
উজাড় করেছ আপনারে অনুপমা!
কনকাঙ্গিনী, কল্পের মনোরমা।

স্বর্গের সীমানা

গোপাল ভৌমিক

সীমারেখা টানো তুমি
আমি ভাঙি তাকে;
বলি, এ কৃত্রিম সীমা
ছোট করে তোমাকে আমাকে।
আকাশের শেষ সীমা
আদিকাল থেকে
যে প্রজ্ঞা নেয়নি মেনে
সে কি এই বিংশ শতাব্দীতে
মেনে নেবে ভূগোলের
ছোট ছোট আল? তুমি
চোখে ঠুলি-পরা তুমি
দেখো না অদূরে হাসে বৃদ্ধ মহাকাল।

শ্বেত পীত কৃষ্ণবর্ণ
মানুষের মেধা ও মননে
ভালবাসা প্রেম ঘৃণা
রিরংসা রমণে
এতটুকু ভিন্নতার
সন্ধান মেলে না :
মিলনের সূত্র খুঁজে
তবু তুমি গাইলে তেলেনা
নিজেকে ঠকাতে পারো,
কাল তার গতিপথ জানে।
জীবন যেখানে সত্য
মৃত্যুতে কে খোঁজে তার মানে?

গ্রহ-উপগ্রহ জয়
আপাতত বন্ধ থাকে যদি,
পরিবর্তে দৃষ্টি ফেরে
মানুষের পৃথিবীর দিকে
এবং ক্ষুধা ও ভয় জয় করে
মিলনের মহামন্ত্রবলে
যদি ভেঙে দিতে পারো
মানবিক সীমা
তাহলে তোমার প্রেমে
ম্লান হয়ে যেতে পারে স্বর্গের মহিমা।

পরিত্যক্ত বৃক্ষগুলি

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পরিত্যক্ত বৃক্ষগুলি ভরে ওঠে আবার সৌরভে।
সেই পুরাতন ঘ্রাণ আকণ্ঠ নরম সজীবতা
স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উচ্ছল। ব্যর্থ ব্যথা চিহ্নগুলো
বিদূরিত রোদ্রের শোষণে। দীর্ঘ শাখাপ্রশাখায়
রঙবেরঙের লিপি, পুষ্পচিহ্ন অঙ্কুরিত প্রায়
সমস্ত শরীরে। বর্ষার কদর্য পোকার উল্লাস
এখন কোথাও নেই; কীটদষ্ট পাতালতা সব
ঝরে গেছে নিঃশেষে চতুর্দিকে সূর্যের ছোঁয়ায়
সবুজ জীবন্ত দৃশ্যে লাল নীল ফুলের বাহার।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বৃক্ষের বাকলে রেখে হাত
মন স্থির, বৃত হতে চায়। আর সকাল সন্ধ্যায়
একবার লুপ্ত হতে চায় স্থির নির্বাক সভায়
বিষণ্ণ আর্তির দাহ অন্তরালে একান্তে নির্ভয়ে।
কি রকম ফুল কিংবা লতাপাতা কি ফুলের নাম
না জেনেও রেখে যায় স্মিতমুখে একটি প্রণাম
উজ্জ্বল হৃদয় এই স্থিতিময় বৃক্ষের সভায়।
প্রণয়বঞ্চিত যদি কেউ থাকো এসো নির্বাচনে
ধন্য হবো ফুল পাতাদের এই মায়াবী সংসারে।
পরিত্যক্ত বৃক্ষগুলি প্রেমে সিক্ত আবার সৌরভে।।

স্কেচ — কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

মহারাষ্ট্রের গৌরবময় যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ও সর্বপ্রধান রাজনীতিক পেশোয়া প্রথম বাজীরাও কল্পনাপ্রবণ ছিলেন কিনা সেটা বিচার-সাপেক্ষ কিন্তু ভাবপ্রবণ বা আবেগ-প্রবণ ছিলেন এমন অপবাদ বোধ করি অতি বড় শত্রুও দিতে পারত না। তাঁর যে সবচেয়ে কাছের মানুষ, সে তো নয়ই। কিন্তু আজ, এই প্রথম, তাঁর প্রিয়তমা মস্তিবাঈয়ের কিছু সন্দেহ দেখা দিল মনে, মনে হ'ল কথাটা অত নিঃসংশয়ে আর বলা যায় না।

সে যখন ব্যাকুল হয়ে এসে পেশোয়ার এই স্কন্ধাবার কক্ষে প্রবেশ করেছিল, তখন ভেবে-ছিল আর কিছু না হোক—বিমর্ষ না হোক, পেশোয়াকে কিছুটা চিন্তিত দেখবে। কারণ, আজকের এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এমন অঘটন লোকের সুদূর কল্পনারও অতীত। যিনি যত বড় ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাই হোন—এমন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকা কঠিন। উত্তেজিত বা বিচলিত না করুক—দোলা দেবে যে-কোন লোককেই। পেশোয়াও নিশ্চয় প্রবল এটা নাড়া খেয়েছেন মনে মনে। শুধু শৌর্য-বীর্যের জোরে এ রকম পরি-স্থিতির সম্মুখীন হওয়া যায় না—সাধারণ মানুষের সামান্য বুদ্ধির জোরেও না। অসাধারণ মানুষেরও অসামান্য প্রতিভার প্রয়োজন হয় এমন বিপদকে লঙ্ঘন করতে। কারণ যে বিপদ শুধু-মাত্র ভয়ের কারণ নয়—লজ্জারও কারণ, যে বিপদ বাইরের থেকে মনে বেশী—সে বিপদ বড় কঠিন। পেশোয়া যা আর যত বড়ই হোন না কেন, তিনিও মানুষ, তাই আর কিছু না হোক, তিনি স্তব্ধ চিন্তাকুল হয়ে বসে থাকবেন অন্তত—মস্তিবাঈ মনে করেছিল—ঠিক এমন একটা কাব্য-ময় অবস্থায় দেখবে ভাবে নি।

সে ছুটে এসেই ঘরে ঢুকেছিল, পেশোয়াকে ঐ অবস্থায় দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল। বাজীরাও তখন নিবিষ্ট মনে একটি খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর সঙ্গে খেলা করছেন। ছোট্ট পাখীটি কিন্তু বড় সুন্দর দেখতে। ঐটুকু দেহেই মহত্তম শিল্পস্রষ্টা জগদীশ্বর তাঁর বিচিত্র বর্ণের খেলা দেখিয়েছেন, বোধ করি এক যুগ ধরে এঁকেছেন ঐ এক রত্তি পাখীকে। মাথায় গলায় ঝুঁটিতে পালকে বুকে সর্বত্র—বহুবর্ণের সমাবেশ। এ পাখীটি পেশোয়ার প্রিয় তা মস্তানী জানত, তার সঙ্গে খেলা করেন তিনি মধ্যে মধ্যে—তাও কিছু অজানা নয়, কিন্তু এই কি সে খেলার সময়? অথচ পেশোয়া তো তা-ই করছেন। এক হাতে তিনি খাঁচার সামনে ধরেছেন একটি অর্ধ-প্রস্ফু-টিত লাল গোলাপ আর এক হাতে একটি সুপক্ক পেয়ারা। পাখীটির লক্ষ্য পেয়ারার দিকে। পেয়ারাটা একটু একটু ক'রে যেমন কাছে নিয়ে যাচ্ছেন পেশোয়া, পাখীটিও উৎসুক হয়ে ঠোকর মারছে আর সেই অত্যল্প সময়েই তিনি পেয়ারাটা সরিয়ে নিয়ে সামনে ধরছেন গোলাপটা, তার ফলে ক্ষোভে হতাশায় অস্থির হয়ে পাখীটি খাঁচার লোহাগুলোয় ঠোকর মারছে আর রাগে কী এক ধরনের অব্যক্ত আওয়াজ করছে।

এদিকে ফেরেন নি পেশোয়া কিন্তু তাঁর প্রিয়-তমার আগমন টের পেয়েছেন। তিনি বলে উঠলেন, 'দেখেছ মস্তী, দেখতে অত সুন্দর হ'লে কি হবে—পাখীটার রুচি-বোধ কিছু-মাত্র নেই। অমন সুন্দর গোলাপটাতে ভ্রূক্ষেপ নেই—ওর যত কিছু ঝোঁক ঐ পাকা পেয়ারাটাতে

—তবে আর তির্যগ্-যোনি বলেছে কেন! ওদের নজরটাই বাঁকা আর ছোট!'

তারপর ফুল আর পেয়ারা দুটোই তাঁবুর বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মস্তানীর দিকে ফিরে বসলেন, 'কিন্তু আমার আছে মস্তি, রুচি আর সৌন্দর্যবোধ দুই-ই আছে, আমি বসে বসে তোমার কথাই চিন্তা করছিলাম!......ভাবছিলুম কী যেন, সেই যে তুমি সেদিন পুরুষ-বেশে এসে ঘরে ঢুকলে আমার—অত সুন্দর আর কোনদিন লাগে নি। যেন কিশোর কন্দর্প। মনে হচ্ছিল যেন, সাক্ষাৎ গৌরী কিছুতেই শিবের ধ্যান ভাঙ্গাতে না পেরে অবশেষে এই কিশোর বালকের বেশে অবতীর্ণ হয়েছেন! যেন কন্দর্প আর উমার মহামিলন হয়েছিল সেদিন তোমার মধ্যে!'

'ছি ছি, কী বলছেন পেশোয়া। এমন উপমা কৌতুকচ্ছলে দেওয়াও মহাপাপ।......আর আমি নিজের রূপের ব্যাখ্যানা শুনতেও ছুটে আসিনি আপনার কাছে! না না—এমন বিপদের দিনে এমন হাসবেন না, সবটা তামাসা ক'রে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি যে কিছুতেই স্থির থাকতে পারছি না—এই উদ্বেগ আপনি এত সহজে বইছেন কি করে মালিক!

'উদ্বেগের কারণ তো এই প্রথম ঘটল মস্তি' বাজীরাও এবার ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলেন, 'তুমি বিচলিত হয়েছ, তুমি তোমার স্বভাবজ কৌতুক বোধ এবং স্থৈর্য হারিয়েছ—একমাত্র সেইটেই আমার কাছে দুশ্চিন্তার কারণ বোধ হচ্ছে এই মুহূর্তে। আজ তোমার হ'ল কি, তুমি কি অসুস্থ হয়েছ?

'তার আগে বলুন, যুদ্ধ-সজ্জা হচ্ছে, সেনা-নিবাসে সাজ সাজ রব উঠেছে কেন, কী এমন বিপদাশঙ্কা করছেন?

শত্রু যখন সসৈন্যে সুসজ্জিত অবস্থায় সামনে আক্রমণোদ্যত হয়ে এসে দাঁড়ায়—তখন নিশ্চিন্ত হয়ে কালহরণ করে মূর্খ বা হতভাগ্য এর কোনটাই বলতে আমি প্রস্তুত নই মস্তি!'

বেশ ধীরে শান্তস্বরেই বলেন পেশোয়া।

'শত্রু! কী বলছেন প্রভু, সত্যিই কি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল! আপনার মা, স্ত্রী-আপনার পুত্র, আপনার ভাই—এদের বিরুদ্ধে আপনি যুদ্ধ-যাত্রা করবেন? এদের আপনি আক্রমণ করবেন?'

'কে বলেছে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব কে বলেছে ওদের আক্রমণ করব! ওরা যদি যুদ্ধ করে তো তার প্রত্যুত্তর দেব, আমি আক্রমণ কর

অনন্ত গোধূলি লগ্নে

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

যুদ্ধ করেন তখনও যেমন কোন প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারে না—যখন ভালবাসেন তখনও তাই—সব বাধা সব বিপদ সব বিবেচনা ভাসিয়ে নিয়ে যায় সে ভালবাসা।

সব কিছুই বড় মাপের বলে—তাঁর ভালবাসা ধরে রাখতে পারেন নি সাধ্বী মহিষী কাশীবাঈ। চিত্তের এতবড় আধার নেই তাঁর। সাধারণ মাপের সাধারণ পতিপরায়ণা সতী মেয়ে তিনি, স্বামী-পুত্র, তাদের পদমর্যাদা, তাঁর নিজের নিত্য-করণীয়—এই সব সহস্র বিচার-বিবেচনা রীতি-পদ্ধতিতে তাঁর জীবন বাঁধা। এমন মেয়েকে নিয়ে পেশোয়ার মতো মানুষ ঘর করতে পারেন মাত্র, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। সে তার জীবন-সঙ্গিনী, প্রণয়-সহচরী হ'তে পারে না। হয়ও নি। যতদিন না মস্তানীর সঙ্গে দেখা হয়েছে ততদিন শুধু সহ্য ক'রে গেছেন তাকে।...তারপর এসেছে সেই পরম লগ্ন ওদের জীবনে। রাজা ছত্রশাল বুন্দেলা মহম্মদ খাঁ বাঙ্গালোর আক্রমণে বিপন্ন হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছেন বাজীরাওয়ের। বাজীরাও তাঁকে বিপন্মুক্ত করে রাজ্যখণ্ড ফিরিয়ে দিয়েছেন—সেই কৃতজ্ঞতায় ছত্রশাল দান করেছেন তাঁর মুসলমানীরক্ষিতার গর্ভজাত কন্যা—রূপে-গুণে, নৃত্যে-গীতে, সাহস-বুদ্ধিতে অতুলনীয়া কন্যা মস্তানীকে।

সেই কী এক শুভ বা মহাঅশুভ ক্ষণে দেখা হয়েছিল ওদের, চার চোখে মিলেছিল। বাজীরাও ওকে দেখেই বুঝেছিলেন যে, এ-ই তাঁর সেই সঙ্গিনী, যার জন্য হৃদয় তৃষ্ণার্ত হয়েছিল এতকাল। তাঁর সে প্রত্যাশা ও অনুমান ব্যর্থ হ'তে দেয়নি মস্তানী। তাদের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়নি—কিন্তু মস্তানী সেই দিন থেকে স্বামী বলে, মালিক বলেই জেনেছে বাজী-রাওকে। সিংহের উপযুক্ত সিংহী হয়ে উঠেছে সে, রণে বনে দুর্গমে—সর্বত্র ও সর্বদা সে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে, সাহস দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে পরামর্শ দিয়ে সেবা দিয়ে জীবনকে পূর্ণ ক'রে তুলেছে পেশোয়ার। তার চেয়েও বেশী দিয়েছে হয়ত। নৃত্যে-গীতে, হাসিতে-কৌতুকে, লাস্যে-বিলাসচর্যায় সে তাঁর অবসরের শুষ্ক শূন্য কোষগুলি ভরে দিয়েছে অমৃতে। একাধারে স্ত্রী, মন্ত্রী, বন্ধু ও উপপত্নী গণিকার কাজ ক'রেছে সে।

না, সে দিয়েছে অনেক—বরং পেশোয়াই দিতে পারেন নি। তিনিই কথা রাখতে পারেন নি। মস্তানী বরাবরই বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিশোর বয়সেও আবেগের চেয়ে বিবেচনাই বড় ছিল তার কাছে। সম্পূর্ণ ধরা দেবার আগে সে পেশোয়াকে প্রতিশ্রুত ক'রে নিয়েছিল যে, তাদের মিলনে যে সন্তান হবে, যদি সন্তান হয় কিছু, সে সন্তান তাঁর অন্যান্য সন্তানের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে।

এক দুর্বল বিচার-বিবেচনাহীন আবেগসর্বস্ব মুহূর্তে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পেশোয়া। চেষ্টাও করেছিলেন। মস্তানীর পুত্রসন্তান হ'তে তাকে ব্রাহ্মণ

আমার অর্ধাঙ্গিনী, তোমার ধর্ম আর আমার ধর্ম পৃথক হ'তে পারে না।'

'কিন্তু লোকচক্ষে আমি কি ভেবে দেখুন।'

'লোক-লজ্জার ভয় করলে, অপরের বিবে-চনার কথা বিবেচনা করলে আজ তোমার মরদ বাজীরাও পেশোয়া বাজীরাও হ'তে পারত না। আমি যা ঠিক বলে মনে করি তা অপরের কথাতে বেঠিক ভাবি না কখনও—সে তো তুমি জানোই মস্তানী!'.

তারপরই—ওকে আর কোন প্রত্যুত্তরের অব-কাশ না দিয়ে—সহসা হাত বাড়িয়ে মস্তানীর একটা হাত ধরে সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে টেনে আনলেন তাকে, সেই হাতেই তার কোমর জড়িয়ে তার বুকে মাথা রেখে ঊর্ধ্বমুখে প্রিয়ার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'ওসব কথা এখন থাক মস্তি, তুমি সেই পুরুষের পোশাকটা একবার পরবে?...... তোমার সেই চেহার'টা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না!'

একটা হিম-হতাশা বোধ করে মস্তানী।

অতঃপর কী হবে তা সে জানে। সমস্ত প্রতিজ্ঞা, সমস্ত শুভ সঙ্কল্প ভেসে যাবে তার। তাকেও এই উন্মত্ত প্রণয়লীলায় মেতে উঠতে হবে, এই দুর্দান্ত মানুষটার মর্জি ও খেয়ালের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হবে। প্রতিকার বা প্রতিবিধান কিছুই হয়ে উঠবে না। এই বিরাট পুরুষের জীমগাড়িকে প্রতিরোধ করতে পারবে না কিছুতেই—মহা সর্বনাশের পথেও বাধা দিতে পারবে না।

দুর্ধর্ষ বীর, প্রচণ্ড ক্রোধী এই রাষ্ট্রাধিনায়ক রণে ও প্রেমে সমান অপরাজেয়। তাঁর প্রেম-ক্ষেত্রেও অন্য সমস্ত চিত্তবৃত্তির মতোই প্রবল ও সর্বগ্রাসী। সব কিছুই বড় মাপের তাঁর। যখন

আত্মরক্ষা করব। প্রস্তুত থাকা আর যুদ্ধ এক জিনিস নয়।'

'কিন্তু আপনার মায়ের বিরুদ্ধে, আপনার র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে আপনার রা?'

'প্রয়োজন হয় তো করতে হবে বৈকি! তাঁরা গুলী ছোঁড়েন তো সেগুলো ঠিক স্নেহের পবৃষ্টি বলে মনে করার কোন কারণ নেই—তেও আমার লোক মরবে, আর তা যদি মরে ওরা সে মৃত্যুর জবাব দেবে না—এটাই বা ক'রে সম্ভব!'

'ছি ছি, এসব কী বলছেন পেশোয়া, আমার না—তুচ্ছ একটা বিধর্মী মেয়ের জন্য মার গ লড়াই করবেন! লোকে বলবে কি, আমি দেখাব কি ক'রে এর পর জনসমাজে!'

'তুচ্ছ বিধর্মী মেয়ে কী বলছ মস্তি! তোমার আগে যাই থাক, তোমার বাবা আমার হাতে মাকে সম্প্রদান করেছেন, দেবতা সাক্ষী রেখে পবিত্র গোধূলি লগ্নে আমাদের শুভ-দৃষ্টি ছে, তোমাকে [illegible] স্ত্রী বলে করেছি। [illegible] আমাকে [illegible] তুমি [illegible]

সন্তানের পরিচয়ে হিন্দুর মতো মানুষ করতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন যজ্ঞোপবীত তার গলায় তুলে দিতে। এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন তিনি, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের ঘুষ দিয়ে এই বিধান বার করিয়ে নিতে। কিন্তু পণ্ডিত কয়েকজন ছাড়াও হিন্দুদের যে বিশাল বিপুল একটি সমাজ আছে—সেই অদৃশ্য বিধানদাতা রাজী হয়নি কিছুতেই এ অনাচারে। তা ছাড়া সব ব্রাহ্মণ বা সব পণ্ডিতকে কিছু টাকায় কেনা যায় না—শীর্ষস্থানীয় যাঁরা তাঁদের অনেককেই পারেন নি রাজী করাতে। সুতরাং যার সূর্য রাও হবার কথা সে সামশের বাহাদুর নামেই বড় হয়ে উঠল—আর ধর্ম তথা গণিকা-পরিচয়কে চিরস্থায়ী ক'রে। বীরপুত্র সামশের বাহাদুর বাপের নাম রাখতে পারত, বংশের মুখ উজ্জ্বল করত। সে এই বালক বয়সেই রণনিপুণ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। চিৎ-পবন ব্রাহ্মণদেরই দুর্ভাগ্য যে অমন একজনকে তাদের বলে পরিচয় দিতে পারল না।...মস্তানী দুঃখ বোধ করেছে কিন্তু পেশোয়ার এই অসহায় ব্যর্থতা নিয়ে ধিক্কার দেয়নি কখনও। এটা সে বুঝেছিল যে, তাকে অদেয় বাজীরাওয়ের কিছুই নেই, সাধ্য থাকলে অবশ্যই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন তিনি।

ওদের সেই প্রথম দেখা হওয়ার দিনটি থেকে কেটে গেছে বহুকাল। তবু আজও মস্তানীর প্রেমে অরুচি বোধ হয়নি পেশোয়ার, তার সাহচর্যে আসে নি ক্লান্তি। বরং প্রণয়ের নেশা ঘনীভূতই হয়েছে যেন, কামনার অগ্নি হয়েছে উগ্রতর, প্রচণ্ডতর। তৃষা বেড়েই গেছে। তার কারণ মস্তানীর নিত্য নূতন রূপ—বাইরের তত নয়, যত অন্তরের। সে চির নূতন সে চির চমকপ্রদ। সে ফি-রোজা, আসমানের মতোই নিয়ত পরিবর্তনশীল রূপ তার। তাই সে আজও এই ভারতত্রাণ বীরের হৃদয়েশ্বরী, পেশোয়া বাজীরাওয়ের চিত্তজগতে একেশ্বরী।

ঈর্ষা, অসূয়া! বিদ্বেষ?

হ্যাঁ, আঘাত করেছে বৈকি! নানা লোকে নানা সুযোগ খুঁজেছে এই একাধিপত্য ভাঙতে, এই প্রতিপত্তি নষ্ট করতে। নানা দুর্নাম তুলেছে তার, সত্য মিথ্যা নানা অপবাদে আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে তুলেছে বিপুল মহারাষ্ট্র রাজ্যের। সে অপপ্রচার সে কুৎসা স্বয়ং ছত্রপতির কানেও পৌঁচেছে, তুলে দিয়েছে লোকে। বিষাক্ত করতে চেয়েছে পেশোয়ার মন। উত্তেজিত করতে চেয়েছে প্রজাসাধারণের ধারণাকে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। পেশোয়া বাজীরাওয়ের গভীর প্রেম গভীরতর হয়েছে শুধু এই মেয়েটিকে ঘিরে। ছত্রপতি তাকে কন্যা সম্বোধন করেছেন। সমস্ত বিদ্বেষ ও বিরোধিতাকে উপেক্ষা ক'রে সংসার সরোবরের কালোজল কাটিয়ে লঘুপক্ষ মরালীর মতোই অনায়াসে বিহার ক'রে বেড়িয়েছে সে, এই পঙ্ক বা মালিন্য তাকে স্পর্শমাত্র করতে পারেনি।

কিন্তু এবার বিপদ এসেছে অন্য রকম।

বাজীরাওয়ের লৌহকঠিন শরীর ভেঙেছে এবার, বীর তরুণ তেজোদৃপ্ত রূপবান পেশোয়া শীর্ণ কঙ্কালসার হয়ে উঠেছেন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। মধ্যে মধ্যে জ্বরও হচ্ছে। প্রস্তর কঠিন শক্তিতেও ক্ষয় ধরেছে, যে ক্লান্তি শব্দটাই ছিল অপরিচিত তাঁর কাছে সেই ক্লান্তিতেই যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

ভেবে দেখলে—এটা দুঃখের হতে পারে, কিন্তু এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই! এদের বংশেই নাকি ক্ষয়রোগ আছে। চিমনজী আপ্পা এই বয়সেই ক্ষয়কাশে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বয়ং বালাজী বিশ্বনাথ রাওয়ের অকাল মৃত্যুর কারণও নাকি এই ক্ষয় রোগ। এ রোগ এদের বংশগত—এদের ভেতরে ভেতরে কুরে খায়, হঠাৎ, অকালে বৃদ্ধ ক'রে দেয়। তা ছাড়া বাজীরাওয়ের ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝঞ্ঝা যায় নি। কুড়ি, একুশ বছরের ছেলে তিনি, যখন এত বড় রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়ে। সেদিন তাকে সকলের মতের বিরুদ্ধে এই গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচন ক'রে ছত্রপতি শাহু খুব বিবেচনা বা দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন নি, এই কথাই বলেছিল সকলে। কিন্তু তাদের আশঙ্কা ব্যর্থ ও ছত্রপতির আশাকে সার্থক ক'রে বাজীরাও এই উনিশ বছরকাল মধ্যে অসাধ্য-সাধনই করেছেন। উনি যখন গদীতে বসেন তখনও মারাঠা শক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তার আসন তখনও বালুভিত্তিক। সেই শক্তিকে তিনি সুদূর বিস্তারী এবং দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করেছেন, রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছেন। দমন করেছেন তিনি মুঘল শক্তিকে, দমন করেছেন নিজামকে। বুন্দেলা রোহিলা জাঠ সবাই ত্রস্ত তাঁর ভয়ে। ইংরেজ পর্তুগীজ শক্তি থরথর কম্পমান। যেখানে তিনি যান নি সেখানকার লোকেও মারাঠা শক্তি সম্বন্ধে আজ সচেতন ও অবহিত। যে তাঁকে দেখেনি সেও তাঁর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান। নাদির শা যে দিল্লীর দক্ষিণে পা দেয় নি পেশোয়া বাজীরাওয়ের বীরখ্যাতি তার অন্যতম কারণ। একটা মানুষের পক্ষে—সহায়-সম্বলহীন অভিজ্ঞতাহীন এক তরুণের পক্ষে—এই কীর্তিই যথেষ্ট। একটা মানুষের শরীর ভাঙবার পক্ষেও। লোহার শরীর হ'লে বোধ হয় আগেই ভাঙত। মানুষের শরীরে সামর্থ্যের চেয়ে ইচ্ছাটা বড় কথা বলেই আজও দাঁড়িয়ে আছেন এই ব্রাহ্মণ। খেটেছেন যত খেয়েছেন সেই পরিমাণে কম। যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ সৈনিকের খাদ্য তাদের সঙ্গে ভাগ ক'রে খেয়েছেন বরাবর। বিশ্রাম তো নেন নি বললেই হয়। যে কটি মুহূর্ত তাঁর মস্তানীর সাহচর্যে কাটে সেইটিই তাঁর বিশ্রাম, সেই আনন্দ থেকে সঞ্জীবনীরস গ্রহণ করে তাঁর প্রাণ-মক্ষিকা।

কিন্তু এইটেই বিশ্বাস করতে চাইছে না অনেকে। বিশেষ ক'রে পেশোয়ার বাড়ির লোক—তাঁর নিকট আত্মীয়রা তো নয়ই। তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী, তাঁর উপযুক্ত বীর যশস্বী ভাই আপ্তাজী বা চিমনজী—তাঁর কিশোর পুত্র বালাজীরাও, সকলে একদিকে এককাট্টা হয়েছে। তাদের বিশ্বাস মস্তানীই তাঁর প্রাণরস শুষে খাচ্ছে, ডাকিনী কুহকিনীর মতো। আসলে সে সেই রূপকথার রাক্ষসী, নিজে মোহিনী সেজে ভুলিয়ে রেখে—রাত্রে নিদ্রিত বীরের রক্তশুদ্ধ পান করে। তা যদি নাও হয়—ওর বলিষ্ঠ যৌবনের কামনা হুতাশনে আ[illegible] ইন্ধন যোগানোর ফলেই বীর পেশোয়ার প্র[illegible] শক্তি নিঃশেষিত। অর্থাৎ তথ্যে কিছু [illegible] গোলমাল থাকলেও সত্যটা এক। এ[illegible] স্বাস্থ্যের, ঐ অকাল বার্ধক্যের কারণ যে রমণী তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওকে সরাতে পারলে—পেশোয়ার চোখের আ[illegible] করতে না পারলে—ও'র জীবনের আর [illegible] নেই।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাস করতেই চায় সবাই। সুতরাং বিশ্বাসও করলে সব[illegible] ফলে যে বিরোধী শক্তিকে এককালে হা[illegible] পরিহাসে ধিক্কারে উড়িয়ে দিয়েছিল দু[illegible] সেই শক্তিই তার বিকট চেহারা নিয়ে সা[illegible] এসে দাঁড়াল। ছেলে এসে এক রকম বন্দী করল তার পিতাকে, বীর বিজয়ী পু[illegible] শাস্তি নিতে হাত উঠল না দিগ্বিজয়ী [illegible] পিতার। বালাজী সরিয়ে নিয়ে এল পেশোয়ার —তাঁর শানওয়ার ওয়াড়া প্রাসাদ থেকে, [illegible] অবসরে বিধবা মহিষী রাধাবাঈ, স্ব[illegible] পেশোয়ার স্ত্রী ও বর্তমান পেশোয়ার [illegible] নিজে হাতে বন্দী করলেন মস্তানী[illegible] দুর্ভেদ্য পাষাণ কারায় পুরে নিজে হাতে [illegible] দিয়ে চাবি রেখে দিলেন নিজের কা[illegible] ভরসা করে আর কারও ওপর সে ভার ছাড়[illegible] পারেন নি তিনি।

তবু, তাতেও কি আটকাতে পার[illegible] রাধাবাঈ? মায়াবিনী যেন ভেলকী দেখিয়ে [illegible] সবাইকে। সেই নিরেট নিশ্ছিদ্র কঠিন লৌহ[illegible] যেমন বন্ধ তেমনিই রইল, তার সু[illegible] প্রস্তর প্রাচীরের কোথাও কণামাত্র [illegible] শুধু মস্তানী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তার [illegible] থেকে—যেন কর্পূরের মতো উবে গেল।

না গিয়ে উপায়ও ছিল না অবশ্য [illegible] বাপ ছেলের ওপর সংহার-মূর্তি[illegible] উদ্যত করেছে দেখে সে-ই বাধা দিয়েছি[illegible] অনুরোধ করেছিল ছেলের কাছে হার মা[illegible] তার ইচ্ছার কাছে নিজের ইচ্ছা বিলিয়ে দি[illegible] ছেলে নিয়ে আসতে চেয়েছিল এই পাটা[illegible] সৈন্য শিবিরে, বিনাপ্রতিবাদে তাই আ[illegible] বলেছিল তাকে। আর সেই সময়ই অ[illegible] দিয়েছিল সে বাজীরাওকে, যে, যেমন ক[illegible] হোক, অচিরকাল মধ্যে, সে এসে মিলিত [illegible] তার হৃদয়নাথের সঙ্গে। কোন রাজ্যের [illegible] কারাগার যাকে ধরে রাখতে পারবে না, [illegible] দিতে পারবে না কারও কোন অসূয়া।

এবং পারেও নি। যখন, মাত্র তিন দিনের অদর্শনেই উন্মত্ত অধীর হয়ে উ[illegible] ছিলেন বাজীরাও—ত্রিভুবনের সমস্ত বির[illegible] শক্তির সঙ্গে বিরোধ ক'রে প্রিয়তমাকে [illegible] ক'রে আনবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন—[illegible] সেই চরম মুহূর্তে এসে হাজির হয়ে[illegible] মস্তানী। কিন্তু সে আসাতে তত বিস্মিত [illegible] নি, কারণ, এই মেয়েটি সম্বন্ধে ছিল [illegible] অসীম আস্থা অগাধ ভরসা। তিনি জানত[illegible] যে, সব কিছুই করতে পারে [illegible] রাক্ষসী। অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই [illegible] অভিধানে। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন [illegible] কারণে। বিস্মিত আর মুগ্ধ। বহুদিন ধরে [illegible] বিজয়িনী নারীর যদ্দুর[illegible] তিনি [illegible] আসছেন।
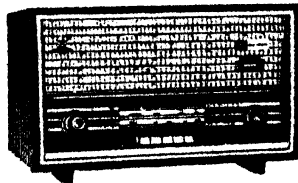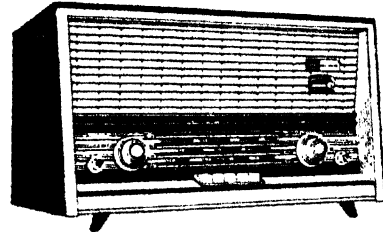
কিন্তু এমন বেশে যে তাকে এত সুন্দর দেখায় তা কোনদিন ধারণা করতে পারেন নি। সাধারণ শ্রমজীবী মারাঠী বালকের পোষাক, অতি সামান্য পাগড়ি—এবং তাতেই কী অসামান্য সুন্দর দেখিয়েছিল, বাজীরাওয়ের মনে হয়েছিল ওকে এই প্রথম দেখলেন।...... সেদিন সেই আবেগ-উন্মত্ত মুহূর্তে বাহুবন্ধ বক্ষলগ্ন প্রিয়তমার কানে কানে গদ্‌গদ কণ্ঠে এই কথাই বলেছিলেন তাই, 'মস্তি, তুমি আমার নব-জীবনদায়িনী, তুমি আমার জীবন-কাঠি, তোমাতেই আমার প্রাণ। তুমি কাছে না থাকলে আমার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না, তখন দেহটাই শুধু থাকে, আত্মা মৃত জড় হয়ে যায়। তুমি যাই কেন না করো মস্তানী এই কথাটা শুধু মনে রেখো, যদি বীরের মতো, শাসকের মতো না বাঁচতে পারি তো আমার কাছে বাঁচার কোন অর্থই নেই। আর তেমন ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে পারো তোমার এ সেবককে একমাত্র তুমিই। তুমি শুধু আমরণ আমার পাশে থেকো, তাহলেই আমার বাহুতে বল, হৃদয়ে শক্তি অটুট থাকবে। তুমি যেন আর কোনদিন, কোন কারণে আমাকে ছেড়ে যেও না, তাহ'লে আর আমি বাঁচব না।.....বলো, যাবে না?'

সেদিন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মস্তানীকে সায় দিতে হয়েছিল, একরকম প্রতিজ্ঞাই করেছিল সে। তার এ তুচ্ছ প্রাণ বা দেহের মূল্যই বা কি—যদি মালিকের কাজে না আসে? ......সে সেই কথাই সেদিন জানিয়েছিল তাঁকে। তার নিজের রক্ত দিয়ে—সে রক্ত ওঁর ধমনীতে সঞ্চালিত করে দিয়েও যদি পূর্ব-স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতে পারে বাজীরাওয়ের তো, সে এখনই শেষ বিন্দু পর্যন্ত হাসিমুখে উৎসর্গ করতে রাজী আছে। শুধু উনি বাঁচুন, উনি সুস্থ হোন, ওঁর বাহিনীর পদভরে সুদূর হিমাচল ও গান্ধার দেশ পর্যন্ত প্রকম্পিত হোক! মস্তানীর আর কোন কাম্য নেই, জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই!......

কিন্তু হঠাৎ যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। এসব প্রতিজ্ঞা শুভ সঙ্কল্পই বুঝি অঘটনের বন্যায় ভেসে তলিয়ে যেতে বসল। এমন একটা অকল্পিতপূর্ব পরিস্থিতি এগিয়ে এল সামনে যার জন্য স্বপ্নেও কোন প্রস্তুতি ছিল না তার। ভাগ্যের সে আঘাত মস্তানীর প্রখর বুদ্ধি ও অবিচল আত্ম-বিশ্বাসকে পর্যন্ত টলিয়ে দিল। এই প্রথম নিজেকে অসহায় ও বিপন্ন বোধ করল সে।

রাধাবাঈ তাঁর এই উপ-পুত্রবধূটির কাছে সমস্ত লড়াইতে হেরে শেষ অবলম্বন হিসেবে আশ্রয় নিতে গিয়েছিলেন ছত্রপতির কাছে। সেখানেই চরম মার খেয়েছেন আবার। শুধু যে মস্তানীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সহায়তা করেননি তিনি তাই নয়—প্রকাশ্যেই প্রশ্রয় দিয়েছেন তাকে। যে তরুণ যুবকটি তার পলায়নে সাহায্য করেছিল বা পলায়ন আদৌ সম্ভব করেছিল—সে যুবকটিকে স্বয়ং ছত্রপতি তাঁর ছত্রছায়ায় গ্রহণ করেছেন, শুধু তাকে নয়—তার সমস্ত পরিবার, সাহায্যকারী এবং বান্ধবদেরও। মাতৃশ্রী রাধা-বাঈ ও পেশোয়ার বীর কেশরী ভ্রাতার রুদ্র-রোষ সেই সুকঠিন রাজ-প্রশ্রয়ের প্রাচীরে প্রহত হয়ে ফিরে এসে আঘাত করেছে ওঁদেরই —ক্ষতির চেয়ে অপমান বেশী বেজেছে তাঁদের।

আর তাইতেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে-ছেন তাঁরা। এমন কাজই করেছেন, যা এই হিন্দুস্থানে তো নয়ই—সারাদুনিয়ায় কেউ কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ। জননী রাধাবাঈ মহিষী কাশীবাঈ, এবং চিমনজী আপ্পা—তাঁদের যেসব ব্যক্তিগত রক্ষী, প্রহরী ও দেহ-রক্ষী ছিল— যেসব অনুগত জনকে বুঝিয়ে ভরসা দিয়ে আনতে পেরেছেন—তাদের এক বেশ বড় একটি বাহিনী নিয়ে এসে হানা দিয়েছেন পাটাসের উপকণ্ঠে—এখান থেকে অদূরে ছাউনি বা থানা ফেলেছেন। পুত্র বালাজী প্রকাশ্যে এসে এ বিদ্রোহে' যোগ দেন নি—কিন্তু প্রায় দুশ' আড়াই শো লোক পাঠিয়েছেন তিনিও।

অবশ্য এদের সমস্ত মিলিত শক্তিও বাজীরাওয়ের শক্তির কাছে নগণ্য, তুচ্ছ। এখানে আপাতত তাঁর যা সেনা আছে শুধুমাত্র তাঁদের মিলিত নিঃশ্বাসেই উড়ে যাবার কথা ওদের। কিন্তু শক্তি নয়, সামর্থ্য নয়—এখানে প্রশ্ন অন্যত্র। এ অসমযুদ্ধের ফলাফল যাই হোক বাজীরাওয়ের পরাজয় অনিবার্য। মা স্ত্রী ও ভাই—এদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা মানেই তো ঘোরতর লজ্জা, বিপুল অবমাননা। আর তাই কি পারবেন তিনি, তাদের ওপর কামান-বন্দুক চালাবার হুকুম দিতে, দিলেও সৈনিকেরা কি সে হুকুম তামিল করবে? যদিই করে—অপরপক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর তারা এবং তাদের প্রভু মুখ দেখাবে কি ক'রে জনসমাজ-সংসারে?

না, না—তা হয় না, হ'তে পারে না। ছিঃ!

অথচ কী যে হয়, তাই-তো বুঝতে পারছে না মস্তানী কোনমতে। এই প্রথম তার উপস্থিত বুদ্ধি এবং সকল অবস্থাতেই অবিচল তীক্ষ্ন সহজ কৌতুকবোধ যেন ত্যাগ করেছে তাকে। এই প্রথম আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটেছে তার, সে বিচলিত ও বিহ্বল হয়ে উঠেছে।

তাই মালিকের ঈপ্সিত বাহুবন্ধনে থেকেও স্বস্তি পেল না সে, তাঁর প্রজ্বলন্ত প্রণয় চুম্বনেও আবেশ আর সুখের সেই অভ্যস্ত মধুর ঘোরটি নামল না চোখে। কী একটা অস্বস্তিতে যেন ছটফট ক'রে উঠল সে, আস্তে আস্তে, ঈষৎ শ্রান্তির সুযোগে সে বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিল, তারপর যেন কোমল লতার মতো, সর্পিল সরীসৃপের মতোই পিছলে নেমে বাজীরাওয়ের পায়ের কাছে বসে পড়ল। বাজীরাও বাধা দিলেন না, কোন অনুযোগও করলেন না, বিগত-আবেগ পরি-শ্রান্তির তৃপ্তিতে চোখ বুজে এলিয়ে বসে রইলেন নিজের দিওয়ানে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলেন, তা তার সেই নিমীলিত নেত্র মুখের ওপরের সামান্য একটু স্মায়ু কুঞ্চনেই টের পেল মস্তানী। সে এবার নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল তাঁর দুটি পা, ভারী জুতোশুদ্ধ শীর্ণ অথচ লোহ-কঠিন সেই চরণযুগল নিজের নবনীত কোমল বক্ষে চেপে ধরে খুব মৃদু অথচ গাঢ় স্বরে ডাকল, মালিক!'

'বলো মস্তি।'

মালিক, অনেকদিন সেবা করলুম, কখনও কিছু চাইনি। যা দিয়েছেন তা নিজেই দিয়েছেন—হয়ত আশার অতিরিক্তই দিয়েছেন, নিজে চেয়ে নিলে অত চাইতে পারতুম কিনা সন্দেহ—তবু কিছু চেয়ে নিতে সাধ যায় বই কি। আজ, আজ একটা জিনিস চাইব ভাবছি, দেবেন?'

'মস্তি, যে দুটো জিনিস মানুষের সবচেয়ে প্রিয়, যা দেবার আগে বহু বিবেচনা করে দে, যার জন্য হুঁশিয়ারীর অন্ত নেই এর—সেই প্রাণ আর ভবিষ্যৎ—তোমাকে নিঃশেষে দিয়ে বসে আছি। বাকী আর কী আছে যে দেবে তুমি?'

'যদি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় আর সযত্নে রক্ষণীয় বস্তু দুটিই খরচ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তো আর এত হুঁশিয়ারীর কিছু নেই। আমাকে কথা দিন তাহলে যে, আমি যা চাইব তা-ই দেবেন?'

'যে দুটি জিনিসের নাম করলুম, তা ছাড়া এমন দু-একটা জিনিস আছে মস্তিরাণী যা মানুষ দিতে পারে না। অন্ততঃ পুরুষ পারে না। সে হচ্ছে তার পৌরুষ, মনুষ্যত্ব আর আত্মমর্যাদা বোধ। এ তার জীবনের সর্ব এ-জন্মের এই তার যথার্থ উত্তরাধিকার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা এগুলো তার ভাগ্য আর ভবিষ্যতের সঙ্গে। এ দেওয়া যায় না রাণী আমার।'

'কাউকেই না, আমাকেও না?'

'না কাউকেই নয়, তোমাকেও না।'

'বেশ, আপনি বহুদিনের অঙ্গীকারবদ্ধ বদ্ধ আছেন, সে ঋণ শোধ করুন এবার আমার আজকের যাচনা পূরণ করলেই আপনার সে ঋণ শোধ হবে। দাসীর কাছে ঋণ থাকা বড় লজ্জার কথা প্রভু। আশা করি সে ঋণের কথা ভোলেন নি আপনি?'

'না ভুলিনি। সামশের বাহাদুরকে আমি বালাজীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিতে পারিনি, কিন্তু সে আর ঋণ নেই, সে এখন অপরাধে পরিণত হয়েছে। প্রতিশ্রুতিভঙ্গের অপরাধ সে প্রতিশ্রুতি পালনের কাল চলে গেছে চিরদিনের মতো।......কিন্তু আমাকে এখনই বাইরে যেতে হবে মস্তি, তোমার প্রার্থনাটা জানালে না-তো। অসম্ভব না হলে তোমার কোন প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না—সেটা তুমি বিশ্বাস করো।'

'আমাকে ত্যাগ করুন প্রভু—বহুদিন তো সেবা করেছি, আমাকে ছুটি দিন। সামশেরকে যে জায়গীর, আর দুর্গ দুটো দিয়েছেন—তাতেই আমাদের মায়ে-বেটার বেশ কুলিয়ে যাবে, আমরা খুব সুখে আর শান্তিতে থাকব—ঈশ্বরের কাছে নিত্য দোয়া মাগব। যদি চিরদিনের মতো নাও ছাড়তে পারেন—অন্ততঃ এক বছরের জন্য ছুটি দিন।'

'না, তা হয় না। তোমাকে ছাড়া মানে আমার শক্তি, আমার বীর্য ত্যাগ করা। তুমি না থাকলে, আর আমার দ্বারা কোন কাজই সম্ভব নয়।'

'বেশ' পাদুটো আরও জোরে সেই দুর্বিনীত দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত বক্ষে চেপে ধরে বলল মস্তানী, 'বেশ তবে চলুন এসব ছেড়ে দূর কোন দেশে—কোন অখ্যাত পল্লীতে কি কোন তীর্থস্থানে চলে যাই, যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না, সাধারণ দুটি নর-নারীর মতো

রণ জীবন যাপন করব! আপনি পাবেন
শ্রায় আর শান্তি—যেদুটোর একান্ত অভাব
নে। কোন উদ্বেগ কোন চিন্তা রাখবেন
—আমিই যেমন করে পারি— অন্তত ভিক্ষা
রও খাওয়াব আপনাকে। চলুন।'
না, তাও হয় না।' শান্ত অথচ অবিচলিত
উত্তর দেন বাজীরাও। 'ধর্ম' আর
রুষের মতো কীর্তি ও কর্মও পুরুষের
ছ অত্যন্ত মস্তানী। আমার এই কর্মক্ষেত্র এবং
নের কীর্তি স্থাপনের আশা যদি আমাকে
গ করতে হয় তাহলে সেই মুহূর্তেই আমার
ঘটবে। বরং তোমাকে ত্যাগ করলেও
কিছুদিন বাঁচব—কিন্তু এই কাজ এই
গী ছাড়লে বোধহয় এক দণ্ডও বাঁচব না।'
মস্তানী যেন অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেল
দ্ভুত রকম, আস্তে আস্তে পা দুটো ছেড়ে
উঠে দাঁড়াল। ঈষৎ হাসি-হাসি মুখেই
'আমার উত্তর আমি পেয়ে গেছি মহান
শোয়া—আমার থেকেও প্রিয় কোন মানুষ
বস্তু আছে কিনা সেইটেই জানতে
ছিলাম।'

পেশোয়াও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন প্রায় সঙ্গে
সঙ্গে, উত্তেজিতভাবে ওর হাত দুটো চেপে
বললেন, 'পাগলামী ক'রো না মস্তানী—আর
কিছু করার চেষ্টাও করো না। তোমাকে
ছাড়ব না, ছাড়তে পারব না। তার জন্যে
মা তাই স্ত্রী পুত্র—এমন কি জগৎ সংসার
যায়—তা হ'লে বরং জগৎসংসারের সঙ্গেই
করব—সেও আমার সইবে।...মা এসেছেন
সঙ্গে ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে—এতে কেন
পাচ্ছ মস্তি, এত বিচলিতই বা হচ্ছ কেন?
যে আক্রমণ করে সে শত্রু, তার আর
পরিচয় নেই। আরও একটা কথা কী
মার কাছে এখন সন্তানের কল্যাণ কামনার
নিজের জিদ এবং ব্যক্তিগত অপমানের
বড় হয়ে উঠেছে। আর তাই যদি উঠে
তো আমারই বা কি মাথাব্যথা তাঁর
কাছে নিজের সমস্ত আশা ভরসা
বিলিয়ে বসে থাকবার! তুমি আর
কথা নিয়ে মাথা ঘামিও না মস্তি—আমি
যেধ করছি।'

পেশোয়া যত সহজে নিশ্চিন্ত হলেন,
তানী তত সহজে পারল না। সে যতই
জের শিবিরে বদ্ধ থাকে, তার প্রখর বুদ্ধি,
র পরিবেশ সচেতনতা তাকে বার বার সতর্ক
রে দিচ্ছে যে সব ঠিক ঠিক, ঠিকমতো
চ্ছে না। কোথায় কী একটা বড় রকম গোল-
ল থেকে যাচ্ছে। সে একটু বাইরেও বেরিয়ে-
ল, আড়াল থেকেও দেখেছে—ঝি চাকরের
খেও শুনেছে অনেক কথা। সেনা মহলে
ব আলোড়ন ও আলোচনা শুরু হয়েছে—
সফিসানির অন্ত নেই সেখানে। তারাও
কটা মহা অস্বস্তি ও অশান্তির মধ্যে দিন
টাচ্ছে, একদিকে পেশোয়া বাজীরাওয়ের
লঙ্ঘ্য আদেশ আর অনমনীয় দৃঢ়তা—অপর
কে তাদের দেবতার মতো পেশোয়া স্বর্গত
জী বিশ্বনাথ রাওয়ের বিধবা। শেষে কি
রা স্ত্রী হত্যার দায়ে দায়ী হবে? আর সে
লোক ব্রাহ্মণের বিধবা, তাদের মনিবের
নী—নিজেদেরও মাতৃস্থানীয়া?.....এক সঙ্গে
হত্যা স্ত্রীহত্যা মাতৃহত্যার পাপ!

অথচ, আদেশ লঙ্ঘন করার কথাও কল্পনা-
তীত। বাজীরাওয়ের ভয়ঙ্কর ক্রোধ এবং সে
ক্রোধের পরিণাম—ওদের জানা আছে। তার
সামনে দাঁড়াবার মতো সাহস কারও নেই। দুই
বিপদের এই দোটানায় পড়ে তাদের রাত্রের
ঘুম ও দিনের আহার চলে গেছে, আর—
আর তার জন্যে ওরা দায়ী করছে এই
মস্তানীকেই, এই মেয়েটা তাদের এবং তাদের
রাষ্ট্রনায়কের জীবনে যেন মূর্তিমতী অভি-
শাপ, শুধু অশান্তির বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে
চারিদিকে। যদি স্ত্রী-হত্যা করতেই হয়—ঐ
আপদটাকেই তো সরিয়ে দেওয়া ভাল—সব
গণ্ডগোলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ওদের মনোভাব অনুমান করতে পারে
বৈ কি মস্তানী, ওদের কাছে না গিয়েও পারে।
কী বলছে তাও তার অজানা নেই। তবু কাছে
গিয়েও শুনল। নিজের কানেই শুনল। যে
পুরুষ বেশটি তার প্রিয়তমের অত নয়নাভিরাম
মনে হয়েছিল সেই পুরুষ বেশেই বেরিয়ে
পড়ল সে—সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে।
নিজেদের ছাউনি ঘরের আশেপাশে, হেমন্তের
ঈষৎ-শিশিরার্দ্র সন্ধ্যায় কেউ কেউ বা শুকনো
পাতার আগুন করে গোল হয়ে বসেছে,
কোথাও বা কোন একটা গাছতলায় জড়ো
হয়েছে কয়েকজনে। কিন্তু কোনটাই খোশ-
গল্পের আসর নয়, তা বুঝতে দেরি হ'ল না
একটুও। সর্বত্রই একটা চাপা উত্তেজনা, সর্বত্রই
একটা আবছা অস্পষ্ট উদ্বেগের উপস্থিতি।
পিছন থেকে কিছু কিছু ওদের কথাবার্তা
শুনল মস্তানী নিজের কানেই। শুনল যে
রাধাবাঈ নাকি কাল প্রত্যুষেই ছেলের শিবির
আক্রমণ করবেন বলে কৃতসংকল্প। সেই জন্য
নাকি আজ থেকে উপবাস ক'রে ভগবান
বিনায়ক ও দেবাদিদেব বিশ্বনাথের পুজো
করছেন। উপবাসী অবস্থাতেই কাল নাকি
যুদ্ধে নামবেন তিনি। মস্তানীকে বন্দী করতে
না পারলে আর মুখে জলবিন্দু দেবেন না—
এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। সারারাত পুজো আর
হোম করবেন আজ। সেই আসন থেকে উঠে
এসে অশ্বপৃষ্ঠে চাপবেন। সেই রকমই আয়ো-
জন হচ্ছে। স্বয়ং মাতৃশ্রী রাধাবাঈ ও মহিষী
কাশীবাঈ বাহিনীর পুরোভাগ থেকে বাহিনী
চালনা করবেন। আর থাকবেন ভাই আপ্পাজী।
যাতে তাঁদের আঘাত না ক'রে ও বাহিনীর
ওপর অস্ত্র বর্ষণ করা না যায়।

আরও শুনল মস্তানী যে, এরা কেউ
ও'দের দিকে একটি গুলী কি একটি বর্শা
কিম্বা একটি তীরও নিক্ষেপ করবে না। সেটা
ওদের পঞ্চায়েতে স্থির হয়ে গেছে। বরং মরবে
সবাই: ওদের অস্ত্রে কিম্বা বাজী রাওয়ের
ক্রোধে—তবু জননী রাধাবাঈয়ের দিক লক্ষ্য
ক'রে কোন অস্ত্র ত্যাগ করতে পারবে না।

...শুধু-এক জায়গায় এও শুনল যে, তাঁরা যা করছেন পেশোয়া তথা সমগ্র মহারাষ্ট্রের কল্যাণের জন্যই করছেন—তাতে ওদের সহযোগিতা করাই উচিত। যদি প্রয়োজন হয় তো কিছু আত্মত্যাগও। পেশোয়া বাজীরাও ওদের গৌরব—দেশের গৌরব। তাঁকে রাহুমুক্ত ক'রে পূর্ণ গৌরবে প্রদীপ্ত ক'রে তোলবার ব্যবস্থা যাঁরা করছেন, তাঁরা ওদের কৃতজ্ঞতার পাত্রই।

আর শুনল না মস্তানী, শুনতে পারল না। আস্তে আস্তে নিজের তথা পেশোয়ার আবাসের দিকে ফিরল। পুরনো কোন্ নবাবের ইমারৎ এটা, বাগানবাড়ি—এইটেই এখানকার আবাস ক'রে নিয়েছেন পেশোয়া. এই বাড়ি ঘিরেই সমগ্র ছাউনি। এখানে—এখানে কেন—পুনা বা সাতারা ভিন্ন সর্বত্রই পেশোয়া আজকাল একত্র বাস করেন মস্তানীর সঙ্গে। তবু নিজস্ব একটা ঘর থাকে তার সব জায়গাতেই। যখন তাঁবুতে থাকতে হয়—তখনও ওরই মধ্যে একটু ব্যবধান রচনা ক'রে পৃথক কক্ষ নির্দিষ্ট হয়। রাত্রে শয়নের সময় শুধু পেশোয়া সে ঘরে যান, বাকী দিনরাতের অন্য সময়—মস্তানীই যায় ও'র ঘরে, প্রয়োজনমতো, তেমন কেউ বাইরের লোক এলে বেরিয়ে আসে।

মস্তানী নিজের ঘরে এসে আয়নাটার সামনে দাঁড়াল। সুরাট থেকে এসেছে আয়নাখানা, সাদা চামড়া ফিরিঙ্গীদের তৈরী। গোটা চেহারাটা দেখা যায়—এত বড়। মাথার ওপরে বিপুল ঝাড়, সেও ফিরিঙ্গী দেশ থেকে আমদানী—তার আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর সেই পূর্ণ প্রতিবিম্ব।

অনেকক্ষণ বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিজেরই বিচিত্র সুন্দর একজোড়া চোখের দিকে। সে দৃষ্টিতে কী—বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, উপেক্ষা—গোটা জগৎসংসারটাকে—না কি শুধুই এক ধরনের দুর্জ্ঞেয় আত্মানুভূতি?

জাদুকরী? কুহকিনী? সর্বনাশিনী?

সর্পিনী সে—যা তার শাশুড়ি বলে থাকেন?

না কি, যথার্থ কল্যাণাকাঙ্ক্ষিনী, অর্ধাঙ্গিনী?

সে তো জানে তার জীবন মরণ তার ভাগ্য ভবিষ্যৎ তার ইহকাল পরকাল সব জড়িয়ে গেছে ঐ মানুষটির সঙ্গে চিরদিনের মতো। ও'র কল্যাণেই তার কল্যাণ। সে ও'র স্ত্রী. ন্যায়ত ধর্মত। ঈশ্বরের চোখে অন্তত। যে গোধূলি লগ্নে ওদের মিলন ঘটেছিল সে লগ্ন অনন্ত গোধূলীতে বিস্তারিত হয়ে গেছে ওর জীবনে ওদের জীবনে। এর ব্যতিক্রম নেই, ব্যত্যয় নেই। সে স্ত্রী। স্ত্রী কি কখনো স্বামীর সর্বনাশ করতে পারে? সে তো নিজেরও সর্বনাশ।

না, তা সে পারবে না।

কল্যাণই করবে সে। যদিও জানে যে তাতে ও'র আখেরী কল্যাণ কিছু হবে না। সে পাশে না থাকলে একদিনেই ভেঙ্গে পড়বে মানুষটা। কিন্তু তবু সে একরকম ভাল, ইহকালে না হয় পরকালে মিলিত হ'তে পারবে তারা, রোজ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তো বটেই—আত্মা থাকবে আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে, সেখানে কারও সাধ্য নেই তাদের বিচ্ছিন্ন করে।

কিন্তু সে পাশে থেকেও বাঁচাতে পারবে না। পুরুষের পৌরুষ সবচেয়ে বড়, সর্বাপেক্ষা রক্ষণীয়। যে কর্তা যে নায়ক তার কর্তৃত্ব তার জীবনের চেয়েও বড়। কাল প্রভাতে যদি সত্যিই বাজীরাওয়ের সেনারা বাজীরাওয়ের আদেশ পালন না করে, যারা চিরদিন অলঙ্ঘ্য বাধা ও নিশ্চিত মৃত্যুর মুখেও তাঁর আদেশে এগিয়ে গেছে, নির্বিচারে বিনা প্রতিবাদে—সে রকম কল্পনাতীত অঘটন যদি ঘটে সত্যিই—তখন সেই ঐ মানী মানুষটার আত্মহত্যা করা ছাড়া যে কোন উপায় থাকবে না। সে অপমান উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না, তা মস্তানী ভাল রকমই জানে।...

সে দুর্গতি অন্তত কিছুতেই হ'তে দেবে না সে—তার রাজা তার মালিক তার প্রিয়তমের। তাতে ওর এবং ও'র অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

বহুক্ষণ সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে পেশোয়ার বসবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল মস্তানী। সেই বেশেই। কোন প্রসাধন করল না কিম্বা পোশাকটাও বদলাবার চেষ্টা করল না। পেশোয়া বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে কাজ করেছেন, করবেন তাও বলেছিলেন। বিভিন্ন সেনাধ্যক্ষদের বৈঠক বসেছিল অদ্য। তারা বিদায় নিতে নিজের গদিআঁটা কুর্শিতেই একটু এলিয়ে পড়েছিলেন পেশোয়া—একান্ত ক্লান্তিতে চোখ দুটো বুজে এসেছিল মাত্র। ঘুমিয়ে পড়েননি, চোখের পাতা ভারী হয়ে এলেও ঘুম আসা তখন সম্ভব নয়। তাই পুরো কার্পেটে মৃদু পদশব্দও কানে গেল তাঁর। চমকে চোখ খুললেন, এবং সোজা হয়ে বসলেন।

'পরে এসেছ পিয়ারী সেই পোশাকটা? বাঃ, বলিহারী! সত্যিই, কে জানত যে সামান্য এই গাঁওয়ার চাষার পোশাকে তোমাকে এত সুন্দর দেখায়—নইলে এতদিনে শ'খানেক এমনি পোশাক করিয়ে দিতুম।'

উচ্ছ্বাসে যেন ছেলেমানুষ হয়ে ওঠেন পেশোয়া।

মস্তানী কিন্তু এ প্রশংসায় অন্য দিনের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল না, শুধু আর একটু কাছে সরে এসে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'শুতে যাবেন না?'

'না। আজ আর তোমার ঘরে নয়, এইখানেই এই চারপাইটাতে পড়ে ঘণ্টা দুই গড়িয়ে নেব।...

কাল শেষ রাত্রে উঠতে হবে একটু। দত্তাজি সিংহে আর মাধোজী ভাইকে তৈরী থাকতে বলেছি, শেষ রাত্রেই একটু কাজে বেরোব ওদের নিয়ে।'

তখনও এক বিচিত্র দৃষ্টিতে বাজীরাওয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল মস্তানী, তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ বলেই সেটা অত লক্ষ্য করেন নি বাজীরাও—সে এবার শান্ত কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবেন পেশোয়া ওদের নিয়ে? শুধুই কি ওরা—না ওদের ফৌজও থাকবে?'

একটু ইতস্তত করলেন পেশোয়া, কথাটা বলতে চাইছেন না ঠিক, অথচ মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত নন—দ্বিধাটা সেই থেকেই। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বলেই ফেললেন, 'ফৌজও থাকবে বৈ কি। আর ভাই ঠিক করেছে কাল ভোর সেই অনুরাধা নক্ষত্র উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা আমাদের এই বাড়ি আক্রমণ করবেন। সামনে থাকবেন মা আর কাশীবাঈ উঁদের দেখলে আমার সেনারা সহজে অস্ত্র ছুঁড়তে চাইবে না। তাই আমি ঠিক করেছি—শেষ রাত্রে—ওঁরা প্রস্তুত হবার আগেই আমি পিছন দিক থেকে ঘুরে গিয়ে আক্রমণ করব। যাদের ওরা সঙ্গে এনেছেন তারা কেউ কোনদিন লড়াই করেনি, দত্তাজি সিংহের মাওয়ালী সৈন্যদের সামনে দু মুহূর্তও টিকবে না। ওদের শেষ করে দিয়ে তাসব—মা বা কাশীবাঈয়ের কেশাগ্রও স্পর্শ করব না যেমন—কোন সহায় সম্বলও রাখব না ওঁদের।'

শিউরে উঠল মস্তানী, বলল, 'তবে তো মা আর স্ত্রীর সঙ্গেই লড়াই পেশোয়া, পরাজয় তাঁদেরই হোক আর আপনারই হোক, সমান অপমানের। আর অপমান ছাড়াও, ব্যথাই কি কম বাজবে!'

'তুমি শুতে যাও মস্তানী. ওসব কথা-বার্তা শোনবার আমার সময় নেই। হাতে পায়ে চোট লাগলে মানুষের ব্যথা কম বাজে না, তবু সময়-বিশেষে, দূষিত ক্ষত দেখা দিলে সেই হাত-পাই কেটে বাদ দিতে হয়, ইচ্ছে করে। আর তাঁরাও—জেনে শুনেই আগুনে হাত দিতে এসেছেন, হাত পুড়লে আগুনের দোষ দেবেন না আশা করি। তুমি যাও, শুয়ে পড়ো গে।'

কণ্ঠের এ কঠিন স্বর মস্তানীর পরিচিত। এখন আর কারও কোন কথাই শুনবেন না। সে-চেষ্টাও সে করল না। একটা ছোট্ট দীর্ঘ-

স ফেলে নিঃশব্দে আরও কাছে এসে
। মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে নিয়ে
একটা মেজ-এ রেখে মাথায় কপালে
লঘু মিষ্ট স্পর্শে হাত বুলিয়ে দিতে
বলল, আপনি একটুও শোবেন না
য়া!'

মস্ত তাহলে জোর ঘুমিয়ে পড়ব,
ময়ে আর ওঠা হয়ে উঠবে না। বড় ক্লান্ত
পড়েছি। এই কুর্সিতে বসেই চোখ
একটু!'

র কথা কইল না মস্তি, বোধ করি
জল ধরা পড়বার ভয়েই। সে আস্তে
লাঠির ডগায় বসানো পিতলের ঠুলি
ঝাড়ের অধিকাংশ বাতি নিভিয়ে ঘর
কৃত অন্ধকার করে তেমনি নিঃশব্দেই
গেল।

তিনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন
ও। নইলে এ আচরণ তাঁর কাছে
ধিক বলেই তো ঠেকবার কথা। কাছে
জন্য জিদ করল না, শয়নগৃহে নিয়ে
জন্য পীড়াপীড়ি করল না—যাওয়ার
কোনরকম সম্ভাষণ জানিয়ে গেল না, এমন
ভাত দুপুরের কথাও মনে রইল না তার!

র, সেটুকু লক্ষ্য করলেন না বলেই তাঁর
ও অসুস্থতার পরিমাণটা যেন বেশী
দেখতে পেল মস্তানী। সঙ্গে সঙ্গেই
কে সমস্ত দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা জোর
করে ঠেলে সরিয়ে দিল। বাইরে এসে ওড়নায়
চোখ মুছে, বার বার ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিয়ে
সদ্যোদ্গত অশ্রুর সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত করল।
তারপর সোজা আস্তাবলে গিয়ে নিজের ঘোড়া
বার করে যতদূর সম্ভব সন্তর্পণে এ বাড়ি
থেকে, শিবির থেকে বেরিয়ে গেল। সেদিনকার
রাত্রের 'ঝাড় শব্দ' ওর নিজেরই তৈরী, সুতরাং
বাধা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ওর
গলার আওয়াজও সান্ত্রীদের পরিচিত, বিনা
প্রতিবাদেই পথ ছেড়ে দিল তারা।

সোজা গিয়ে থামল মস্তানী রাধাবাঈদের
ছাউনীতে। বিস্মিত হতচকিত প্রহরীকে
বলল যে, মাতৃশ্রী দেবী রাধাবাঈকে বলো
মস্তানী এসেছে তাঁকে প্রণাম জানাতে। কোন
ভয় নেই, একা নিঃসঙ্গ অবস্থাতেই এসেছে
সে!'

বিস্মিত রাধাবাঈও বড় কম হলেন না,
তাঁরও মুখে কথা সরল না বেশ কিছুক্ষণ।
তাঁকে কথা বলার সুযোগও দিল না মস্তানী,
বলল, 'আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হতে এসেছি মা,
আর আমি স্বয়ং পেশোয়া কি আমার ছেলের
নামে শপথ করছি আমি পালাবার বিন্দুমাত্র
চেষ্টা করব না। শুধু একটা অনুরোধ,
এখনই—রাত্রি শেষ হওয়ার অনেক আগে
আমাকে নিয়ে আপনারাও এখান থেকে সরে
যান—নইলে, নইলে এক প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে।
আপনারাও বাঁচবেন না—যাকে বাঁচাবার জন্য
আপনাদের এত কাণ্ড তাকেও বাঁচাতে পারবেন
না!'

পেশোয়া বাজীরাওয়ের জননীও সেটুকু
বোঝেন বৈকি। বোধ করি এই প্রথম তাঁর
পুত্রের উপপত্নীর সঙ্গে একমত হলেন তিনি।
তখনই সেই হুকুম ছড়িয়ে গেল শিবিরের
সর্বত্র—দ্রুত ও নিঃশব্দ গতিতে। ঠিক এক
প্রহর কালের মধ্যে অন্ধকারেই সকলে রওনা
হয়ে গেলেন। শুধু সাদা তাঁবুগুলো পড়ে
রইল—এই অবিশ্বাস্য অভিযানের সাক্ষ্য
স্বরূপ।

সংবাদটা এরা পায় নি অনেকক্ষণ পর্যন্ত।
একটু আধটু যা শব্দ, অন্ধকারে ঘোরাফেরা
করা কি ঘোড়া তৈরী করার আওয়াজ সেটাকে
শেষ রাত্রের সম্ভাব্য আক্রমণের উদ্যোগপর্বই
মনে করেছিল। তাই পেশোয়া বা তাঁর সচিব
—কাউকেই সে সম্বন্ধে সতর্ক করার প্রয়োজন
বোঝে নি। তাছাড়া এ শিবিরেও কিছু
উদ্যোগপর্ব ছিল, সেজন্যও অন্যমনস্ক ছিল
সকলে।

পেশোয়াই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা—
বাইরে বেরিয়ে একবার মাত্র চেয়ে দেখে। তাঁর
তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন অন্ধকারের পর্দা ভেদ করে
ভিতরের শূন্যতা দেখতে পেল। তখনই চার
পাঁচজন লোক পাঠালেন খবর নিতে। তারা
দুই দণ্ডকালের মধ্যেই ফিরে এল, খবর দিল—
শূন্য খাঁচা সব কটাই পড়ে আছে, কিছু কিছু

আসবাব বা তৈজসও আছে—কিন্তু পাখী একটিও নেই।

বাজীরাও তার আগেই আশঙ্কা করেছেন ব্যাপারটা। তবুও স্খলিত মন্থর গতিতে মস্তানীর—তাঁদের শয়নকক্ষে গেলেন একবার। আস্তাবলে লোক পাঠালেন। অবশেষে প্রহরারত সান্ত্রীর মুখে নিশ্চিত খবরটা পাওয়া গেল। তারা রাণীসাহেবার গলার আওয়াজ পেয়েছে, ঘোড়াটাও চিনতে পেরেছে অন্ধকারেই। হ্যাঁ, তিনি ঐ দিকেই গিয়েছেন বটে। সন্দেহ বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই কোথাও।

সচিবের ইঙ্গিতে সকলেই নীরবে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তিনি নিজেও। বিশাল বিস্তৃত বহু মধুস্মৃতিভরা সেই শয়নকক্ষে একা বসে রইলেন বাজীরাও। তাঁদের বহু প্রণয় রজনীর সাক্ষী এই শূন্য ঘর। বহু রভসের সঙ্গী এ। ঐ তো চারিদিকেই তার স্পর্শ লাগা কত অসংখ্য জিনিস। তার বিপুল কৃষ্ণ কেশ বন্ধনীর চুলে বোনা দড়ি ও সোনার কাঁটা এক গাদা। কত কী আতরের শিশি। রেশমের আর সুতীর অসংখ্য পোষাক। তারই লোভনীয় পরিপূর্ণ অধরের স্পর্শসিক্ত আলবোলার নল—। সবই ঠিক আছে, শুধু সেই নেই।

বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন বাজীরাও। পাথরের মতো স্থির হয়ে। বোধ করি পলকও পড়ছিল না তাঁর। অস্বাভাবিক বিবর্ণ তাঁর সে সময়কার মুখের দিকে চাইলে আত্মীয় বন্ধু ও সেবকরা ভয় পেয়ে যেত।

অবশেষে পূর্ব গগন উদ্ভাসিত করে নতুন আশার বাণী নিয়ে জাগলেন উষা, ক্রমশ তাঁর আবির্ভাবের দীপ্তি এই অন্ধকার শয়নকক্ষেও প্রবেশ করল এসে। কিন্তু বাজীরাওয়ের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি তাকিয়েছিলেন ঊর্ধ্বমুখে। ঝাড়ের বাতিগুলো নিভছে একে একে। তেল ফুরিয়ে গেছে, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে তাই, একবারে শেষ মুহূর্তে একবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেই নিভে যাচ্ছে সম্পূর্ণ।

এ যেন একটা খেলা পেয়ে গেছেন বাজীরাও। উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন আলোগুলোর দিকে। শেষ বাতিটিও নিভে যেতে চোখটা নামিয়ে আবার ঘরের দিকে চাইলেন একবার। দিনের আলোয় সেই চির-পরিচিত জিনিসগুলো আরও স্পষ্ট, আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি জিনিস তার ব্যবহৃত, কোন কোনটা সদ্য ব্যবহার করা—তার স্পর্শ তার ঘ্রাণ লেগে থাকা প্রতিটি বস্তুও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই সঙ্গে।

সেগুলো সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও রূঢ়, আরও তীব্র একটা আঘাত পেলেন বাজীরাও। যন্ত্রণায় বুকের মধ্যেটা যেন কুকড়ে উঠল অকস্মাৎ। চোখ বুজে দুহাতে বুক চেপে ধরে প্রাণপণে সামলাতে হল সে আঘাত। বুকের এ যন্ত্রণাটা আরও দু-একবার টের পেয়েছেন ইদানীং—কিন্তু এমন তীব্র আর কখনও হয় নি। বেদনায় কপালে বড় বড় স্বেদবিন্দু ফুটে উঠেছে—সামনের বড় আয়নাটায় দেখতে পেলেন পেশোয়া। এই আয়নায় গালে গাল রাখা অবস্থায় দুজনের
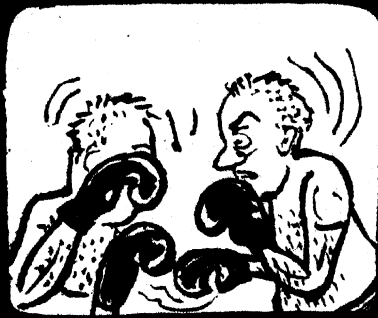
এ আর এমন কি লড়াই, সেদিন তোমাতে আর আমাতে যা হ'য়েছিল.................

মুখ কতবার দেখেছেন দুজনে। মস্তি বলত, 'ঘামলে আপনাকে বড় সুন্দর দেখায় মালিক।' সে থাকলে এতক্ষণে নিজের বুক দিয়ে মুছে নিত এ ঘাম।...

আঃ, আবার! তড়িৎস্পৃষ্টের মতোই লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। থাক ওর কথা। সে জেনে শুনেই তো তাঁকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে। তার কথা কেন ভাববেন মিছিমিছি।

তখনই ডেকে পাঠালেন সচিবকে, ডেকে পাঠালেন সেনানায়কদের। বড় ভুল হয়ে গেছে তাঁর। মুঙ্গী সেবাগাঁওয়ের সর্ত অনুযায়ী হান্দিয়া আর খারগন জিলা তাকে ব্যক্তিগত জায়গীর হিসেবে দেবার কথা ছিল নিজামের। নানা টালবাহানা করে আজও সে তা দেয় নি। তিনি এবার গায়ের জোরে আদায় করবেন নিজের প্রাপ্য। সেনা যা তৈরী আছে তা নিয়ে এখনই তিনি রওনা হবেন, বাকী সবাই যেন পিছনে পিছনে রওনা হয়।

'আজই?' সেখানে উপস্থিত সকলের বিস্ময় প্রতিধ্বনিত করে প্রশ্ন করলেন মুখ্য সচিব, 'এই অবস্থায়? কিন্তু আপনি যে এখনও রীতিমতো অসুস্থ পেশোয়া!'

যোদ্ধার স্বাস্থ্য বিবেচনা করে যুদ্ধ করতে গেলে আর যাই হোক, লড়াই হয় না। ওকথা এখন থাক। যদি আমি মরি—আপ্পাজী আছে, বালাজী আছে, লড়াই বন্ধ হবে না। আপনি যান, যা বললুম সেই মতো করুন গে।...আমি পূজো সেরে এক মুহূর্তের মধ্যেই ঘোড়ায় সওয়ার হবো, দেরি না হয়।

সবাই চলে গেলে পেশোয়া অবশ আয়নাটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাষ্প চোখ বোধ করি বারেক নিজের মুখের পাশে শূন্য স্থানে আর একখানা প্রিয় পরিচিত অভ্যস্ত মুখের প্রতিচ্ছবি অন্বেষণ করল, তার পর সেই শূন্যতাটার দিকে চেয়েই বিড় বিড় করে বললেন, 'তাই হোক, তাই হোক পিয়ারী।...তোমার অভাব বরং সইবে, যুদ্ধক্ষেত্রে নূতন কীর্তির আস্বাদে সে আঘাতও সহ্য হবে বলেছিলাম—সেই অভিমানে আমাকে জেনে শুনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে! কিন্তু আমার কথাই সত্য করব, আমি বাঁচব, নূতন কীর্তি নূতন বিজয় গৌরবের মধ্যে বাঁচব। আর তার মধ্যেই কান পেতে থাকব তোমার আশাভঙ্গের দীর্ঘনিঃশ্বাসটুকু শোনবার জন্যে!'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই যেন শিউরে উঠলেন বাজীরাও, 'না না না, তুমি আমার কল্যাণের জন্যই গিয়েছ পিয়ারী তা আমি জানি। তোমাকে একটুও ভুল বুঝি নি, বিশ্বাস করো।

'তাই আমি বাঁচতেই চেষ্টা করব, প্রাণপণে চেষ্টা করব তোমার এ আত্মত্যাগ সার্থক করে তুলতে।'

ভাগ্যে তখন আর কেউ সে ঘরে ছিল না, নইলে লৌহ মানব মহাক্রোধী মহান পেশোয়া বাজীরাওয়ের যন্ত্রণার সদৃশ চোখের কোণ থেকে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়তে দেখে বিস্ময়ের পরিসীমা থাকত না তাদের।

গুণের পুরস্কার ও গুনাগার

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী
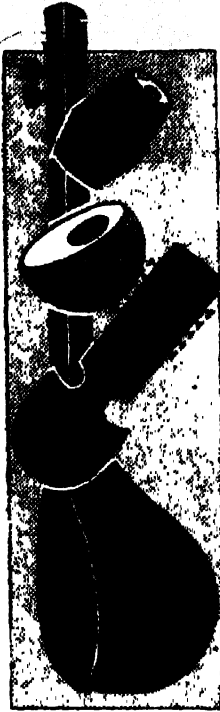
গীত জগতে কৃতিত্ব দেখিয়ে রাজা-রাজড়ার হাত থেকে পুরস্কার পাওয়া গিয়েছে, এর দৃষ্টান্ত অসংখ্য। পুরস্কারের পরিমাণটা যেখানে সাধারণের ...ার বাইরে, সেখানে ইতিহাসের সঙ্গে মাঝে উপকথারও মিশ্রণ ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। ... হীরের আংটি, পাঁচ শ' টাকা দামের ...নি শাল বা নগদ হাজার টাকা, এ ধরণের ...কার এই কিছু দিন আগেও কলকাতার সঙ্গীত প্রেমিকদের কাছ থেকেই সঙ্গীত-...রা লাভ করেছেন। সুতরাং বলাই বাহুল্য ...বাবী আমলে, রাজা বাদশাহের দরবারে ...কারও ছিল নবাবী চালের।

শোনা যায় তানসেন সম্রাট আকবরকে ...ত বসতে সারাক্ষণ গান শোনাতেন। কিন্তু ...শুনে আত্মহারা হয়ে যাবার কয়েকটা বিশিষ্ট ...র্ত আছে। এইরকম এক মুহূর্তে আকবর নিজের গলার মণিহারটিই তানসেনকে দিয়ে ...। তার দাম কত ছিল সেটা অনুমান ...ক্ষি।

...র বদলে পয়জার

আর একদিন বাদশাহ ভাবলেন, তানসেন ...ার বাড়ীতে যখন গান করেন, যেখানে রাজ-...র আদব কায়দার তাগিদ নেই, সে গান ...নি কতই মধুর। একদিন সাধারণ ...রকের বেশে সম্রাট গিয়ে উপস্থিত তানসেনের বাড়ীতে। গান শুনে তিনি মুগ্ধ, আত্মহারা।—সে দিনও নিজের গলার বহুমূল্য হারছড়া খুলে তানসেনের গলায় পরিয়ে দিলেন এবং বললেন এই হার পরেই যেন তানসেন দরবারে বসে গান করেন। হারটার দাম ছিল আঠারো লাখ টাকা।

তানসেন সম্রাট [illegible]

তানসেন ছিলেন আত্মভোলা লোক, হারটা তিনি হারিয়ে ফেললেন অথবা কাউকে দিয়ে ফেললেন। সম্রাট ব্যাপারটা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে তানসেনের দরবারে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তানসেন মনের দুঃখে তাঁর আগেকার মনিব রেওয়ার রাজার কাছে গিয়ে ঘটনাটা নিবেদন করতেই রাজা তাঁর পঞ্চাশ টাকা দামের রত্নখচিত পাদুকা তানসেনকে দিয়ে দিলেন। তানসেন সেই মহামূল্য পাদুকা এনে সম্রাটের কাছে হাজির করতেই সম্রাট খুশীও হলেন লজ্জিতও হলেন।

এই ঘটনার অপর একটি বিবৃতিতে পাওয়া যায় যে সম্রাটও তানসেনকে হার না দিয়ে পাদুকাই দিয়েছিলেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তানসেনের ঘর থেকে সম্রাটকে খালি পায়ে প্রাসাদে ফিরতে হয় বলেই বোধ হয় পাদুকার বদলে প্রথমোক্ত গল্পে হারের ব্যবস্থা হয়েছে। মতান্তরে হার ও পাদুকা স্থলে উভয় পক্ষে বাজু দানের কথা আছে।

জমিদারি লাভ

একজন বাঙ্গালী গুণীর কথা বলছি। ঢাকা জেলার একটি অত্যন্ত বিখ্যাত রায় পরিবারের পূর্ব পুরুষ ইনি। মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারে ইনি ছিলেন বিশিষ্ট গায়ক, ইংরাজ-আমলের আগে। নবাব একদিন রায় মহাশয়ের গান শুনে এতই আনন্দ পেলেন যে তিনি তাঁকে একটা গোটা জমিদারিই দিয়ে ফেললেন। এই জমিদারি ছিল যশোহর জেলায় আর এর বার্ষিক আয় ছিল চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। পরবর্তী সময়ে নড়াইলের রাজারা এই সম্পত্তিটা হাতের কাছে ছিল বলে শ্রীহট্ট জেলায় তাঁদের একটা দূরবর্তী জমিদারির সঙ্গে এটা বদল করে নেন। শ্রীহট্টের এই জমিদারির কথা হাল আমলেও অনেকের জানা আছে। ধন রত্ন নয়, শাল দোশালা নয়, এমন কি হাতী ঘোড়াও নয়,—একেবারে একটা এত বড় জমিদারি পাওয়া গেল গান গেয়ে,—এর অনুরূপ দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর নেই।

উপহার দানে অসমর্থ

তানসেনের গুরু বৃন্দাবনবাসী হরিদাস গোস্বামী তানসেনের চাইতেও বহুগুণে বড় গায়ক হওয়ার কথা, এই ভেবে একদিন আকবর বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত,—সঙ্গে কিন্তুর ধন-রত্ন, স্বামীজীকে দেবেন। গান শুনে দেখলেন রাগ রাগিণী সশরীরে সামনে এসে হাজির। অভিভূত হয়ে বাদশাহ রত্নোপহার দিতে

আকবর তাঁর নিজের গলার মণিহারটিই তানসেনকে দিয়ে দেন।

ঐই ফাটলের পাশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে গোপীদের সাবধান করে দিচ্ছেন।

চাইলেন। হরিদাস সন্ন্যাসী, তিনি টাকা পয়সা নেবেন কেন?—মনের ভাব ব্যক্ত না করে বললেন, 'আচ্ছা আর একটা গান শোন।' আকবর চোখ বুজে গান শুনতে শুনতে দেখলেন, যমুনায় একটা প্রকাণ্ড সোনার ঘাট নেমে গিয়েছে। তার একখানে একটা ফাটল,—সেই ফাটলের পাশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে গোপীদের সাবধান করে দিচ্ছেন, জল ভরতে গিয়ে, কেউ ফাটলে পা না দেয়। গীতান্তে এই দৃশ্যের কথা বলার পর, তাঁকে স্বামীজী বললেন, ঐ রকম একটা ঘাট তৈয়ার করে দাও। বলা বাহুল্য সম্রাট নিজের অসামর্থ্যের কথা ভেবে মাথা হেঁট করে রইলেন।

পুরস্কার শিরশ্ছেদ

সিংহল গড়ের রাজা সমুখন সিংহ ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয় রাজপুত। সম্রাট আকবর খবর নিয়ে জানলেন তাঁর মত বীণাবাদক ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই। ভাবলেন এঁকে মোগল দরবারে আনতে পারলে বেশ হয়—তানসেনের মত গায়ক আর সমুখন সিংহের মত বীণকার থাকলে দরবারের সংগীত পূর্ণতা লাভ করবে। অনুরোধ গেল রাজার কাছে, কিন্তু রাজা ছিলেন রাণা প্রতাপের মত জাত রাজপুত, মোগল বাদশাহের রাজনৈতিক অভিসন্ধি তাঁর ভাল করেই জানা ছিল। ঘৃণার সঙ্গে সমুখন সিংহ আকবরের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। সম্রাটের রোষবহ্নি জ্বলে উঠল,—ফলে যুদ্ধবিগ্রহ,— হতভাগ্য ক্ষুদ্র রাজা পরাজিত বন্দী ও নিহত হলেন। শ্রেষ্ঠ বীণকারের জীবনাবসান ঘটল এই ভাবে। পরবর্তী সময়ে এঁরই পুত্র মিশ্রী সিংহ বীণকার মাসিক দু'হাজার মোহর বেতনে আকবরের দরবারে বীণকার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিখ্যাত সদারঙ্গ অদারঙ্গের ইনিই ছিলেন পূর্বপুরুষ।

পুরস্কার কারাবাস

চুরি বিদ্যা নয়, গীতবিদ্যাই একবার একজন গুণীর কারাবাসের কারণ হয়েছিল। জর্মাণির এক বিখ্যাত গীর্জায় ইনি ছিলেন প্রার্থনা গীতগায়ক দলের নায়ক। প্রোটেস্টান্ট গীর্জায় ক্যাথলিকদের অনেক আচার নিয়মই বদলে যায়, কিন্তু প্রার্থনা-গীতগুলি আগেকার নিয়মেই একই সুরে সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হত। এই নায়কটি ছিলেন ভাল সঙ্গীতজ্ঞ, গীর্জার সংগীতেও তিনি প্রচলিত নূতন প্রথায় হার্মনি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। কতকগুলি গানকে নূতন ভাবে সাজিয়ে তিনি হার্মনি সহযোগে গীর্জায় গাওয়াতে সুরু করলেন। দেশে সোরগোল আরম্ভ হল। প্রাচীনপন্থীরা নালিশ করলেন রাজার কাছে। ধর্মাচারে যাঁরা সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরাও এই ব্যাপারে প্রাচীন পন্থারই সমর্থন জানালেন। রাজা তাঁদের সঙ্গে একমত হয়ে সেই সঙ্গীতজ্ঞের কারাদণ্ডের হুকুম দিলেন। কয়েক মাস পরেই এই ঘটনার কথা আর কারো মনে রইল না। কিন্তু বেচারা গুণী যখন কারাযন্ত্রণা ভোগ করছিলেন সেই সময়েই আবার তাঁর প্রবর্তিত গীতের ধারা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হতে লাগল। ক্রমে দেশশুদ্ধ তাবৎ গীর্জাতেই হার্মনি সংযুক্ত প্রার্থনা গান প্রবর্তিত হল। আসামী জেল খাটছেন অথচ তাঁর কৃত অপরাধকেই জনসাধারণ পুণ্যকর্ম বলে স্বীকার করে সেইটেই অনুসরণ করে চলল। বহুকাল পরে অবশ্য এই বিসদৃশ পরিস্থিতি সরকারের বুদ্ধি বিবেচনা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং সেই সংগীতজ্ঞ ভদ্রলোক সসম্মানে মুক্তিলাভ করেন।

গান শোনার ফল

ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ হেনরীর খামখেয়ালির সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। হেনরী নাকি গান বাজনা মোটেই সহ্য করতে পারতেন না,—গান শোনার মধ্যে যে আনন্দ থাকতে পারে তা তিনি বিশ্বাসই করতেন না। একদিন কথায় কথায় রাজা বললেন, এই সভায় যদি কেহ গান গেয়ে তাঁর মন গলাতে পারেন তবে তিনি সেই গায়ককে তাঁর অভিলষিতরূপ বকসিস দেবেন,—আর গানের ফলে যদি মনে রসের সঞ্চার না হয় তা হলে শিল্পীর হবে

তরবারি হাতে তিনি লাফিয়ে পড়লেন সভার মাঝখানে।

প্রাণদণ্ড। ভয়ে ভয়ে একজন শিল্পী ধরলেন,—ক্রমে ভয় কেটে গেল, গান উঠল মনোমুগ্ধকর। সভায় উপস্থিত প্রত্যেকের মনে সৃষ্টি হল সুরের এক অভিনব ইন্দ্রজাল। কিন্তু সব চেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা গেল স্বয়ং রাজার মধ্যে। তিনি ক্রমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—সে উচ্ছ্বাস পরিণত হল উন্মত্ততায়। তরবারি হাতে তিনি লাফিয়ে পড়লেন সভার মাঝখানে আর যাকে যাকে সামনে পেলেন তাদেরই মাথা কেটে ফেললেন। যাদের সংগীত প্রেম নেই তাদের সম্বন্ধে শেকসপীয়রের উক্তি ঋষিবাক্য।

এরই ঠিক বিপরীত একটা কাহিনী আছে ইতিহাসের পাতায়।—খলিফা ওমর দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। ইরাণে তাঁর সদ্য অধিকৃত এক অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল। ওমর দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করলেন। শত শত বিদ্রোহী বন্দী অবস্থায় তাঁর সামনে উপস্থিত হল। তিনি সবগুলি বন্দীর শিরশ্ছেদের আদেশ দিলেন। একজন বন্দী ভয়ে ভয়ে [illegible] করল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পালিত হবার আগে তাকে একটু গান গাইতে দেওয়া হবে কিনা। খলিফা অবজ্ঞার হাসি হেসে অনুমতি দিলেন। গান আরম্ভ হল। শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে ওমরের মন ভিজে এল।—শেষে তাঁর মনের পরিবর্তন এমনি হল যে, তিনি বিদ্রোহীদের [illegible] অপরাধ ভুলে গেলেন। তিনি তখন একেবারে আর এক মানুষ।—বিদ্রোহীরা যে শুধু মুক্তি পেল, তাই নয়, তারা যে যার পদমর্যাদা অনুসারে আদর আপ্যায়নও লাভ করল। [illegible] ফিরে যাবার সময় তাদের বিশেষত [illegible] বন্দীটির হাতে কিছু পারিতোষিক [illegible] হয়েছিল কিনা, ইতিহাসে তার উল্লেখ [illegible] থাকলেও সেটা অবিশ্বাসের কথা হত না।

অতি সাধারন কুসুম বাগচী

শ্রীমতী বানী রায়

নলা খুলে যায় সকালে। রোজই খোলে। শাদা একটি মণিবন্ধ পর্দা টেনে সরায়। একটু ...শী শাদা। রাস্তা দিয়ে যে টি যেতে যেতে চেয়ে দেখল যদি তার মনে থাকত সে বলত আপন মনে :—

"Pale hands I loved beside the
r Shalimar—Pale hands and
r throat."

হাতের বাদামাকৃতি নখের রং গোলাপী পর্দায় মিল পায়। একটু পরে একবোঝা কারনেশন ফুল হাতখানা রাস্তায় ফেলে

খোলা জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে বাতাস যায়। পায়ের ধীর চলাফেরা ওঠে। কর্ম-তা না থাকলেও ঘরের মধ্যে জীবন আছে। একটু পরে ঠিকে ঝি ঢোকে। পেছনের বাড়ীটির দরজায় ঘা দেয়। একটি চাকর খুলে দেয়। কোমর তার পড়ে। কোমর থেকে বেঁকে অদ্ভুত তার র মত চলাফেরা।

ঝি ঘর ঝাঁট দিয়ে মোছে। রান্নাঘরে উনুন জল তুলে দেয়। রাতের খাবার বাসনপত্র কার করে। ততক্ষণ চা তৈরি হয়েছে। চা ও পাতলা একটু মাখো টোস্ট ওপরে নিয়ে যায় ছোকরা চাকর। দোতলার ঘরদোর সেই ঝাঁট দেয়।

ঝি কাজ সেরে চলে গেলে আবার দরজায় দুধওলা আসে, ডিমওলা, ফলওলা আসে। ওরি মধ্যে ছোকরা চাকর একদফা বাজার সেরে ফেরে।

দোতলায় একটি মাত্র লোক থাকেন। প্রায় চল্লিশের কাছে বয়স একজন মহিলা। ক্ষীণ শুভ্র শরীরে, হাল্কা শাদা পোষাকে মনে হয় এখনও তরুণী।

সমস্ত কিছু হাল্কা তাঁর। নটায় এককাপ দুধ। বেলা বারোটায় তরকারী ভাত, ডিমের কিছু। তিনি মাছ খান না।

তিনি হাল্কা বলেই কারুর সংসারে ভার হয়ে বসেন নি। কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী-খানির একটা অংশে বাস করেন। অন্য অংশ ভাড়া দিয়ে ও পৈত্রিক অর্থাদির ব্যবস্থায় চমৎ-কার চলে। মধ্যে মধ্যে শহরের আত্মীয়-স্বজন যে আসেনা তা নয়, কিন্তু কম, খুবই কম। একজন মোটাসোটা হাসিখুশী মেয়ে আসে। ভাইঝি। সে শহরের কলেজে অধ্যাপিকা। সে যখন চলে যায়, হাতের নাইলনের থলেয় একটা-দুটো জিনিষপত্র থাকে। পিসীর উপহার। ভাইঝি নিঃশ্বাস ফেলে। দাদু পিসীকে এতই দিয়ে গেছেন যে পিসী বসে বসে খাচ্ছেন। তারই খেটে খেতে হচ্ছে কষ্ট করে। জানালার ধারে কখনও একখানা মুখ ভেসে ওঠে। শাদা দুর্লভ এক অর্কিড সেই মুখ।

প্রকাণ্ড একটি ফুলের মতই অপরূপ মুখখানা। রগের পাশে চুল দু'একটি শাদা। তাঁর মুখের রেখায় বয়স থাকলেও চোখে এখনও স্বপ্ন।

সারাদিন সাধারণ মানুষের আনন্দ, সাধারণ মানুষের অভ্যাস নিয়ে কাটে তাঁর। যেমন আরও দশজন তেমনি। কাজকর্ম করতে হয় না, খেটে খেতে হয় না। ভাবী স্বামী প্লেন চালাতে যেয়ে মৃত হয়েছিলেন। আর বিয়ে করেননি তিনি। শোবার ঘরের দেওয়ালে ছবি ঝোলে। মধ্যে মধ্যে যেদিন বেশি মনে পড়ে, বিবেকের দংশন জাগে ভুলে যাচ্ছেন বলে, ছোকরা চাকর কলাপাতা মোড়া শাদা ফুলের মালা আনে। ছবিতে মালা দোলে।

পাশে বসবার ঘরে রেডিও। বইপত্র আছে। সময় কাটানো হয়। কখনও শহরে যেতে হয় বইকি।

বাড়ীর অন্য অংশে ওপর নীচে দুটো ফ্লাট ভর্তি লোক। ঝন্‌ঝন্‌-খন্‌খন্‌ করে চলে তাদের কাজ। ছোট ফ্লাটটির নৈঃশব্দ্য ব্যাহত হয়। তুলনায় মনে হয় এখানে লোক নেই বুঝি।

কোমরপড়া লোকটি দেখাশোনা করে। দিদিমণির বাপের আমলের লোক। এমনিভাবে দিন কাটে।

—দুই—

হঠাৎ সেদিন। শহর থেকে ফিরেছেন। বড় যেন ক্লান্ত লাগছে। রাস্তায় বৃষ্টি পেয়েছিলেন. শ্রাবণের ধারায় কুসুম স্নান করে উঠেছেন। কুসুম বাগচী ম্যাকিন্‌টশ নিতে ভুলে গিয়েছিলেন।

বাড়ী ফিরে জ্বর হল। দুর্বল দেহে বিছানায় পড়লেন।

তারপর—জানালা দিয়ে চেয়ে নিজের মনে বলে উঠলেন কুসুম, "পুবালী হাওয়ায় কিছুই বাঁচেনা দেখছি।" ছোকরা চাকর ডাক্তার ডেকে আনল। বিছানায় বিশ্রামের ব্যবস্থা হল।

—তিন—

পাশের ফ্লাটের গান্ধারী গিয়েছিল কুসুম দেবীর বাড়ী সেদিনকার ইংরেজি কাগজখানা আনতে।

কোমরপড়া বাবার আমলের চাকর কর্তা। সে বলে দিল সকালের চা-রুটির সঙ্গে দিদিমণিকে কাগজখানা পাঠানো হয়েছে।

যাই, কুসুমমাসী কেমন আছে খবরটা নিয়ে আসি। গান্ধারী আস্তে দোতলায় উঠে গেল।

একটা হাতলদার চেয়ারে কুসুম বসে আছেন। পায়ে গোলাপী চাদর ঢাকা। মাথা হেলানো চেয়ারের পিঠে। নিশ্ছিদ্র বিশ্রাম।

"কুসুমমাসী, মা আজকের ইংরেজি কাগজটা"—

থমকে দাঁড়িয়ে গেল গান্ধারী। ছোট বারো বছরের মেয়ে। কিন্তু কী একটা যেন সারা গায়ে স্রোতের মত খেলে গেল। একছুটে সিঁড়ি নেমে সে কাছে এল কোমরপড়া বুড়ো চাকর রুইদাসের।

"দেখগে রুইদাসদা, কুসুমমাসী যেন কেমন করে রয়েছে।"

আর বলতে হল না। কুসুমের সুজির রুটি আর মাগুর ঝোলের আয়োজন করছিল রুইদাস। নামিয়ে রেখে কচ্ছপগতি যতটা পারে বর্ধিত করে ছুটে গেল দোতলায়, রেলিং আঁকড়ে দ্রুততালে চলার বেগে মাথা নাড়াতে নাড়াতে।

আবার একটু পরেই নেমে এল রুইদাস। ছোকরা চাকর ছুটল ডাক্তারবাড়ী। উনুনে এক কেৎলি গরম জল বসাল।

গান্ধারী ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে গেল মাকে খবর দিতে। বেড়ার ধারে রাঙ্গা শাকের বন। কুসুম লাগিয়েছেন। সেদিকে চেয়ে আপনমনে গান্ধারী মাথা নাড়াল।

কুসুমমাসী আর রাঙ্গা শাক খেতে আসবে না।

—চার—

মনোজ সমাদ্দার পাড়ায় একটা গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান খুলেছে। লোকে বলে গানবাজনা ভিন্ন কিছু হয় না। কিন্তু সামাজিক কর্তব্য করে যাওয়া তার প্রধান অভিপ্রায়। এই নূতন কলোনিটি আজকাল বেশ জেঁকে উঠছে, কারণ কাছেই বিরাট একটি ফ্যাক্‌টরী তৈরি হচ্ছে। কোনও বিশিষ্ট বিদেশী প্রতিষ্ঠান কেন জানি না ওদের কারখানার উদ্দেশ্যে আর একটি নূতন শহর সৃষ্টি করতে চেয়ে এই স্থানটিই মনোনয়ন করেছে। কলোনিবাসীদের এহেতু দারুণ গর্ব। জমির দাম বেড়ে যাচ্ছে।

মনোজ সমাদ্দার বিপত্নীক, মধ্যবয়সী। উকীল সে। এখান থেকে রাণাঘাট সদরে নিত্য ওকালতি নিয়ে ছোটে। বাবা এখানে পেন্‌সন নিয়ে বাড়ীখানি করেছেন। ছেলে আর বিশেষ কিছু করতে পারল না। অগত্যা ক্লাব খুলল।

কুসুম দেবীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনোজ কোর্টে যাওয়া বন্ধ দিল। কুসুম দেবী বৈজয়ন্তী ক্লাবে নিয়মিত পালপার্বণে অর্থ সাহায্য করতেন। অতএব জরুরী এক মিটিং ডেকে আশেপাশের ছেলেছোকরার দলে স্থির করল, ক্লাবের নাম দিয়ে মালা পাঠানো হবে শবযাত্রার সময়ে।

কানাই বলল, "কলকাতায় গেলে ভাল মালা আনা যায়। এখানে ব্রজ মালির দোকানের মালা ছাড়া ভাল মালা পাওয়া যাবে না।"

হরেন বলল, "যাতায়াতে ঢের সময় লাগবে। তাছাড়া কলকাতার মালা আনাতে খরচ আছে। আমরা ভিন্ন চাঁদা দেবে কে?"

সকলেই একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। অবশেষে মনোজ স্থির করল, "ব্রজর দোকানে দাঁড়িয়ে অর্ডার দিয়ে একটা স্পেশাল মালা করিয়ে নাও। কলকাতা থেকে আনতে গেলে যদি আবার দেরী হয়ে যায়? কখন ওঁকে নিয়ে যাবে শ্মশানে, কে জানে? বেশী দাম দিলেই ব্রজ যত্ন করে গেঁথে দেবে। দাম যা হয় দিতে আমরা প্রস্তুত। আহা, কুসুম দেবীর কি দরাজ হাত ছিল!"

—পাঁচ—

ছোট ডাকঘরটিতে লোকের ভিড় হয় সকালে। ঠেলে ঠেলে আধবুড়ো ভদ্রলোক যাচ্ছেন। পায়ের জুতো ফিতেবাঁধা, কাদাভরা, ধুতির ওপর অফিসের শার্টপরা।

"কি রায়সাহেব, বড় ব্যস্ত যে! অফিস যাবার সময় হল না কি?"

দরজার কাছে বুড়ো একজন পেনশনী লোকের প্রশ্নে বীরেন রায় বললেন, "আর দাদা, আজ অফিস যাওয়া হয় কি না সন্দেহ।"

"বাড়ীতে মরা ফেলে রেখে যাই কি করে। শহুরে আত্মীয়দের টেলিগ্রাম করতে এসেছি। কখন ওঁরা আসবেন, কে জানে?"

"মরা? বল কি?"

"কেন শোনেননি? আমার বাড়ীর মালিক কুসুম দেবী সকালে হঠাৎ মারা গেলেন। এখ আমরা ভাড়াটেরাই কর্মকর্তা।"

"অ্যাঁ? কি হয়েছিল?"

"সর্দিজ্বর হয়েছিল। শহরে ভাইদের সঙ্গে দেখা করতে মধ্যে মধ্যে যেতেন [illegible] আষ্টেক আগেও তাই গিয়েছিলেন। পথে বৃ আসায় ভিজে গিয়েছিলেন। তিন-চার করে জ্ব হত। তবু ভাইদের খবর দেননি। দুর্বলতা মারা গেলেন আরকি।"

বুড়ো ভদ্রলোক যেন চোখে দেখতে পেল একটা নীলপেড়ে শাড়ীপরা কুসুম বাগচী পা কোলাপুরী চটী টেনে টেনে হেঁটে চলছে যেমন করে তিনি মধ্যে মধ্যে কলকাতা যাব আগে ষ্টেশনে যেতেন। যেন একটা কামরায় উ বসে হাত নাড়লেন বিদায়ের। বুড়োর চোখে জ এসে গেল।

বীরেন রায় ততক্ষণে টেলিগ্রাম পাঠাব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ডাকবিভাগের ভারপ্রা কর্মচারীটি বলে উঠল, "আহা হা, একা ঘ প্রাণটা গেল মহিলার! ডিভিডেণ্ডের শেয়ারে টাকা আসত, কত কাগজপত্র নিতেন।"

অন্য কর্মচারীটি বলল, "ভাইদের চিঠি কিন্তু কমই আসত।"

অন্য লোকেরাও আলোচনায় যোগ দিল টের-টক্‌কা বাহনে ততক্ষণ টেলিগ্রাম [illegible] গেছে।

ততক্ষণে দোতলায় কুসুম বাগচী [illegible] ধীরে ধীরে উত্তাপবিহীন হয়ে শক্ত [illegible] রুইদাস উনুন নিভিয়ে ছোকরা চাকরকে [illegible] কাছে বসতে বলছে। কারণ লোকজন [illegible] প্রকাশে আসছে।

ব্রজ মালী শক্ত তার বেছে কানাই জিজ্ঞাসা করছে, "কত ইঞ্চি লম্বা হবে বল

গান্ধারীর মা রান্নাঘরে কড়ায় কে পটল ছাড়তে ছাড়তে বলছেন, "তাড়াতা খাওয়া সেরে নিয়ে ওবাড়ী যেতে হবে। ভাই আসার আগেই মোটামুটি ব্যবস্থা কুসুমদি ভাড়াটেরা ও ডাক্তারবাবু করে রাখবে ভাইএরা বাকী যা ইচ্ছা করে নেবে আহা, কি ভাবে ও'দের বোনটি গেলে কোন আত্মীয় স্বজন কাছে না, মুখে একফোঁ জল পড়ল না।" গান্ধারীর মায়ের শীত শী করতে লাগল। তিনি গায়ে আঁচল টেনে দিলে

গান্ধারীর বাবা বললেন, "তাড়াতা ঝোলটা দাও। অফিস যাবার মুখে একটু ওবা হয়ে রুইদাসকে বলে যাব। এত দূরে বা করার ফল পাচ্ছি খুব। অফিসে রোজ লেট।"

তাঁর পত্নী তাড়াতাড়ি ফুটন্ত ঝোল এক বাটী করে তুলে দিলেন, "এতদূরে না হ শহরে মাটী কিনে কি আমাদের মত লোক বা তুলতে পারে? জীবনে হোত? এই তো জীব একজনের শেষ হয়ে গেল তো!"

গান্ধারীর বাবা নিরুত্তরে মুখে গ্র তুললেন। আজ স্ত্রীর রান্না কি এতই খার হয়েছে? নুন দেয়নি না কি? না, তো। ত এমন বিস্বাদ কেন?

হঠাৎ গান্ধারীর বাবার চোখের সাম প্রকাণ্ড শাদা এক অর্কিড ঝুলে গেল। কুসুমে মুখ। এত ভাল করে প্রৌঢ়া কুসুম বাগচী কবে যে তিনি দেখেছিলেন, মনে নেই। কি জোড়া ভ্রূ, ঠোঁটের কাছের তিল মনে করিয়ে দে দেখাটা কত সম্পূর্ণ ছিল।

দোতলায় কুসুম বাগচীর আর একটা ...রে আঙুল শক্ত হয়ে গেল।

—ছয়—

হাসি টেলিফোন পেল কলেজে, "পিসীমা ... গেছেন। আমরা এখনি মোটারে ওখানে ...না হচ্ছি। তুমি যাবে তো এসো।"

হাসির একটার ক্লাসটা বেয়াড়া মেয়েদের ...। কোনদিন সে ঠিকমত শাসনে রাখতে ...ত না। প্রিন্সিপ্যাল টের পেলে বিপদ। তাই ...নিত্য অনুনয়ের সুরে মেয়েদের থামাতে ...ত। প্রত্যহ ক্লাসটায় যাবার আগে বুক ...ফড় করত। মনে মনে প্রার্থনা জানাত ...বান, আজ যেন ওরা গোলমাল না করে। ...জ ওরা গোলমাল করবে কি, করবে না, সেই ...নায় সকাল থেকে বিব্রত থাকত ও। হঠাৎ ...সটা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রথমে খুশী হয়ে ...ল। পিসীমার মৃত্যু হয়েছে এমন একটা ...রণ খুবই যুক্তিসঙ্গত হাসির কলেজ থেকে ...ল যাওয়ার পক্ষে।

কিন্তু, মনকে চাবুকে মারা হল, পিসীমা এত ...লবাসতেন। কত জিনিষ দিতেন। আমি কেন ...খুব দুঃখ পাচ্ছি না?

...মোটরে বিষণ্ণ মুখে মা-বাবা, কাকা-...কীমার সঙ্গে রওনা হতে হতে সে ভাবল: ...নার এমনি আমিও মরে যাব। যে জীবন ...মার সর্বাঙ্গে, আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে ...রে একদিন। থেমে যাব আমি। আর হাসর ...। পিসীমার সমস্ত জামা-কাপড় আমি ...বো। কিন্তু কতদিন পরবো?

তখন রজু মাজী ফুলের মালায় ...ল গেঁথেছে। গান্ধারীর মা পাটভাঙ্গা শাদা ...ড়ীর সাজে চন্দন ঘষে রাখছেন পাশের ঘরে। ...ড়াটেরা জড় হয়েছে। আলতা এসেছে। শাদা ...ল ধনঞ্জয়বাবু কিনে আনলেন। বীরেন রায় ...িস কামাই করে তাম্বিরে লেগেছেন।

বীরেনবাবুর স্ত্রী মহামায়া বলছেন, "আহা, ...সুন্দর জীবন! কেমন পবিত্রভাবে চলে ...লেন? চিরকুমারী থাকা কি সোজা কথা?" ...ন্তী বোস বললেন, "বাড়ী থেকে মিস বাগচী ...শী না বেরোলেও বেশ সামাজিক মানুষ ...লেন। পাড়াটা খালি হয়ে গেল।"

...জবাবুর স্ত্রী এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, ...ভাইরা এখন এলেই হয়। আসারও সময় ...য়েছে। টেলিগ্রাম যদি না পান ভেবে ট্রাঙ্ককল ...রা হয়েছে। সবই তো ও'রা পাবেন। আছেও ...স্তর। বড়লোকের মেয়ে হলেও বাজে খরচ ...ভ্যাস ছিল না।"

কবিরাজ মহাশয়ের মেয়ে বলল, "আমার ...মারী স্কুলে একখানা বড় সতরঞ্চি দেবেন ...লেছিলেন। ও'র ভাইদের বললে সেটা কি ...াওয়া যাবে?"

কেউ কোন কথা বলল না। ঠিক সেই সময়ে ...ধা রাস্তায় কুসুমের বড় ভাইবৌ বলল, ...ভাগ্যি, আজ বৃষ্টি নেই। নইলে ভারী মুস্কিল ...ত। ওখানকার শ্মশানটাও অনেক দূরে।"

ছোট ভাইবৌ বলল, "বুবুল-সীতার খাবার ...তেন পি-টা ঠিকমত দিতে পারলে হয়। আমার ...টেলিফোন পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। ও'কে ...লে কয়ে আসতে পারিনি।"

ভাই দুজন চুপ করে বসে রইল। এক-...নের দিকে একজনের ছোট কোন মারা গেছে। ...এখন কোথায় শ্রাদ্ধশান্তি করা হবে? উইল ...করেছে কিনা তাও জানা যায় নি।

আবার তারা লজ্জিত হল। একমাত্র সহো-দরার মৃত্যুতে তার বিষয়ে অন্যভাবে ভাবা উচিত।

গান্ধারীর বাবা ফাইল সরাতে যেয়ে মনে করলেন কুসুম একদিন তাঁকে বলেছিল, "আমার লেগহর্ণ মুরগীগুলোকে মাংসের টুকরো খাওয়াই। আপনিও তাই করবেন।"

পোস্ট অফিসে সকলে উদগ্রীব হয়ে দেখছে, ভাই-এরা আসছে কিনা? কর্মচারী জানলার পাল্লাটা খুলে দিল।

পেনসনী বুড়ো দিবানিদ্রায় ঘোরে বিষম খেলেন। স্বপ্ন দেখলেন ভরা কলসী কাৎ হয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে কলসী শেষ হচ্ছে। সেই কলসীটা দেখতে দেখতে কুসুম হয়ে গেল। ওর মুখ যেন কলসীটার হাঁ। আবার দেখতে দেখতে কুসুমের মুখটা তাঁর নিজের মুখ হয়ে গেল।

তখনই কুসুমের পাশের ঘরে রজের মালা পৌঁছে গেল। কানাই হরেন বয়ে আনল, তারের গায়ে আঁটা কাগজে লেখা 'বৈজয়ন্তী ক্লাবের শ্রদ্ধা নিবেদন।'

পাশের ঘরে কুসুমের মুখে নীলচে ছায়া পড়ল। আস্তে আস্তে ছায়া কালচে হতে সুরু করল।

কুসুমের মুখ কাল হতে সুরু করেছে।

—সাত—

দূর শহরে মৃগাঙ্ক সুর ভাবছেন।

শহরতলীতে দুদিন একটা গানের ক্লাস তিনি নিয়ে থাকেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে দুপুরে যান। রাত্রে ক্লাস সেরে ফিরে আসেন। মৃগাঙ্ক সুরের চুল পাতলা হ'তে সুরু করেছে, গলার লালিত্য কমে গেছে। শহরের আদর ক্ষীণ হবার মুখে। গুটিকয়েক ছাত্রীর জন্য শহর-তলীতে যেয়ে অনেকক্ষণ সময় দিতে হয়।

তবু ভাল লাগে। ভাল লাগে। গায়ক-কবি মৃগাঙ্কের হাতে শহরতলী যেন দিয়েছে নূতন কলম, নূতন মন্ত্র। যা শহর দেয়নি, দিয়েছে শহরতলী। প্রাচীন পান্থ যেন একটি হ্রদের তীরে এসে পৌঁছেছে। হ্রদের মত দুটি চোখ। বলেছিল: "আপনার গান আমার খুব ভাল লাগে। আমার বাড়ী আজ যা গান শোনালেন, অনেকদিন এমন গান শুনিনি।"

আকাশে ভেসে এল একখণ্ড মেঘ—আকাশের প্রচণ্ড তাপ ঢেকে গেল। গায়কের কণ্ঠে স্থান পেল আকাশের গান।

সে বলেছিল: 'বয়স কম থাকলে আমিও আপনার ছাত্রী হতাম।'

শাদা ফুলের মত দীর্ঘ গ্রীবায় শাদা মুখ। মুক্তোর মত হাতের নখর। প্রেম সন্ধ্যায় আবার কাল দেখা হবে। সে কাল গানের ক্লাসে গান শুনতে আসবে। সে স্কুলের পৃষ্ঠপোষিকা।

হঠাৎ যেন সে ফিরে এল। অনুভবে ফিরে এল, নির্জন অপরাহ্নে মেঘছায়ায় এল সে।

সমস্ত জীবন মৃগাঙ্কের ভরে দিয়েছে। সেই মুখ, সেই নাম, সেই সত্তা। কেউ জানে না। সে নিজেও কি জানে না?

বিশীর্ণ যৌবন অপরাহ্নের ক্লান্ত দেহ স্বপ্নে আসে বার বার। ফুল ফোটে রাতের অন্ধকারে। জীবন ধন্য হয়।

কিন্তু, আজ কেন এত মনে পড়ছে ওকে? কেন বার বার অপরাহ্নের বিশ্রামে ফিরে আসছে ও? শরীর খারাপ থাকলেও জ্বর থেকে মুক্তি পেয়েছে তো? সে তো ভাল আছে?

চঞ্চল হয়ে উঠে বসলেন মৃগাঙ্ক। কুসুম বাগচী যদি না থাকে, তাঁর জীবনও শেষ হয়ে যাবে।

অজানা অস্বস্তিতে ঘরে পদচারণ সুরু করলেন মৃগাঙ্ক। নিজের মনে বার বার অস্ফুট আদরে উচ্চারণ করলেন—"কুসুম, কুসুম!"

শহরতলীতে কুসুমের দেহ এতক্ষণে সহস্র পুষ্পে সেজে উঠল। শুভ্র মুখে চন্দনচর্চা সমস্ত কালিমা বিদূরিত করে দিল। উজ্জ্বল-দীপ্তি পেল এতক্ষণে অতি সাধারণ কুসুম বাগচী।

—আমার চেয়ে পুতুল ভাল

আয় চাঁদ

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আকাশের বুকে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। তারই ফাঁকে ফাঁকে বেড়ানো চাঁদকে আবিষ্কার করে খুকুর কী আনন্দ।

শমির এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞতা তার নিজের অতীতকেই সামনে তুলে ধরে। সুহাসকেও সে এমনি ভাবেই খুঁজে বেড়িয়েছে। তার মনের আকাশের চাঁদও এমনি ভাবেই মাঝে মাঝে মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে। তাকে নতুন করে আবিষ্কার করে ঠিক এমনি আনন্দই হয়েছে তার।

সন্ধানের শুরু তা'হলে মানুষের জন্ম থেকেই? —তিন বছরের কোলের শিশুর মুখের দিকে চেয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে শমি।

আশ্বিনের এক সন্ধ্যা। মেয়েকে নিয়ে ছাতে বেড়াতে এসে মনটা যেন নিবিড় নিরালায় হঠাৎ উধাও হয়ে গেল অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে।

একমনে শমি ভাবছে পুরোনো দিনের কথা। সাত-আট বছর আগের কথা।

হাজারীবাগের নীল নীলিমায় কত ইচ্ছের ভেলাকে সে দিনের পর দিন ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে। রাতের আকাশের নিবিড় স্তব্ধতাকে অনুভব করতে গিয়ে এক এক সময় সে ভেঙে পড়েছে। তার ইচ্ছে হয়েছে জিজ্ঞেস করতে, সুহাস কি তা'হলে এই রাতের আকাশের চাইতেও নির্বাক নিস্পন্দ?

জ্বলজ্বলে এক একটি তারার ওপরে চোখ রেখে রেখে কতবার শমির ইচ্ছে হয়েছে একটি একান্ত প্রশান্ত মনের সান্নিধ্যকে কাছে পেতে।

কিন্তু সে সবই ইচ্ছে। সবই থেমে থাকা ইচ্ছের ভেলা। সেই আকাশ সেই কালো কালো পাহাড়, সেই আদিম অঞ্চল, বন-বনানীবৃত উপত্যকা যেমন যুগ-যুগান্তের স্তব্ধতা নিয়ে থেমে রয়েছে ঠিক তেমনি। কিন্তু সেই আকাশেই তো সূর্য ওঠে, আলো ফোটে পাহাড়ের গায়ে, বনে-উপবনে, পথে-প্রান্তরে, স্রোতস্বিনীর জলধারায়। সেই আলো তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে, তারপরে ধীরে ধীরে

ক্ষীণ হয়ে আসে। ক্রমেই মিলিয়ে যায় আলোর রেশ—আবার সেই অন্ধকার, স্তব্ধতা। থেমে থাকার বিষণ্ণতা।

শমিও নির্বাক হয়ে থেমে থাকতো। সূর্যোদয়ের ঈষৎ আলোর হঠাৎ ছোঁয়ায় তার একটু আনন্দ-ঘন হয়ে উঠলেও দিনান্তের অন্ধকার শমিকে ভারি বিষণ্ণ করে তুলতো। ভাবনায় ডুবে যেত তার সম্পূর্ণ সত্তা।

সে সব মুহূর্তে তাকেও যে কেউ করছে বারবার—তার মন-উজাড় করা ছত্রের জন্যে যে কারও মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। সুহাসের হঠাৎ স্তব্ধতা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে পথের নানা অন্তরায়কে। সে নিজে যখন আলো-ছায়ার প্রায় দিশেহারা, তার মন আশা-নিরাশায় অবিরত দোলায়মান তখনও শমি কিন্তু দূরে ব্যগ্র প্রতীক্ষিত আরেকটি অন্তরকে স্থিরভাবে অনুভব করে চলেছে। কিন্তু যা চাওয়া যায় তা কি সহজেই পাওয়া যায়?

শমি অবশ্য পেয়েছে। অনেক পেরিয়ে এসে পেয়েছে। আয় চাঁদ বলে কি চাঁদ আসে, বামন হয়ে চাঁদকে ছোঁয়ার কি অবাস্তব নয়? ঠিকই তাই। কিন্তু হলেও শমির বেলায় অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। তার রূপের আকর্ষণ তা সম্ভব করেছে। না হলে জজের ছেলে সামান্য একজন মেয়েকে বিয়ে করে কখনো।

সুহাসের সঙ্গে শমির পরিচয় অদ্ভুত এক পরিবেশে।

বুড়ো বাপের সঙ্গে নরসিংহ মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল কার্তিক পূর্ণিমার দিনে প্রতি বছর এই বসে হাজারীবাগ শহরের দক্ষিণে পাহাড়ের কোলঘেঁষা ঘনবনাঞ্চলের নরসিংহ স্থানে। বহু দূর-দূরান্তের থেকে ছেলেমেয়ে, জোয়ান-বুড়ো সব সব বয়েসের মানুষেরা পায়ে হেঁটে, চাকার পাহাড়ী গরুর গাড়ি চড়ে, টাট্টু

বসে চলে আসে এ মেলা দেখতে। শহর ও অনেকে আসে।

হাজারীবাগের লোকেরা অধিকাংশ বাসের হয়ে এলেও ওদের সকলকেই খালি পায়ে দী পার হয়ে মেলায় আসতে হয়েছে। মেলার চরিত্রই প্রায় একই রকমের। দেখবার কেনবার নানা জিনিস। শর্মি তার বাবার দেখতে দেখতেই এগিয়ে চলেছে। কেনা-ও করেছে কিছু কিছু। সস্তায় গাঁদা লর মালা এ মেলার এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কয়েক ছড়া কেনা হয়েছে। সেগুলো নিজেই তার হাতে রেখেছে।

হঠাৎ এক অধিক কণ্ঠে বারবার উচ্চারিত টা চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালো শর্মিলা। পেতে শুনলো, বলা হচ্ছে—"এক পয়সা মে কাত্তা শহর"। এক পয়সায় কলকাতা শহর ানো হচ্ছে, আর তাই দেখার জন্যে বেজায় মের এক ভীড় জমে গেছে সেখানে।

কিন্তু বাবা কোথায়?—ভীড়ের দিক থেকে খ ফিরিয়ে বাবার খোঁজ করতে যেয়ে শর্মিলা ৎকার! চমকে উঠে সে এদিকে ওদিকে কাতে থাকে, কিন্তু কোনো দিকেই বাবার ানো পাত্তা করতে পারে না সে। আর কোনো ায় না দেখে একবার সে এগিয়ে যায় নিকদূর পর্যন্ত। ডান-বাঁ করে কিছুক্ষণ র কিছুতেই কোনো ফল হয় না। এদিকে ধ্যা হয়ে আসছে। অজানা অচেনা জায়গায় ছদশী শর্মিলা ভয়ে আতঙ্কে কেঁদে ফেলে।

ঠিক সেই সময়েই মোড়ল গোছের এক ানীয় বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলছিল এক পরিচিত তরুণ। সাজসজ্জায় সে বিশিষ্ট। নো বনেদী উচ্চশিক্ষিত ঘরের ছেলে, শহর কে মেলা দেখতে এসেছে, দেখেই বৃদ্ধ ঝতে পেরেছেন। তাই যুবকের প্রশ্নের উত্তরে নি অতি সুন্দর ভাবে এই মেলার প্রাচীনত্ব কে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। বলছিলেন, "এ লা তো বহুৎ দিন কা পুরানা বাবুজী। লোগ যব বাচ্চা থে তব বাপ-দাদা (ঠাকুর্দা) শুনতে থে ইয়ে মেলা বহুৎ পুরানা।"

একথা বলবার সময়েই অদূরে ক্রন্দনরতা র্মিলার দিকে চোখ পড়েছে বৃদ্ধের। তাঁর মনে ন্দহ জেগেছে, কোনো অঘটন ঘটেছে বোধহয়। নি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়েই মেয়েটির কাছে ায়ে গিয়েছেন। তার খোঁজ-খবর নিয়ে যখন না গেল যে সে শহর থেকে বাবার সঙ্গে লা দেখতে এসে বাবার সঙ্গ-ছাড়া হয়ে ড়েছে, শহরে ফেরবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, তখন তাকে নির্ভয় দিয়ে যুবকটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সুহাসের সঙ্গে শর্মিলার সেই প্রথম রচয়।

দারুণ এক বিপদের দিনের পরিচয় বলেই তা অক্ষয় হয়ে আছে শর্মিলার। সুহাস শর্মিলাকে নিয়ে ঐ বৃদ্ধ সেদিন বেশ ক্ষণ ঘুরেছিলেন এদিক সেদিকে। মেলা তে এসে ভালো করে মেলা না দেখেই চলে মেয়েটি, বৃদ্ধের মনে এ চিন্তাটা বেজে ছিল। তিনি আরো ভাবছিলেম, বাপও তো র জন্যে ছটফট করছেন, চলতে চলতে র মধ্যে কোথাও বাপ-মেয়েতে দেখাও হয়ে তে পারে।

কিন্তু বৃদ্ধ ওদের সঙ্গে থাকা পর্যন্ত সে-দেখা হয়নি। গল্প করতে করতেই তিনি ওদের নিয়ে এগিয়ে চলছিলেন। বলছিলেন নরসিংহ স্থান মেলার আরম্ভের কথা।

তিনশ' বছরেরও বেশী পুরোনো এই মেলার গল্প ওরা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। ভারি আশ্চর্য লাগছিল ওদের সেই কাহিনী শুনে। রামগড় রাজের এক দীঘিতে হঠাৎ এক শিলামূর্তি ভেসে ওঠে, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই নরসিংহের সেই মূর্তি হঠাৎ আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায় রাজ্যময়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান পাওয়া যায় যে, সেই শিলামূর্তিই হাজারী-বাগের কাছে বানহা গ্রামের এক গভীর জঙ্গলে একটা পুকুরে কয়েকদিন ধরে ভেসে চলেছে। কথাটা রাজার কানে আসতেই মহাসমারোহে সেই নরসিংহ মূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন তিনি। দেবতার নিত্য পূজার জন্যে বাইশটি মৌজার ভোগস্বত্ব দিয়ে তিনি নিয়োগ করলেন এক পূজারীকে। সেই থেকেই এই কার্তিক পূর্ণিমা মেলার প্রচলন।

বিশদ ভাবে এই কাহিনীটি বলা শেষ করেই সুহাস এবং শর্মিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যান বৃদ্ধ। তাঁর সঙ্গীরা মন্দিরের সামনে নাকি অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। তাঁকে অনেকখানি পিছিয়ে যেতে হবে।

সে মন্দির দেখেছে শর্মিলা। তার বাবার সঙ্গে চলতে চলতেই দেখেছে। ছোট মন্দির। প্রবেশপথ তার আরো ছোট। আর সেখানে ঢোকবার ও বেরোবার জন্যে কী প্রচণ্ড হুড়ো-হুড়ি গুঁতোগুঁতি। তা দেখেই পাশ কাটিয়ে তারা চলে এসেছে।

বৃদ্ধ বিদায় নেবার পর সুহাসের পাশে পাশে চলতে সংকোচ বোধ করে শর্মিলা। তবু সে-ই প্রথম যেচে কথা বলে সুহাসের সঙ্গে। সদ্য পরিচিত এক যুবকের সঙ্গে বেশী রাতে বাড়ি ফেরা কারো চোখে পড়ে গেলে তা নিয়ে আবার কথা উঠবে, সেই ভয় থেকেই সে বলে, চলুন এবার ফেরা যাক, তা না হলে অনেক রাত হয়ে যাবে যে!

হলোই বা রাত, ভয়ের কি আছে? অন্তত আমার ভয় পাবার কোনো কারণ নেই, সত্যি সত্যি আমি ভদ্রলোকের ছেলে।

এ উত্তরে স্বভাবতই একটু লজ্জা পায় শর্মিলা। তবে উত্তরটা শুনে তার এটুকু জীবনের মধ্যেই দু-একটা ভদ্রলোকের ছেলের যে পরিচয় সে পেয়েছে সে ছবি হঠাৎ তার মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। সে-সব চেপে রেখে পাল্টা জবাবে সে বলে, ছিঃ, একথা আপনি বলছেন কেন? আমি বরং ভয় পাচ্ছিলাম, নরসিংহ দেবতার মতো আপনি আবার উধাও না হয়ে যান, তাহলেই আমি গেছি!

আমি তো দেবতা নই, মানুষ। জীবনে এই মানুষের পরিচয় দিতে পারলেই আমি খুসী। তার বেশী কিছুই আমি হতে চাই না।

কিন্তু আপনি তো আমার জীবনে এক চরম বিপদের মুহূর্তে দেবতার মতোই এসে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই আমার উদ্ধারকারীকে আমার পক্ষে দেবতা মনে করাই স্বাভাবিক।

যার যেমন ইচ্ছে সে তাই মনে করতে পারে
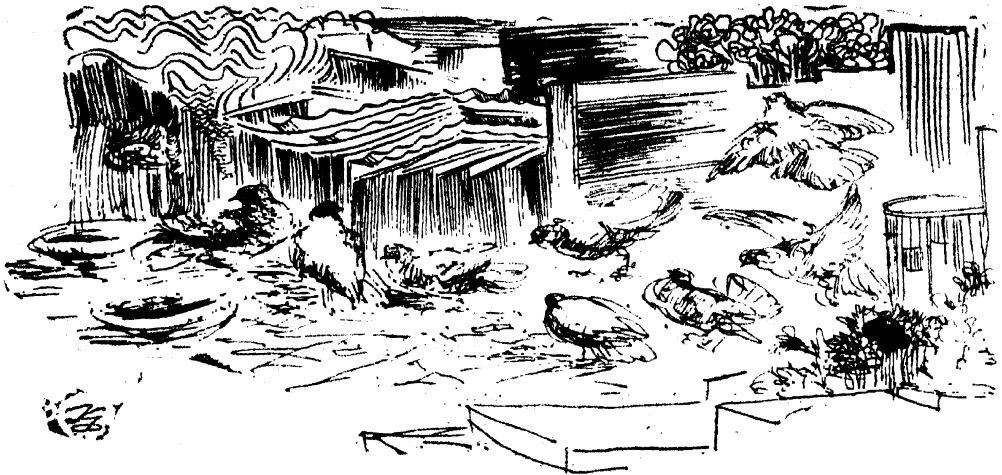
স্কেচ — কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

আমার সম্বন্ধে, কিন্তু আমি প্রকৃতপক্ষে যা, তা-ই।

সুহাসের মুখের কথা যখন শেষ হয়েছে তখন তারা একটা খুব উঁচু কাঠের মঞ্চের কাছে এসে উপস্থিত। সেই মঞ্চের গায়ে চটা ওঠা লম্বা একটা সাইন বোর্ড ঝোলানো—চিড়িয়াখানা। তাতে বাঁদর, ভালুক, সাপ—আরো কতো কতো সব জানোয়ারের আঁকা ছবি। আর সেই মঞ্চের ওপর গাল চোপ্‌সানো কামানো মুখের মিশকালো এক আধবয়েসী মিনসে লজ্জাবগুণ্ঠিতা বৌ সেজে শরীরটাকে নানা ভঙ্গীতে ভেঙে-চুরে হাত নেড়ে নেড়ে ঝাঁ ঝাঁ গলায় গাইছে, "অহো, মোহন নহি আয়ে, মোহন নহি আয়ে..."

গানের কথায় কেমন যেন একটু দোলা লাগে শর্মিলার মনে। সে একটু থমকে দাঁড়ায় সেখানে। সুহাসও তার পাশে। একটু চোখ ফিরিয়েই শর্মিলা চিৎকার করে ওঠে, ঐ যে বাবা, ঐ যে! ভীড়ের মধ্যে বাবার দিকে ছুটে যায় সে। তিনিও মেয়ের গলা শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরেন তাকে।

বাবার সঙ্গে শর্মিলা পরিচয় করিয়ে দেয় সুহাসকে। বলে, তুমি কোথায় হঠাৎ হারিয়ে গেলে ভীড়ের মধ্যে। ভাগ্যিস ভগবান একে জুটিয়ে দিয়েছিলেন, তা' না হলে যে কী হতো কে জানে। ইনিও শহরেরই লোক, হাজারীবাগ কলেজে পড়েন হোস্টেলে থেকে। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ইনিই নিয়েছিলেন।

সব শুনে সুহাসকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন শর্মিলার বাবা। তাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছিলেন সুযোগ সুবিধা মতো তাঁদের বাড়িতে একদিন আসবার জন্যে।

সুহাস সেদিন একই বাসে একই সঙ্গে ফিরেছিল হাজারীবাগে। শর্মিলারা একটু আগে নেমে পড়েছিল ওদের বাড়ির কাছাকাছি স্টপেজে, আর সুহাসকে একটা ফাঁকা মনকে বয়ে বয়ে নিয়ে টার্মিনাসেই নামতে হয়েছিল এবং সেখান থেকে সেই মনকে নিয়েই একটা রিক্সায় চড়ে একেবারে কলেজ হোস্টেলে।

শর্মিলার বাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা তার পরদিনই করেছিল সুহাস। সুযোগের অপেক্ষা না করে সে নিজেই সুযোগ করে নিয়েছিল। আসন্ন পরীক্ষার চিন্তা বা অন্যকিছু সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। তার পরেও সে আরো কয়দিন এসেছিল। আরেকটি মনও যে তখন 'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ' বলে ডেকে চলছিল অহরহ। আকাশের চাঁদ কোনোকালে কারো ডাকে সাড়া না দিলেও, পৃথিবীর চাঁদদের সাড়া পাওয়া যায় মাঝে মাঝে।

উঃ, কত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শেষপর্যন্ত সুহাস কিভাবে পুরোপুরিই তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল, ছাতে বসে একা একা সে কথাই ভাবছিল শর্মিলা।

ভালো ছেলে হাজারীবাগে বি, এস-সি পরীক্ষায় ভালোই ফল করেছিল সুহাস। তারপর কলকাতায় এসে বি, ই পাশ করেছে। তার মধ্যে বাবা-মার সঙ্গে সুহাস একবার মাত্র বেড়াতে এসেছিল হাজারীবাগে। শর্মিলাদের বাড়িতে তখন একদিন এক ফাঁকে ঘুরেও এসেছিল। সেবারই সুহাসদের পরিবারে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল সুহাস-শর্মিলার অন্তরঙ্গতার কথা। সমস্ত ব্যাপার শুনে সুহাসের বাবার জজের মেজাজ দাবাগ্নির মতো জ্বলে উঠেছিল। রেগে গিয়ে বন্দুকটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়েছিলেন চীৎকার করতে করতে, জজ সতীশ চাটুজ্যের ছেলে বিয়ে করবে কেরাণী মতি মালাকারের মেয়েকে? তার আগে অমন ছেলেকে একেবারে বিদায় করে দেবো না পৃথিবী থেকে!

জজের বিচারবুদ্ধি সেই মুহূর্তে সম্পূর্ণই লোপ পেয়েছিল। তাঁর বুদ্ধিমতী স্ত্রী সুলতা সেই বিপদে সবদিক রক্ষা করেছিলেন। তা' না হলে ব্যাপারটা কোন্ পর্যন্ত গিয়ে গড়াতো কেউ বলতে পারে না।

বি-ই পাশ করার পর সুহাসের বিয়ের কথা উঠলে মায়ের কাছে সে শর্মিলাকেই বিয়ে করবে আর নয়তো বিয়েই করবে না বলেছিল। জজ সাহেবের তখন অবসরজীবন, মেজাজ অনেক পড়ে গিয়েছে। স্ত্রীর মুখে থেকে স[...] জেনে তিনি বলেছিলেন, তা' ছেলে তোম[...] এখন স্বাধীন, সে এখন তার যা ইচ্ছে ত[...] করতে পারে। তবে তার কোনো ব্যাপারে আম[...] টেনো না, এটুকুই আমি চাই।

এমনি পরিবেশেই সুহাস তাকে বি[...] করেছিল। ভাবতে ভাবতে সে কথাটা ম[...] হতেই শিউরে উঠছিল শর্মিলা। আর ঠি[...] তখুনি দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে নে[...] আসতে হলো তাকে।

ঝি তৎক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছে। বাড়ি[...] ভেতর ঢুকেই সুহাস ডাকতে শুরু করে[...] শামি, ও-শামি শোনো, খুব ভালো খবর আ[...]

কী খবর?—প্রশ্ন তুলে এসে সামনে দাঁড়[...] শর্মিলা খুকুকে কোলে নিয়ে।

খুকুকে আদর করতে করতে হাস[...] হাসতে সুহাস বলে, আর টেম্পোরারী ন[...] এবার একেবারে পাকা চাকরি, রাজ্য সরকারে[...] ইঞ্জিনীয়ার। নতুন ইস্পাতনগরী দুর্গাপ[...] যেয়ে আমাদের থাকতে হবে।

খুব ভালো। কলকাতায় আমার মো[...] ভালো লাগে না। কবে যাবে দুর্গাপুরে? আনন্দে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করে শর্মিলা।

হ্যাঁ, শীঘ্গিরই যাবো। তবে তার আ[...] বসিরহাটের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্যে যে[...] হবে। মা তোমায় সেদিন লিখেছেন না, বা[...] এখন অনেক শান্ত হয়ে গেছেন, মাঝে মা[...] তাঁর নাতনীর কথা জানতে চান? তুমি খুকু[...] বাবার কোলে তুলে দিয়ে প্রণাম করবে আ[...] আমি প্রণাম করব আমার সরকারী পা[...] চাকরির কথা জানিয়ে। তিনি জল হয়ে যাবে[...] বাবা সরকারী চাকরি খুব ভালোবাসেন।

এই বলে খুকুকে নিজের কোলে তু[...] নিয়ে সুহাস খটখট করে দোতলায় উঠে গে[...] শর্মিলাও তার পিছে পিছে। ঝি খরাস ক[...] গেটের দরজাটা বন্ধ করে দিলে।

—
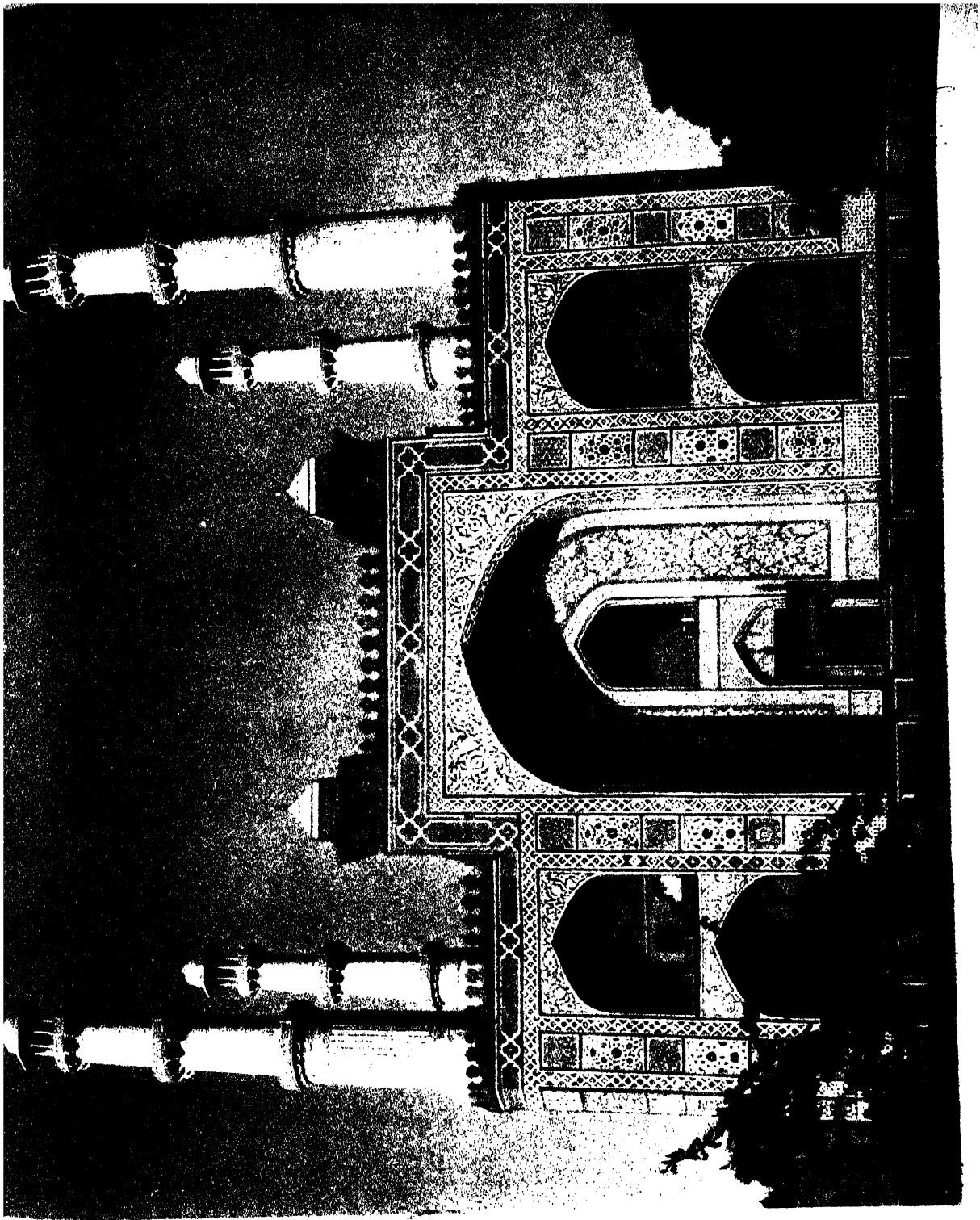
সেকেন্দ্রা
প্রভাতকান্তি ঘোষ

শীতের আমেজ

সাধন রায়

ছোটদের পাততাড়ি
পূজা সংখ্যা, ১৩৭১
স্বপন দেখি জোছনা রাতে ফুলপরীদের মেলা,
ঝরণাধারার পাশে চলে বন-হরিণের খেলা!
সকল দিকে হাসছে শুধু ফোটা ফুলের দল—
সপ্ত ডিঙায় নদীর পথে আসছে কেরে বল?
আকাশে আজ হাজার পাখী কি গান গেয়ে যায়?
ফুলপরীদের ভীড় জমেছে বকুলবনের ছায়!
হাজার রকম প্রজাপতির রঙেরই আলপনা—
শিউলী শুধু পড়ছে ঝরে—যায়না তারে গোণা!
শরৎকালের মধুর হাওয়া দোলায় কাশের রাশি—
পাততাড়ির এই সওদা নিলে বাজবে প্রাণে বাঁশী!
শুভার্থী
স্বপনবুড়ো

গজাননের জন্মকথা

যামিনীকান্ত সোম

গজানন অর্থাৎ শ্রীগণেশজীকে অবশ্য দেখেন সবাই।

এ'র সমস্ত শরীর জবাফুলের মত লাল, হাত হলো চারটি, বেশ ছোট-খাট ভুঁড়িটি—দেখতে বেশ ভালোই সব দিকে। কিন্তু মাথাটি? মাথাটি হলো একেবারে সাদা হাতীর মাথা। লাল শরীরের উপর সাদা হাতীর মাথা বেশ মানিয়েছে, দেখতেও চমৎকার।

গণেশজীকে তো কত জায়গায় দেখা যায়। মহাভারতের গোড়াতেই তিনি আছেন। তিনি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছেন আর একমনে মহাভারত লিখে যাচ্ছেন। চারটি হাতই খুব ব্যস্ত। আর মহাভারতের আখ্যান বলে যাচ্ছেন ব্যাসদেব নিজে। দুর্গাপুজোয় দেখা যায়, প্রতিমায় অন্য সব ঠাকুরের সংগে তিনিও বসে আছেন আর পুজো নিচ্ছেন।

কিন্তু গণেশের জন্মকথা খুবই বিচিত্র রকমের, আর এ'র মাথাটি অমনতরো হাতীর মাথা হলো কেমন করে সে গল্পও ভারি মজার। এ কিন্তু নিছক গল্প নয়, পুরাণের কথা, আর শুনতে ও খুবই সুন্দর।

গণেশের বাপ-মা হলেন শিব আর দুর্গা। শিব-দুর্গা থাকেন কোথায়? থাকেন কৈলাস পর্বতে। সে পর্বত এমন দুর্গম ও দুরারোহ যে, তার কাছ অবধিও এখন কেউ যেতে পারে না। দূর থেকে দেখা যায়, দুধের মতো ধব্‌ধবে সাদা খুব উঁচু এক পর্বত দাঁড়িয়ে রয়েছে একেবারে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে।

এই পর্বতে থাকেন শিব আর দুর্গা। দুর্গার সংগে থাকেন তাঁর দুই সখী জয়া আর বিজয়া। শিবঠাকুর সর্বক্ষণ ধ্যান-ধারণা নিয়েই মগ্ন থাকেন। তাঁরও আছে অনেক অনুচর, তার ভেতর নন্দী আর ভৃংগী হলেন প্রধান। শিবের বাহন হলো ষাঁড় আর মা দুর্গার বাহন সিংহ। সিংহে আর ষাঁড়ে কোন রকমের আক্‌চাআক্‌চি নেই। ঝগড়া-ঝাঁটি নেই। মিলে মিশে আনন্দে আর সুখ-শান্তিতে সবাই থাকে।

একদিন মা-দুর্গা বসে বসে ভাবছেন। ভাবছেন যে, তাঁর যদি একটি ছেলে হতো তো বেশ হতো। ভাবতে ভাবতে তিনি গিয়ে শিবঠাকুরকে সেই কথাটি বললেন। শিবঠাকুর খুব ভোলা-ভালা। তিনি বললেন—"ছেলে নিয়ে হবে কি? বেশ তো আছ। কি দরকার ছেলেপিলের?" এই বলে তিনি চুপ করে গেলেন। মা-দুর্গার মন থেকে কিন্তু ছেলের ভাবনাটা গেল না। তিনি শিবের কাছে বসে বসেই সে কথাটা ভাবছেন। শিবঠাকুর বুঝলেন তাঁর মনের কথা। শিবঠাকুর তখন চট্‌ করে উঠে গিয়ে, মা-দুর্গার একখানা টুকটুকে লাল রংয়ের কাপড় টেনে নিলেন। কাপড়টা টেনে নিয়ে সেটাকে বেশ করে এক পুঁটুলি পাকালেন। তারপর সেই লাল কাপড়ের পুঁটুলিটাকে মা-দুর্গার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন—"এই তোমার খোকা। কেমন, খোকা পেলে তো?" এই বলেই শিব চলে গেলেন সেখান থেকে।

মা-দুর্গা এক মনে ভাবছিলেন। এখন দেখলেন, একটা কাপড়ের পুঁটুলি রয়েছে তাঁর কোলের মধ্যে। শিবঠাকুর বলে গে সেটা খোকা। এ কি রকমের খোকা? পুঁটুলিটাকে তিনি নিয়ে নাড়তে লাগলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন—"খোকা কি রকমের খোকা!" তিনি নাড়ছেন আর ভাবছেন, ভাবছেন নাড়ছেন। এমন সময়, ও মা এ কি? পুঁটুলির হাত হলো, পা হ দেখতে দেখতে মাথা হলো, চোখ মুখ নাক কান সবই হলো। খোকাটা নড়ে উঠলো, হাত-পা ছুঁড়তে লাগলো।

অ্যাঁ, সত্যিই তো খোকা। "ও জয়া, ও বিজয়া—কো তোরা? শিগ্‌গির আয়। দেখে যা, আমার কেমন খোক জয়া-বিজয়া ছুটে এলো। সত্যি এই খোকা দেখে আহ্লাদে মাতোয়ারা। মা-দুর্গার মনে তখন কত যে আনন্দ। জবাফুলের লাল রংয়ের খোকা— হাত-পা ছুঁড়ছে, খেলা করছে।

তারপর জয়া গিয়ে শিবঠাকুরকে ডেকে আনলেন। শিবঠা আসতেই মা-দুর্গা তাঁকে বলছেন—"এই দেখ, কেমন সুন্দর খো তোমার দয়াতেই এটি পেলুম। একে তুমি একবার কোলে কোলে নিয়ে আদর কর।" শিবঠাকুর চেয়ে চেয়ে দেখলেন খোকাটির তারপর তিনি হাসিমুখে খোকাটিকে কোলে নিলেন। কোলে বলছেন মা-দুর্গাকে—"তোমার এই ছেলেটি অতি সুন্দর, চমৎকার। সব সুলক্ষণ দেখছি এই ছেলেটির। তবে—তবে এ বেশি দিন থাকবে না—থাকবে না"। এই বলে তিনি খোকা খুব আদর করতে লাগলেন। আদর করতে করতে কি হলো কে খোকাটির মাথাটি ছিল উত্তর দিক পানে, হঠাৎ খোকাটি মহা হাত ফস্‌কে পড়ে গেল মাটিতে। মাটিতে পড়ামাত্রই খোকাটির একেবারে আলাদা হয়ে গেল, আর তার প্রাণও গেল বেরি কি সর্বনাশ!

খোকার এই দশা দেখে মা দুর্গা কেঁদে উঠলেন বিজয়াও কাঁদতে লাগলেন। গোলমাল শুনে, নন্দী ভৃংগী প্র শিবের অনুচরেরাও ছুটে এলো। শিবঠাকুরের মূর্তিটি কিন্তু প্রশান্ত ও ধীর। তিনি মা-দুর্গাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—" চিন্তা নেই। এই ছেলে তোমার বাঁচবে—বাঁচবে। কি উপায়ে বাঁচ আচ্ছা, আমি তার উপায় করছি।" এই বলে তিনি নন্দীকে দিলেন—"দেখ নন্দী, তুমি এখনি চলে যাও। তুমি ঘুরে ফির উত্তর শিয়রে কে রয়েছে। উত্তর শিয়রে যে রয়েছে দেখবে, মাথাটা কেটে নিয়ে এস। তাহলেই এই ছেলেটি জীবন পাবে"

নন্দী বেরিয়ে পড়লেন তখনই—লম্বা এক ধারালো তলো নিয়ে। ঘুরলেন এ-দিক ও-দিক চতুর্দিক। কিন্তু উত্তর শি কাউকেই দেখতে পেলেন না। ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উপস্থিত হ ইন্দ্রের অমরাবতীতে। যাওয়া মাত্রই দেখলেন, ইন্দ্রের সাদা ধব ঐরাবত হাতীটি রয়েছে উত্তর শিয়রে। আর বলা নেই, কওয়া নে নন্দী একেবারে তলোয়ার উঁচিয়ে তার মাথাটা কেটে ফেললেন। অমনি সেই কাটা মাথাটা তুলে নিয়েই ছুট দিলেন কৈলাসের দি মহাগণ্ডগোল উঠলো। ইন্দ্র ছুটে এলেন, ব্যাপার দেখে তো হত ভীষণ রেগে গেলেন। দেবতারা হায় হায় করে উঠলেন। চীৎ উঠলো—"ধরো, ধরো ওকে" কিন্তু ঐ চীৎকারই সার। ন কোথায়? সবাই দেখলে, নন্দী নেই। নন্দী যেন চক্ষের নি গেলেন উধাও হয়ে।

ঐরাবতের মাথা নিয়ে শিবের কাছে হাজির হলেন নন্দ শিব মহাখুসী। মাথাটি নিয়ে তিনি ছেলেটির কাঁধে দিলেন বসি

।।এক ।।

প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর আগেকার কথা। মহীশূরের ংহাসনে সসম্মানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন টিপু সুলতান। য়দার আলীর সুযোগ্য সন্তান তিনি। শৌর্যে বীর্যে বিদ্যা-ন্ধিতে অদ্বিতীয়।

পিতার মৃত্যুর পর সুলতান মসনদে বসিয়া নির্ঝঞ্ঝাটে জা-শাসন করিতে লাগিলেন। ইংরাজরা ছিলো তাঁহার পরম ু। কয়েকবার যুদ্ধ এবং সন্ধি হইলেও তিনি ইংরাজদের দেশ তে তাড়াইয়া দিবার জন্য সবসময়ই যত্নবান ছিলেন। তা'ছাড়া পু মোটেই তাহাদের বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। তিনি লতেন : বণিকের জাত সাগরপাড়ি দিয়ে এসেছে, আমাদের নার ভারতের ধন-দৌলত লুটে নিতে, সুখশান্তি সব কিছু ট করতে। আমি আমার জীবন থাকতে এ-অন্যায়কে প্রশ্রয় তে পারবো না।

পূর্বেই বলিয়াছি ইংরাজদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহ গিয়া থাকিত। ইংরাজরাও সর্বক্ষণ টিপুকে জব্দ করিবার ত্তির খুঁজিয়া বেড়াইত। একদিন সে সুবর্ণক্ষণটি তাহাদের ছে অভাবনীয়ভাবে আসিয়া পড়িল। লর্ড কর্ণওয়ালিশ রহাট্টাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। থায় কোন্ পথে দুর্গ অবরোধ করিয়া রাজধানী শ্রীরঙ্গপট্টম অধিকার করা যায় তাহাও গোপনে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস। অতর্কিতে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। ইংরাজরা একজোটে মারহাট্টাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। সুলতান মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অপ্রস্তুত অবস্থায় স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়াই রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। কিন্তু ইংরাজ ও মারহাট্টাদের সম্মিলিত সৈন্যবলের কাছে তাঁর সৈন্যরা কতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে! সুলতানের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। পাহাড়ের কোলে অবস্থিত দুর্গগুলি ইংরাজরা দখল করিয়া তাহাদের বিজয় অভিযান সদম্ভে চালাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। টিপু প্রমাদ গণিলেন। পরাজয়ের আসন্ন গ্লানিতে তাঁহার মন ভীষণ নিপীড়িত হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া তিনি যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য ইংরাজদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। সুচতুর রণ-কুশলী ইংরাজ জাত মনে মনে তাহাই চাহিতেছিল। এবং তাহারা সেই সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলো। এইবার সেই সুযোগ তাহাদের কাছে বিস্ময়করভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল।

লর্ড কর্ণওয়ালিশ সানন্দে টিপুর সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং কতকগুলো সর্তের উল্লেখ করিয়া টিপুর কাছে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিলেন স্বাক্ষরের জন্য। সর্তগুলো ছিল এইরূপ : (১) আপনার অর্ধেক রাজত্ব আমাদের ছাড়িয়া দিতে হইবে। (২) ক্ষতিপূরণ ৩৩০ লক্ষ টাকা অবিলম্বে রাজকোষে জমা দিতে হইবে। (৩) দুই ছেলেকে ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে।

টিপু সুলতানের মতো একজন বীরের কাছে এইভাবে নতি স্বীকার পরাজয়েরই সামিল। তা'ছাড়া সবচেয়ে সর্তের মারাত্মক দিক প্রাণাধিক প্রিয় কচি কোমল ছেলে দুটিকে ইংরেজ সরকারের কাছে সমর্পণ। প্রজা সাধারণের মুখ চাহিয়া নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা না ভাবিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর এবং মোহরাঙ্কিত করিয়া টিপু যথাসময়ে উহা পাঠাইয়া দিলেন।

।। দুই ।।

সুলতানের দুই ছেলে। আবদুল খালেক ও মুজা-উদ্দিন। বড়টির বয়স দশ আর ছোটটির আট। দুইজনেরই বুদ্ধিদীপ্ত, প্রতিভা-ব্যঞ্জক চেহারা।

গভীর চিন্তার পর তিনি একটি মতলব ঠিক করিয়া ফেলিলেন নিজের ছেলেদের না পাঠাইয়া রাজ্যের অন্য দুইটি ছেলেকে রাজপোশাকে সুসজ্জিত করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তো আর তাঁর ছেলেদের দেখেন নাই। আসল-নকল কি করিয়া বুঝিবেন।

টিপু রাজ্যের উজীর এবং মন্ত্রণা-পরিষদের সভ্যদের মতামত চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সুলতানের রোষানলে পড়িবেন এই ভয়ে তাঁহারা কেহই মতামত প্রকাশ করিলেন না।

সকালবেলা। ভোরের আলো সবেমাত্র পৃথিবীর বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুলতান বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। এমনি সময় বড় ছেলে আবদুল খালেক পিতার কাছে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

সুলতান সস্নেহে পুত্রের চিবুকে হাত দিয়া বলিলেন : কী খবর আব্বাজান!

আবদুল বললে : আব্বা, আমাকে আর ছোট ভাইকে কবে ইংরেজের কাছে পাঠিয়ে দেবেন?

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

আশ্চর্য। ছেলেটি দেখতে দেখতে অমনি বেঁচে উঠলো। আর র রূপ হলো এমন মনোরম ও সুন্দর যে দেখলেই চোখ জুড়িয়ে । লাল জবাফুলের মতো শরীরের রং, তার উপর হাতীর সাদা া, খোকাটির নাম রাখা হল ভারি চমৎকার—নাম হল "গণেশ"।

আবার আনন্দের ঢেউ উঠলো। ছেলেটিকে কোলে নিলেন দুর্গা। তাঁর আহ্লাদের সীমা পরিসীমা নেই। খবর পেয়ে তারাও সব ছুটে এলেন ছেলেটিকে দেখতে : দেবগুরু বৃহস্পতি লেন। এসে ছেলেটির গলায় একটি যজ্ঞসূত্র পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ লেন। মাতা পৃথিবীও এলেন। তিনি ছেলেটিকে দেখে মহাখুশী। লেন—"আমি আশীর্বাদ করছি প্রাণভরে। আর আমার এই কটি একে আমি দিয়ে গেলাম, এটি এর বাহন হয়ে থাকবে।" যোনি ব্রহ্মা ছেলেটিকে দেখে আনন্দে একেবারে গলে গেলেন। ন আশীর্বাদ করে বললেন—"এই ছেলেটি অতি অপরূপ হয়েছে তে। আমি একে বারবার আশীর্বাদ করি। এই ছেলেটি সর্ব-াধার হবে, আর পুজো পাবে প্রথমেই, সকল দেবতার আগে।"

সকলেই জানেন যে, গণেশজী পুজো পান সকল দেবতারই গে।

গণেশের মনে মনে শখ—একটু সেজেগুজে মামার বাড়ী যায়। বরাবরই পুজোর সময় তার মা বাপের বাড়ী যান। তখন তাঁর সংগে যায় কার্তিক-গণেশ দু-ছেলে আর দু-মেয়ে লক্ষ্মী-সরস্বতী।

এক মাস আগে হ'তেই লক্ষ্মী-সরস্বতী এ-দোকান সে-দোকান ঘুরে হাল ডিজাইনের শাড়ি দেখতে থাকে, যা প'রে তাদের মামার বাড়ী যাওয়া চলবে। কার্তিকও প্যারাডাইজ-সেলুনে গিয়ে হপ্তায় হপ্তায় চুল কাটিয়ে স্যাম্পু করিয়ে রাখে, পমেটম মাখিয়ে গোঁফটিকে চোমড়ানোর ব্যবস্থা করে। নন্দন-কাননের সেরা দোকানীকে পায়ের সেলিম-স্যু আর গায়ের চুড়িদার পাঞ্জাবীর অর্ডারও দিয়ে আসে।

গণেশের কিন্তু ও-সব বালাই নেই, যখন যা জোটে তাতেই সই। মামার বাড়ী যাওয়ার সময় তার সম্বল কাঁধে ঝোলাবার একখানা উড়ানি, আর পায়ের একজোড়া চপ্পল।

বড়ছেলের এ-বেশ দেখে মায়ের মনে দুঃখ হয়। তাই তিনি লক্ষ্মী-সরস্বতী আর কার্তিককে ডেকে বললেন—'তোদের আক্কেলটা কিরে? নিজেরা তো বাহারী সাজসজ্জা ক'রে মামার বাড়ী যাস্। দাদার দিকে কারুরই লক্ষ্য নেই! দে না বড়-খোকাকে একটা জামা বানিয়ে আর এক জোড়া স্যু-জুতো কিনে এনে।'

মায়ের কথা শুনে লক্ষ্মী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—'জামা পরাতে চাও তুমি কাকে, মা? দাদার হাঁদা ভুঁড়ি, না, চাল রাখার সাতমণী একটি মট্‌কী। গজের মাপে কাপড় এনে কি ঐ মটকীখানিতে বেড় দেওয়া চলে! তার উপর মামার বাড়ী গিয়ে হরেক-রকম খাবার পেয়ে হাপুস্ হুপুস্ ক'রে দাদা যে-ভাবে পেটে ঠাসে তাতে জামা গায়ে থাকলে একবেলায়ই তা হবে ফর্-ফর্-ফরাৎ!'

সরস্বতীও লক্ষ্মীর সুরে সুর মেলালো। সে বলল—'শোনো কথা! দাদার পায়ে পরাতে হবে স্যু-জুতো! দাদার পা-দুখানি যে গোদা হাতীর পা-কেও হার মানায়! ফরমাস দিয়ে কিনে আনলেও হাঁটার সময় দুপ্‌দাপ্ ক'রে দাদার যে তুর্কী নাচন চলে তাতে মামার বাড়ী যাওয়ার পথেই সে-জুতো হবে ফট্-ফট্-ফটাস্!

গণেশ দাদা হ'লেও তার চাল-চলনের প্রতি কার্তিকের তেমন আস্থা নেই। তাই সুযোগ পেলে বড়ভাইয়ের উদ্দেশে মস্করা করতেও সে ছাড়ে না। বোনদের কথার পর কার্তিক বলল—'মা, দাদার যে-রকম বাবাজী-বাবাজী ধরণের গতরখানি তাতে উড়ানি আর চপ্পলেই তাকে মানায় ভালো। তবে ওর সংগে তালুতে যদি ফর্ ফর্ ক'রে ওড়ে একটা চৈতনচুট্‌কী তা হ'লে কার সাধ্যি তাকে গুরুঠাকুর ব'লে না মেনে পারে! চাই কি, মামা-মামীরাও হয়তো ওকেই ঠাকুর-কর্তা ভেবে ওর কাছে মন্তর নেবেন। তখন খ্যাটের তো কথাই নেই, [illegible] প্রণামী যা মিলবে, তাতে তোমার বড়ছেলের রোজগারেই আমাদের সারা বছরের সংসার চ'লে যাবে।'

কার্তিকের কথা শুনে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মুখেও আরো কথার তুবড়ি ছুটল।

লক্ষ্মী মুখ টিপে টিপে হেসে বলল—'ভাইটা বলেছে তো খাসা কথা। কিন্তু চৈতনচুট্‌কী গজাবে কোথায়? দাদার মাথাটা তো একটি কদবেল—কপাল থেকে ঘাড় পর্যন্ত চিচিংফাঁক!'

সরস্বতী ফোড়ন দিল—'আরে, সেজন্য চিন্তা কি! আজকাল মাথায় চুল গজাবার অষুধের অভাব কি? বিজ্ঞাপনও তো কতই দেখি—হ্যানো অষুধ মাখলেই মহিষাসুরের চাপ দাড়ি গজাবে গালে, ত্যানো অষুধ তালুতে ঘষলে উর্বশী মেনকার বেণী দুলবে মাথায়। ঐ রকম অষুধ এক বোতল জোগাড় ক'রে আনলেই তো কাজ হবে,—ফর্ ফর করে চৈতন চুট্‌কী উড়ুক না-উড়ুক মাথায় টেরিটাও তো কাটা চলবে!'

গণেশ মায়ের কাছে আসছিল। ভাই-বোনদের সমস্ত কথাই তার কানে গেল। তা শুনে সে ভাবল—তাই তো! ঠিকই তো ওদের কথা। আমার ন্যাড়া মাথায় চুল গজালে মামাতো ভাই-বোনদের উৎপাত হ'তেও আমি রক্ষা পাই। নইলে, মামার বাড়ী গেলেই তারা আমার তালুতে চটাং চটাং থাপ্পড় মারে আর গান গায়—

টেকো মাথায় টাক্‌টুক্,
চাঁটি লাগার ভারী সুখ।

...কিন্তু চুল গজাবার সে-অষুধ মেলে কোথায়? সেদিন হ'তে গণেশ তার খোঁজ করতে লাগল।

* * *

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

পিতা ভাবিলেন, বালক বোধহয় অজানা বিপদের আশঙ্কায় এইরূপ প্রশ্ন করিতেছে।

পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে তিনি বলিলেন : তোমাদের কোন ভয় নেই। আমি তোমাদের ঐ ধূর্ত ফন্দিবাজ ইংরেজদের কাছে পাঠাবো না। আমি ঠিক করেছি, তার বদলে এ রাজ্যের অন্য দুটি ছেলেকে পাঠিয়ে দেবো।

বালক পিতার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল। বড় বড় চোখ করিয়া সে বলিয়া উঠিল : সে হয় না বাবা! আমার বাবা কি কাপুরুষ—যে ইংরেজদের ভয়ে আমরা ভীত হবো।

এ কি ব্যবস্থা আপনি করতে যাচ্ছেন—আমাদের বদলে অন্য দুটি ছেলেকে পাঠালে কি রাজরক্তের অপমান হবে না! যদি ইংরেজরা এ-কথা জানতে পারেন, তাহ'লে সে-অপমান কী আপনার 'পর—বংশের 'পর বর্তাবে না। আপনি যে সর্ত মেনে নিয়েছেন, তার খেলাপ করবেন না।

আমাদের দু' ভাইকে আর কালবিলম্ব না করে ইংরেজদের কাছে পাঠিয়ে দিন। ইংরেজরা জানুক আপনি শুধু একজন বীর নন, কথা ও কাজে সত্যনিষ্ঠ।

পুত্রের কথায় পিতার চোখে-মুখে এক দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

একদিন যেতে যেতে পথে সে দেখে একখানা গরুর গাড়ীতে কতকগুলো বোতল। সেই গাড়ী নিয়ে যাচ্ছিল এক গাড়োয়ান। গাড়ীর বলদ-দুটীর গলায় ঘুঙুরের মালা, গাড়োয়ানের গলায়ও তাই। গাড়ী চলার তালে তালে যেমন বলদের গলার ঘুঙুর তেমনি গাড়োয়ানের গলার ঘুঙুরও বাজছিল ঝুমঝুম্।

গণেশ জিজ্ঞেস করল—'ও গাড়োয়ান, ওসব বোতলে কি নিয়ে যাচ্ছ, আর নিচ্ছই বা কোথায়?'

গাড়োয়ান জবাব দিল—'আচ্ছা আচ্ছা দাওয়াই আছে এ-বোতলে। মালিককে এ-সব দিতে নিয়ে যাচ্ছি।'

—কে মালিক, কোথায় তার মোকাম—গণেশ জানতে চাইলে গাড়োয়ান নিজের গলা দেখিয়ে দিয়ে বলল—'মালিকের নাম শুনেছেনই তো আমাদের গলার ঘুঙুরের ঝুম্‌ঝুম্-বাজনায়। এই রকম বাজনা শুনবেন যেখানে তার নোকর-বোকর গরু-মোষ আছে সব্বাইর গলার ঘুঙুরের শব্দে। তার নাম ঝুম্‌ঝুম্-আলা কিনা সেইজন্য তিনি ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছেন সকলের গলায়, যাতে তার ঝুম্‌ঝুম্ বাজনা শুনে মালিকের নামটাও মনে হবে।' ঝুম্‌ঝুম্-আলার মোকামের কথা বলতে গিয়ে গাড়োয়ান বলল—'আপনি কি মোলাকাত করতে চান মালিকের সঙ্গে? তবে আসুন না, আমিও তো যাচ্ছি তার মোকামেই এই সব দাওয়াই নিয়ে।'

গণেশ ভাবল—ঝুমঝুম্-আলার তো শুনছি অষুধের কারবার। একবার যেয়েই দেখি না তার কাছে। চুল গজাবার অষুধ হয়তো মিলতে পারে সেখানে। —এই ভেবে সে গরুর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ঝুমঝুম-আলার মোকামে গিয়ে উপস্থিত হ'লো।

ঝুমঝুম-আলা ঘরের মেঝেতে চাটাই পেতে উপুড় হ'য়ে শুয়েছিল। তার দু-পাশে দুজন জোয়ান-মরদ ব'সে তার হাত-দুখানি দলাই-মলাই করছিল। সে লোক-দুটিরও গলায় ঘুঙুর। তাদের হাতের কসরতের তালে তালে গলার ঘুঙুরও বাজছিল—ঝুম্‌ঝুম্।

গাড়োয়ান ঝুমঝুম্-আলাকে চিনিয়ে দিল। গণেশ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—'আপনার কি অষুধের কারবার, মশাই?'

ঝুমঝুম্ আলা বলল—জী। কোন্ কোন্ ব্যামারীর দাওয়াই চাই হাপনার বলুন। বিলকুলই মিলবে।'

গণেশ মাথার চুল গজাবার অষুধ চাইতে ঝুমঝুম-আলা বলল—'আজ ওয়ার্ডার দিয়ে যান। কাল ফজীরেই এসে নিয়ে যাবেন।'

গণেশ ঝুমঝুম-আলার কাছে এক বোতল চুল গজাবার অষুধের অর্ডার দিয়ে এলো।

পরদিন অষুধ নিয়ে গিয়ে ঝুমঝুম-আলার কথামত রাতের ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় মাথায় ঘষে ঘুমিয়ে রইলো।

ভোরে ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে গণেশের মহাফ্যাসাদ! তার শোবার বালিশটী কিসে যেন ল্যাটা মাছের মত তার মাথায় লেপ্‌টে রয়েছে। ঘুমের ঘোরে সে হয়তো এপাশ ওপাশ করছিল, তাতে বালিশের খোল ছিঁড়ে ভেতরকার তুলো বেরিয়েও তার মাথায়-নাকে-মুখে-গালে আটকে পড়েছে!

ব্যাপারটা শুনেই লক্ষ্মী-সরস্বতী দাদার ঘরে ছুটে এলো। এসে তার মুখের দিকে চেয়ে এক বোন হাসে—হিঃ হিঃ! আর এক বোন হাসে হাঃ হাঃ!

ঝুমঝুম-আলার ব্যবসা ছিল ভেজালের। চুলের দাওয়াইর নাম ক'রে সে গণেশের কাছে বেচেছিল এক বোতল আলকাতরা। সেই আলকাতরার উপর ছেঁড়া বালিশের তুলো আটকে প'ড়ে গণেশকে দেখতে হয়েছিল যেন একটি হোঁদল-কুৎকুৎ!

গণেশ ভাবল—মামার বাড়ী গেলে লক্ষ্মী-সরস্বতী কি সকলকে এ গল্প না ক'রে ছাড়বে? মামাতো ভাই-বোনরা তখন তার টাকে চাঁটি মারতে মারতে হয়তো নতুন ছড়া কাটবে। তাই সে ঠিক করল—নাঃ, এবার আর মামার বাড়ী যাবে না।

* * *

এই গণেশটি কি দুর্গাদেবীর পুত্র সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুর? আরে রামো! ও-তো ও-পাড়ার রকবাজদের গণ্‌শা যাদের সঙ্গে চব্বিশঘণ্টার দহরম-মহরম তারা তার মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে গোবর-গণেশও বলে। গণেশ পুজোর দিনে জন্ম ব'লে তার বাপ-মা নাম রেখেছিল গণেশ। সেই নামেরই মান বাড়িয়ে তার মামা-মামীরা আদর ক'রে ডাকে—গণেশচন্দোর।

কার্তিক আর লক্ষ্মী-সরস্বতীই বা দুর্গাপুজোর সময়ে ঠাকুর-দেবতা হ'তে যাবে কেন? এই গণেশেরই সোদর ভাই-বোন তারা। লক্ষ্মীর জন্ম লক্ষ্মীবারে, সরস্বতীর জন্ম সরস্বতী পুজোর সময়ে, কার্তিকের জন্ম কার্তিক মাসে, তাই তাদের নাম কার্তিক, লক্ষ্মী আর সরস্বতী।

হাতটায় কি হইল—ডান হাত! কেমন যেন... অর্থাৎ ব্যথা ঠিক নয়, কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য! এমন তো কখনো হয় নাই। আজ বিশ-বাইশ বৎসর এই হাতে কলম পিষিতেছি। তার পূর্বে এই হাত লইয়াই স্কুলে অংক কষা—ছুটির দিনে পরের বাগানে ঢুকিয়া......

গেলাম ডাক্তারের কাছে। পাড়ার ছেলে। সদ্য পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। রোগ হইলে ভয়ে এখনো তার কাছে কেহ ঘেঁষে না! এখনো শতমারী হওয়া দূরের কথা, একমারীও হইতে পারে নাই।

ছোকরা ডাক্তার বলিল জিভ দেখি।

দেখাইলাম। তারপর ছোকরা আমায় ওঠ-বোস করাইয়া হাত-খানা ধরিয়া উঠাইল নামাইল, বাঁকাইল। যেন বেউড় বাঁশ পাইয়াছে! শেষে বলিল রক্ত একজামিন করিতে হইবে।

তার মানে পয়সা! সরিয়া পড়িলাম।

তারপর হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। গলির মোড়ে ডিসপেন্সারী ভদ্রলোক যেন আমারি ধ্যান করিতেছিলেন। পাইবামাত্র লুফিয়া লইলেন।

বলিলেন, কি খপর।

বলিলাম—হাত... এই ডান হাত!

তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—যেন চীনা পটকার বাঁধা বাণ্ডিলে কালীপুজোর রাত্রে অগ্নিসংযোগ।

কয়েকটি প্রশ্ন মনে আছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজ পর্যন্ত কত পান খাইয়াছি, রাত্রে ঘুমাইয়া পাশ ফিরি কবার?

ঘুমাইলে আমার নাক ডাকে কিনা? এক মাসের মধ্যে ক'মাইল হাঁটিয়াছি? পাড়ায় ক'ঘর ব্রাহ্মণের বাস? ট্রামে এক মাসের মধ্যে কেমন সব লোকের পাশে বসিয়াছি? তিন বছরের মধ্যে কত মাইল হাঁটিয়াছি? বছরে কতবার হাই তুলি? ইত্যাদি ইত্যাদি!

কোনোটার জবাব দিলাম,—কোনোটার উত্তরে বলিলাম, জানি না। মনে নাই।

তিনি ঔষধ দিলেন, বলিয়া দিলেন, ঔষধ খাইতে খাইতে এক দিন সারিতে পারে। না সারে, দুঃখ কি? জীবনের মেয়াদ তো প্রায় চুকাইয়া আনিয়াছি।

পথে আসিতে দেখা হইল বটকৃষ্ণর সঙ্গে।

কহিল—কি হে খপর কি?

মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া বলিলাম—হাত। ডান হাত।

বটকৃষ্ণ বলিল—কি হইয়াছে?

কহিলাম—তা ঠিক বুঝিতেছি না। তবে হাতখানা ঠিক আগেকার মতো নাই।

বটকৃষ্ণ কহিল—আমারো অমন হইয়াছিল। হাত...ডানহাত... আচ্ছা হাত চুলকায়?

চিন্তা করিয়া কহিলাম,—না।

বটকৃষ্ণ বলিল—ঠিক। আমারো চুলকাইত না। আচ্ছা ভারী জিনিষ তুলিতে পারো?

কহিলাম—তুলিয়া দেখি নাই।

বটকৃষ্ণ মহা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, কহিল—ঠিক। আমি কখনো ভারী জিনিষ তুলিবার চেষ্টা করি নাই। আচ্ছা হাত মুড়িয়া রাখিলে কষ্ট বোধ করো, না হাত ঝুলাইয়া রাখিলে?

কহিলাম—দুই অবস্থায়ই সমান।

বটকৃষ্ণ কহিল—আর কিছু বলিতে হইবে না। গত বৎসরের কথা। ঠিক বর্ষার পরে। কি জানো? বর্ষায় হাতে স্যাঁতানি ধরে! ইহা হইতেই বাত। শীত পড়িলেই......ও খুব দেখা আছে। এর-তার কাছে যাইও না। আমি অনেক ডাক্তার দেখাইয়াছি, কোনো ফল হয় না। শেষে...

বটকৃষ্ণ তখনি সামনের মুদির দোকান হইতে কাগজ পেন্সিল চাহিয়া একটা নাম ঠিকানা লিখিল। লিখিয়া কাগজখানা আমার হাতে দিয়া বলিল,—বংশীবদন কবিরাজ। এ রোগে ইনিই একমাত্র ধন্বন্তরি। এখনই যাও।......কাজ?......না, আগে হাত? না, আগে কাজ? হাত থাকিলে তবে তো কাজ করিবে?

ভাবিলাম, কথাটা সত্য। চোখের সামনে সারা পৃথিবী কুণ্ডলী পাকাইয়া দারুময় জগন্নাথ মূর্তিতে রূপান্তরিত হইতেছিল।

শ্রীপতির সঙ্গে দেখা। দু'চারিটা কথার পর বলিলাম হাতের কথা। বটকৃষ্ণর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বংশীবদন কবিরাজের কথা বলিলাম।

শুনিয়া শ্রীপতি চমকাইয়া উঠিল, একটা ঝঙ্কার দিয়া বলিল—রামচন্দ্র! হাত! পুরুষ মানুষের হাত তাও ডান হাত! আনাড়ির কাছে সেই হাত সঁপিয়া দিবে—তার চেয়ে কালীঘাটে গিয়া হাড়কাঠের মধ্যে হাতখানা গুঁজিয়া দাও না! খবর্দার! শোনো আমার কথা। আমার ভাই......ছোট ভাই শচীপতি—তারো ঠিক এমনি হইয়াছিল। চোখে দ্যাখো, হাতে কোনো গোলযোগ নাই—কিন্তু ঐ যে বলিলে, যেন কেমন কেমন... স্পষ্ট বুঝা যায় না! ইহাই রোগ! চেতলায় আছেন শঙ্কর ডাক্তার—পাশ করা নন; কিন্তু অনেক পাশ করা ডাক্তারের গলা কাটিয়া দিতে পারেন। এমন শক্তি। তাঁর ঔষধে শচীপতি সারিয়া উঠিল। হাতে এখন ক্যায়সা জোর। বোধহয়, একটি ঘুষিতে ডাব ভাঙ্গিতে পারে।

উৎফুল্ল স্বরে কহিলাম,—ডাব ভাঙ্গিয়াছে? শ্রীপতি বলিল—ভাঙ্গে নাই। তবে পারে, বোধহয়।

শঙ্কর ডাক্তারের ঠিকানা টুকিয়া লইলাম বংশীবদনের নাম লেখা কাগজে—সে নামের পাশে। শ্রীপতি চলিয়া গেল।

রবিবারের দিন। ভূধরের সঙ্গে দেখা।

ভূধর বলিল,—মাংস কিনিতে চলিয়াছি। বলিল, আছো কেমন?

বলিলাম —ডান হাত যাইতে বসিয়াছে।

ভূধর বলিল—তার অর্থ?

অর্থ খুলিয়া বলিলাম। ভূধর বলিল,—কোনো ঔষধের কাজ নয়! কামারডাঙ্গায় আছে একবুড়ী। বুড়ীর বয়স নব্বুই বছর। শনিবার রাত্রে বুড়ী দেয় জলপড়া......অব্যর্থ! কামারডাঙ্গায় যাও ......সামনের শনিবারে রাত ঠিক দশটার সময়।

ভূধর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দু'পা অগ্রসর হইয়াছি, হাতে এক ভাঁড় দই রতিনাথের সঙ্গে দেখা।

কথায় কথায় হাতের কথা উঠিল। শুনিয়া রতিনাথ কহিল,—অমার পিসিমা......তাঁর হইয়াছিল ঐ রোগ......কিছুতেই সারে না। শেষে জানো, বীডন স্কোয়ারে আছেন চৈতনচাঁদ ...অবধূত? ফু'য়ের জোরে সে হাত সারাইয়া দিল। পিসিমা থাকেন পশ্চিমে—বড় জাঁতা ঘুরাইয়া প্রত্যহ আড়াইসের গম ভাঙ্গিয়া আটা বাহির করেন। জাঁতা ভাঙ্গা আটা—সেবারে বড়দিনের সময় পিসির কাছে গিয়াছিলাম—সে আটার রুটি খাইয়া আসিয়াছি। রুটি তো নয়—ভিটামিনের বস্তা। এ নামটিও সেই বংশীবদনের কাগজের কোণে টুকিয়া লইলাম।

রতিনাথ চলিয়া গেল। দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম, করি কি? কোথায় কার কাছে যাই? রবিবার নইলে চিকিৎসারও অবসব মেলে না......

এমন সময় সামনে আসিয়া উদয় হইল কামাখ্যা।

কুশল প্রশ্ন করিবামাত্র হাতের কথা উঠিল। শুনিয়া কামাখ্যা কহিল—এ রোগ এবারের বর্ষায় দেখা দিয়াছে। আমার খুড়ো মশায় এগারো বৎসর দু'পায়ে বাত লইয়া এমন কাতর হন নাই, যেমন হইয়াছেন এবারে তাঁর ডান হাত লইয়া। কত চিকিৎসা করানো হইল—রোগ সারে না; শেষে টালায় আছেন অবিরাম মোক্তার...তাঁর মাসিমার এক স্বপ্নাদ্য ঔষধ......ধন্বন্তরি! কাহারো কথা তুমি শুনিও না ভাই, সোজা টালায় চলিয়া যাও!

অবিরাম মোক্তার। পুলের ওপারে গিয়া যার কাছে নাম বলিবে, সেই তোমাকে বাড়ী দেখাইয়া দিবে। আমি চলিলাম —বাজারে পায়রা কিনিব।

হাতের সেই অস্বাচ্ছন্দ্য। ট্রামের পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চিন্তার সীমা নাই। সকলেই বলে ধন্বন্তরি! সেকালে ধন্বন্তরি ছিলেন একজন! কিন্তু আজ এই একটু অবসরে এক নয়, বহু ধন্বন্তরির পরিচয় মিলিল! এতগুলির মধ্যে কোন্ ধন্বন্তরির শরণ গ্রহণ করি!

ভাবিলাম, গৃহে ফিরিয়া একবার ভাবিয়া চিন্তিয়া ...বৈকালেই না হয় যাওয়া যাইবে! এতদিন রোগ ভোগ করিতেছি—না হয় আর এক বেলা ...

গৃহে ফিরিলাম। ফিরিয়া দেখি এক অতিথি... মামাতো ভাই হরেন।

হরেন বলিল,—চলো মাছ ধরিতে যাই। ঢাকুরিয়ায় ভালো পুকুর পাইয়াছি। মাছ ধরার সখ চিরদিন। আজ কাল পুকুর আর কেহ ছাড়িয়া দিতে চায় না; অব্যবসায়ী বাঙ্গালীর মাথায় ব্যবসা-বুদ্ধি গজাইয়া উঠিয়াছে।

ওবারামারগাও !

নামটা বোধহয় তোমরা কেউ কেউ শুনেছো। আল্পস্ পাহাড়ের উত্তর দিকে জার্মাণীর দক্ষিণ সীমান্তে একেবারে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এই 'ওবারামারগাও' গ্রাম। একেবারে তুলি দিয়ে আঁকা ছবির মতো সুন্দর এই গ্রামখানি। তোমরা হয়ত ভাবছো যে, জার্মাণীর সুখ্যাত সব ভাল ভাল শহর থাকতে আমরা কেন আল্পস্ পাহাড়ের গায়ে এই অখ্যাত অবজ্ঞাত ছোট্ট গ্রামখানাতেই আগে এলুম ?

বলছি সে-কথা। আমরা অনেকদিন আগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মুখে এই গ্রামের গল্প শুনেছিলুম। প্রতি দশ বৎসর অন্তর এই গ্রামের অধিবাসীরা সবাই মিলে প্রভু যীশু খৃষ্টের জীবন-নাট্য অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনয় করেন। এই নাটক অভিনয়ের জন্য এ'রা দীর্ঘ এক বৎসর ধরে প্রস্তুত হয়। এই এক বৎসর গ্রামবাসীরা সবাই অত্যন্ত শুদ্ধাচারে জীপনযাপন করেন। কেউ কোনও অন্যায় কাজ করেন না, মিথ্যা কথা বলেন না, ঝগড়া-বিবাদ করেন না। বাইবেলে যীশুর যে-দশটি উপদেশ আছে, তা ও'রা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবার চেষ্টা করেন। কারণ, যীশুর জীবন-নাট্য অভিনয় তাঁদের কোনো সখের আমোদপ্রমোদ নয়।

এর একটা করুণ ইতিহাস আছে। প্রায় তিনশো পঁয়ত্রিশ বছর আগে এই গ্রামে একবার ভীষণ মড়ক দেখা দিয়েছিল। প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই কেউ-না-কেউ 'প্লেগে' আক্রান্ত হয়ে দু'-একদিনের মধ্যেই মারা পড়ছিল। চিকিৎসা করেও কোনো রোগীকেই বাঁচানো যাচ্ছিল না। সারা গ্রাম জুড়ে ঘরে-ঘরে শোকের কান্না ও হাহাকার উঠেছিল। এই সময় একজন ধর্মপ্রাণ লোক ঈশ্বরের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করতে করতে আকাশবাণী শুনলে যে, তোরা যদি গ্রামশুদ্ধ সবাই মিলে প্রভু যীশু খৃষ্টের জীবন-নাট্য শুদ্ধমনে, পবিত্রচিত্তে পুণ্যব্রত পালনের মতো অভিনয় করিস, তাহলে তোদের এ-বিপদ কেটে যাবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে সবাই ভগবানের নামে মানত্ করে ভক্তিভরে শুরু করে দিলে প্রভু যীশু খৃষ্টের জীবন-নাট্য অভিনয়ের আয়োজন করতে। আশ্চর্যের বিষয় যে, প্রথম অভিনয়ের পরই দেখা গেল, গ্রামে মড়কের মহামারী বন্ধ হয়ে গেছে! তারপর থেকেই প্রতি দশ বছর অন্তর এ'রা পরম ভক্তিভরে এই অভিনয় করেন। এ যেন এখন তাঁদের গ্রামের এক অবশ্যকরণীয় জাতীয় ব্রতধর্ম পালনে পরিণত হয়েছে।

প্রভু যীশু খৃষ্টের এই জীবন-নাট্য অভিনয়কে বলা হয় "প্যাশন প্লে"। এমন প্রাণস্পর্শী হয় এ'দের এই অভিনয় যে, পৃথিবীর দেশ-দেশান্তর থেকে বহু নর-নারী আসেন এ'দের এই অভিনয় দেখবার জন্য। কবিগুরুর মুখে এ'দের এই অভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনবার পর থেকে আমাদের মনে মনে একান্ত সাধ হয়েছিল যে, যদি কখনো ইউরোপে যাবার সুযোগ ঘটে, তবে এমন সময়ে যাবো, যাতে এই 'প্যাশন প্লে' দেখতে পাই।

ভগবানের দয়ায় সে-সুযোগ আমাদের এসে গেল। পৃথিবীর সমস্ত লেখক-লেখিকাদের একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে, তার নাম 'পি-ই-এন', অর্থাৎ 'PEN'—'p' হল 'পয়েট' এবং প্লে-রাইট'দের আদ্যাক্ষর, 'E' হল Essayist আর 'N' হল 'নভেলিস্ট'। সুতরাং, বুঝতেই পারছো যে, 'পি-ই-এন' আর কিছুই নয়, 'কবি', 'নাট্যকার', 'প্রাবন্ধিক' ও উপন্যাস লেখকদের একটি সম্মিলিত সংঘ। পৃথিবীর সমস্ত নামকরা বড় বড় লেখক-লেখিকা এর সদস্য। প্রতি বছর এক-এক দেশে এ'দের 'নিখিল বিশ্ব লেখক সম্মেলন' বসে। সেবার এই সম্মেলন হয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা শহরে। আমরা ভারতবর্ষের লেখক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে এই সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়েছিলাম ১৯৫০ সালে, আর সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেই সময়েই দীর্ঘ সতেরো বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ওবারামারগাও গ্রামে জার্মাণীর ভুবনবিদিত 'প্যাশন প্লে' বা 'প্রভু যীশু খৃষ্টের জীবন-নাট্য' আবার অভিনয় শুরু হয়েছিল।

এ-সুযোগ কি ছাড়া যায়? আমরা ছুটলুম জার্মাণীর দিকে। যেতে যেতে ভাবছি 'ওবারামারগাও' নামটা কেমন যেন উদ্ভট আর রহস্যময়। গ্রামটি না-জানি কেমন? কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি—বাঃ! চমৎকার! আল্পস্ পর্বতের ঢালু প্রান্তে বনশ্রীমণ্ডিত সুন্দর গ্রামখানি। শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ। এখানে অধিকাংশই কাঠের বাড়ী। কোনোটি একতলা। কোনোটি দোতলা। সব বাড়ীর সঙ্গেই ছোট-বড় এক-একখানি বাগান রয়েছে। ফলে-ফুলে ভরা। গ্রামবাসীরা যুবা-বৃদ্ধ-নারী সবাই প্রায় শিল্পী আর কারিগর। ছোটখাটো ব্যবসাও কেউ কেউ করেন।

আমরা অস্ট্রিয়ার ইনস্ব্রুক শহর হয়ে ওবারামারগাও গ্রামে এসেছিলুম। এইটেই নাকি সহজ পথ। এখান থেকে সোজা বাসে চড়ে আসা যায়। সারাদিন পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে ঘুরে ঘুরে কত বিচিত্র দৃশ্য আর লোকালয় পার হয়ে চলেছিল আমাদের যাত্রীপূর্ণ বাসখানি। অবিস্মরণীয় সেই তীর্থযাত্রা। হ্যাঁ, ভগবানের লীলাভিনয় হয় যেখানে, আমরা ভারতবাসী আমাদের কাছে সে-স্থান পবিত্র তীর্থ বই কি! বাসখানি আমাদের নিয়ে একবার উপরে উঠে যায় আবার তর-তর করে নিচেয় নামতে শুরু করে। পাহাড়ের পর পাহাড়ের বুক চিরে ঘন অরণ্যের ভিতর দিয়ে ছোট-বড় কত শৈলমালা ও পার্বত্য উপত্যকার গিরিসংকট পার হয়ে কত নদনদী ঝর্ণা ও হ্রদের ধার দিয়ে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত ছাড়িয়ে, জার্মাণ সীমানায় এসে প্রবেশ করলুম। দু' জায়গাতেই আমাদের 'পাসপোর্ট' ও 'ভিসা' বা অনুমতি-পত্র ও ছাড়পত্র পরীক্ষা হল।

'ওবারামারগাও' গ্রামের মধ্যে এসে যখন নামলুম, হঠাৎ মনে হল যেন দু'হাজার বছর আগের সেই বাইবেলে বর্ণিত 'জেরুজালেম' 'ন্যাজারেথ' অথবা 'বেথেলহেম' জনপদে এসে পড়েছি। শুধু বইয়ের

কোনো মতে মাথায় জল ঢালিয়া মুখে অন্ন গুঁজিয়া হরেনের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে ফিরিলাম। ধন্বন্তরির কাছে আর যাওয়া হইল না। না যাই, সারাদিন ছিপ হাঁকরাইয়া হাতটা যেন......

বাঃ......সে কেমন কেমন ভাব আর নাই তো!

আপনারা বলিতেছেন —মাছ?

না, মাছ পুকুরে আছে,......মনে হইল।

মাছ ধরিতে যায় অনেকে—কিন্তু ক'জন মাছ ধরিয়াছে, বলিতে পারেন?

মাছ না ধরি, ছিপ চালাইয়া আমার ডান হাত সারিয়া গিয়াছে।

পাতায় আর ছবির ভিতর দিয়ে যে-দেশের সঙ্গে হয়েছিল আমাদের অস্পষ্ট পরিচয়, সহসা মনে হল তা যেন আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই কাঁচাপাকা অজস্র ফল-ভরা আপেল, পিয়ার্স আর দ্রাক্ষালতায় আচ্ছন্ন অর্ধচন্দ্রের মত গ্রামখানি। বিচিত্র রং-করা কাঠের বাড়ীগুলির দেওয়ালে নানা বর্ণের চিত্র অংকিত। এখানে প্রায় প্রত্যেক পথের বাঁকে বাঁকে ও কোনো কোনো বড় গাছের গুঁড়ির গায়ে হয় একটি ক্রুশ, নয়ত ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতিমূর্তি স্থাপিত রয়েছে। দেখে মনে হল আমাদেরই শুধু বদনাম দেয় এরা পৌত্তলিক বলে, কিন্তু নিজেরা এ কি করেছেন? ক্রুশ নিয়ে এই বাড়াবাড়ি অনেকটা বলিদানের হাঁড়িকাঠ কাঁধে নিয়ে নাচানাচির মতো মনে হয় যেন। 'ধর্মোন্মাদনা' একেই বলে বোধহয়।

ওবারামারগাওয়ে ঢুকে দেখি, এ-গ্রামের মুটে-মজুর, পাণ্ডা (গাইড), দোকানদার সরাইখানার মালিক রিক্সাওয়ালা ট্যাক্সী-ড্রাইভার, খবরের কাগজ বিক্রী করছে যারা সবাই সেই ইজরায়েলের য়িহুদীদের মতো মাথায় বাবরি চুলের ঝাঁকড়া আর লম্বা দাড়িগোঁফ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! দেখে খুব অবাক লাগলো। ইউরোপে তো সবারই ছাঁটা-চুল আর দাড়িগোঁফ চাঁচা দেখি! এ-দেশটা কি তবে ইউরোপের বাইরে? মেয়েদের দেখি, সবার এক ঢাল সোনালি এলো চুল পিঠে ঝুলছে, কারু ববড্-হেয়ার বা শিংগেল-করা চুল নয়। আর পরনে সেই বাইবেলের যুগের মতো ঢিলেঢালা সর্বাঙ্গ ঢাকা জেরুজালেমী ঝোলা গাউন!

এখানে এসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল গাঁয়ে একটি জার্মাণ শিল্পী পরিবারের বাড়ী। এ-বাড়ীটি দোতলা কাঠের বাড়ী। এ-বাড়ীর গঠনসৌন্দর্য আর রং-চং দেখলেই বোঝা যায় এঁরা সৌখীন লোক। এ-বাড়ীরও পুরুষ আর মহিলাদের দাড়িগোঁফ, চুল আর পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হল এঁরা নিশ্চয় য়িহুদী। হিটলারী নাজী দলের য়িহুদী-নিধন যজ্ঞের ভয়ে আল্পস্ পর্বতের কোলে এই নিরালা গ্রামে লুকিয়ে বাস করছে।

আমাদের পথের সঙ্গিনী একটি মেয়ে বললে, 'না, না! এঁরা কেউ 'জ্যু' নন, এঁরা সবাই 'খাঁটি জার্মাণ খৃষ্টান!' যীশুর জীবন-নাট্য অভিনয় করবার জন্য ব্রতী হয়ে এঁরা বালক-বৃদ্ধ-যুবক—সকলেই এক বছর দাড়িগোঁফ আর চুল রাখেন। 'প্যাশন প্লে' অভিনয়ে এঁরা কেউ পরচুল ব্যবহার করেন না কিনা। প্রত্যেক গ্রামবাসীকেই এই অভিনয়ে যোগ দিতে হয়। শুনে মনে পড়লো আমাদের দেশেও যাঁরা গাজনে সন্ন্যাসীর ব্রত গ্রহণ করেন, তাঁরাও এই রকম একমাস ধরে পূজা, উপবাস, গঙ্গাস্নান ও হবিষ্যান্ন ভোজনে ধর্ম-জীবন যাপন করেন।

আমরা যে বাড়ীখানিতে উঠেছিলুম, তার নাম 'মাটির ঘর' (Land hans) কিন্তু বাড়ীখানি আগাগোড়া কাঠের তৈরি। কাঠের সিঁড়ি, কাঠের বারান্দা, কাঠের দেয়াল আর দরজা-জানলা তো কাঠেরই হয়। ওবারামারগাও গ্রামের সব বাড়ীগুলি, দোকানপাট, উপাসনা-মন্দির সমস্তই বেশ সুন্দর ও শিল্পরুচিসম্মত। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এই গ্রামের খুব কাছেই মিউনিক শহর। নাজী-দের প্রধান আস্তানা ছিল সেখানে। কিন্তু এ-গ্রামে তারা ঢোকেনি। তাজেই গ্রামটি অক্ষত আছে।

আমাদের বাড়ীর কর্ত্রী আমাদের খুব আদর-যত্ন করে রেখেছিলেন। বাড়ীর কর্তা তাঁর দুই ছেলে এবং মেয়ে-জামাই সবাই প্যাশন প্লে'-তে অভিনয় করছেন। অভিনয় দেখবার প্রবেশপত্র এঁরাই আমাদের সংগ্রহ করে দিলেন। আমরা অনেক চেষ্টা করেও কোথাও টিকিট পাইনি। যেখানে যেখানে গেছি, সব জায়গাতেই এক কথা শুনেছি। বড়ই দুঃখিত! টিকিট আর নেই। সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে। কিন্তু এঁরা যে দিতে পারলেন তার কারণ আগে টিকিট কিনে রেখেও অনেকে সেদিন আসতে পারেন না। সেই সব খারিজ টিকিট এখানে এলে পাওয়া যায়। আমরা সেই ভরসাতেই এখানে এসে হাজির হয়েছিলুম। ভগবানের দয়ায় আমাদের আশা পূর্ণ হয়েছিল। যিনি টিকিট এনে দিলেন, তিনি বললেন, কাল সকালে ৮টার মধ্যেই প্রাতরাশ সেরে অভিনয় দেখতে চলে যাবেন। ঠিক সকাল সাড়ে ৮টায় অভিনয় আরম্ভ হবে এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টায়। মধ্যে দু'ঘণ্টা মধ্যাহ্নভোজনের জন্য বিরাম।

আমরা রাত্রে আহারাদি সেরে সকাল সকাল শুয়ে পড়েছিলুম। পাহাড়ের কোলে গ্রাম। ভীষণ ঠাণ্ডা। কনকনে শীত। ওঁরা ঘরে কাঠের আগুন করে দিয়ে গিয়েছিলেন তাই রক্ষে। নইলে কাঁপুনি ধরে যেত। সারাদিন বাসে এসে শরীর ক্লান্ত ছিল। লেপের ভিতর ঢুকতেই এক ঘুমে রাত কাবার। গির্জার ঘণ্টাধ্বনিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, ঘড়িতে ৬টা বেজেছে। আমরা উঠেছি জেনে গৃহস্বামীর মেয়ে 'ইলাইজা' এসে বলে গেলেন 'বেলা ৭টার মধ্যেই প্রাতরাশ তৈরি থাকবে। ৮টার মধ্যে খেয়ে বেরিয়ে পড়বেন।' গির্জায় এত ভোরে ঘণ্টা বাজছে কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, প্রতিদিন ভোরে অভিনয়ে যোগ দেবার আগে আমরা সবাই গির্জায় জড়ো হয়ে প্রার্থনা করি যেন অভিনয়ে আমাদের কোনো ত্রুটি না হয়।

যথাসময়ে আমরা অভিনয়মণ্ডপে গিয়ে হাজির হলুম। বিরাট প্রেক্ষাগার। ছ'হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে অভিনয় দেখতে পারেন। প্রত্যেকটি আসন টিকিটের নম্বর অনুসারে সংরক্ষিত থাকে। সুতরাং আমাদের অভিনয় দেখার কোনও অসুবিধা হয়নি। বেশ ভাল সীটই পেয়েছিলুম। স্টেজের সামনেই ৪নং সারিতে মাঝামাঝি আমাদের সীট নির্দিষ্ট ছিল। রঙ্গমঞ্চটিও বিশাল। ৫০-৬০ জন অভিনেতা-অভিনেত্রী একসঙ্গে মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে অভিনয় করতে পারেন। পারেন কেন, করছেনও দেখে এলুম। প্রেক্ষাগারের মাথার ওপর ছাউনি আছে বটে কিন্তু রঙ্গমঞ্চের মাথার ওপর কোনও আচ্ছাদন নেই। পিছনেও কোনো পটভূমিকা নেই। একেবারে খোলা। ফাঁকা পিছনে সত্যিকার পাহাড়-জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। আঁকা সীন নয়। দেখা যাচ্ছে আকাশ, মেঘ। কখনো রোদ্র এসে পড়ছে, কখনো এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সেই ক্ষণবর্ষণে ভিজতে ভিজতেই অভিনয় করে যাচ্ছেন।

অভিনয় দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। এত স্বাভাবিক ও সুন্দর যে, মনে হচ্ছিল যেন আমরা সেই দু' হাজার বছর আগের জেরুজালেমে এসে পড়েছি এবং যীশুকে নিয়ে সে-যুগে যা-কিছু ঘটেছিল, তা যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করছি। সেই গাধার পিঠে চড়ে মেরী ও যোশেফ। অশ্বপৃষ্ঠে বর্মচর্মধারী রোমান সৈন্যদল। সেই য়িহুদী পুরোহিত 'কায়ফাস' সেই বিশ্বাসঘাতক অর্থলোভী 'জুডা' আর সেই মহাপ্রাণ দিব্যমানব যীশু, সকলেই যেন জীবন্ত রূপে দেখা দিয়েছেন। মুগ্ধ মোহাভিভূতের মতো সেই ছ'হাজার দর্শক নিঃশব্দে সারাদিন সে-অপূর্ব অভিনয় দেখলেন। অভিনয়ান্তে যখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে এলুম, মনে হল যেন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠলুম।

তোমরা যদি বড় হয়ে কেউ কখনো জার্মাণীতে এসো, তবে এই 'প্যাশন প্লে' দেখে আসবার জন্য 'ওবারামারগাও' গ্রামে অতি অবশ্য যেও।

কবি নজরুল ইসলামের
অপ্রকাশিত কবিতা

সারস পাখী! সারস পাখী—
আকাশ-গাঙের শ্বেত-কমল!
পুষ্প-পাখী! বায়ুর ঢেউ-এ
যাস্ ভেসে তুই কোন্ মহল?
তোরে ময়ূর-পঙ্খী করি'
পরিস্থানের কোন্ কিশোরী
হাল্‌কা পাখার দাঁড় টেনে যায়?
নিম্নে কাঁপে সায়র-জল।
গগন-কূলে ঘুম ভেঙে চায়
মেঘের ফেণা অচঞ্চল!

দীঘির তীরের কুমুদ-কুঁড়ি
রাঙা চরণ মৃণাল তোর!
তুলতে এসে চমকে ওঠে
মাঠের রাখাল খল্-কোমর।
পালক-মুকুল পাপড়ি খুলি'
যাস উড়ে তুই লহর তুলি'
খোকা ভাবে চাঁদ উড়ে যায়,
চাঁদ ভাবে তুই ফুল-চকোর।
চক্ষুতে তোর জল ঢেলে দেয়
নীল যমুনার মেঘ-কিশোর।

কমল-শাখার মীড়-খসা ফুল!
দুলবি রে তুই কণ্ঠে কার?
দিগ্‌বালিকার মুক্তামালা,
ভাদর-দীঘির চন্দ্রহার!
আকাশ-খুকির রূপার ঘুঙুর!
যাস্ নেচে তুই ঝুমুর ঝুমুর,
তমাল ভাবে শুভ্র ময়ূর,
ময়ূর ভাবে মেঘ-তুষার।
দিবা-শেষের বিদায়-বাণী,
আনন্দ-গান শ্বেত-ঊষার॥

আব্দুল আজীজ আল্ আমানের সৌজন্যে

চোখ গেল

মন্মথ রায়

[একাঙ্কিকা]

[তেলকলের মালিক পশুপতি সাধুর একমাত্র পুত্র গণেশের পড়ার ঘর। গণেশ তাহার সতীর্থ বন্ধু কার্তিকের সহিত গোপন আলোচনারত। রুদ্ধ দ্বার। সন্ধ্যা।]

কার্তিক।। আমি বলছি হ্যাঁ।

গণেশ।। হতেই পারে না।

কার্তিক।। কি হতে পারে না?

গণেশ।। তুমি যা বলছ।

কার্তিক।। বটে?

গণেশ।। হ্যাঁ।

[দ্বারে করাঘাত শোনা গেল]

গণেশ।। আঃ, কে?...... এখন নয় পরে এসো।

[কার্তিককে] তোমার কথার প্রমাণ কি?

কার্তিক।। প্রমাণ তুমি।

[দ্বারে পুনরায় করাঘাত।]

গণেশ।। নাঃ জ্বালালে দেখছি।

[বিরক্ত গণেশ দরজা খুলিয়া দিতেই আর এক সতীর্থ বন্ধু অমলের প্রবেশ।]

গণেশ।। একি! অমল তুমি!

অমল।। হ্যাঁ আমি। কার্তিকও আছিস দেখছি। গণেশাকে তেল দিচ্ছিস।

কার্তিক।। মানে?

অমল।। মানে গণশাকে তেল দিয়ে ওদের তেলকল থেকে সরষের তেল নিতে এসেছিস তো? আর কেনই বা আসব না! সরষের তেলের যা 'ক্রাইসিস' চলছে—আধ মাইল লাইনে দাঁড়িয়েও তেল মিলছে না—যাওবা মিলছে তাও ভেজাল জ্যলজ্যান্ত বিষ। কালো বাজারের তেল কেনা সে আমাদের সাধ্যে কুলোয় না। কাজেই ভরসা এখন তুই গণশা। দু কেজি ছাড় ভাই বাঁধা রেটে নগদা নগদি।

গণেশ।। দেখ অমল, তেলের ব্যবসাটা আমার বাবার। আমার নয়।

অমল।। আরে তোরই তো বাবা—আর বাবারই তো তুই। তেল অভাবে হেঁসেল বন্ধ। মাকে বলে এসেছি ভেবো না মা, যখন রয়েছে গণশা, তখন রয়েছে ভরসা। না ভাই, দু কেজি ছাড়তেই হবে আজ।

গণেশ।। কি বিপদ!

অমল।। ক্লাস ফ্রেন্ড হয়ে এইটুকু হেল্প তুই করবি নে গণশা?

কার্তিক।। না করবে না।

অমল।। তোমার এইফোঁপর দালালী কেন ফ্রেন্ড? তুমি কি ওর পার্টনার? নাকি তোমার ভাগে ভাগ বসাচ্ছি?

গণেশ।। তেলের জন্য কার্তিক আসে নি। ও এসেছে আর একটা কাজে। আমার যা বলবার বলেছি। তুমি এখন এসো দেখি।

অমল।। তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

গণেশ।। কি বিপদ! দেখ দেখি ভাই কার্তিক।

অমল।। দে—আমার গলা ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দে—তবে যাবো। সো-জা কথা তেল না নিয়ে আমি যাব না। এই আমি বসলাম।

গণেশ।। ভালো হচ্ছে না অমল।

অমল।। ডাক্ দারোয়ান, ডাক্।

কার্তিক।। কেন এই ঝামেলা করছিস অমু। খবরের কাগজে পড়িস নি, সরষের তেল খাওয়াই এখন বিপদ ডেকে আনা। প্রায় সব সরষের তেলই আজ ভেজাল—সরকারী পরীক্ষায় ধরা পড়েছে মারাত্মক সব বিষ মেশানো। শেয়ালকাঁটার বীজ, আরো সব এমন বিষ—যাতে পেটের গোলযোগ হয়ে প্রাণ যেতে পারে, অন্ধ করে দিতে পারে। এই বিষ না খেলেই নয়?

অমল।। তার মানে তুই বলতে চাইছিস গণেশদের পশুপতি মিলের তেলও ভেজাল, ঐ বিষ?

কার্তিক।। পশুপতি মিলের কথা আমি বলছি না। সরকারী পরীক্ষায় যেটুকু জানা গেছে আমি তাই বলছি।

অমল।। সরকার কি পশুপতি মিলের নাম করেছে?

কার্তিক।। আমি এখনো শুনিনি।

গণেশ।। কি করে একথা উঠছে আমি বুঝছি না। পশুপতি মিলের তেল তো আমরাও খাচ্ছি। একদিনও তো অসুখ-বিসুখ করে নি কারো।

কার্তিক।। আমার মনে হচ্ছিল তোমরা তেল হয়তো খাওই না। মজুরা খাও ঘানির তেল।

গণেশ।। না। কি জানি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি কোন দিন।

অমল।। আরে বাবা পশুপতি শিব ঠাকুরের নামে মিল। তার তেল কখনো ভেজাল হতে পারে! অনেক পুণ্যে সে তেল মেলে। গণশা যখন দোস্ত সে পুণ্যি আমাদের আছে। কি বলিস ভাই গণশা—?

গণেশ।। তুমি বেরুবে কি না বল—

অমল।। যা ইচ্ছে বলো, কানে দিয়েছি তুলো; মারতে হয় মারো পিঠে বেঁধেছি কুলো। তেল না নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

কার্তিক।। আচ্ছা। অমু, বিশুকে দেখেছিস?

অমল।। কোন বিশু?

কার্তিক।। আমাদের ফুটবল চ্যাম্পিয়ান?

অমল।। তার কি যেন অসুখ করেছে। এবার লীগে তো খেলেনি।

কার্তিক।। কাছেই তো বাড়ি। একবার গিয়ে দেখে আয় তো অমু আছে। ততক্ষণ গণশার সঙ্গে আমার গোপন কথাটা সেরে নি।

অমল।। আমি যাই, আর তুমি তেল নিয়ে খসে পড়ো!

কার্তিক।। কথা দিচ্ছি অমু, তুই ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এখানে থাকবো। কেমন গণশা?

গণেশ।। বেশ।

অমল।। কথা দিচ্ছ?

গণেশ।। হ্যাঁ, দিচ্ছি।

অমল।। মতলবটা ঠিক বুঝছি না।

কার্তিক।। মতলবটা আর কিছু নয়। গণশার সঙ্গে আমার একটু গোপন কথাবার্তা আছে। তাই তোকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দিতে চাই। কাছেই বিশুর বাড়ি তাকে একবার দেখে আয়। বেচারীর অসুখ, আমরা খোঁজ খবর নেই নি। এই উপলক্ষে সেটাও হয়ে যাক্। হাজার হোক্ বিশু আমাদের চ্যাম্পিয়ান, তার লাইফটা সত্যিই ভ্যালুয়েবল নয় কি?

অমল।। কথা দিচ্ছ আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমরা থাকচো।

কার্তিক।। কথা দিচ্ছি।

অমল।। ফিরে এসেই আমি তেল পাচ্ছি।

কার্তিক।। [হাসিয়া] আচ্ছা—আচ্ছা, তাও আমি দেখব।

অমল।। ও-কে! রাইট্ ও!

[অমল চলিয়া গেল।]

গণেশ।। বাব্বা! কাঁঠালের আঠা! হ্যাঁ, তারপর?

কার্তিক।। বিশু যদি অন্ধ হয়ে যায়, তার জন্য দায়ী তুমি।

গণেশ।। বাঃ দায়ী আমি!

কার্তিক।। তবে কে?

গণেশ।। তুমিই বলছ আগে থেকেই সে চোখের অসুখে ভুগতো।

কার্তিক।। সেটা মারাত্মক কোন অসুখ ছিল না। যাকে চোখ ওঠা বলে, তাই। চিকিৎসা হচ্ছিল। এর মধ্যে সরষের তেলের এই সঙ্কটে, সে তোমাকে এসে ধরে—দু কেজি তেলের জন্য।

গণেশ।। ঠিক্ অমল যেমন আজ এসে ধরেছে। একেবারে নাছোড়বান্দা। তেলের ক্রাইসিসটা তখনো এতটা ছিল না। আমাদের মিলে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে ধরে দু কেজি সরষের তেলের একটা টিন ওকে কিনে দি আমি।

কার্তিক।। কদ্দিন আগে?

গণেশ।। তা মাসখানেক হবে।

কার্তিক।। আর এই মাস খানেকের মধ্যেই বিশুর চোখের অসুখ বাড়তে বাড়তে আজ চরমে এসেছে। রোজ ঐ তেলের রান্না খেয়ে।

গণেশ।। আমাদের মিলের তেল ভেজাল নয়।

কার্তিক।। আমি বলছি ভেজাল। মারাত্মক বিষ আছে ওতে।

গণেশ।। তুমি বললেই হবে না। আজ পর্যন্ত কেউ একথা বলে নি। আমাদের মিলের তেল করপোরেশনের পরীক্ষায় পাশ। বাবা নিজে আমাকে বলেছেন।

কার্তিক।। কিন্তু বিশুর ডাক্তার বিশুর চোখের ঐ অবস্থা দেখে সন্দেহ করেন তোমাদের ভেজাল সরষের তেলই এজন্য দায়ী।

গণেশ।। করুন গিয়ে। আমাদের তেলটা তিনি এক্সপার্ট দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন?

কার্তিক।। গভর্ণমেন্ট এনালিস্টকে দিয়ে তিনি পরীক্ষা করিয়েছেন দাদার।

গণেশ।। এনালিস্ট কি বলেছে?

কার্তিক।। বলেছে মারাত্মক রকমের ভেজাল ঐ তেল। ওতে যে বিষাক্ত জিনিষ মেশানো হয়েছে অন্ধ করে দেবার শক্তি রাখে তা।

গণেশ।। কিন্তু সে তেল যে আমাদেরই তেল, তার কি প্রমাণ আছে?

কার্তিক।। সে টিনটা তোমাদেরি মিলের।

গণেশ।। সে টিনে অন্য কোন দোকানের তেলও তো রাখা যেতে পারে। হয় তো আমাদের তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল, অন্য দোকান থেকে তেল এনে ঐ টিনেই রাখা হয়েছিল।

কার্তিক।। আমিও তা বলেছিলাম। কিন্তু বিশুর মা বলছেন তা নয়। তিনি জানেন বিশু তোমার বন্ধু। উপকার হবে বলেই তুমি বিশুকে তেল দিয়েছিলে। তোমাদের অপকার হতে পারে জেনে তিনি মিথ্যা বলবেন কেন।

গণেশ।। হুঁ। বিশুর মাকে আমি জানি। খুবই স্নেহ করেন আমাকে।

কার্তিক ।। কিন্তু তুমি তোমার বাবাকে কি ভালো করে ানো?

গণেশ ।। মানে?

কার্তিক ।। ভেজাল সরষের তেলের ব্যবসা চালিয়ে এত লোকের র্বনাশ করবার মতো লোক কি তিনি?

গণেশ ।। আমি জানি না। না, আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি রে না কার্তিক।

কার্তিক ।। কিন্তু এটা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়?

গণেশ ।। না—না, তা হ'তে পারে না। বাবাকে আমি দেবতার াতো ভক্তি করি।

কার্তিক ।। কিন্তু আজ-কাল যা দিন পড়েছে, আদর্শ বলে কিছু নেই। অর্থলোভ এত বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে দেবত্ব তো দূরের কথা মনুষ্যত্বও গেছে। নইলে, তোমার বাবা লক্ষপতি। তাঁর তো টাকার অভাব ছিল না। তবে কেন তিনি এই মানুষমারী ব্যবসায়ে হাত দিয়েছেন?

গণেশ ।। তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন প্রমাণ হয়ে গেছে যে বাবা এই অপরাধ করেছেন।

কার্তিক ।। কিন্তু প্রমাণ হতে আর দেরি নেই গণশা।

[অমলের প্রবেশ]

অমল ।। সর্বনাশ!

কার্তিক ।। কি?

অমল ।। বিশু একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললো—আমার চোখ গেল ভাই, চোখ গেল। বললো অমু, গণশাকে জিজ্ঞেস করে আয়, আমি তাদের কি সর্বনাশ করেছিলাম যে তাদের ভেজাল তেল খাইয়ে এমন করে আমার চোখ দুটি কেড়ে নিল।

[নিস্তব্ধতা]

গণেশ ।। আমি বিশ্বাস করি না—বিশ্বাস করি না যে আমাদেরই মিলের তেলে—

[ভৃত্য রামুর প্রবেশ]

রামু ।। [গণেশকে] দাদাবাবু!

গণেশ ।। কি? কিরে রামু?

রামু ।। সর্বনাশ। শীগ্গীর এসো।

গণেশ ।। কি হয়েছে?

রামু ।। একপাল পুলিশ এসে কর্তাবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে। মিলের সব তেলের টিন লরীতে তুলছে। কর্তাবাবু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

গণেশ ।। ম্যানেজার বাবু? ম্যানেজার বাবু কোথায়?

রামু ।। পুলিশ তাঁকেও গ্রেফতার করেছে। কর্তাবাবু তোমাকে ডাকছেন। শীগ্গীর।

[নিস্তব্ধতা]

গণেশ ।। গিয়ে বল আমি যাব না। যদি বিচারে তাঁরা বেকসুর খালাস পান তবে আবার দেখা হবে। নইলে এ জীবনে আর দেখা হবে না।

[গণেশ ঘর হইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। বিস্মিত কার্তিক ও অমলের চোখের উপর যবনিকা নামিল।]

—যবনিকা—

ছোটদের পাততাড়ি

রুমানিয়ার উপকথা

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

অনেক—অনেকদিন আগের কথা—

এক গাঁয়ে থাকতো এক চাষী। তার নাম ছিল সাইমন। তার একটি গাধা ছিল। গাধাটার নাম ছিল গ্রিগর।

একদিন সাইমন গ্রিগরের গলায় দড়ি বেঁধে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। তখন দুটো লোক তাকে দেখে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করলো। তারপর, তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ গিয়ে গ্রিগরের গলার দড়িটা খুলে নিজের গলায় বাঁধলো। আর অন্য লোকটা গ্রিগরকে নিয়ে দিলে ছুট।

সাইমন এসব কিছুই জানতে পারলো না। সে তেমনি চলেছে। গলায় দড়িবাঁধা লোকটাও চলেছে তার পিছু পিছু। খানিকদূর যাবার পর লোকটা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

এদিকে দড়িতে টান পড়ায় সাইমন মনে করলো, গাধাটা বুঝি দাঁড়িয়ে পড়েছে। সে অমনি পিছন ফিরে দেখে, গ্রিগর নেই, কিন্তু তার জায়গায় রয়েছে একটা লোক।

তাই দেখে লোকটাকে জিগ্যেস করে, "তুমি কে? আমার গাধা কৈ?"

লোকটি বলে, "আমিই সেই গাধা। লেখাপড়া করতাম না বলে আমার মা আমায় এক সাধুর কাছে নিয়ে যান। তিনিই আমায় গাধা করে দেন। আর বলেন যা করেছিস্ তার জন্যে যেদিন তোর মনে অনুতাপ জাগবে সেদিনই তুই মানুষ হবি। আজ তোমার সঙ্গে চলতে চলতে হঠাৎ আমার বাড়ির কথা মনে পড়লো আর যা করেছি তার জন্যে অমনি অনুতাপ জাগলো। তারপরই দেখি, মানুষ হয়ে গেছি। আমার মাকে দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আমি চললাম।" এই বলেই সে গলার দড়ি খুলে এক দৌড়ে হাওয়া হয়ে গেল।

আর, বোকা সাইমন তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো।

পরদিন সকালে সাইমন হাটে গেল আর একটা গাধা কিনতে। সে দেখলে, হাটে আর সব গাধার সঙ্গে তার গ্রিগরও বাঁধা রয়েছে। সে আস্তে আস্তে গ্রিগরের কাছে গিয়ে তার কানে কানে বললে "আবার তুমি এমন কি অন্যায় কাজ করেছো যার জন্যে সাধু তোমায় গাধা বানিয়েছে? তোমায় কিনতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু কি করবো? তুমি আবার যে কোন সময়ে মানুষ হয়ে যেতে পারো। বারে বারে গাধা কেনার টাকা তো আমার নেই। তবে একথা না বলে থাকতে পারা যায় না যে, তুমি আমার খুবই অনুগত ছিলে।"

এই বলে সাইমন গ্রিগরের কাছে আর দাঁড়ালো না, অ একটা গাধা কিনে নিয়ে বাড়ি গেল।

তার পর দিন যায়। সাইমন তার গাধাটার কাছে বসে ব ভাবে, তার আগের গাধাটার কথা। ভাবতে ভাবতে তার চো জল আসে। তার ধারণা, তার গাধা গ্রিগর সত্যি মানুষ ছিল।

খোকার সাধ

অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

দখিন জোছনায় সবুজ পাতায়া দোলে
আকাশের বুকে অনেক অনেক তারা।
সূয্যি এখন কোথায় গেছে মা চলে
কোথায় পড়েছে তাহারি আলোক ধারা।

মাঝি-মাল্লারা চলেছে নৌকো বেয়ে
ওদের গানেতে ঢেউ ওঠে দুলে দুলে।
পালগুলো কাঁপে থামালো বাতাস পেয়ে
দাঁড় টেনে টেনে কোথা যায় পাল তুলে।

ইচ্ছে হয় মা ওদের মতন আমি
তরী নিয়ে যাই দূর হোতে বহু দূরে।
বালুকা বেলায় নির্জনে একা নামি
ছায়া বীথিকায় বিরলে বেড়াবো ঘুরে।

জলের প্রণালী পেরিয়ে নৌকা নিয়ে
আমি যাবো মাগো অজানা দ্বীপের বুকে
আদিবাসীদের কাছে সদা গিয়ে গিয়ে
কত না গল্প করবো মনের সুখে।

পাখীর বাসার সন্ধান নিয়ে নিয়ে
বুকে করে নেব রং বেরঙের ছানা।
ঝিঁঝি ডাকা পথে মন্থর পায়ে গিয়ে
মৌমাছিদের মৌচাকে দেব হানা।

ফল পেড়ে পেড়ে গাছের তলায় একা
খাবো বসে আর বাজাবো বাঁশের বাঁশী।
তোমাদের সাথে হবে না আমার দেখা
সেথা ঘর বেঁধে হবো মাগো পরবাসী।

চোর পুরাণ

শ্রীবীরেন্দ্রলাল ধর

মিকা

আমাদের দেশে পুরানো কাহিনী নিয়ে 'পুরাণ' লেখা য়েছে অনেক। পৃথিবীর জন্ম থেকে সুরু করে নানা দেবদেবীর হিনী আর রাজা-রাজড়ার কথা তাতে আছে। তবে সে-সব ড়দের জন্য লেখা। ছোটদের জন্য যে কখনও কোন পুরাণ লেখা য়েছে, সে-কথা কেউ জানতো না। জানালো একদল গাঁজাখোর।

ই গাঁজাখোরের দল গাঁয়ের বাইরে এক পুরানো গাছতলায় বসে জা খেতো। কিন্তু শান্তিতে তারা গাঁজা খেতে পারতো না, ছের উপর ছিল পাখীর বাসা, পাখীরা বড় উৎপাত করতো। কদিন গাঁজাখোররা ঠিক করলো, পাখীর বাসাগুলো আগে ভেঙে দেবে, তারপর গাঁজা খাবে। দলপতি গাছে উঠলো, একটা খীর বাসা ভাঙতে গিয়ে দেখে, বাসার মধ্যে লাল শালু-জড়ানো ক একটা রয়েছে। খুলে দেখে একখানি প্রাচীন পুঁথি।

তখনই পুঁথিখানি নিয়ে তারা গেল এক পণ্ডিতের ড়ীতে। পণ্ডিত পুঁথি পড়েই বললেন—মহামূল্যবান আবিষ্কার। এ-পুঁথি তোমরা কোথায় পেলে?

গাঁজাখোররা সত্যি কথা বললো। পণ্ডিত বললেন—তোমাদের গাঁজা খাবার আর দুঃখ থাকবে না, তবে একটু কায়দা-মাফিক চলতে হবে।

পণ্ডিত মশাইয়ের উপদেশে গাঁজাখোরের দলের নতুন নাম হলো 'বংগসেস', অর্থাৎ বঙ্গীয় গঞ্জিকা সেবী সংঘ। তারপরেই খবরের কাগজে ফলাও করে খবর ছাপা হলো—বংগসেস এক মহামূল্যবান প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করেছে—চোর পুরাণ।

ক'দিন পরে কলিকাতার পণ্ডিতমণ্ডলী এক সভা করে বংগসেসকে সম্বর্ধনা জানালো। সেই সভায় বংগসেসের দলপতি বললেন- মাথা পরিষ্কার রাখার পক্ষে গাঁজার চেয়ে ভালো খাদ্য আর কিছু হয় না। খাদ্যে যেমন ভিটামিন আছে, গাঁজায় তেমনি ধোঁয়ালীন আছে। গাঁজার ধোঁয়া মানুষের কল্পনাকে আকাশে লীন করে দেয়। তাতে মানুষ নিত্যনতুন কথা ভাববার, নতুন বস্তু আবিষ্কার করবার সুবিধা পায়। সেই জন্য মানুষের মনের উন্নতি করতে হলে, প্রত্যেকটি মানুষের ছেলেবেলা থেকেই গাঁজা খাওয়া দরকার।

এর পরেই পার্কে পার্কে বেকার ছেলেরা সভা করলো—আমরা গাঁজা খাবো, সেজন্য আমাদের উপযুক্ত গাছতলা চাই।

মেয়েরা পিছিয়ে রইল না। বললো—ছেলেরা গাছতলায় গাঁজা খেতে গেলে, তারাই বুদ্ধি বাড়িয়ে ফেলবে, আমাদেরকে পিছনে পড়ে থাকতে হবে, তা হয় না।

শেষে দু'দলে একটা মিটমাট হয়ে গেল, কথা হলো, কলিকাতার মত সহরে গাছতলায় যাবার দরকার নেই, বাড়ীর রোয়াকে বসে গাঁজা খেলেই চলবে, অভিভাবকরা আপত্তি করতে পারবেন না।

রোয়াকে ছেলের দল বসে গেল, কিন্তু অতো লোকের জন্যে গাঁজা বাজারে পাওয়া গেল না। ছেলেরা তখন মিছিল বার করলো—আমাদের দাবী মানতে হবে, গাঁজার জোগান দিতে হবে।

মিছিলের জন্য রাস্তা বন্ধ হলো, লোকের যাওয়া-আসা বন্ধ হলো, কাজকর্ম বন্ধ হলো। সহরের কর্তারা তখন ঢেঁড়াতে ঘোষণা করলেন—ছাত্রদের দাবী ন্যায্য বলে আমরা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু এ-দেশে গাঁজার ফলন খুব কম। একদিনে সবাই মিলে এতো গাঁজা চাইলে তো পাওয়া যাবে না। চাষ করে নতুন ফসল ওঠা অবধি অপেক্ষা করতে হবে। ততদিন ছেলেরা রোয়াকে বসে গাঁজাখুরী গল্পগুজব করে শিক্ষানবিশী করুক, নতুন ফসল উঠলেই কলিকাতায় পাড়ায় পাড়ায় গাঁজার দোকান খুলে দেব।

ছেলেদের আর কিছু বলার রইল না। সারা দেশ জুড়ে বংগসেস সমিতির প্রতিষ্ঠা হলো, পাড়ায়-পাড়ায়, রোয়াকে-রোয়াকে ছেলের দল বসে গেল শিক্ষানবিশী করতে।

পুরাণ আরম্ভ কথা এইখানে শেষ।
সমস্বরে বল সবে—বেশ, বেশ, বেশ॥

পরিচয়

যাক, এবার আমরা পুঁথিখানির আসল কথায় আসি।

লাল শালু-জড়ানো পুঁথি। শালু খুললেই প্রথমে চোখে পড়ে একখানি চিঠি। চিঠিখানি লিখেছেন চৌর্য্যাচার্য হনুমানসেবক।

"এই পুঁথিখানি আমার বংশের সম্পত্তি। এখন আমিই এই পুঁথির মালিক। গত সাতপুরুষ ধরে এই পুঁথিখানি পড়িয়ে আমার পূর্বপুরুষেরা তাঁদের সন্তানদের মানুষ করেছেন। পুঁথিখানি একখানি পুরাণ। চুরি-বিদ্যা যারা অভ্যাস করবে, তাদের অবশ্যপাঠ্য। আমার ঊর্ধ্বতন সাতপুরুষে চুরি-বিদ্যায় আচার্য ছিলেন। এই পুঁথি পড়িয়ে তাঁরা বহু শিষ্যকে 'মানুষ' করেছেন।

"এই পুঁথির কাহিনী আমাদের পূর্বপুরুষেরই কাহিনী। তাঁদের আদি বাস ছিল রাজস্থানে। সাত ভাই চুরি করে দিন গুজরান করতেন। হঠাৎ একদিন তাঁরা খবর পেলেন, বাংলা-মুলুকে চুরি করার সুবিধা খুব বেশী। সেই কথা শুনেই তাঁরা বাংলামুলুকে চলে এলেন। এ-দেশে এসে তাঁদের বরাত ফিরে গেল। তাঁরা এই দেশেই রয়ে গেলেন।

"তারপর সাতপুরুষ ধরে তাঁদের বিদ্যা চললো। সাত-পুরুষ দিব্যি আরামে জীবন কাটালো। কিন্তু বেধে গেল আমার বেলায়।

"নানা রকম ফন্দি-ফিকির বের করে চুরি করাই আমাদের কাজ। আমিও ফন্দি বের করলাম। হরলিক্সের শিশিতে ছাতু ভরে বাজারে ছেড়ে দিলাম। এক টাকার ছাতু পাঁচ টাকায় হরলিক্স হয়ে বিক্রী হলো।

"টাকা আসছিল খুব, কিন্তু মুশকিল বাধলো। আমার ছেলের হলো টাইফয়েড। ডাক্তার বললো—হরলিক্স খেতে। অনেক দেখেশুনে হরলিকস কিনলাম। কিন্তু সে যে আমারই ভেজাল হরলিক্স, তা কে জানতো? ছেলেটি পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়লো। তিনদিনের মধ্যে এমন হলো যে, তাকে আর বাঁচানো গেল না।

"আমার পয়সা ভোগ করার আর কেউ রইল না। বংশ লোপ পেল। আর কারও এই পুঁথি পড়ার দরকার হবে না। পুঁথিখানি তাই আমি গাছের মাথায় রেখে দিয়ে গেলাম। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে এই পুঁথি একদিন হাওয়ায় মিশে যাবে। পবনের জিনিস পবন দেবতাই ফিরে নিন। পবনপুত্র হনুমান ভারত-বিখ্যাত হয়েছেন। আমরা তাঁকেই আমাদের গুরু বলে ছিলেন চোর-চূড়ামণি। রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করে তিনি মানি, আমাদের বংশের গোত্র হনুমান-গোত্র। চুরি-বিদ্যায় তিনি

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

সপ্তম গ্রহ

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

ছেলেবেলায় দিদিমা গুণতে শেখাতেন : বল—একে চন্দ্র, দুইএ পক্ষ, তিনে নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চ বাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু... আর পর নয়ের বেলায় নবগ্রহ। উদ্দেশ্য, নাম করে করে বললে সংখ্যাগুলো ঠিক মনে থাকবে। নবগ্রহ কিনা—সোম অর্থাৎ চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি অর্থাৎ সূর্য, রাহু এবং কেতু —এই ন'টা গ্রহ। এর মধ্যে চন্দ্র আর সূর্য কিন্তু আসলে গ্রহ নয়, আর রাহু, কেতু তো একেবারেই কাল্পনিক। কিন্তু বাকি ক'টা গ্রহ সম্বন্ধে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীদের ধারণা ঠিকই ছিল। তা হলে সত্যিকার গ্রহ দাঁড়াল পাঁচটি, আমাদের পৃথিবীকে নিয়ে ছয়টি।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করি গ্রহ কটি, তারা কিন্তু অনেকেই বলবে—কেন, নয়টি তো! সূর্য থেকে পর পর দূরত্ব অনুযায়ী তাদের নামও বলে যাবে তারা। প্রথম হ'ল বুধ, ইংরেজী নাম মার্কারি। তার পর শুক্র বা ভেনাস্, পৃথিবী (আর্থ), মঙ্গল বা মার্স, বৃহস্পতি কিনা জুপিটার, শনি কিনা স্যাটার্ণ, ইউ-রেনাস, নেপচুন, প্লুটো। যারা আরও বেশী খবর রাখে তারা বলবে, —না, গ্রহ দশটা। আরও দূরে আরও একটা ছোট গ্রহ আছে—ভলক্যান,—যার কথা সম্প্রতি অল্প কয়েক বছর হ'ল জানা গেছে। অবশ্য খুবই ছোট্ট গ্রহ সেটা।

প্রাচীন জ্যোতিষ শাস্ত্র যে নানান্ দিক্ দিয়ে খুবই উন্নত ছিল তার প্রমাণ আমরা আজও পাই সেই শাস্ত্র অনুযায়ী নানা রকম নির্ভুল গণনার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীন জ্যোতিষীরা গ্রহের সংখ্যা সম্বন্ধে কেন ভুল করলেন? শনির পরেও আকাশে যে আর কোন গ্রহ আছে এ খবর তাঁরা কেউই রাখতেন না,—না আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা, না সাগরপারের বিলিতী জ্যোতিষীরা।

এর উত্তর অবশ্য খুবই সহজ। আজকালকার জ্যোতিষীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছে দূরবীণ নামক যন্ত্রটি। সেকালকার পন্ডিতদের সেটি ছিল না। কাজেই তাঁদের যা কিছু জ্ঞান তা সবই ছিল শুধু চোখের দেখার ওপর নির্ভর করে। আর মানুষের চোখের দৃষ্টিরও তো একটা সীমা আছে! তাই শনির চেয়েও দূরে যে সব গ্রহ আছে খা[লি] চোখে তাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া সম্ভব ছিল না। শনির চেহা[রা] সম্বন্ধেও মানুষের সঠিক ধারণা হয়েছিল দূরবীণ আবিষ্কারের প[র]। ইটালির বিখ্যাত পন্ডিত গ্যালিলিওই দূরবীণ আবিষ্কার করে রহস্যের সমাধান করেন। শনির চারদিকে যে আংটির মত আর এ[ক] কিছু ঘুরছে সে তথ্যও তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন।

দূরবীণ আবিষ্কারের পরেও কিন্তু নতুন কোন গ্র[হ] আবিষ্কার খুব তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়নি। ইউরেনাস্ নামে যে গ্রহ শনির পরেই আছে তার কথা আমরা জানতে পেরেছি মাত্র সেদিন পৌনে দু'শ' বছরও হয়নি। সেই আবিষ্কারের কাহিনী আজ তোমাদের শোনাব।

শুনলে হয়তো অবাক হবে, যিনি এই মস্ত আবিষ্কারটা ক[রে] ছিলেন তিনি কিন্তু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী নামক অধ্যাপক ছিলেন না, উচ্চশিক্ষা বলতে আমরা যা বুঝি তাও ত[াঁর] অদৃষ্টে জোটে নি। তবে হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় অনেক এ জ্যোতির্বিজ্ঞানে অগাধ পান্ডিত্য দেখিয়ে গেছেন তিনি—যাঁর জ[ন্য] আজ তাঁর নাম বিজ্ঞানীদের কাছে নমস্য হয়ে আছে। কে ইনি? উইলিয়াম হার্সেল। আরও সঠিক করে বলতে গেলে বলতে হ[য়] ফ্রেডরিক উইলহেল্‌ম্ হার্সেল।

চল, আজ থেকে দু'শ' বছরেরও কিছু আগে চলে আসা যাক ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ। বাংলা দেশে তখন নবাব সুজাউদ্দীন রাজ[ত্ব] করছেন। সেই সময়ে সুদূর জার্মেনীর হানোভার অঞ্চলে একটি শি[শু] জন্মগ্রহণ করল। তখন কে জানত এই শিশুই একদিন তার কীর্তি[তে] হানোভারের নাম উজ্জ্বল করে রেখে যাবে?

উইলহেল্‌ম্ হার্সেলের বাবা বড়লোক ছিলেন না। গান গে[য়ে] বাজনা বাজিয়ে তার স্বল্প আয়ে সংসার চালাতে হ'ত তাঁকে। ছে[লে] পুলেও ছিল অনেক। কাজেই তাদের ভাল করে লেখাপড়া শেখার খরচ যোগাতে পারতেন না তিনি। তবে হ্যাঁ, নিজের বিদ্যে—গা[ন] বাজনাটা সবাইকে কিছু কিছু শিখিয়েছিলেন, হার্সেলকে শিখিয়েছিলেন। এবং এই গান-বাজনার দৌলতেই হার্সেল প[রে] পর্যন্ত অত বড় বিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন। কথাটা শুনতে কে[মন] কেমন লাগছে? আমরা তো জানি, যে ছেলে লেখাপড়া না করে শু[ধু] গান-বাজনা নিয়ে দিন কাটায় তার পরকাল ঝরঝরে হয়ে যায়। ত[বে] এক্ষেত্রে উল্টো হ'ল কি করে? একটু পরে সে কথায় আসছি।

রোজগার না করে দীর্ঘদিন ঘরে বসে অন্ন ধ্বংস করা, ত[া] যারই হোক, হার্সেলের মত গরীবের ঘরের ছেলের পোষায় না। [তাই] অল্প বয়সেই তাঁকে চাকরীতে ঢুকতে হ'ল। কি চাকরী? সৈন্য দ[লে] চাকরী। কিন্তু সৈন্যদলে হলেও লড়াই করার চাকরী নয়। হার্সেলে[র] কাজ হ'ল সৈন্যদের মার্চ করে যাবার সময়ে সংগে সংগে তালে তা[লে] ব্যান্ড বাজানো। বাপ বাজনাদার, ছেলেও সেই বাজনাদারের ক[াজ] করবে এই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু ও কাজ হার্সেলের ভাল লাগবে কেন? ঐরকম জয়[ঢাক] ঘাড়ে করে ঘুরে বেড়ানো? তা ছাড়া লড়াই করার মধ্যে হয়তো কিছু উত্তেজনা আছে, স্রেফ্ ব্যান্ড বাজাবার মধ্যে তো তা নেই! ফ[লে] সুযোগ বুঝে তিনি একদিন চম্পট দিলেন।

কিন্তু কোথায় যাবেন? সৈন্যদল থেকে পালিয়ে আসা মারা[ত্মক] অপরাধ। জার্মেণীতে থাকলে একদিন ধরা পড়তেই হবে। তাই তি[নি] পালিয়ে এলেন সটান ইংল্যান্ডে। কিন্তু এখানেও তো রোজ[গার] করেই খেতে হবে, আর এখানেও সেই গান-বাজনা ছাড়া আর [কি] করতে পারেন তিনি? তাই আবার সুরু করলেন। চাকরীও জ[ুটে] গেল একটা! এক গীর্জায়। গীর্জায় উপাসনার আগে কন[সার্ট] বাজানো হয়। হার্সেলের কাজ হ'ল সেই কনসার্ট বাজানো।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

প্রবর্তক। তাঁকে স্মরণ করে তাঁর বিদ্যা তাঁকেই ফিরে দিয়ে যাচ্ছি। জয় হনুমানজীকি!

চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, সর্ববিদ্যা সার,
বড় চোরে শ্রদ্ধা করে জগৎসংসার।
সীতারে করেন চুরি লঙ্কার রাবণ,
মৃত্যুবাণ চুরি করে পবন-নন্দন।
ননীচোরা বলি খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ গোপাল,
তাঁদের স্মরণ কর ফিরিবে কপাল।
ধর্ম হবে, অর্থ হবে, পাইবে সম্মান,
চোরের আচার্য আমি, করি জ্ঞান দান।
মনোদুঃখে এই বিদ্যা ছাড়িনু যদিও
তোমরা সবাই এরে আদরে করিও।
জয় জয় ননীচোরা, জয় হনুমান,
সর্বকালে সর্বচোরে করিনু প্রণাম।

ছোটদের পাততাড়ি

ইতিমধ্যে দেশে হার্সেলের বাপ মারা যেতে তাঁর ছোট বোন ক্যারোলিনের দায়িত্ব পড়ল তাঁর ঘাড়ে। বোনটিকে তিনি ইংল্যাণ্ডে নিজের কাছে নিয়ে এলেন।

কিন্তু এই কন্সার্ট বাজাতে গিয়েই যে তাঁর জীবনে একটা মস্ত পরিবর্তন আসবে তা কে ভেবেছিল?

হার্সেল ঠিক সাধারণ জাতের বাজনাদার ছিলেন না। ভাল মত বাজনা বাজাতে হ'লে সুরের উঁচুনীচু ঠিকমত যন্ত্রে ধরা চাই, আর তা সঠিকভাবে করতে গেলে অনেক হিসেবপত্র করতে জানা চাই। হার্সেল কোন কাজই দায়সারাভাবে করবার লোক ছিলেন না। এই হিসেব-পত্রের খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে ধরবার জন্য তিনি প্রায়ই নানা রকম অঙ্কের বই ঘাঁটতেন আর তাই থেকে অঙ্কের প্রতি তাঁর একটা আকর্ষণ দেখা দিল।

এখন, অঙ্কের নানা শাখা আছে—জ্যোতির্বিজ্ঞান, চলতি কথায় যাকে আমরা জ্যোতিষীও বলি,—সেটাও অঙ্কেরই একটা শাখা। অঙ্কের এ বই ও বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে শেষে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিকে তাঁর নজর পড়ল। তাঁর বাবাও ওই শাস্ত্রটি অল্পস্বল্প জানতেন এবং তাঁর কাছে ছেলেবেলায় হার্সেল একটু আধটু বিষয়টা শিখেছিলেন। এখন আবার, নতুন ক'রে ঐ বিষয়টি তাঁকে নেশার মত পেয়ে বসল।

নেশা বলে নেশা! এদিকে গান-বাজনা হল তাঁর পেশা। সেটাও ছেড়ে দেবার উপায় নেই। ছাড়লে খাবেন কি করে? কাজেই তাঁকে তাঁর বিশ্রামের সময়টুকু ঐ জন্য ছেড়ে দিতে হল। হার্সেল কিন্তু তাতেও পিছপা নন। দিনের খাওয়ার সময় আর রাতের ঘুমের সময় কমিয়ে দিয়ে তিনি সেই বাড়তি সময়টা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়ে কাটাতে লাগলেন। আর রাতের পর রাত জেগে আকাশের গ্রহ-তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চিনতে লেগে গেলেন।

কিন্তু খালি চোখে আর আকাশের কতটুকু দেখা যায়?—কতটুকু চেনা যায়? একটা দূরবীণ না হ'লে কি করে চলে? অথচ একটা দূরবীণের দাম তো নেহাৎ কম নয়! গরীব হার্সেলের পক্ষে তা সংগ্রহ করা অসম্ভব।

একটা দূরবীণের জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন হার্সেল। দূরবীণ তাঁর চাই-ই চাই। শেষে ঠিক করলেন, নিজেই তিনি একটা দূরবীণ তৈরী করে নেবেন। প্রচুর সময় লাগবে? লাগুক। প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে? তা হোক। কিন্তু খরচ তো বাঁচবে।

কিন্তু সময় পাবেন কোথায়? রাতে ঘুমোবার জন্য অতি সামান্য যেটুকু সময় রেখেছিলেন তাও এবার ছেড়ে দিতে হ'ল, এমনিতেই দিনের মধ্যে ১৫।১৬ ঘন্টা খাটতে হ'ত তাঁকে, এবারে তার সঙ্গে আরও কয়েক ঘন্টা যোগ হ'ল। কিন্তু হার্সেল অপরাজেয়। দূরবীণ তিনি তৈরী করবেনই। তখন ভাইএর কাজের সাহায্যের জন্য তাঁর বোন ক্যারোলিনও এগিয়ে এলেন। দূরবীণের চোঙ্গার জন্য কাঠ কেটে দেওয়া, লেন্সের জন্য কাচ ঘষে দেওয়া—এসব কাজে ক্যারোলিন হলেন তাঁর প্রধান সহায়। অবশেষে দুই ভাইবোনের বহু-দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে একদিন সত্যি সত্যিই একটা মনের মত দূরবীণ তৈরী হয়ে গেল।

তারপর আর কিছু না,—ভাইবোনের একমাত্র কাজ হ'ল দূরবীণ দিয়ে আকাশ চেনা। সন্ধ্যা হবার আগেই দুজনে গিয়ে ছাদে বসে থাকেন। তার পর একটু অন্ধকার হতেই সুরু হয় দৈনন্দিন কাজ। হার্সেল দূরবীণের তলায় চোখ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, আর পাশে বসে ক্যারোলিন তাঁর কথামত নোট টুকে যান। হয়তো দুরন্ত শীতের রাত, ঝুর ঝুর করে বরফ পড়ছে—যেমন ওদেশে শীতকালে হয়। কিন্তু ভাইবোনের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই। তারপর হঠাৎ হয়তো খেয়াল হ'ল কলম আর দোয়াতে চলছে না। কি হ'ল? হবে আবার কি, দোয়াতের কালিও দুরন্ত শীতে জমে বরফ হয়ে গেছে।

শুধু আকাশ দেখাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে চলল হার্সেলের এক একটা করে নতুন নতুন আবিষ্কার। হার্সেল দেখলেন, চাঁদের গা-টা আগাগোড়া নিভন্ত আগ্নেয়গিরিতে ভর্তি। তিনি ঐ পাহাড়-গুলি খুঁজে খুঁজে চাঁদের গায়ের দস্তুরমত একটা নক্সা বানিয়ে ফেললেন। এমন কি চাঁদের শ'খানেক পাহাড়ের কোন্‌টা কতখানি উঁচু অঙ্ক কষে তাও বার করে ফেললেন।

এরপর ঘটল আর একটা অদ্ভুত ঘটনা। হঠাৎ একদিন হার্সেল লক্ষ্য করলেন—দূর আকাশের প্রান্তে কেমন একটা নতুন ধরণের নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। না, নক্ষত্র নয় নিশ্চয়ই। নক্ষত্রের মত তো ওটা মিট্ মিট্ করছে না! আর নক্ষত্রের মত অত স্থির হয়েও নেই—বরঞ্চ যেন গ্রহদের মতই আকাশে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তবে কি—তবে কি ওটা কোনও নতুন অজানা গ্রহ—যার কথা কেউ এতাবৎকাল শোনে নি? নিশ্চয়ই তাই।

হার্সেলের এই আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা রাষ্ট্র হতেই চারদিকে হুলুস্থুল পড়ে গেল। ঐতিহাসিক কালে এরকম তো আর শোনা যায় নি? ছটা গ্রহের কথাই এতদিন জানা ছিল,—তা হ'লে গ্রহ আরও আছে। এ যে অবিশ্বাস্য কথা!

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। হার্সেল অকাট্য যুক্তি দিয়ে সে সত্য প্রমাণ করলেন। এক রাত্রের মধ্যে হার্সেলের নাম বিশ্ব-বিখ্যাত হয়ে গেল।

কি নাম রাখা যায় গ্রহটির? তখন ইংল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন তৃতীয় জর্জ। হার্সেলের ইচ্ছা ছিল তাঁরই নাম দিয়ে গ্রহটির নাম হয় জর্জিয়াম। কিন্তু অন্যান্য দেশের পণ্ডিতেরা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। রাজার নামে গ্রহের নামের কোনও নজির নেই। বরঞ্চ আবিষ্কর্তা হার্সেলের নাম দিয়ে নামকরণ করলে তাঁদের আপত্তি হবে না। হার্সেল অবশ্য তাতেও রাজী হলেন না। সব গ্রহের নামই যখন পৌরাণিক দেবদেবীর নাম থেকে হয়েছে তখন এটাই বা অন্য রকম হতে যাবে কেন? তখন অনেক ভেবেচিন্তে গ্রহটির নাম দেওয়া হ'ল "ইউরেনাস্"। ঐ নামই শেষ পর্যন্ত চালু হ'ল। ইউরেনাস্ হ'ল আকাশের সপ্তম গ্রহ।

আলপনা — মুন্নী ঘোষ

একটি পণ্ডিতের কাহিনী

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

বারাণসীর কুইনস্ কলেজের নাম খুব। কিন্তু অর্থের অভাবে কাজকর্ম ভাল চলে না। পন্ডিতদের মাইনে-টাইনে দিতেও মধ্যে মধ্যে মুস্কিলে পড়তে হয় কর্তৃপক্ষকে। এই নিয়ে তখনকার ইংরেজ সরকারের শিক্ষা-বিভাগের সঙ্গে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনেক লেখালেখি চলে। কিন্তু কিছুই ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত কলেজের অধ্যক্ষ সে সময়কার ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জনের কাছে আবেদন করেন এবং কলেজের পন্ডিত ও অধ্যাপকদের অভাব-অভিযোগের কথা বিশদভাবে জানান।

লর্ড কার্জন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী বিচক্ষণ বড়লাট। ১৮৯৯ সালে তিনি 'ভাইসরয়' হিসাবে ভারতে আসেন। তাঁর সময়েই ভারতে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রভুত উন্নতি হয় এবং বঙ্গব্যবচ্ছেদও হয় তাঁরই সময়ে। বারাণসীর কুইনস্ কলেজের নাম ছিল তাঁর কাছে খুবই পরিচিত। তাছাড়া ওখানকার কয়েকজন বিখ্যাত পন্ডিতের খ্যাতির কথাও তিনি জানতেন। অধ্যক্ষের আবেদনের উত্তরে তিনি নিজেই কলেজ পরিদর্শনে যাবেন বলে চিঠি লিখে দেন।

কুইনস্ কলেজের ভাগ্যে ঘটে যায় এক অভাবনীয় ঘটনা। কয়েক দিনের মধ্যেই সারা শহর জুড়ে সাজ-সাজ রব পড়ে যায়। নির্দিষ্ট দিনে কলেজটি সেজে ওঠে বিচিত্র সাজসজ্জায়। ঝলমলিয়ে ওঠে চারিদিক। নিমন্ত্রিত হয় বারাণসীর রাজা, রাজপুরুষ, জমিদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। কলেজের সাধারণ মালী থেকে কর্মচারী ও অধ্যাপক পন্ডিত সকলের জন্যেই বিশেষ বিশেষ স্থান ও আসন নির্দিষ্ট হয়। যার যা মূল্যবান সাজ-পোশাক, শিরোস্ত্রাণ, উর্দি-কোর্তা, জোব্বা-জাব্বা, শাল দোশালা, আলোয়ান, জামিয়ার গায়ে দিয়ে সবাই এসে সভা আলো করে বসেন। লর্ড কার্জনও আসেন সমারোহের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ-কর্মচারী ও সেপাই-সান্ত্রীদের নিয়ে। গমগমিয়ে ওঠে সভামন্ডপ। সভায় শুধু উপস্থিত হন না কলেজের একজন আচার্য পন্ডিত। তিনি যথারীতি সেদিনও কলেজে এসে, তাঁর নিজের কক্ষে বসে, পুঁথিপত্র নিয়ে কাজ করতে থাকেন। বড়লাটের উপস্থিতিতে কোন চাঞ্চল্যই দেখা যায় না তাঁর মধ্যে।

কলেজের অধ্যক্ষ সে খবর পেয়ে ছুটে যান পন্ডিতটির কাছে। গিয়ে বলেন, চলুন শীগগির, বড়লাটের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। তবে, আপনার খালি গায়ে একটা কিছু দিয়ে আসবেন।

কিন্তু পন্ডিতটি অধ্যক্ষের সে কথায় কোন কানই দেন না, যেমন নিজে কাজ করছিলেন, তেমনি করতে থাকেন।

এদিকে সভার কাজ যথারীতি এগিয়ে চলতে থাকে। এক সময় অধ্যক্ষ কলেজের সমস্ত অধ্যাপক ও পন্ডিতদের সঙ্গে লর্ড কার্জনের পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু সেই সময় ঘটে এক অভাবনীয় ঘটনা। হঠাৎ সকলকে বিস্মিত ক'রে বড়লাট জিজ্ঞাসা করে বসেন, আচ্ছা, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে অগাধ পন্ডিত, যে শাস্ত্রী মহাশয় এই কলেজেরই অধ্যাপক শুনেছিলুম, তাঁকে দেখছি না কেন—তিনি কি অসুস্থ?

প্রিন্সিপালের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। তিনি কিংকর্ত বিমূঢ় হয়ে বলে বসেন, তিনি কলেজেই একটি বিশেষ গবেষণার কা ব্যাপৃত আছেন।

পন্ডিত কলেজেই আছেন অথচ তাঁর সভায় উপস্থিত হননি এবিষয় কোন উষ্মা বা ক্ষোভ প্রকাশ না ক'রে লর্ড কার্জন বলে ঠিকই হয়েছে, আমি নিজেই তাঁর কাছে গিয়ে দেখা করব। তাঁ দেখার বিশেষ বাসনা নিয়েই আমি এখানে এসেছি।

অধ্যক্ষ অত্যন্ত বিব্রত বোধ ক'রে আবার শাস্ত্রী মশায়ের কা গিয়ে বলেন বড়লাটের কথা।

উত্তরে শাস্ত্রী মশায় বলেন, বেশ বেশ, আসতে চান তো আস না লাটসাহেব। তবে, আমি বাপু জামা-টামা আর গায়ে দি পারব না।

সভা শেষ হলে বড়লাট অধ্যক্ষের সঙ্গে নিজেই এসে উপস্থি হলেন শাস্ত্রী মশায়ের ঘরে।

সৌম্যকান্তি, উন্মুক্ত দেহ, উপবীত-ধারী পন্ডিত, সাম একটি চৌকির উপর পুঁথিপত্র নিয়ে নিবিষ্ট মনে কাজ করছিলে কার্জন তাঁর কাছে গিয়ে দোভাষীর সাহায্যে বললেন, আপনি ভার বিদিত শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত, আপনার নাম শুনে আপনার স দেখা করতে এসেছি।

উত্তরে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে পন্ডিত বললেন, আ সামান্য ব্যক্তি মাত্র, আপনিই মহাপন্ডিত, অমানীকে আ মান দান করেছেন।

বড়লাট বললেন, আপনি সভায় উপস্থিত হননি কেন?

শাস্ত্রী মশায় উত্তরে বললেন কেবলমাত্র উত্তরীয় নিয়ে খা গায়ে সভায় গেলে আপনার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হ তাছাড়া সে সময়টা আমার সায়ং-সন্ধ্যা করার সময় - পবিত্র উপাস সময় অন্যভাবে নষ্ট করা মানে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ করা। সে নিশ্চয়ই আপনি সমর্থন করবেন না!

শাস্ত্রী মশায়ের কথায় বড়লাট অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলে আপনাকে দেখে সত্যিই আজ আমি ভারতের একজন পন্ডি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে দেখলুম মনে হচ্ছে।

এরপর লর্ড কার্জন কলেজ থেকে বিদায় নিলেন।

কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও কর্তৃপক্ষগণ সক অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, লাটসা শাস্ত্রী মশায়ের সামনে সম্মান প্রদর্শন করলেও মনে মনে হয়ত হয়েছেন—সভায় শাস্ত্রী মশায়ের অনুপস্থিতিতে।

কিন্তু এর কিছুদিন পরেই সব চিন্তার অবসান হ'ল। সর কুইনস্ কলেজের জন্যে বার্ষিক মোটা টাকার ব্যবস্থা করেছেন যেমন খবর এলো, সেই সঙ্গে কাগজে বেরুল যে, শাস্ত্রী মশা বড়লাট সি. আই. ই উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

অধ্যক্ষ ছুটোছুটি ক'রে গিয়ে, আনন্দের সঙ্গে এই সংবা জানালেন শাস্ত্রী মশায়কে। কিন্তু নিরহঙ্কার শাস্ত্রী মশায় উপাধি ও সম্মান সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন ব'লে সহাস্য বললেন, আরে প্রিন্সিপাল সাব্, বড়েলাট তো হামারে 'সিয়াই' ডাল দিয়া।

লর্ড কার্জন তাঁকে 'কম্পেনিয়ান অব্ দি ইন্ডিয়ান এম্পা উপাধিতে সম্মানিত করলেন বটে, কিন্তু শাস্ত্রী মশায় তাঁর না উপর 'সিয়াই' অর্থাৎ কালি ঢেলে দেওয়া হ'ল ব'লে উপহাস ক উড়িয়ে দিতে চাইলেন ব্যাপারটা।

ভারতের এই দার্শনিক সর্বজন-শ্রদ্ধেয় স্বর্গত পন্ডিতের গঙ্গাধর শাস্ত্রী।

হাসিতে মুক্তা ঝরে •
কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জটিল খেলা
হীরেন চৌধুরী

"হে পিতঃ। তুমি এদের ক্ষমা করো—এরা জানে না এরা কি করছে।"

কথাগুলো বলেছিলেন যীশুখৃষ্ট। । স্বর্গের ঈশ্বরের কাছে করজোড়ে তিনি প্রার্থনা করেছিলেন মর্ত্যের অজ্ঞান মানুষের জন্য—যারা ধর্মান্ধতার মোহে সে দিন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের জন্যই তিনি করেছিলেন ক্ষমা ভিক্ষা, ক্ষমাসুন্দর যীশুর স্মৃতি তাই মানুষের অন্তরে আজও রয়েছে অম্লান। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ তাই আজও তাঁর শরণাগত।

ঠিক এমনি ধরণের কথাই আর একদিন উচ্চারিত হয়েছিল আমাদের এই বাংলা দেশে। প্রায় পাঁচশো বছর আগের কথা। বাংলা দেশে তখন পাঠান রাজত্ব—আফগান নবাবদের শাসন। নবাবের অধীনে কাজী দেশের বিচার বিভাগ পরিচালনা করেন। একদিন কাজীর সামনে প্রহরা বেষ্টিত হয়ে হাজির হলেন এক পরম বৈষ্ণব সাধক। নিয়তির এমনি পরিহাস। ধর্মছাড়া জীবনে যার আর কোনই অবলম্বন নেই তিনিই আজ অধর্মাচরণের দায়ে অভিযুক্ত। জাতিতে নাকি তিনি মুসলমান। অথচ তাঁর মুখে সর্বক্ষণ শোনা যায় হরিনাম। গোঁড়া ইসলাম ভক্তদের কাছে এ এক অমার্জনীয় অপরাধ। তাঁরাই কাজীর কাছে এঁর বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী। অভিযোগকারীদের বক্তব্য শেষ হবার পর কাজী অভিযুক্ত বৈষ্ণবের কাছে শুনতে চাইলেন তাঁর বক্তব্য। বৈষ্ণব বললেন যে ধর্মকে তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন সেই ধর্মই তিনি অনুক্ষণ পালন করছেন—এতে অধর্মের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কাজীর বিচারে সাব্যস্ত হলো যে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে লোকটি নিতান্তই বিধর্মী।

কাজী নিজেই শাস্তি দিতে পারতেন, তবু ভাবলেন অপরাধ যেরকম গুরুতর তাতে নবাবের হাতেই দন্ডদানের ব্যবস্থা করা সঙ্গত হবে—বিধর্মী (?) বৈষ্ণবকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি নবাবের আদালতে। অভিযোগের মর্ম এবং কাজীর মত জানার পর আসামীকে আর কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই ভেবে নবাব তক্ষুনি বৈষ্ণবকে কারারুদ্ধ করার আদেশ দিলেন। আদেশ সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হলো। রক্ষী প্রহরী বেষ্টিত হয়ে বৈষ্ণব এলেন কারাগৃহে। দন্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হবার সময় কিম্বা কারাগারে বন্দী হবার পরও বৈষ্ণবের কথাবার্তায় কিম্বা আচরণে এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না—তিনি যেন আত্ম সমাহিত। বাইরের জগতের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নেই, তাঁর নির্বিকার নির্বিকল্প অবস্থা।

কারাগারে এসেও সমস্তক্ষণ তিনি নামকীর্তন করে চলেছেন—অন্যান্য বন্দী এমন কি কারা প্রহরীদের কাছেও তিনি নাম মাহাত্ম্য শোনাতে লাগলেন। নবাবের কাছে নতুন অভিযোগ জানানো হলো। ডেকে পাঠানো হলো বৈষ্ণবকে নবাবের দরবারে। নবাবের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন :

শুন, বাপ! সবারই একই ঈশ্বর।
নামমাত্র ভেদ করে হিন্দু যে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে।

উত্তর শুনে নবাবের ক্রোধাগ্নি জ্বলে উঠলো। অসহ্য হলো এতো আস্পর্ধা এই বিধর্মীর। কোরাণের ঈশ্বর আর পুরাণের ভাগবত অভিন্ন? না, এ বিধর্মীকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। নবাব বেত্র-দণ্ডের আদেশ দিলেন। সভাগৃহ নীরব নিস্তব্ধ; শুধু বৈষ্ণব তখনও অবিরাম তাঁর ইষ্ট দেবের নাম জপ করে চলেছেন। সভাগৃহে সচকিত করে ভেসে এলো নবাবের কণ্ঠস্বর—তোমার কাছে এখনও জানতে চাইছি—বিধর্মী এই আচরণ তুমি ত্যাগ করতে রাজী আছ কি না? রাজী না হলে তোমায় ভোগ করতে হবে চরম শাস্তি, দৈহিক নির্যাতন বেত্রাঘাতে জর্জরিত করা হবে তোমার দেহ। তবু অচল নির্বিকার বৈষ্ণব। শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বল্লেন :

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম।।

কাজী ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। বৈষ্ণবের অনাবৃত দেহে পড়তে লাগলো আঘাতের পর আঘাত—শরীরের সর্বত্র ফুটে উঠলো নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন। তবু নির্বিকার রইলেন বৈষ্ণব— মৃদুতম আর্তনাদও বেরিয়ে এলো না তাঁর কণ্ঠ ভেদ করে। আঘাতের পর আঘাতে জর্জরিত হলো তাঁর দেহ, আহত স্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়লো নীচের মাটিতে। তবু তাঁর মনে মনে চলছে অবিরাম নাম কীর্তন। নিজের দেহের জন্য মায়া নয়, প্রাণের জন্য ভয় নয়, তাঁর একমাত্র ভয় বেত্রাঘাতকারী প্রহরীদের জন্য। পাপের স্পর্শে যদি তাদের অমঙ্গল হয়, তাই আরাধ্য দেবতার কাছে বৈষ্ণব আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন।

এ সব জীবেরে কৃষ্ণ! করহ প্রসাদ
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ।

বাইশ হাজার বেত্রাঘাতে জর্জরিত দেহ লুটিয়ে পড়লো ভূমিতে। ক্লান্ত হলো প্রহরীরা। নবাবের সংজ্ঞাভঙ্গ হলো—বিধর্মীর দেহ গত-প্রাণ মনে করে ভাসিয়ে দেওয়া হলো গঙ্গার জলে।

অনির্বাণ দীপের শিখা তাঁর দেহে মনে, তিনি মৃত্যুঞ্জয়, কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তাই সম্বিত ফিরে পেলেন পুণ্যতোয়া গঙ্গা তাঁর পুণ্য দেহ প্রত্যর্পণ করলো মাটির বুকে।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে তিনি শোনাতে পারলেন প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী। নিজেদের মধ্যে আবিষ্কার করলেন তিনি ঐক্যের বন্ধন। নিষ্ঠুর ঘাতকদের জন্য তিনি প্রাণের বিনিময়েও ইষ্ট দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন—সমস্ত অন্তর দিয়ে যাদের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা করেছিলেন—তিনি হলেন চৈতন্যকালীন ভক্ত হরিদাস।
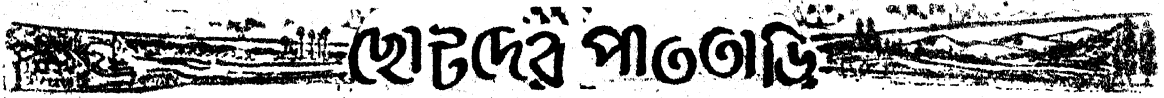
এক ছিল শ্রীহাড়-কিপ্টে। লোকটা যেমন ধনী, তেমনি কৃপণ, আর তেমনি পাজি। কাউকে হাত তুলে কিছু দেওয়া তার কুষ্টিতে লেখেনি।

তবু শ্রীহাড়-কিপ্টে একদিন দাতা হয়ে বসল। সেই কাহিনীই বলছি।

শ্রীহাড়-কিপ্টে একদিন ঘর ঝাট দিতে দিতে ঘরের কোণে খুঁজে পেল এক ঝুড়ি ডিম। গুনে দেখল, বারোটা ডিম। মনে পড়ল, প্রায় মাসখানেক আগে ডিমগুলো সে সেখানে রেখেছিল। তারপর নানা কাজের চাপে সে কথা সে ভুলেই গিয়েছিল।

শ্রীহাড়-কিপ্টে ভাবল, তাইতো, ডিমগুলো তো এতদিনে নির্ঘাৎ পচে গেছে। এগুলো নিয়ে এখন আমি কি করি?

হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল তার মনের কোণে। এই ফাঁকে একটু দাতা সাজলে কেমন হয়?

ডিমের ঝুড়ি নিয়ে সে হাজির হল শ্রীনাক-বোঁচা রুটি-ওয়ালার দোকানে। সে বেচারার নাকটা এমনি খারাপ যে কোন গন্ধই তার নাকে যায় না। এক ঝুড়ি ডিম পেয়ে সে তো মহাখুশি। বলল, অনেক ধন্যবাদ হাড়-কিপ্টে মশাই। ডিমগুলোর বদলে দয়া করে এই পাউরুটিখানা গ্রহণ করুন।

শ্রীহাড়-কিপ্টে রুটিখানা নিয়ে হাসতে হাসতে বাড়ি গেল।

শ্রীনাক-বোঁচা ভাবল, শ্রীমতী রোগিণী তো সেদিন ডিমের জন্য এসেছিল। বেচারি প্রায়ই রোগে ভোগে। ডিমগুলো পেলে তার খুবই উপকার হবে।

ডিমগুলো পেয়ে শ্রীমতী রোগিণী তো ভারি খুশি। কিন্তু তার কপাল মন্দ। সেই দিনই তার সারা শরীর কাঁপিয়ে প্রচন্ড জ্বর এল। ডিম তো দূরের কথা, তার পথ্যি হল বার্লির জল।

সে ভাবল, ঘরে রেখে ডিমগুলোকে পচিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে ওগুলো পাঠিয়ে দি শ্রীমতী ভিখারিণীর বাড়ি।

শ্রীমতী ভিখারিণীর তো ডিমগুলো পেয়ে আনন্দের সীমা নেই। আহা! সারাদিন তার কিছু খাবার জোটে নি। এইবার সে পেট ভরে বারোটা ডিম খেতে পাবে। কী মজা!

কিন্তু হায়! কপালে নেই ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি!

ঠিক সেই সময়ে দরজায় কড়া নড়ে উঠল : ঠক্-ঠক্-ঠক্।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলেই দেখে শ্রীহাড়-কিপ্টে দাঁড়িয়ে। সে কড়া গলায় বলে উঠল : গত সপ্তাহে তুমি যে একটা টাকা ধার নিয়েছিলে, সুদে বেড়ে সেটা দু'টাকা হয়েছে। দাও আমার টাকা।

শ্রীমতী ভিখারিণী বলল, হাড়-কিপ্টে মশাই, আজ এই একটা টাকা নিন। বাকি টাকাটা পরে দেব।

শ্রীহাড়-কিপ্টে চেঁচিয়ে বলল, না না, সে হবে না—

এমন সময় তার চোখ পড়ল ডিমগুলোর উপর। সে বলল, বেশ, তাহলে এক কাজ কর। আজকের মত ওই ডিমগুলো আমাকে দিয়ে দাও। পরে এসে টাকাটা নিয়ে যাব।

বেচারি শ্রীমতী ভিখারিণী! কি আর করে! মনের দুঃখ মনে চেপে ডিমগুলো দিয়ে দিল।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাড়ি ফিরল শ্রীহাড়-কিপ্টে। টেবিলে সাজিয়ে বসল বারোটা ডিম আর আস্ত একখানা পাউরুটি। রুটি-খানাকে কেটে বারো টুকরো করল। তারপর একটা ডিম ভেঙে ছড়িয়ে দিল এক টুকরো রুটির উপর।

এ কি! ডিমটা তো পচা। ধাঃ. রুটিখানাই নষ্ট হল। জানালা গলিয়ে রুটির টুকরোটাই সে ফেলে দিল বাগানে।

আর একটা ডিম ভেঙে ছড়িয়ে দিল আর এক টুকরো রুটির উপর।

ও হরি! এ ডিমটাও যে পচা। আর কী দুর্গন্ধ! ফেলে দিল সে-রুটিখানাও।

এমনি করে একে একে বারোটা ডিম আর বারো টুকরো রুটিই তার বরবাদ হয়ে গেল। শ্রীহাড়-কিপ্টে তো রাগে একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। কী! আমাকে ঠকানো! দেখাচ্ছি মজা!

রাগে গরগর করতে করতে শ্রীহাড়-কিপ্টে চলল থানায় শ্রীচোর-ধরার কাছে। আর তাকে নিয়ে সোজা হাজির হল শ্রীমতী ভিখারিণীর বাড়ি।

সব কথা শুনে শ্রীমতী ভিখারিণী বলল, আমার কি কসুর বলুন চোর-ধরা মশাই। আমি কি করে জানব যে ডিমগুলো পচা!

—কিন্তু কোথায় পেলে তুমি ডিমগুলো? ধমকে উঠল শ্রীচোর-ধরা।

ভয়ে ভয়ে কথা বলল শ্রীমতী ভিখারিণী, ওগুলো আমাকে পাঠিয়েছেন শ্রীমতী রোগিণী।

তখন শ্রীহাড়-কিপ্টে ও শ্রীচোর-ধরা হাজির হল শ্রীমতী রোগিণীর বাড়ি।

শ্রীহাড়-কিপ্টে চীৎকার করে বলল, কী রকম খারাপ মেয়ে-মানুষগো তুমি, এই পচা ডিমগুলো খয়রাৎ করেছ শ্রীমতী ভিখারিণীকে?

—বারে, তার আমি কি জানি? ওগুলোতো আমাকে পাঠিয়েছে শ্রীনাক-বোঁচা রুটিওয়ালা।

হাজির হল তারা রুটিওয়ালার দোকানে।

শ্রীনাক-বোঁচা নাক সিটকে বলল, ডিম পচা, তার আমি কি করব? ওগুলো তো আজই সকালে আমাকে খয়রাৎ করে গেছে শ্রীহাড়-কিপ্টে মশাই নিজে।

শ্রীচোর-ধরা তখন মুখ ফিরিয়ে গোঁফ পাকিয়ে বলল, বটে! শ্রীহাড়-কিপ্টে মশাই. ওগুলো তোমার ডিম! তুমিই জেনেশুনে খারাপ ডিমগুলো পাচার করেছ, আবার থানায় গিয়েছ নালিশ জানাতে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমায় মজা। চলো থানায়।

শ্রীচোর-ধরা তখন ঘাড় ধরে শ্রীহাড়-কিপ্টেকে টানতে টানতে নিয়ে গেল থানায়। এবং সেখান থেকে শ্রীঘরে।

* একটি বিদেশী গল্প অবলম্বনে।

যমের সঙ্গে সাক্ষাৎ

শ্রীমতী পুষ্প বসু

মৃত্যুরাজ যমের কথা তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই, জীবিত অবস্থায় যমকে যে কেউ দেখেনি একথা আমি হলফ করে বলতে পারি! তবে আমি শুনেছি যে যাঁরা ভাল লোক সাধু লোক তাঁদের মৃত্যু আসন্ন হলে যমরাজ স্বয়ং তাঁদের নিতে আসেন। যারা পাপী অসৎ ও দুষ্ট লোক তাদের নিতে আসে যমরাজের চাকর-বাকর বা যমদূত।

সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনী যারা পড়েছ তারা যমরাজ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করতে পারবে। উপনিষদে আছে 'যম ও নচিকেতা'র কথা। যাই হোক এখন তোমাদের শোনাব একটি অলৌকিক এবং রোমাঞ্চকর ঘটনা। এটি গল্পকথা নয় সত্যই ঘটেছিল। একটি জীবন্ত স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ যমরাজকে দর্শন করেছিল।

শোন এইবার :—

আমরা ছোটবেলায় সিমলা পাহাড়ে থাকতুম, বাবা মাঝে মাঝে দু' একমাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসতেন। আমরা মামার বাড়ীতে এসে উঠতুম। আমার মামার বাড়ী হাতীবাগানে। বাড়ী ভর্তি লোক। দুই মামা, মামীমা, মাসী, মামাতো ভাইবোনেরা, বামুনদিদি, চাকর-ঝি। আবার মাসতুতো ভাইরাও থাকত মামার বাড়ীতে। আমরা খুব হৈ-হুল্লোড় করে কাটাতুম কিছুদিন।

বাড়ীতে আর একজন ছিল, যাকে আমরা পড়সী মাসী বলতুম। মার কাছে শুনেছি প্রথমে ঝি-এর কাজ নিয়ে পড়সী মাসী আসে। তখন দাদু দিদিমা বেঁচে, মামা মাসীরা সব খুব ছোট। পড়সী এসে সমস্ত সংসারের ভারটা নিজের উপর নিয়ে নিলে, তারপর ক্রমে তার নিজগুণে সে ঝি-এর পদ থেকে উঠে বাড়ীর কর্ত্রীর পদ নিয়ে বসল। একরকম সেই বাড়ীর গিন্নী হয়ে বসল আর কি! দাদু দিদিমা পড়সীকে না জিজ্ঞেস করে কোন কাজই করতেন না। পড়সী দেশেও যেতো না কোনোদিন। এক ভাইপো ছাড়া কেউ নাকি ছিল না তার। খুব অল্পবয়সে বিধবা হয় পড়সী। বাপ মা মারা যাবার পর সে কলকাতায় চাকরী করতে আসে। দাদু যখন মারা যান তাঁর উইলে পড়সীকে একখানা ঘর দিয়ে যান—যতদিন সে বাঁচবে ততদিন খাওয়া-পরাতো থাকবেই তাছাড়া তার ঐ ঘরখানা রইল।

পড়সী মাসী বেঁচেও ছিল অনেকদিন। বোধহয় প্রায় সত্তর বছর বয়সে মারা যায়।

আমরা পড়সীমাসীকে দেখে আসছি জন্মাবধি। দেখতে পড়সীমাসী বেশ কালো ছিল। স্ত্রীলোকের পক্ষে একটু বেশী লম্বা—রোগা ছিপছিপে। মুখশ্রী ভালই ছিল, সর্বোপরি ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর কথাবার্তা চালচলন অতি ভদ্র।

আমরা পড়সীমাসীকে ভয়ানক পছন্দ করতুম ও ভালবাসতুম। পড়সীমাসী ছোট ছেলেদের ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে আদর করে শোয়াত—সেই গানের সুর যেন এখনও কানে বাজে :—

হাসি হাসতো রতন
এ হাসির হাজার টাকা মণ
হাসি হাজারো রকম।।

তারপর আমাদের কত রূপকথার গল্প বলত কিন্তু আমরা ভূতের গল্প শুনতে চাইলে, বলত, "দূর বাপু ভূতই নেই তার আবার গল্প! ওসব আমি জানিনে।"

একবার আমরা সিমলা থেকে এসে কলকাতায় প্রায় তিন মাস ছিলাম। তখন শীতকাল পড়েছে। এসেই শুনলুম পড়সীমাসীর বড্ড শরীর খারাপ হাঁপানীতে ভুগছে।

একতলার বৈঠকখানার পাশের ঘরটা পড়সীমাসীর। সেটা ঠিক গলির রাস্তার উপরই। ঘরখানা বেশ বড় এবং খোলামেলা। সেই ঘরে পড়সীমাসী থাকত। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে ঘরের মাঝখানে একখানা তক্তপোসে ধবধবে বিছানা। এককোণে জলচৌকির উপর ঠাকুরের আসন পাতা ঘরের আর এককোণে দড়িতে ফরসা সেমিজ থান কাপড় ঝুলছে। জলের কুঁজো আরও টুকিটাকি কত কি। মোটমাট ঘরখানা বেশ গোছান আর ঘরের মেজেটাও পরিষ্কার ঝকঝক করছে। সেই ঘরে সে আমাদের মাদুর পেতে দিত, আমরা সবাই বসে খেলা করতুম, গল্প করতুম।

একদিন হয়েছে কি—গভীর রাত, খুব শীত পড়েছে, যে যার দোরতাড়া বন্ধ করে লেপের মধ্যে শুয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। আমরা দোতলার ঘরে সব ঘুমুচ্ছি। হঠাৎ পড়সীমাসীর চীৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে গেল। মামা, মাসী, মামীমারা মা সবাই ব্যস্ত হয়ে দরজা খুলে দুড়দাড় করে একতলায় নেমে পড়ল; সারা বাড়ীতে আলো জ্বলে উঠল। আমরাও চুপচাপ পা টিপেটিপে নেমে পড়লুম নীচে।

দেখলুম কি পড়সীমাসী কাত হয়ে বিছানায় শুয়ে হাঁপাচ্ছে। সবাই তো তাকে ঘিরে দাঁড়াল, দেখে কি পড়সীমাসী এত শীতেও ঘেমে নেয়ে গেছে: প্রায় অজ্ঞান অবস্থা! সবাই মিলে কেউ মুখে জল দেয়, কেউ বাতাস করে, খানিকপরে পড়সীমাসী চোখ চাইল।

মাসী মুখের উপর ঝুকে পড়ে বললে, "কি হল দিদি—শরীর কেমন করছে?"

মামা বললে, "ব্যাপার কি বলত দিদি—মনে হল যেন তুমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে!"

এবার পড়সীমাসী আস্তে আস্তে পাশ ফিরে হাঁফাতে হাঁফাতে বললে, "ভয়ই পেয়েছি, বলছি সব, আগে একগেলাস জল দাও।" বলেই ভয়ে-ভয়ে গলিটার দিকে একবার দেখল।

আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে পড়সীমাসী একটু সুস্থ বোধ করল, তারপর উঠে বসে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে সকলের দিকে চেয়ে বলল, "ঠায় দাঁড়িয়ে কেন সব বসনা—এই বিছানাতেই। হ্যাঁ কি বলছিলুম এমন কখনও দেখিনি অবাক কান্ড মা!"

মামীমারা বল্লেন, "কি দেখলে গো আবার—ভূত না চোর-ডাকাত?"

পড়সীমাসী বললে, "ওসব নয়—বলছি শোন—

হাঁপানীর ধমকে কিছুতে বিছানায় শুতে না পেরে গলির সামনে ঐ জানলাটায় গিয়ে একটু বসলুম। কেসে কেসে

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

ও প্যালারাম খেলার খবর
আয়না শুনি— সয়না যে তর।
টিকিট কেটে আজ ওবেলা
গেছিলি তুই দেখতে খেলা।
তাই তো তোকে ডাকছি আমি,
খবর দিবি জবর দামী।
কী বলিস তুই যা-তা মিছে—
গাছের থেকে পড়লি নীচে?
বুঝছি মাঠে খেলতে যেয়ে
পা ভেঙেছে হুমড়ি খেয়ে।
লেম সাইডে গোল বাঁচাতে—
কিম্বা সটান বল নাচাতে—
দম ফাটানো লম্বা শটে
ওস্তাদেরো অমনি ঘটে।
যাক্, খেলেছিস কোন সে দলে?
মোহনবাগান? ইস্টবেঙ্গলে?
গোল খেলো কে? এই মলো যা—
রাগিস কেন? ভাগিস সোজা।
পা ভেঙেছে ঘোড়ার গুঁতোয়?
ভোলাতে চাস মিথ্যে ছুঁতোয়!
গলিতে রোজ রবার বলে
তোদের সবার চর্চা চলে
কোন্ দিন ঠিক শুনবো—শিখে
যোগ দিয়েছিস অলিম্পিকে।
হাঁ-হাঁ বাবা, হই আনাড়ি,
ওস্তাদ ঠিক চিনতে পারি!
থাকবো বসে ধৈর্য ধরে,
খবর পাবোই যুগান্তরে।।

বুড়োর বয়স একশো-কুড়ি
  বুড়ির বয়স নব্বই
ব'ললে তারাঃ 'কে বলেছে
  আমরা দু'জন মরবই!!'
বুড়ো বলেনঃ 'শুনছো বুড়ি,
  আমার বয়স অল্প—'
ফোকলা দাঁতে বুড়ি বলেনঃ
  'আর করি ভাই গল্প।
স্পন্দন হলে বুড়োর দাড়ি
  টানতো বুড়ি জোরসে
বুড়োর দু'চোখ অন্ধ হতো
  বুড়ির চোখে সরষে।
চিৎকারেতে পটাং চিৎ
  বন্ধ হতো রান্না
উপোস করে সটাং তারা
  জুড়তো বসে কান্না।
ভাব করাতে পাড়ার লোকে
  ডাব নিয়ে সব জুটতো
তাই না দেখে বুড়ো-বুড়ি
  লাফিয়ে আবার উঠতো।
রান্না ঘরে জ্বলতো চুলো
  তৈরী হতো খাদ্য
পাড়ার যত বুড়োবুড়ি
  বাজায় ঢোলক বাদ্য।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

একটু দম নিয়েছি—অনেক রাত হয়েছে, ভাবছি আবার শুয়ে দেখি, ওমা এমন সময় মনে হল পায়ে ঘুঙুর বেঁধে কে যেন ঝুমঝুম ক'রে ছুটতে ছুটতে গলি দিয়ে এদিকে আসছে। ভাবলুম তাইত এত রাতে চানাচুরওলা মরতে এসেছে এই গলিতে! ভাবতে ভাবতেই দেখি কি আমার চোখের সামনে দিয়ে একজন লোক দৌড়ে যাচ্ছে—ওমা কি বলব তোমাদের —তার গায়ের নীল আলোতে সারা পথ ঝলমলিয়ে উঠেছে, এই লম্বা চওড়া সাজোয়ান পুরুষ—সারা গায়ে হীরে মুক্ত ঝলমল করছে—হাতে গদা, মাথায় মুকুট, নিমেষের মধ্যে আমার সুমুখ দিয়ে এদিকে বামুনদের বাড়ী চলে গেল। এই দেখ, বলতে গিয়ে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।"

বড়মামা হেসে বললেন, "তুমি স্বপ্ন দেখেছ দিদি!"

পড়সীমাসী বিরক্ত হয়ে বললে, "শোন কথা, জেগে ব মানুষ স্বপ্ন দেখে? কি যে বলিস বাপু!"

এইসব কথাবার্তার মাঝে হঠাৎ সদর দরজায় কড়া ন উঠল। বড়মামা তাড়াতাড়ি গেলেন দরজা খুলতে। ফিরে এ বললেন, "বামুনদের বাড়ীর কর্তা খানিক আগে মারা গেছে তাই ডাকতে এসেছে। একটু চুপ করে থেকে তিনি পড়স মাসীকে বললেন, "দিদি তুমি ঠিকই দেখেছ, অমন সাধুসজ্জ মানুষকে স্বয়ং যমরাজ এসেছিলেন নিতে তাতে আর ভু নেই।"

মানুষ ছোট থেকেই বড়ো হয়। সাধারণ ঘরের সন্তান নিজের ৎসাহ, উদ্দীপনা আর চেষ্টায় জীবনে সার্থকতা লাভ করে াধারণের মধ্যে নিজের বিশিষ্টতা ফুটিয়ে তোলে। উত্তরকালে এ'রাই ন সমাজের নেতা, এ'রাই হন দেশমাতৃকার মুখোজ্জ্বলকারী ন্তান। আজ এই রকম কয়েকজন প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর ছেলেবেলা ম্পর্কে তোমাদের কিছু বলছি ঃ—

তোমরা 'ডায়নামো'র নাম শুনেছ নিশ্চয়-ই? এই 'ডায়নামো' নি আবিষ্কার করেছেন—তাঁর নাম 'ফ্যারাডে'। ইনি একজন ুগন্ধর বিজ্ঞান সাধক ছিলেন। কিন্তু এ'র জীবনী তোমরা যদি ড়ো, জানতে পারবে শৈশবে এ'কে কতোই না কষ্ট স্বীকার করতে য়েছে। ইনি ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা সহজে লাভ করতে পারেন নি। দারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে এ'র শব, বাল্য এবং কৈশোর কাল; এমন কি নিজের পাঠ্য কার্যের ব্যয় র্বাহের জন্যে এ'কে কোনও একটি কলেজে ভৃত্যের কাজও করতে য়েছিল।

* * * *

মহাকবি 'সেক্সপীয়রের' নাম তোমরা সকলেই জানো আশা করি। নও বাল্যকালে এবং কৈশোরে চরম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবন টিয়েছেন; জীবিকার জন্য এ'কে 'গ্লোব থিয়েটারে' দর্শকদের ড়া পাহারা দিতে হতো; আর উত্তরকালে এ'রই প্রতিভার লোতে সারা পৃথিবীর সাহিত্য আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

* * * *

ইতালীর ভাগ্য-বিধাতা 'মুসোলিনী' কৈশোরে এক মুদির কানে মুটের কাজ করতেন; শুধু ইনি-ই নন, জার্মাণীর প্রবল-াক্রান্ত এক-নায়ক 'হিটলার' ছেলেবেলায় কি করতেন জানো? দারিদ্র্যের মধ্যে যখন তাঁর কৈশোর জীবনের দিনগুলি কাটছিল, াহারে যখন এই বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি তিলে তিলে কয়ে যাচ্ছিলেন—তখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাঁকে ঠেলাগাড়ীতে ময়লা ও আবর্জনা অপসারণ করতে হয়েছিল; এইভাবে তিনি পাঠ্য কার্যের ব্যয়ও নির্বাহ করে গেছেন।

* * * *

বিদেশীদের কথা না হয় বাদ-ই দিলাম; বহু ভারতীয় মনীষীও জীবনে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে উত্তরকালে সম্মান ও কতার শীর্ষে উঠতে পেরেছিলেন। রামদুলাল সরকার এ'দের তম। কৈশোরে ইনি কোনও একটি জাহাজে মাত্র ৫ টাকা বেতনে করতেন। পরে নিজের অধ্যবসায় ও সাধনায় ইনি জাহাজের ক হন এবং দেশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। খ্যাতনামা ৌতিক ও ব্যবসায়ী স্যার নলিনীরঞ্জন সরকার এই কলকাতা ই অনাহারে ফুটপাতে রাত্রি যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু বড়ো হবার অদম্য বাসনা এবং মহৎ সঙ্কল্প তাঁর জীবনের দুর্গম পথকে সুগম করে তুলেছিল। চেষ্টায় কি না হয়। তোমরাও মহৎ সঙ্কল্প এবং দৃঢ় মন নিয়ে এগিয়ে যাও, বড়ো হবেই।

আসুন দাদা—ভালো হোটেল!
মনের মতন খাবার পাবেন,
এই হোটেলে বারেক খেলে
লাগবে সোয়াদ—আবার খাবেন।
স্পেশাল—কাঁকর তৈরী এ ভাত,
চালের ভেজাল নেই কো মোটে,
করাত গুঁড়ো ভুষির আটা
কোন্ হোটেলে এমন জোটে।
বছর খানেক আগের ধরা
ঠান্ডা ঘরের টাটকা মুগেল
কয়লা পিষে মশলা দেওয়া
রান্না তো নয়—যাদুকা খেল।
তেলের কথা বলব কী স্যার—
রেড়ীর সাথে মবিল দিয়ে
এমনি সরেস্ সুতারটি তার
গেছে পাড়ার কাক পালিয়ে
পথের যত মরা ইঁদুর
চর্বিতে তার তৈরী ঘি যে—
ঢুকবে যখন পেটের ভেতর
নেবেন বুঝে ব্যাপার কী যে!
ছেঁড়া জুতোর সোল কুড়িয়ে
মিশিয়ে তাতে তেঁতুল গোলা—
চাট্‌নি যা স্যার তৈরী আছে—
ঠেকলে জিভে যায় না ভোলা।
বৃদ্ধ পাঁঠার মাংস কচি
কাগের ডিমের আদত কারী,
আসুন দাদা ফুরিয়ে গেলে
হতাশ শেষে হবেন ভারী।
এই যে দাদা—ভাল হোটেল।
মনের মতন খাবার পাবেন—
থাকলে বরাত এখান থেকে
নিমতলাতে সোজাই যাবেন।।

ওঠায় নামায়

॥ মনোজিৎ বসু ॥

"এই যে বাপু বংশীবদন, বদন দেখি শুকনো যে!
দাওয়ায় ব'সে সড়ক পানে রও চেয়ে আজ কার খোঁজে?
ব্যাপার কী হে, ব্যাপার গায়ে? জ্বর হয়েছে? তাইতে কি,
বংশী তোমার বিরস-বদন? দেখি দেখি, হাত দেখি!
এই মরেছে, কাঁদছ কেন? বলবে কিগো সেই কথা?
মন্দ খবর? দুর্ঘটনা? হচ্ছে বুঝি দাঁতব্যথা?"

"ওসব কিছুই হয়নি আমার",—বংশীবদন কয়, "বাবু,—
ভায়া আমার লাট হয়েছে? তাইতে আমি হই কাবু।
চন্দ্রবদন ভাইটি আমার, বয়স হবে দেড় কুড়ি,
লেখাপড়ায় গোবর-গণেশ! বোকামিতেও নেই জুড়ি!
রাগ ক'রে সে পেইলে গেল, এক্কেবারে কোলকেতা,
সেথায় তারে মুখ্যু গেঁয়ো এখন কে আর বলবে তা?
শুনতে পেলাম কাজ পেয়েছে সরকারী কোন্ দপ্তরে—
সাহেবসুবোয় ওঠায় নামায়, সব নাকি তার খপ্পরে!
বলব কি, তার কাণ্ড শুনে, আজকে আমি ভিরমি যাই—
মন্ত্রীদেরও ওঠায় নামায় চন্দ্রবদন, শুনতি পাই।
ভাবছি আমি এমনি ধারা লাটসাহেবি কাজ করা
পোষায় মোদের, বলুন বাপু, ধরায় সরা জ্ঞান করা?
আমরা হলেম চাষাভুষো মুখ্যু মানুষ—বেশ আছি,
বাপ-পিতেমোর লাঙল চ'ষে ফসল ফলাই, তাই বাঁচি।
আঙুল ফুলে হয় কলাগাছ, শেষকালে তা যায় ঝড়ে
সেই কথাটা ভুলেই বুঝি আমার অমন ভাই মরে!
ঢাক পিটিয়ে বলছে চাঁদু—'সেক্রেটারি, মিনিস্টার
আমার হাতে ওঠেন নামেন, যে সে আমি নইকো আর!'
আরে বাপু গেঁইয়া গোভূত কাজ পেয়েছিস কাজটা কর
তায় নয় যত [illegible] তুমি খুব হয়েছিস ধুরন্ধর!
সাহেবসুবো সেক্রেটারি, তার ওপরে মিনিস্টার—
তাদের ওঠায় তাদের নামায় বুঝুন এখন ভাই আমার!"

"তাই নাকি গো বংশীবদন, খুব বাহাদুর তোমার ভাই!
বুকের পাটা দেখছি আছে আর আছে তার সাহসটাই।
বলতে পার, ভাইটি তোমার কোন্ পদে আজ বহাল সে?
মাইনে এবং উপরি কত পাচ্ছে এখন সে আল্সে?"

বংশীবদন বললে কেঁদে—"সে কথা আর শুধান ক্যান,
চন্দ্রবদন ভাইটি আমার গবরমেণ্টে লিফ্‌টোম্যান!!"
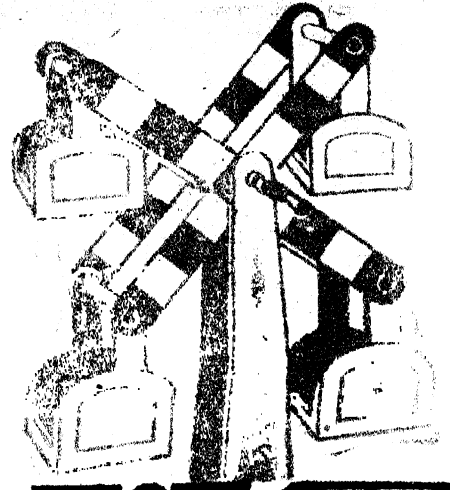
নাগর দোলা

পরিতোষকুমার চন্দ্র

এবার পুজোয় তোমাদের নাগরদোলা উপহার দেবো। এর মানে এই নয় যে, তোমাদের হাতে একটা করে নাগরদোলা তুলে দেবো; নিজের হাতে তোমরা যাতে নাগরদোলা তৈরী করে নিতে পারো তারই উপায় বলে দেবো। নাগরদোলা তৈরী করতে যে সব জিনিস দরকার হবে তার ফর্দ নীচে দিলুম:

(১) একটা ১৪"×১৪" মাঝারি মোটা পিচবোর্ড, (২) দুটো ৭"×৩" মোটা পিচবোর্ড, (৩) একটা ৩"×২½"×½" কাঠের টুকরো, (৪) একটা ৩"×½"×½" কাঠি, (৫) চারটে ১½"×½"×½" কাঠি, (৬) একটা ১"×½"×½" কাঠি, (৭) একটা আধ ইঞ্চি লম্বা সিক ইঞ্চি গোল কাঠি, (৮) একটা ১৬"×৮" পোস্ট কার্ডের মতো পাতলা কার্ডবোর্ড, (৯) কয়েকটা করে ½" ও ¼" পেরেক এবং (১০) একটা কুশন পিন। চেয়ারের গদী লাগাবার সময় টুপীর মতো গোল মাথা যে পেরেক ব্যবহার হয় তাকেই কুশন পিন বলে। ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

প্রথমে ১৪"×১৪" পিচবোর্ডটার ওপরে পাশাপাশি ৬" ব্যাসের দুটো বৃত্ত এঁকে কাঁচি দিয়ে কেটে দুটো গোল চাকা তৈরী করো। সেই চাকা দুটোর ওপরে স্কেলের সাহায্যে যোগ চিহ্নের আকারের ½" চওড়া বাহুবিশিষ্ট দুটো ক্রুশ (Cross) এঁকে তিন কোণা অংশগুলো কেটে বাদ দাও এবং বাহুগুলোর প্রান্তের কোণগুলো গোল মতো করে দাও। তারপর দুটো ক্রুশেরই কেন্দ্রে একটা করে সিকি চৌকো ফুটো করো। এই ক্রুশ দুটো হবে নাগরদোলার চাকা, যার থেকে চারটে বাক্স ঝুলবে। চাকার কেন্দ্রে ফুটো করবার সময় বিশেষ খেয়াল রাখবে ক্রুশদুটোর বাহুগুলো মিলিয়ে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে ধরলে দুটো চৌকো ফুটোর ধারগুলো যেন ঠিক ঠিক মিলে যায়। তা না হোলে নাগরদোলা তৈরী করা যাবে না।

এবারে ৭"×৩" পিচবোর্ড দুটোরই আড়ের দিকের একটা প্রান্তের সমান্তরালে ½" চওড়া একটা লাইন টানো। তারপর লম্বা

ছোটদের পাততাড়ি

দকে দুপাশে ১" করে জায়গা ছেড়ে নীচের সেই লাইন থেকে ১" াবধানে লম্বালম্বি দুটো লাইন টেনে থামের মতো করে এ'কে দু পাশের এক ইঞ্চি করে অংশ কেটে বাদ দাও। তারপর থাম দুটোর মাথা থেকে আধ ইঞ্চি নীচে একটা করে সিকি ইঞ্চি গোল ফুটো করো এবং মাথার কোণগুলো মেরে গোল করে দাও। এদুটো হবে নাগরদোলার দুপাশের দুটো খু'টি, যার সঙ্গে চাকা দুটো আটকানো থাকবে।

এর পরে ৩" লম্বা কাঠিটার এক প্রান্তের সিকি ইঞ্চি ও অন্য প্রান্তের আধ ইঞ্চি ভেতরে ছুরি খাড়া করে ধরে চৌকো কাঠিটার চার ধারেই চাপ দিয়ে কেটে দাগ দিয়ে সেই কাটা দাগের বাইরের সিকি ও আধ ইঞ্চি অংশ দুটো চে'চে গোল করো। এই অংশ দুটো
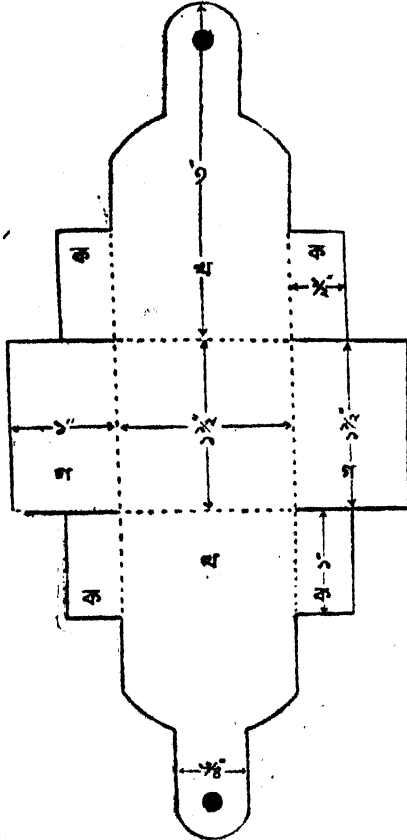
১নং ছবি

সিকি ইঞ্চির থেকে কিছুটা ছোট করে গোল করতে হবে। এই কাঠিটা হবে চাকার ধুরো, যেটাকে কেন্দ্র করে চাকা দুটো ঘুরবে।

এখন ১½" লম্বা কাঠি চারটের দু প্রান্তেরই এক সুতো (⅛") পরিমাণ অংশ ছেড়ে চাকার ধুরোর মতো করে ছুরির দাগ দিয়ে দু পাশের এক সুতো অংশগুলো চে'চে সিকি ইঞ্চির থেকে কিছুটা ছোট করে গোল করে দাও। এই চারটে কাঠি হবে বাক্সের ধুরো, যেগুলোর সাহায্যে বাক্সগুলো ঘুরবে।

এবারে ১" লম্বা কাঠিটার দুটো প্রান্তের কোণগুলো মেরে গোল করে দাও। এটা হবে হ্যাণ্ডেল বার, যেটার এক দিক চাকার ধুরোতে আটকানো থাকবে, আর অন্য দিকে থাকবে হ্যাণ্ডেল। আধ ইঞ্চি লম্বা গোল কাঠিটাই হোলো হ্যাণ্ডেল। আর ফর্দের ৩নং জিনিসটি হোলো খু'টি দুটোর পায়া।

এবার ১৬"×৮" কার্ড বোর্ডটার ওপরে ১নং ছবিতে দেওয়া মাপ অনুযায়ী পাশাপাশি চারটে নক্সা এ'কে সেগুলোর বাইরের লাইন ধরে কাঁচি দিয়ে কেটে আলাদা করে ফেলো এবং 'ক' ও 'গ' চিহ্নিত অংশগুলোর মাঝের টানা লাইনগুলো ফুটোকি দেওয়া লাইন পর্যন্ত কাঁচি দিয়ে কাটো। তারপর 'ক' 'খ' ও 'গ' অংশগুলো ফুটোকি দেওয়া লাইন বরাবর ওপর দিকে ভাঁজ করো এবং 'ক' চিহ্নিত অংশগুলোর অপর পিঠে ('ক' লেখা পিঠের উল্টো পিঠে) আঠা লাগিয়ে 'গ' চিহ্নিত অংশগুলোর ভেতর পিঠে ('গ' লেখা পিঠে) জুড়ে দাও। জোড়বার সময় 'খ' ও 'গ' অংশগুলো খাড়া করে ধরে রাখবে, নইলে জুড়তে পারবে না। এইভাবে তৈরী করলে যে চারটে জিনিস হবে সেগুলোই হবে নাগরদোলার বাক্স, আসল নাগরদোলায় যেগুলোতে বসবার ব্যবস্থা থাকে।

যদি বার বার নক্সা আঁকার হাঙ্গামা এড়াতে চাও, তবে কার্ড বোর্ডটার এক ধারে প্রথমে একটা নক্সা এ'কে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে, সেটাই কার্ড বোর্ডের ওপর রেখে রেখে সেটার ধার দিয়ে পেনসিলের দাগ দিয়ে বাকি তিনটে নক্সা আঁকবে এবং কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে নির্দেশ মতো ভাঁজ করে জুড়ে বাক্সগুলো তৈরী করবে।

বাক্সগুলোর আঠা শুকিয়ে গেলে সেগুলোর দুদিকের খাড়া বাহু দুটোর প্রান্ত থেকে সিকি ইঞ্চি নীচে সিকি ইঞ্চি গোল ফুটো করো। তোমার বা তোমার জানাশোনা কারো বাড়ীতে যদি কাগজ পাঞ্চ বা ফুটো করার যন্ত্র থাকে, তবে আঠা দিয়ে বাক্সগুলো জোড়বার আগেই সেই যন্ত্র দিয়ে বাহুর ফুটোগুলো করে নিতে পারলে খুবই ভালো হয়।

এতক্ষণ ধরে যা সব তৈরী করলে সেগুলো হোলো নাগরদোলার বিভিন্ন অংশ। সেই অংশগুলো জোড়া দিলেই নাগরদোলা তৈরী হবে। এখন সেই কাজটা করো।

প্রথমে পায়াটার ৩" পাশ দুটোর দুপাশে খু'টি দুটোর ৩" অংশ দুটো রেখে বাইরের দিক থেকে কয়েকটা ½" পেরেক মেরে আটকে দাও। তারপর চাকার ধুরোর দুদিক দিয়ে দুটো চাকা ঢুকিয়ে সেটার দু প্রান্তের গোল অংশের পরেই যেখানে চৌকো অংশ আরম্ভ হয়েছে তারই সামান্য একটু ভেতর দিকে চাকার চৌকো ফুটো দুটো বেশ টাইট করে আটকে দাও। এবার বাক্সের বাহুর ফুটো দুটোর মধ্যে বাক্সের ধুরোর দু প্রান্তের গোল অংশ ঢুকিয়ে দাও এবং দু পাশের চাকার ভেতর দিকে, বাহুর প্রান্তের আধ ইঞ্চি নীচে, বাক্সের ধুরোর দু দিকের মাথা রেখে বাহুর বাইরের দিক থেকে একটা করে আধ ইঞ্চি পেরেক মেরে আটকে দাও।

এবারে খু'টি দুটো একটু ফাঁক করে সে দুটোর ফুটোর মধ্যে চাকার ধুরোর প্রান্ত দুটো ঢুকিয়ে দাও। এতে এক দিকের খু'টির বাইরে সিকি ইঞ্চির চেয়ে কিছুটা বেশী অংশ বেরিয়ে থাকবে, আর অন্য দিকে থাকবে খুব সামান্যই। এই সামান্য বেরিয়ে থাকা অংশের মাথায় কুশন পিনটা হাতুড়ী মেরে এমন করে বসিয়ে দাও যাতে পিনের মাথার টুপীটা খু'টির গায়ে চেপে বসে না যায়। এই পিনের জন্যে ধুরোর যেটুকু খু'টির ফুটোর মধ্যে থাকা দরকার তা সেখানেই থাকবে। ভেতর দিকে সরে বেরিয়ে যাবে না।

এবার অন্য দিকের খু'টির বাইরে যে অংশটুকু বেরিয়ে আছে সেটার ভেতর দিকের, অর্থাৎ খু'টির দিকের আধ সুতো আন্দাজ জায়গা ছেড়ে বাইরের দিকের বাকি অংশে আঠা মাখানো কাগজের সরু ফিতে জড়িয়ে একটু মোটা করে দাও। প্রান্তের এই মোটা অংশটি অন্য দিকে মারা কুশন পিনের মতো কাজ করবে, অর্থাৎ ধুরোটা ভেতর দিকে সরে বেরিয়ে যাবে না।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তারপর হ্যাণ্ডেলটা মাটিতে খাড়া করে ধরে রেখে সেটার মাথায় হ্যাণ্ডেল বারের এক প্রান্তের চ্যাপ্টা দিক সমকোণে রেখে ওপর থেকে একটা আধ ইঞ্চি পেরেক মেরে আটকে দাও। এবার সেটা উল্টে, অর্থাৎ হ্যাণ্ডেলটা ওপর দিকে করে হ্যাণ্ডেল বারের অন্য প্রান্তটা মোটা-করা ধুরার মাথায় সমকোণে রেখে ওপর থেকে একটা আধ ইঞ্চি পেরেক মেরে আটকে দিলেই নাগরদোলা রেডী। তখন পায়ার ওপর দাঁড় করিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে ঘোরালেই বাক্স চারটে নিয়ে চাকা দুটো ওপর-নীচ করে ঘুরবে। তৈরী করার পর সেটা দেখতে কেমন হবে তা নাগরদোলার ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে।

নাগরদোলাটা যদি রং করতে চাও, তবে বাক্স চারটেতে চার রকমের রং দেবে। আর বাকি সব কিছুই বাদামী রং করে দেবে।

লক্ষ্মণ মান্না। 'রূপশ্রী সেলুনের' মালিক। তার সাথে আমার পরিচয় অনেক দিনের। তারাপদের সেলুনে তাকে প্রথম দেখি। তার বয়েস তখন ছিল দশ থেকে বারোর মধ্যে। বাবা-মা নেই। তাই অল্প বয়সেই তাকে কাজের সন্ধানে আসতে হয়েছিল গ্রামের বাড়ী ছেড়ে ক'লকাতা সহরে। বাচ্চা-ছেলে ব'লে কেউ তাকে দিয়ে দাড়ি কামাতে চাইত না। শান্ত এবং মিষ্টি স্বভাবের লক্ষ্মণকে আমার খুব ভালো লাগত। লক্ষ্য করতাম, কেউ তাকে দিয়ে দাড়ি কামাতে না চাইলে, তার মুখখানি ম্লান হ'য়ে যেত। আমি তাকে কাছে ডেকে এনে বলতাম, নাও—লক্ষ্মণ, আমার দাড়িটা কামিয়ে দাও? লক্ষ্মণ যেন হাতে আকাশ পেত। অতি উৎসাহে আমার দাড়ি সে কামিয়ে দিত খুব সতর্কতার সঙ্গে। এ ঘটনা দীর্ঘ পঁচিশ বছর আগেকার।

আজ লক্ষ্মণ নিজেই একটা 'সেলুনের' মালিক। স্বভাবটি আজো কিন্তু তার তেমনি আছে। মিষ্টি এবং নম্র! তারাপদের 'সেলুনে' আমি সুদীর্ঘ বিশ বছর চুল কাটিয়েছি। লক্ষ্মণ তার 'রূপশ্রী সেলুন' খোলার পর থেকে এখন সেখানেই চুল কাটাই। চায়ের দোকানে যেমন নানা কথার আড্ডা জমে—সেলুনেও ঠিক তাই। রাজনীতি ও নেতাজী থেকে সুরু ক'রে সিনেমা থিয়েটার, বাজার দর, শিকার কাহিনী, 'স্পুটনিক' খেলার মাঠ, মায় ঘোড়দৌড়ের মাঠ পর্যন্ত আলোচনা যা তর্কের বিষয় বস্তুরূপে দেখা দেয়। এ সব আলোচনা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আলোচনাকারীটি যেন সর্ব-ব্যাপারে একজন 'অথরিটী' মানে 'সবজান্তা'! অথচ, আসলে এরা ডুবে আছে অপরিসীম অজ্ঞতার পচা পাঁকের মধ্যে। তবু, তারা 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে'—যে কোন 'গুল' পরিবেষণ করে যায়। রূপশ্রী সেলুনের' মালিক লক্ষ্মণ মান্না কিন্তু নির্বিকার। সে কাউকেই বাধা দেয় না—অখুশি হবে বলে। কেন না, খদ্দের লক্ষ্মী!

আমি 'রূপশ্রী সেলুনে' একদিন অন্তর একদিন যাই দাড়ি কামিয়ে নিতে। সেদিন বোধ হয় সোমবার। দাড়িটা কামিয়ে নিতে হবে ব'লে একটু অসময়তেই রূপশ্রীতে গেলাম। দুপুরবেলা। কোন খদ্দের ছিল না। দোকানের দুটি কারিকর খেতে গেছে। লক্ষ্মণ নিজে একটা এ্যালুমিনিয়ামের ছোট্ট হাঁড়িতে মাংস সিদ্ধ করছিল, স্টোভ জ্বালিয়ে। আমি হেসে বললাম, 'কিহে লক্ষ্মণ, পিকনিক করছো নাকি?' সে তার স্বভাবগত মিষ্টি হাসি হেসে জবাব দিলে,—না বাবু। একটা কুকুর কিনেছি। দিশী নয়, বিলিতি! মাংস ছাড়া কিছু খায় না। উৎসাহের আতিশয্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তার বড় বড় চোখ দুটি—কথাগুলি বলার সময়। আমার বেশ লাগলো তার এই ছেলেমানুষী দেখে।

যদি ইচ্ছে হয়, তবে ছবিতে যেমন দেখানো আছে তেমনি করে চাকার বাহুগুলোতে সাদা কালো রং দিয়ে চিত্রিত করে নিতে পারো।

লক্ষ্মণের বাড়ী হাওড়া জেলায়, রামনগর। বাগনান স্টেশনে ...মে পাঁচ ক্রোশের পথ। হালে, গাঁয়ে সে তার নিজের বাড়ী করেছে। ...রে চোরের উপদ্রব। থালা-বাসন ঘটিবাটি আর হাঁড়ির ভাত পর্যন্ত ...রি যাচ্ছে। এককথায় যাকে বলে ছিঁচকে চুরি। তাই, লক্ষ্মণের এই ...কুর পোষা সখ নয়, প্রয়োজন। এই বিলিতী কুকুর ...নি'র জন্যে লক্ষ্মণকে সপ্তাহে তিনবার গাঁয়ের বাড়ীতে যেতে ...—কলকাতা থেকে মাংস নিয়ে। 'লাকির' আহার শুধু মাংস।

এই সেই বাপ-মা মরা ছেলে ছোট্ট লক্ষ্মণ। আজ সে দেশে এসে ...ড়ী করেছে। বাড়ী করার সংবাদ আশে-পাশের গাঁয়ের লোকেরা ...টা না রাখে, তার চাইতে ঢের বেশী খবর রাখে তারা ঐ বিলিতী ...কুর লাকি'র। সপ্তাহে কি কি বার এবং কখন কলকাতা থেকে ...াকির' জন্যে মাংস আসে—তা পর্যন্ত তারা মুখস্থ বলতে পারে।

গাঁয়ে চুরির কামাই নেই। কিন্তু, লক্ষ্মণ মান্নার বাড়ী চোর ...কে না। একে বাড়ীতে পোষা কুকুর—তাতে আবার দিশী নয়, ...লিতী। চোরের সাহস কি সে বাড়ী ঢুকবে? 'বার্কিংডগ সেলডম ...ইটস'—এই ইংরেজী প্রবাদ-বাক্যটির ঐ গাঁয়ের চোরদেরও জানা ...ল বোধ করি। 'লাকির' আওয়াজ কখনো কারুর কানে যায়নি। ... কুকুর ঘেউ ঘেউ করে না, সে যে ভয়ঙ্কর জাতীয় কুকুর হবে—...কথা অনুমান করার বুদ্ধি চোরদেরও আছে। তাই আশে-পাশে ...মের যত চোর কেউ লক্ষ্মণ মান্নার বাড়ীর দিকে ঘেঁষে না।

নিস্তব্ধ গভীর রাত।

অবশেষে, সেই লক্ষ্মণ মান্নার বাড়ীও চোর ঢুকলো। একটি ...য়, দুটি নয়, একসঙ্গে তিনটি চোর। এ চোর অবশ্য ধারে কাছের ... দূরে গাঁয়ের। তারা এ-বাড়ীর বিলিতী কুকুর লাকির খবর রাখে ...। খবর রাখলে হয়তো ঢুকতে সাহস পেত না। চোর শুধু ঢুকলো, ...মন নয়। একটু হলেই 'লাকি'কে প্রায় মাড়িয়ে ফেলেছিল আর ...? লাকি শুয়ে ছিল। স'রে গিয়ে উঠে দাঁড়ালো। হয়তো, ...অন্ধকারে এবার চোরদের কান্ড-কারখানা লক্ষ্য করতে থাকবে তার ...তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে। মুখে 'লাকির' শব্দটি মাত্র নেই। হায়! বেচারী ...চোরেরা এখনো টের পায়নি যে, বিলিতী কুকুর লাকি'র হাতে আজ ...াদের চোর-জীবনের শেষ যবনিকা পতন হবে। নিঃশব্দে সিঁদ ...কেটে একটির পর একটি করে চোরেরা লক্ষ্মণ মান্নার বাক্স-পেটরা ...মূল্যবান সব দ্রব্য সামগ্রী বের করে ফেললে। এবার! এবার বুঝি ...লাকি' এক-একটা লাফে এক-একটা চোরের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ...ফেলবে। ইস্! কী বীভৎস কান্ড ঘটবে এক্ষুণি! যাকে বলে ...বিলিতী কুকুর। 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে'র' ডিটেকটিভদের পর্যন্ত হার ...মানায়। আজ আর কারুর রক্ষা নেই, 'লাকির' কাছে। চোরেরা একটি একটি করে সবগুলি জিনিষ মাথায় তুলে নিয়ে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। এবার! এবার! এবার বুঝি 'লাকি' এক লাফে মরণ কামড় বসিয়ে দেয় চোরের টুঁটিতে। কিন্তু, কই? কোথায় 'লাকি?' তাকে দেখা যাচ্ছে না তো? এত আশা! এত আশঙ্কা! এত উত্তেজনা! এত কল্পনা! সবই কি মিথ্যে?

লক্ষ্মণ মান্নাকে সর্বস্বান্ত করে চোর সব নিয়ে পালিয়ে গেল ...বিলিতি কুকুর 'লাকির' নাকের ডগার ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে। 'লাকি' ...টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না। সে নির্বিকার!

'মুগশ্রী সেলুনে' ব'সে সেদিন চুল কাটাচ্ছিলাম। কথায় কথায় ...জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার 'লাকির' খবর কি হে লক্ষ্মণ? সে তার ...মুখখানি কাচুমাচু করে জবাব দিলে,—'ওটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, ...বাবু। বাড়ীর সব জিনিষপত্র চুরি হয়ে গেল। ব্যাটা টুঁ শব্দটি ...পর্যন্ত করলে না!

'তা বলে তাড়িয়ে দিলে?'

'তাড়িয়ে দেবো না, বাবু? গাঁয়ের খেঁকি কুকুরগুলি পর্যন্ত রাত্রিতে গাছের একটা পাতা পড়লে—চিৎকার করে সারা গ্রাম জাগিয়ে তোলে। আর এত বড় একটা চুরি হয়ে গেল, ব্যাটা একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করলে না? আমার সব নিয়ে গেল!'

'কুকুরটা বোবা-কালা ছিল না তো হে?'

'বোবা-কালা বলছেন, বাবু? খাবার সময় পেরিয়ে গেলে ঘোঁ-ঘোঁ করে ভারিক্কি আওয়াজ তুলে সবাইকে জানিয়ে দিতে ভুল হত না'।

'তুমি তাড়িয়ে দিয়েছো পর আর একদিনও আসেনি কুকুরটা?'

'না বাবু, আর আসেনি।'

"দিশী কুকুর হলে তাড়িয়ে দেবার পরও আবার ফিরে আসতো। বিলিতী মানে, সাহেব কুকুর কিনা? এদের প্রেস্টিজ জ্ঞান অনেক বেশী।

* সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে রচিত।

ঘন বন, আর পাহাড়। যেদিকে চাও, সেদিকেই জঙ্গল। এরই মাঝে বাংলো। এখানে থাকে খুকু। আর তার মা-বাপ। বাবা বিমল-বাবু এ বনের রক্ষক। সারা বন তাঁরি অধীন। রোজ বার হন। রোজ একটা না একটা শিকার করেন। হাজারীবাগ জঙ্গলে না আছে এমন জানোয়ার নেই। দিনদুপুরেও ঘুরে বেড়ায় ভালুকের দল।

খুকু ভাবে, তার যদি বাবার মত বন্দুক থাকত। সেও শিকার করতে পারত। মনে ভাবে আর হা-হুতাশ করে। একদিন থাকতে না পেরে বলেই ফেলল. দুড়ুম ফটাস্ দাও বাবুমণি।

কি হবে-রে, বন্দুক দিয়ে। খুকুকে জিজ্ঞেস করেন বিমল-বাবু।

ছিকাল কলব। বাঘ মালব। হাতী মালব।

খুকুর বয়স চার মাত্র। তার কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন বিমলবাবু। চীৎকার করে ডাকলেন, ওগো! শোন, শোন—তোমার খুকুর কথা। ও বাঘ মারবে—হাতী মারবে।

মালবইত। তুমি দাও না—দুড়ুম ফটাস্।

দেব—দেব—কিনে দেব—

ছত্যি দ্যায়বে—ছত্যি ত?

হ্যাঁ-রে হ্যাঁ। সত্যিই দেব। বিমলবাবু সান্ত্বনা দেন।

একদিন, সত্যিই টয়গান এলো। কি কাজে বিমলবাবু শহরে গিয়েছিলেন। ফিরবার মুখে টয়গান কিনে আনেন খুকুর জন্য।

টয়গান পেয়ে খুকুর কি আনন্দ। যাকে দেখে, তাকেই দুড়ুম ফটাস্ করে দেয়। খুকুর ভয়ে কেউ ঘরে আসতে চায় না। খুকুর কান্ড দেখে, মা-বাবা ত হেসেই লুটোপুটি।

দুপুরবেলা। সবাই ঘুমাচ্ছে। খুকু উঠে বসলো। দেখলো—বাবা-মা ঘুমে। টয়গানটা হাতে নিয়ে খুকু ঘরের বাইরে এলো। বাঃ এখানে ত কেউ নেই। সে ত এই চায়। গানটা কাঁধে ফেলে খুকু টুক-টুক করে নীচে নেমে এলো। নীচও খালি। তবু খুকু ঘাড় দুলিয়ে দেখে নিলো। তারপর গেট খুলে বাইরে এলো। বন—বন—ঘন বন। তার ভিতর খুকু মিলিয়ে গেলো।

খুকু যেদিকে যায়, সেদিকেই ঘন বন আর পাহাড়। লতায় পাতায় পূর্ণ। গানটা কাঁধে নিয়ে খুকু ঘুরছে। কোথায় যাবে সে তা জানেনা। এক জায়গায় এসে থামলো খুকু। জায়গাটা ফাঁকা। ঝোপ-ঝাপ আর পাহাড়ী ফুলের ছড়াছড়ি। ফুলের উপর কতকগুলো প্রজাপতি। আপন মনে উড়ছে। বাঃ কি সুন্দর! খুকু ধরতে যায়। প্রজাপতি ফুড়ুত করে উড়ে, আর একটা ডালে বসে। খুকু ধরি ধরি করেও ধরতে পারে না। এভাবে সে অনেক দূরে চলে গেলো।

ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ। কুকুরের ডাকে ফিরে তাকায় খুকু।

এই পাপি—তুই। যা-যা ঘরে যা—চলে যা।

ঘেউ ঘেউ, ফ্রক ধরে টানে—

মালব ছাড় ছাড় দূরে হ। ওদের এ্যালশিসিয়ান কুকুর।

ঘেউ ঘেউ ঘেউ—ঘরে চল। এ জায়গা ভাল নয়। আবার ফ্রক টানে।

আঃ—মালব—মালব ছাড়। বিরক্ত হয় খুকু। চড় দেয় পাপির মাথায়।

গর-গর-গর। ঝোপের ভিতর দিয়ে ভালুক বের হয়ে এলো। খুকু ও পাপিকে দেখে রেগে ওঠে। ওদের দিকে আসছে ভালুকটা।

পাগলের মত হয়ে গেলো পাপি। খুকুকে ছেড়ে দিয়ে ভালুকের মুখোমুখী হলো। নখ দিয়ে মাটি আচড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে ঘেউ ঘেউ। ভালুককে ভয় দেখিয়ে বলছে—ফিরে যা—ফিরে যা—

ভালুক দেখে খুকু ত খুশি। সে গানটা তাগ করলো। বলল—দাঁড়া। দুড়ুম ফটাস্ করব। পাপি ছুটে আসে খুকুর কাছে—ডাকে—ঘেউ ঘেউ—পালাও—পালাও—দেখছ না, যম আসছে।

খুকু রেগে যায়, এই পাপি মাকে বলব—মালব। ছাড় বলছি—ছাড়। এই অবসরে ভালুকটা আবার এগুতে থাকে।

ঘেউ ঘেউ ঘেউ। পাপি রুখে দাঁড়ায় ভালুকের দিকে। বাধা পেয়ে ভালুকও দাঁড়িয়ে যায়। ভালুক যতবার খুকুকে ধরতে যায়, পাপি বাধা দেয়। শেষে না পেরে ভালুকের লেজ কামড়িয়ে দেয়। এবার ভালুক খেপে যায় পাপির উপর। সেও ঘুরে দাঁড়িয়ে পাপিকে আক্রমণ করে। দুজনে যুদ্ধ লেগে গেলো। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। ভালুকের গর্জনে . বন কেঁপে উঠলো। খুকু ওদের কাণ্ড দেখে খুশিতে হাততালি দিচ্ছে।

খুকু চলে যেতেই মা ঘুম থেকে ওঠেন। দেখেন ঘরে খুকু নেই। খুকু খুকু অ-খুকু। খুকুর সাড়া নেই। মা পাগলের মত এ ঘর, ও ঘর খুঁজেন। খুকু নেই। বিমলবাবুকে ডেকে বললেন, ওগো—খুকু নেই। ওকে কোথায়ও দেখছিনে।

বন্দুক নিয়ে বিমলবাবু ছুটলেন। চাকররাও তাঁর পিছু নিলো। কিছুদূর যেতেই শব্দ কানে এলো—ঘেউ ঘেউ। আর গর গর। শব্দ লক্ষ্য করে সেদিকে সকলে ছুটলো।

বিমলবাবু যখন এলেন পাপি তখন ভালুকের কণ্ঠনালী কামড়িয়ে ধরেছে। ভালুক ছাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। আঁচড় আর খামচিতে পাপির দেহ ক্ষতবিক্ষত। তবু কামড় ছাড়েনি পাপি। ওদের অদূরে দাঁড়িয়ে খুকু। আনন্দে হাততালি দিচ্ছে আর লাফাচ্ছে।

চাকররা গিয়ে খুকুকে কোলে তুলে নিলো। ভালুককে ফায়ার করে দিলেন বিমলবাবু। ভালুক মরে গেলো। তিনি ছুটে পাপির কাছে এলেন। ডাকলেন, পাপি, আয়-আয়। পাপি সাড়া দিল না। পাপিকে তুলতে গেলেন বিমলবাবু। দেখেন পাপি মৃত। তিনি মৃত কুকুরটাকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন বাংলোয়। তাঁর চোখে তখন জল। তিনি কাঁদছেন।

তোমরা যদি সুদূর মার্কিণ দেশের নিউইয়র্ক নগরীর সেন্ট্রাল পার্কে যাও, তাহলে সেখানে দেখবে সুদৃশ্য রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি উচ্চস্থানে প্রমাণ সাইজের একটি কুকুরের স্ট্যাচু। চারপাশে দাঁড়ানো শিশুদের মত তুমিও অবাক হয়ে যাবে। এ কিরে বাবা। স্ট্যাচু তো হয় বিখ্যাত মানুষদের। কুকুর আবার বিখ্যাত মানুষের মত বিখ্যাত হল কবে?

প্রকৃতপক্ষেই কুকুরটি বিখ্যাত এবং এর কীর্তি সত্যিই মহৎ। বিশ্বের সেরা কুকুর হিসেবে অভিহিত হয়েছে . এই ব্যাল্টো নামক প্রাণীটি। তার আশ্চর্যজনক এক কীর্তি কাহিনী আজ তোমাদের শোনাবো।

মেরুমণ্ডলে আলাস্কা নামক একটি চির তুষারাবৃত স্থান আছে তোমরা জানো। সেখানে বাস করে এস্কিমোরা। এগারো হাজার এস্কিমো অধ্যুষিত সেখানকার নোমে নামক সহরে কালান্তক এক রোগ দেখা দিয়েছিল একবার। এস্কিমোরা তাকে 'কালো-মৃত্যু' নামে অভিহিত করেছে। আসলে রোগটা ছিল মারাত্মক, ডিফথিরিয়া। অকস্মাৎ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল এ রোগ সেখানে। স্থানটি কল্পনাতীত দুর্গম। আরটিক সাগরের পূর্বে ও উত্তরে, হাজার মাইল ধু-ধু করা চোখ ঝলসানো বরফের দুরন্ত অবস্থিত সে স্থান।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনা। নিউইয়র্কের পত্রিকায় যখন এ ভয়াবহ সংবাদ পৌছলো, তখন নোমে সহরে মাত্র একজন মার্কিণ ডাক্তার আর গোটা কয়েক মাত্র নার্স বর্তমান। আর সেখানে তখন ডিপথেরিয়ার কোন সিরাম অর্থাৎ অ্যান্টিটক্সিন নামক অব্যর্থ ঔষধ আদৌ ছিল না। ডাক্তার জরুরী বার্তা পাঠিয়েছে, সেই অষুধ চেয়ে। অষুধ না পেলে সমস্ত লোক অবিলম্বে মারা পড়বে। অনুরোধ এসেছে, এরোপ্লেনে করে অবিলম্বে অ্যান্টি-টক্সিন পাঠান।

কিন্তু নোমেতে এরোপ্লেন পাঠানো ছিল অসম্ভব। জিরো ডিগ্রীর নীচে ৪৬ ডিগ্রী ঠাণ্ডায় কোন পাইলটের, পক্ষেই প্লেন নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও কয়েকজন দুঃসাহসী পাইলট চেষ্টা করেছিল যাবার জন্যে এই অবিশ্বাস্য দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পথে প্লেন নিয়ে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল, প্লেন সে পথে গেলে মাঝ রাস্তায়াই ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে যাবে—এবং মূল্যবান প্রাণদায়িনী অষুধগুলো বেঘোরে নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং বিজ্ঞান যেখানে বিফল হল, সেখানে প্রাকৃতিক জন্তুর হল জয়। অর্থাৎ সেই দুর্গম পথের একমাত্র বাহক হল কুকুর টানা স্লেজগাড়ি।

স্থির হল, ৬৬৫ মাইল দীর্ঘ তুষারাচ্ছন্ন, তুফান সংকুল পথ, কুকুর টানা স্লেজের চারটি দল, রিলে করে অষুধ নিয়ে পৌছবে নোমেতে।

শ দেড়েক মাইল দূরে দূরে থাকবে এক-একটি দল। এ পথটি যেতে ইতিপূর্বে সময়ের রেকর্ড ছিল নয় দিন। অবশ্য ভালো আবহাওয়ায়। এ দলেরা স্থির করলো আরো দুদিন সময় কমিয়ে এরা নতুন রেকর্ড করবে। এতগুলো প্রাণের ওপর মৃত্যু হাত বাড়িয়েছে, তাদের বাঁচাতে হবেই। কিন্তু এ সময়টা আবহাওয়া হয়েছে সাংঘাতিক। একে বরফের রাজ্য তাতে পুরো শীতকাল, সবার ওপরে শোঁ-শোঁ করে ৮০ মাইল ঘন্টায় তুষার ঝড় বইছে অনবরত। যাই হোক, প্রতিটি দল সঙ্গে নিল রেডিও। সংবাদ আদান-প্রদান হবে রেডিওতে।

যে কুকুরের দল নির্বাচিত হল, তারা সবাই ইতিপূর্বে নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে বহুবার। বরফের রাজ্যে যে কোন আবহাওয়ায় চলবার উপযুক্ত তারা। শিশুকাল থেকে এদের শিক্ষা দেয় এস্কিমোরা, কিভাবে স্লেজ নিয়ে মাইলের পর মাইল উঁচু-নীচু বরফের কর্কশ ও বিপদ সংকুল পথে যেতে হয়। এদের বুদ্ধি বৃত্তিও চমৎকার। অনেক মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধি এদের। নিশানাহীন ধু-ধু বরফের রাজ্যে পথ চেনবার ক্ষমতাও অদ্ভুত।

রিলে রেসের তৃতীয় পর্যায়ে ছিল গানার ক্যাসন নামক এক ব্যক্তি। তার কুকুর দলের পথ-প্রদর্শক ছিল ব্যাল্টো। এই ব্যাল্টো, ছিল আধা কুকুর, আধা নেকড়ে জাতীয় প্রাণী। ১৯১৫-তে মুক্ত রেসে যে কুকুর দল জয়ী হয়, তার প্রধান ছিল এই ব্যাল্টো। ১৯২৩ শে উত্তর মেরু অভিযানে বিখ্যাত পর্যটক রোনাল্ড অ্যামাণ্ডসন যখন যাত্রা করেন, সে সময়ও কুকুর দলের সর্দার ছিল এই ব্যাল্টো।

যাই হোক, ফেব্রুয়ারী ২৭ তারিখে অ্যান্টিটক্সিন ভর্তি কয়েকটি বাক্স স্লেজে চাপিয়ে প্রথম কুকুরের দলটি সেই ভয়াবহ পথে যাত্রা শুরু করল। যে পথের শেষে ১১০০০ নর-নারী শিশু মহামারী আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুণছে। প্রথম দল দ্বিতীয় দলের হাতে এক সময় অষুধের বাক্সগুলি তুলে দিল, দ্বিতীয় দল পুনরায় যাত্রা করে সব সুদ্ধ আধা-আধি পথ অতিক্রম করে পৌঁছে দিল তৃতীয় দলের কাছে। এ দলের নায়ক গানার ক্যাসন। এর ভয়াবহ ভ্রমণ পথটুকুর কথাই তোমাদের বলি।

২রা ফেব্রুয়ারী রাত তখন ১টা। কল্পনা কর, অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই বরফের রাজ্য। প্রবল ঝটিকা বইছে তুষারের। বিশাল মোটা পোশাক ভেদ করে লোকটার দেহে তপ্ত লোহ শলাকার মত তীক্ষ্ণ শৈত্য প্রবেশ করছিল হাড়ের মধ্যে। স্লেজের সঙ্গে চামড়ার দড়ি হাতে বাঁধা অবস্থায় টলতে টলতে সে এগোচ্ছিল। আর পারে না বুঝি চলতে। সূচের মত বিঁধছে শীত সর্বদেহে। চতুর্দিকে জনমানবহীন তুষার—বহু মাইল দূরে নোমে সহর। সমস্ত শরীর এক সময় অবশ হয়ে এল লোকটার। সহসা সে জ্ঞান হারিয়ে প্রায় হাঁটু ভেঙ্গে সেই তুষার সমুদ্রে শুয়ে পড়ল। সামনে ৩ লক্ষ ইউনিট জীবনদায়িনী ঔষধ অ্যান্টিটক্সিনের বাক্স ভরা স্লেজ গাড়ী. পরমোপকারী মানব বন্ধু কুকুরের দল টেনে চলেছে। জিরোর নীচে ৫০ ডিগ্রী শৈত্য—লোকটি জ্ঞান হারিয়ে তুষারের মধ্যে পড়ে রয়েছে। আর বুঝি প্রাণে বাঁচবে না, ঔষধও পৌঁছবে না, ফলে এগারো হাজার লোকের অপঘাতে মৃত্যু হবে অবধারিত। ৮০ মাইল গতিতে আলাস্কার তুষার ঝটিকা বইছে। অকস্মাৎ জ্ঞান ফিরে এল ক্যাসনের। কানে এল ঝড়ের শব্দ ভেদ করে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ শব্দ, ঝড়কে তুচ্ছ করে তার কুকুর দল এগিয়ে চলেছে। অগ্রগামী কুকুরটি তার প্রভুর বিপদ বুঝি বুঝতে পারে। প্রবল টানে ক্যাসন উঠে পড়ে কোন মতে। চীৎকার করে বলে—ব্যাল্টো, এগিয়ে চলো, আমাকে নিয়ে যাও সহরে। ব্যাল্টো ঘেউ-ঘেউ করে বুঝি সমর্থন করে। ভয়াবহ পথ সে পেরিয়ে এসেছে, কখনো জমা সমুদ্রের ওপর দিয়ে পথ সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে, কখনো ৬০০ ফুট উঁচু টিলার মত বরফের চাঁই-এর উপর দিয়ে। নিষ্ঠুর ঝটিকায় তাকে ও তার কুকুর দলকে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। পথ হারিয়ে গেছে। অন্ধকার রাত। তার উপর পতন ও মূর্চ্ছা। কুকুরদল পথ চিনে চলেছে। অগ্রগামী ব্যাল্টো পথ-প্রদর্শক। তুষার ঝটিকা এত প্রবল যে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, শুইয়ে ফেলে দেয়। তার উপর বরফের কণা এসে চোখ দিচ্ছে অন্ধ করে; কতবার যে স্লেজ সে ঝড়ে উল্টে গেল তার ইয়ত্তা নেই। ক্যাসন শুয়ে জাপটে ধরে বাক্সগুলোকে বাঁচালো—তারপর সেগুলো অতিকষ্টে স্লেজে চাপিয়ে, পুনরায় পথ চলতে লাগল। কুকুর দলও আর পারছে না—লোমেভরা শরীর তাদের বরফে প্রায় ঢাকা পড়েছে—পাগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে অভাবনীয় শৈত্যে। ব্যাল্টো—থেমো না—চলো। ব্যাল্টো প্রাণ জ্বালিয়ে প্রভুর আদেশ পালন করে এগিয়ে চলেছে। এ ঔষধ যে পৌঁছতেই হবে। এগারো হাজার লোকের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে এ বিশল্যকরণীর উপর।

আর মাত্র বারো মাইল আছে। হে ঈশ্বর শক্তি দাও, ক্যাসন প্রার্থনা করে। আবার যেন মূর্চ্ছার ভাব আসছে তার। হাঁটু ভেঙ্গে পড়তে চাইছে, শীতে রক্ত জমে গেছে, চোখ প্রায় অন্ধ। বেরিং সাগরের তীরে তীরে চলেছে স্লেজ। দুটি কুকুরের দেহ শক্ত হয়ে এল স্লেজ থামিয়ে ক্যাসন তাদের গায়ে খরগোস চামড়ার ঢাকনা দিয়ে দিল। শিরায় শিরায় রক্ত বুঝি জমে যাবার দাখিল।

প্রায় ভোর ভোর সময়ে সোমবার গিয়ে তারা অবশেষে উপস্থিত হল বহু আকাঙ্ক্ষিত নোমে সহরে, আধা মৃত, আধা অন্ধ অবস্থায়। পৌঁছেই ক্যাসন তার কুকুর দলের পাশে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে আনন্দাতিশয্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ব্যাল্টোর ক্ষত-বিক্ষত পা থেকে তুষার কণাগুলো বেছে বার করতে করতে সে বলে উঠল, আমার ব্যাল্টো, কুকুর মণি, সোনামণি. কত কষ্টই না তুমি করেছ। তুমি প্রাণ বাঁচিয়েছ আমার আর এগার হাজার মানুষের।

৬৬৫ মাইল তুষারাবৃত অসম্ভব পথ ওরা মাত্র ৫½ দিনে অতিক্রম করে রেকর্ড করেছে। নোমেতে ভয়ে আতঙ্কে সবাই অর্ধমৃত। গৃহে-গৃহে অর্গল বন্ধ। একজন মহিলা তার বাপকেই বাড়ি ঢুকতে দেয়নি পাছে ছোঁয়াচে রোগ বাড়ি ঢোকে। ১০ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ঔষধের কল্যাণে মহামারীর জরুরী অবস্থা কেটে গিয়ে বিপন্মুক্ত হল সহর।

এর সব কিছু প্রশংসা একমাত্র ব্যাল্টোর প্রাপ্য।

মার্কিণ সেনেটে এই মহৎ উপকারী কুকুরের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা পাশ হয়ে গেল। তারপরই তৈরী হল ওর প্রমাণ সাইজ স্ট্যাচু। স্থাপন করা হল নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের অভ্যন্তরে। প্রত্যহ শিশুরা আজ খেলা করে বিশ্বের সেরা কুকুরের প্রতিমূর্তির আশেপাশে।

ধন্য প্রখ্যাত মানব বন্ধু আধা নেকড়ে আধা কুকুর, ব্যাল্টো।

গলা-ফোলা কোলাব্যাঙ

শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি)

হঠাৎ মনে হলো কারা যেন চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে আসছে আমার ঘরের দিকে। কানে এলো ওরা চেঁচাচ্ছে—"গাল ফোলা কোলা ব্যাঙ ভাঙবো আজ তোমার ঠ্যাঙ!"

কী ব্যাপার! তড়াক করে উঠে দরজার দিকে পা বাড়াতেই সত্যি সত্যি একটা ইয়া বড় গাল ফোলা কোলা ব্যাঙ ঘরে ঢুকেই এক লাফে আমার খাটের ওপর উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই ছোট্ট বন্ধুর দলও হুড়মুড় করে ঢুকলো ঘরে—শঙ্কর বললে—মৌমাছি আজ ঐ ব্যাটা ব্যাঙের ঠ্যাঙ না ভেঙে ছাড়ছি না।

আমি বললাম—থাম! থাম! আগে বল্ ওর অপরাধটা কি?"

"অপরাধ? ব্যাঙ ব্যাটা সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে রান্নাঘরে উনুনের পাশে ঘাপটি মেরে বসেছিল, ছোড়দি অন্ধকারে উনুন ভাঙা মাটির ঢেলা মনে করে যেমনি ধরেছে অমনি ব্যাটা লাফিয়ে বারান্দায়।" হাঁপাতে হাঁপাতে বললে কথাগুলো শঙ্করই।

আমি বললাম—"তাতে ওর অপরাধটা কোথায়? কিছু ক্ষতি তো করেনি তোমাদের কারও?"

মিঠু কাঁদো কাঁদো গলায় বললে—"বারে? আমি যে হাত দিয়ে ধরেছিলুম ওটাকে আমার হাতে যে গরল হবে মৌমাছি।"

আমি বললাম "নারে না, কোলা ব্যাঙ ধরলে গরল হয় না মোটেই। ওরা মোটেই বিষাক্ত বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। ব্যাঙ সম্বন্ধে অনেক বাজে ও ভুল কথাই লোকে বলে ওসবে কান না দেওয়াই ভালো।" বলেই আমি কোলা ব্যাঙটাকে হাত দিয়ে ধরে বিছানা থেকে তুলে নিলাম। ছোট্ট তুতুন ঠোঁট উলটিয়ে বলে উঠল—"ম্যাগো মৌমাছি দাদাভাইটা পেতনী। ভয়-ঘেন্না নেই একটু খানি! বলেই আমার পাশ থেকে সরে গেল দেড়হাত দূরে!

তোমরাও ব্যাঙকে ঘেন্না, ভয় করতে না, কুচ্ছিৎ, বিচ্ছিরী বলতে না, যদি জানতে তোমরা আমাদের বাগানে বা ক্ষেতে ব্যাঙরা আমাদের কতখানি সাহায্য করে গাছপালার শত্রু সব পোকামাকড় মেরে খেয়ে।"

শঙ্কর বললে 'পোকা-মাকড় মেরে খেয়ে বাগানের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে বলে ব্যাঙকে কুচ্ছিত বিচ্ছিরী বলতে দোষটা কি? সত্যিই তো ব্যাঙের চেহারা শরীর একদম বেটপ বিচ্ছিরী। ঘাড় মাথা শরীর সব একাকার।"

আমি বলি—"ওরে সব জীবেরই আলাদা চেহারা, আলাদা গড়ন হয় এই জন্যে যে, যার যেমন কাজ, জীবন তার শরীরটা তেমনই দরকার। তোমাদের চেহারা দেখে ব্যাঙেরাও নাক সেঁটকায় হয়তো গ্যাঙর গ্যাঙর করে বলেও তাই—"মানুষের ছানা বেটপ শরীরখানা!"

পট করে মিঠু বলে বসলো—"বলে বলুক গে! আমরা তো বুঝতে পারি না। আচ্ছা মৌমাছি ওদের ঐ তো মোটে আড়াই ইঞ্চি ছোট্ট দেহটা তার ভেতর থেকে অমন গাঁক গাঁক হাঁক ডাক বেরোয় কি করে।

"ভাল প্রশ্ন করেছে মিঠু—আসলে ব্যাঙেদের ফুসফুস যন্ত্রটাতে আমাদের ফুসফুস যন্ত্রের মতো নিঃশ্বাস নেওয়া-ছাড়ার কাজটা করতে হয় না। আসলে তাদের ফুসফুসটাই ব্যাঙেদের হাঁক ডাককে জোরালো করে তোলে।"

নিতু বললে—"ফুসফুস দিয়ে নিঃশ্বাস নেয় না ওরা তবে কি ব্যাঙেরা ল্যাজ দিয়ে নিঃশ্বাস নেয়!"

আমি হেসে জবাব দিই—"নিতু, ঠাট্টা করতে গিয়ে প্রায় তুমি ঠিক কথাই বলে ফেলেছে—ব্যাঙেদের লেজ নেই—ব্যাঙাচি অবস্থাতে ল্যাজ খসে যায় নিশ্চয় পড়েছ?"

"হুঁ পড়েছি!" জবাব দেয় নিতু। কিন্তু ব্যাঙদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা চলে কিভাবে?"

শুনলে অবাক হবে ব্যাঙেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটি আসলে চালায় ওদের শরীরের ঐ ভিজে ভিজে পাতলা চামড়া তার রক্ত-বওয়া শিরাগুলিকে কাজে লাগিয়ে। ব্যাঙেদের চামড়া আর শিরা এমনভাবে তৈরী যে সেগুলি বাইরের অক্সিজেন ভেতরে আসতে দেয় আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড বাইরে যেতে দেয়। কিন্তু মনে রেখো ব্যাঙেদের চামড়া এভাবে কাজ করতো না যদি না সব সময়ে ভিজে আর সাঁৎসেতে হয়ে থাকতো।"

মিঠু শিউরে উঠল পট করে বলে বসল—"ঐ জন্যেই তো ব্যাঙটাকে ধরার পর থেকে এখনও আমার গাটা শির শির করছে, ভয় হচ্ছিল ওর গায়ের রস লেগে আমার হাতে গরল হবে। আচ্ছা মৌমাছি! ব্যাঙেদের চামড়া শুকিয়ে গেলে কি হবে?"

"কি আর হবে! ব্যাঙেদের চামড়া অতিরিক্ত শুকিয়ে গেলে ওরা মরে যায়। আর সেই কারণেই ব্যাঙগুলো থাকে জলে-কাদায়। বুঝিয়ে বললাম ওদের।

মিঠু বললে—"তাহলে রান্নাঘর থেকে পালিয়ে ভালই করেছে ব্যাঙটা। আচ্ছা মৌমাছি! ব্যাঙটার চামড়া যেমন ভিজে তেমনই ওর গাটা যেন কাঁটা কাঁটা খসখসে, অমন কেন?"

"তার কারণ ব্যাঙদের চামড়ার ওপর শক্ত কাঁটাওলা একটা খোলস জন্মায়—আর তাদের নীচেই থাকে সেই গ্ল্যান্ডগুলো যেগুলো সর্বদা রস বার করে করে ব্যাঙেদের চামড়াটাকে অমন ভিজিয়ে রাখে। তাই রান্নাঘরে থাকলেও ব্যাঙটা সহজে মরতো না। চামড়া শুকিয়ে মরবার ভয়ে ব্যাঙটা পালিয়ে আসে নি। পালিয়ে এসেছে তোমাদের চেঁচানি আর ঠ্যাঙ ভাঙবার শাসানি শুনে।"

শঙ্কর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে এবার মুখ খুললো—গম্ভীরভাবে বললে—"এতদিন জানতুম সাপেই খোলস ছাড়ে, কোলা ব্যাঙেরা খোলস ছাড়ে একথা শুনিনি কারও মুখে!"

তুতুন বললে—"শোননি এখন তো শুনলে! আচ্ছা মৌমাছি ব্যাঙেরা কি করে খোলস বদলায় বল না?"

—"বেশ বলছি শোনো, আসলে কোলা ব্যাঙ তার গাল গলা আর শরীরটাকে ফোলায় পিঠটাতে চাড় দেয়—খোলস পুরানো হয়ে এলে তাতে তার শরীরের চামড়ায় চাড় লেগে জায়গায় জায়গায় ফেটে যায়—ফেটে গিয়ে গা থেকে ছেড়ে আসে গুঁড়িয়ে কুঁকড়িয়ে। তারপর পেছনের পা দুটোকে কাজে লাগিয়ে সে খোলসটা টানাটানি করে ছাড়ায় সামনের পা দুটো দিয়ে—সেই পুরানো ছাড়ানো খোলসটা টুকরো টুকরো করে গিলে খায়।"

—"আমার গা গুলিয়ে উঠছে এ সব কথা শুনে আমি পালাচ্ছি, বলেই মিঠু দৌড়ে পালালো ঘর থেকে।"

শঙ্কর বললে—"ছোড়দিটার সবেতেই বাড়াবাড়ি—বিজ্ঞান শিখতে গেলে অত ঘেন্না করা কি চলে!"

তুতুন বললে—"মৌমাছি? আমাকে বুঝিয়ে বলো ব্যাঙের ঐ গ্যাঙর গ্যাঙর গান কি রকম করে ওদের ফুসফুসটা তৈরী করে?"

—"ভাল কথা জানতে চেয়েছে তুতুন? আসলে ব্যাঙের

(স্নোফেলিও থেকে)

কোন সময়ে ইতালীর ক্যালে প্রদেশের কোন একটি গ্রামে একজন পরম বিত্তশালী এবং মহানুভব ব্যক্তি ছিল। তাঁর নাম নাদান। এত বড় উদার এবং সরল অন্তঃকরণের লোক সে সময়ে দ্বিতীয়টি আর ছিল না। নাদানের প্রাসাদ যেমন বিরাট তেমনি মনোহর। প্রাসাদের ভিতর অনেকগুলি সুসজ্জিত ঘর এবং অতিথি অভ্যাগতদের পরিচর্যার জন্যে অনেক দাস-দাসী। নাদানের আতিথেয়তা এবং মহানুভবতার কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে দেশ-দেশান্তরে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নাদানের গুণগানে মত্ত, শুধু একটি লোক ছাড়া। এই লোকটির নাম মিথ্রিদানেস। একদিন মিথ্রিদানেস মনে মনে বলল, আমি যখন নাদানের চেয়ে কোন অংশেই কম নয় তখন আমার নাম না নিয়ে শুধু নাদানের গুণগানই করে বেড়াবে কেন সবাই?

একদিন মিথ্রিদানেস প্রাসাদে বসে আছে এমন সময় একটি ভিখারিণী এসে ওর কাছে ভিক্ষা চাইল। মিথ্রিদানেস তাকে ভিক্ষা দিল। কিন্তু ভিখারিণী এই একবার ভিক্ষা নিয়েই চলে গেল না। প্রাসাদের তেরটি প্রবেশ দ্বার। ভিখারিণী বারটি দরজায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষা নিয়ে তের নম্বর দরজায় এসে দাঁড়াতেই মিথ্রিদানেস বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, তুমি কেমন ভিখিরি গো? বারো বার ভিক্ষে নিয়ে তোমার মন ভরল না। এখন আবার তের নম্বর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছ? কেন জ্বালাতন করতে আস বাপু? যাও বিদেয় হও।

'হায় ভগবান! এমন কথাও শুনতে হোলো? নাদানের প্রাসাদের বত্রিশটা দরজা। আমি বত্রিশটা দরজায় গিয়েই ভিক্ষে চেয়েছি, নাদান হাসি মুখে ভিক্ষে দিয়েছে। আর এখানে মুখ নাড়া খেতে হোলো! ভগবান নাদানের মঙ্গল করুন।' এই কথা বলেই ভিখারিণী বিদায় হয়ে গেল।

ভিখারিণীর মুখে এই কথা শুনে মিথ্রিদানেসের গোটা শরীরটা আগুনের মত জ্বলে উঠল। মনে মনে বলল, এই নাদান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন লোকে আর আমার নাম করবে না। অতএব এই পৃথিবী থেকে ওকে জন্মের মত সরিয়ে দিতে হবে। তা হলেই শান্তি মনে মনে এই অভিসন্ধি করে মিথ্রিদানেস কয়েক-জন সঙ্গী নিয়ে নাদানের প্রাসাদের দিকে যাত্রা করল একদিন। তিন দিনের দিন প্রাসাদের কাছে পেঁাছেই মিথ্রিদানেস দেখে রাস্তায় এক-জন লোক অতি সাধারণ পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মিথ্রিদানেস জিজ্ঞাসা করল, দেখুন মশাই এইটাই কি নাদানের প্রাসাদ?

'আজ্ঞে হ্যাঁঃ কেন বলুন ত? উত্তর দিল লোকটি।

মিথ্রিদানেস বলল, 'আমাকে এই প্রাসাদে ঢুকবার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারেন? তবে এমনভাবে আমাকে নিয়ে যাবেন, যাতে কেউ দেখতে না পায় এমন কি নাদানও না। পারবেন?'

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। লোকটি বলল, এ আর এমন শক্ত কি কাজ? আসুন আমার সঙ্গে।' কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্রিদানেস সঙ্গীদের বাইরে রেখে নিজে অনুসরণ করল লোকটির।

প্রাসাদে ঢুকে মিথ্রিদানেস লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে লোকটি নিজেকে নাদানের একজন ভৃত্য বলে পরিচয় দিল। কিন্তু আসলে তা নয়। আসলে এই সাধারণ লোকটিই অসাধারণ গুণশালী নাদান। তবে মিথ্রিদানেস তা মোটেই বুঝতে পারল না বরং এই লোকটিকে দিয়েই ওর স্বার্থ সিদ্ধি হবে এই ভেবে মিথ্রিদানেস নাদানের কাছে ওর মনের গোপন অভিসন্ধির কথা সব প্রকাশ করে দিল।

মিথ্রিদানেসের এই জঘন্য অভিসন্ধির কথা শুনে নাদান প্রথমে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে রইল। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে বলল, 'বেশত ভালো কথা। আপনি কিভাবে খুব সহজেই নাদানকে হত্যা করতে পারবেন তার একটা সহজ রাস্তা বলে দিচ্ছি। এখান থেকে ঠিক আধ মাইল দূরে একটা সুন্দর বাগান আছে। নাদান প্রত্যেক দিন সকালবেলা ঐ বাগানে হাওয়া খেতে যায়। সঙ্গে কেউ থাকে না। আপনি সেই বাগানে ঢুকে আপনার উদ্দেশ্য অতি সহজেই সাধন করতে পারবেন। এই পরামর্শ দিয়ে নাদান সেই রাত্রের মত মিথ্রিদানেসের কাছ থেকে বিদায় নিল। নাদানের আদেশ অনুযায়ী ভৃত্যরা কোন ত্রুটিই রাখল না মিথ্রিদানেসের পরিচর্যার সেই রাত্রের মত। দু'জনার মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ হোলো না সেই রাত্রে।

পরের দিন ভোরবেলা মিথ্রিদানেসের হাতে মৃত্যুকে বরণ করবার জন্যে নাদান উপস্থিত হোলো গিয়ে সেই নির্দিষ্ট বাগানে। নাদানের বিশ্বাস মিথ্রিদানেস ওকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবে না। ওর উদারতা এবং আতিথেয়তার কাছে নিশ্চয়ই হার মানবে মিথ্রিদানেস। পর বিশ্বাস এবং সৌহার্দ্য দিয়ে অতি বড় শত্রুকেও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়। মনে মনে ভাবল নাদান।

এদিকে মিথ্রিদানেস বাগানে ঢুকে দেখে ও যেদিক দিয়ে বাগানে ঢুকেছে ঠিক তার বিপরীত দিকে মুখ করে সত্যি-সত্যিই

ফুসফুসটা ব্যাগ পাইপ বাজনার মতই কাজ করে। ব্যাঙের মুখ আর ফুসফুসের মাঝখানে গলাটায় শব্দ তোলার মতো কতকগুলো শিরা আছে সেগুলোতেই ফুসফুসের জমা বাতাস জোরে ধাক্কা মেরে একবার ভেতরে যায় আবার ধাক্কা মেরে বাইরে আসে। সেই ধাক্কায় ব্যাঙের স্বরতন্ত্রী বা ভোক্যাল কর্ডগুলোকে কাঁপায় আর তাতে শব্দ হয়, তারপর ব্যাঙের গলার নীচে একটা বাড়তি থলি আছে সেই থলিটাই লাউড স্পীকারের কাজ করে ওদের হাক ডাককে বেশ গুরু গম্ভীর জোরালো করে তোলে।"

যেই এই কথা বলা অমনি কোলা ব্যাঙটা গলা ফুলিয়ে কোঁক কোঁক দুটো শব্দ করেই লাফ মারলো ব্যস! জানলা গলে উধাও!

তুতুন চেঁচিয়ে উঠলো—"সর্বনাশ! তেতলার জানলা গলে ব্যাঙটা নীচে পড়লো। মরে গেল নিশ্চয়ই।"

আমি হেসে বললাম "না বেঁচে গেল! ঠ্যাঙ তোমরা ভেঙে দিলে ভাঙতো বটে—তবে ব্যাঙের ঠ্যাঙ লাফঝাঁপে ভাঙে না আর ওপর থেকে নীচে পড়লেও, কারণ ওদের পায়ে স্প্রীং আছে থাবা আছে!"

কথা শেষ না হতেই দেখি ঘর খালি। লাফ মেরে ছোট বন্ধুরাও আমার পালিয়েছে। ওদের পায়েও স্প্রীং আছে যে জানিয়ে গেল ওরা।

একজন লোক চুপচাপ বসে আছে। একেই নাদান বলে স্থির করে মিথ্রিদানেস নিঃশব্দ পদক্ষেপে ওর পিছনে পিছনে গিয়ে নিজের হাতের তরবারিটা ওর মাথার উপর উঁচু ক'রে ধরে বলে উঠল, 'এইবার? ভণ্ড কোথাকার! টাকার জোরে নাম কিনতে চাও? এখন দেখি তোমাকে কে বাঁচায় আর তোমার নামই বা কে মুখে আনে!

ঠিকই বলেছ বন্ধু, মৃত্যুই আমার যোগ্য পুরস্কার।' মুখ না ফিরিয়ে বলল নাদান।

গলার আওয়াজ শুনে মিথ্রিদানেসের সন্দেহ হোলো। মনে-মনে ভাবলো এই লোকটার সঙ্গেই যেন কাল রাত্রে ও একসঙ্গে ভোজে বসে আনন্দ উল্লাস করেছে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন দিক থেকে সরে এসে সামনে দাঁড়ালো মিথ্রিদানেস। দেখল সত্যি-সত্যিই সেই একই ব্যক্তি। এবং এই ব্যক্তিই যে নাদান তা বুঝতে আর একটুও বিলম্ব হোলো না মিথ্রিদানেসের। লজ্জায় এবং ঘৃণায় মাথা নত হয়ে পড়ল। হাতের তরবারি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নাদানের সামনে নতজানু হয়ে সাশ্রু নয়নে বলল, 'মহাশয় আপনি যে কত মহান তা আমি নির্বোধ বলে আগে বুঝতে পারিনি। হিংসায় উন্মত্ত হয়ে আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ভগবান সেই দুর্মতি এখন দূরে করে দিয়েছেন। আমার এই পাপের উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার। আপনি আমাকে শাস্তি দিন, আমি মাথা পেতে নেব।'

নাদান মিথ্রিদানেসকে দু'হাত দিয়ে নিজের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, বন্ধু তুমি কেঁদো না। আমি জানি তুমি হিংসায় বশীভূত হয়েই এই কাজ করতে চেয়েছ। পৃথিবীতে এর চেয়ে কত বড় বড় হিংসার ব্যাপার ঘটে যায়। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়। লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ যায়, বড় বড় সহর ধ্বংস হয়। এই সবই স্বার্থ আর হিংসার জন্যে। তোমার কাজটা ত এসবের তুলনায় কিছুই নয়। তুমি দুঃখ কোরো না। আমি তোমার উপর খুব খুসী হয়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গল হোক। তবে একটা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই। আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। এই সংসারে থাকবার আর একটুও ইচ্ছে নেই আমার। তুমি যদি এখন আমার এই বিরাট সম্পত্তির ভার গ্রহণ করে আমারই মত ধর্মপরায়ণ হয়ে এই প্রাসাদে বাস কর তা হলে আমি মুক্তি পাই।'

নাদানের মুখে এই কথা শুনে মিথ্রিদানেস অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, লোকটা বলে কি! কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে নির্বাক হয়ে রইল মিথ্রিদানেস। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম আর তার পুরস্কার হিসেবে আপনি আপনার ধন-দৌলত আমাকে দান করে দিতে চাইছেন! আশ্চর্য! আপনার মহানুভবতার তুলনা হয় না। কিন্তু আমি মহাপাপী, আপনার এই উদারতার সম্পূর্ণ অযোগ্য পাত্র। যদি কোন উপায় থাকত তা হলে আমার আয়ুকে আপনার আয়ুর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেই পরমায়ুকে আরো সুদীর্ঘ করে তুলতাম। তাতে লোকের উপকার হোতো।''

'যদি সম্ভব হোতো তা হলে সত্যি-সত্যিই তুমি তাই করবে মিথ্রিদানেস?' প্রশ্ন করল নাদান।

মিথ্রিদানেস বলল, 'নিশ্চয়ই: আপনার মত উদারচেতা লোকের জন্যে এ কাজ করা এমন কি আর শক্ত!'

নাদান বলল, 'তোমার কথায় আমি অত্যন্ত খুশী হোলাম মিথ্রিদানেস। তুমি সত্যি সত্যিই আমার উপযুক্ত বন্ধু। তবে শেষবারের মত তোমায় একটা কথা বলি শোন। আমার মৃত্যুর দিন এগিয়ে এসেছে। তুমি এখনো অনেক দিন বেঁচে থাকবে। সংসারে আমি একা। তুমি ছাড়া এখন দেখছি কেউ নেই আমার। তাই বলছি ফিরে যেয়োনা। আজ থেকে তোমাকেই এই প্রাসাদের সবাই নাদান বলে মানবে এবং উপযুক্ত সম্মানও দেখাবে। এই প্রাসাদ এবং ধন-দৌলতের মালিক হয়ে তুমি এখানে থাক আর আমি আমার জীবনের বাকি ক'টা দিন তোমার অট্টালিকায় কাটিয়ে দিই।'

মিথ্রিদানেস বলল, হে মহানুভব! আমি মহা পাপী এবং নীচ। আপনার প্রাসাদে থেকে আমি আপনার নামের কলঙ্ক করতে চাই না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

মিথ্রিদানেস যখন কিছুতেই রাজি হোলো না তখন নাদান আর কি করবে। বাধ্য হয়ে অনুরোধ থেকে নিজেকে বিরত রাখলো। তারপর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত দুজনে গল্প করতে করতে প্রাসাদে ফিরে এলো। অনেক দিন নাদানের অতিথি হয়ে প্রাসাদে রইল মিথ্রিদানেস ওর সঙ্গীদের নিয়ে। নাদানের আন্তরিকতা এবং আদর অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হয়ে গেল মিথ্রিদানেস। মনে মনে ভাবলো, কোনদিনই ও নিজে নাদানের সমকক্ষ হতে পারবে না। তারপর একদিন প্রিয়তম বন্ধু নাদানকে উপযুক্ত সম্মান দেখিয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেল মিথ্রিদানেস।

শরৎ এসেছে
প্রকৃতি সেজেছে
ধরেছে নতুন রূপ—
নীলিম আকাশে
সাদা মেঘ হাসে,
:একি শোভা অপরূপ!!

আলোর ঝর্ণা ঝরিতেছে আজ
ফেলে দেবে তোরা যত বাজে কাজ—
ছুটে চল্ আজ বাইরে,
:এমন পুলক নাইরে..

কাঙাল গরীব
সকলই শিব,
সকলকে ভালো বাস্ রে—
দিয়ে অঞ্জলি
স্বার্থেরে বলি,
:ভেদাভেদ আজ নাসরে!!

ছোটদের পাততাড়ি

মিষ্টি মধুর শরৎ এল
বৃষ্টি মুখর বর্ষা শেষে,
স্বর্ণালী-রং রোদের ছোঁয়ায়
সারাটি দেশ উঠলো হেসে।
যখন এল সোনার শরৎ
উঠলো মেতে কুমোরপাড়া,
খড়-বাঁধুনি রং-মাটিতে
আটচালাতে পড়লো সাড়া,
মূর্তিগড়া মায়ের রূপের
নানা রঙের তুলির টানে।
কোন অপরূপ রূপে তারা
সাজায় মাকে কেইবা জানে?
শারদীয়া মায়ের পূজায়
কোন লগনে বাজবে বাঁশী
বিশ্ব জগৎ উঠবে মেতে
দেখলে মায়ের উজ্জল হাসি!
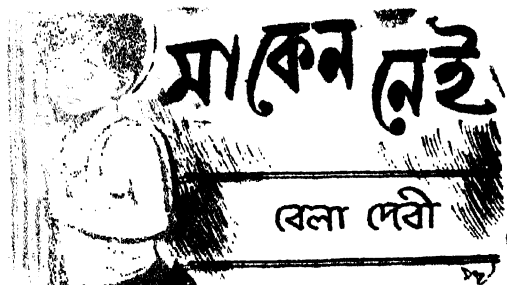
সবার দেখি মা রয়েছে
আমার কেন নেই,
আমার জগৎ শূন্য কেন
পাই না খুঁজে থেই।
এত দুষ্টু মিঠুরও হায়
মায়ের আদর বন্যা ধারায়
এমন ভালো কে আর
আমার বাসে
রাতের বেলা বুকে নিয়ে
কে-ই বা ঘুমায় পাশে
ঘুমের মাঝে স্বপন দেখে
হঠাৎ যখন উঠি জেগে
মাকে খুঁজি শূন্য বিছানায়
সবার ভুবন পূর্ণ হেন
আমার ভুবন শূন্য কেন
এই কথাটাই বুঝতে নারি হায়।

নীল পরীরা আয়,
নক্‌সা পাড়ের শাড়ি পিন্ধে, খোকার বিছানায়,
আয় পরীরা আয়,
সাত রাজ্যির হাসি নিয়ে সোনামণির গাঁয়।
সোনামণির গাঁয়ের ধারে বইছে নদীর জল
উঠ্‌ছে বেজে কংকাবতীর পায়ের মল।
যে নদীতে পায় না খুঁজে ভরসা আপন ঢেউ
যে নদীতে হারিয়ে গেছে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ।
ঢেউ নয় গো ঢেউ নয় গো—রাজকন্যা-আরো
হারিয়ে গেছে কোন সকালে নাইকো জানা কারো
সেই সে—সোনার নদী পারের গাঁয়
মেঘ মেদুরের ডানায় ভেসে
সোনামণির সবুজ দেশে,
আকাশ পরী দল বেঁধে সব আয়
আয়-আয়—আয়,
নক্‌সা পাড়ের শাড়ি পিন্ধে—ঘুঙুর বেঁধে পায়।

বরাত ভালো তোর

শ্রীঅতীন মজুমদার

অঙ্ক পরীক্ষাতে বাপু পেলিই না হয় সাত,
ভাবার কি আর আছে তাতে সারাটা দিন-রাত?
একশো মোটে নম্বর তো,—সবাইকে ভাগ করে
হবে দিতে, ক্লাসে তো তোর বাহান্নজন পড়ে।
হিসেব করে দেখ, জোটেনা ভাগ্যে সবার দুই,
বরাত ভালো তোর যে একাই সাত পেয়েছিস তুই।
কিছুই বাপু বুঝিসনেক,—মগজ কি ছাই ভরা?
যা মাঠে ঘাস কাঠ গে ঘোড়ার—ছেড়ে দে লেখাপড়া।

ছোটদের পাততাড়ি

আলপনা —রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্থক যেন হই

দুলাল মুখোপাধ্যায়

শরৎ কালের সূর্য
বাজালো আশার তূর্য
দুর্গা মায়ের আগমনে আজ
ধরণীর আশা পূর্ণ
সুরু করো ভাই কল্যাণ কা
হিংসারে করো চূর্ণ।।

অসুর নাশিনী জননী আমার
অহংকারেরে করো চুরমার
জীবনের পথ সুগম করগো
তোমার চরণ স্পর্শে
জন কল্যাণে সার্থক হই
যেন গো বর্ষে বর্ষে।।

ছোটদের পাততাড়ি

অভিনয় জগৎ

ছায়া দেবী, অনুপকুমার ও সাবিত্রী — 'অন্তরাল'

সুচিত্রা সেন — 'সন্ধ্যা দীপের শিখা'

সন্ধ্যা রায় — 'আলোর পিপাসা'

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় — 'এতটুকু বাসা'

অঞ্জনা ভৌমিক — 'অনুষ্টুপ ছন্দ'

কালো রাত্রির যুগ

উৎপল দত্ত

রাণী এলিজাবেথ বাকিংহাম প্রাসাদের উদ্যানে এক চায়ের আসর ডেকে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রী, নাট্য পরিচালক, নাট্যকার ও নাট্য-সমালোচকদের নিয়ে শেক্সপিয়রের ৪০০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করবেন ঠিক করেছিলেন। অনেকেই এলেন। অনেকে আবার রাজ-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ চিচেষ্টার-এ নাট্যোৎসব শুরু হয়ে গেছে, প্যারিসেও। মহারাণীর সঙ্গে চা পানটাকে তুলনায় তাঁরা অকিঞ্চিৎকর মনে করলেন।

সব চেয়ে কড়া জবাব পাঠালেন জন অসবোর্ণ। অবলীলাক্রমে তিনি বলে পাঠালেন, আমার সময় নেই; আর সময় থাকলেও যেতাম না কারণ ভীড় আমি সইতে পারি না।

অসবোর্ণ তাঁর নিজ সৃষ্ট লুথার-এর মতনই একা। এবং যেহেতু 'লুক ব্যাক ইন এংগার' লিখে তিনি নয়া মানববিদ্বেষী ধারার প্রবর্তন করেছেন, সেহেতু ইংলণ্ডের অধিকাংশ নাট্যকারই একাগ্রচিত্তে অসবোর্ণ-এর চটকদার কায়দাকানুন অনুকরণে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন।

ইংলণ্ডের আজকের নাট্যজগৎ ভয়াবহ মানববিদ্বেষের লীলাক্ষেত্র। নায়করা হয় উন্মাদ, নয় ছায়া। নাটকের বক্তব্য মানুষের ক্ষুদ্রতা ও অসহায়ত্বটাকে তুলে ধরার মধ্যে সীমিত। মানুষ এবং ভীড় যে কতটা ঘৃণ্য এটাই সকলের প্রতিপাদ্য।

*

আইরিস মারদক-এর উপন্যাস 'এ সেভার্ড হেড'। সেই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন লেখিকা স্বয়ং, প্রিস্টলির সাহায্যে। মানুষ মাত্রেই যে কামাতুর পিশাচ, সেটাই হচ্ছে প্রায় তিন ঘন্টাব্যাপী এই নাটকের বিষয়বস্তু। হাস্যরসের প্রলেপে কিছুতেই ঢাকা পড়ে নি এর উৎকট অন্তর। শেষ পর্যন্ত মনস্তত্ত্ববিদ চরিত্রটিকে একই শয্যায় নিজ ভগ্নীর সঙ্গে শায়িত দেখিয়ে তবে নাট্যকারদের আশ মিটলো। ক্রাইটিরিয়ন থিয়েটারে এ নাটক হিট্ করেছে।

লণ্ডনে চলছে একটি মার্কিণ নাটক 'হু ইজ এফ্রেড অফ ভার্জিনিয়া উল্‌ফ'। কনস্টান্‌স কামিংস-এর অবিস্মরণীয় অভিনয়ও ঢেকে রাখতে পারেনি এর জঘন্য মর্ম কথাটা। এ নাটকের নায়ক নায়িকা দুজনেই উন্মাদ। প্রাণপণে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত করছেন। এই কলহের মধ্যে তাঁদের যৌনবিকার পরিস্ফুট।

অল্ডউইচ থিয়েটার নাকি পরীক্ষামূলক নাট্য প্রযোজনার দিগদর্শক। শোনা যাচ্ছে ফ্রান্‌স ও ইংলণ্ডে নিষিদ্ধ জাঁ জেনে-র 'স্ক্রীন্‌স' নাটকের এঁরা মহড়া দিচ্ছেন; 'স্ক্রীন্‌স' এলজিরীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত বিপ্লবী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাটক। কিন্তু বর্তমানে এঁরা যা দেখাচ্ছেন তা হোলো পিন্টার-এর মানববিদ্বেষী 'বার্থডে পার্টি', রাডকিন-এর ন্যক্কারজনক 'এফোর নাইট কাম', আর গুটিকয়েক একাঙ্ক নাটিকার একটি অনুষ্ঠান। ডেভিড রাডকিন-এর নাটকটায় ছিল বলিষ্ঠ নাটকের সব উপাদান, ইংলণ্ডে আইরিশ বিদ্বেষ ছিল নাটকটার মূল বক্তব্য। কিন্তু নাট্যকারের আধুনিকতার চাপে শেষ পর্যন্ত এক কুৎসিত নরহত্যা-ব্রত পালনের রূপ নিল নাটকটা। এই আদিম ধর্মবিশ্বাসের বলি হোলো নায়ক; তাকে ছোরা মেরেই ধর্মান্ধরা ক্ষান্ত নন, টেনে তার মাথাটা ধড় থেকে ছিঁড়ে নিল। জাতিবিদ্বেষের সামাজিক কার্য কারণটাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে বীভৎস রসের জোয়ার বইয়ে দেয়া হোলো।

'এন্টারটেইনিং মিস্টার স্লোন' নামে এক ভীষণ খুনের গল্প চলছে উইন্ডহাম থিয়েটারে। খুনী এখানে এক বৃদ্ধকে স্রেফ পদাঘাত করতে করতে হত্যা করলো। আর বৃদ্ধের কন্যা ও জামাতা খুনীকে মাথায় করে নিল, কারণ দুজনই খুনীর প্রতি যৌনকামনায় আচ্ছন্ন।

*

জন হোয়াইটিং মরে গেছেন। ব্রেন্ডান বেহান-ও। আধুনিকদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর্নল্ড ওয়েসকার-এর লেখনী এক অজ্ঞাত কারণে স্তব্ধ।

ব্রেশট্-এর 'সেন্ট জোন অফ দা স্টকইয়ার্ড'-এর এক চমকপ্রদ প্রযোজনা করেছিলেন কুইন্‌স থিয়েটার। শিকাগোর মাংস ব্যবসায়ীদের নরখাদকসুলভ লোভ আর এক আধুনিক জোন অফ আর্ক-এর সংঘর্ষের কাহিনী। জোন-কে আবার শহীদ হতে হোলো; তবে এবার সে সদর্পে বলে গেল :

> সহিংস সংগ্রাম ছাড়া কিছু হবার নয়।
> যেখানে সহিংস দমননীতি, সেখানে সহিংস
> প্রতিরোধই একমাত্র পথ।

এ নাটক অভিনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত সংবাদপত্র ছিল সবাই একযোগে গাল পাড়তে সুরু করলো। শোভান ম্যাককেনা এবং লায়োনেল স্ট্যান্ডার-এর অভিনয় নাকি কদর্য। নাটক নাকি স্থূল, সোচ্চার, এমন কি মিথ্যা। শিকাগোর পুঁজিবাদীরা নাকি আসলে লোক ভাল। ব্রেশট্ নাকি কমিউনিস্টদের মাইনে-করা প্রচারবিদ।

নাটকটা ছ সপ্তাহ পরে উঠে গেল। 'মাউসট্র্যাপ' নামক সেই অর্থহীন থ্রিলারটি কিন্তু বারো বছর ধরে চলছে।

ওয়েসকার-এর না লেখার কারণটা হয়তো ততটা অস্পষ্ট নয়!

*

শেক্‌সপিয়ার নাকি ইংলণ্ডের। স্ট্র্যাটফোর্ডে মহান ট্র্যাজেডিগুলোর অভিনয় উঠে গেছে। ঐতিহাসিক নাটকগুলো নিয়ে পড়েছেন পিটার হল আর পিটার ব্রুক। এর অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে শেক্‌সপিয়ার-এর বিশালত্ব আর রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর ঘৃণা প্রকট। কিন্তু হ্যামলেট - ওথেলোকে বাদ দিয়ে?

রিজেন্ট্‌স পার্ক-এ মুক্তাঙ্গনে পঞ্চম হেনরি দেখতে গিয়ে হতভম্ব। প্রথম দৃশ্যটি তাঁরা বাদ দিয়েছেন। এই দৃশ্যে হেনরির যুদ্ধাভিযানের আসল কারণটা ব্যক্ত হয়েছে। পুরো যুদ্ধটা যে ধর্মযাজকরা ষড়যন্ত্র করে বাধাচ্ছে সেই ইংগিতটি এই অভিনয়ে পরিত্যক্ত হয়েছে। হেনরিকে এক আদর্শ নৃপতি করে দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সামনে এক অতিমানব সৃষ্টি করা হচ্ছে। তার জন্যে শেক্‌সপিয়ারকে অবজ্ঞা করতে এদের বাধে না।

মারমেড থিয়েটারে 'ম্যাকবেথ' দেখতে দেখতে প্রথম বিরতির সুযোগেই উঠে গেছেন এমন লোকের সংখ্যা বড় কম নয়।

*

লণ্ডনের রাস্তাঘাট নোংরা। টিউবস্টেশনের গায়ে পোস্টার চোখে পড়বে : কীপ ইংল্যান্ড হোয়াইট। আর দলে দলে ছেলেরা দীর্ঘ চুল রেখে, হাই-হীল জুতো পরে, লিপস্টিক মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

বীট্‌লস্, স্কর্পিয়ন্‌স আর রোলিং স্টোনস-এর এই জনপ্রিয়তার কারণ কি?

কথা হচ্ছিল বিখ্যাত নাট্য সমালোচক অ্যাসল্‌ ট্রিলিং-এর সঙ্গে। বললাম : একি যুদ্ধজনিত নৈতিক অধঃপতন?

ট্রিলিং বললেন, 'কতকটা। আসল কথা হচ্ছে, এ সমাজ ক্ষয় পেয়ে পেয়ে শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। নূতন পথ নির্দিষ্ট করতে এ সমাজ পারে না। তাই সংস্কৃতির ক্ষুধাকে বিপথে চালিত করছে একদল বুদ্ধিমান প্রচারবিদ। বীটল্‌স-প্রমুখের প্রচারবিদরা একটা কথা মনে রেখেছে : ইংলণ্ডে হোমো-সেক্‌শুয়াল-এর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি। তাই বীটল্‌সদের প্রায় মেয়ে সাজিয়ে উপস্থিত করে ইংলণ্ডের কিশোরদের যৌনবিকৃতিতে উস্কানি দেয়া হচ্ছে। যৌনবিকৃতি এখন এ সমাজে একটা খোলাখুলি ফ্যাশানে পরিণত হয়েছে।

*

মনে পড়লো পূর্ব বার্লিন-এর উন্নত বৈপ্লবিক নাটক আর নানা রূপরীতির পরীক্ষা। ব্রুলিনের অ্যাসম্বল-এর বিশ্বজয়ী নাটক। ডয়েট্‌শেস থিয়েটারে কিং লিয়ার আর 'হ্যামলেট'। ফোল্কস্‌বুয়েনেতে 'ওয়র এন্ড পীস'। মাক্সিম গোর্কি থিয়েটারে 'লোয়ার ডেপথ্‌স'। ভাইমার স্টেট থিয়েটারে 'ফাউস্ত'। বার্লিন থেকে বহুদূরে রস্টক শহরে নূতন নাটকের মেলা, ফল্ক কুবা-র 'গুয়ের ইন্‌কগ্‌নিতা'। লাইপজিগ-ড্রেসডেন-এর থিয়েটার। টালে শহরে পাহাড়ের মধ্যে উন্মুক্ত থিয়েটারে পড়ন্ত রোদে 'তৃতীয় রিচার্ড' অভিনয়ের আশ্চর্য বলিষ্ঠতা। দুই সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি নাট্যশালা। ট্রিলিং-এর কথাই বোধহয় ঠিক : শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনেই আজ বৃটিশ থিয়েটারে যৌনবিকারের বন্যা। নইলে অল্ডউইচ থিয়েটারের (রাষ্ট্রায়ত্ত) পাঁচটি একাংকিকার সবগুলিই এমন কদর্য বিকারের প্রতিচ্ছবি হবে কেন।

*

ট্রিলিং বলেছিলেন, 'ওথেলো দেখো না যেন, ও এক জঘন্য ব্যাপার'। বিশ্বাস করি নি। কারণ অলিভিয়ের-এর প্রযোজনায় 'আংকল ভ্যানিয়া' দেখে মনে হয়েছিল, এই লোকটি কর্মস্রোতে গা ভাসাতে পারে না। তাই বহু আয়াসে টিকিট যোগাড় করে দেখতে গেলাম অলিভিয়েরের অভিনীত ও প্রযোজিত 'ওথেলো'। দেখলাম উনি খালি পায়ে প্রবেশ করছেন, হাতে গোলাপ ফুল। দেখলাম সামান্যতম সুযোগে উনি প্রায় নগ্ন দেহ প্রদর্শন করছেন। দেখলাম উনি হাঁটছেন কোমর দুলিয়ে, কথা কইছেন জামাইকার উচ্চারণে। আর বিশেষ আবেগময় মুহূর্তে নেপথ্যে জাজ-সংগীতের সঙ্গে হাত তুলে আফ্রিকান সাম্বা নাচতে নাচতে কথা কইছেন; সাম্বার বিশেষ ভঙ্গীতে হাততালি দিতেও ছাড়ছেন না। ডেসডিমোনাকে হত্যা করে উনি শয্যার ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য করলেন। ইয়াগোকে জড়িয়ে ধরে, চুম্বন করে, ইয়াগোর ঊরুদেশে হাত বুলিয়ে ওথেলোর চরিত্রের এক অজ্ঞাত দিক উন্মোচন করলেন।

'কেন এসব?' শুধোলাম সমালোচক শ্রেষ্ঠ ট্রুইনকে।

বললেন, 'এসব হোলো আফ্রিকান মানুষদের বৈশিষ্ট্য।'

বললাম, 'ওথেলো শেক্‌সপিয়ার-এর বীর নায়ক। আফ্রিকান বৈশিষ্ট্য আর ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির ফারাক সৃষ্টি করে শেক্সপিয়ারের নায়ককে ধরা যায় কি? 'হ্যামলেট' করার সময়ে অলিভিয়ের কি আগে তার ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজতে বসেন? ওথেলো-র বেলায় এই মনোভাব আসলে অলিভিয়ের-এর অবচেতনস্থিত জাতিবিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয়।

বাংলা উচ্চারণ

শম্ভু মিত্র

কিছুদিন আগে একদিন দুপুরে হঠাৎ রেডিয়ো খুলে শুনেছিলুম একজন ভদ্রলোক আবহাওয়া সম্পর্কে বলছেন। তিনি বল্লেন যে, আবহাওয়ার সংবাদে প্রকাশ 'বঙ্গোপ্‌সাগরে'......ইত্যাদি।

বঙ্গোপসাগর কথাটায় যে প-য়ে হসন্ত দিয়ে 'বঙ্গোপ্‌সাগর' করা যায় এটা আমি আগে কখনো শুনিনি। ভাবিওনি।

আর একদিন শুনলুম......মন্ত্রী শ্রী চাবন 'লেলিনগ্রাডে' বলেছেন......ইত্যাদি।

একদিন শিশুদের শিক্ষার আসরে শুনেছি বক্তা বলছেন 'তৈল্‌জাতীয় দ্রব্য'।

একটি কলেজে একজন মেয়ে আবৃত্তি করছিল —মৃত্যুরে লব অমৃৎ করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগীতে পাশ করা গায়িকা (এমনিতেও তিনি বি-এ পাশ) বলছিলেন ......'দ্রুৎ' লয়ে......ইত্যাদি। অথচ বাঙলা ভাষায় কেন রাগসংগীত গাওয়া হবে না সে সম্বন্ধেও উত্তেজিত আলোচনা শুনেছি এঁরই সংগীবর্গের কাছ থেকে।

অবশ্য এমন হতে পারে যে, আমি খুবই রক্ষণশীল, খুবই প্রাচীনপন্থী। কারণ বানান, উচ্চারণ এ সমস্তই তো যুগে যুগে পাল্টায়। গল্প শুনেছি, কোনো এক ছেলে ইংরাজিতে ভুল বানান লিখে বাবার হাতে কানমলা খেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল—বানান আজ আছে কাল নেই, বানান দিয়ে কি ইংরিজি হয়?

সত্যিই তো। শেক্‌স্‌পীয়রের সময়কার বা তৎপূর্ববর্তী ইংরেজির বানান তো অনেকখানিই ভিন্ন ছিল। সেই রকম যে কলকাতায় একদিন 'নেবু, নুচি, আব' ইত্যাদি উচ্চারণ চলিত ছিল সেই কলকাতারই মতো 'বঙ্গোপসাগর, তৈলজাতীয়, অমৃত বা দ্রুত' উচ্চারণকারী কলকাতাও হয়তো অপসৃয়মান। এখন থেকে হয়তো এই রকম নতুন উচ্চারণই চলিত হবে। তা হোক। শুধু নতুন চলনের অন্তর্বর্তী নিয়মটাকে বুঝতে পারছি না বলেই আমাদের এতো মুশকিল হচ্ছে।—বলতে গিয়েও, লিখতে গিয়েও।

বুঝতে পারছি না বলেই আবার আমাদের মতো কিছু লোকের সন্দেহ হয় যে, এগুলো আসলে কিন্তু উচ্চারণের অপরিচ্ছন্নতা, কোনো নতুন নিয়ম শৃঙ্খলা এর মধ্যে নেই। যেমন রাস্তা-প্রিয় ছোকরাদের পয়সা কে পয়হা বা বাবাকে বাওয়া বলতে শুনেছি এও সেই রকম।

এর আবার একটা উল্‌টো দিকও তৈরি হয়েছে। যেখানে অস্বাভাবিক একটা উচ্চারণ-ভঙ্গী তৈরী করা হয়েছে নিজেদের বৈদগ্ধ্যের বিজ্ঞাপনের জন্যে। সেখানে র স্থানে ড় বলা হয়, শ, ষ, বা স স্থানে ডবল ডোজের Sh বলা হয়, বাংলা অ এবং আ উভয়েরই স্থানে হিন্দি অ (অর্থাৎ ছোট আ) বলা হয়। ফলে উচ্চারণটা দাঁড়ায় অনেকটা এই রকম—'গাগানে গাড়োজে মেগ, ঘানা ঘাড়োSh।'

(বাহুল্য ভয়ে একার এবং ওকারের উচ্চারণ-ভঙ্গীর বিবরণ দেওয়া হোলো না।)

এমন কি, একদিন দেখি, চিরকেলে কলকেতিয়া বংশের একটি মেয়ে—যাদের আমরা অলিখিত ভাষায় ঘটি বলে থাকি—সেও এই রকম উচ্চারণ অভ্যাস করেছে। কী করবে বেচারা। সিনেমার রেডিয়োতে রবীন্দ্র সংগীতে এই উচ্চারণের যে তর্কাতীত প্রাদুর্ভাব। (সুচিত্রা মিত্রের মতো দু-একজন স্মরণীয় ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে) ফলে ঐ মেয়েটিরও গভীর প্রতীতি জন্মেছে যে, এইটেই হোল বাংলা উচ্চারণের আধুনিকতম বিদগ্ধ ভঙ্গী।

দেশ বিভাগের পর যেমন পৌর প্রতিষ্ঠান ও সরকার সজাগ না থাকার দরুণ এই কলকাতা ও তার শহরতলীগুলোতে পরিকল্পনাবিহীন স্ফীতি ঘটেছে, যার ফলে বে-আইনীভাবে বহু রাস্তা অধিকার করে দোকান বসে গেছে, যেখানে বাস চালানো অসুবিধে ড্রেন বসানো অসুবিধে, অথচ সকলকেই আজ সেই অবস্থা মেনে নিতে হচ্ছে, কারণ সংস্কার করাও বিপুল ব্যয়সাধ্য,—ঠিক সেই রকম বাঁধনহীন এই উচ্চারণ (বিকৃতি না প্রগতি?) উত্তরকালে বোধ হয় আমাদের একটু বিপদেই ফেলবে।

একটা ব্যাপার এই নৈরাজ্যের মধ্যে কিন্তু খুবই লক্ষণীয়। কেউ যদি gratকে গ্র্যাট বলে, বা Bengal Bank 'ব্যাঙ্গল ব্যেংক' উচ্চারণ করে, তাহলে বেশীর ভাগ বাঙ্গালীরা, আমি দেখেছি, হেসে গড়িয়ে পড়েন। অর্থাৎ মাতৃভাষার উচ্চারণ সম্পর্কে আমরা যতোই শিথিল হই না কেন, ইংরেজির উচ্চারণ সম্পর্কে কিন্তু আমরা খুবই সজাগ। এর দ্বারাই বোধ হয় আমাদের সামাজিক শ্রেণী বিভাগ হয়। এটা নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটা মহৎ ঔদার্যের লক্ষণ।

তাই আমাদের মতো যারা অতো উদার নয় সেই ইংরেজরা (যাঁরা বর্ধমানকে বার্ডওয়ান ও বারাণসীকে বেনারস বলে গেছেন বলে আজও আমরা কথোপকথনে তাই বলে থাকি) নিজেদের উচ্চারণ সম্পর্কে কিন্তু অত্যন্ত সজাগ। আর তাই তারা নিজেদের ভাষায় উচ্চারণের একটা মান তৈরী করেছে এবং কেবল মাত্র উচ্চারণেরই প্রামাণ্য অভিধানও লিখে থাকে। তাছাড়া কথা কেমন করে বলা হতো সে সম্বন্ধেও তারা মাথা ঘামিয়েছে অনেকদিন থেকে। (Oxford University Press-এর Elizabetham A c t i n g নামক বইটিতে এর অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে।)

আমাদেরও এখানকার থিয়েটারে এক সময়ে উচ্চারণ স্পষ্ট করার জন্য অনেক পরিশ্রম করান হোত। আমরাও ছোটবেলায় মেঘনাদ বধ কাব্য থেকে আবৃত্তি করার অনুশীলন করেছি। কিন্তু নাট্যশালার পতনে এমন দশা হয়েছে যে, একজন পুরানো অভিনেতা—'ভগবান শ্রীকৃষ্ণ'—এই কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। হয় বল্লেন শীকৃষ্ণ, না হয় বল্লেন শ্রীকিষ্ণ।

আর আধুনিকরা তো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রই মনে হয়—কিছু গ্রাহ্যই করেন না। সম্মানকে নিরঙ্কুশভাবেই সম্মান বলে যেতে কাতোই না শোনা যায়। অথচ এঁরা বেশীর ভাগই নতুন ধরণের নাট্য প্রযোজনার আদর্শ নিয়ে দল বেঁধে অভিনয় করে থাকেন। এইটাই মারাত্মক দুঃখের। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছেন না যে তাঁদের চেষ্টার এই শিথিলতা এমন একটা অপরিচ্ছন্ন চিন্তার পরিবেশ তৈরী করছে, যার ফলে নতুন নাট্য প্রয়াসের কৈশোরেই অন্ত্যেষ্টি সৎকারের সূত্রপাত হয়ে গেছে।

ট্‌ইন একমত হলেন না, তবে জবাবও দিলেন না; শুধু হাসলেন।

জিগ্যেস করলাম, 'আর ইয়াগোকে অমন করে জড়িয়ে ধরার, মুখচুম্বন করার, তার জঙ্ঘায় হাত বুলোবার প্রয়োজন?'

ট্‌ইন বললেন, 'এ বিষয়ে অলিভিয়ের লিখেছেন।' বলে এক খন্ড টাইমস ধরিয়ে দিলেন হাতে।

অলিভিয়ে বলছেন: 'সমালোচকরা আজ পর্যন্ত দুটি প্রশ্নের কিনারা করতে পারেন নি; ইয়াগো কেন ওথেলোকে ধ্বংস করতে চাইছে; আর ওথেলো কেন ইয়াগোর কথায় এতটা বশীভূত হচ্ছে। আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা যৌনবিকৃতির লক্ষণ আছে। শেক্‌সপিয়ার-এর নিজের যৌনজীবন সুস্থ ছিল না। তাঁর পক্ষে দুজনের মধ্যে সমকামের ইংগিত দেয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বিশেষতঃ আফ্রিকানরা বাইরে যতই বলিষ্ঠ-দেহ হোক না কেন, ওদের সঙ্গে মিশে দেখেছি ওরা অত্যন্ত এফেমিনেট।'

মনে পড়লো কয়েক বছর আগে অলিভিয়ের ইয়াগো করেছিলেন রেফ রিচার্ডসন-এর ওথেলোর পাশে। একটা বিশ্রী কান্ড ঘটেছিল। রিচার্ডসন জানতেন না (কি করেই বা জানবেন বেচারা) যে অলিভিয়েরর অন্তর অন্তরে ইয়াগো-ওথেলোর যৌনসম্পর্ক ঘটাতে বদ্ধপরিকর। ড্রেস-রিহার্সালে অকস্মাৎ "আই ডু নট লাইক দিস্‌ অফিস—" বক্তৃতাটি দেয়ার সময়ে রিচার্ডসনকে হাত [illegible] পা দুই দিয়ে সাপটে ধরলেন অলিভিয়ের; আলিঙ্গনাবদ্ধ দুই জোয়ান দুলতে দুলতে বাকি দৃশ্যটুকু অভিনয় করলেন। পর্দা পড়তেই রিচার্ডসন এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত ক'রে বললেন, 'ল্যারি, এটা কি হোলো?'

অলিভিয়ের তখন তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব শোনাতে লাগলেন। বাধা দিয়ে রিচার্ডসন বললেন, "ল্যারি, তুমি নিজেই ওরকম নও তো?" বলে চলে গেলেন বাড়ি। খবরের কাগজের লোকেরা কথাটা জানতে পেরে ফলাও ক'রে ছেপেছিল।

★

মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও অলিভিয়ের ভুল করছেন। মনস্তত্ত্ববিদরা বলেছেন, ওথেলো ক্যাসিওর প্রতি সমকামে আকৃষ্ট, তাই তিনি ট্রান্স্‌-ফারেন্স মারফৎ ক্যাসিও-ডেসডেমোনার গুপ্ত প্রণয় কল্পনা ক'রে নিচ্ছেন। নাটক পড়লে একেও প্রলাপ বলে মনে হতে বাধ্য। কিন্তু এর পেছনেও যত বিকৃত হোক এক যুক্তি আছে। ওথেলো ইয়াগোর কামলীলা একান্তভাবেই ল্যারি অলিভিয়ের মৌলিক আবিষ্কার।

★

তা বলে বৃটিশ নাট্যশালার মরুভূমিতে ওয়েসিস নেই এমন নয়। শ্যাফার-এর নূতন নাটক "রয়াল হান্ট অফ দ্য সান" চিচেস্টার-এ অভিনীত হোলো। পরিচালনা জন ডেক্‌সটার ও ডেসমন্ড ওডনোভান। পিজারো-র পেরু-জয়ের কাহিনীকে এমন দক্ষতার সঙ্গে উপস্থিত করেছেন শ্যাফার যে সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস নিষ্ঠুর চেহারাটা কালজয়ী হয়ে ফুটে উঠেছে। আটাহুয়ালপা-র ইনকা-রাজ্যকে ধূলিসাৎ করতেই হবে কারণ সে দেশে বড়লোক নেই, গরীব নেই, অন্নকষ্ট নেই, দুঃখ নেই। দুঃখ হচ্ছে ভগবানের দান। দারিদ্র্য হচ্ছে ঈশ্বরের বিধান। যে বর্বররা ঈশ্বরের বিধানকে এমনভাবে পদদলিত করে, চরম বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে দিয়ে তাদের পাইকারী হত্যা ক'রে যীশুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন স্পেনিয়ার্ডরা।

★

এক অন্ধকার কালের মধ্যে দু-একটি দীপশিখা জ্বলছে এখানে-ওখানে। শ্যাফার-এর হাতে সেই বর্তিকার একটি।

অবশ্য কাকেই বা কী বলা যাবে। একজন অজানামা অধ্যাপক তিনি আবার কবিও বটে—আমাদের 'বিসর্জন' অভিনয়ের পর মুখে বলেছিলেন এবং কিছু দিন পরে চিঠি লিখেও জানিয়েছিলেন যে, 'ক্রুর' শব্দটির উচ্চারণ অকারান্তই হবে, আমরা হসন্ত দিয়ে ভুল করেছি। বলেছিলেন তৎসম শব্দ মাত্রেই অকারান্ত উচ্চারণ হবে। লিখেছিলেন যে কর্ণকুন্তী সংবাদে রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি (ক্রুর হাস্যে পাণ্ডবের বন্ধুগণ সবে ফিরাইল) গ্রামোফোন রেকর্ডে কী আছে সন্ধান করা অফলপ্রসূ হবে না।

হয়ও নি। রবীন্দ্রনাথ হসন্ত দিয়েছেন। যুক্ত শব্দ হওয়া সত্ত্বেও। তাছাড়া সকল ক্ষেত্রে শেষ প্রমাণের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছেই বা দৌড়িয়ে যেতে হবে কেন? তিনিও মানুষ ছিলেন, তাই গোটাকতক ভুল তিনিও করে থাকতে পারেন। তাই আমাদের চিন্তাচালনার কাজটা আমরা ন্যায় মত করে গেলেই হয়তো তাঁর প্রতি আমাদের সবচেয়ে বেশী সম্মান দেখানো হবে।

যেমন, ঋ ফলার কী উচ্চারণ, আমরা অনেকেই ঋ ফলাযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব ঘটিয়ে ওটাকে রফলা উত্তর ইকারান্ত করে উচ্চারণ করি। যেমন, আবৃত্তি, অমৃত।

এতে অনেক ক্ষেত্রে ছন্দেরও মুশকিল হয়। অর্থাৎ 'মৃত্যুরে লবো অমৃত করিয়া তোমার চরণে ছোঁয়ায়ে—'।

তাছাড়া আরো একটা প্রশ্ন ওঠে যে, ওটার যদি নিজস্ব কোনো আওয়াজ না থাকবে তাহলে ওটাকে স্বরবর্ণ তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাখা কেন? কেবল অভ্যাসবসে?

আমরা যারা সেকেলে, তারা আবৃত্তির সময়ে মৃত্যু অমৃত কৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দগুলোতে ঋ-কে স্বরবর্ণের মতোই উচ্চারণ করি। অন্যান্য ভাষাতেও তাই করা হয়। যেমন মারাঠিতে 'বিশ্রান্তি গৃহ'কে গ্রিহ বলা হয় না। কেবল আমাদের এখানেই 'অভিনেতৃ সঙ্ঘ'-এর উচ্চারণ করা হয় অভিনেত্রী সঙ্ঘ বলে। রাজশেখর বাবু বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের প্রতি পক্ষপাত দেখে এক জায়গায় ঠাট্টা করেছেন। কিন্তু বাংলা দেশের অভিনেতাদের পক্ষে নিজেদের অভিনেত্রী সঙ্ঘ বলা যেন পক্ষপাতের চেয়েও বেশী অর্থ বহন করে।

তাছাড়া আরো একটি স্বরবর্ণ আছে যার উচ্চারণে আমাদের অনেক বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। সেটি হোল—এ। যেকতা না অ্যাকতা? যেকত্র না অ্যাকত্র? আজকাল আবার মেয়েদের মুখে অ্যাক্কুণি শুনি ছোটবেলায় এটা শুনিনি। এই স্বরবর্ণটি সম্পর্কেও একটা তদন্ত হওয়া দরকার।

তাই আশা করি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় উপযুক্ত অধ্যাপকদের দ্বারা উচ্চারণ বিধি সম্পর্কে একটা অনুসন্ধান করাবেন। নইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালীদের হয়তো এর জন্যে কঠিন মূল্য দিতে হবে। অনেক বাঙ্গালীকে তো আমি দেখেছি যাঁরা ইংরেজির ভাবে বাংলা উচ্চারণ করাটা বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক বলে মনে করেন। তাঁরা বাংলা র-কে সেই জন্য সম্পূর্ণ উচ্চারণ করেন না। ফলে তাঁরা কর্ণকে কড়ণ বলেন। কিন্তু ইংরেজি একদিন তো যাবেই এবং হিন্দি আসবেই। তখন এই সমস্ত পয়সা ও প্রতিপত্তিকামী লোকেরা ঠুক করে বদলে গিয়ে 'আরে ইয়ার' 'সুনো ইয়ার' জাতীয় স্ল্যাং হিন্দি বলে প্রচুর গৌরব বোধ করবেন, এবং বাংলাতে হিন্দি ভাষণ ভঙ্গী আমদানী করবেন। সুতরাং যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের ঘরের খোঁটা শক্ত করে না পুঁতলে আমরা এই রকম যে কোনো একটা প্লাবনেই

গোলমাল আমাদের, বলতে গেলে, স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণ থেকেই। অ-কে যেমন হিন্দি অ-এর মতো উচ্চারণ করা হয় তেমনি আবার যেখানে সেখানে ও-এর মতোও উচ্চারণ করা হয়। আমার সন্দেহ (অবশ্য ভুল হতে পারে) যে অনেকে ঠোঁটকে বিস্তৃত করা বা চোয়াল খুলে কথা বলাকে আধুনিক ও সভ্য বলে মনে করেন না। তাই ঐ বন্ধ চোয়াল অবস্থায় উচ্চারণ করতে গিয়েই অ-গুলো ছোট আ-য়ের মতো হয়ে যায়, ই-গুলো এ-র মতো হয়ে যায়। আবার ও-কার বাড়ালে মিষ্টত্ব বাড়বে মনে করে বোধ হয় উচ্চারণ করা হয় গাগোনে গাগোনে আপানার মোনে (অর্থাৎ গগনে গগনে আপনার মনে)। এতে একটা আধো আধো ভাব আসে কিনা।

এটা আরো ব্যাপক অকারান্ত শব্দে। এই ধরণের উচ্চারণ পদ্ধতিতে প্রায় সমস্ত অকারান্ত শব্দই ওকারান্ত ভাবে উচ্চারিত হয়। এরই চরম উদাহরণ আমি শুনেছিলুম এক 'বড়ো মিষ্টি মিষ্টি' চেহারার ছাত্রের মুখে—নজরুল সাহেবের এক

"লাল পাথর" চিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী

কবিতার—চালো চান্চালো বাণীরো দুলালো এShচেলো পাথো ভূলে,
আগো এয় গাঙ্গারো কূলে।*

*অদীক্ষিতদের জন্য সাধারণ লিপিতে দেওয়া হোল।—

'চল চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে
ওগো, এই গঙ্গার কূলে।

বিদ্রোহী কবি নজরুলের॥—শুনে মনে হয়েছিল নজরুল সাহেব কি পাগল হবার আগে এই রকম আবৃত্তি শুনেছিলেন? ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যেও এই রকম তদন্তোপযোগী বর্ণ কয়েকটি আছে। পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না বলে এক-আধটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন ওষ্ঠ্যবর্ণগুলোয় দুটি ঠোঁট ভাল করে মেলানো হয় না। ফলে, ফ-টা বহু ক্ষেত্রেই ইংরেজি f-এর মতো উচ্চারিত হয়। এই দোষ আমারও অনেকদিন ছিল। শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ঠাট্টা করে বলেছিলেন—তাহলে বিসর্জনে জয় সিংহ কী বলবে? Fool দে মা। Fool দে মা। শুধু Fool নিয়ে হোক তোর পরিতোষ?

সেদিন যে লজ্জা পেয়েছিলুম তা বলবার নয়। প-য়ের বেলাতেও এই রকম ঠোঁট দুটি যুক্ত না হওয়ার দরুণ উচ্চারণ বিকৃত হয়।

আর স-এর উচ্চারণ নিয়ে গণ্ডগোল তো বহু দিনের। কিন্তু ভয়ঙ্কর বিকৃতির কথা ছেড়ে দিলেও বেশ কতকগুলো বিভিন্নতার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, আসতে নিশ্চিত কাস্তে। অনেকে শব্দমধ্যবর্তী শ ষা স হস্‌যুক্ত হলেই তাকে S উচ্চারণ করেন। কিন্তু ষষ্ঠ বলবার সময়ে বিপদে পড়েন, মন খুলে ষস্‌ঠ বলতে পারেন না। আবার যাঁরা মোটামুটি বাংলা শ-এর উচ্চারণ করেন তাঁরাও কাস্তে বলতে S ছাড়া বলেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে অশ্লীল বিশ্লেষণ প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণে স হবে, না শ হবে?

কিন্তু বর্ণের কথা অনেক হোল। এইবার আর একটা কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হোল ঝোঁকের কথা। (Accent)। বাংলা বাক্যে ঝোঁক কীভাবে পড়ে তারও বোধ হয় একটা বিধি বিধান লিপিবদ্ধ হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। সেদিন এই ধরণের ঝোঁক দেওয়া একটা ঘোষণা শুনলাম,—এর পর দিল্লী থেকে। রিলে করে। শোনানো হচ্ছে ......ইত্যাদি। প্রত্যেক শব্দের সুরুতেই ঝোঁকগুলো দেওয়া। বেশ একটা ইংরেজি ইংরেজি ভাব হয় বটে।

পুরানো অভিনেতা ছিলেন শ্রীভূমেন রায়। তাঁর বাংলা ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান যাই থাক তাঁর উচ্চারণ ছিল ভয়ঙ্কর। তিনি থিয়েটারে নাম করেছিলেন মডা কাঁউলো ইত্যাদি সাহেবী ভূমিকার অভিনয়ে। এবং তাঁর সফলতা ছিল ঐ রকম ভূমিকাগুলোরই উপযোগী। তিনি ঐ রকম বেশীর ভাগ আদ্য অক্ষরেই ঝোঁক দিতেন—রাজা বাজা, আমি আসিয়াছে।

এখন দেখি যাত্রার অল্প বয়স্ক অভিনেতাদের ওপর এই বাচনভঙ্গীর বেশ প্রভাব আছে। এমন কলকাতায় এমন নাট্য প্রতিষ্ঠানও আছে যাদের বাচনভঙ্গী শুনলে মনে হয় ঐ রকম ইংরেজি ঝোঁকের বাংলা অনুবাদ। হয়তো তাঁরা ভাবেন যে, বাংলার মরা গাংয়ে এর দ্বারা একটা জোয়ার এনে ফেলা যাচ্ছে। তবে আমরা সকলে প্যান্ট পরলেই যে আমাদের মনের জোর বা গায়ের জোর বাড়বে এমন ভরসা করা তো মুশকিল।

যাই হোক, এই সব ব্যাপারের একটা মীমাংসা হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়। অভিনেতাদের পক্ষে তো আবার বেশী করেই প্রয়োজনীয়। কারণ অভিনেতারাই তো সমাজে শুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর বাচন ভঙ্গীর মান স্থাপন করবেন। অনেকানেক দেশে তা হয়েও এসেছে।

তবে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার উপলব্ধিতে আমরা সবাই যেমন নিয়মানুবর্তিতাকে ভাঙছি তেমনি হয়তো উচ্চারণও স্বাধীনতা পেতে চলেছে। এবার থেকে সব উচ্চারণই হয়তো হবে বাক্তিগত উচ্চারণ।

কিংবা দস্যু বাড়ীর সেই ছেলেটির মতো কেউ যদি এসে বলে যে, উচ্চারণ আজ আছে কাল নেই, উচ্চারণ দিয়ে কি ভাব প্রকাশ হয়? তখন মেনে নিতেই হবে। বিশেষতঃ সে যদি কোনো সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে একটু ইংরেজির টাকনা দিয়ে বলতে পারে, তাহলে আমরা সবাই কান থেকে ঘণ্টোপ্সাগর বলতে বাধ্য। তাতে আমাদের জিব্‌ভার যতোই অসুবিধে হোক না কেন।

ভেনিস, কাঁন্, বার্লিন...

সরোজ সেনগুপ্ত

ভেনিস, কান্, বার্লিন, কার্লোভীভ্যারী অথবা মস্কোতে ইয়োরোপের প্রধান চলচ্চিত্র উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয়। সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো, যুগোস্লাভিয়া, পুলা, স্পেনের সেণ্ট সিবাস্তিয়ান, ইংলণ্ডের এডিনবারা এবং আয়ারল্যাণ্ডের কর্ক-এও চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, তবে এগুলি—বেশী অথবা কম—অপ্রধান এবং কোন কোনটা প্রতিযোগিতামূলক নয়। ইয়োরোপ শীত প্রধান দেশ বলে গ্রীষ্ম অথবা বসন্তকালে এই সব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। একে সামারের টুরিস্ট সমাগম, তার ওপর উৎসবগুলিতে আমন্ত্রিত অতিথিদের ভীড়—এই সময়টা এই শহরগুলিতে তিল ধারণের জায়গা থাকে না এবং এই সময়টিতে ব্যবসা বাণিজ্যও প্রচুর হয়। উৎসবে পুরস্কার পেলে তো কথাই নেই, প্রায় সব দেশই ছবিটি কিনে নেবে। পুরস্কার না পেলেও আন্তর্জাতিক বাজারে ঢোকবার সরল এবং প্রশস্ত একটা রাস্তা তৈরী করে দেয় চলচ্চিত্র উৎসব।

প্রতিযোগিতামূলক হোক বা না হোক, এই উপলক্ষে পৃথিবীর অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। কোন্ দেশ কোন্ ফেষ্টিভ্যালে ছবি পাঠাবে, কার ছবি পাঠাবে, তাই নিয়ে বিতর্ক এবং কর্মব্যস্ততা। আন্তোনীয়নীর ছবি বার্লিনে যাচ্ছে, অতএব এলাই রেনে সেখানে ছবি পাঠাবেন না। জাঁসেরা রুয়েন কান-এ ছবি পাঠিয়েছেন, অতএব মার্টিন রিট ভেনিস অথবা কার্লোভীভ্যারীতে যাবেন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সাড়া পড়ে যায়: ছবি পাঠাও, প্রতিনিধি পাঠাও!

কোন দেশের সরকারী নিয়মের বিচিত্র বিধানে ছবি পাঠান হয়। কোন দেশের চলচ্চিত্র শিল্প-সংস্থাই উপযুক্ত ছবি নির্বাচন করে। যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপ, সেখানেই কেলেংকারী। অন্ততঃ আমাদের দেশে। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপযুক্ত ছবি প্রেরিত হয় এবং অন্যান্য দেশের উন্নততর শিল্প-সৃষ্টির তুলনায় এই নির্বাচন এত লজ্জাকর হয় যে, আত্মসম্মান বোধ আছে এমন নিমন্ত্রিত সাংবাদিকদের মুখ দেখানই দায় হয়ে ওঠে।

সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকলেই যে নির্বাচন ভাল হবে তার কোন নিশ্চয়তা অবশ্য নেই—তবে সে সব ক্ষেত্রে সমালোচনা তীব্র হয় না। কারণ বোধ হয় এই যে, তখন নির্বাচিত ছবি সেই দেশের প্রতিনিধিত্ব করে না। সেই জন্যেই বোধ হয় official entry এবং unofficial বলে দুটো কথা আছে।

কিন্তু প্রতিনিধিত্ব করুক আর নাই করুক, নিম্ন মানের ছবি চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্দেশ্য সাধিত করে না। কারণ নিছক প্রতিনিধিত্ব অথবা প্রদর্শন—কোনটাই ছবি অথবা চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্দেশ্য নয়। ছবির উদ্দেশ্য উন্নত-মানের সার্থক পরিচয় দেওয়া, উৎসবের উদ্দেশ্য তার উৎকর্ষতা বিচার। উৎসবের আর এক উদ্দেশ্য হোল, পৃথিবীর চলচ্চিত্রের বিচিত্র নিদর্শনের পরিচয় দেওয়া; পৃথিবীর দর্শক সাধারণের কাছে নতুনের আস্বাদ নিয়ে আসা। কিন্তু বেশীর ভাগ চলচ্চিত্র উৎসবেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কারণ প্রচারের উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র নামকরা চিত্রকারদের ছবিই আহ্বান করা হয়। অন্ততঃ গত চার বছরে কোন চলচ্চিত্র উৎসবে রোগোসিন, আর্মান্দ গাত্তি, জ্যুলে দাসা, ঋত্বিক ঘটক, বারীন সাহা, মৃণাল সেন প্রমুখ কোন চিত্রকারের কোন ছবি দেখিনি। অথচ, এঁদের চিত্র-সৃষ্টি নতুন চিন্তা, নতুন আঙ্গিকের পরিচায়ক।

"Though exceptionally brilliant, we regret we cannot accept your film"—

এই বলে এবারের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব বারীন সাহার 'তের নদীর পারে' ছবিটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। অথচ, অপরিচিতকে পরিচিত করাবার দায়িত্ব এঁদের। ভেনিস এবং কান্-এর আরো গুণের কথা পরে বলছি।

তবে একটা ভরসার কথা এই যে, সরকারী উৎসবের বাইরে এমন শিল্প-সৃষ্টির সাক্ষাৎ মেলে যা শিল্পীর অনুপ্রেরণা ও জীবনবোধের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত, বিশিষ্ট শিল্প-কর্মের অখণ্ডতায় বিধৃত। এই সব সৃষ্টি সাংস্কৃতির জগতে নতুন ধারাকে প্রতিষ্ঠিত করে। একবার কান চলচ্চিত্র উৎসবের বাইরে এর পরিচয় পেয়েছিলাম আর্মান্দ গাত্তি পরিচালিত "দি এনক্লোজড্", শার্লি ক্লার্ক পরিচালিত 'দি কানেকশান', জাঁ পলা সার্ত্রে পরিচালিত 'দি স্কিন অ্যান্ড দি বোন্স', ওয়াইদা পরিচালিত "ইনোসেণ্ট সোর সারার্স" এবং পিয়ারী কান্ত পরিচালিত ছবিগুলিতে। এই ছবিগুলি চলচ্চিত্র জগতে নবদিগন্তের সূচনা করেছে।

এবারে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের বাইরে দেখেছি ইঙ্গমার বার্গম্যান-এর যুগান্তকারী সর্বশেষ চিত্র-সৃষ্টি "দি সাইলেন্স"—দেহাতীত যার বক্তব্য মনের নিবিড়তম কথাটাই বলেছে এবং বলেছে এমন স্পষ্ট ভাষায় যা ইতিপূর্বে অন্ততঃ চলচ্চিত্রে শোনা যায় নি। এই ছবি 'পর্নোগ্রাফি', 'অশ্লীল' "হিমালয়-প্রমাণ অখ্যাতির যোগ্য"। কিন্তু এই ছবি অকুণ্ঠ সত্য প্রকাশ। সত্যকে এমন এক আপোষহীন ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, যা সহ্য করা কঠিন। কঠিন বলেই এই আপত্তি। ভণ্ড মানুষ সত্যকে স্বীকার করতে পারে না, তাই নীতির দোহাই দিয়ে তাকে এড়াতে চায়।

কোন জিনিষ আসলে ভাল্‌গার নয়, ভাল্‌গার হোল মানুষের নিজস্ব মানসিক প্রতিক্রিয়া, যাকে ওই জিনিষটির ওপর আরোপ করা হয়। ঢেকে রাখা হয়তো ভাল কিন্তু কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ঢেকে রাখা নিন্দনীয়। দেহ আচ্ছাদনের ইতিহাস যাদের জানা আছে, তাঁরা সত্যবাদী হলে বলতে পারেন কেন আচ্ছাদনের প্রয়োজন হয়েছিল। শালীনতা বোধ থেকে এই প্রয়োজন আসেনি। এর প্রয়োজন হয়েছিল কৌতূহল সৃষ্টির জন্য। আচ্ছাদনের আড়ালে কি আছে তা জানবার কৌতূহলই পুরুষ এবং নারীকে পরস্পরের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। আচ্ছাদন না থাকলে এই অস্বাস্থ্যকর কৌতূহলও থাকবে না এবং নীতি তখন প্রতিমুহূর্তে দুর্নীতিতে পরিণত হবে না।

বিবাহ একটা নৈতিক বন্ধন। নৈতিক হলেও এটা একটা চুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এই চুক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব করে। পুরুষের অন্য নারীর কাছে যাবার স্বাধীনতা নেই, নারীর অন্য পুরুষের কাছে যাবার স্বাধীনতা নেই। এটা পরাধীনতা-জনিত অক্ষমতা—সাধুতা, নয়। স্বাধীনতা থাকলে এ সাধুতা যে কী পরিমাণে থাকতো পৃথিবীর প্রতি দেশের বারবনিতারাই তার জবাব।

এই যুক্তিগুলি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে "দি সাইলেন্স" পর্নোগ্রাফী তো নয়ই, অকুণ্ঠ সত্য প্রকাশ।

কোন কোন চলচ্চিত্র উৎসবের পরিচালনা ক্ষেত্রে রাজনীতির বিষও ঢুকেছে। কারণ, এই সব উৎসবের ব্যয়ভার বহন করে এমন কোন কোন মহল, যারা নিজেদের নীতি আরোপিত করেন ছবি নির্বাচন এবং উৎকর্ষতা বিচারের ক্ষেত্রে। শুনেছি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন রোমের ক্যাথলিক চার্চ। অতএব, এই চলচ্চিত্র উৎসবে আন্তোনীয়নী অথবা ফেলিনীর দর্শন পাওয়া যায় না। কারণ যে আভিজাত্য অথবা নীতিবোধের ওপর ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, এঁরা তার মূলেই কুঠারাঘাত করে থাকেন। তবে একজন (ফেলিনী) ড্রামার সাহায্যে, অন্য জন (আন্তোনীয়নী) তার সাহায্য না নিয়ে। পঙ্কিল আবর্তে ঘূর্ণায়মান অভিজাত রোমের ওপর হেলিকপ্টারের সাহায্যে যীশু-মূর্তির ছায়া ফেলে ফেলিনী ক্যাথলিক ধর্মের শূন্যতার ওপর নির্মম কশাঘাত করেছেন এবং আন্তোনীয়নী বলেছেন—"আমার ধর্মের যে যুগে বাস করছি, তা হোল erratic এবং erotic যুগ। And we are more afraid of the moral unknown than of the scientific unknown!

একটা নারীর পদস্খলন নিয়ে হৈ চৈ-এর শেষ নেই,—এটা নৈতিক অপরাধ। কিন্তু এটম বোমা যে মানবতার বিরুদ্ধে কত বড় বৈজ্ঞানিক অপরাধ, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছেন না!

চলচ্চিত্র উৎসব হোক বিচিত্র শিল্প সমারোহের বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণের পর তার উৎকর্ষতা বিচার—বিশেষ কোন মতবাদ প্রচারের জন্যে নয়। কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে চলচ্চিত্র উৎসবের কাজকর্ম চলা উচিত নয়। চলচ্চিত্র-শিল্প সম্পর্কে উন্নততর বোধের অনুশীলনই এই উৎসবের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন হয় সর্বদেশের পরিচিত ও অপরিচিত পরিচালক কৃত উল্লেখযোগ্য চিত্র-সৃষ্টির প্রদর্শন এবং সমর্থন। এ সব হয় না বলেই আন্তোনীয়নী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন একবার—"আমার নতুন ছবি (তখন আন্তোনীয়নী-ও বিশেষ নাম করেন নি) "অ্যাভেন্তুরা" যখন কান চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হয়, তখন সমাদৃত হয়নি। কিন্তু কান অথবা ভেনিসের মত চলচ্চিত্র উৎসবের আজের ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা আমার নেই।" আন্তোনীয়নীর মত চিত্রকার যদি কোন চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে এই মন্তব্য করে থাকেন, তার নিরপেক্ষতা এবং সততার ওপর আস্থা না রাখাই ভাল।

কান্-এ সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ হয় না বললেই হয়। একবার তো এর কর্তৃপক্ষ "সাইট অ্যান্ড

সাউন্ড"-এর মত চলচ্চিত্র পত্রিকাকে আমন্ত্রণ জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। এখানে রাজনীতির প্রাধান্যও এত বেশী যে, একে চলচ্চিত্র উৎসব না বলে একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। একবার এলাই রেঁনে—যাঁর 'হিরোসিমা মন আমুর এবং লাস্ট ইয়ার ইন মারিয়ানবাদ" যুগান্তকারী দুটি চিত্র-সৃষ্টি হিসেবে নন্দিত হয়েছে—এবং ফ্রাঁসোয়া লেটিরিয়ের-এর ছবি কান্ চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নাকচ করা হোয়েছিল কারণ এঁরা দুজনেই নাকি আলজেরিয়ান দলিলে সই করেছিলেন। এভাবে যদি শিল্পকে হত্যা করা হয় তবে উৎসবকে রণক্ষেত্র বলাই তো উচিত।

কিন্তু এ সব দিক থেকে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব সত্যিই নিরপেক্ষ, সৎ এবং উদার। আন্তোনীয়নীর "লা নত্তে" যখন এই উৎসবে দেখান হয়, তখন শুধু সমাদৃতই হয় নি, শ্রেষ্ঠ পুরস্কার গোল্ডেন বেয়ারও পেয়েছিল। (But when Antonioni's 'La No the' was shown at the Berlin Film Festival, not only the reception was unique, it was awarded the Golden Bear also).
এই মন্তব্য করে ভাষ্যকার জিজ্ঞেস করেছেন—এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না যে, উৎকর্ষতা বিচারে বার্লিন নিরপেক্ষ এবং সৎ?

নিরপেক্ষতা এবং সততার আরো নিদর্শন আছে। ভেনিস যখন ইতালীয় ছবিকেই পুরস্কার দিচ্ছে গত তিন বছর ধরে, কান্ও যখন এই নীতিরই অনুসরণ করছে, বার্লিন তখন বিচারে না দাঁড়ালে কোন জার্মাণ ছবিকেই পুরস্কৃত করছে না।

এবারের প্রতিযোগিতায় দুটো জার্মাণ ছবি ছিল। একটা রাজনৈতিক—হত্যার ষড়যন্ত্র এবং দোষী কে, কী করে ধরা হোল তার বিবরণ। নেহাৎ-ই ডায়লগ প্রধান মামুলি ছবি। অন্যটি ব্যঙ্গ-কৌতুক মিশ্রিত এক অভিনব ছবি যার সম্বন্ধে লন্ডনের "গার্ডিয়ান" বলেছেন—'ইটস্ স্যাটায়ার ইজ্ ভিসুয়াল্।' তবু ছবিটি পুরস্কার পায়নি কারণ উৎসব অধিকর্তা ডাঃ আলফ্রেড্ বাওয়ার কখনও এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না। "মহানগর", "দি পন্ ব্রোকার", "দি ইনসেক্ট উয়োম্যান", "লার্ভিসিটা"র মত ছবি থাকতেও যখন টার্কীর 'ড্রাই সামার' এবং ব্রেজিলের "ওস্ ফুজিস্" এর মত অতি সাধারণ ছবি যথাক্রমে গোল্ডেন বেয়ার এবং সিলভার বেয়ার পেল, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন, কিন্তু জুরীমন্ডলীর সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নি।

ফিনল্যান্ডের "দিস সামার অ্যাট ফাইভ" পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ছবি—ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী স্ত্রী মার্তি কম্কি এবং তুলা ইলোমা এতে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বৃটেনের দুটো ছবি—"দি নাইট মাষ্ট ফল" এবং "অব্ হিউম্যান বন্ডেজ"-ও উল্লেখযোগ্য দুটি চলচ্চিত্র। 'নাইট মাষ্ট ফল'-এ বিকৃত মস্তিষ্ক নায়কের ভূমিকায় অ্যালবার্ট্ ফিনি অনবদ্য অভিনয় করেছেন। তাঁর মস্তিষ্কে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার দৃশ্যগুলি অবিস্মরণীয়। এবং দুশ্চরিত্রা স্বৈরিণীর চরিত্রে 'অব্ হিউম্যান বন্ডেজ' ছবিতে কিম নোভাকের অভিনয়ও মনে রাখবার মত। কী করে একটি সুন্দরী মেয়ে ধাপে ধাপে নরকে নেমে গেল এবং অবশেষে দুরন্ত যৌন ব্যাধিতে মারা গেল, তা নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কিম নোভাক তাঁর অভিনয়ে। ডেনমার্কের "ও স্ফুর অব সুইসাইড" একটি নতুন ধরণের ছবি।

সোস্যালিজম্-এর ছাপ মারা না থাকলে যে উৎসবে পাত্তা পাওয়া মুস্কিল সেই মস্কো অথবা কার্লোভীভ্যারী চলচ্চিত্র উৎসবে আর যাই হোক না কেন, উৎকর্ষতার বিচার হয় না। আন্দ্রেই ওয়াইদার কোন ছবি কার্লোভীভ্যারী অথবা মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছে কি? হয়নি, কারণ ওয়াইদার ছবিতে পোলান্ডের শিল্পীদের সুতীব্র স্বাজাত্যাভিমানের কারণ নিহিত থাকে। "Wajda is more rooted to the soil than drawn to wards Socialism.
সোস্যালিজম্-এর জয়গান করার চাইতে ওয়াইদার ছবিতে পোলান্ডের অবদমিত যন্ত্রণারই তীব্র বিক্ষুব্ধ আত্মপ্রকাশ থাকে। অতএব অপাংক্তেয়।

বার্লিনের পর কার্লোভিভ্যারী অথবা মস্কো ক্লান্তিকর ব্যাপার। ছবির ব্যাপারে এই দুটি চলচ্চিত্র উৎসবে হতাশা সব চাইতে বেশি। আনন্দিত অথবা উৎসাহিত হবার মত বিশেষ কোন ছবি আহৃত হয় না এই দুই চলচ্চিত্র উৎসবে। মস্কোতে আড়ম্বর অন্য সব ফেস্টিভ্যালের চাইতে বেশি। বিস্ময়কর এর প্রেক্ষাগৃহ, অদ্ভুত এর জাঁক-জমক। কিন্তু উৎকর্ষতা সব চাইতে কম তাই ক্লান্তি আসে। ক্লান্তির মধ্যে উৎকর্ষের বিচার সম্ভব নয়। হলে কী আর [illegible] থাকতে কার্লোভীভ্যারী চলচ্চিত্র উৎসবে "শহর আউর স্বপ্না" আকাদেমি পুরস্কার পেত।

নান্যঃ পন্থা

এন কে জি।

বাংলার ছবির ভবিষ্যৎ কি?—এই বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা বাক্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই। বর্তমান সময়ের অসহনীয় মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ছবির চেহারা কি রকম দেখাচ্ছে এবং এরই সঙ্গে অনুপাত রেখে আগামী দিনে এর চেহারাটা কেমন দেখাবে—এও চিত্রশিল্প মহলে বেশ সরবে আলোচিত হচ্ছে। অতএব বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুটো সম্বন্ধেই চিন্তার কারণ ঘটেছে সন্দেহ নেই।

বর্তমানকে গৌণ করে রেখে বা দেখে অথবা তাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের হিসেব করা চলে না। তেমন হিসেব বৈজ্ঞানিক ক্রমান্বয়তার অভাবে ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। এ ছাড়া বর্তমানের যন্ত্রণাটা যখন দুঃসহ হয়ে ওঠে তখন ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় আসতেই চায় না। তাই ঠিক আজকের দিনের বাংলা ছবির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করে এবং এর থেকে ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাই বলবার চেষ্টা করব।

ঠিকভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প এখন বিবর্তনের দিক থেকে তৃতীয় পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল ছবির আদি যুগে। এটা ছিল নির্বাক যুগ এবং এই যুগের ছবি ছিল যাত্রা-থিয়েটারের চলমান ফোটোগ্রাফিক রূপ। অভিব্যক্তির মধ্যে আতিশয্যের ছাপ থাকতো প্রগাঢ়, তাছাড়া রূপসজ্জা, পশ্চাৎপট-পরিকল্পনা, ছবির চিত্রনাট্য সবই ছিল প্রাচীনপন্থী, কেমন যেন অপটু। অবশ্য ম্যাডান কোম্পানী যখন নির্বাক চিত্র তুলতে আরম্ভ করলেন তখন আঙ্গিক, অভিনয় ও চিত্রগ্রন্থনের দিক থেকে যথেষ্ট উন্নতি দেখা গেল। বিশেষ করে বাংলা ছবির স্টার সিস্টেম বা তারকা-রীতির জন্ম হল ঠিক এই সময়ে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, সীতা দেবী, পেসেন্স কুপার প্রমুখ শিল্পীরা অসম্ভব রকমের জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। এঁরা ছবিতে থাকলেই প্রেক্ষাগৃহ উন্মুখ দর্শকে ভরে উঠতো। সুতরাং প্রথম পর্যায়কে নিষ্ফল বলব না অথবা ছোট করে দেখবার চেষ্টা করব না। শুধু বলব যে ওদেশে ডেভিড গ্রিফিথ, আর্ণেষ্ট লুবিশ, চার্লি চ্যাপলিন প্রভৃতি দিক্‌পালেরা ছবির আদি-কৃত্রিমতা দূর করে যে মনোহারী রূপ এনে দিয়েছিলেন, বাংলা দেশে খুব শক্তিমান ও ভাবুক রূপকার সে সময় না থাকাতে ছবি মোটামুটি মঞ্চঘেঁষা ও মন্থরগতি হয়েই রইলো। এমন সময় এলো সবাক চিত্র। ছবিকে প্রত্যক্ষ প্রমোদের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবার সুযোগ এলো এবং এর কিছুদিনের মধ্যেই আবির্ভাব হল প্রমথেশ বড়ুয়ার।

আজ একথা সর্বথা স্বীকার্য যে, প্রমথেশ বড়ুয়াই সর্বপ্রথম বাংলা ছবিকে মঞ্চরীতিবিমুক্ত একটি স্বকীয় প্রমোদবস্তুতে পরিণত করলেন। অত্যন্ত প্রগতিশীল ছিল বড়ুয়ার চিন্তাধারা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তিনি যেমন 'দেবদাস' করেছিলেন তেমনি মুক্তি, মায়া, অধিকার, রজত-জয়ন্তী, শেষ উত্তর প্রভৃতি ছবি করে দেখিয়েছিলেন বিষয়বস্তুর মধ্যে আধুনিকতা না আনতে পারলে ছবিকে সবদিক থেকে উন্নত করা যাবে না। সব চেয়ে বড় দান তাঁর [illegible]। এমন একটা প্রাণ-চঞ্চলতা, গতিশীলতা ও বুদ্ধির ছাপ বহন করতো তাঁর ছবি যে [illegible] বাংলা ছবির রূপই বদলে [illegible]। এবং সত্যি সত্যিই তিনি যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। [illegible] ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রে আধুনিকতার [illegible]।

এর পর বাংলা ছবির অন্ততঃ কুড়ি বছর কেটে গিয়েছিল বড়ুয়া-প্রদর্শিত পথে হেঁটে। এর অর্থ এই নয় যে, সমস্ত পরিচালক ও চিত্রনির্মাতা তাঁর অনুকরণ করে চলেছিলেন। তিনি পথ দেখিয়েছিলেন কিন্তু চলার ও বলার ভংগী ছিল প্রত্যেকের নিজস্ব—কেউ ধীর, কেউ মন্থর, কেউ লঘুগতি, কেউ ক্ষিপ্র, কেউ ভাবগম্ভীর, কেউ আদর্শবাদী, কেউ কাব্যধর্মী। কিন্তু একথা নিয়ে তর্ক করার অবকাশ নেই যে সেই যুগে বড়ুয়ার আবির্ভাব না হলে বাংলা সিনেমার মোশান পিকচার বা চলচ্চিত্র নাম অর্জন করতে নিশ্চয় আরো দেরী হত।

বড়ুয়া-পরবর্তী ২০।২২ বছর অবশ্য বাংলা ছবি আত্মসচেষ্ট হয়ে উন্নত হবার সব রকম চেষ্টা করে গিয়েছিল। আঙ্গিক, অভিনয়রীতি, সুর-সংযোগ, পরিচালনা—সব দিক দিয়েই একটা ক্রমাধুনিকতা লক্ষিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই নতুন অগ্রগতির মধ্যে নিউ থিয়েটার্সের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখা গিয়েছিল সবচেয়ে স্পষ্টভাবে। দেবকী বসু, নীতীন বসু, হেম চন্দ্র, ফণী মজুমদার, বিমল রায়, কার্তিক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কলা-কুশলী পরিচালক একের পর এক সুন্দর ছবি করে বাংলা ছবির উৎকর্ষের মান বাড়িয়ে তুলছিলেন। নিউ থিয়েটার্সের বাইরেও বেশ কয়েকজন সুদক্ষ পরিচালক ভাল ভাল ছবি করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে নীরেন লাহিড়ী, শৈলজানন্দ, সুশীল মজুমদার প্রভৃতির নাম আগে করতে হয়।

যাইহোক মোটামুটি একটা অভিন্ন ধারায় বাংলা ছবির প্রবাহ এগিয়ে চলছিল। এর পর প্রায় একই সময় দুটো ঘটনা ঘটলো। প্রথম, সুচিত্রা-উত্তম জুটির উৎপত্তি। জুটি হিসেবে বাংলা ছবিতে ইতিপূর্বে আরো কয়েক জোড়া অভিনেতা-অভিনেত্রী জনপ্রিয় হয়েছিলেন। কিন্তু এই নতুন জুটির অনন্য জনপ্রিয়তা যেন বন্যার বেগে সব প্রতিযোগিতা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। ফলে এঁদের দুজনকে নিয়ে ছবি করে সার্থক হবার এক উদগ্র ইচ্ছা দেখা দিল চারদিকে এবং এঁদের দুজনকে নিয়ে ডজন কয়েক ছবি ৪।৫ বছরের মধ্যেই হয়ে গেল। আজও এঁদের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে কাহিনী, পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতির নিরিখে এঁদের বিচার করবার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। গত দিনের সেই মাদকতাটা *আজ কিছু বোধ করি কমেছে,—হয় তাদের [illegible] চিত্রাবতরণের ফলে, কিম্বা কালের অমোঘ বিধানে।*

দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে বাংলা ছবিতে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সত্যজিৎ রায়ের উৎপত্তি। আকস্মিক এই কারণে বলছি যে সত্যজিৎ কোন পরিচালকের সহকারী হিসেবে কাজ করেননি। তিনি ছিলেন সুনিপুণ চিত্রকর। চিত্রশিল্পী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তিনি সিনেমার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন, একথা খুব কম লোকেই—তাঁর অন্তরঙ্গ কিছু লোক বাদে—জানতে পেরেছিল। যাই হোক, সত্যজিৎ এলেন একটি দীপ্ত প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে। নতুন চিন্তা, নবতর দৃষ্টিভঙ্গী, অনন্যসাধারণ প্রয়োগরীতির প্রবর্তন করলেন সত্যজিৎ তাঁর প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালি' দিয়ে। বাংলা ছবি যেন একটি নতুন ভাষা খুঁজে পেল সত্যজিৎ রায়ের ছবির পর ছবিতে। তিনি যে-পথে যাত্রা সুরু করলেন তা দুর্গম বা দুর্বোধ্য নয়, অতি-স্বাভাবিকতার গুণে সমৃদ্ধ ও সহজ। বোধ হয় সেই কারণেই এই পথটি এতদিন কেউ চিনতে পারেননি। সত্যজিতের শিল্পচিন্তা ও শিল্পরীতি নিয়ে বহু বাদানুবাদ হয়েছে। পুরাতনের প্রতি অতি-আসক্ত যাঁরা তাঁরা তাঁর অনন্যসাধারণতাকে আজও স্বীকার করতে যেন কুণ্ঠিত। কিন্তু আর্টের গতিশীলতা ও নবতর উন্মেষকে যাঁরা মানেন, সর্বদেশের সেই নরনারী সত্যজিৎকে বর্তমান বিশ্ব চিত্রজগতের একজন অসামান্য কলা-কুশলী ও চিন্তাশিল্পী বলে মেনে নিয়েছেন। গত ৬। [illegible] বছরের বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায়ের নাম ও ছবি সেই কারণেই সর্বাগ্রগণ্য হয়ে রয়েছে।

সত্যজিতের ইপক্ বা যুগ এখনও চলছে। এই যুগেই অবশ্য সৃষ্টিধর্মী আরও কয়েকজন দক্ষ পরিচালকের আবির্ভাব হয়েছে। এঁদের মধ্যে তপন সিংহ, অসিত সেন, অজয় কর, অগ্রদূত, অগ্রগামী, পার্থপ্রতিম, তরুণ মজুমদার প্রভৃতি উল্লিখিত হবার দাবী রাখেন। এঁরা সত্যজিতের যুগেও যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন এবং এঁদের ও অন্যান্য কর্মীদের সামগ্রিক চেষ্টায় বাংলা ছবি আজ এই অর্থকৃচ্ছ্রতার বাজারেও [illegible] রক্ষা করে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু বাংলা ছবির সামনে আজ একটি [illegible] প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তার শিল্পগুণের বৃদ্ধি [illegible] সত্ত্বেও। এই প্রশ্নটি আদিম প্রশ্ন—এর শিল্প [illegible] দিন ধরে ক্ষতবিক্ষত দেহ ও মন নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে? দেশবিভাগের পর ভৌগোলিক [illegible] জন্য যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, অনেক [illegible] চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর সেগুলির আংশিক সমাধান

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

বাঙলা নাটকের একাল

মহেন্দ্র সরকার

নাট্য-রসিক মহলে বেশ কিছুকাল ধরে একটা হতাশার কথা শোনা যাচ্ছে, ভালো নাটক নেই ভালো নাটক রচনা হচ্ছে না।

এই অনুযোগ বা হতাশা অনেকাংশে ঠিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সারা দুনিয়ার অবক্ষয়ের যে ধ্বস নামতে সুরু করেছিল তার ব্যাপকতা এবং ধ্বংসশক্তি এখনো পুরোমাত্রায় সক্রিয় রয়েছে। ইয়োরোপ, আমেরিকা এবং প্রাচ্য-খণ্ডে জাপানের যুদ্ধোত্তর জীবনে মানবীয় মূল্যবোধে যে প্রচণ্ড তারতম্য ঘটে গেছে তার প্রতিফলন যুদ্ধোত্তর সাহিত্যে বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে জড়িত না থাকলেও উত্তাপের হল্কা এ দেশকেও রেহাই দেয় নি। সারা পৃথিবী জুড়ে দুঃখ, দৈন্য, হতাশা আর বিকৃতির যে ব্যাপক প্রকাশ, ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশও তার আওতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে নি। তাই যুদ্ধোত্তর শিল্প-সংস্কৃতির মূল্যায়ন করতে বসে আমরা কেবলই যদি হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকি তাহলে সেটা এই সাময়িক অন্ধকারের কাছে নিছক আত্মসমর্পণেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র—উত্তরণের আশা আর অতিক্রমণের সুস্থ চেতনা তার ভেতর থেকে কোনোক্রমেই রূপ নিতে পারবে না। একথা মনে হয় বলেই এই বিকৃতির প্লানি আর নৈরাশ্যের পুঞ্জীভূত বেদনার মধ্যেও যদি কোনো আশার আলো দেখা যায় তারই সন্ধানে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা দরকার।

বাংলা দেশে তথাকথিত নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে আজ কয়েক বছর ধরেই বিচারবিতর্ক চলছে। কেউ বলেন, আন্দোলন বলতে যা বোঝায় সেই সমগ্রতা এবং তন্ময়তার কোনো লক্ষণ এতে নেই। আবার অন্য পক্ষ বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলন আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চেহারা কখনোই এক হতে পারে না। রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সংহত শক্তির প্রকাশ ঘটে তা মূলত একটি বিশেষ আদর্শ বা চিন্তার ক্রিয়াশীল রূপ মাত্র। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে যেহেতু সৃজনী শিল্পের প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেই হেতু এ ক্ষেত্রে ওই একটি বিশেষ ধারণা বা প্রক্রিয়ার সমগ্রতা গণ্য নয়। নাট্য প্রযোজক, নাট্যকার বা নাট্যশিল্পী প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সৃজনী-শক্তির অধিকারী। অনিবার্যভাবেই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কথা এসে পড়ে। এই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের একত্র যোগফলের মধ্যেই আন্দোলনের স্বরূপ নিহিত। অতএব একটি বিশেষ যুগের সামাজিক চেতনা যদি ওই খণ্ড এবং বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টাগুলির ভেতর দিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়ে একটা সমষ্টিগত যোগফলকে প্রকাশ করে তবে তারই মধ্যে আন্দোলনের সার্থকতা। সুতরাং নবনাট্য আন্দোলন এদিক থেকে সার্থক। অসংখ্য বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে এ যুগের নাট্য-প্রচেষ্টা এ যুগের কথাকে তুলে ধরছে।

"মহালগ্ন" চিত্রে বিকাশ রায় ও জনৈক শিশুশিল্পী

যুদ্ধোত্তর নাট্য প্রচেষ্টা যথার্থই নাট্য-আন্দোলন কিনা এ কূট বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে চাই না। এই কয়েক বছরের রচিত ও অনূদিত নাটক এবং নাট্য প্রযোজনা সম্বন্ধে আমার যে বিশ্বাস জন্মেছে সেই কথাটাই বলি।

গত দশ-পনেরো বছরে নাটকের দর্শক সংখ্যা যে ক্রমেই বেড়ে চলেছে একথা সর্বজনস্বীকৃত। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকেও পেশাদার মঞ্চের নাটক দেখতে গিয়ে যে দর্শক সম্প্রদায় ভাবোচ্ছ্বাসকেই নাটকে অগ্রাধিকার দিতেন তাঁদের সঙ্গে আজকের দর্শকের অনেক পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বমূলক সাংকেতিক নাটক এখন টিকিট বেচে অভিনয় হয় এবং প্রেক্ষাগৃহে আদৌ শূন্য থাকে না। বিদেশী নাট্যকারের প্রখ্যাত নাটকের অনুবাদ করলেও নিয়মিত দর্শক সমাগম হয়। এ ছাড়া নতুন নতুন নাট্যকারের রচিত কিছু সংখ্যক নাটকও গত কয়েক বছর হল দর্শক সমাজকে আকর্ষণ করেছে, চিন্তা করিয়েছে। পেশাদারী নাট্যশালার গতানুগতিক নাট্যধারার পাশাপাশি হঠাৎ ট্র্যাডিশন-বহির্ভূত নাটকের প্রযোজনা বিপুল পরিমাণ দর্শক আকর্ষণ করছে এও গত কয়েক বছরের মধ্যে সকলে লক্ষ্য করেছেন। খ্যাতনামা বহুরূপী সম্প্রদায়ের নাটক অভিনয় ইদানীংকালে বেশ কিছু দর্শকের রুচি তৈরী করেছে তাতে সন্দেহ নেই। মিনার্ভা থিয়েটারে লিটল থিয়েটার গোষ্ঠীর কয়েকখানি নাটক পেশাদারী মঞ্চের প্রযোজনা-রীতির ধারাই পরিবর্তন করে দিয়েছে। ভালো প্রযোজনা হলে পেশাদার গোষ্ঠীর নাটক লোকে পয়সা দিয়ে দেখছে তার দৃষ্টান্ত এই কয়েক বছরে প্রচুর লক্ষ্য করা গেছে। সুতরাং, সামাজিক যন্ত্রণা আর হতাশার মধ্যেও অন্ধকার উত্তরণের চেষ্টা যে একেবারে হচ্ছে না, এমন তো নয়।

ভালো নাটক রচনা হচ্ছে কি না এ নিয়ে রসিক মহলের মধ্যে বিরুদ্ধ মতবাদ আছে। একটি কথা সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে কোনো দেশে

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

করা গিয়েছিল। কিন্তু সাময়িক চিন্তামুক্তিকে নতুন এক বিপদ এসে আঘাত করে সবকিছু বিপর্যস্ত করে দিল। এটা হচ্ছে ছবির নির্মাণব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধি।

এই ক্রমবৃদ্ধি ধাপে ধাপে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, এর ফাঁস থেকে প্রযোজক সমাজ কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছেন না। চিত্রনির্মাণের আজকের দিনের ব্যয় ৮।১০ বছর আগেকার তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অথচ ছবির বিক্রী বেড়েছে সেই অনুপাতে অনেক কম। তাই আয়ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কোন মতেই সম্ভব হয়ে উঠছেনা।

এই ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় সব দিক থেকে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের—ঠিক কথা বলতে গেলে—ওপরের স্তরে যাঁরা আছেন তাঁদের পারিশ্রমিকের হার অনেক বেড়ে গেছে। শোনা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে অসহনীয়ভাবে বেড়েছে। কাঁচা ফিল্মের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। এদিক দিয়ে সরকারী কোন চাপ আমদানীকারকদের উপর পড়ছে কিনা আমার জানা নেই। রিলিজ প্রিন্টের উপর মোটা শুল্ক চেপেছে। বিজ্ঞাপনের ব্যয়, কাগজ, ছাপা প্রভৃতির খরচ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যয়ের ক্রমবৃদ্ধির চাপে প্রযোজকদের প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হবার অবস্থা হয়েছে। এই ব্যয় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ভালভাবে ছবি তোলার প্রচেষ্টা ক্রমেই প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বাংলা ছবির সামনে আজ বেঁচে থাকবার প্রাথমিক সমস্যাটিই আকাশচুম্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয় কেবলমাত্র আর্থিক সাহায্যের কয়েকটি দরজা (যেমন ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন) খুলে গেলেই এই কঠিন সমস্যার সমাধান হবে না। ছবি করার খরচ কমাতে হবেই। ধারদেনা করে যেমন শেষ পর্যন্ত সপ্তডিঙাকে ভাসমান রাখা যায় না, তথাকথিত ক্রেডিট পাবার সুযোগ হলেই বাংলা সিনেমাশিল্পের তরণী তরতর করে এগিয়ে চলতে থাকবে, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের নেতৃবৃন্দের সামনে আজ দ্বিতীয় পন্থা আছে বলে মনে হয় না।

ইতিহাসে প্রত্যেক যুগে এক সংগে অসংখ্য প্রতিভাবানের আবির্ভাব ঘটে না। আমাদের দেশে গত শতাব্দীতে যা ঘটেছিল তারও কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। তা আমাদের আলোচ্য নয়। বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা নাটকে শক্তিশালী সৃষ্টির নিদর্শন যে একেবারে নেই এ-কথা এক বাক্যে মেনে নেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অল্পশক্তিবিশিষ্ট নাট্যকারের হাতে এ-যুগের জীবন-যন্ত্রণার বহিরঙ্গ মাত্র আভাসিত হয়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছক-বাঁধা কাহিনী আর চরিত্রের পরিকল্পনায় নাট্যবস্তু অগভীর। মধ্যবিত্ত-জীবনের ব্যথা-বেদনাই এই পর্বের নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে—কারণ নাটক যাঁরা লেখেন তাঁদের অধিকাংশই এসেছেন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। এই ছক-বাঁধা নাট্যবস্তুর আবেদনও যে বড় কম নয় তা দেখা গেছে পেশাদার মঞ্চে নাট্য নির্বাচনের মধ্যেও।

গত কয়েক বছরে বিষয়বস্তু এবং ক্যানভাসের অপরিচিত পটভূমির ওপরেও যে বাংগালী নাট্যকার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তার নিদর্শনও কিছু আছে। অনূদিত নাটকগুলি বাদ দিলে বিষয়-বস্তুর ব্যাপকতা এবং গভীরতায় কয়েকজন নাট্যকার বাংলা নাট্য সাহিত্যের পটভূমি প্রসারের বলিষ্ঠ ইংগিত দিয়েছেন। এঁরা যে চিন্তাশীল নাট্যকার তার প্রমাণ এঁদের রচিত নাটকেই বিধৃত। শুধু বিস্তৃততর পটভূমিই নয়, নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয়াবহ পটভূমিতেও এরই মধ্যে বাংলায় নাটক রচিত হয়েছে। সুতরাং গতানুগতিক সেণ্টিমেণ্ট-সর্বস্ব নাটকই যে ইদানীংকালের বাংলা নাটকের একমাত্র নিদর্শন নয় সে-কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে ইতিহাসাশ্রিত দেশপ্রেমমূলক নাটকগুলি লোকমানসকে উদ্দীপ্ত করত। বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে সে আবেগের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। মনীষী ব্যক্তির জীবনী-নাটকের দর্শক পাশ্চাত্যে অনেক আগেই কিছু কিছু সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশে জীবনী-নাটকের দর্শক-সংখ্যা এখন বেড়েছে। পরলোকগত নাট্যাচার্য শিশিরকুমার জীবনের শেষ ক'বছরের মধ্যে 'মাইকেল মধুসূদন' নাটকের অভিনয় বেশ কয়েক-বার করেছিলেন কিন্তু সে নাটকের দর্শক সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। পরিবর্তিত পটভূমিতে আজ তুলনায় এ জাতীয় নাটকের দর্শক বেশী। বনফুল রচিত শ্রীমধুসূদন বা বিদ্যাসাগর নাটকের অভিনয় দেখার জন্যে আগ্রহশীল দর্শক এখন দেখা যায়। এই জীবনী-নাটকগুলির পাঠমূল্যও বড় কম নয়। কিন্তু আমাদের দেশী কলেজীয় পাঠ্য-ছাড়া নাটক পড়ার রেওয়াজ এখনো তেমন হয় নি বলে অভিনয় ছাড়া এসব নাটকগুলি অনাদৃতই থেকে যায়। নারায়ণ গংগোপাধ্যায়ের রচিত রাম-মোহনের জীবনী-নাটক কোথাও অভিনয় হয়েছে কি না আমার জানা নেই। এই মূল্যবান নাটক-খানির কথা ক'জন মনে রেখেছে তাও জানি না। সাম্প্রতিককালে বাংলা জীবনী-নাটক শাখায় আরও দু'একখানি শক্তিশালী নাটক রচিত হয়েছে।

এ-কথা হয়ত ঠিক যে সমাজ-মনসের যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে তার সংগে তাল রেখে এগিয়ে চলা আজকের নাটকের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু এই অসম-গতিই তো শেষ কথা নয়। চটুল এবং স্থূল রসের রসিক সব দেশেই আছে এবং তাদের চিত্তবিনোদনের আয়োজনও সব দেশেই ব্যাপক। সমাজ-বিজ্ঞানীদের মতে কোনো দেশ বা সমাজের অবক্ষয়ের কালে তার নৈতিক চেতনা শিথিল হয়ে পড়বার ফলে উগ্র মাদকের আকাঙ্ক্ষা আরো বেশী বেড়ে যায়। আমাদের দেশে স্থূল প্রমোদোপকরণের এত প্রাচুর্যের কারণ কী তা ওই ব্যাখ্যার মধ্যেই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই স্থূলতা আর বিকৃতির আড়ালে চিন্তাশীল নাট্যকার ও নাট্যপ্রযোজকদের প্রচেষ্টা যে অব্যাহত রয়েছে তাতে আমার সংশয় নেই। বানের জল যখন সমস্ত আবর্জনা নিয়ে ছুটে এসে সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায় তখন তার বয়ে-আনা পলিমাটিটুকু নজরে পড়ে না। সে জল সরে যাওয়ার পর তারই দিয়ে-যাওয়া পলিমাটিতে নতুন শস্য আর মহীরুহের অংকুর মাথা তোলে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দিকে দিকে সেই নবাঙ্কুর মাথা তুলুক, তারই প্রতীক্ষায় এখন থাকতে হবে।
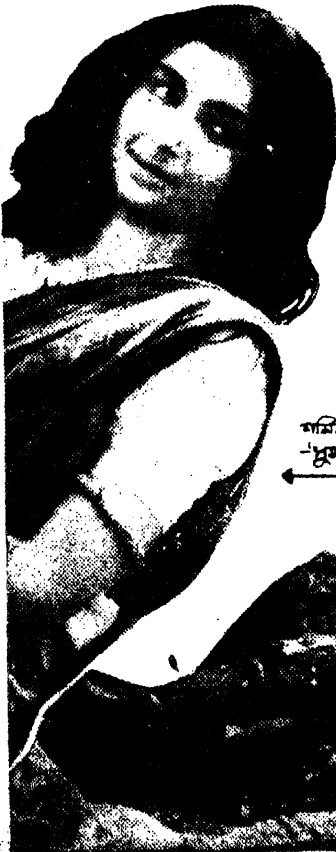
গীতালী রায় — 'শেষ তিন দিন'

জ্যোৎস্না বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ — 'তৃষ্ণা'

শর্মিলা ঠাকুর — 'দুটো ও দেবতার গ্রাস'

উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া চৌধুরী — 'লালপাথর'

হাওয়া বদল

সুমথনাথ ঘোষ

বিদেশে গেলে, প্রায়ই দেখেছি, বেড়াতে বেরুবার সময় উপস্থিত হলে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে যেন এক খণ্ড-প্রলয় বেধে যায়। রাগ, ঝাল, চেঁচামেচি, মায় অশ্রুবর্ষণ পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় না অথচ এর উপলক্ষ এত তুচ্ছ যে, সেকথা ভদ্রসমাজে মুখে আনতে লজ্জা করে।

অর্থাৎ তাঁর যা বক্তব্য, তার মর্মার্থ হলো এই যে, তিনি যেমন সাজগোজ করে, নিত্যনূতন সাড়ীর সঙ্গে রঙের 'ম্যাচ' দিয়ে ব্লাউজ, পেটি-কোট, জুতো, ভ্যানিটি ব্যাগ ও কপালে টিপের ফোটা কাটেন, আমাকেও ঠিক তদ্‌পযুক্ত না হলেও অন্ততপক্ষে দাড়ি কামিয়ে, ধোপদোরস্ত একটা ধুতি পাঞ্জাবী পরে তাঁর সংগী হতে হবে, নইলে কেবল যে 'প্রেস্টিজের' হানি তাই নয়, মানসম্ভ্রম ইজ্জত সবকিছু তাঁর একেবারে নাকি রসাতলে যাবে।

জানি এটা নারীর স্বভাবধর্ম। সাজার পিছনে থাকে সাজ দেখানোর ইচ্ছা। পরপুরুষের বক্ষে কামনার আগুন জ্বালিয়ে মজা দেখা। এ এক রকমের লীলা। মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে-খেলা। তাই পথেঘাটে বেরুবার সময় তাদের এত সাজসজ্জার ঘটা। কিন্তু এই কথাটি ত স্পষ্ট করে বলা চলে না। তাই একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলি, দেখো এই বিদেশ বিভূঁই জায়গায় কে কাকে চিনছে! আর কারই বা এত দায় পড়েছে যে, তোমার বেশভূষা ও মানসম্ভ্রম ওজন করার জন্যে দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরবে।

কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। ফল এতে আরো উল্টো হয়। কণ্ঠের উত্তাপ সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো কয়েক ডিগ্রী বেড়ে যায়। তার পর জবাব আসে, তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনি কথা-ই বলেছো! আমার ত মনে হয় অচেনা অজানা জায়গাতেই আরো বেশী সাজগোজের প্রয়োজন। 'চেনা বামুনের ত পৈতে লাগে না'!

এই বলে একটু থেমে দাঁতের ওপর দাঁত চেপে আবার শুরু করে, তোমার কি একবারও মনে হয় না, এই বেশে তোমাকে আমার সঙ্গে পথে ঘুরতে দেখলে অপরিচিত লোকেরা কি ভাববে?

হাসি চাপতে গিয়েও মুখ ফসকে বুঝি এক ঝলক বেরিয়ে পড়ে। বলি, ভাববে আর কি, বাবু বাড়ী নেই, সেই সুযোগে মনিবপত্নী তার সখের খানসামাটিকে সঙ্গে নিয়ে সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছেন। এমন প্রাকৃতিক পরিবেশ! পাহাড়, জঙ্গল, নদী—এর ভেতর কোথায় কতটুকু সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, তার খোঁজ করতে।

চুপ করো। সবতাতে তোমার এই রসিকতা ভাল লাগে না! বলে ধমক দিয়ে ওঠে। তারপর আরো একপর্দা গলা নিখাদে চড়িয়ে বলে, তাতে বুঝি তোমার মুখ খুব উজ্জ্বল হবে। গৌরব বাড়বে?

নিশ্চয়! তোমাকে নিয়ে লোকেরা কত জল্পনাকল্পনা করবে। চাই কি কোন আধুনিক গল্প লেখকের তুমি নায়িকা বনে যাবে রাতারাতি—একি কম সৌভাগ্যের কথা!

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি হলো! সঙ্গে সঙ্গে যাকে বলে 'তেলেবেগুনে জ্বলে' ওঠে আমার স্ত্রী। যদি সত্যি সত্যিই তাই করতে পারতুম, তাহলে বুঝতে 'কত ধানে কত চাল!' দেখতুম কত তোমার ওই কণ্ঠে রস ঝরে! অনেক তপস্যা করে পেয়েছিলে আমার মত মেয়ে তাই তরে গেলে এ জন্মে, সব সময় মনে রেখো। বলতে বলতে জ্বলন্ত লোহার ওপর হাতুড়ির ঘা মারলে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে যায়, তেমনি ভাবে ঘরের মধ্যে গিয়ে বেশভূষা খুলে ফেলতে থাকে।

তারপর আর কি! মানভঞ্জন, সাধ্যসাধনা, আপোষ, রফা!

সত্যিকথা বলতে কি, বিদেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না, আমার প্রকৃতি যেন বিদ্রোহ করে ওঠে! সভ্যতার খাতিরে যে অভ্যাসগুলোর দাসত্ব করতে বাধ্য হই শহরে, কতক্ষণে তা থেকে মুক্তি পাবো তারই জন্যে যেন দেহের মধ্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্ করতে থাকে।

তাই সব প্রথম আক্রোশটা গিয়ে পড়ে ওই 'সেভিং সেট্‌টার' ওপর। ঘুম ভেঙে সকলের আগে যার মুখদর্শন না করলে কলকাতায় নিজের মুখ অন্য দর্শককে দেখাতে পারি না, তার দিকে পিছন ফিরে থাকি একাদিক্রমে হয়ত, তিন, চার, কি পাঁচ দিন পর্যন্ত।

আর ধুতি পাঞ্জাবী, যাদের ছাড়া নাগরিক-জীবন একেবারে অচল, এখানে কিন্তু তাদের ভুলে বেমালুম দিন চলে যায়। কোন্ স্যুটকেশ-এর কোন্ গহ্বরে যে তারা তালাচাবি বন্দী পড়ে আছে, সে খোঁজ নেবারও অবসর মেলে না। অনেক দিন পরে পুরনো বন্ধুকে পেলে সবকিছু ভুলে দিনরাত যেমন তার সঙ্গে কাটাতে ইচ্ছা করে, আমিও তেমনি বহু দুর্দিনের সাথী, বেকারজীবনের মহত্তর সেই লুঙ্গিটাকে পেয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও কাছ-ছাড়া করতে পারি না। আহারে, বিহারে, ঘুমে, জাগরণে—সে আমার সব সময়ের সঙ্গী। তার সঙ্গসুখ যে আমার দেহে মনে মুক্তবিহঙ্গের আনন্দ এনে দেয় সেকথা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না আমার স্ত্রীকে। আমার ওই লুঙ্গিটার ওপর তার যেন সপত্নীর বিদ্বেষ! তবু ওকে ত্যাগ করতে পারি না।

বিশেষত ওই শিমুলতলার মত জায়গায়। যেখানে এখনো শহর বা সভ্যতার আঁচড়টি লাগে নি! হোটেল, সিনেমা, রেস্তোরাঁ, ডাইংক্লিনিং সেলুন দূরে থাক, একটা সাইকেল রিক্সার 'ক্রিড়িং ক্রিড়িং' শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না। তার বদলে পাখীর ডাক, শাল মহুয়ার মর্মরধ্বনি, দূরে তরঙ্গায়িত পাহাড়, ছোট-বড় বহু চড়াই উৎরাই, আর পায়ে হাঁটা মেঠো পথ! যানবাহন বলতে সেই আদি এবং অকৃত্রিম গোযান ছাড়া আর কিছু নেই। তাও মেলে না সব সময়! আগে থাকতে ব্যবস্থা করতে হয়।

'চেঞ্জ' কথাটার প্রকৃত অর্থ যেন এখানে এলে উপলব্ধি করা যায়। বেশ লাগে আমার এই আদিম বর্বর জীবন। মনে হয় যেন ফিরে গেছি কোন্ প্রাগ-সভ্যতার যুগে! সত্যি বাজার-হাট বলতেও এখনো এখানে তেমন কিছু নেই। পাহাড়ের দিক থেকে সাঁওতাল মেয়ে পুরুষরা মাথায় করে বিক্রী করতে আসে, নানা জিনিষ। কেউ আনে কাঠ, কেউ দুধ, কেউ মুরগী, কেউ চাল, কেউবা তরিতরকারী, যার ক্ষেতে যেটুকু ফলে। তাই সব দিন সকলের ভাগ্যে সব জিনিষ জোটে না। কোনদিন হয়ত বা শূন্য! তবু এর মধ্যে যেন এক নূতন জীবনের আস্বাদ পাই। কলকাতার জনকোলাহল ও একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন আবহাওয়া ছেড়ে সুযোগ এবং সুবিধা পেলেই, এখানে পালিয়ে এসে তাই কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাই।

সেবার শিমুলতলা থেকে ফিরেই বাবার চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেন, খুব সুসংবাদ। ভগবান রেণুর জন্যে একটি ভাল পাত্র মিলিয়ে দিয়েছেন। ঠিক যেমনটি আমি চেয়েছিলুম। রূপে গুণে অদ্বিতীয়। খোলাপোতার জমিদার অসীম চৌধুরীর একমাত্র ছেলে, শিবপুর থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে রাউরকেল্লায় আটশো টাকা মাইনের চাকরী করছে। সামনের মার্চ মাসে ওকে অফিস থেকেই জার্মেণীতে পাঠাবে। সেখানে দু বছরের ট্রেণিং নিয়ে ফিরলেই দেড় হাজার টাকা মাইনে হবে। পাত্রের বাপ নিজে দেশে এসে দেখে গেছেন রেণুকে। তিনি একটু সেকেলে ধরণের, পাড়াগাঁয়ের অল্পশিক্ষিত মেয়ে পছন্দ করেন। রেণুকে যে কলকাতায় পাঠিয়ে তোমার ওখানে রেখে কলেজে পড়াইনি, এতেই তিনি বেশী খুশী হয়েছেন। আর রেণু একে-বারে মুখ্যু নয়। স্কুল ফাইনাল ভালভাবেই পাশ করেছে! কোন্ সাবজেক্টে কত নম্বর পেয়েছে, মার্কসিটটাও তিনি দেখেছেন। তোমায় নিয়ে পাত্র দেখতে যাবো বলে তোমার বাসায় গিয়ে ছিলুম। শুনলুম, তুমি চলে গেছো শিমুলতলায় হাওয়া খেতে। ব্যাটরা থেকে তোমার ছোটমামাকে নিয়ে আমি তখন রাউরকেল্লা যাই পাত্র দেখতে। দিব্যি স্বাস্থ্যবান, হাসিখুসি ছেলেটি। তোমার ছোটমামার খুব পছন্দ হয়েছে। তোমারও হবে জানি! তবে তোমাকে একবার দেখাতে পারলে ভাল হতো কিন্তু পাত্রের একেবারে ছুটি নেবার উপায় নেই। উপস্থিত একটা দিনের জন্যেও সে কলকাতায় আসতে পারবে না। দেখতে হলে তোমাকে সেখানে গিয়ে দেখে আসতে হবে এবং সঙ্গে তোমার ছোটমামাকেও আবার যেতে হয়। তুমি কবে ছুটি নিতে পারবে জানালে, তোমার ছোটমামাকেও আমি সেই মত পত্র দেবো যাতে ওইদিনে সেও অফিসে ছুটি নিতে পারে! তবে দেরী করো না, এই হপ্তার মধ্যেই যাতে হয়, ব্যবস্থা করো। কেন না তোমার মতের জন্যে আমি অপেক্ষা করছি, নইলে পাকা-কথা আমি একরকম তাদের দিয়েই দিয়েছি। আমি জানি তোমার পছন্দ হবেই। তবু তোমার ছোট বোনের বিয়ে, পাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে তোমার সম্মতি থাকা দরকার।

আগে ভেবেছিলুম, পাকাদেখার দিনই দেখবে তুমি। কিন্তু ওদের আবার পাকাদেখা নেই। বিয়ের দিন রাত্রে তাই আগে উভয়পক্ষের পাকা দেখা হবে, তারপর বিয়ে।

তুমি কবে নাগাদ ছুটি নিতে পারবে, তাড়াতাড়ি জানাও। কারণ বিয়েটা এই অগ্রহায়ণ মাসেই দিতে হবে পাত্রের পিতার একান্ত অনুরোধ। সামনে পৌষ মাস ও মাঘ মাসে ছেলের জন্ম মাস, কাজেই হবে না। অথচ ফাল্গুনে পাত্রকে জার্মেণী যাত্রা করতে হবে। তা ছাড়া শুভস্য শীঘ্রং এই শাস্ত্রবাক্যটিকে আমি মনে-প্রাণে মানি, তা তুমি জানো!

বাবার চিঠির উত্তরে পরের দিন আমি অফিসে গিয়ে লিখলুম। আপনি এবং ছোটমামা—দুজনেরই যখন পাত্র এত পছন্দ হয়েছে, তখন আমার আবার দেখার যে প্রয়োজন আছে, আমি মনে করি না। তা ছাড়া রাউরকেল্লা কাছে নয়। আজকাল ট্রেণের যা অবস্থা, তাতে ফার্স্ট ক্লাশ ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই অনর্থক এতগুলো টাকা বাজে খরচা করে লাভ কি? আপনি ওপক্ষকে পাকা কথা জানিয়ে দিন!

এ চিঠির জবাব না দিয়ে বাবা কয়েকদিন পরে সশরীরে এসে হাজির হলেন। একটা চাপা আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের দীপ্তি যেন তাঁর চোখে মুখে। ভাবী জামাতার গুণপনার কথা সাড়ম্বরে বিবৃত করে তারপর বললেন, এই মাসের উনত্রিশে দিন স্থির করে এলুম। আজ থেকে আর মাত্র আঠারোটা দিন বাকী এরি মধ্যে সব কিছু গোছগাছ করতে হবে! হাঁ, একটা অনুরোধ বেয়াইমশাইয়ের যে বিয়েটা কলকাতা থেকেই দিতে হবে। তাঁর একমাত্র ছেলের বিয়েতে যদি বড়লোক সব আত্মীয়স্বজনরা যোগ দিতে না পারে, তাহলে খুবই দুঃখের হবে! আমি তা আজই তোমার কাছাকাছি কোথাও একটা বাড়ি অন্ততঃ তিনটে দিনের জন্যে ভাড়া করে যেতে চাই। সেই ঠিকানাতেই ত চিঠি ছাপাতে হবে।

বললুম, এর জন্যে চিন্তা করবেন না আমার অফিসেই এক ভদ্রলোক কাজ করেন, তাঁর শ্বশুরের ভবানীপুরে একটা তিনতলা বাড়ি আছে, [illegible]তিদিন একশো টাকা হিসেবে এই রক বিয়ে-[illegible]র জন্যে ভাড়া দেন!

উৎসাহে বাবার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো পকেট থেকে তিনশো টাকার নোট হাতে দিয়ে বললেন, আজই তুমি এটা পাকা করে ফিরবে তারপর কাল সকালে আমি গহনার হাঙ্গামা চুকিয়ে যেতে চাই। তোমাকে ও বৌমাকে সঙ্গে করে গিনিহাউসে যাবো!

এবার দেওয়া থোয়ার কথাটা উঠলো বললুম, মোট কত কি দিতে হবে বাবা?

তিনি বললেন, সত্যিকথা বলতে কি, কিছু তাঁরা চাননি। নগদ একটা পয়সাও নেবেন না তবে বেয়াই বলেছেন, আমার একমাত্র বৌমাকে এমনভাবে পাঠাবেন যেন দশজন আত্মীয়স্বজনের সামনে আমার মুখরক্ষা হয়।

মুহূর্তখানেক চুপ করে, একটা ঢোক গিলে বাবা এবার বললেন, আমি একেবারে তোমার ছোটমামার কাছ হয়ে সবকিছু ফর্দ করে নিয়ে এসেছি। এই দেখো! বলে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন।

ছোটমামা অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা ভক্তি করি। তিনি ব্যাটরাতে থাকেন বটে। তবে তিনি কেবল হঠাৎ ব্যবসা করে পয়সা করেন নি। তাঁর শ্বশুরবাড়ীর তরফ এবং বড়লোক যে সব সময় তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে, কলকাতার তথাকথিত সভ্য সমাজের রুচি বা 'টেস্ট' কখন কোনদিকে

কিভাবে কত ইঞ্চি ওঠানামা করছে সব তার কণ্ঠস্থ। বাজারপর্ব—শৌখীন জিনিষপত্র কেনা-কাটায় তিনি ওস্তাদ। যাই হোক, মামার ফর্দটা সবই শুনলাম। জামাই 'ফরেনে' যাচ্ছে—কাজেই তার উপযুক্ত তিনটে ভাল স্যুট তিন রকমের থেকে শুরু করে 'ফ্রিজিডেয়ার', 'রেডিওগ্রাম' আর ঘড়ি, হীরের আংটিটা পর্যন্ত যেমন বাদ নেই, এদিকে তেমনি মেয়ের সোনার গহনার সঙ্গে জড়োয়ার সেট্, বেনারস থেকে অর্ডার দিয়ে ভি, পি-তে সাড়ী আনানো। তাছাড়া 'ক্যাবিনেট'-এর 'ফারনিচার' 'ডানলোপিলোর' গদি বিছানায়, 'সোফাকাউচ' 'ডিভানে'—সব কিছু নিয়ে মোট খরচা পড়ছে, দশহাজার।

দশহাজার! আমার কণ্ঠস্বর শুনে বাবা চমকে উঠলেন। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, তোমাদের বংশে এরকম জামাই আর কখনো আসেনি। তাছাড়া তোমার ছোটমামা বললেন, এরকম ছেলে আজকাল বিশপঁচিশ হাজার টাকাতেও পাওয়া যায় না। আমাদের খুব বরাত ভাল। নইলে এম-এ, বি-এ পাশ-করা শহরের নামকরা সুন্দরী মেয়েদের 'কিউ' লেগে যায় এরকম পাত্রের জন্যে। বেয়াইমশাই নেহাত একটু সেকেলে ধরণের। তিনি এইসব আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েদের ধরণধারণ একে-বারেই পছন্দ করেন না তাই। নইলে আমার পক্ষে এত বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ার মত—তা কি আমি জানি না?

একটু ঢোক গিলে বললুম, তা ঠিক। তবে দশ হাজার টাকা ত এখুনি আপনাকে জোগাড় করতে হবে।

আরে তার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না। আমি আগে থাকতে সেসব ব্যবস্থা ঠিক না করে কি কাজে হাত দিয়েছি। বলে আমার কানের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, হরিখুড়ো পাঁচ হাজার টাকায় বাগানসমেত বসতবাড়ীটা বাঁধা রাখতে রাজী হয়েছে। এদিকে পোষ্ট অফিসে তোর মায়ের প্রায় হাজার টাকার মত জমা আছে। আর তার গায়ের গয়নাগুলো বেচলেও হাজার দেড়েক টাকা হবে। এই গেল সাড়ে সাত হাজার, আর তোর ছোটমামার কাছ থেকে আড়াই হাজার টাকা হাওলাত আজ নিয়ে তবে এসেছি। এদিকে গহনাগাটির অর্ডারটা দিয়ে আমি কাল দেশে চলে যাবো। তারপর হরিখুড়োর টাকা দু'চারদিনের মধ্যে পেলেই তোর মামাকে পাঠাবো, পাত্রের সব জিনিষপত্তরগুলো সে পছন্দ করে কিনে ফেলবে। এরপর বাবাকে আর একটি কথাও বলতে পারলুম না। তাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি নিজে যেমন ইচ্ছা খরচ করে দেবেন তাতে আমার বলারই বা কি আছে! আর বললে, তিনি শুনবেনই বা কেন?

বিয়ের তখনো দশদিন বাকি, বাবা রেণুকে আমার বালীগঞ্জের বাসায় রেখে চলে গেলেন। বললেন, বেয়াইমশাইয়ের চিঠি পেয়েছি, তাঁর বড়শালাজ শ্রীরামপুরে থাকেন। খুব ধনী। নিজেদের চারখানা গাড়ী আছে। তিনি দু'এক-দিনের মধ্যে দুপুরের দিকে এসে রেণুর গায়ের রংটা ঠিক কি রকম দেখে যাবেন, কারণ তারি সঙ্গে 'ম্যাচ' করে তিনি 'বেনারসী' কিনবেন এবং রেণুর গলারও একটা মাপও নেবেন—মুক্তোর শেলীর অর্ডার দেবেন সেই মাপে!

দু'দিন পরে সত্যি সত্যি শ্রীরামপুর থেকে দুপুরে মোটরে করে পাত্রের মামী ও এক মামাতো বোন রেণুকে দেখে গেলেন।

আমি অফিস থেকে ফিরতেই আমার স্ত্রী সে কথা আমায় জানালে। বললে, ওঃ ঠাকুরঝির বরাত ভাল। সত্যি কি বড়লোক ওর মামী-শাশুড়ী। বলে একটু থেমে বললে, জানো ঠাকুরঝির যে মামাতো ননদ এসেছিল সঙ্গে, সে আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা আপনি কি এবার পুজোর সময় শিমুলতলায় গিয়েছিলেন?

বললুম, কেন বলুন ত?

বললে, কেন আবার। আপনাকে দেখেছি তাই। বলে মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। রূপের দেমাকে যেন ফেটে পড়ছে। শ্যামবাজারে ওই যে রূপশ্রী সিনেমা—তাঁদের। তাদের ছোট ছেলের সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছে দু' বছর হল।

দু'দিন পরে অপিস থেকে যেমন ফিরছি ছুটো এলো আমার স্ত্রী। বললে, ওগো সর্বনাশ হয়েছে। বিয়ে ভেঙ্গে গেছে। বাবা আজ দুপুরে এসে ঠাকুরঝিকে নিয়ে চলে গেছেন। বাবার মনে এত আঘাত লেগেছে যে, একটু বসলেন না, এক গ্লাস জল পর্যন্ত খেলেন না। এসেই রেণুকে নিয়ে চলে গেলেন। সে বেচারা কাঁদছিল। চোখের জল মুছে কোন রকমে একটা সাড়ী বদলে তখনি চলে গেল। বাবাকে বলে বললুম, এই দুপুরে না খেয়ে যাবেন, কিছুতে শুনলেন না। শুধু একবার বললেন, দুটোর ট্রেনে আমায় আমতায় ফিরতেই হবে। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন মেয়েকে নিয়ে।

ব্যাপার কি! আত্মীয়স্বজনদের সব নেমন্তন্ন পত্র ছাড়া হয়ে গেছে! জিনিষপত্র সব কেনাকাটা একরকম শেষ। চিন্তায় সব রাত ঘুমুতে পারলুম না। সকালে উঠেই ছুটলুম বাটরায়। ছোটমামার কাছে গিয়ে বলি, ব্যাপার কি?

আর ব্যাপার! তখনি বারণ করেছিলুম তোমার বাবাকে যে এই সব মেয়েদের আগে দেখতে না দেওয়াই ভাল বিয়ের আগে। তোমার বাবা বললেন, পাত্র নাকি ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছিল মামারবাড়ী ওই বড়মামীর কাছে। কাজেই তিনি যখন গহনা আর সাড়ীর নাম করে মেয়েকে দেখতে যাচ্ছেন, তখন বারণ করবো কি করে? তারপর দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বললেন, এখন ঠেলা সামলাও! গরীবের কথা বাসি হলে কাজে লাগে! ওই সব চৌরঙ্গী বড়লোক মফঃস্বলের মেয়েদের চরিত্র আমি তের বেশী চিনি জানি। তোমার বাবার বয়স বেশী হতে পারে কিন্তু তিনি পাড়াগাঁয়ের লোক। আর ছেলেবেলা থেকে আমরা এই শহরে মানুষ! বাটরা থেকে কলকাতা আর কতটুকু তফাৎ! কলকাতাও যা বাটরাও তা একই।

বললুম, মামা, যা-হবার তা হয়েছে—এখন উপায়?

উপায় আর কি। টেলিগ্রাম করে দাও আত্মীয়স্বজনদের কাছে। তাছাড়া জিনিষপত্র যা যা বায়না দিয়েছিলে, যতটা পারো ক্যানসেল করে দাও! বলে একটা সিগারেট
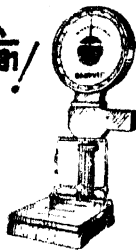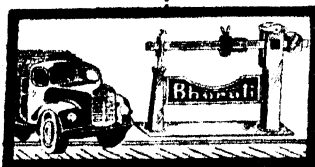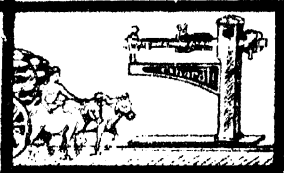
বার করে ধরাতে ধরাতে বললেন, আমি কিন্তু যেমন জিনিষ দিয়েছি বা যাজনা দিয়েছি তা তার যেমন মেয়ের কথা বলতে পারবো না মুখে। জানো ত, আমার সমাজে একটা প্রেসটিজ আছে! তখনি তোমার জেঠামশাই আমায় বলেছিল, ওই পাড়াগাঁয়ের মেয়ে রেণু। এত বড়ঘরে তার সম্বন্ধ করা ঠিক হচ্ছে না। সমঘরে বিয়ে দেওয়া উচিত! এখন দেখছি, তোমার মামী, আমাদের সকলের চেয়ে বেশী বিচক্ষণ।

অপিস কামাই করে দুপুরের গাড়ীতে দেশে গিয়ে হাজির হলুম! বাড়ীতে ঢুকে দেখি সব নিস্তব্ধ। বাবা চুপ করে তাঁর ঘরে বসে তামাক খাচ্ছেন। মা রান্নাঘরে বসে বঁটি পেতে নিঃশব্দে কুটনো কুটছেন। আর রেণুর ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ!

প্রথমেই বাবার ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করলুম, আচ্ছা বাবা, আসল কারণটা কি বললে তারা। মেয়ের রঙ কালো—পছন্দ হলো না?

বাবা আমার কথায় জবাব না দিয়ে হুঁকোটা ঘরের এককোণে নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন সদর দিয়ে।

হতভম্বের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি ফিরে এলুম মার কাছে। তাঁর সামনে মাটির ওপর থেবড়ে বসে পড়ে, নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলুম তাঁর মুখের দিকে। যেন কি এক মহা অপরাধ করেছি আমি, যার ক্ষমা নেই এমনি একটা ভঙ্গী করে তিনি আলুর খোলা বঁটিতে ছাড়াতে লাগলেন একমনে!

এই ভাবে মিনিট কয়েক কাটাবার পর আমি জিজ্ঞেস করলুম, মা তা ওদের বিয়ে ভেঙে দেবার কারণটা কি? কিছু ত একটা নিশ্চয়ই বলেছে?

মাকে তখনো তেমনি নীরব থাকতে দেখে বললুম, কি রকম ছোটলোক বলোত? আর এই কটা দিন বাকী। জিনিষপত্র কেনাকাটা মায় নেমন্তন্ন পত্র ছাড়া সব হয়ে গিয়েছে—এই সময় না বলাটা কি ভদ্রতা?

মা এবার শুধু বললেন, ওঁদের কোন দোষ নেই।

আমি আর রাগ সামলাতে পারলুম না। চেঁচিয়ে উঠলুম, ওঁদের দোষ নেই ত কি আমাদের দোষ? আমরা কি অপরাধ করেছি ওঁদের মত বড়লোকের ঘরে মেয়ে দিতে গিয়ে?

মা আমার একথার কোন জবাব না দিয়ে বঁটিটা কাত করে সেখানে শুইয়ে রেখে তারপর ধীরে ধীরে ভাঁড়ারঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ব্যাপার কি! চুপ করে সেখানে আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে ভাঁড়ারঘরে গিয়ে আমি মার সামনে দাঁড়ালুম! মা এবার তাঁর কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা চাপতে চাপতে প্রশ্ন করলেন, হাঁরে খোকা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, ঠিক জবাব দিবি ত? আমি মা, আমার কাছে মিথ্যে বলবি না? দিব্যি করছিস্?

মায়ের এই প্রশ্নে আমি আরো ঘাবড়ে গেলুম! আমি মিথ্যে বলছি কোনদিন তোমার কাছে, আবার তার জন্যে দিব্যি করতে বলছো! ব্যাপার কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না মা, একেবারে।

মা তখন বললেন, হাঁরে বৌমার স্বভাব-চরিত্র যে ভাল নয় সে সম্বন্ধে তুই কিছু জানিস? কোনদিন তোর চোখে কিছু পড়েছে? তুই ত সমস্তদিন অপিসে থাকিস, আর একলা ফ্ল্যাটে বৌমা থাকে—তুই-ই বা জানবি কি করে?

বলে কি মা! আমার সারাদেহে যেন একটা শিহরণ জাগে! শুকনো জিবটা ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলুম, তুমি কি বলছো মা এসব?

আমি, কিছুই বলিনি বাবা! যারা নিজে চোখে দেখেছে, তারা বলেছে! এ-বিয়ে ভেঙেছে সেই কারণেই।

কি বললে! অসম্ভব! এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না!

হ্যাঁ, শিমুলতলাতে তোরা যখন পুজোর সময় গিয়েছিলি তখন পাত্রের মামাতো বোনও গিয়েছিল, তারা নিজে চোখে দেখেছে, একটা মুসলমান ছোঁড়ার সঙ্গে বৌমাকে সন্ধ্যের পর একলা পাহাড়ে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে। রাস্তায় চলতে চলতে হাসি মস্করা করতে।

এতক্ষণে সবটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল! কিন্তু আমি মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না যে, ওটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমিই লুঙ্গি পরে বেড়াতে যেতুম ওকে নিয়ে। মা বললেন, ওই বলে তুই বৌমার অপরাধ ঢাকবার চেষ্টা করিসনি। স্বামী-স্ত্রী বেড়াতে বেরুলে তাদের দেখে কখনো মেয়েদের চোখ কি ভুল করে। বিশেষকরে বিবাহিত মেয়ে। এই বলে একটু থেমে তিনি আমায় সদুপদেশ দিলেন, এখন থেকে বৌমার ওপর একটু নজর রাখতে। ওসব বালীগঞ্জ অঞ্চল ভাল জায়গা নয়। ওই ফ্ল্যাটবাড়ী ছেড়ে আমি যেন কোন ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে ঘর নিয়ে বাস করি!

বুঝলুম, বাবার সেদিন আমার ওখানে জলগ্রহণ না করার কারণ এবং আমাকে দেখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন কেন অমন করে!

সেইদিনই রাতে ফিরে এলুম কলকাতায়। বাসায় এসে স্ত্রীর কাছে সেকথা বলতে, একেবারে কেঁদেকেটে অস্থির হলো সে! বাবা-মাকে কি করে বোঝাবে সে এখন! আর আত্মীয়-স্বজনদের কাছেই বা কি করে মুখ দেখাবে! এই চিন্তা তার কিছুতেই যায় না। তিন-চারদিন সে শুধু কাঁদলে। আমিও অপিস কামাই করে বাড়ীতে বসে রইলুম। শেষে বড়বাবুকে ধরে কলকাতা থেকে মাদ্রাজের অপিসে বদলী হয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু বাবা-মা আমাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। দেশের বাড়ীতে আর যাবার বা আমাদের ঢোকার মুখ রইলো না।

সবচেয়ে দুঃখ হয় রেণুর জন্যে! সে এমন আঘাত পেলে এই বিয়ে ভেঙে যাওয়াতে যে, চিরকুমারী ব্রত নিয়ে সে দেশের রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে গিয়ে নাম লেখালে এবং সন্ন্যাসিনীর মত নিজের জীবনটা দরিদ্র আতুরের সেবায় উৎসর্গ করলে।

দুখের দিন, সুখের রাত

জমিদারী প্রথা বিলোপের সরকারী যূপকাষ্ঠের বলিদানে খণ্ড-বিখণ্ড সোমনাথদের বৃহৎ পরিবার। বার্ষিক খাজনা আদায় বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে সোমনাথই জানে না। যৌথ সংসার এখন ভেঙে টুকরো টুকরো। যেন একটা গর্বোদ্ধত মাথাউঁচু পাহাড় চিড় খেয়ে ফাট ধরে হঠাৎ ধ্বসে পড়েছে সমতল মাটিতে। মূর্তিমান অহঙ্কার আজ ধুলোয় মিশেছে। দোর্দণ্ডপ্রতাপের দাপট উবে গেছে কর্পূরের মত।

প্রদীপের তেল নিঃশেষ, তাই আর বাতিদানে, ঝাড়-লণ্ঠনে আলো জ্বলে না। ঘরে ঘরে শুধুই অন্ধকার। অবিমিশ্র কালো অন্ধকার। বাবুদের পাকশালের চুলোয় এখন বিড়ালে বাচ্ছা বিয়োয়। কাছারী ঘরে দু'বেলা আর ধুনো পড়ে না। দরজায় দরজায় গঙ্গাজলের ছিটা দেয় না কেউ। আদায়-পত্র নেই, জমার ঘরে যখন শূন্য বৈ কিছুই পড়ে না, তখন আর সাড়ম্বরে কাছারী সাজিয়ে রেখে দিয়ে কোন লাভ নেই। নিজের কুকুর পথ্যি পায় না, পাইক-পেয়াদা কে পুষবে!

বাবুরা আজ ফতুর ফকির। বাবুরা আজ ফাঁপা, ফরসা।

রঙ ঝলমল কাগজের ফানুষ আজ ফেটে চৌচির। দেশী জাতীয় সরকার বাহাদুরের ফুস-মন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেল ব্রিটিশের সৃষ্টি পর-ভৃতিকা সম্প্রদায়, জমিদার বা জমাদার যাই বলুন।

দেখে শুনে নিরাশায় কলকাতার দিকে পাড়ি জমালো সোমনাথ। ভাগ্য-অন্বেষণে চললো জন্ম-ভূমির মায়া কাটিয়ে। অনশনে অর্ধাশনে থেকে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ অপেক্ষা কলকাতা শহরের রাস্তায় চলন্ত গাড়ীর চাকার তলায়—

কুলদেবীর দেউলের দুয়োরে প্রণাম ঠুকে ষ্টেশনের পথ ধরে সোমনাথ।

কাঁচা রাস্তা, আঁকা-বাঁকা। সর্পিল আকারে এগিয়ে গেছে ষ্টেশন বরাবর। রাস্তার দুই পাশে ছাড়া ছাড়া বসতি। মাটির ঘর, ইঁটের ইমারত্। ফাঁকে ফাঁকে আগাছার জঙ্গল।

পাছে কারও নজরে পড়ে, সোমনাথ তাই ভরা-দুপুরে যাত্রা ক'রেছে। যখন ঘরে ঘরে স্তব্ধতা থমকে থাকে। গৃহস্থ ভাতঘুমে ডুবে থাকে।

কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই যদি নিদ্রায় অচেতন থাকে, সৃষ্টি রক্ষা হয় না।

নীলাম্বর স্যাকরা উদয়াস্ত দোকানে কাজ করে। সেজের আলোর সামনে, চোখে চশমা এঁটে ঠুক ঠুক হাতুড়ী ঠুকে চলে সোনার বুকে। উকা ঘষে আর হাঁপর চালায়। কাজের মধ্যে থেকেও নীলাম্বর লক্ষ্য রাখে রাস্তায়। দেখে, কে যায়, কে আসে। চেনা না অচেনা। নীলাম্বরের ছেলেটি দোকানের দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে ব'সে থাকে। নেহাৎ শিশু বছর পাঁচেকের। ছেলেটির আশে-পাশে দেখতে পাওয়া যায় লাল-মলাটের বর্ণ-পরিচয়; ধারাপাত, কালো শ্লেট, সাদা চক্‌খড়ি।

—কোথায় চললেন বাবুমশাই?

দোকানের ভেতর থেকে নীলাম্বর শুধোয় তার পরিচিত কণ্ঠে।

সোমনাথ ভেবেছিল, কেউ দেখতে পাবে না তাকে। কথা শুনে যেন চমকে ওঠে সোমনাথ। শুকনো গলায় কথা বলে। বললে,—পশ্চিমের দিকে যাবো স্থির ক'রেছি। হাওয়া বদল করতে যাবো মাস খানেকের জন্যে।

উত্তরে যাবে, কিন্তু দক্ষিণের নাম ব'লতে শিখে ফেলেছে সোমনাথ। অবস্থার বিপাকে কেমন স্বভাবের পরিবর্তন হয়, ভাবতেও হাসি পায় সোমনাথের।

—হাতের বাক্স-প্যাটরা দেখেই অনুমানে ঠাউরেছি। কিন্তু বাবুমশাই সেই যে একটা আংটি রেখে টাকা নিয়ে গেলেন, তারপর আর পাত্তা নেই কেন? না পেলাম সুদ, না পেলাম

প্রাণতোষ ঘটক

আসল। জিনিষটাও ফেরৎ নিলেন না. এ কেমন কথা।

শরীরগতিক ভাল ছিল না নীলাম্বর। ফিরে আসি। সুদে আসলে পেয়ে যাবে। কথা বলতে বলতে হাতে-ধরা এ্যাটাচির দিকে চোখ পড়ে ই কেমন যেন লজ্জা পায় সোমনাথ। নিজের রূপা সে আজ নিজেই কি না বহন করছে।

আগে শরীর, তারপর অন্য কিছু। জান থাকে তবেই মান থাকে। বিদেশে থেকে ভাল খেয়ে সারিয়ে আসুন শরীরটা। যন্ত্র খারাপ হলে মেরামত করতে হবে, জানা কথা এটা। জামা ফুটলে তালি মারতে হবে বৈ কি।

নীলাম্বরের মুখে উপদেশ শুনতে শুনতে শরীর জ্বলতে থাকে সোমনাথের। বললে,—তবে কাচ ভাঙলে কি আর জোড়া লাগে নীলাম্বর? তোমার ধারণা ঠিক নয়।

—কাঁচ জোড়া লাগে কি লাগে না জানি না বাবুমশাই। সোনা জোড়া লাগে। সোনা যদি খাঁটি হয় আমরাই জুড়ে দিতে পারি। আসল সোনা হওয়া চাই। একেবারে যাকে বলে নিখাদ। ভেজালের মাল চলবে না।

কথা এড়িয়ে অন্য কথা পাড়ে সোমনাথ। বলে,—নীলাম্বর, দাও দেখি শ' দুয়েক টাকা। রেখে দাও এই হীরের বোতামের সেটটা। এও তোমার একেবারে যাকে বলে খাঁটি হীরে। বেদাগ পলকা হীরে। কর্তাদাদু প্যারিস থেকে আনিয়েছিলেন। আমি ভাগে পেয়েছি।

—আবার টাকা চাই! দেখি কেমন প্যারিসের হীরে!

কথার শেষে হাত পাতলো নীলাম্বর। মুখের ভঙ্গীতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

—আজকের দিনে এই সেটটার দাম অন্ততঃপক্ষে হাজার দেড়েক টাকা। যাচাই করিয়ে নাও নীলাম্বর, আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়।

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় বাবুমশাই। নগদ টাকার বাজার ভীষণ মন্দা চলেছে।

ঘন খয়েরী রঙের ভেলভেটের বাক্সটা খুলে হীরের বোতাম দেখতে দেখতে বলে নীলাম্বর। ওর চোখে যেন অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগানো আছে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে দেখছে, হীরার ঔজ্জ্বল্য।

—কাছে আছে হাজার খানেক টাকা। বিদেশ বিভূঁয়ে যাচ্ছি, যদি এক আধশো বেশী থাকে, বুকে বল পাওয়া যায়। দিন কতক থাকতে পারি নিশ্চিন্ততায়।

নীলাম্বরের বিরক্ত মুখে কথা নেই। সে দেখছে তো দেখছেই। ভেলভেটের চারকোণা বাক্স থেকে বোতাম কটা বের ক'রে সেজের আলোর সামনে তুলে ধরে। চোখে যেন দুরবীক্ষণ যন্ত্র। দেখছে দূর আকাশের অধরা গ্রহ-নক্ষত্র।

ধৈর্য হারিয়ে যায় সোমনাথের। বেশ একটু জোরালো সুরে কথা বলে সে। বলে,—ট্রেনের সময় এগিয়ে আসছে নীলাম্বর। যদি না দাও জানিয়ে দিলেই পারো। ষ্টেশনের কাছেই গয়নার দোকান আছে একটা। মধু স্বর্ণকারের দোকান সেটা সুদটা একটু বেশী নেয় মধু, তা হোক। দাও তবে ফিরিয়ে দাও—

হেসে ফেললো নীলাম্বর। নাকের চশমা কপালে তুলে দেয় হাসতে হাসতে। বলে,—বাবুমশাইয়ের রাগের মাত্রাটা দেখছি ঠিক জমিদারদের মতই রয়ে গেছে। এতটুকুও বদলায়নি।

সোমনাথ ছিনিয়ে নিতে উদ্যোগী হয় একবার। বলে,—টাকা তুমি দেবে জিনিষ রেখে। ভিক্ষে দেওয়ার ভাব দেখিও না। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

—ভাত না স্রেফ কাঁকর দেখে নিতে হবে বাবুমশাই। হীরে না পোখরাজ—

নীলাম্বরের কথা শেষ হ'তে না হ'তে কথা ধরে সোমনাথ। বললে,—সোনা দানা চিনতে পারো তুমি, হীরের ভ্যালু তুমি জানবে কোথা থেকে! স্যাকরা আর জহুরীতে বহুৎ তফাৎ।

—শ' দেড়েক টাকা দিতে পারি, তার বেশী নয়। রাজী থাকেনতো বলুন।

—দেড় শো!

ঘরের কড়িকাঠে চোখ তোলে সোমনাথ। আলকাতরা মাখানো কাঠের বরগাগুলো গুণতে থাকে যেন মনে মনে। খানিক নিশ্চুপ থেকে বলে, —বড্ড কম হচ্ছে নীলাম্বর। আর পঁচিশটা টাকা দিলে ভাল হয়। কাজে লাগে।

—পঁচিশ কেন বলছেন, বলুন যত দেবে তত নেবো। পঁচিশ শো দিলেও ক'দিন লাগবে আপনার টাকাটা ফুঁকে দিতে, জানতে আমার বাকী নেই।

কথার শেষে ব্যঙ্গের হাসি ফোটে নীলাম্বরের মুখে। সে যেন গ্রহাচার্য, জ্যোতিষী! দুনিয়ার সকল কিছুই জানা আছে তার। নখদর্পণে দেখতে পায় অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ।

ক্রোধের আতিশয্যে কি একটা কথা বলতে বলতে থেমে যায় সোমনাথ। রাগ দমন করে সে। গুম মেরে থাকে কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলে,—আমরা ফুঁকে না দিলে তোমরা কোথায় থাকতে নীলাম্বর? জবাব দাও।

—আচ্ছা আর পঁচিশ নিয়ে যান। যতই হোক, ব্রাহ্মণ মানুষ আপনি। বড়মুখে চাইছেন পঁচিশটা টাকা। কথা বলতে বলতে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলাম্বর। কপালে তোলা চশমা চোখে নামিয়ে বলে,—টাকা যে কত ফেরৎ পাবো তাও আমার জানা আছে। ঐ যে আমার ছেলেটাকে দেখছেন দাওয়ায় বসে আছে। সেও পাবে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

সোমনাথ টাকার নোটগুলি পকেটে রাখে আর বলে,—বিদেশ থেকে ফিরে আসি নীলাম্বর। সুদে-আসলে মিটিয়ে দেবো। মা-কালীর দিব্যি। দেখে নিও।

—মা কালীকে আর টানবেন না বাবুমশাই। দোহাই। তাঁর কোন দোষ নেই।

আকাশের মধ্যস্থানে দুপুরের কড়া সূর্য থমকে আছে। খররোদে তীব্র দাহিকা। তপ্ত বাতাস। দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে সোমনাথ। রাগের গুমরানি হয় বুকে। বিড় বিড় বকছে। হয়তো ট্রেনের সময় এগিয়ে আসছে। হন-হনিয়ে এগিয়ে চলে ষ্টেশনের দিকের আঁকা-বাঁকা কাঁচা পথে।

একটা স্বপ্ন যেন এসে গ্রাস করে ধীরে ধীরে। স্বপ্ন না কল্পনা কে জানে।

সোমনাথের চোখের সমুখে ভেসে ওঠে শহর কলকাতা। ব্যস্ত চঞ্চল, সদা জাগ্রত মহানগরী—কলকাতা। কে যেন বলেছে কার মুখে শুনেছে সোমনাথ, কলকাতার শহরে টাকা না-কি উড়ছে সদাক্ষণ। তাক বুঝে হাত বাড়িয়ে ধরতে পারলেই রাশি রাশি টাকা হাতে এসে যায়। ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলেই পাওয়া যাবে। সোমনাথের চলার গতি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কলকাতার আকর্ষণে। সে যেন স্বপনপারের ডাক শুনেছে। পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে নতুনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। বিচ্ছেদের বিষণ্ণদিনে গৃহছাড়া সোমনাথ স্বপ্ন দেখছে, উপার্জিত টাকায় সে কলকাতার বুকে আকাশ-চাঙা ইমারত তুলেছে। তার মনগড়া প্রাসাদের গ্যারেজে মোটরগাড়ী, ঘরে টেলিফোন, রেডিও, টেপ্-রেকর্ডার, রেফ্রিজারেটর। আর দশটা ধনী লোকের তালিকায় স্থান পেয়েছে সোমনাথ।

—সোমনাথদা!

চেনা চেনা সুরে ডাক শুনলো চলমান পথিক। ইদিক সিদিক দেখলো চোখ ফিরিয়ে। আচম্বিতে নিজের নামটা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লো।

কাঁচা সড়কের দু'পাশে তৃণের সারি মাথা তুলেছে। কচু গাছের বড় বড় পাতা গজিয়েছে। জল বিছুটির ঝোপের তলায় ব্যাঙ ডাকছে থেমে থেমে। গিরগিটি আর বহুরূপী অনড় অচল গাছের শাখায়। তারা যেন চিত্রার্পিত। মাটির তৈরী।

—কোথায় চললে এমন ভরা দুপুরে?

ঘন সন্নিবিষ্ট বাঁশঝাড়ের পাশ থেকে কে যেন কথা বলছে কোমল কন্ঠে। কেউ যেন না শুনতে পায় তাই যেন মিহি সুরে ফিস্-ফিস কথা।

এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে সোমনাথ। দেখে খুশী না অখুশী হয়েছে, ধরা যায় না ঠিক। বললে,—কলকাতায় যাবো স্থির ক'রেছি। আর থাকবো না এ পোড়া গাঁয়ে। জমিদারী এখন হাতছাড়া, আয় বন্ধ। উপায় চাই বাঁচতে হ'লে। ভাত-কাপড়ের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত—

মাধুরী-মাখা হাসি দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় মুখ থেকে। হরিণীর চাঞ্চল্য থেমে যায় কথার মধ্যপথে। যুবতীর ডাগর চোখে পলক পড়ে না। আঁখিপ্রান্ত ছলছলিয়ে ওঠে। মৌন-মুখে দুঃখের মলিন ছায়া পড়ে।

সোমনাথ আবার বলতে থাকে,—এখানে থাকলে তিলেতিলে মরতে হবে উপোষে অনাহারে। তুমি তাই চাও ইন্দিরা?

এপাশে ওপাশে মাথা দোলায় মেয়ে। কালোকো ফুলের মত রুক্ষ চুলের কুন্তল নাচানাচি করে কপালের 'পরে। একটা উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে সশব্দে। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলে,—না। তা চাই না। আমি চাই তুমি সুখী হও।

ইতি-উতি দেখতে দেখতে চাপা গলায় সোমনাথ বললে, ভেবেছিলাম চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবো। তুমি জানতে পারবে না। ভগবান বাদ সাধলেন। যাবার বেলায় দেখা হবে ভাবতে পারিনি ইন্দু।

ইন্দিরার পদ্মবহুল চোখে প্রিয়ার ব্যাকুল চাহনি। পরম ব্যথায় বুকে তার কাঁপন লেগেছে। ফিস ফিস কথা বলে সে। বললে, ঘুমিয়ে ছিলাম আমি, হঠাৎ বুকের মধ্যে শুনলাম যেন কার পায়ের শব্দ। তাই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছি। চরণ দর্শনের আশায়।

—আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমি নিরুপায়। যেতে আমাকে হবেই। খেয়ে প'রে বাঁচতে হ'লে—

কথার মধ্যপথে কথা থেমে যায় সোমনাথের। একটা ঝামা ইটের টুকরো জুতোর তলায় পিশতে থাকে কথা বলতে বলতে।

বললে,—এখানে কে খাওয়াবে আমাকে? কার দায় পড়েছে?

—আমি।

নিজের উঁচুনীচু বুকে হাত রাখলো ইন্দিরা। বললে,—আমি তোমাকে খাওয়াবো। রান্না করবো, ঘর-দোর সাফ করবো, কাপড়-জামা কেচে দেবো। তুমি যা বলবে শুনবো আমি। ফাই-ফরমাশ খাটবো।

হেসে ফেললো সোমনাথ। হতাশার নিষ্প্রাণ হাসি। বললে—খাদ্যবস্তু নেই, রাঁধবে কি? কাপড় জামা না থাকলে কি কাচাকাচি করবে? কে জোগাবে আমাকে মুখের অন্ন? পরনের বাস?

—আমি।

আবার নিজের বুকে হাত রাখলো ইন্দিরা। তার বুকে চড়াই উৎরাই। আরামের নরম আধার। ইন্দিরা কথা বলে একটু যেন জোরালো সুরে। স্থান-কাল পাত্র ভুলে যায় যেন। বলে,—আমি ফসল ফলাবো জমিতে। শাক-শব্জীর চাষ করবো নিজের হাতে। চরকায় সুতো কাটবো। তুমি বীজ আর চারা এনে দেবে। হাট থেকে তুলো কিনে দেবে।

পয়সা পাবো কোথায়? যে সওদা করবো হাটে? টাকা পয়সা চাই।

—তুমি কাজ করবে। টাকা রোজগার করবে।

—কাজ! আবার হেসে উঠে সোমনাথ, হাসতে হাসতে বলে,—বেকার কাজ পাবে কোথায়? আমরা এতকাল চাকরী দিয়েছি লোককে। আমাকে আবার চাকরী দেবে! কাজের জন্যে ঘুরে ঘুরে শেষে না আত্মহত্যা করতে হয়। বিষ খেয়ে সুইসাইড।

—তুমি কাজ পাবে। আমি তার ভার নেবো। পঞ্চায়েতের মাথাদের বলবো আমি। মন্ডলের প্রেসিডেন্টকে ধরবো। ভাবনা আমার, তোমার নয়।

ছলছল চোখে কথা বলছে ইন্দিরা। করুণ করুণ সুরে। আসন্ন বিয়োগ ব্যথায় জর্জরিতা সে যেন।

—তা হয় না ইন্দু। তুমি কেন মান খোয়াবে লোকের কাছে? সোমনাথ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বলে।

—মান!

আবার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্দিরা। বেদনার্ত হাসি ফোটে মুখে। বলে,—মেয়েদের আবার মান! মেয়েদের আবার হায়া! তোমার জন্যে আমি মান খোয়াতে প্রস্তুত। আমার মান আমার কাছে।

বাম হাত এগিয়ে ধরে কব্জিতে হাত-ঘড়ি দেখলো সোমনাথ। দেখে যেন চমকে উঠলো। বললে,—চারটে দশের ট্রেণটা মিস করলাম। যাঃ!

—ভয় নেই, আধ ঘন্টা অন্তর ট্রেণ আছে কলকাতার। ইলেকট্রিক ট্রেণ এখন।

—আবার সেই পাঁচটা পনেরোয় একটা ট্রেণ আছে। ধরতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে, পলকহীন চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে ইন্দিরা বলে,—শুনবে না আমার কথা? আমাকে তুমি অবহেলায়—

ঈষৎ হেসে সোমনাথ বললে,—তুমি যা বলছো প্র্যাকটিক্যালি তা একেবারেই অসম্ভব। এ-সব তোমার অবাস্তব কথা। কাজে লাগবে না। শেষ পর্যন্ত কি বানের জলে ভেসে যাবো! অতলে তলিয়ে যাবো! আয়ের ব্যবস্থা করতেই হবে আমাকে।। বাঁচতে হবে মানুষের মত।

দুই বিন্দু জল চোখ থেকে নেমে গন্ড বেয়ে বুকে ঠিকরে পড়লো। চোখে আঁচল চাপলো ইন্দিরা। বললে,—ঠিক আছে, তোমার কথাই থাকলো। তুমি যাও যেখানে মন চায়। আমার পথ আমি বেছে নেবো।

আমতা আমতা করে সোমনাথ। বলে,—তুমি? তুমি কি করবে? কি করতে চাও?

জলভরা চোখের তির্য্যক দৃষ্টি হেনে ইন্দিরা বললে,—কি আর করতে পারে মেয়েরা! গলায় শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়বো। নয়তো গলায় কলসী বেঁধে ডুব দেবো দীঘির জলে।

শিউরে শিউরে উঠলো সোমনাথ। মাথায় যেন সাপের ছোবল পড়লো। বললে,—না ইন্দু, তুমিতো অবুঝ নয়। তুমি কত বুদ্ধিমতী!

ম্লানমুখে কাতর হাসি দেখা দেয়। ইন্দিরা ক্ষোভের সুরে বলে,—অতি বুদ্ধির গলায় দড়ি পড়ে, জানো না? তাই যদি না হবে আমি ঠকবো কেন এমন! সব দিয়ে পেলাম না কিছুই।

সূর্যের রূপালী নির্ঝর মাঠে ঘাটে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে অবিরাম। গলিত রূপার মত রোদ্দুরে চোখের দৃষ্টি যেন ব্যাহত হয়। বাতাসে আগুনের ঝলক খেলছে। তৃষাতুর কাক ডাকছে ঘনপত্র দেবদারুর শাখায়।

—আগে দাঁড়াই নিজের পায়ে। তারপর—

সোমনাথের কথা থামিয়ে ইন্দিরা কাঁপা কাঁপা সুরে বলে,—ঠিক আছে, তুমি যাও। আমিও আর অপেক্ষা করতে পারবো না। ঢের হয়েছে। তোমার নামটা লিখে রেখে যাবো। মৃত্যুর জন্য তোমাকে দায়ী করবো।

পরম কামনাকে হারাতে বসেছে ইন্দিরা। বাসনা-বাঁধনে বাঁধতে পারলো না সে।

তপ্ত বাতাসের চঞ্চলতায় ইন্দিরার এলোমেলো আঁচল উড়তে থাকে। আর্তের কান্না দেখেও দয়া হয় না যার মিথ্যা আবেদন নিবেদন তাকে জানিয়ে কি হবে। আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না ইন্দিরা। যে দুয়োর খুলে বেরিয়ে এসেছিল সেই দুয়োর পানে ফিরে চললো নীরব চরণে।

মাঝ-আকাশ থেকে সূর্য কখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, কথায় কথায় দেখতে পায় না সোমনাথ। পা চালালো সে। ষ্টেশনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো হন-হন। এখনও অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে তাকে। ষ্টেশন দূরে অনেক।

হাওয়া চলছে আগুনের। কোথায় যেন আগুন লেগেছে সর্বগ্রাসী। নিদাঘ দিনে পথ চলা কত যে কষ্টকর, আজ এই প্রথম টের পায় সোমনাথ। রেহাই নেই, যেতেই হবে

সোমনাথকে। চলতে চলতে রাস্তার দুই পাশে দেখতে পায় গাছের পাতায় হাতছানি। তরুর শাখায় শ্যামল পাতা দুলছে বাতাসে। যেন পিছু ডাকছে সোমনাথকে।

চলতে শুরু করলেই আবার সেই স্বপ্ন এসে চোখে ভাসতে থাকে। এক স্বপ্নলোকে সোমনাথের মন যেন আচ্ছন্ন হ'তে থাকে ধীরে ধীরে। সোমনাথ দেখতে পায়, কলকাতার শহরের সৌখীন অঞ্চলে হাল-ফ্যাসনের বাড়ীর মালিক সে নিজে। দেখতে পায় ফটকের সম্মুখে তারই মোটরগাড়ী অপেক্ষারত। নতুন চকচকে গাড়ী চাঁছাছোলা। সোমনাথ দেখলো, সে যেন জনৈকা সঙ্গিনীর হাত ধ'রে গাড়ীতে উঠলো। তারপর সেই গাড়ী ছুটলো কোন্ এক হোটেল অভিমুখে।

—কলকাতার টিকিট দেবেন একখানা। কত লাগবে?

ষ্টেশনের কাউন্টারে এই উক্তি হামেশাই শুনতে হয়। ষ্টেশন মাষ্টার চেনেন স্থানীয় ট্রেণ-যাত্রীদের। গলা শুনেই চিনতে পারেন, মুখ দেখতে হয় না।

—জমিদারবাবুদের বাড়ীর কেউ? ঠিক ঠাওরাতে পারছি না। একটা চোখের ছানি কাটিয়েছি ক'দিন আগে। ভুল হ'লে ক্ষমা করবেন।

—আপনি ঠিকই ব'লেছেন। অনুমান মিথ্যা নয়। আমি সেজ তরফের—

—আর বলতে হবে না। আপনি তো বাবার একটি মাত্র?

—সবই জানেন দেখছি। আমার নাম সোমনাথ—

—জানি বাবুমশাই, জানি। আজ সাতাশ বছর আছি এই রাজগড় ইষ্টিশনে। রিটায়ার করতে চাইলাম, রেল কোম্পানী আরও ৫ বছর এক্সটেনশন দিয়ে দিলে। এত ইষ্টিশন আছে ভূ-ভারতে, কিন্তু রাজগড়ের সুনাম জানবেন আজও আনপ্যারালাল। ইউনিক! কখনও টাকা পয়সার হিসাবে ভুল হ'ল না।

সোমনাথ বললে,—প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা কম, তাই ঝামেলা হয় না।

—তেমন কিছু কম নয় বাবুমশাই। এই কারেন্ট মাসেই খান-চার পাঁচ কলকাতার মান্থলি টিকিট নতুন ইস্যু হয়েছে। আপনার ট্রেণ এসে পড়বে এখুনি। সিগন্যাল ডাউন দেখতে পেয়েছেন।

সিগন্যাল ডাউন! টিকিট আর ফেরৎ খুচরো পয়সা ছোঁ মেরে তুলে নেয় সোমনাথ। প্লাটফর্মের দিকে ছুটতে থাকে। নজরে পড়ে অদূরে সিগন্যালে আলো জ্বলছে বোতল-সবুজ রঙে। ঝুলে পড়েছে যান্ত্রিক বাহু।

পশ্চিম দিগন্তে সূর্য কখন ঢলেছে জানতে পারে না সোমনাথ। দিনান্তের শেষ আলোতে অনাগতা সন্ধ্যার কালো ছায়া। মেঘ-নীল আকাশে জোড়া জোড়া বাদুড় পাড়ি জমিয়েছে বেলা শেষে। উদয়াস্ত উপোসী থেকে আহারের সন্ধানে চলেছে।

সোমনাথের কানের কাছে গুঞ্জন শুরু হয়। মশা ভোঁ ভোঁ করে। কে যেন কথা বলছে কানে কানে। সোমনাথ স্পষ্ট শুনতে পায় যেন। শুনলো,—ঠিক আছে। তুমি যাও। আমিও আর অপেক্ষা করতে পারবো না। ঢের হয়েছে। তোমার নামটা লিখে রেখে যাবো। মৃত্যুর জন্য তোমাকে দায়ী করবো।

শিউরে শিউরে উঠলো সোমনাথ। তার বুকে দুরু-দুরু শুরু হয়। ভীতির চিহ্ন মুখে। ইন্দিরার কথা যদি সত্যি হয়! মেয়েরা আবার যা বলে তা করে। মেয়েরা মিথ্যা বলতে পারে না মনগড়া। সোমনাথ যেন দেখতে পায়, আকাশ থেকে ঝুলছে ইন্দিরা। ফাঁসির বাঁধনে কণ্ঠ তার সংলগ্ন। দেহ নিঃসাড় নিস্পন্দ।

ট্রেণের সান্টিং শুনে চমকে ওঠে সোমনাথ। ইলেকট্রিক ট্রেণ, কখন আসে কখন চ'লে যায় নিঃশব্দে, জানতে পারলো না সোমনাথ! হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করে, রাজগড় ষ্টেশনে সে একা। চেকারবাবুও গেটে নেই! কি এক খেয়ালে ফিরে চ'লেছে সোমনাথ। আবার ট্রেণ মিস্ করেছে।

ষ্টেশন থেকে কাঁচা রাস্তায় নেমে ফিরে চললো সোমনাথ। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকার, দিকে দিকে আসমানী আঁচল ছড়িয়েছে। রহস্যের জাল যেন।

এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে স্পর্শ বুলায় সোমনাথের ঘর্মাক্ত কপালে। তার যে কি কর্তব্য সে স্থির করতে পারছে না। নিজের মন আর মতি আয়ত্তে রাখতে পারে না। ভয় আর আতঙ্কে বিভীষিকা দেখছে যেন। ইন্দিরা তবে কি তাকে আদালতের কাঠগড়ায় তুলতে চায়! মেয়েরা না কি শান্ত সরল ধৈর্যশীলা। মিথ্যার ঘোরপ্যাঁচ জানে না। বোঝে না ঠকবাজী, জুয়াচুরি।

সাঁঝের অন্ধকারে দিগ্বিদিক অদৃশ্য হ'তে থাকে। গাছের শাখায় পাতায় আঁধার যেন জমাট বেঁধেছে। শঙ্খধ্বনি বেজে চলেছে কোন্ দেউলে। সোমনাথের চোখে পড়ে তুলসীতলায় প্রণামরত এক কুলবধূ। আকপাল গুণ্ঠনে মুখ-খানি দেখা যায় না।

বাতাসে ধোঁয়াটে গন্ধ ভাসছে যেন। ঘরে ঘরে উনানে আঁচ পড়েছে। ধোঁয়ার সাপ-রেখা ঊর্ধ্বমুখে উড়ছে পাক খেতে খেতে। বাঁশবনে শিয়ালের জটলা চলছে। ঝিঁঝি ডাকছে ঝোপে-ঝাড়ে।

—ইন্দিরা!

আর পারলো না সোমনাথ। ডাক দিলো দূর থেকে দেখতে পেয়ে। সাঁঝের বেলার আলো আঁধারে অস্পষ্ট চোখে পড়তেই ডাকলো স্বর উঁচিয়ে। তবে কি মেয়েটির প্রেতমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দুয়োর আগলে।

হাতের তর্জনী অধরে তোলে ইন্দিরা। কথা বলতে মানা করে সহাস ইসারায়। লোকলজ্জার ভয়ে থামিয়ে দিলো সোমনাথকে। যেন তার আকুল প্রতীক্ষা সার্থক হয়। ইন্দিরার চোখে জল, মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি ঝিলিক তোলে।

সোমনাথ ফিস ফিস করে বললে,—চল' আমার ঘরে চল,। তোমাকে ছেড়ে—

মনের কামনা পূর্ণ হওয়ার আনন্দে দুই বাহু মেলে ধরলো ইন্দিরা। চকিতের মধ্যে বুঝতে পারে, সেই বন্দিনী এক জোয়ানের বুকে। বাঁধন শিথিল হোক চায় না ইন্দিরা। মুক্তি চায় না সে। চুপি চুপি কথা বলে সোমনাথের কানে। বলে,—একটু বসো। আমি যাবো আর আসবো। তোমার পছন্দের সেই লাল শাড়ীখানা প'রে আসি। তুমি যেও না। লক্ষ্মীটি—

জোনাকি জ্বলছে দপ দপ। বনাঞ্চলে আলোর নাচন। আকাশের তারা না জোনাকি কে জানে! সোমনাথ মিনিট গুনতে থাকে অস্থির আগ্রহে।

হঠাৎ চোখে পড়লো, আকাশের এক কিনারায় চতুর্দশীর ভরাট চাঁদ। সোনালী বর্ণচ্ছটায় যেন মিলনসুখের খুশী খুশী হাসি।

———

ভ্রম-বিহার বিশ্ববন্ধু বসাক

বিদীর্ণ তমসা

মায়া বসু

"কোনদিনও না? একেবারেই না?"

প্রতাপের সংশয় সন্দেহ বেদনার্ত প্রশ্নের উত্তরে আই-স্পেশালিস্ট ডাক্তার দত্তের গলায় দৃঢ়তার ব্যঞ্জনার সঙ্গে গভীর আত্মপ্রত্যয় যুক্ত হল। 'কোনদিনও নয়। দুটো চোখই একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বয়স হয়ে গেছে। এসব ক্ষেত্রে অপারেশন করেও আমরা সব সময় কোন উপকারই পাই না। ওকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবার অর্ডার আমি দিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে হলে আপনি আজই ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারেন।'

ট্যাকসি থামতেই মণি ছুটে এলো, 'এতো দিন পরে এলে কেন বুড়ো? যাও আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব না। বুড়ো তুমি ভারী দুষ্টু।'

বুড়োকে ট্যাকসি থেকে নামিয়ে প্রতাপ ভাড়া দিচ্ছিল ট্যাকসিওয়ালাকে, মেয়েকে ধমক দিয়ে উঠল, 'দেখতে পাচ্ছ না বুড়োর চোখের অসুখ এখনো সারেনি? যাও ওর হাত ধরে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাও।'

অপ্রস্তুত মণি বুড়োর হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এতদিন হাসপাতালে রইলে, তবু কেন তোমার চোখ ভাল হল না বুড়ো? তুমি বর্ধমানে ছিলে না, তোমার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করছিল। কতদিন গল্প শুনিনি। রেলগাড়ি দেখিনি। কুসমীর পুলে যাইনি। কে আমাকে নিয়ে যাবে বল?'

একটি ম্লান বিশীর্ণ হাসি রেখায়িত হল বুড়োর বার্ধক্য জরাগ্রস্ত বলীরেখাঙ্কিত মুখের উপর। 'এবার থেকে আবার আমরা দুজনে বেড়াতে যাব মণিদিদি। এবার থেকে কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। এতদিন আমি তোমার হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে গেছি, এবার থেকে তুমি আমার হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কেমন?'

'সে বেশ হবে। ভারী মজা হবে। ওকি বুড়ো? হোঁচট খাচ্ছ কেন বার বার? তুমি কি কানা নাকি? দেখে শুনে চলতে পার না?'

* * *

সম্পর্ক বলতে কিছুই নেই। মনেও পড়ে না কবে থেকে এ সংসারে এসে ঢুকেছে। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, একটি একটি করে সব কাজগুলো নিঃশব্দে ওর ঘাড়ে চেপে বসেছে। রুগীর সেবা, অফিসের ভাত দেয়া, আঁতুড়ে পোয়াতিকে দেখাশোনা করা, এমন কি মেয়েটাকেও কোলেপিঠে করে এত বড়টা সেই তো করেছে। প্রায় সমস্ত জীবনটাই তো কেটে গেল। আজ ঘাটের পথে পা বাড়াবার চরম মুহূর্তে ভগবান বুড়োর মাথায় এ কী সর্বনাশা সর্বগ্রাসা অন্ধকার অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দিলেন?

তবু—তবু যদি সেই নিদারুণ অভিশাপটা শুধু বুড়োর চোখ দুটোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো!

সে অন্ধকার কালো মেঘ হয়ে আসন্ন ঝড়ের সংকেত নিয়ে ক্রমশ ঘনীভূত হতে লাগল এই অতি দরিদ্র সংসারটার ছেঁড়া ফুটো আকাশে। একটার পর একটা দিন কাটতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ক্ষোভে বিরক্তিতে অসন্তোষে প্রতি মুহূর্তে প্রণতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে চাইল। আর প্রণতির চোখে, গলার ঝাঁঝে সেই জটিল সংঘর্ষের সম্ভাবনায় নিরীহ ভীত সন্ত্রস্ত প্রতাপ, যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগল স্ত্রীকে! কিন্তু সেটাও কি সম্ভব? সমস্ত দিন যদিবা বাইরে বাইরে অফিসের কাজে কাটানো যায়, রাত্রে তো শুয়ে পড়তেই হয় ঐ একখানা শোবার ঘরের মধ্যেই!

'কী ভেবেছ তুমি? ঐ কানা বুড়োটার একটা গতি করবে, নাকি মাসের পর মাস এমনি করে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে? এই তো অবস্থা সংসারের। দুবেলা থালা থালা ভাত কী করে জোটাব, বলতে পার? খাওয়া ছাড়া কুটো নেড়ে দুখানা করার মত ক্ষমতাও যখন নেই—'

'—তখন ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াই উচিত ওই এতদিনের পুরোনো অন্ধ মানুষটাকে! চমৎকার!' প্রতাপ আর সহ্য করতে পারল না। শুয়েছিল। বিছানার উপর উঠে বসল। 'প্রত্যেক দিন এক কথা শোনাও কেন? আজ কটা মাসই না হয় চোখ দুটো গেছে, অক্ষম অকেজো হয়ে পড়েছে। কিন্তু আগেকার কথা

গুলো কি এমন করেই ভুলে যেতে হয় প্রণতি? আমার সেই টাইফয়েড হবার সময়, মণির ডিপথেরিয়া হবার পর? খোকন হবার সময় তো মরেই গিয়েছিলে, ছ মাস বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারনি—সে সব কথা ভুলে গিয়ে আজ ওর এই অসময়ে দূর করে দিতে চাও বাড়ি থেকে? ছিঃ। তুমি কী প্রণতি!'

'দূর করে দেবার কথা বলিনি।' স্বামীর কঠিন ভৎর্সনা অনায়াসেই অগ্রাহ্য করল প্রণতি। 'দেশে পাঠিয়ে দাও। মাসে মাসে কিছু টাকা না হয়—'

'দেশে পাঠাব ওকে এই অবস্থায়? কে আছে ওর সেখানে? কে দেখবে ওকে? আচ্ছা প্রণতি, মেয়েমানুষেরা এত অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীন হয় কি করে বলতে পারো? আজ যদি বুড়োর বদলে আমার চোখ দুটোই যেত, তাহলে আমাকেও বোধ হয় বাড়ি থেকে দূর করে দিতে, না?'

দাঁতে দাঁত চেপে এত বড় অপমান, আঘাতটাও সহ্য করল প্রণতি। 'বোধহয় দিতাম। কিন্তু তোমার বদলে আমার চোখ দুটো গেলে তুমি কি করতে জানো? যেখানে হোক আমাকে বিদেয় করে সেইদিনই দু চোখের জায়গায় চার চোখওলা আর একটা মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনতে। পুরুষ যা পারে, সব সময় মেয়েরাও তা পারে না।'

কান্না সামলাতে সামলাতে প্রণতি হাতের কাজ ফেলে রেখেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

আলোটা নিবিয়ে দু হাতে মাথাটা টিপে আবার শুয়ে পড়ল প্রতাপ। ঢং ঢং করে দূরে এগারোটা বাজার শব্দ হল। রাত অনেক হয়েছে তাহলে!

'বাবা! একটা কথা বলব বাবা?'

ভয়ঙ্কর ভাবে চমকে উঠল প্রতাপ। মণিটা জেগে আছে? সব শুনেছে? মাত্র ছ বছর বয়সের শিশু একি রূঢ় বাস্তবের কঠিন নগ্নমূর্তিটা প্রত্যক্ষ করছে দিনের পর দিন?

'একি মণি? তুমি এখনো জেগে আছ? ঘুমোওনি? কি বলবে বল?'

'বুড়ো চোখে দেখতে পায় না। রান্না করতে বাসন মাজতে, কিচ্ছু কাজ করতে পারে না। তাই মা ওকে বকে। দেখতে পারে না। না বাবা? আচ্ছা বাবা চোখে অসুখ হলে সারে না? অন্য অসুখ হলে তো সেরে যায় বাবা। বল না বাবা? বুড়োর চোখ ভাল হয়ে যাবে বাবা?'

বুকের মধ্যে যন্ত্রণা হচ্ছিল। একটা ঢোক গিলে প্রতাপ কোনমতে জবাব দিল, নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে মা। বুড়ো আবার চোখে দেখতে পাবে। সব কাজ করতে পারবে। ভগবানের দয়া হলে সব অসুখ সেরে যায়। রাত অনেক হয়েছে মা-মণি, এবার তুমি ঘুমোও।'

* * *

বাড়ির সামনেই গাছপালা আগাছা ভর্তি বিরাট এবড়ো খেবড়ো মাঠ। মাঠ পেরুলেই রেল-লাইন। রেল লাইন ধরে অনেকটা হেঁটে গেলে ওপারে কুসমীর পুল। পুল পেরিয়ে আবার একটা মাঠ। সেই মাঠের শেষ সীমান্তে বিশাল দুটো সিন্ধ বট অশ্বত্থের তলায় এ অঞ্চলের অতি প্রসিদ্ধ লোকমান্য দেবতা বাবা জটাধরের লিঙ্গমূর্তি। বহু যুগ থেকে পুজো পেয়ে আসছেন। এখানকার লোকেরা বলে, স্বয়ম্ভু সদাজাগ্রত বাবা জটাধরের কাছে ভক্তি ভরে এক মনে কোন কিছু প্রার্থনা করলে, তিনি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

মাঝে বাদ পড়েছিল। বুড়ো হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর আবার মণির বেড়ান সুরু হল। তবে এবার বুড়ো নয়, মণিই বুড়োর একটা হাত শক্ত করে ধরে থাকে। বুড়োর অন্য হাতে থাকে শক্ত লাঠিটা। ঠক্ ঠক্ শব্দ তুলে বুড়ো এগিয়ে চলে মণির সঙ্গে। এই অশিক্ষিত অতি দুঃখী অন্ধ বুড়ো আর অনভিজ্ঞ সরল শিশুর দ্বৈত সংলাপে মণির ভূমিকাটাই প্রধান হয়ে ওঠে সদাসর্বদা।

'বুড়ো তুমি একটুও দেখতে পাও না? ঐ পাখিটা? রেল লাইন? রেলগাড়িটা?'

খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি গোঁফ। বার্ধক্যজীর্ণ কুঁজো হয়ে যাওয়া বুড়োর মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে। স্বল্পভাষী বুড়ো অন্যদিনের মতই ওর প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

উত্তরের অপেক্ষাও মণি করে না। দু হাতে হঠাৎ নিজের চোখ দুটো সজোরে টিপে ধরেই ছেড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। 'কী বিচ্ছিরি! কী বিচ্ছিরি অন্ধকার! তুমি চোখে দেখতে পাও না, তোমার খুব কষ্ট হয়, না বুড়ো?'

দৃষ্টিহীন চোখের কোণ দুটো জ্বালা করে। গলাটা ধরে আসে। আস্তে আস্তে বুড়ো মণির প্রশ্নের জবাব দেয়, 'কষ্ট কেন হবে মণিদিদি? আমি চোখে দেখি, তাঁর ইচ্ছে নয়।'

'আচ্ছা বুড়ো, বাবা বলছিল, তোমার কেউ নেই। মা বাবা ছেলেমেয়ে বৌ। কেন নেই?'

'ঐ যে বললাম মণিভাই, তাঁর ইচ্ছে নয়। তাই আমার কেউ নেই।'

'কার ইচ্ছে নয়? বল না বুড়ো সে কে?' মণির গলায় যতটা জেদ, ততটা কৌতূহল।

'ঐ যে বাবার থান, জোড়াবটের তলায় বাবা জটাধর মহাদেব থাকেন, তাঁর ইচ্ছে নয়।'

লাঠিধরা কাঁপা হাত দুটো এক করে কপালে ছোঁয়ায় বুড়ো। 'উনিই মহাদেব, উনিই হরি-ঠাকুর, উনিই ভগোমান। ও'র ইচ্ছে হলে অন্ধ চোখ পায়। খোঁড়া পাহাড়ে ওঠে। মরা মানুষ বাঁচে। ও'র ইচ্ছেতেই যে জগৎসংসার চলে মণি-ভাই! ও'র জন্যেই তো তোমার বাবার শক্ত টাইফয়েড অসুখ সারল। তোমার মায়ের খোকা হল। তোমার ডিপথিরি হল সেবার, আমি ছুটলাম বাবার থানে। তুমি ভাল হয়ে উঠলে। এমন
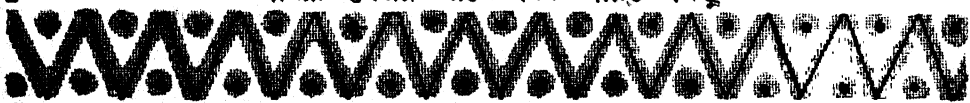
কতবার তোমাদের কত শক্ত অসুখ হয়েছে মণিদিদি, আমি ছুটে এসে বাবা জটাধরের পায়ের তলায় কেঁদে এসে পড়েছি। রক্ষে কর, এদের ভাল করে দাও বাবা! ডাকার মত ডাকতে পারলে, চাইতে পারলে তিনি কি না দিয়ে পারেন কখনো?'

'তবে—তবে কেন তুমি জটাধর ঠাকুরকে তোমার চোখ ভাল করে দিতে বল না? মণি উত্তেজনায় অধীর হয়ে দু হাত দিয়ে নাড়া দিল বুড়োকে। 'কেন বল না?'

'নিজের জন্যে ঠাকুরের কাছে কিছু চাইতে নেই মণিদিদি। ইচ্ছে হ'লে উনি নিজেই দেবেন। আমি কি চাইতে পারি?'

দারিদ্র্য মানুষকে সংকীর্ণচেতা করে তোলে। কিন্তু মেয়েদের উপর তার যতটা আধিপত্য পুরুষ মানুষের উপর ততটা নয় বোধ হয়।

অসহ্য কাজের চাপে প্রণতির গলায় কখনো আগুন, কখনো বিষ ঝরে। ক্ষুরধার বাক্যবাণে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে মারে কখনো স্বামীকে। কখনো বা বুড়োটাকে।

ছোট্ট ছ বছরের মেয়েটা এর মধ্যেই এগিয়ে আসে। ছোট ভাইটার কান্না থামায়। বাবাকে তেলের বাটি গামছা এগিয়ে দেয়। ওর চেয়েও লম্বা ঝাঁটাগাছটা নিয়ে চেষ্টা করে ঘর ঝাঁট দেবার। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে মুড়ির টিনের কৌটোটা হাতড়ায়। একদানাও নেই। বাইরে চুপচাপ বসে থাকা অন্ধ বুড়োটা এতবেলা অবধি কিছু খায়নি। সবার খাওয়া শেষ হলে, সেই ভরদুপুরে মা ওকে ভাত বেড়ে দেবে। ওর শুকনো মুখ দেখে মণি বুঝতে পারে, বুড়োর খু-উ-ব খিদে পেয়েছে।

রাত্রে মা খানকতক রুটি গড়েছিল। তাই থেকে খানদুই রুটি ফ্রকের কোঁচড়ে পুরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ই ধরা পড়তে হল।

ঘা কতক পিঠে পড়ে। গলা ছেড়ে চেঁচায় প্রণতি। 'গত হপ্তায় রেশন আসেনি টাকার জন্যে। তলানি কটা আটা পড়েছিল, খানকতক রুটি গড়ে রেখেছি, হতচ্ছাড়ি বাপসোহাগী মেয়ে কিনা সেই রুটি কখানা চুরি করে আদরের বুড়োকে গেলাতে যাচ্ছে? আর বুড়োকেও বলি, একটু লজ্জাও কি করে না ঠুঁটো জগন্নাথের মত হাত পা কোলে করে বসে বসে খেতে! অন্য কিছু না পারুক, অন্ধ, খোঁড়া মানুষগুলো পথে পথে ভিক্ষে করেও তো পেট চালায়......'

* * *

এই সর্বব্যাপী অন্ধকার রাজ্য পরিক্রমায় যদি ঐ বিদ্যুৎ শিখাটি না থাকতো! এই নিদারুণ লাঞ্ছনা গঞ্জনা বিষের সমুদ্রে ঐ অমৃত-টুকুর জন্যেই যে বেঁচে আছে বুড়ো! হঠাৎ সেদিন ভোরবেলা থেকে সেই মণিকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না!

এদিক ওদিক, চারদিক খোঁজাখুঁজি করে মাথায় হাত দিয়ে বসল প্রতাপ। আর পাগলের মত লাঠি ঠুকে ঠুকে রেল লাইনের ধারে গিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল বুড়ো, 'মণিদিদি, মণিভাই, মণিসোনা—ফিরে আয়!'

মণি ফিরে এলো অনেক বেলায়। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শুকনো মুখে। বাড়ি ঢুকে মায়ের গলার সাড়া পেয়ে একেবারে বাবার বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল।

এতক্ষণ অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করছিল প্রণতি। মেয়েকে ফিরে আসতে দেখে চোখের জল মুছে এবার সুর পাল্টাল, 'কোথায় গিয়েছিলি ঘুম থেকে উঠেই, উড়নচণ্ডী ঘর-পালানি হতচ্ছাড়ি মেয়ে? কাউকে না বলে, একা একা?'

'যা রে! আমি তো রেলগাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম!' বাবার বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে মণি কোন মতে জবাব দেয়।

'রেলগাড়ি দেখতে! যদি কাটা পড়তিস? রেলগাড়ি দেখে আশ মেটে না নবাবনন্দিনী! এই বয়সের ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। লেখাপড়া করে। আর এ মেয়ের? লেখা নেই পড়া নেই রাতদিন বুড়োটাকে নিয়ে টো টো করে মাঠে-ঘাটে রেললাইনের ধারে ঘুরছে! কেউ দেখবে না। কেউ কিছু বলবে না। আমার যেমন পোড়া-কপাল।'......

ভরদুপুরে যখন সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ হল, ঘুমন্ত মায়ের পাশ থেকে সতর্ক পায়ে উঠে হিজল গাছের তলায় বসে থাকা বুড়োর কাছে এসে দাঁড়াল মণি।

বুড়ো ওকে কোলের কাছে টেনে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা মণিদিদি, সত্যি করে বলতো আজ ভোর-বেলা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? রেল লাইনের ওদিকে তো তুমি ছিলে না।'

'আমি—আমি রেললাইন পেরিয়ে কুসমীর পুল পেরিয়ে জটাধর মহাদেবের কাছে গিয়েছিলেম বুড়ো। আমি তো রাস্তা চিনি। একটুও ভয় পাইনি।'

বুড়ো চমকে উঠল, 'ঐ জঙ্গলে, ঐ সাপের রাজ্যে, কাউকে না বলে তুমি কেন গিয়েছিলে? ছিঃ মণিদিদি, এমন কাজ কি করতে আছে?'

'তুমি আমায় বকনা বুড়ো। তোমার জন্যেই তো যেতে হল। আমি ঠাকুরকে অনেক করে বলেছি, কত প্রার্থনা করেছি। ঠাকুর, তুমি বুড়োর চোখ ভাল করে দাও। আচ্ছা বুড়ো, বল না, ঠাকুর কি আমার কথা শুনবেন না?'

ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরতে লাগল। ফিস ফিস করে বুড়ো বলতে লাগল, 'শুনবেন বই কি মণিদিদি, নিশ্চয় শুনবেন। জটাধর ঠাকুর কত বড় জাগ্রত দেবতা। তোমার কথা না শুনে কি তিনি স্থির থাকতে পারেন? এবার আমি নিশ্চয় দেখতে পাব।'......

গলার জোর কমিয়ে এবার অন্য পথ ধরেছে প্রণতি। সোজাসুজি বুড়োকেই ধরেছে এবার। দেশে চলে যাক না বুড়ো। এই তো অবস্থা ওদের। আবিশ্যি প্রণতি নেমকহারামি করবে না। মাসে মাসে টাকা পাঠাবে যা হোক কিছু। মানুষকে বুঝিয়ে বলে বুড়ো মাসকাবারেই যেন দেশে যাবার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলে।

প্রায় নিঃশব্দ গলায় বুড়ো জবাব দিয়েছে, 'তাই হবে মা। মাসকাবারেই আমি চলে যাব।'...

* * *

ঠাকুরতলা থেকে ফিরে আসার পর থেকে প্রত্যেক দিন মণির এক কাজ হয়েছে। সকাল-বেলায় উঠেই বুড়োকে প্রশ্ন করবে, 'বলতো কটা আঙ্গুল? দুটো? পাঁচটা? উঁহু হল না। দুর, তুমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না বুড়ো। তবে কেন বললে ঠাকুর আমার কথা শুনবেন? মিথ্যে কথা!' অভিমানে মণির গলা ভার হয়ে ওঠে। 'বল না বুড়ো কবে থেকে তুমি আবার সব দেখতে পাবে। কাজ করতে পারবে? ঐ লাঠিটা কবে ফেলে দেবে হাত থেকে? বল না?'

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তীক্ষ্ন ছুঁচ বেঁধা যন্ত্রণাটা কোনমতে সহ্য করতে করতে বুড়ো জবাব দেয়, 'কালকের চেয়েও আজ যেন চোখ-দুটো ভাল মনে হচ্ছে মণিদিদি। আর কটা দিন গেলে একেবারে সেরে যাবে। শক্ত অসুখ কিনা, তাই সারতে একটু সময় লাগছে।'

মণি খুশী হয়ে ওঠে। 'বুড়ো তোমার চোখ ভাল হয়ে গেলে আমার একটা কথা শুনবে?'

'শুনব বই কি মণিদিদি, বল, নিশ্চয় তোমার কথা শুনব।'

'যেদিন তুমি ভাল হয়ে যাবে, সব পরিষ্কার দেখতে পাবে, সেদিন তুমি আমার মত ভোর-বেলায় উঠে রেললাইনের ধারে একলা চলে যাবে। তোমার ঐ. বিচ্ছিরি ঠুকঠুকে লাঠিটাকে দুটো লাইনের মাঝখানে ফেলে রেখে খালি হাতে বাড়ি ফিরে আসবে। রেলগাড়ি চাপা পড়ে লাঠিটা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তুমি তো সবই দেখতে পাবে, লাঠিটার কোন দরকার তোমার আর হবে না। মিছিমিছি ঐ বাজে জিনিষটাকে রেখে তোমার কী হবে?'

তাই তো! তাই তো! এত বড় দামী কথাটা তো একবারের জন্যেও মনে হয়নি!

এই অতি তুচ্ছ অতি অপ্রয়োজনীয় বাজে জিনিষটা যখন এই পৃথিবীর, এই সংসারের কোন উপকারেই আর লাগবে না, তখন এটাকে এভাবে বাঁচিয়ে রেখে লাভ কি?

বুড়ো হলে, বয়স হলে এমন করেই বুঝি সব বিচার বিবেচনা বুদ্ধি হারিয়ে ফেলতে হয়। নইলে ছ বছরের শিশুটা যা বোঝে, ছেষট্টি বছরের বুড়োর সেকথা বুঝতে এতদিন দেরী হয় কেন?

* * *

কোন সান্ত্বনাই কাজে লাগেনি। মণির আকুল কান্না থামাতে পারেনি কেউ।

অবোধ অজ্ঞান শিশু অনবরত সেই একই ভয়ঙ্কর প্রশ্ন করে চলেছে সবাইকে।

মণি তো জানে, মণি তো বুঝতেই পারছে ঠাকুর জটাধরের দয়ায় বুড়োর চোখ দুটো একেবারে ভাল হয়ে গিয়েছিল। সব কিছু পরিষ্কার চোখে দেখতে পেয়েছিল আবার বুড়ো। ভোর রাত্রের অন্ধকারে ঠিক পথ চিনে এবড়ো খেবড়ো মাঠটা পেরিয়ে একা একা রেল-লাইনের ধারে গিয়েছিল মণির কথা মতই। সেই বিচ্ছিরি অকেজো লাঠিটাকে দুটো লাইনের মাঝখানে শুইয়ে রেখেছিল ঠিক যেমনটি মণি বলে দিয়েছিল বুড়োকে।

অত বড় রেলগাড়িটা তার উপর দিয়ে চলে গেলেও কোন ক্ষতিই হয়নি লাঠিটার। ভাঙ্গেনি। অক্ষত অটুট অবস্থায় পড়েছিল সেই অনেক বেলা অবধি।

কিন্তু, চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েও, সব কিছু স্পষ্ট, পরিষ্কার দেখতে পেয়েও বুড়ো কেন সাবধান হয়ে রেললাইন পার হয়ে আবার বাড়ি ফিরে আসতে পারল না—

কেন? কেন? কেন?

মৌমাছি

চিত্তরঞ্জন মাইতি

মধুরঙ ছোট মৌমাছি
অতি মিহি সুরের সুতোয়
নেচে নেচে আসর মাতায়
আমাদের খুব কাছাকাছি;

কতবার যায় আর আসে
কাজে, খোঁজে এখানে ওখানে
উড়ে যায় বাগানে বাগানে
কত ফুল ফোটে আশেপাশে;

একদিন দেখলাম চেয়ে
সঙ্গীদের এনেছে কখন
সম্ভবতঃ স্থান-নির্বাচন
চলে গেল গান গেয়ে গেয়ে;

দেয়ালে বেঁধেছে দেখি ঘর
এলে পরে তাড়াই কেবল
চলবে না আর কোন ছল
এইবার হয়েছি তৎপর;

চলে গেল এলো নাকো আর
বসে বসে ভাবি, দিন যায়
মিহি সুর কোথায় হারায়
ভেঙে যায় সব সংসার;

কখন হয়েছি মৌমাছি
মধু আনি, গড়ি সংসার
কে যেন নাড়ালে হাত তার
এই নেই, এই আমি আছি।

নীল ঐ পাহাড়ের মতই

গোবিন্দ চক্রবর্তী

আজ ঐ পাহাড়ের জন্য একটি স্তোত্র রচনা কর।

ঘুমে, জাগরণে, স্বপ্নে কি তন্দ্রায়
তোমার প্রতিদিনের, প্রতি ক্ষণের সংগী
যে অতন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে তোমার দিগন্তে—
অথচ যারদিকে ভাল করে একবার ফিরেও তুমি তাকাও না!
কারণ তোমার সময় নেই, তোমার সময় নেই।

আজ ঐ পাহাড়ের জন্যই একটি স্তোত্র রচনা কর :
ঐ বন্ধুকে ঘিরে বন্দনা, একটি কবিতা—একটি কবিতা।

ভাল করে কোনদিন ফিরেও দেখোনি
অথচ নীল ঐ পাহাড়ের মতই
তোমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে আরো, আরেকজন
যে নীরবে তোমার দিকে চেয়ে তোমাকে পাহারা, পাহারা দিচ্ছে।

তুমি জান না, জান না—না, তুমি জান না :
তারই চোখের মধুর আলোয়
হায় তুমি, তুমি শুধু তুমি কি—
যুগ-যুগান্তরের ইতিহাসের পথ আলোকিত,
ইতিহাস আলোড়িত, বিলোড়িত,
হিল্লোলিত, কল্লোলিত হচ্ছে—।

আকাশের একটি নক্ষত্রও তুমি নড়াতে পার? নাড়াতে পার?
যোগ-বিয়োগে মেলাতে পার? পাও, সাহস পাও?
কেন, কী জন্য লেখো কবিতা?
দেখো, জীবনাতীতকেও একবার চোখ তুলে দেখো।
তার চোখে চোখ রাখো। তাকাও।

ঊনিশশো-চৌষট্টিতে

হাসিরাশি দেবী

সে কি আসবে না!
ধান-কাটা মাঠ পার হ'য়ে,—
গাছের ছায়ায়
দিনের আলো আর রাতের অন্ধকারকে মাড়িয়ে
পুরানো সেই চেনা আবেষ্টনী কাটিয়ে
এখানে আসবে না?
এইতো শীতের রোদ লাইনের এপারে হাসছে,
হাসছে ঘাসের আর দূর্বার সবুজ ডগাগুলোও;

দেখা যাচ্ছে আকাশের অফুরন্ত নীল।
কেন তবে ওপারের আকাশটার কোলে কোলে
কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে আগুনের ধোঁয়া?
চীৎকার করছে মানুষগুলো!
এ কি সেই আদিম যুগের
শিকার-উৎসব? না—আর কিছু!
ঐ ধোঁয়াগুলো কি মেঘে রূপান্তরিত হবে?
কান্না হ'য়ে ঝরে প'ড়বে
ফসল-কাটা জমিতে আর মাটিতে!

এইতো একঝাঁক পাখী উড়ে এল,—
ছুটে এল' দুই-একটা মাঠ-চরা গরু,
চীৎকার ক'রে উঠল কাকের দল!
ওরা কী ব'লতে চায়? কী বোঝাতে চায় ওরা?
সে আসবে না?...ঐতো লাইনের ওধার থেকে
ভেসে আসছে মানুষের গলার আওয়াজ!
তার কণ্ঠস্বর কি ওতে নেই?
ঐতো আকাশের নীল রংয়ের সঙ্গে
মিশে যাচ্ছে ধোঁয়ার কালো রং,—
ও রঙে কি তার স্বাক্ষর নেই?
ঐতো কোলাহলে গুঁড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'চ্ছে
এপার-ওপারের নিস্তব্ধতা,—
এর সঙ্গে কি তার সহানুভূতি নেই?
সে কি তবে এরই মধ্যে হারিয়ে গেল!
হারিয়ে গেল পাতাগুলো বিবর্ণ হওয়ার সঙ্গে
আর নেবু ফুলের পাঁপড়ি ঝরবার সাথে,—
যে ব'লেছিল—আসবে,—নিশ্চয়ই আসবে সে,—
এখানে খেজুরের ফুল ফুটলে!

দ্বিতীয় যৌবন

দিলীপ দাশগুপ্ত

স্বাগতম্! স্বাগতম্! দ্বিতীয় যৌবন!!
দ্বিপ্রহরে দীপ নিয়ে যতো উত্তরণ
করেছে তৃষিত মন, আর খরাঘাতে
দিয়েছে প্রতিমা বলি কামনার রাতে
বাসনাকে সাক্ষী রেখে উদার প্রাঙ্গণেঃ—
তবু অন্যমনে
অকস্মাৎ অতিকায় ভল্লুকের শাণিত নখরে
ভীতগ্রস্ত দেহ যেন ভয় পেয়ে পড়ে থাকে জ্বরে।
পদপ্রান্তে নাগিনীর কলুষকুটিল উপহার
অলসতৃষিত শয্যা...দেহান্তরে তবু বার বার......
ছিন্ন বাধা পলাতক চিত্ত নিয়ে রূঢ় পরিহাস,
সে যৌবনে বারিধারা—মেঘমন্ত্রে ছিল না আকাশ।

স্বাগতম্! স্বাগতম্! দ্বিতীয় যৌবন!!
সার্থক হয়েছে আজ পূর্বার্জিত আমার তর্পণ!
তোমার এ আবির্ভাবে সংস্কারের কেশরাশি মুঠাভরে নিয়ে
ফেলেছি ভুবনপ্রান্তে। ইন্দ্রানীকে এনেছি ফিরিয়ে
দেখাতে তোমার রূপ...জয়বেশ দেখাতে আমার।
কৃষ্ণ-বুদ্ধ-যীশু-আল্লাহ প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রজ্ঞার
সমাবেশে নবধর্ম, নবমন্ত্র, নব প্রেমাসনে
অস্থিরতাধ্বংসী এক অপরূপ মহাসন্ধিক্ষণে
কী যেন এনেছি! তুমি কী যেন দিয়েছ প্রাণভরে
কী যেন বলেছ কানে প্রীতিধন্য সম্মোহনী স্বরে
আর কিছু মনে নেই। সহস্রের বুকে তুমি তাই
বিষ নিয়ে সুধা ঢেলে বন্ধুত্বের ঘুচালে বালাই।
দ্বিতীয় যৌবনে তাই—সর্ববিশ্ব শুধু একবার—
নর ও নারী ভেদাভেদে এই দেহে একান্ত আমার।

চাঁদ

কুমারেশ ঘোষ

নেই নেই, সময় নেই যে হায়,
আকাশের দিকে চেয়ে দেখবার
সময় কোথায়?
উঁচু নিচু পথ, কেবল হোঁচট খাওয়া,
দেখে চললেও সহজে যায় না যাওয়া!
পড়ি আর মরি,
দৌড়োদৌড়ি!
দুদণ্ড যে দু' চোখ মেলবো আকাশটায়,
সময় কোথায়?
তাইতো আকাশে ঘটবে কি ছাই,
জানিনে ভাই।

অমাবস্যা কি পূর্ণিমা সেটা জানিয়ে দেয়
দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের
লাল-কালো রং পাতাটা-ই।

হায়, সময় কোথায়?
তাই কাগজে দেখি ছাপা চাঁদ রোজ
কালো ও সাদায়
কমচে বাড়চে
অমাবস্যা ও পূর্ণিমায়।

চাঁদির জন্যে শুধু ঘোরাঘুরি,
পড়ি-মরি ক'রে দৌড়োদৌড়ি
চাঁদের জন্যে সময় দেবার
সময় কোথায়?
নকল চাঁদনী ফ্লুরেসেন্ট আলো
তাই তো জ্বালাই।

প্রেমে অবহেলা

শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ

বঞ্চিত কোরে কতকাল ধোরে
ভাসাবে নয়ন নীরে,
এসো প্রেমে কাছে—লুকানো যা আছে
সঁপিব হৃদয় চিরে।
তোমারি বিহনে হেথা রিপুগণে,
জীবনে গোপনে পাপ প্রলোভনে;
মোহ ছলনায় ঘিরে।

মোহিনী মায়ায় নিয়ত ভুলায়
প্রগতির মরীচিকা,
চিত-চিতা জ্বলে বিরহ অনলে
ওঠে প্রেমে হোমশিখা।
সহে না বেদনা প্রেমে অবহেলা,
পূজার খেলায় এসো এই বেলা;
আপন আসনে ফিরে।

দর্পণে বৃদ্ধের দৃষ্টি

রাণা বসু

আহা! কী খুশী ওই প্রজাপতিটা।
ফুলের বনে রঙের ওড়না উড়িয়ে
কেমন ঘুরে ঘুরে নাচছে।
ওর কি চিন্তা-ভাবনা বলে কিছুই নেই
ও কি দুঃখকে জয় করেছে?

দেওয়ালি পোকাগুলো আলোর চারপাশে নাচছে।
আলোর ছটা ওদের মাতাল করেছে,
এখুনি পাগল পোকাগুলো পুড়ে মরবে।
মরবে একথা জেনেও
কেমন খুশীভরা মনে ঝাঁক বেঁধে নাচছে!
মৃত্যুভয় ওরা জয় করেছে!
দেখলে, মাছরাঙাটা কেমন ছোঁ মেরে
খুদে মাছটাকে ঠোঁটে ধরে পালিয়ে গেল।
ওই দেখো, বালুচরে বসে
কী খুশী মনেই তার আহার শেষ করছে।
অশোক নিলয়ের অস্তিত্ব নেই
তথাগত প্রমাণ করেছেন।
আমি জানি, আমার দ্বারা
অনন্ত মুহূর্ত সৃষ্টি করা অসম্ভব।
প্রজাপতি, দেওয়ালি পোকা বা মাছরাঙার মতন
আমি কারুরই চিত্তে সাড়া জাগাতে পারব না।
কোনো মোহিনী নারীকে নয়, সুন্দর প্রকৃতি
আর তার আশ্চর্য মহিমাকে প্রাণভরে ভালোবেসে
আমি ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হব॥

খাঁচার বাইরে

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

"রেখা, তুমি কখনও সমুদ্র দেখেছ?"

"না।"

"এবার আমরা সমুদ্র দেখতে যাব।"

"পুজোর সময়?"

"হ্যাঁ, পুজোর ছুটিতে।"

"কোথায় যাবে?"

রাস্তার ওপারে আমের শাখায় নিজেকে ঢেকে রেখে রাতের একটা পাখি খুড়ের বোলের মতো আওয়াজ তুলেছিল। আর তা শুনতে শুনতে প্রথম প্রথম দ্বিজনাথের মনে হয়েছিল সমুদ্র যেন ওদের খুব কাছাকাছি আছে। দ্বিজনাথ রেখাকে সমুদ্র তীরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

"পুরী কিম্বা ওয়ালটেয়ার, বম্বে কিম্বা মাদ্রাজ—তুমি যেখানে যেতে চাও, আমরা সেখানে যাব।"

"আমি সব জায়গায় যাব" আবেশের ঘোরে রেখার চোখদুটো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল, তুমি একা একা যত দেশ দেখেছ, এবার আমি তোমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সেইসব দেশ দেখব।"

সেইসব দেশ মানুষ নগর পাহাড় সমুদ্র একা-একা যত দেখেছে দ্বিজনাথ তা সে রেখার সঙ্গে সত্যি আবার দেখতে চেয়েছিল। কেননা তখন তার বুকের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ-এর মতোই গভীর একটা বেগ কিম্বা আবেগ ফেনিয়ে উঠেছিল।

"হ্যাঁ, দেখবেই।"

কিন্তু যে অনুভূতি একদিন ওদের সমুদ্রের খুব কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তা আর থাকল না। সমুদ্র দূরে সরে গেল। পরে, আরও পরে। তারপর—আরও। রেখা সমুদ্র দেখল না। আর ঘন ঘন সিগ্রেট টানতে টানতে দ্বিজনাথের সেই সমুদ্রের কথাই মনে হল। তার মনে হল একটা অন্ধকার সমুদ্রে সে ডুবে যাচ্ছে। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ জাগছিল দ্বিজনাথের।

সূচে সুতো পরাবার চেষ্টা করতে করতে রেখা বলে উঠল, "না, চোখটা বোধহয় খারাপই হয়েছে। প্রায়ই মাথা ধরে। আলো থাকলেও কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা লাগে—"

একটা পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছিল দ্বিজনাথ। মুখ না তুলেই বলল, "চোখটা এবার দেখাও। বোধ হয় চশমা নিতে হবে।"

সূচ সুতো ফেলে রাখল রেখা। বিনুর ছেঁড়া ফ্রকটাও ঠেলে দিল। অল্প হেসে বলল, "না, চশমা-টশমা এখন থাক—"

"তাহলে চোখ তো আরও খারাপ হবে।"

"হোক। কী আর করব—" একটু ইতস্তত করল রেখা। বিরক্তি গোপন করবার চেষ্টা করে আস্তে দ্বিজনাথকে মনে করিয়ে দিল, "আমার কাছে তো আর টাকা নেই। এ মাসের ইলেকট্রিক বিল—"

পত্রিকা বন্ধ করল দ্বিজনাথ। রেখার কথা ফুরোবার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "জানি, আমার মনে আছে।"

রেখা থামল না। তার আরও বলবার ছিল, "দুটো প্রিমিয়াম বাকি পড়ে আছে। ও ছাড়া আর তো কোন সঞ্চয়ই নেই। যদি হঠাৎ একটা কিছু—"

দ্বিজনাথ হেসে উঠল, "যদি আমি মরে যাই তাহলে কী হবে এই বলতে চাও তো?"

"আজেবাজে কথা বল কেন?" বিরক্তি গোপন করবার কোন চেষ্টা রেখা এবার আর করল না, "আমি কেমন করে সংসার চালাই তা আমিই জানি। তুমি তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ!"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে দ্বিজনাথ বলল, "না! আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই। কোনদিক না ভেবে সব সময় তুমিই নিশ্চিন্ত হয়ে টাকা খরচ করে যাও। এ মাসেই চেয়ারগুলো কেনবার কী দরকার ছিল?"

"লোকজন এলে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবে? কিছুই তো নেই এ বাড়িতে—"

দ্বিজনাথের একবার চুপ করে থাকবার ইচ্ছে হল। কেননা কথা বললেই তাকে রোজকার মতো একই কথা বলতে হবে আর তা শুনে আবার একে একে অনেক অভাব অনেক অভিযোগের কথা মনে পড়ে যাবে রেখার। কিন্তু থামতে চাইলেও আজ থামতে পারল না দ্বিজনাথ। সে মাথার মধ্যে একটা চাপ অনুভব করল। রেখার অবস্থান সে সহ্য করতে পারল না।

দ্বিজনাথ বলল, "কিছু থাক না থাক—খালি নেই-নেই করলেই কি সব এসে যায়? বিনুর বালা এখন না গড়ালেই তো পারতে—"

রেখা আর বসে থাকতে পারল না। উত্তেজনা মনের মধ্যে চেপে রাখতে পারছিল না বলে বিনুর ছেঁড়া ফ্রক দিয়ে জোরে জোরে আয়নাটা ঘষতে লাগল, "বালা না গড়ালেই কি টাকাটা ব্যাঙ্কে যেত? তোমার পাগল পিসির কথা ভুলে গেলে নাকি?"

চেপে চেপে দ্বিজনাথ বলল, "না ভুলিনি। আমি ছাড়া তাঁর আর কেই বা আছে!"

রেখা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। কান্নার একটা বেগ যা তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল তা চাপবার কঠিন চেষ্টা করতে করতে সে ভারী গলায় বলল, "আমার যদি যাবার কোন জায়গা থাকত তাহলে ছেলে মেয়েকে তোমার কাছে রেখে আমি সেখানে ঠিক চলে যেতাম—কিন্তু আমারই শুধু কেউ নেই!"

রেখার বুকের ভিতর সে কান্না ফেনিয়ে উঠছিল তার কথা এই অস্থির মুহূর্তগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে দ্বিজনাথ বুঝতে পারল না। সে কর্কশ স্বরে বলে উঠল, "নিজের সব ইচ্ছাকে সব খেয়াল খুশিকে প্রশ্রয় দিলে কোনদিক সামলানো যায় না।—"

দ্বিজনাথের কথা শুনে রেখার দেহটা কঠিন হয়ে উঠল—গলার স্বরও, "আমার নিজের জন্যে এতদিনে আমি কী করেছি বলতে পার?"

"আমার মুখের সামনে সকাল-বিকেল গেলাস-গেলাস দুধ কি এসময় না তুলে দিলেই নয়? বারবার বারণ করলেও কেন কথা শোননা তুমি?"

প্রথম প্রথম চুপ করে থাকল রেখা। তার চোখ অল্প অল্প ভিজে উঠল। তার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছিল। কিন্তু তা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যেই। দ্বিজনাথকে তার এই অপচয়ের কৈফিয়ৎ দেবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখা বলল, "আমার স্বার্থের জন্যেই আমি তা করি—জান না? তোমার দীর্ঘজীবন কামনায় আমার অনেক স্বার্থ আছে—"

"কিন্তু তোমার স্বার্থসিদ্ধি হবে না। এই-সব পাওনাদারদের টাকা মেটাবার ভাবনায় আমার আয়ু অনেক কমে যাবে—"

কথা বলবার সময় রেখার ঠোঁট কাঁপছিল, "কাল থেকে তোমার জন্যে আমি আর দুধ নেব না—খোকা বিনুর জন্যেও না—"

কথা বলবার আর ইচ্ছে হল না দ্বিজনাথের। কপালের ওপর একটা হাত রেখে সে চুপচাপ বসে থাকল। এই সব মান-অভিমানের খেলা খেলতে তার আর ভাল লাগছিল না। সান্নিধ্যে এই চরম ক্লান্তি থেকে সে মুক্ত হতে চাচ্ছিল। দ্বিজনাথ বিকলাঙ্গ পশুর মতো হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু তাহলেও, যখন কাছাকাছি আর কোন সমুদ্র ছিল না—ভিন্ন ভিন্ন দেশ, স্থির যৌবনকাল আর প্রাণচঞ্চল পাত্র-পাত্রী স্মৃতির ফিকে রেখায়ও ধরে রাখা অসম্ভব মনে হত তখন এই যন্ত্রণা জর্জর সংসারেই একটা সৌরভ জোর করে তৈরি করে নিতে চাইত দ্বিজনাথ। তৈরি করার জন্যে প্রস্তুত না থাকলেও অপচয়ের কয়েকটি মুহূর্তে হঠাৎ কখন সেই সৌরভকেই এখানে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিত।

ছোট ছোট দুটো রঙীন পাখিসুদ্ধ তারের একটা হাল্কা খাঁচা কিনল দ্বিজনাথ। তখন বুদ্ধপূর্ণিমার রুপোলি আলো স্থির হয়ে ছিল। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ খেয়া পারাপার করছিল। রেখাকে অবাক করে দেবার জন্যেই বোধহয় লুকিয়ে লুকিয়ে বাড়ি ঢুকল দ্বিজনাথ। খাঁচাটা বারান্দায় ঝুলিয়ে দিল।

তারপর সে রেখাকে ডাকল। আঙুল তুলে পাখি দেখিয়ে বলল, "দেখ!"

"একী?"

'পাখি", দ্বিজনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠল, "কথা বলবে। গানও করবে!"

রেখা ঠোঁট টিপে বলল, "ছাই!"

রেখার কথা মনে মনে মানতে পারেনি দ্বিজনাথ। সে পাখিওলার কথাই বিশ্বাস করেছিল। পাখিওলা বলেছিল, "হ্যাঁ বাবু, গান করতে পারে।'

কিন্তু রেখা না পাখিওলা, কার কথা ঠিক তা আর জানা হল না দ্বিজনাথের। অল্পদিন পর যখন বাইরে খাঁ খাঁ গ্রীষ্মের রোদে চারপাশ চুপসে গিয়েছিল তখন হঠাৎ বারান্দায় তার চোখ পড়ল। খাঁচাটা হাঁ করে আছে। রঙীন পাখি দুটো আর নেই। কাছাকাছি ওরা আছে কি-না জানবার জন্যে বাইরে এসে দ্বিজনাথ এদিক-ওদিক দেখল। নেই। কোথাও নেই।

"ওরা কোথায় রেখা?"

"কারা?"

দ্বিজনাথ শূন্য খাঁচার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "উড়িয়ে দিয়েছ?"

রেখা অবাক হয়ে বলল, "আমি তো জানি না। খোকা, ও খোকা, পাখিরা কেমন করে পালাল? কেন খাঁচায় হাত দিস তোরা?"

"আমি আজ ওদের জল দিইনি মা। নিশ্চয়ই বিনু—'

কিন্তু বিনুও কিছু বলতে পারল না। খালি খাঁচাটা দেখতে দেখতে হঠাৎ দ্বিজনাথের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কোন কৌতূহল না থাকলেও হারিয়ে যাওয়ার একটা আঘাত যেন ধক করে তার বুকে এসে লাগল। দারুণ তাপে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তৃষ্ণায় গলা কাঠ হয়ে গিয়েছিল দ্বিজনাথের। আস্তে পা টিপে টিপে সে ভিতরে চলে এল।

দ্বিজনাথের থমথমে মুখ দেখে রেখা হাসল, "ভালই হয়েছে। ওইটুকু খাঁচার মধ্যে ওরা শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিল।' একটু থেমে সে যেন দ্বিজনাথকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল, "যাক না যেখানে খুশি।"

দ্বিজনাথ যেন আপন মনেই অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল, "যাক!" তারপর রেখার দিকে ফিরে একটু জোরে বলল, "আমাকে এক গেলাস জল খাওয়াও না।"

তারে ঝোলানো হালকা খালি খাঁচাটা অনেকক্ষণ থেকে হাওয়ায় দুলছিল। খাঁচার মধ্যে দিয়ে আকাশও দেখা যাচ্ছিল। রোদ ছিল না। একটা হলদে বাড়ির একদিকে আয়নায় ধরা সূর্যের আলোর মতো পাতলা রোদের রেখা শুধু থরথর করছিল।

শ্রাবণের অপরাহ্নে চারপাশ বিবর্ণ ধূসর দেখাচ্ছিল। একটু দূরে ধোঁয়া আর ধূলির সংগমে মনে হচ্ছিল কুয়াশা ঘন হয়েছে। সরু বারান্দায় একটা ভাঙ্গা বেতের চেয়ারে বসে দ্বিজনাথ এক-একবার মাথা তুলে এইসব দেখছিল।

আর খাঁচাটা দেখতে দেখতে সে একটা অদ্ভুত দুরারোগ্য রোগকেই শুধু নিজের মনের মধ্যে অনুভব করতে পারছিল। বাঁচা-মরার ব্যবধান বোঝবার ক্ষমতা যেন লোপ হয়ে গেছে দ্বিজনাথের। তার মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে একটা উৎকট যন্ত্রণার কাঁপন ছাড়া আর কিছু নেই।

দ্বিজনাথ খালি খাঁচাটার দিকে একটানা তাকিয়েছিল। সিগ্রেটের ধোঁয়ায় তার চোখ জ্বালা করলেও একটা উদ্ভট কল্পনায় সেই খাঁচার মধ্যে সে ঢুকে পড়তে বাধ্য হচ্ছিল। শুধু তার কল্পনাশক্তির ওপরই এখন পুরো-পুরি নির্ভর করতে পারছিল দ্বিজনাথ।

খাঁচাটা ছোট। দ্বিজনাথের দীর্ঘদেহের চেয়ে অনেক অনেক ছোট। দ্বিজনাথকে দেহ ভাঙ্গতে হল। তাকে একটা বিকলাঙ্গ মানুষের মতো অনেক ছোট হয়ে খাঁচায় ঢুকতে হল।

খাঁচার মধ্যে জবুথবু হয়ে বসেছিল দ্বিজনাথ। তার শরীর থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছিল। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। বুকের চাপ অধিক মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাহলেও দ্বিজনাথ চুপচাপ বসেছিল। তার নড়াচড়া করবার আর কোন ক্ষমতা ছিল না।

রেখা দ্বিজনাথের ভাঙাচোরা দেহের ওপর অনেক ভারী-ভারী জিনিস চাপিয়ে দিচ্ছিল। দ্বিজনাথ অত ভার বহন করতে পারছিল না। তার শরীর আরও ভেঙে যাচ্ছিল। সে মুখ বুজে সেই খাঁচাকেই আঁকড়ে ধরেছিল। আর এক-একটা জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করবার চেষ্টা করছিল। তখন আরও বেশি কষ্ট হচ্ছিল দ্বিজনাথের।

প্রসাধন সেরে নিয়েছিল রেখা। একটু পরে দ্বিজনাথের খুব কাছে এসে বলল, "আজ বোধহয় বৃষ্টি হবে না। খোকা আর বিনুকে নিয়ে একটু বেরুচ্ছি—"

ঘামে ভেজা কপালের ওপর দুটো ক্লান্ত

আগলে বুলিয়ে দ্বিজনাথ আস্তে বলল, "আচ্ছা।"

"একবার ডাক্তার দাসের ওখানেও যাব। খোকার টনসিলটা বড় হয়েছে—"

দ্বিজনাথ কাতর স্বরে বলে উঠল, "আমি শিগগিরই অপারেশনের একটা ব্যবস্থা করব।"

তারপরও রেখা দাঁড়িয়ে থাকল। দ্বিজনাথের অবস্থা দেখে তার মন হয়তো নরম হয়ে আসছিল, "তুমিও আমাদের সঙ্গে চল না—"

দ্বিজনাথ যেন ভয় পেয়ে মাথা নাড়ল, "না—না।"

"একা-একা বসে কী করবে," দ্বিজনাথের আরও কাছে সরে এসে মিষ্টি স্বরে রেখা বলল, "একসঙ্গে তো বেরুনোই হয় না। চল না আজ এমনি একটু বেড়িয়ে আসি?"

এখানেই একা-একা সময় কাটাতে চাচ্ছিল দ্বিজনাথ। রেখার সান্নিধ্যের আকর্ষণ তাকে একটুও নড়াতে পারল না। সে বলল, "আমাকে নিয়ম করে রোজই বেরোতে হয় কিনা। ছুটির দিনে আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করে না। তোমরাই যাও—"

আকাশ তখন একদিকে গাঢ় লাল রঙ ছড়িয়ে সূর্যকে বিলীন করে দিচ্ছিল। ভিজে মাটির বুক থেকে শ্রাবণের হাওয়া একটা খুব চেনা গন্ধ বয়ে আনছিল। কিন্তু আকাশের রং দেখার মতো দৃষ্টি দ্বিজনাথের আর ছিল না তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও বিকল হয়ে গিয়েছিল।

রেখা নেই। খোকা নেই। বিনু নেই। চারপাশ চুপচাপ। দ্বিজনাথের ঘাম শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে এখন সকলের অলক্ষ্যে সকলকে ফেলে রেখে একা-একা অনেক দূরে অন্য কোথাও সরে যেতে চাচ্ছিল। উদ্ভট কল্পনায় ভর করে দ্বিজনাথ যেমন খাঁচার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল—এখন এই নির্জনতায় তার ভাবনায় ভিতরে ভিতরে একটা জাহাজ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। মুক্তির তীব্র বাসনায় দ্বিজনাথ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরল। তার ত্বক কুঞ্চিত হল। মনের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর প্রার্থনা সাপের মতো হিস-হিস করে উঠল।

"ঈশ্বর আমাকে এ-খাঁচা থেকে বার করে দাও—" কল্পনা শক্তি আরও প্রবল— আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল দ্বিজনাথের—তার প্রার্থনা আরও স্পষ্ট হল। একটা বর্বর আনন্দে সে মনে মনে বলে উঠল, "একটা দুর্ঘটনা—প্রলয় কিম্বা ভূমিকম্প—আমার কাছ থেকে ওদের সরিয়ে নাও। সংসারের সুখ আমি আর চাই না। রেখা বিনু খোকা—ঈশ্বর, এদের সকলের কাছ থেকে আমাকে মুক্তি দাও—"

আবার খুব জোরে হাওয়া বইছিল। ক্লান্ত আকাশ মুহুর্মুহু গর্জন করে পুনর্বর্ষণের ইঙ্গিত দিচ্ছিল। আলো নেই। একটা অন্ধকার সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে ঢেউ-এর প্রচণ্ড ঝাপটায় দ্বিজনাথকে অতলে ঠেলে দিচ্ছিল।

আর একবার ঈশ্বরকে ডাকত দ্বিজনাথ। মুক্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষায় হয়তো ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠত। কিন্তু কালো কালো ঢেউ কেটে কেটে একটা অতি বৃহৎ জাহাজ দ্রুত-গতিতে তার কাছে এসে তাকে তুলে নিল।

প্রথম প্রথম জাহাজের আলোয় চোখ ঝলসে গেল দ্বিজনাথের। কিন্তু সে খাঁচা ভাঙল। ... হল। রেখা নেই। বিনু নেই। খোকা নেই।

আর আশ্চর্য, দ্বিজনাথের শরীরে রোগের কোন যন্ত্রণাও আর নেই।

জাহাজের একটানা গম্ভীর বাঁশি তখন সমুদ্রের জলে একটা মিষ্টি আমেজ ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বড় বড় ঢেউ আলোময় হয়ে উঠেছিল। আর যেন আনন্দে বিহ্বল হয়ে গোটা জাহাজটা আপন মনে জল কেটে কেটে রাজহাঁসের মত সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল।

দ্বিজনাথের দেহ থেকে সব জ্বর মিলিয়ে গিয়েছিল। তার মন যেন আরও অনেক সমুদ্র গ্রহণ করার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। জাহাজটা খুব চেনা-চেনা লাগল দ্বিজনাথের। দু-এক মুহূর্ত একটা তীব্র উত্তেজনায় সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ডেক-এ খটখট পায়ের শব্দ হচ্ছিল। একটু দূর থেকে বিদেশিনীর কলকল হাসির টুকরো ভেসে আসছিল। এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্বিজনাথ বুঝতে পারল জাহাজে নাচ শুরু হয়েছে। খুব জোরে বাজনা বাজছিল।

কিন্তু দ্বিজনাথ জানত ডেক-এর একেবারে অন্য প্রান্তে একজন রেলিং-এ ঝুঁকে পড়ে জলে আলোর খেলা দেখতে দেখতে তারই অপেক্ষায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

বুকের মধ্যে একটা কম্পন অনুভব করল দ্বিজনাথ। তারপর দ্রুত পায়ে জুতোর শব্দ তুলে তার খুব চেনা জায়গায় পৌঁছে অস্বাভাবিক জোরে ডেকে উঠল, "গ্লোরিয়া!"

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। তার টানা টানা নীল চোখে বিস্ময় স্থির হয়ে ছিল। অনেক পরে সে হাসল। কথা বলল। তার স্বর কাঁপছিল, "এতদিন কোথায় ছিলে?"

"আমি তোমার কাছেই আসছিলাম। কিন্তু আমার খুব অসুখ করেছিল। আমি একটা ছোট খাঁচার মধ্যে আটকা পড়েছিলাম।"

গ্লোরিয়ার দুই চোখ খুশি ছড়াচ্ছিল, "আমি জানতাম তুমি আসবে—আসবেই।"

"গ্লোরিয়া," দ্বিজনাথ ফ্লোরেন্সের সেই সুন্দরীকে স্পর্শ করে বলল, "চল।"

"কোথায়?"

"বন্দরে নামব। শহর দেখে জাহাজ ছাড়বার সময় সময় আবার ফিরে আসব।"

"তারপর?"

"তোমার দেশ-এ কয়েক সপ্তাহ কাটাব।"

"তারপর?"

"তারপর কলকাতা। আমি তোমাকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।"

এখন সমুদ্র নয়। দ্বিজনাথের পায়ের তলায় কঠিন মাটি ছিল। তার আশেপাশে স্পেনের বহু নরনারী আসছিল-যাচ্ছিল। দ্বিজনাথ জিব্রল্টরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সমুদ্রের হাওয়া খুব জোরে ছুটে আসছিল।

এখনও অনেক সময় আছে। কিন্তু গ্লোরিয়া ভয় পাচ্ছিল যেন জাহাজ তাদের ফেলেই চলে যাবে। দ্বিজনাথ হাসছিল। তাকে আশ্বাস দিয়ে বলছিল, "জাহাজ ছেড়ে গেলেও আমি আর তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

দ্বিজনাথ গাছ দেখছিল। আকাশ দেখছিল। আর গ্লোরিয়াকে দেখতে-দেখতে তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

জিব্রল্টরের আকাশ স্তিমিত। রোদের তেজ নেই। একটু দূরে খুব বড় গাছের কাছে একটা ঘর দেখা যাচ্ছিল। রেস্তোরাঁ মনে করে দ্বিজনাথ গ্লোরিয়ার সঙ্গে সেখানে এল। মিষ্টি গন্ধ লাগল দ্বিজনাথের নাকে।

"জাহাজ ছাড়তে এখনও অনেক দেরী। এস, এখানে কিছুক্ষণ বসি।"

আরও পরে মুখটা আশ্চর্য রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠল গ্লোরিয়ার, "ইন্ডিয়া কত দূরে?"

"আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব গ্লোরিয়া।"

"আমি জানিনা কারো আমার ভাল লাগবে কি না। যে চাকরি নিয়ে যাচ্ছি তা কেমন তা-ও জানি না। আমি সেখানে শুধু তোমারই প্রতীক্ষা করব।"

গ্লোরিয়ার একটা হাত খুব শক্ত করে চেপে ধরল দ্বিজনাথ, "আমি আসবই।"

কিন্তু দ্বিজনাথের মাথা ঘুরছিল। গ্লোরিয়া, সেই ঘর আর জিব্রল্টরের নরম মাটি যেন অস্বাভাবিক বেগে ঘুরছিল। দেখতে-দেখতে অন্ধকার হল। অন্ধকার আরও ঘন হল। সেই নিকষ কালো অন্ধকারে আলোর কোন রেখা ছিল না। দ্বিজনাথ আবার সমুদ্র দেখল।

জাহাজটা অনেক দূরে ভেসে গিয়েছিল। একটা দমকা ঝড় দ্বিজনাথকে ঠেলে জাহাজে তুলে দিল। কিন্তু দ্বিজনাথের মনে হল, গ্লোরিয়া নয়, অন্য একজন তাকে ধরে রেখেছিল। তার সঙ্গে ছায়ার মতো চলে আসতে চাচ্ছিল। তাকে সঙ্গে নিয়ে আসার শক্তি দ্বিজনাথের ছিল না বলে সে বুকের মধ্যে বেদনা অনুভব করল।

নাচের বাজনায় জাহাজটা তখনও গম গম করছিল। কিন্তু আলোর বর্ণচ্ছটা অসহ্য মনে হচ্ছিল দ্বিজনাথের। গ্লোরিয়ার উজ্জ্বল মুখটাও যেন একেবারে নিভে গিয়েছিল। দ্বিজনাথ স্থলের ক্রন্দন শুনছিল।

ডেকে একা দাঁড়িয়ে দ্বিজনাথ দূর ভূমি-খন্ডের দিকে তাকাল। সেই অন্ধকারেও কঠিন ভূমিখন্ডের ওপর দ্বিজনাথ একটা মানুষের মূর্তি দেখল। সে মূর্তি ক্লান্ত শীর্ণ—দ্বিজনাথের কাছে আসবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

দ্বিজনাথ যেন বোবা হয়ে গেছে। তার দেহও নিশ্চল হয়ে গেছে। সে মানুষকে দ্বিজনাথ কিছুতেই নিজের কাছে টেনে আনতে পারছে না। আর সমুদ্রের ব্যবধান ঘুচিয়ে সে নিজেও তার কাছে পৌঁছতে পারছে না।

অক্ষম অসহায় দ্বিজনাথের গলা চিরে হঠাৎ আর্তস্বর বাজল, "রেখা!"

সেই মূর্তিকে আরও শীর্ণ আরও ঝাপসা মনে হল। অন্ধকার সমুদ্র তীরে একা-একা দাঁড়িয়ে রেখা চিৎকার করে কাঁদল, "আমি তোমার কাছে যাব।"

যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল দ্বিজনাথ। তারও গলায় কান্না কাঁপছিল। তার স্বর ভাঙা-ভাঙা শোনাচ্ছিল, "তুমি সমুদ্র দেখতে চেয়েছিলে?"

"আমি সমুদ্র দেখব!"

দ্বিজনাথের বুকের মধ্যে অনুতাপের আগুন ধক ধক করে উঠল, "আমি পারলাম না—তোমাকে সমুদ্র দেখাতে পারলাম না রেখা—"

(শেষাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায়)

শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

এ-কি উষার অরুণ, না শারদাকাশের চাঁদ? সার্বভৌম দেখিলেন—এক জ্যোতির্ময় বিগ্রহ জগমোহন তলে শয়ান। জগন্নাথ দেবের সেবক পড়িছাগণ (ছড়িদারগণ) তাঁহাকে প্রহারে উদ্যত। সার্বভৌম তাঁহাদের নিবারণ করিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু পুরীধামের নিকটবর্তী ভার্গী নদী তীরে কমলপুরে জগদানন্দের হস্তে আপন দণ্ডখানি দিয়া কপোতেশ্বর দর্শনে গমন করেন। জগদানন্দ শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে দণ্ড-কমণ্ডলুর ভার দিয়া স্নান করিতে যান। নিত্যানন্দ সেই অবসরে দণ্ডখানি ভাঙিয়া ফেলেন। এই জন্যই মহাপ্রভু আঠার নালা হইতে একাকী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই দিব্যোন্মাদবশত তিনি শ্রীবিগ্রহকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন, এবং অল্পদূর গিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ছড়িদারেরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিতে আসিয়াছিল, সেই সময়েই সার্বভৌম আসিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করেন।

নবদ্বীপের ভারত বিখ্যাত বিদ্বান, পণ্ডিত-কুল চূড়ামণি শ্রীবাসুদেব সার্বভৌম জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন শকাব্দের চতুর্দশ শতকের মধ্য-ভাগে, অনুমান খৃষ্টাব্দের ১৪৩০-৩৫ মধ্যে। পিতার নাম নরহরি বিশারদ, মাতার নাম ভাগীরথী। পিতা নরহরি সর্বশাস্ত্রে বিশারদই ছিলেন। সার্বভৌম পিতার নিকটেই ন্যায় বেদান্তাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। নব্য ন্যায়ের স্রষ্টা স্বনামধন্য রঘুনাথ শিরোমণি সার্বভৌমের ছাত্র। ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া উঠিলে ছাত্রকে স্থান ছাড়িয়া দিয়া কতকটা বা রাজভয়ে বাসুদেব পুরী চলিয়া যান। উৎকলাধিপতি পুরুষোত্তমদেব তাঁহার পাণ্ডিত্যে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম-দেবের অন্তে সার্বভৌম মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সভা অলঙ্কৃত করেন। বাসুদেব শতায়ু ছিলেন।

রাজ সভাপণ্ডিত সার্বভৌম প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শনে আসিতেন। সেই পুণ্যে দারুব্রহ্ম দর্শনে আসিয়া আজ সচল ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিলেন। দেখিলেন লাবণ্য লহরীতে বন্দী অপরূপ রূপ, সারা দেহ সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব ভূষণে বিভূষিত। মানব দেহে এই অধিরূঢ় ভাবের বিকার! বিস্ময়ান্বিত বাসুদেব অতি যত্নেই পড়িছা এবং ছাত্রগণের সাহায্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দাদি আসিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন। দৈবক্রমে মহাপ্রভুর সঙ্গী মুকুন্দ দত্তের সঙ্গে সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্যের দেখা হইয়া গেল। গোপীনাথ সকলকে সার্বভৌম মন্দিরে লইয়া গেলেন। সার্বভৌম তাঁহাদিগকে জগন্নাথ দর্শন করিয়া আসিতে বলিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা দেখিলেন তখনো মহাপ্রভুর চেতনা হয় নাই। ভক্তগণ উচ্চকণ্ঠে শ্রীহরি সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। তৃতীয় প্রহরে প্রভুর চেতনা হইল। গোপীনাথ পরিচয় করাইয়া দিলেন—এই নবীন সন্ন্যাসীর পূর্বা-শ্রমের নাম নিমাই পণ্ডিত, বিশ্বম্ভর মিশ্র। জগন্নাথ মিশ্র ইহার পিতা, এই সন্ন্যাসী নীলাম্বর চক্রবর্তীর দৌহিত্র। আর মহাপ্রভুকে বলিলেন, আপনার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন বিশ্রুতনামা পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। উভয়ের মধ্যে সেই প্রথম পরিচয়। এই পরিচয় শেষে সেব্য সেবকত্বে পরিণত হইয়াছিল, বাসুদেব গৌরাঙ্গদেবের অন্যতম প্রধান ভক্তরূপে পরি-গণিত হইয়াছিলেন।

বাসুদেবের সম্বন্ধে কত না জনপ্রবাদ, তিনি মিথিলায় পড়িতে গিয়াছিলেন, ন্যায়-গ্রন্থ মুখস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন, ইত্যাদি। স্বর্গগত বন্ধুবর দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁহার বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান গ্রন্থে (নব্য ন্যায় চর্চা ১ম খণ্ডে) এই মতের অসারতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এমন কি রঘুনাথ শিরোমণিও যে মিথিলা গিয়াছিলেন তাহারো কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। বাসুদেবের এবং রঘুনাথের অনন্য সাধারণ প্রতিভাই এই প্রবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। এই নিবন্ধ গ্রন্থনে আমি সারস্বত অবদানে সাহায্য লইয়াছি।

নরহরি বিশারদ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্তাদি গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য প্রবেশাধিকার ছিল। হরিদাস রচিত গ্রন্থ বিবেকের টীকায় উল্লিখিত আছে—তথা গৌড় প্রৌঢ় পরিবৃঢ়ে বারবকে রাজ্যং শাসতি ইত্যাদি। মনে হয় সুলতান বারবক শাহের উৎসাহে নরহরি স্মৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। (খৃষ্টাব্দ—১৪৭৬) ন্যায় গ্রন্থের তত্ত্ব চিন্তামণি টীকাও নরহরি বিরচিত। মহাপ্রভুর মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী এই নরহরির সমাধ্যায়ী ছিলেন।

এই সময় হইতেই মিথিলার পণ্ডিতগণ নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের সঙ্গে পরিচিত হন। ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহারা গৌড় মত খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন, ইহার বহু প্রমাণ আছে। বাসুদেবও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। কিন্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে মাত্র কয়েকটি। 'অনুমান মণি পরীক্ষা' বাসুদেবের অন্যতম ন্যায়দর্শনের গ্রন্থ। বেদান্ত প্রকরণে অদ্বৈত মকরন্দের টীকা সার্বভৌম রচিত। অনুমিতি লক্ষণে সার্বভৌম নিজ গুরুর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হইতেই জানা যায় পিতা নরহরি বিশারদই তাঁহার গুরু। মহাপ্রভুর সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বেই হেত্বাভাস প্রকরণের প্রারম্ভে সার্বভৌম বলিতেছেন—

হৃদ্ব্যোম কমলাসীনং তত্ত্ব সাধক মন্ডুতং।
অনাভাসং পরং ধাম ঘনশ্যামমহং ভজে।

অন্তর্নিহিত এই ঘনশ্যাম প্রীতিই মহাপ্রভুর সঙ্গ প্রভাবে হৃদয়ে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তর্কনিষ্ঠ মন বিনা পরীক্ষায় মহাপ্রভুকে স্বীকার করিয়া লয় নাই।

সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বেদান্ত শুনিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। সপ্তাহকাল ধরিয়া মহাপ্রভু সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন। বেদান্ত শুনিতেন, কিন্তু নীরব থাকিতেন, কোন প্রশ্ন করিতেন না, মন্তব্যও করিতেন না। সাত দিন পরে সার্বভৌম জিজ্ঞাসা করেন, চুপ করিয়া আছ কেন? মহাপ্রভু বলিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। সার্বভৌম বলিলেন যে বুঝিতে পারে না, সে প্রশ্ন করে, জানিয়া লয়। মহাপ্রভু উত্তর করিলেন বেদান্তের সূত্র পড়িতেছ, বেশ বুঝিতেছি, তোমার ভাষ্য বুঝিতেছি না। ইহার পর বিচার আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন শ্রুতি সবিশেষ নির্বিশেষ—দুই ব্রহ্মের কথাই

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আরও দূরে সরে যেতে যেতে, আরও অস্পষ্ট হতে-হতে শেষবার ক্ষীণস্বরে রেখা মিনতি করল, "আমি সমুদ্র দেখব—"

রেখা অনেক দূরে সরে সরে যাচ্ছিল। দ্বিজনাথ আর তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। সে তাকে ডাকছিল। তাকে ধরে রাখতে চাচ্ছিল। কিন্তু ওদের দুজনের মাঝখানে ভয়ঙ্কর সমুদ্র গর্জন করছিল। অনেক হাঙ্গর ভেসে বেড়াচ্ছিল। এই সব বাধা অতিক্রম করে ওরা পরস্পরের নাগাল পাচ্ছিল না। একজন আর একজনের ধরা-ছোঁয়া না পেলেও অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওরা দুজনেই অকাল বার্ধক্যের খোলস পরে নিচ্ছিল।

বাতাস ছিল না। খাঁচাটা স্থির হয়ে ছিল। দ্বিজনাথ এখন খাঁচাটাকে আর সহ্য করতে পারল না।

এখনও রেখা ফিরল না। বিনু খোকা ফিরল না। দ্বিজনাথ অস্থির হয়ে উঠল। এখন বোধ হয় অনেক রাত। ছোট বারান্দায় ভাঙ্গা চেয়ারে বসে তার সময়ের খেয়াল ছিল না।

রেখা বিনু খোকা ফিরল আরও পরে। ওদিকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল। ওরা একেবারে ভিজে গিয়েছিল। টনসিল কট কট করছিল বলে খোকা ঘন ঘন কাশছিল।

সকলকে দেখে নিশ্চিন্ত হল দ্বিজনাথ। হাসল। তারপর খাঁচার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে রেখাকে বলল, "এতদিনেও ওটা এখান থেকে সরাতে পার নি?"

আস্তে আস্তে [illegible] নিজেই খাঁচাটা নামিয়ে রাখল।

বলিয়াছেন, বিচারে সবিশেষ মতই বলবত্তর হয়।

শ্রুতি বলেন—

"অপাণিবাদ জবনো গৃহীতা পশ্যত্য চক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণ" ব্রহ্মের হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি পদহীন, তথাপি বেগে ধাবিত হন, চক্ষু নাই, দর্শন করেন, কর্ণ নাই শ্রবণ করেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বুঝিতে হয় শ্রুতি বলিয়াছেন ব্রহ্মের প্রাকৃত কর চরণ নাই, প্রাকৃত চক্ষু কর্ণ নাই। এইরূপ অনেক বিচারের পর সার্বভৌম পরাজয় স্বীকার করিলেন। একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া মালা প্রসাদ লইয়া সার্বভৌম গৃহে উপস্থিত হইলেন। সবেমাত্র অরুণোদয় হইতেছে—মহাপ্রভু শুনিতে পাইলেন সার্বভৌম কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম করিতেছেন, বোধ হয় এইমাত্র জাগরিত হইলেন। বাহিরে আসিয়াই সার্বভৌম মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন। প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। আসনে বসিয়াই মহাপ্রভু জগন্নাথের প্রসাদ সার্বভৌমের হস্তে অর্পণ করিলেন। তখনো সন্ধ্যা-বন্দনা তো দূরের কথা মুখ প্রক্ষালন দন্তধাবনাদি কোন কিছুই হয় নাই, সার্বভৌম কিন্তু মহাপ্রসাদ পাইবা মাত্র মুখে তুলিয়া দিলেন। আনন্দে মহাপ্রভু তাঁহাকে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নাচিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন—

আজি আমি হেলায় জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি আমি করিনু বৈকুণ্ঠে আরোহণ।
আজি মোর পূর্ণ হইল সব অভিলাষ।
সার্বভৌমের হইল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।

আজি নিষ্কপটে তুমি হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে হৈলা তোমারে সদয়।

চৈতন্য চরিতকারগণ কেহ বলেন সার্বভৌম মহাপ্রভুর ষড়ভুজ মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। একই দেহে দুই হাতে ধনুর্বাণ, দুই হাতে বংশী, দুই হাতে দন্ড কমন্ডলু। চৈতন্য চরিতামৃত প্রণেতার বর্ণনায় জানা যায়—তিনি প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্তি দেখিয়া পরে দ্বিভুজ মুরলীধরকে দেখিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বিষয়ে রচিত সার্বভৌমের দুই শ্লোক চরিতামৃতে আছে। একটির অর্থ—"বৈরাগ্য বিদ্যা এবং নিজ ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার জন্য যে করুণার্ণব এক অদ্বিতীয় আদি পুরুষ শ্রীচৈতন্যরূপে জগতে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলাম।" আর একটির অর্থ—"কাল-প্রভাবে বিনষ্টপ্রায় নিজ ভক্তি যোগ পুনরায় প্রচারের জন্য যিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণ কমলে আমার চিত্ত ভ্রমর নিবিড়ভাবে মজিয়া থাকুক।" গোপীনাথ আচার্য যখন মহাপ্রভুকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—তখন সার্বভৌম কত তর্ক তুলিয়াছিলেন। এখন তিনিই পুরীধামে মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্তগণের অন্যতম। বাস্তবিকই এইরূপ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিনিষ্ঠ একজন প্রকান্ড পন্ডিতকে স্বমতে আনয়ন, তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং ভগবানরূপে আসন গ্রহণ, শ্রীমহাপ্রভুর লীলাতেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জনজীবনে ইহার প্রভাব অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ হইয়াছিল। অবশ্য মহাপ্রভুর লীলায় ইহা অপেক্ষাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অভাব নাই। বঙ্গের তদানীন্তন সর্বোচ্চ পদগৌরবে সমাসীন শ্রীরূপ সনাতনের এবং ধনকুবের গোবর্ধন দাসের পুত্র দাস রঘুনাথের সর্বস্বত্যাগ, আজিকার দিনে চিন্তা করিলেও যেন দিশা হারাইতে হয়।

শ্রীরূপের পদ্যাবলীতে সংগৃহীত সার্বভৌম রচিত একটি শ্লোক,—মহাপ্রভুর সঙ্গে পরিচয়ের পরের রচনা—

জ্ঞাতং কাণ ভুজং মতং পরিচিতৈ বাম্বিক্ষিকি শিক্ষিতা মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্য সরণিযোগে বিতীর্ণা মতিঃ। বেদান্তঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিন্তু স্ফুরন্মাধুরী ধারা কাচন নন্দ সূনু মুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি।

সার্বভৌমের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি খড়দহ মেলের বিখ্যাত কুলীন কামদেব পন্ডিতের পুত্র সুধাকরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সার্বভৌমের ভ্রাতা বিষ্ণুদাস বিদ্যা বাচস্পতি সনাতনের গুরু। কাহারো কাহারো মতে চমূপতি বা চম্পতি ভণিতার পদ জলেশ্বরের রচিত। চন্ডিদাস নামে সার্বভৌমের এক সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। আমার মতে দ্বিজ চন্ডিদাস ভণিতা দিয়া ইনিই কতকগুলি বিখ্যাত পদ রচনা করিয়াছিলেন। সার্বভৌমের অপর পুত্রের নাম চন্দনেশ্বর। জলেশ্বর এবং চন্দনেশ্বর উড়িষ্যাতে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর শান্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যকাররূপে স্মরণীয় হইয়া আছেন। রঘুনাথ বিদ্যালঙ্কারের "অনুমান দীধিতি প্রতিবিম্ব" গ্রন্থে রঘুনাথ শিরোমণি বাসুদেবের ছাত্ররূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

স্বর্গগত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে সার্বভৌম শেষ বয়সে কাশীবাসী হইয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে সার্বভৌমের কাশীধামে যাওয়ার উল্লেখ আছে। কাশী খন্ডের টীকাকার রামানন্দ বন বাসুদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় চৈতন্য মত বিরোধী প্রকাশানন্দের মন্দ মত নিরসনের জন্যই তিনি কাশী গিয়াছিলেন এবং কাশী হইতে পুরীধামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই বর্ষীয়ান্ পন্ডিতাগ্রণী অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রাজ মাহেন্দ্রীর প্রদেশপাল রায় রামানন্দ যখন পুরীধামে ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গেও ইহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। রায় রামানন্দ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ, আর বাসুদেব নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ। সে কালে বাঙ্গালী উড়িষ্যায় কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই দুইজনকে দেখিয়াই তাহা জানিতে পারি। আমার মনে হয় মহাপ্রভুর দেহের সাত্ত্বিক বিকার যে সার্বভৌমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, রায় রামানন্দের সাহচর্য তাহার অন্যতম কারণ। হেত্বাভাসের প্রারম্ভ শ্লোকে সার্বভৌমের ঘনশ্যাম প্রীতি দেখিয়াছি। তাঁহার মত পন্ডিত যে অলঙ্কার শাস্ত্রে পারঙ্গম ছিলেন, সে কথা না বলিলেও চলে। নরহরি বাসুদেব ও রঘুনাথ শিষ্যপরম্পরায় নব্য ন্যায়ের অঙ্কুর, কান্ড ও শাখা প্রশাখা। এদিকে বাসুদেব জলেশ্বর ও স্বপ্নেশ্বর—পিতা পুত্র ও পৌত্র এই তিন পুরুষকে বংশপরম্পরায় ভক্তি পথেও বিচরণ করিতে দেখিলাম। বাসুদেব সার্বভৌম বাঙ্গালীর বন্দনীয় পুরুষ।

———

ক্ষুধা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অবশেষে বৃষ্টি এলো। খুসি মনে গাছের জটলা
মাঠের সবুজ চোখ চেয়ে আছে আকাশের দিকে
ক্ষণে-ক্ষণে বজ্র শুধু হানে তার কটাক্ষের বাণ
তারপর ঝমঝম চতুর্দিক একেবারে ফিকে।
চক্ষে তার তৃষ্ণা তবুও তো মেটে না কখনো
তৃষ্ণা তার বক্ষ জুড়ে হাহাকার করে
কোথায় উধাও হবে হৃদয়ের রুক্ষতা ডিঙিয়ে
প্রতি স্বার রুদ্ধ তাই অর্থ নেই কোনো অভিসারে।
আলেয়ার কুহেলিকা মন তার পারেনি এড়াতে
পাবো বলে ছুটে গিয়ে জলা থেকে জলান্তরে যায়
সলিল-সমাধি তার এ-নিয়তি কী করে এড়াবে
স্মৃতির এ-রাখী দিয়ে দাঁড়াতে কি পারবে বন্যায়?
শতক্রতু ক্রমাগত অস্ত্র তার হেনেই চলেছে
ইন্দ্রপুরী গোপন করে রেখেছে সব সুধা
অন্ধকার বৃষ্টি এলো আকাশ মুখ ঢাকে
যুগল স্তনে বলো কি শুধু অনির্বাণ ক্ষুধা?

গোধূলি বেলায়

শ্রীশান্তি পাল

গোধূলি মুদিল আঁখি, সন্ধ্যা জ্যোৎস্নামুখী,
চাঁদের শীতল আলো নামে ধরণীতে।

কর্মস্রোত থেমে গেল, চরাচর সুখী,
দিবা আর রাত্রি মিলে জোয়ার-ভাঁটিতে।

তারার প্রদীপ জ্বলে ধ্রুবেরে ঘিরিয়া:—
তিমির অঞ্চলে ঢাকি' গগন-বেলায়,
দিগঙ্গনা অভিসার—তৃষাতুর হিয়া
রাত্রির বিলাসে চলে আনন্দ-মেলায়।

ঊষা না ফুটিতে নভে উদয় শিখরে
আলোক বসন বোনে পাণ্ডুর আকাশে:
সৃষ্টির জগৎ পুনঃ নবজন্ম ধরে,
নিখিল বিশ্বের আত্মা জাগে কলভাষে।
এই সত্য চিরদিন—তুলির পরশে,
শিল্পী-কবি কত ছবি রচে রূপে রসে।

হে ঈশ্বরী

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বলছো তুমি—
বিছিয়ে আছো, শীতল পাটির মতই হৃদয়খানি।
যুগের পরে যুগ হলো যে পার
অসহ্য এক যন্ত্রণাতেই সময় কেটে গেল
তবুও তোমার হিসেব কষা, শেষ হলো না আর॥
ঈশানে মেঘ, নৈঋতে ঝড়,
উত্তরেতে শীত
পশ্চিমেতে গুমোট গরম হাওয়া,
পায়ে বেড়ী, চলতে বাজে, শব্দ বিষম তার
শুনতে পাবে, জানবে সবাই—
ভয় যে লাগে, কেমন করে করবো অভিসার।

হে ঈশ্বরী, দোহাই তোমার! ফিরিয়ে রাখো চোখ
তুলে রাখো শয্যা-শীতলপাটি,
পাঁজিপুঁথির বহর নিয়ে, প্রহর গোণো নিত্য অনিবার
যাবার সময় জানিয়ে যাবো,
হে ঈশ্বরী—
নিয়ে গেলাম শূন্য বুকে, কান্না-হাহাকার॥

হে আকাশ, নীল হও

প্রভাকর মাঝি

নীলাকাশ রক্তবর্ণ হয়ে গেল আগুনের আঁচে
গৃহের পবিত্র শান্তি বাঁচে কি না বাঁচে।
সরীসৃপ-কামনায় বিষাক্ত অন্তর—
সূর্যের সম্বিৎ নেই, ছলো ছলো ম্লান দ্বিপ্রহর।
ভয়, বড়ো সর্বনেশে ভয়,
ভেঙে যাচ্ছে, ধ্বসে যাচ্ছে পুরানো প্রত্যয়।
শাশ্বতী সে বাণী নয় শ্রেষ্ঠ কবিতার,
একমাত্র সত্য শুধু সূচীমুখ হিংস্র হাতিয়ার।
শোণিত-তৃষ্ণায় মেতে, কে তুমি জল্লাদ,
অন্ধকারে তোলো সিংহনাদ,
পৈশাচিক উল্লাসে এ কার করতালি,
ছিন্নমূল মানবতা সভ্যতার মুখে লেপে দিল চুণকালি।
শিল্পের সুন্দর নাম করো না, করো না,
নিষ্পাপ শিশুর কান্না, অশ্রুমুখী কুমারীর আর্তি যায় শোনা।
ভয়, বড়ো সর্বনেশে ভয়,
সাহিত্যের সত্য আজ বিদ্রূপের মত মনে হয়।
চারদিকে শকুন চোখ, অবিশ্বাসী হাওয়ার হুঙ্কার,
প্রীতি নাই, আশা নাই, আলো নাই আর।
কোথায় বাঁধবো রাঙা রোদ্দুরের রাখী,
হে আকাশ, তুমি আর নীল হবে না কি?

কিছুক্ষণ

শিবদাস চক্রবর্তী

এখানে অনেক আলো, রোদে-ভেজা হাওয়া করে ভিড়
উপরে আকাশ নীল, নীচে মাটি মমতা-নিবিড়,
ঊর্ধ্বমুখী প্রতীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য সাক্ষী করে
এখানে সবুজ ঘাস পান্থজনে আতিথ্য বিতরে।

এখানে প্রকৃতি নেই, আছে প্রকৃতির অনুকৃতি,
নাগরিক পরিবেশে ক্ষণিকের বাঞ্ছিত নিভৃতি,
এখানে পথিক পাখি মহানন্দে পাথেয় সন্ধানে
দুদণ্ডের অবসর ভরে তোলে উচ্ছ্বসিত গানে।

এখানে উচ্ছল প্রাণ দেয়ালের মানে না শাসন,
চঞ্চল শিশুর দল সদ্য-ফোটা ফুলের মতন
ছড়ায় দুহাত ভরে অনাবিল অকারণ হাসি—
না হয়ে কখনো তারা কারো কাছে কিছুর প্রত্যাশী।

এখানে ছুটির দিনে ঘর ছেড়ে একা আসি চলে
নিজেকে একান্ত করে কিছুক্ষণ কাছে পাবো বলে:
কারণ, এখানে এলে সব গ্লানি করে দেয় দূর—
ত্রিকোণ পার্কের এই মায়াঘন পড়ন্ত দুপুর।

ছবির মুখ

ছবি,—শুধু ছবি!

ছোটো ছোটো কাগজের টুকরো যত্ন করে রেখে দেয় ইন্দিরা। যেখানেই ছবি পায়, কেটে রাখে। পুতুল খেলার ঝাঁপি আর সাবানের খালি বাক্সটা ভরে উঠেছে। টুকরো টুকরো কাগজ,—পাঁজির পাতা, খবরের কাগজ আবার বইয়ের পাতার টুকরো। আগে আগে ছিঁড়ে নিতো; এখন ছোট্ট কাঁচি দিয়ে কেটে নেয়।

লুকিয়ে লুকিয়ে তুই কি করিস রে?

এ্যাঁ, এই কাণ্ড!

ঝণ্টু এসে কাড়াকাড়ি করে। ও-বাড়ির ওতা এসে অবাক হয়,—এ আবার তোর কি শখ রে? কি হবে ওই ছাইপাশ ছবিগুলোতে?

তবু ছবির টুকরো জমে ওঠে। নিরিবিলিতে ঘরের কোণে বসে উল্টে পাল্টে ছবিগুলো দেখে ইন্দিরা।

—বাঃ, কি সুন্দর মুখ! না, এটা নয়, ওটা। চোখ দুটো কেমন বড়ো বড়ো। না, নিশ্চয়ই ওটার মতো নয়। টানা-টানা চোখই ভাল। বাঃ, এর চোখ দুটো কেমন টানাটানা। মুখে হাসি লেগে রয়েছে।

—নাঃ, ছবি দেখে গায়ের রঙ বোঝা যায় না। ঝণ্টু বলেছিল,—জানিস, ফোটোতে কালো মানুষকে ফর্সা দেখায়!

—ভাইত! না, না, ঝণ্টুটা কিচ্ছু জানে না। বাবাকে জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তরই দেয় না শুধু হাসে। আবার কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে।

—হ্যাঁ, একদিন বলেছিল, তা কতকটা সত্যি বটে।

ইন্দিরার মনের কথা কে বুঝবে? ছবি দেখলেই তার মনটা কেমন করে ওঠে। ছবি! কোন্ ছবিটা ঠিক হবে?

—ধ্যেৎ, তা কি হয়? একজনের চেহারা আর একজনের মতো হতেই পারে না।

ঝণ্টু তাকে বলেছিল বিদ্রূপ করে।

ওরা বড়ো বিরক্ত করে। ছবিগুলো আর সহজে বের করে না ইন্দিরা। ওদের দেখলেই লুকিয়ে ফেলে।

আঃ! ছবিটার একটুখানি নষ্ট হয়ে গেল। —শাড়ির ঠোঙাটা কেটে ছবিটা সংগ্রহ করেছে ইন্দিরা। ছবির বাঁদিক্টা ছিঁড়ে গেছে। তবু কপাল আর চোখ ঠিকই আছে।

—টিপ পরেছে! কেমন স্পষ্ট! কিন্তু মুখটা কেমন গম্ভীর! তবু ভাল লাগে। ঝণ্টুর দিদি কুমকুমের টিপ পরে, সুন্দরই লাগে। ঋতার মায়ের কপালে যেমন সিঁদুরের বড়ো টিপ। হরিশ পণ্ডিতের ছেলের বউকে কেমন সুন্দর লাগে। হ্যাঁ, সিঁদুরেই ভাল মানায়। কপালের উপর ঘোমটা থাকবে। লাল-পাড় কেমন বেড় দিয়ে মাথাটাকে ঢেকে রাখবে, —জ্বল্-জ্বল্ করবে সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতে সিঁদুর সবচাইতে সুন্দর।

বউ!—না, বউই আবার মা হয়ে ওঠে। ওই তো দু'বছর আগে হরিশ পণ্ডিতের ছেলের বিয়ে হল। এখন কোলে একটি মেয়ে। ডলের পুতুল। কেমন হাত-পা ছোড়ে। হাসে,—খিল-খিল হাসি। গালটা টিপে দিলে আরো হাসে। আর দুদিন পরেই এই ছোট্ট খুকীটার মুখে বুলি ফুটবে—আ-আ-আ, —মা-মা—মাম্মা!

আপন মনে বিড়বিড় করে কথা বলছে ইন্দিরা,—সব্বাইর মা আছে। ঝণ্টুরও আছে, ঋতারও আছে। ওই লছমনিয়াটারও মা আছে।

—এত বড়ো হয়েছে ঝণ্টুটা। তবু মাকে কেমন জড়িয়ে ধরে। সেদিনত তার মায়ের গলাটা দু-হাতে জড়িয়ে ধরে ঝুলছিল। বাব্বা!

কে যেন ডাকে—মা!—ফ্যালফ্যাল করে এদিক-ওদিক তাকায় ইন্দিরা।

—আচ্ছা বৌদি! খুকুকে একটু আমার কোলে দাও না।

খুকুকে বুকে চেপে ধরে ইন্দিরা।

—বল্ মা, মা, মা! আঃ, দুষ্টু মেয়ে কেবল হাসি।

এমন ক'রেই ইন্দিরার দিন কাটে।

ইন্দু!—বাবা ডাকেন।

—আচ্ছা বাবা, মায়ের একটা ছবি তুলে রাখোনি কেন?

বাবার মুখে কি যেন কেমন হাসি খেলে যায়। আবার কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায় মুখখানা। এরকম দেখলে ইন্দিরার কেমন যেন ভয় হয়!—আচ্ছা, বাবা কি ভাবেন?

—ছবি দিয়ে কি হবে পাগলি!

বাবার মুখটা থমথমে হয়ে ওঠে। ইন্দিরার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন ডাক্তার শঙ্কর সান্যাল।

তবু কতদিন বাবাকে একই প্রশ্ন করেছে। এখন ইন্দিরা বড় হয়ে উঠেছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। ছবি দেখলেই মনটা কেমন করে ওঠে।

তারপর একদিন—

স্কুলের লাইব্রেরীর কি একটা বইয়ের ছবি কেটে নিয়েছে ইন্দিরা। খাতা ধরিয়ে দিয়েছে। হেডমিস্ট্রেস মিস্ মল্লিক ডেকে পাঠিয়েছেন।

—তুমি ছবি কেটে নিয়েছো?

চুপ করে দাঁড়িয়েছিল ইন্দিরা। চোখে তার জল। ছলছল করছে চোখ দুটি।

—কেন? কেন কেটে নিলে? বইটার দাম দিতে হবে।

ইন্দিরার চোখে ধারা নামে। শুধু একটি কথা শোনা গেল—মা!

হেডমিস্ট্রেস কিছুই বুঝতে পারেন না। বইটার পাতায় ছিল একজন মহিলা কবির ছবি। ছবিটা নেড়েচেড়ে দেখেন মিস্ মল্লিক। কাপড়ের পাড়টা কপালের উপর পর্যন্ত,—সুন্দর প্রশান্ত মুখের ছবি। কপালে সিঁদুরের টিপ।

বলো,—কেন এ ছবি কেটে নিলে?

ইন্দিরা উত্তর দেয়নি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে মিস্ মল্লিকের কি জানি কি মনে হ'ল। ইন্দিরাকে বললেন,—আচ্ছা যাও! বড়ো হয়েছো। ভাল মেয়ে। আর ওরকম করো না।

মিস মল্লিকের কাছে থেকে ফিরে এসে আকাশ-পাতাল ভাবেন ডাক্তার শঙ্কর সান্যাল। হ্যাঁ,—তেরো বছর, ঠিক তেরো বছরই হয়েছে। তিন মাসের মেয়েকে নিয়ে সে কি ঝঞ্ঝাট! মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল। দুদিন চুপ করে খোঁজাখুঁজি করেছিলেন। কাউকে কোনো কিছুই জানতে দেননি।

তারপর এই নেপালী আয়া আর মেয়েকে নিয়ে সুদূরে এই শহরে পাড়ি দিয়েছিলেন শঙ্কর সান্যাল।

সুমিতা মরে গেছে! মেয়েটির মা নেই।

নেই?—সত্যি কি সুমিতা মরে গেছে?—পায়চারি করতে থাকেন শঙ্কর সান্যাল।

মেয়েটার এ কি খেয়াল?—ছবি, শুধু ছবি! একটা আলমারি খুলে একরাশ বইয়ের নীচে খুঁজতে থাকেন শঙ্কর সান্যাল। এতোদিন তো মনে পড়েনি!

ইন্দিরা বড়ো হয়েছে। জানবে না, কোনোদিন জানতে পারবে না, তার মায়ের কথা। হ্যাঁ তার বাবার কথাও!—বুকের ভেতর খচ্ করে কি যেন বিঁধে যায়। ভুলে যাওয়া ছবি মনে পড়ে। ইন্দিরা যতই বড়ো হয়ে উঠছে, তার মাঝেই ফুটে উঠছে সেই ছবি। অবিকল সেই মুখ,—সেই হাসি। কি আশ্চর্য।

—হ্যাঁ, এই তো সেই অ্যালবাম!—উল্টে-পাল্টে দেখেন শঙ্কর সান্যাল। কিছুক্ষণ একটা ছবির দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর রেখে দেন।

—থাক্, থাক্! ও-ছবি দেখিয়ে লাভ কি? মিস্ মল্লিক বলেছেন, আসল ছবিটা দেখলে এই ঝোঁকটা থেমে যাবে। কি জানি? দরকারই বা কি?

—কার দোষ?—শঙ্কর সান্যাল তো সবই মেনে নিয়েছিলেন। অন্ধ অধ্যাপক গুরুদয়ালের মৃত্যুশয্যার সেই অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়ে। সুমিতাই তাকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। তখন তো সুমিতা আপত্তি করেনি।

—কেউ নেই বাবা! সুমিকে তোমার হাতে তুলে দিলাম।—শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। তাঁকে ভালবাসত, ভক্তি করত শঙ্কর সান্যাল।

আগে অতশত ভাবেনি শঙ্কর সান্যাল। বেপরোয়া হলেও আপন কাজেই ব্যস্ত থাকত শঙ্কর সান্যাল। পোষাক-আশাকের ঠিক-ঠিকানা ছিল না। রিসার্চ, শুধু রিসার্চ নিয়েই থাকত।

বন্ধুরা বলত,—দার্শনিক। ক্লাশের মেয়েরা বলত,—আপনভোলা মহেশ্বর। সুমিতাও টিপ্পনী কাটতে ছাড়ত না। এই সুমিতা আর সুভদ্র! লজ্জা-সরম ছিল না ওদের। ওদের নামে কত কি শুনত!

সেই শঙ্কর সান্যালই পড়ে গেল ফাঁদে। সুভদ্র পালিয়েছে। হায়ার ষ্টাডির জন্য বিলেতে গিয়েছে সুভদ্র—ব্যারিষ্টার আনন্দ বর্ধনের একমাত্র ছেলে।—আর সুমিতা?

শঙ্কর সান্যাল আর সুমিতার মাঝে যে অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে উঠেছে,—বিয়ের মাস-তিনেকের মধ্যেই বুঝতে পারলে শঙ্কর সান্যাল। তবু সুমিতা যদি বুঝত। বোঝেনি সুমিতা, হয়ত মৃত্যুপথযাত্রী বাবার মনে চরম আঘাত না দিতে গিয়ে চুপ করেই ছিল। কিন্তু সুমিতার মাঝে আগুন জ্বলছে। সুভদ্রই জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে সে আগুন।

তুমি ভেবো না সুমিতা! ভুল,—ভুল তো মানুষেরই হয়। তার জন্য তুমি তো দায়ী নও। আগের সব কথা ভুলে যাও সুমিতা। যে আসছে, তার অমঙ্গল করো না।—শান্ত হাসিমুখে সুমিতাকে বুঝিয়েছিলেন শঙ্কর সান্যাল।

সুমিতা কি যেন ভাবত। বিশেষ কোনো উত্তরই দিতো না। মনে হতো তাকেও সহ্য করতে পারছে না সুমিতা।—লোভ? লোভে পড়েছিল সুমিতা। সুভদ্র তাকে প্রতারণা করেছে! সুমিতার পেটে এসেছে এই ইন্দু,—ইন্দিরা!

—পালিয়ে গেছে, না আত্মহত্যা করেছে? আজ তেরো বছর। না, সুমিতা বেঁচে নেই। বেঁচে থাকবার মেয়ে সে নয়। আঃ, ইন্দু,—ইন্দুর তো কোনো দোষ নেই। আমার ইন্দু!

যদি সুমিতা বেঁচে থাকে? না, না,—ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন শঙ্কর সান্যাল।

এ-কি? এ ছবি কার? নামও লেখা রয়েছে—সুমিতা! ওরকম মুখ তো দেখেছি। আমার দিকে কেমন তাকিয়ে থাকে। হাসপাতালের নার্স! মাথায় সাদা রুমালের ঘেরা-টোপ! কিন্তু কপালে সিঁদুরের টিপ নেই।

একদিন, দুদিন, তিন দিন! ওর মুখের দিকে তাকালে কেমন যেন হয়ে যায় ইন্দিরা।

না-না,—ছবি, ছবি!—ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে ইন্দিরা।—আর কিছু তার মনে থাকে না।

ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার সান্যাল।

এ-কি! ইন্দিরা বেঁহুশ হয়ে পড়ে আছে। সেই ছবিটার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে মেয়েটা।

নাড়ীটা ক্ষীণ! সংজ্ঞা প্রায় নেই।

জল! জল!

কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। নেপালী আয়াটা হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে। হাসপাতালে নিতে হ'ল।

তেরো বছর!—এ-কি রোগ! মাকে তেরো বছর দেখেনি, আর সেই তিন মাস বয়সের দেখা। তার ছবি দেখে এ কি হ'ল? ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছে ইন্দিরা। মাঝে মাঝে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে বাবার মুখের দিকে তাকায়। নাঃ, মেয়েটা বাঁচবে না। এ কি হ'ল। প্রবীণ ডাক্তার মনোতোষ ভাবাও হতভম্ব!—সিরিয়াস কেস্! মেন্টাল শক্। ভাল হলেও মানসিক বিকৃতি ঘটতে পারে।

পাগলের মতো হাসপাতালের দিকে ছুটলেন শঙ্কর সান্যাল। রাত্রে ঘুমোননি।

প্রভাতের আলো পড়েছে বিছানায়। নার্সের কোলে মাথা রেখে এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইন্দিরা। দুজনের মুখেই অকৃপণ হাসি।

এগিয়ে চলেছেন শঙ্কর সান্যাল। তিনি কি স্বপ্ন দেখছেন! এখনো কি রাত রয়েছে। তিনি বিছানায় শুয়ে নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখছেন!

নাঃ! কথা বলছে!—কে এই নার্স? ছবি?—ইন্দিরা কি এতোদিনে তার হারানো ছবিটা পেয়ে গেছে!

—সুমিতা!

ইন্দিরা আঁতকে উঠল। আর নার্স চোখ তুলে চাইল। তার চোখে আর আগুন নেই, ঠিকরে পড়ছে মমতার ধারা!

কিন্তু ইন্দিরার যে চোখের পাতা আর পড়ে না!

আর্তকণ্ঠে নার্স বলে উঠল—এ-কি হ'ল?

পলক আর কোনোদিন পড়বে না চোখের পাতায়। ইন্দিরা তার ছবির মুখ পেয়ে গেছে। সুমিতার চোখেও অঝোরে ধারা বইছে।

পরাজয়

নির্লজ্জ! নির্লজ্জ! চমকে উঠে নিজের হাতে নিজের চোখ ঢাকল মনীষা, ওদের যদি এতটুকু লজ্জা সরম না থাকে, তবে মনীষাকে তো নিজের চোখের লজ্জা ঢাকতেই হবে।

মনীষার ঘরের সামনেই লম্বা বারান্দা। তার শেষ লম্বা সিঁড়ির একপাশে বসেছে ওরা দুজন। মনীষা মনে মনে ওদের বেহায়াপনার নিন্দে করে করে অবশেষে নিজের চোখের সামনের জানলাটাই বন্ধ করে দিল।

নাঃ, বন্ধ হাওয়ায় দম যেন আটকে আসে। আবার জানলাটা খুলে বাইরের দিকে উঁকি দিল মনীষা। ওরা দুজনে বসে আছে পাশাপাশি। বাইরে ফুটফুটে জোৎস্নায় ভরে গেছে। রাত্রির অপরূপ মায়াজাল ছড়ান প্রকৃতি। পূর্ণিমার মিলনতীর্থের সহযাত্রী ওরা। দুটি সদ্য প্রস্ফুটিত তরুণ-তরুণী। উপচে পড়ছে ওদের আনন্দ। মনীষার চোখে কৌতুক জ্বলে উঠল, সর্বাঙ্গে জাগল শিহরণ। কে? কে ওই মেয়েটি? জ্বালা ধরে মনীষার চোখে, যেন কোন মায়াবিনী চারিধারে ছড়িয়ে দিয়েছে তার মোহিনী শক্তি। কিন্তু কি সুন্দর, কি দৃপ্ত ওর বসবার, কথা বলবার, পাশ ফিরবার ভঙ্গি। দুজনে বসে বসে নিভৃতে কত কথাই না বলে চলেছে ওরা। পাশাপাশি দুলে দুলে উঠছে ওদের যুক্ত ছায়া দুটি। মাঝে মাঝে ওদের মুখের একটু একটু দেখা যাচ্ছে। চেনা চেনা মুখ। হ্যাঁ, ওদের দুজনকেই চেনে মনীষা। কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না তো ওরা কারা! ওই তো খিল খিল করে হেসে উঠল ওরা। মনীষার দিকেই তাকাল যেন! তবে কি ওকে দেখেই হাসিল নাকি? স্পর্ধার সীমা নেই। আজকালকার ছেলেমেয়েদের রকমই এই। নিজেদের জৌলুষে নিজেরা আত্মহারা। ধরাকে সরা জ্ঞান করা হয়। বয়স্করা ওদের হাসি আর করুণার পাত্র যেন। কেন? কেন? ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। একদিন সবারই দিন ছিল, আর একদিন সবারই দিন যাবে। বয়েসের গরমে ডগমগ। জ্ঞানের কোঠায় শূন্য! তাই না এত দেমাক।

তবুও শান্ত হিমেল রাত্রির মায়া লাগে মনীষার চোখে। মোহিনী রাত্রির চিরন্তন অভিসার জাগে আকাশের তারায় তারায়। কত সুখী ওই দুটি তরুণ-তরুণী. কত সম্পূর্ণ ওদের জীবন। ওরা নতুন, চঞ্চল ওরা, যৌবন ওদের, ওদেরই জীবন জাগে সমকালের ছন্দে ছন্দে।

এবার উঠে দাঁড়াল ওরা দুজন। ওদের আলাপের টুকরো ভেসে আসছে। আওয়াজ আসছে, কিন্তু কথাগুলো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কান খাড়া করে মনীষা। কৌতুক জাগে। কি এত গল গল করে কথা বলছে ওরা? আজেবাজে সস্তা প্রেমালাপ ছাড়া আর কি? কলেজের ছাত্রছাত্রী বলেই তো মনে হচ্ছে। আরে! অমন লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ার কি আছে! নির্লজ্জ, বেহায়া মেয়েটা! আদিখ্যেতা আর কাকে বলে? হাসিও পায়। নেহাতই ছেলেমানুষ ওরা। করুণার পাত্র। মনীষা নিজের দিকে ভাল করে তাকায়। আঁটসাঁট হয়ে আবার বসে জানলায় মুখ দিয়ে। নাঃ, ঐ মেয়েটাকে আর ঐ ছেলেটাকে না চিনতে পারলে স্বস্তি নাই মনীষার। মাথার মধ্যে কেমন জ্বলে ওঠে ওর। চোখ নেই ওদের। দেখতে পাচ্ছে না চারিধারে কত বাড়ীঘর, আশেপাশে কত লোকজন? মনীষার মত আরও যে কত লোক দেখছে ওদের তার ঠিক নেই। আহা, বেচারীরা! নেহাতই ছেলেমানুষ, না আছে বয়েসের অভিজ্ঞতা, না আছে সংসারের সুখদুঃখের ধারণা। হাওয়ায় হাওয়ায় ভাসছে ওরা। কিন্তু আর কদিন? বুঝবে একদিন, আর দেরীও নেই বেশি। বিয়ে হলেও দেখবে সংসারের কত ঝক্কি, আর কত জ্বালা। বেরিয়ে যাবে অমন কাণ্ডজ্ঞানহীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে প্রেম করে বেড়ান। আর বিয়ে না হলে তো মিটেই গেল। আর এই বা কি প্রেম? অল্প বয়েসের মাতামাতি বৈ আর কিছুই নয়। জীবনের বেদনার মর্ম ওরা কি বুঝবে? মানুষের হৃদয়ের গভীরে যে কী সম্পদ আছে তা কি একদিনে বোঝা যায়? ক্রমশঃ বিকশিত অভিজ্ঞতা আসে ক্রমশঃ পরিণত বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে। প্রেমের চোখে লাগবে প্রজ্ঞার আলো, সুখের দহনে খাঁটি হবে অন্তরের বাঁধন, তবেই না আসবে জীবনের পূর্ণতা। এ জীবনের প্রত্যেকটি স্তরই তার নিজস্ব রূপের বৈশিষ্ট্যে বীর্যবান। অপরিণতকে ঈর্ষা করার কী আছে? ওদের সহজ আনন্দ, সরল কৌতুক। ওরা করুণার পাত্র, বড়জোর স্নেহের পাত্রও হতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী হবে কি করে?

আরে! ওরা দুজন যে এইদিকেই মুখ ফিরিয়েছে। মুখের চেহারাও অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার ঠিক চিনতে পারবে মনীষা। আর একটু এগিয়ে এলেই চিনতে পারবে। ঐ তো আসছে এদিকেই। ছিঃ ছিঃ মনীষাকে দেখে ফেললে ওরাই বা কী ভাববে। হ্যাংলা ভাববে নিশ্চয়ই। আর আজকালকার ছেলেমেয়ে, হয়তো মুখের উপর ফট্ করে কিছু বলেই বসবে। তখন মনীষার মান থাকবে কোথায়?

মনীষা মাথা নামাল বিছানার উপর। এখন শুনতে পাচ্ছে ওদের পায়ের শব্দ, শব্দটা ক্রমশঃ মনীষার জানলার নিচে এসে মিলিয়ে গেল। ফিস ফিস করে কী যেন পরামর্শ করছে ওরা।
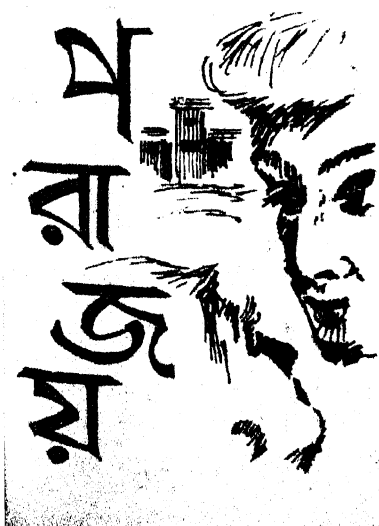
কান খাড়া করল মনীষা। সমস্ত শরীরে একটা উদ্বেগ জাগছে ওদের জন্য। কাণ্ডজ্ঞান তো একেবারেই নেই। পালিয়ে-টালিয়ে যাবে নাকি কোথাও? অভিভাবকরাই বা কি ওদের? অস্বস্তি লাগে মনীষার। আবার একটু পরেই ওদের চলে যাবার শব্দ পায়। আবার জানলায় মুখ বাড়ায় মনীষা। বাঃ, কেমন হাত ধরাধরি করে চলল ওরা মনীষার চোখের সামনে দিয়ে। চঞ্চল ওদের গতি, কী সহজ আনন্দে ভেসে চলেছে ওরা। আহা, চলে যাচ্ছে কেন? বেশ তো লাগছিল দুটিকে দেখতে। আর তো চাইছে না এদিক ফিরে? সামনে এগিয়ে চলছে ওরা। সাদা মেঘের হাল্কা পালকে ভর দিয়ে উড়ে চলেছে যেন। কোথায় যাবে ওরা? কি যেন এতক্ষণ ফিস্ ফিস্ করে পরামর্শ করল। ভাল করে শোনা গেল না। মনীষার বুকটা কেমন শূন্য হয়ে গেল যেন। এক টুকরো গানের সুর ভেসে এল ওদের:

"নবীন মেঘের সুর লেগেছে—"

জানলার শিক ধরে উঠে দাঁড়াল মনীষা। যতদূরে দেখা যায় চোখ পেতে রইল। আস্তে আস্তে একটা বনের আড়ালে মিলিয়ে গেল ওরা। মনীষা হতাশ হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়, মনে হল এদের দুজনকেই চেনে মনীষা। ঠিক চেনে, অনেকবার দেখেছে। কথাও যেন বলেছে ওদের সঙ্গে। তবু কিছুতেই মনে আনতে পারছে না ঠিক কি ওদের নাম, ঠিক কোথায় দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে। পথ চলতে কোথাও কি? সেদিন না লেকের পাড়ে দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে? কোন বিয়েবাড়ীর নেমন্তন্নের ভীড়ের মধ্যে যেন ওদের দেখেছিল মনীষা? না, মনীষারই কোন দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন কে জানে? নইলে মুখের আদল এত চেনা চেনা লাগছে কেন? ঠিক! ঐ মেয়েটি বোধহয় মনীষার জায়ের সেই ননদ, যার লক্ষ্মীছাড়াপনার গল্প শুনেছিল সেদিন ওর জায়ের কাছে! হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর ঐ ছেলেটা? ঐ হ্যাংলা ছেলেটাই বা কে? ওর তো ভবিষ্যতের বারটা বেজেই গেছে।

যাক্‌গে, চোখের আড়ালে চ'লে গেল ওরা, ভালই হ'ল। মনীষা নিশ্চিন্তে পাশ ফিরে শুল। ভেবে লাভ নেই এই আধুনিক ছেলেমেয়েদের কথা। এদের না আছে কাণ্ডজ্ঞান, না আছে বুদ্ধি বিবেচনা। মুহূর্তের আনন্দই ওদের কাছে সব। সমাজ সংসার ওদের কাছে কিছু না। লঘু-গুরু জ্ঞান নেই। কলকাতার পথে বের হও, এমনি জোড়ায় জোড়ায় কত যে দেখবে তার ঠিক নেই। আর যদি গঙ্গার ধারে বা লেকের পাড়ে যাও তবে তো ওদের মরসুম দেখতে পাবে। স্কুলের গণ্ডি ছেড়ে যদি কলেজে একবার ঢুকল তবে তো পাখা গজিয়ে গেল আজকালকার ছেলে-মেয়েদের। কো-এডুকেশনের কলেজ হলে তো আর কথাই নেই। আর যারা কলেজে যাচ্ছে না তারাই কি আর কিছু পেছিয়ে আছে নাকি? পাড়ার ভিতরে ভিতরে চোখ রেখে দেখ, এ জানলা ও জানলা, এ-ছাত ও-ছাত—কথা চালাচালি, চোখ ইশারা চলছে। না আছে নিজেদের মানুষ হবার চেষ্টা, না আছে মা বাপের দুঃখ কষ্টের দিকে একটু নজর। এই বেপরোয়া তরুণ তরুণীর দল নিজেরাই সমাজের সমস্যা বিশেষ। ওরা যাকে স্বাধীন প্রেম বলে তা আসলে উচ্ছৃঙ্খলতা, ওদের রঙে রূপ নেই, প্রেমে ধী নেই, জীবনে স্থিতি নেই......কিন্তু ঐ ছেলেমেয়ে দুটো কারা, গেল কোথায় ওরা? ওদের ডেকে ধমক দিল না কেন মনীষা? এক এক ফোঁটা ছেলেমেয়ে—আর চলেছে যেন দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী! অভিসার হচ্ছে, অভিসার! যত্ত সব—! সভ্যতা ভব্যতার বালাই নেই। জ্বালা ধরে মনীষার চোখে। চেনা চেনা ছেলে মেয়ে দুটো যেন একটা কালির আঁচড় টেনে দিয়ে গেল মনীষার আজকের জ্যোৎস্নাভরা সাদা আকাশটায়।

হঠাৎ আবার মনীষার বাঁ পাশের জানলার ওধার থেকে কি যেন একটা শব্দ হল। মনীষা তাড়াতাড়ি উঠে বসে বাঁ পাশের জানলাটা খুলে দিল। এ ধার থেকে একটু দূরে একটা ছোট্ট লেকের পাড় দেখা যায়। চমৎকার এ দিকটা। মনীষার রুচি আছে বলতে হবে। এই লেকের ধারটা দেখেই মনীষা এই বাড়ীটা বেছেছিল। চোখ জুড়িয়ে যায় নরম জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে।

যেন ভূত দেখে চমকে উঠল মনীষা। একি! ঠিক ওর চোখের সোজাসুজি এসে আবার দাঁড়িয়েছে সেই দুজন। লেকের রেলিং ধরে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে সেই তরুণ তরুণী। আরও একটু কাছে সরে এল ওরা। কী পরিপূর্ণ যৌবনের রূপ ওদের! সেই চেনা চে[illegible] মুখ, সেই চেনা চেনা ভঙ্গি—আরও আরও স্পষ্ট করে দেখতে চায় মনীষা। আত্মনিগ্রহের ভী[illegible] উন্মাদনা জাগে মনীষার। হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে গেল মনীষার—ও যে মনীষার—মনীষার সমীর। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই যৌবনদৃপ্ত বলিষ্ঠ বাহু! সমীর—সমীর তুমি? উঃ তুমি এত ভীষণ!...ঐ তো সমীর হাত রাখল ঐ মেয়ের কাঁধের উপর!...কে? কে ওই মায়াবিনী নারী? না-না কক্ষণো না, কক্ষণো না! সমীর—আমি যে পারি না হেরে যেতে—ঐ সামান্য একটা মেয়ের কাছে আমাকে এমন করে হারিয়ে দি[illegible] না সমীর...কিন্তু কে? কে ওই মেয়ে কে[illegible] কে?......

মনীষা চীৎকার করে উঠল।

বাইরে জুতোর শব্দ পেয়ে সম্বিৎ ফিরল মনীষার। আত্মস্থ হয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। একি, এমন হিম-হিম রাতে দরদর করে ঘেমে উঠেছে কেন মনীষা? কি আশ্চর্য! এতক্ষণ কি দেখছিল মনীষা? স্বপ্ন ঘুরে গেছে বহুক্ষণ আগে। ঘরে আলো জ্বলা হয়নি। সামনের দেয়ালে টাঙানো পঁচিশ বছর আগেকার তোলা মনীষা আর সমীরের ফটো-খানার উপর একফালি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে জানলা দিয়ে। বিয়ের আগে তোলা। এটাই ওদের সবচেয়ে সুন্দর ফটো। পঁচিশ বছর আগে নৈনিতে বেড়াতে গিয়ে লেকের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে এই ফটোখানা তুলেছিল ওরা।

* * * *

পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি সুইচ টিপে আলো জেলে দিল মনীষা। সমীরবাবুর গলা শোনা গেল; ডাক্তার ঘোষ এসেছেন [illegible] আমরা। মনীষা তখন রীতিমত ঘামছে। তাড়া-তাড়ি গায়ের মাথার কাপড় ঠিক করে উঠে বসল বিছানার উপর। হাত তুলে নমস্কার জানাল ডাক্তারকে।

ডাক্তার ঘোষ বললেন: কী ব্যাপার, অবশ্য যে আমার ডাক পড়ল?

সমীরবাবুই জবাব দিলেন: আজ আবার মনীষার ব্লাড প্রেসারটা বেড়েছে মনে হচ্ছে তাই—।

মনীষা কেমন হতভম্বের মত বসেই রইল। এত যে আলাপী মনীষা, কিন্তু কোনও কথা যেন বের হচ্ছে না ওর মুখ দিয়ে। কী যেন এক ঝড় বয়ে গেছে ওর উপর দিয়ে।

ব্লাড প্রেসার পরীক্ষা করে ডাঃ ঘোষ বললেন, হুঁ, একটু নয়, বেশ একটু বেড়েছে দেখছি প্রেসারটা।

সমীরবাবুর চিন্তাক্লিষ্ট বিব্রত মুখের উপর মনীষা তার অসহায় করুণ চোখ দুটি মেলে ধরল।

তুমি কি কেবল ছবি ?
মদন দত্ত

তুষারশ্রী
অমিয়কুমার নন্দী

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

স্নেহ

বড়দিকে সর্বরকমে বড় মেনে নিয়েছে বোনরা। আরো বড় মনে হয় তাকে কারণ অত বড় হয়েও ছোট বোনেদের প্রতি তার অকৃপণ স্নেহদৃষ্টির রকমফের কখনো হয়নি। কারো কোনো পরামর্শ চাই, উপদেশ চাই—বড়দি আছে ভাবনা কি, ফোন করো বড়দিকে, বা শ্যামবাজার থেকে হোক বাগবাজার থেকে হোক অথবা টালিগঞ্জ থেকে হোক, চলে এসো বড়দির কাছে। বড়দি পরামর্শ দিলে নিশ্চিন্ত।

কোনো বোনের বাড়িতে অপ্রীতিকর বা অভাবিত কিছু ঘটেছে শুনলে আর এক বোন এসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে, বড়দিকে জানিয়েছিলি ? বা বড়দিকে বলিসনি কেন। ভগ্নিপতিরাও এই ভক্তিশ্রদ্ধার বিপথে যায়নি। অফিসের ব্যাপারে তারা ওপরওয়ালাকে যে চোখে দেখে, পারিবারিক ব্যাপারে তারা বড়দিকেও সেই চোখেই দেখে।

মাসের মধ্যে দুই একবার অন্তত সব বোনেরা এসে বড়দির বাড়িতে মেলে। জমজমাট আসর বসে তখন। পাছে বড়দি বিরূপ হয় সেই আশঙ্কায় ভগ্নিপতিদের একটু সজাগ থাকতে হয় তখন। কারণ বোনেরা তখন অনেক সময় আড়ি করেই যার যার কর্তার বিরুদ্ধে কল্পিত বা অপ্রত্যাশিত অভিযোগ আবিষ্কার করে বড়দিটিকে বিচারের আসনে টেনে আনে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরনের অভিযোগ নিছক মানকাসির ব্যাপার। বড়দি খুশি হতে পারে ভেবেও এই প্রহসনের অবতারণা হয়।

বড়দি কোনো ভগ্নিপতিকে বলে, এ কিন্তু অন্যায় তোমার, কাউকে বা বলে, সংসারের শান্তি গেলে তো সব গেল, একটু বুঝে চলতে হয়। ভগ্নিপতিরাও কিছুটা চালাক হয়েছে আজকাল, আবেদনের সুরে প্রতিবাদ জানায় অনেক সময়, বলে, বোনের হয়ে আপনি বলছেন বড়দি বলুন, কিন্তু আপনার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব দেখলে আমাদের সব থেকে বেশি কষ্ট হবে।

ওতেই কাজ হয়। আর একফাঁকে বড়দি সেই বোনকেই একটু বকে-ঝকে ভগ্নিপতিকে বুঝিয়ে দেয় যে সে পক্ষপাতিত্ব করার লোক নয়।

বোনেদের মধ্যে সব থেকে ছোট শোভনা। তাকে কিছুটা তরলমতি বলেই জানে সকলে। তার মতির যে ঠিক নেই সেই জলজ্যান্ত প্রমাণ তার ঘরেই। এই গোছের আত্মীয় সমাবেশে অনেক সময় হেসে ওঠে সে, আর তক্ষুনি সকলে বুঝে নেয় এবারে কিছু ফোড়ন কাটবে ও। কিন্তু তার সাহসও, এক-একসময় ওই বড়দিকে নিয়েই পড়ে ও। বলে, বড়দিকে মিনিস্টার হলে মানাত, পারিবারিক মন্ত্রী,

মিসেসপক্ষে ডাইরেকটর—ডাইরেক্টর অফ্ হোম অ্যাফেয়ারস্!

মেজাজ প্রসন্ন থাকলে সকলের সঙ্গে সুরুচি অর্থাৎ বড়দিও হাসে। রুদ্ধকোপে চোখ রাঙ্গায়, মারব এক থাপ্পড়, আমি মিনিস্টার বা ডাইরেক্টর হলে তোর সব থেকে বেশি দুর্গতি হত—তোর ওই অকর্মণ্য ছোঁড়াকে আন্দামানে লাঙল চাষ করতে পাঠাতাম। একদিন এর থেকেও কঠিন ঠাট্টা করেছিল, বলেছিল, তোদের ডাইরেক্টর তো হয়েইআছি, মণিকে একবার পাঠাস আমার কাছে কানটা মুলে দেব, একটা ছেলে আছে একটা মেয়ে আছে, তাদের সামলা-বার নাম নেই—আবার তার ওপর আর এক মেয়ে! জ্ঞান-গম্যি আর হবে কবে!

মাস ছয় আগে শোভনার তৃতীয় সন্তান হয়েছে, তাও আবার মেয়ে। বড়দি তার অসাক্ষাতে অন্য বোনেদের কাছে এই প্রসঙ্গে অনেক আক্ষেপ করেছে, বলেছে, ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে, ওর জন্য এক-একদিন রাতে আমার ঘুম পর্যন্ত হয় না। যেমন বুদ্ধি তেমন তো কপালে হবে, কত বারণ করলাম, গোঁয়ারতুমির ফল বোঝ এবার!

অন্য বোনেরা চিন্তিত মুখে সায় দিয়েছে। ছেলেপুলে হবার ব্যাপারেও আগে বড়দির সঙ্গে পরামর্শ না করে নেওয়াটা যে অন্যায় হয়েছে এটাই যা মুখ ফুটে বলতে পারেনি।

বড়দি আরো বলেছে, আসুক মণি একবার, আচ্ছা করে ধুইয়ে না দিয়েছি তো—একি ছেলে-খেলা নাকি!

কিন্তু সরাসরি শোভনাকে ঠেস দেওয়া সেই প্রথম। কান মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল শোভনার। ভগ্নিপতিরা আড়ে আড়ে তাকে দেখেছে আর মুখ টিপে হেসেছে। তিন ছেলে-মেয়ের মা হলেও এই মুখখানা লোভনীয় লেগেছে তাদের।

কিন্তু এ-রকম কথা বড়দিই শুধু বলতে পারে। মেজাজ চড়লে এর থেকে অনেক বেশিও বলতে পারে। তখন আর বোন ভগ্নিপতি বলে খাতির নেই। ফিরে একটি কথাও বললে ওই মেজাজ আরো রুক্ষ হবে। সেটাই বরং শঙ্কার কারণ। বড়দি ব্লাড প্রেসারের রোগী। মেজাজের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও চড়ে, আর চোখ থেকে রাতের ঘুম উবে যায়। একটু ঘুমের জন্য অনেক সময় অনেক পয়সা খরচ করতে হয় বড়দিকে।

তাছাড়া বড়দির মেজাজও যে তাদের ভালোর জন্যেই চড়ে সেটা বোনেরা অন্তত নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে। সেজ বোন আর নবোন তো এই রাশভারী বড়দির কল্যাণেই আজ সুখে ঘর সংসার করছে। সেজ বোন সুকৃতির স্বামী ওকালতি করে মাসে দু'শ টাকাও ঘরে আনতে পারত না। ওদের বড় সংসারে তাই খটাখটি লেগেই ছিল।

মুখ বুজে থেকে সুরুচি কিছুকাল বোনের কষ্ট দেখল। তারপর ব্যবস্থা করল। নিজের স্বামীকে বলে কয়ে বড় একটা কোম্পানীর ল' অফিসার ক'রে দিল তাকে। কিন্তু বিনা শর্তে নয়। বোনকে নিয়ে ভগ্নি-পতিকে আলাদা বাড়িতে থাকতে হবে এবং বোনকে সুখে রাখতে হবে।

সুকৃতির স্বামী সানন্দে এই শর্তে রাজি হয়েছিল।

নবোন সুমতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ বড়দির কাছে। অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীর ঘরে বিয়ে হয়েছিল তার। কিন্তু শ্বশুর চোখ বুজতে অন্য ভাইদের সঙ্গে খাওয়া-খাওয়ি লেগে গেল। তার কারণ বোধ হয় বাপের বর্তমানে নিজের স্বার্থটা সে একটু বেশি দেখত। তখন সুমতি বাধা দিত বলে সুমতির সঙ্গেও তার তেমন বনিবনা হত না। কোর্টে কেস উঠল, এমন অবস্থা দাঁড়াল যে ওদিকে কেস চলে না, এদিকে সংসার চলে না।

বড়দির কাছে এসে ভেঙ্গে পড়ল সুমতি। সুরুচির স্বামী তখন দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যবসায়গত সফরে য়ুরোপে ঘুরছে। তবু বোনকে নিরাশ করেনি সে। নিজের গয়না ভেঙ্গে ক্রমে ক্রমে এগারো হাজার টাকা সে বোনের হাতে তুলে দিয়েছে। বলেছে, তোর জামাইবাবু যেন কখনো না জানে, সে এসব পছন্দ করে না। সেই টাকায় একদিকে কেস চলেছে অন্যদিকে খুব ছোট করে নতুন ব্যবসার পত্তন করেছে সুমতির স্বামী। আজ তার মোটামুটি সচ্ছল সংসার। আর সেই থেকে সুমতি যেন স্বামীর নাকে অনুশাসনের দড়ি পরিয়ে রেখেছে একটা।

দরকারে সব বোনকেই দরাজ হাতে সাহায্য করে থাকে সুরুচি। কোনো বোনের বাড়িতে অসুখ-বিসুখ শুনলে বড় ডাক্তার নিয়ে বড়দি এসে হাজির হবে, এবং বড় ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে অব্যবস্থার জন্য বকাবকি করতেও ছাড়বে না। আবার কারো বাড়িতে অন্নপ্রাশন অথবা অন্য কিছু উৎসব উপস্থিত হলে সব থেকে দামী উপহার যে বড়দিই নিয়ে আসবে সেটা সকলেই জানে।

আত্মীয় পরিজনের বড় ভাগ্য অনেক সময় ঈর্ষার কারণ হয়, কিন্তু বড়দির এই বড় ভাগ্যকে কেউ ঈর্ষাও করে না।

বোনেদের মধ্যে বয়েসকালে বড়দিই সুন্দরী ছিল সব থেকে বেশি। বড় এঞ্জিনিয়ার চাকুরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার। সেই জামাইবাবু আকাশছোঁয়া বড় হয়েছে এখন। বিয়ের আগেই কয়েকবার বিদেশে গিয়েছিল, এখন তো তার দিল্লী বোম্বাই ইংল্যান্ড আমেরিকা জার্মানী করে বেড়ানোটা শ্যামবাজার বালিগঞ্জ টালিগঞ্জ করে বেড়ানোর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বছরের মধ্যে ক'টা মাস কলকাতায় থাকে বা কোথায় কখন থাকে, বোনেরা ভালো করে খবরও রাখে না। এই জামাইবাবুটি পুরোদস্তুর সাহেব মানুষ, স্বল্পভাষী—বোনেরা বা ভগ্নিপতিরা রীতিমত সমীহ করে তাকে। কখনো সখনো দেখা হয়ে গেলে তটস্থ হয়। বাড়িতে থাকলেও তার সঙ্গে দেখা কমই হয়. বিশাল বাড়ির আর এক মহলে সে তার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এক মস্ত ম্যানেজিং এজেন্ট ফার্মের কর্ণধার এই ভগ্নিপতি, তার অধীনে অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানী। এমন সফল মানুষের কি-বা দিন কি-বা রাত্রি—সর্বদাই কাজ তার।

দাসদাসী চাকরবাকর নিয়ে নিজস্ব এই মহলে বড়দির রাজত্ব। ছেলেপুলে নেই। তাই বোনেদের সংসারের খবরদারী করার সময়ের অভাব তার হয় না। নিজের খরচে সব বোনেদের বাড়িতে টেলিফোনের ব্যবস্থাও সে-ই করে দিয়েছে। একটু দরকার হলেই বা একটু পরামর্শের প্রয়োজন হলেই বোনেদের ছুটে ছুটে আসতে কষ্ট হয়, সেই কষ্টের লাঘব হয়েছে।

কিন্তু এই বড়দির এবং ফলে অন্য বোনেদেরও সব থেকে বেশি মুশকিল হয়েছে ছোট বোন শোভনাকে নিয়ে। সুরুচির ধারণা গোঁয়ারতুমি করে ও নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল দিয়েছে। সকলের ছোট এই বোনকেই সব থেকে বেশি ভালোবাসত সুরুচি। ওর ন' বছর বয়সে মা মারা যায়। সুরুচি ওর থেকে পনের বছরের বড়। তাই স্নেহটা স্বভাবতই তার ওপর বেশি ছিল।

তাদের সকলের বিয়েই বাবা নিজে দেখে শুনে দিয়ে গেছেন। শুধু শোভনার ছাড়া। বলতে গেলে সকলের অমতেই সে ওই অযোগ্য ছেলেটাকে বিয়ে করেছে। বকে বসে থাকা বাউণ্ডুলে ছোঁড়া একটা, কেউ সুনজরে দেখেনি কখনো। বি-এটা কোন রকমে পাস করেছিল অবশ্য, আর ভালো গানও করত একটু আধটু।

বি-এ পাস করে দিগ্‌গজ হয়ে শোভনার পিছু নেওয়া ধরেছিল। শোভনা তখন সবে ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে। বেণী দুলিয়ে কলেজে যেত আসত। চোখ মুখ লাল করে ওই ছোকরা অর্থাৎ মণীশের নামে বাড়িতে নালিশ করেছিল সে। বড়দি তখন রোজই বাপের বাড়িতে আসত। সব শুনে সে-ই একদিন মণীশকে রাস্তায় ধরেছিল এবং নাকের জলে চোখের জলে এক করে ছেড়েছিল।

কিন্তু এর পর দু'বছরের মধ্যে সুরুচির কানে এসেছে শোভনা ওই ছেলেটার সঙ্গে গোপনে মেলামেশা করে। অন্য বোনেরা অনেক-বার হাতেনাতে ধরেছে ওদের। কোনদিন সিনেমায় দেখেছে কোনদিন বা লেকে। শুনে বড়দি যাচ্ছে তাই করে বকেছে শোভনাকে, তার বাবাও মেয়ের জন্য চিন্তিত হয়েছেন।

বি-এ পরীক্ষা দিয়েই শোভনা ঘোষণা করেছে মণীশকে বিয়ে করবে। মণীশ তখন একটা বিলিতি ফার্ম-এ দু'শ টাকা মাইনের চাকুরে—গান বাজনা চুলোয় গেছে। ভবিষ্যৎ বলতে গেলে অন্ধকার।

বাবাও তখন সুরুচির কথায় ওঠেন বসেন। তাঁর চিন্তার ভার লাঘব করার জন্য সুরুচি শক্ত হাতে হাল ধরতে চেষ্টা করেছিল। শোভনাকে বকাবকি করছে, আবার বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ওসব ভালবাসা-টাসা কিছু নয় মাঝখান থেকে হাড় কালি হবে শুধু, তোকে খুব ভালো বিয়ে দেব আমি, দেখিস।

শোভনা বড়দির পা জড়িয়ে ধরেছিল একদিন, কেঁদেছিল—বলেছিল, আমি অন্য জায়গায় বিয়ে করলে একটা লোক আত্মঘাতী হবে বড়দি, যা অদৃষ্টে আছে হবে, তোমরা ওখানেই বিয়ে দাও। শুনে মন ভেজার বদলে বড়দির আরো দ্বিগুণ রাগ হয়েছিল। কিন্তু শোভনা অনুনয় অনুরোধ ছেড়ে বেঁকে বসল এবং একদিন সকলে জানল রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছে তারা।

সেই থেকে বড়দি মনে মনে অসন্তুষ্ট শোভনার ওপর, তার থেকে বেশি অসন্তুষ্ট

ণীশের ওপর। কিন্তু এত আদরের ছোট বোন, াকে আর ফেলে কি করে। নিজে দাঁড়িয়ে াগযজ্ঞ ক'রে আবার বিয়ে দিয়েছে ওদের। কন্তু আজও খেদ যায়নি তার, যাবেই বা কি রে, এতদিনেও মণীশ সর্বসাকুল্যে সাড়ে েন শ' টাকা মাইনে পায় কি না সন্দেহ— রবস্থার কথা ভাবলেও সুরুচির গায়ে কাঁটা য়।

তার রাগের যথার্থ কারণও আছে। বিয়ের কছুকাল পরে অনটন দেখে সুরুচি কিছু বস্থা করা যায় কিনা ভেবেছিল। আরো করা য়কার কারণ শোভনার প্রথম ছেলে হয়েছে খন। ব্যবস্থা করেওছিল। চাকরি ছাড়িয়ে দবার মণীশকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রাস্তা দখিয়েছিল। বছর দেড় বছরের জন্য একবার ানপুরে আর একবার বোম্বাইয়ে ট্রেনিং-এ াঠিয়েছিল। কিন্তু সেয়ানা ছোঁড়া আসলে কবারও চাকরি ছাড়েনি, ছুটি নিয়ে দেখতে য়েছিল টিকে থাকতে পারবে কি না। ারেনি। ফিরে এসে আবার পুরনো কাজে লগেছে। ক'দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছে তার- র। সুরুচির তার থেকেও বেশি রাগ হয়েছে ানের ওপর। ও-ই মাথাটা খেয়েছে। মণি ুবারই তবু একটা কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা রেছে, বলেছে, বনিবনা হল না বলে চলে সতে হয়েছে। কিন্তু ছদ্মরাগে শেষের বারে াভনা বলেছে অন্য কথা, বলেছে, বিদেশে াকবে কি, নিজের হাতে এক গেলাস জল ড়িয়ে খেতে জানে যে একলা থাকবে।

অন্য বোনেরা পরে এই নিয়ে হাসাহাসি রেছে। আর রাগের আড়ালে শোভনার চাপা ানন্দ আর গর্বটুকু ঠিকই লক্ষ্য করেছে রুচি। তার গা জ্বলেছে, এত রাগ হয়েছে য় এক-একসময় নিষ্ঠুর মনে হয়েছে তাকে। ই রাগের সময় কিছুদিন শোভনা বা মণীশ র ধারে কাছেও ঘেঁষেনি।

এখন সুরুচির বদ্ধ ধারণা, তার বিরূপতার য়ে শোভনাই ওকে আগলে আগলে খে সর্বদা। অন্য বোনেরা বা ভগ্নিপতিরাও ামী-স্ত্রীতে ঝগড়া-ঝাঁটি করে কত সময় কত লিশ করে তার কাছে এসে। সুবিচার চায়। কন্তু আজ পর্যন্ত শোভনা কোনদিন একটি ভিযোগও তোলেনি, অথচ অভাব-অনটনের লে ওদের মধ্যেও যে খটাখটি লাগে, শোভনা ক-একসময় যে তুলোধুনো করে দেয় ণীশকে, তার দুই-একটা নমুনা হঠাৎ গিয়ে ড়ে সুরুচি নিজের চোখেও দেখেছে। তা' াড়া অন্য বোনেরাও বলেছে। অথচ এ বাড়িতে লে ও সন্তর্পণে এ-সব প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে ই অযোগ্য ছোঁড়াটাকেই রক্ষা করতে চেষ্টা রে যেন। তেমন বিপাকে পড়লে বড়দি ছাড়া তি নেই, কিন্তু বিপাকের সংবাদ তাকে নেতে হয় অন্য বোনের মারফৎ। পাছে এই য়ে আবার মণীশকে কথা শোনায় বড়দি এই য়েই নিজে বলে না নিশ্চয়। ফলে সুরুচির বগুণ রাগ হয়, সে সাহায্য করতে এগিয়ে সে বটে, কিন্তু বকাবকি বা কটূক্তি করতেও াড়ে না।

*

এই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রায় সামান্য একটু রিবর্তনের সূচনা দেখা গেল একদিন। পরি-

বর্তনটা সুরুচির কাছে সামান্য কিন্তু শোভনার কাছে অসামান্য।

মণীশ যে ফার্মে কাজ করত তার মালিকানা বদল হল একদিন। যে ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে এলো তার সর্বাধিনায়ক মিস্টার অবনী চৌধুরী, অর্থাৎ, বড়দির স্বামী। শুনে শোভনা পুলকে রোমাঞ্চিত, মণীশ আশান্বিত। অন্য বোনেদেরও ধারণা, এই মুরুব্বির জোরে এবারে মণীশের ভাগ্য ফিরে যাবে।

কিন্তু বড়দিকে একেবারে নীরব দেখে শেষে অন্য বোনেরাই একদিন তার কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করল, মণির একটা কিছু করে দাও বড়দি, শোভাটার সত্যি বড় কষ্ট।

সুরুচি রেগে গেল, ওর কষ্ট দেখলে আমার থেকে বেশি লাগে তোদের? কিন্তু করব কার জন্যে, অমন বি-এ পাস তো আজকাল রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাও যদি একটু চালাকচতুর হত।

বোনেরা চুপ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শোভনা নিজেই পারল না চুপ করে থাকতে। মণীশকে নিয়েই একদিন বড়দির কাছে ধরণা দিল। অভিমান করে বলল, তোমাকে যে আবার মুখ ফুটে বলতে হবে বড়দি, ভাবিনি।

সুরুচি মণিকে দেখেই হয়ত আরো চটেছে। আগুন হয়ে বলল, বড়দি কি গাছ যে ধরে নাড়া দিলেই পড়বে কিছু?

শোভনা অপ্রস্তুত। তবু আব্দারের সুরে বলল, এতদিন তো পড়ছিল। ও-সব জানি না বড়দি, জামাইবাবুকে বলে যা-হোক কিছু সুরাহা করো, আর না করো তো জামাইবাবু কবে আসবে বলো, আমিই বলব।

চুপচাপ দুজনকেই সুরুচি দেখল একটু, তারপর জবাব দিল, তাহলে আর আমার কাছে এসেছিস কেন, বলগে যা না—এখানেই আছেন।

শোভনা আতকে উঠল।—ও বাবা, যে গম্ভীর, সামনে এলেই বুক কাঁপে। শালীর সঙ্গে লোকে কত আনন্দ করে, আমাদের অদৃষ্টে কিছুই জুটল না। আমার দ্বারা হবে না, তুমিই বলো বড়দি, আত্মীয়ের জন্য করবে না কেন?

সুরুচি মণীশকে শুনিয়েই ঠেস দিল, যোগ্যতা থাকলে করত, এসে বলতেও হত না। আত্মীয় বলে তাঁর প্রেস্টিজটা তো ধুলোয় গড়াগড়ি যাবার জিনিস নয়।

শোভনা চুপ। মণীশের মুখ শুকনো।

সুরুচি আড়ে আড়ে খানিক দেখল দুজনকেই। ভুরুর মাঝে কুঞ্চন রেখা পড়ছে, ভাবছে কিছু একটা। ঈষৎ রুক্ষ চোখে হঠাৎ মণীশের দিকে ফিরল সে, ঠান্ডা প্রশ্ন করল, সুযোগ যদি পাও যোগ্যতা নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারবে?

শোভনা বা মণীশ কিছুই বুঝল না, সশঙ্ক চেয়ে রইল শুধু।

সুরুচি বলল, কোম্পানীর খরচায় তোমাকে বিলেত পাঠানো যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে পারি। দু'তিন বছর সেখানে থেকে কিছু একটা ভালো ট্রেনিং নিয়ে আসতে পারলে তখন আর কিছুতে আটকাবে না। এদিকের সংসার খরচের ভাবনাও তোমাকে ভাবতে হবে না।

মণীশ লাফিয়ে উঠল একেবারে। বিলেত! সে-যে স্বপ্নের ব্যাপার। উদ্দীপিত, উত্তেজিত। শোভনাও তাই। মণীশ একেবারে এসে পায়ের ধুলো নিল সুরুচির। শোভনা বলে উঠল, পারবে না কেন, দু'তিন বছর আর ক'টা দিন।

আনন্দে আটখানা দুজনে খানিকক্ষণ। কিন্তু সুরুচি গম্ভীর। চেয়ে চেয়ে দেখছে দুজনকেই। বলল, উনি এখন ব্যস্ত খু[illegible] তিন চার দিনের মধ্যেই বলে যা-হোক এক[illegible] কিছু ব্যবস্থা করা যাবে। মণীশের দি[কে] ফিরল, তুমি প্রস্তুত থেকো, ওঁকে বলা হলে ফোন করে জানাব।

আরো ঘন্টাখানেক বাদে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কমতে সুরুচির কেমন মনে হল, বোনের মুখখানা এরই মধ্যে কেমন একটু চিন্তাচ্ছন্ন লাগছে। তারা চলে যাবার পরও সে চুপচাপ বসে রইল খানিক। কি এক চাপা রোষে দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক।

*

সুযোগের প্রতীক্ষায় দুটো দিনই কেটে গেল বটে। তৃতীয় দিনে মিস্টার চৌধুরী হঠাৎ বিকেলেই বাড়ি ফিরল। ভারী জুতো মশমশ করে সুরুচির ঘরে ঢুকল। আলমারী খুলে সুরুচি কি একটা করছিল, তাড়াতাড়ি ফিরে দাঁড়াল।

বলতে ভুলে গেছি, একটা পার্টিতে যেতে হবে, এক ঘন্টার মধ্যে রেডি হয়ে নাও।

অস্ফুট স্বরে সুরুচি বলতে চেষ্টা করল, আমার শরীরটা তেমন......

ড্যাম ইট! বিরক্তিতে ঝাঁঝিয়ে উঠল অবনী চৌধুরী, এই শরীর তোমার আছে কেন? ইয়েস অর নো—যাবে কি যাবে না?

পাংশু মুখে সুরুচি বলল, যাচ্ছি......।

গট গট করে চলে গেল মিস্টার চৌধুরী। সেদিকে চেয়ে সুরুচির দুই চোখ খরখরে হয়ে উঠল। সাজসজ্জা করে চিরাচরিত হাসিখুশি মুখেই বাইরের আভিজাত্য রক্ষা করে এলো সে। একা ফিরল। মিস্টার চৌধুরী সেখান থেকে অন্য কি কাজে গেছে।

সে ফিরল রাতে ন'টায়। এত তাড়াতাড়ি ফেরে না সাধারণত। সোজা নিজের মহলের দিকে চলে গেল সে। সুরুচি প্রস্তুত হচ্ছে।

আধ ঘন্টা বাদে পায়ে পায়ে এগলো সেদিকে। আর দেরি করলে সুযোগ হারাবে। ওদিকের বারান্দার টুলে বেয়ারা বসে। সে উঠে দাঁড়াল।

খুব মৃদু গলায় সুরুচি জিজ্ঞাসা করল, সাহেব একা আছেন?

আগে এ প্রশ্ন করতে মাথা কাটা যেত। আর কার থাকা সম্ভব বেয়ারাও জানে। এই বাড়িরই ওপাশের ফ্ল্যাটে থাকে মিসেস উইলসন—প্রাইভেট সেক্রেটারী। মাঝের দরজা খুলে দিলে এক বাড়ি। মিস্টার চৌধুরী কলকাতায় এ বাড়িতে থাকলে ওই দরজা প্রতি রাত্রিতেই খোলে। দীর্ঘ অবকাশ বিনোদনে কোনরকম ব্যাঘাত ঘটে না।

কিন্তু ব্যাঘাত মাঝে সাজে সুরুচিই ঘটায়। কিছু আদায় করতে হলে এই একমাত্র সময়, মিসেস উইলসন আসার আগে। সুরুচির উপস্থিতি তখনই সব থেকে বেশি অবাঞ্ছিত।

বেয়ারা মাথা নেড়েছে, অর্থাৎ একাই [illegible]। [illegible] ভারী পরদা ঠেল[ে]

সুরুচি ঘরে ঢুকল। হুইস্কির বোতল [illegible] নিয়ে বসেছে মিস্টার চৌধুরী—এটা নিয়[মিত] অভ্যাস। তাকে দেখে তিক্ত কণ্ঠে বলে [উঠল,] হোয়াই নাউ?

একটু দরকার ছিল......

কুইক! অ্যান্ড লিভ মি অ্যালোন—

মণিকে বিলেতে পাঠিয়ে ভালো [illegible] ট্রেনিং—টেনিং কিছু—

হ্যাঙ ইট অল! বিরক্তিতে মুখ [illegible] বিকৃত, যত সব বাজে ব্যাপার নিয়ে কেন [illegible] এই সময়? যাও এখন—

সুরুচির পা দুটো কাঁপছে একটু [illegible] কিন্তু গোঁ ধরে দাঁড়িয়েই রইল। [illegible] থাকে। বলল, আর বলার সময় কখন [illegible] আমি কথা দিয়ে ফেলেছি তুমি পাঠাবে, [illegible] প্রেস্টিজ রাখার জন্যেই বলতে হল....

অল রাইট! নাউ গেট আউট—

সাহেব মানুষ, কথা দিলে কথা র[াখে।] সুরুচির এবার পালাবার কথা। পা ন[ড়তে] চাইল না তবু। পাংশু মুখে বলল, [illegible] এলেই এভাবে তাড়াও কেন?

হাতের গেলাসটা টেবিলে ঠুকে মি[স্টার] চৌধুরী গর্জন করে উঠল, উইল ইউ [illegible] নাও?

বিবর্ণ মুখে সুরুচি দ্রুত প্রস্থান ক[রল।] আগে দুই একদিন এই আদেশও অমান্য [করে] দেখেছে। গ্লাসের মদের ঝাপটা সজোরে চোখে এসে লেগেছে। ওপাশের ফ্ল্যাটের [illegible] খুলে কেউ তাকে দেখুক চায় না বলেই [illegible] রাগ আর এই অসহিষ্ণুতা। এ-সময়ের প্রা[র্থনা] মঞ্জুর হয় শুধু এই কারণেই।

নিজের ঘরে ফিরে সুরুচি হাঁপাতে [illegible] দু'চোখ জ্বলছে ধকধক করে। টেলি[ফোনের] কাছে গিয়েও অস্থির পায়ে এ-ধার ও[-ধার] করল বার দুই। এক অজ্ঞাত আক্রোশ যেন [illegible] বাড়তে লাগল। এক্ষুনি জানাবে শোভ[নাকে,] এক্ষুনি খবরটা দেবে।

রিসিভার তুলে ডায়েল করল, [illegible] কাঁপছে। নিঃশ্বাস দ্রুততর হয়েছে।

আঃ! বিরক্তির একশেষ সুরুচির। [illegible] নাম্বার ডায়েল করছে। রিসিভার রাখ[ল,] আবার তুললো। আবার ডায়েল করলো। এ[বার] দ্বিগুণ বিরক্তিতে রিসিভারটা আছড়ে [ফেলল] ফোনের ওপর। লাইন এনগেজড।

কিন্তু সুরুচি দাঁড়াতে পারছে না। [illegible] যেন একটা হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। [illegible] বৃশ্চিক দাহনে জ্বলে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। [illegible] আর হল না ফোন করা। জ্বালা[টা] বাড়ছে আরো। দ্রুত পায়ে সুরুচি [illegible] ছেড়ে বেরিয়ে এলো। ওধারের একটা [illegible] ঘরে গিয়ে ঢুকল। এ-ঘরটার খবর বাড়ির [illegible] রাখে না। এটা সুরুচির ঠাকুরঘর—গা[illegible] হল সংগোপনে এই ঠাকুরঘর করেছে সে। [illegible]

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে [illegible] সামনে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। [illegible] পর পাগলের মত মেঝেতে মাথা ঠু[কতে] লাগল।—রক্ষা করো, রক্ষা করো ঠা[কুর,] এই ঈর্ষার আগুন থেকে আমাকে রক্ষা [করো] —আমি ওদের বিচ্ছেদ ঘটাতে চেয়েছি, [illegible] তফাত করে দিতে চেয়েছি—ওদের মঙ্গল [illegible] ওদের ভালো হোক!

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে ঠান্ডা হল সুরু[চি।] ঠাকুরের পায়ে অপরাধ নিবেদন করে [illegible]

অমৃতস্য পুত্রাঃ

ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার চট্টোপাধ্যায়

আদিম সমুদ্রের জলে কণামাত্র জৈব পদার্থের দেহ নিয়ে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণীর আবির্ভাব। সেই সমুদ্রের জলেই তার লালন-পালন এবং বংশবৃদ্ধি। বৈজ্ঞানিক মতে সেই কণামাত্র এককোষদেহী আদিম প্রাণী থেকেই কোটি কোটি বৎসরের ক্রমবিবর্তনের পৃথিবীর যাবতীয় সব প্রাণীর উদ্ভব। তাই বলা যায় আদিম সমুদ্রই সব প্রাণীর অমৃতস্বরূপা জননী ও ধাত্রী। প্রাণের সেই অমৃতের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। এখনও সেই অমৃতেই প্রাণধারা অব্যাহত আছে। সেই অমৃত ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তবে এখন আর অমৃত বাইরে নাই, আমাদের দেহের মধ্যেই সযত্নে তাকে ধারণ করে আছি।

প্রাণধারণের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও জলীয় পরিবেশ

আদিম সমুদ্রের জলে ভাসমান এককোষ আদিম প্রাণীর জৈবক্রিয়া চলত তার ভিতরের জৈব পদার্থের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক দ্রবীভূত নানারকম অণু-পরমাণুর আদান-প্রদানে। উন্নত শ্রেণীর প্রাণীদেহেও যে অসংখ্য কোষ আছে তাদের জৈব-ক্রিয়াও এই ভাবেই চলে। সেই জন্য প্রাণী-কোষের সূক্ষ্ম আবরণের (সেল মেমব্রেন) ভিতর দিয়ে জলের ও দ্রবীভূত বিভিন্ন অজৈব পদার্থের অণু সহজে যাতায়াত করতে পারে। কিন্তু প্রাণীর জৈব পদার্থ প্রোটোপ্লাজম-এর বৃহৎ অণু আবরণ ভেদ করতে পারে না। এ রকম ক্ষেত্রে রসায়নের একটি সাধারণ নিয়ম অসমোসিস অনুযায়ী জৈব কোষের ভিতরে ও বাইরের জলে দ্রবীভূত অজৈব পদার্থের আণবিক ঘনত্ব সমান হয়ে যায়। রাসায়নিক ভাষায় এর নাম অসমোটিক ইক্যুইলিব্রিয়াম।

প্রাণী-কোষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ জল থাকে যাতে বিভিন্ন উপাদান দ্রবীভূত অথবা কোলয়ডীয় অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট গাঢ়ত্বায় থাকে। পারিপার্শ্বিক জলের সঙ্গে অসমোটিক সমতা রক্ষা না করতে পারলে হয় কোষের মধ্যে অতিরিক্ত জল প্রবেশ করে অথবা কোষ থেকে বেশী জল বেরিয়ে যায়।

দ্রবীভূত অবস্থায় অজৈব কিছু পদার্থের পারমাণবিক অংশগুলি সামান্য পরিমাণ তড়িৎ-শক্তি নিয়ে অল্প-বিস্তর বিশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় ইলেকট্রোলাইট এবং বিশ্লিষ্ট অংশগুলিকে বলা হয় আয়ন। রাসায়নিক ধর্ম অনুযায়ী আয়ন অ্যাসিড অথবা বেসিক দুই প্রকারের হয়। প্রাণী-কোষের উপাদানে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ এবং অ্যাসিড ও বেসিক আয়নের অনুপাত একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাণধারা অব্যাহত রাখতে এর কোনও পরিবর্তন চলে না। প্রাণী-কোষের মধ্যে জৈবক্রিয়ার যে নিরবচ্ছিন্ন রাসায়নিক ভাঙ্গাগড়া চলে তার ফলে যাতে কোষের আভ্যন্তরীণ আণবিক বা ইলেকট্রোলাইট সংগঠন বিপর্যস্ত না হতে পারে সেজন্য কিছু অণু-পরমাণু আয়নের আকারে বর্জন ও গ্রহণ করতে হয়। এর জন্য পারিপার্শ্বিক জলে দ্রবীভূত ইলেকট্রোলাইট এমন হওয়া চাই যাতে প্রয়োজনীয় অদল-বদল সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সূত্রানুসারে চলতে পারে।

আদিম প্রাণী যে জলে আবির্ভূত হয়েছিল তাতে দ্রবীভূত অজৈব পদার্থের প্রকার ও পরিমাণ প্রাণীকোষের অসমোটিক ধর্ম এবং ইলেকট্রোলাইট অদল-বদলের অনুকূলে ছিল। সেই তরল পদার্থের পরিবেশ প্রাণীকোষের কাছে অমৃতস্বরূপ। আদিম সমুদ্রের জল কিন্তু অপরিবর্তিত থাকল না। কালে কালে প্রাকৃতিক নিয়মে সমুদ্রের জলে লবণের ভাগ বাড়তে লাগল। আরও কিছু অদল বদল হতে লাগল যার দরুণ তার অসমোটিক ধর্ম গেল বদলে। প্রাণীকোষের জৈব ক্রিয়া নতুন পরিবেশের সঙ্গে খানিকটা খাপ খাইয়ে নিলেও বেশী দিন আর সমতা রক্ষা করা সম্ভব হল না।

অমৃত আত্মসাৎ

প্রাকৃতিক কৃপার উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে প্রাণধারা অব্যাহত রাখতে প্রাণীকে তার জীবন-মরণের আশ্রয় সেই অমৃতস্বরূপ তরল পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখবার ব্যবস্থা করতে হল। বিবর্তনের পথে এক কোষ থেকে যখন বহু কোষবিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভব হল তখন কোষগুলির চারপাশের তরল পদার্থ দেহের অভ্যন্তরে নিয়ে তার উপরে অভেদ্য আচ্ছাদন তৈরী হল। বাইরে থেকে দূষিত হবার ভয় আর থাকল না। উচ্চতর প্রাণীর দেহে যে অসংখ্য কোষ আছে সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন থাকলেও প্রত্যেকটি কোষ খুব পাতলা এক স্তর তরল পদার্থ দ্বারা বেষ্টিত। অর্থাৎ জলাবৃত। প্রাণীদেহের যাবতীয় কোষগুলি সেই আদিম সমুদ্রে ভাসমান আদিম প্রাণীর মতই এক তরল পদার্থে ভাসছে। বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক দৈত্যের হাত থেকে প্রাণদায়ী অমৃত রক্ষা করবার জন্য প্রাণীদেহ নিজের দেহের মধ্যেই অমৃতকে লুকিয়ে নিয়েছে।

দেহাভ্যন্তরের এই জলীয় পরিবেশের গুরুত্ব এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক ক্লোদ বিরনার প্রথমে উপলব্ধি করেন। তিনি এর নাম দেন মিলিউ আঁতেরিওর।

বাইরের অনিশ্চিত পরিবেশকে দেহের অভ্যন্তরে নিজের নিয়ন্ত্রণের আয়ত্তে এনে যদিও বাইরে থেকে দূষিত হওয়ার ভয় কাটান গেল, কিন্তু দেহের চাহিদা মেটাতে যে ক্ষয় হয় তার পূরণ না করতে পারলে এবং সঞ্চিত আবর্জনার অপসারণ না করতে পারলে মিলিউ আঁতারিওর নিষ্কলুষ রাখা যায় না। এই ব্যবস্থাও উচ্চতর প্রাণীর শরীরে কতগুলি বিস্ময়কর স্বনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে এমন নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয় যে, স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের জল, ইলেকট্রোলাইট ও অ্যাসিড-বেসের পরিমাণ ও অনুপাত নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই থাকে।

শারীরিক রস

মানুষের শরীরের মোট ওজনের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জল। এর বেশীর ভাগ (শতকরা ৫০ ভাগ) থাকে কোষগুলির ভিতরে (ইনট্রা-সেলুলার ফ্লুইড)। বাকি অংশ (শতকরা ২০ ভাগ) থাকে কোষগুলির বাইরে (এক্সট্রা-সেলুলার ফ্লুইড)। কোষের বাইরের জল আবার কিছুটা (শতকরা ৫ ভাগ) রক্তের আকারে। শিরা ধমনীর মধ্যে সংবহমান থাকে। বাকিটা সব কোষগুলিকে বেষ্টন করে আছে। (ইন্টারস্টি-

---

করল একটু।......কাল ফোন করবে কাল ফোন করে শোভনাকে বলে দেবে, যাওয়া হল না মণির, ব্যবস্থা করা গেল

রদিন।

কালই মণি আর শোভনা এসে হাজির। অবাক একটু। শোভনার মুখ শুকনো, মুখের অবস্থাও কেমন দ্বিধা বিড়ম্বিত,

শে।

সময়ে এলি ?

শোভনা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তুমি জামাইবাবুকে কথাটা বলেছ নাকি বড়দি ?

কথা ?

দিকে গিয়ে শোভনা বলল, ওর বিলেত কথা ?

কেন ? নিজের অগোচরে দুচোখ খরখরে উঠল সুরুচির।

হওয়া হবে না বড়দি, তুমি বোলো না, র অদৃষ্টে সুখ নেই......

কণ্ঠে সুরুচি বলল, এ-কি ছেলেখেলা হল নাকি ?

শোভনা তাড়াতাড়ি তার পায়ে হাত দিয়ে বলল, রাগ কোরো না বড়দি, এবারের মত ক্ষমা করো. ওই মুখের দিকে চেয়ে দেখ, পর পর তিন রাত ঘুমোয়নি, এক-একজনের এই রকম রোগ আছে, কি করব বলো—

গত রাতের প্রার্থনার কথা এই কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ভুলে গেছে সুরুচি। তার দুচোখ ধকধক করে জ্বলছে আবার। শুধু মণীশের নয়, দুজনের মুখের দিকে চেয়েই সে রোগ দেখলে কয়েক মুহূর্ত। তারপর চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করল যেন। অস্ফুট স্বরে বলল, আচ্ছা যা—

নিজেই দ্রুত ঘর ছেড়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল সে। বড়দির এই মূর্তি দেখে ওরা দুজন বিমূঢ় মুখে দাঁড়িয়ে রইল খানিক।

ওরা জানে না বড়দি কোথায় গেল। ওরা জানে না বড়দি গত রাত্রির মতই ঠাকুর ঘরে মাথা খুঁড়তে গেল।

সিয়্যাল ফ্লুইড্)। তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে শরীরের জলীয় অংশ তিন রকম রসের সৃষ্টি করেছে। তিনটি পৃথক প্রকোষ্ঠে পৃথকভাবে আবদ্ধ থেকে এই তিন রকম রস নিজ নিজ রাসায়নিক সংগঠন বজায় রাখে। কিন্তু প্রকোষ্ঠ-গুলির মধ্যে জল ও ইলেকট্রোলাইট অণুর যাতায়াতে কোন বাধা না থাকায় অসমোটিক প্রেসার, অ্যাসিড বেস অনুপাত ইত্যাদি একটা সমতা রক্ষা করে চলে। কি উপায়ে শারীরিক রসের জলীয় অংশ ও বিভিন্ন ইলেকট্রোলাইট পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখা হয় এখন তার আলোচনা করা যাক।

জল নিয়ন্ত্রণ

শরীর থেকে অনবরত কিছু জল অপরিহার্য ভাবে ক্ষয় হয়। তার প্রধান হচ্ছে প্রস্রাবের সঙ্গে। শরীরের অবাঞ্ছিত আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ নিষ্কাশন করতে দৈনিক অন্ততঃ এক লিটার পরিমাণ প্রস্রাব নির্গত হওয়া প্রয়োজন। নিঃশ্বাসের সঙ্গে এবং ত্বকের উপর থেকে অদৃশ্যভাবে কিছু জল বাষ্পের আকারে ক্ষয় হয়। এর পরিমাণ প্রায় ৬ শত মিলিলিটার। গরমের সময় ঘামের সঙ্গেও প্রচুর জল ক্ষয় হয়। শারীরিক পরিশ্রমেও ঘাম হয় অনেক। কোনও কাজ না করে শীতল আবহাওয়াতে থাকলে কম পক্ষে ১·৬ থেকে ১·৮ লিটার জল দৈনিক আমাদের প্রয়োজন। চোখের জলেও কিছু যায়। শারীরিক পরিশ্রমে ও গরম আবহাওয়ায় এই চাহিদা স্বভাবতই অনেক বেশী। শরীরের জলের প্রয়োজন আমরা বুঝতে পারি তৃষ্ণা থেকে এবং দরকার মত জল পান করলেই তৃষ্ণা মিটে যায়। যদি পানীয় জল কম বা বেশী হয় তাহলে প্রস্রাবের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরের মোট জলের পরিমাণ ঠিক রাখা হয়। মস্তিষ্কের নিচের দিকে অবস্থিত ক্ষুদ্র পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের পশ্চাদংশের একটি হরমোন এই নিয়ন্ত্রণ কাজটি করে। শরীরের জল সামান্য বাড়লে বা কমলেই সংবহমান রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের অ্যাণ্টি-ডায়ুরেটিক হরমোন কিডনীর উপর প্রভাব চালিয়ে প্রস্রাবে জলের পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে রক্তের পরিমাণ সমান রাখে।

কোনও কারণে শরীরে জলের পরিমাণ অতি-রিক্ত বৃদ্ধি হলে যতদূর সম্ভব ইণ্ট্রাসেলুলার ফ্লুইড্ (কোষের ভিতরের জল) ও সংবহমান রক্তের পরিমাণ সমান রাখা হয় এবং বাড়তি জল ইণ্টার-সেলুলার প্রকোষ্ঠে জমা হয়ে শোথের সৃষ্টি হয়। অবশ্য অতিরিক্ত জলের অসমোটেক প্রেসারের সমতা রক্ষা করতে জলের সঙ্গে লবণও শরীরে বেশী পরিমাণে ধরে রাখতে হয়। প্রয়ো-জন মত লবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) ধরে রাখার কাজও কিডনীর।

ইলেকট্রোলাইট নিয়ন্ত্রণ

শরীরের প্রধান ইলেকট্রোলাইট হল সোডি-য়াম পটাসিয়াম ও ক্লোরাইড্ এবং অল্প পরি-মাণ ক্যালসিয়াম্, ম্যাগনেসিয়াম্, সালফেট ও ফসফেট। পটাসিয়াম বেশীর ভাগই থাকে কোষ-গুলির ভিতরে। কোষের বাইরের তরল পদার্থে প্রধান ইলেকট্রোলাইট হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড (লবণ)। প্রস্রাবের সঙ্গে দৈনিক কিছু সোডিয়াম নির্গত হয়। খাদ্যের সঙ্গে আমরা প্রচুর লবণ খাই। শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লবণ জমলে অসমোটেক্ সমতা রক্ষার জন্য তার সঙ্গে

স্কেচ — কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

কিছু জলও শরীরে ধরে রাখতে হয়। তাতে শরীরের মোট জলের পরিমাণ ও অনুপাত বিপর্যস্ত হতে পারে বলে অতিরিক্ত লবণ প্রস্রাবের সঙ্গে বর্জন করা হয়। আমাদের দৈনিক লবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইড) প্রয়োজন ৪ থেকে ৫ গ্রাম। এর বেশী খেলে কিডনী দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়। আবার খাদ্যের সঙ্গে লবণ না খেলে বা কম খেলে কিডনী সোডিয়াম ধরে রাখে এবং প্রস্রাবের সঙ্গে সোডিয়াম নিষ্কাশন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিডনীতে এই সোডিয়াম নিষ্কাশন নিয়ন্ত্রণ করে অ্যালডোস্টেরন নামে একটি হরমোন। এই হরমোন আসে অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের কর্টেক্স বা বহিরাংশ থেকে। কিডনীতে রক্ত থেকে পরিস্রুত ইলেকট্রোলাইট ও জলীয় অংশ বিশ্লিষ্ট হয়ে সূক্ষ্ম কতগুলি আঁকা-বাঁকা নলের মধ্যে দিয়ে বাহির হয়। এই নল-গুলির গায়ে যে কোষগুলি আছে তাহা নলের মধ্যেকার দ্রব থেকে প্রচুর পরিমাণে জল, সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও গ্লুকোস তুলে নিয়ে রক্তে ফিরিয়ে দেয়। এর মধ্যে জল ও সোডিয়ামের কত পরিমাণ নির্গত হবে এবং কত পরিমাণ শোষণ হবে সেটা শরীরের প্রয়োজন-মত নিয়ন্ত্রণ করে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের হরমোন ও অ্যালডোস্টেরন পটাসিয়াম নিষ্কাশন ও অ্যালডোস্টেরনের প্রভাবে বৃদ্ধি পায়।

অ্যাসিড-বেস সমন্বয়

শরীরের জৈব ক্রিয়ার ফলে অনবরত অ্যাসিড জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। অতিরিক্ত অ্যাসিড যাতে শারীরিক রসের হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারে তার জন্যেও কতগুলি ব্যবস্থা আছে। রক্তে এবং কোষের বাইরের জলীয় পদার্থে কতগুলি যৌগিক পদার্থ আছে যারা অতি সহজে হাইড্রোজেন পরমাণু সোডিয়ামের সঙ্গে অদলবদল করতে পারে। এই সব পদার্থকে বলা হয় বাফার। রক্তে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ও কার্বনিক অ্যাসিড এই বাফারের কাজ করে। অ্যাসিডের মাত্রাধিক্য হলে সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট থেকে সোডিয়াম বিচ্ছিন্ন হয়ে অ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়। মুক্ত কার্বনিক অ্যাসিড থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। আবার ক্ষার পদার্থের মাত্রাধিক্য হলে কার্বনিক অ্যাসিড তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বনেট তৈরী হয় এবং প্রস্রাবের সঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। কিডনীতেও প্রয়োজন মত অ্যাসিড গ্রহণ বা বর্জনের ব্যবস্থা আছে। শরীরে অ্যাসিড বেশী হলে প্রস্রাব হয় অ্যাসিড ধর্মী। আবার শরীরে যদি ক্ষারের মাত্রা বাড়ে তবে প্রস্রাব হয় অ্যালকেলাইন বা ক্ষারধর্মী। শরীরে অ্যাসিড ও বেস-এর অনু-পাতিক পরিমাণ এমন নিখুঁত ভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে যে, রক্তে বা কোষের বাইরের জলীয় পদার্থে পি এইচ বা হাইড্রোজেন আয়ন পরিমাপক চিহ্ন ৭·৩৫ থেকে ৭·৪৫-এর মধ্যে বজায় থাকে।

শরীরে জল ও ইলেকট্রোলাইট বিপর্যয়

শরীরের জল লবণ অ্যাসিড বেস ইত্যাদির সুনিয়ন্ত্রিত সমন্বয় নানা রকম রোগে বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। পানীয় জলের অভাবে অথবা রোগীর অচৈতন্য অবস্থার জন্য জলপান অসম্ভব হলে শরীরে জলের অভাব হয়। ডায়াবিটিস মেলাইটাস বা ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস (পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ডের অ্যাণ্টি-ডায়ুরিটিক হরমোনের অভাবে) রোগেও শরীরের প্রচুর জল ক্ষয় হয়। কলেরায় বা মারাত্মক উদরাময় রোগে বমন ও দাস্তের জন্য প্রচুর জল ক্ষয় হয় কিন্তু তার চেয়েও বেশী ক্ষতি হয় লবণে। এ সব ক্ষেত্রে বমনের দরুণ ক্ষতিপূরণের উপযুক্ত পরিমাণ জল ও লবণ রোগী গ্রহণ করতে পারে না। সেজন্য সরাসরি শিরাপথে পর্যাপ্ত লবণ এবং জল দেওয়াই প্রাণ রক্ষার একমাত্র উপায়। অ্যাড্রিন্যাল গ্ল্যাণ্ডের রোগে এবং কিডনীর কোনও কোনও রোগে প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত সোডিয়াম ক্ষয়িত হয়। কিডনীর রোগে প্রস্রাবে অ্যাসিড-বেস নিষ্ক্রমণের নিয়ন্ত্রণ বিপর্যস্ত হলে শরীরে অ্যাসিডোসিস্ উপস্থিত হয়। আবার অতিরিক্ত বমি হলে ক্লোরাইড অধিক মাত্রায় ক্ষয় হয়। তার দরুণ শরীরে ক্ষারের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় (অ্যালকালোসিস্) এই রকম নানা রকম গোলযোগে দেহের রসগুলির রাসায়নিক সংগঠন ও ধর্ম রক্ষা করা যখন তার নিজের শক্তির সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে তখন কৃত্রিম উপায়ে উপযুক্ত পরিমাণ জল, লবণ, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, বাইকার্বোনেট, ক্লোরাইড ইত্যাদি প্রয়োগ করে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হয়। এর জন্যে প্রথমই দরকার কোন পদার্থের অভাব বা আধিক্য হয়েছে তার সঠিক পরিচয়।

ঝরাপাতা

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

ঝরাপাতা, নিদাঘের প্রজাপতি একক ক্রীড়ায়
অলক্ষ্যেই উড়ে আসে, কারে খোঁজে এই বিছানায়:
সতরঞ্চি চাদরের বুকে পোড়ামাটি ধূসরতা,
পত্রের উদ্ভাস যেন চিত্রের বিস্ময়, নীরবতা
হাওয়ায়, আকাশে, নীরবতা রাত্রি, নীরবতা তুমি,
সাদা দেয়ালের গায়ে অখণ্ড বধির বনভূমি!

কাল রাত্রে এসেছিল একজন, হাওয়ার মতন
ঘুরে ঘুরে দেখেছিল সব, বধিরতা তার স্বর :
তার নাম জানিনাক, শুধু বুঝি নিঃশব্দ ক্রন্দন
নক্ষত্র-অক্ষিতে তার, সুদূরতা, আহত নির্ঝর!

ওগো ঝরাপাতা, কেউ কাছে আর্সেনিক, নিঃসঙ্গতা
নামে এক পুরাণের নদী পাতালেই বহে চলে,
স্মরণ-গুহার মুখ খুলে দিলে তার প্রবহতা
জানা যায়, নেমে এলে চুপি চুপি গভীর অতলে
মৃত্যুর পাহারাদার জেগে ওঠে হাওয়ার মতন।

কাল রাত্রে এসেছিল ঝরাপাতা, ঝরাপাতা-মন!

আসছে

হরপদ চট্টোপাধ্যায়

মহাপ্রলয়ের বিষাণ উঠেছে ধ্বনি:
মহাঝঞ্ঝার মহা ইঙ্গিত শুনি
গগনের ছায়ে ছায়ে।
ধরণীর গায়ে গায়ে
আগুনের তাপে ক্ষত হয়ে গেছে জানি।
ঝলসে উঠেছে কালের বদনখানি
কশাঘাতে কশাঘাতে।
অশনির পদপাতে
আশীষধারায় ধ্বংসের পরশন
তপোবনে শুরু শোণিতের বরষণ।
নিকষ অন্ধকার
বন্ধ পন্থ আর
অমারাত্রির ভালে আঁধারে টিকা,
তার মাঝে দেখি লাল আগুনের শিখা।
ঝলসানো মরুপ্রান্ত
সাপের মতন শান্ত
শ্যাম-তৃণ-তলে শায়িত অগ্নিগিরি
গর্জে উঠছে ধরার জঠর চিরি
ধমকানি তার শুনছো?
এখনো স্বপন বুনছো?

সিমলা

শতদল গোস্বামী

বরফ জমেছে পথে, বৃষ্টিভেজা শীতের সকাল
মেঘের আড়ালে সূর্য কুয়াশায় হারায়েছে পথ,
নিবিড় অরণ্যভূমি, দেবদারু, দীর্ঘদেহী শাল—
উটের সারির মতো আদিগন্ত পাহাড়-পর্বত।

এ-এক আশ্চর্য ছবি, অবিশ্বাস্য, স্বপ্ন মনে হয়
ঘরে বসে লাভ নেই, তাই আজ মুগ্ধ চোখে ঘুরি—
উন্মুক্ত উদার পথে ক্লান্তিহীন কাটাই সময়,
উপভোগ করি আমি প্রকৃতির রূপের মাধুরী।

'ম্যাল' আজ পরিপূর্ণ, স্বাস্থ্যান্বেষী, ভ্রমণবিলাসী
কলরব করে তারা, 'স্কেটিং গ্রাউণ্ডে' জমে ভিড়—
গল্পেগানে মত্ত হয়, অকারণে হাসে উচ্চ হাসি
গির্জার ঘড়ির কাঁটা পরিশ্রান্ত, স্তব্ধতায় স্থির।

বাতাসে হিমের স্পর্শ, শৈলপুরী কাঁদে যন্ত্রণায়
বিবর্ণ পাণ্ডুর সূর্য মেঘের আড়ালে ঢাকে মুখ,
বরফে সজ্জিত পথ, পরিচ্ছন্ন, শুভ্র শুচিতায়—
আমি সেই পথে হাঁটি, খুঁজে পাই রোমাঞ্চ কৌতুক।

এবার উদার রৌদ্রে

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

গর্বিত শরীর থেকে যৌবনের বিজ্ঞাপনগুলি
মুছে নিয়ে তুলে রাখো ঘরে।
সর্ব অলঙ্কার খুলে শুভ্র নত হও: তারপরে
উদার রৌদ্রের মতো শস্যে তৃণে স্পর্শ রেখে এসে
নদীর নির্জন সুরে বলো তুমি, বলো—ভালোবেসে
সকল জীবন মন,
সমর্পিত আনন্দিত পরিচ্ছন্ন পবিত্র এখন!
প্রার্থিত প্রেমিক ক্লান্ত; সে প্রেমিক বিকেলের মতো
সারাদিন দাহ শেষে স্তব্ধ ক্ষেতে এবার আনত
ঘরে ফিরে যাবে বলে,
এই মাটি বৃক্ষ নদী উদ্ভিদের নম্র কোলাহলে
তার শেষ নমস্কার,
ঢেকে দেয় হেমন্তের অনাদৃত মৃত অন্ধকার!
যৌবনের অহঙ্কার ফেলে এসে দাঁড়াও আলোকে
পরিপূর্ণ পুষ্পদেহে, অনিদ্রিত অতলান্ত চোখে
সৌন্দর্য সংগীত প্রেম সুন্দরের যাজুক বিস্ময়;
এবার উদার রৌদ্রে প্রেমিকের আসার সময়!

আর এক সমুদ্র

নির্মল দত্ত

অনেক জমেছে ধূলি : অনেক আবর্জনা,
হয়েছে মন ক্লেদাক্ত; আর বিষাক্ত, দূষিত আবহাওয়া :
পথে পথে অসংখ্য উত্তেজনা।
ফুলের সৌরভে আসে সিক্ত জঞ্জালের পূতিগন্ধ হাওয়া।

লোলুপ দৃষ্টি মেলেছে যত শকুনির দল,
ঝটাপট্ পাখা মেলে ছুটে আসে। দ্যাখ তার ভোজের বাসনা;—
কঙ্কালের স্তূপের মাঝারে মৃত্যুপথযাত্রী চায় তৃষ্ণার জল।
মদমত্ত পৃথ্বীর শিখরে শিখরে তার জয়ের ঘোষণা॥

নিঃসহায় জনতা কাঁদে। কাঁদে ওই প্রাণের দেবতা;
দুঃশাসনের পিপাসা আনে দুরন্ত প্লাবন,
ভয়াল বিকট গর্জনে দিয়ে যায় মৃত্যুর বারতা।—
অমৃতের স্বাদ আহা, সেও এমন—প্রাণ্সে জীবন।

তোমরাও মূক আজ, স'য়ে আছ উদভ্রান্ত রৌদ্র?
গলিত বরফ স্রোতে নিয়ে এস আর এক সমুদ্র!

মধুমালার স্বপ্ন

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

তোমায় আমি দেখেছিলাম ময়নামতীর দেশে
সবুজ মাঠে অবুঝ হাওয়া, চলতে গেলে দু' পা
বশ মানে না বসনখানি, সামলে ওঠ হেসে,—
কোমরেতে ঝিলিক মারে চন্দ্রহারের রূপা।

দেখেছিলাম কলসী কাঁখে মধুমতীর ঘাটে,
তন্বী তনু, কটির তটে এলোচুলের ঢেউ,
নদীর পারে কাজল রেখা, সূয্যি নামে পাটে
আমি তুমি একলা দুজন : আর ছিল না কেউ।

লজ্জাবতীর নিটোল দেহে প্রথম যৌবন—
পদ্মকলি থরো থরো আকুল কৌতুকে,
জল-চোঁয়ানো গাল দুটিতে অস্ত রোদের রং,
ডুরে শাড়ির ভিজে আঁচল আলপনা দেয় বুকে।

দেখেছিলাম চলতি নায়ে চলেছ বধূবেশে,
কৃষ্ণকলি চোখ দুটিতে রাঙা চেলির আভা—
চাঁদের পানে চিবুক তুলে দূরের নিরুদ্দেশে,
অবাক বসে কি যেন কি স্বপ্নকথা ভাবা!

জোছনা-হ্রদে সাঁতার কাটা নীল পরীদের ছায়া
অথই বিলের স্ফটিক জলের আয়নাটিতে কাঁপে,
স্বপ্নবতী রাতের ঠোঁটে কোন্ কবিতার মায়া—
আকুল তুমি বুঝি তাহার সুরের সংলাপে।

দেখেছিলাম মেঘ-মাতনী মেঘনা নদীর কোলে
নীল নাগিনীর ফণায় চড়ে ঝড়ের অভিসার—
মেঘ-দামিনীর অট্ট হাসে আকাশ পাতাল দোলে,
উথাল পাথাল বিষের ফেনায় সৃষ্টি একাকার।

তার পরেতেই আর দেখিনি, তুফান এল পূবে :
কোন্ পাতালে তলিয়ে গেলে ময়নামতীর মেয়ে—
মধুমালার স্বপ্ন আমার কোথায় গেল ডুবে,
সর্বনাশের অন্ধকারে আকাশ গেল ছেয়ে।

তুমি তো দিলে না রঙ

জয়ন্তী সেন

তুমি তো দিলে না রঙ
মনে করে নিজেই এঁকেছি—
আমার পৃথিবী আর আকাশের সুগভীর নীল
নিপুণ ছন্দের ধাপে সবখানে সবটুকু মিল।
তুমি তো ফেরালে মুখ
তবু আমি অন্য মুখ ধ্যানে
কল্পিত স্বপ্নের স্বাদু স্নিগ্ধতায় হৃদয় ভরাই
বিচ্ছেদ বেদনা মুক্ত আনন্দের সুখে শিহরাই।

অথচ তোমারই রঙ মিলে মিশে ছবিতে আমার
হয় একাকার
অথচ তোমারই মুখ প্রিয়তম মুখের আদলে
সবটুকু মেলে।

স্মৃতি

অবিনাশ রায়

আজ কিছু স্পষ্ট নয়, কাঁচের টুকরোর মত স্মৃতি
ইতস্ততঃ জ্বলে উঠে জীবন-নাট্যের চারপাশে—
কলকাতার কালীদহে শৈশব-যৌবন ভেসে যায়
কদম্ব-কাননে নামে অন্ধকার, হিংসা, প্রেম-প্রীতি
ভালবাসা, চিহ্নগুলি ক্ষতচিহ্ন হয়ে ফিরে আসে :
আর্তস্বরে কাঁদে হাওয়া ঝাপ্সা ধুলোপথ, [illegible]
সহৃদয়েষু বন্ধু, প্রতিধ্বনিত ইউনিভার্সিটি
সাহিত্যের আলোচনা, কবি সম্মেলন, সব শেষ।

মৌমাছি বৃত্তিতে কারা আত্মসুখী, হর্ষের বারতা
মাঝে মাঝে চমকে দেয় লস্ এঞ্জেলের নীল চিঠি।
নৈরাশ্যের পৃথিবীতে কোন স্থানে সূর্যোদয় হয়।

নরকের গান

আবুল কাশেম রহিমউদ্দীন

এবার আমার নরকেও ফুল ফোটে,
স্বর্গে তোমার থামাও জয়ধ্বনি;
অন্ধকারের ললাটে সূর্য ওঠে
নরকের দীন বাসনা পরশমণি।
সেই আমরণ সরণীর দুই বাহু
আলোর তনুকে জড়ায় গভীর সুখে,
কক্ষচ্যুত সর্বনাশের রাহু
গভীর কবরে লজ্জিত কালো মুখে।
বন্ধ্যা জমির জাগরণ কী-যে মধুর,
ফুল্ল প্রাণের চতুরঙ্গনে তার
হাজার নদীর জঙ্ঘা বাজায় নূপুর।
স্বর্গে তোমার বহু বয়সের ভার
অনাদি কালের স্বরূপে ধরায় শনি,
এবার নিছক অহংবোধেই তার
আর কি মানায় দুঃস্থ জয়ধ্বনি?
সূর্যেও তার বৈরাচারের ছায়া,
দুর্দিন তার দুই দিগন্তে হাঁটে,
আলো-আঁধারির নির্বেদ নীল মায়া
আসন বিছায় শেষ পারাণির ঘাটে!

তাইতো তোমার স্বর্গ পাষাণকারা,
নরকে আমার নবীন ফুলের জয়,
বাসর-রক্ষা দৈবশরণে যারা,
সত্য কেবল তাদেরই সত্য নয়!
হাজার কলির শিখরে আমার গান
অনাদি কালের প্রত্যয় নিয়ে দোলে,
পশ্চাতে সঁপে যন্ত্রণা তার প্রাণ
রাত্রি আমার সহাস্যে মুখ তোলে।

আলোর প্রয়াণে স্বর্গের বৃথা বোধন
কালান্তরের বিবিক্ত শবাধার
দর্শনে জাগে দেবতার চাপা রোদন॥

বিলম্বমঙ্গল

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

আমার কন্যাটি একটু গানটান গাইতে পারে। আমাদের শহরতলির গ্রামে আশেপাশের পাড়ায় ছাড়াও ধারেকাছের গ্রামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে সসম্মান আমন্ত্রণ পায়। গান গেয়ে, শুনি, প্রশংসাও পায়। গত বছর পঁচিশে বৈশাখের মরসুমে পাশের স্টেশনের গ্রামে এক শনিবারের সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-জলসায় গান গেয়ে এল।

পরদিন সকালবেলা আমার বাড়িতে এসে হাজির নবকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্যে। যৌবনকালের সহপাঠী বন্ধু। গত তিরিশ বছরের ওপর দেখা নেই। মাথায় একসঙ্গে টাকপাক ধরিয়ে পুরানো কৃষ্ণ হয়ে গেছে।

আট বছর হয়ে গেল সে নাকি পাশের স্টেশনের গ্রামে বাড়ি করে বাস করছে। বলল, তোমার সঙ্গে, ভাই, দেখা করতে আসি-আসি করছি অনেকদিন ধ'রে, কিন্তু আসা আর হ'য়ে ওঠে না। এ বয়সের নানান হ্যাপা—সময়ের অভাব—শরীরে আজকাল তাগতেরও অভাব—বুঝতেই তো পারছ নিজেই।

—তা তো বটেই। তা তো বটেই। সে আর বলতে?

এর মধ্যে কাল সন্ধ্যায় এক নতুন সূত্রের আকর্ষণ পেলাম। সেই টানে আজ তোমার বাড়ি আর না এসে থাকতে পারলাম না, ভাই।

—ভাল ভাল। তা, নতুন আকর্ষণটা কী?

—তোমার মেয়ে। আমাদের পাড়ায় কাল রবীন্দ্র-সভা হল। তোমার মেয়ে গান গেয়ে একেবারে মাত্ করে দিলে, ভাই। সভাশুদ্ধ লোক 'আর-একখানা আর-একখানা' ক'রে চেঁচিয়ে চারখানা গান গাইয়ে ছাড়ল তোমার মেয়েকে দিয়ে। আহা—মধু! আর, দেখতেও হয়েছে যেন মা-দুর্গা। কে মেয়েটি? কার মেয়ে? পাড়ায় পথে তো কোনদিন দেখিনি! খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, তোমার মেয়ে!

কন্যাপ্রশস্তিতে পিতৃহৃদয় উল্লসিত হল। নব বলল, ডাক দেখি মেয়েকে।

ডাকলাম। মেয়ে এল। বন্ধুর পরিচয় দিলাম। মেয়ে তাকে এবং আমাকেও প্রণাম করল।

নব উচ্ছ্বসিত হল, অ্যাই! এই জিনিষটা এখনকার অনেক ছেলেমেয়েই জানে না, ভাই। এক জায়গায় যত গুরুজন ব্যক্তি থাকেন, তাঁদের একজনকে প্রণাম করলে যে সকলকেই প্রণাম করতে হয়, এই কথাটা আজকাল...

সেই থেকে শুরু ক'রে আর এক দফা প্রচণ্ড প্রশস্তি চলল। মেয়ে লাল হয়ে উঠল। ছেলেরাও এল। তাদের মাকেও ডাকলাম। বহুকাল পরে মেয়ের টানে আমার হারানো বন্ধুর অভ্যুদয়ে গৃহ আনন্দমুখর হল।

মেয়ে এবং ছেলেরা নিজেদের কাজকর্মে গেল। ঘরে শুধু আমরা দুই বন্ধু। গৃহিণী জলযোগের থালা এনে বন্ধুর সামনে দিলেন। গৃহকর্তাও, বলা বাহুল্য, বঞ্চিত হলেন না। নবকৃষ্ণ হাত তুলে বসে গৃহিণীকে বলল, আপনাদের কাছে এসেছি আমি এক প্রার্থনা নিয়ে। আগে বলুন পূরণ করবেন, তা নইলে...

গৃহিণী আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করলেন। আমি করলাম বন্ধুর দিকে, কী ব্যাপার? প্রার্থনা-টার্থনা কী সব বলছ আবার?

নব বলল, তোমার কন্যাটি আমাকে দিতে হবে, ভাই।

অর্থাৎ?

—আমার ছেলে দেখলে তোমার অপছন্দ হবে না। কিন্তু সে এখানে নেই। কানপুরে চাকরি করে। বি. এস-সি পড়ছিল, অতবড় নামজাদা কারখানায় ভাল চাকরি পেয়ে বাইরে চলে গেল, তাই আর পড়া হল না।

—তা, পড়া তো চাকরির জন্যে। ভাল চাকরিই যখন পেয়ে গেল। কী চাকরি? মাইনে কত?

—সুপারভাইজার। তোমাদের আশীর্বাদে তিনশ' টাকার ওপর পাচ্ছে এখন। ছেলের ফোটো নিয়ে এসেছি আমি।

দেখলাম। চমৎকার চেহারা। স্বাস্থ্যবান। বলিষ্ঠ। অতি বাঞ্ছনীয় লোভনীয় পাত্র। তার ওপর বন্ধুপুত্র। অসামান্য সংযোগ। বললাম,

মেয়ের বয়স যে মোটে এই ষোলো চলছে। ক্লাস টেন-এ পড়ছে। বিয়ে হলে কি আর পরীক্ষা দেওয়া হবে?

—খুব হবে। এবারে না হয়, আসছে বারে দেবে। আর, পরীক্ষা যদি না-ই দেওয়া হয়, কি, ধর পরীক্ষা দিয়ে যদি পাস করতে না পারে, তা হলেই বা কী? আমার বউমাকে কেরানিগিরি করতে হবে না।

—কিন্তু বয়স...

—কুড়িপারের বুড়ি আমার একদম পছন্দ হয় না, ভাই। ছেলেরও এই পঁচিশ চলছে। বেমানান হবে না। এখনকার তিরিশ-পারে ছেলের বিয়ে দেওয়া—তাও আমার একদম অপছন্দ।

—আমি যে একেবারেই প্রস্তুত নই। সঞ্চয় সম্বল কানাকড়ি নেই। ধার-দেনায় নাক পর্যন্ত ডুবে আছি।

—এক পয়সাও চাইনে আমি। আমি শুধু চাই তোমার মেয়েটি। ব্যস্। মাকে আমার পছন্দ হয়েছে, আমার মনে লেগেছে, আর কিছু চাইনে।

—কিন্তু, তোমার যোগ্যপুত্র। একটু চেষ্টা করলেই তো—মানে কন্যাদায়ের বাজারে...

—অনেক খুঁজেছি। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছি। কিন্তু মনের মত পাত্রী পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, ভাই। তোমার ছেলেও তো বড় হয়েছে। পাত্রী খুঁজতে নেমে, দেখ না।

সম্মতি আদায় করে তবে ছাড়ল নব। আমিই বা এমন সুযোগ আর পাব কোথায়? বন্ধু-বেয়াই ক'জনের ভাগ্যে জোটে? অপ্রত্যাশিত একেবারে!

কিন্তু দাবি-দাওয়া তার কিছুই না থাকলেও, আমার একমাত্র কন্যা, আমাকে তো যথাসাধ্য কিছু দিতেই হবে। শুধু বিয়ে দেওয়ার খরচা—তাই কি কম? গয়না মেয়ের মা'র যা আছে তা থেকে ছ'-সাত ভরি খসানো চলবে। তাঁর গয়নার এ বয়সে এর চেয়ে বেশি সার্থকতা আর কিসে? বাকি খরচা অনেক কষা-কষি কাটছাট করেও আড়াই হাজারের নিচে নামানো গেল না। ঠিক করলাম, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ছত্রিশ কিস্তির বিশেষ ব্যবস্থায় নিতে হবে দু' হাজার সাতশ' টাকা। মাইনে থেকে মাসে মাসে পঁচাত্তর টাকা করে কাটা যাবে ছত্রিশ মাস। কন্যাদায় উদ্ধারের এমন সুবর্ণ সুযোগ তো হাতছাড়া করা যায় না। তারপর সংসার তো পড়েই আছে ভগবানের চরণতলে। বড় ছেলেটির একটা চাকরি হব হব করছে। তাই যদি হয়ে যায়, তবে এম-এ পড়ে আর কোন ফয়দা?

অবিলম্বে অফিসে দরখাস্ত করে দিলাম প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার পাবার জন্য। একটা ভরসা পাওয়া গেল। চাকরির মেয়াদ যখন আর পাঁচ বছর কি তার চেয়েও কম, তখন প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা ধার নেওয়া হলে যদি তা শোধ করা না যায়, তাতেও অপরাধ হয় না।

দরখাস্ত করলাম মে মাসের পনেরো তারিখ—বৈশাখ মাসের শেষ। একটা সুবিধে, বন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র—তার বিয়ে তো জ্যৈষ্ঠ মাসে হতে পারে না। নবর আপত্তি নেই। কিন্তু শাস্ত্রের দোহাই পেড়ে আমিই প্রবল আপত্তি তুললাম। আমারও তো জ্যেষ্ঠ সন্তান না হলেও জ্যেষ্ঠকন্যা। অগত্যা নবকৃষ্ণকে জ্যেষ্ঠ-জ্যৈষ্ঠ মানতে হল।

অফিসের হিসাব শাখায় যে বন্ধুটি প্রভি-ডেন্ট ফান্ড নিয়ে কাজ করেন, তাঁকে অনুনয় করে বললাম, ভাই, এই এক মাসের মধ্যে যেমন করে হোক টাকাটা তুলে দিতেই হবে। দেখবেন যেন, আমার কন্যাদায়।

বেসরকারী অফিসে কী হয়। তার কিছু-দিন আগেই তো দেখেছি। এক বন্ধুর বাবা মারা গেলেন। পিতৃদায় উদ্ধারের জন্য তিনি তাঁর অফিসের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে কয়েকশ' টাকা ধার পাবার দরখাস্ত করলেন। টাকা পেয়ে গেলেন তৃতীয় দিবসে। কিন্তু আমাদের হল মহামান্য সরকারী ব্যাপার।

অফিসে তাগিদ চালালাম নিত্য।

জুন মাসের অর্ধেক কেটে গেল। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ। নবকৃষ্ণ তাড়া দিল। বললাম, এই—আর ক'টা দিন। সবে তো আষাঢ় পড়ল হে।

অফিসের হিসাব-শাখা বলল, একবার অর্থদপ্তরে যান দেখি।

একবার ছেড়ে অনেকবার গেলাম। দিনের পর দিন গেলাম। উপদেশ পাওয়া গেল, অমুক অফিসে গিয়ে খোঁজ করুন।

গেলাম। জানা গেল, যাঁর কাছে আমার ফাইল, তিনি ছুটি নিয়েছেন। ধরলাম গিয়ে শাখা-কর্তাকে। পাত্তাই দিলেন না। অফিস থেকে সহকারী সচিব মশাইকে দিয়ে ফোন করালাম। তাঁর চিঠি নিয়ে গিয়ে ধরলাম এক বড়কর্তাকে। তিনি উপস্থিত কর্মচারীদের একজনকে ডেকে আমাকে উদ্ধার করার উপদেশ দিলেন। তখন আমার ফাইল নিখোঁজ।

একদিন জানা গেল, ফাইল নাকি ফেরত এসেছে আমার অফিসে। কী এক ফ্যাকড়া নাকি উঠেছে।

সর্বনাশ! এদিকে আষাঢ় চলে যায়! পাত্রের পিতা মারমুখী হয়ে উঠল। চোখা চোখা কথা শোনাতে লাগল। কিন্তু আমি নিরুপায়।

অফিসে নথির পাত্তা পাওয়া গেল দিন-দশেক পরে। ফ্যাকড়া কী? সংশ্লিষ্ট সহকারী বললেন, এই রে! যে-মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য টাকা চেয়েছেন, সে যে আপনার ওপর 'সোললী ডিপেনডেন্ট' তা তো লেখেননি।

—আমি কী করে জানব যে ওটা লিখতে হবে? আপনি তো বলে দেননি, ভাই।

ভাই বললেন, আমিই কি অত দেখেছি? আর ওর জন্যে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা কি আমিই জানতাম, দাদা?

—আমার মেয়ে যে একান্তভাবে আমার ওপরই নির্ভরশীলা, তাও বলবার দরকার আছে?

তিনি ভেবে বললেন, আছে বইকী! আপনার মেয়ে বলেই যে আপনার ওপর নির্ভরশীলা হবে, তার কী মানে আছে।

—তা না হলে তার বিয়ে দেবার কী দায় পড়েছে আমার?

—আইনতো সে কথা বুঝবে না!

আইনকে বোঝাবার ব্যবস্থা করলাম। লিখে দিলাম, যার বিয়ে দেবার জন্য টাকা চাইছি, সে আমার একমাত্র কন্যা এবং আমার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীলা—'সোললী ডিপেনডেন্ট'।

নথি কেঁচে যাত্রা শুরু করল।

শ্রাবণের অর্ধেক কাবার।

পাত্রের পিতা একদিন মুখচোখ শুকিয়ে এসে হাজির। পাত্র নাকি লিখেছে যে, হঠাৎ তাদের কারখানায় খুব জরুরী কাজ পড়ে গেছে। সুতরাং এখন বিয়ে-হেন ব্যাপারের জন্যও এক সপ্তাহের বেশি ছুটি পাওয়া যাবে না। অন্তত একটি মাস ছুটি না পেলে সে বিয়ে করতে আসবে না।

সেই চিঠির বার্তা নিয়ে নবকৃষ্ণ আমার বাড়িতে এসে শুয়ে পড়ল। আমার তো নাড়ী ছেড়ে যাবার দশা। বেঁকে বসল নাকি পাত্র? গেল নাকি সব উলটে?

অফিসের ভায়ার কাছে বললাম সে কথা। শুনে তিনি এবং তাঁর আশেপাশে যতজন ছিলেন সকলেই মর্মান্তিক ব্যথিত হলেন। কিন্তু সকলেই নিরুপায়। সরকারী ব্যাপারই আলাদা, তাঁরা করবেন কী? আমাদের হিসাব-শাখা কী করবেন? অর্থবিভাগই বা কী করবেন? কেই বা কী করবেন? তাঁদের তো আইন দেখতে হবে।

শ্রাবণ মাস চলে গেল। তারপরে তো ভাদ্র-আশ্বিন কার্তিক মাসে বিয়ে হবে না। অগত্যা অগ্রহায়ণের মুখ চেয়ে দিন গুনতে লাগলাম—এক এক করে মালা জপার মত। হিসাব-

বিভাগে, অর্থ-বিভাগে, মহা-হিসাবশালায় কয়েক দিন পরে-পরেই ধরনা দিতে লাগলাম, অগ্রহায়ণ মাসের আগে যাতে টাকাটা পাওয়া যায়, দয়া করে তার একটু চেষ্টা করুন, দাদা। হাঁটুর বয়সী ছোকরাদেরও দাদা বলতে লাগলাম।

পাত্রকর্তা আর ঘন ঘন আসে না। যখন আসে, তখনই আমাকে যা-তা শুনিয়ে যায়। মরমে মরে থাকি।

টাকা অগ্রহায়ণের আগেই পাওয়া গেল। পুজোর ছুটির কয়েক দিন আগে। মাত্র পাঁচ মাসেই।

পুজোর ছুটিতে বেড়াতে এল বিনয়—আমার প্রধান কুটুম্বের নন্দন। বললাম, কতকাল পরে পিসিমাকে মনে পড়ল, বাবা?

বলল, আমি তো এখন এখানে থাকি নে, পিসেমশাই। আপনি জানেন না? কেন? পিসিমা আপনাকে বলেন নি?

স্মরণ করতে পারলাম না। হয়তো বলেছেন, আমার খেয়াল নেই। বয়স হয়েছে তো। তা, কোথায় আছ এখন?

—কানপুরে।

সেই একই বিরাট প্রতিষ্ঠানে চাকরি—যেখানে আমার বন্ধু নবকৃষ্ণের পুত্র—আমার কন্যার জন্য স্থিরীকৃত পাত্র শ্রীমান মনীষ বাবাজীবন কাজ করে।

জিজ্ঞেস করলাম, মনীষকে চেন? ওখানে সুপারভাইজার। মনীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বলল, হ্যাঁ,—হ্যাঁ, খুব চিনি। এদিকেই তো কোথায় যেন বাড়ি।

—এইতো, আমার পাশের স্টেশনের গ্রামে। আমার ছেলেবেলার বন্ধু নবকৃষ্ণ, তার ছেলে মনীষ।

—তাই নাকি! তা, মনু ব্যানার্জিকে চেনে না এমন লোক ও-তল্লাটে কমই আছে।

—আচ্ছা! খুব 'সোশ্যাল' ছেলে বুঝি?

বিনয় মুখ বাঁকাল, হ্যাঁ! মোনা ব্যানার নামে সেখানকার 'সোসাইটি' সভয়ে সেলাম ঠোকে।

—মোনা ব্যানা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ! ওই হল সেখানে তার গৌরবের খেতাব। কিন্তু, আপনার বন্ধুপুত্র, তার সম্বন্ধে আমার কিছু বলা বোধ হয় ঠিক হবে না, পিসেমশাই।

উদ্বিগ্ন হলাম, ছেলেটির সম্বন্ধে যে একটু ভাল করে জানা দরকার আমার। তার সঙ্গে শীলার বিয়ের একটা প্রস্তাব এসেছে, বাবা।

বসে ছিল বিনয়, আঁতকে উঠে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ল, শীলার বিয়ে মোনা ব্যানার সঙ্গে! বলছেন কী আপনি? মোনা ব্যানার সঙ্গে......শীলার......অসম্ভব।

বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া গেল। মনীষ ওখানকার একটি প্রথম শ্রেণীর নামজাদা গুণ্ডা। কারখানার কর্তৃপক্ষের পোষা গুণ্ডাদলের অন্যতম সর্দার। মাইনে পায় শ-দুই টাকা, কিন্তু উপরি পায় অন্তত তিনশ টাকা। এক পয়সাও থাকে না, বাড়িতেও পাঠায় না, উল্টে ধার করে। জুয়ার আড্ডার বড় পাণ্ডা। মদ এবং তার আনুষঙ্গিক সর্বগুণের গুণধর। মনীষের বিয়ের কথা নাকি ওখানেও ছড়িয়েছে, কিন্তু হালে সে একটি নববিদ্যাধরীর সঙ্গে মশগুল, তাই হয়তো বিয়ের উৎসাহে ভাঁটা প'ড়ে গেছে। কারখানায় সে এমন কোন কর্মই করে না যার জন্য ছুটি পাবে না।

বিনয় বলল, চলুন না, পিসেমশাই, আমার ওখানে গিয়ে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসবেন। ওতো আপনাকে চেনে না। পরিচয় পেলেও পরোয়া করবে মনে হয় না। আপনি ওখানে গিয়ে একটি সপ্তাহ থাকলেই ওর কোন তথ্য জানতে আর বাকি থাকবে না।

পরদিন সকালেই গেলাম নবকৃষ্ণর বাড়ি। শুধোলাম, একী শুনছি ভাই নবো?

তার ছেলের সম্বন্ধে যা যা শুনেছি সব বললাম।

নীরবে নতমস্তকে সব শুনল। বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, যা শুনেছ সবই সত্যি।

—আর, তা জেনেও তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার ওই কীর্তিমান পুত্রের বিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লেগেছ!

বলল, আমায় ক্ষমা কর, ভাই। ভেবেছিলাম, একটি সুন্দরী গুণবতী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলে, তার সংস্রবে—তার প্রভাবে যদি শোধরায়।

—যদি না শোধরায়? আমার মেয়েটির ওপর দিয়ে তুমি পরীক্ষা চালাতে চেয়েছিলে?

কেঁদে ফেলল, আমার মাথার ঠিক নেই, ভাই। এমনি দেখতে পাচ্ছ বটে যে, আমি স্বাভাবিক মানুষের মত চলছি, কিন্তু আসলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার মত বিপদে পড়লে কারও মাথার ঠিক থাকতে পারে না। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, মহাশত্রুও যেন আমার মত বিপদে না পড়ে।

বিনয় আমাকে বাঁচিয়ে দিল। বিনয় নয়, তার মধ্য দিয়ে কোন্ মঙ্গলদেবতা আমাকে—আমার মেয়েকে বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু তারও আগে বাঁচিয়ে দিল আমার সরকারী অফিস। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা যদি আমি এক মাসের মধ্যে—কি দেড়মাসের মধ্যে পেয়ে যেতাম, তা হলে তো কবে সেই আষাঢ়ে কি শ্রাবণের গোড়াতেই আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে যেত!

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা তোলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন যত বন্ধু, পুজোর ছুটির পরে অফিসে গিয়ে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছি। তাঁদের চা খাইয়ে দেবার প্রস্তাব করেছি। তাঁরা সরকার-মধ্যবর্তী নারায়ণকে নমস্কার জানিয়েছেন।

এ বছর এপ্রিল চলে গেছে তিন মাস আগে, আমি এখনও আমার ইনক্রিমেণ্টের জন্য অফিসে একবারও তাগিদ দিইনি।

আত্মীয় বলেছিলেন, বিদেশে যাচ্ছ Beware of pick-pockets মটোটাকে সব সময়ে মনের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে। উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে যত কিছু পুণ্য-কর্ম করবে—সব সময়ে যেন ওটা চোখে পড়ে! মনে করবে চোর বদমাইশ গুণ্ডা গাঁটকাটারা সর্বদাই তোমার আশে-পাশে ঘুরছে।

উপদেশটা হিতকর নিঃসন্দেহ, তবু অস্বস্তি ঘুচেছিল না। ভ্রমণের শান্তি কে যেন কেড়ে নিয়েছে মনে হচ্ছিল! সব জায়গায় যদি কাঁটা আর পাঁকই ছড়িয়ে রইল—স্বচ্ছন্দে পা ফেলি কোথায়!

পা ফেলার জায়গা অবশ্য কোথাও ছিল না। যাকে বলে 'সিমভাতে হওয়া' তেমনি অবস্থায় ট্রেনের কামরায় চেপেছিলাম। ভ্রমণের ভয়াল রূপটি সর্বত্র দেখছিলাম—সকলের চোখে-মুখেও সেটি ফুটে উঠেছিল। ইতিমধ্যে গয়া আর প্রয়াগেও নামতে হয়েছিল। কুলির, গাড়োয়ানের আর পাণ্ডার বিভীষিকা রীতিমত কায়েম হয়ে গিয়েছিল মনে। সবাই যেন ওৎ পেতে বসে আছে শিকারের লোভে,—নিরীহ তীর্থযাত্রী দেখবা-মাত্রই পাঁয়তাড়া কষে তার ঘাড়ে প্রচণ্ড একটা লাফ......নাসিকে পেঁছে মনে হল এইবার এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে।

এই ধারণাবশতই ভদ্রলোকটিকে প্রথমে আমল দিই নি। যেন শুনতে পাইনি—এমনি অনা-মনস্কতার ভাণ করে মালপত্র গোছগাছ করতে লাগলাম।

প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করলেন উনি, তীর্থে চলেছেন বুঝি? পঞ্চবটীতে থাকবেন তো?

সন্তর্পণে ঘাড় নেড়ে যাচ্ছি—হঠাৎ—'আপনাদের পাণ্ডা কে?' প্রশ্নে চমকে উঠলাম। বুঝলাম—ইনিই পাণ্ডা—আর আমাকে করকবলিত করতে আগ্রহী।

নিস্পৃহভাবে বললাম, তীর্থ-কর্ম করব না, ঘুরে-ফিরে দেখব জায়গাটা।

অ! হাসলেন ভদ্রলোক। টাকা খরচ করে এতদূরে এলেন শুধু জায়গাটা দেখতে! হিন্দু হয়ে তীর্থের কাজই যদি না করলেন—

বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলাম, করা না করা আমার খুশি।

ওঁর মুখের হাসি ঠিক রইল—বললেন... ঠিকই তো—আপনার খুশি। এখন জমানা বদল হয়েছে—খুশিরই তো জয়-জয়কার!

বক্রোক্তিতে হুল ছিল—বিদেশ বলে গায়ে মাখলাম না। ট্যাকসিতে গিয়ে উঠলাম। ভাবুক গে যা খুশি—এখানে সৌজন্য শিষ্টাচারের কি মূল্য!

এলাম পঞ্চবটীতে, উঠলাম ধর্মশালায়। নিরাপদ কোটে এসে নির্ভয় হলাম।

পরের দিন সকালে গোদাবরীর ঘাটে চলেছিলাম স্নান করতে। এ ধারের জায়গাটা বেশ ছোটই। নদীকে ঘিরে বসতবাড়ী, মন্দির, হাট-বাজারের মেলা। এ পারে পঞ্চবটী—ওপারে নাসিক। ও পারের বিস্তারটা বেশী।

আমাদের ধর্মশালার নিকটেই গোদাবরীর স্নান-ঘাট, রামকুণ্ড। সেখানে স্নান-তর্পণ-পূজো-মন্ত্র—বিধি আচার। সেখানেই শিকার-প্রত্যা অভাবও ছিল না। নানা ধরনের প্রশ্ন। বাবু মোকাম কোন্ দেশে—কোন্ জিলায়? কি গোত্র কি? পিতার নাম—গ্রামের নাম?

জবাব একটিই দিলাম—মোক্ষম জব তীর্থের কাজ করব না—ব্যস, সরে পড়।

একজন বাদে সবাই সরে পড়ল। সেই জন আমার কটূক্তি গ্রাহ্য না করে বলে লাগল, আপনার খুশি হয় মন্ত্র বলবেন—উৎসর্গ করবেন—পিতৃ-পুরুষকে সন্তুষ্ট কর —এতে জোর-জুলুম নেই। এতদূরে একব আসে লোকে—একবারই ক্রিয়াকর্ম করে। পুণ্য এ-সব না-ই মানুন—পিতৃ-পুরুষকে শ্র জানিয়ে তো কম তৃপ্তি হয় না—

কথাগুলো পাকা পাকা—বাঁধুনি আলগা ঠিক যুক্তির ধার না ঘেঁষেও ভাব-নাটাতে তুলতে সক্ষম। চাইলাম ভাল করে। বয়স হয়ে লোকটার—মাথার চুলে পাক ধরেছে। পর ধুতি—কাঁধে উত্তরীয়, নগ্ন পা, উপবীত দ মান। ধুতি-চাদর ফরসা—মনে হয়, এই মাত্র ভেঙে পরে এসেছে। কপালে একটি চন্দ ফোঁটা। বাহুমূলে একগাছা তাগা—সেটা তুলস কি অন্য বস্তুর—ঈশ্বর জানেন। বয়স যা হয়েছে, কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারা।

ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে বললা কাল যেন আপনাকে কোথায় দেখেছি? স্টেশ কি?

হাঁ বাবু, এই আমার বৃত্তি, যজমান নিয় আমরা আছি।

এই ছ-মাইল রাস্তা রোজ যাতায়াত করে হেঁটেই যান?

হেসে বলল লোকটা, ও আর বেশি কি? কখনো কখনো যাত্রীর সঙ্গে গাড়ীতেই ফি আসি। বোঝেন তো বাবু—যে দিন-কা পড়েছে!

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বললাম, বুঝি। তবে আপনিও নিশ্চয় ...খেন—সেই আগেকার দিনের ভক্তি-শ্রদ্ধা আর ...ষের মনে নেই?

নেই বলেই তো আমাদের এই অবস্থা। ওর ...ঠ করুণ শোনাল।

বললাম, তা অন্য কাজ করেন না কেন?

...কি কাজ করব—কে কাজ দেবে? ইংরেজি ...খাপড়া জানি নে—বয়স হয়েছে, খাটবার ...তা গেছে—কি কাজ করব?

কেন—আপনি না পারেন, ছেলেরা তো কাজ-... করতে পারে!

জওয়ান ছেলে আর কই! নিঃশ্বাস ফেলল ...কটি। যেটা আছে—খোঁড়া—কাজের বাইরে। ...কেই খাওয়াতে হয়। আমরা বুড়ো-বুড়ি—...ছেন তো দিন-কাল—

মনটা নরম হল। শিকারীর মুখে অন্য ...! বললাম, শুনুন তাহলে সত্য কথা—ওই ...স্নান-তর্পণে আমার বিশ্বাস নাই—ওসব ...রতে আসিনি।

হায় রাম! বলে মুখ ফিরিয়ে ও রামকুণ্ডের ...কে চাইলে। হায় প্রভু, তোমাকেই যারা মানে ...—তারা কী দেখতে এখানে আসে! এখানে ...মি ছাড়া আছে কী!

হেসে বললাম, সেকি পাণ্ডাজী—রামজী ...ড়া এখানে দেখবার কিছু নেই! এমন সুন্দর ...ট-এমন সহর—

ও বললে, বাবুজী, রামজী এসেছিলেন ...লেই তো গোদাবরীর ঘাট এমন সুন্দর করে ...ধানো দেখছেন, এত বড় সহর দেখছেন। ...শ্রম তৈরী হয়েছে কত—কত মানুষ আসছে ...দেশ থেকে—কত মানুষ তাঁর দৌলতে খেয়ে ...রে বাঁচছে। এই সবই তো রামজীর কৃপা।

আপনি এই সব বিশ্বাস করেন? বললাম।

করি।

হেসে বললাম, তবে আর আপনার ভাবনা ...? রামজী খাওয়া পরার ভার নিয়েছেন ...ভরে চুপ করে বসে থাকুন না।

ও হাসল। বলল, প্রভু কি বলেছেন, ...তোমরা কাজ করো না—চুপ করে বসে থাক ...? তাহলে হাজার কোশ পথ ভেঙ্গে অযোধ্যা ...থেকে এখানে এলেন কেন? কেন লঙ্কায় ...গেলেন? অত বড় পেল্লায় যুদ্ধই বা করলেন ...কেন! না বাবুজী—এ সংসার—কাজের জায়গা। ...র যা কাজ তা তাকে করতে হয় বই কি। ...ভু নিজে কি কাজ করেননি? যিনি ইচ্ছে ...করলে সব করতে পারতেন—তিনিও কি কম ...ষ্ট ভোগ করেছেন।

ওর কথা মন্দ লাগছিল না। ইচ্ছা হল—...রও একটু পরীক্ষা করে দেখা যাক—এই ...র কথার দৌড় কতদূর।

বললাম, ভাল-ভাল। রামজীর কৃপায় আপনার দিন চলে যাচ্ছে—একথাটা নিশ্চয় ...নেন?

ও ঘাড় নেড়ে বলল, মানি।

বললাম, আচ্ছা, কাল বিকেলবেলা তো ওই ...দূরে ছুটেছিলেন, আমিও আপনাকে আমল ...ইনি—কাল কি উপার্জন করেছিলেন?

সকালে দিন চলার মত কিছু পেয়েছিলাম ...পেট ভরার মত আটা মিলেছিল।

স্কেচ — দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আজ?

তাইতো আপনাকে বলছি—স্নান তর্পণ করুন—

আমি ওসব বিশ্বাস করি না—আপনি অনাত্র চেষ্টা দেখুন।

আমার রূঢ় কথায় লোকটি বিষণ্ণ মুখে চলে গেল। ঘাটে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম—আরও যাত্রীর পিছু পিছু ঘুরতে লাগল, কিন্তু কেউ ওকে আমল দিল না।

অতঃপর স্নান সেরে উঠলাম। তখনও দেখি—ও ঘাটের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে।

পরিহাসের ভঙ্গীতে বললাম, কেউ তো আপনাকে দিয়ে কাজ করালে না। আপনার রামজীর কৃপায় নিশ্চয় উপোস করতে হবে না?

লোকটা গভীর দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে বললে, তাঁর কৃপা হলে উপোস দেব না।

যদি কৃপা না হয়?

ও হেসে বলল, বাবুজী—উপবাস করা অভ্যাস আছে আমাদের—আমরা একাদশী করি—রামজীর বার-তিথি পালন করি—

ওর কথায় বিশ্বাসের একটি বেগ অনুভব করলাম। সুদৃঢ় একটি প্রত্যয়ের সুরে কথাগুলি উচ্চারণ করল যেন। মুগ্ধ হলাম। খুশি হয়ে বললাম, আপনার রামজী বলছেন—আজ আপনি উপবাসী থাকবেন না। এই নিন—

লোকটি অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। আমার হাতে ধরা নোটখানার পানে চেয়ে খুশিতে চকচক করে উঠল ওর চোখ দুটি। বলল, দাঁড়ান—ফুল-চন্দন ভোজ্য নিয়ে আসি।

হাত উঠিয়ে বললাম, না-না—ওসব কিছু চাই না—টাকাটা আপনি নিন।

নিমেষে ওর মুখ থেকে খুশির রং মুছে গেল। ও কাতর চোখে আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করে বলল, ভিক্ষে দিচ্ছেন?

কথাটা ফিরে এসে লাগল বুকে। আমার স্পর্ধাকে—অহংকারকে কুৎসিতভাবে প্রত্যক্ষ করালে। নিজের অভদ্রতায় আহত হলাম—মর্মপীড়া ভোগ করতে লাগলাম। এক মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে ভেবে নিলাম—কি করতে পারি আমি? কি প্রতিকার করা সম্ভব?

আমার মুখে হয়তো মর্ম-বেদনার রেখাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আমার পানে একবার চেয়ে নিয়ে ও যেন অপ্রতিভ হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর আরও নামিয়ে বলল, কিন্তু বাবু, আপনার কোন কাজ তো করতে পারছি না—শুধু শুধু টাকা নেব কেন? আপনি কি এমনভাবে টাকা নিতে পারতেন কারও কাছে?

কথাটার অন্তর্নিহিত জ্বালা ছিল হয়তো—আমার মনে কিন্তু জ্বালা ধরাল না। শুধু মনে হতে লাগল আমি অনেকখানি নেমে গিয়েছি। টাকাটা পকেটে তুলতেও পারছি না। কিছুতেই সহজ হতে পারছি না। কি করি—কি করি—! অস্থির হয়ে উঠলাম।

লোকটা আমার অস্থিরতা লক্ষ্য করল। একটু করুণ হেসে বলল, আমাকে দয়াই করতে চান যদি—বেশ তো, যেটুকু আমার করণীয় তা করতে দিন। আর ত কোনদিন আসবেন না এদিকে—তীর্থের কাজটা সেরেই নিন না। রামজী আপনার মঙ্গল করবেন—পিতৃপুরুষরা খুশি হবেন। আনব ফুল চন্দন ভোজ্য সাজিয়ে?

ওর কথায় সহজ মাটিতে পা দিতে পারলাম। ওর সংস্কারে আমার বিশ্বাসে মিলবে না জানি—তবু মনে হল—উপস্থিত ক্ষেত্রে এইটিই ভাল। ওর মধ্যে যে দেবতাকে এখন প্রত্যক্ষ করছি—রামজীকে মাঝে রেখে—তাঁরই কাছে আমার পুজোটা যদি পৌঁছে যায়—যাক না। পঞ্চবটীর মাহাত্ম্য এতে বাড়বে বই কমবে না।

আমার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে দিয়ে ও বলল, ভোজ্য সাজিয়ে আনি। উৎফুল্ল স্বরে বললাম, আনুন।

জীবজগতে প্রেম

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

এ লেখার নাম জীবজগতে প্রেম না হয়ে হওয়া উচিত ছিল প্রেমজগতে জীব। কারণ পূজা সংখ্যার সম্পাদক আপনাদের কাছে আমাকে দিয়ে সেই কথাটাই কবুল করাতে চেয়েছেন। অথচ এ লেখা লেখার আগেই তিনি শিরোনামাটি তৈরী করেছিলেন। অগত্যা তাই এই কলমকে গুটি গুটি পা পা করে সেই পথই অনুসরণ করান হয়েছে। যখুনি আমরা প্রেম কথাটা উচ্চারণ করি আভাষে ইঙ্গিতে মনের মধ্যে মানুষ নামধেয় সেই তাজ্জব জীবটির মুখচ্ছবি ফুটে ওঠে। ধুতি পাঞ্জাবী পরা, কেমন বোকা চাহনীওলা, মহিলা-গত-প্রাণ, কিম্বা আজকাল নর্দমা পাতলুন লাগান, ছুঁচল জুতো পরা কোন রোমিও এবং ছাপা সাড়ী পরা এক বিনুনী করা অড্রে হেপবার্ন মার্কা চুলকরা কোন মহিলার চেহারা। মানুষের মত এমন প্রেম-করনেওয়ালার আর তুলনা হয় না। নব নব প্রেমের আবিষ্কারে সে অনেকবার নোবেল পুরস্কার পেত। মানুষের কাছে প্রেমের ব্যাপারে দেবতারাও শিশু। তাদের মত বিদ্যাধর আর বিদ্যাধরীর তুলনা হয় না।

কিন্তু এই দুনিয়াদারীতে মানুষ ছাড়া হাজার রকমের জীব আছে—তারাও প্রণয় দোলায় দোলে, প্রেম ভালবাসায় ভোলে, দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে পাওয়ায় মাতে। মানুষের মাপকাটি দিয়ে তাদের প্রেম ভালবাসা ভাল কি মন্দ, উচ্চ কী নীচ বললে ভুল হবে। মানুষ প্রেমের জন্য জীবন তৈরী করতে রাজি। অন্য জীবদের কাছে অবশ্য জীবনের জন্য প্রেম আসে। সৃষ্টি রক্ষার্থেই তাদের কাছে প্রেমের যা কিছু অবদান। প্রেম নিয়ে সূক্ষ্ম বিবেচনা, গভীর চিন্তা, উদার কল্পনা করার শক্তি মনুষ্যেতর জীবের পক্ষে অসম্ভব। তারা প্রকৃতির দেনা শোধ করে ভালবাসার নাম করে। তাদের মধ্যেও মিলনে অধীরতা, যৌবনে অস্থিরতা এবং যৌবন বন্যায় সমান পরবশ হতে দেখা যায়। কয়েক হাজার জীবের মধ্যে জীবনের এই নিভৃততম স্ফুরণটি কেমন করে অলক্ষ্যে ঘটে চলে তার সব কথা আজও সম্পূর্ণ জানা নেই। আরও মুস্কিল মানুষ যতটুকু দেখে তাতেও আবার মানবীয় গন্ধ আবিষ্কার করে। যৌবন বিভ্রমবিলাস এসব মানুষেরই সাজে। মানুষে সহজেই যৌবনের জোয়ারে ভেসে যায়। আনন্দ হলে খুশীর হরির লুট দেয়। একজন আর এক-জনের কাছে হয়ে ওঠে কল্পলোকের অতিথি। সে তার হৃদয়কে আবিষ্কার করতে আজীবন ভুলভুলাইয়া খেলে। কিন্তু স্থির জানবেন, আমাদের জীবনের বাইরে যে বিরাট এবং ব্যাপক জীবনের অস্তিত্ব আছে সেখানে সৃষ্টি বিধানে চলছে নতুন জীবন তৈরীর অবিরত অভিযান।

রসিক জীববিজ্ঞানী মাত্রেই বলবেন, মানুষরা প্রেমের ব্যাপারে চিরকাল পিছল পথের পথিক, বেহিসেবী, বেনিয়মী। সে তুলনায় অন্যান্য প্রাণীরা একটা নির্দিষ্ট নিয়মে চলে তাই তারা প্রেমের ব্যাপারে অনেক বেশী আস্থাভাজন। তারা কখনও প্রেমের নাম করে অভিনয় করে না। ভালবাসার তাগিদে এমন দারুণ অসম্ভব কিছুও তারা করে বসে না যা তাদের কাছে আশা করা যায় না। কিন্তু মানুষ ভালবাসার জন্য সব কিছু করতে পারে—অসম্ভবকেও সম্ভব করে, সোজাকে উল্টো আর দিনকে রাত্রি। এ সব ব্যাপারে এক কথায়—ইউ ক্যান নেভার টেল।

ঘড়ি ধরে প্রেম

আইনষ্টাইন সময় কি তা বোঝাতে গিয়ে একবার বলেছিলেন যে, সময় বলে এ জগতে কিছু নেই—এটা আমাদের মনের তৈরী একটা অলীক সৃষ্টি মাত্র। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একলা বসে থাকলে ঘণ্টা যেন মিনিটে পর্যবসিত হয়, তেমনি আগুনে আঙুল দিলে মনে হবে এক মিনিট অবক্ষয় হয়ে ঘণ্টায় রূপান্তরিত হয়েছে। কলেজে আসলে তিনটা-ছটা ছবি দেখার নাম করে পাশে বসবার একটা প্রকৃষ্ট সময় হতে পারে কিন্তু আজীবন অমন ঘড়ি ধরে প্রেম করতে কোন প্রাপ্তবয়স্ক রাজী হবে না। মানুষের মনের খোরাক ঘড়ি ধরে পাওয়া যায় না। অত সময়মত যদি সবকিছু চলত তাহলে সহরের মাতৃসদনগুলোর অধিকাংশ বেড বছরের কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভর্তি বা খালি হোত। কিন্তু মানুষ ছাড়া এই প্রাণিজগতে দেখি একটা নির্দিষ্ট সময়ে মিলনাকাঙ্ক্ষা অনেক প্রাণীর মধ্যে প্রকট হয়ে উঠে। বলা বাহুল্য সময়টা সুপ্রশস্ত বসন্ত কাল, ঋতুরাজের শুভাগমন হয়েছে, প্রকৃতি শ্যামল বরণ আভরণ গায়ে তুলে নিয়েছে, চারিদিক পুষ্পপত্রে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এমনি সময়ে পশুকুলের অনেকের মনবন উপবনে চলে অভিসারের পালা। তখন আর দূরে দূরে নয়, দুজনে নিতান্ত কাছাকাছি হবার ইচ্ছা হয়। একরকম সামুদ্রিক (Bustle worm) আছে, যাদের পুরুষেরা মহিলাদের দেহ বেষ্টন করে এবং তার ফলে ডিম নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়। শামুকেরা উভয়লিঙ্গ হলেও দেখা যায় তাদের জীবনে মন দেওয়া-নেওয়া হয় পাল্টা পাল্টি ধরে অর্থাৎ নিজের দেহের বাইরে বাইরে কার সঙ্গে আসক্ত হতে থাকে। এই আসক্তি উদ্রেক করতে একে অন্যকে ধুলো মাখানর নাম করে ভাল-বাসার রেণু ছড়িয়ে দেয়। তাতেই কাজ হাসিল হয়। এমন করাতেই এক শামুকে-হৃদয় অন্য শম্বুক হৃদয়ের কাছে জল হয়ে যায়।

রূপে তোমায় নিশ্চয়ই-ই-ই-ভোলাব

একদা আমাদের কবি গেয়েছিলেন—রূপে তোমায় ভোলাব না, কিন্তু চিংড়ী এবং কাঁকড়াদের কবিরা সর্বদা তার ঠিক উল্টো গেয়ে থাকে। ওখানে গাওয়া হয় রূপে তোমায় নিশ্চয়ই করে ভোলাব এবং এমনি না খুললে জোরসে ধাক্কা মেরে হৃদয়ের দরজা খুলব। নানা রকমের চিংড়ী এবং কাঁকড়াদের দেখা যায় তাঁরা রূপ দেখিয়ে ধাঁধা লাগিয়ে কুহক সৃষ্টি করে। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এমন রূপের গরব মহিলাদের নয়, পুরুষদের। এদের পুরুষদের রংয়ের ঘটা, সাজের বহর দেখে মহিলারা বিমোহিত হয়। রূপের শ্রী শ্রীমতীদের নয়। গলদা চিংড়ীর একরকম জ্ঞাত ভাইরা আছে যাদের জীবনে দেখা যায় মাদাম-চিংড়ীর মন গলাতে—মসিয় চিংড়ীরা তাদের হাতের অনুরূপে দাঁড়া গায়ে বুলায়। ইংল্যাণ্ডে একরকম ছোট চিংড়ী আছে যারা ভালবাসার পুলকে পুলকিত হয়ে দোসরের অঙ্গ জড়িয়ে ধরে। এমন ভঙ্গি দেখলে মনে হবে যেন হাতে হাত রাখার মত কিছু ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। এমনি স্পর্শ করে প্রেম জানানর রেওয়াজ তাদের অদ্ভুত এবং মধুর। 'ফিডলার' কাঁকড়াদের পুরুষরা নিজেদের রঙিন দেহ নিয়ে মহিলাদের জন্য আকুল প্রতীক্ষা করে। কখন তাঁদের মন রং দেখে মেতে উঠবে তখন সুপ্রসন্ন হয়ে তাঁরা জানাবেন—'হ্যাঁ।'

ভালবাসায় দম ফাটে

কোন কোন জীব আছে যাদের ভালবাসার দুর্বিষহ পরিণতি দেখে মনে হয়, হায় হায় এও একরকম মদনভস্ম হচ্ছে। 'রঘুকুল রীতি সদা চলি আয়ি'। বিছাদের কুলরীতি ভয়ংকর। পুরুষ বিছাদের ভাগ্যই সর্বস্বান্ত হওয়া। প্রাণ হাতে করে প্রেমের আসরে তাদের অবতীর্ণ হতে হয়। বড়-সড় মহিলাটির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নাচতে নাচতে পুরুষটিকে প্রাণভয়ে পৌঁছুতে হয়। এমনি রঙ্গ যে একবার ভুলক্রমে বেকায়দায় পা ফেললেই বিছা ভদ্রলোকের অবস্থা শোচনীয় অর্থাৎ আমাদের ভাষায় 'চোশনীয়'।

পার্শিসার শা মাথায় থাকুন মাকড়সাও এক বিচিত্র রকমের 'শা'। এদের মহিলাদের বদনাম কিন্তু চিরকেলে। এদের দেখলে 'ছি ছি' করতে ইচ্ছা করে। এমন মহিলাদের সম্মুখীন হলেই পুরুষদের দম ফাটে। মিলন উৎসবের প্রারম্ভে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় যত মর্মস্পর্শী তত বেদনা-দায়ক। নাচতে নাচতে একবার ভুল পা চাললেই বেচারী পুরুষ অবলীলাক্রমে মহিলার বিষাক্ত দাঁতে জীবন খোয়ায়। (কালে কালে এই দশাই পুরুষদের হয়!) প্রেমের দরবারে এসেও

তাই পুরুষদের সব সময়ে প্রাণ ভয়ে ভীত থাকতে হয়। এদের ভাগ্য ভারি মন্দ—এমনও হয় যে বিবাহের শেষে তাদের পুরুষদের প্রিয়তমার প্রাতরাশের জোগান দিয়ে জীবনের যবনিকা টেনে দিতে হয়। মানটিস মাকড়সার জীবনে ভালবাসার ছিরি এমনি যে, শুভদৃষ্টি শেষ হবার পূর্বেই পুরুষটির সঙ্গিনী তাকে আঘাত করে জীবন শেষ করে দেয় এবং মদন ভক্ষণ করে ছাড়ে।

ভালবাসার বিচিত্র গতিপথ

ভালবাসার নিয়মটা অনিয়ম তাই বোধ হয় এতে এত রকম-ফের দেখা যায়। এই শুনবেন প্রেম করতে গিয়ে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। ভালবাসার গতিপথ যত বিচিত্র তত ভিন্ন। দোসর খোঁজার রীতি-নীতি-বিভিন্ন জীবের মধ্যেও নানারকম। এই যেমন ধরুন, মহিলা জোনাকী বড় হুঁসিয়ার। তাদের পুরুষকে ডাক পাঠায় নিজের দেহ থেকে আলো বের করে। সেই আলো দেখে পুরুষ বুঝতে পারে ভালবাসার দীপ জ্বলে উঠেছে। একরকম মথ যাদের প্রেমের বার্তা পরিবেশন করার কৌশল অন্য রকম। নিজের দেহ থেকে গন্ধ বিলোয়—সেই গন্ধে পুরুষ আকৃষ্ট হয়ে রমণী সন্দর্শনে আসে। মক্ষীদের জীবনে মধুর মিলন ঘটাতে দেখতে পাওয়া যায় আর এক অদ্ভুত খেয়াল। মক্ষীরাণীর উদ্দেশ্যে একাধিক পুরুষ তাকে অনুসরণ করে আকাশে ডানা মেলে দেয়, চলে এক বিবাহ অভিসার পর্ব। অনেক পুরুষের মধ্যে ভাগ্যবান তিনি যিনি ভাল কমমোনটু-মক্ষীরাণীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়তে পারেন। উড়ুক্ত এবং দুরন্ত প্রেমিক।

এফিড জাতীয় এক রকম পতঙ্গের জীবনে দেখা যায় পুরুষ পতঙ্গরা মহিলা পতঙ্গের মন পাবার জন্যে ঘুষ দেয়। ভাল কথায় বলবেন 'যৌতুক'। ফুলের কলি মধ্যে ভাল লাগার সংবাদটি পরিবেশন করে। ফুল দিয়ে ফল লাভ করা। মহিলাদের অনুকরণে যে সমাজে পুরুষেরা সাজে (বলা বাহুল্য মহিলারা এখানে বিনা ভূষণেই কাজ হাসিল করিতে পারেন) সেই সমাজে ভালবাসার নিয়ম-কানুন সর্বনেশে। অনেক মাছ এই পর্যায়ে পড়ে। মহিলাদের অনুগ্রহ ভজনা করতে পুরুষ মাছ নিজের সারা দেহ দিয়ে সম্ভাষণ জানায়—তার চাকচিক্য একটি মনোরম স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে।

গলাবাজি করে হৃদয়ের দরজা খোলা

হৃদয়ের দরজা খুলতে নানান উপায়ের কথা বলা হচ্ছে। কোন কোন জীব আছে যারা তারস্বরে চিৎকার করে, মানে স্রেফ গলাবাজি করে দোসরকে রাজী করায়। অর্থাৎ শব্দ দিয়ে প্রলোভন সৃষ্টি করায়। এই পর্যায়ে ভেক-ভেকিনীদের অভিসারের কথা আসে। পুরুষ ভেক তাদের মহিলা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গলাবাজি করে। বর্ষার সন্ধ্যায় খোলা মাঠের ধারে যখন গলাফুলো কোলা ব্যাং ডাকিছে গ্যাঙর গ্যাঙ তখন বুঝতে হবে আসলে তারা তাদের মহিলাদের উদ্দেশে বলছে—'এসেছি তোমার দ্বারে'। এমন মর্মভেদী ডাক মহিলাদের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় এবং বলাবাহুল্য তারাও সারা দেয়। তারপর যা হবার তাই হয়। কিন্তু ব্যাঙগোষ্ঠীর আর এক আত্মীয় আছে নিউট। তাদের প্রণয়-লীলা ব্যাঙদের মত অত হাঁকডাক করে অনুষ্ঠিত হয় না। প্রণয়ের সকল স্তর নিভৃতে নির্জনে প্রায় নিঃশব্দে কাটে। নিউটদের পুরুষদের দেহ কালোর উপর রঙিন ডোরা কাটা—নিজেদের এমন রঙদার করে মহিলাদের বিমোহিত করে। নিজের হাতে করে ভালবাসার দান মহিলারা পুরুষদের হাত থেকে গ্রহণ করে। কচ্ছপদের রীতিটা আবার অন্যরকম। তারা এক জোট হয়ে কোন এক নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে ডিম পাড়ে এবং একসঙ্গে তাদের পুঁতে রাখে। যেন একটি 'সেফটি ভল্ট'-এ ভবিষ্যতের বাচ্চাদের গচ্ছিত রেখে আসে।

পাখীদের বধূবরণের বিচিত্র রীতি

পাখীরা বুঝিবা ইন্দ্রলোকের খবর নিয়ে এই ধরার বুকে নেমে এসেছিল। এদের বধূবরণের রীতি হাল ফ্যাসানের' ভালবাসা দেখান'র চাতুর্য অদ্ভুত। প্রণয়ের ব্যাপারে ভারী ওস্তাদ। মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের মধ্যে এত পারিপাট্য দেখা যায় না। নিজেদের মধ্যে ভালবাসার আদান-প্রদান দেখলে চমকে উঠতে হয়। তারা গান গায়, মন হরণ করতে সাজে, চমকপ্রদ মিলনোৎসুক্য দেখায়। কিন্তু এ কথা হয়তো এখানে বলে নেওয়া ভাল যে পক্ষী সমাজে
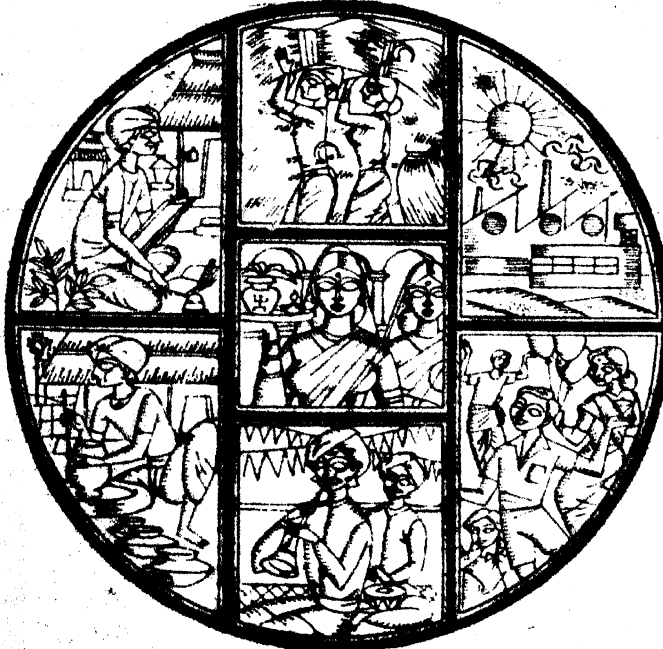
মহিলারা নয়, পুরুষরা রমণীয়। রমণীয় পুরুষ অর্থাৎ পুরুষ-পাখীদের দেখতে ভাল, তারাই সাজে, গান গায়, মহিলাদের আকৃষ্ট করার জন্য যাবতীয় নাম-ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে। কখনও কখনও মহিলা হৃদয় জয় করার জন্য তারা লড়াই পর্যন্ত করে—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। যে-সব পুরুষ পাখী মনোরম সাজে—তাদের মধ্যে বার্ড অব প্যারাডাইস অর্থাৎ নন্দনবিহঙ্গ রঙ্গে বর্ণে অপূর্ব মোহন-মায়া (মহিলা নয়, তাই মোহিনী মায়াও নয়) ছড়িয়ে প্রেম নিবেদন করে। কখনও কখনও এই সব পাখীর পুরুষদের মধ্যে দারুণ লড়াই বাধে একই মহিলার দাবীদার হিসাবে। তখন 'লড়কে লেংগে বউ' এই সাহেবী রীতি চলে।

যার গায়ের জোর বেশী তারই ভাগ্যে বিহঙ্গ-বধূ জোটে। আরগাম ফেজেন্ট নামধেয় পাখীদের পুরুষরা নিজেদের লেজ দেখিয়ে অপর পক্ষের শুধু দৃষ্টি নয়, মন পর্যন্ত হরণ করে। পেনগুইনদের বেলায় আকর্ষণ করার [illegible]য় অন্য রকম।

মহিলাদের সুপ্রসন্ন করবার আগে পাথর দিয়ে ডিম পাড়ার জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখে। ডিম পাড়ার জায়গা দেখে মহিলা পেনগুইনরা তাদের বর পছন্দ করে। পুরুষরা নিজেদের মধ্যে খেয়াখেয়ি করে এ ওর তৈরী ডিম পাড়ার জায়গা ভেঙ্গে দেয়। 'ফালারোপ' জাতীয় স্নাইপদের মহিলারা অবশ্য পুরুষদের চেয়ে বড়-সড় এবং আরও সুন্দর হয়ে থাকে।

যারা মালঞ্চের মালাকর

আরও কতকগুলি পাখী আছে, যাদের প্রেম-চর্চার রীতিনীতি দেখলে মনে হয় তারা যেন পাশকরা প্রেমিক। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী নিয়ে এসে প্রেমের আসরে নেমেছে। এরা রীতিমত সব রসিকজন। মহিলাদের অনুগ্রহ পাবার জন্য যা করে তা' একরকম অবিশ্বাস্য। দোসরের জন্য মিলন আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করে। তাদের আছে মুক্ত অঙ্গন—সেটাই যেন খোলামেলা নাচ-ঘর। সেখানে দলে দলে পুরুষ পাখী এসে উপস্থিত হয় বধূবরণ করতে।

পুরুষদের আগমনের পর সেখানে মহিলাদের উদয় হয়। নিজের রূপ দেখিয়ে পুরুষরা বিউটি কনটেস্টে নামে। মহিলারা পছন্দ করে কোন্ পুরুষ বেশী রমণীয়। সেখানে মাঝে মাঝে খেয়োখেয়ি মারামারি হয় নানান পুরুষদের মধ্যে।

নীড় বাঁধবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে এমন পুরুষ পাখী আছে যারা দুটি সরু উঁচু কাটি রাখে। তার সামনে পরিপাটি করে লন তৈরী করে এবং অন্যত্র হতে তুলে এনে সেখানে ফুল রেখে দেয়। বাসি ফুল ঝরে গেলে আবার সদ্য-ফোটা ফুল নিয়ে হঠাৎ-পাওয়া প্রিয়ার আসার অপেক্ষা করে। বাড়ীর সামনে নুড়ি দিয়ে অদ্ভুত বিন্যাস সৃষ্টি করে। চিড়িয়াখানায় এই সব পাখীর গৃহ-নির্মাণ প্রচেষ্টায় দেখা যায় নুড়ির অভাব ঘটলে মুখের কাছে যা পায় তাই নিয়ে আসে—সিগারেটের কাগজ, পয়সা, বাসের টিকিট। তারা তাদের প্রিয়ার মালঞ্চের মালাকর।

ইংল্যাণ্ডে আর একরকম পাখী আছে—আটপৌরে 'ওয়ার্ব্লার'। তাদের প্রেম নিবেদন পালা দেখলে আতঙ্কিত হয়ে যাবেন। মহিলাদের সম্মতি পাওয়ার আশায় পুরুষরা 'ঘুষ' দেয়—মাংসের টুকরো, ঘর-বাঁধার কাটি ইত্যাদি। একটু

—ইঁনি বোধহয় ট্যাক্সকালেক্টর ছিলেন।

লজেন্স, একটু চকলেট—ঠিক যেমন আমাদের সমাজে অনেক পাওয়াতে সাহায্য করে।

প্রণয়ের গুন্ গুন্ ও অন্যান্য গুণ

একাধিক পাখীর মধ্যে প্রেম নিবেদন করার সময় সশব্দভাব লক্ষ্য করা যায়। ভালবাসার এমন কিচির-মিচিরকে প্রণয়ের গুন্ গুন্ বলা যেতে পারে। এখানেও ছেলেরা গাইয়ে, মেয়েরা শ্রোতা। পুরুষ পাখীরা গান শুনিয়ে মহিলাদের মোহিত করে দেয়। শৃঙ্গারের মুহূর্তে গুঞ্জরন পাখী ছাড়া অন্যান্য জীবের মধ্যেও শোনা যায়। বিড়ালের প্রেম-নিবেদনের সময় মিনি ও হুলো-দের এই রকম শব্দ করতে শোনা যায়। হরিণ, সজারুরাও গলা খুলে ভালবাসা জানায়, অন্য সময় মুখে চাবি বন্ধ। বধূবরণের সময় মুখ খুলে জানান। বানররাও এই পর্যায়ে আসে। যৌন সান্নিধ্য ঘটলে স্ত্রী-পুরুষরা চিৎকার করে জাহির করে। বানর যে বানর সেও মনের পরম কথাটি বানরীর উদ্দেশে নিবেদন করে।

জীব-জীবনে অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে গন্ধের একটা বিশিষ্ট গুণ আছে যৌন আকর্ষণ করাতে। অনেক প্রাণীর মধ্যে গন্ধ বিলিয়ে পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যেকার দূরত্ব নাশ করা হয়। পুরুষ ভেড়া, পুরুষ হাতী এবং পুরুষ উটের পেটে গন্ধযুক্ত গ্রন্থি আছে, যাদের বৈশিষ্ট্য হল আপন আপন গোষ্ঠীর স্ত্রী সম্প্রদায়ের কাছে মিলনের আমন্ত্রণ পাঠান। পুরুষ হিপোর গায়ে লালচে রঙের ঘাম হয়। এই ঘাম বিশেষ গ্রন্থি থেকে বার হয়ে সারা দেহ রক্তাক্ত কলেবর করে তোলে। এই ঘামই মহিলা হিপোর পক্ষে নিতান্ত মনোমুগ্ধকর। রক্ত মাখা এমন ঘেমো-ভালবাসার আর দ্বিতীয় উদাহরণ কোথাও পাওয়া যায় না। এ ছাড়া সিংহের কেশর, বেবুনের চুল, ছাগলের দাড়ি প্রত্যেকটির নিজস্ব যৌন-বৈশিষ্ট্য আছে—একজন আর একজনের কাছে আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠার কারণ। সিলদের বেলা দেখা যায় জলের মধ্যে পাণিপ্রার্থী পুরুষরা মহিলাকে ঘিরে চারপাশে লম্ফ-ঝম্প করে। যে পুরুষ যত উঁচুতে লাফাতে পারে তার ভাগ্যে জয়মাল্য অর্পিত হয়। হাই-জাম্প দিয়ে যেন ভালবাসা আদায় করা। পুরুষ সিলরা যত সব কম্পমান প্রেমিক।

পছন্দ অপছন্দের হের-ফের

এই পৃথিবীতে পছন্দ অপছন্দ করার কত বিচিত্র রকমের উপায় এবং অবলম্বন তা আর কহতব্য নয়। তবু বলব প্রাণিজগতে একটা মিলনের নিয়ম আছে—সেই নিয়ম ধরে সব কিছু চলছে। কিন্তু মানুষ এমন একটি জীব সেখানে কোন নিয়ম খাটে না। সব-কিছুর বাইরে সে। তাই বোধ হয় প্রেমের ব্যাপারে মানুষ সবচেয়ে অনন্য এবং ছন্নছাড়া। কখন কী তারা করে বসে তার কোন ঠিকানা নেই। কিসে কেন কখন কার জন্যে—বেলা-অবেলা—কাল বেলায় কার মন দুলে উঠবে, প্রেম জেগে উঠবে তার কোন সঠিক ঠিকানা নেই। অনাদিকালের বধূ নতুন বেশে কেবল ঘুরে ঘুরে ফিরে আসবে—প্রতিদিন কত নতুন বধূ বরণ হচ্ছে। ত্রিভুবনের বাসনা হল মানুষের এই মন। সে যে কখন মধুর খোঁজে কোন্ তৃষিত হৃদয়ের উৎসুক চাওয়াকে ভরিয়ে দিতে যায় তা হলপ করে বলা যায় না। মানুষের রীতি-নীতি অন্য ধরণের। সে টেলিফোন করে, চিঠি লেখে, কবিতা লেখে, মন দিয়ে মন ভরাতে চায়।

কিন্তু আজ পর্যন্ত এ কথা ঠিক জানা যায়নি এতজনার মধ্যে কেন একজনা আর এক-জনাকে পছন্দ করে চায়। সে কথা জেনে ফেললে বোধহয় সব রহস্যই শেষ হয়ে যাবে। সে কথা জানার চেষ্টা আজও প্রতিনিয়ত যদিও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু সঠিক কী জানা যাবে? কেন লায়লা মজনুর জন্যে পাগল হয়েছিল? অষ্টম এডওয়ার্ড শ্রীমতী সিমসনের জন্য কেন রাজ-সিংহাসন ছেড়ে দিলেন? একমাত্র সিমসন ছাড়া আর কোন মহিলা এ পৃথিবীতে কি ছিল না!

———

আকাশ এখন তৃণমণি

রাম বসু

আকাশ এখন তৃণমণি, অনেক হাওয়া দোলে
নৌকোখানি অথৈ গাঙে ভাসে
ও মন তোর সিন্ধু পারের উপকথার পালা
সাঙ্গ হল; সামনে ছায়া ধরো।
জয়ের চূড়া গুঁড়িয়ে গেছে, মুড়িয়ে গেছে গাছ
হাওয়া, শুধু হাওয়ার হাহাকার
যেখানে তুই দাঁড়াবি গিয়ে
সেখানে চঞ্চল
সময়, শুধু সময় বোনে
আহত অঙ্কুর
দিগন্তকে ভয় দেখায় জঙ্গলের শুঁড়।
যা কিছু গত স্মরণে তা ত স্বরোদ হয়ে বাজে
ও মন তোর সংরাগের সঞ্চয়ের কণা
উড়িয়ে দে না, হাওয়ায় শুধু হাওয়ার হাহাকারে
দগ্ধ বীজ ভালবাসার কণ্ঠ হয়ে যাক
যা কিছু তোর লুকিয়ে আছে ছড়িয়ে দিলে তবে
নিজেকে পাওয়া যাবে—
আকাশ যখন তৃণমণি নৌকো দোলে গাঙে।

ভুল

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

পুঞ্জ পুঞ্জ স্বপ্ন-ফেনা, রামধনুরঙের লীলায়
বনানীর শ্যামলিমা পার হয়ে মনেরে ভোলায়!

সাদা আর কালো রঙ মেশে আর হয় যে আলাদা,
কালো আসে মৃত্যু নিয়ে, প্রাণের ইঙ্গিত দেয় সাদা?

কালো-সাদা-সতরঞ্চ-ছকে ঘুরি গুটিকা কি মোল্লা?
এ-রঙের ধাঁধা চক্রে মুসাফির ঘোরে বিশ্ব জোড়া।
ভুল-গুলিস্তাঁয় ফোটে গোলাপের গুচ্ছ সারি সারি
স্বপ্ন ভাঙে ফেনা রাঙে, ছেঁড়ে দল কাঁটার পসারি।

শিরি আর ফরহাদেরা মরুপথে কাঁদে তবু কত,
প্রেমের পতাকা পোঁতে বিজয়ীরা বুকে লয়ে ক্ষত।

এ-ভুলের ফুল-মধু পান করে যেই মধুপেরা
এ-ভুলের ফুল বনে তারা আজো রসিকের সেরা।
যত কবি শিখিপুঞ্জ কলাপেরে মেলিয়া ছড়ায়
কাব্য-গান-শিল্প-সুর-পতাকার জয় ঘোষণায়!

ছায়ার দেশে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

খণ্ডগিরি উদয়গিরি—সব গিরিতেই আলো
চলতে চলতে হঠাৎ পড়ে থেমে,
তারপরেতে সাঁঝের বাতাস আপনা থেকে কালো
হতে হতে কুঞ্জে ওঠে ঘেমে।
এ-ফুল থেকে ও-ফুলেতে আলোর মৌমাছি
চলতে চলতে হঠাৎ বসে পড়ে,
দিনের আলো নিবতে গিয়ে কোথাও কাছাকাছি
সাগরকূলে ত্বরিত খসে পড়ে!
তারপরেতে শুধুই কালো—কালো রঙের ঢেউ
ছায়ায় ছায়ায় হেলে-দুলে যায়,
ঘাসের বনে তাকিয়ে তখন দেখে না যে কেউ
শাদা কুঁড়ি কালোর চুমু পায়!
জেলে-নৌকো—তারও পরে কালো চাদরখানা
গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে,
ছায়ার দেশে ছায়াই যেন চলেছে একটানা,
জোড়া ছায়া মালা-বদল করে!

সুভাষিত

অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পথ চলে এঁকেবেঁকে—সোজা হয়ে চলা ভার;
উঁচু-নীচু পাহাড়েতে ক্লেশ তার এন্তার;
মরু মাঝে, খরতাপে লয় কভু পায়-পায়;
ত্যজে না পথিকে তবু, যথাস্থানে নিয়ে যায়।

নরদেহে বুক 'স্টল' কিসে বেশী শোভা পায়?
বৌ, না, সে বই দিয়ে? বই দিয়ে—বিদ্যায়।

শতায়ু তো হয়ে আছে শত শত নর।
সৎ কাজে সৎ আয়ু যে, তারে করি গড়।

সমধিক পুষ্টি-তুষ্টি দেয় কোন্ ভালো আম?
জেনে রাখো, মনে রাখো, সে আম—ব্যায়াম।

"স্বার্থপর" শব্দটার অর্থ ক'রে নূতন,
জেনে রাখো, স্বার্থ—পর,—সে নয় কভু আপন।

এইসব দেখে-শুনে, যাহা কিছু পাই,
এ জীবন জাদুঘর তা দিয়ে সাজাই।

সোনার খাঁচা

সুনন্দা দাশগুপ্ত

বাঁকা গলিটার অপর প্রান্তে 'শিলকাটাও'-এর স্বর
দূরে চলে যায়, প্রতিধ্বনিতে ক্লান্তির সুর তুলে।
উদ্দেশহারা এতটুকু অবসর
ক্ষীণ আয়ু নিয়ে, ঝরে-পড়া কোন অজানা নামের ফুলে
থরো থরো কাঁপা ভীরু প্রজাপতি যেন।
এ মন আজিকে আবেগে ব্যাকুল কেন?
ছোট সীমানার এই গৃহকোণে আমি এক গৃহবধূ।
প্রয়োজন দিয়ে মেপে মেপে মোর দিনের প্রহর গোণা—
মনের গহন নিভৃত কোষের সঞ্চিত যত মধু,
নিঃশেষ করে প্রতিটি ক্ষণের প্রতিদিন আনাগোনা।
আজকে দুপুরে পুরোনো এ মন কোথায় চলে যে ভেসে,
স্তব্ধ দুপুর আঁখিতে আমার আঁকে মায়া-অঞ্জন,
ক্ষণবর্ষণে সিক্ত কেতকী স্মৃতির সুরভি ঢালে,
সমীরবাহিনী মদির গন্ধে উন্মনা হয় মন।
আলোছায়া গড়া কল্পময়ূরী চিত্রিত পাখা মেলে
উড়ে যেতে চায় কোন অলকায়—স্বপনমথিত দেশে।
চারটে বাজল বড় ঘড়িটায় ঃ সম্বিত ফিরে পাই।
কাংস্যকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলে ঠিকে ঝি লেগেছে কাজে।
ছেলেরা ফিরবে ইস্কুল থেকে—খাবার যে ঠিক নাই,
সংসারচাকা পুরোনো সুরেই বাজে।
স্বপনচারিণী মনের ময়ূরী আবার ফিরেছে ঘরে
উতলা কলাপ ডানা গুটিয়েছে সোনার খাঁচার তরে॥

প্রেম

নচিকেতা ভরদ্বাজ

পারমিতা, মুখ তোলো;
তোমার যৌবন আমি অন্য হাতে ছুঁয়ে যেতে পারি,
দীপ্র কোনো আকাঙ্ক্ষায় ভোলো;
অনাঘ্রা নিহত হবে সময়ের হাতে
স্বাভাবিক নিয়মেই; নিসর্গকে পাড়ি
দিয়ে যেতে আমরা কেউ পারি না কোথাও।
অন্য ফুল বিকশিত—অন্য এক সুরেলা প্রভাতে।
প্রথাবন্ধ নিহত হবার
আদেশ এসেছে। তাই অনাঘ্রাত আলোর যৌবন
বন্দনা করেছে তোরে, স্বয়ংবরার
খুব বেশী দেরি নেই আর।
অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যু, ঐ দ্যাখ সময় চারণ
কী নিপুণ বন্দনায় ছন্দোশীল—উজ্জ্বল কৌতুকে
মুগ্ধ তোর চারিদিকে নৃত্যময়ী; নম্র নত মুখে
মানব সঙ্গিনী হয়ে ফিরে আয় মানুষের ঘরে।
সময় যে আবর্তিত প্রহরে প্রহরে।
জীবনের এই মানে রক্তজাত—ঃ রাত্রি অভিমুখে
আমাদের সবাইকে যেতে হবে
প্রচলিত প্রাণের উৎসবে।

তবে যদি স্থির থাকো—হয়তো বা এ পথেরই শেষে
পেতে পার অনির্বাণ আলো,
মুক্তির ঠিকানা; এই চেতনারই অপর প্রদেশে
প্রীতির প্রসন্ন মেঘে হয়তো বা বৃষ্টি ঝরালো!

তোমার হাতের ইচ্ছা

মানস রায়চৌধুরী

তোমার হাতের ইচ্ছা এখন যুগ্ম স্মৃতির মধ্যখানে পাথর
ইচ্ছা তুমি কখন হবে আতর?
প্রাচীনতাই গন্ধ দেবে, প্রাচীন খোঁপা-খুলে
আরো প্রাচীন নক্সা করো চুলে।
তোমার হাতের ইচ্ছা এখন কাঁটাকুরুব উলে
সপ্রতিভ মানুষকে যায় ভুলে।
তোমার তীব্র সুবাস খুঁজি, ইচ্ছা তুমি কোথায়?
পাঁপড়ি থেকে শিশির মধ্যে প্রবেশ করা যায়
বলেই তুমি বরফ, রৌদ্র, করতলের ঘাম
এড়িয়ে হবে শুদ্ধ শোভন, লক্ষমোহর দাম!

প্রতিধ্বনি

শান্তনু দাস

এত আলোয় পথ চেনা দায়
মুখ চেনা দায় তীব্র আলোর ঝাঁজে
স্বপ্ন-ঘেরা রঙিন সড়ক

মনের খেয়া বেয়ে।
অনেক পথ পেরিয়ে এলাম
পেরিয়ে মেঠো সাঁকো

উষ্ণ ঠোঁটে স্মৃতির চিবুক
অনেক দূরে নদী
মন্দিরে সেই পরিচিত ঘণ্টাধ্বনি বাজে।

নিরালায়

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

কত কথা ভাবি নিতি, জীবনের সন্ধ্যায়,
আকাশের নীলিমায় সেই সুর ভেসে যায়,
চঞ্চল নির্ঝর জাগে গান নিরিবিলি,
একান্তে গুঞ্জন, জ্যোছনার ঝিলিমিলি,
চোখবুজে একাকী
নীরবে চেয়ে থাকি,
বেদনার পরপারে বিস্মৃতির নিরালায়।

অনাগত স্বপনের মৃদু ঢেউ ছল ছল
যউবন সীমারেখা বাজে সুর অবিরল,
জীবনের আড়ালে যে মৃত্যুর অভিযান,
আলোকের বন্যায় তটিনীর জাগে গান,
অজানার হরষে
সুখস্মৃতি পরশে
কোথা ভেসে যায় মন সুদূরের নীলিমায়।
রাতের ছোঁয়ায় কোন যাদু আছে কেবা জানে,
নিশীথিনী চলে ধীরে আঁধারের জয়গানে,
উদ্দাম, চঞ্চল আজি মোর প্রাণমন,
কল্পনা জাগে ধীরে, জাগে স্মৃতি অনুখন,
তারা হারা আকাশে
ক্ষণিকের বাতাসে
নীলনভে মেঘমালা কতদূরে ভেসে যায়!

প্রতিপক্ষ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

প্রতিপক্ষ গাছের ছায়া ভালোবাসে;
পাথর জড়ো করা স্বভাব ছাড়া
আমি কী আর ভালোবাসি—তাইতো!
ফুল-ফলের দেশের ভিজা মাটি
তবু আমাকে রেখেছে ঠিক খাড়া;
আমার প্রেম চলেছে বনবাসে।
মনে হয়েছে কতো না দিন-রাত্রি
যাবো তাদের অন্দরমহলে;
তারা হয়তো আমার বেশবাস
দেখবে কৃপামিশ্রিত কৌতুকে,
আমার দুঃখ তারা দয়ার ছলে
ভুলে থাকবে নিয়ত বারো মাস।
তাদের ভালোবাসার কাছে কী যে—
মানাতে পারে; আমি মানবো তা কি?
তাদের ছায়া কোমল পল্লবে
সমগ্র নীল আকাশময় পাখি!
পাথর জড়ো করা স্বভাব ছাড়া
বলো আমার আর কি কিছু হবে!

চোরের মতো পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন দেবীদাস দত্ত। চোখে-মুখে এমন একটা সন্ত্রস্ত ভাব যেন এত গোপনতা সত্ত্বেও উর্মিলা সব কিছু জেনে ফেলেছেন। যেন অদৃশ্যভাবে দেবীদাসকে অনুসরণ করতে করতে তিনি এ-পর্যন্ত এসেছেন। সিঁড়ির আর দু'এক ধাপ উঠলেই হয়তো হঠাৎ পিছন থেকে সেই নিষ্করুণ কঠিন গলায় উর্মিলা বলে উঠবেন, তবুও তুমি ওই কুলাঙ্গার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে এলে? তোমার কি লজ্জা ঘেন্না মান অপমান কিছুই নেই?

আপনমনে একটু হাসলেন দেবীদাস। তিনি ভালোভাবেই জানেন, উর্মিলা এখন চুঁচুড়ার বাড়ীতে। হয়তো দোতলার পুবের বারান্দায় বসে ফেরিঘাটের লঞ্চ পারাপার দেখছেন। কিম্বা হয়তো বাবলির বিয়ের ফর্দটা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। দেবীদাস নিজের মুখে প্রকাশ না করলে উর্মিলা আজকের এ-কথা কোনোদিনই জানতে পারবেন না। তবুও স্ত্রীর সেই ভয়ঙ্কর কঠিন চাউনিটা কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারেন না দেবীদাস।

তেতলায় উঠে ডান দিকের কোণের ফ্ল্যাট। দরজার ওপর লেখা নম্বরটা মিলিয়ে দেখলেন দেবীদাস। বন্ধ দরজার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর কড়া নাড়লেন। দীর্ঘ আট মাস পরে মেয়ের সঙ্গে এই মুখোমুখি দেখা হওয়ার আগে নিজেকে শেষবারের মতো সহজ স্বাভাবিক ক'রে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি।

খুট্ ক'রে শব্দ হ'ল।

দরজা খুলেই সামনে দেবীদাসকে দেখে হতবাক্ হ'য়ে কয়েকমুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো তপতী। শেষে অস্ফুটস্বরে শুধু বললে, বাবা, তুমি!

কয়েকমুহূর্তের জন্যে একটা বিহ্বল চেতনায় দেবীদাসও নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। তপতী ততক্ষণে নিজেকে অনেকখানি সামলে নিয়েছে। মৃদুস্বরে বললে, ঘরে এসো বাবা।

নীরবে ঘরে ঢুকলেন দেবীদাস। অনেকটা যেন স্বগতোক্তির মতো বললেন, তুই এত রোগা হ'য়ে গেছিস তপু!

দরজা বন্ধ ক'রে দেবীদাসের হাত থেকে ফোলিও ব্যাগটা নিয়ে একপাশে রেখে তপতী বললে, তুমি কলেজ থেকেই আসছ বাবা?

হ্যাঁ। আজ আবার একটা মিটিং ছিল তাই এতটা দেরী।

এমন একটা কৈফিয়তের সুরে কথাটা তিনি বললেন যেন মাঝে মাঝেই মেয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে যাওয়া তাঁর অনেক দিনের অভ্যেস। আজ একটু দেরীর জন্যে তিনি যেন খুবই বিব্রত।

তপতী আর কিছু বললে না। এমন কি, তার এই নূতন ঠিকানা তিনি কার কাছে পেয়েছেন তাও জিজ্ঞেস করলে না।

দেবীদাসের মনের ভেতর কোথায় যেন একটা অদৃশ্য কাঁটা খচ্ খচ্ করতে লাগলো। পথে আসতে আসতে এই প্রথম-কটি-মুহূর্তের কথা যতবার তিনি ভেবেছেন ততবারই তাঁর মনে হয়েছে, অপ্রত্যাশিত সেই মুহূর্তে তপু বিহ্বল হয়ে যাবে। হয়তো বাপের সামনে থেকে ছুটে পালাবে, নয়তো ঝর্ঝর্ ক'রে কেঁদে ফেলবে। সে-অবস্থার কথা ভেবে নিজের সম্বন্ধেও বেশ চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন দেবীদাস। কিন্তু কই, সেরকম কিছুই তো হ'ল না! প্রথম কয়েক মুহূর্ত তপতীর চোখে মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল বটে; কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সে দেবীদাসকে অভ্যর্থনা জানালে। তবে কি অপরাধবোধের চেতনাটুকু পর্যন্ত এই আট মাসে মেয়েটার মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে?

আট মাস পরে সাক্ষাৎ। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তপতী। কিন্তু তাকে বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না দেবীদাস। মনে মনে মহলা দিয়ে যে কথাগুলো তিনি সাজিয়ে এনেছিলেন সেগুলো বলবার কোনো প্রয়োজনই দেখা দিল না।

তপতী এগিয়ে এলো। নিচু হ'য়ে প্রণাম করলে দেবীদাসকে। এতক্ষণে দেবীদাস যেন একটা উপলক্ষ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। অভ্যেস মতো মেয়ের মাথায় হাত রেখে বললেন, থাক্ মা, হয়েছে। আশীর্বাদের কোনো বাঁধা-ধরা নিয়মমাফিক কথা তিনি উচ্চারণ করলেন না। তার পরিবর্তে একটু যেন অস্বাভাবিক ব্যস্ততায় বললেন, জানিস তপু, এবারে তোর জন্মদিনে একটা নাগকেশরের চারা পুঁতেছি।

বেদনার্ত চোখে তাকালে তপতী। মৃদুস্বরে বললে, ও-গাছটা তুমি উপড়ে ফেলে দিও, বাবা।

কেন রে? নাগকেশর ফুল তুই তো খুব ভালোবাসিস্।

তা হোক, তবু তুমি ও-গাছটা তুলে ফেলে দিও—

বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলবার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তপতী। আর সামান্য একটু কাল এ-ঘরে থাকলেও হয়তো চোখের জল ধরা পড়ে যাবে। কোনোমতে ধরা-গলায় সে বললে, তুমি একটু ব'সো বাবা, আমি আসছি।

পর্দা সরিয়ে দ্রুতপায়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল তপতী। দেবীদাসের চোখের সামনে পর্দাটা কেঁপে কেঁপে দুলতে লাগলো।

অতবড়ো মিথ্যেকথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে তিনি ভীষণ চমকে উঠেছিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় নেই। তপতী চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ায় তিনি নিজেও যেন বেঁচে গেলেন। তপতীর জন্মদিনে পুঁতে দেবার জন্যে একটা নাগকেশরের চারা সত্যিই তিনি এনেছিলেন। কিন্তু চারাটা মাটি পায়নি। তার আগেই আর-একজনের নিষ্করুণ কঠিন হাতে সেই কচি চারাটা প্রাণ দিয়েছিল। সে-কথা তপতী জানে না। জানতেও পারবে না কোনোদিন। কারণ তপতী আর কোনোদিন বাপের বাড়ী যাবে না।

দেবীদাস আর ঊর্মিলার প্রথম সন্তান তপতী। মেয়ের বয়স যখন চার বছর তখন এক বন্ধুর দেখাদেখি মেয়ের জন্মদিনে এই সুন্দর নিয়মটা দেবীদাসও চালু করেছিলেন। সেই থেকে আজ বিশ বছর ধরে তেইশে আষাঢ় তপতীর জন্মদিনে একটা ক'রে ফুলগাছের চারা পুঁতে আসছেন দেবীদাস। তার সব-গুলো অবশ্য বাঁচেনি। তবু যে ক'টা বেঁচেছে তারাই বাগানের অনেকটা জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তপতীর বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে ছুটির দিনে পশ্চিমের বারান্দায় ব'সে বাগানটার দিকে তাকিয়ে কেমন বিভোর হ'য়ে যান দেবীদাস। তপতীর পরে আরও তিনটি সন্তান ঘরে এসেছে। তাদের কারো জন্মমাস বর্ষাকালে নয়। তাই তাদের জন্মদিনে ইচ্ছে থাকলেও এ-প্রথাটা পালন করা সম্ভব হয় নি। যে সন্তানটি প্রথম তাঁকে পিতৃত্বের প্রগাঢ় অনুভূতি এনে দিয়েছিল তার সম্বন্ধে মনে মনে কোথায় যেন একটু পক্ষপাতিত্ব আছে। ঊর্মিলা তা নিয়ে মাঝে মাঝে খোঁটা দেন। দেবীদাস একটু মুচকি হাসি হেসেই তার জবাব দিয়ে এসেছেন বরাবর। তপতীর নবম জন্ম-দিনে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা পোঁতা হয়েছিল তাতে আগেই ফুল ফুটতে সুরু করেছে। কিন্তু এবার তার শাখায় শাখায় এসেছিল অজস্র ফুল। রক্ত-রাঙা সেই কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ দেখতে দেখতেই সেদিন প্রথম সেই মর্মান্তিক খবরটা শুনেছিলেন দেবীদাস।

একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য খবর। সে খবর বিশ্বাস করতে পারেননি দেবীদাস। বিশ্বাস করতে চাননি। কেবলই তাঁর মনে হচ্ছিল, এত অসম্ভব ঘটনা ঘটতেই পারে না। তপতীর মতো মেয়ে এ-কাজ করতে পারে না। কিন্তু যত অসম্ভব-ই মনে হোক, ঘটনাটা যে সত্যি তা পরের দিনই জামাইয়ের চিঠি পড়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ঊর্মিলা কয়েকদিন অন্নজল স্পর্শ করেন নি। দেওয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কপালটা কাটিয়ে ফেলেছিলেন। দেবীদাস কাঁদতেও পারেন নি। কী প্রচণ্ড একটা আঘাতে যেন নিঃসাড় হ'য়ে গিয়েছিলেন। স্তব্ধ বিমূঢ় মানুষটি অসহায়ভাবে শুধু এর-ওর মুখের দিকে তাকিয়েছেন মাত্র, একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

বৈশাখ মাসের প্রথম দিকেই খবরটা এসে-ছিল। তারপর থেকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখানো বন্ধ, পাড়ায় চাপা বিদ্রূপ আর ঘরে দুঃসহ থমথমে ভাব। তারই ভেতর নিয়মিত কলকাতায় গেছেন দেবীদাস; পরীক্ষার খাতা দেখেছেন, কলেজ খুললে যথারীতি ক্লাশ নিয়েছেন। প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন মেয়ের সঙ্গে দেখা না করে গেলে যাঁর মন অস্থির হ'ত, সেই মানুষটা তারপর থেকে প্রতি-দিনই ক্লাশ শেষ ক'রেই স্টেশনে ছুটেছেন। কোনোমতে চোখ কান বুজে বাড়ীতে এসে পৌঁছনোটাই যেন তখন তাঁর সবচেয়ে বড়ো কাজ।

এমনি ক'রেই আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছে। কিন্তু তেইশে আষাঢ় তারিখটা যতই এগিয়ে আসছিল ততই নিজেকে আর সামলাতে পারছিলেন না দেবীদাস। ঊর্মিলা এ-কথা শুনলে সেই ভয়ঙ্কর কঠিন গলায় হয়তো চূড়ান্ত একটা কিছু বলে বসবেন। তাই দেবীদাস তাঁকে কিছুই বলেন নি। তপতী নাগকেশর ফুল ভালোবাসে। অনেকবার সে বলেছে, তোমার বাগানে একটা নাগকেশরের গাছ ক'রো বাবা। ভারী মিষ্টি গন্ধ!

হয়তো সেই জন্যেই অথবা হয়তো মেয়ের ওপর চূড়ান্ত অভিমানেই এ-বছর খুঁজে খুঁজে নাগকেশরের একটা চারা কিনে নিয়ে গভীর রাতের ট্রেণে চুঁচুড়ায় ফিরেছিলেন দেবীদাস। তপতী আর কোনোদিন বাপের বাড়ী আসবে না। অথবা এলেও তার মা তাকে এ-বাড়ীতে প্রবেশ করবার অনুমতি কোনোদিনই দেবেন না। অন্তত ঊর্মিলা যতদিন জীবিত আছেন ততদিন তা অসম্ভব। তবু সেই হতভাগিনী যদি কোনোদিন আসে তাহলে দেখে যাবে, তার নাম এ-বাড়ী থেকে মুছে গেলেও তারই নামে একটা নাগকেশরের গাছ এখানে স্থান পেয়েছে, বাতাসে মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে তার নিষ্পাপ ফুলগুলো।

ঊর্মিলার আক্রোশ থেকে গাছের চারাটাকে বাঁচাবার জন্যেই সেদিন অনেক রাত করে ফিরে-ছিলেন দেবীদাস। কিন্তু বাঁচানো যায় নি। পরের দিন সকালে দেখলেন, কে যেন সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে থেঁতলে ফেলে রেখেছে। নিঃশব্দে সেই নিহত চারাটাকে তুলে নিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন দেবীদাস। ঊর্মিলাকে এ-নিয়ে কোনো কথাই তিনি বলেন নি।

তপতী এখনো এ-ঘরে ফেরেনি। একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে চুরুট ধরালেন দেবীদাস।

তপতীর মতো মেয়ে কেমন ক'রে এ-কাজ করলো তা এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না দেবীদাস। মাত্র চার বছর আগে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। মেয়ের সচ্ছল-ভবিষ্যতের আশায় সাধ্যের অতীত টাকায় অনেক জামাই কিনেছিলেন। একটা বিরাট মার্কেণ্টাইল ফার্মের বেশ উঁচুদরের অফিসার দীপঙ্কর। তখন তার বয়স সবে সাতাশ। উন্নতির সিঁড়ি-গুলো তার সামনে তখন পর পর সাজানো। মেয়ের রূপেই ও-তরফের পছন্দ হ'য়েছিল এক-বাক্যে। কিন্তু তার সঙ্গে টাকার দাবীটাও বড়ো কম ছিল না। নিজের শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভেবে এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করবার অবকাশও নেননি দেবীদাস। ভবিষ্যতে নিজের অসুবিধে যা-ই হোক তার জন্যে এ পাত্র তিনি হাতছাড়া করতে চাননি। বিয়ে হ'য়ে গেল বিয়ের পরে এই চার বছরের ভেতরেই দীপঙ্করের মাইনের অঙ্ক দেড় হাজার থেকে আড়াই হাজারে উঠে গেছে। আরও উঠবে তপতীর মুখেই সে-কথা শুনেছিলেন দেবীদাস। কিন্তু হঠাৎ কোথায় কী যেন গোলমাল হ'য়ে গেল। মেয়ের বিয়ের দেনা তখনো সব শোধ হয়নি। এরই মধ্যে একদিন সেই খবর এলো, একটা বাজে লোকের সঙ্গে স্বামীগৃহ ত্যাগ ক'রে তপতী কোথায় চ'লে গেছে!

এ-খবর আসার পর ঊর্মিলার সেই বুক-ফাটা আর্তনাদ এখনো দেবীদাসের কানে বাজে। ক'দিন পরে ঊর্মিলা যখন কান্না থামিয়ে স্তব্ধ হ'লেন তখন তাঁর সেই চেহারা দেখে বিমূঢ় দেবীদাসও চমকে গিয়েছিলেন। বাড়ীময় তপতীর যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন ছিল সব নিজের হাতে পুড়িয়ে দিলেন ঊর্মিলা। এমন কি, তার ছেলেবেলার ছবিগুলো পর্যন্ত বাদ গেল না। ছোটোভাই রিণ্টু আর বোন বাবুলিকে নানা উপলক্ষ্যে তপতী যে-সব উপহার দিয়ে-ছিল সেগুলোও আগুনে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল। তারপর আজ পর্যন্ত তপতীর নাম বাড়ীতে একবারও উচ্চারিত হয়নি।

এই ক'মাসে একটা রাতও ভালো ক'রে ঘুমোতে পারেননি দেবীদাস। তপতীর বিয়ের পরে সপ্তাহে অন্তত দু'তিন দিন তার পার্কসার্কাসের ফ্ল্যাটে নিজে গিয়ে নিয়মিত তিনি মেয়ের খোঁজ-খবর নিয়েছেন। মেয়েকে মাঝে মাঝে নিজেদের কাছে নিয়ে রাখবার স্বাভাবিক আগ্রহটুকু তাঁকে মনেই চেপে রাখতে হয়েছে। তাতে দীপঙ্করের তেমন সম্মতি নেই দেখে আর পীড়াপীড়ি করেন নি। নিজের চেষ্টায় তপতী যা দু'একবার গেছে তাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন দেবীদাস। শেষের দিকে এক বছরের মধ্যে একবার মাত্র দু'দিনের জন্যে গিয়েছিল তপতী। সে যা-ই হোক, মেয়ের বিবাহিত জীবনের এই অল্প কয়েক বছরে অশান্তি বা অতৃপ্তির কোনো চিহ্ন দেখতে পান নি দেবীদাস। অন্তত তাঁর চোখে তেমন কিছু ধরা পড়েনি। সত্যিই যদি তা হ'ত তবু এই মর্মান্তিক লজ্জার একটা সান্ত্বনা থাকত। কিন্তু এ যে সব নিয়মের অতীত!

মেয়ের এই নির্লজ্জ কাজের একটা সংগত কারণ আবিষ্কারের চেষ্টায় রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন দেবীদাস। একটি মাত্র স্বাভাবিক কারণের কথা-ই ঘুরে ফিরে বার বার মনে এসেছে। উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির তাড়না। অথচ প্রথম যৌবন থেকে বিয়ের সময় পর্যন্ত ঊর্মিলাও মেয়ের চালচলনে এতটুকু কুশ্রীতা দেখেন নি। সে রকম কিছু থাকলে মায়ের নজর নিশ্চয়ই এড়িয়ে যেত না।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে দেবীদাসের। এক-একবার মনে হ'য়েছে তাঁর নিজেরই মধ্যে হয়তো ব্যাস্ত-লালসার আগুন ছাইচাপা হয়ে পড়ে ছিল। সেই আগুনের দাহ সঞ্চারিত হয়ে গেছে সন্তানের অস্থি-মজ্জায়। কখনো বা মনে হয়েছে, হয়তো বা ঊর্মিলার মধ্যেও ছিল এ-তাড়নার উৎস। কারণ ছাড়া তো কার্য হয় না।

কথাটা ভেবেই লজ্জায় গ্লানিতে নিজের মনেই শিউরে উঠেছেন দেবীদাস। মেয়ের অপরাধের কৈফিয়ৎ তৈরী করতে গিয়ে স্ত্রীকে তিনি এ কোথায় নামাতে চলেছেন! সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন সেদিন। কোনো কোনো রাতে এ চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়াবার জন্যে আলো জেলে বই নিয়ে বসেছেন। সুমেরিয়া, ব্যাবিলন, মিশর আর সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্ন-ইতিহাস। হাজার হাজার বছর আগেও মানুষ অপরাধ করতো, সামাজিক প্রথাকে লঙ্ঘন করতো। হাজার হাজার বছর আগেও অপরাধ ছিল, অপরাধী ছিল। কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল তবু মানুষ অপরাধ ক'রেছে। এখনো তাই! তাহ'লে পরিবর্তনটা হল কোথায়? তপতীকে তার মা ক্ষমা করেন নি। কিন্তু একমাত্র ছেলে রিন্টু যেদিন পরীক্ষায় নকল ক'রতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, সেদিন ঊর্মিলা কিন্তু তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেননি। লজ্জায় ঘৃণায় মাথা কাটা গিয়েছিল অধ্যাপক দেবীদাস দত্তের। তবু তিনি নিজেও তো ছেলেকে কঠোর দণ্ড দিতে পারেন নি। অন্ধ স্নেহ না বার্ধক্যের দুর্শ্চিন্তা? বাবুলির হার্টের অসুখ। কিন্তু সে কথা অবলীলাক্রমে গোপন করে তার বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন ঊর্মিলা। দেবীদাসও তাতে সায় দিয়েছেন। নিজেদের দায়মুক্তির আনন্দে বাবুলির ভবিষ্যৎটাও ভুলেছেন তিনি।

এলোমেলো নানা কথা ভাবতে ভাবতে দিশেহারা হ'য়ে পড়েন দেবীদাস। এমনিভাবেই রাতের পর রাত কেটেছে। তপতীর অপরাধের বিচার করতে গিয়েও বিচারকের আসন থেকে বার বার তিনি নেমে এসেছেন। তবু এই আট মাসের ভেতর তপতীর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন নি। সে-কথা ভাবতে গিয়েও শিউরে উঠছেন মনে মনে। এ সংস্কার বড়ো কঠিন। কুলত্যাগিনী ভ্রষ্টা মেয়েকে হয়তো সামনাসামনি সহ্য করতে পারবেন না।

দিন তিনেক আগে খবরের কাগজে ছোট্ট একটা মোকদ্দমার বিবরণ পড়বার পর থেকেই ছটফট করতে লাগলেন দেবীদাস। ব্যভিচারের দায়ে তপতীর নামে নালিশ রুজু করেছে দীপংকর। যা ঘটেছে তাতে এ নালিশ অপ্রত্যাশিত নয়। তবু এই তিনটে দিন দেবীদাস খেতে পারেন নি, শুতে পারেন নি। বেশ কিছু খরচ ক'রে কোর্ট থেকে তপতীর এই ঠিকানা জোগাড় করে সেখান থেকেই সোজা আসছেন। কলেজ থেকে আজ তিনি ছুটি নিয়েছিলেন।

পর্দার ওপাশে মৃদু পায়ের শব্দ হ'তেই সচকিত হ'য়ে উঠলেন দেবীদাস। একটা প্লেটে গোটা চারেক সন্দেশ আর এক গেলাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো তপতী। দেবীদাসের সামনে সেগুলো রেখে মৃদুস্বরে বললে, এগুলো দোকানের খাবার বাবা, আমার তৈরী নয়।

দেবীদাসের বুকের ভেতর একসঙ্গে যেন একশোটা হাতুড়ির ঘা পড়লো। প্রচণ্ড আঘাতে বোধশক্তি অসাড় হয়ে গেলে মানুষ যেমন ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে থাকে, তেমনিভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন, একটু চা ক'রে আন্ মা। অনেকক্ষণ চা খাইনি।

তপতীর মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। বললে, ঝি-কে জল চাপাতে বলেছি।

ও, আচ্ছা।

কিছুক্ষণ কারো মুখেই আর কোনো কথা নেই। একটু পরে তপতী নীরবতা ভেঙে বললে, রিন্টু, বাবুলি ওরা কেমন আছে বাবা?

ভালো। বাবুলির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সামনের মাঘ মাসেই বিয়ে।

কথাটা ব'লেই নিজের কাছে যেন এতটুকু হয়ে গেলেন দেবীদাস। এই মুহূর্তে ওর কাছে এ-কথাটা কেন যে বলে ফেললেন তা নিজেই যেন বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি।

তপতী কিন্তু বেশ সহজ স্বরে বললে, সম্ভব হ'লে বর-ক'নের একটা ছবি আমাকে পাঠিয়ে দিও বাবা।

দেবো। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন দেবীদাস।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে ঝি এলো। তপতী জলের গেলাসটা সরিয়ে চায়ের পেয়ালা সেখানে রাখতেই ঝি বললে বাবু তোমাকে একবার ডাকছেন দিদি—ওষুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে বললেন।

দেবীদাস তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলেন, দীপংকরের অসুখ?

মুখ নিচু ক'রে অস্ফুট স্বরে তপতী বললে, না!

অভ্যাস্ত নামটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সংগে সংগেই দেবীদাস কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। সংগে সংগে তপতীর মুখখানাও ফ্যাকাশে হয়ে যেতেই তিনি কোনোমতে বললেন, তা যা না, তুই ওষুধ খাইয়ে দিয়ে আয়।

নতমুখে চলে গেল তপতী।

বেশ কয়েকমুহূর্ত আচ্ছন্নের মতো বসে রইলেন দেবীদাস। খাবারের প্লেট আর গেলাসটা নিয়ে ঝি-ও চলে গেল।

লোকটার নাম মনে করবার জন্যে মনের ভেতর ব্যাকুলভাবে হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন দেবীদাস। তপতীর নামের সংগে এ-লোকটার নামও কাগজে তিনি পড়েছিলেন। এইবারে নামটা মনে পড়লো—বাসুদেব সেন। কিন্তু এখন মনে পড়ে আর লাভ নেই।

চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিয়ে দেবীদাস সবে একটা চুমুক দিয়েছেন ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে উত্তেজিত পুরুষ-কণ্ঠের আঘাতে তাঁর চিন্তা থমকে থেমে গেল।

উনি কী জন্যে এসেছেন?

কী জন্যে আবার? বাবা মেয়ের কাছে আসবেন না? তপতীর উত্তর।

তাহ'লে এতদিন খোঁজ করেননি কেন?

কেন করেননি তা তুমি বুঝতে পারো না? দোহাই তোমার চুপ ক'রো, বাবা শুনতে পাবেন যে!

বাসুদেব চুপ করলে না। আগের চেয়ে একটু নীচুস্বরে কথা বললে বটে। কিন্তু তার সব ক'টি শব্দই দেবীদাস স্পষ্ট শুনতে পেলেন।

বাসুদেব বললে, আমার একটু অনুরোধ রাখো তপতী। এতদিন পরে উনি যখন এসেছেন তখন এইটুকু অন্তত ও'কে জানিয়ে দাও যে তুমি যেখান থেকে পালিয়েছ সেটা স্বামীর ঘর নয়, জানোয়ারের থাবা।

আঃ, আবার ওইসব কথা? ওষুধ খাও তো—

খাচ্ছি। কিন্তু যে জানোয়ারটা প্রমোশন আর তিন হাজার টাকা মাইনের খাতিরে নিজের বউকে ওপরওলার হোটেলে রেখে আসতে পারে তার কথাটা ও'কে জানাতে পারলে না তুমি? তুমি না পারো আমিই যাচ্ছি।

ছিঃ। তোমার কি মাথা খারাপ হ'ল নাকি? ওগো দোহাই তোমার, উঠো না—

চাপা স্বরে ব্যাকুল আর্তনাদ ক'রে উঠলো তপতী।

এঘরে তখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছেন দেবীদাস। চোখের সামনে দেওয়ালগুলো ভূমি-কম্পের মতো দুলছে। মাথার ভেতর তীব্র যন্ত্রণার একটা আবর্ত যেন পাক খেতে খেতে উন্দামবেগে সমস্ত চেতনাকে অতলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তারই ভেতর কাটা কাটা ভাবে বাসুদেবের আরও কয়েকটা কথা শুনতে পেলেন দেবীদাস।

নিরুপায় তপতী নিজেকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছিল। শেষ পর্যন্ত পারে নি। রাতের পর রাত তাকে ওপরওলা সায়েবের কবলে ফেলে রেখে আসবার চেষ্টা করেছিল দীপঙ্কর। উদ্যমী অফিসার শেষ পর্যন্ত খুশী করতে পেরেছিল তার ওপরওলাকে। তার পদোন্নতির খবরটা দেবীদাস ঠিকই পেয়েছিলেন। কিন্তু যে মূল্যে তা কেনা হয়েছিল তার হিসেবটা তাঁর কাছে কেউ পৌঁছে দেয় নি।

তপতী কখন আবার এ-ঘরে ফিরে এসেছে তাও হুঁশ নেই তাঁর। তখনো যেন একটা বিকট দুঃস্বপ্নের ঘোরে তিনি নির্বাক নিস্পন্দ।

তপতী আস্তে ডাকলে, বাবা!

চমকে উঠে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন দেবীদাস।

তোমার চা জুড়িয়ে গেল যে!

কোনো জবাব দিলেন না দেবীদাস। যে-কথাটা বলবার জন্যে তিনি এসেছিলেন সে-কথাটা মেয়ের কাছে যে কী মর্মান্তিক বাজ হ'য়ে দাঁড়াবে তা তিনি একটু আগেও ভাবতে পারেন নি। তপতী যদি রাজী হয় তাহলে তার হয়ে দীপঙ্করকে নালিশ তুলে নেওয়ার আবেদন জানাতে গিয়ে যতখানি নীচু হতে হয় তার জন্যে মনে মনে তৈরী হয়েছিলেন দেবীদাস। চার বছর আগে যার জানু স্পর্শ করে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন তার কাছে হাত জোড় ক'রে আর একবার গিয়ে দাঁড়াবেন ভেবেছিলেন তিনি।

নির্বাক দেবীদাস উঠে দাঁড়ালেন।

তপতী মৃদুস্বরে বললে, চা খেলে না বাবা?

না।

তপতী এগিয়ে এসে আর একবার প্রণাম করতে গিয়ে ধরা-গলায় বললে, আমাকে তোমরা ভুলে যেয়ো বাবা। তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

দেবীদাসের মুখে কোনো কথা নেই। সমস্ত শরীরটা থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। হাত বাড়িয়ে ফোলিও ব্যাগটা তুলে নিলেন তিনি।

তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে তপতী একটু ভয় পেয়ে গেল।

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে বাবা?

না।

দেবীদাসের চোখের সামনে তখনো দেওয়ালগুলো দুলছে। ঝাপসা দৃষ্টির সামনে শুধু এক নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকারের [illegible] আবর্ত। একই কেন্দ্রের অভিমুখে সে আবর্ত পাক খেয়ে খেয়ে তলিয়ে চলেছে আবার ওপরে উঠছে। এ অন্ধকারের শেষ নেই, এর সূত্রও হয়তো কোনোদিন ছিল না।

কাঁপা-হাতে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিলেন দেবীদাস। এতক্ষণে থর্ থর্ ক'রে কেঁদে ফেললো তপতী।

দেবীদাসও একবার শিশুর মতো কাঁদতে চাইলেন কারণ তিনিই এই কক্ষচ্যুত [illegible] জন্মদাতা। কিন্তু কাঁদতে পারলেন না কারণ বাৎসল্যের অধিকারকে আটমাস আগে উপঢৌকন দিয়ে তার বদলে তিনি নিজের সামাজিক সম্ভ্রম, নিরাপত্তা আর ব্যক্তি-অভিমানকে চড়া দামে কিনেছিলেন।

উর্মিলার পুঞ্জীভূত অভিমানের আর ঘৃণার পেষণে নিহত সেই নাগকেশরের চারাটিকে বাগানের বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন দেবীদাস। অথচ এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে সে চারাটা তাঁর বুকের ভেতর যেন এইমাত্র বেড়ে উঠলো।

তপতীর চোখের জল মুছিয়ে দেবার কোনো চেষ্টা করলেন না দেবীদাস। মৃদুস্বরে শুধু বললেন, বাসুদেব আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে না, মা?

হারিয়ে গেছে

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এক দশকেরও বেশী, প্রায় সাড়ে এগারো বছর আগে মাসীমার বাসায় উত্তরবঙ্গের এক গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলাম। শহরের কালাহল আর অবরুদ্ধ বাতাসের আওতা থেকে বহুদূরে বালুরঘাট আর মালদার মাঝা-মাঝি এক নির্জন নদীর ধারে মাসীমার কোয়ার্টার। গ্রীষ্মে ছোট নদীর দেহ শীর্ণ কন্তু স্রোতের তেজ প্রখর। ঠিক জানিনে ...নলাম কোন পাহাড় থেকে নেমেছে নদীটি ...স্থর গতিতে এগিয়ে এসে মিশেছে মহা-নন্দার জলে।

বিকেলে নদীর ধারে সাঁকোর নীচে গিয়ে ...সলাম। সঙ্গে থাকত মাসীমার সাত বছরের ...য়ে তনু।

কাঁচা বেতের মত উজ্জ্বল টান-টান দেহটা ...কিয়ে আমার কানের কাছে মুখটা এনে ...নর্গল কথা বলে যেত। চোখদুটোয় মুহূর্তে ...হূর্তে ভাব পরিবর্তন হোত, বুদ্ধির দীপ্তিতে ...র অনুভূতির গভীরতায় চিকচিক করে উঠত ...র ছোট খয়রা মাছের মত ঝকঝকে চোখদুটো।

—ছোড়দা !

আমাকে ছোড়দা বলে ডাকত ওরা। ...নের ডাকবাংলোটা হাওয়াঘরের দিকে ...কিয়ে থাকতে থাকতেই বলতাম,—কিরে ?

ওই দ্যাখ, ছোড়দা দ্যাখো।

—কি ? বলে ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ...কাতাম। দেখতাম গুটি পাঁচেক বক সার ...ধে ডান দিকে বিশাল অশ্বত্থ গাছটার দিকে ...ড়ে চলেছে।

—ওরা উড়লেই ওদের গলাটা ফুলে যায়। ...ন বলো তো ?

ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম সত্যি বক-...লোর গলার নীচে রীতিমত ফুলো ছোট ...টোলীর মত। অথচ এই বকগুলোই কিছু ...গে যখন বালির চড়ায় বসে সন্তর্পণে ...লের ধারে এগিয়ে গিয়ে টুক টুক করে ছোট ...টে মাছ ধরছিল, তখন ওদের গলা ছিল সরু ...ম্বা।

শহরে থাকি, এ ধরণের জবাব দেয়া ...মার পক্ষে শক্ত। বোধকরি সেইজন্যেই তনু ...ধরণের সব কথাই আমাকে বলত। ধাঁধায় ...লত আমাকে।

তাই কি ? না হতেও পারে। জন্মদিন ...থেকে পর্যন্ত নদী মাটি আর আকাশ দেখে ...খে ও নিবিষ্ট মনে এই সবই লক্ষ্য করত। ...ন গাছে শালিকের বাসা—কোন মাটিতে ...ঁচো পাওয়া যায়। কোন গর্তে ব্যাঙ থাকে ...র কোন গর্তে সাপ থাকে দেখা মাত্র বলে ...তে পারে। অনায়াসে দেখিয়ে দিতে পারে নদীর কোন ঘাটের ধারে মাছের চলাচল বেশী আর কোন ঘাটের ধারে শামুক ঝিনুক বেশী।

ও যেন এই নদীটাকে আর মাটির গাছগাছালিদের বই পড়ার মত মুখস্থ করে ফেলেছে।

খিল খিল করে হেসে উঠল তনু।—বলতে পারলে না ?

জব্দ হবার ভয়ে একটু ভেবে বলি।—ওড়বার সময় ওদের লম্বা গলাটা গুটিয়ে ছোট করে আনে কিনা। তাই গলাটা নীচে অমন ফুলে ওঠে।

বলেছিলাম ঠিকই। তনু মনঃক্ষুন্ন হোল। অশত্থ গাছটার দিকে তাকিয়ে বললে,—আচ্ছা বকের মাথায় টিকি দেখেছ ?

—টিকি !—অবাক হবার কথা। শুভ্র বলাকা নীল আকাশের কোল ঘেঁসে সার বেঁধে ওড়ে। শহরে কল্পনা নেত্রে দেখে আমরা বড় জোর কাব্য করি। বকের মাথায় টিকির খবর জানব কোত্থেকে ?

—ওই দ্যাখো।

দেখলাম আরও দুটো চর থেকে উড়ে অশত্থ গাছের দিকে আসছে। সত্যি তাদের মাথার ওপর লম্বা সরু টিকির মত ঝুঁটি। খুব লক্ষ্য না করলে দেখা যায় না।

হাসতে হাসতে মেয়েটা আমার কোলের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই আমার দিকে তাকিয়ে বললে,—ওরা অশত্থ গাছটায় রাত্তিরে থাকে। সকাল বিকেল অব্দি বেড়ায়, মাছ-টাছ খায় তারপর রাত্তিরে ঘুমোতে যায়।

তনু যেন ওদের পরমাত্মীয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে ওদের কর্মসূচী ওদের আহারাদি ব্যবস্থা, ওদের নিদ্রার স্থান সব কিছু খবর ও রাখে।

ওদের গায়ে কিন্তু বিচ্ছিরি গন্ধ।

এত ভাল লাগে ওর কথাগুলো। হেসে বলি,—তুই কি করে জানলি ?

—কি সুন্দর দেখতে : একদিন ভাবলুম একটা ধরে পোষ মানাব। পেছন থেকে একটা ধরেছিলুম। শেষে গিয়ে দেখি গায়ে কি বিচ্ছিরি গন্ধ ! ছেড়ে দিলুম।

—তোকে কামড়ায় নি ?

না, আমার দিকে তাকাচ্ছিল। চোখ দেখে মনে হচ্ছিল—ভয় পেয়েছে।

চোখদুটো ঘুরল তনুর।—ওই তালগাছের ওপর বাসাগুলো কিসের বলো তো ?

হাসলুম। এবারে বেশ অহঙ্কার নিয়ে বললুম,—ভারী কথা জিজ্ঞেস করলি। ও আর কে না জানে ! ও তো বাবুই পাখীর বাসা।

তনু চড়াং করে উঠে বসল,—তুমি ছাই জানো। ওদের কত বুদ্ধি জানো। ওরা রাত্তিরে ঘরে আলো দেয়।

ওর সুন্দর পাতলা দেহখানা যেন পাখীর মত। ও যখন দৌড়োয়, মনে হয় উড়ছে। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবি, কি আনন্দে আছে ! কি সুন্দর মেয়েটা !

পাখীরা যে ওর বন্ধু, তাই ওদের প্রশংসায় ওর চোখদুটো খুশীতে ভরে ওঠে। বলে,—কি বুদ্ধি ওদের। মুখে করে গোবর এনে বাসার ভেতর রাখে। তারপর উড়ে গিয়ে ঠোঁটে করে সব জোনাকী ধরে ধরে সেই নরম গোবরের ভেতরে জোনাকীর মুখটা গুঁজে দেয়। সাত আটটা জোনাকী ধরতে পারলেই ওদের বাসা আলো হয়ে যায়।

বাবুইয়ের বাসার কথা কে না জানে। তবু ওর চোখে কি তন্ময় ভাব ! কি ভাল লাগে ওর কথাগুলো। ওর সরু কোমরটা জোর করে চেপে ধরে ওকে ঝাঁকাই।

—আমার কি ইচ্ছে করে জানো ছোড়দা ?

তাকাই ওর দিকে।

—ইচ্ছে করে ওদের বাসায় রাত্তিরে ঘুমোই। কি পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে ওদের বাসা। আমাদের ঘরের চেয়ে অনেক ঢের ভালো।

হাসতে হাসতে ওকে কোলে তুলে নিই। ও হাত পা ছুঁড়ে ছটফটিয়ে ওঠে। কোলে উঠতে একেবারে চায় না। ধরা পড়তে চায় না। হাতের স্নেহের বাঁধনেও হাঁপিয়ে ওঠে।

ওকে ছেড়ে দিতে পন্ পন্ করে দৌড়ে যেন উড়ে পালায়।

হাসতে হাসতে কোয়ার্টারে চলে আসি।

এসে দেখি মাসীমা ওকে ধমকে হাত পা ধোয়াচ্ছে।

বলি,—কি হোল, বকছেন কেন ?

মাসীমা বললেন,—আর বলিসনে বাবা, মেয়েটা একেবারে বুনো হয়ে উঠছে।

হেসে বলি,—যা বলেছেন, একেবারে বন-বেড়াল।

তনু চোখ পাকিয়ে তাকায় আমার দিকে।

বাইশ দিন ছিলাম এই গাঁয়ে মাসীমার কোয়ার্টারে। সর্বক্ষণ তনু আমার কাছে। চান করতে যাবে নদীতে হাঁক দিলো,—ছোড়দা, নাইতে চলো।

নাইতে গিয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ঝাঁপাঝাঁপি। গামছা দিয়ে মাছ ধরা। ডুব দিয়ে শামুক তোলা, শীর্ণ নদীর অল্প জল তোলপাড় করে তুলত একা।

চান সেরে আসতে আসতে বলত,—জানো, আমরা সাঁতার কাটলে ঝাঁপাঝাঁপি করলে মাছ-গুলোর কষ্ট হয়।

—কেন ।

—ওরা ভয় পায়। এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করে।

হেসে বলি,—শামুক ঝিনুকের কষ্ট হয় না ?

ও যেন গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়ে বলে,—না—ওরা ঘোমটা বন্ধ করে। জলের নীচে চুপ করে পড়ে থাকে।

কথাটা ভারি অদ্ভুত লাগে। ঘোমটা বন্ধ করে। ভয়ে লজ্জায় ঘোমটা টেনে দেয় শামুক ঝিনুক।

খেতে খেতে গল্প। দুপুরে আমি শুয়ে থাকি বটে, মাঝে মাঝে ও দৌড়ে ঘরে ঢোকে। টেনে নিয়ে গিয়ে দেখায় এক রকমের লম্বা শুকনো ফল। তার ভেতরে পোকা থাকে, মাছ এই পোকা খেতে খুব ভালবাসে।

এখানকার নদী জল প্রান্তরের সবটা যেন স্পষ্ট করে দেখতে পাই তনুর ভেতরে। তনুর ভেতরেই যেন বালুচরের সীমানায় নীল আকাশ ছড়িয়ে আছে। ওকে দেখার মানেই সব দেখা। ওকে ছোঁয়া মানেই সব ছোঁয়া। তনুকে ভাল-বেসেছিলাম। ওর ভেতর দিয়েই এ গাঁয়ের নদী, মাছ, পাখী, গাছ-গাছালি সব কিছুকে মিলিয়ে নিয়ে ভালবাসতে পেরেছিলাম।

আসবার দিন মনটা বড় খারাপ। আবার কবে তনুকে দেখব, কে জানে !

বললাম,—আমি কাল যাব। তোর কষ্ট হবে না ?

প্রান্ত অবকাশ ঃ নীহার তালুকদার

ও যেন অবাক হোল।—কষ্ট ! না তো ! কষ্ট হবে কেন ?

বলতে নদীর ধারে তীর বেগে ছুটে চলে গেল।

অনেকদিন কেটে গেছে। সুদীর্ঘ এগারো বছরের ওপর। এক সওদাগরী অফিসের আটশ' টাকার একটি পদে অধিষ্ঠিত হয়ে কোট প্যান্টুলুন টাই পরে শেষে ফাইলের কাগজ ঘেঁটে ঘেঁটে দিন কাটছে।

খবর পেলাম। মাসীমা কলকাতায় এসেছে। মেসোমশাই রিটায়ার করবার পর শিলিগুড়িতে থাকেন। কি একটা ব্যবসা করবার চেষ্টা করছেন।

ওরা কলকাতায় এসেছে শুনে প্রথমেই মনে পড়ল তনুর কথা। সেই গাঁয়ের এক ঝলক পুবাল হাওয়া এসে যেন লাগল মনে। তনুর মুখখানা মনে পড়ল। সেই কাঁচা বেতের মত সতেজ দেহটি আর খয়রা মাছের মত চিকচিকে দুটো চোখ।

ক্লাইভ স্ট্রীটের প্রাসাদের বন্ধ চেম্বারে বসে মুহূর্তে মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

অপিস থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বড় মাসীমার পাম এভিনিউয়ের বাসায় পৌঁছোলাম। ওখানেই মেজ মাসীমা তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছেন।

ঝকঝকে পাঁচের রাস্তা, চৌকো দেশলাইয়ের বাক্সর মত বাড়ি।

কলিংবেল টিপতে চাকর এসে দোর খুলে দিলো। ড্রইংরুমে গিয়ে দুই মাসীমার সঙ্গে দেখা। ওঁরা চা খাচ্ছেন। বড় মেসোমশাই তাঁর ছেলে দিল্লীর মস্ত অফিসার—সকলের সামনে চায়ের কাপ।

প্রণামে আর কুশল সংবাদের পর্ব শেষ করে ঘরে ফিরে অপিসের কথা, রাজনীতির কথা [illegible] গল্প।

আলোচনায় যোগ দিলেও তনুকে দেখার জন্যে মনটা আমার অস্থির হয়ে উঠেছিল। তনু কোথায় ? তবে কি ও আসেনি ? জন্যেই তো বিশেষ করে এলাম আজ।

কিছুক্ষণ পরেই দুটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে ঢুকল ঘরে। বড় মাসীমার মেয়ে অনী আর তনু।

তনু এসে প্রণাম করল।

—ভাল আছো ছোড়দা ?

ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডেক্রনের টকটকে একখানা শাড়ি পরনে। চোলীর মত লাল রঙের পেটকাটা ব্লাউজ। লাজুক গণ্ডী চোখদুটো আলতা কাজলের ছোঁয়া। এক হাতে ঘড়ি, আর এক হাতে একগাছা মোটা বালা।

এই কি তনু ? হ্যাঁ, এই তো তনু।

তোরা চা খাবি তো. ওর জন্যেও কাপ চা করতে বলিস তনু।

বড় মাসীমার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙল।

তনু মাজা স্বরে বললে,—কি খাবে ছোড়দা চা, না কফি ?

মেজ মাসিমা আমাকে উদ্দেশ্য করে ছিলেন, তনু এবারে বি এস-সি দেবে। কিছুতে সায়েন্স না নিয়ে ছাড়ল না। মেয়ের গেল বছর শিলিগুড়িতে ব্যাডমিণ্টনে উইনার প্রাইজ পেয়েছে। কথাগুলো ভাল করে যাচ্ছিল না।

অবাক হয়ে দেখছিলাম। এই কি সেই তনু না, সে তনু হারিয়ে গেছে. গ্রামের সেই প্রান্তর নদীর ভেতরে হারিয়ে গেছে। শালিক আর বাবুই পাখীর বাসায় চিরকালের মত হারিয়ে গেছে।

—কি খাবে ছোড়দা, চা, না কফি।

সম্বিত ফিরে এলো। মনটা বিস্বাদ হয়ে গেছে। ধরা গলায় বললাম,—কিছু না, [illegible]

খেলাধুলা..
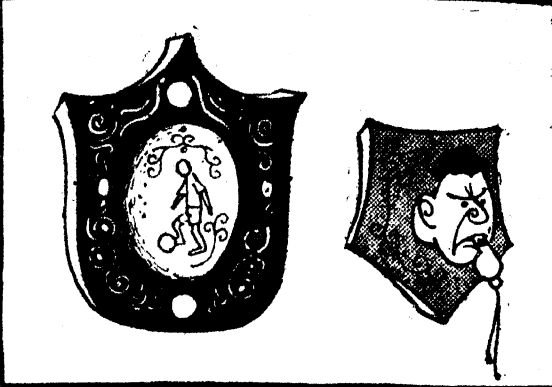
রণজির সাফল্যে সমকালীন ভারতে চাঞ্চল্য

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

মোহনবাগানের সঙ্গে আমাদের জাতীয়তার সম্পর্কের কথা শিক্ষিত মহলে সুবিদিত। স্বাধীনতাপূর্ব ভারতকে যাঁরা স্মরণ করার মত বয়স্ক, তাঁদের মনে নিশ্চয় পড়বে, ভারতীয় হকি দলের বিশ্বজয় এই পরাভূত ও পদানত জাতির স্তিমিত রক্তে কি রকম দোলা লাগাত। এমন কি পোলো খেলা—ঘোড়ার পিঠে চড়ে ভারতের নবাব ও নবাব-নন্দনেরা যা খেলত,—তাতেও কোনো কোনো ভারতীয় রাজার সাফল্য প্রজা-ভারতীয়ের চিত্তে হর্ষ সঞ্চার না করে পারেনি। সে এমন এক যুগ ছিল,—আমার রাজনীতিচর্চা পাঠক ক্ষমা করবেন, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা খাদ্যবস্তুতে ভেজাল দিলেও তা স্বদেশী ভেজাল বলে সমাদর পেত। স্বাধীনতার পরে সে সেন্টিমেন্ট আমাদের নেই—আমরা স্বাধীন, সকলের সঙ্গে সমান,—সেই আবেগে এখন সকলের পিছনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আমরা মহান!

সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যখন রণজিৎ সিংহের আবির্ভাব হল প্রাচ্যের তারকারূপে প্রতীচ্যের গগনে, তখন পাঠক অনুমান করতে পারেন, 'সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ'! উহুঁ, আমি প্রতিবাদ করতে বাধ্য হচ্ছি, ব্যাপারটা পাঠকের অনুমানকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমার পাঠক সকলেই বাঙ্গালী। তাঁদের জানাই, রণজিকে কেন্দ্র করে পশ্চিম ভারতে যে বীরপূজা হয়েছিল (রণজি পশ্চিম ভারতের অধিবাসী), বাংলা দেশে তার পরিমাণ কিছু কম ছিল। তাছাড়া বাংলা দেশে ক্রিকেট কোনোদিনই তার উইকেট গভীর করে পুঁততে পারেনি (এখনো পর্যন্ত নয়। এখনো ক্রিকেট বলতে আমরা বুঝি টেস্ট-ক্রিকেট, যা শীতের ক্রীড়া-সার্কাস; অবশ্য আমাদের সেই চিত্ত-দুর্বলতায় আঘাত করার জন্য কর্তৃপক্ষ গ্রীষ্ম-ক্রিকেট এবং শারদ-ক্রিকেটের আয়োজন সুরু করেছেন, শুধু আষাঢ়ে ক্রিকেট বাকি আছে)—উনিশ শতকের শেষভাগ থেকেই এদেশে ফুটবলের জনপ্রিয়তা বাড়তির পথে। বাঙ্গালী তার দারিদ্র্যের জন্য ক্রিকেটকে নিতে পারেনি, স্বদেশীর জন্য রূপটিকে আদর্শ করেছিল, কিন্তু সমন্বয় প্রতিভার আকৃষ্ট হয়েছিল ফুটবলের দিকে,—মাঠে পড়ার পরেই কাদা মাখামাখি হয়ে যে ফুটবলের জাতিকুল চেনা শক্ত হয়ে ওঠে। খালিপদ বাবু হয়ে ফুটবল নাচিয়ে গোরাহারি হওয়ার গৌরব যখন বাঙ্গালী অর্জন করেছিল, তখন খেলার মাঠ শুধু চীৎকারে কাঁপেনি, বাড়ির দেওয়াল পর্যন্ত কেঁপেছিল, একথা আগেই বলে এসেছি।

তাই ফুটবলপ্রিয় বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ জানা নেই, একদিন ভারতের একাংশে রণজির ক্রিকেট সাফল্য জাতির আত্মগৌরব বৃদ্ধির পক্ষে কতখানি সহায়ক হয়েছিল। পশ্চিম ভারতে রণজির সাফল্যকে কেন্দ্র করে প্রভূত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, যা এমন কি রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার সামনে লোভের লাল বল ঝুলিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য বাংলা দেশ একেবারে সেই লোভের ছোঁয়া থেকে দূরে থাকেনি। সেদিনকার রণজি কেন্দ্রিক গৌরববোধ ও কল্পনা-বিলাসের কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাঠককে দিতে চাই। তথ্যগুলি পুরানো সংবাদপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সময়ে চোখে পড়েছে। সংবাদ প্রচুর, অল্পই নিবেদন করছি।

রণজির সাফল্যের সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে বেশী করে স্থান পেতে সুরু করে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। রণজি ছিলেন নবনগরের জাম-সাহেবের দত্তকপুত্র; সিংহাসনের ব্যাপারে চক্রান্তে তাঁর প্রাণসংশয় হলে তাঁকে কৈশোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ইংলণ্ডে, যেখানে তাঁর শিক্ষা ও ক্রিকেটশিক্ষা (দ্বিতীয়টিই বেশী) দুইই চলতে থাকে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ থেকেই ইংলণ্ডের ক্রিকেট-রসিক মহল একটি প্রতিভার অভ্যুদয় সম্বন্ধে সচেতন হতে থাকে, এবং এক বৎসরের মধ্যে তার বিষয়ে সপ্রশংস হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের 'মর্ণিং লীডার' পত্রিকায় রণজি সম্বন্ধে যে প্রশংসা উচ্চারিত হয় তা উদ্ধৃত

ব্যাট হাতে 'রণজি'

করে কলকাতার ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকা ১৮৯৪-র ৭ই মে সংখ্যায়। 'মর্ণিং লীডার' লেখে—"He is the first genuine Aryan brother to take part in a light Blue Cricket Eleven, and the first Hindu who could ever be said to have taken a prominent place among fiirst class English cricketers." এর পর দেখতে পাচ্ছি, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন অমৃতবাজার পত্রিকায় আয়ুষ্মান্‌ ভিজীর একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে, যাতে তিনি রণজির ক্রিকেট-সাফল্য কিভাবে ভারত ও ইংলণ্ডকে নিকটতর করেছেন উচ্ছ্বসিত হয়ে তার কথা বলেছেন। এই বৎসরই লেখা হয়, তরুণ রণ... স্থান ইংলণ্ডের ক্রিকেট-প্রধান ডাক্তার ডবলিউ... গ্রেসের পরেই।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দেই রণজি সম্বন্ধে মু... অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়ে ইংলণ্ডে এমন কথা লেখা... যা আজকের দিনে বিশ্বাস করা কঠিন। ঐ ব... গুলির মধ্যে কিছু কৌতুক হয়ত আছে, ... তথাপি লেখা যে হয়েছিল সেইটেই আশ্চর্যজনক... কথাগুলি অনুবাদে এই—

> 'মিঃ কে এস রণজিৎ সিংজী, যিনি ... নৈতিক মতে লিবারাল, হাউস অব কমন্স... নির্বাচনে দাঁড়াতে চান। যদি তিনি দাঁড়ান ... নির্বাচিত হন, তাহলে অল্প দিনের মধ্যে ... যে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পড়বেন না, ... কেউ বলতে পারবেন না—যখন ঐ ... খেলার যুগ।'

রণজি সম্বন্ধে ইংরেজদের এই ... রসিকতাপূর্ণ মন্তব্যের রসিকতাটুকু সানন্দে ... করে পুণার "মারহাট্টা" পত্রিকা কল্পনাবিহ্বল ... লিখল—

> "একথা বলা হয়, ওয়াটার্লুর যুদ্ধ... হয়েছিল ইটনের খেলার মাঠে। তবে ... ভারতীয় শাসন সংস্কার যুদ্ধের নিষ্পত্তি ... ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠে?"

হয়ত 'মারহাট্টা'র মন্তব্যের মধ্যেও কৌতু... রেশ আছে, কিন্তু আশার ছলনাই বেশী।

১৮৯৫-র রণজি প্রশস্তিতে তবু সংযম ... কিন্তু ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সেটাও গেল, ইংরেজ... ভারতীয় উভয় পক্ষেই। এই বছরই রণজি অ... লিয়ার সঙ্গে টেস্টে ইংলণ্ডের পক্ষে নেমে ... অবতরণের অপূর্বতম খেলা দেখিয়েছে... ভারতীয় রাজকুমারের স্বেচ্ছাসেবায় ইংল... ক্রিকেট-মুকুট শিরচ্যুত হয়নি। তারপরে অব... দাঁড়াল, গ্রেট ডবলিউ জি গ্রেসের সঙ্গে তুল... রণজির পক্ষে সামান্য কথা।—"তাঁকে ইণ্ডিয়া... ভারতীয় গ্রেস বলতে সুরু করা হয়েছে; কি... অনেক ব্যক্তি তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করছে... কালে তিনি গ্রেসেরও গ্রেস কমিয়ে ছেড়ে দেবে... (মারহাট্টা—১৮৯৬, ২৬শে জুলাই)। যে-সব পা... ক্রিকেট-সাহিত্য পড়ায় বেশী সময় দিতে পারেন... তাঁদের জানাই, ডবলিউ জি গ্রেস ছিলেন ইংলি... ক্রিকেটের প্রতীক রাণী ভিক্‌টোরিয়া ও ... পত্রিকায় উদ্ধৃত—১৮৯৬, ৮ই জুন)।

গ্রেসের জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল রণ... জনপ্রিয়তা—একথা সত্যই ইংরেজরা লিখে... যথা লণ্ডন ডেইলী নিউজ ক্রনিকল্‌ পত্রিকা ... "ডবলিউ জি গ্রেস ক্রিকেট মাঠে জনপ্রিয় ... ছিলেন ও থাকবেন, কিন্তু ক্রিকেটারদের ... ভারতীয় রাজকুমারের জনপ্রিয়তা গ্রেসের চে... বেশী, এমন সন্দেহই জাগে" (ইণ্ডিয়ান নে... পত্রিকায় উদ্ধৃত—১৮৯৬, ৮ই জুন)।

তাই যদি সত্য হয়, তাহলে স্বাভাবিক সিদ্ধা... হল, রণজি যেহেতু জনপ্রিয়তায় গ্রেসকে হারি... দিয়েছেন, তাহলে গ্রেস জনপ্রিয়তায় যাঁদের সম...

রণজি তাঁদেরও হারিয়ে দেন। ১৮৯৬-র ২৩শে অক্টোবর অমৃতবাজার পত্রিকার লণ্ডন সংবাদদাতা সেই কথাই লিখলেন—

"বর্তমান ইংলণ্ডে সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি মিঃ গ্লাডস্টোন কিংবা লর্ড সলিসবেরী নন—জনতার হীরো প্রিন্স রণজিৎ সিংজী।"

কাণ্ড! ব্যাপার দেখে শ্রীঅবিশ্বাস্যকেও সন্ত্রস্ত হতে হয়। যে রণজি ব্যাট ধরে মনোরম ছন্দে ক্রিকেট মাঠে নেচেছিলেন, তাঁকে নিয়ে সমধুর সুখে নাচা-নাচি করা হতে লাগল মাঠের বাইরে। বহু ভোজনে ও ভাষণে আপ্যায়িত করা হল তাঁকে। কেম্ব্রিজের ভোজসভায় 'মাস্টার অব ট্রিনিটি' ডাঃ বাটলার সহাস্য বিস্ময়ে বললেন—

"আমাদের প্রজাবন্ধু ভারতীয়গণের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম; যদি দেখা যায় যে, ভারত থেকে এসে কেউ সিনিয়ার র‍্যাংলার হয়ে গেল (কয়েক বৎসরের মধ্যে মারাঠি ছাত্র পরাঞ্জপে সিনিয়ার র‍্যাংলার হন।) কিংবা ট্রিনিটি হলের ভোজসভায় কোনো ভারতীয় বিচারক নিরাপদে নিরুপদ্রবে বসে পড়লেন—তাহলে খুব বেশী হতভম্ব না হলেও চলবে; কিন্তু কে ভাবতে পেরেছিল—আমাদের জনৈক ভারতীয় প্রজাবন্ধু আমাদের দেশে এসে আমাদেরই সুমহান জাতীয় ক্রীড়ায় আমাদের হারিয়ে দেবে!"

ডাঃ বাটলার ঐ বক্তৃতায় জানান ভারতের পক্ষে রণজির ক্রিকেট-নৈপুণ্যের শুভ ফল হল,— দূর-ভারতের কথা জানতে কেয়ারই করত না সাধারণ ইংরেজ, তারাও রণজির দেশ সম্বন্ধে এখন আগ্রহী হয়ে উঠছে।

রণজি সম্বন্ধে ইংলণ্ডে সর্বসাধারণের উদ্দীপনা ভারতে সংক্রামিত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডের রণজি-সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রাদিতে প্রচুর সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে, এবং ভারতীয় সংবাদ-পত্রে বহু সংখ্যক সম্পাদকীয় রচিত হয়েছে তাঁকে নিয়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, রণজির সাফল্য খেলা-ধুলার উৎসাহসৃষ্টি অপেক্ষা ভারতে জাতীয় গৌরব খ্যাপনের অধিক সহায়ক হয়েছিল। রণজির কীর্তিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেষ্টাই বেশী দেখা গেল। এ বিষয়ে দৃষ্টান্তরূপে অমৃতবাজার পত্রিকার ১৮৯৬-র ১৬ই আগস্টের মন্তব্য হাজির করা যায় :

"ডাঃ ডবলিউ জি গ্রেসের ব্যাটিং অ্যাভারেজ যেখানে ৪৬ সেখানে রণজিৎ সিংজীর ব্যাটিং অ্যাভারেজ ৫৭—এই সংবাদ আবার দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ভারতস্থ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের কথামত ভারতীয়রা সত্যই নিম্নশ্রেণীর জাতি নয়। নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করবার জন্য ভারতের শুধু দরকার—সুযোগ, যা থেকে সে এখন বঞ্চিত। ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র রণজিৎ সিংজীই ঘটনাচক্রে এই খেলার সঙ্গে জড়িত হন, এবং তার পরেই তিনি দেখিয়ে দিলেন, কারো থেকেই তিনি কম নন। স্বজাতির পতিত অবস্থার কথা তাঁর হৃদয়ে জেগে আছে। সেই চিন্তা পার্শীদের পবিত্র অগ্নির মতো নিরন্তর জ্বলছে প্রতিটি ভারত-বাসীর অন্তরে। 'ভারতবাসী গ্রামের চৌকিদার হবার যোগ্যও নয়',—এই অপবাদের প্রত্যুত্তর দেবার গোপন বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত রেখে, রণজিৎ সিংজী একমাত্র ভারতীয়রূপে ক্রিকেটে অংশ গ্রহণ করে দেখিয়েছিলেন—তিনি ইংলণ্ডের সেরা ব্যাটসম্যানদের পাশে দর্পের সঙ্গে স্থান গ্রহণ করতে পারেন।"

তবে সকল সময়েই ভারতীয় সংবাদপত্র ইংলণ্ডে রণজির জনপ্রিয়তার ভিতর থেকে নিজেদের রাজ-নৈতিক সুযোগ সন্ধান করছিল একথা বলা ঠিক হবে না। হীনসাহস, অপটু দেহ বলে বিকৃত ভারতবাসীর কাছে রণজির দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছিল অনেক সময়ে, জাতীয় জীবনে খেলাধুলো ও শরীরচর্চার গুরুমূল্য বোঝাতে। নমুনারূপে বোম্বাইয়ের 'গুজরাটি' নামক পত্রিকার ১৮৯৬-র ৯ই আগস্টের মন্তব্য উপস্থিত করছি:—

"রণজিৎ সিং—রণজয়ী সিংহ—সত্যই তাঁর নামের মর্যাদা রেখেছেন। আমরা ভারতীয়গণ আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে পড়ি যখন ভাবি, আমাদেরই একজন অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের ক্রিকেট-চাম্পিয়ান হয়ে দাঁড়াবেন। এইটি আর একটি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত যা দেখিয়ে দিচ্ছে—সমান সুযোগ পেলে কিভাবে ভারতীয়রা অন্য সকলকে নিষ্প্রভ করে জ্বলে উঠতে পারে। আমরা আশা করি, রণজির অপূর্ব দৃষ্টান্তে আমাদের প্রদেশে (বোম্বাই প্রদেশে) শরীরচর্চা বৃদ্ধি পাবে। ......দুঃখের বিষয় প্রতিপত্তি ও সম্পদশালী হিন্দুরা শরীরচর্চার ব্যাপারটির পিছনে তাঁদের অর্থ ও সামর্থ্য নিয়োগ করছেন না। ....বোম্বাই হাই স্কুল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক প্রতি-যোগিতায় অতি নগণ্য সংখ্যক হিন্দু প্রতি-যোগীকে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এর থেকে লজ্জাজনক দৃশ্য আর কিছু নেই।... মন্দ স্বাস্থ্যের জন্যই এই দুর্গতি, একথা আমরা বিশ্বাস করি না। দোষের মূলে আছে হিন্দু অভিভাবকগণের বিরোধী মনোভাব—তাঁরাই এ ব্যাপারে দায়ী। যত শীঘ্র তাঁরা তাঁদের সন্তানদের সম্বন্ধে এই জাতীয় আত্ম-ঘাতী মনোভাব ত্যাগ করেন ততই মঙ্গল।"

গুজরাটি পত্রিকা বোম্বাই প্রদেশ সম্বন্ধে যে-কথা লিখেছিল, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে তা অধিকতর সত্য ছিল।

১৯১২ সালে দরবারী পোষাকে প্রিন্স রণজিৎ সিংজী

কিন্তু রণজির দ্বারা কি ভারতের শাসন সংস্কার হয়েছিল? তা কি সত্যই সম্ভব ছিল? সম্ভব ছিল না একথা ভারতবাসী বুঝতে ভুল করেছিল, ভুল করেনি ভারতবাসী ইংরেজরা। রণজির সাফল্য নিয়ে হৈ-চৈ করা হয়।

ইংলণ্ডের ইংরেজরা ভারত শাসন ব্যাপারে এই সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের উপরই নির্ভর করত। স্বদেশে উদারতা এবং বিদেশে নিষ্ঠুরতা—এই দুমুখো নীতি সুন্দরভাবে ইংরেজরা বজায় রেখে চলেছিল যার ফলে অত্যাচার করেও তারা প্রশংসা অর্জন করেছে সর্বসময়। রণজির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। যিনি নাকি 'ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত হয়ে পড়তে পারেন',—সেই রণজি ইংলণ্ডে স্বেচ্ছানির্বাসনে বছরের পর বছর কাটাতে বাধ্য হয়েছেন, —তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য জামনগরের সিংহাসন তাঁর হাতে তখনই তুলে দেওয়া হয়নি—দেয়নি রণজি-মুগ্ধ ইংরেজরাই।

আর একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই সর্বশেষে : হয়ত রণজির সাফল্য সংবাদ ভারতে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে আমাদের জাতীয় গৌরব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল—রণজি ভারতে জন্মেছিলেন, ভারত থেকেই অন্নবস্ত্র জোগাড় করেছেন, তাও সত্য—কিন্তু রণজি কোনোদিনই নিজের ক্রিকেট-গৌরব তাঁর মাতৃভূমিকে দান করতে রাজি হননি। ইংলণ্ড তাঁকে ক্রিকেটার তৈরী করেছে (অবশ্য ভারতের পয়সায়), একথা কৃতজ্ঞচিত্ত রণজির পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি জানিয়েছেন, তিনি ইংলণ্ডেরই ক্রিকেটার। অ্যান্টনি ডি মেলো যখন দুঃখের সঙ্গে এই কথা লিখেছিলেন, তখন চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল, কিন্তু ডি মেলো ঠিক কথাই বলেছিলেন।

জাপানী প্রথায় খেলা

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

এশীয় অঞ্চলে বিশ্ব ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম আয়োজন উপলক্ষে আজ টোকিওর দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। ওলিম্পিক সংগঠনে, অতিথি আপ্যায়নে, জাতীয় সমৃদ্ধির পরিচয় উপস্থাপনে জাপানের চেষ্টার অন্ত নেই।

একালের আসরে সেকালের 'কেন্‌ডো'

নতুন সূর্যের দেশ জাপান প্রগতিতে আস্থাবান। ।কালের **প্রচলিত** নানান খেলায় হাত পাকাতে এবং সেই সূত্রে এগিয়ে যাওয়া অন্য দেশগুলির সঙ্গে মান তালে পাল্লা দিতে জাপানের সাধনায় কামাই নেই। বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কল্যাণে বাকালের জাপান তার ক্রীড়া প্রতিনিধিদের উপযুক্ত রে তুলেছে। তার আশা, অষ্টাদশ ওলিম্পিক াসরে অনেকগুলি স্বর্ণপদক সংগ্রহ করা।

উন্নত দেশ জাপানকে যাঁরা চেনেন এবং ান্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার খবরাখবর যাঁরা াখেন তাঁরা বিশ্বাস করেন, জাপানের এ আশা রাশা নয়। জলক্রীড়া এবং বিশেষভাবে জিম-ন্যাস্টিকে জাপানের স্বর্ণ সঞ্চয় ওলিম্পিক আসরের ক অতি প্রত্যাশিত ঘটনা। কিন্তু সেকথা থাক।

নতুন যুগকে নিজেদের জীবনধারার সঙ্গে খাপ াইয়ে নেবার পথেও নতুন সূর্যের দেশ জাপান ন্তু তার পুরানো দিনকে অতীতের বিশিষ্ট াকে ভুলে থাকতে চায়নি। এবং নিজেকেও াপান ভুলতে পারে না। তাই অষ্টাদশ ওলিম্পিক ংগঠনের পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনার মাঝখানে জাপান দেশীদের সামনে তার নিজস্ব ঘরোয়া ক্রীড়ারীতির ছু নমুনা উপস্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলো ঘিরে এ পরি-কল্পনা গড়ে ওঠেনি। উঠেছে প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের ত্রে। যদিও খাঁটি জাপানী খেলা জুডো অষ্টাদশ লিম্পিক ক্রীড়াসূচীভুক্ত রয়েছে। জাপানী প্রথায় বাবাদের মতো জাপানী প্রথায় ক্রীড়ানুষ্ঠান ডোর বহির্বিশ্বেও কিছুটা চল রয়েছে। কিন্তু না অচল যেগুলি অথচ ঐতিহ্য স্মরণে জাপান যেগুলিকে এখনও অচ্ছুৎ করে দিতে পারেনি, এমন ক'টি খেলার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা জাপ সংগঠকেরা করেছেন।

অনেক প্রদর্শনীর আয়োজন। তারই মধ্যে **যেগুলি কৌলীন্যে নিছকই জাপানী** ঠিক সেই গুলির **কথাই আগে বলা যাক্।** এই খেলাগুলির সঙ্গে অন্য মুলুক হয়তো অসম্পৃক্ত, কিন্তু খাস, জাপানের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নাড়ীর। এবং এই-গুলির উল্লেখে 'আমাদের খেলা' বলতে জাপানও গর্ব অনুভব করে।

জাপানের নিজস্ব ক্রীড়ানুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বর্ণাঢ্য হলো সুমো—অনেকটা আদ্যিকালের মল্ল-ক্রীড়ার মতো। সুমো কুস্তিগীরদের বেশবাসে, চাল-চলনে, আচারে-ব্যবহারে এবং অনুষ্ঠানটির পরিচালন পদ্ধতির আঙ্গিক বিন্যাসে সাবেককালের রীতি নীতি রক্ষার চেহারা আছে।

সুমো বীরদের আদ্যিকালের কটিবাস আঁটতে হয়, মাথায় ঝুঁটি বাঁধতে হয়, লড়াই সুরুর আগে পুরোহিতরা এসে মন্ত্র-স্তোত্র আউড়ে যান। সুমোর বিধানও একালেরও মতো আধুনিক নয়। কুস্তির নামে শুধু ঘুষোঘুষি ছাড়া আর সবকিছুই চলে সুমোতে। শেষ পর্যন্ত যে মল্লবীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে তুলে আঙিনার বাইরে ফেলে দিতে পারে তারই হয় জিত্।

জাপানে অনুষ্ঠানটির আদর-কদর কম নয়। অপেশাদারদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের চল আছে। আবার পেশাদারী সুমো আরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত। শোনা যায় যে, জাপানে সুমো মল্লবীররা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা এক অঞ্চলে বাস করে। নিজেদের মধ্যেই যাবতীয় সামাজিক আচার-ব্যবহার সীমাবদ্ধ রাখে।

পেশাদার সুমো মল্লবীরেরা রীতিমতো বিত্ত-বান। **যেমন দেহভার তেমনিই জনপ্রিয়তা তাঁদের।** বছরে গুটিকয়েক বড়সড় প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া ছাড়া একটি জাতীয় সুমো অনুষ্ঠানেও তাঁরা যোগ দেন। **সেই অনুষ্ঠানে শীর্ষস্থানীয় সুমো** বীরের জাত যাচাই হয়ে যায়। হাজার হাজার দর্শক জাতীয় সুমো প্রতিযোগিতা দেখতে আসে এবং টেলিভিশন প্রদর্শনীর কল্যাণে লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ানু-রাগী অনুষ্ঠানটির দিকে আকৃষ্ট হয়। এক হিসেবে বলা যায় যে, খাস জাপানে বেসবল ছাড়া সুমোর মতো জনপ্রিয় ক্রীড়ানুষ্ঠান আর একটিও নেই।

সুমোর মতো আর একটি সাবেকী ক্রীড়া হাল আমলের ছিমছাম ক্রীড়াকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর নাম কেন্‌ডো। কেন্‌ডোতে অংশ নেয় যারা তাদের হাতে থাকে বাঁশের তৈরী তলোয়ার। মাথায় শিরস্ত্রাণ, হাতে ও শরীরের এখানে ওখানে বর্ম আঁটা। দুজনে তলোয়ার ঘুরিয়ে যায়, পরস্পরের ওপর ঘা বসায়। শেষ পর্যন্ত পয়েন্টের হিসেবেই দু'পক্ষের হারজিতের ফয়সালা হয়।

এক সময় শাণিত তরবারি হাতে নিয়েই দুই যোদ্ধা পরস্পরের মুখোমুখি হোতো। পাশ্চাত্য সভ্যতার অভ্যুদয়ের পর ইস্পাতের জায়গা দখল করেছে বাঁশ এবং অনেকটা মুষ্টিযুদ্ধের ঢংয়ে কেন্‌ডোর পয়েন্ট অর্জনের ব্যবস্থা স্থির হয়েছে এবং সেই পথেই এক একটি প্রতিযোগিতার মেয়াদ নির্দিষ্ট হয়েছে।

তীর-ধনুকের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতা একালে অচল হয়ে যায়নি। অশ্বারোহণে প্রতিযোগিতাও জাপ জাতীয় জীবনে এখনও [illegible] পেয়ে রয়েছে। যুগ-যুগান্তের পথ পরিক্রমার পর অশ্বারোহণ কাকেগাসা ও লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতা ইবুসেম নামে এখনও প্রচলিত। অশ্বারোহণে লক্ষ্যভেদে অনুশীলন দ্বাদশ শতকে জাপানে [illegible] ছড়িয়ে পড়েছিল।

অশ্বারোহণ থেকেই পোলোর প্রচলন [illegible] পোলো শব্দটি পুরোনো আমলে জাপানে [illegible] পরিচিত ছিল না। সেকালের [illegible] ডাকু নামে অভিহিত করা হোতো, যদিও [illegible] হিসেবে একালের পোলো ও [illegible] তাদের মধ্যে ক্রীড়ারীতিগত [illegible] ছিল না।

কয়েক শতাব্দী আগে [illegible] এই পোলো বা ডাকু চীন মহাদেশ [illegible] এসে পৌঁছলে [illegible] খেলাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। [illegible] যাদুঘরে বিশাল ও [illegible] চিত্রচিত্র দেওয়ালে টাঙানো [illegible] একাংশে অশ্বচারক তরুণ পোলো [illegible] ছুটোছুটি করছে এবং অদূরেই [illegible] সেই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে। [illegible] তরুণী মনোরঞ্জনেই সেকালে [illegible] খেলায় মাততে হতো।

এই ডাকু, সুমো, কেন্‌ডো, কাকেগাসা, [illegible] ইত্যাদি ক্রীড়ানুষ্ঠানের রাজদরবারে এবং [illegible] কেন্দ্রেও এককালে ঠাঁই ছিল। শোনা যায় যে [illegible] যুগে জাতীয় উৎসব পালন উপলক্ষে পবিত্র [illegible] সভা প্রাঙ্গণেও এই সব খেলাধুলোর [illegible] বসতো।

এর কোনোটিই নব্য জাপানে লুপ্ত নয়। [illegible] আগেকার অনুপাতে বর্তমানে তেমন প্রচলিত [illegible] তবে সাবেক আমলের এইসব খেলাধুলো [illegible] জাপানের জাতীয় চেতনা যে একেবারে লুপ্ত [illegible] যায়নি তারই প্রমাণ অষ্টাদশ ওলিম্পিক [illegible] পুরানো ক্রীড়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

নিজেদের হাতে গড়া আকাশচুম্বী [illegible], মনোরম ক্রীড়াঙ্গন, সাবেকী বৌদ্ধ বিহার, [illegible] ফুলের সমারোহের মাঝখানে খেলাধুলোয় পুরানো ঐতিহ্যকে যথাযোগ্য আসন দিয়ে আধুনিক জাপান বিদেশীদের বোঝাতে চায় যে, তারা আত্মবিস্মৃত জাতি নয়।

জাপানী মতে, ফুটবলও সে দেশের এক অতি প্রাচীন ক্রীড়ানুষ্ঠান। কেমারি নামে অভিহিত এই অনুষ্ঠান সপ্তম শতকেও জাপানে প্রচলিত ছিল। জাপ সম্রাট গাবোতা নিজেই ফুটবল মাঠে নামতেন। তবে সেদিনের কেমারির সঙ্গে আধুনিক সরকারের নিয়মের তফাৎ আছে অনেক। খাস জাপানে কিয়োতো নামে এক প্রতিষ্ঠান এখনও সেই পুরোনো রীতি-নীতি মেনে কেমারিকে ঘিরে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে এবং তাই দেখতে লোকের ভীড়ও জমে।

পালোয়ানজী

আসলে 'অ্যামেরিকান ফ্রি স্টাইল' নামে আজ আর কোনো কুস্তি নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় 'ক্যাচ-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান' কুস্তি 'ফ্রি স্টাইল' নামে পরিবর্তিত হবার পরে জনসাধারণের মনে ধোঁকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, কিছু সংখ্যক অ্যামেরিকান পরিচালিত 'অল-ইন' কুস্তিই সাইনবোর্ড পাল্টিয়ে 'অ্যামেরিকান ফ্রী স্টাইল' হয়ে বসেছিল। কিন্তু 'অ্যামেরিকান' শব্দটি থাকায় এ কুস্তির মধ্য দিয়ে অ্যামেরিকার রাষ্ট্রগত পরিচয়টি প্রকট হতে থাকায় আবার সাইনবোর্ড পাল্টিয়ে 'ইন্টারন্যাশন্যাল ফ্রী স্টাইল'—এই নতুন নাম নিতে হয়েছে। কিন্তু নামে কি আসে যায়! একটা বাঁদরকে যতই নতুন নতুন বা সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিয়ে আসরে নামান হোক তাকে বাঁদর বলে চিনতে যেমন কারো এক মুহূর্তে দেরি হয় না, 'অল-ইন' কিংবা 'ইন্টারন্যাশন্যাল ফ্রী স্টাইল'কেও তেমনি 'অ্যামেরিকান ফ্রী স্টাইল'এর হুড়োহুড়বাজী বলে চিনতে ওয়াকিবহাল মহলের এক পলক দেরি হয় না, এবং যেহেতু কুস্তির নামে এই ধাপ্পাবাজি ব্যবসার জন্ম অ্যামেরিকায় এবং এ কুস্তি আজও অ্যামেরিকান চরিত্রের একটা বিশেষ পরিচয় বহন করে চলেছে, সেই হেতুই মনে হয়, এর 'অ্যামেরিকান ফ্রী স্টাইল' নামই যথাযোগ্য ও সমীচীন।

এখন যেমন বক্সিং সাধারণ লোকের মনে মাদকতা সৃষ্টি করতে সমর্থ, এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কুস্তির অবস্থাও ছিল সেই রকম। বড় বড় মুষ্টিক এবং বড় বড় ভারোত্তোলকেরাও তখন ফাঁক পেলেই কুস্তির আসরে নেমে পড়তেন। শুধু ফিট্‌জিমন্সের মতো মুষ্টিক এবং আর্থার সাক্সন, টমাস ইঞ্চ কিংবা উইলিয়াম ব্যাংকিয়ারের মতো ভারোত্তোলক বা শক্তিবীরেরাও তাই কুস্তির মহড়া না দিয়ে ছাড়েন নি। জবিস্কো, হ্যাকেনস্মিদ, ডেভিয়াজ প্রমুখেরা বড় দরের ভারোত্তোলক হয়েও শেষের দিকে কুস্তিকেই প্রধান পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আরো পরবর্তী সময়ে উয়েইন মান এবং জিম ম্যাকমিলান ফুটবল আর চার্লস রিগলই ভার তোলার ক্ষেত্র থেকে কুস্তিগীরের পেশা নিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য সেই এক—জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থোপার্জন! কুস্তিতে তখন যথেষ্টই অর্থ মিলত।

কিন্তু টাকা চাইলেই ত আর যেখানে সেখানে টাকা মিলে না। মিলতে পারে ধনবাদীর তীর্থস্থান

(শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায়)

আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালেই জাপানী ক্রীড়াজগতের চেহারায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। অ্যাথলেটিক, সাঁতার, টেনিস, জিমন্যাস্টিস, গলফ এবং মার্কিণ প্রভাবে বেসবল ইত্যাদি খেলাধূলোর পুরানো জমিগুলি দখল করে নিচ্ছে। পাশাপাশি এগিয়ে আসছে ক্রমশঃই ফুটবল, হকি ইত্যাদি।

বেসবলই হলো অধুনা জাপানের সবচেয়ে বড় খেলা। বেসবলকে ঘিরে বড়সড় প্রতিযোগিতার আসর বসে। বিদেশ থেকে দল আসে সেখানে। শুধুমাত্র বেসবলের জন্যেই টোকিও শহরে অন্যূন চারটি স্টেডিয়াম আছে। খেলার দিনে এই স্টেডিয়ামের একটি আসনও ফাঁকা পড়ে থাকে না। পেশাদারী বেসবলই জাপানের বৃহত্তম ক্রীড়ানুষ্ঠান।

পাশ্চাত্য খেলা গলফ নিয়েও সম্প্রতি যথেষ্ট মাতামাতি করছে জাপান। ১৯০৩ সালে বৃটিশ ক্রীড়াবিদ আর্থার গ্রুম জাপ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম গলফ খেলেন ও প্রথম জাপানী গলফ ক্লাব টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৪ সালে। কিন্তু বর্তমানে টোকিও শহরেই পঞ্চাশটি গলফ ক্লাব আছে এবং সমগ্র জাপানে গলফ খেলোয়াড়ের সংখ্যা আজ বিশ লক্ষের কম নয়। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পেশাদারও বটে।

গলফে সাম্প্রতিক উৎসাহের সূত্রে ১৯৫৭ সালে জাপানে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা কানাডা কাপ গলফের আয়োজন করা হয়েছিল এবং বর্তমানে বছর বছর এশীয় অঞ্চলের সেরা প্রতিযোগিতা ফার-ইস্ট গলফ সার্কিটের আসর ওই নতুন সূর্যের দেশেই পাতা হয়।

এসব ছাড়া জুডো তো আছেই। একেবারে জাপানের নিজস্ব ঘরোয়ানা। তবে জুডো তার আবেদনকে সর্বজনীন করে তোলার পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। গলফ, টেনিস ইত্যাদি পাশ্চাত্য খেলা যেমন আজ জাপানে জমিয়ে বসছে তেমনি জাপান থেকে রপ্তানী করা জুডোও ভিন দেশকে জাঁকিয়ে বসেছে। অধুনা ভিনদেশী তরুণ-তরুণীরাও জাপ ভূমিতে আসেন শুধু জুডোর উন্নত কলাকৌশল রপ্ত করতে। অবস্থা দেখে মনে হয়, সুমো বা কেন্‌ডোর জনপ্রিয়তা যাই হোক না কেন, জুডো কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলেও জমে উঠেই থাকতে পারবে।
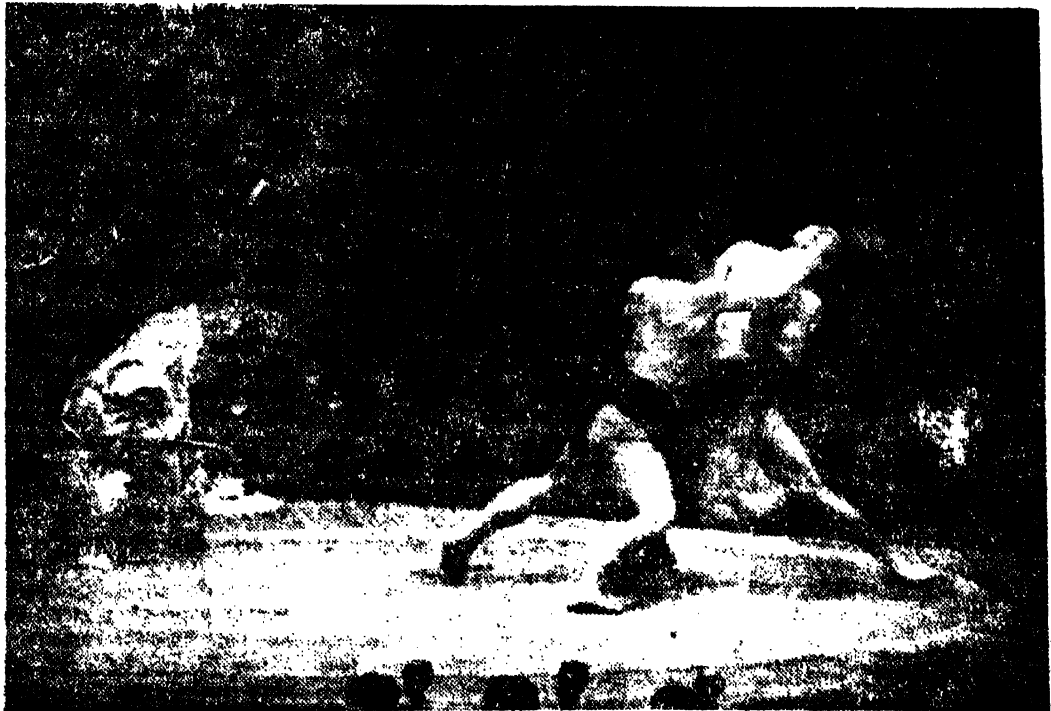
সুমো যুদ্ধে দুই জাপানী মল্লবীর, পাশেই বিচারক

কে বলে তুমি অবলে!

অজয় বসু

স্কটিশ তরুণী ডেল গ্রেলের কথা মনে পড়ে? সেই যে, সাতষট্টি জন পুরুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যিনি হেঁকে বলেছিলেন, আমিও ম্যারাথন রেসে দৌড়বো।

শুনুন কথা। ছাব্বিশ মাইল ৩৮৫ গজ দৌড়তে কতো জোয়ানই না হিমসিম খেয়ে যাবেন। উঁচু-নীচু, আঁকা বাঁকা, চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে নির্দিষ্ট সীমানায় পৌঁছতে কতো প্রাণান্তকর পরিশ্রমেরই না মূল্য ধরে দিতে হবে। কেউ মূর্ছা যাবেন। অবসাদে কতোজন যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর কোলে আশ্রয় নেবেন কে জানে।

শক্ত সমর্থ জোয়ানদের নিয়েই অনেক বিপদ। তার ওপর আবার এই মেয়েলি বায়না। সংগঠকেরা মিষ্টি কথায় অনেক বোঝালেন। কিন্তু ডেল গ্রেল নাছোড়বান্দা। ম্যারাথনে তিনি দৌড়বেনই। ভাবখানা এই, আপনারা মিছেই ভয় পাচ্ছেন। দেখুনই না, আর পাঁচজনের মতো ছাব্বিশ মাইল ৩৮৫ গজ পথটুকু উৎরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর কিনা?

অনুরোধ, উপরোধ, আবেদন নিবেদনে দুপক্ষ অনেক প্রহর কাটিয়ে দিলেন। তবু, ফয়সলা হোলো না। শেষ পর্যন্ত সংগঠকদেরই নরম হতে হোলো। সিদ্ধান্ত হলো, বেশ, শ্রীমতী গ্রেলও দৌড়বেন। তবে সাতষট্টিজন পুরুষের সঙ্গে একত্রে তিনি দৌড় সুরু করবেন না। তিনি আরম্ভ করবেন মিনিট চারেক আগে। শেষ করবেন, অবশ্য পারলে, যখন খুসী।

তাই হলো। ডেল গ্রেল নির্দিষ্ট সময়ে দৌড় সুরু করলেন। তারপর থামলেন তিন ঘণ্টা সাতাশ মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড একটানা ছোটার পর। ম্যারাথন পথের সীমানা পেরিয়ে। দীর্ঘ পথের পরিশ্রম ডেল গ্রেলকে কাবু করতে পারেনি। যে অ্যামবুলেন্স গাড়ীটি তাঁকে সারা পথ অনুসরণ করছিল তার প্রতীক্ষাও হার মানলো।

সবাই বললো, সাবাস গ্রেল! ডেল গ্রেল ম্যারাথন দৌড়ে মহিলা মহলে নতুন বিশ্বরেকর্ড করলেন এক মার্কিণ তরুণীর তিন ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিটের রেকর্ডটিকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে। কান্ড দেখে চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। তবে যে বলে নারী অবলা!

অবলা? অপবাদ ঘোচাতে গত আগষ্টের এক দিনে নিউজিল্যান্ডের এক সুগৃহিণী আরও কম সময়ে ম্যারাথন পথ শেষ করে দিলেন। সুগৃহিণীর নাম শ্রীমতী মিলড্রেড স্যাম্পসন। বয়স একত্রিশ। অকল্যান্ডের ম্যারাথন পথ ৩ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে অতিক্রম করার ঘন্টা কয়েক পরই শ্রীমতী স্যাম্পসন রেঁধে বেড়ে, ঘর নিকিয়ে, গৃহস্থালীর নিত্যকর্ম সুসম্পন্ন করেছেন।

এর পরও যদি কেউ বলে যে নারী অবলা তাহলে বুঝতে হবে যে অভিযোগটি নিশ্চয়ই একচোখো। আর পুরুষ ছাড়া এমন একপেশে মন আর কারই বা থাকতে পারে!

মেয়েরা কাদামাটিতে গড়া। পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ ওদের ধাতে সয় না। দ্রুত লয়ে ছুটতে পারে না। উঁচুতে লাফাতে পারে না। জোরের খেলার সঙ্গে তাদের চিরন্তন আড়াআড়ি। একদিন এসব কথায় কান পাতা যেতো, যখন মেয়েরা অ্যাথলেটিক চর্চায় কোমর বেঁধে এগিয়ে আসতে চায়নি। কিন্তু আজ?

আজ পরিস্থিতি বদলেছে। আজ তারা ছেলেদের পাশাপাশি সমান তালে ছুটেছে, লাফাচ্ছে। এমন কি শ্রমসহিষ্ণু ম্যারাথন পথও দৌড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। যে হারে মেয়েরা এগিয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। ছেলেরা অনুশীলনে ও প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার অফুরন্ত সুযোগ পেয়েছে। মেয়েরা কম। আর সেই সীমিত সুযোগে মেয়েরা যতোটা এগোতে পেরেছে তার আনুপাতিক হার অবশ্যই বেশী।

১৮৯৬ সালে আধুনিককালে যখন ওলিম্পিক ক্রীড়ার পুনঃ প্রচলন ঘটলো তখন সে আঙিনায় মেয়েদের ঠাঁই মেলেনি। পুরুষদের ব্যবস্থাপনায় মেয়েরা অচ্ছুৎ যেন। আধুনিক ওলিম্পিকে মেয়েদের প্রথম ডাক পড়লো ১৯১২ সালে সাঁতার কাটতে। আর অ্যাথলেটিকে অংশ নিতে পনেরো-ষোল বছর পর, আমস্টারদামে।

অর্থাৎ ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের পরিপ্রেক্ষিতে ছেলেরা মেয়েদের ষোল বছর আগে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক জলক্রীড়ায় এবং প্রায় বত্রিশ বছর আগে অ্যাথলেটিক চর্চার সুযোগ পেয়েছিল। আজ যে ছেলেরা সাঁতার বা অ্যাথলেটিকে মেয়েদের চেয়ে এগিয়ে আছে তার মূলে কি এই বাড়তি সুযোগের আশীর্বাদ নেই? ওই ১৮৯৬ সালেই যদি মেয়েরা ওলিম্পিক আসরে আসতে পারতো তাহলে এতো দিনে যে তারা ছেলেদের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারতো না একথা হলপ করে দিয়ে বলার মতো যুক্তিনির্ভর মূলধন কোথায়?

সত্যিই সে মূলধন আজ আর হাতে নেই। মেয়ে বলে মুখ ফিরিয়ে রাখা অনুচিত। বরং বক্তব্যকে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল যে মেয়েরা অবলা নয়। তারা কুস্তি না লড়তে পারুক, ঘুঁষি না চালাতে পারুক, অ্যাথলেটিক, সাঁতার ও ওলিম্পিক স্বীকৃত আরও নানান খেলার আসরে বেমানান নয়। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয়েরা কোনো কোনো দেশের পুরোবর্তী ক্রীড়াবিদদেরও হারিয়ে দেবার সামর্থ্য ধরেন।

আধুনিক ওলিম্পিকের সর্বপ্রথম অনুষ্ঠানে যাঁরা সোনার মেডেল গলায় ঝুলিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে এক আসরে যদি বর্তমান কালের মহিলা ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ানেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাততেন তাহলে ফলাফলটা কি দাঁড়াতো তা ভাবতেও মজা লাগে।

১৮৯৬ সালে এথেন্সে আমেরিকার টি ই বার্ক শত মিটার দৌড়ে শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন ১১-৬ সেকেন্ডে। তিনি যদি ১৯৬০ সালে রোমে মহিলাদের শত মিটার ফাইনালে অংশ নিতেন তাহলে নিশ্চয়ই ষষ্ঠ স্থানও পেতেন না। কারণ ষাট সালে রোমে এই পথটুকু দৌড়তে নিগ্রো তরুণী উইলমা রুডলফ আরও এক সেকেন্ড কম সময় নিয়েছিলেন এবং ষষ্ঠ স্থানাধিকারিণী জে স্মার্টের সময় লেগেছিল ১১-৬ সেকেন্ড।

চারশ মিটার দৌড় সম্পর্কেও ওই একই কথা বলা যায়। এথেন্সে বার্ক ৫৪½ সেকেন্ডে দৌড় চারশ মিটার ফাইনাল জয় করেছিলেন। আর ১৯৫৯ সালে রুশ তরুণী মারিয়া ইৎকিনা ৫১-৬ সেকেন্ডে চারশ মিটার পথ উত্‌রে গিয়েছেন।

তবু তো চারশ মিটার দৌড় ঘিরে একালের মহিলা অ্যাথলিটরা অনুশীলনে আত্মস্থ হবার তেমন তাগিদ অনুভব করতে পারেন নি। কারণ বিভগটি ওলিম্পিকে মহিলা ক্রীড়াসূচীভুক্ত নয়, যদিও ওলি-

দিনকে মহিলাদের চারশ মিটার দৌড়ের ব্যবস্থা করার জন্য দাবী পেশ করা হয়েছে। কিন্তু থাক্‌ সে স্বতন্ত্র কথা।

আটশ মিটার দৌড়েও মহিলারা এগিয়ে যাওয়ার তেমন সুযোগ পান নি। ১৯২৮ সালে আমস্টারডামে মহিলা বিভাগে এই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকলেও পরে তা বর্জন করা হয়। তবুও একালের মহিলা অ্যাথলিটরা আটশ মিটারে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন। কোরিয়ার সিন কিম দান সম্প্রতি দু মিনিট ১-২ সেকেন্ডে এই পথ অতিক্রম করেছেন। নজীরটি কিন্তু ১৮৯৬ সালের ওলিম্পিক বিজয়ী অস্ট্রেলীয় ফ্ল্যাকের দৃষ্টান্তের চেয়ে উন্নততর। কারণ ই এইচ ফ্ল্যাক সেবার সময় নিয়েছিলেন দু মিনিট এগার সেকেন্ড।

ওলিম্পিকে দূর পাল্লার দৌড়ে অংশ নেবার সুযোগ মহিলাদের ক্ষেত্রে সব সময়ের জন্যেই কৃপণ হয়ে আছে। জানি না, ডেল গ্রেল বা শ্রীমতী স্যাম্পসনের সাফল্যের পর মহিলাদের দাবী সুবিবেচনা করা হবে কিনা। তবে সুবিবেচনার দাবীর সমর্থনে আরও একটি দৃষ্টান্ত রাখা যেতে পারে। এই দৃষ্টান্ত চুয়াম বছরের বিজ্ঞানী ডাঃ বারবারা মুরের, যিনি হাঁটাপথে বার্মিংহাম থেকে লন্ডনে (মোট ১১০ মাইল) পৌঁছে সর্বকালের সবদেশের পুরুষ ভ্রমণবিদদের কীর্তি ম্লান করে দিয়েছেন।

মহিলাদের জাম্পিং আরও হাল আমলের ঘটনা। দৌড়ে তাঁদের আগে হাতেখড়ি হয়। পরে লাফানোতে। তবু অপেক্ষাকৃত কম দিনের চেষ্টায় রুমানীয় তরুণী ইওলান্ডা বালাসের ১৯৬১ সালে ৬ ফুট ৩-২ ইঞ্চি উর্ধ্বে ওঠা সাধ্যাতীত হয় নি। অথচ এতোটা উঁচুতে ওঠা ১৮৯৬ সালের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন ই এইচ ক্লার্ক বা ১৯০৪ সালের চ্যাম্পিয়ন মার্কিণ ক্রীড়াবিদ এস এস জোন্সের অসাধ্য ছিল।

ওই ক্লার্ক এথেন্সের ব্রডজাম্পও জয় করেছিলেন ২০ ফুট ৯¾ ইঞ্চি অতিক্রম করে। কোনো মহিলা ওলিম্পিক ব্রডজাম্পে ক্লার্কের নজীর ম্লান করতে না পারলেও ১৯৬০ সালে এবং রোম ওলিম্পিকোত্তর কালে ক্লার্কের কৃতিত্বকে বারেবারে হার মানতে হয়েছে। ষাট সালেই জার্মাণ তরুণী এইচ ক্রস ও রাশিয়ার ভেরা ক্রেপকিনা ২০ ফুট ১০¾ ইঞ্চিতে পৌঁছেছেন। এবং টোকিও ওলিম্পিকের আগে বৃটেনের মেরী রিগন্যাল ও রাশিয়ার তাতিয়ানা সেজকানোভা হামেশাই বাইশ ফুটের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছেন।

এতো গেল স্থলের কাহিনী। জলক্রীড়ায় মহিলাদের অগ্রগতির ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ। অবশ্য জলক্রীড়ায় যোগ দেবার সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন আগেই। আগেই জানিয়েছি যে, সঠিক হিসেবে মহিলারা সন্তরণ প্রতিযোগিতার সূত্রেই সর্বপ্রথম আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়াকেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন। সাল ১৯১২। ক্রীড়া কেন্দ্র স্টকহোম।

ওলিম্পিক সাঁতারে সর্বপ্রথম হাতপাত্তি দেবার সুযোগ পেয়েই অস্ট্রেলীয় তরুণী ফ্যানি ডুর‍্যাক ১ মিনিট ২২-২ সেকেন্ডে শত মিটার ফ্রি স্টাইল পথ উত্তরণ করেছিলেন। ঠিক যে সময়ে আধুনিক ওলিম্পিক ক্রীড়ার প্রথম চ্যাম্পিয়ন সাঁতারু হাঙ্গেরীর আলফ্রেড হাজস এথেন্সের শত মিটার ফ্রি স্টাইলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীর ছুঁয়েছিলেন।

ঘড়ির কাঁটা দুটিকে উলটো পথে চালিয়ে দেওয়ার মতো অদ্ভুত যদি সময়ের হিসেবে তালগোল পাকিয়ে কোনোরকমে একটিবারের জন্যে নব্যকালের তরুণীদের সঙ্গে ১৮৯৬ সালের ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সাঁতারুদের একই পুলে নামিয়ে দেওয়া যেতো তাহলে সেকালের চ্যাম্পিয়নেরা বোধহয় লজ্জায় পুলের জলেই ডুবতে চাইতেন।

একালের তরুণী ডন ফেজার শত মিটার ফ্রি স্টাইল উত্তরণে এক মিনিটও সময় নেন না। শীর্ষস্থানীয় আর যাঁরা আছেন তাঁরাও বাষট্টি-তেষট্টি সেকেন্ডের বেশী নয়। পুরুষদের মধ্যে ওলিম্পিকে এক মিনিটের কমে শত মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতার দিয়েছিলেন সর্বপ্রথম আমেরিকার জনি ওয়াইজমূলার, ১৯২৪সালে।

ছায়া-চিত্র জগতের সুবিখ্যাত 'টারজন' এই ওয়াইজমূলারের পরিচিতি সর্বকালের অন্যতম সেরা সাঁতারু হিসেবে। ১৯২৪ সালে শত মিটার ও চারশ মিটার, ১৯২৮ সালে শত মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে তিনি শীর্ষস্থান পেয়েছিলেন। তাছাড়া দু-দুবারের রিলে সাঁতারের স্বর্ণপদকও তাঁর সংগ্রহশালায় জমা রয়েছে। দিক্‌পাল সাঁতারু তিনি সন্দেহ নেই।

কিন্তু এ হেন ওয়াইজমূলারও যদি ১৯৬০ সালে রোমের ওলিম্পিক পুলের মহিলা মহলে পাড়ি দেবার চেষ্টা করতেন তাহলে শত মিটারে জিতলেও চারশ মিটার ফ্রিস্টাইলে তাঁর অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যেতো না। চারশ মিটারে ওয়াইজমূলারের রেকর্ড ছিল ৫ মিনিটে ০৪-২ সেকেন্ড। আর রোমে কমপক্ষে আটজন তরুণী তারও কমে চারশ মিটার ফ্রিস্টাইল পথ উত্তরে গিয়েছিলেন। তাঁদের পুরোবর্তিনী মার্কিণ তরুণী ক্রিস ভন সালজা নির্দিষ্ট পথ শেষ করেছিলেন মাত্র চার মিনিট ৫০·৬ সেকেন্ডে।

বুক সাঁতার, চিৎ সাঁতার, রিলে, মায় অপেক্ষাকৃত পরিশ্রমসাপেক্ষ বাটারফ্লাই সাঁতার সম্পর্কেও পাশাপাশি এমন অনেক দৃষ্টান্ত রাখা যেতে পারে। কিন্তু তার দরকারই বা কি? এতো কথার পরও যদি মহিলাদের অগ্রগতির প্রমাণাদি সম্পর্কে কেউ নিঃসন্দেহ হতে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে যে তিনি ভেঙে পড়লেও মচকাতে চান না। এবং নিঃসন্দেহে তিনি নিছকই অবুঝ পুরুষ!

সত্যিই, সার্বিক খেলাধুলায় মহিলাদের অধিগত দক্ষতা ও অগ্রগতির ইতিহাস বিস্ময়কর। গণিতের সরল সূত্রের সাহায্য নিলেই বোঝা যাবে যে আগের ষোল বা বত্রিশ বছরের সুযোগ থেকে মহিলারা যদি বঞ্চিত না হতেন তাহলে এতোদিন নিশ্চয়ই অ্যাথলেটিক ও সাঁতারে একালের তরুণীরা তরুণদেরই নাগাল ছুঁয়ে ফেলতেন। তাই কি ক্ষেত্রবিশেষে দুপক্ষই হয়তো একেবারে পাশাপাশিই দাঁড়িয়ে থাকতেন।

নব্যকালের তরুণীরা দলে দলে দুর্নিবার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করছেন। পাহাড়ে চড়ছেন। টেবল টেনিসে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। ম্যারাথন দৌড়েও সেই পথ পরিক্রমার সাধ জাগছে। মার্গারেট স্মিথ, মারিয়া বুয়েনো পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে একই কোর্টে টেনিস অনুশীলন করে নিজেদের খেলার ধার ও জোর বাড়াচ্ছেন।

তাঁরা ক্রিকেট খেলছেন। ক্রিকেটে প্রশিক্ষকের বৃত্তিগ্রহণ করছেন। মায় মুখে বাঁশী, হাতে স্টপ-ওয়াচ নিয়ে ফুটবল মাঠে রেফারীর দায়িত্বও পালন করছেন। কিছুই যেন বাকী রাখতে চান না! পুরানো পৃথিবী এগিয়ে চলেছে, সন্দেহ নেই।

এখন আর নারী অবলা নয়। সত্যিই নয়।

কুস্তির নামে ধাপ্পা

(২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে। তাই, অন্য সমস্ত দেশের পালোয়ানকেই ছুটতে হতো অ্যামেরিকায়; নতুবা মল্ল হিসাবে যথার্থ পরিচিতি এবং টাকা কোনোটাই আশানুরূপ মিলত না। কিন্তু কুস্তিবিদ্যা এমন শক্ত বিদ্যা যে দুই-এক বছরের চেষ্টায় তার কিছুই শিক্ষা হয় না। কেবল দৈহিক শক্তি, সহিষ্ণুতা ও দম থাকলেই হয় না, সেই সংগে ক্ষিপ্রতা, আংগিক কলাকৌশল এবং তীক্ষ্ম মননশীলতা থাকলে তবে কুস্তিগীর হওয়া যায়। কুস্তিতে চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়া আরো অনেক পরের কথা। বছরের পর বছর নিবিষ্ট এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন ছাড়া সে বস্তু বড় একটা মিলে না। সেইজন্যই সাক্সন বা রিগলটের মতো 'বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন' ভারোত্তোলকরাও কুস্তির দ্বিতীয় সারিতেও স্থান পান নি। কিন্তু তাই বলে চতুর ও ধূর্ত লোকেরা ত বসে থাকতে পারে না;—তারা ফন্দী আঁটতে লাগল।

কিছুদিনের মধ্যেই একদল লোকের মাথায় প্ল্যান এসেও গেল—খুব চমকপ্রদ কায়দায় কুস্তির ডেমোন্‌স্ট্রেশন দিতে হবে। সেটা মামুলি কুস্তি হলেও চলবে না, দর্শকরা যাতে এক সংগে ক্যাচ-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান ও গ্রীকো-রোমান কুস্তির কিছু কিছু প্যাঁচ (Holds) গাঁট (locks) এবং আছাড় (throws) ছাড়াও যুযুৎসু এবং মুষ্টি-যুদ্ধের কিছু কিছু ঢংও দেখার সুযোগ পান এমন বিষয় হওয়া চাই। এমন কি চমক বাড়ানোর জন্য এসব বিদ্যার বাইরেও কিছু কিছু থাকা দরকার। যেমন—লাথি, চড়, কিল, চুলটানা ইত্যাদি। কিন্তু সবই হবে শো্যা, পর্যায়ক্রমে হার-জিতও হবে শো্যা, এবং সেজন্য প্রত্যেক খেলোয়াড়ই উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে টাকা পাবে।

কিন্তু এই নতুন কায়দায় কুস্তি বা ডেমোন-স্ট্রেশনের নাম হবে কি? কুস্তি? উঁহু, কুস্তিতে ত ঘুঁসি লাথি থাকে না! তবে কি বক্সিং? না, তাও নয়। আচ্ছা, তবে ফ্রী ফাইট হলে কেমন হয়? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে? 'ফাইট' আর 'ডেমোনস্ট্রেশন' ত এক বস্তু নয়। তা হলে?

আচ্ছা, এই নতুন খেলায় সব রকমের কায়দাই যখন ঢুকান হল, তখন একে 'অল অ্যালাউড' স্টাইল বলতে বাধা কি? না-না, কোনো বাধা নেই; তবে কিনা কথাটার মধ্যে ইংরেজির গন্ধ থাকলে চলবে না, বিশুদ্ধ মার্কিণ টার্ম 'অল-ইন' বরং চলতে পারে।

কিন্তু 'অল-ইন্' স্টাইল নাম দিয়ে জন কয়েককে হুল্লোড়বাজিতে নামিয়ে দিলেই বা দর্শকরা আসবেন কেন? মোটা টাকার অংকে নাম-জাদা লোকদের ভেড়াতে হবে, তবে ত লোকে পয়সা দিয়ে টিকেট কিনবে। পরামর্শ মন্দ ছিল না। আধ ঘণ্টার ডেমোনস্ট্রেশনে পকেট ভর্তি হলে কে না রাজি হয়? তাই অনেক বড় বড় মল্ল ও মুষ্টিক এতে মাথা নুইয়েছিলেন।

১৯৩০ অব্দে মার্কিণ মল্লযুদ্ধকে এইভাবে অল-ইন' স্টাইল আত্মপ্রকাশ করল। এটি তখন হুড়ো-হুড়ি মারামারি নয়, তার অভিনয় মাত্র। দর্শকরা দেখে তাজ্জব বনে গেলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন হলে চলল এরূ অনুষ্ঠান। অ্যামেরিকানদের পয়সার অভাব নেই, একঘেয়ে কুস্তি বা বক্সিংয়ের বদলে এই অভিনব 'অল-ইন' দেখে তারাও খুসি।

প্রথম দিকে ১৯৩২ অব্দে ইতালির মুষ্টিক প্রিমো কার্ণেরাকে দিয়ে অল-ইন কুস্তিতে [illegible] বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানর অর্থ ছিল অল-ইন কুস্তিকে 'স্টান্ট' সৃষ্টি করা। অল-ইন কুস্তির উদ্যোক্তাদের সে চাতুর্য সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যেমন ১৯৩৬ অব্দে রোমানিয়ার জর্জ ইওনেস্কোর গামার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জের ব্যাপারটাও অনেকের বোধগম্য হয় নি। সে যাই হোক, অল্-ইন্ কুস্তির পরবর্তী চাতুর্য-গুলি কি, এবার সেগুলি বলা দরকার।

প্রথমতঃ, অল্-ইন্ কুস্তির নাম বদল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ক্যাচ-অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান কুস্তির নাম 'ফ্রী স্টাইল' হবার সঙ্গে সংগে অল-ইন্‌য়েরও সাইনবোর্ড পাল্টে হল অ্যামেরিকান ফ্রী স্টাইল'। উদ্দেশ্য শুধু সাধারণ লোকের মনে ফ্রী স্টাইলের সংগে অল্-ইন'য়ের একটা বিভ্রান্তি (Confusion) সৃষ্টি করা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, তাতেও সাধারণ লোক বিভ্রান্ত হয় নি; 'অ্যামেরিকান' শব্দটাই সাধারণ লোকের মনের ধোঁকা কাটিয়ে দিচ্ছে। তাই, বছর দশেকের মধ্যেই আবার উদ্যোক্তাদের সাইনবোর্ড পাল্টাতে হল। এবার 'ফ্রী স্টাইল' কুস্তি আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে 'অ্যামেরিকান ফ্রী স্টাইল'এর 'অ্যামেরিকান' শব্দের পরিবর্তে 'ইণ্টারন্যাশনাল' শব্দ ব্যবহৃত হতে লাগল! ব্যবস্থাটি মন্দ নয়।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থ দিয়ে অর্থলিপ্সু কিছু নামজাদা লোককে ক্রয় করা। এই শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে কম নেই; তাই অল্-ইন'য়ের উদ্যোক্তারা এবিষয়ে বহুলাংশে কৃতকার্য হয়েছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নির্বোধরা জানত না, সর্ববিষয়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বান গোবরবাবুর মাথা কিছুতেই কেনা যায় না। তাই, শুধু রিংয়ের পাশে বসে থাকার বিনিময়ে তাঁকে দু'হাজার টাকা দিতে চেয়েও এদের অপমানিত হয়ে ফিরতে হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ, যাত্রা-থিয়েটারের মতোই এক-একজন খেলোয়াড়কে এক-একটা নির্দিষ্ট দিনে চুক্তিমত জয় বা পরাজয় মেনে নিতে হবে। এই নিয়মে খেলোয়াড়দের আর্থিক লোকসান নেই; বরং সবলতর খেলোয়াড়কে পরাজয় স্বীকারের বাবদ বেশি টাকা দেওয়া হয়।

চতুর্থতঃ, খেলোয়াড়দের নামের বাহার। প্রায় প্রত্যেক দেশেই বহুকাল থেকে বলী ও মল্লরা পছন্দসই এক-একটা নাম নিয়ে আসছেন বটে, তবে যাঁরা এ-ধরণের নাম নেন, তাঁরা কেউ বাজে লোক ছিলেন না। অর্থাৎ বাজে লোক সাধারণতঃ এরূপ নাম গ্রহণ করত না। কিন্তু অল-ইন্ কুস্তির সাংগাতদের সে সবের বালাই নেই। তাই, ঘরকুণো কুকুরের 'বাঘা' নামের মতো এ'রা এক-একজন 'টাইগার', 'উলফ', 'বিয়ার', 'এলিফ্যাণ্ট' থেকে সুরু করে 'বোলতা', 'বিছা' নাম নিতেও দ্বিধা-করেন না। আত্মগোপন করাও এসব নামের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইংল্যাণ্ডের মিচেল গিলের পরিচয় আজ আর কারো অজানা নেই; কেননা, ২৫।২৬ বছর আগে তিনি প্রায় প্রত্যেকটা কুস্তিতে হার মেনে-ছিলেন। কিন্তু আজ যখন 'রেড্ স্করপিয়ন'য়ের নাম ঘোষণা করা হয়, তখন খুব কম ব্যক্তিই বুঝতে পারেন, এই লোকটাই সেই মিচেল্ গিল্!

পঞ্চমতঃ, এ কুস্তির 'মাস্কিং প্ল্যান'। উদ্যোক্তারা এক্ষেত্রে একটি লোককে মুখোস পরিয়ে আসরে ছাড়েন এবং ঘোষণা করেন, তাকে কেউ পরাজিত না করা-পর্যন্ত তার মুখোস খোলা হবে না। লোকটির আসল নাম এক্ষেত্রে গোপন করে একটা ছদ্মনাম চালান হয়। দর্শকদের ধারণা হয়, এই লোকটা নিশ্চয় অসাধারণ কিছু। কিন্তু তাঁরা জানে না, প্রত্যহ-লোকের মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করার জন্যই তাকে পরাজিত করা হয় না।

ষষ্ঠতঃ, 'টাগ্ ফাইট'। টাগ্ ফাইট মানে জোড় লড়াই, প্রতি দলে দুজন করে একসংগে চারজনের লড়াই। এসব ক্ষেত্রে কখনো কখনো একে বিরুদ্ধে দুজনও লড়ে। কিন্তু একসঙ্গে স্টেজের ওপর চারটে লোকের হুড়োহুড়ি দাপাদাপিতে প্রতিযোগিতার ঢংটা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হলে, সস্তা মজা এবং হাল্কা ভাঁড়ামি যথেষ্টই হয়। অবশ্যই, এসব কুস্তির দর্শকরা সাধারণতঃ হাল্কা মন এবং হাল্কা চরিত্রেরই হয়ে থাকেন; সস্তা ভাঁড়ামি ছাড়া যথার্থ কুস্তি তাঁরা হয়ত পছন্দ করেন না।

সপ্তমতঃ, 'লেডি রেস্টলার'। যেখানে ডেমোনস্ট্রেশন দিয়ে দর্শকদের অর্থ লুণ্ঠন মূল লক্ষ্য, সেখানে উদ্যোক্তাদের নতুন চমক উপস্থিত না করলেই নয়। নাম ভাঁড়িয়ে, গণেশ উল্টিয়ে সাইনবোর্ড পাল্টিয়ে, মুখোস পরিয়েও যখ মানুষের মনকে যথেষ্ট মাত্রায় আকর্ষণ করা যা না, তখন স্বভাবতঃই মেয়েদের খাড়া করার প্রয়ো জনীয়তা অল্-ইন্ কুস্তির উদ্যোক্তারা বো করেছেন। অবশ্যই, মার্কিণ মুলুকে এ অস্ট্রেলিয়ায় বহু পূর্বেই মেয়েদের আসরে নাম হয়েছিল; এমনকি, ১৯৪৮ অব্দে কলকাতা ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতেও 'লেডি পালোয়া নামে কিছু সংখ্যক মেয়েদের নামান হয়েছিল।

এবার এ কুস্তির ম্যাজিকের কথা বলেই [illegible] করছি। এ খেলার কতকগুলি মামুলি দৃশ্য সক দর্শকেরই নজরে আসে; যেমন, কখনো কখ খেলোয়াড়দের দড়ির ওপর পড়া, কখনো বা একজনের একজনকে শূন্যে তুলে রিংয়ের বাই নিক্ষেপ, জাপটাজাপটি, খেলার সময় খেলোয়াড়ে ছাড়িয়ে দেবার ভাণ করে রেফারীর [illegible] দড়িতে ধাক্কা খাওয়া, রেফারীকে খেলোয়াড়ের আ [illegible] গণ এবং রিংয়ের বাইরে নিক্ষেপ, হুংকার, চীৎকা বা খেলোয়াড়দের বুকে পিঠে বা পেটে চোট লা এবং সেই চোটে কিছু সময়ের জন্য [illegible] থাকা, চোটের জায়গায় ঘন ঘন বা মাঝে মাঝে হা বুলোন, কখনো বা অন্যকে দিয়ে [illegible] সময়ে সময়ে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা ইত্যাদি। কুস্তি বিষয়ে অনভিজ্ঞ দর্শকরা প্রথম প্রথম এ [illegible] বিস্মিত ও ভীত হন বটে, কিন্তু [illegible] করেই বুঝে ফেলতে পারেন, সমস্ত দৃশ্যই সাজান।

একজন খেলোয়াড় যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিংয়ের বাইরে ছুঁড়ে দেয়, তখন কোথায় [illegible] হবে, উভয়েরই জানা থাকে। একজন যখন অ একজনকে কোণঠাসা করে পুরোবাহু দিয়ে ত বুকে পর পর আঘাত করতে থাকে, তখন উভয় কণ্ঠ থেকেই কেমন ঘোং ঘোং শব্দ হয়। [illegible] আবার এ ঘটনার উল্টো অভিনয়ও হয়। [illegible] পিঠে পেটে বা কোমরে চোটের ব্যাপারটা [illegible] বস্তু নয় বলেই কোনো কোনো চতুর দর্শক ধ ফেললেও অন্যরা পারেন না। কিন্তু মুখের ম লাল রংয়ের ক্যাপসুল রেখে কোনো [illegible] বুকে চোট পাওয়ার দৃশ্যে ক্যাপসুল [illegible] বমনের অভিনয় করতে পারে, এমন কথা সহ তেমন চতুর দর্শকের পক্ষেও অনুমান করা [illegible] অথচ এইসব ছেলেমানুষী অভিনয় [illegible] দেখিয়ে অল্-ইন্ কুস্তির উদ্যোক্তারা [illegible] বছর লক্ষ লক্ষ টাকা পিটছেন! কেবল তাই [illegible] এ কাস্তর প্রপাগাণ্ডার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বা সিনেমার ছবি পর্যন্ত তোলা হচ্ছে এবং সেসব ছ দেখার জন্য শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত [illegible] ভিড়ও কম হয় না। সেক্ষেত্রে দর্শকদের যদি রূপকথার বই চলতে পারলে এ বই চালাতে দে কি?

কৃতির আহ্বান

দেব দত্ত

সমুদ্রের আহ্বান

রণজিৎ গুপ্ত

কলঙ্কিনী রাই

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

হাওড়া জেলার একখানি গ্রাম। গ্রামের নাম সোনাতলী।

সোনাতলী গ্রামে মুকুজ্যেদের আর ঘোষালদের বাড়ী পাশা-পাশি, একেবারে গায়ে গায়ে। দু'বাড়ীর দুই খিড়কীর অদূরেই পূবদিক থেকে একটা টানা নালা বরাবর পশ্চিম দিকে এগিয়ে এসে কাছের একটা পুকুরে গিয়ে মিশেচে।

সেদিন ধারা-শ্রাবণের এক মধ্যাহ্ন। গত কয়েকদিনের অবিচ্ছিন্ন বর্ষণে শ্রান্ত হোয়ে, আকাশ আজ সকাল থেকে যেন বিশ্রাম নিতে বাধ্য হোয়েচে। আকাশের এখানে-ওখানে একটু আধটু মেঘ আছে বটে, কিন্তু সেই-সব ছিন্ন মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে চক-চকে রোদ্দুরও গাছ-পালা ভেদ কোরে পৃথিবীর ওপর ঝিলিক মারচে। তাতে জায়গায়-জায়গায় গাছের কিছু-কিছু পাতা, জলে-ভেজা রূপোর পাতের মত চিক্-চিক্ কোরে উঠচে। সেই ভিজে রোদ্দুরে, পুকুরধারের ঘাস-বনের ওপর রং-বেরংয়ের ফড়িং আর প্রজাপতি ঘুরে-ঘুরে উড়ে বেড়াচ্চে। নালাটা দিয়ে ঝির-ঝির কোরে একটানা জলস্রোত বয়ে এসে পুকুরের দিকে নেমে চলেচে।

ঘোষালদের খিড়কীতে ছোট একটা গরু বাঁধবার চালা ছিল; এখন গরু নেই, কিন্তু চালাটা আছে। সেইখানে বোসে একটি তের-চোদ্দ বছরের ছেলে আর একটি আট-ন' বছরের মেয়ে খাতা-পেন্সিল হাতে নিয়ে, গভীর মনোযোগের সঙ্গে লেখা-পড়ায় ব্যস্ত ছিল; অর্থাৎ হাতী, ঘোড়া, গরু, বেড়াল, ফুল প্রভৃতির ছবি আঁকছিলো।

"ও কি রে মালা! ওই বুঝি বেড়াল হোল? ওর গোঁফ কোথায়?"

"বাঃ রে! মিনি-বেড়াল যে!"

"তা হোলেও গোঁফ থাকবে; তুই কিছু জানিস্ না, একেবারে আনাড়ী। এই দ্যাখ্, আমার গরুটা কিরকম ফার্স্ট কেলাস হোচ্চে।"

বাড়ীর ভেতর থেকে মালার মায়ের ডাক শোনা গেল—"মালা কোথা গেলি রে?"

মালা চেঁচিয়ে বললে—"এই যে মা, আমি খিড়কীতে।"

"কি করচিস্ ওখানে?"

ছেলেটি ফিস-ফিস কোরে কি বোলে দিলে। মালা আবার ঐরূপ চেঁচিয়ে বললে—"অরুদার কাছে অংক শিখচি, মা।"

মালার মা দরজার ওপাশে এসে দাঁড়ালো। ভেজানো দরজাটা খানিকটা ফাঁক কোরে, অরুণের উদ্দেশে বললে—"কষতে পাচ্চে রে অরু?"

সঙ্গে সঙ্গেই অরুণ তার গরুটা মেজের ওপর উল্টে রেখে বললে—"ভালো পারচে না খুড়ীমা, একটু-আধটু ভুল কোরে ফেলচে।"

"ভুল কোরলে পিঠে দুটো কিল মারবি" বোলে মালার মা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

মালা মেয়েটি ঘোষাল-বাড়ীর মেয়ে, আর ছেলেটি মুকুজ্যে-বাড়ীর একমাত্র বংশধর—অরুণ। এই দু'বাড়ী যেমন পাশা-পাশি গায়ে-গায়ে, চিরকাল এদের মধ্যে ভাবও তেমনি গলায়-গলায়। বর্তমানে এই দু' বাড়ীর সকলেই মরে-হেজে গিয়ে এখন এ-বাড়ীর মা ও মেয়ে আর ও-বাড়ীর মা ও ছেলেতে এসে ঠেকেচে।

মালার মা বাড়ীর মধ্যে চলে গেলে, অরুণ মালার পিঠে গুম-গুম কোরে গোটা-তিন কিল মারতেই সে লাফিয়ে উঠলো—"কিল মারলে কেন?"

আরো একটা কিল মেরে অরুণ বললে—"শুনলি না খুড়ীমার হুকুম। বেড়ালের গোঁফ দিস্ নি কেন?"

অরুণের কিলগুলো অবশ্য আদরের কিল এবং মোলায়েম গোছেরই। কিল খেয়ে কৃত্রিম রাগের ভাবে মালা অরুণের মুখের প্রতি তাকিয়ে রইলো, তারপর তার গোঁফশূন্য বেড়ালকে খাতা থেকে ছিঁড়ে, পাকিয়ে, দলা কোরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। অরুণও তার গরুর একটা শিং দিয়ে, পাতাটার ওপর কতকগুলো হিজিবিজি লাইন টেনে উঠে দাঁড়ালো—"চ মালা, নালার জলে নৌকো ভাসাই গে।"

সামনের নালাটা শ্রাবণের ধারায় কানায়-কানায় ভরা। কল্-কল কোরে একটানা জলস্রোত পুকুরের দিকে বয়ে চলেচে। নালার যেখানটায় একটু গভীর ও চওড়া, নর্তকীর ঘাগরা ঘোরাবার মত স্রোতটা সেই জায়গাতে গিয়ে ঘূর্ণিপাক খাচ্চে। ওরা দু'জন নালার ধারে, ঘাসের ওপর এসে বসলো। খাতার কাগজ ছিঁড়ে, দু'চারখানা কোরে নৌকো কোরে, তাকে

নিজের নিজের নাম লিখে, একটার পর একটা নালার স্রোতে ছাড়তে লাগলো।

একখানা নৌকো ছেড়ে দিয়ে, উল্লাসের সঙ্গে মালা বোলে উঠলো—"ঐ দ্যাকো অরুদা, ক্যারসান্ যাচ্ছে আমার নৌকো!"

অরুণ চেঁচিয়ে উঠলে—"ঐ! তোর নৌকোকে আমারটা ছাড়িয়ে গেল! আমার নৌকো ফাস্ট!"

"ইস্‌ লি!...আবার দ্যাকো ছাড়চি! দ্যাকো-দ্যাকো, কি জোরে যাচ্ছে! এবার আমি ফাস্টেরও ওপর!"

এমনি কোরে এই দুটি ছেলে-মেয়ে উদভ্রান্ত এক সঙ্গে থেকে খেলা-ধুলো করে, বেড়ায়, লেখা-পড়া করে—অর্থাৎ বেড়াল-গরু আঁকে, নৌকো ভাসায়।

মাঝের পাড়ার সত্য গুরুমশায়ের পাঠশালা-টাই এ গ্রামে বিদ্যা শিক্ষার একমাত্র স্থান। ছেলে-মেয়ে দুই-ই এখানে পড়ে। মেয়েদের জায়গাটা একটা ছিটে-বেড়ার আড়াল দিয়ে আলাদা করা আছে। অরুণ আর মালা দুজনেই সত্য গুরুর পাঠশালায় পড়ে। দুজনে এক সঙ্গে আসে, এক সঙ্গে যায়। যেদিন আসে, দুজনেই আসে, আর যেদিন আসে না, দুজনেই আসে না। এই বছরটা হোলেই অরুণের পাঠশালার পাঠ শেষ; তখন মালার কি হবে, এই সমস্যা নিয়ে ওদের দুজনের মধ্যে মাঝে-মাঝে কথা হয়। মালা বলে—"আমি বুঝি বরাবরই পাঠশালায় যাব? অরুদা না গেলে আমি পাঠশালা ছেড়ে দোবো, কিছুতেই যাব না।"

হলও তাই। মাস-কতক পরে যখন পাঠশালার পাঠ শেষ কোরে অরুণ দেড় ক্রোশ দূরের শেতলহাটির হাই স্কুলে ভর্তি হোল, তখন মালাও সত্য গুরুমশায়ের পাঠশালার পদপ্রান্তে বিদায়-মালা অর্পণ কোরে, তার সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এল।

কিন্তু এখন থেকে অরুণ আর মালার একত্রে বেশীক্ষণ থাকা আর গল্পগুজব করার সময়টা খুব কমে এল। দেড় ক্রোশ দূরের স্কুলে যেতে অরুণকে বেলা ন'টার মধ্যেই খেয়ে-দেয়ে স্কুলে বেরিয়ে পড়তে হয়। আসতেও বেলা একেবারে গড়িয়ে আসে, শীতের দিনে প্রায় সন্ধ্যা হোয়ে যায়। দুজনের এই ক্ষতিটা ছুটির দিনে ভালোরকমেই উসুল কোরে নেয়। অরুণ তার স্কুলের কত কথাই মালাকে শোনায়; স্কুল, মাষ্টারমশাইরা, সংস্কৃতের কৈলেস পণ্ডিত, শেতলহাটির হাট, ননী ময়রার দোকান, দত্ত বাবুদের বাগান...তারপর গাবাড়ীর মাঠের ধারে সাঁওতালদের পল্লী, মোরগের লড়াই, মুসিমপুরের পীরের দরগা...আরও আরও...কত কি! অরুণ বলে যায় আর মালা শুনতে থাকে।

এইভাবে তিন বৎসর শেতলহাটির স্কুলে যাতায়াত কোরে, অরুণ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাস করলো। তারপর কোলকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ী থেকে আই-এ পড়বার ব্যবস্থা হোল। কলেজে পড়বার একটা নতুন উৎসাহে অরুণ উৎফুল্ল হোয়ে উঠল। মালা বললো—"অরুণদা, এখন থেকে তুমি বরাবরই কোলকাতায় থাকবে? মাঝে মাঝে বাড়ী আসবে না?" অরুণ বললো—"কি কোরে আসবো বল্? [illegible] মোটা মোটা বই, সব পড়তে হবে, বাড়ী আসার সময়ই আর পাব না, মালা!"

"কেন, নায়েব-পাড়ার কানাইও ত কলেজে পড়ে, সে ত ফি হপ্তাতেই বাড়ী আসে; শনিবার সন্ধ্যের পর আসে, আবার সোমবার ভোরে চলে যায়।"

"আমিও পরে তাই কোরবো। তবে প্রথম প্রথম দু'চার মাস পড়ার চাপ ত খুব বেশী, হয় ত ফি হপ্তায় আসার সুবিধে হবে না।"

"খুব হবে। তোমাকে আসতেই হবে।"

'হ্যাঁ রে মালা, তোর মামা কোথা থাকে রে?'

"মামা থাকে কালীঘাটে। কখনো কখনো আবার মামাকে ঢাকাতেও যেতে হয়।"

"ঢাকাতেও তোর মামার ব্যবসা আছে?"

"তা জানি না, তবে মামাকে যেতে হয়; ঢাকা যেতে হয়, পাবনা যেতে হয়, আরো কত জায়গা যেতে হয়।"

"দেখিস্, বড় হোয়ে আমিও ব্যবসা করবো আর নানান্ দেশে ঘুরে বেড়াবো।"

* * * *

অরুণ কোলকাতায় এসে বৌবাজারে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আছে ও শিয়ালদ'র কাছাকাছি এক কলেজে ভর্তি হোয়েছে। কালেজে সে রোজই উৎসাহের সঙ্গে হাজিরা দেয় বটে, কিন্তু তা' অপেক্ষা সে বেশী উৎসাহে কোল-কাতার সব জায়গা ঘুরে বেড়ায়। শনিবার এলেই সে সেদিন তিনটার ট্রেণ ধরবার জন্যে হাওড়ার ষ্টেশনে এসে পড়ে। পাঁচটায় সে 'কদমগাছি' ষ্টেশনে নামে। ছোট লাইনে দু' ঘণ্টার পথ। 'কদমগাছি' তাদের গ্রাম-প্রান্তের ছোট ষ্টেশান। ষ্টেশান থেকে তাদের বাড়ী এক মাইলের মধ্যেই।

শনিবার এলেই মালা পাঁচটা থেকে তাদের বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। বেশী লোক ও পথে যায়-আসে না; খুব কম লোকই আসে, কম লোকই যায়। ঐ যেন কে আসচে? ঐ ঐ!...নাঃ, ও-পাড়ার ননী চক্কোত্তির ছেলে!... ঐ আসচে! এবার ঠিক অরুণদা!...ঠিকই ঠিকই...ধুৎ!—মালীপাড়ার হাবুল মালী!...ঐ, এবার ঠিকই অরুণদা...নির্ঘাৎ অরুণদা! ঐ যে হাতে ব্যাগ! ব্যাগটা বোধ হয় এবার গিয়ে নতুন কিনেচে। অরুণ যখন খুব কাছে এসে পড়লো, মালা খুসী মনে অরুণের দিকে এগিয়ে গেল।

এইভাবে দু'চার মাস গেল। ফি শনিবারেই অরুণ বাড়ী আসে। ছুটি-ছাটা পড়লেও বাড়ী চলে আসে। মালার কাছে কোলকাতার কত গল্প করে। কি চমৎকার জায়গা! কি রকম সব চওড়া-চওড়া বাঁধানো রাস্তা! কত বাজার, কত রকমারি ধরণের দোকান! আর সে-সব সাজানোই বা কি সুন্দর! আর বাড়ীই বা কত! এক-একটা বড়-বড় বাড়ী দেখলে চক্ষু-স্থির হোয়ে যাবে!—খুব উৎসাহের সঙ্গে অরুণ কোলকাতার সমুদ্দির কথা বলে, আর মালা অবাক হোয়ে তাই শোনে।

গড়ের মাঠ, কেল্লা, হাওড়ার পোল, মনুমেণ্ট, পরেশনাথের মন্দির, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল,... আরো কত-কি...একটা একটা কোরে অরুণ সব [illegible] যায়। মালা জিজ্ঞাসা করে—"আচ্ছা অরুণদা, [illegible] কোথায় থাকে?

[illegible]

হবে; ও কেল্লা-টেল্লা সব আমাদের [illegible] যাবে।"

অরুণ কোলকাতায় থেকে এখন দেশের [illegible] স্বাধীনতার কথা প্রভৃতি. কিছু কিছু [illegible] বোঝবার মত বয়সও প্রায় তার হোয়েচে। [illegible] মালা এ-সব কথা শুধু শুনেই যায়। বড় [illegible] বোঝে না। বয়স তার মোটে [illegible] বছর, তার ওপর সে জন্মাবধি [illegible] গ্রামেরই মেয়ে। সে জানে—তাদের সেই [illegible] গ্রাম আর তার পথ-ঘাট, বন-বাদাড়, মাঠ-প্র[illegible] নালায় জলে কাগজের নৌকো ভাসানো [illegible] তার অরুণদাকে। তার আজন্মের [illegible] একমাত্র তার অরুণদা।'

অরুণ আই-এ পাস কোরলো। এখন [illegible] থার্ড-ইয়ার। গ্রামের লোকের কাছে [illegible] তার সম্ভ্রম অনেকটা বেড়ে গেল। তার [illegible] এখন সকলকারই নজর পড়লো। এর [illegible] কারণ আছে। প্রথম কারণ, তাদের জায়গা-[illegible] বিষয় সম্পত্তি। গ্রামের মধ্যে যে দু'চারজন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, অরুণ তাদের অন্যতম। তার [illegible] অরুণ দু'-দুটো পাস কোরে কালেজে পড়[illegible] অবশ্য নায়েব-পাড়ার হরি মোড়লের [illegible] কানাইও ফোর্থ ইয়ারে পড়ে; কিন্তু তারা সা[illegible] গেরস্ত মাত্র। তৃতীয় কারণ, অরুণ আর [illegible] ছোট কিশোর বয়স্ক নয়, সে যৌবনের প্র[illegible] দ্বারে এসে দাঁড়িয়েচে। এইসব কারণে [illegible] গাঁয়ের অনেকেই তাকে সম্ভ্রম করতে [illegible] করেচে। কিন্তু এ ধরণের সম্ভ্রম শুধু এক[illegible] করে না। সে—মালা। অবশ্য মালাও [illegible] আর বালিকা নয়, সে কৈশোর-যৌবনের স[illegible] স্থলে এসে দাঁড়িয়েচে। তবুও মালা হা[illegible] হাসতে অরুণকে বলে—"অরুণদা, [illegible] বেড়ালের গোঁফ থাকে? মিত্তিরদের সা[illegible] বাগানে পেয়ারা পাড়তে যাবে? [illegible] সামনেটায় সাংঘাতিক রাঙা ফুল ফুটেচে, [illegible] আনলে হয়। চল অরুণদা' [illegible] কাগজের নৌকো ভাসাই গে!...ঐ [illegible] ফাষ্ট! ফাষ্ট!" এসব কথায় অরুণ [illegible] মিটি-মিটি হাসে। তারপর একটু পরে [illegible] "এখানকার এই সবই ভালো, মালা, কোলক[illegible] ছাই জায়গা!"

"কেন অরুণদা' কোলকাতা এখন [illegible] ভালো লাগে না?"

"মোটেই না। সব যেন বন্ধ, চাপা-[illegible] পাশে ইঁট-কাঠের পাহাড়। আর দিনরাত [illegible] হট্টগোল! রাম রাম! ওখানে মানুষে থা[illegible] ওখানে নিশ্বেস নিতে যেন কষ্ট হয়, [illegible] লাগে।" খানিক চুপ করে থেকে অরুণ বললে [illegible] ওখানে চিলেকোঠার ঘরখানায় আমি প[illegible] একদিন বিকালে আকাশভরা বড়-বড় মেঘের চাঁই পূব থেকে পশ্চিমে ভেসে চলেছে [illegible] তুই ত 'মেঘদূতের কথা জানিস না, আমা[illegible] পড়ানো হয়। আমি সেইসব মেঘকে [illegible] বললুম—"তোমরা গঙ্গার ওপারে হাও[illegible] ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছ। যাও—যাও। ওখান থে[illegible] একটু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণাকুণি 'সোনা[illegible] গাঁয়ে যাও।"

"আর কি বললে?"

অরুণ বললো—"আর বললুম—মালা বো[illegible] [illegible] অরুণ হাস[illegible] লাগলো।

সত্যই অরুণের এখন কোলকাতা মোটেই ভালো লাগেনা। প্রথম-প্রথম যে ভালোলাগাটা সেটা আজন্ম গাঁয়ে থাকার পর নতুনত্বের একটা মোহ মাত্র। সে মোহ তার এখন কেটে গেছে। এক শনিবার বাড়ী এসে সে মাকে স্পষ্টই বললে—"কোলকাতা আমার মোটেই ভালো লাগে না, আমি আর ওখানে থাকবো না।" মা বললেন—"সে কি কথা বাবা। বি-এ'টা পাস কর্, তারপর না হয় চলে আসিস্।" অরুণ আর কিছু সেদিন বললে না।

তারপর কয়েকটা দিন কেটে গেলে, একদিন দুপুরে হঠাৎ অরুণ তার বই-পত্তর বাক্স-বিছানা নিয়ে বাড়ী ফিরে এল। মা বললেন—"এ কি! চলে এলি যে! শরীর ভালো আছে ত?"

"হ্যাঁ"

"তবে?"

"পড়া-শুনো আমার আর ভালো লাগে না। কোলকাতায় আমার কিছুতেই থাকতে ইচ্ছে করে না।"

খবর পেয়ে মালা ও মালার মা-ও এল। অরুণ মালাকে বললে—"কত ভালো ভালো বাংলা বই কিনে এনেছি, বিকেলে আসিস্, সব দেখাবো'খন।"

* * * *

"হ্যাঁরে মালা, খুড়ীমা আজ কেমন আছেন?"

মালা ঘরের ভেতর থেকে রোয়াকে বেরিয়ে এসে বললে—"ভালো আছে, অরুণদা—কালও সারাদিন আর জ্বরটা হয়নি। এসো না, মা ডাকছে।"—অরুণ ঘরের ভেতর গেল।

গেলবছর অরুণ যখন পড়াশুনোর পাঠ চুকিয়ে দিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে আসে, তখন থেকেই মালার মা ঘুষ-ঘুষে জ্বরে ভুগতে থাকে। গ্রামের ফকির ডাক্তারের ওষুধে সে জ্বর সারে নি। দশ-পনেরো দিন ভালো থাকে, আবার জ্বর হয়। এইভাবে গোটা বছরটাই ভুগে আসছিল। তারপর কিছুদিন হোল, অরুণ সাঁইপাড়ার মাধব কবিরাজকে ডেকে এনে চিকিৎসা করানোর ফলে রোগ এখন ভালোর দিকে মোড় ঘুরেচে।

গতকাল কোলকাতা থেকে মালার মামা রমেনবাবু দিদিকে দেখতে এসেছিলেন। চার-পাঁচদিন পরে, তাঁর চলে যাবার দিন সকালবেলায় মালা ধরে বসলো, মামার সঙ্গে সে কোলকাতায় যাবে। কখনো সে কোলকাতা দেখেনি, খালি অরুণদার কাছে কোলকাতার কথা সব শুনেছে। এবার সে মামার সঙ্গে একবার যাবেই। তার জেদ দেখে মা আর কোন আপত্তি করলেন না, রমেনবাবু তাকে কোলকাতায় নিয়ে গেলেন। যাবার আগে সে অরুণদার মত নিয়েছিলো। অরুণ উৎসাহের সঙ্গে মত দিয়েছিল।

রমেনবাবু পাঁচ-সাতদিন ধরে কোলকাতার বিভিন্ন দেখবার স্থানগুলো দেখালেন। তারপর তাঁর ব্যবসার ব্যাপারে হঠাৎ তাঁর একবার ঢাকা যাবার প্রয়োজন হোল। মালা তাঁকে ধরে বসলো, সে-ও তাঁর সঙ্গে যাবে। জন্মের পর থেকে এই ষোল-সতের বছর বয়স পর্যন্ত সে তাদের গ্রাম সোনাতলীর বাইরে কখনো পা ফেলেনি। জীবনে এই প্রথম কোলকাতা দেখে, তার অন্য অন্য জায়গা দেখারও ইচ্ছা প্রবল হোয়ে উঠেছিল। মামীমা বললেন—"নিয়েই যাও, ঢাকা শহরটা একবার দেখে আসুক।"

* * * *

প্রথম ফাল্গুনের মাদকতা-মাখা এক প্রভাত। নব-বসন্তের যাদুস্পর্শে ঢাকা শহর-প্রান্তের আকাশে-বাতাসে মাধুর্যময় এক উন্মাদনার তরঙ্গ বয়ে যাচ্ছে। কোথায় কোন দূরের নিভৃতে বোসে কি-একটা পাখী সুস্বরে চারিদিক ভরিয়ে তুলছিল। বোধহয় সে ভেবে নিয়েছিল, বসন্তটা শুধু তার জন্যেই, আর কারো জন্যে নয়। চকবাজার থেকে খানিকটা দূরে, একটা বাড়ীর জানালার ধারে বোসে মালা একাগ্র হোয়ে পাখীর ডাকটা শুনছিল।

আজ দুদিন হোল রমেনবাবু মালাকে নিয়ে ঢাকায় এসেছেন। আরো দুদিন থেকে তিনি কোলকাতায় ফিরে যাবেন। মালারও ঢাকা শহরটা তেমন ভালো লাগছে না; তার মনের কোথাও যেন কি-একটা অস্বস্তি মাঝে-মাঝে তার অন্তরকে নিঃসাড়ে নাড়া দিচ্ছে। একটা যেন কুণ্ঠা, ভয়-ভয়, অনিশ্চিন্ত-ভাব। যেন—তরঙ্গময় সমুদ্রের বুকে ছোট একখানা তরণীতে সে খুঁটি ধরে বসে আছে, কূল অনেক দূরে ঝাপসা দৃষ্টিতে তা ছায়ার মত দেখাচ্ছে। কোলকাতায় তার মন খুব আনন্দ-উৎসাহপূর্ণ আর তাজা ছিল। কোলকাতা যেন তাদের সোনাতলীর কিছুটা দূরে খুব প্রকান্ড একটা সাজানো-গোছানো বাগানবাড়ী। কিন্তু ঢাকা যেন তা নয়, এ যেন বহু—বহু—বহুদূরের কোন বিদেশভূমি। তার অরুণদা! কোলকাতা থাকাকালে সে মনে কোরতো, তার অরুণদা যেন তার কাছেই আছে। কিন্তু এখানে তার দৃষ্টিপথ থেকে সম্পূর্ণভাবেই সে তার অরুণদাকে হারিয়ে ফেলেছে। তার অসহায় দুর্বল মন ভেঙ্গে পড়ে। সে এখন সোনাতলী যেতে পারলে বাঁচে। এর বেশী সে আরকিছু চায় না। সে কোলকাতা চায় না, ঢাকা চায় না, এতবড় পৃথিবীর কোথাও কিছু চায় না, শুধু চায় সে—তাদের সোনাতলী। আর চায় তার অরুণদা, তার মা, তার জেঠিমাকে; চায়—মাঠের ধারের বড় বিলের পাড়, মিত্তিরদের সাজার বাগান, ধাড়াদের কলাগাছের তলা, হরিসভার চত্বর, কেঁদোর বট-তলা, গাবাড়ীর মাঠ, বিশালাক্ষীর মন্দিরতলা; আর চায়—তাদের খিড়কীর অদূরে সেই নালা—একদিন বর্ষায় যার জলস্রোতে সে আর তার অরুণদা কাগজের নৌকো তৈরী কোরে একটার

ঝড়ে কাশ বন — বিমল সরকার

পর একটা তাতে ভাসাতো। কদমগাছি ষ্টেশনের পথে যেখানটায় মস্তবড় একটা ছাতিম গাছের...

"মাল্যা!"

চমকে উঠে মালা সামনে ফিরে বললো—"কি বলচেন, মামা?"

"খাবি কিছু? খিদে পেয়েছে ?"

"খেলুম ত মামা তখন চায়ের সঙ্গে; আর কিছু এখন খাব না। ঢাকায় আর ক'দিন থাকবে মামা?"

"কেনরে, মন-কেমন করচে বুঝি? কালই হয় ত চলে যেতে পারবো; এখানকার কাজ হয়ত আজই শেষ হোয়ে যবে।"

"তা হোলে, কালই আমরা যাবো ত?"

"নেহাৎ যদি কাল না হোয়ে ওঠে, পরশু নিশ্চয়ই যাবো। খালি মৌলভীবাজারের হিসেবটাই বাকী, বোধ হয় আজই তা হোয়ে যেতে পারে!...একটু ঘুরে-ঘারে আসবি না কি?"

"না মামা, ভালো লাগচে না।"—এক ঝলক বাতাস এসে মালার মুখে-চোখে তার স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়ে গেল। দূরের সেই পাখীটা আর ডাকচে না, আর কোনদিকে কোন গাছে বোধহয় উড়ে গিয়ে বসেচে।

* * * *

মানুষ ভাগ্যের অধীন। ভাগ্য তাকে যেদিকে নিয়ে যাবে,সেইদিকেই তাকে যেতে হবে। চেষ্টা অবশ্য সে করবে এবং করাও তার কর্তব্য, কিন্তু বিধিলিপিকে সে একেবারে উল্টে দিতে পারবে না।

হঠাৎ চারদিককার বাতাসে কি একটা অশুভ গুন-গুন্ সুর অস্ফুটে বেজে উঠলো। কি-একটা অমঙ্গলের ছায়া মাথার ওপরকার আকাশের আলোকে যেন আবছা ম্লান কোরে দিলে। কোথায় যেন কি হোয়েছে, কি একটা যেন হবে। যেটা হোয়েছে যেটা হবে—সেটা অভয়ের নয়, সেটা মঙ্গলের নয়, সেটা বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রকৃতি স্তব্ধ। বাতাস স্তব্ধ। গাছপালা, কানন-প্রান্তর সবই স্তব্ধ, নীরব। ঝড় উঠবে কি, ঝড়? ঢাকাশহর আর তার গ্রামাঞ্চল—সর্বত্রই একটা কেমন যেন থমথমে ভাব। সন্ধ্যার পর থেকেই একটু একটু বাতাস বইতে সুরু হোল। সে বাতাসে স্নিগ্ধতা নেই, জ্বালা আছে। ক্রমেই যেন সে বাতাসে জোর লাগতে লাগলো। তাতে যেন বিষের গন্ধ, কোথাকার সব সভার গন্ধ, কোন্ ছেলেদের হোলি-খেলার ফাগের গন্ধ!

আগুন! আগুন! চারিদিকে হৈ-চৈ, গোলমাল, কলরব, পটাপট-ফটাফট, ছোরা-লাঠি, পৈশাচিক তান্ডবের লীলা! আক্রমণকারীদের বীভৎস চীৎকার! প্রাণভয়ে সব সম্প্রদায়ের ছুটো-ছুটি! চারদিককার পথে-ঘাটে নৃশংস খুন, জখম, হত্যা! সকল সম্প্রদায়েরই বড়-বড় কারবারি আড়ৎ পুড়ে ছাই; বড়-বড় কোঠা ধূলিসাৎ!

রমেনবাবু মালার হাত ধরে থর থর কোরে কাঁপচেন। এ উত্তাল তরঙ্গ থেকে উদ্ধারের উপায় কি? একান্তমনে ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন। সামনের বাড়ীর এক মহাপ্রাণ আলিমুদ্দীন মন্ডল ধীরে ধীরে সন্তর্পণে তাঁদের কাছে এসে দাঁড়ালেন। স্বর্গের দূত যেন এলেন বিপন্নকে উদ্ধার করতে "আসুন ভাই, এস মা-লক্ষ্মী! কোন ভয় নেই।" রমেনবাবু অকূলে কূল পেলেন।

সাতদিন ধরে দাঙ্গা আর ধ্বংসলীলা সমানে চললো। তারপরও এখানে-ওখানে তার জের একটু-আধটু চলতে লাগলো। আলিসাহেবের সুরক্ষিত বাড়ীর পেছনের দিকে সম্পূর্ণ পৃথক-ভাবে দু'খানা কোঠা ছিল। সেইখানে তিনি রমেনবাবু ও মালার থাকবার ও খাবার সমস্ত সুব্যবস্থা কোরে দিয়েছিলেন। সমস্ত খাদ্য-উপকরণ তিনি দিয়ে যেতেন; মালাকে বলতেন—"মা, ছেলের কাছে যেন কিছু লজ্জা কোরো না, যা দরকার হবে, আমার কাছে চাইবে।" দেশে থাকতে তার অসুস্থ মাকে সাহায্য করবার জন্যে মাঝে মাঝেই তাকে রান্না করতে হোত, সুতরাং মালার এতে কোন অসুবিধে হোত না। আলি-সাহেব, তাঁর স্ত্রী, কন্যা দিনের মধ্যে বহুবার এসে তাদের খবর নিয়ে যেতন—তাদের কোন কষ্ট বা অসুবিধে হচ্ছে কি না। কন্যাটি মালারই সমবয়সী। সমস্ত দুপুরটা দুজনে বোসে নানাবিষয় গল্প-গাছা করতো। মালা মনে মনে ভাবতো—দেবতারা আর কোথাও নয়, মানুষেরই মধ্যে, মানুষেরই রূপে তারা থাকেন।

আট-দশদিন পরে দাঙ্গার গরম হাওয়াটা ঠান্ডা হোতেই রমেনবাবু কোলকাতায় চলে আসবার ইচ্ছে করলেন, কিন্তু আলিসাহেব তাঁকে আসতে দিলেন না। তখন তিনি অতি কষ্টে দু'খানা পোষ্টকার্ড যোগাড় কোরে, একখানা কোলকাতার বাড়ীতে, আর একখানা সোনাতলীর বাড়ীতে লিখে ডাকে দিলেন। বিলম্বের কারণটা মোটামুটি সংক্ষেপে জানা গেল। তারপর আরো প্রায় দিন-পনেরো আলিসাহেব তাঁদের রেখে, নিজের দু'চারজন লোক সঙ্গে দিয়ে ওঁদের যাবার বন্দোবস্ত কোরে দিলেন এবং তারই ফলে একদিন সকালে রমেনবাবু শিয়ালদা ষ্টেশনে মালার হাত ধরে ট্রেণ থেকে নামলেন।

* * * *

জগতে যেখানে যত ঘটনা ঘটে, তার বৈদ্যুতিক দূত থাকে। সেই দূত, তার অদ্ভুত শক্তিবলে সর্বস্থানে তা রটনা করে। ঢাকার দাঙ্গার সংবাদ অবশ্য দিনের পর দিন এখানকার সব কাগজেই ছাপা হোয়েছিল, কিন্তু যা ছাপা হয়নি, সেই বিকৃত এবং গুহ্য খবরটি সোনা-তলীর মেয়েসমাজের ফিস্‌ফিসানি ও কানা-কানির মধ্যে দিয়ে, তলে তলে গুনেগুনিয়ে উঠলো—'দাঙ্গার সময় দুর্বৃত্তেরা মালাকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ও নবযৌবনা মালাকে তারা প্রায় একমাস তাদের ঘাঁটিতে আটকে রেখেছিলো?......ইত্যাদি।

মালা তাদের দেশের বাড়ীতে এসেচে। সে এখন নবযৌবনের পুষ্পরাজিশোভিতা। আসার পর সে তার অরুণদার সঙ্গে দেখা করেচে। অরুণ প্রত্যহই মালাদের বাড়ীতে আসে। মালা যেন আগের মত অরুণের সঙ্গে গল্প-গাছা করতে পারে না। গ্রামের মেয়েমহলের ফিস্‌ফিসানি তাকে যেন কেমনতর কোরে দিয়েচে। যেন সে কোনো মহা অপরাধে অপরাধী; অথচ কি যে তার অপরাধ তা সে বুঝতে পারে না।

রমেনবাবু মাঝেমাঝেই আসেন। মালার বিয়ে দেওয়া দরকার। তিনি চারিদিকে চেষ্টা করতে লাগলেন। দু'এক জায়গায় ঠিকও হোল। তারা সোনাতলী এসে মেয়ে দেখে পছন্দ করেও গেল। কিন্তু কোথায় এবং কে তাদের কানে গুরুমন্তর দান করলে, তারা আর অগ্রসর হোল না।

দিন কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে না; একটার পর একটা কোরে দিন চলে যেতে লাগলো। মালার বিয়ের জন্যে মালার মার একরকম আহার-নিদ্রাই ঘুচে গেল। দীর্ঘদিনের অসুস্থ দেহ, সবে ত একটু সেরে আসছিলো, এই দুশ্চিন্তায় আবা তা ভেঙ্গে পড়লো। এমনি সময়ে, শেষ আষাঢ়ে এক সকালে অরুণ এ-বাড়ীতে এসে উঠান থেকে ডাকলো—"খুড়ীমা!" তারপর অরুণ তাঁর হাতে পাঁচশো টাকার একটা থলি দিয়ে বললো—"সামনের ২৪শে বিয়ের ভালো দিন। মা বুড়ো হোয়ে পড়েচে, ঘরে একটি বউ না হোলে আ চলে না। ঐ শুভদিনে মালাকে আপনি আমায় দান করবেন। আমরা দুজনা আত্মীয়...

অতিমাত্রায় চমকে উঠে খুড়ীমা বললেন—...কে......তুই?"

"হ্যাঁ খুড়ীমা। মালাকে আমরাই দেব দুপুরবেলা। মা আপনার কাছে আসবে এখন থলিটাতে পাঁচশো টাকা আছে। ...পর এখন ওইতে করুন, তারপর দরকার হোলে আরো আমি দিয়ে যাব। সময় আর বেশী নেই খুড়ীমা।" অরুণ ব্যস্তভাবে চলে গেল।

মানুষ অনেকসময় অনেক দুরাশা ...মনে পোষণ করে, অনেক অসম্ভব ভাবনাও ভাবে কিন্তু মালার মা কোনদিন মনের এক কোণে একথা ঠাঁই দেন নি যে, বংশে, বিদ্যায়, ধনে মানে এ গ্রামের মধ্যে কতো বড়ো যে অরুণ সে অরুণের সঙ্গে তাঁর মালার বিয়ে হবে—বিশেষ কোরে বর্তমানে যার সম্বন্ধে একটা কলঙ্ক রটনার চাপা সুর সোনাতলীর মেয়েমহলের মধ্যে গুনেগুনিয়ে ভেসে বেড়াচ্চে!

কিন্তু তাই হবে; এ জগতে তাই হয় বিধির বিধান। ভবিতব্যতা। মানুষের চিন্তা তার চেষ্টা এখানে থই পায় না। এ ...নাগালের অনেক—অনেক ঊর্ধ্বে।

* * * *

২৪শে আষাঢ়।

ঘোষালবাড়ী আর মুকুজ্জেবাড়ীর সংলগ্ন সামনেটায় মোটা মোটা চারটে শালের খুঁটির ওপর নবৎখানা বসেচে। নবতের প্রভাতী সুর সারা গ্রামের বাতাসে আলোড়ন তুলে ভেসে বেড়াচ্চে। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব সমাগমে দু'বাড়ী কোলাহল মুখর। সন্ধ্যা থেকে সে কোলাহল চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেল। লগন—রাত নটায়।

* * * *

বাসর ঘর। রাত প্রায় একটা। বাসর সঙ্গিনীরা যে যার বাড়ী চলে গিয়েচে। নীচে এখনো কাজের সম্পূর্ণ বিরাম হয় নি।

অরুণ মালার হাত দু'খানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ডাকলো—'মালা!'

'কি বলচো?'

"বেড়ালের যে গোঁফ আঁকলি না?"

মালা একটুখানি চুপ কোরে থেকে বললে—"নালার জলে নৌকো ভাসাতে যাবে?"

আজ ২৪শে আষাঢ় রবিবার, গ্রামের হরি সভার বার্ষিক উৎসবের দিন। সমস্তদিন ধরে সেখানে উৎসব চলেছিল। এখন উৎসব-শেষে নীরবতার মধ্যে কে যেন সেখানে একলা বোসে কীর্তনের একটা পদ উচ্চকন্ঠে গাইছিল। তার একটা কলি তখন বাতাসে ভেসে এল—

'ও সে—কলঙ্কিনী রাই আমাদের—
রাই আমাদের—রাই আমাদের!

———

প্রজ্ঞাপারমিত

জগন্নাথ চক্রবর্তী

লেকের বেঞ্চিতে বসে প্রজ্ঞাপারমিত
জগৎ-সংসার যেন অস্থির অস্মিত,
জলে মাছ কেলি করে স্থলে কলরব
উক্তি পুনরুক্তি আর নিন্দার প্রসব,
বাদামের খোসা ভাঙে কলেজের বালা
অন্তরঙ্গ সম্ভাষণে কর্ণ ঝালাপালা,
উপবেশনের ভঙ্গি অতীব সম্বৃত
লেকের বেঞ্চিতে বসে প্রজ্ঞাপারমিত।

নীঘল দু'চোখে মেখে রোমান্স-কস্তুরী
শিকারী ও শিকারিণী; নানা অলিগলি
অবশেষে মেশে এসে যেন দায়ে ঠেকে
হৃদয়ের হ্রদে নয় ঢাকুরিয়া লেকে;
সায়াহ্নের মহাকাব্য অতীব বিস্তৃত
লেকের বেঞ্চিতে বসে প্রজ্ঞাপারমিত।

মূল্যমানের নিরিখে—

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

জঙ্গলে ছিলো শ্বাপদ এবং জঙ্গল ছিলো অনেক দূরে;
উপমাচ্ছলে জংলী বলেছি বড়াই করতে সভ্যতার।
জন-জঙ্গলে যত ঘুরি বুঝি আছে ও-মতটা বদলাবার
দেখি সব কিছু গিয়েছে পাল্টে, টেবিলটা পুরো গিয়েছে ঘুরে।
জঙ্গল যতো হাসিল হয়েছে, হচ্ছে ও হবে পৃথিবী জুড়ে
শ্বাপদেরা সব আপদের মতো সেঁধুবে কক্ষে জন সভার।
জঙ্গলে ছিলো শ্বাপদ এবং জঙ্গল ছিলো অনেক দূরে;
উপমাচ্ছলে জংলী বলেছি বড়াই করতে সভ্যতার।
এটা কোন্ যুগ? বিংশ শতক? নানা জন বলে নানান সুরে—
ব্যাবেলের ভাষা, বোঝা মুস্কিল, অভব্য বা তা ভব্যতার;
প্রমাণ কী আছে, যাইনি যে ফিরে প্রাক্-ইতিহাস-বন্যতার
দিকে; মানবিকভাবে ভেবে দেখো নিজেরই শুদ্ধ বিবেক চুঁড়ে।
জঙ্গলে ছিলো শ্বাপদ এবং জঙ্গল ছিলো অনেক দূরে;
উপমাচ্ছলে জংলী বলেছি, বড়াই করতে সভ্যতার।

দক্ষিণাপথের কবিতা

(প্রাচীন প্রাকৃত থেকে)

সুশীল জানা

প্রিয়তম যবে সম্মুখে দাঁড়াবে এসে
দু হাতে না হয় ঢাকবো নয়ন দুটি,
সারা দেহ সখি ঢাকবো কি দিয়ে বলো—
সে যে কদমের রোমাঞ্চে ওঠে ফুটি।

*

লোকে বলে শুনি সেই সে আমার কঠিন হৃদয় প্রিয়
কাল নাকি যাবে কোথায় সুদূরে প্রবাসে,
ওগো ভবগতি নিশাদেবী, তুমি এমনি দীর্ঘ হও
সেই কাল যেন কোনো দিন আর না আসে।

*

তারি কথা দিয়ে সুরু হয় কথা যত,
সে কথাই বাড়ে—শেষ হয় তারই কাছে।
মনে হয়, যেন তোমাদের গাঁয়ে মাসী
কেবল ওই সে একটি যুবকই আছে।

*

শুকপাখীতে ধান যদি খায় থাক্ গে
ক্ষেত পাহারায় আর ব'লো না যেতে।
পথের দিশে জেনেও যত পথিক
পথ শুধোবে আমায় সেধে সেধে ॥

*

সামনে মাঘের নিদারুণ শীত—তবু আছে ঘরে সুখ—
ধোঁয়াহীন যেন তুষের আগুন শ্যামলী বধূর বুক।
সেই সে সুখের কথা মনে করে গাঁয়ের কিষাণ শেষে
বলদ কিনতে গায়ের কাপড় বেচে দিল অক্লেশে ॥

নিদ্রিত কুকুর

শ্রীসুধীর গুপ্ত

পথ-পাশে অনাদৃত পথের কুকুর
নির্বিবাদ নিদ্রাটুকু উপভোগ করে।
অঘোরে-ঘুমানো রূপ দূর্বাগুচ্ছ 'পরে
বড়ো তৃপ্তিকর লাগে। পড়ন্ত দুপুরে
মন্থর সমীরে শ্রান্ত বিহঙ্গের সুর
সন্তর্পণে কর্ণে তার আবেগে আদরে
ঢেলে দেয়। অফুরন্ত পত্রের মর্মরে
স্বপন-ঘোর বোনে বুঝি সুন্দর সুদূরে।

বিটপীর ছায়া দোলে; নূপুর নদীর
কূলে কূলে বহুদূরে বেজে বেজে যায়;
দুরন্ত মাছেরা করে পলি-জলে ভিড়;
লুকানো লেজের দাগে পলির কাদায়
আঁকাবাঁকা লেখা পড়ে। নিদ্রায় নিবিড়
শান্ত রূপ স্বর্গ-সুখ দেখে মুগ্ধতায়।

বিদায়

অনিল ভট্টাচার্য

আমার ডাক পড়েছে আমি যাই
ফুরালো বেলা
নীল আকাশে ভাসবে না আর
সাদা মেঘের ভেলা।
দোল দেবে না কাশের বনে
অলস ভ্রমর গুঞ্জরণে
ফুরিয়ে যাবে শিউলি কমল,
কুন্দকলির মেলা।
অশ্রু-হাসির এই যে লীলা
মধুর হ'য়ে
বাজবে বুকের বীণার তারে
রয়ে রয়ে—
চিহ্ন যাহা গেলাম রেখে
আজ শরতের শেষে
লবে তুলে হেমন্তেরি
প্রভাতবেলা এসে
আনবে সাথে ধানের ক্ষেতে
ফসলকাটার বেলা।

সখের থিয়েটারের নায়িকা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

অনেক আশ্বাস তার কানে গেছে,
ভালবাসার অনেকগুলি স্তোক,—
তবু সে চঞ্চল নয়, স্থির মূর্তি,
প্রাচীন অতীত শিল্পলোক—
অবন্তী, কোশল কিম্বা বিদিশার সৌন্দর্যসংকেত
মুখে সে বহন করে শুনে গেছে সব,
কখনো জবাব নেই, একান্ত নীরব!

'আমি ভালবাসি', 'আমি ভালবাসি।'
'সবচেয়ে বেশী ভালবাসি আমি,
দেখো, তাই উপহার এনেছি কতই
প্রাণের চেয়েও যেন অতিরিক্ত দামী।'

স্তব্ধ রাত্রে অশ্রু ছলো ছলো দুটি আনত নয়ন
আকাশে ধরেছে তুলে, নিঃসীম শূন্যতা
হয়তো ছুঁয়েছে তার মন!
নিষ্পাপ ফুলের মতো, অথচ নাগর-ভ্রমর
অর্থদম্ভে অকারণ
কোলাহল তুলে
বসিয়েছে হিংস্র নখর, পবিত্র সে ফুলে
পাপ মধুচক্র গড়ে
পরম আদরে
পণ্য ভেবে দুমুঠো টাকার বদলে
রেখেছে দখলে।
নদীকে অনেকে বাঁধে
বাঁধ দেয়, পোল গড়ে;
তবু নদী সজীব, সতেজ, দূরে বালুচরে
ঈষৎ অপেক্ষা করে আবার সতেজ হয়,
গতি তার হয় গীতিময়!
তেমনি সে নদী-নারী,
নায়িকার বিচিত্র পোষাকে
হাজার ব্যাপারী এসে বাঁধুক না তাকে!
যতই শুনুক সে হৃদয়ের বিচিত্র বিভাস,—
ভিন্ন নায়কের যত প্রণয়ের গীতা—
জানি, জানি, দুঃখের বিভূতি মেখে
পবিত্র সে, তবুও যে অ-পরাজিতা!

ভাঙা পুতুল

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

সে জন যদি না মন বোঝে তবে কিসের এ-খেলা?
চকিতে যদি না এসে দোলা দেয়, কিসের দোসর?
মেঘের ছায়ায় ছায়ায় কখন চলে গেল বেলা
হায়রে বকুল, বাসক-সজ্জা বৃথা হলো তোর!

তনু-মন ঢেলে সৌরভে তুই সাজালি বাসর,
বুক পেতে নিতে হলো অপমান, এ-অবহেলায়!
বৃষ্টির মতো ভাঙলো যে তোর আকুল কান্না,
অভিমানে শেষে রইলি কি পড়ে পথের ধুলায়!

সান্ত্বনা খোঁজা বৃথা জানি, তাই দিতে তা' চাইনি—
শুধু তুই যবে ক্লান্ত, ঘুমের ঘোরে অচেতন,
তপ্ত কপালে হাত রাখি তোর, স্নিগ্ধ-সজল,
ছুঁয়ে যাই তোকে বৃষ্টিশেষের হাওয়ার মতন।

ছেঁড়া-খোঁড়া মেঘ উড়ে গেলে, হলে শান্ত আকাশ—
চোখ মেলে যদি কখনো তাকাস বুকের গহনে,
দেখবি সেখানে পাতা খেলাঘর, হাতছানি দিয়ে
খেলার সাথী যে ডাক দিয়ে যায় গোপনে গোপনে।

সেখানে মুখর নিত্যনতুন খেলার আসর,
ধুলো ঝেড়ে উঠে যোগ দিতে যদি পারিস খেলাতে
পাবি তার দেখা, যে-জন শিখেছে যাদু-মন্তর
ফেলে-আসা সেই ভাঙা পুতুলের দুঃখ ভোলাতে।

মাধুরীলতার হৃদয়

সুনীল ভট্টাচার্য

অনেক কথা বলার শেষে তবুও কথা থাকে
একটি কথাই সারাটা দিন অনেক কথা বলায়.
অনেক কথা হারিয়ে যায় ঃ মাধুরীলতা রাখে
একটি কথা লুকিয়ে শুধু বুকের পটে অনেক কথার তলায়।

অচেনা-চেনা অনেক মুখ দু'চোখে ডোবে ভাসে
একটি মুখ তবুও যেন অনেক মুখের ভিড়ে
প্রগাঢ় হয় ঃ মাধুরীলতার নিকটে ফিরে আসে
একটি মুখই চিরটাকাল কাঁদায় সেই মাধুরীলতাটিরে।

বোঝা না বোঝায় অনেকদিন গিয়েছে হেসে খেলে
অনেক স্মৃতি-টুকরো ভাঙা হৃদয়ে গেছে এ'কে,
একটি দিন তবুও যেন অনেকদিন অনেক পিছে ফেলে
মাধুরীলতার হৃদয়ে যায় অনেক বেশী গভীর দাগ রেখে।
অনেক রাত গিয়েছে কেটে একলা তারা গুণে
অনেক রাত—একলা রাত—গা ছমছম ভয়ের কালোরাত
একটি রাত তবুও যেন চকিত এই তেইশে ফালগুনে
মাধুরীলতার দিকে বাড়ায় নির্ভয়ের সবল দৃঢ় হাত।
অনেক দিনের অনেক কথাই অনেক সুরে টেপরেকর্ডে ঘোরে
মাধুরীলতার হৃদয়ে শুধু একটি কথা ধূপের মত পোড়ে।

বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী
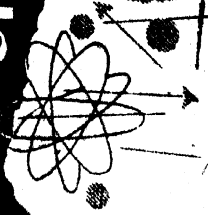
কচ্ছপ ও খরগোশ

বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক কল্পকথার সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাবলে আমার কথামালার সেই সুপরিচিত খরগোশ আর কচ্ছপের কাহিনী মনে পড়ে। গল্পের খরগোশ আলস্যে সময় নষ্ট করে দৌড়ে হেরে গেল, আর কচ্ছপ অবিচলিত অধ্যবসায়ের ফলে জিতে গেল। সায়েন্স-রূপে কচ্ছপ আর সায়েন্স-ফিকশন-রূপে খরগোশের বেলায় উপমাটা কিন্তু উলটে দিতে হবে, কারণ সেইটেই তো স্বাভাবিক, কোন সত্যিকার কচ্ছপ কোনদিন সত্যি খরগোশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নিশ্চয়ই হেরে যাবে না।

বাস্তব বনাম কল্পনা

বিজ্ঞান সর্বদিক বিচার বিবেচনা না করে এগোয় না। তার ভিত্তি বাস্তব ঘটনা। কল্পনার বল্গা নিরঙ্কুশ তা এক লাফে তের নদী সাত সমুদ্র পার হয়ে যায় অনায়াসে। তবে এই কল্পনার পশ্চাতে কিছু বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন। ব্যাপারটা হ'ল ইংরেজীতে যাকে বলে 'একস্ট্রাপোলেশন'—যেটুকু জানা আছে তার ধারা কোন্ দিকে যাবার প্রবণতা রয়েছে তা থেকে তার

চালনক্ষম বেলুন
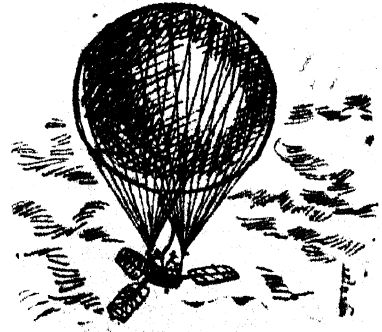
সম্ভাব্য পরিণতিতে পৌঁছান। এই একস্ট্রাপোলেশন, অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয় না তা নয়, যথেষ্টই হয়। তবে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিণতি ছাড়িয়ে আরও দূরে যাবার কোন বাধা নেই।

এমন ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিজ্ঞান কোনদিনই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর নাগাল পাবে না। [illegible] বহু ক্ষেত্রে নাগাল পাওয়া [illegible] কল্পনা-বিলাসী [illegible] থেকে গেছে। অথচ বহু [illegible] আসলে 'ফ্যান্টাসি' বা রূপকথার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সেখানে এই প্রশ্ন অবশ্যই আসবে না।

বিজ্ঞানী ও লেখক

আজকাল এতলোক বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী রচনা করছেন যে তাঁদের হিসেব রাখা অসম্ভব। অনেক প্রথিতযশা বিজ্ঞানীও এখন সায়েন্স ফিকশন লিখছেন, যেমন হয়েল, আসিমভ, ক্লার্ক প্রভৃতি। এমন কি এঁদেরও অনেক কাহিনী সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে এমন স্তরে পৌঁছেছে যে সায়েন্স ফিকশনের 'সায়েন্স'-টুকু নিতান্তই বুড়ি ছোঁয়া বলে বোধ হয়।

আগের যুগে যাঁরা এই জাতীয় কল্পকাহিনী লিখতেন, তাঁদের অধিকাংশই ঠিক বিজ্ঞানী ছিলেন না, কিন্তু বিজ্ঞানের তথ্যের প্রতি তাঁদের নিষ্ঠা ছিল অবিচল, কল্পনার বল্গা শ্লথ করলেও বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি তাঁরা যতদূর সম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন।

রামের আগে রামায়ণ

পারমাণবিক বোমা নির্মিত হবার বহু আগে এইচ জি ওয়েলস পারমাণবিক বোমার কথা লিখে গেছেন, রাম না হ'তে রামায়ণের মতো। যেদিন বিজ্ঞানীরা জানলেন বস্তুজগৎ আসলে ঘনীভূত শক্তি ছাড়া আর কিছু নয় এবং বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে, সেইদিনই এই সম্ভাবনা হয়তো অনেকের মনে উদিত হয়ে থাকবে, কিন্তু সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবার জন্য সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ের প্রয়োজন তা বোধ হয় ওয়েলসেরই মাত্র ছিল।

সায়েন্স ফিকশনে এমন দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তির দেহ থেকে মস্তিষ্ক বিচ্যুত করে শুধুমাত্র মস্তিষ্ককে বাঁচিয়ে রেখে তাকে কম্পিউটারের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। দেহের কোন ক্ষুদ্র কোষসমষ্টি বা 'টিস্যু' উপযুক্ত মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব এই সত্য বহুদিন আবিষ্কৃত হয়েছে। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী আলেক্সিস কারেল মুরগীর হৃৎপিণ্ডের কোষ বছর তিরিশেক বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কোষের এই অমরত্ব দেখে আর প্রয়োজন নেই বোধে এই পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করেন।

মস্তিষ্ক অত্যন্ত জটিল অঙ্গ। এবং দেহের অংশ যত জটিল হবে তাকে বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়ে রাখাও তত কঠিন। তবুও বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি বানরের মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন করে ৯৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন কৃত্রিম যন্ত্র সাহায্যে সঞ্চালিত রক্ত শোধন করে নিলে আরও বেশি সময় মস্তিষ্ক বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। সুতরাং মানুষের মস্তিষ্ক যে অনুরূপ অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিস্ময়কর কৃতিত্ব

এমন আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু তার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণীতে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখা গেছে বিশেষ করে একটি লেখকের রচনায়। তিনি হলেন আধুনিক বৈজ্ঞানিক কল্পকথার জনক ফরাসী লেখক জুল ভের্ন। তাঁর প্রথম বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাহিনীর শতবর্ষপূর্তি হয়ে গেছে গত বছর। ভের্ন সম্পর্কে বিশদতর আলোচনা যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক হবে আশা করা যায়।

জুল ভের্ন

জুল ভের্নের জন্ম হয় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে। ৩১ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর প্রতিভার কোন নিদর্শন দেখা যায় নি। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় হত বিশদ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহে। অচিরে তাঁর দুটি বিরাট ফাইল গড়ে উঠল, একটিতে বৈজ্ঞানিক তথ্য, অপরটিতে কাহিনী। এর উপর ভিত্তি করে তিনি আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে কয়েকটি রচনা জনৈক প্রকাশকের কাছে পাঠান। প্রকাশকের
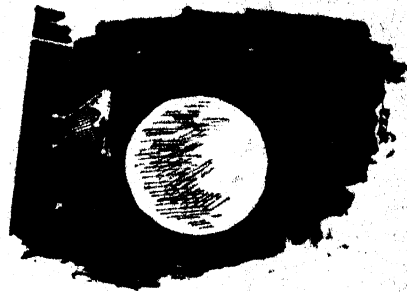
মহাকাশ বিচরণ

নির্দেশে পুনর্লিখিত হয়ে তথ্য ও কাহিনীর সমন্বয় ঘটল 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ' নামক পুস্তকে। বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে।

চালনক্ষম বেলুন

এই বইয়ে চালনক্ষম বেলুনের কথা প্রথম বলেন ভের্ন। তিনি অবশ্য বেলুনকে বশে চালাবার যে উপায় বলেন সেটি যথেষ্ট বিপজ্জনক। তাছাড়া এযুগে বশেচ্ছ চালনক্ষম বেলুনের কোন উপযোগিতা আছে বলে মনে হয় না। ভের্ন-এর বেলুন জাঞ্জিবার থেকে পশ্চিম আফ্রিকার সেনেগাল পর্যন্ত

...হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ বেলুন 'দি স্মল ওয়ার্ল্ড' প্রথম পাঁচজন আরোহী নিয়ে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হয়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ভের্ন অপর একটি বইয়ে পুনরায় আকাশ-ভ্রমণের প্রসঙ্গে ফিরে এসেন। ইত্যবসরে বেলুন সম্পর্কে তাঁর ধারণার সম্ভবতঃ পরিবর্তন হয়েছিল। সুতরাং তাঁর আকাশযান 'আলবাএস' এবার আর বেলুন রইল না হল আধুনিক এরোপ্লেনের মতো বাতাসের চেয়ে ভারি যন্ত্র। যন্ত্রটিকে যথাসাধ্য হালকা এবং দৃঢ় করবার জন্য কল্পনা করা হল স্তরের পরে স্তর কাগজ জুড়ে তা নির্মিত। এই ধরণের গঠন প্রণালী এখন ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অবশ্য কাগজ দিয়ে নয়। আলবাএসের সামনে পিছনে পাখা ছিল তাকে চালাবার জন্য, আর হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখবার জন্য উর্ধমুখে ৭২টি পাখা। যানের আকৃতি জাহাজের মতো। ভের্নের প্লেনের দৈর্ঘ্য ছিল ১০০ ফুট, প্রস্থ ১২ ফুট আর সর্বোচ্চ বেগ ছিল ঘন্টায় ১২৫ মাইল। এই হেলিকপটার ও প্রপেলার-যুক্ত এরোপ্লেনের সমন্বয় দেখা গেল ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ 'ফেয়ারী রোটো-ডাইনে'। ভের্ন প্রায় সর্বত্রই বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়েছেন, কিন্তু বর্তমান কালে প্লেন চালাবার কাজে বিদ্যুৎশক্তি এখনও ব্যবহৃত হচ্ছে না। 'ফেয়ারী রোটোডাইনের' সর্বোচ্চ বেগ ছিল ঘন্টায় ১৯৫ মাইল।

ত্রিচর যান

ভের্ন আর একটি যানের বর্ণনা দিয়াছেন যা জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে বিচরণ করতে পারে। তার 'মেত্র্ দ্য ম'দ' (পৃথিবীর অধীশ্বর) গ্রন্থে এই ত্রিচর যান এপুভাঁত-এর উল্লেখ আছে। কৌতূহলের বিষয় আকাশে চলবার সময় পাখি বা পতঙ্গের মতো ডানা নেড়ে এপুভাঁত অগ্রসর হত। এই ধরণের আকাশ যানকে এখন অর্নিথপ্টার (অর্নিথস-এর অর্থ পাখি) বলা হয়। এই জাতীয় এরোপ্লেন এখনও পরীক্ষাধীন। আর কোন ত্রিচর যান এখনও তৈরি হয় নি, সম্ভবত প্রয়োজনের অভাবেই, নইলে তৈরি কিছু অসম্ভব নয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চেষ্টা হয়েছিল। আধুনিককালে উভচর যান ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষত যুদ্ধের প্রয়োজনে।

মহাকাশ বিচরণ

ভের্নের ভবিষ্যদ্বাণী এবং হিসাব সবচেয়ে বেশি মিলেছে সাবমেরিন এবং মহাকাশ-বিচরণের ক্ষেত্রে। ভের্নের 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' এবং 'চাঁদের চতুর্দিকে পরিভ্রমণ' বই দুটি পড়েন নি বাংলা দেশে এমন শিক্ষিত ব্যক্তি বোধ হয় বেশি নেই। প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৫তে এবং পরেরটি ১৮৭০। এখানে এ কথা উল্লেখযোগ্য যে, মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করছেন ১৯৭০ নাগাদ মানুষ প্রথম চাঁদে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। রুশদের সাম্প্রতিক উক্তি থেকে মনে হয় এ নিয়ে তাঁরা আর এগোবেন কিনা সন্দেহ। যেই আগে যাক এই প্রত্যাশিত ঘটনা যে আগামী অনেক বছরের মধ্যে ঘটবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভের্ন অবশ্য চাঁদের মাটিতে কাউকে নামান নি, শুধু চারিদিকে ঘুরিয়ে এনেছেন।

জানালা দিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীকুল পর্যবেক্ষণ

কোন বস্তু কত বেগে উৎক্ষেপ করলে তা পৃথিবীর আকর্ষণ ছিন্ন করে যেতে পারবে ভের্ন তাঁর নিখুঁত হিসেব দেন। যাত্রার পূর্বে ১০ থেকে পিছনে গণার পদ্ধতি—যাকে ইংরেজিতে 'কাউন্ট ডাউন' বলা হয়—এটিও ভের্নের উদ্ভাবনা, আধুনিক নয়। প্রায় ১০০ বছর আগে ভের্ন মত প্রকাশ করে গেছেন চাঁদে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। আজকের বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। তিনি স্পেস-স্যুটের আলোচনা করে মনে করেন এতে বিশেষ সুবিধে নেই। ভারহীনতার অবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য বিপরীত মুখী রকেটের ব্যবহার তাঁর রচনায় পাওয়া গেছে। তবে কামানের গোলায় চড়ে মহাকাশ যাত্রা সম্ভব নয়।

পিছনে বিস্ফোরণের চাপ আর সামনে বাতাসের প্রতিরোধে গোলা একেবারে চেপ্টে যাবে।

সমুদ্রের তলায়

ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রচনা 'সমুদ্রের তলায় বিশ হাজার লীগ'। সাবমেরিন 'নটিলাস' এবং তার মালিক ও পরিচালক ক্যাপ্টেন নিমোর দুঃসাহসিক কার্যাবলী বহুদিন থেকে আবালবৃদ্ধবনিতার মনোরঞ্জন করে আসছে। এইটিই বোধ হয় ভের্নের সর্বাধিক জনপ্রিয় রচনা।

'সমুদ্রের তলায় বিশ হাজার লীগ' প্রকাশিত হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে। তখন সাবমেরিন একেবারে তৈরী হয় নি এমন বলা যায় না। এদের চালাবার কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা ছিল না... এবং চালাতে গিয়ে অনেকেই সলিলসমাধি লাভ করেন। সে যুগে সাবমেরিন একটি বিপজ্জনক বৈজ্ঞানিক খেলনা মাত্র ছিল বললে খুব ভুল হবে না। প্রথম প্রেষিত বাতাস দিয়ে চালিত সাবমেরিন নির্মিত হয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে। ভের্ন সম্ভবতঃ এই যন্ত্রের বিবরণ জানতেন। তাঁর কল্পিত নটিলাস এর চেয়ে সবদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। নটিলাসের বর্ণনা অনুযায়ী তা ছিল বেলুনাকার, দুই প্রান্ত শংকুর মতো, মোট দৈর্ঘ্য ২৩০ ফুট, প্রস্থ ২৬ ফুট, অপসরণ-ক্ষমতা ১৫০০ টন। একটি খোলের উপর আর একটি খোল জোড়া, মধ্যের স্থান জল দিয়ে পূর্ণ করা যায় জলের নিচে নামবার জন্য। সিলিণ্ডারে ভর্তি করে প্রেষিত বাতাস রাখা হত নাবিকদের শ্বাসকার্যের প্রয়োজনে। নিমজ্জিত অবস্থায় ডুবুরিদের প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের জন্য জলাভেদ্য বাতাস-লকের ব্যবস্থা ছিল। সাবমেরিনের গায়ে ছিল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরু কাঁচের জানালা। জানালা দিয়ে সমুদ্রিক প্রাণিকুলের পর্যবেক্ষণ এবং আলোক চক্ষু গ্রহণ চলত। সাবমেরিন চালনা, রান্না, পানের জন্য সামুদ্রিক জলের পাতন, সার্চলাইট জ্বালান এবং প্রতিরক্ষণ প্রভৃতি সব কাজে বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হত।

উল্লেখযোগ্য যে জৈব বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সাবমেরিন ব্যবহৃত হয় মাত্র ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। রুশ সাবমেরিন 'সেভেরইয়াংকা' হেরিং মৎস্যকুলের আচরণ সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ৪০০০ মাইল দীর্ঘ পাড়ি দেয় এই সময়ে।

আসল নটিলাস

মার্কিন নৌবিভাগের প্রথম পরমাণু-শক্তি-চালিত সাবমেরিন-এর নামও দেওয়া হয় 'নটিলাস'—আর ভের্ন কল্পিত যন্ত্রের আশ্চর্য মিল দেখা গিয়েছে। এটিতেই প্রথম সাবমেরিনের সব কাজ বিদ্যুৎশক্তি সাহায্যে চালান হয়েছে। ক্যাপ্টেন নিমোর দক্ষিণ মেরুর পৌঁছনর অভিজ্ঞতার সঙ্গে এযুগের নটিলাসের অধ্যক্ষ অ্যান্ডারসনের উত্তর মেরুতে পৌঁছনর অভিজ্ঞতার মধ্যে যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। অ্যান্ডারসন উত্তর মেরুতে পৌঁছান ৪ঠা আগস্ট, ১৯৫৮।

বহুরূপী

রনজিৎকুমার সেন

চিরকাল গান-বাজনা ভালোবাসি। কোথাও কোনো আসর বসলে কচিৎ কখনও নিমন্ত্রণও পেয়ে যাই। উপভোগ্য পরিবেশে যতখানি আনন্দ কুড়িয়ে নেবার নিয়ে তবে আবার ঘরে ফিরি। কিন্তু সেদিন ডিহী শ্রীরামপুরের এক সঙ্গীত-আসরে গিয়ে গান না শুনেই আমাকে উঠে আসতে হলো। অথচ প্রথম সারিতেই ভালো আসন পেয়ে বেশ গোল হয়ে বসে কেবল দু' খিলি পান মুখে পুরেছিলাম। হঠাৎ নজর গেল তবলচির দিকে। মনে হলো খুব পরিচিত আমার; কবে যেন কোথায় দেখেছি, কিন্তু এখন ঠিক মনে করতে পারছি না।

প্রথমটা চোখ বুজে বোধ করি সুরের আবেশে ভাবাবিষ্ট হয়েই সে বাঁয়া-তবলায় চাটি মারছিল। হঠাৎ চোখ খুলতেই তার দৃষ্টি এসে ঠিকরে পড়লো আমার মুখের উপর। এবারে আমার মতই অবাক-বিস্ময়ে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে আমার মুখের দিকে; বোধ করি সেও আমাকে স্মরণে আনতেই চেষ্টা করছিল। ততক্ষণে আমি তার দিক থেকে চোখ নামিয়ে নিয়েছি। এইভাবে প্রাথমিক একটা কনসার্টের সঙ্গে কোনোভাবে সংগত করে অন্যের হাতে বাঁয়া-তবলা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ সে ডায়াসের উপর উঠে দাঁড়ালো তারপর এক সময় উইংসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি অপাঙ্গে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে স্পষ্ট তার অন্তর্ধান লক্ষ্য করলাম। কিন্তু তখনও মনে করতে পারলুম না যে কোথায় তাকে দেখেছি, কোথায় কবে কেমন করে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে।

হঠাৎ পেছন থেকে কার যেন হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম। ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়লো তবলচিকে। ডায়াস ছেড়ে সে তবে আমারই উদ্দেশ্যে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে এখানে? কানের কাছে মুখ এনে বললো : 'আপনি ফরিদপুরের মাণিক মিত্র তো?'

স্বীকৃতি জানিয়ে বললাম : 'আপনার নামটা কিন্তু ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না!'

এবারে দু'হাতে আমার একখানি হাত চেপে ধরে তবলচি বললো : 'আসুন, একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। আপনার সংশয় কাটতে দেরী হবে না।'

ইচ্ছে না থাকলেও তার সঙ্গে উঠে গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে দাঁড়ালাম।

তবলচি বললো : 'আজ্ঞে—আমি সনাতন দাস। ফরিদপুরে থাকতে আপনাদের কত বহুরূপীর সাজ দেখিয়েছি, মনে নেই?'

—'ও — তাই বলো! আমার এতক্ষণ তাই খুব চেনা - চেনা লাগছিল, অথচ কোথায় কবে দেখেছি, ঠিক মনে পড়ছিল না।' বলে সনাতনের মুখের দিকে চোখ দু'টোকে তুলে ধরলাম।

সনাতন বললো : 'এতকাল দেশের উপর দিয়ে যে সব ঘটনা ঘটে গেল, তার মধ্যে আমার মতো ছোটখাটো লোককে মনে না থাকবারই কথা। কিন্তু আপনাকে একবার দেখেই আমি ঠিক চিনে ফেলেছি দাদাবাবু তাই আর বাঁয়া-তবলা নিয়ে বসে থাকতে পারলুম না, উঠে এলাম।'

তার কথার জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়ে এবারে কিছুক্ষণ থামতে হলো আমাকে। কম দিনের কথা নয়, প্রায় আঠারো বিশ বছর তো হলোই বটে। স্মৃতি রোমন্থন করে সনাতনের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপের সূত্রটা মনে মনে একবার আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলাম।

—ফরিদপুর শহরে ভাড়া দেবার মতো আমাদের ছোট ছোট কিছু চালা-ঘর ছিল। যারা ভাড়াটে থাকতো, তাদের কিছু পাইকার, কিছু বা ফড়ে ব্যাপারী। সেবার এক ফড়ে উঠে যাবার পর একটি লোক এলো বাবার কাছে মাত্র পনেরো দিনের জন্যে নতুন ভাড়া চেয়ে। আমি পাশেই ছিলাম। বাবা জিজ্ঞেস করলেন : 'পেশা কি?'

লোকটি বললো : 'আজ্ঞে বহুরূপী।'

এই সেই সনাতন দাস।

বাবা বললেন : 'ভাড়া দিতে আপত্তি নেই,

ভারতীয় পাঠকের দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেন নিমোর বৃহত্তর আকর্ষণ তিনি আসলে ছিলেন একজন ভারতীয় নৃপতি এবং সুযোগ পেলেই ব্রিটিশ জাহাজ ধ্বংস করতেন।

বিষ-গ্যাস ও ক্ষেপণাস্ত্র

ভের্নের আরও কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক ভবিষ্য দৃষ্টির উল্লেখ করা যাক। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি পুস্তকে বিষ-গ্যাস ও পাঁচ-ফুট ব্যাসবিশিষ্ট বিশাল কামানের বর্ণনা আছে। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত বিগ্‌ বার্থা কামান বিগ বার্থা'র সঙ্গে এই কামানের বেশ খানিকটা মিল দেখা যায়। আরও কৌতূহলের ব্যাপার ঐ বিষ-গ্যাস ও বৃহৎ কামান নির্মিত হয় হের শুলৎসে নামক জনৈক জার্মান দ্বারা। হের শুলৎসের [illegible] সঙ্গে হের হিটলারের [illegible] মিল বর্তমান।

...১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তাঁর ইংরেজিতে লেখা একমাত্র পুস্তক '২৮৮৯ সাল' প্রকাশিত হয়। এতে আটলান্টিক মহাসাগর পারাপারে টেলিভিশন সংযোগের উল্লেখ আছে। গ্রহান্তরে অভিযানের উল্লেখও এই বইটিতে পাওয়া যায়। স্বতচল রাস্তার বর্ণনাও তিনি দিয়ে গিয়েছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত একটি রচনায় জনৈক উন্মার্গগামী প্রতিভাবান ফরাসী বিজ্ঞানী নিখুঁত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করেন এবং এমন এক বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন যে, তের মাইল ব্যাসের মধ্যে সকল প্রাণী এই বস্তুর বিস্ফোরণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও এমন বিস্ফোরকের কল্পনা সত্যিই বিস্ময়কর। টেলিগ্রাফের সাহায্যে পিয়ানোর স্বর দূরে প্রেরণ, স্বয়ং-প্রসারণশীল লাইফ-জ্যাকেট এবং তাতে পালের ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপগ্রহ, স্কাইস্ক্রেপার প্রভৃতি নানা বিচিত্র বিষয়ের সন্ধান তাঁর রচনায় পাওয়া যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রকৃত বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বিশ্লেষণশীল মানসের অধিকারী বর্তমান বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি দৃষ্টে ভবিষ্যতের একটা সম্ভাব্য ছবি দিতে পারেন। অবশ্য সব সায়েন্স-ফিকশন এই ধরণের নয়, কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদৃষ্টি নয়, বিনোদন মাত্র। তবুও একদিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী যেমন রস আহরণ করে বিজ্ঞান থেকে, বিজ্ঞানীরাও তেমনই বহু প্রয়োজনীয় ধারণা পেতে পারেন এই সব কাহিনী থেকে।

——

[illegible] ভাড়াটা পুরো একমাসেরই চাই এবার [illegible]।'

[illegible] ইতস্ততঃ-করে শেষে [illegible] রাজি হলো।

[illegible] বয়স হলেও দেখলাম—[illegible] যৌবনের দ্যুতি আছে। আমি নিজে গিয়ে তাকে ঘর খুলে দিলাম। সনাতন বললো ঃ সারাদিন আমার কিছু কাজ থাকবে না, যদি মাঝে মাঝে এসে দেখা দেন দাদাবাবু, তবে একা একা আর কষ্ট পাবো না।'

দু'একদিন কেটে গেলে এক সময় জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'তুমি কখনও থিয়েটার করেছ?'

সনাতন বললো ঃ 'সে কি একবার? থিয়েটারে এ পর্যন্ত অন্ততঃ দু'শো বার নেমেছি। মেল ফিমেল—কোনো রোলই বাদ নেই। কিছু মেডেলও পেয়েছি।'

বললাম ঃ 'তা হলে থিয়েটারে থাকলেই তো পারতে! খ্যাতিও ছিল, পয়সাও ছিল।'

—'অদৃষ্টে ঘটলো না।' সনাতন বললো ঃ 'যে কোম্পানীতে ছিলাম, হঠাৎ লিকুইডিশনে গিয়ে সব তচ্‌নচ্‌ হয়ে গেল। নতুন কোথাও গিয়েও সুবিধে করতে পারলুম না। তাই ও-পথে নমস্কার দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম।'

জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'নিজের পায়ে মানে বহুরূপীর এই সাজ দেখিয়ে?'

সনাতন বললো ঃ 'না, এর আগে এক ঢপের দলে গিয়ে ভিড়েছিলাম, কিন্তু বেশীকাল ভালো লাগলো না বলে নিজে থেকেই ছেড়ে চলে এলাম।'

—'তারপর থেকেই এই সাজ দেখাতে সুরু করলে?'

—'এ ছাড়া আর কি করতে পারতাম?' সনাতন বললো ঃ 'সংসারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেবার দায় যে বড় দায়।'

জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'কে কে আছে তোমার সংসারে?'

সনাতন বললো ঃ 'এক বিধবা পিসী, আমার স্ত্রী আর একটি মেয়ে। নিজে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে পয়সা রোজগার করে কিছু কিছু বাড়িতে পাঠাই, তবে সকলের মুখে অন্ন জোটে।'

একথার পর কিছু একটা যে বলবো, এমন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এরকম ছোটখাটো আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে সনাতনের সঙ্গে ক'দিনের মধ্যেই আমার পরিচয়টা দিব্যি গাঢ় হয়ে উঠলো। উঠবার প্রধান কারণ হলো ওর সাজ সম্পর্কে আমার অনুসন্ধিৎসা। কিন্তু সনাতনের মেক-আপের সময়ে লক্ষ্য করে দেখতাম—নিজেকে ও সম্পূর্ণ আড়াল করে নিতো। নেবার হয়তো প্রয়োজন ছিল।

দেখলাম—ক'দিনের মধ্যেই সারা শহরে বিপুল সাড়া এনেছে সনাতন। আমাদের বাড়ির উঠোনেই লক্ষ্য করে দেখেছি—কোনোদিন রাজরানী, কোনোদিন ঝাড়ুদার, কোনোদিন দেবী দুর্গা, কোনোদিন স্বামী-পরিত্যক্তা কুলবধূ, কোনোদিন বা তাড়কা রাক্ষসীর সাজ নিয়ে অপূর্ব অভিনয় করে গেল সনাতন। অদ্ভুত বৈচিত্র্য, অদ্ভুত ব্যঞ্জনা। কোনো ক্ষেত্রেই নকল সাজ বলে ধরবার উপায় নেই। স্বামী-পরিত্যক্তার ভূমিকা নিয়ে এসে বিলাপ করে করে এমনভাবে নিজের অদৃষ্টের পরিহাসে কেঁদে গেল যে, দেখে শুনে মেয়েদের মনে করুণার সঞ্চার হতে দেরী হলো না। কোন্‌ বাড়ির কোন বউ যেন এগিয়ে এসে স্পষ্টই বললো ঃ 'এমনি মা পারোতো অমন সোয়ামীর বিরুদ্ধে দাও না আদালতে কেস ঠুকে। যেমন বেহায়া পুরুষ-মানুষ তেমনি শিক্ষা হোক্‌। আমার বন্ধাটিকেও ইদানীং কেমন যেন সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমি তোমার মতো অমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে মেয়েমানুষ নই বাপু, এমন-তেমন দেখলে দেবো না আগুনে জ্বালিয়ে সব!' কিন্তু সপ্তাহ খানেক বাদে সনাতন যখন বক্‌শিস চেয়ে এসে হাত পেতে দাঁড়ালো, সব জেনেশুনে বউটি লজ্জায় আর তখন মুখ দেখাতে পারে না।

এক সময় গিয়ে সনাতনকে বললাম ঃ 'বেশ তো জমিয়েছ, তা বাবুদের বাড়ি থেকে ভালো পয়সাকড়ি পাচ্ছো তো?'

সনাতন বললো ঃ 'ভালো আর কবে কি পেলাম! পরিশ্রমের পয়সা কোনোদিন ওঠে না। তবে কোনোভাবে চলে যায়, এই পর্যন্ত।'

কিন্তু সনাতন তার প্রোগ্রাম মতো পনেরোটা দিনও শহরে টিকতে পারলো না। তার তাড়কা-রাক্ষসীর সাজটা ছিল সবচাইতে মারাত্মক। রাত্রে মশাল হাতে মশালের মুখে ধুনো ওড়াতে ওড়াতে চিৎকার করে এসে পড়তো এক-এক বাড়িতে। যেমন বীভৎস সাজ, তেমনি ভয়াবহ রূপ। হঠাৎ দেখে আমার নিজেরই ভয় করতো। থানার ও-সি'র বাচ্চা মেয়ে তাড়কা রাক্ষসীর এই বীভৎস কদাকার মূর্তি দেখে হঠাৎ দাঁতকপাটি লেগে মূর্ছা গেল, তিন দিনের মধ্যেও আর জ্ঞান ফিরলো না। তাই নিয়ে শহরময় হুলুস্থূল। শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট অর্ডার দিল—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহুরূপীকে শহর ত্যাগ করে যেতে হবে; অন্যথায় তাকে গ্রেপ্তার করা হবে।

শুনে হঠাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসলো সনাতন। অভিনয় যেমন জমিয়েছিল, তাতে আশা ছিল পনেরো দিনের বদলে পুরো একটা মাস অন্ততঃ সে শহরে সাজ দেখিয়ে কিছু মোটা রোজগার করতে পারবে। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলো।

বললাম ঃ 'একবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা জানিয়ে বলো—রাক্ষসীর সাজ তুমি আর দেখাবে না। তবে হয়তো তোমাকে বহিষ্কারের অর্ডার তিনি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।'

কিন্তু সনাতন সাহস করলো না। ফলে তাকে একরকম প্রাণের দায়েই শহর ছেড়ে চলে যেতে হলো। যাবার আগে বাবার হাতে কাড়ার-গণ্ডার ঘর ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে সনাতন বললো ঃ 'এবারে বিদেয় হই দাদা-বাবু। এসে আপনাকে মাঝে মাঝে কাছে পেয়ে বেশ কাটছিল সময়গুলো; কিন্তু আর টেকা গেল না এখানে। বেঁচে থাকি তো আবার কোনোদিন কোথাও হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে।'......

সেই দেখা এই এতদিনে হলো। কে আর মনে রেখেছিল তাকে? এরকম কত লোকই তো এলো গেল, কত ভাড়াটেই তো কাটিয়ে গেল আমাদের সেই চালা-ঘরে, এমন কিছু-একটা ঘটনাবহুল ব্যাপারই নয় যে, সনাতনকে এই এত বছর ধরে স্মৃতিতে [illegible] করে রাখবো! কিন্তু স্মৃতি ফিরে এলো—যখন ডায়াসে ব[illegible] তাকে তবলায় চাটি দিতে দেখলাম। ত[illegible] আশ্চর্য সনাতনও অদ্ভুতভাবে চিনে ফেল[illegible] আমাকে।

বললাম ঃ 'সত্যিই তা হলে তোমার সং[illegible] আবার দেখা হয়ে গেল!'

সনাতন বললো ঃ 'হয়ে গিয়ে বোধ ক[illegible] ভালই হলো! অন্ততঃ এমন একটা নির্ভরশী[illegible] পরিচিত জায়গা পাওয়া গেল—যেখানে অকপ[illegible] নিজের কথা খুলে বলতে সঙ্কোচ নেই।'

জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'কেন, কিছু বলব[illegible] আছে?'

সনাতন বললো ঃ 'কিছুই যে বলা হয়নি[illegible] ফরিদপুর ছেড়ে চলে আসার পর থে[illegible] এজীবনে যত ঘটনা ঘটলো, তা যদি লিখ[illegible] পারতাম, তবে হয়তো একটা মস্তবড় বই হতে[illegible] কিন্তু কোনোদিন লেখাপড়া তো শিখি[illegible] জীবনটা তাই গাড়ীর চাকার মতো গড়া[illegible] গড়াতে এসে এখন বুঝি একেবারেই থে[illegible] পড়ে!'

জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'কেন, সাজটাজ এ[illegible] আর দেখাচ্ছো না? বাড়ির সবাইকে নিয়ে এখ[illegible] কলকাতাতেই আছো তো?'

বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন ক[illegible] নিয়ে সনাতন বললো ঃ 'আজ আর আমার কে[illegible] নেই দাদাবাবু, সব গেছে, সব ভেসে গেছে[illegible] মায়ের মতো যে পিসী স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখে[illegible] ছিল সংসারটাকে, কালাজ্বরে ভুগে ভুগে অস্থি[illegible] সার হয়ে সেই পিসী একদিন শেষ নিঃশ্বা[illegible] ফেললো। তারপর হঠাৎ একদিন কলেরা[illegible] আক্রান্ত হয়ে আমার স্ত্রী চোখ বুজে চ[illegible] গেল। তার আগেই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলা[illegible] কিন্তু মেয়ে আমার এমনই ভাগ্যবতী যে, দে[illegible] বছর ঘুরতে না ঘুরতে শাখা-সিঁদুর খুই[illegible] পেটে বাচ্চা নিয়ে ফিরে এলো।' বলে অতি[illegible] দুঃখে একবার শ্মশান-হাসি হাসলো সনাত[illegible] তারপর পুনরায় বললো ঃ 'মনে করলাম জামা[illegible] না থাকলেও নাতিকে কোলে পেয়ে তার ম[illegible] দিয়েই জামাইকে অন্ততঃ মনে মনে ফিরে পাবে[illegible] কিন্তু বিধাতা বোধ করি আমার এতবড় ইচ্ছে[illegible] সহ্য করলেন না। প্রসব হতে গি[illegible] মেয়ে এবং নাতি দুজনকেই হারালাম[illegible] গরীবের সংসারে যারা ছিল আমার সোনা[illegible] প্রতিমা, তারা যখন কেউ আর রইল না, তখ[illegible] ভাবলাম—কার জন্যে পরিশ্রম করে দরজা[illegible] দরজায় ঘুরে সাজ দেখাবো? ছেড়ে দিলা[illegible] তাই বহুরূপীর পেশা। এককালে বাঁয়[illegible] তবলায় কিছু তালিম নিয়েছিলাম, কলকাতা[illegible] এসে ভাবলাম—কোথাও যদি দু'হাত বাজি[illegible] কিছু পাই, তাতেই আমার এ পোড়া পে[illegible] চলে যাবে। কিন্তু আজ তাও বুঝি যায় [illegible] দাদাবাবু। বাজাতে বসলেই আজকাল আঙ্গু[illegible] গুলো কিরকম যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে, কে[illegible] যায় তাল। আজ আমি আর নিজের ভার[illegible] বইতে পারছি না দাদাবাবু। আমার কি উপা[illegible] হবে?'

সনাতনের অদৃষ্টের কথা শুনে দুঃখ[illegible] হচ্ছিল। জীবনে কত না রূপের মধ্য দিয়ে[illegible] চলতে হয়েছে সনাতনকে, একদিন তাই বহ[illegible] রূপীর সাজ তাকে কিছুই [illegible] আনিয়েছিল। আ[illegible] তবলায় চাটি [illegible] দিয়ে যে চাটি বাজি[illegible]

নিগ্রো কণ্ঠস্বর

কৃষ্ণ ধর

কৃষ্ণ মানুষের প্রতি করুণা দেখানোর কথা যাঁরা ভাবেন তাঁরা নিজেদের প্রতারিত করেন। আফ্রিকা কিংবা আমেরিকার যে-অধিবাসীরা কৃষ্ণবর্ণ তাঁরা কারো করুণার অপেক্ষা করেন না। ভারতীয়দের মধ্যে নিগ্রোদের প্রতি সহানুভূতি আজকাল রাজনৈতিক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিগ্রো জাতি বা তাদের সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে এই সহানুভূতির জন্ম হয়েছে কিনা সন্দেহ। যেহেতু আফ্রিকার সঙ্গে ভারতীয়দের যোগাযোগ ব্যবসায়িক লেন-দেনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। গান্ধীজীর সংগ্রামের কথা নিশ্চয়ই আফ্রিকান নেতাদের মনে আছে। তিনি কৃষ্ণ মানুষের জন্যই শুধু সংগ্রাম করেননি, মানুষের জন্যই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন এবং জিতেছিলেন। কিন্তু তারপর অন্যান্য ভারতীয়রা আফ্রিকার কৃষ্ণ মানুষের মর্যাদার জন্য খুব বেশি ভেবেছেন বলে মনে হয় না। সেজন্যই আফ্রিকার নূতন-জাগা দেশগুলিতে এশিয়ান, বিশেষ করে ভারতীয়দের খুবই অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে। তাদের পুরনো জীবনযাত্রার সঙ্গে নূতন আফ্রিকার জীবনযাত্রার অনেকখানি ফারাক। কৃষ্ণ মানুষের হাতে ক্ষমতা এসেছে। নূতন জাগরণের জোয়ারে একটু আতিশয্য থাকবেই। একজন বিদেশী পর্যটক সম্প্রতি আক্ষেপ করে বলেছেন, আফ্রিকাতে এখন গায়ের রঙ কালো না হওয়া একটা অপরাধ। বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রোরা সংগ্রাম করেছেন, এখনো করছেন। তবে জাতীয়তাবাদের উন্মত্ততায় তাঁরা প্রথমদিকে বিপরীত দিক থেকে বর্ণ-বৈষম্যের পরিচয় যদি দেন তাহলে আমরা মর্মাহত হতে পারি, কিন্তু বিস্মিত হব না। ইতিহাস তার প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

তবু এই আশা করা যায় যে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। নিগ্রো জাতি যে অপমান সহ্য করেছে, সে-অপমান অ-নিগ্রোদের ওপর তারা ছুঁড়ে দেবে না। আফ্রিকা তার পার্সোন্যালিটি খুঁজে পাবে। এই পার্সোন্যালিটি বর্ণ-সহিষ্ণুতার কথা বলবে, প্রতিশোধের বা অসহিষ্ণুতার কথা নয়। কৃষ্ণ মানুষের আজ দুই মহাদেশ। তার মাতৃভূমি আফ্রিকা আর তার পরবাস আমেরিকা। অতলান্তিকের দুই পারে একই চেতনা, একই বেদনা একসূত্রে আবদ্ধ। আফ্রিকার জাগরণ আমেরিকার নিগ্রোদের মনে প্রবল সাহস জুগিয়েছে। আফ্রিকার প্রতি তাদের আকর্ষণ প্রবল। অনাদি জননীর মতো আফ্রিকার নিরক্ষ সূর্য আমেরিকার নিগ্রোদের মনের অঙ্গারকে প্রজ্বলিত করে তুলেছে। আফ্রিকার এক একটি দেশ স্বাধীন হচ্ছে, আর তার ঢেউ গিয়ে লাগছে আমেরিকায়। আফ্রিকার নিগ্রোদের সম্পদ নেই, আছে সম্ভাবনা। তবু বিশাল নিগ্রো জাতি স্বাধীন হয়েছে, বর্ণ-বৈষম্যপীড়িত আমেরিকান নিগ্রোদের কাছে এর চেয়ে সুসংবাদ আর কিছু নেই।

নিগ্রো জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে অ-নিগ্রোদের আগ্রহ বেড়েছে। বাংলাদেশে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের যখন দাস হিসেবে নিয়ে গিয়ে আমেরিকায় বিক্রী করা হত, তখন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা, ইংরেজী-শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল গ্রুপ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ডিরোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের নেতা। তাঁর প্রেরণাতেই নিগ্রো জাতির মানবিক মর্যাদার জন্য উনিশ শতকের বঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা দাবী জানিয়েছিলেন। বাংলার রেণেসাঁসের বহুবিধ সুকর্মের মধ্যে এই অন্তর্জাতিক মানবতাবোধর সঙ্গে একাত্মতা অন্যতম।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। মুসোলিনী তাঁকে তুষ্ট করার জন্য অনেক ছলকলার আশ্রয় নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বুঝতে পেরেছিলেন, মুসোলিনীর একহাতে ফুলের তোড়া, অন্য হাতে মেশিনগান এবং সে অস্ত্রে আফ্রিকার মানুষের সর্বনাশ করছেন, তখন তাঁর দীপ্তকণ্ঠ উচ্চারণ করেছিল সেই মহৎ কবিতা 'আফ্রিকা'। নিগ্রো জাতি এই কবিতার খবর রাখে। ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে ভারতবর্ষের এই অপরাজিত কণ্ঠ আফ্রিকার কৃষ্ণ মানুষদের মন স্পর্শ করেছে। বাংলাদেশের দুই জেনারেশন আফ্রিকার বেদনাকে বুঝেছে রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে। মানহারা মানবীর সে-অপমানের অশ্রু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাঙালীকে উদ্দীপ্ত করেছে নূতন সঙ্কল্পে।

আজকে আমরা আফ্রিকার নিজের কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। আফ্রিকান ভাষা আমরা জানি না। আমেরিকার নিগ্রোদের ভাষা ইংরেজী। তার কথা প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে তাদের যাঁরা স্বাধীনতা, শান্তি ও একতার আদর্শের কথা ভাবেন। আফ্রিকার নিগ্রোরা নিজেদের ভাষাতেও লিখছেন, কিন্তু বেশি লিখেছেন শাসকদের ভাষায়। বৃটিশ উপনিবেশের নিগ্রোরা লিখেছেন ইংরেজী ভাষায়, ফরাসী ভাষায় লিখেছেন ফরাসী

অদৃষ্টে গিয়েই লাগছে, তাই বাঁয়া-তবলাও আজ আর তাকে টেনে রাখতে পারছে না।

ওপাশ থেকে কানে ভেসে এলো—কে যেন মূলতানে আলাপ ধরেছে, তবলায় ঠেকা পড়ছে মৃদুমন্দ। কিন্তু সনাতনের জীবনকাহিনী শোনার পর আর ইচ্ছে হলো না ফিরে গিয়ে গানের আসরে বসতে। পকেট থেকে দশ টাকার একখানি নোট বার করে সনাতনের পকেটে গুঁজে দিয়ে বললাম : 'কিছু মনে কোরো না সনাতন, ডাক্তার দেখিয়ে একটু ওষুধ-পত্তর খাও, দেখবে—নিশ্চিত তুমি ভালো হয়ে গেছ। যাও, আসরে গিয়ে বসো, আমি চলি।'

অস্ফুট কণ্ঠে সনাতন বুঝি একবার বলতে চাইল : কেন, আপনি যাবেন না?'

কিন্তু সে কথার কিছু একটাও আর জবাব না দিয়ে আমি পা দুটোকে দ্রুত চালনা করে সোজা পথে বেরিয়ে পড়লাম।

কমিউনিটির নিগ্রো অধিবাসীরা। এ্যাঙ্গোলার নিগ্রোরা পর্তুগীজ ভাষা ব্যবহার করছেন তাদের সাহিত্য প্রকাশের জন্য। আমাদের কাছে নিগ্রো সাহিত্যের বিশেষ আবেদন আছে। এই আবেদন শুধু রাজনৈতিক সমধর্মিতার নয়। নিগ্রো দৃষ্টি-ভঙ্গির সঙ্গে প্রত্যেক দেশের অপমানিত মানুষের সমধর্মিতা থাকবে, এ আশা করা অযৌক্তিক নয়। নিগ্রোরা যে মানুষ একথা তাদের শাসকরা স্বীকার করতে চায়নি। মানুষকে তারা পণ্য করে রেখেছিল। সেই মানুষ যখন কথা বলতে শিখেছে তখন তার রক্তে ক্রোধ ও ঘৃণা টগবগ করে ফুটেছে। নিগ্রো কবিতার মধ্যে এই উত্তাপের সুর আছে। তার মধ্যে এখনও সে-প্রশান্তি আসেনি যা দীর্ঘদিন মুক্ত সমাজে বাস করলে শিল্পের প্রকরণে একাত্ম হয়। সেজন্য আমরা আক্ষেপ করি না। তার অপমানের ইতি-হাস এত দীর্ঘ, এত প্রবল, এত রক্তাক্ত যে এই উত্তাপ না থাকলেই বরং আমরা বিস্মিত হতাম।

আমেরিকার নিগ্রোর কবিতায় যে বক্তব্য উচ্চা-রিত তার সঙ্গে আফ্রিকান কবিতার ভিতরকার কথার মূলগত পার্থক্য খুব বেশি নেই। তবে দুই দেশের মানসিকতার ব্যবধান তো আছেই। আমেরিকার নিগ্রোরা সংগ্রাম করছেন সামাজিক মুক্তির জন্য। আফ্রিকা তাদের মাতৃভূমি ছিল। নূতন মাতৃভূমি আমেরিকা। দাস হিসেবে তাঁরা একদিন চালান হয়ে এসেছিলেন। নূতন দেশের নূতন সমাজ তাদের সমান অংশভাগীরূপে গ্রহণ করেনি। স্বাধীন দেশের মানুষ হয়েও তারা জল বয়ে আর কাঠ বহন করেই চিরকাল কাটিয়েছে। তাদের গায়ের রং নূতন সমাজে মানবিক মর্যাদা অর্জন করতে প্রতিবন্ধকতা করেছে। তার বিরুদ্ধেই আমেরিকান নিগ্রোদের সংগ্রাম। তার সাহিত্যও প্রতিবাদের। এই দেশকে তারা মাতৃভূমি বলে জানে। অথচ বিমাতার মতো তাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। তারা কালো, তারা নিগ্রো, এই চেতনা সমাজে তাদের মর্যাদা দেয়নি। যখন পরিশ্রমের ডাক আসে, রণাঙ্গনে গিয়ে প্রাণ দেবার প্রয়োজন হয় তখন তারা আমেরিকান। যখন তারা সমান নাগরিক অধিকার দাবী করে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা চায়, তখন তারা আর কেউ নয়। এই হতাশা থেকে আমেরিকার নিগ্রো সাহিত্য জন্ম নিয়েছে। আজকের আমে-রিকান নিগ্রো সাহিত্যিক কোনো করুণা চান না, আবেদন করাও তাঁর সাহিত্য-কর্মের মূলে বিষয় আর নয়। জেমস্ বলডুইনের মতো আমেরিকান নিগ্রো সাহিত্যিক সে জন্যেই তাঁর বইয়ের শিরো-নামা দেন **"Fire Next Time"** এর পর আগুন।

এই আগুনের কথা আফ্রিকানরাও বলছেন। তবে তাদের যন্ত্রণা শুধু সামাজিক মুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, গোটা মহাদেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বিরাট অজগর সাপের মতো তাদের কবিতায়, লেখায় ও অন্যবিধ সাহিত্যকর্মে মোচড় দিয়ে উঠেছে। আফ্রিকান নিগ্রোর এই ব্যক্তিত্বের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে একটি বিশেষ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাকে বলা হয় নেগ্রিচুড (Negritude) নিগ্রো-র প্রথম অক্ষর বড় হরফে, ক্যাপি-ট্যাল এন্ দিয়ে লিখতে হবে। একদিন তাদের কোনো নাম ছিল না। নিগারস্ কিংবা ব্ল্যাকস্ এই লাঞ্ছনার নামে ছিল তার পরিচয়। আজকের আফ্রিকান সাহিত্যে সেই অপমানের কথা আছে। তাঁরা সহজে এই দুঃখ ভুলতে পারবেন না। ১৯৩৭ সালে প্যারিসে নির্বাসিত জীবনযাপন কালে ফরাসী গিনির কবি ডামাস এই অপমানের জ্বালা প্রকাশ করেন এই ভাষায় :

...... my hatred thrived on the
margin of culture
the margin of theories the margin
of idle talk
with which they stuffed me since
birth
even though all in me aspired
to be Negro
while they ransack my Africa

নিগ্রো হবার এই আকাঙ্ক্ষা "Aspire to be Negro" আফ্রিকান কবিতার ভিতরে প্রবল ব্যক্তিত্ব এনেছে। এটাই নেগ্রিচুড আন্দো-লনের দান। আফ্রিকার কবিতায় আমেরিকার নিগ্রো কবিতার মতো সফিস্টিকেশন নেই। তার ভাষা, তার চিত্রকল্পে আবেগের তীব্রতাই বেশি লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু এই কবিতা একেবারে নূতন, আফ্রিকার মাটি আর অরণ্যের গন্ধে ভর-পুর। তার নিরঙ্কুশত্বের আলোকে এই কবিতা-গুলি ঝলমল করে, চোখ ধাঁধায়। আফ্রিকান কবিতায় কবির ব্যক্তিত্বকে এখনো আলাদা করে চেনা যায় না। তাঁর কবিতার আবেদন কনটেন্টের, ব্যক্তির নিজস্বতার নয়। আফ্রিকার কবি নিজের ব্যক্তিত্বকে সাহিত্যের রূপকর্মে তুলে ধরতে ব্যস্ত নয়, তিনি কিছু বলতে চান এবং এই বক্তব্য সমস্ত অপমানিত মানুষের প্রতিষ্ঠার জন্য। সে হিসেবে আমেরিকার নিগ্রো কবিতায় ব্যক্তিসত্তার চিহ্ন আছে। একটা সমৃদ্ধ অর্থ-নীতির যন্ত্রণার ছায়ায় বাস করে, সমাজ জীবনের পরিমণ্ডলে অভ্যস্ত হয়ে আমেরিকার নিগ্রো ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা স্পষ্টতর হয়েছে। সে জন্য আমেরিকান নিগ্রো কবিতা অধিকতর ব্যক্তি-লক্ষণাক্রান্ত। অন্যদিকে আফ্রিকান কবিতা দেশ ও কালের পরিব্যাপ্ত [illegible] ভাষায় প্রকাশিত। [illegible] [illegible] না। বরং প্রখর মানবিক [illegible] একটি গোটা মহাদেশের উপস্থিতিতে কবিতাগুলি উচ্চকিত।

আমেরিকান নিগ্রোদের কবিতায় [illegible] এখন "we shall overcome" আমরা জয় করব, আমরা পার হব। অনেক নিষেধের পাঁচিল তাঁদের সামনে। পাঁচিল টপকে তাঁরা জয় করবেন। দুস্তর বাধাগুলি তাঁরা পার হবেন। ওদিকে আফ্রিকার কণ্ঠেও সেই এক সংকল্প। দুই মহাদেশের কৃষ্ণ মানুষের বেদনা আশ্চর্য সমতা। আফ্রিকার নিগ্রোর মনে আমেরিকার নিগ্রোর বেদনা দুঃসহ স্মৃতি পাথরের মতো চেপে বসেছে। আমেরিকার নিগ্রোর আকর্ষণ তার আদি জননীর দিকে আফ্রিকার নিগ্রোর আকাঙ্ক্ষা তার জননীর মুক্তি। প্যাট্রিস লুমুম্বার সেই বিখ্যাত কবিতা "আফ্রিকার বুকে সকাল" দুই মহাদেশের যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছিল :

সকাল হয়েছে বন্ধু চেয়ে দেখো,
আমাদের মুখের দিকে
চেয়ে দেখো, পুরানো আফ্রিকার
বুকের উপর
ভেঙেপড়ছে নতুন সকাল।
এতদিনে ফিরে পাবে সর্বহারা নিগ্রো তার
হাজার বছরের হারানো দেশ
হারানো জমি, হারানো জল
হারানো বিশাল নদ-নদী।
সূর্য উঠছে। তার বিকীর্ণ [illegible]
[illegible]
শুকিয়ে যাবে তোমার চোখের জল
শুকিয়ে যাবে তোমার মুখের উপর
[illegible]
শেকল ছেঁড়ো বন্ধু, শেকল ছেঁড়ো
শেকল ছেঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিরদিনের
মতো সাঙ্গ হবে তোমার
দুঃসহ দুঃখের দারুণ দুর্দিন।
(অনুবাদ : সরোজকুমার [illegible])

ওদিকে আমেরিকার নিগ্রো কবি দ্যু বোয়া [illegible] মানুষের জয়গান রচনা করে নিজেকে [illegible] তন হতে ডাক দেন। এই মানুষের [illegible] ভাইরাই তো সভ্যতাকে উজ্জ্বল করেছিল। তার অপমান, তার লজ্জা সব কিছুর উপর মনুষ্যত্বের এই গৌরব প্রতিষ্ঠিত।

দ্যু বোয়া আমেরিকান নিগ্রোদের সামাজিক [illegible] কার দাবীর জন্মদাতা। ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর এ্যাডভান্সমেণ্ট অব কালারড পিপল (NAACP) তিনি গড়েছিলেন। [illegible] আদমীর বোঝা' কবিতায় তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন সভ্যতাগর্বী শ্বেতাঙ্গদের। তিনি বলেছেন :

কে মূর্খদের ঊর্ধ্বে গৌরবের পথ দেখিয়েছে
তারা কি মিশরের আর ভারতের কালা
আদমীরা নয়

তারা কি ইথিওপিয়ার, ব্যাবিলনের, চীনের
কেউ ধূসর কেউ হলুদ রঙের
মানুষেরা নয়?
তারা কি ভোরবেলার ইহুদী
সন্তানদের মধ্যে
অথবা রোম আর গ্রীসের দোআঁশলা
মানুষদের ভিড়ে
একদিন মিশে ছিল না?
(অনুবাদ: বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

নেগ্রিচ্যুড্ আফ্রিকার কাব্য আন্দোলনের একটি ...হৎ দান। নিগ্রো শুধু কালো নয়, সে অশ্বেত-...য়, এই অপমানের চেতনা থেকে নেগ্রিচ্যুডের ...ভব। প্রত্যাখ্যানের পর অধিকার প্রতিষ্ঠার ...রূপ নেগ্রিচুড্। ফরাসী শাসিত আফ্রিকার ...বিরাই এই আন্দোলন তৈরী করেছেন। ...রেজীভাষী আফ্রিকায় এই আন্দোলন দানা ...বাঁধেনি। এর একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ...াহিত্যিক আন্দোলন ফরাসী সংস্কৃতির সঙ্গেই ...ড়িত, এ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্যে এ ধরণের ...আন্দোলনের রেওয়াজ নেই। সেদার সেনঘর, ...তুন আফ্রিকার এই কাব্য আন্দোলনের সব-...চেয়ে সার্থক, সবচেয়ে সংবেদনশীল কবি ...নিগ্রোর অপাপবিদ্ধ রক্তের কথা বলেন, শ্বেত ...আক্রমণ থেকে আদিম আফ্রিকার টোটেম ...তাকে রক্ষা করতে চান তিনি:

I must hide him in my innermost veins
The Ancestor whose stormy hide is shot with lightning and thunder
My animal protector, I must hide him
That I may not break the barriers of scandal;
He is my faithful blood that demands fidelity
Protecting my naked pride against
Myself and the scorn of luckier faces.

আমেরিকান নিগ্রোর কাছে আশা আকাঙ্ক্ষা আরও পার্থিব, অর্থনীতির ওপর তার ভিত্তি। যেহেতু আমেরিকান নিগ্রোর চোখের সামনে সমৃদ্ধি অথচ তা থেকে সে বঞ্চিত:

A yellow girl rides in a limousine
A brownskin rides a Ford
A black girl rides an old jack ass
But she gets there, yes, my Lord

আমেরিকান নিগ্রো কবি ল্যাংস্টন হিউয়েস যন্ত্রণায় আর্ত কণ্ঠে বলেন, "you spit on the face of my dream;" স্বপ্নের মুখে থুথু ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই স্বপ্ন সেনঘর, ডেভিড ডিয়প, মালানগাটানা যে ভাষার কবিতা লিখেছেন আমেরিকার নিগ্রো কবিতার ভাষার সঙ্গে তার গভীর একতা এই দুই মহাদেশের কৃষ্ণ মানুষকে একই অস্তিত্বের অভিজ্ঞতার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। শঙ্খবেলের মতো অনুদাত্ত অথচ মর্মভেদী সে ভাষা, নিরলংকার, সরল অথচ অবিস্মরণীয় সত্যের মতো উজ্জ্বল।

কৃষ্ণ মানুষের জন্য স্বতন্ত্র মর্যাদা নয়, মানুষের মর্যাদা এই কাব্য আন্দোলনের দাবী। কিউবা, হাইতি, জামাইকা কিংবা মার্টিনিকের কৃষ্ণ রমণীর, শিশুর ও পুরুষের রক্তে একই স্পন্দন। কিউবার কবি নিকোলাস গিয়েন বলেন:

আমার চোখে কি তুমি সেই
মাদল দেখছো না!
তুমি কি দেখছো না সেই মাদলের
তালে তালে
গড়িয়ে পড়ছে দুফোঁটা শুষ্ক অশ্রু?
আমার কি পূর্বপুরুষ নেই, রাত্রির
বিশাল কালো চিহ্ন আঁকা
(গায়ের চামড়া থেকে তা কালো)
বিরাট দাগ
চাবুক দিয়ে আঁকা
আমার কি পূর্বপুরুষ নেই
মান্ডিঙ্গো, কঙ্গো কিংবা দাহোমিতে?

এই প্রশ্ন আমেরিকার নিগ্রোর। আফ্রিকার নিগ্রো তাকে ভাই বলে ডাক দিয়েছে। নিগ্রো অস্তিত্বের এই বেদনার্ত আকুতি আজ সমস্ত মহাদেশগুলিকে আলোড়িত করছে। আমরা নেগ্রিচ্যুডের সার্থক আলোকিত দিনের প্রতীক্ষায় থাকি।
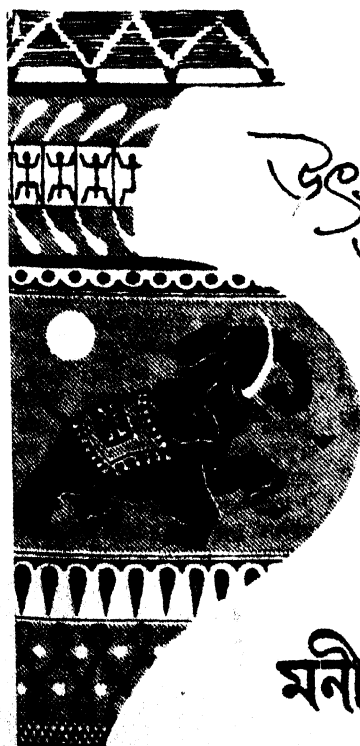
ভারতবর্ষে হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ পুরাকাল থেকেই চলিত আছে। তবে চিকিৎসা শাস্ত্রে তার ব্যবহার খুবই কম ছিল। ভাবপ্রকাশ ও সুশ্রুত সংহিতায় যেভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা বলা আছে, তার অধিকাংশই উপসর্গকে কেন্দ্র করে। হিপনোটিজ্‌ম্‌ বেশির ভাগ তন্ত্র-সাধনায় বশীকরণ করার জন্য ব্যবহৃত হত। আমাদের দেশের হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ সরাসরি (Direct Method) ভাবে করা হত। যিনি মোহনিদ্রা সৃষ্টি করতেন, তিনি সোজা তাকিয়ে থাকতেন, যাঁকে করা হবে, তাঁর দিকে। যিনি মোহগ্রস্ত হতেন, তাঁকে বলা হত, সোজা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে। অল্পক্ষণের মধ্যে মোহগ্রস্ত ব্যক্তি মোহাভিভূত হয়ে পড়তেন। তখন সমস্ত সত্তা হারিয়ে ফেলতেন এবং বশীকরণ-কারক যা খুসি করতে পারতেন। এ ছাড়া ভারতবর্ষে যা প্রচলিত ছিল ও আছে, তার নাম সমাধি। ব্যক্তিগত যোগবলে সাধু-সন্ন্যাসীরা নিজের দেহের সমস্ত অনুভূতি (Sensation) বিলোপ করতে পারতেন, এমনকি জীবনের বাহ্যিক উপসর্গও পরীক্ষায় ধরা পড়ত না। সমাধি যোগ-সাধনায় নিজের দেহের ওপর বিস্তার করা যায়, অন্য লোকের দেহতে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়।

হিস্টিরিয়া রোগের চিকিৎসায় সর্বপ্রথম হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ প্রবর্তিত হয়। হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌-এর পূর্বে হিস্টিরিয়ার বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করলে হিপ্‌নোটিজ্‌ম-এর প্রভাব ভালভাবে বোঝা যাবে। হিস্টিরিয়া কথাটি এসেছে, হিস্‌টেরো (Hystero) কথা থেকে। হিস্‌টেরো শব্দের বাংলা অর্থ জরায়ু। হিস্টিরিয়া রোগ বেশির ভাগ মেয়েদের হয় বলে প্রাচীনকালে চিকিৎসকদের ধারণা ছিল রোগগ্রস্ত জরায়ু হিস্টিরিয়া রোগের উৎপত্তিস্থল। পরবর্তীকালে অনেক গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে, স্নায়বিক দুর্বলতা থেকে হিস্টিরিয়া রোগের উৎপত্তি। বাতিক (Neurosis) যেমন স্নায়বিক রোগ, হিস্টিরিয়াও তেমনি স্নায়বিক রোগ। হিস্টিরিয়ার বিকার থেকে কেবল তড়কা (Fits) হয় না, নানারকম উপসর্গও দেখা দিতে পারে। রোগিণীর মনে যদি ধারণা জন্মায়, তার খিদে নেই, তাহলে দিনের পর দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই রোগের নাম (Anorexia Nervosa) রোগিণীর মাথায় যদি ঢোকে তার পা দুর্বল হয়ে আসছে, তাহলে অচিরাৎ সে বিছানা নেবে, এবং বলবে তার পা দুটো পঙ্গু হয়ে গেছে। হিস্টিরিয়া থেকে হঠাৎ বিনাকারণে প্রচণ্ড বমি হতে পারে। Justin M. Hope এবং Raymond D. Adams এই প্রকারের বমিকে 'হিস্টিরিয়া ভমিটিং' বলেছেন। এক ভদ্রমহিলা হঠাৎ ভাগ্য-বিপর্যয়ে খুব বিপদে পড়েন এবং আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়েছিলেন। যাদের তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তারাই তাঁর সর্বস্ব চুরি করে নেয়। সর্বস্বান্ত হয়ে যাবার পর, কোন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন দেখা পর্যন্ত করেন নি। পথে দৈবাৎ দেখা হয়ে গেলে, না চেনার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যেতেন। কিছুকাল পরে ভদ্রমহিলার স্বামী নিজের চেষ্টায় আবার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং আর্থিক সাচ্ছল্য ফিরে এল। আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসা সত্ত্বেও অতীতের কথা স্মরণ হলেই প্রচণ্ড বমি হত।

এই ধরনের রোগিণীদের সুস্থ করে তোলা আয়াসসাপেক্ষ। এঁদের শুধু ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করলে, কোন ফল পাওয়া যায় না। যে রোগিণীর মনে দৃঢ় ধারণা সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তাকে ওষুধ দিয়ে কোন ফলই হবে না। যতক্ষণ না তার মন থেকে বদ্ধধারণা দূর করে না দেওয়া যায়, ততক্ষণ সমস্ত রকমের চিকিৎসা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনার মানসিক রোগের চিকিৎসক মেস্‌মার (Mesmer) একটি রোগিণীর ওপর মোহনিদ্রা সৃষ্টি করে মানসিক রোগ নিরাময় করেন। মেসমারের নামানুসারে এই প্রথাকে মেস্‌মেরিজম্‌ বলা হয়। পরবর্তীকালে মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌কে হিপ্‌নোটিজম আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ চিকিৎসাশাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। চেহারায়, পোশাকে চিকিৎসকের দেহে এমন একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি করা উচিত যা দেখেই রোগী বা রোগিণীর মনে আস্থা সৃষ্টি হবে। অনেক চিকিৎসক রোগীর ঘরে প্রবেশ করলেই রোগীর অর্ধেক রোগ উপশম হয়ে যায়। এই বিশ্বাস তৈরি হয় ডাক্তারের জ্ঞানে নয়, তার সম্বন্ধে 'ইলিউশন' সৃষ্টিতে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের চিকিৎসা বিষয়েও এ ধরণের ইলিউশন সৃষ্টি হয়েছিল।

মেস্‌মারের পূর্বে হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। অনেকের ধারণা ছিল ম্যাগ্‌নেট্‌ থেকে হিপ্‌নোটিজ্‌ম হয়। রোগিণীকে একটা টুলের ওপর বসিয়ে, পাশে একটা বড় ম্যাগ্‌নেট্‌ রাখতেন, তারপর সেটা স্পর্শ করিয়ে দিতেন রোগিণীর গায়ে। চিকিৎসকের বিশ্বাস ছিল ম্যাগ্‌নেটের স্পর্শে রোগিণী মোহনিদ্রাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন, কিন্তু ব্যর্থ হতেন।

ফরাসী চিকিৎসক শারকট্‌ (Charcot) মানসিক চিকিৎসায় হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌-এর প্রবর্তন করেন। তিনি Indirect method-এর পক্ষপাতী ছিলেন। শারকট্‌ মোহনিদ্রা সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক উপায় ভাবতে লাগলেন। মা শিশুকে যখন ঘুম পাড়ান তখন গুনগুনিয়ে একঘেয়ে সুরে গান করেন। একঘেয়ে সুরের গান শুনতে শুনতে শিশুর চোখ এবং মাংসপেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ফলে এক সময়ে শিথিল হয়ে যায় এবং ঘুম জড়িয়ে আসে। শারকট্‌ দেখলেন একঘেয়ে সুর মোহনিদ্রা সৃষ্টির প্রধান সহায়ক। যে কোন লোকের স্নায়ুর ওপর একঘেয়ে সুরের জাল সৃষ্টি করতে পারলে স্নায়বিক ক্লান্তি আপনা থেকেই আসবে এবং মোহনিদ্রা সৃষ্টি হবে। শারকট্‌ আবছা অন্ধকার ঘরে রোগিণীকে শুইয়ে দিতেন, তারপর দূরের কোন বিন্দুকে এক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে বলতেন। রোগিণী সেই বিন্দুর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। এদিকে শারকট্‌ একই সুরে নানা-রকমের বিশ্বাসভাজন কথা বলে চলতেন, যথা—আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার দেহকে অবশ করে দিন। —ইত্যাদি। এই ধরনের কথা বলতে বলতে এমন একটা সময় আসে যখন রোগিণী নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলেন এবং মোহগ্রস্ত হন। ইংরেজীতে যাকে বলে ট্রান্স। এই সময়ে চিকিৎসক যা বলেন, রোগিণীও তাই শোনেন।

এ সব রোগিণীর ধারণা যে পঙ্গু, তাঁদের যদি বলা যায়, আপনার পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়, আপনি হাঁটুন। দেখা যাবে সত্য সত্যই রোগিণী হাঁটছেন। এই রকম দিনের পর দিন মোহনিদ্রা সৃষ্টি করে রোগিণীকে হাঁটানো অভ্যাস করা হত। কিছুদিন পরে রোগিণীর বিশ্বাস হত তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত নন, এবং সুস্থ হয়ে যেতেন।

বিশ্ববিশ্রুত মনঃসমীক্ষক সিগমণ্ড ফ্রয়েড (Sigmund Frued) হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌-এর প্রভাবে বহু জটিল মানসিক রোগের চিকিৎসা করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ পরিত্যাগ করে সাইকো-এ্যানালিসিস্‌ পদ্ধতিতে চিকিৎসা শুরু করেন। হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌-এর প্রভাবে ফ্রয়েড একটি রোগিণীকে বিচিত্রভাবে সুস্থ করে তুলেছিলেন। ভদ্রমহিলা শিক্ষিতা এবং অত্যন্ত ভদ্র ও বিবেচক। সামনাসামনি কথাবার্তা বললে কোনরকম স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে, বোঝাও যায় না। একটু বেশি বয়সে ভদ্রমহিলার বিয়ে হয় এবং বাচ্চা ফরসেপস (forceps) দ্বারা প্রসব করানো হয়। অস্বাভাবিক রক্তস্রাব বা অন্য কোন রকমের অসুবিধা প্রসবের সময় হয়নি এবং মা সুস্থই ছিলেন। কিন্তু শিশুকে স্তন্যদান করবার আগে হঠাৎ একটা ভীতি মনের ভেতর সৃষ্টি হয়, ও বাধা হয়। তিনি শিশুকে দুগ্ধদান করতে পারেন না। যতবার তিনি চেষ্টা করেন, বুকে অসহ্য ব্যথা হয় ও একবিন্দু দুধও নিঃসৃত হয় না। হাসপাতালের চিকিৎসকগণ এ রকমের চিকিৎসা করলেন, কিন্তু কোন ফল পেলেন না। দিন চৌদ্দ পরে বাধ্য হয়ে শিশুকে ওয়েট-নার্সের কাছে তুলে দেওয়া হয়। শিশুকে দুগ্ধপান থেকে নিরত করার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের সব রোগ কমে যায়। তিনি আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন।

তিন বছর পরে দ্বিতীয় সন্তান প্রসব হবার পর আবার একই রকমের উপসর্গ দেখা দিল। তার সঙ্গে বমি শুরু হল। শিশুকে স্তন্যদান করবার কথা মনে করলেই বুকে অসহ্য ব্যথা অনুভব করেন এবং বমি করতে শুরু করেন। ভদ্রমহিলার ফ্যামিলি ডাক্তার ছিলেন ভিয়েনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ব্রয়ার (Breuer) এবং ডাঃ লট (Lott) অনেক চেষ্টা করেও যখন কৃতকার্য হলেন না তখন তাঁরা ফ্রয়েডকে আহ্বান করলেন। রোগিণী ভদ্রমহিলা ফ্রয়েড-এর বহুদিনের পরিচিত। ফ্রয়েড ভদ্রমহিলার সাংসারিক ইতিহাস জানতেন, এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌-এর দ্বারা এই রোগ সারবে।

ফ্রয়েড যখন রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত, তখন ভদ্রমহিলা রাগে-দুঃখে লাল হয়ে উঠেছেন। যতবার শিশুকে দুধ খাওয়াবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ততবারই রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। ফ্রয়েড পেসেন্টকে আদেশ করলেন তাঁর চোখের দিকে তাকাতে। মিনিট তিনেকের মধ্যে রোগিণীর মোহনিদ্রা সৃষ্টি হল, তখন ফ্রয়েড বলতে লাগলেন, কোন ভয় নেই। তুমি শিশুকে খাওয়াবে। খুব ভালভাবে খাওয়াতে পারবে। তোমার ক্ষিধে হবে, বমি বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি

কিছুক্ষণের মধ্যেই রোগিণী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। ফ্রয়েডও বিদায় নিলেন। যাবার সময় রোগিণীর স্বামী বেশ ভীত হয়ে পড়লেন। ফ্রয়েড ভরসা দিয়ে চলে গেলেন।

সংলগ্ন নীহার তালুকদার

পরদিন আবার গিয়ে ফ্রয়েড দেখলেন উপসর্গগুলো একইভাবে দেখা দিয়েছে। তবে সকালের দিকে ছিল না। সকালে মা খাবার খেয়েছেন এবং শিশুকে খাইয়েছেন কিন্তু দুপুর বেলায় খাবার পর বমি হয়ে গেছে, পূর্বের সমস্ত উপসর্গ আবার দেখা দিয়েছে। ফ্রয়েড নিশ্চিন্ত হয়ে দ্বিতীয়বার মোহনিদ্রা সৃষ্টি করলেন। ফ্রয়েড চিকিৎসা শেষ করে চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পরে রোগিণী বাড়ির লোকদের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া শুরু করে দিলেন,—আমার ক্ষিধে পেয়েছে। খেতে দাও। আমি না খেলে শিশুকে খাওয়াবো কি করে?

তারপর আর কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি। আট মাস ধরে শিশুকে মা দুধ পান করিয়েছিলেন।

হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ দ্বারা চিকিৎসার কিছুটা অসুবিধা আছে। রোগিণীর সঙ্গে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা (Personal attachment) খুব বেড়ে যায়, ফলে নানা সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ সময়ে রোগিণী কিছুদিন পরে চিকিৎসককে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করতে থাকে, এবং বিয়ে করতে চায়।

ফ্রয়েড পরবর্তীকালে হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ পরিত্যাগ করে সাইকো-অ্যানালিসিস প্রথায় চিকিৎসা শুরু করেন। সাইকো এ্যানালিসিস আরও উন্নত ধরণের মনঃসমীক্ষা, এবং হারিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলো খুঁজে পাওয়া যায় এবং তারই ভিত্তিতে চিকিৎসা করা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

বর্তমান কালে হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌ দ্বারা অপারেশন করা সম্ভব কিনা এবিষয়ে গবেষণা চলছে। হিস্টিরিয়া রোগের চারটি স্তর (Stage) আছে, হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌-এর চারটি স্তর আছে আবার জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়ার চারটি স্তর আছে। হিপ্‌নোটিজ্‌ম্‌-এর প্রভাবে যদি পেসেন্টকে থার্ড স্টেজ-এর থার্ড প্লেনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়, তাহলে অপারেশন করা সম্ভব হবে। তবে বেশিক্ষণ রাখা সম্ভব হবে না, কারণ ঘুম যেমন আপনা থেকে শেষ হয়ে যায়, মোহনিদ্রাও তাই হবে। মোহনিদ্রাকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারলে ছোটখাটো অপারেশন করা অদূরভবিষ্যতে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

আর এক কংস

সুভাষ সমাজদার

আমি যাবো।
তোমার যাওয়া হতে পারে না তৃপ্তি।
তৃপ্তির মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। পাশের ঘরে একটি কাঁচ গলার কান্না শোনা গেল। সে তাড়াতাড়ি ছুটল সেদিকে। আর শিবনাথ চিন্তিত হয়ে বাইরের ঘরে এল।

বাইরের ঘর মানে আপার চীৎপুর রোডের এক গলির ভেতরে ভাঙ্গা নড়বড়ে একটা দোতালা বাড়ীর নীচের তলার ঘর। রাস্তার দিকের জানালার শিকের সঙ্গে একটা সাইন-বোর্ড ঝুলছে : "সাবিত্রী অপেরা"। স্ত্রী ভূমিকায় নৃত্যগীত নিপুণা মহিলারা অভিনয় করে থাকেন। ম্যানেজার স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিল্পী সর্বশ্রী শিবনাথ রায়।

কুন্তী কোথায়?

শিল্পীদের ভেতর থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়ালো। মোটামুটি সুশ্রী। শান্ত। [illegible] বহুদর্শী অভিনেতা শিবনাথ। তাকে মনের চোখ দিয়ে দেখতে লাগল। হ্যাঁ। কুন্তীর ভূমিকায় মানাতে পারে। কিন্তু একটু বেশী বিষণ্ণ আর করুণ যেন। পাশাপাশি তৃপ্তির বুদ্ধিদীপ্ত সুডৌল মুখখানা ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে যেন আগুনের ছ্যাঁকা লাগল।

না। অসম্ভব। ওকে এই থিয়েটারের নেশা থেকে মুক্ত করতেই হবে। মনের অশান্তিতে জ্বলতে জ্বলতে 'কর্ণার্জুন' নাটকের বইখানা ধরল শিবনাথ।

—কুন্তী বলো তো—

আমি নারী দুর্বলা অভাগী
মনোব্যথা মোর
জানেন সে অন্তর্যামী যিনি।

মেয়েটি বলল। কেমন চাপা চাপা গলার স্বর। বললও সে তোতাপাখীর মত।

—উঁহু, হচ্ছে না। কিচ্ছু হচ্ছে না। তোমাকে দিয়ে চলবে না।

পূর্ণ উদ্যমে রিহার্সেল চলতে লাগল। পূজা এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। শুধু

র্জন নয়, আরও গোটা চারেক বই তৈরী হতে হবে।

প্রত্যেক বছর ঠিক পূজোর মুখে বেরিয়ে পড়ে শিবনাথ তার পার্টি নিয়ে। সে এক উত্তেজনাময় বিচিত্র জীবনযাত্রা। খানিকটা উচ্ছৃঙ্খলও। আজ কালনা, কাল বর্ধমান, পরশু সংবাদ। যেখান থেকে ডাক আসে, বায়নার টাকা হাতে দেয়, 'সাবিত্রী অপেরা' শুধু সেই-খানেই যায়। কিন্তু যে দিনকাল। পোষায় না। অভিনেতা, অভিনেত্রী, বাজনদার ইত্যাদি সবাইকে দিয়ে থুয়ে নিজের বলতে তেমন কিছু থাকে না।

শুধু তাই নয়। রাতের পর রাত জেগে রঙ মেখে কখনো ফরাসী বীর সেনাপতি কার্তালো হয়ে অট্টহাসা করতে হয়, কখনো বীরত্বের আস্ফালন দেখাতে হয় টিপু সুলতান সেজে। লোকে হাততালি দেয়। বাহবা বলে। কিন্তু দিনের আলোয় যখন কারো বাড়ীর বারন্দায়, কি কোন শহরের স্কুল ঘরে বসে মুড়ি চিবোয়, তাস খেলে, বিড়ি খায় আর চিড়িয়াখানায় জন্তু দেখার মত করে দেখতে আসে লোকে, তখন-- তখন বেশ বুঝতে পারা যায়, ওরা তাদের নকল সাজটাকে শ্রদ্ধা করে, প্রশংসা করে। আসল মানুষগুলোর জন্য আছে শুধু উদগ্র কৌতূহল আর কিছুটা করুণা। এসব কারণে থেকে থেকে শিবনাথের মনে হয়, তার সারাটা জীবনই বোধ হয় অভিনয়ের মত মিথ্যা আর অসার।

অর্থ নেই, সম্মান নেই, এমন একটা কাজের নেশা তাকে যক্ষ্মার জীবাণুর মত কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে। তাই সে ঠিক করেছে, এই রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচাতে হবে তৃপ্তিকে—বাঁচাতে হবে নব জাতককে। কিন্তু—

তাকে বুঝতে পারছে না কেন তৃপ্তি? কেন—কেন, স্বামীর ভালবাসা আর শিশুর কলকণ্ঠ দিয়ে ঘেরা একটি পরিপূর্ণ সংসার পেয়েও সে অভিনয়কে ভুলতে পারছে না? তবে কি জন্মজন্মার্জিত সংস্কারের চেয়েও অভিনয় শিল্পের ওপরে ওর টানটা বড়?

দিন কাটে। প্রতি দিনই সকালে মহড়া চলে। একটার পর একটা বই তৈরী হতে থাকে। —কিন্তু শিবুদা কুন্তীর রোলটা—পঞ্চু কি বলতে যেয়ে থেমে গেল। সে কর্ণার্জুনে শকুনি সাজে।

—শুধু কুন্তীই তো দিচ্ছি আর কিছু তো দিচ্ছি না তাকে।

আলোচনা হয় বিশিষ্ট প্লেয়ারদের সঙ্গে। তৃপ্তির কানে পড়ে সব। কিন্তু শুনেও শোনে না যেন। সে ছেলের দুধ জ্বাল দেওয়া, বিছানা করা আর পাঁচটা সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঠিক সময় করে নিয়ে তার স্বামীর ও তার এক কালের সহকর্মীদের চা-খাবার করে নিয়ে যায়। সেদিন কাঙ্গালী পাল বলল—বৌদি আপনি না নামলে অর্জুন করবো কি। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে—

হু হু করে উঠল তৃপ্তির বুকের ভেতরটা। তীব্র ব্যথাটাকে গোপন করে হাসল। নিঃশব্দে দোলনার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, পায়ে বেড়ী পরিয়ে দিয়েছে ঠাকুরপো—আর দাঁড়ায় না সে।

—বৌদি আশ্চর্য চেক করেছে তো নিজেকে!

আশ্চর্য—সত্যিই আশ্চর্য। শিবনাথের স্মৃতির ভেতরে রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত, হিংস্র আবার করুণ আর অসহায় এক বিচিত্র নারী মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে আকুল হয়ে বলছিল, বনবীর শয়তান, তুমি উদয়সিংহের রক্ত দান করতে চাও......

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বনবীরের হাত থেকে রক্তমাখা ছোরা পড়ে গিয়েছিল। বনবীর কখনো কোন ধাত্রীপান্নার মুখে প্রচণ্ড তেজস্বিতা আবার সেই সঙ্গে কাতর করুণতার অভিব্যক্তি এত স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেনি।

শ্যামনগর কালীবাড়ীতে ধাত্রীপান্না বই হচ্ছিল। সে সেজেছিল বনবীর আর নাম-ভূমিকায় ছিল তৃপ্তি। তখন মতি অপেরায় কাজ করতো সে. আর তৃপ্তি নতুন ঢুকেছিল দলে। রিহার্সেলেই সে অদ্ভুত প্রভুভক্তি আর আত্ম-ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল এই চরিত্রটিকে এমন সুন্দর ফুটিয়ে তুলল যে ম্যানেজার কিশোরী দাসের মত সবাই অবাক হয়ে গেল ওর সহজাত অভিনয় প্রতিভায়!

দিল্ গয়া তুমনে লিয়া হম ক্যা করে
জানে ওয়ালী চীজ্ কা গম্ ক্যা করে?

নবাব মীর্জা 'দাগ'এর এই কবিতা অংশটুকু থেকে তার মেজাজের একটা পরিচয় পাওয়া যায়।—হৃদয় হারিয়েছি, তুমি সেটি গ্রহণ করেছো, কি আর করব? যে বস্তু যাবার তা যাবেই, দুঃখ করে লাভ নেই।—

অতিশয় হালকা ভাবে জীবনকে গ্রহণ করা এবং হেসে-খেলে দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া এই জীবন-দর্শন অনুসরণ করে মীর্জা 'দাগ' এই পৃথিবীতে চুয়াত্তর বছর সুখে অতিবাহিত করে গেছেন।

২৫শে মে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে লোহারু রাজ্যে 'দাগের' জন্ম হয়। পিতা নবাব শমসুদ্দীনের ফাঁস হয়েছিল বৃটিশ গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট মিস্টার ফ্রেজারকে হত্যা করার অপরাধে। 'দাগে'র জননী ছিলেন অতিশয় রূপবতী এবং কথিত আছে, কিছু লঘু চরিত্রের মহিলাও ছিলেন তিনি। অবৈধ সম্বন্ধের সন্দেহে শমসুদ্দীন ফ্রেজারকে হত্যা করেন।

পতির মৃত্যুর পরে মীর্জা 'দাগে'র মা দিল্লীর লালকেল্লায় এসেছিলেন, বাদশাহ বাহাদুর শাহ জফরের পুত্র যুবরাজ মীর্জা ফখরু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁদের বিবাহ হয়। মায়ের সঙ্গে 'দাগ' লালকেল্লায় আসেন এবং রাজ-পরিবারের সদস্যরূপে সুখে বাস করতে থাকেন।

মীর্জা ফখরু দাগকে স্নেহ করতেন এবং তাঁর জন্য রাজপুত্রদের যোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। 'দাগ' ভাল আরবী ও ফারসী পড়েছিলেন কিন্তু প্রথম থেকেই কবিতার প্রতি ঝোঁক বেশী ছিল। তাছাড়া লালকেল্লায় তখন কবিতার খুব আদর, বাদশাহ স্বয়ং কবি। মীর্জা ফখরুও কবি এবং পিতাপুত্র উভয়েই প্রসিদ্ধ উর্দু কবি ইব্রাহিম জোখ সাহেবের শিষ্য। 'দাগ'কেও তাঁর শিষ্য করে দেওয়া হল।

মাত্র ষোলো বছর বয়সে 'দাগ' এই শের (কবিতা) বলে লালকেল্লায় খুব সুনাম অর্জন করেন।

"নিকলে অব তীর সীনে সে কি জানে
পর অলম্ নিকলে"

—হৃদয়ে যে তীর (প্রেমবাণ) বিদ্ধ করেছ এবার সেটি বার করে নাও যাতে তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণটাও বার হয়ে যায়—

এত অল্প বয়সে এ ধরনের কবিতা এখন একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়, তবে তখনকার কালই আলাদা ছিল।

বেশ সুখে দিন কাটছিল কিন্তু ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে দাগের দ্বিতীয় পিতার মৃত্যু হল কলেরায়। তার পরের বছর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহের সময় বহু মুসলমানকে দিল্লী ছেড়ে যেতে হল। 'দাগ' দিল্লী থেকে রামপুরে নবাবের আশ্রয়ে গেলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রামপুরে ছিলেন। রামপুর নবাবের সঙ্গে 'দাগ' হজযাত্রা করেন এবং পবিত্র কাবের সামনে বসে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ গজল রচনা করেন—

"সবক্ আয়সা পড়া দিয়া তুনে
দিল সে সব্ কুছ ভুলা দিয়া তুনে"

—হে পয়গম্বর, এমন পাঠ তুমি পড়ালে যে বাকী আর সবকিছুই বিস্মরণ হয়ে গেল।

রামপুর নবাব কলবে আলী খাঁর মৃত্যুর পর 'দাগ' হায়দরাবাদে নিজামের কাছে তাঁর অবশিষ্ট জীবন ভালভাবেই কাটিয়েছেন।

* * * *

উর্দু কবিতার উপজীব্য প্রেম, কদাচিৎ তা মানব-মানবীর মন ও শরীরকে অতিক্রম করে ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি ধাবিত হয়েছে। সমসাময়িক কবিদের শেরগুলিতে প্রেম ও অপ্রেম, বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গ, চাওয়া ও না পাওয়া বা হারানর খেদজনিত অতিশয়োক্তিগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে হয় ভাবের গভীরতায় নয় রচনা-বিন্যাসের চাতুর্যে মনোরম এই প্রেমের কবিতাগুলি দরবারে বসে পড়বার এবং বাহবা দেবার জন্য রচনা হয়েছে, হৃদয়কে কানায় কানায় পূরে দেবার গভীর আনন্দ-বেদনার মাধুরী দরবারী কোলাহলের বস্তু নয়।

'দাগের' ভাষা জ্ঞান ও বিন্যাসের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। খুব সহজবোধ্য উর্দুতে শের লিখেছেন, উর্দুকে আরবী ফারসীর প্রচণ্ড প্রতাপ থেকে মুক্ত করে তা জনসাধারণের বোধগম্য করেছেন দাগ। মীর্জা গালিবের কঠিন কবিতাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে এর সত্যতা প্রমাণিত হবে। দাগের রচনাংশ উর্দুতে প্রায় প্রবাদ ও অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত হয় এখন।

—কহতে হৈঁ উসে জবানে উর্দু—
জিসমেঁ ন হো রং ফারসী কা—

আসল উর্দু জবান ফারসীর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া চাই—

দাগের প্রেমের কবিতার খুব সমাদর। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় আছে—

দিল্ হী তো হ্যায়, ন আয়ে কেঁও
দম্ হী তো হ্যায় ন জায়ে কেঁও
লাগ্ হো ইয়া লগাব হো, কুছ ভী
ন হো তো কুছ নহী
বন্ কে ফরিস্তা আদমী বজমে—
জহাঁ মে আয়ে কেঁও
ইশকাজনু সে মুঝকো লাগ্ হে শো-
খিরুদ সে ইত্তফাক।
পর ইয়ে কহুঁ তো ক্যা কহুঁ মৈনে
সিতম্ উঠায়ে কেঁও।
পর্দায়ে-ইশক হো চুকা দাগ রতী করার থা,
সব্র পে আহ্ আহ্ ক্যা জব্ত পে
হায় হায় কেঁও

—হৃদয় ই তো, ভাল লাগবে না কেন, প্রাণই তো সুতরাং তা যাবে না কেন? অর্থাৎ হৃদয়বান ব্যক্তি নিশ্চয় প্রেমিক হবেন এবং বিরহে প্রাণ বার হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমাকে যদি ঈশ্বর ধৈর্যবানই করবেন তাহলে তোমায় এত রূপবতী করেছেন কেন? অনুরাগ বা বিরাগ একটা কিছু তো থাকবেই, দুটোর একটিও যদি না থাকে তাহলে সে জীবন জীবনই নয়, তাহলে তো দেবতা হয়ে সংসারে জন্মালেই হয়। আমি জানি যে অনুরাগ বা প্রেম জিনিষটা দুঃখ দেয় তবু সে কেন প্রেমিকার নিষ্ঠুরতা সহ্য করবার জন্য অনুবক্ত হল তা আমি জানি না। 'দাগ' সাহেব বলছেন প্রেমকাণ্ড

তো ইতি হল, এই মন্ত্রই সর্ত ছিল, তবে আর প্রতীক্ষায় আহা উহ্‌ করে অথবা (প্রেমিকাকে) হারিয়ে হায় হায় করে লাভ কি?

খুবই উচিত কথা সন্দেহ নেই!

—তেরী সুরত্‌ কো দেখ্‌তা হুঁ ম্যায়
ঊসকী কুদরৎ কো দেখ্‌তা হুঁ ম্যায়,
দেখ্‌নে আয়ে হ্যায় জো নব্জ মেরী,

উনকী সুরত কো দেখ্‌তা হুঁ ম্যায়

—আমি বিরহে পীড়িত হয়েছি তুমি আমার নাড়ি দেখতে এসেছো (হয়ত জান না যে আমি তোমার প্রেমেই এহেন কষ্ট পাচ্ছি)। আমি আর কি করব তোমার রূপ দেখছি এবং তোমার মত রূপের যিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর বা প্রকৃতি তাঁকেও দেখছি!

রোজ ইক্‌ দিল মেরে সীনে মেঁ
খুদা প্যায়দা করে
ঔর ম্যায় অরমান উস দিল মেঁ
নয়া প্যায়দা করুঁ

একটি ছোট্ট হৃদয়ে আর কত আকাঙ্ক্ষা ধরে তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি তিনি রোজ আমায় নতুন নতুন হৃদয় দান করুন।

মজে ইশ্‌ক কে কুছ বহী জানতে হৈঁ
কি জো মৌত্‌ কৈ জিন্দগী জানতে হৈঁ

প্রেমের আনন্দ একমাত্র সেই প্রেমিকই জানে যে মৃত্যুকে জীবনের সমতুল্য মনে করতে পারে অর্থাৎ প্রেমের জন্য সহজে মরতে পারে।

মৌত্‌ উস্‌ দিন্‌ কো কি মুঝকে
সিত্‌ম ঈজাদ্‌ ন হো
ম্যায় তো মর্‌ জাঁউ অগর্‌ লজ্জতে
বেদাদ ন হো
বাত্‌ কা জখম হ্যায় তলবার কে
জখ্‌মো সে সিবা
কীজিয়ে কত্‌ল মগর্‌ মুঁহ্‌ সে কুছ্‌
ইরশাদ ন হো।

এমন দিন যেন না আসে যেদিন প্রেমের দুঃখের সঙ্গে মোকাবিলা করতে না হয়ঃ অর্থাৎ হজরত 'দাগ প্রেমের দুঃখ সদা সহন করতে প্রস্তুত। তাই বলছেন যদি নিষ্ঠুরতার স্বাদ না থাকে জীবনে তাহলে আমি তো মরেই যাব!

কটুভাষিণী প্রেমিকাকে বলছেন তলওয়ারের চোট তোমার কঠিন বাক্যের চেয়ে সহন করা সহজ, আমাকে তুমি মেরে ফেল। (আমার প্রাণটাই তুমি নাও) কিন্তু মুখে কিছু বল না!

—সর জাতা হৈ, সর্‌ সে তেরা সৌদা
নহী জাতা
দিল্‌ জাতা হৈ, দিল সে তেরী উলফৎ
নহী জাতী
অল্লাহ সে মহশর্‌ মেঁ কহুঙ্গা তেরে আগে
মজবুর্‌ হুঁ ম্যায়, ইস্‌কী মুহব্বত
নহী জাতী।
বহ্‌ আকে মেরী কব্র পে য়হ লিখ্‌
গ্যায়ে মিস্‌রা
কাফির্‌ তুঝে দুনিয়া কী মুহব্বত
নহী জাতী
হম্‌ চাহ্‌ কে পছতায়ে হ্যায় উস্‌
পর্দা নশী কো
আখোঁ সে কিসী বক্ত্‌ বহ সুরত
নহী জাতী।

মাথা গেল কিন্তু মাথার ওপর থেকে তোমার প্রেমের বোঝা নামল না, হৃদয় গেল কিন্তু হৃদয় থেকে প্রেম গেল না। পরিণামকালে খোদার কাছে তোমায় দেখিয়ে বলব— 'আমি নিরুপায়, আমার হৃদয় থেকে এর প্রতি প্রেম কিছুতেই গেল না'।

আমার কবরের ওপর এই পংক্তিটি তিনি এসে লিখে গেলেন—কাফের, তোমার মন থেকে কিছুতেই এই ইহলৌকিক প্রেম নিঃশেষ হল না।

আমি সেই পর্দানশীনা প্রেমিকাকে আকাঙ্ক্ষা করে দুঃখ পেলাম, তবু আমার চোখের সামনে তারই রূপ সদাবিরাজমান।

'পর্দানশী' শব্দটি ভারি সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছেন কবি।

'দাগ' কা ইশ্‌ক্‌ ভী দুনিয়া সে নিরালা দেখা
দিল জব্‌ আতা হ্যায় তো আতা হ্যায়
দিল আজারোঁ পর—

মীর্জা দাগ-এর প্রেম দুনিয়ায় এক অদ্ভুত বস্তু বটে কারণ তিনি সদাই নিষ্ঠুরা প্রেমিকার প্রতি আসক্ত হন!

দাগের প্রেমের কবিতাগুলি সবই খুব হাল্কা সুরে রচিত। দীর্ঘজীবনকাল ভোগ-বিলাসে এবং স্বাভাবিকভাবে বার বার প্রেমে পড়েছেন এটা নিঃসংশয়ে ধরে নেওয়া যেতে পারে। একনিষ্ঠতার দাবী সে যুগে আর কোন কবি করেছেন কিনা জানি না কিন্তু মীর্জা 'দাগের' এক প্রেমিকার নাম প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন মুন্নীবাঈ। কলিকাতার এই নৃত্য-গীত-পটীয়সী বাঈজী বার বার দাগের জীবনে এসেছিলেন। পত্নীর মৃত্যুর পর কিছুকাল দাগের সঙ্গে হায়দরাবাদে বাস করেছিলেন মুন্নীবাঈ, কিন্তু মেজাজী মহিলা ছিলেন, দাগের সঙ্গে বনিবনা হল না, কলকাতায় ফিরে গেলেন। দাগ আজীবন তাঁকে অর্থ সাহায্য পাঠাতেন ও প্রায়ই বন্ধু-বান্ধবের কাছে তাঁর নাম করতেন।

দাগের দার্শনিকতার কিছু নমুনা দেখুন—বলেছেন—

পিন্দে-বুজুর্গ সুনতে সুনতে কান অপ্‌নে
ভর্‌ গয়ে
ক্যা ইবাদত্‌ কো হমী হৈ,
সব ফরিস্তে মর্‌ গয়ে?
ফুট্‌ কর রোয়ে জো ছালে হো গয়ে
জঙ্গল হরে
চশ্‌মে-দরিয়াবার জব্‌ বরসী তো জল্‌
থল্‌ ভর গয়ে
আদমী অ্যায়সা কঁহা?
কোঈ ফরিস্তা হো তো হো
শেখ সাহব, য়হ্‌ নহী মালুম
তুম কিস পর গয়ে।

শেখ মৌলবী পণ্ডিতদের উপদেশ শুনে শুনে কান ঝালাপালা, উপদেশ দেবার যোগ্য ব্যক্তি কি কেবল আমিই রয়ে গেছি আর সব ফরিস্তারা কি মরে গেছে? কেঁদে জগত ভাসিয়ে দেবে, চোখের জলের ঝরণা থেকে নদী বইয়ে দেবে, মাটি সবুজ হয়ে যাবে সেই জলে, এমন মানুষ কোথায়। দেবতারা অবশ্য এরকম করলেও করতে পারেন! শেখ সাহেব, তুমি যে এত উপদেশ দাও, তুমি নিজেই তার অর্থ জান না!

গর তো সকুকে কর না ইন্সান্‌ করকে ভুলে
অহসান্‌ কা মজা হৈ অহসান্‌ করকে ভুলে—

পরোপকার করে ভুলে যাও, সেই ভুলে যাওয়াতেই পরোপকারের মহত্ত্ব!

কুছ চাহিয়ে বশর্‌ কে লিয়ে গম্‌ কে ছেড়্‌ছাড়্‌
হম্‌ ভী ন হোঁ অগর্‌ সিতমে—আস্‌খাঁ ন হো
তোহমত্‌ কিসী কো ক্যুঁ মুঁ কী এ 'দাগ'
কেঁও লগায়ে
শিকওয়া বুতোঁ সে কেয়া জো
খুদা মেহরবাঁ ন হো।

—সংসারে বেঁচে থাকতে হলে দুঃখ কষ্ট কিছু থাকা আবশ্যক, দৈবী বিপত্তি যদি মাঝে মাঝে না আসে তাহলে আমরাও অকর্মণ্য হয়ে যেতাম। দাগ সাহেব বলছেন—অত্যাচারে অনাচারের অভিযোগ করে লাভ কি? ঈশ্বরই যদি দয়াবান না হন তাহলে প্রাণহীন মূর্তির সামনে অভিযোগ করে লাভ কি?

হুয়া হ্যায় চার সজদোঁ পর্‌ য়ে দাবা
জাহিদো তুমকো
খুদা নে কেয়া তুম্‌হারে হাথ্‌ জন্নত্‌
বেচ্‌ ডালী হ্যায়?
উঠায়েঁ লুৎফ কোঈ দিন, কহাঁ ফির হম্‌
কহাঁ ফির তুম
বুরা বখ্‌ত্‌ আনে বালা হ্যায়,
জুদাঈ হোনে বালা হ্যায়।

দাগ শেখ মোল্লাদের উপদেশের চোটে অস্থির হয়ে পড়েছেন, বলছেন—দুচারজন নমাজীর ওপর গুরুগিরি করে কি পেলে? ঈশ্বর কি তোমাদের কাছে স্বর্গের চাবি বিক্রী করে দিয়েছেন নাকি?...সংসারে দুচার দিন মজা, তারপর কোথায় বা তুমি আর কোথায় বা আমি! খারাপ দিন আসছে, বিচ্ছিন্ন হতে হবে সুতরাং...

ছুটে হজার মর্তবা কাতিল কে হাথ সে
নিকলে না একবার হম্‌ দিল্‌ কে হাথ সে

খুনীর হাতের ছুরি থেকে হাজারবার বেঁচে গেলাম কিন্তু নিজের হৃদয়ের কাছে বিজয় পেলাম না একবারও। সম্ভবত তাই বলতে চেয়েছেন যে নিজের হৃদয়কে বশ করা সবচেয়ে কঠিন।

দুনিয়া কো দেখ্‌নে কে লিয়ে আঁখ্‌ চাহিয়ে
জন্নত্‌ কী সৈর্‌ হ্যায় সিবা ইস্‌ মকাঁ কী সৈর
কেঁও আদ্‌মী কো আলমে-বালা কি হো হবস
বর্‌কর নহী জমীন্‌ সে কুছ্‌ আসমাঁ কী সৈর,

—দুনিয়াটাকে দেখার মত চোখ থাকা চাই স্বর্গের চেয়ে এ ধরিত্রী ভ্রমণ ভাল। মানুষের স্বর্গের তৃষ্ণা কেন? এ মাটির পৃথিবীর চেয়ে স্বর্গের সুখ মহত্তর নয়।

মীর্জা দাগ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভাল বাসতেন, বলেছেন—"দাগ দুশমন সে ভী ঝুককর মিলিয়ে"

শত্রুর সঙ্গেও বিনীতভাবে মেলামেশা কর। দিন গুজায়ে উম্র কে ইনসান্‌ হস্‌তে বোলতে
জান ভী নিক্‌লে তো মেরী জান হসতে বোলতে

জীবনের দিনগুলো হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়াই ভাল, এ সংসার থেকে বিদায় নেবার সময়ও যেন প্রসন্ন থাকতে পারি।

শোনা যায় মীর্জা 'দাগ' মৃত্যুকালে বেশ প্রসন্ন চিত্তেই মহাযাত্রা করেছিলেন।

বসে বসে ঘুম এসে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘুমে এলে চলবে না। একটু তন্দ্রালু, কিম্বা একটু ঝিমনোর ভাব—চাকরির ওপর চাপ পড়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাই মনে মনে গল্প তৈরি করছিল লতিফ বিশ্বাস—কোনো কাগজে দেবার জন্যে নয়, কিম্বা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাতেও নয়। এ গল্প শোনাতে হবে একজনকে। ঐ একটি মাত্রই শ্রোতা। কিন্তু মনে হয়, ওর মনোরঞ্জনের চেয়ে তামাম দুনিয়ায় আর বোধহয় কোনো বৃহত্তম কর্তব্য নেই।

গল্পটা ভালোই হবে মনে হচ্ছে।—

একদিন—

এই পর্যন্ত বলেই একটু থামতে হবে। এই সময়ে আফরোজা নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে তার কাছে আরও একটু সরে আসবে। সে জানে এ নিছক বানানো গল্প নয়, ব্যাপারে তার স্বামীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার গল্প। ভাববে সে। লতিফ বলে যাবে—

এখনো সন্ধ্যের অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে নি। ডাউন প্যাসেঞ্জারখানা প্লাটফর্ম থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছোট্ট স্টেশন। কোনো প্যাসেঞ্জার নামে নি, ওঠেও নি। হঠাৎ চমকে উঠল গার্ড—লাল-পাড় শাড়ি পরা একটি তরুণী বধূ পিছন থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি ভ্যাকুয়াম টেনে আপ করল গার্ড। গাড়ি থেমে গেল। প্যাসেঞ্জাররা উদ্বিগ্ন হয়ে মুখ বাড়ালো। মুহূর্তে কথাটা ছড়িয়ে গেল—অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে—অ্যাকসিডেন্ট! সুইসাইড করেছে একটি মেয়ে—না, একটি বৌ! গাড়ি থেকে প্যাসেঞ্জাররা নেমে পড়ল মজা দেখবার জন্যে কিন্তু কাছে এগোতে পারল না, গার্ড তার আগেই নেমে পড়েছে আহত বধূটির কাছে। সকলে দূরে থেকে সসম্ভ্রমে গার্ডের দিকে তাকিয়ে রইল। গার্ড কয়েকজন খালাসীর সাহায্যে লাইন থেকে মেয়েটিকে তুলল। না, আঘাত গুরুতর নয়। ফার্স্ট এড দিতেই জ্ঞান ফিরে এল। মেয়েটি চোখ মেলে তাকিয়েই কাতর কণ্ঠে বলল, গার্ড-সাহেব, কেন আপনি আমায় বাঁচালেন? আমার জীবনে যে বড় কষ্ট।

লতিফ বিশ্বাস জানে, এইখানে আফরোজারও দু'চোখ জলে ভরে উঠবে। বলবে, নিশ্চয়ই ওর স্বামী ওকে ভালোবাসত না।

তাই না?

কী জানি। সে গল্পটাই জমকালো করে বানাতে হবে।

কিম্বা—

মনে করা যাক, গভীর রাত্রি। বৃষ্টি পড়ছে। একটা ছোটো স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা। গার্ড সবুজ আলো দেখাচ্ছে, হঠাৎ প্লাটফর্ম থেকে ছুটতে ছুটতে একটি তরুণ আর একটি তরুণী এগিয়ে এল কাছে। দু'জনেই ভিজে গেছে জলে। দু'জনেরই চোখে মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। তরুণ ছেলেটি হাত জোড় করে বললে, তাড়াতাড়িতে টিকিট কাটতে পারলাম না। যদি দয়া করে—

উঠে আসুন। বলে গার্ড তাদের ব্রেকে তুলে নিল।

না, এরা স্বামী-স্ত্রীও নয়, ভাই-বোনও নয়, মেয়েটির মুখে একটি সলাজ হাসি। সঙ্গে একটা পুঁটলি মাত্র। পরনে মোটামুটি একটা শাড়ি। দেখলেই বোঝা যায়, খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। অথচ এত রাতে—

লতিফ বিশ্বাস জানে, এইখানে আফরোজা বলে উঠবে—নিশ্চয় ওরা পালিয়ে যাচ্ছে! তাই না?

কী জানি। সে গল্পটাও এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি।

গার্ড-সাহেব রিস্টওয়াচটার ওপর একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। রাত সাড়ে তিনটে। না, আর গল্প বানানো যাচ্ছে না! মাথাটা ভার হয়ে উঠেছে।

গরমকাল। তার ওপর অসহ্য গুমোট। চারিদিকে গাছপালা জঙ্গল। কিন্তু একটি পাতাও নড়ছে না। জনশূন্য চারিদিক।

জঙ্গলের মধ্যে থেকে ঝি-ঝি ডাকছে। একদিকে জঙ্গল, আর একদিকে জলা। চাঁদের আজ কত তারিখ কে জানে। এখনো তো চাঁদ উঠল না। চারিদিকে শুধু অন্ধকার। দীর্ঘ মালগাড়ি। কত দূরে যে ইঞ্জিন তার ঠিকানা নেই। সব শেষে এই ব্রেক-ভ্যান। তারই মধ্যে একা গার্ড-সাহেব।—যেন নির্বাসিত আসামী।

ব্রেক-ভ্যানটির অবস্থাও শোচনীয়। এমন ব্যবস্থা নেই যে, অন্তত বিপদের সময়েও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হতে পারে। জানলা আছে, কিন্তু সাটার নেই। খোলা ব্রেক-ভ্যান। একটা কুকুরও ইচ্ছে করলে পাশের জঙ্গল থেকে লাফ দিয়ে লবিতে উঠে পড়তে পারে। অন্য কোনো কিছুর আক্রমণ তো—

তরুণ গার্ডের সর্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল।

হাঁ, এই লাইনে এমনি অরক্ষিত লবিতে বিপদ ঘটেছে বৈকি। এ পথে যত মালগাড়ি চলে, তার কোন্ গার্ড না জানে সে-সব বিপদের কাহিনী! গার্ড চেঁচিয়েছে প্রাণপণে, কিন্তু এ তো প্যাসেঞ্জার ট্রেন নয় যে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করতে লোক ছুটে আসবে—খাটখানা ওয়াগান পার হয়ে সে আর্তস্বর ড্রাইভার বা খালাসীদের কানে পৌঁছয় নি।

সে-সব ঘটনায় দেখা গিয়েছে, কতবার দুর্বৃত্তের দল ছোরা হাতে গার্ডের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, ছিনিয়ে নিয়েছে হাতঘড়ি কিম্বা মানিব্যাগ। কিম্বা হয়তো সদলবলে আক্রমণ করেছে এক একখানা ওয়াগান লুঠ করবার জন্যে।

ঠিক সেই জায়গাতেই এসে এখন গাড়িটা দাঁড়িয়েছে। সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে ক্রস করে গাড়িখানা ঢুকেছে ইস্টার্ণ রেলের ওপর।

গার্ড অন্যমনস্ক হবার জন্যে বুক পকেট থেকে একটা খাম বের করলে। খামের ভিতর পোস্টকার্ড সাইজের একটা ফোটো। তাদের বিয়ের পরে তোলা। সবেমাত্র প্রিন্ট করা হয়েছে। এখনো আফরোজাকে দেওয়া হয় নি। বাপের বাড়ি চলে গেছে। বলে গিয়েছিল বার বার করে, ছবি হলেই যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ছাই দেবে। বাপের বাড়ি বসে থাকলে আর অত সহজে ছবি পাওয়া যায় না। এ ছবি পেতে হলে হাতে হাতে পেতে হয়।—গার্ড সাহেব হ্যাণ্ড সিগন্যাল ল্যাম্পের সবুজ আলোয় ছবিখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

বিয়ে হয়েছে মাত্র কয়েক মাস হল। গত দু' সপ্তাহ ধরে সে কাছে নেই। গিয়েছে বাপের বাড়ি। বাপের এক মেয়ে। এক সময়ে অবস্থা ভালোই ছিল। আজ অবস্থা পড়ে গেলেও শান-শাওকত যায় নি। সবাই ইজ্জৎ করে। নিজেদের বিরাট আম বাগান। প্রতিবারই এই সময়ে আফরোজা বাড়ি থাকে। তাই এবারও—প্রসন্ন মনে যেতে দেয় নি লতিফ। কেই বা যেতে দেয়। বিশেষ নতুন বিয়ের পর। তবু মেয়েদের মন—বোঝা যায় না। যে বিরহে পুরুষের মন চঞ্চল, সেই বিরহের জন্যেই স্ত্রীর মন উৎসুক।

আব্বাকে অনেক দিন দেখিনি। লক্ষ্মীটি পনেরোটা দিন থেকেই চলে আসব।

লতিফ গম্ভীর ভাবে বলেছে, তুমি আম খেতে ভালোবাস?

বোধ হয় আফরোজা ইঙ্গিতটা ধরতে পারে নি। তৎক্ষণাৎ বলেছে, হ্যাঁ।

—বেশ, কালই এনে দেব। কত খেতে পার দেখব।

এবার আফরোজা বুঝতে পারল। লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে বললে, ধেৎ! আম খাবার জন্যেই যাচ্ছি নাকি! লক্ষ্মীটি, তুমি অমন ভুল বুঝো না।

আফরোজা চলে গেল।

তাদের এই প্রথম ছবিটা এখনো আফরোজা দেখেনি। যখন দেখবে, সে মুহূর্তে তার সেই আনন্দে উজ্জ্বল মুখখানি কি শুধু কল্পনা করেই ছেড়ে দেওয়া যায়? লতিফ সেই সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছবিখানি পাঠায় নি। আর তো তার এসে পড়ার সময় হয়ে এল।

আফরোজাকে দেখতে খাপা। ফর্সা রং, চোখে কাজল, নাকে সাদা নোলক। ছবিতে তাকেও মন্দ লাগছে না। ও বলেছিল, গার্ড সেজেই তুলতে। সাদা প্যান্ট, সাদা কোট, মাথায় সাদা হ্যাট। পাগল! ঐ সং সেজে কি ছবি তোলে কেউ; কিন্তু আফরোজার সাধ ছিল। ইচ্ছে, সবাইকে দেখায় স্বামী তার গার্ড—শুধু গার্ড নয় গার্ড-সাহেব!

ইঞ্জিনের হুইশ্‌ল বাজল। চমকে উঠল গার্ড। সিগন্যাল হয়েছে তা হলে। তাড়াতাড়ি লবিতে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ড ল্যাম্পটা নাড়তে লাগল। ড্রাইভার দেখেছে। গাড়ি চলতে শুরু করল। লিলুয়া আসছে। লিলুয়া ছেড়ে বেলুড়। তারপর বেলানগর, এখানেও দাঁড়ালো অনেকক্ষণ। ডিটেনসান—কেবলই ডিটেনসান! এইসব মালগাড়িতে চড়লে মনে হয় পৃথিবীতে বোধ হয় গতি বলে কিছু নেই। গতিই জীবন—গতির দৈন্য মৃত্যু। মালগাড়ির গার্ড প্রতিমুহূর্তে এই অপমৃত্যুতে মরছে। ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দেয় সীটে। রাত চারটে বেজে গেছে। আকাশ ফর্সা হয় আসছে।

এ এক বিচিত্র জীবন। কতদিন এমনি রাত দুটো থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত কেটে গেছে এই ব্রেকভ্যানে। গায়ে এই ধড়াচুড়ো—সদাসর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি।

এমনি কত রাত—কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে। শুধু রাত নয়—রাত থেকে রাত ভোর—ভোর থেকে বেলা দ্বিপ্রহর! মাল গাড়ির গার্ড—তার ডিউটির নির্দিষ্ট সময় নেই। দু'ঘণ্টা আগে নোটিশ—কল বুকে সই করে প্রস্তুত হয়ে নাও!

কিন্তু তবু হয়তো এ কষ্ট সহ্য করা যেতে পারত যদি একটা সঙ্গী পাওয়া যেত। কিন্তু সঙ্গী কোথায়! ষাট খানা গাড়ির আগে ইঞ্জিন চলেছে ধক্ ধক্ ঝক্ ঝক করতে করতে। ঈর্ষা হয় ঐ ড্রাইভারের ওপরে। ওর তবু সঙ্গী আছে ফায়ারম্যান, খালাসী। দুটো কথা তো বলা যায়। কিন্তু—

ভাবতে পারে না তরুণ গার্ড। এ কী কঠোর শাস্তি। একটা মানুষ পারে একটানা আঠারো ঘণ্টা—বাইশ ঘণ্টা কথা না বলে থাকতে। কোনো মানুষের কণ্ঠস্বর পর্যন্ত শোনা যায় না—শুধু চাকার শব্দ—একঘেয়ে একটানা ঘটাং ঘটাং ঘটাং ঘটাং! এখানে মানুষ নেই—মানুষের প্রসঙ্গ নেই—শুধু আছে ওয়াগান ভর্তি মাল—লোহা লক্কর টিন কাঠ কয়লা!

গার্ড দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। কবে মুক্তি পাবে এ নির্বাসন থেকে? বেশি উচ্চাশা নেই—শুধু একটি প্রমোশন প্যাসেঞ্জার ট্রেণে! সেখানে তবু মানুষ দেখা যায়। সেখানে তবু ডিউটির একটা নির্দিষ্ট সময় আছে—এমন যখন-তখন সময়-অসময়ে 'কলবয়' গিয়ে ঠেলে আনে না!

না, আর ভালো লাগছে না। বড় নীরস জীবনকথা। তার চেয়ে আর একবার মনটাকে সুধারসে ভিজিয়ে নেওয়া যাক। আফরোজা—আফরোজা—আফরোজা! আশ্চর্য এই চারটি অক্ষরের নাম। শুধু মাত্র উচ্চারণেই মনের সব-ক্লান্তি দূরে হয়ে যায়।

কিন্তু এই আফরোজার সঙ্গেও সে ... করেছে—মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। সে ... মাপ নেই।

মাত্র কয়েক মাসের দাম্পত্য জীবনের ... এক এক দিন যখন সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে ... তখনও আফরোজা স্বামীর প্রলুব্ধ কাম... কৃত্রিম কোপে নিবারিত করে বলে উঠেছে—... কেবল বিরক্ত করে! তার চেয়ে একটা ... বলো না।

প্রথমে গল্প বলতে চায়নি লতিফ। ... রোজাও পাশ ফিরে শুয়েছে। প্রত্যাখ্যাত ... তাড়াতাড়ি নববধূর মনোরঞ্জনের জন্যে ... গল্প বলতে চেয়েছে। কিসের গল্প আফ... শুনতে চায় তা সে জানে।—গার্ডের গল্প। সত্যকার জীবনের বাস্তব গল্প। কিন্তু ... মালগাড়ির গার্ডের জীবনে গল্প বলে ... নেই—ও জীবন নিয়ে গল্প হয় না। ... নীরস জীবন—কেবল লোহা লক্কর ... করোগেটেড টিন কিম্বা চাল পাট টেনে ... যাওয়ার কাহিনী। পদে পদে ডিটেনসান ... এক্সপ্লেনেসান!

তাই হতভাগ্য গুড্‌স ট্রেণের গার্ডকে সা... হয়েছে প্যাসেঞ্জার ট্রেণের গার্ড। বানাতে হ... গল্প। মিথ্যে করেই বলতে হয়েছে ... বিশ্বাসকে। বলতে হয়েছে, বড় সুখের চা... তার! ভেবে দেখোনা, বিনা পয়সায় কত ... প্রতিদিন ঘুরে বেড়ানো হয়—কত র... মানুষ—কত রকমের ঘটনা! ভিড় নেই, ঠেলা... নেই—গার্ডের জন্যে আলাদা ঘর। সেখানে ... আঁটা সীট। হ্যাঁ গো, আমি—তোমার স্বা... এই লতিফ বিশ্বাস!

শুনতে শুনতে আফরোজার গায়ে শি... জাগে। দু' চোখে বিস্ময়। স্বামীর হাত... নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন ... মুহূর্তে তারই বুকের ওপর পড়ে ... খেয়াল নেই—স্বামীর মুখে গল্প শুনে ...

—হ্যাঁ, ট্রেণ চলবে আমার অনুমতি পে... আমি সবুজ নিশান নাড়ব, আমি হুইশ্‌ল ... তবে গাড়ি ছাড়বে। আবার আমিই প্রয়ো... বুঝলে গাড়ি থামিয়ে দিতে পারি, ... আমারই হাতে। টিকিট কাটতে পারেনি, ... দয়া করে অনুমতি দিলে গাড়িতে উঠতে পা... দুর্ঘটনার সময়ে আমাকেই গিয়ে দাঁড়াতে ... আগে।

বলতে বলতে চতুর নায়ক হঠাৎই ... যুবতী বধূকে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করে। ... বাধা দেয় না। স্বামীর কণ্ঠলগ্না হয়ে আদ... সুরে বলে, একদিন আমায় দেখাবে—যে ... তুমি থাকবে গার্ড?

লতিফকে তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গ বদলাতে ... গল্প বলি শোনো। একদিন—

কণ্ঠস্বরটা গাঢ় করে নিয়ে লতিফ ... ভাড়ি গল্প আরম্ভ করে দেয়। ভাবতে ... আশ্চর্য হতে হয়, কী অসাধারণ তার ... ঘাবাবার ক্ষমতা। গুড্‌স্ ট্রেণের গার্ডের চা...

...নিয়ে গল্প লেখবার চেষ্টা করলে একদিনে লেখক বলে খ্যাতি রটে যেত।

একটার পর একটা গল্প মনে যেতে হয়। ...সব গল্পে এইটেই দেখানো হয় সম্মানের কত ...আসলে তার স্থায়ী আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। সে ...—অতএব, না বাঙালির সে ... শুধু ...হনে দিয়ে সে সম্মানের ... বিচার ... না।

সুখ রোমন্থনে বাধা পড়ল। ইঞ্জিন ...হুইশল দিচ্ছে। বোধ হয় সিগন্যাল পেয়েছে। ...তাড়াতাড়ি হ্যান্ডল্যাম্প নিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ...দাঁড়ায় গার্ড। না, সিগন্যাল হয়নি। অধৈর্য ...ড্রাইভার হুইশল দিয়ে সিগন্যাল চাইছে।

মনে পড়ল আর একদিনের কথা। সেদিনও ...নি ডিটেনসান। অসুস্থ শরীরেই গাড়ির চার্জ ...নিয়েছিল। ওয়াগনগুলো একটার পর একটা ...করে, রাত বারোটায় লম্বা গাড়ি ছেড়েছিল। ...তারপর মাত্র আট দশ মাইল পথ গাড়ি চার ...বার এসে এমনি কোনো স্টেশনের মুখে ...ডিটেনসান! ভোর রাত্রি। খোলা ব্রেকভ্যানের ...দিয়ে ঝির ঝির করে বাতাস বইছিল। ...শরীর অসুস্থ। আন্দাজ করা গিয়েছিল ঘণ্টা ...খানেকের আগে কিছুতেই লাইন ক্লিয়ার পাওয়া ...যাবে না। তাই দু হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে ...চুপ করে বসে ছিল। হঠাৎ লক্ষিত পায়ের শব্দ। ...সঙ্গেই টর্চ এসে পড়ল মুখের ওপর। ...দেখল সামনে প্যান্ট-কোট পরা দীর্ঘ ...মূর্তি। What's your name? আগন্তুক ...প্রশ্ন করলে। বুঝতে বাকি রইল না, ইনি ...অফিসার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ...গার্ড বললে : I am Latif Biswas Sir।

...কণ্ঠস্বরে অফিসার বললে, You were sleeping?

জিজ্ঞাসা নয়, একেবারে মন্তব্য। চার্জ!

লতিফ স্খলিত কণ্ঠে বললে, No Sir.

অফিসার সে উত্তরে মনোযোগ না দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বললে, Why your side light not burning?

গার্ড প্রমাদ গুণল। আজকেই সাইড ল্যাম্পটা জ্বালানো হয়নি। অবশ্য দোষ তার নয়। তাই সাচ্চা কথাই বললে—বুল-আই গ্লাসটা ভেঙ্গে গেছে স্যার।

টেল-ল্যাম্প? গর্জে উঠলেন অফিসার।

হায়! টেল-ল্যাম্পের ঢাকনাটা ভালো করে বন্ধ করা হয়নি। কখন বাতাসে নিভে গেছে পিছনের বাতি।

নিশ্চয় সেফটি অফিসার! খাতায় খস খস করে লিখে নিয়েছে কি। চমকে উঠেছিল গার্ড। বারে বারে মনে পড়তে লাগল শুধু একটি কথা—You were sleeping?

সেফটি অফিসারের কথার উপরে আপিল করা চলে না।

যাক চাকরিটা তবু থেকে গেছে।

আরও সৌভাগ্য—সেই অপমানের সময় আফরোজা তখনও তার ঘরে আসেনি। গার্ডের গল্প তাহলে সেদিন কী রকম জমত তা বলা যায় না।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে। কাঁকুড়গাছি কেবিন পার হয়ে বালিগঞ্জ লাইন। বালিগঞ্জ ওয়াটার কলাম ক্রস করে মাইল ফাইভ বি পার হয়ে কালীঘাট, মাঝেরহাট। এখানেও ডিটেনসান। যতক্ষণ না ডক গাড়ি নিতে পারে। বেলা এগারোটা বেজে গেছে। মাথার চুল উস্কখুস্ক, রুক্ষ। মুখখানা কালো হয়ে গেছে, দু চোখ অনিদ্রায় রক্তবর্ণ। ছুটি? ছুটির এখনো বহু দেরি। ডকে পৌঁছে আবার মালপত্র বুঝিয়ে দিতে হবে।

তবু যত দেরিই হোক আর আটচল্লিশ ঘণ্টা পরেও তো সাঁত্রাগাছিতে ফিরতে পারবে—সাঁত্রাগাছির সেই একতলা বাড়িটি যার দরজায় তালা ঝুলিয়ে এসেছে। যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে তখন নিশ্চয় দেখতে পাবে দরজা তালা বন্ধ নয়, আরও দেখবে জানালায় জানালায় পর্দা ঝুলছে। ... কালুন কাল শুক্রবার—কালই দুপুর নাগাদ আফরোজা এসে পৌঁচচ্ছে।

এই যে তার চিঠি—

আবার বুক পকেট হাতড়ে আর একটা খাম বেরোল। তার মধ্যে নীল কাগজে দীর্ঘ একখানি চিঠি। তারই অংশবিশেষ—

গার্ডসাহেব, সালাম!

শুক্রবার রওনা হচ্ছি ভোরে। শুনলাম, কোথায় কোন গাড়ি লাইন থেকে পড়ে গিয়েছে। ভয়ে মরি। এবার গিয়ে অনেক গল্প শুনব সারা রাত জেগে। আর একটা কথা বলব—একদিন ট্রেনে করে বেড়াতে নিয়ে যাবে?—যে ট্রেনে তুমি গার্ড, আর আমি বিনা টিকেটের যাত্রী! নামিয়ে দিও না দয়া করে।......

চিঠিখানি আরও দুবার পড়ে সযত্নে পকেটে রেখে দিল গার্ড।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু গার্ডের মনে আবার দুর্ভাবনা—যে দুটো গল্প আরম্ভ করেছিল তার কোনোটাই শেষ করা হয়নি। তা ছাড়া সত্যিই যদি আফরোজা ট্রেনে করে বেড়াতে যাবার জেদ ধরে? বলা তো যায় না, যা জেদি মেয়ে!

গোপাল ঘোষ

অগ্নিকন্যা

ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

এখন অনেক রাত, তুমি ঘুমোও বেলাদি। তোমার চারপাশে ঘুম পাড়াবার কত আয়োজন, এতেও ঘুম আসছে না কেন বলতো! তোমার মনের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে ঘরের বাতায়নটা খুলে দাও দেখি একটু। তারপর কান পেতে থাক; শুনতে পাবে শ্রাবণের ঝর ঝর বারিধারা ঝরছে অঝোর ধারে।

তুমি ঘুমোও বেলাদি। তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুমাব। তোমার না ঘুমানোর হাওয়াটা কেমন করে বাদলে বাতাসে বাতাসে ভেসে এল এত দূরে এই নিশুতি রাতে। তুমি আমার কথা ভাবছ বলে কি? তুমি ভাবছ আজ যদি তোমার গাড়িটা লাস্ট ট্রেণ না হোতো, প্রথমদিনের মত গল্প করে আজকের কথাটাও বুঝিয়ে বলতে আমায়। আজ আবার তোমায় নতুনরূপে দেখে অবাক হয়েছি নিশ্চয়ই। হয়ত ভুল বুঝেছি যেমন প্রথমদিনে গল্প না শোনা পর্যন্ত বুঝেছিলাম। বেলা বোসকে আমি ভুল বুঝলে কি ক্ষতি? সে তো আমাদের মত সাধারণের কাছের মানুষ নয় কোনদিনও। অতীতের বেলা বোস যেমন আমাদের নাগালের বাইরে, বর্তমানের মহিলাটিও তো সবার চেয়ে স্বতন্ত্র।

তুমি সেই বেলাদি যে মাখনের মত নরম নরম হাতে রিভলবার ধরে আগুন ছুটিয়েছিলে একদিন। বোমা পিস্তল নিয়ে মৃত্যুর কারবার ছিল যে মেয়ের সে আজ এমন মনের কারবারী হল কি করে।

তাইতো অবাক লাগে ভাবতে। একজন অসাধারণ মেয়ের মধ্যে কেমন করে সংস্কারাচ্ছন্ন এক সাধারণ মেয়ে ঘুমিয়ে থাকে নির্বিঘ্নে। সেদিনেই প্রথম শেয়ালদয়ে দেখলাম সেই অসাধারণ মেয়েকে। নিরাভরণ হাতে শুধু মাত্র দুগাছি লিকলিক করা সরু সোনার চুড়ি। পরনে রঙ্গীন তাঁতের শাড়ি, কানে দুটো মুক্তা, সিঁথিটা যেখানে রক্তের মত লাল হয়ে থাকত টকটকে সিঁদুরে সেটা সাদা, ধান-কেটে নেওয়া মাঠের মত শূন্য খাঁ খাঁ করছে।

—বেলাদি? তোমাকে দেখেই চমকে উঠে আর্তনাদ করে ডেকেছিলাম আমি। আমার ঐ ভয়ার্ত কণ্ঠ তোমাকেও বুঝি শঙ্কিত করে তুলেছিল। তাই তুমিও স্বাভাবিকভাবে আমাকে কোন প্রশ্ন করতে পারনি বেশ কয়েক সেকেণ্ড।

হাজার হলেও অগ্নিযুগের মেয়েতো তুমি। আমাকে যেন অভয় দেবার জন্যই মৃদু হেসে জবাব দিলে—

—শ্যামল না?

—হ্যাঁ বেলাদি, কিন্তু তোমার এমন সর্বনাশ কবে হল?

আমি কি কেঁদেছিলাম বেলাদি? আমার চোখে জল দেখেই কি তোমার চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছিল? আমি ছাঁপোষা সংসারী মানুষ। আমার অপরিসর কাঁধে একটা গোটা সংসারের জগদ্দল পাথর চাপানো, আমি চোখ বুজলেই তারাও অন্ধকার দেখবে, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদবে। হঠাৎ আমি নেই ভেবেই চোখে জল এসেছিল যদি ভূপতিদার মত আমিও কাল না থাকি।

কি আমি দেখেছিলাম তোমার দিকে চেয়ে জানি না। নিশ্চয় ভয় নয়। ভয়টা তোমার অভিধান থেকে কবেই বিদায় নিয়েছিল।

নিশ্চয়ই তুমি ভুলে যাওনি সেই বেলা বোসকে। আমিও ভুলিনি। তুমি, ভূপতিদা আর তোমাদের সঙ্গী রতন সেন আত্মগোপন করে ছিলে আদিবাসীদের একটি গ্রামে। কেমন করে জানি সংবাদ পেয়েছিল পুলিশের দল। যখন সমস্ত গ্রামটাকে ঘিরে ফেলেছে তখনই তো খবর পেলে তোমরা।

—কি হবে এখন—তুমিই মুখ খুললে প্রথম।

ভূপতিদা কথা বলারও সময় পায়নি। সে ছুটেছিল উত্তর দিকের ছোট্ট পাহাড়টার উদ্দেশে, ইতস্ততঃ গুলী ছুটেছিল এদিক ওদিক থেকে। ধরা পরে গেল বেশ কিছুটা দৌড়াদৌড়ি করে। তুমি গ্রামের শেষের নালাটা সাঁতরে পার হয়ে পার পেলে। সেদিন অন্ধকারের মধ্যে তোমার চোখ দুটো জ্বলেছিল বোধ হয় কিন্তু সত্যই কি পার পেয়েছ আজও। সেদিন যে নালাটা পার হয়েছিলে গুলীবর্ষণের মধ্যেও আজ কলকাতার মত নিরাপদ দূরত্বে এসেও সে নালাকেই মনে হয় এক দুস্তর পারাবার।

মাসীমা আপশোস করে বললেন,—কিছু মনে করিস্‌নে মা। অতি আদরের জন তুই তোকে আশ্রয় দিতে না পারার যে কি যন্ত্রণা...।

—একটি রাত্রির মত ঠাঁইও নেই মাসিমা।

মাসিমার চোখে কি সত্যিই সেদিন জল দেখেছিলে বেলাদি!

যাক ওকথা। পুরনো কথা মনে করে কিই বা লাভ বল! শেয়ালদয়ে যে বেলাদিকে দেখলাম তার সংগে দেখা না হওয়াই ছিল ভাল। কত আপনার জনই তো দূরে চলে গেছে মন থেকে, সেই সংগে তুমিও যেতে। তোমাকে এই বেশে এমন একা একা না দেখলেই পারতাম। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত ভূপতিদা আর তোমাকে দেখেছি একসাথে পাশাপাশি। রাজনীতির সংগী হল জীবনসংগী। অথচ সেই ভূপতিদা...।

—কোথায় থাক এখন, কি কর?

আমার সব ভাবনায় ছেদ পড়ল তোমার ঐ আচমকা প্রশ্নে। কি জবাব দেব। নিজের কোন কথাই যে মনে আসছে না। ঘুরে-ফিরে অবাধ্য চোখদুটো কেবল তোমার মুখের ওপর থেকে সিঁথি বরাবর গিয়ে থমকে থাকছে। আর তখনই মনে পড়ছে ভূপতিদাকে।

—কি হয়েছিল ভূপতিদার! জেলের মধ্যেই কি......

অদৃশ্যে বেশ ঠেলঠেলি চলেছে দুজনের মধ্যে। অঘোষিত যুদ্ধের মত। বেলাদি যতই তার নিজের কথা এড়িয়ে গিয়ে আমার প্রসংগে আসতে চায় আমি ততই আঁকড়ে ধরি তাকে। অদ্ভুত পরিস্থিতি। সকলেই চায় নিজের কথা শোনাতে। আমরা কিন্তু বিপরীত।

কেনই বা হবে না। ভূপতিদাকে ভোলা কি সহজ নাকি! মৈমনসিং থেকে চলে আসার সময় যা শুনে এসেছিলাম সেকথা মনে হলে কি চুপ করে থাকা যায়? কেউ পারে!

বন্দী ভূপতিদাকে থানায় নিয়ে তোলার পরের কথা বেলাদি শোনেনি হয়ত। না শুনেছে ভালই হয়েছে। ফেরারী বেলা বোস তখন ট্রাউজার আর সার্ট পরে মাথায় পাগড়ী জড়িয়ে পাঞ্জাবী সেজে সাইকেলের পিছনে ক্যারিয়ারে বসে মৈমনসিংএর পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় পালিয়ে আসতে ব্যস্ত। তখন কি তার পিছন ফিরে তাকাবার সময় আছে?

বেলা বোস পালিয়ে আসতে পারল কিন্তু আমরা পারিনি। তার প্রয়োজন ছিল বাঁচার পুলিশের হাত থেকে, আমাদের তা নয়। তাই সারারাত সেদিনে আমার মত থানার আশপাশের বাড়ির মেয়ে-বৌ আর পুরুষেরা শুধু কেঁদেছে হাউ হাউ করে। সে কি অত্যাচার। কোন গল্প কথা নয় বেলাদি! সারারাত ভূপতিদাকে পিটিয়েছে পুলিশ, দলের লোকদের খবর জানার জন্য। ভূপতিদার ব্যথাটা অনুভব করেছি আর চোখের জলে ভেসেছি। ওরা তো জানেনা প্রতিটি রুলের বাড়ি পড়েছে আমাদেরই গায়ে।

তাইতো প্রশ্ন তোমায় বেলাদি কি হয়েছিল ভূপতিদার? হাসপাতালের খবর তুমি জানতে। দীর্ঘদিন হাসপাতালে থাকার খবর আমিও জানতাম; জেল হাসপাতালেই কি ভূপতিদা...?

—তোমার চেহারাটা তো বেশ হয়েছে দেখছি? চাকরি বাকরি কর নাকি?

আমি অবাক। বেলাদি কি ভূপতিদাকে ভুলতেই চায় নাকি! মুখের দিকে চেয়ে থেমে যেতে হল। বেলা বোসকে মনে করিয়ে দিতে হবে ভূপতিদার কথা। বেলাদিকে দেখে প্রথম [illegible] কেন? সেকি তার [illegible] সাথে নয়? [illegible]

সিঁথিতেও তো ভূপতিদার স্মৃতিই রয়েছে জড়িয়ে। তাই তো মনে পড়ছে তার কথা বার বার। ভূপতিদাকে সারা অংগে ধারণ করে আছে কে? সেতো বেলাদিই—বেলাদিকে দেখেই তো মনে পড়ল তাকে।

—কি দেখছো অমন করে বারে বারে!

লজ্জা পেয়ে মুখ নামিয়ে নিলাম।

আয়নার সামনে বসে যেমন সহজভাবে সিঁদুর কৌটো থেকে সিঁদুর তুলে সিঁথিতে পরতে ঠিক তেমনি সহজভাবে সিঁদুরটাকে মুছে ফেলতে পেরেছিলে কি? না কি হাত বাড়িয়ে ওটাকে মুছতে গিয়ে হাতটাকে টেনে নিয়ে এসেছ?

—তোমার কোন জরুরী কাজ নেই তো হাতে!

ছিল ঠিকই কিন্তু এখন বেলাদির সব কথা শোনার চেয়ে অন্য জরুরি কাজের কথা মনে আসে কি করে!

—না বেলাদি!

—তবে চল, একটু চা খাওয়া যাক।

পর্দাটা টেনে দিয়ে রেস্টুরেন্টে বসলাম দুজনে মুখোমুখি। বেলাদির এত কাছে এরকম মুখোমুখি বসবার সাহস জীবনে এই প্রথম। দূরে থেকেই দেখে এসেছি এতকাল। কেমন যেন ভয় ভয় করত দেখলেই। আজও সেই ভয়। পাশে ভূপতিদা নেই, তবুও।

—বল তোমার খবর শুনি।

কি বলব! দশটা-পাঁচটার ঘানিতে ঠুলি বাঁধা বলদের মত পাক খাচ্ছি। সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরছি। নেই নেই শব্দের মাঝে মনে পড়ছে অফিসের ডেবিট ক্রেডিটের ফিগারগুলো। নিট মুনাফার অঙ্কটা যখন আমার ছোট মাইনের অঙ্কের পাশে তার বিরাট ল্যাজ নিয়ে বিদ্রূপ করছে, তখন ক্ষোভের আগুনে জ্বালা পোড়া হয়ে ভয়ে ভয়ে দুটো পয়সা চাইতে আসায় মেয়েটাকে ধরে নির্মমভাবে ঠেঙাচ্ছি। এই কথা বলব নাকি? বলব আগুন নিয়ে খেলা করা মেয়ে বেলা বোসকে! কি করব! বললাম শেষ পর্যন্ত চাকরির কথা। যাক, চাকরি করছ তা হলে? ভাল। জানতো আমিও চাকরি করছি একটা।

বেলাদির খালি হাত। নতুবা ভাবতাম বোমা ফাটালো নাকি! আশ্চর্য! চাইলাম বেলাদির দিকে।

স্কেচ গৌরীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চেয়েই আছি অবাক হয়ে। দেখছি এখনও বিদ্যুৎ চমকায় কিনা বেলা বোসের চোখে।

আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বেলাদি বলল:—কি বিশ্বাস হচ্ছে না। এই দেখ ৬০ টাকা মাইনের ছাপ আঁকা আছে কি না—বেলাদি হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন আমার সুমুখে।

চা খাব কি! চা তো জুড়িয়ে যায়! কেবল হাঁ করে চেয়ে থাকার পালা: এক রেডিও কোম্পানীতে চাকরি বেলাদির। হাতের কাজ। সারাদিন ধরে একটানা একঘেয়ে খাটুনী। লীড কাটতে হয়, স্ক্রীন লীড। কখনও তার জড়াতে জড়াতে ঘা-টা পড়ে যায় হাতে। পুরোদস্তুর শ্রমিক বেলাদি। শেষ পর্যন্ত ফিনিশড গুড রেডিওটাকে কাঠের বাক্সে প্যাকিং করে হাতুড়িও ঠুকতে হয়।

বেলাদি হাত দুখানা তখনও মেলে রেখেছেন টেবিলে। দেখলাম কড়া পড়েছে হাতে। রিভলবার ধরা হাতের কড়াটা আরও কঠিন ছিল কি না কে জানে!

—কি করি বল: তোমার ভূপতিদা অসুস্থ শরীর নিয়েই আসছেন। চিকিৎসার জন্য মুক্তি সরকার দিয়েছে। তাই তো ওঁকে বাঁচাবার জন্য এই চাকরি। তাও কি হয়? কুমারী মেয়ে ছাড়া নেবে না।

কুমারীই সাজতে হল শেষে—

হাতের ঠেলা লেগে চায়ের কাপটা নীচের পড়ে চুরমার। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল সারা ঘরে। এত কাছে বসে থাকা সত্ত্বেও বেলাদির মুখটা অস্পষ্ট, যেমন দূরের মানুষ ছিল তার আগের জীবনে এখনও তাই। এ মেয়েকে চিনিনা জানিনা। যেটুকু জানি তার চেয়েও অনেক রইল অজানা। দুজনের মাঝে শুধু মাত্র একটা টেবিল অথচ মনে হয় যেন দুস্তর একটা পারাবার। এপারে বসে আমি আর ওপারে বেলাদি।

*

এখন অনেক রাত্রি। বৃষ্টি থেমেছে। বাইরে হাস্নুহানার গন্ধ। ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধের লোভে ঝিঁ ঝিঁ পোকারা চীৎকার করছে তারস্বরে। ভাবছি বেলাদি তোমার কথাই। প্রথম দিনের মতই আজও আবার হঠাৎ দেখলাম তোমায় শেয়ালদতেই। বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল আমরাও তোমার মতই। তোমার ট্রেন হুইসিল দিয়ে ছাড়ল। তুমি তাড়াতাড়িতে উঠে বসলে চলন্ত ট্রেনেই। শেষ ট্রেন। গাড়িতে উঠে কি যেন বলতে গেলে মুখ বাড়িয়ে। ট্রেন তখন স্পিড নিয়েছে। বলা হল না তোমার কথা।

না, বেলাদি। তুমিও ঘুমোও। আমি ভুল বুঝিনি তোমায়। অত ব্যস্ততার মধ্যেও চিনেছি তোমাকে। আজ মনে হয়েছে তুমি যেন ফুলের ভারে নুয়ে পড়া রজনীগন্ধা। তোমার সাদা সিঁথিটায় আজ টুকটুকে লাল সিঁদুর উঠেছে। একদা বিপ্লবের আগুনে রাঙানো মুখখানা তোমার লজ্জাসুখের তৃপ্তিতে ভরে উঠতে দেখেছি। এর পরও কি তোমায় মুখ ফুটে বলতে হয় কিছু! কি বলার ছিল, হয়ত বলতে—জান শ্যামল, তোমার ভূপতিদার সঙ্গে নতুন করে বিয়ে হল যে—যেও একদিন আমাদের বাসায়। ভূপতিদাকে দেখতে যাবে না?

নিশ্চয়ই যাব। তোমাদের দুজনাকে নতুন করে দেখে আসব একদিন। আজ তুমি ঘুমোও বেলাদি। এখন অনেক রাত।

ফিরে দেখা

কালিদাস দত্ত

"এই জীবন, সব বিদ্যা, শিক্ষা, সাফল্য—সব কিছু—জীবনের এক অর্থহীন সুসম্পূর্ণতা— অর্থহীন, মূল্যহীন, মহিমান্বিত তুচ্ছতা—"

তিমির কথাগুলি উচ্চারণ করল থেমে থেমে, গাঢ়, অদ্ভুত এক আত্মমর্যাদাময় আসক্তি এবং বিশ্বাসের উপলব্ধিতে। সেই প্রশান্ত আবেগ এমন এক মোহমুগ্ধ, তন্দ্রাচ্ছন্ন ছায়া এনে দিয়েছিল তিমিরের সারা মুখমন্ডলে, বিশেষতঃ তার দুই চোখে, যা আমার মত বিঘোষিত অবিশ্বাসীকেও মুগ্ধ, বেদনাহত করল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। নীল আকাশকে এক বিরাট দৃশ্যপটের মত মনে হচ্ছিল।

আমরা আকাশের ছাতি মাথায় দিয়ে ময়দানে বসেছিলুম চুপচাপ। দূরে দক্ষিণ-পূব কোণে ভিক্টোরিয়া হল কুয়াশাচ্ছন্ন আবছা প্রতিভাত হচ্ছিল। পাখিরা সারাদিনের ক্ষুধা, আলোর পিপাসা সাঙ্গ করে কলকাকলিতে ঘরে ফিরছিল। মার্চের শেষের সান্ধ্য বাতাস তীব্র, উদ্দাম, কবোষ্ণ দীর্ঘশ্বাসের মত গায়ে বিঁধছিল। কেউ যেন আমাদের পাশে বসে কাঁদছিল।

তিমির অদূরে হকি খেলে ঘরে-ফেরা গুটি-কয় স্বাস্থ্যবতী মেয়ের পা থেকে চোখ আকাশে ফেরাল।

আমি বেশ বুঝতে পারছিলুম ওর কিছু ভালো লাগছে না, ও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। ওকে যে কী ভাবে আমি একটু স্নিগ্ধতা এনে দিতে পারি ভেবে পাচ্ছিলুম না।

ওর জীবনের অনেক কথা আমাকে বলেছে, আমি আমার পরিহাস দিয়ে ওকে অনেক [illegible] করার [illegible], কিন্তু জীবনকে ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে শেখেনি। পৃথিবী ওর কাছে অমৃতের ভান্ড, মানুষ সম-হৃৎপিন্ডের আত্মীয়, পাখি, ফুল, সমুদ্র, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র এক বিশাল পরিবারের মহান পরিজনবৃন্দ। এই সব কথা ও যখন বলত, আমি তখন শুধু একটি কথাই ভাবতুম যে, ডক্টর তিমির চ্যাটার্জি এম-বি-বি-এস, এফ আর সি এস-এর নাম তিমিরবরণ চট্টোপাধ্যায় হওয়া সঙ্গত ছিল এবং বিলেত থেকে ডাক্তারির খেতাব না বাড়িয়ে ওর "নক্ষত্রের স্বর্ণতলে" ইত্যাকার কয়েকখণ্ড কবিতার বই প্রকাশ মারফত কবি হওয়া অধিক-তর সুসমঞ্জস হত। কেননা, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, ওর মন খুবই কোমল। ও যে এখন কেমন করে খুব কঠিন জীবন মরণময় গুরুতর সমস্ত অপারেশন ওই কোমল অঙ্গুলিতে সম্পন্ন করে থাকে ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।

আকাশের দিকে, চোখ তুলে তিমির ধ্যানীর মত কিছুক্ষণ বসেছিল। ও খুব চিন্তা করছিল, ওর মুখের সরলতা, মসৃণতা মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল ও যেন মনের ভিতরে সঙ্গোপনে কাউকে তীব্র তিরস্কার করছিল।

কাং হয়ে ট্রাউজারের পকেট হাতড়াল, বলল, সিগ্রেট দে। জানিস, কাল দুপুরে কেয়ার সঙ্গে দেখা, আশ্চর্য।

ও সিগারেটের জন্যে অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়াল। ওর প্যাকেট নিশ্চয়ই ও দূরে রাস্তায় দাঁড় করানো মোটরে ফেলে এসেছে। আমার সিগারেট হাতে নিয়ে আজ আর ও অন্যদিনের মত ভ্রূ এবং নাক কোঁচকাল না। এই মাইল্ড সিগারেট ঠোঁটে ঠেকিয়ে বলল না, "তুই একটা মেয়ে, ওয়ার্কিং গার্ল।" আজ একটা গুরুতর বিষয়ের মুখোমুখি আমরা উপনীত। যে কেয়াকে বিলেত থেকে ফিরে তিমির [illegible] [illegible] কলকাতা [illegible] খুঁজেছে অথচ পায়নি, সেই কেয়ার সঙ্গে ওর হঠাৎই দেখা।

সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে ছিটিয়ে অন্যমনস্কভাবে তিমির বললে, "যা মানুষ অনে[ক] খোঁজে, তা পায় না। যখন পায়, তখন হয়তো প্রয়োজন থাকে না, গ্রহণ করা যায় না। জীবনে দেখলুম, এ এক আশ্চর্য কানামাছি খেলা। এমন অনেক জিনিস আছে যা হারালে আর ফিরে পাওয়া যায় না। না পেলে তুই কি করবি"

আমি চুপ করে রইলাম। কেননা সত্যি ও আমার কাছে এখন প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করে না।

"ইউ আর এ ওয়াইজ ম্যান, টেল মি হোয়াট য়্যু উড্ ডু—"

তিমিরের সমস্যাটা আমি ঠিক ধরতে পারছিলুম না। ও এই রূপক দিয়ে কী বোঝাতে চাইছে তা পরিষ্কার, কিন্তু সমস্যাটা কী?

বললুম, "তিমির, ভাই সব খুলে বল, তোর মনে কোথায় জট বাঁধছে আমি কিছু ধরতে পারছি না। এটুকু শুধু বুঝছি, তুই ভয়ংকর কষ্ট পাচ্ছিস। এই মাঠে কেন তুই বারে বারে আমাকে টেনে আনিস, অথচ কিছু বলিস না, বল্ তো?"

"অবসেশন। এই মাঠ। আমি তো ডাক্তার আমি সব জানি, সবই বুঝতে পারি। কেয়া এই মাঠ খুব ভালোবাসত। এই ময়দান। [illegible] কলকাতার বুকে এক টুকরো সবুজ হৃৎপিন্ড সেই হু হু বাতাসের কত সন্ধ্যা এই মাঠে দুজনে পাশাপাশি হেঁটেছি, আকাশের তারা [illegible] [illegible] [illegible]। আমরা [illegible] [illegible] [illegible] যে, [illegible] ওর ঠোঁটে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কেয়া খু[ব]

ফর্সা ছিল, তুই তো দেখেছিস।" তিমির থামল।

"বিলেতের পাঁচ বছরে পৃথিবী অনেক বদলে গেছে। প্রথম প্রথম পড়াশুনায় খুব ব্যস্ত থাকতুম। তুই জানিস, আমি এ ব্যাপারে প্রায় "সাধক" টাইপের ছেলে ছিলুম। আমি জানতুম কেয়া আমাকে ভালোবাসে এবং প্রথম ভালোবাসা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অটুট থাকে। আমি সেদিক দিয়ে এত নির্ভয় ছিলুম যে, ভাবতুম কেয়া—সে তো আমার, হাসি কান্না রাগ বিরাগ—সব কিছুতেই কেয়া আমার। চিঠি লিখি আর না লিখি, উত্তর দিই আর না দিই, হেলা ফেলা অবহেলা সব কিছু চূড়ান্তের পরেও যা থাকে তা হল কেয়ার হৃদয় তিমিরের। তিমিরও কেয়ার।

"তুই লক্ষ্য করেছিস, আমি মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাই, পারিপার্শ্বিকের দিকে আমার তখন কিছুমাত্র খেয়াল থাকে না, তার মানে এই নয়, আমি পারিপার্শ্বিককে ভালোবাসি না। পড়াশুনা এই রকম একটা জিনিস। আমি যখন অপারেশন থিয়েটারে কাজ করি, রোগী ছাড়া তখন আমি আর কিছু দেখতে পাই না। কেয়া ভয়ে ভয়ে তাকাতো। ও ঠিক বিশ্বাস করতে পারত না। আমার ওই একাগ্রতা স্বাভাবিক, না অস্বাভাবিক। ওর চোখ দেখে আমি তা বুঝতে পারতুম। কিন্তু খুব আনন্দ পেতুম এই ভেবে যে, কিছু অবিশ্বাস, দুর্বলতা, নার্ভাসনেস—এইগুলি একমাত্র গভীর ভালোবাসারই সিমটমস্। আই ফেল্ট হ্যাপি দ্যাট সি লভ্‌ড্ মি সো নার্ভাসলি।"

"হঠাৎ এক সময় আবিষ্কার করলুম কেয়ার চিঠি খুব কম আসছে। কবিতার চরণে ছন্দ-পতন হলে যেমন তুই সজাগ হয়ে উঠিস, আমারও ঠিক তেমনি হল। ছন্দ পূরণ করার জন্যে আমারই ব্যগ্রতা বাড়ল। ঘন ঘন চিঠি লিখতে সুরু করলাম। আমি কেমন ভয় পেয়ে গেলুম, কেয়া আমাকে ভুল বুঝে ভুল করল না তো! শেষের দুবছর কেয়া কোন চিঠিরই জবাব দেয়নি। স্ট্রেঞ্জ!

"কলকাতায় ফিরে আমি ওদের পাইক-পাড়ার বাড়িতে গিয়েছিলুম। শুনলুম বছর খানেক আগে উঠে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারলেন না। আমি সমস্ত কলকাতা চষে ফেলেছি, লোকভয় তুচ্ছ করে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি—কিন্তু কোন পাত্তাই নেই।

"সাধারণ একটা অনার্স গ্রাজুয়েট, অ্যানিমিক, মেয়ের জন্যে এতবড়ো একটা উঠতি ডাক্তারের এই ব্যাকুলতা হাস্যকর মনে হতে পারে, সিনেমার কাহিনী মনে হতে পারে। কিন্তু আমার পয়েন্ট তা নয়। এই পাঁচ বছরে আমিও অনেক বদলেছি। যখন কেয়াকে কলকাতার কোথাও খুঁজে পেলুম না, আমি মাথা ঠান্ডা করে ভাববার চেষ্টা করেছি, আমার এই ব্যাকুলতার অর্থ কী। আজ ভারতবর্ষের সুন্দরীতম মেয়ে আমার ঘরণী হলে নিজের ভাগ্যকে প্রতিদিন ধন্যবাদ দেবো। কিন্তু সেটাও তো পয়েন্ট নয়।"

তিমির থামল। অন্যমনস্কভাবে আবার বৃথাই ট্রাউজারের পকেট হাতড়াল। পরে পাশে পড়ে থাকা সিগারেটের প্যাকেট থেকে আর একটি সিগারেট ধরিয়ে রুমাল দিয়ে চশমার লেনস পরিষ্কার করল। সন্ধ্যা অনেক দূরের আকাশ থেকে নীরব তুষারপাতের মত নেমে আসছিল। আমি কোন শব্দ করলুম না, পাছে সুর কেটে যায়। ভাবছিলুম, তিমির ওর কাহিনী শেষ করুক। শেষ করলে ও একটু শান্তি পেতে পারে।

"কাল কেয়ার সঙ্গে দেখা। হঠাৎ। আমরা এখন যেখানে বসে আছি তারই কাছাকাছি। কালও এমনিভাবেই বিকেলে এখানে এসে-ছিলুম। তোকে বিরক্ত করিনি। রোজ রোজ তোর কর্মপণ্ড করতে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তুই আমার পরম বন্ধু। তোর উৎসাহেই আমার শেষ পর্যন্ত ডাক্তারীতে লেগে থাকা। আর একদিক দিয়ে তুই-ই আমার পরম শত্রু। তোর জন্যেই—থাক সে কথা।

"আমার কেমন যেন মনে হত, এই মাঠ একটা সবুজ সমুদ্রের মত। কেয়া এখানে অবগাহন করতে ভালোবাসত—হাওয়ায় ভাসত, দু'হাতে দীঘল ঘাসগুলো জড়িয়ে ধরত, প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিত। ও এত ভালোবাসত এই মাঠকে, আমার তাই কেমন যেন মনে হত—এইখানে ও নিশ্চয়ই আবার আসবে, ওর সঙ্গে এইখানে আবার আমার দেখা হবে। ঠিক এই জায়গায় আমরা আগে অনেকদিন বসেছি। প্রথম প্রেমের জায়গাগুলি প্রণয়ীর মত আদরের হয়ে থাকে। সচেতনে অথবা অচেতনে মানুষ সেখানে বার বার গিয়ে থাকে। ব্যথা পেলেও যায়, না পেলেও। স্বপ্নময় সেই জায়গাগুলি। গোপন অঙ্গের মত লুকিয়ে রাখে, কিন্তু ফিরে ফিরে দেখে যায়।

"মোড়ে গাড়ি রেখে আমি মাথা নিচু করে হাঁটছিলুম ঘাসের মধ্যে দিয়ে। এই দিকে আসছিলুম। আঙুলে সিগারেট পুড়ছিল, আমার লক্ষ্য ছিল না। কে যেন কি বলল, আমি শুনেও শুনতে পাইনি। আবার শুনলাম—

: ডাক্তারবাবু, আপনি?

দাঁড়ালাম। ফিরে তাকালাম। এক যুবক, সঙ্গে বোধ হয় স্ত্রী। স্ত্রীর দিকে তাকানো হল না, যুবকটিকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল, মনে করার চেষ্টা করছিলুম। কোথায় দেখেছি? নিশ্চয়ই কোন রোগের সূত্রে, নতুবা 'ডাক্তারবাবু' বলে ডাকবে কেন?

: আপনার জন্যেই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। এখন ফুললি কিয়োরড। এখন যা খুশি তাই খাচ্ছি।

এইবার মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে ছেলেটির আলসার অপারেশন করেছিলুম হসপিটালে। ডিউডিনাল আলসার। হাসিমুখে তাকালুম ওর আনন্দ দেখে।

"কিন্তু ইনি ভীষণ কড়া—আমার স্ত্রী। এডুকেশনে অনার্স। টিচাররা জানেন ডাক্তার-বাবু, সর্বত্রই টিচারি করে থাকেন, বাড়িতেও। জানো, ইনিই আমার অপারেশন করেছিলেন—অল্প বয়সেই বিরাট সার্জেন—ডক্টর তিমির বরণ চ্যাটার্জি—এফ আর সি এস্—

দুটি অত্যন্ত শুভ্র হাত যুক্ত হয়ে চিবুক পর্যন্ত উঠেছিল, একটি আনত মাথা আমার সামনে প্রণত দেখেছিলুম। ওই হাত দেখে কি আমি চিনতে পেরেছিলুম, ওই আনম্র গ্রীবা, কন্ঠ বা কাঁধ দেখে?

: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। উচিত ছিল হসপিটালে অথবা বাড়ি গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসা। হয়ে ওঠেনি। ক্ষমা করবেন। আমার স্বামী আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেই আমার সুখ। সেই আমাদের কৃতজ্ঞতা।

আমার চোখ ফেটে জল বেরুবার উপক্রম করছিল। কিন্তু ও যখন আমাকে চিনতে চাইল না, এমন কি, অপারেশনের সময় পর্যন্ত দেখা করেনি, তখন ওর স্বামীর সামনে পূর্ব পরিচয়ের প্রমাণ দিয়ে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করার ইচ্ছে আমার হল না। অথচ আমার মনের মধ্যে যে দুর্নিবার ক্ষোভ এবং প্রশ্ন অহর্নিশ আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তার থেকেও তো মুক্তি আমার দরকার। প্রেম, ভালোবাসা—এই সব প্রশ্ন এখন আমাকে আর কষ্ট দিচ্ছে না। আমি জীবনে যা পেয়েছি তার তুলনা হয় না। আমার এখন শুধু একটিই মাত্র জিজ্ঞাস্য—ভুল করে কেয়া এই ভুল করেছে কিনা। বাস। আর কিছু আমি জানতে চাই না। কিন্তু আজকের এই ফিরে দেখার পর, আমি জানি, আর জীবনে সুযোগ পাওয়া যাবে না। কেয়া নিজেকে চিরতরে আমার চোখের আড়ালে নিয়ে যাবে। ওকে তো আমি চিনি।

প্রাণপণে মুখে হাসির প্রলেপ মাখিয়ে বললুম, "আপনার জন্যে সত্যিই একজন টিচারেরই দরকার। কিছুদিন ডায়েট রেস্ট্রিকশন থাকা ভালো। কিন্তু আপনার স্বামীর এত বড়ো অপারেশনটা আমি করলুম, আর আপনিই আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। রোগীর বিষয়ে কথা-বার্তা সব সময়ে রোগীর সামনে করা বিধেয় নয়। তাতে ক্ষতি হয়। দেখা যখন হল, ভালোই হয়েছে। আপনি একটু এদিকে আসুন, জানিয়ে দেওয়া দরকার। আপনি, ব্রাদার, একটু ফিরে থাকুন, এ-সব নিষিদ্ধ কথা শুনবেন না—"

পরম আত্মীয়ের মত হেসে চটপট হাত দশেক সরে গেলাম। যুবকটি সত্যিই ওদিকে সানন্দে ফিরে দাঁড়াল। নামও জানি না। মনে নেই। কেয়া একটু ইতস্ততঃ করল। শেষে ধীর পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল। ও কোন কথা বলল না, কিন্তু কাঁদছিল। ওর ওই কান্না দেখে আমার নিজেকে কেমন যেন নিরুৎসাহ বোধ হল। সমস্ত ক্ষোভ প্রশ্ন—সব যেন ভুলে গেলুম।

বললাম, "কলকাতায় ফিরে অনেক খুঁজে-ছিলাম তোমাকে।"

: জানি।

: কাগজে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলাম।

: দেখেছি।

: তুমি আমার অবস্থা কল্পনা করতে পারো কি পারো না, জানি না। তোমাকে এভাবে বেশী-ক্ষণ আটকাতেও পারব না। একটি কথার শুধু উত্তর দিয়ে যাও—কেন এমন করলে? সত্যি কথা বোলো, জীবনে আর কখনও হয় তো দেখা হবে না।

কেয়া নীরবে কাঁদছিল। কিন্তু শরীরে তরঙ্গ ছিল না। ও ক্ষমাপ্রার্থীর মত যুক্তকরে বলেছিল: "আপনি এত বড়ো, কত শক্তিমান। আপনি সব কষ্ট একদিন সহ্য করতে পারবেন। বিশ্বাস করুন, আমার অত শক্তি ছিল না। আমি ক্রমশঃই

(শেষাংশ পর [illegible])

সংবাদের পিছনেও সংবাদ থাকে। প্রায়ই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তার জন্য স্থান হয় না। আইসবার্গের মত সংবাদের একটা অংশমাত্র উপর থেকে নজরে পড়ে, বাকীটা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায়। এমন কি কোন কোন সংবাদ সম্পর্কে একথাও বলা চলে যে, যে-অংশটা অগোচরে থাকে সেটাই মনে ক'রে রাখার মত। কিন্তু যেহেতু তাদের উপর সমসাময়িকতার ছাপ থাকে না সেহেতু এইসব ঘটনা কখনই সংবাদ হয়ে ওঠে না। এমনি দুটি সংবাদের কাহিনী শোনাচ্ছি।

বছর দশেক আগে একদিন সংবাদ পাওয়া গেল, সুন্দরবনের নামকরা জমিদার দ-বাবু (সুস্পষ্ট কারণেই তাঁর নামটা উহ্য রাখতে হচ্ছে) তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীর ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছেন। এটি একটি আত্মহত্যার ঘটনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এই কাহিনীর অপ্রকাশিত অংশটুকু, ভূতপূর্ব এম এল এ শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনুন :—

সুন্দরবনের ডাকসাইটে জমিদার ব-বাবুর ছেলে দ-বাবু ছিলেন শিক্ষিত, সৌখীন মানুষ। আমেরিকা থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন। জমিদারীর মধ্যে নিজের নামে গ্রামের নামকরণ করেছিলেন। সেইখানে তিনি সৌখীন বাংলোবাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন, ডায়নামো বসিয়ে বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটিও ব্যবহার করতেন। চাষ করার জন্য ট্রাক্টর আনিয়েছিলেন। লম্বা চওড়া, রীতিমত সুপুরুষ চেহারা, যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে তাঁর বয়স ৫৫।৫৬ বছর হয়েছিল। তখনও তাঁর স্বাস্থ্য অটুট ছিল।

বাংলা ১৩৬০ সনের কথা। ঐ বছর সারা সুন্দরবনে তেভাগা আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ঐ গ্রামেও তার ঢেউ এল। ভাগ-চাষীরা দ-বাবুর জমির ধান কেটে পঞ্চায়েৎ খামারে তুলল। দ-বাবু লেঠেল লাগা-লেন, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা রুজু করলেন, ভাগ কোর্টে ভাগচাষীদের ক্ষেতমজুর বলে সাব্যস্ত করার চেষ্টা করলেন। এদিকে চাষীদের প্রতিরোধও তীব্র হতে লাগল। গ্রামের মধ্যে দ-বাবুর ও তাঁর লোকজনের প্রায় একঘরে অবস্থা হয়ে এল। দ-বাবুর লোক গ্রামের দোকানে চিনি কিনতে গিয়েছিল। দোকানদার বলল, চিনি নেই। দ-বাবুর লোক বলল, ঐ ত রয়েছে দেখছি। দোকানদার জবাব দিল, বেচব না বললে কি ভাল শোনাবে ?

কিন্তু জমিদার দ-বাবু দমবার পাত্র নন। তিনি কিছুতেই চাষীদের ফসলের আধা ভাগের বেশী দেবেন না। এদিকে ভাগ-চাষীরাও আইন অনুসারে দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ দাবী করতে লাগল। মামলা চব্বিশ পরগণার জেলা জজের এজলাস পর্যন্ত গড়াল। সেখানে দ-বাবু হারলেন।

যেদিন ঐ মামলার রায় বেরোল তার পরদিনই দ-বাবু আমার কলকাতার মেস বাড়ীতে এসে উপস্থিত। তাঁকে অত্যন্ত অবসন্ন, মনমরা দেখাচ্ছিল। তিনি আমাকে বললেন, "সুবোধবাবু, আমি ত' হেরে গেছি। এখন আমাকে কি করতে বলেন ?" আমি তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম। বললাম, খবর দিলে আমি নিজেই তাঁর কাছে যেতুম, তাঁর কষ্ট করে আসার দরকার ছিল না। তাঁকে আরও বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, চাষীর অধিকার রক্ষা করার জন্য দেশে যখন একটা আইন হয়েছে তখন তাঁর মত একজন শিক্ষিত মানুষের উচিত সেই আইন না ভেঙে বরং সেটা মেনে নেওয়া। কিন্তু তখন তিনি ভিন্ন মানুষ। যে তেজস্বী, অহংকারী জমিদারটিকে আমরা জানতাম তাঁকে সেদিন আমার মেসবাড়ীর ঐ অতিথিটির মধ্যে পেলাম না। যাই হোক পর-দিন তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীতে যাব কথা দিয়ে তাঁকে বিদায় দিলাম।

পরদিন তাঁর বাড়ীতে যেতেই শাদা পাথরের রেকাবীতে কটা ফল ও মিষ্টির টুকরো আর শাদা পাথরের গ্লাসে শরবৎ এল। দ-বাবু বারে বারেই বলতে লাগলেন, আমি হেরে গেলাম, বেইজ্জৎ হলাম। আমি তাঁকে বোঝালাম, আমাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-গত কোন মান-অপমানের লড়াই হয় নি। তিনি একটি কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ ছিলেন। সেই স্বার্থ তিনি তাঁর সাধ্যমত রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন আর আমরা সেই স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়েছি। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, আমরা সফল হয়েছি, কেননা আইন আমাদের পক্ষে। অতীতে যা হয়েছে সেসব ভুলে গিয়ে এখন তিনি চাষী-দের সঙ্গে নূতন সম্পর্ক গড়ে তুলুন। চাষী-দেরও তাঁর জমি ভাগে না পেলে চলবে না, আর তিনি নিজে যখন হাল ধরতে পারবেন না, তখন তাঁরও চাষীদের সাহায্য চাই। অতএব দুই পক্ষের মধ্যে একটা রফা করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমি তাঁকে একথাও বললাম যে, পরাজয়ের গ্লানি যদি তিনি ভুলতে না পারেন তাহলে আজ এই বিরোধের নিষ্পত্তি হলেও কালই তিনি আবার এই পরাজয়ের শোধ তুলবার চেষ্টা করতে পারেন। যাই হোক, ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষীর প্রাপ্য আর এক-তৃতীয়াংশ জমির মালিক হিসাবে তাঁর প্রাপ্য, এই সর্তে শেষ পর্যন্ত তিনি চুক্তি করলেন।

চাষীদের আমি এই মীমাংসার সংবাদ দিলাম। আমাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হল। এর সপ্তাহখানেক পরেই সংবাদ পেলাম দ-বাবু ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছেন। তাঁর কর্মচারীদের কাছে শুনলাম, কদিন ধরেই মনিব তাঁদের বলছিলেন, প্রজাদের কাছে এই অসম্মানের পর বেঁচে থাকার আর অর্থ কি ?

কাহিনী শেষ করে সুবোধবাবু মন্তব্য করলেন, "সুন্দরবনে অনেক জমিদার দেখেছি যাঁরা মুখে মিষ্টি কথা বলেন, তলায় তলায়

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নিজেকে আপনার পাশে অযোগ্য মনে করেছি, আর তা ঠিকই করেছি। আমাকে কথা দিয়ে-ছিলেন বলেই যে আমাকে আপনার গ্রহণ করতে হবে—এই দায় থেকে আমি আপনাকে মুক্তি দিতে চেয়েছি। এই দুঃসাহসের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি জীবনে সুখী হবেন, সবাই আপনাকে ভালোবাসবে।" একটু থেমে বলেছিল, "যাচ্ছি"।

তিমির চুপ করল।

আমি সিগারেট ধরালুম। আকাশের নক্ষত্র-গুলি খুব দূরবর্তী মনে হচ্ছিল। আমি কোন কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না যা বলে তিমিরকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। সমস্ত ঘটনাটাই একটা অবাঞ্ছিত বিষণ্ণতায় মাখা।

"কেয়াকে জীবনে পেলুম না এটা আমার পয়েন্ট নয়, জানিস"—তিমির তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বরে বললে, "যার জন্যে তুই জীবনে সমস্ত সাফল্য, সমস্ত জয়ের মালা জগৎ মন্থন করে নিয়ে এলি, তাই সে গ্রহণ করল না। ভয়ে না অবিশ্বাসে, আমি এখনও ঠিক জানি না।"

এইবার আমি নিজের বিশ্বাসকে উপলব্ধি করলুম। বললুম, "ভয়ে, নার্ভাসনেসে। অ্যান্ড দ্যাট শো-জ সি লভড্ য়ু, নে—ইয়েট লভস্ য়ু। সত্যি, তোকে ও ভালোবাসে—এবং এখনও।"

তিমির দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল। বলল, "হয়তো তাই। হয় তো ভালোবাসাই মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।"

সন্ধ্যার উজ্জ্বল নক্ষত্র তখন আকাশে মিটি-মিটি হাসছিল।

জালজুয়াচুরি, মিথ্যা কথা কোনমতেই পিছপাও হন না। কিন্তু দ-বাবু সে-জাতের মানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সত্যিকারের দাপটওয়ালা। এমন লোকের সঙ্গে লড়েও বোধ হয় সুখ।"

❦

দ্বিতীয় কাহিনীটি আরও কয়েক বৎসর আগেকার। বিপ্লবী রাজবন্দীরা সবে মুক্তি পেয়েছেন। "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে তাঁদের এক দলকে চায়ের আসরে অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছে। বাইরের আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে সেখানে ছিলেন প্রাক্তন এম-এল-এ ডাঃ হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়। সভার পরে বিপ্লবী নলিনী দাস ডাঃ চট্টোপাধ্যায়কে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে তিনি আস্তে আস্তে বললেন, আমরা সবাই ফিরে এলুম, শুধু দীনেশ ফিরে এল না। নলিনীবাবুর গাল বেয়ে দুফোটা চোখের জল গড়াতে দেখা গেল।

এইবার হীরেনবাবুর নিজের জবানীতে শুনুন :—

প্রায় ত্রিশ বৎসর আগেকার কথা। আমার এক বন্ধু বলল, জেলপলাতক একজন বিপ্লবী নেতাকে তোদের চন্দননগরের বাড়ীতে আশ্রয় দিতে হবে। এরই কিছুদিন আগে চন্দননগরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শ্যাঁপিয়র গুলীতে জীবন ঘোষালকে মারা যেতে দেখে ব্যথিত হয়ে আমার মা আমাকে কথা দিয়েছিলেন, এইসব ছেলেদের মধ্যে কেউ যদি তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে আসে তাহলে তিনি নিশ্চয় আশ্রয় দেবেন। সেই ভরসাতেই আমার বন্ধুর কথা মাকে বললাম মা সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে গেলেন। দুর্গা পূজার একাদশীর দিন সে এল। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, দোহারা শ্যামল চেহারা। টিকলো নাক। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ, অথচ দৃষ্টির মধ্যে দার্শনিকসুলভ একটা গভীরতা। পাঁচ ছয় মাস আমাদের বাড়ীর ভিতর মহলে একখানা ঘরে সে ছিল। মধ্যে কয়েকবার অবশ্য দুয়েকদিনের জন্য বাইরে কাটিয়ে এসেছে। আমার কাছে সে মণিবাবু, মা-র কাছে মণি এবং বাড়ীর অন্যান্য ছোটদের কাছে মণিদা নামে পরিচিত ছিল। কখনও কখনও একটি মেয়েকে তাঁর কাছে আসতে দেখতাম। নিঃশব্দে আসত, নিঃশব্দে বেরিয়ে যেত। কোনদিন তাঁর বা ঐ মেয়েটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিনি। কিন্তু কিছু অনুমান করেছিলাম।

একদিন রাত্রে আমি আর সে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে আছি। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কে বলে আপনার মনে হয়? আমি বললাম, আমার ধারণা, আপনি দীনেশ মজুমদার। সে জোরে হেসে আমার কথাটা উড়িয়ে দিল, বলল, কার সঙ্গে কার তুলনা? দোল পূর্ণিমার আগের দিন রাত্রে সে চন্দননগর ছেড়ে চলে যায়। যাবার আগে সে আমার এক ভাইপোকে বলে যায়, আপনাদের অবিশ্বাস করার কোন কারণই নেই, তাই বলে যাই হীরেনবাবুর অনুমান ঠিক, আমিই দীনেশ মজুমদার, এখন বাঙ্গালা দেশে যুগান্তর দলের ডিক্টেটর। কিছুদিন পরে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনি কি করে আমার পরিচয় ধরতে পারলেন? আমি জবাব দিলাম, ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার যে রিপোর্ট অমৃত-বাজার পত্রিকায় পড়েছিলাম তার একটা লাইন আমার মনে ছিল। লাইনটি হচ্ছে, "And there sat Dinesh clad in white khaddar in a philosophic mood", আপনার মধ্যে সেই philosophic mood লক্ষ্য করেই আমি বুঝেছিলাম, আপনি দীনেশ মজুমদার ছাড়া আর কেউ নন।" সে আমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছিল। ঠিক তেমনি আশ্চর্য হয়েছিল যেদিন আমি তাকে বলেছিলাম, আপনার কাছে আপনাদের দলের যে মেয়েটি আসে তার নাম কল্যাণী। "কি করে জানলেন?" সে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম, মা যখন আমার ছোটভাইয়ের স্ত্রী কল্যাণীর নাম ধরে ডেকেছিলেন তখন ঐ মেয়েটি হঠাৎ সাড়া দিয়ে ফেলেছিল। আমার অনুমান আরও পাকা হল যখন আমার এক শিক্ষকস্থানীয় ডাক্তার বললেন, তাঁর বোনের মাথাব্যথা কিছুতেই ছাড়ছে না, মাথার এক্সরে ছবি নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নি। ডাক্তার বললেন, তাঁর বোনের নাম কল্যাণী। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল, আপনিও একদিন মেয়েটির মাথার ব্যথা সম্পর্কে ঠিক এই কথাগুলিই আমাকে বলেছিলেন। অতএব দুয়ে দুয়ে মিলিয়ে চার করে নিলাম।

স্কেচ কালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার

দোল পূর্ণিমার দুদিন আগে রক্তমাখা কাপড়চোপড় নিয়ে সে বাড়ীতে ঢুকল। চন্দন-নগরে পুলিশ কমিশনার ক্যাঁ (Quin) সাহেবকে এইমাত্র গুলী করেছে, এই কথা জানিয়ে সে তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় বদলে মাথায় তেলজল দিয়ে টেরি কেটে একটা সিগারেট ধরিয়ে (এমনিতে সে কোনদিন ধূমপান করত না) গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে দিব্য খোস মেজাজে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

আরও দুদিন সে চন্দননগরে আমার ভাই-পোর বাড়ীতে আত্মগোপন করে ছিল। দোল-পূর্ণিমার আগের দিন সকালে সে আমাকে একটি রিভলভার দিয়ে বলল, আজই সন্ধ্যায় চন্দননগর ছাড়ছি, যদি ধরা পড়ি তাহলে এটা সমেত ধরা পড়তে চাই না। এটা আপনার কাছে রাখুন। আমার পরিষ্কার মনে আছে, সেই শাদা কর্ড লাগানো রিভলভারটিতে দুটি তাজা বুলেট তখনও অবশিষ্ট ছিল।

সেইদিন সকালেই মঃ ক্যাঁ-কে কবর দেওয়া হবে। চন্দননগরের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে আমিও সেই অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সরকারী আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। কবরখানায় যখন পৌঁছলাম তখন আমার হাতে নিউ মার্কেট থেকে কেনা শাদা ফুলের মালা আর পেট-কোমরে লুকানো শাদা দড়ি বাঁধা সেই অস্ত্র যা দিয়ে ক্যাঁ সাহেবকে হত্যা করা হয়েছে!

সেইদিন বিকাল বেলায় নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির হলের শোকসভায় আমি যখন শোক-প্রস্তাব সমর্থন করতে উঠলাম তখনও আমার জামার নীচে সেই রিভলভার। দীনেশ ততক্ষণে হাতে মদের বোতল ও সঙ্গে একজন বারাঙ্গণাকে নিয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নদী পার হয়ে ঘোষপাড়ার দোলের মেলার ভীড়ে মিশে যাবার ফিকির খুঁজছে।

মাসখানেক পরের কথা। এক ভদ্রলোক আমার বাগবাজারের বাড়ীতে এসে বললেন, একজন রোগী দেখতে যেতে হবে।

আমি তখন সবে পাশ করে বেরিয়েছি, বাড়ীর সামনে নেমপ্লেটও নেই। মাষ্টারী করি, রোগী বড় একটা দেখিও না। তবুও এইরকম একজন অজানা মানুষ এসে কল দেওয়ায় আমি বুঝলাম, এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। ভদ্র-লোকের সঙ্গে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে চিত্রা সিনেমার উল্টো দিকে একটি ফ্ল্যাটে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সেখানে বসে আছে দীনেশ। বলল, ব্রঙ্কাইটিসে ভুগছে। আমি তাকে দেখে একটা প্রেসক্রিপশন লিখে, তার তলায় 'ডি মিত্র' নাম সই করে দিয়ে এলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে দীনেশ ঐ ফ্ল্যাট থেকেই ধরা পড়ল এবং বিচারের পর তার ফাঁসি হল। কয়েকদিন সাবধানে ছিলাম। কিন্তু সে বা তার দলের আর কেউ ঘুণাক্ষরে কখনও পুলিশের কাছে তার আশ্রয়দাতার নাম অথবা 'ডি মিত্র'-এর আসল পরিচয় প্রকাশ করেনি।

হে অচেনা পত্রলেখা

নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)

পত্রলেখাকে দেখলাম।

মার্বেল পাথরের শুভ্র সোপানে সে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে কর্ণার টেবিলে রক্ষিত প্রকাণ্ড ঝকঝকে পিতলের গামলায় পাতাবাহারের গাছ মৃদু হাওয়ায় থির থির করে কাঁপছে। তারই সামনে পত্রলেখা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেশমী শাড়ীর কনক-চাঁপা রঙের সঙ্গে তার গাত্রবর্ণ মিলিয়ে গেছে। শাড়ীর আঁচল লুটোচ্ছে।

পত্রলেখা মৃগাক্ষী।

দেখতে দেখতেই উপরে উঠলাম। মার্বেল সোপানের বাঁকে এসে দাঁড়াতে হল। পত্রলেখার হালকা লিপস্টিক-লাঞ্ছিত অধরের ফাঁক থেকে মুক্তো দাঁতের সারি দেখা দিল।

—স্টাফ-রুমটা কোন দিকে ভাই?

বললাম—'আসুন আমার সঙ্গে। আপনি?'

—আমি নতুন। আজ জয়েন করেছি: সংস্কৃত পড়াব। আপনি?

—আমি আর্ট টিচার।

আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। যাবার পথে ছাত্রীদের প্রাতঃকালীন অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে এগোলাম।

বলল—'বাঃ এখানকার ছাত্রীরা বেশ ডিসিপ্লিনড্ তো?'

গর্বের হাসি হাসলাম।

এই আমাদের বিরাট পাঠশালা। দক্ষিণ কোলকাতার উপকণ্ঠে তার অভিজাত চেহারা নিয়ে শোভা পাচ্ছে। কোলকাতার অভিজাত পাড়া থেকে ছাত্রীরা আসে এখানে—সুচারু পরিপাটীরূপে সজ্জিত হয়ে। মূল্যবান পুস্তকাধার নিয়ে তারা প্রকাণ্ড গেটের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে এই মার্বেল মণ্ডিত অট্টালিকাতে। শুভ্র সোপান মাড়িয়ে মাড়িয়ে তারা চলে যায় যে যার ক্লাসে। দারিদ্র্য এরা জানে না; এদের সুখলালিত চেহারা ঝলমল করে সর্বত্র। পাঠশালার কোল ঘেঁসে বিরাট মাঠ। তারই চতুঃসীমানায় বিভিন্ন পুষ্প ও পত্র সমাকুল বৃক্ষ। এ মাঠের প্রতিটি ঘাস সযত্নে প্রোথিত—প্রতিটি বৃক্ষ থেকে মৃত্যুপথযাত্রী পত্রগুলিকে ফেলে দেওয়া হয়।

দারোয়ান ও বেয়ারাগণের ঝকঝকে উর্দির ভাঁজ নষ্ট হয় না। ওরা নিঃশব্দে আনাগোনা করে। ওরাও কেতা-দুরস্ত।

এই বিরাট অট্টালিকার শুভ্র সোপানের কোণগুলি, প্রায়ই বৃক্ষাধার পরিবর্তিত করে নবরূপে শোভিত করা হয়। এখানে এই রূপবতী নবাগতকে মানায়।

—আপনার নাম?

আমি সুকন্যা চৌধুরী; আপনি?

—আমার নাম পত্রলেখা।

——পদবী? বলেই সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠলাম—থাক থাক পদবী আমি চাই না। পত্রলেখাই থাক আপনার সম্পূর্ণ পরিচয়; এ চেহারায় একটা নামই যথেষ্ট।

হাসল পত্রলেখা—কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছেন!—আর্টিস্ট কিনা, তাই এমন সাজিয়ে বললেন।

সেই আমার প্রথম পরিচয় পত্রলেখার সঙ্গে। আমি ছাড়া আরও অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় হল। ফুলের সৌরভের মত তার রূপের খ্যাতি বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। বিদেশিনী অধ্যক্ষা মিসেস উইলসনও ভারী গলায় পত্রলেখাকে প্রশংসা শুনিয়েছিলেন।

শুধু রূপ নয়। জ্ঞানও আছে, বিদ্যা আছে, সকলের মন জয় করার শিল্পটিও জানা আছে। বিভিন্ন জাতের ছাত্রী ও শিক্ষিকা মহলে গুঞ্জন উঠল।

তাছাড়া সবকিছুর সঙ্গে আছে অর্থ আর সুখী সংসারের অহংকার।

পত্রলেখার বড়ো অহংকার—স্বামী-গর্ব। স্বামী তার রূপের পূজারী।

বলি—'আমি মেয়ে, তা সত্ত্বেও তোমাকে মুগ্ধ চোখে দেখি; তার আঁখি তো ফিরবেই না।

পত্রলেখার হরিণের মতো চোখে খুশীর ঝলক দেখা যায়।

—সুকন্যা, তুমি আমার একটা ছবি এঁকে দাও। একটা পোর্ট্রেট।

—কি ভাবে আঁকবো? তাম্বুল-করঙ্ক বাহিনী? বাণভট্টের অনাদৃতা পত্রলেখা।

—না-না। মাথা ঝাঁকানি দিয়ে উঠলো সে।

হীরে বসানো কর্ণভূষণ চিকচিক করে উঠলো সেই তালে। আমাকে তুমি অমন উপেক্ষিতার চেহারা দিওনা সুকন্যা।

—তবে কি বন্দিনী কুলূতেশ্বর দুহিতা?

—তার যে জীবনের ফুল ফুটলো না।

—তাহলে! ভাবতে লাগলাম। তাহলে রাণীর মতো?

—ঠিক বলেছ। রাণী বিলাসবতীর মতো, এযুগের রাণী পত্রলেখা। রবীন্দ্রনাথ তিনই বলেছেন ... বড়ই একচোখা, একটা পাপিষ্ঠ মেলা মেয়েকে দেখলেনই না ... না ভাই, আমি সেই অনাদৃতা পত্রলেখা নই।

—তোমার এত সুন্দর মুখটা কি তা ক্যানভাসে ফোটাতে পারব?

—পারবে, পারবে। সপ্তম শতাব্দীর বাণভট্ট যে পত্রলেখাকে তাঁর কাব্যে ধরে রাখতে পারলেন না।—এ যুগের শিল্পী তাকে রেখায় আর রঙে ধরে রাখবে।—উচ্চৈঃস্বরে হাসে পত্রলেখা।

পত্রলেখা, স্টাফ-রুমটা ভরে রাখে। গান করে, আবৃত্তি করে। লাঞ্চের সময়, কিংবা অবসর সময়ে যখনই আমরা একসঙ্গে বসি, গল্প হয়। পত্রলেখার গল্প শুনতে ভাল লাগে। অধিকাংশই স্বামীর গল্প। তার স্বামীর নাম পতঞ্জলি।

বলি—বাঃ ঐ নামটাও বেশ। তোমরা মিলেছ ভালো।

পত্রলেখা খিলখিল করে হেসে উঠলো, মুখটা রক্তিম হয়ে উঠলো——নামটা ভাল লাগে আমারও। তাই ওকে আমি নামধরেই ডাকি।

—নাম ধরলে রাগ করেন না?

—রাগ? ইস! রাগ করলেই হলো আর কি! তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল সে।—কতক্ষণ রাগ করবে! আমি ছাড়া কি তার চলবে?

পত্রলেখার অনেক কথা পরে জেনেছি। মস্ত ধনীর কন্যা। দুই বোন ওরা—পত্রলেখা তার শশিলেখা। ও বড়ো।

পিতা মোহনলাল রায় রাজা নন বটে, তবে অর্থে, ক্ষমতায় আর দাপটে রাজারই সমান 'রাজাবাবু' নামেই তিনি পরিচিত।

জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তাদের গ্রে স্ট্রীটের বাড়ী অসংখ্য প্রকোষ্ঠযুক্ত বাড়ীতে অগণিত মানুষ থাকতে দেখেছে। এ বাড়ীতে রোজ আধমণ কয়লা লাগে—একগাড়ী সব্জী।

দারোয়ান, চাকর, বাবুর্চি, খানসামা, দা

আর পরিচারিকা, পুরোহিত ও পণ্ডিত মিলে একটি ক্ষুদ্রকায় শহর রাজাবাবুর বাড়ী।

কত আশ্রয়হীন আশ্রয় পেয়েছে; কত ছাত্র পড়াশুনো করছে এখানে আশ্বাস পেয়ে, তার হিসেব নেই। সাহায্য পাচ্ছে, বইখাতার সঙ্গে কলেজের মাইনে পর্যন্ত।

পত্রলেখা তখন লোরেটোতে পড়ে। বাড়ীতে পণ্ডিত মশাই পড়ান বাংলা আর সংস্কৃত। ওস্তাদ আসেন এসরাজ শেখাতে।

যখন সংস্কৃত পড়ে, তখন আসে পতঞ্জলি। পণ্ডিতমশাই পড়ান; পত্রলেখার সঙ্গে সেও শোনে।

পতঞ্জলি এ বাড়ীতে থাকে—অসংখ্য প্রকোষ্ঠগুলির একটিতে। বাড়ী তার নৈহাটিতে; এ বাড়ীর কুলপুরোহিতের ছেলে সে। বি-এ পড়ে ইংলিশ অনার্স নিয়ে।

পত্রলেখা ঠাট্টা করে—"তুমি হলে পুরোহিত-মশাইয়ের ছেলে, তুমি কোথায় অং-বং ছিং-টিং সংস্কৃত পড়বে, তা না—সাত সমুদ্দুর পারের ইংরিজি নিয়ে টানাটানি করছ। কোথায় আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতাকে পুজো করবে—তার বদলে বিউলফ, কিনেউলফ-এর জটিল জাল ছিঁড়ছ।

—তুমিই বা লোরেটোর মেমসাহেব হয়ে রঘুবংশ আওড়াচ্ছ কেন? —পতঞ্জলি উল্টে জবাব দেয়!

—পাঠশালায় গেলেই পারো? কৌতুকে চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে ওঠে। পত্রলেখার মনে হয় ঝির ঝির মধুর সমীরণ বয়ে গেল সারা অঙ্গে।

এরই ফাঁকে পত্রলেখার হৃদয়পদ্ম কখন বিকশিত হয়ে উঠেছে। তখন সে কলেজের ছাত্রী; সংস্কৃত পড়ছে। আর পুরোহিত পুত্র পতঞ্জলিকে রাজাবাবু পাঠিয়েছেন কেম্ব্রিজে; সেখান থেকে বিদেশী মহাকাব্যের উপর থিসিস্ লিখে ডক্টরেট নিয়ে আসবে। পতঞ্জলির সমস্ত ভার বহন করছেন তিনি, সে শুধু তাকে সাহায্য করার জন্য; একটি জ্ঞানপিপাসু ছাত্রকে যেন সাধ্যমত বড় করে তুলে কিছু পুণ্য অর্জন করতে পারেন, এজন্য।—তাকে জামাতৃ পদ দিয়ে বরণ করার জন্য নয়।

ইংলণ্ড ফেরত পতঞ্জলি আকাশ প্রার্থনা করছে। সে আকাশ কতখানি উঁচু তা কি সে জানে? পত্রলেখার সঙ্গে পতঞ্জলির মানাবে কেন? রাজার কন্যা যাবে পর্ণকুটীরে? অসম্ভব! কায়স্থ-কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণ-পুত্রের বিবাহ! পাপ।

পত্রলেখা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রে স্ট্রীটের বাড়ী থমথমে হয়ে উঠল। জানাজানি হয়ে গেল। অগণিত প্রকোষ্ঠবাসী অসংখ্য মানুষের দল ফিসফিস করতে লাগল।

বন্দিনী হল সে। বন্ধ হলো কলেজ যাওয়া, বন্ধুকে টেলিফোন করা, চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করা। বন্ধ হলো এসরাজের ঝঙ্কার। যার কণ্ঠ কাব্য আবৃত্তিতে ক্লান্ত হয় না সে চুপ হয়ে গেল।

পুরোহিত-পুত্র পতঞ্জলি কোন বাধাই মানল না। [illegible] পত্রলেখাকে [illegible] করে নিয়ে এলো নিজের কাছে।

[illegible] রাজা [illegible] হয়ে গেল। গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীর আকাশে কালো মেঘ [illegible] গেল। [illegible] জানতে দিলেন না কাউকে। একদিনের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন কন্যাকে। তারপর মহা সমারোহে জ্যেষ্ঠা-কন্যার বিবাহ দিলেন ব্রাহ্মণ পুত্রের সঙ্গে। আর দিলেন পত্রলেখার নামে ব্যাঙ্কে কিছু টাকা—দুখানা বাড়ী। কন্যা-জামাতাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পাইকপাড়ার সাজানো বাড়ীটিতে। পিছন থেকে গ্রে স্ট্রীটের বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পিতৃগৃহের সঙ্গে সম্বন্ধের এইখানেই শেষ।

পতঞ্জলি আর পত্রলেখা। পতঞ্জলির অংশ সে। পত্রলেখার সবটাই পতঞ্জলি।

রাজা তারাপীড়ের রাণী বিলাসবতী যেমন ছিলেন—শিবের জটায় চন্দ্রকলার মতন; যেমন থাকে সমুদ্রের বুকের কাছে সৈকতভূমি; যেমন করে জ্যোৎস্না মিশে থাকে চাঁদের অঙ্গে, বসন্তে যেমন ফুল ফোটে; আকাশের কণ্ঠে যেমন দোলে তারার মালা—সেই রকম পতঞ্জলির সঙ্গে মিশে আছে পত্রলেখা।

পত্রলেখা পিতৃ-পরিত্যক্তা। কিন্তু অধ্যাপক পতঞ্জলির বরণীয়া। কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখের আর অবকাশ নেই।

আর্ট রুমে রং, তুলি, আর ইজেল ছড়ানো: সবেমাত্র একটা ক্লাস শেষ হয়েছে। চারিদিকে বিশৃংখলতা। পত্রলেখা ঘরে এলো।

বসল একটা চেয়ার টেনে।

—ভাই, তুমি কবে থেকে সুরু করবে বল।

—কি করব? —বিস্মিত হয়ে বলি।

—আমার পোর্ট্রেট।

—ওঃ! নিশ্চয় আঁকব। তবে তোমাকে কয়েকদিন সিটিং দিতে হবে। কিন্তু এতো তাড়া কিসের?

হঠাৎ মিনতিতে কণ্ঠ করুণ হয়ে উঠল তার।

—যদি মরে যাই। যদি পৃথিবীতে না থাকি আর?

সোহাগী সুকন্যা, তাড়াতাড়ি সুরু কর। তাছাড়া—বলতে গিয়ে থেমে গেল সে।

—তাছাড়া কি?

—চাকরী করে, কাজ করে চেহারা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

—তাহলে চাকরী করছ কেন?

—করছি কেন? —হৈ-হৈ করে হাসল পত্রলেখা।

—সারাদিন কি করব তবে? পতঞ্জলি এই তো তিন মাস হলো এমেরিকা গেছে। ফিরতে এখন ক-তো দেরী। একটা কিছু [illegible] তো হবে।

—তুমি তাকে একলা ছেড়ে দিলে?

খুব দুঃখের নিশ্বাস ফেলে বলল পত্র-লেখা—

'না দিলে কি যাওয়া হতো! আর আমি সঙ্গে থাকলে কিছুই পড়াশুনো হতো না তার।

কি মিষ্টি ওর কথা বলার ধরণ! আর কতোটা মনের জোর! একা থাকে। পিতার পরিত্যক্ত; স্বামীর পরিবারের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই। তবু কি খুশী মন! উচ্ছল আনন্দে পতঞ্জলির প্রতীক্ষা করে চলেছে।

ঠিক হলো প্রতি রবিবার সকালে ওর বাড়ীতে যাবো ছবি আঁকার জন্য।

প্রকাণ্ড বড় গাড়ী নিতে এলো আমাকে। কালীঘাট থেকে অনেকখানি পথ—পাইকপাড়ার পৌঁছতে সময় লাগে। রং, তুলি ইত্যাদি সব কিছু আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে গেলাম।

পুরোনো আমলের বাড়ী। লাল কাঁকরের রাস্তায় দুপাশে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। গাড়ীটা একটা বাঁক নিয়ে গাড়ী-বারান্দার নীচে থামলো।

পত্রলেখা দাঁড়িয়ে আছে সামনেই লাল, নীল কাঁচ লাগানো দরজার গায়ে হাত দিয়ে।

একজন পরিচারিকাকে সে বলল—'মোহিনী জিনিষগুলো নামিয়ে নাও—' আমার দিকে ফিরে বলল—'তুমি শেষ পর্যন্ত সত্যিই এলে। খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। চলো যাই।'

পালিশ করা কাঠের সিঁড়ির মুখে কাট-গ্লাসের বাতিদান। সিঁড়ির মাঝখানে লাল কার্পেট বিছানো—বিবর্ণ হয়ে গেছে।

মাঝ সিঁড়িতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। একটি অয়েল পেন্টিং—অতি সুন্দর একটি মুখ।

আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো—কে? চমৎকার! লাল হয়ে গেল পত্রলেখার মুখ। বলল—'পতঞ্জলি, আমার স্বামী। ওপরে চল।'

সমস্ত বাড়ীটাতে ঐশ্বর্যের চমক। আমি নিঃশব্দে দেখতে লাগলাম। পত্রলেখার ঘরেও সেই মধ্যযুগীয় আসবাবপত্র। দেয়ালে মস্ত একটা আয়না, তারই নীচে শ্বেত পাথরের টেবিল। তাতে প্রসাধনের টুকিটাকি সাজানো। একদিকে পতঞ্জলির ছবি; মুখ টিপে হাসছে।

বারান্দায় সিটিং দিল পত্রলেখা। মুখের একটি অংশ প্রোফিল। ওটাই বিষয়বস্তু করলাম।

পত্রলেখা চেয়ে আছে, দূরে নীল আকাশের দিকে। বারান্দায় ভিনিসিয়ান ব্লাইণ্ডস-এর ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে নাকের পাশে—চুলের ওপর আর কাঁধে, গলায়।

সুরু করলাম। ক্যানভাসে রং রেখার আঁচড় পড়লো। যে পত্রলেখা কেবল হাসে—কেবলই কথা বলে, সে যেন পাথরের স্ট্যাচু হয়ে গেছে। চোখের পলক পড়ে না। যেন কথা বলতে জানে না।

এক সময়ে মোহিনী এসে মিষ্টি আর সরবৎ দিয়ে গেল।

বাড়ী ফেরার সময় পত্রলেখা বলে—

—আমার বাড়ী তোমার কেমন লাগল বললে না!

—আশ্চর্য! এখনও তুমি কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলে রয়েছ?'

মুখ লাল করে হাসলো সে।

—তারও আগে রয়েছি, সপ্তম শতাব্দীর হর্ষবর্ধনের আমলে। অনেক মদনিকা, কাননি-কার মতো কবির কল্পনা হয়ে। হাসি থামিয়ে আবার বলে— আসলে কি বুঝছ না? আমার স্বামী যে গরীব। তার কিছু নেই। এ বাড়ীটা ছিল আমার ঠাকুর্দার; এই আসবাবপত্র, বাগান, মালী, দারোয়ান সমেত আমাকে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছে অনেক মান্যগণ্য অতিথি আসতেন, তাঁদের জন্য এটা সব সময় রেডি থাকতো। ঠিক সেই অবস্থায় আমি পেয়েছি। টাকা-পয়সার সব বন্দোবস্তই আমার রাজা বাবা করে দিয়েছেন—অবশ্য আমার নামটা তিনি ভুলে গেছেন এতদিনে। পতঞ্জলি বলে, আজ এই রকম এই বাড়ীটা। এর ঐতিহ্য নিয়ে

সুখে থাকুক। আমরা যেন এখানে অতিথি হয়েছি।

তারপর পতঞ্জলি কত বড় হবে। আজ সে গরীব প্রোফেসর। কিন্তু যখন ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে ফিরবে, অনেক খ্যাতি অনেক সম্মান পাবে। আমরা আবার নতুন করে সংসার করবো; তখন একেলে হয়ে যাবো। তখন আমার বলবে— সফিস্টিকেটেড। এই বলে তার চাঁপা রং-এর হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

রুটিন হয়ে গেছে; রবিবার বা অন্য যে কোন ছুটির দিন তুজ গাড়ী এসে পড়বে আমার বাড়ীর দরজায়।

বারান্দায় বসে সকালের রোদে খানিকক্ষণ ছবি আঁকা হয়, তারপর হাসি-গল্প চলে। পত্রলেখা এস্রাজ বাজায় কখনও।

বলে—'সুকন্যা, কতদিন লাগবে আর? পতঞ্জলি যে এসে পড়বে। ওকে তাক লাগিয়ে দিতে হবে না!'

আর দিন দুই তোমাকে কষ্ট করতে হবে ভাই। 'কোথায় যেন একটা কি মিলছে না। সেটুকু টাচ দিতে পারলে......!'

এস্রাজের ছড়িতে দীর্ঘ টান দিয়ে আমাকে থামিয়ে দেয়—ছি ছি, আমার আবার কষ্ট কি। তুমিই তো কত কষ্ট করছ, আমার কাছে আসছ তোমার সময় নষ্ট করে। আমার নিঃসঙ্গ দিনগুলোতে আনন্দ দিচ্ছ। সত্যি, তোমার ঋণ কি করে শোধ করব। তুমি আমার বোনের চেয়েও বেশী। আমার বোনও আমার কথা একবার ভাবে না।

একটু চুপ করল।

কিন্তু মোহিনী বলে, ছবিটাতে আমার মুখ নাকি হুবহু এসে গেছে! পতঞ্জলির এক ফরাসী বন্ধু ঐ সিঁড়ির অয়েল পেন্টিংটা করে দিয়েছে। আমার বাঙ্গালী বন্ধুর আঁকা আরো সুন্দর।

তবে আমি ঠিক বুঝতে পারি, কি যেন মেলে না এই ছবিখানায়। ঠিক বুঝি এ পত্রলেখা নয়।

যখন সিটিং দেয়, আকাশের দিকে যখন চলে যায় হরিণ-নয়নের দৃষ্টি—কৌতুকের ঝিলিক হারিয়ে যায়। চুপ হয়ে যায় একটি চঞ্চল মন। একটা বোবা আত্মা স্থির হয়ে বসে থাকে আমার সামনে।

কোথায়, কোন একটি রেখা আমি খুঁজে পাচ্ছি না, তাকে কোথায় পাই! ভাবতে থাকি আমি।

সেদিন সকালে এই রকম ভাবতে ভাবতে গিয়েছি। লাল-নীল কাঁচ লাগানো দরজার পাশে পত্রলেখা নেই। গাড়ী থেকে নেমে একাই পেরিয়ে গেলাম, কাঠের পালিশ করা সিঁড়ির বিবর্ণ লাল কার্পেট। উজ্জ্বল দৃষ্টি আর সুন্দর মুখের অয়েল পেন্টিংখানা প্রতিদিনের মতই একবার করে তাকিয়ে দেখে নিলাম।

দোতলায় পত্রলেখা নেই। শুনতে পেলাম, শোবার ঘর থেকে এস্রাজের সুর ভেসে আসছে। পাছে [illegible] থামিয়ে দেয় [illegible] নিঃসাড়ে ঢুকলাম। চুল খোলা মুখ নীচু করে যোগীয়ার আলাপ করছে। ক্লান্ত আঁখি পল্লব অশ্রুসিক্ত; মুখ বেয়ে জল নেমে এসে কাঁধের শাড়ীতে পড়ছে।

আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি এস্রাজ নামিয়ে রাখল। —এসো সুকন্যা। এখনও তৈরী হইনি ভাই, কিছু মনে কোর না। একটু বসো, এখুনি আসছি। মুখটা দুহাতে মুছে নিয়ে, চুলগুলো গোছা করে ধরল।

সোনালী ফ্রেমে বাঁধা আয়নার নীচে পাথরের টেবিলের ওপর পতঞ্জলির ছবির দিকে চেয়ে বলল—উঃ—কি ধড়িবাজ মানুষটা, দেখেছ ভাই! দিব্যি হাসছে, আর?'

আমার দিকে চেয়ে লজ্জিতভাবে বলল— 'আমার বড়ো মন কেমন করছিল ভাই। তোমার কি করতো না!'

—নিশ্চয় করতো। মন আছে, অথচ কেমন করবে না এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

আবার স্বচ্ছ হাসি দেখা দিল তার মুখে— বসো, আমি দশ মিনিটেই আসছি।

এই চেনা মুখটা কেন ফুটছে না আমার ক্যানভাসে? কোন রেখাটি এখনও ধরতে পারিনি? ডিভানে হেলান দিয়ে টান হয়ে বসলাম।

অনেকক্ষণ কেটে গেছে। মোহিনী এল। মিনে-করা জয়পুরী ট্রেতে করে পেস্ট্রি আর কফির পাত্র নিয়ে। একটা ছোট্ট টেবিল টেনে এনে বলল—'কাল রাত থেকে আবার বড় কাঁদছেন দিদিমণি। একটু সামলাতে দেরী হচ্ছে। কাল থেকে খাননি কিছু। ঘুমোতেও পারেননি বোধহয়। তাই হয়তো স্নান করতে গেছেন। আপনি ততক্ষণ কফি খান।'

বললাম—'একা একা থাকে তো বেচারী। মন খারাপ হয়ে যায় মধ্যে মধ্যে বুঝতে পারি।'

মোহিনী নীচু হয়ে কফি ঢালতে লাগল। পাথরের টেবিলে টুকিটাকি প্রসাধন সামগ্রীর মাঝে পতঞ্জলির ছবিটা মুখ টিপে হাসছে। সে

লেখক [illegible]

দিকে চোখ যায়। জিজ্ঞাসা করলাম—'তা তো[illegible] জামাইবাবুর ফিরতে আর কত দেরী!

—জামাইবাবু?' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চম[illegible] উঠল মোহিনী। কফি ঢালা বন্ধ করে আ[illegible] দিকে তাকালো। অতি বিস্মিতভাবে চাপা গ[illegible] বলল—জামাইবাবু তো আর ফিরবেন না।

কি বললো মোহিনী, আমার মস্তিষ্[illegible] রন্ধ্রে প্রবেশ করল না।

—কেন? কেন? শুষ্ক কণ্ঠে আবার [illegible] করি।

—তিনি তো সেখানে ঘর বেঁধেছেন [illegible] একজনকে নিয়ে।

—সেকি! সেকি!

—আপনি জানেন না? অনেকদিনের [illegible] তো, সকলে জানে।

ভিক্টোরিয়ান আসবাবপত্রের মধ্যে [illegible] খানিকক্ষণ বসে রইলাম। কার্পেটের ওপর এস্[illegible] পড়ে রয়েছে। কফি ঠাণ্ডা হচ্ছে সামনে।

তীব্র দৃষ্টিতে তাকালাম, সোনালী [illegible] বাঁধানো আয়নার নীচে যেখানে পতঞ্জ[illegible] ছবি রয়েছে।

ঠিক সেইরকম মুখ টিপে হাসছে: পত্রলেখ[illegible] জব্দ করেছে যেন, এমন একটা ভাব।

তুলি ধরতে পারব না। রং মিলিয়ে গেছে সকালের রোদের সঙ্গে। এখনও এস্[illegible] যোগীয়ার আলাপের রেশ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে— ঘরের দেয়ালে দেয়ালে, সবহারানোর সুরের স[illegible] সুর মিলিয়ে।

সেই হারানো রেখাটা খুঁজে পেয়েছি এ[illegible] দিনে, সেটা পরাজয়ের রেখা; একটি অ[illegible] হৃদয়ের রেখা। যে অজানা রংটা এত[illegible] হাতড়াচ্ছিলাম, তা শূন্যতার রং।

বাঙ্গালী মেয়ের আঁকা পত্রলেখার [illegible] কোনদিনও দেখতে আসবে না পতঞ্জলি। এ[illegible] সুখের আবরণের অন্তরালে এক নিপীড়িত [illegible] অস্ফুট কান্না কাঁদছে।

কিন্তু পত্রলেখা কি সত্যি এখনো পত[illegible] ফিরবে আশায় বসে আছে? মন বলছে, সুদূরে যে ঘর বেঁধেছে, তাকে পত্রলেখা চে[illegible] না। সে আর আসবে না, এলেও পত্রলেখার হৃদয়ে ঠাঁই হবে না। পত্রলেখা শুধু স্মৃতি [illegible] বসে আছে, আর নিষ্কলুষ এক স্বাভাবিক ক[illegible] দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখতে চেষ্টা করছে।

হায় পত্রলেখা! তুমি তো উপেক্ষিতা [illegible] চাওনি! তুমি যে সৌভাগ্য[illegible] বিলা[illegible] পত্রলেখা হতে চেয়েছিলে। তোমার রূপটা ধ[illegible] চেয়েছি ক্যানভাসে! কিন্তু এ তোমাকে যে [illegible] চিনি না। এ ছবি আঁকতে চাই নি পত্র[illegible] অনাদরের রেখায় তোমাকে জর্জরিত করতে [illegible]নি।

পালিশ করা কাঠের সিঁড়ির বিবর্ণ কার্পেট মাড়িয়ে নীচে নেমে এলাম। পত্র[illegible] থাকুক তার সপ্তম শতাব্দীর মর্মবেদনা [illegible] একাকী, নিঃসঙ্গ। বিংশ শতাব্দীতে তাকে [illegible] করে নিয়ে আসি।

উৎসবের
দিনগুলি
আনন্দমুখর
করে
লিলি বিস্কুট
দুইটি জনপ্রিয় বিস্কুট
কার্নিভ্যাল
ও
থিন এরারুট
লিলি বিস্কুট কোং, প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

শ্রী ও সৌন্দর্য রক্ষায় নারী

* বেলা দে *

এতকাল নারী গৃহাঙ্গনের কল্যাণশ্রী রক্ষা করে এসেছে। এখন তার ডাক পড়েছে ঘরের বাইরে।

ঘরের শ্রীছাঁদ বজায় রেখেও পল্লীর স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষার দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছে। এ কাজ নারী সহজেই করতে পারে, এখানে তার প্রাণের সহজ প্রেরণা আছে। নারীকে মনে রাখতে হবে এই কর্মের যুগে অলস জীবন-যাত্রার স্থান নেই ঘরে ও সমাজে। পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত রাখতে হবে। আজ জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নারী তার কর্ম-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। হয় তো এতদূরে আমাদের সকলের পক্ষে পৌঁছান সহজ নয়। যা আমরা সহজে করতে পারি, তা হলো গৃহ ও আশেপাশের স্বাস্থ্যরক্ষা করা ও পরিচ্ছন্ন রাখা।

আমাদের শরীর ও স্বাস্থ্য খারাপ হলে আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে থাকি ও স্বাস্থ্যবিধি পালন করি। এতে রোগের উপশম হয়, দেহমন সুস্থ থাকে। তেমনি ঘরকন্নার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতায় মন খুসী থাকে, শরীরও সুস্থ থাকে।

কোথাও যেতে গেলে সাধ্যমত পরিস্কার জামা কাপড় আমরা পরে থাকি। মলিন কাপড়ে কোথাও গেলে মনের মধ্যে কেমন একটা গ্লানি বোধ করি। তেমনি অপরিস্কার, অগোছালো বাড়ীতে অতিথি এলে তিনিও অস্বস্তি বোধ করেন—আর গৃহিণীর তো লজ্জার সীমা থাকে না।

কিন্তু লজ্জার কোনই কারণ থাকে না, যদি গৃহিণী নিয়মিত কিছুটা সময় ঘর পরিস্কার করার জন্য ব্যয় করেন। এক ইংরাজ মহিলা আমাকে একদিন বলেছিলেন, তাঁদের সমাজে যে গৃহিণী বাড়ীঘর আসবাবপত্র পরিস্কার রাখতে অভ্যস্ত নন, তা তিনি যদি চাকুরে মহিলাও হন, তথাপি তাঁর অপরিস্কার ও এই অলসতার জন্য তার নিন্দা করা হয়।

*

আমাদের গৃহিণীরা যদি শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েকে পরিচ্ছন্ন থাকার শিক্ষা দেন, তারা বাড়ীঘর কখনো নোংরা করবে না। শুধুমাত্র লোকজনের উপর বাড়ীঘর পরিস্কার রাখার ভার দেওয়া উচিত নয়। এমনও দেখা যায়, বাড়ীর মেয়েরা নিখুঁত করে জামাকাপড়, রংচং মিলিয়ে সেজেগুজে বাইরে বেরুলেন কিন্তু ঘরটিতে দেখা গেল, ভিজে তোয়ালে পড়ে আছে, মেঝেতে রাশীকৃত জামাকাপড় পড়ে আছে, ড্রেসিং টেবিলে পাউডার, স্নো, চুলের গুচ্ছো, একরাশ কাঁচের চুড়ি, সব এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। কে পরিস্কার করবে, কখন পরিস্কার হবে সে খোঁজ সে রাখে না। আমি তার সাজের নিন্দা করছি না, কিন্তু যে মেয়ে নিখুঁত করে সাজ জানে, ঘর সম্বন্ধে তার এমন রুচিবোধের [illegible] অভাব হয়? ঘর থেকে বার হবার আগে ঘর পরিচ্ছন্ন করে রেখে যাওয়া মার্জিত রু[illegible] পরিচয়।

গৃহের পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়ে [illegible] করে যেমন শোবার ঘর, তার বিছানাপত্র [illegible] দেওয়া, জানালা দরজা পরিস্কার রাখা ইত্যা[illegible] বসবার ঘর, আমাদের মিলন ক্ষেত্র। ধূলিমা[illegible] আসবাব বা বই ইত্যাদি বড়ই দৃষ্টিকটু। এ[illegible] পরিচ্ছন্ন ও রুচিসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। [illegible]

রান্নাঘর পরিষ্কার রাখা তো স্বাস্থ্যের পক্ষে পরিহার্য। কোনো পরিশোধক দ্রব্য দ্বারা মাঝে মাঝে ঘর পরিষ্কার করা দরকার।

*

পরিচ্ছন্নতা মানুষকে দীর্ঘজীবী ও সুস্থ রাখে। পরিচ্ছন্নতা বিলাসিতা নয়। গৃহ পরিষ্কার রাখার জন্য বেশী অর্থের প্রয়োজন

ঘর সম্বন্ধে রুচিবোধের অভাব কেন?

হয় না, প্রয়োজন শুধু নিয়মানুবর্তিতার আর কর্মশক্তির।

এতো গেল ঘরের কথা—নিজের পরিবারের প্রতি কর্তব্যপালন করার পরই আসে প্রতিবেশীর প্রতি, পরিচিত পল্লী বা পাড়ার প্রতি কর্তব্য। গ্রামজীবনে নিন্দা বা প্রশংসার স্থান আছে—সেখানে সমাজে বাস করে সমাজের প্রতি উদাসীন হওয়া চলে না। সেখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ আছে। কিন্তু শহরের বিধিব্যবস্থা আলাদা। আমি শহর-জীবনের কথাই বলছি। এখানে সবই গভর্ণমেন্ট বা মিউনিসিপ্যালিটি করবে বলে আমরা উদাসীন থাকি। বিশেষ করে প্রতিবেশীর প্রতি আমরা খুব সুস্থমনের পরিচয় দিই না। কিন্তু পাড়ার সেবাযত্ন নেবার মনোভাব থেকে বৃহত্তর দেশসেবার শক্তি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবে। কি গ্রামে, কি শহরে, কিছু পাড়ায় মহিলা সমিতি, মহিলা সংঘ প্রভৃতি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান আছে। এই জাতীয় সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান আমরা পাড়ায় গড়ে তুলতে পারি। ঘর সংসার বজায় রেখেও মেয়েরা এ কাজ করতে পারেন। কাছে যদি বস্তি থাকে তবে সেখানে গিয়ে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি এবং পরিচ্ছন্নতার কথা বুঝিয়ে দিতে পারেন। এমনি করে মিলেমিশে পরস্পরের সহায্যে পাড়ার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা চলে।

*

নিজের বাড়ী পরিষ্কার করে সব আবর্জনা পথে বা অন্য বাড়ীর সামনে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। এই স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে হবে। কারণ, আবর্জনা ও নোংরা থেকে রোগের উৎপত্তি। নিজে পরিষ্কার থাকলেই রোগমুক্ত হওয়া যায় না। রোগমুক্ত হতে গেলে পাড়াটি পরিষ্কার রাখতে হবে। পার্কে আমরা বেড়াতে যাই দেহমন সুস্থ করতে। সেখানে আমাদের কর্তব্য হলো ছোট ছেলেদের ও অন্যান্যদের শিখিয়ে দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে চানাচুরের ঠোঙা, ফলের খোসা, টুকরো কাগজ ইত্যাদি ফেলে দেওয়া। দেয়ালে লেখা, গাছের ফুল পাড়া এইসব কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য আমরা ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে বলতে পারি। বড় বড় সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি কুৎসিত হয়ে যায়

পাড়ার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যরক্ষার দায়িত্ব।

দেয়ালে বিজ্ঞাপনপত্র ইত্যাদি লাগিয়ে—সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে।

মানুষ একা বাঁচতে পারে না। তাই সবাইকে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে সুস্থ দেহে ও মনে। আমরা পৌর অধিকার নিয়ে দাবী জানাই। কিন্তু এই দাবীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আমাদের কর্তব্যবোধ। এই দায়িত্ব ব্যক্তিগত এবং যৌথ দায়িত্ব। এর সঙ্গে জাগ্রত রাখতে হবে সৌন্দর্যবোধ ও রুচিবোধ। মানুষ শিব-সুন্দরের উপাসক! পরিচ্ছন্নতার মধ্য দিয়ে মানুষের ঘরে ঘরে এই শিব-সুন্দর বিরাজ করুক।

প্রাকৃতিক দৃশ্য (কাঠমাণ্ডু) — ইথ আল্ল পদ্মেন্দ্র

কুন্তলার মৃত্যু

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

এত বড় একটা বিপর্যয়ের জন্য দ্বিজেন প্রস্তুত ছিল না। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ তাকে জানিয়ে দেওয়া হ'ল যে, আর এক মাস পরে তার চাকরী থাকবে না। অথচ এরাই তাকে তার পূর্ব কর্মস্থল থেকে চলে আসবার জন্য বারবার প্রলুব্ধ করেছে। দ্বিজেন মুখ থুবড়ে পড়ল। তার চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার।

সেই থেকেই সুরু হয়েছে তার জীবন-সংগ্রাম। স্ত্রী কুন্তলা প্রথম প্রথম প্রচুর উৎসাহ দিয়েছে। তার পরে দিয়েছে সান্ত্বনা—এখন দেখা দিয়েছে প্রচ্ছন্ন অনুযোগের সুর।

প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। একটি একটি করে দ্বিজেনের বেকার জীবনের ছ'টি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। বারে বারে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার চেষ্টায় আর তেমন উৎসাহ নেই। কতকটা যেন ভাগ্যের কাছে হার মেনে গা ভাসিয়ে দিয়েছে দ্বিজেন। এমনি দিনে কুন্তলা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল। অভিযোগ নেই—অনুযোগ নেই। সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে কথা কইলে সে, তুমি না করো না লক্ষ্মীটি। তা ছাড়া দায় আর দারিদ্র শুধু তোমার একলার—তা আজকের দিনে বলা চলে না।

দ্বিজেন প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, তাই বলে তুমি...

শান্ত হেসে কুন্তলা বলল, অভিনয়কে অত ছোট করে দেখছো কেন তুমি। তা ছাড়া আর কটা দিন অপেক্ষা করলেই যদি সমস্যার সমাধান হয় তখন না হয় পিছিয়ে আসব। আজ তুমি বাধা দিও না।

বাধা দিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন পারেনি। স্ত্রীর ইচ্ছা আর যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তা ছাড়া যে কথাগুলি কুন্তলা আজ বলেছে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র কটাক্ষ নেই, অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই বরং বন্ধুর মত পাশে দাঁড়িয়ে দায়-দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করতে চাইছে।

আবেদনের ভঙ্গীতেই নিবেদন করেছে তার বক্তব্য। কিন্তু দ্বিজেন জানে যে, এটা তার আবেদন বা নিবেদন নয়—সিদ্ধান্ত। সুতরাং বাধা দিয়ে মিথ্যা তিক্ততার সৃষ্টি করেনি।

কুন্তলা মিষ্টি করে হেসে বলল, আমি জানি তোমার অনুমতি আমি পাবই তাই ওদের শুধু কথা নয়, একখানা বইয়ের জন্য চুক্তি পর্যন্ত করে এসেছি। তুমি দেখে নিও আমাদের দুঃসময় আর বেশী দিন নেই—

তা হয়ত থাকবে না। কুন্তলার রূপ আছে, শিক্ষা আছে। এখন দেখছে সাহসেরও অভাব নেই। ভাল পরিচালকের হাতে পড়লে কুন্তলার আশা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কুন্তলা তার বক্তব্য আর সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়ে গেছে। প্রকাশ্যে বাধা দিতে পারেনি, ভিতরে ভিতরে দ্বিজেন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ঘরের মধ্যে মন্থর পদে সে পায়চারী করতে থাকে

আবার ফিরে এসেছে কুন্তলা। হাতে পিয়ালা ধূমায়িত চা। কন্ঠে মিষ্টি একটি জিজ্ঞেস করল, চা খাবে? তোমার জন্যে এলাম।

আকাশ থেকে দৃষ্টি নেমে এল কুন্ মুখের উপর। বলল, বদ্‌অভ্যাসটা আর করে করতে চাই না। অনেক কষ্টে ছেড়েছি

তা জানি। কুন্তলা জবাব দেয়, আ ছেড়েছিলাম। এখন থেকে বাড়ীতে দু'চার ভদ্রলোক আসা-যাওয়া করবেন, তাই খানি ভাল চা নিয়ে এলাম। ভাবলাম না আনার করতেই হবে তা আজ থেকেই হয়ে যাক ছাড়তে চাইছো যখন তখন আর জোর ক না।

কুন্তলা চলে গেল। হয়ত রাগ করেই গেল। তা যাক...

দ্বিজেন পুনরায় পায়চারী সুরু করে একটা অস্থিরতা তার প্রত্যেকটি পদক্ষে ভাবতে চেষ্টা করছে তার আগামী দিনগু কথা। কুন্তলা ছায়াচিত্রে অভিনয় করবে। নামও করবে। অর্থাগমও হবে। স্বাচ্ছ মুখও দেখবে। কিন্তু এই স্বচ্ছলতার গ্রহণ করা দ্বিজেনের পক্ষে সম্ভব হবে বিশেষ করে এই অর্থাগমের পথটাকে সে মেনে নিতে পারছে না। তবুও সে কুন্ত তার মনের কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে পারেনি। বলতে পারেনি এ কাজ তো করতে দেব না! কেমন করেই বা সে বল আজ দীর্ঘ ছ'টি মাস যে করে তাদের কে তা নিজের চোখেই ত দেখেছে। এর প দিনগুলি যে আরও ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেবে না তা কে বলতে পারে। কুন্তলা আরও বেশী করে অনুভব করেছে দিনের ভয়াবহ পরিস্থিতিকে। মাতৃ-পা
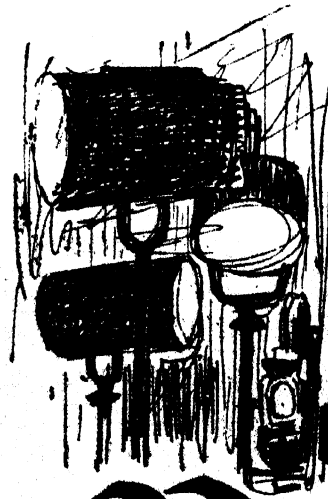
…ক্ষেচন্ট থাকতে পারেনি কুন্তলা। দ্বিজেন …খন হাল ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে আশ্রয় …নিয়েছে কুন্তলা তখন বাইরের দিকে দৃষ্টি …ফেরাল। পথও খুঁজে পেল।

কুন্তলা জানত দ্বিজেন বলবে, এ পথ …মোটেই সহজ পথ নয়। এর জবাবটাও সে মনে …মনে ঠিক করে রেখেছিল। সহজ পথে চলে কি …পেয়েছে দ্বিজেন—এই কথাটাই জিজ্ঞেস করবে …কুন্তলা। কিন্তু যুক্তি-তর্কের ধার দিয়েও সে …গেল না। কিসের জোরে যুক্তি-তর্কের …অবতারণা করবে দ্বিজেন। তা ছাড়া মিথ্যে …বলেনি কুন্তলা। যে মানুষ এগিয়ে যেতে পারে …প্রয়োজনে সে পিছিয়ে আসতে পারবে না এটা …একটা কথাই নয়। সুতরাং মনে তার যাই থাক, …কুন্তলার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করেই …বর্তমান সমস্যার উপর যবনিকাপাত করল …দ্বিজেন। কিন্তু দৃশ্যান্তরে আর একদিন …তাকেই আবার যবনিকা তুলে ধরতে হল। …তুলতে সে বাধ্য হল।

*

আচমকা একটা দমকা হাওয়ায় সরে …গিয়েছিল দোরের রং-বেরংএর ভারী পর্দাটা। …আর সেই মুহূর্তের অবকাশে পর্দার …আড়ালের যতটুকু তার দৃষ্টিপথে ধরা পড়েছে …তাতেই সচকিত হয়ে উঠল দ্বিজেন। তার …দেহের সবটুকু রক্ত মাথায় উঠে এলেও কোন …প্রকার হঠকারিতা সে করেনি। একদিন যা …সহজ ছিল আজ আর তা নেই। আজ কুন্তলার …পরিচয় দ্বিজেনের স্ত্রী হিসেবে নয়। চিত্র-…জগতে সে একজন উজ্জ্বল তারকা। তার …খাওয়ার ভঙ্গী, চলার বৈশিষ্ট্য, কথা বলার …ধরন, কোন্ রংটি তার প্রিয় এ নিয়ে বর্তমানে …অনেকে গবেষণা করে। আজকে কাউকে দিচ্ছে …অটোগ্রাফ..কারুর হাত থেকে নিচ্ছে ফুলের …মালা।

বেকার স্বামীর স্ত্রী কুন্তলাকে আজ …কেমন করে খুঁজে পাবে দ্বিজেন। কুন্তলার …বাড়ী হয়েছে, গাড়ী হয়েছে। তার ইচ্ছা …অনিচ্ছার কত মূল্য...বহু রথী-মহারথী তার …গুণগ্রাহী, কৃপাপ্রার্থী। দ্বিজেনের মত একটা …সাধারণ মানুষকে নিয়ে পড়ে থাকার জন্য …প্রকাশ্যে তারা অনুযোগ দেয়। ইতিপূর্বেও …হয়ত দিয়েছে। কানে আসেনি তাই। আজই …হঠাৎ শুনে ফেলেছে সে। শোনার কথা নয়। এ …সময় কোনদিনই সে বাড়ী থাকে না। আজকের …ফিরে আসাটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা। …দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি বলতে পারে দ্বিজেন। …তার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা।

দ্বিজেন আর দশটা ঘটনার মতই মেনে …নিয়েছিল তার বর্তমান জীবনকে, কিন্তু …কুন্তলার খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে সে যে একটু …একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে একথা জেনেও সে …জোরালো প্রতিবাদ করতে পারেনি। এই কিছু-…দিন আগেও ক্ষীণ অভিমানজড়িত কণ্ঠে অনু-…যোগ দিতে গিয়েছিল—

কুন্তলা শান্ত ভাবে তার কথা শুনে …আশ্চর্য অন্তরঙ্গ সুরে জবাব দিয়েছিল, আমি …জানি এ প্রশ্ন তোমার মনে একদিন দেখা …দেবেই। আমার হলেও দিত। দিয়েছেও। কিন্তু …তার জবাবও আমি পেয়েছি।

দ্বিজেনের চোখে-মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন।

কুন্তলা বলতে থাকে, আমার অভিনেত্রী জীবনটাকে যখন মেনে নিয়েছো। তখন অভিনয়-টুকু মেনে নিলেই সমস্যা থাকে না।

এ কথার মানে!

অত্যন্ত সহজ। অভিনয়কে বাদ দিলে অভিনেত্রী জীবনের কোন মূল্য থাকে কি?

তাই বলে ঐ একটা আর্টিস্টকে নিয়ে—কথা কটি শেষ করতে পারে না দ্বিজেন। তার কণ্ঠ বুজে আসে।

কুন্তলা একটু হেসে দ্বিজেনের অসমাপ্ত কথাটা শেষ করে। বলে, একটু বেশী বাড়াবাড়ি আর প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। তাই না? তার কারণও ঐ একটিই। যে জীবনকে বাধ্য হয়ে আমার গ্রহণ করতে হয়েছে তা অসম্পূর্ণ থেকে যেতো যদি না ঐ শিল্পীর অকুণ্ঠ সমর্থন পেতাম।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ ওর মত একজন খ্যাতিমান অভি-নেতার অকুণ্ঠ সহায়তার জন্যই কুন্তলা আজ কুন্তলা। প্রতিদানে দুটো মিষ্টি কথায় যদি তার সঙ্গে একটু অভিনয় করে থাকি তার জন্য তোমার ব্যথা পাবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

অভিনয়...

নির্জলা অভিনয়। আমার প্রত্যেকটি কথা আর ব্যবহার শুধু উচ্চাঙ্গের অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়।

কুন্তলা থামল। দ্বিজেনের একান্তে এসে দাঁড়াল। ওর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে একটু চাপ দিল।

হয়ত মিথ্যে বলছে না কুন্তলা। মনে মনে দ্বিজেন নিজেকে অনুযোগ দিয়েছে এই ধরণের বিপরীত চিন্তা তার মনে এসেছে বলে।

তারপর বেশ কিছুদিন একটা দার্শনিক নির্লিপ্ততার মধ্যে কাটিয়েছে সে। অভিনয়.....কে না অভিনয় করছে এ পৃথিবীতে। ক্ষেত্র বিশেষে ধরণটা আলাদা হয়। রং বদলায়। রূপের তারতম্য হয়। বিদ্রোহ করতে গিয়েও একেবারে শান্ত স্থির হয়ে গিয়েছিল দ্বিজেন। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে তার দার্শনিক নির্লিপ্ততা অবিশ্বাসের আগুনে গলে গলে পড়তে লাগল। শুধু একটা প্রশ্নই তার চোখের সম্মুখে বড় হয়ে উঠল। কার সঙ্গে অভিনয় করে চলেছে কুন্তলা। দ্বিজেনের, না ওই নামজাদা অভিনেতার সঙ্গে?

ওদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মুক্তি পত্রে সই করে দিলে কেমন হয়...কুন্তলা আর ওই শিল্পীর পথের বাধা দূর হয়ে যাক। ওরা নিরুদ্বেগে বাধাহীন জীবন কাটাক। কিন্তু এগিয়ে যেতে গিয়েও আবার পিছিয়ে গেল দ্বিজেন। এত বছর ধরে যার অন্নে জীবনধারণ করেছে তার ঋণ কি এত অল্পে পরিশোধ হবে?

মাতালের মত টলতে টলতে নিজের ঘরে চলে এল দ্বিজেন। ওদের প্রত্যেকটি কথা জ্বলন্ত শিখার গোলার মত তার বুকে এসে বি'ধেছে। বেশ বলেছে কুন্তলা। বিয়ে করা স্বামী থাকায় সুবিধে অনেক। মাঝে মাঝে শুধু তার দেহটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেই খুশি হচ্ছে...তারপরে খিল খিল হাসির মাতাল করা উচ্ছ্বাস, আঃ শ্রবণ...একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না কি?

আর দাঁড়াতে পারেনি দ্বিজেন। টলতে টলতে চলে এসেছে। কতক্ষণ নিশ্চল পাথরের মত সে বসেছিল তা সে নিজেই জানে না। সহসা কুন্তলার আহ্বানে সম্বিৎ ফিরে পেল।

একি এমন চুপ চাপ বসে আছো যে? ফিরলে কখন? তবে যে শুনলাম সিনেমায় গেছো?

ভুল শুনেছো।

ডেকে পাঠালে না কেন?

তুমি ব্যস্ত ছিলে—

তোমার শরীর খারাপ নয় তো? গলায় আওয়াজটা কেমন কেমন মনে হচ্ছে...

'ও কিছু নয়। তুমি যেখানে যাচ্ছিলে যাও।'

একটা ডিনার পার্টিতে যেতে হবে। বম্বের একজন মস্ত বড় প্রডুসার আসছেন।

ওরা অনেক পয়সা দেয়। একটু চেষ্টা করলেই সফল হবে। একখানা বই মানেই আর একখানা বাড়ী। আচ্ছা কুন্তলা...

থামলে কেন?

তোমার ব্যাঙ্কে কত টাকা জমেছে?

শুনে তোমার লাভ?

নিছক কৌতূহল।

কৌতূহল ভাল নয়। অনেক সময় দুঃখের কারণ হয়।

তা হয়...কিন্তু তোমার যে দেরী হয়ে যাচ্ছে...

যাক—

আজ কত তারিখ তুমি জান কুন্তলা? ফাল্গুনের চার তারিখ। বারটাও রবিবার। তাই সকাল সকাল ফিরেছিলাম, তা হোক তুমি ত ডিনার পার্টিতে যাচ্ছ। তারিখটা স্মরণ করে একটু বেশী করে খেও।

আমাদের বিয়ের তারিখের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছ তো?

মনে আছে দেখছি। আগে বরং আমারই মনে থাকতো না। তুমি স্মরণ করিয়ে দিতে।

কুন্তলা চুপ করে থাকে।

দ্বিজেন বলে, শ'খানেক টাকা আছে তোমার ভেনিটি ব্যাগে? দিতে পারো?

কি করবে?

টাকার অঙ্কটা একটু বেশী হয়ে গেল। তা হোক। দেবে তুমি। প্রাণ ভরে একটু ফূর্তি করবো। দ্বিজেন হা হা করে হাসতে থাকে। আজকের তারিখে ধর্মসাক্ষী করে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

কুন্তলা ওর কথার ধরনে খানিকটা অস্বস্তি বোধ করছিল। সে দ্রুত হাতে একখানি একশ টাকার নোট ছুড়ে দিয়ে বাইরে পা বাড়াতেই আর একবার হেসে উঠল দ্বিজেন। বলল, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে নাকি কুন্তি? আমাদের বিয়ের রাতটিকে স্মরণীয় করে রাখতে?

কুন্তলা কান দিল না দ্বিজেনের কথায়। সে দ্রুত পদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। তার হাইহিল জুতোর খটাখট শব্দ দ্বিজেনকে জানিয়ে দিল যে, সে দিনটি জুতোর তলায় পিষ্ট হয়ে গেছে।

দ্বিজেনের এতক্ষণের হাসি বেদনায় করুণ হয়ে উঠল। আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে কুন্তলার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। একটি স্মরণীয় দিন। আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন আর মধুর কল্পনার রং দিয়ে মনের ক্যানভাসে যে অনিন্দ্যসুন্দর ছবিটি এঁকেছিল তার সব কটি রং কি কাঁচা ছিল? নইলে সে ছবি আজ এমন করে ধুয়ে মুছে বিলুপ্ত হয়ে গেল কেমন করে?

বিষের ক্রিয়া সুরু হয়েছে দ্বিজেনের জীবনসত্তায়। হাতে ধরা রয়েছে কুন্তলার অবজ্ঞার দান একশ টাকার নোটখানা। কি মাথান রয়েছে ছাপান কাগজখানার সর্বাঙ্গে।

চঞ্চল হয়ে উঠল দ্বিজেন। এখানের এ বদ্ধ আবহাওয়ায় তার দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন। চলে যেতে চায় সে। মুক্তি পেতে চায় সে। আশ্চর্য এ কথাটা এত দেরীতে সে অনুভব করল।

ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল দ্বিজেন। হাতের নোটখানা একবার আলোয় তুলে ধরল সে। আঁকা বাঁকা আখরগুলোর মধ্যে কি খুঁজে দেখছে সে। তার ভবিষ্যতের কোন ইঙ্গিত..... কোন নির্দেশ......

দোতলা থেকে একতলায়, সেখান থেকে সোজা রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে দ্বিজেন। একবার আকাশের পানে চোখ তুলে তাকাল। তারপর চলতে শুরু করল। কিন্তু কোথায়? যেখানে কুন্তলা নেই......

ফুলে ঢাকা একখানা গাড়ী চলে গেল। বিয়ে করতে চলেছে। একটুখানি হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। এমনি করে একদিন সেও গিয়েছিল। শুদ্ধাচারীর মত সারাদিন উপবাস থেকে কুন্তলাকে সে গ্রহণ করেছিল। কেন ভাবছে এসব কথা দ্বিজেন। মরা গাছে জল ঢেলে কি সে ফিরে পেতে চাইছে!

একটা খালি ট্যাক্সি আসছিল। ডাক দিয়ে উঠে বসল।

✻

একটু বেশী রাত্রেই ফিরে এল কুন্তলা। অনেক আনন্দ অনেক স্ফূর্তির মধ্যেও কে যেন তার কানে কানে বলছিল "৪ঠা ফাল্গুন"। বাড়ীতে প্রবেশ ক'রেও কথাটা আবার তার কানের পাশে ধ্বনিত হ'ল।

ইদানিং কোন কিছুই দ্বিজেন তার কাছে চায় না। নিঃশব্দে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। শুধু এই একটি দিনের সন্ধ্যাটিকে সে ছেলে-মানুষী আর পাগলামী দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চায়। বিগত ছ বছরের এই বিশেষ দিনটিতে এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। ব্যতিক্রম ঘটল আজ। এই সর্বপ্রথম। নিজেকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছে কুন্তলার। মনে হ'চ্ছে কাজটা সে ভাল করেনি। পায় পায় সে এসে দ্বিজেনের শয়নকক্ষে প্রবেশ করেই চমকে উঠল।
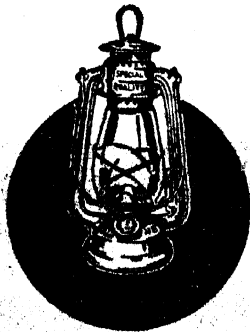
দ্বিজেন এখনও ফেরেনি। কিন্তু চমকটা তার জন্যে নয়। চমকে উঠেছে ঘরময় ভাঙ্গা কাচ ছড়ান দেখে আর তাদের উভয়ের একসঙ্গে তোলা প্রমাণ সাইজের ফটোখানার শতচ্ছিন্ন অংশগুলো আবিষ্কার ক'রে।

দ্বিজেনের খাটের উপর চুপ ক'রে বসে আছে কুন্তলা। তার আজকের এলোমেলো কথাগুলি নিয়ে ভাবতে বসেছে সে। একটু শান্তভাবে চিন্তা ক'রতে গিয়েই সে চাবুক খেল। ছটফট করে উঠল। দ্বিজেনের মনের মধ্যে যে একটা চাপা অসন্তোষ গোপন রয়েছে তার প্রমাণ পেয়েও, সেকথা বুঝতে দেয়নি তাকে। বুঝতে দিয়ে অসন্তোষের মূল্যবৃদ্ধি ঘটায় নি কুন্তলা। এই অসন্তোষ যে একদিন বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ ক'রতে পারে এ কথাটাই সে ভেবে দেখে নি। কতকটা নেশার ঘোরে এগিয়ে চলেছিল।

রাত দুটোর সংকেতধ্বনি শোনা গেল। ঘারায় কুন্তলা ফিরে এসেছে। মনে মনে শঙ্কিত হ'য়ে উঠল সে।

সেই খ্যাতিমান অভিনেতাকেই ডায়েল করল কুন্তলা। বলল, জান দ্বিজেন চলে গেছে ......কি ব'লছো......কোথায় আর যাবে?...... ফিরে আসবে? আমার সন্দেহ হ'চ্ছে...... দশটার পর কোনদিন বাইরে থাকে না। তুমি একবার আসবে? খোঁজ করা দরকার। কি বললে? ও চলে যাওয়ায় তুমি খুশী হয়েছো? ......ও......

ঠক্ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল কুন্তলা।

সত্যিই দ্বিজেন আর ফেরেনি। কুন্তলাকে সবদিক থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নিজের জীবন দিয়ে কুন্তলার নতুন জীবনকে সে পথ করে দিয়েছে। কিন্তু কুন্তলা পারেনি সে পথে আর একধাপও এগুতে। অনেক ভেবেছে সে। তার অভিনেত্রী জীবনে অনেক অভিনয় কুন্তলা ক'রেছে দ্বিজেনের সঙ্গে। আর সেই অভিনয়ই যে শেষ পর্যন্ত এতবড় পরাজয়ের কারণ হবে তা কি একদিনের জন্যও সে জানতে পেরেছে। যখন পারল তখনই সে থামল। তার পরম সহায় সেই শিল্পীবন্ধুর প্রসারিত হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, আমায় মাপ করো। এতদিন আমি নিজেকে চিনতে ভুল ক'রেছি। আসলে তোমার সঙ্গেই আমি এতদিন ধরে অভিনয় ক'রে এসেছি। দ্বিজেনকে বাদ দিয়ে কুন্তলা বাঁচতে পারে না। তার সঙ্গে সঙ্গে সেও মরে গেছে।

সত্যিই মরে গেছে কুন্তলা। রূপালী পর্দায় নতুন করে আর কেউ কোনদিন তাকে দেখেনি।
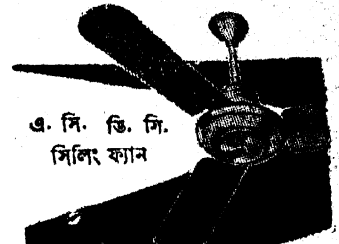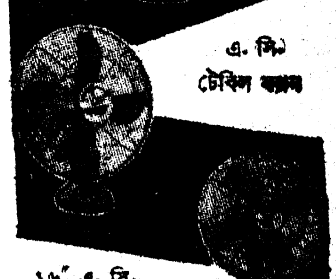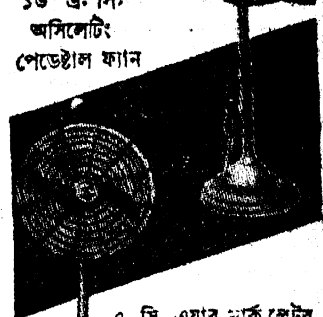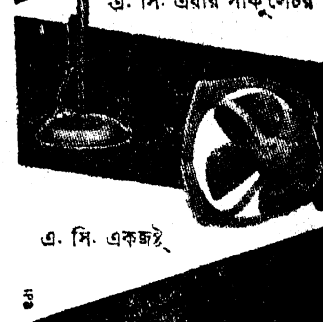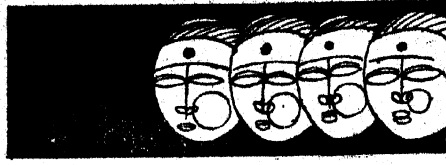
স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে বঙ্গনারী

অমিয়া সরকার

মোগল রাজত্বের শেষে ও বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে ভারতীয় তথা বাংলার সমগ্র নারী সমাজ অত্যন্ত হীনমান্ হয়ে পড়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় "সতীদাহ"-নিরোধক পুস্তকে নারীজাতির আত্মস্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে আনার জন্য কতকগুলি পন্থা অবলম্বনের কথা উল্লেখ করেন। তাহার মধ্যে শিক্ষা এবং সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রধানতম উপায় বলে স্বীকার করেন। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন গত শতাব্দীর ষষ্ঠ, সপ্তম দশকে ধর্মে এবং সামাজিক ব্যবহারে নারীদের সমান অধিকার ঘোষণা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সাহিত্য, সংস্কৃতি, সেবা ও শিক্ষাদানের যে বীজ উপ্ত হয় তাহাই এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে মহীরূহে পরিণত হয়। বাংলা দেশে নারী-কল্যাণ ও নারী-শিক্ষা প্রসারে যে মহিলারা অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে থেকেই কয়েকজনের কথা আজ এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

ইংরেজ অধিকারের শতাধিক বছর পরেও ইংরাজ সরকার ভারতের নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্টই শৈথিল্য দেখিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু তারও ২০ বছর পর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার ছিলো না। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে ২৭এ এপ্রিল তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম নারীদের পরীক্ষা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। আমরা কি আজ সেই অন্ধকার দিনের কথা কল্পনাও করতে পারি? ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সরলা দাস (সরলা রায়) ও কাদম্বিনী গাঙ্গুলী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রথম মহিলা এণ্ট্রান্স পরীক্ষার্থিনী। কিন্তু সরলা দাসের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আর দেওয়া হয় নি, এই সময়ে বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়ের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর স্বামীর কর্মস্থল ঢাকাতে গিয়ে সেখানে বালিকাদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি স্কুল স্থাপন করেন। তাঁর স্বামী কলকাতা ফিরে এলে তিনি নানা নারীকল্যাণ-মূলক সংস্থা গড়ে তোলেন এবং সক্রিয়ভাবে উন্নতির চেষ্টা করেন। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে যখন "ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়" উঠে যাওয়ার অবস্থায় এসেছিলো তখন তিনিই এর কর্ণধাররূপে শক্ত হাতে পরিচালন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সরলা রায়ই ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদিকা।

স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলার মহিলা সমিতিতে সরলা রায় যোগদান করেন। তিনি স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে একসঙ্গে কাজ ক'রে "সখি সমিতি"র শ্রীবৃদ্ধি করেন। শ্রীমতী রায় তাঁর অদম্য উৎসাহ, অশেষ কর্মশক্তি ও সমগ্র জীবন স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কাজে স'পে দেন। তাঁর আর একটি উজ্জ্বলতম কীর্তি, 'গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল'। এই কীর্তি বাংলার স্ত্রী-শিক্ষা জগতে তাঁর স্মৃতিকে অবিনশ্বর করে রাখবে।

শিক্ষা ও সমাজ-কল্যাণে নারীর কৃতিত্বের কথা বলতে গেলে প্রথমে এক মহীয়সী বিদেশিনীর নাম উল্লেখ করতে হয়। যদিও তিনি জন্মে বিদেশিনী কিন্তু আচারে, ব্যবহারে, স্নেহে, প্রেমে তিনি বাংলার একান্ত প্রিয়জন। সেই মহীয়সী নারী—ভগিনী নিবেদিতা। ১৯০২ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে আবার নতুন করে গড়ে তোলেন। এখানে বালিকা, বিধবা এবং গৃহিণীরাও শিক্ষা গ্রহণ করতে আসতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টিতে যখন কেবল লেখ পড়াই শেখানো হতো, তখন ছাত্রী সংগ্রহ করা জন্য তিনি অভিভাবকদের কাছে ভিক্ষার্থী আকুলতা নিয়ে তাঁদের দরজায় দাঁড়িয়েছেন কেউবা তাঁর ভিক্ষা পূরণ করেছেন আর অনেকে তাঁর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়েছেন তাতেও তিনি ক্ষান্ত হননি। ১৯০২ সালে আবা নূতন আদর্শে—নূতনতর পরিকল্পনায় বিদ্যা লয়টিকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। সাহিত্য ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি বিষয় ছাড়ও নিবেদিত সকল ছাত্রীকেই ছবি আঁকা, পুতুল, খেলনা, ঝুঁ প্রভৃতি তৈরী করা ও নানারকম সেলাইয়ের কাজে শিক্ষা দিতেন। এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাকে সমাজ-কল্যাণের উপযুক্ত করে তোল এবং অসহায়া নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পথে এগিয়ে দেওয়া।

দীর্ঘকাল বাংলাদেশের প্রায় মেয়েরা অজ্ঞত নিরক্ষরতা ও পরনির্ভরতার মধ্যেই দিন অতি বাহিত করছিলেন। দেশের সেই ঘোর অন্ধ কারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে মেয়েরা যাতে শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় উন্নত পর্যায়ে পৌঁছতে পারে তার জন্য বাংলার এক রক্ষণশীল পরি বারের বধূ শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস সমগ্র জীব উৎসর্গ করেন। মাত্র দশ বৎসর বয়সে বহরমপুর নিবাসী শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পুত্র ব্যারিস্টার দেবেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে বিয়ে হয়। স্বামীর সঙ্গে তিনি বিলাত যান এবং সেখানে চোদ্দ বছ স্বামীর সঙ্গে থেকে সে দেশের নারীদের সেব ধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন ১৯১০ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন কালে একটি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেল সরলাদেবী চৌধুরাণী দ্বারা আহূত হয় এ এই সম্মেলনই 'অখিল ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' নামে পরিচিত হয়। এই সমিতির মাধ্যমে অ হায়া, অবলম্বনহীনা নারীরা স্বাবলম্বী হ পারে সেই শিক্ষাই দেওয়া হ'ত। এই সমিতি প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই শ্রীযুক্তা কৃষ্ণভাবিনী আমৃত্যু (১৯১৯) বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখা সম্পাদিকা ছিলেন। তিনি প্রথমে একাই কল কাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ী বাড়ী গিয়ে অন্তঃ পুরিকাদের সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষাদানে ব্যবস্থা করে দিতেন। ক্রমে তাঁর কয়েকজন সহ কর্মিণী জুটে যায়। তিনি ভারত স্ত্রী মহা মণ্ডলের প্রাণস্বরূপিণী ছিলেন। ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল বাংলাদেশের দীর্ঘ আঠার বৎস অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষাদান ব্যাপারে ব্যাপৃ থেকে উঠে যায়।

বাংলাদেশে নারী-শিক্ষা প্রসারের কাজে বাংলার মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাজ করে গেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিণী লেডী অবলা বসু। ১৯১৪ সালে তিনি স্বামীর সঙ্গে জাপান ভ্রমণে যান। সেখানের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে নিজের দেশের অজ্ঞতার তুলনা করে, তখনই তাঁর মনে 'নারী শিক্ষা সমিতি' স্থাপন করার ইচ্ছা জাগে। দেশে ফিরে এসেই তাঁর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে তাঁদের উৎসাহে ও সহযোগিতায় তিনি ১৯১৯ সালে "নারী শিক্ষা সমিতি" প্রতিষ্ঠা করলেন। বন্ধুদের পুজোর দালানে, কারুর বা বাগানবাড়ীতে মেয়েদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো। সেদিনের ক্ষুদ্র বীজ আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত। কলকাতা শহরে সমিতি স্থাপিত কয়েকটি স্কুলের মধ্যে দু'টি শিক্ষায়তন (মুরলীধর গার্লস কলেজ ও বেলতলা বালিকা বিদ্যালয়) আজ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচেষ্টায় কলেজে রূপান্তরিত। তারপর যখন কলকাতা পৌরসভা প্রাথমিক শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করলেন, তখন সমিতির কর্মক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হলো।

বাংলার অবজ্ঞাত, অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীগুলিতে তখনো শিক্ষার আলো পৌঁছয় নি। মেয়েদের শিক্ষা সেখানে তখনো অচিন্তনীয় ছিল, সেই সব গ্রামে বালিকাদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হ'তে লাগল। গ্রামে কাজ করবার সময় শিক্ষয়িত্রীর অভাব দেখে আমাদের দেশের দুঃস্থা, পরের গলগ্রহ, অসহায়া বিধবাদের লেখাপড়া শিখিয়ে গ্রামে গ্রামে শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত করার কথা শ্রীমতী বসুর চিন্তায় আসে। এই কল্পনা থেকেই 'বিদ্যাসাগর বাণী ভবনে'র উৎপত্তি। এই কাজে শ্রীমতী হরিমতী দত্ত নামে এক বিধবা মহিলা ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন। এখানে বিনাব্যয়ে শিক্ষার্থিনীদের মধ্যে ইংরাজি মান পর্যন্ত লেখাপড়া, তাঁতবোনা, সেলাই, কাট-ছাঁট, রেশম বোনা ও আরও অনেক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হ'ত। এই ভবন থেকে অনেক দুঃস্থা বিধবা ও অসহায়া নারী স্বাবলম্বী হতেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মৃত্যুকালে বয়স্কা নারীদের শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার আয়োজনের নিমিত্ত 'নারী-শিক্ষা সমিতি'র হাতে এক লক্ষ টাকা দিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অর্থভাণ্ডারটিকে 'সিস্টার নিবেদিতা উইমেন্স এডুকেশন ফান্ড' নাম দেওয়া হয়। এই ফাণ্ডের অর্থে বাংলাদেশের নানা জায়গায় বয়স্কা নারী শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কিন্তু লেডী অবলা বসু ও নারী-শিক্ষা সমিতির সঙ্গে এঁদের সম্পর্কের কথা হয়ত অনেকেই জানেন না।

শ্রীমতী বসু দীর্ঘকাল ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। অবলা বসুর একাগ্র নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠা, গঠন ও পরিচালনার অসাধারণ ক্ষমতা এবং অকৃত্রিম সৌজন্য ও সহৃদয়তা সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রধান কীর্তি নারী-শিক্ষা সমিতি'র মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের মেয়েদের হৃদয়ে জেগে থাকবেন।

আজকাল প্রতি পাড়ায় আমরা প্রাক্-প্রাথমিক শিশু (কিণ্ডারগার্টেন) ও নার্সারি বিদ্যালয় দেখি। যদিও অন্যান্য অগ্রসর দেশ এবং আমাদের শিশুদের সংখ্যার তুলনায় খুবই কম, তবুও বাঙালীর মধ্যে এই বিদ্যালয়ের প্রথম প্রতিষ্ঠাত্রী এক নারী। শ্রীমতী মৃন্ময়ী রায়ের একক প্রচেষ্টায় অতি সামান্যভাবে ১৯৩৬ সালের ২রা এপ্রিল জিতেন্দ্রনারায়ণ রায় ইন্‌ফ্যান্ট এণ্ড নার্সারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি পাশ্চাত্য দেশ ঘুরে, সেখানকার নার্সারি স্কুল পরিচালনা, শিশুদের লালন-পালন এবং মন্তেসরি ও কিণ্ডারগার্টেন প্রথায় শিশুদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করে আসেন।

সেদিনের সেই অন্ধকারাচ্ছন্নতাকে ভেদ করে কয়েকজন মহীয়সী মহিলা দুঃখভারাক্রান্ত মূঢ়-ম্লান মূক মুখে যে ভাষা ফুটিয়েছিলেন, যে আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন তারই শিখা ধরে তারই স্বর শুনে আজ আমরা জগৎসভায় এক বিশিষ্ট স্থান ক'রে নেওয়ার উৎসাহ ও প্রচেষ্টা নিয়ে এগিয়ে চলছি। বাংলার নারী বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কর্মনৈপুণ্যে বর্তমানে যে-কোন দেশের নারী সমাজের সমতুল বলিয়া গণ্য। আন্তর্জাতিক সমিতি ও সম্মেলনে, আইন পরিষদে, মন্ত্রিসভায়, পৌরসভায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। আজকের এই নেতৃস্থানীয়া পূর্বসূরীদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমি তখন সদ্য অ্যামস্টারডম্ থেকে ডুসেলডর্ফ সহরে পৌঁছেছি। অচেনা জায়গা। সস্তায় ভাল হোটেল কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে ধারণা আমার নেই। অগত্যা বাধ্য হ'য়েই স্টেশন সংলগ্ন ইনফরমেশান অফিসের শরণাপন্ন হ'লাম। বললাম—"আমি বিদেশী—এ সহরের কিছু আমার জানা নেই। কোথায় ভাল ও সস্তা হোটেল পাওয়া যাবে বলতে পারেন?"

ভদ্রলোক মুহূর্তকাল তার চশমার মধ্য দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছড়িয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে নিলেন আমাকে। তারপর বললেন—"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

বললাম—"ভারতবর্ষ থেকে।"

তারপর ড্রয়ার থেকে ছোট একটি নোটবই বার ক'রে সেটাতে কি যেন দেখে নিয়ে আবার প্রশ্ন করলেন—"কোন্ প্রদেশ থেকে?"

একটু অবাক হ'তে হল আমাকে। বললাম—"বাংলাদেশ"—

বললেন, "তবে আপনাকে একটি ঠিকানা দিচ্ছি—সেখানে ভাল থাকা খাবার ব্যবস্থা পাবেন অথচ সস্তাতেও হবে"—

বলেই একটি কাগজে ইংরেজীতে লিখে একটি ঠিকানা আমার হাতে দিলেন। বললাম—"তার মানে?"

বললেন—"তার মানে ওই বাড়ীর ল্যান্ড-লেডি আমাদের কাছে তাঁর বাড়ীর ঠিকানা রেখে গেছেন। তাঁর নির্দেশ কোন বাঙালী এলে যেন তাকে ও'র ফ্ল্যাটে থাকতে উঠতে বলি—সব রকম ব্যবস্থাই খুব ভাল—একটু দাঁড়ান—ফোন ক'রে জেনে নিচ্ছি ঘর খালি আছে কি না—"

অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। ভদ্রলোক ফোন ক'রে জেনে নিয়ে বললেন—"হ্যাঁ—ঘর খালি আছে। আপনি স্বচ্ছন্দে যান সেখানে"—

বিদেশে দীর্ঘদিন থেকে ল্যান্ডলেডির জাতকে ভাল করেই চিনি। তাই মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করলাম। ভদ্রলোক বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন—"কি ভাবছেন অতো—বেশ সুব্যবস্থা আছে, তায় সস্তা। তার ওপর ল্যান্ডলেডি অতি চমৎকার মানুষ। অনেকের কাছ থেকে কোন পয়সাও নেন না"—অগত্যা পা বাড়ালাম ঠিকানাটি নিয়ে। নির্দিষ্ট গৃহে পৌঁছে কল্ বেল টিপলাম। এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। যৌবন তাঁর বিগত-প্রায়। তবুও তাঁর সুঠাম সুন্দর সুগঠিত দেহতট মনোমুগ্ধকর। সুন্দর মুখশ্রী। মিষ্টি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। বললেন—"ভেতরে আসুন, বসুন"—বললাম—"আমি ভারতবাসী, বাঙ্গালী। দিনকয়েকের জন্য এ সহরে এসেছি"—

মনে হ'ল মুহূর্তে ভদ্রমহিলার চোখে মুখে খুসীর ভাব দুলে উঠল। বললেন—"এই মাত্রই ওখান থেকে ফোন এসেছিল। আপনার জন্যই বোধহয়। আমাদের এই ফ্ল্যাটটাতে আমি আর আমার মা থাকি। বাবা মারা গেছেন। মা এখন খুব বুড়ী। বিদেশীদের থাকবারও একটা ব্যবস্থা রেখেছি এখানে। আশাকরি আপনার কোন অসুবিধা হবে না এখানে।"

ভদ্রমহিলা আমাকে তাঁর ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেলেন। সুন্দর সাজানো আধুনিক ড্রয়িংরুম। দেয়ালে সুন্দর ছবি কয়েকটি। হাতে আঁকা। সোফা সেট্, রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশান সবই রয়েছে। আমার দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করল একটি বিরাট কাঁচের আলমারী। বইয়ে ভর্তি। জানলাম ওই বইগুলি সবই রবীন্দ্র রচনাবলীর জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ। জার্মাণ ভাষায় যে রবীন্দ্রনাথের এতো বইয়ের অনুবাদ হ'য়েছে এর আগে আমার তা জানা ছিল না।

আমি আর স্থির থাকতে না পেরে বললাম—"একটা জিনিষ কিন্তু আমাকে খুব অবাক্ ক'রেছে। আপনি বিদেশিনী হ'য়েও রবীন্দ্র-সাহিত্যের এতো অনুরাগী!"

ভদ্রমহিলা একটু ম্লান হাসি হাসলেন মুহূর্তেই মুখে যেন একটা ম্লান আভা ফুটে উঠল। বললেন—"এককালে রবীন্দ্রসাহিত্যে অনেক চর্চা করেছিলুম। আমি বাংলা পড়তে পারি, বলতে পারি। কিছু কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেও পারি। দেখতেই পাচ্ছেন, জার্মাণ ভাষায় অনুদিত রবীন্দ্রনাথের সব বই-ই আমার কাছে আছে"—

বললাম—'রবীন্দ্রসাহিত্যকে আপনি এতো ভালবাসেন? আমি বাঙ্গালী হয়ে গর্ববোধ না করে পারছি না"—

"আপনার গর্ববোধ করার কিছু নেই এতে। কবিকে আপনি দেশ-কাল-পাত্রের সীমায় আবদ্ধ ক'রে ভাবতে চান কেন? যাক্ সে কথা—আমার রবীন্দ্রসাহিত্য সাধনার কথা আপনাকে শোনাবো আর এক সময়। কিন্তু ভাল কথা—আপনার নাম?"

"অশোক ব্যানার্জী"—

"আপনার?"

"মণিকা হাইলগার্স্"

তখন এক অতি বৃদ্ধা ট্রেতে ক'রে কফির সরঞ্জাম নিয়ে ঘরে হাজির। মণিকা বললেন—"মা, ইনি মিষ্টার ব্যানার্জী। আমাদের এখানে থাকবেন দিনকয়েক। ইনি ভারতীয়, বাঙ্গালী।"

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"ইনি আমার মা।" মা হাত বাড়ালেন। আমি ডান হাতটি বাড়ালাম।......

পরে মণিকা আমাকে আমার ঘর দেখালেন। সুন্দরভাবে সাজানো। সুসজ্জিত শয্যা, ওয়ার্ড-রোব, ড্রেসিং টেবল্, সোফা সেট, ফুলদানীতে ফুল, পেলমেটে ঝোলানো পর্দা, মেঝেতে কার্পেট পাতা, রেডিও, অ্যাটাচড্ বাথরুম—সত্যিই কোন অসুবিধাই নেই এখানে। নিজের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে মনটা যেন কি রকম খারাপই হ'য়ে ওঠে।

দুপুরবেলা মণিকা বেশ যত্ন করে খাওয়ালেন আমাকে। ও'র অতিথিপরায়ণতা দেখে মুগ্ধ হ'লাম। আহারান্তে নিজের ঘরে চলে গেলাম। ঘুমুতে হবে। ট্রেণ জার্ণির ক্লান্তি কেন ঘোচেনি এখনও। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি। ঘুম ভাঙ্গল দরজায় করাঘাতের শব্দে। দরজাটা খুলেই একটু লজ্জিত হতে হল আমাকে। সামনে মণিকা। হাতে ট্রেতে কফির সরঞ্জাম। বললেন—"আমাদের কফি খাওয়া সারা হয়ে গেছে। এর আগে এসেও একবার করাঘাত করেই বুঝতে পেরেছি আপনি ঘুমুচ্ছেন। বিরক্ত করিনি তাই। কফি রাখলাম"—

লজ্জিত হ'য়েই বললাম—"মাপ করবেন আমাকে। অনেক কষ্ট দিয়েছি তো"—

"না সেজন্য কিছু ভাববেন না" বলে ট্রেটা রেখে মণিকা চ'লে গেলেন। কফি শেষ করলাম।

......নিজের সব কাজ শেষ ক'রে বেশভূষা পরিবর্তন করে মণিকা হাজির। সাদা পোষাক তাঁর পরনে। তাঁকে মানিয়েছে বেশ। বয়স যেন তাঁর হঠাৎ দশ বছর কমে গেছে। বিস্মিত বিমুগ্ধ চোখ মেলে আমি লক্ষ্য করলাম মণিকা যেন সেজেগুজেই এসেছেন। মণিকা বললেন—"এই সহরে আপনার চেনাজানা কেউ আছেন কি?"

বললাম "না। এখানে আমি একেবারেই নূতন"—

"বিকেলবেলা কি করছেন? ফ্রি আছেন?"

"একা একা কিছু করার নেই। ফ্রি আছি"—

"তবে যদি আপত্তি না থাকে তো চলুন বিকেলবেলা নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। রাইন নদীর কুলু কুলু স্বর বেশ ভাল লাগবে আপনার। আমার বান্ধবী আসুক—আমরা এক সঙ্গে যাবো। ততোক্ষণে আপনি তৈরী হ'য়ে নিন"—

অল্পক্ষণ পর বান্ধবী সহ মণিকা হাজির। আমি তখন প্রস্তুত। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কি কাজ আছে ব'লে বান্ধবীটি চলে গেলেন। অগত্যা আমরা দু'জনই গেলাম রাইনের ধারে বেড়াতে। অতি মনোরম দৃশ্য। নদীর কুলুকুলু সুর এর আগেও অনেক শুনেছি কিন্তু আজকের রাইন যেন সব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আলাদা। আবেগে আবেশে সহজেই তন্ময় মুগ্ধ আমি। হঠাৎ তন্দ্রার ঘোর কাটল মণিকার কণ্ঠস্বরে। মণিকা বললেন "মিঃ ব্যানার্জী আপনি তো বাঙ্গালী। কৃষ্ণনগর সহরে গেছেন? শুনেছি সেখানকার মাটীর পুতুল বিখ্যাত। আচ্ছা কৃষ্ণনগরের কাউকে চেনেন কি?"

একটু অবাক হ'তে হ'ল। ভারতবর্ষের এতো খবর রাখেন মণিকা। ব'ললাম—"আশ্চর্য তো— বাংলাদেশ সম্বন্ধে এতো ধারণা আছে আপনার। হ্যাঁ কৃষ্ণনগরের কথা জানি। আমার পিসীমা থাকেন সেখানে। কলেজ জীবনে বারকয়েক গিয়েওছি সেখানে।"—

একটু ইতস্ততঃ ক'রে মণিকা ব'ললেন—"সেখানকার কোন সমর বাগচিকে চেনেন?"

অনুচ্চিত্র মণিকোঠা হাতড়ালাম। ওই নামের কোন লোকই আমার চেনা জানা নেই। ব'ললাম—"না—ওই নামে তো কাউকে চিনি না। কিন্তু কেন বলুন তো?"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মণিকা চুপ ক'রে রইলেন। তারপর উদাস কণ্ঠে ব'ললেন—"থাক্ সে কথা।" সোনালী সন্ধ্যা তখন গাঢ়তর, সুন্দরতর। রাইনের ছন্দ তখন আরও মনোমোহিনী রূপ ধারণ ক'রেছে। দুজনই জলের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নীরব। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললাম—"যদি কিছু মনে না করেন তো একটা অনুরোধ আছে আমার"—মণিকা বললেন—"স্বচ্ছন্দে বলুন"—

"বলেছেন আপনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন—যদি আপনার আপত্তি না থাকে তবে এ পরিবেশে গান কিন্তু বেশ মানাতো"—

"নিশ্চয়ই শোনাবো। কিন্তু সে কি আর আগের মত ভাল হবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অনভ্যাসের দরুণ যেন সব ভুলে যেতে বসেছি।"—

"তাতে কি!" ব'লে আমি চুপ ক'রলাম। কিছুক্ষণ জলের দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থেকে মণিকা গান ধরলেন—"রোদন ভরা এ বসন্ত"—খুব ভাল লাগল আমার। দু-এক জায়গায় উচ্চারণ বাঙ্গালী কানে অসঙ্গত ঠেকলেও বেশ ভাল গাইলেন মণিকা। গলা তাঁর মিষ্ট, সুমধুর। গানের চর্চা যে এককালে ছিল তা নিশ্চিত। লক্ষ্য ক'রলাম গানটি শেষ হওয়া মাত্র মণিকাও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আমি একটু চকিত হ'য়েই বললাম—"বেশ চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারেন আপনি"—মণিকা প্রশংসা গায়ে মাখলেন না। সহজভাবেই চুপ ক'রে রইলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ব'ললেন—"বাড়ী ফিরবেন কি এখন? না আরও ব'সতে ভাল লাগছে এখানে।"

বললাম—"চলুন বাড়ীই ফেরা যাক"—

উঠে পড়লাম আমরা। লক্ষ্য ক'রলাম হঠাৎ যেন মণিকা খুবই গম্ভীর, খুবই অন্যমনস্ক। সকালবেলাকার সেই হাসি-খুসী ভাবটি যেন আর নেই। অসমবয়সী হ'লেও এই সুদূর বিদেশে অনাত্মীয় সুন্দরী মহিলার সঙ্গে পাশাপাশি রাইনের পারে হাঁটতে আমার কেমন যেন বেশ ভালই লাগছিল। এক অচেনা আবেগে আমি তখন আচ্ছন্ন। অভিভূত।

বাড়ী ফিরে মণিকা বললেন "মিঃ ব্যানার্জী আপনার কি কোনো কাজ আছে এখন?"

ব'ললাম—"না"—

"তবে আসুন আমার সঙ্গে"—আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর সেই সাজানো ড্রয়িংরুমে। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে হঠাৎ ব'ললেন—"বাংলার কথা বলা, রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চা এসব আমি কার কাছ থেকে শিখেছি জানেন?" মাথা নাড়লাম। বললেন "কৃষ্ণনগরের সেই সমর বাগচীর কাছ থেকে। যার কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রেছি একটু আগে। যার কথা আগেও আমি অনেক লোককেই জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম কিন্তু সকলের কাছ থেকেই একই জবাব শুনেছি"

আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে ব'ললাম—"তার মানে?"

"তার মানে আমার ছোটোখাটো এক জীবন-ইতিহাস"—

পরের জীবন-ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল দেখানো ভদ্রতাবিরুদ্ধ। বিশেষ ক'রে মেয়ে মানুষের জীবন-ইতিহাস। অগত্যা আমি অস্বস্তিকর ভাবেই নীরব। মণিকা আবার বললেন—ম্লান ক্ষীণ কণ্ঠ—যেন অতীতের বহু দূর থেকে সেই সদ্য যুবতী মণিকার গলা ভেসে আসছে—"আমি আর সমর বাগচী তখ হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রী। সম বাগচীর মতো প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত ভাবপ্রবণ পুরু আমি আর দুটি দেখিনি। তাই সহজেই প্রে প'ড়েছিলাম। সমর কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথে কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতো। ভাল গা গাইতে পারত ও ভাল জার্মাণ ভাষা জানত। আমাকে বাংলা কবিতা জার্মাণ ভাষায় ব্যাখ ক'রে শোনাতো। আমি মুগ্ধ হ'তাম। তারপ যত্ন ক'রে ও-ই আমাকে বাংলা শিখিয়েছিল রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখিয়েছিল। সেই থেকেই আমা রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার শুরু। রবীন্দ্রনাথে অজস্র বই জার্মাণ ভাষায় অনুবাদ হ'য়েছে সবই আমি কিনেছিলুম সেদিন। এসব পুরো এডিশন আজকাল পাওয়াই যায় না। গ ১৯৩৭ সালে হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সি থেকে আমরা দু'জনই গ্র্যাজুয়েট হ'য়েছিলাম সেদিন আমাদের কি আনন্দের দিন। তারপ

ওর একটা চাকুরী নিয়েছিল। কিছু টাকা-
পয়সা জমাবার উদ্দেশ্যে। দেশে ফিরতে হবে
তো ও নিজে বরাবরই খরচে স্বভাবের। বন্ধু-
বান্ধব নিয়ে স্ফূর্তি আমোদ ক'রতেই ওর
অনেক টাকা বেরিয়ে যেতো। দু'জনই নীড়
বাঁধার স্বপ্ন দেখছিলাম। ওর বিয়ের প্রস্তাবে
আমি সেদিন সহজেই রাজী। ওর মতে বছর
দুই-দুই কাটলে ওর আর্থিক অবস্থা অনেক
ভাল হবে। আমরা তখন বিয়ে ক'রে ভারতবর্ষে
যাবো। পরাধীন ভারতের অনেক দুঃখ-দুর্দশার
কথা আমি শুনেছিলাম। প্রথম প্রথম মানাতে
আমার খুব কষ্ট হবে জানতাম তবুও আমি
তখন রাজী। হাজার হ'লেও সেটা সমর বাগচীর
দেশ। আমার তাতেই আনন্দ। সমর মাঝে
মাঝে জার্মাণী থেকে লণ্ডনে বেড়াতে যেতো
এক বন্ধুর কাছে। সেখান থেকে কি সুন্দর
চিঠি লিখত সব আমাকে। ওর চিঠি পেয়ে
সেদিন যে আমি কি আনন্দ পেতাম তা
আপনাকে ব'লে বোঝাতে পারব না।"

"কিন্তু বছর দুই যেতে না যেতেই হঠাৎ
বাধল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। তখনকার হঠাৎ হওয়া
নিদারুণ পরিস্থিতিতে কে যে কোথায় ছিটকে
পড়েছিলাম তার ঠিকানাই নেই। বোমার
ঘায়ে সারা ডুসেলডর্ফ সহর একরকম
নিশ্চিহ্ন প্রায়—আজকের যে ডুসেলডর্ফকে
আপনি দেখেছেন তা যুদ্ধের পরে গড়া।
সেইবারই আমার বুড়ো বাবা মারা গিয়েছিলেন।
নানারকম পরিস্থিতির চাপে আমিও তখন
দিশেহারা। সেই অনিশ্চিত অবস্থায় সমর
খেয়াল করে কোন ঠিকানা রেখে যেতে পারেনি
আমার কাছে। ভারতেই ফিরে গিয়েছিল কি না
জানি না। আমারও কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই
ওর কাছে যাতে ও আমার খোঁজ নিতে পারে।
অগত্যা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আমার কাছে ভয়ঙ্করতম
সর্বনাশী হ'য়েই রইল। তাই দু'জনই আজো
কক্ষচ্যুত গ্রহের মতো বহু দূরে ছিটকে প'ড়ে
আছি। তারপর একদিন যুদ্ধ শান্ত। ভাঙ্গা
সহরগুলি আবার নতুন করে গড়ে উঠল। কিন্তু
আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও আজও আমার
সমরকে পেলাম না। ভারতীয় দূতাবাসের
শরণাপন্ন হ'য়েছিলাম—ভারতীয় অনেক পত্র-
পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়েছি। কিন্তু তবু
কে পরের জন্য মাথা ঘামায় বলুন তো!
তারপর এদেশে আজ পর্যন্ত যতো বাঙালীর
সঙ্গে আমার পরিচয় হ'য়েছে আমি সকলকেই
জিজ্ঞাসা ক'রেছি সমরের খবর। কেউই কোন
খবর দিতে পারেনি। সকলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে
দেশে ফিরে খোঁজ নিয়ে জানাবে। কিন্তু বুঝতে
পারি সকলেই দেশে ফিরে আমার কথা ভুলে
যায়—একটা সামান্য চিঠিও লেখে না কেউ।
অথচ সেই সমরের জন্যই আমি আজো বিয়ে
করতে পারিনি, ঘর বাঁধতে পারিনি। তারপর
বহু লোকের সঙ্গেই আমি মিশেছি—কিন্তু
আজ পর্যন্ত কাউকেই চেষ্টা করেও মন
দিতে পারিনি—কারুর মধ্যেই আমি দ্বিতীয়
সমরকে খুঁজে পাইনি। তাই আজো সম্পূর্ণ
ব্যর্থ জেনেও সময়ের খোঁজ ক'রে চলি—হয়তো
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এ খোঁজ আমাকে
নিতে হবে"—মণিকার চোখ দুটি এবার অশ্রু
ছলছল—হঠাৎ গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ। আমার
মনেই হ'ল না আমি সুদূর বিদেশে ব'সে। মনে
হ'ল আমার ঘরে ব'সে যেন কোন বাঙালী
মেয়ের অশ্রু-সজল প্রেমের কথা শুনছি। সহানু-
ভূতি জানাবার মতো কোন ভাষা খুঁজে পাইনি,
—হয়তো তার দরকারও নেই। মণিকা নিজেকে
একটু সামলে নিয়ে একগুচ্ছ চিঠি এগিয়ে
দিলেন আমার হাতে। অতো কম সময়ে সব
চিঠি পড়া সম্ভব নয়—হয়তো আমার পক্ষে
পড়াটা শোভনও নয়—এই মনে ক'রে উল্টে-
পাল্টে দুই তিনটে চিঠি কেবল পড়লাম। প'ড়ে
এইটুকু বুঝেছি সমর বাগচী যেই হোন তিনি
ঠিক সাধারণ নন। চিন্তাশীল ভাবাবেগে ভরা
তাঁর সব চিঠি। এ চিঠি সকলকেই আকর্ষণ
ক'রবে, মুগ্ধ ক'রবে।

মণিকা এবারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সামলে
নিয়ে ব'ললেন—'আমার এ কাহিনী শুনে
আপনার কি মনে হ'ল?"

কি মনে হ'ল এককথায় বলা কঠিন। তবু
বললাম—"মনে হ'ল আপনার সঙ্গে ভারতবর্ষের
বাঙ্গালী মেয়ের এতোটুকু তফাৎ নেই। আপনি
আজো অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়েই প'ড়ে
আছেন। তাই আজো সংসারী হ'তে পারেন নি।
জীবনের অনেক সুখ-সম্পদ থেকেই নিজেকে
বঞ্চিত করেছেন"—

"আমি সব বুঝি—সব বুঝি—কিন্তু সব
জেনে-শুনেও নিজেকে ঠিক ক'রতে পারিনি—
কিছুতেই পারি না—সে যে কি নিদারুণ ভয়ঙ্কর
কষ্ট!" ব'লে চোখ মুছলেন মণিকা। আমার
কাছে তাঁর এতোটুকু লজ্জা নেই, দ্বিধা নেই,
সংশয় নেই, সংকোচ নেই। অশ্রুসজল মণিকাকে
সান্ত্বনার কোন ভাষাই শোনাতে পারিনি আমি।
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমিও নীরব।........

সেদিন রাত্রিবেলায় বিছানায় শুয়ে কেবল
মণিকার কথাই ভাবছিলাম। মণিকা আজো
সমরকে ভুলতে পারেন নি। বহু পুরান অতীতের
স্বপ্নেই মগ্ন, বিভোর, হারানো। কিন্তু কেন?
তিনি কি শুধু একটা অবসেশানে ভুগছেন?
আজকে যদি সমর বাগচীর খোঁজও পাওয়া
যায় মণিকা কি সুখী হবে? সেদিনকার তরুণ
সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্ত ভাবুক সমর আজ এই
সুদীর্ঘদিনে নিশ্চয়ই মেদবহুল সংসারী
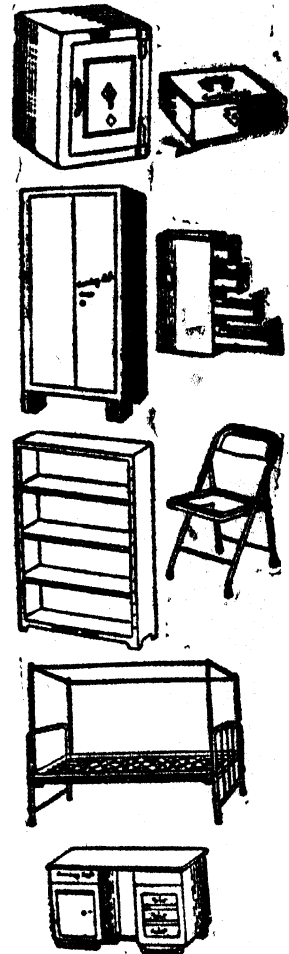
সাধারণ এক প্রৌঢ় বাঙ্গালী মাত্র। এতোদিনে বসন্ত নিশ্চয়ই তার দেহ-মন-প্রাণ সব কিছু থেকেই বিদায় নিয়েছে। হয়তো তিনি এখন কয়েকটি সন্তানের পিতা। তাদের আহার শিক্ষা স্বাস্থ্যের কথা ভাবতে ভাবতেই তাঁর দিন কাটে। অতীত প্রেমের মধুর স্বপ্ন কবেই কুহেলিকার মতো মিলিয়ে গেছে তাঁর জীবন-দিগন্ত থেকে। আমার কেবলই মনে হ'ল আজকের সমরের খোঁজ বুঝি মণিকার না পাওয়াই ভালো। তবে তাঁর এই অতীত-মন্থনের দুর্ভোগের উপর জুটবে এক চরম আঘাত। আবার সমরকে নিয়ে এতো কথা ভাবা আজ নিরর্থকও হ'তে পারে। হয়তো সমর আজ আর এ পৃথিবীতেই নেই।......

ডুসেলডর্ফ সহর ছাড়ার আগে আমিও মণিকাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সমর বাগচীর খোঁজ ক'রবই। যেমন ক'রেই হোক। মণিকা মৃদু হাসলেন। যেন কারুর প্রতিশ্রুতিতেই আজ আর তাঁর বিশ্বাস নেই, আস্থা নেই। এর আগেও অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু সে শুধু প্রতিশ্রুতিই।......

......ক'লকাতায় ফিরে কাজের চাপে মণিকার কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। তারপর বহুদিন পর একবার কৃষ্ণনগর গেলাম। সমরের অনেক খোঁজ ক'রলাম। একান্ত আন্তরিকভাবে। মণিকাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি আমি রাখবই। কিন্তু সমরের কোন সন্ধানই পেলাম না। মনে হয় সমরের বাড়ী কৃষ্ণনগরের আশেপাশে কোথাও হবে, ঠিক কৃষ্ণনগর সহরে নয়। নইলে এ খবর জোগাড় করা কিছু অসম্ভব হ'ত না। হয়তো পরিচয়ের সুবিধার জন্যই সুদূর বিদেশে তিনি কৃষ্ণনগর নামের ব্যবহার করেছিলেন। মণিকাকে চিঠি লিখতে লিখতে মাস কয়েক কাটল। দুঃখ করেই সে চিঠি লেখা। তাতে জানালাম 'অনেক চেষ্টা করেও আপনার সমরের কোন সন্ধানই পাইনি আজো। নিরাশ হইনি—আপনার মতো অনন্তকাল এ সন্ধানের চেষ্টা ক'রবো।' প্রকৃতপক্ষে মণিকাকে নিরাশ ক'রতে চায় নি আমার মন। মাস কয়েকের মধ্যেও কোন জবাব না পেয়ে একরকম ভুলেই গেছি সে কথা। হঠাৎ জার্মাণী থেকে আসা একটি চিঠি আবার সব মনে করিয়ে দিল। খুসী হ'য়েই চিঠিটা খুললাম। হাজার হ'লেও বিদেশিনী এক মহিলাকে চিঠিতে সহানুভূতি জানাতে, তাঁর চিঠি পেতে কার না ভাল লাগে। চিঠিটা খুলে কিন্তু খুসী হ'তে পারিনি—এটা মণিকার চিঠি নয়, তার মায়ের লেখা। লিখেছেনঃ—

প্রিয় অশোক,

সময়মতোই তোমার চিঠিটা পেয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা সেদিন আমার ছিল না। জবাব দিতে পারিনি তাই। মাপ ক'র। তোমার চিঠি পাবার কয়েকদিন আগেই মণিকা হঠাৎ এ পৃথিবী ত্যাগ ক'রেছে। তুমি জানো সমর বাগচীকে সে কোনোদিনই ভুলতে পারেনি। অনেক বুঝিয়েছিলাম ওকে। কিন্তু সেইজন্যই সে বিয়ে ক'রে সংসারী হ'তে পারেনি কোনদিন। ওরই দুর্ভাগ্য। সেই সঙ্গে আমারও ওর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার মতো বৃদ্ধা মায়ের অবস্থা বুঝতেই পারো। আজ আমি একান্তই একা।

শুভকামনা জেনো।

ইতি—

মণিকার মা।

চিঠিটা প'ড়ে স্তম্ভিত হ'লাম। মণিকার কথাই ঠিক। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সমরের খোঁজ করেছেন তিনি। সত্যিই মণিকার মতো মেয়ে স্বদেশে বিদেশে সর্বত্রই বিরল। সমর বাগচী কোথায় আছেন জানি না কিন্তু সত্যিই তিনি হতভাগ্য। অজ্ঞাতসারেই আজ আমার দুটো চোখ অশ্রুসজল হ'ল। কানে ভেসে উঠল যেন মণিকার কণ্ঠস্বর—"রোদন ভরা এ বসন্ত"......

সম্ভাবিত

সুশীলকুমার গুপ্ত

দিনে দিনে হয়েছি পাহাড়। হিংস্র রৌদ্রের দাপটে
ভস্মীভূত হয়ে গেছে দুঃসাহসী পাইনের বন।
ঝর্ণার কঙ্কাল নড়ে হাওয়ায় হাওয়ায়, গুহাজটে
লালিত আদিম নিদ্রা, পলাতক পাখির স্মরণ।
তুমি এলে—নীল নদী, তরঙ্গে তরঙ্গে খুলে দিলে
দিগন্তের সিংহদ্বার: এল প্রেম, সৃষ্টির যন্ত্রণা।
মেঘে মেঘে বেজে উঠল প্রাকৃত পৈঙ্গল, তিলে তিলে
উন্মোচিত হল স্বপ্ন, সমর্পিত সত্তার প্রার্থনা।

বললে তুমি গাঢ়কণ্ঠে, "দেখা হল কতদিন পরে!
সময়ের উৎপীড়নে আমিও বিক্ষুব্ধ, তীব্র জ্বরে
ভুগে ভুগে বড় শ্রান্ত। এস গড়ি দীপ্ত লোকালয়।"

"আমিও প্রস্তুত" বলে যে মুহূর্তে প্রসারিত হাতে
তোমাকে গেলাম নিতে বুকে, অমনি কে রূঢ় আঘাতে
আনলে তীক্ষ্ণ ব্যবধান। শোনা গেল, "হয়নি সময়!"

বণিক ইসারা

সুনীলকুমার লাহিড়ী

ও কার গুঞ্জন? কিসের হাতছানি?
আঁধারে ওরা করে কি নিয়ে কানাকানি?
তবু কি উন্মন আড়ালে দিতে পা—
নিশির ডাকে মন আজো কি টানাটানি।

অবাধ-কৌতুকে অবোধ রেষারেষি—
বাতাসে ফিসফিস—চটুল হাসাহাসি
তবুও লতাজালে জড়ালে দুটি মন
আলোয় আসে না তো দুটিতে পাশাপাশি।

বণিক-ইসারায় মুনাফা-লোভী মন
দূরে যে খুঁজে ফেরে নিভৃত ছোট কোণ;
কড়িতে কেনা যার রূপের সম্ভার
সেখানে বাঁধাছকে স্বভাবী আচরণ!

বলেছিলে

আশিস সান্যাল

বলেছিলে ফিরবে তুমি বিজন অন্ধকারে,
যখন মেঘে প্রধান নদ-নদী,
হাওয়ার হাতে গল্প হবে নিপুণ ব্যবহারে;
কাবেরী জল টাল-মাতাল যদি
তোমার দেখে হয় ক্রমে; হয়ত তবে তুমি
বলবে ঠোঁটে দুহাত রেখে, "ক্ষমা......
পেতে জানলে অনেকভাবেই পায় এ পটভূমি।"
অন্যমনস্কতায় উঠবে জ্বলে অবাক নিরুপমা॥

সূর্যমুখী

দুর্গাদাস সরকার

সবাই সূর্যের দিকে চেয়ে আছে : তবু পৃথিবীর সকলেই
সূর্যমুখী নয়। তেমনি প্রত্যেকেই প্রত্যেকেরে ভালবাসতে জেনে
একজন অন্যজনে ভালবেসে একদিন উন্মত্ত অস্থির,
অথচ তাদেরই জন্য শাপভ্রষ্ট ত্রিকালজ্ঞ আছেন সামনেই।

অতীত আশ্চর্য অতি : বর্তমান ভয়ঙ্কর দুটি বড় চোখে,
গ্রহ ও নক্ষত্র তার নখের দর্পণে, শুধু রাখে না খবর
সূর্যের দিকে সে চেয়ে—সূর্য আছে কিনা। হাতে তার চকখড়ি,
তা দিয়ে সে যত অঙ্ক কষে—তারা কাঁপে দুপুরের রৌদ্রালোকে।

যোগ ও বিয়োগে তার গণনায় কখনো বা ভুল যদি হয়—
গৃহস্থ তটস্থ, আর প্রবীণেরা জোড়হস্ত শনির সম্মানে।
সকালে যে সূর্য ওঠে চোখ মেলে দ্যাখে তারা, তাও সত্য নয়।
পৃথিবীকে শবাধার ভেবে তারা যাত্রা করে বিবস্ত্র শ্মশানে।
আর সেই চকখড়ি, ভুল অঙ্ক, রাহু, কেতু পায়ে দলে দলে
সূর্যমুখী হেঁটে গেছে রাতভর—একজনে ভালবাসবে বলে॥

অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হয়ে

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

চুপচাপ ব'সে থাকা, নির্জন রাত্রির মতো ব'সে থাকা।
বিসর্পিল কতো কথা : ঝিকিমিকি কতো আঁকাবাঁকা
মন সব তারা হ'য়ে জ্বলে ওঠে। প্রশান্ত গভীর।
কতো সব নিরিবিলি সুবিস্তার সৈকতের তীর
ভীড় করে। মুক্তা করে। বালুচর করে।
এই সব চুপচাপ নির্জন মনের ভিতরে।
মনের প্রশান্তি নিয়ে তারপর উজ্জ্বল গোপনে
অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ হ'য়ে তুমি এসে মিশে যাও মনে।
নির্জন রাত্রির মতো নির্জনতা আরো গূঢ় হয়
হৃদয়ে তখন এসে। তারা হয়। তারার বিস্ময়।
আলো হয়। সুকোমল মুহূর্তেরা আলো হয় আরো।
বিশাল নদীর মতো ফিরে পাই আরো বেশী তোমাকে
আবারো।
অবিশ্রান্ত অবারিত সৈকতের সুগভীরে ফিরে ফিরে পাই
চুপচাপ নির্জনতা : ব'সে থাকা : ভালো লাগে,
ভালো লাগে তাই।

উদ্যানী

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

লৌকিক বাগানে আমি অলৌকিক বৃক্ষরোপণের
প্রয়াসে বিফল,
আমার দু চোখে জ্বলে দৃশ্যহীন সাত সমুদ্রের
ধু-ধু নীল জল,
সূর্যমুখী গাঙচিলের উড়ন্ত সংসারও চোখে, তাই
ইচ্ছার স্বভাবে
নীল জলের জ্বালা ভুলে অলৌকিক চারা আনতে যাই
বারংবার
ইচ্ছার প্রভাবে॥

(একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তী)

ঘাটাল মহকুমার গণ্ডগ্রাম জাড়া। "জাড়াগ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায়"—মঙ্গলকাব্যের কবি উল্লেখ করেছেন এই গ্রাম। "জাড়া গেলক বৃন্দাবন"— কবিওয়ালার এই উক্তিও জাড়াগ্রামকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

জাড়া থেকে পাঁচ মাইল দূরে চন্দ্রকোণা। এ নগণ্য অখ্যাত চন্দ্রকোণা নয়। "বাহান্ন বাজার তিপ্পান্ন গলি"র চন্দ্রকোণা। সেকালের জনবহুল শিল্প-সমৃদ্ধ শহর চন্দ্রকোণা। দেব-দেউল শোভিত ঐতিহাসিক শহর।]

সে অনেকদিন আগের কথা। বিষ্ণুপুরের এক শক্তিধর মল্লরাজকে পরাজিত করে চন্দ্রকেতু হলেন চন্দ্রকোণার রাজা। রাজা হয়ে চন্দ্রকেতুর প্রথম কাজ হল আশেপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীদের আয়ত্তে আনা। তাদের বশীভূত করে ভূসম্পত্তি করতলগত করা। এইসব ছোট ছোট জমিদাররা সেকালে রাজা বলেই অভিহিত হ'তেন মর্যাদাও পেতেন রাজোচিত।

এই চন্দ্রকোণার অদূরেই বাস করতেন জর নামে জাড়ার এক রাজা। হয়ত ইনি ছিলেন মগধের জরাসন্ধ রাজবংশের কোন বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ। অথবা স্থানীয় কোন শক্তিশালী বিত্তবান্ ভূস্বামী। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল "জারা"—আমরা এখন বলি জাড়া। তাঁর ভূসম্পত্তি যা ছিল তার চেয়ে বেশী ছিল তাঁর বাহুবল আর মনোবল।

চন্দ্রকেতুর লোলুপদৃষ্টি পড়ল জাড়ার ওপর। চন্দ্রকোণার সংগে জাড়াকে সংযুক্ত করতে পারলে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি হবে, রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটবে। তাই সুযোগ-সন্ধানী রাজা একদিন আক্রমণ করলেন জাড়া। 'রণখাকির' মাঠে চন্দ্রকেতুর সংগে মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন জর রাজা। প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন সর্বস্ব পণ করে। যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলো জাড়ার পথে প্রান্তরে।

জর রাজার স্ত্রী হরিমতী। রূপে গুণে তুলনারহিত। যুদ্ধে যাবার আগে হরিমতীকে নানা নির্দেশ দিয়ে গেলেন জর রাজা। আর সেই সংগে তাঁকে ভরসাও দিয়ে গেলেন—চন্দ্রকেতুকে পর্যুদস্ত করে নিশ্চয়ই তিনি জাড়াকে রক্ষা করবেন।

রাজার ছিল দুটি প্রিয় পারাবত। বিশ্বস্ত সুশিক্ষিত সংবাদবাহী পারাবত। এই পারাবত দুটি সংগে নিয়ে রাজা চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। হরিমতীকে বলে গেলেন যুদ্ধে তিনি যদি নিহত হন তাহলেই পারাবত দুটি জাড়ার গড়ে ফিরে আসবে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানাতে। আর যদি তিনি যুদ্ধে জয়ী হন তাহলে তারা ফিরে আসবে তাঁরই সংগে। তার পূর্বে নয়।

প্রবল শত্রুর সংগে ক্ষুদ্র ভূস্বামীর সংঘর্ষ। তবুও জর রাজার কাছে সম্মুখসমরে পরাজিত হলেন চন্দ্রকেতু। জর রাজার অটুট মনোবলের কাছে চন্দ্রকেতুর বাহুবল লাঞ্ছিত হল। রাজা জাড়াকে রক্ষা করেছেন, যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। তিনি রাণী হরিমতীকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে আসেন নি।

কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। অকস্মাৎ এক অঘটন ঘটে গেল। জর রাজার অলক্ষ্যে তাঁর পারাবত দুটি জাড়ার গড়ে ফিরে এল। সুশিক্ষিত পারাবত, তবুও এমন মারাত্মক ভুল তারা করল কেন? দুটি পাখীর ভ্রান্তিতে জাড়ার চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। রাজা মাথায় করাঘাত করলেন।

পারাবত দুটি যখন জাড়ার গড়ে ফিরে এল তখন নিদারুণ আতঙ্কের ছায়া নামলো রাজ-পুরে। হরিমতী শোকে বিহ্বল হলেন। পুরনারীদের ক্রন্দনে আর কোলাহলে আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হল। পাখী দুটি ফিরে এসেছে গড়ে, কাজেই শত্রুহস্তে জর রাজা নিহত হয়েছেন, এ বিষয়ে কারুর আর মনে কোন সন্দেহই রইল না। বীরদর্পে চন্দ্রকেতু জাড়ার গড়ে প্রবেশ করবে, রাণীকে বন্দী করে নিয়ে যাবে, শতলাঞ্ছনা শত অপমান তাঁকে সহ্য করতে হবে। আর পুরনারীদের ভাগ্যেও ঘটবে অনন্ত দুর্দশা। অদৃষ্টের একি নির্মম পরিহাস!

আর ত বিলম্ব করা চলে না। তাই মুহূর্ত মধ্যেই রাণী তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। শত্রুহস্তে বন্দী হওয়ার চেয়ে মৃত্যুই তো বরণীয়।

রাণীর নির্দেশে চিতাশয্যা রচিত হল। স্বামীকে স্মরণ করে, মিলন হবে স্বর্গে, এই আশা বুকে নিয়ে পতিপ্রাণা রাণী ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই অগ্নিকুণ্ডে। অগ্নির লেলিহান শিখা বেষ্টন করল মহীয়সী রাণীকে।

এদিকে জর রাজা ফিরে এলেন তাঁর গড়ে। জয়মাল্য তিনি পেয়েছেন বটে কিন্তু জয়োল্লাসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই তাঁর অন্তরে। আশঙ্কা আর দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে। পারাবত দুটিকে দেখে হরিমতী যদি বিভ্রান্ত হয়, যদি প্রাণবিসর্জন দিয়ে ফেলে—এই ছিল রাজার আশঙ্কা।

তখনও চিতাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলছে—রাণী হরিমতীর শেষ নিঃশ্বাস, তখনও অনন্ত আকাশে মিলিয়ে যায় নি, তখনও তার দেহ-বল্লরী সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় নি। চারিদিকে বিরাজ করছে এক নিঃকরুণ নিস্তব্ধতা।

সে এক করুণ মর্মস্পর্শী দৃশ্য। রাজা এসে দাঁড়ালেন জ্বলন্ত চিতার পাশে। যা আশংকা করেছিলেন তাই তো ঘটেছে। নির্বাক নিস্পন্দ রাজা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন অগ্নিকুণ্ডের পাশে। মুহূর্তের মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন সেই চিতার আগুনে, যেখানে তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর দেহাস্থি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

রাজাকে বাধা দিতে এগিয়ে এল অনেকেই, কিন্তু তিনি শুনলেন না কারুর অনুনয়, মানলেন না কারুর বাধা। আগুনের লেলিহান শিখা বেষ্টন করল রাজাকেও। জর রাজা পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর তার বংশও বিলুপ্ত হল চিরতরে। কেবল বেঁচে রইল কিংবদন্তীর আলোকে রাণী হরিমতী আর রাজা জরের করুণ কাহিনী।

সংবাদ পৌঁছল রাজা চন্দ্রকেতুর কাছে। তাঁর রাজ্য বিস্তারের একটা প্রবল অন্তরায় সহজেই অপসৃত হল। আর জর রাজার দেহাবসানের পর তাঁর সৈন্যেরাও হলো ভগ্নোদ্যম, দিশাহারা। সহজেই তাদের ছত্রভঙ্গ করলো চন্দ্রকেতু।

তারপর একদিন তিনি প্রবেশ করলেন সসৈন্যে জাড়ার গড়ে। একটি রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটল, আর একটি ভূখণ্ড করতলগত হল অন্য এক রাজার। জাড়া গ্রামের আজও সেই প্রাচীন গড়ের বিলীয়মান ভগ্নচিহ্ন অনুসন্ধিৎসু দর্শকের চোখে পড়ে। আর মনে পড়ে অতীতের সেই ভাগ্যাবিড়ম্বিত রাজার করুণ কাহিনী—জর রাজা ও হরিমতীর সহমরণের বেদনা-বিধুর ইতিকথা। *

---

* সি এস বি লিখিত 'ক্রনিকলস অব চন্দ্রকোণা', ক্যালকাটা রিভিউ, ১৮৮৩ দ্রষ্টব্য।

জিপসী প্রসঙ্গ

কবে কোন অখ্যাত অজ্ঞাত দিবসে দেশ ছাড়া হয়ে বিদেশ-বিভুঁইয়ে ওরা ছড়িয়ে পড়েছিল ইয়োরোপ আর আমেরিকার পথ-প্রান্তরে, সে কথা আর কোন কুলপঞ্জীতে বা ইতিহাসের পাতায় লিখিত হয় নি।

তবু অনুমিত হয়, দিগ্‌বিজয়ী বীর আলেকজান্ডার যখন তাঁর বিজয়কেতন উড়িয়ে পঞ্চনদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখনই ওরা গ্রীক বাহিনীর হাতে বন্দী হয়ে হয়েছিল দেশছাড়া। স্বেচ্ছায়ও হয়তো ওদের সঙ্গ নিয়ে থাকতে পারে।

গীয়ারসন ও অপরাপর বৃটিশ পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, গজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরী তাঁর সপ্তদশবার ভারত আক্রমণকালে পাঞ্জাব, গুজরাট, সিন্ধু প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার জাঠ ও রাজপুত সৈন্য আর বেসামরিক বাসিন্দাকে ক্রীতদাস করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইরাণ ও মধ্য এশিয়ায় উপনীত হয়ে আরও কয়েক সহস্র ইরাণীকেও তিনি ক্রীতদাসে পরিণত করেছিলেন। আর এ বিপুল ক্রীতদাস বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা সুলতানকে যখন বিচলিত করে তোলে, তখন তিনি অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ ভারতীয় ক্রীতদাসদের মুক্তির নির্দেশ দেন। মুক্তি পেয়ে ওরা তখন প্রথমে ইরাক ও সিরিয়ায় এবং পরে মিশর, গ্রীস আর উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের পথ ধরে ইয়োরোপের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

অমর কবি ফিরদৌসীর শাহ্‌নামায় এমনিতর আরেক কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ আছে। ইরাণের শাহ বহরাম গুড় একবার নাকি উত্তর ভারতের জনৈক নৃপতি সংখলকে ঐ বলে অনুরোধ করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ইরাণের জাতীয় উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য বিশ সহস্র ভারতীয় নর্তক-নর্তকী ও বাদ্যকরদের তাঁর সভায় প্রেরণ করেন। রাজা সংখল তাই পাঠিয়ে ছিলেন। শাহও ভারতীয় নৃত্যবিদ ও গায়ক-গায়িকাদের কলাকুশলতায় এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি ওদের সবাইকে তাঁর রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে অনুরোধ করলেন। তিনি ওদের বিস্তর নিষ্কর জমি, গবাদি পশু ও বীজধান দিলেন চাষ-বাসের জন্য।

ভারতীয় বাদ্যকার দল কিন্তু চাষ-আবাদ জানত না। জানত খালি গান-বাজনা। ওরা তাই চাষের বীজধানটাই খেয়ে ফেলল বসে বসে। হালের বলদগুলিকেও জবাই করে করলে সাবাড়।

ইরাণের শাহ্ তাই দেখে মহা খাপ্পা হয়ে উঠলেন। অগ্নি কুড়ের বাদশা বেহদ্দ বাদ্যকরদের দিলেন নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করে।

[illegible] গীতিকাররাই মিশর বা ইরাকের পথ [illegible] ইয়োরোপের [illegible] বিভিন্ন অঞ্চলে তারপর [illegible]।

এমনি আর একটি কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে জিপ্‌সী ভাষায় :

"আমরা তখন গঙ্গাতীরে বাস করতাম। আমাদের দলপতি ছিলেন খুব প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি যখন জোরে কথা বলতেন, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তা প্রতিধ্বনিত হোত। বিচারও ছিল চূড়ান্ত। সর্দারের ছিল একমাত্র পুত্র। নাম চেন। হিন্দুস্থানে তখন আর এক শক্তিমান রাজাও রাজত্ব করতেন। তাঁর একটি অপূর্ব সুন্দরী কন্যা ছিল। নাম জ্যান। সর্দারের মৃত্যুর পর পুত্র চেন জ্যানকে বিবাহ করতে চাইল। কিন্তু জ্যান এতদিন চেনের ভগ্নীরূপেই প্রতিপালিত হয়ে আসছিল।

চেন-আর জ্যানের বিবাহকে কেন্দ্র করে দেশের অমাত্যবর্গ দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়ল।

এমন সময় এক ভবিষ্যৎবক্তা ভবিষ্যৎবাণী করল যে, দেশ তাদের শীঘ্রই শত্রুকবলিত হবে। দেশের দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে।

সত্যি সত্যিই একদিন দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজান্ডারের এক সেনাপতি ঝড়ের মত এসে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসল তাদের। হিন্দের রাজাকে করল যুদ্ধে নিহত। লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড চালাল অবলীলাক্রমে সর্বত্র।

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলল যথাযথ।

বিজিত অমাত্যদের একজন তখন বিজয়ী সেনাপতির নিকট গিয়ে প্রতিকার চাইল অনাচারের—ভাই বোনকে বিয়ে করার। বিদেশী সেনাপতি কিন্তু বিচার না করে বৃদ্ধ অমাত্যের মাথায় আঘাত করে বসল রেগে গিয়ে। আর সেই মুহূর্তেই বিদেশী সেনাপতি আর তাঁর অশ্বটি লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে পাথরের বুকে ছুঁড়ে মারা খান খান হয়ে ভেঙে পড়া পোড়া মাটীর এক পাত্রের মত। দমকা একটা হাওয়াও উঠল এসময়। আর তাতে ওর দেহাবশেষকে উড়িয়ে নিয়ে গেল অদূরে মরুপ্রান্তরে।

রাজ্যের বাসিন্দারা ইতিপূর্বেই দুদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। যারা চেনের বিরুদ্ধে ছিল তারা ওকে তখন দিলে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। জ্যোতিষী চেনের নামে শপথ করল : পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তুই চিরকাল ঘুরে ঘুরে বেড়াবি। একস্থানে কখনও তিন রাত্রি মাথা রেখে ঘুমাতে পারবি না। এক কুয়োতে কখনও দুবার জল তুলে পান করা তোর হয়ে উঠবে না কপালে!"

জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী কতখানি ফলেছিল জানি না, তবে গত পাঁচ শতাধিক বছর কাল জিপ্‌সীরা পূর্ব ও মধ্য ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমনি ছন্নছাড়া হয়ে। এখানে-ওখানে বাস করছে ডেরা পেতে। পঞ্চদশ শতকে মলডাভিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মাণী, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে ওদের উপস্থিতির নজির রয়েছে প্যারিসের রাজপথে ওরা লোকের হাত দেখে ভাগ্য গণনা করত তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ওরা উত্তর আফ্রিকার পথ ধরে স্পেনে প্রবেশ করেছিল তাও জানা যায়।

হাঙ্গেরীর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রে অনুমান করেন যে, প্রাক্তন সেলজুক সাম্রাজ্যের 'রুম' হোল জিপ্‌সীদের আদি বাসভূমি। এজন্য তাই অনেকে জিপ্‌সীদের মিশরীয় বলে ভুল করে থাকেন। তাঁদের ভ্রান্ত ধারণা : অত্যাচারী হেরডের রোষদৃষ্টি থেকে শিশু যিশুকে নিয়ে যখন তাঁর অসহায় মা আর বাবা দেশ-দেশান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য, তখন নাকি জিপ্‌সীদের আদিপুরুষ মিশরে তাঁদের আশ্রয় দান করতে অস্বীকার করে। ফলে তারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ওরা আজ এমনি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশে দেশে। হাঙ্গেরী আর বলকান অঞ্চলের জিপ্‌সীদেরও তাই ধারণা। বিশ্বাস করে নিজেদের মিশরীয় বলে।

ভাষা ও সংস্কৃতি পর্যালোচনা করে সুপণ্ডিত এ. এফ. পট ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রমাণ করেছেন যে, জিপ্‌সীদের আদি বাসস্থান মিশর নয়, ভারতের সন্নিকটবর্তী উত্তর-পশ্চিমে কোথাও হয়ত হবে। কেননা জিপ্‌সীদের কথ্য ভাষায় কাফেরিস্তান, দার্দিস্তান, কাশ্মীর আর 'ছোট তিব্বতী' প্রচলিত ভাষার সুস্পষ্ট ছাপ দেখা যায়।

চার্লস লিল্যান্ড একজন সুবিখ্যাত জিপ্‌সী শাস্ত্রবিশারদ। তাঁর মতে, হিন্দীই এ সব ছিন্নমূল বোহিমিয়ানদের আদি ভাষা। তিনি লিখেছেন :

রোমানীর উৎপত্তি প্রসঙ্গে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রোফেসর ই. এইচ. পামার তাঁর সংগৃহীত প্রায় চার হাজার ইংরেজী জিপ্‌সী শব্দ পর্যালোচনা করেছেন। এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাদের বেশীর ভাগই হিন্দী বা পারসিক মূল থেকে উদ্ভূত। গ্রীক বা ইয়োরোপীয় কোন ভাষাসম্ভূত নয়।'

চার্লস লিল্যাণ্ড আরও লিখেছেন : 'রোমানী ও ভারতের উপর লেখা বহু গ্রন্থ পাঠ করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, জিপ্‌সীদের আদি পুরুষ হিন্দুই। ঐ দেশ থেকে ওরা হয় বিতাড়িত হয়েছে, নয়ত প্রবাসী হয়েছে।......ভাষা, প্রথা, রীতি-নীতি, দেশাচারের প্রমাণ বাদ দিলেও, সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা পৃথিবীর জিপ্‌সীদের সঙ্গে ভারতীয়দের দেহাবয়বের সাদৃশ্য কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। এমনকি, মিশরের বাসিন্দা জিপ্‌সীরাও আকৃতির দিক থেকে মিশরীয় নয়, ভারতীয়ই।"

শিক্ষিত জিপ্‌সীরাও তাই বলে :

'তু' ম্যেইন এক রক্ত—'

তোমার আর আমার মধ্যে একই রক্তধারা প্রবাহিত।

সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। প্রায় ৯০ লক্ষের মত। ভারতের এই বিস্মৃত-প্রায় ছিন্নমূল সন্তান-সন্ততিগণ বিশ্বের সর্বত্রই রয়েছে আজ আকীর্ণ হয়ে। বোহিমিয়ান এ জাত যে দেশেই গেছে সেখানকার অনেক কিছুই আহরণ করে নিয়েছে সুবিধামত। মুসলিম দেশে গিয়ে সেজেছে মুসলমান। গ্রীসে গিয়ে হয়েছে খৃষ্ট ধর্মের পরম অনুরাগী। খৃষ্টানদের সঙ্গে খৃষ্টান, ক্যাথলিকদের সঙ্গে ক্যাথলিক। কোন ধর্মীয় শাস্ত্রানুশীলনের প্রতি ওদের তেমন টান নেই বটে, তবে নিজেদের গোষ্ঠিগত আইন ও অনুশাসনের প্রতি ওদের আনুগত্য প্রবল। বদ্ধমূল ধারণা, অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের মূর্ত প্রতীক বলা যায় ওদের। অদৃষ্টবাদী—নিয়তির ক্রীড়নক মাত্র।

জীবনকে ওরা গ্রহণ করেছে সহজ সাবলীল আর অনাবিলভাবে। নীতিশাস্ত্রের মাপ-কাঠিতে নয়। বিবাহ ও যৌন-জীবনেও ওরা স্বেচ্ছাচারী না হলেও স্বাধীন, উদ্দাম, বেপরোয়া।

স্যামুয়েল রবার্টসের কথায়, জিপসীরা হোল অনেকটা ভগবানের গৃহহারা পাখীর দল। ঈশ্বরই ওদের খাওয়ান—পরান। ঈশ্বরই ওদের প্রতি যত্ন নেন। খাওয়া-পরার ব্যাপারে জিপ্‌সীদের মত আর কোন সৃষ্ট জীব এমন মুখাপেক্ষী নয় ভগবানের। ঈশ্বর সম্পর্কে ওরা অবশ্য ততখানি তত্ত্বজ্ঞানী নয়, আমাদের মত। তবে ঈশ্বরকে ওরা পেতে ভালবাসে তাঁর অসীম সৃষ্টির মধ্যে। স্রষ্টাকে নয়, সৃষ্টিকে।

নিজেদের গড়া অনুশাসন, বিশ্বাস আর সংস্কার ওদের রক্ত-মাংসের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। আমাদের আশেপাশে ওরা ঘোরাঘুরি করে। আমরা কিন্তু ওদের সঙ্গে মিশি না তুচ্ছ অপাংক্তেয় ভেবে —লিখেছেন রবার্টস। ওরা কিন্তু আমাদের গোপন কথার হদিশ রাখে ; হস্ত-বিচার করে আমাদের। আমরা নিজেদের সম্পর্কে যা জানি তার বেশী খোঁজ-খবর রাখে ওরা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জিপ্‌সীরা হোল সংযোগ।...... স্পেনীয়দের চাইতেও ওরা বেশী পটু নাচ-গানে। হাঙ্গেরীয়ানদের চাইতেও ওরা অধিকতর পাকা গীতবাদ্যে। খুব কম কাজই করে ওরা। তবে যা করে তা করে অপর অনেকের চাইতে বেশী নিপুণতার সঙ্গে। সৃষ্টি হয়ত ওরা করেনি তেমন কিছু। কিন্তু সংরক্ষণ করেছে অনেক। যা কিছু তাদের ব্যবহারের প্রয়োজন, সবটাই তা গ্রহণ করেছে। বাদ দিয়েছে যা তাদের ধাতে সয়নি। সর্বত্রই হয়েছে এ-জাত নিপীড়িত আর নির্যাতিত। তবু কিন্তু আশ্রয়ের ফাঁক দিয়ে বাতাসের মত ওরা অতর্কিতে পড়েছে—পড়েছে সর্বত্র।

জিপ্‌সীদের ইউরোপে বলা হয় 'রোম' (Rom)। এ থেকেই এসেছে 'রোমানী-চেল' শব্দ ; আর্মেনিয়ায় বলা হয় 'লোম', ইরাণে 'ডোম' ; আর 'ডোম' বা 'ডামু' সিরিয়ায়। ওয়েলসেও ও নামে ডাকা হয় জিপ্‌সীদের। ডোম বা ডাম মানে 'স্বামী'—অর্থাৎ মানুষ। জার্মাণ ভাষায় 'মানুষ' বলতে জিপ্‌সীকেই বোঝায়। আর এ 'মানুষ' হোল জিপ্‌সী শব্দ। সংস্কৃতই তার মূল।

সংস্কৃত ব্যাকরণের মূল কাঠামোটি জিপ্‌সীদের ভাষা রোমানীতেও পরিলক্ষিত হয়। এমনকি, সংস্কৃত ভাষার তিন 'স-র'—তালব্য শ, দন্ত্য-স ও মূর্ধণ্য ষর—ধ্বনিগত পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য জিপ্‌সীদের ভাষায়ও বিদ্যমান। ব্যঞ্জনান্ত র-ফলা রোমানীতেও দেখা যায়। গণনায়, সংখ্যাগুলির বেশীর ভাগও নিয়েছে ওরা ভারতীয় অংকশাস্ত্র থেকে। যেমন —১, ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি। তবে ৭, ৮, ৯ প্রভৃতি কয়েকটি সংখ্যা গ্রহণ করেছে ভিন্ন উৎস থেকে—পারসিক ও গ্রীকদের কাছ থেকে। (ইয়োরোপের দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে বেশ কিছুকাল ওরা যে পারস্য ও গ্রীসের কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাস করেছিল তা প্রমাণিত হয়।)

জিপসীদের সপ্তাহের দিনগুলির নাম ভারতীয়। সংস্কৃত থেকে গৃহীত। যথা : প্রথম দিবস (সোমবার) ; দ্বিতীয় দিবস (মঙ্গলবার) তৃতীয় দিবস (বুধবার) ইত্যাদি।

রুশ গবেষক পণ্ডিত ডঃ এম জে কৌন-ভিন জিপ্‌সী ভাষা ধ্যান-ধারণা অনুশীলন করে লক্ষ্য করেছেন রুশ দেশে যে সকল জিপ্‌সীর বাস তাদের অনেকেই এখনও ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও পৃথিবী প্রভৃতি বিভিন্ন
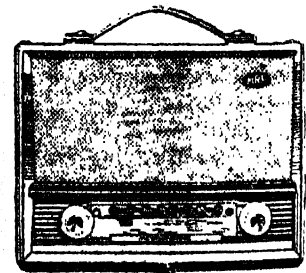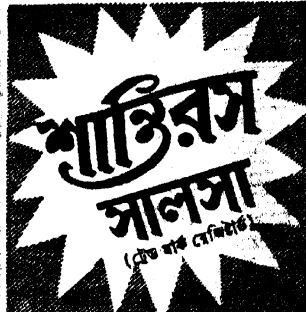
হিন্দু দেব-দেবীর আরাধনা করে থাকে। সংরক্ষণ করে আসছে তাদের মাহাত্ম্য কথা আর উপাখ্যান।

শেষোক্ত দেবী 'পৃথিবীকে' ওরা মাতা বা মা বলে অভিহিত করে থাকে।

কোনভিন পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। ১৮২০ খৃঃ তাঁর জন্ম। কিন্তু দীর্ঘ ৩৫ বৎসরকাল তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জিপ্সী তত্ত্বের গবেষণা করেন। ভারতবর্ষেও তিনি দু-দুবার পরিদর্শনে আসেন। তিনি ১২৩টি জিপ্সী কাহিনী, ৮০টি পৌরাণিক উপাখ্যান ও কিংবদন্তী আর ৬২টি লোকগীতি সংগ্রহ করে গেছেন। পুরো পাঁচ বছর ধরে তিনি জিপ্সী ভাষাও শিক্ষা করেছিলেন। ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অবস্থিত জিপ্সী-দের সঙ্গে অবস্থান করে তাদের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংগ্রহ কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। লক্ষ্য করেন, হিন্দুদের দেব-দেবীর সঙ্গে জিপ্সী ঠাকুর-দেবতার বহু মিল রয়েছে। যেমন—বরামী (ব্রহ্মা), জান্দ্র (ইন্দ্র), লাকি (লক্ষ্মী), মাতা (পৃথিবী মাতা বসুমতী) ইত্যাদি।

চলমান ক্যারাভনই তাদের যাযাবরী জীবন-বেদ। স্থায়ী অবস্থিতি বা কৃষি তাদের পেশা নয়। নেশা হোল নাচ-গান, বাদ্য-গীত, হাত-দেখা, ভাগ্য গণনা ইত্যাদি পরগাছা বৃত্তি। অবশ্য সূক্ষ্ম কারুকার্য—সোনা, রুপো, পেতলের কাজেও ওরা সমান পটু। কুকুর, ঘোড়ার কেনা-বেচা ব্যবসায়ও ওদের আর এক উপজীবিকা। ফলে, অভাব-অনটন, দারিদ্র্য, রোগ-শোক হামেশায় প্রায় লেগে থাকে ওদের মধ্যে কর্ম-বিমুখতা ও রাজশক্তির প্রতি নিস্পৃহ নীরব উপেক্ষা তাদের দুর্দশাকে দিয়েছে চরম পর্যায়ের দিকে ঠেলে।

একমাত্র ইহুদীরা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জাতি জিপ্সীদের মত অমন নির্যাতিত হয়নি। ফ্রান্স, জার্মাণী, ইংলন্ড, সর্বত্রই দক্ষণশীল এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হয়েছে হন্য কুকুরের মত বিতাড়িত ও নিপীড়িত। জুটেছে তাদের লঘুপাপে গুরুদণ্ড—পাইকারী মৃত্যু। স্পেনে জিপ্সীদের নিজ ভাষা রোমানীতে কথা বলাও পর্যন্ত হয়েছে নিষিদ্ধ রাজশক্তির অমোঘ বিধানে। ডালকুত্তা লেলিয়ে নৃশংসভাবে নিধন করার নজিরও বিরল নয়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এক নাৎসী জার্মাণীতেই ফাসিস্ট হিটলার পাঁচ পাঁচ লাখ জিপ্সী আবাল-বৃদ্ধ নর-নারীকে গ্যাস-চেম্বার আর কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে পুরে নিশ্চিহ্ন করেছে। নুরেমবার্গ বিচারই তার নজির।

সমগ্র জিপ্সী সাহিত্য যেন তারই প্রতি-ফলন। নিজেদের ব্যাপক অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য, অদৃষ্টবাদ, কর্মবিমুখ, কূপমণ্ডুক, নিপীড়িত জীবন আলেখ্যেরই বুঝি সবাক প্রতিবাদ।

চার্লস লিল্যান্ড আর জেনেট টাকৃকির রচনা থেকে একটি জিপ্সী কবিতা অনূদিত করা গেল এখানে :

মাতৃহারা—

ভেড়ার ছোট্ট বাচ্চাটি সাঁঝ সন্ধ্যায়
ফেরে তার খোঁয়াড়ে।
পাখিগুলো ফেরে নিজ নিজ বাসায়।
কিন্তু অভাগী আমি, এখন যাই কোন্ চুলায়?
পথ চেয়ে চেয়ে আমি তাই বসে আছি
ফিরবে তুমি কবে,
মৃতরা যায় যে দেশে সেখান থেকে?

হাসিকান্না, হীরাপান্না

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে হেলে পড়েছে কৃষ্ণা নবমীর এক-ফালি চাঁদ তার ক্ষীণ রজতপাণ্ডুর আভা নিয়ে। কলকল ছলছল করে জোয়ারে উজিয়ে যাওয়া জল ভাটার স্রোতে ফিরে চলেছে সাগর-সঙ্গমে। গঙ্গার ঘাটের চাতালে বসে আছে ওরা কজন, তপনদাকে নিয়ে এসেছে শ্মশানবন্ধু হয়ে। হ্যাঁ, উৎসবে ত বটেই, দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে ওরা দাঁড়িয়েছে ওর পাশে, রাজ-দ্বারেও একসঙ্গে জেল খেটেছে, আজ এসেছে শ্মশানে, সব শেষের অবসানে। তপনদা বলতে ওদের চোখ দুটো উজ্জ্বল হতো গর্বেতে দীপ্তিতে, আর আজ কিনা সেই তপনদার কালি-মাখা মুখ, কাদাভরা পা দুটোকে তারা টেনে নিয়ে এলো, রাতের গভীরে চুপি চুপি শ্মশান-ঘাটে—যাঁর মৃত্যুতে হাজার হাজার শোকসন্তপ্ত-দের সমাবেশ হবার কথা, সে কী না আজ অজ্ঞাত অখ্যাত লোকের মত শুধু কয়েকজনের ঘাড়ে চেপে উঠলো শেষপারাণীর বহ্ন্যুৎসবে—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ—এ কী করলেন তিনি।

তপনদার নাম ছিল শুধু জ্ঞানগুণীকর্মী বলে নয়, একজন ত্যাগী অকৃতদার চরিত্রবান পুরুষ বলেও। কতো কিছু জেনেছেন, কতো কিছু পড়েছেন, কতো কিছু শুনেছেন, ইউরোপ-আমেরিকা গেছেন, ডি এস সি, পি এইচ ডি হয়েছেন, ভারতের মুখোজ্জ্বল করেছেন, শুধু কারাবরণ নয়, অনেকের ক্লেশ হরণও করেছেন তিনি, দৌড়েছেন দেউলী থেকে হিজলী। বিয়াল্লিশের সেই হিরো, পঞ্চাশের সেই অজাত-শত্রু কর্মী, পঞ্চান্নর সেই প্রৌঢ় সাহিত্যিক অধ্যাপক নিরলস বিজ্ঞানসাধক তিনিই কিনা এই বয়সে দুশ্চরিত্রাদের কুহকে মুগ্ধ হয়ে সারাজীবনের সঞ্চিত সাধনাকে পঙ্ককুণ্ডে ফেলে আজ কুণ্ঠিত অনাদৃত অবগুণ্ঠিত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন—ছিল না কি তাঁর আত্মীয়স্বজন, ছিল না কি তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীর দল, তাঁর সহকর্মী-কর্মিণীরা—ছিঃ, ছিঃ ছিঃ।

রাত্রিশেষের আকাশে বাতাসে বায়ুর হিল্লোলে শব সংকারের ধোঁয়াতে যেন সেই কথাগুলিই রণিত ধ্বনিত হতে লাগলো—ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ।

ক্ষিতীশ বললে—একী করলেন তপনদা, বুঝতেই পারছি না, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না—

ধীরু মন্তব্য করলে—হয়তো অর্থ আছে, কিন্তু অনর্থ ঘটলো যে, ফোড়ন কাটলে সমীর—পুরুষমানুষের এই বয়সটাই বিপজ্জনক, উন-পঞ্চাশী শুরু হয় ঐ উনপঞ্চাশেই—শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েড সাহেবই জিতে যান—ওসব সাপ্রেশন, রিপ্রেশন চলে না, বাবা, সংসারটা মায়া নয় দু-দুটোকে চিতায় তুলে তৃতীয়ার জন্য মাথা মুড়িয়েছি—ক্ষিতীশ বললে—থাম, সাবিত্রী-হার্ড সলিড ফ্যাক্ট—আরে সেইজন্যই ত বল্লভ সত্যবানের উপযুক্ত কাজই করেছিস।

মনীষা দূরে ছিল, ঝরঝর করে কাঁদছিল—ও'রই ল্যাবোরেটরীর রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্ট—বয়স ত্রিশ ছুঁই ছুঁই, ডি এস সি-র গবেষণা করছে—সবাই জানতো তপনদাকে ও শুধু মাস্টার-মশাই বলেই শ্রদ্ধা করতো না, হয়তো আরো একটু অতিরিক্ত মোহময় আবেশের সন্ধানে ছিল। তবে তপনদার দিক থেকে অবশ্য সে বিষয়ে কোন উৎসাহ ছিল না—তিনি ছিলেন নির্মমভাবে নির্বিকার, যেন সাধনমগ্ন যোগীশ্বর, নিজের ল্যাবোরেটরী আর কাজ নিয়েই ব্যস্ত। কাজ, কাজ, কাজ, সেই মানুষই হঠাৎ ডুব দিলেন সুপ্তপ্রাণের নিশীথ রাতের অন্ধকারের গভীর তলে। ল্যাবোরেটরীতে আসা অনিয়মিত হতে লাগল, সব সময়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। প্রশ্ন উঠলো সঙ্গতভাবেই—কোথায় কাঁটা ঘুরলো। তারপর একেবারে ডুব, তারপর শুধু খোঁজ পাওয়া গেলো এমন এক জায়গায় যেখানে তাঁকে কেউ কল্পনা করতে পারে না, শুধু পাড়াটা খারাপ, পরিবেশও তথৈবচ, তারপর একেবারে রাতের অন্ধকারে কাশী মিত্তিরের ঘাট।

এই আত্মভোলা মানুষটির জন্য রূপসী-বিদুষী মনীষার মনের মণিকোঠায় একটি স্থিরশিখা প্রদীপ জ্বলতো, যার শুভ্র আলোয় সে দেখেছিল একটি মনস্বী বিদ্বানকে নয়, ভালোবাসার যোগ্য একটি পুরুষপ্রধানকে নয়, এক তেজস্বী তপস্বীকেও, যার মধ্যে দীপ্যমান ছিল অনুরাগসিঞ্চিত একটি নিবাতনিষ্কম্প হোমশিখা। ভাবতো এ'র কাছে থেকে সুখ, কথা বলে সুখ, জ্ঞান আহরণ করে সুখ, আর সেবা করে শতগুণে সুখ। কতোদিন দেখেছে, উনি কাজ করছেন একমনে, সামনে চা-খাবার ঠাণ্ডা, জামায় বোতাম লাগানো নেই, ক্লান্তিতে দেহ অবসন্ন। তখন তার ইচ্ছে করতো, অন্য সব কাজ ফেলে রেখে ও'কে কিছু আরাম দেয়, সেবা পরিচর্যা করে। মনীষা চোখটা মুছে বললে—একদিন আমি স্বেচ্ছায় ও'র সহকর্মিণী হয়েছিলুম, সহধর্মিণী হতেও আমার দিক থেকে বাধা ছিল না—মানুষটি ম্যাগনেটের মত আমাকে টেনেছিল শুধু বৈজ্ঞানিক বলে নয়—মন বলতো যে যদি উনি চান সব কিছু দিতে পারি, নাইবা ও'র রইলো প্রয়োজন। বুঝতেন সবই, একদিন আমায় বললেন—দেখো, মনীষা, বিজ্ঞানচর্চা একটা বিশেষ সাধনা, এখানেও চাই নিষ্ঠা, একাগ্রতা, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন—ঘর সংসারে মন থাকে, স্বামীপুত্র চাও,

ভালোবাসায় ভরা একটি নিটোল স্বপ্ন—এতে অন্যায় কিছু নয়, খুব ভালো কথা—তাহলে পালাবদলের দরকার, আর তার আধার আমি নই। তারপর তাঁর সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বলেছেন—আমার সঙ্গে মালাবদল করলে একেবারে ঠকে যাবে—কীটদষ্ট ফুল বাইরে থেকে আমায় যতটা খাঁটি ভাবছো, আমি ঠিক ততটা নই।

মনীষা সলজ্জভাবে উত্তর দিয়েছিল—কী যে বলেন!

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ক্ষণেক তিষ্ঠ, এখনও মধুপান শেষ হয়নি, তারপর একদিন সবই শুনবে, তোমাদের ধীর-স্থির স্থিতধী তপনদাকে সোনার সিংহাসন থেকে নামিয়ে মাটির কাদায় ফেলবে, বিজ্ঞানী আমি, নির্জ্ঞান মনকে অবিশ্বাস করি কি করে, অবচেতনে কী আছে তার হদিশ ত জানি, মুখে অতি চেতনের কথা যতোই বলি।

মনীষা বললে, আমি বলেছিলাম,—না, না, না উনি বলেছিলেন—হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, শুনতে যেয়ো না রূপসী, আমার প্রতি শ্রদ্ধাটা ফাটা বেলুনের মত চুপসে যাবে, একেবারে দুম ফটাস।

আপনার প্রতি শ্রদ্ধা অতো ঠুনকো নয়—বলেছিল মনীষা। গলাটা কেঁপে উঠেছিল ওর, বললে—আমি কিন্তু শেষ কথা শুনেছি কাল, ওঁরই কাছে, সেই কথাই বলছি, এ যেন কবির ভাষায়—

অনিঃশেষ প্রাণ, অনিঃশেষ মরণের
স্রোতে ভাসমান

(২)

ওঁর কথাই বলি। মাষ্টারমশাই ছিলেন দরিদ্র ঘরের পিতৃমাতৃহীন ছেলে, দিদিমা-দাদামশাইএর কাছে মানুষ। দাদু ছিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পৌরোহিত্য করতেন গ্রামের জমিদারদের ঠাকুরবাড়ীতে—চতুষ্পাঠীও ছিল—মস্তো বড় বৈষ্ণব পণ্ডিত। রাধামাধবের মন্দিরের পাশেই ছিল তত্ত্ববাগীশ মশায়ের আঙিনা, দুচালা ঘর, বেশ কয়েক বিঘে ব্রহ্মোত্তর জমি, বাগান। সাধারণভাবে কোন অভাব অনটন ছিল না—স্বামী-স্ত্রীর আর নাতিটি নিয়ে নির্লোভ সংসার। ঠাকুরবাড়ীর খাস দাসী ছিলেন মানদাসুন্দরী, বৃদ্ধা। যৌবনে গলায় কণ্ঠী পরে এসেছিলেন জমিদার বাড়ী ঝিগিরি করতে—তারপর বিগ্রহের মন্দির দালান অতিথিশালায় তদ্বিরতদারকের ভার পড়েছিল তাঁর উপর। পঞ্চাশ বছর পূর্বে বীরভূম জেলার এক অখ্যাত বৈষ্ণব পল্লী থেকে অন্নসংস্থানের আশায় এই গ্রামে এসেছিলেন। এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, রাধামাধবগত প্রাণ, এখনও ফোকলা দাঁত বের করে বসে বসে জপ করেন গোবিন্দর নাম কুঁড়োজালি হাতে, কখনো বা ভাঙ্গা গলায়—ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে আমার প্রাণ রে।

তপনদাকে বড্ড স্নেহ করতেন বৃদ্ধা, বলতেন—ও আমার গোপাল। মাষ্টার মশায়ের বয়স যখন পাঁচ পেরিয়েছে, হাততালি দিয়ে নাচতে শিখিয়েছেন—নাচত নন্দদুলাল—কিছু কিছু গানও কণ্ঠে উঠেছে, এমন সময় একদিন বুড়ি হাউ হাউ করে কেঁদে গিন্নীর পায়ে পড়লেন—খবর পেয়েছেন যে তাঁর বোনঝি বিধবা হয়েছে, আশ্রয় নেই, বোষ্টমবংশের মেয়ে, ওঁর ঘরের এককোণে শুয়ে থাকবে আর ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়ে থাকবে দুটি প্রসাদ মুখে দিয়ে, অনুমতি দিতে হবে।
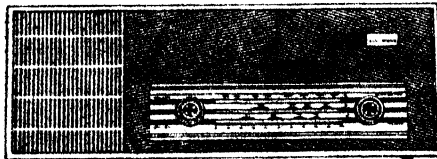
গিন্নী বুদ্ধিমতী, বললেন—বয়স কত, আর মেয়েটার বোন ত বড় বোস্টমের সেবাদাসী ছিল, গুরুজাকেত্তন গাইতো—

শেষ কথার জবাব না দিয়েই মানদা ঠাকরুণ বললেন—একেবারে ছেলেমানুষ, বছর বারো বয়স হবে, সাত বছরে বিয়ে হয়েছিল মালাচন্দন করে ষাট বছরের বুড়ো বৈরাগী মুক্তোগাছার কৃষ্ণদাস বাবাজীর সঙ্গে, তাঁর অবশ্য সেবাদাসীর অভাব ছিল না, তবু একটা আশ্রয় আর আস্তানা—কথা ছিল উঠতি বয়স হলে ঘরবসত করবে, এমন সময় এই অঘটন—চমৎকার কীর্তনের গলা, মায়ের কাছে শেখা, রাধামাধবকে শোনাবে।

গিন্নী বললেন—তোমাদের ত বাপু, কণ্ঠীবদল চলে তাই করাও, ওর তো বিয়ে হয়নি বললেই হয়—এখন কচিকাঁচা আছে, আনতে চাও আনাও, কিন্তু সোমত্ত আগুনকে বেশীদিন রাখতে পারবো না বলে দিচ্ছি, একটু বেচাল হলেই চলে যেতে হবে, বুঝে সুঝে আনিয়ো, তা যাক্ ওকেও বলে রেখো, সেরেস্তাতেও যেন খবর দিয়ে রাখেন।

ঠাকুরমশাই শুনে বললেন—সাধু, সাধু, আশ্রয় চাইলে দিতেই হয়, এই হচ্ছে গৃহস্থের ধর্ম, তারপর মহামায়ার কাজ তিনি নিজেই করে নেন।

তপনদার কানে খবরটা পৌঁছল, যে আসছে সে সদ্যবিধবা, অবশ্য অবোধ বালকের মনে বিধবা সধবার ভেদাভেদ জ্ঞান তখন একেবারে অখণ্ড অচিন্ত্যতত্ত্ব—এহ বাহ্য, একটা নতুন ধরণের খেলার সাথী মিলবে, এই যথেষ্ট তায় আবার গান জানে, কেত্তন গায়, মনটা চনমন করে উঠলো।

শ্যামবর্ণা, সুচিকণা, নাকে রসকলি দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি এসেই জমিয়ে ফেললে। পাঁচ বছরের বুড়োধাড়ি তপনদাকে কোলে তুলে নিয়ে গোটাকতক চুমু দিয়ে বললে—এযে, একেবারে জ্যান্ত গোপাল গো, হাতে নাড়ু দিলেই হয়—পূর্ণিমার চান্দ সনে চন্দন বাটিয়া গো কে গড়িল গৌরতনুখান্—অরুণকিরণখানি তরুণ অমৃতেছানি কোন বিধি নিরমিল দেহা।

তারপর পাঁচটি বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো, তা কেউ বুঝতে পারলে না। তপনদার সব ভার তুলে নিয়েছিলো এই কিশোরীটি। ওকে চান করাতো, খাইয়ে দিতো, গান শেখাতো, এমন কি সুর করে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত পড়াতো। মেয়েটার লেখাপড়ার দিকেও ঝোঁক ছিল, ঠাকুর মশাইও উৎসাহ দিতেন, সাহায্য করতেন। দিদিমা খুঁত খুঁত করতেন।

ঠাকুরমশাই বলতেন—শ্রীমতীর "গোপী" অংশ, আর কী গলা বলো দিকিন্, আর ভক্তি—চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ—বৈষ্ণবের আবার জাত আছে নাকি—

বৃন্দাবনদাস বলেছেন, না, যে কুলেই জন্ম হোক ভক্তিলতাবীজেই সে সর্বোত্তম।

জাতিকুল ক্রিয়াধনে কিছু নাহি করে,
প্রেমধন আর্তি বিনে না পাই কৃষ্ণেরে।

একদিন তপনদাকে অঙ্গমার্জনা করে ঝুঁটি বেঁধে তিলক পরিয়ে ছেড়ে দিলে, শ্রীমতী বললে—কুঞ্জে যাবে ত বলো, কুঞ্জর আনি, কৃত কুসুমাবলি বেশটি ত বেশ মানিয়েছে—কিন্তু রংটি ত কালিন্দী সলিল নয়—

তপনদা বললে—কুঞ্জর মানে তো হাতি, কিন্তু 'কুঞ্জ' কাকে বলে—আর কালিন্দী জিনিষটি কি?

শ্রীমতী জবাব দিলে—দাদুকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো না, তপন ঠাকুর, যে—যমুনার জলে ডোববার বয়স আমার হয়েছে কী না—

দাদু শুধু হেসে উত্তর করলেন, দিদিমার দিকে চেয়ে—একটু নজর রেখো, বৈষ্ণবীশক্তি এক-দিকে যেমন অনন্তবীর্যের আধার আর এক-দিকে পরমা মায়া—সেই মায়াকালনাগিনী মাঝে মাঝে ছোবলও দেন, যদি না তাঁর ভিতরের রহস্যটিকে বোঝা যায়, তখনই মোহরাত্রি মহা-রাত্রি হয়, মুদগর আপনি গড়ে ওঠে, শ্রীরাধার কুঞ্জ বিলাসের ক্ষেত্র নয়, মহাভাবের আশ্রয়—রাধামাধব, রাধামাধব—তন্ময় হয়ে গেলেন তিনি।

দিদিমা বললেন—আমি আর কী নজর রাখবো, তবে মেয়েটা যেন লক-লকে আগুন শিখার মত বেড়ে উঠছে—ঠাকুরবাড়ী, পাঁচজন যায় আসে—মন না মতি—

ওদিকে তখন তপনদাকে নিয়ে বসেছে শ্রীমতী, গাইছে,

কাজলে আর করবে কত
যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিললো খ্যাপা
তবে সাধনভজন কদিন রাখে

(৩)

বয়স বাড়ে দুজনেরই—শ্রীমতী তখন অষ্টাদশী—দেহবল্লরীর গাঁটে গাঁটে আঠারোটি বসন্তের মালা গাঁথা, তনুমন দুইই চনমন হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ম ক্ষুরধার। তপনকে নানা ছুতোয় কাছে ডাকে, বুকে টেনে নেয়, চুয়া চন্দনে সাজায়। একদিন তপন বলে—ধোৎ আমি কী ছেলেমানুষ নাকি, আমাকে ধরে টানাটানি করো কেন?

ওমা, পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে হবে নাকি তোমার কাছে, এযে দশ হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি—

দিদিমা কিন্তু ভালো বুঝছিলেন না—শ্রীমতীর চোখে তিনি তখন প্রহর শেষের আলোয় রাঙা চৈত্র মাসের সর্বনাশের আভাস দেখেছিলেন বোধ হয়, তাছাড়া তাঁর বাড়ীতে অনেক লোকজনের যাতায়াত, পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি পড়তে কতক্ষণ। তিনি ওর মাসীকে ডেকে বললেন কথাটা—বোনঝিকে নিয়ে দেশে যাও, জমিদারবাবুকে বলে পাঁচ টাকা করে পাঠানো হবে মাসে মাসে। বুড়ী মানদা ঠাকরুণ ত শুনে হতভম্ব, কতকাল ধরে এ রাধামাধবকে আঁকড়ে পড়ে আছে, যৌবনে অফুরন্ত গান শুনেছে এইখানে, বার্ধক্যে বারাণসী এ যে। কান্নাকাটি সুরু করে দিলে, তখনকার মত স্থগিত হলো বটে সে বিদায় যাত্রা। কিন্তু জমিদার বাড়ীরই দু-একজনের এদিকে বেশী আনাগোনায় আর লোকের কানে ঘুরোয় নানা কথা এদিক-ওদিক হতেই গিন্নী

চণ্ডাল্যা হয়ে উঠলেন শুধু নয়, শ্রীমতীই মন-স্থির করে ফেলে বললে—মাসী, আমারও নিজের পায়ে দাঁড়াতেই হবে, দরকার নেই এই পরভৃতিকার আশ্রয়—রাধামাধব মাথায় থাকুন, তিনি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নন, মানুষের মনেই তিনি থাকেন, ঐখানেই তাঁর মন্দির, সেইখানে খাঁটি থাকলেই হলো, চলো, দেশেই যাই, মার কুঁড়েটা আছে, আখড়াটাকে আবার চালাই—নামগান চলবে, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবো, রসরাজ বসবেন সেখানে।

তপনদা দাঁড়িয়েছিলেন কাছে, শুনলেন কথাগুলো, ভালো লাগলো না, বললেন—সবাই বলছে, তুমি নাকি দেশে গিয়ে তোমার মার মতন চপ্‌কেত্তনের দল খুলবে। চক্ষু রক্তবর্ণ করে তেড়ে এলো শ্রীমতী। কী বললে, মার কথা তুমি কী জানো, তোমার এসব কথার দরকার কী, ছেলেমানুষের পাকামী দেখো।

বাঃ, এতে দোষ কী, আমায় দলে নেবে না, খঞ্জনী বাজাবো, দোয়ার দেবো, আর কে আমায় গান শেখাবে।

রেগে বললে শ্রীমতী—হ্যাঁ, তোমার ইহকাল আর পরকাল চিবিয়ে খাই—এই তুমি চাও।

তারপর নিজের মনেই যেন বললে—যদি আঁচল বেঁধে নিয়ে যাওয়া যেতো তপনঠাকুর তাহলে তাই নিতুম, চোখের জলে ভিজিয়ে দিতুম তোমার পায়ের সব ধুলোটুকুন, সব আপদবিপদ থেকে ঢেকে রাখতুম বুকের ভিতর।

তুমি কাঁদচো—বলে চলে গেলেন তপনদা। আর ওদের যাবার দিনে চোখ ফুলিয়ে সরে দাঁড়ালেন। গিন্নী অবশ্য বলে দিলেন—মাঝে মাঝে এসো, রাধামাধবকে গান শুনিয়ে যেয়ো।

তারপরের কয়েক বছর কখনো-সখনো ওরা আসতো, পুজোয় পার্বণে, রাসে-দোলে, ঝুলনে, তর্তদিনে কিশোর তপনদা নওল কিশোর হয়েছেন, দাদুকে সাহায্য করেন—ছোটঠাকুর তাঁর নাম। মাতামহের কাছে ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য পড়েছেন, চোখের উপর নতুন জগতের সন্ধান খুলেছে, আবার স্কুলে কলেজে ইংরাজী শিক্ষাও হয়েছে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ভক্ত তিনি। ছেলে ভালো, মেধাবী, ভিতরে আগুন আছে, ক্ষেত্র সরস, টক্‌টক্ করে পাশ করে জলপানি পেয়ে বড় কলেজে ভর্তি হলেন। এর মধ্যে মানদামাসী মরেছে, শ্রীমতীও আর আসে না।

(৪)

এমন সময় শুনলেন, দিদিমাই বললেন—ওরে এবারে রাধামাধবের ঝুলনে কাজরী গাইবে শ্রীমতীর দল, আসিস সে সময়। যেদিন সে এলো সেদিন আকাশে বাতাসে দ্রিমিকি, দ্রিমিকি দ্রিমি গগন বোলত রে। আর যে এলো সেও কুণ্ঠিতা কিশোরী নয়, অনবগুণ্ঠিতা অকুণ্ঠিতা এক প্রস্ফুটিত শতদল, যৌবন সরসী নীরে যে টলমল করছে। যেন আলোর টুকরো দিয়ে গড়া অমিয় ছানিয়া অনতিগৌর তনুখানি প্রেমযমুনার খরস্রোতে ভরা গাঙ্গে গাগরী ভরছে। রাধামাধবের ঠাকুরবাড়ীতেই এসে উঠলো, খঞ্জনী বাজিয়ে ধরলে,

রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন
ঝিমঝিম শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিদ যাই মনের হরষে

কিন্তু নিদ্ যাবে কে, রাধার অন্তরে হৈল ব্যথা। তপনদার মনে হলো যেন সমস্ত বিশ্ব জুড়ে ঝরঝর বাদরের সঙ্গে বিরহ ব্যথা ঘনিয়ে উঠলো, গুমরে উঠলো।

ওঁকে দেখে বললে—কী গো ঠাকুর চিনতে পারো, এখনত আর কচিকাঁচা নও, রসে টইটুম্বুর, শুধু ভেতরে নয়, বাইরেও যে রং ধরেছে, বলি, ও কুব্জার বন্ধু, কিশোর চিত-চোর, গোপীজনবল্লভ—শুনছো

মুরলি গান পঞ্চম তান
কুলবতি চিত-চোরণি
শুনত গোপি, প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপনা সোঁপি
বিসরি গেহ, নিজ হুঁ দেহ,
এক নয়নে কাজর রেহ
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্ধ,
বেগে ধাওত যুবতিবন্ধ

তারপর দিদিমাকে বললে—দিদিমা, নাতিকে সাবধানে রাখবেন।

দিদিমা কম যান না, বললেন—ঘরে সিঁধ চেনা চোরই দেয়, আর দেখ শ্রীমতী আমার নাতির পেছনে ঘুরঘুর করিসনি, ওর এখন উঠতি বয়স, আর তুই তো সাতঘাট ঘুরে

আগুনেপারা জ্বলেছিস, ও আমার গানপাগলা ছেলে, আর শুধু তোর গলাতেই যাদু নেই বুকেও মধু আছে; জানিস তো ছেলেবেলায় তোর কতো নেওটা ছিল, মানুষ করেছিস ত তুইই?

সজল চোখে শ্রীমতী বলেছিল—তা, দিদিমা, তখনই যে মনের ষ্ট্যাম্প কাগজে দলিল দস্তাবেজ করে নিয়েছি—উনি কেষ্ট, আমি রাধা। সেদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আমি যা চাইবো তাই দেবে। ও বলেছিলো, নিশ্চয়ই। তিন সত্যি করো—তিন সত্যি, তোমাকেই যদি চাই কেষ্টঠাকুর। ও কী বলেছিলো জানো দিদিমা—যদি সত্যি করে চাও, তবেই পাবে, ও বাবা, তখন কতই বা বয়স, ঐটুকু ছেলের পেটেপেটে বুদ্ধি—রাধামাধবের অংশ আছে ওর ভিতর, ভয় নেই কিছু।

দিদিমা হেসে বললেন—ওরে, ভরসাও কিছু নেই, তুই যে প্রকৃতি, সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর তুই একদিকে, যদি টানিস সে হবে মহাপ্রকৃতির টান, মায়া কালিনাগিনীর রূপ, পারবে না রুখতে।

জানো দিদিমা, চাইবে না রুখতে, এ রোগের নিদেন হচ্ছে শোধন করে নিতে হয়, প্রকৃতি সম্ভাষণ ঠেকানো কী সোজা কথা।

ওমা, তুই ত কম পণ্ডিতানী নস্।

তবু তোমার মত পণ্ডিতের বউ নই, কিন্তু শিখেছি সেই মানুষটির কাছেই, সারা রসশাস্ত্র পড়িয়েছেন বসে বসে।

যাক্ পোড়ামুখী কথা দে, কোন অঘটন ঘটাসনি, আমার বংশের দুলাল।

আমি কে দিদিমা, আমাদের হাসি কান্না, তাঁর পায়ের হীরাপান্না, কাকে কোথায় কীভাবে জব্দ করেন কেউ বলতে পারে না, মানুষের মন ত নয়, নারায়ণ—সবই সেই বাঁশী হাতে ঠাকুরটির কারসাজি—সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইব দাসী। কলঙ্ক দিতেও তিনি, কলঙ্ক মুছতেও তিনি। তিনি কি আর হাত দিয়ে ছোঁন না, চোখ দিয়ে দেখেন না, কান দিয়ে শোনেন—আমার মুরারি মন দিয়েই স্পর্শ করেন—সব রাংতা সোনা হয়ে যায় সেই পরশপাথরের গুণে। তোমার নাতির জন্য ভয় নেই দিদিমা, ও হচ্ছে আসল হীরে নকল পোগরাজ নয়—ওর দাদু যে সাধক ছিলেন তাঁর শিক্ষা তাঁর আশীর্বাদ বিফল যাবে কেন? আমিও যে ছিটেফোঁটা পেয়েছি।

একদিন সে দিদিমাকে বললে—তোমার নাতিটিকে তিনদিন ধার দেবে দিদিমা, আমাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে রাসপূর্ণিমার দিন—ওকে দিয়ে পুজো করাতে আমার বড় সাধ, গান শোনাবে আমার শ্যামসুন্দরকে, পাঠ আলোচনাও হবে—

না বাপু।

কেন ভয় হচ্ছে ডাইনীর হাতে পুত্তুর সমর্পণ।

তা একটু হয় বই কি—তোদের বিশ্বাস কী, কণ্ঠীবদল করতে কতক্ষণ।

কিন্তু কণ্ঠবদল করিনা আমরা, সেই এক কণ্ঠ ধরেই ঝুলি, বাইরের বিষে নীলকণ্ঠকে রাধারমণের চন্দনচর্চিত বনমালা গলায় শ্রীকণ্ঠ করেনি।

নীর না ছুঁইবি, সিনান করিবি
ভাবিনী ভাবের দেহা

(৫)

অনেক বলে কয়ে সাধ্যসাধনা করে দিদিমাকে রাজী করালে শ্রীমতী—অবশ্য সঙ্গে যাবেন পাড়ার সুবাদে এক পিসী গার্জেন হয়ে, পাহারা দেবেন অশোভন কিছু না ঘটে। বর্ধমানে নেমে ছোট লাইন ধরে ওরা পেঁৗছল এক গণ্ডগ্রামে—বৈষ্ণবপ্রধান গ্রাম, গরীব বটে, কিন্তু শ্রী আছে, শালীনতা আছে, নিষ্ঠা আছে—মচ্ছব চললো তিনদিন—ভোজন, ভজন, কীর্তন—গান, পুজো, আরতি—অষ্টম প্রহর নাম। এলেন বহু ভক্ত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী, কেউ রসে ডগমগ, কেউ কিছু গুছিয়ে নিতে, কিন্তু সমস্ত উৎসবের মক্ষিরাণী ছিল শ্রীমতী—আর কি তোয়াজেই না রেখেছিল ওদের। মাটির ঘর খোড়ো চাল হলে কি হয়, তকতকে ঝকঝকে ঘরদুয়ার লেপাপোঁছা, নতুন বিছানা, নতুন চাদর, নতুন মশারি, ফুলের মালা চুয়াচন্দন, মালপো পায়েসের ছড়াছড়ি। দীয়তাং ভুজ্যতাম। সারাদিন ধরে দুলে দুলে ঢুলে ঢুলে কণ্ঠে কণ্ঠে নামগান, এক অপূর্ব আবেশমগ্নতা, মধুরং মধুরং—

নাম ভজন নাম চিন্তন, নাম কর সার
নাম ভিন্ন কলিযুগে গতি নাহি আর

তপনদাকে দিয়ে শুধু পুজোই করালো না শ্রীমতী, গানও গাওয়ালে। প্রথমদিনে রাসপঞ্চাধ্যায়ে প্রথম শ্লোক ধরলেন তপনদা, ব্যাখ্যা করলেন ঠিক যেমনটি করে ওঁর দাদু করত হুবহু সেই ধরণে—ভগবানপি তা রাত্রি শারদোৎফুল্ল মল্লিকা বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগামায়ামুপাশ্রিতঃ। শ্রীমতী কানে কানে বললে—তোমার সাহসকে বলিহারি, বড় বড় মহাজন হার মেনে গেলো বোঝাতে, আর তুমি হেলে ধরতে পারোনা কেউটে ধরতে এলে, বেশ বেশ বিষয় বিষ বিকার কেটে গেলো, নীলকণ্ঠের অংশে যে জন্ম নীলমাধব গো

আবত হী যমুনা ভরে পানী
শ্যামবরণ কা হু কো টোটা
বদন ঘর গই ভুলানী

দ্বিতীয় সান্ধ্য আসরে বললে, আজ তুমি আরতি করবে, ছোটঠাকুর

প্রদীপ জারি থারি পর রাখই
আরতি করতীহ গাওত গীত
ঝলকত ও মুখচন্দ

এমন করে আরতি করো যে ঝলমল করে উঠুক আমার ঠাকুরের মুখচন্দ্র—চোখ বুজেও

যখন দেখতে পাই যে, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আমার বুকের ভেতর, মদনমনোহর শুধু নন, মনমথ নিসূদন

ঠাড়ি রহো মেরা আঁখনকা আগে

দেখে দেখে যে তৃপ্তি হয় না—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন ন তিরপিত ভেল
মধুরহি বোল শ্রবণ শুনেন
শ্রুতিপথে পরশ না গেল
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু
তবু হিয়া পরশ না পেল

তৃতীয় দিনে তপনদাকে বললে শ্রীমতী—আজ শেষ দিন, অন্য মহাজন কবিরাও আসুন, আজ যে বাঁশী বাজে, বন মাঝে মন মাঝে

মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখি জাগ, জাগ

তপনদা পাল্টা গাইলেন—বাঁশি বাজলো বটে কিন্তু হরিচরণ স্মৃতিসার কই—রাধে গৃহং প্রাপয়, বলবো কাকে—রাধা যে বিরহিনী রাঙা বেসপরা যোগিনী পাগলপারা—সা মনুতে দেশতনুরিব ভাবম্ উত্তোর ধরলে শ্রীমতী—না, না, তা নয়

নীদ মেঘপর স্বপন-বিজলি সম
রাধা বিলসিত হাসি

আর দেরী নয়

চলহ তুরিতগতি শ্যামচকিত অতি
ধরহ সখীজন হাত
নীদ মগন মহী ভয়ডর কিছু নাহি
ভানু চলে তব সাথ

যমুনাতীরে ধীর সমীরে বনমালী যে বসে আছেন।

(৬)

সেইদিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটলো—পিসীমা বাইরে শুয়েছেন গরমের জন্য—ঘুম আসছে না তপনদার—দেহমন দুইই উত্তেজিত—এক ঘন কম্পমান আবেশের মধ্যে দিন কেটেছে—মালা-চন্দন আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন বৈষ্ণব প্রধানরা। কাল ভোরেই যাত্রা সুরু—এই অদ্ভুত-অবাস্তব পরিবেশ যাবে ভেঙে। যেতে নাহি দিব কেউ বলবে কি, তপনদার নিদ নাহি আঁখিপাতে। এমন সময় ঘরে ঢুকলো শ্রীমতী। রোজই আসে এ সময়, খবর নেয়, সুখদুখের কথা বলে, নিজের হাতে বিছানাটা নতুন করে ঝেড়ে দেয় আর একবার, মশারিটা গোঁজে, গেলাসের জলটা পালটে দেয়, আর যাবার সময় গালটা টিপে বা থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বলে—কি দেখছো, ছোটঠাকুর, আমাকে যেন স্বপ্নে দেখোনা—সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি— মনটা তো পাঁচ বছর বয়সেই কেড়ে নিয়েছো, তারপর এই চোদ্দ বছর চলছে সীতার অগ্নি পরীক্ষা—আমার বারো থেকে ছাব্বিশ, কুড়ি পেরুলেই বুড়ী—কিন্তু তুমি ত আর বুড়ো নয় যে বুড়োবুড়ী দুজনাতে মনের মিলে সুখে থাকব।

পিসী বলতেন—তুই আবার বুড়ী—গড় করি মা পায়ে—বুড়ী কিলা, রসবতী, রাই-কিশোরী, প্রেমের ডুবুরি, যে রকম কেত্তন গাস কলকাতায় বসে কীর্তনওয়ালী হলে দুচার হাজার হেসে খেলে আসে মাসে মাসে। আর নিজের পানে চেয়ে দেখেছিস কোনদিন, নিজের ঠমক আর গমকটা দুকুল ছাপিয়ে কুলবতী যে।

সে বলেছিল—স্বর্গে গেলে না হয় ভোগবতী হতুম, এখানে শুধু বেত্রবতী—আমাদের কপালে ঐ বেত্রই সম্বল—কিছু না মিলল ,কিছু না মিলল—তোমাদের কেষ্টঠাকুর কলা দেখিয়েই পালালেন। সেদিন সে এসে বসলো তপনদার পাশে, অনেকদিনের পুরানো স্মৃতির মত—কতোদিন সে তার বিছানায় শুয়ে বসে তপনদাকে ঘুম পাড়িয়েছে, শান্ত করেছে, গল্প বলেছে, ছড়া কেটেছে, কিন্তু আজ লজ্জা করছে কেন—রাধারমণ কোন চৈত্র রাত্রে উন্মীলিত মালতীর সুরভিতে কৌমারহরকে ডেকে নিয়ে এলেন—ছি, ছি, সে কী তার যৌবনের গুরুভার নামিয়ে দিতে পারেনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুরের পায়ে—পাষাণঠাকুর কী মানুষকেই প্রতীক করে নেন ? তপনদা বললেন—কি হলো ঠাকরুণের, শ্রীরাধার অভিশাপ লাগলো নাকি ? শেখ সিরাজীর একটা বয়েৎ আছে

তুজানে কাহম না
বরনা খামুশী সোখনস্ত
হে মৌন না যদি তুমি কইলে কথা
বুকভরে বইব আমি তোমার নীরবতা

হঠাৎ শ্রীমতী ডুকরে কেঁদে উঠলো, দুহাত দিয়ে চোখমুখ চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কী যেন হয়ে গেলো তপনদার—সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন বৈদ্যুতিক শক, গুমরে উঠলো মনটা, ছেলেবেলার রঙীন স্মৃতি বুঝি ফিরে এলো যখন মুখ গুঁজে ওর বুকের অতি কাছে নিঃশব্দে ওর আদর আপ্যায়ন ভোগ করতেন এক অতিবঞ্চিতার শত লাঞ্ছিত চিহ্ন আঁকা থাকতো ও'র মুখে-বুকে কপালে, কিন্তু তার মধ্যে তখন নিঃশব্দ নির্ভরতা ছিল, আজকের মত জ্বালা নয়, দংশন নয়। পরম গম্ভীরও যে, প্রকৃতি সম্ভাষণে পরম অস্থির হয়ে ওঠে। এ যে লাবণ্যামৃত ধারায় তারুণ্যস্নান। মাথা গুলিয়ে গেলো তপনদার, সমস্ত মনদেহ বিদ্রোহী হয়ে জাগ্রত হয়ে উঠলো—অণুতে অণুতে প্রবাহিত রক্তের লাভাস্রোতে মত্ত হয়ে তিনি তার দুহাত জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না, তোমার কেষ্ট রাধা, শ্যাম-সুন্দর, ওসব বুঝি না, শুধু তোমাকেই চিনি। বেশ খানিকক্ষণই চুপ করে সেই আবেশের মোহে নিজেকে ফেলে রেখে দিল শ্রীমতী, তারপর তার মনকে কে যেন চাবুক মারলে, সে না কৃষ্ণ-দাসী, সে না দিদিমার কাছে কথা দিয়ে এসেছে—জোর করে তপনদাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে গেলো সে। যাবার সময় শুধু জলভরা ডাগর চোখ দিয়ে চেয়ে দেখলে একবার তার দিকে—দাদু থাকলে বলতো—শ্রীমতী, এ যে —পপো,

নিমেষাজলসংখ্যপংক্তি উপোরিতভ্যোং ইব লোচনাভ্যাম্। কিন্তু সে দৃষ্টি মধুরে বিধুর, কিন্তু নিকটকে আমল দেয় না, সুদূরকে আহ্বান করে। দুরন্ত বর্ষার শেষে বিরাট পাহাড়ের তন্দ্রী গায়ের মত, ঢল নেমেছিল বটে, কিন্তু উঁচুনীচু খোঁচ খাঁচ আজ সব পরিস্কার।

ভোর হোল, ওদের যাবার সময় এলো—আখড়ার সবাই এসে দাঁড়ালো, কিন্তু শ্রীমতী কোথায়—আসল মানুষটাই যে অনুপস্থিত। না, না সে ঠাকুরঘরে নমস্কার জানাচ্ছে।

লোকেশচৈতন্য মায়াধিদেব.....সংসারযাত্রা অনুবর্তায়িষ্যে। পিসী এগিয়ে এসে বললেন—চলি, মা, রাধারাণী তোমার মঙ্গল করুন, কদিন বড়ই তৃপ্তিতে কেটেছে—

এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সে। বৃদ্ধ বাবাজী বললেন—শ্রীমতী মা'র কি ভুলচুক হয়, সবদিকেই নজর, স্তোত্রপাঠও স্থগিত নেই—ঠিক সময় মত। শ্রীমতী শুধু তপনদার দিকে সোজা একবার চাইলে, কোন কথা নয়, শুধু নীরবতা। তারপর উপুড় হয়ে পড়লো গিয়ে বিগ্রহের পায়ে—ঠাকুর, ঠাকুর

বুড়ো বাউল তখন গান ধরেছে—

যখন অন্তরে ছিল এই রূপ
ছিল নয়ন পিয়াসী
এখন নয়ন পেয়েছে এই রূপে
এখন অন্তর উদাসী

(৭)

তপনদা বদলে গেলেন একেবারে—কলকাতায় এলেন পড়তে, এখন শুধু পড়া আর পড়া—শুনলেন, আখড়া অন্যের হাতে তুলে দিয়ে শ্রীমতী চলে গেছে, বলে গেছে—আমাদের মাধুকরী করতে হয়, পাঁচের দরজা থেকেই সংগ্রহ, পথের ধুলোই অঙ্গের ভূষণ, পথেই নামজুম। কেউ বললেন, বৃন্দাবনচন্দ্র ডেকেছেন, তাকে দেখতে পাবে যমুনার তীরে, কেউ বললে—আরে রামোঃ, ওর মতিগতি কোনকালেই ভালো ছিল না—চিরদিনই ছটফটে, বেপাড়ায় ডুব মেরেছে অন্য নামে, মায়ের মেয়ে ত, রক্তের রেশ যাবে কোথায়? মহাকালের প্রবাহে মিলিয়ে গেলো একটি জলবুদ্বুদ। শ্রীমতী কিন্তু রয়ে গেলো তপনদার মনে, খানিকটা আগুনের একটা গোলার মত আর খানিকটা একটা বাসি চাঁপা-ফুলের গন্ধের মত। অন্তরে তাপ দেয়, সৌরভ দেয়, কিন্তু বাহিরঙ্গে সান্ত্বনা দেয় না।

তার পরের কথা ত আপনাদের সকলেরই জানা—তপনদা ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র হলেন, তপনদা জেলে গেলেন, তপনদা সেবাব্রত নিলেন, অধ্যাপনায় খ্যাতিতে তেজস্বিতায় ধাপে ধাপে উঠলেন—নাম ডাক মান সম্ভ্রম—একজন বলবার কইবার মত লোক হলেন তবু লাজরক্ত প্রথম যৌবনের সেই অনাস্বাদিত ছন্দকে ভুলতে পারেননি, তারই বাঁকে বাঁকে যে অভাবনীয় মুহূর্ত এসেছে তারই স্মৃতিকে। বিয়ে করলেন না, আত্মভোলা সন্ন্যাসী মানুষ, বিজ্ঞান আর গান, কাজ আর গবেষণা এই নিয়েই রইলেন। মাঝে মাঝে সেতারে ঝঙ্কার উঠতো শেষ মালকোষের বিরহী ব্যথা সুরের মারফৎ লুটিয়ে পড়তো সুরেশ্বরের পায়ে, গভীর রাতে বেহাগে কান্না উঠতো ঝনঝনিয়ে তারই মাঝে রয়্যাল সোসাইটিতে প্রবন্ধ যেতো, ল্যাবোরে-টরীতে বসে থাকতেন অতন্দ্র এক সমাহিত মূর্তি। ছাত্রছাত্রী অনুরাগী অনুরাগিণীদের নিয়েই তাঁর দিন কেটে যেতো—আত্মীয় স্বজন-দের সঙ্গে বিশেষ কোন সংস্রব ছিল না, শুধু আসতো ওঁরই এক দূর সম্পর্কের পিসতুতো ভাই নারুদা—তার সঙ্গেই জমতো ভাল, কারণ গানের জহুরী ছিল সে। জলসা, আসর, যাত্রা, ঝুমুর এই সব করেই বেড়াতো সে—রাঢ়ের লোক, মাঝে মাঝে কলকাতায় উদয় হয়ে তপনদের সঙ্গে রূঢ় রসিকতা করে যেতো, দুটের টাকা হাতাতো, গান ধরতো,

ওরে কেউ ভাসে, কেউ ডুবে মরে রে
ঝাঁপ দিয়ে রসের সাগরে

একদিন এসে বললে,—শোনো হে অধ্যাপক মশায়, চমৎকার কেত্তন হচ্ছে তালতালায়, 'মরিলে টাঙ্গায়ে রেখো তমালেরই ডালে।' আরে ব্রাদার, তোমরা হচ্ছো লক্ষ্মীসরস্বতীর খাস তালুকে বাস করো, সেরা সুন্দরীদের চম্পক-মালা বিদুষী রূপসীদের দেহসৌরভ নিয়েই দিন কাটাও, সাধারণ কীর্তন আসরে যাবে তো বলো, তোমার আবার মানসম্মান আছে—আকুমার ব্রহ্মচারী চরিত্রবান মহাপুরুষ—বিরাট বিদ্বান—লোকে কিছু বলবে না তো। আমাদের ত আর কামিনীকাঞ্চনে অনাসক্তি নেই—আমাদের কাছে মহারাত্রি মোহরাত্রি হয়েই আসেন—তবে ব্যূহ ভেদ করবার চক্র নেই—অর্থাৎ রজত চক্র।

তপনদা ছিলেন গান পাগলা লোক, তা ছাড়া তাঁর স্নায়ুতে অণুতে কীর্তনাঙ্গ গান পদাবলীকে ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল শ্রীমতী। তাই বেশী সাধাসাধি করতে হলো না তাঁকে—গেলেন তিনি সেই আসরে। জমজমাটী গান বাজনা, তরুণী তন্বী গাইছে, লাস্যে হাস্যে ভঙ্গীতে ইঙ্গিতে আসর মাত করেছে, কিন্তু তারই কাছে বসে রয়েছেন সাদা শুভ্র সাধারণ কাপড় পরা জড়োসড়ো হয়ে একটি প্রৌঢ়া তাল দিচ্ছেন আস্তে আস্তে নিজের ভাবে নিজের হয়ে। বোধ হয় তাঁর কাছেই গানের শিক্ষা পেয়েছে মেয়েটি, মুজরোর। কি জানি কেন তপনদার মনে দূরের একটা অস্পষ্ট ছবি জেগে উঠলো রূপ নিয়ে রং নিয়ে, রেখা নিয়ে—নরম দেহ, গরম বুক নয়, স্নিগ্ধস্নাত চন্দনচর্চিত একটি অপাপবিদ্ধ দেহশিখা, ধূপের মত পুড়ে যাচ্ছে গন্ধ বিলিয়ে ধূমাবতী। বিশ বছরের ওপার থেকে আর একজন কে যেন ডাক দিচ্ছে তাঁকে।

তিমির অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী

গান যে বিরাটের পুজো, কামনার আমন্ত্রণ না। সেই হলো ভাঙনের সুরু, এদিক ওদিক যান, খোঁজ খবর করেন, কী যে ভাবেন, কী যে সন্ধান নেন কেউ জানে না। কিন্তু একদিন দেখা গেলো তাঁকে এক অখ্যাত পল্লীতে—শুনলেন যিনি থাকেন সেখানে তিনি শুদ্ধ

কীর্তন শিক্ষা দেন কয়েকটি মেয়েকে যাদের চারিত্রিক সুখ্যাতি ছিল না বটে, কিন্তু তাঁকে তারা খাতির করতো মায়ের মতন, অনেক পরিবর্তনও এনে দিয়েছেন তাদের মধ্যে। উনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাসপাতালে দিতে চেয়েছিলো তারা, তখন ও'র অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দুইই শোচনীয়। ওদেরই একজন ওর অত্যন্ত নেওটা হয়ে পড়ে, নিজের আশ্রয়েই নিয়ে যায়, যা হোক কিছু সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করে ডাক্তার ডাকে। তপনদা যখন সন্ধান পান তখন মৃত্যুপথযাত্রিণীর প্রায় শেষ লগ্ন, দেহ দুঃসহ মানলে তাঁর দুর্জয় চেতনা পূর্ণাহুতি দিচ্ছে। তবু শেষের কদিন যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করেছিলেন তিনি নিঃশব্দে অনাড়ম্বরে, রোগটা শুধু সাংঘাতিক নয় সংক্রামকও। পাড়াপড়শীরা এ সব দেখতে অভ্যস্ত নয়, শুধু সেই পল্লীরই এক বৃদ্ধা বলেছিল—ওরে, ছেলে বয়সের মনের রং-ই আসল রং, দেহটা ত ঢেলা, আজ আছে, কাল নেই—দেখ্ দিকিন্ মনের মানুষকে টেনে এনেছে—এই হলো আসল রং—

আর একজন বলেছিল—ছিঃ, উনি কি আমাদের মতন, উনি যে মা গোঁসাই, রাধারাণীর অংশ, পায়ের ধুলো নে, দাও বাবা, নিজের হাতে সিঁথেয় সিঁদুর পরিয়ে দাও, সতীলক্ষ্মী মা আমার—কোনদিন বেচাল ত দূরের কথা, একটু ভাবান্তর দেখিনি—আপনি মন আর কী গলা, কী শিক্ষা—মেয়েগুলোর মলা ধুয়ে গেলো, আমার ক্ষ্যান্ত মানুষ হয়ে গেলো—বিয়ে করে ঘর সংসার করছে—

...শ্মশানকৃত্য সেরে এসে সেইখানেই শুয়ে পড়েছিলেন তপনদা, বলেছিলেন—এইখানেই থাকি মা কয়েকটা দিন, কি বলিস, এটা যে তপস্যার ক্ষেত্র, একটু হাওয়া গায়ে লাগিয়ে নি—নে, আমার এই ব্যাগটা রেখে দে, খরচ খরচা আছে তো—

মেয়েটি বলেছিল—বাবা, সে কী করে হয়, আপনার যে কষ্ট হবে, আর আমরা খারাপ!
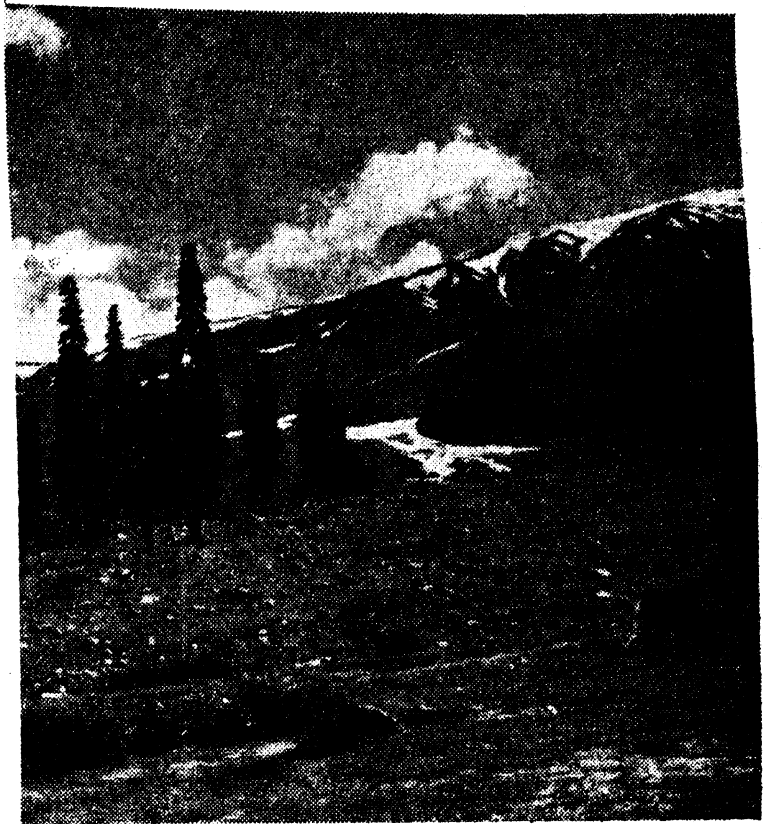
খিলেনমার্গ (কাশ্মীর)

—শ্রীঅজিতকুমার শ্রীমানী

গর্জন করে উঠেছিলেন তপনদা—তোরা না মায়ের জাত, মা কখনো খারাপ হয় বেটি, আমি উঠতে পাচ্ছি না, শরীরটা খারাপ লাগছে—জানিস মহামায়ার পুজোয় লাগে তোদের দ্বার মৃত্তিকা—তিনি শুচি হন তোদের স্পর্শ পেয়ে—তারপর গুন গুন করে গান ধরেন—

প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি আমার ক্ষমাহীনতা কে ক্ষমা করবে—

মেয়েটা বুঝতে পারে না, হতভম্ব হয়ে যায়, কিন্তু তপনদারও তখন শেষ হয়ে আসছে—শ্রীমতীর যাওয়ার সংগে সংগে তারও যেন সব কর্তব্য সমাপন—সেই রাত্রেই আরো অসুস্থ হলেন তিনি—না হলো সময়োচিত চিকিৎসা, না হলো উপযুক্ত সেবা একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের। যেটুকু করেছিল, সে ঐ মেয়েটি, ঐ যে বসে আছে এধারে মুখ নীচু করে, ওর নাম রমা, বয়স আঠারো উনিশ—অন্ধকারের ঘোমটাপরা পুরুষ লালসার একটি নামহীন বলি।

মনীষা চুপ করে রইল, তারপর বললে—প্রায় শেষ মুহূর্তে ঐ রমাই আমার ঠিকানাটা ও'র কাছ থেকে জোর করে আদায় করে, জানতে পারে কতো বড় মানুষটা ওর ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, খবর পেয়ে ছুটে যাই—তখন আর করবার কিছু ছিল না, জ্ঞান ছিল, আস্তে আস্তে নিজের জীবনের কিছু কিছু কথা আমায় বললেন, যা আমার জানা ছিল না। তারপর আমার হাত দুটো ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—মনীষা, তুমি শুধু আমার ছাত্রী নও প্রিয় শিষ্যাও, রমার ভার আমি তোমায় দিয়ে গেলাম, মেজেঘষে ওর মালিন্য তুমি মুছিয়ে দিয়ো।

এই স্বীকৃতিটুকুই আমাকে চিরকালের জন্য ধন্য করে দিয়ে গেছে। সৃষ্টির আরম্ভবীজ যে মহারুদ্রতপের মন্দিরমণ্ডপে।

চুপ করে বসে রইলো তারা, আকাশে সূর্য উঠছে, অন্ধকার কেটে যাচ্ছে, নতুন দিন জাগছে। ভরাগাঙে মাঝিরা গান ধরেছে—

অতল আলোর গহন মাঝে
ডুবিয়ে আমায় শীতল কর।

অভিশপ্ত উপত্যকার বিপ্লবী গারো বীর

শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র

রাঙ্গিরা পাহাড়ের সেই অভিশপ্ত উপত্যকার কথা বাইরের জগতে বড় একটা জানা নেই। স্বল্পজ্ঞাত রাঙ্গিরা উপত্যকার ভীষণদর্শন উপদেবতাকে কেন্দ্র করে কত উপাখ্যান যে প্রচলিত গারোদের মধ্যে তার আর অন্ত নেই। আধা-পুরুষ, আধা-নারী এই ভয়ালমূর্তি দানব নাকি ঘুরে বেড়ায় কর্দমাক্ত জলাভূমির ওপর দিয়ে। কোনো মানুষকে দেখলেই সে নাকি তার আভূমিলম্বিত বাহু দুটি বাড়িয়ে তাকে টেনে নেয়।

এই উপদেবতারই নজর লেগেছিল নাকি বিপ্লবী গারো বীর মিকাত সাঙ্‌মার ওপর। তাই কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আজ বৃদ্ধ বয়সে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি অভিশপ্ত জীবনের বোঝা।

গারো পাহাড়ের রাজধানী তুরা থেকে অনেক—অনেক দূরে অভিশপ্ত উপত্যকার সন্নিহিত রাঙ্গিরা পাহাড়ে মিকাত সাঙ্‌মার ঘর। তুরা থেকে তাঁর বাড়িতে যেতে লাগে কম-সে-কম এক সপ্তাহ। এ অঞ্চলে কুখ্যাতি আছে রাঙ্গিরা উপত্যকার—ওখানে যদি কখনো যান আপনি তাহলে নাকি চিরতরে হারিয়ে যেতে পারেন।

তুরা থেকে হাতীর পিঠে চড়ে এগোতে হয় অরণ্য পথ ধরে। লম্বা বাঁশ গাছের পত্রঝালর এবং পল্লবঘন অন্যান্য তরুকুঞ্জ যেন মাথার উপর রচনা করে রেখেছে গম্বুজের পর গম্বুজ।

ক্রমাগত বনের ভেতর দিয়ে চলতে চলতে মনে যেন সবুজের নেশা ধরে যায়। মনে হয় চিরযৌবন ধরণীর এ শ্যামশোভার বুঝি অন্ত নেই।

বনভূমি পার হয়ে উন্মুক্ত পার্বত্যভূমিতে এসে দাঁড়ালে দূরের ঘন সবুজ বনানীর মখমলী পটভূমিকায় রাঙ্গিরাগিরি গ্রামটি চোখে পড়ে ছবির মতো।

রাঙ্গিরাগিরি গ্রাম থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটি পাহাড়ের মাথায় কুষ্ঠী মিকাত সাঙ্‌মার ঘর। তারাহীন নৈশ অন্ধকারে এই দুর্গত বিপ্লবীর গৃহাভিমুখে যদি আপনি রওনা হন, তাহলে অগণিত জোনাক পোকা শুভ্র আলোর মশাল জ্বালিয়ে চলবে আপনার পথের দিশারী হয়ে। কতকগুলি চড়াই-উতরাই অতিক্রম করবার পর একটি চড়াইয়ের মাথায় ক্ষীণ আলোর রেখা আপনার চোখে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গেই দেখবেন বস্ত্রাচ্ছাদিত দুটি মনুষ্যমূর্তি মশাল হাতে এগিয়ে আসছে আপনার দিকে।

এঁরা দুজনেই কুষ্ঠরোগী, এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ যিনি, তিনিই হচ্ছেন মিকাত সাঙ্‌মা। কি অসম্ভবের নেশায় এঁরা দুজনে যে গভীর রাত্রে এই পার্বত্যভূমিতে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ান কে জানে? সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে যখন মিকাত ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের তোড়জোড় করতেন তখন ধরা পড়বার উপক্রম হলে তাঁর অনুচররা তাকে লুকিয়ে রাখত এখানকার জঙ্গলে—গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার পক্ষে এমন সুবিধাজনক জায়গা তো আর নেই।

আজ আর সে আশংকা নেই। মিকাত সাঙ্‌মা তাই কতকগুলো বেতের চেয়ার বানিয়ে বিছিয়ে রেখেছেন তরুচ্ছায়াতলে। কেউ যদি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় তাহলে মিকাত সাঙ্‌মা এখানেই তাকে সমাদরে স্বাগত করেন। বনচ্ছায়ায় বেতের আসনে বসে তাঁর মুখে শোনা যায় গারো জাতির অধ্যাত্ম এবং সাংস্কৃতিক জীবনের কথা, গারো ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক তিনি, তাঁর জানা গারো রূপকথার ভাণ্ডারও অফুরন্ত। এগুলো বলতে তাঁর শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই—আর‚ তাঁর নিজের স্মৃতিচারণ! উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক সে কাহিনী।

মিকাত সাঙ্‌মা শৈশবে প্রতিপালিত হন এক খৃষ্টান মিশনারীর দ্বারা। ঐ মিশনারী শুধু যে অপত্য স্নেহে তাঁকে পালনই করেছিলেন তেমন নয়, তাঁর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। মিকাত সাঙ্‌মা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। বিদ্যাভ্যাস কালে দেশাত্মবোধের আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন এবং গারো জাতিকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে কৃতসংকল্প হন। মিশনারী অভিভাবকের অনুসৃত ধর্মানুশীলনের পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি সংগ্রামী বিপ্লবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং নিজেকে গারো পাহাড়ের দক্ষিণ অঞ্চলের একটা গোটা জেলার প্রধান বলে ঘোষণা করেন। ফলে জঙ্গল-এলাকার বাইরে যে ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থা চালু ছিল তার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিকাত সাঙ্‌মার বিবাদ বেধে উঠল।—এই অঞ্চল এখন পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজ তাঁর প্রাধান্য তো মেনে নিলই না, উপরন্তু রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফ্‌তার করে তাঁকে জেলে পুরল। কারাগার থেকে পালিয়ে এসে পাহাড়ে ঘাঁটি হয়ে বসলেন মিকাত সাঙ্‌মা এবং তাঁর কর্তৃত্বের দাবীকে যারা স্বীকৃতি দেয় নি তাদের সকলেরই শত্রু বলে নিজেকে ঘোষণা করলেন। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামই হচ্ছে তাঁর আদর্শ। এই আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে একদল অনুগামী এসে দাঁড়াল তাঁর পাশে এবং পাহাড়িয়া জঙ্গলের নিভৃত স্থান থেকে তিনি যে কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন তাই নয়, মাঝে মাঝে সশস্ত্র আক্রমণও চালাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি অস্ত্র সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

তারপর ক্রমে দেশ স্বাধীন হল, দ্বিধাবিভক্ত হল। আবার রাজনৈতিক প্রবক্তার ভূমিকায় দেখা দিলেন মিকাত সাঙ্‌মা। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, পাকিস্থানের সীমান্ত সরিয়ে নিতে হবে আরো ত্রিশ মাইল দূরে, অর্থাৎ, গারোদের অধিকৃত অঞ্চলকে দুভাগে বিভক্ত করার নীতির প্রতিবাদ জানালেন তিনি। বাস্তবিক, জাতিগতভাবে যারা এক, সেই গারোদের পরস্পরকে পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করার নীতি চাইতে অযৌক্তিক আর কিছুই হতে পারে না। আর এই আদিবাসী বিপ্লবীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা যে কত বেশী ছিল—তা প্রমাণিত হল পূর্ব পাকিস্তানে গত হাঙ্গামার সময় যখন দলে দলে দক্ষিণের উপদ্রুত গারো নরনারী এসে আশ্রয় নিতে লাগল গারো পাহাড়ে। এই রকম ঘটনা যে ঘটতে পারে গারো পাহাড় বিভক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিকাত যেন তা আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই অমন জোরালোভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার মিকাত সাঙ্‌মাকে তাঁর স্বগ্রাম রাঙ্গিরাগিরাতে গিয়ে বসবাস করতে আদেশ দিলেন। আজ তাঁর যে অবস্থা তাতে তাঁর পক্ষে এই অঞ্চল ছেড়ে বেশী দূরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। আজ তাঁর জীবনে বিধাতার অভিশাপ নেমে এসেছে সত্যি, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে এখনো তিনি হতাশ হন নি। চালমুগরা তেলের সাহায্যে নিয়মিত ভাবে তিনি রোগের চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসীদের দান যে কতখানি সে সম্বন্ধে অনেকেই আমরা সম্যক অবহিত নই। শুধু আসামের কথাই ধরা যাক না। সিপাহী বিদ্রোহেরও আগে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিলেন খাসিয়া রাজা তীর্থ সিং, একান্ত শোচনীয় অবস্থায় যাঁর জীবনাবসান হয় ব্রিটিশের কারাগারে। আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত নাগারাণী গাইডিলিউ দেখেছিলেন ব্রিটিশের কবলমুক্ত স্বাধীন 'নাগা-রাজ্যের স্বপ্ন, আগস্ট আন্দোলনে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছিলেন বামলা মিরি, আর গারো বীর মিকাত সাঙ্‌মা বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্বলিত করেছিলেন গারো পাহাড়ে।

ছোটনাগপুরের পশ্চিমদিকে মধ্যপ্রদেশের সুরগুজা জেলাকে জুড়ে আছে পাহাড়ী বন্ধুরতা। স্তরে স্তরে পাহাড়ের সমাহার। তাদের অনেকগুলি প্রায় চার হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু।

বন-পাহাড়ের এই ঠাসবুনানির পশ্চিম অংশে চিরিমিরির কয়লাক্ষেত্র। চিরিমিরি যে মহকুমার অন্তর্ভুক্ত, তাকে বলে 'কোড়িয়া।'

কোড়িয়ার বন-পাহাড়ের সমাবেশের মধ্যে মানুষের স্থান নগণ্য। কোড়িয়ার প্রকৃত ইতিহাস উহ্য আছে বন, পাহাড়ের দুর্গমতায়।

কোড়িয়ার ইতিহাসের ধারা অবশ্য ক্ষীণ—সুরগুজা থেকে কোড়িয়াতে এসে রাজ্য পত্তন করেন ধর্মল শা। সে প্রায় দুশ বছর আগেকার কথা।

কোড়িয়া ছিল বনের রাজত্ব। বনের রাজত্বে রাজার রাজত্ব পুরোপুরি খাটে না। বনের গহনে বন্য পশুদের বিচরক্ষেত্রে পৌছায় না রাজার শাসন। রাজ্যের মালিক যে রাজা, মানুষের বানানো এ বিধান পশু-পাখীদের বিধিবিধানের সঙ্গে মেলে না। তাদের রাজত্বে সকলেই স্বাধীন—কেউ রাজা নয়, কেউ প্রজা নয়।

বন্য পশুরা মানে না রাজার শাসন। কাজেই কোড়িয়ার রাজারা তাঁদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন বন্য পশুদের শাসনে। দুশো বছর ধরে ব্যাপ্ত তাঁদের রাজত্বের মধ্যে পশুসংহার-পর্ব ছাড়া আর কিছুই নেই।

কোড়িয়ার বন নানারকমের বন্য পশুর সমাবেশের জন্য বিখ্যাত। এখানে বাঘ, চিতা-বাঘ, ভালুক, হরিণ, সম্বর ও নীলগাই পাওয়া যায়। আগে শাদা বাঘও নাকি ঘুরে বেড়াত।

শিকারের জন্য কোড়িয়ার রাজারা চিরিমিরির বনে আসতেন প্রায়ই। কোড়িয়া, সোনামণি, কন্তাখোল, ঘোরগোলা, বিজাওর, ঝরিয়া প্রভৃতি নালাগুলোতে ঘুরে বেড়াতেন তাঁরা পশুদের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ ক'রে।

ঘুরতে ঘুরতে নালার মধ্যে উন্মাটিত কয়লার স্তর তাঁরা হয়তো দেখেছিলেন। কিন্তু বনের ঝোপ-ঝাড়ের ঘন সন্নিবেশের মধ্যে বন্য পশুর জ্বলন্ত চক্ষুর দীপ্তিকে অনুসরণ করেছেন তাঁরা, কয়লার কালিমাকে বুঝি দেখেও দেখেননি।

ইংরেজরা দেখেছিলেন। কোড়িয়ার বনের গহনে সন্ধানী দৃষ্টিপাত ক'রে ঘন বনের নিবিড় কালিমা থেকে কয়লার গাঢ়তর কালিমাকে উদ্ধার করেছিলেন তাঁরা।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কোড়িয়া ও সুরগুজার জঙ্গলে কয়েকটি বুনো হাতির সমাগম ঘটেছিল। ইংরেজরা যখন কোড়িয়াতে কয়লার খনিপত্তনের কল্পনাকে পরিকল্পনায় রূপ দেওয়ার কথা ভাবছিলেন, তখন কোড়িয়ার রাজার সমস্ত মন জুড়ে ছিল হাতি শিকারের কল্পনা।

হাতি শিকার নিষিদ্ধ ছিল ইংরেজ সরকারের নিয়মে। সে নিয়ম দেশীয় রাজ্যগুলিতেও খাটত। হাতি শিকার করতে হলে বিশেষ অনুমতি প্রয়োজন হ'ত স্বয়ং গভর্ণরের কাছ থেকে।

সুরগুজার রাজা মধ্যপ্রদেশের গভর্ণরের অনুমতি নিয়ে কয়েকটি হাতি শিকার করেছিলেন। হাতিগুলোকে তিনি তাঁর রাজ্যের সীমার মধ্যেই পেয়েছিলেন।

তারপর অবশিষ্ট রইল একটি হাতি। চিরিমিরির জঙ্গলে সে আস্তানা নিয়েছিল।

হাতি শিকার করে শিকারীর যশ অর্জন করলেন সুরগুজার রাজা। তাঁর সাফল্যে কোড়িয়ার রাজা হলেন ঈর্ষাকাতর। শিকারী হিসেবে সুরগুজার রাজার তুলনায় তিনি কম কৃতী নন, হাতি শিকার ক'রে শিকারের কৃতিত্বে সুরগুজার রাজা তাঁকে অতিক্রম ক'রে যাবেন এ তাঁর সইল না। চিরিমিরির জঙ্গলের হাতিটিকে শিকার না করলে তাঁর মান রক্ষা হয় না বলে অনুভব করলেন তিনি। যে করে হোক হাতিটিকে মারবার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

হাতিটি ছিল মত্ত। পাগলা হাতির স্বভাব হ'ল জীবন্ত মাত্রেরই জীবননাশ। স্বজাতীয়কে দেখলেও সে তেড়ে যায়। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে বাঁচতে দিতে সে নারাজ।

হাতিটির উপদ্রবে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল স্থানীয় আদিবাসীরা। ওখানকার জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে যাবার জো ছিল না তাদের। হাতিটার সামনে পড়ে প্রাণ হারিয়েছিল কয়েকজন। তাদের মধ্যে ছিল একজন সুন্দরী যুবতী।

আদিবাসী মেয়ে। বনের পরিবেশে মানুষ হ'য়ে বনকে নিজের ঘর ব'লে মনে করত। ভয় করত না বন্য পশুদের। একদিন চিরিমিরির পূর্বদিকে একটি নালার মধ্যে 'খিরশালি' শাক কুড়োতে এসেছিল মেয়েটি। বুনো পাগলা হাতিটি কাছাকাছি আছে জেনেও এসেছিল।

হাতিটি ঐ নালার মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মেয়েটিকে দেখা মাত্রই তাড়া করল। নালার মধ্যে কয়েকটি গহ্বর ছিল। তাদের একটির মধ্যে গিয়ে লুকোল মেয়েটি। কিন্তু হাতিটি শুঁড় দিয়ে একটা বড় গাছের ডাল তুলে মেয়েটিকে নিষ্পিষ্ট করে মেরে ফেলল।

কোড়িয়ার রাজা হাতিটির হিংস্রতার কথা উল্লেখ ক'রে হাতিটিকে মারবার অনুমতি প্রার্থনা ক'রে গভর্ণরের কাছে দরখাস্ত করলেন। দরখাস্তটি নিয়ে তিনি নিজেই গেলেন মধ্যপ্রদেশের তখনকার রাজধানী নাগপুরে।

দরখাস্তটি মঞ্জুর করতে গভর্ণর দ্বিধা করছেন দেখে কোড়িয়ার রাজা তাঁকে বললেন, হাতিটি আমাকে মারতে দিতেই হবে স্যার। নইলে আমার মান থাকে না, আমার প্রজাদেরও প্রাণ বাঁচে না।

গভর্ণর বললেন, আপনার প্রজারা একটু সাবধানে চলাফেরা করলেই তাদের প্রাণ বাঁচতে পারে। কিন্তু আপনাদের ঐ তল্লাটের এই একটি মাত্র হাতি, এই হাতিটিকে মারবার অনুমতি আমি দিতে পারিনে। আপনার প্রজাদের প্রাণের চেয়েও এই হাতিটির দাম অনেক বেশি।

কাতর দৃষ্টিতে গভর্ণরের মুখের পানে চেয়ে কোড়িয়ার রাজা বললেন, কিন্তু আমার মান! আমার মানের চেয়েও কী হাতিটির দাম বেশি! বিবেচনা ক'রে দেখুন স্যার, সুরগুজার রাজা তিন চারটে হাতি মেরে আমার ওপরে টেক্কা মেরে বসে আছে। আমি যদি একটিও হাতি না মারি, সবাই ভাববে সুরগুজার রাজার চেয়ে নীচু স্তরের শিকারী বুঝি আমি।

গম্ভীর মুখে গভর্ণর বললেন, হাতি মারার অনুমতি যদি আপনাকে দিই, বিনিময়ে আমাকে কী দেবেন আপনি?

—আপনি যা' চান তাই দেব।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

ভয়ঙ্করী জিউনরাগালি

সুনীল চৌধুরী

নরম তুষারের বুকে পথ করে চলা। লক্ষ্য কিত্তীষিকাময়ী জিউনরাগালি। খাড়া চড়াই নাকের সিধে উঠে গেছে ওপরে।

জিউনরগালি কলের ওপারে তিন শ' ফুট নিচে রহস্যাবৃত রূপকুন্ড। শত শত নাম-ধামহীন মানুষের মৃতদেহ ঘুমিয়ে আছে তুষারের নিচে। আর মাত্র ক'য়েক শ'-গজ উঠলেই আকাঙ্ক্ষিত রূপকুন্ডে পৌঁছব। নরম বরফে চলতে কষ্ট হচ্ছে। হাঁটুঅব্দি ডুবে যাচ্ছে তুষারে। এক পা ফেলার পর অপর পা তুষারের গহ্বর থেকে তোলা দায়। হৃৎপিন্ডটাকে কেন যেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। দারুণ পিপাসা, গলা কাঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তবু অদ্ভুত এক আকর্ষণ। এ আকর্ষণ যেন যুগযুগান্তের, আমার আত্মার আত্মীয়ের।

মনে পড়ে, ১৯৫৫ সালের কোন এক উজ্জ্বল সোনালী সকালে চ'য়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সংবাদপত্রের কোন এক পাতায় বিস্মিত দৃষ্টি আমার থমকে দাঁড়িয়েছিল।—রূপকুন্ড! শত শত মৃতদেহ যুগযুগান্ত ধরে পড়ে আছে এ কুন্ডের তীরে। কারা এই হতভাগ্য? নাম গোত্রহীন কতকগুলো নারী-পুরুষ তুষারের তলায় অনন্ত শয়নে শায়িত। ওরা কারা?

রহস্যাবৃত রূপকুন্ডের ওই মানুষগুলোর অতৃপ্ত আত্মা সে দিন থেকে আমায় বুঝি টেনেছে।

তুষারপাত শুরু হয়েছে বেলা একটা থেকে। বিচিত্র তুষারপাত। মিছরীর দানা, এলাচদানা, শেষে পেঁজা তুলোর মত তুষারপাত। সারা দেহ তুষারের কণায় বিচিত্র। অনাবৃত অঙ্গ শাদা হয়ে গেছে।

কালো মেঘের ঘন আস্তরণে আকাশ আচ্ছন্ন। সূর্যদেব মুখ লুকিয়েছেন কোথায় জানা নেই। ঘন কুয়াশা আর তুষার ঝড় এক হাত দূরের বস্তুকেও ঝাপ্‌সা করে দিয়েছে। অকরুণ তুষারপাতের সঙ্গে ঝড়—তুষার ঝড়।

নন্দাকিনীর তীর ধরে চনোনিয়া কোটের ধ্বস নামা গা বেয়ে এগিয়ে চলেছি।

বেলা দুটোর মধ্যেই হোমকুন্ড পৌঁছে গেলাম!

নন্দাভগবতী স্বামী কৈলাসপতিকে তুষ্ট করার জন্য হোম করেছিলেন এখানে। হোমের আগুন নেভাতে হয়—প্রয়োজন হয় জলের। চারি-দিকে তুষার—জল নেই, হোমের আগুন নেভাবেন কি করে? দেবাদিদেব নন্দাভগবতীর বিব্রত অবস্থা দেখে বৃষ্টি দান করলেন। হোমের আগুনও নিভে গেল।

এ কাহিনীর পেছনে আছে বৈজ্ঞানিক কারণ। চনোনিয়া কোট, নন্দাঘুন্টি ও ত্রিশূলের খাঁজে খাঁজে অনেক মেঘ জমা হয়ে থাকে। হোম করলে বা আগুন জ্বালালে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাস মেঘের সংস্পর্শে আসে এবং মেঘ ঘনীভূত হয়ে হয় বৃষ্টি।

বিচিত্র সুর করে নন্দাদেবীর জাগার গাইছে কেদার সিং। সুর মেলাচ্ছে অন্যান্য কুলিরা।

ত্রিশূলী তীর্থ হোমকুন্ড। গাড়োয়ালবাসী প্রত্যে-কের মহাতীর্থ। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি থাকলে নাকি এ তীর্থ সম্ভব। তাই, হোমকুন্ডে এলে জন্মসার্থক জ্ঞান করে ওরা। নন্দাভগবতীর তুষ্টিতে ওরা জাগার গায়। আজ সেই জাগার গাওয়ার উৎসব।

গাড়োয়ালে নন্দাদেবীর বাপের বাড়ী থেকে স্বামীগৃহে যাবার স্মৃতি উৎসব—নন্দজাত উৎসব। নন্দজাত উৎসব দু রকম—বড়ী নন্দজাত ও ছোটি নন্দজাত। ছোটি নন্দজাত উৎসব প্রতি বছর নন্দাষ্টমীর দিন (ভাদ্র-আশ্বিন মাসে) নৌটি কোটের ভ্রামরী দেবীর মন্দির থেকে দুর্গামূর্তি পালকীতে সাজিয়ে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে যাত্রা করে। শোভাযাত্রা বৈদিনী কুন্ডে এসে শেষ হয়। কিন্তু বড়ী নন্দজাত উৎসব প্রতি বছর হয় না। এ উৎসব হবার আগে গাড়োয়ালের [illegible] পুরোহিত চার সিংবিশিষ্ট এক ভেড়ার স্বপ্ন দেখেন। ভেড়ার খোঁজ পেলেই বড়ী নন্দজাত উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়।

শুভ দিনে সুসজ্জিত পালকীতে নন্দাদেবীর প্রতিকৃতি বহন করে শোভাযাত্রা বেরয়। শোভাযাত্রায় হাজার হাজার তীর্থকামী মানুষ, বাদ্যভান্ড প্রভৃতি থাকে। শোভা-যাত্রা বৈদেনী হয়ে পাতরনাচুনি, কৈলু বিনায়ক, বগুয়াবাসা, গিনতলী (হুনিয়া-থর) অতিক্রম করে রূপকুন্ডে আসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত অনেকগুলো বড়ী নন্দজাত উৎসবের শোভাযাত্রার মাত্র দুটি পৌঁছুতে পেরেছে হোমকুন্ডে। এবং খেসারত দিতে হয়েছে বহু প্রাণের। রূপকুন্ড এবং জিউনরাগালির পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিত্য ঘটনা। দারুণ তুষারপাত আর তুষার ঝড়ে বহু তীর্থযাত্রী আর ফিরতে

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কোড়িয়ার রাজার মুখের পানে ধূর্ত দৃষ্টি হেনে গভর্ণর বললেন, ঠিক বলছেন তো?

দ্বিধামাত্র না ক'রে কোড়িয়ার রাজা বললেন, নিশ্চয়ই। বলুন না আপনি, কী চাই আপনার।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে গভর্ণর বললেন, আপনার স্টেটের সমস্ত খনিজের স্বত্ব চাই আমার। পারবেন দিতে?

কোড়িয়ার রাজা তাঁর রাজ্যের কয়লার খবর রাখতেন না—রাখার চেষ্টাও করেননি। তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর রাজ্যে মাটির ঘর লেপার 'ছুই' মাটি ছাড়া আর কিছু নেই।

কাজেই গভর্ণরের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে রাজাসাহেবের এক মিনিটও লাগল না। রাজ্যের যাবতীয় খনিজের স্বত্ব তৎক্ষণাৎ লিখে দিলেন তিনি মধ্যপ্রদেশের সরকারকে আইনসম্মত দলিলের মাধ্যমে।

বিনিময়ে হাতি শিকারের অনুমতি মিলল। হৃষ্টচিত্তে বৈকুণ্ঠপুরে ফিরে এসে শিকারের আয়োজন করেন রাজাসাহেব। চিরি-মিরির জঙ্গলে দিন কয়েক ঘোরাঘুরি ক'রে অবশেষে একদিন হাতিটিকে হত্যা করলেন তিনি।

একটি হাতির জন্য কোড়িয়ার কয়লার স্বত্ব ইংরেজ সরকারের নিয়ন্ত্রণে এল। তারপর হ'ল ভূতাত্ত্বিক [illegible] পত্তন হ'ল কয়লাখনির।

পারে নি। রূপকুন্ডের গহবরে অনন্ত শয্যায় ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়ী নন্দজাত উৎসব তাই কঠিন, ত্রিশূলোত্তীর্থ দুর্গম।

চনোনীয়া ঘাট থেকে বেরিয়ে শিল সমুদ্র হিমবাহের নিচের অংশ দিয়ে নন্দাকিনী অতিক্রম করে হোমকুন্ড পৌঁচেছি। কিন্তু হোমকুন্ড দেখে মনে মনে আহত হলাম। কুন্ডের এক পাশের দেওয়াল ছাড়া কুন্ডের কোন অস্তিত্ব নেই।

হোমকুন্ড থেকে ফেরার পথে এক দীর্ঘ গিরিশিরা। পিরামিডের মত ত্রিভুজাকৃতি। গিরিশিরার প্রস্থ দেড়-দু' ফুট। বড় বড় পাথরের খাজে বরফ জমে আছে। অতি সন্তর্পণে সে পথটুকু পার হয়ে 'ঘিথপন' এসে পৌঁছলাম। এখানে এসে দেখলাম সামনে বিস্তীর্ণ তুষার ক্ষেত্র। ডানে চনোনীয়াকোট পর্বতমালা, বামে ত্রিশূলের রেঞ্জ। দুটি হিমবাহ নেমেছে—একটি ত্রিশূলের তৃতীয় শৃঙ্গ হতে, অপরটি চনোনীয়াকোট পর্বতমালা থেকে। হিমবাহের সঙ্গে নোতুন পড়া বরফ মিলে শতশত গজ দীর্ঘ তুষার ক্ষেত্র। মাঝে মাঝে কালো পাথরের মাথা জেগে রয়েছে। তিনটি ধাপে পথ উঠে গেছে ১৮৩০০ ফুট উচ্চে জিউনরাগালি কলের দিকে। চোদ্দ হাজার ফুট হোমকুন্ড থেকে জিউনরাগালির দূরত্ব প্রায় আট মাইল। এই আট মাইলে চার-সাড়ে চার হাজার ফুট চড়াই। সাত-আট ফুট বরফের মধ্য দিয়ে এই পথ আমাদের অতিক্রম করতে হবে। অথচ মাত্র দু'-তিন ফুট বরফ থাকায় রূপকুন্ডের পরিচিত পথ পাতর-নাচুনি, কৈলুবিনায়ক, বগুয়াবাসা, হূনিয়া থর ছেড়ে নোতুন পথে এসেছি—ভাগ্যের কি অদ্ভুত পরিহাস!

বেলা বারোটা নাগাদ আকাশ অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রাশি রাশি মেঘ জিউনরাগালি কলের পিছনে রূপকুন্ড থেকে উঠে আকাশে জমছিল। প্রমাদ গুনলাম। এ পথে বৃষ্টি নামা মানেই তুষারপাত। হঠাৎ গগনবিদারী সহস্র কামানের সম্মিলিত ভীমগর্জন। চমকে উঠলাম। ভয়-বিস্ময়ে তাকালাম ত্রিশূল পর্বতের দিকে। আমার বিস্মিত দৃষ্টিকে চমৎকৃত করে নামল বিশাল এক বরফখন্ড। দিগন্ত জোড়া তার ব্যাপ্তি। ত্রিশূলের তৃতীয় শৃঙ্গ থেকে হচ্ছে হিমানী সম্প্রপাত! লক্ষ-কোটি মণ বরফ চূর্ণ গুঁড়ো দুধের মত কে যেন আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে। শাদা কুয়াশায় আকাশ আবৃত।

—শো বাইরে, এ্যাভালান্স আ রহা হ্যায়!

হুকুমের সাবধান বাণীতে কে শুয়েছে জানিনা, আমি শুইনি। এমন বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার সৌন্দর্য বলব না বিভীষিকা বলব, রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে ভুলে গেছি নিজের অবস্থান। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছি প্রকৃতির ধ্বংসলীলার তান্ডব নৃত্য দেখে।

আর মাত্র কয়েক শো গজ উঠলেই জিউনরাগালি কল। দেহে কিন্তু সামর্থ্যের ঘাটতি পড়েছে। নরম বরফে হাঁটু, কোমর, বুক অব্দি ডুবে আছি। বাগদোয়ার রতন টেনে তুলছে। এগুচ্ছি আগে, কিছুটা যন্ত্রের মত। পিপাসায় গলা কাঠ। ঢোক গিলতে যাচ্ছি—কান্না পাচ্ছে। মুখে গলা চেরা রক্তের ছিটে। ওপর দিকে তাকালাম। হুকুম সিং, সমর ও কৈদানাথ উঠে গেছে জিউনরাগালি কলে। তুষার ঝড় চলছে অকরুণভাবে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, তবু

চলার নেই বিরাম। হঠাৎ এক সময় চড়াই শেষ হল। জিউন্‌রাগলি কলে পেঁছিলাম।

ত্রিশূল আর চনোনীয়াকোট পর্বতমালার মুখোমুখি হঠাৎ থমকে দাঁড়ানোর মধ্যবর্তী এক অপরিসর অংশ জিউন্‌রাগলি গিরিপথ। বিভীষিকাময় জিউন্‌রাগলি বহু তীর্থযাত্রীর প্রাণের মূল্য নিয়ে বড়ী নন্দজাত উৎসবের পথ ছেড়ে দেয়। এই অপরিসর স্থানে, তুষারঝঞ্ঝা হলে দিশেহারা মানুষ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে ছোটাছুটি করে নিচে অতলান্ত রূপকুণ্ডের গহ্বরে আশ্রয় নেয়। আমাদের পেঁছানর পরই আবার শুরু হল তুষারপাত আর তীব্র তুষারঝঞ্ঝা। পিছনে ভীম-গর্জন করে হিমানী সম্প্রপাত হচ্ছে। নিচে হিমানী সম্প্রপাতের মুখে পড়ে যে অবস্থা হয়েছিল তা মনে পড়ছে। কিন্তু জিউন্‌রাগলির তুষারঝঞ্ঝা চিন্তিত করে তুলল। দলের সবাই এসে গেছে। ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে তুষারের ওপর শুয়ে তুষারঝড় থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছি।

কাঁদছে বৈদ্যনাথ রক্ষিত। হুকুম সিং বলেছে —জিউন্‌রাগলি দোসরা রূপকুণ্ড হয়ে যাবে। কাঁদছে বৈদ্যনাথ আকুল হয়ে। হয়তো ওর সুদূর কোলকাতায় আত্মীয়-স্বজনের কথা মনে করে কাঁদছে। সমর বোঝাচ্ছে ওকে, সান্ত্বনা দিচ্ছে। জ্যোতি পাল অসীম সান্যালকে আঙ্গুলের আংটি খুলে দিয়ে বলছে—বৌদিকে এটা দিও—আর কোনো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি স্ত্রী আর ছেলেটাকে দেবার ইচ্ছা শেষ সময় তোমায় বলেছি। কুলিগুলো অবস্থা দেখে হতভম্ব। ওরা হঠাৎ মালপত্র ছেড়ে পালাচ্ছে। ধমক দিলাম হুকুম সিংকে—ক্যা হোতা হ্যায়? সব আদমী মরোগে? সবকো ওয়াপস করো।

হুকুম সিং ফিরিয়ে এনেছে কুলিদের। অসীম ইতিমধ্যে দড়ির পথ তৈরী করে হাঁক-ডাক শুরু করেছে। দড়ি ধরে নামতে হবে, নামাতে হবে কুলিদের আর মালপত্র, তবেই যদি এই বিভীষিকার রাজত্ব থেকে মুক্তি পায় সবাই। এই অল্প পরিসর স্থানে এতগুলো মানুষের এই দারুণ তুষারঝঞ্ঝায় অবস্থান মৃত্যুর সামিল।

জিউন্‌রাগলি থেকে তিন শ' ফুট নিচে রূপকুণ্ডের তীরে দড়ির সাহায্যে নামল সবাই। সুভাষ রায় জ্যোতিদার সঙ্গে ছায়ার মত লেগে রয়েছে। বিস্ময় জাগে এই ছেলেটাকে দেখে। এমন শান্ত-সেবাপরায়ণ যে শত কষ্ট স্বীকারের পরও মুখে এতটুকু বিরক্তির চিহ্ন নেই।

ষোল ফুট বরফ জমা রূপকুণ্ডের চেহারাই অপরূপ। ছবিতে এ কুণ্ডকে একটি অ্যাম্ফি-থিয়েটারের মত দেখায়। কুণ্ডের তীরে অসংখ্য বড় বড় পাথর ঢেকে গেছে তুষারের নিচে। ডিম্বাকৃতি রূপকুণ্ড এখন তুষার নদী। এরই নিচ দিকে কোন গুপ্তপথে রূপগঙ্গা নদীর উৎস-পথ। ১৯০৫ সালের কোন এক দিন বিখ্যাত পর্বতারোহী লংস্টাফ সাহেব নন্দাদেবী পর্বতের পথের খোঁজে আকস্মিক রূপকুণ্ডের তীরে এসে স্তম্ভিত হয়ে যান। সহস্র মৃত মানুষের কঙ্কাল, তাঁবু-ছত্তোলী দেখে বিস্ময়ে হতবাক হন। এত মৃতদেহ কাদের? কারা এই দুর্গম পথের বিচিত্র কুণ্ডে এসে মৃত্যু বরণ করেছে? যদিও রূপকুণ্ডের নানা কাহিনী গাড়োয়াল জেলার ওয়ান-সুতোল-মান্দোলী ইত্যাদি গ্রামে প্রচলিত ছিল। তবু বহুকাল সভ্য জগৎ জানতে পারেনি রূপকুণ্ডের রহস্য।

১৯৫৫ সনের সেপ্টেম্বরে উত্তরপ্রদেশের ফরেস্টার শ্রীমাধোয়াল সিং রূপকুণ্ড অভিযান করে প্রথম এক দুর্ভেদ্য রহস্যের আবরণ উন্মোচনের প্রয়াস পান। সারা বিশ্বে আলোড়ন জাগে। প্রশ্ন ওঠে মৃতদেহগুলো কাদের? ওরা কি ডোগরা রাজপুত জরোভার সিংয়ের সৈন্য-দল, না তিব্বতী ব্যবসায়ী অথবা মহম্মদ বিন্ তোগলকের সৈন্যদল। অথচ নন্দাদেবীর জাগার এবং কনৌজের রাজা যশোদয়াল-কা রাস্যায় আছে আর এক কাহিনী।

চতুর্দশ দশকের শেষ ভাগে বড়ী নন্দজাত উৎসবে যোগ দেন কনৌজের রাজা যশোদয়াল। সঙ্গে নেন স্ত্রী বল্লভা এবং বিরাট অনুচর ও দুলির দল। রাজসিক তীর্থযাত্রা। বৈদিনীকুণ্ড হয়ে তীর্থযাত্রীরা অতিক্রম করেন দুর্গম পথ। পাতরনাচুনীর সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউণ্ডে ক'দিন অবস্থান করেন সুখে। ইতিমধ্যে রাজা রূপসী নর্তকীর নূপুর নিক্কণে ভুলে যান তীর্থ করতে এসেছেন। দেবতা কুপিত হন তাঁর এই অনাচারে। শুরু হয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তীর্থ-যাত্রীরা প্রমাদ গোনে। রাজা স্বপ্ন দেখেন—তিনি ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সুন্দরী নারীর মোহে অন্ধ হয়ে তীর্থপথ কলুষিত করছেন। চমক ভাঙ্গে রাজা যশোদয়ালের। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে অসহায় নর্তকীদের ওপর। তাঁর আদেশে সেই নর্তকীদের জ্যান্ত কবর দেওয়া হয়। পাতরনাচুনী—নর্তকী বাইজীদের করুণ ইতিবৃত্ত নিয়ে দুর্গম হিমালয়ের কোলে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

আসন্নপ্রসবা রাণী বল্লভা পথশ্রমে ক্লান্ত দুর্গম রূপকুণ্ড আর মাত্র কয়েক মাইল, অথচ সামান্য পথ তাঁর কাছে সীমাহীন বলে মনে হয় অবশেষে এক কাল সন্ধ্যায় প্রসব বেদনায় কাতর হলেন বল্লভা। রাজার অনুচরেরা কঠিন পরিশ্রম করে তৈরী করলেন শ্লেট পাথরের প্রসবগৃহ।

রাজকীয় তীর্থযাত্রী দলের একটি অংশ রূপকুণ্ড ছাড়িয়ে জিউন্‌রাগলিতে পৌঁ গেছে। তাঁবু খাটিয়ে তারা বিশ্রাম সুখে মগ্ন হঠাৎ দেখা দিল দুর্যোগ। শুরু হল দারু তুষারপাত আর তুষার-ঝঞ্ঝা। দমকা হাওয়া উড়ে গেল তাঁবু। যাত্রীরা হতভম্ব! নন্দ ভগবতী ক্রুদ্ধ হয়েছেন! কেন?—এ প্রশ্নে উত্তর আর তাদের পেতে হয়নি। দিশাহারা যাত্রীরা স্বল্পপরিসর জিউন্‌রাগলিতে ছুটোছু করতে গিয়ে নিচে রূপকুণ্ডের গহ্বরে পড়েছে চাপা পড়েছে বরফ আর বড় বড় পাথরের নিচে

রাণী বল্লভা দেবভূমি কলুষিত করেছে তাই নন্দাভগবতীর কোপে প্রকৃতির এই রু রূপ। নবজাতককে বুকে চেপে রাণী বল্লভা ত্রিশূলী তীর্থকামী রাজা যশোদয়াল আর তাঁ অনুচরেরা রূপকুণ্ডের তীরে, বলুগা সুলেড়া তুষারের কফিনের নিচে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। বলগা সুলেড়ায় (রাণী বল্লভার সূতিকাগার) আজও শ্লেট পাথরের তৈরী ঘরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

রাজা যশোদয়ালের তীর্থযাত্রী দল ছাড়া নন্দজাত উৎসবে যোগদানকারী তীর্থযাত্রীদের মৃতদেহ আশ্রয় নিয়েছে রূপকুণ্ডের তীরে।

রহস্যাবৃত রূপকুণ্ড আজও তার রহস্যের জাল উন্মুক্ত করেনি। দলে দলে অভিযাত্রী আসছে এর রহস্যভেদ করতে, সংগৃহীত হচ্ছেও অনেক উপকরণ। হয়তো একদিন রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হবে। স্মরণাতীত কালের ঘুমন্ত মানুষের পরিচয় কাঁয়ে দে একালের মানুষ সভ্য জগতের কাছে।

তুষারের নিচে ওদের আর্তনাদ চাপা পড়ে আছে। চাপা পড়ে আছে ওদের শেষ কথা।

যুগান্তর (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক ১৪নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেনস্থ (কলিকাতা—৩) পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।
যুগ্ম-সম্পাদক—[illegible] চৌধুরী।

সুচীপত্র

কথা ও কাহিনী

বিষয় লেখক

সূচীপত্র

কথা ও কাহিনী

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

কবিতা

সুচীপত্র

কবিতা

সূচীপত্র

অভিনয় জগৎ

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

খেলার দুনিয়া

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

স্কেচ, কার্টুন ও রেখাঙ্কন

সূচীপত্র

ছোটদের পাততাড়ি

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

ছোটদের পাততাড়ি

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

পূজা পাততাড়ির রেখাঙ্কনে

সর্বশ্রী সমর দে, সিদ্ধেশ্বর মিত্র, ধীরেন বল, শ্যামদুলাল কুণ্ডু, রেবতীভূষণ ঘোষ, শৈল চক্রবর্তী, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রঞ্জন দাস ও অনিল মুখোপাধ্যায়।

মহিষাসুরমর্দিনী

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

বর্ষে বর্ষে শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মহাদেবী মহিষমর্দিনীর আগমনী-গীতি বাঙলার আকাশ-বাতাস-জল ধ্বনিত করিয়া তোলে। মহিষমর্দিনীর বহু আখ্যান পুরাণসমূহে নিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে একটি অর্থাৎ শ্রীশ্রীমার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মহিষাসুরবধ-মাহাত্ম্যই সাধারণের নিকট সুপরিচিত। বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে আর একটি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কাহিনী বর্ণিত হইয়েছে।

পিতা দক্ষের মুখে পতিনিন্দা শ্রবণে ক্ষুব্ধা হরজায়া সতী যোগবলে তনুত্যাগ করিয়া হিমাচলগৃহে গিরিরাজ-কন্যকা দেবী পার্বতীরূপে পুনরাবির্ভূতা হইলেন। কঠোর তপস্যার পর হৈমবতী দেবাদিদেবকেই পুনরায় পতিরূপে লাভ করিলেন। অতঃপর হরগৌরীর অভিনব মধুময় দাম্পত্য-জীবনের সূত্রপাত হইল।

একদিন কৈলাসশিখরে দিব্যদম্পতী একাসনে বসিয়া নর্মালাপে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় সহসা উমার মনে কৌতুকস্পৃহা জাগিয়া উঠিল। দেবী পতিকে কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপরত দেবদেবের সকল চাঞ্চল্য অন্তর্হিত হইল। সমাধিযোগাবিষ্ট শরীর স্থির-ধীর-উন্নত, মুখ-মণ্ডল প্রশান্ত গম্ভীর, নাসাগ্রন্যস্তস্তিমিত তাঁহার নয়নের দৃষ্টি অন্তর্মুখী—যেন আপনাতে আপনাকে অবলোকনে বিভোর। এই ব্যাপার দর্শনে চপলচিত্তা গৌরীর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তিনি মহেশ্বরের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার কর-পল্লবদ্বয় প্রসারিত করিয়া যোগীশ্বরের অর্ধস্ফুট কমলনিভ নয়নত্রয় আবৃত করিয়া ফেলিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বভুবন অন্ধতমসাচ্ছন্ন — অমরবৃন্দ স্ফূর্তিহীন—যক্ষ-গন্ধর্ব-সিদ্ধ-কিন্নর প্রভৃতি দেবযোনিগণ ভয়ে কম্পমান। নরলোকে বেদচর্চা বিলুপ্তপ্রায়—যাগযজ্ঞ উৎসন্ন হইবার উপক্রম ঘটিল। চারিদিকে সভয় আর্তনাদ—হাহাকারে দিক্ মুখরিত। সকলেরই মুখে ঐ এক আতঙ্ক-বিস্ময়ের প্রশ্ন—'এ কি ব্যাপার! অকালে প্রলয় কেন?' ভয়ের প্রথম আবেগ কাটিয়া যাইবার পর অনুসন্ধানে দেবগণ জানিতে পারিলেন যে, জগন্মাতা ত্রিলোচনের সহিত কৌতুকক্রীড়াচ্ছলে জগতে এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার আনিয়া ফেলিয়াছেন। তখন কিছু আশ্বস্ত হইয়া তাঁহারা হরপার্বতীর স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় বিচলিত হইয়া শঙ্কর গৌরীকে নিজ নয়নাবরণ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। শঙ্করী মহেশের ত্রিনেত্র-আচ্ছাদন উন্মোচন করিলে ত্রিভুবনের পুঞ্জীভূত অন্ধকার নিমেষে অপসৃত হইয়া জগতে আবার আলোক প্রকাশ পাইল। তখন প্রভু দেবীকে অনুযোগ করিলেন যে, ক্ষণিকের জন্যও তাঁহার নয়ন আবৃত করিয়া উমা জগতে যে আকস্মিক অনর্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করা তাঁহার একান্ত প্রয়োজন। লজ্জিতা, মর্মাহতা, অনুতপ্তা দেবী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে দেবদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন — 'দেব! আদেশ করুন, কোন্ প্রায়শ্চিত্ত আমার যোগ্য?' উত্তরে বিশ্বপতি বলিলেন—'দেবি! অনুতাপে সকল পাপেরই ক্ষয় হয় সত্য; তথাপি মরধামে আদর্শস্থাপনের উদ্দেশ্যে তোমায় কৃচ্ছ্র-তপস্যা করিতে হইবে'।

মহাদেবের আদেশ শিরোধার্য করিয়া পার্বতী কাশীপুরীর অন্তর্গত কম্পানদী-তীরে গমনপূর্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া তীব্র তপস্যায় মগ্ন হইলেন। আরাধ্যদেবতা তাঁহারই হৃদয়বল্লভ—দেবদেব শঙ্কর।

গৌরীর কৃচ্ছ্রসাধনের উৎকট ভাব দর্শনে শিবের হৃদয় তখন স্নেহে ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি দেবীর মাহাত্ম্য নরলোকে প্রখ্যাপিত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে কম্পানদীর জল ক্রমশঃ বর্ধিত হইতেছে দেখিয়া তিনি উমাকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধ্যানরতা গিরিজা অচল অটল—পাষাণ-প্রতিমার মতই স্পন্দনহীন। বয়স্যাগণের কাতর মিনতিতে একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া নদী-স্রোতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন মাত্র; কিন্তু প্রারব্ধ তপস্যা ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। ক্রমশঃ জল বর্ধিত হইয়া যখন তাঁহার দেহ স্পর্শ করিল, তখন তিনি সখীগণকে স্থানত্যাগের আদেশ দিলেন। জল আরও বর্ধিত হইতে লাগিল। অব-শেষে স্রোতোবেগ এমনই প্রবল হইল যে, দেবীকেও ভাসাইয়া লইবার উপক্রম হইল। পূজানিরতা পার্বতী তখন নদীতীরস্থ অনাদি শিবলিঙ্গটি দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় ধ্যানমগ্না হইলেন।

নদীর জল যখন তপস্বিনীর কণ্ঠদেশ পর্যন্ত উঠিল, সেই সময় একটি দৈববাণী শ্রুত হইল—'দেবি! আপনি গৌতম মুনির আশ্রমে গমন করুন, ইহাতে আপনার তপোভঙ্গের প্রত্যবায় জন্মিবে না'। এই দৈবোক্তি শ্রবণে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া গিরিকুমারী গৌতমাশ্রমে গমন করিলেন ও মহর্ষির নিকট ঐ নদীতীরস্থ অদ্ভুত লিঙ্গমাহাত্ম্য অবগত হইলেন।. ঐ অপরূপ অনাদি লিঙ্গটির নাম "অরুণাবলালিঙ্গ।" পরে নদীতীরের বন্যার জল সরিয়া গেলে গৌতমের নিকট তপস্যার বিধিনিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া দেবী পুনরায় ঐ লিঙ্গোপাসনারূপে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে তখন দুর্দান্ত মহিষাসুরের আসুরিক অত্যাচারে সুর-নর-মুনিবৃন্দ সকলেই নিদারুণ নিপীড়িত। সকলে মিলিয়া পাপভারাক্রান্তা দেবী বসুন্ধরাকে অগ্রণীকরতঃ তপোনিরতা গৌরীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় মুহূর্তের জন্য ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দেবী তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিলেন—"মা ভৈঃ!" দেবাদি প্রার্থয়িতৃবর্গ সহর্ষে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলেন। দেবীও পুনরায় সমাধিমগ্না হইলেন। এমন সময় মহিষাসুর স্বয়ং ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্ত আশ্রমের নিরীহ মৃগগণ অসুরপতির দুর্দান্ত অনুচরবৃন্দের লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছে বুঝিয়া দেবীর অনুচরগণ উহাদিগকে মহেশ্বরীর তপোবিঘ্ন উৎপাদন করিতে নিষেধ করিল। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ নিষেধ গ্রাহ্য না করিয়া আসুরী মায়াবলে পক্ষিরূপ ধারণপূর্বক আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। কয়েকজন মায়াবী ধ্যানমগ্না তপস্বিনী গৌরীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যদর্শনে বিস্মিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তপোবনের বাহিরে গমন করিয়া প্রভুকে সংবাদ দিল। তখন মহিষাসুর কৌতূহলবশে এক বৃদ্ধের ছদ্মবেশে স্বয়ং আশ্রমে প্রবেশ করিল ও পার্বতীর পরিচারকবর্গের বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক কথোপকথনচ্ছলে তপস্বিনীর সকল পরিচয়ই জানিতে পারিল।

অতঃপর অসুররাজ দেবীর সন্নিধানে গমনপূর্বক কহিল—'সুন্দরি! আমি ত্রিলোকবিজয়ী অসুরপতি। মহিষী তুমি আমাকে পতিরূপে ভজনা কর'। মৃদু হাসিয়া দেবী উত্তর করিলেন—"বীরবর! বলবানের পত্নী হইব—এই আকাঙ্ক্ষায় সুদীর্ঘকাল অতি কঠোর তপস্যায় মগ্ন আছি। আমাকে যদি পত্নীরূপে পাইতে ইচ্ছা কর, তবে অলৌকিক বীর্যের নিদর্শন দেখাইতে হইবে"।

ক্ষীণদেহা অবলা নারীর মুখে এই স্পর্ধার বাণী শ্রবণে বিস্মিত ও ক্ষিপ্তপ্রায় মহিষদানব বলপূর্বক দেবীকে গ্রহণ করিতে সবেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু ক্ষণমধ্যে তাহার বিস্ময় আরও শতগুণ বর্ধিত হইল। কৈ! সম্মুখের সেই চন্দ্রকরলেখার ন্যায় স্নিগ্ধসৌন্দর্যময়ী, তপঃকৃশা, বলহীনা বালা কোথায় অন্তর্হিত হইল! এ যে তাহার পরিবর্তে প্রোজ্জ্বলপাবকশিখারূপিণী এক অতিদৃপ্তা মহীয়সী দেবী প্রতিমা! হরগৃহিণী উমা-পার্বতী অসুরদলনী দুর্গারূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। দেবীর সাহায্যার্থ চারিদিক হইতে সশস্ত্র সুরবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের অস্ত্রশস্ত্রে দেবীর রণসজ্জা সম্পূর্ণ হইল। আক্রমণের প্রচণ্ডবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া মহিষাসুর প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই আবার সশস্ত্র হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া আসিল। তখন দেবীও যোগবলে নিজদেহ হইতে অসংখ্য মাতৃকা যোগিনী উৎপাদন করিলেন। উভয়পক্ষে তুমু[ল] সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের প[র] দেবীর শূলাঘাতে মহিষাসুর প্রাণ পরিত্যা[গ] করিল। কিন্তু তখনও দেবগণের ভয় সম্পূ[র্ণ] দূর হয় নাই। অতএব তাঁহাদিগের সন্দে[হ] দূর করিবার জন্য দেবী খড়্গাঘাতে মহিষে[র] শিরশ্ছেদনপূর্বক সেই রুধিরাপ্লুত ছি[ন্ন] শীর্ষের উপর ভীমারূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে করাল প্রলয়নৃত্য দর্শনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। দেবগণ সভয়ে দেবীস্তুতি আরম্ভ করিলেন! সন্তু[ষ্টা] তুষ্টা দেবী ধীরে ধীরে তাঁহার সংহার মূর্তি সংবরণ করিয়া পূর্বের পার্বতীরূপে পুন[রায়] প্রকাশিতা হইলেন।

ইহার পর কিছুদিন অতীত হইল। মহিষাসুরের ছিন্নমস্তক তখনও পর্যন্ত ঐ স্থানেই পড়িয়া ছিল। একদিন সখীগণের সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে দেবীর দৃষ্টিতে পড়িল যে, মহিষাসুরের গলদেশ একটি শিবলিঙ্গসংলগ্ন হইয়া আছে। কৌতূহলবশে লিঙ্গটি যেমন তিনি হাতে তুলিয়া দেখিতে গিয়াছেন, অমনি উহা তাঁহার করতলে আটকাইয়া গেল। দেবী বুঝিলেন শিবভক্ত মহিষাসুরকে বধ করায় তাঁহার মহাপাতক জন্মিয়াছে। অনুতাপে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিল। মুনিবর গৌতম সান্ত্বনা দিলেন —'মা! আপনার ত' কোন ক্ষোভের কারণ নাই। আপনার হস্তে নিহত হওয়ার সৌভাগ্যে শাপগ্রস্ত মহিষাসুর মুক্তিলাভ করিয়াছে।'

শুনিয়া দেবী আশ্বস্তা হইলেন। এদিকে তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনার কাল অতিবাহিত হওয়ায় দেবদেব আসিয়া দেবীর সহিত মিলিত হইলেন।

—

রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক লিখিত ও তৎকর্তৃক প্রাপ্ত পত্রগুচ্ছ

শ্রীমতীবাসন্তী চক্রবর্তীর সৌজন্যে

পত্রলেখকগণ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, সৌদামিনী দেবী, মদনমোহন বসু।

॥ ১ ॥

পুরে বোয়ালিয়া **ধর্মসভার সম্পাদক মহাশয়কে**
লিখিত রাজনারায়ণ বসুর চিঠি—

ওঁ তৎসৎ

দেবগৃহ

১৮ই—শকাব্দা ১৮৯১

মান্যবরেষু রামপুরে বোয়ালিয়ার ধর্মসভার
সম্পাদক মহাশয় ধর্মপরায়ণেষু

সম্মান নিবেদন

দেবভাণ্ডার মন্দির ভাঙ্গা লইয়া যে আন্দোলন **হইতেছে** তাহা **শীঘ্র ছাড়িবেন** না। প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া আমাদিগের উহা চালানো **কর্তব্য।** যখন পবিত্র সনাতন ধর্মের জন্য আমরা **প্রাণ** দিতে পারিব তখন ভারতবর্ষের এক নূতন **শ্রী** হইবে নিশ্চয় জানিবেন। সকল হিন্দু **সম্প্রদায়ের এই** আন্দোলনে যোগ দেওয়া কর্তব্য।

"মহিষের সিং বাঁকা,
লড়িবার **সময়** একা।"

ইতি

বশম্বদ—

রাজনারায়ণ বসু

পুনশ্চ : ডাকের ঠিকানা, বৈদ্যনাথ, দেওঘর।

॥ ২ ॥

পণ্ডিত **ঈশ্বরচন্দ্র** বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চিঠি—রাজনারায়ণ বসুকে

শ্রীশ্রীহরিশরণম্

সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্

কয়েক **দিবস** হইল মহাশয়ের পত্র পাইয়াছি। **কিন্তু** নানা কারণে সাতিশয় ব্যস্ততা প্রযুক্ত এতদিন **উত্তর** লিখিতে পারি নাই, ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

আপনার কন্যার বিবাহ **বিষয়ে** অনেক বিবেচনা করিয়াছি কিন্তু আপনাকে কি **পরামর্শ** দিব কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। **ফল কথা** এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোন মতেই **সহজ ব্যাপার** নহে। **প্রথমতঃ** আপনি **ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী।** **ব্রাহ্মধর্মে** আপনার যেরূপ আস্থা **আছে** তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু যে প্রণালীতে কন্যার **বিবাহ দিয়াছেন** যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী **বলিয়া** আপনার বোধ থাকে তাহা হইলে ঐ **প্রণালী** অনুসারে **আপনার কন্যার** বিবাহ **সর্বতোভাবে** বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি দেবেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন **প্রণালী** অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন তাহা হইলে **ব্রাহ্ম** বিবাহ প্রচলিত হওয়া পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবে।

তৃতীয়তঃ ব্রাহ্ম প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কিনা তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। তবে এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে এরূপ বিষয়ে আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থানে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যেরূপে বোধ হয় তদনুসারে কর্ম করাই কর্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায় তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন। আপনপর হিতাহিত বা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।

এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া উপস্থিত বিষয় স্বয়ং কর্তব্য নিরূপণ—আমার মতে সর্বাংশে ভাল হয়।

আমি কায়িক ভাল আছি।

ইতি ৬ আশ্বিন

ভবদীয়

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

॥ ৩ ॥

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিঠি
—রাজনারায়ণ বসুকে—

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু— 52/2, Park Street

আমি গত শনিবারে একটা বক্তৃতা দিয়াছিলাম পত্রিকা এবং ভারতীতে দেখিবেন। আর্যামী ও সাহেবিয়ানা। দঃ রহস্য তাহার ভিতরে বিকট মুখে হাস্য করিতেছে—আপনি দেখিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইবেন—
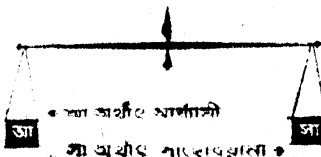
আপনি সৌদামিনীকে **প্রায়ই পত্র লেখেন** আমার চিঠি এগোন না, দার্শনিক **রহস্য মুখ** ব্যাদান করিয়া আছে—যে ভয়ে আপনি শঙ্কিত। আপনার শরীর কেমন? আমার শরীর * * * ভু হু করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে—অল্পই অবশিষ্ট আছে। কর্তামহাশয় তদবৎ—আপনাকে **মনশ্চক্ষে** দেখিয়া সুখ হইতেছে না—যেমন আমার **দন্তহীন** অবস্থায় কৃত্রিম দন্তে লুচোদি **কটর মটর** করিয়া সুখ হয় না সেইরূপ সৌদামিনী আমার ভার দিলেন ও বলিলেন "আমার হইয়া রাজনারায়ণবাবুকে গোটা দুই কথা লিখিও।" আমি তাঁহার জীবিতশক্তি, ইহা তিনি জানেন তবুও আমাকে দিয়া স্বকার্য করাইবেন। ইহাতে তাঁহার সকল অপটুতা প্রকাশ পাইতেছে। কি লিখিব তাহা আমাকে বলেন নাই।—তাঁহার মনের ভিতরে কি আছে তাহা আমি কিছুই জানি না কাজেই আমি যতটুকু জানি তাহাই লিখি—তিনি আলস্য প্রযুক্ত আপনাকে **পত্র** লিখিতে কাতর। আপনি তাঁহাকে সদয় অন্তঃকরণে মার্জনা করিবেন। ইতি—

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ ৪ ॥

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত পত্র
রাজনারায়ণ বসুকে—

জগদীশ্বর

সবিনয় নমস্কার পুরঃসর নিবেদনমিদম্

আপনকার প্রেমার্দ্র পত্র প্রাপ্ত হইয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম এবং অমনি আপনার আনন্দোৎফুল্ল উৎসাহকর মুখশ্রী এবং চিত্তরঞ্জন ভঙ্গিম কোমল কলেবর আমার অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইল, যেন আপনি সমাজের সোপান দ্বারা আগমন পূর্বক সহসা আমাকে দর্শন দিলেন।

দূর হইতে প্রণয়পবিত্র মিত্রের স্বহস্ত লিখিত কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইবার অপেক্ষার অধিকতর মধুর ব্যাপার আর কি আছে? যতক্ষণ আপনকার পত্র বারম্বার পাঠ করিলাম ততক্ষণ আপনকার সহিত আলাপ করিয়া **সুখী হইলাম।**

আপনি যে স্থানে (মেদিনীপুরে) রহিয়াছেন তাহা **উত্তম স্থান এবং তথায় খাদ্যসামগ্রীও** সুলভ ও অল্প মূল্য, ইহা আহ্লাদের বিষয়। যদিও তথায় গামা ঘোরা দ্বারে **দ্বারে ঘুরিয়া** বেড়াইতেছে কিন্তু বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) লিখিয়াছেন উহাতে **আপনার কোন**

চিন্তা নাই। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, আপনি এ কর্ম পাইয়া বড় সন্তুষ্ট নহেন কারণ অর্থের পরিবর্তে প্রিয় সুহৃদদিগের সংসর্গ ও আলাপ পরিত্যাগ করিতে হইল এবং প্রিয় কর্ম সকল হইতে ক্ষান্ত থাকিতে হইল—(আর এক প্রধান কারণ এই যে, অর্থের নিমিত্তে গণিত বিদ্যাতেও মনোযোগ দিতে হইল)। কিন্তু আপনি মনে রাখিবেন যে, এখনও আপনি মর্তলোকে আছেন, অতএব এ সংসারের স্বভাব কি প্রকারে একেবারে অতিক্রম করিতে পারিবেন।

আপনি কৃ, ম, বন্দ্যোর (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের) উত্তর দিয়া এখানে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন তাহা শীঘ্র নির্বাণ হইবার নহে। সুধাংশুর পত্রে তাহারি প্রতিপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছিল, প্রভাকরে তাহার উত্তর প্রকাশিত হইয়াছে এবং ১০ই মার্চের Intelligencer and Citizen পত্রে উহার অনুবাদ প্রকটিত হইয়াছে। Christian Advocate পত্রে বন্দ্যোর পক্ষে & আপনার প্রতিপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। তাহারও উত্তর প্রস্তুত হইতেছে। বোধ হয় আগামী সোমবারে Intelligencer পত্রে তাহা প্রকাশিত হইবেক।

আমার এক্ষণে শারীরিক সুস্থ আছে। আপনি যখন যেরূপ থাকিবেন লিখিয়া বাধিত করিবেন। আমার সাংসারিক অবস্থা পূর্ববৎ আছে। আপনি আমার নিমিত্তে কয়েকটি শিল্পলিপি পাঠাইতে চাহিয়াছেন উহাতে যথেষ্ট বাধিত হইলাম। তথাকার আচার ব্যবহারাদির বৃত্তান্ত লিখিতে আলস্য করা হইবেক না।

আমাদের ব্রজেশ্বর বিদ্যালঙ্কার আপনাকে নমস্কার জানাইয়াছেন।

বড়বাবুর পত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিব।

ইতি ১লা চৈত্র

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

॥ ৫ ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীর চিঠি : রাজনারায়ণ বসুকে

ওঁ

৩০শে শ্রাবণ,
বৃহস্পতিবার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এবার আপনাকে পত্র লিখিতে বিলম্ব হইয়া গেল, আরবার এখানকার সংবাদ পান নাই বলিয়া ভাবিতেছিলেন সেই কারণে আমি শীঘ্র উত্তর দিয়াছিলাম। এবার ততটা শীঘ্র উত্তর দিবার ততটা আবশ্যক নাই দেখিয়া ধীরে-সুস্থে লিখিতেছি।

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী বলিয়া—একখানি পুস্তক আপনি প্রকাশিত করিয়াছেন তাহাতে আপনার ও বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে। বেদের ও উপনিষদের সার মর্ম যাহা তাই লইয়া তিনি

সীমিত স্বাধীনতা : দীপাল ঘোষ

পণ্ডিতদের সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াছেন এবং অনেক দেশের কুপ্রথা নিবারণ করিয়া গিয়াছেন। সহমরণ উঠিয়া দিবার নিমিত্তে কতই তাঁর পরিশ্রম করিতে ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। এই পুস্তকটি পাঠ করিয়া তাঁর কাজের অনেক পরিচয় পাওয়া গেল এবং অনেক জ্ঞান লাভ হইল। তিনি যে আমাদের দেশে একটি মহৎ লোক জন্মেছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) আজকাল ভারি ব্যস্ত। তিনি একটি বিষয় লিখছেন সেইটি এই শনিবারে সাধারণদের নিকট বক্তৃতা দেবেন। তাঁর আহার নিদ্রার অবসর নাই। দিন রাত সেই লেখা লইয়া মাথা ঘোরাইতেছেন। সে লেখার বিষয়াদি এই—"আর্যামী ও সাহেবিয়ানা"—। আপনি এ সময় এখানে থাকিলে তার পক্ষে বড় ভাল হতো, এক একবার আপনার জন্য বড় আক্ষেপ করেন।

আপনি ও বধূমাতা সকলেই বোধ হয় কুশলে আছেন। এখানকার মঙ্গল জানিবেন।

সৌদামিনী দেবী

॥ ৬ ॥

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন বসুর চিঠি—ইনি বিধবা বিবাহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কার্যে খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

শ্রীঈশ্বর সহায়

কলিকাতা
১৪ই শ্রাবণ ১২৮৯

প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং

অতীব দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গতকল্য রজনীতে প্রায় আড়াইটার সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ... সকলেই কাতর। সহরশুদ্ধ ... কি ভারতবর্ষ সমুদয় তাঁহার ... দুঃখ প্রকাশ করিবেক। তিনি ... তিনি যাহা ছিলেন তেমন ... পারিবেক। তাঁহার নিকট ... লোকে আসিত। কেহ বা আপনার ... পড়াইবার জন্য আসিতেন, কেহ বা ... নাই বলিয়া আসিতেন, কেহ বা ... করিয়া দিবার জন্য আসিতেন। কেহ বা ... কন্যার পুনর্বিবাহ দিবার জন্য আসিতেন ... না কর্ম করিয়া দিবার জন্য আসিতেন ... সহ্য গুণ অসাধারণ ছিল। লোকে ... এরূপে বিরক্ত করিত তবুও তিনি বিরক্ত ... না। অন্য লোক হইলে বাটির ... বসাইয়া রাখিত কিন্তু তিনি ... দরওয়ান বসান নাই। তাঁহার ... যেতে পথ বাড়িয়া যায় এক্ষণে ... মিত্রের কথা লিখি। লোকেরা বলিতেছে যে ... দুইজনে পরামর্শ করিয়া ... ২।। (আড়াই) ঘণ্টার তফাৎ। ... ভারতবর্ষ একটি Savant হারাইয়া ...

মদনমোহন বসু

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পত্রাবলী

অবন্তীদেবীর সৌজন্যে

॥ ১ ॥

Allahabad.
9th Nov. '89

মা!

আমি ও মহলানবিশ মহাশয় (*) গতকল্য রাত্রে লক্ষ্ণৌ হইতে এলাহাবাদে আসিয়াছি। এখানে ৩।৪ দিন বিলম্ব হইবে। কাপড়-চোপড় কাচাইয়া লইতে হইবে। আমরা শারীরিক ভাল আছি। তোমার কার্ড ও পত্র লক্ষ্ণৌতে পাইয়াছি। সরলার (১) পত্রে জানিলাম যে তোমার দিদিমা অন্নপথ্য করিয়াছেন শুনিয়া ভাবনা দূর হইল। সরলা লিখিয়াছে যে তাহার মা একাকী বর্ধমান যাইবেন। এরূপ যেন করেন না। তিনি একাকিনী বিধবা স্ত্রীলোক, তিনি থাকাতে আমাদের বিশেষ কিছু ব্যয় নাই। তিনি কেন এত ব্যস্ত হন?

ছায়াময়ী পরিণয় বইখানি আজিও আরম্ভ করিতে পারি নাই, ত্বরায় করিব আশা করিতেছি। নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইলে ওসব কাজ হয় না, ইহা হাটের মধ্যে করিবার কাজ নয়। দেনা দেনাতে জড়াইতেছি। বড় ভয় হইতেছে। ঈশ্বর যাহা করেন। ইতি—

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

* গুরুচরণ মহলানবিশ (অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পিতামহ)।

(১) একটি পালিতা কন্যা।

॥ ২ ॥

ইন্দোর
২৫শে নভেম্বর, ১৮৮৯

মা হেম,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আমরা গতকল্য ইন্দোরে পৌঁছিয়াছি। এখানে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত থাকিব, তৎপরে উজ্জয়িনী হইয়া রতলামের অভিমুখে যাত্রা করিব।......... আমি ও লছমনপ্রসাদ উভয়েই ভাল আছি। আমরা ২রা রতলামে পৌঁছিব। ৫ই, ৬ই নাগাদ আজমীরে যাইব, ৭ই ৮ই নাগাদ আমেদাবাদ রাজকোটেতে পৌঁছিব। তৎপরে বোম্বাইয়ের অভিমুখে যাত্রা। তোমার জেঠাইমা (২) কি ঘরে আসিয়াছেন! তাঁহাকে আমার নমস্কার দিবে ও তাঁহাদের সংবাদ লিখিবে। ইতি—

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

(২) নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের বিধবা পত্নী। তাঁকে শিবনাথের পুত্র-কন্যাগণ 'জেঠাইমা' বলিয়া ডাকিতেন।

॥ ৩ ॥

Khandwa
18th Nov. 1889

মা হেম,

আমি ও লছমনপ্রসাদজী গতকল্য খাণ্ডোয়াতে পৌঁছিয়াছি। নবীনবাবুর বাড়ীর সকলে ভাল আছেন। এখানে নলিনী, নির্মলা, বিমল (৩) প্রভৃতিকে লইয়া বেশ সুখে আছি। স্বর্ণকে (৪) বলিবে তাদের ঘরে আসিয়াছি। আমি এ যাত্রা মান্দ্রাজ যাইতেছি না। সেখান হইতে তাঁহারা টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, ফেব্রুয়ারী মাসে গেলে ভাল হয়। তাহাই করা যাইবে। বাড়ীর সকলকে আমার ভালবাসা জানাইবে ও বাড়ীর সংবাদ দিবে। সরোজিনীর (৫) পড়ার ক্ষতি যেন না হয়। সুখদার কি করিবে? স্বর্ণকে কি বোর্ডিংএ দেওয়া হইবে? তাহাই ভাল বোধ হয়। তাহাতে অনেকটা উপকার হইতে পারে। সুরমাকেও দিতে পারিলে ভাল হয়। ... ইতি—

তোমার পিতা
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

(৩) নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের পুত্র-কন্যা।

(৪) নবীনচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা তখন শিবনাথ পরিবারে থাকিয়া কলিকাতায় স্কুলে পড়িতেন।

(৫) শিবনাথের পালিতা কন্যা, পরে ইনি ডাক্তারি পাস করিয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসকের কার্য করিয়াছিলেন।

॥ ৪ ॥

Lahore
15th Nov. 1897

হেম!

আমি করাচীতে গিয়া জ্বরে পড়িয়াছিলাম। জ্বর হইতে উঠিয়া লাহোরে ফিরিয়া আসিয়াছি। আজ পোঁছিয়াছি ও তাড়াতাড়ি এই কার্ড লিখিতেছি। সুহাসিনীর মুখে শুনিলাম তোমার দুই ছেলেরই রক্তামাশয় হইয়াছে। তাহারা কেমন আছে? ১৭ই বিজলীর জন্মদিন। সেদিন আমি ও সুহাসিনী উপাসনার সময় তাহাকে স্মরণ করিব। কুঞ্জলালের পত্রে জানিলাম যে, বিপিন মধুপুরে আসিতেছেন। তিনি কি আসিয়াছেন? তিনি কতদিন মধুপুরে থাকিবেন? আমার আর অধিক দিন পাঞ্জাবে থাকিবার ইচ্ছা নাই। এলাহাবাদে Mrs, Rav (৬)-এর পীড়া বাড়িতেছে। তাঁহাকে শীঘ্র স্বতন্ত্র করিতে হইবে। আর ৮।১০ দিন পরে এখান হইতে যাইব। সুহাসিনীকে দিল্লী আগরা প্রভৃতি দেখাইয়া মধুপুরে পাঠাইব। ইতি—

শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য।

(৬) নবীনচন্দ্র রায়ের বিধবা।

॥ ৫ ॥

Chandannagar,
11th May, 1900

হেম,

তোমার সব পত্র আমি পাইয়াছি। আজ কাল করিয়া উত্তর দিতে পারি নাই। উত্তর দিব কি! আমার পত্রের উত্তর দিতে প্রতিদিন গড়ে দুই ঘণ্টা করিয়া সময় যায় ও গড়ে তিন আনা করিয়া প্রতিদিন ষ্ট্যাম্পে ব্যয় হয়। তবু সকল পত্রের উত্তর দিয়া উঠিতে পারি না।

সে যাহা হউক, এবারকার "মুকুল" দেখিয়াছি। কামিনীর (৭) কবিতা অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। নাম দিলে ভাল হইত। বিপিনের (৮) 'ধুলো'ও বেশ, তবে ছেলেদের বোধগম্য হওয়া কঠিন। 'হামিরের বিবাহে'র ভাষা কঠিন। তুমি এত কঠিন লেখ কেন? কলম ধরিবার সময় ভাবিতে হইবে যে ১৬ বৎসরের বালক বালিকাদের জন্য লিখিতেছ। 'মুকুল' তোমার হাতে ভালই চলিবে। তবে দুইটি ভয় আছে, [illegible]-Management ভাল চলিবে না। তেমন লোক কেহই নাই। মাসিক পত্রিকার উন্নতি management-এর উপরে দশ আনার অপেক্ষা অধিক নির্ভর করে। management করিতে পারে এরূপ লোক কাহাকেও দেখিতেছি না। দ্বিতীয় ভয় তোমার ঘরকন্না খারাপ হইয়া যাইবে।... তোমার ঘরকন্না সর্বপ্রধান দ্রষ্টব্য তৎ অবসরক্রমে যাহা কর, সকাল করিতে প এ বিষয়ে পরে কথা হইবে। আমি মু লিখিব ইচ্ছা করিয়াছি। পৌরাণিক কথা বা রামায়ণ ও মহাভারত হইতে লিখিবার ই সময় করিতে পারিলে হয়। বড়ই সময়াভাব

আমি কল্য দুপুরের বেলা কলিকা যাইতেছি। তোমার মা তোমার জন্য এক খাবার পাঠাইবেন। সুশীর কাছে থা আসিয়া লইয়া যাইও। ইতি—

তোমার পিতা

(৭) কবি কামিনী রায়।

(৮) শিবনাথের জ্যেষ্ঠ জামাতা।

॥ ৬ ॥

Chandannaga
26th June, 190

প্রিয়, (৯) মঙ্গলবার

তোমার মাকে ও আমাকে যে লিখিয়াছ, তাহা আমরা পাইয়াছি। এই বোধহয় বৃহস্পতিবার তোমার হাতে পৌঁছি সেই দিন তোমার জন্মদিন। মনে করিয়াছি কুঞ্জলালকে একখানা ভাল বই কিনিয়া তো নামে পাঠাইতে বলিয়া আসিব, কিন্তু বলি ভুলিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, তুমি আমা

শিকারা ফোটো : সুস্মিতা ঘোষ

...ের স্নেহাশীর্বাদ জানিবে। আমরা ঐদিন ...ার জন্য পরিবারে বিশেষ প্রার্থনা করিব। ...ও সেদিন বিশেষ চিন্তা ও প্রার্থনাতে ... করিবে। তুমি কখনও আমাদের নিকট ...ে দীর্ঘকালের জন্য দূরে যাও নাই। ...তে বোধ হয় তোমার অনিষ্ট হইয়াছে। ...ার তুমি স্বাধীনভাবে নিজ জীবনের ...ার নিজে করিবার অবসর পাইয়াছ। এ ...টা যেন বৃথা না যায়। তোমাতে যে কিছু ... আছে, তাহা এক্ষণে প্রকাশ পাইবার সময়। ... যদি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিজ ...কে প্রয়োগ কর, নিশ্চয় উন্নতি লাভ করিতে ...বে। আমরা সর্বান্তঃকরণে তোমার ...তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। তুমি একটি ...া কাজ লইয়া বসিলেই তোমার মাকে বায়ু ...বর্তনের জন্য তোমার কাছে পাঠাইব। যখন ... থাক আমাদিগকে সংবাদ দিবে। তুমি কি ... করিতেছ, কোথায় থাকিতেছ, কিরূপ ...কের সহিত আলাপ হইতেছে, সবিশেষ ...িবে। আমরা সর্বদা তোমার জন্য চিন্তিত ... জানিবে।

ইতি—
শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য

(৯) পত্র প্রিয়নাথকে লিখিত। তিনি তখন ...পলকে রাঁচিতে ছিলেন।

॥ ৭ ॥

কলিকাতা,
৪১নং পদ্মপুকুর রোড
২৮শে নভেম্বর, ১৯০২।

...তি ও শ্রদ্ধাপূর্বক, (১০)

... গতকল্য সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিয়া ...পনার প্রেরিত টেলিগ্রাম পাইলাম। ...শ্বরের প্রসাদে বধূমাতা নির্বিঘ্নে পুত্র-...ানের মুখ দেখিয়াছেন এই সংবাদে আমরা ...লেই আনন্দিত হইয়াছি। আমরা নিকটে ...িলে আপনাদিগের সহিত আনন্দ করিতাম। ...ে ঈশ্বর করুন শিশু নিরাপদে রক্ষিত ...া দীর্ঘজীবী হউক। কিন্তু এ পৃথিবীতে ...া মাতা হওয়ার যেমন সুখ আছে তেমনি ...ও আছে। প্রিয়নাথ ও অবন্তীর স্কন্ধে ...াতা গুরুতর ভার অর্পণ করিলেন। তাহা-...কে আশীর্বাদ করুন এবং ঈশ্বর চরণে ...াদের জন্য প্রার্থনা করুন যেন তাহারা এই ... সমুচিতরূপে বহন করিতে সমর্থ হন। ...াতাকে আমাদের স্নেহাশীর্বাদ দিবেন এবং ...পনারা উভয়ে প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানিবেন।

ইতি— প্রেমানুগত
শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী

(১০) পৌত্র অমরনাথের জন্ম সংবাদ পাইয়া ...নাথের মাতামহ কটক নিবাসী মধুসূদন ... (ভক্ত কবি) মহাশয়কে লিখিত।

॥ ৮ ॥

মধুপুর
১০ই মার্চ

...!

... তোমার পোস্টকার্ড পাইয়াছি। আসিবার ... রজবাবুর নিকট ২৪টি টাকা কর্জ করিয়া আসিয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন, তাহা শোধ হইবার আশা আছে। বোধ হয় তাহা শোধ হয় নাই। ইহার উপর আর ঋণ করিবার ইচ্ছা নাই। আমার হাতের টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে। এই জন্যই ভাবিতেছি, আর কয়েকদিন পরেই যাওয়া কর্তব্য। টাকা পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইও না। কর্জপত্র করিও না। ইতিমধ্যে নানাপ্রকারে যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া মনের শান্তি হরণ করিতেছে। এ দাসের যাহা যথার্থ অভাব ঈশ্বর পূর্ণ করিবেন। Mrs. P. C. Sen, কি আসিয়াছেন।

ইতি—

তোমার পিতা

॥ ৯ ॥

C/o Babu Radhakanta Banerjee
Retired Dy. Collector, Puri
23rd October 1906.

হেম,

তোমার পত্র পাইয়া সমুদয় অবগত হইলাম। এখানে আমরা সকলে ভাল আছি। আমি রোজ সমুদ্রে স্নান করিতেছি ও সাগর কূলে বেড়াইতেছি। শরীরটা ভালই আছে। তোমার ছোটমা ও সুশীলা (১১) সমুদ্র জলে খুব স্নান করিতেছেন। আমরা এখানে আর কতদিন থাকিব তাহা এখনও স্থির করি নাই। বৈবাহিক মহাশয় ফিরিবার সময় কটক দিয়া যাইতে বলিয়াছেন। হয়ত কটক দিয়া যাইব।...

কার্তিক মাসটা বড় চিন্তার কাল। খুব সাবধানে থাকিবে। সর্বদা সংবাদ দিবে। তোমার পিসামহাশয় ও পিসীমা (১২) আমাকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিতেছেন না। তোমার ছোটমা অনেক দিন পরে মনমোহিনীকে পাইয়া কাপে কাপে বসিয়া গিয়াছেন। শীঘ্র এখান হইতে নড়িতে চাহেন না। কিন্তু সমাজের কোনও কোনও কাজে আমার সেখানে থাকা আবশ্যক বোধ হইতেছে। দেখি এখান হইতে কতদূর হয়। যখন যাওয়া স্থির করিব তখন তোমাকে জানাইব।

ইতি—

তোমার পিতা

(১১) সুশীলা চক্রবর্তী : স্বর্গীয় শ্রীচরণ চক্রবর্তীর বিধবা পত্নী ও সুলেখক অজিত চক্রবর্তীর মাতা।

(১২) রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার পত্নী মনমোহিনী দেবী। ইঁহাদের বিষয় শাস্ত্রী মহাশয় 'আত্মচরিতে' সবিশেষ লিখিয়াছেন।

কিঞ্চিৎ

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

দক্ষিণ ভারতবর্ষের এক দেশীয় রাজ্যে দিন কয়েক বাস করতে হয়েছিল। কারণ কর্ম-ফল। আষাঢ়-শ্রাবণ মাস নাগাদ গিয়ে কাজে যোগ দিলুম। স্টেশনে নামতেই রঙচঙে পোষাক ও বিরাট পাগড়ীধারী একদল লোক আমাকে অভ্যর্থনা করলে। দেশীয় রাজ্য ঘুরে ঘুরে আমি ঝুনো হয়ে গিয়েছিলুম। এইরকম লাল-নীল আচকান ও পাগড়ী দেখা আমার অভ্যেস ছিল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—আমার বাসস্থান কতদূর?

তারা বললে—কাছেই। আপাতত একটা স্টেট গেস্ট হাউসে আপনার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমার সঙ্গে উড়িষ্যাবাসী পরিচারক শ্রীমান গোবিন্দ ছাড়া আর কেউ নেই। শ্রীমান গোবিন্দ তদারক ক'রে জিনিষপত্র তুলে নিয়ে তাদের জিম্মেয় দিয়ে আমার পেছু পেছু স্টেশন থেকে বেরোলো। স্টেশনের কাছেই বাসস্থান ঠিক হয়েছিল—হেঁটেই সেইটুকু রাস্তা পার হয়ে এলুম।

একটা বড় মাঠের চারদিকে তার দিয়ে ঘেরা। ওরই মধ্যে কাঠের দুটো গেট—তাও ঝুলে পড়েছে। মাঠের মাঝখানটা বেশ উঁচু। এই উঁচু জায়গায় মানুষভর উঁচু পাথরের চাতালের ওপর পাথরের একতলা বাড়ী। পাঁচ-ছটা সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে ওপরে উঠে একটা চওড়া বারান্দা—তার তিন দিক ঢাকা, সামনের দিকটা খোলা। বারান্দার গায়েই দুটো বড় বড় ঘর—তার সঙ্গে এ কোণে ও কোণে চারদিকে আটটা দশটা ঘর—পাথরের উঁচু দেয়াল, চাল খোলার। আমার সঙ্গে যে সব রাজকর্মচারী এসেছিল তারা বললে—ঘরগুলোয় সিলিং লাগানো নেই বটে তবে সিলিং-এর অর্ডার হয়ে গিয়েছে। এখন দোকানদার কাপড় দিতে পারছে না, কাপড় পেলেই সিলিং হয়ে যাবে।

দুটো বড় ঘরের পাথরের মেজেতে মোটা সতরঞ্চি পাতা, খাট, মশারি, ইজিচেয়ার, টেবিল, চেয়ার—কোনো জিনিষেরই কমতি নেই।

কিছুক্ষণ বাদে রাজকর্মচারীরা চলে গেল। আমার গোবিন্দ জিনিষপত্র সব তুলে এ ঘরে ও ঘরে জিনিষপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগল। রান্নাঘরে আমাদের জন্যে কিছু কাঠকয়লা রাখা হয়েছিল, আসবার সময় চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ইত্যাদি সব নিয়ে এসেছিলুম—গোবিন্দ মহা আনন্দে উনুন ধরিয়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দিলে।

আপিসে যাতায়াত আরম্ভ করলুম। আপিস থেকেই গাড়ী আসত, বাড়ী পৌঁছে দিত। দিনের মধ্যে পাঁচ-সাত বার বৃষ্টি হয়। জায়গাটা পাহাড়ে—এমনিতেই ঠাণ্ডা, বর্ষার সময় বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। সবাই বলতে লাগল—এর চেয়েও ঢের বেশি ঠাণ্ডা পড়বে। আসলে এইটেই শীতকাল।

আমি গরম কাপড়-চোপড় সবই বোম্বাইয়ে রেখে এসেছি, আর বেশি ঠাণ্ডা পড়লে কী যে করব বুঝতে পারছি নি। এদিকে বৃষ্টি বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে একদিন গোবিন্দ বললে—মাংসের দোকান খুঁজে পেয়েছি আজ্ঞে।

গোবিন্দ সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। কলকাতা ছেড়ে যখন বোম্বাই আসি তখন গোবিন্দ আমার কাছে এসে জোটে। জাতিতে করণ, মাতৃভাষা উড়িয়া ছাড়া আর কিছুই জানে না। রোগা একহারা চেহারা, রঙ মোটা-মুটি কালো—বয়স পনেরো ষোলো। একেবারে নিরামিষাশী। বোম্বাইয়ে আসবার সময় ট্রেণে তার জন্য রাইসকারি আনিয়েছিলুম। সে উৎসাহ করে খেলে বটে কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরু করলে বমি। বোম্বাইয়ে আমি অন্তত একবেলা মাংস খেতুম, নিজেই রাঁধতুম কিন্তু গোবিন্দ উৎসাহ করে আমার হাত থেকে রাঁধবার ভার কেড়ে নিলে।

আমাদের ফ্ল্যাটের পাশেই দু'টি মুসলমান পরিবার থাকতেন—গোবিন্দ কি ক'রে সে বাড়ীর বাবুর্চির সঙ্গে ভাব করে ফেললে। বাবুর্চিকে সে চাচা বলে ডাকত এবং তারই কাছ থেকে নানা রকমের মাংস রান্না শিখত আর বাড়ীতে এসে তারই মহড়া দিত। গোবিন্দ বলত—তার চাচা কলকাতার কোনো এক সৌখীন মহারাজের বাড়ীতে বাবুর্চি ছিল। সেখানে প্রায়ই লাটসাহেব আসতেন খানা খেতে। সেই বাবুর্চির কাছ থেকে গোবিন্দ চপ-কাটলেট-বিরিয়ানি এবং আরও কয়েক রকম রান্না শিখে ফেললে। তরকারী তার মুখে আর রোচে না।

দু'টি বেলা মাংস-সেবন করে দেহটি তার বেশ পুষ্ট হতে লাগল। আমার আত্মীয় পরিজনবর্গ এসে পড়ায় তার স্বাধীনতা কিছু খর্ব হয়ে পড়ল। কিন্তু রাঁধবার ভার সে কিছুতেই ছাড়বে না এবং তার হাতের রান্না খেয়ে এরাও যে ক'দিন এখানে ছিল বেশ খুশিই ছিল। এখানে এসে গোবিন্দ একেবারে চারখানা হয়ে পড়ল। কোনো বাধা নেই, বলবার বা বারণ করবার কেউ নেই। নিজের ইচ্ছেয় বাজার করে, নিজের ইচ্ছেয় রান্না করে —এমনি ভাবেই চলতে থাকল।

এদিকে বৃষ্টি দিনে দিনে বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়ছে। আপিসে সবাই বলে বর্ষাকাল পার না হ'লে এখানে কাজকর্ম কিছুই আরম্ভ হয় না। এক এক দিন ভোর থেকেই সাংঘাতিক বর্ষণ সুরু হয়। মেঘগর্জন নেই, আকাশ অন্ধকার-করা মেঘসঞ্চার নেই, বিনা সমারোহে ঝরঝর ক'রে শুধু ঝরেই চলে। এইসব দিনে ধরণী একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করে মেঘলোকের কাছে। কাজকর্ম সব বন্ধ, হাটবাজারও বসে না, ছেলেমেয়েরা ইস্কুল-কলেজে যায় না, দোকানদার দোকান খুলে বসলেও দোকানদারি করে না—কারণ খদ্দের নেই। এইরকম দিনে দ্বিপ্রাহরিক আহারাদি সেরে দরজার সামনে একটি ছোট ইজিচেয়ার নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে পড়ি—কারণ আপিস থেকে গাড়ী আসবার তাড়া নেই।

চোখের সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে দিই। যতদূর দেখা যায়—ঝমঝম করে জল পড়ে চলেছে। রাস্তায় লোকজনতো দূরের কথা—গাড়ী পর্যন্ত চলছে না। একশ গজ দূরে একটা উঁচু টিলার ওপরে একখানা দু'চালার প্রকাণ্ড খোলার বাড়ী। দূর থেকে মনে হয় দু'দিককার চালা দুটো যেন মাটিতে এসেছে—যেন এক বিরাট কূর্ম হাত-পা-মুখ খোলের মধ্যে টেনে নিয়ে সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজছে।

উঁচু-নিচু মাঠের মাঝখান দিয়ে সরু একটুখানি শাদা পথ চলে গিয়েছে এঁকে-বেঁকে। তারপরে কোথায় হারিয়ে গেছে। পথের কাঁকরগুলো বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ধবধবে শাদা হয়ে গেছে। দূরে—অনেক দূরে যেন একটা আবোয়ারি পর্দা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারই ভেতর দিয়ে পাহাড়ের সার দেখা যাচ্ছে আবছায়ার মত।

মনে পড়ে প্রথম যৌবনে বেকার অবস্থায় আমরা কয়েকটি বেকার বন্ধু মিলে কাব্যগ্রন্থ নিয়ে বসতুম। কোথা দিয়ে দিনরাত্রি কেটে যেত—তা আর হুঁস থাকত না। কোথায় গেল আমাদের সেই দিনগুলি! অতীতের গর্ভ থেকে সুরের রেশ কানে এসে লাগে—"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়!" —"কারে" বলা যায়? কৈশোর যৌবন অতীত হয়ে গেছে, মনে পড়ে না—আয়ু চলে পড়েছে প্রৌঢ়ত্বের প্রান্ত-সীমায়। তবুও সেই "তারে" পাবার আকাঙ্ক্ষায় অন্তর উন্মুখ হয়ে আছে। চিরবিরহী চিত্ত আমার "তারে"-র দেখা এখনও পায়নি। এই বাসনার বোঝা বুকে নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেরিয়েছি। কত লোক বন্ধু হয়েছে, কত অজানার সঙ্গে চির-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি; কিন্তু "তারে" পাবার আকাঙ্ক্ষা অনির্বাণ দীপশিখার মত অন্তরে জ্বলছে। মনে হয় হয়তো এ জন্মে যার দেখা পেলুম না—পরজন্মে তার সঙ্গে দেখা হবে; কিন্তু তখুনি মনে হয় পরজন্ম কি সত্যই কিছু আছে?

প্রথম জীবনে যে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশই তা শিথিল হয়ে আসছে। কত আপনার জন, আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়তম ভাই-বন্ধু চলে গিয়েছে—পরজন্ম যদি থাকত সেখান থেকে কোনো দিনই কি আমার কাছে আসত না? এমন সংশয়ময় ঘননীল যবনিকা যদি ঘনতর হয়ে ওঠে তবে তো এ জীবন বৃথাই কেটে গেল। ব্যর্থতার বেদনায় ব্যথিয়ে ওঠে মন—চোখ আপনি বন্ধ হয়ে আসে, তারই মধ্যে অশ্রুও এসে জোটে। হয়তো এই পরম ক্ষণটিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে উপভোগ করছি এমন সময় গোবিন্দর কর্কশ কণ্ঠে চটকান ভেঙে যায়—চা এনেছি আজ্ঞে—

চোখ চেয়ে দেখি—ধূমায়মান পেয়ালা হাতে নিয়ে গোবিন্দ দাঁড়িয়ে আছে।

বলি—ওই বড় ইজিচেয়ারটার হাতলে রাখ—আমি যাচ্ছি।

উঠেই মুখে চোখে জল দিয়ে চা খেতে বসলুম। বাইরে বৃষ্টি তখনও ঝরে যাচ্ছে—ঝর ঝর ঝর।

চা-পানের সঙ্গে সঙ্গে আবার সংসার-ক্ষেত্রে নেমে আসতে হলো। হাঁক দিলুম—গোবিন্দ—গোবিন্দ—

গোবিন্দর দেখা নেই। এখানে এসে অবধি আমার হয়েছে দিনান্তে গোবিন্দ, নিশান্তে গোবিন্দ, দিনার্ধে গোবিন্দ, নিশার্ধে গোবিন্দ,—

গোবিন্দ ছুটতে ছুটতে এলো—আজ্ঞে—

জিজ্ঞাসা করলুম—এ বেলা কি পাকাচ্ছ?

গোবিন্দ বললে—আজ্ঞে, এখনও বিষ্টি পড়ছে, বাজার তো বসেনি।

জিজ্ঞাসা করলুম—আটা আছে?

উত্তর হলো—আছে।

—আলু আছে?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

—প্যাঁজ আছে?

—আছে আজ্ঞে। "অদা"-ও আছে।

—তবে আর কি আজ্ঞে! আটার লুচি বানাও আর আলুর দম বানাও। তাড়াতাড়ি খেয়ে লেটিয়ে পড়া যাক।

শ্রাবণ মাসের আর ক'টা দিন মাত্র বাকি। এখন বৃষ্টি অনেক কমেছে, তবু মাঝে মাঝে বড় জ্বালাতন করছে। এইরকম একটা দিনে ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে দেখি—মেঘ। বেশ জমিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আমিও চাদর-খানি মুড়ি দিয়ে জমিয়ে আর একটি ঘুমের জন্য তৈরি হলুম। বোধহয় একটু ঘুমিয়েও পড়েছিলুম—এমন সময় গোবিন্দর চীৎকার—উঠে পড়ুন আজ্ঞে, সর্বনাশ হয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে বললুম—কি হয়েছে রে?

গোবিন্দ মেজের দিকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই দেখুন।

চোখ রগড়ে ভালো করে দেখলুম—মেজেটা একেবারে কালো হয়ে রয়েছে। বাইরের জলধারার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ঘরের মধ্যে শুঁয়োপোকার বৃষ্টি হচ্ছে। আর তাদের কি আকৃতি। মধ্যমা-ঙগুলির মত লম্বা ও সেই রকম মোটা শুঁয়ো-পোকার বর্ষণ হচ্ছে চাল থেকে।

গোবিন্দকে বললুম—শীগ্‌গির ঝ্যাটা নিয়ে আয়।

কিন্তু ঝ্যাটা আনতে যাবে কি করে? পা ফেলবার জায়গা নেই। বালিশের খোল দিয়ে শুঁয়োপোকা একটু একটু করে সরিয়ে পথ করে গোবিন্দ ঝ্যাটা নিয়ে এল। কিন্তু পরিষ্কার করলে কি হবে বৃষ্টি এক সময় থেমে গেল কিন্তু শুঁয়োপোকার বর্ষণ থামল না।

সেদিন আপিসে গিয়ে সকলকে একথা বলতে তারা বললে—খোলার চালের বাড়ীতে বর্ষাকালে ঐ রকম হয়। দু-চার দিন বাদেই থেমে যাবে।

দু-চারদিন খুবই জ্বালাতন করে শুঁয়ো-পোকারা নিরস্ত হোলেন।

শ্রাবণ-ভাদ্র কেটে গেল। আবার ঝকঝকে আলোয় ধরণী হাসতে লাগল। আমারও কাজের চাপ পড়ল। সকালবেলা উঠেই আপিসে চলে যাই, এসেই সন্ধ্যেবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় ঘুম। বেশ চলছিল। এমন সময় সহরে লাগল মায়ের অনুগ্রহ।

আমাদের মধ্যে কয়েকজনের ওপর মায়ের দয়া হওয়ায় কাজ একদম বন্ধ হয়ে গেল। আবার এগারোটায় যাই, বিকেলবেলায় চলে আসি। দিনকাটে তো রাত কাটে না। গোবিন্দকে বললুম—হ্যারে, বাংলা শিখবি?

সে জোর করে ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল—শিখব।

—তা হলে আজই বাজারে গিয়ে একটা শেলেট আর শেলেট পেনসিল কিনে আনবি।

সেদিন থেকে রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গোবিন্দকে বাংলা শেখাতে লাগলুম। গোবিন্দ বেশ মেধাবী ছাত্র—আমিও উৎসাহী শিক্ষক।

এমন সময় একদিন—

রাত্রি প্রায় এগারোটা হবে—আমাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ শেষ হয়েছে—এবার বাতি নিভিয়ে শোবো। গোবিন্দ তার বিছানায় বসে—আমি আমার খাটে বসে, কালকের রান্না যা কি হবে—তারই কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় দমাদ্দম করে জানলা দরজা খুলে গেল। ঘরের বাতিটাও নিভে গেল।

অন্ধকারে বসে ভাবতে লাগলুম—কি হলো? প্রায় কুড়ি পঁচিশ সেকেণ্ড বাদে গোবিন্দকে ডাকলুম, কিন্তু গোবিন্দর কোনো সাড়া নেই।

বিজলী আপিসের কোনো গোলমালের

দরুণ বাতি নিভল কি না ভেবে উঠে গিয়ে সুইচে হাত দিয়ে দেখলুম—সুইচটা বন্ধ করা রয়েছে। বাতি জ্বালিয়ে দিলুম। কিন্তু বাতি জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে জানলা-দরজা দমাস করে বন্ধ হয়ে গেল। খাটে গিয়ে বসেছি এমন সময় আমার সামনের ঘরটায় আলো জ্বলে উঠল। গোবিন্দকে ডাক দিলুম—এই গোবিন্দ—

সে বিছানা থেকে উঠে ধীরে ধীরে এসে আমার খাটটি ঘেঁসে দাঁড়াল। দেখলুম ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে—ঠোঁট কাঁপছে:

বললুম—কি রে কি হয়েছে?

সে বললে—আজ্ঞে, এ যে দেবতা আজ্ঞে—

বেশ করে এক পাত্তর কড়া হুইস্কি টেনে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—গোবিন্দ একটু খাবি?

সে বললে—না, আজ্ঞে।

ওদিকে দরজা খোলা বন্ধ ও থেকে থেকে আলো জ্বলতে নিভতে লাগল। গোবিন্দ তার বিছানাটা টেনে নিয়ে এসে খাটে ঠেকিয়ে বসে পড়ল। তাকে বললুম—তুমি শুয়ে পড়, আমিও শুয়ে পড়ি। ও দরজা খোলা বন্ধ হতে থাক আর আলোও জ্বলুক-নিভুক দেখা যাক কতদূর কি হয়।

দুজনে শুয়ে পড়লুম। দরজা কখনো বন্ধ হয়, কখনো খোলে—কখনো জোরে, কখনো আস্তে। শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন উঠে দেখি বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে—জানলা দরজা হাট করে খোলা। গোবিন্দ এখনও ঘুমোচ্ছে দেখে তাকে ঠেলে তুললুম—দেখলুম—তার গা বেশ গরম। বললুম—তোর কিছু করতে হবে না—আমিই সব করে নিচ্ছি।

কিন্তু সে মানলে না। উনুন ধরিয়ে চা করে ফেললে। তখনই বাজারে ছুটল। বাজার থেকে মাংস তরি-তরকারী কিনে নিয়ে এসে রান্না চড়িয়ে দিলে।

সেদিন আপিসে গিয়ে গত রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলা মাত্র সকলে হো হো করে হেসে উঠল। কেউ কেউ উপদেশ দিলে—সোডা একটু বেশি খেয়ো। কেউবা বললে—নেশার ঘোরে ও রকম মনে হয়। এই কয়েক দিনের মধ্যেই আমার একটি ডাক্তার বন্ধু জুটেছিল। তাড়াতাড়ি আপিস থেকে বেরিয়ে ডাক্তারের ওখানে গেলুম আড্ডা দিতে। তাকে রাত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলতে সে বললে—ও রকম কিছু শুনিনি বটে। তবে ও বাড়ীটা ছেড়ে দাও—ওটা ভালো নয়।

ডাক্তারের ডিসপেনসারী থেকে একটা চার আউন্স শিশিতে হুইস্কি ভরে নিলুম। কম্পাউন্ডারকে বলে শিশিটায় আটটি দাগের কাগজ মেরে নিলুম। বাড়ী এসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—হ্যাঁরে সোডা আছে?

সে বললে—হ্যাঁ আজ্ঞে। দুটো সোডা একুনি এনেছি।

আমি তখন বললুম—যা, দুটো জিঞ্জারেট নিয়ে আয়।

জিঞ্জারেট নিয়ে আসার পর তাকে জিজ্ঞেস করলুম—হ্যাঁরে, কি খেয়েছিস?

সে বললে—আজ্ঞে মাংস আর ভাত।

—বেশ করে জ্বরের ওপরে মাংস ভাত

পসারিণী : সুধীন ব্যানার্জি

খেয়েছ? রাত্রিবেলার জন্যে খান কয়েক আটার লুচি বানা, দুজনেই খাবো।

খাওয়া-দাওয়ার পর বসে বসে গল্প করতে লাগলুম। রাত্রি সাড়ে দশটা নাগাদ গোবিন্দকে এক দাগ ওষুধ এক বোতল জিঞ্জারেট দিয়ে খাইয়ে দিলুম। মিনিট কয়েক পরে জিজ্ঞাসা করলুম—কি রকম লাগছে রে গোবিন্দ?

গোবিন্দর মুখখানা হাসিতে সমুজ্জ্বল। সে জোর করে ঘাড় নেড়ে বলল—ওষুধটা খুব ভাল আছে আজ্ঞে।

—দরজা-টরজা সব বন্ধ করেছিস তো?

—হ্যাঁ, আজ্ঞে।

প্রেতলোকের ঘড়ি একেবারে সূর্যের বাচ্চা বললেও হয়। ঠিক এগারটার সময় আবার সেই দড়াম করে দরজা-জানলা সব খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতি সব নির্বাপিত। টর্চটা আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছিলুম। টর্চ জ্বালিয়ে ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিলুম। মুরগীর ঘরটা বাইরে থেকেই শেকল দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হতো। হঠাৎ ঝনাৎ করে শেকল খুলে দরজাটা খুলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে মুরগীর পাল ত্রাস্ত হয়ে পিক-পিক করে মাঠময় ছুটে বেড়াতে লাগল। বেশ বুঝতে পারা গেল—কে যেন তাদের তাড়া দিচ্ছে। বোধ হয় মিনিট দু-তিন এই রকম চলেছিল। তারপর আবার তারা চীৎকার করতে করতে তাদের নিজেদের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল। ইতিমধ্যে আমাদের জানলার সশব্দ উত্থান ও পতন চলতে লাগল।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—কিরে, আর একটু ওষুধ দেবো?

সে বললে—দিন আজ্ঞে।

তারপরে—মানে গোবিন্দর ওষুধ সেবনের পরে আমিও কিঞ্চিৎ ওষুধ সেবন করে গোবিন্দকে বললুম—এবার শুয়ে পড়।

সে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে শুয়ে পড়ল। কিন্তু বৃথা, তখুনি আরো জোরে আওয়াজ করে দরজাটা খুলে গেল। দরজা-জানলা খোলা এবং আলো-জ্বালা অবস্থাতেই আমরা ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন আপিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছি, গোবিন্দ হন্ত-দন্ত হয়ে এসে বললে—এই গাছটাতে ব্রহ্মদত্যি আছে আজ্ঞে।

আমাদের মাঠে কোণের দিকে একটা বড় বট গাছ ছিল। গোবিন্দ সেই দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল—আজ্ঞে, ওর তলায় ফুল আর এক বাটি দুধ আজ সন্ধ্যেবেলায় রেখে আসব আজ্ঞে।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম—এ সংবাদটি তোমায় দিলে কে?

সে বললে—চাচা দিয়েছে। চাচা বজরুগ লোক। তিনি নিজে দেখেছেন।

—বলিহারি বাপ—এখানেও চাচা জুটিয়েছ? কোথায় থাকেন তিনি?

গোবিন্দ বললে—হাটের মধ্যে যে দরগা আছে, তিনি সে দরগার মাতোয়ালি। তিনি আমাকে সস্তায় মুরগী ও ভালো মাখম কিনে দেন। তাকে সবাই মানে— কেউ ঠকায় না।

সন্ধেবেলা একটা বাটিতে করে দুধ আর ফুল গোবিন্দ আগেই কিনে এনেছিল—আমরা দুজনে গিয়ে সেই গাছতলায় রেখে এলুম। মনে মনে বললুম—বাবা ব্রহ্মদৈত্য, একটু নিশ্চিন্দে ঘুমুতে দিও বাবা।

গোবিন্দ তো সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে।

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে গোবিন্দ নিশ্চিন্ত হয়ে শেলেট নিয়ে কর খল ইত্যাদি লিখছে, সাবধানের মার নেই মনে করে সাড়ে দশটা নাগাদ তাকে এক দাগ ওষুধও দিয়েছি, এগারটার সময় শোবার ব্যবস্থাও হচ্ছে—আবার সেই দড়াম দড়াম করে দরজা খোলা আর বন্ধ করা, বাতি নিভে যাওয়া আর জ্বলে ওঠা, মুরগী মাঠে বেড়িয়ে যাওয়া আর ত্রাস্ত হয়ে আবার ঘরে ঢুকে পড়া ইত্যাদি সমানে সুরু হয়ে গেল।

গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলুম কিরে তোর চাচা কি বলে?

গোবিন্দ জবাব দেবে কি, ভয়ে তার কথা বন্ধ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি আর এক দাগ ওষুধ তাকে দিয়ে বললুম—শুয়ে পড়, কালই আমরা বোম্বে চলে যাব।

গোবিন্দ বললে—হ্যাঁ আজ্ঞে, তাই চলুন।

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই গোবিন্দ ছুটল মাঠে; একটু বাদে ফিরে এসে বললে—বেহ্মদাত্যি মশাই বাটি শুদ্ধ খেয়ে ফেলেছেন আজ্ঞে।

তার সঙ্গে তখখুনি গিয়ে দেখলুম—গাছের নিচে সত্যিই বাটি নেই।

একটুখানি ভালো করে দেখতেই বেশ বুঝতে পারলুম কোনো লোক সকালবেলা মাঠে এসে দুধটা গাছের গায়ে ঢেলে দিয়ে বাটিটা নিয়ে সরে পড়েছে।

গোবিন্দকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে ভাবতে বসলুম—কি করা যায়! একটু পরেই সে বাজার থেকে ফিরে বললে—চাচা বলেছে আজ দুপুর বেলায় এসে বাড়ীতে মন্ত্র পড়ে দিয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যে, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

অনেকদিন আগে আমার ওস্তাদের বাড়ীতে এই রকম সব উপদ্রব আরম্ভ হয়েছিল, বন্ধ ঘরের মধ্যে ঝরঝর করে ময়লা এসে পড়ত। সেখানেও এক "চাচা" মন্ত্র-তন্ত্র প'ড়ে কি সব লিখে দেয়ালে কাগজ মেরে দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাদের ও বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হয়। এই কারণে মন্ত্র-তন্ত্রের উপর আমার বিশেষ আস্থা ছিল না। যাই হোক সেদিন দুপুরবেলা আপিসে গিয়ে জানিয়ে দিলুম—দু' এক দিনের মধ্যে যদি আমার জন্যে অন্য বাড়ীর ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব।

এতদিন আমার রাতের অভিজ্ঞতা শুনে যারা হেসেই উড়িয়ে দিতেন, দেখলুম সেদিন তাঁদের অনেকেই আমার কথা শুনে মুখ গম্ভীর করলেন। দু' একজন এমন কথাও বললেন—ও বাড়ীটা সম্বন্ধে অনেক আগে নানা কথা শুনতে পাওয়া যেতো বটে কিন্তু কিছুদিন থেকে ওসব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এইসব মন্তব্য শুনে বেশ খুশি হয়ে ডেরায় ফিরে এলুম। ঘরের মধ্যে ঢুকে ধূপধুনো ও লোবানের গন্ধ পেয়ে গোবিন্দকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি রে গন্ধ কোত্থেকে আসছে?

গোবিন্দ বললে—চাচা এসেছিল আজ্ঞে, তিনি নেমাজ পড়ে, ঐ দেখুন দেয়ালে সব মন্তর মেরে দিয়ে গেছেন।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পরে আশা হলো আজ একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যাবে। কিন্তু সেদিন আবার এক নতুন উৎপাত ঘটে গেল।

আমার ঘরের পাশের ঘরটিতে বাক্স পেঁটরা রাখা ছিল। আমার ট্রাঙ্কটার তলায় দুটো চাকাও লাগানো ছিল। দেখলুম পাথরের মেজে দিয়ে ঘড়াক্ ঘড়াক্ ক'রে স্বয়ংচালিত হ'য়ে সেটা আমার ঘরে এসে ঢুকল। তারপরে সতরঞ্চির ওপর দিয়ে সেই ভাবে ঘসড়াতে ঘসড়াতে এসে আমার খাটের সামনে স্থির হয়ে এসে দাঁড়াল। গোবিন্দের দিকে চেয়ে দেখলুম সে বিস্ফারিত লোচনে ট্রাঙ্কটার দিকে চেয়ে আছে অর্থাৎ এর পরে কি হয় বোধহয় তারই দিকে নজর রাখছে। জিজ্ঞাসা করলুম—কি গোবিন্দ, তোর চাচা কোথায়?

ওদিকে চ্যাঁ চ্যাঁ করে একটা আওয়াজ কানে যেতেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি ওদিককার ঘর থেকে গোবিন্দর টিনের বাক্সটা এগিয়ে আসছে। ডাকলুম—গোবিন্দ—ও গোবিন্দ—

কিন্তু গোবিন্দ হতবাক্। বলা বাহুল্য, গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর সামনে এসে দাঁড়াল। গোবিন্দকে ডেকে তাকে তাড়াতাড়ি এক ডোজ ওষুধ তোয়ের করে দিলুম। তাকে বললুম—তোর বাক্সটা ঘরের কোণে রেখে দে। আর আমার ট্রাঙ্কটাও ঠেলে ঘরের এক পাশে রেখে দে।

কিন্তু তখুনি গোবিন্দর বাক্স গোবিন্দর কাছে আর আমার ট্রাঙ্ক আমার কাছে এসে পড়ল। এই রকম রাত্রি প্রায় বারটা অবধি ভূতের সঙ্গে খেলা ক'রে সর্বাঙ্গ টাটিয়ে গেল। আবার আমরা এক এক ডোজে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বার মতলব করছি এমন সময় দেখি পায়খানা থেকে কমোডটা সরতে সরতে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। অবশ্য অবস্থাটা কমোডে বসবার মতই হয়েছিল কিন্তু ভরসা করে আর বসতে পারলুম না—কাজেই শুয়ে পড়া গেল।

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি। দারুণ চীৎকারের চোটে আমরা দুজনেই ধড়মড় করে উঠে পড়লুম। দেখি আমাদের মাঠের মধ্যে গোটা দশেক গাধা ডেকে প্রাণপণে গলা সাধছে। এতদিন ভূতের অত্যাচারে যা না হয়েছে একদিন গাধার চীৎকারে তা হয়ে গেল অর্থাৎ কিনা আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। গোবিন্দকে বললুম—গোবিন্দ বিছানাপত্তর বাঁধ, বাসন-কোসন তুলে ফেল। শুধু এ বেলা রাঁধবার জন্যে দু'একখানা বাসন বাইরে রাখ। একটা মুরগী মেরে ঝোল বানা আর ভাত। আজই আড়াইটার কিংবা সন্ধ্যের গাড়ীতে চলে যাব।

গোবিন্দ বললে—মুরগী তো নেই আজ্ঞে।

—সে কিরে! অতগুলো মুরগী কি করলি?

—চাচাকে দিয়ে দিয়েছি আজ্ঞে।

—বেশ করেছ আজ্ঞে। তাহলে আর রেঁধে কাজ নেই আজ্ঞে। আমরা হোটেলেই খেয়ে নেব আজ্ঞে। একটা গাড়ী ডাক, একখুনি আপিসে যাব।

গোবিন্দ গাড়ী ডেকে নিয়ে এলে তখুনি বেরিয়ে পড়লুম। তাদের আপিসে গিয়ে জানালুম—আমি আজই চলে যাচ্ছি, বাড়ী ঠিক করে আমায় টেলিগ্রাফ করবেন—আমি চলে আসব।

ওরা বললে—বাড়ীতো ঠিক হ'য়ে গিয়েছে।

একজন লোককে ডেকে আমাকে বললে—এর সঙ্গে যান। এ আপনাদের নতুন বাড়ীর দরজার তালা খুলে দেবে। এ কদিন বাড়ীটা ধোয়া হচ্ছিল বলে আর আপনাদের জানানো হয়নি।

মনে মনে ভাবলুম—এখানে সবই ভূতগত ব্যাপার দেখছি।

ফিরে এসে তখুনি গোবিন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে জিনিষপত্তর তুলে নতুন বাড়ীতে গিয়ে ওঠা গেল।

দিব্যি বাড়ী—দোতলা। সামনে খানিকটা জায়গায় বাগান। ঘরে ঘরে আসবাবপত্র ঝকঝক করছে। বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য দরবার থেকে এই বাড়ীটাই নির্দিষ্ট আছে।

ভূতের কল্যাণে এখানেই কায়েমি হয়ে বসা গেল। এখানে ভূতগত নতুন অভিজ্ঞতা কিছু হয়নি বটে তবে মানুষের জীবনে নিত্যই নতুন অভিজ্ঞতা যা সঞ্চিত হয়ে থাকে তাও কম কৌতুকপ্রদ নয়।
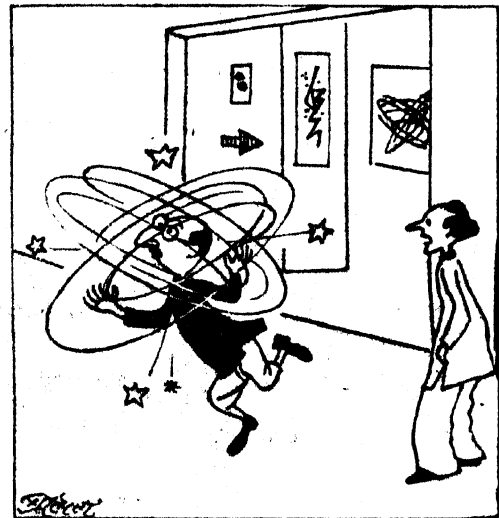
সম্পূর্ণ উপন্যাস
সংকেত
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কথা আমিই অর্থাৎ উমানাথ মুখোপাধ্যায় বলছি কথক হিসাবে। উপন্যাস না গল্প না কারুর কাহিনী তা বলতে পারব না। তবে নাম দিলাম 'সিগন্যাল'। বলতে পারেন—সিগন্যাল-সংকেত উপাখ্যান, কথক আমি। সংকেতই ভাল। নামটা বলেছে আমাকে যার কথা বলছি সেই। তার সঙ্গে আলাপের প্রথমেই যেটা চোখে পড়ল—সেটা তার দুটো চোখ। জবাফুলের মত লাল। না-যেন দুটো রক্তের ঢেলা। তার মধ্যে কালো তারার আভাষ মাত্র জেগে রয়েছে।

আমার দেশের বাড়ী খড়ের চাল মাটির দেওয়াল বটে; কিন্তু দেখতে অতি সুন্দর, যে কোন রুচিসম্মত বাংলোর মত। সামনে বাগান অছে। বাগানটিও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে। লোকে থমকে দাঁড়িয়ে দেখে যায়। একটি বাঁধানো নিমগাছতলা আছে—তার উপরে চারটি খুঁটির উপর খড়ের চাল, দেখে মনে হয় কোন তপোবন বা আশ্রম। আমি সেই নিমগাছতলায় বসেছিলাম। পথিকের সারি চলেছে সামনের সদর রাস্তা দিয়ে। সব সেটেলমেন্ট আপিসের মক্কেল। থমকে দাঁড়াচ্ছে, দেখছে, চলে যাচ্ছে। তার মধ্য থেকে একখানা গামছা মাথায় দিয়ে একটি লোক এসে ভিতরে ঢুকল। লম্বা মানুষ, বেশ শক্ত কাঠামোর লোক। রঙটা গৌরবর্ণ। মাথায় গামছার ঢাকাটার জন্যে মুখখানা দেখে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। তবে কদিন দাড়ি কামানো হয় নি এটা ঠিক এবং একজোড়া গোঁফ আছে। পায়ে একজোড়া টায়ার কাটা স্যাণ্ডেল। গায়ে একটা ঘরে কাচা হাফসার্ট, পরনে লাল নরুণ পেড়ে ন হাতি খাটো ধুতি।

একটু হেঁট হয়ে একটি নমস্কার করে বললে—শ্যামাপতিবাবু আছেন? শ্যামাপতি আমার ভাই; আমি তাকে বলি স্বাধীন আমলের রায়সাহেব। দেশের কাজকর্ম নিয়েই মেতে আছে। সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে। তাঁরা ওকে একটু পাগলা বলে থাকেন। অনেকে চটাও বটে। সে সাধারণ লোকেদের হাজার ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা নিয়ে তাঁদের কাছে যায়, কাজ করিয়ে দেয়। ভাই বলে নয়, ভগবান মানি—তাঁর নামে হলফ নিয়ে বলতে পারি—সে এ থেকে কোন স্বার্থ করে না। কাগজ-কলমে দখল থাকলে—আর মাথা একটু ঠাণ্ডা হলে—এবং কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ধরলে উপরে উঠতে পারত। হাল ধরবার শক্তি তার আছে—পেশী তার শক্ত কিন্তু বুদ্ধিটা সোজা ব'লে বন্দরে নৌকোর ভিড় ঠেলে এঁকে-বেঁকে কূলে এসে ভিড়তে পারলে না। ওর দলের কর্তারা ওকে স্নেহ ক'রেই বলেন দুর্বাসা। দুর্বাসা নামটা ঠিক দিয়েছেন তাঁরা—যেমন কটুভাষী তেমনি খড়ের মত চরিত্র—আগুন ঠেকলেই দাউ দাউ করে জ্বলে। থাক—তার কথা থাক; আগন্তুক তাকেই খুঁজছিল—আমি বললাম—এই তো ছিল—কোথায় গেল। বসুন আসছে।

খানকয়েক লোহার চেয়ার পাতা ছিল—দেখিয়ে দিলাম। সে বসল না। বললে—আপনি উমানাথবাবু?

বললাম—হ্যাঁ।

সে নমস্কার ক'রে বললে—আজ আমার ভাগ্য। আপনাকে দেখলাম। দেখবার বাসনা আমার অনেক দিন থেকে। ব'লে নিমগাছের ছায়ায় একটা বাঁধানো স্বতন্ত্র বেঞ্চির উপর বসে তার মাথার গামছাখানা সরালে।

এবার চোখ দুটো নজরে পড়ল। রক্তের ঢেলা দুটো, কালো তারার আভাষ শুধু দেখা যাচ্ছে। নইলে ভাবতাম অন্ধ। বললাম—আপনার চোখে কি হয়েছে—এমন লাল! শিউরে উঠলাম।

সে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলে। বললে—শিউরে উঠছেন?

—তা উঠছি। কি হয়েছে। চোখ উঠেছে?

—না—ও কিছু না। ধরতে পারলেন না। ও হচ্ছে সিগন্যাল।

—সিগন্যাল? কিসের সিগন্যাল?

—রেড সিগন্যাল।

—রেড? আপনি পলিটিক্স করেন?

—করতাম। আর করিনে। কম্যুনিস্ট কংগ্রেস কিচ্ছু নাই। শুধু মানুষ। ও দুটো আমার পারসোন্যাল সিগন্যাল। লোককে বলে আমার কাছে এসো না। কথাটার মধ্যে দাম্ভিকতা বা রূঢ়তা কি আছে বুঝতে পারলাম না। মুখের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে যে আর এক মানুষ হয়ে গেল। শ্রান্ত ক্লান্ত বিনীত মানুষ একটি। কণ্ঠস্বর নিম্ন হয়ে গেল—সুরে বেদনা বা আক্ষেপ ফুটে উঠল। বললে—কাকে কি বলতে হয় সব সময়ে ঠিক থাকে না মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা হয়। সব কিছুকে যেন বিষিয়ে দেয়। আপনাকে যে কত শ্রদ্ধা করি—আপনাকেই বলে ফেললাম কথাটা।

অনুতাপের বিষন্নতায় ভরা একটি হাসি তার মুখে ফুটে উঠল। আবার বিস্ময় অনুভব করলাম—একটা পাথরে খোদাই করা কঠোর মুখ-ভঙ্গীর মত মুখ এই হাসিটুকুতে শুধু প্রসন্ন কোমল নয় সুন্দরও হয়ে উঠেছে। কারণ বোধ হয় সুন্দর সুগঠিত মুক্তা পাঁতির মত দাঁতগুলি। ঝকঝক করছে।

একটু ভাবছিলাম। সে বললে—একটু জল খাব।

বললাম—নিশ্চয়। রোদ্দুরে এসেছেন। ওরে ধীরেন। জল দে বাবা এঁকে। তারপর তাকে বললাম—কোত্থেকে আসছেন?

—ঘাটবলরামপুর থেকে। হেসে বললে—রাস্তা বেশী নয় শীতকাল—রোদ্দুরও বেশী নয়। গ্রীষ্মের সময় চালের উপর বসে ঘর ছাইয়েছি। সে জন্যে নয়। আমার তেষ্টা পায় বড্ড বেশী। আগে পেত না। এখন এই চোখের ব্যামোর পর থেকে হয়েছে।

ধীরেন একটি প্লেটে দুটি মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে আমার সামনের ছোট টেবিলটির উপর নামিয়ে দিলে।

—মিষ্টি? আমি শুধু জল খাচ্ছি!

আমি বললাম—ওটি আমার গৃহিণীর পুজোর প্রসাদ এবং এটি তাঁর সংসারের নিয়ম।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—মিষ্টি আমি খাই না বাবু।

—খান না?

—না। নিমের পাতা খাই, নিমের ফল মিষ্টি বলে মুখে দি নে। সে আমার চাকরের দিকে তাকিয়ে বললে—দুটো মুড়ি আন তো নিয়ে এস!

শান্ত নম্র কণ্ঠস্বর—কখন শক্ত হয়ে উঠেছিল টের পাই নি শেষ কথা কটায় টের পেলাম। আবার সবিস্ময়ে তার দিকে তাকালাম।

আমার গৃহিণী ভাগবত পড়ছিলেন বারান্দায় [illegible] বিস্মিত হয়ে উঠে এসে বললেন—খাবেন না—কেন? ব্রত-টত—?

—না এমনি খাই না। সামান্য মানুষ সামান্য কাজ করি।

আমি বললাম—কি করেন?

——করি? পাঠশালা করতাম। তা সে উঠে গেল। এখন মাটিও কাটি, লাঙলও চালাই। সরকারী বিলিফে [illegible] খাটি। আবার জাল বুনে তৈরী ক'রে বিক্রীও করি।

—জালও বুনতে পারেন?

—জাল ফেলতেও পারি।

—আপনি তো অসাধারণ লোক!

শান্ত নীরব হাসিতে মুখ ভরে উঠল। হাসলে সুন্দর দেখায় মানুষটিকে—সে এবার আরও সুন্দর হয়ে উঠল। কারণ চোখটি এবার প্রশান্ত।

আমার গৃহিণী ইতিমধ্যে ঘরে গিয়ে একটি গ্লাসে কিছুটা দুধ নিয়ে ফিরে এসে দাঁড়ালেন।—খান।

—দুধ?

—হ্যাঁ। এ তো খাব না বললে চলবে না?

—না-না-না। আমার বাড়ীতে গাই আছে—নিজে সেবা করি, ঘাস কেটে আনি। খাওয়াই। বাড়ীতে আমরা দুটি প্রাণী। সে আর আমি! দুধ আমি খাই। দিন।

দুধ গ্লাসটি নিঃশেষে পান ক'রে জলের গ্লাস তুলে আলগোছে জল খেয়ে, হাত মুখ ধুয়ে নামিয়ে রাখলে। তারপর তৃপ্তির একটি আঃ শব্দ করে সে বললে—গত বড় বন্যার সময়। বুঝলেন তিন দিন একটা চালের উপর বসেছিলাম—নিরম্বু উপবাস করে আর আমার সুরভি—ধসে পড়া বাড়ীর দাদার উপর। তিন দিন—ওরই দুধ খেয়েছি বাটে চুমুক দিয়ে। জল থৈ থৈ চারিদিক-

শব্দে বয়ে যাচ্ছে, তবু খাবার জল নেই। কাদা জল। ওই জল পেয়েছি, আহার পেয়েছি। তিন দিন পর জল নামল। —আশপাশ গ্রামের বন্ধুরা—আমি তখন বামপন্থী বাবু। গোঁড়াপন্থী। কেউ খোঁজ করলে না। প্রথম খোঁজ করলেন শ্যামাপতি-। এই দু কোশ দূর থেকে জল কাদা ঠেলে—

আমার বাড়ী গ্রামের প্রথমেই। আমার বাড়ীতে এসে ডাকলেন—সাই আছ? আমি সেদিন তখন সবে একটা গাটি মাটির ঢিপির থেকে বের করে, ধুয়ে সুরভিকে দুইয়েছি। সুরভির বাছুরটা গিয়েছিল বানে। সুরভির বাঁট দুধ জমে টাটিয়েছিল—সে হাম্বা-শব্দ করে মরা বাচ্চাটাকে ডাকছে। আমার পেট জ্বলছে, গলা-শুকিয়ে আছে—দুধটুকু খাব। এমন সময় ডাক শুনে মাথার আগুন জ্বলে উঠল দপ ক'রে; আবার বাবু ভালও লাগল—মানুষ এল খোঁজ করতে। ডাকছে—দেখছে বেঁচে আছি কিনা। —কে? উনি বললেন—আমি শ্যামাপতি। নবগ্রামের। বেরিয়ে আসতে উনি ঢুকে থপ্ ক'রে বসে পড়লেন। জলে-কাদায় কাপড় একাকার, মোটা মানুষ হাঁপাচ্ছেন, বসেই বললেন—খবর কি বল তো! বললাম—তা তো জানি না, তবে আমি উপর তিন দিন কাটিয়েছি। উনি ও'র জলের বোতল খুলে খেলেন খানিকটা। আমি ও'র হাত চেপে ধরে বললাম—আপনি দুধটুকু খান। ভদ্রলোক ভাল লোকের ছেলে, নামী লোকের ভাই বাড়ী এসেছেন, এইটুকু খান আপনি। উনি আমার হাত ধরে —গোসাই ভাই, তুমি ওটুকু খাও আমি দেখি। আমরা তো বানে ভুগি নি। আমরা তো ভাল ভাল যেমন খাই খেয়েছি। তোমরা উপোস ক'রে আছ। তুমি খাও, আমি দেখি। আমি অনেক কষ্টে এসেছি। নিজে কিছু আনতে পারি নি, তবে আসছে, চাল, ডাল, বিস্কুট, গুঁড়ো দুধ কিছু জোগাড় করেছি—তা আসছে জিপে। আমি ভোরে বেরিয়েছি। ওরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাবে। বুঝেছেন—আমি দুধটা খেলাম। ওই সুরভির দুধ খেয়েই ভরা পেটে মনে মনে বললাম—আর বামপন্থী-টন্থী নয়। মানুষ, শুধু মানুষ আমি। আমি মানুষকে ভালবাসতে চাই, পারি না, ওই দু-চারজনকে বাসি। দু-চারজনও কিন্তু আমাকে ভালবাসে না। এক-আধজন বাসে। আর বাসে আমার সুরভি।

আমার সমস্ত স্নায়ু-শিরার মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল, নির্নিমেষ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। গোঁসাই? গোস্বামী? ঘাটবলরামপুরের নারান গোস্বামী? কেউ বলে—খুনে গোঁসাই। কেউ বলে—দানো গোঁসাই। কেউ বলে—অসুর। আমি কাহিনী শুনেছি অনেকজনের কাছে—অনেক রকম। আমার কাছে বিচিত্র বিস্ময়কর মানুষ। আমার যদি নব মহাভারত লিখবার শক্তি থাকত, তবে তার মধ্যে একটি উপাখ্যান থাকত, নারান গোস্বামী উপাখ্যান—তার নায়ক হ'ত নারান গোস্বামী। ইতিহাসের হাজার কি পাঁচশো বছর আগেও যদি জন্মাতো, তবে হয় তো একটা বংশই সে স্থাপন করতে পারত।

আমি উঠে দুই হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। তুমি—নারান, আমি তোমাকে চিনতে পারি নি। আমি এর আগে দু-তিনবার তোমাকে আসবার জন্যে খবর পাঠিয়েছিলাম, তুমি এস নি।

সে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল—বার বার মৃদুস্বরে বললে—বাবু—বাবু! আমি—আমি। আমাকে ছাড়ুন। বাবু!

আমি বললাম—বাবু নয়। বরং দাদা বল।

—দাদা?

হাঁ! দাদা—

—দাঁড়ান, ছাড়ুন তা হলে—প্রণাম করি।

প্রণাম নিলাম। ধন্য মনে করলাম নিজেকে। নারান গোস্বামী সামান্য বেশী মানুষটি তো সামান্য নয়। অসামান্য। বাংলার
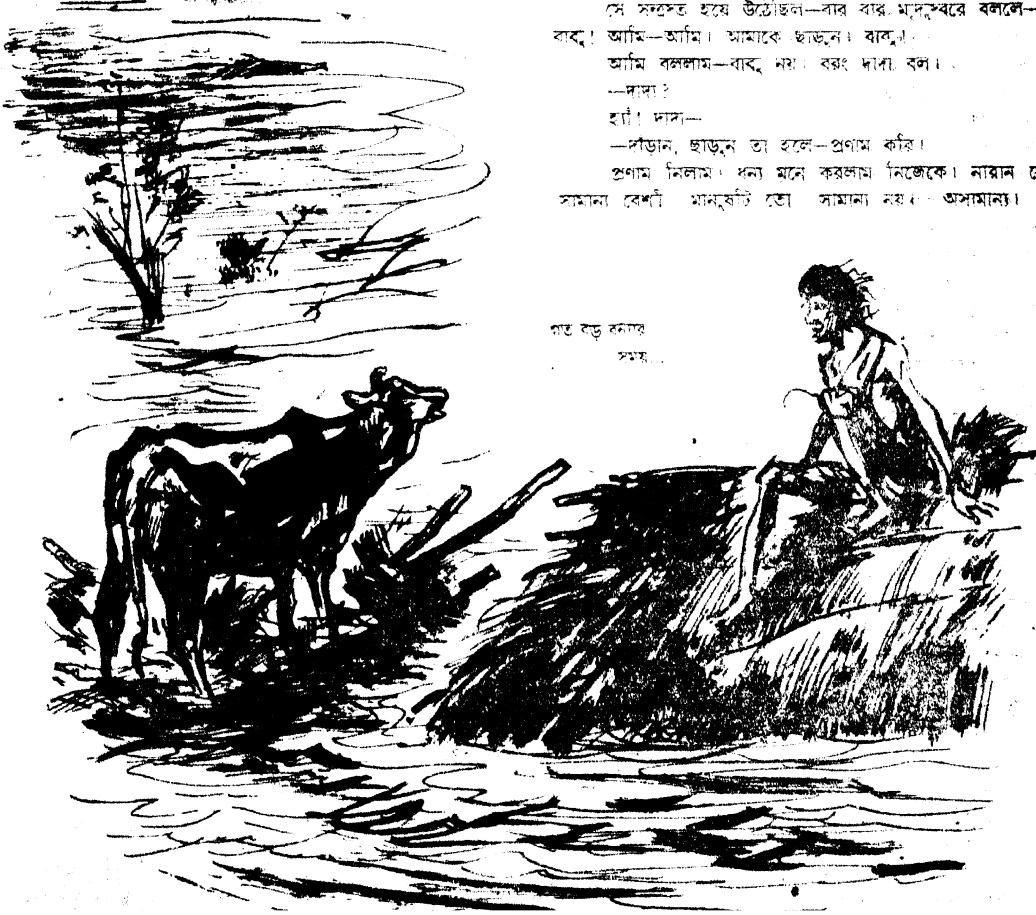
গত বড় বন্যার সময়...

সেক্রেটারিয়েটে বিশ্ববন্ধু একজন ডেপুটি সেক্রেটারী। তার কাছে ওর কথা শুনেছি। বাংলার আইনসভার সভ্য প্রমোদবাবুর কাছে শুনেছি।

নারান বললে—না দাদা, আমি কাঁটা গাছ। আমি মরি না। পোড়ালে আবার জন্মাই, কাটলে আবার গজাই। অমৃত-টমৃত জানি না। অমর বললে বলব, না; তবে মরণ আমার নাই। আর আমার কাঁটার ঘায়ে আমিও জ্বলি। এই দেখুন—কাঁধের হাড় উঠে আছে। মেরেছিল আমাকে! আরও দাগ আছে। এই দেখুন—কপালে একটা মাংসপিন্ড, এক সময় পাথর দিয়ে নিজেই ঠুকেছি, মাথার যন্ত্রণাতেও বটে—জ্বালাতেও বটে।

মৃদু-শান্ত-প্রসন্ন কণ্ঠে বললে নারান্।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ ক'রে বসে রইলাম। তারপর বললাম—কোথায় এসেছ ভাই, এবার তো আমি খবর পাঠাই নি—আর আমিও সবে কাল এসেছি, একেবারে হঠাৎ এসেছি।

—একটু কাজ আছে দাদা সেটেলমেন্ট আপিসে। সামান্য কিছুটা কাঠা-দশেক জমি আমার আছে নদীর ধারে। ওইটে নিয়ে গোলমাল বাধিয়েছে ভুতু চাটুজ্জের ছেলেরা—ওই জমিটার ওপরেই ভুতু চাটুজ্জে খুন হয়েছিল। কিন্তু ওটুকু তো আমি দিতে পারব না। তাই শ্যামাপতিবাবুর কাছে এসেছি—উনি সেটেলমেন্ট আপিসে আমার কাগজপত্র দেখিয়ে মিথ্যে ডিসপিউট যদি কাটিয়ে দেন। উনি বলেছেন—তা করিয়ে দেবেন। আমি বুঝি না, পারি না, তা নয়। কিন্তু—

চুপ ক'রে গেল নারান। স্থির মানুষটি অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। মুখ যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে উঠছে। দাঁতে দাঁতে টিপে ধরে আছে বুঝতে পারছি, দুটো ঠোঁট পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ় নিবদ্ধ কঠিন; চোয়ালের দুটো হাড়কে মনে হচ্ছে যেন চামড়া ঢাকা দুটো বোল্টের মত। নিজের নিষ্ঠুর ক্ষোভকে নিষ্ঠুরতর দৃঢ়তর শক্তিতে নাট্ কষে বোল্ট দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে।

আমি কোন কথা বললাম না। এ-যুগের মানুষের ক্ষোভ আমি জানি। রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত দল কংগ্রেসের সভ্য আমি—কিন্তু তার চেয়েও আগে এবং তার চেয়েও বড় সত্য আমি সাহিত্যিক। তাকে অস্বীকার করব কি করে।

এবং নিশ্বাস ফেলি—নারান আজ বাম-পন্থীও নয়, দক্ষিণপন্থীও নয়; সে যা বলেছে, তা সত্য, সে মানুষ। হয়তো যে জ্বালা তার বুকে—যে ক্ষোভ তার অন্তরে, তার সঙ্গে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস-এর সম্পর্কটাই সব নয়। হয় তো বামপন্থা ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও তার অন্তরে এখনও তার প্রভাব আছে। এবং নারানের ক্ষোভ হয় তো—নারানের ক্ষোভ। তার সঙ্গে অন্য মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। তবু পুরাণে আছে, কাব্যে আছে—এক-একটা মানুষ সারাজীবন অগ্নিদাহে জ্বলে—আর ভগবানকে অভিসম্পাত দেয়, তার সৃষ্টিকে অভিসম্পাত দেয়। জীবনের জ্বালাটা বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে যায়। নারানের সে জ্বালা অবিরাম স্ফুরিত হচ্ছে, আমি দেখতে পাচ্ছি—তার দুই চোখ দিয়ে।

নারান

মিথ্যে বলে নি নারান—ও দুটো রেড সিগন্যালই বটে। রক্তের ঢেলার মধ্যে কালো তারা দুটোর আভাস দেখে মনে পড়ছে—লাল কাঁচের পিছনে যে আলোটা জ্বলে ও দুটো যেন সেই আলো।

(দুই)

—না দাদা! নারানের উপাখ্যান নয়। নারানকে ভুলে যান।

—তবে কার উপাখ্যান? বল, তুমিই বল। নারানকে বললাম আমি।

হেসে বললে—দুখীরামের উপাখ্যান। মা-বাপ নাম রেখেছিল নারান কিন্তু আসলে সে দুখীরাম। সংসারে দুখীরামের শেষ নাই, কোটি কোটি দুখীরাম, অসংখ্য কোটি দুখীরাম। সুখ-সুখ করে ভিড় করে ছোটে। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে, ঠেলাঠেলি ক'রে। একদল একদলকে পায়ে দলে চ'লে যায়। হুচোট্ খেয়ে পড়ে। মরে। এরই মধ্যে দুটো-চারটে দুখীরাম থাকে দাদা—যাদের মরণ হয় না। কই মাছের প্রাণ।

একটু থেমে বললে—কোথা থেকে যে এত শক্তি পায়, তা বলতে পারি না।

*   *   *

ঘাটবলরামপুরে একটা ছেলে জন্মেছিল গোঁসাইদের বাড়ীতে। হরি গোঁসাইয়ের এক মেয়ে এক ছেলে। হরি গোঁসাই বাস করেছিল শ্বশুরের ভিটেতে। শ্বশুরের দুই মেয়ে—বড় মেয়ের হরি গোঁসাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তাকেই ভিটেতে রেখেছিল, ছোট মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল এক পোস্টমাস্টারের সঙ্গে, তার বাড়ী শহরে কলকাতার কাছে। টাকা দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল—সে মেয়ে-জামাই থাকত সেখানে। ক্রমে গাঁয়ের লোক ভুলেই গিয়েছিল তাদের। হরি গোঁসাই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল তিন-চার ক্রোশ দূরে, জামাই সদর [illegible] মোক্তারের মুহুরী। চাষীবাসী সংসার। নারানের আসল নাম দুখীরাম, ভগবান আমি মানি না—তবে ভগবান ছাড়া কার দেওয়া নাম বলব? বলতে পারি, বাঘের মধ্যে যেমন চিতে-বাঘ আছে, গুল-বাঘ আছে, ডোরা-বাঘ আছে, নেকড়ে-বাঘ আছে, কাগো-বাঘও আছে, তেমনি মানুষের মধ্যেও দুখীরাম আছে, সুখীরাম আছে, আরও হয় তো অনেক আছে। নারানের জাতই হল দুখীরামের জাত। হয়ে গেল তাই। হঠাৎ বাপ মরল, মা মরল, নারানের বয়স তখন বছর আটেক; বাস, নারান নারান ঘুচে দুখীরাম হয়ে গেল।

ত্রিসংসারে আপনার মধ্যে বোন-ভগ্নীপতি—আর অনেক দূরে মাসী-মেসো। মাসী-মেসো চিঠি দিয়ে বোধ হয় খোঁজ করেছিল,—তখন থাকত মেদিনীপুরে উড়িষ্যার ধারে। বোন আর বোনাই এসে নারানকে নিয়ে গেল। তখন সে দুখীরাম হয়ে গেছে।

এ উপাখ্যান দুখীরামের। বহু দুখীরামের মধ্যে একজন দুখীরাম।

ভগ্নীপতি রামহৃদয় মাস কয়েক পর সেদিন শুক্রবার সদর থেকে বাড়ী এসেছিল। কিছুকাল ছিল বাড়ীতে। দু-মাইল দূরে একটা বাস টার্মিনাস, সেখান থেকে হেঁটে আসে। শনিবার বিকেলে আসে সোমবার ভোরে উঠে চলে যায়। বেশী বোঝা থাকলে কুলী নিয়ে আসে নইলে নিজেই আনে। রামহৃদয় সেদিন সময়টা শীতের প্রথম এক ঝুড়ি কপি এনেছিল। শনি-রবি দুদিন সকালে কপি ঝুড়িটা গ্রামে বিক্রী করবে। পাঁচ টাকার জিনিষে অন্ততঃ সাত আট টাকা হবে।

হিসেবী লোক। বাড়ীর দোরে নারান দুখীরামের দিদি লক্ষ্মী শঙ্কিত মুখেই দাঁড়িয়ে পাশের প্রতিবেশী শিবু ভল্লাকে বলছিল তুমি একবার যাও শিবু, মিয়াদের ঘিরে এ-ভাব এমন কখন হবে না। নারানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও! আজকের মত ছেড়ে দিতে বল।

দাওয়ায় বসে আট বছরের নারান কেরোসিনের ডিবের সামনে একখানা প্রথম ভাগ খুলে বসেছিল। পাশে খানিকটা মাটি। অমনি গড়ছিল সে একটা পুতুল।

রামহৃদয় থমকে দাঁড়িয়ে বললে—কি? কি হয়েছে?

—গরু।

—গরু কি? গরু?

—গাইটে, পাজের ছোঁড়াটা দেখে নি—কখন গুলো গরু ছটকে গিয়ে নদীর ধারে মিয়াদের তরীর ক্ষেতে ঢুকেছিল—মিয়ারা ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে।

রামহৃদয় কুলীটাকে বললে—নামা। এই নে! বলে একটা দোআনি দিলে। তোকে। সে বললে—দু-আনা কি মশায়?

দুহাত নেড়ে রামহৃদয় বললে—তবে কি দু-টাকা না কি মশায়? এই তো আধ ঘণ্টা পথ। সারাদিনে আট ঘণ্টা খাটলে আট আনা মজুরী। আধ ঘণ্টায় কত হয়? আধ আনা মানে দু পয়সা হয়। তার জায়গায় দু আনা দিয়েছি আবার কি দেবে?

যা বলছি যা!

বলেই সে দাওয়ার দিকে তাকিয়ে নারানকে দেখে ডাকলে—এই! এই! ওরে—শুয়োর! নারানে!

চমকে উঠল নারান—এ্যাঁ?

কাছে গেল হৃদয়—কি হচ্ছে কি?

—পড়ছি!

—পড়ছিস! পড়তে হবে না—উঠে আয়।

—এ্যাঁ।

—উঠে আয় আমার সঙ্গে। গরু ডাকিয়ে আনতে হবে।

—আমার যে পড়া হয় নি। কাল পণ্ডিত মারবে যে?

কানে ধরে তাকে টেনে তুলে হৃদয় বললে, আজ আমি মারব শুয়োর কি বাচ্চা। উঠে আয়। পড়ে তো হাইকোর্টে জজ হবি!

উঠে আয়।

মিয়াদের বাড়ী থেকে গরু খালাস করে—সেই রাত্রে নারানই বেশ নিপুণতার সঙ্গে গরুগুলোকে তাড়িয়ে বাড়ী এনেছিল।

পরদিন সকালে হৃদয় দাওয়ায় বসে তামাক নিয়ে বসবার আগেই ডেকেছিল স্ত্রীকে—বলরাম-পুরের বউ! লক্ষ্মী উনোন ধরাচ্ছিল—হৃদয়ের জন্য চা করবে। নারান মুখ হাত ধুয়ে মুড়ির জন্য বসেছিল, খেয়ে পাঠশালা যাবে। লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। আমাকে ডাকছ।

—তোকে না তো—পরের পরিবারকে ডাকতে যাব?

লক্ষ্মী হৃদয়কে ভয় করে। হৃদয় হৃদয়হীন নয় সে মারে লক্ষ্মীকে। এ নিয়ে হৃদয়ের মনে সংকোচ নেই—লজ্জাও নেই। অকুতোভয়ে চকিতে বলে—বেশ করছি মারছি। নিজের বউকে মারছি। অন্যের গায়ে হাত দিলে কাছারীতে নালিশ করিস। নইলে আমার সঙ্গে মারামারি করিস!

লক্ষ্মী তার কথায় হেসেই বলেছিল—সকাল বেলা কথার ছিরি দেখ দেখি? পরের পরিবারকে ডাকলে যে খেঁটে হাতে আয়ান ঘোষ তেড়িয়ে আসবে।

হৃদয় কল্কেটা দিয়ে বলেছিল—সকাল বেলা মুখে আগুন দিতে বলছি। কল্কেতে আগুন নিয়ে আয়। আর কপিগুলো দেখ। যেগুলো একটু একটু শুকনো হয়েছে সেগুলো আলাদা করে সাজিয়ে দে একটা ডালায়। আর এক কাজ করবি। প্রত্যেকটা থেকে একটা দুটো পাতা ছাড়িয়ে নিবি। দশটা কপিতে একটা হবে। পাতা নে—দুটো তিনটে করে।

লক্ষ্মী বলেছিল বাবাঃ

হুঁ, বাবাই বটে। যা বললাম তাই কর। আর নারানে কোথায়? ও যাবে আমার সঙ্গে কপির ডালাটা নিয়ে। ঐ কালীতলায় ওকে বসাব, আমি দাঁড়িয়ে থাকব, বেচব।

—ও পাঠশালা যাবে না? ক্ষুণ্ণ এবং ক্ষুব্ধস্বরে বললে লক্ষ্মী।

—পাঠশালা? না। পাঠশালা গিয়ে হবে কি?

লক্ষ্মী ঘরের ভিতরে এসে নারানকে বলেছিল, নারান, আজ আর পাঠশালায় তোকে যেতে হবে না।

খুসী হয়ে উঠেছিল নারান। যেতে হবে

—না। তোর জামাইবাবুর সঙ্গে কপি বেচতে যাবি কেমন?

তাতে আরও খুসী হয়েছিল নারান।

লক্ষ্মী কিন্তু অপরাধী মনে করেছিল নিজেকে, বলেছিল—নইলে কতকগুলো কপি একেবারে খারাপ হয়ে যাবে। আজ আমাদের কপির তরকারী হবে। আয় আমার সঙ্গে কপি বাছবি।

নারান একমুহূর্তে অনুভব করেছিল যে সে মস্ত বড় কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এবং কপির পাতা আর ফুল ভেঙে নেওয়া কাজ বেশ নিপুণভাবেই করেছিল—বলতে গেলে লক্ষ্মীর থেকে। লক্ষ্মী হিসেব করছিল—ভয় করছিল ভেঙে নেওয়ার জোচ্চুরী বা চুরি খদ্দেরের কাছে ধরা পড়বে। নারানের সে হিসেব ছিল না। তা ছাড়া ওর হাতে একটি নিপুণতা আছে।

সেদিন কপি বিক্রী করে ফিরে এসে খুসী হয়েছিল হৃদয়। বলেছিল ছোঁড়া চালাক আছে একজন একটা কপি কিনে আর একটা সরাচ্ছিল—ধরে ফেলেছে।

এই সময়েই গাইটে পালের রাখাল এসেছিল গরু খুলতে।

হৃদয় তাকে গতকালকের ঘটনার জন্য তিরস্কার করে বলেছিল—যাঃ তোকে আর গরু চরাতে হবে না। যা!

তারপর ডেকেছিল—নারানে! শোন!

নারান আঁচলে মুড়ি নিয়ে পেঁয়াজ আর লংকা হাতের মুঠোয় ধরে পাশের ভল্লাপাড়ায়

যাবার উদ্যোগ করছিল। ভল্লা-পাড়াটা নারানের খুব ভাল লাগত। ভল্লাদের পেশা চাষ। তরীর চাষে ওরা আশ্চর্য চাষী। তার সঙ্গে ওরা শরীর চর্চা করে। লাঠিয়ালি ওদের বংশানুক্রমিক পেশা। বড় বড় বিয়েতে ওরা রায়বেঁশে নাচে! নানান রকম কসরত দেখায়। গানও

করে। ওদের জীবনে অভাব অনেক। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ আশ্চর্য সহ্যশক্তি তার মধ্যে ওরা কাঁদে না—দুঃখ গেয়ে বেড়ায় না, ওরই মধ্যে ওরা হাসে। হা—হা করে হাসে। এককালে ওরা ডাকাত ছিল। কয়েকজন দাগীও আছে। নারান গল্প করে বিচিত্র বিচিত্র গল্প।

ভূতের নাম করলে হা হা করে হাসে। রাম ভল্লার একটা গল্প তার আজও মনে আছে। ভল্লাদের বাড়ীতে ওই গল্পটাই সে প্রথম শুনে আকৃষ্ট হয়েছিল। গল্প হচ্ছিল 'পেত্যা'র অর্থাৎ আলেয়ার। —রাম বলেছিল—বছর দশেক আগে 'পেত্যা' দেখা দিলে। নদীর ধারে লোকে বলতে লাগল—এক জোড়া পেত্যা ঘোরে। পেত্যা আমার দেখা ছিল। আগে একবার দেখেছিলাম। ধরেছিলাম। ওই নদীর ধারে ধারে চলে আসত। আসত ওই দণ্ডেশ্বর তলা থেকে। দপ-দপ করে জ্বলতে জ্বলতে চলে আসত—এসে ঢুকত ভোগপুরের যোগিনী তলায়! লোকে বলত—ওই গাঁয়ের পাড়ার চাঁড়ালের মেয়ে কামিনী কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরেছে—এ হল—সে। আমি বলি দেখব একদিন। নানান কথা বলত। দূরে থেকে নাকি দেখেছে কেউ কেউ। ওই যোগিনী তলার সন্ন্যেসী বলত—সর্বাঙ্গ চামড়া ওঠা একেবারে শ্বেতির মত। মাথার চুল পোড়া। সে ভয়ংকর ব্যাপার। আমার ভয়ও লাগত আবার ভারী ইচ্ছেও হত! কি হবে? তারপরে

পড়ে তো হাইকোর্টের (?)

একদিন যা হয় হবে ব'লে রাতে উঠে নদীর ধারে—লাঠি একগাছা নিয়ে বসে থাকলাম। টেনে নেশা করলাম। তারপর হঠাৎ দণ্ডেশ্বর তলায় দপ করে আলো জ্বলল। নিভল। আমার বুক ধড়াস করে উঠল। মনে হল—ছুটে পালাই। কিন্তু তারপরেই ধমক দিলাম নিজেকে—খবরদার রামা! তারপর আসতে লাগল, দেখতে তো পাই না অন্ধকারে, হঠাৎ দেখলাম রশি অনেক এগিয়ে এসে আবার দপ। এবার দপ-দপ-দপ করে বার তিনেক। আবার অন্ধকার। আবার রশি অনেক পরে। আবার রশি অনেক পরে। দেখতে দেখতে কাছে। দপ করে জ্বলতেই দেখলাম—সাদা মূর্তি। আমাতে তখন আমি নাই। কিন্তু তারপরই মনে হল কাপড়। হ্যাঁ কাপড়।—আবার দপ। এবার দেখলাম পুরো চেহারা। হাত। পা। আলো জ্বলছে মাথায়। হাঁ-হাঁ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম।—ডাকলাম—কে?

—এ্যাঁ—। বলে চেঁচিয়ে উঠল।

আমি তখন বুঝেছি লাঠি তুলে সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম—মারব লাঠির বাড়ি। ফেল—ফেল—মাথার সরা!

এবার চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম। —কে? কে তু?

কথা কয় না। মাথায় ঘোমটা টেনেছে। টেনে খুলে দিলাম—ঘোমটা। মেয়েটা আছড়ে পড়ল পায়ে—তুমি আমার বাবা।

আমি মাতাল তখন—তার ওপর ভর্তি জোয়ান তবু পিছিয়ে এলাম—বললাম—করছ কি মা। তুমি ব্রাহ্মণ কন্যে। তোমার বাবাকে গুরুর মত ভক্তি করি!— ওঠ মা ওঠ! কিন্তু এ কি কাণ্ড মা?

কাণ্ড ওই—যোগিনী তলার সন্নেসীর কাছে রাতে আসে বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যে। সন্নেসী বললে—আমি কি করব বল? আমি বারণ করি। কিন্তু ও শুনবে না!

আমি বললাম—তা হবে না—তুমি ওকে নিয়ে যাও ভৈরবী করে। আর শোন যদি কখনও এই কন্যে ফিরে এসে বলে সে—তুমি ফেলে পালিয়েছ তবে আমি বেহ্মাণ্ড খুঁজে—লাঠির ঘায়ে মাথা ভেঙে দিয়ে আসব। চল আজই রাতে চল তোমাদিগে ইস্টিশনে রেলে তুলে দিয়ে আসি! তাই দিয়ে এসেছিলাম।

এবার বুঝলি—জোড়া পেত্নী! হুঁ বুঝলাম খেলটা জমিয়েছে—ভাল। দুজনাতে দুটো সরা মাথায় নেত্য করে লীলা করে। বেরিয়ে গেলাম রাত্তিরে। সন্দ হয়েছিল শক্ত ব্যাপার। মানে পেরায় সারা রাত ছুটোছুটি করে। সঙ্গে নিলাম অবিনেশেকে। ছোঁড়াটা শক্ত। গেলাম দুজনায়। দেখলাম হন-হন করে যেন সাইকেলে চড়া মানুষের বেগে—আলো দপ দপ করে জ্বলতে জ্বলতে ছুটে আসছে। মধ্যে মাঝে একই জায়গায়—খানিকক্ষণ ছুটোছুটি করে পাক খেচ্ছে। কি ব্যাপার। অবিনেশে একবার বু-বু করে উঠল। আমি বললাম—এ-ই। আর এই। ছোঁড়া হুন পিছু ফিরেছে। দে ছুট। আমি—বললাম—যা শালা। যাওয়াই ভাল। কোথা ভিমরী খেয়ে পড়বে। বিপদ হবে যাওয়াই ভাল। এক পা এক পা করে নদীর শরবনের আড়াল দিয়ে ওদের পানেই এগুলাম।— তখন কোথা হাত চারেক দূরে দপ ক'রে আলো জ্বলল। চমকে উঠলাম। এ কি রে বাবা। এ যে চার পেয়ে জন্তুরে। কুকুরের মতন। যা হবে হবে বলে সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে দিলাম লাঠি—জয় কালী। চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে পড়ে গেল। আর একটা তখন হ্যা-হ্যা করে তেড়ে আসছে আমাকে—যত হ্যা-হ্যা করে হা করছে—তত দপ দপ করে আলো জ্বলছে। আমি আবার লাঠি তুলে হাঁকড়ালাম। কিন্তু লাগল না। জন্তুটাও পালিয়ে গেল। একটুকুন দাঁড়িয়ে থেকে জন্তুটাকে টেনে নিয়ে এলাম। চামড়াটা নুন দিয়ে মুচিদের ঘরে দিলাম। শেয়াল। একরকম শেয়াল।

আশ্চর্য লাগত! নারান দুখীরাম আশ্চর্য সুখের আস্বাদ পেত ওই গল্পের মধ্যে। বোধহয় ভল্লাদের নিজেদের চেয়েও বেশী। তাই ছুটি পেলেই নারান যেত ভল্লা পাড়ায়।

সেদিনও নারান যাচ্ছিল—ওই ভল্লা পাড়াতেই। মস্ত বড় হুঁকোটা নিয়ে রাম ভল্লা বসে আছে বকুল তলায় ওদের শিব-কালী-হরি সব ঠাকুরের মাটি বাঁধানো আটনের সামনে—চ্যাটাই বিছিয়ে—হয় লাঠি বানাচ্ছে, নয় জাল বুনছে, নয় গায়ের জুত পাচ্ছে না বলে—উঠ-বস করছে ডন টানছে, নইলে কোন একটা তরুণ জোয়ান পিঠের উপর দুহাত মুঠো বেঁধে গুম-গুম শব্দে কিল মারছে। মেয়েরা ঘুঁটে দিচ্ছে—ধান মেলে দিচ্ছে পায়ে পায়ে, ঢেঁকিতে ধান ভানছে, অল্প বয়সীরা কাঠ কুড়ুতে যাবার জন্যে দল বেঁধে দাঁড়িয়েছে—বাকী সঙ্গিনীদের ডাকছে—কই লো সাবি—হ'ল? পাড়া থেকে বেরিয়েই গান ধরবে—একসঙ্গে নদীর ধারের ওলাতে লো ফুল ফুটিছে মটর লতাতে!

সে গেলেই রাম বলত—এস-ঠাকুর এস!

মেয়েরা তাকে বলত—ছোট্ ঠাকুর!

ভল্লা পাড়ায় ছিল তার স্বপ্ন রাজ্য!

সেদিন পা বাড়াতে ভগ্নীপতি হৃদয় তাকে ডেকে বলেছিল—শোন—। এই যে মুড়ি নিয়েছিস আঁচলে। ঠিক হয়েছে। গরুগুলো খোল। তাড়িয়ে নিয়ে যা—নদীর ধারে। খবরদার যেন কারুর খেতে না ঢোকে। তা হলে তোমার পিঠের চামড়া তুলব। সেই তিনটের সময় বাড়ী আনবি। এসে চান ক'রে ভাত খাবি। বুঝলি!

দিদি লক্ষ্মী ছুটে বেরিয়ে এসেছিল—না!

খুব গম্ভীরভাবে হৃদয় বলেছিল—কি?

—গরু চরাবে কি—

—হ্যাঁ চরাবে। গাইটে পালে গরুর চরাট ভাল হয় না। তাছাড়া এই সব ঝঞ্ঝাট!

—তাই বলে—বামুনের ছেলে—

—বামুনের ছেলের চারটে হাত বেরিয়েছে! বামুনের ছেলে। বামুনের ছেলে হলত হল কি? স্বয়ং কৃষ্ণ গরু চরিয়েছেন। গাইটে পালে—পয়সা লাগে!

বলেই হেঁকে বলেছিল—নারানে খোল গরু খোল।

নারানের খারাপ লাগেনি। ভাল লেগেছিল। সে তৎক্ষণাৎ এক গাছ কঞ্চির লাঠি হাতে নিয়ে গরুগুলো খুলে—তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল—নদীর ধারের দিকে। যে দিকে ভল্লাদের ছেলেরা গরু চরায়।

* * *

বলতে তার চেহারা পাল্টেছে। সে হাসছে। মধ্যে হৃদয়ের কথা বলতে বলতে [illegible] মিশিয়ে দিচ্ছে। বলছে কিন্তু [illegible] হঠাৎ থেমে টেবিলের উপর থেকে জলের [illegible] তুলে নিয়ে জল খেলে। একটি বিড়ি [illegible] একটি দুটি মৃদু টান দিয়ে আকাশের [illegible] তাকালে। তারপর আশ্চর্য কণ্ঠে বললে—আকাশ ঠিক আর দেখি না আমি। আর [illegible] দিকে আলোর দিকে তাকাতেও তো পারি [illegible] রাতের আকাশের দিকে তাকাই। তখন [illegible] নদীর ধারে নীল আকাশ বড় ভাল লাগত [illegible] জানেন—নদীর ধারের সব খুব ভাল লা[illegible] আকাশ ভাল লাগত নদীর জল ভাল লা[illegible] বালির ওপরে হাঁটু জল তর-তর করে [illegible] যেত। দহ ছিল একটা অনেক জল। [illegible] স্রোত বোঝা যেত না। দহতে ঝাঁপ [illegible] সাঁতার কাটতাম। নদীর ধারে শরবন—আড়ালে আড়ালে লুকোচুরি খেলতাম। [illegible] ঘাস হ'ত। ঘাসে কত রকেম রকমের [illegible] ফুটত। কুচি-কুচি ফুল। লাল, সাদা, [illegible] হলুদ। কোন দুঃখ ছিল না। দিদি দুঃখ ক[illegible] নারান করত না। দিদি কপালকে মন্দ বল[illegible] বলত না। পৃথিবীতে দুঃখীজনদের সুখ [illegible] নেবার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা আছে। ক্ষ[illegible] তারা অর্জন করে। তার উপর আর একটা [illegible] আছে দাদা—সেটা হল—মায়ের পেট থেকে [illegible] জন্মানোর শক্তি। সুখীজনেরা এটা [illegible] হারায় সুখের মধ্যে বড় হয়ে, দুঃখীজনের [illegible] বাড়ে। নারানের এটা বেড়েছিল [illegible] হুঁচোট যে খেয়েছে, কত যে [illegible] কত যে বিছে কামড়েছে, [illegible] মৌমাছি কামড়েছে [illegible] লেগে মধ্যে মধ্যে পায়ের [illegible] বাবলার কাঁটা ভেঙে [illegible] বের করে দিত। একবার [illegible] কামড়েছিল—সারা [illegible] পড়েছিল। দিদি [illegible] ভল্লাদের বাড়ী থেকে নিয়ে [illegible] অবিশ্যি খানিকটা জোর হয়েছে এবং [illegible] হচ্ছিল—ভল্লাদের কাছে লাঠিখেলা শি[illegible] শূন্যে ডিগবাজী খাওয়া শিখেছিল [illegible] খাওয়া। দেহ যেমন শক্ত হয়েছিল—তেমনি [illegible] আশ্চর্য উল্লাস, উৎসাহময় হয়ে উঠেছিল। দুঃখ-ভয় যেন দূরে পালিয়েছিল—[illegible] একবার একটা শেয়াল ধরেছিলাম [illegible] নদীর ধারে দেখি একটা গর্ত—একটা [illegible] বেরিয়ে আছে, বেশী নয় [illegible] আর চারিপাশে অনেক [illegible] শেয়ালটা গর্তের মধ্যে খরগোসের [illegible] নখে গর্তটা খুঁড়ে তার মধ্যে ঢুকেছে। কিন্তু শেয়াল বলে বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল লেজটা খরগোসের। [illegible] লেজের ডগাটা। সে খপ করে লেজের [illegible] চেপে ধরে টানতে সুরু করেছিল—[illegible] টেনে যখন আধেকটা বের করেছিল [illegible] চিনেছিল শেয়াল বলে। কিন্তু তখন [illegible] দিতে পারেনি। উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বিচরণ করে প্রকৃতির শুধু রূপই [illegible] চেনেনি—তার ক্রোধ, তার হিংসাকেও [illegible] গাছে উঠে পাখীর বাচ্চা পাড়তে গিয়ে মায়েরই ঠোকর খায়নি; বাচ্চাটাও কাম[illegible] [illegible] তা জেনেছিল। সে জানত-

...নি দেখলে ছুটে পালায়, কিন্তু আঘাত ...লে ঘুরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করে। জানত ...য়ালের নাকে দাঁতে শুধু ধারই নেই, তাতে ...বও আছে। সুতরাং ছেড়ে সে দেয়নি; ...ল শক্তি প্রয়োগ করে টেনে বের করেই সে ...টাকে দুই হাতের জোরে পাক দিয়ে ঘোরাতে ...রু করেছিল। বার-কয়েক পাক দিয়ে সে ...কের মুখেই সেটাকে ছেড়ে দিতেই সেটা ...ক আছাড় খেয়ে গিয়ে পড়েছিল খানিকটা ...রে। বেশ একটু দূরে। তারপর দুই হাতে ...লে নিয়েছিল একটা মোটা পাথর। শেয়ালটা ...ন্তু একটু নিঝুম হয়ে পড়ে থেকে কোনরকমে ...ঠে দিয়েছিল চোঁচা দৌড়। দুঃখের কথায়। ...ল গোঁসাই হেসে শান্ত কণ্ঠেই বললে— ...দিনের দুঃখের কথায় মনে হয় কি জানেন ...বু—মনে হয় দুঃখ সেদিন শেয়ালটার মতই ...টে পালিয়েছিল নারানের কাছ থেকে।

...সুখ। নারান বললে সেদিনের সুখের কথা ...ন হলে—মনে পড়ে যায় একটা বুনো লতার ...া। নদীর ধারের জঙ্গলে হয়েছিল—বারো ...স ফুল ধরত, আর গাছের মাথায় মাথায় ...ড়েই চলেছিল, বেড়েই চলেছিল—আর তলায় ...াত হাজার হাজার চারা। চারা বের হত ...ড় থেকে। গরুতে খেতো, মানুষের পায়ে ...ত, মেয়েরা কেটে কেটে খড়-কুটা করত— ...ন্তু তার শেষ নেই উপরেও নেই—তলাতেও ...ই।

* * *

...থম বছর দুয়েক সে সকালে উঠে পাঠ- ...লায় যেত। কিন্তু বাড়ীতে পড়ত না— ...বার সময় হ'ত না বলে সেখানে পড়াটা ...ত না। দিদি ধান-চাল বিক্রী ক'রে মাইনে ...াতো, তাও বাকী পড়ত। পণ্ডিত মধ্যে ...ে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু পণ্ডিতের কাজ ... অনেক করে দিত। দশ বছর বয়স যখন, ... সে শক্ত হয়ে উঠেছে—অনেক কাজ ...রেছে। ভগ্নীপতির বাড়ীর মাটীর দেওয়াল ...ড় গেলে, সেটা সে দিতে পেরেছে। ঘর-দোর ...তে পেরেছে। বাবুই সাবুই খড়ের দাঁড় ...াতে পেরেছে। খড়ের চালে ঘরামী ছাইতে ...লে সে খড় ছুঁড়তে পেরেছে, দাঁড় জোগাতে ...রেছে। চালে উঠেও একটু আধটু কাজ ...রেছে। গরুর খড় কাটা, শাক-সব্জীর জন্য ...া কোপানো, সার দেওয়া, গাছের যত্ন ...া এও শিখছে সে। আর তাতে তার ওই ...টার মত ফুল ফোটানোর উল্লাস।

...বিড়ি তামাকও ধরেছে। তামাক কাটতে ...াতে কাঠের হামান দিস্তেতে ছেঁচতে তাও ... পারে।

কাজেই গুরুমশাই তাকে তাড়াননি। আর ...র মধ্যে একটি অফুরন্ত সুখই বলুন, ... উল্লাস উৎসাহই বলুন—তার জন্যে ...তেও ভাল লাগত' তার; তার দু-চারবার ... পড়ত—তা সহজে ভুলত না। দ্বিতীয়ভাগ ...পাত শেষ করেছিল।

...দু বছর পর দিদি লক্ষ্মীর ছেলে হল। ...কে নিয়ে দিদি মাতল—সঙ্গে সঙ্গে ... নারান। তার উল্লাস আনন্দের শেষ ছিল ... লোকে এর মধ্যে কানাকানি করছিল— ...র বউয়ের ছেলে আর হবে না। আর ... হবে? আঠারো-ত্রিশ বয়স হয়ে গেল।

হৃদয়ও নাকি বিয়ে করব করব করছিল। কিন্তু বিয়ে করতে পারছিল না দুটো কারণে। প্রথম হৃদয়দের টাকা দিয়ে বিয়ে করতে হয়। কন্যাপণ লাগে। লক্ষ্মীর জন্যে তার বাবাকে নগদ দেড়শো টাকা দিয়েছিল হৃদয়। এবার দ্বিতীয় পক্ষে আরও বেশী লাগবে। আর একটা কথা—নারানের সাত বিঘে জমি। তার ধান হৃদয় গিয়ে গিয়ে নিয়ে আসে ঘাট-বলরামপুর থেকে। একটা পুকুর আছে মাছ-গুলো আছে জেলেদের কাছে—বছরে পঁচিশ টাকা জমা পায়। বিয়ে করলে লক্ষ্মীর সঙ্গে নারানও চলে যাবে হয়তো। ওটাও লোকসান হবে। হৃদয়ের ভয় যাই এবং যতই হোক—লক্ষ্মীর ভয় উদ্বেগ তার থেকে অনেক বেশী ছিল। তাই সন্তান হতেই তার আর খুসীর সীমা ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে নারানেরও।

ভল্লাপাড়ায় রাম জিজ্ঞাসা করত—ছেলে কেমন গো?

—ভাল—ভাল!

—ক দিনের হল?

—পাঁচ বছরের! দিনের বলতে নেই। যত দিনের, তত বছরের বলতে হয়, তাতে ছেলের পরমায়ু বাড়ে!

ছেলে তিন মাসের হতে হতে নারান পাঠশালা বন্ধ করলে, ছেলেটির সামনে সকালে বসে সে তাকে আদর করত—বাবু-রে, বাবু-রে, বাবু-রে! কিছুদিনের মধ্যে সে যতরকম ছেলে আদর করার ছড়া আছে, এখানে আছে তা শিখে ফেলেছিল। ছ' মাসের হতেই সে তার কোলে উঠল এক বছর হতেই নারান তার ঘোড়া হল। এসমস্তের মধ্যেই আশ্চর্য উল্লাস ছিল তার। কোনদিন ভাবত না, তার এটা নেই সেটা নেই—ভাবত না সে ছোট কি বড়। ভাবত না তার ভবিষ্যৎ। সমাজ, মানুষ, ভগবান ক-উকে কিছুর জন্যে দায়ী করেনি। সামনে যা এসেছে, তার যে কোন ইচ্ছার পথে, তাকে সে নদীর বন্যার স্রোত ঠেলে—পরমোল্লাসে এগিয়ে যাবার মত এগিয়ে গেছে।

নারান দুখীরামই ছিল। দুঃখ ওর পায়ের তলায় পিছনে দুই পাশে ওকে জড়াতে চেষ্টা করত—কিন্তু নারান ছুটে সামনে দুঃখকে অনবরত পিছনে ফেলে। দুঃখের সঙ্গে দেখা হত না। কচিৎ দেখা হ'লে ওই শেয়ালটার মত লেজে ধরে পাক দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত—দুঃখ ছুটে পালাত—সে হাসত।

একবার হয়েছিল বাবু, ওই ভল্লাদের একটা যুবতী মেয়ে নদীর ধারে পাশের গাঁয়ের বাবুদের একটা বাগানে কালজাম ফলেছিল, পেড়ে খাচ্ছিল। নির্জন নদীর ধার পুরনো আম-জামের বাগান।

ওখানে রেশম কুঠী ছিল সায়েবদের, তাদের লাগানো বাগান। জাম আম খুব ভাল। জাম ছিল বিখ্যাত। মোটা কালো মিষ্টি রসে ভরা জামগুলি বেশ বড় বড়—তা দোকানে তৈরী কালোজাম মিষ্টির মত বটে। বেটী লোভ সামলাতে পারেনি; গাছে উঠেছে। উঠবার সময় ঝুড়ি নিচে রেখেছে কাপড় ছেড়ে গামছা পরেছে। কাপড়ে জামের কষ লাগলে ওঠে না। মনের আনন্দে জাম খাচ্ছে। আমি নদীর ধারে ভল্লাদেরই একটা মোষের পিঠে শুয়ে আছি। মোষের পিঠে বসার চেয়ে শোয়াতে আরাম—চওড়া পিঠ—আর মোষের গুণ হল, দৌড়ায় না—আর পিঠ ঝাড়ে না। হুঁস রাখতে হয়—কখন বসছে, আর কখন, জলে নামছে। নইলে হেলে দুলে চলে শুয়ে ভারী আরাম লাগে! বেটা রোদের তাপে বাগানটায় ঢুকে পড়েছে। ছায়ায় দাঁড়িয়েছে। নিস্তব্ধ বাগান। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। চিঁ-চিঁ! আমবাগানে ঝিঁঝিঁদের অহোরাত্রি: দিনরাত ডাকে। মোষ বেটা বসল, আমি উপুড় হয়ে গলা জড়িয়ে ধরলাম। এমন সময় কথা শুনতে পেলাম।

—নাম বলছি—নাম। নাম। নইলে দেখেছিস বন্দুক।

ঘাড় তুলে দেখলাম—পাশের গাঁয়ের বাবুদের একটা ছোকরা জাম গাছের দিকে বন্দুক তুলেছে। এবার কথা শুনলাম—আমি চেঁচাব। মেয়ের গলা।

ছোকরা বললে—চেঁচাবি? —আমি চেঁচাব দাঁড়া—তুই কাপড় ছেড়ে গাছে উঠেছিস। কাপড়টা নিয়ে আমি চলে যাব! যা—ওই গামছা পরে যা বাড়ী!

ওদের গামছা তেমনি গামছা বাবু। কোন রকমে কোমরটা ঢাকে, বুকে ওঠে না। আমি উঠে দাঁড়ালাম। বুঝলাম মতলব। ওরে ছোকরা

তার ক্রোধ, তার হিংসাকেও জেনেছিল...

বাবু; অল্পবয়সী মেয়েটার খোলা বুক দেখে—ফুলের মত গোঁজেছে। নারান উঠল। গাছের আড়ে আড়ে গিয়ে পিছন দিক থেকে বন্দুকটার নল ধরে খ্যাঁচ করে টেনে কেড়ে নিলে। জানতো না তো। ওই টানেই বন্দুকটা কিরকম ফায়ার হয়ে গেল আর গুলিটা নারানের এই বগলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। নারান হতভম্ব হয়ে পড়ে গেল কি রকম আর বন্দুকটা পাশে পড়ল আছড়ে। বুঝলেন—সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের ছোকরা দৌড় দৌড়—দে দৌড়। মনে করেছে নারান খতম। নারান হতভম্ব হয়েছিল কিন্তু বাবু ছোকরার দৌড় দেখে তা কেটে গেল—হা হা ক'রে হেসেই সারা হল। ছুঁড়িটা নেমে এল। নারান বললে—কাপড় পর—বাড়ী চল।

রামভল্লা বাবুদের বাড়ী গিয়ে টাকা আদায় করে বন্দুক দিয়ে এল। নারানের কিন্তু দুঃখ ছিল। হৃদয় দাদা বাড়ী এসে বাবুদের বাড়ী গিয়ে সব শুনে নারানকে আগাপাশতলা পিটন দিলে। ঘরে ভরে রেখে দিলে। খেতে দিলে না।

সে কিন্তু গায়ে লাগে নি। ছোকরা বাবুর ছুটে পালানো যত ভেবেছে নারান তত হেসেছিল।

লোকের কাছে রটে গেল নারানের চরিত্র খারাপ।

রামভল্লা বলেছিল—ছোটঠাকুর এবার নষ্ট চাঁদের রাতে তোমাকে চাঁদ দেখতে বারণ করেছিলাম। হল তো!

নারান খারাপ কথা বলেছিল একটা। শিখেছিল বই কি! ওদের কাছে ওদের ঝুলিতে যা ছিল তাই পেয়েছিল—তাই শিখেছিল।

বিড়ি খেতো তামাক খেতো। মদ ওরা চোলাই করত। এবং প্রচুর খেতো। নারান মদ চোলাই করতেও শিখেছিল। কিন্তু মদ খেতো না। কেমন গন্ধ লাগত, গা-টা ঘুলিয়ে উঠত। তা ছাড়া—ছেলে বেলা মা মারা যাবার পর যে এক বছর বাবা বেঁচেছিল—সেই এক বছর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। বাবা অবস্থাপন্ন কায়স্থ ঘরে শালগ্রামের সেবা করতেন। সুন্দর পুরুষ ছিলেন বাবা, শান্তশিষ্ট মানুষ ছিলেন; নারানকে যা শিখিয়েছিলেন তিনি কিংবা নারান তাঁর কাছে যা শিখেছিল তাতে, ঠিক মনে না পড়লে, মদ খাওয়া যেন বারণ করেছিলেন আর মাতালকে তিনি ঘেন্না করতেন। নইলে নারান মদ খেতো। মদ চোলাই সে একটা বিদ্যা বাবু। সে বিদ্যাটা সে শিখেছিল।

রামকে বলত মাঝে মাঝে এটা কেন কর? কেন খাও রাম?

রাম [illegible] হাসত। কিন্তু কখনও বলে নি—তুমি খাও। বরং চোলাইয়ের সময় নারান তখন তাদের মত প্রবল উৎসাহে কাজ করত তখন সে বলত—ঠাকুর একি নেশা বল [illegible] মদ খাবে না অথচ—।

নারান বলত—বিদ্যে তো একটা রাম!

[illegible]—আর বিদ্যে ঠাকুর। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে লেখাপড়া শিখলে না, গরু চরালে। ঘরের দেওয়াল দিতে শিখলে, ঘর ছাওয়াতে শিখলে, জাল বুনতে শিখলে—জাল ফেলা দিলে, [illegible], কুমোরদের কাছে ঠাকুর গড়ার সময় [illegible] জমিতে লাঙ্গল চালাও, বীজ মারা, ধান পোঁত, ধান কাটো। [illegible] কাঁধে করে বেড়ালে—শিখলে না শুধু বামুনের কাজ, লেখাপড়া কুলকর্ম। কপাল তোমার!

নারান বলেছিল—পড়তে আমি পারি রাম। পাঠশালা যাই না। কিন্তু দিদির বাড়ীতে একটা মোটা রামায়ণ আছে সেটা আমি পড়ি।

—তবে তো মেলাই পড়লে। এবার তোমাকে জজ ম্যাজিস্টর ক'রে দেবে।

—শুধু রামায়ণ নয় রাম, জামাই দাদা যাত্রার বই আনে, বাড়ীতে আছে, তাও পড়ি!

রাম হৃদয়ের শখ বলতে যাত্রা দলে পার্ট করা। পাশের গাঁয়ের শখের যাত্রা দলে বড় পার্ট করে। সেই বই বাড়ীতে আনে। ফাঁক পেলে নারান তাও বানান ক'রে পড়ে। বুঝতে পারে তার কারণ হৃদয় যাত্রা করতে যায়, নারানকে নিয়ে যায়। যাত্রাদলে নামলে সে মদ খায় বেশী। নারানকে সামলাতে হয়। নারানকেও দলে নামাতে চেয়েছিল। কিন্তু নারান বক্তৃতা করতে পারে না। তার উপর হেসে ফেলে। বক্তৃতা শুনে শুনে এমন হয়েছে যে বইটার একটা শব্দ পড়তে পারলেই বাকী গুলো মনে পড়ে, পড়া সহজ হয়ে যায়। কিন্তু রাম তাতেও হাসলে।

* * *

হঠাৎ একদিন একটা চিঠি এল। পোস্ট কার্ডের চিঠি। নিয়ে এল রাম। রাম গিয়েছিল যে গ্রামে সায়েবরা রেশম কুঠী করেছিল সেই গাঁয়ে। বাঁটের পিওন তাকে চিঠিটা দিয়ে বলেছিল—দেখ্ রাম ওই হৃদয়ের পরিবারের নামে চিঠি। চিঠিখানায় লিখছে শুক্রবার দিন—ওদের বাড়ীতে কলকাতা থেকে কুটুম আসবে। হৃদয়ের পরিবারের মাসী। ওদের চিঠি তো কখনও আসে না, তাই পড়ে দেখলাম। তা তোদের গাঁয়ে বাঁট সেই শনিবার। শুক্রবারে কুটুম আসবে, বাসে নামবে, এখন লোক রাখতে বলেছে—গাড়ী রাখতে বলেছে। মাসীর হাঁপানী আছে। নেমে তো আতান্তরে পড়বে রে! তুই দিস—তোদের পাশেই তো বাড়ী!

রাম চিঠি এনে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে মুখে সব খবরটা বলেছিল। লক্ষ্মী বলেছিল—মাসী কলকাতা থেকে আসছে? ক্যানে রে বাবা! নিজের জ্বালায় মরি! ক্যানে আসছে লেখে নাই?।

রাম বলেছিল—পিওন তো তা বলেনি।

নারান খস খস ক'রে খড় কাটছিল—লক্ষ্মী তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—ওই এক বামুনের ঘরের গরু। মুখ্যু ডাং। এত বড় ছেলে ঘরে থাকতে পরকে পড়াতে যেতে হবে চিঠি!

নারান উঠে এসে চিঠিখানা ফস করে টেনে নিয়ে পড়তে চেষ্টা করেছিল। লক্ষ্মী বলেছিল—দে দে—চিঠি দে। পড়িয়ে আনি, ঘোষালদের বাড়ী।

—পড়তে পারছি। বেশ গোটা লেখা—দিদি সাবি—আমি—সাবি—ত্রী সমানেষু। মা-ল-ক্ষ্মী লক্ষ্মী, তুমি আমার—

—ও সবাই পড়তে পারে। দে আমাকে দে। বাচালামো করিস নে বলছি। আমার সময় নাই। বলে লক্ষ্মী চিঠিখানা টেনে নিয়ে চলে গিয়েছিল খানিকটা দূরে ঘোষালদের বাড়ী।

নারান রামকে বলেছিল—আমি পড়তে পারছিলাম না রাম? এই সব ছোট ছোট দুঃখ সে পেত। হৃদয়ের কাছে নয়। দিদির কাছে। ওই রামের কাছেও পেতো। কিন্তু দুনিয়া তাকে দুঃখ দিতে পারত না। রাম বলেছিল—তা পড়ছিলে তো বাপু। সাবিত্রীর সমানেষু, তো পিওন বলে দেয় নাই, আমিও বলি নাই, তুমি পড়লে। তবে গড় গড় করে পড়তে হবে তো। দিদি সেই রাগে নিয়ে গেল আর কি। তা কি বলে, কোথা কি ভুল হয়।

রাম চলে গেল। নারান খড় কাটতে বসেছিল, খোকা উঠল ঘুম থেকে। কেঁদে উঠল। নারান তাকে দাওয়ার উপর পাতা বিছানা থেকে কোলে তুলে নিল। খোকা দেড় বছরের হয়েছে। সে মামার ভয়ানক ন্যাওটা। মামা তাকে ঘাড়ে করে বিষ্ণুকে বহন করে গড়ুরের মত প্রায় উড়ে বেড়ায়। মামা তাকে খড় কাটা জায়গার কাছে বসিয়ে দিয়ে খড় কাটতে লাগল। খোকার কথা ফুটেছে। কথা কয়। নারান তাকে বললে—তুই বেটা খুব লেখাপড়া শিখবি। [illegible] ইংরিজি পড়বি। ফরফর করে ইংরীজি বলবি। তখন তোর কাছে আমি শিখব। বুঝলি না কি বললি? গেট আউট, [illegible] কোথাকার? হুঁ-হুঁ এক চড় মারব [illegible] তোর বাবাকে [illegible] বলে [illegible] করব না!

লক্ষ্মী ফিরে এল [illegible] আসছেন। আমাকে [illegible] মা লক্ষ্মী আমি তোমার বাড়ীতে আগামী শুক্রবার সন্ধ্যায় যাইব। [illegible] হাঁপানীতে কষ্ট পাইতেছি। মরণও হইতেছে না। [illegible] কিছু হইল না। তাই তোমাদের ওখানে [illegible] ওখানে যাইব। [illegible] চিরকাল বিখ্যাত। [illegible] আছেন। রবিবার ঔষধ দেন, আমার [illegible] শুক্রবার যাইব। শনিবার থাকিয়া রবিবার ঔষধ লইয়া আবার সোমবার ফিরিব। [illegible] হইতে তোমাদের বাড়ীও [illegible] পারিব না। গাড়ী একখানি রাখিয়ো, ভাড়া আমি দিব। আমার সঙ্গে আমার [illegible]।

মাসীকে মেসো বিয়ে করে নিয়ে গিয়েছিল দিদির জন্মের আগে। [illegible] গাঁয়ে পোস্ট মাস্টার হয়ে এসেছিল। ঘাটবলরামপুর [illegible] হাটির পাশেই। মেসোও ছিল আচার্য্য [illegible] ওদেরও বিয়ে করতে টাকা লাগত। সে কলকাতা অঞ্চলেও লাগত। কালটা তো আজকের নয়। যে সময় মাসী হাঁপানীতে ভুগে আসবে বলে চিঠি লিখেছিল—সেটাই ছিল ১৯৩৫ সাল। তারও পঁচিশ বছর আগে মাসীর বিয়ে হয়েছিল। মেসোর কাছে টাকা নেয়নি। নারানের মাতামহ কিন্তু লিখিয়ে নিয়েছিল এখানকার সম্পত্তি তারা পাবে না। মাসী সুন্দরী ছিল। মেসো তাতেই রাজী হয়েছিল। আর পাড়াগাঁয়ে বাস করতে আসবার ইচ্ছেও ছিল না। বিয়ের পর থেকে বিদেশে বিদেশে ঘুরেছে মাসী। কখনও কখনও পত্র দিয়েছে। একবার না কি এসেছিল দাদামশায়ের মৃত্যুর পর। তখন দিদি লক্ষ্মী হয়েছে। নারান হয়নি। তারপর একবার পত্র দিয়েছিল নারানের মায়ের মৃত্যুর পর। কলকাতার পাশে দমদমে ওদের বাড়ী। তখন ওরা দমদমেই ছিল মেসোর ছুটিতে। দুটাকা নৌকুতো পাঠিয়েছিল। দিদির বিয়ের সময় মাসী মেসো দুজনেই এসেছিল। দিদিকে আশীর্বাদী দিয়েছিল কানের দুল। বাবার মৃত্যুর পর হৃদয় পত্র দিয়েছিল, সে পত্রের জবাব আসে নি। এবং কিছুদিন পর

ষাটপলশারামপুর থেকে গোবিন্দ নাপিত ওখানকার রায়েদের বাড়ীর ক্রিয়াতে নেমন্তন্ন পত্র বিলি করতে এসেছিল এ গ্রামে। সেই একখানা চিঠি এনে দিয়ে গিয়েছিল। গ্রামে পিওন বিলি করতে এসে—কাউকে না পেয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওখান-কার বর্ধিষ্ণু বাড়ী রায়দের বাড়ীতে। রায়েরা গোবিন্দের হাতে চিঠিখানা দিয়ে বলেছিল ও গ্রামে তো থাকিস— চিঠিখানা আমাদের গোঁসাইয়ের জামাই হৃদয়কে দিস। তাতে ছিল মেসো মারা গেছে। মাসী দমদমের বাড়ীতে আছে।

লক্ষ্মী একবার কাঁদতে হয় বলে কেঁদেছিল। নারানের দুঃখ টুঃখ কিছু হয়নি। একটু আপ-শোষ হয়েছিল মেসো ছিল শুনেছে কিন্তু দেখতে পেলে না।

দিদি বলে মেসো খা শৌখীন লোক ছিল। পোষ্টমাষ্টার তো কিন্তু আমাদের গাঁয়ের বড়-লোকদের চেয়ে বাবুলোক ছিল। চোখে সোনার চশমা। সুন্দর সার্ট! আর সর্বদাই ফিট-ফাট। জামাতে একটু কিছু লেগেছে তো আঙ্গুলের টোকা দিয়ে এমন ঝাড়তো যে সঙ্গে সঙ্গে ময়লাটা চলে যেত! খেতো ভালো। যা-তা মুখে রুচত না। আমার বিয়ের সময়, না সে মাছ খেলেই না। সেই রান্নে মাসী নিজে হাতে রুটি গড়ে দেয় তবে খায়।

ওই কাঁদতে কাঁদতেই বলেছিল সেদিন দিদি। পরদিন থেকে আর নাম হয় নি। মাসীরও না মেসোরও না। হৃদয় কোন পত্র দেয়নি।

এতদিন পর মাসীর পত্র এল—মাসীর বাপান্তি হয়েছে। মাসী কলেশ্বরের শিবের ওদের জন্য এখানে আসছে, দু-দিন থাকবে।

আসবে থাকবে দু'দিন, তাতে অন্যায় কিছু হয় না। তবে হৃদয় যে ভিন্ন জাতের মানুষ। কিন্তু আর উপায় তো নেই, কাল শুক্রবার। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে লাগছে।

নারানের কিন্তু উৎসাহের সীমা ছিল না। মাসী আসছে, মাসীকে দেখবে। কলকাতার মাসী। আরও আশ্চর্য লাগছে—মাসীর সঙ্গে ব্যাটাছেলে কেউ আসছে না। এক ভাসুর-ঝি আসছে।

ওই ভাসুর ঝিকেই নাকি মাসী মানুষ করেছে। মাসীর তো ছেলে-পুলে হয়নি। মাসীর হাতে অনেক টাকা! সারা জীবন চাকরী করেছে মেসো!

* * *

মাসী সত্যিই কলকাতার মাসীর মত মাসী বটে।

ধবধব করছে রঙ। দিদি বলে—মাসীকে সুন্দর দেখে বিয়ে করেছিল মেসো। নারানের মাও ফরসা ছিল—দেখতে ভাল ছিল। একটু একটু, একটা দুটো ছবি নারানের মনে আছে। মা তার পুকুর ঘাটে চান করত। সে অল্প জলে খেলা করত। আর একটা ছবি মনে আছে—মা তার পুজোর থালা হাতে রায়েদের ঠাকুর বাড়ী পুজো দিতে যেতো দুর্গাপুজোর সময়। আর কতক-গুলো খুব টুকরো—মা ভাতের হাঁড়িতে হাতা দিচ্ছে। সামনের ঘরটা ঝাঁট দিচ্ছে। এমনি। কিন্তু মার সঙ্গে মাসীর রঙের তুলনা হয় না। মাসীর চেহারা বলতে গেলে খুব রোগা নয়। মুখ চোখ দেখলে গেলেও খুব জাঁকালো। চুল পেকেছে অনেক। বড় বড় চোখ। পরনে সেমিজ তার উপর থান কাপড়। ধবধবে ধোওয়া, কিন্তু হাঁপাচ্ছে। কথা বলে থেমে থেমে। মধ্যে মধ্যে কাশে। গলায় ঘড় ঘড় সাঁই সাঁই শব্দ ওঠে। তার সঙ্গে একটি এগার বারো বছরের মেয়ে। মেয়েটি কালো। নাকটি টেপা। চোখদুটি টানা নয় কিন্তু ডাগর। মাথায় চুলগুলি সুন্দর করে আঁচড়ানো। চুলে খোঁপা বাঁধা নয়—মোটা একটা বিনুনী, তাতে ফিতে বাঁধা। গায়ে নীল রঙের জামা। পরনে ডুরে শাড়ী। সব থেকে আশ্চর্য হয়ে গেল নারান— মেয়েটির পায়ে চটি।

ভুই বেঁধে রায়েদের গাড়ীটা নিয়ে নারান একলাই গিয়েছিল বাস ষ্ট্যাণ্ডে। মাসী আর মেয়েটি নেমে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখছিল। মাসীর হাতে একটা ছোট্ট থলি। পানপাতা দিয়ে মোড়া। বাসের লোকটা একটা টিনের মাসীর সাইজের সুটকেস নামিয়ে দিলে।

নারানের চিনতে কষ্ট হল না—মাসীর রূপ দেখে, পোশাক দেখে—আর সঙ্গের মেয়েটির পোশাক দেখে—আর চেহারা দেখে। আশ্চর্য কালো রঙ যে মেয়েটার, নাকটা যার টেপা এবং সেই তাকেও এমন সুন্দর লাগে!

নারান গিয়ে মাসীকে প্রণাম করে বলেছিল— আমি নারান!

—নারান! তুই! অবাক হয়ে কিছু দেখে-ছিল ওর মাসী তার মাসীমা।

মেয়েটিও অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। প্রায় তার সমবয়সী। নারান কিছু বড় হবে। সে বলেছিল—তোমার বোনপো? খুড়ীমা?

হাঁ। তারপর নারানকে বলেছিল মাসী— হাঁ রে, গাড়ী এনেছিস তো?

—হাঁ মাসী! বেশ ভাল করে খড় বিছিয়ে এনেছি। ওই যে!

—ও যে মোষ রে!

—তা হোক না। গরুর থেকে মোষ ভাল মাসীমা! ভারী শান্ত—ওর পিঠে আমি শুয়ে থাকি।

—ও মা! শিউরে উঠল মেয়েটি। কিছু বলে না? ফেলে দেয় না?

—না। হেসেছিল নারান।—খুব শান্ত। কোন ভয় নেই। একটু আস্তে যাবে। তাতে আরামে যাবে।

—কে জানে! মাসী বলেছিল গাড়োয়ানকে খুব সাবধানে নিয়ে যেতে বলবি যেন!

—হেসে নারান বলেছিল—আমিই নিয়ে যাব মাসী! আমিই গাড়োয়ান হব!

—সে কি রে? তুই গাড়োয়ান হবি কি? তবে আমি যাব না বাবা। এখানেই আমায় কোথাও একটু জায়গা দেখে দে কারুর বাড়ীতে, ভাড়া দেব।

—কোন ভয় নেই মাসী। আমি খুব ভাল গাড়োয়ানি করি। জামাইদাদার ধান আমিই গাড়ীতে তুলে আনি। ধান বেচতে নিয়ে যাই ষাঠপলশার হাটে। তুমি চড়, কিছু ভয় নেই।

বাসের ক্লীনার বলেছিল—হাঁ মা যান। ও ছোকরা খুব হুঁশিয়ার, আমরা হরদম দেখছি!

তার অভয় পেয়ে মাসী গাড়ীতে চড়েছিল, বলেছিল—ভাল করে ধর মোষ দুটোকে।

আমি বিক্রী হতে এসেছি?

তাই সে ধরেছিল—সংগে সংগে এই ভয় দেখে অনেক কৌতুকও সে অনুভব করেছিল। মাসীর পর মেয়েটি উঠেছিল খুব সন্তর্পণে। নারান গাড়ীটা তুলে মোষ দুটোর কাঁধে চাপিয়ে অভ্যাস মত কৌশলে মোষের পিঠে হাতের ভর দিয়ে টপ করে চড়ে বসেছিল গাড়ীতে। পেটে পায়ের টোকা দিয়ে মোষ দুটোকে জিভের ক্যাঃ ক্যাঃ শব্দ ক'রে চলতে ইংগিত করেছিল। গাড়ীটা চলতে শুরু করেছিল।

মাসী এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—হ্যাঁ-রে নারান!

—মাসী!

—কোন্ ক্লাসে পড়িস রে?

—আমি পড়িনে মাসী!

—পড়িস নে?

—না!

—তবে?

এর উত্তর দেয় নি নারান। কি উত্তর দেবে? মাসী কিন্তু ছাড়ে নি। বলেছিল—হ্যাঁ নারান!

—এ্যাঁ।

—পড়িস নে তো করিস কি?

—কি করব? কাজ কর্ম দেখি ঘরে। গরু-বাছুর দেখি, চরাই, চাষবাস দেখি। আবার ছাডও লাগাই। ধান কাটি। দিদির ছেলে নিয়ে থাকি!

—কত দূর পড়েছিস?

—ওই পাঠশালাতে দু বছর পড়েছিলাম।

—তারপর?

—তারপর আর কি? ছেড়ে দিলাম। বাড়ীর কত কাজ। ছেলে দেখা। কত হবে এক সংগে?

—হুঁ। ফেল করে ছেড়ে দিলি?

—না ফেলটেল করিনি! সময়ে কুলোল না। জামাই দাদা রাগ করতে লাগল। দিদির খুব কষ্ট হচ্ছিল। তো ছেড়ে দিলাম! দিদিও বললে।

গাড়ীটা নদীর ঘাটে ঢালে নামছিল। হুড়হুড় ক'রে। মেয়েটি চীৎকার করে উঠল—ওকি করছ পড়ে যাব যে—উল্টে যাবে যে—নারান হেসে বলেছিল—না।

মাসী বর্ধমান থেকে ছোট চ্যাঙারী ক'রে সীতাভোগ মিহিদানা নিয়ে এসেছিল। দিদির ছেলের হাতে দুটো টাকা দিয়েছিল। দিদির ভারমুখ একটু হাসি হাসি হয়ে উঠেছিল সংগে সংগে। প্রণাম ক'রে বলেছিল পথে খুব কষ্ট হয়েছে—না মাসী?

মাসী বলেছিল—রেলে তো খুব কষ্ট হয়নি মা। মেয়েদের গাড়ী দেখে চড়েছিলাম, ভিড় ছিল না। বাসে কষ্ট হয়েছে—যা রাস্তা—আর যা ভিড়। তবু মেয়েছেলে দেখে বসবার জায়গাটা দিয়েছিল। কিন্তু যা তোমাদের পথ। খাল ডিং—দুম-দুম করে পড়ছিল। তারপর এখানটুকুর কথা কি বলব মা।

কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিল—কি বলব বাবা কলেশনাথের নাম নিয়ে এসেছি—আর এই রোগের যাতনায় এসেছি। রাত্রে বসে কাটাতে হয়। 'দম আর পড়ে না। নইলে ওখান থেকেই ফিরতাম তোমাদের মোষের গাড়ী দেখে। কি ঢাউনি মা!

দিদি খুব হেসেছিল। বলেছিল—কি করবে বল মাসী—যে দেশের যা। এ তো কলকাতা নয়। তা এইটি বুঝি ভাসুরঝি?

—হ্যাঁ, ওই আমার নিরু। নিরুপমা। ভাসুরের তিন তিনটে মেয়ে—ওকে আমি নিয়ে-ছিলাম আঁতুড়ে। ওর মায়েরও খুব অসুখ করেছিল। আর সেই অসুখেই গেল। আমার কাছেই আছে।

—তা এইবার তো দায় এসেছে তোমার। বিয়ে দিতে হবে—

নিরু মুখে হাত চাপা দিয়েছিল হাসি চাপতে। মাসী বলেছিল—বিয়ে কোথায় এখন মা—কলকাতায় তো পাড়াগাঁয়ের মত নয়। দশ পেরুতেই বিয়ে। ও এখন পড়ছে। পড়ুক।

—পড়ছে? ইস্কুল যায়?

—হ্যাঁ। পাড়ার ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি।

—কলকাতার কথাই আলাদা। তা একলা ইস্কুলে যায়?

—যায় বই কি! কে নিয়ে যাবে!

দিদি নিরুকে বলেছিল—বাঃ তুমি তো খুব বাহাদুর মেয়ে!

নিরু আবার হেসেছিল।

মাসী এবার বলেছিল—তা হ্যাঁ লক্ষ্মী। নারান পড়ে না কেন? বললে—পড়ে না—পড়া ছেড়ে দিয়েছে!

লক্ষ্মী চুপ করেছিল। একটু পর বলে-ছিল—কি বলব মাসী ওর কপাল!

—লেখাপড়ায় মন নেই বুঝি? না—বুদ্ধি নেই?

—বুদ্ধি ওর খুব মাসী। যা দেখে—তাই শিখে ফেলে। কিন্তু মন ঠিক নেইও বটে—আর মিথ্যে বলব না তোমাকে—তোমার জামাই চুপ ক'রে গিয়ে বললে—বাড়ীতে তো আমি থাকি—সে বিদেশে—ঘরের কাজকর্ম, চাষবাস দেখবার লোক নাই—। বললে। আর নারানও সংগে সংগে লেগে গেল। দেখ না—এতবড় বামুনের ছেলে পৈতে হ'ল না।

আবার একটু চুপ করে থেকে দিদি বললে—তুমি ওকে নিয়ে যাও না মাসী। তোমার তো অনেক টাকা। ওকে পড়াবে। তোমার ঘরে ও চাকরের মত খাটবে—দেখো!

মাসী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে-ছিল—না—লক্ষ্মী। আমার টাকা নেইরে। সে তোর মেসোই খুইয়ে গেছে। রিটায়ার করে এসে ব্যবসা করতে গেল। তাতেই সব গেল মা; শেষ বাড়ীর অংশ তাও গেল। ভাসুরের গেল—ও'র দুজনের গেল, পৈত্রিক বাড়ী ছেড়ে শেষ ভাড়ার বাড়ী। ওর পেনসন ছিল—কোন মতে দিন চলেছে। এখন নিজের গয়না বিক্রী করে চালাচ্ছি। ভাসুর মারা গেছেন—দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন—একটা ছেলে ছিল—সে কোথায় চলে গেছে ঠিক নেই। এখন ওই মেয়ে ঘাড়ে। লেখাপড়া শেখাচ্ছি। শিখতে পারলে—যা হোক কিছু করবে—মাস্টারী-টাস্টারী। নইলে বিয়ে। তাই বা কি করে দেব তা জানি না।

লক্ষ্মী বলেছিল—কেন মাসী! আমাদের ঘরে তো মেয়ের বিয়েতে টাকা পায় গো!

হেসে মাসী বলেছিল—কলকাতায় সে সব দিন বদলে গেছে মা। সে সব আর নেই। ভাসুরের বড় মেয়ের বিয়ে—এমনি এমনি হয়ে-ছিল—পণ লাগে নি। মেজ মেয়ের বিয়েতে আড়াই হাজার লেগেছিল। যত কাল যাচ্ছে—তত মেয়ের বিয়ের খরচা বাড়ছে। তার ওপর রঙ কালো, অনেক টাকা লাগবে।

নিরু বলে উঠেছিল—কি সব যা'তা বলছ খুড়ীমা? আমি বিয়ে করব না।

মাসী হেসে বলেছিল—ওই দেখ মেয়ের লজ্জা হচ্ছে। থাক ও সব কথা। এরপর একটু চুপ ক'রে থেকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল—মাসী তোর বড়লোক নয়রে! গরীব। তোদের চেয়েও গরীব। তারপর মাসী একে একে সব খোঁজ নিয়েছিল। ঘাট বলরামপুরের—লক্ষ্মীদির সংসারের।

জিজ্ঞাসা করেছিল—সেখানকার বাড়ী আছে তো!

—আছে। মধ্যে মধ্যে ছাইয়ে আসে। লোক না থাকলে ভাংগা ভগ্ন হয়। তাই হয়েছে। অনেক দূর তো! বাড়ীর দরজা নিয়ে গেল চুরি করে। জানালায় উই লাগল। তখন—সেগুলো ছাড়িয়ে বিক্রী করে দিলে। যখন যাবে ... করবে নারান।

—জমিগুলি?

—হ্যাঁ। ধান বছর বছর গিয়ে নিয়ে আসে।

—তা হ'লে তো ওই থেকেই ওর পড়া হয়রে। ওই জমি থেকেই তো ওর বাপের সংসার চলত। আমার বাপের চলত।

লক্ষ্মীদি এবার চুপ করে গিয়েছিল। একটু ভেবে বলেছিল—সে সব ওকে হিসেব ... দেবে! তা কি দেবে না? নিশ্চয় দেবে।

হৃদয়দা বলেছিল—কঞ্জুষ কিপটে বুড়ী কোথাকার! গরীব। গরীব তো গরীবের মত কথা বলে না কেন—লম্বাই চওড়াই বাত কেন?

কথাটা বলেছিল—মাসী চলে যাওয়ার পর শনিবার সন্ধ্যেতে হৃদয় যেমন আসে তেমনি এসেছিল। একটু মদ খেয়েই সে আসত। পকেটে একটা শিশি থাকত। এখানে এসে চোলাই খেতো। ভল্লাদের কাছ থেকে নারানকেই এনে দিতে হত।

মাসীকে দেখে—সে একটু খুসী হয়েছিল। বড়লোক মাসী এসেছে! লক্ষ্মীদির কাছে বৃত্তান্ত শুনে বলেছিল—দুর! দুর! খোকাকে কিছু দিলে?

লক্ষ্মী বলেছিল—দু হাতে দুটো টাকা দিয়েছে।

—দু টাকা? যা—যা—যা! তোকে কি দিলে?

—দেয় নি কিছু। একখানা নিজের সিল্কের শাড়ী এনেছে, দেবে।

—পুরনো! কানা কুকুর মাড়ে সন্তুষ্ট।

লক্ষ্মী চুপ করে ছেলের কপালের চুলগুলি সরিয়ে দিয়েছিল। হৃদয় আবার বলে-ছিল—নারানকে কি দিলে?

—কই? কিছু তো দেখি নি!

—এই নারানে!

নারান কাছেই দাঁড়িয়েছিল। কোঠার উপরে মাসীকে আর নিরুকে শুতে দিয়ে লক্ষ্মী নিচের ঘরে শুয়েছিল, নারান বারান্দায় শুয়েছিল।

নারান বলেছিল—কিছু দেয়নি!

—যা দেবে—দিবি দিদিকে! বুঝলি! তারা তো চলে যাব সকালে। দেবে কিছু, গাড়োয়ান করছিস! দেবে।

তা করেছিল সে। সেই নিয়ে গিয়েছিল কলেশনাথতলা। সংগে দিদি গিয়েছিল হৃদয়ও গিয়েছিল। মতলব ছিল হৃদয়ের কলেশনাথতলায় পাশের গ্রামের সারখেল

অবস্থাপন্ন লোক—ওদের নিজেদের শ্রেণীর লোক। মানে ওরাও কন্যা পণ দিয়ে বিয়ে করে; বিয়ে দেয়। সারখেলদের একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছিল। সে তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সে দিন খাইয়েছিল। ভাল বাড়ী ঘর। টিনের চাল, পাকা দাওয়া। উঠানে তিন চারটে বড় বড় মরাই। বড় বড় গরু। খুব আদর যত্ন করেছিল তারা। নিরু বেড়াচ্ছিল—নারানের সঙ্গে, নারান তাকে পাড়াগাঁ দেখাচ্ছিল। কল্লেশনাথের মন্দির—মহাবাবাকে দেখে সেই বলেছিল নারানদা—ওই ওখানে কি সব ফুল ফুটে রয়েছে সাদা লাল! কল্লেশনাথের মন্দিরের দক্ষিণদিকে প্রকাণ্ড মাঠ। তার মধ্যে একটা মজা দীঘি। সেই দীঘিতে ফুটেছিল—শালুক ফুল—সাদা গোলাপী আর গাঢ় লাল রক্তকম্বল। সময়টা ছিল চৈত্র মাস। খোলা মাঠ; মধ্যে মধ্যে তরীর জমিগুলি সবুজ হয়ে আছে, কিছু কিছু জমিতে তিল ফসল হয়েছে। তাতে ফুল ধরতে সুরু করেছে' তার বাকীটা সবই ফাকা, ধুলো উড়ছে। দূরে দূরে পলাশ শিমুলের গাছে—দুটো চারটে লাল ফুল ফুটে রয়েছে। এর মধ্যখানে দীঘিটাতে ফুটেছে ফুল—অজস্র ফুল—আর মাথার উপর ঝাঁক বেঁধে উড়ছে সরালি হাঁস।

নারানের সঙ্গে নিরুর কাল অল্প কিছু ভাব হয়েছিল। কিছু ভাব। নিজেদের গ্রামটা তাকে দেখিয়েছিল। নদীর ধার-দহ-শিবতলা—তার প্রিয় স্থান ভল্লাপাড়া—এ সব দেখিয়েছিল। সে তাকে বলেছিল কলকাতার গল্প—চিড়িয়াখানা মিউজিয়ম, পরেশনাথের বাগান, সিনেমা, তার ইস্কুল মাষ্টার, দিদিমণিদের গল্প করেছিল। ভল্লাপাড়ায় এসে—নারান নিজেও অপ্রস্তুত হয়েছে—নিরুকেও বিব্রত করেছে।

রমের স্ত্রী বলেছিল—ওমা, তোমার সিঁথিতে সিন্দুর কই গো? না বিয়ে হয় নাই?

নারান বলেছিল—কলকাতায় ছোটতে বিয়ে হয় না।

—ছোট! ছোট কিসের গো? বিয়ে হলে যে ছেলে হত এতদিন!

নিরু চটে উঠেছিল—সে বলেছিল—কোথকার অসভ্য তোমরা? নারানদা আমি চললাম। ছি। ছি। বলে সে ফিরে চলেছিল হন হন করে। নারানও খুব লজ্জা পেয়ে তার পিছন পিছন আসছিল। হঠাৎ নিরু থমকে দাঁড়িয়ে—মা গো! বলে চীৎকার করে উঠে—পিছন ফিরে—নারানকে দেখে বলে উঠেছিল—সাপ!

—সাপ? কই? নারান নিরুকে পিছনে রেখে এগিয়ে গিয়ে পথের উপর একটা ছেলেকে দেখে হেসে উঠেছিল। বলেছিল—এই সাপ।

—মস্ত সাপ!

সাপটা এঁকে বেঁকে পালাচ্ছিল—নারান লেটার লেজে ধরে তাকে একপাক ঘুরিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে বলেছিল—হেলে। ওর বিষ নাই।

—কি ডাকাবুকো তুমি? যাও হাত ধুয়ে এসো।

—ক্যানে? হাত ধোব ক্যানে? কিছু হবে না।

—তুমি খুব নোংরা!

ধাক্কা খেয়েছিল নারান—নোংরা সে? নিরু থামে নি, বলেছিল—তুমি ওই অসভ্যদের সঙ্গে মেশ কেন? ওই ভল্লাদের সঙ্গে?

তারপর বলেছিল—লেখাপড়া না শিখলে মানুষ অসভ্যই থেকে যায়।

নারান ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আর কাছে যায় নি। কিন্তু সন্ধ্যা বেলা ও লক্ষ্মীদিকে কলকাতার নানান গল্প বলছিল যখন—তখন অবাক হয়ে শুনেছিল। শুধু চিড়িয়াখানা মিউজিয়ম নয়, কলকাতায় স্বদেশী আন্দোলনের গল্প করেছিল। গান্ধীজীকে দেখেছে নিরু। সুভাষচন্দ্রকে দেখেছে। অটোগ্রাফের খাতায় তাঁর সই আছে।

নারান তখন অটোগ্রাফ কাকে বলে জানত না। মনে মনে একটু সম্ভ্রম জেগেছিল। তাই কল্লেশনাথ তলায় যখন ওই পুকুরে ফুল দেখিয়েছিল—তখন সে ছুটে গিয়েছিল ওই পুকুরে।

পুকুর থেকে এক গাদা শালুক রক্তকম্বল তুলে মন্দিরে ফিরে ওদের পায় নি। খোঁজ করে সারখেলদের বাড়ী গিয়ে থমকে গিয়েছিল। নিরু কাঁদছে, উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। মাসী বিব্রত হয়ে বলছে—ওরে না। বিয়ে বললেই বিয়ে হয় না! মেয়ে থাকলে ছেলে থাকলে বলে। নিরু!

নিরু শোনে নি। সে বলেছিল—না খুড়ীমা এখান থেকে চল। না।

সারখেলরা নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে নিরুর সঙ্গে ওদের ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল। ছেলেটির ঠাকুমা অশ্লীল কথা বলে ঠাট্টা করেছিল নিরুকে। মাসীকে বলেছিল টাকা আমাদের মেলা। কত টাকা চাই বল। আমার নাতি ক্ষেপেছে। তা ক্ষেপবার কথাই। বলে আজ রেতেই বিয়ে হোক!

নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল মেয়েটির জেদ দেখে—শক্তি দেখে। মাসী চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তার সঙ্গে লক্ষ্মী। হৃদয় থেকে গিয়েছিল, কিন্তু সে কটু কথা বলেছিল নিরুকে মাসীকে দুজনকেই! বলেছিল—আমার মেয়ে হলে চাবকে দিতাম।

নিরু ফোঁস ক'রে বলে উঠেছিল—মারুন তো? দেখি! বড় লোকসান হল না? কত টাকা দালালী পেতেন? আমি বিক্রী হতে এসেছি?

মাসী বলেছিল—চল-চল-মা-চল। লক্ষ্মীমা আমরা বরং নারানকে নিয়ে চলে যাই। বুঝেছ? আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।

লক্ষ্মী অগত্যা উঠে এসেছিল। বাড়ীতে এসেও নিরু কিছু খেতে চায় নি। জেদ ধরেছিল। চলে যাবে সে এখান থেকেও। বহু কষ্টে নিরস্ত করেছিল মাসী। নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার মনের সম্ভ্রম আরও বেড়ে গিয়েছিল।

রাত্রে এসে হৃদয় আর একদফা গালাগাল করেছিল। নিরুকে মাসীকে দুজনকেই। মাসীকে বলেছিল—মাসী আমার। নিজের গরজে বোনঝির বাড়ী এসে তার সংসার ভাঙবার চেষ্টা!

মাসী বলেছিল—হৃদয়, এ কি বলছ বাবা?

—ঠিক বলছি! আপনি বলেন নি লক্ষ্মীকে, নারানকে পড়াস না কেন?

—সে কি অন্যায় বলেছি?

—খুব ন্যায় বলেছেন। আবার জমি জেরাতের হিসেব নিয়েছেন। একটা ডাগড়ো ছেলের খেতে পরতে কত লাগে জানেন?

—জানি বই কি। কিন্তু ওই সম্পত্তি থেকেই তো আমার বাবার চলেছে। ওর বাবার চলেছে। ওরও চলা উচিত।

হৃদয় বলেছিল এবার—সে সব আর নাই। জমিদার নিলেম করেছে। বিঘে তিনেক ব্রহ্মত্র ছিল তাই আছে। তাও ইন্দ্রপ্রসাদী মেঘের জল ভেঙ্গে হলে ধান হয়, নইলে হয় না।

মাসী বলেছিল—তা তো আমি জানতাম না বাবা। লক্ষ্মী আমাকে বলেছিল—জমি জেরাত সবই আছে।

চুপ করে গিয়েছিল মাসী।

নারান খবরটা প্রথম শুনেছিল।

কেমন একটা ধাক্কা খেয়েছিল। জমি সে ভালবাসে। হৃদয়ের জমিতে সে খাটে। তাই জমি নেই বিক্রী হয়ে গেছে শুনে ভারী দুঃখ পেয়েছিল।

(শেষাংশ ২২৫ পৃষ্ঠায়)

চলে যেয়ো। নইলে তুমিও এমনি হয়ে যাবে।
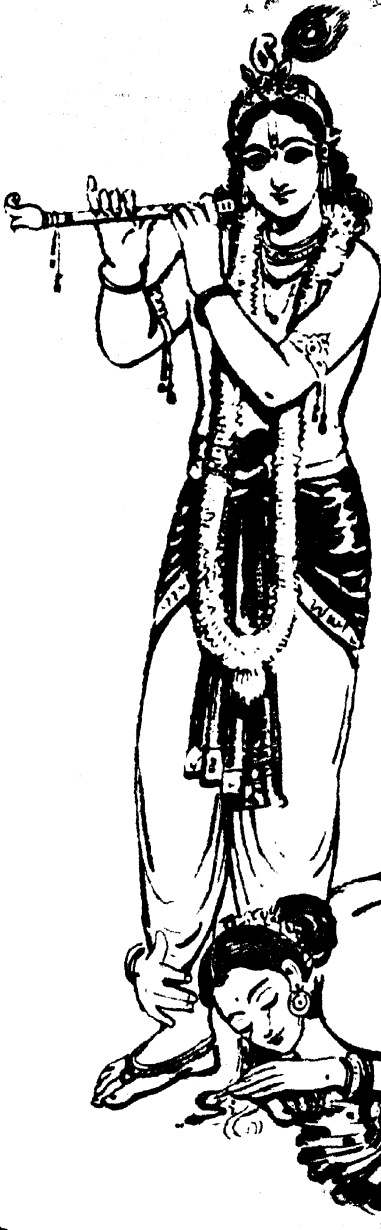
কি জানি কখন নিদ্রা টুটিবে
ঘুচিবে সুপ্ত রজনী।
শুধু চরণে তোমার পড়িয়া রহিব
আর আসিবে না দিন যামিনী।
নয়ন ভরিয়া অশ্রু ঝরিবে
শুধু শীতল করিবে তপ্ত ধরণী
আমার এ অশ্রু স্পর্শিবে না কভু
তোমার স্নিগ্ধ চরণ তরণী।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। নবদ্বীপ।

"হনিমুন"

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিবাহের পর নবদম্পতি 'হনিমুনের' জন্য বেরিয়ে গেল। ওটা প্রায় রেওয়াজেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ওদিক'কার অনেক আচার-অনুষ্ঠানের মতো। মন্দ কি? অনুবাদে নামটিও বেশ দাঁড়িয়েছে, "মধুচন্দ্র"। আমাদের চন্দ্র তো আবার সুধাই; মধুর চেয়ে অনেক বেশি। পরিণাম যা সে তো আছেই—হেঁসেল, খোরাক হিসাব, ফিডিং-বট্‌ল্‌, ল্যাক্‌সো, তার আগে যদি ক'টা দিনের জন্যে দু'জনের মাঝখানে নামিয়ে আনা যায় আকাশের চাঁদকে, সে তো ভালোই। সেই চেষ্টাতেই বিমল মাস-খানেকের ছুটি নিল, রেলের টাইম-টেব্‌ল্‌ দেখে প্রোগ্রাম ঠিক করল, আগাম জায়গা নিয়ে রাখল হোটেল-খোটেলে; তারপর বেরিয়ে পড়ল নব-বধূ মনীষাকে নিয়ে। সুধা ঝরাতে ঝরাতে নেমে আসছিল চাঁদ, তার আগেই কিন্তু জ্যেঠ-শ্বশুর এসে দখল করে নিলেন জায়গাটা; মনীষার জ্যাঠামশাই অনাথবান্ধব।

অনাথবান্ধবই বিমলের শ্বশুরবাড়ির কর্তা। ব্যাংকে ভালো চাকরি করতেন, এখন রিটায়ার করে বাড়ি ব'সে আছেন। অর্থাৎ ব'সে থাকবার কথা, তবে বিমলের শোনা, থাকেন নাকি প্রায় বাইরে বাইরেই। আর একটা ব্যাপার একটু অদ্ভুত লেগেছিল বিমলের; বাড়ির সর্বময় কর্তা হলেও অনাথবান্ধব বিবাহে উপস্থিত ছিলেন না, এমনকি অষ্টমঙ্গলায় তিনদিন গিয়ে সে ছিল, সে সময়ও দেখেনি তাঁকে, শুনেছিল তিনি যে সেই বাইরে গিয়েছিলেন, ফেরেন নি তখনও। এবং দেরিও আছে। ব্যাপারটুকুর যেন কোথায় কি আছে স্বভাবতই মনে হয়েছিল। নূতন শ্বশুরবাড়ি, বেশি কৌতূহলী হওয়া চলে না, তবু ওরই মধ্যে খানিকটা সজাগ থেকে একটা যে সন্দেহের আঁচ পেয়েছিল বিমল তাতে বেশ একটু অশান্তির মধ্যে পড়ে যায়, অনাথবান্ধবের নাকি এ বিবাহে মত ছিল না বলেই তিনি আর সব কিছু করলেও নিজে এইভাবে আড়ালে-আড়ালে থেকে গেছেন।

বিশেষ কারুর মুখে শোনা নয়; কথাটা যেন সমস্ত পরিবারের গোপনের চেষ্টা সত্ত্বেও হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছিল, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত কোনও এক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ধরা পড়ে যায় বিমলের কাছে; তীব্র কৌতূহলে মনের তার বাঁধা থাকলে যেমন হয় অনেক সময়।

মনীষাকে জিজ্ঞেস করল। অবশ্য সোজা-সুজি নয়। বিবাহের পর প্রথম ক'টা দিন পরিচয়-অপরিচয়ের এমন একটা স্বপ্নলোকের মধ্যে দিয়ে কাটে, এমন একটা স্পর্শ-কাতর মোহ-মাধুর্য যে, সাহস হয় না তার মধ্যে এমন কিছু এনে ফেলতে যাতে এতটুকুও রীতিভঙ্গ ভুলে বিভ্রান্তি ঘটাবার সম্ভাবনা আছে। তুলনাটা শাস্ত্রসংগত হবে কিনা জানি না, তবে সময়টা সত্যই যেন তুলায় রাখা একটি পেশোয়ারী আঙুর; মুখে তুলতে গিয়ে স্পর্শের যদি একটু এদিক-ওদিক হয় তো ফেটে গিয়ে সমস্ত রসটা ছড়িয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

মনীষাকে বলল—সবই বেশ লাগছে, শুধু জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখাটা হোল না বলে মনটা বড় খারাপ হয়ে রয়েছে। শুনেছে নাকি লোক খুব ভালো, সেই জন্যে আরও খুঁতখুঁত করছে মনটা।

মেয়েদের কাছে গোপন কথার সার্থকতা তার প্রকাশেই। প্রিয়জন হলে তো আরও। তবে বিবাহের ঠিক অব্যবহিত পরেই কয়েকটা দিন পর্যন্ত একটা কুণ্ঠা থাকেই লেগে। একেবারে অপরিচিত লোক ঘনিষ্ঠতম পরিচয়ের সম্ভাবনা নিয়ে এল তো।

মনীষা জানাল জ্যাঠামশাই সত্যই অপূর্ব মানুষ। বদলি হ'য়ে হ'য়ে বেড়ানোর চাকরি, তার মধ্যেও পরিবারটিকে কি ক'রে দূর থেকে আগলে আগলে রেখেছেন, মনীষার বাবা মারা যাওয়ার পর আরও যেন কত বেশি করেই, সেটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। এমনি লোকও খুব সত্যনিষ্ঠ, যেটা বিশ্বাস করেন সেটা থেকে এক চুল কেউ নড়াতে পারে না। এইরকম কিছু রেখেঢেকে যা বলল মনীষা তা থেকে সবদিক দিয়েই বেশ এক-

মধুই

জন সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ বলেই মনে হোল বিমলের। যা একটু সংশয় জেগেছিল—তাও তো কারুর কাছে শোনা কথায় নয়—অচিরেই একটি গভীর শ্রদ্ধার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেল।

আরও একটি কথা অবশ্য আছে। এ-সময়টা মনীষাকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার সময়; তাকে পেতে এসে জ্যেঠশ্বশুরকে হারালাম, কি, তিনি রইলেন সে-কথাটা বড় হয়ে থাকতে পারে না। এখন মনের আকাশে মধু-চন্দ্রের উদয় হয়েছে, অন্য কোনও চন্দ্রের কথা ভাবাই যায় না আর।

অথচ, দুর্ভাগ্যের কথা, সেই অন্য কোন চন্দ্রই এসে উদয় হোল দুজনের মাঝখানে।

ওরা এক সপ্তাহের মধ্যে চারটে জায়গা শেষ করে ফেলল—আলমোড়া, নৈনিতাল, দেরাদুন, কাশী। এতে একটা কথা স্পষ্ট যা হোল তা এই যে, পরস্পরের সান্নিধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শতগুণ সুন্দর হয়ে ওঠে বটে, তবে এত দ্রুত লয়ের মধ্যে তাকে ঠিকমতো পাওয়া তো যায়ই না, উলটে পরস্পরকেও যেন হারিয়ে ফেলতে হয়। দুই-ই হোল তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করবার জিনিস, আর তার জন্য উন্মত্ত গতির বদলে চাই একটি শান্ত আত্ম-সমাহিতি। ওদের ভ্রমণ সূচীতে গোটাতিনেক জায়গা একেবারে বাদ দিয়ে ওরা রাজগীরে এসে উপস্থিত হোল। জায়গাটা ছোট, খুব বেশি দেখবারও নেই। ফল এই হোল যে, যেটুকু আছে সেটুকু যে অপরূপ হয়ে উঠল শুধু তাই নয়, অধিকন্তু পরস্পরকে দেখবার অনেকখানি অবসরও পেল ওরা। ভালো লাগল এবং ওরা এখানেই একটানা পাঁচদিন দিল কাটিয়ে। আরও যে রইল না তার একটা কারণ অবশ্য এই যে জায়গাটা ছোট, তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, তবে আরও একটা কারণ ছিল। ভালো হোটেল নেই, বাঙালী-পছন্দ খাবার পাওয়া যায় না তেমন। ওরা এগুলোর অভাবে আবিষ্কার করল—ভালোবাসা জিনিসটা নিছক হৃদয়ের এলাকার হ'লেও, হয়তো উদরটা তার নিকটতম প্রতিবেশী বলেই তার সঙ্গেও একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রাখে। ওরা দেওঘরে চলে এল; ওদের ভ্রমণ-পর্যায়ে শেষ জায়গা। দেওঘর কার্যতঃ বাংলা দেশই—আহার, বিহার, পরিবেশ সর্বদিক দিয়েই। এইখানে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দুজনে ফিরে যাবে বাড়ি; বারাকপুরে।

এইখানে ব্যবস্থাটা একটু ফলাও ক'রেই করেছে বিমল। জায়গাটা ওর পরিচিত, দু'তিনজন বন্ধু-বান্ধবও আছে, তাদের সাহায্যে মাসখানেকের ভাড়া আগাম দিয়ে একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া করে রেখেছে। ওদের বেরুবার হপ্তাখানেক পরেই বাড়ির প্যাচকঠাকুর চলে এসে একটি চাকর জোগাড় করে সব প্রস্তুত রাখবে, এরা এদিক থেকে এসে যেন সব ঠিক পায়। বিমলের প্ল্যানের মধ্যে আছে—প্রথমে হোটেল, তারপর ছোট একটি গৃহস্থালি, তারপরেই বড় গৃহে অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ। প্রথম কটাদিন মনীষাকে পেয়ে নিল একেবারে পূর্ণ একাকীত্বে, এবার পাবে বন্ধু-বান্ধবীদের মিশ্র সংসর্গে, তারপর পাবে সংসারের বিচিত্র-মধুর সম্পর্কের মধ্যে ওকে বিলিয়ে দিয়ে; কারুর স্নেহের বধূ, কারুর ভ্রাতৃজায়া, কারুর আরও কিছু। লোকটা কবি-প্রকৃতির, যতটা পারছে কাব্যময় করে নিচ্ছে দাম্পত্যজীবনের মুখপাতটুকু।

দেওঘরে পৌঁছাল ভোর বেলা। এসে দেখল পাচকঠাকুর এসে গেছে, একটি চাকরও ঠিক ক'রে রেখেছে। বাড়িটিও পাওয়া গেছে ভালো—সহরের শেষদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা বড় হলঘর, মাঝখানে দুখানি শোবার ঘর, বাথরুম ইত্যাদি নিয়ে ছোটখাট ছিমছাম বাড়িটি। ক'দিনের জনাই বা ? তবু খরচ করে রঙ-কলি ফিরিয়ে রেখেছে বন্ধুবান্ধবেরা। মেয়েদের মধ্যে রসিকা কেউ আলপনাও দিয়ে মঙ্গলঘট বসিয়ে রেখেছে। এতখানি তৃপ্তি নিয়ে ওরা আর কোথাও গিয়ে ওঠেনি। মনীষা হেসে বলল—"ভয় ক'রে কিন্তু বাপু তোমার এখানকার এঁদের। আবার নতুন ক'রে সমস্ত বিয়ের ব্যাপারটাই না এনে ফেলেন !"

"মন্দ কি ?"—উত্তর করল বিমল।

"আবার সেই উপোস ! কুশণ্ডিকের ধোঁয়া ! ...অপরাধ ?"

"যদি ফুলশয্যের রাত্রটারও ব্যবস্থা ক'রে আবার ? কী গোলাপের গন্ধ দেখেছ বাড়ির মালিকের !"

নিজেদের সব গোছগাছ ক'রে নিয়ে সবাইকে খবর দিল। বিমলের পর মনীষা যতক্ষণে স্নান সেরে বাথ-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল, ততক্ষণে অন্তরঙ্গ যে পাঁচ-ছয় জন আছে, মেয়ে-পুরুষে, সবাই এসে গেছে। সমস্ত বাড়ি কল-মুখর হ'য়ে উঠল, তারই মধ্যে চা-লুচি-হালুয়ার সঙ্গে নানা অভিমতের মধ্যে সামঞ্জস্য ক'রে নিয়ে ওরা প্রথম দিনের প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলল, তারপরেরও মোটামুটি একটা খসড়া।......খাওয়ার পর একটু আরাম ক'রে নিয়ে দুখানা ট্যাক্সিতে বেরিয়ে প'ড়ল সমস্ত দলটা। আজ থাকবে তপোবন। একসুরে বাঁধা সবার মনের তন্ত্রী—হাস্যে-পরিহাসে প্রথম শীতের সকালটিকে উচ্ছ্বসিত ক'রে তুলে ওরা সব ফিরে গেল। একেবারে ট্যাক্সি নিয়ে আসবে, এরা ততক্ষণে থাকবে প্রস্তুত হয়ে।

আজ তপোবন, কাল ত্রিকূটী, পিকনিক, দূরের দূরের বন্ধু-পরিচিতদের সঙ্গে দেখা, নিমন্ত্রণ—পাঁচটা দিন যে কোথা দিয়ে গেল কেটে যেন বুঝতেই পারা গেল না। এত তীব্র গতিবেগই, তবে এখানে যেন আরও বেশি করেই পাওয়া যাচ্ছে মনীষাকে। নিথর জলে চাঁদের নিঃসঙ্গ প্রতিচ্ছায়াকে খুঁজে নিতে হয়; জল যেখানে চঞ্চল, উর্মি-সংকুল সেখানে সেই একটি প্রতিচ্ছায়াই শতধা হয়ে গিয়ে এক অন্যরূপ ধরে। একদিন একটি নিথর নিঃসঙ্গতাই খুঁজেছিল বিমল, মনীষাকে পূর্ণভাবে পাওয়ার জন্যে; বলতে গেলে পায়নি। আজ সবার সরস চাপল্যের মধ্যে খণ্ড-খণ্ড কী অপরূপ দীপ্তিতে সে পেল তাকে ! মনীষার দিক দিয়েও তো সেই কথাই। মনটা যে কী পূর্ণতায় নিটোল হয়ে আসছে বলা যায় না !

সেদিন ওরা গিয়েছিল বহুদূরে। ত্রিকূটী পাহাড়ের দূরপ্রান্তে একটা ঝর্ণার নীচে ওদের পিকনিক ছিল। সকালেই শুধু চাটুকু খেয়ে বেরিয়েছিল, তারপর সমস্ত দিন সেখানেই কেটেছে। ঝর্ণার জলেই স্নান, সেখানেই রান্না, খাওয়া; যতটা খুশি পরিধি নিয়ে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ান; যথেচ্ছা সঞ্চয়—রকমারি পাথরের টুকরো, ফুল, লতা গাছ—মুক্ত আনন্দের হুল্লোড়ের মধ্যে বিকাল পর্যন্ত কাটিয়ে সন্ধ্যার কিছু পরে ওরা ফিরল। এসব দিনেরও নিজের ক্লান্তি আছে, কিন্তু সেটা জমতে পায় না। মুখ হাত ধুয়ে একটু ঝরঝরে হওয়ার পরও যেটুকু রইল লেগে সেটা এক কাপ চায়েই নিঃশেষ হয়ে গেল। ঠাকুরকে রাতের খাবারটা হালকা করে ক'রতে আদেশ দিয়ে দুজনে পিছনের বারান্দায় গিয়ে দু'খানি বেতের চেয়ারে পাশাপাশি বসল।

শীত রয়েছে, তবে অল্প; এমন যে চাকাটি দিয়ে বসলে বেশ ভালোই লাগে। বাড়ির মধ্যে পেছনের এই বারান্দাটুকু আরও সুন্দর। অল্প একটু দূরেই সীমানার নীচু দেয়ালটা; তারপর থেকে জমিটা আস্তে আস্তে গেছে নেমে খানিকটা পর্যন্ত, তারপর কোথাও উঁচু কোথাও নীচু হ'তে হ'তে বহু দূর পর্যন্ত গেছে চলে। দূরে, এখানে-ওখানে এক একটা কালো ঝোপ, গাছের সমষ্টি, কিম্বা একক পাহাড় কোন। এরপর সবটা নূতন শীতের কুয়াশায় গেছে মুছে।

শুক্লপক্ষ সবে সুরু হয়েছে ক'দিন। একটা তরল জ্যোৎস্না ছেয়ে রয়েছে সব কিছুর ওপর। আর সমস্ত বাগানটার যত ফুলের একটা মিশ্র অতি মৃদু গন্ধে মন্থর হাওয়াটা যেন আরও অলস ক'রে তুলেছে।

বিমল চেয়ারের হাতলের ওপর রাখা মনীষার হাতখানার ওপর আস্তে আস্তে নিজের হাত বোলাচ্ছিল, বলল—"তুমি আমার কাছে আজ কিছু চাও মনীষা।"

চিনেছে মানুষটাকে খানিকটা এই ক'দিনে, তবে এটা যেন আরও নূতন, আরও অপ্রত্যাশিত। একটু বিস্মিতভাবেই ঘাড় ফেরাল মনীষা। একটু হেসেই বলল—"কি চাইব ?"

"যা খুশি।"

"কি বাকি রেখেছ দিতে ?"—মণিরত্ন-ঢাকা নিজের গহনার দিকে চাইল, দামী শাড়িটার ওপরও নজর গিয়ে পড়ল। বিমল বলল—"ওসব তো বাবা দিয়েছেন।"

"তুমিই তো উপলক্ষ।"

"উপলক্ষই। প্রত্যক্ষ কি পেয়েছ আমার কাছ থেকে ?"

একটু দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুঁজল মনীষা। যেন এত পেয়েছে তার ফিরিস্তিই করে উঠতে পারছে না এত তাড়াতাড়ি। কিম্বা ভাষাই পাচ্ছে না বলবার—এইভাবে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আগেকার প্রশ্নটারই পুনরুক্তি করল—"বাকি কিছু থাকলে তবে তো চাইব ?"

"কিছুই বাকি নেই ? কত সাধ থাকে মেয়েদের। যারা বুদ্ধিমতী তারা এইরকম রাতে পেলে আদায় করে নেয়......"

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে মনীষা, শেষের কথাগুলো বোধহয় কানেও যায়নি। একটু চুপ করে থেকে বলল—"অভাব নয়, তবে হ্যাঁ, যদি সাধের কথা বল......"

"তফাৎটা কি ?...বেশ, যেমন বুঝেছ তুমি সাধের কথাই শুনি।"

এবার একটু বেশিক্ষণ চুপ করে রইল মনীষা। মুখটা একটু বেশি ঘুরিয়ে নিয়েও

তারপর আস্তে ফিরে একটি সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলল—"তোমায় আজ পর্যন্ত রেঁধে খাওয়ানো হোল না।"

"মাত্র এই।......"

নিরাশার সুরটা স্পষ্ট হয়ে ওঠবার আগেই থেমে গেল বিমল। তারপর সামলে নিয়েই বলল—"এ তো আমারও সাধ, বলব বলব করছিলাম।"

"বলনি কেন?" —বেশ সহজ হয়ে উঠেই প্রশ্ন করল মনীষা; সাধের তুচ্ছতাটুকু নিয়ে যে লজ্জা সেটা স্বামীর কথায় গেছে কেটে।

"বলিনি..." একটু চোখ তুলে ভাবল বিমল, বলল—"বলিনি—তুমি রাঁধতে গিয়ে ঘেমে সারা হবে, আগুনের তাতে মুখ হয়ে যাবে রাঙা, কপালের চুল যাবে ঘামে জড়িয়ে......"

"যেন খারাপ লাগে বাবুদের!"—সহজ ছেড়ে বেহায়া হয়ে পড়েছে হঠাৎ মনীষা; প্রগলভা। হেসেই উঠল, তবে মুখটাকে আর সোজা রাখতে পারল না; চেয়ারের হাতলে দুজনের হাতের ওপর চেপে ধরতে হোল।

আবার রাঁধার প্ল্যান হোল ওদের দুজনের বারান্দায় বসেই। মনীষা রাঁধবে একদিন, যারা খুব অন্তরঙ্গ আর কাছে তাদের থাকবে নিমন্ত্রণ। কি কি ভালো রাঁধতে পারে মনীষা, সে আলোচনা হোল, কি কি পদ থাকবে তাও হোল ঠিক।

একটা জিত হলে আর একটার পথ খোলে। একদিন নয়, অন্তত তিনদিন ওকে হেঁসেলে ঢুকতে দিতে হবে, অনেক দিন তো আছে এখনও। একদিন দেশী, একদিন বিলিতী, একদিন মোগলাই। সব আগে ওর, স্কুল-কলেজে ডোমেস্টিক সায়েন্স ছিল।...... বেশ, রাজি বিমল।...তবে দেশীটাই বেশি পছন্দ ওর—জ্যাঠাইমা নিজের হাতে শিখিয়েছেন; পাকা রাঁধুনী তো। তাই, মনীষার ইচ্ছা অন্তত একটা ক'রে কিছু ও রোজই রেঁধে খাওয়াবেই, শুক্ত, ডালনা, ছ্যাঁচড়া, লাউঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, মুড়িঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট—যেমন সুবিধা।...তথাস্তু; আপত্তি নেই বিমলের।...তাহলে তিনদিন যদি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হয়, তবে আর সময় কোথায়? কালই একটা দিন হয়ে যাক না।...আপত্তি নেই বিমলের, তবে একটা দিন থাক না হাতে, বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে না? অবশ্য মনীষা যেমন বোঝে।...মনীষা একটু চিন্তা করল, অথবা চিন্তা করবার ভান করল, বলল—"হ্যাঁ, ভেবে দেখছি তোমার কথাই ঠিক। তাহ'লে, আগে দেশী রান্না, জোগাড় করতে সময়ও নেবে। পরশুই থাক।"

একটু নিরাশই হয়েছিল বিমল, এমন একটি রাতে নিতান্তই ঔদরিক আলোচনা! কিন্তু আবদারে— গৃহিণীপনায়— ছেলেমানুষীতে এও তো কই মন্দ লাগল না! মনীষা আশ্চর্য।

তারপর দিন জ্যাঠামশাই অনাথবান্ধব এসে পড়লেন। সশরীরে নয়, সে বরং ভালো হোত। এলেন একখানি নাতিদীর্ঘ চিঠির মাধ্যমে।

কাল ধকোলাটা খুব গেছে বলে আজ সকালের দিকে ওরা কোন প্রোগ্রাম রাখেনি। কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে কাটিয়ে একটু বেলা করেই ফিরল। মনীষা সোজা হেঁসেলে চলে গেল। শুক্তর আনাজ কুটেই রেখে গিয়েছিল, এবার চড়িয়ে দেবে। বিমল একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরের বারান্দায় রোদে চেয়ার টেনে বসেছে, এমন সময় একজন ডাকপিয়ন গেটের ফলকে লেখা বাড়ির নামটার সঙ্গে একটা খামের ঠিকানা মিলিয়ে নিয়ে সোজা চলে এসে খামটা ওর হাতে দিল; প্রশ্ন করল, "আপকা হ্যায়?"

ওরই নাম; নিয়ে নিল বিমল।

অনেকগুলি পোস্টাফিসের ছাপ খামটায়, তার মধ্যে নৈনিতাল, বারাণসী আর এখানকারটা একটু স্পষ্ট। পাঁচবার ঠিকানা বদল হয়েছে, এপিঠে ওপিঠে আর জায়গা নেই। বিমল প্রত্যেক হোটেলেই পরবর্তী হোটেলের এবং শেষে রাজগীরে এই বাসার ঠিকানা দিয়ে এসেছে; বেশ বোঝা যায় খামটা গোড়া থেকে সব জায়গা স্পর্শ করতে করতে তার পেছনে পেছনে এসেছে। রাজগীরে পাওয়া উচিত ছিল, কোনও কারণে পায়নি। খুব আশ্চর্যের কথা নয়, এমনকি লাল কালিতে মাথার ওপর স্ট্রীকটলী কনফিডেনসিয়াল (বিশেষ গোপনীয়) লেখা দেখেও আশ্চর্য মানল না বিমল, হোটেলে হোটেলেই ঘুরছে তো। সিগারেটটা ঠোঁটে টিপে খুলে ফেলল খামটা।

প'ড়ে কিন্তু সমস্ত শরীরের রক্ত মুহূর্তে জল হয়ে গেল। একবার, দুবার, চারবার—ক'বার সে পড়ে গেল হিসাব নেই, শুধু যতই পড়ছে, ততই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে চিঠি, মাথা ঝিমঝিম করে আসছে, পায়ের নীচে থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে। চিঠির শেষে জ্যেঠশ্বশুর অনাথবান্ধবের নাম। লেখা আছে—

কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন, তোমার ট্যুর প্রোগ্রামটা জোগাড় করতে দেরি হয়ে গেল, তাই আপাতত তাড়াতাড়ি তোমায় কোনরকমে সতর্কটুকু ক'রে দেওয়া দরকার মনে ক'রে চিঠি সংক্ষিপ্ত করতে হোল আমার, ব্যাপারটা জীবন-মরণের সমস্যা হোলেও। মনীষা খুব ভালো মেয়ে, কিন্তু রন্ধনে উৎসাহ কখনও দিও না; কোন মতেই নয়। একেবারে নয়, তাহলে বোঝা যেত, খাদ্যের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে বিষ সংক্রামিত ক'রে দেবে শরীরে। "স্লো পয়জন।" এ বাড়ির মেয়েদের ব্যাধি। ওর মার ছিল, আমার বিশ্বাস মনীষার বাবা তাইতেই মারা যায়। ওর জ্যাঠাইমার আছে; আমি কত সতর্ক থেকে এই একাত্তর বছর পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছি, সে-কথা মনীষাই বলবে তোমায়। অবশ্য কারণটা বলবে না। পাগলে তার পাগলামি স্বীকার করে না, অনেক রোগী তার রোগ মানতে চায় না। এও তাই।

শেষ করি। ঠিকানা পেয়েই চিঠি দিচ্ছি, নইলে আজকের ডাকটা বেরিয়ে যাবে। হোটেল, তাই আশা করি বিষক্রিয়া ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে যায়নি। আশীর্বাদ নেবে।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅনাথবান্ধব দেবশর্মা

চিঠিটা পকেটে পুরে টলতে টলতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল বিমল। হানিমুন?—মধ্যাহ্নের এমন প্রখর সূর্য পর্যন্ত যেন আকাশ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।...কাটিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে—তাকে মন্থর বিষ দেবে? মনীষা? ওর মা ওর বাবাকে তাই করে মেরে ফেলেছিল? নিশ্চয় কোথাও গলদ আছে—পত্রলেখকের মধ্যেই।...এ বিবাহে মত ছিল না, কিন্তু সব ব্যবস্থা তো ওরই। কি রকম স্ববিরোধী কাণ্ড সব যেন!...মনীষার দিকে চলে আসে মনটা। এমনকি হতে পারে না?—সব ঠিক আছে, শুধু মস্তিষ্কের একটা কোষে ঐ দুর্বলতা—বিষ দিতে হবে, যে কেউ হোক! ...দুই রগ বেয়ে ঘাম ঝরে আসছে বিমলের। উৎকট ভয়ে দেয়ালের কী একটা ছবির দিকে চেয়ে আছে। মনীষা! বিষ!...না, হতে পারে না—কোন মতেই নয়! মাথাটা ঝেরে নিল, উঠে বসল। হাতে সিগারেটটা নেই, কখন ফেলে দিয়েছে। বেশ ধীরে সুস্থে উঠে একটা ধরাল। শোবে না, বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করতে লাগল। আর ভাববে না এ রকম অসম্ভব কথা। সোজাসুজি মনীষাকে জিজ্ঞেস করুক না।......কিন্তু এ রকম যে হয়! সব ঠিক আছে, শুধু মস্তিষ্কের একটা বা গোটা কয়েক কোষ বিকৃত। ......হ্যাঁ এই তো মনে পড়েছে একটা, ক্লেপটোমেনিয়া! ক্রোড়পতির স্ত্রী—জিনিষে বোঝাই ঘরদোর—তবু চুরি করতে হবে একটা উন্মাদ আনন্দ! দোকানে গেলে দোকানী সন্ত্রস্ত ভেতরে ভেতরে, নিমন্ত্রণে গেলে নিমন্ত্রণকারী।......হয় যে এ রকম—সংক্রামিত হয় ওপর থেকে নীচে, মা থেকে কন্যায়!......হ্যাঁ, এই যে মনে পড়ল—মেয়েদের মধ্যেই আবার বেশী এ রোগ!......না, তবুও ভুল—কোথায় কি গলদ আছে।......কারুর জাল নয়তো? শত্রুতা!......প্রায় উল্লসিত হয়ে উঠল বিমল। হয়েছে আবিষ্কার; মনীষাকে দেখালেই তো হয়—এই হাতের লেখা কি জ্যাঠামশায়ের?

পকেটে হাত দিয়ে ঘুরেছে ভেতরের দিকে, মনীষা বেরিয়ে এল, বলল—

'আমার হয়ে গেছে, বলি থালা দিতে?......ও কি, তোমার চেহারা অমন কেন? শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?'

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে বিমল। মনীষার কপালে, ঠোঁটের ওপর, চিবুকে মুক্তাবিন্দুর মতো ঘামের সারি, সমস্ত মুখখানা রাঙা হয়ে গেছে; কপালে, ঘাড়ে, কাঁধের কাছে হাল্কা চুলের গুচ্ছ গেছে সেঁটে। চেয়ে রইল বিমল। আস্তে আস্তে হাসি ফুটল মুখে—মনটাকে বেশ ফিরিয়ে এনেছে; এ কমলে কীট থাকতেই পারে না কখনও!

বলল—'খারাপ কেন হ'তে যাবে? তবে, সবার চেহারা তো মেহনতে খোলে না তোমার মতন।' কথার মোড়টা ঘুরিয়েই দিয়ে বলল,—'দিতে বলো। আমি কিন্তু নিন্দে করবার জন্যে তৈয়ের হয়ে বসব, সাবধান!'

দু'বার চেয়ে নিল শুক্তটা। হয়েছেও সত্যই চমৎকার, তখন মনের সঙ্গে একটা প্রবল লড়াই চলছে যে, জিততে হবেই যে কোন রকমে। নিজেই ওপরপড়া হয়ে ফরমাস করল—'ওবেলা তাহলে শাকের ঘণ্ট।'

'ওমা লুচির সঙ্গে শাকের ঘণ্ট!' —মনীষা খিলখিল করে হেসে উঠল একেবারে। বলল—'আরও কিছুদিন ওদিকে থাকলে তোমার অবস্থা যে কী হোত?'

চলো না বুঝি!' —নিজেও যোগ দিল হাসিতে।

—এবং এই হাসিটাকে অশেষ রকমে জীইয়ে রাখবার চেষ্টা করল কাজে-কর্মে, ভ্রমণে-বিশ্রামে। জিততে হবে!

কিন্তু পেরে যে উঠছে না সেটা ও-ও টের পাচ্ছে এবং একটা দুরন্ত রকম কিছু যে হয়েছে ভেতরে, আর সবার কাছেও সেটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে।

নিমন্ত্রণের দিন আর একদিন পিছিয়ে দিল বিমল। অবিশ্বাস ওর এতটুকু নেই মনীষার ওপর। কিন্তু অপরকে টানবার সাহসও নেই—যদি—নিতান্তই যদি কিছু কোথাও থাকে! একটা মানসিক ব্যাধিই তো। মনীষা যে নিতান্তই নিরুপায় সেখানে। বলল—'থাক, মনু, একটা পদ তোয়ের করতেই যা অবস্থা হয় তোমার, যেমন চোখ ফেরানও যায় না, তেমনি আবার দেখতেও পারা যায় না।......তার চেয়ে বরং কিছু ছুটি হাতে থাকতে বাড়ি ফিরে যাই চলো।'

'তাই চলো না হয়।' —বাঁচল মনীষা। এই কথাটাই বলতে চায়, কিন্তু নিজের আতঙ্কটা—স্বামীর মনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার ভয়েই পেরে উঠছিল না।

বন্ধু-বান্ধবরাও তাই বলল—সবটা বাইরে-বাইরে ফুরিয়ে না দিয়ে সেখানকার আকাশের চাঁদের জন্যও কিছু রাখা দরকার তো।

আতঙ্কিত ওরাও হয়ে উঠছিল।

বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি চিঠি আগের দিন এসেছে। সেই ডাকে মনীষারও একখানি চিঠি এসেছে, ওরা শীঘ্রই চলে আসবার চেষ্টা করছে। চিঠিটা তাই রিডাইরেক্ট করা হয়নি।

অনাথবাবদেরই চিঠি। দেওঘরের ঠিকানায় লাল কালিতে ঠিকানা বদল করে দেওয়া। মোহরের ছাপ দেখে বোঝা গেল ওরা যেদিন বেরোয় সেইদিনের ডাকেই পৌঁছে-ছিল। খামের মাথায় সেই রকম স্ট্রিক্টলি কনফিডেনসাল লেখা।

ওপরের ছাতে গিয়ে নিরিবিলিতে পড়ল বিমল; হাত দুটো ঘন ঘন কাঁপছে উত্তেজনায়।

'কল্যাণবরেষু,

বাবাজীবন, আমার পূর্ব পত্র পেয়ে থাকবে এবং আশা করি যথেষ্ট সতর্কই আছ। দেওঘরে এসে গেছ জেনে এ চিঠি এখানেই দিলাম।

নিরতিশয় উদ্বেগের মধ্যে তাড়াতাড়িতে লেখা সে চিঠিতে বোধহয় সব কথা পরিষ্কার হয়নি, বিষের স্পর্শ কোন রকম নিরোধ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। অত্রপত্রে কিছু স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

একটা কথা শুনে থাকবে: তোমাদের বিবাহে আমার সম্মতি না থাকার জন্য আমি উপস্থিত থাকিনি। কথাটা সত্য। প্রথমাংশে পত্রাচার করে আমিই বিবাহ স্থির করি: পরে ফটোগ্রাফে তোমার অপূর্ব স্বাস্থ্য দেখে আমি মত বদলাতে বাধ্য হই। আমি নিজের পরিবারে সবার এই ধরণের আদর্শ স্বাস্থ্য গঠন করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। এই ব্যর্থতার মূলে আমাদের বাড়ির স্ত্রীলোকেরা। সে ইতিহাস বড়ই মর্মান্তিক।

কথাটা আরও ব্যাপকভাবে ধরতে গেলে,—বাঙ্গালী মেয়ে মাত্রেই বাঙ্গালী জাতটাকে ধীরে ধীরে যে ক্ষয় করে আনছে এ কথা আজ বিজ্ঞানসম্মত, অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিভাবে জান বাবাজী? তাদের মারাত্মক রন্ধন পদ্ধতি দিয়ে। শুধু মুখরোচক করে দশ ব্যঞ্জন পাত্র সাজিয়ে দেওয়ার নেশায় তারা যে কী সর্বনাশ করছে—এই চিঠির সঙ্গে সংলগ্ন চার্ট থেকেই পারবে বুঝতে। সব খাদ্যের প্রধান অংশ তার আবরণ বা খোসায়। কুটনা কোটার সময়েই এরা সযত্নে এগুলোকে কেটে বাদ দেবে। বাকি যে অবান্তর অংশ তারও যেটুকু শক্তি আছে সেটা নিঃশেষভাবে নষ্ট করে দেবে, ভেজে, মশলা-বিষ দিয়ে সাঁৎলে—কত রকম উপায় ওরা যুগ যুগ ধরে রন্ধনশালার একাধিপত্যে বের করতে পেরেছে। প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বো-হাইড্রেড, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন প্রভৃতি যা কিছু নিয়ে খাদ্যের মূল্য, ওরা বঁটি, খুন্তি, হাতার অস্ত্রে নির্মমভাবে ধ্বংস করে যাচ্ছে। অসার দিয়ে ধীরে ধীরে বিষ প্রবেশ করিয়ে যাচ্ছে। মূর্খ আমরা, মোহগ্রস্ত আমরা, তার জন্যে পাচ্ছে কি আমাদের কাছে জান? অকুণ্ঠ প্রশংসা!

বাঁচতে চাও তো ওদের আগে রান্নাঘর থেকে তাড়াও। ওরা মাস্টার হোক, কেরাণী হোক; উকিল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার হোক; পুলিশ হোক, দারোগা হোক; বঁটি, খুন্তি, কেড়ে নিয়ে গেট খুলে দাও। নৈলে বাঙ্গালী বাঁচবে না।

তুমি ছিলে পাঞ্জাবে। সেখানে অপক্ব ডাল, কাঁচা ঘি, তরি-তরকারিও অবিকৃত। তোমার স্বাস্থ্য দেখলে হিংসা হয়, আর আতঙ্ক লাগে বাংলায় বাস তুলে এনে এদের কবলে পড়ে তোমার পরিণতি কি ভয়ঙ্কর! আমি এ বিবাহে সম্মতি দিয়ে কি করে নিজের বিবেককে বলি দিতাম বাবাজী।'

—আরও এই ধরণের কথা। তারপর ফুল-স্কেপের একটি পুরো শীটে একখানি টাইপ করা দীর্ঘ চার্ট—প্রোটিন থেকে নিয়ে ক্যালরি পর্যন্ত কোন্ খাদ্যদ্রব্যের কি খাদ্যমূল্য, তার খোসায় কত অংশ, শাঁসে কত, [illegible] কুটনায়, ভাজায়, সাঁৎলানোতে [illegible] মেয়েরা সেগুলোকে কী পরিমাণ [illegible] জাতির কী পরিমাণ শত্রুতা করছে।

চার্টের শেষে একটি ফুটনোটও আছে—

এরা জানে না যে এমন নয়। [illegible] খোসা, বেগুনের বোঁটা, লাউ কুমড়োর [illegible] মাছের কাঁটা অস্থি প্রভৃতি খাদ্যের [illegible] দিয়ে ত্যাগের মহত্ত্ব দেখিয়ে নিজেদের [illegible] ভাইটামিন-পুষ্ট ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তা থেকে বুঝতে পারবে ওরা কত বড় জ্ঞানপাপী।

বারাকপুরের গঙ্গার ধারে পার্কে [illegible] আছে ওরা দুজনে। জ্যাঠামশাইয়ের [illegible] জিজ্ঞেস করেছিল বিমল, মনীষা [illegible]—

অদ্ভুত ভালো জ্যাঠামশাই—কিন্তু [illegible] নিয়ে সে যে কী শুচিবাই, না দেখলে [illegible] যায় না! চিরকালটা তো হাত পুড়িয়ে [illegible] রেঁধে কাটালেন—সব আস্ত-সমস্ত [illegible] করবে বিমল? —আফিসে [illegible] কাঁচা-কাঁচা পটল, কাঁচা আলু, কাঁচা [illegible] সুদ্ধ—নয়তো কাঁচা নটের শাক' [illegible] বলতে নেই—কী না, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার [illegible] চিবোবেন!

অনেক দিন পরে স্বামীকে [illegible] একটু সেখানে সুড়সুড়ি [illegible] কথাতেই খিলখিল করে উঠছে [illegible]

ওরা রোজ এইখানটিতে [illegible] জ্যাঠামশাইয়ের কথা [illegible] হতে। চিঠি দুটোও দেখায়নি। [illegible] ভবিষ্যতে পারে দেখাতে কোনদিন [illegible] দিয়েই ওদের সন্ধ্যা-রজনী [illegible] তুচ্ছই; আলমোড়া—নৈনিতালের [illegible] এখানে; একখানি প্রায় জীর্ণ [illegible] দুজনে, পাশে একটি [illegible] লতা তাও অবহেলিতই।

কিন্তু 'হনিমুন' যেন [illegible] সার্থক হয়ে ওঠে। তাই তো [illegible] অপরূপ করে তোলাই তো [illegible] চেয়ে বড় কৃতিত্ব।

আর, রাহু-গ্রাসের পর চন্দ্র তো [illegible]-তরই হয়ে ওঠে।

femila
পুজোর শ্রেষ্ঠ নিবেদন...
ফেমিলা স্নো
জে. জির অবদান
PUJA

জাপান-রেল-যাত্রা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসের ৫ই তারিখ। জাপানের রাজধানী টোকিওতে হাওয়ায়ি দ্বীপপুঞ্জের হনোলুলু শহর থেকে দু'দিন মাত্র হ'ল, ৩রা তারিখের সন্ধ্যাবেলা এসে পৌঁছেছি। জাপানের বন্ধুরা, আর ভারতীয় রাজদূতাবাসের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত যাকোব—সাংস্কৃতিক বিভাগের সচিব—এঁরা বিমানঘাটায় আমাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন। এঁদের ব্যবস্থামত জাপানে আমার অবস্থানের, ভ্রমণের, দেশ দর্শনের আর বক্তৃতাদির কার্যক্রম নির্ধারিত হ'য়েছিল। প্রথম দুই রাত্রি টোকিওতে কাটিয়ে ঠিক হয়েছিল যে তৃতীয় দিনে আমি টোকিও থেকে রেলে ক'রে মধ্য জাপানের Kansai কান্‌সাই অঞ্চলে ক-টা দিন কাটিয়ে, আবার টোকিওতে ফিরে আসবো। কান্‌সাই অঞ্চল জাপানের সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, সবচেয়ে পুরাতন ঐতিহাসিক স্থান, জাপানের প্রাচীন শিন্‌তো ধর্মের আদি ক্ষেত্র, আর খ্রীষ্টীয় ৬।৭ শতক থেকেই জাপানের বৌদ্ধধর্মেরও প্রাচীনতম কেন্দ্র। এই অঞ্চলে আছে জাপানের প্রাচীন রাজধানী আর ধর্মনগরী নারা আর কিয়োতো, শিন্‌তো ধর্মের উৎসভূমিস্বরূপ ইসে-তীর্থ; আর ওসাকা আর কোবে নগরীদ্বয়, আধুনিক জাপানের শিল্প-বাণিজ্যের অন্যতম দুই প্রধান স্থান, এই কান্‌সাই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত।

জাপানের টোকিওর Chuo চুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক এবং ভারত-জাপান সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার Otoya Tanaka ওতোইয়া তানাকা আমাকে ভারতীয় রাজদূতাবাসের গাড়ী ক'রে রাজদূতাবাস থেকে টোকিও স্টেশনে নিয়ে এলেন। তিনিই আমার ভ্রমণের সব বন্দোবস্ত ক'রে দেন। টোকিও স্টেশনটি হচ্ছে এই শহরের সবচেয়ে বড় স্টেশন। প্রসঙ্গতঃ ব'লে রাখি যে, টোকিও এখন হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় শহর—এর লোকসংখ্যা দশ লাখের উপর, আর শহরের অধিকাংশ বাড়ী প্রাচীন জাপানী পদ্ধতিতে একতালা বা দোতালার হওয়ায় শহরটি অনেকখানি জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে। আমেরিকার মত আট-দশ, বিশ-চল্লিশতালা বাড়ী এখন টোকিওতে তৈরী হ'তে শুরু হ'য়েছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম, কাজেই শহরে লোকের কর্মস্থান, বাসস্থান আকাশের দিকে না উঠে এখনও মাতা ধরিত্রীকে আঁকড়েই আছে।

টোকিও থেকে কিয়োতো পাঁচ ঘন্টার পথ, তিনশ' মাইল আন্দাজ, প্রথম শ্রেণীর এক্সপ্রেস ট্রেনে। জাপানের রেলের আকার আমাদের স্ট্যান্ডার্ড গেজের চেয়ে ছোটো। স্টেশনে পৌঁছে খানিকক্ষণ ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল। হাজারে-হাজারে যাত্রী মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চার ভীড়, কিন্তু জাপানীরা এমন চমৎকারভাবে চলাফেরা করে যে কোনও হট্টগোল হৈ-হল্লা ধাক্কা-ধুক্কি নেই। এই পাঁচঘন্টা পথের যাত্রার জন্য রেলের ভাড়া ছিল ৩৮২০ ইয়েন—৭৫ ইয়েনে আমাদের এক টাকা হিসাবে টাকা পঞ্চাশের কিছু উপর। আমাদের ট্রেনে প্লাটফর্মে আসার খবরের জন্য আমরা প্লাটফর্মের বাইরে যাত্রীদের বসবার স্থানে খানিকক্ষণ ধ'রে অপেক্ষা ক'রতে লাগলুম। এখানে নানা পত্র-পত্রিকা বই আর টুকিটাকি জিনিসের দোকান, রেস্তোরাঁ, চায়ের দোকান সব আছে। খান দুইতিন সচিত্র জাপানী পত্রিকা কিনলুম, ভাষা বুঝবো না, ছবি বুঝবো তো, সেই জন্য। ডাক্তার তানাকা একটি বিরাট আকারের কাগজের খামের প্যাকেট কোথা থেকে কিনে এনে আমাকে দিলেন, পরে দেখলুম, প্যাকেটটিতে চালের গুঁড়োয় তৈরী Sempei সেমপেই বা জাপানী বিস্কুট আছে। ডাক্তার কিছু সচিত্র পত্রিকাও এনে দিলেন—ছবির সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা আছে জেনে। ডাক্তার তানাকা কলকাতায় অল্প কিছুকাল আগে আমার গৃহে পদার্পণ করেছিলেন, নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আর অন্য কতকগুলি বিদেশী অধ্যাপকের সঙ্গে সদালাপ হয়েছিল, সে-সব স্মরণ ক'রে তিনি এতটা সৌজন্য দেখান।

প্লাটফর্মে গিয়ে যথানির্দিষ্ট গাড়ীতে উঠে আসন গ্রহণ ক'রলুম। জাপানে নবাগত আমি। এখানকার সব রীতিনীতি জানা নেই। গাড়ীটা চমৎকার গদীআঁটা, করিডর গাড়ী, মাঝখানদিয়ে চলাফেরার পথ প্রতি সারে দুধারে দুটি ক'রে চারটি বসবার চেয়ার। ভীড় বেশী হ'লে, মাঝখানের পথেও বসবার জন্য আর একটি ক'রে চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক যাত্রীর সামনে ছোটো টেবিলের মত একটু জায়গা, সেখানে গরম চায়ের পাত্র রাখে। ভারী মাল কেউ সঙ্গে নেয় না। আমার সঙ্গে ছিল একটি ছোট সুট্-কেস, আর একটি হাত-ব্যাগ, মাথার উপরে র‍্যাকে রাখবার অসুবিধা হয়নি। ডাক্তার তানাকা আমাকে আমার জায়গায় বসিয়ে দিলেন। তার পরে, ট্রেনের রেস্তোরাঁর লোক চা, ফল, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি গাড়ীতে গাড়ীতে বিক্রী ক'রছিল, তার কাছ থেকে এক বড় পাত্রে দুধ-চিনিবিহীন জাপানী চা আমার জন্য কিনে দিয়ে গেলেন—যদি পথে আমার তেষ্টা পায়। গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত তিনি স্টেশনে অপেক্ষা ক'রলেন।

গাড়ী ছেড়ে দিলে, যাত্রীদের জন্য প্রত্যুদ্‌গমনকারী আত্মীয়স্বজন বন্ধু মিত্র হাত নাড়তে আর রুমাল দোলাতে লাগলেন। এইবারে আরাম ক'রে বসে সহযাত্রীদের দিকে নেত্রপাত করা গেল। জাপানে নেমেই একটা জিনিস লক্ষ্য করি—এখন জাপানে ইউরোপীয় পোষাকের জয়জয়কার। পথ-চলতি পুরুষদের মধ্যে বোধ হয় শতকরা ৭০ জন পুরোপুরি ইউরোপীয় সুট টাই কলার হ্যাট প'রে যাওয়া আসা ক'রছে। মজুর শ্রেণীর লোক, বোম্বাই অঞ্চলে যাদের কামগার বলে, মিস্ত্রি ফেরিওয়ালা প্রভৃতি হ'য়ে হাফ-প্যান্ট নয় চুরিদার পাজামার মতন পুরাতন জাপানী ঢঙের পাজামা প'রে, মাথায় ইউরোপীয় ক্যাপ বা ফেল্ট্ হ্যাট। জুতো ইউরোপীয় ধরনের, গরীব লোকেদের কারো কারো পায়ে গেতা বা জাপানী কাঠের খড়মের বা চপ্পলের মত জুতো। বৌদ্ধ পুরোহিতরা তাঁদের প্রাচীন ঢিলে-ঢালা চীনা-জাপানী পোষাক ছাড়েন নি, কিন্তু সাবেক চালের জাপানী পুরুষের পোষাক কিমোনো আর হাওরি এই দু'দিনে টোকিওর রাস্তায় চোখে পড়েই নি। একটি বইয়ের দোকানে ডাক্তার তানাকার সঙ্গে যাই, তিনি খাস জাপানী পোষাক পরা একটি প্রাচীন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন, ইনি একজন লেখক, প্রবন্ধকার, কবি, ঔপন্যাসিক, ইংরেজি জানেন—এঁকেই প্রথম টোকিওতে তাঁদের পুরাতন পোষাকে দেখলুম। আর একটি লোককে দেখেছিলুম—লম্বা চওড়া চেহারা, রঙটা একটু ময়লা, মুখখানা খুব ভালো মানুষের মত, আলখাল্লার মত ঢিলে জাপানী পোষাক, পায়ে জাপানী গেতা, কিন্তু মাথায় চূড়োর মত করে বাঁধা বেশ বড় একটা টিকি। পরে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলুম, লোকটি হচ্ছে কুস্তিগীর পহলওয়ান, পহলওয়ানেরা এখনও সাবেক চালের পোষাক আর চালচলন বজায় রেখেছে। ছেলে, বুড়ো, প্রায় সকলেই, অন্ততঃ শহর অঞ্চলে, আর বিশেষ ক'রে টোকিওতে ইংরেজি পোষাক ধরেছে। আমাদের দেশেও এই অবস্থা এসে যাচ্ছে। ইংরেজি শিক্ষিত হোক বা না হোক, ধুতিকে যাদের ঘরের আর ঘরের বাইরের এই দুয়ের পোষাক বলা যায় এমন বাঙালী আর দক্ষিণীদের মধ্যেও ধুতি কোণ-ঠাসা হচ্ছে—ভারতের পুরুষের পোষাক হয়ে দাঁড়িয়েছে ইংরিজি ধাঁচের পেন্টুলেন, আর গায়ে হয় হাফ শার্ট নয় হাওয়ায়ি শার্ট বা বুশ শার্ট, পায়ে ইংরিজি জুতো, কদাচিৎ চপ্পল, মাথায় হ্যাট্‌টা ঐচ্ছিক, আবশ্যক নয়। বিয়ের মত সামাজিক আর ধার্মিক অনুষ্ঠানে পাঞ্জাব উত্তর-প্রদেশ আর এমন কি রাজস্থানেও বর ইউরোপীয় পোষাকে বিয়ে ক'রতে বসে। পিঁড়ের উপরে বসে হাতের বদলে ফুলের টোপর পরে বিয়ের মন্ত্র পড়ে, আর বরযাত্রী বিশেষ বরের বন্ধুরা তো ধুতি প'রে উপস্থিত থাকবার কথা ভাবতেই পারে না। অনেকেই গর্ব ক'রে বলেন যে তাঁদের ঘরে ধুতি নেই। বোম্বাইয়ে উচ্চশিক্ষিত কোঙ্কণী সারস্বত ব্রাহ্মণের ঘরে বিয়েতে দেখেছিলুম, বর যিনি ছিলেন চুরিদার পাজামা আর মাথায় পাগড়ী প'রে, আর সমাগত সমস্ত বরযাত্রী আর কন্যাযাত্রীর মধ্যে একজনও ধুতি প'রে আসেননি—সব পেন্টুলেন আর হাফ শার্ট বা বুশ শার্ট পরে, কেবল কন্যাকর্তা যিনি সস্ত্রীক বরের পা পুজো করলেন আর কন্যা সম্প্রদান করলেন তিনি, আর দুজন ভট্ট বা পুরোহিত ধুতি প'রেছিলেন। তবে সুখের বিষয়

মেয়েরা সকলেই নয়নাভিরাম সাড়ী প'রেই উপস্থিত ছিলেন। ভারতের মেয়েরা এখনও শালীনতা বোধ আর স্বাজাত্য বোধ—'অন্ততঃ পোষাকে'—ছাড়েন নি, ছাড়তে চাচ্ছেনও না।

টোকিওর রাস্তায় দেখি, মেয়েদের মধ্যেও ইউরোপীয় স্কার্ট বা ঘাগরা, ব্লাউস, হাঁটু পর্যন্ত খোলা পায়ে রেশমের মোজা, বিলিতি জুতো, মাথায় ইউরোপীয় হ্যাট্—এরই বাহুল্য। বর্ষীয়সী ছাড়া শতকরা যাটজন এই পোষাকেই চলাফেরা ক'রছে। বৃদ্ধারা এখন জাপানী চোখ-জুড়ানো কিমোনো ছাড়েন নি। কিন্তু কলেজের ছাত্রী, আপিসের কেরানী, কারখানার শ্রমিক, রেস্তোরাঁর পরিবেশিকা—প্রায় সব শ্রেণীর মেয়েই ইউরোপীয় পোষাকে। শুনেছিলুম, অনেকেই বাড়ীতে কিমোনো পরেন—কি মেয়ে কি পুরুষ—জাপানী বাড়ীর সাজ-সজ্জা জাপানী রহন-সহনের পদ্ধতির সংগে হ্যাট কোট, পেন্টুলেন খাপ খায় না।

পুরাতন পোষাকের মর্যাদা জাপানে এখনও মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। টোকিওর রাস্তায় এখন অল্পবয়সী মেয়েদের অনেকেই কিমোনো ছাড়েনি। পাড়াগাঁ অঞ্চলে, আর ছোটো শহরে, ইউরোপীয় পোষাক খুব সাধারণ হলেও, কিমোনো বোধ হয় এখনও আধেকের উপর মেয়েরা প'রে থাকে। শুনতা ব'লে—জাপানী মেয়েদের কিমোনো একটু ভদ্রসমাজের উপযোগী হতে গেলে আজকাল দামী পোষাকের পর্যায়েই পড়ে—মেয়েরা ইউরোপীয় পোষাক ধরছে, আর এতে দৌড়ধাপ চলাফেরার সুবিধা হয় ব'লেও। কিন্তু শুনেছিলুম, জাপানী মেয়েদের মধ্যে ইউরোপীয় পোষাক ঘরের বাইরে আর অনেকটা ঘরের মধ্যেও চালু হলেও, জাপানী মেয়েদের মধ্যে অনেকাংশে তাদের রীতি-নীতির চালচলনের পরিবর্তন হয় নি—বিদেশী পোষাক এসে ভিতরের প্রকৃতি আর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ততটা বদলাতে পারেনি। অবশ্য যুগধর্মের ফলে পরিবর্তন অনেক এসে গিয়েছে, আসছে, আরও আসবে। কিন্তু সেটা মনে হয় ধীরে-সুস্থে স'য়ে স'য়ে হচ্ছে।

আমাদের ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে প্রায় সকলেই, কি পুরুষ কি মেয়ে, ইউরোপীয় পোষাক পরে চ'লেছেন। আমার পাশে একটি মধ্যবয়সী জাপানী ভদ্রলোক ছিলেন, অত্যন্ত আধুনিক ইউরোপীয় সুট টাই কলার প'রে, কিন্তু আলাপের চেষ্টায় জানা গেল, মাতৃভাষা জাপানী ছাড়া আর কোনও ভাষা জানেন না। সারা করিডর গাড়ীতে ইংরেজি জানা দুই একটি মাত্র লোক ছিলেন, দূর থেকে ইংরেজিতে কথা কইছি দেখে তাঁদের একজন আমার সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। আমাদের যাত্রার দিনটি ছিল পরিষ্কার—জাপানের অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমরা জানলার কাচের মধ্য দিয়ে উপভোগ ক'রতে পেরে-ছিলুম। কেবল যখন আমরা জাপানের বিখ্যাত ফুজি পর্বতের অঞ্চলটা দিয়ে যাই, তখন একটু মেঘলা-মেঘলা করেছিল ব'লে ফুজির দৃশ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম। যাত্রীরা অধিকাংশই খবরের কাগজ বা পত্রিকায় মনোনিবেশ ক'রলেন, মাঝে মাঝে গরম জাপানী চা ছোটো বাটিতে ঢেলে ঢেলে খেতে লাগলেন। দেখলুম, জাপানীরা বেশ হিসেবী জাতের মানুষ, অধিকাংশ যাত্রী সংগে ক'রে খাবার এনেছে,—'ফুরোশিকি' বা কাপড়ের পুঁটুলি থেকে পরিষ্কার গালার কাজ করা কাঠের বাক্স আর বাটী বার হ'ল, তাতে আছে ভাত মাছ আর অন্য খাদ্য—ভাত খাবার লম্বা কাঠের কাঠি বেরুল, যাত্রীদের অনেকেই তার সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁর চাকর হাল্কা ছোটো রবারের চাকাওয়ালা ঠেলা গাড়ীতে গরম চায়ের পাত্র, লেমনেড, অরেঞ্জেড, বিয়ার সাকে বা জাপানী মদ, ফল, বিস্কুট, কেক, এই সব বিক্রী করছিল, কেউ কেউ তাও কিছু কিছু কিনছিল।

মাঝের একটি স্টেশনে এই রিজার্ভ করা আসনযুক্ত গাড়ীতে তিনটি আসন খালি হ'ল। সংগে সংগে আর তিনজন নোতুন যাত্রী সেই খালি জায়গার জন্য আমাদের গাড়ীতে উঠলেন। সাধারণ জাপানী ভদ্রঘরের মানুষ। সংগে যা সামান্য মালপত্র ছিল, উপরের র্যাকে তুলে দিলেন। খালি দুটি খাবারের পুঁটুলি নীচে রাখলেন। তিনজনকে দেখেই বুঝতে পারা গেল—প্রৌঢ়া মাতা, যুবক পুত্র, আর পুত্রবধূ। মা-টি পুরাতন জাপানী পোষাকে, কালো রঙের, সৌষ্ঠবপূর্ণ পোষাক, চটকদার নয়। পায়ে সাদা মোজা, আর জাপানী জুতো, মাথার চুলে চূড়াকার জাপানী খোঁপা। মহিলাটির বয়স ৫০ আন্দাজ হবে। ছেলেটি আর ছেলের বউ ইউরোপীয় পোষাকে। বউটি সুশ্রী মেয়ে। বসবার জন্য এরা যে তিনটি স্থান পেলে, সে তিনটির মধ্যে দুটি পাশাপাশি, তার একটি জানলার ধারে, আর তৃতীয় স্থানটি পিছনে, জানলার ধারের জায়গা নয়, জানলার ধারে আর এক যাত্রী আগের থেকেই বসে ছিলেন, জায়গা তখনও খালি হয় নি। নবাগত পরিবারটি আমার বসবার জায়গা থেকে সামনে একটু আগে স্থান পেয়েছিল।

ছেলে আর বউয়ের জন্য পাশাপাশি জায়গা দুটি খালি রেখে, পিছনে করিডরের ধারে যে স্থানটি ছিল, মা এগিয়ে গিয়ে সেখানে বসলেন। বৃদ্ধা আগে বসবেন, তার পরে ছেলে বউ। বউটি চকিতের মধ্যে স্বামীকে একটি কথা বললে, স্বামী দাঁড়িয়ে রইল, তার পরে এসে শাশুড়ীকে উঠে জানলার ধারে বসবার জন্য অনুরোধ করলে। বৃদ্ধার আপত্তি শুনলে মা—বৃদ্ধা চাইছিলেন, ছেলে বউ পাশাপাশি বসুক, কথাবার্তা করতে-করতে যাবে। ছেলেও মাকে অনুরোধ করলে—অগত্যা মা উঠে এসে জানলার ধারে বসলেন। তার পরে, মায়ের পাশে তাঁর ছেলেকে বসবার জন্য বউটির আগ্রহ, নিজে স্বামীর পিছনের সীটে বসবে। প্রাচীন জাপানী সামাজিক রীতি এইভাবে পালন করবার জন্য বউটির চেষ্টা শ্বশুর-শাশুড়ী আগে, পরে স্বামী, তার পরে স্ত্রী। অতি সহজ সুন্দরভাবে হৈ চৈ না ক'রে, পুত্রবধূর ব্যবস্থায় শাশুড়ীর আর স্বামীর চিরাচরিত মর্যাদা রক্ষিত হ'ল। ছেলে মায়ের পাশে নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজে নিবিষ্ট হ'ল। বউটিও একখানি সচিত্র মাসিক পত্র নিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু তার নজর শাশুড়ী আর স্বামীর দিকে। মাঝে স্বামী পায়ের ইউরোপীয় জুতো খুলে ফেললে, আরাম করে বসতে চায়। সংগে সংগে স্ত্রী উঠে পিছন থেকে পুঁটুলির ভিতর থেকে এক জোড়া চটি বার করে স্বামীর পায়ের কাছে রাখলে, আর স্বামীর জুতো জোড়া গুছিয়ে সীটের নীচে রেখে দিলে। মাঝে দুবার উঠে গরম চা ঢেলে বাটি করে শাশুড়ীর কাছে ধরে তাঁর পরিচর্যা করলে। গন্তব্য স্টেশনে পৌঁছুবার আগেই যুবকটি উঠে সংগের সামান্য হাত ব্যাগ পুঁটুলি গুছিয়ে নিলে, নিজেই সব বয়ে নিয়ে গাড়ী থেকে নামল, বউটি শাশুড়ীর আর নিজের ছাতা আর ছোট থলে সামলে নিয়ে শাশুড়ীর পিছনে পিছনে চলল।

শুনেছিলুম, জাপানে আধুনিকতার বিশেষ করে আমেরিকান আধুনিকতার হাওয়া খুব জোরে বইতে আরম্ভ করা সত্ত্বেও, এখনও জাপানে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে প্রাচীন সামাজিক পদ্ধতি যা জাপানী জাতকে নানা বিষয়ে একটা discipline বা নিয়মানুবর্তিতা এনে দিয়েছে, জাপানীদের শক্তিশালী আর সুসংহত করতে সাহায্য করেছে, তা মোটের উপর অটুট আছে, জাপানী গৃহস্থ পরিবারে শান্তি-শৃঙ্খলা সেই কারণে বিপর্যস্ত হয়নি। রেলে এই জাপানী পরিবারটির ধরণ-ধারণ দেখে, বিশেষ বউটির চাল-চলনে আমার মনটা যে একটা অকারণ আনন্দে ভরে উঠেছিল, তা অসংকোচে ব'লবো। এদের সংসার বউটির আচরণে সুখের সংসার বলেই মনে হ'ল, একটা চিত্তপ্রসন্নতা এল, আর এদের জন্য আন্তরিকভাবে আপনা থেকেই শুভ কামনা আর আশীর্বাদ মনের মধ্যে জেগে উঠল।

এইরকম পথ-চলতি জাপানী পরিবারের ধরণ-ধারণ দেখে এদের ঘরোয়া ব্যাপার রীতিনীতির সম্বন্ধে একটু আধটু দিগ্দর্শন হয়েছিল। আর একবার কিয়োতো থেকে ওসাকা মাত্র কয়েক মাইলের রেলযাত্রা করবার সময়ে একটি জাপানী মহিলার সংগে আলাপ হয়, সেটিও একটি বেশ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল। আমার সহযাত্রী ছিলেন কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার অধ্যাপক ডক্টর Yutaka Ojihara য়ুতাকা ওজিহারা। আমেরিকায় ফিলাডেল-ফিয়ায় পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে যখন আমি ছ'মাস কাটিয়ে আসি, ১৯৫১।১৯৫২ সালে, তখন ওজিহারা সেখানে আমার ছাত্র ছিলেন। আমরা পাশাপাশি দুটি সীটে ব'সেছিলুম, আমাদের সামনেও তেমনি আর দুটি সীটে আর দুজন যাত্রী ছিলেন, দুজনেই মহিলা। ওজিহারা আর আমি ইংরেজিতেই কথা কইছিলুম। দুই-একবার "ক্যালকাটা" আর "ইণ্ডিয়া" এই দুটি কথা শুনে, সামনের দুই মহিলার মধ্যে একজন দেখলুম একটু উৎসুক নেত্রে আমাদের দেখছেন। মহিলাটি প্রৌঢ়া, বৃদ্ধত্বের দিকে বেশ এগিয়েছেন, খর্বাকৃতি শীর্ণকায়া মহিলা, মুখখানা বেশ প্রশান্ত বুদ্ধিশ্রীমণ্ডিত, পরনে রেশমের কাল রঙের কিমোনো, হালকা কালো রঙের 'ওবি' বা কোমরবন্ধ, পুরোনো জাপানী কায়দায় চুল বাঁধা। তিনি কিছু পরে ওজিহারাকে জাপানীতে কি জিজ্ঞাসা করলেন, ওজিহারাও উত্তর দিলেন, অনুমানে বুঝলুম, মহিলাটি জানতে চাচ্ছেন, আমি ভারতীয় আর কলকাতার মানুষ কিনা। ওজিহারার মাধ্যমে

আলাপ হ'ল। মহিলাটি নিজের পরিচয় দিলেন। প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন। স্বামী ছিলেন জাপানী ব্যাঙ্ক—ইয়োকোহামা ব্যাঙ্কের কর্মচারী। কলকাতাতেই তাঁর দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে। স্বামীর মৃত্যু হয় কলকাতায়। বহুদিন পরে কলকাতার লোক দেখে তাঁর সব পূর্বস্মৃতি জেগে উঠছে। মোটের উপর স্বামীর মৃত্যুর কথা না ধরলে কলকাতা তাঁদের ভালই লেগেছিল। আমি কোথা থেকে, কেন জাপানে এসেছি, কোথায় যাচ্ছি, সেকথাও ভদ্রতা করে শুনিয়ে দিলুম। জাপান কেমন লাগছে জিজ্ঞাসা করায় বোধ হয় একটু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তাঁর দেশের প্রশংসা করি—এটা ঠিক নিছক ভদ্রতার জন্য ছিল না। তাতে ইনি বেশ খুশী হন। কি কাজ করি, ঘরে স্ত্রী পুত্র কন্যা কারা আছে, এই সব ঘরোয়া প্রশ্নও করলেন। নিজের পরিচয় দিলেন—চমৎকার জাপানী 'হিরাকানা' ছাঁদের অক্ষরে তাঁর নাম লেখা কার্ড। ওজিহারা সেটি পড়ে দিলেন, ঐ নাম আর ঠিকানা কার্ডেই আমি রোমান হরফে লিখে নিলুম। মহিলাটির নাম শ্রীমতী তোশিকো হিরাতো। ওজিহারা বললেন, হিরাতোরা কিয়োতো শহরের একটি অভিজাত বংশের মানুষ। স্বামীর মৃত্যুর পরে দেশে ফিরে আসেন। পয়সা কড়ি বিশেষ ছিল না, ছেলে-মেয়েদের মানুষ করবার জন্য শিক্ষকতার কাজ আরম্ভ করেন। শিক্ষার বিষয়ে—সুন্দর ছাঁদের হস্তাক্ষর—Calligraphy লিখতে শেখানো, আর Ikebana 'ইকেবানা' অর্থাৎ দেবতার বেদিতে। জাপানী ঘরের 'তোকো-নোমো' বেদিতে পাত্রে ফুল সাজানো। এই দুইটিই হচ্ছে জাপানের ভদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের অবশ্য আলোচ্য সুকুমারকলা—বিশেষতঃ 'ইকেবানা' বা ফুল-সাজানো, কতকটা আমাদের হিন্দু ঘরের মেয়েদের আলপনা দেওয়া একটা প্রাচীন গৃহশিল্প, এই ফুল-সাজানোটাও জাপানী মেয়েদের পক্ষে অত্যাবশ্যক শিল্পচর্যা। লিপি-কলা আমাদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত, জনসমাজে এর প্রচলনও এতটা ছিল না, কিন্তু চীন জাপান কোরিয়াতে, মধ্যযুগের ইউরোপে এবং আরবী-ফারসী লিপিকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন দেশে অভিজাত বা শিক্ষিত মুসলমান সমাজে লিপি কলা তত্তদ্দেশের সংস্কৃতির একটি বড় অঙ্গ ব'লে বিবেচিত হ'ত, আর এখনও হ'য়ে থাকে। এ ছাড়া, তিনি জাপানী রীতিতে গীত বাদ্যও শেখান। ভদ্রমহিলা নিজে থেকেই বললেন, কিয়োতোতে তাঁর বাড়ী, তিনি যাচ্ছেন ওসাকাতে তাঁর এক ভাইয়ের কাছে, ভাইয়ের একটি মেয়ের বিয়ের কথা ঠিক হ'য়ে গিয়েছে একটি যুবকের সঙ্গে, সব পাকাপাকি ব্যবস্থা বিয়ের দিন স্থির ইত্যাদি সব হবে, বন্ধু-কুটুম্বদের সঙ্গে শেষ কথা হবে, কনের পিসি ব'লে তাঁরও ডাক পড়েছে, এ শুভকার্যের প্রাথমিক পদক্ষেপে তাঁকে থাকতে হবে। আমাকে বোঝাবার জন্য তিনি কতকগুলি কথার অবতারণা করলেন, ওজিহারা অনুবাদ করে যেতে লাগলেন। আগে জাপানী সমাজে বর কনের সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই পাত্র পাত্রীর বাপ-মা বিয়ের সব ঠিক করতেন। ঘটকের রেওয়াজ এখনও জাপানে আছে, ঘটকদের ঘটকালিতেই বিয়ের ব্যবস্থা হ'ত। বর ২০, কনে ১৫—এইরকম বয়সেই বিয়ে হ'ত। আজকাল ছেলে আর মেয়ে উভয়েই একটু স্বাধীনতা চায়, বিশেষতঃ ছেলেরা। ছেলেদের আর ছেলেদের আত্মীয়দের মেয়ে দেখার রেওয়াজ আগে জাপানে ছিল, ঘটকের মধ্যস্থতায়ও কোনও মন্দিরে, বা চা-পানের দোকানে, বা সাধারণ বাগানে মেয়েকে এনে বরপক্ষকে দেখানো হ'ত। বর কনে পরস্পরকে আড় চোখে দেখে নিত, কিন্তু কথাবার্তা হ'ত না। আজকাল বিয়ের কথা যখন চ'লছে তখন ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে কথাবার্তার আলাপ-আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। কোথাও বা বিয়ের কথা খানিকটা এগোলে, দুজনে থিয়েটার বা সিনেমা দেখে আসতে পারে, কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে এক সঙ্গে খেয়ে আসতেও পারে। মহিলার ভাইঝিটি অতি সুন্দর সেকেলে লাজুক স্বভাবের মেয়ে, তবে তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে এখন সিনেমায় থিয়েটারে রেস্তোরাঁয় যাবার অনুমতি পেয়েছে। বিবাহ হবে মাস দুই পরে। বিয়ের দামী দামী পোষাক, উভয় পক্ষের যৌতুক, এ সব ঠিক হবে। বিয়ে হবে শিন্‌তো রীতিতে। কনে গিয়ে উঠবে শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে। পরে সুবিধামত নোতুন সংসার পাতবার জন্য বরের বাপ-মা ওদের জন্য আলাদা ফ্ল্যাট বা অন্য বাসার ব্যবস্থা ক'রবেন।

এই স্বল্প পরিচয়ে চলতি রেলে ভদ্রমহিলা এতগুলি কথা ব'ললেন। ঘর গৃহস্থালীর ব্যাপারে তাঁর যে একটা আনন্দ আছে, তা বেশ বোঝা গেল। আমার কাছেও এই সরল হৃদ্যতা ভালোই লাগ্‌ল। জাপানের সামাজিক পরিবেশের একটা সুন্দর ছবি পাওয়া গেল।

যথাকালে ওসাকা স্টেশনে আমরা পৌঁছুলুম, সৌজন্যের সঙ্গে আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলুম।

সুদূর সুগন্ধ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কানে-কানে বলার মত করে মিসেস রঞ্জিতা চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা ভালো কাজ ছিল, করবে?'

অবাক হয়ে মিসেসের মুখের দিকে তাকাল দীপিকা। প্রশ্নের পিঠে একটা উত্তর দিতে হয় তাই বললে, 'কী কাজ?'

'কী আবার! কেরানীগিরি।'

'কোথায়!'

'ওষুধের কারখানায়। দাঁড়াও, নামটা আমার টোকা আছে।' ব্যাগ খুলে ঘাঁটতে লাগলেন রঞ্জিতা। 'সঙ্গে টেলিফোন নাম্বারও।'

তার চেয়েও বোধ হয় যে খবরটা বেশি জরুরি তার দিকেই দৃষ্টি ফেরাল দীপিকা। বললে, 'মাইনে কত?'

'তোমার এখানকার চেয়ে বেশি।'

দীপিকা হাসল অস্ফুটে। তার মানে এখানকার চেয়ে বেশি মাইনের চাকরির জন্যেও তার যোগ্যতা আছে। কিংবা এখানকার এ মাইনেটাই তার পক্ষে তুঙ্গতম নয়।

'কত বেশি!'

'পঞ্চাশ টাকা।'

'তার মানে, দুশো টাকা মাইনে?' তরল চোখ উজ্জ্বল করল দীপিকা।

'তা ছাড়া, সবচেয়ে যা সুবিধে, ধরা-বাঁধা সময়ের জন্যে কাজ—অনেক হাল্কা হয়ে থাকতে পারবে।' স্বরটা বুঝি একটু আর্ত করলেন রঞ্জিতা: 'এখানকার মত চব্বিশ ঘণ্টার কয়েদী হয়ে থাকতে হবে না।'

'তা হলে বাড়িতে থাকতে পারব।'

'নিশ্চয়।'

'মা-বাবা ভাই-বোনদের সঙ্গে।' প্রায় স্বপ্নের সুরে বলে উঠল দীপিকা।

'হ্যাঁ, এই যে—এই সেই ঠিকানা।' কাগজের টুকরোটা খুঁজে পেয়েছে রঞ্জিতা।

'দরখাস্ত পাঠাব?'

'দরখাস্তের সময় কোথায়? ম্যানেজারকে টেলিফোন করো। টেলিফোনে সময় ঠিক করে ইন্টারভিয়ু দিয়ে এস। দেরি কোরো না।'

তবু তক্ষুনি-তক্ষুনি ফোন করতে ছুটল না দীপিকা। বোধ হয় তারও জন্যে একটি লগ্নকাল দরকার।

'কখন ফোন করব!'

'তাও ফোন করে জেনে নাও না ম্যানেজার কখন ফোনে এভেইলেবল হবে।' ব্যস্ত মানুষ রঞ্জিতা, উঠে পড়লেন।

'যদি চাকরিটা পাই', সঙ্গে-সঙ্গে দীপিকাও উঠে দাঁড়াল: 'আপনারা আমাকে ছেড়ে দেবেন তো?'

'তুমি তোমার নিজের স্বার্থে ছেড়ে যাবে, আমরা আটকাবার কে? আমরা তোমার উন্নতিতে বাধা দিতে যাব কেন?' বদান্য হাসিতে মুখ ভরে তুললেন রঞ্জিতা: 'তুমি যদি এখন হঠাৎ বিয়ে করো, আর হোল-টাইমার না থাকতে পারো, আমরা কি তাই বলে তোমার বিয়েতে বাগড়া দেব? মেয়েদের সবচেয়ে বড় উন্নতিই তো বিয়ে।'

আমি তা মানি না। দীপিকার ইচ্ছে হল, বলে গম্ভীর হয়ে। কিন্তু সুপিরিয়রের সঙ্গে তর্ক করা ঠিক নয়। তার হ্যাঁ-তে হ্যাঁ আর না-তে না বলে যাওয়াই উন্নতি।

নিরিবিলি দেখে রিসিভার তুলে নিল দীপিকা।

হয় এনগেজড, নয় রং নাম্বার, নয়তো মৃত, নিঃশব্দ।

হয়তো সবটাই ভাঁওতা। অন্তত ভুল-খবর। অমন কারখানাই আছে কিনা ঐ ঠিকানায় তার ঠিক কী।

চুপিচুপি জেনে ঐ এলাকায়। তাকাল এদিক-ওদিক।

না, জলজ্যান্ত কোম্পানি। প্রকাণ্ড সাইনবোর্ডে পাড়া জাঁকিয়ে বসেছে।

হোম-এ ফিরে এসে নির্জন বুঝে আবার ডায়াল করল দীপিকা। তিনবারের বার ঘণ্টা বাজল।

'ম্যানেজার মিস্টার রায় আছেন?'

'আছেন। ধরুন।'

দীপিকার বুক ধুকধুক করতে লাগল।

'হ্যালো—' এক মিনিট স্তব্ধতার পর ভারী কণ্ঠের আওয়াজ হল।

'আপনাদের অফিসে একটা কাজ খালি আছে জানতে পেরে—'

কথাটা ও-প্রান্ত শেষ করতে দিল না। ঝপ করে জিজ্ঞেস করে বসল: 'আপনার নাম?'

'দীপিকা দে।'

'কী পাশ করেছেন?'

'বি-এস্‌সি।'

'আপনার বয়েস?'

ধাক্কা খেল দীপিকা। কোন্ সালে পাশ করেছে জেনে নিয়েই তো কায়দা করে বার করতে পারত বয়েসটা।

এক হিসেবে হয়তো ভালো। লোকটা সরাসরি।

অজান্তে ঢোক গিলল দীপিকা। বললে, 'সাতাশ।'

কে জানে বেশি হল না কম হল। বয়েসটা এমনি একটা বাড়তি বোঝা যে কখন তুলতে হবে বা নামাতে হবে বুঝে ওঠা যায় না।

কিন্তু ও প্রান্তে কোনো কুয়াশা নেই। প্রশ্ন হল: 'কে আপনাকে এই চাকরির খবর দিল?'

'মিসেস চৌধুরি। মিসেস আর—রঞ্জিতা চৌধুরি।'

'কই ওকে তো আমি চিনি না—'

'লিণ্টন স্ট্রিটে থাকেন।'

'কোথায় লিণ্টন স্ট্রিট? থাক গে, ওতে আমি ইণ্টারেস্টেড নই।' ও-প্রান্তকে একটু বা অসহিষ্ণু শোনাল: 'এখানে চাকরিটা কী জানেন?'

'কেরানির চাকরি।' কুণ্ঠা মিশিয়ে বললে দীপিকা।

'তা এক হিসেবে বলতে পারেন। কিন্তু নামটা সম্ভ্রান্ত। আমরা বলি প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

'মাইনে?'

'স্টার্টিংএ তিন শো। আচ্ছা, আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন? পাবলিক ফোন?'

'না। আমার হোম থেকে।'

'হোম? মানে যেখানে আপনি থাকেন, মানে আপনার বাড়ি—বাসা থেকে?'

অজান্তে হেসে উঠল দীপিকা। বললে, 'না! যেখানে আমি কাজ করি সেখান থেকে।'

'সে আবার কী হোম?'

'রেস্কিউ হোম।' কেমন একটু বা মৃদু করুণ শোনাল দীপিকাকে।

'মানে, মেয়েদের আশ্রম? যে সব মেয়েরা অর্থাৎ যে সব মেয়েদের উপর—'

'হ্যাঁ,' দীপিকা গম্ভীর মুখে বললে, 'পুলিশ-কেসের মেয়ে।'

'তা, আপনার সেখানে কাজ কী? আপনি—'

অজান্তে আবার একটু হেসে ফেলল দীপিকা।

'হাসছেন?'

চাপল্য হয়ে গিয়েছে বোধ হয়, তাড়াতাড়ি গাম্ভীর্যের রঙ চড়াল দীপিকা। বললে, 'না, ও কিছু না।'

'আমি বুঝতে পারছি কেন হাসলেন। মানে, চাকরিটা নামে যেমন সম্ভ্রান্ত মাইনেতে তেমন নয়। তাই না?'

'ঠিক তাই।'

লোকটা ভীষণ খোলাখুলি। জিজ্ঞেস করলে, 'কত দেয়?'

মাইনের কথাও লোকে জিজ্ঞেস করে? ঢোক গিলল দীপিকা। ঘুরিয়ে বললে, 'আপনি যা দিতে চাইছেন তার আদ্ধেক।'

ঘুরিয়ে বলার ধার ধারে না লোকটা। বললে, 'তার মানে, দেড়শো? রাবিশ! আপনাদের হোমের কর্তা কে?'

'কমিটি আছে একটা। আর ঐ যে মিসেস রঞ্জিতা চৌধুরি—যাঁর নাম করেছি—তিনিই সেক্রেটারি।'

'মিসেস-ফিসেসে আমি ইণ্টারেস্টেড নই।' বলেই পরমুহূর্তে সামলাল ও-প্রান্ত: 'মানে, আপনার হোম-অ্যাফেয়ার্সে আমার আগ্রহ নেই। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি মাইনে কম বলেই আপনি আপনার বর্তমান চাকরি ছেড়ে দিতে চাইছেন?'

'আরো একটা কারণ আছে।'

'কী? জায়গাটা খারাপ? মানে, আই মিন, ভিশিয়েটেড?'

'না, তা কেন?'

'তবে?'

'এটা চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি।'

'তার মানে, রেসিডেনশিয়াল? ঘর-বন্দী?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।' পরে হঠাৎ কণ্ঠে কাঠিন্য জাগল: 'তাহলে একদিন দেখা করবেন আমার সঙ্গে।'

'কবে?'

কতক্ষণ ও-প্রান্ত থেকে শব্দ নেই।

সে কী? কেটে গেল নাকি? দীপিকা চঞ্চল হয়ে উঠল: 'হ্যালো, কবে? কবে যাব দেখা করতে?'

তবুও ও-প্রান্ত মৃত, নিঃশব্দ।

পারে এসে তরী ডুবল নাকি? দীপিকার গলায় অসহায় ব্যাকুলতার সুর জাগল: 'শুনছেন—কবে, কবে দেখা করব?'

ও-প্রান্ত থেকে ছোট্ট একটি হাসির শব্দ উঠল: 'মাঝখানে একটা ক্রস-কনেকশান হয়েছিল। তা কবে আসবেন? কাল—পরশু—শুনুন,' এবার ব্যাকুলতা বুঝি ও-প্রান্তে: 'কোথায়, কোথায় দেখা করবেন বলুন তো? আমার অফিসে, না, আর কোথাও?'

'আর কোথাও?'

'মানে, অফিসে দেখা করার সুবিধে নেই, চারধারে লোকজন—চৌরঙ্গিতে আসতে পারেন?'

'চৌরঙ্গি?' কী রকম ফ্যাকাশে শোনাল দীপিকাকে।

'হ্যাঁ, পার্ক স্ট্রীট অঞ্চলে। মানে, আই মিন, আমার চেম্বারে।'

'চেম্বারে?' দীপিকার হাতের রিসিভারটা ভার হয়ে উঠল।

'আপনার আপত্তি আছে?'

'আচ্ছা, আপনার ফোন নাম্বার দিন। প[illegible] জানাব সময় ও স্থান। কেমন?'

'তাই ভালো।' তাড়াতাড়ি ফোনটা ছে[illegible] দিয়ে হাঁপ ছাড়ল দীপিকা।

কী সর্বনাশ! বলে কিনা চেম্বারে গি[illegible] দেখা করো।

'তার মানেই চাকরিটা হবে।' সমবয়[illegible] সখীর মত মুখ টিপে হাসলেন রঞ্জিতা।

'কিন্তু অফিসের চাকরি, অফিসে ইণ্টা[illegible] ভিয়ু হওয়াই তো উচিত।'

'চাকরিটা প্রাইভেট সেক্রেটারির, তাই কো[illegible] হয় প্রাইভেটে—' রেখাটাকে রঞ্জিতা আর স্প[illegible] করলেন না।

'বাবা, দরকার নাই। কি জানি কী-[illegible] দীপিকা গুটিয়ে গেল।

'আচ্ছা, এত ভয় পাবার কী হয়েছে[illegible] সঙ্কোচ উড়িয়ে দিয়ে শক্ত হলেন রঞ্জিতা: 'এব[illegible] বার দেখা করেই এস না হয়।'

'কিন্তু চেম্বারে বলছে কেন?'

'যারা বড়-বড় অফিস চালায় তারা অনে[illegible] সময় ঐ রকম বলে থাকে।' আশ্বস্ত কর[illegible] চাইলেন রঞ্জিতা: 'মুখোমুখি কথা ব[illegible] হয়তো দেখবে, ভয়ের কিছুই নেই। একেবারে[illegible] জল ভাত।'

'কিন্তু পার্ক স্ট্রীট অঞ্চল—'

'কেন, ও অঞ্চল তুমি চেন না?' হেসে[illegible] উঠলেন রঞ্জিতা: 'হোমএর কাজে কেনাকা[illegible] করতে কতদিন গিয়েছ ও দিকে—'

'তা গিয়েছি, তবু—'

'তুমি একটা হোমএর সুপার, তোমার ভ[illegible] পাবার কী হয়েছে! তুমি কেন কুসংস্কা[illegible] মানবে? গিয়ে দেখ, পছন্দ না হয়, নেবে না[illegible] তবে মাইনেটা বেশি—একটা ভালো চান্স[illegible] আচ্ছা, ঠিক আছে,' আবার আশ্বাসের সু[illegible] আনলেন রঞ্জিতা: 'আমিও খোঁজ নিচ্ছি—'

কই, দুদিন কেটে গেল, ভদ্রলোক স্থা[illegible] কাল জানিয়ে ফোন করল না তো!

কী করে করবে! সেদিন দীপিকা [illegible] ভদ্রলোককে তার ফোন নাম্বারই দেয়নি। পার্[illegible] স্ট্রীট অঞ্চল শুনেই পড়ি-মরি করে ছে[illegible] দিয়েছে রিসিভার। ছি ছি ছি! ভদ্রলো[illegible] না জানি কী ভেবেছে! যে মেয়ে এত ভী[illegible] দুর্বল, অন্যমনস্ক, তার চাকরি হয় কী করে[illegible] ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে নিজেই দীপিকা ডায়া[illegible] করল।

পেয়ে গেল ম্যানেজারকে।

'আমাকে আপনি দেখা করবার সময় [illegible] স্থান জানাবেন বলেছিলেন—'

'ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা দেখুন, কা[illegible] আসুন। ধরুন, সকাল আটটায়। কি, ঐ সম[illegible] পারবেন আসতে?'

'পারব।' তারপর একটু থামল দীপিকা[illegible] 'কোথায়?'

'আমার চেম্বারে।'

'ঠিকানা?'

ঠিকানা বলল ও-প্রান্ত। একবার ন[illegible] দুবার বলল। অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে দিল[illegible] হ্যাঁ, একটু গলির মধ্যে। বাঁহাতেই সিঁড়ি[illegible] সোজা উঠে যাবেন উপরে। হ্যাঁ, দোতলাতে[illegible] চেম্বার। দরজায় নেমপ্লেট আছে। দরজা ব[illegible] থাকলে কলিং বেল টিপবেন। কেউ না কে[illegible]

'বলে কিনা দরজা বন্ধ থাকবে।' সেক্রেটারিকে বললে দীপিকা।

'তাহলে কলিং বেল টিপো না। সোজা ফিরে এস।' রঞ্জিতা ব্যঙ্গ করে উঠলেন। 'সোজা কথা। দরজা যখন বন্ধ তখন উন্নতিও বন্ধ।'

না, ভয়ই কুসংস্কার। দেখি না কী আছে! বন্ধ দরজা কোথায় খোলে কিংবা খোলা দরজা কোথায় বন্ধ হয়।

ঠিকানা মিলল, অবস্থান মিলল। কিন্তু দরজা বন্ধ।

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলে দিল বেয়ারা। বসুন। সাহাব এখুনি এসে পড়বেন।

ভিতরের ঘরে এসে বসল দীপিকা।

টেবিলে-চেয়ারে তাকে-আলমারিতে চেম্বারের মতই ঘরটা। মোটা মোটা ডাক্তারি বইয়ের স্তূপ—একটা বই একটু নেড়ে-চেড়েও দেখল দীপিকা—শারীরবিজ্ঞানের বই। তাড়াতাড়ি সরিয়ে রাখল। কিন্তু দেখবে কী, তাকাবে কোন্ দিকে? দেয়ালে কতগুলি পট—স্ত্রীপুরুষের। হ্যাঁ, রয়েছে, শারীর তত্ত্বের চার্ট, কিন্তু নগ্ন, বীভৎস। কঙ্কালের আবার নগ্নতা কী, নিজের মনেই একটু বিচার করল দীপিকা, তবু কেন কে জানে, মনে মনে শিউরে উঠল। কী আশ্চর্য, ডাক্তারি কারখানায় এসব চার্ট তো থাকবেই—তবু, কেন কে জানে, না থাকলেই ভালো হত। সাদা দেয়ালই শান্তির দেয়াল।

কতক্ষণ পরে বেয়ারা এসে বললে, 'ফোন।'

'আমার?'

'হ্যাঁ, সাহাব।'

সামনের টেবিলের উপরেই ফোন, কিন্তু সেটা না বেজে এ ফোন কোথায় বাজল। দীপিকা ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করল বেয়ারাকে। ঢাকা বারান্দা পেরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকল। ঘরটা ছোট, কিন্তু গা-টা ছ্যাঁৎ করে উঠল, খাটে বিছানা পাতা। ত্রস্ত চোখে চারদিক তাকাল দীপিকা, না, জন-মানুষ নেই।

খাটের শিয়র ঘেঁষে টিপয়ের উপর টেলিফোন। বুকজোর হয়ে রিসিভারটা তুলল দীপিকা।

'হ্যালো, তুমি—আপনি এসে গেছেন?' ও প্রান্ত উচ্ছল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁ, আপনি বলেছিলেন আটটায়—'

'হ্যাঁ, তাই। দেখুন, আমি খুব দুঃখিত, ঠিক সময়ে যেতে পারলাম না। একটা জরুরি কাজে আটকা পড়ে গেছি—'

'তা হলে—'

'হ্যাঁ মিনিট পনেরো দেরি হবে। পারবেন একটু অপেক্ষা করতে?'

'পারব।'

'এই এসে পড়ছি। বেশি দেরি হবে না। ফোনটা একটু বেয়ারাকে দিন।'

ফোনটা বেয়ারার হাতে ছেড়ে দিয়েই অফিস ঘরে চলে এল দীপিকা।

নিঝুম হয়ে বসে আছে, বেয়ারা এক কাপ কফি এনে রাখল সামনে।

'এ কি?' ভয়ের কিছু নেই, সামান্য একটা পেয়ালা, তবু চমকে উঠল দীপিকা।

'সাহাব আপনাকে আরাম করতে বললেন, বললেন, কফি খেতে।' বেয়ারা ফ্যানের রেগুলেটারের উপর হাত রাখল: 'কমিয়ে দেব?'

'না, ঠিক আছে।'

কী আর করা, কফির পেয়ালায় চুমুক দিল দীপিকা।

আর চুমুক দিয়েই মনে হল, মাথাটা ঘুরে উঠেছে। শরীর ঝিমঝিম করছে।

এ সে কী করল? অচেনা-অজানা জায়গায়, নির্বান্ধব নির্জনে কফি খেতে গেল সে কোন্ লজ্জায়? এখন কোন্ পথে কী সর্বনাশ না জানি উপস্থিত হয়!

হাতের ঘড়ির দিকে তাকাল দীপিকা। মনে হল, ঘড়ির অক্ষর কিছুই পড়তে পারছে না। ডাকল: 'শোনো।'

সচকিতে বেয়ারা ছুটে এল।

'আচ্ছা, তোমার সাহাব কি এইখানে থাকেন?'

'হ্যাঁ, এই তো তাঁর ফ্ল্যাট।'

'বলো কী, বলছিলেন এটা তাঁর চেম্বার।'

'হ্যাঁ, এই ঘরটা চেম্বার, বাকিটা ফ্ল্যাট।'

'বাড়িতে আর লোকজন নেই?'

'কী করে থাকবে! সাহাব যে—'

এবার অফিস ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল। বেয়ারা কানে ঠেকিয়েই বাড়িয়ে ধরল দীপিকার দিকে। 'আপনার।'

'ভীষণ দুঃখিত। ঘণ্টাখানেকের আগে ছাড়া পাচ্ছি না। আচ্ছা, পরশু এমনি টাইমে আসতে পারবেন? কত যে আপনার অসুবিধে করলাম, কী বলে যে ক্ষমা চাইব! হ্যালো, শুনছেন? কি, পারবেন আসতে?'

'দেখি যদি ছুটি পাই—।'

'না, না, ছুটি পাবে। এস। আমি ঠিক অপেক্ষা করে থাকব। কেমন?'

দড়াং করে টেলিফোনটা রেখে দিল দীপিকা।

রঞ্জিতাকে সব বলল দীপিকা। 'কিন্তু ভদ্রলোক 'তুমি' বলেন কোন সুবাদে?'

হাসলেন রঞ্জিতা। বললেন, 'তার মানেই তো চাকরিটা হবে।'

'তাই বলে—'

'কী আসে যায়! ভদ্রলোকের বয়েস, যা শুনেছি, তোমার দ্বিগুণ।' রঞ্জিতা অভয় দিতে চাইল।

'তা হোক, আমার এখনো চাকরি হয়নি। এখুনি প্রভুত্বের সুর কেন?'

'স্নেহেরও হতে পারে।'

'সেটা আরো আপত্তিজনক।'

'তুমি একটা কুসংস্কারের ডিপো। একটা বৃদ্ধ লোক অল্পবয়স্ক মেয়েকে 'তুমি' বললে দোষ হয় না। তা বলেওছে তো দু একবার। তাও জিভ ফসকে।'

'আচ্ছা রঞ্জিতাদি' আশ্রিতের মত একটু কাছাকাছি হল দীপিকা: 'আপনাকে এ চাকরির খবরটা দিয়েছিল কে?'

'মিসেস খাসনবিশ। আমাদের উইমেন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট।'

'মিস্টার খাসনবিশ কে?'

"বা তিনিই তো ঐ ডাক্তারি কোম্পানির সবচেয়ে বেশি শেয়ারওয়ালা ডিরেক্টর।' একটু শাসনের সুর তুললেন রঞ্জিতা: 'তুমি কি মনে করো বিজ্ঞাপন দিয়ে ওপেন মার্কেট থেকে রিক্রুট করতে গেলে তোমার কোনো চান্স ছিল? মিসেস খাসনবিশ কথায় কথায় আমাকে বললেন, কোনো জানাশোনা স্মার্ট গ্র্যাজুয়েট মেয়ে চাকরি করবে কিনা, আমি তোমাকে বললাম। তা তোমার না পোষায়, তোমার একটুতেই মান যায়, তুমি নিও না—'

'আমার সঙ্গে তো এখনো ইন্টারভিয়ুই হল না।' হেসে উঠল দীপিকা: 'আগে সিলেক্টেড হই, তারপরে অন্য কথা।'

'আমিও তো তাই বলছি। তুমি একেবারে না মরতেই ভূত দেখছ।'

দরজা খোলা। মুখোমুখি বসল দীপিকা।

বেঁটেখাটো শক্ত-সমর্থ লোক, বয়েস পঞ্চাশের বেশি মনে হয় না। বরং কম দু-এক বছর। জরার চিহ্ন নেই কোথাও, কানের দিককার চুলে পাক ধরেছে মাত্র।

'আপনি অবিবাহিত?' ধ্রুবেশ ধীরে চোখ তুলল।

'হ্যাঁ।'

'আপনি বয়েস যা বলেছিলেন তার চেয়ে আপনাকে কম দেখায়।'

রঞ্জিতাদির কথা মনে পড়ল দীপিকার। তাহলে চাকরিটা বুঝি হল। কিন্তু চাকরিটা কী?

'আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?'

'মা বাবা ভাই বোন।'

'বাড়িতে আপনার রান্নাবান্না করতে হবে না তো? আই মিন,' ধ্রুবেশ হাতের সামনে ছোট একটা পেপারওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, 'হোম থেকে ছাড়া পেলে বাড়িতেই থাকবেন তো, তাই জিজ্ঞেস করছি।'

'না, বাড়িতে রান্নার ব্যবস্থা আছে।'

'মানে, পিছটান যাতে না থাকে। একটু বেশিক্ষণ এখানে থাকতে হতে পারে।'

'বেশিক্ষণ!'

'সন্ধে সাতটা-আটটা? মিটিং-টিটিং এই সন্ধের দিকেই থাকে কিনা—'

দীপিকা চুপ করে রইল। দেখল কালো পাথরের পেপারওয়েট আরো অনেকগুলি পড়ে আছে টেবিলের উপর। একটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

'তাই বলে রোজ নয়, মাঝে মাঝে।'

'আসতে হবে কখন?'

'দশটা-এগারোটা। তার বিশেষ কড়াকড়ি নেই। কিন্তু সন্ধেগুলি অনিশ্চিত।' একটা ছেড়ে আরেকটা পেপারওয়েট কুড়িয়ে নিল ধ্রুবেশ।

'কিন্তু কাজটা কী!

'কাজ আবার কী! এই ডিক্টেশান নেওয়া, চিঠি টাইপ করা, মিটিং অ্যারেঞ্জ করা—বাই দি ওয়ে, আপনি টাইপিং জানেন?'

'জানি।'

'সর্টহ্যান্ড?'

'জানি, কিন্তু স্লো।'

'আমার ডিক্টেশান আরো স্লো। সেই জন্যে আপনি ভাববেন না। আমি আপনাকে ট্রেণিং দিয়ে নেব। বাই দি ওয়ে—আপনার স্বাস্থ্য কেমন?'

দীপিকা উত্তর দিল না।

'দেখছেন এদের কেমন স্বাস্থ্য?' ধ্রুবেশ পেপারওয়েটগুলির দিকে ইংগিত করল।

আসলে পেপারওয়েট নয়, দীপিকা লক্ষ্য করে দেখল, ছোট ছোট পাথরের গায়ে খোদাই-করা মিথুন মূর্তি।

মনোযোগ ফিরিয়ে নিল ধ্রুবেশ। বলল,

'তা আপনাকে তো ভালোই দেখাচ্ছে। রোদে-জলে মানুষ, হার্ড টাইপ। হ্যাঁ, আমি কাজের মানুষ চাই—অফিসও করবে আর আমার সংগে ঘোরাঘুরি করবে—'

'বুঝেছি।'

'মানে বন্ধুত্ব গোছের। আচ্ছা, আপনি সিনেমা দেখেন? কোন্ সময়ে যান, সন্ধেয় না দুপুরে? নাইট শো তো নিশ্চয়ই নয়।'

'ছুটি পেলেই যাই। সময়ের ঠিক নেই।' বলে তাকাল দীপিকা। 'সংগী থাকলে নাইট-শোতে আপত্তি কী।'

'আচ্ছা হোটেলে খেয়েছেন কখনো?'

'খেয়েছি।'

'আমিষ না নিরামিষ?'

'দু-রকমই।'

'মানে, আমি জানতে চাইছি, আপনার সেই সাহস আছে কী, আই মিন, কারেজ—বুঝেছেন?' প্রবেশ আরেকটা পাথরের মূর্তি তুলে নিল।

'বুঝিছি।'

'আছে, কারেজ আছে?'

'আছে।'

'আমার সংগে আপনাকে দেখলে আপনার দিকের কোনো লোকের আপত্তি হবে কি?'

'না, আপত্তি হবে কেন?'

'যদি টুরে বাইরে যেতে হয়?'

'যাব।'

'ধরুন, একটা 'কুপে' রিজার্ভ হল দুজনের জন্যে। যাবেন?'

'অন্য কামরায় যার্থ যদি না পাওয়া যায়, যাব না কেন? আমি আপনার সেক্রেটারি, আপনার সংগেই তো থাকব।' উদার সম্মতি দিল দীপিকা।

'খোলাখুলিভাবে বলতে গেলে, দেখতেই পাচ্ছেন, আমি সিংগল লাইফ কাটাচ্ছি—আপনি কিছু মনে করছেন না তো—আপনি যদি সেক্রেটারি হন তবে আপনার-আমার মধ্যে একটা বোঝাবুঝি না থাকলে চলবে কী—'

'হ্যাঁ, বোঝাবুঝি চাই বৈ কি।'

'আমার সব সংসার এই চাকরের উপর নির্ভর। কিন্তু যে আমার সেক্রেটারি হবে তাকেই হয়তো মাঝে-মধ্যে আমার টাকা-পয়সা রাখতে দেব, ধরুন ব্যাগ ঘড়ি চশমা—কখনো-কখনো খরচের দায়িত্ব তারই উপর বর্তাবে—একটা বোঝাবুঝি না থাকলে চলবে কেন?'

'তা তো ঠিকই।'

'আপনি পারবেন তো?'

'আপনার কী মনে হয়?' কালো কটাক্ষ উজ্জ্বল করল দীপিকা।

'আমার তো মনে হচ্ছে পারবেন। আপনি ঠিক আমার টাইপ। দেখুন তো এই ডিজাইনটা। দেখবেন আরো দেখবেন। আমার কী সব 'হবি' আপনি সেক্রেটারি, সব আপনাকে জানতে হবে। কিন্তু দেখুন, একটা কথা—'

'বলুন।' গোপনীয়ভাবে কান পাতল দীপিকা।

'আপনার-আমার মধ্যে কী সম্পর্ক কেউ যেন না জানে।' প্রবেশের স্বরেও গোপনীয়তা ফুটল : 'আমার এখানে অনেক ভাড়াটে আছে, অনেক লোকজন, সবার সামনে যেমন আপনি কাজের লোক তেমনি কাজের লোকই থাকবেন। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

'মানে সকলের সামনে সেক্রেটারি, আমার সামনে প্রাইভেট।'

'তবে কবে থেকে—'

'এই ফর্মটা নিয়ে যান, ফিল-আপ করে পাঠিয়ে দিন যত শিগগির সম্ভব। পাবার সংগে-সংগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পৌঁছে দেব। বুঝতে পাচ্ছেন এ একটা ফর্মই মাত্র।' ফাইল থেকে একটা ফর্ম বের করে এগিয়ে দিল দীপিকার দিকে।

'মাইনে তিন শো?'

'তার উপর আরো কিছু এলাউয়েন্স আছে। ওটা তো লিখিত। অলিখিত—'

নিপুণ নয়নে হাসল দীপিকা।

'তারপর আপনার হোম-এর গল্প বলুন। অনেক সব থ্রিলিং স্টোরি নিশ্চয়ই। বলুন না কয়েকটা।'

মানে, গল্পের লাইন ধরিয়ে দিল প্রবেশ, বেশির ভাগ কত বয়সের মেয়ে? সবাই কি অত্যাচারের বলি, না, কি কারু কারু মধ্যে বিশুদ্ধ আগুন আছে, নির্বিচার আকাঙ্ক্ষার আগুন? প্রেম বিশুদ্ধ হয় কিনা জানিনা, কাম বিশুদ্ধ হয়। হ্যাঁ, শুনেছিলাম, হোম থেকে একটা মেয়ে এক রাজমিস্ত্রির সংগে পালিয়েছিল, কে এক পণ্ডিত ধর্ম শেখাতে আসত, একটা মেয়ে সেই পণ্ডিতের সংগে। বিয়েও হয় কারু কারু? কেউ-কেউ আবার সেই স্বামীর ঘর থেকেই পালায়? সাধে এক-বার ধরলে যা আর শুকোতে চায় না!—

'সব সময়েই তো এই সব দেখছেন, শুনছেন, ঘাটাঘাঁটি করছেন—'

'উপায় কী তা ছাড়া! সর্বত্রই শুধু মানুষের কল্পনা।'

'সেই যে পাগলাগারদের দরোয়ান পাগল দেখে দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল আপনি না তেমনি—' অনুকম্পায় নয়, যেন বা প্রশংসায় চোখে তাকাল প্রবেশ। বললে, 'তাই তো বল-ছিলাম, ডিপ্রিয়েটেড ঘ্যাটমশাফিয়ার—বেরিয়ে আসুন চটপট—'

'হ্যাঁ, তাই তো আসছি—' উঠি উঠি করল দীপিকা।

'আর সেই যে কে এক মিসেস চৌধুরী কথা বলছিলেন—'

ভ্রমর বুঝি বিষ-ফুলকেও ছাড়ে না। বিষ ফুলের থেকেও মধু নেয়। তাই দীপিকা শুধু রঞ্জিতার কথাই নয় তাদের মহিলা-সমিতির ক... এমনকি প্রৌঢ়োত্তমা মিসেস খাসনবিশের কথা টেনে আনল।

'কে—কে নবিশ বললেন?'

'খাস না খোস ঠিক বলতে পারব না। আ... কিছুও হতে পারে।'

'যাক, তাড়াতাড়ি ফর্মটা পাঠিয়ে ... কিন্তু।' ইতির রেখা টানল প্রবেশ : 'আর সমস্ত ব্যাপারটা ঘ্যাজ বিটুইন ইউ অ্যান্ড মি। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই।'

'নিশ্চয়ই।' দীপিকা উঠল : ... পৌঁছুবার কতদিন পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আশা করব?'

'প্রায় সংগে সংগেই। শুধু বোর্ড অব ডিরেক্টরস মিটিংয়ে পাশ করিয়ে নেওয়া ... মিনিটের ব্যাপার। বোর্ড বসবার আগেই লেটার ইশু করে দিয়ে পরে অ্যাপ্রুভ করিয়ে নেব।'

'আর, হ্যাঁ, শুনুন—'

দরজার কাছে এসে থামল দীপিকা।

'আমাকে আপনি ভুল বোঝেন নি তো?'

সরল রোদ্দুরের মত তাকাল দীপিকা : 'ভুল বুঝব কেন?' হাসল শিশুর মত। ... 'ফর্মটা তো আমি নিজে এসেও দিয়ে যেতে পারি।'

'নিশ্চয়ই। একশোবার।'

'কেমন হল ইন্টারভিউ?' ... জিগগেস করল রঞ্জিতা।

'জঘন্য।'

'তুমি কাজে যাওনি?'

'তুমি বলোনি কিন্তু তার হাব-ভাবে বলেছে।'

'তার মানে?'

সমস্ত সবিস্তার বললে দীপিকা। দেয়ালে কতগুলি নগ্ন দেহের চার্ট। টেবিলের উপর কতগুলি মন্দিরগাত্রের ছোট-ছোট পাথুরে প্রতিচ্ছবি।

'ছি-ছি-ছি।' ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন রঞ্জিতা। 'এখুনি 'না' করে দাও।'

'আচ্ছা একবার মিসেস খাসনবিশের সংগে দেখা করব?'

'না, তোমার কী দরকার! তোমার কাজ পছন্দ হয়নি, লোক পছন্দ হয়নি, ... তুমি নেবে না কাজ। চুকে গেল। তুমি চুপ করে থাকো।'

'কিন্তু—' সর্বাঙ্গে জ্বালা ... এখনো।

'যদি বলতে হয় আমি বলব।'

'সুপারিন্টেন্ডেন্ট আছেন?'

'আছেন। ধরুন। ডেকে দিচ্ছি।'

কতক্ষণ পরে দীপিকা এল। রিসিভার তুলে নিল টেবিলের উপর থেকে। 'কে?'

'ও, হ্যাঁ, আচ্ছা, সেই চাকরির কী ... ফর্ম ফিল আপ করে পাঠিয়েছেন?'

'আপনি মিস্টার রায়?'

'হ্যাঁ, আমি প্রবেশ—'

'দেখুন, আমি ও কাজ করব না।' বিরক্তিতে ঝেঁজে উঠল দীপিকা : 'পারব না।'

'হাউ নাইস অফ ইউ!' উচ্ছ্বসিত হল ধ্রুবেশ : 'আপনি কী ভালো, কী মহৎ! বাঁচিয়েছেন আমাকে। ফর্মটা ছিঁড়ে ফেলে দেবেন।'

'অনেক আগেই ছিঁড়ে ফেলেছি।'

'আপনার অসীম দয়া। যাক গে, আপনার সঙ্গে আলাপ হল। আনন্দ হল। যদি কখনো ও অঞ্চলে এসে পড়েন, আসবেন আমার বাড়িতে।'

'ধন্যবাদ।' খটাং করে নয়, আস্তে আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখল দীপিকা।

বেশি দিনও লাগল না, এক পড়ন্ত বেলায়, পার্ক-স্ট্রীট অঞ্চলে গিয়ে পড়ল। আর, ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, মুখোমুখি ধ্রুবেশের সঙ্গে দেখা।

'আরে, আপনি? তুমি? তুমি এখানে?' আনন্দের সারল্যে উচ্ছলে উঠল ধ্রুবেশ।

কেন, কে জানে, সুন্দর করে হাসল দীপিকা। বললে, 'হোম-এর কাজে এসেছিলাম ঘুরতে ঘুরতে।'

'বেশ তো, চলো আমার ওখানে। চা খাবে। না কফি নয়।' ধ্রুবেশ প্রায় শিশুর মত হেসে উঠল : 'চা। আমি জানি তুমি কফি পছন্দ কর না।'

'চলুন।' আশ্চর্য, দীপিকা রাজি হল।

তবে আর ভয় কী, কুণ্ঠা কী। সে তো জয়ী। সে আর চাকরির উমেদার নয়। সে একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

তা ছাড়া এ তো অন্য লোক। বন্দী পুরুষ নয় আনন্দিত পুরুষ। যেন বুকের উপর থেকে পাহাড় নেমে গিয়েছে। খোলা মাঠে নিঃশ্বাস নিচ্ছে বুক ভরে। খুনের আসামীকে ছেড়ে দিয়েছে আদালত।

'বোসো।'

সেই আগের চেয়ারটাতেই বসল দীপিকা।

'আচ্ছা, দেখ, সেই দিন যখন তোমাকে ফোনে ডেকে দিল, মনে আছে?' ধ্রুবেশও তেমনি মুখোমুখিই বসেছে। বললে, 'তুমি দেরি করে এলে, বেশ দেরি করে। রিসিভারটা বোধহয় টেবলের উপর ছিল। শুনতে পাচ্ছিলাম গান হচ্ছে। তোমার হোম-এর মেয়েরা গান করে বুঝি?'

'বা, গান করে বৈ কি।'

'তুমিও করো?'

'বা, আমিই তো শেখাই।' দীপিকার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল : 'আর গানই তো পুনর্বাসনের প্রধান মন্ত্র।'

'তোমাদের হোম-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্গত মেয়েগুলোকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া, তাই না?'

'যেখানে সম্ভব, বিয়ে দিয়ে দেওয়া। নয়তো নিজের সামর্থ্যে স্বাবলম্বী করে তোলা।'

'সুন্দর কথাটা এই পুনর্বাসন।'

দীপিকা ধ্রুবেশের মুখের দিকে তাকাল। এ আরেকরকম মুখ।

'পুনর্বাসন মানে', ধ্রুবেশ বললে হাসতে-হাসতে, 'পুনরায় বাসনা করা। মানে, বাসনার রং-বদল। আরেক রকম করে চাওয়া। পাওয়াও আরেক রকম করে।'

এ কি সেই ধ্রুবেশ!

তাছাড়া আবার কী। সেই ঘর, দেয়ালজোড়া সেই সব ডাক্তারি চার্ট, টেবলের উপর ছড়ানো সেই সব পাথুরে অঙ্গভঙ্গি, তবু কিছুই যেন আজ বিসদৃশ দৃষ্টিকটু লাগছে না। বস্তুকে বুঝি ব্যক্তির প্রসঙ্গেই দেখতে হয়। আজ ধ্রুবেশ আরেক রকম হয়েছে বলে মূর্তি-গুলিও আরেক অর্থ ধরেছে।

'একটু রদ-বদল ঘটাতে পারলেই বাসনা সোনা হয়ে উঠতে পারে। কী বলো, পারে না?'

'পারে। সব কিছু পারে।'

'শুধু একটু ছোঁয়া, একটু সুর, একটি চাউনি।' ধ্রুবেশ দরাজ গলায় বললে, 'তাতেই, শুধু তাতেই একটা বিশাল মরুভূমির শ্যামলে শীতলে পুনর্বাসন হতে পারে। আচ্ছা, তুমি কবিতাও লেখ?'

কী অবলীলায় তুমি বলছে! অথচ কী আশ্চর্য, একটুও বেসুরো লাগছে না। আহত করছে না।

'ও সব আসে না।' সলজ্জ মুখে হাসল দীপিকা।

'কিন্তু জানো তুমি কাউকে বোলো না—না, তুমি কাউকে কিছু বল না—আমি লিখি, লিখতে চেষ্টা করি, কিন্তু কিছু হয় না।' সহাস্যে দীর্ঘ-শ্বাস ফেলল ধ্রুবেশ : 'মানে কাটাকুটি হয়ে যায়। আমার যিনি গ্রন্থকার, আমি তাঁরই অনুসরণ করি। যেমন তাঁর হাতে আমার জীবন কবিতা না হয়ে কাটাকুটি হয়ে রয়েছে।'

বেয়ারা চা দিয়ে গেল, এবং চায়ের সঙ্গে যে সমস্ত খাবার এল তা প্রায় লক্ষ্য না করেই দীপিকা একে একে, কথা শুনতে শুনতে, খেয়ে ফেলল সমস্ত।

'তুমি দেশ ভ্রমণ করোনি, খাজুরাহো দেখনি, কোনারক পুরী—মহাবলীপুরম। গ্রাম্য শিল্পীরা কত যত্নে মন্দিরগাত্রের ছবি ছোট ছোট পাথরের টুকরোতে নকল করেছে, তুমি ইচ্ছে করলে পাথরও দেখতে পারো, ইচ্ছে করলে দেখতে পারো সেই কারিকরের তন্ময়তা।' উঠে পড়ল ধ্রুবেশ : 'তুমি আমার লাইব্রেরিটা দেখনি আর ও পাশে ছাদের উপর কেমন বাগান করেছি।'

'আমি বসে বসে ডাক্তারি চার্ট দেখেছি।' দীপিকাও উঠল।

'আর ডাক্তারি! সব ব্যাধি সারাতে পারবে একদিন, হয়তো বা ক্যান্সার-ও, কিন্তু আকাঙ্ক্ষারই আরোগ্য নেই। দেহ জীর্ণ হয়ে যায় তবু আকাঙ্ক্ষা জীর্ণ হয় না।'

গল্প করতে করতে দীপিকাকে রাস্তায় এগিয়ে দিল ধ্রুবেশ।

বললে, 'তুমি একটা মহৎ কাজে নিযুক্ত আছ। ডাক্তারির চেয়েও মহৎ। যদি একটা রুগ্ন ভগ্ন দুঃস্থ জীবনকে পুনর্বাসিত করে দিতে পারো তার চেয়ে বড় কীর্তি আর নেই কিছু সংসারে।'

ফিরে যেতে যেতে দীপিকার মনে হল চাকরিটা নিলে এমন কি অকীর্তি হত তার।

স্মৃতির মণিকোঠায়

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

উনবিংশ শতকে জন্মাইয়া আজও যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের দেখা ও জানা বিষয়গুলি স্মৃতির ঝুলি হইতে বাহির হইলে এমন বহু অজানা কিন্তু জানা প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাইবে যাহা বিংশ শতকীয়দের জানা নাই। আমার অতি সাধারণ জীবনেও সেজন্য এমন বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত আছে যাহা আজকার দিনের লোকের উপভোগ্য হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। তাই উনবিংশ শতকের শেষভাগে আমার জানিত রাজনৈতিক আবহাওয়ার যে চিত্র স্মৃতির মণিকোঠায় সঞ্চিত আছে তাহার কিছু পরিচয় দিবার বাসনায় এই প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হইলাম। সৌভাগ্যবশতঃ আমার এই সময়কার জীবনের পরিবেশ এমন ছিল যে, এ দেশের বহু খ্যাত্যাপন্ন ব্যক্তি আমার পিতৃদেব দ্বারকানাথ গাঙ্গোপাধ্যায় ও মাতৃদেবী কাদম্বিনী দেবীর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া আমাদের গৃহে আসিতেন এবং সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহাদের আলাপ আলোচনা চলিত। সেগুলি বুঝিবার মত বয়স তখনও আমার না হইলেও সেই পরিবেশের প্রভাব আমার অবচেতন মনে যেভাবে ক্রিয়ারত হয় তাহার ফলে আমার কৈশোরকালেই ইংরেজ অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া ভারতকে স্বাধীন করিবার বাসনা উগ্র হইয়া উঠে। ইহা যে কেবল আমারই জীবনে ঘটিয়াছিল তাহা নহে, বস্তুতঃ সে সময়ে বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী ঘরের বহু তরুণের মনেই জাগিয়াছিল, নতুবা বিংশশতকের প্রারম্ভেই রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা আনিবার স্বপ্নে বাঙ্গলার বিপ্লবী দলের সৃষ্টি এবং তাঁহাদের অভাবনীয় আত্ম-ত্যাগ সম্ভব হইত না। এই অনুভূতি জাগিবার অবশ্যই কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে ম্যাজিনী ও গ্যারিবল্ডির সাধনায় প্রাচীন মহান ঐতিহ্যের অধিকারী, কিন্তু তৎকালে কোনো পরাধীনতার অভিশাপে নিতান্ত হীনাবস্থায় অবস্থিত ইতালীর পুনর্জাগরণের কাহিনী এ দেশের প্রায় সমান অবস্থায় ওইরূপে জাগরণের সম্ভাব্যতা এ দেশের চিন্তাশীলদের মনে দানা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং তাহার পরেই আফ্রিকার আদোয়ার রণক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কৃষ্ণকায় আবিসিনিয়ার কাছে ইতালীর পরাজয়ের সংবাদ এ দেশের ভাবকেচিত্তে শ্বেত-শ্রেষ্ঠতার অলীকত্ব এমন স্পষ্ট করিয়া তুলে যে, বৃটেন অপরাজেয় নহে, আমরাও তাহার কবল হইতে মুক্তি পাইতে পারি, এই বিশ্বাস জাগাতেই তরুণদের চিত্তে স্বাধীনতা অর্জনের যে বাসনা জাগে তাহারই ফল। এই সত্য কয়েক বৎসর পূর্বে এক পূজা-সংখ্যা 'যুগান্তর' পত্রিকায় বিপ্লবীবীর স্বর্গত পুলিনবিহারী দাস স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়াছেন। বিংশ শতকের প্রারম্ভে তরুণদের মনে যে আকাঙ্ক্ষার স্ফুরণ অগ্নিস্ফরা হইয়া প্রকাশ পাইল তাহা উনবিংশ শতকের বয়স্কদের মধ্যে চিন্তাশীলদের মনে ধীরে ধীরে যেভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল তাহার একটি কেন্দ্র ছিল আমাদের বাড়ী। সেই কেন্দ্রে যাহা ঘটিত তাহার সব কিছুই আমার বুঝিবার মত বুদ্ধি তখনও হয় নাই, তথাপি উহার অলক্ষ্য প্রভাব যে বেশ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে আমাদের বাড়ীর আবহাওয়া দ্বিমুখী ছিল এবং দুইটি ভিন্নমুখী ধারাই বেশ সজোরে প্রবাহিত ছিল। আমার একান্ত শৈশবে আমাদের আবাস ছিল সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ১৩ নম্বর কর্ণোয়ালিস ষ্ট্রীটে; এই বাড়ীর উত্তরাংশে আমাদের বাস ও দক্ষিণাংশে আমার পিতৃদেব পরিচালিত ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন বোর্ডিং ছিল। উত্তরাংশের তিনতলায় আমার পিতার বৈঠকখানা ছিল এবং সেই বৈঠকখানার সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াসীদের আনাগোনা, আলাপ আলোচনা ও কর্মপদ্ধতি স্থির করিবার একটি প্রধান আস্তানা হইয়া উঠিয়াছিল; আর দ্বিতলে আমার তিন মাতুল কেদারনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ বসু ও আমার ভগ্নিপতি উপেন্দ্রকিশোর রায় ও তাঁহার দুই ভ্রাতা কুলদারঞ্জন ও প্রমোদারঞ্জন রায়কে কেন্দ্র করিয়া তৎকালে সবে মাত্র বিকাশোন্মুখ শিশু-সাহিত্যের সেবকগণের যথা প্রমোদাচরণ সেন, ভুবনমোহন সেন, অন্নদাচরণ সেন, যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির বৈঠক বসিত এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুলদা ও প্রমোদাবাবু মনোহারী বিদেশী শিশু সাহিত্যে কথিত কাহিনীগুলি বাঙ্গলায় বলিতেন। এই আসরেই অতি অল্প বয়সে আমরা "ওয়েষ্ট ওয়ার্ডহো" "অ্যালান কোয়রটার ম্যান, "রবিন্সন ক্রুসো" "অ্যালিস ইন ওয়ণ্ডার ল্যাণ্ড" "কিং সলোমনস মাইন" হইতে আরম্ভ করিয়া লুই ষ্টীভেন্সন ও কোনান ডয়েলের বইগুলির সংক্ষিপ্তসার শুনিয়া যেমন আনন্দ উপভোগ করিয়াছি, তেমনই সেই অল্প বয়সেই সাহিত্যসেবার বাসনা মনে জাগিয়াছে। ত্রিতলের হাওয়ায় ছিল রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত হইবার উপায় লইয়া আলাপ আলোচনা। এই আসরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, পরেশনাথ সেন, কালীশঙ্কর সুকুল, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি নিয়মিতভাবে যোগ দিতেন এবং তদ্ব্যতীত মধ্যে মধ্যে সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুও আসিতেন। প্রথমোক্ত দল "সঞ্জীবনী" পত্রিকার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"র ধ্বজা তুলিয়া তাঁহারা সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনার বাণী উক্ত পত্রিকার মারফৎ প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। ইঁহাদের ঘিরিয়া সে সময়ের একদল প্রগতিশীল ছাত্র সমাজ সংস্কারক কাজে দুঃসাহসিকতার সহিত রত হন। তাহার মধ্যে কুলীন কুলকন্যার দুঃখ মোচন, বিধবা বিবাহ সংগঠন, অনাথ বালক-বালিকাদিগকে আশ্রয় দান, পতিতা নারীদের বালিকা কন্যাদের উদ্ধার করিয়া শিক্ষা দিয়া সমাজে পুনর্বাসন দান, চা-বাগানের কুলি প্রেরণের প্রাক্কালে আড়কাঠিদের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া আসন্ন দাসজীবন হইতে উদ্ধার সাধন প্রচেষ্টাই প্রধান কাজ ছিল। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক উন্নত প্রণালীতে শিক্ষা প্রদানের বাসনায় সিটি কলেজ স্থাপন ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাও সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনার অন্যতম কার্যক্রম ছিল।

এই সমস্ত ব্যাপার পরিচালনায় যে প্রেরণা ও উদ্যম তাঁহাদের নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়াছে সেই কাহিনী অল্প পরিসরের মধ্যে বলা সম্ভব নহে। কাজে কাজেই তাহা বর্তমানে মুলতুবী রাখিয়া যেগুলি রাজনৈতিক মুক্তি সাধনের পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ সেগুলি গ্রহণ করিয়া সেই গন্তব্য পথে দেশকে লইয়া যাইবার বিষয়েই কিছু বলিব। এ দেশে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, উনবিংশ শতকে রাজনীতি ক্ষেত্রে যাঁহারা বিচরণ করিতেন তাঁহাদের মনে পূর্ণ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগে নাই, ইংরেজের নিকটে যাহা পাওয়া যায় তাহা আবেদন নিবেদনের মারফৎ আদায় করাই তাঁহাদের কাম্য ও চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল। এ ধারণা সর্বৈব ভুল। পরাধীনতার অভিশাপ যে জাতিকে অধঃপতনের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে তাহা ইঁহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেন; এবং দুঃসহ এই অবস্থা হইতে মুক্তি কামনা তাঁহাদের উদ্বেলিত করিত। তাই দেখা যায় আমাদের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ ছাত্র দলকে আহ্বান করিয়া ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির কাহিনী শুনাইতেছেন এবং তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, "আমি ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির শিষ্য," আবার শিখের বলিদান কাহিনীও বর্ণনা করিতেন ও বিপ্লবী চৈতন্যদেব আখ্যা দিয়া চৈতন্যের সমাজ বিপ্লবের কাজ যে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনারই একটি বিশিষ্ট পরিচয় তাহা বুঝাইয়া তরুণদের মনে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনার বীজ রোপণের প্রয়াস পান। তিনি ম্যাজিনি ও গ্যারিবল্ডির জীবন কথা বাঙ্গলায় লিখিতে যোগীন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণকে উৎসাহিত করিলেন। তখন দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কবি মনোমোহন বসু গাহিলেন "দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন",

প্রবাহিণী মন্দাকিনী (কেদারনাথ) ফোটো : গোলক সেন
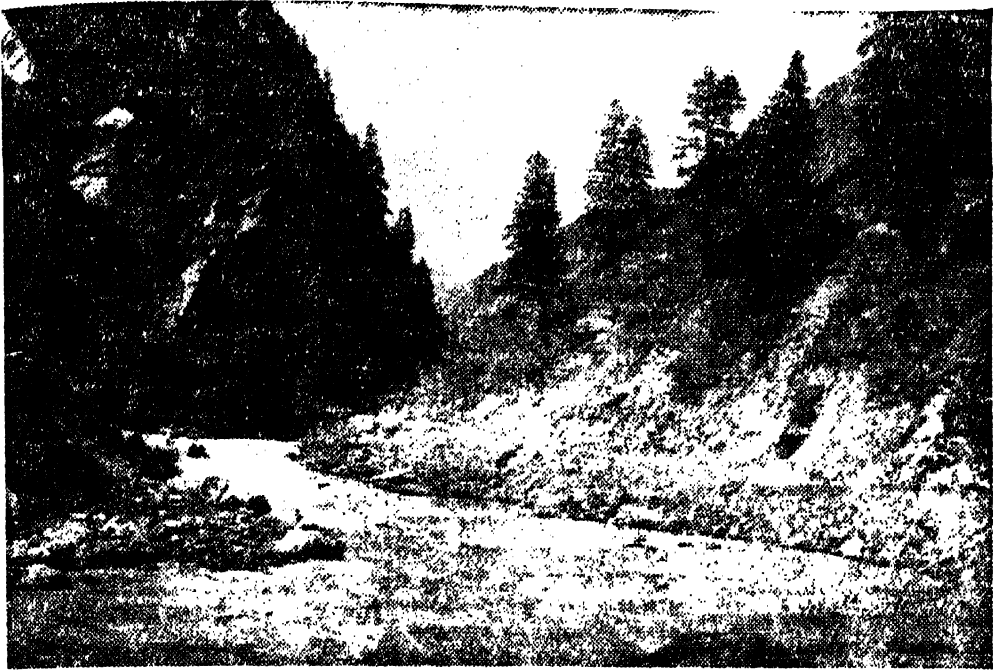
কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় গাহিলেন "কত কাল পরে, বল ভারতরে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবেরে", দ্বারকানাথ গাহিলেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা", "কাঁপিবে বিমান পৃথ্বী বিক্রমে নবীন, রহিবে না পুণ্যভূমি চির পরাধীন"; হেমচন্দ্র গাহিলেন "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়"। এই সমস্ত সংগীতরাজি ঘরে ঘরে বিলাইবার জন্য দ্বারকানাথ সর্বপ্রথমে জাতীয় সংগীতের সংকলন "জাতীয় সঙ্গীত" নামে পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। এই সব সঙ্গীতের প্রভাব আমার বালক মনে এইরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে মাত্র আট নয় বৎসর বয়সে আমি হেমচন্দ্রের সুবৃহৎ কবিতা "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে" সম্পূর্ণটা মুখস্থ করিয়া যখন তখন আবৃত্তি করিতে পারিতাম। যেসব নেতার মনে স্বাধীন হইবার আকাঙ্ক্ষা এরূপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, স্বতঃই মনে হয় যে কেন তাঁহারা স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনও সক্রিয় পন্থা গ্রহণ করেন নাই? তাহার উত্তর মিলে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রবর্তিত "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" নামক অনুষ্ঠানের প্রতিজ্ঞার মধ্যে। দেশময় যে বিরাট জাগৃতি ও প্রস্তুতি ভিন্ন স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নহে, তাহার অভাব তাঁহাদের সেই পন্থা তখনই গ্রহণ না করিয়া প্রস্তুতি পর্বে আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। অপ্রস্তুত অবস্থায় বিদ্রোহের অনল জ্বালিলে তাহা সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতির ন্যায়ই যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে তাহা বুঝিয়া এই দীক্ষা গ্রহণকালে গ্রহণীয় প্রতিজ্ঞার মধ্যে তাই একটি প্রতিজ্ঞা ছিল "দেশের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমানে গভর্ণমেন্টের আইন কানুন মানিয়া চলিব, কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনও এই গভর্ণমেন্টের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।" প্রতিজ্ঞা গ্রহণকারীদের মনোভাব ছিল এই যে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে যাহাতে অযথা অরাজকতার সৃষ্টি না হয় সেজন্য আইন কানুন মানিয়া লইয়া দেশকে প্রস্তুত করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন; কিন্তু সরকারী কাজে লিপ্ত হইলে সেই সরকারকে কায়েম রাখিয়া নিজের সাংসারিক বৈভব বাড়াইবার মোহ যাহাতে পাইয়া না বসে, হৃদয়ে সর্বদা এই শয়তান পরাধীন শাসনের অবসান কামনা যাহাতে স্তিমিত না হয় তজ্জন্য দারিদ্র্যের দ্বারা নিপীড়িত হইলেও সেই অন্যায় শাসনের দাসত্ব না স্বীকার করিবার অঙ্গীকার কি ইঁহাদের অন্তরের অন্তস্তলের বাসনাকে প্রকাশ করে না? শিবনাথের মনে স্বাধীনতা অর্জনের স্পৃহা কত বেশী ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচিত একটি কবিতার এই পংক্তিগুলির মধ্যে :—

"ওরে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে
যেরূপেতে থাকে শুদ্ধাচার লয়ে,
আয় সে প্রকার থাকি
শুদ্ধাচার মত স্বাধীনতা উদ্দেশিয়ে।
যদি দিন আসে তবেরে উল্লাসে
নাচিব গাহিব সকলে মিলিয়ে,
যদি দিন নাহি আসে যাক অমানিশা
ভারত আকাশে
জ্বালিয়া সলিতা রাবণের চিতা,
আয় থাকি সবজন বসিয়ে।"

প্রতিজ্ঞা গ্রহণান্তর শিবনাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে ইস্তফা দিয়া আজীবন সরকারী কর্ম হইতে মুক্ত ছিলেন এবং অন্যান্য ব্রতধারিগণ যথা বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর চৌধুরী প্রমুখ কখনই সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন নাই ও অন্য আর একটি প্রতিজ্ঞা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি না করিবার প্রতিজ্ঞাতে অটুট ছিলেন। তারাকিশোর হাইকোর্টে যশস্বী উকীল ছিলেন বলিয়া জজিয়তী গ্রহণের জন্য একাধিকবার অনুরুদ্ধ হয়েন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা স্মরণে রাখিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে ধর্মসমাজ পরিচালনেও নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা যেমন সভ্যদের বাসনাকে রূপ দিবার পন্থা হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল, তেমনই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ভবিষ্যতে সেই পদ্ধতিতে দেশ শাসনের ব্যবস্থার ভিত্তিকে রচনা করা। তাই সমাজের মুখপত্রে সে সময়ে বলা হইয়াছিল যে, "অন্যায়ের উপর ন্যায়, অসাম্যের উপর সাম্য, রাজার উপর প্রজার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া পৃথিবীতে এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।" আজ দেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে এবং বিশ্বময় এক সংযুক্ত মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার কত পূর্বে এই সাধক দল সেই স্বপ্নে বিভোর হইয়া তাহার প্রাথমিক সূচনা করিয়াছিলেন? সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড সত্তার বোধ জাগাইয়া তুলিবার আশায় সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁহার এই প্রচেষ্টার ফলেই সর্বপ্রথম নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলন ন্যাশন্যাল কনভেনশন এই কলিকাতা নগরীতেই অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের সাধনা যে ব্যর্থ হয় নাই তাহার প্রমাণ এই যে বুয়ার যুদ্ধের সময়

বাঙলার তরুণ দলের সকলেই ক্ষুদ্র একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে বীরত্বের সহিত দুর্মদ ইংরেজ শক্তির সহিত সংগ্রামে শুধু বুয়ারদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, সেই সময়েই রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে ভারতকে স্বাধীন করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করেন। ইহা ভিতরে ভিতরে যুবজনচিত্তে প্রবাহিত না থাকিলে কি প্রমথনাথ মিত্র, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রনাথ ঘোষের বিপ্লব প্রচেষ্টা এত বিস্তৃতি লাভ করিত?

যুগান্তরের একটি পূজাসংখ্যায় পুলিনবিহারী দাস লিখিয়াছিলেন যে, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও তরুণদের মনে বিপ্লবী দল গঠনের ইচ্ছা এত জাগিয়াছিল যে, বহু অঞ্চলে আপনা হইতেই বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, রাজসাহী, নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, মেদিনীপুর সর্বত্রই ডাক শুনিবামাত্র প্রভূত সাড়া পাওয়া এজন্যই সম্ভব হইয়াছিল। আমার বেশ মনে আছে বুয়ার যুদ্ধের আরম্ভ সময়ে আমার বয়স দশ বৎসর। তবুও এ যুদ্ধে এত আগ্রহ জাগিয়াছিল যে, প্রতি বৃহস্পতিবার "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় যুদ্ধের সংবাদের জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতাম এবং যুদ্ধে ইংরেজের পরাজয়ে অত্যন্ত উল্লসিত হইতাম এবং বুয়ারদের পরাজয় সংবাদে বিষাদে মুহ্যমান হইতাম। তখন দেশের যুবকগণের সকলেরই ভাব এইরূপ ছিল।

তাহার পর বার তের বৎসর বয়সে প্রতাপাদিত্যের অনুসরণে বিপ্লবী দল গড়িয়া তুলিবার বাসনা আপনা হইতেই মনে জাগে। তাই তাহার অনতিকাল পরে বন্ধুবর প্রভাসচন্দ্র দের নিকট হইতে যখন অনুশীলন সমিতির কথা শুনিলাম তখনই তাহার সহায়তায় সেই দলে যোগ দিলাম। তখন অনুশীলন দলই ছিল এবং এই দল হইতেই বিপ্লব মন্ত্র ব্যাপক প্রচারের জন্য "যুগান্তর" পত্রিকা প্রকাশ হয়। পরে কার্যক্রম লইয়া মতভেদের ফলে অনুশীলন ও যুগান্তর পৃথক দলরূপে পরিণত হয়। আমার স্পষ্ট মনে আছে, যখন ১৯০৬ সালে বক্সার জেল হইতে মুক্ত হইয়া বিপিনচন্দ্র পাল কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন জনগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কি বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়! সেই অভ্যর্থনা আয়োজনে গঠিত কমিটির আমি একজন স্বেচ্ছাসেবক হই এবং সেই দিন মিছিলের সময় বিতরণের জন্য প্রথম বৈপ্লবিক ইস্তাহার "Now or Never" বিপ্লবী দল কর্তৃক সুমতি প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত হইয়া নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের তত্ত্বাবধানে বিতরণের ব্যবস্থা হয় এবং তাহা বিলি করার ভার প্রভাস ও আমার উপর পড়ে! আমরা বেশ দক্ষতার সহিত সেই কাজ করি। কিন্তু এই প্রচার পত্রিকা হইতেই পুলিশ বিপ্লবের প্রথম সন্ধান পায়। এগুলি এত বিশদভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না, কেবল সে সময়ে তরুণদের মনোভাব এবং তাহার পশ্চাদপট বুঝাইবার জনাই প্রয়োজন। শুধু চিন্তা করিয়া ও চিন্তা প্রচার করিয়াই এই সমস্ত ঊনবিংশ শতকের চিন্তা-নায়কগণ ক্ষান্ত থাকেন নাই। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষার অন্যতম প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহারা লাঠি চালনা, অসি চালনা, বন্দুক ব্যবহার ও অশ্বারোহণ অভ্যাস করিবেন। আর অন্যদিকে দ্বারকানাথের নেতৃত্বে কৃষ্ণকুমার মিত্র, উল্লাসকর দত্তের পিতা দ্বিজদাস দত্ত প্রমুখ বলশালী ব্যক্তি একটি দল গঠন করিয়া প্রায়ই চৌরঙ্গী, ইডেন উদ্যান প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে বাহির হইতেন। এ অঞ্চলে তখন শ্বেত প্রভুত্বের দাপট খুবই বেশী ছিল। ওই অঞ্চলে কালা আদমী দেখিলেই শ্বেত অহমিকা জর্জলিয়া উঠিত এবং ব্যাঘ্রবিক্রমে সেই সকল নিরীহ পথচারীদের উপর অযথা আক্রমণ চালাইত। এই অত্যাচার দমনই এই ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শ্বেতকায়গণকে এরূপ অত্যাচারে উদ্যত দেখিলেই তাঁহারা তাহাদের চ্যালেঞ্জ করিতেন এবং দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রীতিমত শিক্ষা দিতেন। পরে সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই কার্যে ব্রতী হন। জিতেন্দ্রনাথের পরাক্রমকাহিনী দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' পত্রিকায় "বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল" নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিরোধ সাহেব মহলে অপ্রত্যাশিত ছিল; তাই উহাতে হতচকিত হইয়া ওইরূপ অত্যাচারের অবসান হয়। দ্বারকানাথের নিকট উচিত শিক্ষা পাইয়া কতিপয় সাহেব দ্বারকানাথের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করেন। আমাদের ছেলেবেলায় এরূপ জনদুয়েক ইংরেজকে আমাদের বাড়ীতে আসিতে দেখিয়াছি এবং দ্বারকানাথের মৃত্যু দিনে একজন এরূপ ভক্ত শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়সূত্র এই যে, সাহেব পুঙ্গব হলওয়েল লেনে থাকিতেন এবং কাছেই মুসলমানপাড়ার প্রগতিশীল ছাত্রদের মেসে দ্বারকানাথের আনাগোনা ছিল। একদিন মুসলমানপাড়া লেনে যাইবার কালে দ্বারকানাথ দেখিতে পাইলেন যে, সাহেব পুঙ্গব একটি ঠিকা গাড়ীর গাড়ওয়ানকে ন্যায্য ভাড়া না দেওয়াতে, তাহা চাওয়াতে নেটিভের আস্পর্ধা বিবেচনা করিয়া তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিতেছেন। দ্বারকানাথ প্রতিবাদ করাতে সাহেবটি ক্ষিপ্ত হইয়া দ্বারকানাথকে গালিগালাজ করিতে থাকে। দ্বারকানাথ তখনই তাহাকে সমঝাইয়া দিবার জন্য প্রচণ্ড আক্রমণে তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া দেন। সাহেব 'ঢের হইয়াছে, আর না, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং বন্ধুত্ব কামনা করিতেছি' বলাতে দ্বারকানাথ তাহাকে ছাড়িয়া দেন ও সাহেবটি দ্বারকানাথের ঠিকানা জানিতে চাহেন। দ্বারকানাথ ভাবিলেন সাহেব বোধ হয় মামলা রুজু করিতে চাহে। সেক্ষেত্রে ঠিকানা না দিলে দ্বারকানাথ ভয় পাইয়াছেন বলিয়া যদি সাহেব মনে করেন ভাবিয়া নামধাম সবই প্রদান করেন। সাহেবটি সেরূপ কিছু করার পরিবর্তে নিতান্ত অনুগতজনের ন্যায় মধ্যে মধ্যে সাক্ষাতের জন্য আসিতেন। দ্বারকানাথের মৃত্যু সংবাদে তিনিই শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আসিয়াছিলেন।

এই বাঙ্গালী বনাম ইংরেজের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী ঘটে ইন্টারন্যাশনাল একজিবিশনের সময়। মিস্টার জুবেয়ার নামক এক ব্যক্তি ইহার কর্তা ছিলেন। কলিকাতাতে এরূপ বৃহৎ প্রদর্শনী ইহাই প্রথম বলিয়া প্রত্যহ অসম্ভব ভিড় হইতে থাকে। সংবাদ পাওয়া গেল যে, প্রতিদিন গেটের অভ্যন্তরে একটি উচ্চ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া জুবেয়ারনন্দন প্রবিষ্ট দর্শকদের পৃষ্ঠে ছড়ির ঘা দিয়া এক, দুই, তিন প্রভৃতি রবে প্রবিষ্টদের সংখ্যা গণনা করে; ইহা তাহার কাছে কৌতুকের বস্তু হইলেও উহা বরদাস্ত করা সাহেব ঠেঙ্গানো দলের কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হয়। কৃষ্ণকুমার তখন সিটি স্কুলের শিক্ষক ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি উহার প্রতিকার বাসনায় সিটি স্কুলের কয়েকজন বলিষ্ঠ শিক্ষক-ছাত্র সঙ্গে লইয়া একজিবিশন অভিমুখে রওনা হইলেন। দলের পুরোভাগে ছিলেন কৃষ্ণকুমার। তাঁহার সম্মুখে দুইজন দর্শনেচ্ছু যাইতেছিল। যখন জুবেয়ারনন্দন প্রতিদিনের মত গণনা আরম্ভ করিয়া এক, দুই বলিয়াছেন, অমনই তৃতীয় ব্যক্তি কৃষ্ণকুমার এই তিন বলিয়া তাহার গণ্ডে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন। অমনই মহা সোরগোল পড়িয়া যায় এবং উভয়পক্ষই দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। সংবাদ পাইয়া হন্তদন্ত হইয়া জুবেয়ার সাহেব নিজেই অকুস্থলে উপনীত হন ও পুত্রের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটি মিটাইয়া ফেলেন। দ্বারকানাথের দল ও জিতেন্দ্রনাথের এই সাহসিক অভিযানের পর সাহেবপাড়ায় কৃষ্ণকায় নির্যাতন থামিয়া যায় এবং বাঙালীর মনে শ্বেতজাতির স্বাভাবিক নেতৃত্ব সম্পর্কে মোহের অবসান হয়।

এই সমস্ত ঘটনার মোট ফল স্বরূপই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক চেতনা বিপ্লবসাধনের সাধনার পথে অত সহজে ধাবিত হইতে পারে।

এসময়কার আর দুই একটি ঘটনার উল্লেখ না করিলে জাতীয় জাগরণের উন্মেষ কাহিনী পূর্ণ হয় না। উহার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের অঙ্গ স্বরূপ প্রথম স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের জামাতা যোগেশচন্দ্র চৌধুরী এবং এই প্রদর্শনী দর্শনীয় করিয়া তুলিবার জন্য দ্বারকানাথ সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থান হইতে দর্শনীয় শিল্পসম্ভার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। ক্ষয়মুখী ভারতীয় শিল্প তখনও কত শিল্পসুষমামণ্ডিত ছিল তাহার পরিচিতি লাভে উহাকে রক্ষা করিবার জন্য স্বদেশী দ্রব্য প্রচারের আয়োজন হয়। দ্বারকানাথ নিজেই উদ্যোগী হইয়া এরূপ দ্রব্য সম্ভারের এক বিপণি স্থাপন করেন। কিন্তু যাঁহাদের উপর দোকান পরিচালনের ভার অর্পণ করেন তাঁহারা খুব বিশ্বস্ততার সহিত কাজ করিলেও ব্যবসায়ের অনভিজ্ঞতার দরুণ দ্বারকানাথকে প্রচুর লোকসান পোহাইতে হয়। অভ্রের কারবার তখন সাহেবদের একচেটিয়া ছিল; দ্বারকানাথ গিরিধিতে একটি খনি কিনিয়া এই কারবারে লিপ্ত হন; কিন্তু এখানেও অনভিজ্ঞতার জন্য প্রচুর লোকসান হইতে দেখিয়া উহা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানে যাঁহারাই পথিকৃৎ তাঁহাদের প্রত্যেককেই এরূপ লোকসান সহিতে হইয়াছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকার সাবানের কারখানা ও চামড়ার কারখানা স্থাপন করিয়া প্রচুর লোকসান সহ্য করেন; অবশ্য তাহার পর ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ তাঁহার জামাতা সুধীর সেনের পরিচালনায় উহা

লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার সুপক্ব বুদ্ধির অন্যতম পরিচয় ক্ষয়িষ্ণু সেন পণ্ডিতের ব্যবসায়কে রূপান্তরিত করিয়া সুবিপুল সেন র‍্যালে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গালীর গৌরবোজ্জ্বল যে স্বল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আছে তাহার মধ্যে ইহা অন্যতম। আজকাল চা-বাগিচায় বাঙ্গালীর বেশ উচ্চস্থান আছে। উহারও আরম্ভ হয় সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সাধনার অন্যতম সাধকদ্বয় আনন্দমোহন বসু ও দুর্গামোহন দাসের যুগ্ম পরিচালনায়। আসামের তেজপুরের সন্নিকটে মোনাই চা-বাগিচার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহারা এই ব্যবসায়ের পথিকৃৎ হন।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। মনে পড়ে মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীর একতলায় দুইটি বড় বড় ঘরে ঘর ভর্তি ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিহিত সুপুষ্ট-দেহী ঘোরকৃষ্ণ বর্ণের নরনারীকে আসিয়া দুই একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইতে দেখিতাম। ইহারা কাহারা, কেনই বা সহসা আসে এবং কেনই বা কেনই সহসা চলিয়া যায় তাহা জানিবার কৌতূহল হওয়াতে জানিতে পারিলাম যে, ইহাদের চা-বাগানে কুলিরূপে চালান দিবার জন্য ...র্তে আড়কাঠিগণ মিথ্যা প্রলোভনাত্মক স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া চুক্তিপত্রে টিপ সই আদায় করিয়া তাহাদের আসামে চালান দিবার যখন উদ্যোগ করে তখন আমার পিতৃদেবের দ্বারা নিয়োজিত ...লের প্রকৃতির ব্যবহারজীবীর সহায়তায় উহাদের মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া চুক্তির সর্ত না বুঝাইয়া সম্মতিসূচক টিপ সহি আদায় করিয়াছে, অতএব উহা বাতিলযোগ্য বলিয়া আদালতে প্রমাণ করিয়া মুক্ত করিয়া আনা হইয়াছে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় ইহারা ছাড়া পাইলেও তাহাদের সৌভাগ্য এই যে, দাস জীবন হইতে তাহারা মুক্তি পাইল। ইহাদের গৃহে স্থান দিয়া আহারাদি করাইয়া স্বগৃহে পাঠাইবার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উহারা আমাদের গৃহেই আশ্রয় পাইত। পণ্ডিত রাম-কুমার বিদ্যারত্ন আসাম হইতে কুলিগণের দুঃসহ জীবনের কাহিনী প্রথম সংগ্রহ করিয়া "সঞ্জীবনী" পত্রে প্রকাশ করেন এবং তাহার পর উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ" নামক গ্রন্থে তাহার যে জ্বলন্ত চিত্র প্রকাশ করেন তাহার ফলেই দেশময় আলোড়ন জাগে। ভারত সভা হইতে এসম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য দ্বারকানাথ আসামে গমন করিয়া যে সমস্ত প্রামাণ্যকর তথ্য সংগ্রহ করিয়া কুলি জীবনের মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনী "সঞ্জীবনী" পত্রে আসামে লোগ্রর সন্তান" ও 'বেঙ্গলি' পত্রিকায় স্লেভ ট্রেড ইন আসাম" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন, তাহার ফলে দেশে ... আন্দোলন উঠে তাহাতে সরকারকে বাধ্য হইয়া "ইমডেনফার সিসটেম" নামক চুক্তিবলে কুলিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধার ব্যবস্থা আইনতঃ অসিদ্ধ ঘোষণা করিতে হয়। কিন্তু যতদিন না এই ব্যবস্থা গৃহীত হয় ততদিন দুঃখীর প্রতি সহানুভূতিশীল উকিলের সহায়তায় কুলি সংগ্রহ ... আসানসোল, রাঁচি, হাজারিবাগ ও ...র্যাধির আদালতে মামলা করিয়া এরূপ বহু কুলিকে আসাম দাসত্ব জাল হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা ভারত সভার পক্ষ হইতে হইয়াছিল এবং তাহারই অঙ্গ স্বরূপ আমাদের বাড়ীতে ওইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষ ও রমণীর ভিড় হইত। আজ-কাল একটা কথা খুবই প্রচার করা হয় যে, এদেশে দরিদ্র জনদরদ এবং তাহাদের হীন জীবন হইতে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগে কম্যুনিষ্ট-গণই পথপ্রদর্শক। কিন্তু এদেশে সাম্যবাদের সামান্যতম প্রকাশের বহু পূর্বে ঊনবিংশ শতকের জননায়কগণ যে আত্মত্যাগ ও অকুতোভয় সাহসের পরিচয় দিয়া নীলচাষী ও আসামের কুলিদের মুক্তির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহার তুলনায় বর্তমান শ্রমিক নেতাদের আত্মত্যাগ কতটুকু?

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, ট্রেড ইউনিয়ন স্থাপন এবং সেই প্রথায় শ্রমিক কল্যাণেরও অগ্রদূত কম্যুনিষ্টগণ নহেন। উহার প্রথম স্থাপনা হয় বিংশ শতকের প্রারম্ভে প্রেমতোষ বসু, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী, নিশীথচন্দ্র সেন প্রভৃতির চেষ্টায় এবং পরে বৃটেনের শ্রমিক নেতা ফায়ার হার্ডির এককালীন প্রাইভেট সেক্রেটারি কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী এই আন্দোলনের নায়কত্ব করেন। পরে মৃণালকান্তি বসুরও অবদান কম নহে। শ্রমিক আন্দোলনের সেই ইতিহাস আজও অলিখিত, তাই কম্যুনিষ্ট তরফে মিথ্যা প্রচারণা তাহাদেরই এই আন্দোলনের পথিকৃৎ রূপে ঘোষণায় জনমনে এক অবাস্তব আস্থা জন্মিয়াছে।

১৮৯৬ সালে কলিকাতা নগরীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে যোগ দিবার জন্য যে সমস্ত সর্ব ভারতীয় নেতারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের বাড়ীতে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুই-জনকে আমার স্পষ্ট মনে আছে, দুইজনেই পরে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। একজন হইলেন মাদ্রাজের আনন্দ চার্লু। চার্লু নামটির জন্যই বোধহয় আমাদের বেশী আকর্ষণ করিয়াছিল। বেঁটে খাটো মানুষটির মুখময় বসন্তের দাগ, মাথায় বিরাট পাগড়ী। লোকটি বেশ হাসিখুসি। অপরজন হইলেন বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ জননেতা নারায়ণগোবিন্দ চন্দবারকর। স্যার নারায়ণ অত্যন্ত সুদর্শন ছিলেন। তাঁহার রূপ স্বভাবতঃই আকর্ষণের বস্তু ছিল। ইনি কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর হাইকোর্টের জজের পদে বৃত হন ও পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। তখনকার দিনে প্রভাবশালী নেতাদের রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সাময়িকভাবে অপসারণের জন্য সরকারী বড় চাকুরী দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এইভাবে বদরুদ্দিন তায়েবজী, রহিমতুল্লা সায়েনী, নারায়ণ চন্দবারকর ও শঙ্কর নায়ার জজিয়তী পান। চন্দবারকর রাণাডের শিষ্যবর্গের মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে প্রার্থনা সমাজভুক্ত হন ও বোম্বাই অঞ্চলের সমাজ সংস্কারের একজন উৎসাহী নায়ক হন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে নিখিল ভারতীয় সমাজ সংস্কার সম্মেলন ও নিখিল ভারতীয় একেশ্বরবাদী সম্মেলন হইত। আমার মাতৃদেবী ইংলণ্ডে অধ্যয়নার্থে যাইবারকালে বোম্বাই শহরে চন্দবারকরদের গৃহে ও ডাক্তার আত্মা-রাম পাণ্ডুর তারপুদের গৃহে মহাসমারোহের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন এবং সেই হইতে তাঁহাদের পরিবারের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা।

[কন্দর্প ।। প্রজাপতি ।।]

প্রজাপতি ।। কন্দর্প, তোমার সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে, তা তোমার দেখা পাওয়াই ভার।

কন্দর্প ।। আমাকে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয় কি না!

প্রজাপতি ।। নানাস্থানে এবং নানারূপে, কখনো তুমি অনঙ্গ কখনো সাঙ্গ।

কন্দর্প ।। আমার মনের কথা এর চেয়ে সুষ্ঠুতরভাবে আর প্রকাশ করতে পারতো কে?

প্রজাপতি ।। বলো কি! মনের কথা জানায় তোমার সমকক্ষ কি আমি? মনের কথা জেনে বেড়ানোই যে তোমার ব্যবসা।

কন্দর্প ।। জানতে পারি কই? এ ব্যবসায়ে যে দেউলে হতে চললাম।

প্রজাপতি ।। জানো না কি যে অনেক ব্যবসায় আছে যাতে যতই দেউলে হওয়া যায় ততই মূলধন ফেঁপে ওঠে।

কন্দর্প ।। এমন সুগম কোন্ ব্যবসা?

প্রজাপতি ।। তোমার রাজ্যে যাকে মন দেওয়া নেওয়া বলে।

কন্দর্প ।। প্রজাপতি, মন দেওয়া-নেওয়া ব্যবসায় কিনা জানিনা, তবে এমন কঠিন কাজ অল্পই আছে।

প্রজাপতি ।। কি আশ্চর্য! আমরা তো জানি ঐ কাজটাই চলছে জগৎ জুড়ে, স্বর্গে, মর্ত্যে, সর্বত্র।

কন্দর্প ।। অনেক শোনা কথার মতোই এ-কথাও অর্ধসত্য।

প্রজাপতি ।। ঐ অর্ধসত্যই তো তোমার রাজ্যের আবহাওয়া, যাকে বলে মনের আলো-আঁধারি ভাব।

কন্দর্প ।। মিথ্যা বলোনি দেব, আলো-আঁধারিময় নিত্য গোধূলির সোনার চেলি ঝুলিয়ে দিয়ে নরনারীর চিত্ত কাছাকাছি টেনে নিয়ে আসি আমি।

প্রজাপতি ।। ঐ ছলনাটুকু কেন?

কন্দর্প ।। ছলনা! তা ছলনা বলতে পারো। প্রেমের পথ এত বিঘ্নসঙ্কুল, পথ এমন উচ্চাবচ, পথে এত কণ্টক, এত শ্বাপদ, এতই সমস্যা যে একটু মোহের আবশ্যক আছে বই কি! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিবাহের দেবতা পূর্বরাগের এসব রহস্য জানলো কেমন করে?

প্রজাপতি ।। দেবতা মাত্রেই যে অন্তর্যামী, সে বিবাহেরই হোক আর প্রেমেরই হোক।

কন্দর্প ।। ঐখানে আমার আপত্তি। প্রেমের দেবতা অন্তর্যামী হলে আলো-আঁধারি সৃষ্টি না ক'রে ভাস্বর মধ্যাহ্ন সৃষ্টি করতো। প্রজাপতি, আমি জানি না কি করছি, আলো-আঁধারিতে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পথ চল[illegible]

প্রজাপতি ।। কেন এমন অনর্থক প্রয়াস [illegible]

কন্দর্প ।। অনর্থক কিনা জানি না,

আনন্দ আছে।

পতি ।। আনন্দ আছে ?

র্প ।। আনন্দ না থাকলে কি গোধূলিতে তারা উঠতো ?

পতি ।। অলঙ্কার ছেড়ে দিয়ে মানুষের কথা বলো।

র্প ।। আনন্দ না থাকলে কি নরনারী পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হ'তো ?

পতি ।। রঙ্গমঞ্চে সীতার দুঃখ দেখে দর্শক কাঁদে। এ কি সেই রকম আনন্দ নয় ?

র্প ।। হতে পারে, তবু আনন্দ হিসাবে তার মূল্য এতটুকু কম নয়। কাঁদে তবু ফিরে ফিরে আসে।

পতি ।। আনন্দটা মিথ্যা না হতে পারে তবে দুঃখটাও তো সত্য। কেন এমন বিপাকে ফেলে বিব্রত করো মুগ্ধ নরনারীকে ?

র্প ।। আমি তো গোড়া থেকেই তোমার প্রশ্নের মুখে বেতসীলতার মতো কম্পমান হ'য়ে আছি, এবারে আমি দুটো প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই ধৃষ্টতা বলে গণ্য হবে না।

পতি ।। নিশ্চয় নয়।

র্প ।। প্রেমের দুঃখের মধ্যে আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু বিবাহের আনন্দের মধ্যে কি দুঃখ নাই ?

পতি ।। কোন্‌টা আনন্দ কোন্‌টা দুঃখ স্থির করবে কে ?

র্প ।। সীতার দুঃখে কাঁদে যে দর্শক সে।

পতি ।। রঙ্গমঞ্চে যে সীতা কাঁদে তার মনের মধ্যে আনন্দও নাই দুঃখও নাই আছে আচরণের মধ্যে অভ্যাস।

র্প ।। কিন্তু যে সীতা কেঁদেছিল তমসার তীরে তার তো দর্শক ছিল না।

পতি ।। ছিল বই কি নতুবা কি রামায়ণ রচিত হ'তো ! কিন্তু কন্দর্প, তুমি সুকৌশলে আমাকে অলঙ্কারের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছ, এবারে আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

র্প ।। অলঙ্কার ও আসল স্বতন্ত্র তো নয়। অলঙ্কার তো দেহেরই অংশ।

পতি ।। বলো কি, স্বর্ণকারের কীর্তি আর বিধাতার কীর্তি ও দুই কি এক ?

র্প ।। দুটোই কি বিধাতার কীর্তি নয় ?

পতি ।। বুঝলাম না।

র্প ।। যে অলঙ্কার স্বর্ণকার জোগায় সেই তুচ্ছকে ছেড়ে দাও, নারীর প্রকৃত অলঙ্কার তো বিধাতৃ প্রদত্ত।

পতি ।। কতকটা যেন বুঝতে পারছি।

র্প ।। যে দিন আদিম রহস্য সিন্ধুগর্ভ থেকে নিষ্কলুষ যৌবনসম্পন্না উর্বশী উত্থিত হয়েছিল, বিমূঢ় দেবদৈত্য কি মনে করেন নি যে, উর্বশীর সর্বাঙ্গ স্বর্ণাভরণে ভূষিত ? সৌন্দর্য সেই স্বর্ণাভরণ যা কেবল বিধাতাই গড়তে সমর্থ ?

পতি ।। একথা অবশ্য স্বীকার করতে হয়।

র্প ।। প্রকৃত অলঙ্কার নারীর সহজাত।

প্রজাপতি ।। কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো।

কন্দর্প ।। মিথ্যা বলো নি। পুরুষের প্রকৃত অলঙ্কার বীর্য, নারীর সৌন্দর্য আর এই বীর্য ও সৌন্দর্যের সমবায়ে, অরণি কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে সঞ্জাত অগ্নির মতো, জন্ম প্রেমের।

প্রজাপতি ।। তোমার এই পরিকল্পনার মধ্যে বিবাহের স্থান কি নেই ?

কন্দর্প ।। অবশ্যই আছে।

প্রজাপতি ।। চোখে তো পড়ে না।

কন্দর্প ।। প্রজাপতি, গঙ্গোত্রীর শিখরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র সঙ্গম কি চোখে পড়ে ? তবু তো আছে। আর যদি তা না থাকতো তবে পূর্বরাগ শব্দটাই তো সৃষ্টি হ'তো না।

প্রজাপতি ।। কন্দর্প, সব পূর্বরাগ কি বিবাহে গিয়ে অবসিত হয় ?

কন্দর্প ।। সব নদী কি সমুদ্র সঙ্গমে পৌঁছয় ?

প্রজাপতি ।। তবু তাদের সংক্রমণ মিথ্যা নয়, অনতিদীর্ঘ যাত্রাপথের তৃষ্ণা নিবারণ ক'রে থাকে।

কন্দর্প ।। বিবাহে অনবসিত প্রেমও অসার্থক নয়, বিচ্ছেদের মরুবালুতে লুপ্ত হওয়ার আগে পর্যন্ত আনন্দ দান করে।

প্রজাপতি ।। কিন্তু তারপরে ?

কন্দর্প ।। তারপরেই বা মিথ্যা হতে যাবে কেন ? স্রোত শুকোয় জল থেকে যায় গভীরে। একদিন মরুর পথিক এসে সরিয়ে দেয় বালুর মুখোস, নিদ্রাভঙ্গে শুভ্র বারি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে তরল রজনীগন্ধার ফোয়ারায়, সেই তো কাব্য। প্রজাপতি, ভুলে যাওয়া প্রেমেই হচ্ছে শিল্পের প্রেরণা। বিবাহের অভিজ্ঞতায় হিসেবের খাতা লেখা যায়, কাব্য নয়।

প্রজাপতি ।। কন্দর্প, কে কবে কোথায় একখানা কাব্য লিখবে সেই আশায় মানুষে অনিশ্চয়ের মধ্যে ঝাঁপ দিতে যাবে কেন বলতে পারো ?

কন্দর্প ।। অনিশ্চয় বলতে কী ?

প্রজাপতি ।। পূর্বরাগ। ওর রক্ত মাংস শিরা ধমনী অস্থি মজ্জা অণু পরমাণু সব অনিশ্চয়ের উপাদানে গঠিত।

কন্দর্প ।। ক্ষতি কি ?

প্রজাপতি ।। মানুষে নিশ্চয়তা চায়।

কন্দর্প ।। ঠিক উল্টো। নিশ্চয়তার কোলে মানুষ বলেই মানুষে অনিশ্চয়তা চায়, নিরাপত্তার কোলে বাস বলেই দর্শকে বাঘের খেলা দেখতে ভালোবাসে। বাঘের খেলায় যাদের বাস সেই বুনো মানুষের আসক্তি নেই বাঘের খেলায়।

প্রজাপতি ।। তুমি বলতে কী চাও ?

কন্দর্প ।। মানুষে পূর্বরাগের দোলায় দুলতে ভালোবাসে এমন কি নিতান্ত পত্নীরত স্বামীরও আপত্তি নেই এক আধবার দোল খেতে। আর বাস্তবে দোল খেতে যার সাহসের অভাব মনে মনে দোল খায় সে।

প্রজাপতি ।। এ যে গুরুতর অভিযোগ।

কন্দর্প ।। গুরুতরও নয়, অভিযোগও নয়। পুরুষের বীর প্রকৃতি নিশ্চয়ের আরামে ঘুমিয়ে পড়ে, তাই মাঝে মাঝে তাকে পূর্বরাগের ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে হয়। বীর্যের পথে পূর্বরাগ জল বায়ুর মতো অত্যাবশ্যক। অর্জুনের পক্ষেই অপরিহার্য চিত্রাঙ্গদা প্রণয়, আর সুভদ্রা হরণ। ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির একনিষ্ঠ হ'লে কেউ বিস্মিত হয় না।

প্রজাপতি ।। এমন চললে যে লোকস্থিতি অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।

কন্দর্প ।। পূর্বরাগ সত্ত্বেও তো লোকস্থিতি সম্ভব হয়ে আসছে।

প্রজাপতি ।। পূর্বরাগের প্রভাব তেমন ব্যাপক নয় বলেই।

কন্দর্প ।। প্রজাপতি, দেবতারা না অন্তর্যামী ?

প্রজাপতি ।। হঠাৎ সন্দেহ হ'ল কেন ?

কন্দর্প ।। তোমার কথা শুনে। পূর্বরাগের প্রভাব যেমন ব্যাপক তেমনি প্রবল। মনে মনে চিনি না খাচ্ছে কে ? ঐ যে জরদগব বৃদ্ধ যষ্টি সহযোগে ত্রিপাদ জীবে পরিণত হয়েছে, দেখো, দেখো, চেয়ে দেখো ওর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ঐ সুঠাম তরুণীর দিকে। আর ঐ যে নামাবলী চিহ্নিত গুরুঠাকুর ইষ্টমন্ত্র দান উপলক্ষ্যে সুন্দরী যুবতীর কর্ণ-বিবরের দিকে একটু অতিরিক্ত ঝুঁকে পড়েছে ও কি কেবলি শিষ্যার প্রতি গুরুর কর্তব্য ! কই, ঐ বৃদ্ধাকে মন্ত্র দানের সময়ে তো এমন আগ্রহ প্রকাশ পায় নি ? আর ঐ দেখো নিভৃত কক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ দম্পতি। স্বামীর মন কি পত্নীতে আবদ্ধ না তাকে উপলক্ষ্য ক'রে আর রমণীকে উপভোগ করছে।

প্রজাপতি ।। এ কি পাপের চিত্র ?

কন্দর্প ।। এ পাপের চিত্র নয় মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্য। জীবন ধারণের পক্ষে দাম্পত্য প্রেম যথেষ্ট নয়—আরও কিছু চাই। সেই আরো কিছু বিতরণ করে বেড়ানো আমার কাজ।

প্রজাপতি ।। তবে তোমাতে আমাতে মিল হবে কেমন ক'রে ?

কন্দর্প ।। মিল হ'তেই হবে এমন কি কথা আছে। তবু মিল হতে বাধা নেই, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষদ্বয়ে যেমন মিল হয়ে থাকে তোমাতে আমাতে তেমনি মিল।

প্রজাপতি ।। মনে রেখো কন্দর্প, দাম্পত্য প্রেম লোকস্থিতির প্রধান সহায়, মানুষের শেষ ও চরম নির্ভর।

কন্দর্প ।। কিন্তু এই জগৎ চরাচরে মানুষ কতটুকু স্থান অধিকার করে আছে ? এই যে ক্ষুদ্র ভূমণ্ডল যার বারো আনা জলময়, বাকি চার আনার মধ্যেও মরুভূমি মেরুভূমি অরণ্য পর্বত বাদ দিলে যে সামান্য অংশ থাকে তারই এক প্রান্তে মানুষের সমাজ। এই গেল এক দিকের চিত্র। আর এক দিকে দেখো অসংখ্য নক্ষত্র গ্রহ উপগ্রহময় আকাশ যার মধ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মুক্তা-বিন্দুর মতো দোদুল্যমান এই পৃথিবী। কোন্ দিব্য শক্তিতে এ সমস্ত নিয়ন্ত্রিত

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

আমার যৌবনকালে যাঁরা ছিলেন অগ্রজ কবি, তাঁদের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে চল্লিশ বছর আগে স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথকে। এঁর সংগে আমার প্রথম আলাপ বহরমপুরে। আমার এক আত্মীয় কন্যার সংগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরিবারের একটি যুবকের বিবাহে কবি বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা আমার খুব ভালো করে পড়া ছিল এবং ভারতী প্রবাসীতে আমার দু'চারটা কবিতাও বেরিয়েছিল। কাজেই আমার সংগেই আলাপটা জমেছিল ভালো। তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলেছিলেন-"বিয়ের বরযাত্রী হওয়া কি আমার কাজ! আসল উদ্দেশ্য, মুর্শিদাবাদ শহর ও তাহার উপকণ্ঠের ঐতিহাসিক স্মৃতি সাক্ষ্যগুলি দেখা। কাল সকালেই তা দেখতে রওনা হচ্ছি।"

তারপরে কল্‌কাতায় পড়াশুনা করতে গিয়ে তাঁকে পেয়েছিলাম, ভারতী আফিসের বৈঠকে আর হেদোর ধারে। কবি হেদো পুকুরে সাঁতার শিখতেন আর বৈকালে বেড়াতেন হেদোর পার্কে—কখনও একলা,—কখনও নিত্য সহচর ধীরেন দত্তর সংগে।

হেদোর ধারে বেঞ্চিতে বসে তাঁর সংগে মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনা হ'ত। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—"ভারতী ও প্রবাসী ছাড়া অন্য পত্রিকায় লেখা দেন না কেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"ঐ দুই পত্রিকায় প্রুফ আমি দেখতে পাই। অন্য কোন পত্রিকা প্রুফ দেয় না। কবিতায় ভুল ছাপা থাকলে কবিতার মুণ্ডপাত হয়। তাছাড়া, ছাপা লেখার ফাইল-ও কেউ দেয় না। আসল কথা—ভারতী প্রবাসীর মারফতে আমার একটা পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হয়ে গেছে—আমার কবিতা তাদের জনাই লেখা। তারা আমার লেখার জন্য উৎসুক হয়ে থাকে।" একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—"রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্যান্য কবিদের লেখা আপনি পড়েন?"

তিনি জবাব দিলেন—"দৃষ্টি বড় ক্ষীণ, সেজন্য অন্যের লেখা পড়া বিশেষ হয় না। ভারতীর কবিতা নির্বাচনে অনেকেরই লেখার সংগে আমার পরিচয় ঘটে, প্রবাসীর কবিতাগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিই। আর নব্য ভারতে গোবিন্দদাসের কবিতা পেলে পড়ি: তাঁর লেখা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। কবির ভাষা নিজস্ব, টেকনিক নতুন, পূর্বসূরীদের প্রভাব বা অনুকৃতি নেই। এরূপ অমার্জিত স্পষ্ট ভাষণ ও অকৃত্রিম বলিষ্ঠ রচনা ভঙ্গী রবীন্দ্র যুগে আর কারো নেই।

বন্ধুরা অন্য কবির কবিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে পড়ি।" আমাকে বলেছিলেন—"দেখ, পল্লী জীবন নিয়ে কবিতা লেখার লোকের অভাব হবে না। তুমি দুর্বাসার মত পৌরাণিক চরিত্রগুলির যুগোপযোগী নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে কবিতা লেখ। পৌরাণিক ... গল্পো সবই সিম্বল। কবিতায় সি... ব্যাখ্যার প্রয়োজন। মৈনাক, জটায়ু, দ্রৌপ... নারদ, একলব্য ইত্যাদি চরিত্রের কবিতায় ব্যা... দেওয়া চলে।" আমি তাঁর উপদেশ বরাবর পা... করে আসছি। দেশ ভ্রমণ প্রসংগে ... বলতেন—"দেখ দৃষ্টি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ... হয়ে আসছে—বই পড়ার নেশা ছিল, ক্রমে ... পড়া এখন বন্ধ হয়ে আসছে—নতুন ... লেখার পথও রুদ্ধ হয়ে আসছে,—ভয় ... হয়ত শেষ পর্যন্ত অন্ধ হয়ে যাব—যত ... পারি সৃষ্টিটাকে দেখে নিই। সেজন্য সুযোগ সুসংগ পেলেই দেশ ভ্রমণে বেরুই। আনন্দে... সংগে জ্ঞানও পাই। মানুষের লেখা বই প... বন্ধ হয়ে এসেছে,—বিধাতার বিশাল বইখা... পড়বার সামর্থ্য এখনও আছে। এথেকে সৃ... উপাদানও যথেষ্ট পাই।"

সত্যেন্দ্রনাথ মিতভাষী ছিলেন। ... কারো লেখার নিন্দা করতেন না। তবে ... বিচার সম্বন্ধে অসংগত মন্তব্য ও মহা... গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা-ব্যঞ্জক ... পড়লে তীব্র ভাষায় ব্যংগ রচনায় জবাব দি... ছাড়তেন না। 'হসন্তিকা' ও ... আরতি'তে এই শ্রেণীর কবিতার নিদর্শন পা... যাবে। একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিকে... সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতা... রবীন্দ্র শিষ্যদের কবিতা নিয়ে সমালোচনার না... ব্যংগ-বিদ্রূপ ক'রে হাততালি পেতেন। ... সম্পাদককে তিনি প্রত্যাঘাত করার সু... খুঁজছিলেন। একটা সুযোগও পেয়ে ... সুযোগ আমিই দিয়েছিলাম। ভারতী... টেনিসন টার্ণার নামক একজন কবির ... অনুবাদ বেরিয়েছিল। উক্ত সম্পাদক ম... করলেন কবি তো টেনিসন, টার্ণার নি... কবিতার নাম। আমি কবির সংগে ...

সঞ্জীবিত, পরিচালিত? সে শক্তি প্রেম, বিশুদ্ধ নির্গুণ, মনুষ্য সম্পর্ক বিরহিত প্রেম। প্রজাপতি, সেই প্রেমকে তুমি নির্বাসিত করতে চাও?

প্রজাপতি ।। নির্বাসিত নয়, নিয়ন্ত্রিত করতে চাই।

কন্দর্প ।। যা আপন নিয়মে নিয়ন্ত্রিত তাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? এ যে পিষ্ট পেষণ।

প্রজাপতি ।। নদী যদি কূল লঙ্ঘন করে তবে কি বাঁধ বাঁধবো না?

কন্দর্প ।। নদী মাঝে মাঝে কূল লঙ্ঘন করবেই, ও তার স্বভাব। সমুদ্রে মাঝে মাঝে তরংগোচ্ছ্বাস ঘটবেই কিন্তু জেনো জোয়ার ভাঁটার দ্বারা যা নিয়ন্ত্রিত সাময়িক উচ্ছ্বাস তার ব্যতিক্রম।

প্রজাপতি ।। সেই জন্যই তো সমুদ্র থেকে দূরে থাকতে চাই।

কন্দর্প ।। যত খুশি দূরে থাকো কিন্তু সমুদ্রকে বাদ দিলে দেখবে জনপদের সরোবর শুকিয়ে উঠেছে। প্রজাপতি, সমুদ্র বিশুদ্ধ নির্গুণ প্রেম আমি যার অধিপতি। আর সরোবর চার কূলে সীমিত দাম্পত্য প্রেম যার অধিপতি তুমি। নির্গুণ প্রেমকে বাদ দিয়ে সগুণ প্রেমের অস্তিত্ব কল্পনা বাতুলতা।

প্রজাপতি ।। কিন্তু এদিকে যে সমাজ টলমল ক'রে ওঠে।

কন্দর্প ।। তার প্রতিকার নির্গুণ প্রেমের পথরোধ নয়।

প্রজাপতি ।। তবে?

কন্দর্প ।। দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে নির্গুণ প্রেমের প্রবেশের পথ ক'রে দাও।

প্রজাপতি ।। বুঝলাম না।

কন্দর্প ।। পৃথিবীর যে অঞ্চলে ভূমিকম্প নিত্যকার অভিজ্ঞতা সেখানে মানুষে পাকা অট্টালিকা না গড়ে কাঁচা বাড়ী তৈরি করে, ভূমিকম্পে নাড়া দিয়ে গেলেও ক্ষতি হয় না।

প্রজাপতি ।। তার মানে বলতে চাও যে দাম্পত্য প্রেমকে শেষ নির্ভর মনে করবো না।

কন্দর্প ।। শেষ নির্ভর মনে করো ক্ষতি নাই, চরম নির্ভর মনে করলেই সঙ্কট। দাম্পত্য প্রেম সহস্রশীর্ষ বাসুকির ফণায় অবস্থিত পৃথিবী। মাঝে মাঝে ফণা বদলাবার সময়ে পৃথিবী একটু নড়বেই—তাই বলে ভয় পেলে চলবে না। সেই জন্যেই মনে করিয়ে দিতে চাই দাম্পত্য প্রেম যদি কখনো বিচলিত হ'য়ে ওঠে, গেল গেল বলে আর্তনাদ করলে বিপদ বাড়বে বই কমবে ন... ভূমিকম্পের সময়ে ছাদ থেকে লাফি... পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু কিন্তু বাড়ী ধ্বংস না হতেও পারে। প্রজাপতি... জগতের আদ্যাশক্তিকে বাদ দি... ঘটাকাশে পটাকাশে শক্তির কল্প... ক'রো না।

প্রজাপতি ।। ঘটাকাশে পটাকাশে শ... পরিকল্পনা করাই আমার কাজ। কাজে... তোমার পরামর্শ আমি গ্রহণ কর... অক্ষম।

কন্দর্প ।। আমি পরামর্শ দিতে পারি ... বেশি আর কি ক্ষমতা আছে আমা...

প্রজাপতি ।। তাই তো বলছি তোমা... আমাতে কখনো মিল হবে না।

কন্দর্প ।। সেটা দুঃখের হতে পারে ... অসম্ভব কিছু নয়।

প্রজাপতি ।। লোকস্থিতির জনাই আ... তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—দাম্প... প্রেমের বাইরে মানুষ কখনো শা... পাবে না।

কন্দর্প ।। জগৎস্থিতির জনাই স্মরণ করি... দিতে চাই দাম্পত্য প্রেমে মান... কখনোই তৃপ্তি পাবে না।

—

বুঝি সমাস করেছি, তাই নিয়ে সম্পাদক খুব এক চোট বাঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ এর উত্তরে লিখলেন—

কাগজের হাতী
বা
নব্য দিঙ্‌নাগ প্রশস্তি

এই নব্য দিঙ্‌নাগ নব্য কালিদাসের বিরুদ্ধবাদী। কবিতাটি আছে 'বেলা শেষের গানে।' কবিতাটি এই—

দূরে থেকে দেখে দিগ্‌গজ বলে
ভুল করেছিনু প্রায় তারে।
কাছে এসে দেখি দিগ্‌গজ একি!
নজগজে এ যে একেবারে।
পথ জুড়ে চলে প্রতিপদে টলে
চাঁচাড়ি চেরাই দন্ত-রে।
ঘোড়া ভড়কায় দেখে আচমকা
ছেলে ভয় পায় অন্তরে।
আগে আগে চলে ময়ূর পংখী
কাগজের হাতী যায় পিছে
প্রত্যান-মারা শুঁড়ের বহর
কিন্তু সে ভুয়ো, সব মিছে।
ও শুঁড় কারেও মুড়ে তুলে কভু
পাটে তুলে রাজা করবে কি?
ও শুঁড় কখনো মহাকক্ষ্মীর
অভিষেক ঘট ধরবে কি?
ও শুঁড়ে পাকড়ি বট পাকুড়ের
পাতাটিও ছোঁড়া যায় না রে।
ও শুধু খামখা সমাস ভাঙিতে
পটু টেনিসন টর্পারে।

১৯২২ সালে ২৫শে জুন কবির মৃত্যু হয় চল্লিশ বৎসর বয়সে। এ সংবাদে এমন দারুণ আঘাত পেয়েছিলাম যে, সাত দিন ধরে অশ্রু সংবরণ করতে পারিনি। এ শোক শুধু তাঁর স্নেহের জন্য নয়, কাব্য-সরস্বতীর নিদারুণ ক্ষতির জন্য। তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকলে কেবল কাব্য সাহিত্যের নয়, গদ্য সাহিত্যেরও অনন্যমা শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারতেন।

সবচেয়ে মনে পড়ে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে। ছাত্রজীবনে এঁর সঙ্গেও আলাপ বহরমপুরে তাঁর জমিদারী কাছারি বাড়ীতে। কলকাতায় এসে তাঁর সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে মেসে ঘন ঘন যাতায়াত করতাম। ইনি আমাকে পল্লী কবিতা রচনা করতে উৎসাহিত করতেন। সেকালের সকল গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও বহু অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে এঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি যাতায়াত করতেন এবং তাঁকে নিজের কবিতা শুনিয়ে আসতেন। রবীন্দ্র শিষ্যদের মধ্যে ইনিই কবিগুরুর সবচেয়ে বেশি সহায়তা, উৎসাহ ও উপদেশ লাভ করেছিলেন। ইনি অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিয়ে দেন। এঁর নিজের শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। বিন্দুমাত্র সংকোচ বা কুণ্ঠা ছিল না। আমাকেও নিজের কবিশক্তি সম্বন্ধে সচেতন হতে উপদেশ দিতেন। নিজের বাড়ীতে সাহিত্যিক বৈঠক বসিয়ে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করে আনতেন। নিজে খুব সহৃদয় মজলিসী ও বহুভাষী মানুষ ছিলেন। এঁর অধিকাংশ কবিতা এঁর নিজের মুখেই আমার শোনা। ইনি চমৎকার আবৃত্তি করতে পারতেন মোহিতলালের মতো। ফলে, এঁর আবৃত্তির গুণে প্রায় সব কবিতাই আমাদের মর্মস্পর্শী হয়ে উঠত।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে ইনিই আবিষ্কার করেন। যতীন্দ্রনাথ ছাত্রজীবন থেকেই কবিতা লিখতেন, কিন্তু তাঁর নিজের রচনা সম্বন্ধে সংকোচ ও কুণ্ঠা ছিল খুব বেশি। যখন তিনি কৃষ্ণনগরে ইন্‌জিনিয়ার, তখন যতীন্দ্রমোহন কৃষ্ণনগরে তাঁহার গৃহে অতিথি হয়ে তাঁর কবিশক্তির পরিচয় পান এবং তাঁর কয়েকটি কবিতা কেড়ে নিয়ে এসে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই যতীন্দ্রনাথ অসামান্য কবিখ্যাতি লাভ করেন। এতেই তাঁর আত্মপ্রত্যয়ও প্রবুদ্ধ হলো। ফলে, এই দুই কবির মধ্যে আমরণ গাঢ় বন্ধুত্বের ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল।

যতীন্দ্রমোহন তাঁর কবি প্রতিভার যথাযোগ্য মর্যাদা দেশে স্বীকৃত হয়নি বলে মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন। তিনি বলতেন—"এদেশের লোক স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কখনও কবির প্রাপ্য মর্যাদা দেবে না,—যে যতটা কেড়ে নিতে পারবে, সে ততটুকুই পাবে। সংকোচ কুণ্ঠা ত্যাগ করে কবিদের নিজ নিজ প্রাপ্য দাবি করা উচিত। ঘোষণা করতে হবে—'কবিদেরও চাই বক্তভাগ।'" যাই হোক, রসচক্র থেকে আমরা প্রথম তাঁকে অভিনন্দিত করি—একটা বাগানবাড়িতে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে বৃহত্তর আকারে তাঁকে আর একটি অভিনন্দন দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদকটা তিনি পাবেন, আমরা তা খুব আশা করেছিলাম,—প্রাপ্তির সময়ও আসন্ন হয়েছিল—কিন্তু বিধাতা কবিকে আর বেশি দিন প্রতীক্ষা করতে অবসর দিলেন না।

তাঁর অপর একটা ক্ষোভের বিষয়,—পপুলার এজেন্সি নামে একটি প্রকাশ ভবন তাঁর কাব্য মালঞ্চ নামে ৩১৩ পৃষ্ঠার একখানি কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছিল। কিন্তু কি কারণে জানি না বিক্রয়ের জন্য বই-এর বাজারে আসার আগেই তার প্রচার বন্ধ হয়ে গেল। এতে কবি খুব আঘাত পেয়েছিলেন। নতুন সংকলন তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে।

মোহিতলালকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করে এনে কবি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন,—তাঁর কাব্যাবলীর রসবিচারমূলক একটি আলোচনা। মোহিতলালও লিখতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই কবি দেহত্যাগ করলেন। এই সময়ে মোহিতলাল যতীন সেনগুপ্ত ও কুমুদরঞ্জনের কাব্যাবলী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এত শীঘ্র যতীন্দ্রমোহন দেহত্যাগ করবেন তা মোহিতলাল ভাবতে পারেননি। মহাযাত্রী কবির মনে আরও একটা ক্ষোভ থেকে গেল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে কবির খুব সদ্ভাব ছিল। এই সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ থাকেনি। মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন ধরে উপবাস করছিলেন—সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে—এদিকে টাউন হলে বিপুল আড়ম্বরের সহিত শরৎচন্দ্রের সংবর্ধনার আয়োজন হচ্ছে। যতীনদাদা আমাদের তিন চারজনের সহি নিয়ে সংবাদপত্রে একটা চিঠি ছাপলেন। মহাত্মা গান্ধীর মরণাপন্ন অবস্থায় এ সংবর্ধনা স্থগিত রাখা হোক, এই ছিল আমাদের আবেদন। শেষ পর্যন্ত সংবর্ধনা পণ্ডই হল—কিন্তু আমাদের চিঠির জন্য নয়। সেদিন ছিল শোক দিবস—হিজলি ডে, বিপ্লবীর দল সেজন্য সংবর্ধনা প্রায় বন্ধ করে দিল। যাই হোক, শরৎচন্দ্র খুবই বিরক্ত হলেন। আমাকে তিনি ক্ষমা করলেন, ক্ষমা না চাইতেই; কিন্তু যতীনদার উপর খুব চটে গেলেন। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদই ঘটে গেল। পরবৎসর শরৎচন্দ্রের কোন একটি সংবর্ধনায় কবিদের নেতৃত্ব করে যতীন্দ্রমোহন শরৎচন্দ্রের সহিত মনোমালিন্য মিটিয়ে নিলেন।

এই পুনর্মিলন বেশী দিন টিকল না। যতীনদাদা একটা বার্ষিক পত্রিকার সম্পাদনের ভার নিয়েছিলেন। তিনি তার জন্য শরৎচন্দ্রের কাছে একটা রচনা চান। শরৎচন্দ্র 'দেবেন' বলে কথা দিয়েছিলেন। দুমাস পরে যখন কবি লেখা চাইতে গেলেন, শরৎচন্দ্র তখন বললেন—লিখতে তো পারিনি ভাই, কোন লেখা হাতেও নেই, শরীর খুব খারাপ চলছে। নতুন কিছু লিখতেও পারব না।

যতীনদাদা বললেন—সে কি? আমি বিজ্ঞাপন ছেপেছি—আপনি কথা দিয়েছেন। শরৎচন্দ্র বললেন—কথা যখন দিয়েছিলাম তখন শরীর ভালো ছিল। অগ্রিম টাকা যাদের কাছে নিয়েছি—তাদেরই দিতে পারছি না। কথা দিয়েছি বলে তো মাথা দিইনি ভাই। আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদের পক্ষে কথা দিয়ে কথা রক্ষা খুবই সহজ, ৮।১০ লাইন কবিতা লিখে দিলেই চলে। আমার পক্ষে সে সুবিধা তো নেই।

যতীনদাদা অপমানিত ও উত্তেজিত হয়ে ফিরে এসে শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় খুব কড়া একটা চিঠি লিখেছিলেন। যতীনদাদার ডাকাডাকিতে আমি যখন গেলাম—তখন চিঠিখানা পড়ে আমাকে শোনালেন। আমি চিঠিখানা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে কবির পিকদানি ভাবরে ফেলে দিলাম।

যতীনদাদা বললেন—চিঠি আগেই চলে গিয়েছে, এটা তার নকল। তুমি আসতে দেরী করলে—তোমাকে আগে শোনাতে পারিনি।

আমি বললাম—ভারি অন্যায় করেছেন দাদা, এখন আর উপায় কি?

শরৎচন্দ্র তখন রসচক্রের চক্রবর্তী। যতীনদা রসচক্র ত্যাগ করলেন। রসচক্রের পক্ষেও একটা অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটে গেল। শরৎচন্দ্র খুবই রেগে গেলেন এবং বিরূপ হয়েই থাকলেন।

কিছুকাল পরে যতীনদার এক কন্যার মৃত্যু হল। এ সংবাদ রসচক্রে শরৎচন্দ্রকে শোনালাম। শরৎচন্দ্র বললেন—কালিদাস এক্ষুণি চলো। এক্ষুণি চল। যতীনের এমন দুর্দিনে আমি উদাসীন থাকতে পারি না।

আমার সঙ্গে শরৎচন্দ্র ইন্দ্রাবাসের গেটে গিয়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে ডাক দিলেন—'যতীন!' যতীনদাদা ছুটে এসে শরৎচন্দ্রের পা ধরে বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। শরৎচন্দ্র যতীনদাদাকে বুকে আঁকড়ে ধরলেন। এই ভাবে অস্বস্তিকর ব্যাপারের অবসান হ'ল। সেকালের এমনি কত কথাই মনে পড়ে।

নিবন্ধ ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে পড়ছে. সকলের কথা বলার স্থান নেই। করুণানিধানের সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করি।

দরিদ্র শিক্ষক কবির বাসভবন ছিল আমাদের কলেজের পাশেরই রাস্তাতে। একদিন দেখা করতে গিয়ে নিজের নাম বলে দাদাকে প্রণাম করলাম। যেন কত দিনের চেনা এই ভাবে আমাকে গ্রহণ করে কবি বললেন—এই যে এসে পড়েছ, কিছুদিন থেকে তোমাকে খুঁজছি। কৃষ্ণবিহারী তোমাকে কিছু বলেনি? ঠিক সময়ে

এসে পড়েছে। আমি চার পয়সার গুড় কিনতে চললাম। ততক্ষণ এক কাজ করো। এই কবিতাটার যে শব্দ কানে বেসুরো মনে হবে, তার তলায় দাগ দিয়ে রাখ। আমি ৪।৫টা শব্দের তলায় দাগ দিলাম। ফিরে এসে তিনি শব্দগুলো বদলানোর জন্য নানা প্রতিশব্দ ও বিকল্প শব্দ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন।

কবি কবিতা রচনায় শ্রুতিকেই প্রধান বিচারিকা মনে করতেন। বললেন—মরমে প্রবেশ করতে হলে কানের ভিতর দিয়েই তা করতে হবে। কান হ'লো মর্মের হর্ম্যের দ্বারী। দ্বারীকে আগে তুষ্ট না করলে প্রবেশ লাভ সম্ভব হয় না। গীতি কবিতায় অর্থের চেয়ে সুরের দাম বেশি। অর্থের একটু এদিক ওদিক হলেও চলে, কিন্তু সুরভঙ্গ হলে চলবে না। এটা হ'ল কবির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা। কবির সঙ্গে সাধারণতঃ ছুটির দিন দেখা হত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাসভবনে অর্থাৎ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর দক্ষিণাংশের একতলার একটি ঘরে। এখানে কবি ছাড়া যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে প্রধান অধ্যাপক বহু ভাষাবিদ কবি নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়। সুধীনবাবু খুব কম কথা বলতেন, দেশবন্ধুর সান্ধ্য মজলিসেও তিনি নীরব থেকে সব কথা শুনতেন। নলিনীবাবু বহু ভাষাবিদ, কিন্তু তাঁর মুখেও কোন ভাষাই ফুটত না। করুণাদাদাই প্রধান বক্তা। আমাকেও যোগ দিতে হত। সেকালে আমাদের আলোচ্য ছিল রবীন্দ্র-সাহিত্য। সৌম্য তখন বালক, সেও এসে বসত।

বৈকালে আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ বাগচির বাসভবনে করুণা দাদাকে পাওয়া যেত। বহুতত্ত্বজ্ঞ বাগচি মশায়ের মুখে আমরা বহু-তত্ত্বের কথা শুনতে পেতাম। তিনি আমাদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতেন।

একদিন আমার একটি কবিতা নিয়ে বাণী পত্রিকার আফিসে গেলাম, বললাম,—এই কবিতাটা প্রবাসী, ভারতী ও মানসী আফিস থেকে ফেরৎ এসেছে—কবিতাটা ছাপাবার অনুপযুক্ত কিনা আপনারা বিচার করুন। সেখানে ছিলেন সম্পাদক অমূল্য বিদ্যাভূষণ, করুণাদাদা, চারুচন্দ্র সি, ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। করুণাদাদা কবিতাটা শুনে হাসলেন, —হেসে বললেন—প্রবাসী, ভারতী কেন ছাপেনি —তা বুঝেছি কিন্তু মানসী কেন ছাপলে না— —তা বুঝলাম না। দাও দেখি ওটা। বাণী যদি আর বেরোয় তবে বাণীতে, বাণী আর যদি না বেরোয় তবে ভারতবর্ষের ১ম সংখ্যাতেই ছাপা হবে। ফুটনোটে লিখে দেব—তিনখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র থেকে কবিতাটি ফেরৎ এসেছে। কবিতাটি অমূল্যবাবুর দপ্তরে থাকল। জানো বোধ হয়—ইনিই ভারতবর্ষের সহকারী সম্পাদক হবেন।

আমি বললাম—এতে তো আমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই—এর মূল্য সম্বন্ধে আমার নিজেরও সংশয় আছে। এটা আমার গুম্ফন শিল্পের একটা নিদর্শন মাত্র।

অমূল্যবাবু বললেন—কানের কবি, গানের কবি, প্রাণের কবি যখন তোমায় আশ্বস্ত করছেন —তখন তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার অনায়াসেই। আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে।

বিষয়বস্তু পুরাতন বলে বোধ হয় ফেরৎ এসেছে—কিন্তু বাংলা দেশে এ বিষয়বস্তু কখনো পুরানো হবে না।

করুণাদাদা বললেন—মালাকার ফুল ফোটায় না—সে ফোটা ফুলে মালা গাঁথে। এই মাল্য-শিল্পের কি কোন মূল্য নেই? আমি আশীর্বাদ করছি এই এক কবিতাতেই তোমার কবিখ্যাতি লাভ হবে। কবিতাটির নাম 'অন্ধকার বৃন্দাবন।' প্রথম চরণ—নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।

ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন—'কবির আশীর্বাদ পেলে কবিকে প্রণাম কর।'

আমি কবিকে প্রণাম করলাম। কবি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

* * *

অল্পকাল পরেই করুণাদাদা আইন কলেজের অধীনে একটি চাকরি পেয়ে দারিদ্র্যের কবল থেকে অব্যাহতি পেলেন। কিন্তু তার পর থেকে তাঁর লেখার ফসলের ফলন কমে এলো। তাতে তাঁর কবিখ্যাতি বিন্দুমাত্র কমেনি। রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে এমন সর্বজনবল্লভ কবি কেউ ছিলেন না—যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যগণের রচনার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁরাও তাঁর কবিতার প্রশংসা করতেন। কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালকেও তাঁর কবিতার সুখ্যাতি করতে শুনেছি। করুণাদাদার সহযোগী কবিরা সকলেই তাঁর রচনার ভক্ত ছিলেন।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন ঋষিতুল্য অনসূয় ও নিরভিমান—তাঁর চরিত্রমাধুর্য তাঁর অসামান্য জনবল্লভতার অন্যতম নিদান। অনেক দিন পরের কথা—

মিত্র ঘোষের পুস্তকালয়ে একদিন কথা-সাহিত্যিক প্রবোধ সান্যাল প্রস্তাব করে বসলেন, কবি করুণানিধানকে হাজার টাকার তোড়া দিয়ে সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চাঁদার খাতায় করলাম। কেবলমাত্র সাহিত্যিকদের অর্থানুকূল্যেই প্রস্তাবটিকে কার্যে প করার ব্যবস্থা হ'ল। অভ্যর্থনা সমিতি গ হল, আমাকে হ'তে হ'ল তার সভাপতি। ষ্ঠানের পৌরোহিত্য করবার জন্য কবি রঞ্জনকে আহ্বান করা হল। কবি মোহিতলা ভার দেওয়া হ'ল অভিনন্দনপত্র রচনা ও পা সকল শ্রেণীর সাহিত্যিকরা মিলিত হয়ে শ্রদ্ধাভরে অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর তুলেছিলেন। পরে সজনীকান্তের উ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকেও কা অভিনন্দিত করা হয়।

আমার সম্পাদনাতে কবির কবিতা সং 'শতনরী' নবকলেবরে প্রকাশিত হয় এবং বি-এ অনার্সের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। বিদ্যালয় কবিকে জগত্তারিণী পদক সম্মানিত করেন। যে ক্ষোভ নিয়ে সত্যেন্দ্রনা বিদায় নিয়েছেন করুণানিধানকে সে ক্ষোভ বিদায় নিতে হয়নি।

স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে কবি নি নিরানন্দ গৃহে আর বাস করতে পারতেন আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ও ভক্ত অনুরো আমন্ত্রণে তাঁদের গৃহে আতিথ্য স্বীকার শেষ জীবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়ে গেছে আমার ও মোহিতলালের বন্ধু ও বহরমপুরের কবিরাজ জীবনকালী রায় সবচেয়ে বেশি সেবা করেছিলেন। তাঁর কবি বহু দিন রোগে শয্যাগত ছিলেন। বিষয়, দেশের লোক তাঁকে কবিবর গোবিন্দদাসের মতো দেয়নি এবং তাঁর কবিপ্রতিভারও মর্যাদা স্বীকার করেছে।

ডাকাতি

মনোজ বসু

গ্রীষ্মের ছুটিতে জয়ন্তী মামার বাড়ি এসেছে। আম ফলেছে খুব—দিদিমা পঙ্কজিনী চিঠিতে লোভ দেখিয়েছিলেন। আম খাবে, আর ছুটির বেড়ানো হবে। মামারা কেউ থাকে না। বড় মামা ভিলাই-এর ইঞ্জিনীয়ার; ছোটমামা পুনায়—মিলিটারিতে ঢুকেছে। দুনিয়া ছোট হয়ে গেছে, জোয়ান যুবা কেউ ঘরে পড়ে থাকে না। পৈতৃক দালান-কোঠা বাগ-বাগিচা আগলে পড়ে রয়েছেন সেকালের দুটি মানুষ—দাদু আর দিদিমা। দালানের ইট কাঠ খসে খসে পড়ছে, উঠান অবধি জঙ্গল এঁটে এসেছে। বড় ছেলে বাসায় নিয়ে যাবার জন্য ঝুলোঝুলি—জনরব, জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় কলসি ভর্তি হয়ে বাড়ির কোন একখানে পোঁতা রয়েছে, সেই বস্তু ছেড়ে কর্তাগিন্নির নড়বার উপায় নেই।

জয়ন্তী এলো অনেক দিন পরে। নাতনির গায়ে মাথায় পঙ্কজিনী আদরে হাত বুলোন: একেবারে নতুন মানুষ হয়ে এলি দিদিভাই। রূপ যে অঙ্গে ধরে না।

কাশীনাথকে কলকণ্ঠে জয়ন্তী বলে, দিদিমা কি বলে, শুনতে পাচ্ছ দাদু? তবু কিন্তু দু-বছর ধরে বর খুঁজে খুঁজে বাবা হয়রান। তুমি রাজি হয়ে যাও লক্ষ্মী দাদু, আমার আইবুড় নাম খণ্ডে যাক।

পঙ্কজিনী ঝগড়া করেন: চিঠি লিখে লিখে নিয়ে এলাম, পেটে পেটে এত শয়তানি তোমার! আমারই উপর ডাকাতি?

কাশীনাথ বলেন, যৌবন বয়স ছিল, তোর দিদিমা তখনও একদিনের তরে আমায় পছন্দ করে নি। তোদের আমলে এসে পাত্রের এত দুর্ভিক্ষ হয়েছে দিদি?

পাত্র থাকবে না কেন—শূন্য পাত্র সব, ঘা দিলে ঢন ঢন করে বাজে। ভরা পাত্র তোমার মতন সত্যিই মেলে না দাদু। তা বেশ, দিদিমা রাগ করছে তো ভাগাভাগি করে নিই। মানুষটা তুমি দিদিমার ভাগে যাও। মনের সাধে তোমায় নাওয়ান খাওয়ান বাতের তেল মালিস করুন, হিংসে করতে যাব না। আমার ভাগে তোমার সেই

গোপন কলসিটা। সোনার টাকা রূপোর টাকা দু-হাতে তুলে তুলে খরচ করব।

খিল খিল করে হেসে উঠে আবার বলে, হাল আমলের বিয়ে-য় শাড়ি-গাড়ি টাকাকড়ির বন্দোবস্ত থাকলেই হল, বর না হলেও চলে যায়। বরের বখেড়া যে বয়ে বেড়াই, মানুষটা মরজি মতন খরচার যোগান দিয়ে যাবে সেই জন্য।

অজ পাড়াগাঁ। পথ-ঘাট আলোহীন, বিদ্যুতের পাখা নেই, কল ঘোরালে জল পড়ে না—একটা মাস তবু যেন পাখনা মেলে উড়ে চলে গেল। বর্ষাটা বড় তাড়াতাড়ি নেমেছে এবার। ছুটিরও শেষ হয়ে এলো, যাই-যাই করছে জয়তী—হেনকালে এক কান্ড। সকাল-বেলা দরজা খুলে দেখা গেল ভাঁজ-করা এক টুকরো কাগজ চৌকাঠের সামনে খানইট চাপা দেওয়া। পংকজিনী ঠোক্কর খেতেন আর একটু হলে—পা দিয়ে ইট সরিয়ে কাগজটা তুলে নিলেন। জয়তীকে বলেন, দেখ দিকি কিসের কাগজ। আমার তো আবার চশমা লাগবে।

দেখতে হবে কী আবার! ঝঙ্কার দিয়ে জয়তী উঠানে নেমে গেল। বলে, দিব্যি ছিলাম দিদিমা, উড়ো-চিঠি এদ্দিনে এই গাঁয়ের ঠিকানা পেয়ে গেছে।

পংকজিনী বলেন, কি লিখেছে, মানুষটাই বা কে—দেখতে হবে না?

জয়তী তেমনি অবহেলার ভাবে বলে, উড়ো-চিঠি দশ-বারোটা পেয়েছি এমন। না পড়েই বলে দিচ্ছি—আমা বিহনে জীবন অন্ধকার, এরই রকমফের কিছু। কথা সব মুখস্থ—ঠিক কিনা মিলিয়ে দেখ।

উঠানের পাশে নিমগাছের ডাল ভাঙছে জয়তী। দাঁতন করবে। মামার বাড়ির এই এক মাসে ষোলআনা গাঁয়ের মেয়ে সে এখন।

বলে, উড়োচিঠিতে নাম দেয় না। গাঁয়ের কোন্ মানুষটা লিখেছে, আমি কিন্তু বলে দিতে পারি। সেই একজন অকালে বাতাবিলেবু এনে আমায় দিল, আমি তাই দিয়ে ফুটবল খেললাম—

শোভন? পংকজিনী জোরে জোরে ঘাড় নাড়েন : কক্ষনো নয়, হতেই পারে না। তেমন ছেলে শোভন আমাদের নয়।

জয়তী বলে, দেখ দিদিমা, বুড়ো হয়ে গেছ, প্রেমের খুঁটিনাটি তুমি কি বোঝ? যৌবনে জানতে বটে, সে সমস্ত কবে ভুলে মেরে দিয়েছ। একশ মানুষের ভিতর থেকে বেছে আমি বলে দিতে পারি কোন কোন চোখে প্রেমের চাউনি! তুমি আমার ভুল ধরতে এসো না।

পংকজিনী অগত্যা চশমা খুঁজে আনলেন। উচ্ছ্বসিত হাসি হেসে জয়তী বলে, বুঝেছি দিদিমা, তোমায় তো কেউ প্রেমপত্র দেয় না—পড়বার জন্য চাতকিনী হয়ে আছ। দাদুকে বলে দিচ্ছি, দাঁড়াও।

চিঠি পড়ে পংকজিনী কলরব করে ওঠেন। ডাকাতের চিঠি। বাড়িতে ডাকাত পড়বে—একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে এই চিঠি রেখে গেছে। আগামী শনিবার ঘোর অমাবস্যা, ঐ দিন রাত্রি দশটা থেকে চারটার কোন এক সময় আসবে তারা। গৃহস্থ প্রস্তুত থাকবেন। টাকার কলসিটা যদি আপোসে বের করে রাখেন, নির্ঝঞ্ঝাটে দশ-বিশ মিনিটের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে।

কাশীনাথ জয়তীকে বলেন, কলকাতায় আজই রওনা হয়ে পড় দিদিভাই। ছুটি আছে আর আটটা দশটা দিন—কিন্তু উড়ো-চিঠির পর একদণ্ড আর থাকা চলে না।

জয়তী বলে, চিঠি বুঝি কলকাতায় যায় না! আমার কপাল—যেখানেই থাকব, চিঠি ছাড়বার মানুষগুলো কেমন টের পেয়ে যায়।

অবুঝ কথায় পংকজিনী বিরক্ত হয়ে বলেন, সর্বনেশে চিঠি যে—লাঠিসোটা, ছোরা-মশাল নিয়ে এসে পড়বে। তোর কলকাতার উড়োচিঠি নয় যে ছিঁড়ে ফেললেই চুকে গেল।

তা বই কি! চোখ বড় বড় করে জয়তী বলে, তোমারও বয়স ছিল দিদিমা, দেখতেও ভাল ছিলে, উড়োচিঠি পাওনি কখনো? তবে এমন বলো কেন? চিঠিতেই চুকে যায় না, তারপরে আসে কবিতা। সে কবিতা লাঠি-ছোরার চেয়ে বেশি সাংঘাতিক।

ফিক করে হেসে বলে, হ্যাঁ দিদিমা, সত্যি কথা বলো। কবিতা লেখেনি কোন প্রেমিক তোমায় নিয়ে?

আস্ত পাগল মেয়েটা—এতবড় উদ্বেগের মধ্যেও এই সমস্ত কথা। ভয়ডর নেই, জেদ ধরে বলে, এমনি যদিই বা যেতাম এখন আর কিছুতে নয়। কলকাতায় চুরি হয় হরদম, ডাকাতি একেবারে নেই। ডাকাতি না দেখে আমি যাব না।

চিঠির কথা চাউর হয়ে গিয়ে পড়শিরা আসতে লেগেছে। শোভন নামে সেই ছোকরাও এসে গেল একবার। অনেকে প্রবোধ দিচ্ছে : ক্ষেপেছেন কর্তা-মশায়! সম্মুখ-যুদ্ধের কাল চলে গেছে। কলিযুগে চোরা-গোপ্তা কাজকর্ম, খবর দিয়ে কেউ কিছু করে না। রসিকতা করেছে, আপনার তরাস দেখে হাসছে এখন সেই লোক।

শুনে জয়তী রাগে গরগর করে : আমি বলে কত আশা করে আছি, রসিকতা বলে এখন ওঁরা ভণ্ডুল দিতে লাগলেন। আপনাদের কি—ঘাঁটির উপর বসত, শনিবারে না হল দু মাস পরেই হবে। আমার যত-কিছু, সবই তো এই ছুটির ভিতরে!

তখন জয়তীর পক্ষ নিয়েও কেউ কেউ বলে, একেবারে নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয় কর্তা-মশায়। ভেজাল কিসে নেই—উৎকৃষ্ট বাদশা-ভোগ চাল, তার মধ্যেও সের করা পনের-বিশটা কাঁকর। কলিযুগ মানি, তা বলে দুটো-পাঁচটা সত্যবাদী কি থাকতে নেই! সেকালে এই জিনিষই হত—আগেভাগে খবর দিয়ে রে-রে করে ডাক ছেড়ে আসত, নাম হল তাই ডাকাত। সেই রকম বনেদি ডাকাতের কোন একটা দল পুরানো রেওয়াজ ধরে কাজ করতে চায়। থানায় গিয়ে আপনি অন্তত খবরটা দিয়ে রাখুন। নইলে তাঁরা দুঃখ করবেন : দেখেছ, দেশভুঁই ছেড়ে পড়ে আছি, আমাদের একটা মুখের কথা বলবার পিত্যেশ নেই। চুরি-ডাকাতি খুন-জখম তাঁদেরই এক্তিয়ারে পড়ে—তাঁদের একটু জানান দিতে হয়।

জাঁদরেল ইনস্পেক্টর মহাদেব সেন থানা আলো করে আছেন। প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক-ঘাটে জল খায়। দুটো দাগি চোর বিশাল দেহে তেল মাখাচ্ছিল। কাশীনাথের হাত থেকে উড়ো-চিঠি নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে মহাদেব [illegible] দিলেন : ঘুমোন গিয়ে।

ঘুম আসে কি করে এই অবস্থায়?

চটে গিয়ে মহাদেব বলেন, ভাল সর্ষের [illegible] কিছু কিনে নিয়ে যান, নাকের ফুটোয় ঢুকি[illegible] দিয়ে শুয়ে পড়বেন। আমার এলাকার ম[illegible] চোর-ডাকাত হোক আর সাধুমোহান্তই হো[illegible] কারো কিছু করবার জো নেই।

কথা না বাড়িয়ে তিনি স্নানে উঠে গেলে[illegible] [illegible] করেন কাশীনাথ, ফিরে যাচ্ছেন বিরসমু[illegible] পাশের দালানে সাব-ইনস্পেক্টর করালীকান্ত[illegible] অফিস, হাতছানি দিয়ে তিনি ডাকলেন : আ[illegible] দের এই জায়গায় চরণ পড়ল, কি হয়ে[illegible] কাশীবাবু?

ডাকাতের চিঠি করালীকে দিয়ে কাশীনা[illegible] বললেন, বড়বাবু তো ঘুমানোর হুকুম দি[illegible] দিলেন, আপনি কি বলেন শুনি।

আদ্যন্ত পড়ে চিঠি ফেরত দিয়ে হাসামু[illegible] করালী বলেন, বড়বাবুর ভারি ভারি মক্কে[illegible] ছোটখাটো কাজে ও'কে নড়ানো যায় ন[illegible] ডাকাত না আসে ভালই, কিন্তু এসে পড়[illegible] তখনকার ব্যবস্থা কি? খানদানি ডাকাতের রীতি[illegible] এই। চুপিসারের কাজ হল চুরি—চোরকে ডাকা[illegible] ঘেন্না করে, তাদের পাশাপাশি পাত পে[illegible] খায় না, জাতে এক হলেও ছেলেমেয়ের বিয়ে[illegible] থাওয়া দেয় না চোরের ঘরে। আমার কথা য[illegible] শোনেন, হেলা করবেন না, যেমন কুকুর তেম[illegible] ধাক্কা মুগুরের ব্যবস্থা রাখুন।

কাশীনাথ বলেন, একটা তো রাত্রি—আপ[illegible] দয়া করে যান যদি ঐ সময়।

করালী লুফে নিয়ে বলেন, দয়াধর্মের [illegible] হল—আমাদের কর্তব্যই এই। লোকের বিপ[illegible] আপদে দেখব, সরকার সেইজন্য মাইনে দি[illegible] থানার উপরে পুষছেন।

একটুখানি ভেবে নিয়ে ফসফস ক[illegible] কাগজে হিসাব কষলেন। বলেন, আপনাদে[illegible] গাঁয়ের পথঘাট ভাল নয়, বিস্তর জলকাদা[illegible] সাইকেল চলবে না, ঘোড়ারও একটা পা জখম[illegible] পালকিতে যাব। আট বেহারার বারো আন[illegible] হিসাবে ছয়টাকা আর পালকি ভাড়া চার আনা[illegible] দু-জন সিপাহি নিয়ে যাব, তাদের বারবরদারি[illegible] সকলের খাওয়াদাওয়া চা-সিগারেটের বন্দোবস্ত[illegible] রাখবেন। বাকি যা কথাবার্তা, সে সমস্ত সরকা[illegible] থানার উপর হওয়া ঠিক নয়। নিয়ম যা আ[illegible] সেই মতো হবে। আপনি আপাতত পালকি[illegible] বেহারার খরচাটা দিয়ে চলে যান।

কাশীনাথ দোমনা হয়ে বলেন, টাকা তো[illegible] নিয়ে আসিনি।

বেশ, গিয়ে পাঠাবেন। আজকে না হয় [illegible] কাল। তারিখ ধরে বসে থাকবেন না কি[illegible] মশায়। চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে, এর মধ্যে[illegible] অন্য কেউ এসে যদি রাহাখরচা জমা দিয়ে যা[illegible] আপনাকে মুশকিলে পড়তে হবে।

কাশীনাথ বেরিয়ে পড়েছেন, করালী আবা[illegible] ডেকে বলেন, চিন্তা নেই। গিয়ে পড়েছি শুনতে[illegible] পেলে ডাকাত ও-মুখোই হবে না। একটা কথা—[illegible] মশারির জোগাড় থাকে যেন। আর একটা[illegible] পাশবালিশ। মাথার বালিশ না হলেও চলে[illegible] পাশবালিশ ছাড়া শুতে পারিনে। বদ অভ্যাস।

পংকজিনী উদ্বেগে ঘর-বার করছেন। কাশীনাথ ফিরে দাঁড়াতেই প্রশ্ন : কি হল?

দ কেন হবে—কর্তব্যই তো ও'দের। বিছানা ...বালিশ-পাশবালিশের জোগাড় দেখ। গরচটা ...মো দিলেই ছোট-দারোগা আসতে শুয়ে ...কবেন, তাতেই ডাকাত আর এ-হবে না—বলে দিলেন।

য়ন্তী বলে, খাঁটি কথা দাদু। ডাকাতে কিনা ও'দের! সিংহির মামা ভোম্বলদাস, তর মামা তেমনি ও'রা। মামা এসে পড়েই হস্থের যা-কিছু সম্বল কতক পেটে কতক পকেটে নিয়ে পুরেছে—ডাকাত কি কাটা মেটে হাঁড়িকুঁড়ি আর ফুটো টির জন্য? ডাকাতি করতে হলে তখন গৃহস্থের উপর নয়, দারোগার উপর।

শীনাথও মনে মনে তাই ভেবে দেখছেন। পারে ডাকাত, আবার না-ও তো আসতে আগেভাগে আপোষে তবে মামা-র হাতে গিয়ে পড়া কেন?

তো না করে করালীর কিছুতে সোয়াস্তি সিপাহি পাঠিয়ে তাগাদা দেন : শনিবার য়ার, খবরাখবর দিলেন না, ব্যাপার কি?

শীনাথ মনস্থির করে ফেলেছেন : অত কোথায় পাই এখন? যা কপালে থাকে হবে। টাকা নেই তো ডাকাত আসছে কেন?

নামটা আছে যে। টাকার কলসির বদনাম। চেয়ে ডাকাতে চিঠি দেয়, থানার লোক কলসির কথা, দুদিনের তরে নাতনিটা এসেছে—সে-ও কলসি-কলসি করে। নার সিপাহি ফিরিয়ে দিয়ে কাশীনাথ ল, হাঙ্গামার ব্যাপারে সরকারি মানুষ ছুইয়ে রাখা ভাল। গবর্নমেন্টকে তাচ্ছিল্য ন বলে আইনের প্যাঁচে না জড়াতে পারে। র ছেড়ে তখন চৌকিদারের বাড়ি চলে ন।

শান নটবর, চৌকিদারি-ট্যাক্স বাড়াতে ছ-আনা থেকে পাঁচ সিকেয় ঠেলে । এই বিপদে সরকারি মানুষ তোমার া করা উচিত।

টবর তটস্থ হয়ে বলে, রাত্রে ঘুম হয় না—র বাড়ি সারারাত আমি জেগে পাহারা । বটার মা'কে একটিবার বলে যান শাই।

টা অর্থাৎ বটকেষ্টর মা—নটবরের বউ। ডেকে কাশীনাথ বলেন, শনিবারে আমার ডাকাত পড়বে। চৌকিদার গিয়ে পাহারা কথাটা তোমায় জানিয়ে যেতে বলল।

টবরের বউ একগাল হেসে বলে, তা যাবো । আপনার মতন মানুষ দায়ে পড়েছেন, যাবো না? আমার বটকেষ্টও যাবে। কিন্তু ছেলে কার কাছে রেখে যাই?

শীনাথ অবাক হয়ে বলেন, কেন, তুমি যাবে কেন? তোমার কি কাজ?

উ বলে কাজ তো আমারই। নতুন বর্ষায় দারের হাঁপানি চাগান দিয়েছে, সারাক্ষণ কামারের হাপর টানছে। আমিই তো বুকে করে কোন গতিকে দমটুকু ধরে ছি।

কথাবার্তা বলে কাশীনাথ চৌকিদারের থেকে ফিরছেন, শোভনের সঙ্গে পথে । বলে, বেশ ভালোই হবে। বউ সত্যি কথা , রাত্রের মধ্যে নটবর ঘুমোয় না। সর্বক্ষণ নির টান টানছে ঘুমোয় কেমন করে? রা নিখুঁত হবে। মাকিলশের পুরোনো-ঘিয়ের জোগাড় রাখবেন, বাড়ির উপর নয়তো অপঘাত ঘটে যেতে পারে। ওদের ঐ বাচ্চা ছেলে বটকেষ্টকে নিয়ে যাচ্ছে—বিষম খেতে পারে কিন্তু। চামড়ার নিচে হাড়মাংস নেই, ফাঁপা বালিশের খোলের মতো। খাইয়ে খাইয়ে সেই খোল ভরাট করে রাখতে হয়। ক্ষিধে-ক্ষিধে করে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠে বসবে, তক্ষুনি চিঁড়ে-ভাজা দিতে হবে।

বিপন্ন কাশীনাথ বলেন, বড্ড মুশকিলে পড়ে গেলাম। কী করে ডাকাত ঠেকাই, ভেবে কোন হদিস পাইনে। দিনও তো এসে গেল।

গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, নিজেদের কথা বলি কি করে? অভিমান ভরে শোভন বলতে লাগল, এতজনকে এত রকমে খোশামোদ করছেন,—আমরা যে রক্ষিবাহিনী সাজিয়ে গ্রাম জুড়ে মার্চ করে বেড়াচ্ছি, আমাদের একটি বার মুখের কথাটা বললেন না। না বললেও যায় আসে না—ঠিক আছে, আমাদের বাহিনী সারা রাত সেদিন বাড়ি ঘেরাও করে থাকবে। দুশমন রুখবার জন্য দরকার হলে প্রাণ দেবার জন্য তৈরি।

কাশীনাথ চমৎকৃত হয়ে বলেন, ভদ্রলোকের ছেলেপুলে তোমরা সব—জলকাদা মেখে রাত্রি জেগে আমার বাড়ি পাহারা দেবে, এমন কথা কী করে বলি? ইচ্ছে হলেও তো বলতে পারি নে বাবা। তোমাদের বাড়ির লোকেই বা কি ভাববেন! কতজন তোমরা আসছ, আমায় তবে একটা আন্দাজ দিয়ে দাও।

শোভন বলে, বাহিনীর মেম্বার হল কুড়ি। তার মধ্যে কাজকর্মে অসুখ-বিসুখে কিছু ঝড়তি-পড়তি—ধরুন পাঁচ। দাঁড়াল তা হলে পনের। কিন্তু হিসাব নিয়ে কি হবে? যার যার বাড়ি থেকে খেয়েদেয়ে সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ঠিক দশটায় আপনাদের আমতলায় এসে পড়ব। আপনার বাড়ি একটা মুড়িও দাঁতে কাটব না। সেবার খুঁত হবে তা হলে, স্বার্থগন্ধ লাগবে। মারামারি কাটাকাটি যা-ই ঘটুক আপনারা পড়ে পড়ে ঘুমোবেন, যা করবার বাহিনীই সব করবে।

অতঃপর ক'দিন ধরে শোভনের খুব আনাগোনা। বাড়ির চতুর্দিক ঘুরে ঘুরে দেখে—কে কোথায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেবে, সেই বন্দোবস্ত। জয়ন্তীকে দেখে শোভন মনে করিয়ে দেয় : শনিবারের আর তিন দিন। বলা যায় না, আমাদের জীবনের মেয়াদও হয়তো তাই।

বলে, আর দু-দিন।

বলে, কাল শনিবার। এসপার-ওসপার যাহোক একটা কাল রাত্রিবেলা।

শনিবারে সারাদিন দুর্যোগ। সন্ধ্যা থেকে বৃষ্টিটা বড় চেপে এলো, সঙ্গে বাতাস। একটু থামে, আবার মুষলধারে শুরু হয়ে যায়। নীরন্ধ্র আঁধার, বেঙ ডাকছে তুমুল সোরগোল করে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটা—তখন থেকেই শোভন যথানির্দিষ্ট আমতলায় দাঁড়িয়ে। অন্য কারো টিকি দেখা যায় না। ভয় পেয়ে গেল? কিম্বা ঘুম ধরেছে ঠান্ডা বাদলার রাত্রে? লজ্জায় মাথা কাটা যায়—কী ভাবছে গ্রামের লোক রক্ষিবাহিনী সম্বন্ধে! বিশেষ করে জয়ন্তী—কলকাতা থেকে দুদিনের জন্য যে এসেছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ পিছন দিকে। খাপ-সুদ্ধ ছোরা কোমরে বাঁধা, আমের গুঁড়িতে ঠেশান দেওয়া শড়কি। ছোরায় হাত রেখে শোভন চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ডাকাত নয়, বাহিনীরও কেউ নয়— সেই মেয়েটা যার কাছে অবস্থাটা গোপন রাখার বেশি দরকার। জয়ন্তী।

কী আশ্চর্য! অন্ধকারে একা চলে এলেন, ভয় করে না?

জয়ন্তী বলে, ভয় করলে ডাকাত দেখব কি করে? দেখবার জন্যেই তো জেদ করে আছি। দাদুর কথা কানে নিলাম না।

শহুরে অবুঝ মেয়ে—বিদ্যে থাকতে পারে, বুদ্ধির বেলা লবডঙ্কা। বিরক্ত কণ্ঠে শোভন বলে, চুপিসারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ডাকাত ভেবে ছোরাটা আপনারই ঘাড়ে যদি বসিয়ে দিতাম!

কাঠের ছোরা তো আপনার। ভয়-দেখানো জিনিষ।

ঝুঁকে-পড়া একখানা ডাল জয়ন্তীর গায়ে লাগছিল, অপমানিত শোভন এককোপে সেটা দুই খন্ড করে ছোরার ধারের প্রমাণ দিল।

জয়ন্তী ব্যাকুল হয়ে বলে, ডাল কাটতে গেলেন কেন? দেখুন দিকি! তবু খানিকটা আড়াল হয়ে ছিলেন, ডাকাত এসে হঠাৎ দেখতে পেত না।

শোভন বলে, আড়ালে থাকবার হলে তো আপনাদের ঘরের মধ্যে গিয়েই থাকতাম। তার চেয়ে আরও ভাল, নিজের বাড়ির দোতলায়।

জয়ন্তী নিরীহভাবে বলে, একপক্ষে অবশ্য ভালই। জানলা খুলে দেখা যাবে এবার আপনাকে। কি করেন দেখব। ডাকাত যদি আসে—দরজা খুলে দেবো, টুক করে ঢুকে পড়বেন। এই বলা রইল।

বীরত্ব প্রকাশ করে শোভন বলে, দেখবেন বই কি! কিন্তু একটা জায়গায় কতক্ষণই বা দেখতে পাবেন! ঘুরে ঘুরে বাহিনী চালনা করতে হবে না! তারা সব এসে পড়ল বলে।

অনেক রাত্রে জয়ন্তী আবার বেরিয়ে এসেছে : এলো বাহিনী?

অকারণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে অপ্রতিভ সুরে বলে, আসবার তো কথা। আজ সকালেও মিটিং হয়েছে। এসে যাবে ঠিক, দেখুন না—

আসবে কাল সকালে, ডাকাতে হেস্তনেস্ত করে যাবার পর। আপনার মতন বোকা তারা নয়।

রীতিমতো চটে গেছে শোভন। বলে, ঝড়-জল কী রকম সেটা তো বুঝে দেখবেন। এমন দুর্যোগে শিয়াল-কুকুর পর্যন্ত বেরোয় না—

আপনিই বা কেন বেরুলেন?

শোভন বলে, আমিও ঠিক সেই প্রশ্ন করব। ঝড়-জল-অন্ধকারের মধ্যে মেয়েলোক হয়ে কোন্ সাহসে আপনি বারবার বেরুচ্ছেন?

এমনি তো কথার সাগর জয়ন্তী, কিন্তু থতমত খেয়ে গেল। বাড়ী পাহারা দিতে এসে তার উপর ধমক দেবার অধিকারও যেন শোভনের বর্তেছে।

ঘরে চলে যান। শান্তিতে আমাদের কাজ করতে দিন। আর আসবেন না।

জয়ন্তী বলে, চা হয়ে গেছে, তাই বলতে এলাম। খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন, বৃষ্টিবাদলার মধ্যে ভাল লাগবে।

ঘাড় নেড়ে শোভন বলে, গ্রামসেবায় এসেছি—চা কি বলেন, একঢোক জলও খাবো

কলিকাতার সমাজ জীবন

নির্মলকুমার বসু

-মাদুর্গার চেহারা অবশ্য পরিমার্জিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদ করিয়া এক পুরুষ ভদ্রলোক সেদিন বলিয়াছিলেন, "দেখ দেখি, পুরনো প্রতিমা দেখলেই মা-দুর্গা মা-দুর্গা মনে হতো। আর এখনকার দুর্গাপ্রতিমার মধ্যে যেন কলেজের দিদিমণি-দিদিমণি ভাব। তাঁরা কোথা থেকে আসবে?"

কলিকাতার ইতিহাস লইয়া অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও ভারতের নৃতত্ত্ব বিভাগ (অ্যান্থ্রপলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া) গত এক বৎসর ধরিয়া কলিকাতার সমাজজীবনের কোন কোন বিষয় লইয়া গবেষণা করিতেছেন। কোন সমাজই স্থিতিশীল নয়, কলিকাতার সমাজ তো নয়ই। কিন্তু যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, কতটা পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা হইলে নানা রকমের উত্তর মিলিবে। দিল্লী সহরে, বিশেষতঃ পাঞ্জাবী সমাজের মধ্যে, ইংরেজীপনা খুব দেখা যায়। কলেজে, আপিসে তো বটেই, বিবাহ-বাসরে পর্যন্ত ইংরেজী পোশাক পরিয়া নিমন্ত্রিতদের আসিতে দেখা যায়। রাজশেখর-বাবুর ভাষায় অনেকের ঠোঁটেই সিঁদুর উঠিয়াছে। বাংলাদেশে অতটা হয় নাই। অতএব একদল পর্যবেক্ষক বলিবেন পাঞ্জাব পশ্চিম দিকে বেশি চলিয়াছে, আমরা কলিকাতায় ততটা চলি নাই। আমাদের বিশিষ্ট একটি সংস্কৃতি আছে এবং আমরা তাহাতে গৌরব বোধ করি। অপরের তাহা নাই।

অর্থাৎ সমাজে বা জীবনে পরিবর্তনের মাপকাঠি হিসাবে পোশাক-পরিচ্ছদ, সামাজিক আচার-ব্যবহারের তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' পাঠ করিলে অনুরূপ বিচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরেজী-ঘেঁষা সমাজ যে উৎসন্নের পথে চলিয়াছে দেড় শ' বছর আগেও প্রাচীনেরা তাহা লইয়া আক্ষেপ করিতেন। মেয়েরা সেলাই করা জামা পরিতেছে এবং ঐ অশুচিবস্ত্রে ঘরে কাজকর্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ছেলেরা শিখা রাখিতে লজ্জা পায়, বাধ্য হইয়া কালীঘাটের মন্দিরে গেলেও মা কালীকে 'গুড মর্নিং ম্যাডাম' বলিয়া অভিবাদন করে—এরূপ দুর্ঘটনা সে-সময়েও ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে।
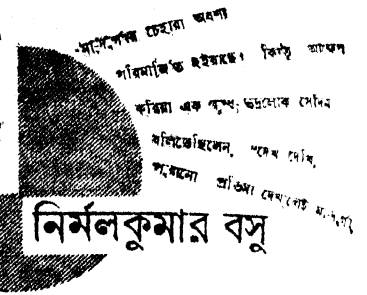
কিন্তু যদি নৃতত্ত্ববিদ বলেন, 'এগুলি তো খোসার জিনিস, ভিতরের নয়, ভিতরে পরিবর্তন সংসাধিত হইয়াছিল তাহার কি?' ফলে হয়তো কেহ কেহ বলিবেন, পরিবার ভাঙিয়া যাইতেছে। ছেলেরা আগের মত বাধ্য নয়। তাহারা উড়ে নিজের সুখ-দুঃখ লইয়া আলাদা থাকিতে তবে বৈজ্ঞানিক বলিতে পারেন,— 'হ্যাঁ, আরও ভিতরের কথা বটে। তবে মাপিবার উপায় কি? শতকরা কতগুলি বার আর যৌথ নাই? আর যৌথ পরিবার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র থাকিলেই স্বার্থপরতা প্রমাণিত হয়? আলাদা থা তো লোকে আত্মীয়স্বজনকে অর্থ দিয়া সহা

মা এ-বাড়ি। তেষ্টা পেলে পুকুরঘাট থেকে আঁজলা ভরে খাবো।

বা রে! এই রাতে উনুন ধরিয়ে কত কষ্ট করে করলাম—অভিমানে জয়তীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। শোভন কিছু নরম হয়ে বলে, স্বার্থগন্ধ এসে যাবে তাহলে। পুরোপুরি সাত্ত্বিক সেবা হবে না।

না হল তো বয়ে গেল। বৃষ্টিজলে ভিজে শরীর খারাপ করেছে আপনার, ঘনঘন কাসছেন। আমার চোখ-কান ফাঁকি দিতে পারবেন না। সখের চা নয়, অষুধ। সাত্ত্বিক গুণ এতে নষ্ট হয় না।

অতএব পিছু পিছু গিয়ে আদা-চা খেয়ে আসতে হল। অনেকক্ষণ কাটল, অন্য কেউ এলো না তা হলে। শোভন একাই ঘুরছে—কোন রন্ধ্র-পথে ডাকাত চুপি চুপি না ঢুকে পড়ে। মোড় ঘুরে বেরিয়ে আবার দেখে জয়তী।

উৎকণ্ঠায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে জয়তী বলে, খুঁজছি কতক্ষণ ধরে. খুঁজে খুঁজে পাইনে। যা ভয় হয়েছিল—

শোভন সকৌতুকে বলে, ডাকাতে হরণ করে নিয়ে গেছে, তাই বুঝি ভাবলেন? আপনাকেই তো একবার ডাকাত ভেবে ছোরা উঁচিয়েছিলাম। কী দুঃসাহসী আপনি, একালের দেবী চৌধুরাণী। কিন্তু চা হয়ে গেছে, এবারে কি? পোলাও-লুচি মাংস-রসগোল্লা—

পোলাও না আরো কিছু! আমি তো খাইনি—ডাকাত এই আসে এই আসে, সেইজন্য বসতে পারি নি। খাচ্ছি. ওদিকে এসে হয়তো চলেই গেল! চায়ের জন্য উনুন ধরানো হল্ল তো ভাবলাম. খাবারটা গরম করে নিই। যা খাবার দিদিমা রেখেছে. আমার মতন পাঁচজনেও খেয়ে পারবে না। রাত অনেক হয়েছে—আমি বলি, ওদিকটা এইবারে সেরে নেওয়া যাক।

শোভন শিউরে উঠল : এখন ভাত খেতে বসব—বলছেন কী! চা খেয়েছি, দু-চার মিনিটের ব্যাপার—সে-ও অন্যায় খুব। মাপ করবেন, ঘাঁটি ছেড়ে আর নড়তে পারব না। যদি এসে পড়ে—

জয়তী রাগ করে বলে, দল জুটিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে পড়বে—পারবেন লড়তে একলা?

শোভন গর্বভরে বলে, কেন পারব না। গাঁখানা আমার না তাদের? দলে ভারি হোক ডাকাতরা, শড়কি-বন্দুক নিয়ে আসুক, আমার সঙ্গে পারবে কিসে? প্রাণও যদি যায়, বুঝব দশের কাজে গিয়েছে—

বড্ড গুরুগম্ভীর হয়ে উঠছে, খেয়াল হল বুঝি সেটা। ফিক করে হেসে শোভন ব্যাপারটা লঘু করে নেয় : একলাই বা কিসে। আমি ডাকাত পাহারা দিচ্ছি, আপনি আছেন আমার পাহারায়। দুজন তাহলে।

না, হবে না। বাজে কথা থাক, আত্মহত্যা করতে দেবো না চোখের উপর—

জয়তী এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। শোভনের হাত ধরে টানে : বাহিনীর কেউ এলো না তো আপনি বা কেন আসবেন! আপনার কোন্ দায় পড়েছে। কড়া হয়ে দাদুর গোড়াতেই মানা করা উচিত ছিল। কোন একটা বিপদ হলে আপনার বাড়ির লোকে কি বলবেন?

উত্তেজনা দেখে শোভন হেসে ফেলে : ভাবনা করবেন না, সেদিক দিয়ে অসুবিধা নেই।

ভ্রূকুটি করে জয়তী বলে, বুঝেছি। গোঁয়ারগোবিন্দ বলে বাড়ির লোকে আশা ছেড়ে দিয়েছেন।

তা নয়। কেউ তো নেই আমার। থাকলে অবশ্য কি করতেন জানি নে।

জয়তী অবাক হয়ে বলে, বাবা-মা বোন—

বউয়ের কথা বলল না। এ হেন বাউণ্ লোকের বউ থাকা উচিত নয়। থাকলে মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ। বলল, সং একেবারে কেউ নেই?

কেউ নেই। মা ছিলেন, বাড়িতে তিনি থাকতেন। গৃহদেবতা ধানচাল গরুবাছুর নি ছিলেন। আমি পড়াশুনো করতাম বাই বসন্ত হয়েছে মায়ের, খবর পেয়ে ছুটে এল এসে আর দেখতে পাইনি।

গলা ভারী হয়ে ওঠে ছন্নছাড়া বেপর ছেলের। বলে, সেই থেকে গাঁয়ে আছি। হবে আর পড়াশুনোয়! গাঁয়ের সকলের স দশরকম কাজকর্ম নিয়ে থাকি। শান্তি আছি। শহরে হাজার-লক্ষের হৈ-হল্লা. গাঁ দশ-বিশজন জোনাকির মতন আমরা টিম করি।

ডাকাত এলো না। ক'দিন পরে ভি থেকে কাশীনাথের বড় ছেলে এসে পড় এমন অসহায় অবস্থায় বাপ-মাকে গাঁয়ে প থাকতে দেবে না, নিয়েই যাবে বাসায়।

বলে, ডাকাতি এবারটা না-ই হল. কি ভরসা কিসের? যখন তখন তো হতে পারে

কাশীনাথ হেসে বললেন. হয়নি ডাকাতি তা-ই বা কেমন করে বলি বাবা?

সন্ত্রস্ত হয়ে ছেলে বলে, কিছু হয়ে নাকি? কই. গাঁয়ের একজনকে পথে পেলা মা-ও তো তেমন কিছু বললেন না।

ডাকাতি বইকি! সে ডাকাত আগে এসে আমার বাড়ি ঘাঁটি করে ছিল। গাঁ ছেলেটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। শোভ নিয়ে গেছে কলকাতায়! আবার সে পড়াশ করবে।

পারে? গণিয়া দেখিলে সেরূপ পরিমাণ কত?'

কিন্তু গণনা করিলেই যে সঠিক সংবাদ যায়, তাহাও সব সময়ে ঠিক নয়। সার্বজনীন পূজা। আমাদের বাল্যকালে ...কের বাড়িতে ধুমধাম করিয়া পূজা হইত, ...ত ইতরভদ্র সকলেরই স্থান থাকিত। ...য়ারির সংখ্যা খুব কম ছিল। বিগত ...বছরের মধ্যে বারোয়ারির সংখ্যা ১০।১৫ ...সমগ্র কলিকাতায় নয়শতের কাছাকাছি ...য়াছে। কিন্তু কলিকাতার বাঙ্গালীর ...ক্ত ৯০ গুণ বাড়িয়াছে এরূপ ভাবিবার ...নাই। বস্তুতঃ, হিসাব লইলে দেখা যায় ...র আসল খরচ অপেক্ষা 'সাংস্কৃতিক অনু-...র খরচ অনেক বেশি হয়। অবশ্য এই ...র অনুসারে বলা যায় যে, বাঙ্গালীর ...তি আরও সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে ও জন-...হইয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু সে কথাটাই কি ...মা-দুর্গার চেহারা অবশ্য পরিমার্জিত ...ছে। কিন্তু আক্ষেপ করিয়া এক বৃদ্ধ-...লোক সেদিন বলিতেছিলেন, "দেখ দেখি, ...না প্রতিমা দেখলেই মা-দুর্গা, মা-দুর্গা ...হতো। আর এখনকার দুর্গাপ্রতিমার ...কলেজের দিদিমণি-দিদিমণি ভাব। ...কোথা থেকে আসবে?"

...উপরোক্ত মত যে আমি পুরাপুরি স্বীকার ...রি নহে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সমাজে ...সংস্কৃতিতে কতখানি পরিবর্তন ঘটিতেছে, ...সেই পরিবর্তনের প্রকৃতিই বা কিরূপ ...র বিষয়ে কোনও মাপকাঠি দাঁড় করাইতে ...পারিলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমাজ-তত্ত্ব রচনা ...সম্ভব নয়। মাপ কোথাও মোটা থাকের ...ও কোথাও সূক্ষ্ম হইবে। কিন্তু মাপ চাই। ...অনেক জিনিস অস্পষ্ট থাকিয়া যাইবে ...অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। ...উচিত নহে।

এই উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেন্টের নৃতত্ত্ব ...গ কলিকাতার সমাজ-জীবনে পরিবর্তনের ...এবং পরিমাণ নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে ...টি লক্ষণ ব্যবহার করিতেছেন। কবিরাজ

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে খরচ অনেক বেশি...

রোগীর অবস্থা বুঝিবার জন্য নাড়ী পরীক্ষা করেন। ডাক্তার নাড়ী, বুক, রক্ত ইত্যাদি নানা-বিধ পরীক্ষার পক্ষপাতী। সমাজ বিজ্ঞানে আমরা অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারের মত নানাবিধ লক্ষণের বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি, কোনটি পরীক্ষা করিলে বা মাপিলে সমাজের গতির যথাযথ পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু যতদিন এরূপ লক্ষণ বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীরা একমত না হইতেছেন, ততদিন পর্যন্ত কবিরাজদের মত অন্ততঃ কতকগুলি মোটা লক্ষণের উপরেই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হয়।

আরও একটি কথা আছে। বর্তমান কলিকাতা সহরে সর্বসমেত ৮০টি ওয়ার্ড। যদি ১০।১৫ জন কর্মীর সহায়তায় পর্যবেক্ষণ করাইতে হয়, তাহা হইলে সূক্ষ্ম লক্ষণের উপর নির্ভর করার চেয়ে মোটা মাপই তো ভাল। তাহাতে হয়তো সমাজের গভীরে আমরা প্রবেশ করিতে পারিব না সত্য, কিন্তু এই লক্ষণগুলি দেখিয়া মোটা তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নৃতত্ত্ব বিভাগ সমীক্ষার জন্য দুইটি লক্ষণ এই উদ্দেশ্যে বাছিয়া লইয়াছেন। বিগত ৬০।৭০ বৎসরের মধ্যে কলিকাতার জীবনে নানা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। আগে যাহাদের জমিদারী ছিল, বড় বড় হাউসের মুচ্ছুদ্দিগিরি হইতে যথেষ্ট আমদানি হইত, নিদেন কেরাণীগিরি করিয়াও সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহিত হইত, তাহা আজ আর তেমন সম্ভব হইতেছে না। বড় বড় ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর স্থান কমিয়াছে, জমিদারী কার্যতঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে, ছোট চাকরির ব্যাপারেও এমন প্রতিযোগিতা যে বাঙ্গালীর পক্ষে বাঁচা কঠিন।

এ ঘটনা যে-কোনও নগরবাসীকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে। কিন্তু নৃতত্ত্ব বিভাগের কর্মিগণ যাহা করিতেছেন, তাহা এই। তাঁহারা আশিটি ওয়ার্ডে পুরাতন বাসিন্দাদের বাড়িতে যথাসম্ভব গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "আপনাদের মধ্যে বর্তমান কালে যাহারা উপা-র্জন করেন, তাঁহাদের পেশা কি? এক পুরুষ পূর্বে এবং দুই পুরুষ পূর্বে কয়জন উপার্জন করিতেন ও তাঁহাদেরই বা কি কি পেশা ছিল?" এই সহজ প্রশ্নের উত্তরে কলিকাতায় বাঙ্গালীর বৃত্তির সম্বন্ধে যে কি আশ্চর্য তথ্য সংগৃহীত হইতেছে তাহা ভাবিলে আনন্দিত হইতে হয়।

অনেকের ধারণা বড় বড় কলকব্জা না হইলে বিজ্ঞান হয় না। কিন্তু জীববিদ্যার সম্বন্ধে বহু গবেষণা, যথা পাখী বা মৌমাছির জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য, বিনা যন্ত্রে শুধু ধৈর্য সহকারে দীর্ঘ দিনের পর্যবেক্ষণের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানব সমাজের বেলাতেই বা তাহার অন্যথা হইবে কেন?

নৃতত্ত্ব বিভাগের কর্মিগণ আরও একটি বিষয়ে সংবাদ লইতেছেন। প্রতি ওয়ার্ডে ইস্কুল, কলেজ, থিয়েটার বা জিমন্যাষ্টিকের ক্লাব, নৈশ বিদ্যালয়, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার জাতীয় প্রায় অসংখ্য প্রতিষ্ঠান আছে। তাহার কোনটি ছোট কোনটি বড়। কোনটি পাড়ার দু'একজন মাতব্বরের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট, কোনটি বা বহু সাধারণ সভ্যের সমবেত চেষ্টার দ্বারা পরি-চালিত হয়। ১৯১১ হইতে ১৯৬১ সালের ব্যবধান পঞ্চাশ বৎসর। এই পঞ্চাশ বৎসরের বা যে-কয় বৎসরের সম্ভব, বার্ষিক কার্যবিবরণী সংগ্রহ করিয়া, কর্মাধিকারীদের নিকট জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া সমাজ-জীবনে পরিবর্তনের একটি বিশেষ ধারা উত্তরোত্তর স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান নিছক মুষ্টি-ভিক্ষা অথবা অল্প চাঁদার উপরে নির্ভর করিত, যাহাদের উদ্দেশ্য ছিল পাড়ার বিধবা মেয়েদের বা অনাথ বালকদের সামান্যতম সহায়তা করা, সেরূপ প্রতিষ্ঠান প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। যে-সমাজ ওয়েলফেয়ার স্টেটের দ্বারা শাসিত, সেখানে ইহা যে সুলক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দারিদ্র্য মোচনের দায়িত্ব আজ রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা ভিক্ষা বিতরণের দ্বারা নয়, কর্ম বা রোজগারের সুযোগ দিয়া।

অবশ্য একথা বলিব, রাষ্ট্র আজ এই দায়িত্ব

মেয়েরা সেলাই করা জামা পরিতেছে...

দিদিমণি-দিদিমণি ভাব.....

জনপ্রিয় কৌশলী নেতা...

সম্যকভাবে পরিপালন করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন ব্যক্তি যে দায়িত্বকে নিজেদের দায়িত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ব্রতপালন যে ওয়েলফেয়ার স্টেটের আওতায় লুকাইয়া যাইতেছে, ইহাকে পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে করি।

যাহাই হউক, নানাবিধ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে আরও এক বিষয়ে পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। আগে কোনও প্রতিষ্ঠানের অর্থাভাব হইলে জমিদার বা অপর কোনও ধনীর নিকটে গিয়া কিছু "এককালীন দান" সংগ্রহ করিয়া আশু বিপদ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত। কিন্তু আজ ধনীদের করভার এত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ব্যবসায়ের ব্যক্তিগত স্বত্বের পরিবর্তে কোম্পানির অধিকার এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, একজনকে ধরিয়া বিপদ পার হইবার সম্ভাবনা কম। তদুপরি গভর্ণমেন্ট তো নিজেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত।

কিন্তু গভর্ণমেন্টের কল নড়িতে নড়ে। উপরন্তু সে কল চালাইয়া মুদ্রাবর্ষণ করানো সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কেহ কেহ পারে, কেহ পারে না। রাইটার্স বিল্ডিংসের গলিঘুঁজি তো সকলের জানা নাই! ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য আর ধনীকে আশ্রয় করা সম্ভব হইতেছে না, রাজনীতি ক্ষেত্রের কোনও নেতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইতেছে। কার্যনির্বাহক সমিতিগুলিতে ধনে মানে সমৃদ্ধ ব্যক্তি অপেক্ষা জনপ্রিয়, কৌশলী নেতা, যিনি জনগণের কল্যাণার্থ গভর্ণমেন্টের কাছে কিছু আদায় করিয়া লইতে পারিবেন, তাঁহাদের অধিকার বৃদ্ধি পাইতেছে।

অবশ্য ধনী-মানী ব্যক্তির পক্ষে জননেতৃত্ব সম্ভব নয় একথা বলিতেছি না। একই ব্যক্তির দুই গুণ থাকিতে পারে। কিন্তু সচরাচর এক ব্যক্তি দুই গুণের অধিকারী নয় বলিয়া কলিকাতার বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহে এক জাতীয় নেতা বা কর্মীর পরিবর্তে অপর জাতীয় নেতা বা কর্মীর আমদানি ঘটিতেছে। অবশ্য ইহাও বলা চলে যে, অ্যারিস্টক্রেসির পরিবর্তে ডেমক্রেসির ব্যাপ্তি সাধন ঘটিতেছে। ইহার ফলে সমাজে সেবার ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে কিনা তাহা বিচার না করিয়াও বলা চলে যে বহু প্রতিষ্ঠান (কর্মীরা প্রতি ওয়ার্ডে ইহার সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন) রাজনীতির দ্বন্দ্বের ক্রীড়াভূমি হইয়া উঠিয়াছে। একটি গ্রন্থাগার পরিচালনে যদি আজ কংগ্রেসের অধিকার প্রবল থাকে, কাল হয়তো সেখানে ফরওয়ার্ড ব্লকের আধিপত্য দেখা যাইবে, কখনও বা স্থান অধিকার করিবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি নানাবিধ প্রচেষ্টা করিবে।

শুধু গ্রন্থাগার নয়, সার্বজনীন পূজার পরিচালনা বা শরীর চর্চার আখড়ায় কাহার দখল থাকিবে, ইহা লইয়াও রাজনৈতিক দলে দলে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আর একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আমার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। ১৯১১ হইতে ১৯৬১র মধ্যে কলিকাতায় অনেক নূতন রাস্তা হইয়াছে, যেখানে পুকুর ছিল, সেখানে ভরাট করিয়া ছয়তলা বাড়ী উঠিতেছে। যেখানে বাঙ্গালী বা ওড়িয়া অধিবাসী বেশি ছিল, সেখানে বড় রাস্তার ধারে ধারে গুজরাতী বা মারওয়াড়ী ধনীর গৃহ নির্মিত হইতেছে। একেবারে শুধু বাঙ্গালীর বাস এমন পাড়া আর প্রায় থাকিতেছে না। নৃতত্ত্ব বিভাগের কর্মিগণ কলিকাতা করপোরেশনের আনুকূল্যে এই সকল ঘটনা ম্যাপ আঁকিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা হইতে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আরও যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা নূতন হইলেও বেদনাদায়ক।

...ধনীর গৃহ নির্মিত হইতেছে

...একই কারখানায় বা অফিসে কাজ কর...

কলিকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে কোথা[ও] বাঙ্গালী, কোথাও বিহারী, কোথাও ওড়ি[য়া,] কোথাও গুজরাতী, পাঞ্জাবী বা তামিল[,] তেলুগু ভাষাভাষী জনতার বাস। সকলে এক কলে জল খায়, একই পথে হাঁটে... একই কারখানায় বা অফিসে কাজকর্ম কর[ে।] প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাষা বা সংস্কৃতি[র] বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিবেন, ইহাতে আপত্তি নাই[,] বরং তাহা ভাল। আরও ভাল হয় যদি প্র[তি] জনতা স্বীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিবেশী জন[তার] মধ্যে প্রসার করিবার চেষ্টা করেন। ... বা তামিল ভাষাভাষী পরিবারদের যদি ... ইস্কুল, ক্লাব ইত্যাদি থাকে ... না। কিন্তু আরও ভাল হয় যদি তাঁহারা প্র[তি-] বেশী বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবীদের ... সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করি[তে] পারেন ও সে বিষয়ে শিক্ষা দিবার ... ব্যবস্থা করিতে পারেন।

সকল জাতি ঢেঁকির তলায় পড়িয়া চিঁড়[ার] মত এক আকার ধারণ করিবে, ইহা কেহ আ[শা] করে না। বরং ভারতবর্ষ এরূপ ঐক্যকে সর্বদা নিন্দা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ... আদান-প্রদানের দ্বারা ঐক্যবোধের বৃদ্ধি কর[া ...] মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। নৃতত্ত্ব বিভাগের কর্মি[-] গণ লক্ষ্য করিতেছেন যে, ঐক্যবোধ গঠন[ের] চেয়ে প্রভেদকে স্থায়ী করিবার চেষ্টাই বে[শি] কলিকাতার সমাজ-জীবনে বেশি।

যদি নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রচেষ্টার দ্বারা কলি[-] কাতার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপান্তর বিষ[য়ে] এই ভাবে আমাদের সম্যক জ্ঞান লাভ ঘ[টে,] তবে দেশের নেতৃস্থানীয়, চিন্তাশীল ব্যক্তিগ[ণ] সামাজিক দুর্বলতার প্রতিকারকল্পে নানাবি[ধ] উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিবেন, আমরা এ[ই] আশা লইয়াই স্বীয় বৈজ্ঞানিক সমীক্ষণ কা[র্যে] উৎসাহভরে লিপ্ত থাকিব।

কান্না

প্রেমেন্দ্র মিত্র

একদিন [illegible] দেবে না আর।
সব নদী ঘুমিয়ে আসে যদি
সে [illegible] জল দিয়ে দিয়ে,
[illegible] পুষ্পে ভরা
ধরণী'তে তবু।
সুশৃঙ্খল সচ্ছল জীবন,
প্রসারিত সমতল আয়ু
[illegible] শৈশব থেকে
ধীরে ধীরে নিভে আসা প্রসন্ন বার্ধক্যে।
এর চেয়ে আরো কি প্রত্যাশা?
[illegible] জীবন শুধু মরীচিকা
খুঁজে উড়িয়ে দিলে
—সত্যের প্রেমের কান্না,
চারজিৎ অলীক যুদ্ধের।
এর চেয়ে ভালো নয় কি,
সৃষ্টির অটুট স্বাস্থ্য,
ফ্রেমে ঘেরা পরমায়ু,
দুদিকে মলাট দেওয়া উজ্জ্বল কঠিন
বাঁধানো প্রাণের পুঁথি
সব ভাষা যেখানে ছাপানো?
কোন মূঢ় নিঃসঙ্গ একাকী
তবু কান্না চায়?

দেয়াল টপকালে পথ

গোপাল ভৌমিক

দেয়াল টপকালে পথ,
কাজটাও কঠিন তা নয়;
এ জীবন কেটে যায় তবু
কাটে না মনের মূঢ় ভয়।
ওপারে অনেক আলো প্রেম,
আকাশ অনেকখানি বড়,
জেনেও তো এখানে আঁধারে
ভয়ে বসে থাকি জড়সড়।
দেয়ালে উঠতে গেলে যদি
পড়ে গিয়ে ভাঙে পা ও হাত,
সে প্রয়াস না করেই তাই
নিয়তিকে করি প্রণিপাত।

দেয়ালের ও পারে যে পথ
সেখানে অনেক আনাগোনা,
দিনভর হাসিখুশি তারা
কুড়ায় অনেক মুঠি সোনা।
নিরেট আঁধারে বসে একা
এপারে যে আমি খাবি খাই
তার খোঁজ রাখে নাকি কেউ
ওপারের কোন বোন ভাই?
আমি তো সাহসী নই জানি,
ওদের সাহসটাও কই?
দেয়ালের ওপারের হাত
পেলে তো বানাতে পারি মই!
এপারের ভীতি মেশে যদি
ওপারের ঔদাস্যের সাথে,
এ দেয়াল থাকবে যেমন
ছিল সেই আদিম প্রভাতে।

ত্রিধারা

মনীশ ঘটক

পরশুরাম

১

আবার যদি অমন করিস খেপেই যাব,
ঘাড় মটকে তো-সন্দ্যার রক্ত খাব।
ভর করব ষষ্ঠ অবতারের ঘাড়ে,
ছুটবে কুড়োল ইতশ্চেতঃ একনাগাড়ে।
চার্বাকিয়ানার যতো ব্যাটা সাহিত্যিকে,
কলমচি ও তবলচি ও নটনটিকে,
দেশসেবকের মুখোস আঁটা মজন্তালি
পালের গোদা, মদ্দা মেয়ে, বাচ্চা ধাড়ি,—
সব ক'টাকে গো-ভাগাড়ে, যেথায় পুড়ে;
ঠুকবে ঠোনা খোনা খোনা মামদোভূতে।
হাটিকে কেত্তার সস্তা দরে দুচারখানা
জানিস যদি ছিটি থেকে দত্তাদানা
লোপ পেয়েছে—ঠকবি তবে, রাখছি বলে—
খেতায় না করিস, দেবো কানটি মলে।।

মাইক একো

২

আজ যদি কেউ লিখতে বসে মেঘনাদ বধ কাব্য,
পাইনে ভেবে তার বিষয়ে আমরা
কি যে ভাবব।
প্রথমত, লেখাই যদি কোন কাগজে ছাপবে?
ফর্মা মেপে কবির কাছেই হয়ত মাশুল হাঁকবে।
দ্বিতীয়ত, ছাপোই যদি চাইবে কি
কেউ পড়তে?
ন্যাড়া হাতে শক্তিশেল ও গদার সাথে লড়তে?
তবে যদি সৌভ্র কোনো চলচ্চিত্র পরে
মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনার সব কয়েকটি ছত্র
নন্দনবক্ষা চিত্রতারার ছবির সাথে মুড়ে,
নির্ঘাৎ গো-গ্রাসে গিলবে ধাড়ি এবং কচুরে।

খবর শোনা মাত্র মধু কবর থেকে নিকলে
মাইক ফুঁকে দিক কাঁপাবেন একথা কেউ
লিখলে।
চিত্র-পরিচালকবর্গ কুম্ভকর্ণের পার্টটা
ছাঁকেই দেবেন, পাবেন কোথা অমন তোফা
মেকাপটা।।

তবে কেন

৩

মন নিয়ে মনোদুখে আছি যে ব্যাজার,
মনের এ বায়নাক্কা ঘোর অত্যাচার।
মন চায় দুমিনিটে পৃথিবী বেড়াতে,
সংগীত ও বৈদেশিক একচেঞ্জ এড়াতে,
পারে না। আইন তার চেপে ধরে টুঁটি,
মন মরে যায়। বাঁচে আজাদির ভ্রূকুটি।
কিনারা পাইনে ভেবে, কি যে করা যায়
মনের ছাড়লে রাশ ফ্যাসাদ দেজায়।
আবশ্যিক দৈনন্দিন জৈবিক নির্দেশ
দিন আনো দিন খাও—যা হচ্ছে বেশ!"
এই কি ললাট লেখা, মন কেউ নয়?
আমরা জন্মাবো আর পাব শুধু লয়?
তবে কেন স্বাধীনতা। স্বপ্নে কোনো দিন
ভাবতে কি পেরেছি হবো এত পরাধীন।।

বনের আড়ালে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বনের আড়ালে ওই দীর্ঘশাখা প্রতিবেশী গাছে
কেমন সম্পন্ন মন্থরতা। বাঁকা বনপথ
এদিকে সেদিকে ঘুরে ঘুরে
নানা পদচিহ্ন ভারে দলিত মসৃণ।
যেন মুগ্ধ যুবতীর কটি
আড়ালে সংলগ্ন হলো বঙ্কিম ভঙ্গিতে
প্রেমিকের একান্ত আশ্লেষে।

ওই পথ দিয়ে যেতে যেতে
কোথাও অশ্বত্থ বট কোথাও জারুল কি শিশু
কিংবা লতাপাতা গুল্ম এবং ঘাসের
পুরোজিত আস্তরণ, কৃষ্ণচূড়া অথবা তমাল—
সব আছে; শুধু তুমি বুকের গভীরে
লইবে নিবিড় ঘ্রাণ প্রত্যেক নিঃশ্বাসে।

বনের আড়ালে নদী; কয়েকটি পাতার কুটিরে
নিরীহ, নির্লিপ্ত প্রতিবেশী। সারাদিন
সুকঠিন শ্রমলিপ্ত স্ত্রীলোক পুরুষ
কোষ্ঠমল স্বেদাক্ত মুখে বেড়ায় সহজে।
রাত হলে অন্ধকারে কাঠগুলো জেলে
নির্মল আলোয় নাচে স্ত্রীলোক পুরুষ
সকালের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে।

একবার এইখানে সুনিবিড় বনের আড়ালে
দ্যাখো কোনখানে আছে শক্তির অঙ্কুর,
এবং নিবিড় ঘ্রাণ প্রত্যেক নিঃশ্বাসে

বিদেশিনী

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

বসন্তে তুমি গিয়েছিলে মায়াবতী
শেষ তুষারের জ্যোৎস্নায় বীজ বুনতে,
মরু প্রান্তরে তখনো ছিল যে হাজার ঈগল,
রৌদ্রদগ্ধ অসীম ক্ষুধার স্তেপভূমে
চরণে চরণে সুধাকে ঝরাবে বলেছিলে
শস্যের ঢেউ টলটল করে নাচবে।
হেমন্তে তুমি হেসেছিলে মায়াবতী,
সোনালী তখন শস্যদানার মাঠ,
আকাশের চাঁদ নীলাভ পাথরে জড়োয়া,
তুমি সুগন্ধি চাঁদের মতোই আলো,
দূরে পাহাড়ের ছায়াভরা সরোবরে
দুটি ঝলমল মায়াময় নীলতারা,
ফসলের রঙ তোমার সোনালী চুলে।
সেবার দেখেছি ককেশীয় উপকূলে
পর্যটকের ভিড়ের মধ্যমণি
যেন আনন্দে নদীর পাশে চলোচল
বসন্তে তুমি রূপান্তরিত ম্যাগনোলিয়া
টাটকা বসন্তে রক্তাভ স্মিত অসীম শোভা।
বলেছিলে হেসে মায়াবতী
যেন তোমাকে কখনো ভুলি না।
ভুলিনি ভোরের ফলবাগিচায় আঙুর ক্ষেত,
ডিসেম্বরের পাহাড়ী চূড়ায় তুষার তুষার,
ইস্পাত-গলা উরালের সেই ম্যাগনিটোগর্স্ক
ভুলিনি নতুন লোহ আকরে বিদেশী শহর,
বিদ্যুৎগতি হাসে নর্তকী মুক্তধারা,
হায় বিদেশিনী তোমাকে এখনো ভুলিনি।

মায়ের ইচ্ছা এরকম ছিল না। কিন্তু ছেলে একদম বেঁকে দাঁড়াল। বিবাহে কোনো ধুমধাম হবে না। সানাই বাজবে না। লোকজন খাবে না। এমন কি বরযাত্রী পর্যন্ত না। শুধু শাস্ত্রীয় বিবাহ। তার বেশি নয়।

মা এইটুকু বুঝেছিলেন, জগদীশ যে পথের পথিক, তা আরাম-বিলাসের নয়। সেই দুরূহ, দুর্গম পথে বিবাহের কোনো স্থান নেই। সে শুধু তাঁর মুখ চেয়ে, তাঁর সেবার জন্যে বিবাহে সম্মত হয়েছে।

হয়েছে বটে, কিন্তু তার মন মোটেই প্রসন্ন নয়। থমথম করছে মুখ।

মাতা-পুত্রের জেদে মায়েরই প্রধানত জয় হয়েছে। সুতরাং ছোটখাট খুঁটিনাটি নিয়ে টানাটানি করা ভুল হবে। বেশ তো, ফুলশয্যার ঘর ফুল দিয়ে সাজান নাই হল।

চোখে জল হয়তো একটু এসে পড়েছিল। কিন্তু বাঁ হাতের পিঠে অশ্রু মুছে তিনি কাজে মন দিলেন।

বড় ঘরের তক্তপোষে একটি শুধু পরিষ্কার বিছানা পাতা। আর একটি কোণে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালা। কিন্তু তার দরকার ছিল না। প্রদীপের আলো ঘরের একটি কোণ ঈষৎ আলোকিত করেছিল। কিন্তু মাথার দিকের খোলা জানালা দিয়ে যে চাঁদের আলো এসেছিল, বলতে গেলে, সমস্ত ঘর তাইতেই উজ্জ্বল হয়েছিল। প্রদীপ বাহুল্য মাত্র।

রাত্রি তখন দশটার বেশি।

পাড়ার ক'টি মেয়ে চন্দনাকে সাজিয়ে খাটে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সেইখানে পা ঝুলিয়ে বসে সে জগদীশের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল।

তার মনের মধ্যে খুশির আমেজ।

চেয়ে ছিল জানালার বাইরে মাঠের দিকে। অনেকখানি মাঠ। তার প্রান্তে এক জোড়া তাল-গাছ। তার পরে আবার মাঠ।

জোড়া তালগাছের ফাঁকে মস্ত বড় চাঁদ।

সেই চাঁদের আলোর বন্যার সঙ্গে চন্দনার মনের খুশির বন্যা যেন একাকার হয়ে গিয়েছিল।

দেখতে দেখতে তার চোখে ঘুম জড়িয়ে এল। একটু পরে চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। চোখ মেলতে পারে না এমন অবস্থা।

কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রি।

চন্দনা কিছুতে ঘুমুবে না, জগদীশ না আসা পর্যন্ত। চোখে একটু জল দিয়ে আসবে নাকি? কিন্তু বাইরে যেতে লজ্জা করে।

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

যখন আর সে পারে না, তখন জগদীশ এসে দরজা বন্ধ করে একান্ত সন্নিকটে এসে দাঁড়াল।

সমস্তদিন চন্দনা আড়ে আড়ে যখন

য়েছে, দেখেছে জগদীশের মুখ গম্ভীর, দেখে তার নিজের বুকের ভিতরটাও কি করে উঠেছে। এক একবার মনে হয়েছে, এ না হলেই বোধ হয় ভালো ছিল। কিন্তু যখন গেছে, তখন আর কথা কি!

এখন চেয়ে দেখলে, জগদীশের মুখ দিনের র মতো অতখানি মেঘভারাক্রান্ত নয়। ঠের কোণে একটুখানি প্রসন্নতার আভাস যাচ্ছে যেন।

খাট থেকে নেমে সে জগদীশকে একটা ম করলে।

জগদীশ তাড়াতাড়ি দু'হাত ধ'রে ওকে ঠিয়ে খাটে বসালে। নিজেও পাশে বসলে।

ডাকলে, চন্দনা!

চন্দনা নিঃশব্দে ওর মুখের দিকে চাইলে। চাঁদের আলোয় অত্যন্ত পরিচিত মুখ-নিও কি অদ্ভুত রহস্যময় দেখাচ্ছে!

কি শান্ত, কি গভীর, কি ভীরু দুটি চোখ! খের অতলে কি গাঢ় মিনতি! কাজটা ভালো হল, কি মন্দ হল জগদীশ বুঝতে পারলে না। দিন থেকে বিবাহের কথা হয়েছে সেদিন কে আজ সমস্ত দিন ক্রমাগতই এই একটি থা সে ভেবেছে। কোনো কিনারা পায়নি।

অবশেষে নিয়তির হাতে নিজেকে নিঃশেষে মর্পণ করে অনেকটা সুস্থ হয়েছে। যা হবার হবে। ভাবা নিরর্থক। মানুষের জীবনধারা কোন দিয়ে বইবে, মানুষ তা নিজেই জানে না।

নিজের স্বল্পপরিসর জীবনেই, ভাবতে গেলে, জগদীশের কাছে আশ্চর্য রহস্যময় মনে হয়।

তার যে পথ, কে যেন ঘাড় ধরে তাকে সেই দুর্গম পথে ঠেলে দিলে। সে নিজে ভেবেচিন্তে আসেনি। বহু কার্যকারণ পরম্পরার চাপে এই পথে এসে গেল।

এই বিবাহটা ঠিক তেমনি।

এও তার ঘাড়ের উপর হুড়মুড় করে এসে পড়ল। তার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাধাও দিতে পারলে না। আর এসে যখন গেল, বাধা যখন দিতেই পারলে না, তখন একে প্রসন্ন মনে নেওয়াই উচিত।

মেঘভার তখন কাটল।

জগদীশ আবার ডাকলে, এবারে যেন গাঢ় কণ্ঠে, চন্দনা!

চন্দনা চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। আবার তুললে।

—তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাইবার আছে।

কি সর্বনাশ!

চন্দনার বুকের দুরু দুরু স্তিমিত হয়ে এসেছিল। আবার বাড়ল। ক্ষমা? তার কাছে? কি জন্যে?

—আমাদের এই বিবাহের মধ্যে একটা ফাঁকি রয়ে গেছে।

সে আবার কি কথা!

উদ্বেগে, আশঙ্কায় চন্দনার চোখের কম্পিত দৃষ্টি জগদীশের মুখের উপর নিবদ্ধ।

জগদীশ বললে, স্ত্রী-পুরুষে বিবাহ করে তাদের নিজেদের জন্যেই। আমি কিন্তু বিবাহ করেছি আমার জন্যে নয়। আমার দরকার ছিল না। করেছি মায়ের জন্যে। জান বোধ হয়?

এ আর এমন কি কথা! জগদীশের যে পথ, বিবাহ বহু ক্ষেত্রে সে পথে বাধা। বিবাহ করতে সে চায়নি। মায়ের সেবার জন্যেই বিবাহ করতে হয়েছে। একথা তো সে বহুবার শুনেছে। নতুন কিছু নয়।

নিঃশব্দে চন্দনা ঘাড় নেড়ে জানালে, শুনেছে।

—এতে তুমি অপমানিত বোধ করনি?

এই কথাটা চন্দনার কাছে নতুন। এবং এমনই বিস্ময়কর নতুন যে সে চমকে উঠল। বললে, না। অপমানের কি আছে?

জগদীশ হাসলে। নারীজগতে বাঙালী মেয়ে কত পিছনে পড়ে আছে! তাদের ব্যক্তিত্ব কত ছোট! অধিকারবোধ কত কম! এ অবস্থা দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলশ্রুতি। চন্দনা তো অল্প-শিক্ষিতা পল্লীবালিকা, কজন শিক্ষিতা মেয়েই বা নিজের সম্মান এবং অধিকার সম্বন্ধে সচেতন?

জগদীশ হেসে বললে, মেয়েদের একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, তাদেরও সম্মান আছে, এ কি জান না?

—জানি।

—তবুও মনে কর, মায়ের জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছি, আমার নিজের জন্যে নয়, এতে তোমাকে অপমান করা হয়নি?

এ সম্বন্ধে চন্দনার বলবার অনেক কথা ছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রাত্রে, প্রথম দিনেই অত কথা বলবার ক্ষমতা চন্দনার নেই। সে শুধু সহাস্যে বললে, না।

—কেন, বল না?

—আর একদিন বলব।

এই প্রসঙ্গ তুলবে বলে জগদীশ তৈরি হয়েই এসেছিল। কিন্তু প্রসঙ্গ সুরু করার পরে উৎসাহ কমে আসছিল।

বললে, সেই ভালো। ও আলোচনা করবার সময় পরে অনেক আসবে। এখন কিছু কাজের কথা বলা যাক।

চন্দনার হাসি এসেছিল। ফুলশয্যার রাত্রিটা কি কতকগুলো কাজের কথা বলবার জন্যে? কিন্তু হাসি চেপে গম্ভীরভাবে কাজের কথা শোনবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

জগদীশ বললে, তুমি তো কিছু লেখাপড়া করেছ?

—সামান্যই।

—তা হোক। যতদিন বাইরে আছি আমি তোমাকে পড়াব। যদি জেলে চলে যাই, তুমি নিজে নিজেই পড়বে। তোমাকে অন্তত ম্যাট্রিকুলেশন পাস করতে হবে। কেন বুঝতে পারছ?

—না।

জগদীশ বললে, মা যতদিন আছেন, আছেন। আমাদের যা জমি-জমা আছে তাতে দু-চারজনে কোনোমতে চলে যাবে। কিন্তু সংসারে প্রাণীর সংখ্যা বাড়তে পারে।

চন্দনা লজ্জায় মুখ নামালে।

জগদীশ বলে চললে, তখন আমার অনুপস্থিতিতে সংসার চালাবার জন্যে যাতে অন্যের মুখ না চাইতে হয়, তা কি দেখা দরকার নয়?

কথাটা গম্ভীরভাবে উপলব্ধি করে চন্দনা ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

জগদীশ বললে, কতদিন বাইরে আছি জানি না। কিন্তু আমাকেও বি-এটা পাস করে ফেলতে হবে। আমরা দুজনেই পড়া করব।

চন্দনা তাড়াতাড়ি বললে, দিনে কিন্তু নয়। রাত্রে।

জগদীশ হাসলে: বেশ তাই হবে। দিনে সকলের সামনে পড়া করতে তোমার লজ্জা করবে, না?

লজ্জিতভাবে ঘাড় নেড়ে চন্দনা জানালে, করবে। তাছাড়া সংসারের কাজকর্মও আছে। দিনে সময়ও পাওয়া যাবে না।

জগদীশ কি যেন ভেবে হাসলে।

চন্দনা জিজ্ঞাসা করলে, হাসলে যে?

জগদীশ বললে, হাসলাম। বুঝলাম মানুষ তার নিজের মালিক নয়। বিপ্লবের পথে আসব স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি। অথচ এলাম, এসে গেলাম। আবার বি-এ পাস করার চেষ্টা করতে হবে, তাও কোনোদিন ভাবিনি। বিয়ের সম্বন্ধেও কোনোদিন ভাবিনি। তাও করতে হল। কিছুই আমার ইচ্ছেয় ঘটছে না। বলা যেতে পারে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ঘটছে। তাই নয়?

চন্দনা কিছু বললে না। বড় বড় চোখ মেলে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

জগদীশ বলে চলল: তাই হাসলাম। আজ আমরা স্থির করছি পরীক্ষা দেব। তুমি ম্যাট্রিকুলেশন এবং আমি বি-এ। শেষ অবধি কি হবে আমরা কেউ জানিনে। আবার একদিন হয়তো দুজনে বসে এমনি হাসতে হবে, কি ভেবেছিলাম আর কি হল।

সে হাসতে লাগল।

বললে, কিন্তু সেদিনের কথা আজ ভেবে লাভ নেই। সে যা হয় হবে। আপাতত এই স্থির হল যে, দুজনকে পাস করতে হবে এবং জীবিকানির্বাহের জন্য হয়তো মাস্টারীও করতে হবে। জীবিকার্জনের চিন্তা এই প্রথম এল।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

চন্দনা বললে, বিয়ে করে তুমি কি দুঃখিত?

—এখন আর নয়। দুঃখের চেয়ে ভয়ই হয়েছিল বেশি। দুশ্চিন্তা। এখন আর কোনো দুঃখ নেই। তোমার জন্যেও না, মায়ের জন্যেও না। বরং অনেকখানি যেন নিশ্চিন্ত বোধ করছি। বুঝেছি তুমি বড় ভালো মেয়ে। শক্ত মেয়ে। মাকে তুমি দেখবে। তোমাদের দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে আমিও যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আনন্দে চন্দনার চোখ ঝলমল করে উঠল।

বললে, আমার জন্যে তুমি যেন দুঃখ না পাও, সেই চেষ্টাই জীবনভোর করব।

জগদীশ হাসলে: সে বিষয়ে আমি প্রায় নিশ্চিত আছি। আমার চিন্তা আমার জন্যে, তুমি দুঃখ পাবে সেই ভেবে। তার থেকে তোমাকে বাঁচাবার শক্তিও আমার নেই।

—বাঁচিও না। দুঃখ আমি পাব। কিন্তু আমি কাঁদব না। আমি শক্ত থাকবার চেষ্টা করব।

—তাই কোরো। তুমি শক্ত আছ, ভেঙে পড়নি, এইটে জানতে পারলেই আমি আরাম পাব। চন্দনা, জেলের মধ্যে হাজারো দুঃখ। কিন্তু সে দুঃখ হালকা হয়ে আসে যখন ভাবি এই দুঃখ দেশের জন্যে সইছি। তোমারও দুঃখ হালকা বোধ হবে যখন ভাববে সে দুঃখ তুমি দেশের এবং আমার জন্যে সইছ।

—তাই করব। কিন্তু সে তো এখন নয়।

জগদীশ হাসলে: সে যে কখন কেউ বলতে পারে না। যে কোনো মুহূর্তেই সেই সময়

আসতে পারে। আমাকে এবং তোমাকে প্রতি মুহূর্তেই সেই মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

দূরের দুটি আম গাছ থেকে দুটি কোকিল পরস্পরকে ডাকাডাকি করছিল অনেকক্ষণ থেকেই। ডাকতে ডাকতে তারা যেন মাতাল হয়ে উঠেছে।

ফুটফুট করছে চাঁদের আলো।

চন্দনার কান কোকিলের দিকে। চোখ বাইরের চাঁদের আলোর দিকে। এর উপর চাঁপার গন্ধ যেন নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। তার একটু উসখুস, একটু অন্যমনস্ক ভাব।

অন্যমনস্ক জগদীশও।

দৃষ্টি তারও বাইরের দিকে। কিন্তু চাঁদের আলো সে দেখছিল কি না বোঝা যাচ্ছিল না। কোকিলের ডাক, চাঁপার গন্ধ তার ইন্দ্রিয়ে কি পৌঁছুচ্ছিল?

সে অন্যমনস্ক। কি যেন গম্ভীর চিন্তায় মগ্ন।

ঘর নিস্তব্ধ।

হঠাৎ মনে হল জানালার বাইরে একটা মাথা একবার উঁকি দিয়েই সরে গেল।

ওদিকে অনেকখানি জায়গা আশসাওড়া আর জামালকোটালের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মনোযোগের অভাবে জায়গাটা আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। সাপের ভয়ে সহজে ওদিকে কেউ যায় না।

ফুলশয্যার রাত্রে আড়িপাতার কৌতুক বহুকালের। কিন্তু প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে ওদিকে আড়ি পাততে যাবে এমন দুঃসাহসী কে আছে?

মাথা? না কি কিছুরই ছায়া?

দুজনেই চমকে উঠল।

কে? কে?

জগদীশ লাফিয়ে জানালার কাছে চলে গেল।

দেখা যাচ্ছিল না। মাথাই হোক, আর ছায়াই হোক, সেটা আড়ালে সরে গেছে।

জগদীশ আবার ডাকলে, কে?

চাপা গলায় জবাব এল, আমি।

মাথাটা আবার জানালার ধারে এসে দাঁড়াল।

—নাড়ুদা!

নাড়ু জগদীশের বিপ্লবী দলের দাদা। আপনা থেকেই জগদীশের স্বর নেমে এল : কি ব্যাপার?

—ব্যাপার ভালো নয়।

সভয়ে জগদীশ জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে?

—পুলিশ আবার ধর-পাকড় আরম্ভ করেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তিন-চারজন ধরা পড়ে গেছে। আমি ফেরার। ভাবলাম তোমাকে খবরটা দেওয়া দরকার।

ছটফট করতে করতে জগদীশ বললে, আমাকে কি করতে বল।

—গা-ঢাকা দেওয়া দরকার। ভোর হবার আগেই।

—হ্যাঁ। আমি প্রস্তুত।

চন্দনার দিকে জগদীশ চাইলে। তার মুখভাব অস্বাভাবিক। চোখ জ্বলছে। ডাকলে, চন্দনা!

চন্দনা নিঃশব্দে ওর দিকে চেয়ে ছিল, চেয়েই রইল।

জগদীশ হাসলে। অত্যন্ত ভয়ংকর অস্বাভাবিক একটা হাসি।

বললে, কিছু বুঝতে পারলে?

মাথা নেড়ে চন্দনা জানালে, পেরেছে।

—আমাকে গা-ঢাকা দিতে হবে। অন্ততঃ সাময়িকভাবে। জালটা কতখানি বড়, বোঝা যাচ্ছে না। তুমি মায়ের কাছে থাকবে। তাঁকে সাহস দেবে, সান্ত্বনা দেবে। তাঁর সেবা করবে। পারবে?

—পারব।

—তুমি কাঁদবে না, ভেঙে পড়বে না?

—না।

—শক্ত থাকবে?

—হ্যাঁ।

—বোধনেই বিসর্জন!

জগদীশ হাসলে।

বললে, এখনই মাকে খবর দিও না। সবাইকে বলবে, কি একটা দরকারে কোথায় গেছি। ফিরতে সন্ধ্যে হবে। মাকেও তাই বলবে।

—সন্ধ্যেবেলা যখন তুমি ফিরবে না?

—তখন, না তখনও নয়, রাত্রে মায়ের কাছে শুয়ে চুপি চুপি সব কথা বলবে। বলবে, ভয়ের কিছু নেই। দিন কয়েকের জন্যে গা-ঢাকা দেওয়া। কাছাকাছিই থাকব। মাঝে মাঝে খবর দেবার চেষ্টা করব। সুবিধা বুঝলে দেখাও করতে পারি।

এবারে জগদীশ একটু সহজভাবে হাসলে।

জানালার দিকে চেয়ে বললে, তুমি এগোও নাড়ুদা। দীঘির ধারে বটগাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এখনি বেরোচ্ছি।

—অত দেরি কোর না। বাক্সটাকে সঙ্গে নেবে।

—আচ্ছা।

নাড়ুদা বেড়া টপকে চলে গেল। জগ[দীশ] চন্দনার দিকে চেয়ে হাসলে।

—এই আমার জীবন! এমনি মানুষের স[ঙ্গে] তোমার জীবনের গাঁটছড়া বাঁধা হল।

চন্দনা হাসলে : আমার সৌভাগ্য!

—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য ভেবে দেখবার[...]

—তুমি কি এখনই চলে যাবে?

—হ্যাঁ। সময় নষ্ট করতে পারব না।

জগদীশ আবার একবার অস্বাভাবিক[...] হাসলে। বললে, আসছি। বাক্সটাকে স[ঙ্গে] নিতে হবে।

বলে বাইরে চলে গেল এবং একটু [পরে] ফিরে এল। মাটিমাখা হাতে রিভলবার।

কাপড়টা জগদীশ মালকোঁচা দিয়ে শক্ত [করে] পরলে। রিভলবারটা ট্যাঁকে গুঁজলে। তার উপ[র] পাঞ্জাবীটা পরলে।

তারপরে স্থির দৃষ্টিতে চন্দনার [দিকে] চাইলে।

দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা উদভ্রান্তি। [...] দিনের জন্যে, কোথায় যাচ্ছে জানে না। পুলি[শের] হাতে ধরা পড়লে কি হবে তাও জানা নেই। বটগাছের ছায়ার নিচে নাড়ু তার জ[ন্যে] অপেক্ষা করছে, জগদীশের মনে হল, [...] ভবিষ্যৎ অমনি অন্ধকার।

ভাবতে তার মাথার ভিতরটা কি র[কম] ঝিমঝিম করে উঠল।

সেই অবস্থায় সে হঠাৎ একটা কাণ্ড ক[রে] বসল : চন্দনাকে বুকের মধ্যে প্রচণ্ডবেগে [চেপে] ধরল। এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে বল[লে] আসি এবং চন্দনা সেই ধাক্কা সামলাবার আ[গেই] অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভোরে মায়ের ঘুম ভাঙল। ওদের বাস[র] ঘরের সামনে এসে দেখেন, দরজা ঈষৎ খোলা।

মেঝেয় ও কে শুয়ে?

ঘরে ঢুকে দেখেন চন্দনা :

বৌমা! বৌমা!

কোনো সাড়া নেই। চন্দনা মূর্চ্ছিতা।
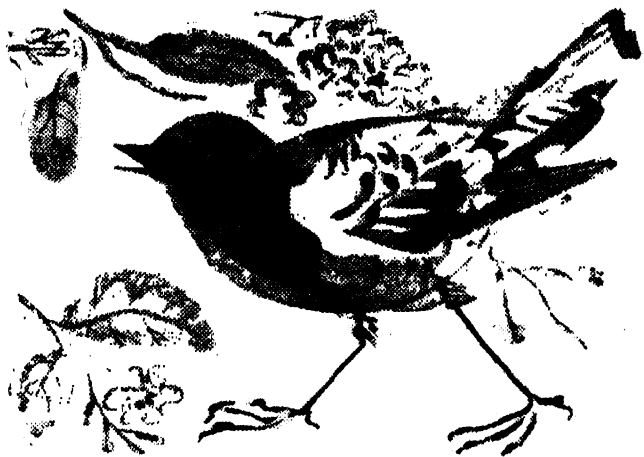
সাধু সিধু সাধনা ও সিদ্ধি

পরিমল গোস্বামী

শহরের প্রান্তে যেখানে মল্লিক বাড়ির বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়িটি শেষ হয়েছে, তারই কিছু দূরে ঐ বাড়িরই সংলগ্ন জমিতে বহুদিনের পরিত্যক্ত একটি প্রায়-ভাঙ্গা মন্দির প'ড়ে আছে। সম্ভবত মল্লিকেরা যখন এই জমিদারি দখল করেন তখনই এই মন্দিরটি ভাঙা অবস্থায় ওখানে ছিল। মন্দিরে এককালে দেবতা এবং পূজারী ছিল, এবং কি কারণে এখন সেটি শূন্য প'ড়ে আছে তা কেউ জানে না। কিন্তু ভাঙা অকেজো হলেও মন্দির ব'লেই মল্লিকেরা এর গায়ে আর হাত দেয়নি. যেমন ছিল তেমনি জঙ্গলবেষ্টিত হয়ে পড়ে আছে। মল্লিকবাড়ি থেকে মন্দিরটি আধ মাইল দূরে অবস্থিত।

অথচ এই মন্দিরেও প্রাণের সাড়া জাগল একদিন। এক সাধু এসে বসলেন সেখানে। জায়গাটি আপন মনে সাধনা করবার পক্ষে মনোরম।

অনাড়ম্বর সাধু নিভৃতকামী। তিনি কখন এসে ওখানে সামান্য একটুখানি স্থান পরিষ্কার ক'রে নিয়ে বসেছেন তাও কেউ জানে না। কিন্তু আস্তে আস্তে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল। আর তার ফলে দু একজন দু একজন ক'রে কৌতূহলী দর্শক আর ভক্ত জুটতে লাগল। কিছু কিছু দানও আরম্ভ হ'ল, আর তার বদলে কিছু কিছু আশীর্বাদ, ইহকালের দুঃখদুর্দশা ঘোচানোর উপায় ও পরকালের পথনির্দেশ ভিক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু সবই বৃথা। সাধু কোনো দান গ্রহণ করেন না, কোনো উপদেশও দেন না। গ্রহণের মধ্যে একটুখানি দুধ বা ফলমূল বা সামান্য চাল-ডাল। তার বদলে কিছু চাইতে গেলে বলেন, আমি কি দেব, উপরের দিকে হাত দেখিয়ে বলেন, দেবার মালিক উপরের দিকে বাস করছেন।

তবে কিছু তত্ত্বকথা শোনাও ঠাকুর।

সাধু বলেন, ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত। আমি যা নিজে জানি না তা অপরকে শোনাব কি ক'রে।

ওরা ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যায়। তারা না পারে মনের মতো কিছু দিতে, না পারে কিছু নিতে।

শিক্ষিত মহলেও সাধুর কথা ওঠে। যারা যুক্তিবাদী তারা বলে এতদিনে এক সাধুর মুখে সত্যি কথা শোনা গেল। সাধু ভণ্ডামিমুক্ত, বুজরুক নয়। যারা কিছুই জানেনা তারা নকল জ্ঞান বিক্রি ক'রে পয়সা লোটে। তারা কেউ স্বর্গের পথ দেখায়, কেউ বা রেস্ খেলার টিপ ব'লে দেয়। এ সাধু নকল সাধু নয়।

এই জাতীয় সব ভক্তির লোকও জোটে, শ্রদ্ধার লোকও জোটে। মল্লিকদের ভাঙা মন্দির তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

সাধু বলেন, এ ভিড় আমি চাই না, আমাকে একা থাকতে দাও। কিন্তু লোকে তা শুনবে কেন। সাধুকে দিলে নেয় না, চাইলে দেয় না—এ যে কত বড় আকর্ষণ, আর কিছু না হোক দেখেই পুণ্য। সাধু সৎকথা বলেন, কিন্তু কেউ

শোনে না। বলেন, ঈশ্বরের কৃপা মানুষের কাছে চেয়ো না। কৃপা ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে। মানবতার মধ্যে। মাটির মধ্যে। ভিক্ষা চেয়ো না, দয়া চেয়ো না, যা চাও নিজের শক্তিতে উপার্জন ক'রে নাও। তোমরা ভাব সাধুর পেট ভরালে সব মিলবে। এ অতি জঘন্য কামনা। মানুষ পুজো। পুজো মানেই তোয়াজ, খোশামোদ। ঈশ্বর ওতে ভোলেন না। পুণ্যের জন্য তোমরা পয়সা খরচ কর। একি হাটবাজারের জিনিস, যার যত টাকা, তার তত পুণ্য? মানুষ হও তোমরা।

বছরের পর বছর কেটে যায়। সাধুর দেহে জ্যোতি। ভাঙা মন্দির ঘিরে জ্যোতি। আগে ছিল সাপ শেয়ালের রাজত্ব। এখন সেখানে পিঁপড়েরাও চলতে দুবার চিন্তা করে। সাপেরা গভীর রাতে নিঃশব্দে মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে যায়। শুধু যাবার সময় সাধুর সামনে একটুখানি থেমে যায়। সে সময় দূরে শুধু শেয়াল ডাকে। ওদিকে সবটাই জঙ্গল। সেই জঙ্গলে স্তব্ধ রাত্রিতে শেয়ালের ডাক বড়ই করুণ শোনায়। সাধুর মনে সে ডাক কি প্রতিক্রিয়া জাগায় কে জানবে তা? হয়তো চোখ ভিজে ওঠে এবং আপন মনেই বলেন, আর কতকাল চলবে এভাবে।

চ'লে তো গেল পাঁচটা বছর। তবু এখনও প্রার্থী আসে এবং একইভাবে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। সাধু বলেন, আজ পাঁচ বছর সাধনা ক'রেও কিছু মিলল না, তোমরা শূন্য ভান্ডারে শুধু হাত বাড়িয়েই হাতে হাতে কিছু পেতে চাও, তা কি ক'রে হবে? আমি যেদিন পাব, সে দিন আর আমাকে দেখা যাবে না। আমার সাধনার জন্য একটুখানি নির্জন বাস দরকার ছিল, কিন্তু কত বাধা।

ভক্ত বলে, তবে শহরের কাছে এলে কেন ঠাকুর? দুর্গম জঙ্গলে বসলে না কেন? সে আরও ভাল হ'ত না কি?

নিশ্চয় হ'ত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আছে। বেঁচে থাকতে হ'লে আমার কিছু খাওয়া দরকার। সে যে কত কম তা তোমরা দেখেছ। এ যুগে বনভরা ফলমূল পাওয়া যায় না তাও তোমরা জান। তাই শহরের কাছাকাছি বসেছি। জানতাম এই অসহায় সন্তানটির কথা কোনো মা লক্ষ্মীর কানে পৌঁছলে আমার কোনো ভাবনা থাকবে না। হয়েছেও তাই।

এত লোকের আসা যাওয়ায় সাধনার ক্ষতি হচ্ছে তো?

না। ফললাভে কিছু দেরি হবে মাত্র। আমি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে গিয়ে আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই না। আধ্যাত্মিকতায় আকাশে ঘুরে বেড়ানোও আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এই জীবনেই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বোধের ভিতর দিয়ে পেতে চাই আমার কাম্য।

এ কথা শুনে দার্শনিক যুক্তিবাদী ভক্তরা নতুন ক'রে সাধুকে শ্রদ্ধা করতে লাগল। অনেক সাধুও এ'লো সাধুকে দেখতে। সাধু সম্পূর্ণ র‍্যাশন্যাল। বিচারবাদী। ধাপ্পাবাজ নন। মোক্ষলাভে যারা জীবন সার্থক মনে করে সে দলের কেউ নন।

এইভাবে নানা দিকের নানান্ পরীক্ষায় সাধু বিভিন্ন মতবাদীদের সবার শ্রদ্ধা বজায় রেখে চলতে সক্ষম হলেন এটি কম কথা নয়। যারা আগে অবিশ্বাসী ছিল তারাও তাদের ভ্রান্তি বুঝতে পারল। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর ধ'রে ভক্তরা বৃথা ঘুরে মরল, হাতে হাতে কিছু পেল না। তারা তবু এই সান্ত্বনা পেল যে, একজন প্রকৃত সাধুকে তারা দেখেছে। জীবন এতে কি আর সার্থক হয় না?

সাধু ইতিমধ্যে কিছু স্থূল হ'য়ে পড়েছেন। একজন ভক্ত বলল, ঠাকুর, তুমি যখন যুক্তিবাদী, তখন একটু চলাফেরা ক'রে দেহটাকে ঠিক রাখ, নইলে যে আর উঠতেই পারবে না।

চলছি একটু একটু। ভোরে উঠে দুচার পা হাঁটি। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতে বুঝতে পারি না। আমি নিজের স্বার্থের জন্য সাধনা করছি, আর কারো জন্য নয়, আমি যে রত্ন, যে মহামূল্য রত্ন চাই তা পেলে তার অংশ তো কাউকে দিতে পারব না। তবু আজও আমার কাছে লোক আসার বিরাম নেই কেন বুঝি না। তারা এখনও কিছু পাবে আশা করছে এ বড়ই আশ্চর্য বোধ হয়। কিছু পাবার জন্য এত লোভ কেন?

ভক্ত বলে, কথাটা আমিও ভেবেছি। মনে হয়, আমাদের সবার উদ্দেশ্য এক নয়। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি একটুখানি আনন্দ পাই। পুণ্যটুন্য বুঝি না। তুমি বিশ্বপ্রকৃতির কাছে কি পাও তা বোঝাতে পারবে না। আমিও তোমার কাছে ব'সে কি পাই বোঝাতে পারব না।

সাধু বলেন, এই মনোভাবের মধ্যে কিছু হীনতা আছে। সমস্ত মানুষকে ছেড়ে মানবতা ছেড়ে, বিশ্বকে ছেড়ে একটা মানুষকে দেখে আনন্দ পাও, এ আমার পছন্দ নয়। মেয়েদের কথা আলাদা। তাদের বোঝাবে কে?

কিন্তু রাধা তো একটি মানুষের মধ্যে বিশ্বকে দেখেছিল।

দেখ, মেয়েরা সব পারে। কিন্তু তুমিও রাধা নও, আমিও কৃষ্ণ নই।

তর্ক আর শেষ হয় না।

এত লোকের যাতায়াত চলছে দেখে মন্দিরের পাশে কিছু কিছু চালাঘর তোলা হয়েছিল, পাঁচ বছর ধ'রে সেই একইভাবে আছে, মেরামত হয়নি। সাধু করতে দেননি। বলেছেন, কিছু দরকার নেই। কিন্তু এবারে কালবৈশাখীর ঝড়ে সব ভেঙে তছনছ হ'য়ে গেছে। বর্ষার আগে নতুন ক'রে ঘর না বাঁধলে বর্ষাটা মাথার উপর দিয়ে যাবে, সে চলবে না।

অতএব সাধুর অনুরোধ বৃথা গেল। আর শুধু চালাঘর নয়, মন্দিরও এই উপলক্ষে মেরামত করাতে হবে, মল্লিক গিন্নির আদেশ। তার মানে, কিছুদিনের জন্য সাধুর মন্দির-বাস ঘুচল। তাঁকে এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে আসা হ'ল মল্লিকদের বাড়িতে। মল্লিক গিন্নি নিজহাতে সব ব্যবস্থার ভার নিলেন। তাঁর এতদিনের সাধ পূর্ণ হ'ল। ঝড়কে মনে মনে প্রণাম জানালেন তিনি। তবে শর্ত হ'ল এই যে, সাধু এবারে সত্যই একা থাকবেন, বাইরের কেউ দিনে বা রাতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে।

তাই ঠিক হ'ল।

সাধুর এবারে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ [illegible] সম্পূর্ণ একা। বাড়ির লোকেরাও একটা [illegible] সময় ভিন্ন দেখা পায় না তাঁর। সব [illegible] নিরাপদ এবং নিভৃত ঘরেই তিনি [illegible] পেয়েছেন। কিন্তু তবু অস্বস্তি। [illegible] জেলখানা।

ওদিকে মেরামতের কাজ চলছে। টুকুই বা কাজ দিন সাতেকের মধ্যে হয়ে [illegible]

একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটল [illegible] বাড়িতে। এত ঐশ্বর্য! এর মধ্যে বাস [illegible] সাধু হাঁফিয়ে উঠছেন। কবে মুক্তি পাব তোমাদের এই কারাগার থেকে।

মল্লিক গিন্নি বলেন, বুঝতে পারছি [illegible] আপনার স্থান খোলা আঙিনায়, খোলা আকা[শের] নিচে। আর মাত্র তিন চার দিন।

কিন্তু সাধুর তো পছন্দ হল না [illegible] চতুর্থ দিনের মাথায় নিরুদ্দেশ। রাতে এ[ক]খানি ঝড়বৃষ্টি হয়ে হাওয়াটা বেশ ঠান্ডা [illegible] সবাই গভীর ঘুমে অচেতন।

সাধু নেই!

নেই তো কোথাও নেই। [illegible] কথাটা। দলে দলে লোক এসে [illegible] হায় করতে লাগল সবাই। [illegible] সাধুকে বন্দী ক'রেই এই [illegible] সম্ভব হ'ল। মল্লিক বাড়ির [illegible] বুক খালি হ'য়ে গেছে সবার।

তিনদিন পরে আবিষ্কার [illegible] বিখ্যাত বংশগত সম্পত্তি [illegible] দামের রত্নখচিত টায়রাটি নেই [illegible] আর নানা দামী পাথর [illegible]

মারাত্মক ঘটনা। মল্লিক [illegible] বুক ভেঙে যেতে লাগল। [illegible] বিরাট বিদ্রূপ। এতবড় সর্বনাশ [illegible] যাকে দেবতার মতো মনে করেছিলেন [illegible] ক'রে সন্ধান পেল। নিরাপদ [illegible] ছিল। ওঁরা নির্বোধের মতো সেই [illegible] থাকতে দিয়েছিলেন। চাবি নিয়ে [illegible] হয়েছে। চাবি পেল কোথায়?

সাধু কেবল ঘরে একখানা [illegible] গেছে। চুরির কথাটা কাউকে [illegible] সাধু তাঁদের এমন বোকা বানিয়ে [illegible] একথা লোকে শুনলে শুধু হাসবে। [illegible] কাউকে বলবার নয় ব'লেই কাউকে [illegible] না। কিন্তু লোকে নানারকম সন্দেহ কর[তে] লাগল। মল্লিক বলেন সাধুদের [illegible] আমাদের দুর্বোধ্য।

কিন্তু মল্লিক গিন্নি বুঝতে পারলেন [illegible] এ এক বিরাট পরীক্ষা। ঐ যে [illegible] ফেলে গেছেন, ওরই মধ্যে আছে তাঁর [illegible] সেখানা পড়তে পড়তে তাঁর প্রায় মুখস্থ [illegible] গেল। কিন্তু যত পড়েন তত কথাগুলি দুর্বোধ বোধ হয় এবং ততই ওটিকে কোনো মূল্য[illegible]

মনে ...রে ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে পড়তে কন। এবং ভাবেন এত বড় বীজমন্ত্র তিনি য় গেলেন অথচ তাঁকে তো কিছুই দেওয়া না। টাকা এর কাছে তুচ্ছ।

লিখনটি দলে দলে লোকে দেখে যেতে লে। ভক্তরা বলল মন্দির তো মেরামত হচ্ছে, ইখানেই এই মন্ত্রটি বাঁধিয়ে রাখতে হবে। খনটি এই—

"পয়সা আধ খানা
শ্বাস হাফ তরল।
আদর যত্ন চলা দুর্লভ
পাঁক পুকুরে মাছি।
ছবি শাদা নয়।"

একদল আধুনিক কবি এ লেখা প'ড়ে নন্দে লাফিয়ে উঠল। সাধু যে এতটা ধুনিক, তাঁর চিন্তাধারা আধুনিক, তাঁর কাব্য ধুনিক এ কথা তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ল। কিন্তু তিনি গেলেন কোথা?

মাথা একটু ঠিক হলে মল্লিক বললেন, ওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। তাঁর সাধনা হঠাৎ ন হল কি না। আমরা কেউ এজন্য প্রস্তুত লাম না। কিন্তু সেদিন কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি র মাথায় পড়তেই হঠাৎ তাঁর সিদ্ধিলাভ ল।

কিন্তু আমরা যে তাঁকে চাই। তাঁর এই লেকারী কবিতা আমরা নোবেল কমিটিতে ঠাতে চাই।

তোমরা কি বুঝেছ ওর অর্থ?

বুঝেছি বৈ কি। কবি বলছেন একটা কেও যার নেই, তার শ্বাস কঠিন। সে যদি ধেক পয়সা পায় তবে তার পুরো-কঠিন স একটু তরল হয়। একজন বলল মি কবিতাটি ইংরেজীতে ভেবেছি—
The unlucky fellow who has not even a dime in his pocket, breathes hard. But if even a half copper is given him his hard breath will melt a little. No affection is showered on him by anybody. His pond is waterless and muddy and full of winged pests. The picture is not bright.

পরে এর চেয়েও ইমপ্রুভ করবে। পুরোনো ষা, কিন্তু কি মৌলিক ভঙ্গি।—ওরা আনন্দ কোলাহল করতে করতে চলে গেল।

বাইরের লোক কিছুই জানতে পারল না, ল্লিক গিন্নিও না, কিন্তু মল্লিক খুব গোপনে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাসকে রহস্য ভেদের ভার দিলেন। ব্রজবিলাস সব শুনে বলল, তার সেই ফেলে যাওয়া লিখনটি একবার দেখা দরকার। কিন্তু মুশকিল বাধল একটুখানি, কারণ, তাতে ইতিমধ্যে তেলসিঁদুরের ছাপ পড়েছে, পড়া প্রায় অসাধ্য হয়ে উঠেছে। তার উপর আবার সোনার ফ্রেমে সেটা বাঁধানো হয়ে গেছে, মন্দির মেরামত হলেই সেখানে ওটিকে টাঙানো হবে।

ব্রজবিলাস বহু কষ্টে লেখাগুলো নকল করে নিল। তারপর প্রাইভেট ডিটেকটিভের নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে পাইপ মুখে দিয়ে ভাবতে বসল।

ব্রজবিলাস ভাবছে।

দ্বিতীয় দিনও ভাবছে।
তৃতীয় দিনও ভাবছে।

চতুর্থ দিন কার স্মৃতি উঠল ভেসে তার মনের মধ্যে। একটু একটু আসছে, অথচ আসছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এমনি ধাঁধা রচনা করত একটি ছেলে স্কুলের ক্লাসে ব'সে। ব্রজবিলাস তার সঙ্গে পড়ত। তার নাম সিধু সরকার। আধুনিক কবিতার চেহারায় ধাঁধা।
ব্রজবিলাসের আর বসে থাকা হ'ল না।

কিন্তু সে এক বিষম সন্ধান ইতিহাস। মাত্র একটি সূত্র থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় একশটি স্থানে পর পর সন্ধান চালাল। একটা থেকে আর একটা। সেটা থেকে আর একটা। অবশেষে তৃতীয় মাসের মাঝামাঝি মিলল সিধু সরকারের দেখা। দেশ-দেশান্তরে যায়নি, এই কলকাতা শহরেই ছিল। পরে, সে ব্রজবিলাসকে বলেছিল লুকিয়ে থাকতে হলে কলকাতার তুল্য স্থান নেই। কিন্তু এ সব কথা পরের।

সিধুর চেহারার সঙ্গে সাধুর চেহারার কোনো মিল নেই। ভক্ত সেজে সাধুর কাছেও ব্রজবিলাস দু একবার গিয়েছে। একবার রাত্রে শেয়াল সেজে মন্দিরের পাশে হুক্কা হুয়াও করেছে, কিন্তু সাধু যে প্রকৃতই সাধু এ ভ্রান্তি তারও ঘটেছে, সাধুর চালচলনে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেনি। কিন্তু এখন তার চেহারা একেবারে অন্য। কেউ আর ধরতে পারবে না। লম্বা দাড়ি-চুল কিছুই নেই, দাড়ি সম্পূর্ণ কামানো, চুল সাহেবি ধরণে ছাঁটা ও ব্যাকব্রাশ করা, পোষাক সাহেবি। গলায় লাল টাই বাঁধা।

ব্রজবিলাস বলল, সিধু তোর মনে আছে আমার কথা? স্কুলে এক সঙ্গে পড়তাম?

সিধু ভ্রুকুটিকে স্মরণ করতে চেষ্টা করল। বলল কি তোমার নাম ভাই?
ব্রজবিলাস সরকার।

চমকে উঠে বলল, ও ডিটেকটিভ হয়েছ এখন। হুঁ, আমাকে কোন্ কেসটি হাতে নিয়েছ?
মল্লিক বাড়ির টায়ারা চুরির কেস।

তাই না কি? ......আচ্ছা, দাঁড়াও।—বলে সিধু ভিতরে চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে একটি ছোট বাক্স হাতে বেরিয়ে এসে বলল, এই নাও। আমার পাঁচ বছরের সাধনার ফল তোমার হাতেই তুলে দিলাম।

ব্রজবিলাস দুটি হাতে সবিস্ময়ে বলল, এত সহজে দিলি?

নাম শুনেই বুঝেছি আর লুকিয়ে লাভ নেই। আমার কোনো কোনো কাজে ভেবে উঠতে পাঁচ বছর লাগে, কোনো কোনো কাজ পাঁচ সেকেন্ড। তোমাকেই শুধু ভয় ছিল, ভেবেছিলাম ধরতে পারে না।

তোর ধাঁধার উত্তর থেকেই তোকে চেনা গেল। প্রত্যেকটি শব্দের শেষ অক্ষর জুড়লেই মীমাংসা। তুই লিখে এসেছিস "সাধনা সফল। রত্ন লাভ করেছি। বিদায়।"—আধুনিক কবিতার নামে তোর এই চাতুরির সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম ব'লেই তো ধরা গেল তোকে।

ব্রজবিলাসের চোখ ঐ টায়ারা থেকে যেন ফিরতে চায় না। প্রকান্ড হীরে, মধ্যমণি। তাকে ঘিরে নানা পাথর স্যাফায়ার, অ্যাগেট, রুবি, ক্যাটস্‌আই, জার্কন। তাছাড়া নিটোল মুক্তার সারি। এমন টায়ারা দেখলে অনেক সাধুও চোর হ'তে পারে। চোর সাধু সাজবে এ আর এমন বেশি কি। বলল, পাঁচ বছর চেষ্টা করেছিস এর জন্য?

বিশ্বাস জন্মানোর জন্য করতে হ'ল। জানতাম একদিন মল্লিক বাড়িতে স্থান পাবই, ও'রা ধন্য হবেন আমাকে ঘরে রেখে। তা ছাড়া ভেবে দেখ, এই টায়ারা—এখন এর দাম পাঁচ লক্ষ টাকা তো বটেই—এর জন্য পাঁচ বছর একটু সংযম অভ্যাস করা কি খুব বেশি হয়েছে? ছোটখাটো বহু লোভ ছেড়েছিলাম ওরই জন্য।

পড়াশোনা কতদূর করেছিলি?

এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিতে এম, এ পাস করেছিলাম। সাধু সাজার পক্ষে সেটাও আমাকে সাহায্য করেছে। মনস্তত্ত্ব বুঝে চলেছি। অবশ্য ওটা সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার। যে সব অদ্ভুত প্রতারণার কথা পড়ি, তার কোনোটাই তো বড় বড় পন্ডিতদের কীর্তি নয়। মানে পাসকরা পন্ডিতদের নয়। অন্তত আমার তাই ধারণা। তবে আমার পক্ষে সুবিধা হয়েছে এই যে, আমি শিক্ষিত অবিশ্বাসীদেরও মন জয় করেছি।

তোর কবিতাটা সোনা মোড়া হয়ে গেছে জানিস?

কবিতা না হাতী। শুনেছি ওর অনুবাদ হয়ে নোবেল কমিটিতে পাঠানো হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কত ভাব যে ওরা আবিষ্কার করেছে। নির্বোধেরা জব্দ হবে। দেশের নাম ডোবাবে। কিন্তু চুলোয় যাক সব। তুমি কত পাচ্ছ এ কেসে?

দশ হাজার টাকা।

আমাকে পাঁচ হাজার দিও। তোমার অনেক পরিশ্রম আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি।

দেব, কিন্তু তুই আর এ কাজ করবি না, প্রতিজ্ঞা কর।

চেষ্টা করব, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ক'রে লাভ কি? অপরাধপ্রবণ মনকে চট ক'রে বদলানো যায় না, এ তো তুমি জান। তবে তোমার জন্যলাভ কি বড় কিছু করবার উপায় আছে?

আমাদের অর্থনীতি চর্চা

ভবতোষ দত্ত

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অর্থনীতি অর্বাচীন শাস্ত্র। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন বা গণিতের মত প্রাচীন ঐতিহ্য এর নেই। আরিস্টটলের লেখায় দ্রব্যবিনিময়, দ্রব্যমূল্য বা টাকার সুদ সম্বন্ধে দু' চারটি কথা পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি বিক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র, এর পেছনে কোনো সুসম্বদ্ধ অর্থনীতি নেই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র মূলত প্রশাসন-ব্যবস্থার উপরে লেখা—অর্থনীতি বলতে যা বোঝায় তার আলোচনা তাতে খুব কমই আছে। মনু সংহিতার দু' একটি শ্লোকে করনীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাও রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দেশ ছাড়া আর কিছু নয়। মধ্যযুগে বিক্ষিপ্তভাবে এখানে ওখানে—যেমন ইয়োরোপের 'স্কলস্টিক'দের লেখায় বা আরবী পণ্ডিত ইবন খালদুনের রচনায় অর্থনীতির কোনো কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা আছে, কিন্তু তখনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা হিসাবে অর্থনীতি দানা বাঁধে নি।

এই দানা বাঁধার সুরু হয় ইয়োরোপে 'মার্কেণ্টাইলিস্ট'দের লেখায় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এর আগেই ভারতবর্ষে আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরিতে দেশের আর্থিক কাঠামো এবং সংগঠনের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু আর্থিক সমস্যার কোনো দিক নিয়ে আলোচনা করেন নি। মার্কেণ্টাইলিস্টদের পরে ফরাসী দেশের 'ফিজিয়োক্র্যাট'-রা অর্থনীতির আলোচনায় আরো অনেকটা অগ্রসর করে দেন, কিন্তু ১৭৭৬-এ অ্যাডাম স্মিথ যে 'ক্ল্যাসিক্যাল' যুগ প্রবর্তন করলেন তার আগে বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির পুরোপুরি সূচনা হয়নি। এটা লক্ষ্য করবার জিনিস যে ইয়োরোপে সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদিতে ক্ল্যাসিক্যাল যুগ বলতে বোঝায় প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের যুগ, কিন্তু অর্থনীতির ইতিহাসে ক্ল্যাসিক্যাল যুগ হোল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। আজকালকার অর্থনীতির ছাত্রদের সবিনয়ে মনে রাখা উচিত যে ক্ল্যাসিক্যাল যুগকে যদি বৈজ্ঞানিক অর্থনীতির শৈশব বলে স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে জ্ঞানবিজ্ঞানের দীর্ঘ ইতিহাসে অর্থনীতি একান্তই নবাগত। ঊনিশ শতকেও অর্থনীতির শৈশবের পঙ্গুত্বো কাটেনি। বৈজ্ঞানিক আলোচনা পদ্ধতির বিবর্তনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে অর্থনীতির সাবালকত্ব-প্রাপ্তি বর্তমান শতাব্দীর গত তিন দশকের মধ্যেই হয়েছে।

এই অবস্থায় যদি আমাদের দেশে অর্থনীতির আলোচনা অপটু এবং অসম্পূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। ঊনিশ শতকের ভারতবর্ষে অর্থনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, দাদাভাই নওরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত ছাড়া আর বিশেষ কারও নাম করা যায় না। এঁদের মধ্যে একমাত্র রাণাডেই বৈজ্ঞানিক অর্থনীতি বলতে যা বোঝায় তার আলোচনা করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় অর্থনীতির তত্ত্বের দিকে যান নি। তিনি যে সময়ে লিখেছিলেন সে সময়টা ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সমকালীন হলেও, মলথস্ বা রিকার্ডোর রচনার কোনো প্রভাব রামমোহনের লেখায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তদানীন্তন ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে তিনি বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা করেছিলেন। বিশেষতঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করনীতি ইত্যাদি বিষয়ে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন সেগুলি আশ্চর্যরকমের আধুনিক বলে মনে হবে। দাদাভাই নওরোজিও অর্থনীতির তত্ত্বের দিকে যান নি—ভারতবাসীর দারিদ্র্যের স্বরূপ ও কারণ উদ্ঘাটনের জন্য রাশি রাশি পরিসংখ্যান সংগ্রহেই তিনি নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। রমেশচন্দ্র ছিলেন মূলত ঐতিহাসিক। ভারতের আর্থিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনি যে বিরাট কাজ করে গিয়েছিলেন, তার কাছাকাছি আসতে পারে এমন কোনো বই আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে লেখা হয় নি। আজকালকার অর্থনৈতিক ইতিহাসের যাঁরা গবেষক তাঁরা হয়তো তাঁদের রচনায় রমেশচন্দ্রের পদ্ধতি গ্রহণ করবেন না, কিন্তু রমেশচন্দ্রের কাছে ঋণ-স্বীকার না করে তাঁদের এক পা-ও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

ভারতীয় আর্থিক সমস্যার তাত্ত্বিক দিকটা নিয়ে প্রথম আলোচনা করেছিলেন রাণাডে ঊনিশ শতকের শেষ ভাগে। তথ্যের আলোচনা তখনই সার্থক হয় যখন তার পেছনে একটা বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। রাণাডের রচনা পড়লে এটা সহজেই স্পষ্ট হয়ে আসে যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক—প্রদত্ত তথ্যের মধ্য থেকে ন্যায়-সঙ্গতভাবে সিদ্ধান্তে আসবার চেষ্টাই তিনি করেছিলেন। আগে থেকে ধরে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত প্রমাণ করবার চেষ্টা তিনি করেন নি। এখানে রামমোহনের সঙ্গে রাণাডের কিছুটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু রাণাডে রামমোহন থেকে প্রায় ৬০ বৎসর পরবর্তী হওয়াতে ঊনিশ শতকের ইয়োরোপীয় অর্থশাস্ত্রের বিবর্তনের প্রভাব রাণাডের উপরে খুব বেশি পরিমাণে পড়েছিল। রাণাডে যে সুবিধা [illegible] পেয়েছি[illegible] রামমোহন সেটা পান নি।

রামমোহন, নওরোজি, রাণাডে ও র[illegible] চন্দ্র এই চতুষ্টয় পথপ্রদর্শক [illegible] খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা [illegible] আমাদের দেশের অর্থনীতি[illegible] অনেক দিন ধরে চলে এসেছে [illegible] শতাব্দীর ভারতীয় অর্থনীতি[illegible] আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করে [illegible] পারি—প্রথম, বিংশ শতাব্দীর [illegible] তিরিশ দশক পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়, [illegible] দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত। [illegible] দশকের ঠিক কোন্ জায়গায় [illegible] দুই যুগকে ভাগ করে নেওয়া [illegible] শক্ত। বৈজ্ঞানিক আলোচনার ইতিহাসে [illegible] রেখা কখনোই টানা যায় না। [illegible] যায় যে, তিরিশ দশক পর্যন্ত আমাদের [illegible] একটা বিশেষ ধারার আলোচনা [illegible] ছিলাম এবং আবার এই তিরিশ দশকেই [illegible] একটা নতুন ধারার সূচনা দেখতে পাওয়া যেটা গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে [illegible] ধারণ করার দিকে অনেকটা এগিয়ে এসে[illegible]

ভারতবর্ষে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের অর্থনীতি আলোচনার প্রধান লক্ষ[illegible] জিনিষ হোল জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। [illegible] ধীন দেশে এটাই স্বাভাবিক। [illegible] বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অর্থনীতির তত্ত্ব নিয়ে নানা রকমের গবেষণা চলেছে [illegible] আমরা সরকারী কর্মপন্থার [illegible] সমালোচনার মধ্যেই নিজেদের [illegible] ছিলাম। দেশের দারিদ্র্যের স্বরূপ [illegible] পারছি, মোটামুটি কি হলে এই দারিদ্র্য [illegible] অন্ততঃ মোচন করা যায় [illegible] কিন্তু কোনো কিছু [illegible] আমাদের নেই। এই [illegible] গবেষণা ও অধ্যাপকেরা যদি [illegible] কর্মব্যবস্থার সমালোচনাই নিজেদের কাজ বলে মনে করে থাকেন, [illegible] হবার কিছু নেই। প্রথম মহাযুদ্ধের [illegible] দশকে স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে একটা পন্থার দিক ছিল এবং আর একটা সর[illegible] নীতির সমালোচনার দিক ছিল। স্ব[illegible] আন্দোলনের যুগে দুর্ভিক্ষ, কৃষি [illegible] সমবায়, শিল্পোন্নয়ন, রেলপথ নির্মাণ [illegible] বিষয়ে সরকারী কর্মনীতির সমালোচনা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু এরই সঙ্গে সরকারী নীতি কিভাবে পরিবর্তিত [illegible] উচিত তার পথনির্দেশের চেষ্টাও [illegible] হয়েছিল। নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তীব্র সমালোচনার ভাব জেগে উঠেছিল [illegible] প্রকাশ গোপালকৃষ্ণ গোখলের বক্তৃতায় [illegible] চন্দ্র পালের রচনাবলীতে। [illegible] সরকারী কর্মপন্থার বাইরেও যে সমা[illegible] ভাবে আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতির করা যেতে পারে এ রকম একটা মত[illegible] তখনই গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের "স্ব[illegible] সমাজ" স্বদেশী যুগের কর্মীদের মতবা[illegible] আবেগ এবং আবেদনপূর্ণ প্রকাশ। এই স[illegible] অর্থনীতির লেখকেরা তত্ত্বকথা নিয়ে [illegible] ঘামান নি—চোখের সম্মুখে যে সব স[illegible] প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, তারই দিকে তাঁদের লক্ষ্য সম্পূর্ণভাবে নিবদ্ধ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালেও

...ই অব্যাহত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ...য় হিসাবে অর্থনীতিকে বিশেষ স্থান ...ক দিয়ে দেওয়া হয় নি। ১৯০৯ সালে ...কাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতিকে একটা ...দা পাঠ্য বিষয় বলে স্বীকার করে নেন— ...আগে অর্থনীতি ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের ...ভুক্ত ছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ...[illegible] নেতৃত্বে তৎকাল-স্বীকৃত ...নিক অর্থনীতির যে চর্চা আরম্ভ হয় ...ই ভারতবর্ষে প্রথম এই বিষয়ে বিজ্ঞান-...ত পঠন-পাঠনের চেষ্টা। ক্রমে ভারতবর্ষের ...ন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার পন্থা অনু-...ণ করেন এবং দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে ...রতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক-...রে অর্থনীতি চর্চা আরম্ভ হয়। এই চর্চায় ...টা যতখানি ছিল, গভীরতা ততখানি ...ল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ...ত্রেরা যখন অর্থনীতির চর্চায় যোগ ...লেন তখন এটা আশা করা অসঙ্গত হত না ...তাঁরা তাদের আলোচনা শুধু বিশেষ ...র কর্মপন্থার ভাল-মন্দের মধ্যে আবদ্ধ ...রবেন না। তাঁরা অর্থনীতির বিশ্লেষণী ...তার মধ্যে একটু গভীরভাবে প্রবেশ ...রবেন। বিলাতে এবং তারই প্রতিধ্বনি ...বে আমাদের দেশে অর্থনীতির তাত্ত্বিক ...তার পঠন-পাঠনে তখন আর্লক্রেড ...দের রাজত্ব। এই মার্শালীয় অর্থনীতির ...তৎকালীন ভাষ্য আমাদের অধ্যাপকেরা ...তেন এবং পড়াতেন। ছাত্ররা এই ভাষ্যের ...খ্যা করে পরীক্ষায় পাশ বা ফেল করতো। ...বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই মার্শালীয় ...নীতির ভারতীয় ভাষ্যের যোগ কোথায় ...নিয়ে প্রায় কেউই চিন্তা করেন নি এবং ...বিশ্লেষণের মধ্যে অসম্পূর্ণতা ও ...ত্রুটি কোথায় তাও কেউ ভাববার চেষ্টা ...রেন নি।

...ফলে দেখা গেল যে, দুই যুদ্ধের ...অন্তর্বর্তীকালেও আবার আমাদের অর্থনীতি-...র প্রধানত সাময়িক সমস্যা ও সরকারী ...পন্থার ভাল-মন্দ নিয়েই আলোচনা ...হল। প্রধানত তিনটে বড় সমস্যা নিয়ে ...আমলের আলোচনাগুলি করা হয়েছিল। ...ছিল আমদানী-কর এবং অন্য উপায়ে ...সংরক্ষণের সমস্যা এবং তারই সঙ্গে ...ছিল তদানীন্তন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ...অংশ থেকে আমদানী জিনিসপত্রকে ...সুবিধা দেওয়ার প্রশ্ন। এই আলোচনায় ...ভাবে বিভক্ত দুটো দল ছিল—একটা ...দল এবং আরেকটা প্রতিপক্ষ দল। ...দল নিয়ন্ত্রিতভাবে সংরক্ষণ সমর্থন ...এবং সাম্রাজ্যের অন্য অংশকে সুবিধা ...পক্ষে ছিলেন। বিরোধী দল ছিলেন ...ভাবে সংরক্ষণ পন্থী।

এই ধরণেরই বাদী-বিবাদী বিসম্বাদ দেখা ...ছিল দ্বিতীয় দশকের মধ্যভাগে টাকার ...ময়ের হার সম্বন্ধে আলোচনায়। এই ...লোচনায় দু' দিক থেকে যে যুক্তিজাল ...ত হয়েছিল তাতে অর্থনীতির বিশ্লেষণের ...ওকালতী ছিল বেশী—ষোল পেন্সের ...আর আঠারো পেন্সের দলের মধ্যে যে ...তখন কোলাহলে পরিণত হয়েছিল ...তীব্রতা ছিল, উষ্মা ছিল কিন্তু অভাব ছিল সমসাময়িক মুদ্রা ও বিনিময় তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণের। এই সময়ে যখন ভারতবর্ষের ভাবী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংগঠন নিয়ে কথা ওঠে তখনও আদালতের মামলায় বা ছাত্রদের বিতর্ক সভায় যেভাবে বাদী-বিবাদী দু দিক থেকে যুক্তিজাল বর্ষণ করেন তার চেয়ে বেশী কিছু হয় নি। ১৯৩১-এ ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষকেও স্বর্ণমান ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এর ফলে এবং তখনকার মন্দার অবস্থায় ভারতবর্ষ থেকে তিন বছরে তিনশ' কোটি টাকার সোনা বেরিয়ে যায়। এই স্বর্ণ রপ্তানী নিয়ে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এবং আন্তর্জাতিক লেন-দেনের মূলে নীতি সম্বন্ধে চমৎকার বিশ্লেষণী আলোচনা হতে পারতো। কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসার দিকে কেউ যান নি, দুটো দল তৈরী হয়ে দু' দিক থেকে ভাল-মন্দের আলোচনাই চলতে লাগল। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে কর-জনিত আয়ের বণ্টনের সমস্যা আলোচনাতেই ঠিক একইভাবে দুটো দল তৈরী হয়ে গেল—একটা কেন্দ্র-পন্থী এবং অন্যটি প্রদেশ-পন্থী।

সরকারী কর্মনীতির আলোচনা এবং সমালোচনার প্রয়োজন কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু এই আলোচনা তখনই সার্থক হয় যখন এর পেছনে থাকে গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এদিকটাতেই আমাদের অভাব ছিল। আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে সংরক্ষণ নীতি, রেলপথের অগ্রগতি, সরকারী কর-নীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে বই লিখেছি, কিন্তু ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে বিশ্লেষণী অর্থনীতিতে যে বিরাট পরিবর্তন হতে আরম্ভ হয়েছিল তাতে আমরা অংশ গ্রহণ করিনি। বৈজ্ঞানিক অর্থ-নীতির বিবর্তনের ইতিহাসে ভারতীয় অর্থনীতিবিদের দান ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।

কথাটা রূঢ় শোনালেও, এটাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। আশ্চর্যের কথা এই যে, মাথাওয়ালা পয়লা নম্বরের ছাত্ররাই অর্থনীতির চর্চাতে যোগ দিয়েছিলেন। হয়তো অনেকটা কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে অর্থনীতি পড়ানোর অসম্পূর্ণতার মধ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনেক জায়গায় যুদ্ধের পরেও অর্থতত্ত্ব নাম দিয়ে যে জিনিস পড়ানো হত সেটা তখন বিদেশে বহুলাংশে পরিত্যক্ত। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা নিজেদের নূতন করে গড়ে নিতে পারলেন না, যা নিজেরা শিখেছিলেন বা শিখেছেন বলে মনে করে-ছিলেন তাই শেখাতে লাগলেন। বিশ্লেষণী অর্থনীতি এবং কর্মপন্থা আলোচনার মধ্যে যে একটা যোগসূত্র থাকা দরকার সে কথা মনেও আনলেন না। সমস্ত ব্যাপারটা আরো আশ্চর্য এই জন্য যে, ভারতীয় অধ্যাপক ও তরুণ গবেষকেরা এই সময়েই দর্শনে, পদার্থ-বিদ্যায়, রসায়নে ও গণিতে মূল্যবান বিশ্ব-পাণ্ডিত্যজন স্বীকৃত কাজ করেছেন। অবশ্য, আর্থিক জীবনে সাময়িক সমস্যা খুব বড় হয়েই দেখা দেয়, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের পণ্ডিতের কাছে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সমস্যা এতটা বড় ও নিকট হয়ে সব সময়ে দেখা দেয় না। কিন্তু এ কথাটা আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিতেরা তখনো বোঝেন নি যে, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যে রকম বিজ্ঞানের তত্ত্বের দিকটার উন্নতির প্রয়োজন আর্থিক জীবনের সাময়িক সমস্যার সমাধানের জন্যও ঠিক তেমনি অর্থনীতির তত্ত্বের দিকটার উন্নতি করানো দরকার।

আমাদের অর্থনীতি চর্চার এই দীর্ঘকাল-ব্যাপী অসম্পূর্ণতার কিছু কিছু পরিবর্তন তিরিশ দশকেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু আমরা এদিক থেকে সাবালকত্ব লাভ করেছি দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে। গত পনেরো-কুড়ি বছরে অর্থ-নীতির চর্চায় আমাদের যে উন্নতি হয়েছে তার জন্য আমরা গৌরব বোধ করতে পারি। ভারত-বর্ষে এখন অন্যূন অন্তত দশ-বারোজন তরুণ অর্থনীতিবিদ আছেন তাঁদের কাজ আজ-কালকার পৃথিবীর যে কোন জায়গার উচ্চতম কাজের সমকক্ষ। একটা দেশের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির পথের ধারা ও সমস্যা নিয়ে ইংল্যান্ডের ক্লাসিক্যাল পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছিলেন। এই সমস্যার দিকে আবার আমা-দের নূতন করে নজর পড়ে গত মহাযুদ্ধের কাল থেকে। এই নূতন করে নজর পড়ার মূলে আছে অনুন্নত দেশের দ্রুত আর্থিক উন্নতির প্রয়োজনের উপলব্ধি। আমাদের নবীন অর্থ-নীতিবিদরা এই ক্ষেত্রটিতে অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। এর সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে, এঁরা শুধু আমাদের দেশের বিশেষ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন নি— আর্থিক উন্নতির অর্থনৈতিক বিশ্লেষণকে তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। আজকের পৃথিবীতে আর্থিক উন্নতি বা পরিকল্পনার সমস্যা যেখানেই আলোচিত হচ্ছে, সেখানেই এই ক্ষেত্রে তরুণ ভারতীয় গবেষকদের দান বিশেষভাবে স্বীকৃত হচ্ছে।

শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, আরো অনেক ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির গবেষকরা গত কয়েক বৎসরে অনেক মূল্যবান কাজ করেছেন। ভোগ্যবস্তুর জন্য চাহিদার মূলে কি আছে, [illegible] পরিমাপ করা কতটা সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে দু-একজন তরুণ ভারতীয় উচ্চাঙ্গের রচনা প্রকাশ করেছেন। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব অনুশীলনে যে সব সমস্যা বহু দিন ধরে অমীমাংসিত ছিল সেগুলিকে মীমাংসার পথে বহু দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন দু'-তিনজন ভারতীয় নবীন অর্থনীতিবিদ এ রকম উদাহরণ আরও দেওয়া চলে। সবশুদ্ধ দেখা

যাচ্ছে যে, এমন অন্ততঃ কয়েকজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ আছেন (এ'দের বেশীর ভাগই বাঙালী) যাঁরা অর্থনীতির বিবর্তনের ইতিহাসে তাঁদের নিজেদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এদিক থেকে আমাদের অর্থনীতি চর্চার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হবার সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু অন্য দিকে নৈরাশ্যের কারণও প্রচুর বর্তমান। যে কয়েকজন অর্থনীতির গবেষক উ'চুদরের কাজ করেছেন তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে। কলেজের সংখ্যা কয়েক হাজার। এর মধ্যে বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই অর্থনীতির নাম করে যা শেখানো হয় সেটা অনর্থনীতিরই নামান্তর। ভাল বই, ভাল লেখা আগের তুলনায় অনেক বেশী প্রকাশিত হচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লেখা বই ও প্রবন্ধের সংখ্যা এত বেশী যে, ভাল লেখাগুলিকে অনেক সময় খু'জে পাওয়া শক্ত। এর প্রধান কারণ হোল যে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনা পদ্ধতিতে এবং অধ্যাপনার বিষয়-বস্তুতে যে সমূহ পরিবর্তন আসা উচিত ছিল সেটা আসে নি। ছাত্ররা নূতন অর্থনীতি শিখবার জন্য তৈরী হয়েছে, অধ্যাপকেরা সব সময়ে তাঁদের পুরোনো সংস্কার এবং অসম্পূর্ণ শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। এই অসম্পূর্ণ, অনাধুনিক এবং অসার্থক শিক্ষণের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থা, যার ফলে পরীক্ষা ভাল করে পাশ করতে হলে লেখা-পড়ার প্রয়োজন নেই। এই প্রথা জটিল জালের মত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমাদের সাধারণ পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা ব্যবস্থার ফলে যাঁরা পাশ করে বেরিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আসছেন, তাঁদের অনেকেরই গবেষণা করবার মত প্রাথমিক জ্ঞান লাভই হয়নি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁদের ঠিক পথে পরিচালিত করবার মত শিক্ষকেরও অভাব। তাই আমাদের গবেষক-ছাত্রদের বেশীর ভাগ গবেষণাই হয় বর্ণনাত্মক — বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার সংখ্যা মুষ্টিমেয়। দুই ধরণের অর্থনৈতিক গবেষণা আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব বেশী দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমটা হল 'সার্ভে' বা বিবরণ। একটি গ্রাম বা অঞ্চলকে বিবরণের বিষয়-বস্তু করে, সেখানে ক'জন লোক আছে, ক'জন স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা কত, কতটা কার চাষের জমি, গরু-বাছুর কার ক'টা আছে ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্ভুল বা ভুল সাজানো-গোছানো বা অগোছালো তথ্য কিছুটা সংগ্রহ করে এক সঙ্গে লিখে দিলেই 'সার্ভে' হয়ে গেল এবং হয়তো একটা ডক্টরেটের দাবীও তৈরী হয়ে গেল। 'সার্ভে' খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস, কিন্তু বিনা বিচারে বেছে নেওয়া একটা মাত্র গ্রাম সম্বন্ধে একজন মাত্র গবেষকের আকস্মিক একটি কাজে কারো কিছু লাভ হয় না, যিনি ডিগ্রি পান তাঁর ছাড়া। এ কাজ ভাল করে করতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং এ জাতীয় সমীক্ষার কতগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মও আছে। মোটামুটি যা জানাই আছে, সে সম্বন্ধে আরো একটা বর্ণনা মাত্র দিলে আর

যাই হোক সেটা অর্থনীতির গবেষণা হয় না। দ্বিতীয় ধরণের গবেষণা হল কোনো একটা সরকারী কর্মনীতির ধারাবাহিক বর্ণনা ও আলোচনা। এর জন্যও বিদ্যাবুদ্ধি বা বিশ্লেষণী শক্তির প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন শুধু একপ্রস্থ সরকারী রিপোর্ট এবং কাঁচি-আঠা। সরকারী রিপোর্টের সারাংশ ও পরিসংখ্যান কালানুক্রমিকভাবে পর পর সাজিয়ে গেলেই এই জাতীয় গবেষণা সম্পূর্ণ হয়। নিজের বিশেষ কিছু লিখতে হয় না। দুঃখের কথা, এক দিকে যেমন কয়েকজন অর্থনীতিবিদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন, অন্য দিকে তেমনি বর্ণনা বিশারদ বা জোড়াতালি বিশারদেরা বহু বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানে আসর জাঁকিয়ে আছেন। তাঁদের হাতেই পঠন-পাঠন এবং গবেষণার পরিচালনার ভার।

এই অবস্থার প্রতিকার যদি না হয় তাহলে আমাদের দেশে অর্থনীতি শিক্ষা ও চর্চার সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন উন্নতি কখনো হবে না। এর জন্য প্রধান দায়িত্ব আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির। পরীক্ষা নেওয়া ও পরীক্ষা পাশ করানো এবং মাঝে মাঝে কিছু অর্থহীন গবেষণাকে উপাধি দিয়ে ভূষিত করাই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ নয়, এটা আজ ভাল করে মনে রাখবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা গণিতে আমরা পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে স্থান করে নিতে পেরেছি, এত বছরের চেষ্টার পরেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ততটা স্থান নিতে আমরা পেরে উঠলাম না কেন? অর্থনীতির গবেষণার ফলে যে নূতন নূতন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হচ্ছে তার মধ্যে আমাদের সব ছাত্রদের আমরা প্রবেশ করাতে পারি না কেন? অর্থনীতির নূতন নূতন শাখাতে যে সব বই এবং প্রবন্ধ বিদেশে প্রকাশিত হয় তার অর্থ গ্রহণ করতে আমাদের একটি শিক্ষক বা ছাত্রও অক্ষম হবেন কেন? অর্থনীতির তাত্ত্বিক দিকটা ছেড়ে দিলেও প্রশ্ন করা যায় রমেশচন্দ্র দত্তের পরে আজ পর্যন্ত কেউ ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ আর্থিক ইতিহাস রচনা করতে পারলেন না কেন?

এই অবস্থার মধ্যেও যে অল্প কয়েকজন বহুদূর অগ্রসর হতে পেরেছেন তাঁদের কৃতিত্বের সীমা নেই, কিন্তু এটা আমাদের গৌরবের কথা নয় যে এ'দের সংখ্যা এখনো খুব কম এবং এটা আরো অগৌরবের কথা যে এ'দের প্রধান কাজ এ'রা করেছেন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে তরুণ অর্থনীতিবিদদের নিয়ে আমাদের গর্ব, তাঁদের প্রত্যেকেরই এক পা ভারতবর্ষে আর আর এক পা লণ্ডনে বা কেম্ব্রিজে, ক্যাম্ব্রিজে বা বস্টন সহরের আশে-পাশে। আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে যাঁদের নিবিড় পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে আমাদের দেশে প্রতিভাবান এবং বিদ্যোৎসাহী ছাত্রের অভাব নেই। এই ছাত্ররা যে ধরণের বিদ্যালাভের অধিকারী সেটা তাঁরা পান না। পঠন-পাঠন এবং পাঠ্যক্রমকে পরীক্ষা-কেন্দ্রিক করে এবং একটা কালজীর্ণ ও নানা রকমের অশুভ ব্যাধিগ্রস্ত একটা পরীক্ষা-পদ্ধতির ভিতর দিয়ে যদি সব কিছু বিচার করতে হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের প্রতি একটা নিরাট অন্যায় করা হয়।

আমাদের অর্থনীতি চর্চায় উন্নততর প্রণালী যদি আমরা আনতে চাই তাহলে কয়েকটি অবশ্য করণীয় আছে। প্রথমত, এমন কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান (তার নাম স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় যাই হোক না কেন) প্রয়োজন যেখানে বুদ্ধিমান ছাত্ররা অল্প বয়স থেকে আরম্ভ করে অনেক বছর একটানা একই ধরনে পড়াশোনা এবং পরে গবেষণা করতে পারবেন। এখন যাঁরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করেন তাঁরা নানা স্তরের, নানা ধরণের পাঁচমিশেলী অর্থনীতির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যান। এতে অর্থব্যয় হয়, কিন্তু অর্থনীতিবিদ তৈরি হয় না। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বল্প সংখ্যক উচ্চস্তরের অর্থনীতির অধ্যাপক ও গবেষকদের এই কয়েকটি বাছাই করা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে একত্রিত করা প্রয়োজন। সব অনধিকারীর মধ্যে একটি সুপণ্ডিত অধ্যাপক নিজেকে পরাভূত বোধ করেন—এক সঙ্গে কয়েকজন ভালো অর্থনীতিবিদ থাকলে তাঁরা অনেক কাজ করতে পারবেন। তৃতীয় প্রয়োজন আমাদের তরুণ গবেষকদের মধ্যে যাঁরা বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করছেন তাঁদের সমাদরে ডেকে আনা। এ'রা অধিকতর উপার্জনের লোভে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন এটা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। এ'রা যেটা চান সেটা হোল বিদ্যাচর্চায় অনুকূল এবং অবাধ পরিবেশ। এই পরিবেশ যদি সারা ভারতবর্ষে তিন চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও গড়ে তোলা যায় তাহলে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের আমরা সহজেই টেনে আনতে পারব। সবশেষে প্রয়োজন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগ। কলকাতা বা দিল্লীর মত জায়গায় এই সহযোগ সহজেই পাওয়া যাবে না কেন সেটা বোঝা শক্ত, কিন্তু পাওয়া যে যায় না এটা ঠিক। মূলত সব কিছুরই পেছনে আছে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের প্রয়োজন। বহু নৈরাশ্যের মধ্যেও এই পরিবর্তনের আশা যদি রাখতে পারি, তাহলেই দেশের জ্ঞানচর্চার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হতে পারি।

জয়যাত্রা

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

তুমি সন্তান!
ওরা হানাদার—
হানা দেয় দ্বারদেশে,
ওদের হস্তে ঈর্ষা মশাল জ্বলে।
তুমি ঋত্বিক জাগ্রত তপোবনে,
দেউলে তোমার আহব বহ্নিশিখা;
কৃপাণে ঝলিছে মাভৈঃ মন্ত্র,
মহাবল হৃদিতলে।
মুক্তি তোমার শান্তির বাণী ছড়ায়েছে দিকে দিকে,
করনি কো ভয় মৃত্যুরে কোনদিন।
মুঠিভরা প্রাণ অঞ্জলি দিয়া ঈর্ষা করেছ জয়ঃ
হিংসা অনল নিবায়েছ প্রেমে, মৃত্যুরে করি ক্ষয়।
তুমি ঋত্বিক,
কৃপাণে তোমার ঈশানী ফেলিছে শ্বাস।
পলকে ঝঞ্ঝা তুলিতে যে পার,
তবু ক্ষমাশীল অন্তরে তুমি চেয়ে আছো অনিমিখে।
মাতৃপূজার আসনে তোমার সিংহ বাহিনী উমা,
দশ হাতে তার দশপ্রহরণ, নয়নে অপার ক্ষমা!
নিন্দিত যাহা নহে সুন্দর,
হিংস্র অসুর হেয় বর্বর,
জানি তুমি কভু নও দুর্বল তাহারে হানিতে শূলে।
ক্ষত্র তোমার ক্ষাত্রিয়সম অরি করে নির্মূলে।
শত্রুরে তুমি করিয়াছ ক্ষমা, ক্ষমাসুন্দর চোখে;
অমৃতের বাণী শুনায়েছ তুমি,
তীর্থ করেছ এ ভারতভূমি,
মৃত্যু জয়ের মহাবেদ গান ধ্বনিয়া মর্তলোকে।
সেই তপোবনে ঘটে যদি কোন দানবের অনাচার,
জানি তুমি তারে করিবে না ক্ষমা—
মৃত্যু অশনি অসহ ঝঞ্ঝা হানিবে দুর্নিবার।
দশপ্রহারিণী দেবতা তোমার,
ভৈরব দুর্জয়!
জটা পিঙ্গলে বহে প্রাণস্রোত,
হস্তে ডমরু ডঙ্কা।
অমর ঈশান বাজায় বিষাণ নাই ভয়, নাই শঙ্কা।
ওরে সৈনিক! নাই ভয়, তোর নাই ভয়।
আগে চল তুই দুর্জয় বেগে,
হবে জয় তোর হবে জয়।

কোনো একটি ঘরে

উমা দেবী

এ ঘরে ধুলো নেই—
যে ধুলো অনন্ত শূন্যের মহাপথ থেকে
সূর্যালোক বয়ে আনে,
আকাশকে করে সুনীল
আর ধরণীকে করে বিচিত্রবরণী।
এ ঘরে ধুলো নেই—
কারণ এর শার্সিগুলো বন্ধ করা—
তার উপরে ঝুলছে লাল ভেলভেটের মোটা পর্দা
সোনালী কার্ণিশ থেকে।
উপরে আলো যাতায়াতের পথগুলি
কাচ টেনে বন্ধ করা।
এর মেজের পুরু গালচের বহুবিরঞ্জিত লতাপুষ্পের অন্তরালে
বিচিত্র পাখিগুলির ওড়বার প্রয়াস শুধু ভঙ্গিসর্বস্ব।
মনে হয় যেন একটি উদ্যানকে ধরণীর গাত্র থেকে টেনে ছুলে এনে
শুকিয়ে পেতে দেওয়া হয়েছে এই ঘরে।
এ ঘরে ধুলো নেই—তাই ওরা ছবি মাত্র।

এ ঘরে ধুলো নেই। তাই এই মেয়েটির চোখ
নীলাভ কাচের টুকরো শুধু।
তাতে দুটি কালো তারা আছে—
কিন্তু তারা নিভে যাওয়া নক্ষত্রের তুলনা।
তার এনামেল-করা মসৃণ মুখের শুভ্র দ্যুতি,
তার বিলম্বিত দুটি বাহুর স্থির অবস্থান,
তার মেরুন রঙের শাড়ীর নিভাঁজ সৌন্দর্য,
—সবই বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছে
এ ঘরে ধুলো নেই—এ ঘরে ধুলো নেই।
কোনো চৈত্রের উদ্দাম বাতাস পারবে না এ ঘরে ঢুকতে
শুকনো পাতা আর ধুলো নিয়ে—
পারবে না ঢুকতে হঠাৎ-জাগা কাল বৈশাখী
কোনো অকাল বসন্তের দ্রুত উৎপাত নিয়ে—
করবে না ভুল ঐ মেয়েটি জীবনের কোনো কর্তব্যে—
কেন না ধুলো করবে না কোনো দিনও ওর দৃষ্টিকে
সংশয়াচ্ছন্ন ও সজল,
ধুলোয় ভরবে না কোনোদিনও ওর মনের ধরণী,
যে ধুলো অনন্ত মহাশূন্য থেকে
সূর্যালোক টেনে এনে আকাশকে করে সুনীল
আর ধরণীকে নানাবর্ণে সুরঞ্জিতা।

সমবেদনা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

স্বামী বাড়ীতে নেই, আট বছরের ছেলেটাকেও নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে। নিজের দরকারী কাজকর্ম সেরে, তিনটের সময় ছেলেকে সার্কাস দেখিয়ে জংশন সহর থেকে রওনা হতে হতে সাতটা। তখন আর এ লাইনে ট্রেণ থাকবে না, হয় বাসে নইলে কোনো একটা চলতি ট্রাকে কিছু পয়সা দিয়ে ফিরে আসবেন দু-জন। তার মানে রাত আটটার আগে কিছুতেই নয়।

আর এই বেলা এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার উনুন ধরানো পর্যন্ত উমার ছুটি। কোনো কাজ নেই—কোনো তাড়া নেই। এখন স্নান করে, খেয়ে, নিশ্চিন্তে ঘন্টা তিনেক ঘুমিয়ে নেওয়া চলে। কিন্তু এই শীতের দুপুরে ঘুমোনো ভারী খারাপ—অন্তত উমার ধাতে একেবারেই সয় না। মাথা ভার হয়ে যায়, গা ম্যাজ-ম্যাজ করতে থাকে, কোনো কাজে মন বসে না। না—ঘুমোনো চলবে না।

উনি সেই যে কোত্থেকে মোটা একটা বাংলা উপন্যাস নিয়ে এসেছেন, সেটাও অবশ্য পড়া যেতে পারে। কিন্তু অত বড় ধুমসো বইটার গোটা পঞ্চাশ পাতা পড়েই মন খারাপ হয়ে গেছে উমার। বেশ প্রেম করে বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু দুম্‌ করে স্বামী মোটর চাপা পড়ে মারা গেল। তারপর আর ভালো লাগে পড়তে? শেষ পাতাটা তবু উল্টে দেখেছিল, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না ব্যাপারটা। কোত্থেকে শাশ্বতী বলে আর একটা মেয়ের আমদানী হয়েছে—সে সুজয় বলে একটা ছেলেকে ইংরেজি - বাংলা মেশানো কী যেন লেকচার দিয়ে বোঝাচ্ছে সমস্ত। 'দুত্তোর' বলে বইটা বন্ধ করেছে উমা। কী যে হয়েছে আজকালকার উপন্যাস—কোথায় সুরু হয় আর কোথায় শেষ হয়, কিছু বুঝতে পারা যায় না।

উমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। একটু দূরে রেলের ছোট্ট লাইন, কয়েকটা নেপালী বাচ্চা কয়লার টুকরো কুড়োচ্ছে সেখানে। সামনে পাহাড়ের টিলার ওপর শাদা কবরটার সামনে যে বাঁশটা পোঁতা রয়েছে—অনেকগুলো ফালি ফালি কাপড়ের টুকরো নিশানের মতো উড়ছে তা থেকে, কী যেন মন্ত্রতন্ত্র লেখা রয়েছে তাদের গায়ে। লাইনের ধারে ধারে বুনো টোমাটো গাছ জন্মেছে কতগুলো, ছোট্ট ছোট্ট লাল টোমাটো টুকটুক করছে তাতে। বাঁ দিকের নীল-সবুজ পাহাড়টার কোলে থরে থরে থাক-কাটা সব্জীর ক্ষেত, কপি হয়েছে, লাউ-কুমড়ো ধরেছে, ভরে গেছে মিঠে কড়াইশুঁটিতে। কোথাও কুয়াশা নেই, লাল মিঠে রোদে হেসে উঠছে চারদিক।

তখন মনে পড়ল, কাজ আছে বই কি। খোকার নতুন সোয়েটারটার গলার কাজ এখনো বাকী। পুরোনোটা ছোট হয়ে গেছে, আজ ছেলেটার মাথায় ঢোকাতে অসুবিধে হচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়ার পর ওইটে নিয়েই বসতে হবে তাকে।

সদর দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছে, ঠিক তখন কে ডাকল : শুনুন?

উমা তাকিয়ে দেখল। তারই বয়েসী একটি মেয়ে। হাতে বড়ো একটা ব্যাগ, কাঁধে ঝোলা। গায়ে ফিকে নীল রং-এর স্কার্ফ। রোগা, শ্যামবর্ণ চেহারা—চোখে চশমা।

উমা অবাক হল একটু। ঠিক এই রকম জায়গায় এমন একটি মেয়েকে আশা করা যায় না।

মেয়েটি আবার বললে, আপনি বাঙালী তো?

—হ্যাঁ। কেন বলুনদিকি?

—দু-একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে—যদি অনুমতি দেন।

উমার আরো অবাক লাগল। চশমাপরা ব্যাগ হাতে একটি আধুনিকা মেয়ে তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে অনুমতি চাইছে—এমন ঘটনা ছোট লাইনের আরো ছোট রেলকর্মচারীর স্ত্রী উমার জীবনে এই প্রথম। এত লজ্জা হল যে সামনের মানুষটি নিতান্তই মেয়ে না হলে সে একগলা ঘোমটা টেনে দিত।

—আসুন আসুন—ভেতরে আসুন।

কাঠের ছোট্ট বাড়ী—রান্নার চালাটুকু বাদ দিলে দুখানি ঘর। বাইরের ঘরখানাতে সর্ব-সাকুল্যে হাত পাঁচেক জায়গাও আছে কিনা সন্দেহ। তারই মধ্যে স্বামী খান দুই চেয়ার পেতেছেন, একটা ছোট্ট টেবিল রয়েছে—তাতে ফুলদানিও আছে যদিও কখনো ফুল থাকে না। দেওয়ালে রঙ্গীন ক্যালেণ্ডার, কামাখ্যা মন্দিরের ছবি, গান্ধীজীর ছবি একখানা। আর এখানে ওখানে গোটা কয়েক জলছবিও মারা হয়েছে—সেটা অবশ্য উমার ছেলের কীর্তি।

মেয়েটি একটা চেয়ারে বসে পড়ে ঘর-খানাকে পর্যবেক্ষণ করল একবার। তারপর বললে, আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করলুম কিনা বুঝতে পারছি না। এখনো বোধ হয় আপনার চান-খাওয়া কিছুই হয়নি।

উমা লজ্জিত হয়ে হাসল : সেজন্যে আপনি ভাববেন না। কি বলবেন বলুন।

—বলছি। এক গ্লাস জল খাওয়াতে পারেন তার আগে?

একটুখানি সন্দেহের ছায়া নামল উমার মনে, কুঁচকে এল কপালটা। এই তো মাস ছয়েক আগে একটা কাণ্ড হয়ে গেছে জংশন ষ্টেশনের সহরে, স্বামী বলেছিলেন ব্যাপারটা। বাড়ীর উকিল কর্তা কোর্টে গেছেন, গিন্নী একা—কোত্থেকে একটা লোক এসে বললে, আমি বাবুর পুরোনো মক্কেল। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে মা—একটু জল খাওয়াতে পারেন? গিন্নী জল আনতে গেছেন, সেই ফাঁকে ঘরের ঘড়ি আর কতগুলো আইনের বই নিয়ে লোকটা হাওয়া।

কিন্তু এই মেয়েটি—

না—না, সে অসম্ভব। ভদ্র ঘরের বাঙ্গালী মেয়ে, চোখে চশমা, সঙ্গে ব্যাগ—লেখাপড়া জানে মনে হয়। মিষ্টি শান্ত মুখখানা—এ কখনো চুরি করতে পারে। আর এখানে চুরি করে পালাবেই বা কোথায়? ছি—ছি।

উমা জিজ্ঞেস করলে, চা খাবেন?

—চা? —মেয়েটি হাসল, উমা দেখল ভারী সুন্দর তার হাসিটি : চা পেলে যে খুব মন্দ হয় তা নয়, কিন্তু এত বেলায় আপনার—

—কিছু অসুবিধে হবে না, পাঁচ মিনিটে করে আনছি। বসুন আপনি।

পাঁচ মিনিটই লাগল, তার বেশি নয়। পাহাড়ে জায়গা, শীতের সময়, আধনেভা উনুনে একটা বড়ো কেটলিতে উমার চায়ের জল ফুটছিল। চা হয়ে গেল তা থেকেই। বাইরের একজন লোক এসেছে, শুধু চা তাকে দেওয়া যায় না, একটা প্লেটে খান চারেক বিস্কুটও সাজিয়ে আনল উমা।

মেয়েটি বললে, আবার বিস্কুট আনলেন কেন? শুধু চায়েই তো হয়ে যেত।

উমা হাসল, জবাব দিল না।

মেয়েটি চা খেতে লাগল। উমার মনে হল ওর ক্ষিদে পেয়েছিল, সত্যি-সত্যিই দরকার ছিল বিস্কুট ক'খানা।

বাইরের একটি অচেনা মেয়েকে এ-ভাবে আপ্যায়ন করবার কি দরকার ছিল, সে-কথাটা নিজের কাছেই জেগে উঠল একবার। কিন্তু এই মেয়েটি যতই আধুনিকা হোক, চশমা পরুক, ব্যাগ আর ঝোলা নিয়ে একা-একা ঘুরে বেড়াক—কোথায় যেন একটা ক্লান্ত করুণতা আছে ওর মধ্যে—কেমন একটা মায়া জেগে উঠেছে উমার। তা ছাড়া পাহাড়ের কোলে এই ছোট্ট রেলের ষ্টেশন। তিন মাস আগে হরিশবাবু বদলী হয়ে যাওয়ার পর থেকে একটি বাঙ্গালী মেয়ের সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ তার হয়নি; হরিশবাবুর জায়গায় এসেছেন একজন নেপালী ভদ্রলোক—বিয়ে-থা'ও করেন নি তিনি। কাজেই এই মেয়েটিকে দেখে গল্প করবার একটা দুর্জয় প্রলোভন জেগে উঠেছে তার মনে।

কিন্তু এখানে এ এল কোত্থেকে? কে এ?

মেয়েটি বোধ হয় উমার চোখের প্রশ্ন বুঝতে পারল। চা-বিস্কুট শেষ করে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলে, খুব অবাক হয়ে গেছেন আমাকে দেখে—না?

—একটু। আপনি এখানে—

—বলছি। তার আগে একটা কথার জবাব দিন। আপনারা ক'ঘর বাঙ্গালী আছেন এখানে?

—বলতে গেলে শুধু আমরাই। আর এক বুড়ো কবিরাজ মশাই আছেন বাজারের দিকে—একাই থাকেন তিনি।

—অবস্থাপন্ন নেপালী কেউ নেই?

—বিশেষ নয়। তবে একজন মাড়োয়ারী আছেন—আগরওয়ালা। বাজারের সবচাইতে বড়ো দোকানটা তাঁরই।

—সেখানে গিয়েছিলুম, সুবিধে হল না—মেয়েটি আবার ক্লান্তভাবে হাসল।

আবার সন্দেহ জাগল উমার মনে। কী চায় এ? কোনো সাহায্য? কোনো চাঁদা? ভাবতে গিয়েই একটু আগেকার কোমলতাটা শক্ত হয়ে উঠল। আজ মাসের ছাব্বিশ তারিখ। গরীব কেরাণীর সংসারে এখন প্রত্যেকটি পয়সার সতর্ক হিসেব। এই সময় কিছু চেয়ে বসলে একটা অত্যন্ত অপ্রিয় প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কিছুই করবার নেই তার।

উমা তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটির দিকে তাকালো : আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

—এইবার বুঝবেন। আচ্ছা, সেলাইয়ের কল আছে আপনার?

—সেলাইয়ের কল। —উমা আকাশ থেকে পড়ল।

—হ্যাঁ, আছে আপনার?

—না। কিন্তু কেন বলুন তো? জামা-কাপড় কিছু ছিঁড়ে গেছে আপনার? দিন না—সূঁচ-সুতো দিয়ে সেলাই করে দিচ্ছি।

—না, তার দরকার নেই। —মেয়েটি মিষ্টি করে হাসল : বলছিলুম, আমি একটা সেলাই-কল কোম্পানির এজেন্ট।

—কী বললেন?

—এজেন্ট। কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না? —চামড়ার ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল কতগুলো কাগজপত্র : নতুন কোম্পানি আমাদের—দু'রকম মেশিন বের করেছি আমরা। এই যে ছবি দেখুন। এ হল 'গৃহিণী'—অর্থাৎ গেরস্ত-বাড়ীর জন্যে। আর এটা 'সীবনী'—মোটামুটি দর্জিদের জন্যেই—তবে বড় সংসারেও কাজে চলে।

'গৃহিণী' নয়, 'সীবনী' নয়—উমা মেয়েটির মুখের দিকেই চেয়ে রইল। শুনেছিল বটে কলকাতায় আজকাল মেয়েরা নানা রকম কাজ করে, কিন্তু জলজ্যান্ত একজন 'এজেন্ট' তার সামনে এই প্রথম। শ্যামবর্ণ ক্লান্ত চেহারার এই মেয়েটির কি এ-কাজ মানায়? ঘর নেই, সংসার নেই, একটা চামড়ার ব্যাগ আর মস্ত বড় ঝোলা কাঁধে নিয়ে সারা দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে। মমতায় উমার মন বিষণ্ণ হয়ে গেল।

মেয়েটি মুখস্থের মতো বলে চলেছিল, দিশী জিনিষ, কিন্তু কাজে বিলিতী মেশিনের চাইতে কোনো দিক থেকে কম নয়। আর কত সস্তা, তা-ও দেখুন। কিনতেও অসুবিধে নেই। আপনাদের জংশন সহরেই আমাদের এজেন্ট রয়েছেন—তাঁর কাছেই পাবেন। তাঁরাই ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন সমস্ত। মাত্র পঞ্চাশ টাকা দিলেই মেশিন ডেলিভারী, তারপর সহজ ইনস্টলমেণ্ট। অর্ডার ফর্ম আমার কাছেই রয়েছে—এটাতে সই করে দিতে পারেন এক্ষুণি, কিংবা এটা রেখে দিন—পরেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। শুধু একটা কথা আমি এতে লিখে দিচ্ছি : রিপ্রেজেণ্টেড বাই অণিমা চক্রবর্তী।

—ও, আপনিই বুঝি—

—হ্যাঁ, অণিমা চক্রবর্তী।

উমা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। বাইরে ছোট লাইনের এঞ্জিন শাণ্টিং করছে। হাওয়ায় ভিজে ভিজে মাটি আর সবজীর নরম গন্ধ। অঘ্রাণের রোদে একটু একটু করে ঝিমিয়ে আসছে ছোট পাহাড়ী গঞ্জটি। চারদিকে একটা শিথিল বিশ্রাম। শুধু অণিমা চক্রবর্তীর শ্রান্তি নেই—সেলাইয়ের কল বেচবার জন্যে দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

—আমাদের মেশিন যদি একবার ট্রাই করেন—

উমা বিমর্ষ চোখ তুলল তার দিকে : মিথ্যে এ-সব বলছেন আমাকে। আমার স্বামী বাড়ী নেই—তিনি না থাকলে কোনো কথাই হতে পারে না।

—কখন ফিরবেন?

—রাত সাতটা-আটটার আগে নয়। জংশনে গেছেন।

—ও। কাগজপত্রগুলো কিছুক্ষণ অন্য-মনস্কভাবে নাড়াচাড়া করল অণিমা : তা হলে—

—কাল এলে দেখা হতে পারে। কিন্তু—উমা একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলল : কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না। সেলাইয়ের কল একটা থাকলে অবিশ্যি খুব ভালোই হয়, কিন্তু ওর

যা মাইনে, তাতে পঞ্চাশ কেন, পাঁচ টাকা দেওয়াও আমাদের পক্ষে শক্ত। অণিমা হাল ছাড়ল না ঃ একটু কষ্ট করে কিনে ফেললে কিন্তু ঠকবেন না। পরিশ্রম, দর্জির খরচ, ঝঞ্ঝাট—

—আমাদের সংসারে দর্জির খরচ কি খুব বেশি বলে মনে হয় আপনার? —উমা হাসল ঃ তা ছাড়া এক আধটু ঝঞ্ঝাট না পোয়ালে গেরস্ত বৌয়েরই বা কী করে চলবে বলুন? কী নিয়ে থাকব?

—অর্ডার ফর্মটা বরং রেখে যাই। একটু ভেবে দেখবেন আপনারা।

—ভাববার কিছু নেই। ও আপনি নিয়েই যান—আর কাউকে দেবেন। মিথ্যে নষ্ট হবে এখানে পড়ে থাকলে।

—আচ্ছা, কী আর করা যাবে তা হলে—ব্যাগে আবার কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে অণিমা চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালো ঃ নিতে না পারলে তো কোনো কথাই নেই। আসি ভাই তবে। চা খাওয়ালেন, বিস্তর আদরযত্ন করলেন— অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

উমা দাঁড়িয়ে পড়ল চেয়ার ছেড়েঃ কোথায় যাবেন এখন?

—জংশনে।

—এখন তো কোনো ট্রেণ নেই। তা ছাড়া এই দুপুরের দিকে বাসও বিশেষ পাওয়া যায় না। যেতে তো দুটো-তিনটে বেজে যাবে।

—তা হোক—আমি চলি। নমস্কার—

অণিমা দরজার বাইরে পা দিয়েছিল, উমা পিছু ডাকল।

—আচ্ছা—শুনুন?

অণিমা ফিরে দাঁড়ালো। আশার একটুখানি আলো জ্বলে উঠল চোখে।

—বলছেন কিছু?

—যদি রাগ না করেন—জিজ্ঞেস করব একটা কথা?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়। —অণিমা হাসল ঃ আপনি তো এতক্ষণ কিছুই জিজ্ঞেস করেননি আমাকে—আমিই বকে গেছি একটানা। বলুন না কী বলবেন।

—আপনি কি জংশনেই থাকেন?

—না। কাল এসেছি, আবার আগামীকাল-পরশুই চলে যাব আসামের দিকে। এমনি করে ঘুরে ঘুরে বেড়ানোই আমাদের কাজ। একটা হোটেলে উঠেছি ওখানে।

—তা হলে—উমা একবার ইতস্ততঃ করল ঃ কিছু যদি মনে না করেন, দুটি খেয়ে যান এখান থেকে।

—আপনার এখানে? এতবেলায়? —অণিমা চমকে উঠলঃ না—না, ও সব কিছু দরকার নেই। আমি চলি।

—আমার কোনো অসুবিধে নেই। খেয়ে যান আপনি।

—অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু সত্যিই কোনো দরকার নেই আমার। জংশনে গিয়ে খাব এখন।

—তার মানে আপনার সেলাইয়ের কল কিনিনি বলে রাগ করে খাবেন না—এই তো?

—এবারে লজ্জা দিলেন—হেসে ফিরে এল অণিমা চক্রবর্তী ঃ ভেবেছিলুম স্টেশনের দোকানের পুরী-তরকারীতেই চালিয়ে নেব, কিন্তু আপনার হাঁড়িতেই চাল মাপা আছে—ফেলে পালাব কী করে!

রইল পড়ে সেলাইয়ের কল, রইল ব্যবসাদারী আলোচনা। উনুনে আরো চারটি আতপ চাল ফুটিয়ে নিয়ে দুজনে এক সঙ্গে যখন খেতে বসল, তখন মাঝখানের সব আড়াল সরে গেছে দুজনের।

—শুধু শুধু আটকে রেখেছি বুঝি আপনাকে? জানেন, আজ তিন মাস ধরে মন খুলে গল্প করতে পারি না কারুর সংগে। প্রাণটা একেবারে ছটফট করছিল।

—তবু বেশ আছেন ভাই! —অণিমার নিঃশ্বাস পড়ল ঃ আমাকে এত বেশি কথা কইতে হয় যে মধ্যে মধ্যে ভাবি কয়েক দিন চুপ করে থাকতে পারলে বেঁচে যেতুম।

—কেন বলছেন এ-কথা! কেমন স্বাধীন জীবন আপনাদের।

—স্বাধীন? হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। —অণিমা আঙুল দিয়ে ভাতগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। হয়তো আরো কিছু তার বলবার ছিল, কিন্তু সামলে নিলে নিজেকে।

সামান্যই খাওয়ার আয়োজন, ভাত-ডাল-মাছের ঝোল, আর অতিথির সম্মানে একটা ডিম সেদ্ধ দিয়েছিল উমা। কিন্তু অণিমার খাওয়া দেখে উমার মন ছলছল করতে লাগল। যেন কতদিন ভালো করে খায় না—কতকাল এতটুকু যত্নও কোথাও পায়নি সে।

—ভারী সুন্দর রান্না ভাই আপনার। কী যে ভালো লাগল।

—ভালো লাগল আপনার খিদে পেয়েছে বলে। রান্না তো কিছুই হয়নি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল অণিমা। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আপনার কথা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না ভাই। চেনা নেই জানা নেই—আদর করে বসালেন, খাওয়ালেন, আপন করে নিলেন। এ অভিজ্ঞতা আমাদের কখনো হয় না। লোকের বাড়ীতে গেলে তারা বিদেয় করবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে—ভাবে, কতক্ষণে আপদ দূরে হয়ে যাবে।

—ছি-ছি, কী যে বলেন!

—এই দেখুন না, বেলা একটার সময় এসে কী বিরক্তটাই করলুম আপনাকে। আপনার মতো সবাই কি এ-সব সইতে পারে ভাই—না, আদর করে ঘরে উপদ্রব ডেকে নেয়!

উমা লাল হয়ে উঠল ঃ না—না, এ-সব বলবেন না। আপনি তো বসতে চাননি, আমিই গল্প করবার জন্যে জোর করে আটকে রাখলুম আপনাকে। হয়তো কাজের কত ক্ষতি হয়ে গেল আপনার।

আবার নিঃশ্বাস পড়ল অণিমার ঃ এরকম কাজের ক্ষতি মাঝে মাঝে করতে পারলে জীবনটাকে অনেক বেশি ভালো লাগত ভাই! খাওয়া শেষ হল। দুজনে আবার এসে বসল বাইরের ঘরটিতে। লাল রোদের ভেতর শির-শিরানি উঠেছে শীতের হাওয়ায়। একবারের জন্যে একটু মুছেও গেল রোদটা, জানলা দিয়ে খানিকটা কুয়াশা ঢুকল ঘরে। গায়ের স্কার্ফটাকে ভালো করে জড়িয়ে নিলে অণিমা।

উমা বললে, গড়িয়ে নেবেন একটু?

এবার শব্দ করে হেসে উঠল অণিমা ঃ একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা করে ফেলছেন। একেই বোধ হয় বলে, বসতে পেলে শুতে চায়। না ভাই, ও-সব অভ্যেস ভুলে গেছি অনেক দিন। আপনি বরং বিশ্রাম করুন, আমি—

—না—না, বসুন না আর একটু।

টুকরো টুকরো গল্প তারপরে। উমার নিজের খবর আর কী আছে, দেশ কোনোদিন যশোরের দিকে ছিল, কিন্তু তার বাবা সারা-জীবন ছোট রেলে চাকরি করে কাটালেন, এই পাহাড় অঞ্চলেই তার জন্ম। বিয়েও হয়েছে ছোট রেলের কেরাণীর সংগেই। সমতল সে আর সইতে পারে না—দু' বছর আগে একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম ভাই, গরমে গায়ে প্রায় বড় বড় ফোস্কা পড়ে গেল—ছেলেটার তো জ্বরই হয়ে গেল। সাত দিন যেতে না যেতে পালিয়ে বাঁচি।'

অণিমা চক্রবর্তীরও বলবার কথা বেশি নয়। গরীবের মেয়ে। বাবা অল্প মাইনের সরকারী চাকরি করতেন, রিটায়ার করবার পরে আর দিন চলে না—পেনশনের ক'টা টাকাই বা পান। বড়ো ভাই এম-এ পাশ করে একটু উঠে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ মারা গেল টাইফয়েডে। অণিমাকে আই-এ পর্যন্ত পড়েই কলেজ ছাড়তে হল, মা-বাবাকে দেখতে হবে, ছোট ছোট ভাই-বোন আছে, তাদের দেখতে হবে। তারপর রোজগারের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে এই চাকরি। বাংলা-বিহার-আসামের সব জায়গায় যেতে হয়। কিছু মাইনে আছে, তা ছাড়া প্রত্যেক অর্ডার থেকেও কমিশন পাওয়া যায়। নতুন কোম্পানি একটু দাঁড়িয়ে গেলেই হয়তো কলকাতার অফিসেই বসিয়ে দেবে, আয়ও বাড়বে।

—একা একাই তো ঘুরে বেড়ান?

—দেখছেন তো।

—ভয় করে না? একলা মেয়ে মানুষ, পথে-ঘাটে নানা আপদ-বিপদ—

অণিমা অন্যমনস্কভাবে বাইরে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ ঃ কী আর করা যায় বলুন। এইতো সেবার লিডো-মার্গারিটা হয়ে আসছি—

—সে কোথায়?

—আসামের একেবারে শেষ সীমা। বর্মার পাহাড় দেখা যায় সেখান থেকে। ওদিককার জন দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে মোটরে করে ফিরছি ডিব্রুগড়ের দিকে। পথে রাত হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ সামনে এক বুনো হাতি।

—বলেন কি! —উমা শিউরে উঠল

—হুঁ, ভাগ্যি ভালো যে আমাদের দিকে ফিরেও চাইল না। কিন্তু বদমেজাজে থাকলে আর দেখতে হত না, গাড়ীশুদ্ধ আমাদের সবাইকে রাস্তার মধ্যে পিষে ফেলত। আর একবার বিহারে জানেন, গঙ্গা পেরুতে গিয়ে একটুর জন্যে একটা স্টিমার ধরতে পারলুম না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু এরপর দেখুন—সেই স্টিমারটাই ডুবল ভরা গঙ্গার মাঝখানে। লোকজন বিশেষ কেউই বাঁচেনি। স্টিমারটায় সে দিন যদি উঠতে পারতুম, তা হলে আজকে আর আমাকে দেখতে পেতেন না এখানে।

—সত্যি। —উমার বুক ঢিবঢিব করতে লাগল ঃ ভগবান বাঁচিয়েছেন বলুন!

আরো গল্প চলল কিছুক্ষণ। কত জায়গায় ঘুরেছে অণিমা, কত রকম মানুষকে দেখেছে। কোথায় পরশুরাম কুণ্ড, কোথায় মণিপুর, কোথায় হরিহরছত্রের মেলা, কোথায় সাসারাম, কোথায় বারাউনির নীল গঙ্গার ওপর [illegible] নতুন পুল, কোথায় বোকারোর ইলেকট্রিক প্ল্যাণ্ট! 'কিন্তু আর ভালো লাগে না ভাই—মাঝে মাঝে এত ক্লান্ত হয়ে যাই যে কী বলব!'

—বিয়ে-থা করবেন না? —অনেকক্ষণ ধরে

অস্তাত্তরস্যাং—

ফোটো : দিলীপ ব্যানার্জি

প্রশ্নটা মনে আসছিল, সেইটিকেই আলগা-ভাবে এগিয়ে দিলে উমা।

অণিমা চুপ করে রইল একটু। তারপর হেসে আস্তে জবাব দিলে, না, ভাই, এখনো ও-সব ভাবতেই পারি না। ছোট ভাইটা এবার আই-এ দিয়েছে ও বি-এ পাশ-টাশ করে একটু দাঁড়াক, তখন যদি—। কিন্তু এ-জীবনে আমার বোধ হয় আর ও-সব হল না, এমনিতেই তো বুড়িয়ে যাচ্ছি।

ঘরের আবহাওয়াটা থমথমে হয়ে উঠল। আবার এক মুঠো কুয়াশা এল জানলা দিয়ে, একটা শীতল বিষণ্ণতা ঘনিয়ে আনল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। উমা জোর করে হাসল : না-না, এমনকি আর বয়েস আপনার!

—এখন আটাশ, আরো পাঁচ-ছ' বছর পরের কথা ভাবুন। —অণিমাও হাসল : যাক সে-সব। এবার আমায় যেতেই হবে ভাই, তিনটে বাজে। সন্ধ্যের মধ্যে জংশনে না পৌঁছুলে কিছুতেই চলবে না। জানি না, আবার কখনো দেখা হবে কিনা, কিন্তু আপনার কথা কোনো দিন আমি ভুলব না।

তিনটে বাজল, চারটে বাজল। সেই বাইরের ঘরটাতেই অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল উমা। অণিমা অনেক দূরে চলে গেছে এখন। কালকে আরো—আরো দূরের পথ তার সামনে। শিডো, মার্গারিটা—দূরে বর্মার সবুজ পাহাড়—

হঠাৎ এল মেয়েটা, কিছুক্ষণ থাকল, আপনার হয়ে গেল, তারপরে হারিয়ে গেল চিরকালের মতো। উমা জানে, জীবনে আর কখনো তার সঙ্গে দেখা হবে না অণিমার। এই ছোট্ট পাহাড়ীগঞ্জটায় অণিমা আর কোনোদিনই আসবে না, কেনই বা আসবে? এখানে তো কেউ তার সেলাইয়ের কল কিনবে না।

অণিমার কথা ভোলবার জন্যে উমা আবার সেই মোটা বাংলা উপন্যাসটা পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু গল্পটা যেন কিছুই ঢুকতে পারছে না—সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে তার কাছে। এ রকম একটা এলোপাথাড়ি বই লিখবার কী মানে হয়!

উমা উঠতে চেষ্টা করল। বেলা পড়ে আসছে, রোদ নিভছে, পাহাড়ের কোলে থাকে থাকে সাজানো সবুজ খেতের উপর লম্বা লম্বা ছায়া দাঁড়িয়ে পড়ছে, কুয়াশা মাখানো লাল রোদের রং তামাটে হয়ে যাচ্ছে, শীত নামছে। স্টেশনে সাড়ে চারটের ট্রেন এল। এবার তার সংসারের কাজে হাত দেওয়া উচিত।

তবু উঠতে পারল না উমা। আবার ঘুরে-ফিরে অণিমার কথাই তার মনে আসছে। বেশ শান্ত মিষ্টি মেয়েটি। সংসার করলে নিজে সুখী হত, সবাইকে সুখী করতে পারত। কিন্তু সে পথ তার বন্ধ। আর পাঁচ-ছ' বছর পরে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়েস হয়ে যাবে, তখন আর—

সারা জীবন এইভাবেই ওর কাটবে—বিশ্রাম পাবে না, শান্তি পাবে না। কোথায় মণিপুর—কোথায় সাসারাম। বছরের পর বছর ধরে ক্লান্ত হবে, বুড়িয়ে যাবে, ফুরিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে। হয়তো পথে ঘুরতে ঘুরতেই কোথাও মরণ আসবে একদিন। সেদিন ওর মুখে এক ফোঁটা জল দেবার জন্যে আপনার জনও কেউ থাকবে না!

কী বরাত মেয়েটার!

বিকেল ঘনিয়ে আসা শীতল ঘরটার ভেতরে বসে থাকতে থাকতে উমা যেন সেই মৃত্যুর দৃশ্যটা দেখতে পেলো চোখের সামনে। একটা স্টেশনের ওয়েটিং রুম, কাঠের বেঞ্চি, তার ওপর—। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দুপুরের রোদে লাইনের ওপারে একটা লক্ষ্মীছাড়া ধুলোমাথা চেহারার তালগাছ খড় খড় করে হাসছে, আর তার মাথায় বসে দুটো শকুন—

—কে? কে? কে?

হঠাৎ দারুণভাবে চমকে উঠল উমা। এই ঘরে একভাবে বসে থাকতে থাকতে কখন বেলা ডুবেছে, কখন সন্ধ্যা এসেছে, কখন এই ঘরের মধ্যে জমে উঠেছে কালো বরফের চাঙাড়ের মতো অন্ধকার। আর বাড়ীর ভেতরে কার যেন পায়ের শব্দ বেজে উঠছে।

—কে? কে ওখানে?

দ্রুত উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ছোট্ট ঘরটার টেবিলের সঙ্গে একটা ধাক্কা লাগল কোমরে, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল। আর বাড়ীর মধ্যে যার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল, সে এই সামনের বারান্দা দিয়ে এই বেরিয়ে গেল—একটা সাদা-কালো কুকুর। উমা আবার বসে পড়ল নিজের জায়গায়।

এবার অণিমার জন্যে নয়, নিজের জন্যে একটা অদ্ভুত ভয়ে তার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল। অণিমার মৃত্যু তবু একটা স্টেশনের ওয়েটিং রুমে—যার জানলা দিয়ে অনেক দূরের আকাশ দেখা যায়, একটা তালগাছের মাথার ওপর রোদ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। তার আগে তার জন্যে বর্মার পাহাড় আছে—বারাউনির গঙ্গা আছে। আর সে? এমনি এক সন্ধ্যায় যখন স্বামী-খোকা কেউ বাড়ী থাকবে না, যখন কালো বরফের পিণ্ডের মতো একটা অন্ধকার তাকে ঘিরে ধরবে, ওই সাদা-কালো কুকুরটার মতো মৃত্যুর পায়ের শব্দ কানে আসবে তার, আর একটুখানি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই এই তিন হাত ঘরের মধ্য থেকে একটা নিষ্ঠুর কঠিন আঘাত এসে—

অণিমার জন্যে নয়—নিজের জন্যেই আতঙ্কে তার রক্ত জমে এল। এই ছোট ঘরটা যেন আরো ছোট হয়ে চেপে আসতে লাগল তার চারপাশে—বাইরের আকাশে পাহাড়-গুলোকে মনে হল কতগুলো অতিকায় প্রাচীরের মতো—যা কোনোদিন, কোনোদিন পার হওয়া যাবে না!

রাজপুরোহিত একটু কাশলেন একবার, কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নেবার চেষ্টা করলেন; বার-দুই পর পর উত্তরীয় প্রান্তে ললাটের স্বেদস্রোত মুছলেন—সম্পূর্ণ বৃথা প্রয়াস জেনেও, কারণ যে স্রোত উপস্থিত সকলের ললাটেই অবিরল ধারে প্রবহমান, রাজপুরোহিতের তো আরও—বার বার মুছেও বিন্দুমাত্র বিরতি মিলছে না, উত্তরীয়টাই ভিজে উঠছে শুধু; তবু খানিকটা অবসর—কিছুটা বা সাহস সঞ্চয়ের জন্যই যেন সেটা প্রয়োজন; এর মধ্যেই কয়েকবার ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁ এবং বাঁ থেকে ডান পা বদল করে নীচের উত্তপ্ত উপল থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন, পা জ্বলে যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই—নর্মদার সেই উপলাস্তীর্ণ তীরভূমিতে এমন এতটুকু শষ্পাশ্রয় নেই যার উপর দাঁড়িয়ে পায়ের জ্বালা নিবারণ করতে পারেন কিন্তু এ সবই করছিলেন অন্যমনস্কভাবে, হাত-পাগুলো আপনা আপনিই কাজ করে যাচ্ছে যেন— তার সঙ্গে তাঁর মনের কোনো যোগ নেই। মন তখন দ্রুত চিন্তা করে যাচ্ছে, অপ্রিয় কর্তব্য থেকে অব্যাহতি লাভের চিন্তা, অধিকতর অস্বস্তি থেকে মুক্ত হবার চিন্তা—এ সব সামান্য দৈহিক ক্লেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সেটা নয়, সে অবসর আর নেই। যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে, অবিলম্বে—সত্বর। এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে তত এই ক্লেশ এই দাহ বিলম্বিত হবে।

সুতরাং—যা করতে হবে, এখনই।

রাজপুরোহিত আবারও একবার কাশলেন, মাথা চুলকোলেন, তারপর ডাকলেন, 'মা!'

কিন্তু কাশীবাঈ নির্বাক। তিনি একদৃষ্টে একদিক পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—স্থির নিস্তব্ধ হয়ে।

না, স্বামীর চিতার দিকে নয়, ওঁর দৃষ্টি সে চিতা পেরিয়ে নর্মদার উপলাহত স্রোতো-রেখার ওপর নিবদ্ধ। নিদাঘের উপবাস শীর্ণ নর্মদা যেখানে ছোট ছোট পাথরে ঘা খেয়ে ছোট ছোট অসংখ্য ঢেউয়ে ভেঙে পড়ছে, সহস্র সহস্র হীরক খণ্ডের মতোই প্রতিবিম্বিত সূর্য রশ্মি সহস্রদিকে বিচ্ছুরিত করে চোখ ধাঁধিয়ে। সে আলো নিশ্চয় মহিষীর চোখে তীক্ষ্ম সূচ্যগ্রভাগের মতো এসে বিঁধছিল কিন্তু তা বিঁধলেও সে অনুভূতির কোন বহি চিহ্ন কোথাও প্রকাশ পাচ্ছিল না, ওঁর মুখে বা চোখে। পাথরের মতোই ভাবলেশহীন তাঁর মুখ, নিষ্পলক শূন্য তাঁর দৃষ্টি।

সত্যিই কি পাথর হয়ে গেছেন কাশীবাঈ?

নইলে কিছুই আজ তাঁকে বিচলিত করতে পারছে না কেন? বৈশাখ মধ্যাহ্নের নিষ্করুণ সূর্য প্রখর রৌদ্রে অগ্নি-বৃষ্টি করছেন চার দিকে, সে অগ্নি মাথায় পড়ে যেমন প্রস্তরে

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

...করছে, তেমনি পায়ের নীচের পাথর-...কেও তাতিয়ে তপ্ত কটাহের মতো অসহ ...তুলেছে। সত্য বটে এ তাপ উপেক্ষা ...আজ এই নিভৃত নদীতীরে সকাল থেকে ...সহস্র লোক এসে সমবেত হয়েছে, তাদের ...ও শ্রদ্ধেয় নেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবার ...—এবং তারা এখনও পর্যন্ত দাঁড়িয়েই ...দুঃখে, শোকে ও এই ঘটনার আকস্মিক-...স্তম্ভিত স্তব্ধ হয়ে, কেউই ফিরে ...তাদের শান্ত ছায়াচ্ছন্ন গৃহ-...—কিন্তু তারা তো সকলেই দুঃখ-কষ্টে ...নিদাঘের খররৌদ্রও তো তাদের কাছে ...পরিচিত নয়, তারা বেশির ভাগই দরিদ্র ...জীবী নয়তো যুদ্ধজীবী, শ্রমজীবী ...সকলেই। মহিষী কাশীবাঈয়ের মতো ভোগে ও বিলাসে, সুখে ও প্রাচুর্যে অভ্যস্ত ...অন্তঃপুরবাসিনী কেউই নয় তারা। তবু ...তারাও এই রাজপুরোহিতের মতো ক্ষণে ...পা বদলে এক পায়ে দাঁড়িয়ে অপর ...মুহূর্তের জন্যও স্বস্তি দেবার চেষ্টা ...মুহুর্মুহু উত্তরীয়ে স্বেদ-...মোচন করছে—কেউ বা সেইগুলো ঘুরিয়েই একটু হাওয়া খাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের যে কষ্ট ...তাতে সন্দেহ নেই। তবে—? রাণী কেমন ...সহ্য করছেন এই কষ্ট, তাঁর কি অনুভূতি বলে আর কিছু নেই?......

রাজপুরোহিত আবারও কেশে, গলা ...করে ডাকলেন, 'মা!'

এবার গলার স্বর একটু উচ্চগ্রামে তুলেছেন তিনি—সব সংকোচ দূরে করেই।

আর বোধহয় সেই জন্যই, সে স্বর পৌঁছেও গেল রাজমহিষীর কানে, তাঁর মস্তিষ্কে। এবার তিনি মুখ ফেরালেন, চোখ দুটি দূরে নর্মদা স্রোত থেকে তুলে এনে নিবদ্ধ করলেন রাজপুরোহিতের মুখের ওপর।

'কিছু বলছেন ত্র্যম্বকজী?' শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কাশীবাঈ।

'হাঁ মা। বলছিলাম,—মানে, দেরি হয়ে যাচ্ছে তো, বালাজীও ছেলে মানুষ, তাঁর দৈহিক ও মানসিক অবসাদ বোধহয় সহ্যশক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে, আর বোধহয় দেরি করা সঙ্গত নয়—এবার—'

'একটু—সামান্য একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন, কাশীবাঈ, 'কিন্তু দেরিই বা আপনারা করছেন কেন—কার জন্য, কী জন্য!'

ঠিক যত সহজে তিনি প্রশ্ন করলেন, তত সহজে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় ত্র্যম্বকজীর। তিনি বিষম বিব্রত বোধ করলেন, তাঁর মুণ্ডিত মস্তক ও ললাটের স্বেদধারা বেড়ে গেল আরও।

অথচ দেরি করারও আর সময় নেই। মহিষী প্রশ্ন করেছেন—মহামান্য পেশোয়ার পাটমহিষী, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন তিনি। মুহূর্তকয়েকের বেশী বিলম্ব করাটা অশোভন শুধু নয়, অপরাধ।

'মা—আপনি তো সবই জানেন—আপনাকে প্রশ্ন করতে যাওয়াই আমাদের ধৃষ্টতা।...... আমাদের যা প্রথা— কোনটা তো আপনার অবিদিতও নেই—।... মানে—মহামান্য পেশোয়ার শেষ-কৃত্য সম্বন্ধে আপনার কোন আর নির্দেশ নেই তো?'

প্রশ্ন করে মাথা হেঁট করলেন ত্র্যম্বকজী, উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহিষীর কাছেই উত্তর চান উনি—কিন্তু তবু তাঁর চোখের দিকে চাইবার যেন সাহস নেই।

'নির্দেশ?' বিহ্বলভাবে পাল্টা প্রশ্ন করেন কাশীবাঈ। তাঁর কিছু পূর্বের স্তম্ভিত বিহ্বলতাই আসলে হয়ত কাটেনি তখনও পর্যন্ত—কোন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তাঁর মাথায় ঢুকছে না।

'কী বিষয়ে আমার নির্দেশ আপনি আশা করেন ত্র্যম্বকজী?' একটু থেমে আবারও জিজ্ঞাসা করেন কাশীবাঈ।

আর না বললে নয়। তবু শেষ মুহূর্তেও যেন একটু ইতস্ততঃ করলেন ত্র্যম্বকজী, যদি শোকাচ্ছন্নতার কুয়াশা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক স্থির-বুদ্ধি ফিরে পান মহিষী—সেই আশায়।

কিন্তু কিছুই হল না। বরং অসহিষ্ণুতার চিহ্নস্বরূপ ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল কাশীবাঈ-এর ললাটে। তখন প্রায় মরীয়া হয়েই বলে ফেললেন ত্র্যম্বকজী, 'বলছিলাম কি মা—মহামান্য পেশোয়ার চিতাতে তাহলে এইভাবেই—যেমন সাজানো আছে তেমনি অগ্নি সংযোগ করা হবে তো—? মানে আর কোন রদ-বদলের সম্ভাবনা নেই—?'

'রদ-বদল? আর কি রদ-বদল হতে পারে?......আপনার বক্তব্যটা একটু খোলসা করে বলুন ত্র্যম্বকজী, আজ আর ঠিক আপনার রাজনীতিক ভাষার প্যাঁচগুলো মাথাতে ঢুকছে না!'

কাশীবাঈয়ের কন্ঠে বিরক্তি আর চাপা থাকে না।......

ত্র্যম্বকজী প্রমাদ গণেন। এ বিরক্তি এ কন্ঠস্বরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। এ বড় কঠিন ঠাঁই। এ কন্ঠস্বরের সামনে অত বড় বীর রাজনীতিক বাজীরাও পেশোয়াও সংকুচিত হয়ে পড়তেন, তা বহুবার ত্র্যম্বকজী নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কিছুদিন আগেও তো—। হয়ত এতটা সমীহ না করলে স্ত্রীকে আজ এই চিতাশয্যা রচনারই প্রয়োজন হত না। আরও ঢের দিন বাঁচতে পারতেন বাজীরাও।

তিনি তাড়াতাড়ি, আরও কুন্ঠিতভাবে হলেও আরও স্পষ্টভাবে বললেন, 'মহামান্য পেশোয়া তা হলে একাই পরপারের উদ্দেশে যাত্রা করবেন তো— মানে আর কেউ—'

বলতে বলতে থেমে যান আবার। কেমন যেন একটু উৎকন্ঠিতভাবেই প্রতীক্ষা করেন ও পক্ষের উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার।

'একা যাত্রা করবেন—তা-তার মানে?'

প্রশ্ন করেন একটু অবাক হয়েই, কিন্তু কথাগুলো বলতে বলতেই যে উত্তরটা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে সেটা বোঝা যায় শেষের দিকে কথাগুলো গলাতে জড়িয়ে গিয়ে থেমে আসায়।

'ও, আপনি সহমরণের কথা বলছেন?'

ত্র্যম্বকজী আর উত্তর করেন না। আর কিছু বলবার নেই তাঁর। এটুকুও বলার প্রয়োজন ছিল না। কথাটা এঁদেরই ভাবার কথা, বলার কথা, আলোচনা করার কথা। তাঁকে যে বলতে হল সেটা এঁদের পক্ষেই ত্রুটি বলে গণ্য হওয়া উচিত। যাই হোক—আর যখন কোন অস্পষ্টতা নেই ওঁদের মনে, তখন আবার কেন কথা কইতে যাবেন?

কিন্তু কাশীবাঈও তখনই কোন উত্তর দিতে পারেন না। আবারও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন দৃষ্টিতে একটা বিহ্বলতা ফুটে ওঠে। বিহ্বলতা—সেই সঙ্গে একটা অসহায় ভাবও। চারিদিক থেকে শিকারীর দল ঘিরলে হরিণীর চোখে যে অসহায়তা ফুটে ওঠে—হয়ত তেমনিই।

ঠিক এই প্রশ্নটাই এতক্ষণ ধরে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন তিনি প্রাণপণে। নিজের মনের কাছ থেকে বিবেকের কাছ থেকে সরে সরে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

ভাবছেন তিনি এই দুদিন ধরেই। সংবাদটা শোনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্নটা জেগেছে তাঁর মনে—সেই থেকে একবারও সম্পূর্ণভাবে তাঁর মনের বাইরে যায়নি। এ প্রশ্ন উঠবেই—তা তিনি জানেন। অবশ্য তাঁর শাশুড়ীও সহমরণে যাননি, দিদি শাশুড়ীও না। উত্তম নজীর আছে এ বংশে—তিনি না গেলে কেউই কিছু বলতে পারবে না।

তবু—

প্রশ্নটা থেকেই যায়। ঐ যে অগণিত লোক নিস্তব্ধ হয়ে চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় পেশোয়ার চিতাশয্যার দিকে চেয়ে—তাদের মনেও হয়ত এই প্রশ্নটাই এখন অগ্রগণ্য। মহামান্য পেশোয়া বাজীরাওয়ের মতো বীর, তাঁর মতো অরাতিদমন শিষ্ট পালক জননেতা প্রায় সারাজীবনব্যাপী কঠোর শ্রমের পর এই অল্প বয়সে পরলোক যাত্রা করবেন একা—সেখানে তাঁর পরিচর্যা করার জন্য, সেবা করার জন্য কেউ যাবে না? এ যে রীতি-মতো অকৃতজ্ঞতা, পরলোকগত বীরের প্রতি অবিচার!.....

প্রাণের মায়া? না, মোটেই না। নিজের মনকেই জোর করে ধমক দেন কাশীবাঈ। প্রাণের মায়া তাঁর এত নয়। স্বামীর প্রতি অভিমানেও এই অবশ্য-কর্তব্য থেকে বিরত হচ্ছেন না তিনি। অভিমান করলে তিনি করতে পারতেন, কেউ দোষ দিতে পারত না তাঁকে। তাঁর স্বামী—উদার, বীর, বিবেচক, ন্যায়পরায়ণ, রাজ্যেশ্বর স্বামী—অপর সমস্ত মানুষের পাত্রে বিবেক-বিবেচনা, ন্যায়-পরায়ণতা নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছিলেন, একটি মানুষের কথা খালি তাঁর মনে ছিল না। নিজের বিবাহিতা ধর্মপত্নীর কথাই ভুলে গিয়েছিলেন শুধু। যে স্ত্রী জীবনে কখনও তাঁকে প্রতারণা করেনি, কখনও তাঁর প্রতিকূলতা করেনি—চিরকাল যোগ্য সহধর্মিণীর কাজ করে গেছেন যথাসাধ্য, সেই স্ত্রীকেই তিনি ঠকিয়েছেন সবচেয়ে বেশী। কোথা থেকে ঐ মুসলমানী মেয়েটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে তাঁর—তাঁদের মাথার ওপর বসিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, কাণ্ডাকাণ্ড ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিসর্জন দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, একেবারেই উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। নইলে তাঁর মতো স্থিরবুদ্ধি স্থিতপ্রজ্ঞ লোকের ঐ বিজাতীয়া কুলটা নারীকে সঙ্গে নিয়ে রাজসভায় রাজার সামনে যাবার দুর্বুদ্ধি হবে কেন? গণেশ চতুর্থীর দিন ইষ্টদেবতা

কুলদেবতা গণপতি পূজোর সময় ব্রাহ্মণ সজ্জন রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ করে এনে ভগবানের সামনে ঐ বেশ্যা নর্তকীটার নাচের ব্যবস্থা করবেন কেন?......

ছি-ছি! সে কথা মনে হলে আজও তাঁর যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়, আজও মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে ইচ্ছা করে তাঁর।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি যে অবিচার করেছেন স্বামী, তা বোধহয় অতটা অসহ্য হয়নি তাঁর—যত এই আচরণগুলো হয়েছে। কারণ এটা তাঁর স্বামীর মানসিক অধঃপতনের প্রমাণ, বুদ্ধিভ্রংশের প্রমাণ। এটা জানাজানি হয়েছে প্রজাসাধারণের মধ্যে, তাঁর অমন স্বামী লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হয়েছেন—ইতর লোকেরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছে, হাসাহাসি করেছে, টিটকারী দিয়েছে তাঁর স্বামীকে। সে কথা শোনবার আগে, সে দৃশ্য দেখবার আগে মরে যাওয়াও ঢের বেশী শ্রেয় ছিল, সেদিন মরবার কোন সুযোগ পেলে তিনি মুহূর্তকালও দ্বিধা করতেন না। নেহাত আত্মহত্যা মহাপাপ, শুধু তাই নয়—তিনি আত্মহত্যা করলে সে পাপ সে কলঙ্ক তাঁর বালক ও শিশু পুত্রদের ভবিষ্যতে ছায়াপাত করবে বলেই নিজে থেকে মরতে পারেননি তিনি।

তবু আজ সে রাগ দুঃখ অভিমানই শুধু এসে তাঁর স্বামীর প্রতি শেষ কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

স্বামীর সে অপরাধ তিনি ক্ষমা করেছেন বহুদিন।

তিনি জানেন কি মর্মান্তিক অন্তর্দাহ তিনি ভোগ করে গেছেন জীবনের এই শেষ কটাদিন। তাইতেই প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেছে তাঁর। আজ স্বামীর চিতাশয্যার সামনে দাঁড়িয়ে সেই সুপুরুষ বীর্যবান মানুষটার এই কঙ্কালসার শবদেহটার দিকে চেয়ে সেইটেই অনুভব করছেন তিনি। মনে হচ্ছে বরং—এতটা হয়ত না করলেও চলত। হয়ত পাপের চেয়ে প্রায়শ্চিত্ত কিছু বেশীই হয়ে পড়ল--

তিনিই দায়ী—এটা ঠিক। সে কথা তিনি অকপটেই স্বীকার করছেন।

স্বামীকে সেই নিরতিশয় গ্লানি থেকে, সে নিদারুণ লোকলজ্জা থেকে—সে একান্ত হীন উন্মত্ততা থেকে তিনিই টেনে তুলে সে অপরাধের মূলোচ্ছেদ করে দিয়েছেন। কুৎসিত প্রবৃত্তির কাছে একান্ত আত্মসমর্পণের হীনতা থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন বিধাতা-পুরুষের কাছে রাজ-সনদ পাওয়া তাঁর রাজ্যেশ্বর স্বামীকে।

সুতরাং সেদিক দিয়ে আর কোন ক্ষোভ, কোন অন্তর-বেদনা তাঁর নেই।

হ্যাঁ, তাঁর শাশুড়ী রাধাবাঈ এবং দেবর চিমনজীও তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন—এটা ঠিক। রাধাবাঈ বালাজী বিশ্বনাথ রাওয়ের যোগ্য সহধর্মিণীর মতোই বলেছিলেন, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে—'ছেলে আমার যতবড় বীর যতবড় শাসক, যতবড় দিগ্বিজয়ীই হোক—এই কলঙ্ক থেকে এই পাপ থেকে মুক্ত হতে না পারলে আমি ভগবান গণপতির কাছে তার মৃত্যু কামনাই করব। তোমাকে আমি আদেশ করছি যেমন করে হোক এই অপযশ থেকে তাকে রক্ষা করো। তার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তো তাকেই বন্দী করো—বিন্দুমাত্র দ্বিধা করো না।...... রাজা কি বলবেন? সে দায়িত্ব আমার, শাহু ছত্রপতির কাছে আমি নিজে গিয়ে সে কৈফিয়ৎ দেব—আমি, তাঁর প্রাক্তন মহামাত্যের স্ত্রী।'

মার কাছ থেকে অমন নিঃসংশয় নির্দেশ না পেলে চিমনজী কাশীবাঈয়ের পাশে এসে দাঁড়াতে পারতেন কিনা সন্দেহ। চিমনজী আপ্পা বীর, চিমনজী আপ্পা বুদ্ধিমান—কিন্তু তবু, তিনি জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুগতও। তা ছাড়া বাজীরাওয়ের দুর্মর দুঃসাহস নেই চিমনজীর মধ্যে, দ্রুত মনস্থির করার শক্তিও না।

চিমনজী আপ্পা এবং রাধাবাঈয়ের উৎসাহ ও অভয় না পেলে তাঁর ছেলে বালাজীও সাহস পেত কিনা সন্দেহ—ঐ স্ত্রীলোকটাকে বন্দী করতে।

আর কাজটা খুব সহজও ছিল না তো।

শুধু রূপসীই নয়, শুধু নৃত্য-গীত-ছলাকলা পটীয়সী মোহিনীই নয়—বিধর্মী কুলটা স্ত্রীলোকটা অসাধারণ চতুরা এবং দুর্জয় দুঃসাহসিকাও বটে। সেটা তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য। জনকয়েক মাত্র শস্ত্রধারী সান্ত্রী পাঠিয়ে বন্দী করার মতো সাধারণ ছিঁচকাদুনে মেয়েছেলে নয় সে। তার পিছনে বাজীরাওর রক্ষাকবচ ছিল সত্য কথা—বিপুল একটা রাজশক্তিই ছিল বলতে গেলে—কিন্তু তা না থাকলেও সে একাই একশ—অথবা শতাধিক।

বালাজীর কূটকৌশল, চিমনজীর বুদ্ধি এবং কাশীবাঈয়ের জিদ ও প্রচণ্ড উদ্যম মিলিত হয়েই সম্ভব হয়েছিল তাকে বন্দী করা। পেশোয়ার দেহরক্ষীরা বালাজী ও চিমনজীর আদেশেও বিচলিত হয়নি—তাদের প্রতি যোগ্য সম্মান দেখিয়েও অনায়াসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে পেশোয়ার আদেশ নির্দেশ তাঁদের আধিপত্যের থেকেও বড়। সে আদেশ পালনের জন্য প্রয়োজন হলে তারা তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতেও কুণ্ঠিত হবে না... অস্ত্রধারণ করেওছিল তারা—এবং তার ফলাফল কি হত তা আজ কারুর পক্ষেই বলা সম্ভব নয়—শুধু শেষ মুহূর্তে স্বয়ং কাশীবাঈ গিয়ে সামনে দাঁড়াতেই সে উদ্যত অস্ত্র সম্ভ্রমে ও সঙ্কোচে নেমে এসেছিল। পেশোয়ার সহধর্মিণী তাঁর পট্ট মহাদেবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে, ওঁর কাজে বাধা দিতে সাহসে কুলোয়নি তাদের।

তাই কি ওকে বন্দী করেই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই শুনে আসছেন তিনি—কুলটা স্ত্রীলোকের অসাধ্য কিছু নেই—কথাটার সত্যতা প্রত্যক্ষ বুঝে পেলেন তিনি। সেই শৃগালীর মতো ধূর্তা স্ত্রীলোকটা—সহস্র সতর্ক চক্ষুকে প্রতারিত করে—মার্গশীর্ষ মাসের নবান্ন উৎসবের সুযোগে অনায়াসেই বেরিয়ে এসেছিল আবার, পটাশের কিল্লাতে গিয়ে মিলিত হয়েছিল তার প্রেমিক ও কামার্ত ক্রীতদাসের সঙ্গে—কাশীবাঈয়ের পূজনীয় স্বামী এবং বিস্তৃত মারাঠা সাম্রাজ্যের মহান অধিনায়কের সঙ্গে।

ধিক! ধিক!

মনে হলেও যেন সর্বাঙ্গে একটা নাম[illegible] জানা গ্লানিতে শিরশিরিয়ে ওঠে— কি [illegible] একটা ক্লেদাক্ত স্পর্শানুভূতি বোধ ক[illegible] কাশীবাঈ। সেই পুনর্মিলনের দিনে না[illegible] বাজীরাও সহস্রাধিক মুদ্রার মিষ্টান্ন বি[illegible] করেছিলেন তাঁর সৈন্য এবং স্থানীয় প্রজা[illegible] মধ্যে। ঘোড়ার ডাক বসিয়ে নাকি পু[illegible] বিখ্যাত গয়লার বাড়ি থেকে 'শ্রীখণ্ড' আনি[illegible] ছিলেন।

কিন্তু কাশীবাঈও অত সহজে হ[illegible] মানবার পাত্রী নন। সিংহেরই যোগ্য সিংহ[illegible] তিনি। সেদিন দেবর ও পুত্রকে নিয়ে তি[illegible] নিজে সেই পটাসের কিল্লাতে গিয়েছিলে[illegible] শানওয়ার ওয়াদার বন্দিনীকে দাবী কর[illegible] কেড়ে আনতে। অন্য কেউ গেলেই সম্ভব হ[illegible] না সেদিন, শুধু কাশীবাঈয়ের মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি পেশোয়া বাজীরা[illegible] লজ্জা ও সঙ্কোচে মাথা অবনত হয়ে পড়েছ[illegible] তাঁর। সেই সামান্য দুর্বলতার সুযো[illegible] চিমনজী ও বালাজী স্ত্রীলোকটাকে ধরে এ[illegible] লোহার তৈরী গাড়ীতে পুরেছিলেন। তারপ[illegible] এই ব্যবস্থা হয়েছিল, যে শানওয়ার ওয়া[illegible] প্রাসাদে একদা সর্বাধিক লক্ষণীয় [illegible] মস্তানী মহল ও মস্তানী দরওয়াজা—ম[illegible] প্রাসাদ থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন উদ্যা[illegible] সুসজ্জিততম প্রান্তে অবস্থিত মস্তানী মহ[illegible] যাওয়ার ফটকটাই বহু মুদ্রা ব্যয়ে [illegible] করিয়েছিলেন পেশোয়া সেই প্রাসাদে[illegible] ক্ষুদ্রতম প্রকোষ্ঠে, তিন হাত চওড়া ও প[illegible] হাত লম্বা—একটি খাটিয়ার মতো ঘ[illegible] মস্তানী মহলের অধিষ্ঠাত্রী বাজীরাওয়ে[illegible] হৃদয়েশ্বরীকে পাঁচটি তালা দিয়ে বন্ধ কর[illegible] রাখা হয়েছিল। তার একটি চাবি অন্ত[illegible] সর্বদা মহিষী বা বালাজীর কাছে থাকবে—অর্থাৎ তাঁদের না জানিয়ে কোন কারণেই সে কারাপ্রকোষ্ঠের লৌহ কপাট উন্মোচিত হবে না—এই আদেশই দিয়েছিলেন কাশীবাঈ। ধূর্ত পশুকে খাঁচাতে চাবি দিয়ে রাখাই রীতি—এই সহজ নিয়মটায় তার ভুল করেননি পেশোয়া মহিষী।

কিন্তু সত্যিই কি ভুল করেননি কিছু?

আজ এই প্রথম—এই সাক্ষাৎ অন[illegible] উন্মুক্ত নীল আকাশের নীচে, [illegible] নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে, তাঁর সমস্ত জীবন, সমস্ত ইহকাল পরকাল সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্যের মালিক তাঁর স্বামীর চিতাশয্যার দিকে চেয়ে এই কথাটাই মনে হচ্ছে বার বার যেন—হয়ত কোথায় একটা মস্ত বড় ভুলই হয়ে গিয়েছে তাঁর!

তারপর থেকে—মস্তানীকে নির্বাসিবার বন্দী করার পর থেকে আর দেখা হয়নি স্বামীর সঙ্গে। তারপর বলতে গেলে এই প্রথম দেখলেন কাশীবাঈ স্বামীকে।

অত সাধের নবনির্মিত শানওয়ার ওয়াদা প্রাসাদ—দিল্লীশ্বরের ঈর্ষা উৎপাদনের জন্য যে প্রাসাদ নির্মাণ সম্পূর্ণ করতে নিষেধ করেছিলেন ছত্রপতি শাহু—সেই ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদেও আর ফেরেননি পেশোয়া বাজীরাও। জীবনের প্রচণ্ডতম ও উগ্রতম বাসনায় ব্যর্থ হয়ে, নিকটতম আপনজনদের দ্বারা প্রিয়তম

...টির সাহচর্যে বঞ্চিত হয়ে সে প্রাসাদে আর ...তে ইচ্ছা হয়নি তাঁর। ফিরলে অত সাধের ...র তাঁর সাধকেই ব্যঙ্গ করত হয়ত। হয়ত ...টাই বড় হয়েছিল। এত বড় দুর্ধর্ষ ...টা একটি স্ত্রীলোক, একটি বালক এবং ...টি রুগ্ন তরুণ অনুজের কাছে পরাজিত ও ...মানিত হলেন—যে প্রাসাদে মহিষীর ...য় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিজের ...তমাকে, সেই প্রাসাদেই আজ সে সাধারণ ...বন্দিনীর জীবনযাপন করছে; খাঁচার মতো ...টি ঘরে আজ সে বন্দিনী—তাঁর নিজেরই ...দেশে; একটি মাত্র আদেশে সে বন্দিদশা ...য়ে ঘুচে যাবার কথা; অথচ তিনি এমন ...হায় যে সেই আদেশটাই দিতে পারছেন ...—এই অবিশ্বাস্য রকমের হাস্যকর অবস্থার ...য় তাঁর পুরাতন দাস-দাসী অনুচরদের ...রা বেষ্টিত হয়ে থাকার মতো লজ্জা আর ... আছে! তাদের কাছে মুখ তুলে কোন ...দেশই আর কোনদিন দিতে পারতেন না যে ...তিনি। প্রতি মুহূর্তেই মনে হত যে ওরা ...ই বিদ্রূপের চোখে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে—...খের আড়ালে গেলেই অট্টহাসিতে ফেটে ...ড়ছে।... না স্বামীর এ মনোভাব অনুমান ...রার মতো এটুকু বুদ্ধি কাশীবাঈয়ের আছে। ...ই তিনি অনুরোধও করে পাঠাননি যুদ্ধ-...ক্ষেত্রের কঠোর জীবন থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে ...দিন বিশ্রাম করে যাবার।

কিন্তু এই অল্প সময়টুকুর মধ্যে, এই ...কটা মাসে একটা মানুষের এত ...পরিবর্তন হতে পারে! সেইটেই যে কিছুতে ...বুঝতে পারছেন না তিনি। আজ সেই থেকে ...মনের আর সমস্ত প্রশ্ন ডুবে গেছে তাঁর ...—সেই প্রথম এসে স্বামীর শবদেহের দিকে ...চেয়ে সময়টি থেকে। এই কি তাঁর সেই ...দর স্বাস্থ্যবান স্বামী পেশোয়া বাজীরাও? ...না—নিশ্চয় এ আর কারও মৃতদেহ ভুল ...রে নিয়ে এসেছে ওরা। এ নয়, এ নয়।...... ...থম দেখায় সেই প্রতিক্রিয়াই হয়েছিল তাঁর ...মনে। কিন্তু পরে, অনেক অভিজ্ঞান মিলিয়ে ...দেখে তবে বুঝতে পেরেছেন যে ভুল ওরা ...করেনি—তিনিই করেছিলেন।

কিন্তু এ কি দেখলেন তিনি! এই ...চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালটা, এই তাঁর মালিক—...তাঁর স্বামী! সেই পেশোয়া বাজীরাও, যাঁর ...রূপ এবং কান্তির খ্যাতি শুধু এদেশে নয়—...ওদেশে তো পেশোয়া কোন পথ দিয়ে যাবেন ...শুনলে পুরললনারা সমস্ত কাজ ফেলে এসে ...সকাল থেকে ঝারোকা বা গবাক্ষের ধারে ...দাঁড়িয়ে থাকে— সুদূর হায়দ্রাবাদে নিজাম-...উল-মুলুকের অন্তঃপুরেও পৌঁছেছিল। নিজাম ...তাঁর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব আলোচনা ...করবেন শুনে বেগমরা সকলে ধরে পড়ে-...ছিলেন নিজামকে—অন্তরাল থেকে সেই ...বিখ্যাত রূপবান ব্রাহ্মণ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখবেন ...বলে অনুমতি প্রার্থনা করে। তাঁর রূপের ...খ্যাতি আরও দূর দিল্লীতেও গিয়েছিল নাকি—...বাদশা সভাশিল্পীকে পাঠিয়েছিলেন দূর থেকে ...বাজীরাওয়ের চিত্র লিখে নিয়ে যেতে। তা ...নাকি নিয়েও গিয়েছিলেন সে শিল্পী। যুদ্ধ-...ক্ষেত্রে যাবার একটি ছবি—তেজী ঘোড়ার ...সওয়ার বাজীরাও, কিন্তু অশ্ববল্গা তাঁর হাতে নয়—ঘোড়ার পিঠেই পড়ে আছে, মাত্র পায়ের ইঙ্গিতে তাকে পরিচালনা করছেন তিনি, ভারী বর্শাখানা এমনভাবে কাঁধে ফেলা যে সম্পূর্ণ খোলা বর্শাও স্কন্ধচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে না—সেই অবস্থায় অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে দুহাতে ধরে ভুট্টা ছাড়িয়ে খেতে খেতে যাচ্ছেন বাজীরাও অথচ দৃষ্টি তাঁর অগ্রে ও পশ্চাতে সেনাবাহিনীর দিকে সজাগ ও সতর্ক। সেই ছবি দেখেই নাকি বাদশা মহম্মদ শাহ চিৎকার করে উঠে-ছিলেন—'এ যে সাক্ষাৎ শয়তান!......

'উজীর আপনি এখনই নিজামকে চিঠি লিখে দিন যে কোন শর্তে এর সঙ্গে সন্ধি করে ফেলতে। এমন লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করে কখনও জিততে পারব না আমরা!'

সেই কান্তির এই পরিণতি। সেই বলিষ্ঠ পেশীবহুল দেহ এই কঙ্কালে পরিণত হয়েছে এই ক'মাসে!!

না, চোখের জল ফেললে চলবে না। এত-গুলো লোকের কাছে এমনভাবে হার মানা চলবে না তাঁর।

তিনি অনুতপ্ত হলে তাঁর চোখের জল পড়লে তাঁর দেবর ও পুত্র আর কোনদিন মাথা তুলে কারও দিকে তাকাতে পারবে না।

চোখের জল শাসন করেন কাশীবাঈ কিন্তু মনকে শাসন করতে পারেন না যেন কিছুতেই। এ কি হল! এ তাঁরা কি করলেন! মন হাহাকার করতে করতে এই প্রশ্নই করে যায় শুধু।

এত যন্ত্রণা পেয়েছে লোকটা, এত আঘাত পেয়েছে—তা তাঁরা একবারও অনুমান করতে পারেননি কেন, কেন খোঁজ করেননি ভাল করে। কেন নিজে এসে জোর করে প্রাসাদে নিয়ে যাননি, অথবা কেন কাছে থেকে এই বেদনার কিছুটাও অন্তত সেবার দ্বারা, মিষ্ট বাক্যের দ্বারা মুছে নেবার চেষ্টা করেননি! এ কি দুর্বুদ্ধিতে পেয়ে বসেছিল তাঁকে! শেষে কি ভাবীকালের কাছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বামীর হত্যাকারিণী বলে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন তিনি?......

'মা' আবারও ডাকেন ত্র্যম্বকজী। এবার আস্তে, মৃদুকণ্ঠে। দৃষ্টি তাঁর মুখের ওপর নিবদ্ধ থাকলেও কাশীবাঈ যে বহু দূরে চলে গিয়েছিলেন মনে মনে—সেটুকু বুঝতে পারেন ত্র্যম্বকজী। অথচ দিবাস্বপ্নের সময় সেটা নয়, আত্মবিশ্লেষণেরও নয়। অসহ্য হয়ে উঠছে সকলকারই এই শারীরিক কষ্ট, মহামান্য পেশোয়ার মৃতদেহও পচে উঠতে শুরু করেছে, এই প্রখর রৌদ্রে চন্দন তৈলের অনুলেপনও কোন কাজ করছে না আর। অগুরু চন্দনের গন্ধ ছাপিয়ে একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে।

'মা!'

ত্র্যম্বকজীর ডাকে সম্বিত ফিরে পান কাশীবাঈ। চিন্তাসূত্রের খেই হারিয়ে ফেলে-ছিলেন যেখানে সেখানেই ফিরে যান আবার।

মনে পড়েছে। সহমরণের প্রশ্ন তুলেছিলেন ত্র্যম্বকজী, সেই কথাটা ভাবতে ভাবতেই বহু দূর এসে পড়েছেন।

না, তিনি যেতে পারবেন না। যাওয়াই উচিত, বিশেষত জীবনের শেষ কটি দিন বিষময় করে তুলে স্বামীর কাছে যে অপরাধ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও অন্তত যাওয়া উচিত ছিল সঙ্গে। ইহলোকের পাপ পরলোকে নিত্য অশ্রুজলে স্খালন করতে পারতেন। স্বামীর প্রতি আর কোন ক্ষোভ, কোন অভিমান নেই—আজ বরং তিনিই অপরাধী মনে করছেন নিজেকে। তবু মরা হবে না তাঁর এখনই। মরার কোন অধিকার নেই তাঁর। ছেলে এখনও বালক, তার হাতেই হয়ত এই বিপুল সাম্রাজ্য শাসন রক্ষা ও প্রসারের ভার পড়বে। ছেলের পিছনে সে সময় তাঁর থাকা দরকার, নইলে বড় অসহায় বোধ করবে সে নিজেকে। কে জানে পিতার এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে তার মনে কোন অনুশোচনা দেখা দিয়েছে কিনা ইতিমধ্যেই। সেক্ষেত্রে তিনি যদি চলে যান—সমস্ত অপরাধের গুরুভার নিয়ে সে বিব্রত হবে, হয়ত সেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। তিনি থাকলে সান্ত্বনা দিতে পারবেন, সাহস দিতে পারবেন, অভয় দিতে পারবেন।

আর যদি বালক বলে শাহু ছত্রপতি তার দাবী উপেক্ষা করেন, তাকে লঙ্ঘন করে অপরকে অগ্রাধিকার দেন—তা হলেও কাশী-বাঈয়ের থাকা প্রয়োজন। অত সহজে তিনি ছেলের দাবী ছেড়ে দেবেন না, শেষ পর্যন্ত লড়বেন—ছেলের ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে যাতে সে বঞ্চিত না হয় তার জন্য চেষ্টা করবেন।

শুধু এই ছেলের প্রশ্নই নয়—আরও তিনটি ছেলে আছে তাঁর। বড়টিই তো বালক, এগুলি আরও ছোট, শেষেরটি জনার্দন পন্ত তো নেহাৎই শিশু। এদের শিক্ষা, এদের কর্মে ও সংসারে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্বও আছে। চিমনজী আপ্পার ওপর যদি এই ভরসাটুকু করতে পারতেন তাহলেও আজ নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যেতে পারতেন তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে। চিমনজী সৎ লোক, ধর্মভীরু, বীর। চিমনজী তাঁর ছেলেদের ঠকাত না। কিন্তু চিমনজী দুর্বল। চিমনজী রুগ্ন। তার মুখে মৃত্যু পাণ্ডুরতার ছায়া পড়েছে। আর কেউ না দেখলেও কাশীবাঈ দেখতে পাচ্ছেন। প্রত্যহ ঘুসে ঘুসে জ্বর হয় তাঁর, দেহ দিন-দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, এখনও যে যুদ্ধ করছে সে শুধু একটা অভ্যাসে আর মনের জোরে। বোধহয় আর এক বৎসরও টিকবে না সে। এই অবস্থায় বৃদ্ধা শাশুড়ী এবং এই অপোগণ্ড শিশুদের ভার কার ওপর ছেড়ে যাবেন তিনি?

কাশীবাঈ মন স্থির করে অথবা মনের কাছে জবাবদিহি শেষ করে স্থির দৃষ্টিতে চাইলেন ত্র্যম্বকজীর চোখের দিকে। শান্ত স্থির কণ্ঠেই বললেন, 'না ত্র্যম্বকজী, স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবার দুর্লভ ভাগ্য আমার নয়। আপনি আপনার যা কাজ সেরে ফেলুন, মহামান্য পেশোয়ার সৎকারে অযথা বিলম্ব করার আর প্রয়োজন নেই।'

'তাই হবে মা। যা আপনার আদেশ। আমি এখনই শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করছি। বালাজীকে তাহলে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি—'

ত্র্যম্বকজী ফিরে এসে চিতার পাশে দাঁড়ালেন। ইঙ্গিত করলেন একজনকে বালাজীকে ডেকে আনার জন্য।

উপস্থিত জনতার মধ্যেও ঈষৎ একটু চাঞ্চল্য জাগল। যা হোক এবার একটা কিছু হবে। শেষ হবে এতক্ষণের এই প্রাণান্তকর প্রতীক্ষা। চিতার চারপাশে প্রহরারত রক্ষীর দলও উশখুশ করে উঠল, তাদেরও অসহ্য হয়ে উঠেছে, তারাও অব্যাহতি চাইছে এক মনে।

রক্ষীর দলে আরও একটু চাঞ্চল্য জাগল। চিমনজী আর বালাজী আসছেন। রক্ষী বেষ্টনী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পথ করে দিল তাঁদের।

সেই দিকেই চেয়েছিলেন কাশীবাঈ। ছেলের জন্যই যেন বিশেষ একটু উদ্বেগ বোধ করছেন। ওর কিশোর মনে যে কত বড় আঘাত লেগেছে পিতার কঙ্কালসার দেহটা দেখে—তা তাঁর অবিদিত নেই।......

'কাশীবাঈ।'

অকস্মাৎ পিছন থেকে এই সম্মানহীন সম্বোধনে চমকে উঠলেন কাশীবাঈ। চমকেই পিছন ফিরে চাইলেন। চেয়ে আরও চমকে উঠলেন।

পিছন থেকে ডাকছে তাঁকে মস্তানী! কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে রাক্ষসী। তাঁর সর্বদুঃখের সর্ব সর্বনাশের মূল।

দেখা মাত্র যে প্রতিক্রিয়া হল তা নিদারুণ ক্রোধের!

কি স্পর্ধা! এখানে এসেছে—আবার তাঁকে নাম ধরে ডাকছে! সাহস তো কম নয়।

কে ছেড়েই বা দিল ওকে! কার এত দুঃসাহস যে তাঁকে না জানিয়ে—

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল যে তিনিই এ আদেশ দিয়ে এসেছিলেন। প্রহরিণী এসে যখন খবর দিল যে রুদ্ধদ্বারে মাথা কুটছে সে—শেষ দেখা পাবার জন্য আকুল হয়ে মিনতি জানাচ্ছে, গর্বিতা উদ্ধতা মস্তানী সামান্য ভিখারিণীর মতো দয়া প্রার্থনা করছে তাঁর কাছে—তখন তিনিই বলেছিলেন ছেড়ে দিতে, চাবিও দিয়ে দিয়েছিলেন। এখন তো আর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না—আর কেন!

মিছিমিছি শুদ্ধমাত্র নিষ্ঠুরতার আনন্দে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যাওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন!

তাই বলে এত কাছে এসে এইভাবে তাঁকে সম্বোধন করতে এতটুকু সঙ্কোচ হল না ওর! এ কি অসহনীয় ধৃষ্টতা!

আর, আর এসব কি—?

আরও বিস্ময় বোধ করেন তিনি ওর দিকে চেয়ে।

এ কি বেশ ওর!

এতো বৈধব্যের কাল বলতে গেলে। বাজীরাও স্পর্ধা করে বলতেন—মস্তানী আমার ধর্মপত্নী— ঈশ্বরের সামনে দেবতার সামনে ওকে গ্রহণ করেছি স্ত্রী বলে—তা এই বুঝি তার নিদর্শন! এই কি ওদের বৈধব্যের বেশ? কে জানে, বিজাতীয়া বিধর্মী তার ওপর নর্তকী—ওদের ধর্ম ওদের রীতিনীতিই বুঝি আলাদা!.

তবু একটা মনুষ্যত্বের প্রশ্নও তো আছে। আর সেটা তো মানুষের সর্ব স্তরেই এক বলে জানেন কাশীবাঈ। লোকলজ্জা, লোকাচার এগুলোও তো অন্তত মানতে হয় সমাজে থাকতে গেলে।......সদ্য বিধবা সদ্য বিগত-দয়িতের এই বেশ! সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সুবর্ণ সূত্র-নির্মিত বেনারসী তাসার পোশাক তার পরনে, আপাদ-মস্তক মণি-মাণিক্যমণ্ডিত, সেই প্রখর দিবালোকে সে রত্নালঙ্কারের দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকণার মতোই চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে বার বার। অলঙ্কার একটিও বাদ দেয়নি বোধহয় সে, কেয়ূরে কঙ্কন চন্দ্রহার, মুক্তার সপ্তলহরী থেকে পায়ের নূপুর অঙ্গুলিত্র পর্যন্ত কিছুই ভুল হয়নি ওর। একেবারে নববধূর বেশ! তবে কি ওর ভয় হয়েছে যে এগুলো এবার কাশীবাঈ কি বালাজী কেড়ে নেবেন, তাই সর্বাঙ্গে বহন করে পাহারা দিতে চায়?

ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নেন কাশীবাঈ।

মুখ ফিরিয়েই প্রশ্ন করেন, 'কী চাই? আরও কি চাই তোমার? এততেও কি সাধ মেটেনি!'

হয়ত বলা উচিত ছিল না কথাগুলো। বলে নিজের মর্যাদারই হানি হল হয়ত। তবু নিজেকে সামলাতেও পারলেন না কাশীবাঈ। অন্তরের জ্বালাটা আপনিই বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

'সাধ!' মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ হাসিতে যেন ফেটে পড়ে মস্তানী, সে হাসি সেই স্থানকালের সঙ্গে এমনই বেমানান যে, উপস্থিত শ্রোতাদের কানে তা চাবুকের মতোই আঘাত করে। মস্তানী বলে, 'সাধ তো তোমার মেটবার কথা গো পট্ট মহাদেবী! আমার সাহচর্যে, আমার আসঙ্গে পেশোয়ার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলেই না তোমরা—তাঁর স্ত্রী, তাঁর মা, ছেলে ভাই—সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠে আমাকে সরিয়ে দিয়েছিলে! অন্তত সেই কথাই তো বলেছিলে তখন, সেই অজুহাতই দেখিয়েছিলে। শরীর ভাল হয়েছে তো তাঁর? সুস্থ হয়ে উঠেছেন তো?......তাকিয়ে দেখছ স্বামীর দেহটার দিকে মহিষী কাশীবাঈ—কি অবস্থা হয়েছে তাঁর অমন সুন্দর কান্তি আর অটুট স্বাস্থ্যের? আমাকে তো সরিয়ে এনেছিলে তাঁর কাছ থেকে, তাঁর সেবা থেকে ; কৈ, সে স্থান পূর্ণ করতে তো কাছে যেতে পারোনি! সে সাহসে বোধ হয় কুলোয়নি—না? নাকি প্রবৃত্তি হয়নি অমন স্বামীর সেবা করবার?'

আবারও হাসে মস্তানী। চাপা লঘু হাসি, তবু সে হাসির শব্দ যেন কানের মধ্য দিয়ে বুকের বহু দূর পর্যন্ত কাটতে কাটতে যায়।

কাশীবাঈ কোন উত্তর দিতে পারেন না চেষ্টা করেও। বোধহয় ওর দুঃসাহস আর স্পর্ধায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

'শোন কাশীবাঈ, আমার জন্য আর বিব্রত হতে হবে না, তোমাদের আপদ বিদায় হচ্ছে এবারে। জীবনেই তোমার অধিকার, মরণ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার সাহসও তোমার নেই—তা ছাড়া ইহলোকের সংস্কার আর বিধি-নিষেধের পরলোকে কোন মূল্য নেই, তোমার মন্ত্রপড়া অধিকারের দাবী পেশ করতে সেখানে যেতে পারবে না, গেলেও লাভ হবে না। যেখানে জাত নেই, ধর্ম নেই, বিবাহের প্রশ্ন নেই—সেইখানেই আমি যাচ্ছি আমার মালিকের পাশে, প্রভুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। সেখানেই আমাকে তাঁর প্রয়োজন বেশী। এখানে রাজ্য ছিল, রাজকর্ম ছিল—সেখানে শুধু ভালবাসার রাজ্য। সেখানে আমিই তাঁর রাণী। সেখানে আমাদের মিলনে কোন বাধা থাকবে না; ঈশ্বরের রাজত্বে তাঁর মঙ্গলময় আশীর্বাদে ঘেরা বেহেস্তে চলবে আমাদের নিত্য বিহার। কোন ঈর্ষাতুর স্ত্রী-পুত্র-জননীর সাধ্য নেই যে আমাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, সরিয়ে আনে তাঁর পাশ থেকে।......কাশীবাঈ, জ্ঞানত কোন পাপ করিনি, তোমরা আমাকে বহুবার বেশ্যা বলে গাল দিয়েছ—কিন্তু কৈশোরের প্রথম উন্মেষে যাঁকে প্রভু বলে জেনেছি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন মনে স্থান দিইনি, ঈশ্বর সাক্ষী। মান ও প্রাণ রক্ষাকারী পেশোয়াকে পিতাজী পুত্র বলে স্বীকার সম্বোধন করেছিলেন, তবুও তিনি উপকারের বদলে নিজের অন্তঃপুরের শ্রেষ্ঠরত্ন হিসেবেই আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, পুত্রকে প্রতারণা করেননি, কোন বাপই করে না। তবু যদি অজ্ঞাতসারে কোন পাপ কোনদিন স্পর্শ করে থাকে তো সেটুকুও আগুনে পুড়িয়ে অগ্নিশুদ্ধা হয়ে যাব তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, আশাকরি তোমাদের ভগবান গণপতিরও আপত্তি হবে না তাতে।'

এতক্ষণে অনেকেই মুখের ভাষা আর মনের জোর খুঁজে পেয়েছে। আশপাশে কাশীবাঈয়ের মুখাপেক্ষিণী যে সব পরভৃতিকার দল ছিল তাদের মধ্যে থেকেই কে যেন বলে উঠল তীক্ষ্ণ বিদ্রুপ মেশানো তিরস্কারের সুরে, 'তুমি মুসলমানী হয়ে যাবে ব্রাহ্মণের চিতায় সহমরণে বসতে! তোমার সাহস তো কম নয়!'

মস্তানী রাগ করে না, সে হাসে। বলে, 'চিতা জ্বলবার পর আর জাত থাকে না। তখন সে অগ্নি, সে পাবক। জিজ্ঞাসা করে দেখ যাও তোমার ঐ পুরোহিতকেই!...... চিতা জ্বলুক, তারপরই আমি তাতে প্রবেশ করব। নইলে ঐ আগুনেই ঝাঁপ দিয়ে আমি পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পুড়ব—তাতে আমার আপত্তি নেই।'

তবু চারিদিকে একটা গুঞ্জন ওঠে। চাপা রোষ ও ধিক্কারের। খুব চাপাও নয়—কারণ সেটা কাশীবাঈকে শোনানো প্রয়োজন।...... বারবিলাসিনী নর্তকীর এত স্পর্ধা সে চায় সহধর্মিণীকে ডিঙিয়ে সহমরণে বসতে! বাস্তবিক কাশীবাঈয়ের ধৈর্যের তারিফ করতে হয় যে তিনি এখনও দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছেন, চিরকালের মতো ওর রসনা নিস্তব্ধ করার আদেশ দেননি। এ দুঃসাহস প্রকাশ করার জন্যই তো শুধু ওর মৃত্যুদণ্ড পাওয়া উচিত।

কিন্তু কাশীবাঈয়ের মুখ থেকে রোষ ও ক্ষোভের শেষ বিন্দুটুকুও মুছে গেছে। সে জায়গায় একটা বিচিত্র ভাব ফুটে উঠেছে। সে কি অনুশোচনার? সে কি ঈর্ষার? সে কি পরাজয় স্বীকারের—না কি বিস্ময়েরও? যে বিস্ময় মুগ্ধ-করা প্রশংসার মনোভাব থেকে প্রকাশ পায়?

তিনি মুখ তুলে তাকান ওর দিকে, মন দিয়ে শোনেন ওর কথাগুলো। তারপর আশ্চর্য রকম কোমল কণ্ঠে বলেন, 'কিন্তু তাহলে তোমার এ বেশ কেন ভাই?'

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবা নয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা
কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ
কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচী গর্ভ
সিন্ধৌ হরীন্দুঃ।

অতি অদ্ভুত কথা। অভাবিতপূর্ব এই বাঞ্ছা। পৃথিবীর কোন জাতির কোন সাহিত্যে ইহার উদাহরণ নাই। জগতের কোন প্রণয়ী কি আজ পর্যন্ত অবচেতনেও এই প্রশ্নের স্থান দিয়াছেন যে প্রণয়িনীর ভালবাসা কেমন? তাঁহার ভালবাসা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করে সে মাধুর্য কেমন? এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করিয়া তিনি যে আনন্দ পান সেই আনন্দই বা কেমন?

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের মনে কিন্তু এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। শ্রীধামবৃন্দাবনে এই প্রশ্নের মীমাংসার সুযোগ হয় নাই। সেইজন্যেই বাঙ্গালার ব্রজভূমি শ্রীনবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অবতার গ্রহণ। "প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্রই আকার পরিগ্রহ করিয়াছিল"; এবং সে এই বাঙ্গালা-দেশে শ্রীধামনবদ্বীপে। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রেমের পুঞ্জীভূত স্বরূপ।

শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য মহাপ্রভুর শৈশব সঙ্গী। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণে অভিমানক্ষুব্ধ অন্তরে কাশীধামে গিয়া তিনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—

সন্ন্যাস কৈল শিখা সূত্র ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ।।

আচার্য শঙ্কর প্রবর্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় দশনামী নামে অভিহিত। ইহাদের দশটি নাম—গিরি, পুরী, বন, অরণ্য, পর্বত, সাগর, তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী ও ভারতী। যিনি যে সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন, তিনিও সেই নামে পরিচিত হন। এই নাম গ্রহণের সঙ্গে একখানি উত্তরীয় পরিধানের বিশিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়, ইহারই নাম যোগ-পট্ট। পুরুষোত্তমের সন্ন্যাসাশ্রমের নাম দামোদর, কিন্তু যোগপট্ট গ্রহণ না করায় তিনি দামোদর-স্বরূপ,—প্রধানতঃ "স্বরূপ দামোদর" নামেই স্বনামধন্য। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

কৃষ্ণ রস তত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ।।
সঙ্গীতে গন্ধর্ব সম বুদ্ধে বৃহস্পতি।
দামোদর সম কেহ নাহি মহামতি।।

এই স্বরূপ দামোদরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতার গ্রহণের শীর্ষোদ্ধৃত ঐ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঋষি দৃষ্টি ভ্রম প্রমাদ পরিশূন্য, ঋষিবাক্য ত্রিকাল সত্য। সুতরাং স্বরূপ দামোদরের আবিষ্কৃত সত্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই। আমাদের অদ্যকার আলোচ্য মহাপ্রভুর জীবনে এই তিনটি বাঞ্ছা কিরূপে পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর অনুষ্ঠিত আচরণে কোন্ কোন্ রূপে ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

প্রথম প্রশ্ন,—শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কেমন? মহাপ্রভুর কার্যাবলীর মধ্যে ইহার অনুভূতি কি ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল? আমার মতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সর্বজীবে দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আচণ্ডালে প্রেমদানরূপে করুণা বিতরণে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাই শ্রীরাধা প্রেমের মহিমা। শ্রীরাধার প্রেম মহিমাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা। তিনিই ত্রিলোকে নিখিল ভগদ্ভক্তগণের অগ্রগণ্যা। তাঁহার একমাত্র কামনা—আমি আমার প্রিয়-দয়িতকে যেমন ভালবাসি, তাঁহাকে সকলেই তেমনই ভালবাসুক। সকলেই কৃষ্ণভক্ত হউক। শক্তিমানের হ্লাদিনী শক্তি তিনি, আনন্দরূপে তিনি তো সর্বজীবহৃদয়েই অবস্থিতি করিতেছেন। মহাপ্রভু প্রতি জীবের হৃদয়স্থিত সেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেমকেই উদ্বুদ্ধ করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাই রাধা প্রেমের মাহাত্ম্য। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা উপলব্ধি করিতে গিয়াই তিনি মাটীর মর্তে অবতরণ করিয়াছিলেন, ধরণীর ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া-ছিলেন। শুধু স্থাবর জঙ্গম নয়, জগতের প্রতি অণু পরমাণু পবিত্র হউক, প্রেমসিক্ত হউক, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। রাধা প্রেমের ইহাই পরিণতি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন,—শ্রীরাধা আপন প্রেম-মহিমায় যে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য আস্বাদন করেন সে মাধুর্য কেমন? সে মাধুর্য কেমন শ্রীমহাপ্রভু তাহা আস্বাদন করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্তনে। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেম সঙ্কীর্তন মহারাসেরই যুগোপযোগীস্বরূপ। কীর্তন-লম্পট গৌরচন্দ্র সঙ্কীর্তনেই আপন অসমোর্ধ্ব

ভাই! উপস্থিত সকলেই চমকে ওঠেন এ সম্বোধনে। চমকে ওঠে মস্তানীও। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে সে বিস্ময় প্রকাশ পায় না। সহজ-ভাবেই বলে, 'ওমা, এ যে আমার বধূবেশ।... এই বেশেই একদিন পান্নার প্রাসাদ থেকে শিবিকায় রওনা হয়েছিলাম প্রভুর সঙ্গে। শুনেছি বধূবেশেই সহমরণে যেতে হয়—তাই না?'

'তা হয়। ঠিকই শুনেছ। তোমার ভুল হয়নি। কিছুই ভুল হয়নি। আমারই ভুল হয়েছে। আমারই মনে ছিল না। কিন্তু ...তোমার ছেলে? তোমার বালক পুত্রকে এই শত্রুপুরীতে ফেলে যাচ্ছ—তোমার ভয় হচ্ছে না একটু?'

'ভয়! মানে মায়া এই তো! কাশীবাঈ, ঐখানে তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ। তুমি যত বড় ঘরেরই মেয়ে হও, তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা। ব্রাহ্মণ লক্ষপতি হলেও ভিখারী মনোভাব ত্যাগ করতে পারে না শুনেছি। ছোট ছোট আশা, ছোট ছোট ভয়, ছোট ছোট কামনা তাদের। ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র হিসেব, অতি সূক্ষ্ম বিচার। তোমাদের বুকখানাই আসলে ছোট। আমি যা-ই হই, ভুলে যেও না রাজা ছত্রশালের রক্ত আছে আমার ধমনীতে, রাজরক্ত। আমরা জীবন-প্রাণ একজনকেই দিই, সর্বস্বপণ করা পাশা খেলার দানের মত। সেই আমাদের মালিক। এ জীবনের ওপর, এ মনের ওপর আর কোন দাবী নেই, আর কারুর কথাই ভাবতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমাকে তাঁর প্রয়োজন, তাঁর কাছে যাচ্ছি, আর কোন কথা ভাববই বা কেন? ছেলে? তাকে ঈশ্বর দেখবেন!'

কাশীবাঈ হাসলেন। মিষ্ট মধুর হাসি—সর্বপ্রকার তিক্ততাহীন। এগিয়ে এসে দুটি হাত ধরলেন মস্তানীর, বললেন, 'ঈশ্বর ত দেখবেনই, সাধ্যমত আমিও দেখব। যাও ভাই, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আমাদের স্বামীর সেবা করতে যাও। তুমি ধন্য। তোমার প্রেম তোমাকে জাতিধর্ম সংস্কারের ঊর্ধ্বে নিয়ে গেছে, আজ তুমি আমার প্রণম্য।...... তবে তুমি ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যা বলেছ সব মেনে নিলাম, কেবল একটা কথা ছাড়া। বুক তার ছোট নয়। আশা করি মৃত্যুর আগে তুমিও সেটা স্বীকার করে যাবে। এসো—আমি তোমাকে হাত ধরে তোমার এবং আমার স্বামীর চিতায় তুলে দিই।...... পার তো আমাকে ক্ষমা করো, আর—আর চাইবার মুখ নেই—তবু, যদি সম্ভব হয় তো তাঁর কাছেও আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও!'

বলতে বলতেই দরদর ধারায় তাঁর এতক্ষণের শুষ্ক চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি উপস্থিত জনতা, আত্মীয় ও পরিজনমণ্ডলী, ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও মাওলী সৈন্যদের বিস্মিত করে মস্তানীর হাত ধরে এগিয়ে গেলেন স্বামীর প্রজ্বলিত চিতার দিকে।

মাধুর্যের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একটা কথা বলিয়া রাখি, মহাপ্রভুর তিনটি বাঞ্ছাই একটির সঙ্গে আর একটি সংশ্লিষ্ট, একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির কথা বলা যায় না।

কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ।
আপনে আস্বাদে প্রেম নাম সংকীর্তন।।
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্তন সঞ্চারে।
নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসারে।।

শ্রীমহাপ্রভু নিজে বলিয়াছেন—

তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি প্রেমরূপ।
নাম সংকীর্তন সর্ব আনন্দ স্বরূপ।।

* * *

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সব জগৎ নিস্তার।।

উপরের কবিতার দুই হেতু—এক যুগধর্ম প্রবর্তন, হরিনাম সংকীর্তন, দ্বিতীয় সেই সংকীর্তনেই স্বমাধুর্য আস্বাদন। এক নাম সংকীর্তনেই দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল। 'নাম সংকীর্তন সর্ব আনন্দ স্বরূপ" কথাটিও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক।

নাগর শেখর শ্রীবৃন্দাবনেও নাচিয়াছেন। মহারাসের নৃত্য তো, নৃত্যের চরম সীমা। অন্যান্য সময়েও গোপীগণ তাঁহাকে নাচাইয়াছেন। কিন্তু এক এক সময় তিনি আপনা-আপনিও নাচিতেন। শ্রীরাধা একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন বৃন্দে, কোথা হইতে আসিতেছ? বৃন্দা বলিলেন—"হরেঃ পাদমূলাৎ" শ্রীহরির পদপ্রান্ত হইতে। তিনি কোথায়? কুঞ্জারণ্যে। কি করিতেছেন? নৃত্যশিক্ষা। গুরু কে? দিকে দিকে প্রতি তরুলতায় তোমার যে মূর্তি স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই মূর্তিই তাহাকে নিপুণা নটিনীর মত আপন পশ্চাতে পশ্চাতে নাচাইয়া ফিরাইতেছে।

কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে ন্যাচিয়া তো আশা মিটে নাই। তা ছাড়া সে নাচন দেখিবারই বা সৌভাগ্য হইয়াছিল কয়জনের? আর এ নৃত্য দেখিয়াছে অখিল নরনারী নয়ন ভরিয়া। নীলাচল হইতে সেতুবন্ধ, রামকেলী হইতে শ্রীবৃন্দাবন ঐ একই দৃশ্য।

শ্রীকৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের মুখনিঃসৃত একটি শ্লোক আছে। এই শ্লোকটি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়—শ্রীচৈতন্যচন্দ্র নাম মাধুর্য আস্বাদন পূর্বক জগতের জীবকে জানিবার সুযোগ দিয়া গিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য কিরূপ? শ্লোকটি এই—

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব
মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধি বর্ধনং
প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্।।

অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখ। কৃষ্ণনামরূপ চন্দ্রোদয়ে কত না অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিতেছে। চন্দ্রের দধীতিক্ষরিত অমৃতবিন্দু চিত্ত-দর্পণকে পরিমার্জিত করিয়া কেমন সর্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সমগ্রতায় তাহাতে প্রতিফলিত হইতেছে দেখ। জ্যোৎস্নায় কখনো দাবানল নিভায় দেখিয়াছ? দেখ নাই কিন্তু শুনিয়াছ,—শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের স্মিত জ্যোৎস্নায় একবার নহে, দুই দুইবার কেমন অবলীলায় দাবানল অবলুপ্ত হইয়াছে। এখানেও তাহারই পুনরভিনয় দেখ। জগজ্জীবের যাহাতে কল্যাণ হয় সেই শ্রেয়স্বরূপ কুমুদ তো নামের কিরণেই বিকশিত হয়। আর কৃষ্ণভক্তি বিধাত্রী বিদ্যা-বধূর পিপাসিতা আকুলা চকোরিণীর জীবনই তো ঐ চন্দ্রাকিরণ। পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সাগর উদ্বেলিত হয়। কিন্তু সাগর কখনো বেলাভূমি অতিক্রম করে না। আর এই নাম মহিমায় উচ্ছলিত আনন্দাম্বুধির তরঙ্গভঙ্গে যে ভূধর কান্তার কেদার প্রান্তর প্লাবিত হইল। স্থাবর তো ভাসিলই, আর জঙ্গম—পশুপাখী নরনারী যে প্রতি পদে অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। পুরীধামে কৃষ্ণকথা আলাপনে সারা রজনী জাগিয়া অসহ আনন্দে মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন—

হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায়।।
সংকীর্তন যজ্ঞে করে কৃষ্ণে আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।।
নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস।।
সংকীর্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম।।
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।।

× × ×

অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।।
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাই সর্বসিদ্ধ হয়।।
সর্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব নামে নাহি অনুরাগ।।

× × ×

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রাম রায়।।
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণ সম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম।।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলা কারে পানী না মাগয়।।
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ।।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।।
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণ নাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ চরণে তার প্রেম উপজয়।।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা
বিংশ পরিচ্ছেদ)

তৃতীয় বাঞ্ছা—

শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে আনন্দ পান, সে আনন্দ কেমন? সে আনন্দ যে কেমন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সমগ্র জীবনই তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ। এই আনন্দই তাঁহাকে আচণ্ডাল নাম প্রেম বিলাইতে বাধ্য করিয়াছে। এই আনন্দই তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছে। মহাপ্রভুর পক্ষে প্রযোজ্য না হইলেও একথা তো প্রসিদ্ধ যে জলোকা যেমন একটা অবলম্বন না পাইলে পূর্বের অবলম্বন ত্যাগ করিতে পারে না তেমনই উন্মাদ ভিন্ন সাধারণ মানুষ অধিকতর সুখের সন্ধান না পাইলে গৃহসুখ পরিত্যাগ করে না। শ্রীকৃষ্ণ লীলায় বৃন্দাবন লীলাই আদি লীলা, মথুরা ও দ্বারকা তাহার পরে। শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় দ্বারকা ও মথুরা লীলা নবদ্বীপেই অভিনীত হইয়াছে, বৃন্দাবন লীলা আরম্ভ হইয়াছে সন্ন্যাসের পর।

যদিও গম্ভীরা লীলাই শ্রীমহাপ্রভুর জীবনে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদনের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল, তথাপি ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে নেত্রদ্বয় তাঁহাতেই কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু কৃষ্ণবিরহে সমস্ত জগৎ কৃষ্ণময় হইয়া যায়। অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ স্মৃতি ও কৃষ্ণ স্ফূর্তি, শ্রীকৃষ্ণ বিরহে এই রহস্যই অনুস্যূত রহিয়াছে। এই দিব্যোন্মাদ মানবকল্পনার অতীত অবস্থা। প্রকাশ করা দূরের কথা, ইহা মানুষের অনুভূতিরও অগম্য। নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর কিম্বা গৌর-পরিকরগণও ইহা সম্যক অবধারণে অপারগ। একমাত্র শ্রীরাধারাণীতেই ইহা পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। গৌরসুন্দরের জীবনে সেই দিব্যোন্মাদ পুনরায় প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য আস্বাদনে যে আনন্দ অনুভব করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা কিরূপে আস্বাদন করিয়াছেন, আমাদের মত পতিত দুর্গত জড় জীবের তাহা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য কোথায়?

যে আমাকে যেমনভাবে পাইতে চাহে, আমি তাহাকে সেইরূপেই ভজনা করি, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীধাম-বৃন্দাবনে তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল। শ্রীরাধা সনাথা গোপীযূথ তাঁহাকে যে ভাবে ভালবাসিয়াছিলেন, তিনি তাহার প্রতিদান দিতে পারেন নাই। সেইজন্য মুক্তকণ্ঠে ঋণ স্বীকার করিয়াছিলেন। কথা উঠিতে পারে বৃন্দাবনে ঋণ স্বীকার করিয়া পুনরায় অর্জুনের নিকট "যে যথা মাম্ প্রপদ্যন্তে" এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনাইলেন কেন? প্রশ্নটি এখানে অবান্তর।

শ্রীবৃন্দাবন একটি পৃথক রাজ্য। সেখানকার আইনকানুনও পৃথক। পরমাত্মীয়, যৌবন-সুহৃদ, নিত্যসহচর অর্জুন যে বিশ্বরূপ দেখিয়া মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন, জননী যশোদা তাহা দুই দুইবার দেখিয়াও সন্ত্রস্তা হন নাই। বরং পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় নারায়ণ স্মরণ করিয়াছিলেন। অর্জুনকে প্রবুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল, সেই সঙ্গে প্রয়োজন ছিল

বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধন। এই দুই উদ্দেশ্য লইয়াই গীতার অবতারণা। সুতরাং এখানে যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিবার প্রয়োজন হয় নাই।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার যাহা শেষ বাণী, শ্রীভগবান যে কথা বলিয়া গীতার উপসংহার করিয়াছেন, গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দ সংবাদে মহাপ্রভু তাঁহাকে বাহিরের কথা বলিয়াছেন। কারণ সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের যে শরণ গ্রহণ তাহা নিরবদ্য হওয়া চাই, প্রেমাপ্লুত হওয়া চাই, সর্ব কামনা-শূন্য এবং অহৈতুকী হওয়া চাই। সে ক্ষেত্রে—"অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি" এই ফলশ্রুতির, এই প্রলোভনের কোন আবশ্যকতা থাকে না।

গোপীগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা। গীতা মাহাত্ম্যে গীতার অপর একটি নাম পতিব্রতা। ইহা শ্রীরাধারই অপর নাম। রায় রামানন্দ বলিয়াছেন "যাঁর পাতিব্রত্য ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী"। যত্র গীতা বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা। মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান রাধিকা সহ।। ইহাও গীতা মাহাত্ম্যের কথা। কায়মনোবাক্যে যে গীতা বাক্যের অনুসরণ করিতে, যে গীতার বাণীকে জীবনে মূর্তি দিতে স্বয়ং অর্জুনও অসমর্থ হইয়াছিলেন, এই বনচরী ব্রজকিশোরীগণ একান্ত অনায়াসে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে তাহাতেই পারদর্শিনীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাই তো ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব গোপীপদরেণুকে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন।

অতি পুরাতনী এই গীতার মহাবাণী। স্মরণাতীত দিনে শ্রীভগবান সূর্যকে এই যোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সূর্য হইতে মনু, এবং মনু হইতে ইক্ষ্বাকু এই যোগ প্রাপ্ত হন। কালে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। গোপীগণের আচরণেই রসিক শেখর পরম করুণ শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য এই মহাযোগ পুনঃপ্রচারে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাঁহার লোভ হইয়াছিল গীতার বাণী জনসমাজে প্রচার করিতে। শ্রীরাধার পদপ্রান্তে বসিয়া তিনি নূতন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন "যে যথা মাম্‌ প্রপদ্যন্তে" কথাটা বৃন্দাবনে বলা চলে না। এইজন্যই গোপী প্রেমের নিকট ঋণ স্বীকারপূর্বক লোককল্যাণ কামনায় ঐ কথা কুরুক্ষেত্রে বলিয়াছিলেন।

রাধা-ঋণ পরিশোধের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের অবতার গ্রহণ। পূর্বকথিত তিন বাঞ্ছার সঙ্গে—এই দেনা পরিশোধের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। ঐ তিনটি বাঞ্ছার পূর্তির মধ্যেই এই দায় পরিশোধের পন্থা রহিয়াছে। দেনাদার অর্থাৎ খাতক যদি মহাজনের ভাব বুঝিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিতে পারেন, খাতকের দেনার বোঝা অনেকটাই হাল্‌কা হইয়া যায়। মহাপ্রভু তাহাই করিয়াছিলেন। শ্রীরাধার ইচ্ছানুসারেই তিনি মানবের দ্বারে দ্বারে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন "ওগো তোমরা আমার বন্ধুকে ভালবাস"। তাঁহার মত ভালবাসার পাত্র এ চৌদ্দ ভুবনে আর কেহ নাই। তাঁহাকে ভালবাসিলেই তোমাদের কুল পবিত্র হইবে, জননী কৃতার্থা হইবেন, আর তোমরাও ধন্যাকৃতকৃত্য হইবে।

কান্তি শব্দের এক অর্থ যেমন ইচ্ছা, অন্য অর্থ তেমনই দেহবর্ণ, অঙ্গচ্ছটা, লাবণ্য। অঙ্গ কান্তি গ্রহণের প্রথম কারণ, সাধারণে যাহাতে তাঁহাকে চিনিতে না পারে। দ্বিতীয় কারণ—শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গের শ্যামল কান্তি শ্রীরাধার গৌর কান্তিতে আবৃত হইয়া গিয়াছিল। মহাজন খাতকের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। অবিশ্বাসের কোন কারণ আছে কিনা জানিনা। তবে দেখিতেছি যে কোন কারণেই হউক, অধমর্ণকে তিনি আঁখির আড় করিতে চাহেন না। কিন্তু ঋণ কি পরিশোধিত হইয়াছে? যে ঋণ অপরিশোধ্য, তাহা শোধ করিবার উপায় কি? এক উপায় আছে, আমরা সকলে যদি এই ঋণের অংশ গ্রহণ করি, এবং পরিশোধে উদ্যোগী হই, তাহা হইলে হয় তো ঋণভারের কথঞ্চিৎ লাঘব হইতে পারে। অকপটে নাম গ্রহণই এই ঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায়। আমাদের তাহাতে রুচি হইবে কি?

বলিতে ভুলিয়াছি, কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গোপী প্রেমের কথা কিছু বলেন নাই, কিন্তু অন্য সময়ে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, পার্থ আমি সত্য বলিতেছি, গোপীগণ আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, ভোগ্যা, বান্ধব এবং স্ত্রী, গোপীগণ আমার কি নয়?
সহায়ঃ গুরবঃ শিষ্যা ভুজিষ্যা বান্ধব স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্য কিং মে ভবন্তিনঃ।।

আয়োজন

আশাপূর্ণা দেবী

ছেলেটার ওপর চোখ পড়ল না। পড়ল তার মা'র ওপর।

কাঁধকাটা পিঠকাটা একবিঘত ব্লাউজ পিঠে ফেলা শাড়ীর আঁচলটা গোছা করে বাঁ হাতের তলা দিয়ে পেঁচিয়ে ফের আবার সামনের দিকে ঘুরিয়ে আনার দরুণ কাটা পিঠ ব্লাউজ সমেত সমস্ত পিঠটা দৃশ্যমান, কাজেই পাঁজরের পাশের মাংসের থাক দুটোও স্পষ্ট চোখে পড়ল।

আর লোকনাথের মনে হল এর চাইতে অশ্লীল দৃশ্য বুঝি জগতে আর নেই।

তারপরই মনে করতে চেষ্টা করলেন লোকনাথ, কতদিন বিয়ে হয়েছে রুবর। সাত? আট? নয়?

হ্যাঁ নয়, ন' বছরই। উনিশশো চুয়ান্ন সাল সেটা। তার পরের বছরই তো লেক গার্ডেনসের এই জমিটা কিনেছিলেন লোকনাথ।

[illegible]

পর পুরো একটা দশকও কাটেনি। 'অথচ এই দশের আগেই দশ মূর্তি' ভাবলেন লোকনাথ। একেবারে [illegible]

রুমা যতক্ষণ ধরে ওর [illegible] করা বিশেষ একটি ছন্দের ভঙ্গীতে [illegible] নামল, আর তারপর রাস্তায় [illegible] পর যতক্ষণ তাকে দেখতে পাওয়া [illegible] যাকে বলে রীতিমত [illegible] করলেন লোকনাথ।

রুমার চেহারাটা অদৃশ্য হয়ে [illegible] দেখতে থাকলেন কিছুক্ষণ, [illegible] শূন্যতার ওপর হঠাৎ একটা [illegible] উঠল।

রুমাকে প্রথম দিন দেখতে যাওয়ার ছবিটা। ওর বাপের বাড়ীর সেই ঘরখানা সমেত।

লোকনাথের মনে হয়েছিল যেন একখানি সরস্বতী প্রতিমাকে এনে বসিয়ে দিল ওর বাবা। লোকনাথ বিমুগ্ধ নেত্রে দেখছিলেন [illegible] তারপর আস্তে ওর বাবাকে [illegible]

বললেন, ...খতে তো আপনার মেয়ে চমৎকার, তবে এ... যেন রোগা না? হাত-টাত শক্ত নয়—

... হাঁ করে উঠেছিলেন, 'ও কিছু না, ও আপ... ঘরে গেলেই দেখবেন দু'দিনে—' একটু ... কথার শেষ করেছিলেন 'গরীব বাপ, ...ই আর যত্ন করতে পারে বলুন? এবার ... 'জজ' বাপ করে দিচ্ছি—'

হ্যাঁ তখনো 'জজ' ছিলেন লোকনাথ। এক্সটেন...নের পিরিয়ড' চলছিল। এখন বাড়ীতে বসা। ...সিঁড়ির সামনের এই ঘরটাই এখন তাঁর আবাসস্থল।

আর ঘরের সামনের দরজাটা এবং পাশের ওই জানলাটা লোকনাথের দুই চক্ষু। খবরের কাগজের আড়াল থেকেই তিনি অবলোকন করেন, কে বেরোচ্ছে, কে ঢুকছে।

সংসার সদস্যদের আগমন-নির্গমনের এই হিসেবটা কেন রাখেন লোকনাথ, রেখে কী লাভ, তা' নিজেই জানেন না লোকনাথ, তবু রাখেন।

আজও ব্যতিক্রম হল না।

হাতের কাগজখানা একরকম আছড়ে এক-ধারে ফেলে দিয়ে চটিতে পা গলাতে গলাতে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'বৌমা এখন সকালবেলা ছেলে নিয়ে গেল কোথায়?'

সুপ্রভাকে এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর সর্বদাই দিতে হয়। তাই উত্তরে কোমলতা ঝরানো সম্ভবও নয়।

তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, 'সেটা আমায় জিগ্যেস না করে বৌমাকে জিগ্যেস করলেই ভাল হ'ত না?'

'ভাল!' লোকনাথ ব্যঙ্গোক্তি করলেন, ভালোর তো সবই হচ্ছে, ভাই! জিগ্যেস করবো কি, নবাবকন্যে তো এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখেন না, মদগর্বে চলে যান।'

'বাড়ী থেকেও তাই গেছেন!'

লোকনাথের রাগটা এবার সুপ্রভার ওপর এসে আশ্রয় নিল। রাগ চাপলেনও না। বললেন, 'বৌ কোথায় বেরিয়ে গেল, সে খবর-টুকু রাখতে পার না?'

'না পারি না। বাতাসে যেটুকু খবর কানে আসে তাই জানি। শুনলাম ছেলেকে সাঁতার ক্লাবে ভর্তি করতে গেলেন।'

'সাঁতারে!'

আকাশ থেকে পড়লেন লোকনাথ। 'ওই দু' বছরের ছেলেটাকে সাঁতার ক্লাবে! তার মানে?'

'মানে আবার কি! মা ছেলের স্বাস্থ্য ভাল করবার চেষ্টা করবে না?'

'স্বাস্থ্য ভাল? ওই বারো মাস সর্দি-কাশি ছেলের সাঁতার শিখে স্বাস্থ্য ভাল হবে?'

'হবে নিশ্চয়।'

বলে সুপ্রভা অকারণেই চশমাটাকে নাকের ওপর চেপে বসিয়ে নিলেন একবার।

এ ভঙ্গী লোকনাথের পরিচিত। এ হচ্ছে প্রসঙ্গে যবনিকাপাতের ইঙ্গিত। ক্রুদ্ধ হলেন বললেন, 'খোকা কোথায়?'

'ঘরে কি বাথরুমে আছেই কোথাও।'

লোকনাথ কাকে যেন ডেকে বললেন, 'ওই দেখতো দাদাবাবু কোথায়? ডাক একবার।'

'খোকা' সদ্য দাড়ি কামানো অর্ধপরিস্কৃত সাবানের ফেনা লাগানো মুখটা তোয়ালেয় ঘসতে ঘসতে এসে দাঁড়াল।

লোকনাথ রাগের ভঙ্গী ছেড়ে বিদ্রুপের ভঙ্গী ধরলেন। বললেন, 'তোমার লায়েক ছেলে নাকি সাঁতার শিখতে গেল?'

আড়াই বছরের ছেলেকে সাঁতার ক্লাবে ভর্তি করতে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে স্ত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যে অনেক বচসা হয়ে গেছে খোকার, অর্থাৎ ধ্রুবনাথের।

রুমা বলেছে, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ী হলে কি হবে, অর্ধ শতাব্দীর অনগ্রসরতা নিয়ে পৃথিবীতে চলাফেরা করছ তোমরা।

ধ্রুবনাথের নিজের মাণিকতলার সেই স্যাঁৎসেঁতে ঘরওয়ালা অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্বশুর-বাড়ীটার কথা মনে পড়েছিল, মনে পড়েছিল শ্বশুরের সেই কলারছেঁড়া টুইল শার্ট পরা বাজারের থলে হাতে করা মূর্তিটি।

কিন্তু যা মনে পড়ে, তা মনের মধ্যে রেখে দেওয়াই সভ্যতা।

সভ্য ধ্রুবনাথ তাই ছেলের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে তর্ক করেছিল এবং যথারীতি তর্কে হেরেও ছিল। সেই তিক্ততা রয়েছে মনের মধ্যে। বাবার এই সাপ্ত প্রশ্নে সেটা আরো বেড়েই গেল। আর তার দরুণ উল্টো গেয়েই বসল। না বলেই বা করবে কি? সত্যি তো আর পঞ্চাশ বছরের অনগ্রসরতা নিয়ে চলাফেরা করছে না যে মা-বাপ ভাইবোনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্ত্রীর নিন্দে করবে?

তাই ওই উল্টো গাওয়া।

বেশ আত্মস্থভাবে বলা, 'তা' আশ্চর্য হবার কি আছে? কত ছেলে যাচ্ছে ও বয়সে।'

'যাচ্ছে! দু' বছরের ছেলে সাঁতার শিখতে যাচ্ছে?'

'দু' নয় আড়াই!'

'সরি! তা সেটাই খুব স্বাভাবিক তোমাদের কাছে?'

'অস্বাভাবিকেরও তো দেখছি না কিছু—' ধ্রুব তোয়ালেটা আরো জোরে জোরে ঘসতে ঘসতে বলে, 'পাঁচজনে যা করছে—'

যে যুক্তি নিজেই এতক্ষণ খণ্ডন করছিল, সে যুক্তি এখন নিজেই প্রয়োগ করছে ধ্রুব।

প্রাক্তন জজ বারকয়েক মসৃণ মোজাইক মেজেয় চটি ঘসে পায়চারি করে কটুকণ্ঠে বলেন, 'তা এ-সব ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একটা পরামর্শ করারও তো দরকার বোধ করনি দেখছি—'

প্রয়োজনবোধ ধ্রুব করেনি তা নয়—করে-ছিল।

...টুবুল বাপের চক্ষের মণি, প্রাণের পুতুল তা তো জানে ধ্রুব কাজেই টুবুল সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাবাকে বলা বিধেয়, এ প্রস্তাব করেছিল ধ্রুব। কিন্তু রুমা বলেছিল, 'জিগ্যেস করা মানেই তো নিষেধের মুখে দাঁড়ানো। নিষেধ অমান্য করে কাজ করাটাই কি তুমি বেশ সুন্দর মনে কর?'

অর্থাৎ 'কাজটা' করা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা নেই। অতএব ধ্রুব আর পরামর্শরূপ প্রহসনের দিকে যায়নি। কিন্তু এত কথা তো বলা চলে না, তাই ধ্রুব গুরুত্বটা লঘু করতে আসে, 'কী এমন একটা ব্যাপার! এটাকে এমন গুরুত্বই বা দিচ্ছেন কেন?'

'গুরুত্বই না দিচ্ছি কেন! তা বটে।' ওই একটা বাচ্চা! হঠাৎ ... কেমন বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসে, নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে যান লোকনাথ অস্ফুট স্বরে কথাটা শেষ করে, 'জলে চোবালে বাঁচবে ও?'

ধ্রুব মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। তারপর মায়ের দিকে তাকায়। সুপ্রভা খাটিতে বসেছিলেন, বসেই আছেন। এসব কথার ছন্দাংশ তাঁর কানে পৌঁছেছে সে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

ধ্রুব ভাবল মেয়েদের নাকি চিরদিন 'মমতাময়ী' বিশেষণে বিভূষিত করা হয়ে থাকে।

তারপর ভাবল 'শাঁখের করাত' বলে একটা প্রবাদ আছে বাংলায়, সেটা কাদের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল? তারপর ঠাকুরের কাছে ভাত চেয়ে খেয়ে বেরিয়ে গেল। জজের ছেলে হয়েও তেমন কিছুই হতে পারেনি। সেকেণ্ড ক্লাশ এম-এ, একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কলেজে অধ্যাপনা করে 'প্রফেসর' নামটার গৌরব গ্রহণ করে আছে মাত্র। আর সেখানে গৌরব বাড়ীর গাড়ী করে যাওয়া আসা করা।

বাসে যেত প্রথম প্রথম, লোকনাথই বলে-করে রাজী করিয়েছেন গাড়ীতে যেতে।

ধ্রুব বেরিয়ে গেল টের পেলেন লোকনাথ গাড়ীর শব্দে। আর যে গাড়ী চড়তে সেধে-ছিলেন ছেলেকে, সেই গাড়ীর শব্দটাই হঠাৎ বিষ লাগল তাঁর কানে। ভাবলেন, মাইনে তো তিন পয়সা, নবাবীর কমতি নেই কিছু।

যাক সেও মনের মধ্যকার কথা।

সে কথার জন্যে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় ...।

কিন্তু কিছু কথা মুখের আগায় এনে জমা করে রাখলেন লোকনাথ। বলবেনই ঠিক করছেন। কেন বলবেন না? কিছু না বলে বলেই এইটি হয়েছে। এতটি বাড় বেড়েছে ওদের।

ছেলের বিয়ের পর কিছু দিন যে তিনি নিজেই সরস্বতী প্রতিমা বৌটি নিয়ে কতটা বাড়াবাড়ি করেছিলেন, সে সব আর এখন মনে পড়ে না লোকনাথের। বৈঠকখানায় বাইরের লোক এসেছে, উনি 'বৌমা'কে ডেকে নিয়ে গেছেন, বৌমার গান শুনিয়েছেন তাদের, শতমুখে প্রশংসা করেছেন তাদের কাছে। এ যেন নিজের বিজয় নিশান। কেমন জোগাড় করেছেন দেখ তোমরা।

মাণিকতলার সেই জরাজীর্ণ বাসার ছায়া জড়ানো নম্রকুণ্ঠিত প্রতিমাখানি কবে বিদায় নিল বেদী থেকে? কবে ওই মেদযত্নে বিশ্ব-নস্যাৎভঙ্গী নারী মূর্তিটি মঞ্চে আসীন হল ঠিক হিসেব করতে পারেন না লোকনাথ।

তবে সুপ্রভা মাঝে মাঝে লোকনাথের পুরনো দিনের 'আদিখ্যেতার' উল্লেখ করে প্রবাদের সাপের উপমা দেন। অতএব বৌয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বিষ হন লোকনাথের কাছে।

ক্রুদ্ধ লোকনাথ বলেন, 'শাশুড়ী হয়ে উচিত কথা বলতে পার না?'

সুপ্রভা বলেন, 'না পারি না। উচিত কথায় বন্ধু বিগড়োয় জান না? শোনাতে ইচ্ছে হয় তুমি শোনাও গে না। যখন শুনিয়েছিলাম, তখন কানে করেছিলে আমার কথা?'

এও একটা উচিত কথা।

অতএব বন্ধু বিগড়োয়।

চিরদিনের বন্ধু এখন সর্বদাই বিগড়ে বসে। আজ লোকনাথ হাল ধরবেন ঠিক করেছেন।

ধ্রুব বেরিয়ে যাবার কিছুক্ষণ পরে

সিঁড়িতে আসামীর পদশব্দ পাওয়া গেল। নকীব আছে তার আগে আগেই। কাঁদতে কাঁদতে আসছে টুটুল। সিঁড়ির দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন লোকনাথ, কাজেই রুমা যা দুচক্ষে দেখতে পারে না তাই করে বসল টুটুল। মায়ের কাছে পিটুনী খাওয়ার নালিশ করতে এল ঠাকুর্দার কাছে।

'দাদু, দাদুভাই মামণি আমাকে জলে ডুবিয়ে দিচ্ছিল, আমায় কান মুলে দিয়েছিল, আমায় রোজ পুকুরে ডুবিয়ে দেবে বলে—'

'টুটুল!'

ডেকে উঠল রুমা, তীব্র কন্ঠে। এইগুলো সত্যিই ভীষণ বিরক্তিকর। ছেলেকে মনের মত করে মানুষ করবার জো নেই।

জজ শ্বশুর থাকার সুবিধেগুলো মনে পড়ে না রুমার, বুড়ো শ্বশুর থাকার অসুবিধেটাই তাকে পীড়িত করে। ছেলের এই নালিশ করা রোগটি কি জন্মাত, যদি লোকনাথ অত প্রশ্রয় না দিতেন! আদুরে নাতিটিকে।

তা' রুমা যতই ইংগিতময় ডাক ডাকুক, টুটুল দাদুরই শরণ নেয়। আর লোকনাথ দেখেন ছেলেটার চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে, মুখটা ফুলে গেছে যেন। লেকের জল এবং চোখের জল, উভয়ের সংমিশ্রণে গঠিত নাতির এই মূর্তি দেখে আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না লোকনাথ, বলে উঠলেন, 'ছেলেটাকে আর জ্যান্ত নিয়ে ফিরলে কেন? লেকের জলে রেখে এলেই পারতে!'

কথাটা বলে ফেলে বুঝলেন একটু বেশী কড়াই হয়ে গেছে, কিন্তু যা হয়ে গেছে তার আর চারা কি?

না চারা নেই।

মহীরূহ হয়ে উঠেছে তৎক্ষণাৎ সেই অসতর্ক উক্তি।

মুহূর্তে রুমার সারা মুখটাই ছেলের চোখের মত রাঙা হয়ে ওঠে।

সেও হঠাৎ বলে ওঠে, 'আপনাদের আশীর্বাদের তেমন জোর থাকলে তাও হতে পারতো বাবা।'

'কী, কী, বললে বৌমা!'

'কিছুই বলিনি বাবা, সামান্য একটা ব্যাপারকে অসামান্য করে তুলে নিজেরাই কষ্ট পান আপনারা, এইটাই শুধু বলছি।'

'এই দুধের ছেলেটাকে জলে চুবিয়ে নিমোনিয়া ধরানোর দুর্বুদ্ধিকে সামান্য বলছ তুমি বৌমা!'

রুমা শান্তস্বরে বলে, 'আপনি বরং একদিন সকালে গিয়ে দেখবেন, একা আপনার নাতিটিকেই জলে ডুবিয়ে মারার ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিনা সেখানে।'

'দেখবার আমার দরকার নেই', লোকনাথ ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, 'ওর যাওয়া হবে না বাস।'

রুমা তবু শান্ত আর অবিচল থাকে, 'ভর্তি করে এলাম—'

'যাক চুলোয় যাক, গোটাকতক টাকা জলে গেলে কিছু এসে যাবে না।'

না, শ্বশুরের মুখে মুখে তর্ক করে না রুমা, শুধু বুঝিয়ে দেয়, 'টাকাই তো শুধু জলে যাবে না বাবা, আমার প্রেস্টিজটাও জলে যাবে। তা ছাড়া সইবে না বললে চলবে কেন? ওকে তো খেটে পিটে খাবার মত করে মানুষ করে তুলতে হবে? ওতো আর জজের ছেলে নয় যে গোবরগণেশ হয়ে থাকলে চলবে!'

লোকনাথ এসে শুয়ে পড়লেন।

সারাদিন শুয়েই থাকলেন লোকনাথ।

বিকেলের দিকে চাকরের মুখে শুনতে পেলেন 'টুটুলবাবু' বেড়াতে যাবে না, বেদম জ্বর এসেছে তার।

লোকনাথ উঠে বসলেন।

তারপর বড় করে একটা আলিস্যি ভেঙে হাই তুললেন। মনের কথা কেউ দেখতে পায় না, তবু চাকরটার মনে হল বাবুকে কেমন উৎফুল্ল দেখাল। তারপর ভাবল ধ্যেৎ, মনের ভ্রম।

ধ্রুবের ফেরার সময়টা দেখেননি লোকনাথ; দেখলেন ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে—বললেন, 'খোকা, এসেই ছুটছ কোথায়?'

লোকনাথের গোবরগণেশ ছেলে, ডাঁট রাখতে পারল না, বিষণ্ণ মুখে আর কাতর কন্ঠে বলল, 'টুটুলের জ্বরটা প্রায় চারের ওপর উঠে গেছে—ফোনে পেলাম না ডাক্তারবাবুকে—'

চারের উপর জ্বর উঠে গেছে!

ফোনে ডাক্তারকে পাওয়া যায়নি!

বিজয় গৌরবদৃপ্ত লোকনাথ গা ঝেড়ে উঠে বললেন, 'টুটুলের জ্বর হয়েছে নাকি? কেন?'

'কেন' সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শক্ত। ধ্রুব ঘুরিয়ে বলে, 'কি জানি এসে তো দেখছি—'

'ঠিক আছে। তুমি আর রোগা ছেলে ছেড়ে বেরিও না, আমি দেখছি। তবে ওর মাকে বোলো—যাক। আচ্ছা—'

বেরিয়ে গেলেন লোকনাথ গাড়ী নিয়ে।

ডাক্তার আসতে দেরী হ'ল না।

কিন্তু ততক্ষণে ধ্রুব কাঁপছে, সুপ্রভা প্রায় কাঁদছেন, আর রুমার মুখটা দেখে মনে হচ্ছে এক উনুন আগুন ভরা আছে ওর মুখের ওই ফর্সা চামড়ার অন্তরালে। আবেগ উৎকণ্ঠা অভিযোগ অভিমান, সব কিছুকে সংহত করে রাখাতেই বোধ করি ওর এই অবস্থা।

ডাক্তার বললেন 'কি, কি খবর?'

ধ্রুব কেঁদেফেলা গলায় বলল, এইমাত্র টেম্পারেচার নিয়েছি, পাঁচ পয়েন্ট ছয়—'

লোকনাথ সেই 'পাচ পয়েন্ট ছয়ে'র মুখের দিকে তাকালেন একবার, বুকের মধ্যেটা হাহাকার করে উঠল, মাথাটা ঠুকতে ইচ্ছে হ'ল দেয়ালে। কেন তিনি সকালে অতবড় একটা কটুকথা বলে বসলেন! এরপর আর কি মুখ দেখাতে পারবেন তিনি ছেলে-বৌয়ের কাছে!

রুমা তো বলবেই ধ্রুবকে।

শোকের সময়—

শোকের সময়! তা ছাড়া আর কি?

লোকনাথ ভাবলেন ওই একমুঠো ফুল কি আর এই আগুনের শিখা থেকে রক্ষা পাবে? 'পাঁচ পয়েন্ট ছয়—' আগুন ছাড়া আর কি!

ডাক্তার আইসব্যাগ আর গরমজল দুটোরই ব্যবস্থা দিলেন। এবং উপস্থিত সকলেরই এ বোধ এলো, এটা শেষ চেষ্টা মাত্র।

ওই নিথর নিস্পন্দ ফুলের মুঠোটা, মাঝে মাঝে হেঁচকি তোলা আর মাথা চালি করা ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষণ নেই যার মধ্যে, কতক্ষণ আর মাথা চালবে সে? কতক্ষণ হেঁচকি তুলবে?

আর পারলেন না লোকনাথ।

পাঁজরের মধ্যেটা মুচড়ে উঠলে মুখ সামলে থাকা কি সহজ? হতে পারে এখন প্রাক্তন, একসময় তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন, পুরো একটা জেলার। তাই সামলাতে পারলেন [illegible] দুঃখ, বলে উঠলেন, 'হলো তো! খেটে-পিটে খাবার মতন করে মানুষ করা হল?'

সবাই চমকে তাকাল। মায় ডাক্তার।

শুধু রুমা চমকালো না।

শুধু তার এতক্ষণের আগুনে-[illegible] মাথার রক্তটা চোখের স্নায়ু পুড়িয়ে দি[illegible] চোখ বেয়ে নামতে থাকল ফুটন্ত জল হয়ে।

লোকনাথ চলে গেলেন ঘর থেকে।

আর প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অপেক্ষা করতে লাগলেন সুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বরের। হ্যাঁ সুপ্রিয়ারই। পঞ্চাশ বছর বয়েস আর আরও পঞ্চাশ বছরের অনগ্রসরতা নিয়ে বসে আছে যে মুমূর্ষু শিশুর মাথার কাছে।

কত যুগ কাটলো?...........

যুগ-যুগান্তর?

সুপ্রিয়া কি চেঁচিয়ে ছিলেন?

লোকনাথ শুনতে পাননি?

লোকনাথ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

নইলে বাড়ীটা এমন নিথর কেন? [illegible] একটা ভয়ে হাত-পা অবশ হয়ে এল লোকনাথের। উঠতে গেলেন, উঠতে পারলেন না। নিশ্চয় বুঝলেন, তখনকার সেই নিষ্ঠুর [illegible] তাঁকে ওদের কাছ থেকে 'একঘরে' করে রেখেছে।

হয়তো ওরা লোকনাথের ওই [illegible] জন্যে নিজেদেরকে নিশ্চুপ করিয়ে [illegible] হয়তো নীরবে নিয়ে চলে গেছে।

'খোকা' বলে ডেকে উঠতে [illegible] পারলেন না। বালিশে মাথা চেপে [illegible] শব্দ করে উঠলেন শুধু।

এ শব্দে কিন্তু খোকাই এল।

বলল, 'এই যে বাবা উঠেছেন [illegible] ঘুমোচ্ছিলেন বলে আর জাগাইনি [illegible] জ্বরটা সাড়ে নিরানব্বইয়ে নেমে গেছে [illegible] খুব এসে পড়েছিলেন নইলে [illegible] পড়তে পারতো।'

লোকনাথ ধ্রুবের মুখের দিকে [illegible] না। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন [illegible] বলল, 'খেতে দেওয়া হচ্ছে।'

লোকনাথ ঘড়ি দেখলেন রাত সাড়ে [illegible]

দুঘণ্টা তাহলে তিনি ঘুমিয়ে [illegible] ছিলেন। সমস্ত মনটা যেন বিস্বাদ হয়ে [illegible] লোকনাথের, সে বিস্বাদ বুঝি [illegible] লাগল, বললেন 'খিদে নেই।'

ধ্রুব চলে গেল।

কিন্তু একটু পরে আবার চাকর [illegible] ডাকতে।

উৎফুল্ল মুখে বলল, 'বাবু, [illegible] জ্বর ছেড়ে গেছে।'

লোকনাথ হঠাৎ তেড়ে উঠলেন [illegible]

বললেন, 'গেছে তার কি? দু হাত [illegible] নাচব? কতজনে মিলে শোনাতে [illegible]

ও থতমত খেয়ে বলল 'খেতে দিয়েছে—'

'বললাম যে খিদে নেই। খাব না।'

আবার শুয়ে পড়লেন লোকনাথ।

নিজেকে যেন পরাজিত হৃতসর্বস্ব [illegible] হল লোকনাথের।

কর্মনাশা পারাপারের অস্থায়ী আয়োজন

কল্পেশ্বর

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
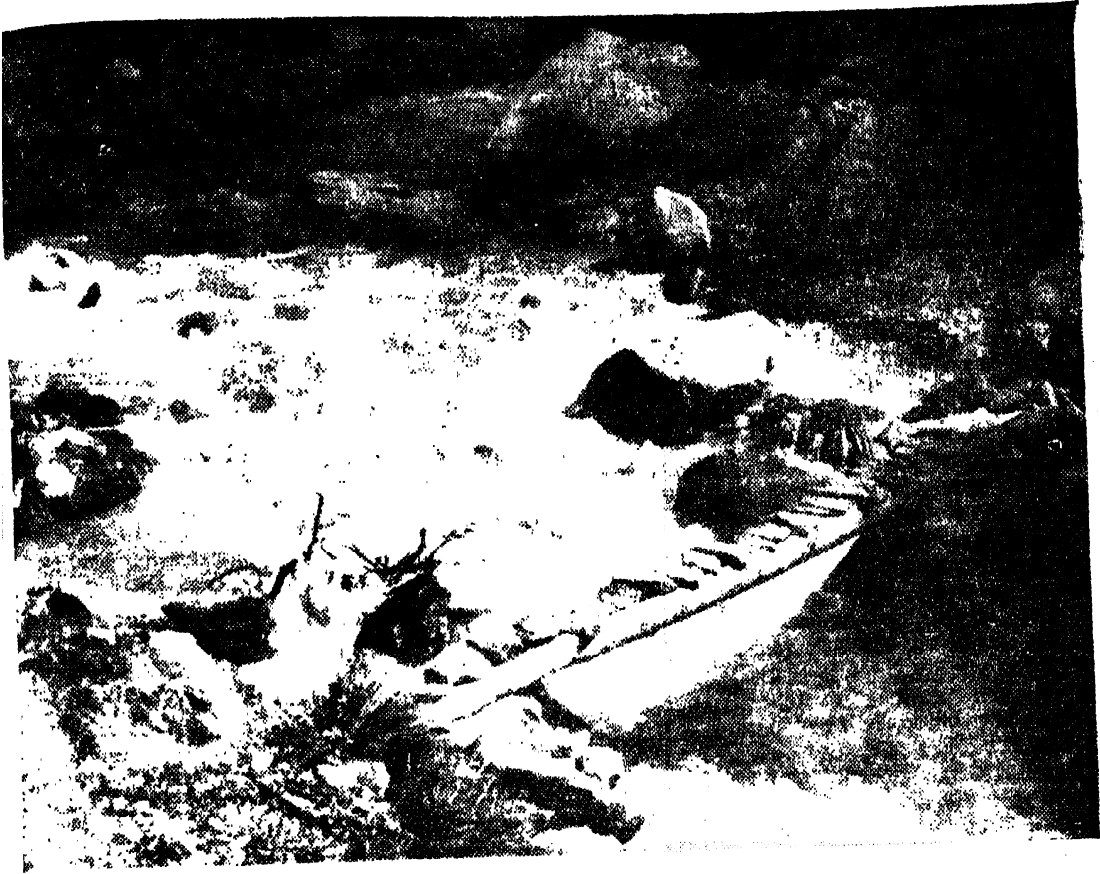
কেদার-বদরীর নাম সকলেরই পরিচিত। অনেকে গেছেনও। কিন্তু, ঐ উত্তরাপথে পঞ্চ-কেদার ও পঞ্চ-বদরী আছেন, সে-খবর হয়ত সকলের জানা নেই।

অন্ততঃ হিমালয়-দুহিতা পার্বতীর জানা ছিল না। তাই বোধ হয় মহাদেব মহাদেবীকে পঞ্চ-কেদারের পরিচয় দেন ঃ

কেদারং মধ্যমং তুঙ্গং তথা রুদ্রালয়ং প্রিয়ম্।
কল্পকং চ মহাদেবি, সর্বপাপপ্রণাশনম্॥

হে মহাদেবি, কেদার (কেদারনাথ), মধ্যম (মধ্যমেশ্বর বা মদ্‌মহেশ্বর), তুঙ্গ (তুঙ্গনাথ), প্রিয় রুদ্রালয় (রুদ্রনাথ) ও কল্পকতীর্থ (কল্পেশ্বর বা কল্পনাথ)—সর্বপাপহর এই তীর্থগুলি।

তারপর, একে একে এই পঞ্চ-কেদারের মহাত্ম্য বর্ণনা করেন। পঞ্চম কেদার কল্পেশ্বর সম্বন্ধে বলেন ঃ

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি পঞ্চমং বৈ মমালয়ম্।
কল্পস্থলমিতি খ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্॥
যত্রাহং দেবদেবেন হ্যর্চিতঃ পর্বতাত্মজে।
যতো দুর্বাসসা শপ্তো নষ্টলক্ষ্মী হৃত প্রভঃ॥
আরাধ্য মাং ত্বয়া যুক্তং প্রাপ্তবান কল্পপাদপম্।
অহং চ দেবদেবেশি কল্পেশস্তং সমাগতঃ॥

দুর্বাসার শাপে শ্রীহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র সেইখানে হর-পার্বতীর আরাধনা করেন এবং কল্পতরু প্রাপ্ত হন। কল্পেশ্বর নাম নিয়ে মহাদেবও ওখানে বিরাজ করতে থাকেন।

সেই কল্পবৃক্ষ আজ কোথায় তা' জানি না। কিন্তু, হিমালয়ের এক নিভৃত অঞ্চলে পঞ্চম-কেদাররূপে কল্পেশ্বর তীর্থ আজও বিদ্যমান। দেবরাজ সেখানে লাভ করেছিলেন কল্পতরু। আধুনিক কালের মানুষ সেখানে কি দেখল সেই কথাই লিখি।

(২)

যাবার পথ—হেলাং বা কুমারচটি থেকে। পিপুলকুঠি হতে বদরীনাথ যাত্রা-পথে যোশী-মঠের মাইল ছয় সাত আগে হেলাংচটি। প্রথম যেবার কল্পেশ্বরে যাই, হেলাং পর্যন্ত বাস চলেনি। পায়ে হাঁটা প্রাচীন পথে যেখানে হেলাং চটির দোকানপাট, ধর্মশালা ছিল, সেখান থেকে প্রায় মাইলখানেক নীচে অলকানন্দার উপত্যকায় নামতে হোত। পার্বত্য এক নদীর সঙ্গে অলকানন্দার সেখানে সঙ্গম। কিছুদূরে হেলাং-এর কাছ থেকে নেমে আসে আরও একটি ঝরণা। বোধ হয়, এই কারণেই জায়গার নাম ত্রিবেণী। অলকানন্দার উপর তখন ছিল দড়ির ঝোলা পুল। সেই পুল পার হয়ে অপর পারে পাহাড়ের উপর উঠতে হয়। মাইল ছয় দূরে উর্গম গ্রাম। ৬০০০ ফুটের উপর উচ্চতা। উর্গম গ্রামের প্রাচীন নাম অর্জুন গ্রাম। অর্জুন মুনি এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে প্রবাদ। গ্রাম ছাড়িয়ে বনের ভিতর দিয়ে আরও এক মাইল পথ। সেইখানে কল্পেশ্বর। পঞ্চ-কেদারের পঞ্চম কেদার।

এর তিন বছর পরে আবার কল্পেশ্বরে যাবার সুযোগ ঘটে। তখন দেখি, দড়ির পুলের জায়গায় ভারী শক্ত লোহার নতুন সেতু। ওপারে পায়ে-হাঁটা পথও প্রশস্ত হয়েছে।

এ-বছর ১৯৬৩ সালে বদরীনাথের পথ দিয়ে ফেরার পথে বাস-এ বসে দেখে এলাম, হেলাং চটি পাহাড়ের উপর থেকে নীচে বাস-পথে নেমে এসেছে। নতুন দোকানপাট সেইখানে বসছে। পথ থেকে অলকানন্দার দূরত্ব আরও কমে গেছে। বাস থেকেই দেখা যায়—ওপারে বহু দূরে পাহাড়ের বনময় সবুজ গায়ে উর্গম গ্রামের ঘরবাড়ী। আঁকা ছবির মতো মনে হয়। কল্পনার চোখে দেখি, ওখানকার পরিচিত লোকগুলির মুখ। স্মৃতিপটে ফুটে ওঠে কতো ছোট ছোট ঘটনা।

(৩)

১৯৫৬ সাল। কেদারনাথ থেকে ফিরে রুদ্রপ্রয়াগে আছি। পাহাড়ী বন্ধুদের কাছে কল্পেশ্বরের খবরাখবর নিই। সকলেই যেতে উৎসাহ দেন। বলেন, সহজেই ঘুরে আসবেন। মদমহেশ্বর বা রুদ্রনাথের মতো দুর্গম পথ নয়, দেখবেন। হেলাং থেকে গিয়ে পরদিনই আবার ফিরে আসতে পারেন। তবে, দুদিনের চাল ডাল, আহার্য সঙ্গে নেবেন। ওদিকে দোকান-পাট নেই। কিছুই কিনতে পাবেন না। কল্পেশ্বরে থাকারও ব্যবস্থা নেই। একটি মাত্র ধর্ম-শালা। কিন্তু, সেখানে এক ব্রহ্মচারীজী থাকেন। যদি তিনি আপনার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে সেই কুটিরে রাত কাটাতে পারবেন—শুধু রাত কাটানো কেন? ভোজনেরও কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু আপনাকে তিনি গ্রহণ না করলে—ফিরে এসে উর্গম গ্রামেই কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। ব্রহ্মচারীজী কখন কার সঙ্গে কি রকম আচরণ করেন, ঠিক নেই।

কৌতূহল হয়। প্রশ্ন করি, কতোকাল আছেন উনি ওখানে? কোথাকার শরীর?

উত্তর শুনি, সম্ভবতঃ বাঙ্গালী। আছেন কয়েক বছরই। মাঝে মাঝে নীচে নামেন।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি, বাঙ্গালী! কয়েক বছর আছেন! অথচ কোথাও সাক্ষাৎ হয়নি এতোদিনে?

জিজ্ঞাসা করি, নাম কি বলুন ত? চেহারাটা কি রকম?

নাম শুনে চিনতে পারি না। কিন্তু অল্প বর্ণনা শুনেই বন্ধুকে থামিয়ে দিয়ে বলি, দাঁড়ান। দেখতে মস্ত কুস্তিগীরের মত — বিশাল দেহ, বিরাট বুক, প্রকাণ্ড গোলমুখ। বড় বড় গোলাকার চোখ। সামান্য টেরা। ফর্সা রং। দাড়ি, গোঁফ, মাথা—সব কামানো। মাথা অবশ্য দেখা যায় না, সব সময়েই ছোট কাপড়ের ফেটি বাঁধা—বর্মীদের মতো। যেমন চেহারা, তেমনি জবরদস্ত মানুষ। হাত দুলিয়ে চলেন যেন শ্বেতহস্তী! কথা বলেন যেন সব সময়েই হুকুম করছেন।

বন্ধু নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন, আপনি তো চেনেন তাহলে দেখছি! হুবহু বর্ণনা দিলেন।

আমি বলি, যিনি ওখানে থাকেন, তাঁকে চিনি কিনা, না দেখলে বলব কি করে? তবে ঐ রকমের এক ব্রহ্মচারীজীর সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে, আলাপও আছে। তিনিই ওখানে গিয়ে বসেছেন কিনা জানি না। তবে চিনি বা না চিনি, সঙ্গে খাবার দাবার না নিয়েই যাবো, থাকবোও কল্পেশ্বরে। যিনিই থাকুন, ব্যবস্থা একটা নিশ্চয় হবে।

বন্ধু তাঁর জানাশোনা একজন লোক ঠিক করে দেন। নাম নারাণ সিং। আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবে। শুধু তো কল্পেশ্বরে যাব না। এখন যাব অন্য দিকে। হেমকুণ্ড, লোকপালও আবার যেতে হবে। ফেরবার পথে কল্পেশ্বরে যাবো, ঠিক করি।

ঘুরে আসিও তাই।

ফেরবার পথে যোশীমঠ থেকে ভোরে রওনা হয়ে হেলাং আসি। ধর্মশালার চৌকি-দারের সঙ্গে বহু বছরের পরিচয়। সহজে ছাড়তে চায় না। দোকানে টাটকা জিলাপী ভাজায়, চা করায়, দুজনে বসে খাই। গল্প করি যেন কতো পরম আত্মীয়। যাত্রায় বিলম্ব ঘটে। ব্যস্ত হয়ে উঠি। সে বলে, বসুন বাবুজি আর একটু। এই তো মাত্র মাইল ছয় সাত পথ। এসেই চলে যান। থাকেন কই?

ফেরবার পথে একদিন ওখানে কাটাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিই। মালপত্র তারই কাছে রেখে দিই। শুধু একটা কম্বল ও সামান্য কাপড়-জামা নিয়ে নারাণ সিং-এর সঙ্গে নতুন পথে যাত্রা করি।

নারাণ সিং-এর বয়স বছর বাইশ। রোগা লিকলিকে চেহারা। হাড়ের উপর যেন চামড়া জড়ানো। ফ্যাকাশে রং। মনে হয়, দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর সবে উঠেছে। চোখাচোখি হলেই মুখে হাসির রেখা ফোটে—অতি করুণ বোধ হয়। যেন, মূর্তিময় দুর্ভিক্ষ। পরনে একটা রঙিন হাফপ্যান্ট। গায়ে ছেঁড়া সার্ট। তার উপর জড়ানো ময়লা মোটা উলের চাদর—নিজেরই হাতে বোনা। খালি পা। এমন শরীরেও অক্লেশে বোঝা বয়ে নিয়ে চলে। বলে, ওতে আমার কষ্ট হয় না।

তার চেহারা দেখে প্রথমে সন্দেহ জেগে-ছিল। বন্ধুকে বলেছিলাম, ও কি পারবে?

কিন্তু তার দুরবস্থা দেখেই তাকে নিতেও হয়। বন্ধু বলেন, ওর সামান্য জমি যা ছিল, পাহাড় ধ্বসে সে জমি গেছে। এখন দিন চলে না। দেখতে রোগা হলেও আপনার সামান্য বোঝা বইতে পারবে। নিয়ে যান সঙ্গে।

দুজনেই আমরা ওপথে নতুন। পথের নির্দেশ নিয়েছি হেলাং-এ। তাই নিঃশঙ্কচিত্তে চলি।

পাকদণ্ডীর পথে দেখতে দেখতে নেমে আসি অলকানন্দার তীরে। দুরন্ত বেগে নদীর ধারা ছুটে নেমে চলে। স্রোতের প্রচণ্ড গর্জন। দুই তটের পাহাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে। অপর পারের পাহাড় থেকে বেগময়ী এক স্রোতস্বিনী ধেয়ে নামে। নাম শুনি, কর্মনাশা গঙ্গা। গঙ্গার নামে অপবাদ কখনো শুনিনি। আশ্চর্য লাগে। সেই দুঃখেই মনে হয় এর জলধারা অমন উন্মত্তভাবে অলকানন্দার প্রবাহে আত্মবিসর্জন করে। অলকা-নন্দার উপর দড়ির পুল। মোটা মোটা পাকানো দড়ি দু'দিকে রেলিং-এর মত ঝুলে থাকে। পায়ের তলায় দড়ির ফাঁকে ফাঁকে বাঁধা সারি সারি বাঁকাচোরা গাছের সরু ডাল। তারি উপর পা ফেলে তাল সামলে পার হতে হয়। পায়ের তলায় ডালগুলির ফাঁকে ২০।২৫ হাত নীচে নদীর খরস্রোত চোখে পড়ে—তীর-বেগে ছুটে চলেছে। দেখলে মাথা ঘোরে। দড়ির ঝোলাও দুলতে থাকে। পড়লে রক্ষা নেই জানি। তবুও, কেন জানি না—ভয় লাগে না। মনে পড়ে ছোট বয়সের দোলনার কথা! মনে আনন্দ পাই।

তিন বছর পরে লোহা ও কাঠের নতুন শক্ত সেতুর উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পার হয়ে এই আনন্দের রোমাঞ্চ জাগে নি।

অপর পারে কর্মনাশার ধার দিয়ে স পথে ছাঁটা পথ। হেলাং-এর দিক থেকে দে যেন পাহাড়ের কালো পাথরে ধূসর রে কখনো বা নদীর উপর অস্থায়ী পুল। পা পাশি দুইটা পাইন-এর গুঁড়ি। তারই উ কয়েকটা পাথর সাজানো। অতি সাবধানে প হতে হয়। এক হাত নীচেই পাহাড়ী নদ উচ্ছল জলধারা। সহস্র তরঙ্গের হাতছানি দি কলহাস্যে যেন ডাকতে থাকে। কিছু গিয়েই চড়াই সুরু। পাইন-এর ঘন বন। সা সারি গাছের সোজা গুঁড়ি। উপরে পাত সবুজ আচ্ছাদন। সরু লম্বা কাঁটার মত পাই পাতা। গাছের তলায় বনভূমি ঝরাপাত আকীর্ণ। শুকনো কাঁটা সবুজ রং হারায় সোনার মত চিকমিক্ করে। পা পাথরের উপরও সেই ঝরাপাতা। রবারের জু তলা পিছলিয়ে যায়। সকালের রোদ নী আকাশ থেকে নেমে আসে। গাছের ডালপাল মধ্য দিয়ে যেন বনতলে ঝরে পড়ে। মন্দ-মধ বাতাস ওঠে। গাছের পাতা দুলতে থা ধরিত্রীর বুকেও আলো ছায়া কাঁপতে থা পাইনের স্নিগ্ধ সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। সা বনস্থল আমোদিত হয়। মনে হয়, প্রকৃ মন্দিরে কে বুঝি ধূপধুনা জ্বালিয়ে দিল!

মনভরা তৃপ্তি ও আনন্দ নিয়ে ধীরে ধী চড়াই উঠি। নারাণ সিং নিজের খুসিমত চ ক্রান্ত হলে বসে। আমিও উঠি আপন ম ভাবনা-চিন্তা-লেশহীন অপার্থিব এক অ ভূতি নিয়ে।

অনেকখানি চড়াই উঠে পাহাড়ের গা বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র। নিকটেই ছোটগ্রা চাষের জমি। গ্রামের প্রধান এসে জিজ্ঞাসা কর কোথায় চলেছি, কল্পেশ্বরে, শুনে আশ্চর্য হ আনন্দও পান। বলেন, এদিকে তো বাইরে যাত্রী কেউ আসে না!—উৎসাহ দেন বড় চড় আর নেই। মামুলী পাহাড়ী পথ এবার। বেশ ভাগ 'ময়দান'—অর্থাৎ সমতল রাস্তা। সত করে দেন, মাঝে দু'একটা গ্রাম পড়বে। সেখা দু'তিনটে পথ গেছে। গ্রামের পথ সেগুলি। ভু পথে যেন না যাই।—কোনটি আমাদের প বুঝিয়ে বলেন। এর পর পথ অনেকটা সেজ ঠিকই। মাঝে মাঝে অল্প চড়াই-উৎরাই। কখ গভীর বনের মধ্যে দিয়ে পথ কখনো বা খো মাঠ। বেলা বাড়তে থাকে। রৌদ্রেরও উত্তাপ বাড় গতির বেগ কমে। তবু, একটানা চলতে থা কিন্তু পথ যেন শেষ হয় না। হাঁটতে সুরু করেছি যোশীমঠ থেকে। মাইল-দশেকের অধিক এসেছি এখন মনে হয়, হেলাং-এ অতো সময় কাটা ঠিক হয়নি। বেলা এগারোটা বাজে। মাত্র তিন দিন আগে লোকপালের তুষার-রাজ্যে ছিলাম তাই, সামান্য রৌদ্র এখন ক্লান্তি আনে। ভাবি পথে কোনও গ্রামে স্নান আহার সেরে রৌদ্র কমলে বিকালে যাবো উর্গমে।

পথের অদূরে ছোট এক গ্রাম দেখি। নারা সিংকে খবর নিতে পাঠিয়ে দিই। পথের পা গাছের ছায়ায় পাথরের উপর বসে বিশ্রাম করি

ভগ্নদূত নারাণ ফিরে আসে। গ্রামে কো আহার্যেরই সন্ধান মেলেনি। দুমুঠো চালও ন একটু আটাও নয়।

ভাবি, এই কি কল্পতরু প্রাপ্তির নমুনা!

অগত্যা আবার চলি। পথও অবশেষে শেষ হয়। উর্গমগ্রামে পৌঁছুবার আগে অনেক দূর থেকে গ্রাম দেখা যায়। বড় গ্রাম। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ঘর বাড়ী। চতুর্দিকে ধাপে ধাপে চাষের জমি। মাঝে মাঝে ঝরণার জলধারা। গ্রামে প্রবেশ করার বহু আগে থেকেই বাজনার শব্দ পাই। কাছে এসে দেখি, মাঠের মধ্যে চারিদিকে লোকজন। চাষের কাজে সবাই ব্যস্ত। ক্ষেতের একপাশে ঢাকী ঢাক বাজায়। ভাবি, বাজনা কেন? গ্রামবাসী একজনকে প্রশ্ন করি। হিমালয়ের নির্জন অঞ্চলে, অশিক্ষিত পাহাড়ীদের মধ্যেও শুনি সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের এক আদর্শ রীতির কথা। চাষের কাজের আজ উদ্বোধন। তাই, এই আনন্দ-উৎসব। গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের নিজস্ব স্বতন্ত্র জমি আছে। কিন্তু, এই গ্রামের বহুদিন-প্রচলিত নিয়ম,—গ্রামের সমস্ত ক্ষেতের কাজ সব গ্রামবাসী মিলিত হয়ে করে। ক্ষেতের কাজে নিজের বা অপরের জমি বলে কোন ভেদাভেদ নেই। সকলেই নিঃস্বার্থ শ্রম দেয় গ্রামের সব জমিতে ফসল ফলাতে। ফসল ফললে তখন যে-যার জমির ফসল নিজের ঘরে তোলে।

অবাক্ হয়ে সেদিন শুনেছি এই কথা। তাকিয়ে দেখেছি, গ্রামবাসীদের সমবেত শ্রমের বিপুল উৎসাহ, ফসল ফলানোর আশা ও আনন্দে উদ্দীপ্ত তাদের মুখ, বাজনার তালে তালে পা ফেলে পাহাড়ের বুকে লাঙল চালাবার ধুম।

গ্রামে প্রবেশ করে নারাণ সিংকে বলি, বেলা বারোটা বাজে। কোথাও একটা আশ্রয় নেওয়া যাক্। দেখ দিকি চাল ডাল কিনতে পাও কিনা। সে খালি হাতে ফিরে আসে। খবর ঠিকই শুনেছিলাম। দু'তিনশ' গ্রামবাসী। কিন্তু গ্রামে দোকান একটিও নেই। কারো কোন কিছু কেনার প্রয়োজন হয় না। ঘরে চাল, ডাল, আলু—সকলেরই আছে। সকলেরই ক্ষেতে পর্যাপ্ত ফসল হয়। ছয় সাত মাইল দূরে বাস্‌পথের গ্রাম থেকে শুধু কিনে আনে সম্বৎসরের লবণ!

নিজের জন্যে চাল ডাল না পেলেও মনে তৃপ্তি পাই দেখে—অভাব-অভিযোগের এই জগতে এমন গ্রাম এখনও আছে—যেখানে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন এত সামান্য, কারও কোনো অভাব-বোধও নেই!

কল্পতরুর জন্মভূমি বটে!

এর তিন বছর পরে আবার যখন এখানে আসি, গ্রামের মধ্যে সরকারী এক কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হয়। গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনার কাজে তিনি তখন এখানে আছেন। সমবায় বিভাগের কাজ চালু করছেন। গর্বভরে আমাকে বলেন, এখানকার জমি বড়ো ভাল। সোনা ফলানো যায়। কিন্তু নির্বোধ গ্রামবাসীরা না জানে থাকতে, না জানে ভালভাবে খেতে। হাতে পয়সাকড়ি নেই। ভীষণ গরীব। মাথায় বুদ্ধিও নেই। আকাট্ বোকা। আমি এসেই আপেল, পীচ্, নেস্‌পাতির গাছ লাগিয়েছিলাম। এই দেখুন, দু'বছরের মধ্যে কতো বড় বড় ফল ফলেছে।—হাতে তুলে আমাকে উপহার দেন্। সুন্দর রাঙা টক্‌টকে আপেল। জিজ্ঞাসা করি, এদের মধ্যে কি কাজ করছেন?

তিনি বলেন, এদের এখন টাকা ধার দিচ্ছি। কেউ বিশেষ নিতে চায় না। বলে, টাকা নিয়ে করব কি? বোঝাবার চেষ্টা করি, টাকা নিয়ে কতো উন্নতি করা যায়—জমিতে কত রকম ফসল হতে পারে, শাক্‌সব্‌জি বোনা যেতে পারে, ফলফুলের সুন্দর বাগান তৈরি করা যায়। হাতে সুতো কেটে জামা বোনার চেয়ে গ্রামে তাঁত বসালে কতো লাভ। এ-সব কাজের জন্যে ধার দিতে রাজি। কিন্তু এখনো এদের মাথায় এ-সব ঢোকে না। তবে, কাজ হবে মনে হয়। এ-বছর কেউ কেউ 'লোন্' নিতে আরম্ভ করেছে।

আপেলটা হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি তাঁর নানান্ স্কীম্-এর ব্যাখ্যা করতে বসেন। আমার কানে কিন্তু কিছুই ঢোকে না। হঠাৎ রাঙা আপেলটা স্মরণ করিয়ে দেয়, Garden of Eden-এর the Forbidden Fruit! কানে যেন শুনতে পাই, সেই তিন বছর আগেকার ক্ষেতের ধারে বাজনার আনন্দ-ধ্বনি।

ভাবি, আজ কি সেই বাজনা বাজবে—গ্রামবাসীর শবযাত্রার পিছনে!

গ্রামে দোকান পাট নেই শুনে গ্রামের এক মাতব্বরের খবর নিই। তাঁরও নাম কল্পেশ্বর। কল্পেশ্বর ডিমুরি। এক পাহাড়ী বন্ধু তাঁর কথা বলে দিয়েছিলেন। বাড়ী খুঁজে বার করতে দেরী হয় না। পাথরের দোতলা বাড়ী। সামনে পাথর-বাঁধানো উঠান। বাড়ীর দরজায় শিকল তোলা। একটি ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে জানি, ডিমুরি গেছেন একটু আগেই কল্পেশ্বরে, ব্রহ্মচারীজীর কাছে। বাড়ীতে তাঁর বৌদিদি থাকেন। কিন্তু, তিনিও গেছেন ক্ষেতের দিকে। অগত্যা সামনে একটা গাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। ভাবি রোদ কমলে কল্পেশ্বরের দিকে আগানো যাবে। দেবরাজ এখানে করেছিলেন তপস্যা, আমিও অনাহারে বৃক্ষতলে বিশ্রামের সাধনা করি।

অচিরে সাধনায় সিদ্ধি পাই। ছেলেটি ছুটে এসে খবর দেয়, বৌদিদি খবর পেয়ে এসে গেছেন। ওপরের ঘর খুলে দিয়েছেন। সেইখানে গিয়ে বসতে বলেছেন।

ছোট বসবার ঘর। একপাশে কম্বল শয্যা। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। বাইরে জুতো খুলে ঘরে ঢুকি। পা ছড়িয়ে আরামে বসি। ছেলেটিকে বলি, একটু ঠান্ডা জল খাওয়াতে পারো?

দরজার পাশে মৃদুকন্ঠ শুনি। ছেলেটি ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে, মাঠা আছে, লস্যি বানিয়ে আনব? আপনাদের ভোজন হয়েছে?

বলি, দুটি চাল ডাল ও বাসন পেলে সঙ্গে যে-লোক আছে সেই কিছু পাকিয়ে দিতে পারে।

একটু পরেই সাদা চক্‌চকে ঘটি ভরে লস্যি আসে। উপরে ভাজা জিরার গুঁড়ো ভাসে। দুইটা গ্লাস চেয়ে নিই। নারাণ সিংকে ডাকি। পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুজনে পান করি।

ছেলেটি এসে জিজ্ঞাসা করে, আরো এনে দেবো? কিন্তু, ভোজনও প্রায় তৈরি হয়ে এলো।

বুঝতে পারি, দরজার আড়ালে কার সতর্ক দৃষ্টি সব কিছুই নজর রাখে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে থালায় সাজানো ভাত, বাটিতে ডাল ও তরকারি আসে। দই-ও আছে। ছেলেটি নামিয়ে রেখে জানায়, নারাণ সিংকেও নীচে খেতে দেওয়া হয়েছে।

এক একা বসে খাই। কিন্তু বেশ অনুভব করি, সেই রমণী অলক্ষ্যে বসে খাওয়া দেখছেন।

সুদূর বাংলা দেশ থেকে হিমালয়ের নিভৃত এক গ্রামে হঠাৎ-আগত অচেনা এক অতিথির সযত্ন সেবা। মুখে গ্রাস তুলতে চোখে জল আসে।

বিশ্রামান্তে যাত্রা করি। যাবার আগেও দর্শন পাই না। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাবার ব্যর্থ প্রয়াস ক[illegible] ভাব-প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাই না।

আজ কোথাও সেই মহিলাকে দেখতে পে[illegible] চিন্‌তে পারব না, জানি। কিন্তু তাঁর সে[illegible] যত্নের কথা জীবনে কখনো ভুলব না।

৪

গ্রাম ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে পথ। ক্ষে[illegible] মাঝে মাঝে ছড়ানো দু'একটা ঘর। পথের উ[illegible] ঝরণা। কিছু দূরে গিয়ে আবার বন-জ[illegible] সুরু। পথও সরু। ডান দিকে খাদের মধ্যে না[illegible] আনন্দে পথ চলি। উল্টোদিক থেকে এক পাহ[illegible] আসেন। অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা ক[illegible] ডিমুরিজি! ব্রহ্মচারীজীর কাছ থেকে আসছে[illegible]

নাম শুনে আশ্চর্য হন্। তখনি জা[illegible] আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বাড়ী চ[illegible] হয়েছিলাম। বৌদি খুব আদরযত্ন ক[illegible] খাওয়ালেন।

তিনি শুনে খুসী হন্। বলেন, দাদা মা[illegible] গেছেন আজ কয়েক বছর হোল। উনিই গৃ[illegible] কর্ত্রী। শুধু বাড়ীর কাজেই নয়। ক্ষেতখামা[illegible] কাজের ভারও উনিই সামলান। গ্রামের অ[illegible] কোন বিপদে আপদে উনিই ভরসা। সব[illegible] বলে, গ্রামের দেবী উনি। কথা শুনে কেন জা[illegible] না, আমার গর্ব ও আনন্দবোধ হয়। [illegible] কোন প্রিয়জনের সুখ্যাতি শুনি।

ডিমুরিজি জিজ্ঞাসা করেন, কল্পেশ্ব[illegible] থেকে ফিরে আসবেন কখন?

ওখানে থাকার বাসনা শুনে বলেন, ব্রহ্ম-চারীজীর সঙ্গে আলাপ আছে কি? থাক[illegible] তো ওখানে আর কোথাও জায়গা নেই।

বলি, দেখা যাক্ না ব্যবস্থা হয় কিনা।

তিনি চিন্তিত হয়ে বলেন, চলুন তা[illegible] আমিও আবার ফিরি। ব্রহ্মচারীজী কিভাব[illegible] নেবেন জানি না।

বনের মধ্যে খানিকটা খোলা জায়গা[illegible] পাশেই নদী। কীর্তিনাশা। অল্প এগিয়ে ডা[illegible] দিকে তাকিয়ে দেখি, নদীর অপরপা[illegible] পাহাড়ের মাথা থেকে সোজা নেমে এসেছে এ[illegible] বিপুল জলধারা। সুন্দর জলপ্রপাত। সে[illegible] ধারা এসে মিশছে নদীর সঙ্গে। সঙ্গমে[illegible] উপরেই সমতলভূমি। তারই এক অংশে—একদিকে জলপ্রপাত, আর একদিকে নদীর মাঝা-মাঝি লম্বা একটি কুটির। পাথরের দেওয়া[illegible] শ্লেটের ছাদ। অতি শান্ত রমণীয় স্থান। সে[illegible] কুটিরের সামনে পায়চারি করেন এক ব্রহ্মচারী[illegible] পরনে লুঙ্গির মত করে ছোট সাদা থান। গা[illegible] ধবধবে সাদা ফতুয়া। মাথায় সেই ফেটি-বাঁ[illegible] দেহের বিপুল আয়তন, হেলে-দুলে চলা[illegible] ধরণ, বেশভূষা—দূর থেকে দেখেও চিনত[illegible] পারি—ব্রহ্মচারীজীকে।

দুইটা কাঠ ফেলে নদীর উপর পুল[illegible] সাবধানে পার হয়ে এগিয়ে চলি তাঁর দি[illegible] প্রফুল্লচিত্তে। নতুন লোক দেখে তিনি থমকে দাঁড়ান। ঘাড় বেঁকিয়ে টেরা চোখে দেখতে থাকেন। নিজস্বভাবে বিঘ্ন ঘটায় হাবভাব[illegible]

প্রকাশ পায়। ডিমরি শঙ্কিত হয়ে বলেন, আগে কল্পেশ্বর দর্শন গেলে হোত না?

হাসতে হাসতে এগিয়ে যাই। ব্রহ্মচারীজী চিনতে পারেন। মুহূর্তের আশ্চর্য হয়ে তাকান—বড়ো চোখ দুটি আরও বড়ো করে। হাত এগিয়ে আসেন। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলেন, আরে, আপনি! কোথা হাজির হলেন এখানে?—বলেই বিরাট বুকের মধ্যে নিয়ে লিঙ্গন করেন। ডিম্‌রিজি অবাক হয়ে দেখেন।

আমি বলি, শুনলাম, কে এক ভয়ঙ্কর ব্রহ্মচারীজী থাকেন এখানে। এলাম দর্শন করতে সেই মহাত্মাকে। আপনি আসন নিয়েছেন ন! চমৎকার স্থান তো? দুর্গম নয়, আসার হাঙ্গামাও নেই, বাসপথ কালয় থেকে বিচ্ছিন্ন ও বেশী দূরে নয়।

তিনি বলেন, বহু কেমন জায়গাটা বলুন। এসে- যখন, আপনাকেও দিন অন্ততঃ কে রাখবো। থাকুন দিন খুসী। কোন অভাব হবে না— ব্যবস্থা আছে আমার। চলুন এখন ঘরের ভেতর।

ডিমরিকে তখনি দেন, কাল সের চার বেশী দুধ চাই। সব্‌জিও অর্থাৎ শাক্‌সব্‌জি।

ঘরের দরজায় সরু চিক ফেলা। ঘরে ঢুকতেই ব্রহ্ম- চারীজী টেনে সোজা ঠিক করে দেন, মাছির ভীষণ উপদ্রব। তাই এসব কিরিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছি। তবু একটু পেলেই ঢুকে পড়ে।

লম্বা দালান। এক- পাশে মেঝেতে বড় অগ্নিকুণ্ড। আধপোড়া কয়েকটা কাঠ ও ছাই পড়ে আছে। দালানের ক ধারে কয়েকটি ন। পরিষ্কার করে মাজা আলো পড়ে ঝক্‌- ঝক্‌ করে।

বারান্দার অপর কোণে হাত-মুখ ধোওয়ার জায়গা। বড় পিতলের বালতিভরা জল। প্রকাণ্ড একটা রুপোর কমণ্ডলু। প্রায় একহাত উঁচু। দেখিয়ে হেসে বলি, অধিকারীর দেহের মাপ অনুযায়ী তৈরি দেখছি! আপনার হাতেই ঠিক মানায়!

তিনি হেসে বলেন, দরকার হলে মুদ্গরেরও কাজ করবে কি বলেন? অস্ত্র অবশ্য আমি সব সময়েই কাছে রাখি।—বলে কোমরের কাছ থেকে টেনে বড় পিস্তল বার করে দেখান। সেটিরও রুপো দিয়ে বাঁধানো হাতল। লতাপাতার কাজ করা তাঁর নাম লেখা।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, এসব রেখেছেন কেন? ভয়টা কিসের?

তিনি বলেন, ভয় কাউকে এ-শরীর করে না। জন্তু-জানোয়ারকে ত নই। এটা একটা অনেককালের সখের জিনিষ, এখন অবশ্য লাইসেন্স করা। আগেকার দিনে—সে আর এক যুগ গেছে!—এসব নিয়ে কম অগ্নিকাণ্ড করা হয়েছে! এখন আসুন, আপনার ঘরে।

বারান্দার কোলে পাশাপাশি দুটি ঘর। তারি একটিতে প্রবেশ করি। এখানেও জানালায় চিক ফেলা। ঘরের মেঝেতে হাতখানেক উঁচু করে লম্বা কয়েকটা তক্তা সাজানো—নিচু চৌকির কাজ করে। দেখিয়ে বলেন, এই আপনার পালঙ্ক।

দেখে বলি, অতি চমৎকার। এখনি কম্বল বিছিয়ে রাজশয্যা তৈরী করে নিচ্ছি।

জামা খুলে রেখে বিছানা খুলি। তিনি তখনি জামাটা তুলে নেন। টাঙানো দড়ির উপর পাট করে ঝুলিয়ে রাখেন। দড়ির উপর থেকে দুটো মাছি উড়ে যায়।

দেখেই ব্যস্ত হয়ে বলেন, ব্যাটারা ঢুকেছে আবার কোথা থেকে! দিচ্ছি এখনি মক্ষী জন্ম থেকে উদ্ধার করে!—একটা মাছি মারা ফ্ল্যাপ নিয়ে গুটি গুটি মারতে যান।

আমি গম্ভীর হয়ে বলি, আহাঃ ওটা দিয়ে কেন, মারতেই যদি হয়, পিস্তলটি কাজে লাগান।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। কোথাও জঞ্জাল নেই। একদিকে দেওয়া- লের গায়ে দুটি বিরাট কাঠের সিন্দুক। ৪।৫ হাত লম্বা, উঁচুও প্রায় হাত দুই। জিজ্ঞাসা করি, ও-দুটোতে কি আছে? মানুষ মেরে রেখেছেন নাকি?

তিনি বলেন, দেখ- বেন নাকি? যা' কিছু প্রয়োজন হতে পারে— সব পাবেন ওতে। সারা বছরের খোরাকও। বাদাম, পেস্তা, কিসমিস, আখরোট,—সব রকম মেওয়া, পাঁপর, বাঁড়, আচার, সুজি, বেসম, ছোলা-মটর, যতোরকম মশলা। চাল, ডাল, আটা, চিনি—এ-সব তো আছেই। থাকুন এখন কদিন। রোজ এক-এক রকম খাবেন। মিষ্টি, মালাই—এসবও তৈরি করব। কোন ভাবনা নেই!

কল্পেশ্বরের গুহা-মন্দির ও বৃদ্ধ পূজারী

আমি বলি, খাওয়াবার খুব ভাল লোক ঠাওরেছেন দেখছি। আহার আমার অতি অল্প। ও-ব্যাপারে পীড়াপীড়ি একেবারে সইতে পারি না। মায়ের সঙ্গে পর্যন্ত রাগারাগি করেছি। প্রথম থেকেই সাবধান করিয়ে দিই,—নিজের খুসিমত আমাকে খেতে থাকতে দেবেন, নইলে না বলে কখন পালিয়ে যাব। আপনি রাঁধুন, খান্—যতো পারেন, আপত্তি নেই। আমাকে দুমুঠো ভাত বা দুখানা রুটি দিলেই যথেষ্ট।

তিন দিন কাটাই কল্পেশ্বরে ব্রহ্মচারীজীর আদর-যত্নের মাঝে। নির্জন পাহাড়ে বনে জঙ্গলে ঘুরি। একান্তে নদীর ধারে পাথরে বসে জলধারার সঙ্গীত শুনি।

ব্রহ্মচারীজী স্নান সেরে সকাল থেকে বসেন উনুন জ্বালিয়ে।
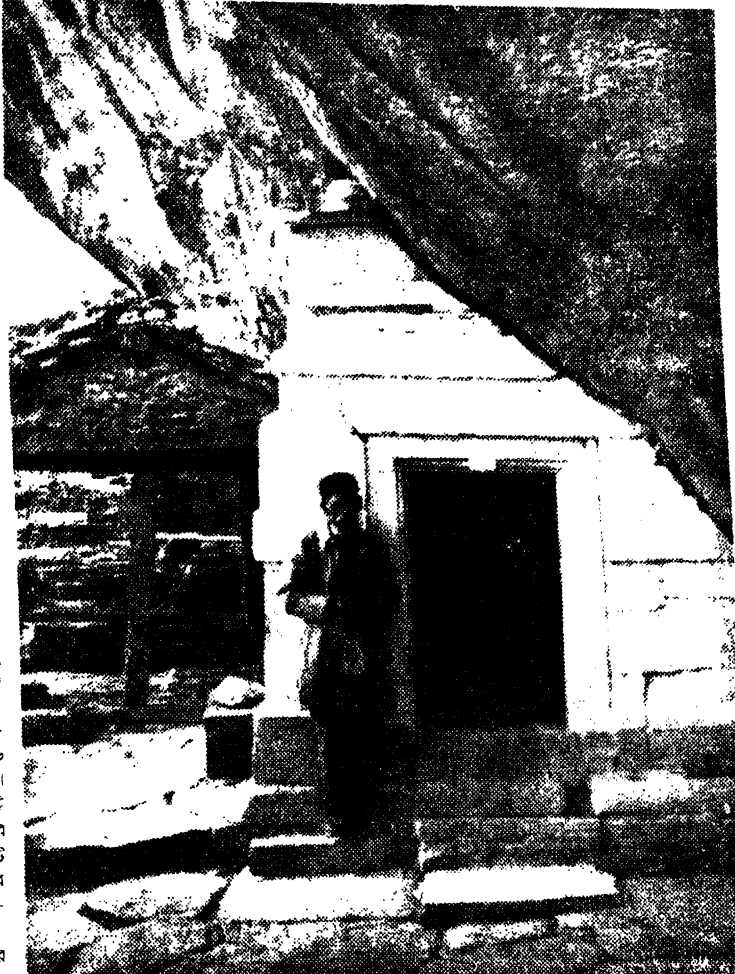
গ্রামবাসী শাক-সব্জি আনে। কুটনো কোটেন মেয়েদের মত বসে। তরিতরকারি রান্নার প্রতি তেমন আকর্ষণ নেই। মিষ্টান্ন পাক করেন প্রতিদিন এক এক রকম। ক্ষীরের মালপোয়া, ক্ষীর-ভরা মোহনপুরি, পেস্তা, বাদাম, কিসমিসে ভরপুর। ঘৃতসিক্ত হালুয়া, উপরে কিসমিস এলাচের গুঁড়া ছড়ানো, সঙ্গে আটার পুরি। যেমন তাঁর বাঘের মত থাবা তেমনি খাবারগুলিও বিরাট আকারের। সারাদিন কম আঁচে উনানের উপর কড়ায় দুধ বসানো থাকে। বিকেলে নামান। দুধের সাদা রং সোনালী হয়ে ওঠে। এক কড়া দুধ মরে মরে কড়ার তলায় ঘন হয়ে থাকে। উপরে মোটা পুরু সর পড়ে—যেন চিকন পশমে বোনা ছিদ্রহীন জালে ঢাকা। সারা ঘর খাঁটি ঘন দুধের গন্ধে ভরে থাকে। ব্রহ্মচারীজী নাক টেনে ঘ্রাণ নেন। চোখ নাচিয়ে সহাস্যবদনে বলেন, ঠিক জ্বাল হচ্ছে। সারাদিন এইভাবে বসানো করে, তবু দেখবেন ধরবে না। আঁচটাই হোল আসল ব্যাপার। আজ খাওয়াবো আপনাকে মালাই। দেখুন না, কি জিনিষ বানাই। এমনটি খানুনি কখনো।

আমি বলি, এই এক কড়া দুধের মালাই—খাবে কে? এর দু'চামচে খেলেই পেটভরে যাবে আমার। তার বেশী খেলে এখানেই দেহ রাখতে হবে। আজ দেখব, আপনি পারেন কতো-খানি খেতে!

তিনি হো হো করে হেসে ওঠেন। বলেন, আমি? এককালে ও সব খেয়েছি অনেক। এখন তো আমার মাপা আহার।

অদ্ভুত মানুষ। নিজে এ সকল বিশেষ-কিছুই খান না। একবেলা আহার করেন—সংযত পরিমিত আহার্য। আনন্দ পান সকলকে খাইয়ে!

ভাণ্ডারভরা আহার্যের আয়োজন। নিত্য দুধ আসে। বিশুদ্ধ ঘি আনান। গ্রামবাসী পরিমাণে অল্প আনলে রূঢ়ভাষায় ভৎসনা করেন। প্রথম দেখে আমার আশঙ্কা হয়েছিল হয়ত মেরেই বসেন। উত্তর প্রদেশে সারাজীবন কাটিয়েছেন। হিন্দী বলেন, হিন্দুস্থানীর মতো। বাংলা কথার মাঝেও হিন্দী মেশানো। গালাগালি দেন বিশুদ্ধ হিন্দীতে। নির্বাক হয়ে শুনি. ভাবি. চোস্ত গালভরা কুৎসিত গালি দেবার এমন ভাষা বোধহয় জগতে আর নেই!

ধমক দিতে দিতে আমার দিকে তাকান। দেখুন তো, ব্যাটাদের বুদ্ধি। জিনিষ দিবি, হাতে হাতে টাকা পাবি,—যা ঘরে হচ্ছে সব নিয়ে আয়। তা না,—টিপে টিপে রেখে রেখে আনবে।—এক টুকরো পর্যন্ত গ্রহণ করি না এদের কাছ থেকে মূল্য না দিয়ে। দান নেবো আমি? যা-কিছু যে কেউ আনে ফেলে দিই টাকা। তাই ওরাও কখনো দাম বলে না। জানে, যা চাইবে, না চাইতেই আমি দেব তার দু-তিন গুণ। তবু, জিনিষ আনবে না বেশী করে!—বলে আবার গালি সুরু হয়।

ব্রহ্মচারীজীর সব কিছুই বিরাট আয়োজন। অল্পে তাঁর মন ভরে না।

তাঁর রূঢ় ব্যবহার দেখে মনে ব্যথা পাই। ভাবি ও লোকগুলি নিশ্চয় আর এদিকে কখনো মাড়াবে না। চুপ করে তারা দাঁড়িয়ে থাকে।

কিন্তু তারা আবার পরে ফিরে আসে, আবার গালি খায়, তারপরেও ফিরে আসে। কেন আসে, তার কারণও দেখি।

ব্রহ্মচারীজী তাদের নিয়ে চলেছেন ঘাড়ে হাত দিয়ে। 'অর্ধচন্দ্র' নয়, অতি স্নেহভরে আলিঙ্গন করে। মাঠের একপাশে তাদের বসতে দেন। নিজের হাতে পরিবেশন করে ভোজন করান। জোর করে পাতে খাবার দেন। খাওয়ানোর জন্য আবার ধমক দেন, গালা-গালিও করেন। বলেন, 'ব্যাটারা খেতে পাস্ কোথা! খা আমার কাছে পেটভরে। খবরদার, পাতে যেন কিছু না পড়ে থাকে।' যেদিন যা' কিছু হয়, সবই এইভাবে খাইয়ে দেন তাদের।

প্রতিদিনই তাদের কেউ না কেউ আসেই। যার যা দরকার—তাঁর কাছে চাইলেই পায়। ভাবি, এই তো কল্পতরু। কিন্তু, গাছের গায়ে কাঁটা ছিল নাকি।

দ্বিতীয় দিন বিকেলবেলায় নদীর ধারে নিরিবিলি একটা পাথরের উপর বসে আছি। সামনেই সেই জলপ্রপাত। দু'হাত নীচেই নদীর উচ্ছল জলরাশি। চারিদিকে পাহাড়। অতি মনোরম লাগে। চমকে উঠি একটা সামান্য শব্দ শুনে। এতক্ষণ তাকিয়ে দেখি নি, নিকটে একটা পাথরের পাশে নারাণ সিং বসে। তার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসি। আশ্চর্য হই দেখে, চোখ দিয়ে তার জল ঝরে পড়ে।

হোল কি? অসুস্থ নাকি? উঠে কাছে যাই, জিজ্ঞাসা করি।

সে বলে, বাবুজি,—এখান থেকে যাবেন কবে?

আমি বলি, এখনো ঠিক করি নি। দু-এক দিন হয়ত আরও থাকব। কেন? বেশ ভাল জায়গা, আছিও তো আনন্দে। শরীর খারাপ হয়েছে নাকি তোমার?

সে মাথা নেড়ে জানায়, না। —তারপর ধীরে ধীরে বলে, ব্রহ্মচারীজী—বলেই কথা শেষ না করে কেঁদে ফেলে।

ভাবি, এইরে! হয়ত কি ভুল করে তাঁকে রাগিয়ে দিয়েছে, তিনি নিশ্চয় গালাগালি করে-ছেন। কে জানে, হয়ত দু'ঘা বসিয়েই দিয়েছেন। বেচারীর এই দুর্বল দেহ!

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। বলি, ব্রহ্ম-চারীজী বকেছেন বুঝি? কিছু মনে কোরো না তুমি? ও'র মন বড় ভাল, ঐভাবেই কথা বলা স্বভাব। আবার তিনি খুসী হয়ে যাবেন।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, না, তিনি মার-ধোর করেন নি। কাল নিজেই উনি খানিকটা আটা দিয়েছিলেন। আজ দুপুরে রুটি পাকিয়ে আমি খেয়েছিলাম। তারপরেই উনি এলেন অনেক খাবার আর খিচুড়ি নিয়ে। এসে বলেন, সব খেতে হবে। আমি তাঁকে জানাই, পেট ভরে এখন খেয়েছি, এখন আর পারব না। তিনি কোনমতেই শোনেন না। ধমক দিয়ে জোর করে সেই সব কিছু খাওয়ালেন। পেট ফুলে গেছে কতোখানি, দেখুন না। এখানে আর থাকলে তিনি জোর করে খাইয়ে নিশ্চয় মেরে ফেলবেন। বাবুজি, চলুন পালিয়ে যাই কালই ভোরে। খেয়ে খেয়ে পেট ফেটে মরে যাবো আমি। —সত্যই সে কাঁদতে থাকে।

ব্রহ্মচারীজীকে গিয়ে ঘটনাটি বলি। তিনি তো হেসেই খুন। বলেন, বটে! রাত্রেও ওকে ঠেসে খাওয়াতে হবে। মালাই আর মালপোয়া পড়ে আছে এখনও অনেকখানি। ব্যাটা! খাওয়া জোটে না দেশে, খেয়ে আবার মরবি কি!

ব্রহ্মচারীজীর এমন দিলখোলা আচরণ, বিরাট ভোজের আয়োজন, লোকের সাহায্যে অকাতর অর্থ বিতরণ,— এসব চলে কি করে, তাই ভাবি।

প্রশ্ন করার প্রয়োজন হয় না। এক সময়ে নিজেই বলেন, একটা পরামর্শ আছে। বলুন তো, আজকাল সবচেয়ে নিরাপদ অথচ ভাল ইনভেস্ট-মেন্ট কোথায় করা যায়?

আমি বলি, ভাল লোককে প্রশ্ন করলেন। ওসব কোন কিছুই খবর রাখি না। হিমালয়ের পথঘাটের কথা জিজ্ঞাসা করুন, তার হয়ত কিছু খবর দিতে পারি। —বলে হাসতে থাকি।

তিনি বলেন, তবে একটা বিশ্বাসী ভালো লোকের সন্ধান দিন—এখানে আমার কাছে এসে থাকবে। আমার স্কীমটা আপনাকে বলি।

—উঠে গিয়ে নিজের ঘর থেকে কাগজপত্র প্ল্যান নিয়ে আসেন। খুলে ছড়িয়ে পেতে দেখান।

কাশীতে তাঁর দুখানা বাড়ী আছে। কনখলে গঙ্গার ধারে অনেকখানি জমিও আছে। খবরটা দিয়েই মুখ তুলে আমার দিকে তাকান, জিজ্ঞাসা করেন, নেবেন নাকি এর কিছু? কাশীর বাড়ী বা কনখলে খানিকটা জমি? ছোট বাড়ী করে থাকবেন বেশ।

আমি বলি, কোন প্রয়োজন নেই, যা আছে তাই ছাড়তে পারলে বাঁচি। বলুন, শুনি আপনার স্কীম।

ঐ জমি ও বাড়ী উনি বিক্রী করছেন। কথা প্রায় পাকাপাকি হয়ে এলো। কয় লাখ টাকা এতে পাবেন। নগদ টাকাও হাতে কিছু জমে আছে। লাখ খানেক টাকা নগদ রাখবেন-হঠাৎ যদি কিছু প্রয়োজন হয়। বাকি টাকা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে কল্পেশ্বরে একটা বাড়ী করবেন। তার প্ল্যানও দেখান। বলেন, একটা ছোটখাট কাঠের বাড়ী ঐ সঙ্গমের কাছে বছর তিনেক আগে তৈরী করেছিলাম। গত বর্ষায় নদীতে বন্যা এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। তখন ছিলাম না এখানে। লোকসান হয়ে গেছে অনেক। নগদ টাকাও কিছু ছিল সিন্দুকে। যাক তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। থাকলেই যায়। এবার বাড়ী করব—নদীর ওপারে, ঐ উঁচু জায়গাটায়। জমিটারও ব্যবস্থা করে নিয়েছি। লেবেল-করা অনেকখানি জমি। ফলফুলের বাগান হবে। তরি-তরকারিও লাগানো যাবে। ভিউও চমৎকার ওখান থেকে। প্ল্যানটা দেখুন। বসবার, শোবার, রান্নার এই দিকের ঘরগুলি। বড় বড় দরজা জানালা থাকবে। পাহাড়ীদের ঘরের মতো ঘুপসি ঘর একেবারে দেখতে পারি না। ঘরের সঙ্গে লাগানো ঐ ছোট ঘরটি হোল বাথ রুম। লম্বা টানা জলের পাইপ এনে দেবো। পাশেই স্যানিটারি প্রিভি। কি রকম দেখছেন?

বলি, দেখছি তো ভালই। কিন্তু, অমন বাড়ীতে থাকতে হলে বাড়ীর কর্তার বেশভূষাও তেমনি করতে হবে। সিল্কের ড্রেস পাঠাবো নাকি?

তিনি আশ্চর্য হয়ে তাকান। বলেন, বেশ বুঝলেন আপনি! আরে, আমার কুটিয়া ত দেখাই নি এখনও। এ-সব হোল, আপনাদের থাকবার জন্যে। যে লোক চাইছি সে-ও এসে থাকবে ওখানে। আমার জন্যে হোল—পাশে ঐ ছোট্ট কুটুরী দেখছেন—ঐটে। ওর জানালা থাকবে না। ঐখানে আমার সাধনভজন চলবে। দিনরাত 'মমস্ত' হয়ে থাকব। এক আধ দিন বার হব। নইলে কেউ দেখাই পাবে না। ইনভেস্টমেন্টের সুদ পাব মাসে পাঁচ শ টাকা করে। যে থাকবে আমার সঙ্গে তাকে ঐ টাকাতে মাসের খরচ চালিয়ে নিতে হবে। হিসেব চাই না। কিন্তু আমার ওপর কোনও ঝঞ্ঝাট না আসে। ঘরদোর পরিষ্কার ঝকঝকে থাকবে। আমার একবেলার খাবার ঘরের দরজার কাছে পোঁছে দেবে। কোন রকমে আমার ডিসটার-ব্যান্স না হয়।

দিন না একটা ভালো লোক, ভার নেবে। আপনিও যখন খুশী চলে আসবেন, থাকবেন যতোদিন চান।

আমি বলি, প্রস্তাব ভাল। এবার কলকাতায় গিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো।

তিনি নিরাশ হয়ে বলেন, আপনাকে সিরিয়াস কথা কিছু বলা চলে না। সবই উড়িয়ে দেন।

ব্রহ্মচারীজীর ঘরে ঢুকি। সাবান দিয়ে কাচা ধবধবে ফর্সা চাদর বিছানো বিছানায়। সামান্য কয়েকটি জামা কাপড়। পাট করে গুছিয়ে রাখা। খানকয়েক বই। সবই ধর্মগ্রন্থ। হিন্দী বা সংস্কৃতে। পাতার আশে পাশে বাঁকা বাঁকা হরফে মন্তব্য লেখা। তাও হিন্দীতে। বলেন, বাংলাটা ভাল করে শেখা হয় নি। কোনরকমে সামান্য লিখতে পারি।

এই বছর ১৯৬৩ সালেও জুনের শেষে, ওঁর সঙ্গে হঠাৎ হৃষীকেশে দেখা। সত্তরের উপর এখন বয়স হয়েছে। সেই বিশাল দেহের পেশীগুলি এবার শ্লথ হতে শুরু করেছে। আমাকে দেখেই আনন্দে জড়িয়ে ধরেন। বলেন, কবছর দেখা হয় নি। আসেন, চলে যান।

যাবার পর খবর পাই। এবার ধরেছি ঠিক। ২রা জুলাই কল্পেশ্বরে ফিরছি। জিপ তৈরি। চলুন সঙ্গে। কয়েক মাস সেখানেই থাকবেন। বাড়ী প্রায় শেষ হয়ে এলো। সেইখানেই উঠবেন। স্যানিটারি ফিটিংস এখনও হয়নি। বর্ষা কাটলেই তার মালপত্র যাবে।

বুক চিতিয়ে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেন, তাঁর ঘরে। বস্তাভরা স্তূপাকার জিনিষপত্র। বলেন, সারা-বছরের খোরাক চলেছে। তাই তো আলাদা জিপ-এর ব্যবস্থা করতে হোল।

জিজ্ঞাসা করি বাড়ী জমি বিক্রী হয়ে গেছে?।

বলেন, বাড়ীর টাকা পেয়ে গেছি। জমির টাকা এই সেপ্টেম্বরে পাব—সব কথাবার্তা ঠিক হয়ে আছে। স্কীমও স্থির করেছি। টাকাটা একটা সেবা-প্রতিষ্ঠানে দান করছি। সর্ত হয়েছে, যতোদিন বেঁচে থাকব, মাসে পাঁচশো টাকা করে আমাকে তাঁরা দেবেন। চলে যাবে তাতে—কি বলেন? কিন্তু লোক কই আপনার? এবার আপনাকে ধরে নিয়ে যাবই।

হিমালয়ের অন্য এক অঞ্চলে যাবার আমার সব আয়োজন প্রস্তুত, তাঁকে জানাই। তবু, তিনি পীড়াপীড়ি করেন। হাত ধরে বলেন, তবে কথা দিন এ বছরেই আসবেন, আর থাকবেনও কিছু কাল। বাড়ী করলাম কেন তবে?

আমিও তাই ভাবি, মনে মনে। অর্থের অভাব নেই। পৈতৃক গৃহ, জমিজমা—অনেক কিছুই পেয়েছিলেন। সব ছেড়ে জীবন কাটালেন সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে, কঠোর তিতিক্ষা করে, দুর্গম তীর্থে তীর্থে ঘুরে। তবু, মানুষ-মনের একি বিচিত্র গতি! হিমালয়ের নির্জন অঞ্চলে নবগৃহ-রচনার আবার বাসনা জাগে। আত্ম-ভোগ-লিপ্সায় নয়।—কার জন্য, কিসের জন্য—কে জানে।

(৫)

ব্রহ্মচারীজীর কুটিরের পিছনে, পাহাড়ের খানিক উপরে, কল্পেশ্বর মহাদেবের অধিষ্ঠান। ওদিকে লোকজনের কমই চলাচল। পাহাড়ের গায়ে চলার পথও সরু। কোথাও বা পথ জুড়ে আগাছার জঙ্গল। চড়াই শেষে উপরে এলে অনুভব করা যায়—প্রাচীন তীর্থস্থান। অতি শান্ত পরিবেশ। পাথর-বিছানো পথ। পথের পাশে কয়েকটা ভাঙ্গা মূর্তি। পাথরের তোরণ। খিলানের উপর থেকে ঘণ্টা ঝোলে। অপ্রশস্ত চত্বর। তারই শেষে একটা গুহার সম্মুখভাগ পাথর দিয়ে গাঁথা, সামনে প্রবেশদ্বার। গুহার ভিতরে এক শিলাখন্ড—পাহাড়েরই অংশ। যেমন, কেদারনাথে। তিনিই কল্পেশ্বর। বৃদ্ধ পুজারী বলেন, জটা আকৃতি স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। উর্গমগ্রাম থেকে পুজারী নিত্য আসেন। পুজা সেরে আবার ফিরে যান। ঘুরে ঘুরে সব দেখান। গুহার পাশে ছোট কুন্ড। যাত্রীদের জন্য আচ্ছাদিত আশ্রয়স্থান।

প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রের জাঁকজমক নেই। দেবতার সাজসজ্জা নেই। পুজার আড়ম্বর নেই। দ্বিতীয় যাত্রীও নেই। কয়েকটি বিল্বপত্র, অঙ্গনে অযতনে ফোটা কয়েকটি ফুল,—তাই তুলে এনে পুজারী হাতে দেন। ভক্তিভরে অঞ্জলি দিই। সঙ্গে আনা দুটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিই। স্পর্শ করে প্রণাম করি। মন্ত্র-হীন পুজা; নগণ্য উপচার, তবু মন ভরে ওঠে সানন্দ তৃপ্তিতে। মনে হয়, যেন দেবতাত্মা হিমালয়ের বিজন নিভৃত গুহায় যোগাসীন বিবস্ত্র এক মহাযোগীর পদতলে উপস্থিত হয়েছি, অর্ধনিমীলিত নয়ন থেকে তাঁর করুণা-ঘন দৃষ্টি ঝরে পড়ে।

এর পরের বারের কথা।

সে-বছর কল্পেশ্বরে রাত কাটাই না। ব্রহ্মচারীজীও তখন সেখানে নেই। শূন্য কুটির। তবু, পূর্বস্মৃতির সূত্র ধরে দেখতে এগিয়ে যাই। বারান্দায় এক সাধু বসে। অভিবাদন করে প্রশ্ন করি, কতোদিন আছেন এখানে?

তিনি বলেন, সপ্তাহখানেক হোল। গিয়েছিলাম বদরীনাথ দর্শনে। দর্শন করলাম বটে, কিন্তু মন ভরল না। লোকজনের ভিড়, হট্টগোল। সহরের জাঁকজমক।—হিমালয়ে এসেও এমন দেখব, আশা করি নি। তীর্থপুরী ছেড়ে তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়ি। হঠাৎ হেলাং-এ এসে খবর পেলাম এই কল্পেশ্বর ক্ষেত্রের। ভাবলাম, একবার ঘুরে দেখে যাই। আসতেই কিন্তু মন বসে গেল। আসন পাতলাম এইখানেই। বদরীনাথে যা আশা করেও পাই নি, এখানে আশাতীতভাবে তাই পেয়েছি। দিন কেটে যাচ্ছে পরম আনন্দে।

সেইবারের আর একটি ছোট ঘটনা বলে এই কাহিনী সাঙ্গ করি। গহন বনে যেমন ক্ষুদ্র জোনাকির আলোও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, আমার স্মৃতিভান্ডারে তেমনি এই ক্ষুদ্র ঘটনাও দীপ্তি বিকীর্ণ করে।

কল্পেশ্বর দর্শন করে উর্গমগ্রামে বিকেলে ফিরেছি। সঙ্গী শিশিরবাবুও সঙ্গে আছেন। এই উর্গমগ্রামে পঞ্চ-বদরীরও এক মন্দির আছে, —ধ্যান বদরী। পাথরের প্রাচীন মন্দির। সংস্কার অভাবে অতি জীর্ণ অবস্থা। মন্দিরের সারা অঙ্গ থেকে আগাছা ঝোলে। সেই মন্দিরের মধ্যেই রাত কাটাবো, ঠিক করি। ডিমরিজিকেও জানাই। তিনি আপত্তি জানান। তাঁকে বলি, আপনি বরং কিছু আহারের ব্যবস্থা করুন। তিনি খুসী হন, বলেন, সে তো করবো। কিন্তু, কষ্ট হবে না মন্দিরের মধ্যে? বিছানাপত্র তাহলে পাঠিয়ে দিই? —দুজনের শুধু দুখানা কম্বল দিতে বলি।

সন্ধ্যার ছায়া নিঃশব্দে গ্রামে নামতে থাকে। মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। পথের উল্টা দিক থেকে এক বৈরাগী আসেন। এলোমেলো চুল দাড়ি। শুকনো মুখ। কোটরগত চোখ। অতি ক্লান্ত দেহ। শতছিন্ন জীর্ণ আলখাল্লা পরনে। হাতে কাপড়ে জড়ানো বাদ্যযন্ত্র। অতি সযত্নে বুকে ধরে রাখা। যেন, মায়ের কোলে ঘুমন্ত শিশু।

আমাদের দেখে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে দোকান কোথায়? দুদিন অভুক্ত আছি।

জিজ্ঞাসা করি, কোথা থেকে আসছেন?

পিছনের পাহাড় দেখিয়ে বলেন, ঐ পাহাড় ডিঙিয়ে—রুদ্রনাথ থেকে।

রুদ্রনাথ পঞ্চ-কেদারের চতুর্থ কেদার। অতি দুর্গম তীর্থ। কয় বছর আগে সেখানে গিয়েছিলাম মন্ডলচটি থেকে অনসূয়া হয়ে। তখনি শুনেছিলাম, রুদ্রনাথ থেকে সোজা কল্পেশ্বর আসবার এই পথের কথা। মাত্র ১৪ মাইল। কিন্তু পথ নেই। গভীর বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়ে নদীর খরস্রোত কোনমতে পার হয়ে, প্রচন্ড চড়াই উৎরাই ভেঙে আসতে হয়। দুতিন দিন লাগে। —বৈরাগী এসেছেন সেই পথ দিয়ে।

তিনি তাঁর দুরবস্থা দেখান। হাতে পায়ে বহু ক্ষত চিহ্ন, ছিন্নভিন্ন অঙ্গাবরণ। তবু, তীর্থশেষে পরিতৃপ্ত মুখ। উৎসাহিত হয়ে বলেন, এটিকে কিন্তু ঠিক বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি। —যত্ন করে বাদ্যযন্ত্রটি দেখান।

কথা শুনে আনন্দ পাই। বলি, দোকান এখানে একটিও নেই। কিন্তু, কোন কিছুর অভাব হবে না। আসুন, আমাদের সঙ্গে ঐ মন্দিরে—এক সঙ্গে রাত কাটাবো। সর্ত শুধু একটি—ভজন শোনাতে হবে।

মন্দিরের গর্ভগৃহ। প্রকান্ড পাথরের নারায়ণ মূর্তি। স্তিমিত দীপের আলোক। ধূপের স্নিগ্ধ সুবাস। গর্ভগৃহের মুক্ত দ্বার। আচ্ছাদিত মন্ডপ। সেই মন্ডপে দ্বারদেশের দুই দিকে বিগ্রহের দিকে মাথা রেখে কম্বল শয্যায় শিশিরবাবু ও আমি শুয়ে আছি। পায়ের দিকে মন্দিরের বৃহৎ প্রবেশদ্বার। উন্মুক্ত। তারি ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে দিগন্তব্যাপী গিরিশ্রেণীর রূপ। স্তরে স্তরে সাজানো পাহাড়। উপরে মেঘহীন নির্মল আকাশ। অযুত তারার আলোয় জ্যোৎস্নার ভ্রম জাগায়।

সঙ্গীতের উপকথা

সুরেশ চক্রবর্তী

(১)

দেবলোকের সঙ্গে মনুষ্যলোকের ব্যবধান যত বড়ই হোক তাদের মধ্যে সুদূর প্রাচীন যুগেই একটা মিলনসেতু রচিত হয়েছিল,—সেই সেতু হচ্ছে সংগীত, আর সেতুর আদি নির্মাতা ছিলেন দেবর্ষি নারদ, শাস্ত্রে এর প্রমাণ আছে। এই কারণে যে ঢেঁকির পিঠে চড়ে নারদ ক্রমাগত স্বর্গে আর মর্তে যাতায়াত করতেন সেই ঢেঁকি আমাদের নমস্য। শিব পার্বতী ব্রহ্মা আর নারদ এই চারজনই সংগীতের প্রাচীনতম অথরিটি। আমাদের বিখ্যাত ছয় রাগের পাঁচটি শিবের আর একটি পার্বতীর মুখ থেকেই নিঃসৃত। এই সব রাগ বীণাযন্ত্রে আদায় করতেন নারদ। সুতরাং অলকাপুরীতে নারদের যে বিশেষ আদর প্রতিপত্তি ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

একদিন নারদকে সঙ্গে নিয়ে পার্বতী কৈলাসের সানুদেশে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। গান-বাজনায় অনন্যসাধারণ অধিকার লাভের ফলে নারদের মনে একটু অহঙ্কার জন্মেছিল। এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক। হাল আমলেও আমরা দেখতে পাই, গলার অতি বদখত আওয়াজ সম্বল করেই অনেক উস্তাদ তানবাজির অসাধারণ পটুত্বের সাহায্যে শ্রোতার প্রশংসা পেতে চান। নারদও বোধ হয় ভেবেছিলেন, বীণা হাতে ঢেঁকির ওপরে বসাটা যতই দৃষ্টিকটু হোক, তাঁর উস্তাদিপনার তারিফ করতে সকলেই বাধ্য। কথাটা মুখে প্রকাশ না করলেও সর্বজ্ঞা পার্বতীর জানতে বাকি রইল না। তিনি একটু মুচকি হেসে নারদকে নিয়ে একটা জঙ্গলের পথ ধরে চলতে লাগলেন।

সহসা নারদ রাস্তার দু' পাশে অনেকগুলি পুরুষ ও নারীর মিলিত কণ্ঠে কাতরানি গোঙানির শব্দ শুনতে পেলেন, — চেয়ে দেখলেন এই সব হতভাগ্য ব্যক্তির কারো নাক নেই, কারো কান নেই, কেউবা পঙ্গু, কারো
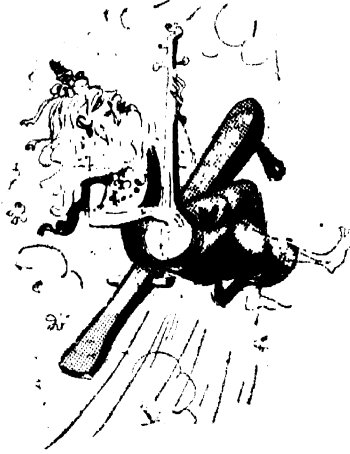
ঢেঁকির পিঠে নারদ

হাত-পা কাটা ইত্যাদি। ব্যথিত চিত্তে নারদ জিজ্ঞাসা করলেন "দেবি, এদের এই অবস্থা কেন?" মুচকি হাসি থামিয়ে গম্ভীরভাবে পার্বতী জবাব দিলেন "এদের এই দুর্দশার জন্য দায়ী তুমি। এরা হচ্ছে সেই সব হতভাগ্য রাগ-রাগিণী যারা তোমার বীণায় ভুল রূপায়ণের ফলে দেহের স্বাভাবিক রূপ হারিয়ে কষ্ট পাচ্ছে। এরা কৈলাসে এসেছিল কৈবল্য লাভের আশায়, কিন্তু তোমার হাতে পেয়ে গেল বৈকল্য।" নারদ নিরুত্তর।

(২)

আলাউদ্দিন খালজী দাক্ষিণাত্য বিজয়ে যে সব জিনিষপত্র লুট করেছিলেন তাদের মধ্যে কিছু কিছু সজীব মনুষ্যও ছিল। এই সব মনুষ্যের মধ্যে একজন ছিলেন উস্তাদ গোপাল নায়ক। দিল্লীতে এসে তিনি সম্রাটের সভা-গায়ক নিযুক্ত হন। সেই আমলে আর একজন মস্ত গুণী ছিলেন বৈজু বাউরা। ইনি লোকালয়ে বাস করতেন না। গোপাল গোপনে গোপনে বৈজুর কাছে কিছু কিছু তালিম পান, কিন্তু দরবারের গায়ক হিসেবে আত্ম-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার অজুহাতে নিজের শিক্ষানবীশির কথাটাও গোপন রাখতেন।

যা হোক বৈজুর খ্যাতি সম্রাটের কানে পৌঁছেছিল। তিনি একদিন বৈজুকে দরবারে ডেকে পাঠালেন এবং গান শুনতে চাইলেন। ব্যাপার বুঝে গোপালের বুক কেঁপে উঠল, কিন্তু আপৎকালে দুর্বলতা দেখানো যে বুদ্ধিমানের কাজ নয় সেটা তাঁর জানা ছিল। তাই বৈজুকে দেখেই তিনি চিৎকার করে বললেন "জাঁহাপনা, এই পাগলটাকে দরবারে ঢুকতে দিলেন কেন?" বৈজু একটু দুঃখ পেয়ে বললেন "হুজুরের আমি আপনার আদেশেই এখানে এসেছি। কিন্তু আমার শিষ্য হয়ে গোপালের এই উক্তি আমার পক্ষে অসহ্য। আপনি অনুমতি করলে আমি যাই।" সম্রাট ব্যাপারটা একটু আঁচ করে বললেন, "না, আপনার যাওয়া হবে না,—যদি প্রমাণিত হয় গোপাল আপনার শিষ্য তবে গুরুর অপমানের জন্য তার গর্দান যাবে, আর যদি এটাই ধরা পড়ে যে আপনার গুরুত্বের দাবীটাই মিথ্যা তাহলে—" বৈজু বললেন, "বেশ আমার গর্দান নেবেন। আমরা দুজনেই গান গাইব, আর তারই ফলাফল থেকে আপনি ঠিক করে নেবেন কার কথা সত্যি।"

এই বলেই বৈজু গান ধরলেন। তার তানপুরার বালাই ছিল না,—এক জোড়া মন্দিরা বাজিয়েই তিনি গান করতেন। গান শেষ করে মন্দিরা জোড়াটা তিনি উঠোনে ফেলে দিলেন। উঠোনটা ছিল পাথরের। পাথর গলে গিয়ে তার মধ্যে মন্দিরা ঢুকে গিয়েছিল। আর পর মুহূর্তে পাথর শক্ত হয়ে যাওয়াতে মন্দিরা সেইখানে একেবারে এঁটে গেল। এর পর বৈজু বললেন, "এইবার গোপালের গান হোক, তার গানে যদি পাথর গলে যায় তবে আমার মন্দিরা জোড়া নিশ্চয়ই উঠে আসবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি হার মানব।"

বহু দূরে যোশীমঠের পাহাড়ের পিছন দিকে তুষার শিখর স্নিগ্ধোজ্জ্বল দেখায়। নীরব হয়ে দেখি, স্রষ্টার সৃষ্টি। হিমালয়ের নিশীথ শোভা। বিরাট দ্বারের চৌকাঠের ফ্রেমে বাঁধানো পরিপূর্ণ নিখুঁত চিত্র।

সেই শব্দহীন স্বর্গীয় পরিবেশে সুরের তরঙ্গ ওঠে।

পাশেই কম্বল বিছিয়ে আসন নিয়েছেন বৈরাগীজী। তানের পর তান ধরেন, মৃদু মধুর কণ্ঠে। তারের বাদ্যে ঝঙ্কার ওঠে। যেন নূপুর বাজে। মাথার উপর আলো-অন্ধকারে মন্দিরের বিগ্রহের মুখে যেন তৃপ্তির হাসি ফোটে। সুরের হিল্লোলে হিমালয়ের বুকে যেন প্রাণের স্পন্দন ওঠে। কথা, ভাব ও সুরের প্লাবনে দেহমন কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আনন্দ-বিহ্বল হয়ে শুনতে থাকি। আধ ঘুমঘোরে রাত কাটে।

এখনও অলস অবসরে সেই সুরের মূর্ছনা কানে শুনি। হিমগিরির সেই নিশীথ চিত্র এখনও চোখে ভাসে।

এই আমার কল্পতরুর অমৃত ফল।

সম্রাটের ইঙ্গিতে গোপাল গান ধরলেন,—গাইতে গাইতে ঘেমে গেলেন কিন্তু পাথর গলার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সম্রাট তখন গোপালের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু দয়াল, বৈজু নিজেই শিষ্যের প্রাণ ভিক্ষা

মৃতদেহ ছুঁয়ে মনে মনে জয়জয়ন্তী রাগের আলাপ করছিলেন

করলেন। মহান গুরুর উদার অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে সম্রাট প্রাণদণ্ডের আদেশ মকুব করে দিলেন।

(৩)

পাঠান আমলের শেষ দিককার কথা। এক গরীব গৃহস্থের বাড়ীতে গৃহস্থ আর তার স্ত্রী, আর তাদের একটিমাত্র পুত্র—এই তিনজন বাস করত। তারা ছিল খুব নিরীহ শান্ত-প্রকৃতির লোক, গ্রামের সবাই তাদের খুব ভালবাসত। ছেলেটিকে নিয়ে বাপ মায়ের আহ্লাদের আর সীমা নেই। বিধির কি বিড়ম্বনা,—একদিন বৃষ্টির মধ্যে সেই ছেলে খেলা করতে নেমে পড়ল উঠোনে, আর অমনি ভীষণ শব্দের একটা বাজ পড়ে সে সেইখানেই মারা পড়ল। বাপ-মায়ের ক্রন্দনের বেগ, আর কিছুতেই থামে না,—পাড়ার লোক ছেলেটাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার নাম করতেই মা গিয়ে জড়িয়ে ধরে মৃতদেহটাকে,—তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মত নিষ্ঠুরতা কারো ছিল না। এইভাবে সারা দিন চলে গেল।

রাত এক প্রহর অন্তে সেইখানে আবির্ভাব হ'ল একজন সূফী সাধুর। সাধু সব শুনে বললেন, "আচ্ছা তোমরা একটু সরে দাঁড়াও, আমি কিছু মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করে দেখি কিছু করা যায় কিনা।" তারপর তিনি সোজা হয়ে বসে মৃতদেহের ওপর হাত রেখে বিড় বিড় করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ এই প্রক্রিয়ার পর বিস্মিত নেত্রে সকলে দেখল, মৃতদেহের গায়ে ধীরে ধীরে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে—এক দণ্ড অতীত হলে ছেলেটা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল আর তক্ষুনই খেতে চাইল। আনন্দে বাপ-মা ছুটে গেলেন খাবার আনতে। গ্রামের মধ্যে দু'একটাকে যাদের একটু হাত ছিল, তারা সাধুকে ধরে পড়ল মন্ত্রটা শিখিয়ে দিতে হবে। সাধু একটু হেসে বললেন তা হয় না,—এ অতি কঠিন কাজ, বহু সাধনার ফলে এই শক্তি লাভ হতে পারে, তাও আবার সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা নাছোড়-বান্দা। তখন নিরুপায় হয়ে সাধু আসল কথাটা বলতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, মন্ত্রতন্ত্র তিনি কিছুই করেন নি, শুধু মৃতদেহটাকে ছুঁয়ে স্থির হয়ে বসে মনে মনে তিনি জয়-জয়ন্তী রাগের আলাপ করেছিলেন। সবাই শুনে অবাক, সঙ্গীতের এত শক্তি! উহুঁ, বিশ্বাস করা যায় না। ইতিমধ্যে শোনা গেল গ্রামের মোড়লের একটা গরু এই খানিকক্ষণ আগে মারা গিয়েছে,—তারই ওপর দিয়ে পরীক্ষা চালান যাক। সাধু রাজী হয়ে মরা গরুটাকে স্পর্শ করে যেই খোলা গলায় জয়-জয়ন্তী ভাঁজলেন আর অমনি গরুটা তড়াক করে উঠে ঘাস খেতে লাগল। তখন আর বিশ্বাস না করে উপায় কী? জয়জয়ন্তী রাগের এই শক্তির কথা এখনো কোনো কোনো উস্তাদের মুখে শোনা যায়; তবে এই মৃত-সঞ্জীবনীর প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ প্রয়োগের কথা আর শোনা যায় না।

(৪)

দিল্লী আসবার আগে তানসেন ছিলেন রাজা মানের সভাগায়ক। একবার আকবরের অনুরোধে রাজা মান তানসেনকে পাঠিয়ে দিলেন দিল্লীর দরবারে। আকবরের সভায় তখন তালমণ্ডীর দু'জন নামকরা গাইয়ে ছিলেন,—দুই ভাই। তাঁরা ছিলেন বয়সে তানসেন অপেক্ষা বড়, অবশ্য সম্মানেও। কিন্তু সম্রাটের আদেশ প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করেও দরবারের গুণীরা গাইবেন আগে, আর অতিথি গুণী গাইবেন পরে। ভ্রাতৃদ্বয় একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ জানিয়েও ফল পেলেন না। তখন তাঁরা একটা ফন্দী আঁটলেন,—সেদিনটা সারা দিন ধরে এক ভাই গাইবেন আর সারা রাত ধরে গাইবেন অপর ভাই। কথা রইল, তাঁরা দু' ভায়ে মিলে যে সব রাগ গাইবেন

দীপক গাইবার ফলে দেহ পুড়ে যায়

তানসেনকে সে সব রাগ গাইতে দেওয়া হবে না। সম্রাট রাজী হলেন, বোধ হয় মজা দেখবার জন্য।

তখন এক ভাই দিনের বেলাকার তাবৎ রাগ গেয়ে শেষ করলেন আর অন্য ভাই রাতের সবগুলি প্রচলিত রাগই গেয়ে ফেললেন। এর ফলে একজনের নাম হ'ল সুরয খাঁ আর অপর জনের নাম হ'ল চাঁদ খাঁ। গাইবার পর তাল-মণ্ডীর উস্তাদেরা খুব খানিকক্ষণ হাসাহাসি করে নিলেন, দেখাই যাক না তানসেন কি গায়! কিন্তু আসরে বসবার আগেই তানসেন আটখানি

মুজককন্যাও বিশুদ্ধভাবে সেই রাগে গান গাইতে পারত

নতুন রাগ বানিয়ে ফেললেন, আর সেই সব রাগের গান শুনে চাঁদ খাঁ সুরয খাঁর মুখ চুণ! তাঁরা অতঃপর দরবার থেকে বিদায় নিয়ে তালমণ্ডী চলে গেলেন। তানসেনের তৈরী এই সব রাগই হ'ল দরবারি কানাড়া, মিয়াঁকী সারং, মিয়াঁকী মল্লার, দরবারি টোড়ী, ধানী ইত্যাদি।

গল্পটা এইখানেই শেষ করতে চান তানসেনের ভক্তরা। কিন্তু তালমণ্ডী ঘরাণার উস্তাদেরা সেনী ঘরাণার কাছে কোনো কালেই মাথা হেঁট করেননি। সুতরাং তাঁরা এই গল্পটার মধ্যে একটা উত্তর কাণ্ড জুড়ে দিয়েছেন। গল্পটা এই:—

চাঁদ সুরয ত বিদায় নিলেন, কিন্তু যাবার আগে আকবরের কানে এই ধরনের একটা কথা তুলে দিয়ে গেলেন যে তানসেন দীপক গাইতে জানেন না। আসল কথা হল দীপক তানসেনের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু ভয়ে তিনি সেটা গাইতেন না, কারণ দীপক গাইবার ফলে গায়কের দেহটা পুড়ে যায়, তখন মল্লার না গাইলে আর স্বাভাবিক চেহারা ফিরিয়ে পাওয়া যায় না। সেই মল্লার রাগটাই তানসেনের জানা ছিল না। চাঁদ সুরযের এই ব্যাপারটা জানা ছিল।

যা হোক, আকবর হুকুম করলেন দীপক গাইতে হবে। তানসেন অনেক মিনতি জানিয়েও যখন রেহাই পেলেন না তখন আর উপায় কি? দীপক গাইতেই হ'ল, আর তার ফলে তানসেনের দেহখানি পুড়ে গিয়ে অঙ্গারের মত রঙ ধরল। এখন উপায়? তালমণ্ডী না গেলে ত আর সুস্থ হওয়া যাবে না, কারণ একমাত্র সেই

খানেই মল্লারের গায়ক মিলতে পারে। সুতরাং দায়ে পড়ে তানসেন চললেন তালমণ্ডী। এ দিকে চাঁদ খাঁ সুরয খাঁ তালমণ্ডীর নবাবকে দিয়ে একটা হুকুম জারি করিয়ে রেখেছেন যে, রাজ্যে পোড়া দেহ নিয়ে কোনো লোক ঢুকলেই তাকে নবাবের সামনে হাজির করতে হবে। তানসেনকে ধরে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার এই ফন্দী পাকা হয়ে গেল।

এ দিকে তানসেনেরও প্রাণের ভয় ছিল। তিনি বড় বড় রাস্তা এড়িয়ে একটা জঙ্গলের পথে তালমণ্ডী রাজ্যের সীমানায় ঢুকলেন। কাছেই একটা ছোট্ট জলাশয়ের ধারে একটি রজক-কন্যা কাপড় কাচতে কাচতে গান গাইছিল। তানসেন খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গান শুনতেই দেখেন তাঁর গায়ের পোড়া চামড়া আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে আসছে,—না গান শেষ হ'তে দেখা গেল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এখন, এই মেয়েটি যে গান গাইছিল সেটা ছিল মল্লার রাগের গান, আর তার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। আসল কথা, যে রাগটা তানসেন জানতেন না, তালমণ্ডীর একটা সামান্য রজকের মেয়েও বিশুদ্ধ ভাবে সেই রাগে গান গাইতে পারত।

তালমণ্ডী তরফের গল্প এইখানেই শেষ। আবার তানসেনের ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ এই গল্পটাও স্বীকার করে নিয়ে এর পেছনে একটা উপসংহার যোগ করে দিয়েছেন, সেটা হ'ল এই ঃ—

তানসেন ত এইভাবে আরোগ্য লাভ করলেন। তখন আর তাঁর ভয় নেই—তালমণ্ডীর লোকেরা তাঁকে আর ধরবে না, কারণ তাঁর দেহ অঙ্গারের মত কালো নয়। সোজা গিয়ে উঠলেন তিনি নবাবের দরবারে এবং নবাবের সামনে দিলেন আত্মপরিচয়। কথা শুনে চাঁদ সুরয খাঁ হাঁ করে উঠলেন, বললেন "এই লোকটা মিথ্যা-বাদী, তানসেন তো দীপক গাইতে জানে, এই লোকটা গেয়ে শোনাক ত দীপক, তবেই ত বুঝব এ তানসেন। তানসেন দীপক আর মল্লার দুই-ই গাইলেন—এবার তাঁকে কোনো বিপদে পড়তে হ'ল না। তারপর তিনি নবাবের কাছে আনুপূর্বিক সব বিবরণ পেশ করবার পর নবাব দেখলেন একটি মেয়ের গান একবার শুনেই যে গায়ক রাগ সম্বন্ধে এতটা দখল করতে পারে সে সামান্য গুণী নয়। আর একবার চাঁদ সুরযের মাথা হেঁট করতে হ'ল। নবাব বহু উপঢৌকন দিয়ে তান-সেনকে মহাসম্মানে আকবরের দরবারে পাঠিয়ে দিলেন।

(৫)

অন্তিম শয্যায় তানসেন। শয্যার চারদিক ঘিরে পুত্র তিনজন আর অসংখ্য শিষ্য ও ভক্ত-বর্গ। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গুণীর আসন্ন মৃত্যুর আশংকায় সকলেই ম্রিয়মাণ। এত বড় গুণীর তিরোধান ত সঙ্গীতকলাকে ম্লান করবেই, তা ছাড়া আর একটা মস্ত গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা প্রত্যেকের মনে জেগে উঠেছে, তানসেনের প্রয়াণের পরে তাঁর সংগীতধারাকে অব্যাহত রাখতে পারবে এমন কেউ পুত্র বা শিষ্যদের মধ্যে আছেন কি? একজন ভয়ে ভয়ে শয্যার পাশে গিয়ে তানসেনকেই প্রশ্নটা নিবেদন করলেন। তানসেন একটু ভেবে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, "জানি না, তবে তোমরা একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। আমার মৃত্যুর পর এখানে যেসব গায়ক উপস্থিত আছে, আমার পুত্র হোক বা শিষ্য হোক, তারা যেন একজনের পর একজন আমার মৃতদেহটার পাশে বসে একখানি করে গান করে। যার গানের সময় আমার মৃতদেহে কোনো অনৈসর্গিক লক্ষণ দেখা যাবে, সেই হবে আমার সঙ্গীতের আসল উত্তরাধিকারী।"

কয়েক মুহূর্ত পরেই তানসেন দেহরক্ষা করলেন। আর তখন পড়ে গেল কাড়াকাড়ি পুত্র আর শিষ্যদের মধ্যে, কে আগে গাইবে তাই নিয়ে। শুধু কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ একটু দূরে সরে রইলেন। পুত্রদের মধ্যে তিনিই ছিলেন পিতার সবচেয়ে আদরের। তিনিও ছিলেন পিতার একান্ত বাধ্য অনুরাগী শিষ্য। শোকে মুহ্যমান বিলাস খাঁ এই বিষম উস্তাদি প্রতি-যোগিতায় যোগ দিলেন না। এদিকে তানতরঙ্গ মানতরঙ্গ, আর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা নামকরা তাঁদের সবাই একে একে গান গাইলেন সমস্ত সাধনালব্ধ শক্তি প্রয়োগ করে। কোনো ফল হ'ল না, মৃতদেহে একটুও বৈলক্ষণ্য দেখা দিল না।

কিন্তু বিলাস খাঁ কোথায়? তাঁর যে দেখাই নেই, তাঁর পিতৃভক্তি ও গুরুভক্তি কি এরই মধ্যে উপে গেল? ডাক তাঁকে। দেখা গেল এক নিভৃত কোণে বসে বিলাস খাঁ অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে এক-খানি নূতন গান রচনা করে গুণ্ গুণ্ করে গাইছেন। একেবারে নব-উদ্ভাবিত একটি রাগে নবরচিত একখানি গান। আহ্বান পেয়ে বিলাস খাঁ উঠলেন, তানপুরা নিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে পিতার মৃত্যু শয্যার পাশে গিয়ে বসলেন। ধীরে ধীরে তানপুরায় সুর দিলেন। কারো মনে কোনো আশা নেই যে, বিলাসের গানে এমন কিছু ঘটবে যা তাঁর চাইতে বয়স্ক ভাই বা গুরুভাইদের গানে ঘটেনি। তবুও বিষম উৎকণ্ঠা নিয়ে সবাই শুনছেন বিলাস খাঁ-এর গান। যে রাগটি তিনি এইমাত্র উদ্ভাবন করেছেন তার নাম বিলাসখানি টোড়ী, আজও এই রাগ গুণীদের মহলে সুপরিচিত।

বিলাস খাঁ গেয়ে চলেছেন মিনিটের পর মিনিট,—মৃতদেহ পাথরের মূর্তির মত পড়ে আছে, তাতে কোনো সাড়া নেই। শ্রোতারা তা ধারণাই যে ঠিক ক্রমে সেটা উপলব্ধি করছে আর এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হচ্ছেন যে, তা সেনের শক্তি তাঁর সঙ্গেই নির্বাণ লাভ করেছে বিলাস খাঁ নিজে কিছু দেখছেন না, তাঁর ন নিমিলিত। এক মনে গেয়ে যাচ্ছেন। ক্রমে আ কিছুক্ষণ পরেই হ'ল গানের সমাপ্তি। গা শেষ করে বিলাস খাঁ চোখ মেলে মৃত পিতা মুখের দিকে চাইলেন। কিন্তু এ কি! বিলা খাঁ দেখলেন, ঘরসুদ্ধ আর সবাই দেখল, মৃ তানসেনের ডান হাতখানি ধীরে ধীরে বিছা ছেড়ে উপরের দিকে উঠল,—তারপর প্রিয় পুত্রে মাথার ওপরে হাতখানি একটু এগিয়ে এ যেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, তারপর আব শয্যালগ্ন হয়ে নিশ্চল হয়ে রইল। বুঝতে বা রইল না, বিলাস খাঁ তানসেনের শুধু প্রিয়ত পুত্র নন, শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারীও বটেন। সকলে মুখে ধ্বনিত হ'ল জয় বিলাস খাঁ, জয় তানসেন

(৬)

গোয়ালিয়র দরবার। দু'শো বছর আ এখানে খেয়াল গানের দারুণ চর্চা সুরু হয় হদ্দু খাঁ, হসসু খাঁ, মহম্মদ খাঁ, নাথু খাঁ ইত্যা বিখ্যাত নাম এই দরবারের অলংকার। কাহ আছে মহম্মদ খাঁ-এর বাবা একদিন দরবা এমন একটি তান দিলেন যে, তার চোটে উঠো বাঁধা হাতীটা ভয় পেয়ে শেকল ছিঁড়ে দে ছুট পুত্রও কম নয়, একদিন এমন জোরালো এক তান তাঁর গলায় বেরিয়ে এল যে, তার বায়ুতরঙ্গ ছাতে আঘাত করায় ছাতের খানিকটা মশল আলগা হয়ে একেবারে সভার মাঝখানে পড়ে গেল, ভাগ্যিস কারো মাথায় গায়ে পড়েনি। পিত সাবধান করে দিলেন, কিন্তু পুত্রের তাে উৎসাহে ভাঁটা ত পড়লই না, বরং তাতে আর জোয়ারের সঞ্চার হ'ল। একদিন পিতা তি সপ্তক ব্যাপী একটা জবরদস্ত তান দিবার চেষ্ট করে হাঁপিয়ে পড়তেই পুত্র বুক ফুলিয়ে বললেন, ওটা অনায়াসে আমি দেখাতে পারি পিতা অনেকবার এই দুঃসাহসের কাজ থেকে পুত্রকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পুত্রের জেদ কমল না। পিতার ওপর টেক্কা দেবার মতলবেই বোধ হয় বিষম গর্জনে তি সপ্তকের তান দিলেন। তান ঠিক হ'ল, কিন্তু বেচারা উস্তাদ তৎক্ষণাৎ বুক ফেটে মারা পড়লেন। আধুনিক আমলে তানের চোটে গায়কের বুক ফাটার কথা আর শোনা যায় না তবে শ্রোতার কান ফাটার দৃষ্টান্ত আছে।

জলযোগ

আর এন দাশ

নূতন ঊষা
হীরেন চৌধুরী

মাসতুতো

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
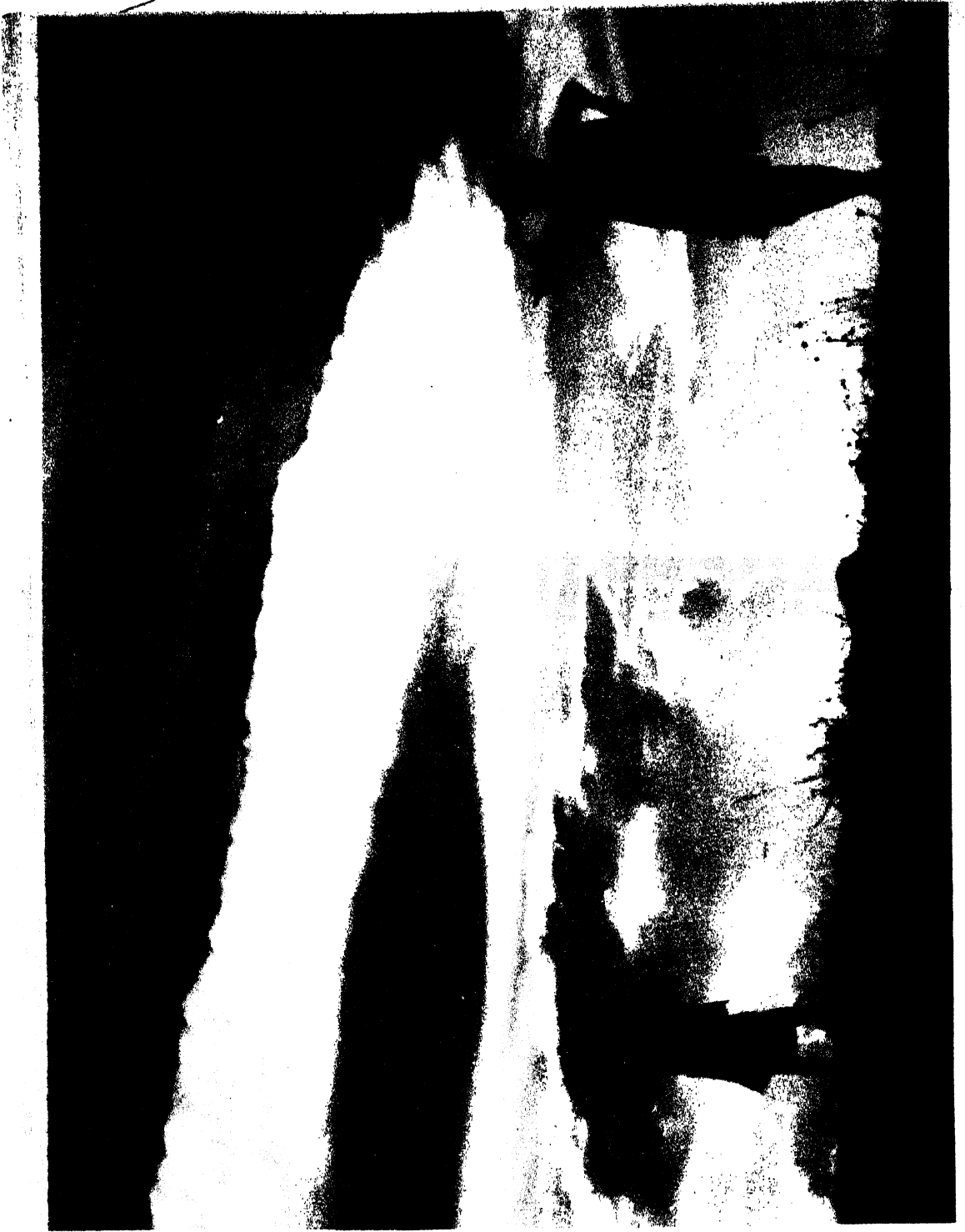
নগদ পঞ্চাশটি টাকা তুলে দিলাম ডাক্তার পাকড়াশীর হাতে। তারপর দেওয়ালের বড় আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ভালো করে একবার দেখা দরকার কেমন মানাল চশমাটা। না, হয়েছে চমৎকার। তবে টাকাটা একটু বেশী লাগল!

ডাক্তার পাকড়াশী পিছন থেকে বলে উঠলেন, ও আর দেখতে হবে না। খাঁটি ক্রিস্টাল গ্লাস, আর সেলের ফ্রেম। বেকসুর দশ বছর চলে যাবে আপনার।

নমস্কার করে বেরিয়ে আসব, এমন সময় ডাক্তার বললেন, বসুন, আর একটা কথা বলার আছে।

ছাতাটি কোণায় রেখে তাঁর অবশিষ্ট উপদেশটি শোনার জন্যে আবার চেয়ারে চেপে বসলাম।

ডাক্তার পাকড়াশী বললেন, যে রকম জোর এ্যাস্টিকমেটিজম হয়েছিল আপনার, তাতে আর কিছুদিন দেরী হয়ে গেলে মহা বিপদ হত। এমন কি, ঈশ্বর না করুন, চোখের দৃষ্টিই খোয়া যেতে পারত।

পঞ্চাশটা টাকার জন্যে মনটা তখনো খুঁত খুঁত করছিল। ডাক্তারের

এই পীলে-চমকানো ব্যাখ্যান শুনে মনে হল, চশমা নিয়ে তাহলে ত ভালোই করেছি। দুটো চোখের কাছে পঞ্চাশ টাকা!

এক টুকরো ন্যাময় লেদার খাপে ভরে সেটা দিলেন আমার হাতে ডাক্তার পাকড়াশী। বললেন কাচ দুটো পরিষ্কার করে মুছে নেবেন চোখে দেবার আগে। আর মনে রাখবেন, সিলিণ্ড্রিক গ্লাস, একসিস বেঁকে না যায় যেন কোন রকমে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম, তারপর নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তার ঈষৎ হেসে বললেন, এমন ব্যস্ত হচ্ছেন কেন বলুন ত? আসল কথাটাই যে হয়নি এখনো।

কি ও'র আসল কথাটা, কে জানে। একটু আনমনা হয়ে আবার বসে পড়লাম।

ডাক্তার পাকড়াশী বললেন, চোখের গোলমালটা মিটল। এবার দাঁতগুলো একবার দেখান। ঐ যে মাথার যন্ত্রণা আর ঘুম না হওয়ার কথা বলছিলেন, ওতে আমার ধারণা, আপনার দাঁতে বেশ গড়বড় আছে।

—কৈ তেমন ত কিছু বুঝি না। মাঝে মাঝে মাড়ি ফোলা কি দাঁত কনকন করা অবশ্য হয়। কিন্তু সে আর কার না হয়?

—জিনিষটাকে অত লঘু করে দেখবেন না। মাইগ্রেণ হেডেক বড় সাংঘাতিক জিনিষ, আর ওটা হয়ই দাঁতের গোলমাল থেকে।

—আগে ত তা বলেন নি। তাহলে চশমা না নিয়ে দাঁতই দেখাতাম।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডাক্তার। বললেন, কথাটা বুঝছেন না কেন? দাঁত থেকে রোগটা চোখে এসে সেটল করার পর চোখটা হয়েছে এক নম্বর এফেক্টেড স্পট, আর মাথাটা হয়েছে দু নম্বর...এখন আপনাকে ফাইট দিতে হবে প্রত্যেকটার সঙ্গে আলাদা আলাদা করে। বুঝেছেন!

মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, এই একরাশ খরচ হল। আবার যদি দাঁতের জন্য খরচ করতে হয়...

ডাক্তার কণ্ঠে অসীম দরদ ঢেলে বললেন, কি করবেন বলুন? ব্যাধি মানেই শত্রু। শত্রুকে সঙ্গে নিয়ে ত আর বাস করা যায় না। তাকে তাড়াতেই হবে শরীর থেকে, আর সেই তাড়ানোর উপায়ই হল চিকিৎসা। কিছু খরচ ত হবেই সেজন্যে।

একটা ঢোক গিলে বললেন, যাতে খুব কম খরচে হয় আপনার, তার ব্যবস্থা করছি আমি। গলো ওস্তাগর লেনে চলে যান, অরোরা ডেণ্টাল ক্লিনিক, ডাক্তার পি ডি হাজরা।

বলেই টেলিফোন তুলে নিলেন তিনি।

অগত্যা ঠিকানাটা টুকে নিয়ে রওনা হতে হল আমাকে।

* * *

ডাক্তার হাজরা দু-পাটি দাঁত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মুখে পরিয়ে তাঁকে বললেন, আয়নায় দেখুন, কেমন চমৎকার ফিট করেছে।

ভদ্রলোক বললেন, ডান দিককার মাড়ির এই খানটায় কিন্তু লাগছে।

ডাক্তার বললেন, ও কিছু নয়। দু-এক দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। হাজার হলেও একটা বাইরের জিনিষ ত।

একই ঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিসান দিয়ে অর্ধেকটায় করা হয়েছে চেম্বার। বাকী অর্ধেকটায় রোগীদের বসার জায়গা।

পর্দার ওপিঠে ডাক্তার তাঁর পেশেণ্টের সঙ্গে কথা কইছেন, এপিঠে আমি বসে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি, আর পাতলা পর্দার ভেতর দিয়ে দুজনকে দেখছি।

ভদ্রলোক রোমালে থুথু ফেলতে ফেলতে আর মুখে অবোধ্য আওয়াজ করতে করতে বেরিয়ে এলেন। পিছু পিছু এলেন ডাক্তার হাজরা।

আমাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। কিছু মনে করবেন না। এ'কে ছেড়ে দিয়েই আপনাকে এটেণ্ড করব।

তারপর ভদ্রলোকটিকে বললেন, বসুন, স্পঞ্জী গাম আর পায়োরিয়ার জন্যেই এতদিন পেটের গণ্ডগোলে ভুগেছেন। এই সমস্ত বিষ শরীরে বসেছে ত! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আরো দেরী করেন নি।

—কিন্তু এ দাঁতে কি খেতে পারব?

—খুব পারবেন, খুব পারবেন। রীতিমতো মাংসের হাড় চিবুতে পারবেন। শুধু তাই নয়, দিব্যি হজমও হবে দেখবেন।

ভদ্রলোক বললেন, সব শুদ্ধ কত দিতে হবে আপনাকে?

ডাক্তার বললেন, আমাদের রেট পৌনে তিনশো। আচ্ছা, আপনি আড়াই শো দিন।

—বড্ড বেশী হয়ে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু।

—আরে না না। এর কমে আপনি কোথাও পাবেন না। অবিশ্যি চীনে মিস্ত্রীদের কাছে পেতে পারেন। কিন্তু তারা ত ডাক্তার নয়, ডাকাত। কত গণ্ডা লোককে মেরে ফেলল ও পর্যন্ত।

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। মনিব্যাগ বের করে বিষম মুখে তা থেকে গুণে গুণে দশ টাকা, পাঁচ টাকা ও এক টাকার নোট বের করতে লাগলেন।

ডাক্তার হাজরা বললেন, আজ হয়ত মনে হচ্ছে আপনার অনেক বেশী খরচ হয়ে গেল। কাল বুঝবেন, সম্পূর্ণ নব জন্মলাভ হয়েছে আপনার। দেখুন খাওয়াই হল জীবনের সার, আর সেই খাওয়ার যন্ত্র হল দাঁত। পুরো এক জোড়া নূতন দাঁত পেলেন, এ কি কম কথা হল?

ভদ্রলোক টাকার গোছাটা ডাক্তার হাজরার হাতে এগিয়ে দিলেন। তারপর থুথু ফেলতে ফেলতে আর মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন।

ডাক্তার হাজরা বললেন, হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। দাঁতটা রাত্রে খুলে জলে ডুবিয়ে রাখবেন। একটা কৌটোর মধ্যে রাখলেই ভালো হয়, নইলে ইঁদুরে নিয়ে যেতে পারে।

ভদ্রলোক সম্মতি জানিয়ে রওনা দেবেন, ইতিমধ্যে ডাক্তার বললেন, আর দেখুন, চোখটা একবার টেস্ট করিয়ে নিন।

—কেন? চোখে ত কোন গোল নেই আমার।

—আছে কি নেই আপনি বুঝবেন কি করে? ফরটি পেরিয়ে গেছে, যে রকম চোখ বেঁকিয়ে তাকাচ্ছেন, তাতে আমার ত ধারণা আপনার ভিসানে দস্তুর মতো গোলমাল আছে।

—কৈ না ত। চোখে আমি বেশ দেখছি।

বললেন বটে, কিন্তু ভদ্রলোকের গলার আওয়াজটা যেন একটু ভাঙা ভাঙা মনে হল।

মিনিট দুই চুপ করে থেকে ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে বললেন, অনেক খরচ হয়ে গেল। আর আমি পারব না স্যার।

হেসে ফেললেন ডাক্তার হাজরা। বললেন, বাঁচতে হলে পারতেই হবে এবং বাঁচাটাই ত মানুষের ধর্ম। তা ঘাবড়াবেন না, খুব কমে টেস্ট করা এবং স্পেক দেবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। আমার বন্ধু ডাক্তার এস এন পাকড়াশী মেফ্লাওয়ার অপ্টিসিয়ান, নেবুবাগান লেন।

টেলিফোন উঠিয়ে নিলেন তিনি।

অর্থাৎ যেখান থেকে আমি এসেছি, ঠিক সেখানে রওনা করে দিলেন তিনি অভিভূত ভদ্রলোককে।

বুঝলাম ব্যাপারটা। দু-মুড়োয় দাঁড়িয়েছেন দুই দোস্ত র‍্যাকেট হাতে নিয়ে। মাঝখানে রয়েছি বেকুব জনসাধারণ আমরা, আর ক্রমাগত মা খেয়ে এক হাত থেকে অন্য হাতে চলাফেরা করছি টেনিস বলের মতো। দিচ্ছি তার জন্যে জবর আক্কেল সেলামি।

কি করব এখন? পালাব? না, তার সুযোগ হল না আর।

ডাক্তার হাজরা পাকড়াও করে ফেললেন আমাকে। বললেন, আসুন, বড্ড দেরী করিয়ে দিলাম আপনার।

—

সাংবাদিকের সত্য গল্প

লীলা মজুমদার

বলা যায় না, আপনারাও হয়তো সেই জাতের লোক যাঁরা 'সাংবাদিক' শব্দটি শুনলেই কাষ্ঠ হাসেন। হয়তো নিজেদের মধ্যে আপনারাও বলাবলি করেন যে, যত রাজ্যের তুচ্ছ অশোভন ঘটনাতে রং চড়িয়ে ফলাও করে দেখাতে গিয়ে, জীবনের সত্যিকার বড় বড় ব্যাপারগুলির দিকে আমাদের চোখ পড়ে না; বড় বড় হরফে রোমাঞ্চময় শিরোনামা দিতে পারলেই আমরা কৃতার্থ হয়ে যাই এবং প্রসঙ্গটা যত অসামাজিক এবং যত বিদেশী হয় ততই ভালো। আমাদের স্বাভাবিক সত্য-বিদ্বেষের কথা নিয়ে যে আপনারা রক্ত গরম করেন সে তো আমি নিজেই বহুবার প্রত্যক্ষ দেখেছি। এমনকি আমার একজন নিকট সম্পর্কীয় গুরুজন খবরের কাগজে আবহাওয়ার বিবৃতি না দেখে কখনো বাড়ির বার হন না। যদি দেখেন ঝড়বৃষ্টি আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী তাহলে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ছাতাটি বাড়িতে রেখে ভালো জুতোটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

আরো বলবার দরকার আছে কি? শুধু আপনাদের এই ক্ষোভজনক মনোবৃত্তির দরুন আমার মনে যত তিক্ততাই জমা হোক না কেন, আরেকটা কথা না বলে পারছি না। আমাদের বেলাতে অত যে আপনাদের কড়া বিচার, আপনারা নিজেদের কি খুব সত্যপ্রেমিক বলে মনে করেন নাকি? হাসব না কাঁদব ভেবে পাইনে। আমরা মিথ্যা কথা প্রচার করি এতো আপনারা হামেসাই বলেন, কিন্তু আপনারা কি করেন? আমাদেরি মতো আপনারাও কি সত্যকে ছেঁটেছুঁটে পরিষ্কার করে, মেজেঘষে সাজিয়েগুজিয়ে মানুষের পাতে দেবার যুগ্যি করে নিয়ে তবে লোকচক্ষুর সামনে বের করেন না? আপনাদের স্ত্রীরা বাইরে বেরোবার সময় মুখে পাউডার মাখেন না, মেয়েরা লিপস্টিক লাগায় না, মেমী ভাবাপন্নরা কর্সেট পরে কোমর সরু করেন না? আপনারা নিজেরা চুল ছাঁটেন না, নখ কাটেন না, দাড়ি কামান না, ময়লা গেঞ্জির উপরে ধোপারবাড়ির পাঞ্জাবী পরেন না? এগুলো কি খুব সত্যনিষ্ঠা?

আমরাও এর এক চুল বেশি কিছু করি না। আসল ব্যাপার হল আনকোরা সত্যের মতো আনাড়ি, কদাকার ও আকর্ষণী শক্তিবিহীন আর কিছু আছে কি না এ বিষয়ে আমার

সন্দেহ আছে। আপনারাই বলুন, প্রকৃতির কাছ থেকে যে জিনিষ যেমন অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই অবস্থাতেই তাকে সভ্য-সমাজে উপস্থিত করা চলে নাকি? তাহলে কাঁচা মাছ তরকারী না খেয়ে রাঁধাবাড়া করান কেন, তেতো তালের গোলা, রস ন্যাকড়ায় বেঁধে ঝুলিয়ে তাকে মিষ্টি করেন কেন, কুকুর-বেড়ালকে ঘরে রাখার আগে তাদের ভালো অভ্যাস করান কেন, আর সব চাইতে বড় কথা স্ত্রীদের সব বাপেরবাড়ির কুশিক্ষা ছাড়িয়ে তবে তাদের সংগে ঘর করেন কেন? এসব নিয়ে অবশ্য আমাদের কারবার নয়: আমাদের কারবার হল সত্য ঘটনা পরিবেশন করা নিয়ে। তার চুল ছেঁটে নখ ছুঁচলো করে তাতে পালিশ লাগিয়ে, ষ্টিলের উঁচু খুরের জুতো পরিয়ে, নাইলনের কাপড় পরিয়ে, চোখে বেগনি ছায়া এঁকে সভ্যভব্য করে যদি উপস্থিত করি, তাতে আপনাদের অত আপত্তির কারণটা কি শুনি? সাজিয়ে দিয়েছি বলে সত্যিটাতো আর মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে না, যেমন ঠোঁটে তুঁতে রং লাগিয়েছেন বলেই আপনার স্ত্রী-কন্যা তো আর অন্য কেউ হয়ে যাচ্ছেন না, নেহাৎ তাদের চিনতে না পারেন যদি সেওতো আর আমাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের অপরাধ নয়।

তাছাড়া আরেকটি কথাও আছে। 'ঐ দেখ! এসব কিছুই হয়নি, আমি উপস্থিত ছিলুম, অথচ কাগজে কি লিখেছে দেখ!'—এই ধরনের কথা বলেন কেন? আপনারা কি জানেন না যে ভাবগত সত্যের কাছে তথ্যগত সত্য কত তুচ্ছ জিনিষ? সে যাই হক, কাকেই বা বোঝাবার চেষ্টা করছি, এবার তাহলে আসল ব্যাপারেই আসা যাক। আপনারাই বলেন যে, সত্যি হোক মিথ্যা হোক, আমরা সর্বদা রোমাঞ্চ খুঁজে বেড়াই, আমাদের কাছে সত্যের চেয়ে শিহরণ বড়; আমার বর্তমান কাহিনীর বিষয়বস্তুই হল রোমাঞ্চ ও শিহরণ তার কতখানি কি বিশ্বাস করবেন, না করবেন সে আপনারাই বুঝবেন, যেমন যেমন ঘটেছিল আমি বলে যাচ্ছি।

গত বছরের কথা; পুজোর ভিড়ের পরের সংসার। সে সময় দেশে আগ্রাসীর হাঙ্গামা, সরকার ও সাংবাদিককে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয়; এমন সময় কলকাতার কাছেই এক মফঃস্বল সহর থেকে—তার নাম দিলাম ভূস্বর্গ কারণ আসল নাম বলা বারণ—নানারকম অশান্তিকর গুজব শোনা যেতে লাগল, তবে ব্যাপারটা বাস্তবিক ভৌতিক, নাকি কোনো দেশবিরোধী ধুরন্ধরের ষড়যন্ত্র এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকাতে জনসাধারণকে এতটুকু কিছু আঁচ করবার অবকাশ না দিয়ে তিন তরফ থেকে অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেল, অর্থাৎ সরকারী, সাংবাদিক ও প্রেততাত্ত্বিক দিক থেকে। জন-সাধারণকে জানতে না দেওয়ার একমাত্র কারণ হল, মাপ করবেন, সত্যের খাতিরে এসব বলতেই হচ্ছে আর আপনারা তো নিজেদের সত্যপ্রেমিক বলে পরিচয় নিয়েই আমাদের কাগজের সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের সম্বন্ধে হাজার-রকম সন্দেহ করে অহরহ চিঠি দিয়ে থাকেন, সত্যি কথায় আপত্তি করবার আছেই বা কি—সে যাই হোক, এই গোপনীয়তার কারণ হল আপনাদের কোনো গুরুতর অভি-যানের কথা জানানো মানেই সব ভণ্ডুল করে দেওয়া, কি অদম্য আপনাদের কৌতূহল, কি বিচিত্র আপনাদের পন্থা, কি দুর্বোধ্য আপনাদের নাগরিকের অধিকার বোধ!

মোট কথা সংবাদপত্র ও সরকার একযোগে কাজ করছেন; প্রেততাত্ত্বিকরা আলাদাভাবে এবং বুঝতেই পারছেন একটু বিলম্বে; অর্থাৎ, প্রথম দুজনার কাজ শেষ হয়ে গেলে পর। মফঃস্বলের ব্যাপারই আলাদা। আপনারা এত কাগজ পড়েন, তার সমালোচনা করেন, আশা করি জানেন যে, মফঃস্বলের একটা মানে হল 'প্রাইভেট' অর্থাৎ বে-সরকারী'। মানেটার উৎপত্তি শুনতে চাওয়াও আপনাদের পক্ষে বিচিত্র নয়, যে রকম তথ্যগত সত্যের ভক্ত আপনারা! একটুখানি সোজাকে বাঁকা করেছি কি অমনি রাশি রাশি চিঠি, উল্টে প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজে প্রবন্ধ পর্যন্ত! সে যাই হোক, মফঃস্বল হল সদরের উল্টো, অর্থাৎ অন্দর তার মানেই প্রাইভেট। আশা করি এইবার বিশ্বাস করেছেন।

এখন ব্যাপার হল যে, আমাদের সম্পাদক মহাশয় আদৌ ভূতে বিশ্বাস করেন না; ছোট-বেলা থেকেই তাঁর পিতৃদেব তাঁকে নাকি এই-রকমই শিক্ষা দিয়েছেন, আর ক্রমাগত অন্ধকার ঘরে একা বন্ধ করে রেখে রেখে ভূতের ভয় ও ভূতে বিশ্বাস দুই-ই চিরকালের মতো ভাঙিয়ে দিয়েছেন। দুটি কথা আলাদা করে বললাম কারণ দুটি এক নয়। ভূতে ভয় না থাকলেও যেমন বিশ্বাস থাকতে পারে, তেমনি বিশ্বাস না থাকলেও ভয় থাকতে পারে। যেমন আমার ছিল আমার পিতৃদেব পড়া না করার জন্যে মাঝে মাঝে আমাকে একলা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে রাখতেন; পুরোনো পলেস্তারা খসা বাড়ি আমাদের, ভূত বলে কিছু থাকলে ঐরকম জায়গাতেই দেখা দিত, কিন্তু কোনোদিনো কিছু দেখিনি বা শুনিনি। প্রথম প্রথম খিদেয় খুব কষ্ট পেতাম, পরে বাঁশের ডগায় খাবারের পুঁটলি বেঁধে মা জানলা দিয়ে গলিয়ে দিতেন। সাংবাদিকরা সাধে বলেন, মাতৃস্নেহের তুলনা নেই। সেকথা থাক, ভূতে বিশ্বাসের আর কিছু বাকি রইল না, কিন্তু ভয়টা অত সহজে যায়নি। তার কারণ হল বাবার রকমসকম দেখে বড় পিসিমা আমার হাতে একটা প্রেতসিদ্ধ মাদুলি বেঁধে রেখেছিলেন, যার প্রকোপের সামনে ভূতপ্রেতের দাঁড়াবার সাধ্য নেই। মাঝে মাঝে ভাবতাম হয়তো ভূত আছে কিন্তু মাদুলির জন্য দেখা দিচ্ছে না। সে ভয়ও ভেঙে গেল যেদিন পিসিমা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, ওটা প্রেতসিদ্ধ মাদুলিই নয়, ভুল করে পেট-ব্যথার মাদুলি দিয়েছেন। মাদুলিটি অবিশ্যি একেবারেই ওয়ার্থলেস, কারণ ওটা হাতে বাঁধা সত্ত্বেও একা অন্ধকার ঘরে দেখতে না পেয়ে অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে সমানে পেট-ব্যথায় ভুগেছি।

বুঝতেই পারছেন আমাদের সম্পাদক মহাশয় এই ব্যাপার তদন্তের জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাকেই পাঠালেন। 'শেষ পর্যন্ত' বললাম, কারণ গোড়াতে যজ্ঞেশ্বর ঘটক, অপরেশ বসু, হৃদয়বাবু ইত্যাদি জাঁদরেল সাংবাদিকরা সরকারী কর্মচারীদের সংগে পাখি-শিকারীবৃন্দ সেজে সাতদিন তথাকথিত ভূতের বাড়িতে মহা আরামে থেকে এলেন। না থাকবার কারণো ছিল না, যেহেতু লোকের চোখে ধুলো দেবার উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্যাপারটাকে এতই [illegible] করে তুলেছিলেন যে রামহরি বাবুর্চি, [illegible] কাটলেট, মুর্গী-মশল্লম, মোগলাই পরটা, পাঁঠার বিরিয়ানি—বলতে বলতে প্রাণটা ছুটে [illegible] উঠছে কারণ লবঙ্গকাসংপন্ন করে তাঁরা [illegible] যখন তিনটে মটর গাড়ি ও একটি ট্রাকে করে কলকাতায় ফিরে এসে বললেন সব [illegible], ভূতপ্রেত অথবা আগ্রাসীর চর কোনো কিছুর টিকিও সেই বাড়িতে কিম্বা সারা ভূ-স্বর্গে কোথাও নেই, তাঁরা সমস্ত জায়গাটাকে [illegible] খোঁজার ছলে, গোয়েন্দা খোঁজা করে [illegible] তখন এল প্রেততাত্ত্বিকদের ও আমার পালা। বলা বাহুল্য সরেজমিনের চেহারা [illegible] বারে অন্য রকম। আমাকে দৈনিক সাড়ে [illegible] টাকা খাইখরচ দিত, আর [illegible] বাহুল্য।

প্রেততাত্ত্বিকরা জনা পাঁচ-ছয়; একজন আবার সাহেব; নাকি সোজা লণ্ডন থেকে এসেছেন সাইকিক-রিসার্চ বিশারদ। সঙ্গে জিনিষপত্র যৎসামান্য, ছোট ছোট ব্যাগে [illegible] দুজন পাঁউরুটি, মাখন, জেলি, সন্দেশ, [illegible] কলা, তোয়ালে, গামছা, এই সব। আর [illegible] ডেক-চেয়ার এবং এন্তার যন্ত্রপাতি। [illegible] ভৌতিক ছবি তোলার, ভূতের [illegible] করার যন্ত্র নাকি। বলা বাহুল্য সঙ্গে [illegible] যান্ত্রিক ও একটা ছোকরা চাকর, [illegible] দেবে, স্টোভ ধরাবে, ফাইফরমাস [illegible] সাহেব নিরামিষ খান।

বাড়িতে ঘর মোটে তিনটি [illegible] একটি বড় ঘর আর দোতলায় দুটি ছোট [illegible] একটিও আসবাব নেই কোথাও, [illegible] চুণবালি খসা, রং চটা, রেলিং ভাঙা [illegible] দেয়ালে শত শত অশ্বত্থ গাছ, জানলার [illegible] ভাঙা, কব্জা খোলা; দরজোও [illegible] সিঁড়িতে তিন ইঞ্চি পুরু, কিন্তু [illegible] বর্তী তদন্তকারীদের পায়ে পায়ে উঠে [illegible] বর্তমান গবেষকরা এসে দেখে সব [illegible] হয়ে গেছে। অবিশ্যি গবেষকরা বললেন [illegible] অতি প্রাকৃত বিকাশ নাকি কলেরার [illegible] মতো সামান্য ধুলোবালির উপর নির্ভর করে না।

আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, এত কথা আমি একটা বাইরের লোক হয়ে জানলাম কি করে। আশ্চর্য! কারণ আপনারাই এ [illegible] বলেন যে ঐ সাংবাদিকরা সব-জান্তা! [illegible] কিছু টের পেল না আর ওঁরা দেড়টা [illegible] ছেপে দিলেন! আসল কথা হল, তথ্য [illegible] করাই আমাদের কাজ, নির্ভুল তথ্য।

তারপর তাকে যেভাবেই সাজাই না [illegible] গোড়ার উপাদানটি হওয়া চাই নিভেজাল খাঁটি। কাজেই ঐ ছোকরা চাকরটিকে [illegible] দিয়ে বশ করা ছাড়া আর উপায় কি ছিল। একে ঘুষ দেওয়া বলে না, অন্যায় কাজে কাউকে প্ররোচিত করবার জন্যে টাকা দেওয়াকে ঘুষ বলে। কথা এবং মানহানি মোকদ্দমা বাঁচিয়ে চলা আমাদের অভ্যাস, এসব বিষয়ে এতটুকু অসাবধান হলে চলে না। একে [illegible] বিনিয়োগ বলা চলে। বিনিয়োগ মানে ইনভেস্টমেন্ট, যদিও হঠাৎ শুনে মনে হয় পটল তোলা অর্থাৎ মরে যাওয়া।

উঠেছিলাম ষ্টেশনের কাছে একটা ছোট হোটেলে, ধর্মশালাও বলতে পারেন, কারণ

এখানে খাবার দাবারের ব্যবস্থা নেই। কাছেই একটা হিন্দুস্থানীয় দোকানে পুরি-তর-কারি খেয়ে সারাটা দিন অকুস্থলে ঘুরি, ঠিক গাছের পিছনে চাকরটাকে মিট করি। একবার ভ্রমণকারী সেজে সদর দরজার কাছাও নেড়েছিলাম, কিন্তু ওরা তখনে একসঙ্গে বেরিয়ে আমাকে বিরক্তভাবে বললেন যে ইয়ুথ গ্রুপের কুচকাওয়াজ বড় মাঠে হয়, এখানে বেশি চালাকি করতে গেলে কম্যান্ডিং অফিসারকে বলে দেওয়া হবে, ওদের হাতে নাকি শাস্তা হয় সে। এদিকে আসল কথা ফাঁস করাও বারণ, কাজেই চলে আসতে হয়।

চারদিকে ঘুরি আর কালেক্ট গভীর কথা তবু মাঝে মাঝে নিয়তির পরিহাসের কথাও মনে হয়। কারণ পাশাপাশি দুটি বাড়ি, ঐ ভেঙে পড়া ভূতের বাড়ি আর তারি পাশে একরকম দেখতে ছিমছাম আরেকটি বাড়ি, তার যত্ন যত, দরজা জানলায় নতুন রং, নতুন গেট, বাগানে জবাগাছে ফুল ফুটেছে, কেউ থাকেও মনে হল। দুটোর সদর দরজার ওপর তারিখ লেখা ১৮৯২। ভাবি হয়তো দুই ভাইয়ের বাড়ি, একজন সর্বস্বান্ত হয়ে নিভৃতে মরেছে, তারি অতৃপ্ত প্রেতাত্মা বাড়িতে ঘোরা-ফেরা করে, রাতে গান গায়, মোমবাতি জ্বালে। অন্য ভাই খাসপাতে কলকাতায় বাড়ি করেছিল, তার ছেলেদের পৈতৃক ভিটের উপর একটা টান যে বাড়িটার যত্ন করে, একটা লোক রেখেছে হয়তো আর নিজেরা পায়ের উপর পা তুলে ঐশ্বর্য ভোগ করে।

যখন যে অবস্থাতেই পড়ি, তার সমস্ত সম্ভাবনা অনুসন্ধান করাই আমাদের অভ্যাস, তাই যেই দেখলাম ভূতের বাড়ির পাশের বাড়ির সদর-দরজায় লালপেড়ে কাপড় পরে হাসিখুশি মধ্য-বয়সী একজন গিন্নি দাঁড়িয়ে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে আমার পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগল না। তারি সুবিধাও হয়ে গেল একরকম অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সহায়লাভ করে। মেঘলা দিন, বৃষ্টির সম্ভাবনা, একটু শীত শীত ভাব রাস্তায় আলো বড় কম, তার অবিশ্যি মানে নয় যে, বাতি কম। প্রচুর বাতি আছে, এ বাড়ির সামনেই একটা বাতি তবে আলো নেই. চাঁদের আলোতে ভাগ্যিস ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেলাম, তাই দেখতে না দেখতে একটা আশ্রয় জুটে গেল।

আমি নমস্কার করতেই তিনিও নমস্কার করলেন, তাঁর বয়স হয়েছে কাজেই নির্ভয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলাম। ইহা সম্পাদকের বারণ সত্ত্বেও পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব কথা জোড় বলে ফেললাম। আমার নামধাম দেখ। নিশ্চিন্তমনে বলে বসলাম যে পাছে অন্য কাগজে যোকা বানিয়ে দাঁওমেরে নেয় তাই আমি কে ও কি তা বলতে মানা। কিন্তু তাঁর কাছে নয়, কারণ দেখেই বুঝতে পাচ্ছি তিনি একজন হাসিখুসি ধর্মপরায়ণ হিন্দু নারী, মাতৃস্থানীয়া, আমার চাকরি খেতে অক্ষম। একটু ভেবে আরো বললাম—এবং খুব ভদ্রিধনিবন্ধন লোক খাওয়াতে পটু।

ততক্ষণে একটু একটু বৃষ্টি নেমেছে। ছোকরা চাকরের সংবাদ হল এ দুদিন গবেষকরা সারাদিন ধরে যন্ত্রপাতি সাজিয়েছেন, রাতে স্টেশনের অপেক্ষাগারে বে-আইনীভাবে ঘুমিয়ে-ছেন, নাকি কাকে কাকে টাকা দিয়ে হাত করে। ভেবে দেখুন একবার গবেষক পণ্ডিতরাও কত নীচে নামতে পারেন। আজ নাকি সারারাত পাহারা চলবে। সারাদিন উপোস করেছেন সকলে, এবার কালো পোষাক পরে যে যার জায়গা নিয়েছেন, সমস্ত রাত্রে একচুল নড়বেন না। যন্ত্রপাতিতে কি ওঠে কাল সকালে দেখা যাবে। ছেলেটি নাকি চাঁদ উঠলেই চম্পট দেবে, সে এ সহরের ছেলে নয়, এ সহরটা তার কাছে বিদেশ-বিভূঁই, এখানে ভূতের হাতে প্রাণ দিতে সে নারাজ, তার কালো পোষাকো নেই, তা ছাড়া সারাদিন ধরে পাঁউরুটির বরাদ্দ সে একাই খেয়েছে। এই বলে টিকি তুলে সে চলে গেল।

ভাবছিলাম এই স্যাঁৎস্যাঁতে অন্ধকারে ভূতের বাড়ির বাইরে একলা রাত কাটাব কি করে, অমনি সাংবাদিকদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁর নাম করতে নেই—দেখুন কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করে দিলেন ভদ্রমহিলা—আমাকে ডেকে এনে ঘরে বসালেন। একতলার বড় ঘরেও নয়, দোতলার ছোট ঘরে, যেখান থেকে সারা রাত পাশের বাড়িটি আমার নজরে থাকবে। জানলার কাছে একটা পুরোনো কিন্তু আরামের বেতের চেয়ার টেনে বসেই দেখি, দশ জন তক্ষুণি কালো পোষাক পরে গোল একটা টেবিলের উপরে নিজেদের হাত উপুড় করে গবেষকরা বসে। ক্ষীণ একটু চাঁদের আলোয় এইটুকু মাত্র দেখতে পেলাম, তাদের ঘরে আলো না থাকারি কথা, আমার ঘরেও আলো জ্বালি নি পাছে ধরা পড়ে গিয়ে সব ফাঁস হয়ে যায়। ভাবলাম একেবারে রিং সাইড সীটে বসে ভূত-ধরা দেখে, পরদিন ভোরের কাগজে সব ছেপে দেব, সঙ্গে রোমাঞ্চকর হয়তো একটা ফ্ল্যাসলাইট ছবি সুদ্ধ।

অন্ধকারে ভদ্রমহিলা চা এনে দিলেন বিস্কুট দিলেন, দুই বাড়ির গল্প শোনালেন। আমি যেরকম অনুমান করেছিলাম একেবারে তাই না হলেও সাদৃশ্য আছে। পাশের বাড়িটা ওঁর খুড়শ্বশুরের বাড়ি, এখন মালিক তাঁর খুড়তুতো দেওর, টাকার জন্যে সে কি না করতে পারে, অথচ হাতে আসে কাঁচকলা। এই গবেষকদের কাছ থেকে পর্যন্ত নাকি টাকা নিয়েছে। অথচ স্রেফ খেতে পায় না, স্ত্রী ঝিগিরি না হক, কোন দোকানে বোতাম সেলাই করার কাজ করে, গায়ে একটা গয়না নেই। খুব খানিকটা হেসে নিলেন ভদ্রমহিলা, নিজের মোটা মোটা সোনার বালা অনন্ত বিছে হার-গুলো একবার নেড়েচেড়ে দেখালেন। ফুস করে একবার ঘুরে এসে আবার খালি তক্তাপোষে বসে বললেন তবু নাকি স্বামী-স্ত্রীতে খুব সুখে আছে, একমাত্র ছেলেটি লেখাপড়া শেষ করেছে, এবার একটা চাকরি পেলেই হল। তখন ঐ বাড়ি সারানো হবে। ভেবেও গাজ্বালা করে।

ভূতের বাড়ি সারানো হবে শুনে আমার কিন্তু হাসি পেল। বললাম—আপনাদের বাড়ির আর সব কোথায়? এখানে কি একলাই আছেন নাকি? ভয় করে না? অন্যমনস্কভাবে হাতের চুড়ি-বালা নাড়তে নাড়তে অনেকক্ষণ পরে বললেন—হ্যাঁ, একলাই আছি। সামনের ঘরটাতে কি কেউ উসখুস করে উঠল নাকি? কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। ভাবলাম একটা মোমবাতি জ্বালি, নয়তো এক পেয়ালা চা করতে বলি। ভদ্রমহিলা আবার উঠে গেলেন। তিনি ফিরে আসতেই বললাম, আপনি নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন, আমার জন্যে রাত জাগছেন আমি ভারি অপ্রস্তুত বোধ করছি।

বললেন—আমার ঘুম হয় না।

পাশের ঘরের দিকে তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই আছি। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ে থাকব, হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখি পুব-দিক একটু ফিকে হয়ে এসেছে, বোধ হয় ভোর চারটে নাগাদ হবে। ভাঙ্গা চাঁদটি ডুবে যাচ্ছে।

সামনের ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গবেষকদেরো রাত জাগা শেষ হয়েছে, তারা উঠে পড়ে মোমবাতি জেলে পাঁউরুটি, সন্দেশ খাবার জোগাড় করছে। প্রথমটা ব্যর্থ রজনীর জন্যে খানিকটা হতাশা বোধ করলাম, তারপরেই মনে হল এই তো সুযোগ, একটা ফ্ল্যাসলাইটের ছবি তুলে, ওদের ইন্টারভিউ করি, তারপরে হেঁকো করে ব্যাপারটাকে দেড় কলাম করতে আমার মতো নব্য ছোকরার পক্ষে আর মেলাকি? ভূত দেখা না-দেখা আমাদের কাছে এক।

ভদ্রমহিলা হয়তো শুয়েই পড়েছেন শেষ পর্যন্ত, তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া হল না। ফ্ল্যাস-লাইটের ছবি তুলতেই পাশের বাড়িতে ঈষৎ সোরগোল উঠল, তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নামতে আরম্ভ করলাম, এই রকম অসতর্ক মুহূর্তে ইন্টারভিউ করলেই মানুষে বেশামাল অনেক চিত্তাকর্ষক কথা বলে ফেলে। সিঁড়ির বাঁক ঘুরেই দেখি কখন নিঃশব্দে পিছন থেকে এসে ভদ্রমহিলা আমাকে ধরে ফেলেছেন। আমার আর দেরি সইছে না, দুটো করে ধাপ এক সঙ্গে নিতে নিতে বললাম দাঁড়াতে পারছি না, ওঁরা কি পেলেন না পেলেন এখুনি জেনে নিতে হবে।

ভদ্রমহিলা হাসলেন—কি আর পাবেন ওবাড়িতে? ভূল বাড়িতে দলের পর দল এসে গবেষণা করলেই কি আর কিছু পাওয়া যায়। এবাড়িতে আসা উচিত ছিল। এবাড়ি এত রং করলেও কেউ কিনতে চায় না, এতদিনের দেশে থাকে না!

এই বলতেই টুপ করে ভাঙা চাঁদটাও ডুবে গেল আমার চোখের সামনে। ভদ্রমহিলাও অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর আমি অজ্ঞান হয়ে গুড়গুড়িয়ে কয়ে শেষ তিনটে ধাপ গড়িয়ে নিচে পড়লাম।

—

মুরাসাকি শিকিবু

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যে মহিলাদের কৃতিত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলি উপন্যাস শাখাতেই দেখা যায়। এটা স্বাভাবিক। উপন্যাস প্রধানত দুই শ্রেণীর। অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী ও প্রেমের কাহিনী। একজন সমালোচক বলেছেন, মানুষের দুটি প্রধান অনুভূতির—ভয় ও ভালোবাসার প্রতীক এরা। ইতিহাসের প্রথম পর্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অ্যাডভেঞ্চারের প্রাধান্য ছিল। তাই প্রাচীন সাহিত্য রচিত হয়েছে যুদ্ধ ও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী কেন্দ্র করে। সংগ্রাম ও সংকটে আসক্তি পুরুষোচিত গুণ। সুতরাং এ জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে পুরুষ। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি প্রভৃতি পুরুষের রচনা।

একালে উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রধান বিষয়বস্তু হল প্রেম এবং হৃদয়ের অন্যান্য অনুভূতি। পুরুষ কাজ নিয়ে ব্যস্ত; হৃদয়ানুভূতিকে লালন করে তাকে নিয়ে বিলাস করবার মতো স্বস্তি বা সুযোগ তার নেই। গৃহকোণে বসে মেয়েরাই মনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিস্তার করে কল্পনার জাল বুনতে পারে। রচনা করতে পারে ঘরোয়া জীবনের কাহিনী। উপন্যাসে তাই নারীসুলভ গুণের প্রাধান্য। বোধ হয় এই কারণেই প্রায় এক হাজার বছর পূর্বে প্রথম উপন্যাস আমরা পেয়েছি একজন লেখিকার কাছ থেকে। এই লেখিকা জাপানের মুরাসাকি শিকিবু। তাঁর বৃহদাকার উপন্যাস গেঞ্জি মনোগাতারি দিয়েই আধুনিক উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছে। ফরাসী কথা-সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তনের গৌরব দাবি করতে পারেন মাদাম দ্য লা ফায়েৎ। আধুনিক ইংরেজী উপন্যাসেও জেন অস্টিন এবং ব্রন্টি ভগিনীরা নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন।

প্রথমের গৌরবের সঙ্গে সাধারণত অপরিণতির অবজ্ঞা ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। কিন্তু গেঞ্জি মনোগাতারি প্রথম হলেও শিল্প-কর্ম হিসাবে অপরিণত নয়। বরং এই প্রথম উপন্যাসটি আজ বিশ্ব-সাহিত্যের একটি ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রাচ্যের একটি বই এ সম্মান সহজে পায়নি। আর্থার ওয়েলি কৃত গেঞ্জি মনোগাতারির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালে। তার পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্যের সমালোচকরা এ বইয়ের যথার্থ মর্যাদা দেন নি। ভাষার বাধা দূর হয়ে যাবার পর সাহিত্যের একটি নতুন জগৎ অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হল। এই ঐশ্বর্যময় জগতের সঙ্গে পরিচিত হবার পর সমালোচকরা গেঞ্জির কাহিনীকে ডেকামেরন, ডনকুইকসোট প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ মুরাসাকির রচনায় এতই আধুনিকতার লক্ষণ দেখতে পেয়েছেন, মনোবিজ্ঞানের এমন সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষ্য করেছেন যে, তাঁদের গেঞ্জির কাহিনী পড়তে পড়তে বার বার মনে পড়েছে প্রুস্তের 'রিমেমব্র্যান্স অব থিংস্ পাস্ট'-এর কথা। আসলে 'গেঞ্জি মনোগাতারির' স্বাতন্ত্র্য এত স্পষ্ট যে, অন্য কোনো উপন্যাসের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে না।

হেইয়ানকিয়ো শহর প্রতিষ্ঠিত হয় ৭৯৪ খৃষ্টাব্দে। জাপানের ইতিহাসে হেইয়ান যুগের আরম্ভও হয়েছে সেই বছর থেকে। কামাকুরা সামরিক সরকার ১১৯২ খৃষ্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ করবার পর হেইয়ান যুগের সমাপ্তি ঘটে। হেইয়ান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল হেইয়ানকিয়ো নগর। গেঞ্জির কাহিনীতে এই নগরের—বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

হেইয়ান আমলে ফুজিওয়ারা পরিবারের ছিল প্রবল প্রতিপত্তি। সম্রাট ছিলেন নামে মাত্র; আসলে রাজ্য শাসন করত এই ফুজিওয়ারা পরিবার। দেশের সর্বত্র এই পরিবারের লোক ছড়িয়ে পড়েছিল শাসনকর্তা হিসাবে। শুধু প্রশাসনের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই পরিবার ছিল অগ্রগণ্য। হেইয়ান আমলের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের প্রায় সবটাই পরিবারের লেখক-লেখিকারা রচনা করেছেন।

আনুমানিক ৯৭৮ খৃষ্টাব্দে এই ফুজিওয়ারা পরিবারের এক শাখায় মুরাসাকি শিকিবুর জন্ম হয়। তাঁর পূর্বপুরুষদের অনেকে ছিলেন খ্যাতনামা কবি। পিতা তামেতোকি ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী; পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল তাঁর। কবিতাও তিনি লিখতেন, কিন্তু চীনা ভাষায়। তখন চীনা ছিল পণ্ডিতের ভাষা; জাপানী ভাষাকে দেখা হত একটু অবজ্ঞার চোখে। সাধারণ পাঠকের জন্য কিছু লিখতে হলে জাপানী ভাষা ব্যবহার করা হত। এ ভাষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন লেখিকারা।

মুরাসাকি শিকিবুর পিতৃদত্ত নাম ছিল তো নো শিকিবু। পারিবারিক নাম যে কখন হারিয়ে গেল সে সম্বন্ধে সঠিক কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এ অনুমান অসংগত নয় যে, গেঞ্জি মনোগাতারি প্রচার লাভ করবার পর তাঁর নতুন নামকরণ হয়েছে। গেঞ্জি কাহিনীর একটি অন্যতম চরিত্রের নাম মুরাসাকি। রাজপ্রাসাদের পাঠক-পাঠিকারা হয়ত এই চরিত্রের সঙ্গে লেখিকার মিল দেখতে পেয়ে মুরাসাকি বলে ডাকতে শুরু করেছিল। তারপরে অলক্ষ্যে তাঁর পারিবারিক নাম লুপ্ত হয়ে গেছে। মুরাসাকির যে আরো একটি নাম ছিল তার প্রমাণ আছে। গেঞ্জির কাহিনী পড়ে সম্রাট লেখিকার ইতিহাস জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। তাই তিনি তাঁর নামকরণ করেন 'ইতিহাস পারদর্শিনী।' প্রাসাদের অন্য সকলেও এই নাম ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন।

পিতার আগ্রহে মুরাসাকির শিক্ষা খুব অল্প বয়সেই শুরু হয়। হেইয়ান আমলে মেয়েদের চীনা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের রীতি ছিল না। কিন্তু দাদার পড়া শুনে শুনে মুরাসাকি চীনা ভাষার পাঠ আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছেন : "দাদা তখন ছোট। বাবার আকাঙ্ক্ষা ছিল দাদাকে চীনা ভাষা ও সাহিত্যে পণ্ডিত করে তুলবেন। পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করতে বাবা প্রায়ই দাদার কাছে এসে বসতেন। আমিও বাবার সঙ্গে থাকতাম। দাদার পড়া শুনে চীনা ভাষার পাঠ শিখে ফেলেছিলাম। দাদা পড়ায় আটকে গেলে আমি বলে দিতে পারতাম চট করে। তা দেখে বাবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলতেন, তুমি ছেলে হলে আমার কত গৌরব আর আনন্দ হত!"

কিন্তু সমকালীন রীতি লংঘন করে মুরাসাকি যে চীনা সাহিত্যের ক্লাসিকগুলি ভালোরূপেই আয়ত্ত করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় গেঞ্জি মনোগাতারি থেকে। এছাড়া বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র তিনি সবই পাঠ করেছিলেন। তাঁর রচনার সর্বত্র শাস্ত্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

দেশের জীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা হেইয়ানকিয়োর সমাজের উপরেই নির্ভরশীল ছিল না। পিতার সঙ্গে মফঃস্বলের কর্মস্থলে ঘুরে ঘুরে তিনি দেশকে দেখেছেন। একবার নগরে ফিরে আসবার পর তাঁর পরিচয় হল প্রভাবশালী সরকারী কর্মচারী নোবুতাকার সঙ্গে। নোবুতাকাও ফুজিওয়ারা বংশের লোক; বয়স প্রায় সাতচল্লিশ; মুরাসাকির বয়স বাইশ। নোবুতাকা মুরাসাকির পাণি প্রার্থনা করলেন। মুরাসাকি সহজে সম্মতি দেননি। একে তো বয়সের এত পার্থক্য; তার উপর নিশ্চয়ই তখনকার রীতি অনুযায়ী নোবুতাকার ঘরে কয়েকজন স্ত্রী ও উপপত্নী ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুরাসাকি তাঁকেই বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল। এ সুখ অবশ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। বিয়ের বছর তিনেকের মধ্যেই স্বামীর মৃত্যু হল। মুরাসাকি স্বামীর স্মৃতি অবলম্বন করে বাকি জীবন কাটিয়েছেন।

অথচ দ্বিতীয়বার বিয়ে করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। যাতে ভালো বিয়ে হতে পারে সে জন্য পিতা তাঁকে রাণী আকিকের সহচরী হিসাবে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদের বিলাস এবং ঐশ্বর্যের পরিবেশে থেকেও মুরাসাকি স্বামীর কথা ভুলতে পারেন নি। মনের বেদনা তিনি প্রকাশ করেছেন দিনলিপিতে। তিনি লিখেছেন, 'শুধু মেয়ের জন্যই সংসার ত্যাগ করিনি, না হলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী হয়ে চলে যেতাম কোনো মঠে। মন আমার বিষাদে পূর্ণ; অথচ রাণীর সহচরী হিসাবে আমাকে ভালো সাজপোশাক করতে হয়, আমোদপ্রমোদে যোগ দিতে হয় এবং সকলের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়। এ এক বিষম বিড়ম্বনা।'

রাজপ্রাসাদে আসবার পর থেকে মুরাসাকি দিনলিপি লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথম

...দের লিপি ১০০৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর ...সের একটি ঘটনা নিয়ে লেখা। প্রাচীন ...পানী সাহিত্যে মুরাসাকির ডায়েরি বিশেষ ...খযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ...ই দিনলিপি থেকে মুরাসাকির ব্যক্তিগত ...জীবনের কথা এবং তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক ...কথা জানা যায়।

...স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম যে প্রলোভন ...সত্ত্বেও বিচলিত হয়নি কয়েকটি ঘটনা থেকে ...তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাণীর বিয়াল্লিশ ...বছর বয়স্ক পিতা মিশিনাগা মুরাসাকির প্রতি ...আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মিশিনাগা প্রধানমন্ত্রী, তাঁর প্রবল প্রতিপত্তি। যে কোনো রমণী ...তাঁর কৃপার পাত্রী হতে পারলে কৃতার্থ বোধ ...করত। কিন্তু মুরাসাকি তাঁকে বারবার ...ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ডায়েরি থেকে এক ...দিনের কথা বলছি। রাণী আকিকোর ঘরে ...মিশিনাগা গেঞ্জি মনোগাতারি দেখতে পেয়ে ...কয়েক পাতা পড়লেন। তারপর ছোট একটি ...কবিতা লিখে পাঠালেন মুরাসাকির উদ্দেশে। সেই কবিতার ভাবার্থ এই যে, কুলগাছের ফুল সুন্দর, গন্ধ মিষ্টি; অথচ ফল এত টক। যে লেখিকা নিজের জীবন থেকে প্রেমকে বিসর্জন দিয়েছে—আশ্চর্য সে-ই লিখেছে এমন প্রেমের কাহিনী! মুরাসাকি উত্তরে লিখলেন, আপনি ফুলকে (অর্থাৎ লেখিকাকে) চেনেন না; ফলের (অর্থাৎ গেঞ্জি মনোগাতারির) পরিচয় পেয়েছেন অন্যের কাছ থেকে (নিজে সবটা পড়েননি)। সুতরাং ফুল ও ফলের মধ্যে কি যোগ আছে তা যথার্থরূপে উপলব্ধি করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেই রাত্রিতেই মিশিনাগা চুপি চুপি এলেন মুরাসাকির ঘরের সামনে। দরজায় বারবার শব্দ করতে লাগলেন টক টক করে। মুরাসাকির ঘুম ভেঙ্গে গেল, বুঝতে বাকি রইলো না এ আহ্বান কার। তিনি নিঃসাড় হয়ে বিছানায় শুয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে মিশিনাগা চলে গেলেন ব্যর্থমনোরথ হয়ে। দরজায় ফাঁক দিয়ে রেখে গেলেন এক টুকরো কবিতা।

প্রাসাদের অন্য মেয়েরা মুরাসাকিকে প্রথমে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি রাণীকে চীনা ভাষা শেখাতেন। যে সব বই সাধারণত কেউ পড়ে না সে সব পড়তেন। চটুল কথাবার্তায় যোগ দিতেন না, একটু দূরে দূরে থাকতেন; তাই মেয়েরা মনে করত তিনি গর্বিত, তাঁর সকল কাজ ও কথার মধ্যে উদ্দেশ্যের সন্ধান করত। মুরাসাকি লিখেছেন : যতদিন চাকরি করেছি ততদিন নিজের চিন্তা ভাবনা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করিনি। যাদের উপলব্ধির ক্ষমতা নেই, যারা নিজেদের বড় মনে করে অন্য সবাইকে সমালোচনা করে তাদের কাছে নিজের ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

কিছু সময় কাটবার পর প্রাসাদের রমণী-দের ধারণা পরিবর্তিত হল। তারা এসে বলল, আমাদের প্রথম মনে হয়েছিল আপনি অহঙ্কারী, অসামাজিক, আমাদের অবজ্ঞা করেন। এক কথায় আমরা আপনাকে মনে মনে ঘৃণা করেছি। কিন্তু পরিচয় হবার পর দেখছি আপনি কত ...ম, কত ... এবং আমাদের পূর্ব ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

রাজপ্রাসাদের জীবনযাত্রা যে তাঁর ভালো লাগত না ডায়েরির বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। ১০১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট ইশিজোর মৃত্যুর পর আকিকোর শোকের অংশভাগী হতে হয়েছে তাঁকে। মুরাসাকির দাদা নোবু-নোরির মৃত্যু হয় ১০১৪ খৃষ্টাব্দে। এই সব শোকের আঘাতে তাঁর মন স্বভাবতই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। লোক-দেখানো মন্ত্র-পাঠ এবং মালা জপায় তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি লিখেছেন : পূজো ও প্রার্থনায় আর আমার আস্থা নেই। একমাত্র ভগবান বুদ্ধের স্তব করি, তাঁর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছি। এ জন্মে যত দুঃখ ভোগ করছি তা যে পূর্ব জন্মের কর্মফল তা উপলব্ধি করে মন বিষাদে পূর্ণ হয়ে যায়।

মুরাসাকির মৃত্যু হয় আনুমানিক ১০১৫ কিংবা ১০১৬ খৃষ্টাব্দে। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র আটত্রিশ বা ঊনচল্লিশ বছর।

গেঞ্জি মনোগাতারির রচনা কবে সম্পূর্ণ হয়েছে তার সঠিক তারিখ জানা যায় না। মুরাসাকি রাজপ্রাসাদে আসবার পরই যে কাহিনীটি লেখা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এই কাহিনীতে প্রাসাদের জীবনযাত্রার নিখুঁত ও বাস্তবানুগ চিত্র আছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে এমন ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া গেঞ্জি কাহিনী রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ত ছিল সম্রাজ্ঞী আকিকোর মনোরঞ্জন করা। সুতরাং ১০০২ থেকে ১০১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গেঞ্জি কাহিনীর অধিকাংশই লেখা হয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। সম্পূর্ণ হয়েছে ১০২১ খৃষ্টাব্দে বা দু'এক বছর পরে।

মুরাসাকি এই উপন্যাস কেন লিখলেন সে সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। একবার তাঁকে আদেশ করা হল একটি উপন্যাস লিখে দেবার জন্য। আদেশ ঠিক কার কাছ থেকে এসেছিল তা নির্দিষ্ট জানা যায় না। হয়ত সম্রাজ্ঞী আকিকো, কিংবা রাজকুমারী সেনশি অথবা কোনো বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী আদেশ করেছিলেন। মুরাসাকি বিপদে পড়লেন। উপন্যাস কখনো লেখেননি, কি করে লিখতে হবে সে সম্বন্ধেও কোনো ধারণা নেই। সুতরাং প্রেরণা লাভের জন্য তিনি এলেন ওমি প্রদেশের অন্তর্গত ইশিয়ামাডেরা মন্দিরে। বিওয়া হ্রদের উপরে এই মন্দির। অষ্টম মাসের পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হ্রদের দিকে নিবিষ্ট মনে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মুরাসাকি প্লটটি পেয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ গেঞ্জি মনোগাতারির দুটি অধ্যায় লেখা হয়ে গেল। এখনো সেই মন্দিরে একটি ঘর সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তাকে বলা হয় গেঞ্জির ঘর। এই ঘরে বসেই নাকি মুরাসাকি গেঞ্জির কাহিনী লিখেছেন। তাঁর ব্যবহৃত দোয়াত-কলম আজও সেই ঘরে দেখা যায়।

তখন ছিল হাতে লেখা বইয়ের যুগ। নকলকারীরা কপি করবার সময় গেঞ্জি মনো-গাতারি কিছু বদল করেছে, হয়ত কিছু যোগ করেছে। সুতরাং মুরাসাকির রচনা অবিকৃত নেই। তবে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, পরিবর্তন সামান্যই হয়েছে।

এই বৃহদাকার উপন্যাসটি মোট চুয়ান্নটি অংশে বিভক্ত। চুয়ান্নটি বইও বলা যেতে পারে। কাহিনীর দুটি ভাগ। প্রথম একচল্লিশটি খণ্ডে নায়ক হিকারু গেঞ্জির জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগের নায়ক কাওরু। কাওরু সকলের নিকট গেঞ্জির পুত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। গেঞ্জি নিজেও তাই জানত। কিন্তু আসলে সে অন্যের ছেলে। গেঞ্জির এক স্ত্রী তাকে ঠকিয়েছে।

গেঞ্জি মনোগাতারি জীবনীমূলক কাহিনী। গেঞ্জির প্রেমের অ্যাডভেঞ্চারই প্রধান বিষয়বস্তু। কাহিনী দৃঢ়সংবদ্ধ নয়। মধ্যযুগের রোমান্সের মতো গল্পের বাঁধুনি শিথিল। গল্পের চুম্বক-টুকু এই : সম্রাট সুন্দরী কিরিৎসুবোকে উপপত্নী হিসাবে গ্রহণ করায় সম্রাজ্ঞী কোকিদেন ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর রাগ বাড়ল যখন কিছুদিন পরে কিরিৎসুবো সম্রাটকে ছেলে উপহার দিল। ছেলেটি দেখতে চমৎকার; সহজেই সম্রাটের হৃদয় জয় করে নিল। কোকিদেন ঈর্ষায় পুড়ছেন। তাঁর আশঙ্কা এই ছেলে পাছে নিজের ছেলেকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে। কিরিৎসুবোর মন ছিল ফুলের মতো কোমল। নিন্দুকের উত্তাপে সে একদিন ফুলের মতোই শুকিয়ে গেল। অকালে মৃত্যু হল তার।

সম্রাট এই ছেলের নাম রাখলেন হিকারু গেঞ্জি। যখন বারো বছর বয়স হল তখন গেঞ্জির বিয়ে দিলেন মন্ত্রীর মেয়ে আওইর সঙ্গে। আওই ছিল গেঞ্জির চেয়ে চার বছরের বড়। তাই

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে নি।

গেঞ্জি ক্রমে রূপবান যুবক হয়ে উঠল। রাজপ্রাসাদে ভালো চাকরি পেয়েছে। গান গাইতে, নাচতে, কবিতা আবৃত্তি করতে তার জুড়ি নেই। মেয়েদের কাছে দুর্নিবার তার আকর্ষণ। অতি সহজে তারা ধরা দেয়। আওই গেঞ্জির আচরণ পছন্দ করে না। স্বামীর কাছ থেকে সে দূরেই থাকে।

গেঞ্জির প্রথম প্রণয়িনী সম্রাটের এক উপপত্নী ফুজিৎসুবো। লোকে এই নিয়ে বলাবলি করত; কিন্তু সম্রাটের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। তারপর একে একে গেঞ্জির প্রণয়িনীর সংখ্যা বাড়তে লাগল। গেঞ্জি কার প্রতি বেশী আকৃষ্ট এই নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কলহের শেষ নেই। বিদ্বেষের পরিণতি একবার শোচনীয় হয়ে দাঁড়াল। য়ুগাও নামক এক সুন্দরী রমণীর সঙ্গে গেঞ্জি রাত্রি যাপন করছিল। হঠাৎ এক ছায়ামূর্তি এসে হত্যা করে গেল য়ুগাওকে। গেঞ্জির অন্য এক প্রণয়িনী য়ুগাও-র সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করিয়েছে। এই শোচনীয় মৃত্যুর ফলে গেঞ্জি অসুস্থ হয়ে পড়ল। দেহ ও মন সুস্থ করবার জন্য রাজধানী থেকে দূরে এক পাহাড়ের উপরে কিছুদিন কাটিয়ে এল। পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ বালিকাকে গেঞ্জি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। নিজের কাছে রেখে তাকে লালন করতে লাগল।

কয়েক বছর পরে আওই সন্তান-সম্ভবা হল। কিন্তু আওইর মনে শান্তি নেই। দিন দিন তার দেহ শীর্ণ হয়ে পড়ছে। গেঞ্জির প্রণয়িনীরা তার মৃত্যু কামনা করে,—এই কেবল ভাবনা। এই দুশ্চিন্তা থেকে তার মুক্তি নেই। সন্তান জন্মের সময় আওইর মৃত্যু হল। এই মৃত্যুর শোক গেঞ্জির জীবনে নতুন বাঁক রচনা করল। স্থির করল আর উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না।

সেই অনাথ মেয়েটি এতদিনে বেশ বড় হয়েছে। নানা গুণে পারদর্শিতা লাভ করেছে। তার নাম মুরাসাকি-নো উয়ে। সংক্ষেপে সবাই ডাকত 'মুরাসাকি'। গেঞ্জি এবার মুরাসাকিকে বিয়ে করে সংসারী হল। গেঞ্জির বিবাহিত জীবন কিছুদিন খুব সুখেই কাটল। কিন্তু মুরাসাকির অকালে মৃত্যু হবার পর গেঞ্জির সংসারে কোন আকর্ষণই রইল না। কিছুদিন পরে গেঞ্জিরও মৃত্যু হল।

গেঞ্জির মৃত্যুর পর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নায়কের অভাবে পাঠকের আগ্রহ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। কাহিনীর শেষাংশের প্রধান বিষয় হল কাওরু ও নিওউ-র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নিওউ বেপরোয়া, নিজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা আছে তার। কাওরু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করতে সে অক্ষম। তার মনে কেবল দ্বিধা। যে মেয়েকে সে পেতে চায়, তাকে পাওয়া হয় না। কারণ দ্বিধা কাটিয়ে কাজ শুরু করতে গিয়ে দেখে নিওউ সে মেয়েকে এর মধ্যে জয় করে নিয়েছে। শেষাংশে পাত্র-পাত্রীদের মনের জগতের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

'গেঞ্জি মনোগাতারি' নিঃসন্দেহে মৌলিক উপন্যাস। তথাপি এর উপর পূর্ববর্তী সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু এই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য সমকালীন সামাজিক জীবন, বিশেষ করে রাজপ্রাসাদের নর-নারীর জীবনযাত্রা। নিজে সেই জীবন-যাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বলেই মুরাসাকি এমন নিপুণতার সঙ্গে রাজপ্রাসাদের জগতকে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। চরিত্র-চিত্রণে এবং পরিবেশ বর্ণনায় মুরাসাকি বাস্তব প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ পাত্র-পাত্রী ঐতিহাসিক নর-নারী, নিছক কল্পনার মানুষ নয়।

আধুনিক বাস্তববাদী লেখকদের মতো মুরাসাকি ভালো-মন্দ সব কিছু মিলিয়ে জীবনের সামগ্রিক রূপ পাঠকের সামনে উপস্থিত করবার পক্ষপাতী। উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে পারি গেঞ্জির মন্তব্য থেকে। গেঞ্জি একদিন লেডি তামাকাৎসুরার ঘরে এসে দেখতে পেল সে উপন্যাস নিয়ে এমন মগ্ন হয়ে আছে যে তার আগমন লক্ষ্যই করল না। মেয়েরা উপন্যাসের উদ্ভট কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে ভালোবাসে বলে গেঞ্জি প্রথমে মৃদু তিরস্কার করল। কিছুক্ষণ পরে গেঞ্জি বলল, উপন্যাস সম্বন্ধে যা বললাম তা কিন্তু আমার সত্যকার মত নয়। আমাদের জীবনে উপন্যাসের বিশেষ মূল্য আছে। পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল তা উপন্যাস থেকেই জানা যায়। ইতিহাসে জীবনের সামান্য অংশ মাত্র ধরা পড়ে। কিন্তু ডায়েরি এবং রোমান্স থেকে লোকের ব্যক্তিগত জীবনের সব তুচ্ছ ঘটনাও জানা যায়। উপন্যাস-শিল্পের স্বরূপ কি এবং উপন্যাসের প্রচলন কেন হল সে সম্বন্ধে আমার নিজের একটি মত আছে। অন্যের জীবনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেই উপন্যাস হয় না। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কারো কারো এমন অভিজ্ঞতা হয় যার ফলে অনুভূতি গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। চার পাশে কত ঘটনা ঘটছে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এরা তুচ্ছ। কিন্তু ব্যক্তি ও সমাজের জীবনে এদের মূল্য অপরিসীম। তাই এদের ভুলে যেতে দিলে সমাজেরই ক্ষতি হবে। যাদের অনুভূতি প্রবল, অভিজ্ঞতার রত্নগুলি হারিয়ে যাবে এটা যারা চায় না, তারা বিস্মরণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী লিপিবদ্ধ করে রাখে। এমনি করেই উপন্যাসের জন্ম হয়েছে।

এ থেকে স্পষ্টই দেখা যাবে যে, যা ভালো বা সুন্দর শুধু তার কথা লেখাই ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। অবশ্য কখনো কখনো ধর্মের প্রাধান্য হতে পারে। তেমনি আবার অন্যত্র পাপের প্রাধান্য ঘটতে পারে। পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দ—সবকিছুই উপন্যাসে স্থান লাভের যোগ্য। সংসারের সবকিছুই লেখক সংগ্রহ করে কাহিনী রচনা করবে। উপন্যাসের অযোগ্য বলে বাদ দেবার মতো কিছু নেই। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে। কাহিনীটি আমাদের পার্থিব জগতের হওয়া চাই। মানুষের নাগালের বাইরে যে পরীর দেশ, তা নিয়ে উপন্যাস হতে পারে না। বাস্তব জীবনকে ভিত্তি করেই কাহিনী উন্মোচিত হবে ও বিস্তার লাভ করবে। উপন্যাসে পুণ্যের পাশে পাপ এবং জ্ঞানের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা দেখা যায় বলে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নয়। কারণ ঔপন্যাসিক নির্বিচারে সমগ্র জীবনের ছবি প্রতিবিম্বিত করে।

হাজার বছর পূর্বে উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা আজও সত্য। এ আদর্শ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় মুরাসাকি ছিলেন সাহিত্যে বাস্তবতার সমর্থক। গেঞ্জি কাহিনীর চরিত্র-চিত্রণে এবং পরিবেশ বর্ণনায় তিনি বাস্তবতার রীতি অনুসরণ করেছেন। অবশ্য এই পরিবেশ প্রাসাদের জীবনযাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর বাইরে যে বৃহত্তর জীবন আছে তার পরিচয় গেঞ্জি কাহিনীতে ধরা পড়েনি। অভিজাত ও সম্পন্ন নর-নারী এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। এমন কি, যারা পরিচারক তাদেরও বংশমর্যাদা কম নয়। জাপানে তখন শান্তির পরিবেশ। পুরুষদের যুদ্ধ বা অন্য কোনো সংকটের সম্মুখীন হবার প্রয়োজন নেই। সংগীত, চিত্রবিদ্যা, নৃত্য কাব্য চর্চা এবং নানা উৎসবের আয়োজন করে দিন কাটে। পৌরুষের অভাব থাকলেও সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুরুচিবোধ পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। কিন্তু এটাই সম্পূর্ণ ছবি নয়। ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, ধর্মের নামে কুসংস্কারের প্রতি আসক্তি, বহুবিবাহ, মাত্রাহীন লোভ—এসবও মুরাসাকি লক্ষ্য করেছেন এবং ভালো-মন্দ মিশিয়ে এক অখণ্ড জীবনধারার চিত্র এঁকেছেন। রাজপ্রাসাদের জীবন হলেও তা সব সময় গুরুগম্ভীর নয়। ছোটো-খাটো কৌতুকজনক ঘটনা হালকা পরিবেশ সৃষ্টি করে, পাঠক বৈচিত্র্যের স্বাদ পায়। সম্রাটের বড় অফিসার সুকেদাতার কথাই ধরা যাক। তার কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাসাদের সবাই তাকে আড়ালে 'কুমীর' বলে ডাকে। ক্রমে তার নামে গান রচিত হল। একদিন সম্রাট নিজে বাঁশীতে সেই গানের সুর বাজালেন। প্রথমে খুব আস্তে আস্তে, পরে যখন খবর নিয়ে জানা গেল 'কুমীর' প্রাসাদে নেই, তখন উচ্চগ্রামে।

কঠোর কর্তব্যের দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকলে পুরুষ নারীর প্রতি বেশী করে আকৃষ্ট হয়। প্রাসাদ-কেন্দ্রিক সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। গেঞ্জি মনোগাতারি মূলত প্রেমের উপন্যাস। অবৈধ প্রেমের অনেক কাহিনী থাকলেও লেখিকা দেহের আকর্ষণকে সর্বদাই পশ্চাতে রেখেছেন। জাপানী চিত্রশিল্পী যেমন নারীর নগ্নমূর্তি আঁকার বিমুখ তেমনি মুরাসাকিও দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আকর্ষণের মাধ্যম হিসাবে বর্ণনা করেন নি। যৌনতাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে এমন বর্ণনা কোথাও নেই। দু'এক ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীকে এক শয্যায় রেখে লেখিকা বিদায় নিয়েছেন।

মুরাসাকির পাত্র-পাত্রী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদির দ্বারা। চোখে দেখবার পূর্বেই হয়ত গান শুনে হৃদয় বিনিময় হয়ে যায়। মুরাসাকি প্রেমকে প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ এবং সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। তাই নারী-পুরুষের আকর্ষণ নিছক দেহসর্বস্ব হবার আশঙ্কা থেকে রক্ষা পেয়েছে। সম্রাট একদিন গেঞ্জিকে উপদেশ দিয়ে বললেন, মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করো না। তোমার

কামিনী যেন তোমাকে ভালোবেসে অপমানিত না হয়, অনুতপ্ত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রেখে আচরণ করবে। গোঞ্জ উপদেশ শুনে মনে মনে ভাবল, সুন্দরের সামনে বিবেচনা হারিয়ে যায়। এই মুহূর্তে যদি একটি সুন্দর ফুল বা গাছ চোখে পড়ে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে জীবন অর্থময় হয়ে উঠবে, দূরে হয়ে যাবে সকল বিধি-নিষেধ, মনে হবে সুন্দরই একমাত্র সত্য।

সুতরাং নারীর প্রতি আকর্ষণ সৌন্দর্য উপভোগেরই আকাঙ্ক্ষা।

নায়ক গোঞ্জ আদর্শ প্রেমিক। সে রূপবান, নৃত্য, গীত, চিত্রশিল্প ও কাব্য রচনায় পারদর্শী। স্বভাব মধুর। রাজপুত্র হয়েও ঔদ্ধত্য নেই। সতেরো বছর বয়সেই নানা ঘটনায় সে জড়িয়ে পড়েছে। পাঠকের মনে হবে এই বখাটে ছেলের সংশোধনের আর আশা নেই। কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে গোঞ্জর মনে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে এল। এই যে বহু নারীর প্রতি আকর্ষণ, সেজন্য যেন তার কিছু করবার নেই, এর হাত থেকে এড়াবার পথ নেই, ভাগ্য তাকে এ পথে চালিত করছে। ত্রিশ বছর বয়সেই নিজের কর্মফলের কথা ভেবে গোঞ্জ বিচলিত। সংসার ত্যাগ করে মঠে যাবে কি না সে কথাও তার মনে এসেছে।

বহু অবৈধ প্রেমের এই নায়ককে লম্পট হিসাবে চিহ্নিত করতে পাঠক দ্বিধা বোধ করে। কারণ গোঞ্জর হৃদয় সহানুভূতিশূন্য নয়, অন্যকে দুঃখ দিয়ে সে বেদনা বোধ করে, তার চোখ জলে ভরে যায়। এবং জীবন যখন তার উপর প্রতিশোধ নেয় তখন আর কোনো ক্ষোভ থাকে না। এক স্ত্রী মুরাসাকির মৃত্যু, অন্য স্ত্রী নিয়োসানের বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিশোধ হিসাবে এসেছে গোঞ্জর জীবনে। কত পরস্ত্রীর হৃদয় সে জয় করেছে; অপমানিত স্বামীদের অভিশাপ লাগল তার জীবনে। নিয়োসান পরপুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিল। লেখিকা এই বেদনাকে বড় করে মহৎ ট্র্যাজেডি সৃষ্টির প্রয়াস করেন নি। গোঞ্জকে হ্যামলেটের মতো ট্র্যাজিক হিরো করবার কথাও তার মনে হয়নি। সংসারের আর পাঁচজনের মতো গোঞ্জ গভীর বেদনা ভোগ করে জীবনের ভার বহন করেছে।

গোঞ্জ মনোগাতারির ইংরেজী অনুবাদ ক্ষুদে অক্ষরে প্রায় সাড়ে এগারো শ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই বিরাট কাহিনীর সবটাই যদি গোঞ্জর জীবনের কথায় পূর্ণ থাকত তাহলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটত নিঃসন্দেহে। কিন্তু মুরাসাকি গোঞ্জর জীবনকে বহু দল ফুলের মতো সাজিয়েছেন। যে সব নর-নারী নায়কের সংস্পর্শে এসেছে পাপড়ির মতো তারা গোঞ্জর জীবনের সঙ্গে যুক্ত। মুরাসাকি এদের জীবনের কাহিনী উপস্থিত করে পাঠককে বৈচিত্র্য উপভোগের সুযোগ দিয়েছেন।

মুরাসাকি চারশ'র অধিক নর-নারীকে কাহিনীর মধ্যে এনেছেন। জীবনের এক বিচিত্র মিছিল। এর মধ্যে প্রায় ত্রিশটি প্রধান চরিত্র। প্রত্যেকেই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে। লেখিকার পক্ষে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষ করে মেয়েদের চরিত্র তিনি নিপুণতার সঙ্গে এঁকেছেন। তাদের ঈর্ষা দ্বন্দ্ব, তুচ্ছ বিষয়ের প্রতি লোভ যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি আছে শিল্পপ্রীতি, সৌন্দর্যলিপ্সা, দয়া মমতার পরিচয়। নায়িকা মুরাসাকির মৃত্যুর দৃশ্যটি মনে আঁকা হয়ে যায়। এখানে মুরাসাকি যে আত্মীয়পরিজনকে রেখে চলে যাচ্ছে সে জন্য তার দুঃখই প্রাধান্য লাভ করেছে; কিন্তু যারা মুরাসাকিকে হারিয়েও বেঁচে থাকবে তাদের বেদনা গৌণ। যে সব পরিচারিকা এতদিন সেবা করেছে, মৃত্যুর পরে তারা অসহায় হয়ে পড়বে—এই ভাবনায় মুরাসাকি বিচলিত। এক আত্মীয়াকে অনুরোধ করে গেল এদের দেখাশুনো করতে।

লেখিকা কোনো চরিত্রকেই সম্পূর্ণ ভালো অথবা সম্পূর্ণ মন্দ করে দেখাননি। সকলের জন্যই তাঁর সহানুভূতি আছে। সুয়েৎসুমুহানা অত্যন্ত লাজুক মেয়ে। কেন এই অস্বাভাবিক লজ্জা? পরে বোঝা গেল দেখতে খুব কুৎসিত বলেই কারো সামনে আসতে চায় না। বিশেষ করে লম্বা লালচে নাকটি এতই বিশ্রী দেখতে যে, সকলেরই সর্বাগ্রে ঐ দিকে চোখ যায়। কিন্তু সুয়েৎসুমুহানার চুল খুব সুন্দর, এখানে সব মেয়েকে তার কাছে হার মানতে হয়।

প্রত্যেকটি চরিত্র নিজের অন্তরের প্রেরণায় কাজ করে, কথা বলে, হাসে কাঁদে। তারা লেখিকার নির্দেশে পুতুলের মতো বিশেষ ভঙ্গীতে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয় না। পাত্র-পাত্রীদের মনের জগৎ বিশ্লেষণ করে দেখাতে পেরেছেন বলেই সব কিছু স্বাভাবিক মনে হয়, সাজানো বলে সন্দেহ হয় না।

মুরাসাকির রচনার এ সব গুণ থাকা সত্ত্বেও এত দীর্ঘ কাহিনী পড়বার ধৈর্য কজনের থাকত বলা কঠিন। চমকপ্রদ ঘটনা নেই যে পাঠক আকর্ষণ অনুভব করবে। পাঠক আকৃষ্ট হয় অন্য কারণে। কাব্যময় ভাষা, ইঙ্গিতময়তা, গভীর প্রকৃতি প্রেম, এবং সর্বোপরি লেখিকার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্বের বিকাশ গোঞ্জ মনোগাতারিকে অসামান্য করেছে। শিল্প সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক মন্তব্য এবং ছোট ছোট বহু কবিতার সন্নিবেশ কাহিনীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবনের নিবিড়-যোগ লক্ষ্য করেছেন লেখিকা। মানুষের মনের আনন্দ বেদনা প্রকৃতির দৃশ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির নানা দৃশ্যের সঙ্গে জীবনের তুলনা করা হয়েছে। যেমন ধরা যাক গোঞ্জ ও তার বন্ধুদের নারীচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনার কথা। একজন বলল, মেয়েরা হল ঘাসের উপরে শিশির বিন্দুর মতো, স্পর্শ করতে গেলেই যা মাটিতে পড়ে হারিয়ে যায়। আর একজন বলল, মেয়েরা চকচকে শিলার মতো, যা হাতের মুঠিতে রাখলে গলে যায়। ঘাসের উপরকার শিশির বিন্দু যেমন শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, মুরাসাকিও ঠিক তেমনি করেই একদিন সংসার থেকে হারিয়ে গেল। মুরাসাকির মৃত্যুর পর থেকে একটা অশ্রুর পর্দা গোঞ্জকে সংসার থেকে পৃথক করে দিল। —এমনি আরও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

একটি কেমন সুন্দর কল্পনা দেখুন। বনের মধ্যে একা বাস করে এক রমণী। প্রিয়তম আসবে সেই প্রতীক্ষায় তার দিন কাটে। কিন্তু প্রিয়তমের আগমন দুর্লভ। কেমন দুর্লভ? কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রের আলো বনের ফাঁক দিয়ে ঘরের দাওয়ায় রাখা গামলার জলে প্রতিবিম্বিত হওয়াটা যেমন দুর্লভ, তেমনি।

লেখিকা অনেক ক্ষেত্রে কিছু না বলে ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের সাহায্যে বেশী বুঝিয়েছেন। এর সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ গোঞ্জর মৃত্যু। মুরাসাকি গোঞ্জর মৃত্যুর কোনো বর্ণনা দেননি। পাঠক যে অধ্যায়ে গোঞ্জর মৃত্যুর কথা জানবে বলে ভাবে সেখানে কিছুই লেখা নেই। অধ্যায়টির নাম দেওয়া হয়েছে 'মেঘের পশ্চাতে আলো'। অর্থাৎ, গোঞ্জ যতদিন মেঘের সামনে ছিল ততদিন তাকে আমরা দেখেছি। মৃত্যুর পরে সে চলে গেছে মেঘের পশ্চাতে। আত্মা অবিনশ্বর; তাই আলো নির্বাপিত হয়নি। নামটি ছাড়া আর একটি শব্দও নেই ঐ অধ্যায়ে। মৃত্যু কথাটি ব্যবহার না করেও গোঞ্জর পরলোকগমন সম্বন্ধে লেখিকা ইঙ্গিত দিতে পেরেছেন। এবং এই ইঙ্গিত অধিক ব্যঞ্জনাময়। পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে—'গোঞ্জ আর নেই........।'

একখানি গ্রাম

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সেই মাঠ, খেয়াঘাট—হাটেবাটে পরিচিত মুখ
মুহূর্তে মিলায়ে যায় ছিন্নভিন্ন জনতার মাঝে।
এ উহার পানে চায়, কেহ কারে চিনিতে পারে না
দূরান্তের দেশে যেন পথ-হারা বিভ্রান্ত পথিক,
বার বার মনে পড়ে ছেড়ে-আসা একখানি গ্রাম,
অতিক্রান্ত সীমান্তের বিদায়-বেলার কালো ছায়া
মেঘে মেঘে ঢেকে দেয় শরতের নির্মল আকাশ,
অশান্ত অস্থির মন ছুটে যায় দুরন্ত আবেগে।

সে পথ আমার পথ, সে গ্রাম সেদিনও মোর ছিল
শৈশবের খেলাঘর, কৈশোরের স্বপন দিয়ে ঘেরা;
যৌবন-নিকুঞ্জ বনে পল্লবিত বসন্ত-মঞ্জরী
দীর্ঘশ্বাসে ঝরে গেল নিষ্করুণ কঠিন মাটিতে।

মালিন্যবিমুক্ত গ্রাম, লাবণ্যে সুস্নিগ্ধ স্পর্শ তার
আশা ছিল বার্ধক্যের বারাণসী সেই তীর্থস্থানে
সব ক্লান্তি ধুয়ে যাবে ক্ষীণস্রোতা নির্ঝরিণী নীরে;
মিথ্যা হয়ে গেল সব, ব্যর্থ আশা নিষ্ফল কল্পনা।
নিকট সুদূরতম; শুভ্র মেঘ দিগন্তে মিলায়
তবু, তবু সেই গ্রাম—মধু হতে মধুর সে নাম,
শ্যামশোভা সমারোহ ভেসে ওঠে নয়ন-সম্মুখে
স্মৃতি তার বেদনায় গুমরিছে মন্থর পবনে,
আদিগন্ত আকাশের শূন্যতায় স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে
থরো থরো কাঁপিতেছে একখানি ছেড়ে-আসা গ্রাম।

জীবনের সীমারেখা—সে যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়,
অবসিত মহিমার চিতাভস্মে শেষ চিহ্ন তার
অদৃশ্য হইয়া যায় কালান্তরে অন্য দৃশ্যপটে
তবে মিথ্যা আশা নিয়ে কেন এ স্বপ্নের জাল বোনা?

ব্যর্থ আরাধনা

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আমারে চিনেছ নদী! আমি সেই দুরন্ত বাতাস
যে তোলে তরঙ্গ বুকে, যার মৃদু কম্পিত নিঃশ্বাস
এনেছে ফুলের গন্ধ লোভাতুর নায়কের মত
তোমার নীলাভ কেশে, ভালবেসে চলেছি নিয়ত
সৃষ্টির প্রথম হতে, তবু আজো পেলাম না মন,
সাগরে মিশিতে চাও, বৃথা মোর প্রেম-নিবেদন!

কাল বৈশাখীর ঝড়ে দোলাই যে তোমারে হিন্দোলে,
বর্ষার কেতকী রেণু মাখাই যে তোমারি কপোলে,
শরতের কাশফুল ফোটাই যে তব তটে তটে,
হেমন্তে শিয়রে তব গান গাই মৃদু ছায়ানটে,
কুয়াশা গুণ্ঠনখানি শীত রৌদ্রে সরাই পুলকে।
বসন্তের কুঞ্জ হতে গাঁথি ফুল তোমারি অলকে।
এত আরাধনা, তবু আপনাকে দাও না যে ধরা,
সাগর দয়িত তব, সেথা তুমি চির-স্বয়ংবরা!

অন্ধ পিপাসার কেন্দ্রে

মণীন্দ্র রায়

আয়োজনে কি বা লাভ? বহুকাল পথে আর ঘরে
তুলামূল্যে যা পাবার পেয়েছি তা স্মৃতির চূড়ায়।
সেই সব স্পর্শ হাসি হীরকের দ্যুতির শিহরে
এখনো অপসরমান্যে অকস্মাৎ চোখে চোখে চায়।
এখনো নির্জন রাতে হৃদয়ের আনাচে-কানাচে
শুনি বহু পদশব্দ, দেখি কতো মুখের আদল।
জানি, যা বিগত সবই ধরা আছে এ মনের ছাঁচে;
তিল তিল যতো যত্ন, আমি তারই মিশ্র যোগফল।

আয়োজনে শান্তি নেই। পেয়েছি যা সে যেন আভাস,
লবণাম্বু-সমুদ্রের তীরে ব'সে দিগন্ত যেমন।
অথবা সে যেন প্রেম, দেহে দেহে যার বাহুপাশ
মায়ার পুত্তলী, তবু মর্ম তার অসাধ্য সাধন,
সুদূর দুরবগাহ। আজীবন তারই স্তব্ধ ডাকে
অন্ধ পিপাসার কেন্দ্রে খুঁজে মরি শুধু আপনাকে।।

জীবন

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

পুঞ্জে পুঞ্জে স্বপ্ন ফেনা রামধনু রঙের লীলায়
বনানীর শ্যামলীমা পার হয়ে মনেরে ভোলায়!

সাদা আর কালো রং মেশে আর হয় যে আলাদা
'কালো' আসে মৃত্যু নিয়ে, প্রাণের ইঙ্গিত দেয় 'সাদা?'

কালো-সাদা—সতরঞ্চ ছকে ঘুরি গুটিকা কি মোরা?
এ-রঙের ধাঁধা চক্রে মুসাফির ঘোরে বিশ্ব জোড়া!

ভুল-গুলিস্তাঁর ফোটে গুলাবের গুচ্ছ সারি হায়,
স্বপ্ন ভাঙে, ফেনা রাঙে, খসে দল কাঁটার খোঁচায়।

কত শিরি ফরহাদ লায়লী ও মজনুরা যত
ভুল-মরু-পথে কাঁদে; ঝরে মরে, বুকে লয়ে ক্ষত।

যত কবি-শিখী-পুচ্ছ কলাপেরে মেলিয়া ছড়ায়,—
কাব্য-গীতি-শিল্প সুর পতাকার জয় ঘোষণায়,—

তারে নিয়ে আরো স্বপ্ন আরো ফেনা জমাইয়া তুলে
প্রত্যহের জীবনেরে মদালস করি না কি ভুলে?

এ ভুলের ফুল মধু পান করে যেই মধুপেরা,
এ ভুলের ফুল বনে তারা আজো রসিকের সেরা?

বৃষ্টি শেষে তার মুখ

জয়ন্তী সেন

জানি তাকে হারাব না।
দীপ্ত মেঘে ফুলবাহিনী বেলা
মগ্ন আছে অবিরাম বৃষ্টি শেষে নীরবে একেলা
আকাশে সন্ধ্যায় রঙ, ক্লান্ত পাখী, শব্দহীন রাত
দৃশ্যপটে ধূসরিত অন্ধকারে নামে অকস্মাৎ
তবুও ভুলি না তাকে—তবু তার রেখাঙ্কিত মুখ
কারুকার্যে এঁকে চলে স্বপ্ন আর প্রত্যয়ের সুখে।

স্কেচ

গোপাল ঘোষ

নর = নারী

সৃষ্টির আদিকাল হইতেই নর ও নারী সম্পর্কে বহু আলোচনা ও গবেষণা লিপিবদ্ধ ও শ্রুতিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অন্যান্য বিবিধ শাস্ত্রের মত এই শাস্ত্রটিও ক্রমশ উন্নত, আবর্তিত, সম্প্রসারিত হইয়াছে, স্বামিত্ব, স্ত্রীত্ব, সতীত্ব, সমত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বর্তমান-কালে যে মত, যে পথ, যে আচরণ, যে বিধি প্রভৃতি জগৎ-সমাজে প্রকটিত হইয়াছে, তৎ-সম্বন্ধে গ্র্যাজুয়েট বিজয় এবং তৎপত্নী গ্র্যাজুয়েটিকা মোহিনীর মনে কোন সন্দেহ বা অস্পষ্টতা নাই।

সেদিন রবিবার। বিজয় এবং মোহিনী চায়ের টেবিলে বসিয়াছে। মেয়ে রমা এবং ছেলে দেবু কাছেই খেলাধুলো করিতেছে। মোহিনী বলিল, দেখ, এবার মাইনে পেলে, হয় রমাকে একটা সুট করে দেবে, কিংবা দেবুকে ঠিক রমার মত একটা ফ্রক করে দেবে, বুঝলে?

বিজয় একটু অবাক হইয়া বলিল, ঠিক বুঝলুম না।

নর আর নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য মাথাটা যখন একালের, মানে আমাদের, মানে জগৎ-সমাজের মত নয়, তখন—

অবশ্য খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অনেক সময়ে অভাবে পড়ে হাফ-প্যান্ট পরে, কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে—স্বাভাবিক মনে কি?—মোহিনী বলিল—জগতে কোনটা স্বাভাবিক আর কোনটা অস্বাভাবিক, সেটা ঠিক করবে কে? তুমি না আমি?

বিজয় বলিল, বোধ হয়, আমরা কেউই নয়। দেখতে পাচ্ছি এই কয় বছরের মধ্যেই আমাদের স্বভাব, আমাদের আদর্শ কত বদলে গেল—এবং যাচ্ছে। নাও, এখন চল একটু টেবিলে বসা যাক। আজ ছুটির দিন, একটু নিশ্চিন্ত মনে গল্প টল্প করা যাক।

উহারা দুজনে ঘরে আসিয়া একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দুপাশে বসিল। কাজকর্মের তাড়াহুড়ো নাই। কম্বাইন্ড হ্যান্ড আছে, ঠিকা ঝি আছে, আর ভাবনা কি? ছেলেমেয়ে দুটি কখনো ঘরে কখনো বারান্দায় লাফালাফি ছুটোছুটি করিতেছে।

মোহিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ওই যাঃ, কি বিশ্রী পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ও-ঘর থেকে। নিশ্চয়ই দুধটা পুড়ে গেছে। একদম ভুলে গেছি। ওদের আর সকালে দুধ খাওয়া হল না।

বিজয় বলিল, কেন, তোমার বুধুয়া কোথায় গেল?

যেখানে যেয়ে থাকে, মানে, বাজারে। ওকে দিনের মধ্যে চৌত্রিশ বার বাজারে পাঠালেও ওর আপত্তি নেই।

মোহিনী স্টোভ নিভাইয়া দুধের কড়াই নামাইয়া রাখিয়া আসিয়া টেবিলের পাশে বসিয়া বলিল, এবার বল, আজকের প্রোগ্রাম কি তোমার মানে আমাদের।

আচ্ছা, তুমিই বল না।

ককটেল পার্টিতে যেতে আপত্তি আছে?

মোহিনী বলিল, আপত্তি? কি যে বল! নিশ্চয় যাব। দেখবে তুমি আমি ঠিক সমান হয়ে গেছি।

মানে?

নরেরা যা করছে, নারীরাও অবিকল তাই করছে। ওঃ সে কি আনন্দ! কি সমান সমান ভাব!

খুব ভাল লাগে, না?

লাগেই তো।

তাহলে, তাই চল আজ। ছেলেমেয়ে দুটো?

সঙ্গে নিয়ে গেলেই হয়। কিংবা, কিংবা ওরা বরং বাড়ীতেই থাক। এত কচি বয়েসে সমান-সমান হয়ে কাজ নেই। মেড-টাকে কিছু বখশিস—ধর ঘণ্টায় দেড় টাকা করে—দিলে, ও-ই ছেলেমেয়ে দুটোকে সামলে-সুমলে রাখবে। বেবী-সিটারের ব্যবস্থাটাই আধুনিক সমাজের খুব ভাল ব্যবস্থা। ঝি যদি না থাকতো তাহলে পাশের ও-বাড়ীর জানাশোনা কোন মেয়েকে ডেকে এনে ব্যবস্থা করতে হবে খন।

বিজয় বলিল, বেশ, তাই করো। আমাদের

মনে রাখতে হবে, আমাদের যুগ স্বাধীনতার যুগ। অর্থাৎ নর ও নারীর সমস্ত লাভের যুগ। পূর্বে পূর্বে যুগে রাম-সীতা, দশরথ-কৌশল্যা প্রভৃতি এবং তারও পরে সাবিত্রী-সত্যবান, ধৃত-রাষ্ট্র-গান্ধারী, অভিমন্যু-উত্তরা প্রভৃতির যুগ মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

মোহিনী বলিল, আর তোমাদের রাধা আর কেষ্ট—ইস, কি গান! —প্রাণ-মন-হিয়া সব সাঁপিয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী—ছিঃ ছিঃ ছিঃ —পড়তেও গা ঘিন ঘিন করে! কল্পনায় আনতে পার, আমি নাকি তোমার দাসী! ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

বিজয় বলিল, সে কখনো হতে পারে? এত-কাল ধরে যে এসব আজগুবি কল্পনা মানুষের মাথায় এসেছে, তার কারণ, মানুষের অজ্ঞানতা জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ দূরে হয়, কিন্তু কুসংস্কারকে জ্ঞান দিয়েও সত্যপথে আনা যায় না। আমাদের দেশের এবং অন্য দেশের ইতি-হাসে ও গল্পে অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। সময় এসেছে এই কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্ত করা।

মোহিনী বলিল, ঠিক। আমাদের আহারে ব্যবহারে আচরণে যেখানে যত কুসংস্কার পুঞ্জীভূত হয়ে আমাদের সমাজকে পিছনে টানছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কুসংস্কার এই স্বামী-স্ত্রীর বা আর একটু সাধারণভাবে, নর ও নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এই ব্যাপারের পিছনে যুগ যুগ ধরে যে কত কুসংস্কার জমে উঠেছে, তা বোঝা যায় এই বর্তমান যুগের বিজ্ঞানকল্প থেকে। বিজ্ঞানে যেমন গত পঞ্চাশ বছরের আবিষ্কার, তার আগের হাজার বছরের আবিষ্কারকে ম্লান করে দিয়েছে, এমন কি একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে, তেমনি এখনকার নরনারী সম্পর্কেও পূর্ব পাঁচ হাজারেরও বেশী বছরের ইতিহাস ও পুরাণ তলিয়ে গেছে।

বিজয় বলিল, এই যে ককটেল পার্টির উৎসব, এটা আমাদেরই কুসংস্কারের আবরণে এতদিন ঢাকা ছিল, পাশ্চাত্ত্য দেশে তো কবে এটা ডাল-ভাতের মতই সহজ হয়ে গেছে।

মোহিনী বলিল, ও সব আমাকে নূতন বলতে হবে না। চারিদিকে একটু চোখ মেলে দেখলেই দেখতে পাবে আমাদের সমাজের প্রায় সবাই—সবাই না হলেও অন্ততঃ আশী জন পশ্চিম-ফেরৎ।

বিজয় বলিল, যাও এখন ফিলজফি থাক। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা দেখলে হয়। বয়কে আর মেজকে ডেকে বলে দাও খোকা খুকুকে চান-টান করিয়ে খাবার টেবিলে বসিয়ে দিক। আমরাও যাচ্ছি।

আহারাদি শেষ হইল। দুপুরের বিশ্রাম হইল। আঃ চাকুরিয়াদের রবিবার! বিজয় তো গুণ গুণ করিয়া গানই ধরিয়া দিল, এমন দিনটি কোথাও খুঁজে পাবে না ক তুমি— আলিস্য-ঘুমের ঢেউ ওঠে নীলাম্বর চুমি—

মোহিনী বলিল, এখন একটু কাজের কথা শোন। বাড়ীতে শুধু একটা বেবী-সীটার না রেখে বরঞ্চ ওই সঙ্গে আমাদের ভার্ণাকুলার বৌদিকেও একটু রেখে গেলে হয়। তিনি তো কাছেই থাকেন।

বিজয়। তা, যা ভাল বোঝ।

যথাসময়ে প্রস্তুত হইয়া, ভার্ণাকুলার বৌদিকে ডাকিয়া আনিয়া সব বুঝাইয়া দিয়া বেবী-সীটারের কাছে খোকা খুকিকে রাখিয়া, বিজয় এবং মোহিনী যথাস্থানে যাত্রা করিল। মোহিনীর গায়ে সিল্কের শাড়ী, নাইলনের জামা—সামনে U এবং পিঠে V, কপালে কুমকুমের টিপ, সিঁথিতে সিন্দুর। এখনও ওটা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। সেকাল এবং একালের সীমান্ত-প্রদেশে এমন হয়। পাশ্চাত্ত্য জগতে এ সকল বালাই কোন দিনই নাই, কারণ তাহারা আরও অগ্রগামী কি না!

উৎসব-হলে ঢুকিয়া তাহারা সুসজ্জিত মেঝের পরে পাতা উৎসবের সাজ-সরঞ্জাম দেখিয়া খুবই আনন্দিত হইল। মোহিনী এ সকল ব্যাপারে একটু কাঁচা, সকলেই বুঝিল। তবু যথারীতি দেখা-সাক্ষাৎ, কেমন আছেন, কেমোন আছেন, হাড়ু-ডুডু ইত্যাদি চলিল। তার-পর বল নৃত্য সুরু হইল। একটু কাঁচা মোহিনীকে যথাসম্ভব পাকাইয়া লইবার জন্য অভিজ্ঞা বর্ষীয়সী মহিলারা এবং তৎসঙ্গে অবশ্য মহোদয়েরাও সযত্ন হইলেন। পার্টি বেশ জমিয়া উঠিল। নৃত্য চলিল, মধ্যে মধ্যে বিরতি, সাজানো টেবিলের পাশে বসিয়া ককটেল-পান, যথারীতি জোড়ায় জোড়ায় ছোট ছোট সিট—আউট ঘরে প্রবেশ, ইত্যাদি কিছুই বাকি রহিল না। কাঁচা মোহিনী যেন একটু বেশী বিহ্বল হইয়া পড়িল। দুইটি বয়স্কা মহিলা বিজয়ের কাছে আসিয়া বলিলেন, আপনি বরঞ্চ এবার বাড়ী যান। আপনার স্ত্রীকে আমরা আপনার গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসছি।

বিজয় বলিল, আমার গাড়ীটাকে চিনতে পারবেন?

মহিলাদ্বয় সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, কি যে বলেন! আমরা সহরের কার গাড়ী চিনি না?

বিজয় গাড়ীর ভিতর ঢুকিতেই প্রায় অজ্ঞান মোহিনীকে দুই পাশ হইতে ঐ দুইটি মহিলা ধরিয়া লইয়া কোন মতে তাহার পাশে বসাইয়া দিল। বিজয় গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। পথে ঘুমের ঘোরে মোহিনী মাত্র একটি কথাই কোন মতে উচ্চারণ করিল, খোকা খুকু কই?

বিজয় বলিল, ওরা তো বাড়ীতে ভার্ণাকুলার বৌদির কাছে। তুমিই তো রেখে এলে? কিছু ভাবনা করো না।

বাড়ীর গেটে পৌঁছিতেই, বেবী-সীটার মেয়েটি এবং ভার্ণাকুলার বৌদি ছুটিয়া আসিয়া গাড়ী খুলিয়া মোহিনীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। ভার্ণাকুলার বৌদি প্রায় চেঁচাইয়া উঠিলেন — এমন পরিস্থিতিতে চেঁচানও মুস্কিল—পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিতে পারে। তিনজনে মিলিয়া কোনমতে ধরাধরি করিয়া মোহিনীকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। বেবী-সীটার বিদায় হইল। ভার্ণাকুলার বৌদি ছেলে মেয়ে দুটিকে কোলে করিয়া শুইয়া পড়িলেন। বিজয়কে বলিলেন, ব্যাপার কি? ওকে একটু সামলে সুমলে রাখতে পারিস নি!

বিজয় গম্ভীরভাবে শুধু বলিল, আমরা সমান-সমান কিনা। কাজেই কেউ কাউকে সামলানোর কথা ওঠে না। যাও বৌদি, শোও গে তুমি। রাত তো দুটো বাজে, দেখছি।

রাত কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে যথা-রীতি চা পর্ব শেষ হইল। মোহিনী উঠিল না। বিজয়ের অফিস আছে। সোমবার সকালে সবই তাড়াতাড়ি সারিয়া সে অফিসে চলিয়া গেল। ভার্ণাকুলার বৌদি যত্ন করিয়া মোহিনীকে বিছানা হইতে তুলিয়া স্নানের ঘরে পাঠাইয়া দিল। প্রায় এক ঘণ্টা স্নানের ঘরে থাকিয়া ৩ খানা সাবান প্রায় শেষ করিয়া মোহিনী বাহির হইয়া আসিয়া ভার্ণাকুলার বৌদির সঙ্গে খাইতে বসিল। নামমাত্র মুখে দিয়া ভার্ণাকুলার বৌদিকে বলিল, বৌদি, এখন তুমি বাড়ী যাও। তোমাদের বাড়ীর সকলে কি ভাবছেন। বৌদিদি মুখ হাত ধুইয়া বাড়ী গেলেন। বলিয়া গেলেন, যাই কর, ওর সঙ্গে আর ঝগড়া-ঝাঁটি ক'র না যেন।

মোহিনী বলিল, তুমি যাও—আমার এখন কথা বলবারও শক্তি নেই।

মোহিনী ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা তিনটার আগে ঘুম ভাঙিল না। ঘুম হইতে উঠিয়া খোকা খুকীকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া আদর করিতে লাগিল। খুকী জিজ্ঞাসা করিল, নেমন্তন্নে কি সব খেলে?

কত কি খেলুম।

আমাকে নিয়ে গেলে না তো!

আমিও আর কখনো যাব না এমন নেমন্তন্ন খেতে।

এই ধরণের কথাবার্তা যখন হইতেছে, সেই সময়েই বিজয় আসিয়া পড়িল। মোহিনী খোকা খুকুকে বলিল, তোমরা এখন ঝিয়ের কাছে যাও। বিজয়কে বলিল, কি, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে কেন?

তুমি কেমন আছ, তাই ভেবে একটু আগেই এলুম।

বেশ করেছ। যাও, কাপড়-চোপড় ছেড়ে, চা-টা খেয়ে এখানে একটু বসো।

তুমি চা খাবে না?

পরে খাব'খন। শোন। আমি কাল রাত্রে যে অবস্থায় পড়েছিলাম, তুমি তো ইচ্ছে করলেই এটা এড়াতে পারতে।

পারতুম তো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা যখন সমান সমান, তখন—

দেখ, তর্ক করবার শক্তি আমার নেই। আমি অকপটে স্বীকার করছি, আমরা সমান-সমান নই। স্বামী স্বামীই এবং স্ত্রী স্ত্রীই। আর এই বলে দিলুম, ঐসব নোংরা পার্টিতে আমাকে যেতে ব'লো না।

যাক, আজ এই পর্যন্ত।

কথা শেষ হইল। কিন্তু তাহাদের মনের বোঝাপড়া চলিয়াছিল অনেক রাত্রি পর্যন্ত।

এই সেই বাড়ীটা।

রামতারণ একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর ভিতর থেকে হাঁক দিয়ে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাতে বলল।

সামনের ফুলবাগানটা যত্নের অভাবে জঙ্গল হয়ে গেছে। দোতলার কার্নিশের কোণায় একটা অশ্বত্থ গাছের চারা গজিয়েছে। বাইরের দরজা জানালা বন্ধ। জায়গাটা নির্জন-স্টেশন আর শহরের মাঝামাঝি। অপরাহ্নের ছায়া ঘোরালো হয়ে এসেছে। পুরনো বাড়ী। তবু একখানা চমৎকার ছবির মত দেখাচ্ছে।

স্টেশন থেকে শহরে যাবার সময়ও বাড়ীখানা তার নজরে পড়েছিল। —নজরে পড়বার মতই বাড়ী। আশে পাশে আর কোন বাড়ী নেই। চারিদিকের খোলা মাঠ আর ছড়ানো ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে ছোট্ট দোতলা বাড়ীখানা যেন কোন প্রতীক্ষমানা সুন্দরী কন্যার মত একলা দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম দর্শনের পর থেকেই বাড়ীখানা রামতারণকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছে। —এবার আর সে থাকতে পারল না, গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। গাড়োয়ানকে বলল, 'গাড়ি নিয়ে ঐ গাছতলায় থাক—এখুনি আসছি।' প্রত্যুত্তরে কি যেন বলতে শুরু করল গাড়োয়ান—বোধহয় ওজর আপত্তি তুলতে যাচ্ছিল। রামতারণ তার কথা কানে না তুলে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেল বাড়ীর দিকে।

কেউ নেই নাকি বাড়ীতে?

না, আছে। বাইরের দরজায় তালা লাগানো নেই—ভিতর থেকে বন্ধ।

বারান্দায় গিয়ে উঠল রামতারণ। দরজা ঠেলে দেখল একবার, কিন্তু কড়া নাড়বার আগেই দরজা ভিতর থেকে খুলে গেল। ভিতরে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন একটি বৃদ্ধা মহিলা। পরনে সাদা থান, আধঘোমটার নীচে মাথায় সাদা চুল—মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কি চাই বাবা তোমার?'

রামতারণ একটু কেসে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিই কি এ বাড়ীর মালিক?'

আরও মৃদু, একটু দীর্ঘনিঃশ্বাসের আওয়াজ
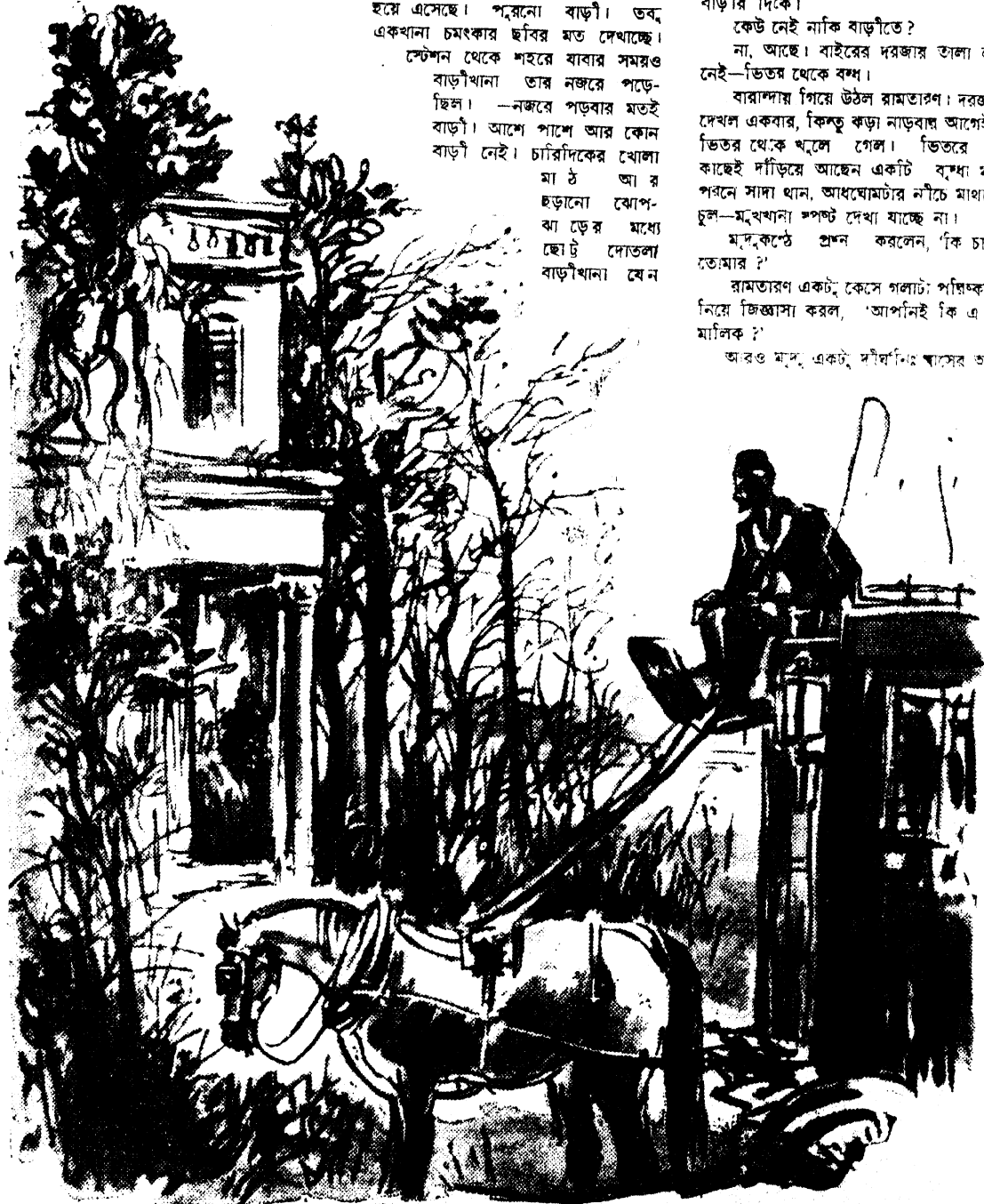
শোনা গেল। বৃদ্ধা নীরবে মাথা নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ, তিনিই মালিক।

'আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল—কাজের কথা।'

'ভিতরে এসে বস বাবা।' —ভদ্রমহিলা ভিতর থেকে দরজাটা আবার ভেজিয়ে বন্ধ করে দিলেন।

ঘরের ভিতর একখানা বড় টেবিল, তার পাশে খানচারেক চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে পড়ল রামতারণ। ঘরটা বেশ একটু অন্ধকার মত। আসলে এটা একটা ঘরই নয়। দু'পাশের দুটো ঘরের মাঝখানে চওড়া করিডরের মত একটা জায়গা। সামনের দিকে একটা ছাড়া আর কোন জানালা নেই। সেটাও বন্ধ রয়েছে আপাতত।

বৃদ্ধা দাঁড়িয়েই রইলেন। বললেন, 'কি বলবে, বল।'

একটুখানি চুপ করে রইল রামতারণ। তারপর অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বলল, 'দেখুন, আমি কলকাতায় ব্যবসা করতাম—লোহালক্কড়ের ব্যবসা, বেশ লাভের ব্যবসা। বড়বাজারে রামতারণ শীলকে সবাই চেনে। টাকাকড়ি ভালই রোজগার করেছি কিন্তু তিনকুলে কেউ নেই। বিয়ে-থা করি নি আত্মীয়-স্বজনেরও কোন খোঁজ খবর রাখি না। তাই ব্যবসাটা বেচে দিলাম। ভাবলাম, কি হবে সারা জীবন পয়সার পিছনে ছুটোছুটি করে? তার চেয়ে জীবনের বাকি কটা দিন একটু আরামে কাটানো যাক্। তা—'

বাধা দিয়ে বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নামটি কি বললে বাবা?' —দুর্বল কণ্ঠস্বরে সামান্য একটু ঔৎসুক্যের আভাস ফুটে উঠল।

'আজ্ঞে, রামতারণ শীল। আদিবাস ছিল হুগলীর ওদিকে, তবে সেখানে এখন বাড়ী-ঘরদোর কিছু নেই। বহুদিন দেশছাড়া তো! তাই ভাবছি, এবার একখানা বাড়ী কিনব। ছোট-খাটো নিরিবিলি একখানা বাড়ী। কলকাতায় নয়—কলকাতার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বাইরে কোথাও।—আপনাদের এখানে এসেছিলাম একটা কাজে। শহরে যাবার পথেই এই বাড়ীখানা নজরে পড়ে। ফেরবার পথে আবার দেখলাম। ঠিক এই রকম বাড়ীই খুঁজছি আমি। শহরের কাছেই, অথচ শহরের মধ্যে নয়। কলকাতা থেকেও খুব দূরে নয়।—জানি, এরকম ভাবে হঠাৎ এসে আপনাকে বিরক্ত করা আমার উচিত হচ্ছে না। আপনি হয়তো কি ভাবছেন। কিন্তু বাড়ীখানা বড় চোখে লেগেছে—আবার কবে এদিকে আসতে পারব তারও কিছু স্থিরতা নেই। তাই ভাবলাম—। তা, আপনি কি বাড়ীখানা বেচবেন?'

প্রস্তাবটা যেমন অদ্ভুত তেমনি অপ্রত্যাশিত। তার কথা শুনে ভদ্রমহিলা যদি বিস্মিত হতেন, বিরক্ত হতেন, এমন কি যদি একটু ক্রুদ্ধ হয়েও উঠতেন, রামতারণ তাঁকে দোষ দিতে পারত না। কিন্তু তা তিনি কিছুই হলেন না—অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিলেন, 'বেচতেই তো চাই বাবা, আজ চৌদ্দ বছর ধরে এ বাড়ী বেচবার চেষ্টা করছি—কিন্তু কেউ যে কিনতে চায় না।'

'কেন? একটু পুরনো হলেও আপনার এমন সুন্দর বাড়ী—কেউ কিনতে চায় না কেন?'

'আমি যে দর চাই তাই শুনেই সবাই পালিয়ে যায়। তাছাড়া বাড়ীখানা সামনে থেকে যেমন দেখছ আসলে তো তা নয়। ওপরের দুখানা ঘরেরই ছাদে বড় বড় ফুটো হয়েছে, বৃষ্টি হলে ঝর্ ঝর্ করে জল পড়ে। আর দু-এক বর্ষা পরেই বোধহয় ভেঙ্গে পড়বে। দোতলায় ওঠবার সিঁড়িটা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে। পিছনের ঘরদোরের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। অনেক পুরনো বাড়ী তো—আমার শ্বশুরের তৈরি। সামনেটা তিনি শখ করে ঝিনুকের চুণ দিয়ে পঙ্খের কাজ করিয়েছিলেন, তাই এখনও অমন ধব্‌ধবে সাদা দেখায়। নইলে বাড়ীর আর আছে কি?'

রামতারণ বলল, 'সে না হয় আমি ভাল করে মেরামত করিয়ে নেব। কিন্তু আপনি কত দাম চান এ বাড়ীর?'

'সতেরো হাজার টাকা।'

'বলেন কি? সতেরো হাজার! এইমাত্র আপনি নিজের মুখেই তো বললেন—'

'জানি বাবা, জানি। শ্রীপতি উকিলও, সেই কথা বলেছিল। উকিল মানুষ তো—এই শহরেরই উকিল—সব কাজ আঁটঘাট বেঁধে করা অভ্যেস, কাঁচা কাজ কখনও করে না। ইঞ্জিনীয়ার সঙ্গে নিয়ে এসেছিল—কি গেছে, কি আছে, নতুন কি করতে হবে, সব খুঁটিয়ে হিসেব করেছিল দুজনে মিলে। তারপর আমাকে বলেছিল যে বাড়ীর প্রকৃত দর ছ-হাজারের বেশি কিছুতেই হতে পারে না—তবে আমি সহায়সম্বলহীনা বিধবা মানুষ, আমাকে সে আরও পাঁচশ বেশি দিতে পারে। —আমি রাজি হইনি। তা—সেও আজ বছর-খানেকের ওপর হয়ে গেল।'

একটু হেসে রামতারণ বলল, 'তবেই দেখুন! সবাই জানেন, তবু এই রকম একটা অসম্ভব দর হাঁকছেন! এ দর আপনি কখনও পাবেন না। মফঃস্বলের সম্পত্তি, শহর-লোকালয়ের বাইরে, চারিদিকে পতিত জমি—জমির দাম আর কত হবে বলুন? তার ওপর বাড়ীর দশা তো আপনি নিজের মুখেই বললেন। তা দেখুন—শ্রীপতিবাবু আপনাকে সাড়ে ছ-হাজার দিতে চেয়েছিলেন, আমি আপনাকে সাড়ে আট হাজার—আচ্ছা বেশ, ন-হাজারই দেব। নেহাৎ চোখে ধরে গেছে বাড়ীটা—'

'না বাবা। সতেরো হাজারের এক পয়সা কমে আমি বাড়ী বেচব না। আমার স্বামীর মুখে শুনেছি, শ্বশুরের এ বাড়ী তৈরি করতে সতেরো হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। এক পয়সা লাভ আমি চাচ্ছি না, জমির দামও ছেড়ে দিচ্ছি— কিন্তু যা খরচ হয়েছিল সেটা আমাকে দিতে হবে। ভাঙ্গাচুরো যাই হক, শ্বশুরের ভিটে। এ বাড়ী আমি লোকসানে বেচতে পারব না।'

রামতারণ ব্যবসায়ী মানুষ। অনেক দর-দস্তুর কেনা-বেচায় অভিজ্ঞতা তার আছে, কিন্তু এ রকম বিচিত্র লাভ-লোকসানের হিসেব সে জীবনে কখনও শোনেনি। ধৈর্য বজায় রাখা খুবই শক্ত। একবার ভাবল, দূর হক! চলে যাই। কিন্তু পরক্ষণেই বাড়ীখানার কথা মনে হতেই আবার সে স্থির হয়ে বসল। নাঃ! এ বাড়ী তার চাই-ই। এমন একখানা বাড়ীর স্বপ্ন তার বহুকালের —

বৃদ্ধা তখনও গুন্ গুন্ করে বলে চলেছেন: 'নেহাৎ বাড়ীটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে গেছি তাই, নইলে কবে চলে যেতাম। বিধবার পেট, কাশী-বৃন্দাবনে ভিক্ষে করে খেলেও চলে যেত। কিন্তু এ বাড়ী ছেড়ে যে আমার যাবার যো নেই কোথাও। অথচ এত গরীব যে, একবেলার হবিষ্যির সংস্থান করতেই প্রাণান্ত হয়। বাড়ী মেরামত করাব কি করে বল? তা তোমার তো টাকা আছে—'

প্রায় চীৎকার করে উঠল রামতারণ, 'হ্যাঁ, আমার টাকা আছে, শখ আছে, শখের জন্য টাকা খরচ করার মত দিলও আছে। কিন্তু তাই বলে আপনি কি আমার গলা কাটতে চান?'—তারপর একটু লজ্জিতভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার ধীরকণ্ঠে বলল, 'আচ্ছা বেশ, আপনার জেদও বজায় থাকুক খানিকটা, আমার দিকটাও একটু বিবেচনা করুন। আমি কিছুটা উঠছি, আপনিও একটু নামুন। একটা মাঝা-মাঝি রফা করে ফেলা যাক। আমি আপনাকে বারো হাজার—সাড়ে বারো হাজার—না, পুরো তেরো হাজারই দিচ্ছি, আপনি রাজি হয়ে যান। এই ভাঙ্গা ইটের পাঁজার জন্যে এত টাকা আপনাকে আর কেউ দেবে না।'

'না বাবা, আমার সতেরো হাজারই চাই।'

আচ্ছা, চৌদ্দ হাজার।'

'না।'

'পনেরো হাজার—সাড়ে পনেরো হাজার।'

'না।'

'আচ্ছা জেদী মানুষ তো আপনি! কিন্তু রামতারণ শীলকে আপনি চেনেন না—তার জেদের সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। একবার গোঁ ধরলে তার আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না।'

সত্যই রামতারণ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম ফুটে ফুটে উঠেছে, চোখ দুটো ঠেলে বেরুচ্ছে, দুই রগের পাশে দুটো শিরা দপ্-দপ্ করে লাফাচ্ছে, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়ছে: 'বেশ তাই দেব। সতেরো হাজারই দেব। কেমন এবার খুশী হয়েছেন তো? সাধ মিটেছে তো?'

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে উঠেছে। ঘরের দেয়ালগুলোও আর ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। তবু তারই মধ্যে দেখা গেল, বৃদ্ধার ছায়াচ্ছন্ন মুখের ওপর চোখ দুটো যেন একবার আকস্মিক দীপ্তিতে ঝক করে জ্বলে উঠল। ভদ্রমহিলা বোধহয় হাসলেন।

রামতারণ হাঁপাচ্ছে।

হঠাৎ বৃদ্ধা একটু ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, 'ঐ দেখ, কি ভুলো মন! এত দূরে থেকে আসছ, সারা বিকেল শহরে কাজের ধান্দায় ঘুরে বেরিয়েছ—মুখে একটু জলও পড়েনি। অথচ একটু যে কিছু মুখে দিয়ে জল খেতে বলব তাও মনে নেই। তুমি একটু বস বাবা, আমি এখুনি আসছি। বামুনের বিধবার ঘর, চায়ের জোগাড় তো নেই— তা দেখি যা হয় একটু—'

মৃদুস্বরে বিড়-বিড় করতে করতে বৃদ্ধা বাড়ীর ভিতরের দিকের অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রামতারণ নিজেকে পুরোপুরি সামলে নিয়েছে। তার মন এখন কার্যসিদ্ধির আনন্দে ভরপুর। সত্যিই খাওয়া-দাওয়ার কথা তার কিছুই মনে ছিল না এতক্ষণ।—তা, ক্ষিদে একটু পেয়েছে বৈ কি। জলতেষ্টা তো খুবই পেয়েছে।

বৃদ্ধা ফিরে এলেন। এক হাতে একখানা পিতলের রেকাবিতে খান আষ্টেক বাতাসা, আর এক হাতে একটা বড় কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস দুধ। বললেন, 'ঘরে তো আর কিছুই নেই—এই একটু মুখে দিয়ে নাও। আমি জল নিয়ে আসছি।'

মনের আনন্দে রামতারণ একখানা বাতাসা তুলে নিয়ে টপাস করে গালে ফেলে দিল।

বৃদ্ধা আবার ফিরে এলেন। বললেন, 'দুধটুকু সব খেয়েছ তো? ভাল দুধ। তারী গয়লানী আমাকে বিশ বছর দুধ দিচ্ছে, এক ফোঁটা জল মেশায় না—ওর দুধ জ্বাল দিলে ক্ষীরের গন্ধ ছাড়ে। হ্যাঁ, সবটুকু খেয়ে ফেল। তারপর জল খাও।

রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে রামতারণ বলল, 'তাহলে আজ আমি উঠি। রাতের ট্রেণেই কলকাতায় ফিরব। আসছে বুধবার সকালে আবার আসব। আপনি দলিল-টলিল সব গুছিয়ে ঠিক করে রাখবেন। লেখাপড়া, রেজিষ্ট্রি, সব কাজ ঐ দিন সেরে ফেলতে হবে। টাকাও আমি আপনাকে ঐ দিনই দিয়ে দেব। —ঠকলাম আমি, অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেল। তা যাক, আমার কোন আফশোস নেই। আপনার জেদ বজায় রইল বটে, তা—আমারও তো শখ মিটল। —হ্যাঁ, আর একটা কথা।'

'কি?'

'আপনাকে কিন্তু ঐ দিনই বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে।'—রামতারণের চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে আসছে—একটু যেন ঘুম ঘুম করছে শরীরটা। সারাদিন ঘুরেছে তো, সেই-জন্যই বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

বৃদ্ধা বললেন, 'হ্যাঁ, বাড়ী আমি তখুনি ছেড়ে চলে যাব।' —অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে উচ্চারিত হল কথা কটি, প্রায় শোনাই যায় না। 'তখুনি' কথাটা রামতারণের কানে যেন 'এখুনি'-র মত শোনাল।

'তাহলে আমি এবার উঠি। গাড়োয়ান ব্যাটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।' —রামতারণের কথাগুলো একটু যেন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে হঠাৎ আবার ধপাস করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল সে।

বৃদ্ধা এখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ফিস ফিস করে বললেন, কি হল বাবা? মাথা ঝিম-ঝিম্ করছে? গা টলছে? হাত-পা অবশ হয়ে আসছে?—তা ওরকম তো হবেই। একটু পরে আরও বেশি করে হবে। সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে যাবে, একদম নড়তে-চড়তে পারবে না—তারপর চোখে দেখতে পাবে না, কানে শুনতে পাবে না—তারপর মিনিট দশ-পনের বাদে তুমি মরে যাবে।'

একটা বীভৎস আর্তনাদ করে রামতারণ পাগলের মত ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু চেয়ার থেকে দু-ইঞ্চির বেশি ওপরে উঠতে পারল না। ড্যাব-ড্যাব করে অসহায় একটা জন্তুর মত বৃদ্ধার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বৃদ্ধা তখন একেবারে তার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'ঐ দুধে আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছি—পুরো এক শিশি বিষ। আমার স্বামীর ওষুধের দোকান ছিল। তিনিই ওটা আমার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন। ওর গুণাগুণের কথাও তাঁর কাছে শুনেছিলাম। বড় মজার বিষ। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই— আস্বাদ নেই, গন্ধ নেই—খাবার সময় কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ফল একেবারে অব্যর্থ।'

ঘর ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে গেছে। হয়তো সন্ধ্যার অন্ধকার, হয়তো আসন্ন মৃত্যুর। কে জানে? রামতারণ শুধু দেখতে পাচ্ছে, তার পাশে সাদা থান জড়ানো অন্ধকার একটা মূর্তি। শুনতে পাচ্ছে ফিস ফিস করে বলা কথাগুলো—যেন তার কানের কাছে একটা কাল কেউটে ফণা তুলে হিস-হিস করছে।

'তোমাকে আমি চিনতে পেরেছি বাবা। তোমার নাম রামতারণ নয়, রামজয়—আমার ছেলের বন্ধু। তিনগুণ দাম দিয়ে কেউ শখের জন্যে ভাঙ্গা বাড়ী কিনতে আসে না। তুমিও শখ মেটাতে আসনি। এসেছিলে টাকার লোভে। অনেক টাকা তো—অনেক টাকা—এক লাখ ষাট হাজার টাকা। তখন আমি খবরের কাগজ পড়তাম—সব খবরই রাখতাম।'

'ছেলে আমার গোল্লায় গিয়েছিল। কলকাতার বড় ব্যাঙ্কে ক্যাশিয়ারের চাকরী করত, মাইনে ভালই পেত। কিন্তু মদ ধরেছিল, জুয়া খেলত, অস্থানে-কুস্থানে যাতায়াত করত। কানাঘুষোয় সব কথাই শুনতে পেতাম, কিন্তু কি করব?—করার আমার কিছুই ছিল না। বিধবার একমাত্র সন্তান, তোমাদের মত বন্ধুর পাল্লায় পড়েই তার সর্বনাশ হল।'

তারপর এল সেই সর্বনাশা রাত। আজ থেকে ঠিক চৌদ্দ বছর আগে। রাত ন'টার গাড়িতে ছেলে হঠাৎ বাড়ী এল—চুল উসকো-খুসকো, চোখের কোণে কালি মেড়ে দিয়েছে, দেখে মনে হয় যেন কতদিন কিছু খায়নি—হাতে মস্ত বড় একটা সুটকেশ। ছুটি না, ছাটা না, ছেলে হঠাৎ বাড়ি ফিরল এমন চেহারা নিয়ে—আমি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ছেলে কিন্তু শক্ত গলায় হুকুম করল, "আজ রাত্রে আমি কিছু খাব না—খেয়ে এসেছি। তুমি ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়। আমার জন্যে ভেব না। আমি এখন নীচে থাকব, কাজ আছে।"

'ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম কি আসতে চায়?—কি হল? ছেলের এমন অবস্থা হল কি করে? কি কাজ করছে সে নীচে বসে বসে? সুটকেশটাতেই বা কি আছে? নানা দুশ্চিন্তা মগজের মধ্যে ওলট পালট করতে লাগল। ওদিকে শহরে কাছারীর পেটাঘড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে যেতে লাগল। শেষে রাত প্রায় দুটো আড়াইটের সময় সবেমাত্র একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় একখানা মোটরগাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ঘস্ করে আমাদের দরজায় থেমে গেল। কে যেন দরজায় এসে ঘা দিল, ছেলে গিয়ে দরজা খুলল—তারপরই আরম্ভ হল বচসা। চাপা গলায় ঝগড়া, কিন্তু ক্রমশঃই তার তীব্রতা বাড়তে লাগল। একবার একটু ধস্তা-ধস্তির আওয়াজ শুনতে পেলাম। আর চুপ করে থাকতে পারলাম না, বিছানা ছেড়ে উঠে এক-পা দু-পা করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। এমন সময় হঠাৎ দুম্ দুম্ করে দুবার আওয়াজ হল—পিস্তলের গুলির আওয়াজ। আমি চীৎকার করে উঠলাম—ছুটে নীচে নামতে নামতে শুনলাম ধপ্ করে কি যেন একটা ভারী জিনিস পড়ে গেল, তারপর বাড়ীর দরজা থেকে একটা লোক দৌড়ে রাস্তায় চলে গেল—মোটরগাড়ি গোঁ-গোঁ করে উঠল, তারপর হুস করে ছুটে চলে গেল।'

রামতারণ আর মাথা উঁচু করে বসে থাকতে পারছে না। আস্তে আস্তে সর্বাঙ্গ যেন এলিয়ে আসছে। পা দুটো কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠছে। সে টেবিলের ওপর দুই কনুই রেখে দুই হাতে মাথা ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে কোনমতে বসে আছে। কানের কাছে সেই মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তখনও শোনা যাচ্ছে।

'মরবার আগে ছেলে আমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল, "রামজয় এসেছিল...ওকে আমি টাকা দিই নি...অনেক টাকা, মা, অনেক টাকা—এক সুটকেশ ভর্তি টাকা...লুকিয়ে রেখেছি।" —আর কিছু সে বলতে পারেনি।—তারপর পুলিশ এল, খানা-তল্লাসী হল, আমাকে কত জেরা করল। কিন্তু টাকার কথা, সুটকেশের কথা আমি বলি নি। ওরাও খুঁজে পেতে কোন সন্ধান পায়নি। কিন্তু আছে, সে টাকা এই বাড়ীতেই আছে। সুটকেশ-শুদ্ধ হয়তো কোথাও পোঁতা আছে। ছেলে আমার লুকিয়ে রেখেছে সে টাকা, লুকনোই আছে এখনও। আমি খুঁজি নি। পাপের টাকা—বামুনের বিধবা আমি, ছুঁলেও পাপ হবে।'

'রামজয়ের নামও আমি পুলিশের কাছে করিনি। ও নাম আমি আজ চৌদ্দ বছর ধরে ইষ্টমন্ত্রের মত গোপনে জপ করে আসছি। আমার ছেলে যে টাকা এ বাড়ীতে বয়ে এনেছে এমন কোন প্রমাণ পুলিশের হাতে ছিল না। কাজেই একবার খানাতল্লাসী শেষ করে আর তারা আসেনি। আর যে আসবে না তা আমি জানতাম। কিন্তু এও জানতাম যে তুমি আসবে—তোমাকে আসতেই হবে। —আর সেইদিন তোমাতে আমাতে বোঝাপড়া হবে।'

'ব্যাঙ্ক থেকে চুরি করা টাকা—একটা আধটা টাকা নয়, এক লাখ ষাট হাজার টাকা। আমার ছেলে তোমাকে তার ভাগ দেয়নি। তাই তাকে তুমি খুন করেছ। এখন সব টাকাটাই তোমার প্রাপ্য। তুমি জান, টাকা এই বাড়ীতেই কোথাও লুকানো আছে। —তুমি আসবে না তা কি হতে পারে? আমি ঠিক জানতাম, তুমি আসবেই।'

রামতারণের মাথাটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর পড়ে গেল। কিন্তু কানের কাছে সেই মৃদু-ভাষণের তরল বাহ্যস্রোত তখনও সমানে বয়ে চলেছে। রামতারণ কি সত্যই কোন কথা শুনছে? —না কথা শোনার স্বপ্ন দেখছে?

'তাই আজ চৌদ্দ বছর ধরে এই বাড়ীর টোপ ফেলে বসে বসে প্রতীক্ষা করেছি। জানি, তুমি আসবে—এ বঁড়শি তোমাকে গিলতেই হবে। কিন্তু তুমিও আচ্ছা খেলোয়াড় ছেলে বাবা। চৌদ্দ বছর ধরে গভীর জলে ঘাপ্‌টি মেরে আছ—সাড়াশব্দ কিচ্ছু নেই—এক একবার মনে হত তুমিও বোধ হয় মরে গেছ। কিন্তু আমার চৌদ্দ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষা আজ সফল হয়েছে—ছ' হাজারের ভাঙ্গা বাড়ী যে সতেরো হাজারে কিনতে রাজি আজ তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েছি।'

'এই তোমার বাড়ী থাকল, বাড়ীর মধ্যে এক লাখ ষাট হাজার টাকা থাকল, আর থাকলে তুমি। এইবার খুঁজতে থাক—সময়ের জন্য আর কোন তাড়া নেই, অনন্তকাল ধরে খুঁজতে থাক। তোমার হকের টাকা, যখ হয়ে আগলে থাক।—আমার বাড়ীর হাঙ্গামা চুকল, এইবার আমার ছুটি।'

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের ধ্বনি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

[গাড়োয়ান ইদ্রিস মিঞার এজাহার থেকে]

......বাবুটা পাগলা ছিল। দুঘণ্টা ধরে বাজারে, কাছারীতে ঘুরিয়ে মারল—তা না করল কোন সওদা, না করল কারও সঙ্গে দেখাশোনা। শুধু শুধু একবার বলে ইদিকে যা, একবার বলে উদিকে যা। স্টেশনে ফেরার পথে ঐ বাড়ীটার সামনে গাড়ি থামিয়ে হন্‌হন্ করে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল। কত বললাম, 'ও বাড়ীতে কেউ নেই, পড়ো বাড়ী, ওখানে যেও না বাবু' তা আমার কোন কথা কানেও তুলল না। বাবু তো এখন মরে খালাস—শুধু এই গরীবের এক-বেলার ভাড়া তিন তিনটে টাকা নাহক্ মাঠে মারা গেল।......

[ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে]

.....ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রকাশ যে, রামতারণ শীলের মৃত্যুর মধ্যে সন্দেহজনক কিছুই নেই। তাঁর রক্তের চাপ বরাবরই খুব বেশি ছিল বলে মনে হয়। হঠাৎ কোন কারণে মস্তিষ্কের শিরা ছিঁড়ে রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যু হয়েছে।...... পাকস্থলী পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে মৃত্যুর পূর্বে অন্তত ছয় ঘণ্টাকাল তিনি কোন খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেন নি......কিন্তু কেন তিনি বিনা কারণে ঐ জনমানবহীন পরিত্যক্ত বাড়ীটার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আমরা কারও কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারি নি।.....

[সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতার রিপোর্ট থেকে]

......রামতারণ শীলের মৃতদেহ যে বাড়ীর মধ্যে পাওয়া যায় চৌদ্দ বৎসর পূর্বে সেখানে একটা অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল।......এ বাড়ীতে বর্তমানে কেউ বাস করে না। বাড়ীর শেষ মালিক শ্রীমতী কাশীশ্বরী দেব্যা প্রায় তিন মাস পূর্বে পরলোকগমন করেছেন।......

অভিজাত

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

তুমি যেন পূর্ণচন্দ্র আপনার কলঙ্কে গর্বিত
প্রাসাদ মালঞ্চ কুঞ্জ তরুলতা ফলে ফুলে ভরি
স্বভাব কুলীন জাতি অকুলীনে এড়াতে চেষ্টিত
কালোরে ছুঁইলে পাছে কালো হয় অঙ্গের উত্তরী!

অমানুষে পূজা করে, মানুষেও স্তুতি করে কত
তোমাদের অভিমান কত বাড়ে তত হও ছোটো
উপাধি শৃঙ্খল পরি' দোলা আর ছোলাতেই রত
অনুপার্জিতের ভোগে ভাগ্যযোগে লক্ষ মজা লোটো।

আপাদমস্তকে তব গৌরব বাড়ায় বেশ ভূষা
উৎকর্ষে উৎসাহহীন নম্রতায় ন্যাকামির গুরু,
সম্ভ্রান্ত সম্যগ্‌ভ্রান্ত, পদাশ্রিতে পদাঘাত ঘুঁষা
মারো আর মনে কর, ঠিক কর (!) হে কুঞ্চিত ভুরু!

পাষাণ-মন্দির মাঝে বিরাজিছ বিরক্ত দেবতা
রঙ-করা পুতুলের মুখে সদা ঢং-করা কথা!

ইতিহাস

শিবদাস চক্রবর্তী

আজ তুমি ইতিহাস, নও শুধু কায়াময়ী স্মৃতি,
নও আর কল্পলোকে কামনার কায়িক বিস্তৃতি।
আজকে তোমাকে ঘিরে আদি-কৌতূহল অবসান,
জীবনের গল্পলোকে করি তাই তোমার সন্ধান।
সেদিন কবির চোখে রূপে গুণে ছিলে তিলোত্তমা,
এখন নিজেই তুমি অভিনব তোমার উপমা;
আজকের এই তুমি, সেদিনের 'তুমি'র বদলে,—
তরু-জীবনের যেন রূপান্তর, ফুল থেকে ফলে।
রূপের চাতুরী নেই, গন্ধের গৌরব অবসান,
গন্ধ আর রূপ মিলে করেছে রসের জন্মদান।
ভোজের আসরে তার না থাকে না থাক্ সমাদর,
জীবনের মরু-পথে তাই চির শক্তির নির্ঝর।
আজ তুমি ইতিহাস—সার্থক এ অভিধা তোমার,
আমার কাহিনী নিয়ে পরিপূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।
পদে পদে নানাবাধা, তবু আশা, তবু দীর্ঘশ্বাস,
বহু ব্যর্থ প্রয়াসের সাক্ষী তুমি—তুমি ইতিহাস।
কবি-কাহিনীর এই অনিবার্য ক্রম পরিণতি,
আজকে তোমার মাঝে খুঁজে ফেরে শৃঙ্খলা সংগতি।

আসা-যাওয়া

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কেন আসো মাঝেমাঝে কখনো অনেক দিন দেখাই দাও না
বুঝি না।

এক-একবার
কাবুলিওলার
মতো কেড়ে নাও সমস্ত পাওনা।

আবার কখনো অজস্র দানে
ভরে দাও আশ্বিনে অঘ্রাণে ফাল্গুনে।
ছয় ঋতু পৃথিবীর পেয়ালাকে দেয় পূর্ণ করে
বাতাসে, মেঘের সাজে, ফুলে-ফুলে, ঘাসের শিশিরে।

কিন্তু এক ফাঁক থাকে, তুমি না-আসার
মাঝার নিনিসুতোয় গাঁথা বিরহের হার।

সারা দিন সারা রাত ভেবে ভেবে ঠিকানা মেলে না
মনে হয় এই এলে বুঝি বা এলে না।

তোমার মায়াবী দেহ
রূপে রসে কামনার আবিরে সন্দেহ
স্পর্শ দিয়ে যায়
দক্ষিণ বাতাস আর চৈত্রের ঝরে-পড়া পাতায়-পাতায়।

একবার মনে হয় মুখ চিনি-চিনি
তোমার কঙ্কণ কিঙ্কিনি
যেন শুনেতে পাই।
আবার কখনো ফাঁকা, সবটা হারাই।।

প্রহরীকে

হাসিরাশি দেবী

এবার ঘুমাতে পার। এবার এ রাতের প্রহরে
ক্ষয়িষ্ণু তারার চোখে। দীর্ঘ অবকাশ
শেষ যদি হয়—হোক একটি নিশ্বাস
সাথে; দেহ আর আহত অন্তর
এবার ঢাকতে পার,—পেতে পার সুপ্তির আশ্বাস।

এবার ঘুমাতে পার। যে ঘুমের মিনতি দু'চোখে
মিলন আকুতি নিয়ে মুহূর্ত কাটায়
তা যদি সমাপ্ত হয়—হোক, আজ নির্ভাবনায়
সংকোচ-বিহীন-চিত্ত দিতে পার' ওকে
না ফিরিয়ে সংশয়ে—দ্বিধায়।

বহুকাল জেগে আছ, কালের নখর
রক্তাক্ত আঁচড়ে লিখে আপন স্বাক্ষর
রেখে গেছে বারবার; বিষে মাখা বাণ
তোমারই হৃদয় খুঁজে করেছে সন্ধান।

তবু যা পায়নি, তাই নীরব আশ্বাসে
আজ তাকে দিতে পার ক্ষমা আর প্রেমে,
এখন আকাশ ভরে মেঘ ভেসে আসে,
এবার ঘুমাতে পার'—কাজের পাহাড় থেকে নেমে।

কালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার

স্কেচ

নবজীবন সৃষ্টি রহস্য

ক্রোমোসোমের ভূমিকা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

পৃথিবীতে কখন কি ভাবে সর্বপ্রথম জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল, সে কথা কেউ জানে না। তবে এ কথা আজ আর কারোর অজানা নেই যে, সেই আদি জীবন থেকেই অগণিত বিচিত্র জীবন উদ্ভূত হয়ে পৃথিবীর সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন বিজ্ঞজনেরা জীবনের উৎপত্তি সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা পোষণ করতেন; এমন কি, স্বতঃজননে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যাও বড় কম ছিল না; কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বহুকাল পূর্বেই সে সব ধারণার অবলুপ্তি ঘটে। দেখা গেল জীবন থেকেই জীবনের উৎপত্তি সম্ভব --এ ছাড়া জীবনের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্য কোন পন্থাই নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে—জীব থেকে অনুরূপ জীবের উৎপত্তি হয় কেমন করে? জীবকোষে অবস্থিত ক্রোমোসোম নামক অদ্ভুত পদার্থগুলির কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলে জীব থেকে অনুরূপ জীবোৎপত্তির রহস্যের অনেকটা সন্ধান পাওয়া যাবে।

জীবনটা যে কি, সেটা অনুমান করা সম্ভব না হলেও জন্ম এবং মৃত্যু যে এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, সে সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ নেই। জীবন তার অনুরূপ জীবন সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকটি জীবনই মৃত্যুর অধীন। সমষ্টিগতভাবে জীবন অবশ্য মৃত্যুকে এড়িয়েই চলেছে। অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থায় আদি-জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয়ে থাকলেও সেই প্রাকৃতিক শক্তির প্রতিকূলতাই তাকে অহরহ নিষ্পেষিত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আদি সৃষ্টি থেকেই জীব এক থেকে ক্রমশঃ বহু রূপে ধারণ করে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে মৃত্যুর বিরুদ্ধে তার জয়যাত্রা অব্যাহত রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে। ব্যষ্টিগতভাবে এতে সাময়িক ঊর্ধ্বাধঃ গতি লক্ষিত হলেও সমষ্টিগতভাবে এই জয়যাত্রার বিরাম নেই। প্রজ্বলিত ক্ষুদ্র বর্তিকা থেকে যেমন অনন্ত-কোটি বর্তিকা প্রজ্বালিত করা যায়, এই জীবন-প্রবাহও তেমনি সেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আদি জীব থেকে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন পথে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে তার বিজয় পতাকা উড্ডীন রেখেছে।

নিষ্ক্রিয়ের পক্ষে জীবনধারণ সম্ভব নয়—তাকে সক্রিয় হতেই হবে। সক্রিয়তার ফলে দেহ-যন্ত্রের ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী এবং চূড়ান্ত ক্ষয়ের ফলেই মৃত্যু-কবলিত হতে হয় (অবশ্য মৃত্যুর কথাই বলা হচ্ছে)। এই ক্ষয় প্রতিরোধ করে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। কাজেই মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে ব্যষ্টিগতভাবে জীবনপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বিত হয়েছে। দেহ-যন্ত্রের ক্ষয় আরম্ভ হবার পূর্বেই তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার জন্যে জীব তার অনুরূপ এক বা একাধিক নবজীবন সৃষ্টি করে যায়। বংশানুক্রমিকভাবে এরূপ নবজীবন সৃষ্টির ব্যাপারটা যে কিরূপ রহস্যপূর্ণ, সে কথা সহজেই অনুমেয়।

এক সময়ে ধারণা ছিল—পরিণত জীবের সর্ববিধ বৈশিষ্ট্যসহ সন্তান অতি সূক্ষ্মাকারে ভ্রূণরূপে প্রথমে মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয় এবং
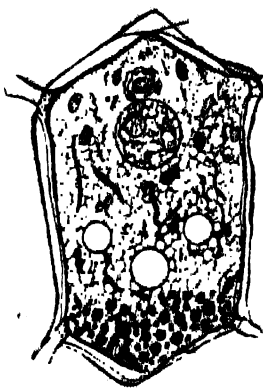
কোষের ভিতরকার বিভিন্ন পদার্থ। উপরের বড় গোলাকার পদার্থটি নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছোট গোলাকার জিনিষটি নিউক্লিওলাস। সাদা গোলাকার স্থানগুলি ভ্যাকুয়োল। লম্বা কালো পদার্থ-গুলি মাইটোকণ্ড্রিয়া। নীচের কালো বিন্দুগুলি প্যারাপ্লাষ্টিক পদার্থ।

কালক্রমে সেই সূক্ষ্ম ভ্রূণই বর্ধিতাকারে ভূমিষ্ঠ হয় মাত্র। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এই ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। যন্ত্র-সহযোগে প্রজনন-তত্ত্বের যে সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেগুলি অতীব কৌতূহলোদ্দীপক।

জীবজগতে অর্থাৎ উদ্ভিদ ও নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে নবজীবন সৃষ্টিতে অযৌন এবং যৌন—উভয় রকমের ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়। অনেক উদ্ভিদই কোরক, কন্দ, অঙ্কুর, গ্রন্থি বা বিচ্ছিন্ন শাখা-প্রশাখার সাহায্যে অযৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। অ্যামিবা, প্যারামিসিয়াম প্রভৃতি প্রাণীরা তাদের শরীর দ্বিধা বিভক্ত করে বংশবিস্তার করে। তা ছাড়া অপর কতকগুলি নিম্নস্তরের প্রাণীর দেহের খণ্ডিত অংশগুলি ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবে পরিণত হয়। যৌন প্রজননে পিতা এবং মাতা উভয়ের জৈবপঙ্ক মিলিত হবার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের যেমন বিভিন্ন দিকে উৎকর্ষতা লাভের সম্ভাবনা থাকে, অযৌন জননে তার সম্ভাবনা খুবই কম। যা হোক, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। যৌন প্রজননে ক্রোমোসোম নামক অতিসূক্ষ্ম, অদৃশ্য পদার্থের ভূমিকা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই বর্তমান প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য।

ক্রোমোসোম নামক বস্তুটা কি? সে কথা বলবার আগে দেহ গঠনের প্রধান উপাদান সেল বা কোষ সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। ইট যেমন গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ, সেল বা কোষও তেমনি উদ্ভিদ ও প্রাণীদের অপরিহার্য উপাদান। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের কোষের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য থাকলেও উভয়ের দেহই অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত। একক কোষকে আশ্রয় করেই আদি জীবন মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং এই কোষের আশ্রয়েই জীবন বহুরূপে বিকশিত হবার সুযোগ লাভ করেছে।

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে মাইক্রস্কোপের নীচে রবার্ট হুক খুব পাতলা এক টুকরা সোলার পর্দায় রবার্ট হুক মধুচক্রের গর্তের মত পরস্পর গাত্রসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য গর্ত দেখতে পান। এর পর অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যেও তিনি একই রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত বা কুঠুরীর সমাবেশ প্রত্যক্ষ করেন। এই কুঠুরীগুলিকেই বলা হয় সেল বা কোষ। প্রত্যেকটি কোষ শ্লেষ্মার মত এক প্রকার অর্ধতরল পদার্থে পরিপূর্ণ। এই পদার্থই প্রোটোপ্লাজম বা জৈবপঙ্ক নামে পরিচিত। সাধারণতঃ কোষগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, ২৫000 কোষ পাশাপাশি সাজিয়ে দিলে এক ইঞ্চির সমান হতে পারে। কলা, কচু প্রভৃতি কতকগুলি উদ্ভিদের কোষ অবশ্য অনেক বড় হয়ে থাকে। বৃদ্ধি সুরু হবার পূর্বে প্রত্যেকটি ডিম্বকে এক-একটি একক কোষ বলা যায়। উদরান্তস্তরের অতি পাতলা এক টুকরা পর্দা মাইক্রোস্কোপের নীচে রাখলে দেখা যাবে—ঢেউ-খেলানো সূক্ষ্ম বেষ্টনী রেখার দ্বারা পৃথকীকৃত কতকগুলি চ্যাপ্টা পাত পরস্পরের গাত্রসংলগ্ন ভাবে সজ্জিত রয়েছে। এই রেখাবেষ্টিত অংশগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি কোষ। আমাদের শরীরের মাংসপেশী, হাড়, যকৃৎ অথবা স্নায়ুসমূহের কোষের আকৃতি বিভিন্ন রকমের। দেখতে কোনটা গোল, কোনটা চ্যাপ্টা, কোনটা চৌকা, কোনটা বা সুতার মত, কোনটা বা তারকা চিহ্নের মত। আকৃতি যেমনই হোক, প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অগণিত কোষের সমন্বয়ে গঠিত। জীববিজ্ঞানে আধুনিক উন্নততর গবেষণার ফলে এমন সব অপূর্ব কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে, যার প্রয়োগে প্রত্যেকটি আণুবীক্ষণিক কোষকে বিচ্ছিন্নভাবে বহুকাল বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। বিচ্ছিন্ন কোষ অনুরূপ নতুন নতুন কোষ উৎপাদন করে সংখ্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এদের আনুপূর্বিক কার্যপ্রণালী পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। এখন দেখা যাক প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে কি কি পদার্থ রয়েছে।

প্রত্যেকটি কোষই জৈবপঙ্ক নামে শ্লেষ্মার

ত এক প্রকার পদার্থে পরিপূর্ণ একথা াগেই বলা হয়েছে। এই অর্ধতরল পদার্থের ধ্যে বিভিন্ন আকৃতির বহুবিধ পদার্থ দেখা ায়। মাইক্রস্কোপের শক্তি বাড়িয়ে দিলেই দেখা াবে জৈবপঙ্কের মধ্যে গোলাকার একটি পদার্থ রয়েছে। একে বলা হয় নিউক্লিয়াস বা ন্দ্রক। নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকের ঘনীভূত চ্ছ পদার্থকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম। মাই- স্কোপের আলো খানিকটা নিষ্প্রভ করে দিলে নিউক্লিয়াসের চেয়ে ক্ষুদ্রতর উজ্জ্বল বর্তুলের ত আরও কতকগুলি পদার্থ দেখা যাবে। এগুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তৈলবিন্দু মাত্র, সাইটো- প্লাজমের স্রোতের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ায়। এদের চেয়েও অসংখ্য ক্ষুদ্রকায় কণিকা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি রে। এসব বিভিন্ন রকমের কণিকা ছাড়াও অতি সূক্ষ্ম সূত্রবৎ কতকগুলি পদার্থ দেখা যায়। এগুলি সাপের মত এঁকে বেঁকে কোষের মধ্যে

কোষের অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের বিবরণ পূর্ববর্ণিত বৃত্তান্ত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। জীবের বৈশিষ্ট্য কেমন করে সন্তানে পরিচালিত হয়, সে কথা জানতে হলে নিউক্লিয়াস সম্পর্কেই একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হয়েছে—যাবতীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী একক কোষ থেকেই অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই একক জীবকোষ একটি ভেঙে দুটি, দুটি ভেঙে চারটি, চারটি ভেঙে আটটি হয়েছে এবং এভাবে উৎপাদিত অগণিত কোষের সমন্বয়ে আমাদের শরীর গড়ে উঠেছে। এরূপ একটি কোষ থেকে নতুন কোষ উৎপন্ন হবার সময় কিরূপ ব্যাপার ঘটে?

মাইক্রস্কোপের নীচে একটি জীবন্ত কোষ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে—নিউক্লিয়াসটি এক বা একাধিক ভ্রাম্যমাণ নিউক্লিওলাসসহ উজ্জ্বল একটি গোলাকার পদার্থের মত প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু উক্ত কোষ থেকে আর একটি নতুন কোষ জন্মাবার পূর্ব মুহূর্তে নিউক্লিওলাস- দুটি সক্রিয় কেন্দ্র আবির্ভূত হয়। ধীরে ধীরে এই দুটি প্রান্তবিন্দুকে সংযুক্ত করে দুটি চুম্বক-মেরুর মধ্যস্থিত শক্তিরেখার মত মধ্যস্থল স্ফীত হয়ে কতকগুলি ধূসর বর্ণের অস্পষ্ট রেখা আত্মপ্রকাশ করে। ক্রোমোসোমগুলি তখন ধীরে ধীরে এই স্ফীত স্থানে একত্রিত হতে থাকে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে কণিকার আবির্ভাবের পর থেকে মধ্যস্থলে সমবেত হওয়া পর্যন্ত প্রায় আটমিনিটের মত সময় অতিবাহিত হয়। কোষটির দ্বিধা-বিভক্ত হবার ব্যাপারে এটিই হলো প্রাথমিক প্রক্রিয়া। ক্রোমোসোমগুলি মধ্য-স্থলে উপনীত হবার পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে কোষ-বিভাজনের কাজ সুরু হয়। তখন দেখা যায়, প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম-দণ্ড লম্বালম্বি দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ছে এবং বিভাজিত অংশগুলি সমান সংখ্যায় কোষের উভয় প্রান্তস্থিত কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ক্রোমোসোমের
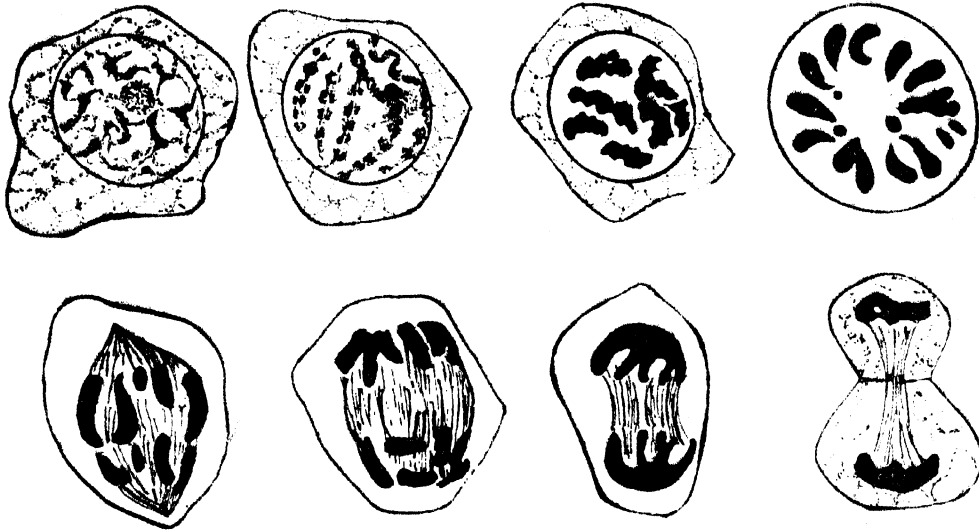
ক্রোমোসোম বিভাজনের পর্যায়ক্রমিক দৃশ্য। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে—প্রথমটি নিউক্লিয়াসে ক্রোমোসোমের আকৃতি পরিগ্রহ করবার পূর্বাবস্থা। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম পর্যন্ত ক্রোমোসোম বিভাজনের বিভিন্ন অবস্থা। অষ্টমটিতে দুটি কোষ উৎপত্তির দৃশ্য।

ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। মাইক্রস্কোপের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে দেখা যাবে কোন কোন সূত্র দু-ভাগে ভেঙে যাচ্ছে, আবার কখনও কখনও দুটি সূত্র পরস্পরের প্রান্তভাগে সংযুক্ত হয়ে একটি অখণ্ড সূত্রে পরিণত হচ্ছে। এরা কিন্তু সাইটোপ্লাজমের স্রোতের সঙ্গে পরি- চালিত হয় না। এদের গতিবিধি স্বতঃপ্রণোদিত বলেই মনে হয়। এই পদার্থগুলি মাইটোকণ্ড্রিয়া নামে পরিচিত। নিউক্লিয়াসের এক প্রান্তে টুপির মত একটু উঁচু স্থান দেখা যায়। এটাকে বলা হয় সেণ্ট্রোস্ফিয়ার। সূত্রাকার পদার্থগুলি সম্ভবতঃ ঐ স্থান থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে, কারণ সেগুলিকে ঐ জায়গা থেকেই কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। মাইক্রস্কোপের শক্তি বাড়িয়ে দিলে নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে এক বা একাধিক বিন্দুবৎ অস্বচ্ছ পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলিকে বলা হয় নিউ- ক্লিওলাস। এরা অনবরত তাদের আকৃতি আয়তন ও অবস্থান স্থান পরিবর্তন করে।

গুলি ক্রমশঃ অদৃশ্য হতে থাকে। এর কিছুক্ষণ পরেই সেই স্থানটি ধূসর বর্ণের এক ঝাঁক অস্পষ্ট কণিকায় ভর্তি হয়ে যায়। এই কণিকা-গুলি ক্রমশঃ একত্রিত হতে থাকে এবং পরস্পরের সংসংলগ্ন হয়ে কতকগুলি সূক্ষ্ম সূতোর আকার ধারণ করে। সূত্রগুলির কোনটা বড়, কোনটা ছোট এবং সেগুলি পরস্পর জড়াজড়ি করে কিলবিল করতে থাকে। কিছুক্ষণ কিলবিল করবার পর গতিবেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে আসে এবং সূত্রগুলি ধীরে ধীরে স্থূলাকার হয়ে দণ্ডের আকার ধারণ করে। এই পদার্থ-গুলিকেই ক্রোমোসোম বলা হয়। অতি সূক্ষ্ম অণুবীক্ষণিক পদার্থ হলেও এরা জীবদেহের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সঞ্চরণকারী ক্রোমো-সোম সূত্রগুলি স্থূল দণ্ডে পরিণত হবার সময়েই নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকের আবরণীটি ভেঙে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে এর ভিতরকার পদার্থগুলি সাইটোপ্লাজমের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদেই কোষটির দুই প্রান্তে

অর্ধাংশগুলি সমান সংখ্যায় দুই দলে বিভক্ত হয়ে কোষের দুইপ্রান্তে জমায়েত হয়। ইতিমধ্যে কোষটিও ক্রমশঃ লম্বাটে হতে থাকে। এই সময়ে কোষটির চতুর্দিকে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে দেখা যায়। উত্তপ্ত পিচে বুদ্বুদ উঠবার মত কোষটির বহিরাবরণের চতুর্দিকে ছোট ছোট কতকগুলি বুদ্বুদ ঠেলে বের হতে থাকে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভিতরে ঢুকে যায়। প্রায় মিনিট পাঁচ-ছয় পর্যন্ত এই ব্যাপার চলতে থাকে। তারপর হঠাৎ কোষটির মধ্যভাগে একটা খাঁজ পড়ে ক্রমশঃ সেটা গভীর হতে থাকে এবং অবশেষে দুটি খণ্ডে পৃথক হয়ে পড়ে। পৃথক হবার পর সংযোগ-সূত্রটি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত পরস্পর পরস্পরের নিকট থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকে। বিচ্ছিন্ন বা একক কোষের পক্ষেই এরূপ সরে যাওয়া সম্ভব; কিন্তু অবিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সংঘবদ্ধ কোষের মধ্যে পাতলা পর্দা আবরণ গঠন করে পৃথক হলেও পরস্পরের গা সংলগ্নভাবেই অবস্থান করতে বাধ্য হয়। যা হোক

ইতিমধ্যে ক্রোমোসোমগুলির চতুর্দিকে পুনরায় একটি সূক্ষ্ম পর্দার আবরণ গঠিত হয়ে নতুন নিউক্লিয়াস গড়ে ওঠে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, নিউক্লিয়াসের আবরণ গঠিত হবার পর
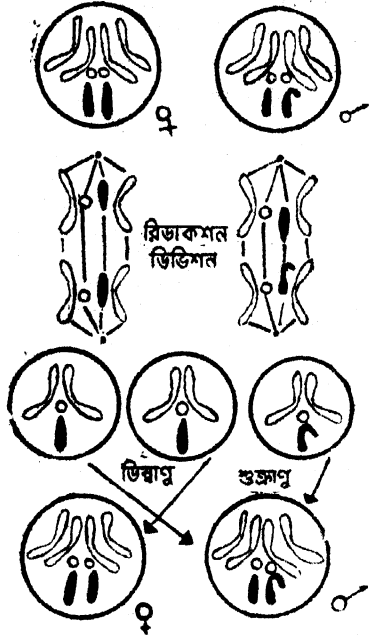
স্ত্রী ও পুরুষ ফল-মাছি ড্রসোফিলার স্ত্রী ও পুরুষ বীজকোষ উৎপাদনে ক্রোমোসোমের বিভক্ত হবার প্রণালী।

ক্রোমোসোমগুলি আবার অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। সেগুলি ক্রমশঃ স্ফীত হতে হতে পরিশেষে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হয়ে যায়। মোটের উপর কোষগুলি বিভক্ত হবার সময় ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় ক্রোমোসোম দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্ভব নয়। কোষ-বিভাজনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে বলা হয় "মাইটোসিস" (Mitosis)। এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে এবং নিউক্লিয়াসের পুনর্গঠনের জন্যে এক ঘণ্টা থেকে দু-ঘণ্টারও বেশী সময় লাগতে পারে। প্রত্যেক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য নির্ধারক জিন নামক কতকগুলি অদৃশ্য পদার্থ ক্রোমোসোম সূত্রে পর পর সুবিন্যস্ত থাকে। কাজেই ক্রোমোসোমগুলি দ্বিধা-বিভক্ত হলেও তাদের বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।

আমাদের দেহবৃদ্ধির কারণ হচ্ছে—অসংখ্য নতুন নতুন সূক্ষ্ম কোষের উৎপত্তি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ক্রোমোসোমগুলি দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে নতুন নতুন কোষ উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় না হয় কোষের অনুরূপ কোষ উৎপন্ন হলো; কিন্তু ভ্রূণের উৎপত্তি হয় কেমন করে? তাছাড়া, স্ত্রী-পুরুষ মিলনেরই বা কি প্রয়োজন? বিভিন্ন জাতের প্রত্যেকটি জীবের প্রত্যেকটি দেহকোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। যেমন প্রত্যেকটি মানুষের দেহকোষে ২৪ জোড়া অর্থাৎ ৪৮টি, প্রত্যেকটি ইঁদুরের দেহ-কোষে ২০ জোড়া অর্থাৎ ৪০টি এবং প্রত্যেকটি ফল-মাছির (Drosophila) ৪ জোড়া অর্থাৎ ৮টি করে ক্রোমোসোম থাকে। এর মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে বিভিন্ন প্রাণীর দেহকোষে যত জোড়া ক্রোমোসোমই থাক না কেন, কেবল পুরুষের ক্ষেত্রে এক জোড়া বাদে অন্যান্য জোড়াগুলি অনেকাংশই প্রায় এক রকম। স্ত্রী-ফলমাছির চার জোড়া ক্রোমোসোম পৃথক আকারের হলেও প্রত্যেকটি জোড়ার একটি অপরটির অনুরূপ। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এক জোড়ার একটি ক্রোমোসোমের মুখ বঁড়শীর মত বাঁকানো। এই জোড়াটিকে পুরুষত্ব-জ্ঞাপক ক্রোমোসোম (Sex Chromosome) বলা হয়। বৈজ্ঞানিক সাঙ্কেতিক ভাষায় একে বলা হয় X Y ক্রোমোসোম। স্ত্রী-মাছির খর্বাকার দণ্ডের মত ক্রোমোসোম দুটিকে স্ত্রীত্ব জ্ঞাপক x x ক্রোমোসোম বলে। অবশ্য পাখী, প্রজাপতি প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটনা লক্ষিত হয়। এদের স্ত্রীদের ক্রোমোসোম X Y, কিন্তু পুরুষদের ক্রোমোসোম X X।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সাধারণ কোষগুলি বিভাজিত হবার সময় নিউক্লিয়াসের মধ্যে সূত্রবৎ কতকগুলি পদার্থ আবির্ভূত হয় এবং নিউক্লিয়াসের বেষ্টনী ভেঙ্গে সেগুলি কোষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রগুলি ক্রমশঃ কোষের মধ্যস্থলে টাকুর মত স্ফীত স্থানটিতে এসে সজ্জিত হয়। তারপর প্রত্যেকটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বি দু-ভাগে বিভক্ত হবার পর অর্ধাংশগুলি কোষের দুই প্রান্তে জমায়েৎ হয়। কিছুক্ষণ পরে উভয় প্রান্তের মধ্যস্থলে পর্দার আবির্ভাবে কোষটি দুটি পৃথক কোষে পরিণত হয়। এভাবে বিভক্ত হবার ফলে দুটি কোষের মধ্যে একই রকমের ক্রোমোসোম বিদ্যমান থাকে। সুতরাং নতুন নতুন যত কোষেরই সৃষ্টি হোক না কেন, তাদের ক্রোমোসোমের সংখ্যা অথবা গুণাগুণের কোনই তারতম্য ঘটে না। এভাবে ক্রমবৃদ্ধির ফলে জীবদেহ যখন পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়, তখন পুংদেহে শুক্রাণু এবং স্ত্রীদেহে ডিম্বাণু নামে দুই প্রকার অভিনব কোষের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। কিন্তু এই অভিনব কোষগুলি উৎ-পন্ন হবার সময় ক্রোমোসোম বিভাজনের পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। এই ক্ষেত্রে ক্রোমোসোম সূত্রগুলি নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়ে কোষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বার পর একসঙ্গে মধ্যস্থলে সমবেত হবার পরিবর্তে একই রকম আকৃতিবিশিষ্ট দুটি করে একসঙ্গে জোড়া বাঁধতে থাকে। জোড়া বাঁধার পর সেগুলি কোষের মধ্যস্থলে এক জোড়ার নীচে আর এক জোড়া—এভাবে পর পর সজ্জিত হয়। এখন পূর্বোক্ত নিয়মে প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমের দ্বিধাবিভক্ত হবার কথা। কিন্তু সেরূপভাবে বিভাজিত না হয়ে প্রত্যেকটি জোড়া ভেঙ্গে পুনরায় তারা কোষের উভয় প্রান্তে সমবেত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কোষটির মধ্যস্থলে খাঁজ পড়ে ক্রমশঃ সেখানে পাতলা পর্দার উদ্ভব ঘটে। অবশেষে এই নবনির্মিত কোষ প্রধান কোষ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ক্রোমোসোম বিভাজনের এই রীতিকে বলা হয়—Reduction division এবং এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় মায়োসিস (Meiosis)। এই Reduction division-এর পর পূর্বোক্ত নিয়মে পুনরায় মাইটোসিস হয়ে কোষগুলি দ্রুত সংখ্যায় চতুর্গুণ বর্ধিত হয়। মায়োসিসের ফলে নবনির্মিত প্রত্যেকটি কোষে নির্দিষ্ট সংখ্যার মাত্র অর্ধেক ক্রোমোসোম থাকে। যেমন—মানুষের দেহকোষে ৪৮টি ক্রোমোসোম আছে, কিন্তু মায়োসিসের ফলে উৎপন্ন কোষে থাকে ২৪টি। এই কোষগুলিকে বলা হয় বীজকোষ। বীজকোষ বলতে শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ উভয়কেই বোঝায়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় দেহকোষকে বলা হয় জাইগট (Zygot), আর বীজকোষকে বলা হয় গ্যামিট (Gamete)। নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক ক্রোমোসোম সমন্বিত গ্যামিটকে হ্যাপ্লয়েড (Haploid) এবং তার দ্বিগুণিত অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যক ক্রোমোসোম সমন্বিত জাইগটকে ডিপ্লয়েড (Diploid) বলা হয়। মোটের উপর সাধারণ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ডিপ্লয়েড; কিন্তু পুরুষের শুক্রকোষ (Sperm) ও স্ত্রীদের ডিম্বকোষ (Ovum) উভয়েই হ্যাপ্লয়েড।

এখন দেখা যাক, শুক্রকোষ ও ডিম্বকোষ মিলিত হবার পর কিরূপ ব্যাপার ঘটে। সি আর্চিন নামক এক প্রকার সামুদ্রিক প্রাণীর কথা বলছি। কারণ মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এদের এই ব্যাপারটার আগাগোড়া অতি সহজেই দৃষ্টি-গোচর হয়ে থাকে। ব্যাঙের ডিমেও এই ব্যাপারটা

তারামাছের ডিম্বাণু নিষিক্ত হবার পর্যানুক্রমিক দৃশ্য।

দেখা যেতে পারে, কিন্তু ডিমগুলি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ নয় বলে শেষ পর্যায়গুলি অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। যা হোক, ডিম পাড়বার সময় হলে কতকগুলি সি-আর্চিনের খোলা ভেঙে স্ত্রী ও পুরুষগুলিকে আলাদা করে হাতের কাছে প্রস্তুত রাখতে হবে। স্ত্রী-প্রাণীটার পেটের ভিতর থেকে কতকগুলি ডিম বের করে চ্যাপ্টা একটা কাচের পাত্রে রাখলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত পাত্রের তলায় একস্তরে সমানভাবে অবস্থান করবে, পুরুষ প্রাণীটার পুং-কোষ থেকে দুধের মত সাদা এক ফোঁটা রস টেস্ট টিউবে নিয়ে তাতে খানিকটা সমুদ্রজল মিশিয়ে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে নিতে হবে। ঝাঁকুনির ফলে শুক্রকোষগুলি জলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। ঐ জলের পাঁচ ছয় ফোঁটা কাচপাত্রের ডিমগুলির উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। ঐ পাঁচ ছয় ফোঁটা জলের মধ্যেই এত শুক্রকীট থাকবে যে সবগুলি ডিম নিষিক্ত হবার পরেও অনেকগুলি উদ্বৃত্ত থেকে যাবে। এখন ডিম সমেত পাত্রটিকে মাইক্রস্কোপের নীচে রাখলে এক অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হবে। মাইক্রস্কোপের নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিমগুলিকে ধূসর বর্ণের কতকগুলি বড় বড় গোলকের মত দেখাবে, আর দেখা যাবে, ব্যাঙাচির মত লেজওয়ালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য শুক্রকীট সেই গোলকগুলিকে ঘিরে কিলবিল করছে। মনে হবে, ডিম্বকোষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েই যেন কীটগুলি তাদের গায়ে ঢু মারবার জন্যে ছুটে যাচ্ছে। কোন একটি শুক্রকীট ডিম্বাণুটির একটি বিশেষ স্থান স্পর্শ করবামাত্রই সেই স্থান থেকে একটি বুদ্বুদ উঠে কীটটিকে ভিতরে শোষণ করে নেয়। কীটের মস্তকটি ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই ডিম্বাণুর চতুর্দিকে অতি সূক্ষ্ম একটি পর্দার আবরণ আত্মপ্রকাশ করে। এই পর্দার আবরণ ভেদ করে অন্য কোন কীট আর ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। ডিম্বাণুর যা প্রয়োজন, সে তা পেয়ে গেছে—কাজেই অন্য কীটগুলিকে ঠেকিয়ে রাখা প্রয়োজন। সেগুলিকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যেই এই পর্দার উৎপত্তি। কীটের মস্তকটিই মাত্র ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করে। লেজটি আঁকাবাঁকাভাবে কিছুক্ষণ বেষ্টনীর বাইরে থাকবার পর বিনষ্ট হয়ে যায়। মস্তকটিকে ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছে দেওয়াই লেজের কাজ। সে কাজটি সম্পন্ন হবার পর তার আর কোন প্রয়োজন নেই।

উপরে মানুষের ২৪ জোড়া ও নীচে ইঁদুরের ২০ জোড়া ক্রোমোসোমের চিত্র

মস্তকটি ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করবার পর এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে। জাপানী ফুলের খেলনা অনেকেই দেখেছেন। সামান্য একটুকরা শুষ্ক পদার্থ এক গ্লাস জলে ফেলে দিলে সেটা ক্রমশঃ ফুলে উঠে সুদৃশ্য লতা-পাতা-ফুল-ফলের আকার ধারণ করে। শুক্রকীটের মস্তকটিও তেমনি ডিম্বাণুর ভিতরে প্রবেশ করবার পর ধীরে ধীরে ফুলতে থাকে। শুক্রকীটের মস্তকটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি নিউক্লিয়াস মাত্র। গতায়াতের সুবিধার জন্যেই অতি সংকুচিত অবস্থায় ছিল। ডিম্বাণুরও একটি নিউক্লিয়াস থাকে। আগন্তুক শুক্রকীটের মস্তক অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটি পরিপূর্ণরূপে স্ফীত হয়ে ডিম্বাণুর নিজস্ব নিউক্লিয়াসটির দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং মধ্যস্থলে উভয়ে সম্মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। কাজে কাজেই মিলিত হবার পর নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ অর্ধসংখ্যক ক্রোমোসোমগুলি দ্বিগুণিত হয়ে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত হয়; অর্থাৎ মিলনের ফলে বীজকোষ পুনরায় দেহকোষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই মিশ্র নিউক্লিয়াসের অর্ধেক ক্রোমোসোম পিতার এবং বাকী অর্ধেক মাতার। হ্যাপ্লয়েড ডিম্বকোষটি এভাবে নিষিক্ত হবার পরক্ষণেই ডিপ্লয়েডে পরিণত হয় এবং ডিপ্লয়েডভাবেই ভ্রূণ থেকে পরিণত অবস্থা পর্যন্ত বাড়তে থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে—পুরুষের কোষে পুরুষত্ব জ্ঞাপক—X Y এবং স্ত্রী কোষে স্ত্রীত্বজ্ঞাপক X X ক্রোমোসোম থাকে। মায়োসিসের পর শুক্রকোষের কতকগুলিতে থাকে X এবং কতকগুলিতে থাকে Y এবং ডিম্বকোষের প্রত্যেকটিতেই থাকে X। অতএব X শুক্রকোষ X ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হলে নবসৃষ্ট ভ্রূণ হবে X X অর্থাৎ স্ত্রী এবং Y শুক্রকোষ X ডিম্বকোষের সঙ্গে মিলিত হলে ভ্রূণ হবে X Y অর্থাৎ পুরুষ। নবজীবন সৃষ্টিতে মোটামুটি এই হলো ক্রোমোসোমের কার্যপ্রণালী। অবশ্য বিভিন্ন প্রাণী-সম্পর্কিত জটিলতাও অনেক আছে, এস্থলে সে বিষয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

লোলিটা

শ্রীমতী বাণী রায়

লোলা সময় পায় না মোটে।

একদা নিম্নবিত্ত পিতার সন্তানরূপে সে যখন জন্মগ্রহণ করেছিল তখন তার নাম ছিল লীলা। একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখল পিতার বাড়ী ও গাড়ী। ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়ে নামটি পাল্টাল সে —"নাম রেখেছি লোলা।"

লোলা নামানুযায়ী কর্ম হল। জীবনের বিন্যাস ওই নামেরি পাকে পাকে। যেমন আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ তরুণী দেখা যায় সমাজের উচ্চস্তরে তেমনি দেখা দিল লীলা 'লোলা' রূপে।

এম-এ পাশ করে সে বসল বাড়ী আলো করে। বর্তমান যুগপরিধিতে সাধারণ এম-এ পাশের মূল্য এত অধিক নয় যে বিশেষ উচ্চপদ লাভ হবে। তাই লোলা গৃহে বসে পুরোপুরি সোসাইটি গের্ল হল।

তবু লোলা সময় পায় না।

নিদ্রাভঙ্গ আটটার পরে। চা-সংবাদপত্র ইত্যাদি নয়টা পর্যন্ত। অতএব সুদীর্ঘ স্নান-পর্ব। তারপরে প্রায়শঃ শপিং বা বন্ধুবান্ধব, কিম্বা সমাজসেবামূলক কাজকর্মের প্রস্তুতি ও আয়োজন। এর মধ্যে টেলিফোনে কথাবলা, চিঠিলেখা আছে। একটায় লাঞ্চ। তিনটে পর্যন্ত অন্য প্রোগ্রাম না থাকলে বিশ্রাম। তখন বিউটি-স্লীপ ও নভেল পাঠ। সন্ধ্যা প্রত্যহ রঙীন। নিদ্রা প্রায় একটা রাত্রে।

করে দিন কাটে—বসন্ত দিনে ফুল-হয়। প্রথম গ্রীষ্মে ফুল ঝরে। কিন্তু ম না আষাঢ়।

কোন ভোজের আসরে একজন তরুণ সাংবাদিকের সঙ্গে আলাপ হল। নাম হলেও ঠিক ওই সার্কেলের লোক নয় সে ব্যক্তি। গেঁয়ো স্বাদ গায়ে মাখা।

অল্প বয়স তার, লোলার থেকে অবশ্যই ছোট। চোখে গভীরতা, অধরে তারুণ্য। প্রশস্ত ললাটে তার এখনও দীপ্তির ছাপ। প্রত্যেক দিনের একঘেয়েমীর মধ্যে পথচলার আঘাতে সে দীপ্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়—যাবেও একদিন।

খাবার টেবিলে ভয়ে ভয়ে চলছে সে। এদিক-ওদিক চেয়ে আনাড়ি হাতে মাছের ছুরী, মাংসের ছুরী বেছে বেছে সন্তর্পণে তুলছে। সামনে তার জীবন্ত আধুনিকতা লোলা রায়।

ফ্রুট-স্যালাডে চামচে ডুবিয়ে লোলা স্থির সোজা লক্ষ্যে তাকাল তার দিকে। সারাক্ষণ ওই দুটি চোখের লক্ষ্য হয়েছিল লোলা। এবার লক্ষ্যকে লক্ষ্যভেদ করল।

লোলা পুরুষদৃষ্টি পূজায় অভ্যস্ত। কারণ রূপ না থাকলেও দীপ্তি ছিল লোলার। কিন্তু সেই পূজা শাসিতরূপে প্রকাশ। পূজার যুগ চলে গেছে এখন। তবু বহু যুগের ওপার থেকে চিরন্তন পূজা বিংশ শতাব্দীর জর্জরিত বক্ষে ফিরে এল বুঝি।

খাবার পরে পানীয় গ্লাস হাতে পায়ে-পায়ে চলে এল তরুণ। চেখে চেখে সুরাপানের মত কাপ্তেন নয় সে। একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে। অথচ ঈষৎ হলুদ পানপাত্রের ওপরে চোখে তার নীলাভ আকাশ—সেখানে ছায়া পড়েছে লোলার।

রুক্ষাভ বাদামী চুলের গোছা আস্তে আস্তে রুপালী হাত দিয়ে পান্ডু দার্জিলিংয়ের মত কপালের পাশ থেকে সরাল লোলা। সোফার হাত রেখে বলল, "বসুন না।"

গ্লাস নামিয়ে রেখে সঙ্কুচিত তরুণ সন্তর্পণে লোলার পাশে বসল। চুল তার এখনও আঙ্গুরের গুচ্ছের মত। বাতাস বইলে হয়তো সেই চুলের বাসা এলোমেলো হয়ে যায়। হয়তো বা সেখানে পলাতক কোন পাখী নামতে পারে। চুলের আড়ালে চঞ্চু তার ডুবে যায়। আবার পাখীর বাসা সেখানে বাঁধা হয়।

শীতের দিনে সে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এসেছে। একটা হলদে সাল পিঠের ওপর এলানো। শালের গাঢ় বাদামী রঙের লাল কাজগুলো এখন উজ্জ্বল নয় আর। হয়তো অনেকদিন আগের বস্তু।

লোলা চোখ নামিয়ে বসে রইল। গাঢ় ছাই রঙের শাড়ীটি টেনে কাঁধের ওপার দিয়ে নামিয়ে আনল। হঠাৎ বুঝি শীত শীত করছে। চোখের পল্লব দীর্ঘ লোলার। কিন্তু এখন সেখানে অন্ধকার ছায়া। জীবনে বুঝি বিষাদ ওর চোখের পল্লবগুলো অমন কালো করেছে।

সোসাইটি গের্ল-এর একঘেয়ে জীবন বোধহয় অনেকদিন হয়েই গেছে।

"আপনার পুরো নামটি জানতে ইচ্ছে হয়।"

"আমার নাম লোলা রায়।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন গান বেজে উঠল। তরুণের কণ্ঠে সুর জেগে উঠল ঘরের সামান্য সাধারণ পরিবেশে। সেই সুর হ্যাট-র‍্যাকে—সেই সুর ডিভানের গায়ে।

"লোলা? বা, বা! লোলা! লোলা—ললিটা!"

লোলা চমকিত হল। নবোকভের নায়িকার সঙ্গে তার নামের মিল আগে কেউ দেখেনি।

টুক্ টুক্ পি-আনোর ঝঙ্কারের মত টুকটুক করে আল্‌গা-আল্‌গা সুর বেজে বেজে একটা গান আবার লোপ হয়ে গেল। তারই রেশ বাজতে লাগল এখানে ওখানে।

পার্ক ষ্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় বসে লোলা বলে উঠল, "কেন যে চা খাওয়াতে নিমন্ত্রণ করলেন, বুঝলাম না।"

কাঁপা-ভাঙা গলায় সম্বরণ বলল, "ইচ্ছে হয়েছিল, তাই!"

চা ঢেলে নিয়ে বাঁ হাতে স্যাণ্ডউইচ-এ কামড় লাগাল লোলা। আস্তে ফুলকাটা রুমাল বার করে ঠোঁট মুছল। ঠোঁটের রং আর নখের রং ডালিমফুলী। আজ শাড়ীখানাও তার জয়পুরী—হাল্কা রংয়ের ডালিম সে শাড়ীর গায়ে গায়ে ফেটেছে। নিজের নিভন্ত দিনে একটা রংয়ের পাড় বসাতে চেয়েছে লোলা! অনেক দেখার শ্রান্তিতে শ্রান্ত চোখের তারায় রং জ্বালার বাসনা তার।

"আপনার পরিচয়ের মধ্যে জানলাম শুধু আপনি 'দিগন্ত' পত্রে আছেন।"

"ওই সমস্ত পার্টিতে আমি যাবার ছাড়পত্র পাই না। সেদিন হঠাৎ ওপরের সকলেই অন্যত্র আবদ্ধ ছিলেন—তাই আমাকে যেতে হয়।"

বাঁকা চোখে চেয়ে দেখল লোলা। বেশ-ভূষায় সাধারণ ছাপ। এত দামী চা-ঘরে ডাকা তার পর্যায়ের লোকের পক্ষে উচিত হয়নি।

এ কে, উদ্বাহু বামন কিম্বা চালিয়াৎ?

অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মিথ্যাবাদীর কপট পরিচয়ে ও কি লোলার সমাজপরিধির দিকে হাত বাড়াচ্ছে?

"কিন্তু লোকের অন্য পরিচয়ও তো থাকে?" লোলা কথা টেনে নিয়ে গেল।

"কি পরিচয় চান আপনি?" হাসিমুখে সম্বরণ জিজ্ঞাসা করল।

"পরিচয় সামাজিক আছে, পারিবারিক আছে, সাংস্কৃতিক আছে।"

"সামাজিক, নিম্নমধ্যবিত্ত"—ভীরু গলায় বলে চলল সম্বরণ, পারিবারিক, বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের ছেলে। একান্নবর্তী পরিবারের নাম শুনে আজকাল লোকে ভয় পায়। সাংস্কৃতিক, বিশেষ কিছুই নয়। আপনার কাছে মিথ্যা বলব না, এম-এটা পাশ করিনি। তবু তো আপনাকে খুঁজে বার করলাম।"

এ কী ভাষা! সোজা-সহজ। কিন্তু দৃঢ়-প্রত্যয়শালী। বিমনা হয়ে লোলা ছোট টেবিলটায় চোখ নামিয়ে রইল। নবোকভের ললিটা সে নয়—হবেও না কোনদিন। তরুণ কিশলয় বয়স বহুদিন পার হয়ে গেছে। পাপের হস্তলিপি হয়ে কালের বুকে ফুটে উঠতে সে সুযোগ পায়নি। সাধারণ নারীর যা চাহিদা, তারও তাই।

ইতস্তত করে সে বলল, "বাড়ীতে কে কে আছেন?"

"মা, দাদারা, কাকারা, আর আমি। সকলেরি নিজস্ব একটি করে ইউনিট আছে। বাবা মারা যাওয়ায় মা ইউনিট ভ্রষ্ট।"

"আপনার?" সাগ্রহে লোলা প্রশ্ন করল।

"আমার ইউনিটে আমার স্ত্রী আর ছোট মেয়েটি।"

পি-আনোর কর্ড এবার ভাঙ্গাসুরে শেষ হল।

***

তবু তো—

লোলা, ললিটা!

আমার স্বর্গ ও নরক, আমার পাপ, আমার মুক্তি।

দিনগুলো লোলার বিরক্ত হয়ে ওঠে। কি করে সে বোঝাবে সম্বরণকে তার সময় নেই? খেলাধুলোর দিন তার শেষ হয়েছে। যেখানে পরিণতি নেই, সেখানে লোলা আর সময় কাটাতে পারে না।

সম্বরণের ডাকার বিরতি নেই।

টেলিফোনে সে শতবার ডাকে লোলাকে, চিঠি লেখে ক্রমাগত। উত্তর না দিলে অভিমান হয় তার। চায়ের নিমন্ত্রণ জানায় ক্রমাগত।

দুই-চারবার লোলাকে চা-খাওয়াবার পরে লোলা লক্ষ্য করে দেখল হাতে পাথরের আংটিটা নেই তার। লাল একটা পাথর বসানো মরা সোনার আংটি ছিল। হয় পৈতে নয় বিবাহ উপলক্ষে পাওয়া।

তারপরে সম্বরণ চায়ে ডাকলে কোন না কোন অজুহাতে লোলা না করত। সে নিয়ে মানাভিমানেরও অন্ত ছিল না। মাঝে মাঝে নিজের বাড়ীতে বাধ্য হয়ে তাকে ডাকতে হত লোলার।

ভিখারীর মত যে লোক চেয়ে থাকে লোলার দিকে, লোলার সামান্য ভ্রূকুঞ্চনে যার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, তাকে নিয়ে চলা বিপদ। অথচ ছাড়বে না সে লোলাকে।

"আপনি বিবাহিত। আপনি পিতা। এভাবে আমার সঙ্গে—"

একদিন দ্বিধার বাধা কাটিয়ে লোলা বলেছিল, "আপনার স্ত্রী জানেন যে আপনি আমার সঙ্গে মিশছেন এত?"

"হ্যাঁ।"

"তিনি কিছু মনে করেন না?"

"না তো। আমি অনেক লোকের সঙ্গেই মিশি, ওভাবে হয়তো তাই।"

"আপনি এত—বাইরে ঘোরা ছাড়ুন।" লোলা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল।

গায়ের জামার মত শাদা হয়ে উঠল সম্বরণের মুখ।

"না, না। না।" বলে উঠল সম্বরণ।

"না কি। আমার সঙ্গে মেশা হবে না আপনার।" তর্জন করে বলে উঠেছিল লোলা।

"লোলা, ললিটা! আমাকে দয়া কর। এমন কথা বলো না।"

শিহরিতা লোলা চুপ করে গিয়েছিল।

তারপরে?

দিনগুলো জট বেঁধে গেল লোলার। হাল্কা মেঘে ভাসা দিনগুলো শ্রাবণের বর্ষণবিকারে ভারী হয়ে উঠল।

যে প্রেমে শেষ দিগন্ত দেখা যায় না, কুয়াশায় আবৃত যার দিগন্ত, তেমন প্রেমে মনে শুধু আসে নৈরাশ্য। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের স্বল্পবিত্ত ছেলে স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। সে ঘর ভাঙ্গতে চায় না লোলা।

ভেঙ্গে যা পাবে, তাতে লোলার চলবে না।

অথচ সম্বরণ বারণ শোনে না। এড়ানো যায় না তাকে।

ধর্মতলা দিয়ে গাড়ী চলছিল সেদিন লোলার বালিগঞ্জের দিকে। বাবাকে হাওড়ায় তুলে দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল বাড়ীতে।

একটু বিষণ্ণ ঔদাস্যে রাস্তার দুপাশে পেভমেন্টের দোকান দেখতে দেখতে চলেছে লোলা। চৌরঙ্গী পাড়ার এধারে বাজার করতে আসে না সে। এখানে নাকি খুবই সস্তায় জিনিষপত্র পাওয়া যায়, বন্ধুরা বলেছে।

আজকাল মন ভালো থাকে না লোলার। সম্বরণ তার প্রেমকে সম্বরণ করবে না, বারণ শুনবে না। ও রকম 'ড্যাম্পিশ নোবাডি' লোককে লোলার দারোয়ান ও বেয়ারাই আদেশ পেলে ঠেকিয়ে রাখত। কিন্তু লোলা সে আদেশ দেয়নি। কেন লোলা সস্তা সাংবাদিককে সরাতে পারছে না, জানে না সে।

শুধু মন তার অবসাদে নিভে আসছে। অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে আছে লোলা।

রাস্তার বেসাতির ওপর ঝুঁকে সম্বরণের মত দর্শনধারী এক ব্যক্তি কি যেন কিনছেন। ঠিক যেন সম্বরণ।

ও তো সম্বরণই। আরে! সোজা হয়ে বসল লোলা। বেলা প্রায় এগারোটা। ফুটপাতের সস্তা পশরা মেলার ধারে উবু হয়ে বসে সম্বরণ কি কিনছে

হয়তো পত্নীর জন্য সস্তা প্ল্যাস্টিকের চিরুণী কিম্বা কন্যার জন্য খেলনা। এখানে? এই পরিবেশে?

এই তো ওর যোগ্যস্থান। একান্ত সংসারী লোকটি ছিটকে এসেছে লোলার কাছে। সে প্রেমিক নয়, সুবিধাবাদী।

বিষণ্ণ মন লোলার শক্ত হয়ে উঠল। আত্ম-গ্লানির উদয় হল।

তারপরে কয়েকদিনের মধ্যে লোলা চলে গেল বোম্বাই শহরে পিসতুতো দিদির বাড়ী। জামাইবাবু আধুনিক ও ধনী, দিদি স্নেহশীলা। এখানে সম্বরণকে জানিয়ে গেল না।

চন্দ্রালোকে জুহু বীচ, প্রমোদ ভ্রমণের স্বর্গ।

শীতের সন্ধ্যা, কিন্তু শীতের চিহ্ন নেই এখানে। চির বসন্ত বিরাজমান। ছোট ছোট ঢেউ নিয়ে সমুদ্র সমতল বালির বিছানায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে। আধো অন্ধকারে দলে দলে লোকের সেখানে নানা আনন্দের আবর্তে গতায়াত। কলেজের ছাত্রছাত্রী স্ল্যাক্স আর্লোয়ার পরা খালি পায়ে সোনার মত উজ্জ্বল মিহি বালু ঠেলে ঠেলে জলের ধারে নেমে আসছে। ঝিরঝিরে জল তাদের পা ভিজিয়ে দিচ্ছে

জামা-কাপড়ের নিম্নাংশ ভিজিয়ে দিচ্ছে। জল কোলাহলে ছুটে তারা পালাচ্ছে, আবার জলের বুকে নেমে আসছে।

প্রবল বাতাসে জামা-কাপড় গায়ে লেপ্টে যায়, গঠন-শ্রী ফুটে ওঠে। জ্যোৎস্নায় সমুদ্র-সৈকত।

লোলা এসেছে এখানে, পরিবারের সঙ্গে। দিদি জামাইবাবুর বন্ধুরা সব এসেছে।

হৈ-চৈ চলছে কলকাতাবাসিনী অনূঢ়া, আধুনিকী লোলাকে কেন্দ্র করে। পুরুষের ছোট একটি দল ঘিরে আছে ওকে।

"লোলা, বল তো কাকে পছন্দ তোমার? এরা সবাই যে শেষে ট্রাজেডির নায়ক হবে।" জামাইবাবু সহাস্য প্রশ্ন করলেন। "কি যে বলেন, অসিতদা!" লোলা অনুযোগে স্বর অভিযোগের করে তুলল।

এদের সঙ্গে সামান্য আলাপ তার, গভীর-তার প্রশ্ন ওঠে না। তবু তার সমাজে এমন রসিকতায় চালান আসে অবিরত।

এদের কাউকে ভাল লাগে না। মনে হয়, বাইরে পোষকপরানো ডামি। অন্তঃসারশূন্যতা কথাবার্তায়, চলাফেরায় প্রকট হয়ে উঠছে।

"না, না, বেছে নিতে হবে, নিন একজনকে:" হাল্কা পরিহাসটাকে বিলম্বিত করে নূতন রসক্ষেত্র সৃষ্টি করল তারা। চাঁদের আলোয়, শান্ত সমুদ্রের মৃদু ঘুমপাড়ানিয়া গর্জনে যেন নেশা জমে উঠেছিল।

ব্যারিস্টার অমরেশ বসু এগিয়ে এল। আস্তে কাঁধে হাত রাখল তার, পাইপ-ধরা ঠোঁট টিপে টিপে বলল, "না হে না, তরুণের দল। আমরা দুজনই পৃথিবী বহুদিন দেখেছি। লোলা ইজ মাই গার্ল।"
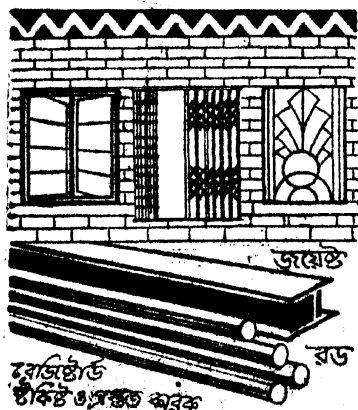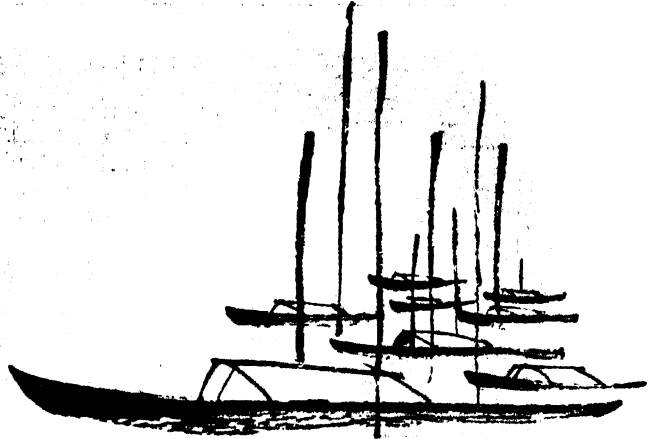
অমরেশ বসুর সম্প্রতি দ্বিতীয়া পত্নী শ্বেতাঙ্গিনীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছে। বয়স হয়েছে তাঁর চল্লিশ। মেদসম্পন্ন বেঁটে চেহারা, কালবর্ণ, বর্তুলাকার মুখে মেচেতার ছাপ।

লোলার মুখ চাঁদের আলোয় নীলাভ হয়ে গেল অপমানে। তখনি উঠে এল অন্ধকার সমুদ্র কিনারা থেকে অস্পষ্ট যেন জলদেবতা কোনো। দু-একটি লোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল সে এতক্ষণ দূরে।

বালি বেয়ে আসতে হচ্ছে, পায়ে জোর লাগছে। তাই দেহ ঈষৎ অবনত তার। বাতাসে গায়ের জামা ফুলে ফুলে উঠছে। স্থির লক্ষ্যে সে দৃঢ়ভাবে জটলার দিকে এগিয়ে এল।

লোলার কাঁধে তখনও প্রৌঢ় লম্পটের হাত থাবার মত আঁকড়ে আছে। হাসছে সকলে তাদের ঘিরে।

কঠিন হাতে লোলার মণিবন্ধ চেপে ধরল আগন্তুক, দৃপ্ত গলায় বলল, "নো, শী ইস মাই গার্ল।"

তরুণ সুন্দর একখানা মুখ। চুলের থোকায় তার সামুদ্রিক বাতাসের খেলা। দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ অঙ্গ তার। লোলা চমকে উঠল। সারা জটলায় তখন চমক লেগেছে। লোলার দিদি জামাইবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। হাসিঠাট্টার কথার মধ্যে সম্পূর্ণ বাইরের ব্যক্তি চলে এল কেন?

"তুমি? এখানে এসেছ?" লোলার প্রশ্নে সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ। অল্প টাকার একটা ট্যুরের লোভ ছাড়তে পারিনি। তুমি এখানে আছ, তা অবশ্য জানতাম না। হঠাৎ এসে পেলাম।"

"সম্বরণ,—তুমি কি একা—" প্রশ্ন পাঠাল লোলা।

"না, একা নই।" অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে সম্বরণ বলল, "আমার স্ত্রী ও মেয়েও এসেছে। ঐ যে ওখানে তারা দাঁড়িয়ে।" জলের দিকে আঙ্গুলে দেখাল সে।

জলের ধারে বালির কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে সজীব পোঁটলা একটি। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অশিক্ষিতা জরোজো বৌ। ভুল হবে না কারুর যে জড়পিণ্ডকে টেনে এনেছে উৎসাহী স্বামী। সস্তা পোষাকে মোড়া সন্তানটি গেঁয়ো মেয়েদের মত ট্যাঁকে গোঁজা।

এরই স্বামী সকলের সম্মুখে লোলার হাত ধরে টেনে বলতে সাহস পায় লোলা তার প্রিয়া!

অসহ্য রাগে লোলার সভ্যতার বাঁধ ভেঙে গেল। ঝাঁকুনী দিয়ে হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠল সে, "কী আস্পর্ধা!" আমার কাজ নেই তোমার মত একটা লোকের —তায় আবার বিবাহিত, মেয়ের বাবা! আকাশ-কুসুমের স্বপ্ন দেখোনা। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।"

লোলা নিজেই গট্‌গট্ করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল উঠে বালি পেড়িয়ে পথের দিকে।

পেছনে জটলা শতধা হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল।

কিছুদিন পরে অনেক দূর থেকে একখানা চিঠি এল—'লোলা আমার ললিটা! আমার পাপ, আমার স্বর্গ! তেরো হাজার ফিট উঁচু থেকে তোমাকে এই চিঠি লিখছি। আমি এখন নেফা এলাকায়। বাড়ীতে মিথ্যা বলে পালিয়ে এসেছি এখানে আমি। সাংবাদিক হিসাবে দেশের প্রতি আমার কর্তব্য করা হয়নি।

আমি নবোকভের নায়ক নই। স্ত্রীর প্রতি উদাসীন না হয়েও তোমাকে ভালবেসেছিলাম সত্য। সেজন্য আমাকে তুমি ঘৃণা করেছ, তা-ও জানি। আমি চরিত্রহীন নই। দুটো ভালবাসাই আমার কাছে সত্য। কিন্তু তারা বিভিন্ন রকম।

আজ এখানে এসেছি আর এক ভালবাসার টানে। আমার চারদিকে নির্মম—বিশ্বাসঘাতক শত্রু। যে কোন উপায়েই পররাজ্যগ্রাসী, লোলুপ পরদেশী ড্রাগনের গ্রাসে হয়তো আমার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই এসেছি। তবু এই ভালবাসা আমাকে ঘর থেকে টেনে এনেছে।

লোলা, ললিটা! আমার জীবনে এই তিন ভালবাসার সমন্বয়ে গড়া মানুষ আমি। কোন ভালবাসা আমার কাছে শ্রেষ্ঠ এখনও জানা হয়নি।

—সম্বরণ

নয়া বিবিজান

সুমথনাথ ঘোষ

মানুষ দেখা যায় না। শুধু একটা লাঠি মনে হয় যেন কোন যাদুমন্ত্রে হেঁটে আসছে, আপনি-আপনি, ওই দূরে পাহাড়ের কোল থেকে নেমে-আসা, ভরা ধানক্ষেতের মাথায় বিছানো একটা ঘন সবুজ কার্পেটের ওপর দিয়ে।

যাদের চোখের জোর আছে, সেদিকে তাকিয়েই বুঝতে পারে, ঝাপড় মিঞা আসছে। ও তার লাঠি। বার্ধক্য যে তার পাকা শালের মত দেহটাকে ভাঙাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে, শুধু কোমরটাকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে, ও যেন সেই বিজয়বার্তা ঘোষণা করে। লোকে বলে ও লাঠি নয়, ঝাপড় মিঞার বিজয় দণ্ড। ডান হাতের দৃঢ় মুঠিতে সেই লম্বা লাঠির মাঝখানটা চেপে ধরে কোমর থেকে সামনে নুয়ে-পড়া দেহটার ভার তার ওপর চাপিয়ে নীচু হয়ে অনায়াসে ঘুরে বেড়ায় ঝাপড় মিঞা সর্বত্র। মাঠে-ঘাটে, পাহাড়ে, বনে-জঙ্গলে, কোথায় নয়। ওর যে এই চার কুড়ি পাঁচ বছর বয়েস, কেউ তা বিশ্বাস

চরতে না চাইলেও, স্থানীয় লোকেরা বলে। ওই যে দূরে সবুজ সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের মত একখণ্ড জমি উঁচু হয়ে আছে, কয়েকটা চালাঘর, কিছু বনজঙ্গল ও তার ভেতর থেকে উঁকি মারছে একটা পুরনো মসজিদের মাথা। ওইখানে ঝাপড় মিঞার ঘর। সোজা রাস্তা ধরে এলে তিন-চারটে মাঠ ঘুরে স্টেশনের গুমটি পেরিয়ে লেভেল ক্রসিং ছেড়ে অনেক হাঁটতে হয়, তাতে কেবল যে পরিশ্রম বাড়ে তাই নয়, সময়ও লাগে অতিরিক্ত, সেই জন্যে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথটা সংক্ষিপ্ত করে নিয়েছে ঝাপড় মিঞা।

বেলা ঠাওর করার জন্যে চলতে চলতে হঠাৎ আলের ওপর থমকে দাঁড়ায়। আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকায়, আবার শুরু করে হাঁটা।

কখন কোন্ বাংলায় হাজিরা দিতে হবে, সব তার মুখস্ত। একদিনও সে ভুল হয় না।

পরণে ময়লা তালিমারা লুঙ্গি, গায়ে ততোধিক মলিন ছেঁড়া গেঞ্জি, কোমরে একখানা শানিত ছুরি, একটা ছোট চটের থলে কোমর থেকে ঝোলে সামনে। মাথার চুল, দাড়ি, গোঁফ, সব পাকা ধবধব করছে সাদা কিন্তু দেখলে মনে হয় যেন সুবিন্যস্ত, পরিপাটি করে ছাঁটা।

ও যখন এসে দাঁড়ায় বাড়ীর দরজায়, ওর আবির্ভাব সহসা শিশিরকুমারের আলমগীরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে প্রথম দৃশ্যে যেমন 'মেক-আপ' নিয়ে তিনি বেরুতেন স্টেজে, কোমরটাকে দুমড়ে, দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে, পিছনে হাত দুটো রেখে, 'দম্ভ কি কাশ্মীরী বাঈয়ের দম্ভ চূর্ণ করা যাবে' বলতে বলতে, ঠিক সেই রকম ওর দাড়ি গোঁফের ভঙ্গী দাঁড়াবার কায়দা, হুবহু যেন মিলে যায়, তার ঘোলাটে চোখের মধ্যে থেকে এখনো হিংস্র দৃষ্টি তেমনি ঝিলিক মেরে ওঠে থেকে থেকে।

সম্রাট আলমগীরও বোধহয় বেঁচেছিলেন পঁচাশী বছর কিন্তু ঝাপড় মিঞার মত এতখানি কর্মক্ষম এই বয়সে যে ছিলেন না, একথা সবাই জানে! যে বাড়ীর দোরে এসে দাঁড়ায় সে বাড়ী থেকে মুরগীগুলো ডেকে ওঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে কোঁক্-কোঁ-কোঁর-কোঁ। তারা যেন গন্ধ পায় বাতাসে যে এসেছে তাদের হত্যাকারী, সেই নির্মম নিষ্ঠুর ঘাতক, জল্লাদ ঝাপড় মিঞা। একটা, দুটো, দশটা, পাঁচটা, যার যেমন প্রয়োজন, এখনি জবাই করে চলে যাবে।

জবাই করাই ঝাপড় মিঞার পেশা—নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম। প্রতিদিন সকাল হলেই সে তাই ছোটে বাড়ী বাড়ী হাজিরা দিতে। দেরী হলে পাছে আর কেউ তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়, এই জন্যে মাঠঘাট বনজঙ্গলের সংক্ষিপ্ত পথে হাঁটে। কোন্ বাংলায় ক'টার সময় হাজিরা দিতে হবে, তার মুখস্ত। সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা ঠাওর করে সে হাঁটতে থাকে। মুরগী পিছু চার পয়সা মজুরী। ছোটবড়র কোন তফাৎ নেই। এক রেট। যার য'টা কাটে তত আনা পয়সা নিয়ে দড়ির গেঁজেটায় ভরে, লুঙ্গির ট্যাঁকে গুঁজে তারপর মুরগীর মুখটা, নখশুদ্ধ ঠ্যাংয়ের নীচেটা, নাড়িভূঁড়ি থেকে কয়েকটা টুকরো কেটে নিয়ে চটের থলিতে রেখে, পালকগুলো কুড়িয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়ে আবার আর এক বাড়ী যায়।

সরকার বাংলাটা অনেক দূরে। চড়াই-উৎরাই অনেকগুলো ভাঙ্গাতে হয় সেখানে যেতে। তবু চারটে পয়সার লোভ ছাড়তে পারে না ঝাপড় মিঞা। সামনের লোহার গেটটা ঠেলে, ইউক্যালিপটাস গাছের সারি দেওয়া লাল পাথরের পথটার ওপর লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সে সোজা ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে। সিমেন্ট বাঁধানো ই'দারাটার পাড়ে পৌঁছে লাঠিটা রেখে একটু বিশ্রাম নেয়। তারপর পেয়ারা গাছের তলা দিয়ে এগিয়ে রান্নাঘর ছেড়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। ডান হাতি সিঁড়ির নীচে যে মুরগীর ঘরটা সেখান থেকে একটাকে ধরে নিয়ে বাইরে পেয়ারা গাছের তলায় এনে জবাই করতে বসে ডাকে, ও চাঁপা দিদিমণি!

বাইশ তেইশ বছরের তরুণী যুবতী রঙীন সাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে পিঠের ওপর লম্বা বিনুনী দুলিয়ে ছোট্ট এক বালতী জল ও একখানা কাঁচের প্লেট রেখে পালিয়ে যায় রান্নাঘরে। চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত জানোয়ারকে জবাই করা চাঁপা সহ্য করতে পারে না। বুড়ো মুরগীটাকে পা দিয়ে মাটিতে ফেলে চেপে রেখে, বাঁ-হাতে তার গলাটা টেনে ধরে ডান হাতে ছুরি চালিয়ে মাথাটা কেটে ফেলে দিয়েই গলাটা বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরে বসে থাকে কিছুক্ষণ, যাতে কাটা-গলা থেকে রক্ত না ছুটে বেরিয়ে যায়। মাংসর নাকি তাতে 'টেস্ট' খারাপ হয়ে যায়। তারপর পালকটালক ছাড়িয়ে দেহটা সাফ করা যখন হয়ে যায় চাঁপা এসে বালতী থেকে জল ঢালে। ঝাপড় মিঞা দু'হাতে রগড়ে ধুয়ে মুরগীটার দেহ পরিষ্কার করে তখন পিস করে কেটে কেটে কাঁচের প্লেটে রাখে। একটা কাঁচা পেয়ারা চিবতে চিবতে চাঁপা দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে। একটা কামড় পেয়ারায় দিয়ে চাঁপা বলে, আচ্ছা বুড়ো, এদের কাটতে তোমার একটু কষ্ট হয় না?

কষ্ট! কিসের কষ্ট?

শিউরে ওঠে চাঁপা, ওঃ কি নিষ্ঠুর তুমি!

বুড়ো বলে, তুমি যখন মাছ কুটে রান্না করো, তোমার কষ্ট হয়?

কিন্তু মাছ আর এই মুরগীর মত এমন সুন্দর জানোয়ার এক হলো?

তোমার কাছে মাছ যা, আমার কাছে মুরগী তাই দিদিমণি!

পেয়ারায় একটা বড় কামড় দিয়ে চাঁপা বলে, আচ্ছা বুড়ো রোজ তুমি ক'টা করে মুরগী কাটো?

তার কি কিছু ঠিক আছে দিদিমণি। তবে "সিজিন টাইমে" বেশী হয়। রোজ দু', আড়াই, তিনটাকা পর্যন্ত।

এ্যাঁ। চমকে ওঠে চাঁপা। অর্থাৎ তিন ষোলং আটচল্লিশটা মুরগী কাটো!

কণ্ঠে ক্ষোভ এনে ঝাপড় মিঞা বলে, সে আর কটা দিন দিদিমণি। পুজোর সময় বড়জোর পাঁচ-সাত রোজ। তারপর ত সব ফাঁকা। লোকজন সব চলে যায়। আর চেঞ্জে যারা আসে, তারাও বেশীদিন থাকতে পারে না এখানে—এই জংলী জায়গায় কারুর মন টেঁকে না। কিছুদিন থেকেই পালায়।

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে চাঁপা বলে, ঠিক ত! কেবল পাহাড়, বন আর জঙ্গল, এ ছাড়া কি আছে তোমাদের দেশে। না সিনেমা, না রেস্তোরাঁ, না গাড়ীঘোড়া, না কোন দেব-দেবীর মন্দির। একটা দোকানপসার, বাজার হাট পর্যন্ত বলতে কিছু নেই। পালাতে পারলে বাঁচি। নেহাৎ প্রাণের দায়ে মানুষ এখানে পড়ে থাকে। জল-হাওয়া ভাল। আমার ছোট ভাইয়ের শরীরটা সুস্থ হলেই আমরা চলে যাবো।

চাঁপা থামতেই বুড়ো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো।

পেয়ারার শেষ টুকরোটা চিবতে চিবতে চাঁপা প্রশ্ন করে, আচ্ছা বুড়ো তুমি কি ছেলে-বেলা থেকেই এখানে আছো?

হ্যাঁ দিদিমণি। ঘরবাড়ী ছেড়ে আর যাবো কোথায়?

তখন বোধহয় আরো বেশী বনজঙ্গল ছিল। বাঘ-ভাল্লুক বেরুতো পাহাড়ে, না?

হাঁ, তা বেরুত। কিন্তু ওই বড় বড় বাগানবাড়ীগুলো এমনভাবে চাবিবন্ধ পড়ে থাকতো না। লোকজন, খানাপিনা, হৈ-হুল্লোড় লেগেই থাকতো। শনিবার হলে, কি দু'-চার-দিনের ছুটি পেলেই বাবুরা ছুটে আসতো এখানে স্ফূর্তি করতে। কত বাঈজীর নাচ-গান, মদের হু-র-রা বয়ে গেছে ওই সব বাড়ীতে দিদিমণি! আচ্ছা, সেই সব আমীর আদ্‌মীরা আজ কোথায় গেল বলতে পারো দিদিমণি?

খিল খিল করে হেসে ওঠে চাঁপা। পেয়ারাটায় শেষ কামড় দিয়ে বলে, তোমার মত অখণ্ড পরমায়ু ত সবাই নিয়ে আসে না বুড়ো। তারা সব কবে ফৌত হয়ে গেছে।

তাদের বেটারা, ছেলেপিলেরা, তারা গেল কোথায়?

তোমার বয়েসটা যে চার কুড়ি পাঁচ ভুলে গেছ, তাই বুঝতে পারো না, তাদেরও আজ বেঁচে থাকার কথা নয়। তাছাড়া যদিও থাকে ত স্ফূর্তি করার ক্ষমতা আর তাদের নেই।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে বুড়ো। তারপর বলে, হাঁ, ঠিক বলেছো দিদিমণি। নইলে আমার ভাবনা কি ছিল। ওই রাজবাড়ী, সিংহীবাংলা, সুরেন-বাবুর কুঠি, রাজেন্দ্রভবন—ওদের বাড়ীর বাঁধা বাবুর্চি ছিলুম আমি। তাছাড়া এই মল্লিক-বাংলায় একদিন কত ওস্তাদ বাঈজীর নাচনা, গানা, খানা-পিনা, রাতভোর-দিনভোর খাঁসি মৌজ মৌজ মৌজ করো!!

যেন অতীতের সেই সুখস্মৃতি ওর চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আবার বেজে ওঠে সেই পুরনো গানের সুর।

চাঁপা এবার বলে উঠলো, তা তোমার এত ভাবনা কিসের? তোমার ত ছেলেপিলে আছে!

আছে দিদিমণি। কিন্তু তাদের সকলেরই ত বালবাচ্ছা আছে, নিজের সংসার আছে।

তাবলে তোমায় খেতে দেবে না? তুমি তাদের বাপ না?

যেখানে তারাই খেতে পায় না, সেখানে বাপ হয়ে কেমন করে তাদের সে মুখের গ্রাস কেড়ে নেবো? খোদা মেহেরবান! যতদিন এই

হাতখানায় তাখত্ রাখবে, ততদিন যেন অন্যের কাছে ভিখ্ মাঙ্তে না হয় দিদিমণি!

ওঃ এত্তো বুড়ো হয়েছো, তবু ত তোমার দেমাক দেখি খুব!

ইয়ে দেমাক নেহি, ইজ্জত কা বাত্ দিদিমণি! আমি মর্দানা, মরদকা বাচ্ছা। যখন দশ বছরের লেড়কা, তখন থেকে এই হাতে কাম সুরু করেছি, আজও তা থামেনি।

মরদকা বাচ্ছা! ওই পঁচাশী বছরের বুড়োর মুখ থেকে শুনে হেসে ওঠে চাঁপা। বিদ্রূপের হাসি! তারপর বলে, বুঝেছি। দীর্ঘদিনের অভ্যাস, অস্থিমজ্জাগত হয়ে গেছে! তাই কারুর কাছে হাত পাততে অপমান বোধ হয়। হবেই, এটাই স্বাভাবিক। বলে সহসা চুপ করে যায়। কথাটা যে ঝাপড় মিঞা মিথ্যা বলেনি, তা অনুভব করতে পারে। দীর্ঘ পরমায়ুর অভিশাপ ছাড়া এ আর কিছু নয়। মনে মনে ওর জন্যে সমবেদনা প্রকাশ করে চাঁপা। তাই ইউক্যালিপটাস্-এর ঝিলিমিলির মধ্যে দিয়ে দূরে লাঠি পাহাড়টার নেড়া মাথার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আপন মনেই সে বলে ওঠে, বেচারা!

পরের দিন বেলা ঠিক ঠাওর করতে পারে নি ঝাপড় মিঞা। সকাল থেকে আকাশের কেমন একটা মেঘলা-মেঘলা ভাব, তাই আসতে একটু বিলম্ব হয়ে গেল। বাঁধানো ইঁদারাটার কাছে পৌঁছবার আগেই চাঁপা ছুটে গিয়ে বললে, বুড়ো, আজ আর দরকার নেই।

কাহে! বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর কপালে কয়েকটা মোটা শিরা একসঙ্গে স্ফীত হয়ে উঠলো। চাঁপার মুখের ওপর চোখ রেখে মুহূর্তকয়েক কি যেন চিন্তা করলে। তারপর বললে, কেন, আজ মাংস খাবে না দিদিমণি?

খাবো না কোন্ দুঃখে। তোমাদের এখানে ওছাড়া আর কি ছাই পাওয়া যায় যে মানুষ খাবে। এই একটা জিনিষই সস্তা এবং প্রচুর। তবে?

আর একজন কেটে দিয়েছে!

কোউন দিয়া? কে দিয়েছে দিদিমণি?—বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠলো! যেন তাকে পেলে এখনি কোমরের ছুরিটা দিয়ে মুরগীর মত জবাই করে ছাড়ে।

সামনের বাগানের ছোকরা মালী বনোয়ারীকে চাঁপা চেনে, সে কেটে দিয়ে গেছে। কিন্তু পাছে বুড়ো তার সঙ্গে গিয়ে ঝগড়া বাধায়, তাই বললে, নাম-টাম জানি না। একজন ছোকরা। বলে মুখ টিপে হেসে, বুড়োকে নিয়ে রগড় করবার জন্যে বললে, ও তোমার চেয়ে ভাল কাটে।

এবার মারমুখী হয়ে উঠলো বুড়ো, আমার চেয়ে ভাল কাট্নেওলা কোন্ শালা এখানে আছে, শুনি।

চারটে পয়সা বুড়োর কাছে যে চারটে মোহরের সমান, তা জানতো চাঁপা। তাই চার-পাঁচ মাইল পথ ভেঙে এই পঁচাশী বছরের জ দেহটা টানতে টানতে নিয়ে আসে। তা ার কেউ ওর কাজ করলে, তার ওপর স্র হয়ে উঠবে, এ কেমন কথা! অভাব আছে, তেমনি আরো দশজনেরও থাকতে পারে। চাঁপা তাই সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, মুরগী কাটবে, তার মধ্যে আবার ভাল-মন্দ কি আছে? বরং তোমার চেয়ে অনেক জল্দি বানিয়ে দিয়েছে ছোকরা।

দিদিমণি, ইয়ে কাম ছোকরালোক কেয়া সমঝ্তা হ্যায়!

রেগে ওঠে চাঁপা, না, তুমি ঘাটের মড়া, তুমিই বোঝো যত কাম, আর কেউ কিছু বোঝে না!

আলবৎ! আসলি কাম্‌মে ত তোড়া দেরী হোগা জরুর। নেহি ত উসকো পুরো মজা, পুরো রস নেহি মিল্‌তি দিদিমণি! সবুরে মেওয়া ফলে জানো ত?

একটা মুরগী জবাই করবে, তার মধ্যে আসলি-নকলী কি, আর পুরো মজা, পুরো রসেরই বা কি আছে, বুঝি না। আমাদের কাছে সময়টার মূল্য বেশী। তোমার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বানিয়ে দিয়েছে ছোকরা, তাই বললুম।

যো কামকো যো দস্তুর দিদিমণি। ফাঁকির কাম আমার কাছে পাবে না। আগে কাম শিখু লেলাম্। রেগে গেলে বুড়োর মুখ দিয়ে হিন্দী বাত্ আপনাআপনি বেরিয়ে পড়ে। নইলে বেশ ভালো বাংলাতেই কথা বলে।

ওর কথা শুনে চাঁপা হেসে ফেলে। বুড়ো বললে, তুমি হাসছো দিদিমণি! ভাবছো বুড়োটার মাথা খারাপ, কি যা-তা বকছে। তুমি ছেলেমানুষ ছুকরী, তাই জানো না, এ-কামে কত রস! আসুক সে ছোকরা আমার সঙ্গে পাল্লা দিক, কোন সমঝদার আদমীকো ডাকো, সে বলুক, কার কাম আচ্ছা।—বলে পাকা দাড়িতে একবার হাত বুলিয়ে বক্রোক্তি করে, দুদিনকা যোগিয়া কেয়া জানেগা ইয়ে কামকো। একটু থেমে চাঁপার মুখের ওপর চোখ তুলে ঈষৎ মোলায়েম কণ্ঠে আবার বলে, তুমি ছুকরী নওজোয়ানকে কাম পছন্দ করো। কিন্তু যো সমঝদার একবার স্বাদ পেয়েছে আমার কামের, সে চায় না আর কাউকে। আমার নসিব খারাপ দিদিমণি, তাই তোমাকে খুশি করতে পারিনি! কত বড় বড় ভারী আদমী, আমীর, জমিনদার আমায় 'সার্টিফিকেট' দিয়েছে। কত ইনাম, বকশিস পেয়েছি তার হিসেব নেই। মোরগ-মসল্লা, রোস্ট, কাবাব, কারী, কোপ্তা, কাটলেট, বিড়িয়ানীর মুরগী কত আমি এই হাতে বানিয়েছি তার ঠিক আছে? দশ বছরের লেড়কা থেকে আজ চার কুড়ি পাঁচ বরস ওমর হলো দিদিমণি। ওসব রহিস্ আদমী, সমঝদার আদমী ত সব গুজার গেয়ি—তাই ত আজ এমনি করে লোকের বাড়ী গিয়ে কামের তাল্লাস করতে হচ্ছে। নইলে একদিন ছিলো, লোকে ছুটতো আমার ঘরে, কে আমাকে আগে কামে লাগাবে বলে!

তোমার মুরগীর মধ্যে যে এত রস, এত মজা আছে, তা কে জানে! আমরা কেউ এ-রসের রসিক নই। মুরগী আমরা খাই না। নেহাত আমার ছোট ভাইকে ডাক্তার খেতে বলেছে বলেই এখানে আসা। আর ও একলা সবটা খেতে পারে না বলেই আমি খাই। আমার বাবা-মা কেউ ছোঁয় না। কাজেই অত কথা আমার কাছে বলে মিছিমিছি সময় নষ্ট করলে তুমি বুড়ো। বলেই হেসে উঠলো চাঁপা। আমি তোমার চারটে পয়সা হয়ত লোকসান করলুম আজ কিন্তু ভেবে দেখো আর এক গরীব লোক ত সেই পয়সাটা পেয়েছে।

এ চার পয়সার লাভ-লোকসানের বা নেই দিদিমণি। এ ইজ্জত্ কি বাত্। এসব আমার জমানা আছে। এই সব বাংলায় যে-যে আসে, সকলের কাম ত আমি বানাই। চালিশ-পঞ্চাশ বরষ হো গিয়া। আম এক্তিয়ার মে যদি আর কেউ ঢোকে তাহ লোকে আমাকেই 'থুক্' দেবে। আমি মরদ বাচ্ছা, সে অপমান কেন সহ্য করবো যত হিম্মত আছে!

ঠিক কথা। তুমি মরদ কি বাচ্ছা। হলে বা। চার কুড়ি পাঁচ বছর বয়স! ঠোঁটের কো হাসি টিপে যে বক্রোক্তি করে চাঁপা তা বুঝ পারে না বুড়ো। আরো উৎসাহিত হয়ে ব বয়সে কি এসে যায় দিদিমণি! যে মরদ্ মরদ্-ই। যেদিন মাটিতে কবরে যাবে, সেদি সে পুরুষের ইজ্জত নিয়ে যাবে।

ঠিক বলেছো।

বুড়ো এবার লাঠি নিয়ে পিছন ফিরে লোহার ফটকটা খুলে সবে বাইরে পা দিয়ে পিছন থেকে চাঁপা ছুটে এসে বললে, হাঁ, দে বুড়ো, কাল আমরা কেউ বাসায় থাকবো ন ভোরে উঠে পিক্‌নিক্ করতে চলে যা নীলাবরণ ঝরণায়।

সে তো এখান থেকে অনেক দূ দিদিমণি!

তা জানি। দুখানা গরুর গাড়ী ক আমরা যাবো ওই সামনের বাংলার বাবুদে সঙ্গে। সারাদিন সেখানে থেকে রান্না-খাও করে তারপর আবার সন্ধেয় ফিরে আসবো।

বুড়ো আপনমনে গজগজ করতে করতে চ গেল। চাঁপা ওর কথা কিছু বুঝতে না পারলে খুব যে রেগে গেছে তা অনুমান কর পারে।

পরদিন ভোরে গরুর-গাড়ী এলে, চাঁ সতরঞ্চি নিয়ে গাড়ীর ভেতর বিছানা পাত এসে অবাক হয়ে যায়। দেখে ছপ্‌টি হা করে গরুর মুখের দড়ি ধরে গাড়ীর ওপর ব ঝাপড় মিঞা হেট্ হেট্ করে পিছনের দি গাড়ীটাকে হটাবার চেষ্টা করছে কিন্তু পার না। গরুদুটো দুদিকে মুখ করে যেন গোঁ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় গাড়ীটার ওপর একটা দশ-বা বছরের ছেলে বসেছিল দড়ি ধরে। সে চাঁপার দেখেই লাফিয়ে পড়লো গাড়ী থেকে। তার বললে, সরে যান গরুটা বড় বদমাইসি কর শালাকে আগে ঠিক করে দিই। বলতে বল ঝাপড় মিঞা যে গরু দুটোকে সায়েস্তা কর পারছিল না, চটকরে গিয়ে তাদের লেজে এম ভাবে পাক দিয়ে দিলে যে সঙ্গে সঙ্গে বলীব যুগল একেবারে অভিপ্রেত স্থানে পিছু হে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

এবার কণ্ঠের বিস্ময় চেপে চাঁপা প্র করলো, একি বুড়ো, তুমি যে!

এ আমার গাড়ী দিদিমণি! কাল তোমাদে লোক ভাড়া করে এসেছিল।

তাই নাকি। কিন্তু গাড়োয়ান কৈ, কে
চালাবে?

আমার গাড়ী আবার কে চালাবে
দিদিমণি?

চাঁপার যেন কথাটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি
হয় না। বলে, না, না, এতটা দূরে পথ তুমি
কি করে চালাবে বুড়োমানুষ।

জিন্দগী ভোর ত এই কাম করছি
দিদিমণি।

চাঁপা বলে, তুমি কত কাম করো? এই ত
ছিলে বাবুর্চির কাজ করছো। ছেলেবেলা
থেকে মুরগী তোমার মত বানাতে কেউ পারে
না।

হাঁ, দিদিমণি আবার এ গাড়ীভি আমার
হাতে বানিয়েছি। কাজেই অন্যকে গাড়ী চালাতে
দিলে ও তো খারাপ করে দেবে। আমার মত
দরদ ত তার নেই গাড়ীর ওপর। তাই খোদা
মেহেরবাণী করে যতদিন হাতে শক্তি দিয়েছে
নিজের কাজ নিজেই করি। আমি মরদকা বাচ্ছা,
দুনিয়ার কাছে কেন মাথা নীচু করবো দিদিমণি।

ঠিক! বলে অপর গাড়ীটা দেখিয়ে চাঁপা
বলে তার, আর ওটা চালাবে কে?

কেন ও-ই চালাবে। ও আমার বেটা। বলে
ঐ ছোট ছেলেটাকে দেখালো ঝাপড় মিঞা
হেসে।

ওই অতটুকু ছেলে পারবে ওই অত বড় বড়
ঘোড়া গরুকে সামলাতে? বলো কি? চাঁপার
চোখে বিস্ময় উপচে পড়ে।

ও ত আমার ছেলে! বাপ কো বেটা
সিপাই কি ঘোড়া, কুছ নেহি ত থোড়া থোড়া।
যে যতই বড়াই করুক ঝাপড় মিঞা, আসলে
পয়সা ছাড়া আর কিছু বোঝে না সে। একটা
পয়সা যেন তার বুকের রক্ত। তাই যতক্ষণ
পারে নিজে দৌড়োদৌড়ি আদায় করে নেয়। অন্য
কাউকে ভাগ দিতে গেলে, তার বুকে চড়চড়
করে। সে স্বার্থপর, কৃপণ, অর্থগৃধ্নু। চাঁপুর
এই দৃঢ়বিশ্বাস। ছোট ভাই ও মা বাবাকে এই
কথাই সে বোঝাতে চেষ্টা করে। নইলে সত্যি
কি এত বয়সে কেউ কি স্বেচ্ছায়, এত
খাটতে পারে?

পরদিন ঝাপড় মিঞা এলো না। চাঁপা
মনক্ষেতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো,
গাড়ীটা দেখা যাচ্ছে না কোথাও। তার পরের
দিনও, তেমনি কাটলো। এমনি করতে করতে
পুরো একটা সপ্তাহ যখন চলে গেল অথচ
ঝাপড় মিঞা এলো না, তখন ছোট ভাই
সুশান্তকে নিয়ে 'মর্ণিংওয়াক' করতে বেরিয়ে
একদিন পায়ে পায়ে চাঁপারা সেই মসজিদটার
কাছে গিয়ে হাজির হলো।

ঝাপড় মিঞা সেই মসজিদটার মাথা দেখিয়ে
বলেছিল, ওইখানে সে থাকে।

তখনো ভাল করে রোদ ওঠেনি। রাস্তার
পাশে ক্ষেতে একজন চাষীকে কাজ করতে
দেখে সুশান্ত প্রশ্ন করলে, আচ্ছা এখানে
ঝাপড় মিঞার বাড়ী কোনটা? সামনের দিকে
অংগুলি নির্দেশ করে লোকটা কয়েকটা ছোট
ছোট বাড়ী যেখানে জড়াজড়ি করে রয়েছে,
দেখিয়ে দিলে।

ও ত অনেকগুলো বাড়ী। ওর মধ্যে
কোনটা ঝাপড় মিঞার? আবার জিজ্ঞেস করলে
সুশান্ত।

লোকটা জবাব দিলে, ওই সবগুলোই ঝাপড় মিঞার।

এ্যাঁ, বলো কি? ওদের ভাইবোনের চোখে-মুখে অবিশ্বাসের ছবি ফুটে ওঠে। চাঁপা অস্ফুটস্বরে সুশান্তকে বলে, বাজে কথা। লোকটা গুল মারছে।

চাঁপার কথা বোধহয় সে শুনতে পেয়েছিল তাই বলে উঠলো, শুধু ওই বাড়ীগুলো নয়, ওই যে আশেপাশের ক্ষেত, চাষের জমি সবই ঝাপর মিঞার।

ওরা তখন এগিয়ে গেল সেই বাড়ীগুলোর কাছে। প্রকাণ্ড একটা উঠোন, তার চারিদিকে এলোমেলো ছড়ানো যেন অনেকগুলো চালাঘর। উঠোনের মাঝে বড় একটা মাচা, তাতে লাউগাছ পুঁইগাছ, সিম গাছ ভরে আছে। ওর একটু তফাতে বড় একটা ইঁদারা। বালতীতে দড়ি বেঁধে একটা মেয়ে জল টেনে টেনে তুলে মাটির কলসীতে ভরছে। একপাল মুরগীর সঙ্গে ছোট ছোট অনেকগুলো বাচ্ছা খুঁটে খুঁটে মাটি থেকে কি যেন খাচ্ছে। কয়েকটা ছাগল, পেঁপে গাছের তলায় বাঁধা, দুটো গরুর গাড়ী পড়ে আছে বাইরের দিকে। রোগা হাড় বার করা গোটা আষ্টেক গাই ও বলদ এক জায়গায় তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। শুকনো জোয়ার ও ভুট্টা গাছের টুকরো পড়ে রয়েছে তাদের সামনে।

মেটে ঘরের দাওয়ায় বসে একটা বুড়ী হুঁকোতে তামাক খাচ্ছিল. তার হাতে মেদী-পাতার রং-এর ছোপ।

ঝাপড় মিঞা আছে? চাঁপা জিজ্ঞেস করে।

বুড়ি হুঁকোর থেকে মুখটা সরিয়ে বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলে, এ বাড়ীতে থাকে না। ওই যে পুকুরের ধারে ছোট-ঘর ওটাই ঝাপড় মিঞার। চাঁপারা যখন পিছন ফিরতে যাচ্ছে, দেখে অনেকগুলো কৌতূহলী স্ত্রী-পুরুষের চোখ ঘরে, ঘরের জানলায়, দোরে। আর উঠোন থেকে বোধহয় আট দশটা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাদের দিক চেয়ে আছে।

পুকুর ধারের সেই চালাঘরটার সামনে গিয়ে তারা দেখে চুপচাপ ঝাপড় মিঞা একটা দড়ির ঘাটিয়ায় শুয়ে আছে। খোলা উঠোনে। তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে একটা ন্যাকড়া বাঁধা।

ওদের দেখে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো সে, আরে দিদিমণি। তোমরা যে এখানে?

চাঁপা বলে এই বেড়াতে এসেছিলুম ওদিকে। তাই যখন এতদূর এসেছি ভাবলুম তোমার খবরটা নিয়ে যাই। ক'দিন যাওনি কেন ওদিকে?

পায়ে একটা শামুক ফুটে গিয়েছিল দিদি-মণি, এত দরদ যে চলতে হাঁটতে পারি না। আজ ক'দিন শুয়ে আছি। থোড়া বখার জ্বরও হয়েছিল, তবে এখন আর নেই।

চাঁপা বললে, ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছো ত?

আমরা গরীব আদ্‌মী, ডাকতর দেখাতে পারি কি দিদিমণি! এই চুনহলুদ, নিমপাতা বাটা, এই সব আমাদের দাওয়াই। বলেই ওদের দিক থেকে মুখটা ফিরিয়ে হাঁক পাড়লো, আরে আমিনা, একঠো চৌপাই লে আও, দিদি-মণিলোক খাড়া হ্যায়, দেখতা নেহি।

দড়ির ছোট একটা খাটিয়া ঘরের ভেতর থেকে বার করে এনে দিয়ে গেল, চাঁপার বয়েসী একটি মেয়ে। পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী। আঁটসাঁট বলিষ্ঠ চেহারা, যেন পাহাড়ী মাটি দিয়ে তৈরী। চাঁপা জিজ্ঞেস করলে. ওকি তোমার মেয়ে, না নাত্‌নী?

বুড়ো সগর্বে উত্তর দিলে, নেহি। ও আমার জরু, নয়া বিবিজান!

এ্যাঁ! তোমার বৌ! কথাটা কানে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে পারছে না চাঁপা।

হাঁ দিদিমণি!

এরপর কি বলবে, যেন কথা খুঁজে পায় না চাঁপা। স্তব্ধ দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে থাকে বুড়োর ওই পাকা দাড়িগোঁফ ও ভ্রূর দিকে।

উঠোনের এক কোণে বসে ভাঙা শানকিতে করে কি খাচ্ছিল, একটা ছোট ছেলে ও মেয়ে। ছেলেটার বয়েস বোধহয় আড়াই কি তিন, মেয়েটা তার চেয়ে বছরখানেকের বড় হবে। হঠাৎ তারা দুজনে বুড়োর কাছে উঠে এসে বললে, বা-জান আর কি খাবো। বুড়ো ধমক দিয়ে উঠলো. যাও আম্মাকো পুছো?

ছেলেমেয়ে দুটো ছুটে ঘরের ভেতর চলে গেলে, চাঁপা আবার কথা বললে। এরা কি তোমার ছেলে মেয়ে, এই বৌয়ের?

হাঁ দিদিমণি। এদের জন্যেই ত এত ভাবনা!

কেন, তোমার ত বাড়ীঘর জমিজমা অনেক, তবে ভাবনা কি?

লেকিন খাবার লোকভি ত অনেক দিদিমণি?

চাঁপা বলে, আচ্ছা ওই যে মসজিদের কাছে ঘরগুলো দেখে এলুম এবং তার আশে-পাশের ক্ষেতখামার—সব কি তোমার?

হাঁ দিদিমণি আমার। বিরস কণ্ঠে জবাব দেয় ঝাপড় মিঞা। তারপর একটু থেমে আবার বলে, লেকিন্ শুধু নামে, এখন আর ওতে আমার কোন অধিকার নেই। সব বিবিদের দিয়ে দিয়েছি। তাদের বালবাচ্চাদের ওতেই কুলোয় না।

বিবিদের, কথাটা চাঁপার কানে কেমন যেন আঘাত দিল। ঠোঁটের প্রান্ত ঈষৎ বাঁকিয়ে প্রশ্ন করলে, বিবিদের! তোমার ক'টা বিবি ঝাপড় মিঞা!

চারঠো, দিদিমণি!

কণ্ঠের বিস্ময় চেপে চাঁপা বললে, এই নতুন বিবিকে নিয়ে চারটে!

না। একে ধরলে পাঁচটা। একটা ত মরে গেল দিদিমণি।

ও সে মরে যেতেই আবার একে বিয়ে করেছো না?

না দিদিমণি, দু' নম্বরটা মরে গিয়েছে আজ বিশ বছরের বেশী, আর আমিনাকে সাদি করেছি বলে সালটা হিসেব করতে গিয়ে চুপ করে রইলো।

আমিনা তখনি বেরিয়ে এলো আঁচলে করে কয়েকটা পেয়ারা ও আতা নিয়ে। তাকে দেখে বুড়ো জিজ্ঞেস করলে, কেত্‌না সাল হুয়া, হ্যামলোককো সাদি আমিনা?

সাত সাল। অর্থাৎ সাত বছর।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কণ্ঠে এনে এবার প্রশ্ন করলে চাঁপা, তা তোমার ছেলেপিলে ত এপক্ষের এই দুটি দেখছি। ও তরফে ক' জন

বুড়ো একটু চিন্তা করলো। বোধহয় সব মনে করতে পারলে না তাই আবার আমিনাকেই বললে, ক'জন বাতাও দিদিমণিকো।

আঁচলে সেই ফলগুলো নিয়ে চাঁপার সামনে এসে দাঁড়ালো আমিনা। তারপর বললে, মোট দু' কুড়ি তিন অর্থাৎ তেতাল্লিশ জন, তবে সবই এখন জিন্দা নেই। বেঁচে নেই। যারা জীবিত আছে তাদের সংখ্যা এক কুড়ি এগারো জন অর্থাৎ একত্রিশ।

চাঁপা সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক হয়ে গেল। আমিনা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে না, হঠাৎ কি হলো তার। বুড়োও যেন কেমন হয়ে যায়।

আমিনা একটু নীরব থেকে শেষে আঁচল থেকে আতা ও পেয়ারাগুলো নিয়ে চাঁপাকে দিলে।

চাঁপা বললে, এর কত দাম?

বুড়ো বলে উঠলো, না না এর কোন দাম দিতে হবে না দিদিমণি। এ আমার গাছের চীজ। তোমরা এত কষ্ট করে আমার বাড়ী এসেছো. তোমরা কত আমীর আদ্‌মি—তোমাদের যোগ্য মর্যাদা দেবার যে আর কিছু নেই দিদিমণি!

না—না—তা হয় না ঝাপড় মিঞা! তুমি গরীব মানুষ! বলে সুশান্ত যেমন তার পকেটে হাত দিতে গেল, ঝাপড় মিঞা দুহাত জোড় করে মিনতি করলে মাফকিজীয়ে! তোমাদেরই নিয়ে ত খাচ্ছি পরছি দাদাবাবু! বলে খুব জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। ছেলে-মেয়েগুলো যদি মানুষ হতো, তাহলে আমার ভাবনা ছিল না দিদিমণি! উল্টে তারা সব আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। মায়ে বেটায় সব জোট বাঁধলো। আমায় খেতে দেবে না, পরতে দেবে না। আমি যেন পর, ওদের সবার গলগ্রহ। একবার অসুখ হলো, তিন রোজ কেউ আমার ঘরে ঢুকলো না, জিজ্ঞেস করলে না কিছু খাবো কিনা। যেন মরে গেলে ওদের হাড় জুড়োয়। তাই ভাল হয়ে ওদের সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছি। আমি মরদকা বাচ্ছা, আমার হিম্মত আছে কিনা দেখাবার জন্যে আমিনাকে সাদি করে আবার নতুন করে এই ঘর বেঁধেছি দিদিমণি। বলো দিদিমণি ঠিক করেছি কিনা?

চাঁপা এর জবাব কি দেবে বুঝতে পারে না। চুপ করে থাকে। তার দীর্ঘপরমায়ু, বুঝি এই সবের জন্যে দায়ী। মনে মনে বৃদ্ধের অসহায় অবস্থার কথা কল্পনা করতে করতে হঠাৎ বলে উঠলো, হাঁ ঠিক করেছো।

চাঁপার ঐ কথার মধ্যে বুঝি কিসের সান্ত্বনা লুকনো ছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর মুখখানা সেই পাকা দাড়িগোঁফের ভেতর থেকে যেন অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোক-ছটার মত ঈষৎ রক্তিম ও পাণ্ডুর হয়ে উঠলো।

ফিরে আসবার সময় সারাপথ চাঁপার কানে ঘুরে ফিরে কেবল সেই একটা কথাই ধ্বনিত হতে লাগল, আমি মরদকা বাচ্ছা!

—

অমরনাথ তীর্থের পথে
নেপাল মুখোপাধ্যায়

পাহাড়ী বাংলো
মদন দত্ত
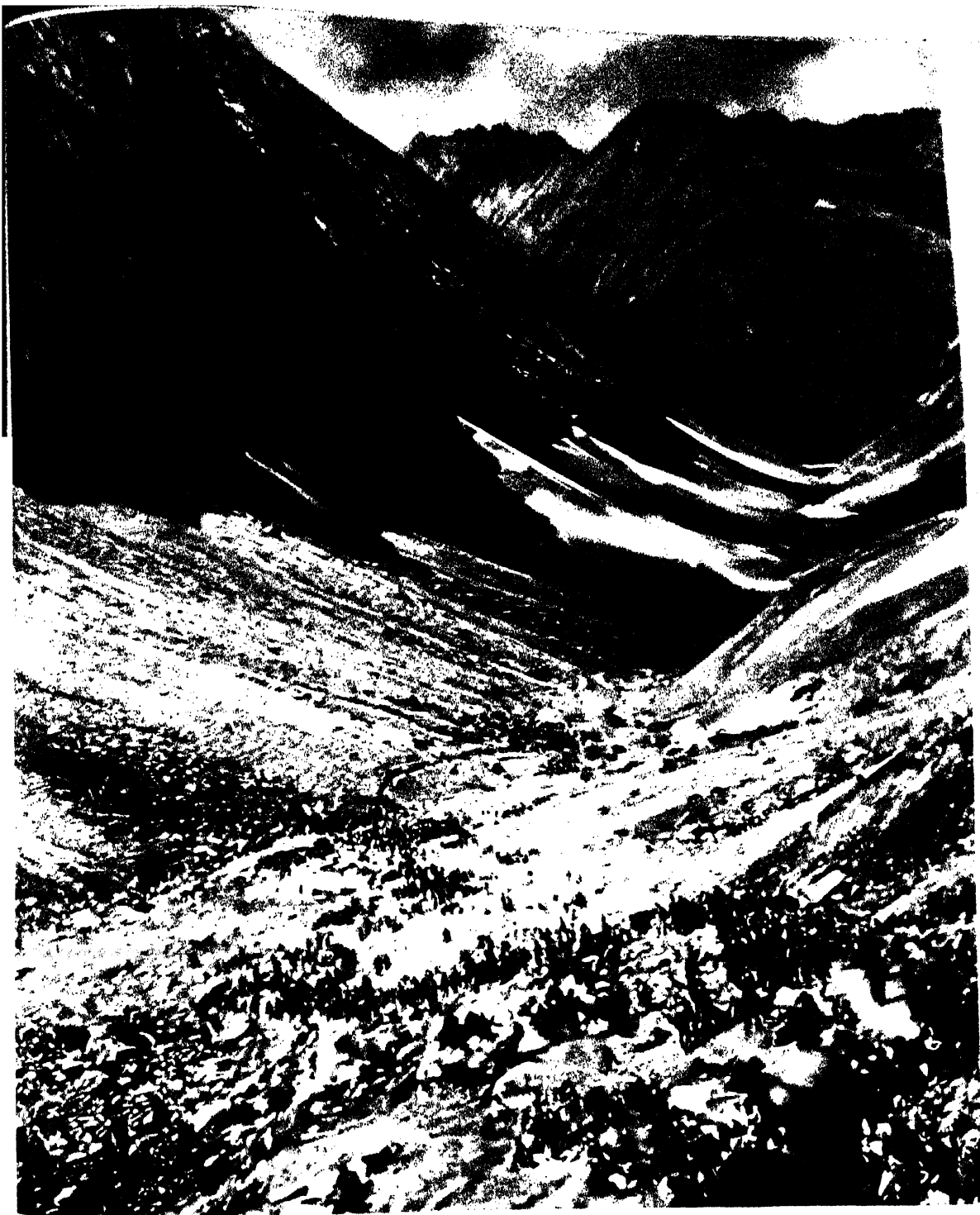
ক্রম নিকাশের পথে জঙ্গলের জীবজন্তু

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

আমার শিকারী জীবনে, শুধু বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নয়, তার বাইরেও আমাকে যেতে হয়েছে। শিকারের এমনি নেশা যে একবার যদি তার মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে জীবনের আর সব কিছুই পেছনে পড়ে থাকে। দৈনন্দিন কাজগুলোও যে অবশ্যকরণীয়, সেটা

তেমন খেয়াল থাকে না। আমি একথা বলতে চাই না যে একই সঙ্গে শিকারী ও সামাজিক মানুষ হওয়া যায় না। আমার বক্তব্যের মূলে উদ্দেশ্য এই যে, মানুষের সংসারে বাস করেও যারা আরণ্য জীবের সাংসারিক পরিচয় নেবার জন্য উৎসুক, তাদের পক্ষে পুরোপুরি সংসারী হওয়া সম্ভব কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এই জীবন যারা বরণ করে নিয়েছে, তাদের লাভ ক্ষতির হিসেব খতিয়ে দেখা যায়, হয়তো একটা দিকে কিছু ত্রুটি থেকে গেলেও আর একটা দিকে যে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, তার তুলনা নেই। দেশের অরণ্য সম্পদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়, জীবজন্তু, বনচারী প্রাণীর জীবিকা, তাদের হাবভাব, রীতি, নীতি, আসক্তি ও বিতৃষ্ণা এবং তারাও যে মানুষের মতই ষড়রিপুর অধীন, এই সব বিষয়ে যে জ্ঞান সংগ্রহ করা যায়, তার মূল্যও কিছু কম নয়, তাই, শিকারে গিয়ে আমার একটি চোখ এই সব দেখেছে, আর একটি চোখ খুঁজে বেড়িয়েছে শিকার। দিনের পর দিন যা চাক্ষুষ করেছি, বিচিত্র পশুপক্ষীর বৈচিত্র্যময় আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং সেই বহুধা জীবন-প্রণালীর মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্যসূত্রে গাঁথা প্রাণিজগতের লীলা আমার অন্তর্লোকে এক অনাস্বাদিত অনুভূতির সৃষ্টি করেছে। এই পৃথিবীতে, মানুষকে বাদ দিয়ে যে বিরাট প্রাণী সাম্রাজ্য ছড়িয়ে আছে, তাদের সামান্য আলোচনাও এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়, কারণ যে কোনও শ্রেণীর যে কোনও জীবের সম্বন্ধে বলতে গেলে, বিরাটকায় গ্রন্থের সৃষ্টি হবে।

আজ এই প্রবন্ধের অবতারণা এই জন্যেই যে, আমার অরণ্য প্রবাসে আমি বিশেষভাবেই একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি এবং সেটা হ'ল আমাদের আরণ্য জীবজন্তুর হ্রাসপ্রাপ্তি। তাই যাঁরা দেশের জন্য চিন্তা করেন, তাঁরা আজ এই জীবজন্তু সংরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন।

একটা অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, শিকার ব্যবস্থা থাকায়, দেশের জীবজন্তু ক্রমনিকাশের পথে এগিয়ে চলেছে। এটা কতখানি যুক্তিসহ বলা কঠিন। তবে নির্বিচার জীবহত্যা কেউ সমর্থন করেন না—আবার শিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করলেও, সেটা আরণ্য জীবের পক্ষে সমুচিত মঙ্গল আনবে কিনা বলা কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে সকলেই একমত যে বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকলে, আমাদের দেশে আরণ্য জীবজন্তুর বিশেষ ক্ষতি হবে।

বন্য পশুপক্ষী যে আমাদের একটি জাতীয় সম্পদ তা' না বললেও চলে। প্রকৃতির দান এই বিরাট ঐশ্বর্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি না করা যায়, হয়ত অদূরভবিষ্যতে চির-দিনের জন্য এই সম্পদ আমাদের হারাতে হবে। মানুষে তার নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে অগ্রণী হবে। এই সম্পদ সযত্নে রক্ষা করা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণের মনে চেতনা জাগিয়ে তোলাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যবস্থার গোড়ার কথা।

সাধারণের বিশ্বাস, অযথা শিকারই জীব-জন্তু, পশুপক্ষী অবলুপ্তির কারণ। অর্থ-নীতিতে একটি প্রবাদবাক্য আছে, খাদ্য দাও, জীব আপনা হতেই আসবে। গ্রাম্য ভাষায় বলে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পশুপক্ষীদের আবাস-যোগ্য উপযুক্ত অরণ্য ও আহার থাকলেই তারা দ্রুত বেড়ে যায় এবং বেঁচে থাকে। বিস্তীর্ণ কাশবনে বন্যবরাহের অভাব হয় না। জনপদের নিকটবর্তী বাঁশ, বেত ও নলবনে চিতার অভাব হয় নি। কিন্তু জঙ্গল কেটে চাষ আরম্ভ হতেই, জন্তু জানোয়ারও কোথায় চলে গিয়েছে। প্রাচীন কালের অভিজ্ঞ শিকারীগণ বলেন, বাংলা দেশে কয়েক বছর আগেও, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে বনমহিষ ও চিতাবাঘের অভাব ছিল না। কত বড় বড় জঙ্গল কেটে জনপদ বসেছে, চাষ আবাদের বৃদ্ধি হওয়ায়, দেশের অরণ্যসম্পদ কমে গেল, আশ্রয় না পেয়ে সেই সব অঞ্চলে জীবজন্তু আর নেই।

অরণ্যে সুষ্ঠু পরিবেশ কা'কে বলে? অরণ্য বিশাল বা গভীর হলেই সেখানে সব রকম বড় জন্তুর সমাবেশ হয় না। সিংহ উঁচু নীচু বালুকাময় উন্মুক্ত জঙ্গল চায়। বাঘ চায় গহন অরণ্য। বিভিন্ন জাতের হরিণ বিভিন্ন ধরণের জঙ্গলে বাস করে। Spotted Deer জলাভূমি বা স্যাঁতসেঁতে জঙ্গল পছন্দ করে, আবার antelope জাতীয় হরিণ, Black Buck বা

নীল গাই চায় উন্মুক্ত প্রান্তর। কিন্তু যে যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানে তাদের খাদ্য ও পানীয়ের পরিবেশ থাকা চাই। চব্বিশ পরগণার সুন্দরবনে সবই প্রায় নোনাজল, কাজেই সেখানে হরিণ বা শূকর বৃদ্ধি পায় না, বাঘের সংখ্যাও নগণ্য হয়েই দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া বছরে দুই তিনবার মধু সংগ্রহ, মৎস্যজীবীদের চলাচল ইত্যাদি কারণে তাদের শান্তিপূর্ণ অরণ্যজীবন বিঘ্নসমাকুল হয়ে ওঠে। এ অঞ্চলে জঙ্গলও ভাল নেই, অতিরিক্ত গরাণ গাছের ছোট ছোট ঝোপ আর হেঁতালের সমাবেশে, আহারের অভাব হয় বলেই হরিণের সংখ্যা বাড়ে না।

সুতরাং আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বন্য প্রাণী ও শিকার সংরক্ষণ বিষয়ে দু একটি কথা বলতে চাই। 'সংরক্ষণ' এই কথাটির মধ্যে একটি তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। সেই তাৎপর্যের দুটো দিক। প্রথমতঃ সাধারণভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে শিকারের উপযোগী পাখী ও জন্তু-জানোয়ারকে উপযুক্ত-ভাবে সংরক্ষিত করা। অবৈধ ও বেপরোয়া শিকারের ফলে আমাদের দেশে ইতিপূর্বেই বন্য প্রাণিজগতে যে দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, সম্পূর্ণ অবলুপ্তির কবল থেকে আমরা যদি তাদের রক্ষা করতে পারি এবং ক্রমশঃ তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব করে তুলতে পারি, তবে যে এই দেশ শুধু প্রাণী সম্পদেই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ হয়ে উঠবে, তাই নয়, আর্থিক জগতেও তার প্রভূত উন্নতি দেখা দেবে।

প্রথমেই, ভারতের, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্য প্রাণী 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার'-এর কথা বলতে চাই। অতীতে সুন্দরবন অঞ্চলে

এই জাতীয় বাঘ বহুল পরিমাণে ছিল; দিনের আলোতেও সুন্দরবনে ঢুকতে কেউ সাহসী হত না; কিন্তু বেপরোয়া শিকারের ফলে এবং চাষ-আবাদ প্রসারিত হওয়ায়, সুন্দরবনের বাঘও ক্রমেই বিরল হয়ে উঠেছে। খাদ্যের অভাব এর একটি প্রধান কারণ। দেশের লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং উপযুক্ত আহারের অভাবে অথবা রুচির পরিবর্তনে মানুষ যদি খাদ্য প্রয়োজনে নির্বিচারে হরিণ শিকার করতে থাকে, তবে বাঘের খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিতে বাধ্য। বাংলাদেশে, বারশিঙ্গা, হগ্‌ডিয়ার, সম্বর প্রভৃতি হরিণ অবলুপ্তির পথে। ভারতীয় বাইসন বা গৌর, বন্য মহিষ, গণ্ডারের সংখ্যাও খুব কমে এসেছে। সুন্দরবন অঞ্চলে যে গণ্ডার দেখা যেত, তা বর্তমানে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। কলকাতার যাদুঘরে তার একটি নমুনা দেখা যায়। হান্টিং চিতাও এই পর্যায়ে।

পক্ষী জগতেও কম বিপর্যয় দেখা দেয়নি। বনের পাখীই হোক, আর বিলের পাখীই হোক, মানুষের লোলুপ দৃষ্টির সামনে কারো রেহাই নাই। পক্ষী জগতের উপর নির্বিচার আক্রমণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশে পূর্বে গোলাপী মাথা হাঁস দেখা যেত, বর্তমানে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। প্যাঙ্গোলিন, সজারু, বনরুই প্রভৃতি জানোয়ারও ক্রমশঃ বিরল হয়ে উঠছে।

প্রকৃতির অফুরন্ত দান এই জীব-জগৎ, কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই কোনও বিশেষ শ্রেণীর পশু বা পক্ষী বিরল হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়; কারণ প্রকৃতির খেয়াল মানুষের হাতের বাইরে। কিন্তু মানুষের যা আয়াসসাধ্য, সেই কাজে তাকে লাগতে হবে।

শিকার নিন্দনীয় নয়; কাব্যে ও সাহিত্যে তার যশোগান করা হয়েছে। কিন্তু শুধু হত্যার জন্যই শিকার সমর্থন করা যায় না। সংরক্ষণবিধি অনুযায়ী শিকার আপত্তিকর নয়। প্রকৃতির প্রাণলীলার যে উদ্দাম প্রবাহ, তাকেও শৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করার কাজে যেমন শিকারের প্রয়োজন, আবার যথেচ্ছ শিকারকে সংযত করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করাও তেমনি অপরিহার্য। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, কানাডা, বৃটিশ যুক্তরাজ্যে দু'শ বছর ধরে নির্বিচার পশুপক্ষী হত্যার ফলে চরম দুর্দৈব দেখা দিয়েছিল; অবশেষে সরকারী প্রচেষ্টায় ও জনসাধারণের সহযোগিতায় সেই সব দেশ বিপদ কাটিয়ে উঠেছে এবং ইদানীং তারাই বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অগ্রণী।

বন্যপ্রাণী সম্পদে ভারতবর্ষ কোনও দিনই অন্যান্য দেশ অপেক্ষা পিছিয়ে নেই। এমন কি, আফ্রিকার ইথীওপীয়ান্ অঞ্চল অপেক্ষা ভারতের প্রাণী-বৈচিত্র্য অনেক বেশী। সুউচ্চ হিমালয় প্রদেশ হতে সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, কাবেরী বিধৌত প্রান্তর, আবার সেই প্রান্তর হতে সমুদ্র সর্বত্রই প্রকৃতির সজীব প্রাণ বৈচিত্র্যে ভারতের জীবজগৎ মুখর হয়ে আছে। পশ্চিমে গুর্জরের মরুঅধ্যুষিত গির্ অঞ্চলের সিংহ, পূর্বে আসামের বাইসন, গণ্ডার, বন্যহস্তী, সুন্দরবনের বাঘ আর সমগ্র ভারতের উত্তরাঞ্চলব্যাপী হিমালয় ও তরাই অঞ্চলের নিবিড় অরণ্যে জীবজগতের প্রকৃত সন্ধান ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায়, তবে ভারতের এই ঐশ্বর্য পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারী প্রচেষ্টায় বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে যে সব কাজের সুপারিশ করেছেন, বেতার, চলচ্চিত্র ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মনে একটা নীতিবোধ জাগিয়ে তোলাই তার মূল উদ্দেশ্য। মানুষ যদি নিজেকে বিশ্বের এই জীবজগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে না নেয়, যদি প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটা আত্মীয়তাবোধ জেগে ওঠে, তা'হ'লে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া অথবা আত্মরক্ষার কারণ ব্যতীত, বন্য পশুপক্ষী-হত্যার ব্যাপারে মানুষ ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠবে। প্রকৃতি নিজের নিয়মেই নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে চলে—কি

বস্তুজগতে, কি প্রাণিজগতে। এই নিয়মের বহির্ভূত কোনও কাজ করা আমাদেরও উচিত নয়।

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যেই দেশে জাতীয় পশুশালা স্থাপন করা হয়েছে। প্রভূত অর্থব্যয়ে দেশবিদেশের পশুপক্ষী সংগ্রহ করে তাদের বিচিত্র জীবন-লীলার সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সুযোগ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। দেশের পশুপক্ষী সম্পদকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চল, অভয়ারণ্য ইত্যাদি গঠিত হয়েছে। সৌরাষ্ট্রের গির্, মহীশুরের বন্দীপুর, মধ্যপ্রদেশের কান্‌হা, আসামের কাজিরাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গের জলদাপাড়া ও গরুমারা—এইগুলিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ভারতের সুবিশাল বনসম্পদও আমাদের এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার অনুকূলে।

কোনও বিশেষ বনাঞ্চল যদি কোনও বিশেষ প্রাণীর পক্ষে বসবাসের উপযুক্ত না থাকে, প্রাকৃতিক কারণেই যদি তার পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তবে, উন্নতধরণের পশুশালা বা পশুউদ্যানের সৃষ্টি করে সেই সব বিরল প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে—এর জন্যে চাই প্রচুর গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নূতন বনাঞ্চল সৃষ্টি করা। ইউরোপের বাইসন, আফ্রিকার শ্বেতপুচ্ছ 'নু' বা চীন দেশের "পিয়ার ডেভিড্ ডিয়ার"ও এইভাবে সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। যদি এইভাবে আমরাও দেশের বিরল পশুপক্ষীদের বাঁচিয়ে রাখতে পারি, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা এবং পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা তাদের বংশবৃদ্ধির উপযুক্ত পরি-

বেশ ও বনাঞ্চল গঠন করতে পারি, তবে শিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সেই হবে আমাদের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। আলিপুরে পশুশালায় মণিপুরের 'থামিন ডিয়ার' এনে রাখা হয়েছে এবং তাদের বংশবৃদ্ধিও হচ্ছে। বিভিন্ন পশু উদ্যানে গির্ বনভূমির সিংহেরও সংরক্ষণ ব্যবস্থা হয়েছে।

শিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আর একটি কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। জীবজগতে পশুপক্ষী যেমন আমাদের জাতীয় সম্পদ, অন্যদিকে আমাদের আর্থিক ব্যাপারেও এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিদেশ থেকে প্রভূত অর্থ অর্জন করে আনে। পর্যটক ও দর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজস্বও অনেক বেড়ে যায়। আফ্রিকার কেনিয়া সরকারের অন্যতম প্রধান শিল্পই হল জীবজন্তু সংরক্ষণ। গত কয়েক বছরে জীবজন্তু ও পক্ষী বিদেশে রপ্তানী করে ভারতের আয় বার্ষিক প্রায় এক কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। একটি জীবিত গণ্ডারের মূল্য বিশ হাজার টাকার কম নয়। এসব ছাড়াও শিকারীদের পারমিট, গুলী বন্দুকের লাইসেন্স ফি ইত্যাদি বাবদ একটা মোটা অঙ্কের আয়ও জাতীয় ধনভাণ্ডারে জমা হয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আমাদের চিন্তা করা উচিত। যদিও প্রচুর ব্যয়ভার বহন করতে হয়, তবুও যদি আমরা উপযুক্তভাবে শিকার সংরক্ষণ করতে পারি এবং সুরক্ষিত অরণ্যে অথবা সামগ্রিকভাবে ভারতের সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত বনাঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় শিকারের উপযোগী পক্ষী ও জানোয়ারের বংশবৃদ্ধি সম্ভব করে তুলতে পারি, তবে হয়ত প্রতি বৎসর অথবা কয়েক বৎসর অন্তর সমস্ত পৃথিবীতে শিকারের আমন্ত্রণ জানাতে পারব এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিক হিসাবে উপযুক্ত লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন হবে। আমার বিশ্বাস, শিকারের অভাব না হলে, উৎসাহী শিকারীরও অভাব কোনও দিনই হবে না।

পরিশেষে একটিমাত্র কথা বলেই ছেদ টানতে চাই। বিখ্যাত শিকারী 'কুমুদনাথ চৌধুরী বলেছেন, "বসুন্ধরা তার প্রকৃতির যে সুন্দর বইখানি আমাদের চোখের সামনে দিনরাত খুলে রেখে দিয়েছেন, তার চেয়ে ভাল পড়বার বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না।" প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃতির

প্রাণ ও নিষ্প্রাণের নূতন সীমারেখা

*** * শিবতোষ মুখোপাধ্যায় * ***

প্রাণ ও নিষ্প্রাণের মধ্যে যে সীমারেখা এতদিন নির্ণীত হোত তার সার্থকতা আজ আর বড় নেই। সাম্প্রতিককালে জীবনের নিগূঢ় সত্তা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা পরিস্ফুট হয়েছে তাতে প্রাণ ও নিষ্প্রাণের মাঝে এখন নূতন সীমারেখা টানা প্রয়োজন।

জীববিজ্ঞানী মাত্রেই বলবেন জীবনের উত্থান হয়েছিল একদা নিশ্চল নিষ্প্রাণ জড় অবস্থা থেকে। নিজীব পৃথিবীতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বস্তুবদৃষ্টিতে যতই আপাত-অঘটন বলে মনে হোক এ কথা স্বীকার্য যে যখন এই আকস্মিক ঘটনা ঘটে তখন পৃথিবীর অবস্থা আজকের মত এমন সুবিন্যস্ত ছিল না। অতীতকালের সেই অকস্মাৎ মুহূর্ত আজ কোথায় হারিয়ে গেছে। যুক্তি তর্ক দিয়ে জীবনের উন্মেষ এবং তার অবিশ্বাসকর এবং বিচিত্রতম পরিণতির কথা হয়তো বোঝান অসম্ভব নয়। কিন্তু কেমন করে জড়ত্বের সমস্ত বাঁধন ভেঙ্গে প্রাণের অভ্যুদয় হল এবং তারপর থেকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে জীবনের প্রবাহ কিভাবে মহাকালকে পেরিয়ে নিত্য ধাবমান তার কোন সরাসরি প্রমাণ নেই। জীবন ও মৃতের স্বধর্ম একে অন্যের এমন অন্তরায় যে এ কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে জড় থেকে জীবনে কেমন করে উন্নীত হতে পারে। জীবনের লক্ষণ স্বরূপ যে সব ক্রিয়াকলাপকে আমরা জানি—নিষ্প্রাণ অবস্থায় তার কোন হদিস মেলে না। জীবন আর মৃত্যু যেন সুমেরু আর কুমেরুর দুই প্রান্তে অবস্থিত। আধুনিক জীববিজ্ঞানের কল্যাণে জীবনমৃত্যুর মাঝখানে যে দুর্লঙ্ঘনীয় ব্যবধান তা যেন উপলব্ধির সেতু দিয়ে অতিক্রান্ত হতে চলেছে। এখন আমরা জেনেছি যে এ জগতে প্রাণের এমন সামান্যতম অবস্থা আছে যা অবস্থাভেদে কখনও সক্রিয়, প্রাণবন্ত আবার কখনও বা তারা নিষ্ক্রিয় নিজীব এবং নিষ্প্রাণ অবস্থা ধারণ করতে পারে। এই নিজীব অবস্থা দেখে মনে হয় মৃত্যুর কাঠিন্যে জীবনের তখন সমস্ত দ্যোতনা স্তব্ধ। এই রকম দুই বিপরীত অবস্থায় ন্যূনতম জীবনের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ভাইরাস জাতীয় জীবের মধ্যে। সমস্ত নিয়মের বাইরে ভাইরাস জন্মমৃত্যুর মধ্যে একটি নতুন সন্ধি স্থাপন করেছে। কতকগুলি অণু নিয়ে গঠিত ভাইরাসের দেহ। এরা জীবনের কতকগুলি অতি অবশ্যকরণীয় কর্ম করতে সক্ষম।

অন্য আর এক গালিভারের জগৎ

এই সব ভাইরাস আয়তনে যে কত ছোট তা অনুমান করা অনেক সময় অসাধ্য হয়। সুবিধার জন্য গালিভারের অন্য আর এক খুদে জগতের কথা অনুমান করতে পারলে ভাল হয়। কোনকিছু ছোট তা বুঝাতে সাধারণতঃ অণুবীক্ষণের সাহায্য নেওয়া হয়। খুব ছোট ওই অ্যামিবা—এককোষী জীব। অণুবীক্ষণের তলায় ফেলে অ্যামিবাকে বড় করে দেখতে হয়—অ্যামিবা প্রোটিয়াসের সাইজ হল একশো একশো কুড়ি মাইক্রন। অ্যামিবার পাশে আবার ব্যাকটিরিয়াকে দেখলে নিতান্ত বালখিল্য মনে হয়। নানান ব্যাকটিরিয়ার নানা রকমের আয়তন হয়। যেমন টিটানাস এর আয়তন দুই থেকে পাঁচ মাইক্রন। এক মাইক্রন হল এক মিলিমিটারের এক হাজার (১।১০০০) ভাগ। অথবা এক ইঞ্চির ১।২৫০০০ ভাগ যক্ষ্মা ব্যাকটিরিয়া হল ০·৫ থেকে ৪·০ মাইক্রন।

যে কথাটা বলতে চাইছি তা হল অ্যামিবা খুব ছোট। তার চেয়ে ঢের ঢের ছোট এই ব্যাকটিরিয়া—ছোট হলেও তাদের অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখা চলে। কিন্তু ব্যাকটিরিয়ার পাশে ভাইরাস রাখলে এই অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে ভাইরাসকে দৃষ্টিগোচর করা যায় না। কারণ ব্যাকটিরিয়ার চেয়ে ভাইরাস হাজার হাজার গুণ ছোট। ভাইরাস হল কতগুলি সজীব অণুর সমষ্টি মাত্র। ভাইরাসকে প্রত্যক্ষ করতে হলে চাই অণুবীক্ষণের চেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র আল্ট্রা-অণুবীক্ষণ। সাধারণতঃ ইলেকট্রন-মাইক্রোসকোপের সাহায্যে এদের দেখা যায়—নানান ভাইরাস আবার নানান আয়তনের হয়। তামাক পাতায় যে ভাইরাস পাওয়া যায় তার আয়তন ১৭ মিলি মাইক্রন। আগেই বলা হয়েছে মাইক্রন হল এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। মিলি মাইক্রন হচ্ছে এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক হাজার ভাগ। এই অনুপাতে টোবাকো মোজাইক ভাইরাসের আয়তনটা একবার কল্পনা করুন।

যত ছোট তত জটিল

ভাইরাসরা পরজীবী—অন্যকোন জীবের দেহে বাসা বেঁধে থাকে। যেমন ব্যাকটিরিয়া থেকে আমাদের নানারকম রোগ ভোগ হয়—যক্ষ্মা, ডিফথিরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা; তেমনি ভাইরাসজনিত রোগ হল ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, হারপিস, হাম, জলাতঙ্ক, সাধারণ সর্দিজ্বর, ক্যান্সার এবং এনসিফেলাইটিস।

ব্যাকটিরিয়া ছোট হলেও তাদের দেহে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও স্লাইম ক্যাপসিউল থাকে। ভাইরাসের দেহে এমন বিরাট কিছু গঠন-চাতুর্য দেখা যায় না। আলট্রা-অণুবীক্ষণের ভিতর দিয়ে ভাইরাসের যে মূর্তিটি আমরা জানতে পারি তা হল অনেকটা ক্লান্তদেহী কোন ব্যাঙাচির মত বা অস্পষ্ট টেনিস বলের আকৃতিবিশিষ্ট জিনিষ। সব ভাইরাস দেখতে অনুরূপ হয় না—গোলাকৃতি বা অন্য প্রকারও হতে পারে। কোন কোন ভাইরাসের মাথায় গোলাকার অংশের সঙ্গে লেজের মত লম্বা একটা জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

ভাইরাস পরজীবী—ব্যাকটিরিয়া থেকে মানুষ পর্যন্ত এদের আক্রমণের সক্ষেত্র। মাছি, মাছ, নানান সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ীদের দেহের মধ্যে এদের সন্ধান মেলে। ভাইরাসদের সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হল এদের 'স্পেসিফিসিটি' গুণ। যে প্রাণীর মধ্যে যে ভাইরাস পাওয়া যায় তা সেই প্রাণী ছাড়া অন্য প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায় না অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ ভাইরাস বিশেষ বিশেষ প্রাণিদেহ আক্রমণ করে। গরুর বসন্ত রোগের কারক যে ভাইরাস তার মর্মানুসন্ধান করে নানা রকমের রসায়নের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর মধ্যে নিউক্লিয়ো প্রোটিন, অন্যান্য প্রোটিন, ফসফেট, কোলেস্টেরল, নিউট্রাল ফ্যাট, কারবোহাইড্রেট, তামা, বাইয়োটিন, রাইবোফ্লেভিন, ক্যাটালেজ, লাইপেস, কারবোহাইড্রেট, ডিএনেজ পাওয়া যায়। সাধারণভাবে যদিচ ভাইরাস দেহে প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডকেই মূল পদার্থ হিসাবে ধরা হয়।

লীলানিকেতন আরণ্যভূমির প্রাণকেন্দ্রে প্রাণচঞ্চল পশুপক্ষীর বিচিত্র ভঙ্গী, কী এক অদ্ভুত সুন্দর শৃঙ্খলায় বাঁধা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—বিভিন্ন ঋতুতে জন্তু জানোয়ারের গায়ের রং পর্যন্ত অরণ্যের মধ্যে যেভাবে মিশে যায়, শিকার উপলক্ষে বিভিন্ন বনাঞ্চলে থাকার সময় এইসব বিচিত্র আনন্দের অভিজ্ঞতাই আমি সঞ্চয় করেছি। শিকার সংরক্ষণের মধ্যেও আছে সেই আনন্দ প্রীতি। বন্যপ্রাণী ও মানুষ অনাদিকাল-ধরে পাশাপাশি বাস করে এসেছে। ক্রমাগত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে আমাদের আরণ্য ভূমিও ক্রমবিকাশের পথে চলেছে। কিন্তু শুধুই শহর গড়ে উঠুক, শুধু কলকারখানা আর ব্লাস্ট ফারনেসের অগ্নি-আলোকে আমাদের জীবন ঝলসে যাক—একথা ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়। কারণ, প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, প্রাকৃতিক নিয়মে যারা চলে, সেই পশুপক্ষী জীবজন্তু থাকবে না, এই চিন্তাও দুঃসহ। সুন্দর বনের বাঘ, গির অঞ্চলের সিংহ, কৃষ্ণবনের নীলকণ্ঠ ময়ূর, বারশিঙ্গা, চিত্রিতাঙ্গ হরিণ বা কৃষ্ণসার মৃগ, গণ্ডার, হস্তী, বাইসন ও নীলগাই যদি লুপ্ত হয়ে যায়, যদি তাদের রক্ষা করার শক্তি আমাদের না থাকে, তবে আমাদের এই অক্ষমতাকে ভাবীকালের দেশবাসী কখনই ক্ষমা করবে না।

ব্যাকটিরিয়াদের যেসব ভাইরাস আক্রমণ করে, তাদের ইংরাজিতে ফাজ পার্টিক্লি অথবা ব্যাকটিরিওফাজ বলা হয়। এই সব ব্যাকটিরিও-ফাজের জীবনেতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এদের আয়তন ৮ থেকে ২১৫ মিলিমাইক্রন। এই সব প্রাণকণার একমাত্র উদ্দেশ্য হল নতুন ব্যাকটিরিয়ার দেহে নিজের অনুরূপে আরও প্রাণকণার সৃষ্টি করা। নতুন প্রাণকণা অর্থাৎ নতুন আর একটি ভাইরাস সৃষ্টি করতে এদের নতুন প্রোটিন উৎপন্ন করতে হয়। প্রোটিনই হল জীবনের মূল বনিয়াদ। প্রত্যেক প্রাণী তার নিজের মত প্রোটিন তৈরী করে জীবনকে অব্যাহত রাখে। সামান্য প্রাণকণার সমষ্টি যে ভাইরাস, তার জীবনেও এই প্রোটিন তৈরী করার সমস্ত পর্যায়গুলি পরিলক্ষিত হয়।

নিউক্লিক অ্যাসিডের সাহায্যে প্রোটিন প্রস্তুতি

ব্যাকটিরিয়া-খেগো ভাইরাসের দেহের আচ্ছাদন হিসাবে থাকে প্রোটিন আর তার ভিতরে নিউক্লিক অ্যাসিড। এই সব ভাইরাস যখন নতুন ব্যাকটিরিয়াকে আক্রমণ করে, তখন তার বাইরের প্রোটিনের আচ্ছাদনটি পরিত্যাগ করে, শুধু নিউক্লিক অ্যাসিডটার অংশটি ব্যাকটিরিয়ার দেহের ভিতরে অনুপ্রবেশ করায়। ভাইরাস ব্যাকটিরিয়াকে একটি রাসায়নিক কারখানা হিসাবে ব্যবহার করে এবং অনতিবিলম্বে নিজের নিউক্লিক অ্যাসিডের সাহায্যে ব্যাকটিরিয়া থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করে। নিজের নিউক্লিক অ্যাসিডকে একাধিকবার বিভাজিত করে তার চারপাশে ব্যাকটিরিয়ার দেহ থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করে নিজের প্রোটিনের আচ্ছাদনটি নির্মাণ করে। বার হয়ে আসার সময় একাধিক ভাইরাস তৈরী হয় এবং এদের প্রত্যেকটি পূর্বেকার মত বাইরে প্রোটিনের আবরণ ও ভিতরে নিউক্লিক অ্যাসিডের অংশ সম্বলিত হয়ে বেরিয়ে আসে। একই ব্যাকটিরিয়ামের মধ্যে যখন দুটি ভাইরাস অনুপ্রবেশ করে, তখন ভাইরাসদের নিজেদের নিউক্লিক অ্যাসিড মধ্যে বদলাবদলি হতে পারে। সবচেয়ে যে কথাটি প্রয়োজনীয়, তা হল এই—নিউক্লিক অ্যাসিডের নিজ দেহানুরূপ প্রোটিন তৈরী করার ক্ষমতা। শুধু ভাইরাসের বেলা নয়, সমস্ত জীব-জীবনের মূলে রয়েছে এই নিউক্লিক অ্যাসিডের অফুরন্ত কর্মকুশলতা। নিউক্লিক অ্যাসিড অণুগুলি দেখতে অনেকটা ঘোরান সিঁড়ির মত। ফসফেট ও সুগার নাইট্রোজেন বেসকে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকে। এই অদৃশ্য সিঁড়িই নিয়ে যাবে জীবনের সমস্ত রহস্যালোকের প্রাণকেন্দ্রে।

কতকগুলি ভাইরাসের এক অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জেনে বিস্মিত হতে হয়। এরা জীবনের সমস্ত লক্ষণ এবং চাঞ্চল্য পরিহার করে মৃতবৎ বহুদিন কিছু না করে পড়ে থাকতে পারে। এই রকম নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ভাইরাসের বংশ বৃদ্ধি ঘটে না, এদের এই অবস্থায় 'ক্রিস্টাল' হিসাবে শিশিতে ভর্তি করে গবেষণাগারের তাকে তুলে রাখা যায়। আবার প্রয়োজন অনুসারে জীবনের সংজ্ঞা-বিরহিত ক্রিস্টালগুলিকে জীবকোষের সংস্পর্শে আনলে নির্জীব ভাইরাস অণুরা সচকিত হয়ে ওঠে এবং পরজীবী অবস্থা গ্রহণ করে জীবনের সংকেত বহন করে। তখন তারা ক্রমাগত নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করতেও পারে। তামাক পাতায় যে ভাইরাস পাওয়া যায়, তাদের জীবনের মধ্যে রয়েছে এই 'দ্বৈত-ভাব'। ভাইরাস শিশির মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, তাদের তামাক পাতার উপর ঘষে দিলে

ইলেকট্রন-মাইক্রোসকোপের নীচে কয়েকটি ভাইরাস—১৫০,০০০ গুণ বড় করে দেখান হয়েছে

ভাইরাসের অণুরা আবার প্রাণের সমস্ত অঙ্গীকার নিয়ে আসে। পর্যায়ভেদে সচল এবং অচল এই দুই অবস্থাসম্পন্ন ভাইরাস জীবনের একটা অভিনব বিচিত্র দিকে আলোক-পাত করে। প্রাণ-পাওয়া অণুর সমষ্টি কখনও জীবন্ত, কখনও মৃত অবস্থায় থাকতে পারে।

ভাইরাস ও ক্যান্সার

বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, ভাইরাসরা জীব-জীবনের ক্রমবিকাশের জটিলতার পথে পথ হারিয়েছে। এরা পরজীবী বলে অনুমান করা কঠিন নয় যে, অভিব্যক্তির সিংহদ্বারে ভাইরাসদের স্থান নেই, তারা পিছন-পথের পথিক। সম্প্রতি কর্কট রোগের সঙ্গে ভাইরাসের নিগূঢ় সম্বন্ধ সম্পর্কে একাধিক বৈজ্ঞানিক আমাদের অবহিত করেছেন। বলছেন যে, মানুষের দেহে স্বাভা[বিক] অবস্থাতেই একাধিক ভাইরাস পরজীবী [হয়ে] বাসা বেঁধে আছে। কোন বিশেষ উত্তে[জক] অবস্থায় না পড়লে এই সব ভাইরাস [মারাত্মক] মূর্তি ধারণ করে না এবং সেইহেতু ক্যান্সারের কোন লক্ষণ দেখায় না। ব্যা[পারটা] পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যখন আমরা [দেখি] একরকম ইঁদুরের দেহে লিউকিমিয়া [ক্যান্সারের] ভাইরাস বর্তমান থেকেও বাহ্যিক লক্ষণ দেখায় না। কিন্তু এক্স[-রে] লাগে যখন এই সব ইঁদুরকে [এক্স-রের] প্রভাবে প্রভাবান্বিত করা হয়, তারপর এই সব ইঁদুরের দেহে লিউকিমিয়া[র] লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। তাই [ও] বৈজ্ঞানিক এই ধারণা পোষণ করেছেন মানুষের শরীরে পরজীবী হয়ে [যে] ভাইরাসই থাকে, তারা সারা জীবনে [হয়ত] কোন রোগ সৃষ্টি করে না। কিন্তু [যদি] কোন বিশেষ রকম উত্তেজক পরি[স্থিতির] সম্মুখীন হলে ভাইরাসরা দেহে ক্যান্সারের লক্ষণ স্পষ্ট করে দেখায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে নানান্ অবস্থা বিপর্যয়ের পর ক্যান্সা[রের] প্রাদুর্ভাব ঘটার বহু নজির সংগ্রহ করেছেন।

আধুনিক গবেষণার ধারা অনেকাংশে না[না] রকমের ভাইরাস কার্যকলাপ নিয়ে পরিব্যাপ্ত। এই সব সামান্য প্রাণকণার মধ্যে জীবনে[র] অসামান্য কথা লুকানো ছিল। বিশেষ ক[রে] এদের জীবন্মৃত এই দ্বৈত অবস্থা এ[বং] নিউক্লিক এ্যাসিডের সাহায্যে প্রোটিন রূপান্তর করার দক্ষতা জীব-বিজ্ঞানে নতুন দিগদর্শী হয়ে উঠেছে। এই সব গবেষণাই ক্রমে আমাদের জানাতে সক্ষম হবে—কী বিশেষ গুণে জড়ে সেদিন ঘুম ভেঙেছে সামান্য অণু পরমাণুর পেয়েছিল প্রাণের ছন্দ।

বাঞ্ছারামের প্রেম

অজিতকৃষ্ণ বসু (অ·কৃ·ব)

বাঞ্ছারাম বলিল, "ভাই, এর পর হঠাৎ কখন কথা বন্ধ হয়ে যাবে জানিনে, তার আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখি, নইলে হয়তো ক্ষমা না চেয়েই চলে যেতে হবে। এ জীবনে জেনে বা না জেনে, জানিয়ে বা না জানিয়ে তোমার কাছে যত অপরাধ করেছি, সব ক্ষমা করো ভাই।"

ক্ষমা করিতে বিলম্ব করিলে বাঞ্ছারাম নিয়ম চটিয়া উঠিবে নিশ্চিত জানিয়া বলিলাম, "করব ভাই, কিন্তু একটি সর্তে।"

করুণ কন্ঠে বাঞ্ছারাম বলিল "কি সর্ত ভাই?"

আমি বলিলাম, "তুমি কত প্রেমিককে সংখ্যক প্রেমপত্র লিখে দিয়েছ, কত দিশেহারা প্রেমার্থীকে প্রেমের গোলকধাঁধায় রাস্তা বাতলেছ, তারপর এই অন্তিমশয্যায় শুয়ে শুয়েও ব্যাপকভাবে প্রেমবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্যে যে প্রেম মহাভারতী রেসিডেনশিয়াল ইউনিভার্সিটির খসড়া পরিকল্পনা শোনালে, তার তো তুলনাই নেই—ওটা ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা করতে পারলে একটা বহু অনুভূত অভাব পূর্ণ হবে, দেশের মহা উপকার হবে। তুমি প্রেম সম্বন্ধে একজন অথারিটি, প্রেমবিদ্যাকে এক-রকম গুলে খেয়েছ বললেই হয়। কিন্তু তোমার মুখে শুধু পরের প্রেমকাহিনী শুনে তো হৃদয় ভরে নি ভাই, তোমার নিজের কিছু শোনাতে হবে।"

ক্ষমার সর্ত শুনিয়া কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া বাঞ্ছারাম মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল আমার এ কৌতূহল স্বাভাবিক বটে। বলিল, "আমার নিজের জীবনে প্রেম কতবার কত রকমে হানা দিয়েছিল, সেই ইতিহাস শুনতে চাও?"

সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়িলাম। আমার সমর্থনে হোমিওপ্যাথ জনার্দন ডাক্তারও তাহাই করিলেন। বাঞ্ছারামের এই শয্যা যে অন্তিম শয্যা এ বিষয়ে বাঞ্ছারামের সহিত তাহার কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে, কিন্তু পেশেন্ট হাতছাড়া হইয়া যাইবার ভয়েই তিনি তাহা প্রকাশ করেন না। বাঞ্ছারামকে তিনি চটাইতে চাহেন না।

বাঞ্ছারাম ছল ছল চোখে ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, "বিধাতা হয়তো অত কথা বলবার সুযোগ দেবেন না ভাই। একটা কাহিনী হয়তো শোনাতে পারি।"

বলিলাম "তাই শোনাও, বাঞ্ছারাম।"

গোপনতার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া নিয়া বাঞ্ছারাম বলিল, "তখন আমি অবসরপ্রাপ্ত হাকিম মুকুন্দ ভাদুড়ীর বাড়ির মোটর ড্রাইভার।"

হঠাৎ ঘরের ভিতর একটা পটকা ফাটিলে বা বজ্রপাত হইলেও বোধ হয় এমন চমকাইয়া উঠিতাম না। জনার্দন ডাক্তার চমকাইলেন কিনা বোঝা গেল না। তিনি বোধ করি পরবর্তী ওষুধ বাছিবার জন্য লক্ষণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন।

আমার মুখ হইতে আমার অজ্ঞাতসারেই প্রশ্ন বাহির হইয়া আসিল "মোটর ড্রাইভার? তুমি?"

আমার অবিশ্বাসের আভাস পাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণতার সঙ্গেই বাঞ্ছারাম বলিল, "হ্যাঁ, মোটর ড্রাইভার। আমি। অবিশ্যি এক মাসের জন্যে, টেম্পোরারি, ভাদুড়ী ভবনের পার্মানেন্ট মোটর ড্রাইভার ব্যোমকেশ পালিত এক মাসের ছুটি নিয়ে দেশে গেল, সেই সময়। আর ঠিক সেই সময় মাসির সঙ্গে আমার একটু মনান্তর। মানে অভিমান। সেই রাগে অজ্ঞাতবাস। মেসো অবিশ্যি জানতেন। মুকুন্দ ভাদুড়ীর ছেলে শংকর ভাদুড়ী আমায় তখন দাদা বলত, সেই এক রকম জোর করে আমাকে এই এক মাসের ড্রাইভারীটা দিলে। ওদের বাড়িতেই থাকা-খাওয়া—একেবারে ঘরের লোকের মতো—আর মাইনেও ভালো। শংকর ভাদুড়ী বললে, ড্রাইভারী তো একরকম নাম-কা-ওয়াস্তে, গাড়ি তোমাকে বড় একটা চালাতে হবে না বাঞ্ছাদা, ও বেশির ভাগ আমিই চালাই।"

বলিলাম, "ড্রাইভারী নিয়ে তুমি ভাদুড়ী-ভবনেই থাকতে লাগলে?"

"থাকতে লাগলাম। গাড়ি বেশির ভাগ সত্যিই চালাত শংকর ভাদুড়ী, অবিশ্যি সঙ্গে আমি থাকতাম। এমনি সময় ক্যালকাটা মোটর ড্রাইভার্স অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক প্রতিযোগিতা, কলকাতার গড়ের মাঠ থেকে রাঁচি পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে যাবার। শংকর নাম লেখালে না বটে, কিন্তু বললে চলো না বাঞ্ছাদা, এই সুযোগে মোটরবিহারে রাঁচি ঘুরে আসা যাক; রাঁচি বেড়ানোও হবে, কম্পিটিশনও দেখা হবে। আমি বললাম, বেশ। রাঁচি দেখবার বাসনা আমারও ছিল।"

"গেলে?"

"গেলাম। কিন্তু আরো রোমান্টিক পরি-স্থিতিতে। ঠিক তার কয়েকটা দিন আগে রাঁচি বেড়িয়ে ফিরেছেন মুকুন্দ ভাদুড়ীর বন্ধু বিনোদ হালদার। সেখানে ছিলেন কানাই মুখুজ্জের ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে। হোটেল তো নয় যেন ইন্দ্রপুরী, অমরাবতী, নন্দন-উদ্যান, প্যারাডাইজ। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল কানাই মুখুজ্জের সঙ্গে কলেজে এক ক্লাসে পড়েছেন বিনোদ হালদার। সঙ্গে সঙ্গে আপনি থেকে তুমি, আর হোটেল বিভাগ থেকে হোটেল মালিকের অন্দর বিভাগে বিনোদ হালদারের স্থানান্তর। সেখানে দেখলেন কানাই মুখুজ্জের মেয়ে মণিলাকে, বেহেস্তের

হুরী, ডানাকাটা পরী, লক্ষ্মীপ্রতিমা, কিন্নরী আর সরস্বতীকে এক সঙ্গে মেলালে যা হয় তাই। বয়স উনিশ বছর। বিনোদ হালদার বললেন, মেয়েকে পাত্রস্থ করবার কি করছ হে কানাই? কানাই মুখুজ্জে বললেন, ঐ তো এক মহা ভাবনা হয়েছে ভাই। নিজের চোখেই তো দেখলে, এ মেয়েকে তো যেমন তেমন পাত্রে সম্প্রদান করতে পারিনে। বিনোদ হালদার আনন্দে তুড়ি মেরে বললেন, হয়েছে। বিধাতা তোমার মেয়ের জন্যে পাত্র ঠিক করে রেখেই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। নইলে বেড়াবার এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে রাঁচিতেই বা এলাম কেন, আর রাঁচিতে আরো হোটেল থাকতে ঠিক তোমার হোটেলেই বা উঠলাম কেন? কানাই মুখুজ্জে শুধালেন, কে সেই পাত্র, বিনোদ? বিনোদ হালদার বললেন, শংকর ভাদুড়ী। মর্মিলার মতো মেয়ে যেমন কোটিতে একটি মেলে কিনা সন্দেহ, শংকরের মতো ছেলে তেমনি লাখে একটা মেলা ভার। রূপে, গুণে, স্বভাবে, কাজেকর্মে, বাপের পয়সায়, স্বাস্থ্যে—সব দিক দিয়েই একেবারে যাকে বলে ওয়ান্ডারফুল। আমার তো মনে হয় তোমার মেয়ে আর মুকুন্দ ভাদুড়ীর ছেলে দুজনে দুজনের জন্যেই জন্মেছে। মর্মিলার বাবা কানাই মুখুজ্জে লাফিয়ে উঠে বললেন, কোন্ মুকুন্দ ভাদুড়ী বলো তো? বিনোদ হালদার বললেন, রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশনস জাজ। কানাই মুখুজ্জে শুধালেন, বাবার নাম? বিনোদ হালদার বললেন, মুকুন্দর বাবার নাম ছিল গোবিন্দ ভাদুড়ী, সিভিল সার্জন, প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি। এইবার আনন্দে তুড়ি মারলেন কানাই মুখুজ্জে। বললেন, মুকুন্দর সঙ্গে ইস্কুলে তিন বছর পড়ে এক সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি। খুব খাতির ছিল ওর সঙ্গে। তারপর থেকে অ্যাদ্দিন আর দেখাশোনা নেই। ওর ছেলেটি একটি জুয়েল হয়েছে বলছ? বিনোদ হালদার বললেন, এ জুয়েলের তুলনা হয় না কানাই। এ মাসটা আশ্বিন। আসছে অঘ্রাণেই লাগিয়ে দাও। কানাই মুখুজ্জে বললেন, মুকুন্দ রাজি হবে তো? বিনোদ হালদার বললেন, মুকুন্দর বাবা রাজি হবে। দুই বন্ধু তোমরা দুই বেয়াই হবে, তৃতীয় বন্ধু আমি ঘটক। আর ঐ যে বললাম, ওরা দুজনে দুজনের জন্যেই জন্মেছে। এবার একটু সংক্ষেপ করব ভাই।"

বলিলাম "করো।"

বাঞ্ছারামের সংক্ষিপ্ত কাহিনী হইতে জানা গেল মোটর গাড়িতে চড়িয়া শংকর ও বাঞ্ছারাম রাঁচিতে ইন্টারন্যাশন্যাল হোটেলে উঠিবে, তারপর বিনোদ হালদারের চিঠি অনুযায়ী কানাই মুখুজ্জে যাহা করিবার তাহা করিবেন। শংকরকে দেখাইয়াই মুকুন্দ ভাদুড়ী কানাই মুখুজ্জেকে চিঠি লিখিলেন "ভাই কানাই, বিনোদের কথা আমার কাছে বেদবাক্য। যতদূর বুঝিতেছি, তোমার কাছেও। তুমি বড়লোক, আমিও তাই; দুজনেই বাল্যবন্ধু, বহুদিন দেখা নাই, তাহাতে কি? তোমার আমার বৈবাহিক হওয়া সেমি ফাইনাল হইল, এবার শ্রীমান শ্রীমতী পরস্পরকে পছন্দ করিলেই ফাইনাল হইবে। শ্রীমান এবং বাঞ্ছারাম (ড্রাইভার) মোটরে রাঁচি যাইতেছে। তুমি যেরূপ ভাল বোধ করিবে।" তারপর 'পুনশ্চ' দিয়া তলায় লিখিলেন "ড্রাইভার বলিয়া বাঞ্ছারামকে হেলা করিও না। সে শিক্ষিত, গুণবান, সম্বংশজাত ইত্যাদি, ইত্যাদি। শ্রীমানকে যেরূপ যত্ন আপ্যায়নাদি করিবে, বাঞ্ছারামকেও তদ্রূপ করিবে, কোনোরূপ তফাৎ করিবে না। শ্রীমান তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে।"

শংকর আড়ালে বিনোদ হালদারকে বলিল "কাকা, নিজের জন্যে নিজেই কনে দেখতে যাব, কেমন একটু লজ্জা লজ্জা করছে। ও'রা কেউ আমাদের কাউকে দেখেননি। বাঞ্ছাদা যদি যান শংকর ভাদুড়ী হয়ে, আর আমি যাই ড্রাইভার বাঞ্ছারাম সেজে, তাহলে নকল বাঞ্ছারামরূপে আমি মুখুজ্জেদের সঙ্গে একটু ফ্রী হতে পারব। মানে সংকোচ বোধটা একটু কম হবে।"

বিনোদ হালদার বলিলেন, "তা যেতে পারো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন জানাজানি হবে তখন ও'রা অপ্রস্তুত হবেন না তো?"

শংকর ভাদুড়ী আশ্বাস দিল পরে উহারা অপ্রস্তুত হইতে পারেন, এরূপ পরিস্থিতি সে বা বাঞ্ছারাম কখনোই ঘটিতে দিবে না। বিনোদবাবু রাজি হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে যে একটা বিষম 'কিন্তু' ভার রহিয়া গেল বাঞ্ছারাম তাহা অনুভব করিতে পারিল। মুকুন্দ ভাদুড়ীর চিঠির সঙ্গে বিনোদ হালদারও ঐ একই খামে আলাদা চিঠিতে কি লিখিয়া রাঁচিতে পাঠাইলেন তাহা বিনোদবাবুই জানিলেন। পাছে পরে রাঁচি পক্ষের কোন প্রকার অপ্রস্তুত হইবার কারণ ঘটে সেই ভয়ে হয় তো তিনি কানাই মুখুজ্জেকে আগাম হুশিয়ারি দিয়া লিখিয়াছিলেন "ভাই কানাই, শ্রীমান শংকর ভাদুড়ী এবং বাঞ্ছারাম (ড্রাইভার) রাঁচি যাইতেছে। শ্রীমান একটু লাজুক প্রকৃতির বলিয়াই সে বাঞ্ছারামের সহিত পরিচয় বদল করিয়া তোমার অতিথি হইবে। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাইতেছি, ড্রাইভারকে শংকর ভাদুড়ী সাজাইয়া শ্রীমান শংকর নিজে ড্রাইভার সাজিয়া যাইতেছে। তুমি যে উহাদের এই চালাকি বুঝিয়া ফেলিয়াছ তাহা উহাদের মোটেই বুঝিতে দিও না। শ্রীমান শংকর যেন ভাবে তুমি উহাকে ড্রাইভার বলিয়াই ভুল করিয়াছ।"

অথবা হয়তো এরূপ কিছুই লেখেন নাই, শুধু লিখিয়াছিলেন "শ্রীমান যাইতেছে। মুকুন্দ আমার মুখে তোমার কন্যার বর্ণনা শুনিয়া তোমার বেয়াই হওয়া সেমিফাইনাল করিয়া ফেলিয়াছে। ফাইনাল নির্ভর করিতেছে শংকর আর মর্মিলার উপর। আমার বিশ্বাস উহাদের দুহাত এক হইবেই, কারণ ইহার পিছনে বিধাতার হাত আছে।"

এই দুই বিপরীত রকম চিঠির কোন্ রকমটি বিনোদবাবু লিখিয়াছিলেন তাহা বাঞ্ছারাম আজিও জানে না, শুধু জানে বিনোদবাবুর চিঠি তাহাদের দুদিন আগেই রাঁচি পৌঁছিয়াছিল। সে চিঠির মর্ম কানাই মুখুজ্জে কন্যা বা পত্নীর কানে তুলিয়াছিলেন, না নিজের মনেই গোপন রাখিয়াছিলেন, তাহাও বাঞ্ছারাম জানে না।

শুধাইলাম "তারপর কি হল, বাঞ্ছারাম?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "প্রতিযোগী মোটর গাড়ীগুলোর সঙ্গেই গড়ের মাঠ থেকে রাঁচি আভিমুখে ভাদুড়ী ভবনের গাড়িতে রওনা হলাম শংকর ভাদুড়ী আর আমি। যেমন ঠিক হয়েছিল বাঞ্ছারাম হয়ে গাড়ি চালাতে লাগল শংকর, আর পিছনের সীটে শংকর ভাদুড়ী হয়ে বসে বসে বড়লোকের ছেলের মতো পা দোলাবার রিহার্সাল দিতে লাগলাম আমি। শংকরের ভূমিকা অভিনয় করব, সারাটা রাস্তা মক্‌সো করতে করতে যেতে হবে তো? শেষকালে রাঁচি গিয়ে মুখুজ্জে ভবনে ভুল করে বসলেই তো কেলেঙ্কারি।"

এই ভুল এবং তজ্জনিত কেলেঙ্কারির ভয় বোধ করি শংকর ভাদুড়ীর মনেও ঢুকিয়া হুলুস্থুলু কান্ড বাধাইয়াছিল। রাঁচি যখন আর মাইলখানেক দূরে তখন গাড়ি থামাইয়া শংকর বলিল, "না বাঞ্ছাদা, ভেবে দেখলাম ওসব ছলনার ভেতর না যাওয়াই ভালো। প্রথমতঃ, আমাদের রিহার্শাল দেওয়া নেই। কখন কি ভুল করে বসবো, বিশ্রী কেলেঙ্কারি হবে। দ্বিতীয়তঃ ভাবী গুরুজনের সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি করা, ভেবে দেখলাম ঠিক শোভন হবে না। তৃতীয়তঃ তোমাকে এই মিথ্যের মধ্যে জড়াতে চাইনে বাঞ্ছাদা।"

সুতরাং বাঞ্ছারাম আবার বাঞ্ছারাম হইয়া গাড়ির চালন-চক্র ধরিল এবং শংকর ভাদুড়ী আবার শংকর ভাদুড়ী হইয়া পিছনের সীটে আসিয়া সু-অভ্যস্ত বড়লোকী ভঙ্গিতে পা দোলাইতে লাগিল।

এই পর্যন্ত বলিয়া বাঞ্ছারাম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। কারণটা দৈহিক, না মানসিক তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

বলিলাম "তারপর?"

বাঞ্ছারাম বলিল, "শেষ পর্যন্ত শংকর আর মর্মিলার মিলন হয়েছিল তাতো বুঝতেই পারছ, সেজন্যে আর আমাকে জিজ্ঞেস করা কেন। কিন্তু আজ অন্তিম শয্যায় শুয়ে শুয়ে মনে পড়ছে ওদের বাড়িতে আমার রাঁচির সেই কটা দিন কি সুধায়ই না ভরে দিয়েছিল মর্মিলা। মনে হয়েছিল তার আশ্চর্য হৃদয়ে শংকর ভাদুড়ী যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে বাঞ্ছারামের কাছে। শংকরকে অবহেলা করেনি মর্মিলা, ভদ্রতা উজাড় করে দিয়েছে তার ওপর, সেদিক দিয়ে নালিশ জানাবার যো ছিল না শংকরের। কিন্তু আমার ওপর মর্মিলা যে আগ্রহ দুহাতে ছড়িয়ে দিয়েছিল তা ভদ্রতার চেয়ে অনে—ক বেশী গভীর। কিন্তু ভাই, আজও জানিনে চিঠিতে কি লিখেছিলেন বিনোদ হালদার। জানিনে রাঁচিতে আমার সেই কটা দিন মর্মিলা যে সুধায় ভরে দিয়েছিল, সে কি আমায় বাঞ্ছারাম ভেবে, না শংকর ভাদুড়ী ভেবে? এই রহস্য বুকে নিয়েই আমায় ওপারে চলে যেতে হবে।"

বলিয়া বাঞ্ছারাম যেভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল তাহাতে মনে হইল বাঞ্ছারামের রাঁচির ঐ দিন কটি অমন মর্মান্তিক সুধায় ভরিয়া না দিলেই ভাল হইত।

আমার মন-পবন বৈশাখী

আবুলকাশেম রহিমউদ্দীন

নদী তোমার বিকিয়ে দূরে-হাটে
শিথিল চালে ফিরে আর কী লাভ
দিনের শেষে মজা দীঘির ঘাটে,
দীঘিতে আজ দারুণ জলাভাব।
এবং অনাদরেই অবশেষে
আমার মন-পবন বৈশাখী;
পালিয়ে গেছে তাইতো কোন্ দেশে
হায় আমার ভালোবাসার পাখি।

এখন আমি একা, অদ্বিতীয়,
যুগের মুখে আগুন দেবো ব'লে।

ভেবো না ছিল পাথর শুধু বুকে,
বরং মেঘ শিলায় ঘনীভূত—
সন্তাপের জঠরে ধুকে ধুকে
যখন গ'লে চোখের পথে দ্রুত
বাইরে আসে, বর্ষা নামে লোনা!
হায়রে সেই আকুল বর্ষায়
দীঘি আমার কেন যে ভরলোনা।
ঘাটের ধ্বস নামলো অবেলায়।

এবং লোনা জলের ছাটে প্রিয়
গানের ক্ষেত অকালে যায় জ্ব'লে।

এখন শুধু বিষ-ফলের কাঁটা
নষ্ট ক্ষেতে পা রাখলেই ফোটে;
বৃথা ভেবেই পাতাল-পথে হাঁটা
ভবিষ্যৎ কবরে কেঁদে ওঠে।
নীলার্তির ছিন্ন মালা বুকে
আকাশও আজ করুণ সন্ন্যাসী,
বাতাস ফেরে আকাল তুলে মুখে,
রাহুর কোলে সূর্য পরবাসী।

আলোয় ছিল যা কিছু রমণীয়
চোখ বুজলো ঝরাপাতার কোলে।

সোনা আমার, মণি আমার, সোনা।
জলসভরা করুণা নয়, নয়,
অন্তিমের নবীন যন্ত্রণা
এনেছ তুমি, যা শেষ সঞ্চয়।
চোখ তোমার ব্যর্থ কলাবতী,
মুখ তোমার অলীক সান্ত্বনা,
বাহু তোমার সব শেষের যতি—
সোনা আমার, মণি আমার, সোনা!

কলস ভেজে তাকেই তুমি দিও
কবরী তোমার যার শিয়রে দোলে॥

যাও পাখী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

'যাও পাখী বোল তারে
সে যেন ভোলে না মোরে'
সে পাখী আকাশপটে প্রসারিত ডানা
আজও উড়ে চলে—
কণ্ঠে বাঁধা মিনতির একটি প্রদীপ
উঠে জ্বলে জ্বলে;
পার হয়ে যায় সেই দূত-পারাবত
মেঘের মিনার
অরণ্য পর্বত নদী কত জনপদ
দূরে সিন্ধু পার;
সুপ্রাচীন বার্তাবহ বয়ে নিয়ে যায়
অতি গোপনীয়
একটি সংবাদ তার প্রাপকের কাছে
অবিস্মরণীয়।
সকরুণ আকুতির মধু গন্ধ ঢালা
দু'ছত্র লিখন
যেন কোন দুর্বিপাকে প্রিয় নাহি তার
হয় অন্যমন।
ভালবাসা জন্মলগ্নে, গভীর গোপন
প্রতিশ্রুতি আনে,
তবু কাঁপে দুটি মন, তবু অবিশ্বাস
বক্ষে শর হানে;
তাই চিরদিন চলে ভালবাসা নিয়ে
বার্তা বিনিময়,
কম্পিত হৃদয়ে বলা পাখীটির মুখে
প্রেমের প্রত্যয়।

যুগ থেকে যুগান্তরে প্রসারিত পথে
পাখী আর ভাষা
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর রূপান্তর নিয়ে
করে যাওয়া আসা।
আমাদের পিতামহী লিখেছিল যাহা
সেই মধুময়
বাণীর হীরকখণ্ডে এ যুগের প্রিয়া
জাগায় বিস্ময়;
মানস-বিহঙ্গ আজও অতিক্রম করে
প্রণয়ের পথ
'ভুলোনা ভুলো না' বাণী কণ্ঠে দোলে তার
শাশ্বত শপথ।

কাল নিরবধি

জগন্নাথ চক্রবর্তী

পাখির মাথায় এখন গাছের বাসা
মুদুলো এবং পুথুলো এবং—
রমণী মাত্রে নবযৌবনে অথৈ
পৃথিবী যদিও বয়সের গাছ পাথর।

নৌকা-গর্ভে এখন নদীর প্লাবন
সেই নিরবধি ছড়া শুধু ছেঁড়া পাতায়
কূপে নলকূপে সন্তরণের রেওয়াজ
অকারণ ক্রোধে ভীষণ রকম কাতর।

নয়া পয়সার কিনেছি জগৎসংসার
করতলগত ভালবাসা থামলাক
ডিগবাজি খান জটাধারী পরমাত্মা
বৃদ্ধে যুদ্ধমাজে বয়ঃসন্ধি-আতুর।

নক্ষত্র গুঁড়িয়ে গিয়ে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

নক্ষত্র গুঁড়িয়ে গিয়েই বিষাদ,
সারাটা রাত সেই হিম কণাগুলি
মনের গভীরে ভেসে বেড়ায়,

কাকে যেন খুঁজে বেড়ায়
অস্তিত্বের প্রাসাদের
অন্ধিসন্ধিতে।

ভোরের ফুঁয়ে রাত ফরসা হয়,
হাওয়ার হাত রুদ্ধ জানালা খুলে দেয়,
খুশির তাপে হিম গলে যায় তখন,

আঁধারের ছায়া-জড়ানো বিষ
বেদরকারী উদাসীন অগ্রাহ্যে
চুপি চুপি মিলিয়ে যায়,
মিলিয়ে যায়
কখন।

আকাশের বুকে নক্ষত্র গুটি তারার মতো
বিষণ্ন প্রাণ জেগে ওঠে পৃথিবীতে,
বিস্মৃতির ঝড় ওদের ওপর দিয়ে গেলে
ওরা গুঁড়িয়ে যায়,

নক্ষত্র যেন গুঁড়িয়ে যায়,
তখন বিষাদ সারাটা রাত
কাকে খুঁজে বেড়ায়
অস্তিত্বের অন্ধিসন্ধিতে।

দান

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

মনে কত আশা প্রীতি ভালবাসা
ও দুটি নয়নে পেয়েছি,
প্রেম সাধনায় লীলার তোমায়
যুগে যুগে কাছে চেয়েছি।

বাসনা কামনা করে ছারখার,
এই বেলা এসে লও সব ভার,
পারি না বহিতে ব্যথার পাথার—
নীরবে ছলনা সয়েছি।

কুসুমের মধু কতকাল রবে
রাখিব কেমনে ধরিয়া,
যত বেলা যায় বিফলে শুকায়
ফুলের পাঁপড়ি ঝরিয়া।

শয়নে স্বপনে মধুর মিলনে
আবাহনী গান গেয়েছি,
আকুল এ-হিয়া চরণে সঁপিয়া
প্রেমের পূজায় দিয়েছি।

চাঁদের দেশে প্রথম মানুষ

শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

গত ৩০শে জুলাই নিচের খবরটি দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল :

চন্দ্র-সার্ভিস

ক্যালিফর্নিয়া ২৯শে জুলাই—আর বছর দশেকের মধ্যেই চাঁদে যাতায়াত সম্ভব হইবে এবং মাথাপিছু যাতায়াতী টিকিটের দাম পড়িবে সওয়া দুই লক্ষ টাকার মত—এই হিসাব কষিয়াছেন লকহীড ক্যালিফর্নিয়া কোম্পানী। হিসাবটি 'নাসা'র জন্য।

এই হিসাবে আরও বলা হইয়াছে—মাসে ১৬টি ট্রিপ ধরিলে চন্দ্র-সার্ভিস চালু রাখার জন্য বছরে খরচ হইবে প্রায় পঞ্চাশ কোটি টাকা।

বিস্তারিত বিবরণের অভাবে এই সংবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন। তবে বছর চারেক আগের হিসেবে ধরা হয়েছিল চাঁদে যাতায়াতে ব্যয় পড়বে ৬ কোটি ডলার অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ কোটি টাকার মতো। তবে একটি বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, চাঁদে পদার্পণ করতে মানুষ বদ্ধপরিকর। সোভিয়েট রুশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই ব্যাপারে জোর প্রতিযোগিতা চলছে। আমেরিকায় একটি প্রচলিত রসিকতা হল এই :

প্রশ্ন : প্রথম আমেরিকান চন্দ্রলোক-অভিযাত্রী চাঁদে সর্বপ্রথম কি আবিষ্কার করবে?

উত্তর : জনৈক রুশ।

১৯৫৭ সালে প্রথম স্পুটনিক আকাশে ওঠবার পর অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ১৯৬০ নাগাদ মানুষ চাঁদে গিয়ে পেঁছবে। এখন অনুমান হয়তো আরও বছর দশেকের আগে তা সম্ভব হবে না। এখানে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চাঁদে যাওয়া এখনই সম্ভব, যাত্রীবিহীন রুশ রকেট চাঁদের বুকে নেমেছে, তা সকলেই জানেন। সুতরাং মানুষ পাঠান কিছুমাত্র কঠিন নয়। মুশকিল প্রথম অভিযাত্রীকে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা।

জড্রেল ব্যাঙ্ক রেডিও টেলিস্কোপকেন্দ্রের অধ্যক্ষ লাভেল প্রমুখ অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন চাঁদে যাবার জন্য এই ব্যগ্রতা—বিশেষ করে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে এই তীব্র প্রতিযোগিতার কোন মানে হয় না, চাঁদে যাওয়াটাও এমন কিছু জরুরী ব্যাপার নয়। এরজন্য যে অজস্র অর্থ ব্যয় হচ্ছে, তা অন্য কোন ভাল কাজে লাগান যেত। যারা চাঁদে যাবার জন্য প্রস্তুত, তারা অবশ্যই একথায় কান দেবে না। এবং চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করবার জন্য নিরলস চেষ্টা করে যাবে।

রকেট কেমন করে চলে

আজকে সকলেই জানেন যে, মহাকাশযাত্রার জন্য রকেটযান অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং রকেট কি এবং কেমন করে চলে এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। রকেট আর হাউই সমার্থক। কালী পুজোর সময় যে হাউইবাজি আকাশে ছোড়া হয়, তার সঙ্গে মহাকাশযাত্রী রকেটের বিন্দুমাত্র মূলগত প্রভেদ নেই।

সাধারণ হাউইয়ে একটি হালকা খোলের মধ্যে কিছু বারুদ থাকে। পলতে দিয়ে বারুদে আগুন লাগিয়ে দিলে দহনের ফলে গ্যাস উৎপন্ন হয়ে পিছনের ছিদ্র দিয়ে তা সবেগে নির্গত হয়, আর এই চাপের প্রতিক্রিয়ায় হাউই উপরে উঠে যায়। যাঁরা বন্দুক ছুঁড়েছেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, গুলী সামনে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা পিছনে ধাক্কা মারে। বন্দুকের ভর যদি গুলীর ভরের হাজার গুণ হয়, তাহলে বন্দুকের বেগ গুলীর বেগের হাজার ভাগ হবে।

মনে করুন আপনি স্থির জলের উপর একটি নৌকোতে রয়েছেন। এখন যদি আপনি গুলী ছোড়েন, তাহলে ধরুন বন্দুকে ছোড়ার ফলে নৌকা সেকেণ্ডে ৪ ফুট বেগে পেছিয়ে যেতে সুরু করল। আর একটা গুলী ছুড়লে বেগ আরও ৪ ফুট বেড়ে সেকেণ্ডে ৮ ফুট হবে। অনেক গুলী থাকলে আপনার নৌকোয় বেগ যথেষ্ট বাড়ান চলতে পারে। এক কথায় রকেটের মূলসূত্র 'ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়' এই প্রবাদের বৈজ্ঞানিক সংস্করণ, 'ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীতমুখী', নিউটনের তৃতীয় নিয়মের মধ্যে নিহিত।

মহাকাশ-বিচরণে এরোপ্লেন বা বেলুনের স্থান নেই, কারণ বাতাস ব্যতীত এরা অচল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে কিছু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ২০০—২৫০ মাইল উঁচুতে বাতাসের অস্তিত্ব নেই, মনে করা যেতে পারে, সুতরাং সেখান থেকে মহাশূন্য আরম্ভ হল, একথাও বলা যায়, যদিও অবশ্য কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। মানুষের শ্বাস নেবার মতো বাতাস পৃথিবীপৃষ্ঠের পাঁচ মাইল উপরেই নেই।

রকেটে শুধু জ্বালানী নিয়ে গেলেই চলবে না, তাকে জ্বালাবার জন্য অক্সিজেন বা অন্য কোন দাহক পদার্থও বয়ে নিয়ে যেতে হবে। রকেট দু রকমের কঠিন-জ্বালানী ব্যবহারকারী অথবা তরল-জ্বালানী ব্যবহারকারী। দুটোরই সুবিধে এবং অসুবিধে আছে। হাউই বাজিকে আমরা কঠিন-জ্বালানী শ্রেণীতে ফেলতে পারি। তরল-জ্বালানী রকেটে সাধারণত কেরোসিন বা সুরাসার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আর দাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তরল অক্সিজেন বা 'লকস' (লিকুইড' শব্দের 'এল' ও অক্সিজেনের অক্স সংযোগে)। সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড এয়ারক্রাফট কর্পোরেশন একটি ২৫০ টন কঠিন-জ্বালানী রকেট নিয়ে পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন। ৭৫ ফুট দীর্ঘ এই রকেটের ওজন ২৫০
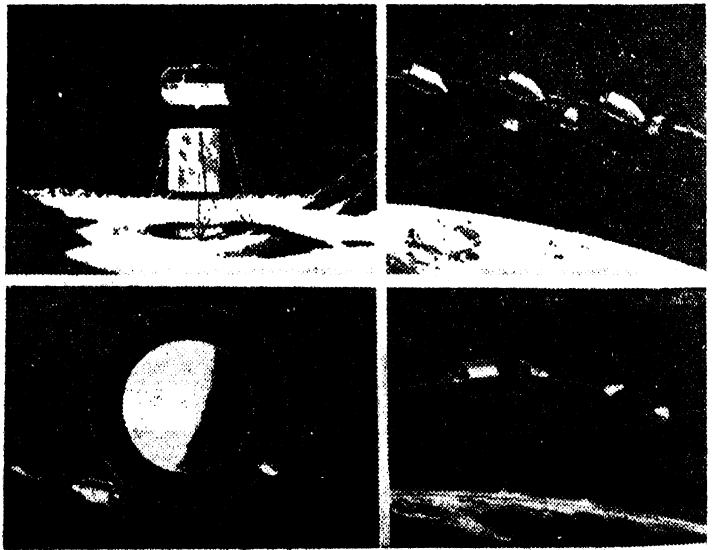
উপরে বামে : চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে যাত্রাশুরু। উপরে দক্ষিণে : চন্দ্র-পরিক্রমারত মহাকাশযানের সঙ্গে মডিউলের সংযুক্তি-সাধন। নিচে বামে : চন্দ্রের আওতা ছেড়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা। নিচে দক্ষিণে : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃ প্রবেশ।

চালকহীন প্রকোষ্ঠ চাঁদের পৃষ্ঠে একটি স্বতঃক্রিয় যান নামিয়েছে। যানটি একটি পারমাণবিক শক্তির উৎস টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে ভবিষ্যৎ চন্দ্র-অভিযাত্রীরা শক্তির ব্যবহার করতে পারে।
(ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর সৌজন্যে)

টন। এতে জ্বালানী ও দাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণ, অ্যামোনিয়াম পারক্লোরেট ও কৃত্রিম রবার। দুই মিনিটে এই রকেটে ১০ লক্ষ পাউন্ড চাপ উৎপন্ন করা যায়। অনুমান চন্দ্র-অভিযানে নিয়োজিত রকেটের প্রথম পর্যায়ে এই রকেট ব্যবহৃত হবে। নর্থ অ্যামেরিক্যান কর্পোরেশনের তরল-জ্বালানী রকেট এফ-১ ১৫ লক্ষ টন চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

পৃথিবী হইতে বিদায়

পৃথিবী তার সন্তানদের এমনই জোরে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যে, সেই বন্ধন কাটান সহজ নয়। স্কুলের ছেলেমেয়েরাও জানে যে কোন বস্তু ছেড়ে দিলে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। উঁচুতে একটি বল ছুড়লে উপরে ওঠার সংগে সংগে তার বেগ কমে এসে শূন্য হয়ে যাবে এবং তারপর তা পুনরায় মাটির দিকে ফিরে আসবে প্রতি সেকেন্ডে ৩২ ফুট/সেকেন্ড ত্বরণ হিসাবে। অর্থাৎ শূন্য বেগ থেকে সুরু করলে ১ সেকেন্ড পরে তার বেগ হবে ৩২ ফুট/সেকেন্ড, ২ সেকেন্ড পরে হবে ৬৪ ফুট/সেকেন্ড ইত্যাদি। এই মহাকর্ষজনিত ত্বরণ সব জ্যোতিষ্কেই বর্তমান। চাঁদে পৃথিবীর প্রায় ষষ্ঠাংশ, বেশির ভাগ গ্রহেও পৃথিবীর চেয়ে কম।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, সেকেন্ডে ৭ মাইল বা ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগ পেলে কোন বস্তু পৃথিবীর মহাকর্ষের বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। এর চেয়ে কম বেগ হলে তা পৃথিবীর বুকে আবার নেমে আসতে পারে অথবা পৃথিবীর চার পাশে কৃত্রিম চাঁদের মতো ঘুরতে পারে। পৃথিবীর চতুর্দিকে পাক খাবার জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় বেগ ঘন্টায় ১৮,০০০ মাইল।

বর্তমানে কোন একটি রকেটে ঘন্টায় ২৫,০০০ বেগ তোলা যায় না। সুতরাং মহাকাশযানকে পৃথিবী ছাড়িয়ে যাবার উপযুক্ত বেগ দিতে কিছু কৌশল অবলম্বন করতে হয়। দুই থেকে চার অংশে রকেট বিভক্ত থাকে এবং সবচেয়ে উপরে থাকে আসল যাত্রীবাহী প্রকোষ্ঠ। প্রথম অর্থাৎ সবচেয়ে নীচের রকেটের জ্বালানী ফুরিয়ে গেলেই তা স্বতঃক্রিয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়ে যায় আর দ্বিতীয় অংশটি চালু হয়ে যায়। ধরা যাক প্রথম রকেটের বেগ ঘন্টায় ১০,০০০ মাইল। তাহলে দ্বিতীয় রকেট চালু হবার সময়েই তার বেগ রয়েছে ১০,০০০ মাইল। দ্বিতীয়টির বেগ ঘন্টায় ৮,০০০ ওঠা সম্ভব হলে মোট বেগ উঠবে ১৮,০০০ মাইল। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই এক-একটি অংশ খসে পড়ে যাবে আর পরবর্তী অংশ চালু হবে। অবশ্য ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইল বেগ উঠলে রকেটের বেগ আর বাড়াবার দরকার নেই, রকেটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেই হবে। যাত্রার প্রথমে রকেট খাড়া উপরে উঠে যায়। তার পর তার বেগ পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠবার উপযুক্ত হলে রকেটের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয় আর রকেটের দিক পরিবর্তিত হয়ে প্রায় অনুভূমিক হয়ে যাবে। এখন তার দিক নির্দিষ্ট থাকলে তা চাঁদের কাছে গিয়ে পৌঁছবে।

ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইলের কিছু কম, ২৪,৯০০ মাইল হলে রকেটের চাঁদের কাছে গিয়ে চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের উপ-উপগ্রহ রূপে ঘুরতে থাকবে। প্রথমে এইভাবে চাঁদ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হবে। চন্দ্রের মাটিতে পদার্পণ তার পরের কথা।

মার্কিন পরিকল্পনা

আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানী লাভেল বলেছেন, রাশিয়ানরা চাঁদে অবতরণের পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। একই বিষয়ে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে মহাশূন্য সম্পর্কীয় গবেষণায় সহযোগিতা বরং বাঞ্ছনীয়। লাভেলের উক্তির সমর্থনে কোন রুশ বিজ্ঞানীর মন্তব্য কিন্তু শোনা যায়নি। রাশিয়ানরা তাঁদের পরিকল্পনাও প্রকাশ করেনি। চাঁদে অবতরণের মার্কিন পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয়েছে প্রজেক্ট অ্যাপোলো।

প্রজেক্ট অ্যাপোলো সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার মাইল। মার্কিন পরিকল্পনা অনুসারে তিনজন যাত্রীবাহী রকেট চাঁদে যাত্রা করবে। চাঁদ পর্যন্ত যেতে
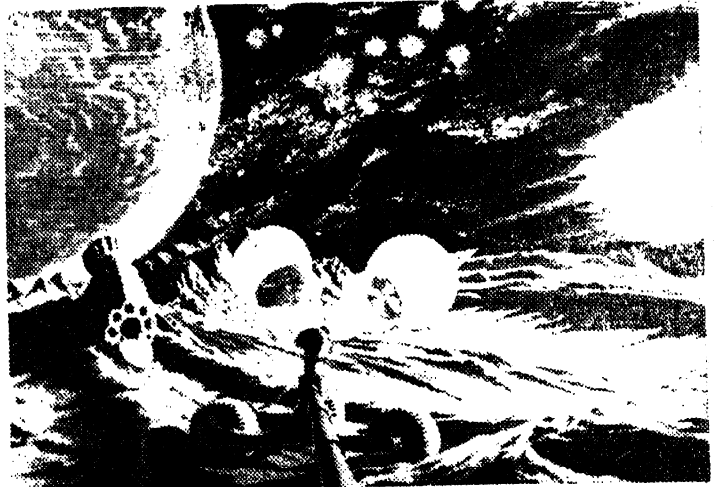
চাঁদের পৃষ্ঠে সক্রিয় স্বতঃক্রিয় টেলিভিজন ক্যামেরা।
(ভারতস্থ রুশ দূতাবাসের সৌজন্যে)

প্রায় তিন দিন সময় লাগবে। রকেটটি সরাসরি চাঁদে নামবে না। প্রথমে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে শ'খানেক মাইল উ'চুতে চাঁদের চারদিকে পাক খেতে থাকবে। এই রকেটযানের একটি অংশ পৃথক করা যাবে, তাকে বলা হয়েছে লুনার এক্সকারশন মডিউল। এই পৃথক অংশে তিনজন শূন্যযাত্রীর দুজন চাঁদের পৃষ্ঠে গিয়ে নামবেন। চাঁদে কয়েক ঘণ্টা সময় কাটিয়ে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তাঁরা ঘূর্ণ্যমান রকেটে ফিরে আসবেন। পরিভ্রমণশীল অবস্থায় দুটি পৃথক যান যুক্ত হবে এবং তার পর পৃথিবীতে ফিরে আসবে। এই ব্যাপারে মার্কিন সরকার ১৯৭০ পর্যন্ত আন্দাজ দু হাজার কোটি টাকা খরচ করবে।

ব্যাপারটা শুনতে যত সোজা, কার্যতঃ তার চেয়ে বহু কঠিন। এর জন্য আরও বহু তথ্য সংগ্রহ এবং অভ্যাস প্রয়োজন। বিশেষ করে মহাকাশে দুটি যানের সংযুক্তিকরণ। চাঁদ সম্পর্কেও আরও বহু তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন চাঁদের পৃষ্ঠে ধুলার আস্তরণ বর্তমান, বিশেষ করে তথাকথিত সাগরগুলো নাকি সূক্ষ্ম ধুলির সমুদ্র। সুতরাং কোথায় অবতরণ করা সুবিধাজনক সেটি বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বিচার করা দরকার। তৃতীয় লুনিক যেমন চাঁদের অদৃশ্য পিঠের ছবি তুলেছিল সেই রকমভাবে আরও অনেক ছবি নেওয়া প্রয়োজন হবে। মানুষ পাঠাবার আগে চন্দ্রের ভূমিতে স্বতঃক্রিয় যন্ত্র পাঠিয়ে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হবে।

এ ছাড়া পথের বাধাও বিবেচনা করতে হবে। পৃথিবী থেকে কিছু দূরে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিকিরণের একটি মেখলা রয়েছে। এর মধ্যে গিয়ে পড়লে বিকিরণের প্রভাবে যাত্রীদের দেহের ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে। ১৯৭০ নাগাদ যদি চন্দ্র অভিযান ঘটে তাহলে আর একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। ঐ বছরে সূর্যের বিকিরণ বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আরও আছে মহাকাশে ব্যাপ্ত সূক্ষ্ম উল্কা-কণিকা।

খাদ্য, পানীয় ও শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সবই বয়ে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য চন্দ্র অভিযান বড় জোর সপ্তাহখানেকের ব্যাপার। সুতরাং এই সমস্যা এমন কিছু বড় নয়।

এতদিন ভারহীন অবস্থায় যাপন করলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া কি হয় সে বিষয়ে আরও পরীক্ষা প্রয়োজন। বর্তমান মার্কিন পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পরীক্ষা করা হবে অদূর ভবিষ্যতে।

চাঁদে উপনিবেশ

চাঁদে একদিন উপনিবেশ গড়ে উঠবে এই কল্পনা আমরা করতে পারি। পৃথিবীর লোক সংখ্যা কমাবার কাজে অবশ্য এই উপনিবেশ সাহায্য করবে না। এটি হবে নিছক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র, বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যার গবেষণার জন্য। এমন উপনিবেশ অবশ্য স্বচ্ছ আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে কারণ চাঁদে বাতাস নেই। জলও সম্ভবত নেই। সুতরাং প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিষই প্রথমে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর্থার সি ক্লার্কের কল্প-কাহিনী আর্থ লাইট-এ চান্দ্র উপনিবেশের চমৎকার বর্ণনা আছে।

———

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সব সাফ। চালকহীন বুলডোজার এবং ক্রেণগুলোকে ফেলে দেওয়া হলো। তিনশ' চারশ' ফুট [illegible]চে। শিবিরের যত খাদ্য, সমস্ত ওষুধ বিষুধ, সাজ সরঞ্জাম প্রয়োজনীয় যা কিছু, সব এক জায়গায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলো। যত পেট্রোল ছিল সব ঢেলে দিয়ে। দেখতে দেখতে সব শেষ হয়ে গেল।

মাত্র সাত মাইল দূরে যুদ্ধ চলছে। দাউ দাউ আগুনে এদিকে সব জিনিষ পুড়ছে। সেই আগুনের আভা ওরা দেখতে পাচ্ছে সাত মাইল দূরে থেকে আর নিজেরাও জ্বলে পুড়ে মরছে।

ক্ষোভের কী দুঃসহ যন্ত্রণা! কিছুই যদি না পাওয়া গেল তবে কিসের জন্যে এই যুদ্ধ?

ওদিক থেকে ঘন ঘন মেসিনগানের শব্দ আসছে। অয়্যারলেস কোডে শত্রুপক্ষের অবস্থান বদলের খবরও মাঝে মাঝে পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের সৈন্যরা নিরুদ্দেশ। শত্রুর অগ্রগতিতে তারা ভ্রূক্ষেপহীন। পশ্চাদপসরণের সামরিক কৌশল তারা গ্রহণ করেছে। শেষ আঘাত হানবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে তারা পিছিয়ে আসছে একের পর এক শিবির জ্বালিয়ে দিয়ে।

এই শিবির জ্বালানোর দায়িত্ব যে স্কোয়াডের ওপর তারা যেমনি দুর্ধর্ষ তেমনি বেপরোয়া। এক টুকরো জিনিষও শত্রুর হাতে যাতে না পড়তে পারে সেটাই তাদের প্রধান চিন্তা। সে কাজে তারা সফল, তাতে তাদের অসীম আনন্দ।

কিন্তু সেই সাফল্য অর্জন করে ব্রহ্মপুত্রের অদূরে শেষ শিবিরে এসে পৌঁছুতে তাদের তিনদিনে একশ মাইল পথ হেঁটে আসতে হয়েছে। প্রচন্ড শীতে পাহাড়ী পথের জমাট তুষারে পা খেয়ে গেছে তাদের অনেকের। তবুও কুছ্‌পরোয়া নেই সেই সব জওয়ানদের। ফার্স্ট এডের পরেই তারা শিরদাঁড়া সটান করে আবার প্রায় 'আমরা প্রস্তুত'! বুঝতে না দিলেও তাদের মধ্যে একজন অবশ্য যথার্থই কাবু। নির্মলের পায়ের ক্ষতটাই সবচেয়ে বেশি। দলের আর সবাই তবু নড়াচড়া করতে পারছে—তারা কষ্ট করে উঠছে বসছে দাঁড়াচ্ছেও সময় সময়। কিন্তু দাঁড়ানো তো পরের কথা নির্মলের পক্ষে বসাও কঠিন সমস্যা।

তা হলেও নির্মলের মনের জোর অপারসীম। তাদের স্কোয়াডে একমাত্র বাঙালী সে—সে-ই স্কোয়াড্রন লীডার। লীডারের দায়িত্ব অনেক বেশি। নির্মল তা জানে। জানে বলেই অসহ্য বেদনার মধ্যেও সে তার হাসিখুসি মুখখানাকে সর্বক্ষণ অবিকৃত রেখেছে, এক পায়ের তিনটি এবং আরেক পায়ের বুড়ো আঙুলটি বরফের কামড়ে খসে পড়ে গিয়েছে।

তবুও তা আভাষে ইংগিতেও সে বুঝতে দেয়নি সহযোগীদের। পাছে সহকর্মীদের মনে তার ফলে কোনো দুর্বলতা দেখা দেয়, তারা তাদের লীডারের জন্যে একটুও ব্যস্ত বা বিব্রত বোধ করে শুধু সে জন্যেই নির্মল হাসতে হাসতে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে চলেছে। সে কষ্ট দুঃসহ কষ্ট। কিন্তু বাইরে তার একটুও প্রকাশ নেই। আশ্চর্য! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলেও সৈনিককে তো এমনিই হতে হবে।

যেখানে তার ব্যতিক্রম সেখানেই লজ্জা। সেই লজ্জার কালিমাতেই ক্যাপ্টেন পাল কলংকিত। এবং বিশেষ করে বাঙ্গালী বলেই পালের কাহিনী শুনে নির্মলও অধোবদন।

ব্রহ্মপুত্রের অদূরে এই শেষ শিবিরের মেডিক্যাল ইউনিটটিতে বেশ কয়েকজন বাঙ্গালী। মেজর ঘোষ, ক্যাপ্টেন পাল এবং নার্স মিস বেলা দাস; এ ছাড়াও আছে হস্‌পিটাল বয় গজানন, বাড়ি কটকে হলেও জন্ম থেকেই সে কলকাতায়। একসঙ্গে এত কয়জন বাঙ্গালীকে পেয়ে বাঙ্গালী সত্তা কিঞ্চিৎ যেন জেগে উঠেছে নির্মলের মধ্যে। গত কয়দিন যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে একমাত্র 'ভারত চিন্তা' ছাড়া আর কোনো চিন্তারই স্থান হয়নি তার মনে। সে ভারতীয়, ভারতীয় ছাড়া আর কিছুই সে নয়—ভারতের প্রতিবিন্দু অপহৃত মাটিকে উদ্ধার করা, তার প্রতিটি কণাকে রক্ষা করাই তার ধর্ম—সেই ভাবেই ভেবে এসেছে নির্মল। শ্রেষ্ঠ ভারতীয়, যথার্থ ভারতীয়ের এই তো লক্ষণ।

কিন্তু সেই স্বদেশবোধের গৌরবকে হারাবে কেন বাঙ্গালী একটি ক্ষেত্রেই বা কেন তার ব্যতিক্রম ঘটবে. এই প্রশ্ন আজ নির্মলের মনে। ক্যাপ্টেন পালের বিমর্ষতা, তাঁর মধ্যে একটা মনমরা ভাব লক্ষ্য করেই নির্মলের মনে এই প্রশ্নের তোলপাড়।

আচ্ছা, বলতে পারেন মিস দাস, ক্যাপ্টেন পাল সব সময়েই এমনি নিস্তেজ নির্বাক্ কেন?

নার্স মিস দাস নির্মলের পায়ের ক্ষত পরিষ্কার করতে করতে বলে. ভদ্রলোক বড্ড ভীতুধরণের মানুষ। এ ধরণের লোকের পক্ষে মিলিটারিতে আসা ঠিক নয়।

কেন, কিসের এত ভয়? ক্যাপ্টেন পাল সম্বন্ধে সত্যি সত্যি আপনি জানেন কিছু?—একটা অসহ্য যন্ত্রণাকে দুপাটি দাঁতে চেপে রেখে নির্মল কোনো রকমে জিজ্ঞেস করে। গভীর ক্ষতের ভেতরে পুঁজ জমে গিয়ে বিশ্রী রকমের একটা গন্ধের সৃষ্টি করেছে। ডেটলের জলে ধুয়ে ধুয়ে সেই দুর্গন্ধ পুঁজ-রক্তই পরিষ্কার করছে নার্স। যে পায়ের বুড়ো আঙগুলটা খসে পড়েছে সেই পায়ে সেই জায়গাটাতেই একটা মস্তবড়ো গর্ত হয়ে গেছে এমনভাবে যা দেখে মিস দাসও চমকে উঠেছে। তবে রোগীকে সে সম্বন্ধে কিছু জানায়নি নার্স। জানানো ঠিক নয়। ক্যাপ্টেন পাল বা মেজর ঘোষকেই সে এ ব্যাপারটা বলবে।

হ্যাঁ জানি বৈকি। এইতো সেদিন পালকে নিয়ে কত কি হয়ে গেল। রোগীর পায়ে গ্যাংগ্রিন ধরে গেছে সেই দুশ্চিন্তাকে মনে চেপে রেখেই উত্তর দেয় মিস দাস।

বলুন না, একটু শুনি।—যা পরিষ্কার করে ততক্ষণে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শুরু করেছে মিস দাস। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে সে ক্যাপ্টেন পালের কাহিনী বলে চলে।

বছর তিন-চার আগে ডাক্তারী পাশ করে একটা নিরুপদ্রব সরকারী কাজের জন্যে বেশ কিছুকাল ডাঃ পাল ছুটোছুটি করেছেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষপর্যন্ত তিনি সামরিক বিভাগেই একটা চাকরি নিয়ে ফেলেন। তখন কি আর তিনি জানতেন যে চীন এমনি হঠাৎ ভারতের ওপর আক্রমণ করে বসবে এবং তাঁকে সীমান্তে যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসার কাজে নিযুক্ত করা হবে? জানলে বোধ হয় তিনি এ চাকরি আদৌ নিতেন না। মেজর ঘোষের সহকারী হিসেবে এই মেডিক্যাল ইউনিটের সঙ্গে সীমান্তে এসেই ক্যাপ্টেন পাল একটা শর্টলিভের দরখাস্ত করে বসলেন। গুরুতর কারণ দেখালেন দরখাস্তে। যুদ্ধ তখনো খুব জোরে শুরু না হওয়ায় ছুটি তাঁর মঞ্জুর হলো। কিন্তু বাড়িতে ফিরেই তিনি মস্তবড়ো এক ভুল সিদ্ধান্ত করে বসলেন। তিনি আর সীমান্তে আসবেন না ঠিক করলেন। কিন্তু তা কি হয়? ছুটি শেষ হওয়ার পর পাল তাঁর কাজে জয়েন না করায় একদল মিলিটারির পাহারায় তাঁকে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হলো এই কর্মস্থলে। বিচারে তিনি গুরুদন্ড থেকে রেহাই পেয়েছেন কয়েকজনের চেষ্টায়। তবে সেই থেকেই ক্যাপ্টেন পাল এমনি মনমরা।

আবার পালাবার তাঁক কষছেন না তো? 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন', বাঙ্গালী কবির এই উদাত্ত বাণী এই বাঙ্গালী চিকিৎসকের চিত্তকে মোটেই স্পর্শ করতে পারেনি তাহলে।—এই বলেই সামান্য পাশ ফিরে বালিশের তলা থেকে একখানা চিঠি বার করল নির্মল। তার নিজেরই লেখা চিঠি। স্ত্রীকে লেখা।

পড়ে দেখুন তো এই চিঠিখানা।—মিস দাসের হাতে চিঠিখানা তুলে দিয়ে আবার সোজা হয়ে শোয় নির্মল।

কিন্তু কার চিঠি আমি পড়বো? কে এই মায়া রায়?

মায়া আমার স্ত্রী। তবু পড়ুন আপনি। লজ্জা পাবার মতো কোনো কিছুই নেই এ চিঠিতে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করে মিস দাস।

নির্মল লিখেছে:

মায়া, আজ বিশে নভেম্বর। আমাদের দুজনের কাছেই এ তারিখটি স্মরণীয়। দুবছর আগে ঠিক এই দিনেই তুমি আমার হয়েছিলে, আমি তোমার। আজও আমি তোমারই আছি। কিন্তু দেশের চরম সংকটের দিনে তুমি যেভাবে আমায় দেশের সেবায় অর্ঘ্য হিসেবে সঁপে দিয়েছ সেজন্য আজ এই পবিত্র দিনটিতে তোমার মহিমাকে আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

জানিনা এ চিঠি তুমি পাবে কিনা। একটা প্রাইভেট সোর্সে এ চিঠি পাঠালাম। তোমাকে দিন পনেরো আগেও একটি চিঠি দিয়েছিলাম। কোনো জবাব পাইনি। খুবসম্ভব মাঝপথে কোথাও গুম হয়ে গিয়ে থাকবে। যাই হোক প্রতি মুহূর্তেই তোমার কাছ থেকে শুভ সংবাদ আশা করছি।

তবে আমার ভয় তোমার স্বাস্থ্য নিয়ে। এ অবস্থায় শরীরের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার একথা তোমার মতো মেয়েকে বলা নিষ্প্রয়োজন আমি জানি। তবু লিখছি মন মানে না বলে।

আমার শরীরও অবশ্য ভীষণ ক্লান্ত। তিন দিনে একশ মাইল পথ হেঁটে গতকাল সকালে এই শেষ শিবিরে এসে পৌঁচেছি। কালই হেঁটেছি প্রায় চল্লিশ মাইল, তাও রাস্তা দিয়ে নয়। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কি করে যে আমরা এখানে এসে পৌঁছে গেলাম তা' আমি নিজেই ঠিক মতো বলতে পারবো না।

মানুষ যে প্রয়োজনে কি পরিমাণ উন্মাদ হতে পারে এর আগে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণা ছিল না। অত্যন্ত দুর্ভেদ্য দুর্গম এক জায়গায় আমরা একটা ছোট রকমের মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ গড়ে তুলেছিলাম। ছোট হলেও জোর কাজ চলছিল সেখানে। সেই ওয়ার্কশপটাকে দু'দিন আগে আমরা নিজের হাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে, পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়ে এসেছি। আমার এক সহযোগী বলছিল, আমার চোখে নাকি জল দেখেছে। কথাটা ঠিক নয়। আসলে আমার চোখে ধোঁয়া লেগেছিল। সেই ধোঁয়া-লাগা চোখের জলও শুকিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে যখন দেখলাম আহত সৈনিকেরা সব দল বেঁধে আসতে শুরু করেছে আমাদের দিকে। আহত, তবু দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞায় তারা উদ্দীপ্ত। আমাদের অবস্থাও তাই—আমরা নিশ্চিত, আমরা জিতবোই!

জানো মায়া, আর একটু এগুলেই শত্রু বাহিনীর ধ্বংস অনিবার্য। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে, অজস্র মানুষের বিরাম-বিহীন পরিশ্রমে তৈরি রাস্তাগুলো এখন মানুষের পক্ষে চরম বিপজ্জনক। প্রতিটি ব্রীজের তলায়, এখন ডিনামাইট লাগানো, ধ্বস নামানোর জন্যে প্রতিটি বাঁকের কাছে, পাহাড়ের গায়ে [illegible] পোরা।

এবার আমাদের রাত কাটানোর কথা একটু শোনো। মন খারাপ করো না কিন্তু। আজকের সৈনিক তো আর বৃটিশ আমলের ভাড়াটে সৈনিক নয়, আজকের সৈনিক প্রত্যেকেই দেশপ্রেমিক। বাস্তবিকই দেশপ্রেমের উন্মাদনার মতো পবিত্র সুস্থ উন্মাদনা আর হতে পারে না। তাই কোনো দুঃখকেই দুঃখ বলে আমাদের মনে হয় না, কোনো ভয়ই আর আমাদের কাছে ভয় নয়। দুঃখকে এবং ভয়কে জয় করতে না পারলে শত্রুকে কি কখনো জয় করা যায়? একবার তুমি ভাবো তো, বিজয়ীর বেশে আমি যখন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবো তখন কি অসীম গৌরবের অধিকারিণী বলে নিজেকে তোমার মনে হবে!

যাঃ আসল কথা না লিখে অন্য দিকে চলে গেছি। এ হোলো ভাবাবেগের বিভ্রাট। ভাবাবেগ সব সময় ভালো নয়। হ্যাঁ, আমাদের রাত কাটানোর কথা বলতে যাচ্ছিলাম। পায়ে জঙ্গল-বুট পরেই পুরো ইউনিট আমরা শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কতটুকু ঘুমুতে পারবো সেটা

সময়ই অনিশ্চিত। পাঁচ মিনিটের হুকুমে আমাদের মার্চ শুরু করতে হয়। কোথায় যেতে হবে তার কিছুই ঠিক নেই। মার্চ করে এগিয়ে যাওয়াটাই আমাদের কাজ। আর এমনিতেও কি ঘুমোবার জো আছে? নেই। দূরে কামানের গর্জন আর একটানা লরীর শব্দে শুয়ে থাকলেও কি আর তেমন করে ঘুম আসে? একটু চোখ বুজে এলেও হুকুমদারের বিকট চিৎকার তক্ষুনি হয়তো ঘুম তাড়িয়ে দিয়ে তার দায়িত্ব পালন করে। টেন্টমেট কেউ অশ্লীল গালাগালি দিয়ে এক গ্লাস গরম কফি খাইয়ে সবাইকে একটু চাঙ্গা করে নিতে উদ্যোগী হয়।

জানো মায়া, এ সবই আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে কিন্তু মন খারাপ হয় কখন জানো, যখন সহজ সরল পাহাড়ী নরনারীরা দলে দলে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে নেমে আসতে থাকে। তাদের প্রত্যেকেরই চোখে মুখে একটিমাত্র জিজ্ঞাসা, আমরা কি দোষ করেছি? এতগুলো সরল মানুষের এই প্রচণ্ড দুঃখের জন্য দায়ী যারা তারা সমগ্র মানবতার শত্রু, পৃথিবীর শত্রু।

সবচেয়ে বিকট আজ আমার ভাবতেও ঘৃণা লাগে যে আমি একদিন কম্যুনিজমের ঘোর সমর্থক ছিলাম। তুমিও তো তাই ছিলে। একই পথে চলতে চলতে একদিন অকস্মাৎ আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তারপর আমরা দুজনে মিলে এক হলাম। তোমারও এতদিনে মোহভঙ্গ ঘটেছে নিশ্চয়ই। জার্মাণ ইহুদি কার্লমার্কস এই চেয়েছিলেন কিনা জানি না, তবে একথা জোর দিয়েই বলা চলে যে লালচীনের পথ মানব-কল্যাণের পথ নয়, কখনোই নয়—তা' ধ্বংসের পথ।

থাক সে সব কথা, চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে যে গণ-জাগরণ দেখা দিয়েছে সে সংবাদ জেনে সমগ্র সৈন্যবাহিনী উজ্জীবিত। শুনতে পেলাম সাধারণ মানুষের দানে দেশরক্ষা ভাণ্ডার ভরে উঠছে, লক্ষ লক্ষ যুবক সৈন্যদলে যোগ দেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। এই তো চাই—'অস্ত্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু', এই হোক আমাদের আজকের শ্লোগান। কালই খবর পেয়েছি ধানসেঁরি নদীর গতি পরিবর্তন করাবার কাজে সাধারণ শ্রমিকদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছে, বিভিন্ন ব্রীজ এবং রেল লাইন পাহারার কাজেও ছাত্রদল অংশ গ্রহণ করছে। এ সবই শুভ সংবাদ। তার জন্যেই জোর করে বলতে পারছি, আমরা জিতবোই।

চিঠি দীর্ঘ হয়ে গেল। এবার শেষ কয়েকটি কথা লিখেই শেষ করছি। শীগ্গির ছুটি পাবার আমার কোনো সম্ভাবনা নেই। পৃষ্ঠদেশে আঘাত নিয়ে বা পালিয়ে বাড়ি ফিরে আমি তোমার মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করবো না। হ্যাঁ, আরেকটি কথা এবং সেটাই বড়ো কথা—তোমার ছেলে হলে ভারতীয় কোনো বীরের নামে তার নামকরণ করবে, আর মেয়ে হলে রাণী লক্ষ্মীবাঈ বা দুর্গাবতীর সঙ্গে মিলিয়ে তার নাম রাখবে।

আমার জন্যে কোনো চিন্তা করো না। ইতি,

তোমার নির্মল

চমৎকার লেখা!—চিঠিখানা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে মন্তব্য করে নার্স।

ক্যাপ্টেন পাল পড়লে তাতে কোনো ফল হবে মনে করেন? তাঁর নিজের ওপর এ চিঠির কোনো প্রতিক্রিয়া হতে পারে বলে আশা করেন আপনি?

এমন হৃদয়গ্রাহী ভাষায় লেখা হয়েছে এ চিঠি যাতে ক্যাপ্টেন পালের মনের পরিবর্তন ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। আর তিনি তো এখুনি এসে যাবেন আপনাদের দেখতে। তখুনি তাঁকে চিঠিখানা পড়তে দেওয়া যাবে।

মিস দাসের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ক্যাপ্টেন পাল সেখানে এসে উপস্থিত। অস্বাভাবিক রকম গুরুগম্ভীর। একটা সন্ত্রাসের কালিমা সারা মুখখানিকে তাঁর ছেয়ে আছে। নেহাৎ অসহায় বলেই যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁর হাবভাবেই তা' ষোলআনা স্পষ্ট।

ক্যাপ্টেন পাল নির্মলের চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। বুঝলেন তার জন্যেই চোখ-মুখ অমন লাল। সঙ্গে সঙ্গে একটা ইনজেকসনের প্রেসক্রিপশন তিনি লিখে দিলেন। বলে দিলেন নার্সকে অবিলম্বে সেই ইনজেকসনটা দিতে হবে।

এই দেখুন স্যার, স্কোয়াড্রন লীডার নির্মল

রায় কি সুন্দর একখানা চিঠি লিখেছেন তাঁর স্ত্রীকে। আপনি পড়তে থাকুন, আমি এক্ষুণি ইনজেকসনটা রেডি করে নিয়ে আসছি।—বলেই মিস দাস সেখান থেকে অন্তর্ধান।

কি স্যার, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে। পড়ে ফেলুন, সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই।—নির্মলের কথায় নড়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন পাল। 'হ্যাঁ, পড়ছি' বলে নির্বিকারভাবে পড়তে শুরু করলেন চিঠিখানা।

বাঃ কি অপূর্ব চিঠি!—ক্যাপ্টেন পালও উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। বলেন, সত্যি একেই বলে দেশপ্রেম!

কিছুটা কাজ হয়েছে তা'হলে। তার লেখা চিঠি ক্যাপ্টেন পালকে সত্যি সত্যি একটু ভাবিয়ে তুলতে পেরেছে।—মনে মনে ভাবে নির্মল এবং এক ধরণের হাসির দীপ্তিও মুহূর্তের জন্যে তার মুখমণ্ডলে জ্বল জ্বল করে ওঠে।

ঠিক তখুনি সেখানে এসে হাজির মিস দাস। নার্সের হাত থেকে তৈরি সূচটি তুলে নিয়ে ক্যাপ্টেন পাল নিজেই নির্মলের উরুতে ইনজেকসন দিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। যাবার সময় তাঁকে খুবই ভাবিত দেখা গেল। একদিকে নির্মলের চিঠির ভাবনা, আরেকদিকে নির্মলের অসুখটা যে বড্ড খারাপের দিকে টার্ণ নিয়ে বসলো সেই ভাবনা।

ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে আসছে নির্মলের। ঠিক ঘুমে হয়তো নয়, ক্লান্তিতে। এমন কি মায়াকে লেখা চিঠিখানা পর্যন্ত সে আর বালিশের তলায় রাখতে পারেনি, তার হাতেই রয়ে গেছে তা এবং কিনা সে চোখ বুজে ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে নার্স মিস দাস তাই অতি সন্তর্পণে অন্য রোগীদের দেখাশুনো করতে চলে গিয়েছে।

না, এবার সত্যি সত্যি অঘোরে ঘুমুচ্ছে নির্মল। হসপিটাল বয় গজানন একবার রাতের খাবার নিয়ে এসে ঘুরে গেছে। শুধু খাওয়ানো নয়, নির্মলের কাছ থেকে মায়াকে লেখা চিঠিখানাও সে নিয়ে নেবে। গজাননের মা শেষ শয্যায়। মাকে শেষবারের মত দেখবার জন্যে সে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছে। কালই নির্মল তার কাছ থেকে সে কথা জেনেছে এবং তার সঙ্গে চিঠি দেবার একটা বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। পাকা বন্দোবস্ত। সেই তাড়াতেই গজানন আবার এসেছে নির্মলের কাছে। ঘুমের মধ্যেই নির্মল ভীষণ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল তখন। গজানন একবার মৃদুস্বরে ডাকতেই সে জেগে গেল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নির্মলও ঐ চিঠি দেবার কথাই ভাবছিল কিনা, হয়তো তারই জন্যে অত সহজে তার ঘুম ভেঙে গেল।

গজানন ফিডিং কাপে হরলিকস খাওয়ালো নির্মলকে। নির্মল থর থর করে কাঁপছিল তখন। জ্বরটা আরো বেড়ে গেছে। অমাবস্যা বলেই হয়তো এত বেশি জ্বর উঠেছে। গজানন অন্তত তার নিজের বিচারে এই সিদ্ধান্তেই এলো। তবে অমাবস্যার জো-টা যে আর বেশিক্ষণ নেই সেটাই ভরসা এবং সেই ভরসাতেই গজানন নিশ্চিন্ত হয়ে নির্মলের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়েই চটপট সেখান থেকে বিদায় হলো। এখুনি আবার গানের বৈঠক আরম্ভ হবে কিনা, সেও যাবে সেখানে।

কলকাতা এবং বম্বে থেকে নামকরা কয়েকজন শিল্পী এসেছে জওয়ানদের আনন্দদান করতে। ভালো ভালো সব শিল্পীর গান শোনবার, নাচ দেখবার সুযোগ পেয়ে সৈন্যদের মধ্যে সে কি স্ফূর্তির হিল্লোল। শুধুমাত্র নির্মলের মতো রোগী এবং আহত জওয়ান ছাড়া সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছে নাচ-গানের সেই আসরে। আসর জমে উঠেছে। গান আর গান, নাচের পর নাচ।

পর পর কয়েকখানা দেশাত্মবোধক গান নির্মলের দেহ-যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। শুয়ে শুয়েই সে-সব গান সে শুনছিল আর ভাবছিল দেশের কথা, এই যুদ্ধের পরিণতির কথা আর তার আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীর কথা। গান শুনতে শুনতে আর ভাবতে ভাবতে এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই ঘুমের মধ্যেই অপূর্ব নাচের বাজনা এবং নূপুর-নিক্কণ নির্মলের কানে যেন মাঝে মাঝে মধু বর্ষণ করছিল। শেষের দিকে আর কিছুই সে টের পায়নি। একটিবার মাত্র মুহূর্তের জন্য নির্মল ঘুমের মধ্যেই পরম আনন্দে হেসে ফেলেছিল। অসীম তৃপ্তির সে হাসি। হেসেছিল চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখে। তার মনের মতো স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখছিল, তাঁর ছেলে—একমাত্র ছেলে বীরেন্দ্র রায় নেফা সীমান্তে অসমসাহসিকতায় শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করে চলেছে এবং চতুর্দিক থেকে জয়ধ্বনি আর আনন্দধ্বনিতে তাকে অভিনন্দিত করা হচ্ছে।

এই তো নির্মল চেয়েছিল। এই তার চরম চাওয়া।

পরদিন সকালের ডাকে সুখবর এসেছে নির্মলের বাড়ি থেকে। ছোটভাই কমল শুভ সংবাদ জানিয়েছে দাদাকে। একখানি পোস্ট-কার্ডে তিনটি মাত্র কথা। কমল লিখেছে: শ্রীচরণেষু, দাদা, আজ সকালবেলা আমাদের সুন্দর একটি ভাইপো হয়েছে। বৌদি এবং খোকন ভালো আছে। তুমি শীগ্গির চলে এসো।

খুশীর হাসি হাসতে হাসতে নার্স মিস বেলা দাস ছুটে আসে নির্মলের কাছে।

কিন্তু নির্মল কোথায়? গোটা শরীরটা নীল হয়ে গেলেও তার অবিকৃত মুখে যেন একটা অপরিসীম আনন্দের ছাপ। একমাত্র ছেলে বীরেন্দ্র রায়ের জয়ধ্বনি সে শুনেছে বুঝি উৎকর্ণ হয়ে!

শুভ সংবাদটা নির্মল আগেই পেয়েছিল তা'হলে।

নির্মলের দেহের পাশে মিস দাস নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। তার দু'গণ্ডেও অশ্রুধারা।

অগ্নিমিত্রা

অমরেন্দ্র ঘোষ

অনেক বর্ষণক্লান্ত দিন ও রাত কেটেছে। অনেক থমথমে মেঘের পরে আজ প্রথম সূর্যোদয়। এক খণ্ড উজ্জ্বল নীলার মত পরিচ্ছন্ন আকাশ। নিচে ভিজে গাছপালা, নদী, ঝিল, বিস্তীর্ণ পৃথিবী।

প্রথম শ্রেণীর কামরায় অগ্নিমিত্রা একা যাত্রী। ট্রেণ ছুটেছে কখনো এঁকে বেঁকে, কখনো বা সহজ সরল গতি। আজ অগ্নিমিত্রার মনে হয় এ পৃথিবী যেন এক শুচি-স্নাতা কুমারী।

কিন্তু সে একটু আগেও কাঁদছিল,—বর্ষার আকাশের মত। ক্ষণে ক্ষণে কাঁদছিল ক'দিন ধরে। যখনই বিগত কথা মনে পড়ছিল, তখনই হু হু করে উঠছিল অন্তর।

একটা ব্যাগ ঝুলছিল আংটার সঙ্গে, আর একটা মোটা ফ্রেমের চশমা পড়ে ছিল গদিতে। অতি সামান্য একটি শান্তিনিকেতনের ব্যাগ আর গোটা দশ পনের টাকা দামের একটি চশমা। কেউ একজন এই জিনিস দুটো ফেলে গেছে। আর ফেলে গেছে সেই সঙ্গে যত রাজ্যের কথার ঢেউ।

অগ্নিমিত্রা শুধু এম-এ নয়, একজন অধ্যাপিকা। জীবনের সূত্রপাত অধ্যাপনা দিয়ে। কিন্তু এ নিরীহ ব্রত দুদিনও তার ভাল লাগেনি। বাপের প্রচুর বিষয়সম্পত্তি ছিল এবং ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ছিল অঢেল। গাড়ী বাড়ীরও অভাব ছিল না অভিজাত পাড়ায়। তার বুদ্ধি-বিদ্যা প্রখর। রূপও তাই কেউ খুঁটিয়ে দেখার অবকাশ পেত না।

নিজের সম্বন্ধে অত্যান্ত সচেতন ছিল অগ্নিমিত্রা। একমাত্র পুরুষ মানুষ হওয়া ছাড়া বুঝি অকল্পনীয় কিছু ছিল না। বাপের মৃত্যুর পর বদ্ধ দুয়ারটা অবারিত হয়েছে। হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, যে কোনো জন-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সে অত্যান্ত সহৃদয়া। পাঠাগার, শিল্প প্রদর্শনীর জন্য মুক্ত হস্ত। আয়ামবীর, বৌদ্ধভিক্ষু, ম্যাজিশিয়ান পর্যন্ত তার কাছে এসে বিফলে ফিরে যায় না। এখন ছেলে-বুড়ো মহিলাদের মুখে মুখে শুধু অগ্নিমিত্রা। কেরাণী, ডাক্তার, মোক্তার, উকিল, ছাত্রছাত্রীদের মুখেও ঐ একটা নাম। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রেও ওই নামের প্রচার দেখা যায়। অগ্নিমিত্রা মহিমময়ী হোয়ে উঠে। রাজনৈতিক দল উপদলও আসে। বৈঠকখানার চত্বরে বসে চা খেয়ে, সিগারেট পুড়িয়ে তুমুল হট্টগোল করে। অগ্নিমিত্রা কখনো উপস্থিত আবার অনেক সময় অনুপস্থিত থেকে এদের প্রশ্রয় দেয়। ফিরে এলে কখন সখন অনুযোগ শুনতে হয়।

—ভেবেছিলাম আজ আপনাকে পাবোই—

—কি করবো বলুন, আমাকে বাধ্য হোয়েই অন্যত্র যেতে হোয়েছিল। যাক্, আপনারা আবার কবে মিট ক'রছেন?

—যেদিন আপনি স্থির করে দেন।

—আচ্ছা বেশ তাহোলে আগামী কাল সন্ধ্যা সাতটায়।

কিন্তু কথা দিয়েও অগ্নিমিত্রা সময়মত উপস্থিত হোতে পারে না। রাত নটার পর মোটর থেকে নেমে শুধু বলে—"সরি"।

তবু অল্পবয়সী এক কুমারী হিমাদ্রি শিখরে উঠেছে। উঠছে। সংবাদের মত সংবাদ বটে।

অগ্নিমিত্রার বাড়ীর সমুখে একটু দাঁড়ালে বোঝা যায় বাঙগালী এখনও মরেনি। কে বলে সে দেউলিয়া হোয়েছে—অন্ততঃ গুণীর সমাদর, সম্বর্ধনার পর সম্বর্ধনা চলে এখানে। উৎসবের পর উৎসব।

চোখদুটিকে ঈষৎ বিনম্র করে, মুখে একটা দৃঢ়তার রশ্মি এনে অগ্নিমিত্রা প্রতিভাষণে শুধু একটি কথাই বলে—সকলের জীবনের শরিক যে জন, কথায় ও কর্মে যে সত্যতা করেছে অর্জন, জীবনের সঙ্গে বাণীর যার অসঙ্গতি নেই তেমন একজন যেন হোতে পারি আমি আপনাদের আশীর্বাদে। বলতে

বলতে অগ্নিমিত্রা যেন একটা কবিতার ভাবময়ী ছন্দ হোয়ে ওঠে।

এরপর শুধু করতালি শোনা যায়।

অথচ অগ্নিমিত্রা স্বদেশের সাহিত্য, ভাষা, কৃষ্টিকে মনে মনে কখনই উঁচু আসন দেয় না।

আর পাঁচজনের অপেক্ষা না রেখে হাসে কিম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে নিজের ইচ্ছামত। সঙ্গের দল উপদলও অমনি অনুকরণ করে। সে নখে নিখুঁত করে নেল পালিশ লাগায়, ঠোঁটে লিপষ্টিক। নীল বডিসের উপরে পরে সাদা মিহি ব্লাউজ। সকালে, দুপুরে শাড়ীর রং বদলায়, চুলের ছাঁদ মিলিয়ে।

নীরোদ ছিল তার ভক্তগোষ্ঠীর বাইরে। ওদের দুজনের পরিচয় হোয়েছিল বিলেতে অক্সফোর্ড লাইব্রেরীতে। নীরোদের কেতাদুরস্ত চালচলন আর 'রাজা' খেতাবটার আকর্ষণ কেবল অগ্নিমিত্রার কেন ওর বাপ সংঘমিত্র রায়ও উপেক্ষা ক'রতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তিনি মেয়ের দেখাশোনার ভার, বিষয়-সম্পত্তির ট্রাষ্টী করে গেছেন নীরোদবিহারীকে।

সংঘমিত্র রায় ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি বুঝেছিলেন, এই অভিজাত ছেলেটিকে কোন নির্ভরতার সূত্রে বাঁধলে তাঁর বংশগৌরব এক-দিন পূর্ণ হবে।

কিন্তু রাজা ব্রজবিহারী চৌধুরীর নাতি নীরোদবিহারী হঠাৎ উঠেপড়ে লেগে গেল ওর লেজুড়গুলো ছেঁটে ফেলতে। প্রথমেই রাজা খেতাবটা ঘষে সরিয়ে ফেল্লে। এতে অগ্নিমিত্রা আপত্তি তুলেছিল।—রাজত্বের সঙ্গে খেতাবের কি সম্পর্ক আছে?

নূতন সরকারী নীতিতে নীরোদবিহারীর রাজত্ব গিয়েছিল। কিন্তু অগ্নিমিত্রার ধারণা, সরকার খেতাবটা কাড়েনি। অগ্নিমিত্রা বেশ ভাল করেই জানে এই খেতাবের উপর তার বাপের কত টান ছিল।

এ কথার উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে নীরোদবিহারী বলেছিল—অন্নপূর্ণার হাত থেকে ভিক্ষা নেবার লোভ স্বয়ং মহাদেবও সংবরণ ক'রতে পারেনি। আমিতো কোন ছার। যদি নিতেই হয় তোমার কাছ থেকেই নেওয়া যাবে।

অগ্নিমিত্রা এতে যে সন্তুষ্ট হোল না সে বুঝতে পেরে বল্লে—মিত্রা, এ ধরো তোমাতে আমাতে এক খেলা। তোমার থাক অর্জন, আর আমার থাক বর্জ্জন।

অগ্নিমিত্রা রাগ করে বল্লে—এ কি উপহাস।

একটু চুপ করে রইলো নীরোদ। তারপর

বল্লে—আপনজনকে উপহাস করার মত অজ্ঞতা আমার নেই। সোজাসুজি বলি মিত্রা, এবার আমার শক্তিপরীক্ষা সুরু হোক। যে বাঁধনে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলেছিলেম সেই বাঁধনের ক্ষয় হোক। তারপর...আবার নিজেকে নিজে ফিরে পাবো, আর পাবো সবাইকে। সেই মিলন ক্ষেত্রে সব মেলামেশার মেলায় কবে যে যেতে পারব মিত্রা, তারই দিন গুণছি।

নীরোদবিহারীর গভীর স্বর ক্রমে মেদুর হোয়ে আসে।

ঠিক সেই মুহূর্তে অগ্নিমিত্রার মনে হয় এক স্বপ্নমায়ায় সে যেন জড়িয়ে পড়েছে। আর কিছু উত্তর দিতে পারেনি সে।

শুকদেব মুখার্জি ব্যারিস্টারী পাশ করে সম্প্রতি বিলেত থেকে এসেছে। চলনে-বলনে সে একেবারে ফ্যাশানেবল পাড়ার ছাপ-মারা। অগ্নিমিত্রাকে সে ডাকে—অগ্নিমিত্রা। ইদানীং সে সব কাজেই অগ্নিমিত্রার সংগী।

অগ্নিমিত্রার যখন কোন দানের খাতায় অংক বসায়, শুকদেব মুখার্জি তখন কতটা বসালে ওর মহিমা বাড়বে সে সম্বন্ধে সচেতন করে দিতে কার্পণ্য করে না।

সে বলে—অগ্নিমিত্রা। এক হাতে দান করো আর এক হাতে নাও। যাকে বলে ইনটেলেক্‌-চুয়াল গ্রেটনেস। বিধাতাও...

এবার অগ্নিমিত্রা থামায়—বিধাতাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন? জানতো অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি না।

শুকদেব মুখার্জি আস্তিকও নয়, নাস্তিকও নয়। সে ভগবানকে বিশ্বাস করবার সময় পায় না। আবার উড়িয়ে দিতেও ভয় পায়। কাজে কাজেই এতবড় কথাটা সইতে তার একটু বিলম্ব ঘটে। তবু মুহূর্তেই একেবারে মুখের পরিবর্তন করে শুকদেব বলে—অগ্নিমিত্রা, এই জন্যেই তুমি অসামান্যা।

অগ্নিমিত্রা হেসে বলে—এত সহজেই মেনে নিলে শুকদেব, কিন্তু নীরোদ হোলে এ কথা মানতে চাইতো না।

এবার শুকদেবের হাসির পালা। সে মুখ থেকে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে বলে— এটা খুব নীরোদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা নয়, অগ্নিমিত্রা; আর একথা তুমি ভালকরেই জান।

উত্তর দিতে বাধলো অগ্নিমিত্রার। কারণ নীরোদবিহারী এখন তার কাছে সমস্যাই বটে।

ওর কাজে নীরোদবিহারী বাধা দেয় না সত্য, কিন্তু ওর স্মিতহাসিভরা মুখ আর আশ্চর্য দুটো চোখের দিকে তাকিয়ে অগ্নি-মিত্রার কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হয়। নীরোদের গভীর স্বরে সে ভয় পায়। ওর মনে হয় নীরোদ যেন ওর সাজসজ্জাকে ব্যঙ্গ করছে—ওর কাজের ধারাকে উপেক্ষা করে চলেছে।

আজকাল নীরোদকে পার্টিতে ঢিলেঢালা ধুতি-পাঞ্জাবীতে আসতে দেখা যায়। এ নিয়ে কেউ জিজ্ঞাসা ক'রলে সে ছোট্ট করে উত্তর দেয় —আরাম লাগে এই বেশে, তাই পরি।

কথাটা কানে যায় অগ্নিমিত্রার। সে লজ্জায়, দুঃখে কাল হোয়ে উঠে। ওর সংগে নীরোদের যে একটা নিবিড় সম্পর্কের কথা একদিন হোয়ে-ছিল এই ভেবে।

সে শুকদেবকে বলে—নীরোদের কথাটা লক্ষ্য করেছ? ও যেন সমাজকে উপেক্ষা করে চলতে চায়।

এর উত্তরে শুকদেব বলে—ও বোধ হয়, তোমায় উপহাস ক'রতে চায়। তুমি যে পাঁচ-জনের অপেক্ষা না করে হাস কিম্বা দীর্ঘশ্বাস ছাড় নিজের ইচ্ছামত—ও দেখাতে চায় এটা ওর নিজের ইচ্ছা। হারবে কেন—রাজা তো!

অগ্নিমিত্রা চুপ করে থাকে। রাজা কথাটা নিয়ে পরিহাস ভাল লাগে না। ওখানে ওর একটু দুর্বলতা আছে—

অগ্নিমিত্রাকে নিরুত্তর দেখে শুকদেব আবার বলে—কিন্তু নীরোদ জানে না তোমার নিজের ইচ্ছা বলে যেটা লোকে ভুল করে—তা কতজনের ইচ্ছার উত্তাপ দিয়ে গড়া। এর জন্য তোমার প্রস্তুতি তো কম নয়?

কথাটা সত্য। অগ্নিমিত্রা জানে "অসামান্যা" প্রমাণ করতে তার কত অভিনয়, কত ছলাকলার প্রয়োজন হয়। কথা দিয়ে উপস্থিত হোতে পারে না সে। একি কেবল ব্যস্ততার জন্যে? কত অবাঞ্ছিতকে তাকে সহ্য ক'রতে হয়। বৈঠকখানার চত্বরে বসে চা-সিগারেট পোড়াতে দিতে হয়। সে সব কি শুধু তার নিজের ইচ্ছার জন্য? তবু সত্যকে স্বীকার ক'রতে অসহ্য লাগে তার। বেশ একটু রাগ করেই বলে—আমি আমার সমাজের সংগে অশোভন আচরণ করি না। যেখানে স্বার্থগত প্রয়োজন সেখানকার কথা ভিন্ন।

শুকদেব একবার অগ্নিমিত্রার দিকে তাকিয়ে দেখলে আর একবার নিজের দিকে। আজ অগ্নিমিত্রার ছিপছিপে দেহখানা বেষ্টন করে উঠেছে আগুন রংয়ের পাতলা সাড়ী। সোনালী রংয়ের আঁচলখানা প্রজাপতির মত উড়ছে। নগ্নবাহু আর প্রশস্ত কাঁধের মাঝামাঝি ফিতের মত ব্লাউজের পাশে মুক্তোর হার দুলছে। মাথায় উঁচু করে খোঁপা বাঁধা। তাতে একটা চন্দ্রমল্লিকা, শুকদেবেরই উপহার দেওয়া।

অগ্নিমিত্রার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের নিখুঁত সুটের দিকে তাকিয়ে স্বার্থক হেসে বলে—সেটা তুমিই ভাল বোঝ অগ্নিমিত্রা। শুনেছি নীরোদবিহারী চৌধুরীর গলায় মালা দিতে পারলে তুমি ধন্য বোধ ক'রতে।

শুকদেব জানে না আজ বিদ্রূপ ক'রতে গিয়ে কতটা সত্য ও স্মরণ করিয়ে দেয় অগ্নি-মিত্রাকে। কি একটা সংশয়ে আজ অগ্নিমিত্রা দ্বিধাগ্রস্ত হোয়ে চুপ করে থাকে। নীরোদকে জীবন থেকে মুছতেও পারে না—টানতেও তার ভয় করে।

খ্যাতির শিখরে অগ্নিমিত্রা যতই উঠেছে, ততই তার নীরোদের সংগে বিচ্ছেদ ঘটেছে।

ওকে নিয়ে সম্বর্ধনার পর সম্বর্ধনা চলেছে। ওর ভাষণের পর যখন করতালি উঠেছে নীরোদের মুখে ততই বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। ওর প্রতিভাকে যখন লোকে অসামান্যা বলেছে, নীরোদ ওগুলো স্বার্থান্বেষীদের মাতামাতি ছাড়া কিছু ভাবতে পারেনি।

অগ্নিমিত্রা ক্ষুণ্ণ হোয়েছে—মনে মনে ছট-ফটিয়ে ভেবেছে সমাজে ওর কতখানি মূল্য নীরোদ তা বুঝতে পারেনি। অগ্নিমিত্রা যখন অধ্যাপিকার পদ নেয়, তখন নীরোদকে একবার প্রশ্ন করেছিল—তোমার কি কোন আপত্তি আছে?

নীরোদ হেসে জবাব দিয়েছিল—যদি ভাল লাগে, তবে আমার বাধা শুনবে কেন?

উত্তরটা ভাল লাগেনি তার। কেননা সে একটা ছোটখাট লেকচার প্রস্তুত করে এনে-ছিল। সেটা দেবার সুযোগ পায়নি বলে সে দুঃখই পেয়েছিল। আবার যখন এই নিরাহ্বত ভাল লাগেনি, তখনও নীরোদ তেমনি হেসে বলেছিল—ভাল না লাগাটাকে টানাটানি করে বাড়িয়ে তুলে লাভ কি মিত্রা।

এমনি নীরোদের স্বভাব। একটা না পাওয়ার খেদে অগ্নিমিত্রার মন অপ্রসন্ন হতে থাকে। এরপর শুকদেবের সংগে আলাপ। শুকদেবের চলনে বলনে অগ্নিমিত্রা বিশেষ মুগ্ধ না হোলেও ওকে পাশে নিয়ে যেতে আরাম বোধ করে। নিজের কাজের একটা সায় খুঁজে পায়। এতেই তার আনন্দ।

শুকদেব বলে—আজকাল এই বৈজ্ঞানিক যুগে সাজসজ্জার মেক-আপ হল বুদ্ধি-দীপ্তির একটা অত্যাবশ্যক অংগ। অগ্নিমিত্রা নিজের রূপ ও মেক-আপ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। শুকদেবের এই কথা তার ভাল লাগে। কিন্তু নীরোদকে সে বুঝতে পারে না। এ সম্বন্ধে যদি কখনো কথা উঠে নীরোদ বলে—প্রকৃতির সাজ বদলের পালার শেষ নেই। কিন্তু সে এত সহজ যে চোখ আপনাতেই ভোলে।

এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে নীরোদের রুচিকে সে স্বীকার ক'রতে পারে না। অথচ নীরোদবিহারী অকস্‌ফোর্ডের সায়েন্সের পি-এইচ-ডি।

* * * *

সেদিন একটা আর্ট এগ্‌জিবিশনের দ্বারোদ্ঘাটনের ভার পড়েছিল অগ্নিমিত্রার উপর। প্রধান অতিথি ছিলেন একজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তি। শুকদেব ওর কানে কানে স্মরণ করিয়ে দিলে—অগ্নিমিত্রা এখানে প্রেস্টিজের প্রশ্ন; হার মেনো না। উদ্যোক্তারা অগ্নিমিত্রার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা ঠিক করে রেখেছিল আর্ট গ্যালারীর ভিত্তির জন্য।

টাকার মাত্রাটা শুনে অগ্নিমিত্রা একটু বিচলিত হোয়ে পড়েছিল। সেটা লক্ষ্য করে শুকদেব বল্লে—বড় রক্ষা পেয়েছ অগ্নিমিত্রা। অল্পের উপর দিয়েই গেছে—

এরপর প্রধান অতিথি যখন অগ্নিমিত্রার প্রাচ্য ছাঁদের চুলের চূড়ায় একটা লাল গোলাপ গুঁজে দিল তখন চারধার থেকে সেই মুহূর্তটি অবিস্মরণীয় করে রাখবার জন্য ক্যামেরার সাটার টেপার শব্দ হোল।

এইবার উদ্যোক্তারা ওকে "কলাবতী" উপাধি দিয়ে সম্বর্ধনা জানায়।

কিন্তু সেদিন অগ্নিমিত্রার মন থেকে অস্বস্তি মুছলো না। কারণ, টাকা তোলবার অনুমতিটা চাইতে হবে নীরোদবিহারীর কাছ থেকে। ও জানে নীরোদ শুনলে হেসে বলবে—কেন, কম্পিটিশান? এর উত্তরে ও যদি বলে—উই আর স্ট্রাগলিং ফর এক্সজিসট্যান্স—তবে এমন করে হাসবে নীরোদ যে, তার কোন কথা বলবার থাকবে না।

এই রকম ভেবে অগ্নিমিত্রা ইতস্ততঃ কর-ছিল। এমন সময় শুকদেব এসে জানালো—এদিকে তোমার যে জয় জয়কার, পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়ে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। অগ্নিমিত্রা একটু আশ্চর্য হোয়ে বলে—পঞ্চাশ হাজার টাকা! কে দিলে? একগাল হেসে জবাব দিলে শুকদেব- লোকে জানে তুমিই দিয়েছ। কিন্তু শুকদেব অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে বলে- আমি

কিছুদিন পূর্বে খবরের কাগজে আমেরিকার এক সংবাদে জানা গিয়েছিল যে, এক ব্যক্তির ক্যানসারগ্রস্ত একটি ফুসফুস খুলে অপর এক ব্যক্তির সুস্থ একটি ফুসফুস তার দেহে লাগান হয়েছে। তার পরের সংবাদে প্রকাশ যে, কিছুদিন রোগীর অবস্থা ভালই ছিল এবং নতুন ফুসফুসটি তার শরীরে কাজ করছিল, কিন্তু ১৮ দিন পরে রোগীর মৃত্যু হয়। যে সুস্থ ফুসফুসটি রোগীকে দেওয়া হয়েছিল সেটা কোথা থেকে নেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে সংবাদে কোন উল্লেখ ছিল না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আরও একটি সংবাদে জানা গিয়েছিল যে, একটি ছোট ছেলের শরীরে তার মায়ের শরীর থেকে প্লীহা (স্প্লীন) নিয়ে সাফল্যের সংগে লাগান হয়েছে। পরবর্তী সংবাদ জানা যায় নাই।

এরকম ধরণের এক দেহ থেকে অন্য দেহে শারীরিক অঙ্গাদির প্রতিরোপণ করার চেষ্টা অনেক দিন থেকেই চলছে এবং চিকিৎসা বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিতে এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। সম্প্রতি সুস্থ দেহ থেকে অথবা সদ্যোমৃত দেহ থেকে কিডনি নিয়ে অসুস্থ লোকের অকর্মণ্য কিডনির স্থান পূরণের সম্ভাবনা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। এ বিষয়ে কিছু সাফল্যও লাভ করা গেছে।

শরীরের যে কোনও অংশ আঘাতে বা রোগে আহত হলে প্রাকৃতিক নিয়মে তার সেরে উঠবার ক্ষমতা আছে। নানা রকম ক্ষতের দরুণ শরীরের চামড়া নষ্ট হয়ে গেলে তার জায়গায় নতুন চামড়া গজিয়ে সেরে ওঠা, হাত পায়ের হাড় ভেঙে জোড়া লাগা অথবা আঙ্গুলের নখ উঠে গেলে নতুন নখ গজান, এসব সাধারণ ঘটনা। শরীরের ভিতরকার অঙ্গাদির ও রোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশের অল্পবিস্তর মেরামতি ও পুনর্গঠন চলে। কিন্তু রোগজনিত ক্ষতি যদি কোনও অতিপ্রয়োজনীয় অঙ্গের সারবার ক্ষমতার বাইরে চলে যায় তবে জীবন সংশয় দেখা দেয়। এরকম অবস্থায় রোগীর জীবন রক্ষার জন্যে মোটরগাড়ীর অকেজো পার্ট বদল করার মত শরীরের অকেজো অঙ্গ বদলের কথা মনে আসে।

শারীরিক উপাদান প্রতিরোপণ

(টিস্যু ট্রান্‌স্‌প্লানটেশান বা গ্রাফটিং)

শরীরের ছোট বড় কোনও অংশ তার স্বাভাবিক সংস্থান থেকে উৎপাটন করে একই দেহের অন্যস্থানে অথবা ভিন্ন দেহে রোপণ করাকে টিস্যু ট্রান্‌স্‌প্লানটেশান বা গ্রাফটিং বলে। এইরূপ উৎপাটিত ও অন্য স্থানে আরোপিত অংশকে বলা হয় গ্রাফট্। গ্রাফট্ নিজের শরীরেরই অন্য কোনও স্থান থেকে নিলে পরে তাকে নিজস্ব গ্রাফট বা 'অটোগ্রাফট্' বলা হয়। প্রতিরোপিত অংশ বা অঙ্গ অন্য শরীর থেকেও আনা যায়। পরন্তু গ্রাফট্ যদি একই শ্রেণীভুক্ত প্রাণী থেকে নেওয়া হয় তবে তাকে বলা হয় 'হোমোগ্রাফট্'। ভিন্ন শ্রেণীর প্রাণীর দেহ থেকে নেওয়া গ্রাফট্‌কে বলা হয় 'হেটারোগ্রাফট্'। যার দেহ থেকে গ্রাফট সংগ্রহ করা হয় তাকে বলা

জানি তোমার মোহিনীমায়ায় যাকে ঘুরিয়ে মারছো, যে মূল্য দেবার জন্যে বসে আছে—সেই দিয়েছে। হঠাৎ অগ্নিমিত্রার দিকে তাকিয়ে চুপ করে যায় শুকদেব। অগ্নিমিত্রার মুখ পাণ্ডুর হোয়ে গেছে।

কদিন অগ্নিমিত্রার সন্ধান নেই। বৈঠকখানার চত্বর নীরব। শুকদেবের মুখ বিরস। এমন সময় একখানা চিঠি এলো অগ্নিমিত্রার কাছ থেকে।

শুকদেব,

চলেছি দূরে। ফিরবো বলে ভরসা রাখি না। তবু যাবার মুহূর্তে তোমার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে পারছি না। তুমি ছিলে আমার আসরের মধ্যমণি। আমার সব কথার, সব কাজের সায়। তাই যাবার আগে ভাবলাম তোমায় দিয়ে যাবো আমার এই সন্ধিক্ষণের শেষ সম্ভাষণ।

সেদিন আর অপেক্ষা না করে নীরোদের বাড়ী গিয়েছিলাম। ভুল বুঝো না আমায়। এতটুকু মধুর সম্ভাষণ নিয়ে যাইনি। গিয়েছিলাম আঘাত দিতে। তুমিতো জান আমার অহংকার আকাশচুম্বি। আমার চেয়েও কেউ বড় হবে এ আমি সহ্য করতে পারি না। সেদিন প্রচণ্ড একটা রাগ নিয়ে গিয়েছিলাম নীরোদের কাছে ছুটে। কিন্তু এমনি নিরাশ বুঝি জীবনে আর হইনি। দেখি, নীরোদ নেই, বাড়ী বন্ধ। দরজা, জানালা সবগুলো আমার দিকে মুখ ফেরালো।

বাড়ী ফিরে এসে মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম। এলো সংশয়। মনে হোল নীরোদ বুঝি বা কিছু ফাঁকি দিয়েছে। ম্যানেজারের কাছে হিসেব মিলাতে গিয়ে দেখি—ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক সব কটাই দানের খাতায় নীরোদের দেওয়া টাকার অঙ্ক।

সারা শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো: শুকদেব, এমন প্রতারণা বুঝি কেউ কারুকে করে না। তারপরের কথা বলতে গেলে চিঠি অনেক বড় হোয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত নীরোদের দেখা মিললো যেখানে সেখানকার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না। আমিও চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না। মনে পড়লো অনেক দিনের ভুলে যাওয়া একটা কথা—"সব মেলামেশার মেলায় কবে যে যেতে পারবো, মিত্রা"।

বললুম এ কোথায় এসেছ! সে হেসে বল্লে—কবিরা চিরদিনই মিলনের বাঁশি বাজিয়েছে, তাই এসেছি কবি জয়দেবের মেলায়।

জেদ নিয়ে ছুটোছুটি করছিলাম। এখন আমার সমস্ত মন স্তব্ধ হোয়ে গেল। বললুম—একি বেশ! ও উত্তর দিলে—এতটুকু চেষ্টা করতে হয়নি মিত্রা, একেবারেই সহজ হোয়ে গেছে। একরকম জোর করেই তাকে টেনে তুললাম। চোখে আমার জল ভেসে যাচ্ছে। বললুম—ক্ষমা কি পাবো না?

উত্তর দিলে নীরোদ—ভালবাসা কি কখন রাগ করে মিত্রা।

আমি কেঁদে বললুম—তুমি আমাকে জোর করে ফেরালে না কেন?

সে হেসে চুপ করে রইলো। যেন বলতে চাইলো—"আমি ক'রবো তোমার উপর জোর!"

কতক্ষণ যে আমরা চুপ করেছিলুম, তা বলতে পারবো না। তারপর কখন একটা ছোট্ট ষ্টেশনে সে নেমে গেল। ব্যাকুল হোয়ে প্রশ্ন করলুম—কোথায় দেখা হবে?

উত্তর দিলে—ভাবনা করোনা। আমি তোমারই জন্যে অপেক্ষা করে রইলুম।

আমি ভাবলুম এই ভাল হোল।

এতদিন কেঁদেছি—একটু আগেও কেঁদেছি। রাগে কেঁদেছি, দুঃখে কেঁদেছি, অভিমানে কেঁদেছি, অনুশোচনায় কেঁদেছি। এবার বুঝি কান্নার শেষ হোল। দেখলুম অনেক থমথমে মেঘের পরে আজ প্রথম সূর্যোদয়। পৃথিবী আজ শুচিস্নাতা কুমারী।

শুকদেব, আমার সামনে আংটায় ঝুলছে একটা শান্তিনিকেতনী ব্যাগ আর গদীতে পড়ে আছে দশ বার টাকা দামের একটা চশমা। শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে, এ নীরোদের। আমিও আশ্চর্য হোয়েছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম—তোমার শেষে এই বেশ? সোনার চশমা জোড়া কোথায় খোয়ালে?

ও বল্লে—সোনার চশমায় সোনা চেনা যায় না মিত্রা।

জান শুকদেব, যে লোক মেলায় মিলোতে পারে নিজের তার কিসের প্রয়োজন অন্য কিছুর—সেতো রাজা। তাই হোক শুকদেব, আমার রাজার সঙ্গে মিলন হোক এবার আলোতে। আলোর পথ এবার আমার সুরু হোল। সঙ্গে থাক ওর সহজ দেখা, আর থাক ঐ শান্তিনিকেতনী ব্যাগে আমার ভালবাসার পাথেয়।

শুকদেব, তুমি আজ আমায় সর্বান্তঃকরণে বিদায় দিও। মনে জেনো সেই তোমাদের অভিনয়ের পুতুল সাজা অগ্নিমিত্রা মরেছে। আর এক অন্য অগ্নিমিত্রা—সে অগ্নিমিত্রা অতি সামান্যা, অতি আশ্চর্যও। আজ পথ আমার সুন্দর, আকাশ মনোহর। আর ভয় নেই।

হয় 'ডোনর' বা দাতা এবং যার দেহে প্রতি-রোপণ করা হয় তাকে বলা হয় 'হোস্ট' বা গ্রাহক। আরোপিত অংশ বা গ্রাফ্‌ট্‌ নতুন জায়গায় অথবা ভিন্ন শরীরে সন্নিবিষ্ট হয়ে সেখানে তার প্রয়োজনমত অক্সিজেন ও পুষ্টিরক্ষার অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করে নিয়ে নিজের স্বাভাবিক জীবক্রিয়া অব্যাহত রাখতে পারলে এই সংরোপণ সফল হয়েছে বলা যায়। সংরোপিত অংগ পরস্ব হলেও গ্রাহকের শরীরে অংগীভূত হয়ে যায়।

প্রতিরোপণ সম্বন্ধে কয়েকটি সমস্যা

প্রতিরোপণ বা গ্রাফ্‌টিং করতে হলে প্রথম প্রয়োজন লাগাবার মত উপযুক্ত একটি অংগ দান করবার মত একজন সুস্থ দাতা। তারপর দাতার সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় রেখে তার শরীর থেকে গ্রাফ্‌ট্‌ বিচ্ছিন্ন করে গ্রাহকের শরীরে প্রতিরোপণ করবার মত অস্ত্র প্রয়োগের শিল্পকৌশল। মূল দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রাহকের দেহে স্থানলাভ করবার মধ্যে কতকটা সময় গ্রাফ্‌ট্‌টি তার স্বাভাবিক রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহের উৎস থেকে বঞ্চিত থাকবে। এই সময় যাতে তার কোষগুলি বেঁচে থাকতে পারে অথবা তাদের জীবক্রিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা যায় তার ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন। তারপর প্রযুক্ত অংশের গ্রাহকের শরীরে অংগীভূত হওয়া, এই সব সমস্যাগুলির সম্যক সমাধানের উপরই শারীরিক অংগ-প্রত্যংগাদি স্থানান্তরে বা দেহান্তরে প্রতিরোপণের সাফল্য নির্ভর করে। শিল্প-কুশলতার দিক থেকে আধুনিক শল্যচিকিৎসা বিদ্যা ও অস্ত্র প্রয়োগের পদ্ধতি এবং তার আনুষঙ্গিক বিধি-ব্যবস্থা যে উৎকর্ষ লাভ করেছে তাতে শরীরের যে কোনও অংগ, শিরা, ধমনী, স্নায়ু ইত্যাদি সমেত দেহান্তরে সন্নিবেশ করা বেশী কঠিন কাজ নয়। তবু এই ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত আশানুরূপ ফল লাভ করা যাচ্ছে না অন্য নানা কারণে।

প্রত্যাখ্যান

জন্তুদের শরীরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পরস্বদেহজাত গ্রাফ্‌ট্‌ খুব ভালভাবে লাগালেও গ্রাহকের শরীরে কয়েকদিন স্বাভাবিকভাবে থাকবার পর পচতে সুরু করে এবং অবশেষে নষ্ট হয়ে যায়। একবার গ্রাফ্‌টিং করবার পর দ্বিতীয়বার যদি একই দাতার শরীর থেকে একই গ্রাহকের শরীরে প্রতি-রোপণ করা যায় তবে গ্রাফ্‌টের পচন আরও তাড়াতাড়ি হয়। গ্রাহকের শরীর যেন আগন্তুক অংশকে নিজ অংগীভূত করতে অস্বীকার করে। গ্রহণকারী দেহ কর্তৃক অপরদেহজাত যে কোন শারীরিক উপাদান প্রত্যাখ্যানই দেহান্তরে অংগাদির প্রতিরোপণের প্রধান অন্তরায়। এর মূলে আছে জীবজন্তুর বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার এবং নিজ নিজ দেহের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য ও বংশগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির দরুণ নিজস্ব দেহজাত ব্যতীত যে কোনও জিনিষই দেহের পক্ষে অ্যান্টিজেনিক বা বিদ্বেষউত্তেজক। এই বিদ্বেষভাব ভিন্ন শ্রেণীর দেহজাত কোনও উপাদানের উপর খুব বেশী। সেই জন্য গ্রাফ্‌টিংএ দাতা এবং গ্রাহক ভিন্ন শ্রেণীর জন্তু হলে গ্রাফ্‌টের প্রত্যাখ্যান প্রায় নিশ্চিত। সম-শ্রেণীর জন্তুদের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি শারীরিক উপাদান সম্বন্ধে এই সহজাত বিদ্বেষভাব বর্তমান। আকারে প্রকারে বা রাসায়নিক গঠনে দুটি মানুষের বা সমশ্রেণীর জন্তুর শারীরিক অংগ-প্রত্যংগাদি ও আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন উপাদান প্রায় একই রকম। তবুও এই উপাদানগুলির মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুণ অন্য দেহে প্রবেশ করলেই তারা পর বলে ধরা পড়ে যায়। এই পরভাব সমশ্রেণীর জন্তুর দেহজাত উপাদান সম্বন্ধে যদিও অনেক কম তবুও দেহান্তরে প্রতিরোপণে এটাই প্রধান বাধা।

আত্মজ অংশের স্থানান্তর (অটোগ্রাফ্‌ট্‌)

নিজের শরীরের কোনও অংশ তার স্বাভাবিক সংস্থান থেকে উৎপাটন করে দেহের অন্য স্থানে লাগান যায়। এখানে বিদ্বেষমূলক কোনও অ্যান্টিজেনিক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নাই। স্কিন গ্রাফ্‌টিং, বোন (হাড়) গ্রাফ্‌টিং এবং প্ল্যাস্টিক সার্জারীতে শরীরের বিকৃত বা বিকলাংগ অংশের পুনর্গঠন করতে অটো-গ্রাফ্‌ট্‌ কাজে লাগান হয়। কিন্তু কোনও অংগ রোগের দরুণ নষ্ট হয়ে গেলে তার বদলে অন্য একটি সুস্থ অংগ লাগাতে হলে অপর কোনও সুস্থ লোকের দেহ থেকেই জোগাড় করতে হয়।

হোমোগ্রাফ্‌টের দাতা নির্বাচন

অপরের দেহ থেকে গ্রাফ্‌ট্‌ নিতে হলে দাতা এমন হওয়া চাই যার শারীরিক উপাদান গ্রাহকের শরীরে বিদ্বেষমূলক (অ্যানটিজেনিক) প্রতিক্রিয়া উদ্রেক করে গ্রাফট্‌ প্রত্যাখ্যাত না করে। মানুষের শরীরে প্রতিরোপণের জন্য নিম্নশ্রেণীর জন্তুদের শরীর থেকে গ্রাফ্‌ট্‌ নেওয়া চলে না এই কারণে। মানুষের জন্য মানুষের দেহ থেকেই গ্রাফ্‌ট নিতে হবে। রক্তের সম্পর্কে অতিনিকট আত্মীয়দের মধ্যে শারীরিক উপাদানে পরস্পরের প্রতি অ্যান্টি-জেনিসিটি বা বিদ্বেষভাব কম থাকার সম্ভাবনা। সবচেয়ে কম থাকে যমজ সন্তানদের মধ্যে। আকারে প্রকারে হুবহু সাদৃশ্য যে সব যমজদের মধ্যে থাকে তারা একই ডিম্বকোষজাত বলে এদের শারীরিক উপাদান পরস্পরের মধ্যে আত্মজ উপাদান বলেই গণ্য হয়। এরকম যমজদের এক-
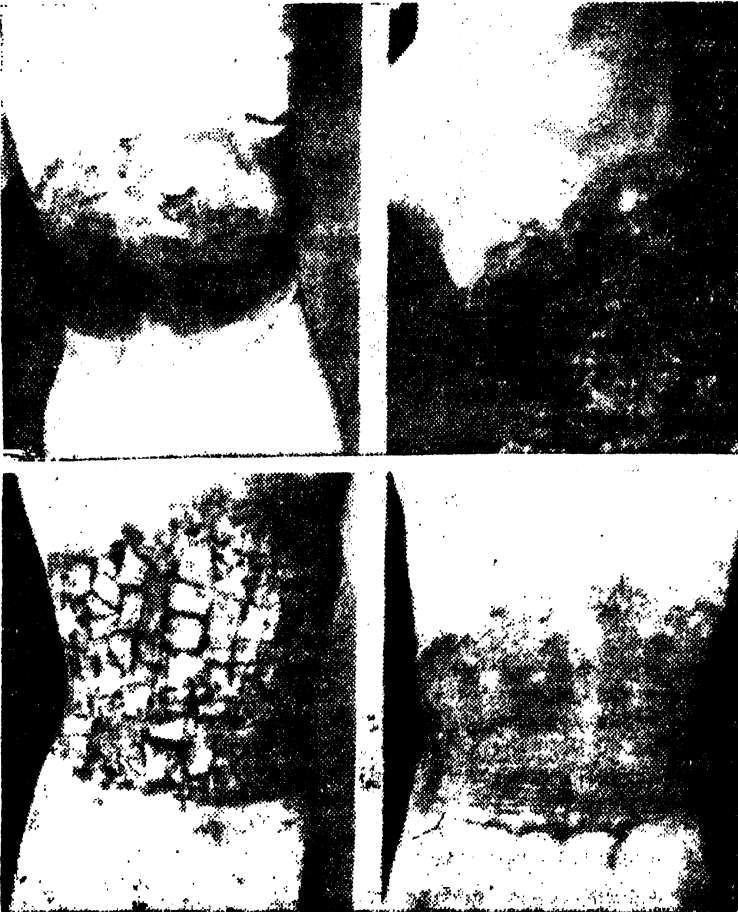
(১) আগুনে পুড়ে পিঠের ক্ষত (২) ২৫ দিন পরও ক্ষতে উপর চামড়া গজায় নাই (৩) চামড়া প্রতিরোপণের ৬ দিন পর (৪) ৪ মাস পর—ক্ষতের উপর চামড়া স্বাভাবিক অবস্থা লাভ।

ন দাতা ও একজন গ্রাহক হলে প্রত্যাখ্যানের য় থাকে না। ভিন্ন কোষজাত যমজ, সহোদর াই বোন অথবা পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যেও ্যান্টিজেনিসিটি কম থাকে। অ্যান্টি-জেনিসিটির দিক থেকে মানুষের শরীরের ক্ত কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ক্ত দেহান্তরিত করতে হলে দাতা এবং গ্রাহকের ক্ত একই শ্রেণীর হওয়া চাই। কিন্তু রক্ত এক শ্রেণীর হলেও তাদের শরীরের অন্যান্য উপাদান পরস্পরের অ্যান্টিজেনিক হতে পারে। যদিও ভিন্ন শ্রেণীর রক্তের লোকের শরীরের উপাদানের চাইতে সমশ্রেণীর রক্তের লোকের শারীরিক উপাদান গ্রাহকের শরীরে অধিকতর গ্রাহ্য হতে পারে। কাজেই এক ডিম্বকোষজাত যমজের পরই অতিনিকট আত্মীয়দের মধ্যে যার গ্রাহকের সমশ্রেণীর রক্ত আছে, দাতা হিসাবে সেই প্রকৃষ্ট।

রক্ত দেহান্তরিত করার জন্য অবশ্য দাতা পাওয়া খুব কঠিন নয়, কারণ অনাত্মীয় বহু লোকের মধ্যেও সমশ্রেণীর রক্ত পাওয়া যায়। কর্ণিয়া বা চোখের স্বচ্ছ সম্মুখভাগ প্রতি-রোপণের জন্যও দাতা নির্বাচন কঠিন নয়। কারণ প্রতিরোপিত কর্ণিয়া গ্রাহকের শরীরের রক্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয় না বলে অ্যান্টি-জেনিক প্রতিক্রিয়া ঘটায় না।

দাতা নির্বাচনে নীতিগত প্রশ্ন

দাতার শরীর থেকে কোনও অঙ্গ নেওয়ার আগে তার নিজের ক্ষতির প্রশ্নটাও চিন্তা করা দরকার। অপরের জীবনরক্ষার জন্য এক-জন সুস্থ লোককে বিকলাঙ্গ করা বা তার জীবন বিপন্ন করা চলে না। শরীরের কতগুলি অঙ্গ আছে যা দান করলে নিজের জীবন রক্ষা করা যায় না। আবার কতগুলি অঙ্গ প্রয়োজনের তুলনায় কিছু বাড়তি থাকার দরুণ কিছু অংশ দান করা চলে। অল্প পরিমাণ রক্ত বা সামান্য এক টুকরা চামড়া দাতার বিশেষ ক্ষতি না করেই নেওয়া যায়। দাতার শরীর সহজেই এই সামান্য ক্ষতি পূরণ করে নিতে পারে। কিডনি বা ফুসফুস্ শরীরে দুটো করে থাকে। একটা দান করে অথবা রোগের দরুণ একটা ফেলে দিয়েও অপরটি নিয়ে সুস্থ ভাবে বাঁচা যায়। তবুও মনে রাখা দরকার যে, দাতাকেও জীবনযাত্রায় নানা রকম রোগের সম্মুখীন হতে হলে দান করা অঙ্গের অভাব তার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। দাতার শরীর থেকে প্রয়োজনীয় অঙ্গ অস্ত্র প্রয়োগে সংগ্রহ করতেও কিছু মাত্রায় বিপ-দের সম্ভাবনা থাকে।

কিডনি বা ফুস্ফুস্ বা চোখের কর্ণিয়া বা অন্য কোনও অঙ্গ দান করলে তার জায়গায় নতুন আর একটি গজাবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই দাতাকে এই ক্ষতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন করা প্রয়োজন। অতি-প্রিয়জন বা স্নেহের পাত্রের গুরুতর রোগে জীবন সংশয় হলে অনেকেই তার রক্ষার জন্য পরম আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত হতে পারেন। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে নীতিগতভাবে এরকম ত্যাগ সমর্থন করা সমীচীন কিনা সেটাও বিচার্য।

মৃতদেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ

মৃতদেহ থেকে অঙ্গ সংগ্রহ করতে পারলে এই সমস্যার সমাধান হয়। দেহের মৃত্যুর পরও শরীরের অনেক অংশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নানা রকম কৃত্রিম উপায়ে এই সম্ভাবনা দীর্ঘতর করা যায়। সদ্যোমৃত দেহের থেকে অঙ্গ সংগ্রহ ক'রে এবং উপযুক্তভাবে সংরক্ষণ ক'রে জীবন্ত দেহে সাফল্যের সঙ্গে সংরোপণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে এর জন্যও উপযুক্ত নির্বা-চনের প্রয়োজন আছে। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মৃত্যু হলে সেই দেহের কোনও অঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থ থাকার সম্ভাবনা কম। কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুতে বা অল্প দিনের কোনও রোগে মৃত্যুতে শরীরের অনেক অঙ্গের বিশেষ কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা কম। এইরূপ মৃতদেহ থেকে দেহান্তরের যোগ্য অঙ্গ সংগ্রহ করা চলতে পারে। তবে প্রয়োজনমত এরকম মৃতদেহ হাতের কাছে পাওয়া সহজ নয়। তাছাড়া প্রতিরোপণের সমস্ত ব্যবস্থা এবং সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি জোগাড় যন্ত্র করতেও কিছু সময় লাগবেই। কারণ মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দেহের অংশবিশেষ কেটে নেওয়ার জন্য তৈরী হয়ে বসে থাকা বিসদৃশ। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের সম্মতিও প্রয়োজন। সমস্ত যোগাযোগ সম্ভব হলেও প্রতিরোপণের পর গ্রাহকের শরীরে প্রযুক্ত অঙ্গের প্রত্যাখ্যাত হও-য়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রত্যাখ্যান প্রতিরোধের উপায়

জীবজন্তুর শরীরে পরীক্ষা করে গ্রাহকের শরীরে অপর দেহজাত উপাদান প্রত্যাখ্যানের কারণ ও এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গেছে। সেই সব তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই প্রত্যাখ্যান প্রতিক্রিয়া দমন করার চেষ্টা চলছে। গ্রাহকের শরীরে শক্তিশালী এক্স-রে প্রয়োগ করে অথবা কোনও কোন ওষুধের দ্বারা তার সহজাত প্রতিরক্ষার ক্ষমতা সাময়িকভাবে লোপ করা সম্ভব। দেখা গেছে যে, এরকম অবস্থায় প্রতিরোপণ করলে গ্রাফটের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। মানুষের শরীরেও প্রতিরোপণে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে।

প্রতিরোপণের সাফল্য

জীবজন্তুর শরীরে বিভিন্ন অংশ দেহান্তরে প্রতিরোপণে অনেকেই সাফল্য অর্জন করেছেন। রুশ বৈজ্ঞানিক ডেমিখফ এ বিষয়ে চাঞ্চল্যকর সফলতা দাবী করেন। তিনি এক জন্তুর মাথা অপর জন্তুর ধড়ের সঙ্গে জুড়ে দিতে অথবা একের উর্ধ্বাঙ্গ অপরের নিম্নাঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন বলে দাবী করেছেন।

শরীরের ওপরকার ছোট-খাট অংশ যেমন চোখের কর্ণিয়া বা চামড়ার ক্ষুদ্র অংশ দেহান্তরে প্রতিরোপণ অপেক্ষাকৃত সহজ এবং গ্রাহকের অঙ্গীভূত হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী। কিন্তু আভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলির মধ্যে কিডনি বা বৃক্কই সবচেয়ে দেহান্তরে প্রতিরোপণের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। মানুষের শরীরেও কিডনি প্রতিরোপণেরই চেষ্টা হয়েছে সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য অঙ্গ প্রতিরোপণের চেষ্টা মানুষের শরীরে খুব বেশী হয় নাই। সম্প্রতি ফুস্ফুস্ ও প্লীহা প্রতিরোপণের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

কিডনি প্রতিরোপণের চেষ্টা বেশ কিছুদিন যাবৎই হচ্ছে এবং কিছু সাফল্যও লাভ হয়েছে। বস্টনের ডাঃ মারে ও তাঁর সহকারিগণই বোধ হয় এ বিষয়ে প্রথম সফলতার দাবী করেন। ১৯৫৮ সালে তাঁরা জানান যে, ১৩ বৎসরে তাঁরা মোট ১৫টি ট্রান্সপ্লান্ট চেষ্টা করেন। তার মধ্যে ৭টি সমপ্রকৃতির যমজদের মধ্যে। এর ৪টি সম্পূর্ণ সফল হয়। দুটি প্রথম সফল হলেও গ্রাহকের শরীরের রোগ নতুন কিডনিকে আক্রমণ করে। একটি সম্পূর্ণ বিফল হয়। এর পর আজ পর্যন্ত আর ২৫টি সমপ্রকৃতির যমজদের মধ্যে কিডনি প্রতিরোপণের সফলতার সংবাদ পাওয়া গেছে। অনাত্মীয় বা নিকট-আত্মীয় দাতার কিডনি প্রতিরোপণে সাফল্য অনেক কম। হিউম ১০ বৎসরে ৯টি কিডনি অনাত্মীয় বা নিকট-আত্মীয় গ্রাহকের শরীরে প্রতিরোপণের চেষ্টা করেন। এর মধ্যে ৪টি ৩৭ থেকে ১৫৭ দিন পর্যন্ত গ্রাহকের শরীরে টিকতে পেরেছিল। ১টি এক সপ্তাহ টিকেছিল। বাকিগুলি সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হয়। তবে ফ্রান্সে এই ধরণের দাতা ও গ্রাহকদের মধ্যে দেহান্তরিত কিডনি একটি এক বৎসর এবং দুটি ছয় মাস পরেও বেঁচে ছিল বলে জানা যায়। আরও একটি ১৭ মাস পরে বিনষ্ট হয়। অসমপ্রকৃতির যমজদের মধ্যে দেহান্তরিত দুটি কিডনি ৪ বৎসর পরও গ্রাহকের দেহে সুস্থ অবস্থায় ছিল বলে খবর পাওয়া গেছে।

মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত কিডনি প্রতি-রোপণেও ডাঃ মারে সফল হয়েছেন। একটি কিডনি গ্রাহকের শরীরে এক বৎসর পরও জীবিত ছিল। অপর একটি দেড় মাস পরও কার্যকরী ছিল। পরের খবর জানা নাই। ইংলণ্ডের একটি সংবাদে জানা যায় যে, ইউরিমিয়া রোগগ্রস্ত সংকটাপন্ন দুটি রোগীকে মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত কিডনি প্রতিরোপণ করে যথাক্রমে ৩৩ দিন ও ৬ মাস জীবিত রাখা গিয়েছিল।

মনে রাখা দরকার যে, কিডনি প্রতি-রোপণ এমন গ্রাহকেই করা হয় যার উভয় কিডনিই মারাত্মক রোগে আক্রান্ত এবং তার শারীরিক অবস্থাও আশঙ্কাজনক। এরকম রোগীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ খুবই বিপজ্জনক। পরন্ত কিডনিকে গ্রাহকের শরীরে গ্রাহ্য করবার জন্য তার স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ক্ষমতাও ওষুধ প্রয়োগে দমন করতে হয়। এতসব বাধা সত্ত্বেও যে কিছু কিছু রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এটাই পরমাশ্চর্য।

কিডনি প্রতিরোপণে এবং মৃতদেহ থেকে কিডনি জীবন্ত দেহে পুনরুজ্জীবিত করাতে যেটুকু সাফল্য লাভ হয়েছে, অদূরভবিষ্যতে অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধেও অনুরূপ ফল লাভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ব্যবধান

শ্রীদ্বারেশ চন্দ্র শর্মাচার্য

টেবিলের উপর থেকে ফুলদানিটা পড়ে গেছে।

ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলেই চীৎকার করে উঠল চন্দনকুমারী। তার চোখের সামনে কে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি বীভৎস তার চোখমুখ। নীল আলোতে প্রেতের ছায়ামূর্তি! বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে চন্দনকুমারী ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

কে? কে? কে?—গলাটা যেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হাসছে ছায়ামূর্তি। প্রেত না কি? পালিয়ে যাবার মুখে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। আবার চোখ দুটি তার জ্বল জ্বলও করছে।

চেঁচিয়ে উঠল চন্দনকুমারী—রোশনলাল! রোশনলাল!

—না, না, না—আমি!—সেই ছায়ামূর্তি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, বাইরে লোকজনের সাড়া পেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পাশের ঘরেই ছিল রোশনলাল। তারও ঘুম ভেঙে গেছে।—চোর, চোর, চোর!—চেঁচিয়ে উঠেছে।

বারান্দা দিয়ে প্রেতমূর্তি পালাচ্ছিল। রোশনলাল একটা হাকিস্টীক নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সামনে পড়তেই সেই লোকটার মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

আঃ—আঃ—আঃ। তবু ছুটছে লোকটা। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে।

হেই দরোয়ান, সিঁড়ির মুখ আগলাও!—কিন্তু দরোয়ানজীর লাঠি খুঁজতে খুঁজতে লোকটা উধাও হয়ে গেল।

ওঃ, সেই পাগলটা! ব্যাটা পাগলের ভান করে ঘুরে বেড়ায়। কি সর্বনাশ! ওখানটায় সন্ধ্যার সময় ঘুরঘুর কচ্ছিল। দু'তিন দিন ধরে আমি লক্ষ্য করছি।—এক ভদ্রলোক চুরুট ধরাতে ধরাতে মন্তব্য করেন।

রাত শেষ হয়ে গেছে। বাদশা-হোটেলের বারান্দায় তখন দুচারজন জড় হয়েছে।

পাগলটা ছুটছে। মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে।

আঃ—আঃ—আঃ—আর্তকণ্ঠ যেন ভোরের বাতাসকে থমথমে করে তুলেছে। বেরিয়ে এসেছে চন্দনকুমারী। সেও দেখছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল চন্দনকুমারী।

—একরাশ কাগজ! ফোঁটা ফোঁটা তাজা রক্ত তার উপর।

কাগজের উপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল চন্দনকুমারী—একি?

পাগলই বটে! এ এক সৃষ্টিছাড়া পাগল। ফ্যাল ফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে। ন্যাকড়ার জড়ানো একটা বাণ্ডিল তার বগলে। বাণ্ডিলে কাগজ

রয়েছে। তা ছেঁড়া নেকড়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখাই যায়। বোঝা যায়, লোকটার বয়স হয়েছে। উস্কখুস্ক চুল বেশ লম্বা হয়ে গেছে। তেলজল না পেয়ে জটার মত দড়ি পাকিয়ে যাচ্ছে। পিঙলে হয়ে গেছে চুলগুলো। মুখময় কাঁচা পাকা লম্বা লম্বা গোঁফ দাড়ি। গায়ের রঙও তামাটে মেরে গেছে।

আগে আগে পার্কে মাঠে যেখানেই ছেলে-মেয়েদের ভিড়, সেখানেই তাকে দেখা যেত। কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর কেউ জানে না। আজকাল আবার সিনেমা ও রংগমঞ্চগুলোর ধারে ধারে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয়, যেন কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বগলের কাগজের বাণ্ডিলটা খুলে মাঝে মাঝে নিরিবিলি জায়গা খুঁজে বসে পড়ে। তারপর এক এক খানি করে কাগজ খোলে কি যেন দেখে। হাসে আবার কাঁদেও। কেউ কাছে গেলে তাড়াতাড়ি কাগজগুলো জড়িয়ে ফেলে। ছেলেমেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারলে তাড়া করে।

ইদানীং বড় বড় সিনেমা-হলগুলোর সামনে ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কেউ ভিখারী মনে করে পয়সা দিতে যায়। হাত সরিয়ে নেয়। ভিক্ষা নেয় না। ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু মুখের দিকে তাকায়।

মেয়েরাই তাকে দেখলে বেশি বিরক্ত হয়।

—কি চোখ রে বাবা! যেন গিলতে আসছে। পাগল! এমনধারা পাগল তো আর দেখিনি।

বিশ্রি চটুল হাসিও হাসে কেউ।

দুষ্টু ছেলেরা নর্দমার জল তার গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

দক্ষিণের সহরতলীতেও দুচারদিন তাকে দেখা গেছে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। প্রতিটি বাড়ির দরজার কাছে এসে কি যেন খোঁজে পাগলটা। সহরতলীর চেহারাটাও পালটে গেছে। এখানে যে খোলাধরগুলো ছিল, গাছপালা ছিল, বস্তী ছিল তার কিছুই আর নাই।

একজন বুড়ো লোককে দেখতে পেয়ে শুধু একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, রাধু পটুয়ার গলিটা কোথা।

হেসেছিল সেই বুড়ো—কতদিন এদিকে আসোনি তুমি? নেই, নেই, সে সব কিছুই নেই। দেখছো না বড় বড় বাড়ি উঠেছে। এভিনিউ রাস্তা! আগের লোক কেউ নেই। সে যে দশ বারো বছর হতে চলল! কবে ভেঙ্গে একাকার করে দিয়েছে।

রাধু পটুয়ার গলির চিহ্নও নাই। তবু সেই বটগাছটা রয়েছে—মা শেতলার স্থান। তাই রয়ে গেছে। লালপাথরের বেদীতে ঘিরে দিয়েছে গাছের গুড়িটা।

বটগাছটার ছায়ায় বসল পাগল। বটগাছটা যেন তাকে চিনতে পারলে। বটগাছটি কথা কইছে কি পাগল স্বপ্ন দেখছে কিছুই বুঝতে পারলে না।

এ্যাঁ সুমন্তই বটে! সুমন্ত পটুয়া!—আঁতকে উঠে পাগল। এ নামটা তারই ছিল বটে একদিন! কিন্তু নামের বালাই তার কেটে গেছে। পাগলের আবার নাম?

সত্যাই সুমন্ত প্রায় কুড়ি বছর পরে ফিরে ছিল।—সব ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে!

দিনেকাই সব গোলমাল হয়ে যায়। এতদিন কোথায় ছিল সে?—বটগাছ বলছে, ওরে শোন্! পুরনো যারা তারা সবাই চলে গেছে। ওধারে ছিল এক পটুয়ার ঘর! সুমন্ত পটুয়া। খুব সুন্দর ছবি আঁকত। পুতুলও গড়ত। হুবহু মানুষের ছবি এঁকে দিতে পারত সুমন্ত পটুয়া। ওই যেখানে সাদা ছ'তলা বাড়িটা উঠেছে। ওইখানে ছিল তার ঘর। খালটালির তিনখানি ঘর। উঠোনে একটা পেয়ারাগাছও ছিল। আর ছিল রত্না। সুমন্ত পটুয়ার বউ। তাদের একটি মেয়েও ছিল,—ঝুমঝুমি বলে ডাকত তারা। ছোট্ট মেয়ে ঝুমঝুমি ঘুরু ঘুরু করে ঘুরে বেড়াত। কি সুন্দর ছিল তার চোখমুখ! কপালে লাল ছোট্ট টিপের মতন জড়ুল।

—রত্নাকে দেখোনি বুঝি? এরকম মেয়ে এ তল্লাটে কেউ ছিল না। বড় ভাল মেয়ে। কিন্তু কি যে হয়ে গেল! দোর বন্ধ করে পটুয়া বসে থাকত। ঘরে বসে কি যে করত কে জানে? কেউ কেউ বলত ছবি আঁকে। মাঝে মাঝে একআধবার বের হ'ত। চোখ দুটো দেখলে ভয় হ'ত। জোর করে খেতে দিত রত্না বউ। কিন্তু সেই ঘরের ভেতর রত্নারও ঢুকবার হুকুম ছিল না। একদিন হঠাৎ ঘরখানিতে ঢোকে কি জানি কি দেখে রত্না ফিট হয়ে গেল। তাকে টেনে ঘরের বাইরে ফেলে রাখল সুমন্ত। তারপর নেকড়ায় জড়িয়ে এক বাণ্ডিল কি যেন ছবি না কাগজপত্র নিয়ে কোথা যে গেল কেউ জানে না।

চমকে ওঠে পাগল! বটগাছ কথা বলছে,—

—আরো শোনো, রত্না বউ জাগল বটে; কিন্তু সাত দিন, সাত রাত যখন সুমন্ত ফিরল না রত্না-বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরল! ওই—ওই খানটায়।

সুমন্ত যেন স্বপ্ন দেখছে। কানে বাজছে, কেন এমন হল? তাও বুঝি জানো না! পুটলীতে কাগজ জড়িয়ে পটুয়া চলে যাবার আগে যে আরো এক বিষম অঘটন ঘটেছিল। বড় আদরের মেয়ে ছিল ঝুমঝুমি। রাতদিন বকর বকর করত। বাপের গলা জড়িয়ে পিঠে চেপে বসত। ছবি আঁকতে দিত না। সেই মেয়েটা হারিয়ে গেল। তাইতো যত গোল! হারিয়ে গেল মেয়েটা। কালীঘাটের মেলা থেকে ফিরে এসে সুমন্ত দেখে বাড়িতে হাহাকার। এই যে, এখানে বসে খেলা করছিল! তিনু সন্ধ্যে হয়েছে। ঘরে প্রদীপ জ্বালাতে গেছে। ফিরে এসে দেখে মেয়েটা নাই।

—ঝুমঝুমি—ঝুমঝুমি!—রাতের অন্ধকারকে ফালি ফালি করে চিরে দিয়েছিল সে আর্তনাদ! এপাড়া, ওপাড়া, থানা পুলিশ কত কি হল; সারা শহরটা তোলপাড় করল সুমন্ত। ন' নম্বরের ছোটবাবু কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন, কিন্তু কোথায় ঝুমঝুমি।

খবরের কাগজে কত খবর বেরোয়। ছুটে যায় পটুয়া। শান্তিপুরে না কাটোয়ায় ছেলেধরা ধরা পড়েছে। ছোটে সেখানে। না, কোথাও তার মেয়েকে পাওয়া গেল না।

তারপরই পটুয়া মদ ধরলে। রত্না বাধা দিলে শুনতো না। রাতদিন দোর বন্ধ করে ঘরে থাকত। মনের আগুন নিভাতে গিয়ে পাগল হল সুমন্ত পটুয়া। কিন্তু আমি জানি, সে ঘরে বসে বসে কি করত।—সে যে ছবি আঁকত গো! ছবি আঁকত,—পাঁচ বছরের মেয়ে বড় হলে কেমনটি হবে বছরের পর বছরের ছবি। কোনো মেয়েকে দেখে তার ছবি এঁকে রেখে অনেকদিন সেটা আর দেখত না। এমনি করে মিলিয়ে নিত। তাই তো ঘর থেকে বের হ'ত না। কত ছবি এঁকেছে। সবাই জানে, আজ তাঁরা নেই। সুমন্ত চলে গেলে বউটারও সাড়া পাওয়া গেল না।। ছোটবাবু একদিন দরজা ভেঙ্গে গলায় দড়ি-দেওয়া রত্নাবউকে বাড়ি থেকে বার করলে। ছোটবাবুর কত আক্ষেপ—এমন জাতশিল্পী পটুয়া মেয়ের শোকে কেমন হয়ে গেল। আর মেয়ের মাও এমন ক'রে মরলে!

গাছের ডালপালাগুলো যেন ভেংচি কাটছে! হ্যাঁ, সুমন্ত পটুয়া! বটগাছটা তার মাথা আরো বিগড়ে দিল। তাইতো ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! এতদিন নানা সহরে গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

কই, তার ছবির সঙ্গে কোনো মেয়ের কোনো ছবির তো মিল দেখতে পেল না।

ছেলেমেয়েদের চুরি করে নিয়ে যায় ছেলে-ধরার দল। এ একরকমের ব্যবসা। রাস্তায় বসিয়ে রেখে ভিক্ষা করায়। আগের কথা সব ভুলিয়ে দেয়। চেহারাও পালটে দিতে পারে। মেয়েদের দিয়ে বয়েস কালে আবার পাপ ব্যবসাও চালায়।—কতজন কত কথা বলেছে।

তবু সুমন্ত পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ সে নিজের নামই ভুলে গেছে। তবু যেন এক নেশায় পেয়ে গেছে।

কত বছর হয়ে গেছে!! ছবি উলটে উলটে দেখে সুমন্ত পটুয়া! সিনেমার স্টুডিয়োতে পর্যন্ত ধাওয়া করে। বাইরে থেকে কোনো দল এলে তাদের মাঝেও খুঁজে বেড়ায়।

রাস্তায় রাস্তায় সিনেমার ছবির প্ল্যাকার্ডের ছবির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

নতুন দল এসেছে। দক্ষিণ দেশের নৃত্য-পটীয়সী চন্দনকুমারীর ছবি সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে। স্পষ্ট বুঝা গেল না আদৌ! তবু সুমন্ত পটুয়া এমন চমকে উঠেছিল কেন? কেন তার এত উত্তেজনা, কেন এত রোমাঞ্চ। এই ছবির ভিতর দিয়ে যেন কোন্ দূরের স্মৃতি তাকে হাতছানি দিচ্ছে। দেখতে হবে, না দেখলেই নয়। যেখানে তারা বাসা নিয়েছে, সেখানে ঢোকবার কোনো উপায় নেই। প্রিন্স থিয়েটারের হলে কখন যে তারা জোট করে গাড়ি করে এসে নেমে পড়ে, তা ঠিকই করতে পারে না। একজন নয়, এক এক দলে আট দশ জন করে মেয়ে।

এরকম তো অনেকবারই চেষ্টা করেছে; মার খেয়েছে। গলাধাক্কা দিয়েছে। পাগল মনে করে বেশি কিছু আর কেউ করেনি। শেষ রাতের অন্ধকারে বাদশা হোটেলে ঢুকেছিল।

চন্দনকুমারীর সামনে ছবির পর ছবি—এ কি! হাতে তুলে নিল চন্দনকুমারী! এ ছবি তাকে কোন ভুলে যাওয়া অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাঁপছে,—থরথর করে কাঁপছে চন্দনকুমারী। তার চোখের সামনে ছবি আঁকছে এক শিল্পী। আর তার একটি ছোট্ট মেয়ে তার পিঠে চেপে গলা জড়িয়ে ধরেছে। অস্ফুট ভেসে আসছে তাদের খুশির কলরব!—কিন্তু দুস্তর সে ব্যবধান! ফোঁটা ফোঁটা রক্ত যেন তার চোখে ধাঁধা লাগাচ্ছে।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

ইতিহাসের ইন্দ্রাণীরা

কৃষ্ণ ধর

পুরুষের হৃদয়ে ভালবাসার উত্তাপ জাগিয়েছে নারী। এ কৃতিত্ব নারীর নিজস্ব কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। পুরুষ শিল্পী বলেই নারীকে সে তার নিজের দৃষ্টিতে গরীয়সী করে সৃষ্টি করেছে। নারী তার ভালবাসার আধার মাত্র। নারীর মধ্যে পুরুষ আবিষ্কার করেছে বিস্ময়, তার চোখে দিয়েছে প্রেমের স্বাদ। তাকে তুচ্ছতা থেকে মুক্তি দিয়ে, প্রতিদিনের মলিনতা থেকে বাঁচিয়ে সীমা স্বর্গের ইন্দ্রাণী করে ভালবাসার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কখনো এই প্রেম মানুষকে মহৎ স্বীকৃতিতে ধন্য করেছে, কখনো নারীর দেহকান্তি, তার লাবণ্য পুরুষকে উন্মত্ত অধীরতায় মাতাল করেছে। ইতিহাস তার মৌন সাক্ষী। অতীতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো ঈশ্বরের পৃথিবীতে প্রথম নারী যিনি সেই প্রকৃতিরূপা ঈভ প্রথম পুরুষকেই কৌতূহলে প্ররোচিত করে নিষিদ্ধ ফল তুলে দিয়েছিল মুখে। নারীকে সেই প্রথম কামনার চোখে দেখলো পুরুষ। সেদিন পুরুষের শিরে বর্ষিত হয়েছিল দেবতার অভিশাপ। স্বর্গ থেকে হৃতমান পুরুষ বিদায় নিয়েছিল নীরবে। নারী হয়তো সেদিন তার জন্য অশ্রু বিসর্জন করেছিল কিন্তু অভিশাপ থেকে পুরুষ বাঁচতে পারেনি। নারীও সঙ্গিনী হয়েছিল তার। এই কাহিনীটিকে আমরা সিম্বল হিসাবে নিতে পারি। পুরুষ ও নারীর ভাগ্য সেদিন থেকেই এক অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। সে বন্ধন আজও আছে। পুরুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে নারীর চরিত্রে। ইতিহাস কতোবার টলমলিয়ে উঠেছে। দেখা গেছে তার পিছনে যার ছায়া সে একটি নারী। এ যুগের নারী মহীয়সী হয়েছে, তার অপর নাম ভালেন্তিনা। আকাশে আকাশে গ্রহ-তারকায় ভেসে উঠেছে নারীর বিশ্ববিজয়িনী মুখখানি। পৌরাণিক যুগ হ'লে বলা যেত, এই নারীর জন্য দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করবেন।

নারীর এই মহীয়সী রূপকে আমরা অস্বীকার করি না, তাকে যোগ্য সম্মানের আসন দিয়েছে পৃথিবীর মানুষ। কিন্তু নারীর যে আদি মোহিনীবৃত্তি তার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ এ যুগেও সব চেয়ে বেশি। ভালেন্তিনার জয়ধ্বনি

ক্লিওপাত্রা

যেদিন আকাশ স্পর্শ করেছিল, সেদিনই সাগর-পারের আরেক নারী ক্রিস্টিন কীলারের আকর্ষণবলয়ে ধরা পড়ে এক মন্ত্রীর আসন হাতছাড়া হ'ল, তার পরিণতিতে আরেকজন ইম্‌মর‍্যাল পুরুষ ডঃ স্টীফেন ওয়ার্ড আত্মঘাতী হয়ে কলঙ্কিত জীবনের অবসান ঘটাল। বিংশ শতাব্দীর মধ্য দশকের এই ঘটনার সঙ্গে অতীতের আরেকটি ঘটনা আশ্চর্য সাদৃশ্যে যুক্ত।

* * *

সেই নারীর নাম ক্লিওপাত্রা। মিশরের রাণী। খৃষ্ট জন্মের ৬৯ বৎসর আগে এই নারীর আবির্ভাব। সপ্তদশী ক্লিওপাত্রা রাণী হয়েছিলেন মিশরের। ক্ষমতাগর্বিণী সুন্দরী তরুণী সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার জন্য শরণ নিয়েছিল প্রবল প্রতাপান্বিত রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারের। শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে সীজার তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন মিশরের দিকে। ক্লিওপাত্রার দৃষ্টির আকুলতার কাছে ভুবন-বিজয়ী সীজার ধরা দিলেন। সীজারের সঙ্গে দেখা না হলে ক্লিওপাত্রার নাম ইতিহাসে থাকত কিনা, জানি না। মিশরের রাণী প্রবেশ করলেন এক অবিস্মরণীয় নাটকের মঞ্চে। প্রবল প্রতাপ-শালী সীজার যুদ্ধ করলেন ক্লিওপাত্রার জন্য। মিশরের সিংহাসন ফিরে পেল ক্লিওপাত্রা, কিন্তু মূল্য দিতে হয়েছিল তাকে। রোমাকরা দেখেছে ক্লিওপাত্রা রোমে বাস করছে সীজারের প্রণয়িনী রূপে। সেদিনেও এই সৌন্দর্যগর্বিণী নারী জনতার গুঞ্জনকে ভ্রূক্ষেপ করেনি। পুরুষ ধরার জাদু ছিল তার চোখে, তার বাহুতে এসে ধরা দিয়েছিল সে যুগের বীর সেনানীরা।

সীজারের হত্যার পর ক্লিওপাত্রা ফিরে আসে মিশরে। এবার তার রূপমোহে ধরা দিলেন সীজারের সেনাপতি মার্ক এণ্টনী। এণ্টনী সর্বস্ব সমর্পণ করেছিলেন এই নারীর জন্য। বিলাসিনী নারী এণ্টনীর হৃদয় নিয়ে খেলা করল। কারণ, ক্লিওপাত্রা কেবল নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে জানত না। নিজের রূপমুগ্ধ এই অসামান্যা নারী। ওক্টাভিয়াস সীজারের সেনাপতি মার্ক এণ্টনী। এণ্টনী জানতেন না, রূপসী নারী তার জন্য কী ছলনার জাল পেতে রেখেছে। এণ্টনীর ভালবাসাকে ক্লিওপাত্রা ব্যবহার করেছিল নিজের সৌভাগ্যের সোপান হিসেবে। সে জেনেছিল এণ্টনীকে দিয়ে সব করাতে পারবে। কারণ, তিনি এই রূপসী দেহদেউলে বন্দী। ওক্টাভিয়াস সীজার তখন জয়ী। তাঁকে বশী করবার জন্য ক্লিওপাত্রা নতুন ছলনার জাল পেতেছিলেন। এণ্টনীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন ওক্টাভিয়াস। ক্লিওপাত্রা নিজের আত্মহত্যার মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে এণ্টনীকে প্ররোচিত করেছিল আত্মহননের সিদ্ধান্ত গ্রহণে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ক্লিওপাত্রা বুঝতে পেরেছিল এণ্টনীর ভালবাসা কতো গভীর, কতো নিবিড়। তার মনে তখন অনন্ত বাসনা, সেক্সপীয়রের ভাষায় I have immortal longings in me তা নিয়েই মৃত্যুর কোলে তাকেও আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। তখন তীব্র আত্মধিক্কারে ক্লিওপাত্রা বলে ওঠে :

"I am fire and air; my other elements I give to baser life."

ক্লিওপাত্রার সৌন্দর্যের আকর্ষণ যদি না থাকত,

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আর্তস্বর বেরিয়ে এল,—রক্ত, রক্ত, রক্ত। এ কি করলে রোশনলাল!

আর এদিকে গঙ্গায় নেমেছে পাগল।

নাঃ, নাঃ, আমায় চিনতে পারবে কেন! আমি যে হারিয়ে গেছি।

চুল দাড়ি ছিঁড়ছে পাগল। আর গঙ্গায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছে। আরো রক্ত ঝরছে—।

আঃ-আঃ আঃ—গঙ্গায় ঝাঁপ দিল সুমন্ত পটুয়া।

চন্দনকুমারী সে ব্যবধানের যবনিকা আর ঘুচাতে পারলে না।

হিনী যদি তার প্রতি আকৃষ্ট না হতেন তাহ'লে রের রাণীর ইতিহাস হয়তো হতো অন্যরকম। তিহাসকে এমনি ভাবেই পরিবর্তিত করেছে রীর রূপ।

*   *   *

আরও পিছনের দিকে তাকালে মনে পড়বে হেলেনের কথা। হেলেনের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস তাকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল স্পার্টা থেকে। স্পার্টার রাজা মেনেলাসের পত্নী হেলেন। তাকে উদ্ধার করবার জন্য গ্রীকরা অভিযান করেছিল ট্রয়ের বিরুদ্ধে। গ্রীক কবি হোমার এই কাহিনীকে অমরত্ব দিয়েছেন তাঁর ইলিয়াড মহাকাব্যে। কাহিনীর সংগে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে রামায়ণের। সীতাহরণকে কেন্দ্র করে ধ্বংস হয়েছিল স্বর্ণলংকা। হেলেনের জন্য ধ্বংস হয়েছিল ট্রয়। বীরের রক্তস্রোতে স্নাত হয়ে মহাযুদ্ধের মধ্যে পরিসমাপ্তি হয়েছিল এই কাহিনী। হেলেনের সৌন্দর্যে যদি প্যারিস সেই রাত্রিতে হিংস্র না হত, মেনেলাসের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে তার পত্নীকে অপহরণ করবার দুর্মতি না জাগত তার মনে, তাহ'লে মহাকবি হোমার হয়তো লোকপ্রসিদ্ধির চিরন্তন প্রবাহ থেকে অন্য কোন কাহিনী সংগ্রহ করতেন, কিন্তু ট্রয় রক্ষা পেত গ্রীকদের দশ বৎসরব্যাপী দুর্মর অবরোধ থেকে। ট্রয়ের বীর হেক্টর কিংবা গ্রীক বীর একিলিসকে অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হতো না। এ সবই সম্ভাব্য কথা। ইতিহাসে অনেক কিছুই না ঘটতে পারতো, কিন্তু ঘটেছে যা তা মানুষের দুঃখেরই কারণ হয়েছে। হেলেন তার অন্যতম আদি উৎস। এই নারীর চোখের আগুনে দুটি জাতিই আত্মনাশা যুদ্ধে পুড়ে ছাই হলো। ক্লিওপাত্রা কিংবা হেলেন যদি আর একটু কম আকর্ষণীয় হতো, তাদের ভ্রূভঙ্গিতে যদি পুরুষের চিত্তচাঞ্চল্য না জাগত তাহলে কী হ'ত? এ সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে চাই না। তবে ইতিহাসের চাকা অন্যদিকে ঘুরত। ইতিহাসে এমনি রক্তাক্ত স্বাক্ষর রেখে গেছে আরেকটি রমণী। বহু লোকের প্রাণ নিয়ে এবং অবশেষে নিজের প্রাণ দিয়ে এই ইতিহাসের প্রতিশোধের মূল্য দিয়েছিলেন যে নারী তার নাম ম্যারী আঁতোয়নেত।

*   *   *

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্স। ষোড়শ লুই এক বিপন্ন সিংহাসনে বসলেন। তাঁর রাণীর নাম ইতিহাসে অঙ্কিত হয়ে আছে ঘৃণার অক্ষরে। ফরাসীরা তাকে ঘৃণার আগুনে দগ্ধ করেছিল। তিনি ফরাসী জনসাধারণের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিলেন। তাঁর নাম ম্যারী আঁতোয়নেত (১৭৫৫-১৭৯৩)। 'অস্ট্রিয়ান উওম্যান' বলে ফরাসীরা অবজ্ঞাভরে তার নামোচ্চারণ করতো। ফরাসী বিপ্লবের আগুন জ্বালাবার কাজে এই নারীর ভূমিকা ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন। ষোড়শ লুইয়ের করুণ মৃত্যুর জন্য দায়ী তাঁর পূর্বপুরুষ আর এই নারী। আঠারো বছর বয়সে তিনি ষোড়শ লুইয়ের অন্তঃপুরে এসেছিলেন। নির্বোধ লুই নিজে ছিলেন ভীরু, লাজুক। এই উত্তপ্ত হৃদয়া রমণী তাঁকে ইচ্ছে মতো চালনা করতেন। ষোড়শ লুই চুম্বন ছাড়া কিছুই করতে পারতেন না। প্রাণোচ্ছলা, বিলাসিনী ম্যারী আঁতোয়নেত ভের্সাই-এর রাজপ্রাসাদ কোলাহলে, হাসিতে উচ্চকিত করে রাখতেন। যখন তখন ঘোড়ায় চড়ে প্রমোদ ভ্রমণে বেরোতেন।

পরিচারিকারা বারণ করতো। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যিনি উপহার দেবেন তাঁর পক্ষে ঘোড়ায় চড়া বিপজ্জনক বইকি। ম্যারী আঁতোয়নেত হেসে উড়িয়ে দিতেন তাদের সাবধান বাণী। বলতেন :

Mademoiselle, leave me in peace. Be assured that I can put no heir in danger.

ভাগ্যবিধাতা তখন নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। ফ্রান্সের সিংহাসনের জন্য তিনি কোনো উত্তরাধিকারী রেখে যেতে পারেন নি। ফরাসী জনতা বুরবোন নীলরক্তের শেষবিন্দু নিঃশেষ করতে দুর্বার হয়ে উঠেছিল যার প্রতি তীব্র ঘৃণায় তিনি এই নারী। অথচ ভাবতে বিস্ময় লাগে, উদ্ধত যৌবন আর রূপ ছাড়া ম্যারী আঁতোয়নেতের আর কিছু ছিল না। প্রমোদে গা ভাসিয়ে থাকতেন তিনি। শিল্প, ইতিহাস, সাহিত্য সম্পর্কে কোনো আগ্রহ ছিল না তাঁর। সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন তিনি। আঁতোয়নেতের মা অস্ট্রিয়ার রাণী মেরিয়া থেরেসা মেয়েকে জানতেন। তিনি চাইতেন না তাঁর মেয়ে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ম্যারী মায়ের কথায় কান দেন নি। তিনি ষোড়শ লুইকে ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহার করে ফরাসী রাজনীতিকে রাজপ্রসাদের প্রিভিলেজে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

ম্যারী আঁতোয়নেত

উদ্ধত, আত্মাভিমানী ম্যারী প্যারিস শহরকে হাতের মুঠোয় করে নাচাতে লাগলো! ঐতিহাসিকরা বলেন, তিনি প্যারিসের প্রত্যেক অপেরা নাচের আসরে যোগ দিতেন এবং ভোর ছয়টায় প্রাসাদে ফিরতেন।

ষোড়শ লুইয়ের সংগে ম্যারী আঁতোয়নেতের পরিণয় করিয়ে ছিলেন রাজার রক্ষিতা আরেক প্রসিদ্ধ নারী। তার নাম মাদাম দ্য পম্পাদুর। হ্যাপসবার্গ ও বুরবোন রাজবংশের এই পরিণয় ফ্রান্সের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল।

রাজকোষ যুদ্ধের খেসারত দিতে গিয়ে প্রায় শূন্য। অথচ ম্যারী আঁতোয়নেত তখন নির্বিচারে সাজ পোষাক, হীরে, জহরৎ কিনছেন, বান্ধবীদের উপহার দিচ্ছেন দুহাতে; থিয়েটার, নাচ আর রেসকোর্সে অজস্র অর্থ অপচয় করছেন। ষোড়শ লুইয়ের অর্থমন্ত্রী তখন জ্যাকুইস নেকার। এই অপচয়ে তিনি মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন রাজকোষ শূন্য হ'তে চলেছে। রাণীর সখীরা আঁতোয়নেতের কাছে অভিযোগ করল, অর্থমন্ত্রী কৃপণ, তিনি থাকলে রাণীর মান রাখা দায়।

রাগে লাল হয়ে ম্যারী আঁতোয়নেত নেকারের বরখাস্ত দাবী করলেন। দুর্বলচিত্ত ষোড়শ লুই রাণীর দাবী মেনে নিলেন। বিপ্লবের পদধ্বনি তখন প্রায় আসন্ন হয়ে উঠেছে। ম্যারী আঁতোয়নেতের বিলাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে ইতিহাস বলেছে :

"With her own hands she could squander all the gold in the universe. There is not a crime she is not intimately acquainted with."

আঁতোয়নেত ফরাসী জনসাধারণের দুঃখ নিয়ে খেলা করেছেন। ষোড়শ লুই তাঁর প্রিয়তমা রাণীর বিলাস ব্যসনে, ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের প্রতিবাদ করেননি। ফ্রান্সে তখন গণবিপ্লবের মহড়া চলছে। প্যারিস থেকে চলে গেলেন ম্যারী আঁতোয়নেত ভের্সাইয়ে। ১৭৮৯ সালের ১লা অক্টোবর। ভের্সাইয়ের প্রাসাদে রাণী আঁতোয়নেত সেনাধ্যক্ষদের আমন্ত্রণ করে এনে বিরাট ভোজ দিলেন। সৈন্যবাহিনীকে তুষ্ট করে রাখাই রাণীর এই ভোজসভার উদ্দেশ্য! খবরটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল প্যারিসে। মানুষ এক টুকরো রুটির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। আর বিলাসিনী রাণীর পানপাত্র উচ্ছ্বলিত করে সেনানীদের নিয়ে প্রমোদে মত্ত।

ক্ষুধার্ত নারীদের মিছিল 'রুটি চাই, রুটি চাই' চীৎকার করতে করতে প্যারিস থেকে সেদিন ভের্সাইয়ে এসেছিল। ম্যারী আঁতোয়নেত জানতেন না, মানুষ রুটির জন্য চীৎকার করে কেন? এক টুকরো রুটির দাম যদি তিনি জানতেন তাহলে ফ্রান্সের ইতিহাসে রক্তাক্ত বিপ্লবকে হয়তো রোধ করা সম্ভব হ'ত। ষোড়শ লুই এ কথা কোনোদিন আঁতোয়নেতকে জানতে দেননি। তার মূল্য দিতে হয়েছিল দু'জনকেই।

বিপ্লবের আগুনে দগ্ধ হ'য়ে, গিলোটিনে প্রাণ দিয়ে রূপাভিমানী, বিলাসিনী নারী প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন নিজের অপরিণাম দর্শিতার। ১৬ই অক্টোবর, ১৭৯৩, ম্যারী আঁতোয়নেতকে গিলোটিনে নিয়ে যাওয়া হ'ল। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে অবশ্য ম্যারী স্বভাবোচিত গাম্ভীর্য ও মর্যাদা দেখিয়েছিলেন। দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে প্যারিসের দরিদ্র, সাধারণ মানুষ। মুখে-চোখে তাদের জয়ের আনন্দ, ঘৃণা ফুটে উঠেছে এই নারীকে দেখে!

ম্যারী মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছেন বধ্যভূমির দিকে। তখনও তাঁর গর্ব, তাঁর অভিমান এতটুকু কমেনি। বললেন :

'I am French. I was happy when you loved me.

তার কয়েকমাস আগেই ২১শে জানুয়ারী, ১৭৯৩, ষোড়শ লুইয়ের শিরশ্ছেদ করেছিল ফরাসী দেশের মানুষ। পঞ্চদশ লুইয়ের অত্যাচারী শাসন বিপ্লবের বীজ বপন করেছিল,

কিন্তু ম্যারী আঁতোয়ানেত্ত সেই বিপ্লবকে নিজের হাতে ডেকে এনে রাজপ্রাসাদ দখল করতে প্ররোচনা দিয়েছিল। তিনি জানতেন না, ইতিহাস তার পক্ষে নয়; ইতিহাসের এই ভ্রূকুটি লক্ষ্য করবার মতো বুদ্ধিও ঈশ্বর তাকে দেননি। মৃত্যুর মূল্যে তাকে এই চরম উপলব্ধি উপার্জন করতে হয়েছিল।

* * *

হতভাগ্য ষোড়শ লুইয়ের জীবনে ম্যারী আঁতোয়ানেতকে যিনি যুক্ত করে দিয়েছিলেন সেই নারীও ফ্রান্সের ইতিহাসে নাম রেখে গেছেন। তার নাম মাদাম দ্য পম্পাদুর। পঞ্চদশ লুইয়ের অন্যতমা সঙ্গিনী ছিলেন তিনি। সম্রাজ্ঞীর আসন তিনি পাননি, কিন্তু ফরাসী সম্রাটের হৃদয় তাঁর কাছে বাঁধা ছিল।

লুইয়ের চেহারায় আকর্ষণ ছিল, সে আকর্ষণে রমণীরা আকৃষ্ট হতেন। মাদাম পম্পাদুর ম্যারী আঁতোয়ানেতের মতো নির্বোধ রূপসী ছিলেন না। শিল্পের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। নামী অভিনেত্রী ছিলেন তিনি।

তাঁর শিল্পানুরাগ, অভিনয় কলার আকর্ষণে ফ্রান্সের বিশিষ্ট জ্ঞানী, গুণীরা মাদাম পম্পাদুরের গুণগ্রাহী হয়েছিলেন। রাজনীতিক বিচক্ষণতা ছিল এই নারীর সহজাত। ভের্সাইয়ের প্রাসাদে তিনি অনন্যা হয়ে বাস করতেন। পঞ্চদশ লুই তাঁর মধ্যে শুধু একজন ভোগ্যা নারীকেই পাননি, পেয়েছিলেন একজন সহচরীকে যিনি এই অস্থিরচিত্ত সম্রাটকে জটিল রাজনীতিক প্রশ্নের সমাধানে সহায়তা দিয়েছেন। ফরাসী শিল্পীরা উৎসাহ ও পোষকতা পেয়েছিলেন এই নারীর।

তার সময়ে প্যারিসের থিয়েটার ইয়োরোপে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করেছিল। ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টদের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন মাদাম দ্য পম্পাদুর। চার্চের বিরোধিতা, রাজপরিবারের কুসংস্কার সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এই বিচক্ষণা নারী এনসাইক্লোপিডিস্টদের গবেষণার মূল্য তুলে ধরেছিলেন বিদ্বৎমণ্ডলীর সামনে।

ফ্রান্সের বিখ্যাত Ecole Militaire বা সামরিক শিক্ষণ বিদ্যালয় মাদাম দ্য পম্পাদুরের অন্যতম কীর্তি। তিনিই সম্রাটকে দিয়ে সেনা-শিক্ষা স্কুল স্থাপন করিয়েছিলেন।

১৭৭০ সালে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ সালে বিদ্যালয়ের রেজিস্টার বইয়ে একজন শিক্ষার্থীর নাম নথিভুক্ত হয়েছিল। বয়স ১৫। নাম, বোনাপার্ট নেপোলিয়ন। পঞ্চদশ লুইয়ের ধিক্কৃত রাজত্বকালের মধ্যে স্মরণীয় কীর্তি যদি কিছু থাকে, তা এই 'ইকোল মিলিতেয়ার'। মাদাম দ্য পম্পাদুর যার স্রষ্টা।

ভলতেয়ার ছিলেন মাদাম পম্পাদুরের অন্যতম অনুরাগী। ম্যারী আঁতোয়ানেতের মতো তিনি সম্রাটকে বিপথে চালনার প্ররোচনা দেননি। বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। ভের্সাইয়ের সন্ধি তার অন্যতম। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অভিলাষ তার ছিল। মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে মাদাম দ্য পম্পাদুরের মৃত্যুতে ভলতেয়ার লিখেছিলেন :

মাদাম দ্য পম্পাদুরের মৃত্যুতে আমি খুবই ব্যথিত। তাঁর কাছে ঋণী ছিলাম আমি, কৃতজ্ঞতা থেকেই আমি তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করি। ভাবতে খুবই বিসদৃশ লাগে যে একজন বৃদ্ধ লেখক যাঁর চলবার ক্ষমতা

মাদাম দ্য পম্পাদুর

প্রায় নেই তিনি এখনও বেঁচে থাকবেন, আর একজন সুন্দরী রমণী তাঁর বিস্ময়কর জীবনের মাঝখানে মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে লোকান্তরিত হবেন।'It is the end of a dream'. বললেন ভলতেয়ার। মাদাম দ্য পম্পাদুরের ভূমিকা নিয়ে মত-বিরোধও ছিল। আরেকজন লেখক দিদেরোর বক্তব্যে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভলতেয়ারের কৃতজ্ঞতায় পাশাপাশি দিদেরোর এই উক্তি ইতিহাস লিখে রেখেছে : Madame de Pompadour is dead. So what remains of this woman who cost us so much in men and in money, left us without honour and without energy, and who overthrew the whole political system of Europe ?

মাদাম দ্য পম্পাদুর ইউরোপের রাজনীতিতে একটি বিতর্কিত ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বিদ্যানুরাগ ও শিল্প-চর্চার আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত।

* * *

আরেকজন নারীর কথা এখানে স্মর্তব্য যাঁর জন্য জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ নৃপতি সলোমন পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। পঞ্চদশ লুই কিংবা ষোড়শ লুই তাঁর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। এই নারী ইথিওপিয়ার রাণী সেবা। প্রজাপালিকা তিনি। আজীবন কুমারী। পুরুষের স্বপ্ন ছিল না তাঁর মনে। তাঁর রূপ আর গুণের মহিমা চারদিকে পরিব্যাপ্ত। ইথিওপিয়ার মানুষ তাঁকে জানে দেশপালিকারূপে, প্রজাদের কাছে তিনি মাতৃসমা। শুনেছিলেন তিনি জ্ঞানী সলোমনের কথা। প্যালেস্টাইনের রাজা সলোমন। দেশ-দেশান্তরে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি জ্ঞানী। রাণী সেবা গেলেন প্যালেস্টাইনে। সলোমনের দর্শনার্থী তিনি। সলোমন তৃপ্ত হলেন এই রমণীর জ্ঞানস্পৃহায়। বললেন, যতদিন খুসী আপনি থাকুন প্যালেস্টাইনে। দেখুন, শিখুন, দুহাত ভরে নিয়ে যান যা কিছু দেবার আছে আমার।

এক বৎসর রাণী সেবা ছিলেন প্যালেস্টাইনে। রাজা সলোমনের কাছ থেকে তিনি জ্ঞান আহরণ করলেন—রাজা শাসনের জ্ঞান প্রজা পালনের জ্ঞান। অভিভূত হয়ে গেছেন রাণী। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রতিভূ মনে হয় এ মানুষকে—সলোমন দি ওয়াইজ। কৃতজ্ঞতায় তাঁ মনপ্রাণ ভরে উঠল।

শিক্ষা শেষে এবার ফিরে যাবার পালা। যাবেন তিনি ইথিওপিয়ায়। প্রাজ্ঞ রাজা সলোমনের চিত্ত এতদিনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এক বৎসর ধরে এই বিনম্রা, বিচক্ষণ সুন্দরী কুমারী নারীকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন। কখনো তার হাতের ছোঁয়া তিনি পেয়েছেন, তিনি নিজেই জানেন না মনে অবচেতন কোণে তিনি এই সুন্দরী নারীর কামনা করে বসে আছেন। যাবার আগের দি রাজা সলোমন ছলনার আশ্রয় নিলেন, এ নারীকে সম্ভোগ করবার জন্য।

রাণী সেবা বিদায় নিতে এসেছেন। ফি যাবেন নিজের প্রজাপুঞ্জের কাছে। সকৃত নমস্কার নিবেদন করলেন জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ সলোমনকে। সলোমন বললেন, আর একটি দি থাকুন। আরও কিছু বলার আছে। কিন্তু করলেন না সেবা। প্রাসাদের নিভৃত ক রাজা সলোমন আর রাণী সেবা। তার কমনী বরতনুতে রূপলাবণ্য আর প্রজ্ঞা ঝলসিত হ উঠছে। সলোমনের হৃদয় চঞ্চল। অনেক কিছু উপহার দিলেন তিনি সেবাকে। নিভৃত আলাপ শেষ হলো। প্রচুর আহার্যে আপ্যায়িত করলে সেবাকে। সবার শেষে বিশ্রাম। এবারে ছলনা আশ্রয় নিলেন সলোমন। প্রতিজ্ঞা করালেন সেবাকে, প্রাসাদের কোনো কিছু তিনি আর স্পর্শ করবেন না।

সেবা রাজী হলেন। তন্দ্রার ভান করে রইলেন সলোমন। জলাধারে রয়েছে স্বচ্ছ পানীয়। সলোমনই রেখেছেন সেবাকে প্রলুব্ধ করবার জন্য। সলোমন তন্দ্রাচ্ছন্ন। রাণী সেবা হঠাৎ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলেন। সামনেই জলপাত্র। তৃষ্ণার্ত নারী জলপাত্রটি তুলে ধরলেন, পান করলেন তিনি। সে মুহূর্তে সলোমন তাকে বাধা দিলেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন রাণী। কোনো কিছু স্পর্শ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আপনি।

তৃষ্ণার্ত সেবা অনুনয় করলেন। জল পান তাঁকে করতেই হবে। সলোমন এমন আহার্য তাঁকে দিয়েছিলেন যে তিনি জল পান না করে থাকতে পারেন না। রাণী সেবা প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলেন না। তিনি জল চাইলেন। তখনও তিনি জানেন না, এটা রাজা সলোমনের ফাঁদ। নারীর রূপে তিনি বন্দী। সলোমন তাকে জল দিলেন। বিনিময়ে কুমারী রাণী সেবাকে রাজা সলোমনের অঙ্কশায়িনী হতে হলো। রূপের আকর্ষণে শুধু সাধারণ পুরুষই নয়, সলোমনের মতো প্রাজ্ঞ, বহুদর্শী নৃপতিও সেদিন চাতুর্য দিয়ে রূপবতীকে ভোগ করেছিলেন। সলোমনের পুত্রের জননী হয়ে রাণী সেবা ইথিওপিয়ায় ফিরে গিয়েছিলেন।

* * *

ইতিহাসের আর একজন রোমান্টিক বিপ্লবী পুরুষ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। এক হাতে ছিল তাঁর বিশ্ববিজয়ের তরবারি, অন্য হাতে তিনি

...রিত করে রাখতেন প্রেমাস্পদার অগুদ্রীয়ের ...। অথচ তিনিই বলতেন,

"Love is the occupation of the idle man, the distraction of the warrior, the rock of the Sovereign".

বার বার তিনি নিজের উক্তি ভুলেছেন, নারীর আকর্ষণে ধরা দিয়েছেন। জোসেফাইনকে তিনি রাণী করেছিলেন। গিলোটিনের হাত থেকে আশ্চর্যভাবে রক্ষা পাওয়া স্বামীহীনা জোসেফাইন যখন ফরাসী বাহিনীর একজন অখ্যাত জেনারেলকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিলেন তখন বিজ্ঞ উকীল রাসুইদিন মহিলাকে বাধা দিয়ে বলেছিলেন,

"What! Marry a General who has nothing but his cloak and sword You'd much better marry a contractor."

নেপোলিয়ান সম্রাট হবার পর উকীলকে ডেকে বলেছিলেন, জেনারেলকে বিয়ে করে জোসেফাইন ভুল করেনি।

জোসেফাইনকে নেপোলিয়ন শুধু সিংহাসনের রাণীই করেননি, তাঁকে তিনি হৃদয়ের রাণী করেছিলেন। জোসেফাইন এই রোমান্টিক বীরের ভালবাসা নিয়ে পুতুল খেলা করেছেন। রণাঙ্গন থেকে নেপোলিয়ন কিশোর প্রেমিকের মতো উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি লিখতেন জোসেফাইনকে। তিনি একটি চিঠিতে লিখেছেনঃ

My sole Josephine, away from you there is no more happiness, away from you the whole world is a desert wherein I stand alone. 'To live for Josephine' that sums up my life.

জোসেফাইন এই আবেগের মূল্য দিতেন কমই। প্যারিস থেকে তিনি তখন চলে গেছেন ভেরোনায়, সেখান থেকে মিলানে। নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীর এক তরুণ অফিসারের জাদুস্পর্শ লেগেছিল জোসেফাইনের চোখে। নতুন ভালবাসার কাঁপন লেগেছিল তাঁর দেহে ও মনে। নেপোলিয়নের চিঠির কোনো জবাব দিতেন না জোসেফাইন। নেপোলিয়নের অধীরতা বাড়ত। তিনি তখনও জানতে পারেননি জোসেফাইন, তাঁর হৃদয়ের রাণী জোসেফাইন অন্য হৃদয়ে আসক্তা। বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নের আকুলতা, একটি নারীর জন্য একটি হৃদয়ের উষ্ণতার একটি অন্তরঙ্গ সন্ধ্যার জন্য—ইতিহাস তার পরিচয় রেখে গেছে বোনাপার্টের হস্তাক্ষরে.

Without his Josephine, without the assurance of her love, what does the world hold for him ?

নেপোলিয়নের জীবনে দ্বিতীয় নারী ম্যারী ওয়ালেস্কা। তখন তিনি পোল্যান্ডে। ইউরোপের বিস্ময় কর্সিকার সেই অনন্য পুরুষ নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে দেখবার জন্য একটি তরুণী প্রোনিয়া শহরে কৌতূহলী চোখ নিয়ে এসেছিলেন। এই বীরপুরুষকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। নেপোলিয়ন ঘোড়া বদল করবার জন্য থেমেছিলেন সেই শহরে। ভীড়ের মধ্যে সেই সুন্দরী তরুণীকে দেখে নেপোলিয়ন আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ফেরার পথে দেখা হবে আবার। দেখা ঠিকই হয়েছিল। ওয়ারশতে। তরুণীটির নাম ম্যারী ওয়ালেস্কা। কাউন্ট ওয়ালেস্কির সহধর্মিণী তিনি। স্বামীর বয়স ৭২, স্ত্রীর বয়স ২২। মনের ভিতর ব্যবধান তৈরী হয়েই ছিল। এমন সময় এলেন নেপোলিয়ন। মুক্তির অগ্রদূত। পোল্যান্ডের স্বাধীনতার অনুরাগী ওয়ালেস্কা। নেপোলিয়নের কাছে তাঁর অনেক প্রত্যাশা। ইউরোপের ত্রাতা নেপোলিয়ন পোল্যান্ডকে মুক্তি দেবেন জার্মাণ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে। নেপোলিয়ন তাঁর মূল্য দাবী করলেন। ওয়ালেস্কাকে তিনি চান। বীরের স্বপ্ন ছিল ওয়ালেস্কার মনে, ওয়ালেস্কার স্বপ্ন লেগেছিল বীরের চোখে। নেপোলিয়ন বলতেন,

In the civil law adultery is a portentous word, in real life it is but gallantry—an episode of a masked ball.

নিজের জীবনে তিনি তার পরিচয় রেখে গেছেন।

বৃদ্ধ স্বামীকে পরিত্যাগ করলেন ওয়ালেস্কা। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সহধর্মিণী হলেন তিনি। পোলিশ তরুণীর কাছে ধরা দিলেন নেপোলিয়ন। অথচ তখনও জোসেফাইন জানতেন না ওয়ালেস্কার কথা।

নেপোলিয়নের জীবনে আরও অনেক নারীই চলচ্চিত্রের মতো ছায়া ফেলে গেছে, কিন্তু ওয়ালেস্কা তার বীর নায়ককে গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন। সাম্রাজ্যের ক্ষমতাচ্যুত নেপোলিয়ন এলবা দ্বীপে যখন আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন ওয়ালেস্কা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে হৃতমান, নির্যাতিত সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। নেপোলিয়নের জীবনে ওয়ালেস্কা হয়তো একটি ঘটনামাত্র। ওয়ালেস্কার জীবনে নেপোলিয়ন অবিস্মরণীয়। নেপোলিয়ন দেখেছিলেন তার রূপ। এই নারী পেয়েছিলেন একটি স্বপ্ন।

* * *

এ যুগেও ম্যারী আঁতোয়নেতরা রয়েছে। ক্ষমতার লিপ্সা সহজে মানুষ ত্যাগ করতে পারে না। নারীর হাতে সে ক্ষমতা হয়ে ওঠে আগুনের মতো সর্বগ্রাসী। ১৯৬৩ সালের আগস্ট। স্থান : সায়গণ। প্রজ্বলিত ইতিহাসের নতুন নায়িকার নাম মাদাম নু। জন্মসূত্রে বৌদ্ধ। ক্ষমতা লাভ করবার পর স্বামীর ধর্মে দীক্ষিত হয়ে তিনি হয়েছেন রোমান ক্যাথলিক। নিগৃহীত বৌদ্ধরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অত্যাচারী ডিক্টেটর প্রেসিডেন্ট নো দিন জিয়েমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল একে একে পাঁচজন আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে।

সারা দুনিয়া বিচলিত। জিয়েমের দুর্ভেদ্য প্রাসাদ ফ্রীডম প্যালেসেও বুঝি দুশ্চিন্তার মেঘ গিয়ে ভীড় করল। কিন্তু ধার্মিক নরনারীর আত্মদানের সকরুণ দৃশ্যের সামনে অবিচলিত রইলেন একজন নারী। তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়েমের ভ্রাতৃবধূ। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ফার্স্ট লেডী (যেহেতু প্রেসিডেন্ট অবিবাহিত)। তাঁর নাম মাদাম নু। ভিয়েৎনামের রাহু। প্রেসিডেন্ট তাঁর কুক্ষিগত। স্বামী নো দিন নু জেনারেল বটে, সুন্দরী স্ত্রীর কাছে তিনিও আত্মসমর্পিত। বৌদ্ধ নিপীড়ন বন্ধ হলো না। আত্মদানের ফলেও না। মাদাম নু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অপবাদ দিলেন, তারা কমিউনিস্টদের চর। মৃত্যুই তাঁদের একমাত্র বিধিলিপি।

পিতা ত্রান ভান চুং আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত। কন্যার অমানুষিকতায় বৃদ্ধ পিতার মন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। পদত্যাগ করলেন তিনি। কিন্তু মাদাম নু টললেন না। প্রেসিডেন্ট জিয়েম অসহায়। স্বামীর সেনাবাহিনী দিয়ে তিনি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ক্যাথলিক ধর্মের গৌরব রক্ষা করবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বৌদ্ধরা প্রাণ দিক, জ্বলে মরুক। মাদাম নু-র মনে একটুও অনুকম্পা জাগল না। ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা তিনি নেবেন না।

ম্যারী আঁতোয়নেত ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ইতিহাস তাকে নিষ্করুণ পরিণতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল। মাদাম নু ইতিহাস জানেন। তিনি দেখেছেন তার দেশেরই ইতিহাস। ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপ দরিদ্র, অভুক্ত, নাঙ্গা মানুষের বিদ্রোহে মেকং নদীর জলে ডুবে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তিনি নিশ্চয়ই ভোলেন নি দিয়েন বিয়েন ফু-র কথা।

তবু তিনি মনে করেন ইতিহাসকে তিনি বদলাবেন। বৌদ্ধদের তিনি শিক্ষা দেবেন। একদিন ভিয়েৎনামের ইতিহাস হয়তো তার উত্তর দেবে। সে ইতিহাসে একটি কলঙ্কিত নাম থাকবে, সে নাম হবে ৩৮ বৎসর বয়স্কা মাদাম ত্রাণ লে নু-র।

•

ইতিহাসে এই নারীরা ছিলেন, থাকবেন। সীমান্তস্বর্গের ইন্দ্রাণীই শুধু নন তাঁরা। তাঁরা পুরুষের ভাগ্যকে, দেশের ও জাতির ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। ইতিহাসের নেপথ্যে তাঁরা বরণীয়া, স্মরণীয়া ইন্দ্রাণী কখন বা কলঙ্কিতা নারী। কবি, শিল্পী কিংবা সম্রাট পুরুষের যে কোনো অস্তিত্বেই তাঁর উপস্থিতি ইতিহাসকে আলোড়িত করেছে। প্রকৃতি স্বরূপা ঈভের উত্তরাধিকারিণী নারী। তার জন্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে, কনকলঙ্কা পুড়ে হয়েছে ছাই, বীর সেনানীর মৃত্যু হয়েছে সকরুণভাবে। তবু, নারী রয়েছে ইন্দ্রাণীর গৌরবে। নারীর ভালবাসার জন্য পুরুষ সসাগরা পৃথিবীর অধিকার ত্যাগেও পরাঙ্মুখ হয়নি। শের আফগানের মতো হতভাগারা স্থান নিয়েছে তৃণদলের নিচে, অখ্যাত সমাধির নিভৃত গহ্বরে। আর মেহেরুন্নিসারা হয়েছেন জগতের আলো নুরজাহান। মিসেস সিম্পসন বাকিংহাম প্যালেস থেকে জনারণ্যে ডেকে এনেছেন বৃটিশ সম্রাটকে। সেযুগে ক্লিওপাত্রা যা করেছেন এ যুগেও সে ইতিহাসের ধারা বদলায়নি। পুরুষের কণ্ঠে মন্দারের মালা শুকিয়ে হয়েছে ম্লান। আর নারীর কন্ঠহার উজ্জ্বলতর হয়েছে ভালবাসার গৌরবে।

পুরুষ তখন সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়েও তার জয়ধ্বনি দিয়েছে। যেহেতু তার হৃদয়ে প্রেমের তৃষ্ণা ছিল অফুরন্ত এবং সেই তৃষ্ণার নদী ছিলেন এই নারীরা।

মান দান

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

দেয়ালের দিকে কচি আঙুল তুলে তিন বছরের ছেলে জিজ্ঞাসা করত, ও কে?

বিষ্ণুচরণ বলত, তোর মা। আর, ওই তুই, মায়ের দুধ খাচ্ছিস।

কচি ছেলেটা দুষ্টু চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত। কবে মায়ের বুকের দুধ খেত মনে নেই, কিন্তু একটু স্মৃতির মত কিছু যেন লেগে আছে। তাই ওই মস্ত ছবিটার মধ্যে মজার খোরাক পেত সে। স্তনভারের একটি তার-মুখে গোঁজা, মুখের চারভাগের তিন ভাগ ওর আড়ালে পড়ে গেছে। বুকের কাপড়ের আধখানা সরিয়ে অন্যটিও তার কচি হাতের দখলে রেখেছে। অর্থাৎ, ওটিও তারই সম্পত্তি।

অবোধ শিশুর এই কৌতূহলের আরো একটা কারণ থাকতে পারে। তিন বছর বয়সেই এই মাটিকে ত্রাসের চোখে দেখত। উঠতে বসতে কর্কশ ধমক, কিল-চড়, আছাড়-ঝাঁকানি ছাড়া আদর-টাদর বড় জোটে না। এই মা একদিন তাকে এমনি কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াতো এও হয়ত শিশু-মনের কম বিস্ময় নয়।

বিষ্ণুচরণের তখন আজকের মত ছবি বাঁধাই আর ছবি বিক্রির দোকান ছিল না। সে তখন এক নাম-করা ফোটো-স্টুডিওর খাস বেয়ারা ছিল। তার সততা কর্ম-তৎপরতা আর উপস্থিত বুদ্ধির জন্য স্টুডিওর বিদেশী-মালিক পছন্দ করত তাকে, কর্মচারী আর ফোটোগ্রাফাররাও ভালবাসত। সকলের মাথার উপর তার মাথাটা আধ হাত উঁচিয়ে থাকত বলে স্টুডিওর অনেকে তাকে ডাকত লম্বা-চরণ।

বিষ্ণুচরণের চেহারাটা ভব্যসভ্য ছিল, থাকতও বেশ পরিচ্ছন্ন। সাহেবপাড়ায় স্টুডিও, কত সাহেব-মেম হোমরাচোমরা মেয়ে-পুরুষ ছবি তোলাতে বা ক্যামেরা কিনতে আসত ঠিক নেই। এর মধ্যে মলিন বেশ-বাস নিজের চোখেই বে-খাপ্পা লাগত বিষ্ণুচরণের, তাছাড়া মালিকও অখুশি হত। জামা-কাপড় কেনা বা সে-সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বাড়তি খরচটা সে মালিকের ওপর দিয়েই পুষিয়ে নিত।

বিষ্ণুচরণের ভিতরে ভিতরে একটা সহজাত কৌতূহলের উৎস ছিল। ফোটোগ্রাফাররা কেমন করে ছবি তোলে, সুন্দর সুন্দর মেয়ে পুরুষেরা এমন হুবহু ছবির মধ্যে ধরা পড়ে কি করে— এই সব-কিছু জানার প্রতি তার বিষম ঔৎসুক্য। হেড ফোটোগ্রাফারের সঙ্গেই ছিল তার সব থেকে বেশি খাতির। ভদ্রলোক সত্যি-কারের শিল্পী ছিল বলেই বিষ্ণুচরণের কৌতূহল প্রশ্রয় পেত। বিনিময়ে বিষ্ণুচরণও তার পদমূলে অজস্র তৈল-সিঞ্চন করত, সর্বদা তোয়াজ-তোষামোদ করত তার, অসুখ-বিসুখ হলে তার বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর নিত, এমনকি সেবা-শুশ্রূষাও করত। তার কাছ থেকেই বিষ্ণুচরণ গোপনে অনেক সুন্দরী মেয়ের ছবির কপি সংগ্রহ করেছিল। আর, এই ভদ্র-লোকই তার ছবি-তোলা শেখার গুরু।

মালিকের অগোচরে এবং অনুপস্থিতিতে স্টুডিওর দরজা বন্ধ করে গোপনে তার শিক্ষার মহড়া শুরু হয়েছিল। প্রথমে সস্তা ক্যামেরায় হাত পাকিয়েছিল সে। শিক্ষা-গুরুটি ত[...] মধ্যেও বোধ করি একটা সুপ্ত শিল্পস[...] আবিষ্কার করেছিল। তার তৎপরতা, নি[...] বিবেচনা, সহজাত পরিমিতি বোধ, ইত্য[...] দেখে অনেক সময় সে অবাক হয়েছে। অব[...] সময়ে গোপনে প্রায় ঝোঁকের বশেই ক্রমশ দা[...] দামী ক্যামেরায় হাত দিতে দিয়েছে তা[...] কয়েক বছর যেতে গুরু নিজেই তাকে পরাম[র্শ] দিয়েছে, এখানে বেয়ারাগিরি না করে কো[...] ছোট-খাট ফোটোগ্রাফির দোকানে ঢুকে প[...] অনেকের থেকেই ভালো ছবি তুলতে [...] গুরুটি একাধিকবার তাকে দিয়ে ফ্ল্যাশ-বাল[...] কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরের ছবি তু[...] নিজের বলে চালিয়েও ধরা পড়েনি।
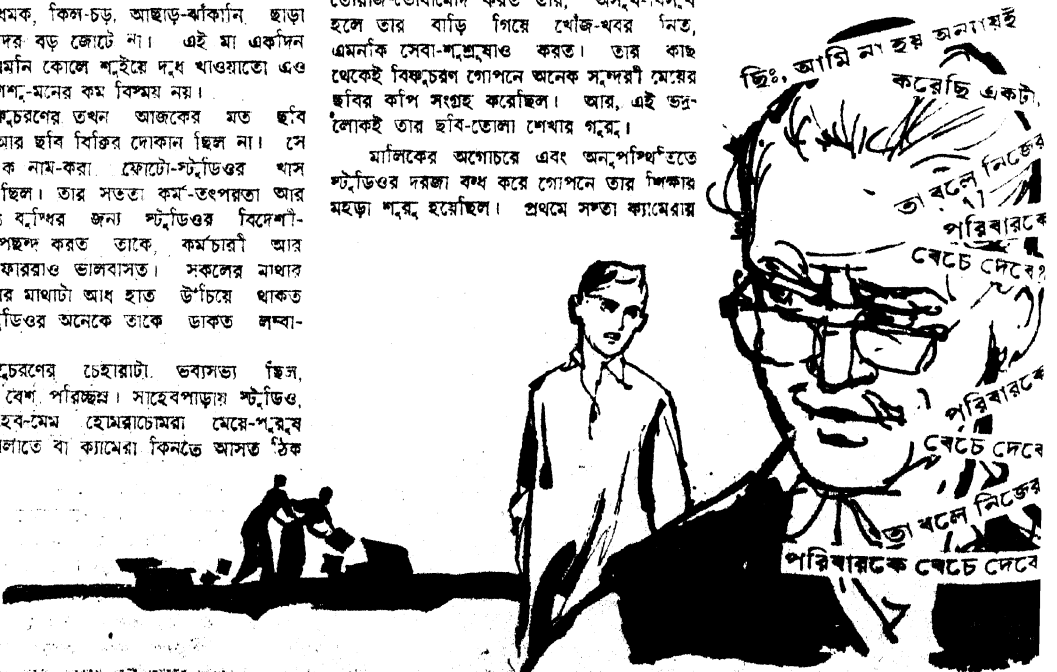
কিন্তু বিষ্ণুচরণ এতবড় স্টুডিও আর এই গুরু ছেড়ে নড়তে চায়নি। এখানে থেকে থেকে শুধু নজর হয়ে গেছে তার। ক্যামেরা প্রাণের জানস, চেষ্টা চরিত্র করে গুরুর সাহায্যে ধারে দেনায় ক্যামেরা একটা অনায়াসে কিনতে পারত। কিন্তু অতকাল আগেরও সেই দামী দামী ক্যামেরায় হাত মগ্ন হওয়ার ফলে সস্তার ক্যামেরা মনে ওঠেনি। ভগবান দিন যদি দেন কখনো, ওই দামী ক্যামেরাই একটা হবে তার।

ইতিমধ্যে বিষ্ণুচরণ বউ ঘরে এনেছিল। তাদের ঘরে বেশ সুন্দরী বউ বলতে হবে। মোটা-সোটা গোল-গাল গড়ন, ফরসা। বউয়ের রূপ দেখে গুণের দিকে তাকানোর কথা মনেও হয়নি তার। এই না তাকানোর খেদ ঘোচবার নয়। যাই হোক, বিষ্ণুচরণ বিয়ে করেছিল এবং যথাসময়ে ছেলে শম্ভুচরণের আবির্ভাব ঘটেছিল।

ছেলের যখন সাত আট মাস বয়েস, তখনই সেই অভিনব ব্যাপারটা ঘটেছিল। স্টুডিওর মালিক দিন কয়েকের জন্য বাইরে গিয়েছিল। ফলে বিষ্ণুচরণের গুরু সর্বেসর্বা তখন। সে কাকুতি-মিনতি করে ধরেছিল গুরুকে, দু-ঘণ্টার জন্য একটা ভালো ক্যামেরা দিতে হবে, দু ঘণ্টার আগেই সে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করবে—

কার ছবি তুলবি?

বিষ্ণুচরণ সলজ্জে জবাব দিয়েছে, আজ্ঞে বউ-ছেলের—

ক্যামেরা হাতে পেয়ে হাওয়ায় উড়তে উড়তে বাড়ি এসেছে। বাড়ি বলতে ব্যারাকের মত একটা একতলা দালানের দেড়খানা ঘর। আশ-পাশ ঘরের বাসিন্দারাও সব তারই মত স্বল্প-বিত্তের মানুষ।

দুপুর ভালো করে গড়ায়নি তখনো। ক্যামেরা হাতে বিষ্ণুচরণ ঘরে ঢুকে দেখে বউয়ের ওই মূর্তি। মেঝেতে বসে আছে, মুখের ঘুমের দাগ ভালো করে মিলায়নি তখনো। আদুরে গা, শাড়ির আঁচলটা বুকের একদিক ঢেকে কাঁধ জড়িয়ে আছে—অন্যদিকটা অনাবৃত। ঈষৎ ঝুঁকে ছেলের মুখে বুকের আহার জোগাচ্ছে। ছেলের মুখের বেশির ভাগ ঢাকা পড়ে গেছে, কাপড়ের তলা দিয়ে তার একটা কচি হাত আহারের দ্বিতীয় সম্পদটি আগলে আছে।

দেখা মাত্র বিষ্ণুচরণের বউকে সাজ-গোজ করিয়ে ছবি তোলার জল্পনা-কল্পনা উবে গেল। ওদিকে কুসুমবালাও এ-সময়ে লোকটাকে দেখে অবাক হয়েছে, আরো অবাক হয়েছে তার হাতের অচেনা বস্তুটা দেখে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করার আগেই বিষ্ণুচরণ গম্ভীর মুখে বলল, চুপ! কথা বোলো না। নোড়ো না। ঠিক ওমনি থাকো। কি মজা হয় এক্ষুনি দেখো।

কিছু না বুঝেই কুসুমবালা অবাক চোখে চেয়ে ছিল তার দিকে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত যেতেই মজার চোটে সে আঁতকে উঠল প্রায়। মুখের ওপর আচমকা ফ্লাশ বালব ঝলসে উঠেছে। বক্ষচ্যুত ছেলেটাও কেঁদে উঠল। কিন্তু বিষ্ণুচরণের কাজ সারা ততক্ষণে। জীবনের একটা পরম মুহূর্তকেই সে যেন ধরে ফেলেছে। দাঁত বার করে হাসতে লাগল। আর একটা ছবি তোলার কথাও মনে হল না তার। হাসতে হাসতে, উড়তে উড়তে আবার স্টুডিওর ফিরে চলল।

সব অভিনব শিল্প-সৃষ্টিই এমনি আকস্মিক কিনা বলা যায় না। যে ছবি তুলল বিষ্ণুচরণ, সমস্ত জীবনের সচেতন চেষ্টায় অমন আর দ্বিতীয়টি তুলতে পারবে কিনা ঠিক নেই। ছবি দেখে তার গুরু অবাক। ছোট ছবি বড় করা হল, তারপর আরো বড়। শেষেরটা দেড়-হাত প্রমাণ হল প্রায়। গুরু বলল, এটা আমায় দাও, স্টুডিওর শো-কেসএ রাখি—কেউ জানবে না।

বিষ্ণুচরণ রাজি হল না। ঘরের পরিবারের ছবি যে......।

রুচি আছে তার। বড় ছবিখানার ওপর স্টুডিওর সব থেকে সেরা আর্টিস্টকে ধরে-পাকড়ে রঙের কাজ করিয়ে নিল। কার ছবি বা কে তুলেছে ব্যক্ত না করে তাকে দিয়ে এই কাজ করাতে বেশ কয়েক টিন দামী সিগারেট উপঢৌকন দিতে হয়েছে। কাজে হাত দিয়ে শিল্পের টানেই যত্ন করে রঙের কাজটুকু করে দিয়েছিল শিল্পী। বিষ্ণুচরণ তখনো বাড়িতে কিছু বলেনি। দামী ফ্রেমে ছবিটা একেবারে বাঁধিয়ে কাগজে মুড়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির হল একদিন। বউ তখন রান্নায় ব্যস্ত। দেয়ালেও অনেক পেরেক লাগানই আছে।

জায়গা বেছে ছবিটা একেবারে টাঙিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ছবি দেখে কুসুমবালা প্রথমে হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর তার স্বভাবসুলভ রসনা খনখনিয়ে উঠেছিল। —এই রস করা হয়েছিল সেই দিন, অ্যাঁ! আদুর গায়ে পরিবারকে সকলের চোখের সামনে টাঙিয়ে রাখার সখ—বলি, স্বভাব-চরিত্তির কি একেবারে খেয়ে বসেছ? কি ঘেন্না কি ঘেন্না, শিগ্‌গীর নামাও বলছি ওটা, নইলে আছড়ে ভাঙব আমি—

বউয়ের বচসায় সচরাচর চুপ করেই থাকে বিষ্ণুচরণ। অসীম ধৈর্য তার, বলতে গেলে মুখ বুজেই সহ্য করে। কিন্তু কাচিৎ কখনো সহ্যের সীমা ছাড়ালে তখন একেবারে মারমুখী মূর্তি। তখন এতবড় কুঁদুলে বউও ঘাবড়ে যায়। কিন্তু এই সামান্য কথায় যে ওই মূর্তি দেখবে ভাবেনি।

বিষ্ণুচরণ ছবির দিকে দু'পা এগিয়ে গেল, তারপর বউয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক রুক্ষ কঠিন স্বরে শাসালো, ওতে হাত দিবি তো তোর ওই হাত আমি দুমড়ে ভেঙে দেব।

অতটা রাগ হলেই তুমি ছেড়ে তুই তুকারি করে।

তবু সামলাতে না পেরে কুসুমবালা অস্ফুট ঝাঁঝে বলে উঠতে যাচ্ছিল, গলায় দড়িও—

যা গলায় দড়ি তুই নিজে দে-গে যা, আমার হাড় জুড়োয় তাহলে।

দিনে দিনে তারপর ওই ছবি কুসুমবালার চোখেও সয়ে গেছে। আড়াল থেকে এক এক-সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে ছবিটা দেখতেও দেখেছে বিষ্ণুচরণ। আর, বছর তিনেক বয়েস না হতে ছেলেও ওটা চিনে ফেলেছে। ফেললেও বাপের কোলে উঠলেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, ও কে?

বিষ্ণুচরণের সংসার-সুখ বলতে কিছু ছিল না। দেখতে দেখতে একদিন সবই ছারখার হয়ে গেল। দুর্যোগ যেন হাঁ করে গিলতে এলো তাকে। গিলেই ফেলল। তাকে আর তার সাড়ে তিন বছরের ছেলে শম্ভুচরণকে। বউ জন্মের শোধ নিল।

বউয়ের বুকে বিষ ছিল। মুখে বিষ ছিল। বিষে বিষে বিষ্ণুচরণের হাড় মাস কালি। কারণে অকারণে কোনো স্ত্রীলোকের এত রাগ সে বোধহয় আর দেখেনি। হয়ত রূপের জোরে আরো একটু সচ্ছল ঘরে পড়বে এ-রকম আশা ছিল বউয়ের। তা না হলে বিষ্ণুচরণের অস্তিত্বটাই ওর চোখে এমন চক্ষুশূল হবে কেন! অবশ্য শুধু তার ওপর নয়, তপ্ত রসনার ঝাঁটা সে সকলের ওপরেই বুলোয়—ওর ভয়ে তার ঘরে একটা ফেরিঅলা পর্যন্ত আসে না।

অতি ক্ষুদ্র কারণে বিপর্যয় ঘটল একদিন। ঘটবে বলেই হয়ত বিষ্ণুচরণেরও কাঁধে শনি ভর করেছিল সেদিন।

কি কারণে তার তালা-বন্ধ ট্রাঙ্ক খুলে এক পাঁজা ছবি হাতে পেল বউ। যে ছবিগুলো সে তার গুরুর কাছে চেয়ে-চিন্তে সংগ্রহ করত। বেশির ভাগই নতুন বয়সের ছেলে-মেয়ের ছবি, বিচিত্র বেশ-বাসের অবাঙালী এবং বিদেশী মেয়ের ছবিও আছে অনেক-গুলো। স্বামীর চরিত্রহীনতার এমন জল-জ্যান্ত প্রমাণ আর বুঝি হয় না। তার ওপর বিষ্ণুচরণ ভুল করল বউয়ের হাত থেকে ছবি-গুলো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে। তার ভয়, বউ ওগুলো নষ্ট করে ফেলবে।

ব্যস, তুমুল ব্যাপার শুরু হল। গলা ছেড়ে স্বামীর গুণকীর্তন বর্ণনা করতে লাগল কুসুমবালা, চরিত্রহীন লম্পট মাতাল বলে তার-স্বরে গাল পাড়তে লাগল। আশপাশের বাসিন্দারা সব সচকিত হয়ে উঠল। তারাও কৌতূহলী হয়ে ভাবল, কুঁদুলি বউ হাতে-নাতে এমন কিছুই ধরেছে যার দরুন সাত-সকালে এই সম্ভাষণ আর এমন কুরুক্ষেত্র। তাদের উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে কুসুমবালার স্বামী-ঝাঁটানোর ক্ষিপ্ত উদ্দীপনা ক্রমশ চড়তেই লাগল।

কতক্ষণ সহ্য করেছিল বিষ্ণুচরণ জানে না। উঠল হঠাৎ। মাথার মধ্যে দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে।

হাতের পাঁচটা আঙুল আচমকা সাঁড়াশীর মত বউয়ের গলায় বসে গেল। ঠেলতে ঠেলতে তাকে খুপরি ঘরটার মধ্যে নিয়ে ঢোকালো। বউয়ের দম বন্ধ, হাত ছাড়ানোর বিফল চেষ্টা—মুখ লাল।

বিষ্ণুচরণ এক ধাক্কায় দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল তাকে। দেয়ালের সঙ্গে লাগল ঠাস করে। বলল, ফের গলা খুলবি তো ওই গলা আমি চিরকালের জন্য বন্ধ করে দেব।

বউ গলা আর খোলেনি। বিষ্ণুচরণ জামা গায়ে চড়িয়ে তক্ষুনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

রাগ পড়তে ফিরল ঘণ্টাখানেক বাদে। কাজে বেরুতে দেরি হয়েই গেছে, চানটা করে না খেয়েই ছুটতে হবে।

বাড়ির কাছে এসে হতভম্ব। লোকে লোকারণ্য। চিৎকার চেঁচামিচি। একটা অজ্ঞাত ভয় বিদ্যুতের মত আঘাত করল তাকে। তারপরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এলো।

সেই খুপরি ঘরের দরজা ভেঙে কুসুম-বালাকে বার করতে হয়েছে। কুসুমবালাকে নয়, বীভৎস দগ্ধ একটা নারী দেহকে। সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দিয়েছে

কুসুমবালা। তখনো প্রাণ আছে, তখনো আর্ত-যাতনায় প্রাণান্তকর ছটফট করছে।

হাসপাতালে দু'দিন বেঁচে ছিল। বেহুঁস অবস্থায় ভুল বকেছে—এই পরিণামের সমস্ত আক্রোশ সে স্বামীর মাথায় ঢেলে দিয়ে গেছে।

বিষ্ণুচরণের চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়েনি। কাঁদার অবকাশও সে পায়নি। একটা মৃত্যু তাকেও নিঃসীম মৃত্যুর দিকেই টেনেছে। পুলিসের টানা-হেঁচড়ায় একটানা দেড়মাস দেহের রক্ত শুকিয়েছে, রাতের ঘুম গেছে। দুধের ছেলেটাকে পাশের ঘরের একজন আশ্রয় দিয়েছে বটে, কিন্তু তার কান্না সে-যেন কোর্ট আর থানায় দাঁড়িয়েও শুনেছে।

দেড় মাস বাদে মুক্তি পেল। মুক্তির বোঝা টেনে টেনে কোন রকমে বাড়ি এলো। প্রথমেই চোখে পড়ল দেয়ালে টাঙ্গানো কুসুমবালার সেই মস্ত বাঁধানো ছবিটা। একটানে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলো সেটা। আছড়ে ভাঙতে গিয়েও ভাঙতে পারল না। ওটা শুধু কুসুমবালাই নয়, তারও ভিতরের একটা সৃষ্টি। কিন্তু ছবিটার দিকে আর তাকাতে পারল না, যে আগুনে কুসুমবালা মরেছে, তার থেকে বেশি আগুন ওর বুকে সে জেবলে রেখে গেছে।

ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা একটা বড় কাগজে প্যাক করে ঘরের কোণে চোখের আড়ালে রেখে দিল। পরে ঘর থেকে সরাবে। দেয়ালের গায়ে চৌকো কালো দাগ পড়ে আছে একটা। গামছা ভিজিয়ে ঘষে ঘষে দাগটা তুলে ফেলল। তারপর জেলে শম্ভুচরণকে নিয়ে এলো।

গোড়ায় গোড়ায় ছেলে কয়েকদিন আঙুল দিয়ে শূন্য দেয়ালটা দেখিয়ে ছবির খোঁজ করেছে, তারপর ভুলে গেছে।

দুর্যোগ একা আসে না। আসেওনি। স্টুডিওতে গিয়ে শোনে তার ফোটোগ্রাফার গুরু বড় কাজ নিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেছে। সেই সুযোগে ঈর্ষা যারা করত তারা মালিককে জানিয়েছে, প্রশ্রয় পেয়ে বিষ্ণুচরণ কি-ভাবে দামী দামী ক্যামেরা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করত। ফলে মালিকও আর তাকে নেয়নি।

দুই-একটা ছোটখাটো দোকানে বিষ্ণুচরণ ফোটোগ্রাফার হতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে দেখল, মূর্খ হয়েও ভিতরের আগ্রহের তাড়নায় যেটুকু শিখেছিল, পেশাদারীর পরীক্ষায় তার সবটাই অচল। কাঁপা হাতে দুই-একটা ছবি যা তুলেছে, তারপর আর কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নিজেই দাঁড়ায়নি।

প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে তারপর।

বড় রাস্তার ফুটপাথের গা-ঘেঁষা ছবি-বাঁধাই আর ছবি বিক্রির দোকান বিষ্ণুচরণের। আগে ফুটপাথে ঘুরে আর বসেই ছবি, রঙিন ক্যালেন্ডার, ম্যাপ ইত্যাদি বিক্রি করত। তারপর দেড়-হাত প্রমাণ বসার জায়গা পেয়েছিল একটা, সেখেই ছবি বাঁধাইয়ের কাজ শুরু করেছিল।

এখন মাঝারি সাইজের দোকান-ঘর হয়েছে একটা। ঘর ভরতি ছবি ঠাসা—ছবির ছোটখাট গুদাম একটা। সারি সারি তাকে থাকে-থাকে ছবি—আর এত ছবি টাঙানো যে দেয়ালে দেখা যায় না। দেশ-বিদেশের মনীষীদের ছবি, রাজ-পুরুষদের ছবি, রাজনীতিজ্ঞদের ছবি, ধর্মাত্মাদের ছবি, পৌরাণিক ছবি, যৌবনোজ্জ্বল চিত্র তারকাদের ছবি, দেব-দেবীর ছবি, স্বর্গের ছবি, নরকের ছবি, কল্পিত যৌবনা-ভিসারিকাদের ছবি—নেই এমন ছবি নেই।

ছবি বাঁধাইয়ের জন্য স্বল্প বেতনে কারি-গর রাখতে হয়েছে একজন। সারাক্ষণ মুখ গুঁজে বসে সে ছবির মাপে ফ্রেম ঠিক করে, বোর্ড কাটে, কাচ কাটে, হাতুড়ী দিয়ে ঠুক ঠুক করে। অবকাশ সময়ে ছেলে শম্ভুচরণ নিজেও ছবি বাঁধে—বাঁধাইয়ের কাজ সেও শিখেছে।

সম্প্রতি বাপ আর ছেলের একটাই বাসনা সর্বদা বুকের তলায় শিখার মত জ্বলছে। পাশের চিলতে খুপরিটা খালি হয়েছে, সেটা পেয়ে গেলে দোকানটা মনের মত করে সাজানো চলে। এই স্বল্প পরিসরে খদ্দের নড়তে চড়তে পারে না, অনেক খদ্দের ফিরেও যায়। ওই জায়গাটুকুর মালিকের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে হন্যে হয়েছে বাপ-ছেলে। ওই চিলতে খুপরির জন্য সাড়ে সাতশ টাকা সেলামী হেঁকে বসে আছে সে—এক কপর্দক নামবে না। কায়ক্লেশে ঘরের জিনিস বেচে সাড়ে তিনশ টাকা সংগ্রহ করে তার হাতে-পায়ে ধরেছে বিষ্ণুচরণ—বাকি টাকাটা মাসে মাসে ভাড়ার সঙ্গে মিটিয়ে দেবে কথা দিয়েছে। কিন্তু মালিক কর্ণপাতও করেনি।

বাকি চারশ টাকা ধার পাবারও অনেক চেষ্টা করেছে বাপ-ছেলে মিলে, কিন্তু তাদের ধার দেবে কে?

তবু বিষ্ণুচরণ আশা ছাড়েনি এখনো, মালিকের আড়ালে অশ্লীল কটু-কাটব্য করে। তার এই মস্ত ঢ্যাঙা শুকনো পাকানো দেহের কোথাও কমনীয়তার লেশমাত্র নেই। ছেলেকেই শুনিয়ে বলে, ওটা না পেলে শালাকে খুন করব আমি।

শম্ভুচরণের বয়স এখন তেইশ। বাপের মত লম্বা নয় আদৌ, সুশ্রী সভ্যভব্য। তার ওপর অনেক মেহনত করে আর দোকানে খেটেও তৃতীয় বিভাগে একটা পাস দিয়েছে। অর্থাৎ রীতিমত শিক্ষিত সে। ফলে বাপের সঙ্গে আদৌ বনে না তার। এক ধরনের সততার আদর্শ কেমন করে যে ছেলের ভিতরে দানা বেঁধেছে সেটা আশ্চর্য। ওদিকে বাপ ঠিক উলটো। সততার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মুখের দিকে তাকিয়েই খদ্দেরের মন আর পকেট ওজন করতে পারে যেন। সুবিধে বুঝে দরও হাঁকে, খদ্দের চালাক না হলে রাতকে দিন বানায়, নকলকে মৌলিক বলে চালায়। অল্পবয়সী মেয়েরা আসে ছবি কিনতে, সভ্য-ভব্য ছেলের দিকে আড়ে আড়ে তাকায় বিষ্ণুচরণ। ছেলে সবিনয়ে দর বলার আগেই একটা দর হেঁকে বসে সে—বলে ওই ছবির ওই দাম মায়েরা—বাজার ঘুরে দেখে আসুন, তফাৎ বুঝবেন। তারপরই সেই ছবির প্রসঙ্গে মিথ্যে আজগুবি গল্প ফেঁদে বসে। শম্ভুচরণ অস্বস্তি বোধ করে।

শুধু এই নয়। খদ্দের বুঝে নিরিবিলিতে গুদোমের কোণা-খুপচি থেকে এমন সব ছবি বার করে বাবা, যা দেখলে শম্ভুচরণের কান লাল হয়। অশ্লীল নগ্ন ছবি। কোথা থেকে যে এসব সংগ্রহ করে ভেবে পায় না। আর এই সব ছবিই চড়া দামে বিকোয়। এক একটার অবিশ্বাস্য দামও মেলে। এই সব কারণে, ছেলে কোনদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখেনি বাপকে।

সেদিন এই বাপ-ছেলের বিধাতা একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন বোধ হয়। নইলে এ রকম হবে কেন!

রাত ন'টা বাজে। দোকান বন্ধ করার উদ্যোগ করছিল তারা। পাঁচ ছ'টি বিদেশী শ্বেতাঙ্গ খদ্দের এসে ঢুকল। বয়েস কারো বেশি নয়। শাঁসালো ট্যুরিস্ট সম্ভবত। খাঁটি দেশীয় নিদর্শন সংগ্রহের আশায় এসেছে। দুই এক-জনের মুখ থেকে মদের গন্ধ নাকে আসছে।

বিষ্ণুচরণ লাফিয়ে উঠল, আইয়ে আইয়ে সাব—

এদের থেকে প্রিয় আর বোধ হয় কেউ নয় বিষ্ণুচরণের। গেল যুদ্ধে এদের মত দিলদরিয়া খদ্দেরের কল্যাণেই তার দোকান ঘর হয়েছে।

তারা মিটি মিটি হাসে আর ছবি দেখে। লাস্যময়ী অপ্সরা থেকে হাস্যময়ী চিত্রতারকা কারো ছবিই পছন্দ হয় না তাদের। মাথা নাড়ে আর বলে, দিশি জিনিস দেখাও।

এবারে গোপন সংগ্রহের দিকে হাত দিল বিষ্ণুচরণ। নির্ভেজাল জিনিসই বার করল। একটা চোখে লাগাতে পারলে দর যা হাঁকবে সে-ই জানে। ঘাড় বাঁকিয়ে সেই সব ছবির দিকে তাকিয়ে শম্ভুচরণের মুখ লাল। কুৎসিত ছবি।

কিন্তু যে দেশের লোক এই খদ্দেররা তাদের চোখে এ সব ছবি কিছুই নয়। তা ছাড়া এ জিনিসও ঠিক চায় না তারা।

বিষ্ণুচরণের রোখ চেপেছে। কয়েকটা অর্ধ-নগ্ন আদিবাসীর বড় ছবি শিল্পী দিয়ে আঁকিয়ে এবং বাঁধিয়ে কোনো এক থাকে লুকিয়ে রেখে ছিল। খুঁজে খুঁজে একটা বড় ফ্রেম টেনে বার করল, একটানে ওপরের কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

তার পরেই তড়িৎস্পৃষ্টের মত কাঠ একে-বারে। বিমূঢ়, হতভম্ব।

শ্বেতাঙ্গ খদ্দেররা বাঁধানো ছবিটা তার হাত থেকে টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের চোখে-মুখে আগ্রহ দেখা গেল। এই ধরনের দিশি জিনিসই তারা চেয়েছিল যেন। ফ্রেমের ওপরে কিছু ধুলো জমেছিল, নিজেরাই রুমালে করে মুছে নিল। ছবির তাজা রঙ ফুটে বেরুলো। ওটা হাতে হাতে ঘুরল তাদের। ভারী পছন্দ হয়েছে। খাঁটি দিশি জিনিস—আদুরে গায়ে শাড়ি জড়িয়ে সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহস্থ বধূ বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে ছেলেকে—কচি শিশুর অন্য হাতে খাদ্য আগলানো দেখেও খুশিতে আটখানা তারা।

একজন জিজ্ঞাসা করল, দাম কত।

অনুভূতিশূন্য মূর্তির মত ছবিটা হাতে নিল বিষ্ণুচরণ। দেখল। ফ্রেমটায় ছাতা পড়েছে শুধু, নইলে এতকাল আগের ছবি ঠিক তেমনি জীবন্ত এখনো। বিমূঢ় নেত্রে ছেলের দিকে তাকালো একবার, ছেলেও বাপের হঠাৎ এই মূর্তি দেখে অবাক হয়েছে।

বিষ্ণুচরণ দেখছে। বউ চেয়ে আছে তার দিকে। তার চোখে যেন ভৎর্সনা। সে-যেন ফিস ফিস করে বলছে, ছিঃ, আমি না-হয় অন্যায়ই করেছি একটা, তা বলে নিজের পরিবারকে বেচে দেবে?

ক্রেতারা অসহিষ্ণু হচ্ছে। বিষ্ণুচরণ একটা উন্মত্ত অনুভূতি সামলে নিয়ে বিড়বিড় করে জানালো, এ ছবি বিক্রির না।

যুদ্ধে গোপন খবরের কারবারী

হিমানীশ গোস্বামী

"আপনি যখন অ্যামেরিকা গিয়েছিলেন ..." শেলেনবার্গ বাধা দিলেন। তিনি বললেন, "আপনারা আমার কাছ থেকে সত্যি কথাই শুনুন, আমি জীবনে অ্যামেরিকায় যাইনি!"

অ্যামেরিকান অফিসার শেলেনবার্গকে জেরা করছিলেন, যুদ্ধের পর। শেলেনবার্গ যথাসাধ্য উত্তর দিচ্ছিলেন। শেলেনবার্গ হিটলারী রাজত্বে গুপ্তচর বিভাগের একজন বেশ উঁচু দরের লোক। যুদ্ধের পর বহু নাৎসীর যখন নুরেনবার্গে বিচার হয় তখন বন্দীদের মধ্যে শেলেনবার্গ ছিলেন অন্যতম। কিন্তু এই শেলেনবার্গের অনেক কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করলেও তিনি কখনো অ্যামেরিকা যাননি একথা অ্যামেরিকান অফিসারটি মানতে রাজি হলেন না। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "আপনি কখনো অ্যামেরিকা যাননি?"

"কখনো না।"

"বাজে কথা বলবেন না।"

"আমি বাজে কথা মোটেই বলছি না।"

"বলছেন।"

শেলেনবার্গ বললেন, "আমি গিয়েছি তার কোনো প্রমাণ আছে?"

"আলবৎ আছে। এই সেই প্রমাণ।"

অ্যামেরিকান অফিসার একটি পাসপোর্ট বার করলেন তাঁর পকেট থেকে। এই পাসপোর্টটি শেলেনবার্গের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। পাসপোর্টটি শেলেনবার্গেরই। শেলেনবার্গের ছবি, নাম সই, হেলথ সার্টিফিকেট, ল্যান্ডিং-এর ছাপ।

শেলেনবার্গ প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও একটু পরেই তাঁর মনে পড়ল। তিনি যখন গুপ্তচর বিভাগের একজন হর্তাকর্তা ছিলেন তখন তাঁদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট জাল পাসপোর্ট তৈরি করার কাজে লাগে। তাদের তৈরী প্রথম পাসপোর্টটি তারা শেলেনবার্গের নামে করে, এবং শেলেনবার্গের জন্মদিনে তাঁকে উপহার দেয়। শেলেনবার্গ তাই বললেন, কিন্তু অ্যামেরিকানদের সে কথা বিশ্বাস হল না।

সুন্দর নিখুঁত পাসপোর্ট, আসলের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। বেশ কয়েকদিন কেটে গেল খোঁজাখুঁজিতে। তারপর প্রমাণ হল শেলেনবার্গ সত্যি কথাই বলেছিলেন।

* * *

যাঁরা গুপ্তচর বিভাগে কাজ করেন তাঁদের কাজ কি হবে তা বলা যায়— কিন্তু কিভাবে হবে তা আগে থাকতে বলা সম্ভব নয়। যেন-তেন-প্রকারেন শত্রুদেশ থেকে খবর পাঠাতে হবে। কারণ বহু শতাব্দী থেকে একথাটা সকলেই বুঝেছেন যে, যুদ্ধে জিততে গেলে কেবল লোকজন কামান বন্দুক এবং অস্ত্রশস্ত্রই প্রয়োজন তা নয়, এর সঙ্গে প্রয়োজন শত্রু সম্পর্কে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা।

কিন্তু সংবাদ তো হাজার রকমের হতে পারে, কোন্ খবরটি প্রয়োজন?

বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ ধরনের সংবাদের গুরুত্ব হয়। শান্তির সময় যদি দেখা যায় কোনো রাষ্ট্র প্রচুর পেট্রল মজুত করছে—প্রচুর রবার সংগ্রহ করছে তখন সে সংবাদ অন্য রাষ্ট্রের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যুদ্ধে যে জিনিসের সবিশেষ প্রয়োজন সে জিনিষ কেউ সংগ্রহ করবার খবর স্বভাবতঃই সে রাষ্ট্র গোপন রাখবার চেষ্টা করে। যতক্ষণ গোপন রাখা যায় ততক্ষণই লাভ। তাই, গুপ্তচরদের কাজ হচ্ছে কেবল খবর সংগ্রহ নয়, তাড়াতাড়ি খবর সংগ্রহ করা।

ধরা যাক দুই জমিদারী পাশাপাশি। একজন বিশ্বস্ত লোক এসে খবর দিল পাশের জমিদার দেড়শো লাঠিয়াল যোগাড় করেছে। সংবাদটি খুব প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান। এর কি অর্থ তা অন্য জমিদার জানে। সেও তক্ষুণি নিজেদের লাঠিয়ালগুলিকে জমায়েত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হয়ত লাঠালাঠি মোটেই হয় না—হলেও এক দলকে সম্পূর্ণভাবে হয়ত

লোকটা দাঁও মারতে চায় ভেবে একবারেই চড়া দাম হাঁকল একজন।

বিক্কুচরণ মাথা নাড়ল।

তারা আরো দাম বাড়ালো। আরো।

বিক্কুচরণ মাথা নাড়ল।

আরো খানিকটা দামাদামি করে তারা রাগতভাবে হুড়মুড় করে নেমে গিয়েও তখুনি আবার ফিরে এলো। যে লোক বেশি মদ খেয়েছিল সে বিক্কুচরণের মুখের সামনে ধবধবে পাঁচটা আঙ্গুল তুলে বলল, দেখো পাঁচশ রুপেয়া দেগা, উইল ইউ সেল্?

বিক্কুচরণের মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখের সামনে তার বড় দোকান ভাসছে—পাশের চিলতে খুপরি পেয়েছে। শুধু তার চোখে নয়, ছেলের চোখেও তাই ভাসছে।

ছিঃ, আমি না হয় অন্যায়ই করেছি একটা, তা বলে নিজের পরিবারকে বেচে দেবে?

বিক্কুচরণ মাথা নাড়ল। হঠাৎ রেগে গিয়ে জোরেই ঝাঁঝিয়ে উঠল, এ ছবি বিক্রির নয়!

তারা চলে গেল। ছেলে বিমূঢ় বিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে। এক ঝটকায় ছবিটা হাতে নিয়েই বিক্কুচরণ দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

দোকান বন্ধ করে শম্ভুচরণ ঘরে ফিরল। দেখল ছবিটা দেয়ালে টাঙিয়ে বাপ তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। ছেলেও ভিতরে এসে দাঁড়াল। পিছন থেকে দেখল ছবিটা। গোটা মুখ থমথমে গম্ভীর।

তেইশ বছরের ছেলে জিজ্ঞাসা করল, ও কে?

বিক্কুচরণ আস্তে আস্তে ফিরল তার দিকে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক করছে। বলল, তোর মা। আর, ওই তুই...মায়ের দুধ খাচ্ছিস।

দুজনেই নির্বাক।

ছেলের থেকে বাপ অনেক লম্বা। মুখ তুলে মুখ দেখতে হয়। আজ এই বাপের মাথাটাই হঠাৎ এত উঁচুতে মনে হল শম্ভুচরণের যে ঘাড় উঁচিয়েও ভালো করে দেখা যায় না।

পরাজিত হতে হয় না। কিন্তু ফলাফল যাই হক, শত্রুর গতিবিধি আগে জানার প্রয়োজনীয়তা আধুনিক সমস্ত রাষ্ট্রই স্বীকার করেন এবং একথা সবাই জানে যে, বড় বড় সমস্ত রাষ্ট্রেরই গুপ্তচর বিভাগ রয়েছে।

যুদ্ধের সময় গুপ্তচরের শাস্তি চরম। প্রাণদণ্ড। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাজার হাজার লোক আজ এই বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত। শান্তির সময়েও গুপ্তচরদের কম শাস্তি হয় না। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে যে রাষ্ট্রের হয়ে তারা কাজ করে, ধরা পড়লে সে রাষ্ট্র বেমালুম তার দায়িত্ব অস্বীকার করে বসে। সব সময় অবশ্য তা সম্ভব হয় না। ইউ-টু বিমানের ঘটনায় স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, রাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া অমন কর্ম করা অসম্ভব। সব দেশই জানে অন্য দেশ তাদের দেশে গোয়েন্দাগিরি করছে এবং কতভাবে সে খবর পাঠাচ্ছে।

সাধারণত খবর পাঠানোর জন্য একটি তৃতীয় রাষ্ট্রের ব্যবহার হয়ে থাকে। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিই। ভারতবর্ষ থেকে যদি চীন দেশে চিঠি পাঠাতে হয় তাহলে সে চিঠিতে চীন দেশের ঠিকানা লেখা থাকলে সে চিঠি ধরা পড়বার আশঙ্কা। অতএব শোনা যায় যে খবরাখবর আদানপ্রদান চলে ইংল্যান্ড বা সুইজারল্যান্ডের মারফৎ। এ সব ব্যাপার জেনেও কিছু প্রায় করা সম্ভব হয় না। কারণ কেবল এভাবে আদানপ্রদান নয়—ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ নামক একটি ব্যাগ যখন এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে পাঠানো হয় তখন আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে সে ব্যাগ খোলা অশিষ্টাচার। অতএব ক্যানাডা থেকে যখন পরমাণু সংক্রান্ত গোপন দলিল রাশিয়াতে এই ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ মারফৎ চালান গেল তখন ক্যানাডার গুপ্তচর বিভাগ তা জেনেও খুলতে পারেনি সে ব্যাগ।

চোরেরা নিজেদের মধ্যে যেমন কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে তেমনি রাষ্ট্রগুলিও এমনি কতকগুলি নিয়ম সৃষ্টি করেছে।

শেলেনবার্গের পাসপোর্টের ব্যাপারে বোঝা গেল জালিয়াতি কত নিখুঁত হতে পারে। কিন্তু গুপ্তচরদের কাজের জন্য পাসপোর্ট জাল অতি সামান্য ঘটনা। যুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডের অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলবার জন্য কোটি কোটি পাউন্ড নোট ছাপানো হয়। জার্মানরা এই কাজটি করে। সে পাউন্ড নোটের সঙ্গে আসল পাউন্ড নোটের বিন্দুমাত্র পার্থক্য ছিল না, কিন্তু কোনো কারণে ইংল্যান্ডে অ্যারোপ্লেনের সাহায্যে বোমার পরিবর্তে পাউন্ড বৃষ্টি করা হয়নি। যদি করা হত তাহলে দেশে বেশ খানিক অরাজকতার সৃষ্টি হতে পারত।

জালিয়াতি, খুন, মারধর, লোককে ধরে আনা, বন্ধুত্ব করা এ সমস্তই গুপ্তচরদের কাজ। অর্থাৎ সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে আইনী এবং বেআইনী যতরকম উপায় মাথা খাটিয়ে বার করা যায় তার প্রত্যেকটিকে কাজে লাগাতে হয় বা কাজে লাগানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। সমস্ত রকম জাতের লোক এবং সমস্ত রকম ব্যবসার লোক গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছে। তারা গুপ্তচর হিসেবে যে রোজই খবর পাঠায় তা নয়, বা পাঠাতে হয় তাও নয়। একজন লোক গুপ্তচর হিসেবে বছরের পর বছর থাকতে পারে—একটিও খবর না পাঠিয়ে। এমন কি সমস্ত জীবন ধরেও একজন লোক অন্য রাষ্ট্রের গুপ্তচর হয়ে থাকতে পারে, মাইনে নিতে পারে, কিন্তু হয়ত যে বিশেষ সংবাদের জন্য তাকে রাখা হয়েছে সে বিশেষ সংবাদ তার জানাতে নাও হতে পারে।

অর্থাৎ কোনো দেশের সঙ্গে যুদ্ধ বাধতে পারে মনে করে সে দেশে গুপ্তচর নিযুক্ত করা হল। যুদ্ধ বাধল না এমন ঘটনাও হতে পারে। তখন সেই গুপ্তচরটির প্রায় কোন কাজই থাকে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক রাষ্ট্র সমস্ত দেশেই গুপ্তচর রাখেন বা রাখবার প্রয়োজন হয়। এ এক রকমের টিকের মত। অসুখ হতে পারে মনে করে টিকে দিয়ে রাখা গেল, সে অসুখ হবার সম্ভাবনা যত কমই থাক।

আলফ্রেড বেরিং-এর কথা ধরা যাক।

জাতে জার্মান। প্রথম মহাযুদ্ধে ছিলেন জার্মান নৌবাহিনীতে। শান্তির সময় তাকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি ঘড়ির সেলসম্যান হিসেবে নানা দেশে ভ্রমণ করেন। অবশেষে স্থির করা হয় ঘড়ির দোকান তাকে খুলতে হবে স্কটল্যান্ডের স্কাপা ফ্লোর কাছে। সেখানে বৃটিশ নৌঘাটি আছে।

১৯২৭ সালের কথা। আলফ্রেড বেরিং প্রথমে চললেন সুইজারল্যান্ড-এ। সেখানে শিখলেন ঘড়ির কাজ। নিখুঁতভাবে তা তাকে শিখতে হল। কারণ এর পর তাকে ঘড়ির কাজই করতে হবে। এখানে কোনো ফাঁকি চলবে না।

তারপর চললেন বৃটেনে। ১৯২৭ সালে। কিন্তু এখন তিনি আর জার্মান নন। তার পাসপোর্ট সুইজারল্যান্ডের—নামও বদলে গিয়েছে। নাম হল আলফ্রেড এরটেল।

ইংল্যান্ডে গেলেন। পাকা চার বছর কেটে গেল। অবশেষে তিনি আবেদন করলেন বৃটিশ নাগরিক হবার জন্য। অনুমতি মিলে গেল। ১৯৩২ সাল। তখনো আলফ্রেডের একটি সংবাদ পাঠাতে হয়নি। মাইনে ঠিক মতই পেয়ে যাচ্ছেন যদিও।

যুদ্ধ বাধল ১৯৩৯ সালে বৃটেনের সঙ্গে জার্মানীর। আলফ্রেডকে এতদিনে কাজে লাগানো সম্ভব হল। আলফ্রেড নিয়মিত সংবাদ পাঠাতে লাগলেন বৃটিশ নৌবহর সম্পর্কে। কেউ বুঝতে পারল না এই শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকটি গোপনে খবর পাঠাচ্ছেন জার্মান প্রভুদের কাছে।

একদিন আলফ্রেড একটি মারাত্মক খবর সংগ্রহ করলেন। স্কাপাফ্লোতে যাবার পথে কোনো সাবমেরিন বিধ্বংসী জাল পাতা নেই। খবরটা জার্মানীতে পৌঁছুনো মাত্র একটি জার্মান সাবমেরিনের উপর হুকুম এল স্কাপাফ্লোর বৃটিশ নৌবাহিনীর কাছে গিয়ে যে কোনো জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে।

যে জাহাজকে টর্পেডোর পর টর্পেডো গিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে আঘাত করল সে জাহাজের নাম রয়্যাল ওক। বৃটিশ নৌবাহিনীর গৌরবের জিনিস। বৃটিশরা হকচকিয়ে গেল। তারা ভাবতে ভাবতেই জার্মান সাবমেরিন পলাতক। পোনের মিনিটে অতবড় জাহাজটা ডুবে গেল। কিন্তু ঐ জাহাজটি ডোবানোর জন্য পোনের বছর ধরে চেষ্টা করা হয়েছে। একদিনের কাজ নয়।

গুপ্তচর বিভাগও একদিনে গড়ে ওঠে না।

পৃথিবীর ভাল কোনো গুপ্তচর বিভাগের ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যাবে কত পরিশ্রম কত শক্তি ব্যয় হয় একটি সত্যিকারের ভাল গুপ্তচরবাহিনীকে গড়ে তুলতে। কিন্তু গুপ্তচর সংস্থার ইতিহাস জানা খুব সহজ নয়। এর কার্যকলাপ এমন গুপ্তভাবে রাখা হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

* * *

কিন্তু অতীতের কাহিনী জানা তত শক্ত নয়। বিশেষ করে পরাজিত দেশের গুপ্তচর বাহিনীর ইতিহাস জানা অপেক্ষাকৃত সহজ। গত যুদ্ধের সময় জার্মানরা কেমনভাবে গুপ্তচরগিরি করত তার ইতিহাস আমাদের কাছে এখন অজানা নয়। নানা কাগজপত্রের মধ্যে শেলেনবার্গের স্মৃতিকথা বইখানা একটি অতি মূল্যবান বই হিসেবে স্বীকৃত। শেলেনবার্গ তার দেশের গুপ্তচর বিভাগ কেমন করে চলত তার একটা যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। তার সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন গুপ্তচর বাহিনী গড়তে গেলে কি কি জিনিসের প্রয়োজন হয়। তিনি লিখেছেন :

'আমার মতে গুপ্তচর বিভাগে প্রথম প্রয়োজন প্রচুর কুশলী টেকনিশিয়ানের। আমার পক্ষে এমন লোক যোগাড় করা কঠিন হয়নি, কারণ যুদ্ধের সময়কার শ্রম আইন অনুসারে আমরা যাকে ইচ্ছে আমাদের কাজে লাগাতে পারতাম। আমি সমস্ত জায়গা থেকে শ্রেষ্ঠ লোককে আমাদের কাজে লাগাতে সুরু করলাম। কেউ ছিলেন অধ্যাপক, কেউ বা কুশলী যন্ত্রী।'

... তারপরেই তিনি বলছেন যে, বাইরের দেশ থেকে খবর পাঠানোটাই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা। তিনি বলছেন :

"বহু গুপ্তচর মধ্যস্থ একজনকে ঘটনা বলেন, অথবা লিখে কোনো চরের সাহায্যে সে চিঠি পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এ দুটি উপায়েই বেশ খানিক সময় নষ্ট হয়। এই সময় নষ্ট হবার ফলে অনেক সময়েই সংবাদের মূল্য কমে যায়—অনেক সময় কোনো মূল্যই থাকে না। এছাড়া চরের সাহায্যে মুখে মুখে খবর পাঠানোর মধ্যে বিপদও রয়েছে। সে কি বুঝবে তার ঠিক নেই কি বলতে কি বলে বসবে তাই বা কে জানে। আর লিখে পাঠানোর বিপদ তো অনুমানই করা যায়। ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাগ বা কাগজপত্র খানাতল্লাস করবার অধিকার বহু

দেশের সীমান্তরক্ষীদের রয়েছে, অতএব চরের সাহায্যে কাগজ পাঠালে তার বিপদ অনেকখানি যে তা অনস্বীকার্য। তাই আমাদের কাজের জন্য ক্রমাগত বেতারের প্রাধান্য হতে থাকে। কেবল আমাদের নয়, সব দেশের গুপ্তচরেরাই রেডিওর সাহায্য একটু বেশী পরিমাণেই নিয়ে থাকে।

'কিন্তু বেতারে সংবাদ পাঠানোর বিপদ এই যে ইচ্ছে করলে কোন জায়গা থেকে সংবাদ পাঠানো হচ্ছে তা জানা যায়। ফলে সংবাদ যারা পাঠায় তাদের ধরাপড়ার সম্ভাবনা থাকে ষোল আনা। আমরা আমাদের শত্রুদের বহু বেতার ট্রান্সমিটার ধরেছিলাম, কিন্তু সব সময় শত্রুদের জানতেই দেওয়া হয়নি খবরটা। আমরা ক্রমাগত খবর পাঠিয়েছি—ভুল খবর তাতে শত্রুকে আরো বিভ্রান্ত করতে সমর্থ হয়েছি। সব সময় ভুল খবর পাঠাইনি। অর্ধেক সত্যি অর্ধেক মিথ্যা এমনভাবে পাঠিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করেছি। অনেক সময় এমন সংবাদ পাঠিয়েছি যাতে শত্রুরা আরো অস্ত্রশস্ত্র এবং লোক পাঠায়। ফলে শত্রুর খরচ বেড়ে গেছে, তাদের লোকজন নিয়োজিত হয়েছে একেবারে বাজে কাজে।

এক সময় আমরা রাশিয়াতে ষাটটা কেন্দ্র থেকে এমনি খবর পাঠিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করেছি।"

শেলেনবার্গ বলছেন তাঁর গুপ্তচরদের জন্য কতরকম জিনিস তৈরি করাতে হতো তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষভাবে তৈরি ক্যামেরা থেকে সুরু করে, বিশেষভাবে তৈরি বেতার ট্রানসমিটার—এ সবই তাঁদের তৈরি করতে হয়েছে। তাঁরা সংবাদ পেলেন ভ্যাটিকানে একজন জার্মান আছেন—তিনি রাশিয়া সম্পর্কে খবর দিতে পারেন—অথচ তিনি তা লিখেও জানাবেন না, বা দূত মারফৎ বলেও পাঠাবেন না। শেলেনবার্গদের পক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করাও সম্ভব নয়। তখন শেলেনবার্গ স্থির করলেন বেতার ট্রানসমিটার যন্ত্র যদি জটিল না হয়ে সহজ হত তাহলে খুব ভাল হত।

অতএব তিনি নির্দেশ দিলেন সহজ ট্রান্সমিটার তৈরি করতে। এমন ট্রান্সমিটার হবে যা কিনা চালানো একজন অযান্ত্রিকের পক্ষেও কঠিন হবে না।

এমন একটি জিনিস তৈরিও হল। সময় লাগল আঠারো মাস। জিনিসটি হল ছোট। যেন একটা চুরুটের বাক্স। এর মধ্যেও উপরের সারিতে সত্যিকারের চুরুট থাকতও। কিন্তু এই রেডিওর একটা লম্বা শুঁড় প্রয়োজন হত। কুড়ি ফুট থেকে ত্রিশ ফুট লম্বা এই তারের তৈরি শুঁড়টি এরিয়েল হিসাবে ব্যবহৃত হত। এমন একটি ব্যবস্থা করা হল এইভাবে সংবাদ পাঠানোর যে, মাত্র কয়েকটি সংকেতের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠানো সম্ভব হল। কম সময়ের মধ্যে সংবাদ পাঠানোয় একটা সুবিধে হল—সেটা এই যে শত্রুপক্ষের লোকেরা রেডিও ট্রানসমিটার কোথায় আছে বার করতে পারে এমন যন্ত্র দিয়েও এগুলোকে ধরতে পারত না।

সংবাদ পাঠানো হত খুব তাড়াতাড়ি। কিন্তু তা ধরবার জন্য প্রয়োজন হত বিশাল যন্ত্রের। ফলে সংবাদ পাঠানোই চলত, কিন্তু চরদের কাছে এই উপায়ে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হত না।

* * *

গুপ্তচরদের কাজ হচ্ছে খবর সংগ্রহ করা। এর নাম হচ্ছে ইংরিজিতে এসপিওনাজ। গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে যে কাজ করা হয় তার নাম কাউন্টার এসপিওনাজ। যদি কোনো লোক তার নিজের দেশের বিরুদ্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবার কাজ করে তাহলে তাকে বলা হয় ট্রেজন। যুদ্ধের সময় দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কাজ করলে সেজন্য অ্যামেরিকার আইনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য অনেক দেশেই তা হয়। কিন্তু সংবাদ পাঠানোর জন্য জন্তু জানোয়ার যখন পাঠান হয়—তখন তারা ধরা পড়লে তাদের আর প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় না! পায়রা, কুকুর ইত্যাদিদের সাহায্যে সংবাদ পাঠানোর ইতিহাস বহু প্রাচীন।

গুপ্তচরেরা খবর পাঠায় বটে নানাভাবে। খবর সংগ্রহও করে কত বিচিত্র উপায়ে—অদৃশ্য কালি, বিন্দুর মত ছোট নেগেটিভে বড় একটি কাগজের ফোটোগ্রাফ। চিঠির উপর ঠিকানা লেখার কায়দা, এমনকি বিভিন্ন রঙের ডাকটিকিট বসিয়েও বহু খবর পাঠানো হয়—কিন্তু গুপ্তচররা কি করছে না করছে, কার সঙ্গে মিশছে সেটা জানবার জন্যও গুপ্তচর রাখা হয়।

রাশিয়ার গুপ্তচরদের মধ্যে নিয়ম হচ্ছে একই জায়গায় তিনজন কাজ করবে। প্রত্যেকে অন্য দুজনের উপর নজর রাখবে। এবং নিয়মিত ভাবে রিপোর্ট পাঠাবে। এই নিয়মটি এত ভাল বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল যে জার্মানীতেই এই-ভাবে তিনজনের একটি দল করে দেওয়া হয়। এই তিনজনের সঙ্গে আর কারুর কোনো যোগাযোগ থাকে না, তারা আর গুপ্তচর বাহিনীর কারুর নামও জানে না, অতএব একজন ধরা পড়লে আর দুজনের সম্ভাবনা থাকলেও সেই অঞ্চলে হয়ত আরো প্রচুর গুপ্তচর ধরা পড়তে পারল না। একবার জার্মান সৈন্যরা একবারে ফরাসী দেশে একশো কুড়িজন লোককে ধরে ফেলে। তার কারণ তারা সাবধান হয়নি এবং সবচেয়ে বড় কথা অতবড় একটি দলের প্রত্যেকে প্রত্যেকের খবর রাখার দরুণ প্রত্যেকের নাম বার করা জার্মানদের পক্ষে কঠিন হয়নি।

* * *

গুপ্তচর নানা রকমের হয়। কিন্তু এক জাতের গুপ্তচর সত্যিই একটু অদ্ভুত ধরনের। এরা দু দেশ বা আরো বেশি দেশের খবর সংগ্রহ করে। এটা তার একরকম ব্যবসা। দেশভক্তি বা ঘৃণা তার নেই। টাকা পেলে সে সব কিছুই করতে পারে। এদের বলা হয় ডাবল এজেন্ট। দু দেশেই হয়ত জানে এরা ডাবল এজেন্ট, কিন্তু তবু তা জেনেও তাদের অনেক সময়েই কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়।

টাকার জন্য লোকে কত কি করে থাকে। একটি দেশভক্ত লোকও ভুল ব্যাখ্যা করে তার নিজের দেশের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি করবার সময়। সে বলে, "আমি জানি, পরিণামে আমাদের জয় নিশ্চিত। শত্রু যদি জানে আমরা কি দিয়ে, কিভাবে, কখন তাকে পরাস্ত করব, তাতে ক্ষতি কি? একজন লোককে ফাঁসি দেবার সময় যদি তাকে বলা হয়, তোমাকে বারো ফুট লম্বা, সিকি ইঞ্চি চওড়া দড়ি দিয়ে ঝোলানো হবে, তাহলে তার কি কোনো লাভ হয়? সে কি বাঁচতে পারে?"

সে বাঁচতে পারে না। কিন্তু শত্রু যদি জানতে পারে কখন, কোথায়, কিভাবে তারা আক্রান্ত হবে, তাহলে তারা পরাজিত হলেও, তারা আক্রমণে মোটেই আশ্চর্য হবে না। প্রতিরক্ষার জন্য তারা যা ব্যবস্থা করতে পারবে, তার ফলে আক্রমণকারীদের প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। অতএব গুপ্তচর বৃত্তির মধ্যে আর যাই থাক, দেশপ্রেমের কোনো চিহ্ন নেই, থাকতে পারে না। নিজের দেশকে অন্য দেশের স্বার্থে বিসর্জন দেবার অধিকার কারুর নেই। নিজের দেশ হয়ত দুর্ব্যবহার করতে পারে—ভীষণ অন্যায়ও করতে পারে, কিন্তু সেজন্য আর সমস্তই করা চলে হয়ত, কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে অন্য দেশকে সাহায্য করা তার মধ্যে অন্যতম নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, প্রত্যেক দেশেই এমনি লোক পাওয়া যায়—যারা নিজের দেশের চাইতে অন্য দেশকে বড় মনে করে। এবং এই ধরনের লোককে ধরা বড়ই শক্ত হয়েও পড়ে। তাই কাউণ্টার এসপিওনাজ-এর প্রয়োজন সমস্ত সভ্য দেশে আজ স্বীকৃত হয়েছে।

আমেরিকার এফ বি আই বা ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেষ্টিগেশনের নাম আজ জগদ্বিখ্যাত। এর কারণ এই বিভাগটি অসামান্য রকমের কৌশলী এবং শক্তিশালী। কিন্তু তবু যুদ্ধের সময় এই গোয়েন্দা সংস্থান টের পায়নি যে, তলে তলে জাপানীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করছে।

পার্ল হারবারের আক্রমণ হয়েছিল অতর্কিতভাবে। আমেরিকানরা আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারেনি আক্রমণ আসন্ন। কিন্তু জাপানীরা তা আগে থেকেই জানত। জাপানীরা আরো জানত, কতগুলি জাহাজ পার্ল হারবারে আছে। সে জাহাজ কোন্ জাতের, তাদের সমস্ত বৃত্তান্ত।

কেমন করে তা জানত?

তাহলে হনলুলুর জাপানী প্রতিনিধি কিতার কথা বলতে হয়। গত মহাযুদ্ধের গুপ্তচর বৃত্তির ইতিহাসে এই নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ডিপ্লোম্যাটদের 'সাত খুন মাপ' বা ডিপ্লোম্যাটিক 'ইমিউনিটি' থাকবার ফলে কিতার পক্ষে সংবাদ চালান দেওয়ার কাজ খুব কঠিন ছিল না। এই কিতা সংবাদ পাঠিয়েছে প্রতি মুহূর্তে পার্লহারবারের জাহাজের সংখ্যা গমনাগমন।

কেমন করে?

একটি কাগজে আটটি খবর দেওয়া হল—এক থেকে আট নম্বর দেওয়া হল। তাদের খবরগুলি আগেই জানিয়ে দেওয়া হল।

১। যুদ্ধ জাহাজ বাহিনী এবং অনুসন্ধানী জাহাজ বাহিনী সমুদ্রে এসেছে।

২। কয়েকটি বিমানবাহী জাহাজ সমুদ্রে আসবার পরিকল্পনা করছে।

৩। সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ বাহিনী বন্দর ত্যাগ করেছে।

৪। কিছু বিমানবাহী জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে।

৫। সমস্ত বিমানবাহী জাহাজ বন্দর ছেড়ে গেছে। ইত্যাদি ৮ পর্যন্ত।

খবর আগেই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন কেবল নম্বর পাঠানোর ব্যাপার। যদি জানানো হয় 'এক' তাহলে বোঝা যাবে 'যুদ্ধ জাহাজ বাহিনী এবং অনুসন্ধানী জাহাজ বাহিনী সমুদ্রে এসেছে।' যদি জানানো হয় 'দুই' তাহলে দ্বিতীয় সংবাদটি পড়তে হবে। মোটামুটি ব্যাপারটা কঠিন নয়। কিন্তু কি করে জানানো হবে এই সংখ্যাগুলি? তারও নির্দেশ দেওয়া ছিল।

ল্যানিকাই বীচ হাউসে যখন রাত আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত একটা আলো জ্বলবে, তখন ধরে নিতে হবে সংবাদ 'এক', ন'টা থেকে দশটা 'দুই', এরকম 'কোড' পেলে আর সমুদ্র থেকে সাবমেরিনের পক্ষে সংবাদ পাওয়া কিছুই শক্ত নয়। এইভাবেই জাপানীরা পার্ল হারবারের আক্রমণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সংবাদ পেয়ে আসছিল। স্কাপা ফ্লো-এর কাছে যেমন একজন গুপ্তচর ছিল, যার ফলে বৃটেনের রয়্যাল ওক ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তেমনি পার্ল হারবারের বিধ্বংসী ঘটনাও ঘটা সম্ভব হয়েছিল গুপ্তচরেরই সাহায্যে!

এদের আগে থেকে ধরতে পারলে যুদ্ধের ইতিহাস অন্য রকম হত।

* * *

যখন পার্ল হারবার থেকে ধোঁয়া এবং আগুন আকাশকে লাল এবং কালো করে তুলছিল, তখন হনলুলুর বাড়িতে কিতা বই-কাগজপত্র পোড়াচ্ছিল। তার আগুন দেখা না গেলেও, ধোঁয়া দেখা যাচ্ছিল—এবং আগুন ছাড়া ধোঁয়া হয় না, এই সত্য জানা থাকার ফলে একটি পুলিশ দেখতে গিয়েছিল ব্যাপারটা কি?

পুলিশ কিতার বাড়িতে ঢুকে দেখে বহু কাগজপত্র পোড়ানো হচ্ছে—সে চট্ করে গিয়ে আগুন থেকে দু'-একখানা বই ও কাগজ উদ্ধার করে। যা উদ্ধার করা হল, তা দেখে তো আমেরিকানদের চোখ হল বিস্ফারিত! অ্যাঁ, এরা এই করেছে?

তারপর আস্তে আস্তে গুপ্তচরদের কার্যকলাপ বন্ধ করা হল। কিন্তু সহজে নয়। গুপ্তচরদের কাজ সহজে বন্ধ করা যায় না, কিন্তু সচেতন থাকলে বহু গুপ্তচরকে এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত করা যায় এবং অনেক সময়েই গুপ্তচরকে ভুল সংবাদ দিয়ে শত্রুকে আরো বেশি বিভ্রান্ত করে তোলা যায়।

* * *

শত্রুকে বিভ্রান্ত করা যুদ্ধরত দেশের একটি প্রধান কাজ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

গত মহাযুদ্ধের ঘটনা। দ্বিতীয় রণক্ষেত্র কোথায় হবে? দুটি দিক থেকে এই আক্রমণ হতে পারে। মিত্র পক্ষ কোন্ দিকে আক্রমণ সুরু করবে?

ফ্রান্সের উত্তরে শেরবুর্গ-এর দিকটাও ভাল, অথবা ভূমধ্যসাগরের ভেতর দিয়ে সার্ডিনিয়ার কাছ দিয়েও আক্রমণ চালানো যায়।

শেষ পর্যন্ত স্থির হয় ফ্রান্সের উত্তর দিকটাই ভাল। কিন্তু জার্মানদের জানানো হবে, কৌশলে, যে সার্ডিনিয়ার দিকেই মিত্রপক্ষের নজর।

একটি অদ্ভুত পরিকল্পনা করা হল।

বহুদিন অপেক্ষা করে পাওয়া গেল একটি মৃতদেহ। এর মৃত্যু হয়েছিল নিউমোনিয়ায়। নিউমোনিয়ায় যারা মারা যায় আর যারা জলে ডুবে মারা যায়, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না!

এই মৃতদেহকে পরানো হল মিলিটারির একটি পোষাক। তার কাছে রইল নানারকম টুকিটাকি। সিনেমার টিকিটের দুটি অর্ধাংশ, স্ত্রীর ছবি—একটি চিঠি। একজন উঁচুদরের অফিসার লিখছেন। তাতে নানা কথার মধ্যে এও লেখা আছে, সার্ডিন মাছ খেতে ভাল। এই মৃতদেহটিকে এরোপ্লেনে করে স্পেনের সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসা হল। তারপর সুরু হল প্রতীক্ষা।

মৃতদেহ স্পেনের পুলিশেরা পাবে। পেলেই জার্মানদের জানিয়ে দেবে। তারা নিশ্চয় চিঠিটাও পড়বে। চিঠিটা পড়ে কি মনে হবে? সার্ডিন মাছের কথা পড়ে জার্মানরা নিশ্চয় ভাববে আক্রমণ হবে ওদিক থেকে।

পরিকল্পনা মত কাজ হল।

এমন কি লণ্ডনের টাইমস কাগজে এক নোটিসও বেরুল যে, ওমুক ক্যাপ্টেন সম[...] ডুবে মারা গেছেন। এই সতর্কতার প্রয়ো[...] ছিল, কারণ যদি জার্মানদের গুপ্তচর লণ্[...] খোঁজ করে দেখতে পায় এ নিয়ে কোনো সং[...] বৃটেনের কাগজে ছাপা হয়নি, তাহলে তা[...] সন্দেহ হতে পারে!

এছাড়া আরও একটি ব্যাপার করা হল[...]

মৃত ক্যাপ্টেনের স্ত্রী সাজিয়ে একজন অ[...] নেত্রীকেও একটি ফ্ল্যাটে রেখে দেওয়া হল কি[...] দিন। অর্থাৎ, যদি জার্মান গুপ্তচর খোঁজ [...] মৃত ক্যাপ্টেনের বাড়ি কোথায়? অর্থাৎ গো[...] গড়া হল কল্পনা থেকে। মৃতদেহটি হল [...] একটি লোকের, স্ত্রীও হল একজন অভিনে[...] কিন্তু বাস্তবের আওতায় আনা [...] প্রত্যেককে!

শত্রুকে বিভ্রান্ত করা সোজা নয়। বি[...] একবার তা করা সম্ভব হলে তার মধ্যে যে[...] যে মজা থাকে তাই নয়, তাতে দেশের অ[...] কিছুই রক্ষা করা সম্ভব হয়। আধু[...] গুপ্তচর এবং তাদের ধরবার কৌশল [...] শত্রুকে বিভ্রান্ত করার কৌশল আর্ট থে[...] সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। প্র[...] দিন তার নতুন নতুন প্রয়োগের খবর পা[...] যাচ্ছে। প্রত্যেক দেশই চেষ্টা করছে ধূর্ত[...] এবং কপটতায় অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে। খেলা মারাত্মক হলেও, অতি প্রয়োজনীয় খে[...]

ছোটদের পাততাড়ি
পরিচালক—স্বপনবুড়ো
পূজোর চিঠি
বক্ষে নিয়ে নতুন আশা
এগিয়ে যাবো সমুখ পানে—
চলার পথে বিঘ্ন-বাধা
গুঁড়িয়ে যাবো সকল খানে।
মোদের খেলা ঘরের মাঝে
লুকিয়ে আছে সুখের স্বপন,
পক্ষীরাজে জিনবো জগৎ
কল্পনা তাই করছি বপন।
এই ভারতের মর্মবাণী
ছড়িয়ে দেবো দিগ্বিদিকে—
নিকষ-কালো মেঘের বুকে
বিজলী তাহাই নিচ্ছে লিখে!
এই ভারতের সপ্তডিঙা
মিতালিরই মন্ত্র জানে—
শারদীয়ার সুখের দিনে
কইব তাহাই মধুর গানে॥
শুভার্থী—
স্বপনবুড়ো
শারদীয়া
১৩৭০

নরের ভিতরে নারায়ণ আছে

সুনির্মল বসু

'নরের ভিতরে নারায়ণ আছে
সেখানে তাঁহারে খুঁজিলি না,

গণের ভিতরে গণেশ বিরাজে,
বুঝি তাও তোরা বুঝিলি না,

ঘুরিয়া মরিলি তীর্থে তীর্থে,
মঠে মন্দিরে ঘুরিলি ঢের—

ব্রহ্মনা সুপ্ত তোরই চিত্তে
মূর্খ, সে কথা পেলিনা টের।

সম্রাট মহিষী

শ্রীযামিনী কান্ত সোম
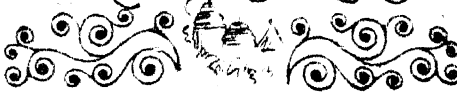
ইনি কোন্ সম্রাট-মহিষী? সম্রাট তো অনেক ছিলেন। ইনি কোন্ দেশের সম্রাট-মহিষী? এবং কবেকার? ইনি ছিলেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সম্রাট মহারাজা গণেশনারায়ণ খাঁ। ইনি প্রথমে সপ্তদুর্গা একটাকিয়া রাজ্যের রাজা ছিলেন, পরে—যুদ্ধে জয়লাভ করে হলেন গৌড়ের বাদশাহ—খ্যাতনামা সম্রাট। এঁরই মহিষী রাণী ত্রিপুরা—তাঁরই কথা বলছি। সম্রাট গণেশের নাম বহু লোকের সুপরিচিত। কিন্তু রাণী ত্রিপুরার কথা অনেকেরই অজ্ঞাত।

সম্রাট গণেশনারায়ণ যেমন ছিলেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী, তাঁর মহিষীও ছিলেন ঠিক তেমনি। সম্রাট গণেশের এক পুত্র ছিলেন—খুব স্নেহের পুত্র, নাম তাঁর যদুনারায়ণ। যদুনারায়ণ অত্যন্ত বলবান, বীর, সাহসী ও তাঁর পিতার মতই যুদ্ধবিশারদ। তাঁর আর এক বিশেষ গুণ ছিল। তিনি একজন পালোয়ান কুস্তিগীর। কুস্তিতে বা মল্লযুদ্ধে কেউ তাঁকে হারাতে পারতো না—এদিকে তিনি ছিলেন সবার সেরা। বড় বড় মুসলমান মল্লবীর তাঁর কাছে হেরে যেতো। এ জন্য তাঁর নাম হয়েছিল যদুমল্ল। মুসলমানেরা বলতেন জিৎ মল্ল কেন না, জিত ছাড়া তাঁর হার হোত না কোনদিন।

সম্রাট গণেশনারায়ণ খাঁ ছিলেন সেরা বাদশাহ। সাত বছর ধরে গৌড় সিংহাসনে নির্বিবাদে রাজত্ব করবার পর তিনি মারা গেলেন। তখন যদুমল্লের উপর গৌড়ের কর্তৃত্ব এলো। সম্রাট গণেশের দুটি রাজ্য ছিল। এক ছিল সপ্তদুর্গা বা সাতগড়া বা বিখ্যাত একটাকিয়া রাজ্য। এ হোল পৈতৃক রাজ্য। এ-ছাড়া আর একটি রাজ্য ছিল—সে হোল গৌড় রাজ্য। গৌড়ের সিংহাসন তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করে অধিকার করে নিয়েছিলেন। এ হোল ১৩৮৫ সালের কথা। সম্রাট গণেশনারায়ণ খাঁর কাহিনী অতি বিচিত্র। সে অন্য কথা।

যদুনারায়ণ খাঁ অর্থাৎ যদু মল্ল গৌড়ের সিংহাসনে বসলেন। গৌড়ে তখন ছিল মুসলমানদের সংখ্যা বেশী। যদুনারায়ণ গোড়া হতেই মুসলমানদের প্রিয় ছিলেন। তারপর হতে হতে ক্রমশঃ এমন হোল যে, তিনি মুসলমানদের অধিক প্রিয় ছিলেন বলে, শেষে মুসলমান হয়ে গেলেন, আর তাঁর নামটি হোল জেলালুদ্দিন। যদু হলেন জেলালুদ্দিন খাঁ। তিনি মুসলমান ধর্ম নেওয়াতে, পৈতৃক একটাকিয়া বংশের সংগে এবং আত্মীয়-স্বজনের সংগে সকল সম্পর্ক তাঁর ছিন্ন হয়ে গেল এবং আর এক মহাবিভ্রাট উপস্থিত হোল।

যদুমল্লের মাতা অর্থাৎ সম্রাট গণেশনারায়ণের মহিষী থাকতেন সাতগড়াতে অর্থাৎ পৈত্রিক একটাকিয়া রাজ্যে। মহিষী রাণী ত্রিপুরা পুত্রের মুসলমান হওয়ার সংবাদে অত্যন্ত বিচলিত ও শোকার্ত হলেন। তারপর পুত্রের উপর ভীষণ রেগে গেলেন। "কি আমার ছেলে হোল মুসলমান? এই উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশের নাম ডুবালো?—যাই, গিয়ে দেখতে হবে, কি সে করছে—"।

তিনি তখন লোক-লস্কর, নৌবহর নিয়ে হাজির হলেন গৌড় রাজধানীতে পুত্রকে শাসন করবার জন্য।

রাণী ত্রিপুরা গৌড় রাজধানীতে পৌঁছুতে, সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। আর সম্রাট জেলালুদ্দিন অর্থাৎ যদুমল্ল মায়ের ভয়ে প্রাসাদের ভিতর এমন লুকিয়ে রইলেন যে, তাকে খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হোল। রাণী ত্রিপুরা তো ছেলেকে পেলেন না। তাঁর রাগ তো ছিলই রাগ আরো ভয়ানক হয়ে উঠলো, তিনি অনামূর্তি ধরলেন।

রাণী ত্রিপুরা দেওয়ানজীকে হুকুম দিলেন রাজকোষ খুলে দিতে। দেওয়ান মহা বিপদে পড়লেন। রাজকোষ খুলে দেবেন কি? তিনি দৌড়াদৌড়ি করে অন্দরে-লুকানো সম্রাট যদুনারায়ণের কাছে গেলেন। গিয়ে রাণীর হুকুমের কথা বললেন। সম্রাট ছিলেন যেমন বীর, তেমনি উদার ও মহৎ। শুনে বললেন—"মায়ের দেখছি ভয়ানক রাগ আমার উপর। অ জ্ঞা তিনি যখন চাইছেন তখন রাজকোষ খুলে দাও। তিনি যা ইচ্ছে গ্রহণ করুন। যা দ্রব্য নিতে চাইবেন, তাই-ই নিন। কেউ তাঁর কথায় বা কাজে বাধা দিও না।"

রাজকোষ খুলে দেওয়াতে রাণী গৌড়ের ধন-ভান্ডার হতে বহু বহু অর্থ নিয়ে নিজের নৌকাতে রাখলেন। ধনাগার ছিল ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ। তারপর করলেন কি? একটাকিয়ায় ফিরে যাবার সময় গৌড়ের অন্য বহু সম্পদ ও মূল্যবান সামগ্রী, এমন কি গৌড়ের রাজ সিংহাসনটি পর্যন্ত নৌকায় তুলে নিয়ে চললেন। তিনি বললেন, 'এ হোল আমার স্বামীর সিংহাসন। স্বামীর আসনটি নোব বৈকি!' তাড়াতাড়ি সম্রাটের কাছে খবর গেল—"রাণী মা রাজ সিংহাসনটি পর্যন্ত যে নিয়ে চললেন!" সম্রাট উত্তর দিলেন "তাঁর যা ইচ্ছে, নিয়ে যান। বাধা দিও না।"

রাণী ত্রিপুরা এই সব অজস্র ধন-দৌলত, মায় রাজ সিংহাসনটি পর্যন্ত নিয়ে চললেন। কিন্তু তিনি হাসি মুখে কি চললেন? না। তাঁর দু'চোখ জলে ভেসে গেল। বললেন, "আমার সে যদু আর নেই।" তাঁর কান্না হতাশার আর অভিমানের।

কিন্তু একটাকিয়া রাজধানীতে গিয়ে তাঁর অভিমানের বদলে রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি গৌড়ের কয়েকটা পরগণাও দখল করে বসলেন। গৌড় সম্রাট তাতেও কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করলেন না।

এই জেলালুদ্দিন যখন বীর যদুমল্ল ছিলেন, তখন তাঁর একটি পুত্র হয়েছিল পুত্রের জননীও ছিলেন সবাই তাঁরা প্রথম থেকেই থাকতেন, রাণী-মা ত্রিপুরার কাছে একটাকিয়া রাজ্যে। এই পুত্রটি হলেন একটাকিয়া রাজ্যের উত্তরাধিকারী। রাণী ত্রিপুরার তিনি চক্ষের মণি। কুমার বলতে তিনি অজ্ঞান, রাণীর প্রাণের চেয়েও প্রিয়।

এই কুমার অনুপনারায়ণ যখন বড় হলেন, তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন হোল। সে কি ধুমধাম, সে কি আড়ম্বর! রাজার বাড়ির বিবাহ! এমন জৌলুস এমন ঘটা—কেউ কখনো দেখেনি। সারা সহরময় সে কি আড়ম্বর। দীন-দুঃখীদের অন্ন-বস্ত্র বিতরণের সাতদিনের উৎসব যেমন হোল, বর-বধূর শোভাযাত্রার আড়ম্বর আর সজ্জাও হোল তেমনি। চমৎকার দুটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতীকে পাশাপাশি রেখে কিংখাবের হাওদার উপর রাণী-মা বসলেন বর-বধূকে কোলে নিয়ে। হাতী চললো এঁদের নিয়ে নগরে ঘুরতে। আগে পিছে চললো লোক-লস্কর সেনা-সামন্ত। সে কি অপূর্ব শোভা।

তখন এই বাংলা দেশে রাজার বা সম্রাটের অভাব ছিল না। বাংলা কি দরিদ্র ছিল? না কারো অধীন ছিল? তখন বাংলা ছিল স্বাধীন, বাংলা ছিল ধন-সম্পদশালী—আর এই বাংলা ভূমিই অসংখ্য লোকে প্রতিপালন করতে—ধন-দৌলত বিতরণ করতো। আর এখন? সে বাংলাদেশ কি আর আছে?

অম্বররাজ জয়সিংহ দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ঔরংজীবের বিশেষ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি বাদশাহের অত্যন্ত প্রিয়-ভাজন হইয়াছিলেন। সে-কালে রাণা জয়সিংহের ন্যায় কূট কৌশলী মন্ত্রণাদাতা খুব কমই ছিল।

দিল্লীর প্রাসাদ। সিপাই সান্ত্রীরা পাহারা দিতেছে। বিনা অনুমতিতে কাহারো প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু একটি যুবক জোর করিয়া, কোনো কথা না শুনিয়া প্রাসাদ কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল। দ্বাররক্ষীরা ছুটাছুটি করিতে লাগিল এই অবাধ্য বেপরোয়া যুবককে ধরিবার জন্য। ঔরংজীব স্বয়ং বাধা দিলেন। সুঠাম দেহ, প্রিয়দর্শন যুবকটিকে দেখিয়া তাঁহার মনে স্নেহের উদ্রেক হইল। কাছে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; তোমার সাহস ত কম নয়...তোমার প্রাণের ভয় নেই?

যুবকটি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল: দিল্লীর মসনদের অধীশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে সাহস থাকা ত চাই-ই। আমার মনের প্রবল বাসনা আজ বাস্তবে পরিণত হতে দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। জাঁহাপনা, আমার ত্রুটি মার্জনা করবেন। আমি আমার কৃত অপরাধের সাজা মাথা পেতে নেবার জন্য প্রস্তুত আছি। আজ্ঞা করুন—দিল্লীশ্বর। আমাকে এই মুহূর্তে কারাগারে নিয়ে বন্দী করুন...আমি প্রস্তুত।

ঔরংজীব যুবকটির এইরূপ নির্ভীক ও স্পষ্ট কথায় কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন; তোমার এই বয়সে এত সাহস দেখে আমি খুব প্রীত হয়েছি।

তারপর যুবকটির দুই হস্ত ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন: তুমি এখন কী করবে। তোমার হস্ত বন্ধন করলাম। আমার এ-বন্ধন হতে কী করে মুক্ত হবে?

এতটুকু ভীত হইল না যুবকটি। স্বাভাবিকভাবে কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিল; হস্ত বন্ধনে আমি ভয় পাই না। বিয়ের সময়তো বর-কনের এরূপ বন্ধন হয়ে থাকে। হস্তবন্ধন ত সৌহার্দ্যের লক্ষণ...ভয়ের কারণ নয়। বিবাহে বর কনের এক হাত ধারণ করে তাহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করে। আপনি আমার দু'হাত ধারণ করেছেন, এত আমার পরম সৌভাগ্য। আজ থেকে ত আমার চির

জীবনের দায়িত্ব বাদশাহ গ্রহণ করলেন—একি কম গর্ব ও আনন্দের কথা!

ঔরংজীব বিজ্ঞজনোচিত কথা শুনিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। বলিলেন : তুমি কে এখনও আমি সম্যকভাবে জানতে পারিনি। কিন্তু তুমি যে একজন প্রসিদ্ধ রাজার ছেলে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। জ্ঞানে বুদ্ধিতে অন্য সকলের চেয়ে 'সওয়া' অর্থাৎ এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ শ্রেষ্ঠ। অতএব আজ হ'তে তোমাকে আমি 'সওয়া' উপাধিতে অভিষিক্ত করলাম।

বলতো যুবকটি কে? ইনিই রাণা জয়সিংহ।

।।দুই।।

জয়সিংহ জয়পুর নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নগর প্রবর্তনের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন একজন পূর্ববঙ্গবাসী পণ্ডিত। নাম বিদ্যারণ্য।

কবি রঙ্গলাল লিখিয়াছেন :

জয়সিংহ জয়পুরী চারু দেশ
যার শোভা মনোলোভা বৈকুণ্ঠ বিশেষ।।

জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম ধুণ্ডাড়। ধুণ্ডাড় নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি ছোট গল্প প্রচলিত আছে। বীশিলদেব নামে একজন আজমীরের রাজা ছিলেন। প্রজাদের ভীষণ অত্যাচার করিতেন। রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উহারা দেশান্তরী হইল, তবু বীশিলদেবের কাছে নিস্তার নাই। উহারা যেখানেই থাকুক না কেন—ধরিয়া আনিয়া বেদম শাস্তি দিতেন। এ-পাপের ফলে তিনি মরণান্তে "দুন্দুভি" রাক্ষস নামে অভিহিত হইলেন।

জয়পুরের পশ্চিম প্রান্তে এক পর্বত। সে পর্বতের ভেতর আছে একটি গুহা। সে গুহাতে রাক্ষসটি বাস করিতেন। দুন্দুভি রাক্ষস তাঁহার পূর্বজন্মের পরিচিত প্রজাদিগকে ধরিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পৌত্র প্রজাদের উৎপীড়নের খবর শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইল। সে নিজেই একদিন রাক্ষসের কাছে আসিয়া ধরা দিল। রাক্ষস পিতামহ অদ্ভুতভাবে পৌত্রকে চিনিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসের মনে ধিক্কার জন্মিল। তাঁহার মনে করুণার উদ্রেক হইল—পৌত্রকে ভক্ষণ করিলেন না। ঐদিন হইতে তিনি এই দুষ্কার্য পরিত্যাগ করিয়া যমুনার জলে অন্তর্হিত হইলেন। দুন্দুভি রাক্ষসের নাম হইতে পর্বতগুলির নাম হইয়াছে 'কুণ্ড'।

* * *

মহারাজ জয়সিংহ ছিলেন পৃথিবী খ্যাত জ্যোতিষী। তিনি ফরাসী জ্যোতির্বিদ দে লা হায়র (De la Hire)-এর গণনার ভুল সংশোধন করিয়াছিলেন। তিনি বাদশাহের আদেশে তৎকালীন প্রকাশিত পঞ্জিকার ভুলও সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

জয়পুরে দিল্লী মথুরা উজ্জয়িনী ও কাশীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

জয়সিংহের রাজত্বকাল (সম্বৎ ১৭৬৮ অব্দে) সম্ভরঝিল বা হ্রদ কছবহদিগের অধিকারভুক্ত হয়। অম্বররাজ যোধপুর রাজ অজিত সিংহের পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া একতাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। অজিত সিংহ ও জয়সিংহ উভয়ে যুদ্ধ করিয়া আজমীরের সুবেদারকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তারপর সম্ভর হ্রদটি তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয়। জয়পুরে মানমন্দিরটিও অম্বররাজের অবিস্মরণীয় অবদান। রাজস্থানের ইতিহাসে রাণা জয়সিংহের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে।

দুর্গাপুজো এসে পড়েছে। কৈলাসে ব'সে দুর্গাদেবী যাওয়ার কথা ভাবছিলেন। নন্দী এসে তাঁকে বললো—'মা, পৃথিবীতে এবার নানা উৎপাতের কথা শুনছি। কারুর নাকি বাড়ি থেকে বেরোবার জো নেই, যাওয়া-আসা করতে হয় দিনের বেলায়ই। দু'দিন আগেই আপনি পৃথিবীর দিকে রওনা হোন্।'

দুর্গাদেবী বললেন—'আমি তো রওনা হওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েই রয়েছি। কিন্তু তোমার দাদাবাবুদের পাত্তা মেলে কোথায়? তুমি তাদের একবার তাড়া দিয়ে বলো তাড়াতাড়ি নিজেদের কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিক্।'

নন্দীর মুখের তাড়া পেয়ে কার্তিক-গণেশ দু ভাই দুর্গাদেবীর কাছে উপস্থিত হলেন। এসে দুজনেই একসঙ্গে ব'লে উঠলেন—'এবার আমরা তোমার সঙ্গে যাব না, মা।'

—'কেন রে? কি হয়েছে তোদের না যাওয়ার?'—জিজ্ঞেস করলেন দুর্গাদেবী।

গণেশ বললেন—'যাওয়ার উপায় কই, তুমিই বলো দেখি! যেতে হবে বিদেশে, তা-ও পুজোর দিনে, একটু সেজেগুজে যেতে তো হয়। কিন্তু আমার সেরকম কাপড়চোপড় কই? বাবাকে তা জানাতেই তিনি বললেন—তুই থাকিস্ তো চব্বিশ ঘণ্টা খালি গায়ে খালি পায়েই, অভাব তো শুধু পরনের যা কিছুর? তা, আমার আনকোরা নতুন একখানা বাঘছাল আছে, সেইখানাই প'রে যা।... শোনো কথা! একেই আমার ন্যাড়া মাথা, তার উপর পরব বাঘছাল! দেখলে সবাই আমাকে গোসাঞ বাবাজী গোসাঞ ব'লে ক্ষ্যাপাবেনা?'

কার্তিক বললেন—'আমার কথাও বলছি, শোনো। তুমি তো দেখছই, মা, চীনে কোট আর চীনে জুতো পরার অভ্যেস আমার চিরদিনের। এর মধ্যে একদিন বাবা আমাকে ডেকে বললেন—তোদের তো পৃথিবীতে যাওয়ার সময় হ'লো,—খবরদার, ও-সব চীনে-ফীনে জিনিষ প'রে ওদিকে এখন যাওয়া চলবে না। তার উপর দাড়ি কামিয়ে পথে পা বাড়াস্ তো হ্যাংগামায়ও পড়তে হবে। দু-দল জানোয়ার চুং-ফাং আর তার ফেউ—কি যে তার নাম মনে পড়ছে না,—চারদিকে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেড়ে-দাড়া কাউকে দেখলেই তারা খ্যাক্ খ্যাক্ ক'রে দৌড়ে এসে ঠ্যাং কামড়ে ধরে।......বলো তো, মা, সে-সব জানোয়ারের ভয়ে আমাকে রাখতে হবে নাকি দাড়ি? আর, চীনে জুতো পরব না, পরব কি খড়ম, পুজো বাড়ীতে যাওয়ার সময়ে?'

* * *

দুর্গাদেবী ছেলেদের কথার কি আর জবাব দেবেন! তিনি শিবঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁদের ওজর-আপত্তির কথা জানালেন।

শিবঠাকুর বললেন—'আমি ছেলেদের এমন কি বলেছি—তে তারা যাচ্ছে না! গণেশচন্দোরের মাথাটি তো অমনি আছে ছাড়া, ভুঁড়িটিও হয়েছে নেওয়াপাতি, তার সঙ্গে মানানসই-ই হ'তো বাঘছাল পরলে। তার সে মূর্তি দেখলে পথেঘাটের সবাই ক্তিতে গদগদ হ'য়ে তার পায়ে লুটিয়েও পড়ত। বেশ, তারা তা না যে তো, দিয়ে দাও গিয়ে তাদের আমার শান্তিপুরী ধুতি-চাদর আর কট্‌কী চটিজুতো। ও-গুলো পেয়েছিলাম আমি জামাই ষষ্ঠীতে তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে। ভেবেছিলাম আসছে জামাই ষষ্ঠীতে ঐ সব প'রেই শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া যাবে। তা যাক্ গে। আমি, বরং আগেরই মত যাব খালি পায়ে আর বাঘছাল প'রে।'

বাপের শান্তিপুরী ধুতি-চাদর আর নক্‌সা-তোলা চটি-জুতো পরতে পেয়ে কার্তিক-গণেশের মায়ের সঙ্গে যেতে আর কোনো বাধা রইলো না। দুর্গাদেবীও ছেলে-মেয়েদের নিয়ে মর্ত্যের দিকে রওনা হলেন।

* * *

পুজোর ক'দিন চ'লে গিয়েছে। পুজোয় যে-জিনিষপত্তর পাওয়ার কথা কৈলাসে তা বয়ে নেওয়ার জন্যে নন্দী এসেছে। ...সেদিকের খুচরো এটা-সেটা গুছিয়ে নিয়ে পুজোর নৈবিদ্য তুলতে গিয়ে নন্দীর চক্ষুস্থির! সে দুর্গাদেবীকে বললে—হাঁ মা, এ কি ব্যাপার? নৈবিদ্যের থালায় আলো চাল আর পাকা কলা কই? তার বদলে রয়েছে দেখছি ভুট্টার দানা আর তার উপরে গণ্ডা-দুয়েক বাতাসা! এই দিয়েই কি নৈবিদ্য দেওয়া হয়েছিল নাকি?'

দুর্গাদেবী বললেন—'দেখছি তো তাই। আর, কেন দেওয়া হয়েছিল তার কারণও জেনেছি পুরুত ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যজমানের কথাবার্তা শুনে। পুরুত-ঠাকুর বলছিলেন—এ সব কি দেওয়া হয়েছে? শাস্তরের মতে পুজোর নৈবিদ্যে দিতে হয় আলো চাল আর পাকা কলা। যজমানের উত্তর শোনা গেল—রেখে দিন, ঠাকুর, আপনার শাস্তরের কথা। শাস্তরে তো আছে মায়ের পুজো করলে ধনেধান্যে লক্ষ্মী লাভ হয়। কিন্তু লক্ষ্মী ঠাকরুণ দিন দিন আমাদের কি দশা করছেন, বাজারটা একবার ঘুরে দেখে আসুন না, বুঝতে পারবেন। এই আক্কারা-গন্ডার দিনে আলো চাল আর পাকা কলা কিনে এনে নৈবিদ্য সাজাই, সে-ক্ষমতা মা কি আমাদের দিয়েছেন? এবার তো তবু কিছু সস্তায় মিলেছে ব'লে ভুট্টা আর বাতাসার ভোগই দেওয়ার উপায় হ'লো। আসছে বছরে মা যদি হাতীতে চড়ে আসেন তবে তাঁর সেই বাহনটিরই খোরাক জোটাতে কলাগাছের বংশ নির্বংশ হবে, তার ফল মিলবে কোথায়? তাই তখন মায়ের পুজোয় দিতে হবে মন-কলা, মনের গাছেই ফলে সে-ফল, আর তার সোয়াদও নিতে হয় মনে-মনেই। ঠাকুর মশাই, তখন সে-ফল মাকে নিবেদন করতে গিয়ে আপনাকেও যে নতুন মন্তর আওড়াতে হবে—মা-দুর্গা, মন-কলা খাও মনে-মনে!' দুর্গাদেবী নিজের কপালে থাপ্পর মেরে কথা শেষ করলেন—'পোড়া কপাল আমার, পুজোর নামে বছরে একটিবার বাপের বাড়ী আসা চলত, এবারেই বুঝি তার শেষ হ'লো!'

এরপর নন্দী আর কি বলে! মুখ ব্যাজার ক'রে ভুট্টার দানা পুটলী বেঁধে নিয়েই সে কৈলাসের পথ ধরলে।

* * *

এদিকে ভৃঙ্গী পুজোর প্রসাদ পাওয়ার লোভে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। নন্দীকে আসতে দেখেই সে ছুটে তার সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। নন্দী ভৃঙ্গীর মুখের কাছে দু'হাতের বুড়ো আঙুল দুটো নাচাতে নাচাতে ব'লে উঠল—'তুই তো কলা খাওয়ার যম। এবার তাতে নবডঙ্কা। তবু তুই হাঁ ক'রে দাঁড়া দেখি, তোর মুখে নতুন একরকমের প্রসাদ দিচ্ছি, নাম তার মন-কলা। তুই সেই মন-কলা খা মনে-মনে।' আসছে বছরের পুজোর যে-নতুন মন্তরের কথা সে শুনে এসেছে, ভৃঙ্গীকে সেই মন্তরই শুনিয়ে দিল।

ভৃঙ্গী সে-হেঁয়ালী বুঝতে পারল না। সে ভাবল—চাটিম-কলা, কাঁঠালী-কলা, চাঁপা-কলারই মত মন-কলাও কলারই এক জাত, আর সেই জাতের কলাই নন্দী নিয়ে এসেছে, ওজনে হবে ত কয়েক মণ। পেট পুরে কলা-প্রসাদ খেতে পাবে সেই আশায় পথের মাঝেই হাঁ ক'রে সে দাঁড়িয়ে রইলো।

এক বুড়ো আর তার বুড়ী। বুড়ো কুড়ুল নিয়ে বনে যায়, কাঠ কাটে, সেই কাঠ বেচে পয়সা পায়—আর বুড়ী চরকায় সুতো কাটে—সেই সুতো বেচে কিছু পয়সা পায়—তাতেই তাদের চলে। কিন্তু দুজনেই বুড়ো হয়েছে—বুড়ো কত কাঠ কাটবে, বুড়ী কত সুতো কাটবে—সে যা কাটে তা খুব সামান্য—কাজেই কাঠ আর সুতো বেচে যে পয়সা পায়, তাতে কোনমতে দিন চলে। খাবার-দাবার আসে তো কাপড়-চোপড় আসে না—কাপড়-চোপড় আসে তো খাবার আসে না। চালাঘর—ঘরের চাল ঝড়ে উড়ে গেছে—নতুন করে চাল ছাইবে তার পয়সা কোথায়? দুজনের বড় কষ্ট।

একদিন বুড়ী বললে, বুড়োকে,—এক কাজ করো দিকিনি।

বুড়ো বললে,—কি কাজ?

বুড়ী বললে,—একরাশ খড় জোগাড় করে আনো—আর এক-জালা আলকাতরা—খড় দিয়ে একটা বলদ তৈরী করো—করে তার গায়ে জ্যাবজেবে আটার মত করে জালার আলকাতরা মাখিয়ে দাও—

বুড়ো বললে—ক্ষেপেছিস বুড়ী! খড়ের বলদ করে তাতে আলকাতরা মাখাবি—তাতে দুঃখ কি ঘুচবে শুনি?

বুড়ী বললে—যা বললাম—তাই করো দিকিনি তার পরে দেখো—আমি কি করি।

বুড়ো তখনি গিয়ে ওপাড় থেকে এত খড় নিয়ে এলো—একজালা আলকাতরা নিয়ে এলো। এনে বুড়ীর কথামত সেই খড়ে এক বলদ তৈরী করলো—করে সে খড়ের বলদের গায়ে জালার আলকাতরা ঢেলে

আলকাতরা করে মাখালো......বুড়ী বললে—বেশ হয়েছে— এখন দ্যাখো কাল আমি কি করি ?

পরের দিন সকালে বুড়ী তার চরকা নিলে, তুলো নিলে—নিয়ে সেই খড়ের বলদটাকে টেনে নিয়ে মাঠে গেল—মাঠের গায়ে পাহাড়। মাঠে বলদটাকে দাঁড় করিয়ে রেখে পাহাড়ের ধারে বসে চরকায় সুতো কাটতে লাগলো, সুতো কাটতে কাটতে গুনগুনিয়ে ছড়া ধরলো—

চরে খা বলদ—আমি সুতো কাটি বসে—
যত খুশী খা রে—পেট ভরে খুব কষে!

খড়ের বলদ খাবে কি—বুড়ী সুতো কাটতে কাটতে ছড়া আওড়াচ্ছে, শেষে বুড়ীর চোখে ঘুমের ঢুলুনি—বুড়ী বসে ঘুমোতে লাগলো।

বুড়ী ঘুমোচ্ছে, তার নাক ডাকছে—এমন সময় বন থেকে বেরিয়ে মাঠে এলো পা টিপে টিপে ইয়া এক ভালুক। ভালুক এসে খড়ের বলদকে বললে—তুই কে রে—এখানে দাঁড়িয়ে।

খড়ের বলদ বললে—আমি খড়ের বলদ—আমার হাড় মাস নেই—শুধু খড় আর খড়, খড়ের তৈরী গায়ে আলকাতরা ঢালা—

ভালুক বললে—শুধু খড় তুই—খড়ে আলকাতরা ঢালা! বেশ আমি তোর গা থেকে কতকগুলো খড় নেবো—নিয়ে আমার চামড়ার উপরে আঁটবো—তাহলে কোনো জানোয়ার ভালুক বলে চিনতে পারবে না আমাকে।

খড়ের বলদ বললে—বেশ, ইচ্ছা হয়েছে নাও—কিন্তু সবটা নিয়ো না।

—না না— খানিকটা আমার গায়ের চামড়াখানা ঢাকবার মতো শুধু।

এ কথা বলে খড়ের বলদের ঘাড়ে পড়ে তার গায়ে ভালুক বসালো নখ আর দাঁত—যেমন তা করা আলকাতরার আঠায় ভালুকের পা আর মুখ গেল আটকে—কিছুতে খোলে না। খড়ের বলদ তখন তাকে নিয়ে চললো বুড়োর বাড়ীতে।

বেলা প্রায় পড়ো পড়ো বুড়ীর ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভেঙে চেয়ে বুড়ী দেখে খড়ের বলদ নেই! কোথা গেল? কে নিয়ে গেল! বুড়ী চারিদিকে খুঁজে পেলো না—ভাবলো, পেট ভরে ঘাস-পাতা খেয়ে বাড়ী গেছে—বুড়ী তখন বাড়ী ফিরলো। বাড়ী ফিরে দেখে—খড়ের বলদ দরজার দাঁড়িয়ে আর তার গায়ে আটকে আছে ইয়া এক ভালুক।

বুড়ী ডাকলো—ও বুড়ো ও বুড়ো চট করে আয়—

বুড়ো এলো—এসে দেখে এই ব্যাপার। বুড়ী বললে—এক কাজ করো—মোটা দড়ি আনো, সেই দড়িতে ভালুকটিকে বেঁধে আমাদের পেছনে যে শুকনো ডোবা আছে—সেই ডোবার মধ্যে ফেলে রাখো।

বুড়ো তাই করল—তারপর দুজনে খেয়ে দেয়ে রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমোলো।

পরের দিন সকালে বুড়ী আবার চললো মাঠে—তার চরকা, সুতো আর খড়ের বলদ নিয়ে। মাঠে এসে আগের দিনের মতো খড়ের বলদকে মাঠে দাঁড় করিয়ে রেখে পাহাড়ের কোলে বসলো চরকা তুলো নিয়ে। সুতো কাটতে কাটতে বুড়ী সেই ছড়া আওড়াতে লাগলো।

ছড়া আওড়াতে আওড়াতে বুড়ীর আসে ঘুমের ঢুলুনি—বুড়ী বসে বসে ঘুমোতে লাগলো—ঘুমোতে ঘুমোতে তার নাকের ডাক।

বন থেকে তখন পা টিপে টিপে মাঠে এলো এক নেকড়ে বাঘ। নেকড়ে এলো খড়ের বলদের কাছে, বলদকে বললে—তুই আবার কোন্ জানোয়ার রে—এ্যাঁ—তোকে যে আমি খাবো।

খড়ের বলদ বললে—আমাকে খাবে কি, আমার গায়ে কি হাড়মাস কিছু আছে—আমি খড়ের তৈরী, শুধু খড় আর খড়—খড়ের গায় আলকাতরা মাখানো।

নেকড়ে বললে,—বটে চমৎকার তো! আমি তোর গায়ের খড় নিয়ে নিজের চামড়া ঢাকবো তাহলে লোকালয়ে ঢুকলে কেউ দেখতে পেলে চিনতে পারবে না আমায়, ভারি মজা হবে তাহলে।

খড়ের বলদ বললে,—চাট্টিখানি খড় নিয়ো, সব নিলে আমি যে মরে যাবো ভাই।

নেকড়ে বললে—না-না সব নেবো কেন? যতটা হলে আমার গা ঢাকে।

এ কথা বলে নেকড়ে দাঁত বার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো খড়ের বলদের উপর—যেমন পড়া তার দশাও ঠিক ভালুকের মতো। আলকাতরায় মুখ আর গা আটকে নেকড়ে একেবারে নড়ন-চড়ন রহিত, যেন পাথরের নেকড়ে।

নেকড়ে পিঠে আঁটা—খড়ের বলদ ফিরলো বাড়ী।

ঘুম ভেঙে বুড়ী দেখে বলদ মাঠে নেই। ভাবলো কোনো শিকার ধরে নিশ্চয় বাড়ী গিয়েছে! বুড়ীও বাড়ী ফিরলো—ফিরে দেখে—খড়ের বলদের পিঠে সেঁটে এক নেকড়ে।

বুড়ী ডাকলে বুড়োকে—তারপর বুড়ীর কথায় নেকড়েটাকেও দড়িদড়া বেঁধে ফেলা হলো উঠানের বাহিরে একটি বড় গর্তে।

পরের দিন আবার এই পালা—খড়ের বলদকে মাঠে দাঁড় করিয়ে তুলো কাটতে কাটতে বুড়ীর চোখে আবার সেই ঘুম—

আজ এলো বন থেকে নয়া এক কেঁদো শেয়াল। শেয়াল এসে খড়ের বলদকে দেখে বললে—কে তুমি গো—ভারী মজার জানোয়ার তো, তোমাকে খাবো আমি।

খড়ের বলদ বললো—আমার মাস আছে কি যে খাবে। আমি খড়ের তৈরী—আগাগোড়া খড়—শেয়ালে খড় খায় কখনো। আর আমার গায়ের চেকনাই যা দেখছো এ হলো আলকাতরা।

—বটে! শেয়াল বললে—তাহলে তোমার গা থেকে খানিকটা খড় আমি নেবো— নিয়ে নিজের গা ঢাকবো—তাহলে কুকুরগুলো দেখে চিনতে পারবে না—তাড়াও করবে না। এমনতারা পাজী, শেয়াল দেখেছে কি অমনি ভেউ ভেউ করে আসে তেড়ে কামড়াতে।

শেয়াল পড়লো খড়ের বলদের গায়ে ঝাঁপিয়ে—যেমন পড়া তার দশাও ঠিক সেই ভালুক আর নেকড়ের মতো—চটচটে আলকাতরায় বলদের পিঠে লেপটে সেঁটে রইলো। তাকে নিয়ে বলদ ফিরলো বাড়ী।

বাড়ী ফিরে বুড়ী ডাকলো বুড়োকে—শেয়ালটাকে বুড়ো বেঁধে নিয়ে গিয়ে ফেললো উঠানের আর এক কোণে ছিল কুয়ো—সেই কুয়োর মধ্যে!

পরের দিন সকালে আবার—তাই বুড়ী এলো মাঠে—চরকা তুলো আর খড়ের বলদ নিয়ে।

আজ এলো এক খরগোশ, খরগোশেরও ঠিক ঐ দশা, বলদ তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

বুড়ী এলে খরগোশকে রাখা হলো ঘরের কোণে ছিল একটা গর্ত—সেই গর্তের মধ্যে।

তারপরের দিন বুড়ী আর মাঠে গেল না—বুড়োকে ডেকে কি পরামর্শ দিলে—বুড়ীর পরামর্শ শুনে বুড়ো এলো উঠানের ডোবার ধারে, এসে সেখানে বসে এতবড় একখানা চাকু ছুরিতে শাণ দিতে লাগলো।

দেখে ভালুক বললে—ও কি করছো তুমি বুড়ো দাদা?

বুড়ো বললে—ছুরি শাণাচ্ছি—ছুরিতে খুব ধার করছি!

কেন! ধার করে কি করবে?

বুড়ো বললে—এ ছুরি দিয়ে তোমার গায়ের লোমওয়ালা চামড়াখানা কেটে বার করে নেবো—তোমার লোমের চামড়ায় আমি একটা কুর্তা করবো—আর বুড়ীর জন্য ঘাগড়া করবো—শীতে তাহলে কষ্ট হবে না।

কথা শুনে ভালুকের দুচোখ উঠলো কপালে, ভালুক বললো—

…বুড়ো দাদা, না তা করো না, তাহলে আমি মরে যাবো। তার চেয়ে …য় ছেড়ে দাও—আমি তোমাদের জন্য এনে দেবো জালার মতো …ক—মধুতে ভর্তি—একটিও মৌমাছি থাকবে না।

বুড়ো বললে—সত্যি কথা বলছো?

—হ্যাঁ বুড়ো দাদা—সত্যি কথা বলছি। ভালুক বললে—ভালুকে …না মিথ্যা কথা বলে না।

ভালুককে বুড়ো দিলে ছেড়ে, ছাড়া পেয়ে ভালুক ছুটলো …লে।

তারপর বুড়ো এসে বসলো নেকড়ের কাছে—বসে ছুরি …লো। নেকড়ে বললে—ছুরি শাণাচ্ছো কেন গো?

বুড়ো বললে, ছুরিতে ধার হবে—ধার হলে এই ছুরি দিয়ে …মার গায়ের চামড়াখানা নেবো খুলে—শীতের দিনে তোমার …ড়াটাতে শোবো—গরমে আরাম পাবো।

নেকড়ে শিউরে উঠলো, বললে—না-না, তা করলে আমি মরে …বা; তার চেয়ে আমায় ছেড়ে দাও—আমি তোমাকে গোয়ালভরা ছাগল …র ভেড়া এনে দেবো।

সত্য বলছো?

—সত্য-সত্য-সত্য তিন সত্য করছি।

নেকড়েকে বুড়ো দিল ছেড়ে, ছাড়া পেয়ে নেকড়ে ছুটলো বনের …কে।

তারপর শেয়ালের পালা, শেয়াল বললে—গায়ের ছাল কেটে …নিয়ো না, আমি তোমাকে একশোটা হাঁস আর মুর্গী এনে দেবো—

ছাড়া পেয়ে শেয়াল ছুটলো বনে।

এরপর খরগোশ—খরগোশ ছাড়া পেলো। সে বললে—আমি এনে দেবো ছালা ছালা গম আর ছোলা।

তারপর রাত্রে খেয়ে দেয়ে বুড়ো-বুড়ী ঘুমোচ্ছে—দুপুর রাত চারিদিক নিশুতি, বুড়োর দোরে পড়লো ঘা, বুড়ো উঠলো, বুড়ী উঠলো—উঠে বেরিয়ে এসে দেখে ভালুক—সে এনেছে জালার মতো এত বড় মৌচাক—মধুতে ভরতি—মৌচাকে একটিও মৌমাছি নেই।

মৌচাক দিয়ে ভালুকের হলো ছুটি—

তারপর দরজা বন্ধ করে বুড়ো-বুড়ী গিয়ে শুয়েছে চোখে ঘুম তখনো আসেনি—হঠাৎ দরজার ব্যা ব্যা ব্যা শব্দ।' দুজনে উঠে দরজা খুলে দেখে নেকড়ে—সে নিয়ে এসেছে এই এত ছাগল আর ভেড়া। সেগুলোকে বেঁধে-ছেঁদে রাখা হলো—নেকড়ে গেল বনে। বুড়ো-বুড়ী শুতে যাবে—দরজায় শব্দ কোঁক-কোঁকোর কোঁ আর প্যাক-প্যাক। বুড়ো-বুড়ী বেরিয়ে এসে দেখে শেয়াল—সে এনেছে রাজ্য ঝেঁটিয়ে এত হাঁস আর মুর্গী।

সেই রাত্রে মুর্গী আর হাঁসদের ঠিক করে রেখে বুড়ো-বুড়ী শুয়েছে—চোখ বুজেছে—খরগোশ এসে দরজায় দিলে ধাক্কা। বুড়ো-বুড়ী গিয়ে দেখে ছালা ছালা গম আর ছোলা।

এরপর বুড়ো-বুড়ীর কোনো কষ্ট রইলো না। সুখে তাদের দিন কাটতে লাগলো।

আর সেই খড়ের বলদ? তার কাজ ফুরিয়ে গেছে—বাড়ীর উঠানে পড়ে থেকে রোদ জলের ছিট লেগে লেগে তার গায়ের আলকাতরা গেল শুকিয়ে মুছে—আর খড়গুলো রাজোর কাক ঠুকরে ঠুকরে নিয়ে যাচ্ছে—সকলে দেখলে যে এই খড়ের বলদের দৌলতেই বুড়ো-বুড়ীর এমন ঐশ্বর্য আজ।

যে দেশে দু'হাজার লেক

নরেন্দ্র দেব

ভূগোল পড়েছো যারা এইদেশটিকে নিশ্চয় চিনতে পারবে: বাল্টিক সমুদ্রের পূর্ব পারে এই দেশ। উত্তর মেরুর প্রায় কাছাকাছি। দেশটির নাম 'ফিনল্যাণ্ড'। মানচিত্র খুঁজলে দেখতে পাবে সোভিয়েট রাশিয়ার যেন বাঁ-কাঁধে চড়ে বসে আছে এই দেশটি। ছোট্ট দেশ। এক সময়ে রাশিয়ার অধীন ছিল। কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের অধিবাসীরা খুব দেশভক্ত। তারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ চালিয়ে রাশিয়ার অধীনতা থেকে মুক্তি লাভ করেছে।

আমরা ফিনল্যাণ্ডে যাই বছর পাঁচ-ছয় আগে। ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিন্‌কির আকাশে যখন আমাদের প্লেন এসে পৌঁছালো তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চারিদিক ঝাপসা। প্লেনের ওপর থেকে নীচের দিকে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। বিমান বন্দরটা কোথায় ঠিক বুঝতে না পেরে আমাদের পাইলট রণধাও সিং এক ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত হেলসিনকির চারিধারে ঘুরতে লাগলেন। একবার ঝপ্ করে নামবার চেষ্টা করেন আবার তখনি হুস করে ওপরে উঠে পড়েন। প্লেনের ঝাঁকানিতে যাত্রীদের অবস্থা কাহিল। একটা বিপদের সম্ভাবনায় সকলেই আতংকিত। এইবার বুঝি বেঘোরে প্রাণটা যায়! মনে মনে সবাই তখন ভগবানকে স্মরণ করছে। বিপদে না পড়লে তো কেউ আমরা দিনান্তেও তাঁকে একবার ডাকিনি।

যাক্! সে যাত্রা বড্ড বেঁচে যাওয়া গেল। হেলসিন্‌কির বিমান বন্দর এইবার চোখে পড়লো। বৃষ্টি থেমেছে। কুয়াসা কেটে গেছে। অসংখ্য বিজলী বাতির জোর আলোয় প্লেন নামার জায়গা দেখা গেল। দূরে হেলসিন্‌কি শহরের বাতিগুলোও মিট মিট করছিল। আমরা তো দুর্গা বলে প্লেন থেকে নেমে যে যার গন্তব্যস্থানে রওনা হলুম।

শহরের কোনো হোটেলে জায়গা না পেয়ে আমরা গিয়ে উঠলুম শহরের উপকণ্ঠে 'ওটানামি' নামে একটি সুন্দর জনপদে। শহর ও গ্রামের সমন্বয়ে একটি অতি মনোরম স্থান। এইখানেই ফিনল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এই কলেজের ছাত্রদের নিজের হাতে তৈরি একটি তিনতলা হোস্টেল বাড়ীতে আমরা জায়গা পেলুম। কলেজ তখন বন্ধ। ছেলেরা অধিকাংশই ছুটিতে বাড়ী চলে গেছে। সবচেয়ে উঁচু তলায় এক কোণের একটি ঘরে আমরা জায়গা পেলুম। ঘরখানি ছোটো কিন্তু বেশ গোছালো। হোস্টেলের ক্যান্টিনেই চারবেলা খাওয়া চলতো। খাওয়া দাওয়াও খুব ভালো। দামও সস্তা।

শহর থেকে দূরে এসে থাকলেও আমাদের কোনই অসুবিধা হয়নি। এখান থেকে অনবরত হেলসিন্‌কি পর্যন্ত বাস যাতায়াত করছে। ভাড়াও কম। শহরের হৈ চৈয়ের বাইরে এই স্নিগ্ধশান্ত পরিবেশে থাকতে আমাদের বরং ভালই লেগেছিল। ওটানামির চারিদিক ঘন অরণ্য ও পর্বত পরিবেষ্টিত। মাঝে মাঝে জলাশয় আর সরু সরু খাল চলেছে। যেন রূপকথার এক স্বপ্নরাজ্যে এসে পড়েছি। পাথরে বাঁধানো পথঘাট ঝকঝকে পরিষ্কার। যখন তখন বৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু, কোথাও এতটুকু জলকাদা নেই। বৃষ্টির জল সব গড়িয়ে

ছোটদের পাততাড়ি

খালে চলে যায়। আমরা এখান থেকে দিনে অনেকবার বাসে করে হেলসিন্‌কি শহরে যাতায়াত করতুম। হেলসিন্‌কি শহরের আর একটা নামও আছে 'হেলসিংফোরস্‌'। আমাদের দেশেও এরকম এক শহরের দু'টো নাম দেখা যায়। যেমন 'কাশী' আর 'বারাণসী'।

আমরা যে সময় ফিনল্যান্ডে এলুম তখন এখানে এদের হিসেবে বসন্তকাল! শীত নাকি অনেক কমে গেছে! কিন্তু ওদের সেই কমশীতে আমাদের মতো গরম দেশের মানুষের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল। ভাগ্যে প্রচুর শীতবস্ত্র সঙ্গে ছিল তাই রক্ষে। ওরা বলে শীত কই? দেখছ না বনে বনে ফুল ফুটেছে কত? গাছে গাছে রাস্‌পবেরি আর স্ট্রবেরি পাকতে শুরু করেছে। আমরা বলি, সূর্যি ওঠেনা কেন? আকাশ সারাদিন মেঘে ঢাকা। দুপুর বেলাও মনে হয় যেন সবে ভোর হয়েছে! একটু আধটু নরম রোদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সেইটুকুতেই আমাদের খুব আরাম লাগে। ওরা বলে মাঝে মাঝে আবহাওয়া খারাপ থাকলে এরকম হয়, নইলে, আমাদের দেশে তো সকাল থেকে রাত্রি আড়াইটে পর্যন্ত ঝলমলে রোদ থাকে। রাত্রে জানালায় মোটা পর্দা ঝুলিয়ে ঘর অন্ধকার করতে হয়। নইলে দিনের আলোয় ঘুমনো যায় না।

কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু, একদিন হাতে হাতে এর প্রমাণ পেলুম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। তেষ্টা পেয়েছে। উঠে কাঁচের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেলুম। ঘড়িটা বার করে দেখি রাত দুটো। রাতের দৃশ্য দেখবার জন্য জানলার ধারে গিয়ে পর্দাখানা সরাতেই ঘরের ভেতর একেবারে এক ঝলক দপ্‌দপে রোদ্দুর এসে ঢুকলো। দিনের আলোয় সারা ঘর ভরে গেল! আমিও অবাক। তাড়াতাড়ি আমার স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখালুম। তিনিও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বললেন, এরা তা'হলে সত্যি কথাই বলেছিল। আমরা এখানে বেড়াতে আসবার আগে দেশটার সম্বন্ধে একটু পড়ে শুনে এলে ভাল হ'ত।

আমরা অবশ্য বরাবর তাই করি। এবার হঠাৎ ফিন্‌ল্যাণ্ডে এসে পড়ায় সব কিছু জেনে আসবার অবকাশ পাওয়া যায়নি। ফিনল্যান্ডের একটা বিশেষত্ব চোখে পড়লো যে এই দ্বীপকল্প দেশটিতে স্থলের চেয়ে জলের ভাগই বেশি। ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরের তীরে ছবির মতো মনোরম এই দেশ। তিনদিক সমুদ্রে ঘেরা। বাল্টিক সাগরের অসংখ্য খাঁড়ি এর মধ্যে ঢুকে পড়ায় শত শত লেক আর খাল সৃষ্টি হয়েছে। নৌকো নিয়ে যাতায়াতের সুবিধা হবে বলে কিছু কিছু খাল এরা খুঁড়েও তৈরি করেছে। জলাশয় এখানে চারিদিকে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হলে দু'চারটে খাল আর লেক পার হতেই হবে। এর জন্যে বারে বারে খেয়া পারের নৌকোয় ওঠা-নামা করতে হবে না। অসংখ্য সেতু নির্মাণ করে রেখেছে এরা। তার ওপোর দিয়ে মোটর, বাস্‌, লরি ট্রাক অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।

ফিনল্যান্ড উপদ্বীপের এই পর্বতসংকুল অরণ্যভূমি খুব উর্বরা। অসংখ্য সব বড় বড় গাছ এ্যাল্‌ডার, পাইন, এ্যাশ আর বার্চের ছড়াছড়ি। একেবারে জংগল হয়ে আছে। এখানে তাই কাঠের ব্যবসা খুব জোর চলে। এদের দেশে কয়লার খনি নেই। সব কিছু-ই কাঠের জ্বালে আর কাঠ কয়লায় চালায়। শুনে অবাক হবে হয়তো যে এদের ষ্টীমার, রেলগাড়ীর ইঞ্জিন পর্যন্ত কাঠের আগুনে চলে। এদেশে দেখবার মতো বেশি কিছু নেই। এক প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্যই ফিনল্যান্ডকে সকল দেশের রাণী করে রেখেছে। সমুদ্রের ধারে বন্দরের কাছেই এদের প্রাচীন পাথরের কেল্লা। কেউ বলে 'সুমিন্‌লিন্না' কেউ বলে 'সীবোর্গ'। বন্দরের দক্ষিণ ধার থেকেই শুরু হয়েছে হেল্‌সিন্‌কি শহর। বন্দরের পাশেই 'অবজার্ভেটারি হিল' বা মানমন্দিরের পাহাড়। এর ওপর উঠলে একেবারে সমুদ্র পর্যন্ত সারা শহরটা ছবির মতো দেখা যায়। বন্দরের একটু দূরেই শহরের বাজার হাট দোকান পাট। এখানটাকে বলে 'মার্কেট স্কোয়ার'। এর একধারে ফিনল্যান্ডের 'রাষ্ট্রপতি প্রাসাদ'। এর পরেই চৌমাথার মোড়। শহরের সমস্ত রাস্তা এখানে এসে মিলেছে। সব রাস্তাই বেশ চওড়া। দু'ধারে বড় বড় সব সুদৃশ্য বাড়ী। এ জায়গাটাকে বলে 'এস্‌প্ল্যানেড্‌'।

এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে একটি সুন্দর গোল পার্ক। ফুলে ফুলে ভরা। এই ফুল বাগানের মাঝখানে এরা কার প্রতিমূর্তি গড়ে রেখেছে জানো? কোনো রাজা উজীরের নয়, কোনো দুঃসাহসী বীর যোদ্ধার নয়, কোনও রাষ্ট্রনেতার নয়। এখানে রেখেছে তারা তাদের সর্বজনপ্রিয় জাতীয় কবি যোহান লুড্‌ভিগ্‌ রুনেবার্গের মর্মর মূর্তি। শহরে আর একটি সুন্দর পার্ক আছে—তাকে বলে এরা 'গ্রেট পার্ক' বড় বাগিচা। বড় বাগিচার একধারে ধাপে ধাপে উঠে চলেছে বিরাট এক সোপান-শ্রেণী। এই সিঁড়ি এসে পেঁছেচে এক বৃহৎ উপাসনা মন্দিরের দ্বারে। এটিকে এরা বলে 'বড় গির্জা'। এই গির্জার অপর দিকে ফিনল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ভবন। বড় পার্কের মাঝখানে আছে তাদের দেশের সে কালের "গ্র্যান্ড ডিউক" দ্বিতীয় আলেকজান্দারের মূর্তি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি স্থাপত্যকলার দিক থেকে ভারি চমৎকার। ব্যাঙ্ক অফ ফিন্‌ল্যাণ্ডের সামনে আর একটি বিরাট প্রতিমূর্তি দেখলুম। এটি হল ফিনল্যান্ডের জাতীয় জাগরণের সর্বজনপূজ্য নেতা স্নেল্‌ম্যানের। ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতার ইতিহাস পড়লে এঁর কথা তোমরা জানতে পারবে। এখান থেকে একটু দূরেই ফিনল্যাণ্ডের জাতীয় নাট্যশালা। হেল্‌সিন্‌কির সবচেয়ে অভিজাতপল্লী যাকে ওখানকার চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে, তার নাম 'রুনস্পার্কেন্‌'। বড় বড় সব বাগানওয়ালা গগনস্পর্শী অট্টালিকা এখানে। ফিনল্যাণ্ডের 'জাতীয় জাদু ঘরটি' দেখবার মতো। এখানে এলে ফিন্‌ল্যাণ্ডের আদিম অবস্থা থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ওদেশের যা কিছু সম্পদ এক নজরে চোখে পড়বে। 'শিল্প সংগ্রহশালাটি' দেখলে বোঝা যায় এরা কতবড় শিল্পীর জাত। আর্ট গ্যালারিকে এরা বলে 'আটেনিয়ম'। এখানে আদিকাল থেকে একাল পর্যন্ত রূপকলার ক্রমবিবর্তন চোখে পড়ে। এদের 'চিড়িয়াখানা' বা জু গার্ডেনে যে সব জীবজন্তু আছে তার মধ্যে উত্তরমেরুচারী পশু-পক্ষীই প্রধান। এরা বরফের দেশের প্রাণী। অন্য কোথাও নিয়ে গেলে বাঁচে না।

ফিনল্যান্ড দেখা আমাদের শেষ হয়ে গেল। প্রায় দিন পনেরো আছি এখানে। শেষের দিকে বৃষ্টি ছিল না। মেঘহীন আকাশ! রৌদ্র ঝল্‌মল্‌ দিন। এমনি সুন্দর দিনের এক রমণীয় প্রহরে আমরা একটি লেকের ধারে বেড়াচ্ছিলুম। হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে পরিষ্কার ইংরিজীতে জানতে চাইলেন আমরা কোন্‌ দেশের অধিবাসী? ফিরে দেখি একটি মহিলা। বয়স বেশি নয়। ফিনিশ মেয়ে বলেই মনে হ'ল। এঁদের ভাষা যদিও ফিনিশ কিন্তু অনেকেই বেশ ইংরিজী বলতে পারেন। বললুম তাঁকে আমাদের পরিচয়। তিনি ভীষণ খুশী হয়ে উঠলেন। মেয়েটি রূপসী বিদুষী এবং সুকন্ঠী। রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড ভক্ত। গীতাঞ্জলির অনেক কবিতা তাঁর কন্ঠস্থ। ইনি ফিনল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত মহিলা কবি। এঁর নাম কুমারী শিরকা সেলজা। তিনি ভারতকে ভালবাসেন শুনে আমার স্ত্রী তাঁর 'সেল্‌জা' নামের বদলে ভারতীয় নাম রাখলেন 'শৈলজা'। সেলজা আহ্লাদে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, কী চমৎকার! তারপর তিনি আমাদের ধরে নিয়ে গেলেন তাঁদের ক্লাবে। সেটা ফিনিশ লেখক-লেখিকাদের একটি সাহিত্য-সমিতি। সেখানে গিয়ে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল।

তাঁরা কেউ কেউ তাঁদের রচনা কিছু কিছু পড়ে আমাদের শোনালেন। শৈলজা সেগুলি ইংরিজীতে অনুবাদ করে দিলেন তারপর আমাদের লেখা কিছু শুনতে চাইলেন তাঁরা। সঙ্গে বই নেই আমার আবার নিজের লেখাও মুখস্থ থাকে না কিছু। আমার স্ত্রী সে যাত্রা মুখ রক্ষা করলেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ভাল। তিনি 'লীলাকমল' আর 'বনবিহগী' থেকে কিছু কিছু আবৃত্তি করে শোনালেন। আ

তার ইংরিজী অনুবাদ করে দিলুম। শৈলজা আবার তার ফিনিশ ভাষায় অনুবাদ করে দিলেন। এর ফলে মূল কবিতার রূপ হয়ত কিছু বদলে গেল. তবু, সেই শুনেই তাঁরা সবাই খুশী। আমাদের ও'রা না খাইয়ে ছাড়লেন না। বৈঠক শেষ হতে রাত বারোটা বেজে গেল। শৈলজা আমাদের সঙ্গে করে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। তাঁর একখানি কবিতার বই আমাদের উপহার দিলেন। বইখানির নাম "ভয়েস অফ ফিন্ল্যান্ড" অর্থাৎ ফিন্ল্যান্ডের কণ্ঠস্বর।

তার পরদিনই আমরা ফিনল্যান্ড ছেড়ে চলে এলুম এই অভিজ্ঞতা নিয়ে যে, পৃথিবীর সব মানুষই সমান। সাজে-সজ্জায় রূপে, রঙে, ভাষায় ও চেহারায় আমরা যেমনই হইনা কেন মনের দিক থেকে মানুষে মানুষে কোনো তফাৎ নেই। চিন্তারাজ্যে আমরা পরস্পরে এক। বিশ্বমানবের মধ্যে যে চিরন্তন মানবীয় ঐক্যবোধ সেই আনন্দানুভূতি নিয়ে আমরা বাড়ী ফিরলুম।

॥ স্কুলের কয়েকজন ছাত্র ॥

হাবুল ॥ তখনি বলেছিলাম, বিষ্যুৎবারের বারবেলা রওনা হয়ে কাজ নেই, তা শুনলো কে! হেডমাস্টার বললেন—যত সব কুসংস্কার!

ভেবুল ॥ কখন আবার এ সব কথা হ'ল?

হাবুল ॥ হয়েছিল—হয়েছিল। কিন্তু ফুটবল ম্যাচের নামে সব এমন মেতে উঠলে যে, আমার কথা কারো কানেই গেল না। অযাত্রায় রওনা হয়ে এখন প্যাঁজ-পয়জার দুই-ই হলো। বোঝ ঠেলা।

কাবুল ॥ কি আবার ঠেলা! খেলায় হার-জিৎ আছেই। দু'বার জিতেছি, একবার না হয় হেরেছি।

গণশা ॥ তা নয় তো কি? হার-জিতের কথা আমি ধরি না। প্রাণ-পণ খেলেছি। এবার হারলাম, আবার জিতবো। কিন্তু কি রকম বাড়িতে এরা আমাদের থাকতে দিয়েছে বলতো। আমরা হলাম গিয়ে গেস্ট। টাউনের সবচেয়ে ভালো বাড়িতে বাসা না দিয়ে কর্তারা যে বাড়িটিতে আমাদের থাকতে দিয়েছে—যতই রাত বাড়ছে ভয়ে যেন গাটা ছম্ ছম্ করছে।

পল্টু ॥ ও, তা' বুঝি জানো না?

অনেকে ॥ কি?

পল্টু ॥ এ টাউনে এ বাড়িটি ভুতুড়ে বাড়ি বলে একটু সুনাম আছে।

অনেকে ॥ সুনাম?

পল্টু ॥ হ্যাঁ, সুনাম। আমি সুনামই বলবো। অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে ভূতের সঙ্গে মোলাকাৎ করা। তাই আমি যেখানেই যাই খোঁজ নিয়ে থাকি। এখানেও নিয়েছি।

হাবুল ॥ কি খোঁজ পেলে?

পল্টু ॥ বাড়িটি দেখতে শুনতে তো মন্দ নয়। দালান বাড়ি। সামনে বাগান। পেছনে পুকুর। একদিকে খোলা মাঠ, আর একদিকে মরা নদী। বেশ নির্জন। বাড়ির মালিকের রুচিটা ভালো। স্বীকার করবে না কি?

ভেবুল ॥ হ্যাঁ, তা করছি। কিন্তু সেই সঙ্গে গা ছম্-ছম্ করছে।

হাবুল ॥ চাকর-বাকরগুলো আমাদের সব খাইয়ে-দাইয়ে চলে গেল নাকি?

ভেবুল ॥ হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কোনো সাড়া পাচ্ছি না তো ওদের!

হাবুল ॥ বাতি-টাতিগুলো জেলে দিয়ে গেছে এই যা রক্ষে।

ভেবুল ॥ ভাগ্যিস আজ অমাবস্যা-টমাবস্যা নয়। চাঁদ উঠেছে।

হাবুল ॥ কটা বাজলো?

গণশা ॥ ন'টা।

কাবুল ॥ আমি কি বোকামি করেছি। দলের সবাই সিনেমা দেখতে গেল। এত ডাকাডাকি করলো—কেন গেলাম না?

ষষ্ঠী ॥ তাই তো কেন গেলাম না? জলের কুঁজোটা কোথায়?

পল্টু ॥ কেন, এরই মধ্যে গলা শুকিয়ে গেল নাকি?

ষষ্ঠী ॥ না-না, ঠিক তা' নয় তবে কিনা—

[অনেকেই হাসিয়া উঠিল]

হাবুল ॥ কিন্তু পল্টুবাবু, বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ি কেন, সেটা কিন্তু বলোনি।

পল্টু ॥ মনের মত বাড়ি তৈরি ক'রে সে বাড়িতে মালিক যদি বাস না করে তবেই বুঝতে হবে—কিছু আছে।

হাবুল ॥ সেটা কি?

পল্টু ॥ এ বাড়িতে ভূত আছে।

সকলে ॥ ভূত?

ষষ্ঠী ॥ এই বাড়িতে?

পল্টু ॥ হ্যাঁ এই বাড়িতে। তাই বাড়ির মালিক অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন ক'লকাতায়। বাড়িটা ভাড়া দেওয়ার জন্য এতকাল এত চেষ্টা করেছেন, বাড়িটা ভালো আর ভাড়াটা কম বলে অনেকে এ বাড়ি ভাড়াও নেয়, কিন্তু টিকতে পারে না কেউ।

হাবুল ॥ কার কাছে শুনলে তুমি এ সব?

পল্টু ॥ এখানকার টাউন ক্লাবের ক্যাপ্টেন মৈনাক চৌধুরী নিজে আমাকে বলেছে।

ভেবুল ॥ পল্টুর সঙ্গে ঠাট্টা করেছে।

গণশা ॥ হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়। জেনে-শুনে কি এমন বাড়িতে এই ভদ্রলোকের ছেলেদের ওরা থাকতে দিতো?

ভেবুল ॥ যত সব গুল। নাও হে, তাসজোড়া নিয়ে বসা যাক।

হাবুল ॥ ঠাট্টাটা মৈনাকবাবু করেননি, করছেন আমাদের পল্টুবাবু। আমাদের ভূতের ভয় দেখিয়ে একটু রসিকতা করার চেষ্টা।

গণশা ॥ ঠিক বলেছ হাবুলদা। ভূতের মত চেহারা কিনা তাই আমাদের পল্টুবাবু সবখানেই ভূত দেখেন।

হাবুল ॥ যা বলেছিস গণশা। একবার কি হয়েছিল জানিস না? হরিণঘাটায় খেলতে গিয়ে বাস মিস করেছি। হেঁটে যাচ্ছি সবাই স্টেশনে ট্রেন ধরতে। অন্ধকার রাত। পল্টু

ক্যান্দানী দেখাতে গিয়ে জোর কদম হে'টে আমাদের পিছে ফেলে এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূরে। অন্ধকার রাতে ওর ঐ চেহারা দেখে—

হাবুল ॥ জানি জানি। একদল চাষী রাম রাম বলে ছুটতে ছুটতে এসে আমাদের হাতে পায়ে ধরে বলে আমাদের ভূতের হাত থেকে বাঁচান। গিয়ে দেখি সে ভূতটি আর কেউ নয়, আমাদের পল্টুরাম। [সকলের হাসা]

পল্টু ॥ খুব ঠাট্টা হচ্ছে যে। (হঠাৎ রাগে চীৎকার করিয়া উঠিয়া) তোমরা কি বলতে চাও ভূত নেই?

হাবুল ॥ আছে। জগতে একটি মাত্র ভূতই আছে তার নাম পল্টু গাঙ্গুলী।

পল্টু ॥ বটে! যদি আমি তোমাদের ভূত দেখাতে পারি।

হাবুল ॥ ভূতেই ভূত দেখে। তুমি দেখতে পারো, আমাদের দেখার কথা নয়।

পল্টু ॥ (অধিকতর দৃঢ়তায়) যদি আমি তোমাদের ভূত দেখাতে পারি?

অনেকে ॥ কোথায়?

পল্টু ॥ এখানে।

অনেকে ॥ কখন?

পল্টু ॥ এই এখন।

হাবুল ॥ আমরা দেখছি।

ষষ্ঠী ॥ কই?

হাবুল ॥ (পল্টুকে দেখাইয়া) ঐ তো!

[সঙ্গে সঙ্গে পল্টু ব্যাঘ্রবিক্রমে হাবুলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। খানিকটা লড়াই হইতেই কয়েক-জন মাঝে পড়িয়া উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিল।]

পল্টু ॥ (হাবুলকে) আমি বাজি রাখছি, যদি তোমাকে আমি এখনি এখানে ভূত দেখাতে না পারি, দশ টাকা দেব। আর যদি দেখাতে পারি তুমি আমাকে দশ টাকা দেবে। (পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া গণশার হাতে দিয়া) এই আমার টাকা গণশার হাতে জমা রাখলাম। যদি মরদ হোস তুই তোর টাকা ওর হাতে জমা রাখ।

হাবুল ॥ রাজি হতাম, কিন্তু আমার টাকা নেই। তাই তোর বাজি আমি ধরতে পারলাম না।

ষষ্ঠী ॥ ওরে বাবা, বাঁচা গেল।

ভেবলু ॥ না-না বাঁচা যাবে কেন? হাবুলদা তোমার টাকা নেই, আমরা তোমাকে টাকা দিচ্ছি।

হাবুল ॥ না ভাই, ও সব ধার-টারের মধ্যে আমি নেই।

কাবুল ॥ না-না, ধার কেন? আমরা চাঁদা তুলে তোমাকে দশ টাকা দিচ্ছি। যদি হারো, তোমাকে এ টাকা ফেরৎ দিতে হবে না। আর যদি জেত, কাল সকালে দশ টাকার রাজভোগ।

হাবুল ॥ দে। দেখি ও কত বড় ভূত, যে আমাকে ভূত দেখায়।

পল্টু ॥ দেখাচ্ছি। তোমরা আর কেউ দেখতে চাও?

অনেকে ॥ না বাবা।

গণশা ॥ ভূত দেখার চেয়ে ভূত না দেখে বাজিমাৎ করাই ভালো।

ষষ্ঠী ॥ জলের কুঁজোটা কোথা?

পল্টু ॥ এখনই গলা শুকিয়ে গেল? ঐ যে জলের কুঁজো ওখানে।

[ষষ্ঠী গিয়া জল খাইতে লাগিল]

ভেবলু ॥ আমাকেও এক গ্লাস দিস।

কাবুল ॥ এক গ্লাস আমাকেও দিতে পারিস। বড্ড গরম পড়েছে আজ।

পল্টু ॥ তাহলে হাবুল, তুমি রেডি?

হাবুল ॥ আমি সব সময় রেডি।

পল্টু ॥ জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও। ঐ মরা নদীর দিকে চেয়ে দেখ।

হাবুল ॥ দেখছি। হাঃ-হাঃ হাঃ— নদীর জল চাঁদের আলোতে চিক্ চিক্ করছে। হাঃ-হাঃ হাঃ— এই তোমার ভূত?

পল্টু ॥ বালুর ওপর দিয়ে এ দিকে কে এগিয়ে আসছে?

হাবুল ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ কে আবার আসছে? তোমার মাথা খারাপ হতে পারে তাই তুমি হয়ত খোয়াব দেখছো। হাঃ-হাঃ হাঃ—দশ টাকার রাজভোগ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পল্টু ॥ চুপ! হাসি এখনই বেরিয়ে যাবে। জানালার বাইরে চেয়ে দেখ কে!—

হাবুল ॥ এ কি! ওটা কি তাল গাছ? না-না, তালগাছ এখানে আবার কোথায়? তবে ওটা কি!

ষষ্ঠী ॥ (কাঁপিতে কাঁপিতে) আমার প্যান্ট খসে যাচ্ছে। তোমরা কেউ বেঁধে দাও না।

পল্টু ॥ চুপ! কি দেখছো হাবুল!

হাবুল ॥ তাল গাছের মত একটা লোক। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, আগুনের ভাঁটার মত দুটো চোখ—এগিয়ে আসছে আমার দিকে। (হঠাৎ আর্তনাদ করিয়া উঠিল) উঃ—গেলাম, আমি গেলাম।

[পল্টু বাদে অন্যান্য সকলে 'ওরে বাবা রে' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে কক্ষ হইতে পলায়ন করিল। হাবুল কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুট আর্তনাদে মাটিতে পড়িয়া গিয়া গোঙাইতে লাগিল।]

পল্টু ॥ এই হাবুল ওঠ। ওরা সব পালিয়েছে।

হাবুল ॥ (মাটি হইতে তড়াক করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া) পালিয়েছে! যাক, দশ টাকা রোজগার হলো। কাল সকালেই রাজভোগ।

পল্টু ॥ নারে হাবুল, এ দশ টাকা আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা ফাণ্ডে জমা দেব। জানিস তো, বিদেশী ভূতগুলোর অত্যাচার বড্ড বেড়ে যাচ্ছে। চুপ! ওরা ফিরে আসছে। তুই শুয়ে পড়। আমি ভূত তাড়াবার মন্ত্র আওড়াবো। তুই ধীরে ধীরে চোখ মেলবি, তারপর উঠে বসবি, তারপর বলবি ভূত আছে, দেখেওছিস। আর আমি বলবো, ভূতের তাড়াবার একমাত্র উপায় মনে সাহস আনা; আর বুক ঠুকে বলা—'ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ সঙ্গে আছে করবি আমার কি?'

[হাবুল পুনরায় শুইয়া পড়িল। পল্টু উপরোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। সভয়ে সঙ্গিগণের পুনঃপ্রবেশ।]

গণশা ॥ বেঁচে আছে তো?

পল্টু ॥ তা আছে। কিন্তু আমার টাকা—

[গণশা সভয়ে পল্টুর হাতে তাহার প্রাপ্য দশটি টাকা দিল। পল্টু মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যাইতে লাগিল। হাবুল ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। পল্টুর নির্দেশে সঙ্গিগণও মন্ত্র উচ্চারণে যোগ দিল—অবশেষে ঐ মন্ত্র কণ্ঠে সমবেত নৃত্য।]

॥ যবনিকা ॥

অনেক—অনেক কাল আগে এক গাঁয়ে থাকতো এক চাষী। র নাম কুয়াকো। কুয়াকোর একটি মাত্র ছেলে ছিল। তার নাম কুমা।

গাঁয়ের আশে-পাশে ঘন বন-জঙ্গল। বাপ-বেটা তার খানিক টেকুটে পরিষ্কার করে দু'খানি ক্ষেত তৈরি করে। ক্ষেত দু'খানা য় ফসলও বোনে। কিন্তু চাষীর এমনি কপাল যে, আকাশ থেকে ক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়লো না। তাই যেখানে যত ক্ষেত ছিল সব খাঁ করতে লাগলো।

একদিন তিকুমা মাঠে যেতে যেতে দেখে একটা গাছের তলায় কজন বেঁটে-খাটো লোক বসে রয়েছে। তার পিঠে মস্ত এক কুঁজ। তিকুমা বলে, 'গড় করি কত্তা। তা আপনার কোথায় থাকা হয়?'

লোকটি বলে, "আমাকে সবখানেই দেখা যায়। আমার কথা হয়তো শুনেছো। আমি হলুম, ওনিয়ানকোপনের কুঁজো।"

তিকুমা বলে, "হাঁ, হাঁ, আপনার কথা অনেক শুনেছি বটে। সকলেই বলে, আপনি অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন।"

কুঁজো ঘাড় নাড়ে।

তিকুমা বলে, "তা আপনি আমার একটু উপকার করুন না। আমি অনেক ফসল বুনেছি। এদিকে বৃষ্টি নেই। সব জ্বলে গেল।"

কুঁজো বলে, "বটে। তোমার বৃষ্টি দরকার? তুমি ঠিক মানুষকেই পাকড়েছো। তা আমি তোমার বৃষ্টির উপায় করে দিতে পারি। কিন্তু তোমার একটি কাজ করতে হবে বাপু। গাছ থেকে একটি ছোট্ট ডাল ভেঙে আনো। তাই দিয়ে আমার কুঁজে আস্তে আস্তে ঘা মারো। খুব আস্তে মারবে। খবরদার! যেন জোরে মেরো না। জোরে মারলে আমার ভয়ানক লাগবে।"

তিকুমা কুঁজোর কথামতো গাছের একটি ছোট্ট ডাল ভেঙে আনে। তারপর, ডালটি দিয়ে কুঁজোর কুঁজে আস্তে আস্তে ঘা মারতে থাকে। আর অমনি তার ক্ষেতের ওপর বৃষ্টি ঝরে ঝর-ঝর, ঝর-ঝর। জল পেয়ে বীজগুলো প্রাণ পায়।

তিকুমা বলে, "এবার আমার ভাল ফসল উঠবে, তাহলে।"

কুঁজো বলে, "তোমার উপকারে লেগেছি। তাই আমি ধন্য।" বলেই সে মিলিয়ে যায়।

তারপর দিন যায়, বেশি দিন নয়, মোটে কয়েকটা দিন। কুয়াকো আর তিকুমা চলেছে ক্ষেতের দিকে।

তিকুমা তার বাবাকে জিগ্যেস করে, "তোমার ক্ষেতের কি অবস্থা?"

কুয়াকো বলে, "অবস্থার কথা আর কি বলবো? দেখতেই তো পাচ্ছো। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই। তোমার খবর কি?"

তিকুমা বলে, "ভালই। চারাগুলো দেখা দিয়েছে। দিন কয়েক আগে বৃষ্টির জল পেয়ে আমার ভারি উপকার হয়েছে।"

কুয়াকো অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে "বৃষ্টি? বৃষ্টির জল পেয়েছিস? কি করে বৃষ্টি হলো? কোথায় পেলি বৃষ্টি? তোর বৃষ্টির জলের কথা আমায় বলতেই হবে। আমি তোর ক্ষেত দেখতে যাবো। চল্।"

কথায় কথায় দু'জনে তিকুমার ক্ষেতে এসে পৌঁছয়। দু'জনে দেখে ঠিক সেই গাছটির তলায় সেই বেঁটে-খাটো কুঁজো লোকটা বসে রয়েছে।

কুয়াকো তাকে জিগ্যেস করে, "কে ওখানে?"

কুঁজো বলে, "আমি ওনিয়ানকোপনের কুঁজো। বৃষ্টি তৈরিতে আমি একদম ওস্তাদ।"

কুয়াকো চীৎকার করে ওঠে, "ভারি মজা! তাহলে তুমিই তিকুমার ফসল ভাল করেছো? আমার ক্ষেতেও তোমায় বৃষ্টি এনে দিতে হবে। চল, আমার ক্ষেতে চল।"

কুয়াকো কুঁজোকে তার ক্ষেতে নিয়ে যায়। ক্ষেতে পৌঁছে বলে, "দেখছো, আমার একেবারে ফসল হয় নি। আমার বৃষ্টির খুব দরকার।"

কুঁজো বলে, "বহুৎ আচ্ছা! তুমি বৃষ্টি পাবে। একটা কাজ করতে হবে তোমায়। গাছ থেকে একটা ডাল ভেঙে এনে তাই দিয়ে আমার পিঠের কুঁজে আস্তে আস্তে ঘা মারবে। কিন্তু খবরদার! যেন জোরে মেরো না। তা হলে আমার খুব কষ্ট হবে।"

কুয়াকো লোকটা বেজায় লোভী। মনে মনে বলে, তিকুমার চারাগুলো অনেক বড় হয়েছে। ওর চেয়ে আমার খুব ভাল ফসল ফলাতে হবে। আমার আরও বেশি বৃষ্টি চাই।

সে গাছ থেকে একটা খুব মোটা ডাল ভেঙে আনে। তারপর তাই দিয়ে কুঁজোর পিঠে খুব জোরে জোরে ঘা মারতে থাকে।

আর কুঁজো চীৎকার করে ওঠে, "অত জোরে মেরো না।"

কুয়াকো জবাব দেয়, "তোমার কষ্ট হচ্ছে কি না তা আমার দেখার দরকার নেই। আমার বৃষ্টি চাই—সেটাই আসল।" এই বলে সে কুঁজোর পিঠে আরও জোরে ঘা দেয়।

আর অমনি কুয়াকোর ক্ষেতের ওপর মুষলধারায় বৃষ্টি পড়তে থাকে। দেখতে দেখতে কুয়াকোর সারা ক্ষেত জলে ভেসে যায়।

কুয়াকো চীৎকার করে ওঠে, "আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। হায় হায় সব ফসল ভেসে গেল!"

ততক্ষণে বেঁটে-খাটো লোকটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। এদিকে কুয়াকোর ক্ষেতখানা এক গভীর হ্রদে পরিণত না হওয়া অবধি সে বৃষ্টি থামলো না।

এখনও আফ্রিকায় সেই হ্রদ দেখা যায়। ওটা হচ্ছে অতি লোভের ফল।

আলপনা : রুবী ঘোষ

হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সকালবেলা উদো ও বুধো বাগানে ফুল তুলছিল। কে নাকি বলেছে মালীর তুলে দেওয়া ফুলে দেবতার পুজো করলে যে পুণ্য হবে নিজের তুলে দেওয়া ফুলে পুজো করলে তার দ্বিগুণ পুণ্য হবে। রাজ্যহীন রাজা উদো আর কর্মহীন মন্ত্রী বুধো তাই প্রতিদিন নিজেরাই বাগানে ফুল তোলে।

এমন সময় সামনের পথে একদল গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে দেখা গেল। হাতে একতারা কাঁধে ঝুলি পরনে আলখাল্লা। উদো বুধোকে দেখে বাগানের ফটকের সামনে এসে তারা একতারা বাজিয়ে গান ধরলো—

জলদ বরণ কানু দলিত অঞ্জন তনু
উদয়িছে শুধু সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর চিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখে নাহি সয়।

গান গায় আর নাচে।

উদো বললো—তোমরা কে গো?

আমরা বাউল।

—নাম গান করি। ভিক্ষে করি। বৈরাগী।

—তা তোমরা এতো লোক যাচ্ছ কোথা?

—কেঁদুলি। জয়দেবের মেলায়। বছরে বছরে একবার সেখানে আমরা সবাই জমায়েৎ হই।

—জয়দেব কে?

—জয়দেব কে জানো না? বাংলাদেশের রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় রাজকবি ছিলেন। মস্ত ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এসে তাঁর কবিতা মিলিয়ে দিয়ে যেতেন। তাঁর জন্মস্থানে বছরে বছরে মেলা বসে কেঁদুলি গাঁয়ে। আমরা যাই।

বাউল আবার নেচে নেচে গান ধরলো—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

উদো বললো—বাঃ এমন গান তো শুনিনি।

বাউল বললো—এ গান আরেক রাজকবির রচনা। মিথিলার রাজকবি কবি কন্ঠহার বিদ্যাপতি ঠাকুর।

উদো বললো—সব রাজারই কি এক-একজন করে রাজকবি থাকতো?

বাউল বললো—রাজকবি না থাকলে রাজাকে গান শোনাবে কে? রাজার গুণ গাইবে কে?

—রাজার গুণ গাওয়ার ব্যাপারটা কী?

—রাজা যা কিছু ভালো কাজ করবেন তা দেশশুদ্ধ প্রজাকে জানাতে হবে তো? রাজকবি তাই জানাবে গান বেঁধে।

উদো এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলো। বাউলদের বিদায় দিয়ে বুধোকে বললো—বুধো, আমার সভায় তো কোন রাজকবি ছিল না। কিন্তু রাজকবি ছাড়া তো রাজসভা হয় না। আমি তো অনেক ভালো কাজ করেছি, রাজকবি না থাকায় সে সব কথা তো লোকে জানে না। আজই হবুচন্দ্রকে বলি একজন রাজকবি রাখতে।

উদো সেই দিনই হবু রাজাকে বললো—রাজসভায় রাজকবি চাই।

হবুচন্দ্র বললো—মন্ত্রী, রাজকবি চাই।

গবুচন্দ্র হুকুম দিল, কোটাল নগরে ঢাক পিটিয়ে দিল—রাজসভার জন্য রাজকবি চাই, কবিরা রাজসভায় এসে রাজার সঙ্গে দেখা করুন।

বাংলাদেশে সবাই কবিতা লেখে, যে লিখতে জানে না সে-ও মুখে মুখে ছড়া বাঁধে। পরদিন রাজসভায় ভীড় জমে গেল। হবুচন্দ্র বললো—আঁ, আমার রাজ্যে এতো কবি! এর মধ্যে বেছে নেবো কাকে?

গবুচন্দ্র দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—আমি ঠিক বেছে নেবো, আপনি শুধু কবিতা শুনুন।

তারপর কবির দলের পানে তাকিয়ে বললো—এক একজন কবি এক একটা কবিতা বলুন, আমরা শুনে বিচার করবো!

প্রথম কবি চাদরের নীচে থেকে একখানি মোটা খাতা বের করলো। বললো—আমি তাহলে পড়তে শুরু করি।

গবুচন্দ্র বললো—ওই সবখাতাখানা পড়বেন নাকি?

—হ্যাঁ, এ এক মহাকাব্য। পড়তে সময় লাগবে তিনদিন।

—না না, ছোট কিছু পড়ুন।

—ভালো কাব্য ছোট হয় না। ভালো কবিতা মানেই বড় কবিতা—মহাকাব্য।

দ্বিতীয় কবি পিছনে ছিল, বললো—কেন হবে না? জাপানের সেরা কবি ছ'টি শব্দ দিয়ে শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখেছেন—বৃষ্টি পড়ে, পুকুর পার, ব্যাঙের লাফ। ব্যাস, একখানি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

প্রথম কবি গর্জে উঠলো—তোমার মাথা হলো। মিল, অলঙ্কার ভাব রস ছন্দ,—এসব না থাকলে কবিতা হয় না।

দ্বিতীয় কবি বললো—শুধু ওগুলো কেন, আরো অনেক কিছু চাই, মিল থাকলেই ফ্যাক্টরি থাকবে, অলঙ্কার থাকলেই রমণী থাকবে, ভাব থাকলেই আড়ি থাকবে, রস থাকলেই রসগোল্লা থাকবে, ছন্দ থাকলেই—

—কী! কাব্য বিচার নিয়ে ফাজলামো? প্রথম কবি বাধা দিয়ে চীৎকার করে উঠলো—এক থাপ্পড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দোব।

—দ্বিতীয় কবি বললো—শুধু মারলে তো মিল হয় না, মিল হয় মারা-মারিতে, মারলে মার খেতেও হয়, তবে কাব্য হয়—প্রহারকাব্য।

বটে! প্রথম কবি লাফিয়ে পড়লো দ্বিতীয় কবির ঘাড়ে। মারামারি বেধে গেল। যারা চারিপাশে ছিল, তারা এবার এগিয়ে এলো দুজনকে ছাড়িয়ে দিতে। সোরগোল পড়ে গেল।

হবুচন্দ্র বললো—এ কী?

গবুচন্দ্র বললো—কোটাল এদের বের করে দাও!

কোটাল সবাইকার গলা ধাক্কা দিয়ে রাজসভা থেকে বের করে দিল।

এবার থামের আড়াল থেকে গুটি গুটি একটি লোক বেরিয়ে এলো, বললো—

মহারাজ শ্রী হবুচন্দ্র মহামহিম, প্রণাম হই,
একটি কণা করুণা পেলে খেয়ে পরে বাঁচিয়া রই!

হবুচন্দ্র অবাক হলো, বললো—তুমি কে?

লোকটি বললো—

গরীব প্রজা কেউ চেনে না, থাকি আমি নন্দী গাঁয়

আপন মনে ঘরের কোণে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
কবিরাজ কুলে জন্ম, নাম কালিদাস
রাজকবি হতে মোর মনে অভিলাষ।

হবুচন্দ্র বললো—না না, আর রাজকবির দরকার নেই, রোজ সকালে রাজসভায় হল্লা-মারামারি দেখতে পারবো না।

কালিদাস বললো—

কবি থাকলেই থাকতে হবে কবির লড়াই,
শাস্ত্রে আছে এই কথা অন্যথা এর নাই।
আগে আসে মহাকাব্য, কবির লড়াই পরে
সবার শেষে গীতি-কাব্য মন হরণ করে।
মহাকাব্য কবির লড়াই, হয়ে গেল শেষ
এবার আমার গীতিকাব্য শুনে বলবেন—বেশ।

গবুচন্দ্র বললো—বেশ শোনাও তোমার গীতিকাব্য।

কালিদাস বলতে সুরু করলো—

রাজা মোদের হবুচন্দ্র করুণা-সাগর
তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্র দয়া-সরোবর।
রাজসভা আলো করি থাকেন বসিয়া
গগনের চন্দ্র-সূর্য পড়েছে খসিয়া।
প্রজাগণ আছে সুখে কোন কষ্ট নাই
অন্নবস্ত্র চিন্তা ছাড়া সুখী যে সবাই।
ঘরে চাল নেই কারো রাতে দেখে তারা
ঘরে বসে শীতে রোদ পোহায় প্রজারা।
বারো মাস কাজ নেই, শুধু খোস্ গল্প,
এমন সুখের রাজা দেখা যায় অল্প।

হবুচন্দ্র বললো—বাঃ, বেশ কবিতা, এ তো ভাল কবি।

গবুচন্দ্র বললো—দাঁড়ান মহারাজ, একটু পরীক্ষা করে দেখি। কবি তো রাজার কবিতা শোনালো, একটা মন্ত্রীর কবিতা শোনাক।

কালিদাস বললো—

মন্ত্রী গবুচন্দ্র 'পরে শাসনের ভার
বুদ্ধির জাহাজ তিনি, ভাবনা অপার।
নিদ্রাকালে চিন্তা শুধু প্রজাদের সুখ,
রাত্রিকালে আট ঘন্টা থেকে যান মূক।
দীর্ঘকাল ভেবে-চিন্তে করেন প্রচার
দুঃখ যত অদৃষ্টের হরিনাম সার।
জীবনটা মায়া শুধু, কর্ম কর ক্ষয়
ইহলোকে কর শুধু পুণ্যের সঞ্চয়।
খাওয়া পরা ভাগ্য যার, সেই সব পায়
সকলের ভাগ্যে সব জোটানো কি যায়?
খাও আর নাই খাও, সুখে থাকো সবে,
ইহলোকে খেয়ে পরে কিবা লাভ হবে?
প্রজারা বুঝেছে বাণী, করে হরিনাম
মহামন্ত্রী গবুচন্দ্র, লউন প্রণাম।

গবুচন্দ্র খুশি হয়ে হাসলো, বললো—বেশ, এবার রাণীকে নিয়ে কবিতা বল।

কালিদাস বললো—

রাজা এক হলে চলে, নয় রাণী চাই—
পাটরাণী রাজকাজে বিব্রত সদাই
সুয়োরাণী দুয়োরাণী ছাড়া গল্প নাই।
মেথরাণী চাকরাণীর—সেবা ও সাফাই,
কেরাণী কলম পেষে দিন রাত ধরে,
হায়রাণী ছাড়া রাজ্য চলবে কি করে?
পারাণীর কড়ি চাই নদী পারে যেতে,
ময়রাণী লুচি ভাজে বাঁস দিনে রেতে।
আরো কত রাণী আছে জানিনা সবারে
শক্তি নাই সবাকার গুণ বর্ণিবারে।
অক্ষমেরে ক্ষমা কর রাজা মহাশয়,
ছোট মুখে বড় কথা উচিত না হয়।

কালিদাস থামলো, হবুচন্দ্র বললো—বাঃ, চমৎকার। আমি তোমাকেই আজ থেকে সভাকবি করলাম, তুমি হলে রাজকবি।

কালিদাস হাত জোড় করে বললো—মহারাজ, তাহলে একটা বালিশ আনিয়ে দিন।

হবুচন্দ্র বললেন—বালিশ? বালিশ কি হবে?
—মাথাটা রাখতে হবে।

—ওঃ, কবিতা ভাবতে গিয়ে মাথা ব্যথা করছে বুঝি? ওরে কে আছিস শীগ্‌গীর রাজকবির জন্য একটা বালিশ এনে দে—

একজন চাকর ছুটে গিয়ে একটা বালিস এনে দিল।

কালিদাস বালিশটিকে নীচে রেখে তার উপর মাথা দিয়ে পা দুখানি শূন্যে তুলে দিল। সবাই তো অবাক, লোকটা পাগল নাকি?

হবুচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠলো, বললো—এ কী?

কালিদাস বললো—আপনার আদেশ শিরোধার্য করলাম।

—তার মানে?

—আপনি যে আমায় উল্টে দিলেন মহারাজ, আমি কবিরাজ আপনি করে দিলেন রাজকবি, কাজেই আজ থেকে আমাকে উল্টে চলতে হবে। মাথা থাকবে নীচে, হাঁটতে হবে পিছনে। আপনার আদেশ তো অমান্য করতে পারি না।

—মুখ দিয়ে রক্ত উঠে যাবে যে?

—আজ্ঞে রাজার আদেশে প্রাণ অবধি চলে যায়, রক্ত ওঠা তো কিছুই নয়।

—বেশ বেশ, তোমার রাজকবি হবার দরকার নেই, তুমি কবিরাজই থাকো।

কালিদাস পা নামিয়ে এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো, বললো—

এবে মোর নিবেদন করি করজোড়ে
আজ থেকে মহাকবি করে দিন মোরে।
পুরাকালে মহাকবি ছিল কালিদাস
দু নম্বর মহাকবি হতে মোর আশ।

রাজা হবুচন্দ্র বললো—বেশ তবে তাই হোক।

কালিদাস বললো—

ছিনু এতদিন কালিদাস কবিরাজ
কালিদাস দু নং মহাকবি হনু আজ।
জয় হবুচন্দ্র মহারাজ!
রাজগুণে গান করা হলো মোর কাজ

সভাসদেরা প্রতিধ্বনি তুললো—জয় হবুচন্দ্র মহারাজ!

ওঠো হে ওঠো মৌমাছি ভায়া! ঘুম তাড়াও। তাড়াতাড়ি হাত বাড়াও—টেবিল থেকে কাগজ নাও, কলম নাও। ঝটপট্ পাততাড়ির পুজোর লেখাটা ভাই লিখে দাও। "শুনছিলুম এই কথাগুলো ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে। হঠাৎ কারা যেন ধাক্কা দিলে আমায়। হে'ইও মারি! হে'ইও মারি ক'রে বেদম জোরে। কানের লতিতে, নাকের ডগাতে চিমটিও কাটলে যেন কারা! নাক-কান জ্বলে উঠল চিড়বিড় করে। কিন্তু আমি তখনও ঘুমের ঘোরে। চোখ বুজেই তাকিয়ে আছি ড্যাব্ ড্যাব্ ক'রে। স্বপনবুড়োর গলা খাঁকাড়ি খেয়েই খুচরো কুচো স্বপ্নগুলো সব পালিয়েছে হুড়মুড় দুড়দুড় করে।"

স্বপনবুড়ো দাদা তোমাদের কাছে যান বাণী নিয়ে, আজগুবি স্বপ্ন নিয়ে খুশি করতে। সভা করতে, বক্তৃতা দিতে। আমার ঘুমের মধ্যে ঐ সব করতে এলে আমিও খুশি হতুম। কিন্তু তাতো নয়! পুজোর আগে প্রতি বছর তিনি আমার ঘুম ভাঙান, তাগিদ জানান।

তাই স্বপনবুড়ো চড়াও হয়েছেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন তাড়াতে। আমার টনক নাড়াতে।

কাজেই ঘুম আমার ইস্পিটলে গড়া হলেও চিড়্ খেয়ে গেল স্বপনবুড়োর ডাকাডাকিতে। আর পুরোপুরি ভেঙে চুরমার হলো—নিতু, মিঠু, শঙ্কর-টঙ্করের হাঁকাহাঁকিতে।

ঘুম ভাঙতেই—দু'চোখের কপাট চিচিং ফাঁক! তাকিয়ে দেখি ছোট্ট বন্ধুরা ঘেমেটেমে একশা! চোখে মুখে তাদের রাগ অভিমানের রকমারি নক্সা। আমিও চোখ রগড়ে, মুখ মুছে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম।

"কি ব্যাপার রে তোদের!" শঙ্কর টং করে বলে উঠলো "নামটা 'মৌমাছি' হলে কি হবে! ঘুমটা তো হাতির মতন?"

ফট্‌কে আঙুল মট্‌কে—জিভ উলটিয়ে বললে—"হবে না কেন? নামে কিবা আসে যায়। মৌমাছি ভায়ার দেহটা কেমন!"

বড্ড রাগ হলো! একে কাঁচা ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপর এইরত্তি ছেলেদের মুখে অমন হাড়-পিত্তি জ্বালানো কথা! তক্কাপোষে বসে হাতের মাসেলগুলো শক্ত করে, বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল নাচাতে নাচাতে রীতিমতো খিঁচিয়ে উঠলুম। বললুম—"জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধুভাণ্ড" পড়ে ভেবেছ সবজান্তা হয়ে গেছ? বলতো তোরা হাতির ঘুমের কতটুকু জানিস?"

মিঠু পট্ করে বলে বসলো—"তোমার ঘুম ভাঙাতে গিয়ে এইটুকুই শুধু জেনেছি যে হাজার ঠেলাঠেলি আর চিমটি চিৎকারেও হাতির ঘুম ভাঙে না।"

আমি বললুম—"কিসসু জান না মুখ্যুর দল। হাতির ভারি সজাগ ঘুম। আশপাশে কেউ উস্‌খুস্ করলে বা এতটুকু শব্দ পেলেই হাতি জেগে ওঠে।"

"'জেগে ওঠে' কথাটা তোমার একদম ভুল হলো মৌমাছি। ঐ দেহ নিয়ে ওঠা কি সহজ বাবা! ঘুম তার ভাঙতে পারে, জাগতেও পারে কিন্তু সে উঠতে পারে না চট করে।" বলে উঠল শঙ্কর।

আমার রাগ জল হয়ে গেল—শঙ্করের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে। আমাকেই হার মানতে হলো। বলতেই হলো—

"ঘুমের পর হাতি যখন জাগে তখন শুয়ে শুয়ে বারকতক ঢেউয়ের মতো দোল খেয়ে হাঁটুতে ভর করে তবে উঠতে পারে।"

অন্তুর ছোট ভাই কিন্তু এতক্ষণ বুড়ো আঙুল চুষছিল—ফস্ করে আঙুল নামিয়ে জিগ্যেস করে বসলো "হাতিরা শুয়ে শুয়ে ঘুমোয় মৌমাছি ভাই?"

অন্তুর কথাগুলো আধো-আধো, ভারি মিষ্টি। তাই ওর কথারও জবাব দিতে হলো। বলতে হলো, "সব হাতি শুয়ে ঘুমোয় না রে। পছন্দ মতো শোবার জায়গা পেলে তবে শোয়। না হলে হাতিরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোয়। এক একটা হাতির এমন খেয়ালও থাকে—যে একদম তারা শুয়েই ঘুমোয় না।"

অন্তু বললে—"তেমন হাতি তুমি চোখে দেখেছ মৌমাছি?"

চোখে দেখিনি ভাই বইতে পড়েছি—ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুইয়ের একটা হাতি ছিল। সে হাতিটা পাঁচ বছর একদম শোয়নি। যখন তার ঘুম পেতো—সে তার মাথাটার ভর রাখার জন্যে, বড় বড় দাঁত দুটো তার হাতিশালের পাথরের চাঙড়ের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে ঘুমুতো।

ফচ্‌কে ফটকে ছোঁড়া ফক্কুড়ি করে প্রশ্ন করে বসলো— হাতিরা যখন ঘুমোয় তখন তোমার মতো নাক ডাকায়? স্বপ্ন দেখে?

"হ্যাঁরে হ্যাঁ! হাতিরা শুধু নাক ডাকায়, আর স্বপ্নই দেখে না। তোর মতো দুঃস্বপ্ন, ভয়ের স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে ভয়ে গাঁক গাঁক করে হাঁক ডাকও ছাড়ে। কথাটা বিশ্বাস না হয়—সার্কাসের লোকদের মাহুতদের জিগোস করে দেখতে পারো।" রীতিমতো রেগেমেগেই জবাব দিলুম আমি।

অন্তু বললে—"জানো মৌমাছি? আমাদের ভুলো কুকুরটা আর হুলো বেরালটা ঘুমুতে ঘুমুতে নাক ডাকায় রকমারী শব্দ করে, আমি নিজে কানে শুনেছি।"

অন্তুর পিঠ চাপড়ে বললুম, "সাবাস ভাই। এইতো চাই। চোখ কান খুলে সব জিনিস দেখলে-শুনলে আমরা আসল জ্ঞান পাই।"

নিতু এতক্ষণ একটিও কথা কয়নি। বয়সটা ওর আগের চেয়ে এ ক' বছরে বেড়েছে। আর কিছু কিছু বইটইও পড়ছে। তাই নি আজকাল বড় বেশি প্রশ্ন করে আমাকে জ্বালাতন করে না। কি আর সে চুপ করে থাকতে পারলে না। নিতু হেসে বললে—"তাই ব দিনরাত চোখ-কান খুলে রেখে জ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করোনা কে ঘুমোনো চাই—নিয়মিত, তা না হলে পাগলা হয়ে যেতে হবে। ত জন্তু-জানোয়ার সবাইকেই ঘুমুতে হয়। কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দি সব্বাই ক্ষেপে যায়। চটে যায়।"

মিঠু আমার গা ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো—মিষ্টি হেসে বললো "তুমি নিশ্চয় ক্ষেপে গেছ? চটে গেছ? আমরা তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলুম।"

'নারে না! এতটুকুও চটিনি।

'বুঝেছি মৌমাছি, এবার তাহলে স্বপনবুড়োকে এই হা

ছোট্ট দ্বীপ। চারিধার ঘিরে যতদূর দেখা যায় শুধু জল আর জল! ডাঙ্গা আর জলের যেখানে মিতালী—তার খুব কাছেই নারকেল আর ঝাউগাছের সারি। নীল আকাশ আর নীল সমুদ্র যেখানে মিশে রয়েছে—প্রতিদিন সকালে সোনালী আলো ছড়িয়ে দেখা দেয় সূর্যি ঠাকুর- গাছের পাতায়, মাটির ঘাসে, বাড়ীর ছাদে, ধানের ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে মুঠো মুঠো সোনালী আলো। পাখিরা গান গেয়ে ওঠে। রাতের ঘুমের শেষে জেগে ওঠে ছোট্ট দ্বীপ।

অশান্ত নীল সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট টিয়ারঙ শান্ত দ্বীপ। সমুদ্রের কল্লোল কোলাহল দ্বীপের মানুষের কানে পৌঁছয়, কিন্তু তাদের সুখে-দুঃখে গড়া জীবনে লাগে না অশান্তির ঢেউ। একই ধারায় বয়ে চলে তাদের প্রতিদিনকার জীবনের স্রোত। কেউ কাস্তে হাতে, কেউ লাঙ্গল কাঁধে—মাঠের ফসল তোলে, ধান বোনে, কেউ হাল্কা নৌকায় পাল তুলে ভেসে পড়ে নিঃসীম সমুদ্রের বুকে। ঢেউ-এর নাচন লাগে নৌকার গায়ে, বাতাস ভর করে পালের বুকে—তরতর করে এগিয়ে যায় ছোট্ট হাল্কা পালতোলা নৌকার সারি। দিনের শেষে আবার আকাশ সমুদ্রের গায়ে ছড়িয়ে পড়ে আবীর গোলা রঙ। সেই রঙের আলোতে ফিরে আসে নারকেল গাছে নরম পালকওয়ালা পাখির দল, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে ওঠে, মন্দিরে শুরু হয় সান্ধ্য আরতি—তার কাঁপন লাগে তীর ছোঁওয়া সমুদ্রের অশান্ত জলে, ঘরের মানুষেরা ফিরে আসে একে একে—আকাশের গায়ে লক্ষ তারার রোশনাই। মানুষের মনে অফুরন্ত আনন্দ, নিশ্চিন্ত জীবন নির্ভয় ঘরকন্না।

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন গেঁথে চলে বছরের মালা—তাতে বৈচিত্র্য নেই আছে নির্ভয় নিশ্চিন্ত অবসর।

একদিন নীল সমুদ্রের জলে দেখা দিল কালোছায়া। প্রকাণ্ড পাঁচখানা জাহাজ এসে নোঙর করলো দ্বীপের কাছাকাছি। জাহাজের মাস্তুলে বিদেশী নিশান। অচেনা মানুষজন। অজানা ভাষা। নীল জলে কালোর ছায়া। শান্ত নিস্তব্ধ জীবনে অশান্তির ঢেউ? কে জানে!

বড়দের চোখে মুখে উদ্বেগের চিহ্ন—দ্বীপের রাজা আর পাত্র-মিত্ররা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোন দুশ্চিন্তা, কোন উদ্বেগ নেই রাতামিয়ার মুখে মনে। প্রতিদিনকার মত বন্ধুদের নিয়ে সে যায় ঝিনুক কুড়োতে। বালির ঢিবি তৈরী করতে ছুটোছুটি করে বেড়ায়—কোনও ভয়-ডর নেই মনে, শাসনও মানে না। জাহাজের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে জঙ্গী ফৌজের লোকেরা—রাতামিয়া সব ভুলে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে জাহাজের দিকে। সব অচেনা মুখ, কিন্তু তাদের মধ্যেই সে খুঁজে বেড়ায় অতিপরিচিত একটি চেহারা। ক—তো দিন চলে গেছে, তবু ভুলতে পারে না সেই মুখখানি। রাতামিয়া তখন খুব ছোট—তবু সেদিনটির কথা তার স্পষ্ট মনে আছে। তার চেয়ে কতই বা বড় হবে? বড়জোর চার বছর বড় তার দাদা—একদিন নৌকায় ভেসে পড়েছিল সমুদ্রের বুকে। রাতামিয়া বারণ করেছিল, কিন্তু শোনেনি তার কথা। সে নৌকা আর ফিরে এলো না, দাদাকে সে আর দেখতে পায়নি। মা কিছু বলেন না শুধু চোখের জল ফেলেন আর সমুদ্রের দিকে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নেন। বাবা খুব রাশভারী, কোন হা হুতাশ কেউ তাকে কোনদিন করতে শোনেনি—তবু রাতামিয়া জানে, এক-একদিন নিশুতি রাতে যখন তার ঘুম ভেঙ্গে যায় তখন শুনতে পায় ঝড়ের মাতন লাগা সমুদ্রের আর্তনাদের চেয়েও গভীর বাবার বুক থেকে বার হওয়া দীর্ঘশ্বাস।

একদিন জাহাজের পাশ থেকে নেমে এলো ছোট এক নৌকা। তার আরোহী মাত্র একজন—তীরের দিকে এগিয়ে এলো নৌকার আরোহী। রাতামিয়ার বন্ধুরা ছুটে পালিয়ে গেল, কিন্তু রাতামিয়া পালানো দূরের কথা, প্যায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো নৌকার দিকে। চেয়ে রইল সেই আরোহীর দিকে। অজানা অচেনা অদেখা সেই আরোহী। কেউ কারুর ভাষা জানে না। তবু তাদের মধ্যে প্রথমদিনেই গড়ে উঠলো বন্ধুত্বের সেতু। তারপর দিনেও তীরে ভিড়লো সেই বিদেশী নৌকা—এগিয়ে গেল রাতামিয়া—তার মনে হলো হ্যাঁ, এতো আমার দাদার বয়সীই—তার মধ্যেই সে খুঁজে পেতে চাইলো হারানো দাদাকে।

সেদিন রাতে বাড়ীতে বহু লোকের আনাগোনা। সকলের মুখে-চোখে একটা চাপা উত্তেজনা। ফিসফাস কথাবার্তা, গোপন কি সব পরামর্শ। পরামর্শ রাতামিয়ার কাছে গোপন রইল না। সে শুনতে পেলো রাজার পাত্রমিত্ররা স্থির করেছেন যে এই বিদেশীদের মতলব একটুও ভালো নয়, এরা এসেছে তাদের ধনরত্ন লুঠ করতে, দু-চার দিনের মধ্যেই তারা সুরু করবে আক্রমণ। দ্বীপের অধিবাসীরা সম্মুখ যুদ্ধে তাদের রুখতে পারবে না। তাই গোপনে স্থির হয়েছে যে পরদিন বিদেশীদের জাহাজে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হবে রাজার পক্ষ থেকে—রাজা তাদের নিমন্ত্রণ করবেন ভোজসভায় যোগ দিতে। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তারা যখন নিঃসংশয়ে আসবে রাজবাড়ীতে তখন নিরস্ত্র তাদের উপর রাজার সৈন্য আর দ্বীপের অধিবাসীরা ঝাঁপিয়ে পড়বে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে—নির্মূল করবে তাদের লুঠপাটের পরিকল্পনা। রাতামিয়া ভাবে আর শিউরে ওঠে—নীল সমুদ্রের জলে বিদেশী জাহাজের কালো ছায়া—তারপর সেই বিদেশীর রক্তে রাঙানো দ্বীপের পথঘাট। সেই সঙ্গে তার মনের চোখে ভেসে ওঠে অচেনা বিদেশী বন্ধুর মুখখানি।

রাতের অন্ধকার তখনও কাটেনি। আকাশের বুক থেকে সবেমাত্র অন্ধকারের পর্দা একটু সরতে আরম্ভ করেছে—পাখিরা তখনও তাদের পাতায় তৈরী বাসায় নরম পালক বিছিয়ে আধঘুমন্ত, নারকেল গাছের আগায় তখনও সোনালী আলোর আভা জেগে ওঠেনি। রাতামিয়া এসে দাঁড়ালো সমুদ্রের ধারে, শান্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্র—জাহাজের কালোছায়া ভোরের আধোঅন্ধকারে তখন গম্ভীরতর। রাতামিয়া ভাবে অন্ধকার আরো একটু পাতলা হোক, জাহাজের ঘুম কেটে যাক। কিন্তু বেশী দেরী হয়ে যাচ্ছে নাকি? ঐ তো শুকতারা

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

রমের খবরই জানাচ্ছে।" ঘাড় নেড়ে বললে মনুয়া। আমি নাক ঝেড়ে বললম—হুম।

সঙ্গে সঙ্গে মনুয়া মিঠুয়া তার বন্ধুর দল বললে—"চল রে চল! মৌমাছি স্বপনবুড়োর কাছে আমাদের কথাই লিখে পাঠাবে। সবাই পড়বে, কি মজা হবে!"

ওরা পালিয়ে গেলো—আমার লেখাটাও হয়ে গেলো।

উৎসাহে কি না হয় — কি না হয় চেষ্টায়?

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

"বা—সন নিবে গো? —বা-সন?..."

মাথায় একটা টুকরির ওপর একগাদা বাসন নিয়ে 'বাসনউলী' দুপুরবেলা দরজার গোড়ায় এসে হাঁক দিল।

টুনু উঠোনের ধারে ঘুর ঘুর করছিল। উঠোন-ভর্তি আমের আচার শুকোচ্ছে, মা একটু চোখ বুজলেই খপ্ ক'রে একদলা তুলে দৌড় দেবে। বাসনউলীর হাঁক শুনে সে ছুটল মায়ের ঘরের দিকে। —"মা, মা! সেই বুড়ী বাসনউলী এসেছে। কত কি এনেছে দেখবে এস। তুমি যে বলেছিলে এলে ডাকতে।"

মা ঘুমের আয়োজন করছিলেন, উঠে এলেন। বাড়ীতে অনেক ছেঁড়া কাপড় জমে গেছে, ওর বদলে কিছু বাসনপত্র কিনলে মন্দ হয় না। এটা ওটা সেটা কতই তো লাগে! আর, নগদ পয়সা খরচ না করে পুরোনো কাপড় দিয়ে এসব জিনিষ কেনা—কলকাতার গিন্নীদের এটা একটা মস্ত সুবিধে। সখও বলা যেতে পারে।

"কি এনেছ দেখি? নামাও তো টুকরি।"

বাসনউলী হাসিমুখে টুকরীর নামিয়ে বলল, "বাসন নিবেন তো? এই দেখুন ডেকচি আছে, কড়া আছে, বোগ্নো আছে, গেলাস আছে, বাটি, সস্প্যান্ যা চান। সব খাঁটি আলমিনির তৈরী।"

টুনু এবার ফ্যাক্ ক'রে হেসে ফেল্ল—"আলমিনি কি গো? বল অ্যালুমিনিয়াম।"

বাসনউলী একটুও লজ্জিত না হয়ে বল্ল, "ও তোমাদের বড়লোকের কাছে ঐ নাম। আমরা মুখ্যু মানুষ, আমরা আলমিনিই বলব।"

মা টুনুকে ধমক দিলেন, তারপর টপ করে ছোট-বড় কয়েকটা ডেকচি তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগলেন। সাদা—ঠিক সাদা নয়, ঝকঝকে রুপোলী ধাতুর তৈরী, সূর্যের আলো পড়ে আরো ঝলমল করছে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ইচ্ছে করে গোটা টুকরিটাই নিয়ে নি।

একটু দরাদরি হ'ল, "বড্ড বেশী কাপড় চাইছ তুমি!" —মা বললেন।

"না মা ঠাকরুণ. সব জিনিষই এখন আক্কারা। এই দেখুন না, এ বাসন তো ওজন দরে বিক্কিরী হয়। এক সময়ে ৪।৫ টাকা সের দরেও কিনেছি—তিন-চার পয়সা করে তোলা। আর আজ ন' টাকা দশ টাকা হয়ে গেছে সের।... যাঃ, সের বলে ফেললাম, সের তো আর নেই এখন সব কিলো বলতে হবে; নইলে নাকি প্যায়দা এসে কিলোবে।"

বাসন দিয়ে চলে গেল বাসনউলী। মা মুগ্ধদৃষ্টিতে ঝকমকে হাল্কা বাসনগুলোর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সেগুলো যথাস্থানে সাজিয়ে রাখতে গেলেন। টুনুও চল্‌ল পিছু পিছু।

বাস্তবিক অ্যালুমিনিয়ামের বাসন আজকাল সমস্ত সংসারই ছেয়ে ফেলেছে। অবশ্য পেতল-কাঁসা যে একদম উঠে গেছে তা নয়, কিন্তু তাদের চলন ক্রমেই কমছে। তার কারণ, অ্যালুমিনিয়ামের বাসন যে অপেক্ষাকৃত সস্তা তাই-ই নয়, যেমন মজবুত, শক্ত, তেমনি হাল্কা। আর দেখতেও চমৎকার। আরও নানান রকম সুবিধে আছে এর। অথচ বছর পঞ্চাশেক আগে, যদি খোঁজ নাও, দেখবে ক্বচিৎ ২।১টি আধুনিক পরিবার ছাড়া এদেশে অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার তো দূরের কথা, অনেকে হয়তো ওর নামই শোনে নি। যারা ব্যবহার করত তাদেরও, শুনেছি, কত লোক সাবধান করে দিত—"খবরদার, ওসব ফ্যাশনের মধ্যে যেওনি; ওতে রাঁধলে পরে দু'দিন পরেই সমস্ত খাবার বিষাক্ত হয়ে যাবে। শেষটায় একদিন বাড়ীশুদ্ধ লোক—ফট্।"

কিন্তু কথাটা যে একেবারেই ঠিক নয়, বেমালুম মন-গড়া আশঙ্কা, লোকে তা ক্রমে ক্রমে দেখে শিখল। বরঞ্চ দেখল, ঠিক উল্টো। ফলে অ্যালুমিনিয়ামের চাহিদা দিন-কে-দিন বেড়েই চলল। আজ বোধ হয় এমন বাড়ী নেই যেখানে বেশীর ভাগ রান্নাবান্নাই অ্যালুমিনিয়ামের বাসনে সারা না হচ্ছে। ইয়োরোপের অনেক অঞ্চলে তো বেশীর ভাগ লোকে বোধহয় ধাতুর বাসন বলতে এখন একমাত্র

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

ফিকে হয়ে আসছে. গাছের পাতার আড়ালে শুরু হয়ে গেছে পাখির প্রভাত কাকলি। সোনালী আভাও দেখা দিয়েছে আকাশের গায়ে। আর দেরী নয়। ঐ তো জাহাজের রেলিঙ-এর ধারেও অস্পষ্ট মূর্তির আনাগোনা।

রাতামিয়া ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে। সমুদ্রের বুকে ছোট একটু আলোড়ন—কিন্তু তাতেই যেন ধ্যান ভঙ্গ হলো সমুদ্র দেবতার—চারদিকে ঢেউ-এর মাতামাতি, হাত পা অসাড় হয়ে আসছে—তবু এগিয়ে চলেছে রাতামিয়া জাহাজ লক্ষ্য করে—কতটুকুই বা দূরত্ব—তবু পার হতে পারবে কি ছোট মেয়ে রাতামিয়া? আরো এগিয়ে গেল—কিন্তু আর এগোবার শক্তি তার নেই—ওঃ কি প্রচণ্ড এই ঢেউ-এর বেগ। এবার তলিয়ে যাচ্ছে রাতামিয়া— ছোট্ট দুটি হাত তুলে ধরলো আকাশের দিকে কিন্তু তারপরেই আবার আরও একটা ঢেউ-এর প্রবল আঘাত! আর কিছু মনে পড়ে না রাতামিয়ার।

তারপর চোখ মেলে দেখলো তার কাছে বসে আছে তার বিদেশী বন্ধু, জাহাজের সব কটি লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। রাতামিয়ার মনে হলো অনেকখানি সময় হয়তো পেরিয়ে গেছে—তার চোখে ভেসে উঠলো নীল সমুদ্র, কালোছায়া, লাল রক্ত। বিদেশী বন্ধুকে মনের ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে বল্লে রাতামিয়া—রাজার আমন্ত্রণ গ্রহণ করো না তোমরা, পালিয়ে যাও, অধর্মের হাত থেকে বাঁচাও আমার দেশকে।

রাতামিয়ার আবেদন ব্যর্থ হলো না। তাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল জাহাজের গা থেকে ঝোলানো নৌকা—রাজার আমন্ত্রণও এসে পৌঁছলো! কিন্তু বিদেশীরা প্রত্যাখ্যান করলো সে আমন্ত্রণ—ফিরে গেল তারা, কেটে গেল নীল সমুদ্রের বুক থেকে জাহাজের কালোছায়া।

রাতামিয়া সেদিন নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঁচালো ছোট দ্বীপের ধর্ম, তবু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলো না তার স্বাধীনতা। বিদেশী জাহাজ আবার ফিরে এলো—সমুদ্রের বুকে দেখা গেল কালো জাহাজের অশুভ ছায়া। সেই জাহাজ থেকে নেমে এলো বিদেশী দস্যুর দল। শুরু করলো তারা ধ্বংসের তাণ্ডব। দ্বীপের শান্ত জীবনকে তারা অশান্তির বন্যায় ভাসিয়ে দিলো। সে বন্যায় ভেসে গেল মলাক্কা দ্বীপ, তার ঘর-বাড়ী, তার স্বাধীনতা, আর ভেঙে গেল রাতামিয়ার স্বপ্ন—গড়ে উঠলো পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি। সে সাম্রাজ্যের কাহিনী লেখা আছে ইতিহাসের রক্তক্ষরা পাতায়—কিন্তু ইতিহাসের সোনার তরীতে ঠাঁই পায়নি রাতামিয়া।

অ্যালুমিনিয়ামের বাসনই দেখছ। শুধু বাড়ীর কাজে নয়—কল-কারখানায়, বিশেষতঃ রাসায়নিক শিল্পে নানারকম মালমশলা তৈরী করতেও এই অ্যালুমিনিয়ামের সরঞ্জাম না হলে চলে না।

অ্যালুমিনিয়াম জিনিষটা কি প্রশ্ন করলে তোমরা সবাই এক-বাক্যে বলবে—ওটা একটা ধাতু—যেমন লোহা, তামা, দস্তা, সীসে, সোনা, রুপো—ও সেইরকম আর কি! কিন্তু ঐসব ধাতুরই একটা করে বাংলা নাম আছে। ইংরেজীতে আয়রন বললেও বাংলায় আমরা লোহাই বলি। স্টীলকে বলি ইস্পাত। তেমনি কপারকে বলি তামা, জিঙ্ককে বলি দস্তা, লেডকে বলি সীসে, গোল্ডকে সোনা, সিলভারকে রুপো ইত্যাদি। কিন্তু 'অ্যালুমিনিয়াম' নাম শুনেই বোঝা যায় ওটি একটি খাঁটি ইংরেজী বা বিদেশী শব্দ। ওর বাংলা কি? ওর বাংলা নেই। অ্যালুমিনিয়ামের বাংলা অ্যালুমিনিয়াম। এর কারণ? কারণ আর কিছুই না, এই ধাতুটির কথা অনেকদিন লোকে জানত না। মাত্র শ' দেড়েক বছরও হয়নি, ওর আবিষ্কার হয়েছে।

তার আগে বলোনি নামটা কি করে হ'ল।

অনেক—অনেককাল আগে ভূমধ্যসাগরের কাছে ইটালির আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে একরকম খনিজ পদার্থ (যাকে আমরা এখন বলি 'মিনারেল') পাওয়া যেত—যা নাকি ওখানকার লোকেরা ওষুধ-পত্র আর রঞ্জনশিল্পে প্রচুর ব্যবহার করত। তখন রোমানদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। তারাও জিনিষটার খুব কদর করত আর তারাই ওর নাম রেখেছিল 'অ্যালুমেন'। কিন্তু জিনিষটা যে আসলে কি তা কেউ জানত না। এর বহু—বহুদিন পরে ইংল্যান্ডের একদল বিজ্ঞানী মাটীর সঙ্গে এ্যাসিড মিশিয়ে ঠিক ঐ ধরনের একটা জিনিষ তৈরী করে ফেললেন আর চেহারা ও গুণের সাদৃশ্য দেখে তার নাম দিলেন 'অ্যালুমিনা'। কিন্তু এই 'অ্যালুমিনাই' বা কি পদার্থ? কেউ জবাব দিতে পারল না।

ইংল্যান্ডে সেই সময় হামফ্রী ডেভীর বিজ্ঞানী হিসাবে খুব নাম। তিনি জিনিষটা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষে বললেন, "এ তো দেখছি অক্সিজেনের সঙ্গে একটা অজানা ধাতু মিলে তৈরী হয়েছে। ঐ অজানা ধাতু সম্বন্ধে তিনি অনেক ভবিষ্যদ্বাণী শোনালেন, এমন কি তার একটা নামকরণও করলেন, কিন্তু জিনিষটা আলাদা করে বার করে ফেলা—যাকে বলা হয় "আবিষ্কার করা"—তা করতে পারলেন না। কি নাম দিলেন ডেভী ঐ অজানা ধাতুর? অন্যান্য ধাতুর বেশীর ভাগই নাম হয়েছে লাটিন বা গ্রীক ভাষায় আর সেই নামের শেষে একটা করে 'য়াম' প্রত্যয় দিয়ে। সেই অনুযায়ী ডেভীও ঐ অনাবিষ্কৃত ধাতুর নামকরণ করলেন, "অ্যালুমিনিয়াম"।

কিন্তু ডেভী যা পারেন নি সে কাজ হাসিল করলেন আর একজন বিজ্ঞানী—ওয়রস্টেড্। সে ১৮২৫ সালের কথা। অবশ্য ওয়রস্টেডের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হোলারও ঐ ধাতু আবিষ্কার করে ফেললেন।

অ্যালুমিনিয়াম তো আবিষ্কার করা হ'ল কিন্তু সাধারণ লোকের তা কোন কাজেই এল না। জিনিষটা শুধু বিজ্ঞানীদের কাছেই একটা কৌতূহলের সামগ্রী হয়ে রইল। এর কারণ,—এককুচি অ্যালুমিনিয়াম্ বার করতে এত খরচ পড়ত যে তা আর কহতব্য নয়। এক সের অ্যালুমিনিয়ামের দাম পড়ে যেত কম করে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা। ঐরকম দামী ধাতু দিয়ে সাধারণ লোকে কি করবে? মেয়েরা হয়তো গয়না গড়াতে পারে—এই পর্যন্ত। ফলে অ্যালুমিনিয়াম আপাততঃ বিজ্ঞানীর মিউজিয়ামেরই শোভা বর্ধন করতে লাগল শুধু। আর লোকে কেবল জানল, হ্যাঁ, ঐ নামে একটা ধাতু আবিষ্কার হয়েছে,—তবে বড় দুষ্প্রাপ্য ধাতু।

অথচ, এদিকে পরীক্ষা করে যে সব খবর বেরুতে লাগল তাও কম আশ্চর্যজনক নয়। আমাদের পৃথিবীতে নাকি এত অ্যালুমিনিয়াম আছে যে অন্য কোন ধাতুই তার ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না। পৃথিবীর আস্তরের ১০০ ভাগের ১৩ ভাগই নাকি অ্যালুমিনিয়াম। কেবলমাত্র অক্সিজেন আর সিলিকন্ (বালির উপাদান) ছাড়া অন্য কোন মৌলিক পদার্থই নাকি পৃথিবীর বুকে অতটা নেই। আমাদের চারপাশের পাহাড়-পর্বত, শিলা-পাথর, এমন কি ধুলো-মাটীর মধ্যে পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম। শুধু কি তাই? যেসব দামী দামী পাথর, জহরৎ দেখে আমরা মুগ্ধ হই—দেদার টাকা দিয়ে কিনি, যেমন ধর পদ্মরাগ, মরকত ইত্যাদি মণি—তার মধ্যেও নাকি রয়েছে এই অ্যালুমিনিয়াম্! তবে বুঝি তার জন্যই অ্যালুমিনিয়ামের এত দাম? মোটেই নয়। তাহ'লে তো ধুলো-মাটীরও অনেক দাম হ'ত!

কিন্তু মণি-জহরৎ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই, ধুলো-মাটী নিয়েও নয়। কথা হচ্ছিল অ্যালুমিনিয়াম নিয়ে। খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম্ ধাতু,—যার একসেরের দামই অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা। সেই কথাই বলি।

কিংবা, তার পরেই যে অদ্ভুত কাণ্ডটা ঘটল, সেই কথা।

আমেরিকার ওবার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। কেমিষ্ট্রি, অর্থাৎ কিনা রসায়ন শাস্ত্রের ক্লাস হচ্ছে। নানারকম ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা করতে করতে কথায় কথায় অধ্যাপক মশাই বললেন, "পৃথিবীতে কত অদ্ভুত দুষ্প্রাপ্য ধাতুই না আছে, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে—শিল্পে-বাণিজ্যে কাজে লাগাতে না পারলে তাদের কোনই সার্থকতা নেই। এই ধর না কেন অ্যালুমিনিয়াম্। আমাদের চারধারে প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম্ ছড়িয়ে আছে, কিন্তু আছে নানা জিনিষের সঙ্গে মিশে—যাকে রসায়নের ভাষায় বলে যৌগিক অবস্থায়—'কম্পাউণ্ড'ভাবে। তা থেকে সস্তায় তা বার করার উপায় কারো জানা নেই। অ্যালুমিনিয়াম তাই আজও একটা দুষ্প্রাপ্য ধাতু হয়েই রয়েছে। আজ যদি কেউ সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম বার করবার প্রণালী আবিষ্কার করতে পারে তা হলে সে জগতের একটা মস্ত উপকার করবে আর নিজেও হয়ে যাবে ক্রোড়পতি। কিন্তু তা কি আর সহজে হয়—?"

ক্লাসের এক কোণে বসে ছিল একটি শান্তশিষ্ট ছেলে—চার্লস হল্। ছোকরা বয়স, কিন্তু অসম্ভব মনের জোর। কথাটা ভারী মনে লাগল তার। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল—'আমি করব এই কাজ। দেখি পারি কিনা।'

কিছু দিন পরেই হল্ কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে এলেন এবং তখন থেকেই তাঁর একমাত্র ধ্যান-ধারণা কি ক'রে সহজ উপায়ে সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম বার করা যায়। আর সমস্ত কাজ ফেলে রেখে এই নিয়ে গবেষণা সুরু করে দিলেন তিনি।

এখন, যারা ধাতুবিজ্ঞানের একটু-আধটু খবর রাখে তারাই জানে যে কোন কোন ধাতু আছে যা তাদের যৌগিক পদার্থ (অর্থাৎ অন্য জিনিষের সঙ্গে রাসায়নিক ভাবে মেশানো অবস্থা) থেকে বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে পৃথক করে ফেলা যায়। কিন্তু তার আগে সেই যৌগিক পদার্থটিকে গলিয়ে তরল করে ফেলা দরকার। যে সব খনিজ পদার্থের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম বেশী পরিমাণে আছে সেগুলির নানা নমুনা সংগ্রহ করে হলের পরীক্ষা চলল। এই সবের মধ্যে বক্সাইট নামে একটি খনিজ পদার্থ ছিল—অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন আর জল দিয়ে তৈরী। এই বক্সাইটকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডে, যার আর এক নাম অ্যালুমিনা—পরিণত করা খুব কঠিন নয়। কিন্তু তার পরের কাজটাই কঠিন। সেই অ্যালুমিনাকে গলিয়ে ফেলা। এমনি না গললে আর কিছুর মধ্যে গুলে গলিয়ে ফেলতে হবে। হল্ আবার নানা জিনিষ নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। শেষে একদিন দেখলেন ক্রায়োলাইট নামে আর এক রকম খনিজ পদার্থকে খুব গরম ক'রে তার মধ্যে এই অ্যালুমিনা মিশিয়ে তেমনি ভাবে গরম করলে জিনিষটা গলিয়ে ফেলা যায়। এই ক্রায়োলাইটের মধ্যে কিন্তু খানিকটা অ্যালুমিনিয়াম আছে। এজন্য অবশ্য খুব প্রচণ্ড উত্তাপের দরকার। হল্ কিন্তু বৈদ্যুতিক চুল্লীর

সাহায্যে এ কাজটা সহজেই হাসিল করে ফেললেন। দেখা গেল ৯৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপে কাজটা সহজেই সম্পন্ন হতে পারে।

তারপর? তারপর সেই উত্তপ্ত ক্রায়োলাইটের মধ্যে অ্যালুমিনা গালিয়ে নিয়ে সেই উত্তপ্ত অবস্থায়ই তার মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ চালিয়ে দিলেন হল। বিদ্যুতের প্রচণ্ড শক্তি অ্যালুমিনার অ্যালুমিনিয়াম আর অক্সিজেনকে ভেঙ্গে পৃথক ক'রে দিল আর হল ঐ দুটি অংশকে কৌশলে আলাদা আলাদা পথে বার করে নেবার ব্যবস্থা করলেন। দেখতে দেখতে রাশি রাশি অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের কোণে জড় হ'তে লাগল। টন টন অ্যালুমিনিয়াম। এক টন মানে প্রায় ২৮ মণ। খরচ কিন্তু সেই তুলনায় এমন কিছুই বেশী হল না। হলের বয়স তখন কত? বড়জোর বাইশ কি তেইশ। অর্থাৎ এইভাবে একটি ২২।২৩ বছরের ছেলে সস্তায় প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম বার করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করে সারা জগৎকে তাক লাগিয়ে দিলেন। তার মাত্র ছ' মাস আগে তিনি কলেজের পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছিলেন।

চার দিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আর্থিক লাভের কথা বাদ দিলেও হলের এই আবিষ্কার শিল্পজগতে এক যুগান্তর নিয়ে এল। যে অ্যালুমিনিয়াম এত দিন একটা দুষ্প্রাপ্য ধাতু ব'লে বিজ্ঞানীর মিউজিয়ামে আলমারীতে বন্ধ হয়ে ছিল এবার সর্বসাধারণের প্রয়োজনে তা ছড়িয়ে পড়ল বাজারে। চারদিকে গড়ে উঠতে লাগল অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা। দেখতে দেখতে এক সের অ্যালু-মিনিয়ামের দাম তিন হাজার টাকা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল তিন টাকার কাছে। হলের আবিষ্কারের কয়েক মাস পরে হেরোলৎ নামে একজন ফরাসী বিজ্ঞানীও সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম বার করার একটি প্রণালী আবিষ্কার করলেন। কিন্তু খ্যাতিটা হলেরই হ'ল বেশী এবং তা তাঁর পাওনাও ছিল।

অ্যালুমিনিয়ামকে দুষ্প্রাপ্য ধাতু বললে তোমরা আজ হাসবে। আর সত্যি ২২।২৩ বছরের একটি তরুণের বাহাদুরীর জন্য ঐ দুষ্প্রাপ্য জিনিষটি এত সহজলভ্য হয়েছে এ যেন আমাদেরই বিশ্বাস হতে চায় না! কিন্তু সত্যি যা তা অস্বীকার করবে কে?

শিল্পে, বাণিজ্যে কত রকম কাজে আজকাল অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু বাসনপত্র তৈরী নয়—অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্য ধাতু, যেমন তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি মিশিয়ে যে মিশ্র ধাতু বা "অ্যালয়" তৈরী হচ্ছে গুণে তা কোন কোন দিক দিয়ে ইস্পাতকেও ছাড়িয়ে গেছে। লোহার চেয়ে অনেক হাল্কা, আরও টেকসই অথচ একটুও মরচে পড়ে না, ইচ্ছে মত পিটিয়ে চাদর তৈরী করে যে কোন আকৃতি দেওয়া যায়—এই রকম কত গুণ তার! মজবুত কলকব্জা গড়তে, এরোপ্লেনের নানা অংশ তৈরী করতে এর জুড়ি নেই। আজকাল আবার অ্যালুমিনিয়ামের ফার্ণিচার, এমন কি বাড়ী-ঘরও তৈরী হচ্ছে। বৈদ্যুতিক তার ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রয়োজনেও প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম কাজে লাগানো হচ্ছে। অ্যালু-মিনিয়ামের গুঁড়ো তেলে গুলে যে ঝকঝকে রুপোলী রং তৈরী হচ্ছে তা নিশ্চয়ই দেখেছ?

তোমাদের এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলে দি। আগেই বলেছি আমাদের চারপাশে—পাথরে, ধুলোয়, এমন কি মাটিতে পর্যন্ত প্রচুর অ্যালুমিনিয়াম ছড়ানো আছে অন্য জিনিষের সঙ্গে মিশেল হয়ে। কিন্তু তা থেকে সস্তায় অ্যালুমিনিয়াম বার করবার প্রণালী আজও আবিষ্কৃত হয় নি। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি একটু বড় হয়ে সেই উপায়টা বার করে ফেলতে পার তা হ'লে অ্যালু-মিনিয়াম তখন মাটির দামেই বিকোবে। যে করতে পারবে সে তো পয়সার দিক দিয়ে "লাল" হয়ে যাবেই, চাই কি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটা নামও রেখে যেতে পারবে। চেষ্টা করে দেখো না!
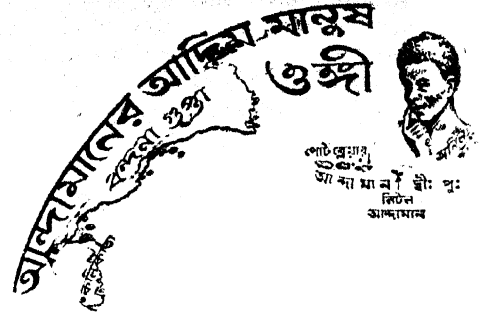
বঙ্গোপসাগরের মানচিত্রে যে কতকগুলো কালির ছিটেফোঁটার মত দেখা যায় ঐ গুলোই যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। কিন্তু ওখানে যদি তোমাদের যেতে বলা হয় তবে ভয় পেয়ে যাবে তো? আমিও যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম আন্দামানের নাম শুনেই ভয় পেতাম—জানতাম খুনী আসামী ও গুরুতর অপরাধীদের নির্বাসন দেওয়া হয় ওখানে, আর ওখানকার জংলী আদিবাসীদের সামনে পড়লে প্রাণ নিয়ে আর ফিরে আসা যায় না। এই আন্দামানে বড় হয়ে যখন আমার যাওয়ার সুযোগ হল তখন কি রকম ভয় আর কৌতূহল নিয়ে গেলাম বুঝতেই পারছো। পৌঁছে দেখি চোখের সামনে যেন এক রূপকথার রাজ্যের দরজা খুলে গেল। আমাদেরই ভারতবর্ষে এমন সুন্দর যে একটি বেড়াবার জায়গা আছে কই সে কথাতো আগে জানতুম না। সবুজ বনানীতে ঢাকা পাহাড়, নীল সমুদ্র, উদার উন্মুক্ত আকাশ—যেদিকে তাকাই এর অপরূপ শোভায় চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে, ঢিলেঢালা ব্যস্ততাহীন জীবনে হঠাৎ চাঞ্চল্য আনলো বিমল রায় নামে আমার একজন আত্মীয়; পাঁচ ছয় বছর সে আন্দামান আছে, নৃতত্ত্ব বিভাগে কাজ করে। একদিন বিকেলে হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো—"দিদি, কারা এসেছে আপনার বাড়ী—গাড়ীতে বসে আছে বাইরে দেখবেন চলুন"—অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে গিয়ে সভয়ে পিছিয়ে আসি কয়েক হাত—আন্দামানের জংলী আদিবাসীদের যা বর্ণনা শুনেছি ঠিক তাই। কয়লার মত কালো গায়ের রং, ছোট্ট, ছোট্ট উলের মত কোঁকড়ান চুল—প্রায় উলঙ্গ দেহে গাছের ছালের সামান্য আবরণ। কিন্তু কই মারতে আসছে না তো তেড়ে—বরং পরম কৌতূহলভরে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। হাসিমুখ দেখে একটু ভরসা পাই। বিমল আমার অবস্থাটা উপভোগ করে নিয়ে এইবার এগিয়ে এসে বলে "এরা আন্দামানের ওঙ্গী—পৃথিবীর প্রাচীনতম মানুষ—এরা মানুষের কোন ক্ষতি করে না—বরং বন্ধুভাবাপন্নই, তবে এদেরই আর একটি গোষ্ঠী আছে 'জারোয়া' তারা কিন্তু মানুষ মাত্রেই শত্রু মনে করে এবং তাদের অব্যর্থ লক্ষ্য তীরের হাত থেকে রক্ষা নেই—। তবে তারা গভীর জঙ্গলে থাকে এবং পোর্টব্লেয়ার থেকে অনেক দূরে—লোকালয়ে আসে না সচরাচর। এইবার ভরসা করে এগিয়ে যাই আমরা এই বিচিত্র অতিথিবৃন্দকে অভ্যর্থনা করতে। ঘরে এসে বসলো তারা শান্ত শিষ্টভাবে। কিন্তু কথা বলার উপায় নেই। এদের ভাষা এত দুর্বোধ্য যে বিমল পাঁচ ছয় বছর ওদের সঙ্গে মিশেও দু'চারটে শব্দ ছাড়া আর কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। তবে বুদ্ধি ওদের খুব প্রখর—ইশারা ইঙ্গিতে সব বুঝতে পারে—। ওদের দলের মেয়েটি আমার শাড়ীখানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলো। ইশারায় জিজ্ঞেস করলাম শাড়ী পরবে কিনা—সঙ্গে সঙ্গে রাজী—পরিয়ে দিলাম আমার একটি শাড়ী আর ব্লাউজ—পরে খুব খুশী কিন্তু একটু পরেই শাড়ী খুলে সযত্নে বগলদাবা করে রাখলো; বুঝলাম এতবড় কাপড় সামলানোই দায় এদের।

এই আদিম মানুষ ওঙ্গীরা পোর্টব্লেয়ার থেকে ষাট মাইল দূরে লিট্‌ল আন্দামান নামে গভীর জঙ্গলময় একটি ছোট দ্বীপে বাস করে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে এরা এদেরই তৈরী নৌকোতে (Canoe) চড়ে এই অশান্ত বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে পোর্টব্লেয়ারে আসে কিসের আকর্ষণে কে জানে! ওদের আদি বাসভূম লিটল আন্দামানে যাওয়ার যানবাহনের কোন নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে মাঝে মাঝে বোট যায়। ওদের দেশে গেলে বুঝতে পারবে "বন্যেরা বনে সুন্দর" কথাটা কত সত্যি! পোর্টব্লেয়ারে যাদের দেখে আঁতকে উঠেছিলাম তাদেরই এই দ্বীপে প্রাকৃতিক পরিবেশে চোখে সুন্দর লাগলো রীতিমতো। নিকষ কালো, বেঁটে মজবুত গড়নের দেহ—মেয়ে পুরুষ-নির্বিশেষে ছোট ছোট কোঁকড়ান চুল। মুখ দেখলে ছেলেমেয়ের তফাৎ বুঝতে পারা শক্ত, কারণ ওদিকে ছেলেদেরও গোঁফ দাড়ির বালাই নেই। চোখ দুটো লম্বা টানা—তাছাড়া অকৃত্রিম সরলতার ছাপ তাদের চোখে-মুখে এনে দিয়েছে আলাদা সৌন্দর্য। এরাই পৃথিবীর একমাত্র জাতি যারা আজও সম্পূর্ণ আদিম জীবন যাপন করে। বাইরের পৃথিবীর প্রভাব পড়েনি এদের জীবনযাত্রায়। গভীর জঙ্গলে শিকার করে তারা বন্য পশু, দুস্তর সমুদ্রে পাড়ি দেয় তারা সামুদ্রিক প্রাণী শিকার করবার জন্য। বন্যপশু এবং সামুদ্রিক প্রাণীই এদের প্রধান খাদ্য। তা ছাড়া বন থেকে ফলমূল ও মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেও খায় তারা। খাওয়ার জিনিষ উৎপন্ন করতে জানে না—সংগ্রহ করে খায় তাই এক অঞ্চলের খাদ্য ফুরিয়ে গেলে আবার দল বেঁধে নতুন জায়গায় গিয়ে কুটীর বেঁধে বাস করে এই যাযাবর জাতি। মস্তবড় একটি বারোয়ারী কুটীরে একসঙ্গে অনেকগুলো পরিবার বাস করে। গাছের পাতা ও বাঁশ দিয়ে তৈরী এই কুটীরগুলোর চাল প্রায় মাটী পর্যন্ত নেমে এসেছে—দরজা বলতে একটি। ঘরের ভিতরে চারদিকে বাঁশের অনেকগুলো মাচা—এক একটি মাচা এক একটি পরিবারের জন্য। ঐ একটি করে মাচা ও তার পাশে বেড়ার গায়ে ঝুলানো যৎসামান্য জিনিষ নিয়ে একটি পরিবারের গৃহস্থালী। মরলে পরে ঐ মাচার নীচেই মৃতদেহকে কবর দেয় ওঙ্গীরা। একটি মাত্র দরজাবিশিষ্ট ঘুটঘুটে এই অন্ধকার ঘরের মধ্যখানে একটি অগ্নিকুণ্ড এদের আলো ও তাপের কাজ করে। শুনলে অবাক হয়ে যাবে যে এই আগুন পর্যন্ত এরা জ্বালাতে জানে না। আগুনকে যুগ-যুগান্ত ধরে তারা জ্বালিয়ে রেখেছে। এদের রান্নার প্রণালীটি মজার। হাঁড়িকুড়ি মশলার হাঙ্গামা নেই। একখণ্ড পাথর আগুনে উত্তপ্ত করে তার উপর মাংস, মাছ ইত্যাদি রেখে পাতা ও পরে মাটী চাপা দিয়ে রাখে—ঐ তাপে সিদ্ধ হয়ে গেলে খেয়ে নেয়—নুনের ব্যবহার পর্যন্ত জানে না এরা। তীর ধনুক এদের প্রধান অস্ত্র, তাছাড়া হারপুন কুড়াল জাতীয় হাতিয়ারও এরা ব্যবহার করে। সমুদ্রে কুড়িয়ে পাওয়া ভাঙ্গা জাহাজের অংশ থেকে পাওয়া লোহাকে ঘষে ঘষে তীরের সুতীক্ষ্ণ ফলা তৈরী করে এরা অত্যন্ত নিপুণ হাতে; এমনি করেই অন্যান্য হাতিয়ারও তৈরী করে। অরণ্যচারী এই জাত মৌমাছিকে একটি অদ্ভুত উপায়ে জব্দ করে মধু আহরণ করে মৌচাক থেকে। বন্য একরকম পাতার রস গায়ে মেখে এরা চাক কাটে—মুখেও রাখে এই পাতার রস, প্রয়োজন হলে মুখ থেকে এই রস ছিটিয়ে দিয়ে মৌমাছিকে তাড়ায়, এর গন্ধে মৌমাছি কাছেও ঘেঁসতে পারে না।

মানুষ চিরদিন নানা রকম প্রসাধন করে আপনাকে সুন্দরতম করবার জন্য—ওঙ্গীরাও মাটী গুলে গায়ে নানা রকম চিত্রাঙ্কন করে আপনাকে সাজিয়ে ভাবে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে—আমাদের যতই অদ্ভুত লাগুক দেখে।

শান্ত স্বভাবের ওঙ্গীরা সহজে উত্তেজিত হয় না। চীৎকার, হৈ-হল্লা ওরা করে না একদম। এমনকি ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত ঝগড়াঝাটি কান্নাকাটি করে খুব কম। মনের খুসী প্রকাশে এদের উচ্ছ্বাসও নেই যেমন আবার কৃত্রিমতাও নেই। অনেকদিন পর পরস্পর দেখা হয়ে খুব আনন্দ হলে বড় যে সে ছোটজনকে কোলে নিয়ে নীরবে বসে থাকবে অনেকক্ষণ।

সারাদিন খেটেখুটে যা আহরণ করে—বিভিন্ন পরিবারের সবাই একসঙ্গে তাই ভাগ করে খায়—এ বিষয়ে তারা সভ্যসমাজের কাছেও আদর্শস্থানীয়। কিন্তু তোমরা ভাবছ এরা আবার মানুষ! পৃথিবী আজ কোথায় এগিয়ে গেছে আর এরা এখনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবন ধারায় আবদ্ধ। কিন্তু লিট্‌ল আন্দামানের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐ সরল প্রকৃতির মানুষগুলোর নিশ্চিন্ত সুখের জীবন দেখে মনে হল কারা সুখী, ওরা না আমরা!

হলদে কি?

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

দুই বন্ধু জয়ন্ত ও প্রশান্ত। দুজনেই যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি চেহারায়। এ বলে আমায় দেখ, তো, ও বলে আমায় দেখ! দুজনেই ছেলেবেলা থেকে ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হয়ে ক্লাসে উঠেছে, স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করেও বৃত্তি পেয়েছে। কলেজেও তাই। দুজনেই বিজ্ঞান পড়েছে একই কলেজে। এই দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বে কোথাও তাদের একদিনের জন্যেও ভাঙন ধরেনি। কিন্তু এম, এস-সি পাশ করার পরই হঠাৎ একদিন একটা ব্যাপার নিয়ে চিড় খেলো তাদের ভালবাসার সম্পর্কে।

ব্যাপারটা সামান্য হলেও জয়ন্ত বিলেত যাবার জন্যে যে পথ নিয়েছিল, সেটাই ভীষণভাবে আঘাত করল প্রশান্তকে। প্রশান্ত এটা ভাবতেই পারেনি যে, জয়ন্ত তার নিজের জন্যে এই অসৎ উপায় অবলম্বন করবে।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে প্রশান্ত, আর জয়ন্ত জন্মেছে কোলকাতার বনেদী বংশে, ধনীর ঘরে। অবস্থার এই ব্যবধান থাকলেও, তবু যে এতদিন তাদের এই হরিহরআত্মা ভাব অক্ষুন্ন ছিল, তা কেবল প্রশান্তর উদার চরিত্র ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্যে। উঁচু ক্লাসে জয়ন্তকে পড়াশোনার ব্যাপারে সর্বদাই প্রশান্ত গাইড করে

এসেছে। জয়ন্তকে সে এতই ভালবাসত যে, পরীক্ষার সময় নিজের ক্ষতি করেও তাদের বাড়ি গিয়ে রাত জেগে তাকে সাহায্য করেছে। আর আজ সেই জয়ন্তই কিনা এই করলে!

এর জন্য অবশ্য পরোক্ষভাবে জয়ন্ত দায়ী হলেও, প্রত্যক্ষভাবে দোষী ছিলেন তার বাবাই। মুখে যদিও তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা দু'জনেই পরীক্ষা দাও, যেই পাশ করবে তার যখন টাকা লাগবে না, সমস্ত খরচ যখন দেবে গভর্ণমেণ্ট, তখন আর ভাববার কি আছে!' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তলে-তলে তিনিই ছেলের জন্যে এমন ধরপাকড় ও তদবির-তদারকের ষড়যন্ত্র করেছিলেন, যাতে জয়ন্তরই বিলেত যাওয়া স্থির হয় এবং অন্য অনেকের সঙ্গে প্রশান্ত সেই পরীক্ষায় ফেল করে। জীবনে জয়ন্তর কাছে প্রশান্তর এই প্রথম পরাজয় ঘটে।

ছাড়াছাড়ি হয়ে যায় তাদের দু'জনের। জয়ন্ত তিন বছরের জন্যে চলে যায় বিলেতে, আর প্রশান্ত রয়ে যায় দেশে। সংসারের অসচ্ছল অবস্থার জন্যে প্রশান্তকে সঙ্গে সঙ্গে কাজ নিতে হয় বিহারে জাতীয় পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসে।

জয়ন্ত প্রথম বিলেতে গিয়ে প্রশান্তকে দু'একখানি চিঠি লিখেছিল বটে, কিন্তু হঠাৎ এক সময় তাও সে বন্ধ করে দেয়। ক্রমশঃ কাজের নানা চাপে পড়ে জয়ন্তর কথা প্রশান্তর কাছে ফিকে হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু তা হলেও, কাজের অবসরে নির্জন মুহূর্তে, হঠাৎ তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে আসে তাদের ছেলেবেলাকার কথা মনে প'ড়ে। ছোট্টবেলা থেকে দীর্ঘদিনের এই ভালবাসার স্মৃতি সহজে কি মুছে ফেলা যায়!

দিন গড়িয়ে চলে, মাস গড়িয়ে চলে, বছর গড়িয়ে চলে— সমস্ত দুঃখ-বেদনার উপর বিস্মৃতির প্রলেপ পড়ে।

প্রশান্ত তখন রাঁচিতে। কি কাজের জন্যে একদিন তাকে যেতে হয় স্থানীয় মানসিক চিকিৎসার হাসপাতালে। চলতি কথায় যাকে বলে 'পাগলা গারদ', সেই পাগলা গারদের এ-ঘর সে-ঘর দেখতে-দেখতে এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে যায় প্রশান্ত। এ কি! এখানে, এই বিচিত্র মানুষগুলির মধ্যে এ কে! এ যে জয়ন্ত!... আশ্চর্য হয়ে জানালার গরাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় প্রশান্ত। চেঁচিয়ে ওঠে—'জয়ন্ত...তুমি!'...

কি যেন নিজের মনে-মনে বকছে আর মাথা চালছে জয়ন্ত। প্রশান্তর ডাকে যেন চমকে উঠে একবার তাকায় তার দিকে। ঘরের মধ্যে যে চেয়ারটায় বসেছিল, সেটা থেকে উঠে বিড়বিড় করে কি সব বকতে-বকতে এগিয়ে আসে জানালার দিকে।

প্রশান্ত উত্তেজিত হয়ে বললে, 'কি চিনতে পারছ না?'

কোন উত্তর নেই। কয়েক মুহূর্ত বকাটা বন্ধ করে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল তার দিকে। তারপর বিড়বিড় করে আবার বকতে লাগল।

'কি বকছ?' প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

হঠাৎ বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়েই জয়ন্ত বলে উঠল, 'লাল টকটকে, কালো মিশমিশে, সাদা ধবধবে,—হলুদে কি...হলদে কি— হলদে কি? শেষের দিকে হতাশা ও উত্তেজনা মেশানো স্বর। উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না সে!

প্রশান্ত ভাবলো, এই কি তবে তার এখানে আসার কারণ! সোজা চলে গেল সে অফিসে। গিয়ে ওর সম্বন্ধে জানতে চাইলে, ওখানকার যিনি ডাক্তার তিনি বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার মশাই, ব্রিলিয়েন্ট ছেলে, বরাবর ফার্স্ট হয়েছেন, স্কলারশিপ পেয়েছেন এবং এম, এস-সি পাশ করেছেন পর্যন্ত! তারপর গভর্ণমেন্টের টাকায় উচ্চ পর্যায়ের পারমাণবিক গবেষণার জন্যে বিলেত যান, কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই মাথা খারাপ হয়ে দেশে ফিরে আসতে হয়। আজ প্রায় দেড় বছর হতে চললো এখানে আছেন। অন্য কোন কিছুই নেই, শুধু অনবরত বলে চলেছেন ঐ এক কথা—শুনেছেন নিশ্চয়

ছোট্ট করে একটা 'হুঁ' বলেই সেদিন ওখান থেকে বে সোজা বাড়ি চলে এলো প্রশান্ত। তারপর তার নিজেরই যেন খারাপ হবার উপক্রম হল, 'লাল টকটকে, কালো মিশমিশে, ধবধবে, (কিন্তু) হলুদে কি?" ভাবতে ভাবতে প্রশান্তর মনে হ'ল একটা কিছু মনোমত উত্তর না পেলে ওর মাথা কিছুতেই সারবে একে আমার সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ির উত্তেজনা তার উপর এই বিদে চিন্তাই ওর মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে।

সত্যিই ক'দিন খুবই অস্বস্তির মধ্যে কাটলো প্রশান্তর। ব কর্ম কিছুই করতে পারলো না। শুধু জয়ন্তর কথাই ভা দিন-রাত।

কয়েক দিন পরে প্রশান্ত আবার গেল জয়ন্তর কাছে। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ওকে যেন চিনতে পেরে কাছে এলো জয়ন্ত এবং এসেই গরাদের ভেতর থেকে হাত নেড়ে উ হয়ে বললে সেই এক কথা—'লাল টকটকে, কালো মিশমিশে, ধবধবে,......হলদে কি, হলদে কি?'......শেষটায় সেই একই উ ও ব্যাকুলতা ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগলো তার চোখ-মুখ দি

প্রশান্ত আর সময় নষ্ট না করে, জয়ন্তর কথা শেষ হবার স সঙ্গেই উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো, হলুদে আবার কি?—

হলদে, হলুদ হরিদ্রা
গাঢ়, ফিকে রঙ হয় যা;
তারই মাঝে এর পরিচয়
সবেতে এক মিল কোথা হয়?

হঠাৎ আগুনে যেন জল পড়ে গেল। ক্ষণেকের জন্য স্থির রইল জয়ন্ত। তারপর হো-হো করে সে কি হাসি! হাসি থাম কি বললে—কি বললে—হলদে, হলুদ, হরিদ্রা?' এবং সেই স প্রশান্ত, প্রশান্ত!' বলে চেঁচিয়ে উঠেই মাটিতে ঘরের পড়ে গেল।

প্রশান্ত তক্ষুনি ছুটে অফিসে গিয়ে ঘটনাটা সব বল ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনাকে চিনতে পেরেছেন যখন, আর মিলও যখন খুঁজে পেয়েছেন, তখন আর ভাবতে হবে না!......

'তাহলে আপনারা এখন একটু লক্ষ্য রাখবেন, আমি যাচ্ছি--একটু তাড়াতাড়ি আছে।' বলেই প্রশান্ত বেরিয়ে হাসপাতাল থেকে।

দু'দিন পরেই মেন্টাল হস্পিটাল থেকে একখানা চিঠি প্রশান্তর নামে। ওখানকার ডাক্তারবাবু তাকে লিখে পাঠিয়ে 'জয়ন্ত খুঁজছে আপনাকে; আপনি যেন এখুনি চলে আসেন।'

খবরটা আসার পরের দিনই প্রশান্ত গিয়ে হাজির হাসপাতালে। গিয়ে দেখে, অফিস ঘরের চেয়ারে জয়ন্তর বা জয়ন্ত বসে। প্রশান্তকে দেখেই জয়ন্ত লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধর জয়ন্তর বাবা বললেন, 'সব শুনেছি বাবা ডাক্তারবাবুর ব তোমাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বাঁধন কেউ কোনদিনই ছিঁড়তে প না। আমি তোমার কাছে সারা জীবন ঋণী হয়ে রইলুম বাবা

'এ কথা কি বলছেন! সন্তানের কাছে আবার পিতা থাকে নাকি? পিতার কাছেই তো সন্তানের ঋণ!

জয়ন্তর বাবার চোখ থেকে তখন টপ্‌টপ্‌ করে গড়িয়ে পড়ছে।

জন্মভূমি

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

শৈল নদ-নদী গহন প্রান্তর ভরা ভাগবত লীলা ক্ষেত্র তুমি,
সৃষ্টির প্রথমক্ষণে জলধি মন্থন করি দিলে দেখা মোর জন্মভূমি।
কলেবর ধরি স্বর্গ হোতে দেব-দেবী নেমে এলো করি জয়ধ্বনি,
রাজ-রাজেশ্বরীরূপে প্রভাতের আগমনী বেদমন্ত্রে গাহিলে জননী।
তোমার উদয় দিনে নিখিলের কোন প্রান্তে হয়নিক নিশি অবসান,
অরণ্য জীবনলয়ে আদিম যুগের যাত্রী সভ্যতার পায়নি সন্ধান!
সারস্বত ছন্দে গাঁথা তোমার প্রাণের কাব্য সীমা হোতে হয়েছে অসীমা,
সমগ্র ভুবন তব জ্ঞানের আলোক লভি গাহিয়াছে তোমারি মহিমা।

এশিয়ার মহাতীর্থ, ধরণীর শক্তিপীঠ, তুমি মাতা বিশ্ব বিধাতার,
আদর্শের অধিষ্ঠাত্রী, সত্য শিব সুন্দরের জন্মদাত্রী ভারত আমার!
কণ্ঠে পরে গরিমার শতনরী দেখায়েছ মানবতা প্রেম বিতরিয়া,
রচেছ যে রক্ত পঙ্ক-পঙ্কজিনী হাসি মুখে সর্ব দুঃখ বেদনা বরিয়া।
দুঃখের পূজায় তব দারিদ্র্য লাঞ্ছিত গেহে ভগবান করে গেছে লীলা,
আজও তার করুণার প্রস্রবণ সংসারের লোকযাত্রা পথে নৃত্যশীলা।

বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য তুমি তো দিয়েছ শিক্ষা,—বহু ধর্ম বহু মত এসে,
মিশে গেছে মর্মে তব, সর্বজাতি লভিয়াছে ঠাঁই তব অঙ্কে ভালবেসে;
ডুবে গেছে কত দেশ, নিবে গেছে কত তারা, কত রাজ্য হয়েছে নিঃশেষ,
তুমি আজো গৌরবের গৌরীশৃঙ্গ বক্ষে লয়ে পৃথিবীরে দিতেছ নির্দেশ
শান্তির উদ্দেশে। বৈদেশিক অভিযানে শোণিতে রঞ্জিত হয়ে বহুবার,
মৃত্যুরে অমৃত করি ভাগ্যের দুর্যোগ রাত্রে আপনারে করেছ উদ্ধার।

নহ দেবী পরাধীন, সন্তান-সন্ততি তব শৌর্যে-বীর্যে হয়েছে প্রবল,
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে বীরেন্দ্র প্রহরিবৃন্দ অস্ত্র লয়ে রহে অচঞ্চল।
শত শত স্তম্ভ শোভে পাশাপাশি এক সাথে শীর্ষে ধরি তব দেবালয়
তবু তারা ভিন্ন মাগো, স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিয়ে যায় নিঃশঙ্ক দুর্জয়।
এদেশে জনম মোর, স্বর্গ হোতে গরীয়সী রাজেন্দ্রাণী জননী আমার!
তোমার প্রহরী হয়ে চিরদিন র'ব মোরা সাথে লয়ে শক্তির সম্ভার।
অতুল ঐশ্বর্য তব হরণ করিতে যদি কেহ আসে যূথবদ্ধ হয়ে,
তারে মোরা প্রতিহত করি শক্তি পরিচয় দিব তব বরাভয় লয়ে।
এ ভারতে দৈবশক্তি করে খেলা, দূরে গেছে বারে বারে কত না দুর্দিন,
বিজয় সঙ্গীত তব গাহিব জননী, অমৃতের পুত্র যারা মৃত্যুহীন।

সাগরতলের শিকারী

শ্রীমনীন্দ্র দত্ত

বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিক্টর হুগো সাগরতলের অতিকায় প্রাণী সম্বন্ধে লিখেছেন, 'টু বিলিভ ইন্ দি অক্টোপাস, উই মাস্ট হ্যাভ্ সীন্ ইট্।' অক্টোপাস যে কি বস্তু তা নিজের চোখে না দেখলে ঠিক বোঝা যায় না।

শুধু অক্টোপাসই নয়, সাগরতলের বিচিত্র রহস্যের সবকিছু সম্বন্ধেই এ-কথা সত্য।

সত্যি, সাগরের তলদেশ যেন এক বিচিত্র রহস্যের মায়াপুরী। কত রকমের আর রঙের জলজ উদ্ভিদ, লাল নীল হলদে সবুজ কত বিচিত্র রঙ আর চেহারার মাছ, কত রকমারি ঝিনুক আর শামুক, আর প্রবাল, আর সবার উপরে কত রকমের সব ভয়ংকর জলচর শিকারী প্রাণী।

কিন্তু তাদের সকলের কথা লিখবার তো জায়গা হবে না। লিখতে গেলে যে এক মৎস্য-মহাভারত হয়ে যাবে। তাই আজকের মত সাগরতলের সেইসব ভয়ংকর শিকারী প্রাণীদের কথাই লিখি।

তাদের কয়েকজনার নাম শুনে নাও আগে। এই ধরো যেমন—অক্টোপাস, স্কুইড আর কাট্ল্‌ফিস্।

ভাল কথা। মনে রেখো, কাট্ল্‌ফিস্ কিন্তু ফিস অর্থাৎ মাছ নয়, অক্টোপাসেরই জাতভাই। আর নামটা যতই অচেনা আর বিদ্ঘুটে শোনাক না কেন, আসলে ও বেচারি কিন্তু তোমাদের অনেক উপকার করে, অনেক কাজে লাগে।

এই ধরো না, সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজবে, দাঁতের মাজন চাই। পা হাত-মুখ ধুয়ে পড়ার টেবিলে বসে একটু শখ হলো ছবি আঁকবে, তার জন্যে 'সিপিয়া' রঙ চাই। কোথা থেকে সে সব আসে জানো কি? ওই কাট্ল্‌ফিসের কাছ থেকে।

বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি আমার কথা? কিন্তু আমি ভাই নাচার। সত্য অনেক সময় উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর।

কাট্ল্‌ফিসের শরীরে সিপিয়া রঙে ভরা একটা থলে থাকে। শত্রুপক্ষীয়েরা তাড়া করলে একটা নলের ভিতর দিয়ে সেই রঙ বাইরে ছড়াতে ছড়াতে ছুটতে থাকে কাট্ল্‌ফিস্। ফলে জলের ভিতরে গাঢ় রঙের একটা আবরণ সৃষ্টি হয়, আর তারই আড়ালে কাট্ল্‌ফিস্ পালিয়ে আত্মরক্ষা করে।

কাট্লফিস্ দেখতে অনেকটা ফুটবল খেলার শীল্ডের মত। মাথার দু পাশে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। কানও আছে। আর আছে পাঁচ জোড়া হাত। কোথায় জানো? মাথায়। সেই জন্যেই তো এগুলোকে 'পা-মাথা' জীব বলে। চার জোড়া হাত মাথার উপর থেকে বেরিয়ে ক্রমশঃ সরু হয়ে হয়ে লিক্ লিক্ করে। পঞ্চম হাত

জোড়া বেশ কিছুটা লম্বা। তাই সে দুটোকে বলে দাঁড়া। চিংড়ি মাছের দাঁড়া দেখেছ তো? অনেকটা সেই রকম।

কাট্‌ল্‌ফিস্‌রা কি খায় জানো? চিংড়ি মাছ, কাঁকড়া ও অন্যান্য ছোট ছোট মাছ। চুপি চুপি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দুটো লম্বা দাঁড়া বের করে এরা খপ্‌ করে বাগিয়ে ধরে সেই সব প্রাণীকে। তারপর তোতাপাখীর ঠোঁটের মত শক্ত ঠোঁট দিয়ে ঠক্‌রে ঠক্‌রে সেগুলোকে ছিন্নভিন্ন করে পেট ভরায়।

কাট্‌ল্‌ফিসের হাতে তবু ভয় কম, কারণ এগুলো খুব ছোট প্রাণী। কিন্তু স্কুইড? ওরে বাপরে। চেহারা ও গঠনভঙ্গিতে কাট্‌ল্‌ফিসের মাসতুতো ভাই হলে হবে কি, যা পেল্লায় একখানা চেহারা তার, তুমি পুঁচকে মানুষ তো কোন্‌ ছাড়, তার পাল্লায় পড়লে তা-বড় তা-বড় তিমি মাছ পর্যন্ত ঘায়েল হয়ে যায়।

একটা বড় আকারের স্কুইড লম্বায় ৫৫ ফুট পর্যন্ত হয়। (একটা প্রমাণ সাইজ মানুষ লম্বায় কতটা জানো তো? সাড়ে পাঁচ থেকে ছ ফুট মোটে!)। স্কুইডের লম্বা দাঁড়াটা হয় ৩৫ ফুট লম্বা, আর শরীরটা ২০ ফুট। শরীরের বেড় ১২ ফুট। এবং পাঁচ জোড়া হাত সমেত মোট ওজন প্রায় এক হাজার পাউন্ড। তবেই বোঝ. এ হেন প্রাণী যদি দুই লম্বা দাঁড়া বাগিয়ে আট হাত কিলবিল্‌ করতে করতে অষ্টভুজা হয়ে তোমার দিকে তেড়ে আসে,—তাও আবার জলের তলে,—তখন তোমার অবস্থাখানা কেমন হয়?

সাধে কি আর স্কুইডকে বলে 'মাছ-দানব!'

তারপর অক্টোপাস্‌।

নাম শুনেই হয়তো বুঝতে পারছ সাগরতলের এই বাসিন্দা-দের হাতের সংখ্যা আট। ইংরেজি 'অক্টো' শব্দটার মানে হলো আট কিনা। আটটি হাতই কিন্তু লিক্‌লিকে লেজের মত শরীরের চারদিকে ছড়ানো। অক্টোপাসকে তাই বিশুদ্ধ বাংলায় 'অষ্টপাশ' বললে কেমন হয় বলো তো?

অক্টোপাসের চেহারা কিন্তু কাট্‌ল্‌ফিস্‌ বা স্কুইডের চেহারা থেকে আলাদা। একটা চাপ্টা ডিম্বাকৃতি দেহ। মুখটা ঠিক মাঝ-খানে। দুটো জ্বলজ্বলে চোখ যেন সব সময়ই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তার নিচেই একটা মস্ত বড় হাঁ। অনেকটা ঠিক তোতাপাখির মত দুটো ঠোঁট। আর সেই ছোট শরীরটার চারদিক থেকে বেরিয়ে গেছে লিক্‌লিকে চাবুকের মত আটটি হাত বা দাঁড়া।

কিন্তু দেখতে আলাদা হলে হবে কি, কাট্‌ল্‌ফিস বা স্কুইডের মতো অক্টোপাসেরও আছে একটা রঙের থলি যার ভিতর থেকে রঙ ছিটিয়ে ও শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে পালায়।

অক্টোপাস স্বভাবতঃ ভীরু। মানুষের সাড়া পেলেই পালায়। কিন্তু একবার যদি কোন প্রাণী তার কবলে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই। আটটি চাবুকের মত দাঁড়া দিয়ে তাকে এমনভাবে আটকে ধরে রাখবে যে জলের তলায় দম আটকেই সে অক্কা পাবে। এমনিভাবে কত সাঁতারু আর ডুবুরি যে এদের হাতে প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

কিন্তু এ হেন ভীষণ প্রাণী অক্টোপাসেরও একটা মৃত্যুবাণ আছে। এই ফাঁকে সেটা তোমাদের জানিয়ে দি। যদি কখনো অক্টোপাসের কবলে পড়, তাহলে কেমন করে বাঁচতে হবে জানো? জন্তুটার দুটো চোখের মাঝখানে মটর-দানার মত একটা গ্ল্যান্ড আছে। প্রাণপণ শক্তিতে দাঁত দিয়ে কামড়ে সেটাকে ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলবে। ব্যস্‌। দেখতে দেখতে অক্টোপাস ঝিমিয়ে পড়বে। নেতিয়ে পড়বে। হাতের ফাঁস আলগা হয়ে যাবে। অক্টোপাস অক্কা পাবে।

নতুন বাড়ীতে এসে অবধি বেরালের উৎপাতে প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মাছ, দুধ খাবারদাবার কোথাও কিছু রাখবার উপায় নেই; মারো ধরো তাড়াও কিছুতেই লজ্জা নেই; বেহায়ার একশেষ! লোকে সেই যে কথায় বলে না,—'বেরালের আড়াই পাউড়ি' একেবারে হুবহু তাই। এই মেরেধরে তাড়িয়ে দিলে, আবার পরক্ষণেই ছোঁক-ছোঁক করে এসে হাজির!

একটা নয়, দুটো নয়, কাচ্চাবাচ্চা হুলো মেনি সমেত একসঙ্গে ছটা—সাতটা! কোথা থেকে যে আসে, কোথায় থাকে, তারও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। পাশেই একটা ভাঙ্গাচোরা পড়ো বাড়ীর মত একটা বাড়ীতে একজনরা থাকতেন, একদিন তাঁদের গিন্নীকে ডেকে বললুম, 'দেখুন আপনাদের বেরালগুলোর জ্বালায় তো দেখছি বাড়ীতে টেকা দায়! এর একটা বিহিত কিছু না করলে...'

তিনি আমায় আর কথা বলতে না দিয়েই বললেন, 'দেখুন, আসলে এই বেরালগুলোর একটাও আমাদের নয়, বরং ওগুলো আপনাদের বাড়ীরই!'

কথাটা শুনে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। একটু রাগত ভাবেই তাঁকে বললুম, 'বলছেন কি আপনি! আমার সঙ্গে কি রহস্য করছেন?'

গিন্নী মুখে একটু হাসির ভাব এনেই বললেন,—'রহস্য করিনি মা, দু'তিনটে এখন এ বাড়ীতে এসে আশ্রয় নিয়েছে বটে এবং এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়ও কয়েকটা, কিন্তু সব-গুলোরই উৎপত্তি আপনাদের ঐ বাড়ী থেকে। আপনাদের আসার আগে ঐ বাড়ীতে এক স্বামী-স্ত্রী ভাড়া ছিলেন; তাঁদের দুটো বেরাল ছিল। ছেলেপুলে হয়নি বলে স্ত্রীটি বেরাল দুটোকে একেবারে ছেলেমেয়ের মতনই ভালবাসতেন। নিজেরা না খেলেও—বেরালের জন্য রোজ মাছ দুধ আনতেন, বিছানায় নিজের কোলের মধ্যে নিয়ে শুতেন। এক মুহূর্ত ওদের ছেড়ে কোথাও যেতে পারতেন না। একবার একটা বেরালের বাচ্চা হবে দেখে, তাঁর আনন্দের সীমা-পরিসীমা ছিল না! ঐ যে বুড়ো মতন হলদে-সাদায় ছোপ ছোপ দেখেন না, ঐটেই আসল গোড়া. বাকী সব ওরই নাতি-নাতনী, ছেলে-মেয়ে। কিন্তু বেরালের এই বাচ্চা হবার সময়েই হঠাৎ মহিলাটি একদিন কলেরায় মারা গেলেন। তারপরই বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন ও'র স্বামী। কিন্তু বেরালটাকে তিনি নিয়ে গেলেন না। চার-পাঁচটা বাচ্চা হবার পর বেরালটা কিন্তু রয়ে গেল এই বাড়ীতেই —বাড়ী আর সে ছাড়লো না। বাড়ীওলা চাবী দিয়ে চলে গেল

মিটমিটে মাটির প্রদীপ
জ্বেলে দিয়ে গেছে কোন লোক,
চপল হাওয়ায় এঁকে বেঁকে
মেলে আছে যেন ভীরু চোখ।
ফুরফুরে ভোরের কুসুম
ফেলে রেখে গেছে বুঝি কেউ,
পথ-ভোলা প্রজাপতি এক
মাতাল হয়েছে দেখি সেও।
ডোরা-টানা রাখালিয়া বাঁশী
পড়ে আছে গাছের কোটরে,
বাজাতে বাজাতে রেখে গেছে,
আসেনি সে আজ আর ভোরে।
এলোমেলো সুখে-দুখে মেশা
ভেসে ভেসে যায় দিনগুলো,
দূরে বোকা কাঁদিছি কোথায়?
পড়েছে একটু চোখে ধুলো!

কোলে শুয়ে খোকন সোনা
মাকে চুমো খেয়ে
আধো আধো সুরে বলে
আকাশ পানে চেয়ে
বল্ দেখিতো কোন তারাটি
তোর মা লাগে ভালো
আকাশে আজ এত তারা
কাহার বেশী আলো?
ইচ্ছে করে যেতে মাগো
তারাদের ঐ দলে
সারা রাতি জ্বালিয়ে বাতি
জাগি আকাশ তলে!
মা হেসে তাঁর খোকারে কন
ওরে সোনা মাণিক
তুই যে আমার বুকের রতন
তারার যে তুই খানিক।

বাইরে থেকে। তারপর অনেকদিন পড়ে রইল বাড়ীটা। আশেপাশের বাড়ী থেকে চুরিচামারি করে খাবার এনে বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে বড়ো করতে লাগল বেরালটা। একটা কথা বলতে আপনাকে ভুলেই যাচ্ছিলুম—ঐ মহিলাটি মারা যাবার পর ক'দিন মানুষের মত বেরালটার সে কি কান্না! তার সে কান্নায় আমরা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু দু' একদিন পরেই হঠাৎ থেমে গেল সেই বীভৎস বিতিকিচ্ছিরি কান্না!......'

ভদ্রমহিলার কথা তখনও শেষ হয়নি, হন্তদন্ত হয়ে বুড়ী ঝি মোক্ষদা এসে বললে, "মা, আজ শেষ করে দিয়েছি সেই ধাড়ি হতচ্ছাড়িটাকে! একটু কি নড়বার জো আছে গো! রান্নাঘরে সবে দুধের ঘটিটা রেখে একটু বাইরে গেছি, এসেই দেখি মুখপুড়ী সমস্ত ঘটিসমেত দুধটা উল্টে ফেলে দিয়ে চকচক করে দুধ খাচ্ছে মেঝেতে! ......হাতের কাছে ছিল লুচি বেলা বেলুনটা, পেছন থেকে সজোরে মাথায় বসিয়ে দিতেই একেবারে সঙ্গে সঙ্গে অক্কা!... ও, একটা আপদ গেল! এমনি করে আর কটাকেও শেষ করব, তবে আমার শান্তি!" একটানা বলে গরগর করতে করতে চলে গেল মোক্ষদা।

পাশের বাড়ীর গিন্নী মোক্ষদার সব কথাগুলোই এতক্ষণ শুনছিলেন। সে চলে যেতে তিনিও কথায় বেশ খানিকটা ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে গেলেন, 'ভাল করলেন না কিন্তু, ছেলেপুলে নিয়ে বাস করছেন!'......

সত্যিই ভাল যে হয়নি তা বুঝলুম সেই রাত্রি থেকেই। মরা বেরালটা ফেলে দিয়ে আসার পর অন্যান্য বেরালগুলোর মড়া-কান্নায় কান পাতা দায় হয়ে উঠলো। সারা রাত ধরে তাদের কাতরানি মিয়াও মিয়াও, ফোঁ-ফ্যাঁ, মারামারি আর কামড়া-কামড়িতে চক্ষে-পাতায় করে কার সাধ্য। আগেও যে এ ধরণের ব্যাপার ঘটেনি তা নয়, কিন্তু এ যেন একেবারে অসহ্য! যে জায়গাটায় মোক্ষদা শুয়ে থাকত, সেইখানটাতেই গিয়ে বেরালগুলো উৎপাত করত সবচেয়ে বেশী। একদিন অনেক রাত্রে ঘুমুতে না পেরে, বেরাল-গুলোর উৎপাত বন্ধ করার জন্যে মোক্ষদা এক বালতি জল নিয়ে যেই ওদের গায়ে ঢালতে যাবে, এমন সময় বালতি সুদ্ধ একটা বিকট আওয়াজ করে পড়ে গেল সে! আমরা সবাই ধড়মড় করে 'কি হল কি হল' বলে উঠে পড়লুম। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা হবে। তাড়াতাড়ি নীচে এসে দেখি, বাইরের উঠনে উপুড় হয়ে পড়ে মোক্ষদা গোঙাচ্ছে। কপালটা বালতির কানায় লেগে ভীষণভাবে কেটে গেছে, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তা থেকে। তাড়াতাড়ি তাকে তুলতে গিয়ে বললুম, 'কি করে পড়ে গেলে এমন করে?'

মুখ দিয়ে বুড়ীর আর কথা বেরুচ্ছেনা। কপাল থেকে রক্ত গড়িয়ে সমস্ত মুখটা ভেসে গেছে। কোন রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে শুধু একবার বললে, 'কে একজন আমায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে মা—আমি আর বাঁচবো না!' কথাটা বলে অজ্ঞান হয়ে গেল মোক্ষদা, সে জ্ঞান আর তার ফিরলো না। সেই রাত্রেই ভোরের দিকে বুড়ী মারা গেল।

পরের মাসেই সেই বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে উঠে চলে গেলুম আমরা। কি জানি, আবার কারুর উপর ঐ বেরাল বা বেরালের মালিক প্রতিশোধ নেয় যদি।
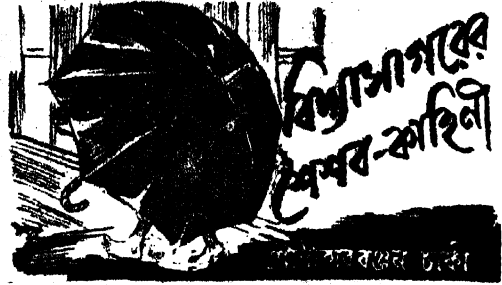
উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন ভগবতী দেবী। সব চিকিৎসা বিফল হল। দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে রোগ। গর্ভে তাঁর সন্তান। চিন্তিত হয়ে উঠলেন সবাই। এ রোগ কি কোন দিনও ভাল হবে না? উন্মাদিনী অবস্থায় কি সারা জীবন কাটাবেন ভগবতী দেবী? শেষ পর্যন্ত ডাক পড়ল জ্যোতিষীর রোগিণীর ভাগ্য গণনা করবার জন্য। "গর্ভে আছেন এক মহা তেজস্বী পুরুষ, তাঁর প্রচণ্ড তেজ সহ্য করতে পারছেন না মাতা, তাই তিনি মানসিক বিকারগ্রস্তা। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সুস্থ হবেন তিনি," ভবিষ্যদ্বাণী করলেন জ্যোতিষী। দশমাস উন্মাদিনী অবস্থায় থাকবার পর সন্তান প্রসব করলেন ভগবতী দেবী এবং সুস্থও হলেন তিনি; জীবনে আর কোন দিনও তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে নাই। জন্ম মুহূর্তে নাড়ী ছেদের পূর্বে শিশুর জিহ্বায় কি যেন এক মন্ত্র লিখে দিলেন সাধক পিতামহ। "কিছুদিন ভালো ভাবে কথা বলতে পারবে না এই শিশু, কিন্তু পরবর্তী কালে এ হবে দেশবিখ্যাত পুরুষ।" ভবিষ্যদ্বাণী করলেন পিতামহ। জ্যোতিষী এবং পিতামহ, উভয়ের বাক্য সফল করে পরবর্তী কালে এই শিশু হলেন প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শৈশবে অত্যন্ত মেধাবী এবং দুরন্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। পাঠশালার গুরু শিশুকে এত ভালোবাসতেন যে, প্রতিদিন বিকালে কোলে করে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যেতেন। অথচ দুরন্ত শিশু প্রায় প্রতিদিন এক প্রতিবেশীর গৃহের দরজার সামনে প্রস্রাব করতেন। কিন্তু কেহই কিছু বলতেন না তাঁকে। গ্রামবাসী সবাই জানতেন এই শিশু হবে দেশবিখ্যাত; জ্যোতিষী এবং পিতামহের ভবিষ্যদ্বাণী নিশ্চয়ই সফল হবে। তাই সবাই ভালোবাসতেন শিশুকে। অত্যন্ত জেদী ছিলেন তিনি; যা জেদ ধরবেন তা তিনি করবেনই। কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাবে না তাঁকে। স্নানে ছিল তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি।

পাঠশালার পড়া শেষ হয়ে গেল মাত্র আট বছর বয়সে। শিশুকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য পিতা ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দিলেন গুরু কালীকান্ত। ঠাকুরদাস তখন চাকরী করেন কলকাতায়। বীরসিংহ গ্রাম হতে কলকাতার দূরত্ব ৩৬ ক্রোশ। রেলপথ নাই। পদব্রজে রওনা হলেন ঠাকুরদাস, সঙ্গে শিশু ঈশ্বর। গুরু কালীকান্তও এলেন ছাত্রের সঙ্গে। শিয়াখালা হতে পাকারাস্তা; রাস্তার ধারে মাইল পোস্টে পথের দূরত্ব ইংরাজী অঙ্কে লেখা। তাই দেখে ইংরাজীতে অঙ্ক অক্ষর শিখে ফেলেন আট বছরের শিশু।

কলকাতায় এসে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র অস্থির হয়ে উঠলেন মা আর ঠাকুমার জন্য। যে গৃহে তাঁর পিতা বাস করতেন সেই গৃহস্বামীর ভগিনী রাইমণি দেবী শিশুকে পুত্রাপেক্ষা ভালবাসতেন। তাঁর মধ্যে স্নেহহারা শিশু খুঁজে পেলেন মা আর ঠাকুমাকে একসঙ্গে। নতুবা অশান্ত শিশু হয়তো থাকতে পারতেন না কলকাতায়, হয়ত জগৎ হারাত দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরকে। চিরজীবন তিনি মাতৃজ্ঞানে রাইমণি দেবীকে শ্রদ্ধা করে এসেছেন। জগতের সব নারী যে মা, এ জ্ঞান শিশুবয়সে তাঁর মধ্যে উদয় হয়। পরবর্তী জীবনে নির্যাতিত নারী জাতির কল্যাণ কামনায় যে মহাব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তার

ছন্দ ছড়া সব বলে

হিমালয়নির্ঝর সিংহ

ছোট্ট মেয়ে টুলটুলি
এলোমেলো চুলগুলি
সদাই মুখে বহে হাসির বন্যা...
দুলে দুলে পথ চলে
ছন্দ-ছড়া সব বলে
ফুটফুটে সে যেন পরীর কন্যা॥
বসে যখন মা'র কোলে
গাছে যেন ফুল দোলে,
আধো আধো ঝরে কথার ফুলঝুরি;
নেইকো তেমন বায়না
ঝুমঝুমিটাও চায় না—
হাসি দিয়ে করে শুধু মন চুরি॥
রাতে যখন টুলটুলি—
ঘুমিয়ে থাকে সব ভুলি,
জ্যোৎস্না এসে চুমা আঁকে চাঁদ মুখে;
মাকে আরও নিবিড় কোরে—
খুকুরাণী জড়িয়ে ধোরে,
ঘুমের দেশে যায় যে ভেসে খুব সুখে॥

মন্দ কি আর!

আশা দেবী

ঠ্যাং ভেঙে তুই এই যে হলি খোঁড়া
কাঁদিস কেন—ভাব না আগাগোড়া।
আস্তো যদি থাকত চরণ দুটি
হয়তো পথে করতে ছুটোছুটি
ইঠাং যেতিস পড়েই গাড়ী চাপা—
মর্গে নিত, কিংবা নিত ধাপা—
তার চেয়ে তুই এই যে হলি খোঁড়া—
মন্দ কি আর এমন আগাগোড়া!

এই যে তোকে কিলিয়ে গেল যদু
ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে চেঁচাস কেন মধু?
কিলের চোটে পোক্ত হলো পিঠ
এবার যদি লাগেও এসে ইঁট
কিংবা যদি মোটা এবং ট্যাঙা—
দুমদুমিয়ে পড়েই এসে ঠ্যাঙা
পাবিইনে টের। করলো ভালোই যদু
কান্না রেখে দ্যাখনা ভেবে মধু।

পরীক্ষাতে এই যে হলি ফেল্ —
ভালোই হলো— বাড়বে যে আক্কেল।
নতুন নতুন সঙ্গী পাবি কত—
গাধার টুপি পরবি মনের মত
বিদ্যে মাথায় যা ছিল সব কাঁচা,
পাকবে দারুণ—বলছি তোকে সাঁচা।
ভালোই হলো করলি এবার ফেল
মগজ জুড়ে গজাবে আক্কেল।

অঙ্কুর জন্মলাভ করে রাইমণি দেবীর স্নেহধারা সিঞ্চনে সেই শিশু-বয়সে।

মাত্র সাড়ে আট বৎসর বয়সে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ছোট্ট শিশু একা যেতে পারেন না। তাই পিতা নিয়ে যেতেন আবার নিয়ে আসতেন। কয়েক মাস পর তিনি একাই যেতে পারতেন। অত্যন্ত বেঁটে ছিলেন তিনি। ছাতা মাথায় দিয়ে পথ চলার সময় সমস্ত দেহ ঢেকে যেত ছাতার আড়ালে। মনে হত যেন ছাতাটাই হেঁটে চলেছে। অনেকে বিদ্রূপ করত। কিন্তু কর্ণপাত করতেন না তিনি। মাত্র ছয়মাস পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাসিক পাঁচটাকা বৃত্তি পান ঈশ্বরচন্দ্র। সে দিন পাঁচ টাকার দাম অনেক, কারণ সে সময়ে চালের দাম ছিল প্রতিমণ বারো আনা হতে এক টাকা। সারারাত পড়তেন তিনি। রাত দশটা হতে বারটা মাত্র এই দুই ঘন্টা ঘুমোতেন শিশু ঈশ্বরচন্দ্র। রাত দশটায় তিনি শুতেন আর বারটায় তাঁকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে পিতা শয্যা গ্রহণ করতেন।

ভাই-বোনদের অত্যন্ত ভালবাসতেন তিনি। একদিন ছোট ভাই দীনবন্ধু বিকালে বাজারে যেয়ে ফিরতে অনেক দেরী করে। বালক ঈশ্বর ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন। চোখের জল মুছতে মুছতে চললেন ভাইয়ের সন্ধানে। অনেক রাতে খুঁজে পেলেন ভাইকে। কোলে করে বাসায় নিয়ে এলেন। এ প্রীতি চিরদিন তাঁর মধ্যে ছিল। মৃত্যুকালে তাঁর দানপত্র এর প্রমাণ। শতাধিক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি বিলিয়ে দিয়ে যান।

ক্রমে সংসারে অভাব দেখা দিল। দশ বছর বয়স হতে দিনের বেলায় রান্না তিনি নিজে করতেন। মসলা বাটা, কাঠ কাটা, বাসন মাজা প্রভৃতি সব করতে হত তাঁকে। অনেক সময় এক বেলা রান্না করে তিন বেলাও খেতেন। তাঁর দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন নাই তিনি। বার বছর বয়সে মাসিক আটটাকা বৃত্তি পেলেন। সংসারের অভাবও অনেক কমে গেল। মাত্র তের বছর বয়সে সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করে পণ্ডিত সমাজকে মুগ্ধ এবং বিস্মিত করেন ঈশ্বরচন্দ্র।

শিশু বিদ্যাসাগরের কাহিনী তোমাদের শোনালাম। জ্ঞান-লাভের ঐকান্তিক আগ্রহের সমুজ্জ্বল এবং সফল দৃষ্টান্ত তোমরা গ্রহণ করবে তাঁর শৈশব জীবন হতে।

ছোট্ট মোদের তুতুলটা

শ্রীহরেন ঘটক

ছোট্ট মোদের তুতুলটা—
যেনই মোমের পুতুলটা।
মুখখানি তার মিষ্টি তো,
মনভোলানো দৃষ্টি তো।
হাসিখুসির মূর্তি যে,
পুতুল পেলেই ফুর্তি যে।

এঘর ওঘর করবে সে,
কাজের জিনিষ ধরবে সে।
ধমক খেলেই চমকাবে,
ভয়ের চোটেই থমকাবে।
এক জোড়া দাঁত উঠছে তো,
যুঁই যেন ঠিক ফুটছে তো।

পড়বে সে অবশ্যই,
অ আ এবং 'অচ্চই'।
বললে দিদি গান ধরে,
মাসির কথায় কান ধরে।
মা গেলে তার রান্নাতে—
ফাটায় বাড়ী কান্নাতে।

চোখের জলে ভাসবে সে,
ফিক্ ক'রে ফের হাসবে সে।
দেড় বছরের বাচ্চা তো?
সব কিছু তার আচ্ছা তো।

হাঁটি হাঁটি — পা — পা,
খোকন হাঁটে দেখে যা'।
খোকন হাঁটে, খোকন হাঁটে,
হাঁটতে হাঁটতে গড়ের মাঠে।
হাঁটি হাঁটি পা — পা চলি,
এ গ ল আর ওই সে গলি।
থাপ্‌দুস্ থুপ্‌দুস্—থপাস্ থপ্—
ওইরে বুঝি পড়লো 'ধপ্'!
তোল্ তোল্ তোল্—তোল্ না ধরে',
দুলিয়ে দে না দোলনা করে।
আবার চলে হাঁটি হাঁটি,
জোর কদমে পড়ছে পা-টি।
সামনে তোরা দাঁড়িয়ে কে রে?
এক্ষুণি দে রাস্তা ছেড়ে।
চলছে খোকন জলদি পায়ে—
ভাগো ভাগো ডাইনে-বাঁয়ে!
যাবেই সে আজ অনেক দূরে
হিল্লী-দিল্লী ব্যারাকপুরে।
চলে চলে জোরসে চলে—
নতুন মুলুক দেখবে বলে।
চলছে খোকন সমুখ পানে
কোন্‌খানে তা কেউ না জানে।
সামনে থেকে সরে দাঁড়া
আজ পেয়েছে খোকন ছাড়া।
চলতে গিয়ে তড়্‌বড়িয়ে
সিঁড়ির দু ধাপ যায় গড়িয়ে।
না—না খোকন হয়নি কিছু
মা রয়েছেন এইতো পিছু!!

না থাকলেই ছিল ভালো!

মনোজেন্দু বসু
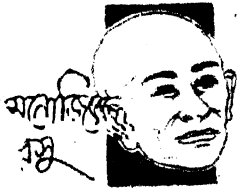
খুব বেঁচে গেছি, খুব বেঁচে গেছি ভাই রে—
মাথায় আমার একটিও চুল নাই রে।
মাথাজোড়া টাক,—তোমরা অবাক্ তাই কি?
দূর বোকা ছেলে! আমি কোনো দুখ পাই কি?
পাকবে না চুল, কলপ দিতেও হবে না;
সেলুনে ছোটার ঝামেলাও আর রবে না!
টেরি কাটিবার, তেল মাখিবার কার্যে—
পয়সা খরচ, সময় নষ্ট
হয় না তো ভাই আর যে!!
আরও বেঁচে গেছি, আরও বেঁচে গেছি সত্যি।
দুবেলা এখন দুধসাবু হ'লো পথ্যি!
ফোক্‌লা হয়েছি,—তাই কি অবাক্ তোমরা?
দূর্ হাঁদারাম! আমার কি মুখ গোম্‌রা?
দাঁত নেই তাই, দাঁতের ব্যথাও গিয়াছে,—
এর চেয়ে সুখ, তোমরাই বলো কী আছে?
দাঁত মাজিবার ঝঞ্ঝাট হ'লো অন্ত!
মাংসের হাড় চিবাইতে আর
কষ্ট পায় না দন্ত!!
এখন আমার কান যদি হ'ত কালা রে—
শুনতে হ'ত না মাইকের ঝালাপালা রে!
সেই সাথে যদি থাকত না চোখে দৃষ্টি,
দেখতে হ'ত না যত সব অনাছিষ্টি!
আর যদি কেউ মাথাটাও খুলে রাখতো,
তোমরাই বলো, মাথাব্যথা আর থাকতো?
একেবারে বেঁচে তাহ'লে যেতাম সত্যি!
জীবনে আমার ঝামেলাও আর
থাকতো না একরত্তি!!

ছোটদের পাততাড়ি

নিজের হাতে করো

পরিতোষকুমার চন্দ্র
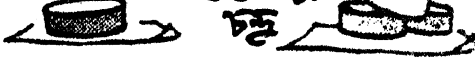
(পেপার-ওয়েট বা কাগজ চাপা)

'বাজারে যখন বহুরকম জিনিসের ও নানা দামের পেপার-ওয়েট কিনতে পাওয়া যায়, কিম্বা যখন সামান্য পাথরের নুড়ি দিয়েও কাজ চলে যায়, তখন কষ্ট করে নিজের হাতে পেপার-ওয়েট তৈরী করবার কোনো মানে হয় না'—একথা যারা বলবে তারা যেন এই লেখাটা পড়েও না দেখে; কারণ এটা লিখেছি তাদের জন্যেই—যাদের নিজের হাতে একটা নতুন কিছু তৈরী করবার আন্তরিক আগ্রহ আছে এবং যারা সুযোগ পেলে তা করেও। তবে এই লেখাটা পড়ে পেপার-ওয়েট তৈরী করতে যাবার আগে একটা কথা জেনে রাখো যে, তৈরী আরম্ভ করলুম আর শেষ করলুম—এ নিয়ম কিন্তু এটি তৈরী করবার বেলায় খাটবে না। হাতে যথেষ্ট সময় এবং সেই সঙ্গে যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও একনাগাড়ে এটা করা যাবে না,—সব কিছুই থেপে থেপে করতে হবে।

প্রথমেই আড়াই ইঞ্চি কিম্বা তার চেয়ে কিছু ছোট বা বড় প্ল্যাস্টিকের একটা গোল কৌটো যোগাড় করো, যেটার তলা হবে সমান এবং ধার হবে সোজা খাড়াই। এই খাড়াই পৌনে এক ইঞ্চি হোলেই ভালো হয়। এই কৌটোটাই হবে পেপার ওয়েটের ছাঁচ, সুতরাং কৌটো যদি পাও তবেই অন্যসব জিনিস যোগাড় করবে,—নইলে নয়। এই জিনিসগুলি হোলো সাদা সিমেণ্ট ও সিমেণ্ট-রঙ। লাল, নীল, সবুজ, হলদে,—নানা রঙের সিমেণ্ট-রঙ পাওয়া যায়। সাদা সিমেণ্ট একসঙ্গে বেশী না কিনে প্রথমে আধ কিলোগ্রাম মতো কিনবে। আর রঙ না কিনে, যে দোকান থেকে সিমেণ্ট কিনবে সেখান থেকেই নমুনা হিসাবে যৎসামান্য একটুখানি রঙ চেয়ে নেবে এবং তাই-ই যথেষ্ট হবে। যদি না পাও তবে বাড়ীতে মেয়েরা যে সিঁদুর ব্যবহার করেন তাই দিয়েও কাজ হবে। আর চাই একটা নরুণ, খাতা সেলাই-করা ছুঁচ আর একটুখানি নারকেল তেল।

এগুলি ছাড়াও আর একটা জিনিস যোগাড় করতে হবে। সেটা হোলো এক ধরণের শিরিষ-কাগজ। এই শিরিষ-কাগজের নাম—'কারবাইড অফ্ সিলিকোন ওয়াটারপ্রুফ অ্যাব্রেসিভ্ পেপার।' অন্য এক কোম্পানীর এই শিরিষ-কাগজই 'ডিউরেক্স অ্যাব্রেসিভ্ পেপার' নামে বিক্রী হয়। যে দোকান থেকে সাদা সিমেণ্ট ও রঙ নেবে সেখানেই এই শিরিষ-কাগজ পাবে। সেখানে না পেলে অন্য দোকানে খোঁজ করবে। যে নামের শিরিষ-কাগজই কেনো, সেটা কিনবে ৩২০সি (320c) নম্বরের।

এইবার সিমেণ্ট মেপে নাও। কতটা সিমেণ্ট লাগবে তা অবশ্য নির্ভর করবে ছাঁচের সাইজের ওপর। তবে যে মাপের ছাঁচের কথা বলেছি তার জন্যে স্তূপাকার করে চা-চামচের যতটা ধরে তেমনি পাঁচ বা ছয় চামচ সিমেণ্ট নিলেই হবে। এই সিমেণ্ট একটা এনামেল পাত্রে রেখে তাতে চিমটি পরিমাণ সিমেণ্ট-রঙ, অভাবে সিঁদুর দিয়ে নেড়ে বেশ করে মিশিয়ে দাও। তারপর তাতে একটু একটু করে জল ঢেলে ও চামচ দিয়ে নেড়ে নেড়ে থকথকে কাদার মতো করে মাখো। এবার একটু তুলো নারকেল তেলে ভিজিয়ে (চপচপে করে নয়) ছাঁচটার ভেতরে সর্বত্র ঘষে ঘষে লাগিয়ে দাও এবং দুই-তিন চামচে মাখা সিমেণ্ট ছাঁচের ভেতরে দিয়ে, ওপর দিক থেকে ছাঁচের দুপাশে আঙুল দিয়ে ধরে সোজা অবস্থায় একটুখানি তুলে ও ছেড়ে কয়েক বার ঠোকো। মাখা সিমেণ্টের ভেতর অনেক বুদবুদ থেকে যায়।

এইভাবে ঠোকার ফলে বুদবুদগুলি ওপরে এসে ফেটে যায় এবং সিমেণ্ট বেশ চেপে বসে। এইভাবে একটু করে সিমেণ্ট দেবে ও ঠুকবে। ছাঁচটা একেবারে সিমেণ্ট দিয়ে ভর্তি করে ঠুকলে নীচের দিকের বুদবুদ সিমেণ্টের স্তর ভেদ করে ওপর দিকে আসতে পারে না। তাই এইভাবে থেপে থেপে ভরতে ও ঠুকতে হয়। ঠোকার ফলে কিছুটা জলও ওপরে উঠে আসে। এই জল ফেলবে না, ছাঁচটা সিমেণ্টে ভরে গেলে তা আপনি উপচে পড়ে যাবে। শক্ত জায়গায় ঠুকলে প্ল্যাস্টিকের ছাঁচটা ফেটে যেতে পারে, তাই টেবিলের ওপর বা মেঝেতে কয়েকশীট খবরের কাগজ পেতে তার ওপরে ঠুকবে। সিমেণ্টে ভর্তি করা হোয়ে গেলে ছাঁচটা সমতল জায়গায় রেখে দেবে। কিছু সময় পরে দেখবে সিমেণ্টের তালটা কিছুটা ছোট হয়ে গিয়ে ছাঁচের গা থেকে ছেড়ে গেছে। তখনও কিন্তু সিমেণ্ট জমে শক্ত হোয়ে যায় না। এই সময়ে ছাঁচটার দুপাশে আঙুল দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে একটু এদিক ওদিক নাড়া দিলে সিমেণ্টের তালটা আলগা হোয়ে যাবে। তখন ছোট একপীস্ মোটা পিচবোর্ড বা পাতলা তক্তা ছাঁচটার ওপরে রেখে চেপে ধরে সেটা একেবারে উলটে টেবিলের ওপর রেখে সাবধানে ছাঁচটা তুলে নিয়ে সিমেণ্টের তালটা মুক্ত করো এবং সেটা আরো একটু শক্ত হবার জন্য সেই অবস্থায় হাওয়ায় রেখে দাও। মনে রাখবে, ছাঁচের ভেতরে থাকবার সময় সিমেণ্টের তালটার যে দিকটা নীচে থাকে সেটাই হোলো সোজা দিক, আর অন্যটা হোলো উলটো দিক।

আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা (শীতকালে আধঘণ্টা ও অন্য ঋতুতে একঘণ্টা) পরে সিমেণ্টের তালটা আবার সোজা করে একটা চেটালো (অগভীর) পাত্রে রেখে এমন করে জল ঢালো যাতে তার ওপর দিকটা

জলের বাইরে জেগে থাকে। ঘণ্টাখানেক পরে সমতল কোনো জায়গায় শিরিষ কাগজটা বিছিয়ে জমে যাওয়া সিমেণ্টের চাঙড়টা তার ওপরে উপুড় করে, অর্থাৎ সোজা দিকটা নীচের দিকে রেখে, হালকা চাপ দিয়ে ঘষে সমতল করো। এমনিতেই সেদিকটা সমতল বলে মনে হোলেও সামান্য একটু ঘষবে। যতক্ষণ ঘষার কাজ চলবে ততক্ষণ মাঝে মাঝে শিরিষ কাগজের ওপর একটু একটু জল দিয়ে যাবে। সোজা দিকটা সমতল হোয়ে গেলে এবার অন্য দিকটা অর্থাৎ তলাটা সামান্য একটু ঘষবে। এদিকটা সোজা দিকের মতো অতটা সমতল করবার দরকার নেই। শিরিষ কাগজের কাজ হোয়ে গেলে সেটা বেশ করে জল দিয়ে ধুয়ে শুকিয়ে রাখবে, কারণ এটা দিয়েই বহুবার কাজ করা যাবে।

দুপিঠ ঘষা হোয়ে গেলে চাঙড়টা কয়েক মিনিটের জন্য হাওয়ায় রেখে দাও। তারপর হাতী, ঘোড়া, মানুষের মুখ প্রভৃতি তোমার পছন্দমতো এমন একটা কোনো রেখাচিত্র বেছে নাও যেটা পেপার-ওয়েটের চেয়ে বড় না হয়। কার্বন পেপারের সাহায্যে পেপার-ওয়েটের সোজা দিকে ছবির একটা ছাপ তোলো। তারপর নরুণটা কলম ধরার মতো করে ধরে ছুঁচলো মুখটা ছাপের লাইনের ওপর রেখে একটু চাপ দিয়ে টেনে টেনে খোদাই করো। নরুণের বিশিষ্ট গড়নের জন্য সেটার চাপের তারতম্যে খোদাই করা লাইন সরু বা মোটা হয়। আর ছুঁচ দিয়ে খোদাই করলে লাইন খুবই সূক্ষ্ম হয়। খোদাই

করবার সময় এই কথাগুলি মনে রাখলে কাজ করা খুব সহজ হয়। খোদাই করার কাজ হোয়ে গেলে পেপার-ওয়েটটা পনেরো বা কুড়ি মিনিট সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবিয়ে রাখো।

ইতিমধ্যে আধ চামচের মতো শুকনো সাদা সিমেণ্ট তোমার বাঁ হাতের চেটো বা তেলোয় রেখে তার সঙ্গে রঙ বা সিঁদুর এমনভাবে মেশাও যাতে সেটা পেপার-ওয়েটের রঙের চেয়ে গাঢ় হয়, নইলে ছবি স্পষ্ট হবে না। শুকনো সিমেণ্টে রঙ মিশিয়ে কিছুতেই বোঝা যায় না সেটা কতখানি গাঢ় হবে। জল দিয়ে মাখবার পর তবেই সেটা বোঝা যায়। যা হোক, তোমার হাতের তেলোয় রাখা রঙ মেশানো সিমেণ্টে ফোঁটা ফোঁটা করে জল দিয়ে একটা ছুরির ফলার সাহায্যে সেটা চেপে চেপে বেশ করে মাখো। হাতের তেলোতে রেখে এই কাজটা না করলে সিমেণ্ট ঠিকমতো মাখা হয় না। ছাঁচ ভরবার সময় সিমেণ্ট যে রকম থকথকে কাদার মতো করে মেখেছিলে এবারে কিন্তু তার চেয়ে একটু পাতলা করে মাখবে।

এবারে পেপার-ওয়েটটা জল থেকে তুলে শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে আলতো ভাবে মোছো এবং ছুরির ডগা করে মাখা সিমেণ্ট নিয়ে খোদাই করা ছবির ওপরে রেখে ছুরিটা কাত করে ধরে চাপ দিয়ে টেনে টেনে সমস্ত ছবিটা ঢেকে ফেলো। একবার মাত্র টেনে টেনে সিমেণ্ট ছড়িয়ে দিলে খোদাইকরা গর্তের অনেক জায়গায়, বিশেষ করে সরু লাইনগুলিতে সিমেণ্ট ঢোকে না। তাই বেশ কিছুক্ষণ ধরে এধার ওধার করে ছুরির চাপ দিয়ে এই কাজটি করতে হয়। এই কাজটি করতে করতে যদি সিমেণ্ট জমে যাবার মতো হয় তবে তাতে ২। ১ ফোঁটা জল মিশিয়ে নেবে। খোদাইকরা ছবির লাইন ভর্তি করার পর পেপার-ওয়েটের ওপরে যে সিমেণ্ট থেকে যাবে, তা না সরিয়ে ছবির সব জায়গায় সমানভাবে বিছিয়ে দিয়ে পেপার-ওয়েটটা দশ পনেরো মিনিট হাওয়াতে রেখে পরে সেটা আগের মতো চেটালো পাত্রে রেখে ছবির দিকটা না ডুবিয়ে জলে ভিজতে দাও। আধঘণ্টা পরে এক টুকরো ন্যাকড়া জলে ভিজিয়ে নিঙড়ে এমন করে পেপার-ওয়েটটার ওপরে বিছিয়ে দাও যাতে ন্যাকড়াটার কিছুটা পাত্রের জলে ঠেকে থাকে। এতে ন্যাকড়াটা সব সময়ই জলে ভিজে থাকবে। আর এটাই দরকার।

এইভাবে ঘণ্টা দুয়েক জলে ভিজিয়ে রাখবার পর পেপার-ওয়েটটা সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবিয়ে দেবে ও সমস্ত রাত সেইভাবে রেখে দেবে। সকালে যখন তোমার সময় হবে তখন জল থেকে তুলে আগের বারের মতোই সেটা শিরিষ কাগজের ওপর উপুড় করে রেখে এবারে মোটেই চাপ না দিয়ে খুব আস্তে আস্তে ঘষবে, আর মাঝে মাঝে তুলে দেখবে পেপার ওয়েটের মূল জমিতে ছবির গাঢ় রঙের লাইনগুলো স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে কিনা। পেপার-ওয়েটের ওপরকার অতিরিক্ত সিমেণ্ট উঠে গিয়ে যতক্ষণ না খোদাই করা লাইনের ভেতর-কার সিমেণ্ট মূল জমির সিমেণ্টের সঙ্গে সমান (সমতল) হয়, ততক্ষণ ঘষতে হবে। ঘষা শেষ হলে পেপার-ওয়েটটা জল দিয়ে বেশ করে ধুয়ে কাপড় দিয়ে মুছে ছায়ায় রেখে দেবে যতক্ষণ না একেবারে শুকিয়ে যায়।

প্রথম বারেই হয়তো ঠিকভাবে পেপার-ওয়েট তৈরী করতে পারবে না। তবে আমার বিশ্বাস, ধৈর্য ধরে কয়েকটা তৈরী করার পর তোমরাও দেখবার ও দেখাবার মতো পেপার-ওয়েট তৈরী করতে পারবেই। কেউ যদি লেখাটা পড়ে তৈরী করবার কায়দা ঠিকমতো বুঝতে না পারো অথচ এটা করবার যথার্থ আগ্রহ থাকে তবে পাততাড়ির স্বপনবুড়োর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলে আমি তাকে সব কিছুই বুঝিয়ে দেবো। কবে ও কোন সময়ে আসবে তা অবশ্যই চিঠি দিয়ে আগে জানিয়ে তবে আসবে।
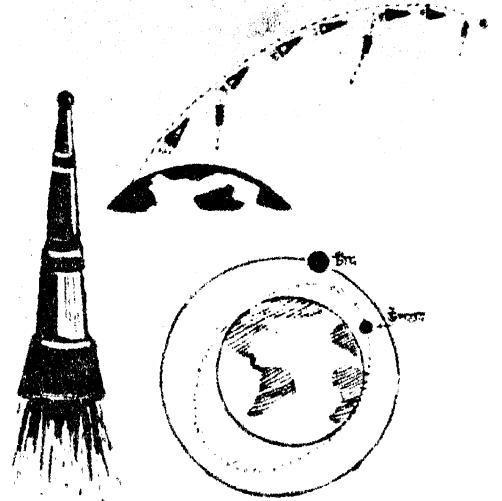
অবশেষে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতিতে, সেই অকল্পনীয় ঘটনাটি সম্ভব হয়েছে। মানুষ আজ মহাশূন্যে সচ্ছন্দে ভ্রমণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরে এসেছে।

মহাশূন্যচারী প্রথম মানুষ রাশিয়ার গ্যাগারিন। তারপর একের পর এক রাশিয়া ও মার্কিণ দেশের একাধিক মানুষ ঘুরে এসেছে মহাব্যোম—কখনো একা, কখনো জোড়ায়, শেষবারে একটি বীর তরুণীও ঘুরে এল সেদিন।

সেদিনটি বুঝি আর বেশী দূরে নেই, যেদিন মানুষ চন্দ্র, মংগল বা অন্য কোন গ্রহে গিয়ে, নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন সংবাদ নিয়ে অনায়াসে ফিরে আসবে।

একদিনে কিন্তু এ অবিশ্বাস্য কান্ড সম্ভব হয়নি। এর পেছনে রয়েছে বহু দিনের প্রস্তুতি পর্ব। মহাপন্ডিত অসংখ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী-দের অক্লান্ত গবেষণার ফল অবশেষে ফলেছে।

শূন্যযাত্রার পূর্বে, বহু বাধা বিপত্তির কথা ভাবতে হয়েছে, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হয়েছে। তোমরা একথা সকলেই জান, সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে নয়টি গ্রহ, তার একটি হল আমাদের পৃথিবী। আবার এই সব গ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে কতকগুলি উপগ্রহ— সব শুদ্ধ সংখ্যায় প্রায় তিরিশটি। আমাদের পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ, তোমরা জানো, সে হল চাঁদ। মহাশূন্যে সংযোগহীনভাবে সে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। একথাও জানো যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই সে নিরবধিকাল ধরে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় এক-একটা পাক দিচ্ছে আমাদের গ্রহকে।

এখন কথা হল, মহাশূন্য কি? পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। সেই বায়ুমণ্ডলের যেখানে শেষ, মহাশূন্যের সেখানে

শুরু। দুটোর মধ্যে কঠোর কোন সীমারেখা নেই। উপর দিকে ক্রমশ বায়ু ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে প্রায় ৩০০ মাইল উর্ধ্ব পর্যন্ত গিয়েছে। মোটামুটি ৩০০ মাইলের পর থেকেই মহাশূন্যের শুরু।

এ পর্যন্ত ঐ স্থান সম্পর্কে মানুষের ছিল না কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান, যা কিছু জানতো, সবই সম্ভাব্য কল্পনা। মানুষ সেখানে যাওয়ার আগে, সেখানকার সব কিছু জানা প্রয়োজন। সেখানকার তাপ উত্তাপ বাধা-বিপত্তি সুবিধা-অসুবিধা সমস্ত কিছু জানতে হবে। তারপর মানুষের পক্ষে যাতে ভ্রমণ করা সম্ভব হয়, সে রকম ব্যবস্থা করতে হবে। শুরু হলো গবেষণা। সমস্ত পৃথিবীর চল্লিশটিরও বেশী দেশের জ্যোতির্বিজ্ঞানিগণ একযোগে সহযোগিতায় নতুন জ্ঞান আহরণে লেগে গেলেন। আন্তর্জাতিক জিয়োফিজিক্যাল বর্ষ নির্দিষ্ট হল ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সাফল্যমণ্ডিত হল প্রথমে রাশিয়া ও পরে মার্কিণ দেশ।

স্থির হল, পৃথিবীর কক্ষপথে চাঁদের মত উপগ্রহ স্থাপন করে, তারি মধ্যে রেডিও টেলিভিসন ও অপরাপর যন্ত্র স্থাপন করে জানতে হবে সেখানকার অবস্থার যথাযথ বিবরণ।

উপগ্রহ পাঠাতে হলেও বহু বিষয় পূর্বাহ্নে বিবেচনা করতে হল। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে যদি তাকে মহাশূন্যে পাঠানো যায়, তবেই সে গিয়ে প্রদক্ষিণ শুরু করবে পৃথিবীকে মাধ্যাকর্ষণের টানে।

পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে হলে উপগ্রহটিকে হতে হবে অকল্পনীয় গতিবেগসম্পন্ন। তার জন্যে স্থির হল, রকেট চালিত হবে সেটি। সব চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান যায় ঘন্টায় তেরশ মাইল, জেট রকেট বিমানের গতি ঘণ্টায় দু হাজার আড়াই হাজার মাইল। বুলেট বা গোলার গতি প্রায় চার হাজার মাইল প্রতি ঘন্টায়। কিন্তু এমন রকেট তৈরী করা হল, যার সাহায্যে উপগ্রহের গতি হবে ঘন্টায় আঠারো হাজার মাইল। স্থির হল তিনটি যুক্ত রকেট একযোগে যাত্রা করে, একের পর এক গতিশক্তি বাড়িয়ে মহাশূন্যে পৌঁছে দেবে উপগ্রহকে।

লিকুইড (তরল) অক্সিজেন ও গ্যাসোলিন শক্তিতে প্রথমে তলার রকেটটি অগ্নি বর্ষণ করে যাত্রা শুরু করবে। ঘন বায়ুস্তর ভেদ করে মিনিট দুই চলবার পর এটি খসে পড়বে, ততক্ষণে উপরের দুটি রকেট উর্ধ্ব দিকে প্রায় ছত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ মাইল উঠে গেছে আর গতিবেগ হয়েছে ঘন্টায় তিন হাজার মাইল। প্রথম রকেট খসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রকেট চালু হয়ে যাবে। বায়ুস্তর তখন হাল্কা হয়ে এসেছে ক্রমশ। দ্বিতীয়টি খসে পড়বার পূর্বে গতিবেগ বেড়ে হয়ে যাবে বারো হাজার মাইল ঘন্টায়—এবং প্রায় ১৩০ মাইল উর্ধ্বে উঠে যাবে। এই ধাক্কায়ই তীব্র বেগে তিনশ মাইল উর্ধ্বে উঠে যাবে তৃতীয় রকেট। এরই মাথায় বসানো রয়েছে ক্ষুদ্রাকার উপগ্রহটি। বক্রগতিতে গিয়ে এবার রকেটটি পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরাল হবে। তারপর খসে যাবে দ্বিতীয় রকেট। তৃতীয় রকেট চালিত হবে কঠিন জ্বালানীর দ্বারা। মিনিট খানেকের মধ্যে সে গতিবেগ বাড়িয়ে করে দেবে ঘন্টায় আঠারো হাজার মাইল। অবশেষে টুক করে সেও বিযুক্ত হয়ে যাবে উপগ্রহ থেকে। কিন্তু গতিবেগের প্রচণ্ডতার দরুণ কক্ষপথে তাকেও উপগ্রহের মত কিছুক্ষণ প্রদক্ষিণ করে চলতে হবে পৃথিবীকে।

এখন কথা হল, কতক্ষণ বা কতদিন মানুষের পাঠানো এই উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে থাকবে? বেশী দিন নয়। কেন না, চাঁদের গতিপথ বৃত্তাকার। কিন্তু মানুষের পাঠানো উপগ্রহের গতিপথ হবে ডিম্বাকৃতি। সুতরাং ঘুরতে ঘুরতে যখন সে পৃথিবীর নিকটবর্তীতম স্থানে আসবে, তখনই বায়ু চাপের বাধার দরুণ কিছুটা করে গতি তার শ্লথ হয়ে আসবে, আর সে নেমে আসবে ঘরের পানে। তারপর প্রবল মাধ্যাকর্ষণের টানে বায়ুস্তরে এসে সংঘর্ষে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে শূন্যাকাশে। যত উর্ধ্বে পাঠানো যাবে, তত বেশী দিন টিকে থাকবে উপগ্রহ।

মাসের পর মাস কঠিন গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে অসাধারণ বিজ্ঞানীরা উপগ্রহ ক্ষেপণের সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেললেন।

পৃথিবীর মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় করে রাশিয়া পাঠালো ১নং স্পুটনিক (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭), ওজন ছিল তার ১৮৪ পাউন্ড। তিন মাস রইল সেটি কক্ষপথে। এরপর এক প্রাণী উঠলো মহাশূন্যে। ১৯৫৭ সালের ৩রা নভেম্বর 'লাইকা' নামে একটি কুকুর নিয়ে ২নং স্পুটনিক যাত্রা করলো। প্রাণীরা কতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে তার পরীক্ষা করবার জন্যে এটি করা হল। কয়েকদিনের মধ্যেই লাইকা প্রাণত্যাগ করলো। প্রায় ছমাস ছিল ঐ উপগ্রহটি কক্ষপথে। এরপর মার্কিণ দেশ ১৯৫৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী পাঠালো এক্সপ্লোরার। চতুর্থ উপগ্রহের নাম ভানগার্ড—১। ১৯৫৮ সালের ১৭ই মার্চ সেটি যাত্রা করে।

রেডিও ও অপরাপর যন্ত্রসহ এই সব উপগ্রহ অনেক তথ্য সংগ্রহ করে পাঠালো পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের কাছে। প্রাণান্তকর কস্‌মিক রশ্মির কথা, উল্কা প্রস্তরাদির কথা, মহাশূন্যের বিভিন্ন স্তরের তাপ উত্তাপের কথা, চুম্বক শক্তির কথা, পৃথিবীকে ঘিরে থাকা মেঘস্তরের কথা, ক্রমশ হাল্কা হওয়া বায়ুস্তরের কথা।

সব কিছু রেডিও মারফৎ জেনে নিলেন বিজ্ঞানীরা। পুনরায় গবেষণা চললো। দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে জয় করতে হবে। মানুষকে পাঠাতে হবে এবার। তাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে হবে। সহস্র বাধা।

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

সকাল হ'লো পূব আকাশে
ছুটলো আলোর বন্যা
নীলিম আকাশ উঠলো হেসে
জাগলো পরী কন্যা
গাছে গাছে সুপ্ত কুঁড়ি
ফুটলো ধীরে ধীরে
শাখে শাখে পাখীর কূজন
শরৎ আকাশ ঘিরে
আজকে প্রাণে পাখীর গানে
আনছে শিহরণ
দিগন্তে আজ হারিয়ে গিয়ে
খুঁজছি আপন মন
মায়ের পূজোয় প্রকৃতিও
নেই পিছিয়ে ভাই
আকাশে আজ বিচিত্রতার
তাইতো রোশনাই ।।
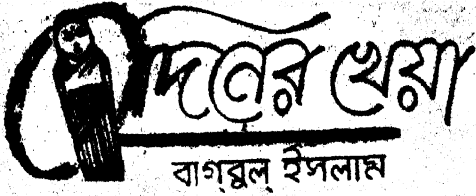
দিনের খেয়া

বাগবুল ইসলাম

ঢাক নেইকো ঢোল নেইকো হোগলা মুড়ি দিয়ে
তেঁতুল তলায় হোলো খুকুর পুতুল রাণীর বিয়ে।
নেই নারায়ণ নেইকো বামুন বাজলো নাকো শাঁখ
চাঁদের সাথে বিয়ে হোলো, পঁচিশে বৈশাখ।
বিয়ে বাড়ি বাতাস এলো সাগর পাড়ি দিয়ে
সূর্ষ্যি এলো সারাবেলাই হাসির আলো নিয়ে।
বিয়ের শেষে সকলকারে রাঙা প্রণাম দিয়ে
দিনের খেয়ায় তুলে চাঁদা বৌকে গেল নিয়ে।

ঝুমকোলতা ও খুকু

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝুমকোলতা, ঝুমকোলতা
দোদুল দোলে দুলি,—
রংগাও যদি এমনি করে
আনবো তোমা তুলি।
ফের দুলছো? আমার কথা
যাচ্ছে নাকো কানে?
ওমনি ক'রে দুলছো কেন?
বলবে না তো মানে?
ফুল তো ফোটে সকল গাছে
ওমনি কেহ দোলে
যেমনি তুমি দুলছো খালি,
কেউ কি ওতে ভোলে
রংটি রাঙা তাই কি বড়
দেমাক ক'রে দোলো
একটুখানি গন্ধ তো নেই,—
বাতাস ভরে তোলো?

তখন থেকে দেখছি খালি
দুলেই সারা হলে
একটুও কি থাকো না চুপ
ঝুমকো লতা বলে?
পড়তে তোমা হয় না বুঝি
তাই কি সারা বেলা—
দোদুল দোলে দুলেই খালি
খেলা কেবল খেলা?
বকবে নাকো মা-মণি ও
বকবে নাকো মালী?
পড়া-শুনোর পাট চুকিয়ে
দুলছো খালি খালি।
লক্ষ্মীসোনা ফুলটি করে
নাওনা মোরে ভাই?
সারাটি দিন পড়বো নাকো,
—দুলবো দুজনাই।

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

কিন্তু বিজ্ঞান, যাদুশক্তিসম্পন্ন বিজ্ঞান, অঘটন সম্ভব করলো। ইতিমধ্যে উপগ্রহকে পাঠিয়ে রাশিয়া চাঁদের না-দেখা পিঠের ছবি তুলে আনলো—এক সময় ফিরিয়েও নিয়ে এল তাকে পৃথিবীর মাটিতে। মানুষের যাবার পথ হল পরিষ্কার।

তবু, বিবেচনা করতে হল অসংখ্য বাধা বিঘ্নের কথা। ঊর্ধ্বাকাশের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন অবস্থা মানুষকে মারবার জন্য যেন ওৎ পেতে আছে। সে সব বাধাকে অতিক্রম করবার জন্যে চাই যান্ত্রিক প্রস্তুতি। মাইল তিনেক উঠলেই অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস কষ্ট দেখা দেবে। মাইল দশেক ঊর্ধ্বে বায়ুর চাপ এত কমে যাবে যে, মানুষের দেহ বেলুনের মত ফুলে ফেঁসে যাবে। নিম্ন চাপের জন্য শরীরের উত্তাপ এত বেড়ে যাবে যে, তার ওপর কেটলী রেখে জল গরম করা সম্ভব। অর্থাৎ রক্তও ফুটতে থাকবে টগবগ করে। পনের মাইল ওপরে যে সাংঘাতিক ঠান্ডা দেখা দেবে, ব্যারোমিটারের মাপে তা জিরোর নীচে ৬৭ ডিগ্রী। কুড়ি মাইলে, বিষাক্ত 'ওজনের' পাল্লায় পড়ে হবে অবধারিত মৃত্যু। পঞ্চাশ মাইলে সূর্য বিকিরিত বিদ্যুৎ প্রবাহ আসবে। ৭৫—১০০ মাইলের সময় অরোরা বা উষার আলোর স্তর অতিক্রম করতে হবে। মানুষকে পড়তে হবে সূর্য থেকে আসা এক্স-রে এবং শক্তিশালী আলট্রাভাওলেট-রে এবং মহাশূন্যের অজ্ঞাত স্থান থেকে আসা কালান্তক কস্মিক রে-র আওতায়। এরপর সহসা আসবে প্রচন্ড উত্তাপের স্তর (২৫ থেকে ৫০ মাইলে) ১৭০ ডিগ্রী উত্তাপ। আবার শৈত্য। তারপর দেখা দেবে কল্পনাতীত উত্তাপ—দু হাজার ডিগ্রী। লোহা গলে যায় সে উত্তাপে। অবশ্য অতটা উচ্চতায় এই উত্তাপের বিশেষ কোন অর্থ নেই। তেমন গরম অনুভূত হবে না সেখানে।

এই সমস্ত কিছু দুর্লঙ্ঘ্য বাধাকে অতিক্রম করে মহাজ্ঞানী বিজ্ঞানীরা তৈরী করলেন উপযুক্ত রকেট ও মহাকাশ যান এবং মহাকাশচারীর বিশেষ ধরণের পোষাক। শুরু হল অভিযান।

তাবৎ দুনিয়ার বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টির সামনে একের পর এক অসম সাহসিক বীরপুরুষেরা মহাকাশে গেলেন, কেউ কিছু বেশী, কেউ কিছু কম সময় রইলেন। ঘণ্টা দেড়েকে এক একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে অদ্ভুত দৃশ্যাদি দেখলেন। এ গ্রহের এক দিকে রাত এক দিকে দিন, মাঝখানে সীমারেখা। অকল্পনীয় এই শোভা নিরীক্ষণ করলেন। খেলেন দেলেন, পরম শান্তিতে ঘুমুলেন, রেডিও টেলিফো[নে] পৃথিবীর জাতভাইদের সঙ্গে কথা বললেন, তারপর এক সময় [যে] নাগরদোলা থেকে টুক্ করে নেমে এলেন। এদের মধ্যে আ[ছে] সাবাস মেয়ে তেরেসকোভা।

অদূর ভবিষ্যতে স্পেস-ষ্টেশান হবে। যাত্রিবাহী মহাকাশ যা[নে] চেপে চন্দ্র কিংবা মঙ্গল কিংবা শুক্র গ্রহ থেকে ধাঁ করে ঘুরে আ[সা] যাবে। কি মজা হবে বলতো!

ছোটদের পাততাড়ি

তবলা সেধে বিভোজ হয়ে ছন্দ-বাগীশ মশাই
রাত-দুপুরে উপুড় হয়ে থাকতে থাকেন মশা-ই।
বলতে থাকেন জানিস যদি মারটি খেতে হবে
ভনভনিয়ে রক্ত খেতে ছুটিস কেন তবে?
জানিস যদি গুনগুনিয়ে গাইতে অমন গান
ইমন সুরে আলাপ করে জুড়িয়ে দেনা কান।

একশ' মশার ভন্‌ভনানি মার্কী সুরের ডাক
শুনলে পরে অনেক মিঞার ডাকবে শুধু নাক।
মিষ্ট বটে ঝিঁঝিঁর বেহাগ মিষ্ট ব্যাঙের সুর
বাদলা রাতে বাতাস চড়ে ছড়ায় বহুদূরে—
পেঁচার কড়া ভুতুম আওয়াজ মিষ্ট বলে লোকে
শুনেক দেখি মশার ঝিঁঝিঁট সিন্ধি খাওয়া ঝোঁকে।
শুনেক দেখি প্রথম ঘুমে আদুড় গায়ে শুয়ে
শুনেক দেখি বাঁশবাগানে মাদুর পেতে ছুঁয়ে।
শুনেক দেখি ভরসন্ধ্যে কানটি করে খাড়া
বলবে তখন এ গান সেরা সকল সুরের বাড়া
বলবে তখন কোরাস গানের এমন ধারা নাই
হার মেনে যায় মির্সাবিল্লা এমন যে সানাই।
বলবে তখন এমন গানের রেকর্ড আছে নাকি?
বলবে আজও হায় রেডিওর গুণের কদর বাকি।

আলু / অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আলু আমাদের জীবনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে যে বাংলা প্রবচন-তালিকার মধ্যে তার দেখা পাওয়া যায়। "গোল আলু যেন, ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সবেতেই আছেন"— বলা হয় যাঁরা সব ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত তাঁদের সম্বন্ধে। "আলু-ভাতের মতো মুখ" বললে সেটা সুন্দর মুখশ্রীর বর্ণনা নয় তা কে না জানে।

আলুর এত কদর কেন? কী আছে আলুর মধ্যে?

আলুর জলীয় ভাগের (আলুর মধ্যে জলীয় অংশ শতকরা ৭৫ ভাগ) কথা বাদ দিয়েও বলা যায় আলুর প্রধান পুষ্টিবস্তু তার স্টার্চ বা শ্বেতসার। স্টার্চ একটি কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ মানুষের নিরামিষ আহারের একটি প্রধান উপাদান।

শুধু স্টার্চই নয়, আলুতে প্রোটীনও আছে—অবশ্য তার পরিমাণ খুবই কম। কিন্তু আলুতে যে প্রোটীন আছে তা অধিকাংশ প্রোটীনের তুলনায় বেশি উপকারী, গুণের দিক দিয়ে অত্যন্ত মূল্যবান। আলুর প্রোটীনের পুষ্টিগুণ দুধ, মাংস বা ডিমের সমান।

আলুতে আর একটি পুষ্টিকর উপাদান আছে—ভিটামিন সি।

আলুর ইতিহাস বেশ মজার। চারশো বছরের কিছু বেশি হলো ইউরোপের লোকেরা প্রথম আলুর কথা শোনে। তার আগে আলু বলে যে একটা সব্‌জি আছে তা তারা জানতোই না। ১৫৫০ সালে স্পেনে প্রকাশিত একটি বইয়ে এক রকম অদ্ভুত সব্‌জির কথা উল্লেখ করা হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর অধিবাসীরা এবং রেড ইন্ডিয়ানরা এই সব্‌জি ফলাতো। তারা একে বলতো "পাপা।" দক্ষিণ আমেরিকা থেকে স্পেনীয় আর পোর্তুগীজরা ইউরোপে প্রথম আলু নিয়ে আসে। ইউরোপের লোকেরা কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত স্থির করতে পারলো না আলু দিয়ে তারা কী করবে। আলুকে কেন্দ্র করে নানান গুজব, অনেক কুসংস্কার ছড়ালো ইউরোপের দেশে দেশে। ১৬৩০ সালে তো ফ্রান্সের পার্লামেণ্ট আইন করে আলুর চাষ বন্ধ করে দেয়।

ইংরেজিতে আলুকে বলে 'পোটেটো' ('পোট্যাটো' নয়)। ইংরেজিতে কথা এসেছে স্পেনীয় 'পাতাতা' বা 'বাতাতা' থেকে। আলুর বৈজ্ঞানিক নাম হলো 'সোলানাম্ টিউবারোসাম।'

আমাদের দেশে গোল আলু প্রথম নিয়ে আসে পোর্তুগীজরা। গোল আলু এদেশে না পাওয়া গেলেও মেটে আলু, খাম আলু, রাঙা আলু, শাক আলু, মিষ্টি আলু প্রভৃতি নানা রকমের কন্দ-জাতীয় ফল পাওয়া যেতো এবং তাদের বলা হতো 'আলু'। সংস্কৃত ঋ-ধাতু মানে গমন করা—মাটির নিচে গমন করে যে সে 'আরু'। এই আরু শব্দের 'রু' বদলে 'লু' হয়েছে। হিন্দীতে কচু বা কন্দ-জাতীয় ফলকে আরুই বলে। তার মানে হলো আলু কথাটা এদেশে চালু ছিলো এবং পোর্তুগীজরা নতুন যে কন্দ-জাতীয় ফলটি এদেশে নিয়ে এলো তাকে আমরা আলু বলেই চিহ্নিত করে দিলাম। অন্ধ দেশে

গুণের তত্ত্ব গানের তত্ত্ব কজন বোঝে ভবে
তাই না হলে শিল্পীরা সব বনে কেন রবে।

এমন সময় বাগীশ মশাই দেখেন একটি মশক
পায়ের পরে রক্ত চুষে হয়েছে এক শশক—
উঃ কী জ্বালা তাল কাটলো তানের মাথায় মাং
একটি চড়ে মারতে গিয়ে বাগীশ মশাই কাৎ।

আলপনা। —মিণ্টু লাহিড়ী

আলু যায় বাংলাদেশ থেকে। সেই জন্যে তেলুগু ভাষায় আলুর নাম 'আপ্পালা-দুম্পোলু।'

খাওয়ার জন্যে আলুর ব্যবহার আমরা জানি। কিন্তু আলু দিয়ে বড় বড় কারখানায় নানা রকমের যে শিল্পবস্তু তৈরি হয়, তার খবর বড় একটা আমরা পাই না। আঠা জাতীয় এক রকম মাড় তৈরি করা হয় আলু থেকে। সেই মাড়ে তারপর ছত্রাক জন্মাতে দেওয়া হয় এবং সেই ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন জাতীয় ওষুধ তৈরি হচ্ছে আজকাল। কোনও কোনও রাসায়নিক পদার্থ এবং পাকা রং তৈরির কাজেও আলুর ব্যবহার হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় আলু থেকে কৃত্রিম রবার তৈরি হয় বলে জানা গেছে। ওদেশে আলুর স্টার্চকে রাসায়নিক উপায়ে চিনিতে রূপান্তরিত করা হয়, তারপর সেই চিনিকে গাঁজিয়ে তৈরি হয় ইথাইল অ্যালকোহল। এই ইথাইল অ্যালকোহল থেকেই কৃত্রিম রবার তৈরি হচ্ছে।

—

বায়না ভুলে যাও

সলিল মিত্র

বুবুন সোনা আর কেঁদোনা
মুড়কি মুড়ি খাও—
বুবুন লাট্টু, পুতুল নাও।
করো নাকো বায়না মোটে
রকেট যদি চাও
কিনে দেবো তাও
হুস করে ঐ চাঁদের দেশে
বুবুন তুমি যাও—তুমি চাঁদের ছোঁয়া পাও।
লক্ষ্মীসোনা আর কেঁদোনা
মুড়কি মুড়ি খাও
বুবুন বায়না ভুলে যাও।

ছোটদের পাততাড়ি

ভিউ ফাইণ্ডারে সত্যজিৎ রায়

সুচিত্রা সেন একটি বিশেষ ভঙ্গিতে
ধীরেন দেব

অভিনয় জগৎ

যুগান্তরের চলচ্চিত্র সম্পাদক আদেশ করলেন পূজা সংখ্যায় একটা কিছু লিখতে হবে। বললাম—চলচ্চিত্র থেকে দূরে সরে এসেছি, কি লিখব এখন? সম্পাদক মহাশয় ধমকে দিলেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বিষয়ে লিখবো বলুন? বিস্মিত হয়ে বল্লেন—"কেন, চলচ্চিত্রে আজকের প্রগতির কথা লিখুন—যেমন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ও ভারতবর্ষ বা বাংলা, অথবা এমনি কিছু যাতে বিশ্বের দরবারে আমাদের জ্ঞান ও গৌরবের পরিচয় আমরা দিতে পারি।" বিপদ ঘনীভূত হয়ে উঠলো, কিছু ছবি করেছিলাম এই দেশেই—কলিকাতায় ও বম্বেতে। কালের দৈর্ঘে সে ৩২।৩৩ বছর হলেও দেশের ব্যাপ্তিতে সে সাগর পারে গিয়েও যায় নাই, তারপর একদা 'সাগর সংগমেই' তার সমাপ্তি ঘটেছিল। ভালই হয়েছে, যে জিনিষ যেখানে শেষ হবার সেইখানেই তার শেষ হবে। আজকের চলচ্চিত্র-রসিক ও দর্শক সেদিনের আরও অনেক কিছুর মত সেদিনের চলচ্চিত্রকে মনে রাখেন নি, মনে রাখবার কথাও নয়। বর্তমান যুগের দ্রুত ধাবমান প্রগতির রথচক্রের তলায় অতীত তেমনই দ্রুত পশ্চাদ-অপসৃত হয়ে বিস্মৃতির অস্পষ্টতায় মিশে যাচ্ছে। এই-ই প্রকৃতির নিয়ম—অতীত যখন মৃত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতের যখন জন্ম হয় না তখন সেই অজাত ভবিষ্যতের অজানা আশংকায় মানুষ বর্তমানকেই খুব তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরে। বর্তমানেই জীবন একথা সত্য। কিন্তু এর অতি তীব্রতা হয়ত আমাদের প্রগতির পথে নিয়ে যেতে গিয়ে অতি-চাঞ্চল্যের পথেও নিয়ে যেতে পারে; এবং আজ সারা বিশ্বে বহু শ্রীবৃদ্ধির সংগে চাঞ্চল্যের অতি-তীব্রতা মানুষকে বহু শ্রী থেকে বিচ্যুতই করে দিচ্ছে। কিন্তু চলচ্চিত্রে আজ এর শুধু শ্রীবৃদ্ধিটুকুকেই লক্ষ্য করে বোধ হয় সম্পাদক মহাশয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু লিখতে বলেছিলেন। অক্ষমতা জানিয়ে বলেছিলাম, আমি তো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র সম্বন্ধে কিছু জানি না, যা জানি অথবা যা ভাবি, তাই লিখবো কি? তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, যা জানেন, তাই লিখুন, নইলে লেখা ভাল হবে না।" মনে মনে ভাবলাম—এমনিতেই লেখা ভাল হবে না, যে ধমকানি। তিনিও বোধ হয় ভেবেছিলেন পূজা সংখ্যা কাগজে সব রকমের লেখা যখন দরকার তখন ভাল লেখা কটাই বা পাবেন, সুতরাং যা হোক্...নিশ্চিন্ত হলাম এবং নিশ্চিন্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে উঠলো, সারা পৃথিবী যেমন আজ মনে এক হয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তেমনি এ দেশেও চলচ্চিত্রে সে চেষ্টা হয়েছে এবং অনেক সাফল্যও এসেছে। সত্যজিৎ রায়, নার্গিস, সুচিত্রা সেন, রাজ কাপুর, দিলীপকুমার, শান্তারাম, ভাসন এবং আরও অনেকে ভারতের চলচ্চিত্রকে

হবে নয় সারাজীবন ধরে বড়র সাথে জোটবেঁধে থাকতে হবে, নইলে বড়র চাপে পিষ্ট হয়ে যেতে হবে। তাই রাষ্ট্রে, বিজ্ঞানে, কৃষ্টিতে যাঁরা বড় হন তাঁরা দেশের কাছে আরও বড় হন—যখন বিদেশেও তাঁরা বড় বলে সম্মান পান। বিদেশে বড় না হলে আজকের জগতে শুধু মাত্র নিজের দেশে বড় হয়ে

মানুষ ও চলচ্চিত্র

দেবকীকুমার বসু

পৃথিবীর সকল দেশে পাঠিয়ে কেউ জয়মাল্য নিয়ে এসেছেন, কেউ অর্থ নিয়ে এসেছেন, কেউ দুই-ই এনেছেন। এর একটা মস্ত বড় দিকতো আছেই। সারা পৃথিবীর মাঝে উন্নতশির হবার গৌরব আমরা চাই। স্বভাবতঃই আমরা বুঝি যে, দুর্বলের স্থান কোথাও নাই এই উন্মত্ত পৃথিবীতে। হয় বড় হতে থাকতে পাচ্ছেন না—চাচ্ছেনও না। আজ মানুষের জীবন তার ঘর ছেড়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, কাজেই আজ চলচ্চিত্রে এ দেশ থেকে যাঁরা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছেন, বিদেশ থেকে সম্মান ও অর্থ আনছেন, তাঁরা শুধু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই নয়—সমগ্রভাবেই দেশের শ্রদ্ধেয়, কারণ তাঁরা দেশকে বিদেশের কাছে বড় করে তুলে ধরেছেন। যাঁরা দেশে বিদেশে ভারতের চলচ্চিত্রকে জাগতিক চলচ্চিত্রের উচ্চ স্থানে তুলে ধরেছেন—তাঁদের আমি অন্তরের সংগে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এবং সেই সংগে আমি তাঁদের—এদেশের ও সকল দেশের চলচ্চিত্রে কৃতী বিশ্বজয়ীদের অনুরোধ করবো যে, ছবির মাধ্যমে কলাকুশলতার বিরাটত্বের সংগে, রূপ-রংএর ঐন্দ্রজালিক বিস্তারের সংগে যে মানুষের আনন্দের জন্য ছবি করা এবং যে-মানুষই ছবির স্রষ্টাকে বড় করে তুলে ধরছে সেই মানুষকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যাঁরা চিন্তা-শীল—তাঁরা প্রায় সকলেই আশংকা পোষণ করেন যে, বিরাট বুদ্ধির অধিকারী মানুষ আজ অসম্ভবকেও সম্ভব করার বহুবিধ উন্নতির সংগে হঠাৎ পরস্পরকে ধ্বংস করে নিজে ধ্বংস হবার বিরাট দুর্বুদ্ধিরও অধিকারী হয়ে উঠেছে। এ উন্মত্ত হিংসা এমনভাবে এগিয়ে চলেছে যে, একে থামান যেন মানুষের হাতের বাইরে হয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্র-শক্তি যেখানে ব্যর্থ হচ্ছে, সাংস্কৃতিক মিলন, শিল্প-কলা, আন্তর্জাতিক সমাজবোধ সেখানে হয়তো আজও মানুষকে বাঁচাতে পারে তার আশঙ্কিত ধ্বংস থেকে। ছবির টেকনিক-এর পরিবর্তনের চেয়ে মহত্তর ও বৃহত্তর সৃষ্টি হবে—ছবির মাধ্যমে মানুষের মনের যথাসম্ভব পরিবর্তন আনা। বাস্তবধর্মী ছবির কথা তুলে আমরা যেন মানুষের মনকে তুচ্ছ না করি। যে সব ছবিকে সাধারণতঃ আমরা বাস্তবধর্মী বলি—সেগুলোও মূলতঃ মনেরই কথা—লেখক বা পরিচালকের মনের নানা বিশেষ বিশেষ ইচ্ছা থেকেই তার সৃষ্টি। কিন্তু তাকে আজ বহুজন যে বাস্তবধর্মী বলে তার প্রধান কারণ সেগুলি বহুজনের মনের সঙ্গে আজ চলে তাই। নইলে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে যে বাস্তব দেখা দেয়, মনের চাওয়া না-চাওয়ার বাইরে যার জয়যাত্রা—ছবির দৃষ্টিতে সেরকম বাস্তবধর্মী ছবি হয় না—যদি তাকে লোকরঞ্জনের চিন্তা করতে হয় বা অর্থও

[illegible] দে পরিচালিত 'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রে দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়

নামের কথা ভাবতে হয়। এটা ততটা বাস্তবতার কথা নয় যতটা জনতার মন আকর্ষণ করার যোগ্যতার কথা। এবং এ বদলেও যায় কিছু বছর পরে পরে। এক দিন এদেশে কৃষ্ণনাম ছাড়া গীত ছিল না এবং সেদিন জনতা একে বাস্তবের মতই মনে করতো। আজ বৈষ্ণবের নবদ্বীপেও লঘু চলচ্চিত্রের জয়ধ্বনি ওঠে কৃষ্ণ-নামের ও গৌর-নামের জয়ধ্বনি ছাপিয়ে। জনতার চাহিদা সব সময় বাস্তব অনুগামী নাও হতে পারে, তা হয়তো অনেক সময় অভ্রান্ত হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার বা দুর্বলতা-প্রসূতও হতে পারে। জার্মাণ চলচ্চিত্রের বড় একজন আমায় বলেছিলেন, তোমাদের একটা ছবি খুব সুন্দর লাগলো, সুন্দর পরিবেশ। কিন্তু ওতে একজন পুরুষ মানুষ এত চোখের জল ফেলছিল কেন?" আমি বলেছিলাম—"এটা এক সময় সমাজে

দেয়া-নেয়া চিত্রে তনুজা

ঘটেছিল যখন মানুষ ভগবানকে স্মরণ করে চোখের জলে নিজেকে স্নিগ্ধ করতো। এটা সত্যিই এত বড় কথা নয় এবং আজ তোমাদের এটা খারাপ লাগাটাও আমি বুঝি; কিন্তু তোমাদের ইউরোপ, আমেরিকার ছবিতে কথায় কথায় অত তীব্র কথা বলা এবং প্রায় প্রতি Sequence-এ একটা না একটা ঘুষোঘুষি দৃশ্য থাকে কেন? ওটা খুব বেশী হলে ছবি দেখতে দেখতে পরে সিনেমা হলেই যে ঘুষোঘুষি ঘটবে। আর ছবিতে Love scene বেশী বাস্তব হলে বোধ হয় পুলিশ ডাকতেই হবে।" ভদ্রলোক বুঝেছিলেন কথাটা এবং বলেছিলেন—"যেটা এক সময় বাস্তব বলি—সেটা হয়ত সেই যুগের আলোড়ন মাত্র।" চিন্তাশীল যাঁরা তাঁরা বলেন যে, বাস্তব বুঝতে হলে সমগ্রতা বোঝবার চেষ্টা করা উচিত। নিজের মনের একটা অংশকে বড় করলে বড় বাস্তব হয় না। যে মানুষ যত বেশী নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেন—তাঁরই কাছে বাস্তব মুহূর্তে মুহূর্তে ধরা পড়ে, আত্মকেন্দ্রিকতায় বাস্তবতা নাই।

আজ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের বিরাট মানুষদের আমি এই অনুরোধই করবো যে, মানুষকে বাঁচাবার, মানুষে মানুষে মিলন ঘটাবার ছবি করলে ছবি করার একটা বিরাট সার্থকতা আসবে স্রষ্টার মনে, দর্শকের মনে। আমি জানি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে বহু মনীষী আছেন—যাঁরা অর্থ ও নামের চেয়েও শিল্পকলাকে বেশী ভালবাসেন, মানুষের মনে যে ফুল ফোটে সেই ফুলকেই তাঁরা বেশী ভালবাসেন। কলাকুশলতায় ও নানা রূপে-রংএ, নানা মোহকরী সৃষ্টির মধ্যে মানুষের কল্যাণ করার কথাটাই জগতের চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের কাছে আজ সবিনয়ে নিবেদন করলাম। এক মহামানবের একটা কথা উদ্ধৃত করে এই সামান্য লেখাটি শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন, "জীবন সংক্ষিপ্তকালের এবং বহু স্পন্দনের মধ্য দিয়ে চলা এই জীবনের অর্থ কি তা যখন খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন একমাত্র বহুর কল্যাণেই নিজেকে উৎসর্গ করে মানুষ তার আত্মকেন্দ্রিক জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে।" এর চেয়ে বাস্তবধর্মী পৃথিবীতে খুব কমই জন্মেছেন—ইনি আলবার্ট আইনস্টাইন।

কিছুদিন থেকেই অনেক লোকের মনে হ'তে আরম্ভ করেছে যে, নবনাট্য নামে যা আমাদের দেশের চারিদিকে প্রবল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সবটাই কিছু ঠিক হচ্ছে না। কেউ কেউ তো একথাও বলছেন যে, পুরো আন্দোলনটাই নাকি পথভ্রষ্ট হয়েছে। অন্য অনেকে অবশ্য অতো কঠিন ক'রে বলছেন না, কিন্তু তাঁদেরও মত এই যে নব-নাট্যের নামে অনেক স্বেচ্ছাচার হ'চ্ছে এবং এখন এর এক নতুন মূল্যায়ন প্রয়োজন।

বর্ষার জল আমাদের কাম্য, কিন্তু বর্ষা যখন আসে তখন সে তো কেবল আমাদের ইতস্ততঃ রাখা কলসী, হাঁড়ি ও ধানের ক্ষেতের প্রয়োজন লক্ষ্য ক'রে বর্ষিত হয় না, তার বর্ষণ নিজের আইনে,—আমাদের পক্ষে তা নির্বিচার। তাই বিচার করতে হয় আমাদেরই। বাঁধ দিতে হয়, খাল কাটতে হয়, ভালো জল রক্ষা করতে হয়, পচা জল নিষ্কাশিত করতে হয়। আর তাই, আজ যখন নাট্য সম্পর্কে এতোবড়ো একটা উৎসাহ এসেছে তখনই একটা বিচারেরও প্রয়োজন ঘট্‌ছে, যাতে ময়লা যেনোজল আমাদের ভালো জলকে নষ্ট ক'রে দিতে না পারে।

এইটুকু বক্তব্যের সঙ্গে কারোর কোনও বিবাদ নেই। বিবাদ বাধে তখন যখন বিচারের পদ্ধতি ঠিক করতে বসা যায়। কেউ ভাবে, জলে আমি পাট পচাবো, সেই ময়লা করাতেই আমার লক্ষ্মী বাসে। আবার কেউ ভাবে, জলে আমি স্নান করবো, রান্না করবো, তাকে নির্মল রাখলেই আমার স্বাস্থ্য থাকে।

কাজে কাজেই বিরোধ পাকিয়ে ওঠে। এবং ক্রমশঃ এই সব চরমপন্থী কথা নিয়ে ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হয় যে লক্ষ্মীর স্তবেই স্বাস্থ্য বাঁচানো যায়, না লক্ষ্মীকে বয়কট করলে তবে বাঁচানো যায়।

একথা সকল বয়ঃপ্রাপ্ত লোকই জানেন যে টাকা একটা সর্বস্বীকৃত মাধ্যম। তাকে তুচ্ছ করাটাও যেমন ছেলেমানুষি, তাকে নিয়ে নাচানাচি করাটাও তেমনি অসুস্থতা। কিন্তু একথা কেউ স্বীকার করবেন ব'লে তো মনে হয়না যে, তাঁর নাট্য-প্রয়াসের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র অঢেল অর্থোপার্জন। কিংবা একথাই বা ক'জন বলবেন যে, তাঁদের নাট্য যতো দর্শক আকর্ষণে অসমর্থ হয়, যতো flop করে, ততোই তাঁরা আনন্দে অধীর হ'ন এবং নিজেদের পন্থার মহত্ত্ব সম্পর্কে ততোই নিঃসন্দেহ হ'ন?—সুতরাং তর্ক উঠলেই দেখা যায়, সত্যবাক্যের পরিবর্তে আপ্তবাক্যই ব্যবহৃত হ'তে থাকে বেশী।

একথা অবিসম্বাদিত যে সকল সংস্থাই চান যে তাঁদের নাট্যপ্রয়াস জনপ্রিয় হোক। এবং জনপ্রিয়তা হচ্ছে অর্থের সমার্থক। তাই জনপ্রিয়তার জন্যে, তথা অর্থাগমের জন্যে, অনেক নাট্যপ্রযোজনা ঘটছে 'নবনাট্য আন্দোলনকারী'দের দ্বারা। কিন্তু কেবল তাতেই দোষ ধরাটা অন্যায়। যদি কেউ নবনাট্য সৃষ্টি ক'রে তাকে জনপ্রিয় ক'রে তুলতে পারে তাতে তো প্রশংসার কথা। কিন্তু, সে নাট্য যদি নব না হয়? তাহলে 'পুরা-নাট্য আন্দোলনকারী' পেশাদার থিয়েটারের সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়? কেবল জনপ্রিয় হয়ে ওঠবার কাড়াকাড়ি সেখানেও চলে, এখানেও চলবে?

তাই বোঝা দরকার যে লোকপ্রিয় হ'বার ইচ্ছে সকল শিল্পীরই থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রিয় হবার দিকেই যার লক্ষ্য সে হোল ব্যবসায়ী। কিন্তু এমন তো কোনও মাপকাঠি নেই যা বগলে দিয়ে এক মিনিট রাখলেই মানুষটার কতো অংশ মহৎ ও কতো অংশ জোচ্চোর ধরা পড়ে যাবে। ফলে, বিচারের নামে আড়ালে নিন্দাকুৎসাই আমাদের কণ্ঠে বেশী এসে যায়।

তাই বিচারকদের কাছে আমার নিবেদন যে ভালমানুষিকতার নামে নির্বিচার প্রশংসা বা সত্যবাদিতার নামে নির্বিচার নিন্দা না-করে বিচারের একটা যুক্তিসংগত ভিত্তি স্থাপন করাই মঙ্গলপ্রদ।

আমাদের দেশের মঞ্চ অনেকদিন আছে। তাতে গিরিশচন্দ্র, শিশিরকুমার ইত্যাদি প্রখ্যাত শিল্পীরা কাজ ক'রে গেছেন। দেশের সেই মঞ্চই যদি আমাদের ঐতিহ্যের ধারাকে সগৌরবে বহন ক'রে এসে থাকে তাহলে তার বাইরে অকস্মাৎ এই নবনাট্য নামধেয় নাচানাচির কী দরকার ছিল? আর যদি এই নবনাট্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন থেকে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের জাতীয় মঞ্চ কোথাও জাতিভ্রষ্ট হয়েছে, তাই জাতির আর একটা চেতনাকে স্পষ্ট করার জন্যেই এই আন্দোলন সুরু হয়েছে।

আমরা জানি যে আমাদের মঞ্চে প্রকৃত

ক্ষমতাসম্পন্ন অভিনেতা ও অভিনেত্রীর উদ্ভব হয়েছে। কিন্তু এও জানি যে ততোখানি গুণ-সম্পন্ন নাট্যকার আসেননি। বিদেশে কিছু বিরাট কবি, কিছু বিরাট সাহিত্যিক, নাটকের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। অভিনয় যদি নাও হোত তাহলেও আমরা শেক্‌স্‌পীয়রের লেখা, গ্যয়টের লেখা, ইব্‌সেনের লেখা পড়তাম, নিজেদের বাঁচার তাগিদেই পড়তাম। কিন্তু বাংলা দেশের বেশীর ভাগ নাটকই আমাদের সেই গভীর অন্বেষায় সাহায্য করে না। তাতে সেন্টিমেন্ট্ আছে, কান্না আছে, ছেলেভুলানো গল্প আছে, অর্থাৎ মঞ্চের চাকা চলন্ত রাখবার জন্যে যে সব প্রমোদ উপকরণ দরকার হয় তারই যোগান আছে। কিন্তু টল্‌স্টয়ের 'অন্ধকারের ক্ষমতা' কি শুধু এন্টারটেন্‌মেন্ট? রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' কি প্রমোদ উপকরণের যোগানদার?—তা যদি না হয় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের নাটকের ঐতিহ্যের মধ্যে বুদ্ধির ভাগ কম, হাল্কা হৃদয়াবেগ বেশী। ফলে, রবীন্দ্রনাথের নাটক আমাদের জাতীয় মঞ্চে অঙ্গীকৃত হয়নি। জোড়াসাঁকোর প্রাঙ্গণে সেও এক নবনাট্য আন্দোলন সুরু হয়েছিলো। আদ্যোপান্ত নব। মঞ্চের মধ্যে বুদ্ধিকে প্রসারিত করবার সেই যে চেষ্টা তার সঙ্গে কি আজকের নাট্য আন্দোলনের যোগ আছে, না নেই? এ'সব কথাও বিচারকদের বিচার ক'রে দেখতে বলবো।

আমাদের জাতীয় মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের কতো নাটক অভিনীত হয়েছে তার তালিকা দেখিয়ে এখন একটা কথা বলবার চেষ্টা হয় যে কবির সঙ্গে আমাদের 'সাধারণ রঙ্গালয়'এর এতো কিছু দূরত্ব ছিলো না। হয়তো বা হ'বে। এ'সব মামলার বিচার জ্ঞানীজনরা করবেন। কিন্তু আমি একজন খুব ছোট সাক্ষী। আমি সাধারণ রঙ্গালয়ে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখেছি। সেখানে দেখেছি শ্রীশ কিংবা বিপিন লাফিয়ে রসিকের কোলে চ'ড়ে বস্‌লো, চন্দ্রবাবু রসগোল্লা খেয়ে আঙুলগুলো আমূল চাট্‌তে লাগলেন। আমার সেই অল্পবয়সেই এগুলোকে অত্যন্ত স্থূল ও অ-রাবীন্দ্রিক বলে মনে হয়েছিলো। আমি কী করবো? আমি কেমন করে মনে করবো যে সাধারণ রঙ্গালয় ও জোড়াসাঁকো—এই দুই স্রোত মিলেছিলো!

অথচ মিললে ভালো হোত। রবীন্দ্রনাথ অমেয় শৌর্যসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি এই সাধারণ দর্শকদের মুখোমুখি হ'লে লড়াই ছেড়ে পালিয়ে যাবার লোক ছিলেন, বলে বোধ হয় না। বরঞ্চ তাঁর অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর নাট্যরচনায় এমন কৌশল আনতে পারতো যে শ্রেয় এবং প্রেয় মিলে
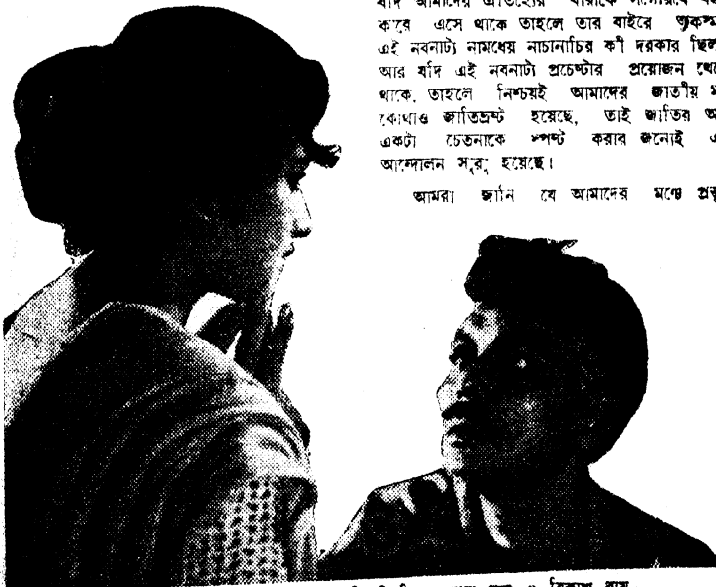
রাজেন তরফদার পরিচালিত জীবন-কাহিনী চিত্রে সন্ধ্যা রায় ও বিকাশ রায়

বাংলা মঞ্চকে অনেক যুগের জন্যে বাঁচিয়ে দিতে পারতো। কেবল নিজের মননের নিঃসঙ্গতার মধ্যে নাট্যরচনার ফলে যা কিছু ত্রুটি তাঁর লেখায় এসে গেছে সে সব ভেসে যেতো সেই সংযোগের স্পন্দনে ও উল্লাসে।

কিন্তু থাক, এসব কথা হয়তো নেহাতই কল্পনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে নাট্যচর্চার সুরু তার মধ্যে জীবনের গভীরতা ও জটিলতা বোঝাবার যে প্রচেষ্টা সেটার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের যোগ কোথায়? কেবল তাঁর কতকগুলি নাটক অভিনীত হয়েছিলো বলে? তাহলে হিন্দীতে 'জলজলা' বলে যে বায়স্কোপ হয়েছিলো, বাংলাতে 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও আরো অনেক যে সব ছবি তোলা হয়েছিলো তারা কি প্রমাণ করে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সব বায়স্কোপের আত্মিক যোগ ছিলো, বা আছে?

এর মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবেই স্মরণীয়। তিনি শিশিরকুমার। তাঁর নাট্য-প্রযোজনায়, তাঁর অভিনয়ে, তাঁর বাচনভঙ্গীতে, তাঁর উচ্চারণে আমরা প্রথম বুদ্ধির দীপ্তি স্পষ্টতঃ অনুভব করলাম। একমাত্র তাঁর কণ্ঠেই কাব্যের কথা যেন স্পষ্ট রূপ পেতো। শুধু কাব্য কেন, কথা যে কেবল সেন্টিমেন্টবাহী নয়, তাতে যে বুদ্ধির বিচিত্র রং ঝলমল করে সেটা কেবলমাত্র তাঁর অভিনয়েই বুঝতে পারতাম। আর কারোর অভিনয়েই সে উপলব্ধি আমার হোত না। 'জীবনরঙ্গ' নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষটায় নাটক কমন হবে তার একটা বর্ণনা ছিলো একটি শিষ্যের মুখে। সেটি অভিনয় করতেন শিশির-কুমার। অমন অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত হৃদয়াবেগের প্রকাশ আমি খুব কম দেখেছি। আজও আমার শিশিরকুমারের ঐ কথাগুলো বলবার ভঙ্গী খুব স্পষ্টভাবে মনে আছে, সে স্বরবৈচিত্র্য অদ্ভুত। যতোদূর মনে পড়ে, নাটকে ছিলো যে শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছে নাট্যাচার্যকে, লোকে তো থিয়েটার দেখতে আসে আনন্দ করবার জন্যে, তারা তো শিক্ষার জন্যে আসে না। সুতরাং আপনি শিক্ষা দেবেন কী করে? নাট্যাচার্য তার উত্তরে বলেন যে, নাটককে সুরু করতে হবে কেতুনপুরের ভুনাগা রাজার রাণীর মতো ঘাঘরা দুলিয়ে, ওড়না উড়িয়ে, আঁখির ঠারে চতুর হাসি হেসে। তারপরে অকস্মাৎ নাটকের মধ্যভাগে আসবে সঙ্কট। তখন—

বিনা মেঘে বজ্ররবের মতো
উঠবে বেজে কাড়ানাকাড়া,
জ্যোৎস্নাকাশে চমকে ওঠে শশী,
ঝন্‌ঝনিয়ে ঝিকিয়ে ওঠে অসি,
সানাই তখন দ্বারের কাছে বসি
গভীর সুরে ধরবে কানাড়া—

রক্ত! রক্ত! বেগে গড়িয়ে পড়বে রক্তধারা! যারা আনন্দ করতে এসেছিলো তাদের দুচোখ যাবে অন্ধ হয়ে।—

এই যে অভিনয় (যার প্রতিটি ভঙ্গী আজও আমার প্রায় মুখস্থ), এই যে বিশিষ্ট বক্তব্য—এর সঙ্গে কি দেশের সাধারণ মঞ্চ কোনও যোগ রেখেছে?—শিশিরকুমার উচ্চারণ সম্পর্কে খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। সেই উচ্চারণস্পষ্টতা কি সাধারণ রঙ্গালয়ে অনুসৃত হয়? কিংবা তথা-কথিত নবনাট্য আন্দোলনে? তাই আমি বিচারকদের অনুরোধ করবো যে, তাঁরা যেন বিশ্লেষণ করে দেখেন যে শিশিরকুমারের নাট্যচিন্তার সঙ্গে নবনাট্য আন্দোলনের কোনও যোগ আছে, আজকের ব্যবসায়িক মঞ্চের সঙ্গে তার আছে?

অর্থাৎ আজকের নবনাট্য আন্দোলন কি উদ্ভূত, না অতীতের গভীরে কোথাও তার শিকড় ছড়িয়ে আছে? যদি এটা অতীতের থেকে এসে থাকে তাহলে সে-ধারাটা কি বুদ্ধি নাট্যপ্রয়াস নয়? বাংলাদেশে একটা ইন্টেলেক থিয়েটার গড়বার চেষ্টা নয়?

তা যদি হয় তাহলে বাংলাদেশের থিয়েটারের দুটি ধারাকে খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। ব্যবসায়িক, অপরটি নাট্যসংস্কৃতিক। তাঁরা নিজেদের যে-নামেই বলুন না কেন। এক করবার সময়ে কাণ্ডজ্ঞানশূন্যে [illegible] সব কিছু একাকার করে দেবেন না। বাংলায় গ্রাম্য কথা আছে—চোর চায় গোলমাল। এর সঙ্গে আর একটা কথা আছে—এলোমেলো করে দে মা, লুটে-পুটে খাই। এই গোলমাল বা এলোমেলো করে দেওয়ার কাজ যাঁরা করেন তাঁরা ঐ [illegible] সাহায্য করেন। তাতে গঠনের কোনও [illegible] না। যে সমাজ সৎ প্রচেষ্টা ও অপচেষ্টা [illegible] তুলামূল্য জ্ঞান করে সে সমাজ [illegible] এটা তার মৃত্যুর পূর্বের জীবলক্ষণ।

জন্মের পরে আমাদের এক একজনের [illegible] নাম ঠিক হয়ে যায়, তা সে নামটা [illegible] হয়ে থাক। আমি একজনের নাম শুনেছিলাম [illegible] কুমার, কিন্তু তার মধ্যে কোনও [illegible] আমার চোখে পড়েনি। অপর দিকে [illegible] একটা সাধারণ নাম, কিন্তু [illegible] রবীন্দ্রনাথ নামটাই কেমন ঝলমল [illegible] নবনাট্য আন্দোলন নামটা এর [illegible] দিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এর কর্মের [illegible] এ নাম ঝলমল করবে কি না। কিন্তু যদি নবনাট্য আন্দোলনের প্রয়োজনের [illegible] থিতিয়ে ভাবি তাহলে দেখবো যে, আমরা নবনাট্য নিয়ে নয়, নাট্য-সংস্কৃতি নিয়ে, [illegible] মঞ্চ নিয়ে। আমাদের নাট্য আমাদের [illegible] সংস্কৃতিকে যথার্থ প্রতিফলিত করবে। [illegible] আগে নাটকে গার্হস্থ্য গল্প ছিলো, [illegible] আছে; দেশাত্মবোধের বক্তৃতা ছিলো, [illegible] আছে, শুধু হয়তো প্রগতিবাদের [illegible] সাম্যবাদের বক্তৃতা এসেছে কোথাও কোথাও। লোমহর্ষক ঘটনা ছিলো ও অশ্রুক্ষরণের [illegible] ছিলো, যেমন আজও আছে। তাই [illegible] রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলবার প্রয়োজন আজও মিটে [illegible] তাই নাট্যসংস্কৃতি গড়ে তোলবার কাজে [illegible] সাধকের দরকার আজও আছে। এবং সেই [illegible] নামটা নবনাট্য আন্দোলনই হোক আর যাই [illegible] ঘটনাটা কিন্তু আকস্মিক নয়; [illegible] আগমনের জন্যে অনেকদিন ধরে পথ তৈরী [illegible] এবং আজ যদি এই প্রচেষ্টা সফল হতে না [illegible] তাহলে আবার অন্য প্রচেষ্টা আসবে অন্য নাম নি[illegible] আসবেই, যদি আমাদের জাতির প্রাণটাই না [illegible] গিয়ে থাকে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সেই বুদ্ধি[illegible] ইন্টেলেকচুয়াল থিয়েটারই কি আমাদের [illegible] থিয়েটার? তাহলে কিন্নরী, আত্মদর্শন, [illegible] থেকে আজকের দিনের সেতু পর্যন্ত যে সব না[illegible] শত শত রজনী ধরে এই জাতিরই সংখ্যা[illegible] অংশকে উচ্ছ্বসিত করে এসেছে, তারা কী [illegible] কি জাতীয় নয়? বুদ্ধিবাদী নাট্য হয়তো বু[illegible] মানসের প্রতিফলিত করবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের খোরাকটাও তো থাকা চা[illegible]

...তারা উভয়ে মিলে জাতীয় রঙ্গমঞ্চকে ...করবে, নয় কি?

...ব্রেখ্‌ট্‌ সাহেব বলেছেন যে, নাট্যাভিনয় যেন ...কে হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে দুর্বল ক'রে না দেয়, ...তার বুদ্ধিকে যেন আরও জাগ্রত করে, আরও ...করে। সেই ব্রেখ্‌ট্‌ সাহেবের রঙ্গমঞ্চই তাঁর ...দেশের জাতীয় মঞ্চের সম্মান পায়, এবং ...তাঁকে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যস্রষ্টা ...বে শ্রদ্ধা করা হয়।

আমরা যখন জাতীয় সাহিত্যের কথা বলি তখন ...বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ ...দের সৃষ্টির কথা বলি, না স্থূলবুদ্ধি লেখক- ...চতুর্থ শ্রেণীর রচনাকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকি? ...বাইরের লোকের সামনে কাকে আমরা আমাদের ...বলি? যে-লোক বাঙ্গালীর গুণগুলো প্রকাশ ..., না যে বাঙ্গালীর চারিত্রিক ত্রুটিগুলোকে ...করে? অর্থাৎ তেলেভাজার দোকান কেউ ...বোধ করতে পারবে না, আমাদের আপনা-...সম্পর্কে— তাতে যাতে ভেজাল না পড়ে।

অথচ মুস্কিল এই যে, শিশিরকুমার ...অভিনয় করেছিলেন, 'বিসর্জন' অভিনয় করেছিলেন, ...; কিন্তু 'রীতিমতো নাটক' প্রচন্ড চলেছিলো। ...ও বহুদল সরকারী সাহায্য পেয়ে ...নাথের ...টক করেছে কিন্তু বেশীরভাগই একদম চলেনি। ...দলকে তো সরকারের কাছে আবেদন করেছে, ...যে রবীন্দ্রনাথের নির্ধারিত নাটক ...দের জন্য নাটক করবার অনুমতি দেওয়া হোক। অথচ এদের মধ্যে কয়েকটি দলের হাল্কা রসের নাট্যাভিনয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের পোষকতা পেয়েছে।

এই অবস্থায় কর্তব্য কী? জাতিই যদি তৈরী না থাকে তাহলে জাতীয় থিয়েটার গড়ে ওঠে কী করে?

আমাদের দেশ এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ থেকে সবে বেরিয়ে আসছে। অতীত ভারতের সমুজ্জ্বল ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের কোনও ধারাবাহিক সম্বন্ধ নেই। মাঝখানের অন্ধকার যুগ সে ধারাকে একেবারে ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। ওদিকে পশ্চিম পৃথিবী থেমে নেই, তারা অনেক এগিয়ে গেছে। আজ তাই আমাদের অনেক কাজ খুব তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলতে হচ্ছে, সম্পূর্ণ দেশটা তারজন্যে তৈরী না হওয়া সত্ত্বেও। যেমন ধরা যাক, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইন এবং মেয়েদের পিতৃসম্পত্তির বিষয়ে ... এই বাংলা দেশেরই বেশীর ভাগ লোক কথা উঠলে নিশ্চয়ই এই আইনের বিরুদ্ধে ...। এ আইন পাশ হওয়ার পর এই কলকাতা শহরেই ... হিন্দুবিবাহের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে এবং নারীর ... দামামা পিটিয়ে নাট্যাভিনয় হয়েছে; এবং সে অভিনয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকসাধারণের বিপুল করতালিতে সম্বর্ধিত। কিন্তু তবু আইন পাশ হয়েছে, এদেশ ... অপেক্ষা না করেই। তেমনি সৎ নাট্যপ্রচেষ্টাও কেবলমাত্র সংখ্যা-গরিষ্ঠের প্রিয় হবার চেষ্টা না ক'রে দেশের বুদ্ধি-বৃত্তিকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করবে যাতে আবেগ ও বুদ্ধিতে সংগতি আসে, জীবনে বোধের গভীরতা আসে। যাতে আমাদের জাতীয় নাট্য-সংস্কৃতি গৌরবান্বিত হয়।

কিন্তু একথাও সত্য যে, কোনও জাতি যখন গ'ড়ে ওঠে তখন সে নীচের তলা থেকেই গ'ড়ে ওঠে, কেবল ওপর থেকে সংস্কার ক'রে তাকে গ'ড়ে তোলা যায় না। এই গ'ড়ে তোলার কাজের ভার অনেকের ওপর। বিশেষ ক'রে যেগুলো জনসংযোগের মাধ্যম— যেমন রেডিও, সিনেমা, খবরের কাগজ, রাজনৈতিক সভা—এদের সকলের চরিত্র সংশোধনের প্রয়োজন। এরা যদি মোট মানবনীতি, ভদ্রনীতি লঙ্ঘন করে, বুদ্ধিগ্রাহ্যের পথ এড়িয়ে কেবল হুজুগ জাগাবার চেষ্টা করে, জনসাধারণের নিম্নতম বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করে (যেমন প্রফুমো কাণ্ডে অনেকগুলি কাগজে দেখা গেছে), তাহলে সৎ শিল্পী ও সাহিত্যিকের পথ কঠিনতম হয়ে ওঠে। এমনিতেই Art is a cruel mistress তারও পরে প্রতিবেশী যদি সবাই 'হোলি হো, হোলি হো' ক'রে কাদা ও গোবরজল নিয়ে তান্ডব সুরু করে, তাহলে গভীর কথা বলবার বা শুনবার পাবার সুযোগই থাকে না।

তাই নাট্যসংস্কৃতি যাতে আমাদের দেশের গৌরবের বস্তু হয় তার জন্যে চেষ্টা করার দায়িত্ব অনেকের এবং অনেক প্রকারের। যদি আমরা জাতি হিসাবে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারি তবেই বাঁচবো, নইলে—কি জানি নইলে কী হবে!

ঋত্বিককুমার ঘটক

আজকাল প্রায়ই বন্ধুমহলে আলোচনা ও প্রশ্ন শুনতে পাই,—ভাল ছবি করা ক্রমশই বাংলাদেশে বিরল হয়ে আসছে কেন।

কথাটা সত্যি ভাববার মত। এবং যে সমস্যাগুলি থেকে এই অবস্থার উদ্ভব, সেগুলি নিয়ে গভীরভাবে ভাবার এবং পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা আজ সমধিক।

বাংলা ছবি করার আর্থিক অন্তরায়গুলি নিয়ে বিভিন্ন কাগজে-পত্রে আজকাল আলোচনা হয়। দেখতে পাই। সত্যি-সত্যিই, আর্থিক বাধাগুলিকে সরানোর রাস্তা আছে এবং জনমত জাগ্রত হলে ও সরকার সচেতন হলে কলকাতার চিত্র-প্রদর্শন ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতিরই সংশোধন করা সম্ভবপর। এটা আজকে জানা কথা,—প্রদর্শন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমাধান করতে পারলে সাধারণভাবে বাংলা ছবির আয় অনেক বেড়ে যাবে ও সরকারের তহবিলে আরও বেশী টাকা আসবে। এর সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকটি সমাধানের পথও সরকারের হাতেই রয়েছে। যেমন, কলকাতায় আরও "রিলিজ চেনে"র ব্যবস্থা করা এবং সাধারণভাবে বাংলাদেশে আরও বাংলা ছবির প্রেক্ষাগৃহ তৈরী করার অনুমতি দেওয়া। এ ছাড়াও অনেকেই ভাবছেন অন্য প্রদেশে এবং বিদেশে বাংলা ছবির প্রদর্শন চালু করার কথা।

এ সব কার্যে পরিণত করতে পারলে সত্যিই বাংলা ছবির দুর্দশা ঘুচবে। এবং অনিবার্যভাবে তার সঙ্গে সঙ্গে ভাল বাংলা ছবি তৈরী করার পথও খানিকটা সুগম হবে। সেদিক থেকে বলা যায়, বাংলা ছবির সাধারণ সংকটের জন্য মানুষের চিন্তা ভাল বাংলা ছবি হবার পথে এক বিরাট সহায়।

কিন্তু এই-ই কী সব? অর্থাৎ শুধু এই কাজগুলি করে গেলেই কী চিত্রভাষা-সম্মত ও মহান বক্তব্য-সম্বলিত চলচ্চিত্র জন্মগ্রহণ করবেই করবে? তেমন কোন প্রতিশ্রুতি এই ঘটনাটার মধ্যে নেই।

কারণ ভাল ছবি হতে গেলে আর্থিক দিকটা যেমন মূল ভিত্তির একটা অংশ, তেমনি আর এক অংশ হচ্ছে সৎ ও রুচিবান শক্তিশালী সত্যিকারের শিল্পীর দল।

কয়েক বছর আগে সে রকম একদল শিল্পীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে আশান্বিত হওয়া গিয়েছিল। পর পর বিভিন্ন শিল্পী উঠছিলেন যাঁদের উপরে শ্রদ্ধা এবং ভরসা রাখা যায়। কিন্তু তার পর থেকে যত নতুন পরিচালকই আসতে থাক না কেন, উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁরা যেন তেমন আর আসছেন না। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত যাঁদের মধ্যে প্রতিভার স্বাক্ষর লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তাঁদেরও কেমন ক্রমশই ঝিমিয়ে যেতে দেখছি।

এ ঘটনাটির কারণ কি, এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে আজকে আলোড়ন তুলছে। বাংলার সংস্কৃতির একটা বলিষ্ঠতম দিক হচ্ছে আজকের চলচ্চিত্র, তার অবক্ষয় মানুষের মনকে ব্যথিত করছে।

শিল্পীর ব্যক্তিগত ইতিহাসের মধ্যে নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটির এক বিরাট দায়ভাগ জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন শিল্পীর নিজস্ব সর্বপ্রকার সমস্যা এবং সুযোগ সুবিধা এরকমটি ঘটার একটা কারণ। কিন্তু আমার মনে হয় এর উপরেও একটা সমষ্টিগত ত্রুটি ব্যাপারটার গভীরে কাজ করছে এবং বোধ হয় সেইটিই হচ্ছে এই ক্ষয়িষ্ণুতার মূলতম কারণ।

এখন যাঁরা বাংলা চলচ্চিত্রের পুরোভাগে, তাঁরা যখন প্রথম ছবি করতে আরম্ভ করেন,—তখন সত্যি সত্যি ঘটি বাটি বেচে ছবি করেছিলেন। ছবির প্রতি উদগ্র ভালবাসা তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে একটা সংগ্রামী রূপ এনে দিয়েছিল। লাভ-ক্ষতির বিচারে তাঁরা বোধ হয় বড় বেশী যাননি। তার ফলেই বাংলা ছবির আজ যা কিছু সমৃদ্ধি।

অথচ আজ যে নতুন পরিচালক ছবি করতে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে প্রায়শই ঋণাত্মক ছাড়া আর কোন গুণ দেখি না।

আমার মনে হয় তার কারণ তাঁদের চারপাশের আবহাওয়া। কয়েক বছর আগের শিল্পীদের আশপাশের আবহাওয়া ছিল একটা চ্যালেঞ্জে ভর্তি। একটা বুদ্ধিগত আন্দোলনের প্রথম আভাষ তখন হাওয়ায় বইতো। আজ সেটি একেবারে মুছে গেছে। আজ তার বদলে এসেছে নিরাপত্তার প্রশ্ন এবং সহজেই চমক দেবার চেষ্টা।

চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার 'কাঞ্চন কন্যা'র নায়িকা রূপে কণিকা মজুমদার

অথচ সেদিনের থেকে আজকের দর্শক অনেক বেশী তৈরী এবং দর্শকদের ক্রমবর্ধমান অগ্রণী অংশটির কথা বাদ দিলেও বলা যায়,—সাধারণভাবে কিছু কিছু ভাল ছবির বিপুল ব্যবসায়িক সাফল্য একথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভাল ছবি মানেই মার-খাওয়া ছবি নয়।

অর্থাৎ এই ক'বছরের কিছু মানুষের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যখন কিছুটা সুফল ফলাতে আরম্ভ করেছে তখনই আমরা পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি।

এ রকম ঘটনা ঘটার মূলতম কারণ হচ্ছে—বাংলাদেশে ছবি করাটা একটা আন্দোলনে পরিণত হতে গিয়েও হলো না। কিছু ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টা ও কর্মে পর্যবসিত থেকে গেল।

যদি আন্দোলনের আবহাওয়া তৈরী করা যেত তাহলে কিন্তু সত্যিই বাংলা ছবির সুদিন আসতো। এটা যে হয়নি, তার জন্যে প্রধানতঃ দায়ী আমরা যারা ছবি করি। এত চেষ্টা করেও এতদিনে আমরা একটা মুখপত্র অথবা platform খাড়া করতে পারলাম না। পৃথিবীর সব দেশের ছবির ইতিহাসে দেখা যায় এ রকম একটা খুঁটির জোরেই খাড়া থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক ছবি করার নবীন আন্দোলন।

এই সঙ্গে এই অভাবও অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে যে, সমালোচনার ভঙ্গীতে স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রকাশ হতে পারছে না। এখানে আমি শুধু পেশাদার সমালোচকদের কথাই বলছি না; যে সব চিন্তাশীল চলচ্চিত্র পত্রিকা বেরোয় তাদের কথাও বলছি।

দর্শক তৈরী করার ভার দুজনেরই,—ছবি যাঁরা করবেন এবং সেই ছবি যাঁরা সাধারণকে বুঝিয়ে দেবেন।

বহু বাধায় ব্যথিত বাংলাদেশের এই সময়ে একটা যুগের দাবী ছিল,—সে দাবীর স্বরূপ উপলব্ধি করা আমাদের কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। যে সময়ে আমাদের সর্বশক্তি সংহত করে অবিশ্বাস এবং অর্থমোহের অচলায়তনে নাড়া দেবার দরকার পড়েছিল,—সেই সময়ে আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ঊর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক নক্সাটাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি।

জানি না এখনও সময় আছে কি না।

—

এস নব যুবরাজ হে

এন কে জি

সম্প্রতি বহু আলাপ-আলোচনা, রাজ্য সরকারের প্রচুর সোচ্চার উৎসাহ, চিত্র-শিল্পনায়কদের বিরামবিহীন দুর্ভাবনা আমাদের এই চিত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে, এবং তার চেয়েও বড় কথা কেন্দ্রীয় সরকারী মহলে তো বটেই এমন কি বহির্বিশ্বের প্রাঙ্গণেও ঐ শিল্পকে একটা বিশেষ কৃষ্টিমূলক স্বীকৃতিদান—এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে একটা নতুন আশার সুর বাঙালীর অবসন্ন মনে ধীরে ধীরে গুঞ্জরিত হচ্ছে।

বাংলা ছবি, শনিকোপকবলগ্রস্ত বাংলা ছবির বক্রীদশার অন্তর্ধান বোধ করি এবার আসন্ন। দুখিনীমায়ের বহু দুঃখে কষ্টে ও অনাদরে লালিত সন্তানের মত এই শিল্পশিশুও রাত্রির তমিস্রা ও ঝড় ঝঞ্ঝার কঠিন ভ্রূকুটি অতিক্রান্ত হয়ে আজ বুঝি তার পূর্বাচলে নবারুণরাগের রক্তদ্যুতি দেখতে পাবে। প্রভাতের আলোকে সে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করতে পারবে শিল্পসাধনার চৈতন্য-লোকে।

সারা ভারতের মধ্যে বাংলা দেশই এই সিনেমা-শিল্পের প্রথম পথিকৃৎ কিনা সে সব বিক্ষুব্ধ বা দুষ্ট বাগবিতণ্ডা দূরে থাক। ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিশু কোথায় জন্ম নিল, কোথায় সেই নবজাতকের নয়নপাতে ধরণীর আলো প্রথম ধরা দিল, বাংলায় না অন্যত্র, সেটাই বড় কথা নয়। হীরক-জয়ন্তী আর সুবর্ণজয়ন্তীর কোলাহল এড়িয়ে চলে আমাদের চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে এই প্রশ্নের পথেই চালিত করা সমুচিত নয় কি যে, কী করে এই ফুলের মত কোমল ও সুন্দর শিল্পশিশুকে গড়ে তুলতে হবে সুস্থ ও বলিষ্ঠ এক চিন্তাশক্তিদীপ্ত যুবকের যৌবনদ্যোতনা দিয়ে?

কি করে ছড়িয়ে দেওয়া যাবে বাংলার ও ভারতের বহুদূরব্যাপ্ত দিগঙ্গনে, এমন কি সম্ভব হলে বহির্বিশ্বের সীমাহীন ক্ষেত্রেও তার বিরাট এক ধর্মশিল্পের উৎকর্ষ ও প্রসার সম্ভাবনা? শিল্পের যে সৌষ্ঠব ও সৌকর্য আজ প্রতিভাধর সত্যজিত রায়ের সৃজনীশক্তি ধীরে ধীরে কুঁড়ির মধ্য থেকে ফুলের মত ফুটিয়ে তুলছে বিশ্ববাসীর সপ্রশংস দৃষ্টিপথে, কেন সেই সৌন্দর্যের মুগ্ধ অনুভূতিকে আমরা কাজে লাগাতে পারব না? কেন বাংলা ছবিকে আমরা করে তুলতে পারব না আন্তর্জাতিক মহিমায় ও লাবণ্যে উজ্জ্বল, যা আনতে পারবে তার বিরাট প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধির স্বর্ণময় প্রতিশ্রুতি?

কোথায় তার প্রতিবন্ধক? জয়যাত্রা পথে কী তার দুর্লঙ্ঘ্য বাধা? কোন্ অচলায়তনকে চূর্ণ করে আনতে হবে এর ধর্মশিল্পাশ্রয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠা?

এই শিল্পের অলি-গলির সন্ধান যাঁদের জানা আছে তাঁদের কাছে এই প্রশ্নের নির্ভীক ও স্পষ্ট জবাব যদি পাওয়া যায় দেখবেন সে জবাব কতখানি হাস্যকর, কত করুণ, কত দুঃখকর। সে কথা আমাদের কাছে বলতে হবে তাঁদের কানে কানে ফিসফিস করে, শুনতে হবে আমাদের সে কথা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে। সে কথাটি হল : যতো দুঃখে-কষ্টেই বাঙলা ছবি গড়ে তোলা যাক, ঐ পর্যন্তই। সে ছবি দেখাবার মত যোগ্য গৃহ মিলবে না পশ্চিম বাংলায়।

কিন্তু কেমন করে বাঙলা ছবিকে বাঁচান যাবে, কেমন করে বলিষ্ঠ শিল্পের সমৃদ্ধি তাকে দেওয়া যাবে, যদি না সেই বাঙলা ছবিকে বাংলাদেশেরই প্রতিটি সম্ভব ক্ষেত্রে প্রদর্শনের প্রত্যাশিত সুযোগ ও সুবিধা না দেওয়া যায়?

ভগবান সাক্ষী, বিশ্বাস করুন পশ্চিম বাঙলার চিত্রশিল্পকে বাঙলাদেশের অন্ততঃ প্রতিটি বাঙালী-অধ্যুষিত ক্ষেত্রে প্রদর্শিত করে তার লগ্নী মূলধন ফিরিয়ে আনাই আজ প্রায় অসম্ভব ব্যাপার এক! সেই প্রদর্শন থেকে প্রচুর লাভের আমদানীর কথা চিন্তা করা তো অলীক স্বপ্ন মাত্র! সে সম্ভাবনা 'কোটিকে গোটিক'!

তবে কি হবে? এই অপ্রমেয় সম্ভাবনাময় শিল্পশিশুর কি খাদ্যাভাবে, অর্থাৎ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের অভাবে, কণ্ঠ রোধ হবে, অকালে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে? কেন না, যতই সে পাক রসিকজনের উদাত্তকণ্ঠে প্রশস্তি, তাইতো তার দেহ ধারণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় খোরাক নয়! প্রাণশক্তি তার যত অমিত হোক, রসোত্তীর্ণ শিল্পের প্রতিশ্রুতি তার যত প্রোজ্জ্বল হোক, সে প্রাণ তো দেহকে বিচ্ছিন্ন রেখে বাঁচতে পারবে না?
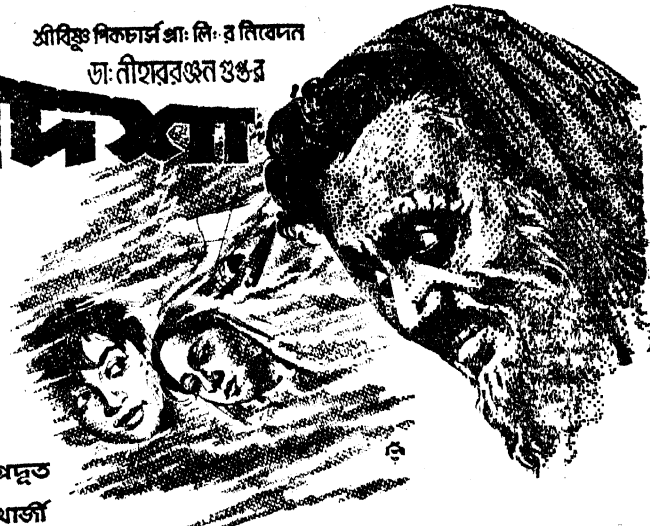
কাজেই নিছক বস্তুমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, শ্রমশিল্পের টাকা-আনা-পাইয়ের স্থূল হিসাব মিলিয়ে এই রূঢ় সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া অসম্ভব যে বাঙলায় এই সুন্দর রসশিল্পকে বাঁচতে হবে সমালোচক-সাহিত্যিক বা রাষ্ট্রনায়কদের প্রশংসার তিলক কপালে এ'টে নয়, ফেস্টিভ্যাল-জুরী'দের উচ্চ মূল্যায়নের তবক্ প'রে নয়। বাঁচতে হবে তাকে এই নিরন্ন, অর্ধভুক্ত, দরিদ্র কিন্তু রসপাগল বাঙালী জাতির সাধারণ নর-নারীকে আনন্দদানের মধ্য দিয়ে, তাদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে।

আর সেই বাঙালীর চিত্ত জয়ের পথের প্রবল অন্তরায় হল বাঙলা ছবি দেখবার মত যথেষ্ট চিত্রগৃহের অভাব। শুধু চিত্রগৃহের অভাব বললে পুরো সত্যটাকে বোঝানো যাবে না। কেন না, চিত্রগৃহের সংখ্যামূলক অভাবটা এই রাজ্যে ততো সত্য নয়, যতো সত্য স্থায়ী চিত্রগৃহগুলিতে সেই সব এখানকার তৈরী ছবি দেখাবার ব্যবস্থার অভাব, সুযোগের অভাব।

এ যেন ঠিক নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে থাকা!...

যদি এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় তবে দয়া ক'রে একবার দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দেখুন, এই রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বিলাসী চিত্রপ্রাসাদগুলির দিকে। হিসাব করুন এই বিশাল জনপদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত যত ক'টি চিত্রগৃহ আছে তার মধ্যে ক'টি চিত্রগৃহে বাঙলা ছবি নিয়মিত দেখান হয়! মোট তিন-পাঁচে পনেরটি চিত্রগৃহে, প্রথম মুক্তির হিসাবে।

দু'টি প্রথমশ্রেণীর চিত্রগৃহে নিয়মিতভাবে বিদেশী ছবি দেখান হয়। আর পঞ্চাশটিরও বেশী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, সহর ও সহরতলীর চিত্রগৃহে প্রায় নিয়মিতরূপে হিন্দী ছবি দেখান হয়। আর এই সহর ও সহরতলীর বাইরে ছড়িয়ে রয়েছে এই সংকীর্ণ পরিসর, দ্বিধাবিভক্ত বাঙলা দেশের যে দুই-তৃতীয়াংশ, তার মধ্যে অধিকাংশ উল্লেখ্য চিত্রগৃহই যে ক্ষুদ্র অনুপাতে বাঙলা ছবি দেখান এবং তার স্বপক্ষে যা যুক্তি, সেই মানসিকতার কথা ভাবলে লজ্জা হয়।

কিন্তু এই অসহ দুঃখ দাবানলের মতো বুকে পুষে বাঙলা ছবিকে এতকাল চলতে হয়েছে। কেননা, অন্য উপায় নাকি নেই। যদিও বাঙলার বাঙালীর ভাষা তার রাজ্যভাষা, তার মাতৃভাষা, তবু যেহেতু বাঙলা দেশ তার সহজাত ঔদার্যবশে সকল প্রদেশের সকল ভাষাভাষী মানবমানবীদের আপন বক্ষে সাদরে ঠাঁই দিয়েছে সেই হেতু সেই ভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে সম্ভ্রম জানিয়ে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এই ব্যবস্থাকে আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, নইলে নাকি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট হতে হবে! হায় এই উদার 'বসুধৈব কুটুম্বকম' নীতি! আর এরই সংগে যুক্ত আছে আরও একটা অসহায় অবস্থা। সকল বাঙালী দর্শকও সুযোগ পেলেই বাঙলা ছবি দেখতে রাজি নন সর্বাগ্রে। বাঙলা ছবি নাকি যথেষ্ট পরিমাণে চটুল নয়, জাকজমকে ঢলঢল নয়, তার নায়িকারা ওদের নায়িকাদের মত আবেশ-সঞ্চারিণী, স্বল্প বেশবাসা ও লাস্যময়ী বিলোলকটাক্ষনয়নী নন, যাঁরা কথায়-অকথায়, জাগরণে, স্বপ্নে, জন্ম-মৃত্যুতে ও বিবাহে, ট্রামে, বাসে, টাংগায়, ট্যাক্সিতে, অফিসে-আদালতে, ময়দানে, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে, শ্মশানে বা বাসর-গৃহে সর্বাঙ্গ নাচের ও গানের ফোয়ারা আবিরের মত মুঠো করে ছড়িয়ে দিতে পারেন, তাঁদের নৃত্য-চঞ্চল চরণের ঘায়ে জেগে ওঠে অন্তরের যে সুপ্ত যৌন-চেতনা, সেই উত্তাপ সঞ্চার করতে পারেন না আমাদের নায়িকা-উপনায়িকারা।

অতএব, বাঙলা ছবির ধাত্রী বংগজননী! অভাগিনী নারী, তুমি কাঁদো! তোমার কলাশিশুর যথেষ্ট স্থান নেই আপন রাজ্যে হাত-পা ছড়িয়ে সুস্থ নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবার, বাড়বার।

অবশ্য এ কথা নিয়ে যে শুধু আজ আমি ভাবছি আর আপনি ভাবছেন, বাঙলা দেশের শিক্ষিত সমাজ, কলারসগ্রাহী দর্শক সমাজ বা তার চিত্র শিল্পনায়করা, কিম্বা রাজ্য সরকারের কর্ণধারেরা ভাবছেন না, তা সত্য নয়।

পাষাণের বোধ করি আজ ঘুম ভেংগেছে! আত্মবিস্মৃত, লোকলজ্জাভিভূত, সর্বজীবকে উদার আলিংগনরত বাঙালীর অন্তত একটা লক্ষ্যনীয় বিরাট অংশ আজ বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রশ্ন করছে,—কেন বাঙলায় বাঙালীর তৈরী বাঙলা ছবি দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া যাবে না? কেন হৃদয়হীন প্রদর্শন-নীতির শাসনে উৎপীড়িত বাঙলা ছবি যথেষ্ট পরিমাণ চিত্রগৃহ পাবে না বাঁচবার জন্য? কেন এইসব বর্তমান চিত্র প্রদর্শকদের বাধ্য করা হবে না অন্তত ভদ্রতার ভারসাম্য বজায় রেখে মোটামুটি একটা সংখ্যানুপাত বজায় রেখে বাঙলা ছবি দেখাতে?" এবং প্রয়োজন বোধে কেন সরকার পূর্ব-অনুসৃত অন্ধনীতি ত্যাগ করে আরো যথেষ্ট সংখ্যায় নতুন চিত্রগৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের ও চিত্রশিল্পের অপার কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন না?

কেন রাজ্য সরকার রাজ্যেরই সীমারেখার ভেতরে তৈরী চিত্রগৃহগুলিতে লাইসেন্স বণ্টনের সময় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হবেন না? তাঁরা দেখবেন না কোন্ চিত্রপ্রদর্শক অন্তত এই রাজ্যে

নির্মিত ছবি দেখাবার জন্য যথোচিত সংবেদনশীল হন?

এইসব বহু সমস্যায় ও সংশয়ে কণ্টকিত আজ বাঙলা চিত্রশিল্পের প্রতিনিধিরা সম্প্রতি যে ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োগ করেছিলেন এই দেশীয় শিল্পের বিলোপ-সম্ভাবনা বা আশু সঙ্কট রোধের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই রস শিল্পকে উন্নতির পথে জাতির শিল্প চৈতন্য এবং কল্যাণমূলক আনন্দবিধানের পথে নিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে, সেই কমিটির সামনে এই সব প্রশ্ন এবং প্রস্তাব এইসব শিল্প-প্রতিনিধিরা উপস্থাপিত করে এসেছেন বলে জানা গেছে। আশার কথা, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত এই অনুসন্ধান কমিটি নিশ্চয় তাদের সূক্ষ্ম ও গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এই চারুশিল্পের সমগ্র দিকটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে তার অর্থনীতিক, শিল্পপ্রশ্ন বিষয়ক এবং অন্যান্য সর্ববিধ জিজ্ঞাসার কল্যাণকর সমাধান করবার মতো যোগ্য প্রস্তাব সরকার সমক্ষে পেশ করেছেন এমন আশা করা নিশ্চয় অসমীচীন হবে না।

এর মধ্যে একটা প্রধান স্থান নিশ্চয় পাবে নতুন চিত্রগৃহ স্থাপনার প্রস্তাব ব্যক্তি-নিরপেক্ষভাবে। এবং সে ব্যাপারে নিশ্চয় কমিটির সভ্যদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করবে যে নির্ধারিত জনসংখ্যার উপরে বর্তমানে নূতন চিত্রগৃহ নির্মাণের অনুমতি দান করা হয় সেই সংখ্যা পুনঃনির্ধারণের প্রশ্ন। একথা ভুললে চলবে না, স্বাধীনতা লাভের পর এই ষোল বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ শ্রমশিল্প স্থাপনে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গেই সুনিশ্চিতভাবে দেখা দিয়েছে এই সব জনবহুল শিল্পাঞ্চলে নতুন নতুন চিত্রগৃহের প্রশ্ন। সেই সব অংশের বিরাট শ্রমিক ও কর্মী বাহিনীকে দিতে হবে ভাল ভাল ছবি দেখবার সুযোগ, যার মধ্যে নিশ্চয় থাকবে এই রাজ্যের নির্মিত ছবি প্রদর্শনের জন্য যোগ্য ব্যবস্থা। যে সাংঘাতিক Exhibition Bottleneck আজ এই শিল্পের কণ্ঠ রোধ করে আছে তাকে সবলে অপসারিত করবার বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন রকম দৌর্বল্য বা অজ্ঞতার সুযোগ যাতে কোন অসাধু ব্যবসায়ী না পায় তার জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। চিত্র-শিল্পের অভ্যন্তরে যে সব আত্মবিধ্বংসী দল-উপদল আজ রচিত হয়েছে এবং যাঁরা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থে এত বড় একটা জাতীয় শিল্পের মহত্তর দিক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে আছেন তাঁদের হুঁশ ফেরাতে হবে। তাঁদের এই শিল্পের মধ্য দিয়ে জাতীয় শিল্পের কল্যাণ সাধনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। নতুবা তাঁদের বহুদিনের কায়েমী স্বার্থ ত্যাগ করে বিদায় নিতে হবে শোষণ-পথ থেকে। আজ সহযোগিতামূলক পরিকল্পনার ব্যাপক ভূমিতে এসে হাতে হাত মিলিয়ে সবাইকে দাঁড়াতে হবে।

এইসব কিছুর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতির শিল্পের বৃহত্তর স্বার্থে নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের সংকোচন এবং এই ব্যাপারে সরকারকেও যথেষ্ট পরিমাণে কর্মোৎসাহী হতে হবে। চিত্রশিল্পকে শুধু আর মজাদার 'ফিলিম' এবং মোহময়ী অভিনেত্রী-দের আকর বলে ভাবলে চলবে না, চলবে না শুধু তাকে ব্যবহার করা রাজ্যের আয় বাড়াবার অমোঘ অস্ত্র রূপে। সকল সভ্য দেশ যে পথে চলছে সেই পথ, সেই নীতি অনুসরণ করে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও রস-বোধের দ্যোতক এই শিল্পের কাছে সরকারেরও মহৎ ঋণ স্বীকার করতে হবে। এবং সে ঋণ শোধ করতে হবে।

স্বর্গত কর্মবীর বিধানচন্দ্র এই শিল্পের পরম সংকটের ক্ষণে বরাভয় বাণী নিয়ে এসে প্রশস্ত বক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এর ত্রাতা রূপে। তিনি বুঝেছিলেন ছোট্ট পশ্চিমবঙ্গের মস্ত বড় এই রসশিল্প না বাঁচলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নেমে আসবে গভীর দুঃখ, অনেক অকল্যাণ। তাঁর প্রারব্ধ ব্রতকে উদ্‌যাপন করতে হবে আমাদের চিত্রনায়ক ও রাষ্ট্র-নায়কদের মিলন সভার সভ্য রূপে।

যে শিল্প জন্ম দিয়েছে সত্যজিতের মতো কালজয়ী প্রতিভার, সেই শিল্প মরতে পারে না। তার অন্তর প্রদীপখানি সমস্ত ঝড় বৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের সযত্নে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। যাতে তার অনির্বাণ শিখা ছড়িয়ে পড়ে দেশে দেশে, তার পরশমণি ধন্য করে মানবচিত্তলোকের শাশ্বত রস-পিপাসাকে।

বাঙলা ছবি আজ তাই অপেক্ষা করে আছে সেই অনুপ্রাণিত মহান নব-নায়কের, যিনি আসবেন এর নবজীবনের সোনার কাঠি হাতে নিয়ে। যুগে-যুগে এঁরাই তো আসেন পথিকৃৎ হয়ে, রেখে যান জাতির জীবনে তাঁদের অক্ষয় স্থান।

অধীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা রইলাম তাঁরই আবির্ভাবের অপেক্ষায়। শুভ শঙ্খধ্বনি দিয়ে তাঁর বরণ করব। আনন্দঘন অশ্রু চোখে নিয়ে বলব : চিত্র মন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে, তুমি এস নব যুবরাজ হে।
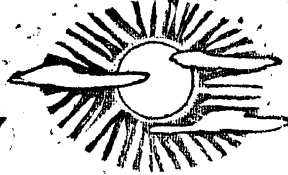
কোনো রসিক বন্ধুর উক্তি মনে পড়ল। তিনি ছবির ভক্ত, আবার ক্রিটিকও। দেশীয় ছবি বিদেশের বিচার বৈঠকে উপস্থিত করে মর্যাদা কাড়ার ব্যাপারে তাঁর যেমন উৎসাহ, স্বদেশে সেই সব ছবিরই মান বিশ্লেষণে তেমনি অকরুণ তিনি। দেশীয় ছবির ঘরোয়া আলোচনা প্রসঙ্গে হঠাৎ তিনি কতগুলো বেখাপ্পা প্রশ্ন করেছিলেন।

পাঁচটা বেড়াল, পাঁচটা টিয়া বা ময়না, পাঁচটা বাঘ বা সিংহ, পাঁচটা হাতী বা গণ্ডার এক সঙ্গে দেখলে একটার সঙ্গে আর একটার তফাৎ বুঝতে পারো? প্রত্যেকের যদি আলাদা আলাদা নাম থাকে, পরে খুঁটিয়ে দেখেও বলতে পারবে কোন্ নামটা কার?

বললাম, না। সব বেড়াল, সব টিয়া বা ময়না, বাঘ বা সিংহ, হাতী বা গণ্ডার এক রকম দেখব। তবে, তাদের খবরদারী যাঁরা করেন, তাঁরা নিশ্চয় বলে দিতে পারবেন। চোখ অভ্যস্ত হলেও পারা যেতে পারে।

ঠিক কথা। আমাদের ছবিগুলোও সেই রকমই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যাঁরা এই সব ছবির খবরদারী করছেন বা যাঁদের চোখ অভ্যস্ত, অর্থাৎ যাঁরা পরিচালক বা প্রযোজক বা টেকনিশিয়ান, তাঁরা হয়ত চোখ বুজেই বলে দেবেন তাঁদের কোন্ ছবির কি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ছবি কাদের জন্য, ছবি কারা দেখে? যারা দেখে, তাদের একটার স্মৃতি আর একটার সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যায়। চোখে বা মনে প্রত্যাশার নতুন চমক লাগে না।

পরিহাসোক্তি হলেও কথাগুলি মনের কোথাও গেঁথে গিয়েছিল বোধ হয়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমি শুধু বাংলা ছবির আলোচনা করছি না, ভারতীয় ছবির একটা সামগ্রিক ধারা আমাকে কিছুটা বিচলিত করেছে। এর মধ্যে কিছু বাংলা এবং দুই একটি প্রদেশীয় ছবি আন্তর্জাতিক সুনাম আর সম্মান নিয়ে এসেছে। চিত্রায়ন গতানুগতিকতার মধ্যে এই ছবিগুলি এক-একটা আলোর শিখার মত। ছবির রাজ্যের কিছু অন্ধকার এগুলো দূর করতে পেরেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকের দিনে এই রাজ্যটিও যে বড় বিস্তৃত, বড় বেশি প্রসারিত। তাই এ-রাজ্যটিতে সামগ্রিকভাবে কিছুটা সুষ্ঠু মানের আলোকপাত না ঘটলে চলবে বলে মনে হয় না। দু চারটে ছবির দাক্ষিণ্যে এত বড় শিল্পের মুল পুষ্ট হবে, সেই আশা খুব বাস্তব আশা নয়।

ছবি বিশ্লেষণ করতে বসলে দেখি, কোনোটা মিলনান্তক, কোনোটা বিয়োগান্ত, কোনোটা বা এই দুইয়ের সংমিশ্রণ, আর কোনোটা নিছক হাস্য-কৌতুকব্যঞ্জক। সব দেশের সব ছবিই মোটামুটি তাই। তাহলে বিদেশের সাধারণ মানোন্নত ছবি-গুলির তুলনায় আমাদের দেশের সাধারণ ছবির মান এত নিষ্প্রভ হয়ে যায় কেন? এর আসল কারণ বোধ হয়, বিরহ মিলন বিচ্ছেদ বা হাস্যপরিহাস পরিবেশনের ব্যাপারে আমরা এক সুদীর্ঘকালের 'সেট প্যাটার্ণ' অনুসরণ করে আসছি। একদিন যা ভাল লেগেছিল, তাকে আর ছাড়িয়ে উঠতে পারছি না। ছাড়তে গেলে মায়া হয়, ভয় হয়। কিন্তু একদিন ভালো লাগত যাদের, এই জটিলতার যুগে, পারমাণবিক যুগে সেই মানুষের মন দ্রুত বদলেছে। এই প্রচ্ছন্ন চিত্ত-বেগের সঙ্গে তাল রেখে ছবির সাজ বদল করলেও আমরা ভাব বদল করে উঠতে পারছি না। যার দরুণ, বন্ধুর উক্তি অনুযায়ী, আমাদের সব বিরহ মিলন বিচ্ছেদ বা হাস্য-কৌতুক-পর্বের মূলে বৈচিত্র্যের স্পর্শ পাওয়া ভার হয়।

দর্শক ছবি কেন দেখেন? সাদা কথায় আনন্দ পাওয়ার জন্যে, খণ্ড অবকাশটুকুতে নিজেকে ভোলার জন্য। কিন্তু তা হলেও, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্তলের একটি নিভৃত বিচারক উপস্থিত। ছবির প্রসাদগুণে এই বিচারকটিকে না ভোলাতে পারলে তাঁর আনন্দ আহরণ ঘাটতি পড়বেই। দর্শক মনের এই বিচারকটিকে ঘুম পাড়ানোর জাদু যাঁরা জানেন, শুধু তাঁরাই ভালো ছবি করেন। অন্যথায়, বিচারক অনুগ্রহ করে ছবি হয়ত দেখেন, মাতোয়ারা হয়ে ওঠেন না। অনুগ্রহের ভরসায় কোনো শিল্প বাঁচে না।

একখানা ছবি ভালো হয়, প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী, কলাকুশলী ও কাহিনীকার প্রভৃতির সকল কারিগরীর মিলিত সমন্বয়ে। বর্তমানের প্রযোজক এক-একখানা ছবির পিছনে বহু টাকা (এদেশের আগের ছবির তুলনায়) খরচ করেন। পরিচালকের চোখের সামনে বহু সার্থক বিদেশী ছবির কলা-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত, মনের তলায় অনেক অভিনব জল্পনা-কল্পনা। শিল্পীদের চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মান আগের থেকে অন্ততঃ অনেক সহজ, স্বাভাবিক—এ-কথা অনস্বীকার্য। সাউন্ড, ফটোগ্রাফি বা অন্যান্য আঙ্গিক যে উত্তরোত্তর ভালোর দিকে যাচ্ছে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আর, আজকের দিনের কাহিনীকারদের দাবী, মানুষের মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে পারেন তাঁরা। তা হলে ছবি ব্যর্থ হয় কেমন করে? বেশির ভাগ ছবি দেখেই কেন আমাদের মন ভরে না, চিত্ত প্রসন্ন হয়ে ওঠে না। যার ফলে কত চিত্র ব্যবসায়ীকে যে এক-একখানা ছবি করার পর মাথায় হাত দিয়ে বসতে দেখা যায়, ঠিক নেই। এর প্রধান কারণ, আমার বিশ্বাস, সৃষ্টির মূলে ওই সামগ্রিক সমন্বয় সাধনের অভাব ঘটছে। এই স্পেশালাইজেশনের যুগেও পরস্পরের প্রতি আস্থা কম। ফলে, যিনি ফল চেনেন, তিনি ফুল গাছ মূল বীজ সবই চিনে নিতে চেষ্টা করছেন। যথাযথ চিনে নিতে পারলে ক্ষতি নেই। কিন্তু সেটা পারা খুব সহজ নয়। না পারলে যে বিপদ ঘটে তাই ঘটছে। অনেক ফাঁক থেকে যাচ্ছে। পরিচালককে অনেকটাই প্রযোজকের পছন্দের দিকটা ভাবতে হচ্ছে, শিল্পী কলাকুশলীদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যের থেকেও পরিচালকের বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হচ্ছে, আবার কাহিনীকারকে প্রযোজক পরিচালক এমনকি শিল্পীদের পছন্দ অপছন্দের দিকেও চোখ রেখে কাহিনীর বুনট রচনা করতে হচ্ছে। আমাদের চিত্র রচনার প্রধান গলদ মনে হয় এইখানে।

এদিক থেকে সব থেকে বেশি বিভ্রম ছবির কাহিনী নিয়ে। এদেশে ভাষা লিখতে পড়তে জানলেই কাহিনীর ওপর অস্ত্রোপচারের অধিকার জন্মায়। প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী প্রভৃতি সকলেরই কাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব এবং প্রভাব দেখা যায়। পরিচালক সম্ভব হলে গল্প লেখেন, সম্ভব না হলে অন্যের লেখা গল্প নিয়ে তো কাটতে জুড়তে বসেন—আর সংলাপ যোজনা তো জল-ভাত ব্যাপার। কিন্তু সত্যিই জলভাত ব্যাপার নয়। দর্শকের কান-মন আগের থেকে অনেক বেশি প্রস্তুত। রসের যোগানদারীতে কোথায় ছেদ পড়ল এ তাঁরা হয়ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারবেন না, কিন্তু অনুভব ঠিকই করবেন। অথচ এই দুটি সম্বন্ধে ছবির নিয়ামকও সচেতন নন। তাছাড়া কাহিনী নির্বাচনের ব্যাপারেও প্রযোজক বা পরিচালকের একচ্ছত্র আধিপত্য। একখানা ছবির আর্থিক দায়িত্বের কথা ভাবতে গেলে সেটা খুব স্বাভাবিকও। কিন্তু তাঁদের বিচার বিবেচনায় প্রায়শঃই ভুল হওয়াটা তেমন অস্বাভাবিক নয় কিছুমাত্র। প্রযোজক বা পরিচালক হওয়ায় প্রতিভা আর সুনির্বাচনের কৃতিত্ব এক না-ও হতে পারে। না হলে যে বিপদ, সেটা দুরপনেয়।

নিরাপত্তার দিক চেয়ে যাঁরা ছবি করেন, তাঁদের অনেকের মুখে শুনেছি, আজকের মানুষের যা মনের অবস্থা তাতে ট্র্যাজেডি ভালো চলে না। অতএব, ছবির শেষে মিষ্টি মিলন চাই। মিষ্টি মিলনে ছবি ভালো হয় না, সে কথা একবারও বলি না। কিন্তু ট্র্যাজেডির ওপর আমরা মিথ্যা দোষারোপ করি। আসলে ট্র্যাজেডি নামে সংগতি শূন্য দুঃখভার চাপিয়ে আমরা দর্শককে পীড়ন করি। কিন্তু মহৎ ট্র্যাজেডির ধর্ম তা নয়। সে চোখের জল টানবে, বুকে মোচড় দেবে, কিন্তু অন্তস্তলের সত্তাকে ঊর্ধ্বাভিমুখী করবেই। তাকে জাগ্রত করাবে। মিলনকে একমাত্র লক্ষ্যকেন্দ্র ধরে নেবার ফলে যে-সব অবাস্তব সস্তা রোমান্সের রাস্তায় আমরা চলতে চেষ্টা করছি, তাতে হৃদয়ের সঙ্গে খুব একটা সহজ যোগ থাকছে না।

কাহিনী নিয়ে সম্প্রতি এদেশেও কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। বলতে বাধা হচ্ছে, এর মধ্যে বিদেশী ছবিঅলাদের মতামতের প্রভাব কিছু আছে। ডি-সেন্ট্রালাইজেশন অফ্ ড্রামা—নাটকীয় বিকেন্দ্রী-করণের বাতাস আমাদের চিত্র-চিন্তাবিদদেরও কিছুটা স্পর্শ করেছে। এর অর্থ বিচিত্রতার দিকে এগিয়ে যাওয়া কিনা আমার ঠিক ধারণা নেই। কিন্তু বাস্তবে তাই দেখছি। অথচ ওদেশে যাঁরা এই মতের পোষক, তাঁদের ছবিতে সহজ বিন্যাসের মধ্যেও এক একটা নাটকীয় মুহূর্ত এমন জ্বলে জ্বলে হয়ে উঠতে দেখেছি, যা সহজে ভোলা যায় না। কিন্তু এ-দেশের উক্ত মতপন্থীরা এটুকুই একমাত্র বর্জনীয় বস্তু ভাবছেন কিনা সেই সন্দেহ হয়।

কি এদেশের কি বিদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলোর কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করি। এর মধ্যে এমন একখানা ছবিরও কি নাম করতে পারেন, যার বিষয়বস্তুর আবেদন শাশ্বত নয়, যার কাহিনী আমাদের মর্মমূলে নাড়া দেয়নি? এই সত্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে থাকলে বড় রকমের ভুল হবে। ছবির মূল ভিত্তি কাহিনী। একখানা পরিপুষ্ট মনোগ্রাহী কাহিনী অনেক দিকের অনেক ত্রুটি ঢেকে দিতে পারে। আবার, জোরালো না হলে পরিচালক আর তাঁর গোষ্ঠীর অনেক সুপটু কারিগরীও ব্যর্থ হয়ে যায়। আমার স্থির বিশ্বাস, সর্বাগ্রে এইদিকে নিষ্ঠাসহকারে চোখ রেখে চিত্রনির্মাতারা কাজে নামলে এদেশে একখানা ছবিও মার খাবে না।
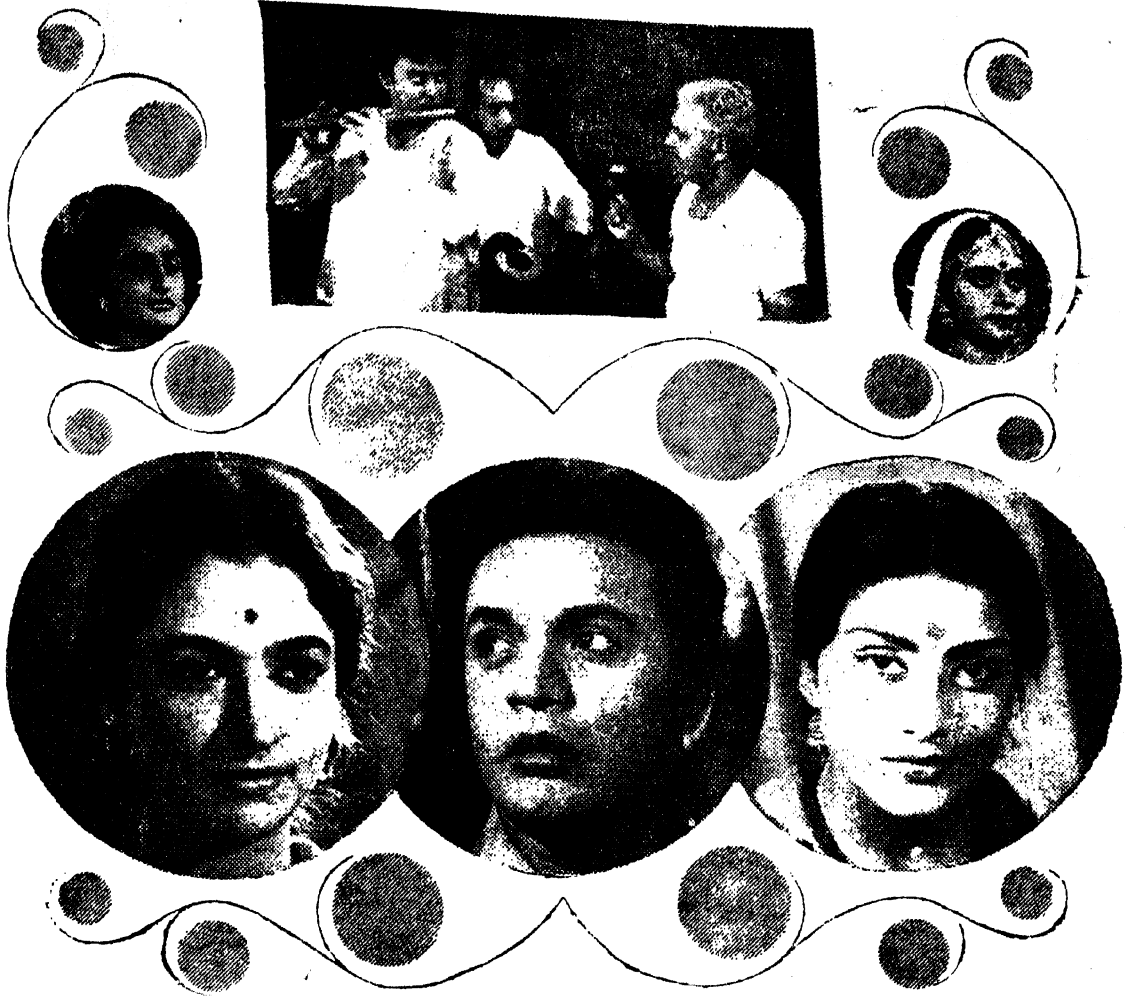
উপরের সারিতে : উৎপল দত্ত পরিচালিত ঘুম ভাঙার গান চিত্রের একটি দৃশ্যে অনুপ চট্টোপাধ্যায় ও চায়প্রকাশ ঘোষ; দুই পাশে : অরোরার রাধাকৃষ্ণ চিত্রে উত্তরা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মধ্য সারিতে : বিনু বর্ধন পরিচালিত আর-ডি-বি'র বিভাস ছবিতে ললিতা চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার এবং সরোজ সেনগুপ্তের প্রোডাকসন্সের সিন্দুরে মেঘ চিত্রে রুমা গুহঠাকুরতা। নীচে : উত্তমকুমার প্রোডাকসন্সের উত্তর ফাল্গুনী চিত্রের একটি দৃশ্যে বিকাশ রায় ও সুচিত্রা সেন এবং অগ্রদূত পরিচালিত শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স'র বাদশা চিত্রের একটি দৃশ্যে সন্ধ্যারাণী, অসিতবরণ ও শ্রীমান শঙ্কর।

তুমি মা : তুমি জীবনরূপিণী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

তুমি তো মাটি নও : তুমি মা,
মানবচৈতন্যের মহিমময়ী প্রতিমা তুমি,
স্বর্ণশস্য শিখায় তোমার প্রাণময়তার লাবণ্য
স্বাধিকারের দীপ্তি তোমার আত্মা।
মাটি নও, তুমি মা,
সিদ্ধি ঋদ্ধি শান্তি মুক্তিরূপিণী
তুমি আমাদের মানবময়ী জন্মভূমি।
চাঁদ কারুর মা নয়
চাঁদের মাটি বন্ধ্যা
সেখানে কেউ কোনোদিন জন্মায় নি,
তুমি চাঁদের চেয়ে লক্ষ গুণে গরীয়সী
তুমি যে মা।
যে মানুষ যে মাটিতে জন্মায়
মা হয়ে ওঠে সেই মাটি
অমৃত সৌরভে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে
সে মাটির আকাশ বাতাস।
আমরা বিদেশ মাতাকেও প্রণাম জানাই
তোমার পায়ে মাথা রেখে।

মাগো, তুমি মাটি নও
তুমি পরমাকল্যাণী জননী।
গৌরবময় ঐতিহ্যের সমুদ্রমন্থনে
আমরা পেয়েছি পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে
মা বলে ডাকার উত্তরাধিকার।
আমাদের মহান সংকল্প :
তোমার বুকে
একটি প্রাণীকেও চোখের জল ফেলতে দেবো না
একটি জীবনকেও ফেলতে দেবোনা দীর্ঘশ্বাস।
তোমার সম্মান রাখতে যারা আত্মোৎসর্গ করেছে
সেই মহান মৃত্যুকে স্মরণে রেখে
দিগন্তপ্রসারী কোটি কোটি দৃষ্টি আমাদের
অতন্দ্র
তোমার বুক থেকে
তোমার পবিত্র অঙ্গন থেকে
সূচের ডগায় তোলা এক কণা মাটিও,
আমরা কাউকে অধিকার করতে দেবো না।
কলঙ্কিত হতে দেবো না
আমাদের অকলঙ্ক মুৎ চৈতন্যকে।
তুমি যে আমাদের জীবনরূপিণী মা।

নতুন ডায়েরী

কুমারেশ ঘোষ

নতুন বছরের
নতুন ডায়েরীর পাতাগুলো
উল্টে-পাল্টে দেখছিলাম।
সাদা পাতা, তারিখের মার্কা মারা,
ফাঁকা, আঁকা-লেখা নেই কিছু :
ঘটনার স্রোতে ডোবানো হয়নি ঘট!
মাঝে মাঝে ছুটির ইশারা :
বন্ধন-মুক্তির নানা মুক্তো ছড়ানো,
আরামের টুকরো আমেজ!

ক'টা পাতা দেখি, দাগী, কোঁচকানো!
তাড়াতাড়ি মুছি দাগ। টেনে টেনে
সোজা করি কোঁচকানো পাতা!
আগামী দিনের দুঃখ ভরা রুক্ষ দিনগুলো
হবে কি মসৃণ, শান্ত, সহজ, সুন্দর
আমার চেষ্টায় বা ভাগ্যের বিধানে?
সরু লাল ফিতে বাঁধা ডায়েরীর মাথায়
'পেজ-মার্ক'!
দিন গুণি—
কোনদিন হবে লাল আমার জীবনে
যশে, মানে, গানে!
কিংবা ভাবি, হবে কালো ঘৃণ্য অপমানে
দ্বিধাগ্রস্ত আমি,
ভয়ে রাখি রহস্যময় নতুন ডায়েরীখানা
জামার পকেটে!

প্লাস্টিক কভারে মোড়া
তিনশো পঁয়ষট্টি দিন—
দু'শো নয়া পয়সায় কেনা!

সিঁড়িতে দেখা

গোবিন্দ চক্রবর্তী

তুমি উঠছিলে,
আমি নামছিলাম।
আমি নামছিলাম—
তুমি উঠছিলে!

মাঝপথে দেখা
আমি সরে দাঁড়ালাম।
তোমাকে পথ ছেড়ে
কিছু দূরে দাঁড়ালাম।

তোমাকে পথ দিয়ে
যদি দূরে দাঁড়ালাম।
গেলে তবুও পাশ কাটিয়ে—
ভারি অবাক হলাম!

কেন পথ পেয়েও
পথ ক'রে নিতে চাইলে?
যেন ব্যবধান চাই-ই
কয়েক হাজার মাইলে!

কেন উঠে এসে
এত নেমে গেলে!
এত নেমে যেতে
কেন উঠে এলে?

অন্তিম প্রার্থনা

দেবব্রত ভৌমিক

না, ওগো না,
ওকে আর জাগায়ো না;—
ও সয়েছে অনেক যন্ত্রণা।
ঘুমোতে দাও ওকে শিশির গায়ে মেখে,
ঘুমাতে দাও ওকে আকাশে মুখ রেখে,
মাটির বিছানায় ঘাসের গালিচেতে
ঘুমাতে দাও ওকে নিবিড় শান্তিতে।

না, ওগো না,
ওকে আর জাগায়ো না;—
ও সয়েছে অনেক যন্ত্রণা।
ভাসায়ে দাও ওকে নদীর খরস্রোতে
দহন-জ্বালা ভুলে নীরবে ভেসে যেতে।
শীতল জলে-জলে কেবলই ধুয়ে-ধুয়ে
অঢ়োক গ্লানি যতো জীবনে গেছে ছুঁয়ে।

দু-পাশে গ্রামে-গ্রামে বধূরা ঘাটে-ঘাটে
দু-ফোটা আঁখিজল ফেলুক নীরবেতে;
বলুক চোখ মুছে এ ওর কানে-কানে :
না-জানি কী ব্যথা ও সয়েছে এ-জীবনে;
না-জানি ঘুমায়েছে কতো-না ক্লান্তিতে!
আহা, ঘুমাতে দাও ওকে নীরব শান্তিতে!

না, ওগো না,
ওকে আর জাগায়ো না;—
ও সয়েছে অনেক যন্ত্রণা।

মালেকের ডাক

শ্রীশান্তি পাল

ওরে লায়েক ভাই—
খেই দিয়ে যা খেই দিয়ে যা
বসে থাকিস্ নে এক ঠাঁই।
হায় কল-কাঠি যে নড়ে নাকো
হাতে 'সোন-মুড়ি'ও নাই।
এখনো 'পাট' অনেক বাকি,
'নরুজে'-রে বাঁধ দিস্‌নে ফাঁকি,
ওরে ফাঁকের ঘরে পড়বে ঢুকি
যমের শত্রুরাই।
'নোঙর' ধরে 'কেটো'-য় ধার
বানিয়ে যা রে 'আটকে' দাঁড়;
'আড়ি-যুধী' নজর রাখিস
হুঁস হুঁশিয়ার সবাই।
ও ভাই জীবন-মরণ পণ ক'রে দেশ
রক্ষে করা চাই।

শেষ অঙ্ক

বাড়াটা অকুলীন এবং আভিজাত্যহীন। বাড়ীটা জীর্ণ পুরোনো। প্রায় বাতিল। কর্পোরেশনের নোটিশের অপেক্ষা মাত্র।

ঘরের ভিতরকার চেহারার দিকে নজর দিলেই ঘরের মালিকের অবস্থা বোঝা কষ্টকর নয়। গৃহস্বামী প্রভাস রায়ের অবস্থা অনুযায়ী ঐতিহ্য দেয়ালে, মেঝেতে, ঘরটির অঙ্গে প্রতিফলিত।

রংজ্বলা চটা ওঠা চেহারাটা ঢাকবার জন্যে ঘরের কাগজ চাপা দেওয়া টেবিলটার উপর প্লেটের অভাবে দাড়ি কামাবার জন্যে ব্যবহার করা অ্যালুমিনিয়মের বাটিটা সিগারেটের অবশিষ্টাংশে ভর্তি হয়ে রয়েছে।

তার পাশেই নতুন মখমলের নেকলেস বাক্স ঘরের প্রায়ান্ধকারের মধ্যেই ঝক ঝক করছে।

আর এক প্রভাস রায়ের উপস্থিতির সব চেয়ে বড় প্রমাণ। অকাট্য এবং অভ্রান্ত।

বিখ্যাত সাহেব কোম্পানীর বোম্বে ব্রাঞ্চের জেনারেল এঞ্জিনীয়ার পি কে রায় তার গাড়িটাকে ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রেখে বেশ স্বচ্ছন্দেই এই ঘরে যেটার মালিক একটি বেসরকারী স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার প্রভাস রায়, এসে ঢুকেছিল। শুধু ঢোকাই নয়, রংজ্বলা চেয়ারটা এমনভাবে টেনে বসেছিল, যেন এই রকম চেয়ারে ও হামেশাই বসে থাকে।

খেজুরতলা নামে একটি বিশেষ গ্রামে একসঙ্গে তাদের শৈশব, কৈশোর কেটেছে। একই স্কুলে পড়েছে এবং ছুটি-ছাটায় বহু দিন আগেকার কথা। ঐ গ্রামেই দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছে। ... ভোলেনি, তার প্রমাণস্বরূপ কলকাতায় এসে ওর খবর নিয়েছে। নিজে হোটেল থেকে ছুটে এসেছে প্রভাসকে দেখতে। এতগুলো অকাট্য প্রমাণের দ্বারা বন্ধুকে প্রায় অভিভূত করে হঠাৎ আসল কথাটায় এসেছে।

প্রভাস জানে, কলকাতায় ও থাকে না। বোম্বে আর দিল্লীতে ছুটোছুটি করতে হয় অবিরত। কালে-ভদ্রে কলকাতায় আসতে হয় দু চার দিনের জন্যে। ওর উপস্থিত স্থায়ী ঠিকানাও বোম্বাই।

ঠিক এই সময়টা ভয়ংকর কাজের চাপ পড়েছে। আর সেই কারণেই ক্যালকাটা অফিসের একটা জরুরী মিটিং-এ ওর উপস্থিতি অত্যাবশ্যক ছিল। প্লেনে সীট রিজার্ভ করে যাওয়া-আসার ব্যাপার। থাকবার মত সময় একেবারেই নেই।

এদিকে পিসতুতো দাদা মৃত্যুঞ্জয়ের ভাগ্নের বিয়ের চিঠি যথাসময়ে বোম্বাই-এ তার স্ত্রীর হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। আর তার কথামত একটা দামী জড়োয়ার নেকলেসও কিনেছে পি রে। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিলের কথা হচ্ছে ওকে কাল দুপুরের প্লেনেই ফিরতে হবে। এর মধ্যে এতটুকু সময়ও নষ্ট করার মত হাতে নেই ওর। কয়েকজন বিজনেস ম্যাগনেট হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করতে হবে। রাত্রে একটা ডিনার পার্টিতেও উপস্থিত থাকতে হবে আজ।

নেকলেসটা পৌঁছে দিতে হবে প্রভাসকে। কাছে পিঠে হলেও বা এক কথা ছিল। বেহালায় কে যাবে? তা ছাড়া ভাগ্নের বাড়ি বদলে নতুন ঠিকানায় উঠে গেছে, ওখানেই খোঁজ-খবরই বা কে করে?

প্রভাসতাই বসবার মত সময় ওর হাতে ছিল না। হড়বড় করে কথাগুলো বলেই ও তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেছে. এতে যেন বেঁচে গেছে প্রভাস। বড়লোক বন্ধুর উপস্থিতি, স্বল্পক্ষণের জন্যে হলেও ওর অসহ্য মনে হচ্ছিল। নিজেকে অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। (ঈর্ষান্বিতও!)

প্রভাস কিন্তু ওর ভাবান্তর একেবারেই লক্ষ্য করেনি। ছেলেবেলায় দুজনের নাম এবং উপাধি, দুই-ই এক হবার দরুণ মাঝে মাঝে ওদের দুজনকেই যে কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে, সেগুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করে ও হেসে অস্থির হচ্ছিল।

'তুই স্কুলে বরাবর ফার্স্ট হতিস বলে মাস্টার মশাইরা তোকে এক নম্বর প্রভাস বলতেন। আর আমি? কোনদিন সেকেণ্ডও হতে পারিনি তবু দু'নম্বর প্রভাস বলে ডাকতেন তাঁরা। তোর মনে আছে?"

হাসি পায়নি, তবু হাসির ভান করতে হল এক নম্বর প্রভাসকে। "হাঁ, মনে আছে।"

"তুই তো বইয়ের পোকা ছিলি। দিনরাত বই নিয়ে পড়ে থাকতিস। আমার একেবারে উল্টো স্বভাব। কোনমতে ফাঁকি দিয়ে প্রমোশন পেতাম। তুই তোর পড়াশোনার লাইনেই রয়ে গেলি, আর আমি? দুটো পয়সার জন্যে দেশ ঘর ছেড়ে হিল্লিদিল্লী ঘুরে মরছি।"

"দুটো পয়সার জন্যেই বটে!" মুখে নয়, মনে মনে উচ্চারণ করেছিল প্রভাস প্রবল বিতৃষ্ণার সঙ্গে।

"তোর চেহারাটাও কিন্তু এতদিনে একটুও বদলায়নি। এত সুন্দর চেহারা রেখেছিস এত বয়সেও কী করে, সত্যিই ভেবে অবাক হয়ে যাই। আর আমি! বয়সে তো তোর সমান, তবু দ্যাখ দিন দিন কী মোটাই হচ্ছি। ফ্যাট—বন্ধ। ডায়েটিং-এর উপর থাকি ডাক্তারের কথামত, তবু ওজন বাড়ছে দিন দিন। সত্যি তোকে দেখলে হিংসে হয়।"

যেন খুব একটা পরিহাসের কথা বলেছে,

মায়া বসু

এইভাবে হো হো করে হেসে উঠেছিল দু নম্বর প্রভাস রায়।

ভাঙ্গপড়া চিবুকের খাঁজগুলো কাঁপছিল সেই উচ্চাঙ্গের হাসির তালে তালে। ছোট ছোট চোখগুলো কুঁচকে গিয়েছিল। গলার টাইটা দুলছিল সাপের মত। আর ওর নিভাঁজ, নিখুঁত বিলিতি স্যুট বুট টাইপরা থলথলে চেহারাটা যেটা এতক্ষণ অসহ্য মনে হচ্ছিল প্রভাসের কাছে, এইবার খানিকটা সহনীয় হয়ে এসেছিল। মনের মধ্যে প্রশান্তির ছায়া অনুভব করছিল।

তবু ওর হাসিটা যেন সরল অর্থের গৌরব হারিয়ে প্রভাসকে ব্যঙ্গ করছিল অন্যভাবে। অর্থাৎ ভাল আর মন্দের সংজ্ঞাটা কি বিচিত্র! তুমি ফার্স্ট, আমি কোনমতে প্রমোটেড, তবু আজ সাংসারিক, সামাজিক, ব্যবহারিক জীবনে দু নম্বরই উৎকৃষ্ট এক নম্বরকে অনেক নীচুতে ফেলে রেখে ধাপে ধাপে উন্নতির শেষ সীমান্তে চলে এসেছে। আরো এগিয়ে যাবে।

এই তথ্যটা হৃদয়ঙ্গম হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ঘরটাকে আরো বিশ্রী আর সংকীর্ণ মনে হচ্ছিল। দু নম্বর প্রভাস এখন পর্যন্ত কি করে কলকাতার কুইনস হোটেলের সোফা, সেটি কার্পেটে মোড়া, এয়ার কণ্ডিশনিং সুইট ছেড়ে এখানে এই ভাঙ্গা চেয়ারে বসে আছে, একথা ভেবে অস্বস্তি বোধ করছিল, নিজের জীবনের অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাকে মুখে চোখে প্রতিফলিত হতে না দেবার প্রচেষ্টায় সতর্কভাবে কথাবার্তা বলতে হচ্ছিল। তবু গ্লানি আর দীনতাবোধের মালিন্যে সংকুচিত পীড়িত হয়ে ক্রমশঃ আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলছিল। প্রতিদিনের অভ্যস্ত এই ঘর, এই পরিবেশ আরো সংকীর্ণ আরো ক্ষুদ্র হয়ে বুকচাপা হয়ে ওর নিঃশ্বাসের বাতাসটুকুকে হারিয়ে যেতে দিচ্ছিল।

মখমলের কেসটা ওর টেবিলের উপর রেখে উঠে দাঁড়াল দু নম্বর প্রভাস রায়। আর একটি সিগারেট উঠিয়ে দাঁতে চেপে বাকিগুলো ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "আমার পিসতুতো দাদাকে তুই তো চিনিস! আমাদের দেশে কতবার গেছেন। কত খেলেছি আমরা একসঙ্গে? তোর সঙ্গেই তো ভাল জমতো। তারি ভাগ্নে অতনুর বিয়ে। মা বাবা নেই, ওকেই তো ছেলের মত মানুষ করেছেন মৃত্যুঞ্জয়দা, আর বৌদি। এই বিয়ের চিঠি। ঠিকানা। নিশ্চয় যাবি কিন্তু কাল। তোকে দেখলে কী খুশি হবে তার ঠিক নেই। আমার অবস্থার কথা একটু বুঝিয়ে বলিস ভাই প্লীজ। আর মজাটাও বড় কম হবে না এক প্রভাসের বদলে আর এক প্রভাস। তুই আর আমি, ওর কাছে দুই-ই সমান। বরং তোকেই ও মনে মনে শ্রদ্ধা করে বেশী। কিছু মনে করিস না ভাই, এই টাকাটা রাখ। সম্ভব হলে কিছু ফুল কিনে নিয়ে যাস। এই আমার কার্ড।"

পেট মোটা মানি ব্যাগটার ভিতর থেকে দুখানা দশটাকার নোট বার করে ওর হাতে জোর করে গুঁজে দিয়ে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না প্রভাস। টাকাটা ফেরৎ দেবার, অথবা বিন্দুমাত্র আপত্তি করবার সুযোগটুকুও ওকে দিল না দু' নম্বর পি রে।

মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে নিমন্ত্রণের চিঠিও পায়নি। তাতেও কোন অসুবিধা ছিল না। নিমন্ত্রিত না হয়ে ওর মত মানুষের কাছে সহজ ভাবেই যাওয়া চলে। আর যে টাকা ও দিয়ে গেছে, ফুল কেনা, যাতায়াতের ট্যাক্সি ভাড়া ছাড়াও আরো কিছু বাঁচে।

কিন্তু বিয়ে বাড়িতে যাবার জন্যে যে বেশভূষা দরকার, সেটা জোগাড় করতে ওকে যে ঝঞ্ঝাট করতে হবে, সেটা মনে মনে কল্পনা করেই ওর মন অধিকতর বিতৃষ্ণায় কুঁকড়ে উঠল। কিন্তু উপায় নেই। এই অত্যন্ত দামী উপহার ওকে ওখানে পৌঁছে দিতে হবেই। যেমন করেই হোক।

সুতরাং অলস শয়ন ছেড়ে উঠে বসতে হল। সার্টটা গলিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে রাস্তায় বার হতে হল পরিচিত লণ্ড্রির দিকে, ওখানে সিল্কের পাঞ্জাবী থেকে জরিপাড় ধুতি সব কিছুই ভাড়া পাওয়া যায়।

* * *

একদল সালংকারা সুসজ্জিতা মহিলা মখমলের উপহার কেসটা খুলে ফেলেই বিমুগ্ধভাবে প্রায় সমস্বরে বলে উঠল "কী চমৎকার! একেবারে নতুন ডিজাইন। আসল পাথর দিয়ে তৈরী। বাবাঃ না জানি কত টাকা দাম।"

একজন অপরাকে প্রশ্ন করল, "কে দিলেন ভাই এটা বৌকে?"

অপরা উত্তর দিল, "প্রভাস রায়। মৃত্যুঞ্জয়দার দূরসম্পর্কের ভাইটাই হবেন বোধ হয়। ও'র তো নিজের ভাই কেউ নেই বলেই জানি। এই শুভা বৌদি, লেখো, জড়োয়ার নেকলেস, শ্রীযুক্ত প্রভাস রায়।"

হল ঘরের উজ্জ্বল আলোয় ফুলের সিংহাসনে বসানো নতুন বৌয়ের পাশে বসে শুভা মুখ নীচু করে একটা খাতায় উপহার আর উপহারদাতাদের নামগুলো পাশাপাশি লিখছিল। কথাগুলো কানে যেতেই হাতটা অসাড় হয়ে এলো। চোখ দুটো সারা হলঘরময় অভ্যাগতদের উপর ঘুরে শেষ পর্যন্ত উপহার হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির উপর বিদ্ধ হল।

"কি নাম বললে স্বপ্না? প্রভাস রায়?"

"হ্যাঁ, শুভাবৌদি। এই দেখ কী দামী উপহার দিয়েছেন বৌকে।"

নেকলেসের ঔজ্জ্বল্যেও শুভার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল না—আবার প্রশ্ন করল, "মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কি রকম ভাই হয়? কোথায় থাকেন?"

স্বপ্না উৎসাহের সঙ্গে বলতে সুরু করল, "সম্পর্ক বড় একটা নেই শুভাবৌদি। মৃত্যুঞ্জয় দা বললেন খেজুরতলার মামাতো ভাই প্রভাস রায় পাঠিয়েছেন। ভয়ঙ্কর বড়লোক নাকি উনি। কলকাতায় থাকেন কতটুকু? একটা কি কোম্পানীর হর্তাকর্তা বিধাতা। দিল্লী, বোম্বাই করে বেড়ান। বড়লোক না হলে এত দামী উপহার কে দেয় বল? নিজের লোকেরাই দেয় না। আর ইনিতো দূর সম্পর্কের ভাই। সত্যি ভাই অগাধ পয়সা থাকলেই হয় না। দরাজ মন থাকাও চাই—ওকি চললে কোথায়?"

ততক্ষণে এগিয়ে গেছে শুভা। "একটু আসছি ভাই। তুমি খাতাটা লেখো। খুব দেরী হবে না আমার—"

শুভা আর দাঁড়াল না। ঘরের ভিড় ঠেলে, সিঁড়ির কর্মব্যস্ত মানুষগুলোর আসা-যাওয়ার মাঝখান দিয়ে, বাইরের অভ্যাগত নিমন্ত্রিত মানুষগুলোর পাশ কাটিয়ে একেবারে রাস্তায় নেমে এলো। একবার তাকাল পিছন ফিরে। ভাল করে চেয়ে চেয়ে দেখল। না নেই। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে প্রভাস নেই। কাজের মানুষ। উপহারটা দিয়েই চলে গিয়েছে। শুভার কি খুব দেরী হয়ে গেছে নাকি?

শুভা দ্রুত পা চালাল। গেট ছেড়ে আর একটু এগিয়ে যেতেই দেখতে পেল। ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে প্রভাস। বোধ হয় ট্যাক্সির অপেক্ষায়—

নাঃ। কোন মিল নেই একযুগ আগেকার কলেজে পড়া, ভীরু, কথা বলতে গিয়ে দশবার ঢোক গেলা গেঁয়ো ভূত সেই প্রভাসের সঙ্গে। সুন্দর চেহারাটা আরো সুন্দর হয়েছে। পদমর্যাদায় বুঝিবা কিছুটা গর্বিত। উদ্ধতও বটে। সিল্কের পাঞ্জাবী জরিপাড় ধুতিতে ভারী মানিয়েছে। হাতের আংটি আর বোতামে আলো পড়ে সেগুলো ঝলসে উঠছে, এতদূরে থেকেও নজরে পড়ল শুভার।

"প্রভাসদা, দাঁড়াও—আমি শুভা।"

"শুভা।" চমকাতে গিয়েও চমকালো না প্রভাস। বিয়েবাড়ি সার্বজনীন মিলনক্ষেত্র। তীর্থক্ষেত্রের মত। পুরোনো বন্ধু থেকে সুরু করে পুরোনো বা প্রথম প্রেম—সব কিছুর সন্ধানই এখানে পাওয়া যায়। শুভার সঙ্গে এখানে এত বছর বাদে দেখা হওয়াটা এমন একটা অঘটন ঘটনা নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু তবু প্রভাসের মন পুলকোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠল না। বুক দুলে উঠল না। তার বদলে মাথার মধ্যে একটা জ্বালাভরা স্মৃতি দপ করে জ্বলে উঠল। বহুদিনের পুরোনো একটা বিষতীক্ষ্ণ কাঁটা হঠাৎ ওর হৃৎপিণ্ডটাকে খুঁচিয়ে রক্তক্ষরণ করাতে সুরু করল।

মুখের রেখা শক্ত কঠিন। কণ্ঠস্বর অনুভূতিহীন আগ্রহহীন। একটু থেমে নেহাত কথা না বললে ভাল দেখাবে না এইভাবে প্রশ্ন করল "খবর ভাল তো?"

ওর উপেক্ষা শুভা স্পষ্ট বুঝতে পারল। অপমান গ্লানি আর হীনমন্যতায় চোখে জল আসবার মত হল। উত্তর দেবার মত কোন কথাই মুখে এলো না সহসা।

ল্যাম্পপোস্টের ছায়াচ্ছন্ন আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা এই দুটি নরনারীকে ঘিরে কয়েক মুহূর্তের জন্যে এক পাথরজমা স্তব্ধতা নেমে এলো।

চকিতে শুভা পরিস্থিতির উপযোগী মন সংবৃত করে নিয়ে প্রভাসের আর একটু কাছে এগিয়ে এলো। "ছোটর দোষ মনে রাখতে নেই প্রভাসদা। তুমি এখন অনেক—অনেক বড় হয়েছ। রাগ পুষে রাখা তোমার সাজে না। তোমার দামী উপহার দেখলাম। তোমার কথা সব শুনলাম। মস্ত চাকরি কর নাকি তুমি এখন। চল, যেতে যেতে কথা বলি। আমিও বাড়ি যাচ্ছি। খুব কাছেই আমার বাড়ি। এই পাশের গলিতেই। রাত বেশী হয় নি। এতকাল পর দেখা হল, তুমি যা ইচ্ছে আমায় ভাব না কেন, আমার সঙ্গে দশ পনেরো মিনিটের জন্য তোমাকে আমার বাড়ি যেতেই হবে। আমার কথা শুনতেই হবে।"

হতবুদ্ধি, প্রায় বিমূঢ় বিহ্বল প্রভাসকে একরকম টেনে নিয়েই যেন এগিয়ে চলল শুভা। চলতে চলতে হঠাৎ একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে

তাকাল প্রভাসের বিস্মিত মুখের দিকে। গালে টোল ফেলা পুরুষের বুকের রক্তে ঝড় তোলা সেই হাসিটা টেনে আনলো মুখের পর। "জানো, সেই ঘটনার পর তোমাকে কত খুঁজেছিলাম। সেই যে ডুব দিলে, কোন পাত্তাই পেলাম না আর তোমার। ক্ষমা চাইবার মত মুখ আমার সেদিন ছিল না, আজো নেই, কিন্তু তবু বলি প্রভাসদা, সেদিন আমার কাছ থেকে চরম লাঞ্ছনা সহ্য করে পালিয়ে গিয়েছিলে বলেই হয়তো আজ তোমার এত ঐশ্বর্য। জীবনের এত উন্নতির মূলে হয়ত আমার দেওয়া সেই ঘটনাটাই কাজ করেছিল। একথা আজ তুমি কোনমতেই অস্বীকার করতে পারো না।"

প্রভাসের সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। উৎসবমুখরিত বিয়েবাড়ির অতি সূক্ষ্ম মদির আনন্দের প্রভাব ওর মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করেছিল। শুভার কথাগুলির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে ওর দেরী হয়নি। শুভাও ভুল করেছে। সেই কৌতুককর পরিস্থিতি আবার কি চমৎকার খেলাই না সুরু করেছে হঠাৎ এতকাল পরে।

কানাই মিস্ত্রি লেনের কানাগলির একতলার ভাড়াটে ভবতারিণী মেমোরিয়াল স্কুলের সেকেন্ড মাষ্টার প্রভাসকে এমন করে আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে হাত ধরে তার নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে ছুটে আসেনি শুভা। আড়াই হাজারী এঞ্জিনীয়ার সুনন্দর প্রভাস মনে করেই বিয়ে বাড়ির আনন্দ উৎসব পিছনে ফেলে পথে নেমে এসেছে।

তবে কি শুভার ভুল ভেঙে দেবে প্রভাস—বলবে, তুমি ভুল করে আমায় অন্য লোক ভেবেছ। তারপর কি হবে?

জানে—ভাল করেই জানে প্রভাস তারপর কি হবে।

আত্মকেন্দ্রিক দেহসর্বস্ব অতি চতুরা এই ছলনাময়ী বারো বছর আগেকার মতই ওকে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে।

না সেদিনকার সেই চরম অপমান আজো রক্তে আগুনের জ্বালা ছড়িয়ে দেয় স্মরণ মাত্রেই!

নিরপরাধ একটা তরুণের হৃদয় নিয়ে যে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক খেলা ও খেলেছিল, যে ঘটনার জন্য প্রভাসের সমস্ত জীবন, সমস্ত ভবিষ্যৎ অন্ধকারের অতলে ডুবে গেছে তাকে ভোলা সহজ নয়। তাকে ক্ষমা করা আরো কঠিন।

শুভা জানে না, কত বড় ক্ষতি করেছে ও প্রভাসের।

একটা উন্মত্ত প্রতিহিংসায় শক্ত হয়ে উঠল ওর চোয়াল। দাঁতে দাঁত চাপল। না থাক। দেখা যাক, পথের শেষ কোথায়। অভিনয় পুরুষও করতে পারে।

গলিটা সরু। একেবারে নির্জন। বাইরে থেকে তালা খুলে দরজা খুলল শুভা। "এসো প্রভাসদা। এই আমার বাড়ি। একতলার ভাড়াটে আমরা। তোমার মত লোককে বসতে বলতেও লজ্জা হয়। দেখছো তো, আমার অবস্থা?"

আলোটা জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই দারিদ্র্যের নগ্নমূর্তি প্রকট হয়ে উঠেছিল প্রভাসের অভ্যস্ত চোখের সামনে। যে সাড়ি আর যে গয়না পরে ও বিয়েবাড়ি গিয়েছিল, সেটাও এককালীন জজসাহেবের মেয়ের পক্ষে অত্যন্ত অসম্মানকর। শুভার এতখানি দুরবস্থার কথা ওর মত স্কুলমাষ্টারও কল্পনা করতে পারেনি।

এখানে ওখানে জামা প্যান্ট লুঙ্গি ছাড়া পড়ে আছে। তক্তপোষের উপর পাতা বিছানাটার উপর ময়লা চাদর পাতা। শুভা পটু হাতে ঘরটার বিশৃঙ্খল অবস্থা খানিকটা গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, "বাড়িতে কেউ নেই প্রভাস দা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে উনি ঐ বিয়েবাড়িতেই আছেন। চা খাবে এক কাপ?"

"না না"—ব্যস্ত হল প্রভাস। "আমায় মৃত্যুঞ্জয়দা খাইয়ে দিয়েছেন।"

"জানি। এ বাড়ির চা তোমার মুখেও রুচবে না।" নিঃশ্বাস পড়ল শুভার। "কোন মতে বেঁচে আছি।"

"তোমাকে এভাবে দেখব সত্যিই ভাবতে পারিনি। মনোতোষ বাবুর ইস্টার্ণ ফ্যানের কি হল?"

"সব গেছে। পার্টনারদের মধ্যে গোলমাল। ডিরেকটরদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি। লক্ষ্মী যখন বিমুখ হন, তখন মানুষের এমন দশাই হয়। তারপর তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, কে জানে তারও ফল কিনা এটা। বাবাও মারা গেছেন সাত আট বছর হল। কাকা এলাহাবাদেই থাকেন এখন। সব গেছে প্রভাসদা—সব গেছে।"

বিছানাটার উপর ভাল করে হাত পা ছড়িয়ে বসে জরীপ করার দৃষ্টিতে অন্যমনস্ক শুভার দিকে ভাল করে তাকাল প্রভাস।

না সব যায়নি। এত বড় দুর্বিপাকে, এতখানি দুরবস্থা দারিদ্র্যের মধ্যেও পুরুষের রক্তে ঝড় তোলার মত ঐশ্বর্য আছে এখনো শুভার। যৌবনের মাদকতা, লাবণ্যশ্রী এখনো ওর সর্বাঙ্গে অটুট। এর মধ্যে ভেঙে পড়ার মত অবস্থা ওর হয়নি। এখনো সময় আছে।

প্রভাসের দৃষ্টির ভিতর সেই পুরোনো দিনের মুগ্ধতা আর বিহ্বলতা ধরা পড়তে দেরী হল'না চতুরা রমণীর কাছে। নড়ে চড়ে প্রভাসের খুব কাছে সরে এলো। গলায় মধু ঢেলে মুচকি হেসে প্রশ্ন করল, "কি ভাবছ? কি দেখছো?"

প্রভাসও সে হাসির জবাব দিল। তরল লঘু গলায় উত্তর দিল, "মানুষের কখন যে কি অবস্থা হয়—"

"দয়া হচ্ছে না?" বাধা দিল শুভা। "যাক এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম। আমাকে দয়া করার মত হৃদয়বৃত্তিটুকু এখনো আছে তোমার মনের কোণে।"

"শুধু দয়ার কথাই বা ভাবছো কেন শুভা?" প্রভাসের গলা কেঁপে গেল। "দয়ার চেয়েও বড় জিনিষ মনের মধ্যে জমা করা আছে। বিশ্বাস কর।"

"বেশ তো বিশ্বাস করলাম। সত্যিই যদি সেটা এখনো থেকেই থাকে, তবে আমাদের একটা ব্যবস্থা করেই দাও না প্রভাসদা। তুমি ইচ্ছে করলেই সব হয়ে যায়। তুমি তো এখন একটা মস্তবড় কোম্পানীর হর্তাকর্তা বিধাতা। ওঁকে একটা চাকরি তোমাকে দিতেই হবে। না দিলেই হবে না—"

দুচোখে সেই বারো বছর আগেকার বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষ। সমস্ত শরীরে যৌবনের হিল্লোল তুলে অসংবৃত আঁচলটাকে আরো এলোমেলো করে অলস লীলাভরে উঠে দাঁড়াল শুভা। সেই পুরোনো তন্বী নায়িকার মত। "বোসো প্রভাসদা। তুমি না হয় পেট ভরে খেয়ে এসেছ। আমাদের খেতে সেই রাত বারোটা। একটু চা করে আনি। এক চুমুক খেয়ে দেখো, খুব খারাপ লাগবে না—"

ইঙ্গিতে আর একটা গভীর অর্থের আভাস দিয়ে ঘর ছেড়ে অন্ধকার বারান্দার দিকে চলে গেল শুভা।

সেই মুহূর্তে প্রভাসের মনে হল এ ঘর থেকে এখনি ওকে চলে যেতে হবে। আর একটু দেরী হলেই ও তলিয়ে যাবে। বেরুবার শক্তিটুকুও হারিয়ে যাবে। মাকড়সার জালে আটকানো মাছির মত সহস্র তন্তুর জালে জড়িয়ে ওকে একেবারে শেষ করবে ওই মেয়েমানুষটা—

রাত হয়েছে। সারা পাড়া, সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে আরসোলার ফরফর আর ইঁদুরের সতর্ক সঞ্চরণ ছাড়া অন্য কোন শব্দ নেই। কেমন গা ছমছমে ভয় জাগানো অস্বস্তিকর পরিবেশ। যেন ঠিক সেই বারোবছর আগেকার একটি চরম মুহূর্তের দুর্বলতার হিমশীতল অনুভূতির শিহরণ প্রভাসের সমস্ত শরীর মন কাঁপিয়ে তুলল!

* * *

কলেজটা মফঃস্বল সহরের। ইংরেজীর অধ্যাপক সহরের জজসাহেবের ছোট ভাই। অতি উদার চমৎকার আত্মভোলা মানুষটি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেধাবী স্কলারসিপ পাওয়া অতি দরিদ্র ছেলেটির অসম্ভব পড়াশোনার আগ্রহে অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলায়, সপ্তাহে তিন দিন করে তিনি ওকে বাড়িতে তাঁর কাছে যেতে বলেছিলেন পাঠগ্রহণ করার জন্যে।

প্রভাসের তখন একমাত্র পড়াশোনা ছাড়া আর কোনো দিকেই মন ছিলনা। দৃষ্টিও ছিল না বুঝি।

তাই এই সুদর্শন কলেজে নামকরা ছেলেটির দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হবার আকাঙ্ক্ষায় বহুদিন বহু চেষ্টা করতে হয়েছিল শুভাকে। পড়ার সময় বই নেবার ছুতোয় ঘরে আসা, প্রভাসের আসা যাওয়ার সময়টাতে দাঁড়িয়ে থাকা, অসংবৃত বেশভূষায়, হাসিতে ইঙ্গিতে ওর লক্ষ্য হতে চেয়েছিল। বয়স দুজনেরই সমান ছিল।

কিন্তু তাতে খুব একটা কাজ হয়নি। প্রভাস নিজের অবস্থা বুঝেই চলতো। যথাসম্ভব এড়িয়ে যেত এই হাস্যলাস্যময়ীকে।

এদিকে যখন হলনা, সুরু হল অন্য খেলা। উপহাস ঠাট্টা বিদ্রুপ। ওর চালচলন, লজ্জা সংকোচ নিয়ে তামাসা। প্রতি মুহূর্তে ওর এই অদ্ভুত ব্যবহার প্রভাসকে সংকুচিত ব্যথিত করে তুলতো। নিজের দারিদ্র্য দৈন্যের হীনমন্যতায় সচেতন হয়ে থাকতো। পড়ার বইয়ে মন দিত ভয়ঙ্করভাবে।

হায় কিন্তু মানুষের মন কি বিচিত্র খেয়ালেই না চলে! কি বিচিত্র পথেই না তার আনাগোনা!

সেই সংযত মনের মধ্যে আর একটা মনের ভগ্নাংশ এই নির্দয়াকে ঘিরেই কেমন করে মুগ্ধ হয়ে বিহ্বল হয়ে উঠতো। এত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও না গিয়ে পারতো না ওদের বাড়ি। শুভার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ, শুভার ছলনায় অভিভূত হয়ে পড়তো।

এভাবেই দুটো বছর কেটে গেল। আই, এ-তে ইংরাজীতে লেটার নিয়ে কলেজে ফার্ষ্ট হল প্রভাস।

শুভার কাকা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিলেন প্রভাসকে।

তখনি শুভার দাদার সঙ্গে মনোতোষকে এবাড়ি দেখতে পেল প্রভাস। বুঝতেও পারল, ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনীয়ার সাহেবের ছেলে মনোতোষ শুভার প্রেমিক। শুভা ওর সঙ্গেও সেই একই খেলা খেলছে। মনোতোষের বাবা মস্ত বড়-লোক। মনোতোষ গাড়ি ড্রাইভ করে এবাড়ি আসে। শুভাকে পাশে বসিয়ে নিয়ে চলে যায়। আর এ যাওয়াতে এ বাড়ির সবারই পূর্ণ সম্মতি আছে।

এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাস আবার গুটিয়ে নিল নিজেকে। বাঁচার তাগিদে। ভবিষ্যতের আশায়। যদিও তখন তার অবস্থা ছলনাময়ী সুন্দরী নারী প্রকৃতির চিরন্তন লীলাখেলার ফাঁদে নিঃশেষিত শক্তি দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মতই।

মনে মনে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলো প্রভাস। আর নয়। মায়াবিনীর মোহজাল যত কঠিনই হোক, তার সম্মোহন শক্তি, তার বশীকরণ মন্ত্র যত মারাত্মকই হোক না কেন, এ ফাঁদে আর পা দেবে না সে। এ মায়া কাটাতেই হবে।

শুভার প্রতি উদাসীন, নির্লিপ্ত হয়েই আরো বছর দুই কেটে গেল। কোনমতেই ওকে আর নাচাতে পারল না শুভা। কোনমতেই কঠিন বরফ গলাতে পারল না ওর উত্তপ্ত সান্নিধ্যের উত্তাপে। কোন প্রলোভনেই বিগলিত হল না সংযত চরিত্র প্রভাস। ও যেন ওর পৃথিবীটাকে একমাত্র পড়াশোনার বই দিয়েই ঢেকে রেখেছে, ভরে রেখেছে। শুভার জন্য এতটুকু ফাঁকও রাখেনি।

বি.এ ফাইনাল পরীক্ষা সুরু হতে আর মাত্র কটা দিন দেরী। তারপরই চলে যাবে প্রভাস চিরদিনের মত। মফঃস্বল সহরের বোর্ডিং বাস তার শেষ হতে চলেছে এতদিনে।

ছোটকাকার ঘর থেকে বইখাতা গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে করিডরের প্রান্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে শুভা। অন্ধকারের মধ্যে। প্রভাসকে আসতে দেখেই ওর হাতখানা চেপে ধরল। "শোন। পরীক্ষা দিয়েই তো চলে যাবে। আর কখনো দেখা হবে না। অনেক অপমান অনেক লাঞ্ছনা আমায় করেছ। দুটো কথাও ভাল করে বলনি। ফিরেও তাকাওনি আমার দিকে। সাধুপুরুষ, শেষবারের মত একটা কথা আমার রাখবে?"

সাধুপুরুষ! শুভার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, ক্ষুর-ধার ব্যঙ্গ সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিল। ইচ্ছে থাকলেও হাতখানা টেনে সরিয়ে নিতে পারল না। একটা কঠিন উত্তর মুখে এসেছিল, বলতে গিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল। শুভার চোখে জল।

শুভা কাঁদছে! উপেক্ষিতা অভিমানিনী কাঁদছে!

"বল কি বলতে চাও? তোমার কথা আমার অসাধ্য না হলে নিশ্চয় রাখবো শুভা।" বুকের উত্তাল স্পন্দন সংযত করে শান্তভাবেই উত্তর দিয়েছিল প্রভাস।

"কাল সন্ধ্যাবেলায় একবার আসবে? আর কোনদিনও কোন অনুরোধ করব না। এই আমার শেষ চাওয়া। তুমি ভাল ছেলে। একদিন, মাত্র একঘন্টার পড়ার ক্ষতিতে তোমার কিছুই এসে যাবে না প্রভাসদা। আসবে তো?"

"আসবো। নিশ্চয় আসবো। কাল আমার পড়ার দিন নয়। তবুও আসবো।"

* * *

ঠিক সন্ধ্যার পর ঠিক সময়েই এসেছিল প্রভাস নিয়তির ইঙ্গিতে, ভাগ্যবিধাতার অমোঘ আহ্বানে।

ঠিক আজকের এই রাত্রের মতই সেই বাড়িটা নির্জন নিঃশব্দ ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ-ই ছিল না। ঘরটা শুধু অন্ধকার ছিল। খোলা দরজায় ভারী পর্দাটা হাওয়াতেও দুলছিল না।

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিস্রস্তবসনা শুভা। তারি কঠিন আলিঙ্গনে আবদ্ধ প্রভাস।

মদালসা মাকড়সার জটিল জালে জড়িয়ে পড়া মুমূর্ষু মাছির মত প্রভাস—

হঠাৎ অন্ধকার খান খান হয়ে ঘন মেঘের মধ্যে স্থির বিদ্যুতের মত একশো পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠল। ঘরে ঢুকল ওর দাদা। সঙ্গে মনোতোষ—

চমকে উঠে অভিনয় নিপুণা নটির মত চিৎকার করে উঠল শুভা। দুহাতে প্রভাসকে ঠেলে ফেলে দিয়ে উঠে বসল। ওর দুচোখে আগুন। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছে। "বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে। অভদ্র ইতর লম্পট কোথাকার!"

তারপর?

তারপর কড়ায় গণ্ডায় প্রভাসের প্রাপ্য শাস্তি ওকে বুঝে নিতে হল মনোতোষ আর শুভার দাদার হাত থেকে। যে তস্কর বাড়িতে কেউ নেই দেখে একটি কুমারী কন্যার ইজ্জত নষ্ট করবার সুযোগ গ্রহণ করে, তার শাস্তি যতদূর হওয়া উচিত, ততখানিই কপালে জুটেছিল সেদিন।

আর অপাপবিদ্ধা সরলা শুভাকে মনো-তোষের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতেও দেখেছিল। কানেও এসেছিল ওর কথা: "ভাগ্যিস তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে! নইলে কি সর্বনাশই না হত। বাড়িতে কেউ নেই, মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে দুটো স্যারিডন একসঙ্গে খেয়ে অজ্ঞানের মত শুয়ে ছিলাম, হঠাৎ ও ঘরে ঢুকল। জানতো আজ বাড়িতে কেউ থাকবে না। কাকার কাছেই শুনেছিল বোধ হয়—"

সেদিন বিনা অপরাধে সেই অমানুষিক চরম লাঞ্ছনা অপমান গলাধাক্কা প্রহার—সব কিছু সহ্য করেও নিঃশব্দ ছিল প্রভাস। নিজের স্বপক্ষে একটা কথাও বলতে পারেনি। সেই রাত্রেই বোর্ডিং ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে জায়গা থেকে। দেশে গিয়ে কঠিন অসুখে পড়েছিল। সে বছর পরীক্ষা দেওয়াও হয়নি।

শুভার প্রতিহিংসায় সব কিছু ছাই হয়ে গিয়েছিল প্রভাসের। জীবন যৌবন ভবিষ্যৎ—সব সব অন্ধকারে ডুবে গেছে।

কি হতে পারতো কি হয়েছে—

ভবতারিণী স্কুলের মাষ্টার চমকে উঠল। চায়ের কাপ হাতে করে শুভা ঘরে ঢুকেছে। এক কাপ এগিয়ে দিয়ে আদুরে গলায় বললো "নিজে হাতে করে আনলাম, খেয়ে দেখো প্রভাসদা। চায়ের গুণে না হোক, হাতের গুণেই মিষ্টি লাগবে।"

নাঃ। আর সময় নষ্ট করে কাজ নেই। মন-স্থির করে ফেলল প্রভাস। একটু যেন সংকুচিত কুণ্ঠিত গলায় বলল, "আমার কোম্পানীর কলকাতা ব্রাঞ্চে একজন সুপারভাইজার চাই। সেইজন্যেই আমায় হঠাৎ কলকাতায় আসতে হয়েছে। যা দিনকাল, বিশ্বাসী লোক ছাড়া কাজ দেওয়াও মুশকিল। মনোতোষবাবু হলে খুব ভালো হয়। মাইনে উপস্থিত শ' পাঁচেকের মত। বছরখানেক কাজ দেখাতে পারলে ভবিষ্যতে উন্নতি আছে। তাছাড়া পিছনে তো আমিই আছি। যদি ওঁর কোন আপত্তি না থাকে, কাল পরশুর মধ্যে আমায় একটা খবর দিও। কাজটা হয়ে যাবে। হোটেলে দেখা করলেই হবে।"

"আপত্তি!" শুভা যেন ঝর্ণার মত ছলকে উঠল। "আপত্তি করবে। পোড়া কপাল। কাজ কর্ম তেমন কিছু আছে নাকি ছাই। অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না? ও কি? মাথা টিপে ধরলে কেন? যন্ত্রণা হচ্ছে বুঝি খুব?"

"খুব শুভা খুব। স্যারিডন আছে?" যন্ত্রণাকাতর গলা প্রভাসের।

"স্যারিডন? নাঃ। নেই তো।" শুভা অপ্রস্তুত হল। "তুমি এই বালিসে মাথা রেখে শুয়ে পড়ো প্রভাসদা। আমি মাথা টিপে দিচ্ছি। পাঁচ মিনিটে যদি না সারে, তখন বলো।"

মদির বিহ্বল দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল প্রভাস। "না না মনোতোষ বাবুরা এখনি ফিরে আসবেন। আমি বরং হোটেলেই ফিরে যাই।"

"ওর হাতে লোকজন খাওয়ানোর ভার। রাত বারোটা একটার আগে ফিরবে না—" কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করল শুভা "যা বলি শোন।"

প্রভাসকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল শুভা—। খট করে একটা শব্দ হল। ঘরের আলো নেভাবার।

তারপরই অন্ধকার। রাশি রাশি অন্ধকার রাহুর গ্রাসের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল দুটো শরীরের উপর।

* * *

"এই নাও কার্ড। কুইনস্ হোটেল। সাতাশ নম্বর তেরো। এই ঠিকানায় কাল পরশুর মধ্যেই মনোতোষবাবুকে পাঠিয়ে দিও। আমাকে দু-তিন দিনের মধ্যেই সুপারভাইজার সিলেকশন করে বোম্বাই ফিরে যেতে হবে, ভুলো না যেন।"

"ভুলবো না গো ভুলব না।" সার্থকতার আনন্দে গদগদ গলায় শুভা প্রভাসের বুকের মধ্যে যেন লেপটে রইল।

"তবে আজ আসি শুভা।" শুভার হাতে দু নম্বর প্রভাস রায়ের হোটেলের ঠিকানা লেখা কার্ডখানা দিয়ে প্রভাস পথে নেমে এলো।

পকেট হাতড়ালো।

গোটা কয়েক নয়া পয়সার সঙ্গে কুড়িটাকার অবশিষ্টাংশ আরো কয়েকটা টাকা আছে এখনো।

দু দিনের বাজার খরচা ভালভাবেই চলবে।

বিয়েবাড়ির শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে দীর্ঘ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রভাস এগিয়ে চলল বাস রাস্তার দিকে।

দীর্ঘজীবী হোক দুনম্বর প্রভাস রায়। আরো উন্নতি হোক তার।

বন্ধুকে বন্ধু ছাড়া কে দেখবে?

শারদোৎসবে অপরিহার্য্য
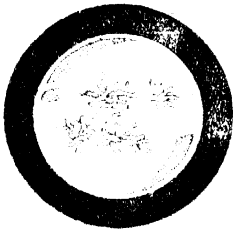
ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

১৪৯৩ খৃস্টাব্দ। কলম্বাসের জাহাজ ভারতবর্ষের মাটি খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একদিন আমেরিকার উপকূলে। অনেকদিন পরে মাটির আস্বাদ পেয়ে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল। হোক না আমেরিকার মাটি, নাই বা হল ভারতবর্ষ।

কলম্বাসের নাবিকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল নতুন উপকূলে। হৈ চৈ নাচ গানে মাতিয়ে তুলল আমেরিকার আকাশ-বাতাস। রেড ইণ্ডিয়ানরাও কাছে এল ক্রমশঃ। নাবিকদের সঙ্গে তারাও নাচগান শুরু করে দিল, অনেক নাবিক আদিবাসী রমণীর সঙ্গে ঘর বাঁধল। বাকী সকলে ফিরে এল ইউরোপে।

সঙ্গে নিয়ে এল সভ্যতার কঠিনতম অভিশাপ, সিফিলিস রোগ।

ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে একদিন আবিষ্কার করলেন ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য, কৃষ্টি, সভ্যতা দেখে বিদেশী বণিকের চোখ ঝলসে গেল। নানারকমের মহার্ঘ উপঢৌকন দিয়ে গেল রাজ দরবারে, তার সঙ্গে গোপন অভিশাপ সিফিলিস রোগ ছড়িয়ে দিল ভারতের গণিকালয়ে।

১৬৩০ খৃস্টাব্দ। পেরুর এক জাহাজী ব্যবসায়ী ওষুধের জন্যে গাছের ছাল পাঠাতেন ইউরোপের বাজারে। এই ছাল সেদ্ধ করে যে জল তৈরী করা হত, সেই জল ওষুধ হিসেবে কাজে লাগত খুব। ক্রমে ক্রমে চাহিদা বেড়ে গেল। ব্যবসায়ী আর আসল গাছের ছাল পাঠাতে পারলেন না। তার বদলে ঠিক ওইরকম দেখতে আর এক ভেজাল ছাল পাঠাতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, এই ভেজাল ছালেরই চাহিদা বেড়ে গেল। ব্যবসায়ী খুব ঘাবড়ে গেলেন। কে জানে কি ঘটছে ইউরোপের বাজারে?

দেখা গেল এই ভেজাল ছালই ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ। গাছের ছালকে স্পেনীয় ভাষায় বলা হয় কুইনা কুইনা আর তাই থেকে কুইনিন নামের উদ্ভব। জাল ও ভেজাল থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম কেমোথেরাপি আর বিশ্বের চিকিৎসাশাস্ত্রকে এক ধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

১৮৬৬ খৃস্টাব্দ। হামবুর্গের এক পাগলাগারদের ডাক্তার-কোয়ার্টার্স। ডাক্তার গৃহিণী এমি ফ্রাৎস স্বামীর জন্য খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এমন অস্থিরমতি লোককে কি করে বশে আনবেন সেই চিন্তায় তন্ময়। এক এক সময় তাঁর মনে হয়, পাগলদের সঙ্গে থাকতে থাকতে বোধ হয়, তাঁর স্বামীর মাথাও খারাপ হয়ে গেছে। কোন সময়ে ফাঁকা জায়গায় চুপচাপ বসে থাকেন, কোন সময় হৈ-হল্লা করে বাড়ি মাথায় তোলেন। এই ঘরে আসছি বলে কোথাও হয়ত বেরিয়ে গেলেন, ব্যস, দু-তিনদিন আর দেখা নেই। আবার ঘরে রইলেন তো রইলেনই। রোগী দেখতেও যান না, কিছুই করেন না।

ফ্রাৎস খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন স্বামীর জন্যে। যেভাবে হোক স্বামীকে আটকে না রাখতে পারলে কোনদিন হয়ত চলে যাবেন আর ফিরবেন না। ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। এক জন্মদিনে ফ্রাৎস তাঁর স্বামীকে একটি মাইক্রোস্কোপ উপহার দিলেন আর এই উপহারেই পৃথিবীর বিজ্ঞান জগতে আমূল পরিবর্তন এনে দিল।

যে মাইক্রোস্কোপ ফ্রাৎস তাঁর স্বামীকে উপহার দিয়েছিলেন, নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্যে, সেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র রবার্ট কখ্‌কে একেবারে টেনে নিয়ে গেল আর এক খেলার রাজ্যে। নতুন খেলার আস্বাদ পেয়ে কখ্‌ সংসারের সব কিছু ভুলে গেলেন। অণুবীক্ষণের মধ্যে নজরের ভিতর কতবার চোখ লাগিয়ে দেখেছেন, ততবারই ভেবেছেন প্রত্যেকটি রোগের জন্য আলাদা আলাদা জীবাণু আছে। এক এক রকমের জীবাণু এক এক রকমের রোগ সৃষ্টি করে।

অণুবীক্ষণের মারফৎ অনুসন্ধান চলল। ইঁদুর পশু পেলেই তার গায়ের খানিকটা রক্ত কেটে নিয়ে মাইক্রোস্কোপের নীচে ফেলেন আর তন্ময় হয়ে দেখেন নতুন কিছুর সন্ধানে।

হঠাৎ একদিন চোখে কেমন ধাঁধাঁ লাগে। লম্বা ধরণের একরকম জীবাণু। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এর আগে যে সব জীবাণু দেখেছেন সবই প্রায় বিন্দুর মত। রেখার মত জীবাণু এই প্রথম।

যাকে দেখান সেই হেসে উড়িয়ে দেয়, কিন্তু কখের মন বলে না—এ কখনও বাজে কিছু নয়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু সত্য লুকিয়ে আছে।

ফ্রান্সে যাবেন ঠিক করলেন কখ্‌। জার্মাণীর লোক ছি-ছি করে উঠল। জার্মাণী ফ্রান্সে ভীষণ রেষারেষি সব ব্যাপারেই। সবাই বলল, ফ্রান্সে গেলে লোকে দুয়ো দেবে।

কিন্তু কখ্‌ দৃঢ়, অদমিত। ফ্রান্সে একজন দিকপাল পণ্ডিত আছে। তাঁর কাছে গিয়ে কখ্‌ দেখাবেন এই নতুন ধরণের জীবাণু। তিনি কী বলেন, তাই শোনার জন্যে পাগল কখ্‌ ছুটলেন জার্মাণীর হামবুর্গ থেকে ফরাসী দেশের আরবোয়া গ্রামে।

দেখা হল ফরাসী-জার্মাণী। দুই হিংসাকাতর দেশের দুই বৈজ্ঞানিক সামনাসামনি এসে দাঁড়ালেন। লুই, পাস্তুর দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন জার্মাণীর রবার্ট কখ্‌কে। লুই সব দেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন, তুমি আবিষ্কার করেছ কখ্‌ এক নতুন জীবাণু। এই লম্বা আকারের জীবাণুদের নাম থাক্‌ ব্যাসিলি আর তুমি যে ব্যাসিলাস্‌ আবিষ্কার করেছ তার নাম তুমিই দিও। কখ্‌ নাম দিলেন অ্যানথ্রাক্স ব্যাসিলাস। এ আবিষ্কারের শুরু। একদিন ভালবেসে নিরুপায় হয়ে যে স্ত্রী উপহার দিয়েছিলেন বোধ হয় বিশ্বের সমস্ত প্রেম তার মধ্যে সঞ্চারিত ছিল, তাই রবার্ট কখের আবিষ্কার ক্রমশঃই এগিয়ে চলল।

১৮৮২ খৃস্টাব্দে মাইক্রোস্কোপের নীচে আবার এক রকমের লম্বা জীবাণু দেখতে পেলেন রবার্ট কখ্‌। নতুন ধরণের জীবাণু, আগে যে রকমের জীবাণু দেখেছিলেন এ সে রকমের নয়। এ একেবারে অন্য জাতের জীবাণু, অ্যানথ্রাকস-এর মত নয়।

ভাবতে লাগলেন ডাক্তার কখ্‌। ... দিলেন ডাক্তারবাবু সমস্ত জীবাণুগুলিকে ... স্তর। আবার তৈরি করলেন স্লাইড, ...
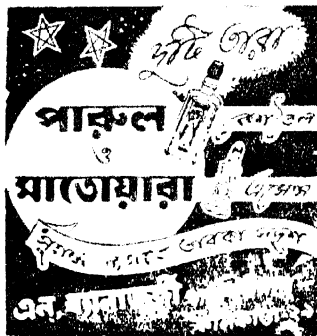
ভাবে দেখা শুরু করলেন। কিন্তু ভুল রেননি তিনি। আবার সেই রকমের লম্বা ের নতুন জীবাণু।

কখ্ স্লাইড নিয়ে কী করবেন ভাবলেন, পর তাঁর বন্ধু পাউল এরলিখ্-এর কাছে জির হলেন। তিনি ছিলেন প্যাথোলজিস্ট। নি যা ত্বক-চামড়া পেতেন, সঙ্গে সঙ্গে রং ফেলতেন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে। র মনে একটা ধারণা ছিল, প্রত্যেকটি জীবাণু আলাদাভাবে রঞ্জিত হয়, আর তাই থেকে এদের ভিন্ন প্রকৃতি ধরা পড়ে। পাউল এরলিখ রবার্ট ের নতুন জীবাণু রং করলেন, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে পর রায় দিলেন কখ্, এগুলো অন্য জাতের জীবাণু।

কখের নামানুসারে সেই জীবাণু নামাঙ্কিত কখের জীবাণু।

পরবর্তীকালে এই জীবাণুর নাম হল টিউবারকুলোসিস—যক্ষ্মা-রোগের জীবাণু।

পাউল এরলিখ আর এক পাগল। ল্যাবোরেটরীতে বসে কেবল ত্বকের রং করে চলেন নানারকমের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে। কোনটা বেগুনে, কোনটা টকটকে লাল, কোনটা গোলাপী। লোকে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছে রং ডাক্তার।

সিফিলিস রোগ কি করে হয়, এরলিখের মাথায় ঢুকল। কোন জীবাণু ছাড়া কোন রোগ হতে পারে না, এ জ্ঞান তখন প্রত্যেক বৈজ্ঞানিকেরই হয়েছে।

যত সিফিলিস রোগী পান, সকলের দূষিত ঘা থেকে খানিকটা ত্বক কেটে নিয়ে রং করে দেখেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। দিনের পর দিন দেখে যান। ব্যর্থ হন, কিন্তু হতাশ হন না।

একদিন হঠাৎ তাঁর ল্যাবোরেটরীর আলো কমে গেল আর সেই অন্ধকারের ভেতর দেখতে পেলেন রূপোর মত চকচকে লক্ষ লক্ষ জীবাণু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে কিলবিল করছে। মুহূর্তের অন্ধকার বিশ্বের চিকিৎসাশাস্ত্রে আবিষ্কারের আলো এনে দিল।

সিফিলিস রোগের জীবাণু দেখতে পেলেন এরলিখ। কিলবিল করে বেড়াচ্ছে কালো স্লাইডের ওপর। অনেক রূপোলী তার যেন নড়ে-চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এরলিখের মাথায় একটা খেয়াল এল। অন্য জীবাণু জীবন্ত দেখতে পাননি তিনি। এই প্রথম তিনি বেঁচে থাকা জীবাণু দেখলেন। এরলিখ বুঝলেন সাধারণতঃ এই জীবাণু মারা যায় না আর সেই জন্য এই রোগের প্রকোপ এত বেশি।

জীবাণুগুলো যত নড়ে-চড়ে বেড়ায়, এরলিখের রোখও তত বেড়ে যায়। যে করে হোক ওগুলোকে মারতে হবে কিন্তু কিছুতেই আর হয় না। এরা যেন রাবনের মত বর পাওয়া জীবাণু। যতবার ওষুধ ঢালেন, ততবারই কিলবিলিয়ে ওঠে। যেন বৈজ্ঞানিককে ব্যঙ্গ করে, জীবাণুগুলো।

একদিন কি খেয়াল হল এরলিখের। খানিকটা আর্সেনিকগোলা জল ছিল একটা পাত্রে। রেগে-মেগে ঢেলে দিলেন মাইক্রোস্কোপের নীচে।

এ কি দেখছেন এরলিখ।

সমস্ত জীবাণুগুলো নিস্তব্ধ নিথর হয়ে গেছে। দু একটা সামান্য নড়ছে, বাকি সব প্রাণহীন।

এরলিখ আনন্দে আত্মহারা। রাগের মাথায় যে কাজ তিনি করে বসলেন, তারই ফলস্বরূপ পৃথিবীতে আবিষ্কার হল সিফিলিস রোগের ওষুধ সালভার্সান্।

আধুনিক কালের কেমোথেরাপির সেই প্রথম পদক্ষেপ।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। গেলমো এক রঙীন কাপড়ের কেমিস্ট। নানান ধরণের রঙ করা কাপড়, তার একমাত্র কাজ। নানা রকমের কাজ করে যায়, লাল নীল হলদে।

হঠাৎ একদিন দেখল রং করা জল নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর নর্দমার জীবাণুগুলো হঠাৎ নড়াচড়া বন্ধ করে ফেলছে একেবারে। তাহলে কী মরে যাচ্ছে? সে এমন রং তৈরী করেছে যার জীবাণুনাশক ক্ষমতা আছে?

গেলমো জানতে পারেনি, কিন্তু সেই সূত্র ধরে একদিন বিশ্বে সৃষ্টি হল আধুনিককালের ওষুধের পরম আবিষ্কার প্রনটোসিল্ আর তাই থেকে নরাযুগের সমস্ত সালফাগ্রুপের ওষুধ।

আর্তনাদের জন্য

- অগ্নিমিত্র -

এখানকার মাটিতে কান পেতে কিছুক্ষণ পড়ে থাকো—আদিম আরণ্যক প্রাণের স্পন্দন শুনতে পাবে।

পাহাড়ের পর পাহাড়। শাল মহুয়া কেঁদ কদম আর পলাশ গাছের ঘন অরণ্যে রাতে বাঘ ভালুকে আর হায়না। পাহাড়ী চিতি আর শঙ্খচূড়ের অব্যর্থ ছোবলে নীল হয়ে যায় কত হিংস্র শ্বাপদের তেজী দেহ। কার্তিকে পাহাড় থেকে নেমে আসে বুনো হাতীর পাল। লকলকে ঢেউ-দোলানো কাঁচা-সবুজ ধানক্ষেতগুলোকে তছনছ করে রেখে যায়। কখনো বা যাওয়া আসার পথে কোনো পাহাড়ী গাঁয়ের দু-পাঁচখানা ঘরই বেমালুম পায়ের তলায় পিষে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। তবুও মানুষগুলো এখানেই থাকে। যুগযুগান্তর বৃক্ষলতা আর শ্বাপদ-সরীসৃপদের সঙ্গে লড়াই করে এই আদিম পাহাড়-পাথরের বুক থেকে প্রাণরস আহরণ করে আসছে জন্ম জন্মান্তর ধরে।

কদিন আগে এখানে হঠাৎ একদল লোক এসে উপস্থিত।

সিপাহী পাহাড়ের নীচে ঝরণার বাঁকের মুখে প্রশস্ত সমতল জায়গাটায় এলোমেলো গোটা কতক তাঁবু পড়ে গেল। দেখতে দেখতে নিস্তব্ধ নির্জন জায়গাটা মানুষের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। ভূতাত্ত্বিক গবেষণার কী একটা কাজে দলটা এসেছে। সারাদিন ধরে লোহার উপকরণ মানুষগুলো পাহাড়ের চাতালে মুখ গুঁজে পড়ে কী যেন খুঁজছে।

এমনিভাবে কদিন যাবার পর শোনা গেল, এবার পাথর কাটিয়ে নীচের স্তরগুলো পরীক্ষা করতে হবে। তারপর দরকার হলে ডীপ-ড্রিলিং।

দলের নেতা ডেকে পাঠালেন ঠিকাদার বনোয়ারিলালকে। মোটাসোটা মাঝ-বয়সী লোকটা হাতজোড় করে এসে দাঁড়ালো, আজ্ঞে করমাইয়ে সাব।

দলনেতা বললেন, কাল থেকে ডিনামাইট চার্জের কাজ সুরু করছি। কয়েক গ্যাং কুলি-কামিনের বন্দোবস্ত করো, পাথর সরানোর কাজে দরকার হবে।

বহুৎ আচ্ছা সাব।

পাওয়া যাবে তো?

কী বোলেন সাব। কুলিকামিন মিলবে না! কত হাজার চাই আপনার?

দলনেতা হেসে বললেন, হাজারে দরকার নেই, আপাতত বিশ পঁচিশজন হলেই চলবে।

বহুৎ আচ্ছা সাব।

নমস্কার জানিয়ে চলে গেল বনোয়ারিলাল।

পরের দিন সকালেই এসে গেল একদল লোক। আশেপাশের পাহাড়ী গাঁ থেকে মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে ছাব্বিশজনকে এনে হাজির করেছে বনোয়ারিলাল। ঝরণার এপারে জটলা করে দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো চোখে তারা কাণ্ডকারখানা দেখছে। ঝরণার ওপারে পাহাড়ের গায়ে হাতপঞ্চাশেক উঁচুতে কয়েকজন লোক কাজে ব্যস্ত। বনোয়ারিলাল ব্যাপারটা এদের ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। একটু পরেই পাহাড়ের ওপর প্রচণ্ড শব্দ করে যা ফাটবে তার নাম ডিনামিট। ওটা ভূতও নয়, দেওতাও নয়—আসলে ওটা হল আংরেজ বাহাদুরের কল। ভয় পাবার কিছু নেই। ওটা ফাটানো হয়ে গেলেই সবাইকে ওখানে যেতে হবে। গাছ সরাতে হবে, পাথর সরাতে হবে, ব্যস্। তারপর বেলা শেষে পুরো দেড় টাকা রোজ নিয়ে যে যার ঘরে যাও। তেল দেওয়া, নুন কেনা, কি হাঁড়িয়া কেনা—বাধা দেবার কেউ নেই।

একটু পরেই প্রচণ্ড শব্দ করে ডিনামাইট ফাটলো।

একটা উৎকট উল্লাস ধ্বনিতে বাতাস কেঁপে উঠল। পাশের ইউক্যালিপটাস গাছের ওপর থেকে পরিত্রাহি চীৎকার করতে করতে এক ঝাঁক টিয়েপাখি উড়ে চলে গেল।

দলের ভেতর বড়কু সর্দারের মেয়ে পাখিনীও ছিল। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই সে পাশের মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরলো।

নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারে না। আর বড়ো বড়ো গাছ আর পাথরের চাঁইগুলো ছিটকে কতদূর উঠে গিয়েছিল উঃ!

চোখ বড়ো বড়ো করে পাখিনী বললো, অ রে বাপ! গোটা ডুংরিটো ফাটাই দিবে নাকি

পেছন থেকে কে যেন হা হা করে হেসে উঠলো।

চমকে পেছন ফিরে তাকালো পাখিনী, সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল তার। হা হা করে হাসছে তেজু সর্দারের ছেলে জটু। বছর দুয়েক আগে পাখিনীর জন্যেই গাঁ ছেড়ে যে টাটানগরের দিকে চলে গিয়েছিল।

পাখিনীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই আরও জোরে হেসে উঠলো জটু। বললো, হায় হায় মেয়েটো বলে কি শুনো! গোটা ডুংরি ফাটাই দিতে কত ডিনামিট লাগবে জানিস তু? এক কুড়ি দশ কুড়ি। বাটে—

নিজের অজ্ঞতা বুঝতে পেরে পাখিনী চুপ করে গেল। কিন্তু অন্য এক বিস্ময় তখন তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। জটুকে চেনা যায় না! তার পরনে পাতলুন, গায়ে রং-বেরংএর

[illegible]-আঁকা জামা, পায়ে আবার চপ্পল। দু-বছর আগে তেজু সর্দারের যে ছেলেটা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তার সঙ্গে এ জটুর কোনো মিল নেই।

তবু পঁওখনীর বুকের ভেতরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। যে মরদের জন্যে সে সব ছেড়ে রাজী ছিল, সে যে অমন ভীরুর মতো একা একা পালিয়ে যাবে তা কখনো পঁওখনী ভাবতে পারেনি। নাই বা হল গাঁওলা-পঞ্চের মত, পঁওখনীর নিজের তো অমত ছিল না! [illegible] মেয়েকে যদি লুট করেই না নিয়ে [illegible] তো মরদ কিসের?

ঝরণার ওপার থেকে ডাক পড়েছে। গাঁইতি [illegible] আর কোদাল নিয়ে দলের আর সবাই [illegible] পড়েছে ঝরণায়। ভাত সমেত অ্যালমোনিয়ামটা [illegible] নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে পঁওখনীও [illegible] হল। জটুর দিকে তাকাতে পারছে না! [illegible]

পেছন থেকে চাপা স্বরে জটু বললে, [illegible] করিস। ঠিকাদারের তাম্বু—হাই নিম-[illegible] নীচে দিখা যায়, উ তাম্বু।

[illegible]

পাথরের ওপর কাৎ হ'য়ে ব'সে আছে জটু!

পঁওখনীর দিকে তাকিয়েই জটু বললে, আমি ঠিক জানতেম তু তাম্বুকে যাবি না, তাই ইখানকে বসে আছি। তর রূপ আরও খোলতাই হইছে রে পঁওখনী! আমার মুনিব [illegible]বাবু তকে দেখে বলেছে, সোবনরেখার [illegible] যানু বাদলার চল নেমেছে!

পঁওখনী তাড়াতাড়ি বুকের কাপড়টা টেনে নিয়ে বললে, তর মুনিবের তাতে কী?

হা হা ক'রে হাসতে হাসতে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করলে জটু। লাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে পঁওখনীর অবাক চোখ লক্ষ্য ক'রে বললে, কী দেখছিস বটে?

উটাকে আগুন জ্বালালি আবার পাকিটে রেখা দিলি?

আবার হা হা ক'রে হেসে উঠলে জটু। বললে, এ ভি আংরেজের কল। কাম কর না ইখানকে—কত্ত কল দেখবি।

চোখ বড়ো বড়ো করে পঁওখনী বললে, আই রে বাপ! কত্ত কল দেখলম আজ! কত্ত আমার ডর হল!

একটু ঘাড় কাৎ ক'রে জটু সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, আরও হরেক কিসিমের কল আছে, আরও দেখবি বটে! দুই মাস তিন মাস ইখানকে কলের খেলা চলবে বটে, হু।

পঁওখনী বললে, তরা ডুংরি ফাটাইছিস, গাছ উপাড়ছিস, কিন্তুক আমি কিছু বুঝতে লারছি বাপু! ইসব কেনে?

একগাল হেসে জটু বললে, জানা চাই তবে তো বুঝবি! ইখানকে ই ডুংরিগুলার পাথরকে বহুৎ দামী দামী চীজ আছে বটে। উ সব তলাশ করা হইচ্ছে রে!

কেনে?

কেনে আবার? দামী চীজ পেলে লিবে না?

পঁওখনী ব্যাপারটা বোধ হয় ঠিকমতো বুঝলে না। পাথরকে সে বরাবর পাথর বলেই জেনে এসেছে। এর ভেতর কী এমন দামী জিনিস থাকতে পারে তা তার মাথায় এলো না। বললে, যা পাবি সব তোরা লিয়ে যাবি বটে?

আবার হা হা ক'রে হেসে উঠলে জটু। ঠিক সেই সকালবেলার মতো। হাসতে হাসতে বললে, লিবে নাই? তবে ডিনামিট কাটাইছে কেনে? এত কলের খেলা করছে কেনে রে?

পঁওখনী কেমন যেন এক বেদনার্ত দৃষ্টিতে জটুর দিকে তাকিয়ে বললে, ইটা ভালো নাই!

কেনে?—নাইরে, ভয় রাখিস নাই পঁওখনী, তদের গাঁও উড়াই দিবে না।

তা না দিক, তবু যেন ব্যাপারটাকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে না পঁওখনী। আজ সারাদিনে যে ক'বার ডিনামাইট ফেটেছে সেই ক'বারই ভয়ে বিস্ময়ে সে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছে শুধু। ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে গেছে পাহাড়ের খানিকটা জায়গা। ওখান দিয়েই নাকি বুনো হাতীর দল নীচে নেমে ধানক্ষেত নষ্ট করে। তাদের আসা যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে গেল। হয়তো এ বছর ধানও উঠবে ভালো। তবু ক্ষতবিক্ষত পাহাড়ের সেই জায়গাটাকে দেখে কী একটা অব্যক্ত ব্যথায় যেন তার বুক টনটন করছিল। মাটি হ'ল না। পাহাড় পাথর মাটি—সবই তো এক। সেই মায়ের অঙ্গ এমন ক'রে ভেঙে গুঁড়িয়ে ছেঁদা করে দিতে পারে কেউ?

কেন যে এত বড়ো ব্যাপারটা ঘটছে, তা সারাদিনে জানতে পারেনি পঁওখনী। এখন একটু একটু বুঝতে পারছে। দামী দামী জিনিস আছে পাথরের নীচে। ওরা সেই দামী জিনিসগুলোকে খুঁড়ে বের করতে চায়।

কিন্তু একটা শিশুর দল যেন স্তনদুগ্ধের ধারায় তৃপ্ত না হয়ে মায়ের বুক চিরে এক
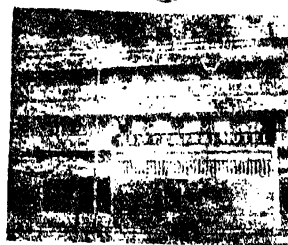
গণ্ডূষে সবটুকু জীবনরস পান ক'রে নিতে চায়!

জট্‌ কী একটা কথা বলতে গেল। তার আগেই হন হন করে এগিয়ে গেল পণ্ডিখনী। জট্‌ ডাকলে, সে ফিরেও তাকালে না।

ক'দিন ধরে ডিনামাইট আর ডীপ-ড্রিলিং-এর কর্কশ আওয়াজে মুখর হয়ে রয়েছে সমস্ত উপত্যকা। যারা প্রথম প্রথম ভয় পেয়েছিল, তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে সে শব্দ। পাখির ঝাঁক শুধু এদিকে আসে না।

জটুর মনে হয়েছিল, পণ্ডিখনী বোধ হয় আর কাজে আসবে না কিন্তু দু'দিন পরে দেখা গেল আবার সে এসেছে।

পণ্ডিখনী চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। জট্‌ তাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানছে! পঙ্গু বাপটা যদি ম'রেও যেত তাহলে বোধ হয় নিষ্কৃতি পেত সে। বাপকে মাটিচাপা দিয়ে সোজা গিয়ে জটুর হাত ধরে বলত, মরদ হয়েছিস—ছাতি নাই, কলিজা নাই তর? ঠিকাদারের কাম জবাব দিয়ে চল্‌ সিখানকে জংলী।

কুলিকামিনদের জন্যেও কয়েকটা তাঁবু পড়েছে। দূর গাঁ থেকে যারা কাজে আসে তাদের জন্যে ব্যবস্থা। কিন্তু কেউ-ই বড়ো থাকতে চায় না, সারাদিন কাজ করার পর তারা যে যার ঘরে ফিরবেই। চার পাঁচজন মাত্র থাকে। তাদের ভেতর দু'জন মেয়ে। একজন অমুর-দল থেকে তাড়ানো, আর একজন এক রেল-কুলির বেওয়ারিশ বিধবা। পণ্ডিখনী তাদের ধার ঘেঁষে না; তাদের হাসি, তাদের চলন বলন ওর কাছে অচেনা। শাল মহুয়া আর পলাশের এই অরণ্যে তাদের সে হাসি বেমানান। তবু তারা ফিক্‌ ফিক্‌ ক'রে হাসে।

ক'দিন পরে জট্‌ এক ফাঁকে বললে, তিনটো তাম্বু তো পড়ে থাকছে পণ্ডিখনী—তু থাক্‌ না এসে!

পণ্ডিখনীর বুকের ভেতর এক ঝলক রক্ত ছলাৎ ক'রে উঠল। মুখ নীচু ক'রে বললে, নাই।

কেনে?

বুড়া বাপকে দিখা করবে কে?

বাপকে লিয়ে আয়। তিনচার মাস কাম চলবে ইখানকে; রোজ রোজ আসা যাওয়াকে মেহনৎ নাই?

পণ্ডিখনী কী বলবে বুঝতে পারছে না। তার সমস্ত দেহমন চাইছে এখানে এসে থাকতে। তার আদিম আরণ্যক নারীমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে। জট্‌ এবার নিশ্চয়ই তাকে ফেলে পালিয়ে যাবে না। পালাতে দেবে না পণ্ডিখনী। কিন্তু সে নিজে কতখানি করতে পারে? এখানে তাঁবুতে ওই নষ্ট মেয়ে দু'টো ছাড়া আর কেউ থাকে না। একা সে যদি এসে থাকে তাহলে গাঁওলা-পঞ্চের রোষ ঠেকাবে কে? আর সব মেয়েরাই বা কী বলবে তাকে? সবই সে বুঝতে পারছে কিন্তু মন যেন আর মানে না! দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে পণ্ডিখনী। বুড়ো বাপটা মরেও না!

তাকে নিরুত্তর দেখে জট্‌ বললে, জবাব দিচ্ছিস নাই যে!

ইখানকে থাকতে লারবো। ব'লেই একছুটে পালিয়ে গেল পণ্ডিখনী।

দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছিল বনোয়ারিলাল। পণ্ডিখনী চ'লে যেতেই এগিয়ে এসে চাপাস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, রাজী হ'ল?

জট্‌ হতাশভাবে বললে, নাই বটে।

রীতিমতো বিরক্তস্বরে বনোয়ারি বললে, তু শালা জংলীর বেটা জংলী আছিস্‌। শুধু কাঁহিকা! যে লেড়কির সঙ্গে দু'সাল আগে ভি পেয়ারমুহব্বৎ করেছিস, ওহি লেড়কি কব্‌জা করতে পারিস না? ছোঃ ছোঃ—

একটা সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর মুখে জট্‌ বললে, একটুক্‌ সবুর করো বনোয়ারিজী, জংলী চিড়িয়া পাকড়াতে সময় চাই বটে!

সে কথায় বনোয়ারি এমন কিছু আশ্বস্ত হয় না। তবু জটুকে বেশী ঘাটাবার সাহস নেই তার। এক সময় মেয়েটাকে ও নাকি ভালোবাসত। তাছাড়া লোকটা সভ্যজগতের সংস্পর্শে যতই আসুক না, আসলে তো জংলী!

পরের দিন বনোয়ারি আর জট্‌ দু'জনেই অবাক্‌।

পঙ্গু বাপকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিয়ে ঝরণা পেরিয়ে এপারে আসছে পণ্ডিখনী। মাথার ওপর একটু মাঝারি পুঁটুলি। বোধ হয় ঘর-কন্নার টুকিটাকি জিনিসপত্র।

জট্‌ আড়চোখে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরালে। বনোয়ারিলাল যদি ইমানদার আদমির বাচ্চা হয় তাহলে এবার তাকে কথা রাখতে হবে। আসনবনীর ঠিকাদারিতে মোট লাভের শতকরা পাঁচ ভাগ জটুর! বেইমানি করলে এ তল্লাটে একখানা টাঙ্গির অভাব নিশ্চয়ই হবে না!

রাত কত কে জানে!

তাঁবুর বাইরে বেশ জোর হাওয়া বয়ে চ'লেছে। আকাশমণি আর ইউক্যালিপটাসের সরু সরু পাতায় কেমন একটা ঝিরঝিরে শব্দ।

বড়ক সর্দার কখন্‌ ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে পণ্ডিখনী। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ ক'রে সে জেগে আছে, কখন আসে অভিসারের সংকেত। এক একবার মনে হচ্ছে, বুঝি ভোরই হয়ে গেল! আপন মনেই একবার হেসে আবার সে বাইরের দিকে কান পাতে।

পণ্ডিখনী! একটা ডাক।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলে পণ্ডিখনী।

আবার একটা ডাক। খুব চাপা স্বর। জটুর গলা!

জট্‌ তাহলে সত্যিই তাকে ভোলেনি!

বুকটা একবার কেঁপে উঠল। তারপরই তাঁবুর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো পণ্ডিখনী।

গভীর অন্ধকার।

আকাশ জুড়ে তারার চুমকি। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়ে পুরো আকাশটা চোখে পড়ে না।

দু'টি কঠিন হাত এসে বেষ্টন ক'রেছে পণ্ডিখনীকে। মৃদু অস্ফুট স্বরে পণ্ডিখনী বললে, ছাড় জট্‌। আমার গতর কি তরু পারা পাথর বটে?

জট্‌ কোনো জবাব দিলে না।

আবেগে শিহরণে কাঁপা গলায় পণ্ডিখনী বললে, ভারী মরদ তু! মনের মেয়্যাকে ছিনাই' লিতে লারছিস তবে কেমন মরদ?

এবারে সুযোগ পেয়ে বনোয়ারিলাল ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললে, ওটা মরদ না আছে। তু হামার পাশ থাক্‌ পণ্ডনী।

বনোয়ারির কথা শেষ না হ'তেই প্রচণ্ড শক্তিতে ছিটকে বেরিয়ে এলো পণ্ডিখনী। শঙ্খচূড়ের মতো সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠল, কে বটিস তু? কে?

মরীয়ার মতো বনোয়ারির একখানা হাত কামড়ে ধ'রেছে পণ্ডিখনী। কাছেই একটা ঝোপ থেকে কী যেন একটা দ্রুতপায়ে সরে গেল। বনোয়ারি আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলে, হায় হা জটুয়া, এ জটুয়া—

প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল বনোয়ারি। থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সেখানেই বসে পড়ল পণ্ডিখনী।

ক'দিন পরেই হঠাৎ নির্দেশ এলো, এখানে কাজ এখন বন্ধ থাকবে। তাঁবু গোটানো সুরু হ'য়ে গেল।

পণ্ডিখনী নিজের গাঁয়ে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল, এপারে আর কাজ করতে আসেনি।

রাস্তার পাশে যে পাথরখানার আড়ালে সেদিন জটুর সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখল পণ্ডিখনী। তাঁবু গুটিয়ে ওরা রেল স্টেশনের দিকে চ'লে যাচ্ছে। এত দূর থেকেও জটুর গায়ে সেই ছবি-আঁকা জামাটা দেখা যায়। বনোয়ারির সঙ্গে কী যেন ঠাট্টা তামাশা করছে জট্‌।

ডিনামাইট-বিধ্বস্ত পাহাড়ের দিকে তাকালে পণ্ডিখনী। ওরা কিছুই পেল না অথচ মাটি-মায়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত ক'রে রেখে চ'লে গেল!

সেই মুহূর্তে পণ্ডিখনীর মনে হ'ল যারা জংগলে থাকে না, তারা সব পারে। জংগলের মনকেও ওরা দখল ক'রে নিয়েছে! জট্‌ ওদের—সে আর জংগলের মানুষ নয়!

বিধ্বস্ত পাহাড়ের ক্ষত জায়গাটুকু যেন তারই বুক। জংলী মেয়ে কাঁদতে জানে না, তবু চোখ দু'টো জলে টলমল করছে তার।

দলটা পাহাড়ের আড়ালে চ'লে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না।

—

খেলার দুনিয়া

ক্রিকেটের স্রষ্টা ও পোষ্টা ইংরেজ জাতির উদ্দেশে সামান্য বাঙালী লেখক আমি এই বিনীত আবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেভাবে হোক যত দ্রুত সম্ভব, মার্কিণ জাতিকে ক্রিকেট নেশা ধরিয়ে দিন। দেওয়ার সবিশেষ প্রয়োজন। আমাদের ভৌগোলিক সীমা যেমন সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে তেমনি সীমিত হচ্ছে চৌগোলিক (চন্দ্র-গোলিক'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) সীমা। আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই জাতি শূন্যে স্পুটনিক ফেলাতে পেরেছে বলে তারাই প্রথমে চাঁদ পাবে। চাঁদ পাবার বন্দোবস্ত জন্য আণবিক বোমা ফাটান পর্যন্ত বন্ধ রেখেছে তারা। কিন্তু রাশিয়া চাঁদে গেলে কখনই ধনতন্ত্রের ভাণ্ডাগুলি ক্রিকেটকে নিয়ে যাবে না যদিও সোভিয়েতের প্রভাবে [illegible] ক্রিকেট চর্চা সুরু হয়ে গেছে, নিদেন যাবে মার্কসের ক্যাপিটাল, ক্যাপিটালের প্রতিষেধক হিসাবে। সে ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা আমেরিকা। ইংরাজগণ, জগতের বিশ্বকর্মাগণ [illegible] স্পুটনিক ওড়াতে পারেনি; এখন যদি মার্কিণ ভাগনেকে বুঝিয়ে তাদের চন্দ্রযাত্রী স্পুটনিকে ক্রিকেট-গীয়ার ও এম সি সি নিয়মাবলী চাপিয়ে দিতে না পারে তাহলে ভবিষ্যতে যখন আমেরিকা ও রাশিয়া এই দুই অর্ধচন্দ্র [illegible] হবে তখন উভয়ার্ধেই ক্রিকেট পাবে অনাদর।

অথচ চাঁদে যদি ক্রিকেট না যায় তো পৃথিবীর ক্রিকেট-রসিকদের পক্ষে অপরিসীম [illegible] বিষয় হবে,—বিশেষত ক্রিকেট-সাহিত্যের [illegible] ইডেনে শীতের দুপুরে [illegible] অপরাহ্নের কথা নিতান্ত তুচ্ছ [illegible] পূর্ণিমার তুলনায়। কল্পনানেত্রে দেখুন আপনারা, ঐতিহাসিক লর্ডস বা ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনের সামান্য সৌন্দর্যের পাশে সৌন্দর্যের অক্ষয় উৎস চাঁদের পৌরাণিক রোহিণী স্টেডিয়ামের ক্রীড়াক্ষেত্র—সেখানে খেলা হয় নিত্য চন্দ্রালোকে, কল্পবৃক্ষ থেকে ডাল ভেঙে ব্যাট তৈরী করা হয়, বল হয় কোনো এক বৃহৎ তারকা এবং খেলোয়াড় হলেন কিরণ-বসন স্বর্গীয় চরিত্রগুলি—সে খেলা দেখছেন—আপনি!!!

তালতলা, বেলতলা বা নাকতলা যেখানেই আপনার আড্ডাস্থল হোক, বাঁশবেড়ে, উলুবেড়ে বা রায়বেড়ে, যেখানেই আপনি বসবাস করুন আপনার ক্লাইভ স্ট্রীটের আকাশে যদি পাঁশুটে চাঁদও না ওঠে তবু আপনি চাঁদনি ক্রিকেটের একজন মুগ্ধ দর্শক—

অসম্ভব। সত্যই অসম্ভব হবে যদি না ইংরেজ তাঁদের বেয়াড়া ভাগনে আমেরিকানদের ক্রিকেট ধরাতে পারে।

চন্দ্রাহত বাঙালী জাতির অন্যতম রূপে আমি চাঁদনি ক্রিকেটের জয়গান করছি না। ইংরেজ ক্রিকেট লেখকরাই চাঁদনি ক্রিকেটের কথা জানিয়ে গেছেন। শুধু চাঁদনি ক্রিকেট নয়—তুষার ক্রিকেট পর্যন্ত। ইউরোপের দ্বীপান্তরবাসী ইংরেজদের উপর প্রকৃতির মারের সীমা নেই। তাদের শীত দীর্ঘ, বিষাক্ত এবং মৃত্যুঘনঘোরনিত। জানুয়ারীর মৃত্যুনিশীথে ইংল্যণ্ডে চাঁদ ওঠে না, উঠলেও কেউ দেখে না, দেখলেও তা নিয়ে ভাবাবিষ্ট হবার বাসনা কারও থাকে না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের তেমনি এক রাত্রি কিন্তু বিস্ময়করভাবে কাব্যচর্চিত হয়েছে—কারণ, সেই রাত্রে উইম্বলডন পার্কের তুষারাচ্ছন্ন রূপালী ময়দানের উদ্যানে ক্রিকেট খেলা হয়েছিল। সেই ৮ই জানুয়ারীর পূর্ণিমা নিশীথে চাঁদ উঠেছিল পূর্ণ প্রভায়, একজন লিখছেন, নির্মেঘ, নির্মল অম্লান-দ্যুতিতে আম্বর চন্দ্র—সন্ধ্যা থেকে রাত্রি পর্যন্ত।" শ্রীযুক্ত এ এ টমসন এই কাহিনী বর্ণনার উপর সানন্দ কৌতুকে মন্তব্য করেছেন—"এই প্রথম বোধ হয় 'শীতরাতের সুদীর্ঘ মহিমার' বিষয়ে একটা কবিতা লেখা হল।" এবং আমরা সকলেই জানি, এর মূলে আছে ক্রিকেট।

কিন্তু এই ক্রিকেট মার্কিণরা খেলে না। সারা পৃথিবীতে যেখানে ইংরেজ গেছে, ইংরেজী গেছে, সেখানেই ক্রিকেট গেছে। ব্যতিক্রম আমেরিকা। মার্কিণ-শরীরে জার্মাণ, ইতালিয়ান, ফরাসী, স্প্যানিশ—সব রক্ত থাকলেও ইংরেজী রক্তের ভাগই সবচেয়ে বেশী, অথচ ক্রিকেট ব্যাপারে মার্কিণ 'স্বাধীনচেতা' ফরাসী-জার্মাণ রক্ত ইংরেজ রক্তকে [illegible] করে দিল। ক্রিকেটকে আমেরিকানরা কখনই [illegible] নিল না, গম্ভীরভাবে ক্রিকেটের কথা উঠলেই অর্বাচীন হাসিতে হো হো করে উঠে কে বলে, বড়ো মামাদের ভীমরতি। লেসবল লেটিপেটি না করে, বাস্কেট মারমারির ছেড়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুতোবাঁধা পুতুলের

এম সি সি নিয়মাবলী চড়িয়ে

মত নড়াচড়া করছে ক্রিকেটে। মার্কিণ ভাগনে বলে, সমারসেট মমের গল্পে পড়নি মামাদের কেতাবী আচরণের কথা?—যেখানে সাতদিন অন্তর ডাক যায় এমন কলোনির ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে বসেও বড়ো-চা ইংরেজ কেমন রোজ 'প্রাতঃকালে' খবরের কাগজ পড়ে? মামা এক সপ্তাহ পরে পুরো গত সপ্তাহের কাগজ পায় বটে, কিন্তু হাতে পেয়েও সাতদিনের কাগজ এক-সঙ্গে পড়ে ফেলে না; মামা সোমবারের কাগজ সোমবারেই পড়ে, মঙ্গলবারের কাগজ মঙ্গলবারেই—তবে আগের সোমবার, [illegible] মঙ্গলবার, এই যা। একশো মাইলের মধ্যে [illegible] সাদা চামড়া নেই কিন্তু মামা তবু খেতে [illegible] পুরো খাওয়ার পোষাক পরে—প্রতিদিন, প্রতি [illegible]

মার্কিণের চাই গতি। [illegible] স্পীডোমিটারের শেষ দাগের উপর গতির কাঁটা [illegible] থাকবে, তবে না তাদের দিল খুশ! [illegible] সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত দৌড়ে [illegible] মাঝের ফিল্ম দেখে খানিক ঝিমোলো, তারপর [illegible] উঠে ড্রেসিং গাউন পরেই আবার ছুটতে [illegible] করে—এরা যে ক্রিকেটের ধীরলয়ের মার্গ [illegible] চৌতালের শিসে গাঁজার সুর ভেঙে উড়িয়ে দেবে [illegible] আর আশ্চর্যের কি আছে?

অথচ উপায় নাহিরে নাই। চাঁদে [illegible] পাঠাতে গেলে আমেরিকান এইড চাইই [illegible]

[illegible]

দুর্ভাবনা, [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] ক্রিকেট এক [illegible] মানিক অর্থ পায় [illegible] চাঁদে যাবেন উপরে ক্রিকেটার। [illegible] কাচ্চা-বাচ্চা নেবে, এরা [illegible] ভূমিকা আছে [illegible] শিক্ষা এ ক্রিকেট কেতাবি।

[illegible] ফাঁকি নাই! অজ্ঞান [illegible] ক্রিকেট [illegible] আহা কিবা মরি আবিষ্কার! [illegible] আমেরিকানদের বেসবলের শব্দার্থ [illegible] খাঁটি করে রাখে, বেসবল মানে যুদ্ধ [illegible] সেটা যেমন দাঁড়ায়? একখানি ভয়ানক ঐ [illegible] বেসবোলারদের সাজ-পোষাকেই [illegible] নাইটদের মত আপাদমস্তক বর্মে ঢেকে [illegible] মাঠে নামে তখন উদ্দেশ্য যুদ্ধ কি [illegible] শত্রু। আমরা অবশ্য বেসবলের বিরুদ্ধে ঐ [illegible] কথা মোটেই বলব না, আমরা [illegible] আমাদের জাত আলাদা, মনোভাব [illegible] থাকে অভ্যাস আছে, আমাদের [illegible] 'এটা ক্রিকেট নয়' যেমন, এটা মানুষ [illegible] ক্রিকেট-ঘাটে মাথা না মুড়োলে কি [illegible] ঐ কথাগুলি লাগাতে বলতে পারতাম না।

মার্কিণ ভদ্রলোক অতঃপর ক্রিকেট [illegible] নিয়ে পড়েছেন—

"ক্রিকেট দেখতে কোনই হাঙ্গামা [illegible] দরকার একটি ইজিচেয়ার, একটি পাইপ [illegible] পশমগোলার কাঁটা এবং সপ্তাহখানেকের [illegible] পলায়ন।"

পুনশ্চ খেলার প্রতি বিদ্রূপ—

"খেলাটা অবশ্য বিশেষ ঝঞ্ঝাটের। [illegible] প্যান্ট-সার্ট, কাঁটাওয়ালা জুতো, উইকেট, [illegible] চামড়ামোড়া বল লাগে। উইকেট আবার [illegible]

[illegible] করে কাঠের খোঁটাকে মাটিতে গেঁথে এক দিকের উইকেট তৈরী হয়, তার মাথায় থাকে দু' টুকরো কাঠ যার নাম বেল। ৬৬ ফুট দূরে মুখোমুখি গাঁথা থাকে আর এক সার উইকেট। একদিকের উইকেটের কাছ থেকে বল ছুঁড়ে বোলার অন্যদিকের উইকেট ছত্রকুটে দেবার চেষ্টা করে। বোলারের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করে ব্যাটসম্যান দুই উইকেটের মধ্যে ঘোড়দৌড় করে রাণ [illegible]।

অধিকাংশ বোলার বলকে ধাপায়। বলকে ঘূর্ণপাক খাইয়ে বা মাঠের খোঁদলের সুযোগ নিয়ে তাকে লাফ খাইয়ে বোলারেরা ব্যাটসম্যানকে ভ্যাবা-চ্যাকা খাওয়াতে সচেষ্ট। ব্যাটসম্যানের পক্ষে আত্ম-রক্ষা করার সবচেয়ে সদুপায় হল বোলারদের দিকে

ফিল্ডারের মতো লম্ফঝম্ফ

[illegible] দিকটি দেখিয়ে স্থিরভাবে ব্যাট ধরে [illegible]। সেক্ষেত্রে ব্যাট ও উইকেটের মধ্যে ব্যবধান [illegible]। এরই নাম উইকেট পাহারাদারী। [illegible] এক আধটা উইকেটে [illegible] চারদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে।...ব্যাটারের বাঁ [illegible] দাঁড়ায় তাকে [illegible] দাঁড়ালে [illegible] ঘুলিয়ে যায়।'

এই পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] আমি কেন না [illegible] কিছু কঠিন ছিল না। কিন্তু আমার [illegible] আমাকে সংযম দিয়েছে। আর দিয়েছে [illegible] সরল উদারতা। এমন মনের উৎসাহেই আমি [illegible] সম্বন্ধে আরও একটি মার্কিণী ব্যঙ্গ রচনা [illegible] দিচ্ছি। লেখাটি ক্রিকেটমোদীদের উপভোগ [illegible] কোনই বাধা হবে না—মহৎ ব্যক্তিরা নিজেদের [illegible] নিজেরাই সবচেয়ে তারিফ করেন, কে না [illegible]।

অনেক আমেরিকান সাহিত্যিক, যিনি এই [illegible] স্রষ্টা, তিনি জীবনে একবার মাত্র ক্রিকেট [illegible], খেলা শেষে লম্বা হয়ে নমস্কার করেছেন [illegible] বর্বর রক্তাক্ত ক্রীড়ানামক কাণ্ডটিকে। [illegible] 'লেখক-সংঘ' ও 'পুস্তকব্যূহ' এই দুই [illegible] খেলায় এঁকে লেখক সংঘের পক্ষে অবতীর্ণ [illegible] বলা হয়। কার যেন মাথায় আইডিয়া এসেছিল, [illegible] কোনো মার্কিণ ভদ্রলোককে [illegible] মাঠে নামিয়ে পরে তাঁর কাছ থেকে [illegible] কথা লিখে নেওয়া যায়, মজা মন্দ হয় [illegible] মার্কিণ ভদ্রলোক সরলপ্রাণে মাঠে নেমে পড়েন [illegible] উৎসাহে।

এবার তাঁর কথা তাঁর মুখেই শোনা যাক—আমি [illegible] দিয়ে হাজির করছি—

'ব্যাপারটি লঘুভাবে নিয়ে আমি খুবই ভুল করেছিলুম। ভেবেছিলুম ছোঁড়া বলকে লাঠিপেটা [illegible] যার কিছু অভ্যাস আছে, যে উঁচু জিনিস [illegible] বা মাঠে খাটাখাটুনি করতে পারে তার পক্ষে [illegible] সহজ খেলাটা ম্যানেজ করে নেওয়া আদপে [illegible] হবে না। বাপ্‌রে—যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম দুটি মারাত্মক শত্রু এবং তথাকথিত খেলাটির মধ্যে এতখানি বিপদ আছে তাহলে আমি (ক) কদাপি এই গুণ্ডামির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতাম না কিংবা (খ) বুলফাইটারদের মত সারারাত্রি প্রার্থনায় কাটাতাম যারা বুঝতে পারে আগামী প্রভাত তাদের জীবনের শেষ প্রভাত।

অনিবার্য সর্বনাশ সম্বন্ধে আমি প্রথম সচেতন হলুম যখন আমাদের দল গোড়াতেই ফিল্ডিং করতে নামল। আমি আবিষ্কার করলুম যে, আমাকে গ্লাভস পরতে দেওয়া হবে না, অথচ হাঁকড়ানো বল আমাকে পাকড়াতে হবে খোলা আঙুলে। তারপরে আমাকে একটা জায়গায় দাঁড় করানো হল—দিব্যি গেলে বলছি তার নাম সিলি মিড অন—যেটা ব্যাটসম্যানের ছয় ফুটের মধ্যে কিন্তু আমাকে মাথায় শিরস্ত্রাণ বা বুকে বর্ম, কিছুই পরতে দেওয়া হল না।

সিলি মিড অনে ফিল্ডিং করবার সময়ে অহো, আমার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন একটি চমৎকার অপরাহ্ণের কথা মনে পড়ে গেল, যখন পাশ দিয়ে একেবারে গা ঘেঁষে এক-ঝাঁক গুলী ছুটে গিয়েছিল। একটি গুলী-বল আমার পায়ের গোছে ধাক্কা খেয়ে চোখের পলকে বাউণ্ডারী। গোছে পরে প্লাস্টার করতে হয়েছিল। উঁচু থেকে সাঁ করে নেমে-আসা বলকে বাগাবার চেষ্টায় একটা আঙুলে এমন জখম হল যে, টাইপ রাইটারের উপর নৃত্য করবার ক্ষমতা তার বেশ কিছুদিন থাকেনি। নাড়ু [illegible] থাকার জন্যে পিঠে ব্যথা ধরে গেল এবং [illegible] তারই টানে, বার্ধক্যের জন্য নয়, মাথা না নাড়াতুম তাহলে একটি বল আমার মাথার খুলি একেবারে চলকে দিত।

'কেমন লাগছে?'—ক্যাপ্টেন শুধোলেন মধু-কণ্ঠে, 'খুব মজার খেলা, কি বলেন?'

ওঁদের চেষ্টা হলো আমাকে যে জায়গাটির রক্ষণা-বেক্ষণের ভার দেওয়া হল, সেটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থান, কিন্তু খানিক পরে দেখি, বাউণ্ডারী বাঁচাবার জন্য দৌড়তে দৌড়তে আমার জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়েছে!

সেই তো সবে শুরু। বিকেলের দিকে আমার ব্যাট করার পালা হল। কখনো ক্রিকেট ব্যাট ধরিনি বলে মাঠে ফায়ারিং লাইনের সামনে দাঁড়াবার আগে আমাকে একটু প্রাকটিশ করতে দেওয়া হল। আমার খোঁড়ানো পায়ের উপরে প্যাড চড়িয়ে হাতে একটা থ্যাবড়া ব্যাট ধরিয়ে দিয়ে আমাকে নেটে দাঁড় করিয়ে দিলে, বলে দিলে, দেখে খেলবে। একটি বোলারও জোগান দেওয়া হল। সে ব্যক্তি দৌড়ে ধেয়ে এসে হঠাৎ লাফ মেরে বলটিকে মাটিতে এমন ঠুকে দিলে যে, বলটি ঝাঁ করে উপরে উঠে আমাকে এমন এক স্থানে আঘাত করল...।

ফার্স্ট এড ও আধ ঘণ্টার বিশ্রামের দ্বারা আমি যে শক্তি সংগ্রহ করলুম তাতে হেঁটে ক্রীজে পৌঁছানো সম্ভব হল।

এখানে বলা উচিত, বৃটিশ ব্যাটসম্যানেরা ষ্টাম্প বা বেলরক্ষার জন্য বিষাক্তভাবে লাফিয়ে ওঠা বলে ব্যাট চালায় না, ব্যাট চালাবার উদ্দেশ্য বিচলিত পৌরুষরক্ষা। গোলাবর্ষণের মধ্যে আমার সংক্ষিপ্ত কুর্মাবস্থানকালে আমি যে ছয় রাণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলুম তা বিশুদ্ধ আত্মরক্ষার্থে, অধিকন্তু আঘাত থেকে পরিত্রাণ চেষ্টায়। পরে শুনলুম, আমি নাকি কয়েকটি অদ্ভুত ভাল হুক করেছি। আসলে মাথা বাঁচাতে আমি দ্রুত বলটিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলুম। প্রথম মারের পর কে একজন চেঁচিয়ে উঠল—'ছোটো!'—যেটা ইয়ার্কি ছাড়া আর কিছু নয়, দৌড়বার অবস্থায় ছিলুম না সকলেই জানে, তবু চেষ্টা করলুম, ফলে শিরায় টান ধরল।

এই অতিবিচিত্র অ্যাংলো-স্যাক্সন আঘাতে সংঘাতে কতক্ষণ লিপ্ত থাকতে পারতুম জানি না, হয়ত বেশ খানিকক্ষণই পারতুম কারণ মানুষের বাঁচার তাগিদ প্রবল—আত্মরক্ষা করে যেতামই প্রাণপণে—যদি না একজন লম্বাপানা প্যাঁকপেঁকে চেহারার বোলারকে আমদানী করা হত। পুরনো ভয়ংকরটির চেয়ে এর ধরনধারণই আলাদা। এঁকে নরম চতুর বলা চলে। ইনি উপরদিকে একটি সুমধুর বস্তু উড়িয়ে দিলেন, মায়ের হাতের দোলার মত সেটি ঝুলতে ঝুলতে অর্ধবৃত্তাকারে আমার কাছে আসতে লাগল—আমার শরীরসম্বন্ধীয় কোনো দুরভিসন্ধি তাতে ছিল না। সেটি টুক্ করে আমার পায়ের কাছে খসে পড়বে আর আমি সেটিকে একদম সাবাড় করব। আমেরিকান ধাঁচে হাত-খুলে লম্বা ব্যাটে প্রেমসে বলটি ওড়াবো—ছ-এর জন্য—আট...দশ...বার যা হয়—বাউণ্ডারী আলো করা অবজ্ঞাপরায়ণ দর্শকদের কিছু শিক্ষা দিয়ে দেব।
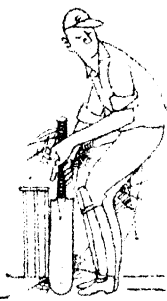
চারদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে।

দুঃখের বিষয় আমি লক্ষ্য করিনি বস্তুটি বোঁ-বোঁ-ও-ও করে ঘুরছে। যে মার বলটিকে টেমসের পরপারে পাঠাতে পারত তা প্রথমত আমার কব্জির একটি তন্ত্রী ছিঁড়ল, এবং তার দ্বারা বলটি ক্রুদ্ধ মৌমাছির মত গন্‌গন্ করতে করতে আকাশে উঠে পড়ল, তারপর নামতে লাগল জনৈক ফিল্ডারের প্রতীক্ষার অঞ্জলির উপরে—ক্রিকেটের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ সেইখানেই।

কিন্তু কর্মফল তখনই শেষ হল না। সেদিন সন্ধ্যায় ইউনে বক্তৃতা দেবার কথা। বসে বক্তৃতা করতে হল কারণ দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। পরদিন [illegible] নখ থেকে কুঁচকি পর্যন্ত মদীয় শ্রীঅঙ্গের সর্বত্র কালশিটে। শুয়েও শান্তি নেই কারণ শুতেই পারি না। অবশ্য আমার এমন কিছু হয়নি যা ছয় মাসের বিশ্রাম, মাসাজ, প্লাস্টার বন্ধন, ইনফ্রা-রেড রশ্মি প্রয়োগ ইত্যাদি দ্বারা সারতে না পারে, যদিও আমার একটা আঙুল এখনো ঘাড় বেঁকিয়ে আছে, তাকে টেনে টাইপ মেশিনের উপর আনতে পারিনি।

ক্রিকেট খুব মজাদার ব্যাপার? হুঁ!'

হুঁ—এ হেন আমেরিকানকে বা আমেরিকানদের ক্রিকেট [illegible] হবে, এমন কল্পনা [illegible] খেয়েছে? [illegible] সাধ্য তা সাধনের [illegible]। তবে একটি আশার কথা হল, ওয়ারেন হেস্টিংসের সংখ্যা যদিও অধিক কিন্তু কোটিকে [illegible] তো আছে। ক্রিকেটকে ভালবাসে এমন আমেরিকান আছেন, যিনি ক্রিকেটকে নিছক খেলারূপে দেখেন না, দেখেন উপভোগময় জীবনছবিরূপে। বুঝতে পারছি, যে সব আমেরিকান অশান্ত জীবনের ঘূর্ণি থেকে মুক্তি পেতে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতটে নারকেল গাছের আলোছায়ার উপর উপুড় হয়ে পড়ে কিংবা জাপানী গেইশা গৃহের স্বপ্নিল চিত্র-শালায় স্বপ্নজীবনে ডুব দেয়—তাদেরই একটি মন ক্রিকেটকে ভাল বেসেছে তার অলস-বিলাসের বিলম্বিত সুরের মোহে। সেই মন প্রশ্ন করেছে—

সারা ভারতে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, অথচ রাজ-নারায়ণের খ্যাতি কিছু নয়। রাজনারায়ণ ইমামকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করেন। অনেকেরই ধারণা ছিল, ইমাম জয়ী হবেন। কিন্তু কার্যকালে প্রায় ৩০ মিনিট প্রবল যুদ্ধের পরে রাজনারায়ণ ইমামকে চিৎ করে দেন। এর দীর্ঘকাল পরে ইমামের দ্বিতীয় পরাজয় ঘটে ১৯২৩ অব্দে লাহোরে শিয়ালকোটের উদীয়মান মল্ল গুঙ্গার হাতে। এ কুস্তিতেও তাঁকে চিৎ হতে হয়েছিল ৩০ মিনিটের মধ্যে। এই ঘটনার পূর্বে, ১৯১৮ অব্দে, কোলহাপুরে অনুষ্ঠিত সারা ভারত কুস্তি দঙ্গলে ইমাম জয়ী হওয়ায় গামা তাঁর ভারত-প্রাধান্য আখ্যা ইমামের পক্ষে ত্যাগ করেছিলেন, অতএব, ইমামকে হারিয়ে গুঙ্গাই নীতিগতভাবে ভারত-জয়ী হয়েছিলেন।

ইমাম-গুঙ্গার শেষ যুদ্ধ হয় ১৯৩৫ অব্দে লাহোরে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রৌপ্য জুবিলী উপলক্ষে। সে যুদ্ধ ৫ ঘণ্টা সমান ছিল। বাস্তবিক, দুইজন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় পালোয়ানের এত দীর্ঘ কুস্তি আর দেখা যায় নি। এ সম্পর্কে নানা মত শোনা যায়। কেউ বলেন, ইমাম ও গুঙ্গার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিরকালের; তাই কুস্তিটা স্বাভাবিক নিয়মেই দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। কারো কারো মতে, গুঙ্গা আর একটু মন দিয়ে লড়লে ইমামকে সেবার তিনি হারাতেও পারতেন। আবার এমন কথাও শোনা যায় যে, সম্রাটের জুবিলী উপলক্ষে লড়াই হয়েছিল বলেই দর্শকদের আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে উভয় মল্ল ইচ্ছা করে কুস্তিটাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিলেন, সম্ভবতঃ শেষোক্ত কথাটাই ঠিক। আসল অবস্থা যাই হোক না কেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইমাম এবং গুঙ্গার মধ্যে পালোয়ান হিসাবে কে শ্রেষ্ঠতর সে কথা সঠিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ, ক্ষিপ্রতায় ইমামই শ্রেষ্ঠতর, আর বলবত্তায় গুঙ্গা শ্রেষ্ঠতর। দেহের বলিষ্ঠতায়ও গুঙ্গা শ্রেষ্ঠতর ছিলেন। এখানে উভয়ের দৈহিক মাপ দিচ্ছি:—

ইমাম	মাপ	গুঙ্গা
৫২ বছর	বয়স	৩৬ বছর
২৮২ পাঃ	ভার	২৫৫ পাঃ
৭০ ইঞ্চি	দৈর্ঘ্য	৭১½ ইঞ্চি
১৮"	গলা	১৮½"
১৫½"—১৬"	বাহু	[illegible]
১২½"	[illegible]	১৩½"
৮½"	কব্জি	৮½"
৪৩½"—৪৯"	বুক	৪২½"—?
৩০"	[illegible]	৩৮½"
২৪"	[illegible]	—
২৯"	উরু	২৭½"
১৭"	[illegible]	—
১৬"—১৭"	[illegible]	১৬½"—১৮"
৯½"	[illegible]	১০"

এইপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গুঙ্গা বুক ফোলানর কায়দা জানতেন না; তা ছাড়া তাঁর সংকুচিত বাহু, পাছা ও হাঁটুর মাপ নেওয়া হয় নি। এদিকে ইমামের ডান বাহুর চেয়ে বাম বাহুর মাপ ছিল ½ ইঞ্চি বেশি। ডান বাহুর মাপ ছিল ১৫½ ইঞ্চি।

ইমামের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৫ অব্দে লাহোর থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে গ্রামের বাড়িতে। তিন ভাইয়ের মধ্যে ইমাম ছিলেন মধ্যম, জ্যেষ্ঠ বড় গামা। পিতার মৃত্যুর সময় ইমামের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর, ছোট ভাইয়ের বয়স এক বছর। ছোট ভাই কুস্তির পেশা ধরেন নি। একেবারে গোড়ার দিকে তাঁর কুস্তি শিক্ষা শুরু হয় পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ মল্ল মাধব সিংহের কাছে. মাধো সিং নামে যাঁর খ্যাতি ছিল সমধিক। কিন্তু মাত্র বছর পাঁচেক তাঁর কাছে শিক্ষা নেবার পরেই ইমাম গামার হাতে শিক্ষিত হতে থাকেন যদিও গামার বয়স তখন ১৫ বছরের বেশি নয়। বস্তুতঃ ইমামের আসল বা ফাইন্যাল ট্রেনিং হয়েছিল গামারই হাতে। ১৬।১৭ বছর থেকে ইমাম দঙ্গল লড়া সুরু করেন; ১৮।১৯ এর পরে বড় বড় প্রতি-যোগিতায়ও নামতে থাকেন। এসব কুস্তি জয়ে তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু তাঁকে প্রথম ধাক্কা খেতে হয় লাহোরের গোলাম মহিউদ্দিনের কাছে প্রায় ২২ বছর বয়সে।

কুস্তিতে যিনি সব চেয়ে দক্ষ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেন মুসলমানরা তাঁকে খলিফা বলে অভিহিত করে, গোলাম মহিউদ্দিন ছিলেন সেই রকম এক খলিফা। বয়সে ইমামের চেয়ে চার বছরের বড় হলেও দেহ পারিপাট্যে তিনি ছিলেন ক্ষুদ্রতর, ক্ষিপ্রতা এবং কুস্তির চাতুর্যেও তিনি ছিলেন বিস্ময়কর। ১৯১১ অব্দে লণ্ডনে যাবার পরে প্রথম তাঁর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে নি। সে সময় মরিস দারিয়াস ছিলেন ফ্রান্সের গ্রীকো রোমান চ্যাম্পিয়ন। ভারতীয়েরা সাধারণতঃ বিদেশে গিয়ে ক্যাচ অ্যাজ ক্যাচ-ক্যান ধারায় প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু দারিয়াস গ্রীকো রোমান ছাড়া অন্য ধারায় লড়তে রাজী ছিলেন না। গোলাম মহিউদ্দিন সেই নিয়মেই দারিয়াসকে হারিয়েছিলেন। অতএব স্বভাবতঃই ইমামের পক্ষে ২০ মিনিট চেষ্টা করেও সেবার মহিউদ্দিনকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়নি। তার পরেই লাহোরের এক প্রদর্শনী উপলক্ষে ইমাম বিলাত-ফেরৎ কালিয়া পালোয়ানকে ২০ মিনিটে পরাস্ত করেন। এক্কা পালোয়ানকেও ইমাম হারিয়েছিলেন মাত্র ১ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে। কালা পরতাপকেও তাঁর হাতে হার স্বীকার করতে হয়।

বিলাত থেকে ঘুরে আসার পরে এক্কা গামার সঙ্গে ইমামের আবার লড়াই হয়; এবারও তিনি ২ মিনিটে জয়ী হন। গাজী সিংকে চিৎ করতেও তাঁর ৩ মিনিটের বেশি লাগে নি। তারপর বজরং পালোয়ানও তাঁর কাছে হেরে যান। কিন্তু বিলাত থেকে ফেরার পরে ১৯১০, ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে হুসেন বখ্শের সঙ্গে তাঁর কুস্তি ভয়ংকর আকার নিয়েছিল। ভারতবর্ষে আক্রমণাত্মক কুস্তিতে যাঁরা দেখা দেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র লাহোরের আলী সাঁই ছাড়া আর কেউ হুসেনের সমকক্ষ ছিলেন না। এজন্য ইমাম হুসেনের লড়াই পালোয়ান সমাজে যথেষ্ট ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল।

বাস্তবিক পক্ষে, দুর্ধর্ষ আক্রমণ ক্ষমতার জন্য হুসেন স্বভাবতই বে-পরোয়া ছিলেন। পক্ষান্তরে ইমাম ছিলেন ক্ষিপ্রতর। দু পক্ষ থেকেই পর্যায়ক্রমে প্যাঁচের মার-কাট চলল। শেষে এক সময়ে হুসেন ইমামকে মাটিতে আছড়ে ফেললেন। সেই আছাড়ে মুহূর্তকালের জন্য ইমামের পিঠ ভূমি স্পর্শ করলেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হুসেনের পিঠও ক্ষণকালের জন্য মাটিতে ঠেকে যায়। এরূপ অবস্থায় আবার তাঁদের যুদ্ধ হয়। হুসেনের ঝড়ো বেগ আক্রমণের সুযোগে এবার ইমাম ধোবি পাট কষে তাঁকে সামনের জমিতে প্রায় চিৎ করে ফেলেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু বোঝার পূর্বেই পলকের মধ্যে হুসেন উঠে পড়েন। কেবল তাই নয়, পাল্টা 'ঢাক' প্রয়োগ করে ইমামকে নিয়ে জমিতে পড়েন এবং এবারও দুজনেই গড়াগড়ি খেয়ে ওঠেন। এবার প্রথম বারের মতোই দর্শকদের মধ্যে জয়-পরাজয় নিয়ে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়; কিন্তু মধ্যস্থ ইমামকে জয়ী ঘোষণা করেন। এর পরেও হুসেনের সঙ্গে তাঁর দিল্লী, পাতিয়ালা এবং লাহোরে যুদ্ধ হয়েছিল এবং দিল্লীর যুদ্ধে [illegible] মিনিট ও অপর দুটিতে ৩০ মিনিটে হুসেন পরাজিত হন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, [illegible] উৎসাহ কিংবা অতি উত্তেজনা ছিল হুসেনের পরাজয়ের কারণ।

গুজরানের রহিম বখশের সঙ্গে ইমামের যুদ্ধটিও ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯১৪ অব্দে কোলহাপুরে যখন তাঁদের সংঘর্ষ হয়, তখন রহিমের বয়স ৬৫ এর কম নয়, [illegible] ইমাম ২৯ বছরের জোয়ান। তবু [illegible] কিছুতেই রহিমকে কাবু করতে পারেন নি। শেষে ২০ মিনিটের মাথায় পাঁজরের [illegible] চোটের জায়গায় আবার চোট খেয়ে যুদ্ধ [illegible] থেকে বিরত হওয়ায় ইমাম জয়ী ঘোষিত হন। পালোয়ানি বিচারে এ পরাজয় যথার্থ [illegible] নয়।

গোলাম মহিউদ্দিনের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের প্রায় ১১ বছর পরে কোলহাপুরের সর্বভারতীয় কুস্তি দঙ্গলে আবার ইমামের লড়াই হয়। [illegible] সে যুদ্ধে ইমাম ৫ মিনিটে জয়ী হন [illegible] জয়ী মল্ল স্বীকৃত হন এবং [illegible] মহারাজার কাছ থেকে ২২ পাউণ্ড [illegible] পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৮ [illegible] বর্ম্বেতে জার্মান মল্ল ওয়েমুণ্ডে [illegible] ইমাম মাত্র ৩০ সেকেণ্ডে পরাভূত করেন। [illegible] সেটা যুদ্ধের মতোই হয়নি। [illegible] অবস্থার [illegible] [illegible] ঘোষণা করেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে [illegible] কিছু [illegible] অন্যের হাতের ট্রফিক হিসাবে [illegible] হন। ১৯২৩ অব্দে [illegible] প্রাধান্য হারাবার পরে পাল্টা যুদ্ধে [illegible] হারিয়ে আবার তিনি 'ভারত-বিজয়ী' হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। যিনি চ্যাম্পিয়ন, [illegible] হবে, তিনি ক্ষমতায় অন্য সকলের উপরে [illegible] অবস্থায় চ্যাম্পিয়নের পক্ষে নিম্নবর্তীদের [illegible] পরাজয়ের ভিত্তিতে আহ্বান করা [illegible] কিংবা প্রথানুযায়ী তিনি যদি [illegible] এপার ভরসা রেখে ছোটদের এবং [illegible] সময়ের ভিত্তিতে লড়ার জন্য আহ্বান জানাতে [illegible] এটা বলে যে, সেই নির্দিষ্ট সময় তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেই তারা পুরস্কৃত হবে, [illegible] সেই মহত্ত্ব দেখাননি; পরন্তু ১৯৩৫, জানুয়ারী তিনি বাংলা দেশের দৈনিক পত্রিকায় চ্যালেঞ্জ জানালেন, যে কোনো বাঙালী [illegible] হারাতে পারলে এগারো হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়েছিল বংশী সিংহের পক্ষ থেকে। [illegible] কুস্তি জগৎ থেকে অবসর নেওয়া সত্ত্বেও তিনি এ দাম্ভিক আহ্বানের জবাব দিয়েছিলেন। তবে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশংকা করে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার এ কুস্তির অনুমতি দেননি।

ইমামের মারফৎ লাহোর ও অমৃতসরের [illegible] শ্রেষ্ঠ পালোয়ান বংশের দলগত [illegible] হওয়া আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। [illegible] কনিষ্ঠ ভাই রহমানের কন্যাকে ইমাম বিয়ে করায় বিষয়টি সম্পাদিত হয়। এদিকে আবার [illegible] মধ্যম ভাইয়ের ছেলে 'ছোট' গামা গামার [illegible] ভাগিনেয়ীকে বিয়ে করেন। ইমামের চার [illegible] মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভোলো, যাঁর আসল নাম [illegible] হুসেন, পেশাদার পালোয়ান হলেও বাপ-[illegible] কাছাকাছি পৌঁছতে পারেননি, এটি খুবই [illegible] ব্যাপার। তথাপি তিনি পাকিস্তানের [illegible] তাতে বোঝা যায়, ভারতের মতো পাকিস্তানের কুস্তির মান নিম্নগামী হয়েছে।

বয়সে হীরালাল

ফরোয়ার্ড থেকে গোল লাইনে—পথটা পিছন পানের একং ঘোরানো। তবুও সেই বক্রপথ পরিক্রমায় তিনি সফল হয়েছিলেন। আর পেছনে এসেও পিছিয়ে পড়েননি। বরং এগিয়ে গিয়েছিলেন অনেকেরই অগোচরে।

অনেকদিন আগেকার কথা। বাংলা দেশের মাঠে ময়দানে তখন সবে ফুটবলের আসর জমতে শুরু করেছে। ফুটবল তখন সাহেব আর গোরাদেরই খেলা। আর তাদের দেখাদেখি কিছু কিছু বাঙালীরাও মাঠে নেমে ফুটবলের সঙ্গে [illegible] সামান্য চেষ্টা করছে।

এই প্রসঙ্গে (১৯০৩ সালে) শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সঙ্গে হাওড়া এরিয়ান্সের প্রীতি ফুটবল খেলার আয়োজন হয়েছে একদিন। [illegible] হিসেবে সে [illegible] সামান্যই। তবু সেই উপলক্ষে [illegible] শিবপুর অঞ্চলে মাঠ লোকজনের ভিড় [illegible] জমেছিল। লোকে লোকে মাঠ একেবারে [illegible]। হঠাৎ রব উঠলো হাওড়া এরিয়ান্সের গোলরক্ষক অনুপস্থিত। কি যেন ঘটেছে পথে। এসে পৌঁছতে পারেননি। নামকরা গোলরক্ষক [illegible] দলের [illegible] খুঁটি। তিনিই [illegible]। শুনে তো হাওড়া এরিয়ান্সের কর্তারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

এদিকে খেলা শুরুর সময় এগিয়ে আসছে। [illegible] আনচান করছেন। অগত্যা কি আর করা [illegible] ডাক পড়লো সেই ফরোয়ার্ডটির 'একটা দিন কোনো রকমে গোলে দাঁড়িয়ে যাও ভাই।'

আকাশ থেকে পড়লেন ফরোয়ার্ড!

'সেকি! জীবনে ও জায়গায় খেলিনি যে।' তবু পীড়াপীড়িতে সেই জায়গাতেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াতে হলো দুঃসাহসে বুক বেঁধে। আর গোলে দাঁড়িয়েই আগের দিনের ফরোয়ার্ডটি সেদিনের আসর একাই মাৎ করে দিলেন।

ওঁর স্বতন্ত্র দক্ষতা ছিল লুকিয়ে। সুপ্ত প্রতিভার মতো। হঠাৎ সে সব কথা জানাজানি হওয়ার ক্ষেত্র হলো প্রসারিত। পরের বছর কোচবিহারের এক বিখ্যাত প্রতিযোগিতায় হাওড়া এরিয়ান্স বাছাই দলের কাছে এক গোলে হারলো বটে, কিন্তু হাওড়া এরিয়ান্সের নতুন গোলরক্ষক সেবারেও আসরের মধ্যমণি হয়ে রইলেন ব্যক্তিগত ক্রীড়াকৃতির মূলধনে।

বাছাই দলের ফরোয়ার্ড ছিলেন শিবদাস-বিজয়দাস ভাদুড়ী, তাজহাটের নর্। তাঁদের মতেই, বিশেষজ্ঞদের স্বীকৃতিতেই সেই মুহূর্তেই বাংলা দেশের ক্রীড়ামহলের হাওড়া এরিয়ান্সের গোলরক্ষকের নাম ছড়িয়ে পড়লো। সেই থেকেই [illegible] ফরোয়ার্ড হলেন নিয়মিত গোলরক্ষক। একটানা ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তিনি ফুটবল মাঠে গোলপোস্টের তলার জায়গাটুকুতেই ছড়িয়ে রইলেন। কেউ আর তাঁকে অন্যত্র নড়তে অনুরোধ পর্যন্ত করেননি।

এক আকস্মিক ঘটনার সূত্রে এমনভাবে একজন ফরোয়ার্ডকে রাতারাতি সুদক্ষ গোলরক্ষক হয়ে যেতে বড় একটা দেখা যায় না। সাধারণ হিসেবে এ পরিবর্তন নিয়মের বাইরেই। শুধু এ পরিবর্তন কারুর কারুর জীবনে আসে। আসে ভাগ্যের আশীর্বাদ হিসেবেই। নইলে গোল বদল না করলে সেদিনের সেই ফরোয়ার্ডটিকে কি ইতিহাস কোনো দিন শীল্ড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় দল মোহনবাগানের গোলরক্ষকরূপে আবিষ্কার করতে পারতো?

সার্থক নাম হীরালাল। হীরালালের কীর্তিকাহিনী সাচ্চা হীরার মতোই ঝকঝকে। যে দেখেছে সেই মজেছে; সাচ্চা হীরার যথার্থ মূল্যায়নে তার কোনো ভুল হয়নি। সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল হীরালালের মূলধন। সঙ্গে দোসর ছিল [illegible] সামর্থ্য। কতোবড় গোলরক্ষক যে তিনি ছিলেন তার হদিশ জানতে হলে আজ আমাদের সেই পুরোনো দিনে, ১৯১১ সালের শীল্ড খেলার বিবরণে ফিরে যেতে হয়।

সেবার আই এফ এ শীল্ডে মোহনবাগান খেলেছিল পাঁচটি দলের বিপক্ষে ছটি ম্যাচ। আর ছটি খেলায় মোহনবাগানের বিপক্ষে গোল হয়েছিল মাত্র দুটি। তার মধ্যে একটি আবার পেনাল্টি কিক থেকে। বাকীটি পেনাল্টি সীমানার ঠিক বাইরের এক ফ্রি-কিকে।

ছটি খেলায় মাত্র দুটি গোল—এর সব কৃতিত্ব একমাত্র দলের গোলরক্ষকের নয়। তবে সে কৃতিত্বের তিনিই যে সবচেয়ে বড় ভাগীদার সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। তাছাড়া সেবার একটি ম্যাচে একা হীরালাল মুখার্জি দু-দুটি পেনাল্টি কিকও আটকে দিয়েছিলেন।

তাঁর আমলে মোহনবাগান ট্রেডস কাপ, লক্ষ্মীবিলাস শীল্ড, গ্ল্যাডস্টোন কাপ, আসানুল্লা কাপ পেয়েছে। আর পেয়েছে আই এফ এ শীল্ড, প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে। শীল্ড ফাইনাল খেলার কথা হীরালালবাবুর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে ছিল। মনে রাখার মতো কথা বটে। তাই সে কথা আজও অনেকের মনে জ্বল জ্বল করছে।

কিন্তু আর একদিনের কথা তিনি ভুলে যেতে চান নি। সে কাহিনী লক্ষ্মীবিলাস শীল্ড ফাইনালের।

'কি বিপদেই পড়েছিলাম সেদিন!' হীরালালবাবু বল্লেন,

'গোরাদের তখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। সেই গোরা দলের দুর্ধর্ষ প্রতিনিধি গর্ডন হাইল্যান্ডারসকে আমরা কিনা হারিয়ে দিলাম! আর যাব কোথায়! যেই না খেলা শেষ অমনি গোরা সমর্থকেরা মুখ লাল করে আমাদের তেড়ে এলো। আমরাও দে ছুট্! খেলার মাঠ গঙ্গার ধারে কেল্লা অঞ্চল থেকে এক দৌড়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড়। ট্রফিটি রইলো মাঠেই পড়ে। পুরস্কার বিতরণী সভা আর হোলো না। তারপর চৌরঙ্গীতে একটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে জানালা কপাট এঁটে বাড়ী ফিরি। সাহেবী আমলে কি কাণ্ডই না আমাদের সইতে হয়েছে!'

হীরালালবাবুর ফুটবলে হাতেখড়ি হয় তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে। উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে [illegible] সেন ও আরও কজনের চেষ্টায় মদনমোহন স্পোর্টিং প্রতিষ্ঠিত হলে সেই ক্লাবেই হীরালালের ফুটবল শুরু হয়।

তার বছর দুয়েকের মধ্যেই স্কুলের পড়ুয়া হীরালাল হাওড়া স্পোর্টিংয়ের মহিম দত্তের নজরে পড়ে। হীরালালবাবুর মতে, এই মহিম দত্ত ছিলেন একাধারে বিচক্ষণ শিক্ষক এবং সুদক্ষ খেলোয়াড়। হীরালালের [illegible] মহিম দত্তই তাঁকে খেলোয়াড় হিসেবে গড়েছেন।

কথায় কথায় হীরালালবাবু সেকালের অনেক গোলরক্ষকের কথা আমায় শুনিয়েছিলেন। ক্যালকাটার আর্মস্ট্রং ও [illegible], ই বি আরের [illegible], ইস্টইয়র্কের ক্রেস ও পিগট। 'আহা! কি খেলাই খেলতেন এই পিগট।' হীরালাল উচ্ছ্বসিত হয়ে [illegible]—যেমন জোয়ান চেহারা আর তেমনি [illegible] মতো খেলা তার! মনে হোতো একা পিগট [illegible] মানুষের কাজ করছেন।'

আরও একজনকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন হীরালাল মুখার্জি। সেজন হলেন শিবদাস ভাদুড়ী।

বলেন, 'শিবদাস একজনই হয়েছে। ভবিষ্যতেও দ্বিতীয় শিবদাসকে দেখতে পাওয়ার আশা আমি রাখি না। সহজাত প্রতিভা নিয়ে সে এসেছিল। ফুটবল যে এদেশে খেলা হচ্ছে তা একমাত্র ওই শিবদাসেরই [illegible]। শিবদাস না থাকলে ১৯১১ সালে ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লেখা হোতো না। আর সে ইতিহাসকে অনুসরণ করায় উত্তরকাল প্রেরণা পেতো কিনা সন্দেহ।'

লোকে শিবদাসকে বলতো যাদুকর। হীরালালের মতে কথাটা খাঁটি। একেবারেই বাড়াবাড়ি নেই তাতে:

'কাঠির মতো সরু দুখানা পা নাচাতে নাচাতে কলের পুতুলের মতো শিবদাস ছুটতো। বিপক্ষের রক্ষণব্যূহ ফর্দাফাই করে দিতো। কি করে যে কঠিন কোণ থেকে সে গোল করতো, মাটিতে পড়ার মুহূর্তে সমস্ত শরীর [illegible] আটুট রাখতে পারতো তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারিনি!'

শিবদাসের লিকলিকে দুখানি পায়ে মাংস বলতে কিছুই ছিল না, যেন হাড়সর্বস্ব। কিন্তু

(শেষাংশ পর পৃষ্ঠায়)

যাঁরা ক্রিকেট খেলেন বা ক্রিকেট খেলা দেখতে ভালবাসেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, একজন ব্যাটসম্যান নব্বই-এর ঘরে রাণ করলে কি উৎকণ্ঠা উপস্থিত হয় ব্যাটসম্যান আর দর্শকদের মধ্যে। সেঞ্চুরী হবে, না হবেনা.....? সেই উত্তেজনার ভাব থাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত যতক্ষণ না সেই ব্যাটসম্যান শতরাণ পূর্ণ করছেন। তারপর সেই উত্তেজনা আর মনের আবেগ ভেঙ্গে পড়ে তুমুল হর্ষধ্বনি আর আনন্দের মধ্যে। কিন্তু সেই ব্যাটসম্যান শতরাণ পূর্ণ করবার আগেই যদি আউট হয়ে যান, তাহলে নেমে আসে বিষাদের ছায়া, দর্শকরা ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকেন তারপর ভারাক্রান্ত মনে অভিনন্দন জানান বিদায়ী ব্যাটসম্যানকে।

মনে পড়ে পঙ্কজ রায়ের সেই দিল্লী টেস্টের কথা; আর এক রাণ করলেই সেঞ্চুরী হয়। ক্রাইন বল করছেন, পঙ্কজ রায় আস্তে খেললেন, রেনড ঝাঁপিয়ে পড়লেন ব্যাটের ডগায়। দর্শকদের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে রইল, কিন্তু না, রেনড ক্যাচটা ধরতে পারেন নি, যাক্ ফাঁড়াটা কেটে গেল তাহলে। কিন্তু ওকি আবার সেই রেনডের হাতেই ক্যাচ। এবার আর কোন ভুল নেই। পঙ্কজ রায় আউট হলেন ৯৯-এর মাথায়!

১৯৫৯ সালে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দলের ফাস্ট বোলার হল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মনে ভীতির সঞ্চার করেছেন। দিল্লী টেস্টে প্রথম ইনিংসে বোরদে সেঞ্চুরী করলেন, দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি করেছেন ৯৬ রাণ। শেষ দিনের শেষ ওভার বল করছেন হল, বোরদে কি পারবেন দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরী করতে? আর তো ৪ রাণ বাকী—একটা বাউণ্ডারী মাত্র। কিন্তু হায় হিট উইকেট হয়ে ফিরে এলেন!

১৯০১—২ সালের সফরে অষ্ট্রেলিয়ার ক্লেম হিল ৯৯ রাণে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে আউট হলেন বার্ণসের বলে উইকেটকীপার লিলির হাতে ক্যাচ আউট হয়ে। পরবর্তী টেস্টে তিনি প্রথম ইনিংসে আউট হলেন ৯৮ আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৯৭ রাণে। পর পর তিনটি ইনিংসে হিল সেঞ্চুরী করতে বঞ্চিত হন ১, ২ আর ৩ রাণের জন্য। পঞ্চম টেস্টেও তিনি করেছিলেন ৮৭ রাণ

ক্লেম হিল তো তবু টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরী করেছেন ৭টি, কিন্তু আরেকজন অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় চিপারফিল্ডের কথা ভাবুন। তিনি ইংলণ্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টে মধ্যাহ্নভোজের আগে করলেন ৯৯ রাণ, আর বিরতির পর ফারনেসের প্রথম বলেই উইকেটকীপার এমসের হাতে ক্যাচ আউট হয়ে গেলেন। এই চিপারফিল্ড কোন টেস্টেই সেঞ্চুরী করতে পারেননি, তবে সান্ত্বনা যে, অনেকেই ত সেঞ্চুরী করেছেন কিন্তু ৯৯ রাণ করে আউট হয়েছেন কজন? এপ্রসঙ্গে একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি হলেন ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক নরম্যান ইয়ার্ডলে। তিনি ১৯৪৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে আউট হয়েছিলেন ৯৯ রাণে, তিনিও কোন টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। চিপারফিল্ড আর একটি রেকর্ড থেকেও বঞ্চিত হন, তা হল মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই সেঞ্চুরী। কেবল ব্রাডম্যান, ম্যাকার্টনী ও ট্রাম্পারই এই কৃতিত্বের অধিকারী।

চিপারফিল্ড আর ইয়ার্ডলের মত আর একজন খেলোয়াড় টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরী করেননি, আউট হয়েছেন ৯৮ রাণে। তিনি হলেন ইংলণ্ডের বিখ্যাত ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউড। ১৯৩২—৩৩ সালে যখন 'বডি লাইন' নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ায় তুমুল হট্টগোল হচ্ছে, তখন তিনি সিডনি টেস্টে আউট হন ৯৮ রাণে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এই যে, তাঁর ক্যাচটি ধরেছিলেন স্পিনবোলার আয়রণমঙ্গার, যিনি ফিল্ডিং-এ খুবই দুর্বল ছিলেন, ক্যাচ ধরতে পারতেন না বলে তাঁর দুর্নাম ছিল। কিন্তু লারউডের এই বিশেষ ক্যাচটি তিনি ফস্কাননি। 'বডিলাইনের' জন্য লারউডের বিপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার দর্শকরা খুব ক্ষেপে থাকলেও ঐ দিন আউট হয়ে ফিরে আসার সময় দর্শকরা তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান।

অষ্ট্রেলিয়ার নাটা ওপনিং ব্যাটসম্যান আর্থার মরিস ১৯৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আউট হয়েছিলেন ৯৯ রাণে, রাণ আউট। তিনি ও হার্ভে ব্যাট করছিলেন সেই সময়ে নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য একটি রাণ নিতে গিয়ে দুজনেই একই দিকে চলে আসেন। বলটি তখন চলে এসেছে বোলারের হাতে। তিনি উইকেট ভাঙতে উদ্যত, দুজনেরই মধ্যে একজনকে আউট হতেই হবে, মরিস হার্ভেকে দাঁড়াতে বলে নিজেই দৌড়ে গেলেন অপর দিকে। মরিসের সেই খেলোয়াড়োচিত মনোভাব অকুণ্ঠচিত্তে সকলেরই প্রশংসা পাবার যোগ্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে হার্ভে সেই ইনিংসে ২০৫ রাণ করেছিলেন।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক ওরেল ইংলণ্ডের বিপক্ষে তাঁর প্রথম টেস্ট খেলায় ৯৭ রাণ করার পর একটা ঝুঁকি নিয়ে মারতে গিয়ে আউট হন, তিনি এভাবে আউট হতে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু ওরেল বললেন, চিন্তা নেই আমি পরের ম্যাচেই সেঞ্চুরী করবো। তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন, পরের টেস্টে তিনি করেছিলেন ১৩১ রাণ

ইংলণ্ডের বিখ্যাত অলরাউণ্ডার এফ এস জ্যাকসন (যিনি বাংলার গভর্নর হয়ে এসেছিলেন) ১৮৯৩ সালে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলেন অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, তাঁর বাবা তাঁকে বলেছিলেন প্রতি রাণের জন্য তাঁকে একটি করে টাকা দেবেন, জ্যাকসন করেছিলেন ৯১ রাণ।

শোনা যায় যে, ডবলুউ জি গ্রেস একবার ৯৯ রাণ করে ইচ্ছে করে আউট হয়ে ফিরে আসেন। কারণ তিনি শূন্য থেকে ১০০ পর্যন্ত সব রাণই করেছিলেন কেবল ঐ ৯৯ রাণ ছাড়া।

তবে হ্যাঁ, একজন কিন্তু কোনদিনই নব্বই এর ঘরে আউট হননি। তিনি হলেন অবিস্মরণীয় স্যর ডোনাল্ড ব্রাডম্যান।

সাচ্চা হীরা

(পূর্ব পৃষ্ঠার শেষাংশ)

সে হাড় যেন দধীচির অস্থি। ঐ দিয়েই তেনি খেলাতে পারতো!"

খাঁটি কথা। তবু বলি, হীরালাল সরকার আমাদের ফুটবলের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন শুধু তাঁর ক্রীড়াকুশলতার পরিচয়ে।

ভারী আমুদে মানুষ ছিলেন তিনি। বেশ নির্ভেজাল স্পষ্ট বক্তা। গত বছর, ১৯৬২ সালে ১৬ই ডিসেম্বর ঊনসত্তর বছর বয়সে হীরালাল যখন আমাদের ছেড়ে গেলেন চিরদিনের মতো তখন বাংলা দেশের ক্রীড়ামহল অপূরণীয় বিয়োগ ব্যথায় কেঁদে উঠেছিল।

সে কান্না তো শুধু তাঁর ক্রীড়া দক্ষতার প্রতি কৃতজ্ঞতা, বোধেরই পরিচায়ক নয়। বাঁধন আরো ছিল। সামাজিক চরিত্রগুণেই তিনি আমাদের আপন করে রেখে গিয়েছেন যে!

চলবে না, চলবে না—

রামকিঙ্কর সিংহ

রামরাজত্বের পলিটিক্যাল সাফারার

শশাঙ্কশেখর দত্ত

নারানের গায়ে এত জোর হৃদয় জানত না

(৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

জমিদার নিলেম করে নিয়েছে।

হৃদয়ের এখনো বড় হয়েছে। জমিদারের সঙ্গে তার কোন আদবার কোন দিন করতে হয়নি। তবু উনিশশো পঁচিশ সাল—এই সময়ের জল বাতাস থেকে জমিদার বিরূপতা তার মনে বুকে বাসা বেঁধে বসে আছে সেটা সে জানতে পারেনি, আজ প্রথম জানলে।

হৃদয়ের উপর রাগ হল। প্রথম রাগ মাসীকে আর ওই মেয়েটিকে পালিগঞ্জের জন্যে। দ্বিতীয় তার জমি হৃদয় নিলেম করিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্ন যেন উঠে গেল। রাগ হল নিজের উপর। সে মূর্খ—সে বোকা—সে গর্দভ। নিলেম হয়ে গেলে জমির ধান সেই সমান আসছে কেন? বোকা মূর্খ না হলে এতদিন ধান আনবার সময় সে যখন যেতে চেয়েছে ঘাট বলরামপুরে তখনই হৃদয় বারণ করেছে তা সে শুনেছে কেন?

—নারান।

মাসী নিচে থেকে নেমে এসে ডেকেছিল—নারান।

নারান বারান্দায় শোয় নি। ঘরে লক্ষ্মীর সঙ্গে ঝগড়া করছিল হৃদয়। লক্ষ্মী বারবার জিজ্ঞাসা করছিল—সত্যি? জমি নিলেম হয়েছে?

দু একবার জবাব দিয়েছিল হৃদয়। তারপর আর দেয় নি।

—বল সত্যি?

—জানি না। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস নে, ঘুমুতে দে।

নারান উঠে গিয়ে বাড়ীর বাইরে গাড়ীর ওপর শুয়েছিল। মাসীর ডাকে উঠে এসে বলেছিল—ডাকছ মাসী?

—হাঁ বাবা! খুব ভোরে একটা বাস ছাড়ে বলছিলি—সেটাই আমাকে ধরিয়ে দিয়ে আয়! আমরা বরং ওখানেই বসে থাকব। নিরুতো কাঁদছেই কাঁদছেই। আমার প্রাণটাও ছাড় ছাড় করছে।

হাঁপাচ্ছিল মাসী। হাঁপানী উঠেছিল।

নারান বলেছিল—চল মাসী। তাই চল। তারও খুব অস্বস্তি লাগছিল।

রামের গাড়ী। হৃদয়ের নয়। হৃদয়ের গরু দুটো বুড়ো এবং রোগা বলে নারান পছন্দ

সংকেত

করে না। প্রাণপণে সেবা করে, চরিয়েও ও দুটোকে শক্ত সবল করা যায় নি। চাষের সময় ওতে চাষ চলত হৃদয়ের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। হাজার বলেও হৃদয়কে নতুন তাজা কাঁচা বয়সের গরু কেউ কেনাতে পারে নি। তাই মাসীকে আনবার জন্যে রামের মোষের গাড়ী চেয়ে নিয়েছিল। তার নিজের মাসী তো! রামের ঘরে গিয়ে রামকে ডেকে বলে মোষ দুটো নিয়ে এসেছিল নারান। তারপর ডেকেছিল—মাসী, গাড়ী তৈরী! এস।

সর্বাগ্রে নেমে এসেছিল নিরু। তার হাতে স্যুটকেসটা। মাসীর হাতে আসবার সময় ছিল মিহিদানার হাঁড়ী। এবার ওষুধের পোঁটলা। আশীর্বাদী।

নিচের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মাসী ডেকেছিল—লক্ষ্মী! ওরে আমরা যাচ্ছি। বাবা হৃদয়?

হৃদয় ওঠে নি। লক্ষ্মী দরজা খুলে বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

মাসী বলেছিল—আমি যাচ্ছি রে। তোরা যেন কিছু মনে করিস নে। জামাইকে বলিস। কেমন?

ঘাড় নেড়ে ইসারায় লক্ষ্মী জানিয়েছিল, বলবে। আঁচলের খুঁটে সে চোখও মুছেছিল।

এখানে গাড়ীর মুখের কাছে দাঁড়িয়েছিল নিরু। সে বলছিল নারানকে—নারানদা তুমি যে কি উপকার করলে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। কিন্তু এ কি দেশ তোমাদের! এক তোমাকে দেখলাম ভাল, তুমি ভারি ভাল। মূর্খ হও—ভাল তুমি। এখানে থেকো না তুমি। চলে যেয়ো। নইলে তুমিও এমনি হয়ে যাবে।

নারান জবাব দিতে পারে নি। সে চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল। নইলে বলত—মন্দই শুধু নাই নিরু। ভালও আছে। হৃদয় জামাই দু চারজনই থাকে।

—আর এক গ্লাস জল খাব। বড় গ্লাসে। একটু জল দে। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। বললে নারান।

দেখলাম নারান বদলে গেছে। মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। চোখের কোটর হতে রক্তের ঢেলার মত চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। হাত দুটো মুঠোয় আবদ্ধ।

ডাকলাম—নারান!

মুখ তুলে সে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে—ভুল বলেছিলাম। মানুষের চেয়ে খুনি—মানুষের চেয়ে হিংস্র—ভয়ংকর কেউ নেই। সাপও নয় বাঘও নয়। আমার মধ্যে—আপনার মধ্যে সবার মধ্যে আছে। পরাধীনতা স্বাধীনতা—কিছুতেই প্রকৃতি বদলায় না। বদলায়নি। বৃথা হয়ে গেছে। গান্ধী বৃথা নেতাজী বৃথা—সব বৃথা। পণ্ড। মিথ্যে শান্তি মিথ্যে। সত্য ওসব বোকার কাছে। মূর্খের কাছে। যতদিন বোকা মূর্খ ছিলাম—।

ধীরেন জল আনলে। বললে—জল!

সে জলের ঘটিটা নিয়ে সবাগ্রে—মাথায় ঢাললে খানিকটা! মুখে চোখে দিলে। তারপর ঘটি তুলে আলগোছে—জল খেয়ে—ঘটিটা

রেখে বললে—সব বিশ্বাস টুটে গিয়েছে আমার। ওঃ। কুটিল কুৎসিত বীভৎস পৃথিবী। ভয়ংকর পৃথিবী। আমি ভুল বলেছিলাম—নিরুকে সেদিন। আমি গড়তে চেয়েছিলাম—ভাল মানুষ—ভাল দেশ। কিন্তু সব মিথ্যে হয়ে গেল। সব! অভিসম্পাতে কিছু হয় না। তবু আরতো কোন অস্ত্র নেই আমার।

বললাম—চুপ কর। শান্ত হও!

সে বললে—শান্ত! অক্ষমের শান্ত হওয়া ছাড়া উপায় কি? হাসলে!

উঠে পড়ল সে। পাক কয়েক পায়চারী ক'রে ফিরে এসে বসল। তারপর বললে—সেই নম্র মৃদু শান্ত কন্ঠ। বললে—মধ্যে মধ্যে হয়! তারপর শুনুন।

* * *

সমস্ত পৃথিবীই এমনি। তবে আমার দেশের তুলনা নেই। কারও বুক অক্ষত নেই। দগদগ করছে ক্ষত। আর একদল মানুষ অর্থ আর প্রতিপত্তির জোরে—কলিজায় দাঁত বসিয়ে চুষে খাচ্ছে। ছিঁড়ে খাচ্ছে। সম্পদকে লক্ষ্মী কে বলে জানি না। সেই সেই সব করায়।

হৃদয় জামাই—হয় তো এতটা অমানুষ পশু ছিল না। হল আমার সম্পত্তির স্বাদ পেয়ে। আমার জমির ধান তাকে লোভালে। প্রলুব্ধ করলে।

আপনার বন্ধুর দুইপুরুষের—নটু মোক্তারের প্রথম বড়লোক হয়ে অমানুষ হওয়াটা সত্য! কিন্তু আবার মানুষ হওয়া, সে মরণের সময়েও—সত্যি নয়।

যাক!

মাসীকে বাসে তুলে দিলাম। মাসী যাবার সময় বললে—নারান তুই একটু লেখাপড়া শেখরে! সংসারে বাঁচতে হবে। বুঝতে হবে। অন্তত কিছুটা শেখ।

নিরু বললে—তুমি এখানে থেকো না নারান দা! চলে যেয়ো। লেখাপড়া শিখো! আচ্ছা—তোমার লজ্জা করে না—ওই বাড়ীতে থাকতে ওই জল্লাদের সঙ্গে বেড়াতে মিশতে?

মাসী ধমক দিলে—নিরু!

—নারান দা মন্দ কিছু করেনি। ওকে ভাল লাগল বলেই বলছি খুড়ীমা!

নারান কিছু বলেনি। বাসে ওদের [illegible] দিয়ে ফিরে—জল্লাদের বাড়ীতে গাড়ী রেখে—মোষ জোড়াটাকে—বেঁধে—খড় কেটে দিচ্ছে—এমন সময়—সে চীৎকার শুনতে পেলে। হৃদয় চেঁচাচ্ছে—হারামজাদী—জুতোর বাড়িতে তোর মুখ আমি ভেঙে দেব।—

লক্ষ্মীকে বকছে। লক্ষ্মীর কথা শুনতে পেলে না। হৃদয়ের কথা শুনতে পেলে—এই নে—এই নে—এই নে!

এবার দিদি চীৎকার করে উঠল। [illegible] কাস্তেখানা ফেলে দিয়ে সে ছুটে গেল [illegible] দিকে। সামনেই দাওয়ার উপর দিদি পড়ে [illegible] কাত হয়ে—আর হৃদয় তার জুতো [illegible] তাকে আতালি পাতালি পিটুচ্ছে। [illegible] আস্ফালন করছে—ধর্ম শেখাও তুমি [illegible] ধর্ম শেখাও!

আবার সে জুতো তুললে।

অকস্মাৎ কি হয়ে গেল বাবু, [illegible] হ্যাঁ কি হয়ে গেল। দিদিকে তার প্রথম [illegible] হয়, প্রথম গাল দেয়নি, অনেক [illegible] দেখেছে—কিন্তু আজ তার কি [illegible] —এ-ই—! বলে সে একটা চীৎকার করে উঠল—

তার নিজের কাছেও এমন চীৎকার [illegible] মনে হল। নিজেই চমকে উঠল। হৃদয় [illegible] ঘুরে তাকে দেখে—ওই জুতোটা হাতে [illegible] ঝাপ দিয়ে পড়ল উঠোনে—মারবে সে নারানকে [illegible] মুখে সেও চীৎকার করছিল—[illegible] শুয়ার কি বাচ্চা—আমাকে—

কথা তার শেষ হল না—নারান তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চোদ্দ বছরের নারানের [illegible] এত জোর—হৃদয় জানত না—নারানও জানত না। তার ধাক্কায় হৃদয় আছাড় খেয়ে পড়ে গেল উঠোনে চিৎ হয়ে। নারান তার [illegible] কপালে—ঘুষি কিল মেরে—উঠে দাঁড়াল। লক্ষ্মী তখন উঠেছে—অর্ধ উলঙ্গ সে। চীৎকার করছে—ওরে শুয়রে। ওরে দোষমন রে! ওরে শয়তান রে। ছাড়—ছাড়-ছাড়। মরে যা। মরে যা। [illegible] যা তুই! মরে যা!

নারানের জীবনে রাগ বোধ হয় সেই প্রথম। রাগেরও বেশী কম আছে বাবু। আগে [illegible] হয়েছে আবার তখনই পড়ে এসেছে। [illegible] পরেই হেসেছে—ভুলেছে। তখন পর্যন্ত [illegible] নারান ছেলেমানুষ ছিল। ছেলেমানুষ [illegible] ভুলবার ক্ষমতা থাকে—সেটাই হ'ল মানুষের খেলার বয়েসের ভাব। পরমহংস দেবের একটা গান আছে 'মা আমারে দয়া ক'রে শিশুর মত করে রেখো'!

নারানের সেই দিন শৈশব ঘুচল। সব পাল্টে গেল। আগের কাল হলে দিদির পায়ে পড়ত—জামাই দার পা ধরে কাঁদত। জামাই দা মারত—সে মুখ বুঁজে সয়ে যেত। মারা শেষ হলে —দাঁতে দাঁত টিপে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে —সয়ে নেওয়াটা পুরোমাত্রায় হয়ে গেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বলত—বাবা

বাঁচলাম! কিন্তু সেদিন আর তা' হল না। রাগ হয়ে কিছুতেই পড়ল না। সে দিদিকে বলেছিল—আমি মরব আর তুমি বেঁচে থাকবে। সুখ করবে! তার থেকে তুমি মর! আমি সহজে মরব না। ওই হৃদয় মরুক।

প্রচণ্ড ক্রোধ—কিন্তু তার মধ্যেও খোকার নাম সে বলতে পারেনি।

দিদি বলেছিল— বেরিয়ে যা—তুই বেরিয়ে যা। এখুনি বেরিয়ে যা। সে তখন হৃদয়কে ধরে তুলছে। হৃদয় উঠে বসে মাথাটা ধরে বলছে—জল, মাথায় জল!

দিদি বলেছিল—জল আন!

সে বলেছিল—না। পারব না।

দিদি পাগলের মত উঠে—আগে ছুটে এসে—তার গালে—মেরেছিল—একচড়। তারপর বলেছিল—চলে যা—তুই চলে যা। বলতে বলতেই জল আনতে ছুটেছিল। জল এনে স্বামীর মাথায় ঢেলে—মুখে চোখে ছিটে দিয়ে বলেছিল—আর দোব!

না!—আমাকে ধর! লক্ষ্মীর হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল তার দিকে। নারান সে [illegible] সম্মুখে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। [illegible] হয়ে উঠেছিল। ঘৃণার ক্রোধের-হিংসার [illegible] অন্ত ছিল না—মনে-দৃষ্টিতে-দেহের [illegible] সবকিছুতে।

ভয় পেয়েছিল হৃদয়। কিম্বা চতুর হৃদয় [illegible] যেমন [illegible] বিচার করে অঙ্ক কষে [illegible] সেইভাবে [illegible] কে আবিষ্কার করেছিল [illegible] তাড়ানো—তার হাত থেকে নিষ্কৃতি [illegible]। বুদ্ধিমান—খুব বুদ্ধিমান হৃদয়। [illegible] হৃদয়—যাত্রাদলে শকুনির পার্ট [illegible]। শকুনিরা ভীম অর্জুনকে ভয় করে—[illegible] পড়ে না। শকুনি মরে সহদেবের [illegible]। সে বুঝেছিল—নারানকে সে চিনতে [illegible]।

[illegible]—একটা ফুলের মধ্যে একটা [illegible] দেখে [illegible] ভেবেছিলেন। [illegible] তক্ষক বলে চিনতে পারেননি।

হৃদয় চিনেছিল। সে জন্তু। চালাক জন্তু। [illegible] ঠিক বুঝতে পারে প্রতিপক্ষ মানুষ হলেও [illegible] ভয়ংকর। তারা পিছোয়। পিছোয় না—বাঘ। [illegible] শক্তি আছে আর দম্ভ আছে। সতর্ক সে [illegible]। কিন্তু সামনা সামনি হলে কি মুখের গ্রাস [illegible] নিয়ে নিলে—হাঁক দিয়ে—ডেকে সে আক্রমণ [illegible]।

বাঘ পরে দেখেছে, নারান তার সঙ্গে [illegible]। সেদিন হৃদয় চতুর জন্তুর মতো বুঝতে পেরেছিল—এই মানুষের বাচ্চাটা যখন রুখে দাঁড়িয়েছে তখন ওর চোখে বুকে সর্ব-[illegible] নেশা জেগেছে। মরতে ভয় ওর নেই। [illegible] ওকে হারানো যায় না। সুতরাং মরতে [illegible]।

দাওয়ায় শুয়ে—সে বলেছিল—ওর কি [illegible] দিয়ে দাও ও চলে যাক। এখুনি।

দিদি বলেছিল—তুই যদি এখুনি না যাস—[illegible] আমার রক্তে তুই পা ধুবি। তোর পায়ে মাথা ঠুকে—মাথা ফাটাব আমি।

নারান কোন উত্তর করেনি। বেরিয়ে [illegible] বাড়ী থেকে। শুধু বাড়ী থেকে নয়, [illegible] থেকে। রামদের পাড়া পর্যন্ত ঢোকেনি। [illegible] একখানা কাপড় আর গায়ে একটা গেঞ্জি [illegible]। মাথায় গামছাখানা বাঁধা ছিল—গাড়োয়ানদের মত। জামা ছিল তার একটা। সে পরত না জামা। গেঞ্জিও পরত না, পরেছিল কেবল মাসীর সঙ্গে গিয়েছিল বলে। ছাড়ার অবকাশ হয়নি। পায়ে ছিল হৃদয়ের পুরনো একজোড়া স্যাণ্ডেল। সেটা ফেলে দিয়েছিল খুলে, ছুঁড়ে। সঙ্গে কাপড়ের খুঁটে দশটা টাকা—বোধহয় তার ভাগ্যবিধাতা—আগে থেকে সংস্থান ক'রে দিয়েছিলেন।

সে বললে—বলতে ভুলেছি, নিরু যখন বলেছিল—তোমাদের এ-কি দেশ! দম বন্ধ হয়ে আসছিল আমার। এক দেখলাম তোমাকে ভাল। তুমি মূর্খ হলেও ভাল। এখানে থেকো না তুমি চলে যেয়ো—নইলে তুমিও শেষে এমনি হয়ে যাবে।

তারপরও ক'টা কথা হয়েছিল মাসীর সঙ্গে। মাসী বাসে উঠবার সময় তার পেটের আঁচলের খুঁট খুলে একখানা দশটাকার নোট বের ক'রে তাকে দিয়েছিলেন।—এটা রাখ বাবা নারান।

নারান আশ্চর্য হয়ে বলেছিল—এ যে দশ-টাকার নোট মাসী।

—তা হোক রে। তুই রাখ। নিজের কাছে রাখিস। কাউকে দিসনে। দিদিকেও না। সব বুঝতে পারছিরে তোর অবস্থা। তুই—, নিরু মিছে বলেনি—বাড়িয়ে বলেনি, বড় ভাল। ভাল-মানুষ বোকা হয়! রাখ।

—না মাসী।

—না নয়। ধর। তুই আমাদের নিয়ে গেছিস—কলেশনাথতলা নিয়ে গেছিস—নিয়ে এসেছিস—আবার নিয়ে এলি। গাড়ী ভাড়া লাগলে কত লাগত? নে—ধর!

পুতুলের মতই নিয়েছিল নারান।

জানেন?—মানুষ তো! বার কয়েক সে নোট-খানা দেখেছিল পথে। তারপর কাছার খুঁটে বেঁধেছিল। ইচ্ছে ছিল—মোষ বেঁধে রামের কাছে গচ্ছিত রেখে যাবে। নইলে সে জানত'—হৃদয়-জামাই ছাড়বে না—উলঙ্গ ক'রে তল্লাস করবে! মনে মনে হিসেবও করেছিল কিভাবে খরচ করবে টাকাটা। রামকে তিনটে টাকা দেবে। ওর গাড়ী নিয়েছিল। ওকে দিতে হবে। বাকীটা রেখে দেবে। সামনেই চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজনের মেলা। মেলা থেকে বীরেনকে একটা খেলনা কিনে এনে দেবে। বীরেন তার ভাগ্নে। দিদির ছেলে। বীরেন নাম নারানই রেখেছিল। বীরেন্দ্র নামটা ওর খুব ভাল লাগত। এসব ভাবতে ভাবতে এসে—মোষ বেঁধে খড় কাটতে গিয়ে—ভাবনার ছন্দ কেটে গিয়েছিল—হৃদয়ের ওই কুৎসিত গাল শুনে আর দিদির চীৎকার শুনে। রামকে ডেকে টাকাটা গচ্ছিত রাখা আর হয়নি।

ওই টাকাটার কথা মনে পড়েছিল। নদীর ঘাটে এসে। সঙ্গে সঙ্গে বুকে বল পেয়েছিল একটা। নেমে পড়েছিল নদীর ঘাটের বালিতে। আর ফিরে তাকায়নি। নদীর বালি—এক হাঁটু জল পার হয়ে হন হন করে হাঁটতে সুরু করেছিল। এপারে এসে নদীর ধারে ওপার

[illegible] চেয়ে কতক্ষণ বসেছিল তার হিসেব ছিল [illegible]। বাসের হর্ণে তার চমক ভেঙেছিল।

বাস স্ট্যাণ্ডে তখন বাসখানা—পাঁচ মাইল দূরের স্টেশনে যাত্রী পৌঁছে দিয়ে যাত্রী নিয়ে [illegible] ফিরে এসেছে। ঘণ্টা দুয়েক পর আবার [illegible]। পাঁচ মাইলের চার মাইল বাসে গিয়ে [illegible] দিকে পথ ভাঙলে—তিন মাইল [illegible] মাঠের পথে—সবশুদ্ধ চার পাঁচ মাইল। [illegible] একটা স্টেশন গেলে—দু মাইল পথ! [illegible] বাসে উঠবে? না। দশ টাকার কিছু খরচ [illegible] না সে পথ হাঁটা বাঁচাবার জন্য। [illegible] বাস স্ট্যাণ্ডে সেই [illegible] নোটটা ভাঙিয়ে নিয়েছিল।

[illegible] আজও মনে আছে—একখানা পাঁচ [illegible] নোট নিয়েছিল। চারখানা এক টাকার [illegible]।

[illegible]

বিশ বছর দূর থেকে নিশানা দেয়। আমনে [illegible] আছে। [illegible] তাই চলেছিল।

একসময় দিগন্তহীন মাঠে দাঁড়িয়ে তাকে পড়েছিল—আকাশে হাজার হাজার পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে।

ছেলেবেলা দেখেছে এ পাখীওড়া। এতকাল [illegible]—৬ বছর পর নতুন লাগল! সুন্দর লাগল! মনে তাকালে সে। হাঁ—ওই দূরে জল চিক[illegible] করছে রৌদ্রের ছটায়। মধ্যে মধ্যে আলোর ঝিকিমিকি যেন এঁকে বেঁকে কেঁপে—ছুটে [illegible] যাচ্ছে। আবার একটা ঝিকিমিকিনি উঠছে—[illegible] ছুটছে। কোনটা পিছু পিছু। কোনটা [illegible]—কোনটা বাঁয়ে। বাতাসের খেলা সে [illegible] নারান খুব ভাল করে জানে। নদী মাটী—[illegible]—এদের সঙ্গে তার মিতালী কতকাল [illegible] দাঁড়িয়ে দেখছিল সে!

আকাশে মুঠো মুঠো অপরাজিতা আর সাদা [illegible] ছড়িয়ে দিয়েছে। ভেসে বেড়াচ্ছে।

পাখী। সাদাগুলো বড় হাঁস। কালোগুলো [illegible]—আরও অন্য জাতের। আশ্চর্য ভাল [লা]গল তার এই সমস্ত কিছুকে। এত পাখী ওখানে ছিল না। কত পাখী কত ডাক। কত জল। জলের মধ্যে আলো আকাশ। চারিপাশে মাঠ! আহাহা।

হঠাৎ একটা উচ্চ কঠিন শব্দে সে চমকে উঠল। শব্দটা ছুটে চলে যাচ্ছে চারিপাশে। দূরে দূরান্তরে। কিন্তু কিসের শব্দ। এমন এমন শব্দ শব্দে মন চমকে ওঠে। ও বন্দুক। ওঃ!

ওই যে আকাশ থেকে পড়ছে ওই পাখীগুলোর ঝাঁক থেকে—পাখী পড়ছে মাটির দিকে।

কে রে? ওঃ এই মানুষগুলো কি?—পাষণ্ড লোভী নিষ্ঠুর! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার ইচ্ছে হয়েছিল—এখানে সে থাকবে—আর এই পাখী কাউকে মারতে দেবে না। তারপর সে বিলের জলে নেমে স্নান করেছিল। গামছা পরে অনেকক্ষণ বসে থেকে কাপড়খানা শুকিয়ে নিয়ে আবার রওনা হয়েছিল গ্রামের দিকে।

নারান বললে—সেদিন সব পরিচয় জানা [illegible] নারানের! প্রতীক্ষা করেছিল। নারান গ্রামে এসে পৌঁছেছিল—বেলা তখন তিন প্রহর পার হয়েছে। একটা ট্রেনের শব্দ আসছিল দূরে [illegible]। খুব দূরে নয়, স্টেশনটা দু মাইল হলেও একটা লাইন আছে লাইনের সেটা এক মাইলের মধ্যে। সে ট্রেনটা আজও আছে। এই যেটাকে [illegible] ট্রেন বলে। যায় সাড়ে তিনটার সময়। [illegible] থেকে উঠে বাড়ী চিনতে তার ভুল হয়নি। [illegible] মাঝে ঘর আছে। দেওয়ালের মাথা [illegible] নিচেই অনেক জায়গায় ভেঙে গেছে। [illegible] নেই। জানালা নেই। উঠোনের চারিপাশে পাঁচিল নেই। উঠোনে জঙ্গল জন্মেছে। [illegible] [illegible] চারটের মধ্যে একটা নেই [illegible] একটা মটকে গেছে। ঘাস ঠেলে সে সেই [illegible] উঠে [illegible] দেওয়ালে [illegible] ঠেস দিয়ে বসল।

তার নিজের বাড়ী! মাসীকে আর [illegible] পড়েছিল। একখানা চিঠি লিখবে সে—[illegible] এসেছে। তোমাদের বাড়ী দেখেছে। [illegible] সে এসেছে! সত্যিই খুব ভাল লাগছে। [illegible] ভারি জল! খুব ভাল লাগছে। খুব ভাল জায়গা। সুন্দর বিল। সুন্দর মাঠ। সব সুন্দর!

(তিন)

[illegible]! নারান বললে—নিজের [illegible] মধ্যে ভালবাসা আছে। দেশটা সত্যিই [illegible] খুব সুন্দর। ওই বিলটা হল—ওই অঞ্চলের বুকের তক্তির মত! কালচে একটা ঝকমকে বড় পাথর বসানো তক্তির মত। হাঁসগুলো যখন বসে থাকে তখন মনে হয় কুচি কুচি সাদা কালো পাথর বসানো তার উপর। ছোট নদী। গাছপালা—হৃদয়ের দেশ থেকে কম। হৃদয়ের ওখানকার মাটি এখান থেকে ভাল। ওদের নদীতে কুমীর নাই। এখানে কুমীর আছে। আপনি বা অন্য লোকে কোন্ জায়গাকে ভাল বলবেন জানি না। কিন্তু নারানের মনে হল তার এই অঞ্চল ও অঞ্চল থেকে ভাল সুন্দর!

মানুষগুলিকেও খুব ভাল লাগল। খুব ভাল! প্রথম দিনই সে বসেছিল সেই দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, অনেক পথ হেঁটে ক্লান্তিতে একটু ঘুম এসেছিল। হঠাৎ কেউ ডেকেছিল—কে ওখানে বসে গো? শুনছ? ওহে!

সে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখেছিল—একজন পঁচিশ তিরিশ বছরের কালো জোয়ানকে। তার হাতে একটা হুঁকো। কাঁধে গামছা। বাড়ীর সামনে উঠোনের ওপাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে। সে বলেছিল—আমি! আমার নাম নারান।

—নারান? কোন্ নারান?

—নারান গোঁসাই। এ বাড়ী আমার। আমার বাবার—।

—তুমি গোঁসাই মহাশয়ের ছেলে?

—হাঁ!

—কি আশ্চর্য! এলে কখন গো? এ্যাঁ! তুমি তো কখনও এস না।

—আমি এসেছি। আমি এখানে থাকব।

—থাকবে কি গো? রাগ করে পালিয়ে এসেছ?

—আর আমি কখনও সেখানে যাব না।

একটু চুপ করে থেকে লোকটি বলেছিল—সে তো ভাল কথা! তা এখানে বসে কি করছ? খেয়েছ কিছু?

—খেয়েছি।

—না। মুখ শুকিয়ে রয়েছে তোমার। এস-এস উঠে এস আমার বাড়ীতে এস। আমরা মোড়লরা। তোমার বাবার যজমান। আমার নাম বিপিন মোড়ল। এস—এস ঘরে সাপ-খোপ-ইঁদুর-[illegible] বাসা হয়েছে। থাকলে আমরাই সব করে দেব। এখন আমার বাড়ীতে এস। কিছু খাও। বিপিন মোড়লের বাড়ীর মেয়েরা তাকে যত্নের [illegible] রাখে নাই। বিপিনের মা বলেছিল—আহা, কি সুন্দর চেহারা হয়েছে ঠাকুরের! [illegible] কেষ্ট বলতাম।

[illegible] দিয়েছিল চিঁড়ে, দুধ-গুড়, কলা।

বিপিনের বউ চিনি দিয়ে এসেছিল, শাশুড়ী [illegible]। নতুন গুড় উঠেছে [illegible] হাঁ বাবা গুড় খাবে না—চিনি খাবে?

নারান গুড় ভাল বাসে। বলেছিল গুড়ই ভাল!

—এই দেখ! বামুনের ছেলে। আগে বামুনেরা চিনি খেত না। বলত—মাগো, বমি বোধ লাগে!

বিপিন বলেছিল না [illegible] চিনিতে নয়।

—কে জানে বাবা। বলত তো! তারপর বলেছিল—তা ভাল হল তুমি এলে। ভিটেটা পড়ে কাঁদছিল। বুঝেছ। আমাদের ভাল হল পুরুত নাই গাঁয়ে। বামুনেরা সব ইস্কুলে পড়ছে। বুড়োদের দেমাক অনেক। তা হাঁ বাবা—পুজো আচ্চা জান তো?

মিথ্যে বলে নি নারান। বলেছিল না, জানি না। এখনও পৈতে হয় নাই।

পৈতে হয় নাই। হেই মা! লোপ [illegible] বেয়ুব করছে! ও বিপিন!

বিপিন বলেছিল—আমরা গাঁয়ে চাঁদা করে পৈতে দিয়ে দেব। এই [illegible] দিয়ে দেব।

খাওয়ার পর বিপিন বলেছিল চল। গাঁয়ে সব দেখা করে আসবে চল। [illegible] নিয়ে এসেছিল। [illegible] আহ্বান করেছিল। [illegible] কি।

বড় লোক [illegible] দিয়েছিল। [illegible] বুড়ো লোক [illegible]

বলেছিল তাই তো এলে, কিন্তু দেরী করে এলে যে! তোমার ভাগ্নিপতি যে সব একরকম শেষ করে দিয়েছে। তা যাক। বুঝলে বিপিন একটা কিছু তো করে দিতে হয়। রাঁধতে পারবে? জান রান্নার কাজ?

নারান একটু ধাক্কা খেয়েছিল। রান্না? রাঁধুনী বামুন?

মনে পড়েছিল নিরুকে! সে বলেছিল—না!

বিপিন বলেছিল পৈতেটা দিয়ে দেন সকালে মিলে। তারপর ওর বাবা আমাদের পুজো আচ্চা করত। তাই করবে।

বুড়ো রায় বলেছিল—পৈতে হয় নি? এ যে পাঁদা মিনষে হয়ে গেছে! তা দাও পৈতে। আমি কিছু দোব।

ওখান থেকে ভটচাজ বাড়ী গিয়েছিল। তার মনে পড়েছিল বিশুকে! বিশ্ববন্ধু। ছেলেবেলায় দুজনে খুব বন্ধু ছিল। বিশ্ববন্ধুকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। নতুন করে পরিচয়ের আগেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববন্ধু দাওয়ার উপর হ্যারিকেনের আলোয় ইংরিজী কবিতা পড়ছিল। সে দিন নারান একটা দুর্বোধ্য ভাষাই শুনেছিল—বুঝতে পারে নি।

বিশু বিপিনের কাছে তার পরিচয় শুনে বলেছিল—নারান। সেই নারান? তুমি নারান?

—হ্যাঁ। ফ্যাল ফ্যাল করে নারান তার পানে তাকিয়েছিল।

বিশু বলেছিল—বস।

—তুমি কি পড়?

—ক্লাস নাইনে পড়ি।

ক্লাস নাইন?

—তুমি?

—আমি তো পড়ি না।

—পড় না?

—না।

—সে কি? বড় হয়ে করবে কি?

নারান বলেছিল—চাষ করব। আমি চাষ করতে খুব ভাল পারি।

বিপিন বলেছিল—আর আমাদের পুরুতের কাজ টাজ করবে!

বিশ্ববন্ধু চুপ করে বসেছিল। বিশ্ববন্ধুর বাবা বেরিয়ে এসে খুব স্নেহ করে বলেছিল—বেশ করেছ। নিজের গাঁয়ে এসেছ খুব ভাল করেছ। থাক কোন ভাবনা নেই। সব হবে।

* * *

সংসারে দুখীরামদেরই হোক আর সুখীরাম-দেরই হোক—যা হয় তা নিজেরাই করে। সুখীরামরা সবের চেয়েও বেশী করে তাও নিজেরাই করে। দুখীরামদের অল্প যেটুকু হয়—তাও তারা নিজেরাই করে। যা হয় না তা কিছুটা বুদ্ধি দোষে হয় না—বাকীটা অন্যে হতে দেয় না। এটা নারান বুঝত না তখন কিন্তু অন্যের উপর ভরসাও সে করেনি। নিজেই করতে সুরু করেছিল, পরদিন সকালেই বিপিনকে বলেছিল—আমাকে একটা কোদাল আর একটা দা দেবে মোড়ল?

—কি করবে গো?

—উঠানটা পরিষ্কার করব।

হেসেছিল বিপিন। —তুমি পরিষ্কার করবে? পারবে?

—পারব, তুমি দাও!

—উ বেলায়। উ বেলায় আমি পাঁচজনকে জুটিয়ে নিয়ে করে দোব।

হেসে সে বলেছিল—আমি খানিকটা করি—

—তা বেশ নাও। কিন্তু সাবধানে। ওখানে দু চারটে সাপ খোপ থাকবে।

দু চারটে নয়, একটা গোখরো—দুটো চিতি একটা লাউডগা সে একবেলাতেই মেরেছিল। এবং ওবেলা হতে হতে প্রায় অর্ধেক সে পরিষ্কার করে ফেলেছিল। ঘাস পাতাগুলো ফেলেছিল একটা গর্তে, সার হবে, ছোট কয়েকটা গাছ ছিল আকড়ের আকন্দের সে গুলোকে কেটে আলাদা রেখেছিল শুকুলে জ্বালানি হবে।

সেদিন নেমন্তন্ন করেছিল বিশ্ববন্ধু। সে রাতে শুয়েছিল মোড়লের বাড়ীতে। সকালে যখন সে কাজে লেগেছে তখন বিশ্ববন্ধু নিজে এসেছিল নেমন্তন্ন করতে।

—নারান! তাকে দেখতে পায় নি—দেখতে পেলেও ঘাস পাতার ধুলোয় মাখা নারানকে চিনতে পারেনি। ভেবেছিল মজুর। নারান ডাক শুনে উঠে দাঁড়াতেই বিশ্ববন্ধু সবিস্ময়ে বলেছিল তুমি নিজে পরিষ্কার করছ?

—হ্যাঁ। সে হ্যাঁ অত্যন্ত সহজ সাদা একটি হ্যাঁ। না—তার মধ্যে পৌরুষের অহংকার না তার মধ্যে ক্ষীণমাত্র মজুরের কাজ করার লজ্জা!

—ওটা কি? সাপ! তখন প্রথম সাপটা মেরেছে নারান। ওতো লাউডগা! চোখ খেয়ে নেয়।

—হ্যাঁ একটা লাউডগা। আকন্দ গাছটায় জড়িয়েছিল। চোখ খায় না। মিছে কথা। আমি মেরেছি আগে।

—কি করে মারলে? ওতো উড়ে যায়।

—এক ঢেলাতে। লাঠি মেরে মারা যায় ওগুলো। উড়ে যায় না—লাফায়। সড় করে লাফ দেয় এগাছ থেকে ওগাছে। মানুষ বলে ওর পাখা, না থাকলে উড়তে পারে?

তার আপাদমস্তক ভাল করে দেখে [illegible] মধ্যে বিস্ময়ের সীমা ছিল না। [illegible] উপর [illegible] নিয়ে বলেছিল মাসেলগুলো কি শক্ত [illegible] উঠেছে! তোমার গায়ে [illegible] জোর! [illegible]

এবার বেশ অপ্রস্তুত হয়ে গেছিল নারান।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—তুমি আমাদের বাড়ী যাবে আজ। মা বলেছে।

বেলা দুটো নাগাদ সে চান করে [illegible] গিয়েছিল। বিশ্ববন্ধুর বাড়ী ছিল [illegible] কোলাঘাটের দিকে [illegible] ইস্কুলে পড়া [illegible] বাবা। বিশ্ববন্ধুর বাবা এখন বেঁচে [illegible] ছিল। [illegible] আদর করে খাইয়ে [illegible] পুরনো কথা বলেছিল। [illegible] কথা [illegible] ছেলে বয়েসের কথা। তার মায়ের সঙ্গে [illegible] বন্ধুর মায়ের সই পাতানো ছিল। [illegible] তাকে সইমা বলে ডাকতে শিখিয়েছিল।

সই মা তার সঙ্গে এসে—বাড়ী [illegible] [illegible] হয়েছে—কেমন হয়েছে—দেখে [illegible] [illegible] দেখে অবাক হয়েছিল। শুধু তাই নয় [illegible] তখন দুটো মরা সাপের গোখরো পড়েছিল এক পাশে, তার সঙ্গে লাউডগাটা আর [illegible] চিৎ দেখে সভয়ে বলেছিল—তুমি মারলে

হেসে সে বলেছিল—হ্যাঁ।

—ওরে বাপরে!

তখনই বিপিন মাঠ থেকে কলাই কেটে গাড়ী নিয়ে ফিরছে। গাড়ীর উপর থেকেই সে উঠোনটা প্রায় অর্দ্ধেক পরিষ্কার হয়ে গেছে দেখে বলেছিল বলিহারি বলিহারি বলিহারি। ঠাকুর তো সামান্যি নয় মা ঠাকরুণ!

বিশ্ববন্ধুর মা বলেছিল হ্যাঁ বাবা। দুর্দ্ধর্ষ ছেলে!

* * *

গোঁসাই গল্প বলতে বলতে বন্ধ করে প্রশ্ন করেছিল আচ্ছা মানুষ দুর্দ্ধর্ষ হয়ে জন্মায় না দুর্দ্ধর্ষ হয়ে গড়ে উঠে বলতে পারেন?

একটু ভেবে আমি বলেছিলাম দুই-ই।

—হ্যাঁ। দুই-ই। দুর্দ্ধর্ষপনা নিয়ে সে না জন্মায় সে অবস্থা পাঁচকে খানিকটা দুর্দ্ধর্ষ হয় তার বেশী হয় না। কান্তকে কাম নিয়ে জন্মায়, লোভী লোভ নিয়ে জন্মায়, সাপের বিষ নিয়ে জন্মানোর মত।

নারানের কাম ছিল না ক্রোধ ছিল না একটা কি ছিল। শুধু একটা হৈ হৈ করে ... এমন একটা কিছু ছিল তার মধ্যে। কোথাও একটু গোলমাল হলেই ছুটে যেত। ভিড় জমলো—ঠেলে ঠুলে ফোঁস—ফোঁস নাক ঢুকে পড়ত। সকলের আগে গিয়ে দাঁড়ানো এমনি একটা কিছু ছিল।

বাহাদুরি দেখানোর একটা সখ ছিল। কাপুরুষতা থেকে হয়েছিল না। কাপুরুষতা নারানের ছিল না।

হ্যাঁ, দুঃখীরামরা কাঙাল হয়, সুখীদের দেখে ঐশ্বর্য দেখে ভীতুও একটু হয় তাদের প্রভাব দেখে। নারান দুঃখীরাম হলেও ও দুটোর একটাও তার মধ্যে ছিল না।

তারপর হেসে গোঁসাই বলেছিল—যাক সে। কি হবে সে হিসেব করে? নারানের হিসেব ছিল না—এইটেই নারানের হিসেব।

দুদিন পর। ঠিক দুদিন পর।

নারানের উঠোনটা পরিষ্কার হয়ে গেছে—সে মাটি কেটে জল দিয়ে কাদা করে পায়ে পায়ে হাটছে তার সঙ্গে খেনোঘাসের কুচি মিশিয়ে দিচ্ছে। এবার সে ঘরের ভাঙা ভাঙা জায়গাগুলিতে মাটি ধরাবে। যেসব জায়গা একেবারে ছেড়ে ভেঙে পড়েছে, সে সব জায়গা বেশ ভাল করে ভেঙে আবার দেওয়াল দেবে। এমন সময় একটা গোলমাল উঠল। —গেল—গেল—গেল! তার সঙ্গে হেই হেই—হেই শব্দ।

ছুটে গেল নারান। গ্রামে বেটাছেলে—চাষীরা নেই; আছে ভদ্রলোকেরা—আর দু চারজন বুড়ো আর নারানের মত অল্পবয়সী চাষীর ছেলে। গিয়ে নারান দেখে একটা ষাঁড় একটা গলির মুখে দাঁড়িয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর শিঙ নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে। গলিটা দুই বাড়ীর মধ্যে পানিপাতনের গলি—আর ও মুখটা পাঁচীর দিয়ে বন্ধ। গলির ভিতর দুটি বউ ষাঁড়টার তাড়া খেয়ে ছুটে ঢুকেছে, খেয়াল হয়নি যে ওমুখ বন্ধ। ষাঁড়টা রায়বাবুদের কার শ্রাদ্ধের ধর্ম্মের ষাঁড়; অত্যন্ত বদমেজাজী—যেমন প্রকাণ্ড শরীর তেমনি দুখানা শিঙ। এর

এবারে ষাঁড়টা পিছু হটল

আগে একটা ষাঁড়কে যুদ্ধ করে প্রায় মেরে ফেলেছে। এক চাষীর একটা বলদ সত্যিই মেরেছে। যখন লেজ উঁচু করে রাস্তা দিয়ে ছোটে তখন দশ বারোজন লাঠি নিয়ে না দাঁড়ালে রোখা যায় না। তখন তারা মারতে মারতে গ্রাম ছাড়া করে দিয়ে আসে। থাকে সে ওই বিলের ধারে মাঠে, ওখানেই প্রচুর ঘাস এবং ফসল খেয়ে বাজার মত ঘোরে; গ্রামের গরু চরাতে গেলে তাদের মধ্যে ঘোরে। মধ্যে মধ্যে এক একটি গাভী তার সঙ্গিনী হয়—তখন তাকে আর বাড়ী আনে না চাষীরা, আনলে ওই বৃষরাজ তার সঙ্গে আসবে। কয়েক দিন মাঠে থেকে গাইটি একদিন আপনিই ফেরে। ষাঁড়টা তখন বিলের অন্য দিকে চলে যায়। হুংকার ছাড়ে। কখনও কখনও ঢুকে পড়ে গ্রামে। সেদিন ওই রকম কি রকম করে গ্রামে ঢুকেছিল। যারা গ্রামে ঢোকা দেখেছিল—তারা তাড়া দিয়ে তাড়াতে চেয়েছিল—তাতে ফল হয়েছিল উল্টো। সে লেজ তুলে হুংকার ছেড়ে ছুটেছিল তাদের তাড়া করে। তারা পাশে সরে বেঁচেছে। কিন্তু সামনে পড়েছিল বউ দুটি। তারা ঢুকে পড়েছে এই বন্ধ গলিতে। ষাঁড়টা গলিতেই ঢুকতে গিয়েছিল—কিন্তু গলিটা এমন সংকীর্ণ হয়ে গেছে বলে সে কিছুটা ঢুকে আর ঢুকতে পারছে না। এদিকে ফেরও হবে না। কঠিন আক্রোশে আগলে দাঁড়িয়ে ক্ষুর দিয়ে মাটি খুঁড়ছে আর শিঙ নেড়ে ফোঁস ফোঁস করছে।

নানান গবেষণা চলছে। ওদিকে থেকে মই নামিয়ে মেয়েদের তুলতে গিয়েছিল—একটি মেয়ে পড়ে গিয়েছে। হৈ হৈ চলছে। পিছন থেকে এরা যত খোঁচাচ্ছে তত সে সামনে এগুতে চেষ্টা করছে। নারান এসে দেখেই হিসেব করলে না—নিরীক্ষণ করলে না। একবার দেখেই ছুটে বাড়ীর ভিতর গিয়ে এক আঁটি খড় নিয়ে বন্ধ মুখের পাঁচীল ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ল। তারপর তার কোঁচড় থেকে দেশলাই বের করে খানিকটা খড়ে আগুন ধরিয়ে সামনে এগুতে লাগল। এবার ষাঁড়টা পিছু হটলে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগল নারান। জ্বলন্ত খড়ে আরও খড় যোগান দিলে। ষাঁড়টা বোধ হয় এমন করে আগুনের সামনে কখনও পড়েনি। গলি থেকে বেরিয়েই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটল। পিছু পিছু নারান। এতক্ষণে পিছনের লোকেরাও যোগ দিল লাঠি নিয়ে। গোটা জনতার উল্লাসের সীমা ছিল না। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী উল্লাস হয়েছিল নারানের।

লোকে বলেছিল—আচ্ছা বুদ্ধি।

কেউ বলেছিল—ডাকাত ছেলে। কি সাহস!

বিশ্ববন্ধুর মা—সেদিন তাকে বলেছিল—এমন অসম সাহস করো না বাবা, কোন্ দিন বিপদ হবে।

নারান বলেছিল—না! অর্থাৎ হবে না।

সেই দিন সে খেয়ে দেয়ে গিয়েছিল হিরণ-হাটি। খাচ্ছিল ক'দিন বিশ্ববন্ধুর বাড়ীতে। বিশ্ববন্ধুর মায়ের সইয়ের ছেলে—তা ছাড়া তিনি এই বিচিত্র ছেলেটিকে দু তিন দিনেই ভাল বেসেছিলেন। সকাল থেকে ঘর মেরামত করছিল—তারপর ষাঁড় তাড়িয়ে আর কাজ হয়নি; অপরিমেয় উল্লাসে হেসেছে—নিজে হেসে তৃপ্ত হয়নি—অন্যদের সঙ্গে হেসেছে। তারপরই মনে হয়েছিল—সকাল সকাল স্নান করে খেয়ে—ও বেলায় সকাল সকাল আবার কাজে লাগবে। খেতে বসে শুনেছিল—বিশ্ববন্ধুর বাবা যাবে হিরণহাটি। কাজও আছে, এখানকার লোকের কাজ হিরণহাটিতে প্রায়ই থাকে। হাট বাজার পোষ্টাপিস ইস্কুল ডাক্তার কাঁদর সবই হিরণ-হাটিতে। বিশ্ববন্ধুর বাবার কাজ—বিশ্ববন্ধু ইস্কুলে পড়ে—সেই করে। আজ কিন্তু নিজেকে যেতে হবে। বিশ্ববন্ধুর মামা বিদেশে চাকরী করেন। তিনি চারটের ট্রেনে এই ষ্টেশন হয়ে দেশে যাবেন। এখান থেকে আরও চারটে ষ্টেশন পর। সেই বিশ্ববন্ধুর মামা লিখেছেন ভগ্নী-পতিকে ষ্টেশনে এসে দেখা করতে। কাজও আছে একটু।

বিশ্ববন্ধুর বাবা তাই যাচ্ছেন। তা ছাড়া আজ হাটও বসে। নারানের ইচ্ছে হল সেও যাবে—দেখে আসবে হিরণহাটি। হিরণহাটি নাকি প্রায় শহর। বড় বড় পাকা বাড়ী আছে। বাবুদের একটা হাতী আছে। হাতী নারান দেখেনি। শহরও দেখেনি। তা ছাড়া একখানা কাপড় না হলে চলছে না। একখানা কাপড় শুকিয়ে পরায় অনেক কষ্ট। লোকে দেখবে। তাতে কেমন লজ্জা হয়। সে চলে যায় বিলে। গামছা পরে কাপড়খানা কেচে পাড়ে মেলে দিয়ে জলে নামে। এক কোমর জল—এক বুক জল—সাঁতার জল—খানিকক্ষণ তোলপাড় করে—হাঁসগুলোকে—তেড়ে দৌড়িয়ে খেলা করে। পাড়ে মেলে দেওয়া কাপড়খানা শুকুলে তবে ওঠে। পরে গ্রামে ফেরে। তাই ইচ্ছে হল—কাপড়ও

একখানা কিনবে। বললে—সইমা—কাকার সঙ্গে আমিও যাব। কাপড় কিনব একখানা।

—টাকা আছে তো রে?

—আছে। ন'টাকা ক'আনা আমার আছে! আর বিঁড়ির পাতা তামাক সুতো কিনে আনব। পাকিয়ে বিক্রী করব।

—তুই বাবা অদ্ভুত। তা রায়েরা বলছে রান্নার কাজ করতে পারিস তো কর না। ওদের জামাই বিদেশে থাকে—তার কাছে পাঠাবে।

—না সই মা! উ কাজ আমি করব না।

কেমন করে যে ওই রান্নার কাজটা তার খারাপ মনে হয়েছিল—তা নারান আজও বলতে পারে না।—অথচ সেইদিনই সে বিশ্ববন্ধুর বাবার মোট হিবণহাটি থেকে বলরামপুর পর্যন্ত মাথায় বয়ে নিয়ে এসেছিল। বিশ্ববন্ধুর মামা স্টেশনে ভগ্নীপতিকে নতুন কাপড়ে চোপড়ে ভর্তি একটা স্যুটকেস দিয়েছিলেন। নতুন চামড়ার স্যুটকেস। গত পুজোর সময় বিশ্ববন্ধু মামার বাড়ী গিয়ে মামার চামড়ার স্যুটকেস দেখে ভারী মুগ্ধ হয়েছিল। বার বার হাত বুলিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল—কত দাম মামা?

মামা হেসে বলেছিলেন—এবার যদি ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে ওঠো তা হলে একটা স্যুটকেস নতুন কিনে দেব। কথা রইল।

বিশ্ববন্ধু ফার্স্ট হয়েছিল এবং চিঠিও লিখেছিল মাঘ মাসে। মামা লিখেছিলেন স্যুটকেস নিশ্চয় পাইবে। চৈত্র মাসে বাড়ী আসবার সময় স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন—ভর্তি করে। ভগ্নী ভগ্নীপতি ভাগ্নের জন্যে কাপড় জামা বোঝাই করে দিয়েছেন। বিশ্ববন্ধুও সঙ্গে ছিল স্টেশনে। স্যুটকেসটা নিতে গিয়ে বিশ্ববন্ধুর বাবা বলেছিল—এ যে খুব ভারী হে! কি আছে।

বিশ্ববন্ধুর মামা বলেছিল—শিল নোড়া। দিদির বরাত। বাড়ীতে মির্জাপুরের শিল দেখে বলেছিল—এবার যখন আসবি—আমার জন্যে একটা শিল আনিস ভাই। সুন্দর শিল। সেটাই আছে তলাতে। আর খানকয়েক কাপড় জামা!

বিশ্ববন্ধুর মামা রেলে কাজ করে—থাকে মোগলসরাইয়ে।

ট্রেন চলে গেলে বিশ্ববন্ধুর বাবা বলেছিল স্ত্রীকে—দেখ দেখি, মেয়েদের আহ্লাদটা বোঝ দেখি। এই শিল—নাও এখন কুলী কর! ডাক রে বাবা—কুলী ডাক।

নারান এসে সেটাকে তুলে দেখে—বিশ্ববন্ধুকে বলেছিল—দাও তুলে দাও আমার মাথায়। চলুন কর্তা আমি নিয়ে যাই।

—তুমি?

—হ্যাঁ। এই তো এইটুকু পথ। এর চেয়ে আমি আরও বেশী ভারী বইতে পারি। দিদির বাড়ীতে বইতাম।

বিশ্ববন্ধু লজ্জা পেয়েছিল। বিশ্ববন্ধুর বাবা বলেছিল—বেশ তো তুই-ই নিবি পয়সা। কাঁধে তোল।

বাড়ী এসে পয়সাও দিতে চেয়েছিলেন—চার আনা। কিন্তু সে নেয়নি। সে মুখ নীচু করে হেসে বলেছিল—না সই মা। নিজের ঘরে [illegible] না। বলে পালিয়ে গিয়েছিল ছুটে।

সেদিন রাত্রে খেতে এসে সে বসেছিল—বিশ্ববন্ধুর কাছে। বিশ্ববন্ধু পড়ছিল। সেদিন তার পড়ায় অনুরাগ ছিল খুব গাঢ়। ফার্স্ট হয়ে সে স্যুটকেস পেয়েছে—জামা পেয়েছে। দুটো জামা!

সে বসে শুনছিল।

মনে আছে সেদিন বিশ্ববন্ধু ইতিহাস পড়ছিল। পলাশীর যুদ্ধ। ইংরিজী নয় বাংলায় পড়ছিল। নবাব আলিবর্দীর পর তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মুরশিদাবাদের নবাব হইলেন। সিরাজউদ্দৌলার নাম সে জানে। আর একটা নামও তার চেনা ঠেকেছিল—মীরজাফর। কিন্তু গল্পটা সে জানত না। বিশ্ববন্ধু পড়ে যাচ্ছিল—সে মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল।

বিশ্ববন্ধুর মা—তাকে একটা বিশ্ববন্ধুর জামা এনে দিয়ে বলেছিল—নারান এটা তোমার গায়ে হবে?

জামাটা নতুনই বটে। তবে মামার দেওয়া নয়। সম্ভবতঃ ঘরে ছিল। নিতে দ্বিধা হয়নি নারানের। নিয়ে কিন্তু দেখে বলেছিল—হবে না সইমা। বুকে টান হবে।

—তা হোক না একটু টান!

—তা হোক। সে পরেছিল। সত্যিই টান হয়েছিল—বেশ টান।

সইমা বলেছিল—নারান—আমার ভাইকে দেখলে?

—দেখলাম। সাহেব লোক।

—হ্যাঁ। রেলে বড় চাকরী করে। এখন কাশীর কাছে আছে। মোগলসরাই—মস্ত ইস্টিশান। ওর সঙ্গে যাবে? বলব ও কে? এখন এটা-সেটা [illegible] করলে—তারপর একটা চাকরী তোমার রেলেই হয়ে যাবে। তোমার কাকাও বলছিল।

খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল—না সই মা। এ গাঁ ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। না।

* * *

একই পৃথিবী—বাবু। কিন্তু একই পৃথিবী দিনের আলোয় একরকম, রাত্রের অন্ধকারে আর একরকম। দিনের আলো ফুটতে ফুটতে ফুল ফোটে—পাখীরা কলকল করে গান গায়। মানুষ জাগে, কাজ করে, গান গায়, জল খেলে বিলে নদীতে আলোর ছটায় ঝিকিমিকিতে ভরে যায়, কোন ভয় থাকে না। রাত্রে সেই পৃথিবীই আর এক রকম। অন্ধকার হতে হতে ফুলগুলো শুকিয়ে ঝরে পড়ে, পাখীরা ডালে বাসায় বসে থাকে, চোখে দেখতে পায় না; চুপচাপ। ওই এতবড় বিলটাতে ওই এত পাখী—যারা ওই আকাশের অনেক উঁচুতে ওড়ে—উড়তে পারে, তারা অসহায় হয়ে ভাসে জলের বুকে। জোৎস্না রাত্রে ওরা অবিশ্যি ধান ক্ষেতে নামে—ফসল খায়। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে নিঝুম। মানুষ আরও পাল্টায়। সে ঘুমোয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। অতৃপ্ত কামনার স্বপ্ন। যারা জেগে থাকে তাদের প্রায় সবাই দুশ্চিন্তায় জেগে থাকে, ক্রোধে জেগে থাকে, হিংসায় জেগে থাকে; আর জেগে থাকে কামে। কাম নিন্দার নয়, তা থেকেই সৃষ্টি,—কিন্তু কামার্ত পুরুষ নারী দুইই প্রায় জন্তু! ওখানে আদিম পৃথিবী। পৃথিবীর বুকে দিনে যারা ঘুমোয় রাত্রে তারা বের হয়। সাপ—শেয়াল জন্তু জানোয়ার—চোর ডাকাত। খুনে—

—ওঃ!

বক্তা গোঁসাই অকস্মাৎ একটা যেন কিছুকে তিরস্কার করে উঠল! তিরস্কার ঠিক নয়। তার মধ্যে আর্তনাদের একটি রেশ আছে সূক্ষ্ম প্রচ্ছন্ন সূচী মুখের মত অতর্কিতে বিদ্ধ করে।

তার দিকে তাকালাম আমি।

গোঁসাই বললে—রাত্রি যে কত ভয়ঙ্কর হয়—! ওঃ!

তারপর তিক্ত হেসে বললে—প্রকৃতির নিয়ম করবে কি মানুষ। কিন্তু অন্ধকারের সবটাই পাপ নয় অন্যায় নয়! না। কালীপুজো অন্ধকার রাত্রে! মহাফল মেলে! মহাফল!

বুঝতে পারলাম কি বলছে সে। কিন্তু কথা বলতে সাহস হল না। হ্যাঁ সাহসই হল না।

মহাফল ও পেয়েছে কিনা জানি না। একটু মহামুহূর্তের কথা ওর মনে পড়েছে রাত্রির কথায়—অন্ধকারের কথায়।

আত্মসম্বরণ করে—একটু পরে সে বললে—রাতে বিলের জলটা অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যায়। চাঁদ উঠলে চকমকে। [illegible] জোৎস্না রাতে বড়জোর জলের সে রূপটুকু [illegible] সেও তো প্রায় দিনের মত!

প্রথম দিকে নারান এই অঞ্চলটিকে [illegible] —দিনের [illegible] চেহারায় দেখেছিল। [illegible] সে এমন [illegible] যে [illegible] [illegible] দিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পরিচয় হয়েছিল তার। [illegible] এখানকার সঙ্গে আগে পরিচয় [illegible] দিনের থেকে আর কিছু বেশী ভাল [illegible] বিল স্নান সে [illegible]। আর [illegible] [illegible]। তারপর [illegible]—তারপর মাটি [illegible] [illegible] মাটির পরিচয় পেয়েছিল—[illegible] মাটিতে বড় বেশী বালি। এখানে বালি [illegible] মাটির রঙ বড় ভাল। মানুষদেরও [illegible] লেগেছিল। বিপিন সব থেকে ভাল। [illegible] সইমা বিশ্ববন্ধু, বিশ্ববন্ধুর বাবা। [illegible] আরও সব। রতন মোড়ল দেবু মোড়ল [illegible] মোড়ল—খোকন নন্দী—চাঁদু পাল—এরা সব মোড়ল পাড়ার, ভটচাজ পাড়ায় সনু ভটচাজ নন্দু ঠাকুর—বাদল চাটুজ্জে—পারু মুখুজ্জে—শিবু রায় সকলেই বেশ লোক। বড়লোক রায় মশায়ও বেশ লোক। হ্যাঁ বেশ লোক। তাকে সহজ স্নেহে গ্রহণ করে—প্রথমটা দু'দিন চারদিন করে খাওয়ালেন। তারপর বৈশাখ মাসে তার পৈতেও দিয়ে দিলেন। গোপেশ্বর [illegible] বিশ্ববন্ধুর বাবাই তার বাপের কাজ করে পৈতে দিয়ে নিয়ে এলেন। দাণ্ডী হাতে মাথা নেড়া করে গেরুয়া কাপড় প'রে গ্রামে ফিরল—বিপিনের মা মুখ দেখলে। সোনার আংটি ছাতা জুতো কাপড় জামা-থালা গেলাস বাটি-পুজোর বাসন কোশাকুশি দিলে ভিক্ষে মা। গাঁয়ের মেয়েরা বাড়ী এসে ভিক্ষে দিয়ে গেল। বামুনেরা—তারপর শূদ্ররা। চাল কলা হরিতকী পৈতে—টাকা আধুলি সিকি; সে অনেক। রায়বাড়ী থেকে রাঁধুনী বামনী—সে রায়েদের নিজের লোক—সে ভিক্ষে দিয়ে গেল—একটা টাকা দিয়েছিল রায়বাড়ী থেকে। সই মা—একটা আংটী দিয়েছিল সোনার।

বিশ্ববন্ধু পাশে ছিল—টাকা রেজগী হিসেব করে সেই গুনেছিল—তিরিশ টাকার উপর হয়েছিল। কলা সে অনেক, তার সঙ্গে বাতাসা কদমা, আর আতপ চাল—তা অগণন।

এরপর আর একদফা ব্রহ্মচারী নিমন্ত্রণ। সে খুব পরিপাটি করে খাওয়া। তাও চলে গিয়েছিল দেড় মাস। শূদ্ররা সিধে দিয়েছিল।

প্রথম মাস তিনেকের মত এমন উৎসবময় জীবন তার আগেও আসেনি—পরেও না—আর কখনও আসবে না।

ওর জমি—ওর পুকুর নতুন ক'রে বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল বিপিন। দিদি কি হৃদয় ওরা পৈতের খবর পেয়েও খোঁজ করেনি। নারানও করেনি। শুধু ভাগ্নে বীরেনের জন্য মধ্যে মধ্যে মনটা কাঁদত।

কাঁদত সন্ধ্যে বেলা। যে সময়টায় দিনের হৈ-হৈ শেষ হয়েছে—রাতের আসর বসেনি সেই সময়টা। ও চলে যেত বিলের ধারে। বসে থাকত। মন কাঁদত। বিলের ধারে যেত' তিনবার, একবার ভোরে।

ভোরবেলা হলেই সে উঠে ছুটত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত। গিয়েই সে—বিলের ঘাস বনে লুকনো একটা টিন আর একটা লাঠী নিয়ে—প্রাণপণে পিটত। ঘুম ভাঙিয়ে উড়িয়ে দিত হাঁসগুলোকে। হাঁসগুলি তখন নিথর হয়ে ভেসে থাকত জলের উপর—গলা আর পাখার মধ্যে মুখটা গুঁজে। এই সময়টাই শিকারীদের শিকারের প্রশস্ত সময়। নিশ্চিন্ত ঘুমন্ত হাঁসগুলোর পিছন থেকে জলে জলে সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে রেঞ্জের মধ্যে পেলেই গুলী করত!

এরপর বেলা হ'লে হাঁসেরা চলে যেত মাঝখানে—চকিত দৃষ্টি সজাগ রেখে সাঁতার কাটত, ভেসে, উড়ত, বসত; কোথাও কোন দিকে একটি ছায়া দেখলে—কি একটি টুপ শব্দ হলে—কি একটু বিড়ি সিগারেটের গন্ধ মেশানো বাতাস নাকে ঢুকলেই—ক্যাঁক্ ক্যাঁক শব্দ করে আকাশে পাখা মেলত। পাক খেতো। এদিক থেকে ওদিকে সরত। এদিক থেকে ওদিক—সে দেড় মাইল দু মাইল। অথবা বসত ঠিক মাঝখানে—যেখানটা চারিদিকের কিনারা হতেই অন্ততঃ পোয়া এক মাইল—আধ মাইল। বন্দুকের গুলী যায় না।

এ নিয়ে দু চারজনের সঙ্গে বচসাও হয়েছে তার। সে ঠিক বচসা করেনি, সে বলেছে—আমি মশায় টিন বাজিয়ে গান করি বিলের ধারে বসে। তাতে অপরাধ কি!

বিশিষ্ট লোক দেখলে প্রশ্ন করেছে—বাবু একটা কথা বলব? ওরা কি করেছে আপনার?

গ্রামে কথাটা এসেছে। রায়ের কাছে এসেছে। ভটচাজ বাড়ীতেও এসেছে—তারা হেসেই বলেছেন—ওর একটু ছিট ছিট্ আছে। তা বললে ও রকম কথা! কারণ এই তিন মাসেই গাঁয়ের লোক জেনেছে—রাত্রে কারুর অসুখে বাড়ে অপদেবতা হলে—নারানকে ডাকতে হবে; কারুর বাড়ীতে আঁতুড় হয়েছে দোরে বামুন শোয়াতে হবে—সে নারানকে ডাকলেই হবে। বাঁকুরে সেদিন মুখুজ্জেদের বাড়ীতে বিধবা পিসী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে বাবা গোপেশ্বর বাবা গোপেশ্বর বলে চীৎকার করছিল—কিছুতেই জ্ঞান হচ্ছিল না। ওখানে অনেক লোক [illegible] বিনয় , [illegible] প্রবীণ বলেছিলেন—এ বাবু—বাবা গোপেশ্বর তলায় অপরাধ। ওখানকার মৃত্তিকে পুষ্প-আনাও। কে আনবে? বাবার স্থানে রাত্রে কে ঢুকবে? পুষ্প আনবে!—

ব্রাহ্মণ না হলে হবে না। নারান বলেছিল আমি যাব।

—পারবি তুই?

—হ্যাঁ। একটা লণ্ঠন দাও। চলে যাব। এই তো পাঁচপো পথ!

তাই সে চলে গিয়েছিল এবং ডাক্তার আসবার আগেই ফিরেছিল। ডাক্তার এসেছিল এক ক্রোশ দূরে হিরণহাটি থেকে, গাড়ীতে। সে পাঁচপো পাঁচপো আড়াই ক্রোশ পথ—তার আগেই মেরে দিয়েছিল।

এ তো মাথার ছিট নইলে হয় না। এবং এমন ছিট যার থাকে—তাকে ভালও মানুষ না বেসে পারে না।

শূদ্রদের পাড়ায় আরও খাতির। সেখানে স্নেহ শ্রদ্ধা দুই। বলতে গেলে তাদের মধ্যেই বাস। তারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে আচারে আচরণে ব্যবহারে খাটো নয়। ওই রায়মশায় আর বিশ্ববন্ধুর বাবা বাদে। তবু তারা তখনও ব্রাহ্মণের ছেলে বলে শ্রদ্ধা করত। সে সেখানে প্রায় অগাধ উল্লাসে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল। সংখ্যার কীর্তনের দলে গাইতে না পারুক সামনে থাকত। ওদের বিচারে থাকত। ওদের হুঁকোর মাথা থেকে কল্কে নিয়ে খেতো। কারুর বাড়ী সাপ বেরুলে ছুটত লাঠি নিয়ে।

সন্ধ্যায় বিলের ধার থেকে ফিরে সে একবার এসে বসত বিশ্ববন্ধুর পাশে। সে পড়ত নারান বসে থাকত। তার বই ওল্টাতো।

এরই মধ্যে কখন যে সে ওদের ভালবেসে প্রতিষ্ঠার মুক্তধনের আস্বাদন পেয়েছিল—তার হিসেব ঠিক দিতে পারে না সে—তবে ওই তিনটে মাসের মধ্যেই পেয়ে গিয়েছিল।

বেহিসেবী নারান হিসেবে যতই অক্ষম হোক বাবু, এই হিসেবটা আজ তার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট—সে ভাবের ঘরে সে চুরি করেছিল—সেই জন্যে বিড়ি বেঁধে ব্যবসা করবার মতলবটা আর ভাল লাগেনি; সে ঠিক করেছিল—একটা বই কিনে পুজোর মন্তর শিখে সে এই চাষীপাড়ায় পুরুতগিরি করে' বেড়াবে।

সত্যনারাণের পাঁচালী তার অনেক মনে আছে শুনে শুনে।

"সমুচিত মূল্যে হার কিনিলাম দোকানে—হস্তে পদে বাঁধি রাজা আন কি কারণে।" তার পর সেই নৌকো ফিরে আসার খবরে বণিকের কন্যা-প্রসঙ্গে "পাক দিয়ে ফেলে রাজা হস্তের প্রসাদ।" এসব তার মুখস্থ আছে। কয়েকটা মন্ত্রও কিছু জানে। —ওঁ বিষ্ণু। না শূদ্রদের বলাতে হয় নম বিষ্ণু—নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু। নম অপবিত্র পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতো পিবা—য স্মরেৎ—পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্য অভ্যন্তরঃ শুচি।" হৃদয় জামাই বলতো—তর্পণের সময়—বাপের মায়ের শ্রাদ্ধের শেষে—'জানি না জানি—সে গোঁসাই ফুল পানি।' বই পেলে বানান করে ঠিক মুখস্থ করে নেবে। এবং ভাল করেই মুখস্থ ক'রে কাজ করবে সে।

নিজের একটি পুরুত রূপও কল্পনা করেছিল সে।

গোফ দাড়ি তখনও ঠিক ওঠে নি। উঠলে কামাবে। গলায় পৈতে থাকবে। কোঁচা উল্টে কোমরে গুঁজে কাপড় পরবে। গ্রামে কাঁধে গামছা, ভিন্ন গ্রাম হলে চাদর, বগলে ছাতা। টিকিও একটি রাখবে তাতে ফুল বাঁধা থাকবে। এ কল্পনায় আশ্চর্য একটি আনন্দ পেয়েছিল সে। তার বাবাকে মনে পড়েছিল। তাঁর এই পোষাক ছিল। এমনি ধরণ ছিল। জমিদারের কাছারীতে তাকে বসতে আলাদা আসন দিত। মোড়লপাড়ায় মোড়া দিত। বামুনপাড়া থেকেও পাঁজী দেখাতে আসত।

ওই মানুষকে ভালবাসায় মানুষেরাই কখন তাকে একটি আলাদা আসন দিয়েছে সেটিকে শক্ত কায়েমী করে নেবার ইচ্ছে ওর অজ্ঞাতসারেই মনে উঁকি মেরেছিল। এ একটা আশ্চর্য নেশা।

সে একদিন বিশ্ববন্ধুকে বললে—বিশু! তোদের ঘরে পুজোর বই আছে?

তখন তারা দুজনে তুই তুই হয়েছে।

বিশু বললে—পুজোর বই?

—হ্যাঁ যাতে মন্তর আছে। পুজোপদ্ধতি আছে।

—কি করবি?

—মন্তর শিখে পুজোটুজো করে বেড়াব [illegible]। করতে তো কিছু হবে। [illegible]—[illegible] বিপিনদার মা—[illegible] বলছে। [illegible]—এবার [illegible] পুজোটুজো [illegible] কর—[illegible] না বলতে লজ্জা লাগে রে।

বিশু বলেছিল—[illegible]। [illegible] উচ্চারণ করি না আমরা। [illegible] [illegible] থাকতে পারে। আমার পৈতের পর [illegible] একখানা পড়তে দিয়েছিলেন। শুধু [illegible]।

[illegible] দিন [illegible] বইখানা নিয়ে এসে তাকে দিয়েছিলেন। —[illegible] বাবা। বই [illegible]। পুজোর বই। বিশুর বাবাও ঠিক [illegible], আমি [illegible] ভুলে গেছিলাম ঠাকুর [illegible]। [illegible]। বামুনের ছেলে।

পরদিন সকালেই সে কোশাকুশি নিয়ে বই খুলে প্রাতঃসন্ধ্যা করতে বসেছিল। কিন্তু বই পড়ে একবর্ণ বুঝতেও পারেনি—অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত বানানগুলো অধিকাংশই পড়তে পারেনি। পড়তে কোন রকমে পারলেও—উচ্চারণ হয়নি জিভে।

সন্ধ্যেবেলা—বিশুর কাছে পড়িয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাতেও সুবিধে হয়নি। বিশু বলেছিল দ্বিতীয় ভাগ পড়েছিলি বলছিস—ভুলে গেছিস। আর একবার পড়।

একটু ভেবে সে বলেছিল—হিরণহাটী থেকে একখানা প্রথম ভাগ একখানা দ্বিতীয় ভাগ আর একখানা ধারাপাত একটা শ্লেট পেন্সিল আমাকে কাল এনে দিস।

বাড়ী গিয়ে একটা টাকা নিয়ে আবার ফিরে তাকে দিয়ে গিয়েছিল।

(চার)

হঠাৎ—! যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল! এ ছাড়া কি বলব? সেই খাটো ময়লা কাপড় জামাপরা সেই মানুষটি বিনীত শান্ত, আমাকে বাবু বলা মানুষটি বললে—

Of Man's First Disobedience, and the Fruit of that Forbidden Tree.

গোঁসাই ওই লাইনটা বলে বললে—এর পর এই বাবু! আর কি! ওই যে আরম্ভ হল—প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ ধারাপাত আর সামনে বিশ্ববন্ধুর মোটা মোটা বই—বাংলা ইংরিজী—তাতে

...বৃক্ষে থাকে? থামা যায়? জ্ঞান বৃক্ষের ফল।

অন্যে থামতে পারত—নারান পারলে না। ...মাসে সে পুজোর পদ্ধতির মন্ত্র পড়তে পারলে ঠিক—কিন্তু বুঝতে পারলে না।

বিশু বললে—আরও একটা দুটো ক্লাসের বইগুলো পড়ে ফেল। বড় হয়ে বুদ্ধি পাকলে পড়তে ক'দিন লাগে, যদি নেশা লাগে!

তার উপর একাল। খবরের কাগজের যুগ। ...কাগজ নেশা লাগিয়ে দিলে বেশী। তাকে ...কিয়ে দিলে শরৎবাবুর বই। ওঃ কি নেশা, ...নেশা!

ছ মাসে তখন পুঁজি ফুরিয়েছে—তবে ...টিশ ধান উঠেছে। চার বিঘে জমির দু বিঘে ...টিশ ধান ভাল হয়েছিল। পেট চলতে লাগল। ...বললে—নারানভাই—দু বিঘের এক ...ছোলা দাও। পাঁচ কাঠা আলু দাও। ...তরিতরকারি লাগাও। আলুটো ...আমি ভাগে ক'রে দোব।

নারানের চাষে ঝোঁক ছিল, সে উৎসাহ ...লেগে গেল। চাষ আর পড়া। মাঠেই বই ...করে গিয়ে পড়ে।

বিপিনদার মায়ের তাগিদে সত্যনারায়ণ ষষ্ঠী ...মনসা পুজোগুলোও করে, কিন্তু মনে ...খচ খচ্ করে, সব মানে এখনও পরিষ্কার ...

...হল বিরণগাঁটির টোলে—আম... টোলে ভর্তি হতে লাগে না; কিন্তু জোরে ...হয়। টোলের পণ্ডিত সকালে টোলে ...দশটায় সময় ইস্কুলে হেডপণ্ডিতি ...

...নরো নয়। সুরু হয়ে গেল।

...বিশ্ববন্ধুর কাছে বসে— One morn... met a lame man পড়ে। দুপুরে পড়ে ...শরৎচন্দ্র। উনিশশো ছত্রিশ সাল ...তখন। কিন্তু আর কেউ আসেন নি ...বিভূতিভূষণের নাম শুনেছে সবে। ...বিশ্ববন্ধু পথের পাঁচালী আনলে। ...বইখানা বিলের ধারে বসে পড়েছিল। ...ছিল। ওই বিলের জলে আকাশের ...পড়েছিল; ওপারে কিনারার কাছে— ...সবুজ ঘাস বনের ছায়া কাঁপছিল। ...মধ্যে আকাশে ওড়া পাখীগুলোর ছায়া ...হালকা ঢেউয়ে বেঁকেচুরে লম্বা হয়ে ...গিয়ে ভেসে যাওয়া মালার মত মনে ...। আমার মনে পড়েছিল—দিদির বাড়ীতে ...ছেলেবেলার কথা।

তারপর বিশু এনেছিল অপরাজিত। অপরাজিত আমার সঙ্গে মেলে নি। মনে হয়েছিল বিশ্ববন্ধুর সঙ্গে মেলে। পরীক্ষা দিচ্ছে—পাশ সে করবেই ভাল ...। কলেজে পড়তে যাবে। অপুর মতই ...বুদ্ধিমান। তবে এত গরীব নয়। না—মেলে না।

মিলবার সব থেকে বড় বাধা কালটা। ...কাল আর আমার বিশুর কালটা ...। বিশুর সঙ্গে অপুর প্রকৃতির কিছুটা থাকলেও আমার সঙ্গে একেবারে মেলে না। রাত্রিতে ঘুমুত। নিশ্চিন্ত নিদ্রা। আমার ছিল না। ঘুমের কাল আমার তখন শেষ ...। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেলে ঘুম বোধ হয় হয় না। তার উপর ওই কালটা যেন ...ট গরমের কাল। বৃষ্টি নেই, আকাশে মেঘ—দূরে দিগন্তে মেঘ ডাকছে, হাওয়া বয় না—গাছের পাতা স্থির। বাইরে রাতে জন্তু-জানোয়ারের কোলাহল, সাপ অবাধগতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, গর্জন করছে, ব্যাংও চেঁচাচ্ছে, মধ্যে মধ্যে সাপের দাঁতের যাঁতাকলে পড়ে কাতরাচ্ছে।

উনিশ শো ছত্রিশ সাঁইত্রিশ থেকে উনিশশো চল্লিশ সাল। নারানের সে কাল আজও কালীকের মত স্পষ্ট। শুধু নারানের ওই গ্রাম ওই অঞ্চলটিতে নয়, সমস্ত দেশে বাংলা দেশে ভারতবর্ষে তাই বা কেন সারা পৃথিবীতে।

দিনের আলোয় ফুলেফোটা পাখীর গান-গাওয়া আপন আপন খেয়ালে খুসীতে কাজে মগন মানুষময় যে অঞ্চল যে পৃথিবীকে সে দেখেছিল তার রাত্রির চেহারা দেখতে পেল সে। দেখল মানুষের মধ্যেই জানোয়ারের সাপের ব্যাঙের খরগোসের চেহারা। ব্যভিচার-চুরি-ডাকাতি মাতলামীতে তারাই যেন সবাই মত্ত!

নারান চল্লিশ সাল পর্যন্ত জ্ঞানবৃক্ষের ফল কেবলই চিবিয়েছে কেবলই চিবিয়েছে। সংস্কৃতে আদ্য পাশ করেছে, মধ্য পাশ করেছে; কিন্তু উপাধিটা দেয়নি। ভাল লাগল না সংস্কৃত, ভাল লাগল না পুরুতোগিরি, পুজোক-গিরির সংকল্প। সংস্কৃতের সঙ্গে শুধু বাংলা উপন্যাস গল্প পড়েনি হাইস্কুলের ক্লাস সেকেন এইটের পাঠ্য পুস্তকগুলোও পড়েছে। আর খবরের কাগজ। নিত্য নিয়মিত পড়ত। ওদিকে তখন তার জীবনের প্রয়োজন বেড়েছে। পড়ার বই কাপড় জামা স্যাণ্ডেল দরকার হয়েছে, মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে যাচ্ছে আসছে দু-চারজন তার বাড়ীতেও আসছে, কংগ্রেসের কাজ করেন পাশের গ্রামের ধনদাবাবু, তখন গ্রামে এসেছেন—নদীর ওপারে দেবীপুরে শিবডাক্তার কংগ্রেসী থেকে বামপন্থী হয়েছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বারী নিয়ে ঝগড়া করে কংগ্রেস ছেড়েছে ডাক্তার। তার সঙ্গে অজয় হাজরার একদল জমেছে। মধ্যে মধ্যে সহর থেকে হীরালালবাবু আসেন, হরিপদ আসেন, এরা মধ্যে মধ্যে আসেন সেও তাঁদের কাছে যায়। খরচ বেড়েছে উপার্জন চাই। পুরুতোগিরিতে কুলোয় না, মনও ওঠে না। সে ভেবে চিন্তে পাঠশালা খুলে বসল।

হেসে গোঁসাই বললে—গণদেবতার দেবু পণ্ডিত একসময় নারানের আদর্শ ছিল।

এতদিনে সে দেখতে পেলে চারিদিকে অন্যায়, চারিদিকে পাপ, পদে পদে মিথ্যাচার, দিনের প্রতিটি ক্ষণ কুটীল চক্রান্তের পাকে পাকে ঘুরছে, প্রবলের গর্জনে দুর্বলের কান্নায় হতাশার আক্ষেপে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি বাড়ে, ব্যভিচারের উল্লাস প্রমত্ততার কোলাহল মধ্যে মধ্যে দুর্বলের কান্নার মত অসহায় মেয়ের অস্ফুট কান্নাও ভেসে আসে। দীর্ঘনিশ্বাসের উত্তাপ কালের গুমোটকে বাড়ায়।

এতো ছিল; কিন্তু এতকাল দেখতে পায়নি, বুঝতে পারেনি নারান।

অম্বুবাচীতে লড়াই হয় কুস্তি। তাতে একটা নারকেল কি একটা কিছু থাকে—সেটা কুস্তী করে জিতে নিতে হয়।

সাঁওতাল মাঝিদের বিয়ের একটা মজার নিয়ম আছে। বিয়ের সম্বন্ধ হল কথাবার্তা হল। কিন্তু বিয়ে কথাবার্তার পাকা পাকিতে হয় না। বরপক্ষকে মেয়েকে একদিন কেড়ে নিয়ে যেতে হয়। ওই কলেশ্বনাথের চড়কের মেলায় নারান প্রথম সেবার দেখে সেবার তার ভয় লেগেছিল প্রথমটা নাগরদোলারই কথা। মেলার একধারে নাগরদোলায় চড়বে বলে সে দাঁড়িয়ে আছে। নাগরদোলাটা থামল—একটা দোলা থেকে নামল তিনটে সাঁওতাল মেয়ে। তাদের তখন একটু ঘোরনপাক লেগেছে, টলছে আর খিল খিল করে হাসছে। অন্ধকার হয়ে আসছে সবে। হঠাৎ কোথেকে দু-তিনটে সাঁওতাল ছুটে এল—তার মধ্যে থেকে একটা জোয়ান মাঝমানের লম্বা মেয়েটাকে ধরে কাঁধে ফেলে ছুটল।

অন্য মেয়ে দুটো চীৎকার করে বাকী মাঝি দুটোর সঙ্গে মারামারি লাগিয়ে দিলে—আর চেঁচাতে লাগল। দেখতে দেখতে আর মাঝিরা ছুটে এসে জমল। দুটো দল। একদল এদিকে আর একদল ওদিকে। কিছুক্ষণ হৈচৈ লড়াই মারপিটও বটে—হয়ে থেমে গেল। তার-পর বসল দুদল মিলে।' সেই ছেলেটা মেয়েটা

ভূতনাথ

কত জনেরা ফিরে যেত; কত জনেরা ওরই মধ্যে শিকার করত। দু দলে তিন দলে ভাগ হয়ে দু তিন দিকে ভাগ হয়ে গিয়ে এদিক থেকে ওদিকে হাঁসগুলো গেলে—আকাশে উড়ন্ত ঝাঁকে গুলী করত। অনেক মিস্ যেত। দু চারটে গুলীতে দু চারটেও মরত আবার দশ বারোটাও মরত।

একবার সায়েব মানে সদর থেকে সার্কেল অফিসার এস ডি ও এসেছিল, সঙ্গে ছিল থানার দারোগা। সে খবর পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলতে সাহস হয় নি। সারাক্ষণই কিন্তু একটু দূরে থেকে পাশে পাশে বেড়িয়েছিল। মনে অনুশোচনার শেষ ছিল না নিজের কাপুরুষতার জন্য।

ঘণ্টা দুই ঘুরে সায়েবরা বসেছিল চা খেতে। ফ্লাস্কে চা ছিল, টিফিন কেরিয়ারে বিস্কুট ছিল, খাচ্ছিল, গল্প করছিল, হাসছিল, সিগারেট খাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় এস ডি ও বার কতক তার দিকে তাকিয়ে ডেকেছিল—এই শোন্।

সে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করেছিল—বুকের ভিতর একটা ধড়ধড়ানির শেষ ছিল না। এস ডি ও বলেছিল—দেখছি সেই গোড়া থেকেই সঙ্গে ঘুরছ। কেন? কিছু বলবার আছে?

এস ডি ও ভেবেছিল কোন দরবার আছে ব্যক্তিটির। এমন থাকে!

সে বলেছিল স্যার! যদি কিছু মনে না করেন তো বলি?

চমকেছিল এস ডি ও—কি মনে করব?

—আজ্ঞে, এই নিরীহ জীবগুলিকে মারছেন—কি অপরাধ করেছে এরা!

—হোয়াট? কি কি? তারপর হেসে উঠেছিল হা-হা শব্দে। তারপর নিজেই উচ্চারণ করেছিল—সে যা বলেছে—তাকে আর হোয়াটের উত্তরে তার পুনরাবৃত্তি করতে হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে সায়েবের সঙ্গীরা এবার হা-হা শব্দে হাসতে সুরু করেছিল। একজন বলেছিল—ওয়াণ্ডারফুল নিরীহ জীব—হা-হা হা-হা!

সে আর থামে না। কিন্তু এস ডি ও গলা ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিতেই সে ইঙ্গিত বুঝে থেমেছিল। সায়েব এবার জিজ্ঞাসা করেছিল—কি নাম?

ভয় হয়েছিল নারানের। অনুশোচনা হয়েছিল—কেন সে বলতে গেল! তবুও নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল—আজ্ঞে শ্রীনারায়ণ গোস্বামী!

—গোস্বামী! বৈষ্ণব? তিলক কণ্ঠী কই?

—আজ্ঞে না।

—তবে গান্ধাইট! গান্ধী শিষ্য?

—আজ্ঞে না। তবে ভক্তি করি তাঁকে। নমস্কার করেছিল সে। কথা বলতে বলতে ভয় ভেঙে গিয়েছিল। তাই হয়। কেউ কথা বলতে বলতে ভেঙে যায়। কেউ সাহস পায়। নারান ভাঙার মত ধাতুতে গড়া নয়। সে সাহস পেয়েছিল। তাই নমস্কারও করতে পেরেছিল।

এস ডি ও বলেছিল—হুঁ! কি করা হয়?

—আজ্ঞে একটি পাঠশালা করেছি। আর এই পুরুতে টিরুতের কাজ টাজ করি।

—মাছ মাংস খাও?

—মাছ খাই। মাংস খাই না।

—কিন্তু মাছ কেন খাও? তারা কি অপরাধ করেছে? এস ডি ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে সকলে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। দারোগার হো-হো শব্দে হাসতে মানা—সে মুখ ফিরিয়ে মুচকে হেসেছিল।

সে হাত জোড় করে বলেছিল—আজ্ঞে—ওটা দেশে এমন চলিত হয়ে গিয়েছে যে, মনে থাকে না—মনে হয় না! তবে অন্যায় বটে স্বীকার করছি। আজ থেকে মাছ আর খাব না, আপনার সামনে বললাম।

সে উঠে চলে এসেছিল একটি নমস্কার করে। কিন্তু সেই দিন থেকে পুলিশের খাতায় তার নাম উঠেছিল।

এখানেই নারানের জীবনের ভবিষ্যতের বীজটি একদিন তার অজ্ঞাতসারেই বিধাতা টুপ করে ওই বিলের ওই উর্বর জমিতে ফেলে দিয়েছিলেন; বীজটি হয় তো তারই পায়ের চাপে মাটিতে বসে গিয়েছিল।

ওই বিলের ধারেই পরিচয় হয়েছিল ভূতনাথ চাটুজ্জের সঙ্গে! সেদিন সে ভোর রাত্রে উঠে বিলের ওপাশের গাঁয়ে গিয়েছিল সীতাহাটির মফেজ সেখের কাছে। কার্তিকের শেষ রবিফসলের জন্যে জমি চাষ দিয়ে বীজের ভাঁড় হাঁড়ি দেখতে গিয়ে কাল দেখতে পেয়েছে ভাল মটর শুঁটির বীজগুলি সব আরসোলায় খেয়ে নষ্ট করেছে। এফোঁড় ওফোঁড় করে কুরে কুরে খেয়েছে। বড় আপশোষ হয়েছিল। এ বীজ সে গতবার বিশ্ববন্ধুকে লিখে কলকাতা থেকে এনে পত্তন করেছিল। এবার বেশী জমিতে দেবে। কিন্তু বীজ শেষ। বিশ্ববন্ধুকে লিখে কলকাতা থেকে আনিয়ে বোনা—সে অনেক দেরী পড়ে যাবে। মনে পড়ল—আধ সের বীজ সে সীতাহাটির মফেজ সেখকে দিয়েছিল। সেখ বড় ভাল চাষী। সে চেয়েছিল, সেও দিয়েছিল। রাত্রে শুয়ে মনে হয়েছিল শেষ রাত্রে উঠে মফেজের কাছে যাবে—যদি আধ পোয়া এক পোয়াও দেয় তবে যত্ন করে থানা করে দেবে। পত্তনটা থাকবে। তারপর বিশ্ববন্ধুকে লিখবে—যদি সময়ে বীজ পাঠায় তখন দেখা যাবে। মফেজের কাছে বীজ নিয়েই সে ফিরছিল। সকাল সাতটা তখন। সূর্য উঠেছে। মিষ্টি রোদ আধ পাকা আধ-কাঁচা আমন ধানগুলির উপর সোনালী পাতলা চাদরের মত পড়ে আছে। ধান গাছগুলির শীষে পাতায় শিশির লেগে রয়েছে, বিন্দু বিন্দু হয়ে রোদে ঝরছে। আকাশে হাজারে হাজারে পাখী উড়ছে। কালো-সাদা বিন্দুর মত। পঙ্গপালের ঝাঁক মনে হচ্ছে। এবার হাঁস এসেছে বেশী। এই হাঁস আসার সময়। আশ্বিনের শেষ হতে আসে। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল সে। একটা কঠিন শব্দের রেশ ছুটে চলে আসছে ক্ষীণ হতে হতে, তাকে পার হয়ে চলে গেল; ওই চলে যাচ্ছে, সীতাহাটির বাইরের জঙ্গলের গাছপালার পাতার মধ্যে হারিয়ে যাবে। —ওই—ওই আবার। —ঠু-ই।— একটা শনশনানির সঙ্গে শব্দটা ছড়িয়ে চারিদিকে ছুটছে—তার দিকেও আসছে। আবার!

তার রাগ হল। আবার আজ ব্যাধ এসেছে। ব্যাধই বটে। না ব্যাধের থেকেও খারাপ ঘৃণ্য। ব্যাধের হল জীবিকা—বৃত্তি। এই করেই খায়। মাংস বিক্রী করে। আর এরা—পেট ভরাবার জন্য নয়, ক্ষুধার দায়ে নয়—রসনার তৃপ্তির জন্যে আর হিংসার কৌতুকে এদের হত্যা করে। মনে তার জোরটা এবার বেশী। মাছও সে ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং বলবার অধিকারটা তার যেন বেড়েছে। হন-হন করে পা চালিয়ে এসে সে বিলের ধারে দাঁড়াল। আকাশে পাখীগুলো আর বিন্দুর মত বা পঙ্গপালের মত মনে হচ্ছে না। কিন্তু কই? ব্যাধেরা কই?

—দু-ম! শব্দ উঠল, ছড়াচ্ছে শব্দটা জলের বুকের উপর দিয়ে। ওই—ওপারে বড় বড় ঘাস জঙ্গলের মধ্যে মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে।

আকাশ থেকে নীচের দিকে মুখ করে তিনটে পাখী পড়ছে! ঝাঁকের পাখীরা ক্যাঁও-ক্যাঁও শব্দ করে পাক দিয়ে বাঁক নিচ্ছে।

—দু-ম! আবার।

ওঃ—এবার আট দশটা পাখী নীচের দিকে পড়ছে। যেন ঝরে পড়ছে। সে ছুটল। ছুটে এসে ঘাস জঙ্গলটার সামনে এসে দাঁড়াল। তখন বাবুরা বেরিয়ে এসে সিগারেট খাচ্ছে—আর কয়েকজন লোক জলে নামছে কজন মাঠে মাঠে ছুটেছে পড়ে যাওয়া পাখীগুলোকে কুড়িয়ে আনবার জন্যে। কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল, এ যে বেশীর ভাগ ঘাট বলরামপুরের লোক। রায় বাড়ীর কর্মচারী তাদের পাইক, বড় রায়ের সম্পর্কে ভাইপো হরেন রায়—ভটচাজ বাড়ীর বিশ্ববন্ধুর জ্যাঠতুতো ভাই দীনবন্ধু; ওপাড়ার অজয় হাজরা—থিয়েটার করে কংগ্রেস করে, এমন কি ডাক্তার শিবু চাটুজ্জে, কংগ্রেসী লীডার সেও রয়েছে!

অজয় হাজরা বললে,—এই এসেছে! আমরা বলাবলি করছিলাম! তোমার বাড়ী হয়ে এসেছি— ভেবেছিলাম— পারমিশনটা নিয়ে আসব।

সে তাকিয়েছিল কেন্দ্রের লোকটির দিকে। একটু কালো—হ্যাঁ কালোই বলতে হবে, কালো দোহারা পরিমার্জিত চেহারা একটি তিরিশ-বত্রিশ বছরের যুবা, পরনে মিহি ধুতি—গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী, সহরের সভ্যতা অনুযায়ী লম্বা রুখু চুল, বন্দুক হাতে—সিগারেট মুখে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

অনুমানে চিনতে তার দেরী হল না। ইনিই তা হলে বড় রায়ের জামাই। ভাল ঘরের ছেলে, শিক্ষিত মানুষ, গ্র্যাজুয়েট, কলকাতায় থাকেন, ব্যবসা করেন। রায়ের অনেক সম্পদ অনেক সম্পত্তি, এবং সন্তান ওই একমাত্র কন্যা। এঁর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এঁকে ঘরে ছেলের মত রাখবেন ভেবেছিলেন কিন্তু তা থাকেননি ভূতনাথ। রায়ের গ্রাম্য স্বভাব এবং অতি হিসাবী সংসারের মধ্যে থাকতে পারেননি। তিনি কলকাতায় ছিলেন। আগে মধ্যে মধ্যে আসতেন জামাইয়ের মত। কিন্তু মধ্যে কি হয়েছিল—যার জন্য কয়েক বৎসর একেবারেই আসেননি। জামাই কলকাতাতে যখন থাকতেন তখন মেয়ে এখানে থাকত, দেশে এলে—মেয়ে যেত শ্বশুর বাড়ী। কয়েকবার মেয়েও কলকাতা গেছে। এবার শ্বশুরের সঙ্গে মিটমাট হয়েছে, ভূতনাথ শ্বশুর বাড়ী এসেছেন। কথাটা সে শুনেছিল। এরই কাছেই থাকবার জন্য বলেছিলেন রায় মশাই! সে তার দিকে তাকিয়েই থাকল—কিন্তু গ্রামের জামাই অনেক দিন পর এসেছেন—তাকে কি বলবে—কি বলা উচিত বুঝতে পারছিল না।

শিবু ডাক্তার তার দৃষ্টি দেখে বললে—কে জান?

সে একটু হেসে বললে—তা চিনেছি। রায় মশায়ের জামাই। নমস্কার করলে সে।

ভূতনাথ বললেন—আমার নাম ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনি রায় মশায়ের জামাই, আমাদের ঘাট বলরামপুরের সবারই আদরের মানুষ। জামাইবাবু!

শিবু ডাক্তার বললে—এর ওপর আপনার কিছু বলার নেই।

হেসে ভূতনাথ বলেছিলেন—তা নেই। তারপর বলেছিলেন তুমি নাকি এখানকার হংসরক্ষক! কিন্তু কেন? হাঁসের উপর এত মায়া কেন?

হেসে সে বলেছিল—নিরীহ পাখী! আপনার আনন্দে থাকে, কলকল করে—মায়া হয় দেখতে ভাল লাগে! কোন অনিষ্টও করে না। এই আর কি!

—তুমি মাছও ছেড়ে দিয়েছ শুনলাম। মাছ খাবার কথা তোমার সঙ্গে চলবে না। কিন্তু কত ক ওরা খায় বলতো? এই তো সারা রাত টিন পিটিয়ে হাঁস তাড়ায় লোকেরা।

হ্যাঁ বটে। এটা এতদিনেও ভাবেনি নারান! কিন্তু উত্তর সে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়েছে—এবং বলে—তা খায়। না বলছি না। কিন্তু কতটুকু সে বলুন? কত খায়! এই এত বড় মাঠ, শুধু এ মাঠই নয়—দেশের মাঠে দু-চার মুঠো করে খায় বাঁচে।

—বাঃ। বেশ বলেছ! আমি আরও খুসী হয়—যদি বলতে মানুষে যেভাবে নানান কায়দায় আইনের জোরে গরীব মানুষগুলোকে সর্বস্বান্ত করে চাষ করে ফলানো ধান কেড়ে নেয়—তার তুলনায় এরা কতটুকু খায়? তাদের কি বলছিল?

নারান অবাক হয়ে গিয়েছিল। ভূতনাথবাবু কি তার শ্বশুরের কথা বলছেন?

ভূতনাথ হেসে আবার বলেছিলেন—গোঁসাই অবাক হয়েছে শিববাবু!—

নারান বলেছিল—তা একটু হলাম স্যার!

—কিন্তু আমি তো জামাই—ছেলে তো নই! তা ছাড়া মানুষে যখন—তখন সত্যি কথাটা বলতে হবে!

—আপনি প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ!

—তুমিও ছোট মানুষ নও গোঁসাই। সব শুনেছি আমি। খুব ভাল লেগেছে। তা হাঁস মারতে বারণ তুমি করতে পার। অন্ততঃ আমি মেরে মারব না। তবে কি জান গোঁসাই—জীবের আর মানেও হয় না। পরিণামও ভাল নয়। খুড়া-নেড়ীর দল বাড়ে। ক্ষাত্রশক্তি না থাকলে দেশ?—না থাকলে এই আমাদের অবস্থা হয়। বিদেশীর পায়ের তলায় থাকতে হয়।

এই সময়ে রায় বাড়ীর পাইক এবং স্থানীয় মজুর শ্রেণীর লোকেরা ফিরে এসে—মরা হাঁসগুলোকে নামিয়ে দিল। গোটা কুড়ি হাঁস। কয়েকটা হাঁস তখনও জীবিত ছিল—মিট-মিট করে তাকাচ্ছিল।

তাদের দিকে তাকিয়ে নারান বলেছিল—আমি যাই। নমস্কার।—

—যাবে? কষ্ট হচ্ছে? তা যাও। ও দেখে আমারও কষ্ট হয়। যাও।

তুইও এইবার বিয়ে কর...

—হ্যাঁ শোন রাত্রে আমার ওখানে, না খেতে হবে না, এস। বুঝেছ। কথা বলব। আমার বাচ্চা দুটোকে পড়াবার লোক খুঁজেছিলাম। তুমিই পড়াও। এস বিকেলে।

মানুষটিকে ভাল লেগেছিল নারানের। বেশ মানুষ। বড়লোকের জামাই হয়েও— একালের মানুষ। এবং বেশ খোলা মানুষ। রাতে মদ নিয়ে বসেছিলেন ভূতনাথবাবু—নারানকে দেখে সংকোচ করেননি। বলেছিলেন—নারান আমি বাপু মদ খাই, নিয়মিত একটু করে খাই। বন্ধু-বান্ধব জমলে কোন কোন দিন বেশীও খাই। কিন্তু লুকোনো আমার নীতিবিরুদ্ধ। বুঝলে! কংগ্রেসকেও ভালবাসি, মেম্বরও বটে—জেল যেতে প্রস্তুত আছি, জেল কেন ফাঁসী যেতেও ভয় নেই; গান্ধীজীকেও ভক্তি করি। কিন্তু মদ খেলে মহাভারত অশুদ্ধ হয় তা মানি না! তোমার যদি ঘেন্না হয়, বসতে বলব না, কাল সকালে এস। তা যদি না হয়, তবে বস। কথা বলি।

সে হেসে বলেছিল—না-না—না। ঘেন্না হবে কেন? তা করব কেন? বসে সে বসেছিল।

সেইদিনই ভূতনাথ চাটুজ্জে পাঁচ টাকা মাইনেতে তাকে ছেলে দুটির প্রাইভেট মাষ্টার নিযুক্ত করেছিলেন। বলেছিলেন—মাইনে আমি দেব—আমার স্ত্রীর কাছে পাবেন। ওই সুদের টাকা মানুষ চোষা ধানের দাম থেকে নয়। পরিষ্কার টাকা, কোথাও তার লালচে দাগ নাই।

অজয় হাজরা এবং আর কজন জমা হয়ে বসেছিল।

* * *

বুনো হাঁস নিয়ে যে যেচে পরের সঙ্গে—সে এস-ডি-ও পর্যন্ত ঝগড়া না হোক—ওই জাতীয় কিছু করতে পারে এবং হাঁস মারা বারণ করবার জন্যে মাছ পর্যন্ত ছাড়তে পারে—লোকে তাকে বলে পাগল। অর্থাৎ অসুস্থ মস্তিষ্ক। আর পাগলই যদি হয় তবে সে সেই ঝগড়াটে পাগল যে শুচিবাইগ্রস্তের অশুচি বস্তু খুঁজে বেড়াবার মত অন্যায় খুঁজে খুঁজে ঝগড়া করে।

সে অসাধারণ মানুষও হতে পারে—আবার —সম্বলহীন প্রতিষ্ঠাকামীও হতে পারে। নায়ক হওয়ার মত এমন প্রতিষ্ঠার সোজা পথ তো আর নেই। ওটা অন্তর থেকেও অকৃত্রিমও হতে পারে। আবার প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা থেকেও ওটা জন্মাতে পারে। নারানের কি থেকে কি হয়েছিল —তা আপনি বিচার করে নেবেন।

নারানও ভেবে ঠিক করতে পারে না। সময় সময় ধাঁধা লাগে। তবে শালগ্রাম ছুঁয়ে সে অনেকবার নিজের কাছেই নিজে বলেছে—না—প্রতিষ্ঠার তৃষ্ণা থেকে নয়—নয়—নয়! তবু সন্দেহ আছে। আছে। প্রতিষ্ঠা কামনাও ছিল বই কি—নিশ্চয় ছিল।

মানুষকে ভালবাসত—তা থেকে তার ইচ্ছা হয়েছিল—মানুষকে ভাল করবে। মানুষের উপর—নিরীহ মানুষের উপর যে যেখানে অন্যায় করবে—তার প্রতিবাদ সে করবে—করবে—করবে। সেটা প্রতিষ্ঠা কামনা থেকেও হতে পারে—কিছুটা তো বটেই—। তা থেকেই সে প্রতিজ্ঞা করেছিল। দোষ না গুণ তা নিয়ে সে আজ মিছে মাথা ঘামায়! হয়তো দুঃখে। কিম্বা রাগে।

সে সময় এ বিচার করবার সময় তার ছিল না—একটা প্রবল বন্যার মত আবেগের বন্যায় চলেছিল সে। তখন ভরা যৌবন তার। বয়স—পূর্ণ কুড়ি। ১৯৪০ সাল কাল অনুকূল। দৃকপাত করে নি। নইলে সে বিপিনের সঙ্গে ঝগড়া করে? সে দিন সকালেই উঠে বিপিনের উচ্চ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে সে ছুটে গিয়েছিল—কি হল? বিপিনের সঙ্গে মায়ের আজকাল প্রায় ঝগড়া হচ্ছে। বিপিনের মা আজকাল অনবরত আক্ষেপ করছে—আমার কিছু হল না। জীবনটা

বৃথাই গেল। রাঁড়ীকুঁড়িরা—তীর্থ করে এল—কাশী গয়া পেরাগ বিন্দাবন মথুরো পর্যান্ত। একশোটা টাকা তাদের জুটল—আমার জুটল না।

গ্রামের কয়েকজন মেয়ে তীর্থের, সেথো-পান্ডার সঙ্গে তীর্থ করে এসেছে; তার মধ্যে দুজন সন্তান সন্ততিহীনা বিধবা ছিল—; তারা সারাটা জীবন খেটে খুটে কিছু কিছু জমিয়ে তীর্থ করে মাথা কামিয়ে বাড়ি ফিরেছে—কিন্তু বিপিনের সঙ্গতি থাকতেও তার মায়ের যাওয়া হয় নি। বিপিনের মায়ের হাতের টাকা পর্যন্ত সে ছেলেকে দিয়েছে। তাতে বিপিনের দোষ নেই। তীর্থ যাওয়ার হুজুগে উঠবার দুমাস আগে একটা জমি বিক্রী করছিল—বিপিনেরই জাঠতুতো ভাই হরিশ। বিপিনের পিতামহের জমি। বিপিনের মা বউ হয়ে এসেছিল দশ বছর বয়েসে—তখন এক সংসার। সে সময়—বিপিনের মা ওই জমি থেকে কাঁকুড় খেড়ো তুলে এনেছে। জমিটায় খেড়ো কাঁকুড় ভাল হয়। ওই জমি হরিশ বিক্রী করবে শুনে—বিপিনের মা নিজেই ছেলেকে বলেছিল—ওটা যেমন করে হোক কেন। জমিটা বড় বাজুড়িও বটে, মাপে দেড় বিঘের উপর। হরিশ জ্ঞাতিকে দিতে চায় নি। খদ্দেরও দাঁড়িয়েছিল পাঁচটা। ফলে দেড়বিঘে জমির দাম উঠে গেল চারশো টাকা। তার উপর তখন রেজেষ্ট্রী অফিসে জমিদারের প্রাপ্য শতকরা কুড়িটাকা সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করতে হবে। রেজেষ্ট্রী খরচা আছে। পাঁচশো টাকার উপর চলে যাবে। বিপিনের হাতে তিনশো টাকার বেশী ছিল না। মা নিজে থেকে তার সম্বল দুশো টাকা বের করে দিয়েছিল। জমি কেনা হল—কিন্তু এর ঠিক মাস দুয়েক পরেই ঝুলনের সময় বৃন্দাবনের পান্ডা এসে যাত্রী সংগ্রহ করতে লাগল, এ গ্রামের ওই দুটি বিধবাই হল অগ্রণী।—তারা আর কয়েকজনকে জোটালে। বিপিনের মা তখন টাকা চাইলে—ছেলেকে। ছেলে বললে—এখন এই বর্ষার সময় টাকা কোথা পাব আমি?

—ধান বেচ।

—ধান বেচব তো খাব কি? তা ছাড়া ক বিশ ধান আছে। বেচলে তো—একশো টাকাও হবে না।

মাকে, তখন নারানই বুঝিয়েছিল। নারান বিপিনের মায়ের ভিক্ষেপত্রে তার উপর পুজো আর্চা করে দেয়। সব থেকে বড় কথা—নারানের এখন মান্য হয়েছে। সকলে সম্ভ্রমের সঙ্গে ভালবাসে। আগে যেটা স্নেহ ছিল এখন সেটা সম্ভ্রম।

মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—আসছে বছর ধান উঠলেই—বিপিন টাকা দেবে। এবং সে নিজে ব্যবস্থা করে তাকে তীর্থে পাঠিয়ে দেবে।

মা বলেছিল—তার আগেই যদি মরে যাই বাবা!

নারান বলেছিল—তা যাবে না—আমি বলছি!

—তুমি বললেই যদি হয় বাবা তাহলে তো হতো। তা তো হয় না।

আমার মন বলছে—এ বছর আমি পার হব না!

নারান বলেছিল—তাহ এবার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল,—বলেছিল—তাই যদি হয় ভিক্ষেমা, মরেই যদি যাও, তবে স্বর্গে গিয়ে পাথরের ঠাকুরের বদলে—সাক্ষাৎ ভগবানকে দেখবে!

অবাক হয়ে গিয়েছিল ভিক্ষেমা।

অভিমানে বৃদ্ধার চোখে জল এসেছিল—সজল চোখে বলেছিল—তুমি এই কথা বললে বাবা?

—কেন? কি অন্যায় বললাম। আমি বলছি দেহাতে তুমি ভগবানকে পাবেই, দেখবেই!

খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন। বৃদ্ধা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—ছেলে ভুলাচ্ছ বাবা?

না, ছেলে ভোলাই নাই। শোন। শাস্ত্রের কথা। এক গ্রামে দুজন লোক ছিল। একজন বড়লোক অনেক টাকা, অনেক সম্পত্তি। অনেক টাকা সম্পত্তি সহজে হয় না, সোজা পথে হয় না—সে দেখতে পাচ্ছো। তার জন্যে লোক ঠকাতে হয়। পরের পাওনা ফাঁকি দিতে হয়; নিজের পাওনা সুদের সুদ তস্য সুদে বাড়িয়ে অঙ্ক ভুল করে দেনাদারকে সর্বস্বান্ত করে আদায় করতে হয়। অনেক কিছু করতে হয়। দু টাকা গারীবকে ধার দিয়ে দশটাকা দাবী করে—পঁচিশ টাকার গাইটা নিয়ে পাইকারকে বিক্রী করতে হয়।

ওই বিধবাদের একজনের কথা কৌশলে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল নারান।

গল্পের উপর ভিক্ষেমার প্রত্যয় তাতে বেড়েছিল। তার সঙ্গে আরও অন্য বিত্তশালীদের প্রতিও ইঙ্গিত করেছিল। সে রায় বাড়ী থেকে ভটচাজবাড়ি পর্যন্ত।

তারপর বলেছিল—আর একজন ছিল—ধার্মিক গৃহস্থ। সংসার কর্ম করত নিজের ন্যায্য পাওনাটিই নিত। ন্যায্য দেনাটি পাই পয়সা মেটাতো। যথা সময়ে ভগবানকে ডাকত। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিত। মিষ্ট কথা বলত। গরীব দুঃখীর দুঃখে কষ্টে চোখের জল ফেলত। খাবার সময় ক্ষুধার্ত এলে—নিজের ভাতটি—তাকে দুমুঠো দিয়ে নিজে এক মুঠো খেতো।

এখন বড়লোক বাড়ীতে ঠাকুর প্রতিষ্ঠে করলে, পুরুত রেখে দিলে, কিন্তু নিজে বড় যেত না—দেখত না। ঘরে গরু আছে মানের আছে। আস্তাবলে ঘোড়া আছে সহিস আছে—ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর আছে পুরুত আছে। আর এ লোকটি ঘরে ঘট পেতে পট টাঙিয়ে নিজে ফুল দেয় চন্দন দেয় জল দেয়। নিজে যা খাবে—তাই ঠাকুরকে আগে ভোগ দিয়ে খায়।

বড়লোক শেষ বয়সে তীর্থে গেল। এর আর যাওয়া হল না। তা ঘরের পটেই প্রণাম করে বলল—তুমিই আমার সর্বতীর্থ।

কিছুদিন পরে একদিন সন্ধ্যে বেলা হব-হব, এমন সময় একটি অনাথ ছেলে এসে ওই বড় বাড়ীতে গিয়ে বললে—বাবা সারা দিন কিছু খাইনি—আর আমার আশ্রয় নাই। দুটো খাবার—আর রাত্রে একটু থাকতে পাব?

বড়লোক বললে—না—না, কোথাকার চোর না ছ্যাঁচড়। রাত্রের জায়গা হবে না। আর খাবার এ অসময়ে সন্ধ্যে বেলা কোথায় পাব? যাও ভাগো!

অনাথ ছেলেটি মুখ চুন করে কিদেতে কাতর হয়ে আসছে, পথে সেই গৃহস্থটির সঙ্গে দেখা। গৃহস্থ বলল—হ্যাঁ বাবা মাণিক—এমন মুখ চুন কেন রে? ছেলে বললে—বাবা—আমি অনাথ, এই চেয়ে চিন্তে খাই, লোকের দাওয়ায় রাত কাটাই; তা আজ আর আহারও জোটেনি—আশ্রয়ও না। রাত্রে যে কোথায় থাকব, কি খাব—তা জানি না।

গৃহস্থ বললে—এস বাবা—আমার বাড়ী এস। এইখানে থাকবে। এইখানে খাবে! নিয়ে গিয়ে একটু গুড় একঘটি জল দিলে। বললে, বস বাবা রান্না হোক খাবে। রান্না হল—খাওয়ালে ছেলেটিকে ডেকে—তার পর বিছানা করে দিলে। ছেলেটি শুলো।

ওদিকে বড় লোকের বাড়ীতে এল—ঠিক সন্ধ্যার মুখে এক হিন্দুস্থানী, হাতে লাঠী এই গোপ এই পাগড়ী—বললে—আমি গয়ার পান্ডার লোক, সেখানে আপনি যখন গিয়েছিলেন—এই আংটীটা ফেলে এসেছিলেন, পান্ডাজী পাঠিয়ে দিলেন। নিয়ে আসছি।

আংটী দেখে চমকে উঠল বড়লোক এ যে হীরের আংটী! কিন্তু তার নয়। তবু লোভ সামলাতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ—হ্যাঁ। [illegible] বস। থাক। ওরে পান্ডাজীর লোককে থাকবার জায়গা দে ময়দা দে ঘিউ দে। কাঠ দে। মিঠাই এনে দে!

রাত্রি দুপুরে, তখন গৃহস্থের মনে হল—যেন কাঁসর ঘন্টা বাজছে—শাঁখ বাজছে [illegible] উঠছে—আর একটা খুব জ্যোতি চোখে লাগছে। চোখ খুলে ফেললে, দেখলে সেই অনাথ ছেলে—মাথায় চুড়া হাতে বাঁশী—হাসছে—বলছে—চল—আমি যে নিতে এসেছি তোমাকে। ওঠ রথ এসেছে। চল। গৃহস্থ রথে চড়লেন। রথ চলল গাঁয়ের ওপাশে রথটা গিয়েছে—তখন গৃহস্থ দেখছেন—বড় লোকের বাড়ী থেকে একজন এই জোয়ান এই গোঁফ এই পাগড়ী হাতে লাঠী বড়লোকটির চুলের মুঠো ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছে— অন্ধকারের দিকে।

গৃহস্থের সঙ্গে ভগবান ছিলেন। তিনি হাসলেন। বললেন—গয়ার প্রেতশিলা থেকে যম প্রেতদূত পাঠিয়েছিল।

গৃহস্থ জিজ্ঞাসা করলে—কেন ভগবান— ও তো অনেক তীর্থ করেছে—বাড়ী দেবতা প্রতিষ্ঠা করেছে—আর আমি—

ভগবান বললেন— আমি স্বর্গেও থাকি না—বৈকুন্ঠেও না—তীর্থেও থাকি না—ভক্ত—আমি তোমার মনেই যে চিরকাল বাস করছি। এবার চল তুমি আমার মনে আমার বুকে বাস করবে।

বৃদ্ধা একমুহূর্তে ভুলে গিয়েছিল। সব সত্য বলে মনে করেছিল। নারান?

গোঁসাই যেন নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিল—নারান? উত্তর দিয়েছিল নিজেই—নারান তখনও নিজে ঠিক নাস্তিক হয়ে ওঠেনি কিন্তু এ গল্পটা সে বানিয়ে বুড়ীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিল। তবে—। হ্যাঁ। তবে মিথ্যে বলার পাপ কি প্রতারণা সে করেনি। ছেলেকে—চাঁদ দেখিয়ে চাঁদকে আয় আয় বলে ডেকে আঙুল দিয়ে কপালে চিৎ দিলে যা হয় তাই হয়েছিল।

থাক—সে কথা। বুড়ী সেদিন ভুললেও—কয়েক দিন পর আবার সুর ধরেছিল। এবার ঝগড়ার সুর নয় দুঃখ পাওয়ার কান্নার সুর! যখন তখন বসে থাকতে হঠাৎ বলে উঠত—আহা হারে। ওঃ! এমন কপাল! মর্তলোকে মানুষ

কুলে জন্মে—! আঃ কিছু হল না। কিছু হল না। শুধু নরক। নরকই ঘেঁটে গেলাম!

এতে বিপিন মৃদু প্রতিবাদ করে। কিন্তু সে মুহূর্তে বুড়ী বলে—লোকের ছেলেতে মজুর খেটে মা বাপকে তীর্থ করায়। আমার এমন গর্ভ! এমন পোড়া পেট! হায়রে! হায়রে! হায়রে! অমনি বিপিন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

আজ হয় তো তাই হয়েছে। এবং আজকের রাগ তার মাত্রা ছাড়িয়েছে। হয়তো এরপর একটা বিশ্রী কান্ড ঘটে বসবে। নারান একটা কাটারী চালাচ্ছিল—একখানা বাঁটুলে জোড়া ধনুক তৈরী করবে। হনুমানের উৎপাত বড্ড বেড়েছে। সে কাটারীটা ও বাখারীখানা রেখে ছুটে গেল। গিয়ে দেখলে সত্যিই একটা বিশ্রী কান্ড ঘটে বসে আছে। বিপিনের বাড়ীর পুরনো মাহিন্দার কানাই বাউড়ী—চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসে আছে। চোখ থেকে জলের ধারা গড়াচ্ছে। লোকটা নিস্তব্ধ। বিপিনের কপাল ফেটেছে, ফুলে উঠে একটা আবের মত দাঁড়িয়েছে এবং সেটা ফেটে রক্ত গড়িয়েছে, একটা শীর্ণ রেখায়। বিপিন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করছে—বেরোও নিকালো অভি নিকালো। এই মুহূর্তে। চাই না—নৌকর মাংতা।

কানাই কোনরকমে বলছে—যাঁ যেতেই চাইছি। আমিও আর থাকব না। ভগমান বললেও থাকব না। কিন্তু আমার মাইনে মিটিয়ে দাও।

—দোব না, দোব না, দোব না।

নারান মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। কানাই বলে উঠল—দেখ দেখ, ঠাকুর মশাই দেখ, ব্যাভারটা দেখ মোড়লের। আমাকে ঠেসে এক চড় মাড়লে—মেরে কেঁদে ফেললে সে।

বিপিন বলে উঠল বেশ করেছি, খুব করেছি, এখুনি যদি না বেরোও তুমি তবে ঘাড় ধরে বার করব। কার ক্ষামতা আটকায়। ঠাকুর মশায়। ঠাকুর মশায়কে টানিশ কেন রে? আমি কারুর ধার ধারি?

ঘটনাটা মায়ের সঙ্গে বিপিনের ওই ব্যাপার নিয়েই আরম্ভ। মা আজও সেই গর্ভকে দোষ দিচ্ছিল। আর আক্ষেপ করছিল। বিপিন তামাক সাজছিল—সে গর্জে উঠেছিল—মা!

মা ভয় খায় নি। সে বলেছিল—কেনোরে মারবি না কি?

মারব না—মরব। গলায় দড়ি দোব।

তা নইলে যোল কলা পুন্ন হবে কি করে। তা তু গলায় দড়ি দিবি ক্যানে? আমিই দোব। বলেই তুলসীতলায় গিয়ে ঠুই ঠুই শব্দ করে মাথা ঠুকে বলতে সুরু করেছিল—আমার মরণ নাই—আমার মরণ নাই। নেবে না তুমি আমাকে?

বিপিনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল—সেও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তুলসীতলায় এসে মায়ের সামনে ওপাশে মাথা ঠুকতে সুরু করেছিল—মরণ দাও মরণ দাও—আজ রাত্তিরে—ওর আগে আমাকে মরণ দাও। না দিলে কাল তোমাকে তুলে বিলের জলে ফেলে দোব। মরণ দাও।

বিপিনের মা স্তব্ধ হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তার বউ ছুটে এসে তাকে ধরে বলেছিল—ওগো তুমি এ কি করলে গো। ওগো, রক্ত পড়ছে গো।

বউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল বিপিন। ওপাশে উঠোনের ওধারে কানাই ছুটে এসে তাকে জাপটে ধরেছিল। মোড়ল।

কানাই বিপিন থেকে বয়সে বড়। তার বাপের আমলের লোক। চুল পেকেছে, কিন্তু দেহে সামর্থ্য আছে। সে এমন জোরে জাপটে ধরেছিল যে বিপিন আর মাথা ঠুকতে পারে নি। তা না পারলেও সে তরুণ জোয়ান—সে ঝাপটা দিয়ে কানাইয়ের হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নিয়েই—সজোরে তার গালে এক চড় মেরেছিল। হারামজাদ!

কানাই বাপ বলে বসে পড়েছিল। কিছুক্ষণ মুহ্যমান হয়ে বসেছিল। বিপিনের মা এসে তার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ডেকেছিল—কানাই। কানাই! ও কানাই।

বিপিন ওতেই থমকে ছিল। কিন্তু মুখের আস্ফালন সে ছাড়ে নাই। বলছিল এত বড় বাড় তোর? ছোট লোক চাকর হয়ে আমার গায়ে হাত। চলে যাও, তুমি চলে যাও। জবাব দিলাম। চাই না।

কানাই সামলে নিয়েও বসেছিল, ওঠে নি, উঠবার ঠিক অবস্থা ছিল না। দুরন্ত অভিমানে

ক্ষোভে সে অধীর হয়ে পড়েছিল। এতকাল সে এবাড়ীতে কাজ করছে, মনিবের এত হিত সে করেছে। মনিবও তাকে ভাল বেসেছে—সেই মনিব আজ—।

সে বসেই বলেছিল—বেশ—আমার মাইনে মিটিয়ে দাও—আমি চলে যাচ্ছি।

কিসের মাইনে? কার মাইনে? দোব না। আমি দোব না।

দেবে না? আমি খেটেছি তার মাইনে দেবে না?

না—না—না। বেরোও, নিকালো, আভি নিকালো। নেহি মাংতা। এখুনি চলে যাও। যা-ও।

আমার মাইনে দাও।

না। দোব না। দোব না। দোব না।

এই মুহূর্তে গিয়ে পড়েছিল নারান।

গোঁসাই বললে—নারান যাবার পর যে কটা কথা হয়েছিল—শুনেছেন। বিপিন আরও একটু সরে গিয়ে তামাক সাজতে বসল আবার।

নারান একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারও মাথার মধ্যে একটা রাগ জমছিল। বিপিন তার কিছু ধারে না কিন্তু কানাইয়ের ধারে এ কথাটা ভুলে যাচ্ছে। ভুলেই যাচ্ছে না শুধু—দেবে না বলে আস্ফালন করছে। মানুষ এমনিই বটে। বিপিনের কিছু আছে কিনা, কানাইয়ের নেই—তাই এই আস্ফালন।

সে বললে—গম্ভীরভাবেই বলে বসল—বিপিন দা, ওর মাইনেটা তুমি মিটিয়ে দাও। বরং কাল আসতে বল। দু'দিন পর আসতে বল। না বলো না। ওটা তোমার অন্যায় হচ্ছে।

—অন্যায়? চম্‌কে উঠল বিপিন?—আমার অন্যায় হচ্ছে?—হুঁ!

—তার মানে?

—তোমার মুখেও এই শুনতে হল নারান?

—কেন? আমার উপকার করেছ বলে তোমার অন্যায়কেও আমাকে ন্যায় বলতে হবে নাকি?

—তাহ'লে নিয়ে যাও ওকে আদালতে। আমার নামে ওকে দিয়ে এক নম্বর ঠুকিয়ে দাও ন্যায় হোক।

—না, তা করব না। তুমি আপনা থেকে দেবে। শুধু মাইনে নয়, এই চড় মারার খেসারৎ দিতে হবে—কানাইয়ের হাত ধরে বলতে হবে, দোষ হয়েছে।

—নারান!

—উঠে এস কানাই। আমার সঙ্গে চলে এস!

সন্ধ্যেবেলা সে কানাইদের পাড়ায় গিয়ে ব'সে এপাড়া-ওপাড়ার আরো মান্দেরী রাখালী যারা করে তাদের ডেকেছিল।

* * *

সনাতন পৃথিবী, মাটি, জল, আকাশ-বাতাস—সেই পুরাতন। মানুষও তার মধ্যে পুরাতন। কিন্তু তার পরিবর্তনের শেষ নেই। মানুষ জন্মায়, শৈশবে-বাল্যে, কৈশোরে-যৌবনে বার্ধক্যের পথে মৃত্যুতে পৌঁছোয়—তা-ও সনাতন। কিন্তু তবু মানুষ কালে-কালে নতুন। পুরাতনকে সে আঁকড়ে ধরে থাকে প্রাণপণে জড়িয়ে। নতুনের আসবার পথ বন্ধ করে দেয়—তবু কাল কোন পথে যে তার মধ্যে নতুনকে সঞ্চারিত করে দেয়—তা মানুষ জানতে পারে না; যখন জানতে পারে, তখন নতুনের উল্লাসের মধ্যে তার মধ্যে পুরাতনের মমতা এবং পুরাতন বিচিত্রভাবে কর্পূরের মত উড়ে গেছে; রেখে গেছে মাত্র একটি গন্ধ। তার নাম স্মৃতি!

এ কথাগুলি নারান গোঁসাইয়ের কথা নয়। সে এসবের খুব ধার ধারে না। এ কথা ক'টি কথকরূপী আমার। কথক তো ব্যাখ্যা করে থাকেন। যা হল এর পর—তা আমি জানি—এ গল্পের শ্রোতারা বুঝতে পারছে। কাল সকল কালেই বিরাট এবং প্রধান কিন্তু একালে তিনি শিঙা হাতে বাঘছাল প'রে উদ্যত ত্রিশূল-ধারী। তিনি মুক্তি-বিধাতা এবার।

গোঁসাই বললে—তাই-ই বললে। সে বললে, নারান মনে করেছিল, বেগ পেতে হবে তাকে। এই নিরক্ষর পায়ের তলায়-চাপা মানুষগুলি উঠতে বললে আদৌ উঠতে চাইবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। ওরা তো উঁচু জাত ভদ্রজাতের পায়ের চাপেই চাপা নেই, নিজেদের বিচিত্র মমতায় ওরা নিজেদের বেঁধে রেখেছে; তার উপর মাথার মধ্যে আছে এক জটিল অপরাধ বোধ! সবতাতেই ওদের অপরাধ হয়। ভদ্র উঁচু জাতের সঙ্গে উত্তর করলে অপরাধ হয়, ছুঁয়ে ফেললে অপরাধ হয়, তাদের খাবারের দিকে দৃষ্টি পড়লেও অপরাধ হয়। কিন্তু আশ্চর্য। সেদিন সন্ধ্যেতে নারান অবাক হয়ে গেল যে, এক কথায় তারা রাজী হয়ে গেল। হিতোপদেশের গল্পে সেই বুড়োর কঞ্চির আটি বাঁধা হয়ে একখানা লোহার কড়ি হয়ে দাঁড়াল। কঞ্চির আটি বাঁধা মুখে বলা যত সোজা কাজে তত সোজা নয়; কঞ্চির গড়নই হ'ল বাঁকাচোরা, সেগুলো আটি বাঁধতে গেলে গায়ে-গায়ে লাগে না। এ যেন এক মুহূর্তে কঞ্চিগুলো সোজা হয়ে গায়ে-গায়ে সেঁটে লেগে এক হয়ে গেল। কথা হ'ল—বিপিনের বাড়ীতে কেউ আর কাজ করবে না; কানাই ছাড়ছে—তার জায়গায় কেউ যাবে না, তা ছাড়াও রাখালটা ছাড়বে—তার এঁটোকাঁটা উঠোন পরিষ্কার করা বাউড়ীর ঝি ছাড়বে; তার গরু কোন গাঁইটে পালের রাখালও চরাবে না!

একদিনেই বিপিনই শুধু নয়—গোটা গাঁয়ের লোক চমকে উঠল।—এ কি?

শুধু ভদ্রলোকই নয়—ওই কানাইয়েরাও চমকে উঠল। তাই তো! এ কি?

নারান নিজেও চমকালো।—তাই তো! এ কি!

কিন্তু পিছুবার কারুর উপায় নেই। শিবু ডাক্তার এল—বাহবা দিয়ে গেল। ব্যাপারটা মিটিয়ে দিয়ে গেলেন ধনদাবাবু। লোকটির ভাষা মিষ্ট, মানুষের মত মানুষ। তিনি মিটিয়ে দিলেন নিজের ঢঙে। নারানকে পর্যন্ত বিপিনের কাছে দোষ স্বীকার করালেন। বললেন—হোক শূদ্র, তোমার চেয়ে বয়সে বড়, ভিক্ষেদাদা—তার সঙ্গে এরকম কথা ঠিক হয়নি। এ কাজ একদিন অপেক্ষা করে ওকে ঠাণ্ডা হতে দিয়ে বুঝিয়ে করাতে হ'ত। ও তো করত। নিশ্চয় করত। স্বীকার কর—দোষ স্বীকার কর।

করলে তা নারান। বিপিনও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু কানাই শুধু শুনলে না কথা, সে মাইনে মিটিয়ে নিয়ে বললে—আমি আর কারুর বাড়ীতেই কাজ করব না বাবু। আমি দিন-মজুর খাটব। আর এই টাকায় গাড়ী-গরু ক'রে ইষ্টিশানে ভাড়াটাড়া বইব। আমাকে মাফ করেন। আর ওই জোটটি আল্গা হলেও বয়ে গেল। তার বাঁধনের দড়িটা বয়ে গেল—নারানের হাতে যেন সে-ও তার সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে।

পুরো একটা বছর সে গ্রামে ছিল না। সেটা একচল্লিশ সাল। সে গুরু ট্রেণিং পড়তে গিয়েছিল। এক বছর পড়ে সে খুব ভালভাবে পাশ করে বাড়ী ফিরল—পাকা পাঠশালার পণ্ডিত হয়ে। সংকল্প করে এল—সে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে। ম্যাট্রিকের কোর্স সে মোটামুটি পড়েছে। সংস্কৃত বাংলায় সে কলেজের পরীক্ষা দিতে পারত! ফিরে এল একচল্লিশ সালের শেষে। তখন পৌষ মাস।

বিশ্ববন্ধু তখন এম-এ পাশ করে রাইটার্স বিল্ডিংসে চাকরীতে ঢুকেছে। ভাল চাকরী। সে বিয়েও করেছে। করেছে—তার অনুপস্থিতির সময় সে গুরু ট্রেণিং পড়ছিল যখন, তখন বউ দেখে সে খুসী হল। বিশ্ববন্ধু তার খুব তারিফ করলে। আর বললে—বিয়ে কর।

সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। তাকিয়েছিল বিলের দিকে।

হ্যাঁ, বিয়ের কথা মনে হয় বই কি! হয়। বিলের ধারে দুটো সারসের মত বড় পাখী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল। একটা একপা গুটিয়ে ঘাড়টা নিচু করে লম্বা ঠোঁটটা নামিয়ে

আধবোজা চোখে দাঁড়িয়ে যেন ভ্রূক্ষেপহীন—আর একটা চঞ্চল—তার লম্বা ঠোঁটটা এর ঘাড়ের উপর দিয়ে ওর পিঠের উপর প্রসারিত। মধ্যে মধ্যে পিঠে মৃদু আঘাত করছে।

নিষ্ক্রিয়টা মাদী। হঠাৎ সেটা পাখা মেলে উড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মদ্দাটাও। ক্যাঁক-ক্যাঁক শব্দ করে অনুসরণ করলে।

ওগুলোর নাম মাণিকজোড়। এ পাখী সচরাচর মারে না কেউ, মারতে নিষেধ আছে। এরই নাম ক্রৌঞ্চমিথুন। কিন্তু মাণিকজোড় নামটা বড় মিষ্টি। ওই পাখী দুটোর দিকে তাকিয়েই বিশ্ববন্ধু বললে—তুইও এইবার বিয়ে কর!

সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বিয়ে? হ্যাঁ বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় বই কি। কিন্তু—!

বিশ্ববন্ধু বললে—ঘরদোর করেছিস, সুন্দর ঘর হয়েছে। এবার গুরু ট্রেনিং পাশ করে এলি, পাঠশালাতে গভর্ণমেণ্ট গ্রাণ্ট পাবি। পাঠশালাতে আজকাল ছেলেও হবে। রায়বাবুর বাড়ীতে টিউশন আছে—। এবার বিয়ে কর। আমি বিয়ে করলাম। গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।

নারান বললে—সব সত্যি। কিন্তু এও তো বললি—আয় কত হবে বল দেখি? সব মিলিয়ে তিরিশ! আর জমি তো পাঁচ বিঘে! এতে কি হবে? এদিকে যুদ্ধ লেগেছে বাজারে আগুন লেগেছে! বাজার তো চড়ছে দিন দিন; ওই তাই মোটা মাইনে পেলে। মাইনে বাড়বে। উন্নতি হবে। কিন্তু আমি? আমি তো এত করেও পাঠশালার পণ্ডিত হয়ে গেলাম। কি করব বিয়ে করে?

—তুই বিয়ে করবি না?

নারান বলেছিল—নাঃ।

তার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছিল বিশ্ববন্ধু। মুখ দেখে মন খোঁজা দৃষ্টি। তারপর হঠাৎ বলেছিল—একটা কথা সত্যি বলবি?

—কি বল? তোকে কোন কথা না বলি?

—তুই কি পলিটিক্স করছিস? মানে দলে জুটেছিস?

বিশ্ববন্ধুর সন্দেহটা ভিত্তিহীন ছিল না বাবু, সে আপনি জানেন, বেশী তো আপনাকে বলতে হবে না! উনিশ শো তিরিশ সালে—আমাদের থানাতে আপনাদের গ্রামের তিনজন জেল গিয়েছিল। আর গিয়েছিল—ডেটেন্যু নরেনবাবু—তিনি এখানে বাস করেছিলেন। তাঁকে ধরেছে এখানকার। বান আসে বাবু—গ্রামের ধারের বাঁধ ভেঙ্গে গ্রামে জল ঢুকে বালি ফেলে মাটি খুলে তার কাজ ক'রে ফিরে যায় কিন্তু ওই বাঁধের ভাঙ্গন দিয়ে অনেক সময় এমন নালার সৃষ্টি ক'রে যায় যে তাকে আর বন্ধ করা যায় না, সেটা নালাই হয়ে যায়। ক্রমে বছরে বছরে সেটা গভীর হয় চওড়া হয়। তাই হয়েছিল এখানে। জেলাতে ষড়যন্ত্র মামলা হয়ে গেল—। এ থানার পাঁচ সাতটা ছেলে জেল গেল আন্দামান গেল। একটা নালা হাতের আঙ্গুলের মত দাঁড়া মেলে ছড়িয়ে গেল। রাজনীতি তখন ওই হাতের আঙ্গুলের মত দাঁড়া মেলে ছড়িয়েছে দেশময়। ধনদাবাবুর কথা বলেছি—শিবু ডাক্তারের কথা বলেছি, বড় বড় পাকাপাকা রাজনীতি কর্মী এ অঞ্চলে আসেন যান। হীরালাল দাশগুপ্ত আন্দামান ফেরৎ। হরিপদ ভার্গব সেও জেলখাটা লোক। এ অঞ্চলটা ওই বিল আর নদীর জন্যে দুর্গম বলে এখানে সকলে ঘাঁটি গাড়তে চেষ্টা করছিল।

কাল তখন আপনি নিজে বলছিলেন—বাঘ-ছাল প'রে ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে নাচবে।

শুধু কাল নাচলে তো হয় না। কালীকে নাচতে হয়। কাল নাচায়—মানুষের বুকের মধ্যে তার প্রকৃতি কালী হয়ে নাচে। তখন কান থাকলে বাতাসে ভেসে আসা গান শোনা যায়—ও মা—দিগম্বরী নাচ গো!

ইউরোপে যুদ্ধ লেগেছে, ইংরেজ হারছে; এ দেশে যুদ্ধ আসি আসি করছে। সুভাষচন্দ্র এ দেশ থেকে নিরুদ্দেশে ভেসেছেন। কংগ্রেস ব্যক্তি সত্যাগ্রহ করেছে—কাজ তেমন হয়নি। তবে একটা কিছু হবে। তার ইসারা যেন মানুষের চোখ ফুটে উঠেছে—গাছপালার ফিস্-ফিসানিতে ভাসছে; আশঙ্কা আর উল্লাস দুই মিলে দিনরাত্রি জুড়ে একটা কি থমথমে ভাব। কংগ্রেসের অধিবেশন আসন্ন।

ক্রমে দ্রুততর হয়। যে চালায় সে একটার পর একটা ঘাট বদল করে দেয়; শক্তির সঞ্চয় বুঝে নারানের জীবনেও তাই হল। তার যে চলা সুরু হয়েছিল—বিপিনের সঙ্গে কানাই বাউড়ীর ঝগড়ার সূত্র ধরে, সেই সূত্রের টানে এসে সে রায়দের সঙ্গে মুখোমুখী দাঁড়াল। তাতে তার ভয় ছিল না। কিন্তু একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।—সে, হয় তো শুনবে—রায় কথাটা শুনে রেগে উঠেছিলেন এবং তা থেকেই উঠতে গিয়ে পড়ে গেছেন এমন করে।

শবযাত্রার সঙ্গে সে গিয়েছিল। রায় বাড়ীর ব্যাপার লোকজনের অভাব হয়নি, কিন্তু এসব কাজে নারানের মূল্য—অপরিসীম। শত্রুতা—যার সঙ্গে যতই থাকুক—নারান শ্মশানে বন্ধু সকলের এবং তার চেয়ে সেখানে বড় বন্ধু আর সে সময় ও অঞ্চলে কেউ ছিল না। তাকে ডাকতেও হয় না সে নিজেই আসে। এখানেও সে নিজেই এসেছিল এবং অগ্রণীর মত সব কাজেই সে করেছিল—সেখানে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেননি—সে রূপলালও না, রায়বাড়ীর কন্যাও না। যদি ভেবে থাকে নারানের কাছে এ বেগার পাওনা—তা ভাবুক—নারানের মনেও সে প্রশ্ন জাগেনি। শব গিয়েছিল—কয়েক ক্রোশ দূরে গঙ্গা তীরের ঘাটে। গ্রামের শ্মশানে মুখাগ্নি করে কন্যা বাড়ী ফিরেছিলেন। নারানরা শব নিয়ে গিয়েছিল। ফিরল পরদিন সকালে। ফিরে রায় বাড়ীর দোরে দাঁড়িয়ে নিম-পাতা মুখে দিয়ে বসেছিল—এখানে চা এবং মিষ্টির বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে। খেয়ে সকলে বাড়ী যাবে। বেরিয়ে এলেন ভূতনাথ বাবু গায়ে গেঞ্জি, সবল-স্বাস্থ্যবান মানুষ, পরনে কাঁচি ধুতি, খালি পা, মুখে-চোখে কালো রঙেও সেই পরিচ্ছন্ন মার্জনা, হাতে সিগারেট। এসে দাঁড়িয়ে বললেন—আসুন, সেখানে কষ্ট-টষ্ট হয়নি তো আপনাদের? শ্রীমান রূপলালের তো গুণের অবধি নেই। বড় হিসেবী লোক। আধ পয়সায় সিকি পয়সা কাটে।

ভটচাজিদের গোবিন্দপদ বললে—না-না। কষ্ট কিছু হয়নি।

—দাহ সুশৃংখলে হয়ে গেছে? ভাল হয়েছে?

—একেবারে শেষ করে দাহ হয়েছে। সুন্দর পুড়েছে। ওদিকে নারানের পারওগমও যেমন তেমনি যত্নের সঙ্গে করে।

গোসাই একটা মানুষ এখানকার মধ্যে। তারপর ভাল তো গোসাই? গত দুবার এসে দেখা হয়নি, শুনলাম গুরুট্রেণিং পড়তে গিয়েছ। খুব ভাল পাশ করেছ নাকি?

হেসে নারান বলেছিল—হাঁ করেছি। কবে এলেন?

—কাল সন্ধ্যেবেলা।

বাড়ীর নায়েব এসে বললে—দিদি বললেন, আপনাকে ভিতরে যেতে।

—ভিতরে? চলুন।

দালান থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, না। আমার যাবার প্রয়োজন নেই। ও আমি যা বলেছি—শেষ কথা। শ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ করুন, দানসাগর করুন, তিলকাঞ্চন করুন—কোন আপত্তি নেই আমার। খাওয়ান-দাওয়ান যেমন করবেন। আমার কথা—ধানের খাতকদের কাছে যা সুদ পাওনা আছে, সেটি সব ছাড়তে হবে। শুধু আসল নেওয়া হবে। বলবেন—তাতে করাব অক্ষয় স্বর্গ হবে। ও যদি হয় আমি আছি। নইলে কুটুম্ব এসেছি, কুটুম্বের মত থাকব, তার বেশী কোন সম্বন্ধে নেই।

নারান অবাক হয়ে গেল। মনে মনে নমস্কার করলে সে।

বাইরে বেরিয়ে এসে ভূতনাথ হাঁকলেন—কই—এদের চা-জলখাবার কই? চা কি আসাম থেকে আনতে গেছে?

চা, জল খেয়ে মুগ্ধ হয়ে বাড়ী এল নারান। রায়বাড়ীর যে সম্পদ-সম্পত্তি মানুষকে, গরীবকে আইনের ফাঁক দিয়ে শোষণ করে জমা হয়েছে, সে সম্পদ সে সম্পত্তি এবার একটি উদার মানুষের হাতে পড়ে মানুষের কল্যাণ করবে। শুধু নারান নয়, সারা গ্রামে, আশে-পাশের গ্রামে কথাটা ছড়িয়ে যেতে দেরী হল না। নারান ঠিক করলে—থানায় কানাইদের নিয়ে গিয়ে ওই মামলাটা যা হোক করে চাপা দেবে, বিচার করাবে এই লোকটিকে দিয়ে।

কানাইকে ডেকে সে বললেও সে কথা। কানাই বললে—আপনি যা বলবেন তাই হবেন। আপনিই তো জোর গো!

বিকেল বেলা সে গেল রায়বাড়ী। কন্যা শ্রাদ্ধ করবেন। ত্রি-রাত্রির শ্রাদ্ধ। এখন অবশ্য সংক্ষেপেই হচ্ছে। পরে সপিন্ডীকরণ শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গ হবে। তখনই বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম যা হবার হবে। তবুও রায়বাড়ীর এই কৃতী সম্পত্তিশালী ব্যক্তির শ্রাদ্ধের সামান্য আয়োজন —ও নয়। আশপাশ গ্রাম থেকে নানান ভদ্রজন এসেছেন। মাঝখানে বসে আছেন ভূতনাথবাবু।

ল পা—গায়ে চাদর। শ্রাদ্ধের কথাই হচ্ছিল! নমস্কার করে দাঁড়াল। তাকে দেখেই তিনি লেন—এস গোঁসাই, বস। অশৌচ—নমস্কার করতে নেই, কিছু মনে করো না। বস। া হচ্ছিল কাঠের; রান্নার জন্যে কাঠ। তুল গাছ কাটা হয়েছে। গাছটা একটা দণ্ড গাছ এবং বাড়ীর খিড়কীতেই গাছটা। ন—ভটচাজ বাড়ীর দক্ষিণ দিকটা অন্ধকার র নয়—অন্ধকার করে। বহু বলাকওয়া, রোধ, প্রতিবাদ করেও রায় ওটা কাটেন নি দিন। ওটাতে তেঁতুল হয় প্রচুর। এবার ঠর জন্য ওটাকেই কাটিয়েছেন ভূতনাথবাবু। -কন্যার প্রতিবাদ সত্ত্বেও। ভূতনাথবাবু ছিলেন—সংসারে হে। তেঁতুলের অভাব , অভাব যত মনের মিলের। তেঁতুল কিনলে বে। এ তো দোকানে মেলে না। টকের ল মধুর ব্যবস্থা করলাম।

এরই মধ্যে শ্রীপতি গমস্তা এসে নমস্কার দাঁড়াল। কোথাও গিয়েছিল, ট্রেণ থেকে য় আসছে। পায়ে কাম্বিসের জুতো, গায়ে -চাদর। বগলে গামছা-বাঁধা একটা পোঁটলা। নাথ বললেন—ফিরলে? সব কাজ হয়ে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সব জিনিষ পেয়েছ?

—হ্যাঁ। দাম বেশী নিলে, তবে জিনিষ উত্তম জিনিষ।

তেমন আর পরান দুটো বড় বোঝা মাথায় হাজির হল এবার। একটু চকিত হল নারান। বুঝতে পারলে জামিন নিয়ে ফিরছে ওরা এবং শ্রীপতি গমস্তার সঙ্গেই যখন ফিরছে, তখন এর সঙ্গে কিছু যোগও আছে।

—যা বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা। তারপর নারানের দিকে তাকিয়ে বললেন—দাঁড়িয়ে রইলে গোঁসাই, বস। ওঃ, জায়গা নেই! তা—ওরে একটা কিছু আন।

—না-না, আমি এই দাওয়াতেই বসছি!

—না। তুমি লীডার লোক। মান্য তোমার প্রাপ্য। ওরে আন কিছু! এই হারামজাদারা শুনতে পাচ্ছিস না?

কাকে বললেন বুঝলে না নারান, তবে বুঝলে, ভূতনাথবাবু উত্তপ্ত হয়ে উঠেছেন। এবং ঐ মানুষটির জাত আলাদা।

একটু অপেক্ষা করে সে হঠাৎ উঠে বললে —নমস্কার। আমি আজ যাই।

—না হে। বস, বসতে বলছি বস।

—আমার কাজ আছে।

—তোমার সঙ্গে আমার কাজ আছে। বস।

—কি কাজ বলুন!

—বলব। বস।

বসল নারান। ভূতনাথ ভদ্রলোকদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এঁদের সামনেই বলব। আচ্ছা তাই বলি। প্রথম ব্রাহ্মণ ভোজনে পরিবেশনের ভার তোমার। ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে—

নারানের কপালে এতক্ষণ একটির পর একটি কুঞ্চন-রেখা ফুটেছিল—এবার তার সবকটিই এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সে হেসে বললে—নিশ্চয়! যা বলবেন তাই করব। দেখবেন—এতটুকু বিশৃংখলা হবে না।

—তা জানি। তুমি মস্তবড় লীডার একজন। বাউড়ী-ডোম-বাগদী এরা তোমার কথায় ওঠে বসে। তা কাল সব তাদের ডেকে ঘাসটাস ছাঁচা-ছোলার কাজ করিয়ে দেবে। মুড়ি পাবে, ভাতের চাল পাবে—চারটে পয়সা পাবে।

—বেগার?

—হ্যাঁ বেগার! শুনেছি—বেগার দেওয়া বারণ হয়েছে।

—তাই ওরা ঠিক করেছে।

—ওরা নয় তুমি!

নারানের কপালের যে কুঞ্চন রেখাগুলি মিলিয়ে গিয়েছিল, সেগুলি এবার একে-একে নয়, এক মুহূর্তে একসঙ্গে জেগে উঠল। বুকটাও দ্রুত স্পন্দনে স্পন্দিত হতে লাগল—মাথার মধ্যে একটা উত্তপ্ত কিছু যেন ঘুরছে বলে অনুভব করলে, কান দুটো তখন গরম হয়ে উঠেছে। এতগুলি লোকের দৃষ্টি যেন তাকে ছুঁচের মত বিঁধছে বলে মনে হল তার। সে প্রাণপণে নিজেকে স্থির রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসেই বললে—সে কি আমি অন্যায় করেছি? বাবু বলা সে তখন ছেড়েছে কিন্তু কি বলবে বুঝতে পারলে না। একটু থেমে সে আবার বললে—অন্ততঃ আপনার কাছে এটা শুনব আশা করিনি!

—কেন? তোমার কথায় হাসি মারব না বলেছিলাম?

—হ্যাঁ।

—হাঁস আর মানুষ এক নয় গোঁসাই। হাঁস বনোজাত। তাদের নিয়ে ঘর করতে হয় না। তাদের গুলী না ক'রে টিন বাজালেও পালায়। মানুষ নিয়ে ঘর করতে হয়। শোন বড়লোকে গরীবদের চুষে খায় এও যেমন আমি পছন্দ করি না তেমনি গরীবরা ভদ্রলোকের সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান করে মাথার উপর দিয়ে চলতে চায়—এও আমি পছন্দ করি না। যাদের জ্ঞান আছে তারা কেউ করে না।

—তারা কারুর অপমান করে না আর মাথার উপর দিয়েও যেতে চায় না।

—চায়। কানাই বাউড়ী তাই গিয়েছে। রায় বাড়ীর মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে। আর লীডার সেজে তুমি তাদের যেতে বলেছ।

—রায় বাড়ীর চাকর চোর হলে তাকে ধরে থানায় দেওয়া আর রায়বাড়ীর মাথার উপর দিয়ে যাওয়া এক কথা?

—জিজ্ঞাসা কর পাঁচজনকে। কি বলেন তাঁরা! সমস্ত লোকের আজ বলতে বিপদ হয়েছে রাখাল মাস্টের নিয়ে।

—যদি হয়ে থাকে তবে দশজনের তাতে সুবিধে হয়েছে। দশজনের কেন বিশজনের।

—বিশজনের না-হোক তোমার হয়েছে।

—আমার? না।

—ভাল ক'রে ভেবে দেখো। তুমি যা উপকার তাদের করছ, তার থেকে পাঁচজনে অনেক বেশী উপকার করে তাদের।

—উপকার? হাসলে নারান।

—নয়? যার নেই তাকে দেয় না পাঁচজনে? তুমি যখন এসেছিলে তখনকার কথা ভাব।

—আমি কিছু করি নি?

—তুমি করলেই আমাকে করতে হবে; মানুষ কেন—জানোয়ারেও তা ক'রে পোষ মানে। শোন—পোষা জানোয়ার বদমেজাজী হলে তাকে মানুষ বেচে দেয়, শেষ পর্যন্ত মারে। ওদের বদমেজাজ ক'রে দিয়ো না।

—ভেবে দেখব। বলে সে উঠে চলে এসেছিল আর দাঁড়ায় নি।

বাড়ী এসে যত ভেবে দেখেছিল কথাগুলো তত তার অন্তর বিদ্রোহ করে উঠেছিল। তারপর সে নিজে গিয়েছিল বাউড়ী পাড়া। সেখানে বসে অন্য পাড়ার লোকদেরও ডাকিয়ে এনে বলেছিল—দেখ তোরা ভেবে কি করবি! যাবি বেগার দিতে?

কানাই বলেছিল—না। কিন্তু অপর সকলে চুপ ক'রে বসেছিল মাথা হেঁট করে। চুপ ক'রে থাকাটা সংসারে সম্মতি লক্ষণ বটে কিন্তু তার সঙ্গে মাথা হেঁট করলে হয় উল্টো। নারান বুঝলে ওরা তার দিকে তাকাতে পারছে না, লজ্জা হচ্ছে।

আবার সে জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—কি—রে? বল!

এবার একজন বলেছিল—উনি তো এসেই পানের বাড়ি ছেড়ে দিলেন গো! তারওপর রায় মশায়ের কাজ বলে কথা। ছেরাদ্দ। রায় মশায় তো ফিরবেন না আর!

নারান চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর বললে—বেশ যাবি!

কানাই বললে—আমি যাব না আজ্ঞে।

এরপর হয় তো মিটে যেত। সে তাই আশা করেছিল। কানাই সত্যিই যায় নি বেগার দিতে। অন্য সকলে গিয়েছিল। সে নিজে শ্রাদ্ধে যথাসাধ্য খেটেছিল। নারানের যথাসাধ্য কম নয়, অনেক। পরিবেশনের ভার সেই নিয়েছিল, ছেলে-ছোকরাদের নিয়ে খুব শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্রাহ্মণভোজন, সৎ শূদ্র ভোজন শেষ হয়ে যখন গরীবের দল খেতে বসল, তখন রাত্রি দশটা। তখন ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকজন পালিয়েছে। বাকী সব বসে পড়ে বললে—আর পারছি না। তখনও নারান কাজ করছে। সে কিছু সংজাতির ছেলে নিয়ে পরিবেশন চালাতে লাগল। পরিবেশনের মধ্যেই সে পড়ল আছাড় খেয়ে। একটা জায়গায় ডাল পড়ে পিছল হয়েছিল—একটা ভাতের বালতী হাতে হনহন করে যেতে গিয়ে পা পিছলে গেল। এবং এমন পড়ল যে, নারান যে নারান সে-ও কিছুক্ষণ উঠতে পারলে না। কোমরে লেগেছিল তার। সেই আঘাত সামলাতে তাকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল তিন দিন। প্রথম দিন নিজে এসেছিলেন ভূতনাথবাবু তাকে দেখতে। বাড়ী থেকে হোমিওপ্যাথিক বাক্স এনে তাকে আর্ণিকা খাইয়ে গিয়েছিলেন। বাকী ক' দিন অজয় হাজরা এসে খোঁজ করে গেল ভূতনাথবাবুর হয়ে। সে বললে—ভূতনাথ-বাবু পাঠালেন। খাতাপত্র নিয়ে ব্যস্ত, আসতে পারলেন না। মনটাও ভাল নেই।

তার কাছেই শুনলে—ঢপের কীর্তন এসেছিল। তাই নিয়ে একটা অশান্তি হয়ে গেছে। বুঝলি না—শ্বশুরের সম্পত্তিতে সুখ নাই।

নারান হেসেই বলেছিল—তা ভাই রায়-কন্যে নিশ্চয় রাগ করতে পারেন! ব্যাটাছেলের দল আনলেই পারতেন।

—ঢপের জন্যে আমরা ধরেছিলাম। বুড়োরা পর্যন্ত। উনিও তখন মত দিয়েছিলেন। ভূতনাথবাবু রসিক লোক। গান-বাজনা বোঝে। ঝগড়া, ভূতনাথবাবু কেত্তনের পর ওদের বাসায় গিয়ে বৈঠকী গান শুনেছিলেন। একলা নয়—আমরাও ছিলাম।

অজয় হাজরাদের জানে নারান। সে হাসলে।

অজয় বুঝলে হাসির অর্থ। সে বললে—তাছাড়া ঝগড়া ও নিয়েও নয়। আসল ঝগড়া—ভূতনাথবাবু বলেছিলেন কাল স্ত্রীকে যে, রায় মশায়ের নামে একটা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা করা হোক। স্ত্রী বলেছিল—ওসব নয়, ওই শিবতলা বাঁধিয়ে দাও, আর মন্দির মেরামত করিয়ে মার্বেল ট্যাবলেট বসিয়ে দাও। ভূতনাথবাবু বলেছিলেন—পাড়াগেঁয়ে সেকেলে—ওইসব ইয়েগুলো ছাড়। ব্যাস্, অমনি হয়ে গেল—হ্যাঁ শহুরে আধুনিক মত হলে তোমার সুবিধে হয়। ঢপ আসে—ফূর্তি করা হয়! তারপর আর কি? আমার বাবার টাকা!

নারানের কোমরে সেঁক দেবার জন্য বুড়ী বিপিনের মা তার ভিক্ষে-মা এসেছিল। অজয় বলেছিল—আমি উঠি।

নারান জিজ্ঞাসা করেছিল—আমার কথা কিছু বলছিলেন? অজয় বললে—এই তো আমাকে পাঠালেন। নারান ঘাড় নেড়ে বললে—না—সেই কানাই-টানাইদের কথা নিয়ে! অজয় হাসলে—কি বলবেন? মিটিয়ে নিলেই মিটে

যাবে! চলে গিয়েছিল অজয় হাজরা। নারান ভাবছিল, মিটিয়ে নেবে? ভাবনাটা ভাবতে ভাবতেই মিটবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। ডোমন-দের মামলার দিন এসে গেল। সেও সাক্ষী ছিল। আদালতে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা সে-ও বলতে পারলে না, কানাইরাও না। ডোমনের এক মাস জেল হয়ে গেল।

রূপলাল গমস্তা সঙ্গে সঙ্গে আপীল করে জামিনে ডোমনদের খালাস করে তাদের সঙ্গে একসঙ্গেই বাড়ী ফিরল। এবং আস্ফালনের আর বাকী রাখলে না। কানাইরা এবং তাদের সঙ্গে সে চুপ করেই ফিরে এল। গ্রামে ঢুকবার সময় ঘুরপথে রায়বাড়ী এড়িয়ে অন্য পথে গাঁ ঢুকল।

গোঁসাই বললে—না, নারান ভয় পায়নি। না। কানাইরা পেয়েছিল। পাবারই কথা। নারানের চক্ষুলজ্জা হয়েছিল। ভূতনাথবাবুর কাছে চক্ষুলজ্জা। লোকটি নিরীহ মানুষ। সুদের ধান ছেড়ে দেয়, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানা করতে চায়, সে তার বাড়ীতে পড়া কোমরে দরদ হয়ে পড়েছিল বলে নিজে দেখতে এসেছিল, ওষুধ দিয়ে গেছে। অজয়কে পাঠিয়েছে দেখতে। মিটমাট করতে করতে করা হল না!

* * *

তবু নারান ভাবছিল। মিটমাট কি করে হয়—এ নিয়ে চিন্তা সে করছিল। ভয়ে নয়, ভূতনাথবাবুর বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে একটা আকর্ষণ আছে। সে আকর্ষণে শুধু অজয় হাজরাই আসে না, ধনদাবাবু আসেন, শিবু ডাক্তারও আসে। দু একদিন হীরালালবাবুর আসার খবরও পেয়েছে সে।

তখন বিয়াল্লিশের প্রথম। জানুয়ারীর শেষ ডোমনের জেল হয়েছে। বাউড়ীরা দল ভেঙেছিল, আবার জোট বাঁধছে। খবরের কাগজে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনার কথা বেরুচ্ছে। যুদ্ধের কালোমেঘ পূব দিকে সাইক্লোনের চেহারা নিয়ে সন্ সন্ করে উঠছে। ভূতনাথবাবুর কাছে কাগজ আসে হিরণহাটি থেকে। হিরণহাটিতে কাগজের এজেন্সী হয়েছে, সেখানে কলকাতার সকালের কাগজ বেলা দুটোয় আসে, ভূতনাথবাবুর লোক—সে কাগজ নিয়ে আসে। তাই নিয়ে আলোচনা হয়। নারান যেতে পারে না। সে নিত্য দুপুরে যায় হিরণহাটি, সেখানে বাজারে কাগজ পড়ে আসে।

জীবনে একটা অশান্তি এসেছিল। ধনদা-বাবু তাকে ডেকেছেন, সে যায়নি। শিবু ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ডাক্তার বলেছিল —বড় ভাল কাজ করছ গোঁসাই। আমার ওখানে যেয়ো না। অনেক কথা আছে। বুঝছ তো—একটা মহামারণ ঘটবে এইবার! তবু সে যায়নি।

একটা নেশা! একটা নেশা তাকে ধরেছিল।

মাঠে চাষ করতে করতে তেষ্টা পায়। হয়তো জমিতে টানাটানি জল—চাষটা কোন-রকমে সে পুঁতে না ফেললে সব খারাপ হয়ে যাবে, সে সময়ে ক্ষিধে মনে থাকে না—কিন্তু তেষ্টা মানে না; লাঙল থামিয়ে সামনের দিকে ছোটে ওই চাষী-বউ দূরে খাবার জলের ঘটি নিয়ে আসছে।

নারানের জীবনে সেই সময়টায় সেই তেষ্টা পেয়েছিল। হিরণহাটিতে সে শুধু কাগজ পড়তে যেত না, সে ট্রেন দেখত। ট্রেনে দেখত মেয়েদের মুখ। যতদূর মনে পড়ে—কালো সুন্দর মাঝারি দেখতে যেমনই হোক—সে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দেখত।

পাপ কামনা—? না! না—নয়ই বা কেন; আংশিক বটে। পুরো নয় সে বলতে পারি। বিয়ের কল্পনা করত। বিয়ের জন্যে অনেকেই তাকে তখন বলছিল—নারানএর একটি মেয়ে আছে রে,—বলছিল—তুই যদি বিয়ে করিস। তখন কাল পাল্টেছে—বিয়েতে টাকা লাগবার কথা নয়। আর তার রোজগার তখন সামান্য বটে কিন্তু ওই সামান্যতে তাদের ও অঞ্চলে সবাই বিয়ে করে। কিন্তু বিচিত্র কথা—বিয়ের কথায় মন সায় দেয় না। মনের সামনে এসে দাঁড়ায়—তার দেখা—মার্জিত রুচির আধুনিকা মেয়েদের মুখ, তারা তাকে বারণ করে। শুধু তাই নয়—গ্রামের কয়েকটা ব্রাত্য স্বৈরিণী মেয়ে তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তখন আকর্ষণ করতেও চেষ্টা করে। ওই কানাইয়ের একটা মেয়ে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল—দেখতে মেয়েটার মধ্যে একটা লালসা জাগানো কিছু ছিল, কি তা বলতে পারব না, নারান তার দিকে ভাল করে তাকায় নি। নাম ছিল—সুরো, সুরধনী কি সুরবালা তা জানতে চেষ্টা করেনি সে। কানাইয়ের সম্পর্ক ধরে সে ছুতোয়-নাতায় প্রায় আসত। হাসত। রসিকতা করবার চেষ্টা করত। আরও কয়েকটা মেয়ে তারা সন্ধ্যেবেলা ইচ্ছে করে বিলের ধারে যেত, নারান যেখানটিতে বসে থাকত বিলের দিকে তাকিয়ে—ওই মাণিকজোড়দের দেখত, ওই হাঁসেদের দেখত, সেইখানটার কাছাকাছি ঘুরত; জমি থেকে দুটো ছোলার শাক কি কলমী-শুষনীর ডগা খুঁটে খুঁটে তুলে আনত! তুলত আর গলা মিলিয়ে একসঙ্গে গান করত। ওদের পুরুষরাও থাকত, মাঠে কাজ করত; তাদের সামনেই তার দিকে তাকাতো, কটাক্ষ হানত, রসিকতা করত, তার সঙ্গেও বটে, নিজেদের মধ্যেও বটে। কিন্তু পুরুষদের ওসব গা-সওয়া; কতকাল ধরে সয়ে সয়ে ওটাতে ওরা প্রতিবাদের বা শাসনের কিছু দেখতে পেত না। তার উপর নারানের উপর বিশ্বাস ছিল তাদের। হয়তো বা তাদেরও লোভ ছিল—এই ঠাকুরটিকে একটু বেশী আপনার করে পেতে।

নারানের বয়স তখন বাইশ-তেইশ। লম্বা গৌরবর্ণ, সবল শক্ত দেহ, বুকের প্রশস্ত ছাতি, মাথায় লম্বা চুল; মেয়েদের দেখে পুরুষের তৃষ্ণা জাগে, সেই হিসেবমত নারানের ধারণা—মেয়েদেরও তাকে দেখে তৃষ্ণা জাগত। কিন্তু ওদের প্রতি তৃষ্ণা জাগতে পেত না নারানের, ট্রেনে দেখে আসা কোন একটি সুন্দর মুখ তার মনে জেগে থাকত। তাছাড়া প্রতিষ্ঠার পুণ্যে বাঁধন। তাকাতে গেলেই বাঁধনটা যেন কষে যেত —পীড়া দিত তাকে।

থাক, হয়তো বেশী বকছি। বেলা দেখে গোঁসাই বলেছিল—বেলা ফুরিয়ে আসছে। সূর্য্যি ঠাকুরের মেশিন—ওতো মাপ করা, একটু বাড়াও বললেও বাড়াবে না।

৬ই ফেব্রুয়ারীর কথা বলছিলাম—।

৬ই ফেব্রুয়ারী ট্রেণ দেখবার জন্যে স্টেশনে সে দাঁড়িয়েছিল। চোখে পড়ল আশ্চর্য সুন্দর একটি মেয়ে। তার চোখে লাগল আশ্চর্য সুন্দর। যেমন রূপ, তেমনি রুচি। ইণ্টার ক্লাসে যাচ্ছিল। নারান লোলুপের মত দেখছিল; চমক ভাঙল—গার্ডের হুইসিলে। তারপর যা করলে, তা নিজেও জানত না যে, সে তা করতে পারে। টিকিট-চেকারের কাছে ছুটে গিয়ে বললে—আমি এই ট্রেনে যাচ্ছি, টিকিট কাটা হয়নি, ট্রেনে নেবেন। জংসন যাব। ইণ্টার ক্লাসেই উঠে বসল সে। জংসন পর্যন্ত তাকে দেখতে দেখতে গেল সে। সে-মেয়ে তার স্বামী এবং বোধ হয় ননদদের সঙ্গে কথা বলছিল—তার দিকে তাকালেও না। না তাকাক, ক্ষতি নেই নারানের, সে দেখতে দেখতে গেল।

জংসনে হঠাৎ যেন নাটক হয়ে গেল। কলকাতার ট্রেন থেকে নামল বিশ্ববন্ধু।

বিশ্ববন্ধু বললে—তুই? সে-ও বললে—তুই?

এরই মধ্যে সে মেয়েরা ওই ট্রেনে চলে গেল। বিশ্ববন্ধু বললে—'কাজ আছে সদরে।' সেক্রেটারিয়েট থেকে স্পেশাল মেসেঞ্জার হয়ে কাগজ নিয়ে আসছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেবে। বললে—ওরে ভালই হল, তোর সঙ্গে দেখা হল। খুব সাবধান ভাই। দেশজুড়ে যা হবে, তা ভাবতেও প্রাণ শিউরে ওঠে। বার্মা চলে গেছে, আমাদের প্রভুরা হটছেন,—একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। এদিকে দেশে—। চুপ করে গেল সে। তার মনে ছিল প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। এ-কথায় ছেদ টেনে বলেছিল—কিন্তু তুই কোথায় এখানে?

সে বিশ্ববন্ধুকেও মিথ্যে কথা বলেছিল। বোধ হয় বলা যায় না এই কথা কোন মানুষকেই। সে বলেছিল—ভাই, ভাল লাগছিল না কিচ্ছু, ভারী খারাপ লাগছিল, তাই চড়ে বসলাম ট্রেনে। যাই জংসনে মেন লাইনের ট্রেন দেখে আবার সন্ধ্যের সময় ফিরে আসব।

বিশ্ববন্ধু বলেছিল—চল, আমার সঙ্গে চল, আজ সন্ধ্যেতে কাজ সেরে রাত্রিটা ওখানে থাকব ডাকবাংলোতে, কাল সকালে আমি চলে যাব কলকাতা, তুই যাবি বাড়ী—।

তাই করেছিল সে। বিশ্ববন্ধুর সঙ্গে সদরে গিয়েছিল। সন্ধ্যের পর থেকে অনেক গল্প করেছিল। বিশ্ববন্ধু তাকে বার বার বলেছিল—দেখ, তুই অনেক ভাল কাজ করিস। মন্দ ভেবে কোনটা করিসনে আমি জানি, বিশ্বাস করি। তবু এ-পথ কাদের জানিস, যারা সারাটা জীবন পুড়তে পারবে, তাদের।

সে বলেছিল—হুঁ। তাতো বুঝি। কিন্তু। বিশ্ববন্ধু প্রশ্ন করলে—কিন্তু কি?

—থাকতে পারি না যে। আমার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আচ্ছা তুই বল—ওইভাবে চোখ রাঙাবে আর তাই সইতে হবে? একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—বে

তুই মিটিয়ে দে।

—দোব। আমি এবার যখন বাড়ী আস তখন নিশ্চয় দোব। লোকটির দোষও আ আবার গুণও আছে। করিয়ে নিতে পার অনেক কাজ হবে। তা ছাড়া—

—কি? বড় দুঃসময় আসছে রে। ও করবে করুক, বড়লোকের জামাই সামলা কিন্তু তুই—আমি বুঝতে পারছি না তোকে তো জানি—একটা ঝোঁকের মাথায় যা করে নিজেকে শেষ করে ফেলবি! না ভী-ষণ সময় আসছে।

পরদিন বাড়ী ফিরল সে। ফিরেই দেখল ভীষণ সময় তার ঘরের উঠোনে এসে হা হয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে তার। পুলি দারোগা বসে আছে, দুজন কনেষ্টবল দাঁ আছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে রূপলাল। পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের লোক, বাউরীরা, বিপিন, বিপিনের মা আছে তার দাওয়ায়।

খবরটা সে পেয়েছিল স্টেশন থেকে ঢুকবার পথেই। সুরো কানাইয়ের ছুটেছিল হিরণহাটির দিকে। কানাইয়ের সার্চ হয়ে গেছে। সে তারই খবর নিয়ে কানাইয়ের মনিব হিরণহাটির চালের দত্তমশায়কে দিতে। কানাই এখন চাল-ধান বয় গাড়ীতে। সে তাকে দেখে বলেছিল—ঠাকুর, তুমি বাড়ী যেয়ো না। সবিস্ময়ে সে সুরো বলেছিল—থানা পুলিশ বাড়ীতে। রূপলাল গমস্তা নিয়ে

থানা পুলিশ রূপলাল ডেকে এনেছে বাড়ীতে? মাথার মধ্যে মুহূর্তে আগুন উঠেছিল। সে হন-হন করে গ্রামের ছুটেছিল। সুরো বলেছিল—ঠাকুর! ধরেছে। তুমি আর যেয়ো না।

নারান তা শোনেনি। ভয়ের কোন কথা নাই তার! তার উপর তার ক্রোধ। সে সে সৎ। তার সুনাম আছে। তার সম্পত্তি টাকা নাই—কিন্তু তার মান আছে। টাকার জোরে পাষণ্ডেরা এই অত্যাচার আর সে তাই সইবে?

বাড়ী এসে ঢুকেই সে বুক দাঁড়িয়েই বলেছিল—কি? কি ব্যাপার বাড়ীতে?

—চোর। এই চোর। আমি রাত্রে উঠেছিলাম—পুকুরপাড় দিয়ে চলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কে? সাড়া দিলে চলে গেল। সে ওই! ওই চুরি করেছে। রূপলা গমস্তা বলে উঠল।

নারান যা করলে, সে নিজেও তা জীবনে কখনও আগুন জ্বলেছে আপন জ্বললে বুঝতে পারতেন। নারান এক মেরে বসল রূপলালের গালে। প্রচণ্ড বাপ বলে বসে পড়ল সে, মুখখানা রক্তাক্ত গেল। দুটো দাঁত ভেঙে পড়েছে। চীৎকার উঠল—মিথ্যেবা-দী!

দারোগা হেঁকে উঠল—পাকড়ো, এই— সঙ্গে সঙ্গে একটা কনেষ্টবল ঝাঁপিয়ে পড় তার উপর। নারান তখন জ্ঞানশূন্য, সে তাকে মারলে এক ঘুষি। তখন আরও একজন কনেষ্টবল তাকে এসে ধরেছে। কিছুক্ষণ

তার সম্বিত ফিরল। এতক্ষণে সে জানতে পারলে—রায়দের ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরের গহনা চুরি হয়েছে। ঠাকুরের গহনা, শালগ্রামের সোনার পৈতে, সোনার ছাতা, রুপোর সিংহাসন।

রূপলাল গমস্তা বলেছে—সে রাত্রে বাইরে উঠেছিল, পুকুরপাড়েই গিয়েছিল; পুকুরটা ঠাকুরবাড়ীর খিড়কী। সে দেখেছে একজন চলে যাচ্ছে পুকুরপাড়ের পাশের রাস্তা ধরে। সে ডেকেছিল—কে? কে? লোকটি সাড়া দেয়নি। রূপলালের দৃঢ় ধারণা, সে নারান গোসাই! অন্ধকার রাত্রি—তবু তার চলন-গড়ন দেখে চিনেছে।

তাছাড়া শালগ্রামের পৈতে, তার সিংহাসন, ছাতা—এ ব্রাহ্মণ ছাড়া কে নেবে। শূদ্রে কি স্পর্শ করতে পারে? পারে না। পারা সম্ভবপর নয়। এক অন্য ধর্মাবলম্বী চোর চুরি করতে পারে—কিন্তু সে শালগ্রামটিকে পাশে নামিয়ে রেখে যাবে না। তাহলে সে ওটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেত। কিম্বা আছাড় মেরে ভেঙে দিত।

এ চোর ব্রাহ্মণ। এবং সে চোর ব্রাহ্মণের ঘরের নাস্তিক কালাপাহাড়—নারান গোসাই।

ভূতনাথবাবু নাকি বলেছেন—আমি কোন কথা বলতে পারব না। বুঝতে ঠিক পারছি না আমি। তবে রূপলাল বলছে তাই বা অবিশ্বাস করি কি করে? পুলিশ যা হয় করুক।

পুলিশ রূপলালকে নিয়ে এসে ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তার অপেক্ষা করছিল। কানাই বাউড়ীর বাড়ীও তল্লাস করেছে পুলিশ। কারণ, কানাই নারান গোসাইয়ের অনুগত লোক।

নারানের মাথার চুল তখন উস্কোখুস্কো। চুল ধরে তাকে টেনে তুলেছে, সরিয়ে এনেছে কনেস্টবল। সে তবুও দৃপ্ত। বুকে তার তখনও জ্বলছে।—

একটু থেমে গোসাই বললে—আগুনে নারানের বুকে কবে লেগেছে—তা নারান জানে না। হয়তো হৃদয়ের বাড়ী থেকে লেগেছে। যেতো গাঁয়ে এসে গ্রামের লোককে ভালবাসতে গিয়ে তাদের মনে তাদের অঙ্গে মৃদু উত্তাপের পর্শ দিতে, ঘরে উনোনশালে ভালবাসাকে পাক করতে আবেগের আগুন জেলেছিল, লোকে সেটাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে—সেটা উনোনের আগুন থেকে ঘর-জ্বালানো অগ্নিকাণ্ড হয়ে বুকের ঘরে লেগে গেল। ওই দিনই বোধ হয় লাগল। হয়তো বা নিজেও সে ছিটিয়েছিল। ওই বাউড়ীদের নিয়ে দল বাঁধতে গিয়ে অসাবধানে জ্বলন্ত আগুন ফেলেছিল—সেটা লাগল। জ্বলল।

নারান জ্বালায় জ্বলন্তের মতই বলেছিল—কাল বিকেল থেকে আমি গ্রামে ছিলাম না। কাল পাঁচটার ট্রেনে গিয়েছিলাম জংসন। সেখান থেকে সদর শহর। আজ সকালে সেখান থেকে বেরিয়ে দশটার সময় হিরণহাটিতে নেমেছি। আমাদের গ্রামের সরকারী চাকুরে বিশ্ববন্ধু মামার সাক্ষী। তার সঙ্গেই কাল রাত্রি কাটিয়েছি। আমি চোর!

গোসাই বললে—চোর নারান নয়, চোর অপবাদ তার টেঁকে নি। কিন্তু নারান অধীর, নারান ক্রোধী! মানুষের উপকার করার যে আনন্দের স্বাদ তাকে মাতিয়েছিল, সেটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকে তখন প্রমত্ত করেছে। তাছাড়া, হেসে গোসাই বললে—মানুষকে চোর সন্দেহ করলে অপরাধ হয় না—সাধুকে বললেও হয় না। কিন্তু সাধুরে তার প্রতিবাদে কোন শাস্তি দেবার অধিকার নেই! দিলে অপরাধ হয়।

নারানেরও হল—রূপলালের দাঁত নড়াই ছিল, তবু দাঁত ভাঙলে হাড় ভাঙার অপরাধ হয়; তার উপর কনেস্টবলকে মেরেছিল। সরকারী কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল। দুই অপরাধে তার জেল হয়ে গেল দেড় বছর।

পাঁচীল-ঘেরা জেলের মধ্যে বুকের আগুন জাগিয়ে সে বসে রইল।

* * *

১৯৪২ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৪৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। তা একরকম ভালই হয়েছিল—নইলে আগস্ট আন্দোলনেই গুলি খেয়ে মরত। নয়তো সেপ্টেম্বরের বানে ভেসে যেত, নইলে অক্টোবরের সাইক্লোনে বাউড়ীদের বাঁচাতে গিয়ে গাছ চাপা পড়ে মরত। সে বার নদীতে প্রবল বান হয়েছিল। বিপিনের ঘর ভেঙেছিল—তার ঘরের দেওয়াল ভেঙেছিল, বাউড়ীপাড়াটা তিন দিন ডুবে থেকে পরিণত হয়েছিল মাটির স্তূপে। দু-তিনটে বাচ্চা, একটা মেয়ে ভেসে গিয়েছিল। ওরা বসেছিল চালের উপর। মজার কথা কি জানেন—আগে পাড়ায় বান ঢুকলেই ওরা ঘটিবাটি, মাটির হাঁড়ি, ছেঁড়া কাঁথা, গরু-বাছুর নিয়ে ভদ্রলোকের পাড়ায় গিয়ে ঢুকে আনাচে-কানাচে, গোয়ালে, চালায় আশ্রয় নিত। এবার তা যায়নি। কারণ জানেন? ওই নারানের ছড়ানো বিষ বা অমৃত যাই বলুন। ওদের জোটটা আবার বেঁধে উঠেছিল। উঠছিল—আগস্ট আন্দোলনের হাওয়া বা উত্তাপে।

গোসাই বললে—কালের কথা বলেছি এর আগে, কাল এক-একটা সময় এমন চেহারা নেয় যে, তার মধ্যে মহাকালকে প্রত্যক্ষ করা যায়। দুনিয়াশুদ্ধকে এক করে এক মহাকালই দিতে পারে। খণ্ড কাল পারে না। সে শুধু কাঠ পাতা জড়ো করেই যায়, মহাকাল তাতে আগুন লাগিয়ে মাটি থেকে আকাশ-আগুনে আলোয় উত্তাপে-ধোঁয়ায় এক করে দেয়। শুধু ঘাস পোড়ে না—বন পোড়ে, গাছ পোড়ে—কীট-পতঙ্গ জন্তুজানোয়ার সব পোড়ে!

উনিশ শো বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন ভাই। পৃথিবী জোড়া যুদ্ধ এগুতে এগুতে বার্মা হয়ে চট্টগ্রাম ফেণীর ধারে এসেছে—উপরে কোহিমা মণিপুর। এ দেশ কাচা ঘাস আর সবুজ পাতার বন হয়ে ঠাণ্ডা বাতাসে হেলতে দুলতে পারে? তাতেও আগুন লাগল। আগস্ট আন্দোলন হয়ে লাগল। তাতে ওই বাউড়ীগুলো দুর্ব্বো ঘাস হলেও ওরাও জ্বলল। না জ্বলুক আগুনের আঁচে শুকনো হয়ে ডাব পাকিয়ে গেল। ওরা বানের সময় গেল না। কিন্তু সাইক্লোনের সময় গেল। ওরা বানের পর ঢিবির উপর বাঁশের কাঠামোর চালা করে—তালপাতা দিয়ে ছাইয়ে বাস করছিল। সাইক্লোনের সময় সে তালপাতা প্রথমেই উড়েছিল। নারান বাইরে থাকলে—নিশ্চয় যেত ওদের

হয়ে গিয়েছিল। একটি ফুটে শুকিয়ে ঝরে যায়, মধ্যে মধ্যে ভাবনাটা ভোলে—আবার হঠাৎ দিদিকে মনে পড়ে, বীরেনকে মনে পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কুঁড়ি দেখা দেয় আস্তে আস্তে ফোটে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—বীরেনের এখন কি অবস্থা ভাবে! বুকের আগুনটা জল হয়ে যায়। আবার হৃদয় বিয়ে করেছে বা করবে কল্পনা করে—তার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

জেলখানা থেকে বেরিয়ে সে বাড়ী যায় নি। গিয়েছিল দিদির বাড়ী। দীর্ঘকাল পর গ্রামের মুখে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। এসেছিল সে ষ্টেশন থেকে হেঁটে। গ্রামখানা দেখে শিউরে উঠেছিল। প্রথমেই চোখে পড়েছিল নদীর ভাঙ্গন। ভাঙ্গনটা ভাঙ্গা পাড়ার ধার পর্যন্ত চলে এসেছে। বেলা তখনও ছিল—অপরাহ্ন বেলা। সেই নদীর ধারের গাছপালাগুলোর কি অবস্থা! তবে ওরা বীর বটে। বড় অর্জুন গাছ উল্টে পড়েছে—দুটো একটা শিকড় লেগে আছে—ডালপালা শুকিয়েও মরেনি—দু-চারটে পাঁচটা ডাল বেরিয়েছে তাতে কিছু পাতা বাতাসে দুলছে। অশ্বত্থগাছ সমূলে উপড়েছে। ওগাছ জরাসন্ধের মত দুফালি হয়ে গেছে—কিন্তু দুফালিই বেঁচে আছে। লম্বা গাছগুলো মাঝ-খানে ভেঙ্গে কবন্ধের মত হয়ে গেছে। ঘাস নাই, নদীর বালিতে চাপা পড়েছে। ভাঙ্গাপাড়ায় ঢুকল নারান—কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারলে না। নাই আছে সব যেন ধুঁকছে। কজন কঙ্কাল-সার পুরুষ সেই গাছতলায় বসেছিল। গাছটার অনেক ডাল ভেঙেছে। ছায়ার পরিধি সংকীর্ণ হয়েছে। তারা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে নারানের মুখের দিকে চাইলে। জেলখানায় ধরাবাঁধার মধ্যে থেকে নারান আরও সবল হয়েছে—দেখতে হয়েছে দেখতে। রংটা গৌরবর্ণ—সেটা আরও ফরসা হয়েছে তখন। নারান জিজ্ঞাসা করলে—রাম কোথায়? রাম ভল্লা?

তারা আশ্চর্য হল—রামভল্লা সে তো অনেক দিন গত হয়েছেন গো! গেল বছর। ঝড়ের সময়—ডাল চাপা পড়েছিল! কটি মেয়ে ভেঙে পড়া বাড়ীর ভাঙ্গা দাওয়ায় ঠেস দিয়ে মড়ার মত তাকিয়ে আছে।

সে আর প্রশ্ন করলে না। মন তার বীরেনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। সেই দু আড়াই বছরের বীরেনকে ফেলে সে চলে গিয়েছিল। আজ কত হবে? দশ এগার বছরের! কেমন হয়েছে? কত বড় হয়েছে!' বাড়ী কাছেই হৃদয়ের। কই কই? সেই উঁচু কোঠাটা? ওইটে ভেঙেপড়া তালপাতা দিয়ে ছাওয়ানো চাল—ইটে? হ্যাঁ ওইটেই তো!

হায় মহাকালের কোপ!

বাড়ীর সামনের দরজা ভাঙা। খোলা। সে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। বুকটা যেন ধড়ফড় করছে! উঁকি মেরে সে চমকে উঠল! ঘৃণায় সাথে মুহূর্তে মনটা কঠিন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ভাঙা দাওয়ায় একখানা সাড়ী মেলে দেওয়া রয়েছে। সাড়ী! তা-হলে—! তবুও আত্মসম্বরণ করে সে ডাকলে—হৃদয় দা!

আবার ডাকলে—হৃদয় দা! বীরেন!

মেয়েদের কণ্ঠে কে সাড়া দিলে—কে? নাম বলতে ইচ্ছে হ'ল না। বললে—হৃদয় দা আছেন? উত্তর এল—আছেন—তার অসুখ। কে আপনি ভিতরে আসুন না।

অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে সে ঘরে ঢুকল। কথাবার্তার সুর স্বর ভঙ্গি এমনি এখানকার সঙ্গে বেমানান যে, সে বিস্মিত না হয়ে পারলে না। কোথাকার মেয়ে?—

সে ঘরে ঢুকে বললে—আমি বীরেনের মামা—।

একটি কালো রোগা লম্বা মেয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল—বারান্দায়। অবাক হবে হল না সে এমনিই প্রত্যাশা করেছিল। কোন অঙ্গে গঠন নৈপুণ্যের কোন রূপ নেই—অথচ একটি শ্রী আছে। বয়স অনেকটা কুড়ি তো হবেই! মেয়েটি সবিস্ময়ে বললে—নারানদা!

নারান বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিনতে চেষ্টা করলে—তাকে।—কে?—কে? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড খুঁজেও তার স্মৃতিকে আবিষ্কার করতে পারলে না সে। কিন্তু মনে হল—এ চেনা—একে তো চেনে।

সে নিজেই চেনা দিল—দাওয়া থেকে নেমে এসে—তাকে প্রণাম ক'রে বললে— আমি নিরু।

নিরু! একটা বজ্রপাত হয়ে গেল! নিরু এখানে? এই শীর্ণ শরীর সেই কালোমাজা রংয়ের মার্জনার উপর অমাজা কাঁসার বাসনের মত একটা ছোপ পড়েছে। এই জীর্ণ কাপড় পরনে দু-হাতে দুগাছা শাঁখা। সিঁথিতে সিঁদুর! নারান হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরু বললে লক্ষ্মীদি মারা গেছেন। তার শূন্য স্থান আমি পূর্ণ করেছি। সে দিন কলে-জরে উনিই বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন দাদা-জীর লোভে। আমি রাগ করে কেলেঙ্কারী ক'রে চলে এসেছিলাম। এখান থেকেই চলে গিয়েছি-লাম তেজ দেখিয়ে। মানুষের কপাল! সে দিন কি জানতাম যে ওঁর হাঁড়িতেই চাল দিয়েছি-লাম আমি! হাসলে সে।

প্রহেলিকা মনে হচ্ছিল সব। মাথার ভিতর বুকের ভিতর কি যেন হচ্ছিল। সে কি বলবে বুঝতে পারছিল না। হে ভগবান! বীরেন কই—কথাটাও মনে এল না তার!

হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ এল—খোনা আওয়াজ—নি-রু! ও-রুক।

নিরু বললে—উনি! আমার কপাল দেখ—উনিও সেজেছেন!

—নি—রু।

নিরু ঘরে গেল, দোরে দাঁড়িয়ে বললে—নারান দা। লক্ষ্মীদির ভাই।

—না-রা-ন। একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এল। আঁ-য় ভা-ই! আঁ-য়! নিরু বললে—ডাকছেন তোমাকে! নারান বললে—না। নিরু হেসে বললে—না নয় এস।

নারানের বুকে থর থর করে কাঁপছিল। ঘামে ভিজে গেছে সর্বাঙ্গ। তবু সে পায়ে পায়ে এসে দোরে দাঁড়াল। দেখলে কঙ্কাল সার হৃদয় পড়ে আছে ছেঁড়া ময়লা বিছানার উপর। দুর্গন্ধে বমি আসে মানুষের। হৃদয় হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ক্ষমা—ক্ষমা—আমি আর বাঁচব না।

নারান বিছানার পাশে গিয়ে বসল। দুই হাত তার জড়িয়ে ধরে হৃদয় কাঁদতে লাগল—ওরে আমি মহাপাপী। মহাপাপী। কি ক'রলাম—ছি-ছি-ছি! সর্বস্বান্ত হয়েছি—আর ওই মেয়েটার—

নারান বললে—শান্ত হও, হৃদয় দা! শান্ত হও—। কি করবে? মানুষ যা করে তার উপর

কি তার হাত থাকে? আমি যে মারপিট করে জেল থেকে এলাম।

—ক'বে খালাস পেলি? ওঃ তুই একটা বাঁদর রে। গায়ে হাত দিল সে সস্নেহে।

—আজই। সোজা আসছি জেল ফটক থেকে। নারান বললে একটু হেসে।

হঠাৎ—বালক কণ্ঠের মা-মা-ডাক শুনে নারান চমকে উঠল। বীরেন।

হৃদয় বললে—হাঁ। ওই ওই একমাত্র সান্ত্বনা রে। মা-হারা ছেলেটা সত্যি মা-পেয়েছে। নারান বেরিয়ে এসে দেখলে—সত্যিই—নিরুর কোল ঘেঁষে নারান—ঠিক মায়ের কোল ঘেঁষে বসার মত বসে দোরের দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখবার জন্য। সুন্দর ছেলে সুন্দর বীরেন। রোগা হাড় জির জিরে কিন্তু মুখখানি টস টস করছে। অবিকল দিদির মুখ।

* * *

গোঁসাই বললে—ভাগ্য? তাই সত্যি। অর্থ-নৈতিক অবস্থা তাও সত্যি? মহাকালের কুরুক্ষেত্রে একটি নারী বলি? তাই সত্যি। যা অজুহাত দেওয়া যাবে তাই সত্যি।

নিরু রাগ করে চলে গিয়েছিল—খুড়ীমা নারানের মাসীর সঙ্গে। সে পড়ছে—পড়বে তারপর ভাল ঘরে বিয়ে হবে, সুন্দর বর, সুন্দর ঘর—নগরে মহানগরে তাদের বাড়ী। তখনই তারা ভাড়ার খোলার চাল বাড়ীতে থাকত দমদমে। কেরোসিনের আলো জ্বালত। কিন্তু ইলেকট্রিক লাইট ফ্যান এর সাধ ছিল বৈকি। বিয়ে না হয়—পড়বে পাশ করবে—ম্যাট্রিক আই-এ, বি-এ। ইস্কুলে মাষ্টারী করবে। কিন্তু বিয়েও হয় নি—পাশও করতে পারে নি। ষোল বছর পার করেও যখন ক্লাস নাইন পৌঁছুতে পারল না—তখন পড়া ছাড়লে। খুড়ীমা হাঁপানির রোগী সম্বল কিছু তখন ছিল কিন্তু তার মধ্যে বিয়ে দিতে পারলেন না। বরেরা কালো মেয়ে পছন্দ করে না, পছন্দ করলে টাকা চায়, সে টাকা নেই। দুটো একটা বাউণ্ডুলে মেলে—যারা বিয়ে করতে চায় তাদের নিরু পছন্দ করে না। বলে—বিষ খাব। নয় তো চলে যাব ঘর থেকে। তখন চল্লিশ সাল এসে গেছে। এক-চল্লিশে নিরুর অপবাদ রটল পাড়ায়। খুড়ীমা বলেছিলেন—তুই মর তুই মর—তুই মর।

নিরু মালিস খেয়েছিল মরবার জন্যে। কিন্তু খেয়েই ছুটে এসেছিল—খুড়ীমার কাছে—মা গো আমি বিষ খেয়েছি! নিরুর ভাগ্য! ভাগ্যই ভয় দেখিয়ে তাকে বাঁচিয়েছিল। নইলে এমনটা করবে কেন? স্থানীয় ডাক্তারের দয়ায় বেঁচে-ছিল; সামান্য পুলিশ হাঙ্গামা হয়েছিল। তাও সামান্য ঘুষেই মিটেছিল। এর পর খুড়ীমাও কিছু বলেন নি, নিরুরও বিয়ে হয় নি। কল-কাতায় বিশ চব্বিশ তিরিশ বছরে অবিবাহিতা মেয়ের তো অভাব ছিল না। নিরু পাড়ায় দুটো তিনটে বাচ্চা ছেলেকে পড়াতো। পনের টাকা পেত। তাও সব মাসে পেত না। তাগাদা করলে জবাব দিত। তবে তিন মাস বাকী রেখে তারপর থেকে এক মাসের করে পেত। সেটা কম ছিল না তখন। তখনও বিয়াল্লিশ আসেনি। না আসুক—নিরুর সতেরো পার হচ্ছে। পাড়ার বখা ছেলেরা ঠাট্টা করত, ইসারা করত। নিরু তা সহ্য করে মুখ বুজে চলে এসে উপেক্ষা করবার কৌশল নিজেই আবিষ্কার করেছিল। তবে পাড়ার লোকে প্রবীণেরা এবং আরও দু-চারজন তাঁকে স্নেহ সহানুভূতির চক্ষে দেখতেন। যে মেয়ের রূপের অভাবে অর্থের অভাবে বিয়ে হয় না—মিথ্যা কলঙ্কের জন্য যে দুঃখে বিষ খেতে যায়—সে স্বাভাবিকভাবেই স্নেহ পায়। সেও পেয়েছিল।

তারপর এল কাল—বিয়াল্লিশ। মহাকালের আগুন ছড়ানো বাতাস মাথায় করে সর্বনাশা বৎসর। বন্যা—সাইক্লোনে কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় মানুষ মরে নি—তাদেরও মরণ হয় নি। কিন্তু তখন চালের দর ডালের দর চড়েছে কাপড়ের দরে আগুন লেগেছে। খুড়ীমার সম্বল শেষ হয়ে এসেছে [illegible]। গয়না সবই তার আগে গেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে—যা হয় হবে বলেই [illegible] পড়েছিল। তখন কলকাতায় লোক কমেছে। দেশের [illegible] লোক পালিয়েছে। [illegible] বাড়ীতে নিরু ছেলে পড়াতো—তাদের [illegible] চলে গেছে। দু বাড়ীর দশ টাকা আছে। কিন্তু তারাও বলেছে শুধু [illegible]—আর পারব না। [illegible] না?

এমন সময় ২০শে ডিসেম্বর বোমা পড়ল। সকাল থেকে কলকাতায় আতঙ্ক ছড়িয়ে [illegible] ২১শে রাত নিয়ে [illegible]। হাতীবাগানে বোমা পড়ল। নিরুর খুড়ীমা [illegible] করে আতঙ্কে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। নিরু থর থর করে কাঁপছিল—সে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ—তারপর ছুটে এসে কাছে বসে চীৎকার করে ডাকলে—মা-গো-মা। [illegible] খুড়ীমা। খুড়ীমা মরে নি। মরলে তার ব্যবস্থা করত কে? চব্বিশে বোমা পড়ল আবার। কলকাতার লোক পালাল ভয়ার্ত ভেড়া ছাগলের পালের মত। যে যেখানে পারে যার চলবার শক্তি আছে—সেই পালাল। যার সামান্য অর্থ আছে সেই পালাল। যার কোথাও কোন আত্মীয় আছে সেই পালাল। তাদের খুড়ীমার চলবার শক্তি ছিল না—অর্থও ছিল না—আপনার জনই বা কোথায়? নিরুর দিদিরা এরা পালিয়েছে। ভাই কোথায় [illegible] জানত না। তারা কোথায় যাবে? নারানের কথা মনে হয়েছিল—কিন্তু সে তো দিদির বাড়ী পোষ্য—কোথায় যাবে সেখানে? খুড়ীমার বাপের বাড়ীর ঘরদোর পড়ে গেছে শুনেছিল।

সেখানেই বা কোথায় যাবে। অন্ধকার। না—সব শূন্য। মাথার উপরে আকাশ। সেখানে উড়ছে বম্বার প্লেন। খুড়ীমা হাঁপাতেন—আর বলতেন—মরে যাব। নিরু—মরে যাব!

এরই মধ্যে একদিন নিরুর হাত ধরে কে টেনেছিল। চীৎকার করে উঠেছিল সে। ভাগ্যক্রমে লোক এসে পড়ায় বেঁচেছিল। সন্ধ্যা থেকে ব্ল্যাক আউটের রাত্রি ঠুলি পরা আলোয় যেন হিংস্র কামার্ত দাঁত মেলে হাসে। ঘরে সন্ধ্যে বেলা থেকে খিল দিয়ে বসে থাকত তারা।

হঠাৎ একদিন হৃদয়ের চিঠি এল। "লক্ষ্মী তাহাকে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে।" যেমন নারানকে চিঠি লিখেছিল হৃদয়—তেমনি লিখেছিল—মাসীকে।

কদিন পর মাসী বলেছিল—চল নিরু হৃদয়ের ওখানে যাই!

—সে-খানে! কেন? ভয় সেই মুহূর্তে পেয়েছিল নিরু।—মাসী বলেছিল—ওরে এখানে থাকতে পারছিস তো আমার দিন নেই, মরব। তখন—

—মা! খুড়ী মা! আরও আতঙ্কিত হয়েছিল নিরু। সেই মুহূর্তটি কল্পনা করে তার হাত্‌তঙ্কের আর সীমা ছিল না। খুড়ীমা থামেন নি—বলেছিলেন—আমি মলে তুই কি করবি? তোকে যে টেনে পথে নিয়ে যাবে! খাবি কি করে? ভাড়ার বাড়ী। আমার হাতে এখন একশো টাকাও নেই। ক দিন চলবে? বাড়ীওলা বের করে দেবে। একটা আশ্রয় তো চাই তোর! সেখানে নারান আছে—লক্ষ্মী মরেছে—হৃদয় আছে।—আর কিছু বলেন নি, বলতে পারেন নি, খুড়ীমা হাপরের মত হাঁপিয়ে ছিলেন।

নিরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল—তাই চল খুড়ীমা। পরদিন তারা এখানে রওনা হয়েছিল। মহাকালের বলি দিতে এসেছিল। নিরুর তবু আশা ছিল—যদি নারান থাকে! নারান দা। মনে মনে তাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিল।

নিরু গভীর রাত্রে নারানকে বলছিল সব। হৃদয় কাতরাচ্ছে, ঘুমচ্ছে, জাগছে কাতরাচ্ছে। নিরু ভিতরে যাচ্ছে—তার মুখে জল দিচ্ছে—বাতাস দিচ্ছে, সে ঘুমিয়ে পড়ছে—নিরু বাইরে আসছে। নারান চুপ করে দাওয়ায় বসে আছে। শুনেই যাচ্ছে। নিরু বললে—এমন কল্পনা তোমাকে করিনি। করতে পারি নি। তুমি আশ্চর্য হয়েছো নারান দা! প্রথমে—। হেসে বললে—আমরা এলাম আমাদের দেখে প্রথমটা অবাক হল—তারপর হাউ হাউ করে কাঁদলে লক্ষ্মীদির জন্যে!

লোকটি খুব আঘাত খেয়েছিল সত্যিই খেয়েছিল। বদলেছেও। সত্যিই বদলেছে। ওর বিয়ে হয়েছে বলে বলছি না। হাসলে নিরু।

নারান নির্বাক। শুনেই যাচ্ছে। নিরু বললে—মানুষ তো লক্ষ্মীদিকে যত লাঞ্ছনা করুক ভালবাসত। হয় তো নিজেও জানত না। তা ছাড়া তখন ও সর্বস্বান্ত হয়ে এসেছে। যুদ্ধের বাজারে বড়লোক হবার জন্যে সর্বস্ব বিক্রী করে মিলিটারী কণ্ট্রাকট নিতে গিয়েছিল। চোরা কারবার করতে গিয়েছিল। কিন্তু সবাই তো বড় লোক হয় না, ফকীরও হয়—ও ফকীর হয়েছিল। কিন্তু স্বভাব যেটা অভ্যাস যেটা সেটা বদলের মধ্যেও বোধ হয় মরে না। নইলে...।

হেসে বললে—খুড়ীমা এসেই সোজাসুজি বলেছিল—বাবা আমি তো মরব। হয় এক মাস। নয় দু-মাস। তার বেশী নয়। আমি এসেছি মেয়েটার জন্যে বাবা। ও তো ভেসে যাবে। নয় তো চরম দুর্গতি হবে—মেয়ে জীবনের সর্বনাশ হবে। তাই খবর পেয়ে এসেছি। তোমার ঘর খালি—ওই ছোট ছেলে। হয় তোমার হাতে নয় নারানের হাতে—তা নারান তো বলছ জেলে! ও বলেছিল—সে বড় সাংঘাতিক লোক হয়েছে মাসী মা—ভীষণ লোক! ভয়ঙ্কর! বুঝেছেন! খুড়ীমা চুপ করে থেকে বলেছিল—সে তো জেল থেকেই প্রমাণ বাবা! তা তুমিই দয়া করে মেয়েটাকে নাও।

দয়া করে নয় খুব আগ্রহ করেই নিয়েছিল আমাকে। আমি আপত্তি করি নি। আমার আপত্তির কিছু ছিল? তেজ শক্তি? আশা? কার আশা করব? এক তোমার।

চুপ করে গিয়েছিল নিরু। নারান বলেছিল—থাক নিরু! নিরু বলেছিল—লজ্জা তুমি কেন পাচ্ছ নারান দা? দেখ, প্রেম তোমার সঙ্গে আমার তো সেই দাতন-দিনের! সত্যি বলতে ভাল লেগেছিল। এমন করে কোন ছেলের সঙ্গে তার আগেও বটে পরেও বটে মিশিনি। কেউ এমন করে ফুল তুলে দেয় নি। কারুর এত সাহসও দেখি নি। তাকে ঠিক প্রেম বলে না। আর তুমি লেখা-পড়া জানতে না বলে—একটা অবজ্ঞাও ছিল। তবু ওর তুলনায় সে দিন তোমাকেই কামনা করেছিলাম। কিন্তু ও মিথ্যে

ধরে বলেছিল তুমি গুণ্ডা। আজ দেখে মনে হচ্ছে আমি ঠকেছি। ঠকিয়েছে ওই। সে কথাও ওর সঙ্গে হয়েছে আমার। বিয়ে হয়ে গেল দশ দিনের মধ্যে। খুড়ীমার অসুখ বেড়ে উঠল! তিনিই ধরলেন। হয়ে গেল বিয়ে। আশ্চর্য কটু কথা বলে নি আমাকে! সেই পুরনো কথা তোলে নি। শুধু হেসে বলেছিল—মজা দেখ, সে দিন কি রাগটাই করেছিলাম। তা তখন কি জানি—যে আমার হাঁড়িতেই চাল দিয়ে তুমি বসে আছ? আমি বলেছিলাম—চাল কি চুলো দুটোর যে কিছুই নেই আমার। ভাতের চাল তো দূরের কথা। থাকলে সে আমি দিতাম না। বিধাতা দিতে গেলেও হাত চেপে ধরতাম। দুটো ভাত—আর এই ভাংগা চাল-এর দাম এত তা জানতাম না! ও চুপ করেছিল কিছুক্ষণ। আমার বলে ভয় হয়েছিল! কিন্তু ও বলেছিল—আমার অন্যায় হয়ে গেল, নয়? হুঁ লক্ষ্মীকে ধরেছিলাম। তাছাড়া—। হঠাৎ বলেছিল—নারানের সঙ্গে। তা মানাতো তোকে। ছোঁড়া উপযুক্তও হয়েছে। তা? কি করব!

একটা ভয় ছিল ওর। লক্ষ্মী দিদির প্রেতাত্মার ভয়। এটা তাই কি কি জানিনে। হয় তো দুটোই। ওর অসুখ তা থেকেই। খুড়ীমা মারা গেল মাস দেড়েক পর। শ্মশানে গেল—ফিরে এল ভয়ে বিবর্ণ হয়ে। বললে—শ্মশানে না কি লক্ষ্মীদি ওকে ডেকেছে। মদ আফিং খেয়েছিল। শরীর ভাল ওরও ছিল না। এদেশের সর্বনেশে জ্বর তখন হচ্ছে। ওকেও ধরেছে। সেদিন আমাকে বললে আঁকড়ে ধরে থাক। থর থর ক'রে কাঁপছিল ভয়ে। বলেছিল—নারানের সঙ্গে বিয়েটা দিলেই ভাল হত! তুমিও সুখী হতে। শুধু ছেলেটার জন্যে বুঝেছ—। ঠিক এর এক মাস পরে জ্বরের মধ্যে লক্ষ্মী-লক্ষ্মী বলে ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা গেল। শুয়েছে তারপর থেকে।

তা—। নিরু বলেছিল—তা বীরেনকে পেয়ে আমার দুঃখ আমি ভুলেছি নারানদা। বড় ভাল ছেলে। বড় মায়াবী। বড় স্নেহ কাঙাল। ঠিক তোমার মত। আমার বুক ও ভরে দিয়েছে। সব দুঃখ আমি ভুলে যাই! ওকে একবার দেখে আসি আমি দাঁড়াও!

নিরু উঠে গিয়েছিল—বীরেনকে দেখতে। স্বামীকে দেখতেও বটে।

নারানের সারা অন্তরটা নিরুর প্রতি স্নেহে; —হেসে গোঁসাই বলেছিল—প্রেমে যদি বলেন প্রেমেই—যেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল—তেমনি হৃদয়ের উপর আক্রোশে ঘৃণায় ভরে উঠেছিল, সে ঘৃণা সে আক্রোশ তাকে অধীর ক'রে তুলেছিল। নারান বলে—তার স্পষ্ট মনে আছে সে রাত্রির কথা—সে অধীর হয়ে উঠে চলে এসেছিল নদীর ধারে। ভয় তো নারানের ছিল না। নদীর ধার বালুচর শরতের জ্যোৎস্নায় ঝলমল করছিল। আট মাস জেলে বন্ধ ছিল। সেদিন এমনি সুন্দর রাত্রিতে এত সুন্দর বালুচরে দাঁড়িয়েও তার মন শান্ত হয় নি—সে আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। বেশ চীৎকার করেই বলেছিল—তুমি মর তুমি মর তুমি মর!

—নারানদা'! পিছন থেকে মিষ্ট কণ্ঠে ডেকেছিল—নিরু! সে চমকে উঠেছিল। ফিরে তাকাতেই নিরু বলেছিল—উঠে চলে এলে? এস বাড়ী এস! কেন মিথ্যে ওকে অভিসম্পাত দিচ্ছ। নিজের সুখ, তার জন্যেই তো মানুষ দুনিয়ায় আসে! ও দুর্ভাগা মানুষ! জানে—লক্ষ্মীদির ভয়ে আমাকে ও ছুঁতে পারে না! মরতেও আর বেশী দেরী নেই। ডাক্তার একজন আসে! সে বলে গেছে—হার্ট জখম হয়ে গেছে!

* * *

পালা শেষ হয়—চাল তত দ্রুত হয়। মহাকালের তাণ্ডবেও তাই। [illegible]—সে মাঝখান। ঝম্ ঝম্ করে বাজছে পায়ের ঘুঙুর। করতালে ঝনো ঝনো ঝনো শব্দ বাজছে। তার মধ্যে মানুষের হৃৎপিণ্ডের [illegible] চলা তো সোজা নয়! দিন চারেক পরে হৃদয় মারা গেল। মারা গেল বসে বসে। সকাল বেলা পিঠে বালিশ দিয়ে উঠে বসত। একটু কড়া মেজাজ হত। রাতের ভাত কাটতো [illegible] তা ছাড়া বিশ্রামের জন্য সুযোগও একটু থাকত। চায়ের জন্য খাবারের জন্য চেঁচাতো। নারান চলে আসতে চেয়েছিল কিন্তু হৃদয় দেয় নি। বলেছিল—ওরে দু দিন থাক! তুই [illegible] এসেছিস—লক্ষ্মীর [illegible] পাই নি। তা ছাড়া তোর কাছে অনেক অপরাধ আমার। মরতে বসেছি রে। [illegible] আমি আর বাঁচব না [illegible] থাক দু দিন তা ছাড়া ভাই—

তার হাত ধরে বলেছিল—আমি মরে গেলে ওদের ভার যে তোকেই নিতে হবে ভাই!

—হৃদয় দা—

—চুপ কর নারান! শোন। আমার বিষয় সম্পত্তি কাবিয়ে আমি ছিলাম [illegible] কেটেছি। [illegible] করতে গিয়েছিলাম। ওরা কি খাবে? [illegible] ছেলেটাকে পড়াতে হবে! আর ওই মেয়েটা [illegible] মাসী ওকে তোর হাতে দেবার জন্যেই এনে ছিল। তুই জেলে তখন। তার উপর [illegible] দুর্নীতি লোভ—আর ওর ভাগ্য। তাই [illegible] করে বাঁধা। লক্ষ্মী বলেছিল—পা ছুঁয়ে বল আমায় তুমি বিয়ে করবে না। আমি বলেছিলাম করব না করব না করব না। সে বলেছিল—আমি তা সইতে পারব না। মরেও পারব না। তা হলে ফিরব আমি তোমাকে নেবার জন্যে।

ও তোমার মনের ভ্রম হৃদয় দা। ও ভ্রম। নারান বলেছিল।

—না রে। ঘাড় নেড়েছিল হৃদয়। তারপর বলেছিল—থাক গে সে কথা। সে আমার কথা তোর নয়। তুই না মানিস আমি মানি। এখন ওই মেয়েটা। বীরেন তোর ভাগ্নে, তুই ছোট বেলায় ভালবাসতিস—তুই মানুষ ভাল, ওকে ফেলবি না—তা জানি। কিন্তু এই মেয়েটা ওরে এর মধ্যেই নদীর ওপারের গুণ্ডারা ওর দিকে তাক ক'রে রয়েছে। রাজাতো দেখছিস অরাজক। ওরাই রাজা। ওকে যে তোকেই রক্ষা করতে হবে ভাই! একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আমি অন্যায় করে বিয়ে করেছি রে। ও তোকেই কামনা ক'রে এসেছিল!

তিন দিন ধরেই এই সব কথা হচ্ছিল। সেদিন সকালে বসে বললে—জানিস একটা
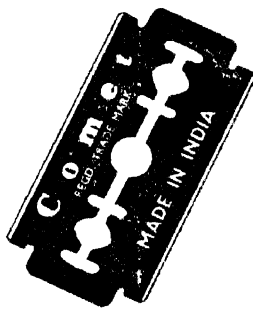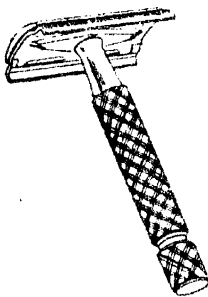
জগৎ পারাবারের তীরে—
রণজিত গুপ্ত

আমাদের শান্তিনিকেতন
শ্যামলকান্তি বসু

াল মনে হচ্ছে রে। কাল রাতে লক্ষ্মীকে দেখেছি। মুখখানা রাগ রাগ নয় হাসি হাসি!

হঠাৎ বলেছিল—শোন। হ্যাঁরে—আজকাল তা বিধবা বিয়ে করছে লোকে—

নারান বলেছিল—ছিঃ হৃদয় দা!

হৃদয় বলেছিল—ওরে এ চারদিন যে ওর ানন্দ দেখছি রে।

নারান দৃঢ়স্বরে বলেছিল—আজই তা হ'লে লে যাব আমি!

—কিন্তু আমার মৃত্যু সংবাদ পেলে াসিস। নইলে মেয়েটাকে বেজাতে লুঠে নিয়ে াবে।

নারান বিরক্ত হয় উঠে চলে গিয়েছিল। য়ে বসেছিল নদীর ধারে। কিছুক্ষণ পর াদের একজন ছুটে এসে বলেছিল—ঁগোঁসাইর আসেন। হৃদয় ঠাকুর গেলেন!

—সে কি? চমকে উঠেছিল নারান।

—হ্যাঁ। বসেছিলেন ঠেসান দিয়ে। ওষুধ এনে উ ডাকলে—খাও। রা' নাই। নেড়ে দেখে মরে গয়েছে। তেতাল্লিশের মড়কে মানুষ দাঁড়িয়ে াকতে থাকতে পড়ে মরেছে, বসে মরেছে, াছে চড়ে চালে চড়ে হঠাৎ মারা গিয়ে নিচে ।ড়েছে ফলের মত।

লক্ষ্মীদি মারা গেছেন। তার শূন্যস্থান আমি পূরণ করেছি।

একটু জল খেলে গোঁসাই। তারপর বললে —মমতা মধুও বটে, বিষও বটে। মমতা সোনার ুতো কিন্তু লোহার শেকলের চেয়ে শক্ত আর াঁকন্ত সাপের মত পাকে পাকে কষে বাঁধে। ছিঁড়তে যারা পারে তারা হয় দেবতা—মহাবীর, য় তো, জানোয়ার। সাধারণ মানুষের ওই াকের মধ্যে যত কষ্ট তত আনন্দ! হৃদয়ের াদ্ধের শেষে নারান ওই বাঁধন পরেই ফিরল। শ দিনে শ্রাদ্ধ গেল। দশ দিনের মধ্যে অন্তত বশবার ওপারের গুন্ডারা ছুতো নাতায় াপারে এসে পাক দিয়ে গেল। তখন জীবের াজত্ব। জাতে হিন্দু তখন বড় অসহায়। ংরেজ হাড়ে হাড়ে চটা। দেশের নেতারা জেলে। গুন্ডারা তখন অবাধে অত্যাচার করে াসখ্যায় দুর্বল হিন্দু যারা তাদের ওপর। দয়ের গ্রামটি ছোট গ্রাম—ঘর পনের ব্রাহ্মণের াস—সবাই দরিদ্র দুর্বল ভীরু। গ্রামের বল ছল ভল্লারা। রাম ভল্লা নেই। যারা আছে— ারা কঙ্কালসার। ওপারের গ্রামখানা প্রকান্ড। াকগুলো দুর্দান্ত লোকের বাস। তাদের ৃষ্ঠপোষক আছে কয়েক ঘর সম্পত্তিশালী াক। নিরু সংকল্প করেই রেখেছিল সে েরেই, নারান পড়েছিল সোনার সুতোর াধন। বীরেন তার ভাগ্নে। তার প্রতি মমতা ার সেই বাল্যের। আর নারান মিথ্যে বলে া। সত্য বলে সে। সে নিরুকে ভালই বেসে- ছল। তবে জানোয়ার সে নয়। না-নয়! সংসারে ারীর প্রেম মানেই যারা বলে—দেহ কামনা— ারা কামুক—বিকৃত মন—ব্যাধিগ্রস্ত মন—সে াদের দলের নয়। নিরুর সঙ্গে সে খোলা থাই কয়েছিল। বলেছিল—নিরু—আমি োমার অপমান করব না। তবু মানুষের মন দি চঞ্চল হয় বলব তোমাকে; তুমি রাগ না- রে চলে যেয়ো!

নিরু তার হাতে একটা টিনের বাক্স দিয়ে লেছিল—এটা রাখ। এইটে তার বিছানার তলায় মেঝেতে ছিল। আমাকে বলেছিল আগে। কিছু থাকবে, মরলে তুলে নিয়ো। ওতে সাতশো টাকা আছে আর গয়না আছে কয়েক- খানা বোধ হয় লক্ষ্মী দিদির। ওটা—যেদিনের কথা বলছ সেদিন খরচ শেষে যা থাকবে তাই দিয়ে ফেরত দিয়ো। দেখ সে আমাকে বলে গেছে বিধবা বিয়ে উঠেছে লোকে করছে, তুমিও করো। কিন্তু বীরেনকে ছেড়ে তার মনে ধাক্কা দিয়ে তাতো পারব না আমি! চল!

ভল্লাদের গাড়ী নিয়ে রওনা হয়েছিল। কিছুদূর এসে নারানের মনে হয়েছিল—তার নিজের গ্রামের কথা। ঘাট বলরামপুরের কথা। সে কথা দুঃস্বপ্নের মত, দুশ্চিন্তা। চঞ্চল হয়ে উঠবে গ্রাম। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল সে নিরুকে। রুখু চুল: দ্রৌপদীর কাঁসার বাসনের মত হলেও কালো মেয়েটির মাথে ছোপের তলা থেকে একটি মার্জনার আভাস। দীর্ঘাঙ্গী। হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দু'গাছি করে সোনার পাত- মোড়া ব্রোঞ্জের চুড়ি পরেছে। একটি উদাসীন নিশ্চিন্ততায় নির্লিপ্ত প্রশান্ত। একটা স্বস্তিতে সে অক্ষুব্ধ একটু বিষণ্ণ। বীরেন মাথা কামিয়েছে। সে কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। নিরু তার দৃষ্টি দেখে একটু হেসে বললে, কি?

হেসে নারান বলেছিল—তোমাকেই দেখছি।

বিচিত্র হেসে মাথায় ঘোমটা টেনে নিরু বলেছিল—

আমাকে কি দেখে? দেখতে নেই।

নারান বলেছিল—দেখছি আর ভাবছি

নয়

আমি দেখব না কিন্তু সেখানকার লোক? তারা কি বলবে?

—বলুক যা বলবে বলুক!

—কিন্তু তারাও তো দেখবে!

নিরু স্থির প্রসারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল—সেখানেও দেখবে?

—এ তো সর্বত্র নিরু! তাই ভাবছি!

নিরু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল—তুমি রক্ষা করতে পারবে না! আমি কি করি বলতে পার?

—সে ভাবনা—আমিই ভাবছি তুমি ভেবো না।

—আমি নিশ্চিন্ত। বলে সে টোপরের গায়ে ঠেস দিয়ে চোখ মুদেছিল। নারান দুঃস্বপ্নের মত দুশ্চিন্তাগুলোকে বার বার মনে মনে বিদ্রোহ করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কার্তিকের প্রথম। এবার মাঠে ফসল অপর্যাপ্ত ধানের এবার আর শেষ নেই, পরিমাপ নেই। আশ্চর্য। প্রকৃতিরই হোক আর সেই বিধাতারই হোক কি ভাঙ্গা গড়া? গত বৎসর এত বড় প্রলয়ের পর—দুর্ভিক্ষ মড়কে যখন দেশ শ্মশান হয়ে উঠেছে তখন এ কি খেলা একটি সুন্দর সুবর্ষা। মাঠ জুড়ে ধান ধান আর ধান। কিন্তু সব জমি চাষ হয় নি। কঙ্কালেরা বুক দিয়ে চাষ ঠেলতে পারেনি। তা না পারলেও এবার অনেক ধান—অনেক ধান। বিচিত্র মানুষের মন। কিম্বা হয় তো মানুষের মন সুখের সামান্য আভাসেই-প্রত্যাশাতেই সব দুশ্চিন্তা দুঃস্বপ্ন ভুলে যায়। রাত্রির অন্ধকারে জেলখানাটা বুকে চেপে বসত। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে বাইরের গাঢ় অন্ধকার আর কালো গাছপালার মাথাগুলো তার দুঃস্বপ্নকে বস্তুর বলে ভ্রমে ফেলত। কিন্তু সকালের আলোর আবছা উন্মেষেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত। স্বপ্ন মনে থাকত না। এবারে মাঠভরা অপর্যাপ্ত ফসল তার দুশ্চিন্তা—তার বিদ্রোহ কল্পনাকে ঢেকে দিল একটি রোদ পড়া সবুজ পর্দা দিয়ে। ঝলমল করতে লাগল। সেই পর্দা পিছনে রেখে নতুন কল্পনা গড়ে উঠতে লাগল তার মনে। গাড়ীর ঝাঁকানিতেও ভাঙল না। পথের মানুষ দেখে বিক্ষিপ্ত হল না; দূরে দিগন্তেও হারিয়ে গেল না। এরই মধ্যে সেও ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাড়ীতে বসে বসেই ঘুমোচ্ছিল; ভাঙছিল-জুড়-ছিল; চোখ মেলছিল-আবার বুজে আসছিল আপনি। দুপুর গড়াচ্ছে, ঘুমের সময় এটা।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙল। সামনে চেয়ে দেখলে—তাদের গ্রামের ধারের বিল। হাঁস আসতে সুরু হয়েছে। মানুষেরও ব্যাধ-বৃত্তি জেগেছে।

হাঁসগুলো উড়ছে। বন্দুকের পাল্লার বাইরে পালাচ্ছে। সামনের শরবনের মাথায় ধোঁয়া উঠছে বন্দুকের নল থেকে। এরই আড়াল থেকে লুকিয়ে মেরেছে। সেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছাটা একবার বিদ্যুৎচমকের মত চমকে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সম্বরণ করলে সে। বেলা অনেক হয়েছে। গাড়ীতে বীরেন-নিরু। দেরী হবে। ওদের দিকে সে তাকালে। তারাও জেগে উঠে ঘাড় উঁচু করে বিল দেখছে। বীরেন বলে উঠল—ওঃ কত পাখী। ওরে বাবাঃ। দেখ মা দেখ ওই-ওই-ওই।

নারান বললে—আমাদের গাঁয়ের বিল। হাজার হাজার হাঁস আসে!

বীরেন সোৎসাহে বললে—পোষা যায় না? নারান হাসলে—না। বুনো হাঁস এরা!

নিরু বললে—আহা বড় সুন্দর বিল। স্নান করতে ইচ্ছে করছে। জান আত্মহত্যা করলে এখানে বিলে ডুবে মরাই ভাল!

—কেন? ও কথা কেন? বীরেন রইল। ওকে মানুষ করতে হবে। আমাদের স্নেহের সম্পর্কে ভরা একখানি সংসার গড়তে হবে। আমি সুখের উপকরণ আনব। তুমি শান্তির ঘট ভরবে। বীরেন আশা আমাদের—

—কোথাকার গাড়ী? গম্ভীর কণ্ঠস্বর! মালিকানার আমেজ সে স্বরের সর্বাঙ্গে। চমকে উঠল নারান—নিরুর মুখের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালে। সে চিনেছে। হ্যাঁ সেই। বড় ঘাসবনটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ভূতনাথবাবু। সঙ্গে একজন পাইক। আর দুজন লোক। চাষী শ্রেণীর! সে অবাক হয়ে গেল। না তার থেকেও বেশী! স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু কথা বললে না। মনে হল ভূতনাথবাবু কিছু বলতে চাচ্ছে—কিন্তু নারান দাঁতে দাঁতের পাটী চেপে বসে রইল। দৃষ্টিটা সামনে প্রসারিত করে দিলে। তার মনে অকস্মাৎ এক মুহূর্তে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। তার ক্ষোভ। তার আক্রোশ। কিন্তু একি? এও সম্ভব? সেই ভূতনাথবাবু? মার্জনার ছাপ সর্বাঙ্গে একটি অভিজাত লাবণ্য সর্বাঙ্গে। সেই এই? একটা বীভৎস-ভয়ঙ্কর স্থূলকায় মানুষ। চোখ লাল। তাতে কি উদ্ধত উগ্র রুক্ষ দৃষ্টি! গায়ে মাত্র এক গেঞ্জি এক হাতে বন্দুক অন্য হাতে দুটো মরা হাঁস। ঠোঁটের দুপাশে পানের রস উপচে পড়ছে। সঙ্গের পাইকটার হাতে বোতল। পাইকটা ধমকে উঠল—এই গাড়োয়ান! —শুনতে পাস না? কোথাকার গাড়ী?

ভূতনাথ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই বললে—যাক! নিরু প্রশ্ন করলে—ও কে নারানদা?

—ও? ও সেই! ভূতনাথবাবু। যার সঙ্গে ঝগড়া করে জেল গিয়েছিলাম! নিরু শিউরে উঠল—মা গোঃ! কি ভয়ঙ্কর লোক!

—ভয় করছে? হেসেই জিজ্ঞাসা করেছিল নারান। বদলে গেল নিরু—না। ভয় করবে কেন? তুমি রয়েছ আমি কেন ভয় করব?

গাড়ীটা গ্রামের মধ্যে ঢুকল; সম্মুখেই বাউড়ীপাড়া—পাড়াটার পাশ দিয়ে রাস্তাটা গেল গিয়ে ঢুকেছে। বাউড়ী পাড়ার পরে কাঠা কয়েক ফাঁকা জায়গার পরেই তার বাড়ী! বাড়ীটার দিকে তাকালে নারান। বাড়ীটা আছে, গোটা আছে। তবে অনেক মার খেয়েছে। অনেক ঝাপটা খেয়েছে! সামনে যে একতলা মাটির ঘরটা নতুন করেছিল—সেটার দাওয়ার চালটা নেই। ভেঙে পড়ে দাওয়ার উপরেই কঙ্কালের মত পড়ে রয়েছে! বিপিন এসে দাঁড়াল সাড়া পেয়ে—নারান ভাই! এলে? নারান বললে হ্যাঁ নাম নিরু! বীরেন! নামু।

নামল ওরা। বিপিন বললে—ভাগ্যে নারান বললে—হ্যাঁ। খবর জান তো। খবর দে পাঠিয়েছিলাম! সেটা পাঠিয়েছিল সে বিপিন বললে হ্যাঁ! আঃ। এক বছরের মধ্যে। তা—ইনি? নারান বললে ওই নিরু মাসীমার ভাসুরঝি—পালন করা মেয়ে হরেনদার সঙ্গে এই আষাঢ়ে বিয়ে হয়েছিল তারপর নারান বললে কিন্তু এ কি হয়েছে গাঁয়ের চেহারা বিপিন দা? বিপিন বললে সব মরা নারান ভাই স-ব মরা আর আধমরা। মেরে দিয়ে গিয়েছে ভগবান যেটুকু জান ছিল—তাও থাকবে না! গলায় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভূতনাথ চাটুজ্জে! নারান বললে—দেখে এলাম। দেখা হয়ে গেল—ঢুকতে। কিন্তু ও কি চেহারা হয়েছে বিপিন-দা!

—চুপ করো। বলো না। মুখের দিকে তাকাবারও সাহস হয় না কারু।

* * *

সত্যি। অক্ষরে অক্ষরে বিপিনের সত্যি। ভূতনাথের মুখের দিকে তাকাতেও সাহস করে না, কথা অমান্য করবে কি? কোন কাজের প্রতিবাদ করবে কি? পরিচয় সেই দিনই পেলে। সে বা পরিষ্কার করবার জন্য বাউড়ীদের ডা গেল। তারা মাথা চুলকে বললে আজ্ঞে মা

করে হল? সেই চেহারা তোমার! আবারও হেসেছিল ভূতনাথ—বলেছিল—কি করে হয়েছে জানি না। ভাবি না কখনও। হয়ে হয়েছি। চোখে দেখ! সে হাসিতে নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করেছিল নারান। নারানকেও ভূতনাথ দেখেছিল। একবার তাকিয়েও ছিল তার দিকে। তারপর বলেছিল—দেখ! এক বিখ্যাত চিত্রকর—একটি সুন্দর ছোট ছেলেকে দেখে—তার ছবি এঁকেছিলেন। ছবিখানাও খুব সুন্দর হয়েছিল। নাম দিয়েছিলেন দেবদূত। খুব খ্যাতি হল তাঁর। কিছু দিন পর তাঁর ইচ্ছে হল—এর ঠিক উল্টো ছবি আঁকবেন। পিশাচ। তিনি খুঁজতে লাগলেন। মনের মত কুৎসিত ভয়ঙ্কর তিনি কোথাও খুঁজে পেলেন না। তখন তিনি জেলখানা খুঁজতে লাগলেন। খুঁজে পেলেন একজন। একজন ভয়ঙ্কর কয়েদী। ভীষণ দর্শন। তিনি অনুমতি নিয়ে তার ছবি আঁকতে লাগলেন। একদিন কয়েদীটা হাসছিল। তিনি বললেন—হাসছ কেন বলতো? সে বললে—এই আমি যখন ছোট ছিলাম—তখন একজন আমার সুন্দর চেহারা দেখে ছবি এঁকে নাম দিয়েছিল দেবদূত। [illegible] তিনি [illegible]—বললেন—তুমি সেই? সে [illegible] বললে আমিই সেই। তিনি বললেন—কি করে হল তুমি এমন? সে [illegible] জানি না। হয়ে গিয়েছি। আমি সেই? [illegible] আমিই সেই।

[illegible]

[illegible] হয়েছিল [illegible]।

কি করে হয়েছে [illegible] হয়েছে। হয়। আরও [illegible] বলেছিল—কি ভয়ঙ্কর! —হ্যাঁ—নিজে বলেছে—হয়েছে। কি করে হয়েছে—কেন হয়েছে সে নারান জানে না—বুঝতে পারে না—হয়েছে। আরও বিস্ময় লাগল তার—এই যে ভূতনাথ জানে দেশে তার শত্রু অনেক হয়েছে। রূপলাল তার শত্রু, [illegible] তার শত্রু, ফেলা-আড়োল তার শত্রু, ঐ ভুবন পাল তার শত্রু, কেষ্ট দাস তার শত্রু, কানাই বাউড়ী তার শত্রু। শত্রু তার অনেক। শিবু ঠাকুরও তার শত্রু—শত্রু না হোক—তার বিরোধী—সক্রিয় শত্রু হয়তো নয়। তার মধ্যে সে নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়। শুধু দিনে নয়, রাত্রেও। সন্ধ্যায়—এক প্রহর রাত্রি, দু'প্রহর মধ্য রাত্রেও সে চলে গ্রাম অতিক্রম করে নদী পার হয়ে শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বন-জঙ্গলের ভিতরে পথ ধরে—তার সেই প্রমোদ-ভবনে—কিম্বা প্রমোদ-ভবন থেকে ফেরে গ্রামে। পদ-ব্রজেই বেশী—কখনও গাড়ীতে। সঙ্গী তার কখনও একজন কখনও দুজন—কখনও চার-জন। নিস্তব্ধ রাত্রি তার ভারী পায়ের

আমাদের আর অকালে ভাসিয়ো না।

আওয়াজে চমকায়, তার স্খলিত কণ্ঠের শাসন বাক্যে শিউরে ওঠে। মানুষ এমন ভাবে ভীষণ হয়ে ওঠে সে শুনেছিল দেখে নি। ডাকাতদের সে জানে, রাম ভল্লাদের সে জানত। তারা অনেক ভীরু এর চেয়ে। মানুষের সাড়ায় তারা লুকোয়—এ মানুষকে তাড়া দিয়ে সাড়া দেয়।

কাল—একমাত্র কাল ছাড়া এর আর কৈফিয়ৎ নাই। বহু যুগের হয়তো কয়েক শতাব্দীর গ্লানি জমে জমে একটা কাল আসে—বিষাক্ত কাল ভয়ঙ্কর কাল—সেই কাল এমনই মানুষ তৈরী করে দিয়ে যায়। এ মরে। কিন্তু মারে কে? সে মানুষ কোথায়? সে—। না। সে ভার নিয়েছে বীরেনের—নিরুর। সে শান্তি চায়। শান্ত জীবন। ভাবতে-ভাবতেই সে গিয়েছিল সদরে—ভাবতে ভাবতেই সে ফিরেছিল বাড়ী। পাঠশালার এড

হয় নি। জেল খেটেছে মারপিট করে। মনটা তিক্তই ছিল—তবু তার সংকল্প ছিন্ন হয়নি—শিথিল হয়। শান্ত জীবন। শান্তি চায় সে। নিরু বীরেনকে নিয়ে শান্ত সংসার।

* * *

[illegible] দিকে তাকিয়ে গোঁসাই থামল। জলের জাগ আর গেলাস টেবিলের উপর ছিল। সে জল খাচ্ছিল মধ্যে মধ্যে। এবার [illegible] করে সব জলটা নিঃশেষে খেয়ে ফেললে। আমি বীরেনকে বললাম—জল দে।

গোঁসাই স্থির দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকালে. আকাশে সূর্য দিগন্তে নেমেছে, গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। অস্তমান সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি—তীর্যক গতিতে উপরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিম আকাশে — শুক্রাচার্য এরই মধ্যে খুব স্তিমিতভাবে হলেও দেখা দিয়েছে। গোঁসাই বললে—চোখ এতক্ষণে জুড়োলো। আঃ।

আমি বললাম—তারপর গোঁসাই? আমি শুনেছি — তাকে মরতেও হয়েছিল। কাল — তাকে এনেছিল — কাল তাকে এমন করেছিল বলছ — তা ঠিক — তা মানি। আবার কালই তাকে শেষ করে। মানুষ চিরজীবীও নয়; আবার তাকে ধ্বংস করবার আয়োজন কালই করে। সে কথা থাক। কিন্তু সে তোমার কি করেছিল। তোমার কিছু করেছিল? না—। কথাটা বলতে আমার বাধছিল।

আমার কথা গোঁসাই বুঝেছিল — সে বললে — করেছিল। নারান পাপীকে বধের জন্যে ভগবানের অংশ থেকে জন্মায় নি। সে সাধারণ, ছোট মানুষ। তবে বিচার-বুদ্ধি তার আছে। সে বিচার-বুদ্ধি তার তখন ছিল না। সে তার বুকে ছুরি মেরেছিল, মাথায় লাথি মেরেছিল। এখন বিচার করে সে দেখেছে। দেখেছে — ওই মাথায় লাথিটা আগে মেরেছিল — তার আক্রোশ তার ছিল। দেখুন — নারানের প্রতিষ্ঠা — তা সে কেড়ে নিয়েছিল — মানুষের দুঃখের সুযোগে উপকার করে। নারান তখন জেলে বলতে গেলে—সেই তার কারণ। নিজের রাগ তার মূল—সেই রাগেই — সে চড় মেরে রূপলালের দাঁত ভেঙেছিল। তবু তার বিচারে দোষ থেকে ওই লোকটাকে সে রেহাই দিতে পারে নি। আক্রোশ ছিল। নিরু আর বীরেনকে পেয়ে তার মন ভরেছিল। বুক ভরেছিল। কাকে সে বেশী ভালবাসত তা বলা কঠিন। বীরেনকে না নিরুকে। হয়তো নিরুকেই। কিন্তু সংসারে যাকে পাপ বলে— তা সে করেনি — করেনি — করেনি। আর পাপ যাকে বলে — তা নেই যে ভালবাসায় তার স্বাদ আলাদা — জোর আলাদা। গরীব যেমন বড়লোক হয়ে গেলে পৃথিবীর উপর আক্রোশ তার যেমন কমে যায়—মুছে যায় — তেমনি করেই মুছে গিয়েছিল — ওই ভূতনাথের উপরেও আক্রোশ কমেছিল। বরং তার সঙ্গে লড়াই করতে গেলে — এদের ক্ষতি হয় এই জন্যে সে ভয়ও পেয়েছিল। বললাম তো ট্রেনের কথা নারান ভাবতে ভাবতে গিয়েছিল, সদরে ডি আই এড তাকে দেন নি। ভেবেছিল ফিরে ভূতনাথের কাছেই যাবে। তার এখন উপর মহলে খুব খাতির — ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট — ওকে ডি আই-কে অনুরোধ করবার জন্যে বলবে। একটা কথা বলি নি। বলি। আগস্ট মুভমেন্টের সময়—এখানে তখন তিন-চার দল কাজ করছিল বলেছি। তারা ঠিক করেছিল মুভমেন্টের সময় তিনটে ইউনিয়ন নিয়ে এরা একটা স্বাধীন এলাকা গড়বে। ভূতনাথও তার মধ্যে ছিল। একটা ইউনিয়নের সে প্রেসিডেন্ট। কিন্তু প্রথমেই ধনদাবাবুকে ধরে নিলে পুলিশ। হীরালাল বাবু এখান ছেড়ে কলকাতা চলে গেলেন। তিনি একটা আগুন — এখানে জ্বলবার মত খাদ্য তাঁর ছিল না। ঘাস — শুধু ঘাস এখানে। তিনি চলে গেলেন — মহাবনের দিকে। শিবু ডাক্তার থাকল। কিন্তু তার দলের হুকুম এল — ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে। ভূতনাথের সঙ্গে মন খাওয়া নিয়ে বনল না কংগ্রেসের। তাকে পেলে ইংরেজ। তার খাতির করতে তখন সরকারী কর্মচারীরা বাধ্য। ভূতনাথবাবু ডি আইকে বলে দিলে কাজ হত। তাই বলব বলেই নারান ফিরল সেদিন। সন্ধ্যের সময় সেদিন আকাশে ওই তারাটি নীল হয়ে ঝলমল করছিল। সে দেখে ভাবছিল — ওই তারাটির মতই একটি শান্ত - মিষ্টি - চোখ জুড়ানো সংসার পাতবে আকাশের এক কিনারার মত — সংসারের এক ধারে।

ষ্টেশন থেকেও ভাবতে ভাবতে এসে গাঁয়ে ঢুকল নারান, একটু ভাবলে—কোন পথে যাবে; সদর পথটায় গেলে প্রথমেই রায়বাড়ী রায়পাড়া তারপর ভটচাজপাড়া—তারপর সদগোপপাড়া তার ওধারে তার বাড়ী। ওদিকে কয়ঘর বাউড়ী বাগদীর বাস। তারপর মাঠ—মাঠের পর বিল। আর একটা পথ গাঁয়ের বাইরে বাইরে—দুটো পুকুরের পাড় ভেঙে বড় বাউড়ী পাড়ার ভিতর হয়ে বিপিনের বাড়ীর পরই তার বাড়ী। রাস্তাটায় বাউড়ীরা ... লোকে মাঠে যায়; নির্জন। যে গ্রাম এড়াতে চায় সেও যায়। এখান এসে অবধি নারান ওই পথেই হাঁটছিল। জেলখাটার লজ্জায় ... লজ্জার কাজ সে করেনি তো। মনের ক্ষোভ — লোকের ভালবাসা সে হারিয়েছে বিনা ... বাধে সেই জন্যে। তার আগে লোকে ... করে অবস্থাপন্নেরা তাকে ঠাট্টা করে বলত বাউড়ীপাড়ার মালিক। বাউড়ীদের ... তাদেরও তো অসুবিধে ছিল। সেই মালিকানা যাওয়ায় নারানেরও মনে ... সে ... হয়েছে। তার যে ক্ষোভ সেই ক্ষোভের ... কারুর কাছে যায় নি। দেখা করে নি। ওই বাইরের পথ ধরেই হাঁটত। যাবার সময়ও সে ওই পথে ইষ্টিশানে গিয়েছিল। ফেরবার সময় সে গ্রাম ঢুকবার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলে। তারপর ধরলে সদর পথ। গ্রামের মধ্য ... রায় বাড়ীর সামনে হয়ে ভটচাজপাড়ার ... দিয়ে যাবে। ক্ষোভ তার থাক, দু'চার জনের সঙ্গে দেখা হবে, তাদের সঙ্গে কথা ... যাবে। বিশ্ববন্ধুদের বাড়ীতে কেউ নেই, ... বাপ স্ত্রী নিয়ে বিশ্ববন্ধু কলকাতায় ... করেছে। তবু অন্যেরা তো আছে। কথাবার্তা বলে— তার কথাটা বলবার গৌরচন্দ্রিকা ... যাবে। যদি ভূতনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হয় ... থমকে আবার দাঁড়িয়েছিল।—হাঁ তার সঙ্গে কথা বলে যাবে! বলে সে ঢুকল গ্রামে। এবং দেখা হয়েও গেল! ভূতনাথবাবু তাঁর সঙ্গী ওই পাইক গমস্তা মোড়ল নিয়ে বসেছিলেন। ভটচাজ পাড়ারও দুজন ছোকরা ছিল। ... বুকটা মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল ফেরে। আবার মনে হল—সম্ভাষণ না ক'রে ... করে চলে যায়! কিন্তু তার আগেই প্রশ্ন হল — কে? স্বয়ং ভূতনাথবাবু। এবার ... নারান। একটি সম্ভাষণেই প্রীত ... গিয়ে নমস্কার ক'রে বললে—"আজ্ঞে ... গোঁসাই!" ভূতনাথ বললেন—"গোঁসাই? ... তা দুটো কানই তো রয়েছে তোমার!" নারান বুঝতে পারলে না। বললে—"আজ্ঞে?" ভূতনাথ বললেন—"এত বোকা নও গোঁসাই ... কথায় আছে—এক কান কাটা গাঁয়ের বাইরে বাইরে যায়। দু কান কাটাদের লজ্জার বালাই নাই—তারা গ্রামের মাঝখান দিয়ে যায়। ... তোমার তো দুটো কানই রয়েছে হে!" এ... খানা চাবুক—তার পিঠে যেন সপাং ক... আছড়ে পড়ল আচমকা। মুহূর্তে নার...

সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে "তার মানে?" ভূতনাথ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—"আমারই ভুল। তোমার দুটো কানই নেই। ও দুটো মেকী কান। একটা কান জেল খেটে গেছে—একটা গেছে রাখনী রেখে। তুমি গাঁয়ের মধ্যে সমাজের বুকে—ঘরে রাখনী রেখেছ? টান হয়ে উঠল নারান। তবুও রাগকে সে যথাসাধ্য দমন করলে। করতে হল। এ তো রূপলাল নয়! রুদ্ধরোষে সে বলে উঠল—"এ কথা যে বলে—তার মাথায় বজ্রাঘাত হবে।" হা-হা করে হেসে ভূতনাথ বললেন—"বজ্র ইন্দ্রের হাতে এবং ইন্দ্র তোমার ভৃত্য নয়। লোকে বলছে—আমার কাছে বলেছে সকলে—তুমি বাড়ীতে একটি স্ত্রীলোক পুষেছ। তুমি যেদিন গ্রামে এস সেদিন আমিও তাকে দেখেছি। সে কে?" নারান বললে—"সে বীরেনের আমার ভাগ্নের মা।" ভূতনাথ বললে—"সৎ মা। তোমার কে? বোনের সতীন বোন হয় না।" নারান এক মুহূর্তে উত্তর খুঁজে পেলে না—তারপরই বললে—"সে আমার ছোট মাসীর পালিতা কন্যা।" ভূতনাথ বললেন—"হ্যাঁ হ্যাঁ পালিতা কন্যা। মাসতুতো বোন নয়। তোমার সঙ্গেও তার বিয়ে হতে পারত।" নারান চুপ ক'রে গেল। সত্যই এর উত্তর নেই। ভূতনাথ বললেন—"শোন গোঁসাই। ও মেয়ের সঙ্গে এক বাড়ীতে বাস তোমার চলবে না। সমাজ তা সইবে না। শোন—ওকে এনেছ আলাদা বাড়ীতে রাখ। আমি দিচ্ছি বাড়ী। শুনেছি মেয়েটি লেখাপড়াও জানে—মেয়েদের একটা পাঠশালা করে দিচ্ছি—ও পড়াক। কিন্তু এ সব চলবে না।"

ঘৃণায় রাগে নারান অধীর হয়ে উঠেছিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার মনের কাছে তখন তুচ্ছ-ক্ষুদ্র হয়ে গেছে—সে বললে—"সমাজকে আমি মানি না। আপনার কথাও আমি বুঝি। আমি ঘেন্না করি। আমি ঘেন্না করি। শুনুন—আমার জীবন থাকতে আমি ওকে বাঘ সাপের মুখে ছেড়ে দিতে পারব না। যা পারেন করুন।" বলেই সে হন হন করে চলে এল।

নিরু সমস্ত শুনে একটু হেসে বললে—"এরই মধ্যে নিজের কথাটা ভুলে গেলে নারান দা? নারানের ভুরু কুঁচকে উঠল—বললে—"কোন কথা?" নিরু বললে—"আসবার দিন গ্রাম ঢুকবার মুখে আমাকে দেখছিলে—আমি বললাম—দেখতে নেই। দেখো না। তুমি বলেছিলে—গাঁয়ের লোক দেখবে—এবং দেখে কি বলবে তাই ভাবছি। আমি বলেছিলাম—যা বলে বলুক। এতো জানা কথা। বীরেন না থাকলে আমি সইতে তোমাকে বলতাম না—আমিও সইতাম না। তোমাকে বেহাই দিয়ে চলে যেতাম। কিন্তু বীরেন—সে তোমার সে আমার। তার জন্যে যা সইতে হয় আমি সইব তুমিও সহ্য কর।" নারান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—সইব। তাই সইব নিরু। বলে উঠে গিয়ে মাথায় এক ঘটি জল ঢেলেছিল সেই অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রে—তখন অল্প অল্প শীত পড়েছে। তারপর এক ঘটি জল খেয়ে বীরেনকে পড়াতে বসেছিল। বীরেনের বয়স ন বছর হল—কিন্তু দেখতে সে ক্ষয়া—ছোট। চেহারা তার মায়ের মত—খানিকটা নারানের সঙ্গে মিল আছে।

বুদ্ধি খুব প্রখর নয় কিন্তু ভারী মিষ্টি ছেলে। বাপ অর্থাৎ হৃদয় থাকতে পড়াশুনো তার হয়েছিল কিন্তু ভাল হয় নি। নিরুর সঙ্গে হৃদয়ের পর থেকে নিরু ওকে কিছু পড়িয়েছিল; নিরু পড়াতে ভাল পারে না—তবে গল্প বলে ভাল— ওদের দুজনের বন্ধনে প্রথম গ্রন্থি ওখানেই। বীরেন পাঠশালা শেষ করেছে—পড়ছে—ক্লাস থ্রিতে। বই কম নয়। নারান ওকে আবার দ্বিতীয় ভাগ থেকে সুরু করিয়েছে। সে তাতে ভারী বিরক্ত। বলে—না—মামা পুরনো বই কানে পড়ব! মামা অনেক বুঝিয়ে থাকে; সে খুন খুন করতে করতেই পড়ে। হঠাৎ নারান ওকে ছুটি দিয়ে দিলে। বললে "থাক—আজ থাক।" বীরেন বাঁচল। সে চলে গিয়ে মায়ের কাছে [illegible] গল্প বলো। নিরু বললে—"বড় [illegible] এর মধ্যে?" বীরেন বললে হাঁ [illegible] পড়েছি। [illegible] কখনও কাহারো হিংসা করিয়ো না। মিথ্যা কথা বলা বড় পাপ। যে মিথ্যা কথা বলে—তাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না। সব পড়েছি মামা। তবে বললে—ছুটি।" নিরু একটু চুপ করে থেকে বাইরে এল। নারান চুপ করে উঠোনে অন্ধকারে [illegible] আকাশ দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিরু ডাকলে—নারান দা। নারান মুখ ফেরালে—বললে—"কি?" নিরু বললে—"আজ এখনও ঠাণ্ডা হল না নারানদা? আমাদের আর অদৃষ্ট [illegible] না। ওই বাজ্যাতার কথা ভাব।" নারান একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"নিরু, মাথা ঠাণ্ডা করতে চাচ্ছি হচ্ছে না।" নিরু চুপ করে রইল—উত্তর খুঁজে পেলো না হঠাৎ বললে—এক কাজ কর না নারানদা? নারান বললে—কি?"—আমি বরং চলে যাই!" তার কথায় বাধা দিয়ে নারান বলে—"না।" স্বর তার গম্ভীর রূঢ়। আবার একটু ভেবে নিরু বললে "তা হলে চল—এ গ্রাম থেকে চলে যাই।" এবারও বাধা দিয়ে নারান বলেছিল—"না" এবং অনেক পায়চারী করে বলেছিল—"এতে হার মানতে পারব না!" পরদিন সকালে নিরু তাকে দেখে বলেছিল—তোমার চোখ লাল হয়েছে নারানদা। কাল রাত্রে ভাল ঘুমোও নি। না?

সেই তার চোখ লাল হওয়া সুরু।

গোঁসাই বললে—অগ্রহায়ণ মাস তারপর পৌষ মাসের অর্ধেক। এর মধ্যে নারান অনেকটা শান্ত হয়েছিল—কিছু ঘটে নি। বিশ্ববন্ধু চিঠি লিখেছে—"আর ঝগড়া বাড়াইয়ো না আমি যাইব। মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিও। ধৈর্য হারাইয়ো না। মহাত্মাজীর দিকে তাকাইয়া দেখ।" সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারী হতে চলেছে বিশ্ববন্ধু। তার উপযুক্ত চিঠি। সে হেসেছিল। কিন্তু নিরু বলেছিল—"কেন কি অন্যায় লিখেছেন?" সে বলেছিল—

একটু, বেশী নয়, একটু অন্যায় ...ছে।" নিরু বিরক্ত হয়ে বলেছিল—...সেটা শুনি? সেটা নারান বলেছিল—...হাত্মাজী মহাত্মাজী আমি নারান। সংসারে ...কার। পাঠশালার পাণ্ডিত্যি গিয়েছে। এখন ...নের সময় ধান তুলছি; দুটো ফসল লাগাচ্ছি ...জে হাতে। এরপর কি করব তাই ভাবি। ধৈর্য আমি মহাত্মাকে দেখে শিখতে পারি?"

তবু সে ধৈর্য ধরেই ছিল। কারুর সঙ্গে ব্যবহার করে নি। সকলকে এড়িয়েই চলে। ...লের ধারে বসে থাকার সময় বেড়েছে। কিন্তু ...খী মারলেও সে কিছু বলে না চুপ করে বসে ...কে। আকাশ থেকে পাখীগুলো গুলী খেয়ে ...ড়ে—সে দেখে। সে বুঝেছে—মেনে নিয়েছে মানুষের গুলীতে মরবার জন্যেই ওদের ...ষ্টি। তিনটে গুলীতে পাখা ভাঙা পা ভাঙা ...সে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে। চূন হলুদ দিয়ে ...দের দুটোকে বাঁচিয়ে একটা বাঁশের খাঁচা করে ...খে দিয়েছে। বীরেন সেগুলোকে নিয়ে আনমনা ...কে। সেই হাওয়ায়। এই সময়ের মধ্যে [illegible] অনেকটা বেড়েছে; মাথায় [illegible]—কমেছে।

সে দিন সরস্বতী পুজো। এক ক্রোশ ...রের সাঁওতাল অস্পৃশ্যেরা [illegible]। তারা এবার ...রস্বতী পুজো করছে। সেও [illegible] বাতাস। ...এ সরস্বতী পুজো আছে ব্রাহ্মণদের। তাদের ...খানে গত বছর সাঁওতালদের ছেলেরা—ঘরে ঢুকে ...মণদের ছেলেদের সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ...য়েছিল—কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তা দেয় নি। এবার ...রা নিজেরাই পুজো এনেছে। তারা তাকে ...জো করবার জন্যে চিঠি দিয়েছিল। ওখান-...ের ব্রাহ্মণেরা রাজী হয় নি। নারানের খবর ...লো লেগেছিল। সে উৎসাহিত হয়ে নিমন্ত্রণ ...য়েছিল। ভোরে উঠে সে সেখানে চলে ...গয়েছিল। পুজো সেরে সন্ধ্যার আরতি সেরে ...ড়ী ফিরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে পাথর হয়ে ...গল! নিরু দাওয়ার উপর পড়ে আছে উপুড় ...য়ে। তার মাথার গোড়ায় বসে বিপিনের মা— ...লছে—ওঠ—মা—ওঠ। সারা দিন খেলে না। ...পোস এমন করে পড়ে থেকে কি করবে বল! ...কপাশে বসে বীরেন যেন শোকার্ত দিশাহারার ...ত বসে আছে!

নারান কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দেখেও কিছু ...ঝতে পারলে না। বিপিনের মা বললে—এস ...বা! দেখ কুলছুঁদি! জানলে আমরা বারণ ...রতাম—তা—।

নারান বললে—কি হল?

তার কণ্ঠস্বর শুনে—নিরু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ...ত চমকে উঠে বসল—বললে আমি বলেছিলাম—...ল— চল— এখান থেকে পালিয়ে চল। গেলে ...। হল—হল মনস্কামনা পূর্ণ!

—কি হল? নারান অধীর উত্তপ্ত কণ্ঠে ...শ্ন করলে।

—এই দেখ কি হল। নিরু তার কপাল ...দখালে। সেখানে একটা ক্ষত চিহ্ন দগদগ ...রছে। বিপিনের মা বললে—আমরা আসবার ...াগে নোড়া দিয়ে ঠুকেছে বাবা!

নারান মাথা ঝাঁকি দিয়ে চীৎকার করলে—...কন? কি হল?

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নিরু প্রশ্ন করে উঠল—...আমি বেশ্যা? আমি বেশ্যা? আমি—। আর সে বলতে পারলে না—হা-হা করে কেঁদে আবার লুটিয়ে পড়ল।

বিপিনের মা বললে—বীরেনকে নিরু যেতে দেয় নি, বীরেন ধরেছিল সরস্বতী পুজোর ওখানে যাবে। কিন্তু বীরেন এক ফাঁকে সেখানে গিয়েছিল—পুষ্পাঞ্জলি দেবে। বামনের ছেলেদের সঙ্গে বসেছিল সে—তাকে ধরে তুলে দিয়েছিল। না। ঘরের বাইরে যা। ওই ছোট জাতের ওখানে দাঁড়াগে, কানও মলে দিয়েছিল। বীরেন কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এসেছিল। নিরু ওকে দেখতে না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পথেই বেরিয়েছিল। পথের উপর নিরু জিজ্ঞাসা করেছিল—কি হল। বীরেন বলতে পারে নি কিন্তু ওর সঙ্গে আসছিল কটি বাউড়ীর ছেলে—তাদের একজন বললে—ওগো ও পুজো করতে গিয়েছিল—তা ওর কান ধরে টেনে আমাদের সাথে দাঁড় করিয়ে দিলে! বললে যাঃ তু বামুন নস। পুজো করতে পাবি না। তাই—ও কাঁদতে কাঁদতে—।

নিরুর মাথায় আগুন জ্বলত না—কিন্তু সে দিন সইতে পারে নি—মাথায় আগুন জ্বলেছিল—হয় তো কপালের আগুন মাথায় ধরেছিল। সে বীরেনের হাত ধরে হন হন করে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সরস্বতী পুজো তলায়। একেবারে সামনে গিয়ে বলেছিল—কে কে আপনারা আমার ছেলেকে পুজো করতে দেন নি। কান মলে নিচে নামিয়ে দিয়েছেন? কেন—? কেন দিয়েছেন? কেন? তার তখন জ্ঞান ছিল না। মাথার কাপড় খসে পড়েছে—চোখে জ্বালা—অনাবৃত মুখে সে দাঁড়িয়েছিল। গ্রাম্য মেয়ে নয় সহরের মেয়ে। তাকে দেখে লোকে বিস্মিতই হয় নি—ওই প্রশ্নের উত্তরও তাদের জোগায় নি!

অকস্মাৎ একটি রূঢ় গম্ভীর কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল—নেমে দাঁড়াও। ওখান থেকে নেমে দাঁড়াও। বলতে বলতে পাশের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ভূতনাথ বাবু। তাকে দেখে সম্বিত ফিরেছিল নিরুর। মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে সে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—কেন? এপুজো তো গ্রামের সকলের, কারুর একার নয়।

—হ্যাঁ। গ্রামের হিন্দুর। পতিতের নয়, সোনাগাছি রামবাগানের বেশ্যাদের নয়। নাম। নাম! নাম।

সে ধমকের মুখে নিরু দাঁড়াতে পারে নি। সে যেন এক একটি নিষ্ঠুর আঘাত। সমবেত মানুষের জোড়া জোড়া চোখ যেন সহস্র ধিক্কারে ধিক্কৃত করছিল—সে ছুটে বাড়ী পালিয়ে এলো—মাটিতে বসেই লুটিয়ে পড়েছে। একবার মাথা ঠুকেছিল। কপালটা ফেটে গেছে। জলস্পর্শ করেনি—ওঠেনি। উপুড় হয়ে পড়ে কেঁদেছে!

আবার নেভানো আগুন দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেছিল নারানের মাথায়। সে হাতের জিনিষগুলো সেইখানে ফেলে তখনই ছুটেছিল।

বিপিনের মা ডেকেছিল—নারান— নারান। ও বাবা! নারান শোনে নি। কিন্তু সেই মুহূর্তে—দাঁড়িয়ে উঠেছিল নিরু, কেন উঠেছিল সেই জানে—উঠেই সে—জ্ঞান হারিয়ে সশব্দে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে।

চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল—বীরেন—মা গো! মা— মা!

নারান এবার ফিরেছিল। না ফিরলে—সেই দিন সেই সন্ধ্যাতে নারান মরত। ঘটনাটা এমন হ'ত না।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত নারান বসেছিল জেগে। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছিল। অসহ্য যন্ত্রণা। মনের মধ্যে চিন্তা তাল পাকিয়ে একটা বজ্র পিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। সব কল্পনা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল—সে গুলো—ওই একটা—সংকল্পে—আকার অবয়বহীন সংকল্পে পরিণত হয়েছিল—"খুন। ওকে খুন করবে সে।" নিরুও অন্য ধারে বসে ছিল। স্তব্ধ স্পন্দনহীনের মত। যেন এ বাড়ীতে সদ্য কেউ মরেছে। তার সৎকার করে এসে তারা দুজনে বসে আছে! বীরেন ঘুমিয়ে পড়েছে!

একসময় পেঁচা ডেকে গেল কর্কশ কণ্ঠে। দূরে—মাঠে শেয়ালেরা ডেকে উঠল। নারান নড়ে বসল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। তার পর বললে—এর শোধ আমি নেব নিরু, ওর রক্তে আমি ওর শোধ নেব। দুঃশাসনের বুকের রক্ত নেওয়ার মত। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। ওঠ যাও শোও গে!

নিরু উঠে ঘুমন্ত বীরেনকে কোলে তুলে নিয়ে অকম্পিত মৃদু কণ্ঠে বলেছিল—সে দিন

আমি নিজেকে তোমার পায়ের তলায় ঢেলে দেব। বলে সে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল।

নারান বারবার মাথা নেড়েছিল—না—না—না!

(ছয়)

—জল! গোঁসাই বললে—জল। আমি বললাম—ওই যে। গোঁসাই এবার জগটা তুলেই আলগোছে জল খেলে। তারপর বললে—এর পর আর কিছু মনে নেই। মাথার যন্ত্রণা—অহরহ যন্ত্রণা চোখে জ্বালা—চোখ লাল, মন অস্থির—বুকের ভিতরটা একটা অসহনীয় উদ্বেগ! হ্যাঁ। উদ্বেগ ছাড়া কি বলব? শুধু ওই এক চিন্তা! সময়ের সঙ্গে সব কমে। কিন্তু কমলো না নারানের। বাড়ল। চার মাস মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র বৈশাখ! চার মাস—।

থামল গোঁসাই, বললে— না— একটা কথা মনে পড়ছে বলতে হবে।—হ্যাঁ বলতে হবে। নইলে নারানকে বুঝতে পারবেন না। নারানের জোরটা বুঝতে পারবেন না!

নিরু সেদিন বলেছিল—যে দিন ওর রক্ত দেখে নারান এই অপমানের শোধ নেবে—সেদিন নারানের পায়ে নিজেকে ঢেলে দেবে। নারান সেইদিনই ঘাড় নেড়ে বলেছিল না—না—না। ওইটাকে পরমসত্য করে তুলেছিল। নিরু হয়েছিল তার ভাগ্নে বীরেনের মা। কল্পনায় একবারের জন্যে অন্য কল্পনা করেনি। কথায় সে একবারের জন্যও এর সীমা লঙ্ঘন করেনি। লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে একবারের জন্যেও তার দিকে তাকায় নি। বিলের শোভা পাখীদের কলকল শব্দ তার কানে পৌঁছুতো না। মাঠে ফসল লাগিয়েছিল—নিজের হাতে, তার কৃষান কিম্বা ভাগীদার হওয়ায় বিপদ ছিল—সে ডাকে নি কাউকে। তা ছাড়া সবটা নিজে পাবে—এর জন্যও বটে…সে নিজে লাগিয়েছিল ফসল। ফসলগুলো মরে গেল না দেখার জন্য। বীরেনকে পড়ানো ছাড়লে। কথা কইতে তার ভাল লাগত না। মানুষ উন্মাদ হয় প্রতিশোধ কামনায়—সে তাই হয়েছিল। তার প্রতিষ্ঠা কেড়ে নিয়ে সে তার মাথায় মেরেছে লাথি, নিরুকে তার নারীত্বের চরম অপমান করে সে তার বুকে মেরেছে ছুরি। মর্মান্তিক যন্ত্রণায় পাগল হওয়ারই কথা। হয়নি কিন্তু—এর মধ্যে সে আর একটা জোর পেয়েছিল—। নিরুর উপর লোভ থাকলে সেটা সে পেত না। নিরুকে শুধু বীরেনের মা—করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে অনুভব করালে—এই অত্যাচারিত অঞ্চলটার প্রতিটি অত্যাচারিত মানুষ তার দিকেই তাকিয়ে আছে প্রতিকারের জন্য। পাড়াগাঁয়ের মানুষ অতি অল্প শিক্ষিত মানুষ নারান—সে নিত্য ভগবানকে ডাকতে সুরু করলে। আমাকে বল দাও। আমাকে বর দেও আমি ওকে মারব। শুধু তাই নয়। কিছুদিনের মধ্যেই তার কাছে লোক আসতে লাগল। রূপকান্ত—ফেলা মণ্ডল কেষ্ট দাস—ভূষণ পাল। তারাও সুযোগ খুঁজছে—ঠাকুর তুমিও এস। কিন্তু সে তা গেল না। ওদের সে জানে—চেনে। ওদের সঙ্গে ভূতনাথের প্রভেদ নেই। ভূতনাথ ওদের তাড়িয়েছে তাই ওদের সে শত্রু। মিল এক জায়গায় আছে—ওরাও অত্যাচারিত সেও অত্যাচারিত। তবে সে শুনেছে ওদের হত্যার কল্পনা। নানান কল্পনা ওরা করে। মদ খায় ভূতনাথ। মদ চোলাই করে তারা তার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে ওর কাছে পাঠাতে চায়। সাপ ধরে বাঁশের চোঙায় পুরে জানালার ফাঁক দিয়ে নিশুতি রাত্রে ওর ঘরে সেই প্রমোদ ভবনে ছেড়ে দিতে চায়। আরও বিচিত্র অনেক কিছু। অনেকে মন্ত্রতন্ত্র বাণমারা এসবও করেছে। কিন্তু নারান তো তা পারবে না। সে তার মুখোমুখী দাঁড়াবে। অস্ত্র তুলে বলবে—এই নাও। শোধ। শোধ। শোধ।

তিন মাস নারান ঘুরল—তার পিছন পিছন। সে চলে আগে তার সঙ্গী প্রহরী নিয়ে, সে চলে তার পিছনে বা পাশে—খানিকটা দূরে দিয়ে জঙ্গলের আড়াল দিয়ে। নদী ওখানে গেছে এঁকে-বেঁকে—সে জনশূন্য নদীর গর্ভে গর্ভে কিনারায় গা ঘেঁষে আড়াল দিয়ে চলে। সে বিলের ধারে যায়, নারান বিলের ঘাস বনে প্রতীক্ষায় থাকে। একলা সামনা-সামনি তাকে চায়। তা ছাড়াও ওই সঙ্গী—বিজে বাগদীতো সামান্য নয়। একলা তো দুজনকে পারবে না সে। কখনও নদীর এপার ধরে সে চলে—নারান ওপার ধরে চলে। রাত্রে সিঁদ কেটে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা তাও সে পারবে না!

সে চলেছে আগে—দম্ভের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে

রাত্রেই এ অনুসরণ চলত। দিনে নয়। দিনে পারত। প্রতিদিনের বার্তার কথা ভেবে দেখতে কেন পারছে না। নিরুও স্তব্ধ ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল। হাসি ছিল না—রহস্য ছিল না, কৌতুক ছিল না—দিনের কোন একটি ক্ষণেও তার পদক্ষেপে ঈষৎ একটি চঞ্চলতা তাও প্রকাশ পেত না। বীরেনকে গল্প বলতে বলতে থেমে যেত। বীরেনও বুঝত কিছুটা। মধ্যে মধ্যে এসে বলত—মা—ওরা বলছিল! নিরু বলত—দেখ। সে চুপ করে যেত। মধ্যে মধ্যে সংবাদ আসত—কেউ বাড়ীর পাশ থেকে বলে যেত—আজ রাতে! কোন দিন কেউ পাঁচটা কথা বলে যেত—আজ রাত্রে ঝিণ্টি হবে গো। বোঝো যেন। ওরা ফাঁদ পাতত। নারান ঠিক আপনার পথ ধরে যেত। কিন্তু দেখা যেত ফাঁদ ব্যর্থ হয়ে গেছে। রাত্রির বাঘ-পুরাণের নিশাচর ঠিক চলে গেল, আপনার পথে। নারান নিজের চুলের মুঠো ধরে টানত ছিঁড়ত। তারপর একদিন—।

—আঃ—বলে একটা চীৎকার করে উঠল গোঁসাই! আমি ডাকলাম—গোঁসাই গোঁসাই। গোঁসাই বলে—হ্যাঁ। এই রকম হয় কখনও কখনও। নইলে আমার তো মনে কোন অনুশোচনা নেই খেদ নেই। কিছু নেই!

আমি বললাম—রাত্রে একদিন ভূতনাথ খুন হল। মাঠের মধ্যে। খণ্ড খণ্ড করে কেটেছিল তাকে। সে তো জানি।

—হ্যাঁ। অন্ধকার রাত্রি সেদিন। সে চলেছিল ওই প্রমোদ ভবনে। বৈশাখ মাসের রাত্রি—সন্ধ্যেবেলা ঝড় হয়ে গেছে প্রচণ্ড। দু-চার ফোঁটা বৃষ্টি। ঝড়ের পর সে বের হয়েছিল আমি নদীর ধার থেকে পিছু নিয়েছিলাম। যাচ্ছে—সে আগে চলেছে—দম্ভের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। ভয় তার ছিল না। বীর সে ছিল। অসুরের মত বীর বিক্রমশালী। সেদিন ফাঁদে পড়ল। রূপ-কালদের দল—যে জায়গায় চারিপাশে লুকিয়েছিল—ঠিক সেইখানেই এসে পড়ল। সেটা আমার ওই জমি টুকরো—সেটার জন্যে আমি এসেছি। সে যেমন এসেছে অমনি—তারা চারিপাশ থেকে এসে ঘিরে দাঁড়াল। সে হাঁকলে—কে? কে একজন বললে—যম। সে হা-হা করে হেসে উঠল। ওর সংগী বিছে লাঠি ধরে দাঁড়াল। কে একজন পিছন থেকে ছুঁড়লে দা। বিছের কাঁধে বসে সে পড়ে গেল। একজন তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরে দাঁড়াল। ভূতনাথের তখনও ভয় ছিল না। হাতে সে বন্দুক রাখত না। রাখত একটা পিস্তল। পিস্তলটা নিয়ে দাঁড়িয়ে বললে—আয়। কিন্তু যাই হই আমি বামুন—এটা বৈশাখ মাস মনে রাখিস! সে কৌতুক করছিল তখনও। আঃ! ফলও হয়েছিল—বৈশাখ মাস—সে ব্রাহ্মণ। কে আঘাত করবে? নারান তখন এসে পড়েছে—সে হাতের দাখানা দৃঢ় মুঠিতে ধরে—আমি! বলে এসে দাঁড়াল। ভূতনাথ চমকে উঠল। মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বোধ হয় আমার থেকে নির্দোষ কারুর উপর আমার মত অত্যাচার করে নি।

তারপর আর মনে নেই। আমি দা তুলতে অনেকগুলো দা উঠেছিল। একসঙ্গে পড়েছিল। যদি আমারটা আগে পড়ে থাকে—তাই পড়েছে—তবে আমি বীর আমি তপস্যায় সফল হয়েছি! কিন্তু সে মুহূর্তটি ভয়ংকর। অতি ভয়ংকর। মহাকালকে যেন সাক্ষাৎ দেখেছিলাম। কাল দৈত্য অসুর সৃষ্টি করে, অনুকূল হয়ে তাদের বর দেয়, তারা সেই বরের বলে—সৃষ্টিকে জর্জরিত করে তোলে প্রহারে প্রহারে। তখন মহাকাল চিরকালের ধর্মে জাগেন—সঙ্গে সঙ্গে জাগে—মানুষ। তারা তাঁর সঙ্গে নাচে তিনি যখন ওই দৈত্য অসুর নাশ করেন! বহু লোক যাকে ধ্বংস করে সে ঈশ্বরের দণ্ডে দণ্ডিত সেখানে মহাকালেরই, মানুষ নয়, শক্তি। মহাকাল মহিষাসুর এমনি ভাবেই বধ করেছিলেন।

নারান তাই বলে। বললে গোঁসাই। নারানও সেদিন নেচেছিল। সেও মহাকালের অনুচরের মত ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। জ্ঞান ঠিক ছিল না। জ্ঞান থাকলে সে ছুটে গিয়ে বাড়ী থেকে ঘুমন্ত নিরুকে টেনে তুলে দেখাতে আনত না। রক্তাক্ত হাতেই সে তাকে টেনে তুলেছিল—ওঠ। এস। নিরু তার মূর্তি দেখে বিহ্বল ভয়ার্ত হয়ে বলেছিল—কোথায়? সে বলেছিল—অসুর বধ হয়েছে দেখবে এস। এস।' সে ভয়াল মূর্তির কাছে নিরু বিহ্বল নিরু মূক নিরু পুতুলের মত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার রাত্রে পথ অনেকটা। সন্ধ্যার ঝড়ে বিপর্যস্ত পথ। সেই পথে পথে সে পুতুলের মতই অনুসরণ করেছিল। না—পলকের মত মন ছিল না—তার সত্তা ছিল না।

—ওই দেখ! নিরু দেখে আর্তনাদ করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। বিশালকায় মানুষটা খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়ে আছে। নারানও এতক্ষণে কি হয়েছে—সঠিক করে দেখেছিল। ওঃ কি আক্রোশ মানুষের। ওঃ! তার মুখখানা দেখে শিউরে উঠে নিরুকে টেনে ছুটে—চল!' চল। সে এক বীভৎস-অশ্লীল দৃশ্য। সে বলা যায় না। নারান বলতে গিয়ে পারেনি। পারে না।

নিরুকে নিয়ে সে ফিরল। বাড়ী ফিরে নিরু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে—তুমি কি ভয়ঙ্কর নারানদা! উঃ! নারান অবাক হয়ে গেল। ঠিক ঠিক এই মুহূর্তটিতে পাঁচীলের ওপাশ থেকে কে বলল—কেঁদো না ঠাকুরুন। চুপ করে মুখ বুজে থাক। নইলে ঠাকুরের ফাঁসী হবে? বাও

চাকুলিয়া ষ্টেশনে রাত্রি

প্রভাকর মাঝি

চৈত্রের চতুর রাত্রি। ছাঁইরেকষ অন্ধকার ঢাকা।
সন্ধ্যার লোকাল ট্রেণ পলাতক। একা অতঃপর।
অর্বাচীন ইষ্টিশান। কাইজারি-গোঁফ কুলিদের
উৎকট ব্যস্ততা নাই। কিংবা কোনো মিহি কণ্ঠস্বর।

টিম্ টিম্ বাতি জ্বলছে। আলো থেকে অন্ধকার বেশি।
এক-একটা শাল গাছ ভৌতিক ইশারা নিয়ে খাড়া।
সময়ের সিঁড়ি ভাঙে টক্ টক্ দেয়াল-ঘড়িটি,
ক্রিং ক্রিং টেলিফোন। আর নাই কোনো শব্দ-সাড়া।

খস্ খস্ লিখতে লিখতে কালো-কোট মাষ্টার-মশাই
বর্তুল দেহটা ক্রমে এলিয়ে দিলেন একেবারে—
সিগন্যালার নিরুদ্দেশ। কি হবে হঠাৎ এলে গাড়ি?
উদ্‌ভ্রান্ত ইচ্ছাকে আমি ছুঁড়ে দিই নীল অন্ধকারে।

'আপ ট্রেণে কলিশন'—একটু পরে তার এলো ছুটে:
ঘোমেধ মেল ধরতে পারে, শেষ রাত্রে আলো জ্বলে উঠে।

শেষ নিবেদন

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সে এক নিষ্ঠুর দস্যু যৌবনের সব সুধা
কেড়ে নিয়ে চলে গেল ঘরে।
অন্ধকার সমুদ্রের সমাহিত প্রশ্নের উত্তরে
আমি ভীরু, পরাজিত, উত্তপ্ত ছবি! তবু সেই হাতে
নিজেকেই তুলে দিই প্রতিদিন সন্ধ্যায়, প্রভাতে!

এতো যে ঐশ্বর্য ছিল জীবনের অলক্ষ্য প্রহরে,
এতো দীপ্ত দীর্ঘ দীক্ষা; কতো বর্ষ কতো ঋতু ধরে
ভরেছে পানের পাত্র পিপাসার পরম অমৃতে,
আজ এই ঘরের নিভৃতে,
লুণ্ঠিত দেহের সব অহংকার, অলংকার, গান
এনেছে দু'হাত ভরে জীবনের আশ্চর্য সম্মান!

সে এক নিষ্ঠুর দস্যু সব চেয়ে সুন্দর, নির্জন
তবু তার কাছে রাখি অন্ধকারে শেষ নিবেদন।

লুম্বিনী

শতদল গোস্বামী

দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমি এক বিমুগ্ধ পথিক
এলাম এদেশে আজ হেমন্তের শীতের দুপুরে:
ধু ধু করে শূন্য মাঠ—শান্ত মৃত স্তব্ধ চারিদিক—
অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো হিমালয় দেখা যায় দূরে।
তোমার মাটির স্পর্শে কি আশ্চর্য লাগে শিহরণ
অতীতের পৃষ্ঠা হতে কত কথা বলে ইতিহাস:
রমণীয় পুষ্পবীথি পুণ্যভূমি লুম্বিনী কানন—
এ-আজ পবিত্র তীর্থ অঙ্গে তার স্মৃতির সুবাস।
এখানে প্রগাঢ় শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্য উদাস প্রান্তর
তপস্যায় ধ্যানমগ্ন, জ্যোতির্ময় স্থির উদাসীন:
কত জন্ম পার হল, কেটে গেল যুগ-যুগান্তর—
স্মৃতিগন্ধে ভরপুর, জরাজীর্ণ, কৃচ্ছ্রতায় দীন।
দণ্ডদণ্ড এখানে বসে স্বর্গসুখ পেলাম আরাম •
বুদ্ধের জনম-ভূমি, নমি আমি তোমায় লুম্বিনী:
সভ্যতার ইতিহাসে অনির্বাণ জ্বলে তাঁর নাম—
ভগবান তথাগত, বিশ্ব আজ যাঁর কাছে ঋণী।

এই পৃথিবী কাঁদে

নির্মল দত্ত

পৃথিবী কাঁদে : অসহায় মানুষের বিবর্ণ কান্নায়
শীর্ণ, পাংশুল সে দুরন্ত বেদনায়।
গর্বিত নগ্ন-নিষ্ঠুরতায় স্খলিত তার সকল সৌন্দর্য!
লুব্ধচিত্ত গৃধ্রের দল সবলে হরণ করে সর্ব ঐশ্বর্য।

ব্যথিতের অশ্রুনীর নিঃশব্দে ঝরে। দুঃস্বপ্ন নেমে আসে ধীরে—
ক্ষুধার্ত জনতার ভিড়ে।
হৃদয়-সঙ্গীত সে ব্যর্থ। এ বিশ্বভূমি ভরেছে শঠতায়।

সত্য ভূ-লুণ্ঠিত। শত-লক্ষ কণ্ঠে মিথ্যার জয়গান গায়।
শক্তির দম্ভ আপন খুসীতে স্বার্থের ইমারত গড়ে;
প্রাণের সৌধ তাই বার বার ভেঙে পড়ে।
পার্থসারথি, তুমি আজো কেন নীরব?
গাণ্ডীবী কি ঘুমায়ে পড়েছে, স্তব্ধ সে রণ-ভৈরব?
চেয়ে দেখ না কি, হে জনার্দন,
যুগযুগান্তের মুক্তিকাবন্ধন ছিঁড়ে, মহাযানে কখন
সে ধরার মানুষ চলেছে শান্ত শুভ্র চাঁদে!
এই পৃথিবী কাঁদে।

প্রণাম

আনন্দ বাগচী

কেন যে জাগিনি রাত্রে, অন্ধকারে, বিপন্ন বিস্ময়ে
প্রমত্ত নরকে এই নগ্নতম মানুষের ভিড়ে,
নিদারুণ নষ্ট ফসলে, বিনষ্ট পুষ্পের গন্ধে ছুঁয়ে
আমরা জাগিনি কেউ, চতুর্দিকে অরণ্যে নগরে
আর্তনাদ ফিরে গেছে ভ্রান্ত ধারণার পরপারে।
সংসার নিহত, প্রেম পরাভূত রাত্রিদিন জুড়ে
সমুদ্র-সৈকত জ্বলে, চোখে বালি, মূঢ়তা কেবল
শরশায়ী মানুষের অতিস্তব্ধ ঠিকানার খোঁজে
সারংবার পৃথিবীতে আত্মহননের আয়োজন
করে চলে। অন্ধকারে তিনি আসবেন জানতাম
আমরা জাগিনি তবু, জ্যোৎস্না মেখের প্রণাম।

তুমি নেই

অবিনাশ রায়

ডুবেছে সংসার স্বপ্ন, শব্দ করে উঠে দীর্ঘশ্বাস।
রৌদ্রে জ্বলছে সারাবেলা, ছায়া কাঁপে জানালার কাচে
হংসমিথুনের মত স্পন্দিত পল্লব, শান্ত স্বর
বাতাসের প্রতিধ্বনি, চিত্রার্পিত দূর নীলাকাশ
দৃষ্টির সম্মুখে সবই পরিচিত রূপ নিয়ে আছে।
তবু বড় ফাঁকা লাগে বুকের গভীরে, এই ঘর
টেবিলের ফুলদানি, দৃশ্যমান কবিতার বই
রবীন্দ্রনাথের ছবি দেয়ালেতে, চোখ ফেরালেই
কলকাতার জনস্রোত প্রতিদিন সমুদ্রের মতই।
পাণ্ডুলিপি পড়ে রইলো, প্রীতিভাজনাসু,
তুমি নেই।

গান

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

চলো বন্ধু, বন্ধুর পথে, চলো মোর সাথে সাথে।
দুর্গম গিরি লঙ্ঘিতে হবে আজি এ
নিশীথ রাতে।

হের, ভৈরব নাদে কাঁপিছে ধরা,
গুরু গরজনে অশনি ত্বরা,
নবীন মন্ত্রে করো আজ পণ যউবন নব প্রাতে।
মল্লার গীতি জাগে বনে বনে মল্লিকা জাগে নীড়ে,
কানন ঘিরি বন মর্মর ওই শোন বনতীরে,
দোদুল দোলায় রঙিন ঝলকে
মন যে ভোলায় আঁখির পলকে,
ঢেউ দিয়ে যায় অন্তর মাঝে পরাণ ছন্দে মাতে।

বনাগ্নি

সুভাষ সমাজদার

শাল, সেগুন, দেবদারু আর ইউক্যালিপ-ট্যাস ঠিক যে গাছগুলো সে ভালবাসে। হোসেনপুরের রিজার্ভ ফরেস্টে তাদেরই ছড়াছড়ি। বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ঊর্মিলার মনে হয়, যেন কোন স্বপ্নের রাজ্যের ভেতর দিয়ে সে চলেছে। আর একটু একটু করে চেতনার ওপরে অদ্ভুত একটা নেশার আচ্ছন্নতা নেমে আসে।

নেশা হ্যাঁ অদ্ভুত একটা নেশাই যেন তাকে পেয়ে বসেছে। অনেক—অনেক বার সে ভেবেছে, আর যাবে না। কিন্তু—

পারে না। যাবো না যাবো না করেও যায়। যেতে হয়। করবে কি সে? সেই মানুষটাতো সিলভিকালচার আর ফরেস্টারীর বই—খিক—উচ্ছ্বসিত হাসি চাপতে গেলে যে শব্দ হয়, সেই শব্দ! গেটের কাছে সুন্দরী গাছের নীচে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ঊর্মিলা।

সে জানে, বিটম্যান ক্লার্কদের মেয়ে-বৌরা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। আড়ালে বলে 'সাহেবের বৌটা 'জংলী'! 'বুনো'!' প্রথম প্রথম মাথার ভেতরটা জ্বলে উঠতো। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। চেষ্টা করেও ওদের মত হাতা খুন্তি নিয়ে হাঁড়ি ঠেলতে পারে না। পারলে সুখী হতো। সুখী করতে পারতো।

যারা ব্যঙ্গ করে তারা জানে কী অদ্ভুত একটা অস্বস্তি আর আশঙ্কার ভেতরে তার দিন কাটে।

ল্যাবোরেটারী ঘরে শেডে ঢাকা হাইপাওয়ার বাল্‌বের আলোয় এক মুঠো মাটি চক চক করে উঠল।

মাটিটা কেমন? স্যাণ্ডি সয়েল! মাটির স্যাম্পল পরীক্ষা করছে সোমনাথ। সামনে এগ্রিকালচারাল কেমিষ্ট্রির বই খোলা স্যাণ্ডি সয়েল, বেলে মাটির লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছে।

—কে? আরে এস এস, কাজে বাধা পেয়ে বিরক্ত হল। তবুও নরম সুরে বলল, বংশীর সঙ্গে কাঠবিড়াল ধরতে গিয়েছিলে বুঝি?

—কেন, তুমি নিয়ে যেতে পারো না? বংশী কে আমার—এই কথাটাই মুখে এসে গিয়েছিল। কিন্তু বলল না। প্রয়োজন নেই। যে বলেছে সে কোন উত্তর শোনার জন্য বলেনি।

—গভর্ণমেন্ট শালগাছের চারা লাগাতে বলছে। কিন্তু দেখছি এখানকার মাটিতে এত বালি—

একটি কথা না বলে নিঃশব্দে চলে গেল ঊর্মিলা!

তার ঘরে এল। জানে শোনা যাবে না। তবুও একটি শব্দ শোনার জন্য কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আসছে? না। অথচ এই কিছুদিন আগেও একটু রাগ করলে দৌড়ে পিছে পিছে আসতো। তার বলতো রাগ করলে—রাগ করলে ঊর্মি।

সেই মানুষ। এখন কেমন ছাড়া ছাড়া ব্যবহার করে। কথা বললে মনে হয় অনেক—অনেক দূরে থেকে কথা বলছে। ও একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। বদলে গিয়েছে। হঠাৎ একটা ভয়ের অনুভূতি শির শির করে উঠল মনের ভেতরে। তাহলে সে কি ফুরিয়ে গেছে? এত শীগ্‌গীর বিয়ের পর এক বছর যেতে না যেতে।

বিকেলের ছায়া নামছে বনে। শেষবারের মত রাউণ্ড দিয়ে ঘরে ফিরছিল বিটম্যান বংশী। সারি সারি দেবদারু আর ইউক্যালিপটাস গাছের দিকে তাকিয়ে বৌকে বলল, দেখিস সোনা, এই গাছগুলো সব আমার হাতে লাগানো।

—জানি—জানি বনটা তোর কাছে আমার চেয়েও বেশি—হেসে উঠল সোনা। বংশীর দরজার কপাটের মত চওড়া বুকের দিকে গর্বের দৃষ্টিতে তাকাল।

শি-স-স বাতাসে শিষের শব্দ হলো।

—হরিতাল পাখীরে সোনা! জারুল গাছটায় বসল।

থাম তুই—

—এই খবরদার! সাঁঝ লেগে আসছে। সাপে কাটবে।

যাস না—তার হাত চেপে ধরল সোনা।

নরম একটা হাত। কিন্তু জোর অনেক। বংশী ভাল ছেলের মত বাড়ীর পথ ধরল। আর দেবদারু বীথির আড়াল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস সন্ধ্যার বাতাসে মিশে গেল।

ঊর্মিলা ভাবতে চেষ্টা করল কোন দিন সোনার মত এত আন্তরিকভাবে তাকে কোন ব্যাপারে কখনো নিষেধ করেছে। করে নি। যদিও রীতিমত ফ্রীহ্যাণ্ড করা আর কলেজের স্পোর্টসে বর্শা ছোঁড়া শক্ত হাত। তবুও সোনার মত জোর নেই। হয়তো সব স্ত্রীই সোনার মত। কেরানীবাবুর ওই ছোটখাটো বৌটা যেমনি। নরম। কাদা কাদা। কিসে স্বামী খুসি হবে তার জন্য চেষ্টার শেষ নেই। আসলে পুরুষেরা তাই চায়। অথচ—বনেবাদাড়ে থাকতে হবে। স্পোর্টিভ স্পিরিটের মেয়েই সে পছন্দ করে, কথাটা পেড়েছিল তার বাবার কাছে সিনিয়র পুলিশ ইন্সপেক্টার ফণীবাবু। ফরেস্টারী নিয়ে ডুবে থাক। ওই লোকটার বন্ধু।

কলেজের স্পোর্টসে তার বর্শা আর ডিস্ক ছোঁড়া দেখে আর পাঁচটা দর্শকের মত সেও মুগ্ধ হয়েছিল। বাবা পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট চুরি ডাকাতি রাহাজানির পেছনে রাতদিন ছুটো-ছুটি করতে হয়। তার নাওয়া খাওয়ার সময় হয় না। মেয়ের দিন কাটে খেলাধুলো আর লেখাপড়া নিয়ে। মা মরা মেয়ে কে শেখাবে সংসারের কাজ? ঘর-গৃহস্থালী রান্নাবান্না। ওসব ঝি-বাবুর্চি খানসামাদের ব্যাপার। ছোট কাল থেকে তাই দেখেছে। —

তাকে নিয়ে যথেষ্ট দুশ্চিন্তা ছিল। কিন্তু ছেলের কথা শুনে হাতে স্বর্গ পেয়েছিলেন বাবা।

স্পোর্টিভ স্পিরিটের মেয়ে। দীর্ঘ শক্ত পুরুষালী চেহারাটার জন্য তার দুঃখ হলো। মনে পড়ল ধনুর্বিদ্যা বিশারদ চিত্রাঙ্গদার আত্ম-ধিক্কারের কথা। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢাকা সেই নির্জন অরণ্যে দাঁড়িয়ে তার চোখ ফেটে জল এল।

সকালে চায়ের টেবিলে বসে সোমনাথ বলল, জানো ঊর্মি, ডাইরেক্টরেট থেকে কতগুলো বই পাঠিয়েছে—

—কি বই?

—কন্ট্রোল অফ ফরেস্ট ফায়ারস! আমেরিকায় বনের আগুন নেভানোর কতরকম ব্যবস্থা রয়েছে। এরোপ্লেন থেকে ওয়াটার বম্বিং করা, হেলিকপ্টার থেকে বালির বস্তা—থামল সোমনাথ হঠাৎ।

তোমার কি হয়েছে বলো তো? ফরেস্টের গল্প আর আগের মত ইন্টারেস্ট পাও না, তাই না?

মাথাটা ঝাঁকালো ঊর্মিলা। তাকে বড় ক্লান্ত আর অবসন্ন মনে হল।

—কিন্তু ঊর্মি, কেরানীবাবুর স্ত্রীর মত তুমি তো ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত থাকার মত সাধারণ মেয়ে নও। এক সময় ফরেস্ট তুমি ভীষণ ভালবাসতে—চিন্তিত হলো সোমনাথ। সেই যে একদিন মোচার ঘন্ট রাঁধতে গিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলে-ছিল তারপর থেকেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছে। কিছুদিন ওকে ওর বাবার কাছে রাখলে মনটা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু—

তার ভাবনাগুলো তলিয়ে গেল। তলিয়ে গেল সিলভিকালচার অর্থাৎ যেসব গাছের তক্তা ভাল হয় তাদের কি করে যত্ন করতে হয় তার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভেতরে।

বংশী এল। হাসতে হাসতে বলল, অনেক শাল ফুল ফুটেছে মেমসাহেব। যাবেন?

—না।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

বৈশাখের রোদে জ্বলছে অরণ্য। জ্বলছে তার মন। ওই জঙ্গল। বংশী। ফরেস্ট-পাগল ওই মানুষটা। তিনটি—তিনটি তার শত্রু। প্রথম প্রথম তো! চোখে রঙ ছিল। চাঁদের আলোয় ভরা কত রাতে তাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেত বনে। আদর করে খোপায় গুঁজে দিত ফুল। তারই উৎসাহে বংশী তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে গাছ চিনিয়েছিল। তারপর কত জ্যোৎস্নার আলোয় কত স্তব্ধ দুপুরে দেখেছে অরণ্যের মায়াময় রূপ। তার মনে হয়—মনে হয় আরণ্যক আদিম সৌন্দর্যের বিচিত্র আস্বাদ তাকে বন্য করে তুলেছিল। তা না হলে আজ ভাবতে অবাক লাগে, কেমন করে সে বংশীর সঙ্গে সজারুর পিছনে ছুটতে ছুটতে শনগাছের গভীর জঙ্গলে চলে গিয়েছিল; কেমন করে বাঁশবনের আবছায়া অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে সে চুপ করে বসে থাকতো।

যত বেশি অরণ্যকে ভালবেসেছে তত ও খুসি হয়েছে। খুসি হয়েছে নিজের স্বার্থে। ফরেস্টারীর বইয়ের ভেতরে কাজের ভেতরে ডুবে থাকা যাবে নিশ্চিন্তে। এমনি করেই ধীরে ধীরে সে দূরে সরে গিয়েছে। যেতে পেরেছে।

তুমি এত বোঝো, আর এটা বোঝো না, যতই অসাধারণ হই না কেন আমি মেয়ে। কোন মেয়ে জঙ্গলকে ভালবেসে সুখী হতে পারে না।

তুমি তো সাধারণ মেয়ে নও—ওসব তোমার মুখের কথা। মনের কথা নয়। তাই যদি হবে এর ওর রান্নার প্রশংসা কেন কর, কেন রেঞ্জ অফিসারের স্ত্রীর হাতে মোচার ঘন্ট খেয়ে এসে পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলে। আমার যেদিন হাত পুড়লো, সেদিন তুমি মুখে আহা, উহু, করেছিলে বটে কিন্তু বিরক্তি চাপতে গিয়েও বলে ফেলেছিলে, যা পারো না, তা করতে যাও কেন?

রান্না-বান্না করে সামনে বসিয়ে খাওয়াবে। আসলে এমন মেয়েই তোমরা পছন্দ কর। কেন মিছিমিছি আমার কাছে অসাধারণত্ব আশা করেছো! কেন শিখিয়ে পড়িয়ে না নিয়ে উল্টে কুমারী বয়সের দৌড় ঝাঁপের নেশাটাই খুঁচিয়ে দিয়েছ! নির্জন বাংলো বাড়ীর এক কোণে বসে তীব্র যন্ত্রণায় সে পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল।

দুটো ড্রেন আর একটা কালভার্ট তৈরী হচ্ছে ফরেস্টের ভেতরে। বর্ষা এল বলে। গাছের নীচে নীচে জল জমলেই গাছের সর্বনাশ। তাই সোমনাথ নিজে তদারক করে কাজ করাচ্ছে।

—স্যার শনগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একটা মেঠো পথ দেখছি, বংশী বলল।

—সে কী! শুকনো শনগাছ মাড়িয়ে বাইরের লোক যাতায়াত করছে! বেড়া দিতে হবে।

ভর দুপুরে খেটেখুটে বাড়ি এল সোমনাথ। দেখল ঊর্মিলা একমনে কার একটা চিঠি পড়ছে।

—কার চিঠি?

—বাবার—

—যেতে লিখেছে বুঝি? যাও—যাও। তাই যাও—বেশ খুসি খুসি মনে হল সোমনাথকে।

যাও! বুকের ভেতরটা যেন ছিঁড়ে গেল। সে চলে গেলে এ বাড়ির ঘাড় বাঁধা নিয়মের জীবনের এতটুকু হেরফের হবে না। কারো প্রাণে এতটুকু বাজবে না। এই বাড়ি, এই ঘর, নিজের নাম, নিজের পরিচয় বিদ্যাবুদ্ধি অস্তিত্বটুকু পর্যন্ত তার কেমন যেন ঝাপসা মনে হল; মনে হল তার দেহ তার মন তার চেতনা শবের মত ভারী, অনড়, আর অবসন্ন হয়ে যাচ্ছে! নিশ্বাস আটকে আসছে। যাবে—যাবে সে! তাকে যেতে হবে—

ঊর্মিলা যাবে। সব ঠিক। কিন্তু হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনা নয়। দুর্ঘটনা—

সন্ধ্যা নামো নামো করছে। এমন সময় নাইট গার্ডরা চীৎকার করে উঠল আগুন—আগুন!

ছুটে গেল বীটম্যানরা। ছুটল সোমনাথ। বিশাল জায়গা জুড়ে শুকনো শনের জঙ্গলে আগুন ধরেছে। রোদে তেতে শুকিয়ে মচমচে হয়েছিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। আর আকাশ বাতাস অরণ্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া ধীরে ধীরে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দূরে—আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ছে।

—গাছের আগুন তো নয়—

—না না—মঙ্গলপুরের হাটুরেরা পথ সংক্ষেপ করার জন্য এই জঙ্গলের ওপর দিয়ে যায়। তারাই কেউ বোধ হয় জ্বলন্ত বিড়ির টুকরো ফেলেছিল—

সোমনাথ পাগলের মত ছুটোছুটি করতে লাগল। চার মাইল দূরে শহরে রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স আছে। আছে একটা দমকল। শহরে খবর পাঠালো সোমনাথ।

ওদিকে বংশী ফরেস্টের পাশে একটা পুকুরে হোসপাইপ ডুবিয়ে জল দিতে যেতেই একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল, খবরদার খবরদার তুই যাবি না—আগুনে পুড়ে মরবি—বংশীর কোমর জড়িয়ে ধরে ভয়ে আতঙ্কে চীৎকার করে কেঁদে উঠল সোনা। কাণ্ড দেখে অনেকে হাসল।

দমকল এসে পড়ল। এল রিজার্ভ ফোর্স। বহু চেষ্টা করে আগুন নিভল যখন তখন শেষ রাত। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে।

বাংলোয় ফিরে এসেও স্বস্তি পেল না সোমনাথ। অস্থির পায়ে পায়চারী করতে লাগল। তার বিশ্বাস, যে জঙ্গলটুকু এখনও পোড়ে নি তার ভেতরে আগুন রয়েছে। তুমি একটু একা থাকতে পারবে আমি এখুনি আসছি—ফরেস্টের দিকে যেতেই যা কখনো করেনি ঊর্মিলা তাই হঠাৎ করে ফেলল। বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বলল, তুমি ফরেস্টে যাবে না—

অবাক হয়ে গেল সোমনাথ, বিড় বিড় করে বলল, তুমি যে বংশীর বৌর মত অত্যন্ত সাধারণ—কি? যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল চোখে-মুখে। তীব্র একটা বাষ্প গলার কাছে পাক দিয়ে দিয়ে উঠতে লাগল। বংশীর বৌ মেয়ে। সেও তো মেয়ে। সে স্বামীকে ভালবাসতে পারে না? তার কোন সাধ আহ্লাদ থাকতে পারে না? তাকে তো ভালবাসতেই সে চায়। তাকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না সে। চিঠি-টিঠি সব মিছে কথা! শুধু তার মন বোঝার জন্য এসব কথা তো মুখে বলতে পারে না। বলা যায় না। তাই নিঃশব্দে দাবদাহের মত জ্বলে যেতে লাগলো।

তার উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ মূর্তির দিকে তাকিয়ে সোমনাথ ভাবতে চেষ্টা করল এই আগুনের উৎস কোথায়? কি করে নেভানো যায়!

পরপুরুষ

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

সম্রাট পঞ্চম জর্জ কি তাঁর বিয়ের সময় দাড়ি কামিয়েছিলেন? দাড়ি যে সব প্রখ্যাত ব্যক্তির চেহারায় বিশেষত্ব সৃষ্টি করেছিল তাঁরা কি নিজ নিজ প্রিয়তমা বরণের উপলক্ষে আপন আপন প্রিয়তম দাড়ি বিসর্জন দিয়েছিলেন? সম্প্রতি আমাকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

আমার ছেলেমেয়েদের ছোটমাসী অঞ্জনার বয়স এখন তেইশ চলছে। শহরতলির এই গ্রাম থেকেই সে কলকাতার কলেজে নিত্য যাতায়াত করে বি-এ পাস করেছে, তারপরে ওই মহানগরীরই এক স্কুলে মাস্টারী যোগাড় ক'রে তাও চালিয়ে চলেছে রেলগাড়িতে নিত্যযাত্রার সাহায্যে। তার যে দিদি আমার গৃহতরণীর কাণ্ডারিণী, তিনিই নিয়ে এলেন খবরটা। কুমারী অঞ্জনা নাকি প্রেমে পড়েছে এবং তাঁর মা অর্থাৎ আমার শ্বশ্রূমাতা আমাকে তলব করেছেন।

"কার প্রেমে পড়ল?"

আমার নিজস্ব সংবাদদাত্রী বিরূপ মুখে বললেন, "তোমাদের দেড়েল ঘোষালের।"

তার মানে, অধ্যাপক গৌতম ঘোষালের সংবাদ যৎপরোনাস্তি অবিশ্বাস্য। অধ্যাপক ঘোষালের বয়স পঞ্চাশ না হলেও তার চেয়ে বড়জোর পাঁচ বছর কম হতে পারে। অতি সজ্জন। গত পাঁচ-ছ' বছর দেখে আসছি। তাঁর আচরণে কোন ছ্যাবলতা কল্পনাই করা যেতে পারে না।

প্রৌঢ় অধ্যাপক গৌতম ঘোষালের অতি শ্রদ্ধেয় রূপের সামনে প্রবীণ লোকেরও মাথা নত হয়। নাতিদীর্ঘ স্বাস্থ্য। ফরশা টকটকে গায়ের রং, মাথায় কোঁকড়া ধরনের চুল বেখেয়ালে ঈষৎ লম্বাটে, আর দেখবার মত তাঁর দাড়ি। কপাল চোখ নাক সমেত ওপর-গণ্ডের দু চিলতে বাদ দিয়ে বাকি মুখ ঢেকে বুকে নেমে এসেছে ঘন বুনটের রেশমকোমল দাড়ি। রবি ঠাকুরের পরে এমন শ্মশ্রুসুন্দর ব্যক্তি আমি আর দেখিনি। সৌম্য সুহাস মধুভাষ মিতবাক প্রজ্ঞাবান—সেই সঙ্গে ওই দাড়ির সমন্বয়ে একেবারে ঋষিতুল্য ব্যক্তি।

ঘোষালমশাই এখান থেকে রেলগাড়িতে নিত্যযাত্রায় কলকাতার এক প্রথম শ্রেণীর কলেজে অধ্যাপনা করেন। আমাদের এই শহরতলির গ্রামে বাড়ি করেছেন—আমাদের বাড়ি থেকে কয়েক মিনিট দূরে এবং গত বছর ছয় ধরে বাস করছেন এখানে। আমার প্রায় সমবয়সীই হবেন—অবশ্য চুল-দাড়ির একগাছাও পাকে নি। তা, আমার বাবার কাকার তো নব্বুই বছর বয়সেও মাথার চুল একগাছাও পাকেনি। ঘোষাল প্রথম থেকেই আমাকে এতখানি আকর্ষণ করেছেন যে, আমিও নারীজাতের হলে তাঁর প্রেমে পড়েছি বলে রটনা হয়ে যেত। অতীব আকর্ষণীয় শ্মশ্রুশোভিত রূপ, মধুর স্বভাব, বিদ্যালোকিত সংস্কৃতি—এ সবের দরুণ এ অঞ্চলে তিনি সকলেরই পরিচিত ও প্রিয় হয়ে উঠেছেন। ট্রেনে কলকাতা যাতায়াতে সম্ভবত অঞ্জনার সঙ্গে প্রায়ই দেখাসাক্ষাৎ এবং মনখোলা আলাপসালাপ হয়। তা থেকেই হয়তো শ্রীমতীর মনে একটা ছাপ পড়েছে আর কি। তাই বলে সেটাকে প্রেমে-পড়া বলা হবে কেন?

শ্বশুরালয় রেল স্টেশনের ওপারে। পরদিনই অফিস-ফেরৎ গেলাম।

অঞ্জনা হালকা স্বভাবের মেয়ে নয় অথচ সদা-নীরব হাস্যে সুমধুরা। চরিত্রে একটু দৃঢ়তা—একটা গোঁ আছে। সেই জন্যেই ভয়। বয়সের বাধা না মেনে যদি গোঁ ধরে যে, ঘোষাল মশাইকেই বিয়ে করবে, তা হলে সেই সংকল্প থেকে তাকে টলানো দুঃসাধ্য হবে না। মনে যদি কোন দুর্বলতা দেখা দিয়েই থাকে, তা হলেও তো মেয়েটির বোঝা উচিত যে, বিয়ে করার ইচ্ছা থাকলে ভদ্রলোক ঢের আগে যথাবয়সেই সে কর্মটি করতে পারতেন এবং সযত্নে ঋষিরূপের চাষ করতেন না।

একান্তে অঞ্জনার সম্মুখীন হলাম। জিজ্ঞাসিত হয়ে সে বিশেষ সংকোচ প্রকাশ করল না। প্রায় অকুণ্ঠভাবেই দৃঢ়কণ্ঠে জানাল যে, ঘটনা যথার্থ—সে অধ্যাপক ঘোষালের প্রেমে পড়েছে এবং তাঁকেই বিয়ে করতে চায়।

বললাম, "কিন্তু তোমার একতরফা পড়াতেই তো চলবে না। উভয়পক্ষের পড়াপড়ি চাই।"

শান্ত সুস্মিত স্বরে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই পড়াপড়িই ঘটেছে—দু পক্ষেরই।"

সে কি! নিজেই অনুভব করলাম আমার চক্ষুস্থির দশা। ঘোষালের মত লোকের পক্ষে এমন পতন কী করে সম্ভব? মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারিত হল, "কিন্তু বয়স?"

বলল, "বয়স দিয়ে কী হবে? আমার ঠাকুমার বিয়ে হয়েছিল নাকি তিন বছর বয়সে আর ঠাকুর্দার নাকি বয়স তখন বাইশ। দুজনে তো সুখেই ঘরকন্না করে গেলেন আশি-পার বয়স অবধি।"

একটু চিন্তান্বিতই হয়ে পড়লাম। গোঁ যেন ধরে ফেলেছে বলেই মনে হল।

শ্বশ্রূমাতা অন্তরালে প্রায় জলে-ডোবা গলায় বললেন, "কী হবে বাবা? শেষে কি একটা বুড়োর সঙ্গে......"

আশ্বাস দিলাম জোর গলায়, "কিচ্ছু ভাববেন না। আমি দেখছি।"

সেখান থেকে বেরিয়ে, চলে এলাম ঘোষাল-বাড়ি। অধ্যাপক তখন বাইরের ঘরেই ব'সে কিছু একটা লিখছেন। দরজা থেকেই চোখ বাড়িয়ে দেখে নিলাম, কবিতা নয়।

আমাকে দেখেই স্বাগত জানালেন, 'আসুন—আসুন—আসুন।"

বরাবরই ওই রীতি। এই 'আসুন—আসুন' বলার সময় যখন সামনে-পেছনে শির সঞ্চালিত করেন, কিংবা কোন বিষয়ে সম্মতি জানিয়ে যখন ওপর-নিচে মস্তক আন্দোলিত ক'রে 'আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা' বলেন, তখন তাঁর অতুলনীয় দাড়ি যে পরম রমণীয়তায় নৃত্য-চ্ছন্দিত হয়ে ওঠে, তা দেখে আমি দীর্ঘশ্বাস রোধ করতে পারি নে। দাড়ির বিধাতা আমাকেও সংগতে প্রায় মাকুন্দচোপা করেছেন।

একথা-সেকথা নানা কথা জুড়ে দিলাম। সকল কথাকেই একমুখী ক'রে নিয়ে বিবাহ সমস্যার মুখরোচক আলোচনায় দাড়ি কাঁয়ে ফেললাম এবং সেই সূত্রে প্রশ্ন করলাম, "নিজে কি ও পাঠ না পড়াই সাব্যস্ত ক'রে ব'সে আছেন নাকি ?"

ঘন দাড়ির ফাঁকে মুক্তোদাঁতের হাসি এমনিতেই মনোমুগ্ধকর। আমার প্রশ্ন শুনে সেই হাসিকে এমন রহস্যময় ক'রে তুললেন যে, দেখেই বোঝা গেল, আমার উদ্দেশ্যটা ধ'রে ফেলেছেন। বললেন, "বয়স কি পেরিয়ে যাচ্ছে ?"

"যাচ্ছে না! বয়স কত হল আপনার ?"

"কত অনুমান হয় ?"

ঠকতে রাজি নই। সতর্ক হলাম। "অনুমানের দরকার কী ? শুনিই না।"

উঠে ভেতরে গেলেন। প্রথম পাসের পাকা সার্টিফিকেটটা নিয়ে এসে মেলে ধরলেন সামনে।

চোখ বুজলাম। শুধু বয়স হিসেব করার জন্য নয়, নিজের বিস্ময় ঢাকা দেবার জন্যও বটে। দাড়ির অরণ্য যে একেবারে পনেরো-কুড়ি বছর বয়স বেমালুম লুকিয়ে রাখতে পারে—এ শিক্ষা লাভ করলাম এই প্রথম, এ পঞ্চাশোত্তর বয়সে। তা, দুনিয়ায় যত বাঁচি তত দেখি, যত দেখি, তত শিখি।

শ্বশ্রুমাতাকে যখন গিয়ে বললাম যে, গৌতম ঘোষালের বয়স এই মাত্র তিরিশ বছর তখন তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন আমি ঘুষ খেয়ে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি।

যোটক বিচারের জন্য কোষ্ঠী নিয়ে এলাম অধ্যাপকের বৃদ্ধ পিতৃদেবের কাছ থেকে। কোষ্ঠীর চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ওতে কোন তঞ্চকতা নেই। কালবিবর্ণ পাঁচতপ্রান্ত তুলট কাগজে চিত্রিত-লিখিত একেবারে দশ-গজী কোষ্ঠী চোঙের আকারে পাকানো। সার্টিফিকেটে আর কোষ্ঠীতে জন্মতারিখ এক। হলও রাজযোটক।

অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি কোষ্ঠী দেখেছিলে ? কিংবা সার্টিফিকেট ?"

বিজয়গর্বিত হাসে বলল, "আজ্ঞে না, শুধুই দাড়ি দেখেছিলাম। তার ভেতর থেকেই আবিষ্কার করা হয়েছে।"

নারীকে অনেকবার নমস্কার জানিয়েছি, আরও একবার জানালাম।

অতঃপর সম্বন্ধ স্থির হতে দেরি হল না এবং খবরটা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

আমার হল মুশকিল। কন্যাপক্ষে একমাত্র সক্রিয় অভিভাবকস্থানীয় ব্যক্তি আমি। সাধারণ লোকের সমাজে আমার মেলামেশাও একটু বেশি। লোকের মুখের উড়ন্ত মন্তব্যগুলি 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' প্রাণের দশা যে কী করে তা শুধু বুঝতে লাগলাম আমি। আমি তো আর ঢোল কাঁধে নিয়ে রাস্তায় হাঁক পেড়ে বেড়াতে পারি নে—'প্রফেসর ঘোষালের বয়স পঞ্চাশ নয় গো, তিরিশ বছর।' মাঠে ঘাটে বাজারে জনতায় সর্বত্র চেনা-পরিচিত লোকের মুখে এক প্রশ্ন, "হ্যাঁ মশাই, শেষ পর্যন্ত একটা বুড়োর সংগে শালীটার বিয়ে দিচ্ছেন ?" জবাব শুনে বিশ্বাস করে না। প্রমাণ শুনে বলে কোষ্ঠী-সার্টিফিকেট জাল।

ঘোষালের জনপ্রিয়তাও কমে যেতে লাগল। লোকের কাছে তার তিরিশী সুকান্ত রূপটাকে দাড়িমুক্ত করতে না পারলে যে চলছে না।

এদিকে শ্বশুরালয়ে শাশুড়ী থেকে শুরু করে বাড়িতে নিজের মেয়েটি পর্যন্ত কন্যা-পক্ষীয় সকলেই আমার ওপর জোর চাপিয়ে দিল—পাত্রের দাড়ি যাতে কামিয়ে ফেলা হয় সেই ব্যবস্থা যেমন করে হোক করতেই হবে।

অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার অভিমত কী ?"

সে বলল, "কেন ? দাড়ি কামাবে কেন ? দাড়ি সমেতই তো মানুষটা। দাড়ি খুইয়ে খুবতো হবার দরকার কী ? সম্রাট পঞ্চম জর্জ কি তাঁর বিয়ের সময় দাড়ি কামিয়ে ফেলেছিলেন ?" দেশী-বিদেশী আরও কয়েকজন শ্মশ্রুশোভন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ক'রেও ওই একই প্রশ্ন করল। আরও বলল, "সিংহকে কি সুন্দর করার জন্যে তার কেশর কামিয়ে দেওয়া হয় ? ময়ূরের কি পেখম উপড়ে নেওয়া হয় তার বাহার খোলাবার জন্যে ?"

এ বিষয়ে শ্রীমতীর সঙ্গে আর কোন আলোচনা না করাই ভাল মনে হল। দাড়িগত প্রেমে ওর মাথা বিগড়ে গেছে—স্পষ্টই বোঝা গেল।

উল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, "এখন আর আপনাকে 'তুমি' বলতে আমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না, ভাই।"

এ বয়সেও এক রকম ছুটেই গিয়ে হাজির হলাম শ্বশুরবাড়িতে। শাশুড়ীর সম্মুখীন হলাম সগৌরবে। আমার মুখ দেখে তাঁর দৃষ্টি উজ্জ্বল হল। "কামিয়েছে, বাবা?"

"কামিয়েছে, মা।"

প্রসন্ন হাসো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ। নব জামাতার মুখচন্দ্র মেঘমুক্ত হয়েছে জেনে তাঁর মুখ থেকেও মেঘের ছায়া সরে গেল।

বিয়েবাড়ির অগণিত স্ত্রী-পুরুষ অভ্যাগতরা আমাকে ঘিরে ধরল। একই প্রশ্ন মুখে মুখে, "কামিয়েছে?"

একই উত্তর আমার মুখে, "কামিয়েছে।"

বারবার জবাব দিতে দিতে আমার মুখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তবে, ক্রমে প্রশ্ন লুপ্ত হল। সারা বাড়িময় হুল্লোড় পড়ে গেল, "কামিয়েছে! কামিয়েছে!"

অঞ্জনার ঘরে গিয়ে দেখি, তার মুখ শুকনো। জানি, বিয়ের দিনে অমন হয় মেয়েদের। যেন ফাঁসিকাঠে উঠবার জন্য তৈরি হচ্ছে। এদিকে তো উপোস চলছে সকাল থেকে। দিনের প্রথমার্ধেই তো কাহিল করে একটু বেশি। সে মুখ বিকৃত করল এবং নাসা কুঞ্চিত করল, "দাড়ি কামিয়ে ছিরি খুলেছে কী রকম?"

বললাম, "সে যা খুলেছে—'ভাষা না জুয়ায় তারে কেমনে বাখানি'। তোমার সবচেয়ে প্রিয় যে শরৎ-চিত্রতারকা, তার চেয়েও সুন্দর। দেখতেই পাবে রাতের বেলা। চিনতে কিছু অসুবিধে হবে। তার জন্যে ভাবনা নেই—আমি আছি 'আইডেন্টিফাই' করতে।"

একেবারে গোধূলিতে কয়েক মিনিটের একটা লগ্ন ছিল। সেটা বাদ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় লগ্ন রাত দশটার পরে। ওটাই ভাল। ইতিমধ্যে ভোজ-পর্বটা প্রায় চুকিয়ে ফেলা যাবে।

সন্ধ্যার পরে বর এল। যারা দাড়ি-সমেত এতকাল দেখেছে তাদের চোখে-বাকে বিস্ময়ের আর সীমা নেই। বরবেশ ওই রূপের খোলতাইও যা হয়েছে—অপূর্ব। যেখানে বর দাঁড়ায় সেখানেই অত-অত পাওআরের বিজলি-আলো যেন মিনমিনে হয়ে যায়।

বিয়ের লগ্ন পড়ল। প্রাথমিক কৃত্যকাণ্ডের পরে বর নিয়ে যাওয়া হল ছাদনাতলায়। পাট-পিঁড়ির দুদিক ধরল দুই তাগড়াই জোয়ান কুটুম্ব পেছনে ধরলাম আমি। তার ওপর বধূ-বেশে শ্রীমতী অঞ্জনা আসনপিঁড়িতে আসীনা। বসে আছে ঘাড় গুঁজে। এক-দুই-তিন করে সাত পাক ঘোরানো হল। তারপর বরের মুখোমুখি রেখে পিঁড়িসমেত তুলে ধরা হল বধূকে। চারদিক থেকে উপদেশ-নির্দেশের সোর উঠল, "তাকাও—তাকাও—ভাল করে তাকাও—বরের চোখের চশমা খুলে ফেলা হোক—" কেউ বলছে, "চশমা খুললে ভাল করে তাকাবে কী করে?"

আমি তো পেছনে। দেখতে পাচ্ছিনে শ্রীমতী কীরকম তাকাচ্ছে।

"মালা—মালা—এর পরেই মালাবদল—"

কিন্তু হঠাৎ এ কী! অঞ্জনা যে পেছনে ঢ'লে পড়ছে! এ সময়ে কি ঘুম পাওয়া সম্ভব?

এ কী হল! অঞ্জনা ঢ'লে পড়ে গেল আমার গায়ের ওপর। সোরগোল স্তব্ধ হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই আর্তনাদ উঠল, "ও গো—কী হল গো!"

"জল—জল—পাখা—পাখা!! উপোসে ধরেছে—গরম দুধ—"

"মেয়ের নিশ্চয় ফিটের রোগ আছে!"

"কক্ষণও না। কেউ কখনও দেখেনি ওকে ফিট হতে।"

বরপক্ষ আর কনেপক্ষেতে হাতাহাতি হবার উপক্রম। বর নিজেই মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে থামাল। কিন্তু ওসব দিকে নজর দেবার উপায় নেই আমার। নজরে যা পড়ল তাই শুধু দেখাতে হল।

অঞ্জনাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গেলাম ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে লোকের ভিড়। ভিড় ঠেলে বাইরে সরিয়ে দেওয়া হল। বন্ধ করে দেওয়া হল দরজা। পাখা চলল পুরো বেগে। তারপরও মাথার কাছে টেবিল-পাখা বসিয়ে চালিয়ে দেওয়া হল। জলের ঝাপটা দিলাম তার চোখে। কনেচন্দন ধুয়ে ভাসল।

লোক ছুটল ডাক্তার ডাকতে।

সেই বিয়েবাড়িতে তখন কী যে কাণ্ড চলতে লাগল তা বর্ণনা করার সাধ্য নেই।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, "এ কী করে হল? হঠাৎ খুব একটা 'শক্' পেয়েছে মনে হচ্ছে।"

ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। মনের নাকি পূর্ণ বিশ্রাম দরকার। নইলে খারাপ হতে পারে। অসাড় হয়ে পড়ে রইল অঞ্জনা। শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে।

অনেকে পরামর্শ এবং উপদেশ দিলেন—কনেকে ওই অবস্থায় বিয়ের আসনে বসিয়ে শক্ত করে ধরে রেখে বিয়ে দেওয়া হোক। কিন্তু পাত্র নিজেই তাতে প্রবল আপত্তি করল।

বেঘোরে পন্ড হল উৎসব।

পাত্রের পিতাও অতি সজ্জন। পাত্র নিয়ে চলে যাবার আগে সকলকে আশ্বাস দিয়ে গেলেন—তিনি বিশ্বাস করেন না যে পাত্রীর ফিটের রোগ আছে, ভাল করে চিকিৎসা হোক, তারপরে আবার শুভরাতে শুভকর্ম হবে—ঠিক যা হয়ে গেছে, স্বয়ং ভগবান যদি না করেন তবে তা বেঠিক হবে না।

পরদিন দেখা করলাম অধ্যাপকের সঙ্গে। চন্দ্রমুখ অন্ধকার। মুখ তুলে শুধু একবার বলল, "আসুন।" কিন্তু সে দাড়ি তো নেই!

জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছে?"

"ঘুমোচ্ছে। অসাড়।"

গৌতমের ধারণা, কাঠ উপবাসের দরুণই এমনটা হয়েছে।

তিন-চারদিনেই অঞ্জনা সুস্থ হয়ে উঠল। তবে, কেমন একটা ভ্যাবাচ্যাকা ভাব।

সারা বাড়ি বিষাদে থমথম করছে। কী যে হয়ে গেল......!

আরও দুদিন গেলে, একদিন একান্তে বসলাম অঞ্জনার মুখোমুখি। বললাম, "সে রাতের অবস্থাটা মনে করার চেষ্টা কর দেখি—কেন হঠাৎ এমনটা হল?"

বলল, "জামাইবাবু, ওর দিকে যখন মুখ তুলে চাইলাম, হঠাৎ ধক্ করে উঠল বুকের ভেতর। এ কে? একে তো আমি চিনি নে! অচেনা লোকের সঙ্গে বিয়ে হলে, সে ছিল আলাদা কথা। কিন্তু যে লোককে এতদিন একান্ত আপন ভেবে এসেছি— অতি আপন করে পাবার জন্যে যে চেহারার ধ্যান করেছি দিনের পর দিন, হঠাৎ দেখি, সামনে এ তো সে লোক নয়! চটুল চকচকে সিনেমা স্টারের মত চেহারার এ যে কোন এক পরপুরুষ! আমার মাথা ঘুরতে লাগল। যখন মালার কথা উঠল, তখন মনে হল, আমি কার গলায় মালা দিতে যাচ্ছি! এ যে পরপুরুষ! তারপর কী হল—আর বলতে পারি নে।"

—চুল না দাড়ি সার?
—না খুশি। সিনেমায় সীট নেই, রেস্তোরাঁয় সীট নেই, ট্রামে বাসে সীট নেই, তাই এখানে ঢুকে পড়েছি, বাবা

অঞ্জনার এই কথাগুলি বললাম গিয়ে গৌতমকে। শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠল তার মুখ। মাথা নাড়তে লাগল এপাশ-ওপাশ, কিন্তু হায়, কোথায় দাড়ি!

নিজেকে অপরাধী মনে হল। এর জন্য দায়ী আমি। আমিই তো ঘোষালের দাড়ির প্রথম প্রেমিক। যতই সবাই তাল দিক, আমি কেন সেই তালে নাচতে গেলাম? আমি অত করে না বললে তো দাড়ি কামাত না গৌতম। শাশুড়ী কি মরে যেতেন ওর পূর্ণ চন্দ্রমুখ না দেখতে পেলে? এখন কী অবস্থায় বেঁচে আছেন তিনি!

গৌতম বলল, "থাক, যা হবার হয়ে গেছে, ওর জন্যে আর দুঃখ করবেন না। দাড়ি আবার বাড়ুক। তবে, মোটামুটি আগের চেহারা ধরে উঠতে ক' মাস লাগবে কে জানে?"

এক মাস গেল। গন্ডস্থল ঢাকা পড়ল বটে, কিন্তু কেমন যেন রুখো রুখো ছাকড়া ছাকড়া ভাব। আরও এক মাসেও রূপ ধরে উঠবে মনে হয় না। শ্রাবণ মাস গেলেই তো সেই অগ্রহায়ণের আগে আর বিয়ের কাল নেই।

ছোট শ্যালক কৃষিবিজ্ঞানের বি এস-সি পড়ছে, বলল, "অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে কেমন হয়?"

গৌতম বলল, "কিছুই করতে হবে না। আপনিই আসুক। পুরো ছ' মাস সময় পেলে দাড়ি আবার স্বরূপ ধরে উঠবে।"

এখন সেই অগ্রহায়ণের দিকেই চেয়ে আছি আর অধ্যাপক গৌতম ঘোষালের মুখের দিকে।

একটি আলোর পাখি

জগদীশ ভট্টাচার্য

একটি আলোর পাখি এসেছিল ফুলের বাগানে।
কণ্ঠে তার সুধা ছিল,
সারাদেহে রামধনু রঙ।

পাতার আড়াল থেকে
হাসি আর কান্না নিয়ে
ছিল তার চুনি-পান্না খেলা।
সে-খেলায় আমাকে সে ডাক দিত
আলো আর গান আর ফুলের জগতে।।

আমার ঘরের পাশে শ্যামস্নিগ্ধ সব্জির ক্ষেত,
শস্যময় ফসলের মাঠ,—
মৃত্তিকার পাত্র ভরে জীবনের সহস্র সঞ্চয়।

ওরি মাঝে
আলোর পাখির কণ্ঠ ছড়াত অমিয়।
সব কিছু হত মধুময়।।

সে আলোর পাখি আজ
ডেকে ডেকে চুপ করে গেছে।
রামধনু রঙ থেকে ঝরে না গানের সুধা আর।

আমার ভুবন তাই শূন্য মনে হয়—
মূল্যহীন মনে হয় শ্যামস্নিগ্ধ সব্জির ক্ষেত,
আর
শস্যময় ফসলের মাঠ।।

আমি শুধু খুঁজে ফিরি
একটি আলোর পাখি ফুলের বাগানে।
কণ্ঠে যার সুধা ঝরে,
সারা দেহে রামধনু রঙ।।

বিদায়

অনিল ভট্টাচার্য

আমার ডাক পড়েছে আমি যাই
ফুরালো বেলা
নীল আকাশে ভাসবে না আর
সাদা মেঘের ভেলা।।
দোল দেবে না কাশের বনে
অলস ভ্রমর গুঞ্জরণে
ফুরিয়ে যাবে শিউলি কমল
কুন্দকলির মেলা।।
অশ্রুহাসির এই যে লীলা
মধুর হ'য়ে
বাজবে বুকের বীণার তারে
রয়ে রয়ে—
চিহ্ন যাহা গেলাম রেখে
আজ শরতের শেষে
লব তুলে হেমন্তেরি
প্রভাত বেলা এসে
আনবে সাথে ধানের ক্ষেতে
ফসল কাটার বেলা।।

আলোয় অন্ধকারে

বটকৃষ্ণ দে

আমি আর অন্ধকার একবার মুখোমুখি বসে
খুঁজেছিলাম জীবনের মানে। অন্ধকার বলেছিলো,
'মানে নেই', তারি মতো নৈতি-রঙে, গভীর রহস্যে
ভরা; ভোর হ'ল অমনি আলোয় কুয়াশা
মুছে গেল!

আর—একবার আমি আর মধ্য দুপুর দুজনে
ভাবছিলাম জীবনের গূঢ় অর্থ। অপরাহ্ন এলো,
ভাবতে-ভাবতে সন্ধ্যা হ'ল, রাত্রির বাগানে
তারা ফুটলো
হঠাৎ আলোর মানে, অন্ধকারে স্পষ্ট হ'ল মনে।

নারীর প্রার্থনা

সুশীল জানা

[অথর্ব বেদ থেকে]

বিজয়িনী অপ্সরার সেই
সর্বজয়ী উৎকণ্ঠিত প্রেম
হে দেবতা,
দাও ওই পুরুষ হৃদয়ে।
আমার কামনা নিয়ে দগ্ধ যেন হয়
উদ্বেল হৃদয় ওর।।

আমার প্রার্থনা শোন হে দেবতা,
ও যেন আকুল হয়
অনুরাগে—একান্ত উন্মুখ।
দাও ওকে সে বিরহ—
আমার কামনা নিয়ে দাহিত হৃদয়।।

ও জ্বলুক আমার বিরহে, হে দেবতা,
(আমাকে দিও না সে জ্বালা)
শুধু ও জ্বলুক আমার কামনা নিয়ে—
দগ্ধ করো ওকে।।

হে মরুদ্‌গণ—মহাশূন্যের হাওয়া, শোন—
মাতাল করে দাও ওকে আমার প্রেমের জন্য
মাতাল করে দাও ওকে হে অগ্নি দেবতা,
দগ্ধ কর দীপ্ত কামনায়

*　　　*　　　*

দেবতারা ঢেলেছে জলে
প্রেমের যে সর্বগ্রাসী কামনা
আর সেই আকুল বিরহ,
বরুণের আমায় বিধানে
তোমার পানীয় ভরে
দিলেম প্রদীপ্ত করে
সে মহাতৃষ্ণাকে।।

জয়ের ভুবনে

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

বলেছি তোমাকে আমি—এই ভালো
এই বেশ আছি!
হোক না দূরের পথ ভূগোলের মানচিত্রে,
তবু কত কাছাকাছি
মনের পরিধি কভু ভৌগোলিক দূরত্ব
মানে না, তাই আমি একান্ত সহজ
তোমাকে যে কত কাছে পাই,
মন দিয়ে মন ছুঁই রোজ!

আমি ত' চাইনি কভু, রূপের গৌরবে
কিম্বা ব্যাংকে যে ব্যালান্স আছে
তা দিয়ে কখনো আমি—পাছে
ছোট করে ফেলি বলে চাইনি তোমায়,
হাতের নাগালে অত কাছে!
তোমাকে চেয়েছি আমি রূপে নয়,
অর্থে নয়, কিম্বা অন্য কোনো গুণে
প্রেমের পংকজ মূল্যে তোমাকে আনব তুলে
ভালবেসে জয়ের ভুবনে।

চতুর্দশপদী

সুনীল ভট্টাচার্য

দুর্গম দুর্গের মত চতুষ্কোণ জ্যামিতি জটিল
গোলকধাঁধার পথ। যদি কেউ ভুল করে এসে
মায়াবী মন্ত্রের স্তবে মুগ্ধ হয়। আকাশের নীল
কঠিন মৃত্যুর হাত স্পর্শ করে। রূঢ় ছদ্ম বেশে
নিজেরই বিহ্বল ছায়া অবিশ্বাসী গুপ্তচর সেজে
নেপথ্যে দাঁড়ায় এসে। তাই রাত্রিদিন দ্রুত ভয়ে
স্বরচিত ব্যবধানে বসে আছি বিজ্ঞান কলেজে
সংকীর্ণ জানালা খুলে।
আমি সিদ্ধকাম অভিনয়ে।

মুখোশ আমার নাম। গড়ে তুলি নিরেট দেয়াল
তিলে তিলে মৃত্যু আমি
ডেকে আনি অন্ধ সর্বনাশে
অনেক আনন্দ আমি পেতে পারি। নিষ্ঠুর খেয়াল
সিদ্ধকাম হতে পারি এই ক্ষণে নির্মম উল্লাসে
যদি দাও হে দেবতা, লক্ষ মুদ্রা দুহাতে আমার
আর এই মুদ্রা কটি নির্বোধের বণ্টনের ভার।

প্রস্তুতি

নীলিমা সেন (গঙ্গোপাধ্যায়)

শিবিরের দরজায় প্রহরী দাঁড়িয়ে
থাকে বেয়োনেট হাতে।
হিউগান্সের সুতীক্ষ্ণ আওয়াজ;
ভারী বুটের শব্দ—আকাশের বুকে
ব্যথা দেয়।
কাঁটা-তারের বেড়ার ওধারে বাঁধানো
কালভার্ট; সেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে
সম্মিলিত পদধ্বনি। প্রান্তরে প্রান্তরে
প্রস্তুতি চলেছে প্রাণ-বলিদানের।

রাত্রি নিঃশব্দ। পেঁচা-ডাকা
রাত।
উত্তরে—তুষার-প্রান্তর।
তারও ওপাশে—বিদেশী বিভীষিকা;
যেন লক্ষ লক্ষ ম্যাকবেথ গুঁড়ি মেরে
ভ্রূকুটি করছে—
মৃত্যুর ছুরিকা হাতে নিয়ে।

জীবিকা

রণজিৎকুমার সেন

পারিবারিক আত্মীয়তা রক্ষার সূত্রে মাঝখানে দিন কয়েকের জন্যে পাটনার মিঠাপুর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে প্রায় এক যুগ বাদে হঠাৎ সেদিন আবার মৃগাঙ্ক লাহিড়ীর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। অনেক কাল ঘুরে-ফিরে নানা সূত্রে তার কথা মনে এসেছে, তারপর একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম মৃগাঙ্ককে। হরিলাল কোয়ার্টার্সের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার চোখে চোখ পড়তেই বিস্ময়ে বলে উঠলাম: 'কে মৃগাঙ্ক না, ব্যাপার কি, এখনও বেঁচে আছো দেখছি! তা—এতকাল বাদে হঠাৎ এ অঞ্চলে কি মনে করে?'

কিন্তু যত সহজে আমার পক্ষে প্রশ্নটা করা সম্ভব হলো, মৃগাঙ্ক কিন্তু ঠিক তত সহজেই জবাব দিতে পারলো না। কিছুক্ষণ অপরিচিতের মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর ঘোর কেটে গেলে সলজ্জ কণ্ঠে বললো, সে কি মাস্টারমশাই আপনি; কতকাল আপনাকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি।

বললাম: সেটা উভয়তঃ, কিন্তু কলকাতা কামারহাটি ছেড়ে হঠাৎ এ রাজ্যে কেন?

মৃগাঙ্ক বললো: 'ব্যবসা সংক্রান্ত সূত্রে এক বিহারী বন্ধুর সঙ্গে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন—মোটামুটি বেঁচে আছি এখনও!'

জিজ্ঞেস করলাম: 'গান-বাজনার অভ্যাস রেখেছ, না ছেড়ে দিয়েছ?'

—'আমি ছাড়িনি তবে গানই আমাকে ছেড়েছে!' মুখে কেমন একটা ব্যর্থতার হাসি টেনে মৃগাঙ্ক বললো—বড় তাড়া আছে মাস্টার মশাই। সন্ধ্যার পর এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবো। এই বলে উপস্থিত মত অদূরে অপেক্ষমাণ তার বন্ধুটির সঙ্গে নিজের কাজে চলে গেল সে।

আমি নিজেও কি একটা কাজে বেরবো বলে তৈরী হয়েছিলাম, কিন্তু বেরনো আর হলো না। মৃগাঙ্কর কথাটাই বহুক্ষণ ধরে আমার সমস্তটা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। কলকাতা ছেড়ে সবাই তখন পালাতে ব্যস্ত। আমি বউবাজারের একটা মেসে থেকে দুবেলা গানের টিউশানি করে কাটাই। মেসটাও তখন তুলে দেবার উদ্যোগ চলছে। ভাবছি—নতুন করে আবার কোথায় গিয়ে উঠি! ইতিমধ্যে যে লোকটি গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসে বললো: আমার এক জানা ফ্যামিলিতে আপনার টিউশানির খুব খ্যাতি। আমি নিজেও যৎসামান্য গান-বাজনার চর্চা করে থাকি। আপনাকে আমার রেসিডেন্সিয়াল টিউটর পেলে আমার খুব উপকার হয়; সে এই মৃগাঙ্ক। কথা যে ঠেলে ফেলবো, এমন অবস্থা নয় তখন। যুদ্ধের ভয়ে সবাই পালালেও আমার পক্ষে পালানো সম্ভব নয়। অতএব কিছুমাত্র দ্বিধা না করে মৃগাঙ্ক লাহিড়ীর প্রস্তাবে সাড়া দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম: 'আপনার রেসিডেন্স কোথায়?'

—'কামারহাটি'। মৃগাঙ্ক বললো; 'সোদপুর অবধি আপনি তো সপ্তাহে একবার করে টিউশনিতে যানই, সুতরাং কামারহাটিতে থেকে বাইরের দু-একটা টিউশনিতে বেরনো আপনার পক্ষে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া দরকার মতো যখন তখন কলকাতাতেও আসতে পারবেন।'

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। জীবনে ঘর না বাঁধলেও একামানুষের প্রাণে ভয়টাই বা কম কি! মনে মনে সেই ভয় নিয়েই মৃগাঙ্কর সঙ্গে একসময় কামারহাটি রওনা হলাম।

গিয়ে যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। বিঘা দুয়েক যায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে মাঝারি ধরণের একটা ফ্যাক্টরী। হেলমেট তৈরীর কাজ। এ-আর-পি ভলান্টিয়ার্স, হোমগার্ড ও সৈনিকদের জন্য সরকারী অর্ডার সাপ্লাই করা হয় এখান থেকে। স্টীল টিনের পাত, রবার আর মোটা মোটা ফিতেয় গুদামঘর ভর্তি। পাশেই কোয়ার্টার। মেইনগেটের ভিতরদিকে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সিঙ্গল রুমের ফ্ল্যাট। দূরে মোটর গ্যারেজ।

বললাম ঃ 'এ কারখানায় গানের কি ঠাঁই হবে?'

—'নাহলে ফ্যাক্টরী আমি তুলে দেবো' সহজ হেসে মৃগাঙ্ক বললো ঃ 'জীবন আর জীবিকা কারই বা বড় একটা একসুরে চলে। জীবিকার পথ স্বতন্ত্র হলেও জীবনে গান আমাকে শিখতেই হবে।'

জিজ্ঞেস করলাম ঃ তা নিজের বলতে এখানকার কোয়ার্টারে কে কে আছে?

—'বিশেষ আমি নিজে আর আমার এক নেপালী বাবুর্চি হরি সিং। সময়মত বিয়ে হয়তো করা চলতো কিন্তু সেদিকে মন দেবার অবকাশ পাইনি।' থেমে মৃগাঙ্ক বললো ভেবেছিলাম—চেষ্টা করে জীবনে বড় কিছু একটা গড়ে তুলবো, তারপর না হয় হারমোনিয়মের সমস্তগুলো রীডের সুরে মিলিয়ে একদিন ঘর বাঁধবো, কিন্তু ঘরণী আর এলোনা, ঘরটাই আপাততঃ মজবুত করে বেঁধেছি।

মিথ্যে নয়। মৃগাঙ্কর কোয়ার্টারটা দেখবার মতই বটে। যেন সবকটা পরিবেশ মিলিয়ে অদ্ভুত একটা ছবি। বললাম ঃ এখনই বা এমন কি একটা বয়স এবারে বরং দেখেশুনে—

কিন্তু কথা শেষ করতে দিল না মৃগাঙ্ক, বললো ঃ ও নিয়ে ভাবা নেই। আপনি বরং গানে আমাকে পাকা করে দিন।'

একটুখানি থেমে আবার মৃগাঙ্ক বললো ঃ শুধু তাই আপনাকে কাছে পাবার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল মাস্টারমশাই। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গতায় আমি বড় হাঁপিয়ে উঠি। আপনি আমার সেই নিঃসঙ্গতার সঙ্গী। ভালো একটা ঘর রয়েছে আমার, ওটা এখন থেকে আপনার ঘরেই থাকবে। অবকাশ মতো অতি রোজ আপনার ঘর থেকেই গানের তালিম দেবো।'

কার্যতঃও সেই ব্যবস্থাই হলো।

ইমার্জেন্সী পিরিয়ড বলে ফ্যাক্টরীতে তিন শিফটে কাজ চলে। ওয়ার্কাররা যন্ত্রের মতো ভয় করে মৃগাঙ্ককে। কিন্তু তারই ফাঁকে নিজেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে সেই যন্ত্র নির্বোধ শিশুর মতো হারমোনিয়মের ডালা খুলে এসে বসে আমার সামনে। তালিম নেয় গানের। আগে থেকেই কিছু চর্চা ছিল, গলার কাজও ভালো, তাই সুরের ক্লাসিকে আসতে তার একটুও আটকালো না।

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন এক অপরিচিত মহিলা একাই গাড়ী ড্রাইভ করে এসে মৃগাঙ্কর খোঁজ করলো। মহিলার বয়স বছর ত্রিশেক হবে, স্বাস্থ্যবতী এবং সুন্দরী। টেলিফোনে যোগাযোগ করে তবে সে মৃগাঙ্কর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অতএব গেটে গাড়ী দাঁড়-করাবার আমার কোনো সুযোগ নেই। বোধ করি মৃগাঙ্কও এই এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, তাই গাড়ী থেকে নেমে মৃগাঙ্কর কোয়ার্টারে গিয়ে ঢুকতে একটুও আটকালো না মহিলাটির।

নিজের ঘরে বসে লক্ষ্য করলাম—বেরিয়ে এসে পুনরায় গাড়ীতে স্টার্ট দিতে তার প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগলো। ভাবলাম—হয়তো ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা ছিল, নইলে এমন পরিবেশে যেখানে বাইরের কোনো পুরুষকেই সাধারণতঃ দেখা যায় না, সেখানে এরকম একটি মহিলা এমন অসংকোচে এসে সোজা মৃগাঙ্কর কোয়ার্টারে ঢুকে পড়তে পারলো কি করে?

যে অর্গানটা মৃগাঙ্ক স্বেচ্ছায় আমার ঘরে এনে রেখেছিল, হরি সিংকে দিয়ে সেটাকে আবার সে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। সেই অর্গানের রীডে এবারে নারীর নরম আঙ্গুলের ছোঁওয়া লাগলো। আমার ঘরে বসেই শুনতে পেলাম—গান গাইছে মহিলাটি। হঠাৎ আমার ডাক পড়লো মৃগাঙ্কর ঘরে।

গান থামলে আমাদের উভয়ের সঙ্গে উভয়ের পরিচয় করিয়ে দিল মৃগাঙ্ক। বলল ঃ জানেন মাষ্টারমশাই, মিস বনানী বোস স্কুলে কাজ করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছেন, পিতৃদত্ত অর্থও অবশ্য কিছু পেয়েছেন। তা দিয়ে এবারে ওঁর ইচ্ছে অভাবী মেয়েদের জন্যে একটা কিছু স্মল স্কেল ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলেন। এ ব্যাপারে আমাকে একজন মস্তবড় বিজনেস ম্যাগনেট মনে করে আমার সাহায্য চাচ্ছেন।

দেখলাম—সেদিন থেকে দিনের পর দিন লক্ষ্য করে দেখলাম—ধীরে ধীরে কেমন পরিবর্তন ঘটছে মৃগাঙ্কর। নেশা হলে যেরকম হয় ঠিক তেমনি। ফ্যাক্টরীর কাজে প্রায়ই তার অনুপস্থিতি ঘটতে সুরু হলো। যে গান শিখবে বলে আমাকে এখানে সে রেসিডেন্সিয়াল টিউটর করে নিয়ে এলো, সেই গান শেখাও একরকম বন্ধ হবার মধ্যেই। এবারে তবে কি নিয়ে বাঁচবে সে? মৃগাঙ্কর প্রশ্নটা এবারে আমার মনে এসেই ভর করলো। কি নিয়ে বাঁচবে তবে সে? বনানী বোসকে নিয়ে? ততখানি দেবে কি সে মৃগাঙ্ককে?

কাছে পেয়ে অসংকোচে একদিন জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'দিন দিন এ তুমি কি হচ্ছো?'

—'কেন? এতদিন ঘর ছিল নদীর চর, যেন উত্তপ্ত বালুকণা, আজ ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে।' হেসে মৃগাঙ্ক বললো ঃ 'আপনার বোধ করি ভালো লাগছে না মাষ্টারমশাই, তাই না?'

কিন্তু অনুমান যে আমি একেবারেই মিথ্যে করেছিলাম, এমন নয়। বনানীর মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম সে কি ধরণের মেয়ে, কিন্তু তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। যার কাছে প্রকাশ করবো, সে তখন বনানীতে আচ্ছন্ন। সেই আচ্ছন্নতার সুযোগ নিতে বনানী একটা মাসও কাটালো না।

একদিন দেখলাম মৃগাঙ্ক লাইব্রেরী। এই এতবড় হেভিমেটে কারখানা পুরোটাই বনানী বোসের অধিকারে চলে গেছে। কিন্তু যে অধিকার পাবার লোভে মৃগাঙ্ক নিজের অধিকার ছেড়ে দিল, আজ তার ঠিক উল্টো হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রের আগুনে পথে দাঁড়াল মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্কের অবস্থা দেখে চোখ দুটো বোধ করি আমারও একবার ছল্ ছল্ করে উঠেছিল।

কিন্তু এতবড় একটা ঘটনার মূলে সত্য কখনও চাপা থাকবার নয়। ক্রমে জানা গেল, কে এক ধুরন্ধর ব্যবসায়ী মিঃ খান্না বনানীকে দিয়ে একাজ করিয়েছে। যুদ্ধের হিড়িকে এমন জালজুচ্চুরির ফাঁদে অনেকেই পড়েছে।

বললাম ঃ তোমার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে বনানী সব নিজের নামে লিখিয়ে নিল, তখন তুমি কি কোর্টে গিয়ে কেস ফাইল করতে পারো না? অন্ততঃ আমি তো সাক্ষী রয়েছি। দরকার হলে আরও সাক্ষী যোগাড় করা যাবে।

মৃগাঙ্ক বোধ করি নিজের মধ্যে একেবারে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল, বললো ঃ 'আপনি ক্ষেপেছেন মাষ্টারমশাই? যা লিখে দিয়েছি, তার জন্য কেস করব? তা হয় না। শুধু দুঃখ থেকে গেল। আমার গানও বোধ করি চিরদিনের মতই শেষ হয়ে গেল! আপনাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না!'

উত্তরে কিছু একটাও না বলে পথে এসে সেদিনের মতো মৃগাঙ্কর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম।.........

প্রথম প্রথম প্রায়ই তার কথা মনে প'ড়ে দুঃখ হ'তো! এমন করেও, কারুর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে! কিন্তু তারপর নানা ঘটনা পারম্পর্যে ধীরে ধীরে একসময় মন থেকে মৃগাঙ্কর কথা একরকম মুছেই গেল। যদি না আজ এই মিঠাপুরের ঝরিলাল কোয়ার্টার্সে'র সামনে হঠাৎ আবার তার দেখা পেতাম, তবে হয়তো কোনোদিনই তাকে আর মনে পড়তো না! কিন্তু স্মৃতি বড় বালাই। মৃগাঙ্ককে দেখতে পেয়ে কামারহাটির সেই দিনগুলি আমার অনুভূতিকে আজ আবার নতুন করে নাড়া দিয়ে গেল। কতক্ষণ যে একই ভাবে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম, বলতে পারি না।

সন্ধ্যার পর সে কিন্তু কথা মতো আমার কোয়ার্টার চিনে আসতে একটুও ভুল করলো না।

মৃগাঙ্ক বললো: 'আমি ইচ্ছে করলে কালই কলকাতায় রওনা হতে পারি। যা কাজ ছিল, আজই প্রায় হয়ে গেল। বাকী কাজের জন্যে আগরওয়ালা আরও সপ্তাহখানেক এখানে থেকে যাচ্ছে। তা—আপনি কবে ফিরছেন মাষ্টার-মশাই?'

বললাম: 'আমার গতকালই ফেরার কথা ছিল, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে হয়ে উঠলো না। তা—তোমাকে সঙ্গী পেলে আমিও কালই যেতে পারি।'

মৃগাঙ্ক বললো: 'তবে তো ভালই হলো। আপনি আর কষ্ট করে টিকিট কাটবার হাঙ্গামায় যাবেন না, আমি টিকিট কেটে রাখবো।'

পরদিন আমি তৈরী হ'য়েই ছিলাম। সময় মতো এসে আমাকে তুলে নিয়ে যেতে ভুল করলো না মৃগাঙ্ক। প্ল্যাটফর্মের কোলাহল কাটিয়ে এক সময় আমাদের ট্রেণটা তার স্বাভাবিক গতিতে ছুটতে সুরু করে দিল।

কম্পার্টমেন্টে লোকের ভিড় কিছু কম ছিল, তাই আমাদের কথাবার্তায় বিশেষ অসুবিধে হলো না।

কথায় কথায় বললাম সেই যে তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেল, তারপর এই এত বছর কি করে কাটালে তুমি বলো?'

—'সে বড় দুঃখের কাটানো মাষ্টারমশাই।' বুকের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিয়ে মৃগাঙ্ক বললো: 'সেদিনের সেই কপর্দকহীন অবস্থায় যখন কোনোদিকে কোনো পথই আমার খোলা রইল না, তখন ঘুরতে ঘুরতে এক সময় গিয়ে দাঁড়ালাম কলকাতার বড়বাজারে। আত্ম-সম্মান ব'লে কিছু রইল না। একটা দোকান থেকে কিছু রেডিমেড জামাপ্যান্ট পেটিকোট আর ব্লাউজ নিয়ে ফিরি করে বিক্রী করতে সুরু করলাম। তাতে দোকানীর হিসেব মিটিয়েও নিজের হাতে কিছু কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। এমনি করে বছর তিনেক কাটবার পর যখন কিছু মোটা টাকা হাতে এলো, তখন কর্পোরেশন থেকে লাইসেন্স নিয়ে খান তিনেক রিক্সা ছেড়ে দিলাম পথে। জানি না রিক্সার চাকার সঙ্গে মানুষের ভাগ্য কিছু জড়িয়ে আছে কিনা, কিন্তু মনে হলো—চাকাগুলো যত বেশী ঘুরতে সুরু করলো, আমার ভাগ্যচক্রও ততই যেন বিঘূর্ণিত হতে লাগলো। একটা ছেড়ে আর একটা, তারপর আরও একটা, এমনি ক'রে পর পর কয়েকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দরজা পেরিয়ে এসে একসময় বড় ধিক্কার এলো মনে। ভাবলাম—

তোমার বাবা বিয়েতে কি ফার্নিচারই দিয়েছেন
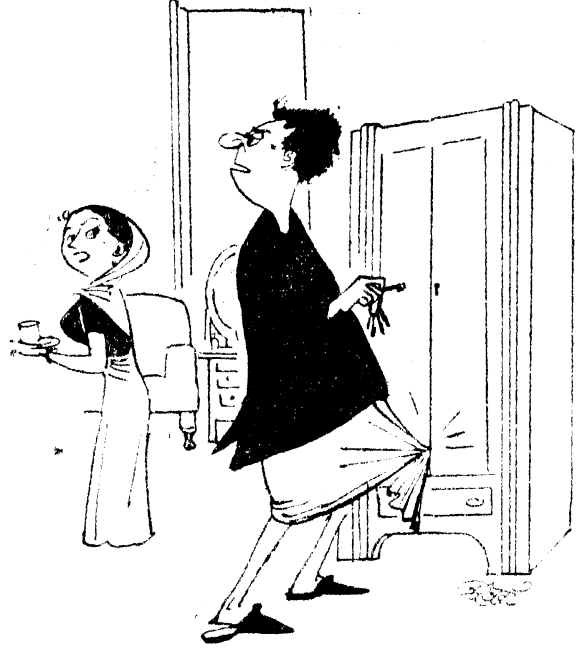
এরকম উঞ্ছবৃত্তি করে আর কতকাল কাটবে! যা হারিয়েছি, তা হয়তো আর ফিরে পাবো না, কিন্তু নতুন করে কি আবার কিছু গ'ড়ে তোলা যায় না—যেখানে শুধু আমি নই, আমাকে কেন্দ্র করে অন্ততঃ দু'একশো মানুষের অন্নের সংস্থান হয়ে যেতে পারে। কামারহাটির কারখানাটাও যে আমি এই উদ্দেশ্যেই করেছিলাম মাষ্টার-মশাই!'

বললাম: 'তোমার হয়তো সেই বিখ্যাত প্রোভার্বটা মনে আছে—গড হেল্পস দেম হু হেল্প্ দেমসেল্ভস। ঈশ্বরের করুণা থেকে তোমার বঞ্চিত হবার কথা নয় মৃগাঙ্ক।'

হয়তো কথাটা ওকে এবারে খুসী করলো। বললো: হয়তো সত্যিই বঞ্চিত হইনি। নইলে সেই দুঃসময়ে আগরওয়ালাকে বন্ধু হিসেবে পাবো কেন! যদি একাজে আগরওয়ালার সঙ্গে পাটনায় না আসতাম, তবে হয়তো আপনাকে কোনোদিনই আর এমনি করে পেতাম না মাষ্টার মশাই!

—তা কেন! কোথাও কোনোদিন দেখা হয়ে যেতো নিশ্চয়ই। বললাম: 'খুব খুসী হলাম তোমার এই নতুন এ্যাক্টিভিটির কথা জেনে। তোমাকে কনগ্র্যাচুলেট করি মৃগাঙ্ক। তা—কামারহাটির ঘটনার পর বনানী বোসের সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?'

শুনে এবারে কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে হো হো করে হেসে উঠলো মৃগাঙ্ক। পাশাপাশি প্যাসেঞ্জাররা অবধি সেই হাসিতে কিছুটা সচকিত হয়ে উঠলো। মৃগাঙ্ক বললো: 'ট্রেডিং কনসার্ণ সুরু করবার সপ্তাহখানেক আগে কোথা থেকে কেমন করে যেন আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে একদিন সন্ধ্যায় এসে বনানী আমার দরজায় নক্ করলো। দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলাম: কি চাই? বনানীর মুখে জবাবগুলো বোধ করি আগে থেকেই সাজানো ছিল, বললো: তোমাকে। বললাম: সে তো আমার যা কিছু ছিল সবই নিয়েছ, আর কেন? বনানী বললো: তোমাকে চাই খামাকে জব্দ করতে। তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার চুকে গেছে। আমার ভুল আমি বুঝেছি। তোমাকে জব্দ করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হয়েছি। জীবনে কোনোদিন ভালবাসার স্বাদ পাইনি; তোমার কাছেই তা পেয়ে ছিলাম। খাম্বার লালসা এতোদিন আমাকে তা বুঝতে দেয় নি। তুমি বিশ্বাস করো লাহিড়ী, সেদিনের ইতিহাসের জন্যে আমি এতটুকুও দায়ী ছিলাম না, দায়ী ছিল আমার একটানা দারিদ্র্য। নইলে বোধকরি সংসারে কোনো নারীই তার নারীত্ব আর সতীত্বের লাঞ্ছনা স্বেচ্ছায় মেনে নেয় না। কিন্তু সেদিন অতীত হয়েছে। খাম্বার সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্কই চুকিয়ে দিয়েছি। এবারে তুমি আমাকে বাঁচাও লাহিড়ী। তুমি যা হারিয়েছ তার চেয়ে আমি আরো বেশী কিছু হারিয়েছি। তুমি শুধু আমাকে নাও।'

বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লো মৃগাঙ্ক, তার-পর একটুকাল থেমে বললো: উত্তরে আমি তার মুখের সামনে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। সে দরজা তার কাছে চিরদিনের জন্যেই বন্ধ থেকে গেল।

লক্ষ্য করলাম, কথা শেষ করতে গিয়ে চোখ দুটো যেন একবার কেমনই করে উঠলো মৃগাঙ্কর। হঠাৎ বলে উঠলো: ভুল! ভুল! সবই ভুল মাষ্টারমশাই! কার ভুল বুঝতে পারছি নে।

আমি চুপ করে রইলাম।

রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ট্রেণ ছুটে চল-ছিল, ছুটে চললো।

———
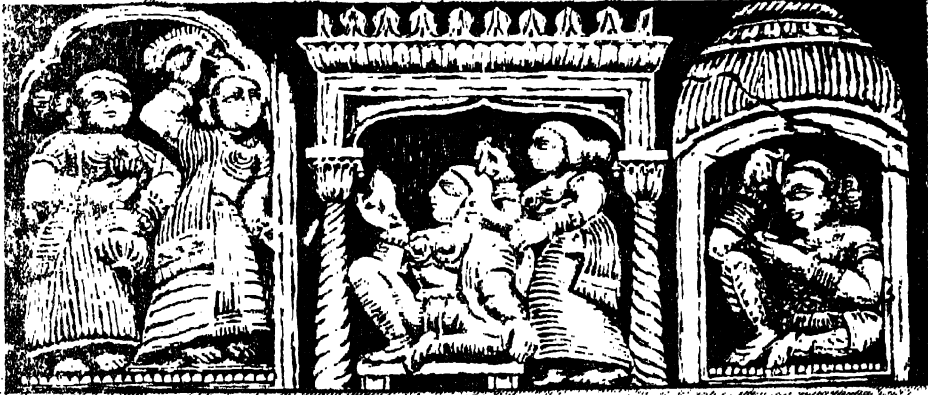
কখনো মেঘ

রাণা বসু

আমি কী তাহলে সত্যি বুড়ো হয়ে গেলুম!
কেন আমার দেহে মনে শীতের জড়তা নামলো
জানি না!
প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করছি:
শীতের রুক্ষতা।

অকাল বসন্তে আমার সতিষ্ণু দেহলতা
শুকিয়ে কেমন যেন বিবর্ণ হয়েছে।
মনের চঞ্চলতা দুরন্ত শীতের দাপটে
বরফের মতোই জমাট বেঁধেছে।
আমি পাষাণ মূর্তির মতোই নিশ্চল,
আমার এ জড়তার বন্ধন-মুক্তি কি ঘটবে না?

সূর্যের মহিমায় প্রাণ তরঙ্গে ঢেউ জেগেছে
মন আবার ধীরে উষ্ণ হচ্ছে।
এখানেই সমাপ্তি নয়, পথ চলায় এখনো অনেক বাকি।
মাটি আমার প্রিয়: মানুষ আমার মিত্র
এ অভিজ্ঞানকে আমি অঙ্গুরী করে
আবার পথে পা বাড়াবো।
আমার মৃত জীবনে সবুজ বসন্তের সাড়া জেগেছে:
শতধাবাক হৃদয় নতুন অনুভবে
আবার মুখর হোক।।

করণিক ও হংসবলাকা

সুনন্দা দাশগুপ্ত

হংসবলাকা উড়ে যায়, এক ঝাঁক চঞ্চলতা ওরা!
কোথাও তো বিরামের নেই অবকাশ।

নীলের নিঃসীম মায়া কেঁপে কেঁপে শিহরিয়ে যায়
ক্লান্তিহীন ওদের ডানায়—
লেখা আছে বিচিত্র যাত্রার ইতিহাস।

হয়তো বা কোন এক নামহারা বালুচরে এসে
শুভ্র ডানায় মেখে আলো-জ্বালা শক্তির ইশারা
নূতনের প্রেরণাতে দীপ্ত হয়ে তারা
অনেক দূরের ঐ রক্তচূড়া অস্তে গিয়ে মেশে।
সেখানে পারে না যেতে পৃথিবীর ব্যাকুল রোদন।।

নিরুদ্দেশ হতে চায় আমারো যে মন
কঠিন প্রাচীর দিয়ে ঘেরা,
নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। একঘেয়ে সুরে বারোমাস—
শহর অরণ্যে তাই অশান্ত মন হল দিশাহারা!
দশটায় সুরু করে পাঁচটায় শেষ যে পাহারা
জীবনের স্বপ্নগুলি সব নিল কিনে!

দোতলা বাসের থেকে শুধু কোন অমলিন দিনে
নগরের দিগন্ত ছোঁয়া নীলিমা আকাশে দেখি চেয়ে
উড়ে চলে পথহারা বলাকার ঝাঁক, অসীমের নীল পথ বেয়ে।

দর্পণের মন

নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার

সুগভীর নির্জনতা নিয়ে
দুপুর মনের মধ্যে গিয়েছে হারিয়ে।
পাখি-বন-অরণ্যের সব চঞ্চলতা
ভুলে গেছে অস্থির মত্ততা।
ভোরের হৃদয়টুকু এখন নীরব,
এখন ঘুমের মতো সব।

তুমিও ঘুমের মতো, দুপুরের মতো
আমার মনের থেকে চঞ্চলতা যতো
মুছে দাও, মুছে দাও এসে।
আমাকে নির্জন কোরে যাও ভালোবেসে।
আমাকে তোমার মধ্যে নীরবে হারাও,
দুপুরের মতো ঘোরে নাও।

প্রশান্তির মগ্নতায় আকাশের দাক্ষিণ্যের সুর
করুক করুক এসে তোমাকে মধুর।
তোমাকে মধুর কোরে করুক দর্পণ।
আমি সেই দর্পণের মন
হ'তে চাই। তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ সুতীব্র স্পষ্টতা।
দুপুরের মতো এসে মনে মনে তুমি হও কথা।

সে ফিরেছে

দুর্গাদাস সরকার

তবুও তো ফিরে এল। পালাবে কোথায়, কতো দূর?
হারানো খবরে তার—ছিল বক্র নম্বরে ঠিকানা;
অলিতে গলিতে গিয়ে শেষে নিজে হারিয়ে সীমানা
ফিরে এল একদিন মুছে ভ্রান্ত সিঁথির সিঁদুর।

চারিদিকে ছি ছি শব্দ? না, না। নিজে সহজে আতুর
কখনো হবে না। চিরকাল গজ কপিখরা হানা
দিয়ে যাবে কোনোদিন কেউ তাকে করবে না মানা।
তবু কিন্তু গোপনে সে একা জানে—কতো যে নিষ্ঠুর

সে নিজেই। কেননা, কেবলই একজন পরাজয়
না মেনেও চেয়েছিল দিতে নয়নের শান্ত ভাষা।
পালিয়ে গিয়েও তাই আজীবন পেছনে হৃদয়
থেকে যায়। সব কিছু দিয়ে তাই একা ফিরে দেখে
ঝরে গেছে একই কেন্দ্রে মানুষের মুগ্ধ ভালবাসা।

দেয়নি কিছুই ভেবে সে ফিরেছে আপন বিবেকে!

অন্য মাটি

রামপদ মুখোপাধ্যায়
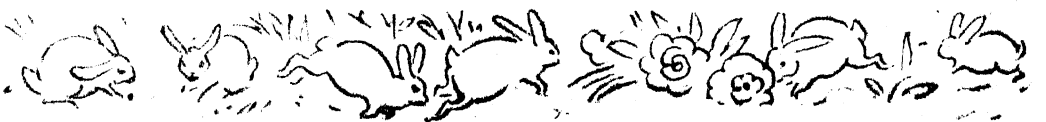
কমাধ্যক্ষ বলে দিয়েছিলেন—সপ্তাহে দু'খানা চিঠি লিখবে। সেই মত প্রথম সভা শেষ হবার পর প্রথম চিঠি লিখেছি তিন দিন আগে। তারপর আরও দুটি সভা হয়ে গেছে—দ্বিতীয় পত্র লিখছিলাম।

প্রথম পত্রের প্রায় সবখানি জুড়ে ছিল—নতুন দেশের বর্ণনা, মানুষের শিক্ষা সহবৎ—আর্থিক অবস্থা আর মতিগতির কথা। বিষয় কটির গুরুত্ব রয়েছে আমাদের পার্টির কাছে। যেহেতু আসন্ন নির্বাচনে আমরা প্রতিনিধি পাঠাবো স্থির করেছি। শুধু স্তোকবাক্য দিয়ে ভোট আদায় করার কৌশল এখন আর খাটছে না। জনদেবতা অতীত কর্মের তালিকা মিলিয়ে ভবিষ্যতের কর্মীকে গণপরিষদে পাঠাতে চাইছে। এখন দেশের মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি আসতে হবে—তাদের হাত ধরে দাঁড়াতে হবে—সুখদুঃখের অংশভাগী হতে হবে—প্রমোদে প্রমাদে আন্তরিকতার উত্তাপ ছড়াতে হবে— উপদেশ দিয়েছিলেন কর্মাধ্যক্ষ এবং সেই কাজে কতটা সাফল্য লাভ করেছি তা জানাতে হবে—মাঝে মাঝে চিঠি লিখে।

শহর থেকে অনেক দূরে এসেছি আমরা সেই উদ্দেশ্যে। সভা ইত্যাদি চলছে এবং চেষ্টাও করছি যাতে গ্রামের মানুষদের খুব কাছে আসতে পারি। ওদের অশন বসনের তত্ত্ব সংগ্রহ করছি, মনোবাসনার হদিসটি চিনে নেবার চেষ্টা চলছে, আর আমরা যে ওদেরই একজন সুখ-দুঃখের অংশীদার এটা সর্বতোভাবে বাক্যে আচারে আচরণে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

তা সভাগুলিতে লোক জমায়েৎ মন্দ হচ্ছে না। সভার সুরুতে কোথাও বা শেষে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রাখতে হয়েছে। এইগুলি ঠিক টোপ হিসাবে রাখছি না। যে বাংলায় আমরা বাস করছি তার দিকে দিকে ছড়ানো বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে যোজনা করে একটি অখণ্ড মহিমান্বিত রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়ে দেশ সম্বন্ধে সকলকে সচেতন করার প্রয়াস। কয়েকটি সভায় লক্ষ্য করলাম—এতে জনতার রুচি রয়েছে। আমরা উৎসাহিত হয়েছি—আমাদের বক্তৃতাংশে ওদের উৎকর্ণ হতে দেখে। সেই অবকাশে আমাদের পার্টি কথাও বলেছিলাম। কিন্তু সেই দীর্ঘ ভাষণের কথা এখন থাক। মোটের উপর সেই সভাগুলির মাধ্যমে আমরা জনতার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলাম। যদিও ওরা প্রশ্ন করেনি—হাততালি দেয়নি— জয়ধ্বনিও নয়—তবু ওদের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি-ছায়ায় সুগভীর কৌতূহলের সঙ্গে সরল প্রত্যয়বোধকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেটি অবশ্যই কণ্ঠস্বরের প্রতীক। আমরা উৎসাহিত ও আশান্বিত হয়েছিলাম। সেই কথাগুলিই এখন পত্রে লিখছিলাম। প্রথম পত্রে লিখেছিলাম; দ্বিতীয় পত্রেও লিখছিলাম। কিন্তু পত্র শেষ হলো না। ঘন ঘন হর্ণ বাজিয়ে বাস আমাকে সচেতন করে দিল।

আর এক মফস্বল শহর থেকে আসছে বাস—সোজা যাবে কলকাতায়। মাঝখানে বাঁকুড়া ছুঁয়ে দুর্গাপুর থেকে ধরবে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। প্রায় উদয়াস্ত পরিব্রজনের ব্যাপার।

আমি বাঁকুড়া থেকে উঠলাম। যথাসময়ে দুর্গাপুরে এলাম। গ্রীষ্মকাল। আকাশে মেঘ ছিল বলে প্রকৃতিকে কোমল মমতাময়ী বোধ হচ্ছিল। হাওয়া বইছিল জোরে জোরে—বেশ আরাম লাগছিল। সেই জোর হাওয়া ঠেলে বাস এগুচ্ছিল—আমরাও ঢেউ ঠেলে ঠেলে চলেছিলাম কৌতুকভরে।

এই কৌতুক আনন্দ বেশীক্ষণ রইল না। দুর্গাপুর রেল ষ্টেশন থেকে মাইল দুই পথ এসে বাস হল বিকল। বহুক্ষণ কলকব্জা নাড়াচাড়া করে চালক রায় দিলে—বাস চলবে না। ন্যায্যমত ভাড়াও ফিরিয়ে দিলে।

এখন দুটি উপায় রইল সামনে। এই মাঝ পথ থেকে বর্ধমানগামী বাস ধরে এগিয়ে যাওয়া অথবা মাইল দুই উজিয়ে এসে দুর্গাপুরের ট্রেনে চাপা।

শেষেরটি মাইল দুই পদব্রজনের ব্যাপার ছিল বলে বেশীর ভাগ যাত্রীই গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার মনে হল এর চেয়ে পিছিয়ে গিয়ে ট্রেন ধরবার চেষ্টাই শ্রেয়। তাতে কষ্ট এবং ঝুঁকি কম, বর্ধমানগামী বাসে বসার জায়গা দূরের কথা—দাঁড়াবার জায়গাই মিলবে না। আর দীর্ঘ পথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া বেশ প্রীতিকর হবে না। অতএব পিছিয়ে যাই।

পা বাড়িয়েছি—আমায় টান পড়ল।

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি—লক্ষ্য করার কথাও নয়। বাসে পাশাপাশি বসে ছিলাম বটে, লক্ষ্য ছিল নতুন জায়গার দিগন্তবিস্তৃত মাঠের পানে। মাঝে মাঝে গ্রাম আসছিল, খানাখন্দ ডোবা আর পুকুর দুধারে দেখা যাচ্ছিল, আমবাগান নারকেল গাছের ছায়া দুলছিল, পথের ধারে হাতে কাঁকে মাথায় পোঁটলা পুঁটলি ঝুলিয়ে গ্রামের মানুষ সার সার যাচ্ছিল...চোখের সামনে কত বিচিত্র রঙ, গতি আর বিস্তারের ছায়াছবিরা ভেসে চলেছিল। দৃষ্টি ছিল তাতেই মজে। বাসের মধ্যে ঠাসাঠাসি মানুষ আর কলকণ্ঠ শব্দ ছিল অস্পষ্ট প্রায়। এখন মুখ ফিরিয়ে দেখি এই লোকটিই তো আমার পাশে বসেছিল। আমি বাসে উঠলে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধিয়েছিল, বাবু গাড়ীটা কলকাতায় যাবে তো? বলেছিলাম—যাবে।

শুনে ও নড়েচড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে পাশে-বসা মেয়েটিকে বলেছিল, শুনলি তো—বাবু বলছে এটা কলকাতায় যাবে।

মেয়েটি ঘাড় কাত করে হেসেছিল।

বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুরে আসতে আরও বহুবার থেমেছিল বাস। বহুযাত্রী উঠানামা করেছিল। ভদ্র বেশবাসের যাত্রী দেখলেই লোকটির উৎকণ্ঠা বেড়ে গিয়েছিল এও লক্ষ্য করেছি। প্রতিবারই কানে গেছে সেই এক প্রশ্ন, বাবু গাড়ীটা কলকাতায় যাবে তো? ওঁরা আমার মতই জবাব দিয়েছিলেন। লোকটি নিশ্চিন্তস্বরে পাশে-বসা মেয়েটিকে একই কথা শুনিয়েছিল, শুনেছিস—বাবু বলছে...

অতএব ওরা নিশ্চিন্ত মনেই চলেছিল; হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। মুখ ফিরিয়ে ওদের দেখে মনে হল যেন অকূল পাথারে পড়েছে।

বললাম, কিছু বলছো?

মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, আপনি কোথায় যাবেন বাবু?

যাব কলকাতায়। ট্রেন ধরব বলে ষ্টেশনে চলেছি।

ও যেন অকূলে কূল পেলে। ব্যগ্রকণ্ঠে বলল, আমারে সঙ্গে ন্যান বাবু—আমি পথঘাট চিনিনে।

নিতান্ত গ্রামের লোক—গ্রামের বাইরে কোনদিন পা দেয়নি বলে মনে হ'ল। একখানা আধময়লা ধুতি পরনে—গায়ে চাপানো ক্ষারে কাচা শত ভাঁজ করা একটা কামিজ। পায়ে জুতো নেই—হাতে গামছা বাঁধা একটা পুঁটলি। মেয়েটির পরনে একখানা মিলের ডুরে শাড়ী। হাতে দু'গাছা করে রুপোর চুড়ি—কানে সেকেলে দুল।

বললাম, দু'মাইল পথ—মেয়েটি হাঁটতে পারবে?

না বাবু আপনার সঙ্গে যাব। পথঘাট চিনিনে—কোন থিগে যেতে কমনে যাব।

আমি তখন ওকে এড়াবার জন্য বললাম, একটা রিক্‌শা টিক্‌শা দেখে নাও—নয়তো পা চালিয়ে এস—আমি বাপু তোমাদের জন্য দাঁড়াতে পারব না।

লোকটি নাছোড়বান্দা হয়ে আমার জামাটা চেপে ধরল। বাবু—আমারে ফেলে যাবেন না। কলকাতায় পথঘাট চিনিনে—কোন্ টেনে চাপতে কোন্ টেনে উঠবু।

বিস্মিত হয়ে বললাম, তুমি এর আগে কি কলকাতায় যাওনি?

না বাবু।

এদিকেও আসনি। এই দুর্গাপুরে—কি বাঁকুড়ায়—

না বাবু—আমরা গেরামের মানুষ—চাষী। চাষবাস করি—ক্ষেতখামার দেখি—জমি কেনা-বেচার সময় এক এক বার পুরুলিয়া যাই শুধু।

এই সময়ে একখানা রিক্‌শা আসতে দেখলাম। হাত ইসারায় ডাকলাম। দরদস্তুর করে লোকটিকে উঠিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি গাড়ীতে যাও—আমি হেঁটে যাচ্ছি। ষ্টেশনে দেখা হবে।

লোকটা রিক্‌শা থেকে নেমে পড়ে—আমার জামা চেপে ধরল, দোহাই বাবু, আমারে ফেলে যাবেন না।

ফেলে যাব কেন। তিনজনকে তো কুলোবে না এতে—

রিকশাওয়ালা বলল, কুলোবে বাবু, কিছু ধরে দেবেন। ওই ওনারে কোলে বসিয়ে দেন।

এই না শুনে লোকটা আমাকে একরকম টেনেই রিকশায় উঠিয়ে দিলে। মেয়েটিকে কোলে নিয়ে বসল আমার পাশে। বলল, আপনি থাকলে তবু ভরসা বাবু—কখনো একলা বার হইনি।

কৌতূহল হল জিজ্ঞাসা করি—তবে এভাবে কেন বার হয়েছ? কি এমন জরুরি কাজ?

ট্রেনে চেপে কৌতূহল চাপতে পারলাম না।

উত্তরে লোকটা বলল, গেরোর কথা আর কন কেন বাবু। গেরামের মাতব্বরেরা বলল, কলকাতায় যাওয়া এমন হাতী-ঘোড়া কাণ্ড নয়। এখান থেকে বাসে চাপবি—নামবি সেখেনে। বাস! নেমে গঙ্গাচ্চান করে—একজনা বামভোনকে ভোজন করিয়ে আবার উঠবি বাসে—নামবি শহরের বাজারে। বাস—হয়ে গেল তোমার ক্রিয়েকম্ম!

বললাম, তা ক্রিয়াকর্মটি কি বুঝলাম না। আসল উদ্দেশ্য তো গঙ্গাস্নান?

হাঁ বাবু যথাত্থ বলেছেন—গঙ্গাচ্চান।

কিন্তু কাল পরশু কোন তিথি পর্ব আছে বলে তো শুনিনি! চন্দ্রগ্রহণ—সূর্যগ্রহণ অক্ষয় তৃতীয়া কি স্নান পূর্ণিমা তো সামনে নেই। বৈশাখও শেষ হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোন যোগ টোগে স্নান করতে যাচ্ছ কি?

না, বাবু—এ আমার কপালের গেরো। তানালে কি এত ধরে আসতে হয়। যা জীবনে হয়নি, বাপ পিতোমোর আমলে হয়নি—তা এই কপালটার জন্যে হলো! বলে সজোরে একটা চড় মারলে কপালে।

ঈষৎ শঙ্কিত হয়ে ওর পানে চাইলাম।

ও বলে চলল, কপাল ছাড়া কি বলি! ঝড় বাদলা নয়, অসুক বিশুক নয়—দেয়াল কি গাছ চাপা পড়ল না—সাপে খোপে কাটল না—জল জ্যান্ত বাছুরটা পট্ করে অক্কা পেল! সন্জে বেলা গোয়ালে তুললাম—শানি মেকে দিলাম—সাঁজালের ধোঁয়া দিলাম গোয়ালে—সকালে উঠে দেখি বাছুরটা অক্কা পেয়েছে!

ভাবলাম—একটা বাছুর যদি হঠাৎ এভাবে মরেই যায়—তা নিয়ে অদৃষ্টকে এমন ধিক্কার দিচ্ছে কেন!

একটু থেমে লোকটা বলল, আবার এমনি কপালের ফের সকালে বেলা সেটা আমি দেখলাম না, পেরথম দেখল গোয়ালা। গাই দুইতে এসে বলল—ওগো বাছুরডা যে মরে গেছে। ন্যাও—এখন সামলাও ঠ্যালা!

বললাম, এতে ঠেলাটা কি?

নয়! ও যেন এই প্রশ্নে অবাক হয়ে গেল। ঠেলা নয়? উনি কি ছাড়া অবস্তায় মরেছে—তখনও যে গলায় দড়া বাঁধা। গোয়ালা তো ছুটে গিয়ে গেরামে খবরটা চাড়িয়ে দিল। এই না শুনে গেরাম শুদ্ধু নোক ভেঙ্গে পড়লো আমার গোয়ালে। বলল, কি সব্বনাশ—এতো শুধু গেরস্তর অকল্যোণ নয়—এ যে গেরামেরও অকল্যোণ। প্রাচিত্তির করতে হবে।

বললাম, প্রায়শ্চিত্ত কেন। তুমি তো ওটাকে মেরে ফেলনি!

তা এক রকম তাই—দড়া ছিল যে গলায়। গলায় বন্ধন—আমারে প্রাচিত্তির করতে হবে না। এক কাহন কড়ি আর দুব্বো ঘাস দিয়ে ওখেনেই পুৎ ঠাউর প্রাচিত্তির করালো।

বলল, কলকাতায় গিয়ে গঙ্গাচ্চান করগে—বামভোন ভোজন করাগে। শুনে আমি তো কাঁদতে নাগলাম। এত যে বয়েস হ'ল—কোথায় কলকাতা—কোথায় গঙ্গা—কোথায় বামভোন—কিছুই জানিনে। একলা কখনও গেরামের বাইরে যাইনি। ওরা বলল, তোর মেয়েডারে সঙ্গে নে—যদি একলা যেতে না পারিস। আমরা বাসে তুলে দিয়ে আসব। নামবি কলকাতায়। চিন্তা কি! গঙ্গা—বাম্‌ভোন সব দেখতে পাবি। বাসে উঠিয়ে বাসওলাকে বলেও দিয়েছিল। কিন্তু বাবু, এমন কপাল, বাস তো পথেই অক্কা পেল! এখন আপনি ভরসা। আপনি কৃপা করে আমায় উদ্ধার করেন—আপনার সঙ্গ আমি ছাড়চিনে।

বলে আমার গা ঘেঁষে বসল।

ভারি আনন্দ হলো ওর কথা শুনে। এই তো ও আমার কাছে এসেছে—আমাকে আত্মীয় মনে করেছে। অভয় দেবার ভঙ্গিতে বললাম, ভয় কি—তোমাকে গঙ্গাস্নান করিয়ে ট্রেনে উঠিয়ে দেব।

ও যেন আঁতকে উঠল। রেলগাড়ীতে না বাবু—কোন্ থিগে যেতে কোন্ থিগে যাবে।

কোথাও যাবে না—। সেটাও এই বাসের মত কলকাতা থেকে ছাড়বে—তারপর তোমাদের শহরে গিয়ে শেষ হবে তার চলা।

যা ভাল বোঝেন করেন—আমি নিশ্চিন্তি। বলে বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজল।

আমরা বর্ধমানে গাড়ী বদল করলাম। ওটা পাঠানকোট এক্সপ্রেস ছিল—সোজা যাবে শিয়ালদহে। আমাদের গন্তব্য স্থান হাওড়া। কাছেই গঙ্গা। গঙ্গার ঘাটেই ব্রাহ্মণ মিলবে—যারা যাত্রীদের পুণ্য সঞ্চয় করিয়ে পরমার্থ পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত সর্বক্ষণ।

বললাম, তোমাকে হাওড়ায় গঙ্গাচ্চান করিয়ে ট্রেনে তুলে দেব।

ও বলল, বাবু, হাওড়া আর কলকাতার গঙ্গা কি এক!

হাঁ—এপার আর ওপার।

আর বাম্‌ভোন ভোজন?

তাও হবে। গঙ্গার ঘাটে মেলাই ব্রাহ্মণ পাবে।

আঃ বাঁচলাম! বলে ও আবার বেঞ্চি ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজল।

বর্ধমানে নেমে এক বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে গেল।

মেঘে কোমল প্রকৃতি সহসা ঝড়ের দাপটে রুদ্রাণী হয়ে উঠল। কি সে ঝড়ের তাণ্ডব! অত বড় শেডটার তলায় বসেও মনে হল বুঝি আকাশে উড়ে যাব! সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি এল ঝেঁপে। চড়বড় চড়বড় শিল পড়তে লাগল। বৃষ্টির ধোঁয়ায় দু'হাত দূরের মানুষটা পর্যন্ত মুছে গেল সামনে থেকে—আর গায়ে এসে বিঁধতে লাগল শিলাবৃষ্টির ছাট। এক শেড মানুষ জড়াজড়ি হুড়োহুড়ি করে তালগোল পাকিয়ে প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যা ঝড়ের বেগ—ভয় হলো, পরস্পরকে আশ্রয় করেও

হল্যাণ্ডের মেয়ে

আমি যে নিজের কাছে নিজের কাজের ভারে বাঁধা—এইটাই গৃহকর্ত্রীদের প্রকৃত কথা। পৃথিবীর অন্য দেশের মেয়েরা তাঁদের কাজের রুটিনে কি রকম বাঁধা, তাই জানতে ইচ্ছে করে। আজকে হল্যাণ্ডের মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের তালিকা দিয়ে আরম্ভ করব আমার এই প্রবন্ধ।

উত্তরে ও উত্তর পশ্চিমে উত্তরসাগর, পূর্বে জার্মাণী এবং দক্ষিণে বেলজিয়ম ইউরোপের এই ছোট্ট রাজ্য নেদারল্যাণ্ডের সীমান্তকে নির্দেশ করছে। সমভূমির দেশ হলেও এর বৈশিষ্ট্য হলো দেশের বেশ কিছু অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নীচে নেমে গেছে। সমুদ্রগর্ভ থেকে শত শত একর জমিকে উদ্ধার করে তা' যেভাবে চাষ ও বাসযোগ্য করে তোলা হয়েছে সেটি রীতিমত বিস্ময়ের। দেশের মধ্যে ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের কাজ চলেছে—কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনও চাষের ওপর নেদারল্যাণ্ডের শতকরা ২০ জন লোকের নির্ভর। প্রধান ফসল নানারকম শস্য—আলু, সুগারবীট। পশুপালনেও হল্যাণ্ড বিখ্যাত। হল্যাণ্ডের মাখন, পনীর সারা পৃথিবীতে নামী জিনিষ। সমুদ্রের লোনা জল ঢুকে যাতে এই সব শস্য সম্পদের হানি না ঘটায় তার জন্য মাইলের পর মাইল বাঁধ দিয়ে দেশকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে। এই বাঁধ সংরক্ষণে প্রতি বছর জাতীয় আয়ের একটি মোটা অংশ ব্যয় হয়ে থাকে। প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর যুঝতে যুঝতে ডাচরা নিজস্ব প্রকৃতিকেও পরিশ্রমী ও সহনশীল করে নিয়েছে।

হল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা দীর্ঘকাল যাবৎ চলে আসছে। ইংলণ্ডের মত এখানে সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার সম্রাজ্ঞীর হাতে। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন সম্রাজ্ঞী উইলহেলমিনার পদত্যাগের পর কন্যা রাণী জুলিয়ানা লুইস্ এমা মেরী উইলহেলমিনা সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হন। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী হবেন এঁরই কন্যা।

বাড়ীর গিন্নী সাধারণতঃ সকাল ৭½টার সময় ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে প্রথমেই আবহাওয়ার চাক্ষুষ পরিচয় নিলেন। এটাই তাঁর প্রথমতম ও প্রধান কাজ। কারণ এখানে বছরের মধ্যে ৬ মাস শীত, চার মাস শীতও আছে বৃষ্টিও আছে, (মানে খুবই খারাপ) আর বাকী থাকে ২ মাস। সে ২ মাস অবশ্য খুব ভালো আবহাওয়াই পাওয়া যায়। আঃ যেদিন সকালে উঠে রোদ ঝলমলে আকাশ দেখা যায়, সেদিন আর আনন্দ দেখে কে!

যাক্ এবার হাতমুখ ধুয়ে এসে চায়ের জোগাড় করতে হয়। চা মানে ব্রেকফাস্টে সাধারণতঃ জেলি দিয়ে স্যাণ্ডউইচ, চা, ডিম সিদ্ধ, পরিজ আর বাচ্চাদের জন্য দুধ। তারপর সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে অফিসযাত্রী পুরুষ আর স্কুলযাত্রী ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু লাঞ্চ তৈরী করে সঙ্গে দিয়ে দিতে হবে। সাধারণতঃ শহরবাসিনী ডাচ-গৃহিণীরা লাঞ্চের জন্য কিছু রান্না করেন না। লাঞ্চে সাধারণতঃ নানা রকম স্যাণ্ডউইচ তৈরী করেন। তার মধ্যে হ্যাম, পনীর ও ডিমই বেশী। আর পল্লীর খামার অঞ্চলের গৃহিণীরা দিনে রান্না করা ডিনার ও রাত্রে স্যাণ্ডউইচ ইত্যাদি খেয়ে থাকেন।

হল্যাণ্ডে আপনি একটিও সাইকেলবিহীন সংসার দেখতে পাবেন না। অন্ততঃ একখানা সাইকেলও থাকবে। বেশীর ভাগ লোকই

বুঝি ভারশূন্য দেহকে আর মাটির আশ্রয়ে ধরে রাখতে পারব না। শেডে শুদ্ধ আমরাও আকাশে উঠে যাব।

এমন সময় প্ল্যাটফরমে একখানা গাড়ী আসতেই আমরা হুড়মুড় করে তাতে উঠে পড়লাম। গাড়ীটা একদম খালিই ছিল গুছিয়ে বসলাম। পরনের কোট প্যাণ্ট ভিজে সপ্ সপ্ করছিল—শীতে কাঁপুনি ধরেছিল। সেগুলো ছেড়ে ফেলে সুটকেশ থেকে লুঙ্গি বা'র করে পরলাম। আরাম করে বসলাম বেঞ্চিতে। দেখি সামনে বসে সেই লোকটা আর মেয়েটা অবাক হয়ে আমাকে দেখছে! ওরা কাঁপছে বটে—শীতে কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হয়েছে বিস্মিত। একদৃষ্টে ওরা চেয়ে রয়েছে আমার লুঙ্গি পরা উদোম দেহের দিকে। ব্যায়ামপুষ্ট সুগঠিত দেহ নয়—তবু কি যে দেখছে পরম বিস্ময়ে, কে জানে!

কেমন অস্বস্তি লাগল। বললাম, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল।

ও বলল, পুঁটুলিটা ভিজে গেছে বাবু শুকনো কাপড় নেই। ভিজে কাপড়ে আমাদের কষ্ট হয় না। মাঠে জলে ঝড়ে প্রায়ই—

তা হোক—ভিজে কাপড়টা নিংড়ে নাও—গামছা দিয়ে গা মাথা মুছে ফেল। আদেশের স্বরে বললাম।

কাপড় জামা নিংড়ে গা মাথা মুছে ওরা সুস্থ হল। বেঞ্চিতে বসবার আগে ভয়ে ভয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে কাকে যেন প্রণাম জানালো। দুর্যোগ কেটে গেছে—রুদ্রাণী প্রকৃতি এখন শান্ত। প্রণামটা ওঁকে উদ্দেশ করেই হয়তো বা।

বেশ খানিকটা বিলম্বেই ট্রেন পৌঁছল হাওড়ায়। নামবার আগে লুঙ্গি পালটে আধ শুকনো প্যাণ্ট আর জামা পরে নিলাম। আমার পিছু পিছু ওরাও নামল।

তখন আটটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই অসহায় মানুষটিকে ছেড়ে যেতে পারলাম না।

ও অবশ্য বলেছিল একবার—আমাদের একটা হোটেলে তুলে দ্যান। কাল প্রাতঃকালে চান-বামভোন ভোজন করিয়ে দেশে যাব।

মন সায় দেয়নি। যে আনাড়ী—কোন্ কৌশলী লোকের হাতে পড়ে লাঞ্ছনার একশেষ হবে। তার চেয়ে এখনই স্নান সারিয়ে রাত ন'টার গাড়ীতে ওদের রওনা করিয়ে দিই।

স্নান সারা হলে ও বলল, বাবু, এইবার বামুভোন ভোজন করিয়ে দ্যান—তালে দুগ্গা দুগ্গা বলে গাড়ীতে গিয়ে বসি।

বিরক্ত হয়ে বললাম, এই রাত্তিরে ব্রাহ্মণ পাব কোথায়! তুমি বরঞ্চ দেশে গিয়ে ও কাজটা সেরো। তাহলে প্রায়শ্চিত্ত ঠিক হয়ে যাবে। বলে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলাম।

লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটাও, কেমন যেন মিইয়ে গেল। বার বার আমার পানে চাইতে লাগল। কেমন আড়ষ্ট সন্ত্রস্ত সকরুণ ভাব!

এদিকে রাত বাড়ছিল। পথশ্রমে শরীরও ক্লান্ত। ওদের বিষণ্ণ থমথমে দৃষ্টিকে আমল না দিয়ে যথারীতি টিকিট কেটে ট্রেনে উঠিয়ে দিলাম। ওরা তেমনি বিস্ময় বিমূঢ় মনমরা ভাবে বেঞ্চের একধারে বসে রইল। বিদায়কালে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাল না, প্রণাম করল না।

* * *

বাড়ী পৌঁছে ভিজে প্যাণ্ট জামা খুলে ফেললাম। মাথা গলিয়ে গেঞ্জিটা খুলবার সময় গলা থেকে উপবীতটা উঠে এলো তার সঙ্গে। সেটা যথাস্থানে রাখবার সময় রহস্যের গ্রন্থিটা যেন হঠাৎ খুলে গেল।

ঠিক—ঠিক—এই জিনিষটিই ওদের মনে অনেক প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। গাড়ীর মধ্যে আমার নগ্নদেহের উপর সঙ্কোচ দৃষ্টিপাত, উদ্দেশে প্রণাম, ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে পাপ-স্খালনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ.....তবু, গঙ্গার ঘাটে-বসা দান-নেওয়া ব্রাহ্মণ নই বলে আমাকে ও সহজভাবে মনের কথাটা খুলে বলতে পারেনি। আর আমারও মনের গভীরে লেগে ছিল একটুকু কৃষ্ণছায়া—যা দানগ্রহণকারীর ভূমিকায় আমাকে নামতে দেয়নি।

সেই রাত্রিতে দ্বিতীয় পত্রখানি শেষ করলাম। কর্মাধ্যক্ষকে লিখলাম ঃ' গ্রামের মানুষের কাছে আসতে পারি আমরা, মিশতেও পারি ওদের সঙ্গে। এগুলো বেশ সহজ। কিন্তু সহজ নয় সেই মাটিতে পা রাখা—যে মাটিতে ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

সাইকেলে করে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে তাঁদের কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন।

এবার গিন্নীরা পড়লেন বাড়ী-ঘর নিয়ে। এঁদের গৃহ সত্যিই দেখার মত। শুধু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই নয়, গৃহকে নিপুণ শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মনোরম করে সাজিয়ে রাখেন। হল্যাণ্ডের মেয়েরা সাধারণতঃ বহির্মুখী নন, তাঁরা গৃহ ও সংসারকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে ভালোবাসেন। তাঁরা চান তাঁদের সংসারের সম্রাজ্ঞী হয়ে শান্তির ও সুখের নীড় বাঁধতে। নিজের গাছের ফুল প্রায় প্রত্যেক গৃহকোণে থাকবেই। সপ্তাহে একদিন কাপড় ধোওয়া আছে। একদিন ইস্ত্রী করার দিন আছে। যদিও ছেলে ও মেয়েদের সামনে শিক্ষার সমান সুযোগ উন্মুক্ত আছে এবং নানা ক্ষেত্রে সেই দেশের মেয়েরা অংশ গ্রহণ করছে, তবুও পাশ্চাত্যের অন্য দেশের তুলনায় তাঁরা সেখানে যথার্থ গৃহিণী হওয়াকেই অধিক কাম্য মনে করেন। সেই গৃহকে নিপুণ শৈল্পিক নিদর্শন দিয়ে তাঁরা মনোরম করে তোলেন। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মত সে দেশেও ঝি-চাকরের বালাই কম। আর তা রাখার মত সঙ্গতিও সেখানে সকলের নেই। তাই গৃহিণী তাঁর হাত দুখানিকে সব সময়ে ঘর গোছানো, কাপড় কাচা, ইস্ত্রী করা, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, বাজার করা, রান্না ও সেলাই-এ নিযুক্ত রাখেন।

ঘরদোর গোছানোর পর গিন্নীরা কিছু স্যাণ্ডউইচ ও কফি দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে থাকেন। ইতিমধ্যে অন্য কোনও প্রতি-বেশিনী এলে তাঁকেও এই দিয়ে অভ্যর্থনা করেন। এবার বাজার করার পালা। কিছু কিনলেন, কিছু দেখলেন। কিন্তু বিকেল ৪টার মধ্যে ঠিক বাড়ী ফিরতেই হবে। বাচ্চারা যে সব স্কুল থেকে ফিরবে ঐ সময়ে। তাদের খেতে দিতে হবে, পোষাক পাল্টাতে সাহায্য করতে হবে। সবই আছে ত! ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ খেলাধুলো করে আবার ডিনারের আয়োজন করতে যাওয়া আছে। এইটাই যা সমস্ত দিনের মধ্যে একমাত্র রান্না করা খাবার। সন্ধ্যে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে পরিবারের সকলে একসঙ্গে খেয়ে থাকেন। এঁদের রান্নারও বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ এঁরা খুব মশলাদার রান্না করেন না, তবে ইংরিজী খানার মত মশলাবিহীনও নয়। আলু খুব বেশীই ব্যবহার করা হয়। ঋতু অনুযায়ী সব্জী, নানা রকম মাংস। সব্জীর মধ্যে সাধারণতঃ ফুলকপি, নানা রকমের বাঁধাকপি, বীন, গাজর, টোমাটো, বেগুন, শসা, লেটুস্ ইত্যাদি পাওয়া যায়। প্রতিদিন খাবারের সঙ্গে কিছু ফল ও ডেসার্ট পুডিং থাকবেই থাকবে। খাওয়ার পর পরিবারের অন্য কোনও জনের সহযোগিতায় বাসনপত্র ধুয়ে, মুছে, টেবিল পরিষ্কার করে সারাদিনের সংসারের কাজ শেষ হয়। তারপর বসে বসে নিজের রুচি অনুযায়ী লেখাপড়া, সেলাই, গান, বাজনা, গল্প ইত্যাদি করে থাকেন, আবার যাঁর টেলিভিশন সেট আছে, তাঁর ত আরোই ভালো। সাধারণতঃ রাত্রি ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে সকলে শুতে যান। আর সকাল ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে ওঠেন। বাড়ীর মেয়েরাই আগে ওঠেন। অনেকে আবার এই ডিনারের পরের সময়টুকু পর্যন্ত গার্হস্থ্য শিক্ষা গ্রহণে কাটিয়ে দেন।

ক্লাশ পরীক্ষারত একদল ছাত্রী

আদর্শ মা এবং আদর্শ গৃহিণী তৈরী করার জন্য এদেশে চেষ্টা এবং ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। নানারকম গার্হস্থ্য অর্থনৈতিক বিদ্যালয় নেদারল্যাণ্ডের শহরে ও গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠেছে। সেখানে রান্না, সেলাই, কাপড় কাচা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, রোগের সেবা, ঘর সাজানো, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, খাদ্যের গুণাগুণ নির্ণয় ইত্যাদি শেখানো হয়। মাধ্যমিক শিক্ষার পর ৩ থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত সময় এই শিক্ষার দরকার হয়। এ ছাড়া মেয়েরা ধাত্রীবিদ্যায়, শিক্ষণের ক্লাসে এবং গ্রামীণ বিদ্যালয়ে অনেকেই যোগ দিয়ে থাকেন।

এদেশে প্রায় ৫০০ রকমের জীবিকার ব্যবস্থা আছে এবং নানা ধরনের শিক্ষার জন্য ৪০ হাজার সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা। সংসারের কাজের ঝামেলা মিটিয়ে মেয়েরা সকলেই এসে প্রায় সমাজকল্যাণের কাজে যোগ দেন এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের তাঁরা সুষ্ঠু ও সুযোগ্য পরিচালিকা। প্রায় ২০ হাজার এই রকম সমিতি আছে আর প্রায় সবগুলিই মেয়েদের অধীনে পরিচালিত। কিন্তু এত সত্ত্বেও গৃহি-ণীরা বাইরের কাজের চেয়ে সংসার আর সন্তানকে এত বেশী প্রাধান্য দেন যে, ছেলেমেয়েরা ছোট থাকলে তাঁরা সমাজ-কল্যাণের কাজেও যোগ দেন না। যাঁদের এ-ধরনের দায় নেই, বা ছুটি মিলেছে তাঁরাই সমাজকল্যাণের কাজে যোগ দেন।

যদিও গৃহিণীরা বাইরের কাজ করতে ভালোবাসেন না, কিন্তু অনেক সময়ে তাঁরা তাঁদের সখসাধ মেটাবার প্রয়োজনে কিছুদিনের জন্য কোনও পার্টটাইমের কাজ নেন। কারুর হয়ত একটি টেলিভিশন, কাপড়কাচা মেশিন, রেডিওগ্রাম, কি অন্য কোনও সখের জিনিসের কিস্তীবন্দী দাম শোধ করতে হবে, তখনই দেখবেন বাড়ীর গিন্নীরা কোনও কাজে নেমেছেন। সে কাজ যাই হোক্ না কেন, কোনও কাজই ছোট বলে বাদ যাবে না। অনেক সময় ছুটিতে বাইরে বেড়াবার শৌখিন খরচের বাড়তি প্রয়োজনটুকুও গৃহিণীরা এই রকমভাবে জোগাড় করেন।

এই রুটিন দেখে হল্যাণ্ডের মেয়েদের সাংসারিক জীবন অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে একই রকম মনে হয়। আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই মেয়েদের বাইরের কর্মক্ষেত্র থেকে নিজেদের গুটিয়ে এনে ঘরের ভেতর নিজেদের বিস্তৃত করার আলোচনা চলছে। জানি না তার কি সিদ্ধান্ত হবে? কিন্তু হল্যাণ্ড চিরদিনই বাইরের চেয়ে মেয়েদেরকে ঘরেই টেনে রেখেছে বেশি করে।

জবাব

মানবেন্দ্র পাল
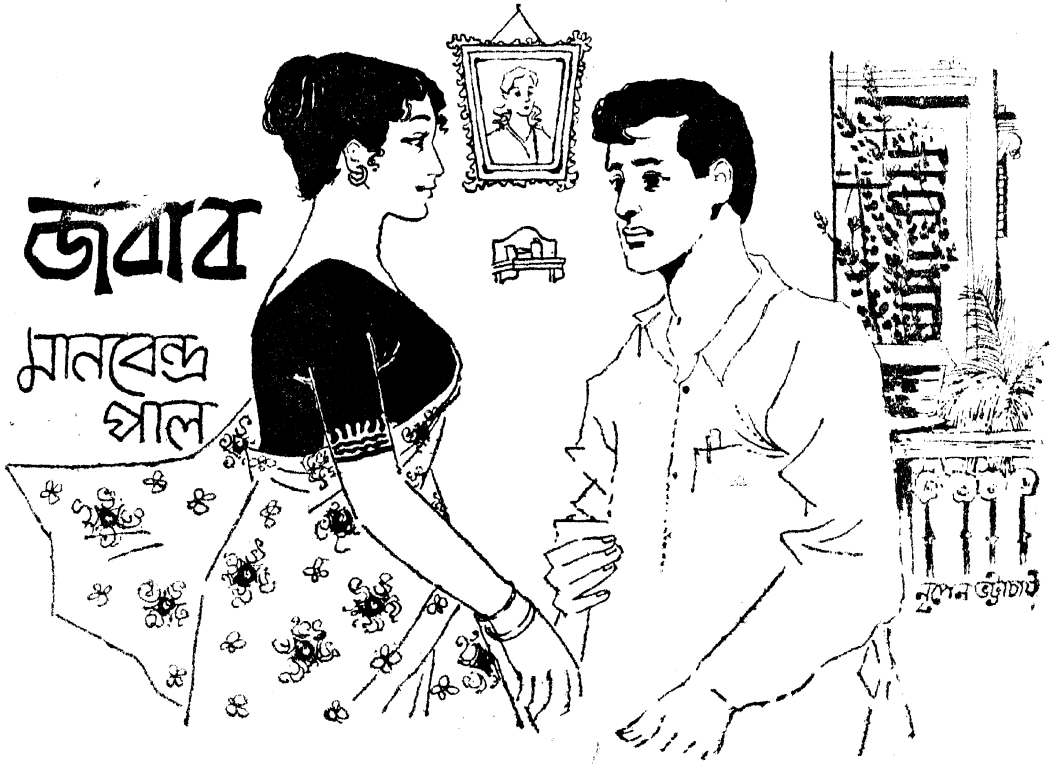
বেলা তখন প্রায় দুটো। হঠাৎ নারীকণ্ঠের একটি আর্ত চীৎকার। চমকে উঠল পাড়ার লোক। জানলায় জানলায় ভিড় জমে গেল। হ্যাঁ, ঐ বাড়িটা থেকে আসছে না? ঐ কৃতান্ত ঘোষের বাড়ি—যে বাড়িতে সেদিন নতুন ভাড়াটে এল।

দুপুর বেলা। পুরুষেরা প্রায়ই যে যার কাজে চলে গেছে। পাড়াতে শুধু রয়েছে মেয়েরা। তাদের দু চোখে ভয়ার্ত ব্যাকুল চাউনি। হায় ভগবান, না জানি কী হল! এ নিশ্চয় কৃতান্ত ঘোষের কাজ। কী শয়তান লোক! দেখছে বউটির স্বামী বাড়িতে নেই, অমনি—! মেয়েটিকে বাঁচাতে পারে পাড়ায় কি এমন কেউ নেই?

প্রতিবেশিনীদের অনুমান সত্য। যদিও কলকাতা শহর, তবু উত্তর কলকাতার এই দিকটা একটু যেন শহর-ছাড়া। অর্থাৎ এখানে এই এলাকাটুকুর মধ্যে প্রায় প্রত্যেকে প্রত্যেককে চেনে—মৌখিক আলাপ না থাক্, চাক্ষুষ পরিচয় আছে। এ অঞ্চলে সব চেয়ে ভয়ানক লোক ঐ কৃতান্ত ঘোষ। পাতলা ফর্সা চেহারা। দীর্ঘ সিঁথিকাটা ঘন কোঁকড়ানো চুল। ছোটো ছোটো দু' চোখে সাপের ক্রূর দৃষ্টি। প্রায়ই দেখা যায় খালি গায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঝুল কাপড় পরে খুব ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারও সঙ্গেই তার সদ্ভাব নেই। প্রায় চীৎকার শোনা যায়। ঝগড়া লেগেই আছে কারও না কারও সঙ্গে। এ ঝগড়া বিশেষ করে তার ভাড়াটেদের সঙ্গেই।

কৃতান্ত ঘোষের কত টাকা আছে সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত। তবে টাকা যাই থাক্ না কেন তার যে একটা সেকেলে পুরনো বাড়ি আছে এর প্রমাণ কল্পনা বা অনুমানের ওপর নির্ভর করে না।

এত বড় বাড়ি একা ভোগ করা যায় না। স্ত্রী ছিল, মারা গিয়েছে। সে মৃত্যুও পাড়ার লোক দেখেছে। সে মৃত্যু নিয়েও একটু পুলিশী হাঙ্গামা হয়েছিল বটে, কিন্তু হাঙ্গামা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কাজেই শ্রাদ্ধশান্তি একটু ঘটা করেই হয়েছিল—এবং পাড়ার লোক বেশ তৃপ্তিপূর্বকই ভোজন করেছিল।

স্ত্রী নেই, শুধু একটি ছেলে আর একটি মেয়ে। ছেলের সঙ্গে বাপের বনল না। কারণ ছেলে স্কুলের পড়া শেষ করার পরেও পড়তে চাইল। সুতরাং তাকে বিদেয় করে দেওয়া হল। রইল শুধু মেয়েটি। মেয়েটি সুশ্রী সুন্দরী। বয়েস বছর চোদ্দ।

যাই হোক, এত বড় বাড়িতে—তা যত পুরনোই হোক না কেন—কেবল দু' খানা ঘর নিয়ে বাপ আর মেয়ে থাকবে আর অন্য ঘরগুলো খাঁ খাঁ করে পড়ে থাকবে এ যেন একটা মস্ত বড় বেহিসেবী ব্যাপার। সুতরাং ঘর দুখানি ভাড়া দিতে হয়। ভাড়া অবশ্য বেশি নয়। দুখানি ঘর মাত্র চল্লিশ টাকা। কিন্তু সেলামী চাই-ই। তবু ভাড়াটে আসে বৈকি। মাসে চল্লিশটা টাকা তেমন কিছু নয়।

কিন্তু আশ্চর্য এই, কোনো ভাড়াটেই তিন মাসের বেশি টিকতে পারে না। এমন চল্লিশ টাকার দুখানা ঘরের মায়া ছেড়ে চলে যেতে হবেই। পুরনো ভাড়াটে চোখের জল আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চলে যায়, আবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নতুন ভাড়াটে জোটে মোটা সেলামীর টাকা নিয়ে। হাসি মুখে তারা আসে। বড় ফ্যামিলিকে কৃতান্ত ঘোষ ভাড়া দেয় না। স্বামী-স্ত্রী আর দু একটি ছোটো সন্তানের সংক্ষিপ্ত কেরাণী ভাড়াটেই কৃতান্তের পছন্দ। দুখানি ঘর। ছোটো ছোটো ফ্যামিলির হাতে হয়ে আসে। মনের আনন্দে ঘরগুলি গোছায়। একটি বেডরুম করা যাবে। আর একটা শোবার ঘর এবং খাবার ঘর। ঘরটায় একটা পার্টিশান দিয়ে নেওয়া চলে—তা হলে আর একটা ছোট্ট ঘর হয়। জানলাগুলোয় পর্দা দিতে হবে। বড্ড গরম। আলো বাতাস কম। ও হোক একটা পাখা ভাড়া করলেই হবে। অমনি সব পরিকল্পনা। তার পর অগ্রিম এক মাসের ভাড়া আর তার সঙ্গে বুকের পাঁজরের মতো পাঁচখানি একশো টাকার নোট। তারপর?

তারপর তিনটে মাসও কাটে না। আবার একদিন হঠাৎ ঝগড়া হয়। মার ধাক্কাধাক্কি করে শরীরে তুলে কম্পিত [illegible] প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে তাদের পালাতে হয়।

এ ঘটনা একবার নয়, বহুবার হয়েছে। কিন্তু বলার কিছু নেই। পুলিশ এসেছে গেছে। ঐ পর্যন্ত। তারপর আবার যথাপূর্বং—পাড়ার লোক বলবে? সে সাহস নেই—সে একতা নেই, কারণ কৃতান্ত ঘোষকে বিশ্বাস নেই। সে পারে না এমন কাজ নেই।

হ্যাঁ, সেই আতঙ্কপুর!

ঘুম ভাঙল অনেকেরই—অনেকেই জানলায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কেবল সে-বাড়ির পাশেই একটা মেস ছিল। সেই মেসের ভিতর থেকে একটি তরুণকণ্ঠে হুঙ্কার শোনা গেল—কী হয়েছে?

মেসের লোকেরা সবাই চলে গেছে যে যার কাজে। ছিল কেবল ঐ তরুণ ছাত্রটি। বৌটি ছেলেটিকে দেখে প্রাণ ফিরে পেল। তাকেই কেঁদে কেটে সমস্ত ঘটনা বললে। আজ ক'দিন ধরেই কৃতান্তবাবু তাদের পিছনে লেগেছে। কী যে অপরাধ তা জানা নেই। শুধু ছুতোনাতা করে ঝগড়া করবার চেষ্টা। আজ দুপুরে বেলা তাকে একলা পেয়ে ঘরের মধ্যে তাড়া করে এসেছিল। কালই বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে এই আদেশ! অথচ এই তো সেদিন এতগুলো টাকা—

ছেলেটির তরুণ রক্তে আগুন জ্বলে উঠল। তখনই সে নিজেই পুলিশে খবর দিল। বলা বাহুল্য পুলিশ তখনই এল না। এল অনেক পরে।

পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর সোজা গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বললেন। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করলেন। কৃতান্তবাবু কখন এসেছিলেন, ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন কিনা, খালিহাতে এসেছিলেন, না হাতে মারাত্মক কোনো অস্ত্র ছিল, সাক্ষী কেউ ছিল কিনা ইত্যাদি।

ভদ্রমহিলা একে একে যথাসম্ভব উত্তর দিয়ে গেলেন।

এবার ডাক পড়ল কৃতান্তবাবুর। কিন্তু কৃতান্তবাবু এলেন না। জানালেন তিনি অসুস্থ, প্রেসার বেড়েছে। অনুগ্রহ করে ইন্‌স্পেক্টর যদি একা আসেন তাঁর ঘরে তা হলে ভালো হয়। কথাকটি যিনি বললেন তিনি এ পাড়ার কেউ নন। দু ঘণ্টা আগেও তাঁকে কেউ দেখেনি।

ইন্‌স্পেক্টর তখনই সেই লোকটির সঙ্গে কৃতান্তর অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু যেই মাত্র তিনি ঘরের মধ্যে পা দিয়েছেন অমনি অকস্মাৎ একটি কিশোরীকণ্ঠ চীৎকার করে উঠল—বাবা!

—কী হল—কী হল? বলতে বলতে কৃতান্ত ঘোষ বিছানা ছেড়ে দৌড়ে এল। কৃতান্তর সঙ্গীটি উন্মত্তের মতো ইনস্পেক্টরকে গালাগালি দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে এসে কৌতূহলী জনতাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল—একী কাণ্ড মশাই! ভদ্রলোকের পাড়া—ইতরামির আর জায়গা পায়নি! যে রক্ষক সেই ভক্ষক!

ইন্‌স্পেক্টর লজ্জায় ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়ে বেরিয়ে এসে সকলের সামনে হাত জোড় করে বলতে লাগলেন,—বিশ্বাস করবেন না আপনারা, সব সাজানো ব্যাপার—সব, সাজানো ব্যাপার।

চাকা ঘুরে গেল। পরের দিন সকালবেলাতেই পুলিশে পুলিশে পাড়া ছেয়ে গেল। খোদ ওপরওয়ালা এসেছে তদন্ত করতে। ইন্‌স্পেক্টরের বিরুদ্ধে নালিশ—বড়ো সহজ কথা নয়।

দারুণ ভিড়। পুলিশ ভিড় হটাচ্ছে। পুলিশের খোদকর্তা ওপরে উঠে গেলেন। সঙ্গে দুজন পুলিশ। সেখানে একটা করে টেবিল চেয়ার পাতা। একে একে ডাক পড়ছে। প্রথমে ভাড়াটে ভদ্রমহিলা তারপর কৃতান্ত ঘোষ তারপর কৃতান্ত ঘোষের মেয়ে।

মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে। ধবধবে ফর্সা রঙ। এক পিঠ কালো চুল। চাঁপা রঙের একখানি শাড়ি পরেছে। শাড়ি বোধ হয় আজই প্রথম পরেছে—হয় তো পরতে হয়েছে।

পুলিশ অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি? পাশ থেকে কৃতান্ত ঘোষ ঈষৎ বাঁকাসুরে বললে, —ওর সঙ্গে 'আপনি' বলে কথা বলুন। She is lady sir, She is lady :

অফিসারের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে বললেন, মিস ঘোষ, আপনার পুরো নামটা জানতে পারি কি?

ছোট্ট উত্তর এল—শ্রীমতী নমিতা ঘোষ।

—আপনি ইন্‌স্পেক্টরকে কখন দেখলেন?

মাথা নিচু করে এক নিশ্বাসে নমিতা বললেন—যখন উনি ঘরে ঢুকলেন।

—আপনি তখন কী করছিলেন?

—গা ধুয়ে ঘরে ঢুকছিলাম।

—ইন্‌স্পেক্টর কী করেছিলেন?

তৎক্ষণাৎ নিঃসংকোচ নির্লজ্জ কণ্ঠে উত্তর এল—শ্লীলতাহানি।

মুহূর্ত কয়েক কারও মুখে কথা সরল না। তারপর অফিসার আবার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলেন—কীভাবে শ্লীলতাহানি করলেন?

মেয়ে চুপ করে রইল।

কৃতান্ত ঘোষ গর্জন করে উঠল—চুপ করে রইলি কেন? বল।

অফিসার বললেন—বলুন, লজ্জা করবেন না।

নমিতা মুখ লাল করে বললে—হঠাৎ পিছন থেকে এসে আমার গায়ে হাত দিয়েছিলেন।

ইনস্পেক্টরের মাথাটা লজ্জায় অপমানে ভয়ে ঝুলে পড়ল।

এদিকে যখন এই রকম জেরা চলছে তখন কেউ লক্ষ্য করেনি পাশের মেসবাড়ির একটা ছোট্ট জানলার ফাঁক দিয়ে একজোড়া চোখ সবকিছু লক্ষ্য করে শিউরে উঠছিল।

দীর্ঘদিন কেটে গিয়েছে। —তা বছর পাঁচেক তো বটেই। কৃতান্ত ঘোষ নেই। মারা গিয়েছে। বাপের মৃত্যুর পর ছেলে ফিরে এসেছে। নিজের পড়াশোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাপের প্রতিকূলতায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তাই বোনটিকে মানুষ করছে সব ঐকান্তিকতা দিয়ে। বোনটির পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার তাকে নতুন উৎসাহে পড়াতে আরম্ভ করলে। এখন প্রায় দেখা যায় বাস-স্টপেজের কাছে একগাদা বইপত্তর নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নমিতা। সত্যিই এখন সে লেডি। কলেজ ছাড়া আজ আর তার অন্য চিন্তা নেই—কলেজের পড়াশোনার মধ্যে সে যেন একটা নতুন জীবন খুঁজে পেয়েছে।

একদিন বিকেলে বাড়ি ফেরবার মুখে হঠাৎ মেসের সামনে একটি যুবককে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেল।

—আপনিই অশোকবাবু তো?

যুবক একটু অবাক হয়ে বললে—হ্যাঁ।

নমিতা নম্রকণ্ঠে বললে—আপনার সঙ্গে কিছু কথা ছিল। দাদাই আপনার কাছে এসে বলতেন, কিন্তু দাদা এত ব্যস্ত যে কিছুতেই সময় পায় না। আজ আপনাকে সামনে পেয়ে কিছুতেই আর ছেড়ে দিতে পারলাম না।

এই বলে নমিতা হাস্যোজ্জ্বল মুখে অশোকের দিকে তাকালো।

অশোক বললে—বেশ, বলুন আপনার কী কথা।

নমিতা বিনীতভাবে বললে—কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে? আসুন না একটু আমাদের বাড়ি—এই তো দুপা মাত্র।

আপনি তো জানেন।

অশোক মুহূর্তকাল কী ভেবে বললে—আচ্ছা, চলুন।

কৃতার্থ হয়ে মেয়েটি এগিয়ে চলল। উৎসাহে আনন্দে আশায় নমিতার প্রতি পদক্ষেপ যেন শূন্যে উড়ে চলেছে।

—আসুন, এই দিক দিয়ে। যা অন্ধকার। এখানে একটু সাবধানে আসবেন। বড় পেছল।

এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে নমিতা। পিছনে অশোক।

—খা পুরনো বাড়ি। আপনাদের আসতেও লজ্জা করে। হ্যাঁ, ঐ দিকে। এই আমার ঘর। চেয়ারটায় একটু বসুন মিনিট দু-য়েক—বই-গুলো রেখেই আসছি।

নমিতা চলে গেল। চেয়ারে বসে অশোক একবার ঘরের চারিদিকটা দেখে নিল। এটা ভিতরের দিকের ঘর। মেস থেকে দেখা যায় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটি। বাইরেটা শ্রীহীন বটে, কিন্তু ভিতরে লক্ষ্মীশ্রী। একটি বিছানা পাতা রয়েছে বেডকভারে ঢাকা। ওপাশে ছোট্ট আলনায় শাড়িগুলি সুন্দর করে গোছানো। জানলায় দরজায় পর্দা ঝুলিছে। হঠাৎ নজর পড়ল দেওয়ালের গায়ে একটা ছবির ওপরে। একটি চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ের ছবি। অশোক তাকিয়ে ছিল, এমনি সময় নমিতা ঘরে ঢুকল।

—কী দেখছেন? ছবিটা? বলুন তো কে? চেনেন?

—আপনারই।

—ঠিক বলেছেন। আশ্চর্য! অথচ সেদিনের চোখ আর আজকের চোখ—অনেক তফাৎ, না?

—হতে পারে।

—হতে পারে কী? নিশ্চয়ই। এখন কত বড় হয়েছি। কিন্তু থাক সে কথা। আসল কথাটাই বলি। এবার আমি [illegible] পাস করেছি। [illegible] নিয়ে নিলাম। আপনি তো আমাদেরই এম-এ?

অশোক মাথা নেড়ে সায় দিল।

—এই মেস থেকেই তো পাস করেছেন?

—হ্যাঁ।

—দেখুন। আমি কিরকম আপনার খবর রাখি। কিন্তু আপনাকে একটি উপকার করতেই হবে। দয়া করে অনার্স পেপারগুলোয় একটু সাহায্য করুন। নইলে আমার যে কী মুশকিল হবে—

অশোক সে মুহূর্তে কোনো উত্তর দিতে পারল না। মাথাটা নিচু করে গম্ভীরভাবে কী ভাবতে লাগল।

নমিতা আবার বললে—আপনাকে এভাবে জোর করে ধরে এনে হয়তো অন্যায় করলাম।

এই পর্যন্ত বলে নমিতা একবার অশোকের [illegible] মুখের পানে তাকালো। তার মনের অবস্থাটা ধরবার চেষ্টা করল।

—আপনাকে এভাবে জোর করে ধরে এনে হয়তো অন্যায় করলাম।

নমিতা আবার [illegible] অশোকের মুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হয় কিনা।

—কিন্তু এতটা জোর করতে পেরেছি আপনাকে অনেক ছোটবেলা থেকে জানি বলেই—

অকস্মাৎ অশোক ক্ষেপে উঠল।

—মিস রায়, আমিও আপনাকে জানি অনেক দিন থেকেই। জানি বলেই আপনার এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে [illegible] পেলাম না। মনে আছে তো, একদিন [illegible] দোষে পুলিশ ইন্সপেক্টরকে আপনি কী অপমানটাই না করে-ছিলেন। আপনি ভুলে গেলেও আমি তা ভুলিনি। আমি তার সাক্ষী। আপনার অসাধ্য কিছু নেই। নমস্কার।

এই বলে অপমানবিদ্ধ নমিতার লজ্জারুণ মুখের ওপর নির্মম কষাঘাতের মতো একটা উদ্ধত নমস্কার ছুঁড়ে মেরে অশোক ঝড়ের মতো বেগে চলে গেল।

নমিতা তবু সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল পাষাণমূর্তির মতো মুহূর্তের পর মুহূর্ত। চোখ দিয়ে আজ অনেকদিন পর ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ল কিন্তু আঁচল দিয়ে মোছবার শক্তিটুকুও নেই।

একটু রাত হলে নমিতার বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

নমিতা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল।

নমিতার দাদা অবাক হয়ে বললে—একী রে, ঘরে এত কাঁচ!

ঝাঁটা দিয়ে কাঁচগুলো সরিয়ে ফেলতে ফেলতে নমিতা নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল—ঐ আমার একটা ছেলেবেলার ছবি ছিল—

কথা শেষ করতে পারল না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ খুব দ্রুত কাঁচগুলো ঝাঁট দিয়ে একপাশে জড়ো করতে লাগল।

মায়ামারীচ

চিত্তরঞ্জন পাল

আর কতকাল, মায়ামারীচ, কথার কাটিয়া রঙমহলা?
যৌবনের এই মউ-বনে মন উপবাসের শুকনো জরা।
বাধার উঁচু পাথর যদি
আটক করে ভাবের নদী
ভাঙা শাঁখে ফুঁ দিয়ে কি চলবে সুখের স্বয়ংবরা?
কল্প-কাজল মাখবে চোখে? বাইরে জ্বলে প্রখর খরা।

মৌতাতে মন মাতিয়ে নিয়ে আকাশ-কুসুমে গাঁথবে মালা?
ভিটেয় ঘুঘু চরছে—মোহে স্বপন-দেখার জমবে পালা?
হাড়ের মধ্যে আগুন আসে,
শনির চেলা অট্ট হাসে,
দাওয়ায় বসে পট্টি নাশে চল্‌বে জুয়োর বাজিধরা?
নাচতে নাচতে হাজার মরে বাঁচার নামে চলবে মরা?
ললাট লিখন স্বীকার করে গণৎকারের সাধন মানা—
লটারিতে লাখ টাকা পাওয়ার আশা জমায় মনা।
আলাদিনের প্রদীপটা যে
খুলছে না আর চিচিং ফাঁকে
ঝামার ঘষায় বেরূপ নাকে রাঙা ছাপের রকম করা।
আর কতকাল, মায়ামারীচ, চলবে সোনার হরিণ ধরা?

একাল

প্রভাতী দত্ত

এপারে দেখেছি আমি সূর্যস্নাত নতুন পৃথিবী
জীবনে অনেক প্রেম মধুবনে তুলেছে গুঞ্জন,
অজস্র স্বপ্নের তরী তীরে আসে, নবীনের ডাকে।।
বিদ্যুৎ জোগায় শক্তি দুই পারে সাজানো পসার।
একক প্রধান গেছে—সাম্যযোগী হয়েছে সমাজ
এ সমাজে ভয় নেই জীবনের শুধু আনাগোনা।
ট্রাকটর এসেছে আজ ক্ষেতে ক্ষেতে নতুন ফসল
চাষী বউ কথা কয়, শুধু হাসে সব তার সোনা।
শিক্ষার আকাশ দীপ্ত ছড়ানো সে ফসলের মত
ব্যবধান ঘুচে যায় এ আলোর ঝিলিমিলি রাতে—
বসন্ত জেলের ছেলে রয়েছে তো শিক্ষার ঝলক।
আলপনা ভালোবাসে। ক্ষতি কি সে হাতে হাত রাখে।
সেদিন আতঙ্ক রাত্রি কেটে গেছে নক্ষত্র আলোকে
নতুন দিনের সূর্য জীবনের দিগন্ত প্রসার।
খেদ নেই এ জীবনে ক্ষতি নেই এমন আকাশ
সজীব প্রাণের ধারা জনপদ শুধুই উচ্ছ্বাস।

অন্ধকার ঘরে

বটকৃষ্ণ দাস

অন্ধকার ঘরে কে আছো? সাড়া দাও। চিত্রপটে
মলিন মুখগুলি থাকে চেয়েই।
নড়ে না কেউ। সব নিরেট, বোবা, স্থির। [illegible]
শব্দ নেই কোনো শব্দ নেই।

দেয়ালে ঝুলানো। প্লাস্টিকের ফুল।
সাদা কলম।

দেখলেহে হতবাক, [illegible]
ফ্রয়েড, চার্বাক, মানব রায়, মার্ক্স, এরিক ফ্রম
প্রমুখ যাবতীয় মহাজন।

কে আছো? সাড়া দাও। অন্ধকারে এসো
কি এক মোহে।
নির্জনতা বড়ো ভয়ংকর।
অনেকদিন আমি দেখিনি ফুল, পাখি।
শুনিনি গান
নদীর মতো কুলো কলস্বর।

ঘরেতে আমি যতো পুতুল গড়ি রোজ রঙ-বেরঙ,
শোনে না কথা বোবা কয় না কথা।
সবাই নড়বড়ে, খঞ্জ, কালা, বোবা, অন্ধ সব—
জেনেছি বিদ্রূপ, অপূর্ণতা।।

আকাশ উদার

রবীন্দ্রনাথ মালিক

দুচোখের চেতনার ভিড় ঠেলে হয়তো আকাশ
নীলের উদার শোভা, ছবি-এঁকে নিয়ে যায় যদি
আশা ভরা সকলের দুচোখের দৃষ্টির ফরাস
বিছিয়ে দিয়েছে যেন কোন সুবিস্তৃত নদী।

ঢেউগুলি প্রতিদিন প্রতি পলে জীবনের সাথে
মেঘের তিমির তীর্থে তরী বেয়ে যেতে দুঃখ নেই,
বাতাসের দোলা নিয়ে এ সবুজ মাঠের সম্মুখে
প্রাকৃতিক দুচোখের দৃষ্টি মেলে যদি সবাই।

অনাদি বা অনন্ত কোন অলৌকিক জীবনের পারে
এই বিশ্ব বিচিত্রের সুবিশাল দর্পণে দর্শন—
আলো-হাওয়া, রঙ-রেখা প্রকৃতির সম্ভারে
আমার শরীরে বুঝি অশ্বত্থের আশীষ স্পর্শ।

মহাবলী কাননে ধৈর্য আমাদের রীতির রক্ষায়—
সমাজপথে উদারতা, মনোগত সুখকর
সম্পদ সম্মান
আকাশ-উদার তীরে আমাদের মনের প্রচ্ছদ;
প্রাণপূর্ণ জীবনের প্রদর্শিত চিত্র চলমান।

দোসর

শ্রীঅনলকুমার ভট্টাচার্য

শুধু কিছুক্ষণ
একান্ত হৃদয়—
আকাশের তারার তারায়
নীল নীল চেতনা-নিলয়।

তারপর চায় কেন মন
মাটির চেতনা?
অথচ বেদনা-রিক্ত সংসারের ধূলি
সন্ধ্যার নীল বিষ বিষণ্ণ গোধূলি
বারবার
গর্জে। হাহাকার
খোঁজে এক নিস্তব্ধ প্রহর।

রাত্রির তিমিরে বোজা দুটি নীল চোখ
চায় যে আলোক!
স্তব্ধ তারে নিয়ে
ঘুম ঘুম নিস্তব্ধ প্রহরে
শূন্য এক প্রতীক্ষায়
চায় ফিরে ফিরে,—
এ-হৃদয় পায় না দোসর!

অথচ আকাশে নেই মাটিতেও নেই—
এ-হৃদয় যারে খোঁজে সে শুধু মিছেই।।

সিঁড়ি

একটি বীভৎস অপরাধমূলক রহস্য কাহিনী

সেদিন রাতে হঠাৎ ঐ-রকম অসময়ে না ফিরলে অন্তত দিবেন্দু, তাহলে হয়তো এর কিছুই ঘটত না।

প্রত্যহের অভ্যাসমত দুপুরের আহারের পর বেশ একটু গড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল দিবেন্দু। যথারীতি চৌরঙ্গী পাড়ায় গিয়ে ম্যাটিনিতে ঢুকেছিল এক সিনেমা হাউসে ইংরেজী ছবি দেখতে। তারপর ছবি দেখে বেরিয়ে চৌরঙ্গীর অফিস-ছুটির ভীড়ে ঢোকবার কথা তার কোন এক রেস্তোরাঁয়। ঢুকেও ছিল এবং খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে ঐ পাড়াতেই দোকান-পসার দেখে এলোমেলো কিছুক্ষণ ঘুরেও বেড়িয়েছিল রোজকার মতন। তারপর ট্রামে বসে আসবার জন্য নিয়ম মাফিক কার্জন পার্কে গিয়ে উঠেছিল ডালহৌসী-মুখী ট্রামে—ডালহৌসী স্কয়ার ঘুরে ধীরে সুস্থে এক সময় ভবানীপুরে পৌঁছবার জন্যে। মিনিট চল্লিশেক পর ভবানীপুরে পৌঁছে বাড়ির একটা মোড় আগেই নেমে পড়েছিল ট্রাম থেকে ক্লাবে যাবার জন্য। তারপর সেই ক্লাবে—নামেই ক্লাব, আসলে তাসের আড্ডা—সেইখানে রাত এগারোটা সওয়া এগারোটা পর্যন্ত তাস খেলে কোনদিন দু-চার টাকা জিতে আবার কোনদিন বা হেরে তবে বাড়ি ফেরবার কথা তার। কিন্তু সেদিন তা হ'ল না। একটু গোলমাল হয়ে গেল গত দু-আড়াই বছরের রুটিনে। ক্লাব ঘর বন্ধ দেখে মনে পড়ে গেল দিবেন্দুর যে আজ আড্ডাধারী-দের একজনের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষ্যে নেমন্তন্ন রয়েছে সকলের। দিবেন্দুরও। ফলে, তার পক্ষে নিতান্ত অসময়ে—ঐ সন্ধ্যা নাগাদ বিয়ের নেমন্তন্নে যাবার জন্য জামা কাপড় বদলাতে তাকে ফিরতে হ'ল বাড়িতে। আর, সেই ফেরাই বুঝি এই বিপত্তির সূত্রপাত।

এতক্ষণ বাড়ি বললেও আসলে কিন্তু ওটা শ্বশুরবাড়ি দিবেন্দুর। তবে দিবেন্দুর পক্ষে দুয়ে তফাৎ নেই কোনও। লক্ষপতি ব্যবসায়ী বনবিহারী ভৌমিকের একমাত্র মেয়ে—একমাত্র সন্তানকে বিয়ে করবার পর থেকে শ্বশুরে-

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু

দাঁড়িই দাঁড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছিল দিব্যেন্দুর এবং 'জামাই'-ই হয়ে থাকবে চিরকাল এবং শ্বশুরের অবর্তমানে সে-ই উত্তরাধিকারী হবে তাঁর সকল সম্পত্তির—এমন কথাই ছিল বিয়ের কথাবার্তা পাকা হবার সময় থেকে। বলতে গেলে সেই শর্তেই বিয়ে। না হলে কোন্ দুঃখে বিয়ে করতে যাবে দিব্যেন্দু ঘোষ রাসবিহারী ভৌমিকের ঐ বোবা কালা মেয়েকে।

শুধু বোবা কালা কেন, সেইসঙ্গে কানা বা অন্ধ হলেও রাসবিহারী ভৌমিকের একমাত্র সন্তান যে মেয়ে—তার উপযুক্ত পাত্রের অভাব হবার কথা নয়। কথা বলাই বলুন, আর তা শুনে বোঝাই বলুন—টাকার চেয়ে ভালো কে পারে? ফলে, মা-মরা ঐ মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র অনেক পেয়েছিলেন রাসবিহারী ভৌমিক কিন্তু তাদের মধ্যে পছন্দ করেছিলেন দিব্যেন্দুকে এবং সেটা যে-বিশেষ গুণের জন্য তা হ'ল বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ বেঁচে নেই দিব্যেন্দুর, যাদের উপর টান পড়তে পারে এমন কোনও নিকট আত্মীয়ও নয়। যে মামা দিব্যেন্দুকে মানুষ করেছিলেন, তিনিও মারা গিয়েছিলেন দিব্যেন্দুর কলেজে পড়বার সময়। বিয়ে থাওয়া করেননি তিনি, তাঁর রেখে যাওয়া সামান্য রেস্ততেই তাই বি এস-সিটা পাশ ক'রে ফেলল দিব্যেন্দু এবং চাকরি করতে শুরু ক'রে দিল বিলেতী এক ওষুধ কোম্পানীতে রিপ্রেজেন্টেটিভের। বিয়ের কথা পাকা হতেই অবশ্য চাকরিটা ছেড়ে দেয়। রাসবিহারী ভৌমিকের জামাই ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হয়ে চাকরি করতে যাবে কোন্ দুঃখে!

কিম্বা, করলেও—পরের চাকরি নয়। মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন কলকাতার বাইরে 'টুর' করবার জন্য রাসবিহারী ভৌমিক নিশ্চয়ই তাঁর ঐ বোবা কালা মেয়ের জন্য জামাই করছেন না তাকে! সুবিধে মতন চাকরি একটা তিনিই ব্যবস্থা ক'রে দেবেন এবং নিজেই ফার্মে'!

শেষেরটি অবশ্য স্বয়ং রাসবিহারী ভৌমিকের মন্তব্য!

মহাধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল দিব্যেন্দুর। মেয়ের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করলেন রাসবিহারী ভৌমিক। আর লাখ টাকা যে বিয়েতে খরচা তার রেশ সহজে কাটতে চায় না—বেশ সময় লাগে। কিন্তু সেইসব শেষ হয়ে তারপরও মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল, তাঁর ফার্মে দিব্যেন্দুর সেই কাজকর্মের কোনও কথা আর রাসবিহারীবাবু বলেন না। শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে অষ্টপ্রহর বোবা কালা বৌয়ের সঙ্গ ক'রে প্রায় পাগল হয়ে যাবার অবস্থা হ'ল দিব্যেন্দুর। একা কোথাও গিয়ে যে হাঁফ ছাড়বে, পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা ক'রে প্রাণখুলে কথা বলবে তার উপায় নেই। বিয়ের পরই গাড়ি ছাড়া তাকে কোথাও বেরুতে বারণ ক'রে দিয়েছিলেন রাসবিহারী-বাবু। অথচ তার বাইরের জন্য গাড়ি সে পায় সারাদিনের মধ্যে ঐ বিকেলের দিকে—বৌকে নিয়ে বেড়িয়ে আসবার জন্য। ছুটির দিনেও নাকি গাড়িগুলি ব্যস্ত থাকে অফিসের কাজে।

মরিয়া হয়ে একদিন শেষ পর্যন্ত দিব্যেন্দুই তুলেছিল কথাটা রাসবিহারীবাবুর কাছে।

—"আপনি যে কাজের কথা বলেছিলেন?"

—"কী কাজ?" ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছিলেন রাসবিহারীবাবু।

—"আপনার ফার্মে সেই চাকরির ব্যাপারটা?"

—"কার চাকরি?"

—"আমার!"

—"তোমার?" শুনে ভীষণ যেন অবাক হয়ে গিয়েছিলেন রাসবিহারীবাবু, "কী বলছো?"

—"আজ্ঞে, হ্যাঁ!" উত্তরে সবিনয়ে বলে-ছিল দিব্যেন্দু—"চুপচাপ আর কতো দিন বাড়িতে বসে থাকবো!"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ সে কথা ঠিক!" জামাইয়ের বক্তব্যটা যেন অবশেষে বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এবং তাই সায় দিয়ে উঠেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে—"বেশ তো, বেণুকে নিয়ে যাও না সাউথ-ইণ্ডিয়াটা ভালো ক'রে বেড়িয়ে এসো। বিয়ের পর এই এতদিনে দার্জিলিং বা শিলং ছাড়া আর কোথাও তো যাওয়া হয়নি তোমাদের!"

শুনে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল দিব্যেন্দু, কী যে বলবে ভেবে পায়নি কিছুক্ষণ। কিন্তু তারপর একটু দৃঢ়ভাবেই বলে উঠেছিল—"আজ্ঞে, আমি আমার একটা কাজকর্মের কথা বলছি। তা আপনার ফার্মে যদি কোনো অসুবিধে—"

কিন্তু তারপরই তাকে থামিয়ে দিয়েছিলেন রাসবিহারীবাবু। গম্ভীরভাবে আচমকা জিজ্ঞাসা করে উঠেছিলেন—"তোমার আদর যত্নের কি কোনো ত্রুটি হচ্ছে এ-বাড়িতে?"

—"আজ্ঞে, না!" আকাশ থেকে পড়ে তাড়াতাড়ি জানিয়েছিল দিব্যেন্দু।

—"তাহলে আমার জামাই হয়ে অন্য কোথাও চাকরি নিয়ে দশজনের কাছে আমার মাথা হেঁট করবার কথা ভাবছো কেন?" বেশ ক্ষুব্ধভাবে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেছিলেন রাস-বিহারীবাবু। তারপর কী ভেবে নিজে থেকেই কথার সুর পাল্টে বুঝিয়েছিলেন দিব্যেন্দুকে—"[illegible] করবার জন্য তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? কাজের দিন তো তোমার পড়েই রয়েছে। আমি আর ক'দিন। বেঁচে থাকলেও সংসার [illegible] আর কাঁধে রাখতে পারবো না। তখন তো সব তোমাকেই দেখতে হবে, তোমাকেই করতে হবে। কাজের চাপে তখন নাওয়া-খাওয়ার সময় পাবে না। অফিস থেকে বাড়ি ফিরেও রেহাই পাবে না [illegible] থেকে। সেসব তো শেষ পর্যন্ত আছেই। আমি থাকতে থাকতে তার আগে [illegible] [illegible]"

কথাটা আর শেষ করেননি রাসবিহারীবাবু, [illegible]

—"একদিন আমি মরব বলে আমার হাতটা বা পা-টা এখনি পুড়িয়ে দিয়ে দাহ করবার কাজটা কিছুটা এগিয়ে রাখতে বলছো?" হাসতে হাসতেই বলে উঠেছিলেন রাসবিহারীবাবু। কিন্তু সে হাসির মধ্যে এমন একটু শ্লেষ ছিল এবং আচমকা উপমাটার মধ্যে গভীর এমন একটা মানে যে আর কথা বাড়াবার সাহস হয়নি দিব্যেন্দুর। মাথা নীচু করে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে এসেছিল শ্বশুরের সামনে থেকে। তারপর চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে না হতেই জানতে পেরেছিল কবে কখন কোন্ ট্রেনে বৌ-কে নিয়ে সাউথ-ইণ্ডিয়া বেড়াতে রওনা হচ্ছে সে। যাতে তাদের কোনও অসুবিধা না হয়— অর্থাৎ তার তরফ থেকে কোনও অনাদর না হয় তাঁর মেয়ের সেইজন্যে দু'চারজন চাকরের সঙ্গে সরকার মশাইকেও তাদের সঙ্গে দিচ্ছেন রাসবিহারীবাবু।

মহাবলীপুরমের মন্দির দেখে ফেরবার পথে গাড়িতে আসতে আসতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে তাঁর দুঃখেও বুঝি হাসি পেয়েছিল দিব্যেন্দুর। চাকরির কথা বলতে গিয়েছিল সে রাসবিহারী ভৌমিককে। শুনে শেষ পর্যন্ত হেসেছিলেন তিনি। হাসবেনই তো। ও রকম কথা শোনামাত্র না হেসে পারে মানুষ।

ভুল করেছিল দিব্যেন্দু মণ্ডল। চাকরি তো তিনি দিয়েছেন তাকে। তাঁর জামাইয়ের চাকরি। অষ্ট প্রহরের কাজ। মরা বা আত্মহত্যা করা ছাড়া যা থেকে মুক্তি নেই আর তার কোনও দিন।

পালাবে দিব্যেন্দু?

কোথায় পালাবে? এমন কোথায় পালাতে পারবে সে যেখান থেকে রাসবিহারী ভৌমিকের টাকা তাকে ঠিক খুঁজে বার করবে না, ধরে আনবে না! হোটেলে হোটেলে যে চাকরটা রোজ রাতে বসে থেকেছে তার দরজার বাইরে—তার উদ্দেশ্য কি শুধু হঠাৎ-প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া? সেই সঙ্গে পাহারা দেওয়া নয়?

ধীরে সুস্থে সমস্ত দক্ষিণ ভারত তন্ন তন্ন করে দেখে বেড়িয়ে তারপর একদিন সদলবলে বা কড়া পাহারায় কলকাতায় ফিরে আবার শ্বশুরবাড়িতে ঢুকেছিল দিব্যেন্দু। তারপর পুরনো রুটিনে কয়েক মাস যেতে না যেতেই পড়েছিল শক্ত অসুখে। ভেবেছিল বুঝি এইবার মুক্তি হল কিন্তু জলের মতন টাকা খরচ করে জামাইকে নীরোগ করে তুলেছিলেন রাসবিহারীবাবু।

বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ডাক্তার যারা চিকিৎসা করেছিল দিব্যেন্দুর, তারা সবাই এক বাক্যে জানিয়েছিল রাসবিহারীবাবুকে যে তাঁর জামাইয়ের অসুখটা শরীরের থেকে বেশি মনের। মন ভালো না থাকলে আবার অসুখে পড়তে পারে এবং এর চেয়েও [illegible] বিশেষ দেরি হবে না দিব্যেন্দুর। কাজেই মন যাতে তাঁর জামাইয়ের বেশ প্রফুল্ল থাকে, রাসবিহারীবাবু যেন সে রকম বন্দোবস্ত করেন এবং অবিলম্বে দিব্যেন্দুকে পাঠিয়ে দেন কোথাও লম্বা চেঞ্জে।

তারপর দিব্যেন্দুর আরোগ্যলাভের পর সেই ডাক্তারদেরই একজন শেষবারের মতন দিব্যেন্দুকে দেখে যেতে এসে দিব্যেন্দুর সামনেই প্রশ্ন করেছিল রাসবিহারীবাবুকে—"কোথায় চেঞ্জে পাঠাবেন বলে স্থির করলেন?"

—"এখন আর পারছি কী করে?" উত্তর করেছিলেন রাসবিহারীবাবু।

—"কেন?" ঠিক বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেছিল ডাক্তার।

—"রেণুরও তো সময় এগিয়ে এসেছে!"

—"ও! কিন্তু সেদিন যা বললেন, তাতে এখনো তো দেরি রয়েছে কয়েক মাস। তার মধ্যে জামাই আপনার ঘুরে আসুক। মাস দুয়েক চেঞ্জ হলেও অনেকটা সেরে উঠবে শরীর, মনের উপকার হবে অনেকখানি!"

—"কিন্তু এই অবস্থায় রেণুকে পাঠানো উচিত হবে কি বাইরে?"

—"কেন?"

—"হঠাৎ যদি কিছু হয় দেশের বাইরে গিয়ে? নিজের অবস্থা সব সময় বুঝিয়ে উঠতে পারবে—এমন তো নয়!"

—"সেটা একটা কথা বটে। তা আপনার জামাই না হয় সঙ্গে থাকবে। আর না হয় জামাইকে একা পাঠিয়ে দিন লোকজন দিয়ে।"

—"একা পাঠাবো?" কথাটা মনঃপূত হয়নি রাসবিহারীবাবুর মাথা নেড়ে তিনি বলেছিলেন—"না-না, সে কখনো হয়? এই সময়ে কি একলা যাওয়া উচিত হবে?"

[illegible] —আর সে [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] সেই [illegible]?

[illegible]

[illegible] পারে না [illegible]

[illegible] রাসবিহারীবাবু। [illegible] সপ্তাহে একবার করে [illegible] রেণুকে, রাসবিহারীবাবু [illegible] অন্দরে। সেই [illegible] নার্স। তারপর রাসবিহারীবাবু, রেণু ও দিব্যেন্দু—এই তিনজনের [illegible] নজর এড়িয়ে সাত মাসের [illegible] সিঁড়ির মাথা থেকে পা হড়কে গিয়েছিল রেণুর। মাত্র কয়েক হাত দূরে [illegible] পা দিয়ে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল দিব্যেন্দু। বোবা-কালা বৌয়ের অস্বাভাবিক চিৎকারে কাগজ থেকে মুখ তুলেই ঐ দুর্বল শরীরে দৌড়ে যাবার আপ্রাণ এক চেষ্টা বুঝি করেছিল সে কিন্তু সামলাতে না পেরে আছাড় খেয়ে পড়েছিল সিঁড়ির মাথায়। আওয়াজ পেয়ে ঘর থেকে নার্স এবং নীচ থেকে লোকজন ছুটে আসার আগেই দোতলায় নামবার সিঁড়ির মাঝের ল্যাণ্ডিং-এ আছড়ে গিয়ে পড়েছিল রেণু। পড়েই বুঝি অসাড় হয়ে গিয়েছিল তার দেহ আর সেই সঙ্গে লাল হতে শুরু করেছিল সেখানকার মেঝে।

রাসবিহারীবাবু তখন আপিসে। টেলিফোন পেয়ে ছুটে এসেছিলেন. কী করে এই সর্বনাশ হ'ল জিজ্ঞাসা করেছিলেন জনে জনে। জবাব দিয়েছিল, দিতে পেরেছিল একা দিব্যেন্দুই—উদভ্রান্তভাবে—"চিৎকার শুনে ফিরে দেখি ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। গিয়ে ধরবার আগেই—"

তারপর কলকাতার বাঘা বাঘা ডাক্তারদের কোচড়ে দু-হাতে টাকার হরির লুট দিয়েছিলেন রাসবিহারীবাবু। টাকায় কিন্তু সে রক্ত আর বন্ধ করা যায়নি। হাসপাতালে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন করবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সার্জন ছুরি ধরবার আগেই মারা গিয়েছিল রেণু। শেষ মুহূর্তে জ্ঞান একবার হয়েছিল তার এবং তখন অপারেশন থিয়েটারে ডাক্তার ও নার্সদের মধ্যে কাকে যেন দু-চোখ মেলে আকুল হয়ে খুঁজেছিল সে। একজন ডাক্তার এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল রাসবিহারীবাবুকে, গিয়ে মেয়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু না তাঁকে নয়। বোধহয় তাকেই খুঁজেছিল যাবার আগে শেষ দেখা দেখে যেতে চেয়েছিল রেণু—রেণুর অচৈতন্য দেহ গাড়িতে নিয়ে [illegible] পথ থেকে যাকে বাড়িতে আটকে রাখতে [illegible] যাচ্ছিল অতগুলি চাকর [illegible]। [illegible] বৌয়ের নাম ধরে গলা [illegible] বাড়ি কাঁপিয়ে [illegible] সে। ঐ শীর্ণ দুর্বল শরীরে অতখানি [illegible] সম্ভব—না দেখলে, না শুনলে নাকি [illegible] বিশ্বাস করা যেত না।

শোকের ধাক্কাটা প্রথম সামলালেন [illegible] বাবু। এমনভাবে [illegible] তখন [illegible] [illegible] কেউ। [illegible] গেলেন, [illegible] দৈনন্দিন কাজ-কর্মের বাঁধা রুটিন যেটুকু ওলটালো তা হল দিব্যেন্দুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ করতে সকাল সন্ধ্যায় মেয়ের ঘরে আসা। সে কাজটুকু—তাঁর নির্দেশেই সম্ভবতঃ—করতে লাগল বাড়ির সরকার মশাই।

শোকের ধাক্কা সামলাতে সময় যা লাগল—দিব্যেন্দুর। তার মনে ধাক্কাটা যতখানি লেগেছে বলে প্রথমে মনে হয়েছিল, ক্রমে দেখা গেল শরীরে লেগেছে অনেক বেশি। চিন্তিত ডাক্তারদের পরামর্শে এক নাগাড়ে ছ মাস কলকাতার বাইরে রেখে দেওয়া হল তাকে। সঙ্গে একজন ডাক্তার। ফলও হল। ছ-মাসে চেহারার সঙ্গে আবার মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল দিব্যেন্দুর। তারপরও আরো দু-মাস বাইরে থেকে ফিরে এল সে কলকাতায় শ্বশুর-বাড়িতে।

এসে দেখল—বাড়ির নিয়ম এই আট মাসে অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে। তার শোবার ঘর বদলে গেছে। যে ঘরে আগে রেণুকে নিয়ে থাকত—সেই ঘরটার দেওয়াল ভরে রেণুর [illegible] ও [illegible] ছবি টাঙানো হয়েছে। [illegible] রেণুর [illegible]—রাসবিহারীবাবুর ঘর থেকে এনে। [illegible] রাসবিহারীবাবু। দিনের অধিকাংশ সময়টা সেই ঘরেই [illegible]। [illegible] দিব্যেন্দুর অনুপস্থিতিতে নাকি ইতিমধ্যে একটি স্ট্রোকও হয়ে গেছে তাঁর।

হালচাল দেখে দিব্যেন্দু প্রথমে যেন খুশিই হল। রেণুকে নিয়ে বাস করা ঐ শোবার ঘরে তাকে শুতে হবে না জেনে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তারপর দুয়েকদিন যেতেই গিয়ে হাজির হল শ্বশুরের সামনে।

"কিছু বলবে?" দিব্যেন্দুর পায়ের আওয়াজে মাথা তুলে তাকালেন রাসবিহারীবাবু।

"আপনার শরীর কেমন?" দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল।

"ডাক্তাররা বলছে ভালো নয়"—জবাব দিলেন রাসবিহারীবাবু—"একবেলা কাজে আপিস যাচ্ছি তাও নাকি অন্যায় করছি।"

"ডাক্তাররা যখন বারণ করেছেন তখন কী দরকার আপনার যাবার?" কথাটা তোলবার সুযোগ পেয়ে আর দেরি করল না দিব্যেন্দু—"আমি তো আছি!"

—"তুমি?" রাসবিহারীবাবুর গলাটা একটু যেন কেঁপে গেল।

—"হ্যাঁ। একটা কাজকর্ম না করলে আমারও আর ভালো লাগছে না। খালি বাড়িতে একা একা ভালোও লাগে না।"

—"[illegible] বাবার [illegible]। ইচ্ছে করলেই তো বিয়ে করতে পার—"

—"বিয়ে!"

—"আজ না করো, দু-দিন বাদে তো করবেই। একা একা যদি ভালো না লাগে এখনই

করতে পারো। রেণু যখন নেই তখন তোমার এ-বাড়িতে আটকে রাখা আমার উচিত নয়।"

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল দিব্যেন্দু। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ধাক্কাটা সামলে নিয়ে তারপর একটু দৃঢ় গলাতেই বলল—"বিয়ের কথা আমি বলছি না। আমি একটা কাজের কথা বলছি। আপনার আপিসে একটা চাকরির।"

"বেশ আগরওয়ালাকে বলে দেখব।"

"আগরওয়ালা?"

"আমার আপিস আর আমার আপিস নেই। আগরওয়ালাকে আমি ব্যবসা বেচে দিয়েছি। তাকে খাতাপত্তর বোঝাতেই আমাকে আপিসে যেতে হয় একবার করে।"

"ব্যবসা বেচে দিয়েছেন?" আর্তনাদের মতন বেরিয়ে এল কথাটা দিব্যেন্দুর গলা দিয়ে।

"আমার পক্ষে আর ব্যবসা চালানো সম্ভব নয়। আর চালিয়েই বা কী করব?" শান্ত গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন রাসবিহারীবাবু।

কোনমতে পা-দুটোকে চালিয়ে তারপর একসময় পুরানো শোবার ঘর থেকে চলে এসেছিল দিব্যেন্দু।

অসময়ে সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে বাড়ির সামনে উকিল-এটর্নী চেহারার ভদ্রলোক লোককে গাড়িতে করে চলে যেতে দেখল দিব্যেন্দু। দেখে কিছু তেমন মনে হয়নি তার। বাড়িতে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে গিয়ে হঠাৎ দেখা হল রাসবিহারীবাবুর এক বন্ধুর সঙ্গে যিনি এ-বাড়িতে আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া বিশেষ আসেন না।

সসম্মানে সিঁড়ির অপরিসর পথ ওঁকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াচ্ছিল দিব্যেন্দু, কিন্তু তিনিই কাছে এগিয়ে এলেন। দিব্যেন্দুকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন—'রাস্ উইল করছে। আমাকে ডেকেছিল, তাই এসেছিলাম।"

ব্যস, ঐটুকু বলেই পিছনে সরকার মশাইয়ের আওয়াজ পেয়ে ব্যস্ত সমস্ত হয়ে নেমে গেলেন তিনি।

আর তারপর বাকী সিঁড়িটুকু ভেঙে উপরে উঠতে পাঁচগুণ সময় লেগে গেল দিব্যেন্দুর।—ভাবতে ভাবতে। উইল? উইল করে কাকে সম্পত্তি দিতে চায় রেণুর বাবা? তাকে দেবার হলে উইলের কী দরকার? নিশ্চয়ই তবে অন্য কারুকে!

ভাবতে ভাবতে কখন দোতলা পেরিয়ে তিনতলা উঠে গেছে সে খেয়াল ছিল না দিব্যেন্দুর। চমক ভাঙল পুরানো শোবার ঘরে ঢুকে রাসবিহারীবাবুর কথায় থমকে দাঁড়িয়ে।

"কিছু বলবে?"

"আজ্ঞে—"

"তুমি এই সময় বাড়িতে? কী ব্যাপার? শরীর খারাপ না, উইলের খবর পেয়েছ?"

শুনে সঙ্কুচিত হয়ে গেল দিব্যেন্দু। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল—"একটা বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল তাই তাড়াতাড়ি ফিরেছি—জামা-কাপড় বদলে যাবো বলে।"

"ও—"

"উইলের খবরটা বাড়িতে ফিরে তবে পেয়েছি।"

"তাই এসেছ?"

—"আজ্ঞে—" শ্বশুরের কথার কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না দিব্যেন্দু।

"কী উইল করছি, কাকে কী দিচ্ছি জানতে চাও, এই তো? বেশ কাল যখন উইল সই হবে, তখন থেকো। সব জানতে পারবে।"

তারপর কোন রকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল দিব্যেন্দু।

বিয়েবাড়ি থেকে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল দিব্যেন্দুর। আসলে খাটাখাটনির লোকদের জন্যে রাখা সিদ্ধির একটু সরবৎ পেটে পড়ায় সময়ের জ্ঞানটা ছিল না তার।—যখন বাড়িতে ফিরল তখন বাড়ি নিঝুম। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গিয়ে নিজের অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে রাসবিহারীবাবুর গলা শুনে।

—"কে?"

—"আমি?" সাড়া দিল দিব্যেন্দু।
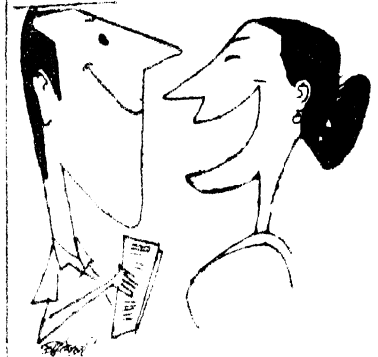
—কালো হাসি, আমার নিজের মামা একটা খবরের কাগজের মালিক।
—হাসালে, খোল নয়া পয়সা ত দাম।

—"এত রাতে এঘরে কেন?"

শুনে খেয়াল হল দিব্যেন্দুর যে তিনতলায় উঠে এসেছে সে, ঢুকেছে এসে পুরানো শোবার ঘরে বোধ হয় সিদ্ধির নেশাতেই।

কী বলবে ভেবে না পেয়ে দিব্যেন্দু বলল—"এমনিই—"

"এত রাতে এমনি এ-ঘরে তোমায় আসতে হবে না—"

মাথা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এল দিব্যেন্দু। এসে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়াল সে—রাসবিহারীবাবুর গলা শুনে—"দাঁড়াও"। তারপর রাসবিহারীবাবু বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। এসে দিব্যেন্দুর সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আচমকা একটা ধাক্কা মারলেন দিব্যেন্দুকে সিঁড়ির দিকে।

চেষ্টা করেও যেন দেওয়াল বা সিঁড়ির দরজাটা ধরবার জন্যে হাত তুলতে পারল না দিব্যেন্দু। চেঁচাতেই বুঝি তেমন করতে পারল না—বাধা হল যেন কোথায়। একটা চিৎকার পর্যন্ত করল না। উল্টে পড়ে গেল। তারপর গড়িয়ে পড়ল নীচের ল্যান্ডিং-এ।

চিৎকার করে উঠলেন রাসবিহারীবাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। চেঁচিয়ে বাড়ির লোকজন ডেকে তুললেন তিনি। আলো জ্বালালেন সিঁড়ির—নিজেই।

প্রথমে তাঁর মনে হল অজ্ঞান হয়ে গেছে দিব্যেন্দু। লোকজন দিয়ে ঘরে তুলিয়ে আনলেন তাকে। তারপর খবর পেয়ে ডাক্তার এসে জানালো অজ্ঞান নয়, মারা গেছে দিব্যেন্দু। ঘাড়-হাত-পা ভেঙে নয়, হার্টফেল করে। সুস্থ জোয়ান ছেলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে এভাবে পড়ে গেল কী করে ভেবে ডাক্তার অবাক একটু।

জিজ্ঞেস করল—"ঠিক কী হয়েছিল?"

রাসবিহারীবাবু শান্ত—সংকল্পিত উইল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত। মেয়ের অপমৃত্যুর পর এতদিনে একটু বুঝি নিঃসন্দিগ্ধ গলায় বললেন—'চিৎকার শুনে ফিরে দেখি ঘুরে পড়ে যাচ্ছে। গিয়ে ধরবার আগে"—অর্থাৎ রেণুর দুর্ঘটনার পর ঠিক দিব্যেন্দুই সবাইকে যা বলেছিল।

এই ফাঁকে সুভাষ তাড়াতাড়ি প্রুফটা শেষ করে আনতে চায়। উঠতেই হবে। কিন্তু উঠবে কি নিয়ে। এক টাকা কয়েক আনা মাত্র সম্বল। এক টাকা যাবে কল্যাণীর সিনেমায়। বাকী পয়সা তার পথের খরচ।

অতএব। ঝড় উঠবে এবার। আসন্ন এই প্রলয় শুধু তার প্রুফ দেখারই সমাধি রচনা করবে তা নয়, সকাল থেকে যে বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া আনন্দ বিরাজ করছিল এই ছন্নছাড়া সংসারটায় সে আনন্দেরও সমাপ্তি ঘটবে।

একটা করে পাতা দেখে সুভাষ আর অপেক্ষা করে কল্যাণীর আগমনের। কল্যাণী এলেই উঠতে হবে। বাইরে কোথাও চেষ্টা করতে হবে ধারের।

কিন্তু না, কল্যাণী নিশ্চুপ। প্রতিমুহূর্তেই আশা করে সুভাষ কল্যাণীর বাজারের থলে হাতে আবির্ভাব হবে, হয় না, না এলেও অন্ততঃ বাজারের জন্য মুখেও তাগাদা দেবে। তাও না।

অস্বস্তি অনুভব করে সুভাষ। দৈনন্দিন কার্যতালিকার ব্যতিক্রম বড় দেখা যায় না। ব্যতিক্রমের অর্থ এও হতে পারে যে, গুমোট আবহাওয়া ঝড় ওঠার পূর্বাভাস।

না, মন দিয়ে প্রুফ দেখা যায় না। সারাক্ষণ মনের মধ্যে বিঁধতে থাকে অস্বস্তির কাঁটাটা। এখনই শুনতে হবে ঃ কিছু বলছি না বলে কি বাজার করতে হবে না নাকি! কাল কি এনেছো মনে নেই! আমার কি! আমাকে জব্দ করবে ভেবে যদি বাজার না করো আমার কিছু হবে না। নিজেই অফিস যাবার সময় ভাত খেতে পারবে না।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পরও যখন সাড়া পেল না সুভাষ, বাধ্য হয়ে নিজেকে অশান্তি থেকে বাঁচাবার জন্যই বলে ফেলে ঃ বাজার করতে হবে না আজ!

কোন সাড়া নেই।

শঙ্কিত হয় মনে মনে। কাছেই আছে কল্যাণী। ওর চুড়ির টুং টাং আওয়াজ পাচ্ছে সুভাষ। চুড়ির মৃদু-মধুর আওয়াজের পরই শুরু হবে গর্জন। কলমটা বন্ধ রেখে অপেক্ষা করে আসন্ন ঝঙ্কার।

সশরীরে হাজির হয় কল্যাণী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে।

—আজ নাই বা করলে বাজার!

মুখ তুলে চাইল ও কল্যাণীর দিকে। গর্জনের বদলে যেন জলতরঙ্গের মিষ্টি আওয়াজ। মুখে মৃদু হাসি।

চেয়েই রইল অবাক হয়ে।

—কি দেখছ বল তো বার বার!

কথা বলতে পারে না সুভাষ। কি সহজে এক টাকায় এমন যাদু! প্রতিদিনের বড় তুফানকে উড়িয়ে দিয়ে দখিনের মলয় বাতাস নিয়ে এল কেমন করে।

—আজ যা আছে তাতেই হবে!

এমন রূপে কল্যাণীর অনেকদিন চোখে পড়েনি। একটি টাকায় এমন করে শান্তি কেনা যায় এ তো মনেই হয়নি কোনদিন।

—দুবেলা হবে!

—হাঁ গো হবে! তোমায় এ সব ভাবতে হবে না! তুমি নিজের কাজ কর দেখি!

আশ্চর্য! চেনাই যায় না কল্যাণীকে।

কিন্তু চেনার বুঝি বাকী ছিল আরও। আবার চা নিয়ে হাজির হল।

বোকার মত সুভাষ চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

—দেখ তো মিষ্টি হয়েছে কিনা?

চুমুক না দিয়েই জবাব দিল—খুব মিষ্টি হয়েছে!

—[illegible] না খেয়েই মিষ্টি লাগল!

গলার স্বর নামিয়ে বলল,—মিষ্টি হাতের চায়ে মিষ্টি এমনিতেই লাগে!

যাও! আর ঠাট্টা করতে হবে না।

সমস্ত শরীর মন সুভাষের ভরে গেল গভীর প্রশান্তিতে। অনেকদিন পরে নতুন মিষ্টি স্বাদে মনে হল জীবনের জন্য অর্থও বুঝি আছে। দৈনন্দিন গ্লানিময় জীবনের কোন ফাঁকে আনন্দলোকের এক টুকরো মধুক্ষরা মুহূর্ত হঠাৎ উঁকি দিয়েছে ভুল করে। এই ভুলকে সে আজ সারাদিনের জন্য অক্ষয় করে রেখে দেবে।

—কল্যাণী।

কল্যাণী এসে দাঁড়াল সম্মুখে।

—আমিও যাব সিনেমায়!

অবাক হয়ে চেয়ে রইল স্বামীর মুখের দিকে।

—তোমাকে নিয়ে যাব সিনেমায়।

বিস্ময়ে আর আনন্দে অভিভূত কল্যাণী চেঁচিয়ে উঠল—সত্যি! সত্যি যাবে! তুমি নিয়ে যাবে আমাকে।

—হ্যাঁ!

তবু যেন বিশ্বাস হয় না। দু হাত দিয়ে সুভাষের হাত দুটো চেপে ধরে বলে আমাকে ছুঁয়ে বল তুমি যাবে!

—বলছি! তোমাকে নিয়েই যাব! তুমি তৈরী থেকো। আমি অফিস থেকে চারটের মধ্যেই ফিরব। জামা-কাপড় পরে রেডি হয়ে থাকবে কিন্তু। আমি বাড়ি ফেরার পর যেন দেরী না হয়।

—ললিতাদের বলে আসব যে ওদের সঙ্গে যাব না।

—হ্যাঁ!

—ঠিক তো!

—হ্যাঁগো হ্যাঁ! তোমার কাছে বেঠিক বলতে পারি!

ওঃ! আমার কতদিনের সখ তোমার সঙ্গে সিনেমায় যাবার!

কল্যাণীর কথা শুনে ললিতা চোখ দুটো কপালে তুলে বলে—বলিস কি কল্যাণী! বরের সঙ্গে সিনেমায় যাবি!

[illegible] কল্যাণীর [illegible] খাবারে থাকে।

[illegible] সবাই [illegible] —আমাদের [illegible] অফিসে পরের টাকার হিসেব করছেন বসে বসে, নিজের বৌ এর হিসেব কে রাখে তার ঠিক নেই।

কল্যাণী এবারে মুখর—তোরা তো ভাই [illegible]! আমার আর হয়েই ওঠে না!

—তাই হোক কল্যাণী! ভাবনা একা একাই যাই! দিনে দিনে বাবুর অফিস থেকে ফেরার আগে আবার ঘরে ফিরতে হবে তো!

সকালে সকালে খেয়ে কল্যাণী একটু গড়িয়ে নেয়। অন্যদিন একটা ঘুম হয়ে যায়। আজ আর ঘুম আসে না। [illegible]। সেকে খাওয়াতে হবে বিকেলের কাজগুলো। উঠে পড়ে বিছানা থেকে। বাচ্চাটা ঘুমিয়ে। একটি একটি করে কাজ সারে। তারপর তিনটে বাজতে না বাজতেই গা ধুয়ে এসে সাজতে বসে।

ললিতারা ডেকে গেল একটু আগে। যাবার আগে আবার এক প্রস্থ হাসি-তামাশা।

কিছুতেই পছন্দ হয় না কল্যাণীর। খোঁপা বাঁধবে কেমন করে তাই নিয়ে সময় কাটে। এক ঘণ্টা ধরে চলে তার প্রসাধনপর্ব। নিখুঁতভাবে সাজ-পোশাক সেরে আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে যায় নিজেই এত সুন্দর দেখাতে সে।

নিজের হলে ছেলেকে সাজানোর পালা। মনের মত করে সাজাবে। বাচ্চাটা হয়ে পর্যন্ত আর সিনেমায় যায়নি সে! ছেলে কোলে নিয়ে সুভাষের সঙ্গে যখন যাবে ঈর্ষায় চেয়ে থাকবে ললিতা। আহা! ললিতা যদি আজ বাড়ি থাকত! সেদিন ললিতা স্বামীর হাত ধরে সিনেমায় যাবার সময় আড়চোখে তার দিকে চেয়ে কেমন যেন বাঁকা হাসি হেসেছিল। আজ সে বাড়ি থাকলে শোধ দিত তার হাসির।

ছেলে কোলে নিয়ে আয়নার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ায় কল্যাণী। চেয়ে চেয়ে দেখে। এই সময় যদি সুভাষ এসে পড়ত। সেই যে বিয়ের পরই একদিন চুপি চুপি অফিস থেকে পালিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তার আয়নার সম্মুখে। দাঁড়িয়ে

গ্র্যাণ্ড সুপার ৭৯০-ডব্লিউ ভারতে তৈরী একমাত্র রেডিও যাতে আছে ৫টি লাউডস্পীকার, প্যানোরামিক ধ্বনির জন্য ■ ৭টি ভালভ, ৯টি ওয়েভব্যাণ্ড ■ পৃথিবীর যে কোন ষ্টেশন সহজেই ধরা যায় ■ ৪টি টোন স্পেকট্রাম কন্ট্রোল ■ শর্টওয়েভে মাইক্রো-টিউনিং।
মূল্য: ১১৩০ টাকা ৩৩ নঃ পঃ*

স্পেশাল সুপার ৬৯২ ডব্লিউ-ও.এ-সি/৬৯২ জি-ডব্লিউ এ-সি/ডি-সি পৃথিবীর যে কোন ষ্টেশন ধরা যায়, চমৎকার অবিকৃত স্বর এবং প্যানোরামিক ধ্বনি। ■ ৬টি ভালভ ৯টি ওয়েভব্যাণ্ড ■ ৩টি লাউডস্পীকার ■ ৩টি টোন স্পেকট্রাম কন্ট্রোল ■ শর্টওয়েভে মাইক্রো-টিউনিং।
মূল্য: ৫৭৫ টাকা*

ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুপার ৬৯১ ডব্লিউ-ও এ-সি ৬৯১ জি-ডব্লিউ এ-সি/ডি-সি দামের তুলনায় অপূর্ব সেরা জিনিস ■ ... ■ ... ■ ... শর্টওয়েভে মাইক্রো-টিউনিং
মূল্য: ৪১৫ টাকা*

সুপার আর-এ ১০১ এ সি আর-এ ১০১ জি-ডব্লিউ এ-সি ডি সি সবচেয়ে নতুন সীমেন্স রেডিও ■ ... ■ ... ■ ...
মূল্য: ২৭০ টাকা*

* উৎপাদন কর সহ। অন্যান্য কর অতিরিক্ত।

প্রস্তুতকারক: ইষ্টার্ন ইলেকট্রনিকস্ জার্মানীর সীমেন্সের লাইসেন্সপ্রাপ্ত

একমাত্র পরিবেশক: **সীমেন্স ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড**

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ও আন্দামানের পরিবেশক: মেসার্স নান এণ্ড কোম্পানী, ৯এ ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা ১। ফোন: ২২-৩৭৯৭

সীমেন্স রেডিওর স্বরে সারা বিশ্ব আপনার ঘরে।

হাসছিল দুষ্টুমিভরা হাসি। সেই রকম যদি আজও সে এসে পড়ত এতক্ষণ।

কটা বাজে! কল্যাণী পিছন ফিরে ঘড়ির দিকে চাইতেই চমকে উঠল। ওমা! চারটে বাজে যে। কি হোলো সুভাষের! চারটের মধ্যে আসার কথা যে।

না, এখনও সাত মিনিট বাকী। হয়ত ট্রেন থেকে নেমে আসছে এতক্ষণ। পথটাও তো কম নয়। সাত মিনিট লাগবে বৈকি!

আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আবার। আচ্ছা ললিতারা কি করছে এখন। ইন্টারভ্যালে বাইরে এসেছে, না তো, সিনেমা ভাঙার সময় হয়ে এল যে! সাড়ে চারটায় তো ভাঙবে। ওরা বেরিয়ে আসবে আর তারা ঢুকবে। নিশ্চয়ই দেখা হবে ললিতা কাঞ্জরীর সঙ্গে। চেয়ে থাকবে তার দিকে হাঁ করে। ভালই হবে। বরং একটু আগে আগেই যাবে তারা।

নাঃ! সুভাষের কি যে হোলো! চারটে দশ। ইস, কখন বেরবে বাড়ি থেকে। আর যে সময় নেই বেশী।

জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে কল্যাণী। দেখা যায় কিনা সুভাষকে। কোথায়? কোন মানুষজনের চিহ্নও নেই পথে!

তাই কি হয়! সে যাবার সময়ও বলে গিয়েছে বার বারঃ তৈরী থেকো! জামা-কাপড় পরে রেডি হয়ে থাকবে কিন্তু। আমি বাড়ি ফেরার পর যেন দেরী না হয়।

—ললিতাদের বলে আসব যে তাদের সঙ্গে যাব না আমি!

—হ্যাঁ!

—ঠিক তো!

—হ্যাঁগো হ্যাঁ! তোমার কাছে বেশিক বলতে পারি।

না, আসবে ঠিকই কিন্তু—এত দেরী করছে কেন? সাড়ে চারটে যে বাজে! কখন যাবে তারা! পাঁচটায় শো আরম্ভ!

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় কল্যাণী। কই কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না। কি হোলো! ট্রেন লেট! না অফিস থেকে বেরুতেই পারেনি। ছেলেটার অসুখের সময়ও এই রকম হয়েছিল একদিন। কারেকসান হ্যান্ড নাকি বসে। এক ফর্মা ফাইন্যাল প্রুফ না দেখে দিলেই নয়। আজও কি তাই নাকি!

এবারে ভাবনায় পড়ে কল্যাণী। একবার ঘর আর একবার রাস্তা। ঘড়ি দেখতে হয়। ওমা! এ যে চারটে পঁয়ত্রিশ।

সর্বনাশ! কি হবে! যদি না আসে। হাঁপিয়ে পড়ে কল্যাণীর। তা হয় না। আসবেই! আচ্ছা যদি এখন আসে। চলে যাবে তারা। পাঁচ মিনিটের পথ। সে তো তৈরী।

আবার ঘরে আসে। চারটে পঞ্চাশ। সত্যিই এলো না সুভাষ। রাগে আর দুঃখে ছটফট করে কল্যাণী। কান্না পায়।

ঘড়িটা নিঃশব্দে টিক-টিক করে বেজে চলে। রাগ হয় ঘড়িটার ওপরে। যেন বিদ্রূপ করছে তাকে টিক-টিক শব্দে।

বাচ্চাটাকে বিছানায় নামিয়ে দেয়। তারপর জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে দৃষ্টি চালিয়ে দেয় রাস্তার শেষ বিন্দু পর্যন্ত। না, দেখা যায় না কাউকে।

—বা-বা-বা-বা! বিছানায় বসে খোকা খেলা করে আপন মনে।

কল্যাণীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে খোকনের ওপর। ওর সুন্দর নরম গালে বসিয়ে দেয় একটা চড়। বা-বা! কোথায় তোর বাবা! যেমন হতচ্ছাড়া ছেলে তেমনি তার বাপ।

চীৎকার শুরু করে খোকন আচমকা চড় খেয়ে। সহ্য করতে পারে না কল্যাণী ওই কান্না। ছুটে বাইরে এসে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় আবার।

—আসছেন বাবু।

আনন্দে লাফিয়ে উঠে কোনায় নিজেকেই [illegible] ছুটে।

ছুটে ঘরে এসে বুকে তুলে নেয় খোকনকে। আনন্দ আর আবেগে তাকে পিষে মারতে চায় যেন। অস্থির করে তোলে শিশুকে আদর সোহাগে।

আসছে রে খোকন! তোর বাবা আসছে। সিনেমায় যাব আমরা! কি সুন্দর ছবি দেখবি'খন।

বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাইরে আসতেই দুজনে মুখোমুখি। মৃদু হেসে অভ্যর্থনা জানায় কল্যাণী—এত দেরি করলে যে।

—নানান জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে দেরি হয়ে গেল।

—কেন? আমি সেই কখন থেকে ঘর-বার করছি! তুমি আসই না! উঃ! কি রাগ যে হয়েছিল তোমার ওপর।

ঘরে ঢুকে যেন বিছানার ওপর এলিয়ে পড়তে চায় সুভাষ।

—ওকি! চল তাড়াতাড়ি! আর সময় আছে নাকি। টিকিট পেলে হয়!

উঠতে হয় সুভাষকে বিছানা ছেড়ে। বুক পকেট থেকে টিকিট দুটো তুলে ধরে ওর সুমুখে।

কল্যাণী খুশিতে ডগমগ হয়ে বলে—সেইজন্যে বুঝি এত দেরী!

—হ্যাঁ! টিকিটের জন্যে যে কত জায়গায় ঘুরেছি হেঁটে হেঁটে হয়রান। শেষে অনেক কষ্টে মিলল। উঃ সমস্ত দুপুরে রোদে যা ঘুরতে হয়েছে আজ!

কল্যাণী তৎক্ষণাৎ পাউডারের তুলিটো বুলিয়ে নিয়েছে মুখে।

—হোলো তোমার! ওমা! বিশ্রাম না করেই চক-চক জল খাচ্ছ কেন?

ওই! খুকুকে কিন্তু তুমি মেরে বসেছ!

খোকনকে কোলে নিয়ে সুভাষ পিছনে। আগে আগে কল্যাণী। ছোট্ট খুকীটির মত এক দৌড়ে সে পৌঁছে যেতে চায় সিনেমায়। কি জানি শুরু হয়ে গেল নাকি! ললিতাদের সঙ্গে দেখা হলে বেশ হোতো।

বার বার দাঁড়াতে হয় কল্যাণীকে। কেবলই পিছিয়ে পড়ছে সুভাষ। কিছু দূর গিয়ে যখনই পিছন ফিরে চায় [illegible] সুভাষের গতি ধীর, মন্থর!

—কি হোলো! হাঁটতে পারছ না [illegible]! ওকে আমার কাছে দাও।

খোকনকে কোলে নিতে গিয়ে হঠাৎ সুভাষের ছোঁয়া লাগতেই চমকে ওঠে কল্যাণী—একি!

—কি! সুভাষ বোকার মত চেয়ে থাকে ওর দিকে!

—দেখি তোমার গা! রাস্তাতেই মাথায় ওর কপালে হাত দিয়ে বলে—উঃ! জ্বরে গা যে পুড়ে যাচ্ছে তোমার! হাত রাখা যায় না এত গরম! চল, এখানে না। কল্যাণীর মুখ শুকিয়ে পাংশু।

ওদের দেখেই পিছনে পিছনে আসছিল রিক্সাওয়ালাটা।

—এই রিক্সা! বলে হাত নেড়ে কল্যাণী থামালো [illegible]।

—[illegible] এসেই তো গিয়েছি সিনেমা হলে! [illegible] সুভাষ পকেটে হাত দেয়।

জোর করে সুভাষকে রিক্সায় চাপিয়ে নিজেও তার পাশে বসে পড়ে কল্যাণী!

—চল! গোলগড় কলোনী! বাড়ির ঠিকানাটা বলে দেয় কল্যাণী রিক্সাওয়ালাকে।

সুভাষ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে কল্যাণীর মুখের দিকে। হঠাৎ মনে হলো ওকে এত সুন্দর বোধহয় আজ সকালেও দেখেনি। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু আর যেন অতো কষ্ট হচ্ছে না।

বুবু ও মালা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

রবিবার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু বিশ্রামের আশায় চোখ বুজে শুয়েছিলাম। পাছে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে তাই ছেলে-মেয়েদের পাশের ঘরে সরিয়ে দিয়েছেন স্ত্রী। পারেননি শুধু কনিষ্ঠা কন্যা বুবুকে। টের পেলাম তার উপস্থিতিতে।

পাখার গতি সামান্য একটু বাড়িয়ে দিয়ে নিঃশব্দে মেঝেতেই নিজের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। চোখ বুজে থাকলেও তার এই সন্তর্পণ গতিবিধি আমি অনুভব করলাম। বুবুও তার মার পাশে রয়েছে।

মার পাশে শুতে প্রবল আপত্তি জানিয়ে মৃদু কণ্ঠে সে বলল, সত্যি বলছি মা আমি একটুও গোলমাল করবো না—চুপ চুপ ক'রে শুধু পুতুল খেলবো।

সংক্ষিপ্ত নিষেধাজ্ঞা আমার কানে এল, না—

তাহলে তুমি আমার মালার গল্পটা শোন...

বিরক্ত করো না। চুপ ক'রে ঘুমোও—স্ত্রীর কণ্ঠে চাপা রোষ।

তবুও বুবু চুপ করতে পারে না। বলে, পুতুল খেলতেও দেবে না গল্পও শুনবে না?

না—

আমার ঘুম পাচ্ছে না যে......

তুমি একটি মিথ্যেবাদী রাখাল।

সত্যি বলছি মা একদম ঘুম পাচ্ছে না। বুবু কাতর কণ্ঠে বলে।

দুষ্টুমী ক'রো না বুবু। শুলেই তোমার ঘুম পাবে।

তাহ'লে ছোটর কেন ঘুম পায় না?

স্ত্রী রাগ করে বলেন, খুব পাকামো হচ্ছে—বলবো তোমার বাবাকে?

খানিক কান্নুর মধ্যেই কোন কথা নেই। সম্ভবত বুবু একটু ভয় পেয়ে থাকবে। আমি তেমনি নিঃশব্দে চোখ বুজে মা-মেয়ের কথা শুনছিলাম।

মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানে বুবু পুনরায় মুখর হ'য়ে উঠল। বলল, বাবা তো এখন ঘুমুচ্ছে। নালিশ ক'রবে কেমন করে?

ডাকবো দেখবি? স্ত্রী বলেন।

এটা যে নিছক ভয় দেখান তা সম্ভবত বুবু জানে, তাই নিরীহ গলায় বলে, বাবার ঘুম ভাঙালে কিন্তু বড্ড রাগ করবে মা।

গত সপ্তাহে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় সত্যিই আমি রাগ করেছিলাম। ওদের কথোপকথন বেশ উপভোগ করছিলাম। বাধা দিয়ে গতিরোধ করলাম না। কিন্তু গতি আপনিই রুদ্ধ হল।

স্ত্রী বললেন, তোমার সঙ্গে আমি আর বক বক ক'রতে পারি না। যা খুশী করো। বাবা উঠে মারধোর করলে কিন্তু আমি একটি কথাও বলবো না।

বুবু আর, বাক্য ব্যয় না ক'রে শুয়ে পড়েছে। টের পেলাম স্ত্রীর কথায়। তিনি বললেন, এই তো আমার সোনা মা। এই জন্যেই তোমাকে এতো ভালবাসি।

কিন্তু এই ভালবাসার সম্পূর্ণ মর্যাদা বুবু দিল না। মার ঘুমিয়ে পড়ার সুযোগ সে নিল। ধীরে সুস্থে সে তার সংসার গুছিয়ে নিয়েছে। আড় চোখে আমি একবার দেখে নিলাম। ইতি-মধ্যে কখন এক সময় ছোটও এসে জুটেছে। ছোট আমার সর্বকনিষ্ঠা নয়। বুবুর চেয়ে সে বছর চারেকের বড়। যদিও বুবু তাকে বড়র মর্যাদা দেয় না। নাম ধরেই ডাকে। মাঝে মাঝে শাসন করতেও দেখা যায়।

বুবু বলছিল, চুপ ক'রে বসে আছিস কেন? তুই আমার সঙ্গে খেলবিনে ছোট?

ছোট আপত্তি জানিয়ে বলে, দেখতে পাচ্ছিসনে বাবা ঘুমুচ্ছে—মা ঘুমুচ্ছে?

আমরা তো আর গোলমাল করছিনে। চুপি চুপি খেলবো। বুবু জবাবে বলে।

তথাপি ছোট রাজি হয় না।

বুবু অনুনয় করে বলে, লক্ষ্মী ভাই ছোট। ছোট জবাব দেয় না।

বুবু ক্ষুব্ধ গলায় বলে, তাহলে ভাই মালার গল্পটা শুনবি?

ছোটর জবাবটা আমার কানে গেল না বটে, কিন্তু বুবুর কণ্ঠে খই ফুটতে সুরু করেছে। জানিস ভাই ছোট মালা এতটুকু মেয়ে হলে কি হবে, দুষ্টুমীতে বড়দের হার মানিয়ে দেয়। মার কথা দাদার কথা গ্রাহ্যই করে না। একটু যা ভয় করে বাবাকে। বাবা কিছু বলে না তো। কিন্তু রেগে গেলে......ওরে বাবা......একেবারে কেটে দু-টুকরো। মা যদি তাকে পড়াশুনো করতে বলে মালা শেলেট পেন্সিল নিয়ে খালি ছবি আঁকে। ছবি মালা ভালই আঁকে, কিন্তু দাদা বলে, কাকের ছানা হ'য়েছে। ছাই এঁকেছো। আর মা বলে বকের ছানা হয়েছে। বাবা বলে, ওরা কিছু বোঝে না। তুমি তো ভালই এঁকেছো মা মণি। দিব্বি দুর্গা ঠাকুরের ছবি হয়েছে। কেমন সুন্দর মাথায় মুকুট আর পটল চেরা চোখ হয়েছে। ঠোঁট দুটোই যা রসগোল্লার মত হয়েছে। তারপরে হেসে বলে, চেষ্টা ক'রতে করতেই ঠিক হবে।

মালার বাবা কিন্তু ঠিক কথাই বলে, না ভাই ছোট?

ছোট ফিস ফিস করে বলে, আমি জানি না ভাই।

আমি কিন্তু মনে মনে একটু চমকে উঠলাম—মালার বাবার মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করে।

বুবু পুনরায় বকতে সুরু করে, এক বছর হতে খাড়া হয়েছে আর একটুও কি লিখতে পড়তে শিখল। দিন-রাত খালি চক দিয়ে ছবি আঁকা। মালার মা কতো যে বকাবকি করে—গ্রাহ্যই নেই। সকাল হতেই খালি খেলা আর খেলা। আমি তো তবু 'অ, আ' পড়তে পারি। কেউ লিখে দিলে বোলাতেও পারি। এক দুই করে অনেকখানি পড়তেও পারি। মা-বাবার কথাও শুনি। মালার আবার এ সব ভাল লাগে না। লাগবে কেন ভাই—ওর তো আর মা-বাবার কথা শুনতে ভাল লাগে না।

যে চিন্তাটা খানিক আগে মনের মধ্যে উঁকি দিয়েছিল আবার তা পথ হারাল। কিন্তু মালার গল্প শুনতে আমি উদগ্রীব হ'য়ে রইলাম।

বুবু তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলে চলল, মা যদি বলে আজ চান করো না মালা—মালার অমনি মাথা নাড়ে। মার পিছু পিছু ঘুরঘুর করে আর বলে, শুধু আজকের দিনটি চান করতে

দাও মা—কাল ঠিক তোমার কথা শুনবো। কাল যখন হলো তখন আবার মালার পড়া ছেড়ে পুতুল খেলার কথা মনে হয়। মা যে কাজটি করতে বলবে সেইটি ও কিছুতেই করবে না। একেবারে কাঁচা আম আর তেঁতুল খাওয়া ছাড়া। টক খেতে মালা ভীষণ ভালবাসে। মালার মা আবার কিছুতেই টক খেতে দেবে না। মালার টনসিল আছে কিনা! মালা কিন্তু তার মা ঘুমুলে চুপি চুপি তেঁতুল খায়। কি যে মেয়ে এই মালা। আচ্ছা ভাই ছোট মালার মা তো ওর ভালর জন্যেই তেঁতুল খেতে মানা করে—তবু ওকে তেঁতুল খেতেই হবে? তেঁতুল নিতে গিয়ে মা সবই বুঝতে পারে। মালা ততক্ষণ খাটের তলায়। মা তাকে টেনে বার করে ঘা কতক বসিয়ে দিয়ে বলে, আসুক তোমার বাবা। আর তোমাকে বাড়ীতে রাখা হবে না। এবারে সোজা বোর্ডিং-এ পাঠানো হবে। বোর্ডিং-এ মা অনেকদিনই পাঠাতে চেয়েছে, কিন্তু পাঠায় না। মালা জানে, মা শুধু ভয় দেখায় কিন্তু বাবাকে তেঁতুল খাওয়ার কথা জানতে দিতেই ওর আপত্তি। মালা কেঁদে কেঁদে বলে, আর কক্ষনো খাব না মা তুমি দেখে নিও। সত্যি বলছি মা আর একদিনও খাব না।

মালার বাবা অফিস থেকে ফিরে আসতে মালা সেদিনে আর সাহস করে সিঁড়ি পর্যন্ত ছুটে গেল না। কি জানি তার মা যদি সত্যি সত্যিই বাবাকে নালিশ করে দেয়। ভয়ে ভয়ে মালা লুকিয়ে বেড়াতে লাগল। মালার বাবা তো আর সব কথা জানে না, তাই মাকে জিজ্ঞেস করে, আমার মালা সোনা কোথায় গেল? মালার মা বলে, আছে নিশ্চয় কোথাও। মা আসল কথাটি একবারও বলল না। মালার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। গুটি গুটি এগিয়ে এসে সে তার বাবার পাশে দাঁড়াল। মুখে ভয় দেখালে কি হবে—মা তো আর মালাকে কম ভালবাসে না? তাই না ছোট?

ছোট নিরুত্তর।

বুবু বলতে থাকে, মালা সব বোঝে। আমাকে বলেছে শুধু দুষ্টুমী করবার সময় সব কথা ভুলে যায়। তাই তো আর কক্ষনো করবো না বলেও আবার সেই কাজটিই করে। এই দেখ না ভাই মালার মা কতোদিন ওকে শাড়ী পরে দৌড়োদৌড়ি করতে নিষেধ করেছে, ও কি সে কথা কানে তোলে? মা ঘুমিয়ে পড়তে সেদিনে কি করেছিল জানিস? মালাকে তার জন্মদিনে মেজমার দেওয়া শাড়ীটা পরে মালার দিদির সুটকেস খুলে নেল পালিশ, লিপষ্টিক পাউডার আর কুমকুম আর কাজল নিয়ে সেকি সাজবার ঘটা! শুধু কি তাই—এর পরে দিদির ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে যেই না দিদির মত করে হাঁটতে যাবে আর কাপড়ে পা জড়িয়ে একেবারে মার ঘাড়ের উপর—

বুবু খুক খুক করে হেসে উঠলো। কিন্তু মুহূর্তেই সামলে নিয়ে, আবার বলতে লাগল, কি কাণ্ড.....কি কাণ্ড.....মালার মা একটুও মারধোর করলে না। মেয়ের কাণ্ড দেখে হেসে খুন। এ আবার কি রে বাবা! মা উঠে বসে একটা আয়না নিয়ে এসে ওর মুখের কাছে ধরল। বলল, চেয়ে দেখ কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। মার না খেয়েও মালা সেদিনে কেঁদে ভাসাল। কুমকুম, পাউডার আর কাজল আর চোখের জলে.....ছোট হি-হি করে হেসে উঠল। সেই সঙ্গে বুবুও। তারপরেই আবার শুরু করল, মা তাকে সেদিনে খুব আদর করেছিল। কাছে বসিয়ে পিঠে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিল, যখন তুমি বড় হবে আমি নিজেই তোমাকে শাড়ী আর ব্লাউজ কিনে দেবো। কেউ তোমাকে শাড়ী পরতে বারণ করবে না। কি ভাগ্যিস কাপড়ে পা জড়িয়ে আমার গায়ের উপর পড়েছো! এই যদি সিঁড়ি থেকে পড়তে কি হতো বলো দেখি? মা নিজে যে ব্যথা পেয়েছে তা একবারও বললে না। অন্য কোথাও পড়ে গেলে কি হতো সেই কথাই বার বার বলতে লাগল। তারপর কত যত্ন করে মুখের কালি-ঝুলি, কুমকুম আর পাউডার পরিষ্কার করে দিয়ে আবার মুখের কাছে আয়না ধরে বলল, চেয়ে দেখতো এখন তোকে দেখতে ভাল লাগছে না তখন ভাল দেখাচ্ছিল। মালার মুখে আর রা নেই। মালার সেদিনে তার মাকে যে কি

ভালই না লেগেছিল। ওর মুখে আর কথা নেই। আর কোনদিন মার কথার অবাধ্য হবে না মনে মনে ঠিক করে নিলে। কিন্তু ঠিক করলে কি হবে? মা বকাবকি করলেই ওর মাথার মধ্যে একটা পাগলা ভূত ঢুকে পড়ে আর কানে কানে বলে, মার কথা শুনতে নেই মাল।

বুবু থামল। পরিশ্রান্ত হয়েছে এতক্ষণ অনর্গল কথা বলে। চোখ বুজে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ওর গল্প শুনছিলাম। এই ক্ষণিক বিরতির অবকাশে আমার মনে নানা প্রশ্ন আনাগোনা করতে থাকে। বুবুর মালার কথা কি শুধু মালারই কথা ....চিন্তায় বাধা পড়ল। ছোট সম্ভবতঃ অবিশ্বাসের হাসি হেসেছিল। বুবুর নিশ্চয়ই তা ভাল লাগেনি। সে প্রবল আপত্তি জানাল, বলল, তুই হাসছিস? কিন্তু মালা নিজে আমাকে এ সব কথা বলেছে তা জানিস? ঐ দুষ্টু ভূতটাই যত নষ্টের গোড়া নইলে মালা তো আর সত্যি সত্যিই খারাপ মেয়ে নয়। সে মার কথা শুনতে চায়। লক্ষ্মীসোনা হয়ে পড়াশুনোও করতে চায়। আর ঐ ভূতটাই সব গণ্ডগোল ক'রে দেয়।

এতক্ষণ পরে ছোটর কণ্ঠস্বর কানে এল, ভূতটা তো আর ছবি আঁকে না—

বুবুর গলায় প্রতিবাদ, আঁকে আঁকে তুই জানিস না। মালা নিজে আমাকে বলেছে। ও যখুনি 'দ' লিখতে যায় তখুনি তার মাথা ব্যথা করে আর সঙ্গে সঙ্গে শুন্য দেখতে আসে—

ছোট বাধা দেয়, ও পচা গল্প সবাই জানে।

বুবু কাতর কণ্ঠে জবাব দেয়, তা আমি আর কি করবো ভাই। মালা যেমন বলেছে আমি তাই তো তোকে বললাম।

ছোট বলে, ভূত না ছাই। সব মালার দুষ্টুমী। লিখতে বসলেই ও 'দ' লেখে কেন? আর বুঝি কিছু লিখবার নেই?

বুবু বিজ্ঞের ন্যায় সায় দিয়ে বলে, আমিও সেই কথাই বলেছি ভাই। মালা বলে সে কি আর ইচ্ছে করে 'দ' লেখে। ভূতটাই ওকে দিয়ে লেখায়।

ছোট বলে, আমার মত তোর মালা মানুষের ছবি আঁকে না কেন? অবিশ্যি মানুষ আঁকা অত সোজা না। তবে চেষ্টা ক'রে দেখতে তো পারে!

হঠাৎ বুবু খুক-খুক করে হেসে ওঠে। বলে, ওমা সে খবর বুঝি তুই জানিস নে? মালা তো আগে মানুষই আঁকতো, কিন্তু মানুষের মুখগুলো সব ভূতের মুখ হয়ে যেতো। চোখগুলো গোল গোল, আর ইয়া মোটা গোঁফ। নিজের ছবি দেখে মালা নিজেই ভয় পেয়ে আর মানুষ আঁকে না। কি বোকা রে বাবা ছবি কখনও ভূত হয় নাকি? তবু মা কত বুঝিয়েছে তাও কি ভয় গেল।......

ছোট বলল, ভয় না ছাই।

বুবু রাগ করে জবাব দিল, সব কথায় তুই বড় টিক-টিক করিস ছোট। আমি নিজে মালার বুকে হাত দিয়ে দেখেছি। কি ভীষণ যে ধুক-ধুক করে—

ছোট তবুও চুপ করতে পারে না। বলে, সেদিনে যখন মালার গল্প করেছিলি তখন তো কই এ সব কথা বলিসনি?

বুবু নরম সুরে বলল, আমি ছোট মানুষ কি অত গুছিয়ে বলতে পারি ভাই। তোর মত বড় তো আর আমি নই?

অকাট্য যুক্তি। ছোটকে হার মানতে হয়। বলে, তা বটে।

বুবু অকস্মাৎ প্রসঙ্গ পাল্টাল। বলল, শুধু নিজের আঁকা ছবি নয়, তেলাপোকাকে ওর আরও ভয়—

তেলাপোকা.....এত ভয় পায় তেলা-পোকাকে! ছোট বলে।

বুবু বলে, ওর মা কি বলে জানিস? তেলাপোকা পুষবে। তেলাপোকা আবার কেউ পোষে নাকি? এ কি পাখী? মালার মা তবুও পুষবে। আর মালা কথা না শুনলে গায় ছেড়ে দেবে। এ আবার কেমন শাস্তি দেওয়া ভাই? ভাল করে বুঝিয়ে বললেই তো মালা কথা শোনে—

ছোট নিস্তেজ গলায় বলে, তেলাপোকাকে এতো ভয়—তেলাপোকাই তো মানুষকে ভয় করে—

কি জানি ভাই ...মালা বলে, ওর ঠ্যাং-গুলো যা বিশ্রী ... যদি একবার গায়.....ওকি ভাই তুই অমন করছিস কেন ছোট...

ছোট ভয়ে চুপসে গিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাকাত পড়া চিৎকার আর সেই সঙ্গে স্ত্রীর বেদনার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে উঠলো, উঃ গেছিরে গেছি...

এক মুহূর্তে ঘরের পরিবেশ পাল্টে গেল। সোজা হয়ে উঠে বসে বলি, হলো কি তোমাদের?

ছোট কাঁদিয়ে উঠল, তেলাপোকা—

স্ত্রী বললেন। আমার হাটুর মালাই চাকি—

আর বুবু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মত ঠক ঠক করে কাঁপছে। একটি মাত্র তেলাপোকার অসীম শক্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। রীতিমত বিপর্যয়!

স্ত্রী এতক্ষণে সামলে নিয়ে গর্জে উঠেছেন, হতভাগা মেয়ে এই তোমার ঘুমানো—তোমার হাড় মাংস যদি না আমি—কথাটা তিনি শেষ করেন না।

বুবু বর্ণিত মালার গল্পটা ধীরে ধীরে আবার নতুন করে আমার মনের পর্দায় ফুটে উঠল। একটির পর একটি দৃশ্য সরে যেতে যেতে একস্থানে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল। মালার মার মমতাময়ী ধৈর্যশীলা মূর্তিটি কিছুতেই মন থেকে সরে যেতে চাইছে না। কিন্তু কে এই মালা? আমার বুবুরই ছায়া, না তার আসল রূপ?

এক প্রেমিকের মন

কালিদাস দত্ত

“এইবার তোমাকে আমি ভালোবাসব, মনোরমা”—মন্ত্রোচ্চারণের মত স্মৃতিময় মনে মনে আবৃত্তি করল। খোলা জানলা দিয়ে ঘন তমসাবৃত আকাশে একটি মাত্র নক্ষত্র দেখা যাচ্ছিল। বাতাস ছিল না। বৈশাখী কৃষ্ণ চতুর্দশীর মধ্য রাত্রে ঘাম, দুঃসহ উষ্ণতা, ক্লান্তির মধ্যে স্মৃতিময় তার মাটকোঠার খুপরিতে আচ্ছন্নের মত শুয়ে ছটফট করছিল।

ছুটে তার বাইরে যেতে ইচ্ছে করছিল কিছুদিন পূর্বে যে কোন এক মনোরম সন্ধ্যাকে সবলে টেনে নিজের আয়ত্তের মধ্যে এই ক্লান্তিকর মুহূর্তে নিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু অসম্ভব, যা যায় তা চিরতরে যায়। কিছু থাকে না, অপরিবর্তিত কিছুই থাকে না। সব কিছু ক্ষণস্থায়িত্বের স্মৃতি আর বেদনা তাকে এই মুহূর্তে জীর্ণ, ভঙ্গুর, সহস্র খণ্ডে বিচূর্ণ করে দিতে চাইছিল। বাইরে রাত্রির সমুদ্রের মত অন্ধকার। “এই ঘরে আমি স্বেচ্ছাবন্দী। এই জীবন আমার বন্দিত্বের প্রাচীর। একে লঙ্ঘন করা যায় না। এই যন্ত্রণা আমার অর্জিত। এই বন্দিত্বের কংস-কারাগার শেষ হবে, আর কিছু পরে, কটা বাজে এখন ঈশ্বর জানেন, ভোরের স্বর্ণরশ্মিধারায় আমার মুক্তি-স্নান হবে।”

স্মৃতিময় ডান পাশে কাত হয়ে শুয়েছিল। এখন কাটা মাছের মত ছটফট করে উপুড় হল। বালিশে মুখ গুঁজে আবার সে বিড়বিড় করতে থাকল। বোধ হয়, দুঃস্বপ্ন দেখছে, কিম্বা নিশিতে ধরেছে।

“এইবার তোমাকে আমি ভালোবাসব, মনোরমা। এইবার, এতদিন পরে, যখন তুমি আমার সমস্ত সান্নিধ্যের সীমানা ছাড়িয়ে—দৃষ্টিলোক আর প্রাপ্তিলোকের ওপারে, অন্য কোনো ঘরে, অন্য কোনো দ্বিতীয় নয়নের মণিকোঠায়। তোমার সেই সযত্নে সাজানো মণিঘরে আমি কোনো দিন যাবো না, কেননা। স্মৃতির সিংহাসনে তুমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত বন্দী।”

এতদিন পরে আজ নিঃসংকোচ স্বীকারোক্তির আগে করজোড়ে শুধু একটি প্রার্থনা করব, “আমাকে মার্জনা করো।”

মাতৃগর্ভে আমি দশ মাস নারীসঙ্গ পেয়েছি। তুমি জানো, তোমাকে পেয়েছি তার থেকে বেশী, শ্রদ্ধা দিয়েছি বেশী, মান্য করেছি অনুগত সেবকের নম্রতায়, কিন্তু ভালোবাসিনি। এইবার ভালোবাসব। ভেবো না, এ আমার অতৃপ্ত কোন মাতৃস্নেহ-কামনার দুর্মর অন্বেষণ। এ যৌবনের অজেয় অহমিকা যা বসুন্ধরাকে করতলগত আমলকী জ্ঞানে লোফালুফি করে গোবর্ধন গিরি আঙুলে নাচায়, সিসিফাসের মত ভূলুণ্ঠিত পর্বতশীর্ষ ঠেলে চূড়ায় তুলতে ক্লান্তিবিহীন সেই যৌবনের অহমিকাতেই আমি হাসতে পেরেছিলুম। বলেছিলুম, “তোমাকে মুক্তি দিলাম।”

তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি স্মৃতির শৃঙ্খল স্বীকার করেছি। সে-ও আমার স্বেচ্ছানির্বাসিতত্বের যুবজনোচিত অহমিকা। এইবার আমি সিসিফাসের মত অনন্ত যুগ তোমাকে আমার ভালোবাসার শীর্ষে তুলতে চাইব। উষ্ণতা, ঘাম, ক্লান্তি যত আমাকে কশাঘাত করবে, ততই আমি অট্টহাস্য করব, বলব, “আমি স্বেচ্ছায়, আমার ঐকান্তিক স্বাধীন ইচ্ছায়, ছিন্নমস্তা হয়েছি, এবার ছিন্ন শির ভালোবাসার রক্তাক্ত কাণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করব।”

বলতো, কেন আমি এমন করি?

ভয় পেয়ো না। আমি বেশ সুস্থই আছি। মাথার কিছুমাত্র গোলযোগের লক্ষণ নেই, অর্থাৎ এখন পর্যন্ত নেই। ভাবিতব্য কেউ কি বলতে পারে? বিকার? না, তা-ও নয়। ও সব আমি ছুঁই না, অর্থাৎ এখনও ছুঁই না। বোধ করি, প্রয়োজন কোনদিন পড়বে না, কেন না, মাতাল নায়কের যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি। আমি ইচ্ছার নই, ইচ্ছাই এখন আমার প্র-অনুগত।

তোমাকে আমি অনেক কথা বলেছি। যা বলিনি এবার বলব। মনে করে দ্যাখো, আমাদের সেই ঘোরাঘুরি, সেই গোধূলির গঙ্গা, হু হু বাতাসময় নির্জন রাত্রির তমসাবৃত ময়দান, সেই কাফে, রেস্তোরাঁ, ফিটন—ছোট ট্যাক্সিগুলো তখনও মাতৃজঠরে, না? মনে করে দ্যাখো, কত উদ্বেগ, ব্যস্ততা, ঘড়ি দেখাদেখি। কী ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা, জনস্রোতের চৌমাথায় কী নিঃসীম একাকিত্ব! সব মনে করে দ্যাখো। আমরা একটি মুখমণ্ডলে পরস্পর মিলনাভিলাষী দুটি আয়ত চোখের মত ছিলাম, কে যেন অপারেশন করে দুই সুরক্ষিত আঁখি-ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছে। আমরাই অনুমতি দিয়েছিলাম, তাই না?

কেন দিয়েছিলাম, বলো তো?

না, তুমি জানো না। শুধু আমি জানি। প্রকৃত কারণ একমাত্র আমি জানি। দাঁড়াও, বলছি। সবই তো বলব। সব বলার জন্যেই তো এই অসংকোচ জবানবন্দী।

মনে আছে, তুমি প্রায়ই আমাকে একটি বিশেষণে সবিশেষ করতে? অবশ্যই পরিহাস এবং জানো, শুনতে আমার কী শিহরিত সুখই না হত। মনে মনে উপভোগ করতুম সমারোহে প্রকাশ না পায়। তুমি আমার উন্মুখ মুখতল দুই করতলে ঠেলে বলতে, “কদাকার”।

তোমার সেই চকিত চোখের শিহরণ আমার স্মৃতির বন্দিশালায় শৃঙ্খলিত করে রেখেছি। সেই অনাস্বাদিতপূর্ব সুখানুভূতির অতলে তবু আমার ক্ষীণ এক ব্যথা, গলার অনেক নিচে সূক্ষ্ম এক কাঁটার মত খোঁচা দিত। হায়, সরল বালিকা, তুমি যদি বুঝতে! প্রেমের রসাতলে ডুবেও রূপহীনকে ‘কদাকার’ কেউ কি বলে? অবশ্য এ-ও ঠিক, রূপ চোখের মণিতে নয়, মনের স্ফটিকে তার উদ্ভাসন। সেই উদ্ভাসিত রূপে বুঝি তুমি মুগ্ধ ছিলে, তাই অত সহজেই উচ্চারণ করতে, “কদাকার”।

অথচ, মনে করে দ্যাখো, তোমাকে আমি সুন্দর বলতাম। বলতাম, “এমন সৌন্দর্য দেখিনি জীবনে।” তোমার ঐ অসুন্দর শরীর, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ সবই তো আমার পরিচিত। আমি যত দেখেছি, ততই বিস্ময় দেখিয়েছি। যত হাতে পেয়েছি, তত হাত সরিয়েছি। আমার যৌবন অজেয়কে জয় করে, প্রণতিতে তার তৃপ্তি নেই। কোন নতিই তার পরিণতি নয়।

কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার সেই প্রশস্তিই তোমার সৌন্দর্যের রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়েছিল। শব্দ বুঝি-বা ব্রহ্ম। কোন শিকড়, জড়ি-বুটি, অঙ্গরাগ, খাদ্যপ্রাণ—কিছুই নয়, শুধু শব্দ, মনোরম মধুর প্রশস্তি—তাই-ই দিনে দিনে, তোমার জড়তা, জাড্য, অরুচি, অমার্জিতির স্তর, কলাগাছের বাকলের মত খুলে খুলে সরিয়ে, তোমার উজ্জ্বল, শুচিশুভ্র সৌন্দর্যের উন্ঘাটন করেছিল। আমি অবাক বিস্ময়ে দেখতুম আর ভাবতুম, গেরুয়া ধারণেই যদি পাষণ্ড নিবেদিত এই বিপুল অর্ঘ্য পায়, প্রকৃত সাধুর পূজা প্রাপ্তির পরিমাণ না জানি কত?

করজোড়ে মিনতি, আমাকে শঠ ভেবো না। আমি “মরা মরা” বলতে বলতে “রামে” পৌঁছেছিলাম। যে-খেলা আমার ছেলেখেলা ছিল, তাই শেষে কাল হল। আমি হেলায় সাপ খেলাতে গিয়ে কাল-বিষে জর্জরিত হলাম। তোমার মধ্যে মুহূর্তে একদিন আদি-অন্ত-হীন এই বিশ্ব চরাচরের সময়জ্ঞান-রহিত-কারী সৌন্দর্য দেখলুম। সেই আমি জীবনে প্রথম ভয় পেলুম। এ কী বিমোহনকারী সৌন্দর্য! প্রকৃত, না অন্তরলোকের কল্প-উদ্ভাসন? রূপ বস্তুতে, না ভাবলোকে? আমার জ্ঞান-বুদ্ধির

সিমলার ম্যালের ধারে কফি হাউসে শৈলশিখরিণীর দিকে চেয়ে গরম পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মামা আর ভাগনেতে বেশ একটা একটানা অন্তরঙ্গ জমাটি গল্পের আবহাওয়া জমে উঠেছিল। কাঁচঢাকা বারান্দার প্রান্ত থেকে দেখা যাচ্ছে বাইরে ঝিমঝিম বৃষ্টি, দমকে দমকে এক এক ঝলক হিমেল হাওয়াও ঢুকে পড়ছিল যাওয়া আসার পথের দরজা বন্ধ-খোলার রন্ধ্র দিয়ে। দূরে দিগন্তে শ্বেতপ্রহরীর দল অক্টোবরেই অক্টোপাসের মত রাজ্যবিস্তার সুরু করে দিয়েছে—অনাগত কনকনে দিনের কঙ্কণের কন্‌কন্‌ ধ্বনিও যেন শোনা যাচ্ছে, বলছে—তফাৎ যাও, ঝুটা মানুষের দল—এ হচ্ছে সাদার জ্যোতির্ময়তার দেশ।

মামা মানে শ্রীকৃষ্ণদাস চৌধুরী বা কেতাদুরস্ত কেষ্টসাহেব বহিরঙ্গে কালোবরণ হলেও গৌরভজন গৌরপুজন গৌরকান্তিমান পুরুষদের একান্ত বশম্বদ ছিলেন—সেকালের মানুষ, কিঞ্চিৎ পৈতৃক বিত্তলাভ হয়েছিল, তীর্থযাত্রা হিসাবে বিলেতে গিয়েছিলেন বারডিনারে বসেছিলেন, ফিরেছিলেন নিখুঁত সাহেব হয়ে, ইংরেজী বলতেন অক্সফোর্ডী ধাঁচে, হাঁচতেন কাশতেন, স্নাগ্‌ করতেন ওজন করে বণ্ডস্ট্রীট কায়দায়—তাঁর ডিনার জ্যাকেটের ওপর কালো 'বো' মরি মরি শিভালরীর কী শোভাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য এসব সে যুগেরই কথা যে যুগে আই সি এস হওয়া ছিল ত্রিঅক্ষরে প্রহ্লাদিনী লাভ, যখন ব্যারিস্টারী করা ছিল সমাজের আরিস্তক্রাতীর চিহ্ন, যখন যেন তেন প্রকারেণ একবার সাগর উল্লম্ফন করতে পারলেই সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত হত, "রূপসিনী ব্রিন্দনী নর্ডিশ নন্দিনী"রাও ভারতগগনে উদয় হতেন না যে তা নয়।

মামা আর ভাগনে মানে গাঁটছড়া বাঁধা কোন রক্ত সম্পর্ক না হলেও, তিনি ছিলেন ইউনিভারস্যাল মামা। চল্লিশ বছর ধরে সিমলা দিল্লী করেন—আজও আছেন—১৯৪৭ সালেরও পর, কারণ যাবার কোথাও স্থান নেই—পূর্ববঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি গেছে, কলকাতার "ডেমোস" তাঁর ধাতে হয় না—দিল্লীর উন্নাসিকতা তিনি বরদাস্ত করেন না, বোম্বের দোকানদারী তিনি পছন্দ করেন না। কেমন যেন এই রজত-গিরিনিভ দেশটাকে তিনি মনে প্রাণে পছন্দ করে ফেলেছিলেন—কেন তা ইতিহাস আমরা জানতাম না। শুধু সেকালের হোটেল সিসিলের গল্প বলতে বলতে কোথায় যেন একটা বিবাগী মৌনী তাপস বেরিয়ে পড়তো যেটা আমাদের আশ্চর্য করে দিতো। আজকের পরিবেশে তাঁকে খাপছাড়া লাগলেও, তাঁর ছেঁড়া পেন্টুলানের ক্রিজ নষ্ট হলেও, কালীবাড়ীর একটা ঘরে পড়ে থাকলেও মিঃ চৌধুরীর মুখে শুনতে ভালো লাগতো সিমলার অতীত গৌরব কাহিনী তার লাটবেলাটের গল্প। মামা, সুচরিতকে বললেন—ভাগনে, আজ যা ওয়েদার, তোমার কাফিতে শানাবে না, একটা রাম পাঞ্চ করে নিলে হতো—প্যারিস হলে বলতাম, সুন্দরীদের কটাক্ষের সঙ্গে একটা ফুলডোজ আবসাঁথ। কী যে তোমরা আজকাল গঙ্গাবারিণি কল্যাণকারিণী ধরেছো অথচ কথায় কথায় ডলগা পেরুচ্ছো, কিন্তু আসল জিনিষটা ধরতে পেরেছো ভড়কা—

মামা সেকালের যে ওল্ড ব্যাচেলার—সিমলের মহারাজ নবাব স্যার, গ্যাম্বাহাডদের

অটল রাজ্যে প্রায় ফাটল এনে দিল। অথচ, বুঝে দ্যাখো, এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি আছে, মধ্য আছে, অন্ত আছে। পঙ্কে পঙ্কজের মত বস্তুর মৃণালে সৌন্দর্যের অবস্থান, জলকণায় নির্ভর রামধনু প্রতিভাসিত সূর্যমাত্র।

এই রামধনু থাকবে না কালচক্রে জলকণার অবসানে, এই পঙ্কজ থাকবে না কালচক্রে পঙ্কের অবসানে, ওই বিমোহিনী সৌন্দর্য থাকবে না কালচক্রে দেহের বিবর্তনে। তখন হায়, পঙ্কজের বদলে পঙ্ককে ভালোবাসব কি করে, রামধনুর বদলে জলরাশিকে, সৌন্দর্যের বদলে লোলচর্মকে। শুধু আমি নই, তুমিও আর খুঁজে পাবে না। আমার মধ্যে সেই 'কদাকারকে' যে তোমায় আজ বিকশিত করে, মুগ্ধ করে, আনন্দিত করে। আমরা পরস্পরে পঙ্ক আঁকড়ে ক্রমশঃই পঙ্কিল, আরও পঙ্কিল, আরও পঙ্কিল হব।

সে দিন তোমাকে এ কথা বলিনি, মনোরমা। আজ বলছি।

সেই অভিশপ্তযুক্ত জীবনের চাইতে বরং এই কি ভালো নয়? বিদ্যুৎকে বন্দী করার মত তোমার সেই মুহূর্তস্থায়ী সৌন্দর্য আমার স্মৃতির সিংহাসনে আমৃত্যু বন্দী। আমি তাকে ভালোবাসব। জলকণা নয়, রামধনু। পঙ্ক নয়, পঙ্কজ। মনো, তুমি নও, তোমার প্রেমের দ্যুতি। মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে যা আমার আয়ু-শৃঙ্খলিত জীবনের সমস্ত তমসাকে চিরঅপসৃত করেছে।

আমি এই যন্ত্রণায় জর্জরিত হচ্ছিলুম আমাকে তুমি শঠ ভেবেছ বলে। এইবার এই জবানবন্দীর পর আমি নতুন মানুষ, যার মুখে শত আক্কাড়ে এবড়ো-খেবড়ো আলুর "ডল" পুতুলের স্মিত হাসি এখনও অম্লান।"

মাইল নেমে একটি ভাঙা বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালুম আমরা। ব্যাপার কী—পাহাড়িয়া বস্তী ঘরের ভিতর একটা অস্পষ্ট ছবি। পুরোনো পিয়ানোর সামনে ভাঙা টুলে বসে এক অতিক্রান্তযৌবনা উদাসিনী। চেহারায় মনে হয়—পাহাড়ী মেয়ে—কিন্তু রক্তের যে মিশ্রণ আছে তাও বোঝা যায়। এককালে ইনি যে সুরূপবতী ও সুগঠনা ছিলেন তার ছাপ এখনও দেহে লেগে। মামাকে দেখবামাত্র রেগে খন্ খন্ করে পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন—ইউ, ইউ, গেট্ আউট—রাস্কেল, বদমাইস। বুড়ো আবার এসেছো—আমার মেয়েকে নিয়ে এসো—আমার উমা মাকে, পূর্বে পার্বতীকে—মাই সোনিয়া, মাই সোনিয়া—

দেখি, মামার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। উত্তেজনায় মহিলাটি উঠে ওর মুখের সামনেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো। চেঁচামেচির শব্দে ঐ বস্তীরই একজন প্রৌঢ় এসে হাজির হলো, সেলাম করে বললে—হুজুর আমি জানতাম আজ আপনি আসবেন—আমি ফুল বাতি আনিয়ে রেখেছি, চলুন—

মামা শুধু বললেন—কী রকম আছে আজকাল, টাকা কড়ির কোন অসুবিধা নেই তো—

—সেই এক রকমই সাহেব, মাথার দোষ আর গেলোনা, কতো ডাক্তার দেখে ত হলো—সারাদিন করবে বক্ বক্—সন্ধ্যা হলেই—সোনিয়া, সোনিয়া, পার্বতী, পার্বতী—আর টাকাকড়ির অভাব আপনি ত কিছু রাখেননি—আর সাহেবও তো মারা যাবার আগে ব্যবস্থা করে গেছেন।

সে আমাদের আলো ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলো পাহাড়ের ধারে জঙ্গলের পারে একটি ছোট ঝরণার তলায়—তারই পাশে একটি ছোট্ট কবর। মামা বসলেন হাঁটু গেড়ে—ফুল বাতি দিয়ে তর্পণ করলেন এক অপরিচিতার উদ্দেশে, বললেন—রইলো এই বাতি, এই শুভ্রফুল আর এই চোখের জল—মা, তোর যাত্রার পথ আরো শুভ হোক।

সত্যি মনে হলো—এ কী হেঁয়ালির মাঝখানে পড়লাম—যেন সিনেমার ছবি দেখছি।

অনেকক্ষণ পরে মামা মুখ খুললেন বললেন নীরেন, সচরিত, কিছু বুঝলে—

না তো—উত্তর দিলো নীরেন।

ঐ যে মহিলাটিকে দেখলে উনি একজন পাহাড়ীয়া রমণী, খৃষ্টান মিশনরীদের স্কুলে পড়াতেন যৌবনে ছিলেন সুন্দরী। আর আমারই এক বন্ধু, সুইস এক্সপ্লোরার উঁকে বিয়ে করেছিল। তুষারমৌলী হিমালয় যেমন তাঁকে টেনেছিল তেমনি নগাধিরাজ দুহিতাও। সুখের সংসার স্বামীস্ত্রীর, কোথাও বেমানান নেই, অমিলও নেই। ফ্রাউ জিন, মাদামাজেল, ভিসিবাবাদের কাছে নগরের টান কাটিয়ে এই ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি সেই যে আস্তানা গাড়লেন আর ফিরলেন না। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে তিনি হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঘুরতেন সংগে বোটানিষ্ট ও জিওলজিষ্টও ছিলেন। ছোটখাটো মিউজিয়মও গড়ে তুলেছিলেন নিজের বাংলোতেও। সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে আলাপ। স্বামীস্ত্রী যেন কপোত-কপোতী—হংসমিথুন। ওদের একটি মেয়ে হলো—বাপ নাম রেখেছিল সোনিয়া, মা রেখেছিল পার্বতী—আমি ডাকতাম উমা বলে। দুষ্ট লোকে বলতো আমি নাকি ওদের ওখানে যেতুম মায়ের টানে—মা অবশ্য তখন পূর্ণ যুবতী, সুন্দরীও বটেই। আমায় টানতো কিন্তু মেয়ে—কি ফুটফুটে রং, টানা টানা চোখ—আধো আধো কথা ফুটতেই আমায় ডাকতো—হের আংকেল বলে। সেই মেয়েকে শিশুকাল থেকে বড়ো হতে দেখলুম, সে কিশোরী হলো—তারপর যখন তার বয়স তেরো—এই সাত বছর আগে হঠাৎ তার জ্বর হলো—বাপ তখন নাংগা পর্বতে উঠতে গেছে—সেও আর ফেরেনি—তার পর তিন দিনের দিন এমনি সন্ধ্যেতে মা আমার চোখ বুজলে। আমিই সব ব্যবস্থা করেছিলাম। মহিলার ধারণা যে সোনিয়াকে আমিই নিয়ে গেছি। আজকের দিনটিতেই সে মারা যায়। এই দিনটিতেই আমি আসি ওর স্মরণে ফুল দিতে। বন্ধুর ড্রেস সুট বেয়ে ঝর ঝর করে চোখের জল পড়তে লাগলো। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। বাতাসের বন্দনা মর্মরে কে যেন আস্তে আস্তে ডাকছে—সোনিয়া, মাই সোনিয়া।

মির্জা গালিবের প্রেমের কবিতা

মায়া গুপ্ত

উর্দু কাব্য সাহিত্যে মির্জা গালিবের নাম সম্ভবত সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। জীবনের দীর্ঘকাল ফারসীতে কাব্য রচনা করেছেন তিনি তবুও একথা সত্য।

১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে গালিবের জন্ম হয়, জন্মস্থান আগ্‌রা। জন্মস্থান আগ্‌রা বটে কিন্তু শৈশবের কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে বাকি পঞ্চাশ বছর তাঁর কেটেছে দিল্লীতে, তাঁর কলা সৃষ্টির ক্ষেত্র দিল্লী।

ছিলেন প্রথমে ফারসী ভাষার কবি এবং আমির খসরু ও ফৈজীকে ছাড়া দেশের আর কোন ফারসী কবিকে তিনি কবি বলে স্বীকার করতেন না, যদিও সে সময় ফারসী ভাষায় লেখাই ফ্যাশান ছিল এবং অনেক কবি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন ফারসী লিখে। মির্জা গালিব নিজেও স্বরচিত ফারসী কাব্যকে শ্রেষ্ঠতর বলে মনে করতেন। এ সম্বন্ধে তাঁর লেখা একটি ফারসী 'কতএ' (এক প্রকার কবিতা) লিখেছিলেন যার অনুবাদ এইরূপ :

—হে প্রতিদ্বন্দ্বী, আমায় বিচার করতে হলে আমার রচিত ফারসী কাব্যগুলিকেই বিচার কর, যাতে বহু বর্ণের সমাবেশ আছে। আমার উর্দু কাব্য নিয়ে আমায় বিচার কর না কারণ সেগুলো নেহাৎই বেরঙগা। সত্যই বলছি, কারণ সত্যকে অস্বীকার করা যায় না, সে যে আমার উর্দু কাব্য নিয়ে তোমাদের এত দহরম মহরম সেগুলো আমার পক্ষে লজ্জাকর।

মজার কথা এই যে, পঞ্চাশ বছর বয়সে মির্জা অনেকটা যুগের তাগিদে উর্দুতে কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর ফারসী রচনাশৈলী ছিল বেশ সহজ প্রাঞ্জল অথচ উর্দু লিখতে আরম্ভ করলেন মির্জা বেদিল-এর অনুকরণে ভয়ানক কঠিন শৈলীতে। সাধারণের পক্ষে প্রায় দুর্বোধ্য, এখনও তাঁর প্রথম দিকের উর্দু রচনাগুলিতে দন্তস্ফুট করতে পাঠক নাজেহাল হয়ে যান। আবার মজার কথা তাঁর উর্দু গদ্য-শৈলী মোটেই কঠিন দুর্বোধ্য নয়, আশ্চর্য মনে হয় দু রকম রচনা পাশাপাশি দেখলে। মির্জা গদ্য বা পত্রাদি লিখতেন অতি সহজ ও মনোরম ভাষায়, যার ছত্রে ছত্রে রসোচ্ছ্বাস ও কৌতুক। কোথাও দীর্ঘ ভূমিকা, কঠিন ভাষা, অতিশয়োক্তি, মিথ্যা প্রশংসা বা অস্বাভাবিকতা নেই, কথাবার্তা আলাপের ভাষায় লেখা, তা সমস্ত প্রাণময়তা ও কৌতুকে সমাচ্ছন্ন। ফলে তাঁর সমকালীন অনেক উর্দু লেখক ও কবি মির্জা গালিবের গদ্যের ভাষার অনুকরণ করতেন, তবে কৃতকার্য হতে পারেন নি। অবশ্য শেষের দিকের কবিতাগুলির ভাষাও কঠিন নয়, ক্রমে ক্রমে বেশ সহজ হয়ে এসেছে।

কঠিন ভাষা লেখার জন্য বারবার সমালোচনা করতে হয়েছে। তাই মির্জা লিখেছেন,

মুশকিল হ্যায় জবস কলাম মেরা আয় দিল
সুন সুন কে উসে সুখনবরানে কামিল
আসান কহনে কি করতে হ্যায় ফরমাইশ
গোয়ম মুশকিল বগর না গোয়ম মুশকিল।

—সফল কবিরা আমার কাব্য খুবই কঠিন বলেন এবং আমায় সহজ করে লিখতে ফরমাশ দেন। কিন্তু আমি কঠিন কাব্যই রচনা করতে পারি, তা না হলে আমার পক্ষে কাব্য রচনা করাই কঠিন।

গালিব রচিত প্রেম কবিতাগুলিই মধুর ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর কাব্যে এক প্রকার নতুনত্ব, সে সময়কার উর্দু সাহিত্যে একেবারে নব অবদান। বলার ভঙ্গীটি ছিল নতুন, অত্যন্ত সাদাসিধে। কথাটি বলতেন মিষ্টি করে ঘুরিয়ে, নতুন নতুন চিন্তা, নতুন উপমা ও অলংকরণ, নতুন ধরণের সংকেত, শব্দ ও বর্ণ বিন্যাস এবং নতুন চিত্র। এ ছাড়া ছিল নিজস্ব প্রকৃতিগত কৌতুকবোধ, যার ফলে সাধারণ বক্তব্যটিও মনোজ্ঞ ও কাব্যময় হয়ে উঠেছে। তাঁর সমকালীন প্রসিদ্ধ কবি মীর, সৌদা, আতশ নাসিখ, জৌক প্রভৃতিকে ছাড়িয়ে গেছে তাঁর প্রসিদ্ধি এর কারণ তাঁর রচনার নবত্ব। না হলে মির্জা গালিব কোন দার্শনিক নন, তিনি কবি মাত্র এবং সেও প্রেমিক কবিরূপেই খ্যাত।

জীবিকার জন্য গালিব বার দুই দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন, তারমধ্যে একবার কলকাতা অবধি যাত্রা করেছিলেন। যৌবনকাল পর্যন্ত একপ্রকার স্বচ্ছলতার মধ্যেই কেটেছে। কিন্তু তারপর অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন মির্জা গালিব। অর্থকষ্ট অথচ নবাবী ধাত, তার ফলে অনিবার্য-ভাবে কষ্ট বেশী পেতে হয়েছিল। অনেকগুলি সন্তান হয়ে অকালে মারা যায়, তার শোক পেতে হয়েছিল। ভাগ্নে আরিফকে সন্তান স্নেহে পালন করেছিলেন, সেও অকালে মারা যায়। নিজের ভাই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। প্রথম স্বাতন্ত্র্য সংগ্রাম বা সিপাহী বিদ্রোহ সবে অতিবাহিত, সে সময়ে মির্জা গালিবের সন্দেহ এত প্রবল হয়েছিল যে [illegible] হয়েছিল। [illegible] ছিল। [illegible] ছিল না। তাই তাঁর বহু কবিতায় দুঃখ, নিরাশা, সমাজের বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে কিন্তু এসব ছাড়াও তাঁর প্রেম কাব্যে তাতে প্রাণ বা রসের অভাব হয় নি কখনও। [illegible] পানপাত্র, সাকী-[illegible] নেশা, [illegible] প্রচুর ব্যবহার আছে। সম্ভবতঃ নিজে [illegible] ছিলেন বলে, কিংবা [illegible] ফারসী কাব্যের ওমর খৈয়াম ও হাফিজ সাহেবের অনুকরণ বা অনুপ্রেরণায়।

মির্জা গালিবের কবিতাগুলি খুব বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়। কেন, জীবনের দুঃখ নিরাশা ব্যক্ত করবার সময়ও গালিব তাঁর স্বভাবসুলভ সংযত কৌতুকপ্রিয়তা দিয়ে মুড়ে দিয়েছেন যার ফলে সেগুলি পাঠকের কাছে গভীর এবং সুখপাঠ্য, করুণ অথচ নিস্পৃহ রসজ্ঞের জীবন দৃষ্টি ছড়িয়ে আছে কবিতাগুলিতে। খুব খোলাখুলি ভাষায় সহজ কথাটি বলে কবি যেন কৌতুকে মুচকি হাসছেন।

গালিবের প্রেম জীবন সম্বন্ধে বহু প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অবশ্য তার মধ্যে কতটা ভাগ সত্য এখন তা বলা কঠিন। ব্যক্তিগত ঢঙে লেখা অথচ তার মধ্যে কতটা বাস্তব ঘটনা ছিল এবং কতটা কেবল আমোদপ্রিয়তা প্রসূত সরস উক্তি মাত্র তাও বলা কঠিন। তবে প্রেমের দুর্গম পথে তিনি বারংবার যাত্রা করেছেন এটা নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তৎকালে একনিষ্ঠ প্রেমের (পুরুষ জাতির) বিশেষ রেওয়াজ ছিল না, সুতরাং মির্জা গালিবও একাধিক সুন্দরীকে হৃদয় দান করেন নি এরকম আশা করা যায় না। নিজেই লিখেছেন—

—চন্দ তসবীরে বুতাঁ চন্দ হসীনোঁ কে
খতূত

বাদ মরণে কে মেরে ঘর সে য়ে সামাঁ নিকলা।

মৃত্যুর পর কবির ঘর থেকে কি কি বস্তু পাওয়া গেল? না কয়েকখানা চিত্র এবং কয়েকজন সুন্দরীর লেখা পত্র।

প্রেমিকার প্রতি উক্তির রংবেরং-এর বৈচিত্র্যে কেমন শোনায় দেখুন—

কমালে-হুসন অগর মৌকুফে
আন্দাজ-তগাফুল হো
তকল্লুফ বর তরফ তুঝসে তৈরী তসবীর
বেহতর হৈ।

সৌন্দর্য যদি বেপরোয়া হয় তাহলে তোমার এই লোক দেখান সৌন্দর্য হতে তোমার চেহারা সুন্দর।

আরও শুনুন—

ফির উয়ো সুয়ে—
চমন আতা হৈ খুদা খৈর করে
রঙ উড়তা হৈ গুলিস্তাঁ কে
হবাদারোঁ কা।

অর্থাৎ বাগানের পথ দিয়ে আবার বাধ (প্রেমিকা) আসছে—ভগবান, রক্ষা করুন। প্রেমিকাকে দেখে বাগানের বায়ু সেবনকারীদের আক্কেল গুড়ুম। প্রেমিকার প্রেমবাণে বিদ্ধ হয়ে প্রাণটি যাবে এই ভয়ে ভীত।

কহতে হো ন দেঙ্গে হম
দিল অগর পড়া পায়া,
দিল কহাঁ কি গুম কীজে?
হমনে মুদ্দআ পায়া
ইশক সে তবীয়ত নে জীস্ত কা মজা পায়া,
দর্দ কী দবা পাঈ, দর্দ বেদবা পায়া।

—তুমি (প্রেমিকা) বলছ এই হৃদয় তুমি কুড়িয়ে পেয়েছো, ফেরৎ দেবেনা। হৃদয় আছে কোথায় যে লুকোবে তাকে? আমার জীবনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে, জীবনের আনন্দ পেয়েছি, সব রোগের ঔষধ পেয়েছি এবং আর কি পেয়েছি? এমন এক পীড়া (প্রেম পীড়া) যার কোন ঔষধই নেই।

ভাবাবেগের প্রাবল্য মির্জা গালিবের কাব্যে নেই, বরং আছে বেশ প্রবল বাস্তব বুদ্ধি। গালিবের প্রিয় বা প্রিয়া (মাশুক) সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, পরীর মত আকর্ষক। সুন্দরী কেবল নয় কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তার আছে, প্রিয়ার প্রকৃতির যথেষ্ট সরস বর্ণনাও পাওয়া যায়।

কভী নেকী ভী উসকে জী মেঁ
গর আ জাএ হৈ মুঝসে
জফাএঁ করকে অপনী যাদ, শরমা জাএ হে মুঝ সে।

—প্রেমিকার মনে আমার প্রতি কদাচিৎ যখন প্রেমভাবের উদয়ও হয় তখন সে স্বকৃত জুলুমগুলি স্মরণ করে আমার সামনে লজ্জিত হয়ে পড়ে!

সুফী কাব্যের অধিকাংশ মাশুক (প্রিয়া বা প্রিয়) চরিত্র বেশ স্পষ্ট ধরা ছোঁয়া যায় না। অনেকস্থলে মাশুক ঈশ্বর, কিন্তু মির্জা গালিবের বেলায় এরকম একেবারেই নয়। তাঁর মাশুক জীবন্ত মানুষ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি মির্জা। রঙ বেরঙের চিত্র আছে প্রেমপত্রের, সে নেহাৎই রক্তমাংসের মানুষ, আর আছে মিলন বিরহের সুখ দুঃখের স্পষ্টোক্তি। আছে হাসি তামাশা, কলহ বিবাদ, মান অভিমান এবং 'নারাজ' হওয়ার অনেক চিত্রণ। ঝাল মিষ্টি নুন কিছুই বাদ যায়নি। বিশিষ্ট রচনা।

আকণ্ঠ নিমজ্জিত প্রেমিকের এক চিত্র দেখুন

ন হোগা য়ক বয়াবাঁ মান্দগী
সে জেকৈ কম মেরা
হবাবে—মৌজএ রফ্‌তার হৈ নকশে-কদম মেরা
মুহব্বত থী চমন সে লৌকিন অব য়হ বে
দিমাগী হ্যায়
কি মৌজে—বুএ গুলে সে নাক মেঁ আতা হ্যায়
দম মেরা

পরিশ্রান্তির জঙ্গলের মধ্যেও আমার (প্রেমিকার) হৃদয়ে উল্লাস উচ্ছ্বাস কিছুই কম হবে না। গতিমান জলতরঙ্গের বুদ্‌বুদের উপর আমার পদচিহ্ন পড়েছে অর্থাৎ আমার অবস্থা অকল্পনীয়। বাগানের প্রতি আমার ভালবাসা তো ছিল কিন্তু এখন তা নিঃশেষ হয়ে গেছে, ফুলের গন্ধের তরঙ্গে আমি একেবারে হয়রান হয়ে গেছি!

মির্জা গালিবের খুব প্রসিদ্ধ একটি শের শুনুন—

দর্দ মিন্নত—কশে দবা ন হুআ
মৈঁ ন অচ্ছা হুআ বুরা ন হুআ
হম কঁহা কিসমত আজমানে জায়
তু হী জব খঞ্জর—আজমাঁ ন হুআ।
কিতনে শীরীঁ হৈ তেরে লব! কি রকীব
গালিয়াঁ খাকে বে-মজা ন হুআ।

—প্রেমিকাকে মিনতি করে করে আমার দুঃখ দূর হল না, প্রেমের পীড়া মিনতি প্রার্থনা দিয়ে আরোগ্য হয় না। আমি ভাল বা মন্দ কিছুই হতে পারলাম না। তার কাছে—আমার পীড়া একভাবেই রইল। এখন আর নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে আমি যাই কোথা যখন তুমিই নিজের খড়্গের ধার পরীক্ষা করলে! অর্থাৎ আমায় নিহত করলে না তোমার প্রেমবাণে। কি মধুর তোমার ঐ অধর প্রিয়া যে, তোমার শত্রুও তোমার ঐ মুখের গালি খেয়ে দুঃখ পায় না, তোমার ও মুখের গালও এত মিষ্টি!

কবি লিখছেন—

লো হম মরীজ-ঈশক কে তীমারদার হ্যাঁয়
অচ্ছা অগর ন হো তো, মসীহা হগ কা
ইলাজ?

অর্থাৎ আমি প্রেম রোগগ্রস্তের (সুযোগ্য) পরিচর্যাকারী। আমার মত পরিচর্যাকারীর সেবায় যদি রোগ উপশম না হয় তাহলে সে রোগ সারান 'মসীহার' (যার দর্শনে সর্বরোগ দূর হয়)ও ক্ষমতার বাইরে, শিবের অসাধ্য রোগ আর কি।

গালিবের আর একটি সুপ্রসিদ্ধ কবিতা—

আহ কো চাহিয়ে ইক্‌ উম্র অসর হোনে এক্‌
কৌন জীতা হৈ, তেরী জুল্‌ফ কে সর হোনে
তক্‌
আশিকী সব্র-তলব ঔর তমন্না বেতাব
দিল কা ক্যা রঙ্গ করুঁ, খুনে-জিগর হোনে
তক্‌।
হমনে মানা কি তগাফুল ন করো গে লৌকিন
খাক হো জায়েঙ্গে হম, তুমকো খবর হোনে
তক।
গমে-হস্তী কা 'অসদ' কিসসে হো জুজ মর্গ
ইলাজ
শমঅ হর রঙ্গ মেঁ জল্‌তী হৈ সহর হোনে
তক্‌।

—দীর্ঘ নিঃশ্বাস (আহ্‌) সফল হতেও এক দীর্ঘ যুগ লেগে যায়। তোমার কেশরাশির ওপর বিজয় প্রাপ্ত করতে, অর্থাৎ তোমায় প্রাপ্ত হতে যে দীর্ঘদিন লাগবে ততদিনে আমি মরে ভূত হয়ে যাব। প্রেমের মার্গে ধৈর্যের দরকার। কিন্তু অভিলাষ অধীর, এই দুই বিরুদ্ধ দশার মধ্যে পড়ে আমি গেলাম। আমার হৃদয়কে কোন রঙ্গে রাঙ্গাব তা জানি না, সুতরাং প্রাণ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি আর কি করব। একথা মানছি যে তুমি আমার প্রেমকে উপেক্ষা করবে না, কিন্তু তোমার কাছে আমার খবর পৌঁছাতে পৌঁছাতেই যে আমি শেষ হয়ে যাব! অসদুল্লাখাঁ গালিব বলছেন অস্তিত্বের এই যে বেদনা, মৃত্যু ছাড়া এর আর কোন চিকিৎসা নেই! কিন্তু মজলিসের বাতিকে তো ভোর হওয়া পর্যন্ত জ্বলতেই হবে।

একটি শেরে গালিব লিখেছিলেন—

মেহরবাঁ হো কর বুলালো মুঝে, চাহো জিস
বখ্‌ত্‌
মৈঁ গয়া বখ্‌ত্‌ নহী হুঁ কি ফির আ ভী ন
সকে
জোফ মে তানিএ—অগয়ার কা শিকবা ক্যা হৈ
বাত কুছ সর তো নহী হৈ, কি উঠা ভী ন সকুঁ
জহর মিলতা হী নহী মুঝকো, সিতমগর বরনা
ক্যা কসম হৈ তেরে মিলনে কী, কি খা ভী ন
সকুঁ

তোমার যখন ইচ্ছা হবে আমায় কৃপা করে ডেকে পাঠাতে পার, আমি তো আর পার হয়ে যাওয়া সময় নাই যে একবার চলে গেলে আর ফেরে না। শত্রুদের বাক্যবাণের জ্বালায় আমার অভিযোগ নেই, কথা তো আর কাটিজ মস্তক নয় যে উঁচু করে রাখতে পারব না। হে নিষ্ঠুরা, বিষ পাইনা

সেইজন্য বিষ খেতে পারি না, নচেৎ বিষ তো আর তোমার সঙ্গে মিলিত না হবার শপথ নয় যে তা খেতে পারি না! অর্থাৎ তোমার সঙ্গে মিলিত না হবার শপথ খেতে পারি না কিন্তু বিষ খেতে পারি।

সামান্য সোজা কথাগুলি বলবার ধরন দেখলে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না! কবিতাটির মধ্যে রসিক প্রেমিকের সব বক্তব্যই বলা হয়ে যায়, অত্যাচারী নিষ্ঠুরা প্রেমিকাকে এর চেয়ে আর কি বা বলতে পারতেন গালিব।

এবার ঘরোয়া একটু শুনুন—

কি সী কো দে কে দিল কোঈ নবা—
সঞ্জে—ফুগাঁ কেঁও হো।
ন হো জব্ দিল হী সীনে মে,
তো ফির মুঁহ মে জবাঁ কেঁও হো।
ও অপনী খু ন ছোড়েঙ্গে,
হম অপনী বজঅ কেঁও বদলেঁ
সুবুক-সর বন্ কে কা পুঁছে কি
হমসে সরগরাঁ কেঁও হো

—প্রেমিক কাউকে হৃদয় দান করে মিনতি প্রার্থনা ইত্যাদি করতে যাবে কেন? প্রেমিকার হৃদয়ই যখন নেই তখন মিনতি করে লাভ কি? সে নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করবে না, সে ক্ষেত্রে আমি নিজের আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিই কেন? মাথা নাবিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাই বা কেন করতে যাব—'তুমি আমার প্রতি অকরুণ কেন?'

এ মনোভাবের সঙ্গে কেই বা একাত্মতা অনুভব করবেন না? আরও আছে—

ইশক মুঝকো নহী, বহশৎ হী সহী
মেরী বহশৎ, তেরী শোহরৎ হী সহী
কতঅ কীজে ন তাল্লুক হম সে
কুছ নহী হৈ, তো আদাবৎ হী সহী।

আমার কপালে যখন তোমার প্রেম নেই তখন পাগলামোই সই। আমার পাগলামী আর তোমার (গুণের) প্রশংসাই সই। হে সখী, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ কর না, প্রেম সম্বন্ধ না থাক শত্রুতাই সই, কিছু সম্বন্ধ তো থাকু!

প্রেম বা ঘৃণা এ দুইএর মধ্যে একটি অন্ততঃ থাক, উদাস বিস্মরণ নয়। অতি আধুনিক প্রেমিক এর চেয়ে আর বেশী কি বলবেন?

ন হুঈ গর মেরে মরনে সে তসল্লী ন সহী
ইমতেহা ঔর ভী বাকী হো তো য়ে ভী ন সহী

প্রেমিক বলছেন—আমার মৃত্যুতেও যদি তোমার শান্তি না হয় তাহলে আর কি করা যায়, মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কোন পরীক্ষা যদি আমার করতে চাও আমি তাতেও প্রস্তুত!

নির্বোধ প্রেমিকার সম্বন্ধে গালিব বলছেন—

উনকে দেখে সে জো আ জাতী হৈ
মুঁহ পর রৌনক
ও সমঝতে হৈঁ কি বিমার কা
হাল অচ্ছা হৈ।

আমি রোগে এত পীড়িত তা সে বুঝতে পারে না! তাকে দেখলে আমার চেহারা প্রফুল্ল হয়ে ওঠে আর সে মনে করে আমি বুঝি খুব সুস্থ আছি!

রোনে সে ঔর ইশ্‌ক মে বেবাক হো গয়ে
ধোয়ে গয়ে হম আয়সে কি বস পাক্ হো গয়ে

—ভালবেসে আর কেঁদে আমি একেবারে নির্ভীক হয়ে গেছি, অশ্রু জলে ধুয়ে ধুয়ে একেবারে পবিত্র হয়ে গেছি।

গালিবের নিম্নলিখিত এই কবিতাটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত গজল সঙ্গীতের মাধ্যমে। অতি সুন্দর রচনা হাসিকান্নাকে ব্যঙ্গের আচ্ছাদনে মুড়ে দেওয়া।

এক অহলে-দর্দ নে সুন সান জো দেখা কফস্
যোঁ কহা আতী নহী অব কেঁও সদা-এ-অন্দলীব
বালো পর দো চার দিখলাকর কহা সৈয়াদ নে
য়ে নিশানী রহ গঈ হৈ অব বজায়ে অন্দলীব।

—এক দরদী শূন্য খাঁচা বা জাল দেখে জিজ্ঞাসা করছেন, বুলবুলের গান শুনতে পাই না কেন? ব্যাধ (প্রেমিকা) বুলবুলের শেষ-বাশিষ্ট দু চারখানা ডানা পালক দেখিয়ে উত্তর দিচ্ছে বুলবুলের বদলে শুধু এই দুচারটে চিহ্নই রয়ে গেছে।

দরদী, শূন্যজাল, বুলবুল (অন্দলীব) ও ব্যাধ (প্রেমিকা) এইগুলির সাহায্যে অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব বলা হয়েছে, স্বহস্তে বধ করা বুলবুলের অবশিষ্ট ডানা পালকগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে প্রেমিকার মনোভাব কিরূপ হতে পারে মির্জা গালিব তাই যেন সকরুণ কৌতুকে শোনাচ্ছেন।

হজারো খোয়াহিশে' অ্যায়সী,
কি হর খোয়াহিশ পে দম নিকলে
বহুত নিকলে মেরে অরমান,
লেকিন ফির ভী কম নিকলে

—কত অভিলাষই মনে আছে, এমন সব বাসনা যার এক একটি পাবার জন্য আমার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। আমার কত বাসনাই তো পূর্ণও হয়েছে, কিন্তু এত পূর্ণ হয়েও তা যথেষ্ট নয় অনেক বাকী রয়ে গেছে। তৃষ্ণা মেটে না।

পুর হুঁ মৈঁ শিকবে সে য়ো, রাগ সে জৈসে বাজা
ইক জরা ছেড়িয়ে, ফির দেখিয়ে ক্যা হোতা হৈ।
ইশ্‌ক কী রাহ মেঁ হে চর্খে-মকৌকব কী য়ে চাল
সুস্ত রো জৈসে কোঈ আবলা-পা হোতা হৈ।

—অভিযোগ এত সঞ্চিত হয়ে আছে আমার মনে যেন বাদ্যযন্ত্রে সুর একটু ছুঁয়ে দিয়ে দেখ কি হয়। প্রেমের মার্গে ভ্রমণ করা বড় কঠিন, নক্ষত্রখচিত আকাশের মত ধীরগতিতে চলতে হয় প্রেমের পথে। সে গতি এত মন্দ ঠিক যেন বিক্ষত পদে পথ চলা।

ফোস্কা পড়লে হাঁটা যেমন আপনিই খুব ধীরে ধীরে হয় সেইরকম খুব ধীরে আর সাবধানে চলতে হয় প্রেমিককে।

আর একটি সুপ্রসিদ্ধ শের শুনুন, এর মধ্যে প্রেমিকের জ্বালা, নৈরাশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রচনাটি গুরু-গম্ভীর।

কোঈ উম্মীদ বর নহী আতী
কোঈ সুরত নজর নহী আতী
মৌত কা একদিন মুয়ৈয়ন হৈ
নীদ কেঁও রাত ভর নহী আতী
আগে আতী থী হালে দিল পে হঁসী
অব কিসী বাত পর নহী আতী
জানতা হুঁ সবাবে—তা অতো—যোহদ
পর তবীয়ৎ ইধর নহী আতী।
হৈ কুছ ঐসী হী বাত জো চুপ হুঁ
বরনা ক্যা বাত কর নহী আতী
হম বহাঁ হৈঁ, জহাঁ সে হমকো ভী
কুছ হমারী খবর নহী আতী

—গত মাসে সে নিয়ে গেছে।
—এটা সার আপনার সাবেকী চাঁদা।

—কোন আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয় না, কোন পথও দেখতে পাইনে। মৃত্যু একদিন তো নিশ্চয় আছেই তবু চিন্তায় রাতভোর নিদ্রা আসে না। নিজের প্রেমিকের হৃদয়ের অবস্থা দেখে আগে হাসি পেতো, এখন এমন পরিপক্ব হয়ে পড়েছি যে কিছুতেই হাসি আসে না। ঈশ্বর পূজা, দয়া পুণ্যকর্ম এ আমি জানি কিন্তু আমার মন সেদিকে আকৃষ্ট হয় না। জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানামি অধর্মং ন চ মে নিবৃত্তি। আমি চুপ করে থাকি তার মধ্যে কিছু রহস্য আছে নাহলে আমি বোবা তো আর নই। প্রেমে আমি এখন এমন অবস্থায় এসেছি যে আমার নিজের সম্বন্ধেই আর হুঁশ নেই। মরার বাড়া অবস্থা...মৃত্যু কামনা করে করেই মরছি।

মির্জা গালিবের রচনার কিছু নমুনা দেওয়া হল। পড়তে খুব ভাল লাগে। উপমা উপমেয়র নবীনত্ব পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া শব্দ নিয়ে খেলা উর্দু কাব্যের যে বৈশিষ্ট্য তা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান তাঁর কাব্যে।

অনেক কষ্ট পেয়েও গালিব প্রেমের প্রতি আস্থা হারাননি, তবে খুব তরলভাবে স্থানে স্থানে প্রেমের দার্শনিক তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন সন্দেহ নেই। তা কবিতাগুলি এত সরস এছাড়া আছে শব্দসম্ভারের সমারোহ, ধ্বনি বৈচিত্র্য ও উচ্চাঙ্গের শিল্পকৃতি।

ওগো সুন্দর বাজাইয়া যাই তোমার
নামের বাঁশী।

করুণাক্ষ বন্দোপাধ্যায়ের খাতায় অটোগ্রাফ দানের সময় কবি যে কবিতাটি লিখে দেন সেটিতে সম্পূর্ণ অধ্যাত্মলোকের কথাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কবিতা হিসেবেও পংক্তি কয়টি অপূর্ব :

সুন্দর তব ধ্যানের কমল ফুটিবে যবে
তোমার নয়নে সেদিন আমার প্রকাশ হবে।
লীলা-চঞ্চল প্রাণ মুগ্ধ রবে স্তব্ধ হয়ে,
মৌনী তোমার বোধনের নীরে আকুল স্তবে।
২৯শে মার্চ, ১৯৩৩ নজরুল ইসলাম

১৯৩৫ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ়ে শ্রীমতী রাণু সোমের খাতায় কবি যে কবিতাটি লিখে দেন সেটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

শ্রীমতী রাণু সোম কল্যাণীয়াসু—
মাটির ঊর্দ্ধে গান গেয়ে ফেরে স্বরগের যত পাখী,
তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা তাদের কণ্ঠ রাখি।
যে গন্ধর্বলোকের স্বপন হেরি মোরা নিশিদিন—
তুমি আনিয়াছ কণ্ঠ ভরিয়া তাদের সুরেলা বীণ।
তুমি আনিয়াছ শুদ্ধ সুরের সুরে ভয়হীন
আবেদন,
যে সুর-মায়ায় বিকশিয়া ওঠে বনবীথিকা অগণন।
যে সুরে স্বরগে অপ্সরী গান গাহে সুন্দর সুরধ্বনী
অসুন্দর এই ধরায় তোমার কণ্ঠে সে গান শুনি।।
সনগ্রাম, ঢাকা 'কবিদা।'
৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫

কবি নিজে যাঁদের গান শিখিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা বিরল। বেগম জাহানারা খান সেই বিরল সংখ্যক সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে অন্যতমা। ইনি কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। দীর্ঘদিন ইনি কবির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন—সুতরাং যখনই সুযোগ হয়েছে জাহানারা খান তাঁর অটোগ্রাফের খাতাখানি এগিয়ে ধরেছেন কবির সম্মুখে। কবি সঙ্গে সঙ্গে দু' পংক্তি কবিতা রচনার পর স্বাক্ষর দান করেছেন। শ্রদ্ধেয়া জাহানারা খানের অটোগ্রাফের খাতায় অনেকগুলি কবিতা আছে—আমি তার থেকে মাত্র দুটি উদ্ধৃত করলাম :

সুন্দর তনু, সুন্দর মন হৃদয় পাষাণ কেন?
সেই ভুলে যাওয়া অবহেলা এলো সুন্দর
রূপে যেন!
নারী কি দেবতা? কেবলি কি তারা পাষাণ
নির্বিকার?
পদতলে তার পূজার অর্ঘ্য নিত্য হয়ে ওঠে ভার।
কত সে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ রাণী?
ধরা নাহি দিলে, তোমারে খুঁজিছে কত সে
কবির বাণী?
আমার গানের একা তরণীতে আজো আছে
আছে ঠাঁই,
তোমার পরশে সোনা হয়ে যাবে, এড়ায়ে
চলিছ তাই?
আমার সুরের শতদলে তবে চরণ রাখিলে কেন,
না ছুঁয়েই যদি চলে যাবে দূরে ভুলে-
যাওয়া লোকে হেন?
নয়নের জল থাকুক আমার—সে মোর বন্ধু, প্রিয়,
থাক মোর গান—যদি মনে লাগে গানেরে
ভালোবাসিও।
দার্জিলিং ১৬-৬-১৯৩১

আর একটি কবিতা আমাদের এ প্রসঙ্গের শেষ উদ্ধৃতি :
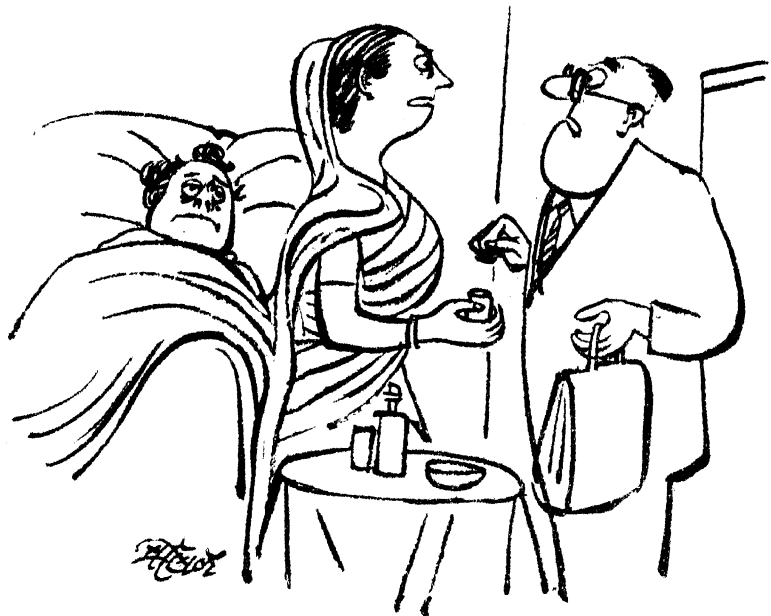
এলে কি স্বপন-মায়া আবার আমায় গান
গাওয়াতে
নিদাঘের দগ্ধ জ্বালা করলে শীতল পূব
হাওয়াতে।।
ছিল যে পাষাণ চাপা আমার গানের উৎস মাঝে—
তারে আজ মুক্তি দিলে ঐ রাঙা চরণ আঘাতে।।
এলে কি বর্ষারাণী নিরশ্রু মোর নয়ন লোকে
বহালে আবার সুরের সুরধুনী বেদনাতে।।
এসেছ ঘূর্ণী হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমেষের,
এসেছ সঙ্গে নিয়ে বজ্র ভরা ঝঞ্ঝাবাতে।।
তবু ঐ ভুল যে প্রিয় ফুল ফোটাল শুষ্ক শাখে
আকাশের তপ্ত নয়ন জুড়িয়ে গেল
ঐ চাওয়াতে।।
তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির
তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখী মনের গহন
মেঘলা রাতে।।
এলে কি তারার দেশের হারিয়ে-যাওয়া
সুরের পরী
শ্রান্ত বান-বেঁধা মোর গানের পাখীর ঘুম
ভাঙাতে।।
এলে আজ বাদলা-শেষে ইন্দ্রধনুর রঙীন মায়া
ছোটে সুর উজান স্রোতে, চোখ জুড়াল
রূপ-শোভাতে।।
দার্জিলিং, নজরুল ইসলাম
২০শে জুন, ১৯৩১

এ ধরনের আরো বহু কবিতা বহু বিদগ্ধ জনের অটোগ্রাফের খাতায় জমা আছে। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তাঁরা এগিয়ে এলে কবিতাগুলি সংগ্রহ করা সহজ হবে। এ বিষয়ে আমরা সকলের আন্তরিক সহানুভূতি কামনা করি।
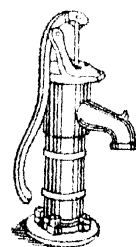
ডাক্তার—এই নিন ঘুমের ওষুধ, রোগীর বিশ্রাম দরকার।
গৃহিণী—ঘুমের পিলটা কখন খাওয়াবো?
ডাক্তার—খাওয়াতে হবে না, আপনি খাবেন।

নৈঃশব্দ্য ও কয়েকটি মুহূর্ত

অনিলবরন ঘোষ

সোমা যে আবার বিয়ে করবে, আবার সংসার করবে, একি কেউ ভাবতে পেরেছিল। কিন্তু তাই করল সোমা। আনন্দকে ছেড়ে এসে তিনটি মাস না যেতেই শংকরকে আবার বিয়ে করল। নিঃসঙ্গ বিড়ম্বিত জীবনে ভয় পেয়েছে সে। তার অতীত স্মৃতির রোমন্থনে। একাকী জীবনে।

নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে শংকর। জীবনে যেটুকু সে চেয়েছিল, তাই পেয়েছে। সোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে নিশ্চিন্ত। সোমাকে পেয়ে সে তৃপ্ত।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে, স্বামীর সোহাগ আলিঙ্গনের মধ্যেও কিন্তু আজ জেগে আছে সোমা। ঘুমোতে পারে না। ঘুম নাই চোখে। যে দুঃস্বপ্ন ভুলে যেতে চায়, সে দুঃস্বপ্নটা সারা মস্তিষ্ক জুড়ে চেপে বসেছে। প্রত্যেকদিন নয়, মাঝে মাঝে এমন হয়। বিশেষ করে যে রাতে শংকরের আদর মাত্রা ছাড়ায়। সে রাতেই ঘুমোতে পারে না সোমা। কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। পাগল পাগল হয়ে জেগে থাকে। কাঠ কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে। এ রাত জাগা যেন টের না পায় মানুষটা। এ দুঃসহ স্মৃতির জ্বালা সে লুকিয়ে রাখতে চায়। ভুলে যেতে চায়।

স্মৃতির চাবুক শিস্ দেয়। অতীত দিনের পাঁচটি বছরের অভ্যেস বড় নিদারুণ হয়ে বাজে। আর কিছু না হোক অভ্যেস বশেই হয়তো বা আনন্দ সেদিন ওকে এমনি করে দুহাতে বুকে টেনে নিত। ওর বুকে মাথা রেখে সে চোখ বুজত। ওর পুরুষ পুরুষ গায়ের গন্ধে কি যে মাদকতা ছিল, ঘুমিয়ে যেত নিঃসাড়ে।

দুচোখে জল নামে। আকুল ব্যাকুল মনে শিহরণ। পাঁচ বছরের ইতিহাস ও শুধু দুঃখেরই নয়।

কোন এক ঘরোয়া চায়ের আসরে মেয়েটির বড় চঞ্চলকে উচ্ছ্বসিত মুখে, টোল পড়েছিল গালে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আনন্দ দেখছিল তাকে। ওর শিল্পিক মনে রেখা পড়ে। এগিয়ে গিয়ে আলাপ করে। মেয়েটির নাম সোমা। আলাপ থেকে পরিচয়। পরিচয়ে মন বাঁধে। এক সোনালী স্বপ্নের বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে সোমা এসে ওঠে আনন্দের ঘরে। চমকে যায় আত্মীয় বন্ধুজন। একি করল সোমা। শেষে কিনা ক্ষ্যাপা শিল্পীটাকে বিয়ে করল? আনন্দের কাছে সোমাকে কঠিন প্রতিজ্ঞা করতে হয়। দুজনের মধ্যে তৃতীয় কারুর স্থান নেই। কোনদিন সন্তান চাইতে পারবে না সোমা। সোমা প্রতিজ্ঞা করে হাসিমুখে খুশিমনে সংসার সাজাতে বসে। হৃদয়ের আবেগ আর ভালবাসা দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলে সংসার, তার নিজের সংসার, তার ভালোবাসার সংসার।

মত্ত মধুকরের রঙিন ডানার রেখায় শুধু যে সুখের আঁচড়। সুখ আর সুখ। বিয়ের পর দুটি বছর আকণ্ঠ তৃপ্তির আবেশে বুঁদ হয়ে থাকে সোমা। কোন খোঁজ করে না, কোন প্রশ্ন তোলে না। শুধু নিজেকে ফুলের মত রাঙিয়ে সাজিয়ে শিল্পীর চোখের সম্মুখে তুলে ধরে। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে চায়। কঠিন পৃথিবী তখনও অনেক দূরে।

সোমার স্বপ্নে নতুন নতুন সোহাগ আল্পনার ছক। এত আনন্দ জীবনে। এত সুখ দেহমনে। এত সুখ ভালবাসায়। ভাবতে বসে সোমার বুক দুরু দুরু করে। ছোট্ট পায়রার মত সর্বশরীর পুলকে থরথরিয়ে কাঁপে। অকারণে হাসে সোমা। থেকে থেকে শিহরায়।

কত বুঝাই না আনন্দ বউকে বলে। বিদ্রোহী শিল্পী সে। গতানুগতিকের পথ তার নয়। আজ তাকে যারা বুঝতে পারছে না, একদিন আসবে, যেদিন তার ছবি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। নাচানাচি শুরু হবে। ফুলের মালায়, নোটের তাড়ায় সোমাই বিরক্ত হবে। পালাই পালাই করবে।

ওর কথা সোমা শোনে সশ্রদ্ধায়। বোঝবার চেষ্টা করে।

বছর ঘোরে। একটি একটি করে তিনটি বছর। একদিন বাড়ীওয়ালা শাসিয়ে যায়। ভাড়া বাকী পড়েছে অনেকগুলি মাসের। আর ভদ্রতা রাখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দিন কয়েক পর মুদি আসে কালো মুখে। বহু টাকা বাকী পড়েছে। টাকা না দিলে সে মালপত্তর দিতে পারবে না।

ভয়ে সোমা কাঠ হয়ে যায়। স্বামীর সামনে যেতে পর্যন্ত ভয় করে। কি করবে ভেবে পায় না। কেন এমন হল? —কিন্তু নির্বিকার আনন্দ। পায়ের উপর পা তুলে নাচায়। শিস্ দিয়ে গান গায়। সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করে। তবু পেটে হাত পড়ায় এবার সে একটু নড়াচড়া করে। কয়েকটা শাড়ির পাড় এঁকে সাময়িক চাল ডালের ব্যবস্থা করে। তারপরই আবার সেই ঘরের কোণের আশ্রয়।

যতই দিন যায়। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সোমার ভাবনা সুরু হয়। ভয় পায় স্বামীর হালচালে। সংসার নিয়ে একটুও চিন্তা নেই। সামাজিকতা, ভদ্রতার ধার ধারে

মা। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব তার কেউ নেই। সকলে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। কাউকে পরোয়া না করে বেপরোয়া আনন্দ। কোন ঝক্কি ঝামেলায় যেতে সে নারাজ। শুধু বড় বড় স্বপ্ন...... বড় বড় কথা আর অলস কল্পনা। একটা পূর্ণ ছবি আঁকবার পরিশ্রম-টুকু করতে পর্যন্ত রাজী নয় সে। নেহাৎ দায়। সংসার দায়। কয়েকটা টাকার যোগাড় করতেই হয়। তাই বই-এর কভার শাড়ির পাড় এঁকেই সে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে। আর একটু অসুবিধে হলেই বিরক্তিতে ফেটে পড়ে। বার বার করে বলে, বিয়ে করেই নাকি তার হয়েছে যত জ্বালা—

মুখ কালো করে সোমা শোনে। নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে। কাজের চেষ্টা করে। আনন্দ শুনে চুপ করে থাকে। অনেক খোঁজ খবর অনেক ধরাধরি করে একটা ইস্কুলে কাজ পায়। প্রথম মাইনের টাকা স্বামীর হাতে দিতে যায়, হাত ঠেলে দেয় আনন্দ। অনুনয় করে, কাঁদে সোমা।

মাসের পনের দিন যেতেই মাইনের টাকা কয়টি ফুরিয়ে যায়। বাকী মাস কি করে চলবে? আনন্দকে বলতে সে একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে বলে তা আমি কি জানি—

প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়। সংসার কার! সে ভাববে সংসারের কথা! কিন্তু অশান্তিকে ভয় করে সোমা। চুপ করে যায়। চাকরির দিকে নতুন দায় বাড়ে। সংসারের দায়।

সোমার গানে আজকাল আর যখন তখন টোল পড়ে না। জীবন থেকে ঝরে পড়ে সব আমোদ আহ্লাদ। কার জন্য সাজবে কে দেখবে। আনন্দের আর সেই প্রেম-গদগদ ভাব নেই। নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সিনেমা নয়, বেড়াবার কথা উঠলেই বলে আর দরকার নেই। ওসব যথেষ্ট হয়েছে—এসব আমার অপছন্দ।

অন্যের পছন্দ বলে কিছু থাকতে পারে—পছন্দ ত শুধু এক তরফা নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সোমা দীর্ঘশ্বাস চেপে চুপ করে থাকে।

বিয়ের পর চারটি বছর কেটে যায়। কেমন একটা একঘেয়ে ক্লান্তি সোমাকে গ্রাস করেছে। ইস্কুলের বাইরে একটা টিউশানি নিয়েছে। বাড়িতে এসে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। তবু রেহাই নেই, রান্না করতে হয়। সংসারের টুকিটাকি অনেক কিছু করতে হয়। থেকে থেকে বড় বিরক্তি ধরে এ একঘেয়ে জীবনে। স্বামীর কাছে তার চাওয়া ফুরিয়েছে। দিয়েছে সে, তার বেশী আর সে দেবে না।

ফুঁপিয়ে পড়ে ছোট মেয়ের মত কাঁদে, লোভী মেয়ের মত কাঁদে সোমা। চারটি বছরের মধ্যে কোন এমন করে সব উল্টে-পাল্টে গেল। এমন ত সে চায়নি। কোথায় গেল আকণ্ঠ তৃপ্তির মধ্যে বন্দী হয়ে থাকার সে সুখ। কেন আনন্দ অমন করে দূরে যাচ্ছে। কি আর দিতে পারে সে? কি আর দেবার আছে তার? হঠাৎ সচকিত হয়ে স্মৃতির রাশ টেনে ধরে সোমা। ঘুমের মাঝে শংকর পাশ ফিরেছে। হাতের বাঁধন তার খুলে গেছে। সোমা পড়ে থাকে এক পাশে। যাক্ ভালই হল। নিশ্চিন্তে সোমা আবার ডুব দেয় স্মৃতির সাগরে।......

বিয়ের রাতে। সেই প্রথম—বিয়ের প্রথম রাতে। সোমার দু'চোখ বেয়ে হুহু করে এক-রাশ জলধারা নেমে আসে। হ্যাঁ, সে রাতেই, সে মধুর রাতেই হাসিমুখে সোমা প্রতিজ্ঞা করে-ছিল, সন্তান তার চাই না, আনন্দকে পেলেই হবে। আজ সেই প্রতিজ্ঞা শুধু যন্ত্রণা বাড়ায়। একটি সন্তান দিক আনন্দ, তার বিনিময়ে আনন্দের সকল অত্যাচার অনুযোগ সে হাসি-মুখে সহ্য করবে। আনন্দের আছে অলস কল্পনা......ধোঁয়াটে স্বপ্ন। বছরের পর বছর সে কাটিয়ে দিতে পারবে ছিন্ন স্বপ্নের জোড় দিয়ে দিয়ে। কিন্তু কি নিয়ে থাকবে সোমা। স্বামী তার রাজ্য ছেড়ে নড়বে না। অহমিকার গগন-স্পর্শী সিংহাসনে মাথা উঁচু করে বসে আছে রাজা। সোমা যেন তার সিংহাসনের পাশে দাঁড়ান দীন এক প্রজা। প্রজার দিকে তাকিয়ে রাজা টিপ্পনী কাটে, আমি ত তোমাকে নিয়েই সন্তুষ্ট, তুমি কেন আমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারো না। তবে একটা কথা, আমাকে অসহ্য মনে হলে অন্য কোথাও চেষ্টা করতে পারো—

ক্ষোভে দুঃখে স্বামীর দিকে তাকায় সোমা। কত সহজে কত নিদারুণ কথা বলে দিচ্ছে। একটুও কি দয়ামায়া নেই! সরে আসে সোমা। কিছুক্ষণ রান্নাঘরের নিরিবিলিতে চুপ হয়ে বসে থাকে। চোখ বেয়ে জল নামতে গিয়েও নামে না। শুধু জ্বালা। সমস্ত হৃদয় জুড়ে শুধু একটা জ্বালা। প্রতিজ্ঞা সে মানবেই। স্বামীকে এ নিয়ে আর জ্বালাতে যাবে না। জ্বলে পুড়ে নিজেই সে খাক হয়ে যাবে। নিষ্ঠুর মানুষটিকে একটুও টের পেতে দেবে না।

তুষ আগুন। নিঃশব্দে পুড়তে থাকে সোমা। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যায়, জ্বলে যায়। হাসি খুশি ভরা চঞ্চল মেয়েটি কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। কি যেন ভাবে আর ভাবে। আর নিজেকে লুকিয়ে স্বামীর দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

লোকে বলে, বেশ যাচ্ছে এটি জীবন। নিরুপদ্রব নির্ঝঞ্ঝাট। একজন আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে। অন্যজন তার স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার টানে।

অনেক দিন সোমার অভিযোগ অনুযোগ শোনা যায় না। বাঁঝা নারীর সহজাত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছে সোমা। আনন্দ মনে মনে খুশি। খুশির আমেজে বউকে আদর করে, প্রশংসা করে। বুকে চেপে ধরে রাখে।

স্বামীর এ আদরে থরো থরো কাঁপে সোমা। পারে না সামলাতে। জানে চোখের জল দেখে এখনই বিগড়ে যাবে মানুষটা। তবু এ আদরে যে বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে! বেদনায় কালো হয়ে যায় সোমা, মরমে মরে যায়। সব ভুলে স্বামীকে জড়িয়ে ধরে প্রাণপণে। ঝর ঝর করে পড়ে বাঁধহীন বন্যা।

শিল্পী আনন্দ। তাই মানববাদে বিশ্বাসী। নরম মুহূর্তে গরম হয়ে ওঠবার, দুর্বল মুহূর্তে সবল হবার সাধনা তার। কাঁদে চোখের জলের স্পর্শ পেতেই সে কাঠ কাঠ কঠিন হয়ে ওঠে। পৈশাচিক তাড়নায় আনন্দ গর্জে ওঠে, আবার ন্যাকামি। সরে যাও—

বুকের উপর থেকে সোমাকে দু'হাতে ঠেলে তুলে ছুঁড়ে দেয় আনন্দ। আশ্রয়চ্যুত বেতসের মতো সোমা এলিয়ে পড়ে একপাশে। চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মাথায় কেমন ঝিমঝিম। এ ঘর, এ সংসার। এ কি ওর সেই স্বপ্নে দেখা ভালবাসার সংসার? কঁকিয়ে ওঠে সোমা। যন্ত্রণায় মস্তিষ্কের ভেতরটা ছিঁড়ে যেন খান-খান হয়ে যাচ্ছে। বন বন করে ঘোরে ঘর। ছোট্ট একটা শিশুর মত দু' হাত বাড়িয়ে কেঁদে ওঠে সোমা। অসহ্য একটা যাতনায় চিৎকার করে সব ভুলে যায়।

মস্তিষ্কের কাজ স্তব্ধ হয়েছিল কতক্ষণ, জানে না সে। চোখ মেলে তাকাতেই দেখতে পায় আনন্দের মুখ। বড় সুন্দর মনে হয় সে মুখ। অনিমেষ দৃষ্টিতে হাঁ করে তাকিয়ে দেখে সে মুখ। ও কি, মুখের রং কেন বদলায়। উৎকণ্ঠিত সোমা।

গর্জে ওঠে আনন্দ। যত রাবিশ। একটা হিস্টিরিয়ার ভূত এসে জুটেছে কপালে। চোখ বোজে সোমা। অসহ্য এ রং বদলানো মুখ। অসহ্য সে মুখের কর্কশ কথা। কানে হাত দেয় সোমা।

বিচিত্র এ দুনিয়া। বিচিত্র মানুষের মন। এতদিনেও সোমা জানে। হিস্টিরিয়া হয়নি তার। হিস্টিরিয়াকে সে ঘৃণা করে। তাই আগের চেয়ে আরও জোরে জোরে হাসে। গালে টোল ফেলে হাসে।

আবার ভুল করে সোমা। নিজের কথাটি ভুলে, হিস্টিরিয়ার কথাটা ভুলে, স্বামীর অসন্তোষের কথা ভুলে মস্ত ভুল করে সোমা। পাড়ার ঘরে এসেছে নতুন এক ঘর ভাড়াটে। তাদের ছোট্ট শিশুটি সব গোলমাল করে দেয়। বুকে ধরে ওকে নিয়ে আসে ঘরে। একেবারে আনন্দের সামনে। শিশুর ঠোঁটে চুমু খেয়ে, বুকের মধ্যে দোল দিয়ে চুমোর পর চুমো দিতে চায়।

স্থির দৃষ্টিতে আনন্দ তাকায় স্ত্রীর দিকে। তাকিয়ে থাকে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই সোমার। দু'হাতের উপর নাচাতে নাচাতে বলে, কি সুন্দর, তাই না—

স্বামীর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েই আবার শিশুকে চুমো খায় সোমা।

—শোন, এদিকে এসো। নিষ্প্রভ কণ্ঠে স্ত্রীকে ডাকে আনন্দ।

খুশিতে ডগমগিয়ে এগিয়ে যায় সোমা। স্বামীর কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়।

—অতো সখ যখন একটা কুকুরের বাচ্চা এনে পুষলেই পারো।

কথাটা শুনে কেঁপে ওঠে সোমা। ওর অবস্থা দেখে হাসি চাপতে পারে না আনন্দ। হেসে ওঠে। হা-হা করে হেসে ওঠে। তড়াকে শিশুকে বুকে চেপে ছুটতে ছুটতে চলে যায় সোমা। পাশের বাড়ি ওকে নামিয়ে দিয়ে টলতে টলতে ফিরে আসে নিরিবিলিতে রান্নাঘরের কোণে। হিস্টিরিয়া এলে বুঝি বেঁচে যেত সোমা। কিন্তু আজ হিস্টিরিয়া আর আসে না। সমস্ত দেহে ক্রিমির মত একটা ঘৃণা শির শির করে। শিল্পী বলে যাকে সে শ্রদ্ধা করে এসেছে, যার সকল অত্যাচার সহ্য করে এসেছে, সে ত শিল্পী নয়। সৃষ্টির ক্ষমতা কোথায় সে পাবে! অমন সুন্দর শিশুটিকে দেখে যার কুকুরের বাচ্চার কথা মনে জাগে, সে আর যাই হোক, শিল্পী নয়। নিদারুণ স্বার্থপর একটি মানুষের সঙ্গেই সে দিনের পর দিন কাটিয়েছে। একেই
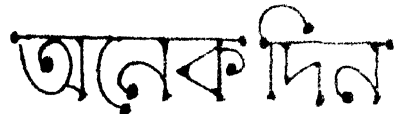
মানুষ দেখার চেয়ে গাছপালা প্রকৃতি দেখা কি নয়নাভিরাম নয়, সহর-প্রকৃতি মানে কি ইঁট-পাথর, লোহা, কংক্রিট? তা হলে সহর পরিকল্পনায় গাছপালার স্থান হয় কি করে? ভুল নয় তো, অবহেলা নয় তো! শুধু ইঁটের, শুধু পাথরের, শুধু লোহার সহর ভাবাই যায় না। লোহার বাসর ঘরে লখীন্দর রক্ষা পায়নি।

অনেক সতর্কতা অবলম্বন করে তবে এপারে আসা যায়। ফুল ফোটা গাছের তলায় দাঁড়ান যায়। গাছতলা ঠাণ্ডা বলে কি ট্রামে ভিড় কম হবে বলে ইতিমধ্যে বাথকাম অনেকেই এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। আহার সন্ধানী কাকের মত চঞ্চল দৃষ্টিতে যানবাহনের গতি লক্ষ্য করছেন। একটু ফাঁক পেলেই হয়।

না, ভবেশবাবু তা লক্ষ্য করছেন না—ভাবছেনও না। সে ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই তিনি পুনরায় যুদ্ধে নেমে পড়তেন, এমনি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতেন না, সরে দাঁড়াতেন না। হঠাৎ আজই বেলা গড়িয়ে বাসের ভিড়ে ধাক্কা খেয়ে বিভ্রান্ত স্মৃতি পুনঃপ্রত্যাবর্তনের মত জীবনটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, দশটা-পাঁচটার পারে তার স্বাদ বোধহয় ভিন্ন! ঐ একঘেয়ে ভিড়ও যেমন আছে, তেমনি গাছে গাছে নিত্য নূতন ফুল-ফোটার সমারোহ আছে। যে যেটা দেখতে পায়, চোখে পড়ে!

খুব ছেলেমানুষী হলেও ভবেশবাবুর মনে হয়, ওপারে জীবন-সংগ্রামের ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা পেট্রোলের, ডিজেলের গন্ধে যেমন ধূমায়িত হচ্ছে হোক না, নিজেকে যেমন বিচ্ছিন্ন করে প্রকৃতির কোল ঘেঁসে এসেছেন তেমনি থাকুন, কি গুটি-গুটি এদিক-ওদিক চলা-ফেরা করে আরো ফুল, আরো ফল, আরো গাছ দেখুন! কিন্তু মনের ইচ্ছেটাকে খুশী মত ছেড়ে দিতে কেমন সঙ্কোচ যেন মনে মনে। ভবেশবাবুর নিশ্চিত মনে হয়, তাঁর এই খেয়াল তাঁর আচরণে প্রত্যক্ষ হয়ে পরিচিত কারো কারো আলোচনার বস্তু হয়েছে।

'ওকি ওপারে কি করতে যাচ্ছেন? ট্রামে যাবেন নাকি!' সহকর্মী জ্ঞানবাবু অযাচিত প্রশ্ন করলেন। তিনিও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন বাস-স্টপে দাঁড়িয়ে।

দৌড় : ভবেশবাবু অস্ফুটে বলে চলে এলেন এপারে। মিলিয়ে দেখলেন চব্বিশ বছর চাকরি-জীবনের পূর্বাপর। সহুরে মানুষের ভিড়টা কবে থেকে এমনি উচ্ছ্বসিত হয়েছে ভাবাই যায় না, গবেষণার বিষয়! ঘোড়া-গাড়ির যুগ কবে শেষ হয়ে গেছে, শক্তি এখন তেলের।

চব্বিশ বছর যেন চব্বিশটা দিন করে শেষ হয়ে গেছে! মাথায় ঘন চুল পাতলা হওয়ার মত নিঃশব্দে বছরগুলো ঝরে গেল। পঁচিশ বছর বয়সে চাকরি হয়েছিল, ভবেশবাবুর অবাক লাগে ভাবতে, চব্বিশ বছর এই একই পথে অফিস এসেছেন, গেছেন, কখনো রোদে, কখনো জলে, কখনো বা যানবাহনের গোলযোগে পথে কিছু দেরী হয়েছে, আর কোন বৈচিত্র্যই ঘটেনি চাকরি জীবনে। কখন ফুরিয়ে গেল সেই চাকরির প্রথম রোমাঞ্চ?

আনন্দ, রোমাঞ্চ, গর্বই বটে! খুব নাকি শক্ত ছিল তখন চাকরি পাওয়া, অনেক কাঠ-খড়ের দরকার হত। চাকরির সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা রোমাঞ্চ যোগ হয়েছিল জীবনে—বিয়ে হয়েছিল, সংসার করেছিলেন ভবেশবাবু যথা নিয়মে, যথা সময়ে, যথা নির্দিষ্ট হয়ে। তারপর? এই চলছে!

অনেকদিন পরে গাছপালা অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওদিকে লাস্যময়ী সহর দেখতে দেখতে গতায়ু স্ত্রীর মুখটা মনে আনবার চেষ্টা করেন ভবেশবাবু। দু বছরও বোধহয় স্বামী স্ত্রী হিসাবে একসঙ্গে তাঁরা বাস করেননি। সে সময় বিয়ের পরেই বড় অশান্তি গেছে, ভবেশবাবুর বাবা প্রমোদবাবু কিছুতে পুত্রবধূর পিতৃকুলের সঙ্গে বনিবনা করতে পারেনি। শেষে—

না, স্পষ্টই মুখটা মনে পড়ে সুধাময়ীর! শান্ত, নিরীহ, গো-বেচারা কেমন যেন। নিজের মুখটা মনে মনে দেখে যেন ভাবতে পারেন ভবেশবাবু—কালে সে মুখেরও কিছু অদল-বদল হয়েছিল বিয়ের পরেই বিশ্রী একটা কাণ্ড ঘটে কি হয়ে গেল, লোকের কাছে মুখ দেখান ভার হয়েছিল! বাপের কথায় স্ত্রীর সম্বন্ধে কোন উৎসাহ আর প্রকাশ করেননি ভবেশবাবু। স্ত্রী এক রকম ত্যাগই করেছিলেন স্ত্রীকে ভবেশবাবু, অন্ততঃ তাই মনে হয় আজকের দিনে। বাপের নামে দোষ দিলে আর কেউ শুনবে না, অমানুষিক, নিষ্ঠুর কাজটা নিঃসন্দেহে!

তেমনি বাস-ট্রাম মানুষ গাদা! তেমনি উদ্ধ্বাস : তেমনি প্রাণপণ! বাড়ি ফেরার জন্য এত তাড়াহুড়ো, কেন? দু-পাঁচ, কি দু দশ মিনিট পরে ফিরলে আর কি ক্ষতি? সময়ের ঝুঁটি-ধরা অবস্থাটা যেন বোঝা যায় এই দশটা-পাঁচটার মানুষগুলোকে দেখলে। প্রাণান্তকর প্রতিদিন!

কি সুখ বাঁধা গরু-ছাড়া পাওয়ার মতন ঘরমুখো হয়ে? এই মুহূর্তে কোন যুক্তিই যেন খুঁজে পাওয়া যায় না। সবাই মিলে একসঙ্গে চেষ্টা না করলে অবস্থাটা অন্যরূপ হত! কিন্তু কি আশ্চর্য, কেউ বুঝবে না, কেউ শুনবে না, একসঙ্গে গুঁতোগুঁতি করবে!

কেবল আজই, এই মুহূর্তে যেন অবস্থাটার চিন্তাহীনতা উপলব্ধি করা যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে না দাঁড়ালে যেন কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। সংসার থেকে, সমাজ থেকে যাঁরা সরে দাঁড়ান তাঁরাই কেবল সংসার সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে মত দিতে পারেন। মানুষের চরম লক্ষ্য বা বাঁচার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল গুহাশ্রয়ী মানুষেরাই কিছু বলতে পারেন। ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং! কিন্তু সে সব কথা কে শুনেছে? গুহা থেকে গৃহ, আবার তার থেকে আরো কত কি মানুষের লক্ষ্য যখন হয়েছে—অরণ্য কেটে সহর বানিয়েছে!

আজকাল মেয়েগুলোর পর্যন্ত কি দুর্ভোগ! জীবিকার জন্যে ঘরের বাইরে বেরিয়ে সারাদিন অফিস করে কেমন সব এলিয়ে গেছে। সেই সকাল দশটার সঙ্গে এই বিকাল শা' পাঁচটা কি সাড়ে পাঁচটার কত তফাৎ! শোল দাঁড়ির এক মাথে পাক দিয়ে যেন খুঁটে ছেড়ে দিয়েছে—অফিস-ফেরৎ মেয়েগুলো বাসের-ট্রামের দরজায় দরজায় মাথা কুটছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে—সংরক্ষিত আসন আর বেশী দিন নয় যা বোঝা যাচ্ছে।

সেদিন বাসে ভবেশবাবু বসে আসছিলেন। পিঠে খোঁচা খেতে ফিরে তাকালেন। চিঁড়ে-চেপটা ভিড় ঠেলে মহিলাটি এগিয়ে এসেছেন, তাই খোঁচা দেওয়া লোকটি সতর্ক করেছে—লেডিজ! যেন খুব অপরাধ করেছেন। কারণও আছে, ও সিটে তিনি একাই বসেছিলেন আর কেউ বসেননি। একটা নিঃশব্দ কৌতুক যেন তাঁর অবস্থা নিয়ে—যেখানে দেবতারা ভয় পায় সেখানে নির্বোধেরাই কেবল—

কিন্তু ভদ্র মহিলাটি পাশে বসতে বললেন। সংসারে নির্বোধেরও জয় হয়! মুখ চেনা মহিলাটি, একই পথের পথিক বুঝি। কম করে ধরলেও, ঠিক স্মরণ না হলেও মাসে অন্ততঃ দশদিন এক বাসে কি ট্রামে অফিসে এসেছেন, ঘরে ফিরেছেন। আর ঐ দিনের পর সেই মহিলাটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন ভবেশবাবু। তারপর কতদিন লক্ষ্য করেছেন, কতদিন লক্ষ্য করেননি! ছুটির পর অফিস পাড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছেন আবোল তাবোল কত! দিবা-স্বপ্ন? কতদিন ভেবেছেন ভবেশবাবু, খুব নিকটের বস্তুকে মানুষ ইচ্ছে করলেই পায় না। মনোভাবটা ঠিক যেন কেউ কাউকে বোঝাতে পারে না। দূরে দূরে দূরেই কেবল! No Communication : চেষ্টা করেও এই দশ-পনের বছরেও মৌখিক আলাপ হয়নি। অথচ চাকরি করা মেয়ে এমন কিছু অভাবনীয় নয়। মন থাকলে কত রকমেই তো আলাপ করা যেত, যেমন আজ কি ভিড়! বাসে ওঠা অসম্ভব! কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন? রোজ এই এক ঝামেলা!

চাকুরীজীবী মানুষের আলাপ-পরিচয়ের পরিধি কত পরিমিত, সীমিত, নাতি বিস্তৃত। অফিসের কটা লোক, বাড়ির কটা লোক, আর বড়জোর দু-পাঁচজন অন্তরঙ্গ আত্মীয় স্বজন! সময় সময় বড় ইচ্ছে করে ভবেশবাবুর নিজেকে প্রসারিত করতে, বিকিরণ করতে সবার সঙ্গে মিশতে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে!

রাতে আজকাল অনেকবার জেগে ওঠেন ভবেশবাবু, মনটা এখন ভার-ভার লাগে বলবার নয়—সকালে উঠে মনে হয় ডাক্তার ডাকেন, প্রেসারটা দেখান, বয়সের রোগ বোধহয় হাত বাড়িয়েছে ধরবার জন্যে। উনপঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেল, আর একটা শীত ফুরলে পঞ্চাশে পা দেবেন। অনেক বয়স হয়ে গেছে। কোন মানে

হয় না এই একই অভিজ্ঞতা আর অবস্থার মধ্যে মনের ভার হয়ে বেঁচে থাকার! নিজের ভাবনায় নিজেকে কুরে কুরে খাওয়ার!

সত্যি কথা বলতে, এককালে খুবই ইচ্ছে হয়েছিল ভবেশবাবুর সহযাত্রিণী, চকিতদর্শিনী সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করবার। মেয়েটিকে দেখলেই কেমন যেন মনে হত, হয়তো একটু চেষ্টা করলে আলাপ হবে, দুজনের এমন মিলে যাবে—, স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ির পরই।

বয়স তখন তিরিশের কোঠায় ছিল, মনের কেমন একটা উন্মুখতা, সজীবতা ছিল, আকাঙ্খার একটা উত্তাপও ছিল। কতদিন কাছাকাছি হয়েও দূরে রয়ে গেছে। বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল ভদ্রমহিলার চেহারাটি, মুখটি—স্মিত, সুস্মিত, শান্ত, ধীর, স্থির! অথচ কালো!

তারপর অনেকদিন প্রশ্নটা মনে ছিল—আচ্ছা, এতদিন চাকরি করছেন, কই ভদ্রমহিলা তো বিয়ে করছেন না? কেন? নাকি বিয়ে ওঁর হয়ে গেছে? মাথায় সিঁদুর দেন না? ফ্যাশন বিনা-সিঁদুরের? বিনুনীর কি সর্প-কুণ্ডলীর?

এখন কয়েক দিন রোগা-রোগা দেখালেও মাঝে বেশ মোটা হয়ে উঠেছিলেন ভদ্রমহিলা! স্বাস্থ্য ভালই রেখে চাকরি করে। পুরনো মানুষ চাকরিকালে গিয়ে নতুন হয়ে ফিরে আসে। চাকরি করা মেয়েদের দেখলে আজকাল দেশের কোন দুঃখই মনে হয় না, ঐ তো কেমন সব চাকরি করছে, স্বাধীন মতে ঘুরছে ফিরছে।

চাকরি করে মেয়েরা অনেক চালাক চতুর হয়ে উঠেছে। তার সাক্ষী ঐ মহিলাটি। আজ কখন সটু করে বাস উঠে বাড়ি ফিরে গেছেন! ভবেশবাবু লক্ষ্যই করতে পারেননি। ভিড়ের মধ্যে কমনীয় আবেগে, নমনীয় পদক্ষেপে মহিলারা বেশ ওঠা-নামা করেন।

অযৌক্তিক হলেও কিছু অভিমান হয়। উনি ফিরে গেলেন, আর তিনি এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। যেন রোজ একসঙ্গে আসা-যাওয়া করবার কথা ছিল, কেউ কাউকে ফেলে যাবেন না, এড়িয়ে চলবেন না!

অসম্ভব! মুখ চেনা কি প্রায়-দেখা পথের মানুষের সঙ্গে এত খাতির কিসের? না বলা অঙ্গীকারের কি প্রতিশ্রুতির মূল্য কি? তবুও অবুঝ মন অনেক সময় অসার কল্পনায় অকারণ মান-অভিমান করে বসে।

ও'রা না হলেও বাসস্টপে যুগলে অপেক্ষা করতে আজকাল অনেককেই দেখা যায় অফিসের ছুটির পর। হয়তো তারা বাগদত্ত, হয়তো বা সহকর্মী, সহকর্মিণী হয়তো বা ভিন্ন সূত্রে পরিচিত। যাই হোক তবু পরস্পরে সান্নিধ্য-ধন্য! অনেকদিন ভবেশবাবু চেয়ে চেয়ে দেখেছেন, আর ভেবেছেন পথটা দুজনের অনেকটা এক সুতরাং একত্রে গমনাগমন এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়, কেবল সাথ করে বাসস্টপে এসে পৌঁছন, তা ছাড়া—

বাদাম গাছের মাথায় একটা বাদুড় এসে বসল। লাইনে ট্রাম অনেকক্ষণ আসছে না। জনমানবী সহরে বাদুড় ঝোলা রাস্তা যেন উচ্চকিত হল। মিউজিয়ম বাড়িটা বুড়ো হাতির মত স্থির। কখনো যাদুঘরে আসেননি ভবেশবাবু, আসবেন একদিন! দেখবেন ওখানে কি আছে, কে আছে, কারা আছে, কেন আছে? বেশ ভাল মেটিরিয়ালে তৈরী বাড়ীটা, শক্ত পোক্ত! অতীত বর্তমানের সংযোগ!

বাদুড়টা উড়ে গেল। ঝটপট ডানার শব্দ হল। পর পর গাছে গাছে সে শব্দের ঢেউ লাগল। মোড়ের মাথায় গাড়ির ভিড় কাঁকিয়ে উঠলো! অনেক সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বাঁধা-ধরা সময়ের রুটিন থেকে। একবার পিছিয়ে পড়লে আর এগিয়ে যাওয়া যায় না, পিছিয়েই থাকতে হয়। আরো এমনি করে থাকলে তো রাত ফুরিয়ে যাবে!

না, এবার একবার চেষ্টা করে দেখা যাক, পা বাড়িয়ে পিছু হেঁটে বাস স্টপে ফেরা যাক। অনেক দেখা হয়েছে আবার দেখা যাবে ভিড় থেকে ছিটকে আবার একদিন। বেশ ভাল লাগল আজ। নতুন স্বাদ নিঃসঙ্গ জীবনকে নানা সম্বন্ধে জড়িয়ে রেখে রেখে! স্বপ্ন? তা হোক, কে না জেগে জেগে স্বপ্ন দেখতে চায়, অসম্ভবের কল্পনায় আনন্দ পায়?

ছেলেটি নতুন তাঁদের অফিসে ঢুকেছে। এক নজরেই ভবেশবাবু চিনলেন।
আজকালকার ছেলে-ছোকরারা অনেক চালাক-চতুর, তাঁদের মত বোকা-সোকা নয়। তিনি হলে কি করতেন অফিসের বয়স্ক সহকর্মীর সঙ্গে হঠাৎ পথে দেখা হলে? নিশ্চয়ই কাছে আসতেন, শ্রদ্ধা বা সুহৃৎ জানাতেন—

ছেলেটি দেখেও দেখলে না। সঙ্গের মেয়েটিকে কি যেন ইশারা করলে। মনোহর দাসের পুকুরে গুমটির মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। ট্রাম-বাসের জন্যে ওদের কোন তাড়া নেই।

তবে ছেলেগুলো বড় বেপরোয়া হয়ে উঠেছে! দেখিয়ে দেখিয়ে মেয়েদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এই এতটুকু থেকে এত বড়টি পর্যন্ত। বড্ড খোলাখুলি, লজ্জার বালাই নেই।

নিজের মান নিজের কাছে। ভবেশবাবুও লক্ষ্য করলেন না। এগিয়ে গেলেন। দিন-কালকে কেউ ফেরাতে পারে না। মনোবল বা মনের কাঠামো সবার এক নয়। আজকালকার ছেলেরা যা পারে সেদিনকার ছেলেরা তা পারেনি। বৃথা আক্ষেপ, বৃথা অভিযোগ, বৃথা কটাক্ষ! দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই! মনোহরদাস-তড়াগের জল বন্ধ বহুকালের; আকাশ-চাওয়া বহুদিনের। মেয়েকে ছোট-বেলায় সেই একটা কবিতা পড়িয়েছিলেন ভবেশবাবু মনে পড়ছে— 'পুকুরের জল ভাবে, চুপ করে থাকি — একদিন ধোঁয়া ডানা মেলে, মেঘ হয়ে আকাশেতে গেল অবহেলে!' মানেটা খুকু বোঝেনি, তাকে বোঝান হয়নি। মাটির জল আকাশের মেঘ হয়ে বার বার মাটিতে ফিরে আসে।

প্রেম মানে কি? বুড়ো বয়সে আছো ভাবনা নিঃসঙ্গ জীবনের, একটা চেনা মুখকে ঘিরে! আকাশ শূন্য নয়, মানুষের হৃদয়ও নয়। শূন্যতাকে, অপূর্ণতাকে প্রকৃতি পরিহার করে। মানুষের মনও?......

ঘরে পা দিয়েই ভবেশবাবু বেরিয়ে আসছিলেন। মুখ-চেনা অফিস-পথের সেই মহিলাটি এসময় তাঁর বাড়িতে কেন? এতদিন পরে হঠাৎ তাঁর কাছে কি দরকার পড়ল? আর ঠিকানা কোথায় পেলেন?

ততক্ষণে মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়েছেন, হাত তুলে নমস্কার করে সপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, 'আসুন! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?'

নিজের কাছে নিজে কেমন অপ্রস্তুত বোধ করেন ভবেশবাবু, যেন অপরের ঘরে কোন নিবেদন নিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছেন, স্বাবলম্বিনী কোন স্বাধিকার-প্রমত্তার সম্মুখীন হয়েছেন। ভুলে গেছেন সময়-কালে আবেদনটি!

ঘরের আলোর তেমন জোর নেই, জানালা-গুলোও সম্পূর্ণ খোলা হয়নি। ওদিকে অন্দরের দরজাটা ভেজান। আপাততঃ ধারে-কাছে কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। দুজনেই নির্বাক। নিস্পন্দ মুহূর্ত।

চেয়ে চেয়ে যেন কৌতুক করে মহিলাটি বললেন, 'আপনার কাছে এলুম!'

ভবেশবাবু চোখ তুলে দেখলেন। মনে হল, যাঁকে সামনে দেখছেন ইনি সে নন, আর কেউ বোধ হয়। অনেক সময় চেনামুখ এমনি গোলমাল হয়ে যায়। ভবেশবাবু কি উত্তর দেবেন যেন ভেবে পেলেন না, মনের পাতা উল্টে উল্টে কোন কথা জোগাল না।

ভদ্রমহিলা স্মিত কণ্ঠে বললেন, 'আজ আপনার ফিরতে অনেক দেরী হল?'

এবার সহজভাবেই ভবেশবাবু উত্তর দিলেন, 'বাসের যা ভিড়, অপেক্ষা করে, আসতে হল!'

'একটা বাস ছাড়লে আর কোন বাসেই ওঠা যায় না!' অভিজ্ঞা মহিলাটি বললেন।

'তা যা বলেছেন! আজ একেবারেই কাঁদিয়ে ছেড়েছে, উঃ!' ভবেশবাবু ক্লান্ত-স্বরে বললেন।

'আমি প্রথমটাতেই উঠেছি!' বাহাদুরী হলেও এ বাহাদুরী যেন জাহির করবার মতন নয়, ভদ্রমহিলা মাথা নিচু করলেন।

'তা হলে অনেকক্ষণ এসেছেন বলুন! সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই—' ভবেশবাবু লক্ষ্য করলেন, মনের সংশয় গেলেও ভদ্রমহিলার রগের দুপাশে চুলে যেন পাক ধরেছে, মুখের রেখাও যেন কুঞ্চিত! বেশ বয়স হয়েছে মনে হয়। অথচ এই কাল, না পরশু এক বাসে ফিরেছেন, তখন কিছু মনে হয়নি। রাতারাতি মানুষ কত বদলে যায় কে লক্ষ্য করে?

চোখ তুলতে চোখাচোখি হল, মহিলাটি বললেন, 'অনেকক্ষণ এসে বসে আছি আপনার জন্যে। রোজ ভাবি আসবো আসবো, বাড়ি ফিরলে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।'

এতক্ষণে ভবেশবাবু শান্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলুন আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?'

ভদ্রমহিলা হাসলেন। চোখ বুলিয়ে ঘরটা দেখলেন, দেওয়ালের ছবিগুলো কেনা পট নয়, সস্তা ছাপা নয়, হাতে-আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ।

বললেন, 'ছবিগুলো বেশ!' একটু উঠে খুঁটিয়ে দেখলেন। ভবেশবাবু প্রশংসায় উজ্জ্বল হলেন। তাঁর নিজের হাতে আঁকা ছবিগুলো, কি খেয়ালে একদিন ছবি এঁকেছিলেন। আজ বোধহয় দাম পেলেন।

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে সরাসরি চোখ তুলে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

তেমনি উৎসুকভাবে ভবেশবাবু বললেন, 'বলুন, কি করতে পারি?'

সপ্রতিভ-কণ্ঠে মহিলা বললেন, 'আপনার মেয়েটিকে আমি চাই, মানে—'

ভবেশবাবুর মুখের দিকে চেয়ে ভদ্রমহিলা থেমে গেলেন। চাইবার জোর পেলেন না।

যে উজ্জ্বলতা আশা করেছিলেন তা প্রত্যক্ষ করলেন না। পৌরুষব্যঞ্জক কেমন যেন কঠিন ভবেশবাবুর মুখ। তবে থাক।

ভবেশবাবু উৎসুক আগ্রহে বললেন, 'মানে কি বলুন?'

ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে ভদ্রমহিলা আপন বক্তব্য বললেন। অফিস-ফেরৎ সোজা এখানে আসার উদ্দেশ্যও। ভবেশবাবু লক্ষ্য করলেন, ভদ্রমহিলা বার বার যেন খেই হারিয়ে ফেলছিলেন, থেমে থেমে কথার সূত্রকে মনে মনে জোড়া দিচ্ছিলেন। তাই অনেকটা সময় নিলেন।

ভদ্রমহিলা থামলে ভবেশবাবু বললেন, এরপর আমাদের আর কি বলবার আছে? প্রস্তাব করবারও কিছু নেই। ধরে নিতে পারেন ও হয়েই গেছে!

মাথাটা তেমনি নিচু করে রেখেছেন ভদ্রমহিলা, লজ্জাই পেয়েছেন ছেলের হয়ে মেয়ের বাপের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে এসে। কে জানে ভদ্রলোক অসুখী হলেন না তো? তিনি কি এমন যে তাঁর ছেলের সঙ্গে উনি নিজের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাবে রাজী হবেন? কি পরিচয় আছে তাঁর? কিছু না। একজন স্বামী পরিত্যক্তা আজ না হয় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন, একমাত্র ছেলেটিকে অনেক কষ্টে মানুষ করে তুলেছেন! তাতেই বা কি? সংসারে অমন অনেক আছে!

ভবেশবাবু বললেন, 'ঠিক আছে, আমি দেখবো!'

ভদ্রমহিলা আমতা আমতা করলেন, কিন্তু—

'কিন্তুর কিছু নেই, এ বিয়ে হবেই! আমরা বললেও হবে, না বললেও হবে। আজকালকার ছেলেমেয়ে তাই! আপনার ভাবনার কিছু নেই!'

'তবু বাপমার আশীর্বাদ, মত, সামাজিক সম্বন্ধ!'

'ও কিছু না, সংস্কার! মানলে আছে, না মানলে নেই!' ভবেশবাবু মাথা নেড়ে বললেন। না, যা ভাবা গিয়েছিল ভদ্রলোক তা নন, খুবই উদারমতাবলম্বী। স্বীকার করছেন ওদের ভালবাসাকে। একেবারে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন মনের দিক থেকে মুক্ত বলা যেতে পারে। এখন যেন মনে হয় শুধু ছেলের কথা নয়, নিজের কথাও ওঁকে অকপটে বলা যেতে পারে! শুনলে উনি আরো রাজী হবেন।

কিন্তু এই সামান্য সময়ে এক কথায় আর এক কথা বলা কি শোভন হবে? বিশেষ করে, উনি যখন বংশ-পরিচয় বা আত্ম-পরিচয় কিছুই জানতে চাননি। মনে মনে ভদ্রমহিলা যেন ঝাপরে পড়েন। এমন লোকের কাছে সবটা স্পষ্ট করে বলা উচিত, রেখে-ঢেকে কিছু বলা উচিত নয়। প্রদীপ কে, তার বাপ কে, সমাজে তার আপন-পর কে ইত্যাদি সব। কিন্তু কি করে বলবেন, এক কথা থেকে আর এক কথা? লজ্জা নয়, বড় সংকোচবোধ করেন।

ভবেশবাবু বললেন, 'আমাদের সময় এমন ছিল না, মেয়ের বাপকেই ধর্ণা দিতে হ'ত ছেলের বাপের দোরে। অনেক বাছাবাছি ক'রে তবে মালা গাঁথা হ'ত, ফুল কি সহজে ফুটতো ভেবেছেন? বিশ্রী! এই আমার দেখুন না, বাপ-মার কথায় বিয়ে করলুম, তারপর টাকা-পয়সার ব্যাপার নিয়ে ওঁদের বৈবাহিক সম্বন্ধ কি হল কে জানে, বেচারী মেয়েটা মাঝখান থেকে কষ্ট পেল, বাপের বাড়ি পড়ে রইল, তারপর একদিন মারা গেল! আমাদের মত সুবোধ বালকেরা সবাই বাংলা দেশের কত মেয়ে যে কষ্ট পাচ্ছে তার হিসেব নেই। পণের টাকাকড়িই আসল, মারা বিয়ে করবে তারা কিছু নয়! খুকীকে তাই তো বলি খুব করে লেখাপড়া শেখ, নিজের পায়ে দাঁড়া যেন তোর মাবাবার মতন কেউ তোকে অবহেলা করতে না পারে! তোর বাবার মতন একটা সুবোধ বালকের সঙ্গে যেন তোর বিয়ে দিতে না হয়!'

বেশ সহজ, সরল ভদ্রলোক! ভদ্রমহিলা আলাপ করবার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। বলেই ফেললেন, যা বলেছেন, এই বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের গায়ের রং আর গয়না নিয়ে কি বিশ্রী কাণ্ড না হয়। অনেক ক্ষেত্রে সম্বন্ধটাই ভেঙে যায়। এই আমারই কথাই ধরুন না। বিয়ের রাতে আমার গায়ের রং যেমন দেখা গিয়েছিল পরের দিন সকালে তেমন নাকি ছিল না। বরপক্ষ বললেন, কালো মেয়ে! তুমুল কাণ্ড করে তাঁরা বউ নিয়ে গেলেন বটে কিন্তু রঙ এর ঝগড়া কিছুতে মিটলো না। একদিন আমাকে এসে বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে গেলেন। সেই আপনার মতন ভালমানুষ স্বামী!'

ভবেশবাবু হাসলেন, 'ভালমানুষ নয়, নির্বোধ বলুন!'

তারপর উভয়ের অনেক আলোচনা হল। সেকাল, একাল এবং আগামী কালের বিয়ে কেমন ছিল, কেমন হচ্ছে, কেমন হতে পারে। দেখা গেল এ ব্যাপারে দুজনেই একমত পোষণ করেন। যে ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রীতি ভালবাসা বা জানাজানি হয়েছে সে ক্ষেত্রে অভিভাবক করে কিছু করা উচিত নয়। আজ মানলে কাল যে ওরা মানবে, তার ঠিক কি?

ভদ্রমহিলা বললেন, 'সেই ভয়েই তো আপনার কাছে ছুটে এসেছি। ছেলে কিছু না বললেও বুঝতে পারি যে [illegible]রটা! ছেলে আমার খুব ভাল, মা-অন্ত [illegible] তবুও—'

ভবেশবাবু বললেন, 'খুব ভাল কাজ করেছেন। ব্যাপারটা আমি জানলে, আপনার কাছে আগেই যেতুম। খুকী আমাকে কিছুই বলেনি। ঐ মাত্র মেয়ে আমার, সংসারে বাপ ছাড়া কিছুই জানে না!'

প্রদীপের মা মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। দেওয়ালের ছবিগুলো আবার দেখতে লাগলেন। হাতে আঁকা ছবিগুলো সত্যই সুন্দর!

ভবেশবাবু বলেই ফেললেন, এক সময় ছবিগুলো তিনিই এঁকেছেন। খুব শখ ছিল ছবি আঁকার। প্রদীপের মা শুনে আরো প্রশংসা করলেন। অকপটে বললেন, এমন ছবি তিনি কোথাও দেখেননি, অরিজিনাল!

তারপর আবার আসল কথা উঠলো। প্রদীপের মা বললেন, 'একদিন আপনি ছেলে দেখুন এসে। কবে আসবেন বলুন?'

'কেন, বাপের যাচাই করবো? তার চেয়ে আপনি যখন এসেছেন মেয়ে দেখে যান!' নিজের আঁকা ছবি নিজের মনে হয় না ভবেশবাবু, মনে হয় সে মানুষ কোথায় ছবি আঁকার?

'কেন রঙ-এর পরখ করবো? মেয়ে আমার দেখা! বেশ মেয়ে!' প্রদীপের মা বললেন।

'কিন্তু কালো মেয়ে আমার আগে আপনাকে বলে দিচ্ছি।' বড় গম্ভীর হয়ে ভবেশবাবু বললেন।

'মেয়ে কালো কিনা বিচার করতে আসিনি আপনার মত চাইতে এসেছি!' বেশ বিনীতকণ্ঠ ভদ্রমহিলার। হয়তো আরও কিছু আছে।

ভবেশবাবু বললেন, আমি অনেকক্ষণ রাজী হয়েছি, মত দিয়েছি।'

নিশ্চিন্ত হয়ে ভদ্রমহিলা বাড়ী ফিরে গেলেন। ভবেশবাবু একা-একা বাইরের ঘরে বসে নিজের মনে হাসতে লাগলেন। যে-কথাটা উত্তর তিরিশে মনে হয়েছিল সে-কথাটা প্রায় চল্লিশে সুযোগ পেয়েও বলা গেল না। এখন সম্বন্ধ বিপরীত দাঁড়িয়ে গেছে, উভয়ের পুত্র কন্যার সম্বন্ধে।

যুগান্তর (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক ১৬নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেনস্থ (কলিকাতা—৩) পত্রিকা প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ২নং আনন্দ চ্যাটার্জি লেন হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক——শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। যুগ্ম-সম্পাদক—শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী।